॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩৫ বর্ষ ১৩৭৪ ।

১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত

আধুনিক জীবনযাত্রার অঙ্গ নেস্‌কাফে

NESCAFÉ instant coffee

একমাত্র নেস্‌কাফেতেই পাবেন পরম আনন্দ

উৎকৃষ্ট কফির উপাদেয় স্বাদগন্ধে ভরপুর নেস্‌কাফে আপনার ভাল লাগবেই। নেস্‌কাফে তৈরী হয় বাছাইকরা সেরা কফিদানা সুনিপুণভাবে মিশিয়ে আর সেঁকে—নেস্‌কাফে ষোল-আনা খাঁটি ইন্‌স্ট্যান্ট কফি। হালফ্যাশানের কফি তৈরীর কায়দা হলো—কাপে শুধু এক চামচ নেস্‌কাফে আর তাতে গরম জল ঢেলে দেওয়া, ব্যস্। নেস্‌কাফেতে পয়সার সাশ্রয়। যার যেমন রুচি—পাতলা কিংবা কড়া—আলাদা আলাদা কাপে তৈরী করা চলবে। ফলে, অপচয়ের বালাই নেই, ফেলা যাবে না, এমন কি তলানিও পড়ে থাকবে না।

তৈরী করতে মাত্র ৫ সেকেণ্ড সময় লাগে। কাপে এক চামচ নেস্‌কাফে নিয়ে তাতে গরম জল ঢালুন—রুচিমাফিক দুধ ও চিনি মেশান। ব্যস্, আপনার কফি তৈরী। আর কোন ঝামেলাই নেই।

নেস্‌লের তৈরী

নেস্‌কাফে—স্বাদে অতুলনীয় কফি

JWT/NCE 5144A R

* নেস্‌কাফে হল নেস্‌লের ইনস্ট্যান্ট কফির রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

FDSUF863A

প্রকাশিত হল

দাম ৪·০০

বুদ্ধদেব গুহ সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত; কিন্তু তাঁর লেখা পড়লে সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত হবে। এমন চমৎকার অথচ অনায়াস একটি রচনাভঙ্গি তাঁর আয়ত্ত, যা কোনও আশ্চর্য এক যাদুমন্ত্রের মত পাঠককে মুগ্ধ ও আবিষ্ট করে রাখে।

"হলুদ বসন্ত" তাঁর প্রেমের উপন্যাস। কিন্তু শুধু প্রেমের উপন্যাস বললে এ বইটি সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। কারণ, প্রেমের উপন্যাস তো সবই—বাংলায় যত উপন্যাস লেখা হয় তার শতকরা নিরানব্বইটিই। "হলুদ বসন্ত" সেই নিরানব্বইয়ের মধ্যে একটি নয়—বলা যায়, একমাত্র।

বুদ্ধদেব গুহর

অনন্য প্রেমের উপন্যাস

হলুদ বসন্ত

একটি তরুণ যুবমনের তীব্র আবেগ-কামনাময় প্রচণ্ড ভালোবাসার যে অনন্য বাণীরূপ এতে বিধৃত হয়েছে, অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, হৃদয়ের যে তীব্র অনুভূতি, উদ্দাম বাসনা, যন্ত্রণাময় প্রবল আবেগ শুধু সমমর্মিতারই অনুভব্য, তা কেমন করে এই নতুন লেখক একজন নিপুণ সেতারী যেমন ধ্বনিরূপের মধ্য দিয়ে মানবহৃদয়ের আনন্দ-যন্ত্রণাকে প্রাণময় করে সঞ্চারিত করে দেন শ্রোতার হৃদয়ে, তেমনি করে সঞ্চারিত করতে পারলেন তাঁর এই কাব্যময় গদ্যগ্রন্থটির মাধ্যমে। এ বই শুধু পড়ার নয়, হৃদয় মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করার, যেমন করে মানুষ অনুভব করে কবিতা, গান, গানের সুর।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

বঙ্গসাহিত্যে রূপদর্শীর এক অক্ষয় অবদান গুল্পো। (গুল্পো = গুল+গল্প।) এ-হেন সরস এবং উপাদেয় বস্তু বঙ্গসাহিত্যপাঠকেরা যে আর কখনও চাখবার সুযোগ পাননি—এ কথা হলফ করে বলা যায়।

ব্রজদা ওরফে ব্রজরাজ কারফর্মা যেন বর্তমানের হতমান বাঙালী জাতির মুখর প্রতীক—অতীত গৌরবের স্মৃতিতে যে কূপের ব্যাঙের মত সর্বদা স্ফীত, অথচ অতীত মর্যাদা ফিরে পাওয়া যার সাধ্যাতীত; ফলম্ : সামর্থ্যহীন হামবড়াই মুখসর্বস্বতা এবং অতিশয়কথন—এমন এক অতি-আত্মাভিমানী পঙ্গুতা, প্রতি পদে পদে যা নিজেকে অন্যের কাছে হাস্যাস্পদ করে তোলে, তার এক আশ্চর্য নিখুঁত রূপায়ণ ঘটেছে ব্রজদার মধ্যে।

রূপদর্শীর

সমুদয় 'ব্রজদা'-কাহিনীর একত্র সংকলন

ব্রজদার গুল্প-সমগ্র

উগ্র সরব রঙ্গকৌতুকের অন্তরালে বুক-মোচড়ানো ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসটুকু এমন সুকৌশলে প্রচ্ছন্ন রাখার নৈপুণ্য একমাত্র রূপদর্শীতেই সম্ভব—রূপদর্শীর অতিখ্যাত নকশাগুলি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন।

এ যাবৎ রচিত ব্রজদার সমুদয় গুল্প-সম্ভার এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—তার মধ্যে এমন কয়েকটি গুল্পও আছে, যেগুলি ইতিপূর্বে কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং পরেও কখনও হবে না; যেহেতু ব্রজদা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন : এবারের বিজয়ার কোলাকুলিই শেষ; আর তিনি তাঁর মুখচন্দ্রমা গৌড়জন-সমক্ষে, কদাপি উপস্থিত করবেন না।

প্রকাশিত হল

দাম ৬·০০

বাংলা ভাষার সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৫ বর্ষ ।। সংখ্যা ১
শনিবার ১৭ কার্তিক ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪:

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭ ০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষাণ্মাসিক ,,	২৩.০০
ত্রৈমাসিক ,,	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

SATURDAY, 4 NOV 1967.

দেশ পত্রিকার নববর্ষ

দেশ পত্রিকা প্রকাশের আরও একটি বছর পূর্ণ হল; বর্তমান সংখ্যা থেকে 'দেশ' পঁয়ত্রিশ বছরে পড়ল। বাংলাদেশের সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে দীর্ঘজীবন লাভ করার নজির একেবারেই নেই এমন নয়, তবু সাপ্তাহিক পত্র বিরল দৃষ্টান্ত। গত তিন দশকের বাংলা সাময়িক পত্রিকার খোঁজ-খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, আজকের মতন পাঠকসংখ্যা সেকালে অপরিমিত ছিল না, আজকের পাঠকের ভিন্নমুখী রুচিও তখন তেমন দেখা যেত না, ব্যবসায়িক সাফল্যও তখন অনিশ্চিত ছিল; এমন একটি অবস্থাতেই দেশ পত্রিকার জন্ম; কিন্তু এই অনিশ্চয়ের মধ্যে পত্রিকাটিকে নানা সমস্যা ও বাধা দূর করে ক্রমশই পাঠকের মনোরঞ্জন লাভের চেষ্টা করতে হয়েছে, আর সেই দুরূহ কাজে সে সাফল্য অর্জন করছে। আজ 'দেশ' পত্রিকা বাংলা ভাষার একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে স্বীকৃত। এ গৌরব শুধু আমাদের নয়, বাংলা ভাষা-ভাষীরও। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে দেশের যে মর্যাদা তা সারা ভারতে আর মাত্র দু-তিনটি পত্রিকারই আছে। এই সাফল্যের জন্যে আমরা আমাদের লেখকদের, অনুগ্রাহকদের এবং সকল পাঠকদের কাছে ঋণী।

দেশ পত্রিকার জন্ম থেকেই তার একটি নীতি আছে। এই নীতি কখনও সংকীর্ণ হয় নি, দেশজ গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় নি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রায় সকল বিষয়ে আমরা উদার মনোভাব গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি এবং রচনা প্রকাশের ব্যাপারে যথাসাধ্য মুক্তমন হবার চেষ্টা করেছি। স্বভাবতই ভিন্ন রুচির পাঠক ও বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী পাঠকের মনে আমাদের প্রতি সহানুভূতি জেগেছে। কখনও কখনও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর মধ্যে যে তর্কাতর্কি সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ আমাদের এই নিরপেক্ষ মনোভাব। বস্তুত আমরা এটা কামনা করেছি, কারণ স্বাধীন ও স্বাস্থ্যকর চিন্তার খোরাক এইভাবেই সাময়িক পত্রিকাকে যোগাতে হয়। অনেক সময় সাহিত্য বিষয়ক ও সামাজিক বিষয়ক এমন রচনা আমরা প্রকাশ করেছি যা স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল তর্ক সৃষ্টি করেছে; বলা বাহুল্য, পাঠক-সমাজে এ ধরনের মতান্তর প্রয়োজন, কেননা আমরা মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার সবিশেষ মূল্য দিয়ে থাকি বলেই মনে করি এই বিরোধী আলোচনার দ্বারা সকলেই উপকৃত হই।

সাহিত্য বিষয়েও আমাদের মনোভাব উদার। এই পত্রিকা পাঠকদের মনোরঞ্জন করার আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ বলে মনে করে না। নানাভাবে আমরা চেষ্টা করি বিশ্ব-সাহিত্যের যে নবধারা চলেছে, যে আন্দোলনগুলি অন্যত্র ঘটছে তার একটা মোটামুটি পরিচয় দিতে। অন্যত্র চলছে তেমনি এখানেও যে-সব তরুণ লেখক বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন স্বাদ সংযোজন করার চেষ্টা করছেন আমরা তাঁদের যথাসাধ্য সুযোগ দিয়ে থাকি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেই শুধু এই সুযোগ দেওয়া হয় না, শিল্প ও সংগীতের ক্ষেত্রেও তা দেওয়া হয়। আমরা আশা করি, কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারছি।

রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের কোনো গোঁড়ামি নেই, তবে অবশ্যই একটা নীতি আছে। আমাদের পত্রিকা সংবাদপত্র অথবা রাজনৈতিক সাপ্তাহিক নয়, তবু এই পত্রিকায় দেশের ও বিদেশের যে রাজনৈতিক আলোচনা প্রকাশ পায় তার মধ্যে উদার মনোভাবের পরিচয় দেবার চেষ্টাই থাকে। আমরা স্বদেশের মঙ্গল এবং সর্বজনের মঙ্গলটাই যে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন এ কথা বিশ্বাস করি, এবং সেই নীতিই অনুসরণ করি। রাজনৈতিক দলবিশেষের প্রতি আমাদের যেমন দুর্বলতা নেই, দলবিশেষের প্রচারের প্রতিও আমাদের তেমন কোনো উৎসাহ নেই। স্বভাবতই এক্ষেত্রে কেউ কেউ কোনো রকম রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা অনুভব করতে না পারেন, কিন্তু আমরা নিরুপায়।

দেশ পত্রিকার নতুন বছরের শুরুতে সকল পাঠক, অনুগ্রাহক, লেখক ও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সকলের সমর্থন কামনা করে তাঁদের আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।
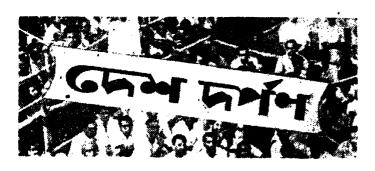
দুটো মুখ থাকলে একটা সুবিধা নিশ্চয়ই আছে। এক মুখে যা বলা যায়, অন্য মুখে তা ফিরিয়ে নেওয়া চলে। তবু অসুবিধাও অনেক। একটা বড় অসুবিধা দুমুখ ব'লে পরিচিত হবার আশংকা থাকে। সে আশংকাও উপেক্ষা করা হয়ত সম্ভব, যেমন, মনে হয়, সম্ভব হ'য়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে। কিন্তু রাজনৈতিক শংকা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। তাই কেবলমাত্র মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিই নয়, যুক্ত ফ্রন্টের অন্যান্য দলের মধ্যেও এই শংকার ছায়া পড়েছে।

আর-এস-পি বা রিভল্যুশনারী সোস্যালিস্ট পার্টির কথাই ধরা যাক। বেশ কিছুদিন আগে এই পার্টির সদস্য এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য তাঁর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটা ব্যক্তিগত রিপোর্ট দাখিল ক'রেছিলেন যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের কাজ সম্বন্ধে। শ্রীভট্টাচার্যের মতে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাগীদার হ'য়ে থাকা দলের পক্ষে নিরর্থক হ'য়ে উঠেছে। কারণ, যে ১৮-দফা কার্যক্রম হাতে নিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠিত হ'য়েছিল, তার কোনটাই কার্যকর করা বা হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই তিনি মনে ক'রেছিলেন আর-এস-পির সদস্য হিসাবে তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। কিন্তু পার্টির মনোনীত সদস্য হিসেবেই তিনি মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন। পার্টির নির্দেশ পেলে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন। তবে যুক্তফ্রন্টকে নিশ্চয় সমর্থন জানাবেন।

শ্রীভট্টাচার্য মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। কারণ তাঁর পার্টি তাঁকে অনুমতি দেয়নি। কথাটা সেখানেই চাপা পড়ে যায়। হয়ত এ প্রশ্ন শীঘ্র আর উঠত না। কিন্তু ২ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির পদত্যাগের সিদ্ধান্ত এবং তারপরের ঘটনা এ প্রশ্নটাকে আবার সামনে এনে দিয়েছে। আর-এস-পির যে আলোচনা বৈঠক বসবে কিছুদিনের মধ্যে, সেখানে এই কথাটাই বিশেষভাবে আলোচিত হবে। হয়ত ২ অক্টোবরের পদত্যাগ সিদ্ধান্তই আলোচনার একমাত্র বিষয়বস্তু হবে না, কারণ ইতিমধ্যে খাদ্যনীতি সম্বন্ধে আর-এস-পির পক্ষ থেকে একটা ভিন্ন মত ব্যক্ত করা হয়েছে। খাদ্য ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য আর-এস-পি এবং সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টারের পক্ষ থেকে বারবার দাবি জানান হয়েছে। কলকাতায় মিছিল ক'রে দাবিকে মুখর ক'রে তোলার প্রচেষ্টা হ'য়েছে। মন্ত্রিসভার যে বৈঠকে খাদ্যনীতি নির্ধারিত হ'য়েছে সেখানে তাদের দাবি স্বীকৃত না হওয়ায় প্রতিবাদ জানান হ'য়েছে। তাই পার্টির সর্বোচ্চস্তরে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

কিন্তু কেবলমাত্র আর-এস-পি বা এস-ইউ-সির চত্বরেই নয়, যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন ছোট বড় সরিকদের মধ্যেও পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অবস্থাকে নূতনভাবে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। রীতিমত একটা উৎকণ্ঠার ভাবও জড়িয়ে আছে। কারণ ২ অক্টোবরের পর যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে ফ্রন্টের প্রতিটি দলের মধ্যে একটা সন্দেহ বারবার উঁকি দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির প্রতি তাদের অনাস্থা নেই কিন্তু অস্বস্তির হাতটাও এড়িয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। চারদিকে যখন শোরগোল উঠেছে ২ অক্টোবর সম্বন্ধে, তখনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীঅজয় মুখার্জি বিবৃতি দিয়েছেন তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে। সব কথা এবং অনেক কথাই তিনি তাঁর বিবৃতি থেকে উহ্য রেখে দিয়েছেন; কিন্তু যে কথাটা জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন তা' হল কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁর মোহভঙ্গ।

এই মোহভঙ্গ হ'য়েছে কম্যুনিস্টদের স্ট্র্যাটেজিটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন ব'লে। অভিযোগ করা হ'য়েছে যে, চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টরা পশ্চিম বাংলায় 'বিপ্লব' সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টা পশ্চিম বাংলায় অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে, এই আশংকা দেখা দিয়েছে বলেই শ্রীঅজয় মুখার্জি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একঘরে করাই হয়ত ছিল উদ্দেশ্য।

অভিযোগ সত্য কি অসত্য, এ প্রশ্ন বড় নয়। বড় কথা—এই অভিযোগের পিছনে যে রাজনৈতিক প্রশ্ন আছে সেটা। প্রশ্নটা কম্যুনিস্টদের একঘরে করা। তাই কম্যুনিস্ট শিবিরে যে-সব দলগুলি আছে, তাদের চিন্তা করতে হ'চ্ছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা নূতন ক'রে নির্ধারিত করা প্রয়োজন কিনা। এইসব দলের বহু সদস্যের কাছ থেকে প্রশ্ন উঠেছে, কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি যদি কোন সময় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিতে পারেন, তাহলে ২ অক্টোবর যে আবার ফিরে আসবে না এমন কোন স্থিরতা আছে কি? যদি না থাকে, তাহ'লে শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বকে সামনে রেখে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করার রাজনৈতিক সার্থকতা আছে কি?

প্রশ্নটা আরও স্পষ্ট ক'রে দেখা দিয়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে। শ্রীঅজয় মুখার্জির পদত্যাগ প্রসঙ্গে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হ'য়েছে, তার জবাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিও শ্রীমুখার্জির বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ এনেছে। তাঁর ভাষায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে কম্যুনিস্টদের একঘরে করার প্রচেষ্টাকে আক্রমণ করেছে। এবং চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিম বাংলায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অভিযোগকে খণ্ডন ক'রে বলা হ'য়েছে যে পার্টির বিরুদ্ধে শ্রীগুলজারীলাল নন্দার "এই [illegible] কুৎসা" প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী প্রভাবিত হওয়ায় কম্যুনিস্টরা অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও গভর্নরের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে মিলিটারী ও অতিরিক্ত পুলিসী সাহায্যে জনগণের প্রতিবাদকে রক্ত গঙ্গায় ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থাকেই ষড়যন্ত্র বলে। "সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে তলে তলে এই ব্যবস্থা গ্রহণকে আমরা নিন্দা করেছি; এতে সংসদীয় গণতন্ত্রকেই শেষ ক'রে দেওয়া হয়"।

অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় শ্রীজ্যোতি বসু শ্রীঅজয় মুখার্জির বিরুদ্ধে অ-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের অভিযোগ এনেছেন এবং পরিষ্কারভাবে বলতে চেয়েছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তন যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠ পন্থা হবে জনগণের

মতামত গ্রহণ করা। অর্থাৎ পুনর্নির্বাচন। কিন্তু এই পুনর্নির্বাচন শ্রীবসু রাষ্ট্রপতির শাসনের আওতায় করতে চান না। তিনি চান যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আওতায় এই পুনর্নির্বাচন করতে হবে। এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কথা এবং শ্রীবসুর এই প্রস্তাব মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। এমন কি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পার্টি সদস্যদের কাছে নির্দেশ দিয়েছেন, 'সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা' করার জন্য পশ্চিম বাংলার সর্বত্র সভা, মিছিল, মোর্চা করতে।

এই নির্দেশের একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি পার্টির সদস্যদের আস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। নিঃসন্দেহে এটা নূতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কারণ নির্বাচনী ইস্তাহারেও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি পার্টির পক্ষ থেকে অনাস্থা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এই নূতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত পার্টির ভিতরে দ্বন্দ্বকে প্রবলতর করে তুলেছে। যে-সব পরিচিত সদস্যদের উগ্রপন্থী হঠকারী বলে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে, পরিষদীয় গণতন্ত্র বা যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। "আগামী ফসল রক্ষার লড়াই" উপলক্ষ করে এ-বক্তব্য আরও বেশী মুখর করে তোলার চেষ্টা হয়েছে; যুক্তফ্রন্ট সরকারকে "জোতদারের দালাল" বলে অভিহিত করা হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপ্লবের যে পঞ্চাশৎ-বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলেছে তা' উল্লেখ করে উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এটাই হবে নক্সালবাড়ীর প্রেরণা নিয়ে কৃষক বিপ্লবের সূচনা করার চরম মুহূর্ত। ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, জোতদারের ফসলের ন্যায্য পাওনা নিশ্চয়ই মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু উগ্রপন্থীরা ঘোষণা করেছে জোতদারদের তো নয়ই সরকারকেও ফসল বিলির ভার দেওয়া হবে না। "ফসল বিলির ভার থাকবে কৃষক সংগঠনের উপর।"

রাজনৈতিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের একাংশ যেমন সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে অটুট রাখার চেষ্টা করছে, উগ্রপন্থীরা তেমনি চেষ্টা করছে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের গায়ে কালি ছিটিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করা। উগ্রপন্থীদের কয়েকজনকে বেছে বেছে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে সত্য; কিন্তু এটা অনুমান করলে ভুল হবে যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে উগ্রপন্থীদের সমর্থক কেউ নেই। সম্প্রতিকালে এবং বিশেষ করে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হবার পর, রাজ্য কমিটির সেক্রেটারী শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন সাত হাজার নূতন সদস্য পার্টির তালিকাভুক্ত করার জন্য। তিনি দাবি করেছিলেন, সাত হাজারের কোঠায় পৌঁছতে খুব বেশী বাকী নেই। কিন্তু এদের মধ্যে বা অন্যান্য পুরোনো সদস্যদের মধ্যে যে উগ্রপন্থী নেই এটা হলফ করে শ্রীদাশগুপ্তও নিশ্চয়ই বলতে পারবেন না। অথচ পার্টির সদস্যদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশেরও বেশী উগ্রপন্থী বলে উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে দাবি করা হয়েছে। এই দাবিকে পার্টির পক্ষ থেকেও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ, এই দাবি যাচাই করার কোন সুযোগ এখনও দেখা দেয়নি। সুযোগ হতে পারে যদি পার্টির মধ্যে কোন সাংগঠনিক নির্বাচন হয়। এইরকম একটা ক্ষমতার লড়াই যে হতে পারে সে-আশংকাও অমূলক নয়। কারণ, পার্টি-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করার দাবি উঠছে বেশ কিছুদিন থেকে। যদি কোন সময় তা অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে প্রয়োজন হবে নির্বাচনে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। রাজ্যের নেতৃত্ব নির্ভর করে এইরকম একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার ক্ষমতার উপর।

তাই পার্টির সংগঠনের ভিতর যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা বা না থাকার যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা আর উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এটা বোঝা যায়, যখন দেখা যায় পার্টির পক্ষ থেকে সংগঠনের কথা প্রচার করা হচ্ছে এক বিশেষ ভঙ্গীতে। বলা হয়েছে পার্টির পক্ষে "শুধু লাইনই যথেষ্ট নয়"। আরও কিছু প্রয়োজন। এই আলোচনায় এই বক্তব্যটাই রাখা হয়েছে যে, ২ অক্টোবর মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাসা বহন করে এনেছে। —"কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার গ্যারাণ্টি কি? আর এরকম চক্রান্ত যে ঘটবে তা কি অস্বাভাবিক?" লক্ষণীয় যে "ঘটবে না" এ-কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ ঘটতে পারে এটা অনুমান করেই প্রশ্নটা রাখা হয়েছে পার্টির সামনে। বরং একথাটাই বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে, "শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হবার দিন যতই ঘনিয়ে আসবে, ততই শ্রেণীশত্রুরা মরিয়া হয়ে উঠবে;—কিন্তু এই আক্রমণ প্রতিহত করার গ্যারাণ্টি কি?"

স্পষ্টত প্রশ্নটা রাখা হয়েছে পার্টির নেতৃত্বের কাছে। মাদুরাই প্রস্তাবে এ কথাটা বলা হয়েছে যে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হবে এবং সেই সঙ্গে তীব্র হবে প্রতিআক্রমণ। এটা স্বীকার করে নিয়েই বলা হয়েছে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মত অ-কংগ্রেসী সরকারের শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে প্রতিআক্রমণ প্রতিহত করতে এবং শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর করতে। তবু আজ বলা হচ্ছে সঠিক 'লাইন' নির্দেশ করাই একমাত্র কর্তব্য নয়। সে 'লাইন'কে ঠিক পথে রাখার জন্য প্রয়োজন 'কর্মী নির্বাচন।' অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে 'কর্মী নির্বাচনের' প্রশ্ন তোলা হয়েছে; কারণ পার্টিকে সংগঠিত করে পার্টির রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে। তাই আজ শোনা যাচ্ছে পার্টির ভিতরে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কথা। শোনা যাচ্ছে, নূতন পার্টি নেতৃত্ব সংগঠিত করার কথা। পার্টির ভিতরে বাইরে আলোচনা চলছে সংগঠন ও যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সম্পর্ক নিরূপণ নিয়ে। শ্রীজ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্তের নেতৃত্ব নিয়ে। কারণ এটা অবিদিত নেই যে, শ্রীজ্যোতি বসু এবং শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির প্রচেষ্টায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে ২ অক্টোবরের ঘটনার পর।

এই গুঞ্জনটা যুক্তফ্রণ্টের অন্যান্য সরিকদের কানে উঠতে দেরি হয়নি। শ্রীঅজয় মুখার্জির বিবৃতির পর যে প্রতিবাদের আলোচনা শোনা গিয়েছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে হয়ত সেই বিতর্ককে সামনে রেখেই ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং জনসাধারণের মনে যে নিরাশা দেখা দিয়েছে তা দূর করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে ফ্রণ্টের সকল সরিকের সর্বশক্তি বিনিয়োগ করা। যুক্তি হিসাবে দেখান হয়েছে যে, জনসাধারণের আশাভঙ্গের সুযোগ নিয়ে এবং যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপলক্ষ করে প্রচেষ্টা চলছে পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করা। তা' প্রতিহত করে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি পুনর্নির্বাচনের প্রশ্নটা কিছুতেই সামনে রাখতে রাজী নয়।

এই আবেদনের কোন ফল দেখা দেবে কিনা সে-সম্বন্ধে কৌতুহল থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের কোন দলের যদি দুটো মুখে দুটো কথা উচ্চারিত হতে থাকে, তাহলে সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহ দেখা দেবে।

আরব-ইজরায়েল বিরোধ

সুয়েজ এলাকায় আরেক কিস্তি পকেট-যুদ্ধে লোকসান আগের মত এবারও আরবদের। এদিকে যুদ্ধবিরতি, রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকরা মোতায়েন—এদের খরচাটা যোগায় রাষ্ট্রপুঞ্জের গেরস্তরাই—তবু কামান বন্দুক চালাল মিশর ইজরায়েল দু'পক্ষই, ইজরায়েলের জাহাজ ডুবল মিশরী গোলায়, দু'দিন বাদে সুয়েজবন্দর, মিশরী তেলের খনি জ্বলে পুড়ে ছারখার ইজরায়েলীদের পাল্টা ঘায়ে। যেমন কর্ম তেমন ফল। কিন্তু এ-কর্মের শেষ কোথায়? ফলই বা গড়াচ্ছে কত দূরে? ইজরায়েলী জাহাজ মিশরী গোলায় কোথায় ডুবেছিল? মিশরী দরিয়ায়, না আন্তর্জাতিক দরিয়ায়, যেখানে ইজরায়েলী জাহাজ স্বচ্ছন্দে চলাফেরার অধিকারী? মিশর বলে, ইজরায়েলের ডেস্ট্রয়ার যুদ্ধজাহাজ ঢুকেছিল মিশরী দরিয়ায় .ইজরায়েল বলে, ওটা ডাহা মিথ্যা। যুদ্ধের সত্যাসত্য নির্ণয় ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মতই দুরূহ। দার্শনিক বলেন, আমরা যা বিশ্বাস করি তার সপক্ষে যাহোক কতকগুলি যুক্তি খাড়া করে নিই। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে এ-পক্ষে ও-পক্ষে যুক্তি প্রায় সেইভাবেই খাড়া করা হয়েছে। আরব-পক্ষের যুক্তি ইজরায়েল যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ভেঙেছে, অতএব ইজরায়েলই দোষী। ইজরায়েলপক্ষের কথা মিশরই যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে অন্যায়ভাবে ইজরায়েলী জাহাজ ডুবিয়েছে। অতএব সংঘর্ষের জন্য দায়ী মিশর।

নিরাপত্তা পরিষদ তো বিচারশালা নয় যে সেখানে নিক্তির ওজনে ন্যায় অন্যায় স্থির করা হবে। পরিষদের সদস্যারা এক একজন এক একটি দেশের রাষ্ট্রনীতির হিসাব মত চলেন; তার ওপরে আবার আন্তর্জাতিক জোড়-বিজোড়। নিরাপত্তা পরিষদ শেষ পর্যন্ত মিশর ইজরায়েল দু'পক্ষকেই অল্পস্বল্প নিন্দা করে ঠাণ্ডা হতে পরামর্শ দিয়েছে। এর বেশী কিছু করতে গেলে নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাব পাস করানো শক্ত, পাঁচটি মাতব্বর রাষ্ট্রের কেউ না কেউ "ভেটোর" জোরে প্রস্তাব নাকচ করে দিত। দুই মাতব্বর রাষ্ট্র, আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন, এদের দায়িত্ব এবং ভাবনাই এখন সবচেয়ে বেশী আরব-ইজরায়েলী বিরোধ ব্যাপারে। নিরাপত্তা পরিষদে এদের উদ্যোগেই আপাতত সাব্যস্ত হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ নয়, রাজনৈতিক বোঝাপড়া চাই। কিন্তু সে বোঝাপড়া হবে কীভাবে? কারাই বা করবে? এখন যা অবস্থা তাতে অনেকের আশঙ্কা আরব-ইজরায়েলী যুদ্ধ বেশ বড়রকমের আরেক দফা হবেই। গত জুন মাসের যুদ্ধে, আরবরা মার খেয়েছে সাংঘাতিক। এর আগেও দুবার আরবরা ইজরায়েলকে ঘায়েল করতে গিয়ে নিজেরাই প্রচণ্ড ঘা খেয়েছিল। তবু সাধ মেটেনি, সহজে মিটতে পারে না, কারণ আরবদের দাবি গোটা পশ্চিম এশিয়ার মালিক একমাত্র তারাই।

গত জুন মাসের যুদ্ধে চরম বিপর্যয়ের শিক্ষা প্রেসিডেন্ট নাসের অবশ্য একেবারে উপেক্ষা করতে পারছেন না। তবে ইজরায়েলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় রাজী হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ নয়। আরব জাতীয়তাবাদী সংকল্প ইজরায়েলকে প্যালেস্টাইন থেকে একেবারে মুছে ফেলা। এই জবরদস্ত দাবির উপরে দশ বছর ধরে প্রেসিডেন্ট নাসের গড়ে তুলেছিলেন আরব দুনিয়ায় তাঁর নেতৃত্ব। গত জুনের যুদ্ধে সে-নেতৃত্বে চিড় ধরেছে। ইজরায়েলের কাছে আরবরা কেবল হেরে যায়নি, হারিয়েছে আরও অনেক কিছু। মিশর, জর্ডন এবং সিরিয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে নিয়েছে ইজরায়েল। এ-সব এলাকা ইজরায়েল সহজে ছাড়বে না, জর্ডনের পশ্চিম তীর তো ইজরায়েল কখনই ছাড়বে মনে হয় না, তার আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য। প্রায় কুড়ি বছর ধরে আরবদের দুষমনির ফলে ইজরায়েল ক্ষতি সয়েছে বিস্তর। গত জুন মাসের যুদ্ধও বাধিয়েছিল আরবরাই ইজরায়েলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য জেহাদ ঘোষণা করে। এরপর ইজরায়েল কেন ফিরিয়ে দেবে সেই সব এলাকা যেখান থেকে মিশর, জর্ডন ও সিরিয়া তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল?

ইজরায়েলী প্রধানমন্ত্রী শ্রীএশকল খোলাখুলি বলছেন, জুন মাসে যুদ্ধের আগে ইজরায়েল-রাষ্ট্রের যে সীমানা ছিল সেটা হাস্যকর, ইজরায়েলী সীমানা আবার সেখানে গুটিয়ে নেওয়া চলবে না। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীদায়ান আরও স্পষ্টভাষী; তাঁর মতে জুন-যুদ্ধের পর ইজরায়েলী সৈন্যবাহিনী মিশর, জর্ডন, সিরিয়ার যে-সব এলাকা দখল করে নিয়েছে সে-গুলি নিয়েই ইজরায়েল রাষ্ট্রের এখন চমৎকার সীমানা। কেন চমৎকার সেটাও তিনি গোপন রাখেন নি। মিশরের সুয়েজখালবরাবর এলাকা, জর্ডনের পশ্চিম তীর, সিরিয়ার একটা প্রবেশপথ, এ-গুলি এখন ইজরায়েলের দখলে; আরবরা আবার নষ্টামি শুরু করলে এ-সব এলাকা থেকে ইজরায়েলী সেনাবাহিনী বেশ সহজেই কায়রো, দামস্কাস (সিরিয়ার রাজধানী), আম্মান (জর্ডনের রাজধানী) পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে। কথাটা সত্যি, ইজরায়েলী সৈন্যবাহিনী সে ক্ষমতা রাখে।

বেগতিক অবস্থায় আরবপক্ষ এখন কিছুটা নরম। তারা বলছে, জুন-যুদ্ধে অধিকৃত আরব এলাকাগুলি থেকে ইজরায়েলী সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিলেই আরবরা প্রতিশ্রুতি দেবে, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আর কখনও যুদ্ধ নয়। আরবদের এই ভালমানুষী ভাণে ইজরায়েল ভুলছে না। ইজরায়েলীদের মনে গত কুড়ি বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি; ইজরায়েলকে খতম করার জন্য আরবদের জেহাদী জিগীর আপাতত থামলেও শত্রুপরিবেষ্টিত ইজরায়েল কী করে ভরসা করবে আরবদের আশ্বাসে? আরবপক্ষে যুদ্ধের আয়োজন সমানে চলেছে। জুন-যুদ্ধে মিশরের ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনী সমস্তই বিধ্বস্ত হয়েছিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট নাসেরকে আবার ট্যাঙ্ক বিমান ইত্যাদি দিয়ে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করছে। কায়রোর মেজাজ অবশ্য জুন-যুদ্ধের আগের মত এখন আর অত চড়া নয়। ইজরায়েলের সঙ্গে রফা-নিষ্পত্তির চেষ্টায় প্রেসিডেন্ট নাসের রাজী কিম্বা অন্ততপক্ষে নিমরাজী। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে এ-রকম শোনা যাচ্ছে।

সুয়েজ খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকায় ব্রিটেনই নাকি এখন বেশী উদ্বিগ্ন। আরব-ইজরায়েলী বিরোধ মেটানোর জন্য তাই ব্রিটেনের গরজ। কায়রোতে ব্রিটিশ কূটনৈতিক তৎপরতার ঝোঁক দেখে ইজরায়েল খুশী হচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট নাসের খুব বিচক্ষণ লোক, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি চান, ব্রিটিশ সরকারী মহলের এই নতুন সুরের প্রচার উপভোগ করবার মত। গরজে বিষম বালাই, নতুবা কায়রো এবং লণ্ডনের মধ্যে গত দশ বছরের প্রচণ্ড বিরোধ-বিদ্বেষ হঠাৎ উবে গিয়ে দু'পক্ষ থেকেই ভালবাসার কথা উঠছে কেন? ব্রিটেনের দৌত্যকালীতে কতটা কাজ হবে বলা শক্ত। ইজরায়েল কখনই এমন কোন প্রস্তাব মেনে নেবে না যাতে তার নিরাপত্তা আবারও বিপন্ন হওয়ার পথ খোলা থাকে। এর অর্থ গত জুন-যুদ্ধে ইজরায়েল যে-সব এলাকা থেকে আরবদের হটিয়ে দিয়েছে সে-গুলির কিছু কিছু অংশকে নিরাপত্তার প্রয়োজনে ইজরায়েল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। এ বিষয়ে ইজরায়েল দৃঢ়-সংকল্প।

৩০।১০।৬৭

এবার যোগীদের মধ্যে বিলেত যাওয়ার হিড়িক লাগবে

'যোগানন্দ'

শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের বিটলেরা এক ভারতীয় 'ইয়োগী'র কাছেই তাঁদের 'পুরুষার্থ' খুঁজে পেয়েছেন। শাস্ত্রে বলে, ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হচ্ছে পুরুষার্থ—আশা করা যাচ্ছে এবারে তাঁদের যাবতীয় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধি-ভৌতিক দুঃখের নিরসন ঘটবে। ভারতীয় ভাব-প্রেরণায় বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলেন, এতদিনে তাঁরা একেবারে পরম তত্ত্বটি খুঁজে পেয়েছেন মনে হচ্ছে। এইবারে হৃষীকেশের আশ্রমে এসে তাঁরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবেন, ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করতে থাকবেন এবং উদীয়মান 'অ্যাণ্টি-বায়োটিকে'র যান্ত্রিক কোলাহল নিশ্চয় তাঁদের বিন্দুমাত্রও বিব্রত করতে পারবে না।

যে মোহিনী যাদুকরী ইউলিসিসের নাবিকদের কতগুলো পোষমানা জন্তুতে পরিণত করেছিল, ক্রুদ্ধ নীরদচন্দ্র চৌধুরী এতদ্দেশেই তার সবচেয়ে সার্থক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই 'সার্সে' (নাকি সার্সি? না-গ্রীক 'কির্কে'?' উচ্চারণবিদেরা দয়া করে সংশোধন করে নেবেন) নামীয় রূপসীটির কথা স্মরণ হলেই আমার শিল্পী দোসো-দোসির সেই অপূর্ব মাস্টারপীস্ ছবিটিকে মনে পড়ে যায় এবং 'পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনী'র ইত্যাকার রবীন্দ্র-উক্তিসহযোগে ইউলিসিসের সহযাত্রীদের খুব দুর্ভাগ্য বলে বোধ হয় না। নীরদ চৌধুরী যে দেশের কথা লিখেছেন, সে দেশের সার্সেরা মোহিনী নয় মোহন; তাঁরা দোসো-দোসির সেই অপরূপা নারী নন—তাঁদের মুখে লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়ি আছে। যাঁরা চর্মচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি, তাঁদের অবগতির জন্যে আমি সংবাদপত্রে প্রকাশিত মহেশ যোগীর ছবিটি রেফার করছি।

ভুল বুঝবেন না— কোনো যোগীর প্রতি বিন্দুমাত্র নিন্দাবাদ আমার উদ্দেশ্য নয়, তাঁদের দাড়ি সম্পর্কেও আমি কোনোরকম কটাক্ষপাত করতে চাইছি না। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ যা-ই বলুন প্রত্যেকেরই তাতে মৌলিক অধিকার আছে, আর এ সংসারে কেই বা কার 'দাড়ি' ধরে? আমি বলছিলুম, আগ্রার তাজমহল আর কলকাতার আবর্জনা সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগেই ভারতীয় 'ইয়োগী'রা তাঁদের মোহন-মন্ত্রে বিদেশীদের বরাবর আকর্ষণ করতেন : "তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না!"

আর যোগ-ব্যায়ামের তো জয়-জয়কার। কিছু দিন আগে একটি বিদেশী পত্রিকায় ছবি দেখছিলুম, ইজরাইলের রাষ্ট্রপতি বেন গুরিয়ন আর বিশ্বখ্যাত বেহালাবাজিয়ে ইয়েহুদী মেনুহিন এক সঙ্গে যোগ-ব্যায়ামের চর্চা করছেন—অধঃশির ঊর্দ্ধপাদ 'পদ্ম' রচনার সে কি নিদারুণ প্রয়াস। দেখে নয়ন-মন একেবারে জুড়িয়ে গিয়েছিল! কে বলে, ভারত আজ নিঃস্ব! তার অ্যাটম বোমা না-ই থাকল—যোগী আর যোগ-ব্যায়ামের জোরেই সে আজও বিশ্বজয় করতে পারে। তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত মহেশ যোগী।

ভারতীয় যোগীদের এই জয়যাত্রা যে কতকাল আগে শুরু হয়েছিল, খুব সম্ভব কোনো ঐতিহাসিকও তার তথ্য নির্ভুলভাবে পেশ করতে পারবেন না। এই কীর্তিস্তম্ভের মূলে কে আছে? শৈবধর্ম? বৌদ্ধধর্ম? আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আসলে অ্যাটম বোমাই হোক আর স্পেস-ফ্লাইটই হোক, আজও আমেরিকা আর ইউরোপের অধিকাংশ দেশই 'ইয়োগী' শুনলেই রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—তারা জানে, 'ইয়োগী' মাত্রেই 'ইণ্ডিয়ান রোপ-ট্রিক' দেখাতে পারে, ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারে, অব্যর্থ 'ট্যালিজম্যান' তাদের হস্তামলকবৎ!

জনশ্রুতি শুনেছি (সত্যি-মিথ্যের দায়িত্ব আমার নয়)। ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে পয়সা-কড়ির টানাটানি পড়লেই রোজগারের একটি অমোঘ উপায় আছে। ফস করে একবার 'ইয়োগী' সেজে বসতে পারলেই হল, তারপরেই আর ভাবনা থাকে না। জনৈক বঙ্গসন্তান নাকি বিপাকে পড়ে এইভাবে 'ইয়োগী' হয়েছিলেন। তাঁর অবশ্য বিশেষ কিছু করতে হত না, রোপ-ট্রিক নয়, ভাগ্য-গণনা নয়, যোগ-ব্যায়াম শেখানো নয়—কিছুই না। তিনি 'ইয়োগী'র বেশ ধরে 'মৌনী বাবা' সেজে একটা পোশাকের দোকানের সামনে (কিংবা 'শো-কেসে'?) ঘণ্টা কয়েক সিটিং দিতেন কেবল। তাঁর সেই আধ্যাত্মিক মূর্তিটি দেখেই দোকানে লোক ভেঙে পড়ত—'বাম্পার বিজনেস' যাকে বলে! কৃতজ্ঞ দোকানদারও 'ইয়োগী'কে বঞ্চনা করত না, এবং সন্ধ্যার পরের সময়টুকু এই 'ইয়োগী' যেভাবে কাটাতেন—তার সঙ্গে যোগের সম্পর্ক সামান্যই—বরং সেটাকে তান্ত্রিক ব্যাপার বলা চলে। কিন্তু সেকথা থাক। খুব সম্ভব ইংল্যাণ্ডের নিউমোনিয়ার ভয়ে এবং পকেট

বিটলরা আমাদের মারিজুয়ানায় দীক্ষা দেবে

কিঞ্চিত ভারী হওয়ার পরে বঙ্গীয় 'ইয়োগী' এই লুক্রেটিভ ব্যাপারটি পরিত্যাগ করলেন, নইলে আজ তাঁর যৌগিক খ্যাতি দেশে-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ত!

আবার সবিনয়ে নিবেদন করছি, এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমি কোনো সৎ এবং সিদ্ধযোগীর প্রতি কোনো কটাক্ষ-ক্ষেপণ করছি না। এই ভারতবর্ষে জন্মে যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতায় আমার যতখানি বিশ্বাস আছে আতঙ্ক আছে তার দশ গুণ! কে না জানে, এই লেখা পড়ে যদি তাঁদের কেউ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তা হলে সুনন্দর কলমের কালি হঠাৎ তেল হয়ে যাবে, এক লাইনও লিখতে পারব না। কিংবা দুম করে 'বাক্-স্তম্ভ' ঘটে যাবে—চেঁচিয়ে মরব প্রাণপণে, অথচ গলা দিয়ে এতটুকু আওয়াজ বেরুবে না। অথবা দড়াম করে শুকনো ডাঙায় একটা আছাড় খাব—তারপর কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার—থাকো পাক্কা ছ'টি মাস বিছানায় পড়ে। না—আমি কাউকে চটাতে চাই না, আমি শুধু বিটলস-বিজয়ী যোগী শ্রীমহেশের কথা ভেবে বিমোহিত হচ্ছি।

কিন্তু ভারতীয় 'ইয়োগী'দের আন্তর্জাতিক খ্যাতি যা-ই থাক—ভারতবর্ষে তাঁরা বিশেষ 'ভিখ' পান বলে তো মনে হয় না। খুব সম্ভব প্রদীপের নীচেই অন্ধকার থাকে। নইলে—এমন কি, 'একই পালকের পাখি' ভারতীয় যোগীরা পর্যন্ত শ্রীমহেশ সম্পর্কে বিরূপ কেন? ঈর্ষা? না—এমন পাপ কথা অনুচ্চার্য—কারণ যোগীরা এসব তুচ্ছ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে থাকেন। আসলে, পর্বতের পাদমূলে দাঁড়িয়ে তার শিখর দেখা যায় না—তা যদি না হত তা হলে জনৈক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী আবিষ্কৃত সেই 'পানিওলা মহারাজ'—যিনি রাজস্থানের মরুভূমি থেকে জলধারা নিষ্কাশন করতে যাচ্ছিলেন—তাঁকে লোকে ঠাট্টা-তামাশা করে এমনভাবে উড়িয়ে দেবে কেন?

আপাতত মহেশ যোগীর জয় হোক। তিনি সব কোড-ভাঙা বিদ্রোহী 'বিটলস বাহিনীকে' বশীভূত করেছেন—ভারতের গৌরব-গাথায় এটিও ভবিষ্যতে গীত হতে থাকুক। বিটলেরা হৃষীকেশ-লছমনঝোলা-মণিকূট পেরিয়ে ক্রমশ সাধনার মহাপ্রস্থানে এগিয়ে চলুন—'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে!'

আচ্ছা, যোগীরা যখন এতই পারেন তখন তাঁদের কাছে কিছু চাল-টালের দাবি পেশ করা যায় না?

আমরা বিটলদের যোগে দীক্ষা দেব

আপনি যদি কখনো কুতুবমিনারে, কি আইফেল টাওয়ারে কিংবা নিদেনপক্ষে কলকাতার কোনো তেরো বা পনেরো তলা বাড়ির ছাদে উঠে নিচের রাস্তা লোকজন গাড়িবারান্দা বাগান গাছপালার দিকে একবার, এবং নিকটবর্তী আকাশ মেঘ ও নক্ষত্রদের দিকে আরেকবার চেয়ে দেখেন, আপনার তখন দু-রকম চিত্তবিকার ঘটতে পারে। এক, পা সিরসির করবে, মাথা ঘুরবে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসবে, ঘাম হবে—একটু ভয় ভয় করবে; ভয়টা মৃত্যু ভয়। আর দুই, দূর থেকে দেখা পরিচিত দৃশ্যগুলি—যাদের হয়ত আপনি প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন, তাদের জন্যে মায়া হবে, স্নেহ জাগবে। ঈশ্বর যেমন অনেক ওপর থেকে আমাদের দেখেন বলে আমাদের প্রতি কোনো ক্রোধ পুষে রাখতে পারেন না, নাস্তিককেও সমান ক্ষমার চোখে দেখেন, অনেকটা তেমনি গুরুজনপ্রতি করুণায় আপনার বুক দুরুদুরু করবে। ঠিক সেই সময়ে রেলিং থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত, কারণ নিচে লাফিয়ে পড়ার লোভ আপনি সংবরণ না-ও করতে পারেন। ভয় হোক বা লোভই হোক, আসলে সেই মুহূর্তে মৃত্যু আপনাকে অধিকার করে। কাছে এসে ফুসলোয় বন্ধুর মতন।

কিন্তু, যেহেতু মৃত্যুর পরের ব্যাপারটা একেবারে অন্ধকার, তাই জীবন নিয়ে তিত-বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছাড়তে পারি না আমরা। ছাড়তে চাই না। কলকাতা থেকে আম্বালায় বদলি হয়েছি শুনলেই যেমন এই ঘিঞ্জি শহরটার নোংরা ধোঁয়া ধুলো ও শব্দের কুৎসিত স্মৃতিগুলো ফিকে হয়ে আসতে থাকে ক্রমশ, এবং তার বদলে ওর প্রিয় মুখটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চোখের সামনে, তেমনিই আমাদের এই দুর্বিষহ মানুষ-জীবনটার জন্যে টান। অবশ্যম্ভাবী জেনেও মৃত্যুর জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে ইচ্ছে করে না। আকস্মিক হোক, তাই চাই। বারুদ নেই মশলা নেই, বাঁচার হয়ত কোনো মানেই নেই—তবু জীবনকে উপভোগ করছি ভেবে আমরা দুর্ভোগই বাড়াতে পছন্দ করি। অভাবগ্রস্ত হলে ভাবি সচ্ছলতা পেলে সুখ, সচ্ছলতা পেলে ভাবি আত্মনির্যাতন বা অন্যের ওপর অত্যাচার না করলে মজা লাগছে না। এইভাবে একটা কাল্পনিক লক্ষ্যবিন্দুর দিকে গোল হয়ে ছুটতে ছুটতে একসময় বলের সঙ্গে নিজেও গোলপোস্টের ভেতর ঢুকে যাই।

> ত্রিশঙ্কু ছদ্মনামের আড়ালে বাংলা দেশের একজন অত্যন্ত শক্তিশালী তরুণ লেখক 'আলোয় কালোয়' শিরোনামে ধারাবাহিক রম্যরচনা এ-সপ্তাহ থেকে শুরু করেছেন। সাহিত্যের সত্য ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার জন্য লেখক আমাদের প্রতিদিনের চেনা জগৎ থেকে শুরু করে এমন সব অচেনা, ভয়ংকর, বীভৎস, রহস্যময় পরিবেশের কথাও লিখেছেন যা বাংলা সাহিত্যে এতকাল প্রায় অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। একই সঙ্গে মুগ্ধ ও শিহরিত হবার মতন প্রতিটি রচনা।—সম্পাদক

আমার মৃত্যু হলে দুনিয়ার কারো একবিন্দু ক্ষতি হবে না, শূন্য জায়গাটা কচুরিপানায় ভরে যাবে আবার, এই নিষ্ঠুর ও সুন্দর সত্যটি উপলব্ধি করে যদি মৃত্যুকে প্রার্থনা করি, তা হলে অনেক অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। জীবনযাপন হয় সুসহ, দিনের পর দিন অদৃশ্য স্থান থেকে নিক্ষিপ্ত আলপিনগুলো আর গায়ে বেঁধে না। তখনই জাহাজের ভোঁ শুনলে দূরের জন্য মন কেমন করে উঠবে।

এই রকম মনোহর অবস্থাটি তৈরি করতে হলে অবশ্য মাঝে-মাঝে শ্মশানে যাওয়া দরকার। একটি মৃত ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ততার স্বাদ নেওয়া দরকার। সতীসাবিত্রীর শবের দিকে, তার সিঁদুর ভর্তি এলোকেশের দিকে তাকিয়ে বলা দরকার: 'এখন না গেলেই নয়, আরো কয়েকটা দিন থেকে যান না বৌদি!' কিন্তু মুশকিল এই যে, তখনই সেই মৃত যুবতীর আবার বেঁচে ওঠার সাধ হতে পারে। একবার দেখেছিলাম, চিতার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে, শরীরের মাঝখানটা হু-হু করে পুড়ছে কালো হয়ে, কিন্তু ভদ্রমহিলা তাঁর প্রশংসার জায়গাগুলি নষ্ট হতে দিচ্ছেন না। লাল টুকটুকে নধর পা দুখানি চিতার বাইরে ভাসিয়ে রেখেছেন, একরাশ চুলসমেত লাল টুকটুকে মুখটি ঘেমে যাচ্ছে, কিন্তু বিকৃত হচ্ছে না। প্রশংসার জন্যে এত লোভ!

মহিলাটির মতো নির্বোধ নই বলে নিজের মৃত্যুর সময়ে আমার এতটুকু কাতরতা ছিল না। ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি, —একবার পুজোর ছুটিতে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে কয়েকদিন কাটিয়ে আমরা কয়েকজন কলকাতা ফিরলাম। অতিরিক্ত আহ্লাদ হওয়ার ফলে এক সন্ধ্যায় গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, পা কেটে গিয়েছিল একটু। প্রকৃতির সাম্রাজ্যে আধুনিক চিকিৎসা নিষিদ্ধ বলে স্বভাবতই কোনো ওষুধপত্র লাগানো হয়নি। ফলে শহর তার প্রতিশোধ নিল। খড়্গপুর থেকেই পায়ের যন্ত্রণা বেশ প্রবল হয়ে উঠল। রাত দশটা নাগাদ যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছই, তখন বেশ জ্বর, শীত না লাগলেও কাঁপুনি হচ্ছে। চরণখানি নাড়তে পারছি না। বন্ধুদের কাঁধে ভর করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলাম। গৃহে চিকিৎসার চেষ্টা ফলবতী হলো না, কারণ সব ডাক্তার-বাবুরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঠাকুর-ভাসান দেখতে বেরিয়েছেন। অগত্যা একটি রিকশায় চেপে মধ্যরাত্রে নিকটবর্তী নগণ্য হাসপাতালে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করতে হলো। হাসপাতালের লোকেরা অত্যন্ত দয়ালু, ধনুষ্টংকারের সূচনা বলে সন্দেহ করলেন। নিচে অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রেখে আমার শয্যা রচনা করলেন। শরীরের আর এক নাম মহাশয়, অতিরিক্ত যন্ত্রণা সহ্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলে জ্বর ১০৬ ডিগ্রি উঠতেই ক্রমশ চৈতন্য লোপ পেতে লাগলো, যন্ত্রণাটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাবোধ কমে আসতে লাগলো। একটা অদ্ভুত আচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে আছি ভাসমান নৌকোর মতন, দুলছি একটু একটু জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝখানে এবং

ডাক্তার-নার্সদের তৎপরতা উপলব্ধি করছি। ওঁরা টিটেনাস্‌-নিরোধক ইনজেকশন প্রস্তুত করছেন, আমাকে অচেতন ভেবে সশব্দে আলোচনা করছেন: একটুখানি দিয়ে আগে দেখি পেশেণ্ট নিচ্ছে কিনা, যদি উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে বেলেঘাটায় নিয়ে যেতে হবে অস্ত্রোপচারের জন্যে, এ্যাম্বুলেন্সে তুমি যাবে আর তুমি যাবে—দেখবে, পথে রোগী না শেষ হয়ে যায়।' কাঁদো কাঁদো গলায় এক সিস্টার বলছেন: 'একী আরম্ভ হোল, যতো লস্ট কেস আমার ভাগে পড়ে।' তারপর অল্প একটু সূচের শব্দ টের পেলাম হাতে, কয়েকটি গরম নিশ্বাস আমার মুখের ওপর পড়ছে, কয়েক জোড়া উদ্বিগ্ন চোখ আমাকে বিদ্ধ করছে। বুঝতে পারছি দশ মিনিটের মধ্যে সব জানাজানি হয়ে যাবে এ রোগী বাঁচবে কি না।...কিন্তু এই সময় আমার বন্ধুরা কোথায়? তারা কি কাল সকালের আগে জানতে পারবে?

মৃত্যু যন্ত্রণা বলে একটা ব্যাপার আছে। আমরা অনেকেই তা দেখেছি কারো-না-কারো মৃত্যুশয্যায়। বড়ো বীভৎস সে দৃশ্য। কিন্তু আমার ধারণা, যে মুমূর্ষু সে সবচেয়ে কম ওই যন্ত্রণা ভোগ করে। মহাশয় শরীর একটা সীমা পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত, তারপর উপলব্ধি কেন্দ্রটি বিকল করে দেন। মস্তিষ্ক শান্ত হয় তবে স্নায়ুগুলি ছটফট করে অকারণ অভ্যাসে। সে কারণে আমার কোনো মৃত্যু-ভয় ছিল না, 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চীৎকার করার প্রয়োজন ছিল না। ভাসমান নৌকোর মতন আমি একটা ঝড়ের অপেক্ষা করছি, উঠলেই সুইচ অফ হয়ে যাবে- তারপর তো আমার দায়িত্ব শেষ; তখন চিকিৎসক নার্স আত্মীয় স্বজনদের ছুটোছুটি শুরু হবে, পুনরায় চেতনা ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো কর্তব্য নেই। আমার মনে হোল, চমৎকার এই তুরীয় অবস্থান যেন একটা ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে একবার এপার একবার ওপার চেয়ে দেখা। কে টানছে বেশি, আয়া, আমি সেইদিকেই যাবো। কার স্নেহ বেশি আমার প্রতি, আয়া, আমি তারই স্নেহপ্রার্থী। জীবন এবং মৃত্যু দুপাশে দড়ি ধরে টানছে—নরম বিছানার ওপর আমি সেই অবশ দড়িটির মতো টান হয়ে আছি। আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। যে-পক্ষের শক্তি বেশি সে-পক্ষ আমায় নিয়ে যাও।...শুধু বন্ধুবান্ধবদের মুখ যদি দেখতে পেতাম একবার। যদি বিদায় যানাতে পারতাম।

চোখ মেলে চাইলাম, কোনো দৃশ্য নেই। শুধু লাল নীল সবুজ ইত্যাদি রঙের চঞ্চলতা। লাল সবুজ নীল...কানের ভেতর সমুদ্রের নিচের গভীরতার শব্দ...নীল সবুজ লাল...মাথার মধ্যে কার রথের ঘটর...সবুজ লাল নীল...আমার বুকের ওপর কার স্নেহময় স্পর্শ। তবে কি পৌঁছে গেছি?...

ডাক্তার বললেন, 'বাকিটা দিয়ে দাও। এযাত্রা বেঁচে গেল মনে হচ্ছে।'

গ্রামোফোন রেকর্ডে কবিকণ্ঠ

গত ২৩শে সেপ্টেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় সুনন্দর জার্নাল পড়ে জানতে পারলাম, গ্রামোফোন কোম্পানী এবারে একটি অভি-নব রেকর্ড বার করেছেন। এর একদিকে আছে কয়েকজন খ্যাতিমান কবির স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি এবং অন্যদিকে আছে কয়েকজন সুপরিচিত আবৃত্তিকারের কণ্ঠে কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবির কবিতা আবৃত্তি। এ খবরে বিশেষ আনন্দিত হলাম। এজন্য গ্রামোফোন কোম্পানীকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। কোম্পানী যদি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকণ্ঠে গীত গান এবং নজরুলের স্বকণ্ঠে আবৃত্তি—এগুলি উদ্ধার করে নূতনভাবে রেকর্ড করেন, তবে তাঁরা আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করবেন। চেষ্টা করলে পুরানো রেকর্ডগুলি তাঁরা উদ্ধার করতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

—শ্রীমতী করুণা বিশ্বাস,

মেদিনীপুর

[২]

গ্রামোফোন কোম্পানি যে বাংলা কবিতার এলপি রেকর্ডটি সম্প্রতি পরিবেশন করে-ছেন, সে সম্বন্ধে সুনন্দ ও চাণক্যের মন্তব্য পড়েছি। রেকর্ডটি শোনার পর আমি সুনন্দের সঙ্গে একমত হয়ে অকুণ্ঠিতভাবে অভিনন্দিত করছি গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে, বিশেষভাবে শান্তি লাহিড়ীকে। চাণক্যের অভিনন্দন 'কিন্তু'-তে কুণ্ঠিত, অথচ বাংলা কবিতার এই অনুপম সংকলন উদ্যম বিনা এই স্মরণীয় প্রয়াস সার্থক হতো কিনা বলা কঠিন। অতএব পাঠক হিসাবে আধুনিক বাংলা কবিতার অনুরাগী-দের অকৃপণ কৃতজ্ঞতা শান্তি লাহিড়ীর অযাচিত প্রাপ্য। মুদ্রিত বইয়ের পাতার কোণে বন্ধ থাকার জন্য যে কবিতা নয়, বাক্যবন্ধের অন্তর্গত সংগীত না জানলে সে কবিতার স্বরূপকে জানা যায় না, এই প্রচেষ্টায় verses and voices যুক্ত হয়ে সেই কথা আমার মনে করিয়ে দিল।

চাণক্য 'কিন্তু'-র তালিকায় পরিকল্পনার অভাব, পক্ষপাতিত্ব ও অপ্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন তুলেছেন। অভিনেতাদের চেয়ে কবিদের পড়া ঢের ঢের ভালো হয়েছে কিনা জানি না, তবে অভিনেতারা আবৃত্তি করেছেন, কবিরা কবিতা পাঠ করেছেন—দুটো ধরণ আলাদা। কবিরা শব্দের প্রতি অনুগত, অভিনেতারা স্বভাবতই কণ্ঠক্ষেপের কথা ভুলতে পারেননি। তবু, দুই গোষ্ঠী সম্বন্ধে এমন সাধারণ মন্তব্য করা যায় না, যেমন চাণক্য করেছেন। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের কণ্ঠ আকাশবাণীর টেপে ধরা ছিল, কিন্তু শুনলাম, সেই টেপ রক্ষা করা হয়নি। এই শোনা কথা যদি সত্য হয়, তাহলে দোষ শান্তিবাবুর নয়, আকাশবাণীর কোনো কর্ম-চারীর অদূরদর্শিতার।

শান্তিবাবুর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কয়েকটি সংশয় নিবেদন করছি। রবীন্দ্রনাথের পর যদি রবীন্দ্রনাথই প্রথম হন, তাহলে সে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'র নন, 'প্রান্তিক' বা 'শেষ লেখা'র রবীন্দ্রনাথ। সেদিক থেকে 'প্রথম দিনের সূর্য' বা 'দুঃখের আঁধার রাত্রি' জাতীয় কবিতা নির্বাচন অনেক সঙ্গত হত বলে আমার বিশ্বাস। আর এই নির্বাচিত কবি-গোষ্ঠীতে সুকান্ত ভট্টাচার্যকে স্থান দিলে সাময়িক রুচির পরিচয় দেওয়া হয় না সম্ভবত। অবশ্য এ সব বিষয়ে মতভেদ সম্ভব এবং সর্বজনকে খুশি করা কোনো সম্পাদকের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু জীবনা-নন্দের 'আট বছর আগের একদিন' 'আট বছর পরে একদিন' হলো কী করে?—কোন্‌ হোমারীয় ঝিমুনির বা ফ্রয়েডীয় অসতর্ক-তার সুযোগ? এখন বোধ হয় শোধরানোর কোনো উপায় নেই। বিনীত—

অশ্রুকুমার সিকদার

শিলিগুড়ি

মহাস্থবির জাতক

(চতুর্থ পর্ব)
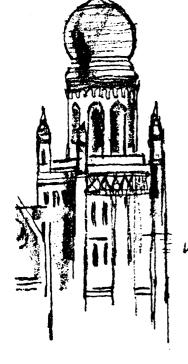
যথাসময়ে কল্যাণে নেমে কিছুক্ষণ হেঁটে সেই জঙ্গলে এসে পৌঁছোন গেল। সামনের দিকটা অর্থাৎ যে দিকটা লোকালয়ের দিকে সেদিক থেকে আরম্ভ করে ভেতরের প্রায় আধ মাইলটাক লম্বা ও আধ মাইলটাক প্রস্থ জমি পরিষ্কার করে আবাদ করা হচ্ছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকে সরু রাস্তা দিয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে একখানা পাতা দিয়ে ছাওয়া ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। মেটাজী উচ্চৈঃস্বরে কয়েকবার কি একটা বলে চীৎকার করতেই ঘরের ভেতর থেকেই জবাব দিয়ে বেরিয়ে এল একজন বেঁটে মতো বেশ গুন্ডা-গোছের লোক, হাঁটুর ওপরে মালকোঁচা-মারা ধুতি পরা, গায়ে একটা ফতুয়া গোছের হাত-কাটা জামা। জামাটার সামনের দিকে একটা বড় তাপ্পি পকেট। লোকটাকে দেখেই আমাদের বাবা কানী আস্তে আস্তে বললে, এ যে ভুলু সর্দার দেখছি।

লোকটা কাছে এসে একবার আমাদের আপাদমস্তক দেখে, তারপর মেটাজীর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল। মেটাজী ও ভুলু সর্দার আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগল আর আমরা তিনজনে তাদের পশ্চাদনুসরণ করতে লাগলুম।

জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূরে গিয়ে বিরাট একটা ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হলুম। দেখলুম, এক দিকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে কলার বাগান করা হয়েছে। বেঁটে বেঁটে কলাগাছ—তাতে কাঁদি ভর্তি বড় বড় মোটা কলা গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল, সেখানে চিচিঙ্গার ক্ষেত করা হয়েছে—তিন-চার হাত লম্বা হাজার হাজার চিচিঙ্গে উঁচু মাচা থেকে মাটির দিকে ঝুলছে। বড় বড় মানুষের সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল দু হাতে সরিয়ে তার মধ্যে রাস্তা করে মেটাজী ও ভুলু সর্দার আগে চলেছেন—তাঁদের পেছনে আমরা চলেছি। সম্মুখে পিছনে আশেপাশে মোটা মোটা বড় বড় গাছ—সেসব গাছের চেহারাও কখনো দেখিনি, নামও শুনিনি। এইসব গাছে জাহাজের কাছির মতন মোটা ও শক্ত পাকানো পাকানো লতা ঝুলছে। কোনো কোনো জায়গায় জঙ্গল এত ঘন যে, গাছের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হয়ে আছে। কত দিন যে সেখানকার জমিতে সূর্যালোক স্পর্শ করেনি, তার ঠিকানা নেই। জায়গাটা একেবারে স্যাতসেঁতে হয়ে আছে। এক জায়গায় দেখলুম, অনেকখানি জমি পরিষ্কার করে লাঙল দিয়ে চষা হয়েছে—প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন স্ত্রী-পুরুষে মিলে সেই জমি থেকে আগাছা ও পাথর ইত্যাদি বেছে এক জায়গায় জড়ো করছে। আমরা আসতেই তারা দাঁড়িয়ে

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

[প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর লেখা 'মহাস্থবির জাতক'-এর চতুর্থ পর্বের প্রথমাংশ এ বছরের শারদীয়া দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, শেষাংশ এই সপ্তাহ থেকে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। চতুর্থ পর্বে লেখক যে কাহিনী লিখে গিয়েছেন তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সুযোগ তিনি পান নি, লেখা অসমাপ্ত রেখেই বিদায় নিয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় এই পর্বের কিছু টুকরো কাহিনী বিভিন্ন সময়ে একাধিক সাময়িক পত্রে তিনি প্রকাশ করেছিলেন, যে কারণে অনেক পাঠকের কাছেই এ লেখার কিছু অংশ পূর্ব পঠিত মনে হতে পারে। কিন্তু একালের বহু পাঠক, যাঁদের বয়েস পঁচিশের কম, তাঁরা লেখকের কৈশোর-জীবনের বহু বিচিত্র রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়বার সুযোগ পান নি মনে করেই আমরা সম্পূর্ণ চতুর্থ পর্ব এই পত্রিকায় প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। তাছাড়া লেখকের লিপিকুশলতার এমনই আশ্চর্য যাদু আছে যে একবার পড়া কাহিনী দ্বিতীয়বার পড়েও সমান আনন্দ উপভোগ করা যায়। —সম্পাদক]
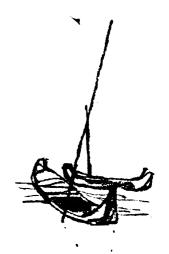
উঠে অবাক হয়ে আমাদের দেখতে লাগল। পুরুষগুলির গায়ে কোনো জামা নেই, কোমরে এক খণ্ড বস্ত্র জড়ানো, তাতে কোনো রকমে লজ্জা-নিবারণ হয়েছে মাত্র। মেয়েদের দেহেরও উত্তরার্ধ একরকম নগ্ন বললেই চলে। কোমরে একটু বস্ত্র জড়িয়ে রেখেছে। পুরুষ কিংবা স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত রোগা। পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা, দেখে মনে হয়—কোনো রকমের খাদ্য তাদের পেটে পড়ে কিনা সন্দেহ। সকলেই অদ্ভুত এক রকমের দৃষ্টিতে বিশেষ করে আমাদের তিনজনকে দেখতে লাগল।

মেটাজী ও সর্দার আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল। এইখানে মেটাজী পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন—এই এদের সংগে তোমাদের কাজ করতে হবে। কাজ এমন হাতী-ঘোড়া কিছুই নয়—একটা বাচ্চা ছেলেকে বললেও সে করতে পারে।

এই অবধি বলে আবার তারা কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগল। আমাদের সামনে ও পেছনে বিস্তীর্ণ অরণ্য, দক্ষিণে ও বামে ছোট পাহাড়ের সারি। মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী জংগলের দু' দিকে উঁচু পাথরের দেওয়াল গেঁথে রেখেছেন। এক এক জায়গায় জংগল সংকীর্ণ হয়ে গেছে—দু' দিকের পাহাড় অনেক কাছাকাছি হয়েছে। দেখলুম প্রায় সর্বত্রই এই পাহাড়ের গা বয়ে নিরন্তর জল ঝরছে—তারই ফলে পাহাড়ের গায়ে শেওলা জন্মেছে। কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দেখা গেল এক খণ্ড প্রকাণ্ড পাথর তারই ওপর দিয়ে একটা শীর্ণ জলধারা এসে নিচে একটা ডোবার মতন সৃষ্টি হয়েছে। মেটাজী আমাদের বললেন—এই দেখ কেমন সুন্দর ঝরনা! এরা এই জল খায়।

কিছুদিন আগে কুঞ্জবাবু আমাদের কাছে যে ঝরনার কথা বলেছিলেন, বোধ হয় এই সেই ঝরনা। আরও কিছু দূরে অগ্রসর হবার পর মনে হল যেন এতক্ষণে আমরা গভীর জংগলের মধ্যে এসে পড়েছি। ছোট বড় গাছ ও লতায় মাথার ওপরে চাঁদোয়ার মতন একটা আচ্ছাদন সৃষ্টি হওয়ায় জায়গাটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও নির্জন বলে মনে হতে লাগল। এখানকার পথও পরিষ্কার নয়, বেশ বুঝতে পারা গেল যে এদিকে লোকজন বড় একটা কেউ আসে না।

এই দিকে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর দূরে একটা বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। বাড়িখানা দেখে কালী বললে—এই পাণ্ডববর্জিত স্থানে কোন শৌখিন এমন বাড়ি তৈরি করলে!

এমন সময় মেটাজী পেছন ফিরে আমাদের বললেন—ঐ দেখ তোমাদের বাড়ি! এমন জায়গায় এমন সুন্দর বাড়িতে লাটসাহেবও থাকতে পায় না।

একটু এগিয়েই আমরা বাড়ির কাছে এসে উপস্থিত হলুম। আমাদের [illegible] সারে প্রায় দশ বারজন নারী ও পুরুষ শ্রমিক যে আমাদের অনুসরণ করছিল তা আমরা টেরই পাইনি। এইখানে এসে দাঁড়াতেই তারা আরও কাছে এগিয়ে এসে আমাদের ভাল ক'রে দেখতে লাগল। কিন্তু সর্দার রক্তচক্ষু বার ক'রে বিকট চীৎকার ক'রে তাদের ভাষায় কি সব বলায় সকলেই ধীরে ধীরে ফিরে চলে গেল। সর্দার মহাশয়ের এই বিকট আওয়াজ শুনে তাঁর মেজাজের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে অর্থাৎ আমরা যাতে বুঝতে পারি—মেটাজীকে বললেন—শুয়োরের বাচ্চারা অত্যন্ত পাজি, শয়তান এবং অসম্ভব রকমের চালাক। আপনার সংগে কথা বলতে বলতে ভুলে ডাণ্ডাটা ফেলে এসেছি—হাতে ডাণ্ডা নেই—বুঝতে পেরেছে যে, এখন আর মারতে পারবে না—অমনি আমাদের পেছু পেছু এসেছে মজা দেখতে! কাজে কোনো রকমে ফাঁকি দিতে পারলে হয়।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর বাড়িখানা ভাল ক'রে দেখলুম। বেশ বড় পাথরের বাড়ি—অনেকটা গির্জা ধরনের। মাটি থেকে প্রায় আড়াইতলা উঁচু পাথরের গাঁথুনি ক'রে, সেখানে ঘর বানানো হয়েছে। ঘরের চারিদিকে দরজার মতো বড় বড় জানলা। মেটাজী ও সর্দার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। বলা বাহুল্য—আমরাও তিনজনে তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করলুম।

ওপরে গিয়ে দেখলুম প্রকাণ্ড একখানি ঘর—যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া—ঠিক গির্জাঘরের মতন। ঘরের মেঝে ও দেওয়াল কাঠের। দেওয়ালে চমৎকার ওয়াল-পেপার মারা। ঘরখানাকে মাঝে পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ঘরের পাশেই আলাদা ভিতের ওপরে তৈরী ছোট্ট একখানি ঘর। বেশ বুঝতে পারা গেল, এক সময়ে এই ঘরে কমোড ইত্যাদি থাকত।

মেটাজী বললেন এই ঘরে সায়েবদের পায়খানা ছিল, তোমরা এইখানেই রান্না-বান্না করো।

মেটাজী আরো বললেন—নিচে একখানা রান্নাঘর আছে বটে, কিন্তু তোমরা এইখানেই ব্যবস্থা করো। আজ থেকেই কাজে লেগে যাও—একটা দিনের 'রোজ' কেন আর মারা যায়!

সেই বিরাট ঘরের এক কোণে আমাদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলিগুলো রেখে তখুনি তৈরী হয়ে নিলুম। মেটাজী ব'লে দিলেন—দেখ, ভোর ছটার সময়ে ছুটি পাবে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে খেয়ে দেয়ে আবার বেলা একটার সময় গিয়ে কাজে লাগবে আর ছুটি পাবে বিকেল ছটায়। দুপুরে ছুটির সময় জল-টল তুলে রাখবে। কারণ বিকেলে ঘরে এসেই সিঁড়ির দরজা ভালো করে বন্ধ ক'রে দেবে। তারপরে আর নিচে নামা চলবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—কেন মশায়?

তিনি বললেন—এ জায়গাটাতে আবার সন্ধ্যের পর জানোয়ার বেরোয় ব'লে শুনেছি।

কি জানোয়ার বেরোয় সে কথা জিজ্ঞাসা করায় মেটাজী ধমকে উঠে বললেন—সে কথায় তোমাদের দরকার কি? বারণ করলুম, দরজা খুলে রেখো না। বাস।

কথায় কথায় মেটাজী বললেন—মনে করো না যে, তোমরা এসে এখানে থাকবে বলে শেঠজী তোমাদের জন্য এই বাড়ি তৈরি ক'রে রেখেছেন।

মেটাজীর মুখে অনেকক্ষণ থেকে এইসব কাকাটি কথা শুনতে শুনতে আমার ধৈর্যচ্যুতি হল। বলে ফেললুম—তা যে হয়নি তা আমরা জানি। ভাগ্যদোষে আজ আমাদের এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে ব'লে মেটাজী মনে করবেন না আপনার চাইতে আমাদের বুদ্ধি কিছু কম আছে।

আমার কথা শুনে মেটাজীর মেজাজ একেবারে [illegible] গেল। তিনি ব'লে উঠলেন—না না, রাগ করছ কেন, আমি ঠাট্টা করেছি।

মেটাজী বলতে লাগলেন—এইখানে [illegible] ক্রীশ্চান পাদরী থাকতেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম না আমেরিকা—এই রকম কোনো একটা জায়গায় ছিল তাঁদের বাড়ি। ঠিক কোন জায়গায় তাঁদের বাড়ি তা তিনি জানেন না, তবে তাঁরা ছিলেন একেবারে গোরা।

জিজ্ঞাসা করলুম—তাঁরা এখানে কী করতেন?

—তাঁরা এসেছিলেন এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে আলোক-বিকিরণ করতে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতে পালাতে পথ পেলেন না ব'লেই মেটাজী উচ্চ হাস্য করলেন।

কিন্তু মেটাজীর কথাটা শুনে আমরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করলুম না। জানোয়ারের কথা শুনে মনটা আগেই দমে ছিল—তার ওপর ক্রীশ্চান পাদরীদের পলায়নের কথা শুনে আরও দমে গেলুম। ভাবলুম ক্রীশ্চান পাদরী—যাঁরা আফ্রিকার সিংহসংকুল গভীর অরণ্যে নরখাদক অর্ধমনুষ্যদের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে

দিতে ভয় পায় না তারা। কিসের ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে চলে গেল! আর আমরাই বা এমনকি তালেবর লোক যে, সে স্থানে আমাদের নিয়ে এসে রাখা হচ্ছে।

ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয় মনে ক'রে মেটাজীকে জিজ্ঞাসাই করে ফেলা গেল—হ্যাঁ মশাই, ক্রীশ্চান পাদরীরা এখান থেকে ভেগে গেল কিসের ভয়ে?

মেটাজী সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন—যেতে দাও। অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে—এবার কাজে চল। তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করেছ?

বললুম—কী বন্দোবস্ত হবে! আমরা তো এই এলুম! তা ছাড়া আমাদের ট্যাঁকে তো কানাকড়িও নেই। রসদ কিনতে হলে পয়সা চাই তো।

আমাদের কথা শুনে মেটাজী সর্দারের সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রে বললেন—আচ্ছা, আজকের দিনটা কোনো রকমে চালিয়ে যাও। কাল বিকেলে তোমাদের দু' দিনের 'রোজ' দেওয়া হবে—তাই দিয়ে বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে এনো। চল, এখন কাজে লেগে যাও।

ঘর থেকে নেমে আমরা চললুম আবার যেখানে কাজ হচ্ছে। চলতে চলতে আমরা মেটাজীকে বললাম—সর্দারকে বলুন আমাদের একটা বাটি ও একটা জলপাত্র দিতে। জল না খেয়ে থাকব কি করে?

মেটাজী সর্দারের সঙ্গে কথা ব'লে আমাদের বললেন—কাজ শেষ ক'রে বাড়ি ফেরবার সময় সর্দারের বাড়িতে গিয়ে চাইলে উনি বাটি দেবেন।

মেটাজী ও সর্দারের পেছনে পেছনে চলতে লাগলুম। এক জায়গায় এসে তাঁরা দাঁড়াতেই আমরাও দাঁড়ালুম। সেখানে দেখলুম পথের দু'ধারে বড় বড় মানুষ সমান ঘাস হয়ে রয়েছে। সর্দার বললেন—এই যে বড় বড় ঘাস দেখছ—এর নিচে [illegible] জমিতে আলুর চাষ আছে।

মেটাজী আবার ব'লে দিলেন—এটা আলুর ক্ষেত—দেখো গাছ [illegible] দেখো যেন ঘাস তুলতে আসল গাছ তুলে ফেলো না।

মেটাজী যাবার সময় বললেন—বেশ মন দিয়ে কাজকর্ম করবে। আমি সর্দারকে ব'লে গেলুম সে কাল তোমাদের 'রোজ' দেবে, তাই দিয়ে বাজার ক'রে এনো।

মেটাজী বিদায় নিলেন আর আমরা জয় দুর্গা ব'লে মনের আনন্দে আলুর ক্ষেতে ঘাস তুলতে লেগে গেলুম। আমাদের আশেপাশে যেসব নরনারী মজুরের কাজ করছিল তারা কিছুক্ষণ এই জামা-পরা মজুরদের দিকে অবাক হয়ে দেখে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ বোধ হয় আমাদের

গোছের লোক ছিল। ধুতি-জামা ছেঁড়া হলেও ওরই মধ্যে সুবিধা পেলেই সে সাবান নিয়ে কেচে পরিষ্কার ক'রে নিত। যতদূর সম্ভব ছেঁড়া জায়গাটুকু ঢেকে সে গুছিয়ে ধুতি পরত। একটি আয়না ও চিরুনি সর্বদা সে কাছে রেখে দিত। স্নান করবার সুবিধে না হলেও সে রুক্ষ চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে রাখত। সেদিন দুপুরবেলা স্নান ক'রে পরিতোষ যখন চুল আঁচড়াচ্ছিল সেই সময় তার আরশিখানা নিয়ে নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠলুম। দেখলুম ডান দিকের কানের ওপরে অনেকখানি জায়গা একেবারে শাদা হয়ে গিয়েছে। প্রথম যাত্রার কালে আমার দাঁতগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এবারের যাত্রায় চুলে পাক ধরল। অর্থাৎ স্থবির মহাস্থবিরে উন্নীত হল, তখনও আমার সতেরো বৎসর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু যেতে দাও সে কথা—

সেদিন বেলা তখন প্রায় দুটো হবে, আমরা খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একরকম কাঁপতে কাঁপতে সর্দারের কাছে গিয়ে বললুম—হয় আমাদের কিছু খেতে দিন আর না-হয় পয়সা ও ছুটি দিন—আমরা বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি।

সর্দার তখন ঘুমোচ্ছিল। আমাদের চেঁচামেচি শুনে সুখশয্যা ছেড়ে এসে খিদের কথা শুনে প্রথমে তো মহাতম্বি শুরু করে দিলে। শেষকালে একটা লোক ডেকে, তাকে ইকড়ি-মিকড়ি ক'রে কি সব বললে বুঝতে পারলুম না। শেষকালে আমাদের বললে—এই লোকের সঙ্গে বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এসো।

আমরা বললুম—পয়সাকড়ি দাও।

সর্দার একবার—'ও' বলে ন' গণ্ডা পয়সা একবার দু'বার তিনবার গুনে আমার হাতে দিলে। আমিও বার তিনেক পয়সাগুলো গুনে জিজ্ঞাসা করলুম—ন' আনা কি হিসাবে দিচ্ছেন?

সর্দার বললে—তোমাদের রোজ ছ'-পয়সা ক'রে মজুরি। দু দিনের মজুরি তিন আনা, তিনজনের ন' আনা।

পয়সা হাতে নিয়ে তো একেবারে হকচকিয়ে গেলুম।

অ্যাঁ! এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করে দৈনিক মাত্র ছ' পয়সা! এতে সবাই খাবেই বা কি? আর পরবেই বা কি?

কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তখন আর পরবার কথা চিন্তা করবার অবসর নেই। তখুনি সেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলুম বাজারের দিকে। পথ চলেছি তো চলেইছি। কিন্তু কোথায় বাজার! সঙ্গের লোকটিকে যত প্রশ্ন করি সে কিছুই জবাব দেয় না। অনেক সাধ্যসাধি করবার পর হয়তো বা যদি কিছু বলে কিন্তু সে ভাষা কিছুতেই বুঝতে পারি না। শেষকালে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পথ চলে একটা জায়গায় এসে সে [illegible] নাকি বাজার।

বাজার বললে বটে, কিন্তু দোকানপত্র কোথায়! দু' একখানা পাতা-ছাউনি ঘর—তারও দরজা অর্থাৎ ঝাঁপ বন্ধ। একটা এই-রকম ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে লোকটা আমাদের বললে—এই একটা দোকান।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে চেঁচামেচি করার পর দোকানদার দরজা খুলতে আমাদের গাইড তাকে কি বললে। দেখা গেল, খরিদ্দারের শুভাগমনে লোকটি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ভালো চাল আছে?

সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। বেশ বোঝা গেল যে 'চাল' শব্দটি তার কর্ণকুহরে ইতিপূর্বে প্রবেশ করেনি। আমরা ভাত, অন্ন, তণ্ডুল, ধান্য ইত্যাদি নানা শব্দ দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে পিলপিল ক'রে চারদিক থেকে লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াতে আরম্ভ করলে। আমাদের কথা শুনে তারাও নিজেদের বিদ্যে অনুসারে দোকানদারকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না। শেষকালে চাল খাচ্ছি দেখে সে ঘরের ভেতর থেকে একটা [illegible] নিয়ে এসে [illegible] দেখলুম তার মধ্যে [illegible] এই জিনিস [illegible] ধরেছে।

সেই [illegible] ও আমাদের [illegible] দাঁড়িয়েছিল [illegible] দুজনকে [illegible] চেষ্টা করতে লাগল। [illegible] সে বস্তুটি [illegible] ও পুঁটির [illegible] পাওয়া গেল না তখন [illegible] বললুম এক সের। দোকানদার আবার ঘরের ভেতর থেকে এক টুকরো [illegible] বাটখারার বদলে তাই দিয়ে সেই [illegible] পুঁটির ও মুড়কির [illegible] ওজন করে দিলে। সেখান থেকে এক পয়সার নুন কিনে বেরোলুম অন্য দোকানের সন্ধানে। পেছনের সেই ভিড়ও চলল আমাদের সঙ্গে।

অনেক বলা-কওয়া ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা এক কুমোর-বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। দেখলুম, সেখানে নানা-রকম মাটির তৈরী জিনিস রয়েছে, কিন্তু হাঁড়ি নেই। অনেক চেষ্টা করেও হাঁড়ি কি দ্রব্য তা বোঝাতে না পেরে শেষকালে আধা-কলসী ও আধা-হাঁড়ি গোছের একটা জিনিস কিনে প্রায় ছুটতে ছুটতে স্টেশনে এসে মুড়ি-ছোলাভাজা ইত্যাদি যা পাওয়া গেল একরকম পেট ভরে খেয়ে নিয়ে দৌড়লুম নিজের ডেরার দিকে। (ক্রমশ)

শয়তান

বিমল মিত্র

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন—তুমি পারবে?

শয়তান বললে—কেন পারবো না ধর্মাবতার, নিশ্চয় পারবো। আমি এখনই মর্ত্যে যাচ্ছি, সেখান থেকে এসেই আপনাকে সব জানাবো।

বলে শয়তান পৃথিবীর উদ্দেশে যাত্রা করলে।

*

শশী ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

ডাকলে কে।

এ দিকটা এমনিতেই একটু নিরিবিলি। এই পুকুর-পাড়ের দিকটা। কাঁকুড়গাছির বাগানের ঝোপঝাড়া পেরিয়ে এসে এখানে পুকুরের কচুরিপানার ভিড়। এখানেই ও-পাড়ার নোংরা সব এসে মিশছে। দিনের বেলাতেও জায়গাটাতে কেমন গা ছমছম করে। দিনের বেলাটা তবু যা হোক একরকম করে কেটে যায়, কিন্তু রাতটাতে বড় নিরিবিলি।

বউ বলেছিল—ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো সংসারের মাথায়। সংসার না নরক! এর থেকে নরক ভালো। এর চেয়ে নরকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারলে না?

কিন্তু সে-সব প্রথম জীবনের কথা। তখন যা ছিল এখন তাও নেই। এখন সেই সরলাকেই গায়ে-গতরে খেটে পয়সা উপায় করতে হয়। সরলা খেটে-খুটে পয়সা নিয়ে এলেই তবে শশীর পেট চলে। শুধু পেট চলে না, শশীর মদ-মসলার খরচও চলে।

তা তখন ভালো করে ঘুমটা চোখে আসেনি এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল।

—শশী, ও শশী—শশে—

অন্ধকারে দেখে চিনতেও সাহস হলো না শশীর। বললে—কে?

—আমি, আমি পঞ্চানন! কিপ্টের দেবতা গো। একটা কথা আছে।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো শশী। তাড়াতাড়ি পরনের কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে খিলটা খুলে দিলে। তারপর নমস্কার করলে—কী বাবু, আপনি? এত রাত্তিরে?

—হ্যাঁ, কাজ আছে। আজকের দিন আর রাত নিয়েও আছি রে। কাল ভোরে কলকাতায় যেতে হবে।

শশী কলকাতার নাম শুনেই চাঙ্গা হয়ে উঠলো। কলকাতা মানেই পয়সা। দু'টো পয়সার কথা ভাবতেই শশীর চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করে উঠলো।

বললে—বসুন না বাবু, বসুন না—

শশী তাড়াতাড়ি একটা জলচৌকি এগিয়ে দিলে।

পঞ্চানন জলচৌকির ওপর বসে বললে—দূর, আমার কি বসবার সময় আছে! এখনই আবার কলকাতায় যেতে হবে। আমার ওপর তিন শো লোকের ভার পড়েছে, আমি একা কত সামলাই—

বলে পকেট থেকে একটা নোট-বই বার করলে। বললে—তোর নামটা ভুলে গেছি, তোর পুরো নামটা কী রে—

শশী বললে—শশী।

—শশী বললে চলবে না। শশী কী? শশী দাস, না শশী রুইদাস?

শশী বললে—আজ্ঞে শশী দাস।

সেই অন্ধকারের মধ্যেই কলম দিয়ে পঞ্চানন শশীর নামটা নোট-বইতে লিখে নিতে লাগলো। শশী বুঝতে পারলে না, অন্ধকারে বাবু কী করে লেখে। হয়ত অন্ধকারে বাস করে করে অন্ধকারটাই বাবুর কাছে এখন সোজা হয়ে গেছে।

—আমি উঠি রে।...তা হলে মনে থাকবে তো?

শশী হঠাৎ এগিয়ে গেল। বললে—বাবু, একটা কথা ছিল—

—কী কথা? টাকা? পাবি, পাবি—

শশী বললে—এবারে কিন্তু ওই খোরাকি আর এক টাকাতে হবে না বাবু। এবার খোরাকিও দিতে হবে আর মজুরিও দিতে হবে।

—মজুরি? মজুরি কীসের? কলকাতায় বেড়াতে যাবি, তার আবার মজুরি?

শশী বললে—আজ্ঞে, সেবারে আমি লাল-ঝাণ্ডার দলে গিয়েছিলুম বলে আপনারা কিছু দিলেন না, আমার ভাইপো গিয়েছিল আপনাদের মিছিলে, আপনারা তাকে মাথা-পিছু তিন টাকা করে মজুরি দিয়েছেন, সঙ্গে খাওয়া-থাকা পেয়েছে—

—তা, খাওয়া থাকা তোকেও দেব।

শশী বললে—লুচি-মাংস দেবেন?

—বলছিস যখন তখন দেব—

শশী বললে—তা আমার ভাইপো কি মিথ্যে বলবে বাবু? কোন্ দুঃখে মিথ্যে বলবে সে? সে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে যাবে কীসের দায়ে? আমরা কত দিন লুচি-মাংস খাইনি তা জানেন?

পঞ্চানন বললে—ঠিক আছে, যা তোমা

চাস তাই পাবি, কিন্তু কাল তোকে যেতে হবে—

—টাকাটা আগাম দেবেন না বাবু?

এবার রেগে গেল পঞ্চানন। বললে—তোদের বড় বাড় বেড়েছে রে শশী, বড় বাড় বেড়েছে, তোদের জন্যে এত করি আর সেই তোরা কিনা এত নেমকহারাম!

শশী আর কিছু কথা বললে না। পঞ্চাননের অত সময় নেই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সংগে তর্ক করে। পঞ্চাননদের অনেক কাজ। তাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিন শো লোক যোগাড় করতে হবে। কলকাতায় একবার তাদের পৌঁছিয়ে দিতে পারলেই ছুটি। তখন পঞ্চানন রাজা।

এমনিতে কলকাতা শহর মিছিলের শহর। কিন্তু এক-একদিন সেই মিছিলের জ্বালায় কাজকর্ম সব বানচাল হয়ে যাবার যোগাড় হয়। তখন কেউ অফিসে যেতে পারবে না। তখন বাস-ট্রাম বন্ধ। লোকে অফিস থেকে ফেরবার সময় হেঁটে হেঁটে ফিরবে আর যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দেবে। গালাগালি দেবে কংগ্রেসকে, গালাগালি দেবে লাল-ঝাণ্ডার দলকে, গালাগালি দেবে কলকাতাকে, গালাগালি দেবে নিজের নিজের ভাগ্যকে, আর সংগে সংগে গালাগালি দেবে ভগবানকে।

—শালা, এত জায়গায় বোমা পড়ে, আর এই কলকাতায় একটা বোমা পড়ে না রে!

ওদিক থেকে চিৎকার আসে—কংগ্রেস জিন্দাবাদ॥

পঞ্চানন এদিকটা সামলাচ্ছে। বলছে—লাইন ভাঙবে না কেউ, লাইন সোজা—

সেই ভোর পাঁচটার সময় পঞ্চানন কাঁকুড়-গাছির বাস-স্ট্যান্ড থেকে দলবলকে উঠিয়ে নিয়েছে। পাড়াগেঁয়ে ভূত সব। যারা কথা বোঝে না, ভাষা বোঝে না, তাদের নিয়ে পঞ্চাননের কারবার। পার্টির অফিস থেকে এক হাজার টাকা পঞ্চাননের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। টাকা কি সহজে সেক্রেটারিবাবুর হাত থেকে বেরোয়? ভুষণবাবুর হাত দিয়ে জল গলে না, সেই ভুষণবাবুর হাতেই টাকা।

—তিন শো ইনটু তিন, তা হলে টোট্যাল হচ্ছে ন' শো। আর এক শো তুমি কী করবে?

পঞ্চানন বলেছিল—এক শো টাকা হাতে রাখবো, কখন কী দরকার হয়...

ভুষণবাবু বলেছিল—তার জন্যে তো আমরা আছি—

পঞ্চাননের সংগে তাই নিয়েই বেশ তর্ক বেধে গিয়েছিল সেবার। পঞ্চানন সব জানে। কোথা থেকে লাখ-লাখ টাকা আসে, কে খায় সে টাকা, সবাই তা জানে। আগে এক টাকা বরাদ্দ ছিল মাথাপিছু। তখন চালের দাম ছিল এক টাকা কিলো। তখন মাথা পিছু এক টাকা দিলে আসতো। দুপুর রোদ্দুরে পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতো। মুখে টুঁ-শব্দটি করতো না। খেতে দাও না-দাও মুখ বুঁজে সব সহ্য করতো।

কিন্তু এখন দিন-কাল বদলে গেছে। চালের দাম বাড়ার সংগে সংগে শশীদের দেমাক হয়েছে। বলে—এক টাকা মজুরিতে আর পোষাবে না বাবু, রেট বাড়াতে হবে—

সেইজন্যেই এক টাকা থেকে পাঁচ সিকে, পাঁচ সিকে থেকে দেড় টাকা। সেই দেড় টাকাই আবার বাড়তে বাড়তে এখন তিন টাকায় এসে ছুঁয়েছে।

পঞ্চানন বলে—তা তিন টাকা না দিলে আর চলবে না সেক্রেটারিবাবু, তার কমে কেউ আসতে চায় না—

শুধু পঞ্চানন নয়, চারদিক থেকেই সবারই ওই এক কথা। ওই উলুবেড়িয়া, সাঁকরেল, শ্রীরামপুর, হুগলী, হাওড়া, শিবপুর। সব জায়গার অফিস থেকেই ওই এক উত্তর এল। মণ্ডল কমিটির কর্তারা বলে পাঠালে, চার টাকা করে মাথাপিছু চাইছে সবাই। কলকাতায় গিয়ে ওর কমে কেউ পুলিসের লাঠি খেতে রাজী নয়। তা ছাড়া আছে খাওয়া। আগেকার মত মুড়ি-চিঁড়ে দিলে আর চলবে না। কেউ চায় রুটি-আলুর দম। আবার কেউ কেউ লুচি-মাংস চাইছে।

ভুষণবাবু করিত-কর্মা লোক। আজ ত্রিশ বছর এই কাজ করে আসছে এক-নাগাড়ে। কর্তাদের সংগে পরামর্শ করলে। কর্তারা এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসে না। বারো লাখ টাকা ডোনেশান এসেছে বড় বড় পার্টির কাছ থেকে। তার থেকে যদি চার লাখ টাকা পকেটে আসে, তা হলেও আড়াই লাখ লোক আনা যাবে মাঠে। লাল-ঝাণ্ডাদের মিটিং-এর চেয়েও বড় মিটিং হওয়া চাই। তাতে যত টাকা লাগে লাগুক।

মণ্ডল কমিটির প্রেসিডেন্ট ডেকে পাঠালে পঞ্চাননকে।

বললে—এই দেখ পঞ্চানন, চিঠি এসে গেছে কলকাতা-কমিটি থেকে—এই পড়ে দেখ—

পঞ্চানন পড়ে দেখলে। তারপর বললে—ব্যাটাদের পোয়া বারো, জানেন! আরামসে তোফা খেয়ে দেয়ে দুবার চেঁচাবে, তার মজুরী তিন টাকা—এ একেবারে রাম-রাজত্ব পেয়ে গেছে বেটারা—

পঞ্চাননের রাগ হবারই কথা। আগে পঞ্চানন ইংরেজ আমলে জেল খেটেছিল পাঁচ বছর। তার আর কোনও দাম রইল না। এখন যে-সে লীডার। লীডার হতে গেলে এখন আর জেল খাটবার দরকার হয় না। গরম গরম লেকচার দেওয়ার দরকার নেই। শুধু টাকা আদায় করার ফন্দি জানলেই হলো। মিলওয়ালা আর কারখানাওয়ালাদের ঘাড় মটকে যে যত টাকা আদায় করতে পারবে তারই ওপর ওপরওলাদের তত নেক-নজর পড়বে।

—এ কি, ন' শো টাকা দিচ্ছেন কেন?

মণ্ডল কমিটির প্রেসিডেন্ট বড় বদরাগী লোক। বললে—তোমার তো তিন শো লোক দেবার কথা। তিন-তিরেক্কে নয়। তার বেশী কী হবে?

—আর আমার? আমার কী থাকবে? আমি কি মশাই খালি পেটে দেশসেবা করবো? আমার রাহা-খরচ নেই? আমার ছেলেপুলে নেই?

—তা তোমার কত চাই, বলো?

—শ' খানেক।

মণ্ডল কমিটির প্রেসিডেন্ট গলা বন্ধ কোটের পকেট থেকে আরো এক শো টাকা বার করে দিলে।

বললে—পাবলিক ফান্ডের টাকা, একটু হিসেব করে খরচ করবে পঞ্চানন। এ তোমার টাকাও নয়, আমার টাকাও নয়। পাবলিকের টাকা। লোকে বিশ্বাস করে দেশের সেবায় আমাদের হাতে দেয়। এর একটা কড়া ক্রান্তি পর্যন্ত ভুল হলে তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, বুঝলে?

পঞ্চানন সবই বুঝলো। আরো ভালো করে বোঝবার জন্যে টাকাগুলো কোঁচার খুঁটে বেঁধে বেশ শক্ত করে পেট-কোমরে গুঁজে ফেললে। তারপরে উঠলো। উঠে প্রেসিডেন্টকে নমস্কার করে অফিসের বাইরে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। সেখান থেকে একেবারে সোজা পাঁচুকালী সাহার দোকানে!

পার্টির হেড অফিসে ভূষণবাবু তখন সারা দিনের কাজের পর চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো।

—কে?

—আমি 'ইণ্ডিয়া অয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং' অফিস থেকে মহেশ বলছি স্যার, নমস্কার।

—নমস্কার।

—টাকাটা পেয়েছেন?

ভূষণবাবু বললে—পেয়েছি, কিন্তু দশ হাজার টাকাতে কী হবে? থুথু দিয়ে কি ছাতু ভেজানো যায়? আরো হাজার পাঁচেক না দিলে চলছে না। বুঝলে? তোমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে বুঝিয়ে বলবে।

—প্রোসেশান ঠিক বেরোবে তো স্যার?

—বেরোবে না মানে? বারো লাখ টাকার বাজেট পাস হয়েছে পার্টির এক্‌জিকিউটিভ কমিটির মিটিং-এ। গ্রামে গ্রামে সব মণ্ডল কমিটি জেলা কমিটি মহকুমা কমিটিতে ডেসপ্যাচ পাঠানো হয়ে গেছে। চারদিক থেকে সেক্রেটারিয়েট ঘেরাও করা হবে, ইংল্যান্ড-যুক্তি-ফোর ভাঙা হবে, ইয়ার্কি নাকি? আট লক্ষ চাষী-মজুরের প্রোসেশানের অ্যারেঞ্জমেণ্ট হয়েছে, সকলকে খাওয়া-থাকা দিতে হবে। এবার আর চিঁড়ে-মুড়ি-পাঁউরুটি নয়, একেবারে লুচি-মাংস খাওয়াবো সকলকে—এরকম প্রোসেশান আর কখনও হয়নি কলকাতায়, দেখে নিও—

—বাস-ট্রাম অচল করে দেবেন তো? আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টার বলছিলেন...

ভূষণবাবু বললে—আলবাত! তবে আর পার্টির স্ট্রেংথ দেখাবো কী করে? তোমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে বলে দিও, আমরা মিনিস্ট্রি পেলে কম-সে-কম আরো পঞ্চাশ লাখ টাকার মেশিনারির পারমিট পাইয়ে দেব কিন্তু আরো পাঁচ হাজার টাকা দিলে ভালো হয় মহেশ—

ওপাশ থেকে মহেশ বললে—ম্যানেজিং ডিরেক্টার বলছিলেন, আরো টাকা দিতে পারেন, কিন্তু তা হলে স্যার আমাদের অয়েল প্রোডাক্টস-এর দাম আরো বাড়াতে হবে—কণ্ট্রোল-প্রাইস রাখা যাবে না, খদ্দের রেগে যাবে, খদ্দেররা আরো হইচই করবে...

ভূষণবাবু বললে—তা করুক, হইচই করুক, খদ্দেররা হইচই করলেই তো পার্টির পক্ষে ভালো। তারা যত মাল পাবে না, আমাদের পার্টি তত স্ট্রং হবে। দাম বাড়ুক, দাম বাড়লেই তো ভালো। মিনিস্ট্রির ওপর ততই লোকে চটে যাবে—

—ঠিক আছে স্যার, দেখি ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে বলে।

—না না, বলাবলির ধার ধারি না। দিতেই হবে। নইলে, ওই যে বললুম, আমাদের পার্টির হাতে যখন মিনিস্ট্রি আসবে, তখন কম-সে-কম পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মেশিনারির পারমিট পাইয়ে দেব, কথা দিলুম—

বলে ভূষণবাবু টেলিফোন রেখে দিলে। তারপর চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে মনে পড়লো নরসিং ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানীর কথা। টেলিফোন ডায়াল করেই বিক্রম সিংকে ডাকলে।

—সিংজী, আমার কথা মনে আছে তো?

—ইয়েস স্যার। সাত শো লরীর বন্দোবস্ত করে রেখেছি। কিছু ভাববেন না। রাত্তির বেলাতেই সব সেণ্টারে সেণ্টারে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে ডাইরেক্ট পার্টির হেড অফিসে নামিয়ে দেব। তারপরে প্রোসেশান করে সেক্রেটারিয়েট—

ভূষণবাবু বললে—সে তো হলো, কিন্তু টাকা? বার লাখ টাকার বাজেট, এখনও আট লাখও ডোনেশান উঠলো না যে—

—হবে হবে সেক্রেটারিবাবু, বাজার বড় টাইট...

ভূষণবাবু বললে—বাজার টাইট বলেই তো টাকা চাইছি। একবার মিনিস্ট্রিটা পেতে দিন না, তখন যত পারমিট চাই আমি পাইয়ে দেব, এই প্রোসেশানেই মিনিস্ট্রি খতম হয়ে যেতে পারে মজাটা দেখুন না—

—ঠিক আছে, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্টটা দেখে পাঠাচ্ছি—

টেলিফোন ছেড়ে দিলে ভূষণবাবু। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এল। আজ রাত থেকেই অফিস ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেছে। কাল ভোর বেলা শুরু হবে প্রোসেশান। তাই এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। বিরাট পার্টি অফিস। মেম্বারেরও সীমা-সংখ্যা নেই। সবাই এক-একটা কাজের ভার নিয়েছে। উঠোনের এক-পাশে হালুইকররা দশটা উনুন তৈরি করছে। সব কটাতে কাল ভোর থেকে রান্না চড়াবে। লুচি হবে, মাংস হবে, আর বোঁদে। চাষী-মজুরদের ওইতেই যথেষ্ট। বেটারা ওই খেয়েই খুশী। খেতে পেলে যারা খুশী হয় তারাই তো আসল বোকা। তাদের খুশী করতে বেশী বেগ পেতে হয় না। কিন্তু আজকাল আবার তারা টাকা চাইতে শুরু করেছে। নগদ টাকা!

—সেলাম সাব!

অফিসের বিরাট গাড়িখানা সামনে এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভার সেলাম করলে। ভূষণবাবু গাড়িতে উঠলো। বললে—চলো, ইয়ং ট্রেডিং কোম্পানী—

হেড অফিস, জেলা কমিটি, মহকুমা কমিটি, মণ্ডল কমিটি সব জায়গাতেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। প্রোসেশান। মিছিল। এক-একটা মিছিল মানেই লাখ লাখ টাকার শ্রাদ্ধ। ভূষণবাবু থেকে শুরু করে পঞ্চানন পর্যন্ত সবাই তা জানে। এই একটা দিনেই যা কিছু মোটা টাকা আসে।

পাঁচু কালী সা কাপড়ের দোকানদার।

—কী হলো পঞ্চাননবাবু, কী মনে করে?

পঞ্চানন পকেট থেকে কয়েকটা এক শো টাকার নোট বার করলে। বললে—আমার কত পাওনা হয়েছে পাঁচু?

—সে কী? আপনি টাকা দেবেন নাকি? আমি তো টাকার তাগাদা করিনি আপনার কাছে।

পঞ্চানন বললে—তুমি তাগাদা না-ই বা করলে, কিন্তু আমার তো একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে, কত টাকা দিতে হবে তাই বলো, এক শো, না দু শো—আমি দেনা রাখতে চাই না।

পাঁচু বললে—সে জন্যে অত তাড়াতাড়ি কীসের? আপনিও পালিয়ে যাচ্ছেন না, আমিও মারা যাচ্ছি না।

—না, না ও-সব ছেঁদো কথা বললে শুনছি না। দেখ পাঁচু আমরা হলুম এককালের জেল-খাটা দাগী লোক, কবে পুলিসের গুলিতে মরে যাই তার ঠিক কী, দেনা শোধ করে যাওয়া ভালো, তোমার দেনার জন্যে আমি নরকে যাই, এইটেই তুমি চাও নাকি?

শুধু পাঁচুকালী সা-ই নয়, কাপড়ের দোকান থেকে শুরু করে ও অঞ্চলের মুদী-গয়লা-ধোপা কারোর দেনাই আর বাকি রাখলে না পঞ্চানন। তারপর বাজারের হরেকেষ্টর পানের দোকানে যেতেই হরেকেষ্ট যথারীতি বিড়ি এগিয়ে দিচ্ছিল।

পঞ্চানন বললে—না, না, হরেকেষ্ট আজ আর বিড়ি নয়, সিগ্রেট দাও—পাশিং শো এক প্যাকেট—

হরেকৃষ্টও অবাক হয়ে গেল। বললে—কী ব্যাপার পঞ্চাননবাবু আবার মিছিল আছে নাকি?

পঞ্চানন হেসে ফেললে। হরেকেষ্টটা ধরে ফেলেছে। বললে—তুমি ঠিক ধরেছ হরেকেষ্ট, মিছিল-ফিছিল না হলে কি আমাদের চলে? এ লাইনে তো ওই একটা দিনই যা আরাম—

হরেকেষ্ট বললে—তা কোথায় মিছিল যাবে?

পঞ্চানন বললে—কোথায় আবার, কলকাতায়!

—তাই বলুন, কলকাতা না হলে কি আর পঞ্চাননবাবুর মুখে সিগারেট ওঠে! আপনার ভাগে কত লোক?

পঞ্চানন বললে—বলে কয়ে তিন শো লোকের অর্ডার পেয়েছি, পাঁচ শো চেয়ে-ছিলুম, শেষ পর্যন্ত তিন শো জুটেছে কপালে।

—তা হলে তো আপনার পোয়া বারো!

পঞ্চানন বললে—দূর, যে কটা টাকা পেলাম, তা দেনা শোধ করতে করতেই ফুরিয়ে গেল। তারপর আবার কবে মিছিল হবে তার কি ঠিক আছে! এইরকম রোজ রোজ মিছিল হয় তো এই বাজারেই দোতলা বাড়ি তুলে ফেলতে পারি!

—দোতলা বাড়ি?

অবাক হয়ে গেল হরেকেষ্ট।

পঞ্চানন বললে—তুমি এইতেই অবাক হয়ে যাচ্ছো হরেকেষ্ট, আর দেখে এসো উপানন্দকে, কদমখালির উপানন্দ হাজরাকে। আমার মত পার্টি-ওয়ার্কার ছিল, অর্ডিনারি পার্টি-ওয়ার্কার, এখন কদমখালিতে তিন শো বিঘে ধান-জমির মালিক বেনামীতে ক্যানিং-এ মাছের ভেড়ির কারবার...আর কত বলবো ...সবই পার্টির দৌলতে।

বলে লম্বা করে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়লো পঞ্চানন।

তারপর বললে—যাই হরেকেষ্ট, রাত থাকতেই আবার গরুর পাল তাড়িয়ে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে।

—লরী আসবে?

পঞ্চানন বললে—হ্যাঁ, সে-সব কলকাতার পার্টি অফিস থেকে বন্দোবস্ত করবে।

নরসিং ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানী। তারা সাপ্লাই করবে, তারা এসে খাল-পারে দাঁড়িয়ে থাকবে। কাঁকুড়গাছি, ময়নাডাঙা, বেদেখালি সব জায়গার লোককে জড়ো করে নিয়ে যাবার প্ল্যান আমার।

—তা লরী ভাড়া দেবে কে?

—ভাড়া আবার কীসের? পার্টির কাজ তো দেশের কাজ! যখন আমাদের পার্টি আবার ক্যাবিনেটে ঢুকবে তখন পারমিট পাবে নরসিং ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানী, লাখ লাখ টাকার পারমিট পাবে—

তারপর আর না দাঁড়িয়ে পঞ্চানন বাড়ির দিকে চললো। বললে—যাই হরেকেষ্ট।

ওদিকে ভূষণবাবুর গাড়িটাও গিয়ে হাজির হলো জয়ন্তী ট্রেডিং কোম্পানীর অফিসে। জয়ন্তী ট্রেডিং কোম্পানী অর্ডার সাপ্লাই-এর কারবার করে নাম করেছে। একেবারে খোদ কর্তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো ভূষণবাবু। ভূষণবাবু যেতেই কর্তা উঠে দাঁড়ালো।

বললে—আসুন স্যার, আসুন—

ভূষণবাবু বললে—ওদিকের খবর কী? দিল্লির টাকাটা এল?

কর্তা বললে—এসেছে, কিন্তু সব টাকাটা পাঠায়নি, দু' লাখ পরে দেবে বলেছে।

ভূষণবাবু রেগে গেল। বললে—পরে দিলে কী করে হবে?

কর্তা বললে—একবার দিল্লি গেলে ভালো হতো আপনার। ট্রাঙ্ক-কলে এসব কথা তো বলা যায় না।

—তা তো বুঝলুম, আমি এখন দিল্লি যাই কী করে? কাল আমাদের প্রোসেশান আছে। তিন লাখ চাষী-মজুর আসছে, সেক্রেটারিয়েট অভিযান চালাবে—

—ওটা একটু পেছিয়ে দিলেই পারতেন।

ভূষণবাবু বললে—কী যে বলো তুমি তার ঠিক নেই, পার্টির জন্যেই সব কিছু, আর পার্টি আছে বলে তবু দু' বেলা দু' মুঠো খেতে পাচ্ছি, আমি এখন দিল্লি গেলে লোকে কী বলবে বলো তো? হোল্ বাঙলা দেশ আমার দিকে চেয়ে বসে আছে, আর এই সময়ে আমি দেশ ছেড়ে পালাবো?

—স্যার, কন্ট্র্যাকটার কিছু টাকা চাচ্ছিল।

—কত টাকা?

—হাজার কুড়ি দরকার। আগে দু' লাখ নিয়েছে, তার অ্যাকাউণ্ট আমার কাছে সাবমিট করেছে, কিন্তু আবার টাকা কম পড়ে গেছে...

—ঠিক আছে! বলে ভূষণবাবু পকেটে হাত দিলে। কাঁচা টাকাই পকেটে ছিল। বরাবর তাই-ই থাকে ভূষণবাবুর। পকেট থেকে এক খামচা নোট তুলে নিয়ে বললে—এগুলো গুনে দেখ কত আছে।

জয়ন্তী ট্রেডিং কোম্পানীর কর্তা গুনে দেখতে লাগলো। সবই এক শো টাকার নোট। বাঙলা দেশের বড় বড় সব কোম্পানী পার্টি-ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছিল। এ সেই টাকা। বিরাট বিল্ডিং হচ্ছে 'জয়ন্তী ট্রেডিং কোম্পানী'র। পার্টি-ফাণ্ডের টাকাতেই বাড়িটা হচ্ছে। এক-একটা করে প্রোসেশান হয় আর 'জয়ন্তী ট্রেডিং কোম্পানী'র বিরাট বিরাট বিল্ডিং হয়। অথচ ভূষণবাবু কোম্পানীর কেউ না। বোর্ড অব্ ডিরেক্টারের

তালিকায় ভুবনবাবুর নামও নেই। কিন্তু দায়দায়িত্ব ভয়-ভাবনা সবই তার।

কুড়ি হাজার টাকা গুনে নিয়ে আয়রন-সেফের মধ্যে রাখলো কর্তা। ভুবনবাবু উঠলো।

বললে—আমি চললাম—টাকাটা ওই আনন্দবালা দাসীর নামে খাতায় এন্ট্রি করে নিও, কোনও গোলমাল যেন না হয়—

দুপুর বারোটা বাজতে না বাজতেই বাংলা দেশের সব জেলা থেকে দলে দলে চাষী মজুর ঢুকতে লাগলো কলকাতা শহরের বুকের ভেতরে। বাস ট্রাম-টেম্পো-গাড়ি-সাইকেল সব অচল হয়ে গেল। চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কলকাতা। প্রেস রিপোর্টার ফোটোগ্রাফাররা তৈরিই ছিল, দৌড়ে এল জিপে চড়ে। পুলিশও তৈরি ছিল বেটন নিয়ে টিয়ার গ্যাস নিয়ে। চাষী-মজুর। তারা অনেকবার কলকাতা দেখেছে। এক বছর ধরে তারা অনেকবার কলকাতায় এসেছে। কখনও তাদের এনেছে লাল-ঝান্ডারা। কখনও এনেছে কংগ্রেস। কাঁকুড়-গাছির শশী যেমন এসেছে, বেলেঘাটার বলাই সামন্তও তেমনি এসেছে। তেমনি এসেছে ময়নাডাঙ্গার কানু মণ্ডল।

কখনও হাতে নিয়েছে লালঝাণ্ডা, আবার কখনও তে-রঙা নিশেন। কখনও বলেছে ইনক্লাব জিন্দাবাদ, কখনও বলেছে জয় হিন্দ। একই লোক একই মুখ, শুধু ঝাণ্ডা আলাদা।

বলাই চিনতে পেরেছে শশীকে।

—কী রে, তুই?

শশী বললে—তুই?

তারপরেই আলোচনা। কত দিলে তোকে?

—তিন টাকা রোজ কড়ার হয়েছে, আর খাওয়া—

বিদেশে এসে যেন বড় আপনার হয়ে গেছে সবাই। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এমনিতে ক্ষেত-খামারের কাজকর্ম হাতে থাকে না। সেই সময়ে উপরি-পাওনাটা মন্দ কী! ময়নাডাঙার কানু মণ্ডল দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল।

বললে—কত দিলে রে তোদের?

বলাই বললে—দেয়নি কিছু, দেবে বলেছে—

কানু বলে—আমি আগাম আদায় করে নিয়েছি—এই দ্যাখ্—

—তোকে আগাম দিলে কেন? আমায় তো দেয়নি! বাবু কোথায় গেল! পঞ্চাননবাবু?

কিন্তু পঞ্চাননের তখন বাজে কথা শোনবার সময় নেই। সে তখন দুপুরের রোদ মাথায় করে এ মুড়ো ও মুড়ো দৌড়ে মুখের রক্ত তুলে মরছে। সব লাইন বেঁধে, সব লাইন বেঁধে ভাই, কেউ লাইন ছাড়বে না।

তারপর সেই দুপুরবেলা যে সংগ্রাম শুরু হলো, কলকাতার ইতিহাসে তা নতুন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সেই যে শুরু হয়েছিল একদিন, তারপর থেকে যেন তার আর বিরাম নেই। কোম্পানি গেছে, ইংরেজ গেছে, কংগ্রেস গেছে। কিন্তু যায়নি কেউ। কেউই যায়নি। তারা সবাই আছে। তাদেরই প্রেতাত্মারা বুঝি আবার নতুন করে উৎপাত শুরু করেছে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে। তোমরা বাঁচো আর মরো, আমাদের তা আবার দেখবার শোনবার বোঝবার দরকার নেই। বহুদিন আগে আমরা এসেছিলুম পলাশীর যুদ্ধের সময়। আমরা এসেছিলুম ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়, আমরা এসেছিলুম সিপাই বিদ্রোহের সময়, আমরা এসেছিলুম খিলাফতের পর আন্দোলনের সময়, আমরা এসেছিলুম ইণ্ডিয়া ভাগ হওয়ার সময়, আমরা এসেছিলুম হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়, তারপর আজ আমরা আবার এসেছি। এবার আর আন্দোলন নয়, এবার হত্যা। এবার হত্যা করে সবাইকে নিঃশেষ করে দেব। সমস্ত শহর ছারখার করে দেব। এবার বাঙালী নামে যে জাত ছিল তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে তবে ছাড়বো।

—শশী!

দূর থেকে বেদেখালির বলাই ডাকলে। শশী চেয়ে ছিল সামনের দিকে। পেছন

থেকে ডাক শুনতেই সে মুখ ফেরালে।

—পুলিশ আসছে রে ভাই, পালিয়ে যাই চল্—

পঞ্চানন তখন চিৎকার করে উঠলো—জয় হিন্দ্—

চারদিকে যেন মানুষের সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠলো। কারা কোথা থেকে ঢিল্ ফেলেছে জনতার ওপর, আর সঙ্গে সঙ্গে মিছিলের মানুষ ছট্‌ফট্ করে উঠলো, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

ময়নাডাঙার কানু মণ্ডল শুধরে দিলে—এই, করছিস কী রে, এ তো লালঝাণ্ডাদের মিছিল নয়—

সবাই বুঝতে পারেনি। গ্রামের চাষী-মজুর মানুষ। কখনও এ-দলে, কখনও সে-দলে কখনও ও-দলে ভাড়া খেটেছে, যা বলতে শিখিয়ে দিয়েছে তাই বলেছে। কী বলতে কী বলে ফেলেছে।

পঞ্চানন চিৎকার করে উঠলো—লাইন সোজা, লাইন সোজা, লাইন ভেঙো না—

হঠাৎ ওদিকে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। রাস্তা আটকে দিয়েছে পুলিস। লাঠি আর রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিসের সার্জেন্টরা। সবাই বসে পড়লো। যারা অফিসের ছুটির পর বাড়ি আসছিল তারা বাস পায় না, ট্রাম পায় না। ওদিকে তারা আর এদিকে এরা। অন্ধকারে মানুষের মুখ চেনা যায় না। হঠাৎ যেন একটা বোমা ফাটার শব্দ হলো। কান ফাটিয়ে দিলে যেন। দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। মার, মার। রোখো, রোখো। রাস্তার আলোগুলো এক নিমেষে নিবে গেল। মারো শালাদের মারো।

তারপর সমস্ত কলকাতা জুড়ে সে এক তাণ্ডব শুরু হলো। যে তাণ্ডবের বুঝি তুলনা নেই কোথাও। ইতিহাস আগে অনেক দেখেছে, অনেক লিখে গেছে, কিন্তু এর বুঝি আর জুড়ি নেই। তুমি কংগ্রেস কি লালঝাণ্ডা তা আমরা জানি না। আমরা কেবল জানি একদল মিনিস্ট্রি পেয়েছে, একদল পায়নি। আমাদের হাতে পুলিস, টিয়ারগ্যাস বেয়নেট, আর তোমাদের দলে টাকা। টাকারই খেলা চললো কলকাতার রাস্তায়। বারো লাখ টাকার বাজেট। মাথাপিছু সবাই তিন টাকা করে পাবে। তারপর আছে 'নরসিং ট্রান্স্‌পোর্ট' কোম্পানীর আটশো লরি, 'জয়ন্তী ট্রেডিং কোম্পানী'র বেনামী কারবার, 'অয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশনে'র ডোনেশান। আরো আছে পাঁচু কালী সা'র কাপড়ের দেনা বাজারের হরেকেষ্টর পান-বিড়ির দোকানের সিগারেট। তারপর আছে কলকাতার হেড্-অফিসের কমিটি, জেলা কমিটি, মহকুমা-কমিটি, মণ্ডল-কমিটির লক্ষ লক্ষ মেম্বার। আর আছে ভূষণবাবু, কলকাতার কমিটির সেক্রেটারি, মণ্ডল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট...

—জয় হিন্দ্!

হঠাৎ কোথায় যেন গুলির শব্দ হলো দুম্-দুম্ করে। টিয়ার-গ্যাস কি গুলি, কে জানে! অন্ধকার কলকাতার রাস্তার ওপর মৃত্যু দিয়ে পুনরাবৃত্তি হলো অপঘাতের। যারা অফিসের চাকুরে তারা ছুটতে লাগলো ব্র্যাবোর্ন রোডের দিকে। সেদিকেও প্রোসেসান। রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে রাজশক্তি। মারো, ওদের মেরে তাড়াও। ভাড়া করা গুণ্ডার দল। তিন টাকা রোজের মজুর সব। লুচি-মাংসর লোভে গাঁ ছেড়ে শহরে এসেছে। ওদের বারো লাখ টাকার বাজেট, তার মধ্যে কত লাখ খরচ হলো, আর কত লাখ 'জয়ন্তী ট্রেডিং কোম্পানী'র বেনামী কারবারের ক্যাপিটালে ইনভেস্ট্ হলো সব আমাদের জানা আছে। জানা নেই শুধু, ওদের, ওই যারা কাঁকুড়গাছি থেকে এসেছে, ময়নাডাঙা থেকে এসেছে, বেলেঘাটা থেকে এসেছে। একদিন ওরা এক টাকা রোজে আমাদের হয়ে ভাড়া খেটেছে, তখন ওরা শ্লোগান দিয়েছে—ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ; আবার আজকে তিন টাকা রোজ পেয়ে লুচি-মাংসর লোভে ওদের হয়ে 'জয় হিন্দ্' বলছে। ওরাই শুধু জানলো না যে আজ জীবনের সব মানে হারিয়ে গেছে বিংশ-শতাব্দীর গোলমালের রাজনীতিতে, সব নীতি গুলিয়ে গিয়েছে দলাদলির রাহাজানিতে। ওরাই শুধু বলি হয়ে গেল জটিল অর্থনীতির টানাপোড়েনে। মানুষের আর্তনাদে, টিয়ার-গ্যাসের দুর্গন্ধে, অন্ধকারের আবর্তে শহর-নগর-জনপদ সব ছারখার হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কারোর কোনও লাভ হলো না, না আমাদের না ওদের। মানুষকে ভাড়া খাটিয়ে ওরা ওদের কাজ গুছিয়ে নিতে চাইছে, কিন্তু তাতে ওদের পার্টি'রও লাভ হলো না, ওদের দেশেরও ভালো হলো না। লাভ হলো শুধু ওই কলকাতা-কমিটি মহকুমা-কমিটি, জেলা-কমিটি আর মণ্ডল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট্, সেক্রেটারি আর অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারি, ভূষণবাবু আর পঞ্চাননদের। আর সেই সুযোগে 'নরসিং ট্রান্সপোর্ট' কোম্পানী, 'অয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন', 'জয়ন্তী ট্রেডিং কোম্পানী'র ব্যালেন্স্-শীটের ক্রেডিটের অঙ্ক বেড়ে বেড়ে আকাশে ঠেকলো। পঞ্চানন তখনও চাষী-মজুরদের নিয়ে হিম্-সিম্ খেয়ে যাচ্ছে। বলছে—লাইন সোজা, লাইন সোজা, লাইন ভাঙবে না—

কলকাতা-কমিটির হেড্-অফিসে বসে তখন ভূষণবাবু টেলিফোন তুলে বলছে—হ্যালো জয়ন্তী ট্রেডিং, হ্যালো জয়ন্তী ট্রেডিং—হ্যালো—

কাঁকুড়গাছির বাজারে পাঁচুকালী সা'র দোকানের দেনা শোধ হয়ে গেছে, পাঞ্চাননদের সব লোন ক্লিয়ার। হরেকেষ্টর পান-বিড়ির বকেয়া-টাকা শোধ। পঞ্চাননের মুখে হাসি ফুটেছে আবার, ভূষণবাবুর মুখেও হাসি ফুটেছে পার্টি'র কলকাতা-কমিটি, মহকুমা-কমিটি, জেলা-কমিটি, আর মণ্ডল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট্-সেক্রেটারিদের মুখে—

সারা কলকাতা ফাটিয়ে আবার পুলিসের রাইফেল গর্জন করে উঠলো—গুড়ুম—

ভোর বেলা শহরের খবরের কাগজের পাতায় ব্যানার হেডলাইন দিয়ে খবর বেরোল:—

কলিকাতার রাস্তায় বুভুক্ষু নরনারীর বৃহত্তম মিছিল

আজ বাঙলার দাবিতে সরকারী অব্যবস্থা ও অবহেলার প্রতিবাদে বাঙলার লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু নরনারী মিছিল করিয়া সেক্রেটারিয়েট ভবনে গমন করে। এমন স্বতোৎসারিত মিছিল কলিকাতা শহর বহুদিন দেখে নাই। পুলিস তাহাদের পথরোধ করায় তাহারা তাহার প্রতিবাদে সেইখানেই বসিয়া পড়ে। ইহাতে সহরের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বিকল ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। নিরীহ শান্ত মিছিলের নরনারীর উপর তখন পুলিস অন্যায়ভাবে লাঠি ও গুলী চালায়। হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে সরকারী কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু অনুমান হয়...ইত্যাদি...ইত্যাদি...

*

শয়তান আবার এসে ঈশ্বরের সামনে হাজির হলো। ঈশ্বর জিজ্ঞেস করলেন—কী সংবাদ?

শয়তান সবিনয়ে বললে—ধর্মাবতার, আমি কাজ হাসিল করে এসেছি। এখন আর পৃথিবীতে কোন মানুষ নেই। আমি সব মানুষের আত্মা কিনে নিয়েছি। তারা আমার কাছে তাদের মনুষ্যত্ব বিক্রি করে দিয়েছে—

ঈশ্বর কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন!

অল্পে তুষ্ট
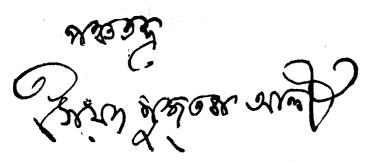
আমার পরিচিত জনৈক সমাজসেবী ভদ্র সন্তান রাত করে বাড়ি ফিরছিলেন। শর্ট্ কট্ করার জন্য যে গলি ধরেছিলেন সেটা প্রায় বস্তি অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে এসেছে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, পরিত্রাহি চিৎকার—যা এ অঞ্চলে রাতবিরেতে আকছারই শোনা যায়। সমাজসেবীটি একটু কান পাততেই বুঝতে পারলেন, যুগযুগ ধরে সমাজ স্বামীকুলকে যে হক্ক দিয়েছে এ স্থলে সে-কুলেরই জনৈক বস্তি সন্তান সেটি তার স্ত্রীর উপর কিঞ্চিৎ পশুবল সহ প্রয়োগ করছে। এ স্থলে সুবুদ্ধিমান মাত্রই তিলার্ধ কাল নষ্ট করে না, কিন্তু আমাদের সমাজসেবীটি এ-কালের যারা 'সেবার' নামে মস্তানী করেন তাদের দলে পড়েন না। দরমার ঝাপ ধাক্কা মেরে খুলে হুংকার ছাড়লেন, 'বাস, থামো! এ সব কী বেলেল্লাপনা হচ্ছে!' আমাদের পাব্লিক স্পিরিটেড ইয়ংম্যানটি নাটকের এর পরের দৃশ্য অবশ্যই আশা করেছিলেন, সেই অবলা মুক্তি পেয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে অঝোরে কৃতজ্ঞতাশ্রু ঝরাবে, এবং তিনিও তাঁর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অদৃশ্য বাতাসের একাংশ অবহেলে দ্বিখণ্ডিত করে, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ' (ইংরিজিতে যাকে বলে 'নটেটোলনটেটোল') বলতে বলতে আত্ম-প্রসাদাৎ ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। ও হরি! কোথায় কি? স্বামিস্ত্রী দুজনাই প্রথমটায় একটুখানি থতমতিয়ে তারপর বিপুল বিক্রমে হামলা করলে তাঁর দিকে। তিনি প্রায় পালাবার পথ পান না। ইতিমধ্যে বস্তির আরো দু পাঁচজন জড়ো হয়ে গিয়েছে। সমাজসেবী সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন ওদের ও দরদ যুযুধান দম্পতির প্রতি।

এটা কিছু একটা উটকো ফ্যাচাং নয়। পরবর্তী যুগে আমি দেশবিদেশে—এস্তেক অতিশিক্ষিত মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপেও এহেন কীর্তন একাধিকবার শুনেছি। দুজনার কাজিয়া মেটাতে গিয়েছ কি মরেছ। দুজনা একজোট হয়ে তোমাকে মারবে পাইকিরি কিল।

এতো গেল সাদামাটা পশুবল প্রয়োগের বর্বরতা ঠেকাবার প্রচেষ্টা। কিন্তু যে স্থলে দুইপক্ষই সাতিশয় শিক্ষিত—বলতে কি, যেন দেশমাতৃকার উচ্চতম অনবদ্য শিক্ষিত সন্তান—এবং যা হচ্ছে সেটি মার্জিততম বাকযুদ্ধ, সে স্থলেও আপনি যদি ফৈসালা করে দিতে চান তবে ফল একই। উভয়পক্ষ একে অন্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত আপন আপন বাক্যবাণ তন্মুহূর্তেই সংবরণ করে আপনাকে করে তুলবেন এজমালি চাঁদমারির টারগেট।

এ তো হল সে-দুর্দৈবের কীর্তন যে-স্থলে আপনার নিজস্ব—আপন বিশ্বাস অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তৃতীয় মত আপনি পোষণ করেন না; আপনি সেফ উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক সুবিবেচনাসহ প্রণিধান করে সুলে-সুপারিশসহ একটা মধ্যপন্থা বাতলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে স্থলে আপনি তৃতীয় মত পোষণ করেন সেখানে —ঈশ্বর রক্ষতু!—আপনার অকাল মৃত্যু অনিবার্য।

ভূমিকাটি আমার অনিচ্ছায় দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু প্রয়োজনাতীত বৃহল্লাঙুল নয়। কারণে ভবিষ্যতেও বহু বহুবার বহু বাদানুবাদের সম্মুখে আমাকে ঠিক এই-ভাবেই সরকারী প্রাণ (আজকালের ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের জমানায় ওটা আর পৈতৃক নয়, এবং জন্মের পরও দুগ্ধাভাবে, অন্নাভাবে ওটা সরকারের হাতেই সমর্পিত) হাতে নিয়ে এগোতে হবে।

*

একদল গুণীজ্ঞানী বলছেন প্রত্যেক—আমি প্রত্যেক শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিতে চাই—অধমের যা কিছু বক্তব্য সে ঐ প্রত্যেক (বা তাবৎ, কুল্লে) শব্দটি নিয়ে—ছাত্রটিকে শিখতে হবে নিদেন দুটি ভাষা। কেউ কেউ বলেন, সে শিখবে ক) আপন মাতৃভাষা ও ইংরিজি কেউ কেউ বলেন, খ) মাতৃভাষা এবং হিন্দী। এঁরা ইহলোকের তাবল্লোককে দোভাষী বানাতে চান—একেবারে শব্দার্থে নয় (ইহ সংসারে কটা লোকের মাত্র একবারের তরেও প্রফেশনাল দোভাষীর প্রয়োজন হয়?) ভাবার্থে। তফাত এঁদের মধ্যে এইটুকু: একদল মাতৃভাষা ও তদুপরি ইংরিজি শেখাতে চান, অন্য দল ইংরিজির বদলে হিন্দী। (আর যাঁদের মাতৃভাষাই হিন্দী তাঁদের কি হবে? সেটা এখনো স্থির হয়নি। তাঁরাই স্থির করবেন। অবশ্যই। কই সে মরদ যার মাতৃভাষা হিন্দী নয় এবং তৎসত্ত্বেও সে হিন্দী ভাষীদের সামনে কোনো 'বাৎ প্রস্তাবও' করবে? হায়, আপসোস! কেন হিন্দী ভাষী হয়ে জন্মালুম না?)

এতো গেল দোভাষীর দল।

অন্য দল ত্রিভাষী। এঁরা বলেন, অত ঝগড়া ফ্যাসাদের কী প্রয়োজন? বিদ্যার্থী তিনটে ভাষাই শিখবে। গ) মাতৃভাষা, হিন্দী এবং ইংরিজি। অর্থাৎ মাতৃভাষা শিখতেই হবে, তারপর কেউ বলছেন সেকেন্ড ল্যানগুইজ হবে হিন্দী, কেউ বলছেন না, ইংরিজি, আর এই ত্রিভাষীর দল মাতৃভাষা তো খাবেনই, তদুপরি ডুডুও খাবেন টামাকও খাবেন।

এই দোভাষী ও ত্রিভাষীতেই ঝগড়া।

এ ছাড়া আরো বহুবিধ আছেন। যেমন কেউ কেউ বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি, বৈদগ্ধ্য সভ্যতার প্রধান ভাণ্ডার সংস্কৃতে। সেই সংস্কৃতই যদি বিদ্যার্থী না শিখল তবে সে নিজকে ভারতীয় বলে কোন মুখে? যে বেদ উপনিষদ ষড়দর্শন নিয়ে আমরা নিজে গর্ব অনুভব করি, বিশ্বজনের সামনে তুলে ধরি সে-সবই তো সংস্কৃতে। এবং এই সংস্কৃতই একমাত্র বিদগ্ধ ভাষা যে-ভাষা একদা আসমুদ্র হিমাচল আর্য অনার্য সকলকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল। আজ যদি আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় আমাদের কারিকুলামে সংস্কৃতকে স্থান না দি এবং ফলে তার মৃত্যু ঘটে তবে ঐতিহ্যবিহীন হটেনটটে ও ভারতীয়তে একদিন আর কোনো পার্থক্য থাকবে না। যুক্তিগুলো যে খুবই সত্য এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্প্রদায় রণাঙ্গন থেকে ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। সংগ্রামে পরাজিত হওয়ার ফলে নয়। কারণ এঁদের বিরুদ্ধে কেউই সংগ্রাম ঘোষণা করে না—দেশের কর্তা ব্যক্তিরা এঁদের সেফ অবহেলা করে করে, just by ignoring এদের hors de combat, রণাঙ্গন থেকে অপসারিত করেন। কারণ সংস্কৃত বাবদে এইসব কর্তা ব্যক্তিদের বৃহত্তমাংশ ১০০% ignoramus।...এরই পিঠ পিঠ মুসল-মানরা বলেন, 'তাজমহল (কোনো মারকিন টুরিস্ট্ যখন তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে কোন ভারতীয় হিন্দুকে ঐ ইমারতের প্রশংসা করে অভিনন্দন জানায় তখন সে তো মুখ বাঁকিয়ে বলে না, না মশাই, এটা আমার দেশের মাটিতে আছে বটে কিন্তু

আমার ঐতিহ্যগত সম্পদের অংশ নয়. এটা মোচরমানদের—ইউ আর বারকিং আপ দি রঙ ট্রী!'), মোগল চিত্রকলা, খেয়াল ঠুংরি, ফারসীতে লিখিত ভূরি ভূরি ইতিহাসাদি অমূল্য গ্রন্থরাজি ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ বিশেষ—এদের সম্যক চর্চার জন্য ফারসী শেখানো উচিত, এবং ধর্মচর্চার জন্য যে আরবী ভাষা শিক্ষা ভিন্ন নান্য পন্থা বিদ্যতে সে তো স্বতঃসিদ্ধ।' সংস্কৃতওলাদের মত এ'রাও বারোয়ারিতে কল্কে পান না—উপরে উল্লিখিত একই কারণে।...এর পরে আছেন জৈন ধর্মাবলম্বী। এ'দের ধর্মগ্রন্থ অর্ধমাগধীতে। পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ প্রধানত আবেস্তার প্রাচীন পার্সিকে। এদেশে বৌদ্ধধর্মালম্বীর সংখ্যা নগণ্য কিন্তু তাঁদের শাস্ত্রীয় ভাষা পালিকে নিরঙ্কুশ উপেক্ষা করলে আমরা 'বৃহত্তর ভারতে' মুখ দেখাতে পারবো না। আমার এ নগণ্য জীবনে যে দুটি বিদেশীর সঙ্গে আমি একই ডরমির্টরিতে কিছুকাল বাস করি তাঁদের উভয়ই ছিলেন সিংহলের বৌদ্ধ শ্রমণ। শ্রমণ ধর্মপাল ও শরণঙ্কর এদেশে এসেছিলেন পালি ও সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য। এ ছাড়া শ্যামের রাজগুরুও বার্ধক্যে এদেশে এসেছিলেন তথাগতের আপন দেশে নির্বাণ লাভার্থে। হিন্দুর 'বার্ধক্যে বারাণসী' ন্যায়। ...এবং আছেন খৃষ্টসম্প্রদায়। যদ্যপি বাইবেলের আদিমাংশ (পূর্ব মীমাংসা?) হীবরুতেও নবীনাংশ (উত্তর মীমাংসা?) গ্রীকে তথাপি খৃষ্টানদের সর্বজনমান্য বাইবেলের অনুবাদ 'ভুলগাতে' লাতিন ভাষায়। লাতিন ভিন্ন খৃষ্ট পাদরির শিক্ষা-দীক্ষা অসম্পূর্ণ।

হালফিল বিজ্ঞানের জয়জয়কার! এ-'বিদ্যা' বোঙ্গে আনা রপ্ত করতে হলে নাকি জরমন ভাষা অবর্জনীয়।

অতি অবশ্য এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত। নিতান্ত কট্টর ভিন্ন কোনো মহামহোপাধ্যায়ই বিধান দেন না যে, সর্ববিদ্যার্থীকে ঘাড়ে ধরে সংস্কৃত শেখাতে হবে, কট্টর ভিন্ন কোনো মোল্লা তাবল্লোকের কল্লা ধরে বিসমিল্লা শেখাতে চায় না। প্রাগুক্ত দোভাষী এবং ত্রিভাষীরা কিন্তু যেসব ভাষা শেখাতে চান, সেগুলো ঘাড়ে ধরে শেখাতে চান। অতএব এই ভাষার রেস্-এ সংস্কৃত ফারসী পালিওলাদের উপস্থিত also ran বলে খারিজ করে দেওয়া যেতে পারে। আমি শুধু নিঘণ্টু নিরঙ্কুশ করার জন্য এদের উল্লেখ করলুম।

*

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুত ত্রিগুণা সেন আসলে বৈজ্ঞানিক বটেন, কিন্তু হিউম্যানিটিজেও তাঁর আবাল্য অনুরাগ। তদুপরি তাঁর কমনসেন্স্ আছে। অতএব তিনি সার্থকনামা ত্রিগুণধারী (সেন-এর বহুবচন সেন্স্ বা sense)।

দোভাষী ত্রিভাষীদের সামনে আরেকটি জীবনমরণ সমস্যা : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? ইংরিজি, হিন্দী, আঞ্চলিক ভাষা তিনটেরই সমর্থক আছেন।

এই সুবাদে আঞ্চলিক ভাষার সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীসেন বলেন (হুবহু বাক্যগুলো আমার মনে নেই বলে শ্রীসেন তথা পাঠকের প্রতি যদি অবিচার করে ফেলি তবে কোনো সজ্জন যেন আমার মেরামতী করে দেন) পৃথিবীর কোন্ সভ্য স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়? শিক্ষামন্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে আমাদের নিবেদন :—

এক শ' বছরও হয়নি কবি হেম বাঁড়ুয্যে লিখেছিলেন,

"চীন ব্রহ্মদেশ অ স ভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।"

সেই জাপানেও কি কখনো জাপানী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়েছে? বস্তুত পাঠক প্রত্যয় যাবেন না. মাত্র কিছুদিন হল ক্যানসার রোগের এক স্পেশালিস্ট্ আমাকে বলেন, ঐ রোগের গবেষণা জাপানে যা হয়েছে সেটা না জেনে সে সম্বন্ধে আপটুডেট হওয়া যায় না। এবং ওর সব কিছুই হয় জাপানী ভাষাতে।...কিন্তু অত দূরে যাবার কি প্রয়োজন? আফগানিস্তানের জনসংখ্যা কত? দেশটা কি খুবই মডারন? নাতো। আমি যখন সে দেশে পৌঁছই (১৯২৭) তখন সেখানে সবে প্রথম কলেজের প্রথম বর্ষ আরম্ভ হব হব করছে। বিশ্ববিদ্যালয় অরুণোদয় হতে ঢের ঢের দেরী। অথচ পরের বছর যখন ঐ ফার্স্ট্ ইয়ার চালু হল তখন তার মাধ্যম হল ফারসী। কিন্তু বৃথা বাক্যব্যয়। পাঠক একটু অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবেন ক্ষুদ্র ফিন্ল্যান্ড্ই বলুন আর বাল্গেরিয়াই বলুন, শিক্ষার বাহন সর্বত্রই মাতৃভাষা।

*

এই বারে আমরা পৌঁছলুম রণাঙ্গনের কেন্দ্রভূমিতে।

এই যারা দোভাষী ত্রিভাষী—হয় ইংরিজি, নয় হিন্দী কিংবা উভয়ই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছেন, তাঁদের শুধোই—শিক্ষামন্ত্রীর মন্ত্র এবং যন্ত্রের সঙ্গে টায়টায় গলা মিলিয়ে—'পৃথিবীর কোন্ সভ্য স্বাধীন দেশের ক'জন উচ্চশিক্ষিত লোক মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি ভাষা—উত্তমরূপে না হোক মধ্যম বা অধমরূপেই—জানে?'

আমি জনপদবাসী বা নগরের অর্ধশিক্ষিতদের কথা তুলছিনে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রীতিমত বি এ পাশ করেছে, তাদেরই কজন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য আরেকটি ভাষা পড়তে পারে, শুনলে বুঝতে পারে, লিখতে পারে, এবং মোটামুটি সাদামাটা কথাবার্তা বলতে পারে? বলা বাহুল্য, যারা কোনো বিদেশে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছে তাদের কথা হচ্ছে না। সে স্থলে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোকও বিদেশী ভাষা অনেকখানি রপ্ত করে ফেলে—আপন আপন মেধা অনুযায়ী।

এ-দেশের কথাও হচ্ছে না। আমরা 'স্বাধীনতা' পেয়েছি মাত্র সেদিন (যদ্যপি এই কুড়ি বৎসরেই আমরা কী তীব্র গতিতেই না ইংরিজির খোলস বর্জন করছি—এ বর্জনের জন্য কোনো মেহন্নৎ-কেরামতি করতে হয় না, আমাদের চৌকশ গোঁপ-খেজুরের আলস্যই এর পরিপূর্ণ ক্রেডিট পায়১)। এবং এই দেশেই প্রায় সাত শ' বছর ফারসী ছিল স্টেট ল্যানগুইজ—সেইটে একদম পালিশ করে ভুলতে আমাদের এক শ' বছরও লাগেনি।

ফরাসি দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কত পারসেন্ট ইংরিজি বই পড়তে পারে? বলতে পারে? এক পারসেন্টও না। মারকিন উচ্চশিক্ষিত লোক—স্কুল কলেজে আট বছর ফরাসি শিখেছে—ক' পারসেন্ট্ ফরাসি পড়তে বলতে পারে? ঠিক বি, এ পাশের পর? তার দশ বছর পর?

অর্থাৎ স্বাধীন দেশের শিক্ষিত লোককেও দোভাষী করা যায় না। ওটা একটা ফ্যাশান—ইস্কুল কলেজে সেকেন্ড্ ল্যানগুইজ পড়ানো।

পেটের ধান্দায় অনেকে দোভাষী হয়—স্কুলে না গিয়েও। মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী তামাম আসাম চষে খায়। ও! মারওয়াড়ের গ্রামে গ্রামে বুঝি সুবোশাম ইস্কুলে ইস্কুলে আসামী ভাষার দিগগজ পণ্ডিত বানানো হয়!

তাই বলি, দোভাষী ত্রিভাষী—এদেশের শিক্ষিত লোকও হবে না। থাকবে এক ভাষী। এবারে দোভাষী ত্রিভাষীর দল আপোসের চুলোচুলি ভুলে গিয়ে একজোট হয়ে আমাকে—আমি, এক ভাষীকে—মারবেন পাইকিরি কিল। এখন বলুন, আমার ভূমিকাটি কি অতি দীর্ঘ হয়েছিল?

---

(১) 'গোঁপখেজুরের' গল্পটি অতি প্রাচীন ক্ল্যাসিক পর্যায়ের : খেজুর গাছতলায় একটা লোক শুয়েছিল। একটা খেজুর কপালে পড়ে গড়াতে গড়াতে তার গোঁপে এসে ঠেকল। কিন্তু লোকটা এমনই হাড়-আলসে যে জিভ দিয়ে সেটা টেনে নিয়ে মুখে না পুরে অপেক্ষা করতে লাগল। দিন শেষে পদধ্বনি শুনে বিড়বিড় করে বললে, 'দাদা, এদিকে একটু ঘুরে যাবার সময় যদি দয়া করে তোমার পা দিয়ে ঐ খেজুরটা আমার মুখের ভিতর ঠেলে দাও! থ্যাঙ্কয়্যু!'

চব্বিশ
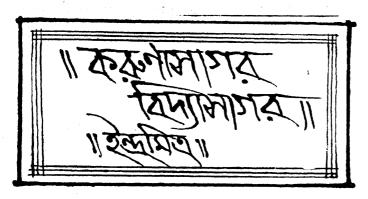
মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন যে বছর কলেজ হল, সেই বছরই 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ডে'র জন্ম।

সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের আয় বেশী নয়; টাকা-পয়সা সঞ্চয় করা হয়ে ওঠে না। সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের মৃত্যুর পর তার সংসার তাই নিঃসম্বল হয়ে পড়ে। এই দুরবস্থা থেকে সাধারণ বাঙালী সংসারকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই কলকাতায় 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হল ১৮৭২ সালের ১৫ জুন। মনে রাখা উচিত, প্রধানত বিদ্যাসাগরেরই প্রাণপণ চেষ্টায় 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ডে'র সৃষ্টি। আরম্ভ থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর বিদ্যাসাগর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এই ফান্ডের সঙ্গে।

আবার মেট্রোপলিটনে ফিরে আসা যাক।

১৮৭৯ সালে ফার্স্ট গ্রেড কলেজ হয়ে গেল মেট্রোপলিটন। ১৮৮১ সালে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে ছাত্রেরা বি এ পরীক্ষা দিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটান ইনস্টিট্যুশন। বাঙালীর নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরেজী বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।"

কলেজ-ক্লাস খোলার পর মেট্রোপলিটনের কাজ-কর্মে কোথাও কোনো বাধা-বিঘ্ন হয়নি, এ কথা মনে করলে ভুল হবে। পদে পদে বাধা পেয়েছেন বিদ্যাসাগর।

নিতান্ত বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর একবার কলেজের সব ছাত্রকে ডেকে বললেন—দেখ, রোজ রোজ গোলমালে দরকার নেই। তোরা কে কে চলে যেতে চাস, বল। এখনই চলে যা, আমি কলেজ-ক্লাস চাই না। কেউ না থাকে সেও ভালো, তবু গোলমাল চাই না। আজ বল, কে কে যাবি?

ছাত্রেরা চুপ।

তখন বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন, একেকজন করে সকলকে জিজ্ঞেস করবেন, কে কে এ কলেজ থেকে চলে যেতে চায়।

প্রথম যাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে বলল—আমি আর কোথাও যাব না।

একে একে সব ছাত্রই তখন বলল—পাস হই আর ফেল হই, এখানেই থাকব, অন্য কোথাও যাব না।

বিদ্যাসাগর খুশী হয়ে বললেন—তোদের জন্য আমার কি ভাবনা নেই? অন্য কলেজে পড়লে যেমন পড়া হত, এখানেও যাতে তা হয়, সে পক্ষে কোনো অভাব হবে না। তোরা লোকের কথায় নাচিস না।

মেট্রোপলিটনে একেকটি ছাত্রের তিন টাকা মাইনে লাগে। বিনা মাইনেতেও পড়ত অনেক ছাত্র। কোনো কোনো ছাত্রের খাওয়া-পরার খরচ আছে—কোথায় পাবে সেসব?

মফস্বল থেকে একটি গরীব ছেলে দরখাস্ত করেছে। সে বিনা মাইনেয় মেট্রোপলিটনে পড়তে চায়।

তা পড়ুক। প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন বিদ্যাসাগর। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু এখানে তুমি থাকবে কোথায়? তোমার খাওয়া-পরার কী ব্যবস্থা হবে? তা ছাড়া বই কিনতে টাকা লাগবে, অন্যান্য খরচ আছে—কোথায় পাবে সেসব?

ছেলেটি বলল—কলকাতায় অনেক দয়ালু বড়োমানুষ আছেন। আমি তাঁদের কয়েকজনের কাছে যাব, সামান্য মাসহারা চাইব। সেই মাসহারাতেই আমার সব খরচ চলে যাবে। আশা করি, কলকাতার কয়েকজন বড়োমানুষ আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করবেন।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কলকাতার দয়ালু বড়োমানুষদের নাম জানো?

—না। খোঁজ-খবর নিয়ে আমি একটা নামের ফর্দ করব।

বিদ্যাসাগর একখানা কাগজ এগিয়ে দিলেন ছেলেটির দিকে। একটা পেন্সিল দিলেন।

বললেন—এখনই ফর্দ করো। ... যাচ্ছি, তুমি নাম-ঠিকানা লিখে যাও।

বড়োমানুষদের নাম-ঠিকানা বলে যেতে লাগলেন বিদ্যাসাগর। ছেলেটি ফর্দ লিখে ফেলল। ফর্দ পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু, হায়, যা আশা করেছিল ছেলেটি তা হল না। কোথায় সাহায্য? কোথাও আশা নেই, ভরসা নেই, কিছু নেই। কেউ কেউ ছেলেটিকে হাঁকিয়ে দিয়েছে, কেউ কেউ অবশ্যি অনেকক্ষণ বাদে—না, হাতে-নাতে কিছু দেয়নি—পরের মাসে আসতে বলে দিয়েছে। পরের মাসে দেবে।

ছেলেটি গেল পরের মাসে। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

ছেলেটির প্রায় উপোস করার দশা। মন ভেঙে গেছে। নিরুপায় হয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে চলে এল ছেলেটি। ওকে দেখে খুশী হলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—কি হে, পেয়েছ? আশা করি, তুমি যেমন চেয়েছ কলকাতার দয়ালু বড়োমানুষদের কাছে তেমনি সাহায্য পেয়েছ।

মাথা নিচু করে রইল ছেলেটি। নিজের দুঃখের কথা বলল।

—আমি এক বিন্দু অবাক হইনি।—বিদ্যাসাগর বললেন—কলকাতার পয়সাঅলা, অলস, বাজে লোকদের মনে দয়া আছে, ... হল।

সেদিন থেকে ছেলেটির সব খরচ যুগিয়েছেন বিদ্যাসাগর।

১৮৭৮ সালে কুমারখালি হাই স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাস করেছে জলধর সেন। মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পেয়েছে।

ঘোর দারিদ্র্য সংসারে। দারিদ্র্যের সঙ্গে বিপুল সংগ্রাম করতে হয়েছে জলধর সেনকে।

এণ্ট্রান্সের ফল বেরল ডিসেম্বরে, মাস কয়েক পরে জলধর কলকাতায় চলে এল। শুনেছে, কলকাতায় গিয়ে বিদ্যাসাগরকে ধরতে পারলে তাঁর কলেজে বিনা মাইনেয় ভর্তি হবার আশা আছে।

কলকাতায় যেদিন এল, তার পরদিনই জলধর গেল বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। পরনে ময়লা ধুতি-চাদর, পায়ে নতুন চটি। জীবনে সেই প্রথম জুতো পায়ে দিয়েছে।

এক কথায় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ার সাহস হল না জলধরের। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের মধ্যে বিদ্যাসাগর যেন কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা শেষ হতেই বিদ্যাসাগর কাকে যেন বললেন—ওহে, দেখ তো, ভেতরে আনো।

জলধর চট করে ঘরে ঢুকল। একটা টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বিদ্যাসাগর সোজা হয়ে বসে আছেন। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করল জলধর। কিন্তু সাহস করে বিদ্যাসাগরের পায়ে হাত দিতে পারল না।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, কি চাস?

জলধর হাতজোড় করে বলল—আজ্ঞে, আমি কলেজে পড়তে চাই।

—এবার বুঝি পাস করেছিস?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। এবারেই সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করেছি, দশ টাকা স্কলারশিপও পেয়েছি।

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন—এতটুকু ছেলে স্কলারশিপ পেয়েছিস, বেশ! তোর বাড়ি কোথায়?

—কুমারখালি।

শুনে বিদ্যাসাগর বললেন—ওঃ, পাংশার কাছে। পাংশায় যে আমাদের সূর্যিদের বাড়ি।

সূর্যি মানে সূর্যকুমার অধিকারী। বিদ্যাসাগরের জামাই। তিনি তখন মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আচ্ছা, কলকাতায় বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে একটা কাজ পাওয়া যায় না? কলকাতায় গিয়ে একবার দেখা করলে হয় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।

সেই চেষ্টায় একবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন দীনেশচন্দ্র।

জ্যৈষ্ঠ মাসের একদিন দীনেশচন্দ্র বাদুড়-বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে চলে এলেন। একা এলেন না, সঙ্গে মামাতো ভাই মতিলাল আছেন।

দোতলার একখানা ঘর; চারদিকে বইয়ের আলমারির মধ্যে একখানা টেবিল, টেবিলের ধারে কয়েকখানা চেয়ার, একখানা চেয়ারে বসে বিদ্যাসাগর কাগজ-পত্র দেখছেন।

দুই ভাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলেন বিদ্যাসাগরকে। যেন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পা সরিয়ে নিতে লাগলেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু তার মধ্যেই দুজনের পায়ের ধুলো নেওয়া হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—কি চাস?

আর কি, চাকরি। বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে চাকরি চাইতে এসেছেন দীনেশচন্দ্র।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ি কোথায়?

দীনেশচন্দ্র বাঙাল।

বিদ্যাসাগর বললেন—তাই তো, তুই যে বাঙাল, তা তো তোর কথার টানেই বুঝতে পেরেছি। এখানকার ছাত্র তোর টিপ্রা জেলার ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্র নয় যে, তুই অনার্স পাস শুনে চমকে উঠবে। এখানে বড়ো বড়ো ওস্তাদ শিক্ষকেরা ঘায়েল হয়ে যায় তারা ক্লাস সামলে উঠতে পারে না; তুই বাঙাল, তোকে তো একদিনে পাগল করে ছাড়বে।

দীনেশচন্দ্র বললেন—ক্লাস পড়াতে দিয়ে দেখুন না, বেশ তো, দেখি আপনার ছেলেরা বাঙালকে কী করে ঘায়েল করতে পারে?

বিদ্যাসাগর বললেন—তোর তো বেশ সাহস আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, তুই পারবি। বাঙালের কর্ম নয়। যা হোক, তুই যখন চাচ্ছিস, আজ শনিবার, তুই সোমবার দিন এগারোটার সময় মেট্রোপলিটন স্কুলে যাস, আমি সেই সময় যাব, তোকে ক্লাস পড়াতে দেব।

দীনেশচন্দ্র শুনেছেন, বাঙাল মাস্টার মেট্রোপলিটনে বড় আমল পায়নি, তবু তাঁর এক কণা ভয় হল না।

যা কথা ছিল, সোমবার ঠিক সময়ে মেট্রোপলিটন স্কুলে গিয়ে হাজির হলেন দীনেশচন্দ্র। প্রায় পনেরো মিনিট পরে একখানা পাল্কি এসে স্কুলের গেটে থামল, পাল্কির ভেতর থেকে চটি পায়ে বিদ্যাসাগর বেরিয়ে এলেন। দীনেশচন্দ্রকে বললেন—চল, তোকে হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করিয়েই দি।

লাইব্রেরি রুমে ডাকিয়ে আনলেন হেড-মাস্টার মশাইকে। তাঁর সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁকে বললেন—তুমি একে প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তে দাও।

হেডমাস্টার মশাই দীনেশচন্দ্রকে বললেন—আপনি দেখছি ছেলেমানুষ। কী পড়াবেন?

দীনেশচন্দ্র বললেন—ইংরেজী আর ইতিহাস।

প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী পড়ালেন। ছাত্রেরা মুগ্ধ হয়ে শুনল। শেষকালে দীনেশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের বললেন—তোমাদের পড়া দেখছি খুব কমই হয়েছে। সামনে পরীক্ষা, কী করে সবটা শেষ করবে? ইংরেজী যিনি পড়িয়েছেন, তিনি বেশ হিসেব ঠিক করে পড়াননি।

বলে যেই ক্লাস থেকে বেরোবেন, দেখলেন, দরজার পাশে হেডমাস্টার চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন, দীনেশচন্দ্রের পড়ানো শুনছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী পড়ান স্বয়ং হেডমাস্টার মশাই। 'ইংরেজী যিনি পড়িয়েছেন, তিনি বেশ হিসেব ঠিক করে পড়াননি'—দীনেশচন্দ্রের এ কথা হয়তো হেডমাস্টারমশাই শুনতে পেয়েছেন এবং দীনেশচন্দ্রের একটু ভয় হল।

পরের ঘণ্টায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস পড়ালেন দীনেশচন্দ্র।

খোঁজ-খবর নিয়ে দীনেশচন্দ্র জানলেন, দুই শ্রেণীর ছাত্রেরাই দীনেশচন্দ্রের পড়ানো খুব পছন্দ করেছে।

পরদিন দীনেশচন্দ্র গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর টেবিলের দেরাজ থেকে একখানা কাগজ বের করে দীনেশচন্দ্রকে দেখালেন। হেডমাস্টার মশাই রিপোর্ট দাখিল করেছেন; জানিয়েছেন যে, প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা খুশী হয়নি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা ভালোই বলেছে।

দীনেশচন্দ্র রাগ করে বিদ্যাসাগরকে বললেন—এসব আপনার হেডমাস্টারের চালাকি, চলুন, আপনি নিজে ছাত্রদের জিজ্ঞাস করবেন। তারা যদি না বলে যে, আমি আপনার হেডমাস্টারের চেয়ে ইংরেজী ভালো পড়িয়েছি—তবে আমি কোনো কাজ চাই না। 'ইংরেজী যিনি পড়িয়েছেন তিনি বেশ হিসেব ঠিক করে পড়াননি'—ক্লাসে আমি এ কথা বলেছিলাম। তাই উনি রাগ করে অমন রিপোর্ট দিয়েছেন। হেডমাস্টার যে দুতীর মতো কপাটের আড়াল থেকে আমার কথা শুনেবেন, এ আমি জানতাম না।

বিদ্যাসাগর বললেন—তোর পেটের বেশ জোর আছে। তুই পারবি। অন্তত একটা ক্লাস তো খুশী করেছিস। হেডমাস্টার নিজে লিখেছে, আমি তা আশা করিনি। বাঙাল মাস্টার পেলে তো ছেলেরা তাকে লাট্টুর মতো ব্যবহার করে। যা হোক, আমি আর কোনো খোঁজ নেব না, তোকে যোগ্য মনে করলাম। কিন্তু তোর আগে পাঁচ-ছজন যোগ্যতা দেখিয়েছেন—এই দেখ তাদের নাম। এরা কাজ পেলে তুই পাবি। আর দেড় মাস কি দু মাস পরে আমি তোকে নিতে পারব। তুই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করিস।

দীনেশচন্দ্র বললেন—আমার যে কুমিল্লার স্কুল খুলেছে। দু-এক দিনের মধ্যেই আমাকে যেতে হবে। আপনি আমায় কাজ খালি হলে চিঠি লিখবেন।

—তা হবে না বিদ্যাসাগর ঘাড় নেড়ে বললেন, তোর এখানে থাকতে হবে। এখানে কর্মপ্রার্থী এত লোক আছে যে কাজ খালি হলে তোকে কুমিল্লা থেকে চিঠি লিখে আনানোর সবুর সইবে না। ওরকম করতে হলে ক্লাসে দশ-পনেরো দিন পড়া বন্ধ রাখতে হয়, তা পারব না। তুই সেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যদি এখানে থাকতে পারিস, তবে দু মাসের মধ্যে কাজ পাবি, এটি আমি বলতে পারি।

দীনেশচন্দ্র বললেন—আগেই সেখানকার কাজ আমি ছেড়ে দিতে পারব না। সেখানে

আমার একটা দায়িত্ব আছে। সেখানকার একটা ব্যবস্থা করে তো ছেড়ে দিতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—তবে আমি আর কী করব?

বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করে চলে গেলেন দীনেশচন্দ্র।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে মেট্রোপলিটন কলেজে কাজ দিলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—যাও, পড়াশোনা করো গে। ভেতরে ভেতরে টেক্কা হয়ে থেকো না যে, আমি খুব জানি।

এক দিন নয়, দু দিন নয় সাত দিন কালীকৃষ্ণের পিরিয়ডে কালীকৃষ্ণের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কেন? কালীকৃষ্ণ একদিন জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে বিদ্যাসাগর কয়েকখানা স্লিপ বের করে দেখালেন। কালীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরকে স্লিপ দেওয়া হয়েছে; এঁর পিরিয়ডে ছেলেরা গোলমাল করে, ইনি ভালো পড়াতে পারেন না ইত্যাদি। স্লিপ দেখিয়ে বিদ্যাসাগর বললেন—আমার বোধ হয় কলেজের উপরাওলাদের কারো কোনো লোকের কাজের দরকার হয়েছে, তাই এই-রকম স্লিপ। আমি তো তোমার পড়ানো শুনলাম। তুমি নির্ভয়ে কাজ করো গে।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন: "মেট্রোপলিটান কলেজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণ ছিল। তিনি প্রায়ই প্রতিদিন কলেজ ও স্কুল দেখিতে আসিতেন। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে পাইলেই তাঁহার নিকট আনন্দে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিত ও নানারূপ আনন্দ প্রকাশ করিত। তিনিও তাহাদিগকে লইয়া মহা আনন্দিত হইতেন। তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া তাঁহাদের অধ্যাপনা শুনিতেন। দোষ দেখিলে তাহার শোধন করিয়া দিতেন। ছাত্রদিগের যাহাতে সম্মান রক্ষা হয়, সে বিষয়ে শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। একদিন আমি অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত হইয়া একটি ছাত্রকে প্রশ্ন করি, সে তাহার উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়াতে আমি অন্য ছাত্রকে তাহার প্রকৃত উত্তরের জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু পর ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা ভাল বোধ হইল না। পুনরায় পূর্ব ছাত্রকে দ্রষ্টব্য বিষয়ের আভাস দিয়া ক্রমে তাহার মুখ হইতেই সম্পূর্ণ উত্তর বাহির করাইয়া লইলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। তিনি আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, এক ছাত্র একটা বিষয় বলিতে না পারিলে তজ্জন্য অন্য ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে নাই। ইহাতে পূর্ব ছাত্রের অবমাননা করা হয়। যেমন করিলে, এইরূপে যাহাতে ছাত্রের মুখ দিয়া প্রকৃত উত্তর বাহির হয় তাহার আভাস দিবে ও তাহার মুখ দিয়া বাহির করাইয়া লইবে।"

মেট্রোপলিটনের জন্য ভালো শিক্ষকের খোঁজ করতেন বিদ্যাসাগর। কোথাও ভালো শিক্ষকের খোঁজ পেলে তাঁকে মেট্রোপলিটনে নিয়ে আসতে চাইতেন। একদিন শুনলেন, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সুশিক্ষক। বিদ্যাসাগর ডেকে পাঠালেন গঙ্গাধরকে।

গঙ্গাধর এলেন। হাঁ, বিদ্যাসাগর গঙ্গাধরকে মেট্রোপলিটনে নিতে চান। গঙ্গাধর রাজী?

গঙ্গাধর বললেন—আপনার হাতে আসতে পারলে আমার বিশেষ লাভ হবে। কিন্তু যেখানে এখন কাজ করছি সেখান থেকে হঠাৎ অসময়ে চলে এলে সেখানকার ছাত্রদের বিশেষ ক্ষতি হবে। সুতরাং এখন পারব না। যখন বুঝব আমি ছেড়ে এলে সেখানে বিশেষ ক্ষতি হবে না, তখন আসতে পারি। কেবল টাকার দিকে তাকালে মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

গঙ্গাধরের কথা শুনে বিশেষ খুশী হলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—ভাই গঙ্গাধর, আমি তোমার এই কথায় খুব খুশী হলাম। তোমাদের মতো লোক নিয়েই বাঙলার গৌরব। তুমি টাকার খাতিরে অসময়ে সে বিদ্যালয় ছেড়ে আসো, এ কথা কিছুতেই বলতে পারব না। আমি তোমাকে তাদের সম্বন্ধে পেজোমি করতে বলতে পারব না।

মেট্রোপলিটনের অধ্যাপকদের মাইনে খুব ভালো।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন একদিন মেট্রোপলিটনের একজন

অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কী বেতন পাও?

বেতনের অংক শুনে মহেশচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন—বলো কি? তুমি এত টাকা পাও! বিদ্যাসাগর মশায় টাকা ঢেলে দেন?

কোনো শিক্ষক বা অধ্যাপক নিজেকে বিদ্যাসাগরের ভৃত্য বলে পরিচয় দিলে বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলতেন— তোমরা আমার সহকারী। আমি সকল কাজ করতে অক্ষম বলেই তোমাদের সহকারী করেছি। ভৃত্য বলো কেন? তোমাদের অধ্যাপনায় যে টাকা আসে তা ধরতে গেলে তোমাদেরই। আমি কেবল ভাগ করে দিই।

নীচু ক্লাসের একজন মাস্টারমশাই ক্লাসের মধ্যে চেয়ারে বসে ঢুলতেন। বিদ্যাসাগরের চোখে পড়ে গেল। মহাবিরক্ত হয়ে মাস্টার-মশাইকে জাগিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

নির্ঘাত চাকরি চলে যাবে। মুখে কথা নেই, বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মাস্টার-মশাই।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তুমি দিনের বেলা ঘুমোচ্ছ কেন? তুমি কি কাল রাত্রে ঘুমোওনি?

ভঁয়ে ভয়ে মাস্টারমশাই বললেন—আমাকে অনেক খাটতে হয়। মস্ত সংসার, দু তিনটে টুইশন করে চালাতে হয়। তাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, সেজন্যে প্রায়ই দাঁড়িয়ে পড়াই। আজ বসে পড়াতে গিয়ে বিপদে পড়েছি।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তুমি টুইশন করে কত টাকা পাও?

টাকার অংক বললেন মাস্টারমশাই।

বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি এখন হতে এই টাকাটা এখান থেকে পাবে। আজই টুইশনগুলি ছেড়ে দাও।

কিছুকাল মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সূর্যকুমার অধিকারী। কলেজের খরচ কমানোর চেষ্টা করেছেন সূর্যকুমার, বিদ্যাসাগর মহা বিরক্ত হয়ে বলেছেন—আমি কি তোমাকে তিল-কাঞ্চনে কাজ সারতে বলেছি?

অপরাধ যদি ক্ষমার অযোগ্য হয় তো বিদ্যাসাগর ক্ষমা করেন না, ক্ষমা করেননি।

কয়েকটি কাহিনী আছে।

মেট্রোপলিটন কলেজের পশ্চিম দিকে সে সময়ে ব্রাহ্ম বালিকাদের 'অবলা ব্যারাক'। কলেজের কয়েকটি ছাত্র মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করে যা মেয়েদের প্রতি শিষ্টাচার নয়।

বিদ্যাসাগরকে এই খবর দিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী।

একদিন 'অবলা ব্যারাকে' ঢুকে বিদ্যাসাগর আড়ি পেতে রইলেন। নিজের চোখে মেট্রোপলিটনের কয়েকটি অশিষ্ট ছাত্রের কীর্তি দেখলেন।

এবং সেই মুহূর্তে কলেজে এসে অশিষ্ট ছাত্রদের নাম কেটে বিদায় করে দিলেন।

কলেজের আয়-ব্যয়ের খাতা দেখতে দেখতে বিদ্যাসাগর একদিন লক্ষ করলেন, হাজার দু-তিন টাকা ঘাটতি পড়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ তখন সূর্যকুমার অধিকারী।

বিদ্যাসাগর বললেন—সূর্যি, হিসেবটা একবার দেখ তো। আমি তিন দিন বাদে আবার আসব।

তিন দিন বাদে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—সূর্যি, হিসেবটা মিলল?

অধ্যক্ষ মাথা চুলকোতে লাগলেন। কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

বিদ্যাসাগর বললেন—টাকার যদি দরকার ছিল তো আমায় বললে না কেন? এ কি আমার বাপের টাকা? এ যে ছেলেদের টাকা। যাক, আজ থেকে তোমায় আর প্রিন্সিপাল-গিরি করতে হবে না।

তারপর উচ্চ কণ্ঠে হাঁকলেন—বদ্দিনাথ।

বৈদ্যনাথ বসু হাজির হলেন। বিদ্যাসাগর বললেন—আজ থেকে তুই কলেজের প্রিন্সিপাল।

বিদ্যাসাগরের জামাই হয়েও সূর্যকুমার নিস্তার পেলেন না।

গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মেট্রোপলিটনের ছাত্র। কী একখানা বইয়ের দরকার হয়েছে তার। কলেজের লাইব্রেরিতে বইখানা আছে।

প্রিন্সিপাল বৈদ্যনাথ বসু একখানা অনুমতিপত্র দিলেন গোপালচন্দ্রকে। সেখানা লাইব্রেরিয়ানকে দিলেই বইখানা পাওয়ার কথা।

কলেজের লাইব্রেরিয়ান তখন শশীবাবু। বিদ্যাসাগরের বন্ধুপুত্র।

প্রিন্সিপালের অনুমতিপত্র শশীবাবু হাতে পেতে নিলেন। তারপর গোপালচন্দ্রকে বললেন—এখন বই হবে না, যাও।

খবরটা একজন বেয়ারা বিদ্যাসাগরের কানে তুলে দিল।

গোপালচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন বিদ্যাসাগর। জানতে চাইলেন, শশীবাবু কি বলেছেন?

গোপালচন্দ্র পড়লেন মহা মুশকিলে। ব্যাপারটা তিনি লঘু করার চেষ্টা করলেন।

শশীবাবু প্রিন্সিপালকে অপমান করেছেন, ছাত্রের প্রয়োজন উপেক্ষা করেছেন। বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় শশীবাবুর অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

বিদ্যাসাগরের বন্ধুপুত্র বলে শশীবাবু রেহাই পেলেন না। সেই মুহূর্তে শশীবাবুকে বরখাস্ত করে দিলেন বিদ্যাসাগর।

তা হলে মেট্রোপলিটনে যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই কি ষোলো আনা সাধুপুরুষ, সকলেই কি সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে? না, তা নয়।

মেট্রোপলিটনে অতি ভয়ানক ভয়ানক লোক আছেন, বিদ্যাসাগর জানেন। জেনে-শুনেও বিদ্যাসাগর তাঁদের মেট্রোপলিটনে রেখেছেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর—কাজ পাই বলে।

ক্রমশ

যৌবনের কমনীয়তা...কোমল লাবণ্য
জয় সৌন্দর্য্য সাবান আপনাকে এনে দেবে তরুণ কমনীয়তা। আপনার গায়ের রঙে ফুটিয়ে তুলবে সজীব আভা। এর মোলায়েম ফেনা আপনার গায়ের চামড়া আরও সযত্নে পরিষ্কার ক'রে দেবে আর চামড়া নরম করবার তেলগুলিকে ভেতরে পৌঁছে দেবে। আপনার ভাল লাগবে এই সাবানের অপূর্ব চামেলীর গন্ধ — আর ওই গন্ধ থাকে সাবানের শেষ পর্যন্ত। মনে রাখবেন, একমাত্র জয় সাবানই আধুনিক ফয়েল মোড়কে সযত্নে রক্ষিত।
জয় — এই অতি বিশেষ সৌন্দর্য্য সাবানটির দাম আপনি যা ভাবছেন তার চাইতে কম!
কোমল লাবণ্যের জন্য
জয়
সৌন্দর্য্য সাবান
আপনার প্রিয় সুগন্ধযুক্ত
Jai
BEAUTY SOAP
টাটার
তৈরী

মস্কো, ১১ অকটোবর

সোভিয়েত সংবাদপত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে এ চিঠিটার নাম দেওয়া যেতে পারে 'মস্কো-তাশখন্দ', কেননা এর মধ্যে মস্ত একটা লাফ দিয়েছিলাম মধ্য এশিয়ায়। পেরিয়ে আসতে হল শুধু ভূগোল নয়, এক মহা ইতিহাস।

নিজেকে দিয়ে প্রথমেই টের পেতে হল মরুভূমি সম্পর্কে মামুলী বঙ্গবাসীর ধারণাটা কী পরিমাণ মরীচিকা। প্রথম দেখাটা বিমান থেকে এবং জেট প্লেনের নিরাপত্তায় যেটুকু চোখে পড়ে সেটায় তাজ্জব লাগে এই জন্য যে, বৃহৎ মানচিত্রের হলুদ রঙা সেই জায়গাটার সঙ্গে তা আশ্চর্য একরকম, যার ওপর সাধারণত লেখা থাকে মরুভূমি। নিচুতে ওড়া আন-২২-এর কল্যাণেই আন্দাজ করা গেল কিজল কুম মরু (আক্ষরিক অর্থে লাল বালি) শুধু লাল নয় এবং শুধু বালি নয়। মাঝে মাঝে তা নুন ফুটে শাদা, বিরল কাঁটাগাছের আঁচড়ে কালচে, নুড়ি আর কাঁকরে মাটির ডাঙ্গায় ধূসর, পাহাড় আর শুকনো নদীর খাতে বন্ধুর, এবং ক্যারাভান পথের আঁকা-বাঁকায় আর ইদানীং মোটর রোড ও রেল লাইনের টানাটানায় সর্বাঙ্গে জালিকাটা।

কোন যুগে নাকি সাগর শুকিয়ে, পর্বত ধ্বসে নায়েগ্রা প্রপাতের মতো অজস্র জল--স্রোতের খাত বদলে বদলে একটা ভূতাত্ত্বিক পর্ব শেষ হয়। তারপর হঠাৎ নিথর হয়ে যাওয়া এক পাটকিলে ঢেউয়ের মধ্য সমুদ্রের মতো এই বিস্তীর্ণ সমভূমিটার স্থানে স্থানে মানুষ যখন তার আদি প্রত্যূষেই শিলার বুকে দুই কুঁজওয়ালা উট আর লম্বা গলা ঘোড়ার ছবি আঁকতে বসেছিল, তখন নিশ্চয় জানত না যে ইতিহাসের আরো যে ভাঙচুর বইবে তার ওপর দিয়ে সেটা তার ভূতাত্ত্বিক পর্বের চেয়ে কম উত্তাল নয়।

আর এখানে যে ঘোড়া ছুটেছে, বার বারই তার ধুলো উড়েছে পামিরের ওপারে ভারতবর্ষে। অথচ কী আশ্চর্য, আমরা যাকে বলি সম্রাট, সেই মোঘল বাদশার মূর্তি দেখলাম এদের প্রদর্শনীতে, যার নিচে লেখা "কবি বাবর।"

এক প্রান্তে চীন এবং অন্য প্রান্তে ভারত, পারস্য, ভূমধ্যসাগর জুড়ে অতীতের যে বিরাট সার্থবাহ বাণিজ্যপথটা গিয়ে-ছিল এই মরুমাটির বুক দিয়ে, তার বাঁকে বাঁকে কত আগেই কত উঁচু সংস্কৃতির শহর গড়ে উঠতে শুরু করেছিল তার চাক্ষুষ একটা নিদর্শন দেখা গেল বর্তমান সমর-খন্দের পাশেই পলিমাটির পাহাড় খুঁড়ে বার করা পুরো একটা মাটি চাপা শহর আফ্রাসিয়াবে। সবটা খুঁড়ে বার করতে এখনো ঢের বছর লাগবে কিন্তু ইতিমধ্যেই নমুনা খননে যেসব সেরামিক ও মুদ্রা পাওয়া গেছে তাতে ১৯৭০ সালে সমরখন্দ তার ২৫০০তম জন্মোৎসব পালনের মতো জোর পেয়েছে। আলেকজান্দারের ঘোড়-সওয়াররা যে এতটা মরু পেরোতে রাজী হয়েছিল তার কারণ নিশ্চয় তাদের ভাষায় 'মরুকন্দের' ঐশ্বর্য।

গ্রীস বা পারস্যের মতো ভারত তার সৈন্য পাঠায় নি, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম যে পাঠিয়েছিল তার অনেক সাক্ষ্যের মধ্যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে তেরমেজের বৌদ্ধ মন্দির ও প্রাচীন সংস্কৃত লিপি। যাযাবর কুশানরা সাম্রাজ্য স্থাপন করে তার কেন্দ্র ভারতে সরিয়ে নিলেও বুখারা শহরের আদি উৎপত্তি নাকি, জনৈক রুশ পণ্ডিতের মতে, বৌদ্ধ 'বিহার' শব্দ থেকে।

আফ্রাসিয়াবে ৮ম শতকের দেয়ালে সেই আশ্চর্য ফ্রেস্কোটি বর্তমানে ফের মাটি চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে যাতে সবটা পুনরুদ্ধারের মতো রাসায়নিক মাল মসলা না পাওয়া পর্যন্ত খোলা হাওয়ায় নষ্ট না হয়। কিন্তু তার প্রতিলিপিতে হস্তিপৃষ্ঠে সপারিষদ রাজপুরুষের যে ছবিটা দেখেছি, তাতে নিজের আনাড়িত্বে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও বলবার লোভ হচ্ছে চীন এবং পারস্য প্রভাব ছাড়াও অজন্তার সঙ্গেও কি কিছু মিল নেই?

তবে এ পর্বটা প্রায় ধ্বংসে হয় আরব অভিযানের নিষ্ঠুরতায়। আরবদের ধর্ম ও বিদ্যা গ্রহণ করেই মধ্য এশিয়া যখন ফের স্ফিংকসের মতো উত্থিত হয়েছে তখন ও প্রান্ত থেকে ধেয়ে এল চেঙ্গিসের ঘোড়-সওয়াররা। বুখারায় দেখেছি প্রাচীন অগ্নিপূজকদের মন্দিরের ওপর মসজিদ তুলেছে ইসলাম—ভারতে এ দৃশ্য আমাদের চেনা। বন্য মঙ্গল-তাতাররা কিন্তু প্রাচীন যা কিছু দেখেছে তাকেই আক্ষরিক অর্থে ধুলোয় মিশিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি পায় নি। সেটা সহজ ছিল আরো এই জন্য যে, খিবা বুখারা সমরখন্দ সর্বত্রই সৌধ

উজবেক রিপাবলিকের অন্তর্গত বুখারাতে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাস্কর্যের নিদর্শন কল্যাণ মিনার... ...

উজবেক রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট ইয়াদগার নাসরিদ্দিনোভা

গড়ে উঠত মাটিতে, রোদপোড়া ইঁটে, পাথরে কদাচিৎ। শ্মশান হল খরেজম, চূর্ণ হল সেচ ব্যবস্থা, মাটি চাপা পড়ল আদি সমরখন্দ! দেড়শ' বছর পরে সমান ভয়ংকর আরেক দিগ্বিজয়ী খোঁড়া তৈমুর যখন দুনিয়ার শুধু ধন নয়, গুণী ও কারিগরদেরও লুট করে এনে যে রাজধানীতে বিশ্বের বিস্ময় করে তুলেছিল সেটা নতুন সমরখন্দ।

পূর্ণিমার আলোয় দেখা গেল সেই ভেঙে ভেঙে পড়া অতিকায় দম্ভ—নিঝুম 'বিবি খানম' মসজিদ, তৈমুর যা গড়তে শুরু করেছিল তার প্রতাপের স্মারক হিসাবে, কবির ভাষায় যার গম্বুজ হত, 'দুনিয়ায় একতম যদি না থাকত আসমান, যার খিলান হত অদ্বিতীয় যদি তার জুড়ি না থাকত ছায়াপথে।' কিন্তু তৈমুর এবং পরবর্তী তৈমুর বংশীয়রা কেউ-ই যে সে খিলান কিছুতেই জুড়ে তুলতে পারে নি তার কারণ সে যুগে এত বিরাট পরিকল্পনা সফল করা ছিল সর্বাধিপতিরও অসাধ্য।

কিন্তু তৈমুর নয়, তাকেও যে ছাড়িয়ে গেছে, সবচেয়ে উঁচু জায়গা পেয়ে মরুভূমি পেরনো দীর্ঘাকার মরসুমী সারসেরা এসে যেখানে বাসা বাঁধে, বুখারার সেই মিনার কলিয়ান বা বড়ো মিনারের চেয়েও যে লম্বা, সে আর কেউ নয়, তৈমুরের নাতি রাজর্ষি উলুক বেগ। পঞ্চদশ শতকের ওই গোড়াতেই তাঁর নিজের তৈরি যে আশ্চর্য মানমন্দিরের, বিরাট মর্মর সেকসণ্টের একটু অংশই আজো টিকে আছে সেখানে বসে উলুকবেগ যে গ্রহ নক্ষত্রের তালিকা প্রণয়ন করেন, তার অতখানি সঠিকতায় অনেক পরের ইউরোপীয় পণ্ডিতরাও স্তম্ভিত হয়েছেন। নিজের গড়া মাদ্রাসায় তিনি নিজে নিজে পড়াতেন কোরান নয়, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন। ধর্ম রসাতলে গেল বলে যেদিন এমন একটি লোককে খুন হতে হল, সেদিন থেকেই সম্ভবত মধ্য এশিয়ার পতনের শুরু।

এ অন্ধতা পর্যায়ে পর্যায়ে কতটা ঘন হয়েছে, তার একটি প্রতীক বলে আমার মনে হয়েছিল বুখারার ওই পূর্বকথিত কলিয়ান মিনারটির পাশে দাঁড়িয়ে। পোড়া ইটের কারুকাজ করা আশ্চর্য সুঠাম এই মিনারটি তোলা হয়েছিল বারো শতকের গোড়ায়। যুগে যুগে স্তর পড়ে তার গোড়াটা বর্তমানে ১০ মিটার বুজে গেছে, মাটির ওপরে জেগে আছে শুধু পঞ্চাশ মিটার। কারাকিতাই উপজাতির অবিরাম হামলার সময় এ মিনারের প্রধান কাজ ছিল শত্রু আগমনের হুশিয়ারি দেওয়া। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে ষোলো শতকে তা পরিণত হল ধর্মকেন্দ্রে, মোয়াজ্জেমখানায়—দিনে পাঁচ বার আজানের ডাক দেওয়া হত তার ওপর থেকে। আঠারো শতকে তা বদলে গেল 'উলুম মিনোরসি' বা মরণ মিনারে, লোকে আজও ঐ নামেই তাকে চেনে। ক্ষুদে স্বৈরপ্রভু আমিরের হুকুমে তখন অপরাধীর প্রাণদণ্ড হচ্ছে ঐ মৃত্যুমঞ্চ থেকে ধাক্কিয়ে ফেলে। আর কাছেই স্তরের পর স্তর ইতিহাস চাপা দিয়ে ওঠা মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোর ও পাশে তখন ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে 'তক' বা চাঁদিনি চক। সস্তা মনিহারি মাল নিয়ে ইরানী, আর্মানী হিন্দুস্তানী সওদাগরদের কারাভান এসে ঢুকছে তাদের নিজ নিজ সরাইয়ে, রেকাবের ওপর নানা দেশের স্তূপাকৃতি তনখা নিয়ে লেনদেন করছে পোদ্দাররা, আর আশ্চর্য মাইয়োলিকে বাঁধানো 'দরোয়াজা'র পাশে বুখারার গোলাম-বাজারে গাধা উট ভেড়া দুম্বার বিচিত্র গন্ধে, বিসদৃশ মলত্যাগে, বিকট ব্যাদনে রঙ করা দাড়ি আর আতর গোঁজা কানে জরির টুপি পরা "বাই'রা টিপে টিপে দেখছে খুবসুরৎ বাঁদীটার দাম বিশ আসরফী নাকি পঁচিশ।

বড়ো মিনার থেকে শেষ প্রাণদণ্ড হয় ১৮৮৪ সালে। রুশ জারের আশ্রয়ে আসায় গোলাম বাজারও আইনত বন্ধ হয়। কিন্তু তাশখন্দ সমরখন্দ ফেরগনায় রুশ লাটেদের 'নয়া শহর' গড়ে উঠতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সারা উজবেকিস্তান জুড়ে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কাজী মোল্লা বাই আর সাহারদের সম্মিলিত পীড়নের যে দুর্দশা ছড়ায়, ভারতবাসীকে তা কল্পনা করতে হলে নিশ্চয় ফিরে যেতে হবে আমাদের আঠারো শতকে।

তবে ধূর্ত ইংরেজ কদাচ যে ভুল করে নি, ঠিক সেই ভুলটাই ক্রমাগত পাকিয়ে তুলেছিল রুশ জার। উপনিবেশে তারা শুধু রুশী কাট আর বিলাসী প্রিন্স আর নির্বোধ বড়ো কর্তাদেরই পাঠায় নি, সেই সঙ্গে পাঠিয়ে বসল রেল পথের রুশী মজুর, কারখানার রুশী মিস্ত্রি, নির্বাসিত

রুশী বিপ্লবীদের। ভেবেছিল মধ্য রাশিয়া বাঁচবে, দেখা গেল মধ্য এশিয়াও জবলে উঠেছে।

বিফল হয়ে গেল লাটেদের হুকুম। কেল্লার তোরণে ঝোলানো প্রকাণ্ড সেই যে বেত্তো থেকে প্রকাশ্য ময়দানে সাতাত্তর কোড়া খেতে হয়েছিল আধুনিক উজবেক সাহিত্যের জনক সদরুদ্দীন আইনীকে, তা আর কোনোই ভয় জাগাতে পারল না। উটের পিঠে সোনা দানা চাপিয়ে হারেমের শতখানেক বেগমকে সংগে নিয়ে এবং আরো শতখানেককে ফেলে রেখে পালাতে হল আমিরকে। আর আজও গর্ব হয় বইকি, যখন এই বুখারাতেই হঠাৎ-দেখা বৃদ্ধ রফিক আহমদের মুখে শুনলাম উত্তাল সেই দিনগুলোর রুশী মজুর, লাল ফৌজী আর উজবেক তাজিক 'দেহকান'দের সংগে একত্রে হিন্দুকুশ পেরিয়ে আসা ৩৪ জন ভারতীয় বিপ্লবীও কিভাবে লড়েছিল। রুশ বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরে আজ রফিক আহমদ ভুপাল থেকে দেখতে এসেছেন তাঁর যৌবনের রণক্ষেত্র।

দেখতে এসেছেন, কিন্তু বর্তমান উজবেকিস্তানকে ঠিক চিনে উঠতে পারছিলেন না রফিক আহমদ। বার বার শুধু বলছেন, 'বদলে গেছে, একেবারে বদলে গেছে!'

পঞ্চাশ বছরে নিশ্চয় সব কোনো দেশেরই অনেক বদলাবার কথা। কিন্তু যখন জানি যে একসময় তার রাজধানীর [illegible] একটি মেয়েও দেখা যেত না [illegible] আর আজ আমি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে শুধু [illegible] একটি [illegible] দেখতে পেলাম না, [illegible] যখন জানি যে সে সময় উচ্চ শিক্ষিত উজবেক ছিল মাত্র দুজন কি একজন, [illegible] নিরক্ষরতা, [illegible] এমন কি [illegible] [illegible] এই একেবারে নিরক্ষর মানুষগুলোই এখন [illegible], উকিল, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, [illegible], অ্যাকাডেমিশিয়ান; যখন [illegible] [illegible] ছাড়া অন্য [illegible] ছিল মেয়েদের একেবারে [illegible], তারা এখন সুতাকলে অটোমেটিক তাঁত চালাচ্ছে, শহরের রাস্তায় ট্রাম হাঁকাচ্ছে, ক্ষেতে বসছে হার্ভেস্টার কম্বাইনে, রোগী দেখছে, গবেষণা করছে, [illegible] দিচ্ছে পার্লামেন্টে, হয়ে উঠেছে প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, এমন কি উজবেক রাষ্ট্রেরও কর্ণধার, তাদের অসংখ্যই উজবেক মেয়ে হলেও কেউ বিস্ময় বোধও করছে না; যখন উজবেক মজুরানির ঘরে ঢুকে দেখি গ্যাস, রেডিও টেলিভিশন এবং অবশ্যই একাধিক সেই জমকালো গালিচা যা তখন-এ পাততে পারত শুধু 'বাই'রা; যখন গাঁয়ের [illegible] [illegible] জাজিম আর তুলোর প্রাচুর্যই নয়, চোখ ধাঁধিয়ে যায় গ্যাসচালিত হামামকে আধুনিক স্নানাগারে যেখানে আগে [illegible] জন্যই লোককে কিনতে হত ভিস্তি-ওয়ালার কাছ থেকে; তখন আপনা থেকেই মনে হয় এতো সব কি কখনো হতে পারত যদি এ জাতটা তাদের মুক্তি গ্রহণ করত মজুরের হাতে হাত দিয়ে নয়, বলশেভিকদের কাছে হাত পেতে?

সাধ হয় দাঁড়ি, অনেক দিন দাঁড়ি, নিজের চোখে দেখে যাই আমাদের [illegible] [illegible] নিজের জীবন। কাহিনী [illegible] [illegible] [illegible] একটি মেয়ে, দু চোখ মায়ের মতো [illegible], একটু না [illegible] বাপ মরা মেয়ে ছিল, সরকারের বাড়িতে ঠাঁই হয় নি, তিন বছর বয়স থেকে লোকের বাড়ি এ'টোকাঁটা তাড়া খেয়ে মানুষ। দশ বছর বয়সে প্রথম ছেঁড়া নয়, নতুন জামা পরে সোভিয়েত এতিমখানায়। আর আজ তিনি উজবেক প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতি-মণ্ডলীর সভাপতি, আই সি নাসিরিদ্দিনভা।

'তাদের জীবন হবে অনেক বড়ো।' আমি যোগ করতে চেয়েছিলাম, তৈমুরের 'বিবি খানমের' চেয়েও। সামনের বিরাট জানালা দিয়ে চোখে পড়ছিল গত বছরের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধসে পড়া তাশকন্দ ইতিমধ্যেই একেবারে নতুন হয়ে উঠছে। গোলাপে লাল হয়ে আছে সামনের ঢালুটা।

ননী ভৌমিক

বিবি খানম্ মসজিদের (১৩৯৯—১৪০৪) ধ্বংসাবশেষ

স্পুৎনিকের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে

খুব রকেট স্টেশনের গবেষণায় যেসব দেশ অংশ গ্রহণ করছে তাদের মধ্যে রয়েছে আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে দেশে লোকের দু' বেলা দু' মুঠো অন্নই জোটে না তার আবার রকেট নিয়ে পয়সা খরচ করা কেন? কথাটার মধ্যে যুক্তি যে একেবারেই নেই তা নয়। তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এই অন্ন উৎপাদনের ব্যাপারটা যে জিনিসটির উপর নির্ভরশীল সেই আবহাবিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে মহাকাশযানের গুরুত্ব সামান্য
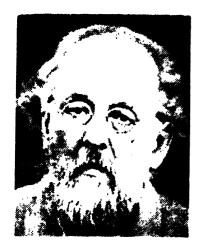
কনস্তান্তিন সিয়লকভ্স্কি

নয়। বৎসর বিশেষে খাদ্যশস্য কেমন হবে না হবে সেটা আগে থাকতে আন্দাজ করা যায় আবহ পূর্বাভাসের সাহায্যে। এখনো পর্যন্ত ভূমণ্ডলের মাত্র ২০ শতাংশ আবহ পরীক্ষা কেন্দ্র আছে। কিন্তু আবহমণ্ডলের উচ্চস্তরে কতকগুলি স্পুৎনিক চালিয়ে শুধু যে আসন্ন আবহ সম্পর্কে আভাস পাওয়া যাবে তাই নয়, এমন কি ভবিষ্যতে ঐভাবে আবহকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হবে। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়ার যে প্রথম "শিশু চাঁদ" বা প্রথম স্পুৎনিকের দশম বার্ষিকী পালিত হয়ে গেল এই অক্টোবরে, তার উদ্দেশ্য শুধু সামরিক স্বার্থে রকেটের শক্তি পরীক্ষা নয়। সেই সঙ্গে পার্থিব বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন এবং আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিক বৎসরের কার্যক্রম সমাপনে সাহায্য করা। আজ থেকে ১০ বছর আগে প্রথম স্পুৎনিকের আমলেই ৬৪টি দেশ মিলে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিক বৎসরের কার্যক্রম রচনা করে কাজে হাত দেয়।

মহাকাশযানের সাহায্যে পৃথিবী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার কথাটা শুনলে একটু আশ্চর্য ঠেকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? দেখছি যে স্পুৎনিক, লুনিক, সার্ভেয়ার, অর্বিটার প্রভৃতি মহাশূন্যযানগুলি পৃথিবী, আবহমণ্ডল ও চাঁদ সম্পর্কে বহু অনুভূতি ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটা উপমা দেওয়া যেতে পারে। একটি মাত্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি নিজের চেহারা আপাদ-মস্তক পিছন ও সামনের দিক দেখতে পারেন না। কিন্তু আপনার পাশে অন্য একজন লোক থাকলে তার সবটুকুই আপনি দেখতে পাবেন। আপনি ও তিনি দুজনেরই মানুষ হিসাবে চেহারায় বহু সাদৃশ্য আছে। পাশ থেকে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখলে সেই সাধারণত্বগুলি আপনার নজরে আসবে। ঠিক সেই রকম শূন্যে ভাসমান কোন মহাকাশ থেকে পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহের সামগ্রিক চেহারা ও চরিত্র দেখতে-বুঝতে পারা যাবে, যেটা পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে সম্ভব হয় না। ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিকরা এটা বুঝেছিলেন যে, পৃথিবীর উপর গোটা কতক জায়গা বেছে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না—যেমন আবহমণ্ডলে ও সমুদ্রে পরিবর্তনের নিয়মগুলি কী, কিংবা ভূস্তরের নিচে কি ধরনের জটিল সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটছে ইত্যাদি। যেমন ধরা যাক ভূকম্পনের কথা। আজও মানুষ ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে পারে না। অথচ দিতে পারলে কত লোক অপঘাত-মৃত্যু থেকে রেহাই পেতে পারত। আসলে ভূমিকম্প কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। ভূগর্ভে দীর্ঘকাল কতকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলার পরিণামে আসে ভূকম্পন। সেইসব ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নেই। আমরা পরিচিত শুধু পরিণতিটির সঙ্গে। অথচ ঐসব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানলাভ না করলে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। আবহমণ্ডলের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের কিছু কিছু ধারণা আছে বলেই আবহ পূর্বাভাসে কিছুটা সাফল্য লাভ করা যায়। সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের ভূকম্পন রেকর্ড করা, চাঁদ, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের শিলার নমুনা সংগ্রহ করা, সেগুলির ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র রচনা, অনেক গভীর জায়গার তাপমাত্রা জানা ইত্যাদি থেকে আমরা গ্রহের গর্ভে সেইসব মন্দাগ্নিত ও দ্রুত কার্যকলাপের খবর পাব, যেগুলির ফলে মাটি ফুঁড়ে পাহাড় গজিয়ে ওঠে বা ভূত্বক চিরে ফুটিফাটা হয়ে যায়। কারণগুলি যদি একই হয় তা হলে ফলাফলও একই হবে। সেইজন্য পৃথিবীতে ভূকম্পনের
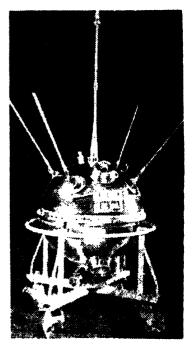
প্রথম স্পুৎনিক

পূর্বাভাস দেওয়ায় সাফল্য লাভ করতে হলে অন্য গ্রহে সেই ধরনের প্রক্রিয়া অনুশীলন করা চাই।

এ ছাড়া স্পুৎনিক জাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ

কজ্‌মস্‌—১৪৪ থেকে গৃহীত উত্তর আমেরিকার গ্রেট লেক্‌স্‌ এলাকার ফটোগ্রাম। ফটোর মাঝখানে হারণ হ্রদ এবং নিচের দিকে মেঘ

আরো বহু কাজ করছে। সেইসব গবেষণার জন্য ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ১৩৫ 'কজ্‌মস্‌' শ্রেণীর স্পুৎনিক মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। আবহমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তর, আয়নমণ্ডল, মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, উল্কা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সেগুলি গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করছে। এইসব স্পুৎনিককে মহাজাগতিক লেবরেটরী বলা যেতে পারে। এগুলির সাহায্যে মানুষ একদিন ঊষর অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারবে, কুয়াশা ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারবে, শিলাবৃষ্টি বন্ধ করতে পারবে।

স্পুৎনিকের সাহায্যে ভূমণ্ডলের মান ও রূপরেখা নির্ণয় করা যাবে, বিভিন্ন মহাকাশযানের কক্ষপথের মহাকর্ষ মাপা যাবে, রচনা করা যাবে ভূমণ্ডলের নির্ভুল মানচিত্র। এই ধরনের স্পুৎনিককে বলা হয় "জিওডেটিক স্যাটেলাইট"।

আর এক রকমের স্পুৎনিক আছে যার নাম "ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট"। সমুদ্রপোত ও বিমানপোতের যাতায়াতের পথে সেগুলির মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা, পৃথিবীর এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের বার্তা বিনিময় করা বা এক দেশের টেলিভিশন আর এক দেশে দেখানো সম্ভব হবে। সোভিয়েটের মলনিয়া-১ স্পুৎনিকটি এইভাবে ইউরোপের সঙ্গে দূরপ্রাচ্যের যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের টেলিভিশন বিনিময় সম্ভব করে তুলেছে। সেগুলির সঙ্গে অন্যান্য মার্কিন স্পুৎনিকগুলির যোগাযোগ থাকায় সারা দুনিয়া-জোড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য যে-কোন জায়গায় টেলিফোন ও টেলিগ্রাম করা সম্ভব হবে, টেলিভিশন পাঠানো যাবে।

স্পুৎনিকের সাহায্যে অসময় টাইফুন, হারিকেন ইত্যাদি ঝড়ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব।

আসন্নকালের [illegible] বিমানগুলি ঘণ্টায় ২০।৩০ হাজার কিলোমিটার বেগে চলবে। কিন্তু ঐরকম প্রচণ্ড বেগে ভূমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে আগুন ধরে যেতে পারে। স্পুৎনিকের [illegible] নিরীক্ষা করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

মহাকাশযান ও [illegible] মহাশূন্যযানগুলি [illegible] পরিবর্তন। [illegible] তার প্রতিফলন দেখা যাবে [illegible] অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা [illegible] আমরা এখানে [illegible] এমন স্পুৎনিক তৈরী করা যাবে যা [illegible] আকাশে সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান হয়ে শহরকে দিনের মত আলোকোজ্জ্বল করে তুলবে।

রুশ [illegible] সিওলকভস্কির গবেষণার ভিত্তিতে সাশেই কন্দ্রাতিয়ুক নামে এক বৈজ্ঞানিক ১৯৩৪ সালে [illegible] রকেট আন্তঃগ্রহ পরিক্রমা সম্পর্কে একখানা বই লিখেছিলেন। [illegible] বিজ্ঞানে যে-সমস্ত সাফল্য লাভ করা গিয়েছে সেগুলির মূলে রয়েছে কন্দ্রাতিয়ুকের পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্মিত দুনিয়ার প্রথম স্পুৎনিক।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বাইশ

সকাল বেলা রাধানাথবাবুর তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও কাল রাতের অস্থিরতা ও অস্বাভাবিক উত্তেজনার কথা এখনো ভুলতে পারছিল না হারকু সাহেব। সে রাধানাথবাবুর সামনে যমুনার সঙ্গে খুব সতর্ক হয়ে কথা বলবার চেষ্টা করছিল বলে অল্প সরে গিয়ে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করল।

একবার ফিরে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল হারকু সাহেবের। রাধানাথবাবুর তাঁবুতে এসে যমুনাকে নানা কথা বুঝিয়ে কী দরকার রঘুনাথের কাছে তাকে টেনে নিয়ে যাবার! এক সময় সে নিজেই স্পষ্ট করে তাকে বলবে, লীলা কেন এসেছিল তার কাছে এবং জানতে চাইবে শিবনাথ কেন সাহস করে তার নামে বাবুর কাছে লাগাতে—হারকু সাহেব কৈফিয়ত চাইবে। এবং রঘুনাথকেও রূঢ় ভাষায় বলবে, শিবনাথবাবুকে ছুট্টি দিতে হবে আপনার। আমার সামনে তার নাক-কান ডলতে হবে। আপনার খুশী হলে আপনি তাকে কোম্পানীতে রাখবেন আউর আমাকে ছুট্টি দিবেন। আমি জুয়েল সার্কাসকে বহুৎ বড়া বানালাম, দোসরা ছোটা কোম্পানীকেও আমি জোর চালু করে দিব ফের—ওই হিম্মৎ আমার আছে। আমার নোকর আমাকে আঁখ দেখলাবে আউর আমি চুপচাপ থাকব—বাবু, আমি সেইরকম আদমী না।

হারকু সাহেব চাকরি দিতে পারে মানুষকে, একটা ছোট সার্কাসকে বড় করে তোলবার ক্ষমতা তার আছে বলেই তো রঘুনাথ তাকে জেনারেল ম্যানেজার করে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। শিবনাথ আসলে তার চাকর ছাড়া আর কী।

ভোরের বাতাস অল্প অল্প করে এক সময় হারকু সাহেবের চড়া মেজাজ নিবিয়ে দিল। একে-একে জেগে উঠছে অনেক মানুষ। কেউ কেউ হঠাৎ হারকু সাহেবকে রাধানাথবাবুর তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে যাচ্ছে—ত্রস্ত হাত তুলে সেলাম জানাচ্ছে তাকে। হারকু সাহেব কারুর দিকে তাকাচ্ছে না, ভদ্রমানুষের বাড়ির দিকে খালি চোখে তাকিয়ে অল্প হেসে সেলামের উত্তর দিচ্ছে।

"হারকু সাহেব নমস্কার", প্র্যাকটিসে যাবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসেই হারকু সাহেবকে দেখতে পেল যমুনা, তার সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে হাসল। যমুনার পাশে হাসিও ছিল, সে প্র্যাকটিসের পোশাক টেনে-টেনে ঠিক করে নিচ্ছিল। হারকু সাহেবকে দেখলেই সে ভয়ে চুপ হয়ে যায়।

"হাঁ-হাঁ, নমস্কার", প্যান্টের পকেট থেকে হাত বের করে নিয়ে হারকু সাহেব হাসল, যমুনার আরও কাছে সরে এসে বলল, "রাধানাথবাবু এখনো ঘুমাচ্ছে—আমি বহুৎ জলদি এলাম—"

"বাবাকে তুলে দেব?"

"হাঁ যমুনা, তাকে উঠাতে হবে—" তার কথা শুনে যমুনা আবার তাঁবুর ভেতরে ঢুকছিল, হারকু সাহেব বাধা দিয়ে বলল, "শুন শুন যমুনা, তোমার সাথে আমার বহুৎ জরুরী বাত আছে।"

"বলুন না?"

"আমি সেইসব বাত বলতে এলাম—" হারকু সাহেব অল্প ইতস্তত করে বলল, "তুমি বলেছিলে আমার রাউটিতে যাবে, শিববাবুর বদমাশির সব বাত বলবে—"

হারকু সাহেবের কথার মাঝে যমুনা বলে উঠল, "হাসি, যা বাবাকে তুলে দে।"

"প্র্যাকটিসে যাবি না দিদি?"

হারকু সাহেব হেসে বলল, "না, হাসি আজ তুমি একেলা প্র্যাকটিস করবার লিয়ে যাবে। পুষ্পরাজ আউর করালীবাবুকে বলবে আমি আজ যমুনাকে ছুট্টি দিলাম—" হঠাৎ কী ভেবে সে বলল, "থাক থাক, কুছ বলবার দরকার নাই, আমি পিছে ওদেরকে বলে দিব।"

রাধানাথবাবুকে ঘুম থেকে তোলবার জন্যে যমুনার কথা মতন তাঁবুর ভেতরে গেল না হাসি, তা ভুলে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে চলে গেল। যমুনা তাকে আর ডাকল না। রাধানাথবাবুকে ঘুম থেকে তোলবার জন্যে নয়, সে হাসিকে অন্য কারণে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল।

হারকু সাহেবের কিছু-কিছু কথা শুনেই যমুনা বুঝতে পেরেছিল শিবনাথ তাকে যা-যা বলেছে তা সে স্পষ্ট করে শুনতে চাইবে এবং যমুনা কী করতে চায় তা-ও জানতে চাইবে।

ভোরের নরম আলোয় ভিজে মাটিতে খালি পা ঘষতে ঘষতে যমুনারও জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল, তার জন্যে আর কী করবে হারকু সাহেব—কবে সে জুয়েল সার্কাসের সার্কাস কুইন হবে। লীলাকে ট্রাপিজে নেয়া হয়নি বলে যমুনার মনে ফেনার মতন অদ্ভুত এক কৃতজ্ঞতা বুজবুজ করে উঠছিল যা তার অন্য সব বোধ ম্লান এবং ভোঁতা করে তুলছিল। নিজের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে হারকু সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছিল যমুনা—এ সময় লীলা তাকে দেখলে হয় তো অহংকারের ছোঁয়া যমুনার মুখ আরও সুন্দর—আরও তৃপ্ত করে তুলত। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও লীলা নেই।

যমুনা বলল, "এখন যাব আপনার রাউটিতে?" হঠাৎ সে মুখ নামিয়ে ভিজে মাটিতে পা ঘষতে ঘষতে লাজুক মেয়ের মতন হাসল, "সেকথা বলতে আমি অনেক আগেই যেতাম, তবে—"

"কী যমুনা?"

"আমার ভয় করছিল হারকু সাহেব", শিবনাথের তাঁবু দেখতে দেখতে যমুনা বলল, "কত রকম মানুষ আছে এখানে, কে কী ক্ষতি করে ঠিক কী, আমি ভয়ে আপনার কাছে যেতে পারি নি।"

হারকু সাহেব যমুনার কথা শুনে জোরে হেসে উঠতে চাচ্ছিল কিন্তু তাহলে এ সময় আর পাঁচজনের দৃষ্টি তার দিকে পড়বে বলে সে ইচ্ছে করেই হাসল না, আবার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু-পা এগিয়ে এসে আস্তে বলল, "আজ আমি তোমার সব বাত শুনতে এলাম। আজ তুমি বাবুর রাওটিতে যাবে—সব শুনাবে। রাধানাথবাবু ভি থাবে। এখানে আর দাঁড়াবে না যমুনা, রাউটির ভিতর চল, রাধানাথবাবুকে উঠাও, আজ দুষমনের সাথে আমার মোকাবিলা হবে।"

যমুনার মুখে বিবর্ণ একটা আভা ফুটে উঠেছিল। সার্কাস কুইন হওয়ার স্বপ্ন, লীলার ওপর একটা অমানুষিক ঈর্ষা এবং শিবনাথের ওপর নির্ভর না করতে পারার দৈন্য—এইসব অনুভূতি তাকে হারকু সাহেবের সঙ্গে রাধানাথবাবুর খাটের কাছে যন্ত্রের মতন টেনে নিয়ে এলেও হঠাৎ যমুনার শরীর ও মন বিদ্রোহ করে উঠছিল। রাধানাথ বাবুর ঘুম ভাঙাতে এসে সে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

বাইরে জোরে হাসতে পারে নি হারকু সাহেব, তাঁবুর মধ্যে এসেও হাসল না কিন্তু এখন তার মুখ বড় প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। তাকে বসতে বলবার কথা যমুনার খেয়াল না থাকলেও আর একটা খাটের ওপর বসে পড়েছিল সে এবং দাড়িতে হাসি আর যমুনার রঙীন শাড়ি ও সার্কাসের জরির পোশাক দেখতে দেখতে আপন মনেই হাসছিল।

"কী হল যমুনা? বাবাকে উঠাও!"

প্র্যাকটিসের পোশাক ছেড়ে নেয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল যমুনার। পিছন ফিরে থাকলেও সে বুঝতে পারছিল হারকু সাহেবের দু-চোখ তার দেহ এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে দিচ্ছে। কিন্তু এখন পোশাক বদলাবার সুযোগ নেই। যমুনা হারকু সাহেবের দিকে ফিরে বলল, "হারকু সাহেব, বাবুর কাছে গিয়ে আমি কী করব—কী বলব?"

"শিববাবু রাতের বেলা তোমার রাউটিতে এসে জোর-জোবরদস্তি করেছে, খারাপ-খারাপ বাত বলেছে আউর আমাকে আউট করবার মতলব করেছে—এইসব বলবে—"

হারকু সাহেব যা বলল তা ঠিক নয়। সব কথা ভাবতে ভাবতে যমুনার বুকের মধ্যে একটা ব্যথা কন কন করে উঠছিল। তার কাছ থেকে শিবনাথ জোর করে কখনো কিছু আদায় করতে চায় নি। যমুনা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, আমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে এবং সে-ই তাকে জেনারেল ম্যানেজার হওয়ার জন্যে জোর করেছে। শিবনাথের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবার সময় নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছিল যমুনা। সে এই সার্কাসের আর সব মেয়েদের চেয়ে অনেক ওপরে থাকবার জন্যেই শিবনাথের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পেরেছিল।

যমুনা এখন বুঝতে পারল, দোষ শিবনাথের নয়, দোষ তারই। শিবনাথ কথা রাখতে পারেনি বলে কোন কারণ না জেনেই সে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছে হারকু সাহেবের সামনে। সেকথা যমুনা ভুলে গেলেও হারকু সাহেব মনে রেখেছে এবং রাগের ঝোঁকে বলা সেইসব কথা

রঘুনাথকে শোনাবার জন্যে তাকে তার সামনে টেনে নিয়ে যেতে এসেছে।

এমন সব ভাবনা শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ার মতন যমুনার মনে কাঁটা ফোটার অনুভূতি এনে দিলেও হারকু সাহেবের কথা অস্বীকার করবার মতন মনের জোর এখন যমুনার ছিল না এবং সে বলতে পারল না যে শিবনাথের কোন দোষ নেই, তাকে জেনারেল ম্যানেজার হওয়ার জন্যে যমুনাই জোর করেছে—হারকু সাহেবের বিরুদ্ধে কথা বলিয়েছে।

একটা ব্যথায় মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেও যমুনা হারকু সাহেবকে যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বলবার চেষ্টা করল, "আজ থাক না হারকু সাহেব। বাবুর সামনে যেতে আমার ভয় লাগে—"

"আরে, ভয়ের কী আছে যমুনা—" হারকু সাহেব কিছু বিমর্ষ হয়ে সিগ্রেট ধরাতে-ধরাতে বলল, "দুষমন রাখতে নাই, দেরি হলে খুব মুশকিল হবে।"

তাহলেও যমুনা করুণ মুখে বলল, "আপনি যা-হয় বলুন না বাবুকে, আমাকে ডাকলে আমি না হয় যাব তখন—"

"আরে না না, আমার সাথ-সাথ তোমরা যাবে। সব বাত বাবুকে শুনাবে—" হারকু সাহেবের চোখ কয়েক মুহূর্ত সিগ্রেটের আগুনের ওপর স্থির হয়ে থাকল, "তোমার মুখের বাত শুনলে বাবুর বিশোয়াস জোর হবে—বাবু বহুৎ খুশ হবে।"

এখনো অঘোরে ঘুমচ্ছে রাধানাথবাবু। তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে যমুনা আরও নিবে আসছিল—তার মনে হচ্ছিল এই একটি মাত্র মানুষের জন্যেই সে এমন যন্ত্রণার কুণ্ডে হিমসিম খাচ্ছে, তার দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে বলেই খুশী মতন কাজ করবার অধিকার নেই যমুনার। এখনো সে ভাবছিল হারকু সাহেবকে সত্যি কথা বলে দেবে কি-না।

হারকু সাহেব আবার বলল, "যমুনা, রাধানাথবাবুকে উঠাও, তুমি তৈয়ার হও—"

যমুনা রাধানাথবাবুর মাটিতে ঝুলে পড়া হাত ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে কয়েকবার জোরে ডাকল, "বাবা, বাবা—"

রাধানাথবাবু চোখ খুলল, কয়েক মুহূর্ত লাগল তার ঘোর কাটতে এবং যমুনাকে দেখে ধড়মড় করে সে উঠে বসে বলল, "কী—কী হয়েছে? আরে, হারকু সাহেব যে! কখন এলেন মাইরি—" রাধানাথবাবু উৎসুক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজল আজও হারকু সাহেব মদের বোতল নিয়ে এসেছে কি-না।

হারকু সাহেব বলল, "উঠেন রাধানাথবাবু, জলদি তৈয়ার হোন। আমরা এখন বাবুর রাউটিতে যাব।"

"সেখানে কেন মাইরি সক্কালবেলা? কী গোলমাল হল?"

"গোলমাল কুছ হল না রাধানাথবাবু," হারকু সাহেব হালকা হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল, "গোলমাল যে করে আমরা সে-মানুষকে ফিনিশ করবার জিয়ে যাব—শিববাবুর বাত আপনার খেয়াল নাই?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব খেয়াল আছে", খাট থেকে নেমে লুঙ্গি ঠিক করতে করতে রাধানাথবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ওকে একেবারে ফিনিশ করে দিন। শিবনাথ খুব বদমাশ।"

যমুনা রাধানাথবাবুকে শাসন করবার মতন গলায় বলে উঠল, "বাবা চুপ কর, যা-তা বকবে না।"

"না না যমুনা, রাধানাথবাবু চুপ থাকলে চলবে না। সে তোমার বাপ আছে। বাবুর সামনে তাকেও বলতে হবে—"

"আলবাত বলব", হঠাৎ হারকু সাহেবের মুখের কাছে মুখ এনে রাধানাথবাবু খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী বলব হারকু সাহেব?"

যমুনা বলল, "যা বলবার আমিই বলব। বাবা কিছু জানে না হারকু সাহেব।"

হারকু সাহেব হাসল এবং কিছু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি বাহার আছি। আপনারা জলদি-জলদি কাপড়া পিনে লিন। দো-চার মিনিটের ভিতর বাবুর রাউটিতে যেতে হবে—"

যমুনা আর একবার বলল, "আজই যেতে হবে?"

"হাঁ-হাঁ। এখন মালিকানি নাই, বাত-চিত করার ভাল টাইম আছে। যমুনা তোমার ভাল হবে।"

যমুনা শুকনো হাসল, "কী হবে?"

"বাবু খুশ হলে আমি তোমাকে সার্কাস কুইন বানিয়ে দিব, বহুৎ জাস্তি রুপেয়া দিব।"

যমুনা হারকু সাহেবের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর লীলার কী করবে?"

লীলার নাম শোনবার সঙ্গে সঙ্গে হারকু সাহেবের মুখ থেকে হাসির রেখা মুছে গেল—সব উৎসাহ জুড়িয়ে গেল। জ্বলন্ত সিগ্রেট দূরে ভিজে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে কঠিন স্বরে যমুনাকে বলল, "লীলাকে আমি ছুট্টি দিয়ে দিব।"

হারকু সাহেবের কথা যমুনার মন থেকে সব সঙ্কোচ সব ব্যথা যেন শিকড়সুদ্ধ উপড়ে টেনে আনল। যদিও সে লীলার যে চাকরি যাবে তা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না তাহলেও জয়ের একটা নিষ্ঠুর উল্লাস তাকে সুন্দর করে মিথ্যা বলবার জন্যে প্রস্তুত করে নিল। এখন রঘুনাথের তাঁবুতে গিয়ে শিবনাথের বিরুদ্ধে কথা বলতে কোন আপত্তি ছিল না যমুনার।

আর একটা সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করবার জন্যে বেরিয়ে যাচ্ছিল হারকু সাহেব, যমুনা তার সামনে এসে বলল, "একটু বসুন, আপনার জন্যে চা আনাই।"

"আরে না-না, আভি আউর টাইম নাই। খানাপিনা পিছে হবে। জলদি-জলদি বাবুর কাছে চল যমুনা।"

রাধানাথবাবু আর যমুনার তৈরি হয়ে নিতে খুব বেশী সময় লাগল না। রাধানাথবাবু আপন মনে কথা বলে যাচ্ছিল, যমুনা তার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হলেও চুপ করে থাকল। হারকু সাহেব তাকে কেন নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা জানলেও সব যেন রহস্যের মতন—কাপড় বদলাতে বদলাতে এক-একবার অশান্ত হয়ে উঠছিল যমুনা। সে যেন একজন ঘুমন্ত মানুষের বুকে ছুরি চালাতে যাচ্ছে। তার হাত কাঁপছিল।

হারকু সাহেব আগে আগে যাচ্ছিল, তার

পিছনে যমুনা। সব শেষে রাধানাথবাবু। সে খুব আস্তে হাঁটছিল। তাজা রোদ উছলে উঠেছে, বড় বটের মাথায় আগুন লাগার মতন। পুলিস ফাঁড়িতে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হল। পাখির ভীত রব শুনতে শুনতে কিছু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যমুনা, তার চটির ঘায়ে পাথরের ছোট একটা টুকরো অনেক দূরে ছিটকে গেল। যমুনা এগিয়ে গেলেও দু-একবার পিছন ফিরে পাথরের সেই ভিজে ছোট টুকরো দেখল এবং তখন তার চোখে রাধানাথবাবু, হারকু সাহেব আর সার্কাসের ছোট বড় সব তাঁবু ও সাজ-সরঞ্জাম ঝাপসা হয়ে আসছিল।

রঘুনাথের তাঁবুর কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যমুনা। অদ্ভুত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শিবনাথ তাকিয়ে আছে তার দিকে। নিজেকে সামলে নিতে কিছু সময় লাগল যমুনার। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে সে মনের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণার অনুভূতি ফেনিয়ে তোলবার খুব চেষ্টা করছিল। শিবনাথ কোন মূল্য দেয় নি তার কথার। নিজের মনের কথাই ভেবেছে—স্বপ্ন দেখেছে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার। এবং ভীতুর মতন এখান থেকে তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছে। তার সঙ্গে কেন পালিয়ে যাবে যমুনা?

হাসি যেমন স্বপ্ন দেখে বিয়ে করে সংসার করবার, যমুনা তেমন দেখতে পারে না। পুরোনো ক্যাম্প ভেঙে নতুন জায়গায় চলে আসার মতন পাকা বাড়ি থেকে রাধানাথবাবু তাদের নিয়ে এসেছে সার্কাসের তাঁবুতে। প্রথম প্রথম নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে খুব কষ্ট হলেও এখন যমুনা নিজেকে পুরোপুরি সার্কাসের মেয়ে বলেই মনে করতে পারে এবং এতদিনে তার বিশ্বাসও দৃঢ় হয়েছে যে চার দেয়ালের আড়ালে সংসার করা এ জীবনে আর হবে না। তাকে থাকতে হবে সার্কাসের তাঁবুতে—ঘুরে বেড়াতে হবে নতুন নতুন জায়গায়, নিয়ম মতন খেলা দেখাতে হবে। দুর্ঘটনা ঘটলে উপোস করে মরতে হবে।

শিবনাথের বিষণ্ণ দৃষ্টি যমুনার মনের মধ্যে এইরকম সব ভাবনার কাপড়টা হঠাৎ পর্দার মতন নামিয়ে আনল। সে এখন সার্কাসের মেয়ে। তার রূপ আছে, বয়স আছে, সাহস তো আছেই। সে কেন লীলার পিছনে পড়ে থাকবে—কেন সার্কাস-কুইন হবে না! শিবনাথ তাকে শুধু আশ্বাস দিয়েছিল, আর কিছু করতে পারে নি। হারকু সাহেব তার গুণের দাম দেয় বলেই তাকে ট্রাপিজে নিয়েছে আর সার্কাস কুইন করে দেবার কথাও বলেছে। শিবনাথ কথা রাখে নি, হয় তো হারকু সাহেব কথা রাখবে। তাকে অবিশ্বাস করতে পারছিল না যমুনা। এত বড় সার্কাস যে গড়ে তুলেছে তার কথার দাম আছে বৈকি। শিবনাথের উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টি মন থেকে মুছে ফেলে যমুনা এখন হারকু সাহেবের ওপরই নির্ভর করে লীলাকে হারিয়ে দিতে চাইছিল।

শিবনাথ যে রঘুনাথের তাঁবুতে বসে-বসে চা খাচ্ছে তা যেন লক্ষই করল না হারকু সাহেব, একটু জোরে বলে উঠল, "এই যে বাবু, যমুনা আউর রাধানাথবাবু আপনার সাথে বাত চিৎ করবার লিয়ে এল—"

"হাঁ-হাঁ, আসুন—" রঘুনাথ উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, "যমুনার খুব নাম হল, বড় ভাল ট্র্যাপিজ খেলছে।"

হারকু সাহেব নিজেই কয়েকটা চেয়ার ঘষে-ঘষে টেনে আনল, "এইখানে বসুন রাধানাথবাবু, বস যমুনা। বাবু, আপনিও বসুন।"

রঘুনাথের সঙ্গে শিবনাথও উঠে দাঁড়িয়েছিল, এখন সে-ও বসল। হারকু সাহেবের সঙ্গে এদের এ সময় এখানে আসতে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছে শিবনাথ। একটু আগেই সে রঘুনাথকে যমুনার কথা বলেছে এখন তা ভাবতে ভাবতে লজ্জা পেল শিবনাথ এবং রাধানাথবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

"কী খবর বলুন রাধানাথবাবু?" রঘুনাথ ভেবেছিল হাসি আর যমুনা হয় তো আরও বেশী মাইনে চায় তাই সকালবেলা এসেছে তার কাছে।

"খবর ফাইন বাবু, সব ভাল আছি মাইরি—" শিবনাথের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে রাধানাথবাবু বলল, "আপনার সঙ্গে আমার অনেক প্রাইভেট টক আছে—"

শিবনাথ বুঝল না যে রঘুনাথকে লক্ষ করে কথা বলছে রাধানাথবাবু। সে হেসে বলল, "আমার সঙ্গে?"

"আরে না", মুখ দিয়ে বিরক্তির ছোট একটা শব্দ উচ্চারণ করে রাধানাথবাবু বলল, "তোমার সঙ্গে আমার আবার প্রাইভেট কথা থাকবে কী হে! তোমার সব কীর্তি ফাঁস হয়েছে আজ বাবুর কাছে—"

রাধানাথবাবুর কথা শুনতে শুনতে যমুনার মুখ অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিল। রঘুনাথের তাঁবুতে [illegible] বসলেও সে তাকে [illegible] নিয়ে বসে [illegible] চুপ করে।

রাধানাথবাবুর এমন দুর্বোধ্য সংলাপের অর্থ বুঝতে কয়েক মুহূর্ত দেরি হল শিবনাথের। পরে সে বুঝল, এসব হারকু সাহেবের কাজ। তার সঙ্গে এখন কথা বলবার প্রবৃত্তি হল না শিবনাথের। সে শুধু মাটিতে জোরে পা ঠুকে শব্দ করল।

যমুনাকে শিবনাথ আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে যমুনা?"

যমুনা শিবনাথের কথার উত্তর দিতে পারল না, চুপচাপ বসে থাকল। এখানে শিবনাথের উপস্থিতি তাকে বড় পীড়া দিচ্ছিল। সে জানত রঘুনাথ কিম্বা হারকু সাহেব তাকে এখন কিছু জিজ্ঞেস করলে সে কথা বলতে পারবে না।

রঘুনাথ বুঝল ব্যাপার জটিল হয়ে উঠবে। তার মনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। সকাল-

লিটকুইজ নং ২৪, ১৭টি সূত্রের অনুবাদ

১। এমন ব্যক্তি কোথায় আছেন যিনি রক্তাপ্লুত পায়ে আগুন নিয়ে খেলা করতে বা উন্মত্ততার পথে পা বাড়াতে চাইবেন শুধুমাত্র **মনোরঞ্জন/প্রায়শ্চিত্ত**-র জন্য!

২। যে সমস্ত মানুষ বাহিরবিশ্বে অনেক কিছু **হতে/পেতে** চান, তাঁরা কখন অন্তর্দর্শী হতে পারেন না।

৩। মানুষের মধ্যেও ঈশ্বরের মত আচরণ করবার **ধৃষ্টতা/সামর্থ্য** রয়েছে।

৪। মানবমন প্রীতিপূর্ণ ভালবাসা পেতে চায় এবং নিরুত্তাপ **জিজ্ঞাসা/শত্রুতা**-র দরুন প্রত্যাখ্যাত হয়।

৫। মানুষ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই কাজ করে, এ কথা নিশ্চয় করে বলার অর্থ মানুষের স্বাভাবিক [illegible] প্রতি এবং **নির্যাত/মনুষ্যত্বের** প্রতি মানুষের বিশ্বাসের অভাবকেই প্রতিপন্ন করা।

৬। আপনি যদি একযোগে জীবন এবং **মুক্তি/জ্ঞান** অর্জন করতে চান, তাহলে একমাত্র ঈশ্বরই আপনাকে তা দিতে পারেন এবং সৃষ্টিমধ্যে আর কেউই তা দিতে পারেন না।

৭। যদি কোন কিছু জীবনকে **গৌরবান্বিত/সমর্থন** করে, তা হল, [illegible]।

৮। [illegible] জীবনে একজন সাংবাদিকের [illegible] ব্যক্তির কাজকর্মের বৈশিষ্ট্য হল সততা, দক্ষতা এবং **সুসংগতি/বিনম্রতা**।

৯। কোন সর্বজীবের মধ্যে নিজেকে এবং সর্বজীবকে নিজের মধ্যে প্রকাশমান দেখেন এমন লোক কি করে অন্যকে **ঘৃণা/আঘাত** করতে অথবা শোষণ করতে পারেন!

১০। স্বাতন্ত্র্যপ্রেম, স্বদেশভক্তি **মানবতা/সমাজের** জন্য ত্যাগ ভাবনা এই সব হল প্রেরণাদায়ী আদর্শ।

১১। চিন্তার সাধনের জন্য এবং সামাজিক এবং **নৈতিক/রাষ্ট্রীয়** উন্নতির ক্ষেত্রে জ্ঞান অপরিহার্য।

১২। আমাদের সমাজের প্রাণ ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত এবং **আকাঙ্ক্ষী/ক্লান্ত**।

১৩। কোন বিষয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে মানুষকে অবশ্যই মহান **কবি/সাধক**-দের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। [illegible] মানুষের চেয়ে তাঁদের দৃষ্টি [illegible] প্রসারিত এবং উত্তম।

১৪। যেহেতু মানুষ **বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন/সামাজিক** জীবন, তাঁকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে দেশের ব্যাপারে তাঁর অবদান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১৫। আমাদের মধ্যে তেমন কিছু নেই মূল্যের বিচারে যেটি **দিব্য/শ্রেষ্ঠ** এবং যে অধিকারবলে আমরা মোক্ষলাভের দাবী করতে পারি।

১৬। ঐশ্বরীয় অনুগ্রহ যদি হয় **অপ্রত্যাশিত/অপ্রার্থিত**, তাহলে তা আরো মাধুর্যময় হয়।

১৭। সমস্ত ধর্মেরই **মূল্য/গুণ** একই।

বেলা গোলমালের আশঙ্কায় তার শিরা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। রঘুনাথ আরও বুঝতে পারছিল তার শরীর ভেঙে আসছে— কিছু-দিন বিশ্রামের দরকার। এখন সে মনে মনে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করল।

তুমুল কলহ এড়িয়ে যাবার জন্যে রঘুনাথ শিবনাথের কানের কাছে মুখ এনে ফিস-ফিস করে উঠল, "শিববাবু, এরা আমার সাথে প্রাইভেট কথা বলতে এল, আপনি ফের পরে আসুন—"

রঘুনাথ স্পষ্ট করে চলে যাবার কথা বললেও শিবনাথ উঠতে পারল না। সে দেখতে চাচ্ছিল কতদূর যায় হারকু সাহেব এবং যেন তার কবল থেকে যমুনাকে রক্ষা করবার জন্যে বেশ জোরেই বলল, "আমি বোকা নই বাবু, সকলের সব ফন্দি-ফিকির বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে। প্রাইভেট টক আবার কী? এসব আমাকে পিছন থেকে ছুরি মারবার মতলব। যদি কারুর সাহস থাকে তো বলুক না বলবার আমার সামনে—" যমুনা [illegible] একটু বেশী জোরে কথা বলে শিবনাথ তার শক্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করছিল এবং তাকে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে রঘুনাথ কিংবা হারকু সাহেব— সে কাউকেই মানে না।

শিবনাথের দম্ভ ও মেজাজের এমন প্রকাশ দেখে হারকু সাহেবের মতন মানুষের পক্ষে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু [illegible] সে [illegible] করল না [illegible]। [illegible] শিবনাথ [illegible] হারকু সাহেবের দিকে, তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলেও নি, সে রঘুনাথের সঙ্গে কথা বলছিল।

কয়েক মুহূর্ত [illegible] করে হারকু সাহেব রঘুনাথকেই বলল, "[illegible] বাবু? যমুনা [illegible] রঘুনাথবাবু, আপনাকে কী বলবে শুনুন—"

"না, আপনি যাবেন না।" হারকু সাহেবের একটা হাত ধরে রঘুনাথবাবু বললেন, "আপনি [illegible] না?"

[illegible] হেসে বলল, "[illegible]"

শিবনাথ [illegible] যমুনাকে জিজ্ঞেস করল, "যমুনা, আমি চলে যাব এখান থেকে?"

যমুনার মুখ ফ্যাকাশে। ভীত, বিবর্ণ। হয় তো সে এ সময় শিবনাথের কথার উত্তর দিতে পারত না, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল রঘুনাথবাবু, "গেট আউট!"

শিবনাথও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার উপর আপনি রেগে গেলেন কেন রঘুনাথ-বাবু?"

"খবরদার, আমার মেয়ের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করবে না—"

যমুনা আর একবার ডাকল, "বাবা!"

শিবনাথ বলল, "আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন তো?"

"কী আবার জিজ্ঞেস করব? আমি কিছু

জানি না ভেবেছ?"

"কী জানেন?"

রাধানাথবাবু ইতস্তত না করেই বলল, "লুকিয়ে লুকিয়ে আমার মেয়ের সর্বনাশ করতে রাউটিতে যাওনি তুমি? তাকে ফুসলে বাইরে বের করে নিয়ে যেতে চাওনি?"

"না, সব মিথ্যা!"

"মিথ্যা? এই যমুনা, বল—"

বড় অস্বস্তি হচ্ছিল রঘুনাথের। এত সময় সে বিমূঢ় হয়ে বসে ছিল, এখন রাধানাথবাবুকে শান্ত করবার জন্যে হঠাৎ বলল, "শিববাবুর সাথে যমুনার সাদি হবে রাধানাথবাবু—"

বিয়ের কথায় আরও রেগে গেল রাধানাথবাবু, কাঠের চেয়ার অনেকটা পিছনে সরিয়ে দিয়ে বলল, "সাদি হবে, না ঘোড়ার ডিম হবে। লোকটা বদমাশ। আপনার কাছে সব মিথ্যা বলে দোষ কাটাতে চায়—"

শিবনাথের আর ধৈর্য থাকল না, কার দোষ তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবার মতন মনের অবস্থাও তার আর ছিল না, সে যমুনার দিকে তাকিয়ে উষ্ণ কিন্তু অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, "যমুনা, এখন লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকবার সময় নয়, তুমি কথা বল—"

"ফের আমার মেয়ের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস?"

"আপনি চুপ করুন!"

"কেন হে? বাপ চুপ করে থাকবে আর—"

শিবনাথ আর শান্ত স্বরে কথা বলতে পারল না, রাধানাথবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে শাসন করবার মতন বলল, "আপনি কেমন বাপ তা জানতে কারও বাকি নেই, বুঝলেন? মেয়েকে সামনে খাড়া রেখে কার ঘাড় ভেঙে কী বোতল গিলেছেন, বলুন?"

"তোর বাপের ঘাড় ভেঙেছি, শালা!"

"কী বললেন?" শিবনাথ রাধানাথবাবুর আরও কাছে এসে দু'হাতে তার কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তীব্র গলায় বলল, "মুখ সামলে কথা বলবেন, খুন করে ফেলব—"

রঘুনাথ উঠে এসে শিবনাথের হাত ছাড়াতে ছাড়াতে খুব বিরক্ত হয়ে বলল, "এ কী রকম হচ্ছে শিববাবু? ছি ছি, ওনারা আমার রাউটিতে এলেন বাতচিত করার জন্যে—যান, আপনি বাহার যান।"

হারবুসাহেব শিবনাথের সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলেও খুশী হয়েছিল। একটা কথাও বলতে হয় নি তাকে, যা বলার রাধানাথবাবুই বলে দিয়েছে রঘুনাথকে। এখন যা বোঝবার সে বুঝে নিক, এবং পরিচয় পাক শিবনাথের চরিত্রের।

রাধানাথবাবু শিবনাথের হাতের চাপে ভয় পেল না, আরও জোরে বলল, "বদমাশ! আমি থানায় যাব যমুনাকে নিয়ে—"

"যান, যান—মাতাল কোথাকার!"

যা হয় হোক, যমুনা প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিল রঘুনাথের তাঁবুতে এসে খুব দরকার না হলে একটাও কথা বলবে না এবং এত সময় সে চুপ করেই বসেছিল। কিন্তু শিবনাথের অভদ্র আচরণ আর সহ্য করতে পারল না যমুনা, সে এখন রাধানাথবাবুর ওপর জন্মগত একটা আকর্ষণ অনুভব করছিল। যমুনা আরও ভাবল শিবনাথকে এ সময় সে যদি দু-একটা কড়া কথা শুনিয়ে দেয় তাহলে হারবুসাহেবও খুশী হবে।

যমুনা বলল, "শিববাবু, আমার বাবাকে যা-তা কথা শোনাবেন না। অনেক হয়েছে। এবার থামুন!"

যমুনার গলার স্বর শুনে চমকে উঠল শিবনাথ। এবং কিছু পরে সে থেমে থেমে বলল, "উনিই তো আগে আমাকে যা-তা বলতে শুরু করলেন—"

"কিছু ভুল বলেছে বাবা?"

"কী বলছ যমুনা?"

"বুঝতে পারছেন না?" যমুনা ঝগড়া করার মতন রুখে উঠল, "বেশী ঘাঁটাবেন না আমাকে—বুঝলেন?"

শিবনাথ যমুনার সঙ্গে তর্ক করল না, খুব জোরে কথাও বলল না, সে আস্তে বলল, "তোমরা সকলেই সমান। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব—" ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হারবুসাহেবকে একবার দেখে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

রাধানাথবাবু হাঁপাচ্ছিল। মুখ নামিয়ে বসেছিল যমুনা। এখন সে একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। কারুর দিকে তাকাতে পারছিল না রঘুনাথ। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। বড় তাঁবু দেখতে দেখতে যশোদার কথা ভাবছিল সে—"আগুনে জ্বলে যাবে। সব ছারখার হয়ে যাবে—"

ক্রমশ

শার্ঙ্গদেব

...ক অবকাশে আমার এক বিশিষ্ট সাংবাদিক বন্ধু এশিয়া মাইনরের ...রেকটি গান বাজনা শোনালেন। এই ...রেকর্ডটি তিনি তাঁর সাম্প্রতিক আমেরিকা-সফরকালে খরিদ করেছেন। সঙ্গীতগুলি ...নলে ধাঁধা লাগে যে, এগুলি অভারতীয় ...কনা, আমাদের বর্তমান সঙ্গীতের সঙ্গে ...দের এতই মিল। একটা বাজনা শুনলুম ...টাকে অনায়াসে আমাদের যাত্রার কনসার্ট ...সে চালানো যায়। বলা বাহুল্য, এই অঞ্চল ...থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অপরাপর দেশ এবং ইরান ...ঞ্চলের লোকসঙ্গীত বা অন্যান্য সঙ্গীত ...দি সংগ্রহ করা যায় তাহলে এই রকম ...রও অনেক নমুনা পাওয়া যাবে যার সঙ্গে ...রতীয় সঙ্গীতের মিল খুব গভীর। যে ...নগুলির কথা বললুম সেগুলিতে এমন ...রনের ছোট ছোট তান রয়েছে যা আমরা ...খেয়াল-টপ্পায় যোগ করি। ভারতীয় ...ঙ্গীতের সঙ্গে এই সব গানের এই যে ...ভীর মিল এর বহু কারণ আছে। ...হস্রাধিক বৎসর থেকে বিভিন্ন জাতি ভারতে ...সেছেন এই সব দেশ থেকে নানা সূত্রে। ...দের অনেকে ভারতে বসতি স্থাপন ...রেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গীতসংস্কৃতিও ...ছুটা ভারতীয় সঙ্গীতে যুক্ত হয়েছে। ...কৃত ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস নির্ধারণ ...রতে গেলে মধ্যপ্রাচ্যের বিরাট সঙ্গীত-সংস্কৃতির সঙ্গে সুগভীর পরিচয় থাকা ...রকার, অথচ আমরা এ দিকটা বরাবরই ...বহেলা করে আসছি।

সুদূর অতীতে মধ্যপ্রাচ্যের অসুর সভ্যতা ... ভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং ...দের কোনও কোনও গোষ্ঠী যে ভারতে ...বসতি স্থাপন করেছিল সেটা বোধ করি ...ঐতিহাসিক সত্য। পারস্যের সঙ্গে ভারতের ...যোগও বহু প্রাচীনকাল থেকেই স্থাপিত ...য়েছে। অনুরূপভাবে মিশর এবং ...বিলনের সঙ্গেও ভারতের অল্পাধিক্তর ...যোগ সাধিত হয়েছে। আলেকজেণ্ডারের ...ত্যুর পর সেলিউকস যে সাম্রাজ্য স্থাপন ...রেন তার সঙ্গেও ভারতের যোগ ছিল। ...করা মধ্যপ্রাচ্যে এই যে একটা বিরাট ...আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এর ফল কম ...দূরপ্রসারী হয়নি। দুঃখের বিষয়, এই ...স্তৃত ভূখণ্ডের সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় ...স্কৃতির যোগসূত্র নিরূপণের খুব কম ...চেষ্টা দেখা গেছে ভারতের তরফ থেকে। ...ন্স, জার্মেনি, আমেরিকা এবং ইংলণ্ড ...কে বহু প্রয়াস দেখা গেছে এসব দেশের ...রাতত্ত্ব চর্চায়, কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র ...সাবে আমাদের দেশ থেকে অনুরূপ ...নও চেষ্টারই লক্ষণ দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে তুর্কী, আফগান এবং ...গল ভারতে দীর্ঘকাল বসবাস করেছে, ভারতীয়দের সঙ্গে এক হয়ে গেছে—অথচ তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় অল্প। তারা পারসীক সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। বহু পারসীক জ্ঞানী গুণীও শত শত বৎসর ধরে ভারতে এসেছেন, গেছেন—অথচ পারসীক সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান সম্বন্ধে তেমন কোনও ব্যাপক কাজ আমাদের দেশে হয়েছে বলে জানিনে। স্বাধীনতা লাভের অল্পকালের মধ্যে ভারতে আরবী, ফার্সী চর্চা প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। যে সমস্ত ফার্সী ঐতিহাসিক কেতাব এক সময় কলকাতায় ছাপা হয়েছিল সেগুলি আর ছাপা হয় না। তাদের অনেকগুলির পাতা এমন ঝুরঝুরে যে গবেষকরা পাতা উল্টোতে ভয় পান। আমাদের দেশের ফার্সী গ্রন্থের সংগ্রহ এত ভাল ছিল যে, গত কয়েক বছরের মধ্যে ইরাণ থেকে বহু বিদ্বজ্জন এসে এই সব গ্রন্থ সংগ্রহ করে গেছেন; অথচ আজ উত্তর ভারতে ফার্সী ভাষায় আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কম দেখা যায়। ফার্সী এবং আরবীতে দখল না থাকলে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র নির্ণয় করা শক্ত। তাছাড়া এই সব ভাষার চর্চা আমাদের দেশে কিছুটা হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধেরও অনেক উন্নতি হতে পারে।

সে যাক—বাইরের সঙ্গীত পদ্ধতি যে কেমন করে ভারতে এসেছে তার উদাহরণস্বরূপ টপ্পার কথা বলা যায়। টপ্পার তানকে বলা হয় "জমজমা"। এই শব্দে উটের দল বোঝায়। মধ্যযুগে উটের পিঠে চড়ে দলে দলে লোক ভারতে আসত। তারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করবার সময় মিষ্টি সুরে নিচু গলায় গান গাইত। লাহোরে এসে উট বদল হত। তাদের গানের একটা পদ্ধতি পাঞ্জাব অঞ্চলে টপ্পায় বিধৃত হয়ে আছে। উইলার্ড সাহেব যখন মন্তব্য করেছিলেন যে টপ্পা উষ্ট্রচালকদের গান তখন ভুল বলেন নি। অবশ্য পরে তার বেশ কিছুটা সংস্কৃতিসাধন করা হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে পঞ্চম স্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—জমজমা-ই-কোয়েল। (কোয়েলার সুরেলা কণ্ঠস্বর) এখানে জমজমা শব্দে সুর বোঝানো হয়েছে।

মোগল ভারতের পূর্ব থেকে রবাব, কানুন, চাংগ, তাম্বুর প্রভৃতি নানান মধ্যপ্রাচ্যের বাদ্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেক রকমের বাদ্য সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। অনেকে "তাম্বুর" বলতে আমাদের তম্বুরা বোঝেন। বহু প্রকার পারসীক গীতপদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। আমীর খুসরো দিল্লীতে বসেই এই সব গান শিখে কয়েকটি নতুন ধারার প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন। বর্তমান উন্নত গবেষণার যুগে ইরানের গীতপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতের কতখানি যোগসূত্র বজায় আছে সে সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলের পরিচয় পাইনি।

প্রকৃতপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যে এবং আরবে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত আছে তার একটি বড় রকমের সংগ্রহ আমাদের মিউজিয়ামগুলিতে থাকা দরকার। এই সব নিদর্শন থেকে অনেক প্রশ্নের জবাব মিলবে এবং অনেক কৌতূহল মিটবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসকেও প্রামাণিকভাবে বিন্যাস করা সম্ভব হবে।

হিন্দুসঙ্গীতে তানের কাজ খুবই অল্প ছিল। মুসলমান গায়ন সম্প্রদায় তানের প্রাধান্য এনেছেন। আমার মনে হয় ইরান থেকে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত অনুশীলন করলে এমন অনেক ছোট ছোট তানের কাজ এবং গীতশৈলীর পরিচয় পাওয়া যাবে যা থেকে বোঝা যাবে আমাদের সঙ্গীতে মুসলমানগণ বহির্ভারত থেকে কী পরিমাণ গীতপদ্ধতি সংযোজন করেছেন।

বস্তুত এ সবই সম্ভব হবে যদি এই সব দেশে গবেষণার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ভ্রমণ করবার সুযোগ পান। বর্তমানে আমাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র ইউরোপ, আমেরিকার দিকে প্রসারিত। এই দুই মহাদেশে ভ্রমণ করে আমাদের শিল্পীরা গৌরব অর্জন করেছেন; বিশ্বের প্রগতিশীল দেশগুলিতে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন; কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে সঙ্গীতবিদ্গণের ভ্রমণ করা অত্যাবশ্যক। এই সব দেশের সাঙ্গীতিক তথ্য আমাদের গভীরভাবে জানা দরকার আমাদের স্বকীয় সঙ্গীতের মূল্যায়ণের উদ্দেশ্যে। এই অন্বেষণে যাঁরা নিযুক্ত হবেন তাঁরাই হবেন আমাদের যথার্থ কালচারেল অ্যামব্যাসেডার।

সাজ ও আওয়াজ

সম্প্রতি শ্রী ভি বালসারা তাঁর প্রতিষ্ঠান "সাজ ও আওয়াজ"-এর নানাবিধ কর্মপন্থার একটি পরিচয় প্রদান করেন। তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার মধ্যে পিয়ানো সহযোগে ভারতীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি খুবই ভাল লাগল। দ্রুত সর্গমের সঙ্গে পিয়ানোর ধ্বনিগুলি একটি অপূর্ব সুরলহরী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। শ্রীবালসারা নিপুণ

বাদক। আমাদের সঙ্গীতে পিয়ানোর মত উন্নত যন্ত্রকে কাজে লাগাতে পারলে যে বহু মনোরম সঙ্গীত সম্পাদন করা যায়—এটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। আশা করি তাঁর এই পরিকল্পনাটি শ্রোতৃসাধারণের বিশেষ মনোগ্রাহী হবে।

সঙ্গারিণী

গত বিজয়া দশমী দিবসে বোম্বাই-এ "সঙ্গারিণী" নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এর পরিচালক হচ্ছেন শ্রীরাজেন্দ্রশঙ্কর। এ'দের দশ দফা কার্যসূচীর মধ্যে কেবল সঙ্গীত নয়, অপরাপর আনুষঙ্গিক কারুকলার পৃষ্ঠপোষকতা ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনও রয়েছে। এ'রা বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সংযোগ রাখবেন, এমনকি বহির্ভারতীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করবেন। এতদ্ব্যতীত শিল্পী বা সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের সর্ববিধ সহায়তায় তৎপর হবেন। তাঁদের এই বিস্তীর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হলে আমরা আন্তরিক খুশী হব। এ'দের ঠিকানা—

A3 Fair Field
South Avenue,
Bombay 54

দ্রৌপদী

রাজনৈতিক ঘূর্ণি হাওয়ায় যাঁরা আবর্তিত হন, তাঁদের জীবন ও আদর্শের অন্য একটা দিক সব সময় সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না। রাষ্ট্রচালন বা শাসন ব্যবস্থায় দলীয় মতামতের খবর ফলাও করে খবরের কাগজে ছাপা হয়, আপত্তির তীব্রতায়, ন্যায়-অন্যায়ের মান বিচারের আলোচনায় হারিয়ে যায় তাঁদের কুসুমের চেয়েও কোমল এক অদ্ভুত নরম মনের খবর। সম্প্রতি ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার মৃত্যুতে যে দেশজোড়া দুঃখ প্রকাশের সংবাদ সব দেখলাম তাতেও ঠিক একই কথা মনে হচ্ছিল। জাতীয় নেতার সম্মান তাঁকে দিয়েছেন সবাই, এমন জাতীয় নেতা যিনি আজীবন অন্যায়ের প্রতিবাদে বীরের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বীরের যে বীরব্রত বা শিভলরি ছিল তার কথা কেবলমাত্র তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী শ্রীমতী রমা মিত্র বেতার মাধ্যমে উল্লেখ করেছিলেন। দুর্বলকে রক্ষা করবার ব্রতই শিভলরি। আমাদের সমাজে নারীকে কখনও দেবীর আসনে বসানো হয়, কখনও বা পরম উপেক্ষায় দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা প্রথম শুনেছি নারীর সমান অধিকারে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াবার কথা। ডাঃ লোহিয়া সারা জীবন নারীকে সেই মর্যাদা দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। রাজনীতিতেও মেয়েরা যাতে পুরুষের সংগে সমানে চলতে পারে তার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। বলতেন মানুষ তো এক পায়ে চলতে পারে না। নারী ও পুরুষ সমাজের দুটি পা। সহজ, স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতির জন্য দুই পা-কে সমানে চলতে হবে।

দ্রৌপদী ছিলেন ডাঃ লোহিয়ার নারী-মর্যাদার আদর্শ। তেজস্বিনী দ্রৌপদী আমাদের নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে তাই তিনি চাইতেন। রাধা, মীরা সমর্পণের শ্রেষ্ঠ রূপ। তাঁরা আমাদের আদর্শ সত্য তবু দ্রৌপদীর তেজস্বী দীপ্তি অন্যায় আচরণে অসহিষ্ণুতা ডাঃ সাহেবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর লেখাতেও দ্রৌপদী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। কোনও মহিলা নাকি কৌতুক করে বলেছিলেন, "He is the last of the romantics in India." উত্তর পেতে দেরি হয়নি। মহিলার মুখ থেকেই উত্তর এল, "He is the only romantics in India."

সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির ন্যাশনাল কমিটিতে একমাত্র মহিলা শ্রীমতী রমা মিত্র বলছিলেন, ডাঃ লোহিয়া সমান সুযোগে বিশ্বাস করেননি। পিছিয়ে যারা আছে

তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ থাকা দরকার এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। পিছিয়ে থাকাদের মধ্যে মহিলা সমাজের কথা বার বার তাঁর মনে পড়তো। আমাদের দেশে মেয়েদের মত দুঃখী কেউ নেই। কত শত সংসার আছে যেখানে দুবেলা উনুন জ্বলে না আজ। সেখানে অভাব দৈন্যের টানা পোড়েনের সবচেয়ে বড় বলি হচ্ছে ঘরের মেয়েরা। ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত জীবন পুরুষও ঘরে ফিরে তার সমস্ত জ্বালার বিস্ফোরণ করেন মেয়েদেরই উপর। (অবশ্য একথাও তিনি বলতেন যে, সেই বিস্ফোরণের ফল কখনও কখনও নেমে আসে ছোট ছেলেমেয়ের নির্দোষ মাথার উপর। তাই বাচ্চাদের দলবদ্ধ প্রতিবাদ প্রয়োজন এমন অহেতুক অন্যায়ের বিরুদ্ধে!)

ডাঃ লোহিয়ার অতি শিশুবয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁর বাবাও ছিলেন একমাত্র সন্তান। কাজেই নিতান্ত আপনজনের আদর জানতেন না বেশী, তাঁর মায়ের প্রতি স্নেহভক্তি দেশের সব মায়ের জন্য সমানে ভাগ হয়েছিল। সাদা শাড়ি, ফুলের মালা, মৃদুসুগন্ধি ছিল তাঁর মতে মেয়েদের সাজসজ্জার সরঞ্জামের শ্রেষ্ঠ উপাদান। বলতেন, রাশিয়ার কর্মব্যস্ত মেয়েরাও সুগন্ধির সামান্য স্পর্শটুকু বজায় রাখতে ভোলে না।

কখনও কখনও কেউ ঠাট্টা করে বলেছে, "ডাঃ সাহেব, একটি ল্যাম্প পোস্টকে শাড়ি পরিয়ে দিলেও কি এমনি করে তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবেন?" কারণ প্রত্যেক মহিলাকে তিনি সুন্দরী মনে করতেন। তবে এ প্রশ্নের জবাব তিনি মার্কিন দেশ সফরকালে দিয়েছিলেন, "A woman has no caste. She is a jewel Take her wherever you find her." নারী অলঙ্কারের মত সৌন্দর্যের আধার। সে রানীর মত, সম্রাজ্ঞীর মত, রাজকন্যার মত। যে কুলেই তার জন্ম হ'ক, সে স্বৈরিণী। পুরুষশাসিত সমাজে এমন করে যদি সবাই ভাবতে পারতো হয়তো মঙ্গলই হ'তো।

ভাষা বিভ্রাট

ভাষার ভিতকে নিয়ে আলাপ, আলোচনা, প্রতিবাদ, আত্মহত্যা, দাঙ্গাহাঙ্গামা সব কিছু ঘটেছে আর যতই ঘটছে, ততই যেন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কর্ণধাররা আমাদের মত সাধারণের চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া এবং তার সংগে সংযোগ রক্ষার ভাষা বা link language হিসাবে হিন্দীর স্থান এবং library language বা উন্নত চর্চার জন্য অতিরিক্ত ভাষার প্রয়োজন হিসাবে ইংরাজীকে রক্ষা করা এই হয়েছে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ। সম্প্রতি মহিলা সমাজের তরফ থেকে অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স মেয়েদের মত সংগ্রহের জন্য তৎপর হয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন শাখায় প্রশ্নমালা পাঠিয়েছেন যুক্তিযুক্ত অভিমত জানাবার জন্য।

ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা সভায় বলছেন শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকর। তাঁর দক্ষিণে ডাঃ সরলা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান • ফটো : দেশ

আলোচনা সভার এক অংশ ফটো : দেশ

এই প্রশ্নমালাকে উপলক্ষ করে দিন কয়েক আগে ৮নং বেথুন রোডে A I W E-র কলকাতার সব কটি শাখা মিলিত হয়েছিলেন। মতামত অনেকেই প্রকাশ করেছিলেন তবে বিশেষভাবে বিষয়টি আলোচনা করার জন্য শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকরকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তিনি এই ভাষা সমস্যার সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ চর্চা করেন।

কোঠারী কমিশনের রিপোর্টের সবচেয়ে সত্য ও নিষ্ঠুরভাবে বাস্তব উক্তি বোধ হয় সমস্যার জটিলতার স্বীকৃতি। 'Of the many problems which the country has faced since independence, the language question has been one of the most complex''. শ্রীমতী কার্লেকরও আলোচনার শুরুতেই সে কথা উল্লেখ করলেন। ভাষা তো কেবলমাত্র গলায় অবস্থিত শব্দ মন্ত্রের ধ্বনি নয়। ভাষার তাৎপর্য গভীরে নিহিত মনের প্রগাঢ় অনুভূতি। সেই অনুভূতির অনুটুকুও যদি আহত হয় তবে এত আয়োজনের সবটাই বৃথা হতে পারে। শিক্ষার বাহন আঞ্চলিক ভাষা হবে এ সুপারিশও অনেকটা এ অনুভূতির উপর ভিত্তি করা। ৩০ বছর আগে, স্বাধীনতার বহু পূর্বে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় ভাষণে বলেছিলেন জাপান যে পশ্চিমী বিদ্যাকে একেবারে আপন করে নূতন ছাঁচে নিজেদের যোগ্য করে নিতে পেরেছে তার কারণ তাদের শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত নূতন তথ্য অনুবাদের ব্যবস্থা আছে বলে জাপানী শিক্ষার্থী পিছিয়ে থাকে না। শিক্ষার বাহনকে বুঝতেই যদি শিক্ষার্থীকে বেগ পেতে হয় তবে শিক্ষার আসল জিনিস তো মুখস্থের পর্যায়ে থেকে যাবে অনেক ক্ষেত্রেই।

আমাদের দেশের সঙ্গে অবশ্য জাপানের তফাত অনেক। ইংরাজ রাজত্ব যেমন শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য ভারতবর্ষকে এক করেছিল, উত্তরকালে যা আমাদের জাতীয়তাবোধ সামান্য সংকীর্ণতায় দুষ্ট না হতে সাহায্য করেছিল তেমন ইংরাজী ভাষা আমাদের সংযোগের বিশেষ একটি
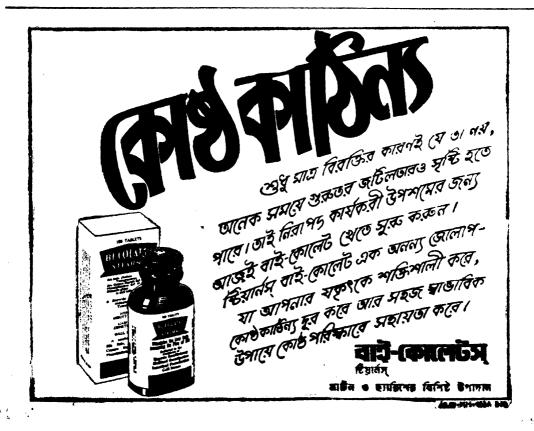
গ্রহণ হয়েছিল। ইংরাজীর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা আমাদের শিক্ষিত মানুষকে সহজে আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের সুযোগ দিতে পেরেছিল। কাজেই উচ্চশিক্ষায় আঞ্চলিক ভাষা মাধ্যম হলে তার প্রস্তুতি এবং আয়োজন সম্বন্ধে সতর্কতার কথা সবার আগে ভাবতে হবে। বিজ্ঞান, টেকনোলজি থেকে নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান আইন অর্থনীতি সবই পরিভাষাগত। তার অনুবাদ এবং সম্যক অনুবাদ কবে কি ভাবে সম্ভব আমরা জানি না। আজকাল এমন বহু দেখা যায় যে গোড়ায় বহুদিন মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের পর কোনও একটা পর্যায়ে হঠাৎ ইংরাজীর সাহায্য নিতে হয়। শিক্ষার্থীর সংকট তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের সংকট দারুণ রূপ ধারণ করে।

কল্যাণীদি আরও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখ করেন। গতিময়তা বা সচলতা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী সব সময় আপন আপন প্রদেশে বাস করেন না। শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে সংকটের মধ্যে এটিও একটি ভাববার কথা।

ক্রমশ আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থার পর যে সমস্যা আসছে সেটা হলো হিন্দীকে link হিসাবে উচ্চপর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়ার কথা। প্রথম প্রশ্নই হলো link বা সংযোগের ভাষার [illegible] সম্বন্ধে কি কেউ ভাল করে ভেবেছেন? আমরা তো হিন্দী বলি। হাওড়া স্টেশনে [illegible] হিন্দী ভাষাভাষী [illegible] মাঝে মাঝে [illegible] হিন্দী [illegible] আত্মপ্রসাদও অনুভব করি। কিন্তু সংযোগ রক্ষা হিসাবে [illegible] হিন্দী [illegible] মাতৃ-ভাষা হিন্দীর [illegible] কাছাকাছি [illegible] সঙ্গে [illegible] সামঞ্জস্য থাকবে না। বাঙালী অথবা উত্তরপ্রদেশবাসী যত সহজে হিন্দী শিখবে, তত সহজে তামিলনাড়ুর [illegible] ছেলেমেয়েরা শিখতে পারবে না। যে কোন একটি ভারতীয় ভাষা মাতৃ-ভাষার উপর শিখতে হলে তারা হয়তো সহজেই নিকটবর্তী অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা শিখতে পারবে কারণ তাতে মিল অনেক অনেকটা বেশী। বহু ভাষাভাষী দেশে এ বড় কঠিন প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব এতদিন ইংরাজী দিয়ে এসেছে বলেই প্রশ্ন জটিলতর। ইংরাজীকে স্থানচ্যুত করতে গিয়ে সমস্যার উৎপত্তি। ইংরাজীকে লাইব্রেরী ভাষা করে রাখা হবে। যেমন ইংরেজ ফরাসী শেখে তেমন ভারতীয় শিখবে ইংরাজী। অবশ্য সেই লাইব্রেরী ভাষা হিসাবে ইংরাজী হবে প্রধান।

হিন্দীর স্বপক্ষে কোঠারী কমিশনের কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"It is however, equally obvious that English cannot serve as the link language for the majority of our people. It is only Hindi which can and should take this place in due course. As it is the official language of the Union and the link language of the people all measures should be adopted to spread it in the non-Hindi areas. The success of this programme to which it is voluntarily accepted will largely depend on the extent by the people of these areas."

এখন এই voluntary কথাটির মধ্যে রয়েছে যত কিছু মারপ্যাঁচ। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দাক্ষিণাত্যের দেশগুলি হিন্দী গ্রহণ করবে না একথা বলা বাহুল্য। উদ্দেশ্যমূলকভাবে চেষ্টা করতে গিয়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে তাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। বাংলাদেশে বরং আপত্তি কম। হিন্দীর সঙ্গে বাংলা ভাষার পার্থক্যও অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু জাতীয় সংহতি বা ঐক্য যদি শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হয় তবে জোর করে হিন্দী ইংরাজীর স্থান নিলে বাঙালীও কতটা খুশী হবে বলা যায় না। '৬২ সালের ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন কাউনসিল আবার বলেছিলেন আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান কৃষ্টিগত বা রাজনৈতিক কারণে তত প্রয়োজনীয় নয় যতটা প্রয়োজনীয় সহজে অধীত বিষয় বোধগম্য হবার জন্য। বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞ দল হয়তো মনে রাখেন নি ভাষার বেলায় কৃষ্টি আর সহজ বোধ্যতা এক সঙ্গে মিলে আছে। আমার ভাষা আমার কৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত বলে আমার ভাষায় যত সহজে যা আমি হৃদয়ঙ্গম করবো আর কারও ভাষায় তা করবো না। বরং রাজনৈতিক কারণগুলো টেনে আনাতে একটা সহজ ব্যবস্থাকে কঠিন করা হয়েছে। সেই কৃষ্টির জন্যই ভাষা এত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিকদের সৃষ্টি। ইংরাজী ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশের আপন ভাষা নয়। অথচ মাতৃভাষার পর ইংরাজীকে স্থান দিলে যদি পঞ্চাশ রকম অসুবিধা দূরে হয় তবে তাকে টানাটানি করা হয়েছে কেন?

আলোচনা সভায়ও বেশীর ভাগ মহিলা ইংরাজী রাখার স্বপক্ষে আপন আপন সমর্থন জানান। অবশ্য আমার বার বার মনে হচ্ছিল ত্রিভাষার ব্যবস্থা মন্দ ছিল কি? অল্পবয়সে ভাষা শেখা অত শক্ত নয়। মাতৃভাষাকে মাধ্যম রেখে দুটি ভাষা বজায় রাখলে হয়তো ভালই হ'তো।

শ্রীমতী

হাসি। অথচ উদাস না। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন চুলচুলু ভাব করেন। আমি ভাবি, এত খবর এর মধ্যেই পেলেন কেমন করে। অন্তত এ ক্ষেত্রে একজন মুখ না খুললে জানবার উপায় ছিল না।

অচিনবাবুর চোখ থেকে চোখ সরাবার আগেই তিনি আবার বলেন, 'তা হলেই বুঝতে পারছ, তুমি এদের ব্যাপারে নেই, সেটা ঠিক নয়। বরং আমি তো বলি, তুমিই কাণ্ডটা ঘটালে।'

'আমি?'

'তবে কি আমি? এই বুড়ো অচিন মজুমদার?'

বলে এমনভাবে ভুরু টানেন, চোখের কোণে তাকান, আর গালের ভাঁজে দুটো হাসি হাসেন, হাসি সামলানো দায় হয়। তবু হাসতে গিয়ে কোথায় যেন ঠেক লেগে যায়। বিব্রত বিস্ময়ে বলি, 'কিন্তু দেখুন, তা তো আমি চাইনি।'

'তোমার চাওয়াতেই কি সব হবে?'

'না, তা—।'

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'তুমি পালালেই কি সব মিটে যায়?'

এ কথার হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারি না। অচিনবাবু আবার বলেন, 'সবাই সবার ভাবে চলে, কাউকে দোষ দিতে পারি না। পালাবে কেন, তুমি তোমার ভাবে চল। পালানোটাই সহজ এখানে, না পালিয়ে সহজে চল, সেটাই ভাল। একটা মুখে অন্ধকার দেখেছ। বাকী মুখের আলো কি কিছুই নয়?'

অচিনবাবুর চোখের দিকে চেয়ে মনে হয়, দৃষ্টির ওপারে যেন এক না-বলা কথার ইশারা। যে ইশারা আলোকে ঝিলিকে দেখা যায় না। যে ইশারা গভীর, গম্ভীর, নিশ্চুপ, অথচ নিরন্তর চলে। বুঝতে পারি, সহজের কথা যত সহজে বলেন, সহজে চলা তত সহজ না। পালানোটা ভুল, সে কথা বুঝি। তবু মনটা কেমন খচখচিয়ে মরে। সহজের পথে অসহজের ঘূর্ণি লাগবে না তো? পালাব না, হে সহজ, তোমার অলক্ষ্যে কঠিন ধাঁধায় টেনে নিও না। পথ চলাতে অন্ধকারের বিড়ম্বনা, সে বড় বালাই।

ঝিনিদের দলটা আমাদের আগে আগে চলেছে। আমরা তেমনি পিছনে। আমাদের চার পাশে নানা পসারের ঝিকিমিকি। নানা মানুষের নানা দিকে যাওয়া আসা, কলকলানি। লক্ষ করেছি, রাধা আর লিলি কয়েকবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছে। ওদের চোখে মুখের হাসি বলে দেয়, এখন আর শুভেন্দুর কথায় ওরা নেই। ওরা তিন সখীতে কী যেন বলাবলি করে। চুড়ির রিনিঠিনির মত হাসিতে বাজে। ওদের চলার ভঙ্গিতে, ছাঁদেও যেন সেই হাসির তালে দোল দোলানো। থেকে থেকে রাধা লিলি ফিরে ফিরে চায়। ঝিনি একবারও ফেরে না। তবু মনে হয়, রাধা লিলির চাহনি আর হাসি ঝিনির চোখে মুখেও ঝলকাচ্ছে। কেবল সুপর্ণাদি চলেছেন দোকান পসার আর মানুষ দেখতে দেখতে। বয়স আর মন নিয়ে তিন সখী থেকে তিনি এখন সঙ্গে থেকেও আলাদা।

অচিনবাবুর দৃষ্টি সামনে। কিন্তু বিশেষভাবে কোন কিছুর ওপরে না। তাই মনে হয় তাঁর দৃষ্টি মনের ভিতরে। সেইদিকে চোখ রেখেই হঠাৎ বলে ওঠেন, 'মেয়েটি বড় ভাল। ভারী মিষ্টি আর সহজ। এত সহজ যে, ওকে ভুল বোঝার পথ বন্ধ রেখেছে হাজারটা। ওর বাইরের পোশাকটা আর ডিগ্রির কথা শুনলে কেউ জানতে পারবে না, ও এত সহজ। নইলে—।'

বলতে বলতে হঠাৎ থমকে যান। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে তাকান। তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'ইস, ছি ছি ছি, একেবারে ভুলে গেছি। তোমার সঙ্গে যে আমার কথাই নেই হে। আমি যে তোমার ওপর ভীষণ রাগ করেছি।'

সেই প্রসঙ্গটা এবার হঠাৎ আমারও মনে পড়ে যায়। বাউল আসরে তিনি আমাকে ধিক্কার দিয়ে উঠেছিলেন। কেন, তা জানা হয়নি। অসহায় বোধ করি, অবাক হয়ে বলি, হ্যাঁ, তখনো বলছিলেন। কিন্তু কী করেছি, বলেন তো?'

অচিনবাবুর এখনকার মুখ আলাদা। ওঁর ঝিকিমিকি মুখের রেখায় হঠাৎ যেন ভারী রাগ দেখা দেয়। কিন্তু মন দিয়ে দেখা, এ রাগ কপট। রাগের ওপারে যেন কেমন একটু অনুরাগের রঙ লাগানো। রুক্ষ স্বরে বলেন, 'কী কর নি, তাই বল। তোমার সম্পর্কে আমার একটা অন্যরকম ধারণা ছিল। কিন্তু তুমি যে এরকম, ছেঃ, ছি ছি ছি।'

[illegible] [illegible] বাজেন না। আর কথাতেই, কথা শেষ করে চোখ পাকিয়ে তাকান। আবার তিন সখীর দিকে একবার তাকিয়ে বলেন, 'এতক্ষণে বুঝলাম, কেন ওরা বারে বারে ফিরে ফিরে চাইছে।'

আমি কেবল ধাঁধার জটায় পাক খেয়ে যাই। অপরাধ কী, প্রসঙ্গ কী, তার নাগাল পাই না। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কেন চাইছেন ওঁরা বলুন তো? কী বলাবলি করছেন ওঁরা?'

'ওরা বলাবলি করছে, আড়ি দিয়েও আমার তোমার সঙ্গে কথা বলছি কেন। না না, তোমার সঙ্গে আমার আর কথা নেই।'

প্রায় ওঁর পায়ে ধরতে ইচ্ছা করে। এ কী অসহায়তা দেখ। জিজ্ঞেস করি, 'কিন্তু কী অপরাধ করেছি, তা বলুন।'

অচিনবাবু রোখ পাকিয়ে বলেন, 'তোমার অপরাধ, তুমি অহঙ্কারী।'

অহঙ্কারী! এ অপবাদ তো শত্রুতেও দেয় না আমাকে। বলি, 'অহঙ্কারী?'

'হ্যাঁ, আর মিথ্যুক।'

'মিথ্যুক?'

'হ্যাঁ। ভাগ্যিস জানতে পেরেছি ভাই। আমি তোমার ঠিকানাও নেব না, তোমাকে কোনদিন চিঠিও লিখব না।'

আর বলবার দরকার হয় না। কোথাকার কথা কোথায় এসেছে, এবার বুঝতে পারি। চিঠির প্রসঙ্গ অচিনবাবুর কানে উঠেছে। আমার মনে কেবল এই ধাঁধা, ওঁর সঙ্গে ঝিনির এত কথাবার্তা কখন হল। দুজনাতে এত বলাবলি কেমন করে হল। কয়েক ঘণ্টার তফাতে দেখছি, আমার মানুষ আর আমার নেই। তিনি এখন ভিন দলের দলী। আমিই পর। তিনি এখন ঝিনিদের শরিক। এখন মনে পড়ে, ঝিনির কান্নার কথাও তাঁর গোচরে এসেছে। আর এই তো একটু আগেই শুনলাম, অমন মিষ্টি আর সহজ মেয়ে তিনি আর দেখেন নি। এ যে দেখি, আমে দুধে মাখামাখি, আঁটি গড়াগড়ি যায়।

তবে এক বেলাতে এটুকুও বুঝেছি, জ্ঞানের এমন ইন্দ্রজাল অচিনবাবুর অচিন লীলাতেই আছে। সহজেই সহজ ভাবে। সহজেই সহজ ধরে। ঝিনি সেই সহজে ধরা দিয়েছে। দিয়ে দুজনে দুজনের ভাবের ভাবী হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বিব্রত লজ্জায় বলি, 'আসলে কী জানেন—।'

'আরে রাখ হে তোমার আসল নকল। তুমি মানুষ চেন না।'

সে কথা শিরোধার্য। [illegible] [illegible] যেন কোনদিন না করি। যে আপনাকে চেনে না, সে কেমন করে মানুষ চিনবে। যার আপন পথের ঠিকানা জানা নেই, সে আপন খোঁজার রূপ চেনে না, সে ভিন্ন মানুষের কী চিনবে। বলি, 'তা ঠিক।'

তাতে অচিনবাবু শান্ত হন না। রুষে বলেন, 'হাজারবার ঠিক। আমি বলব, তুমি ওকে শুধু অসম্মান করনি, ওকে মিথ্যেবাদী করেছ, ওর অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ করেছ।'

অচিনবাবুর মুখের গাম্ভীর্যে এখন আর কপটতা নেই। কিন্তু চিঠির জবাব না দিয়ে অসম্মানিত করতে চাইনি। কী অহঙ্কার যে চূর্ণ করেছি, তাও জানি না। অবাক হয়ে বলি, 'উনি কি তাই বলেছেন আপনাকে?'

'উনি বলবেন কেন। ওঁর কথা থেকেই বোঝা যায়।'

'কিন্তু ওঁর অহঙ্কারের কথাটা বুঝলাম না।'

'কেন, এত মানুষ দেখেছ, এটুকু

বোঝেনি, একটি মেয়ের একটা মেয়েসুর অহঙ্কার থাকে। তোমার কথা সে তার বন্ধুদের বলেছে। তোমার জন্যে সে তার বাবা-মাকে মিথ্যে কথা বলেছে।'

সে অপরাধ মনে মনে আগেই স্বীকার করেছি। অস্ফুটে বলি, 'জানি।'

অচিনবাবু আমার দিকে একবার তাকান। তারপরে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'তার চেয়ে বড় কথা, তুমি ওকে দুঃখ দিয়েছ।'

সে কথাও অনস্বীকার্য। তাই চুপ করে থাকি। অচিনবাবু আমার কাঁধে হাত দেন। আমার চোখের দিকে তাকান। দেখি, ঈষৎ লাল চোখ দুটি প্রীতি-স্নেহে চিকচিক করে। বলেন, 'একটা ভাল মেয়েকে দুঃখ দিলে একটু লাগে. তাই এত কথা বললাম। ওর মনটা ভাব, যেমনি প্রথম আলাপে বুঝেছে. তোমাকে আমার একটু ভাল লেগেছে, অমনি আমাকে সব বলে দিয়েছে। তাতে বোঝা গেল, বিদ্যা বুদ্ধি যা-ই বল, একটি সুন্দর হৃদয় তার চেয়ে অনেক বড়। সে আর যাই হোক, ছলনা জানে না।'

বলে আবার আমার চোখের দিকে তাকান। ও'র চোখে যেন কিসের এক অস্পষ্ট জিজ্ঞাসা। যে জিজ্ঞাসায় জড়ানো একটি অচেনা হাসি। আমি বলি, 'অন্যায় হয়ে গেছে।'

অচিনবাবু বলেন, 'আর সেটা হয়েছে, তুমি ওকে চিনতে পারনি।'

অবাক হয়ে তাকাই। কী চেনার কথা বলছেন উনি। তার কোন জবাব নেই, কেবল একটু হাসেন আমার চোখের দিকে চেয়ে। তারপরে মুখ ফিরিয়ে নেন। আমার ঠেক লেগে যায় মনে মনে। কোন্ সংকেত, কোন্ দিকেতে কী দেখান এই বয়স্ক অভিজ্ঞ রসিক প্রাণের মানুষ। পথ চলি আপন খোঁজার ফেরে। সেখানে সেই চেনাটাই দায়, যে চেনাতে পথের গতি হারিয়ে যায়।

অচিনবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আর যেও না, সামনের ঘরেই ঢোক।'

মেয়েরা দাঁড়ায়। তাদের সামনেই এক চা-কফির ঘর। তেমন ভিড় নেই। মেয়েরা ভিতরে ঢুকেও বসে না। অচিনবাবুর দিকে তাকায়। আমরা এগিয়ে যেতে ঝিনি বলে, 'বসুন অচিনদা।'

এই শোন, এর মধ্যে আমার অচিনবাবু এদের অচিনদাও হয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বসছি। তোমরা বস। সুপর্ণাদি বসুন।'

বলেই রাধা আর লিলির দিকে চেয়ে মুখখানা গম্ভীর করেন। বলেন, 'তোমরা ভাবছিলে আড়ি দিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম? মোটেই না। যা তা শুনিয়ে দিচ্ছিলাম।'

রাধা লিলি হেসে ওঠেন। সুপর্ণাদি নিঃশব্দে হাসেন। কিন্তু ঝিনির অবাক চোখে একটু উদ্বেগের ছায়া। সেদিকে চেয়ে অচিনবাবু হাত তুলে বলেন, 'আরে না মা, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। মিথ্যুককে মিথ্যুক বলেছি, এই যা।'

তাঁর কথায় ভাবে রাধা লিলি আবার হেসে ওঠে। ঝিনির মুখে একটু রঙ ধরে যায়। ও আমার দিকে একবার চেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়। বলে, 'অচিনদা, আমি কিন্তু আপনাকে দক্ষিণের গল্প বলেছি. নালিশ কিছু করি নি।'

'তুমি নালিশ করবে কেন। একে আমার যা বলার ছিল, বলেছি। এখন বস।'

আমাকে ডেকে বললেন, 'বস হে।'

বসতে গিয়েও একেবারে চুপ করে থাকতে পারি না। প্রায় কারুর দিকে না তাকিয়েই বলি, 'হ্যাঁ, অন্যায় তো একটা হয়েই গেছে।'

অচিনদা বলে ওঠেন, 'কবুল?'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। তিনি বলেন, 'বেশ, ক্ষমা চাওয়ার পাঠ এখন থাক, ওটা অন্য সময় হবে।'

রাধা লিলি আমার দিকে চেয়ে হাসে। সুপর্ণাদি আমাকে বলেন, 'আমাদের মেয়েটাকে কষ্ট দিয়ে আপনিও রেহাই পেলেন না।'

ঝিনি বলে ওঠে, 'আহা, কষ্ট আবার কী। এ প্রসঙ্গ থাক, আর নয়।'

ঝিনি লজ্জা পাচ্ছে, বোঝা যায়। প্রসঙ্গান্তরে যেতে চায়। মনে মনে আমারও সেই প্রার্থনা। তবু রাধা চোখে ঝিলিক হেনে বলে ওঠে, 'মিটমাট যাই হোক, সেই পুরনো চিঠির জবাব দিতে হবে।'

আমি বলি, 'তাও দেব।'

ঝিনি হেসে ওঠে। ওর সঙ্গে চোখা-চোখি করে রাধা লিলিও হাসে। অচিনদা জিজ্ঞেস করেন, 'কী হল?'

জবাব দেয় ঝিনি, 'না—মানে ও'র কথা শুনলে একটু অবিশ্বাস করা যায় না কিনা, তাই।'

সকলের হাসির মধ্যেই অচিনদা বলে ওঠেন, 'চিতা, চিতা ভাই, চিতা বাঘের চলা ফেরা টের পাবে না। তখন বললাম না, গোপীদাস ওর নাম দিয়েছে, কালো চিতা।'

লিলি বলে ওঠে, 'আর আপনি দিয়েছেন, কালো বিড়াল।'

সকলের হাসিতে কফিখানাটাই খিল-খিলিয়ে বেজে ওঠে। আমিও বঞ্চিত হই না। কফির কাপ এসে পড়ে সামনে। চুমুক দিতে গিয়ে ঠেক খাই। হঠাৎ এক সাঁওতাল পুরুষ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হেঁকে ওঠে, 'অই, তু অচিনবাবু কী না, আঁ?'

অচিনদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন এক মুহূর্ত। কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া-চুলো, গায়ে ধোকড়া একটা কম্বল সাঁওতাল পুরুষটির দিকে একটু তাকিয়ে থেকে অচিনদা বলে ওঠেন, 'আরে তুই বরহম না?'

'হ' রে হ', তো চিনতে পারলি? আমাদের উদিকুখে যাবি না?'

'যাব। তুই আয় না এখানে?'

'না, ভিতরে যাব না। তু আয় কেনে।'

অচিনদা উঠে দাঁড়ান। এমন ব্যাকুল, এমন হাসির ঝলক মুখে, মনে হয় কত দিন পরে যেন প্রাণের বন্ধুরে দেখা পেয়েছেন। আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখি, তিনি দোকানের বাইরে গিয়ে সাঁওতাল পুরুষটিকে জড়িয়ে ধরেন।

ক্রমশ

প্রাক্-পূজো প্রদর্শনী

কলিকাতা শহরে পূজার পূর্বে অনেকগুলি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। সবগুলির বিষয়ে পত্রিকার এক সংখ্যায় বলা সম্ভব নয়—তাই কয়েকটি প্রদর্শনীর সমালোচনা গত সংখ্যাতে করেছিলাম। অবশিষ্টগুলির মধ্যে বলবীর সিং কাট-এর ভাস্কর্য প্রদর্শনী ও শিল্পী পৃথ্বীশ সেনের চিত্র প্রদর্শনী উল্লেখযোগ্য। অবশ্য মুর্শিদাবাদ সঙ্ঘের বাৎসরিক সম্মিলনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক বিচিত্র প্রদর্শনী ও বাটিক গ্রুপের ছোট প্রদর্শনীর কথাও বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস উদ্যানে বলবীর সিং কাট ভাস্কর্য্য শিল্পের ২০টি নিদর্শন পেশ করেন। অধিকাংশই কাঠ, পাথর ও কংক্রীটে তৈরি। বলবীর সিং কাট তরুণ। শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিক্ষা সমাপ্ত করে ইনি ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করে বরোদায় শ্রীশঙ্খ চৌধুরী ও শান্তিনিকেতনের শ্রীরামকিঙ্কর বৈজ-এর কাছে ভাস্কর হিসাবে কাজ করেন। এঁর কাজ দেখে মনে হয় ইনি কঠিন, ভারী ও নিরেট বস্তুস্তূপে মাধ্যমে নানা আকার সৃষ্টি করতে ভালবাসেন। যাঁরা ভাস্কর্য শিল্প, বিশেষ করে গঠনরীতির সঙ্গে সুপরিচিত তাঁরা জানেন যে মাধ্যম ও ছুরি-ছেনি-বাটালি-হাতুড়ির উপর দখল না থাকলে শুষ্ক ও কঠিন স্তূপমাধ্যম থেকে কেটে কেটে সুন্দর ও সাবলীল কোনও আকার সৃষ্টি করা যায় না।

নিদর্শনগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলে বোঝা যায় যে, ভাস্কর প্রগতিশীল—চিন্তাধারা ও গঠনচাতুর্যের মধ্য দিয়ে সমকালীন ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। আয়তনিক সমতা ছাড়াও কয়েকটির সামগ্রিক রূপে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্লাসটারে রচিত দুটি মুণ্ডের নিদর্শন ছিল—একটি প্রথাগত রীতি অবলম্বনে তৈরি (এস আর দাশ), অপরটির (পোর্ট্রেট ২) মধ্য দিয়ে চরিত্রগত বিশেষত্বটুকু ফুটে উঠেছে এবং এটি দেখে এপ্‌স্টিনের গঠনপদ্ধতির কথা মনে পড়ে। দুই একটি কাজে শঙ্খ চৌধুরী ও রামকিঙ্করের প্রভাব দেখা গেলেও তাতে ভাস্করের স্বকীয়তা নষ্ট হয়নি। কবিসুলভ মনের অনুভূতি ও রূপসন্ধানী চোখের সজাগ দৃষ্টি তাকে নূতন জগতের সন্ধান দেয় এবং পাথরস্তূপ থেকে তিনি কয়েকটি সাবলীল আকার সৃষ্টি করেছেন, যেমন টর্সো—কঠিন, কঠোর ও নীরস পাথরস্তূপ কেটে কেটে নিখুঁত খোদাই কাজ করে ভাস্কর তার মধ্যে যেন স্বাস্থ্যবতী পূর্ণযৌবনা নারীদেহের পেলবতার সৃষ্টি করেছেন। অন্য নিদর্শন—মোবাইল ইন সিটু (১ ও ২)। মার্কানা থেকে আনীত পিঙ্ক মার্বেল স্তূপকে দ্বিখণ্ডিত করে, কেটে কেটে, ভাস্কর একটি থেকে দুটি গরু ও অপরটি থেকে গাড়ির অংশ তৈরি করেছেন। রামকিঙ্করের প্রভাব লক্ষিত হলেও সামগ্রিক গঠন ও প্রকাশ চাতুর্যের মধ্য দিয়ে ভাস্করের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বৈজনাথের স্যান্ডস্টোনে গঠিত দি সিঙ্গারসও উল্লেখযোগ্য। কংক্রীটের মধ্যে কম্পোজিশন হিসাবে প্রাচীর চিত্রজাতীয় রিলিফের কাজ সানফ্লাওয়ারস অ্যান্ড দি সিঙ্গার ভাস্করের চিন্তা ও কল্পনাধারার সন্ধান দেয়। নিরেট কাঠস্তূপে কেটে কেটে ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট বড় নানা আকারের শূন্যস্থান, অর্থাৎ নেগেটিভ ফর্ম, সৃষ্টি করে ইনি সমকালীন ভাস্কর্য শিল্পের চিন্তাধারা ও গঠনকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন—যথা নেক্সট সিফ্‌ট। এই মাধ্যমে গঠিত কয়েকটি কাজে আবার স্থাপত্য-শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে 'এক্‌সেটেণ্ডেড অ্যানোম্যালিজ' আভ্যন্তরীণ রূপসজ্জা হিসাবে যে কোনও ঘরের শোভাবর্ধন করতে পারে। তবে একটা কথা। বলবীর সিং কাট-এর অধিকাংশ ভাস্কর্য নিদর্শনই উদ্যানসজ্জার উপযোগী, অর্থাৎ মনুমেণ্টাল স্কাল্পচার জাতীয়—সুতরাং আশা করি ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে দীর্ঘাকার নিদর্শন দেখতে পাব।

শিল্পী পৃথ্বীশ সেনের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে, এবং তিনি মোট ৪৫ খানি ছবি পেশ করেন। এখানে প্রথমেই একটি কথা বলে রাখি। শিল্পী মাত্রেই ছবি আঁকবেন ও সেই ছবি সকলের কাছে পেশ করার অধিকারও তাঁর আছে। কিন্তু তার আগে একটি কথা ভেবে দেখা বিশেষ প্রয়োজন :

টর্সো —বলবীর সিং কাট

ছবি সর্বসাধারণের কাছে প্রদর্শিত হবার যোগ্য কি না? অবশ্য সব শিল্পীর কাছ থেকেই আমরা ভাল ছবি আশা করি না, তবে যিনিই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করুন না কেন, তাঁর নিজ রচনার গুণাগুণ সম্বন্ধে অবশ্যই তাঁর অবহিত হওয়া উচিত। সোজা কথায় যে কোনও আসরে নামবার পূর্বে শিল্পীকে তৈরি হয়ে নামতে হয়। দুঃখের বিষয় শিল্পী পৃথ্বীশ সেন সে হিসাবে আদৌ প্রস্তুত না হয়ে আসরে নেমে পড়েছেন। এ'র কাজ দেখে মনে হয়না যে ইনি নিয়মিতভাবে কোথাও অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। ছবির অধিকাংশই বিষয়বস্তুমূলক ও পুরাতন, রিয়ালিস্টিক রীতিতে আঁকা—দুঃখের বিষয় এগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি। কয়েকটি আধুনিক ছবি দেখা যায় বটে, তবে তার বেশীর ভাগই বিদেশী শিল্পীদের অনুকরণ। তাহলেও কম্পোজিশন, ফিশার ওম্যান ও ইয়ং কাপ্‌ল্-এর নাম করা যায়। চিত্রকলার প্রতি যে শিল্পীর স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সেটা এ'র কাজ দেখেই বোঝা যায়। আমার বিশ্বাস যদি ইনি নিষ্ঠাসহকারে কোন যোগ্য শিল্পীর কাছে নিয়মিতভাবে শিক্ষালাভ করেন তাহলে যে এককালে ইনি সুফললাভ করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মুর্শিদাবাদ সংঘ একটি পরিচিত প্রতিষ্ঠান। বাৎসরিক মিলনোৎসব উপলক্ষে এই সংস্থার সভ্যগণ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে মিলিত হন ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ মহাশয় এই উপলক্ষে আয়োজিত এক বিবিধ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পশ্চিম দিকের গ্যালারীতে সংস্থার নানা সভ্য ও সভ্যা রচিত ফুলসজ্জা, ছবি, সূচিশিল্প ও স্থিরচিত্রের নমুনা পেশ করা হয়। এই সংস্থার সভ্যগণ যে প্রায়ই মিলিত হন ও অবসর সময়ে নানা সৃষ্ট্য ও গঠনমূলক কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন সেটা প্রদর্শনীর বিরাট আয়তন দেখেই বোঝা যায়। বাস্তবিকপক্ষে সভ্যদের আঁকা কয়েকটি ছবি আমার ভাল লেগেছে। এই প্রসঙ্গে প্রভাস বোথরা, প্রদীপ বোথরা, শ্রীমতী বিমলা দুধোরিয়া ও কমলসুন্দরী সিংঘী-র নাম করা যায়। শিল্পী জে এম বোথরারও এক-খানি ছবি উল্লেখযোগ্য। স্থিরচিত্রের মধ্যে কুমার চন্দ্রসিং দুধোরিয়া, মার্কোপোলো শ্রীমাল ও বি এস নাহার-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

মোনালিসা গ্যালারীতে অসীম চৌধুরী, সুব্রত ভৌমিক ও শ্রীমতী স্বপ্না সিংহ (বাটিক গ্রুপ) বাটিক শিল্পের নানা নিদর্শন পেশ করেন। এ শিল্পটি আজকাল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং বাটিক প্রথায় ছাপা শাড়ি, ব্লাউজ ও অন্যান্য জিনিসের প্রচলনও হয়েছে যথেষ্ট। প্রদর্শনীতে বাটিক প্রথায় ছাপা চাদর, শাড়ি, টেবলক্লথ নেকটাই-এর নমুনা ছিল। সকলেই জানেন এহেন কাজের একমাত্র মূলধন নূতন প্রতীক ও প্যাটার্ন—অবশ্য অভিজ্ঞতা ত আছেই। বাটিক মাধ্যমে রচিত একটি ছবিও প্রদর্শনীতে রাখা ছিল। অবশ্য এখানে নূতন কি না জানিনা তবে বাটিক মাধ্যমে রচিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের নিদর্শন ইতিপূর্বে আমি দিল্লীতে দেখেছি। এই গোষ্ঠীর প্রধান কৃতিত্ব এই যে সভ্যগণ বাটিক বিষয়ে নানা গবেষণা করেছেন এবং বিপরীত দাগ (reverse crack) সৃষ্টি করে বাটিক শিল্পে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করেছেন। শুধু তাই নয়, বাটিক প্রথায় এ'রা টেরেলিনের উপরেও নানা নকশা সৃষ্টি করেছেন। প্রদর্শনীভুক্ত বিপরীত দাগ ও বাটিক-টেরেলিনের নিদর্শন দেখে অনেকেই সভ্যদের চিন্তাধারা ও গবেষণা স্পৃহার প্রশংসা করেন।

চিত্রপ্রিয়

আর্থিক ব্যবস্থায় অসংগতি

প্রায় দশ বছর আগে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ওকশট একবার প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভারতের আদৌ কোনো আর্থিক ব্যবস্থা আছে কিনা। তখনকার মতো জবাব দেওয়া হয়েছিল, সমৃদ্ধ দেশের মতো সমস্ত কর্মকাণ্ড সুসংহত ও ব্যবস্থাবদ্ধ না হলেও, শিল্প-বাণিজ্যের একটি সুগঠিত অংশ এবং প্রধানত কৃষিনির্ভর অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ অন্য একটি অংশ নিয়ে ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে : অবশ্য অংশ দুটির মধ্যে যোগসূত্র অনেক ক্ষেত্রে ক্ষীণ ও পরোক্ষ। পুরো এক দশক পরে আজ আবার একই সন্দেহ মনে জাগা স্বাভাবিক—সত্য সত্য ভারতের কি কোনো দৃঢ় আর্থিক ব্যবস্থা আছে : খাদ্য আমদানির উপর দেশের অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, তার রপ্তানি বাণিজ্য অংশের ভঙ্গুরতা, বৈষয়িক উদ্যোগে তার অনেকখানি ব্যর্থতা কি আর্থিক ব্যবস্থার দুর্বলতাই প্রমাণ করে না? এই দুর্বলতার জন্য মনে হয় আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা তথা সমাজ জীবনে উপস্থিত নানা বৈপরীত্য ও অসংগতি বহু দূর পর্যন্ত দায়ী।

নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন

জাতীয় জীবনে একাধিক অসংগতির দিকে আজকাল মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে : যেমন, একদিকে গণতন্ত্র নিয়ে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অন্য দিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ প্রয়াস। দুটো আপাত-বিরোধী মনে হলেও যুগোস্লাভিয়া প্রমুখ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে আশা জাগে যে অনুকূল অবস্থায় দুয়ের রূপায়ণ অনেক সাধ্যসম্ভব। তবে তার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে নিয়মানুবর্তিতা পালন করা হয় তা সর্বতোভাবে বলবৎ করা দরকার। এর তাৎপর্য : প্রত্যেক চাষী, মজুর ও কর্মী তার নিজের নিজের অংশের উৎপাদন অথবা কাজের জন্য দায়ী : কোনো বিচ্যুতি বা অবনতির জন্য তাকে জবাবদিহি দিতে হবে। ভারতের মতো দেশের বেশীর ভাগ লোকের মধ্যে যখন জাতীয়বোধ বা দায়িত্বজ্ঞানের একান্ত অভাব তখন সেখানে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা ছাড়া কোনো রকম অগ্রগতি সম্ভব নয়। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনতান্ত্রিক দেশের কথা আলাদা : সেখানকার প্রত্যেক নাগরিক তার কাজের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে থাকে, সে জানে যে তার নিজের কাজে অবহেলা বা স্খলন সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেবে। আমাদের লোকের ভেতর দেশ গড়ে তোলার জন্য উদ্দীপনা-অনুরাগ অথবা আত্মোৎসর্গের মনোভাব সচরাচর মেলে না। নিয়মানু-

বর্তিতার ক্ষেত্রে জাপানের কাছে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু আছে।

সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা

আরেকটি মৌল বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছে দেশের সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থার মধ্যে। এই দুই বিপরীত ব্যবস্থা যে পাশাপাশি থাকতে পারে না সেটা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। দুটোর অন্তঃপ্রেরণা একেবারে ভিন্ন, যার কোনো সমন্বয় সাধন অসম্ভব। কোনো বড়ো রকমের পরিবর্তন না এলে দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য দূর হবে না। বেসরকারী ব্যবস্থায় শিল্পের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ববিরোধ উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠছে। একদিকে জাতীয় উৎপাদনের প্রভূত ক্ষতি সত্ত্বেও শিল্পপতিরা শ্রমিকদের দাবী মেনে নেওয়ার চাইতে কলকারখানা তালাবন্ধ করে রাখছে, অন্য দিকে শ্রমিকরা আজ হাড়ে-হাড়ে বুঝে ফেলেছে যে, অবস্থার উন্নতি করতে হলে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করা ছাড়া উপায় নেই। যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আলোকপ্রাপ্ত শিল্পপতিরা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শ্রমিকদের সব রকমের সামাজিক বীমা ব্যবস্থা করা ছাড়াও, লাভের ভাগ, এমন কি শিল্প পরিচালনা ক্ষমতার অংশ দিয়ে থাকে। আমাদের শিল্পব্যবসায়ীদের অনুন্নত নীতিবোধ ও ক্ষীণ দৃষ্টির দরুন বেসরকারী শিল্পের ভবিষ্যৎ আজ বিপন্ন। একদা গান্ধী পুঁজিবাদীদের দেশের সম্পত্তির জিম্মাদার হিসাবে গ্রহণ করে ধৈর্য নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা এখন অচল। প্রসঙ্গত, শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারে যেমন, বণ্টনের ক্ষেত্রেও, সরকারী ব্যবস্থাকে রাশন ও ন্যায্য মূল্য দোকানের মাধ্যমে ক্রেতা ও ব্যবহারকদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে।

কৃষি ও শিল্প অংশ

অপর একটি বিসদৃশ ব্যাপার হচ্ছে ভারত কর্তৃক বিপুল বহরে খাদ্য আমদানি। আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা যেখানে এখনো কৃষিপ্রধান সেখানে বহু ব্যয়ে বিদেশ থেকে বছরের পর বছর খাদ্যশস্য ক্রয়কে নিয়তির পরিহাস বলা চলে। গত ষোলো-সতেরো বছরের বৈষয়িক উদ্যোগ সত্ত্বেও খাদ্যে আমাদের ঘাটতি দূর করা গেল না। আবার, সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার আয়তনের তুলনায় শিল্প অংশটি ছোট, সন্দেহ নেই। অর্থাৎ দেশের গড় আয় কৃষি অংশের উপার্জন দ্বারা অনেকখানি নির্ধারিত হয়। সেক্ষেত্রে কারখানাশিল্পে টাকায় মজুরী দেশের গড় আয়ের চাইতে খুব বেড়ে গেলে কৃষিদ্রব্যের চাহিদার চাপ-জনিত মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং তা সাধারণ মূল্যমানকে বাড়িয়ে ও প্রকৃত মজুরীকে কমিয়ে দেবে। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, কারখানার শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত ক্ষেতখামারের কর্মীদের ফলোৎপাদক শক্তির উপর নির্ভরশীল।

সুগঠিত শিল্প ও কৃষি অংশ দুয়ের মধ্যে প্রদত্ত মজুরীর কিছু বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক : নইলে শ্রমিকরা কারখানাশিল্পে কাজ করতে আকৃষ্ট হবে না। কিন্তু মজুরীর ব্যবধান খুব বেশী হলে পল্লীবাসীদের একটা বড়ো অংশকে বঞ্চিত করে সুগঠিত শিল্পের কর্মীরা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী হয়ে উঠবে। কেবল শিল্পব্যবস্থার অন্তবর্তী অংশগুলির শ্রমিকদের ভেতর নয়, কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতখামারের কর্মীদের মজুরীর মধ্যকার অসাম্য কমিয়ে ফেলা দরকার।

বৈষয়িক উদ্যোগে আবশ্যক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম কিনতে দরকার ছিল দেশের রপ্তানির সম্প্রসারণ। কিন্তু বিদেশে ভারতীয় সামগ্রীর বাজার থাকলেও, রপ্তানি দ্রব্যের উৎকর্ষ বা উন্নত মান সম্বন্ধে স্বদেশী উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া খুবই কঠিন। জাতির নৈতিক অধঃপতনের এটা একটা প্রতিফলন।

উদ্বেগের কারণ হল এই, পরিকল্পনার অধীন বেশীর ভাগ প্রকল্পের কাজ সময়মতো শেষ করা যাচ্ছে না। পরিকল্পনাকে বাস্তবে অনূদিত করতে গিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি দুষ্প্রাপ্য উপাদান-উপকরণের অপচয় প্রভৃতি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এক-একটা পাঁচ বছরের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগের চেষ্টা না করে বার্ষিক পরিকল্পনা অথবা জাতীয় অর্থনৈতিক বাজেট রচনা এবং তাকে বাস্তব রূপ দেবার কাজে মনোনিবেশ করলে ভালো হয়। তাতে পরিবর্তিত অবস্থার প্রতিকূলে অভিঘাত বৈষয়িক অগ্রগতিকে সবচেয়ে কম ব্যাহত করবে।

মিশ্র অর্থনীতি জাতীয় উৎপাদন সম্প্রসারণে আমাদের শৈথিল্য ঘটাচ্ছে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। আধুনিক ধারার অগ্রগতির মানে হল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বড়ো রকমের গঠনতান্ত্রিক রূপান্তর। এই পরিবর্তন যাতে সুসমঞ্জসভাবে ঘটে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলির যথাযথ সংস্থাপন সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে এক দূরদর্শী ও সহানুভূতিশীল সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

দুই সাংস্কৃতিক দূত

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একটু ভয়ে ভয়েই করলাম প্রথম প্রশ্নটি : পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত প্রচারের প্রয়োজন এবং উপযোগিতা কী?

প্রশ্নটি করেছিলাম স্বামী নিত্যবোধানন্দ ও স্বামী ভাষ্যানন্দকে। প্রথম জন জেনিভাকে কেন্দ্র করে বেদান্ত প্রচারের কাজ করছেন কনটিনেন্টে। বললেন রসিকতা করে, "আমার সারকামফারেন্স

স্বামী ভাষ্যানন্দ

আছে, সেন্টার নেই।" কথাটার তাৎপর্য হল, ওঁকে অবিরাম ঘুরতে হয়—রোম, হল্যান্ড, গ্রীস, জারমানী, দক্ষিণ ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডের অন্যত্র।

নিত্যবোধানন্দজী ১৯৩১-এ দীক্ষা লাভ করেছিলেন রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী শিবানন্দের কাছে। ১৯৩৯-এ যোগ দেন রামকৃষ্ণ সংঘে। ১৯৪৬-এ সন্ন্যাস। কাজ করেছেন মাদ্রাজ, রাজমহেন্দ্রী ও রেঙ্গুনে। তারপর ইয়োরোপে। ১৯৫৮তে জেনিভায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপন করেন। মাতৃভাষা মালয়ালম। ইংরেজী ও ফরাসীতে সমান উত্তম অধিকার আছে। এককালে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম ইংরেজী মুখপত্র 'বেদান্ত কেশরী'-র সম্পাদক ছিলেন। জারমান ও বাংলা জানেন কাজচলা গোছের। আর জানেন সংস্কৃত। শান্ত—সুন্দর মানুষটি। প্রসন্নতার প্রভায় সমুজ্জ্বল।

স্বামী ভাষ্যানন্দ এখন চিকাগোর বিবেকানন্দ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত। ১৯৩৮-এ দীক্ষা পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দের কাছে। ১৯৪০-এ যোগ দেন সংঘে। সন্ন্যাস ১৯৫২তে। কাজ করেন নাগপুর কেন্দ্রে ও কলকাতার 'ইনস্টিটিউট অফ কালচার'-এ। ১৯৬৪ থেকে আমেরিকায় আছেন। মাতৃভাষা মারাঠী। মিশনের মারাঠী মুখপত্র 'জীবন বিকাশ'-এর সম্পাদক ছিলেন একদা। বাংলা জানেন। জানেন সংস্কৃত এবং বলা বাহুল্য, ইংরেজী।

আমার প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হাসলেন নিত্যবোধানন্দজী। "পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত প্রচারের প্রয়োজন এবং উপযোগিতা কী? তাঁর মুখে হলাম প্রশ্নটি স্পষ্ট বুঝেছেন বলে। ও দেখুন, পাশ্চাত্যের প্রয়োজন আছে এমন একটি ধর্মের জন্য, যার পরিপ্রেক্ষিত সেখানকার প্রচলিত ধর্মের চেয়ে উদারতর। যা 'ডগম্যাটিক' নয়। বেদান্ত একই সঙ্গে একটি ধর্ম তথা দর্শন। যার ধর্মমত যাই হোক না কেন, এর দ্বারা সকলের অধ্যাত্মচেতনা গভীরতর হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, বেদান্তের আলোকে বাইবেল আরও নিবিড়ভাবে বুঝতে পেরেছেন তাঁরা। রামকৃষ্ণ খ্রীষ্টকে নিকটতর করে দিয়েছেন তাঁদের কাছে। ওঁরা যখন দেখেন যে, আমরা বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-রামকৃষ্ণকে একসঙ্গে রেখে পূজা করি তখন প্রথমটা খুবই অবাক হয়ে যান। আর তারপর এর তাৎপর্য অনুধাবন করলে বিস্ময় রূপান্তরিত হয় শ্রদ্ধায়।

"সত্যিই তো, নতুন আমরা কী দিতে পারি ইয়োরোপকে? ধর্ম? ভালো একটি ধর্ম আছে ইয়োরোপের। আধ্যাত্মিকতা? কে বলবে আধ্যাত্মিকতা নেই ইয়োরোপের? প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদী আর পাশ্চাত্য বস্তুবাদী—এ ধরণটাই ভুল। দিন বিগত। তবে এটা ঠিক যে, বস্তুর প্রতি সঠিক মনোভাব কী হওয়া উচিত, ভারত আমাদের তা শিখিয়েছে। পবিত্র জীবনযাপনের আদর্শ? ক্যাথলিক সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরাই তো তা প্রদর্শন করেছেন ইয়োরোপকে। তাহলে কি কিছুই দেবার নেই ভারতের? বেদান্তের? আছে। তা হল ঔদার্য। 'ওপেননেস'। মহৎ সব কিছুর জন্য হৃদয়-মন খুলে রাখা। রামকৃষ্ণ খ্রীষ্ট-সাধনা করেছিলেন। তার ফলে তাঁর মৌল ধর্ম আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছিল। ধর্মগুলি পরস্পরবিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি—একমাত্র সত্যস্বরূপই তিনি, জ্ঞানী ঋষিরা তাঁকে নানাপ্রকারে বর্ণনা করে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা—যত মত, তত পথ। সারা ভারতের ঐতিহাসিক ইতিহাস এই এক মূল তত্ত্বের প্রতিধ্বনি-মাত্র। বিশ্বের কাছে এটি হল ভারতের বাণী, বেদান্তের বাণী। এই বাণীতে আছে—গভীরতম আধ্যাত্মিকতা, উদার দৃষ্টি এবং

স্বামী নিত্যবোধানন্দ

যৌক্তিক [illegible] দিক [illegible] ইনি ও [illegible]।"

স্বামী ভাষ্যানন্দ বললেন, "নিত্যবোধানন্দজী যা বললেন, আমি তার সঙ্গে একমত। আর আমাদের সব কথাই তো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা। ব্যক্তি [illegible] স্বাধীনতা ভারতেরও লক্ষ্য, পাশ্চাত্যেরও লক্ষ্য। তবে [illegible] করে সকলকে [illegible] আত্মিক স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, পাশ্চাত্য সামাজিক স্বাধীনতা। স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তাব : ভারতের ধর্ম নিয়ে সমাজকে ইয়োরোপের [illegible] পারে। [illegible] এই যে, পাশ্চাত্য সামাজিক ব্যাপারে যাই হোক না কেন, চিন্তার ক্ষেত্রে, ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে তো বটেই, [illegible] বেদান্তের বাণী এই [illegible] সহায়ক।"

"[illegible] না কেন"—বললেন নিত্যবোধানন্দজী, "পাশ্চাত্যের [illegible]

বিজ্ঞানীর কী দশা হয়েছিল। কী নিগ্রহ সইতে হয়েছিল একহার্টের মতো মরমীকে। অপর পথে, বিপ্লবী বুদ্ধকে কী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নিয়েছিল ভারতবর্ষ।"

কিন্তু অবস্থার কি কোন বদল ঘটেনি? —প্রশ্ন করলাম।

"ঘটেছে। কিন্তু খুব বড় রকমের নয়। আর তা ঘটেছে ভারতীয় ভাবধারার প্রভাবে। স্বামীজী এবং তাঁর অনুগামীদের প্রয়াসে। স্বামীজীর ভাষায় যে ভাবধারার বৈশিষ্ট্য তার শান্ত ভাব, তার নীরবত্ব। নিশির শিশিরের মতো যা লোকলোচনের অন্তরালে, অশ্রুত থেকে, ভোরের গোলাপগুলিকে ফুটিয়ে তোলে। তার কাজ তো শেষ হয় নি। এখন ক্যাথলিক চার্চ থেকেও আমরা আমন্ত্রণ পাই। কিছুকাল আগেও এটা ছিল অকল্পনীয়। সব মিলিয়ে —পশ্চিমকে চোখ খুলতে হয়েছে, বাহু প্রসারিত করতে হয়েছে,—কিন্তু হৃদয়? ঠিক বলতে পারব না।

"আর একটা কথা। পাশ্চাত্ত্যে গিয়ে আমরাও শিখি অনেক কিছু। কত তীর্থ আছে ইয়োরোপে। সন্তদের স্মৃতিবিজড়িত কত স্থান। খ্রীস্টীয় মরমীয়াবাদ অনুধ্যান ও অনুশীলনের সুন্দর সুযোগ পাওয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে বহু ধর্মপ্রাণ নরনারী ও ধর্মনেতাদের প্রীতি, সৌজন্য ও আতিথেয়তা পেয়েছি—তার মূল্যও কম নয়। স্বামীজী বেদান্তকে যেমন বিশ্বজনীন ধর্ম বলেছেন, তেমনই জোর দিয়েছেন পূর্ব-পশ্চিমের ভাববিনিময়ের উপর। তাঁর শিক্ষা প্রতি পদে স্মরণ করে চলি আমরা।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন। স্বামীজীর জীবন ও বাণীর এই দিকটি সম্পর্কে প্রসঙ্গত স্মর্তব্য শ্রীযুক্ত ক্রীসটোফার ঈশারউডের একটি গভীর মন্তব্য :

"What he (Swamiji) was working for was an exchange of values .... Indeed, one may claim that no Indian before Vivekananda had even made Americans and Englishmen accept him on such terms—not as a subservient ally, not as an avowed opponent, but as a sincere well-wisher and friend, equally ready to teach and to learn, to ask for and to offer help. Who else had stood as he stood, impartially between East and West, prizing the virtues and condemning the defects of both cultures? Who else could represent in his own person Young India of the Nineties in synthesis with Ancient India of the Vedas? Who else could stand forth as India's champion against poverty and oppression and yet sincerely praise American idealism and British singleness of purpose. Such was Vivekananda's greatness." What Religion Is: in the words of Swami Vivekananda, edited by John Yale, Phoenix House Ltd., London 1962, Introduction p xi and xix).

॥ দুই ॥

পরের প্রশ্নটি করলাম ভাব্যানন্দজীকে : মার্কিন চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি এদেশ থেকে গিয়ে আপনার সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়েছিল?

"তাদের আন্তরিকতা। নতুন কিছু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাদের চিরন্তন ঔৎসুক্য। তাদের ব্যবহারিক বুদ্ধি বা প্র্যাকটিক্যালিটি। আর তাদের যৌবনপূজা। বিশেষ করে শেষেরটা। নব্বই বছরের বৃদ্ধকেও ওরা 'বয়' বলে ডাকে।"

এ সবের সঙ্গে বেদান্তের প্রতি তাদের আকৃষ্ট হওয়ার অবকাশ কোথায়?

"বলি বুঝিয়ে। আমেরিকানদের সর্বতোমুখী ঔৎসুক্য যে তাদের বেদান্তের প্রতিও টানবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সেই ঔৎসুক্য অনেকের ক্ষেত্রে আগ্রহে, এমনকি শ্রদ্ধায় পরিণত হয় তাদের 'প্র্যাকটিক্যালিটি'-র জন্য। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রকৃত বিশ্রাম ওদেশে বিরাট একটা সমস্যা। কত কিছুর পিছনেই না ওরা ছোটে একটু বিশ্রাম পাওয়ার জন্য। বেদান্ত বলে, মনের সত্যকারের বিশ্রাম মেলে ধ্যানে। মনকে স্বস্থ করা, তার প্রকৃত স্ব-ভাবে স্থিত করাই তো ধ্যান। আর এটা তো বাস্তবিক ব্যাপার। ঠিক-ঠিক ভাবে করলে অল্প দিনেই এর সত্যতা বোঝা যায়। ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন আমেরিকান বলে, 'আমাদের দেখাও যে, ধ্যানে বিশ্রাম মেলে।' আমরা বলি, 'বেশ, এসো। যা বলি করো ঠিক-ঠিক।' হাতেনাতে প্রমাণ পায়। তারপর আর যায় কোথায়?

"এবার তৃতীয় দিক। ওদের যৌবন-প্রীতি। যার উল্টো পিঠ জরাভীতি। বয়সকে বেজায় ভয় ওদের। ওদেশে সবচেয়ে দুঃখী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। তারা যেন অপরাধীর মতো জীবনযাপন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া আছে ওদের মানসিকতায়। সেটা কখনও প্রচ্ছন্ন। কখনও প্রকট। আর মৃত্যু নামক তথ্যটি থেকে তো মুখ ফিরিয়ে থাকা চলে না সত্যিই। এই ভীতির প্রতিষেধক বেদান্ত। মানুষের আন্তর সত্য, তার প্রকৃত স্বরূপ, চিরযুবা চিরজীবী। 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—এ বাণীতে বিবাদগ্রস্ত পাশ্চাত্ত্যের মানব যে কী শান্তি ও শক্তি পায়, তা বুঝিয়ে বলা যাবে না।"

আমেরিকার বেদান্ত প্রচারের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বলবেন একটু?

"১৭৮৫ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে লণ্ডন থেকে গীতার একটি ইংরেজী তরজমা প্রকাশিত হয়। অনুবাদক ছিলেন স্যর্ চার্লস উইলকিনসন। ভূমিকা-লেখক, ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৮৩৩-এ সেই গ্রন্থের একটি কপি কারলাইল উপহার দেন এমারসনকে। এমারসন গভীরভাবে প্রভাবিত হন গীতার ভাবধারায়। বিখ্যাত 'ট্রানসেনডেন্টাল' আন্দোলনের সেই হল সূত্রপাত—যার মুখ্য প্রবক্তা স্মরণীয় ত্রয়ী, এমারসন-থরো-হুইটম্যান। এই সঙ্গে উল্লেখ্য ইউনিটেরিয়ান আন্দোলনের কথা। দুইয়েরেই পিছনে কাজ করেছে গীতার বিশ্বজনীন ভাবধারা।' আর বলতে হয় অজ্ঞেয়বাদী (অ্যাগনস্টিক্স)-দের কথা। তাঁরা তাঁদের সংশয় প্রচারের দ্বারা ওদেশে ধর্ম সম্পর্কে গতানুগতিক ভাবের বিরুদ্ধে চিন্তাশীল মহলের একাংশে একটা নতুন ভাবনা ও জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করেছিলেন। ওদেশে ধর্মীয় গোঁড়ামির অচলায়তনে উদারনৈতিক হাওয়া আমদানির ব্যাপারে তাঁদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এইভাবে যেন বেদান্ত প্রচারের জমি তৈরি হয়েছিল।

"১৮৯৩-এ সেই জমিতে বীজ বপন করলেন স্বামীজী। তিনি শোনালেন শুদ্ধ বেদান্তের বাণী। (লক্ষ্য করবেন, ওদেশে

স্বামীজীর বহু ভাষণ ইউনিটেরিয়ান চার্চে দেওয়া। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে আমাদের খুব প্রীতির সম্পর্ক আছে।) স্বামীজীর পর তাঁর পতাকাবাহী হয়ে কাজ করে এলেন তাঁর কয়েকজন গুরুভাই—স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।

"পরবর্তীকালে এ'দের উত্তরসাধক হয়ে গেলেন—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ (বেদান্ত সোসাইটি, সেন্ট লুই। এখন বয়স ৭৮। স্বামীজীকে দেখার অসীম সৌভাগ্য এ'র হয়েছিল।), স্বামী প্রভবানন্দ (দঃ কালিফোর্নিয়া, হলিউড), স্বামী নিখিলানন্দ (নিউ ইয়রক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেনটার), স্বামী অশোকানন্দ (উঃ কালিফোর্নিয়া, সানফ্রানসিসকো), স্বামী পবিত্রানন্দ (নিউ ইয়রক বেদান্ত সোসাইটি), স্বামী অশেষানন্দ (পোরটল্যানড), স্বামী বিবিদিষানন্দ (সিয়েটল, ওয়াশিংটন)। দক্ষিণ আমেরিকার আরজেনটিনায় বুয়েনাস এরিয়াস রামকৃষ্ণ আশ্রমে আছেন স্বামী বিজয়ানন্দ। ব্রাজিলেও একটি আশ্রম আছে। লাতিন আমেরিকায় কাজকর্ম চলে স্প্যানিশে।—এ'রা এখনও কাজ করছেন।

"আরও পরবর্তীদের মধ্যে আছেন—স্বামী সর্বগতানন্দ (বসটন ও প্রভিডেনস), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ (উঃ কালিফোর্নিয়া), স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী অসক্তানন্দ (হলিউড)।

"এছাড়া পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে কয়েকজন ওদেশীয় সাধু আছেন। যেমন —হলিউডে স্বামী কৃষ্ণানন্দ (জরজ ফিটস) ও স্বামী অনামানন্দ (কেনেট আর ফ্রিজফিলড), প্যারিসে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ (জন ইয়েল), সানফ্রানসিসকোতে স্বামী চিদরূপানন্দ (অ্যাল), লন্ডনে স্বামী পরহিতানন্দ (জন)।

"আরও আছে, নারীদের জন্য শ্রীসারদা মঠ, স্যানটা বারবারায়, এবং তাঁদেরই জন্য সানফ্রানসিসকোতে একটি কনভেনট।"

আপনি তো চিকাগোয় আছেন। সেখানকার কেন্দ্রের কথা কিছু বলুন—বললাম ভাষ্যানন্দজীকে।

"১৯৩০-এ স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ চিকাগোয় বেদান্ত সোসাইটির পত্তন করেন। পরে এর পরিচালক হন স্বামী বিশ্বানন্দ। ১৯৫৫তে সোসাইটির নিজস্ব ভবন স্থাপিত হয় ৪৪ ইস্ট এল্‌ম স্ট্রীটে। জুলাই ১৯৬৫ থেকে আমি এর ভারপ্রাপ্ত।

"এটি পুরোদস্তুর মঠ। ভোর পাঁচটায় ঠাকুরঘরে মঙ্গলারতি। পূজা, আরতি ইত্যাদির ভার তিনজন ব্রহ্মচারীর উপর। তাঁরা সকলেই আমেরিকান। মঙ্গলারতির পর সমবেতকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ—সংস্কৃতে। সকলেই সংস্কৃত শিখেছেন। তারপর আবৃত্তি হয় স্বামীজী-রচিত কবিতা সন্ন্যাসীর গীতি—মূলে ইংরেজীতে। অতঃপর সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ধ্যান। এরপর যে যার কাজে যান। সকাল আটটায় প্রাতরাশ। সকাল নটা থেকে দশটা এক ঘণ্টা নিয়মিত শাস্ত্রপাঠের ক্লাস। দুপুরে যথাবিধি ভোগ দেওয়া হয় ঠাকুরকে। সন্ধ্যায় আরতি। দিনের বাকি অংশ মঠের নানা কাজকর্মে কাটে।

"সপ্তাহে তিন দিন রাত্রি আটটায় ক্লাস। এটি হল সমিতির সদস্যদের জন্য। মঙ্গলবার শাস্ত্রের ক্লাস। ধ্যান দিয়ে শুরু। তারপর বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা। শাস্ত্র বলতে বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ী—গীতা, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র—শাংকরভাষ্য সমেত।

"বুধবার ধ্যানের ক্লাস। এটি খুব জনপ্রিয়। মেঝেতে আসন করে বসে প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ—সংস্কৃতে। পরে ইংরেজী অনুবাদে। তারপর পদ্ধতি অনুযায়ী ধ্যান। শেষে শান্তিপাঠ।

"শুক্রবার রামকৃষ্ণ-কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ—ইংরেজী অনুবাদে। গীতা-উপনিষদে যা তত্ত্ব তা বাস্তবে রূপায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনায়। এইদিকটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

"রবিবার বিশেষ অনুষ্ঠান। স্থান বিবেকানন্দ মন্দির। ঠিকানা ৫৪২৩ হাইড পারক বুলেভার্ড। অনুষ্ঠানসূচী আগেই সদস্যদের কাছে প্রেরিত ও প্রচারিত হয়। নিয়মিতভাবে একশ জন আসেন এতে। সকাল ১০-৪৫ মিনিটে শুরু হয় সেতার বা সরোদ। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, বিলায়েত হোসেন, রবিশংকর বা আলি আকবর খাঁর। কোন্ রাগ কোন্ দিন বাজানো হবে (বলা বাহুল্য রেকরডে) তা অনুষ্ঠানসূচীতে উল্লেখিত থাকে। কাঁটায় কাঁটায় ১১টায় উদ্বোধনী প্রার্থনা—সংস্কৃতে এবং ইংরেজী অনুবাদে। তারপর কোন একটি বিষয়ে ভাষণ। অনুষ্ঠানপত্রে সেই দিনকার ভাষণের মূল সুরটি তুলে ধরা হয় স্বামীজীর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে। ভাষণের পর আবার কোন বাজনা। বিসমিল্লা খাঁর সানাই অথবা বাঁশি। তারপর ঘোষণাদি। অতঃপর সমাপ্তি প্রার্থনা। সবশেষে সংগীত—শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীপংকজকুমার মল্লিক বা শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর।

"মাসে একদিন হয় রামনাম। বড়দিন, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি ইত্যাদি পালিত হয়।"

খরচপত্র চলে কীভাবে?

"রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানের শেষে নিয়মিত অর্থসংগ্রহ (কালেকশন) হয়। এটা ওদেশের প্রথা। এছাড়া আমাদের একটা 'প্লেজ ফান্ড' আছে। বছরের শেষে আমরা যখন আমাদের বন্ধু, অনুরাগী ও সদস্যদের বড়দিনের শুভেচ্ছা পাঠাই তখন আগামী বছর তাঁরা কে কীরকম সাহায্য দিতে পারবেন তা জানাতে অনুরোধ জানাই। চলতি বছরে তাঁরা কে কী দিয়েছেন তারও একটা হিসাব পাঠানো হয়। প্রত্যেকেই উত্তর দেন। ফলে আমরা বছরের প্রথমেই বুঝতে পারি কী পরিমাণ অর্থসাহায্য মিলবে। এছাড়া দানও মেলে মাঝে মাঝে। খরচপত্রের হিসাব রাখা হয় কড়াকড়ি। বাজেট হয়। চিকাগো কেন্দ্রের বাজেটের পরিমাণ বাৎসরিক তেত্রিশ হাজার ডলার।"

॥ তিন ॥

ইয়োরোপে বেদান্তপ্রচারের কাজের কথা আপনি বলুন আর একটু—বললাম নিত্যাবোধানন্দজীকে।

"আমেরিকার মতো ইয়োরোপেও বেদান্ত প্রচারের সূত্রপাত করে যান স্বামীজী স্বয়ং। পরবর্তীকালে খুব উল্লেখযোগ্য কাজ করেন স্বামী যতীশ্বরানন্দ। বিশেষ করে, জারমানী ও সুইজারল্যান্ডে। হেগ, প্যারিস এবং লনডনেও কাজ করেছিলেন তিনি। পাণ্ডিত্য এবং সাধুত্বের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, গুরুগতপ্রাণ যতীশ্বরানন্দজীকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন ঠাকুর। প্যারিসে কেন্দ্র সংগঠন করেন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ। এখন প্যারিস থেকে বাইশ মাইল দূরে গ্রেত্‌স-এ আমাদের কেন্দ্র নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। লনডনে আছে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র। হাইগেট টিউব স্টেশন থেকে কয়েক ফারলং দূরে, আলেকজানড্রা পারকের পশ্চিমে। ওখানকার কেন্দ্রের ভবনটিও আমাদের নিজস্ব। তবে জেনিভায় কাজ চালানো হয় ভাড়াবাড়িতে থেকেই।

"এদেশে আমরা পাশ্চাত্য বলতে ইয়োরোপ-আমেরিকাকে একসঙ্গে বুঝি কিন্তু দু জায়গার পটভূমির অনেক তফাত। তফাত কনটিনেনটের সঙ্গে ব্রিটেনেরও। আমাদের দিক থেকে পার্থক্যটা কী তার আভাস দিই একটু। আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলন থেমে থাকেনি কখনও। সেখানে স্থায়ী কেন্দ্র আছে দশটি। শাখাকেন্দ্র অনেক। পরিবেশ, তুলনামূলকভাবে, সেখানে অনুকূল। সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া সহজ। সবচেয়ে সুবিধে, ভাষার। ইংরেজীতেই কাজ চলে। বইপত্র আছে অনেক। দরকার হলে ছাপানো সহজ—এমন কি ব্যবসায়িক দিক দিয়েও। জানেন নিশ্চয়ই যে, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয় চমৎকার একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা 'বেদান্ত অ্যানড দি ওয়েস্‌ট' এবং লনডন থেকে 'বেদান্ত ফর ইসট অ্যানড ওয়েসট'।

"ইয়োরোপ প্রথমত নতুন কোন ভাবধারা গ্রহণের ব্যাপারে অতীব রক্ষণশীল। দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপের বৈষয়িক সমৃদ্ধি, আমাদের তুলনায় যাই হোক না কেন, আমেরিকার তুলনায় অনেক কম। ফলে, এসব কাজে সাহায্য মেলে অল্পই। তাছাড়া, ইয়োরোপের উপর দু-একটি মহাযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি, প্রতিক্রিয়ার কথাও ভুললে চলবে না। তৃতীয়ত, ফরাসী-জারমানে এসব বিষয়ের বইপত্র আছে খুব কম। এজাতীয় বইপত্রের ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা এখনও নেই।"

তবু কাজ চালানোর জন্যও কিছু বই ফরাসীতে নেই ?

"আছে বইকি। চারটি যোগের—রাজ, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—উপর স্বামীজীর বইগুলি, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী-চয়ন আর স্বামীজীর কিছু ভাষণ পুস্তিকাকারে বার করা হয়েছে। স্বামীজীর মাঝারি মাপের একটি জীবনী আছে। রোমাঁ রোলাঁর বই দুটি এখনও ভালো বিক্রি হয়, বিশেষ করে, তাঁর রামকৃষ্ণজীবনী।"

কী ধরনের লোক আসেন আপনাদের কাছে ?

"তিন ধরনের। একদল লোক আসেন নিছক কৌতূহলচালিত হয়ে। দ্বিতীয় একদল আসেন বৌদ্ধিক (ইনটেলেকচুয়াল) আগ্রহ নিয়ে। বলা বাহুল্য, এঁদের সকলকেই আমরা স্বাগত জানাই। তাঁদের প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে চেষ্টা করি। পরে এঁদের অনেকেই আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগ রেখে চলেন। প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর আছেন, তৃতীয় একটি দল। সংখ্যায় তাঁরা কম কিন্তু তাঁরাই আমাদের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। এঁরা আসেন অধ্যাত্মপিপাসা নিয়ে। এঁদের অধিকাংশকেই আমরা বলি যে, খ্রীস্টই তাঁদের ইষ্ট। তাঁরই জপ-ধ্যান, স্মরণ-মনন কীভাবে করা যায়, সে-বিষয়ে নির্দেশ গ্রহণ করেন তাঁরা। কেউ কেউ অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশেষভাবে বরণ করেন।"

সব মিলিয়ে তাঁদের সংখ্যা কত ?

"জেনিভাকে কেন্দ্র করে যে কাজ চলছে শুধু তাতেই আমাদের বন্ধু আছেন হাজার জন। এঁরা আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগ রেখে চলেন। এঁদের মধ্যে আড়াই শ জন বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।"

তাঁরা কি দীক্ষা নিয়েছেন ?

"হ্যাঁ।"

আপনার এখানকার কার্যক্রম কী রকম ?

"সকাল দশটা পর্যন্ত নিরিবিলিতে কাটাই—ধ্যানজপে। তারপর আসে কোন ছাত্র। সাহায্য করে চিঠিপত্র লেখা ও টাইপ করায়। বিকাল তিনটে থেকে চলে সাক্ষাৎকারের পালা। রাত্রি সাড়ে আটটায় শুরু হয় নির্বাচিত কয়েকজনকে নিয়ে ক্লাস। নিয়মিত যেতে হয় জেনিভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে।" (উনি নিজে বলেন নি কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৪-৬৫ সনের রিপোরটে আছে যে, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভারতীয় সভ্যতার 'মিথ' ও প্রতীক' সম্পর্কে উনি যে ধারাবাহিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা গুণীদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।) "এছাড়া আছে প্রচারের জন্য ঘুরে বেড়ানো। মাঝে মাঝে আগ্রহী-দের জন্য নির্জনে সাধনভজনের (স্পিরিচুয়াল রিট্রিট) ব্যবস্থা করা হয় সুইজারল্যান্ডের সেন্ট মরিৎস ও ফ্রান্সের নান্‌সিতে।"

রবিবাসরীয় কোন অনুষ্ঠান হয় না?

"না।"

"কেন ?"

"পাছে কেউ ভেবে বসে যে, আমরা আর একটা চার্চ করছি! বলছিলাম না যে, ইয়োরোপ আমেরিকায় অনেক তফাত।"

খরচপত্র ?

"আমি 'কালেকশন' করি না। হলেই বা ইয়োরোপ, একটা সাধুর খরচ কত আর? আমার ছাত্ররা যা দেয় তাতেই আমার চলে যায়। বাজার, রান্না টুকিটাকি কাজ সকালে একজন ঠিকে ব্যবস্থায় করে দিয়ে যান। সেজন্য ঘণ্টায় পাঁচ টাকা হিসাবে দিতে হয়। অতএব একবেলাতেই সেসব করিয়ে রাখি। বলতে পারেন, এসব কাজ নিজে করি না কেন? করতে পারি, কিন্তু সে সময়টা আরও দরকারী কাজ হবে না তাহলে।"

॥ চার ॥

আচ্ছা, বিদেশে তো আমরা বেদান্ত প্রচার করছি কিন্তু ভারতের সাধারণ মানুষ এর মহিমা কতটুকু বোঝে? এর প্রভাব কি আদৌ কাজ করছে জনচিত্তে? করলে কীভাবে ?

"বেদান্তের দর্শনের দিকটি সকলের জন্য নয়। সাধনার দিকটিও ইচ্ছুকদের
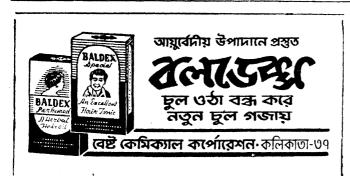
জন্য। কিন্তু এর তত্ত্ব সরলিত হয়ে জন-সাধারণের মধ্যে অজস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে পুরাণের মাধ্যমে। জনচিত্তকে তা সরস করেছে। সেখানে উপ্ত করেছে বিশ্বাসের, সহিষ্ণুতার, শান্তির বীজ। আর সেই বীজ ব্যর্থ হবার নয়। 'মিথ'-এর শক্তি অমোঘ। জনস্তাত্ত্বিক ইয়ুং খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, পশ্চিমী সভ্যতা মিথ হারিয়েছে। এ অভাব নিদারুণ অভাব। ভারতের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে—ঈশ্বরে, কৃপায় কর্মে। অতুলনীয় তাদের সহিষ্ণুতা। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা। খুব সহজ জিনিস নাকি এগুলো?"

মিথ কীভাবে কাজ করে? দৃষ্টান্ত দেবেন একটা?

"আপনাকে একটা ছোট ঘটনার কথা বলি। ইয়োরোপ থেকে এক পর্যটক এসেছিলেন ভারতদর্শনে। তিনিই আমাকে বলেছিলেন এটা। ইলোরায় কালীর একটি চিত্র দেখিয়ে টুরিস্টটি জিজ্ঞেস করলেন গাইডকে, 'এটা কী?' গাইড (বেচারী ইংরেজী বলতে পারে একটু-আধটু কিন্তু ধর্ম-দর্শনের ব্যাপারে তার জ্ঞানগম্যি খুব একটা থাকার কথা নয়) বোঝালো, 'উনি মা কালী।'

'কী করেন উনি?'

'উনি রক্ষা করেন আমাদের সকলকে। এই দেশকে। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব কিছু ওঁর ইচ্ছাতে হয়-যায়।'

'চীন যখন ভারত আক্রমণ করে তখন উনি কী করছিলেন শুনি?'

'কেন? প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে দিয়ে উনিই তো অস্ত্র পাঠালেন আমাদের। সাহেব, তুমি কি মনে কর যে, উনি এক-রূপে কাজ করেন? কতরূপে যে মা লীলা করেন কে তার ইয়ত্তা করবে? আর তুমি একটা আক্রমণের কথা বলছ, এ দেশের উপর কত উৎপাত হয়ে গেছে। জাতটা কিন্তু মরে নি। মা না বাঁচালে এমনটি কি হত? আসুরিক শক্তি যতই ভয় দেখাক, যতই চোখ ঝলসে দিক, পরিণামে তার ধ্বংস সে নিজেই ডেকে আনে। মায়ের আশ্রিতরা ঠিকই থাকে বেঁচেবর্তে'...'

"টুরিস্টটি পরে বলেছিলেন আমাকে, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ভারতের একটি সাধারণ মানুষের অটল ভগবৎ বিশ্বাস দেখে।' এই বিশ্বাস মিথ-এর দান।"

এই সূত্রে স্মরণীয় মিথ-এর ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে পশ্চিমী পাণ্ডিতদের অভিমত—

"......." ... the function of myth, briefly is to strengthen tradition and endow it with a greater value and prestige by tracing it back to a higher, better, more supernatural reality of ancient events." From myth spring the epic romance and tragedy. Myth, therefore, touches the deepest desires of man—his fears, his hopes, his passions, his sentiments as it validates the social order, justifies the existing social scheme and ranges from expressions of sheer artistry to legalism." (Encyclopaedia Britanica, Vol 16, p 55).

॥ পাঁচ ॥

ভবিষ্যতে পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের কাজ কীভাবে চালানো উচিত বলে আপনাদের মনে হয়?

নিত্যবোধানন্দজী বললেন, "ইয়োরোপে দরকার ধীরস্থির কাজ। ঢাক্ পিটানো হুজুগে নয় (ওদেশে খবরের কাগজে অবশ্য তারই কদর)। আর প্রচার বলতে শুধু বক্তৃতা নয়। ওরা চায়, সাধুদের উপস্থিতি। সাধুসঙ্গ। বৈদান্তিক অধ্যাত্ম-জীবনের দৃষ্টান্ত এবং সংস্পর্শ। সুতরাং, আমাদের চাই সাধনার দিকে সদাজাগ্রত চেতনা। চাই, ইয়োরোপের জন্য আরও কর্মী। সহজ কথায়, চাই জীবন। জীবন ছাড়া অন্য কিছু দিয়েই জীবনকে জাগানো যায় না।"

অশেষানন্দজীর বক্তব্য, "মোটামুটিভাবে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের কাজ চলছে ৭৫ বৎসর। ১৯৩০ পর্যন্ত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সেটি যেন প্রসারের যুগ। ১৯৩০ থেকে ১৯৬০ এই তিরিশ বছর সংহতির যুগ। ১৯৬১ থেকে সংহতি বজায় রেখে নতুন করে প্রসারের প্রয়াস চলেছে। আমাদের পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হতে হবে। আমরা হচ্ছিও তাই। সাড়া মিলছে চমৎকার।"

কর্মীর দরকার নেই?

"আছে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, আমেরিকায় কাজের জন্য তরুণ কর্মীদের দরকার বেশি।"

আচ্ছা, আমেরিকায় তো অনেকদিন কাটালেন। এখন বেদান্তের বাণীর কোন্ দিকটির প্রতি ভারতের জনসাধারণের অবহিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন আপনি?—জিজ্ঞেস করলাম অশেষা-নন্দজীকে।

"ভারতের প্রয়োজন—উদ্দেশ্যের সততা, উপায় সম্পর্কে আন্তরিকতা আর কঠোর শ্রম। আর, এসব কিছু দিয়ে জাতীয় জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে বেদান্তের দুটি দিক—অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স। অভ্যুদয় অর্থে জাগতিক উন্নতি। সর্ব-সাধারণের জন্য খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষা-সংস্থান। নিঃশ্রেয়স হল—মহত্তম কল্যাণের জন্য প্রস্তুতি।

"কালের যাত্রায় জাতীয় জীবনের যে রথ চলবে তা মজবুত হওয়া দরকার। বলিষ্ঠ হওয়া চাই রথের অশ্বগুলি। দৃঢ় হস্তে ধৃত হওয়া চাই লাগাম। রথীকে হতে হবে, জীবনসংগ্রামের বিগতসংশয় যোদ্ধা। আর ভুললে চলবে না। 'প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে' সারথিকে।

> আত্মানং রথিনং বিদ্ধি
> শরীরং রথমেব তু।
> বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি
> মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥'

আপনার প্রিয় চিত্রাভিনেতা ও তাঁর প্রিয়

বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা ধর্মেন্দ্র বাড়ীতে আরাম করবার সময় পাশে রাখেন তাঁর মারফি মডেল ৮১৬। এই বিশিষ্ট রেডিও মডেল ৮১৬ এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে রেডিও শোনার আনন্দ আরও অনেক বেশী পাবেন।

আপনার কাছাকাছি মারফির দোকানে আজই এই মডেলটি দেখে আসুন...মারফি ট্র্যানজিস্টরের নানা রকমারি দেখতে পাবেন বেছে নেবার জন্যে!

মডেল টিবি ৫৭৯ | মডেল টিবি ৫৮১ | মডেল টিবি ৮১৬ | মডেল টিবি

মারফি ট্র্যানজিস্টর

Murphy sets the standard

কোনো তরুণীর জন্যে প্রার্থনা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ক জায়গায় এসে
 আমরা সবাই কিন্তু দেখে ফেলতে পারি।
রু-লেন্স-চশমা-চোখে মেয়েটি এখন গেলো গাছের আড়ালে,
ার মুঠোর ওপর থেকে লাল পিঁপড়ে তাড়িয়ে দেবার ছলে
ুশ-শার্ট-পরা লোকটি কিছুটা ঝুঁকলো: এই দিকে
ক্ষার্থী গাড়ির পাল পা রাখতে না পেয়ে শুধু হর্ন দিচ্ছে—
ীত শেষ হ'য়ে এলো: এখন ক্যানাডা থেকে
ড়ে-আসা-পাখি ঘরে যাবে,
শুকে খাওয়াতে হবে জননীর, জননীকে
শু খেতে দেবে।
ই জায়গা থেকে, দ্যাখো, আমরা সবাই কিন্তু
 এই জায়গা থেকে আরো
 তিনটে অন্য দিক দেখে নিতে পারি,
নন্দ বেদনা ঝরে, আনন্দ বেদনা অভিরাম * * *
রু-লেন্স-চশমা-পরা মেয়েটিকে কেউ আজ দুঃখ দিয়ো না॥

রুমালের ভাঁজে

ভাস্কর দাশগুপ্ত

মৃত্যুকে যারা দেখে পরিচিত ঘুমের ভিতর
নিটোল মৃত্যুর স্বপ্ন, ফাঁকা ঘরে যারা
অশরীরী ছায়া দেখে নিহত ঈশ্বর
সভয়ে স্মরণে আনে বসায় পাহারা।

আর যারা প্রেম করে নিন্দুকের ভয়ে
প্রিয়ার নরম বুকে গোলাপ পরাতে,
হাতের আঙুল কাঁপে যদিও হৃদয়ে
গোপন ইচ্ছা জাগে আগুন ধরাতে।

হয়তো হৃদয় তার পলাশের বন,
অসীম সাগরে ভাসে বিজন জাহাজে;
ভালবাসা দিতে পারে রমণীর মন
প্রণয়-গন্ধবহ রুমালের ভাঁজে॥

বেদ আমাকে

সুখেন্দু মল্লিক

বেদ আমাকে এক ধরনের উপাসনায় ব্যস্ত রাখছে।
দেখিয়ে দিচ্ছে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ
 কোনখানে হাত রাখলে প্রণাম
[illegible] বেদীতে মুখ ছোঁয়ালে মায়ের পায়ে মায়ের পায়ে
[illegible] ডুব জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলার ইচ্ছে
[illegible] ঘর ছেড়ে যায়
[illegible] এক ধরনের উপাসনায় ব্যস্ত রাখছে।

দেখছি হাওয়ার সুড়সুড়িতে ছটফটে সেই গঙ্গাফড়িং
ঘাস থেকে যায় ফুলের মধ্যে
 [illegible] ঘাসের গলায়
হাত জড়িয়ে বুক [illegible] নিচ্ছে [illegible]
সূর্য ডোবায় [illegible] ছোট্ট পিঁপড়ে
কানের কাছে ভর্ৎসনা দেয়—একেবারে শূন্য ভাঁড়ার।
এক দানা চাল একটু চিনি [illegible] পাশে নামিয়ে রেখে
দৌড়ে পালায়। এমনি আমার জীবন [illegible]।
সেলাই-ছেঁড়া বই-এর পাতা ঝড়ের [illegible] উড়ন্ত থাকে
কেউ দু হাতে কুড়িয়ে নিচ্ছে। দেখতে গিয়ে দেখছি তমাল
তালবনে কি সজোর বৃষ্টি—সে কি আমার চোখের ভেতর
অথবা দু চোখের বাইরে: যেমন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
ছটফটে সেই গঙ্গাফড়িং ঘাস [illegible] মধ্যে
ফুল থেকে ফের ঘাসের গলায় হাত জড়িয়ে [illegible] জড়িয়ে
যেমন হাতে ছোট্ট পিঁপড়ে
এক জীবনের খাবার ফেলে দৌড়ে পালায়:
বেদ আমাকে এক ধরনের ভালোবাসায় ব্যস্ত রাখছে।

ভগ্ন সিনেট হাউসের দৃশ্য : নীচের পুষ্করিণীটি চিনির ব্যবসায়ীরা খনন করেছিলেন

বম্বের বসায়ী-র ফোর্ট

শিশির রায়চৌধুরী

আ[illegible] পর্তুগীজ [illegible] ইংরেজেরা [illegible] [illegible]।

[illegible] মাত্র তিন মাইল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস আর প্রাচীন [illegible] স্থাপত্যের নিদর্শন আকৃষ্ট করে রাখবে আপনার মনকে। স্টেশন থেকে বাসে, মোটরে বা টাঙ্গায় এসে শহরে পৌঁছলে [illegible] যদি বড় ক্যামেরা [illegible] থাকে ও সঙ্গীদের চেহারায় যদি সিনেমা জগতের বৈশিষ্ট্য থাকে তবে হয়ত রকবাজ ছেলেরা স্থানীয় উচ্চারণে জিজ্ঞেস করবে "কাঁহা সাব, শুটিংকে লিয়ে বা রাহ হ্যায়?" আর এ না হলে বুঝে নেবে আপনি বাড়ি থেকে তৈরি করা খাবার নিয়ে পিকনিক করতে যাচ্ছেন।

রাজশক্তির উত্থানপতনে বসায়ী-এর এক উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। পারিবারিক ষড়যন্ত্র ও গৃহযুদ্ধে জর্জরিত বাজীরাও পুণা থেকে এখানেই পালিয়ে এসে ইংরেজের সাহায্য ভিক্ষা করেন। হোলকার কর্তৃক পরাজিত বাজীরাও ১৮০২ সালে সই করলেন বিখ্যাত ট্রিটি অব বেসিনে। ফলে তৎকালীন ভারতে [illegible] ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা শক্তি ইংরেজ পক্ষপুটে চলে আসে।

কিন্তু বসায়ী দুর্গের ইতিহাস আরো তিন শ বছর পূর্বেকার। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ ১৫৩৪ সালে দুর্গটিকে [illegible] পর্তুগীজদের হাতে তুলে দেন। অবশ্য এক বছর আগেই পর্তুগীজ গভর্নর নুনো দা কুনা প্রাচীন মুসলিম ঢং-এ তৈরি দুর্গটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এবার মালিকানা হাতে পেয়ে কুনা নির্বিবাদে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে তুললেন তাদের উত্তর কোংকনের ঘাটি বা প্রাচীন কারিন্থিয়ান স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। দুর্গ প্রাচীরের চার ধারেও নগর গড়ে উঠলো: ধনীর প্রাসাদ, সরকারী দপ্তরখানা, গুদাম, ও খৃষ্টীয় মঠ তো বটেই। ক্রমে দুর্গ হয়ে দাঁড়াল উত্তর কোংকনের আটটি অঞ্চলের প্রধান শাসন কেন্দ্র।

অবশ্য এ গৌরব বেশী দিন স্থায়ী হল না। কারণ স্থানীয় শাসকদের অযোগ্যতা, বিলাসিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পেন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সময় চরমে ওঠে। ক্রমে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় হল। কয়েক মাস ব্যাপী অবরোধের পর ১৭৩৯ সালের ১৬ই মে পর্তুগীজরা মারাঠা শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। মারাঠাদের হাতে বসায়ী দুর্গের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। পর্তুগীজদের আত্মসমর্পণের পরে জীবিতরা তাদের পরিজনদের নিয়ে অনেকেই পর্তুগালে চলে যায়। আর কেউ কেউ তাদের ইন্দো-পর্তুগীজ বংশোদ্ভবদের সঙ্গে গোয়া ও বম্বে বসবাসের জন্যে চলে যায়। মারাঠারা এ দুর্গ ব্যবহার করেনি—তবে একটা শিবমন্দির স্থাপন করেছে এইমাত্র।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হবার পর ১৮৩০ সালে ইংরাজ বণিক লিংগার্ড সাহেব দুর্গটা ইজারা নিয়ে চিনির ব্যবসা শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে ঐ ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়।
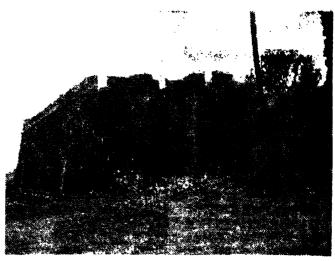
পোর্টু দ্য মার বা সী গেট : এখানে পর্তুগীজরা ভারতীয় জাহাজীদের নিকট থেকে শুল্ক আদায় করত। সমুদ্রে জোয়ার এলে এখানে জল আসে

ঘটনাসম্মুখ চার্চ অব দি হোলি নেম অব জেজাস-এর সম্মুখভাগ

আবার ১৮৬০ সালে মেজর লিটলউড নামক আরেক ইংরেজ চিনির কারবার শুরু করলেন, আর সংগে সংগে চাষাবাদও। ফলে দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। ১৯০৪ সালে প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণের আইন প্রবর্তিত হলে দুর্গটিকে সংরক্ষিত স্থান বলে ঘোষণা করা হয়। তথাপি ১৯০৬ সালে রবার চাষ শুরু হয়। অবশ্য তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে দুর্গ প্রাচীন পর্তুগীজ স্থাপত্যের কীর্তি হিসাবেই থেকে যায়।

এই দশভুজাকৃতি দুর্গের পরিসীমা প্রায় ৪ মাইল। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে দেওয়াল নির্মাণ শুরু হয় এবং তা শেষ হতে দশ বৎসর লেগে যায়। কঠিন প্রস্তরের দেওয়ালের কোণে রয়েছে দশটি গম্বুজ। এক-একটা গম্বুজের ওপর ৯টা করে কামান ও ৭০টা করে মর্টার বসাবার ব্যবস্থা। দেওয়ালগুলি ৩৫ ফিট করে উঁচু কিন্তু ৫ ফিটের চেয়ে বেশী পুরু নয়। কিন্তু স্থলের দিক থেকে ৪৫ ফিট পুরু। এর কারণ ভারতীয় শত্রুরা স্থলের দিক থেকেই দুর্গকে আক্রমণ করবে এহেন ধারণা তাদের ছিল।

দুর্গের প্রধান গেট দুটি দেখবার মত। মাণ্ডবী বন্দর (মারাঠী ভাষায় মাণ্ডবী শব্দের অর্থ কাস্টমহৌস) থেকে পোর্তু দ্যু মার অর্থাৎ সী গেট অতি নিকট। এখানেই পর্তুগীজরা প্রথম কাস্টম হাউস তৈরি করে বাহাদুর শাহের সংগে চুক্তি অনুযায়ী গুজরাত থেকে লোহিত সাগরগামী জাহাজসমূহের এখানে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হত। আবার সফরান্তে এখানে এসে পর্তুগীজদের প্রাপ্য শুল্ক মিটিয়ে দিতে হত। গেটটি এখনও অক্ষত, সমুদ্রে জোয়ার এলে এর সিঁড়িতে জল এসে যায়। কিন্তু পোর্তু দা ত্যাররা অর্থাৎ স্থলের গেটটি একেবারে পশ্চিম প্রান্তে, বেশ মজবুত কীলক দিয়ে তৈরি, দেখতে অনেকটা উত্তর ভারতের মুঘলদের তৈরি দুর্গের গেটের মত। স্থানীয় লোকেরা বলে মত্ত হাতীর উৎপাত থেকে রক্ষার জন্যই নাকি এ গেট অত মজবুত করে তৈরি হয়েছিল।

গেট দুটোকে বাদ দিলে আরো প্রায় ডজন দুয়েক পর্তুগীজ স্থাপত্যের নিদর্শন খুঁজে বার করা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ডিজাইনের গির্জা, বাজার, বিচারালয়, ক্যামারা (মিউনিসিপ্যালিটি ভবন) কারাগার, প্রাসা (পার্ক), রিকুলিমেন্তু দা দোঁজেলাস অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত কুমারীদের জন্য আশ্রম-স্থল, কুষ্ঠী বাড়ি ও মিজারিকরডিয়া (দাতব্য) হাসপাতাল। অবশ্য পর্তুগীজদের ছেড়ে যাওয়ার পরে কর্তৃপক্ষ একটিমাত্র হনুমান মন্দির সংযোজন করেছেন। তা ছাড়া চিনির ব্যবসায়ীরা তাদের প্রয়োজনে ইংরেজী এস অক্ষরের মত ছোট একটি পুষ্করিণী খনন

আরব সাগরের কূল থেকে দুর্গের একাংশের দৃশ্য

করেছেন। আর জেজুইত্ পাদ্রীরা স্থাপন করেছেন ছোট একটি দুগ্ধ কলোনি সমেত হাসপাতাল প্রতিপালন কেন্দ্র।

প্রাচীন ঐতিহ্যের ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে গির্জার সংখ্যাই অধিক। এদের মধ্যে মার্তির্জ অব সেণ্ট জোসেফ সী গেটের অতি নিকটে। ১৫৪৬ সালে একটি মসজিদকে ধ্বংস করে এ গির্জাটি তৈরি। বাহাদুর শাহের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে পর্তুগীজদের ওপর মসজিদের অবমাননা নিষিদ্ধ ছিল এবং ৩০০০ পারদাউ (পর্তুগীজ প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয়ে তাদের মসজিদ রক্ষা করতে হত। গোয়া থেকে তথাকথিত মহান পর্তুগীজ সন্তানের কঙ্কাল আনিয়ে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে। তারপরে দেখুন নোসা সেনহোরা দা ভিদা অর্থাৎ যীশু মাতার স্মৃতিতে তৈরি গির্জা। কারুময় কঠিন কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে এটি তৈরি। তৎকালে পর্তুগীজ রমণীরা প্রকাশ্যে আসতেন না বলে তাঁদের

ঐতিহাসিক সেণ্ট এন্থনি গির্জার সম্মুখভাগ : মারাঠা আক্রমণে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে এখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে পর্তুগীজরা আত্মসমর্পণ করে

জন্য একটি গোপন দরজা রয়েছে এতে। কিন্তু দুর্গের পশ্চিমাংশে হোলি নেম অব জিজাস গির্জার স্থাপত্য সৌন্দর্যের তুলনা আভাবরণ। এর বক্রাকারে খিলান সম্মুখ দিক করিন্থিয়ান স্থাপত্যকলার আদর্শে তৈরি। এতে ব্যবহৃত স্তম্ভগুলি অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য সমন্বিত এবং কতকগুলি দেখতে বীণার মত। গির্জাটি দেখতে যেমন মনো-

দি ক্যামেরা বা মিউনিসিপ্যাল হাউস : এর নকশা ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারে এখনও দেখতে পাওয়া যায়

মনুগ্ধকর তেমনি এর নির্মাণ সম্পর্কিত ঘটনাগুলিও কৌতুহলোদ্দীপক। প্রথমে এখানে ছোট একটি গির্জা ছিল। জেজুইত পাদ্রীরা দেখলেন এতে তাঁদের ইজ্জত বাড়ছে না। সুতরাং ভেঙ্গে ফেলা হল এটিকে। এর পরে দুজন ধর্মপ্রাণা মহিলা এগিয়ে এলেন তাঁদের জোতজমা সব বিক্রি করে। অক্লান্ত চেষ্টায় ১৫৬৫ সালে সুন্দর একটি গির্জা তৈরি হল। জেজুইত পাদ্রীরা এর নামাংকিত করলেন "চার্চ অব দি হলি নেম অব জেজাস।" আর ম্যারীর মূর্তিটিকে বেদী থেকে সরিয়ে দিলেন।

এই গির্জার সঙ্গে আরো একটি মজার ঘটনা জড়িত রয়েছে। তা হল অ্যারিক দ্য কুন্যার কাহিনী। অ্যারিকের আসল নাম ছিল পরশুরাম যোশী। ইনি ছিলেন এ অঞ্চলের সেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জ্যোতিষী। পর্তুগীজরা এঁকে বলতেন প্রকিউর্মিচ বা পরকাম জোচী। এঁর ধর্মান্তকরণের অনুষ্ঠান হয় এই গির্জার মণ্ডপে। পর্তুগীজ গভর্নর ও তাদের প্রধান পুরোহিত সমেত প্রধান ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। আর এঁর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ নিয়ে পর্তুগালে হইচই পড়ে গিয়েছিল। পাদ্রী-সমাজ একে বিরাট এক কৃতিত্ব মনে করেছিলেন। সেণ্ট গোঁসালো গরসিয়া নামক এক ব্যক্তির সঙ্গেও এ গির্জার সম্পর্ক রয়েছে। এঁর পিতা পর্তুগীজ আর মাতা কানাড়া জাতীয়া ছিলেন। ইনি স্পেন দূতাবাসের সহযোগে ১৫৯৭ সালে জাপানে গিয়ে নিহত হয়ে শহীদ হন। এঁর স্মৃতিতে এখনও প্রতি বৎসর ঠিক বড়দিনের পরবর্তী রবিবারে এক বিশেষ প্রার্থনা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য গির্জা হল সেণ্ট এন্থনির ফ্যানসিসক্যান গির্জা। কেননা মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এখানেই বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের চুক্তিতে সই করে পর্তুগীজরা এ অঞ্চলের দু' শো বছরের কায়েমী অধিকার ছেড়ে চলে যায়।

বসাইনী ফোর্ট প্রধানত গির্জার স্থাপত্য হলেও আরো কিছু কিছু অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এতে পরিলক্ষিত হয়। এমন কি স্নানাগারও রয়েছে এতে। এটি পাকা গাঁথুনির স্নানাগার বেশ উঁচুতে তৈরি, বাইরে থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভেতরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। দেওয়ালগুলি ঝিনুক আর সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি। আর স্বচ্ছ পাথরে তৈরি। আরেকটি স্নানাগার পর্তুগীজদের বিলাসপ্রিয়তার নিদর্শন স্বরূপ এখনও আছে। এই স্নানাগারে মস্তকে ফুলের সাজি নিয়ে দণ্ডায়মান দুই জলকন্যার অঙ্গ থেকে জল সরবরাহ হত স্নানাগারে।

চার শ' বছরের প্রাচীন এই পর্তুগীজ শহর আজ নীরব। ভগ্ন অট্টালিকাগুলি যেন নির্জনতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। বড় বড় জানালাগুলি হাঁ করে আছে। আগাছা কিংবা বিরাট গাছ কোথাও বা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছে। শ্বেতকায় ফিদাগোদের (ফিদাগো মানে নোবল, অভিজাত) কংকালের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে উদ্ধত চৌকিদার, আর ট্রানজিস্টার হাতে নিয়ে দুয়েকজন যুবক-যুবতী। দিনে গরুও চরে আর রাত্রে শিয়াল পেঁচা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু দেয়ালের বাইরে দক্ষিণে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে রয়েছে মৎস্যজীবিদের একটি সদা জাগ্রত গ্রাম। বৈদ্যুতিক আলো, রেডিওর কলকাকলী, দেশী মদ ও শুকনো মাছের গন্ধে আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এখানে। কিন্তু পর্তুগীজ জলদস্যুকৃত ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের মাঝখানে তা আপনাকে মোটেই স্পর্শ করবে না।
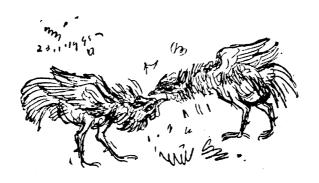
লক্ষ মানিক জ্বলে

শিশিরকুমার চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যকের ধন'ই প্রথম সার্থক অ্যাডভেঞ্চারমূলক কিশোর উপন্যাস, একথা অবিসংবাদিত সত্য, 'যকের ধন'এর প্রথম অবিসংবাদিত সত্য। 'যকের ধন'-এর প্রথম আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস প্লাবিত বর্তমান শিশু সাহিত্যের পাঠকপাঠিকারা তা কল্পনাও করতে পারবে না।

'বিমল' ও 'কুমারের' সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃসাহসিক অভিযানের কল্পরাজ্যে পা বাড়ায়নি এমন বালক সেদিন ছিল নিতান্তই বিরল। বিশেষত আমরা যারা আসামের রাজধানী, খাসিয়া পাহাড়ের শিলং শহরে বাল্যকাল অতিবাহিত করেছি, 'বিমল', 'কুমার' ও 'রামহরির'র 'যকের ধন' উদ্ধারের অভিযানে তারা বিশেষ রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। কারণ এই খাসিয়া পাহাড়ের রূপনাথ গুহাই ছিল 'যকের ধন' রহস্যের খাসমহল। আমরা জানতাম 'রূপনাথের গুহা', উপন্যাসের প্রয়োজনে সৃষ্ট কোন কাল্পনিক পর্বত-কন্দর নয়, প্রকৃতই এর অস্তিত্ব রয়েছে শিলং থেকে মাত্র বত্রিশ মাইল দূরে পৃথিবীর সিক্ততম স্থান চেরাপুঞ্জির সন্নিকটে।

অন্তহীন এই গুহাকে কেন্দ্র করে সে অঞ্চলে অসংখ্য কিম্বদন্তীর প্রচলন ছিল। এমন কি এর একটি শাখা সুদূর তিব্বত বা চীনদেশ পর্যন্ত প্রসারিত এমন কথা গল্প করে বলবার মত লোকেরও অভাব ছিল না।

অ্যাডভেঞ্চারের এরূপ একটি উৎসের সান্নিধ্য, আমাদের কয়েকজন কল্পনাবিলাসী 'ডানপিটে' বন্ধুর মনকে এতটা প্রভাবান্বিত করেছিল যে, বহুদিন পর্যন্ত যে কোন অবকাশে 'রূপনাথ' অভিযানের সার্থক পরিকল্পনা রচনায় আমরা মশগুল হয়ে পড়তাম।

কিন্তু হায় সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সেদিন ছিল দুস্তর ব্যবধান।

পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রথম সুযোগ এল নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষান্তে দীর্ঘ অবসর কালে। পূর্বোক্ত 'ডানপিটে' এক সহপাঠীর অভিভাবক নীলামের মাধ্যমে একটি হুড-জলুস ফোর্ড গাড়ির মালিক হয়েছেন এবং সেটি এক খাসিয়া ড্রাইভারের তত্ত্বাবধানে রেখে দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসী হয়েছেন।

এমন সুযোগ হেলায় হারাবার নয়। অচিরেই আমাদের তৎপরতায় গাড়ির ওপর বন্ধুবরের অবিসংবাদী মালিকানা স্বত্ব মেনে নিয়ে ড্রাইভারও হলো আমাদের 'রূপনাথ' অভিযানের এক সক্রিয় সাহায্যকারী। উৎসাহ দ্বিগুণিত হলো যখন জানতে পারলাম যে, চেরাপুঞ্জির গ্রাম থেকে এমন একজন পথ-প্রদর্শকের সাহায্য আমরা পেতে পারি, যার ওই গুহার বহু হদিসই জানা আছে।

অভিভাবকদের অনুমতি পাবার লেশমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। অতএব নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা আমরা চার বন্ধু মিলে বেরিয়ে পড়লাম, চেরাপুঞ্জি বেড়াবার নাম করে। কিছু দড়িদড়া, কয়েকটা ধারাল ছুরি কাটারি, গোটা চারেক শক্তিশালী টর্চ এবং যথেষ্ট খাবার-দাবার সঙ্গে নেওয়া হলো। মাত্র বত্রিশ মাইল রাস্তা—চেরাপুঞ্জি পৌঁছতে দেরি হলো না।

গাইডের খোঁজ করে এসে ড্রাইভার জানালো তাকে পাওয়া যাবে চেরাপুঞ্জি থেকে কিছুদূরে মুসমাই বলে একটি গ্রামে এবং ঐ গ্রামের পাশ দিয়েই গুহায় যাবার পায়ে চলা রাস্তা।

মুসমাই পৌঁছে সহজেই গাইডকে খুঁজে পাওয়া গেল। ওরই কাছ থেকে জানতে পারলাম যদিচ এই গুহাকেই অনেকে রূপনাথের গুহা বলে, তবু এর আসল নাম 'মুসমাই গুহা'। এখান থেকে দূরত্ব মাত্র দেড় মাইল এবং পথও কিছু অগম্য নয়। কিন্তু গুহার কতটা ভেতরে যেতে পারবো তা নির্ভর করছে আমাদের সাহস ও মনোবলের ওপর। যাই হোক, দক্ষিণার পরিমাণ স্থির করে গাইডের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তারই পরামর্শে কয়েকটি বাঁশের মশালও আমাদের সংগৃহীত স্বল্প উপকরণের সঙ্গে যুক্ত হলো।

গভীর পাহাড়ী অরণ্যের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে অবশেষে আমরা এসে পৌঁছলাম, গুহামুখের সামনে। প্রথম দর্শনেই বুঝলাম, ড্রইং রুমে বসে কল্পনা বিলাস এক, আর প্রকৃত অ্যাডভেঞ্চারের মুখোমুখি হওয়া আর এক। পাহাড়ে মানুষ হয়েছি, অতএব দুর্গম পাহাড়ী পরিবেশে অভ্যস্ত। কিন্তু দিন দুপুরে গুহামুখের কয়েক গজ ভেতরেই সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার দেখে বুক কেঁপে উঠলো। কোন অজানা বিপদ ঐ অন্তহীন বিবরে লুকিয়ে আছে, কে বলতে পারে? দুজন বন্ধু তো শুরুতেই রণে ভঙ্গ দিলেন। তাঁরা ভেতরে যাবেন না। ড্রাইভারও অনায়াসে ওদের দলে ভিড়ে গেল। বুঝতে পারলাম, কেন গাইড বলেছিল, কতটা যেতে পারবো, সেটা নির্ভর করছে আমাদের সাহস ও মনোবলের উপর।

কিন্তু ভীরু অপবাদ নিয়ে ফিরে যেতে অন্তত আমরা দুজন প্রস্তুত ছিলাম না। অতএব মশাল জ্বালা হলো। ইষ্ট নাম জপ করে মশাল হাতে দুই বন্ধু গাইডের অনুগামী হলাম।

গজ দশ বারো ভেতরে যেতেই গুহার রাস্তা বাঁক নিলো, সঙ্গে সঙ্গে যেন মুছে গেল পৃথিবীর সব আলো বাতাস। ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ছে বড় বড় ফোঁটায়, প্রায় বৃষ্টির ধারার মত। পায়ের তলায় বন্ধুর পাথুরে পথ বিপজ্জনকভাবে পেছল। গুহার পরিসর একজন পূর্ণ বয়স্কের কষ্টে চলার মত। আর এগিয়ে যাওয়া নিতান্তই গোঁয়ার্তুমি হবে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। প্রতি পদক্ষেপে সাবধানতার প্রয়োজন, একবার পদস্খলন হলে মারাত্মক আঘাত অনিবার্য। মসৃণ বরফের ওপর দিয়ে চলতে হলে, বিশেষ ধরনের পাদুকা ও গাঁইতি অপরিহার্য। কিন্তু এখানে পতন রোধ করব কি দিয়ে? এমন সময় নজরে পড়ল চারিপাশের দেওয়াল মশালের ধোঁয়ায় মসীবর্ণ। বোঝা গেল মশালধারীদের এই পথে আনাগোনা সদাসর্বদা না হলেও আকস্মিক নয়। স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়া লোক যেমন খড়কুটো ধরেও বাঁচবার চেষ্টা করে, এই আবিষ্কারের আনন্দকে আমরা সেই কাজেই লাগাতে চেষ্টা করলাম।

আরো কিছুটা পথ চলার পর গুহা এতটা সরু হয়ে পড়লো যে, সোজা হয়ে চলাই দুষ্কর। কিন্তু দেওয়াল তখনো মসীলিপ্ত, তাছাড়া এই অভিযান সার্থক বলে মনে হতে পারে এমন কিছু আমরা এখনো দেখিনি।

তাই কতকটা মরিয়া হয়েই এগিয়েই চললাম আর ঝুঁকি নেবার পুরস্কার পেলাম আশাতীতরূপে, প্রায় হাতে হাতেই। গলিপথ সহসা রূপ নিল একটি প্রশস্ত কক্ষের, আর মুহূর্তেই রূপান্তর ঘটল সমগ্র পরিবেশের। কোন মায়াবীর যাদুদণ্ডের স্পর্শে আমাদের চারপাশের দেওয়ালে দেওয়ালে যেন জ্বলে উঠলো লক্ষ দীপের দেওয়ালি।

দেখতে পেলাম কক্ষের দেওয়াল বেয়ে নেমে এসেছে অসংখ্য শ্বেতাভ প্রস্তরের নিশ্চল ধারা। সেই চিরস্তব্ধ শীলাস্রোতের তরঙ্গ ভঙ্গে কত উত্থান-পতন, কত বিচিত্র গঠন, কত বর্ণাঢ্য দ্যুতি। অপ্রত্যাশিত সব

কিছুর জন্য মনে মনে প্রস্তুত থাকলেও এই অকল্পনীয় দৃশ্য দুইটি কিশোর হৃদয়কে সম্পূর্ণ অভিভূত করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। বহুদিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম আমরা প্রবেশ করেছিলাম একটি স্ট্যালেগমাইট গুহার অভ্যন্তরে এবং মশালের আলো ঐ জমাট পাথরের সহস্র সহস্র পিচ্ছিল অসম গাত্রে প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টি করেছিল এই অপূর্ব মায়ালোকের। মোগল প্রাসাদের শিষমহলগুলি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন, এই রহস্যের তাৎপর্য।

আরো একটু এগুতেই দেখা গেল, হিম-শীতল একটি স্রোতস্বিনী গুহাপথের আড়াআড়ি বয়ে চলেছে। গাইড জানাল, পায়ে হেঁটেই এটি পেরিয়ে যাওয়া চলে এবং তারপর আরো ভাল দৃশ্য আমরা দেখতে পাবো। কিন্তু ওপাশের জমাট অন্ধকার, দম আটকানো ভ্যাপসা গুমোট আবহাওয়া আর অজানা হিমশীতল স্রোতস্বিনী, এই ত্রাহস্পর্শ আমাদের উৎসাহ স্তিমিত করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। অতএব নিতান্তই ক্ষুণ্নমনে ফিরে চললাম। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলাম, কোন একদিন এই গুহার রহস্য উন্মোচন করবোই। বাইরে এসে বুঝতে পারলাম, বেশ কিছুটা সময় আমরা গুহার ভেতরে ছিলাম এবং সঙ্গীরা নিরাপত্তার কথা ভেবে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন।

এরপর শিলং ফিরে আসার ইতিহাস বৈচিত্র্যহীন। তবে চেরাপুঞ্জির সদা-পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার আকাশ ভেঙ্গে যে বৃষ্টিধারা সেদিন নেমেছিল, তা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, পৃথিবীর সবচেয়ে সিক্তস্থান বলে এর প্রসিদ্ধি কেন।

স্টালেকটাইট ও স্টালেগমাইট গুহা আমাদের দেশে বিরল হলেও পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে এগুলির সংখ্যা কম নয়। কয়েক বছর আগে শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'দেশ'-র পৃষ্ঠাতেই পূর্ব ইউরোপের এইরূপ একটি গুহার বর্ণনা দিয়েছিলেন। অ্যালাবামার (যুক্তরাষ্ট্র) একটি স্টালেগমাইট গুহার সুন্দর বর্ণনা আমরা পাই মার্ক টোয়াইনের 'অ্যাডভেঞ্চারস অব টম সয়্যার' বইটিতে। টম ও বেকী (দুটি বালক, বালিকা) চড়ুইভাতি করতে গিয়ে ঐ রকম একটি গুহার ভেতরে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তারপর তারা—'মোমবাতি উঁচু করে ধরে বন্ধুর গুহাপথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল...একটু পরেই তারা শৈলস্তবকের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া একটি ক্ষুদ্র জলধারার কাছে এসে দাঁড়াল। এই ধারাই বয়ে নিয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে সামান্য চুনপাথরের পলি, যা জমে জমে গড়ে উঠেছে, স্তব্ধ তরঙ্গ ভঙ্গে বিক্ষিপ্ত অবিনশ্বর অত্যুজ্জ্বল পাথরের এক নায়েগ্রা প্রপাত...এক প্রশস্ত জায়গায় তারা দেখতে পেলো ছাদ থেকে নেমে এসেছে অসংখ্য উজ্জ্বল স্টালেকটাইটস...তারা আরো দেখলো, দেওয়ালের সারি দাঁড়িয়ে আছে অকল্পনীয় গঠনের অনেকগুলি স্তম্ভের সাহায্যে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিরামহীন জল-বিন্দুর পতনের ফলে গড়ে ওঠা স্টালেকটাইটস ও স্টালেগমাইটসগুলির সংযুক্তির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এই স্তম্ভ-গুলি।'

ঐ রাজ্যেরই আর একটি গুহার বর্ণনা দিয়ে দু'জন আবিষ্কারক লিখেছেন—"বিচিত্র গঠনের স্টালেগমাইটসের অরণ্য। দীপালোকে হীরামাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বর্ণাভ রক্তিম। যুগযুগান্ত ধরে বিরাম-হীন জলবিন্দুর পতনের ফলে গড়ে ওঠা শ্মশ্রুমণ্ডিত চিরস্থির ঊর্ধ্ব বাহু দৈত্যকুল। উচ্চ মন্দিরের ছায়াতলে আলোর আবির্ভাবে বিস্মিত, প্রস্তরীভূত দেবদূত ও শয়তান। শিলীভূত অপ্সরা ও ভূতপ্রেতের দল...... সূক্ষ্ম কারুকার্যময় লেস ও ক্ষুদ্র পুষ্প... জমাট উজ্জ্বল পাথরের প্রকাণ্ড জলপ্রপাত।'

কি করে এ ধরনের গুহার উৎপত্তি হয় উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে তার ইঙ্গিত রয়েছে। সাধারণত চুনাপাথরের আকরের সন্নিকটেই এরূপ গুহার অবস্থিতি সম্ভব-পর। খনিজ পদার্থগুলির মধ্যে চুনাপাথর অপেক্ষাকৃত নরম। সেজন্য ভূপৃষ্ঠের নীচের জল যখন ওই আকরের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোটা ফোটা হয়ে গুহার ভেতরে গড়িয়ে পড়ে, তখন তার সঙ্গে অতি সামান্য পরিমাণ চুনাপাথরের গুঁড়োও বহন করে নিয়ে যায়। জল গড়িয়ে চলে যায়, কিন্তু পাথরের গুঁড়ো কিছুটা পতন ক্ষেত্রেই পড়ে থাকে। এইরূপে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঐ পলি জমে জমে গড়ে ওঠে রকমারি স্তূপ। গুহার ছাদে, দেওয়ালে এবং পাদদেশের সর্বত্রই এরূপ স্তূপ থাকতে পারে। আকরের বর্ণই স্তূপগুলিতে বর্তায়। তবে আবহাওয়া এবং বিভিন্ন জলীয় উপাদান, সম্ভবত এগুলির কিঞ্চিৎ বর্ণবৈচিত্র্য ঘটিয়ে থাকে। ওপরে ঝুলে থাকা বটের ঝুরির মত স্তূপগুলিকে বলা হয় স্টালেকটাইটস ও নীচের জমে ওঠা স্তূপগুলিকে স্টালেগ-মাইটস।

বিদেশে এ ধরনের গুহাগুলির ভেতরে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা সরকারের তরফ থেকেই করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া পর্যটক-দের আকর্ষণ করার জন্য উপযুক্ত বৈদ্যুতিক বা অন্য আলোর এবং গাইডেরও ব্যবস্থা থাকে। কাজেই সকলে নির্ভাবনায় স্টালেগ-মাইট গুহার ভেতরে ঢুকে, প্রকৃতির সৃষ্ট এক অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।

আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল 'মুসমাই' আগাগোড়াই ঐ ধরনের একটি গুহা এবং সাহস করে এগিয়ে যেতে পারলে মনোমুগ্ধ-কর বহু সংগঠনই দেখতে পাবো। কিন্তু মনের এই সুপ্ত ইচ্ছা ফলবতী হল আরো প্রায় পঁচিশ বছর পরে অর্থাৎ মাত্র তিন বছর আগে।

তিন বছর আগে জ্যৈষ্ঠের এক মিষ্টি সকালে, মুসমাই গুহার উদ্দেশ্যে আমরা শিলং ছাড়লাম। এ ধরনের অভিযানে যে সব সরঞ্জাম প্রয়োজন হতে পারে, তা প্রায় সবই সংগৃহীত হয়েছে পূর্ব-সন্ধ্যায়। পঁচিশ বছর পূর্বেকার অভিযানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঙ্গে চলেছে কিছু অতিরিক্ত উপকরণ, যেমন কয়েক জোড়া গামবুট, খুব হালকা প্লাস্টিকের বর্ষাতি, দুটো হ্যাজাক ইত্যাদি। ক্যামেরা ও তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য সরঞ্জাম তো আছেই। মুসমাইতে একজন গাইড পাওয়া যাবে জেনে দূত মারফৎ আগেই তাকে খবর পাঠানো হয়েছে। ভাল একটা মোটরযানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। অতএব ব্যবস্থাপনার দিক থেকে কোন ত্রুটিই আমরা রাখিনি।

এবারে আমরা দলে আছি পাঁচজন। দুর্গম পাহাড়ী পথে চলার অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। আর আছে অজানাকে জানার অসীম আগ্রহ। তাই আমাদের ভেতরে

গড়ে উঠেছে এক দুর্লভ একাত্মবোধ, সার্থক অভিযানের জন্য যার মূল্য অপরিসীম।

পাহাড়ের ধার কেটে কেটে তৈরি হয়েছে শিলং-চেরাপুঞ্জি সড়ক। আগাগোড়াই পিচ-ঢালা, প্রশস্ত ও সর্পিল। তবে প্রথম গেটের পর থেকেই একমুখী। পথের একদিকে অতলস্পর্শী খাদ অন্যদিকে উচ্চশির পাহাড়। ড্রাইভারের সামান্য অসতর্কতা ও ভুলের মাশুল যে কি হতে পারে তা ভাবতেও ভয় হয়।

প্রথম গেটের পর থেকেই আমরা পেঁছে গেলাম মেঘমালার দেশে। সেখানে আকাশে মেঘ, পাহাড় চূড়ায় মেঘ, আবার নীচে খাদের মধ্যেও সঞ্চরমান পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের ভেলা। মাঝে মাঝে মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে পথঘাট আবার ক্ষণিক পরেই মেঘ কেটে হেসে উঠছে সোনালী রোদ। নীচে সুনীল উপত্যকার পাদদেশে রূপোলী রেখায় এ'কে বে'কে বয়ে চলেছে নৃত্য-পরায়ণা কলহাসিনী পাহাড়ী নদী। মাঝে মাঝে উতরাই-এর মুখে মোটরযানের গর্জন থামলেই শুনতে পাচ্ছি পাইনবনের উদাস করা একটানা সনসনানি আর বহুদূর থেকে ভেসে আসা ঝরনার কলগান।

সাড়ে ন'টার মধ্যেই আমরা মুসমাই গ্রামে পেঁছে গেলাম এবং গাইডকে খুঁজে পেতেও দেরি হলো না। কিমাশ্চর্যম। এ যে আমাদের পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার পরিচিত সেই পথপ্রদর্শক। সেদিনের যুবা এখন বৃদ্ধ, কিন্তু জরা তাকে আজো স্পর্শ করেনি।

উৎসাহ ভরে পূর্ব পরিচিতির কথা উল্লেখ করলাম, কিন্তু বুঝলাম, ভুল করেছি। গুহা দর্শনার্থীর সংখ্যা আজকাল নেহাত নগণ্য নয়। কাজেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ গাইডের স্মৃতিপট থেকে পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার চারটি কিশোর সন্দেহাতীতরূপেই চির বিদায় নিয়েছে।

প্রথমেই গাইড কয়েকটা বাঁশের মশাল নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, দুটো শক্তিশালী হ্যাজাক ও কয়েকটা ভালো টর্চ আমরা সঙ্গে করে এনেছি অতএব মশাল আমাদের কাছে নিষ্প্রয়োজন, বলা বাহুল্য গুহা দর্শনপ্রার্থীদের কাছে, চড়া দামে মশাল বিক্রি করা গাইডের একটি বাড়তি ব্যবসা।

যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে মালপত্র নাবিয়ে, আমরা পায়ে চলা পথে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। লক্ষ করলাম, এবার পথঘাটের যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে।

চেরাপুঞ্জি এলাকায়, বর্ষায় সাপ ও জোঁকের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় বলে শুনেছিলাম, গাইড জানাল, এ অঞ্চলে সাপ নিতান্ত বিরল। অবশ্যি গভীর জঙ্গলে ময়াল জাতীয় কিছু সাপের দেখা মেলে, আর এবারের বিলম্বিত বর্ষায় জোঁকের ভয় একেবারেই নেই।

গুহামুখে পেঁছে বুঝতে পারলাম রাস্তাঘাটের উন্নতি যাই হয়ে থাক, 'মুসমাই' তার পূর্বতন চ্যালেঞ্জ নিয়েই আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। সূচীভেদ্য অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে ঢাকা রহস্যের উন্মোচন সে কিছুতেই করতে দেবে না।

কতদূর যেতে হবে জানি না। অতএব তাড়াতাড়ি হ্যাজাক দুটো জ্বালানো হলো; আর সবাই পরে নিলাম বর্ষাতিগুলো। গাইড অবাক হয়েই আমাদের প্রস্তুতি পর্ব দেখছিল এবং হয়তো বা মনে মনে একটু হাসছিল।

বারোটার আগেই আমরা গুহায় প্রবেশ করলাম। আমি ছাড়া যদিও সঙ্গীদের একজনও এর আগে এখানে আসেন নি তবু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার উৎসাহ এবং উদ্দীপনা কারুরই কম নেই, কিন্তু কিছুটা এগুতেই আমাদের অবস্থা হলো অনেকটা 'ডনকুইকজোটের' মতো। উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও সাজসরঞ্জামের আড়ালে আমরা শুধু নিরাপত্তার কথা ভেবেছি, কিন্তু তাতে যে চলার সাচ্ছন্দ্য কতটা ব্যাহত হতে পারে তা মোটেই অনুমান করতে পারিনি। বিশেষত দুটো হ্যাজাক নিয়ে চলতে বেশ অসুবিধা দচ্ছিল। সার বেঁধে চলা সম্ভব নয়, আবার আলো না থাকলে এই সর্পিল পথে একপাও এগুনো অসম্ভব। টর্চের একমুখী আলোর কার্যকারিতাও যৎসামান্য। শুধু তলার রাস্তাই অসমান নয় ওপর ও চারধার থেকে বেরিয়ে আছে অসংখ্য প্রস্তরফলক, অন্ধকারে যার একটির সঙ্গে সংঘর্ষ হলেই ফল হবে, মারাত্মক। ফটো তোলার সব সরঞ্জাম আমার কাছে। অতএব অনেকটা 'ডনকুইকজোটের' মতো। উপযুক্ত মাইটসের রকমারি চোখে পড়ছিল, কিন্তু অধিকাংশই মসীলিপ্ত দ্যুতিহীন। অবশেষে শম্বুকগতিতে, সবাই এসে পেঁছলাম সেই হিমশীতল স্বচ্ছগভীর স্রোতস্বিনীর ধারে, যার তীর থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে ফিরে গিয়েছিলাম আমরা দুই বন্ধু।

গাইড আমাদের জানাল যে সবচেয়ে সাহসী গুহাদর্শনার্থীর দলও এর বেশী অগ্রসর হতে পারে না। তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারতাম তার পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার পরামর্শ। কিন্তু নিরর্থক। সারল্য হারিয়ে পাহাড়ীয়া আজ শুধু অর্থকেই পরমার্থ বলে জেনেছে, কোন ক্রমে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই কর্তব্যের শেষ। চুক্তি অনুযায়ী দর্শনী প্রাপ্য হবে তার। কিন্তু গামবুটগুলি আমরা বৃথাই বয়ে আনিনি। এগুলো পরে প্রস্তুত হতেই নিরুপায় গাইড আমাদের নিয়ে জলে নামল এবং অল্পয়াসেই পেঁছে দিল স্রোতস্বিনীর অপর পারে।

প্রথম দর্শনেই এ-পারের স্তূপগুলো আমাদের মুগ্ধ করল। ও-পারের তুলনায় এ-পারে আরো রূপ আরো বৈচিত্র, মশালের কালিমা কোন স্তূপকেই বিশেষ মসীলিপ্ত করতে পারেনি।

আরো গজ কুড়ি এগোতেই দেখা গেল পথ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। গাইড নিবেদন করলো, এখানেই যাত্রার ইতি করতে হবে কারণ এর পরের পথ তার অজানা। নিঃসন্দেহে এটিও একটি ধাপ্পা এবং ধাপ্পায় বিচলিত হয়ে ফিরে যেতে আমরা আসিনি। তাই কর্তব্য নির্ধারণেও দেরি হলো না।

স্পষ্টতই বাঁদিকের গলিপথ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও সুগম। পরামর্শ করে স্থির হলো ঐ পথ ধরেই আমরা অগ্রসর হব। প্রয়োজন হলে গাইডের সাহায্য ব্যতিরেকেই।

আমাদের সিদ্ধান্তের কথা শুনে গাইড বুঝতে পারলো, "পড়েছি যবনের হাতে।" অতএব আমাদের সাথে খানা খেতে আপত্তি করে লাভ নেই। অতঃপর আবার যাত্রা শুরু হলো। সবচেয়ে বড় এবং শেষ বাধা এলো নির্দিষ্ট পথে কিছুটা এগুতেই। দেখতে পেলাম প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঁই আমাদের পথ রোধ করে পড়ে আছে। অভিযানের ইতি বুঝি এখানে। কিন্তু গাইডের কাছ থেকে প্রকৃত সাহায্য পেলাম এবার নতুবা কি হতো বলা শক্ত। তারই সহায়তায় আমরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করলাম ঐ প্রচণ্ড বাধা। এবং তারপরেই এসে পেৌঁছলাম একটি প্রশস্ত গুহাকক্ষে।

এবারে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল যে অপূর্ব দৃশ্য তার বুঝি তুলনা নেই। স্ট্যালেকটাইটস ও স্ট্যালেগমাইটসের অপরূপ বিন্যাসগুলো মুহূর্তেই আমাদের মন প্রাণ কেড়ে নিলো। আমাদের সর্বশ্রম সার্থক হলো। স্তূপগুলো কোথাও সাদা, কোথাও বা ঈষৎ নীল। হলদে আর ফিকে লাল রং-এর স্তূপও দেখতে পাচ্ছি। হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকে [illegible] লক্ষ মানিক। বর্ণাঢ্য দ্যুতিতে ঝলমল করছে অকল্পনীয় এক মায়ালোক। এ সৌন্দর্য একা উপভোগ করে আনন্দ নেই। নিজস্ব দলবল নিয়েও নয়। জগৎ সভাকে ডেকে এনে দেখাতে পারলে তবেই তৃপ্তি।

এরপরে শুধু এগিয়ে চলা। একটু করে এগুচ্ছি আর প্রকৃতির বিচিত্র আরো সব সৃষ্টির নমুনা আমাদের সামনে ভেসে উঠছে। কত তার রং, কত তার গঠন বৈচিত্র, কোথাও নেমে এসেছে পাহাড়ের গা বেয়ে বিশাল জলপ্রপাত যার ধারা কোনদিন ঝরে পড়বে না, কোথাও ডানা মেলেছে চিরস্তব্ধ অনামী পাখি যে কোন দিন মাটির মায়া ছেড়ে সুনীল আকাশে উধাও হবে না। কোথাও ভূতুরে বুড়ো দাঁত বার করে হাসছে অনাদি অনন্ত কাল থেকে, কোথাও বা আবার চিরস্থির ঐরাবত ছুটে আসছে, শুঁড় উঁচু করে সংহারের প্রতিমূর্তি ধরে। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীর বিচিত্রতম কল্পনাও বুঝি এই সৃষ্টির কাছে হার মানে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য এসে সঙ্গীদের বিস্মিত ও অভিভূত করছে—তাঁরা কেবলই আমায় অনুরোধ করছেন, সব কিছু ক্যামেরায় ধরে রাখতে।

কিন্তু ছবি তুলি কি করে? বাতাসে আর্দ্রতা এত বেশী যে চশমা আর ক্যামেরার লেন্সের ওপর ক্রমাগতই বাষ্পের পর্দা পড়ে যাচ্ছে। গুহার ছাদ চুঁইয়ে প্রায় বৃষ্টির ধারার মত টুপটাপ করে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছে, যা থেকে ক্যামেরা বাঁচানোই শক্ত। এত অন্ধকারে দৃশ্যাবলী সঠিক ফোকাসে আনাও এক কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া চোখে যা দেখতে পাচ্ছি, স্থানাভাবের জন্য ছবির ফ্রেমের মধ্যে তা পাচ্ছি না। সময় বুঝে ফ্লাশটাও রসিকতা শুরু করলো। কিন্তু তবু ছবি তুলেই চলেছি, কারণ এ সুযোগ জীবনে হয়তো আর কখনো আসবে না।

সময়ের শাসন ভুলে আমরা শুধু এগিয়েই চলছিলাম, নিতান্ত অভিভূতের মতো। ঐ চলার শেষ কখন হতো বলা শক্ত, যদি না এর পরিসমাপ্তি ঘটতো অপ্রত্যাশিত এক নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে।

একটা মোড় ফিরতেই গুহাপথের প্রান্ত-দেশে জেগে উঠলো অত্যুজ্জ্বল এক আলোক বর্তিকা। চোখ ধাঁধানো এই আলো বিভ্রম সৃষ্টি করলো ক্ষণিকের জন্য। তারপরেই বুঝতে পারলাম আমরা গুহার এক প্রান্ত-দেশে এসে পেৌঁছেছি এবং ঐ আলো দিনের আলো। এতক্ষণ অন্ধকারের রাজ্যের অভ্যস্ত চোখ দিবালোককেই আলোক-বর্তিকা বলে ভুল করেছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গুহার বাইরে বেরিয়ে এলাম, আবিষ্কারের আনন্দে যে ঘড়ির কাঁটার কথা মন থেকে মুছে গিয়েছিল তাই দেখিয়ে দিলো, আমরা গুহার ভেতরে ছিলাম প্রায় তিন ঘণ্টার মতো।

মুক্ত হাওয়ায় প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলাম। চোখ ভরে দেখলাম রৌদ্রস্নাত প্রকৃতির শ্যামল শোভা। পৃথিবী যে এত বর্ণাঢ্য, বাতাস যে এত মধুর তা যেন নতুন করে বুঝতে পারলাম। গুহা থেকে বেরিয়ে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি গভীর অরণ্যানীর মাঝখানে, যেখানে মানুষের পদচিহ্ন চোখে পড়ে না।

বর্ষণশেষের অত্যুজ্জ্বল সূর্যালোকে চার-দিক ভেসে যাচ্ছে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় বৃক্ষ-শাখায় আন্দোলিত হচ্ছে রকমারি অর্কিড ও পুষ্পিত বল্লরী। বনতল ঢেকে আছে অসংখ্য বিচিত্ররূপিণী ফার্নের ঝোপে আর ঘন সবুজ শ্যাওলার আস্তরণে।

এখান থেকে পাহাড় বেয়ে মুসমাই ফেরার পথ সুগম না হলেও নিতান্ত দুর্গম নয়।

মুসমাই-এর পর চেরাপুঞ্জি।

অল্পবিস্তর আহত হয়েছিলাম সকলেই, তাই আঘাতগুলোর প্রাথমিক পরিচর্যা করা হলো, চেরাপুঞ্জির এক চায়ের দোকানে বসে। এখানে পরিচয় হলো উন্নয়ন বিভাগের স্থানীয় কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে। এ'রা এখানে আছেন অনেকদিন এবং মুসমাই গুহার বহু তথ্যই তাঁদের জানা। তাঁরা কিন্তু আমাদের গুহা বিজয়ের দাবি সম্পূর্ণই অবিশ্বাস করলেন। তবে এই বিজয় অভিযানের সম্পূর্ণ প্রমাণ বিধৃত আছে, ক্যামেরার স্পুলে। তাই অবিশ্বাসী-দের পরম ঔদার্য ভরে আমরা ক্ষমা করলাম। এবার ঘরে ফেরার পালা।

শিলং-এ পেৌঁছবার আগেই সন্ধ্যা নেবে এলো। পাহাড়ী শহরের উঁচুনীচু রাস্তায় তখন ফুটে উঠেছে আলোর মালা। আলোকিত পিচঢালা মসৃণ রাস্তায় চলতে গিয়ে মনে হচ্ছিল, সত্যিই আমরা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে রূপনাথের গুহার দুর্গম অজানা গলিপথে ঘুরে বেড়িয়েছি?
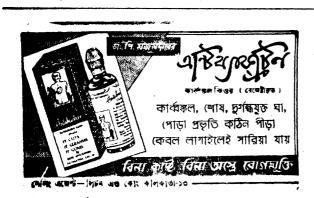
মিগুয়েল আঙ্গেল আসটুরিয়াস

এ বৎসরের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আসটুরিয়াস সম্পর্কে কিছু লেখা আমাদের পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে। বিদেশী পত্রিকাগুলি থেকে আর দু' একটি তথ্য পাওয়া গেল।

আমরা আসটুরিয়াসের কোনো রচনা এপর্যন্ত পড়িনি, কিন্তু তার লেখা এ পর্যন্ত ৩৬টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সাম্যবাদী দেশগুলিতে তাঁর রচনা বেশী জনপ্রিয়। গত বছর তিনি রাশিয়ায় "লেনিন শান্তি পুরস্কার" পেয়েছেন, যার অর্থমূল্য নোবেল প্রাইজের প্রায় অর্ধেক। তাঁর নতুন উপন্যাস "মুলাটা" ইংরেজী অনুবাদে গত মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়েছে।

মিগুয়েল আসটুরিয়াস

আসটুরিয়াস সমাজ বিজ্ঞান ও আইনের ছাত্র ছিলেন। নিছক ভাববাদী কবিত্বময়তায় তিনি বিশ্বাসী নন, তিনি বিপ্লব ও সংগ্রামে বিশ্বাসী, এই সংগ্রাম রক্তাক্ত নয়, সাহিত্যের। গোয়াটেমালার একনায়কতন্ত্রের কালে তিনি সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে ছিলেন, দু'বার দেশ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। এক সময় তিনি রেডিও-তে প্রচারকের কাজ করেছেন, পরে কূটনৈতিক দপ্তরে আসেন।

আসটুরিয়াস এ পর্যন্ত ৭ খানি উপন্যাস প্রকাশ করেছেন, বর্তমানে তিনি অষ্টম ও নবম উপন্যাস এক সংগে লেখায় ব্যস্ত। একটি উপন্যাস জীবনীমূলক, অন্যটি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে

গোয়াটেমালায় স্প্যানীয় অভিযান বিষয়ে। এতকাল এই সমস্ত দেশের রহস্যময় রোমাঞ্চকর দিক এবং প্রবাদ পল্লীগাথার দিকেই সাহিত্য পাঠকদের আকর্ষণ ছিল, তাঁর রচনায় সমসাময়িক জীবনের নির্মম ও বাস্তব দিকটিই বেশী জোরালো।

আসটুরিয়াস বিষম ভাবে আমেরিকা-বিরোধী। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ এবং হস্তক্ষেপের তিনি বারবার প্রতিবাদ করেছেন। আমেরিকার ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি—এই সব ফল উৎপাদনকারী দেশগুলিকে যে শোষণ করে—আসটুরিয়াস বিভিন্ন রচনায় তার বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেছেন।

নোবেল পুরস্কার তাঁকে কোনো বিশেষ একটি রচনার জন্য দেওয়া হয়নি—দেওয়া হয়েছে সমস্ত সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে। পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে তাঁর ৬৮তম জন্মদিনে। পুরস্কার পাবার পর তিনি বলেছেন, "সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, পুরস্কার দেওয়া হয়েছে খুব ছোট একটি দেশের একজন লেখককে। অ্যাটম বোমার ডিপো ভর্তি কোনো দেশকে দেবার বদলে এই ঘটনা অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ।......সমস্যা এড়িয়ে যাবার দিকেই আমাদের এতদিন ঝোঁক ছিল, রোমান্টিসিজিম এবং পল্লীগাথার আড়ালে সমস্যাগুলিকে লুকিয়ে রাখা হতো। সুইডিস আকাডেমি আমাকে নির্বাচন করে অন্যদিকটিকে মূল্য দিলেন—যে দিকটাতে আছে লেখকদের "involvement, confrontation and commitment".

অমিয় চক্রবর্তী

কবি অমিয় চক্রবর্তী আমেরিকার নতুন সম্মানিত পদ গ্রহণ করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক প্রদেশের নিউ পলটজ অঞ্চলে নিউ ইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি কলেজে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে সাহিত্য ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলীতে যোগদান করেছেন। তিনি প্রাচ্য দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এবং এসিয়ান স্টাডিজ প্রোগ্রাম-এর পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবেন।

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী এর আগে আমেরিকার অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যাপনা করেছেন, কিছুদিন আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের পরামর্শদাতা ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন এবং তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে তিনি বিভিন্ন দেশে বক্তৃতাও দিয়ে এসেছেন সম্প্রতি।

শঙ্খ ঘোষ

তরুণ কবি শঙ্খ ঘোষ গত ২৭শে অক্টোবর আমেরিকা গেছেন। তিনি আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কবিতা ও সাহিত্য' বিভাগের আমন্ত্রণে ও দেশে বাংলা কবিতার একটি ইংরেজী সংকলন প্রকাশের কাজে সহায়তা করতে রাজী হয়েছেন। তিনি প্রায় বৎসরকাল সেখানে থাকবেন।

কবি শঙ্খ ঘোষ কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এ পর্যন্ত তাঁর দুটি কবিতার বই বেরিয়েছে। এ ছাড়া তিনি অনেকগুলি মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন।

হায়দ্রাবাদে সাহিত্য সম্মেলন

হায়দরাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪৩তম অধিবেশনে যোগদানেচ্ছু সমস্ত কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির তরফ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব নয় বলে সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করলে রেলওয়ে কনসেশন ফরম ইত্যাদি পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হবে।

S. N. SEN
General Secretary
Nikhil Bharat Banga Sahitya Sammelan
"SAKEENA"
Hyderabad-28

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

স্বীকারোক্তি। সমরেশ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড: ৫ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা-৯। ৫·০০ টাকা।

বিবরের পর স্বীকারোক্তি—সমরেশ বসুর সাম্প্রতিক চিন্তার উত্তরণের স্পষ্টতর চিহ্ন। বলা যায়, দুটি উপন্যাসই একই জমির ফসল। বিবরে যে-মন্তব্য যে-আকারে পরিবেশিত হয়েছিল তাতে আকস্মিকতার চমক ছিল বলেই হয়তো সকলে সমানভাবে মেনে নিতে পারেন নি। স্বীকারোক্তিতে পরিণতির দীপ্তি আরও সহজ, সাবলীল। ফলে, অসুবিধা হবার কথা নয়। স্বীকারোক্তির নায়কও 'পাপের বিবরে বাসা বাঁধার' রীতি জেনেছে, জেনেছে 'স্বাধীনতার থেকে পরাধীনতার সুখেই বাস করা সহজ' এবং বিবরের নায়কের মতই সব কিছু ছেড়ে বাইরে এসে মুক্তির জন্য তৃষ্ণার্ত, বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও, বিবর ও স্বীকারোক্তি যে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি উপন্যাস, বুঝতে অসুবিধা হয় না। ফর্ম, ভাষা ট্রিটমেণ্ট—সব দিক থেকেই স্বীকারোক্তি ভিন্ন ধরনের। উৎকর্ষগত পার্থক্যও অনুল্লেখ্য নয়।

তত্ত্বনির্ভর হলেও বিবর শেষ পর্যন্ত ঘটনা প্রধান উপন্যাস বলা চলে। স্বীকারোক্তি কিন্তু কোনো মতেই ঘটনাময় উপন্যাস বলা যায় না। সম্পূর্ণরূপে বক্তব্য-প্রধান এই উপন্যাসটির আঙ্গিক বাংলা সাহিত্যে নতুন স্বাদ যুক্ত করেছে, সন্দেহ নেই। এই ফর্ম এই কারণেই সার্থক বলব যে, তত্ত্ব জুড়ে পাঠককে সামনে বসিয়ে লেখক-নায়কের অনর্গল স্বীকারোক্তি স্বভাবতই একঘেয়ে, মন্থর বা ক্লান্তিকর মনে হতে পারত, কিন্তু ভাষার সজীবতা তা হতে দেয় নি—সমরেশ বসুর অন্যতম সাফল্য এটি।

স্বীকার, অস্বীকার ও পাপ—তিনটি পর্বে বিন্যস্ত এই উপন্যাসের প্রথম পর্বে ক্রুদ্ধ অসুখী এবং বঞ্চিত নায়কের নৃশংস কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। সমরেশ বসুর লেখার

সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা নিশ্চিত জানেন, কী অসামান্য পরিবেশ রচনা করেন তিনি। ফলে, একটির পর একটি হত্যাকাণ্ডের জীবন্ত বীভৎস বর্ণনায় যখন পাঠক বিপর্যস্ত, বিপন্ন তখন আরম্ভ 'অস্বীকার'-পর্ব। দেখা যায় প্রথম পর্বের যাবতীয় খুন কাল্পনিক। কাল্পনিক কিন্তু অনিবার্য। প্রথম পর্বে যা প্রায় অবিশ্বাস্য, অস্বীকারোক্তির মাধ্যমে তাকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্বাভাবিকতার চূড়ান্ত আসনে। অস্বীকারোক্তির পর্বের নায়ক আমাদের প্রত্যেকের বিষম চেনা, আমাদের প্রতি দিনের অভ্যাসমলিন চেহারার আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেই নৃশংসতম খুনী—এ কথা অপ্রতিরোধ্য রূপে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে, এই একই অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে মনে ঘটে যায় সেই সংগোপন হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে। 'আমরা সকলেই সকলের পাপের অংশীদার হয়ে পড়ছি'—'পাপ' পর্বে নায়কের আত্ম-বিশ্লেষণের শেষ ধাপে পৌঁছে অনিবার্যভাবে মেনে নিই এই সিদ্ধান্ত, মেনে নিতে বাধ্য হই—'পাপের বিবরে বাসা বাঁধার নীতিই এই যাকে পরাজিত আর পরাধীন বলতে চাই আমি, সে কেবলি অপরের গলায় হাত দিতে যায়, কারণ নিজের গলাটাকেই সে একমাত্র গলা মনে করেছে, সেখানে সে হাত দিতে চায় না।'

স্বীকারোক্তির কাল্পনিক পাঠক করুণা, সমবেদনা ও শঙ্কামিশ্রিত এক অদ্ভুত অনুভূতিতে হাত রাখতে চেয়েছে নায়কের শরীরে, বোধহয় নিজেকেই ছুঁতে চায় সে। এক নির্মম কঠিন স্থির সত্য ও উন্মোচনের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেয়—স্বীকারোক্তির সর্বোপরি সার্থকতা এইখানে।

২৪৯।৬৭

বাদশা সিক্কিগড়। শীতাংশুবিকাশ সেনগুপ্ত। আনন্দধারা প্রকাশন: ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য: ১০·০০।

বাদশা সিক্কিগড় একটি সুখপাঠ্য কল্পকথা। কিন্তু রচনার গুণে মনে হয়, ইতিহাসের অগোচর কোনো অধ্যায় যেন উপন্যাসের আকারে পরিবেশিত। একটি তরুণ প্রেমের উন্মোচন ও দীর্ঘশ্বাসের এই কাহিনীটির লিপিকুশলতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইতিহাসের ছদ্ম-আবরণ থাকার জন্যই হয়তো, অনেক ক্ষেত্রে রোমান্সের রঙটি চড়া। কিন্তু এ সত্ত্বেও 'আরজুমহলে'র খিলানে-গম্বুজে ভেসে-বেড়ানো অতৃপ্ত সিরাজের বুকফাটা আর্তনাদ মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। তবে গল্পারম্ভের অতিলৌকিক ঘটনাবলী ঈষৎ গতানুগতিক। যুক্তি শৃংখলার অতীত এই জাতীয় ঘটনাগুলির বক্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাহিনীর সমাপ্তিতে যেমন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়, বাদশা-সিক্কিগড়ের উপাখ্যান শুনিয়ে তেমনি রহস্যময়ভাবে আসন শূন্য করে উঠে গেছে হকিবৎ খান। এই ত্রুটি অনায়াসেই সংশোধন করা যেত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখকের গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্বেই মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর অকাল-মৃত্যু একটি বিপুল সম্ভাবনার আকস্মিক ছেদ—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৫০।৬৭

শারদ সাহিত্য

কাঁচালেখা। সম্পাদক: সুশান্ত চক্রবর্তী। দেশবন্ধু নগর, ২৫ পরগণা। মূল্য ·৭৫ পয়সা।

বেশ কয়েকটি গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতার সমাবেশে আলোচ্য সংখ্যাখানি প্রকাশিত হয়েছে। লেখকগণের মধ্যে রয়েছেন: দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল গুহ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কুমারী স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার ঘোষ। প্রদীপকুমার ব্যানার্জী, শংকর মুখার্জী প্রভৃতি। এই সংখ্যার নবাগত লেখকগণের রচনা ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ।

সোমা। সম্পাদক: অরুণকুমার চৌধুরী ও মণীষ রায়। ৭৪ ইন্জিতুল্লা লেন, কলিকাতা-৩৩। মূল্য ১·০০।

কবিতা, গল্প, স্মৃতিচারণ, খেলাধুলো এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনার সমাবেশে এই শারদ সংকলনটি প্রকাশিত। লেখকদের মধ্যে খ্যাতনামাও কয়েকজন থাকায় তাঁদের রচনাগুলিই যা পড়বার মতো। নচেৎ আকৃতি ও আঙ্গিকের দিক থেকে দীনতা কলকাতা থেকে প্রকাশিত বলে যেন মনে হয় না।

মৃত্যুর মুখোমুখি বার্গম্যানের নায়ক—দি সেভেনথ সীল

বার্গম্যানের ছবি ঃ "সেভেনথ সীল" ও "স-ডাস্ট অ্যান্ড টিনসেল"

ইঙ্গেমার বার্গম্যানের "দি সেভেনথ সীল"-এর নায়ক নচিকেতা নয়। তবু তার প্রশ্নগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার আভাস পাই। বুদ্ধি দিয়েই সে মানুষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ ও সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছে। যুক্তির হাত ধরে যখন আর সে এগোতে পারছে না, তখনই সে নতজানু। উদ্ধত জিজ্ঞাসা মিশে গিয়েছে প্রার্থনায়।

বার্গম্যানের নায়ক শমনকে ক্ষণেকের জন্য যে দাঁড়াতে বলেছে (মৃত্যুর সঙ্গে দাবাখেলার ছলে নায়ক সময় চেয়ে নিয়েছে) সেটা উপাস্যের সঙ্গে তার শেষ মিলনের মুহূর্তটির জন্য নয়। বুদ্ধির গ্রন্থি সে তখনও ভেদ করতে পারেনি, তখনও সে নিঃসংশয় নয়। কেন সে বিশ্বাস করবে সে প্রশ্নের উত্তর তখনও মেলেনি। "বিশ্বাস করাই তো দুঃখ পাওয়া"—নায়কের মনে এই অনুভূতি তীব্র বেদনার মত বেজে চলেছে। "ডার্ক নাইট অব দি সোল" কী বার্গম্যান তা কয়েকটি দৃশ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্তরের ভয়ংকর সংকটের বাহ্যরূপ—যেন চিত্রকল্প—দেখতে পেলাম চোখের সামনে। ক্যামেরার ভাষায় তা পরিস্ফুট। ফিল্মের স্বভাব-গুণের এক অপরূপ নিদর্শন। নায়কের সংশয় ও যন্ত্রণার পরিচয় পেয়েছি তার কথায়—যা আমাদের সত্তাকে তীব্রভাবে আঘাত করে, জীবনের কিছু মৌল

বার্গম্যানের "স-ডাস্ট অ্যান্ড টিনসেল"

তপন সিংহ পরিচালিত "হাটে বাজারে" ছবিতে বৈজয়ন্তীমালা—ছবির মুক্তি আসন্ন ফটো-দেশ

সমস্যার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। কাহিনীর পটভূমি মধ্যযুগীয়। সংশয় ও অন্ধবিশ্বাস, জিজ্ঞাসা ও মূঢ়তা পাশাপাশি চলেছে। সত্যান্বেষী নাইট একটির পর একটি প্রশ্ন করে চলেছে নিজেকে, এবং অদৃশ্য ভগবানকে। অপরদিকে গোঁড়া পুরোহিতের নির্দেশে ডাইনি হিসাবে এক বালিকাকে জীবন্ত দগ্ধ করার নিষ্ঠুর পর্ব। ডাইনি দগ্ধ অন্ধ সংস্কারের বিচারে, নাইট দগ্ধ তার জ্বলন্ত জিজ্ঞাসায়। এই দুই সমস্যা একটি সমাধানের বিন্দুতে বুঝি কোনদিন মিলতে পারে না। অনন্তকাল থেকেই এরা পরস্পরের বিপরীত। মাঝখানে রয়েছে আর একটি চরিত্র, নাইটের সহচর। বুদ্ধির অতীত যত কিছু ঘটে, যার অর্থ আমরা খুঁজে পাই না এবং যার সামনে আমরা অক্ষম ও অসহায়, মানুষের মনে সেই সব ঘটনার কিছু সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। নাইটের পার্শ্বচর ওই সব প্রতিক্রিয়ার যেন একটি প্রতীক চরিত্র। তার উত্তেজনা ও বিদ্রোহ, ভয় ও হতাশার মধ্যেও একটা সমস্যার সুর আছে। পরম নির্ভরতার শান্তি কি মানুষ পেতে পারে না? এই সব প্রশ্নের বিরাম নেই। সৃষ্টির মতই অনাদি, অনন্ত। বার্গম্যান, তাঁর ছবিতে প্রকাশ, ঈশ্বরবিশ্বাসী, শিল্পী। শিল্পী বলে তিনি এত সহজ, চমৎকার ভাবে মানুষের মনের "ক্রাইসিস" ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। সত্যের জন্মলাভের জন্য দুঃখের জঠর-বেদনা অদ্ভুতভাবে তিনি দেখিয়েছেন। ফিল্ম তৈরির অসাধারণ নৈপুণ্যও এই সঙ্গে লক্ষণীয়। ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে পদে পদে সংশয়ের কাঁটা মাড়িয়ে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের দল চলেছে সত্য ও আলোর সন্ধানে। অসাধারণ ফিল্ম ইমেজ সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দুর্দম জিজ্ঞাসার অভিযান যেন অলৌকিক ঈশ্বরীয় বিধানে স্তব্ধ। এ-যেন জয়-পরাজয়ের খেলা। এক পক্ষে অসহায় মানুষ, অপরপক্ষে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। অনন্ত শক্তিধর মানবাত্মা এমন কিছু জয় করে নিতে পেরেছে কি যা পেলে আর কিছু পাবার থাকে না? ঈশ্বর কি মানুষের সত্যলাভের আস্পৃহার বশীভূত? বার্গম্যানের ছবিতে?

দার্শনিক হিসাবে বার্গম্যান এই ছবিতে কিছু গভীর প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে শত কাজের মাঝে ঈশ্বর, আত্মা, মৃত্যু নিয়ে কোন জিজ্ঞাসা আমাদের তাড়না করে না। কখনও বা এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন জীবসীমার ঊর্ধ্বের সত্যকে আমরা জানতে চাই। জানতে চাওয়াই সেখানে যন্ত্রণা। এমনি একটি যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষের প্রতীক বার্গম্যানের নায়ক। এই চরিত্র অঙ্কনের মধ্যেই বার্গ-ম্যানের দার্শনিক ভূমিকা শেষ। এর পরের কোন সত্য তিনি দেননি, এটা তাঁর কাছে আশাও করি না। হয়ত ছবির সরল বিশ্বাসী ওই 'জাগলার'ই বার্গম্যান-দর্শনের সিদ্ধান্ত—যে সৎ ও সরল জীবন যাপন করে, ভালবাসে, সে অলৌকিক দর্শনের অধিকারী। যদি তাই হয়, তবে বার্গম্যান আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট। "ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট"-এ ওই আদর্শ জীবনের কথা আছে। ক্ষতি যা হয়েছে তা শিল্পের, যেখানে বার্গম্যান অস্থির জিজ্ঞাসার ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েও তর্কের মীমাংসায় উপনীত।

স-ডাস্ট অ্যান্ড টিনসেল-এর বক্তব্য থেকে ঈশ্বর বাদ। বার্গম্যান এখানে মাটির কাছাকাছি।

তাঁর বিশ্লেষণের বস্তু মানুষের জটিলতা ও অবক্ষয়। সার্কাস দলকে ঘিরে তাঁর গল্প। সার্কাসের মালিক একদা জীবনকে নিয়ে দুই হাতে লুফোলুফি করেছে। যেমন খুশি চলেছে, যাতে সে সুখী তাই করেছে। সে বুঝতে পারেনি দিনে দিনে কেমন করে শূন্যতার চোরা-বালির উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বাহুযুদ্ধে স-ডাস্টের উপর সে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার মধ্যে অপমানবোধ, প্রতিহিংসার জ্বালা সবই ছিল। থিয়েটারের যে চরিত্রহীন অভিনেতার শিকার হয়েছিল তার প্রেমিকা (সার্কাসের মেয়ে) তাকে সে সমুচিত শিক্ষাই দিতে চেয়েছিল। পারেনি। এর আগে সে একটু সুখ, একটু শান্তি ভিক্ষা করতে গিয়েছিল তার স্ত্রীর কাছে (যার সঙ্গে নায়কের তিন বছরের বিচ্ছেদ)। সেখানে সে আশ্রয় পায়নি। ভগ্নহৃদয়, নিঃসঙ্গ, ভালবাসার জন্য লালায়িত নায়ক ট্র্যাজেডির প্রতিমূর্তি। "স-ডাস্ট......" বার্গম্যানের প্রথম জীবনের ছবি হলেও এতে চমৎকৃত হবার মত মুহূর্ত—ফিল্মের কাজ—অনেক আছে। যেখানে থিয়েটারের শূন্য মঞ্চে আনা (সার্কাসের মেয়েটি) আলোর নীচে এসে দাঁড়িয়েছে ওই

সলিল সেন পরিচালিত "অজানা শপথ"-এ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

"আলেয়ার আলো" (পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্তী) ছবিতে জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

মুহূর্তটি চমৎকার। হঠাৎ করে বুঝি সে নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। সার্কাসের মালিক অ্যালবার্টের কাছে উপেক্ষার অশান্তি পেয়ে সে ছুটে যায় থিয়েটারের অভিনেতার কাছে।

সার্কাস কিংবা থিয়েটার উপলক্ষ মাত্র। আসলে মানুষের ক্লান্তি, নিঃসঙ্গতা ও মূল্যবোধহীনতার হদিস দেওয়াই বার্গম্যানের লক্ষ্য। কাহিনীর সুর কিছুটা নাটকীয় কিংবা কিছু সমস্যা গতানুগতিক হলেও ছবিটি মনকে আকৃষ্ট করে রাখে।

[সুইডিশ দূতাবাসের সহযোগিতায় ফেডারেশন অব দি ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইণ্ডিয়া সম্প্রতি সুইডিশ চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেন। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি, সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি প্রভৃতি সংস্থা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ক্লাবের সভ্য এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমালোচকরা ছবিগুলি দেখবার সুযোগ পান।]

"হাটে-বাজারে" : মুক্তি আসন্ন

তপন সিংহ পরিচালিত প্রিয়া ফিল্মসের **"হাটে-বাজারে"** অনতিবিলম্বেই মুক্তি পাচ্ছে। বনফুলের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবির চিত্রনাট্য রচিত। অশোককুমার ও বৈজয়ন্তীমালা দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলি, চিন্ময় রায়, শ্যাম লাহা অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন তপন সিংহ।

শ্রীশঙ্কর প্রোডাকশন্স-এর প্রথম ছবি **'কুহু ও কেকা'**-র প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত।

বাংলা ছবিতে বোম্বাই শিল্পী

বোম্বাইয়ের অভিনেত্রী শবনম ও নবাগতা শীলা চক্রবর্তীকে ছবির দুটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শবনম জয়শঙ্কর প্রোডাকশন্স-এর **লালবাঈ** ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ছবির অন্যতম প্রধান স্ত্রীচরিত্রের শিল্পী। চিত্ত বসু চিত্রপরিচালক।

বাংলা ছবিতে বোম্বাইয়ের শিল্পীদের আরও অনেককেই দেখা যাবে। বি ভি প্রোডাকশন্স-এর **প্রথম প্রতিশ্রুতি** ছবিতে অভিনয় করছেন অঞ্জু মহেন্দ্রু। মাধবী মুখোপাধ্যায় ছবির নায়িকা, রবি বসু চিত্র-পরিচালক। সম্প্রতি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় ছবির কিছু গান রেকর্ড করা হয়।

এ-আর-সি প্রোডাকশন্স-এর **অন্বিতীয়া** ছবিতে ডেইজি ইরানিকে নিয়ে সম্প্রতি কিছু দৃশ্য গ্রহণ করলেন পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সবেন্দু দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী।

তনুজা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে 'তিন ভুবনের পারে' (সমরেশ বসুর কাহিনীর ভিত্তিতে) ছবির কিছু দৃশ্য সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রপরিচালনা করছেন।

বোম্বাইয়ের বিজয়া চৌধুরী অভিনীত **রক্তরেখা মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিগুলির** অন্যতম। উমাপ্রসাদ মৈত্র ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী কিনে ইউনিটের 'শীলা' এখন মুক্তির অপেক্ষায়। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

শীলা

পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, গীতা দে, শোভা সেন, শেখর চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রাজেন সরকার ছবিটির সুরকার।

মুক্তিপ্রতীক্ষায় "কেদার রাজা"

জিন্দল ফিল্মসের প্রথম প্রয়াস "কেদার রাজা" মুক্তি প্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির অন্যতম। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা

আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত "কেদার রাজা"—নামভূমিকার শিল্পী পাহাড়ী সান্যাল

করেছেন বলাই সেন। চিত্রনাট্য তপন সিংহের। পাহাড়ী সান্যাল নাম ভূমিকার শিল্পী। লিলি চক্রবর্তী, অসিতবরণ, দিলীপ রায়, দীপিকা দাস, রত্না ঘোষাল, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় শিল্পী। কালীপদ সেন সুরকার।

বোম্বাইয়ে বাংলার দুই শিল্পী

বোম্বাইয়ে বাংলা গান ও মূকাভিনয় পরিবেশন করে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও যোগেশ দত্ত সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। শ্রীদত্তের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দর্শক ও সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। বিশেষ করে "চোর", "চলা", "বাস প্যাসেঞ্জার", "জন্ম থেকে মৃত্যু" প্রভৃতি খুবই প্রশংসিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদত্ত বলেন, "অজন্তা ও ইলোরা দেখে মনে হয়, এইসব শিল্পকলা থেকেই মূকাভিনয়ের আদি ভাব ও ভঙ্গিমার সৃষ্টি।" শ্রীদত্তের সঙ্গে সংগীতে সহযোগিতা করেন নীরেন ঘোষ।

প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গান "বন্ধু হে পরবাসে" এবং আরও কিছু রাগপ্রধান বাংলা গান শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

জেমস বণ্ড ধরা পড়েছেন

ফিল্মে জেমস বণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। তা-ছাড়া বণ্ডের ধরা পড়ার প্রশ্ন তো ওঠেই না। বাস্তবের ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। "সর্বশক্তিমান" বণ্ড এবার আসল জেমস বণ্ডের হাতে ধরা পড়েছেন। ফিল্মের বণ্ড দণ্ডিত। তাকে ১৫ স্টার্লিং জরিমানা দিতে হয়েছে। রয়টারের সংবাদটি হল এই যে, ফিল্মের জেমস বণ্ডের চরিত্রের অভিনেতা সিয়ান কোনারি (৩৮) লণ্ডনে দ্রুত গাড়ি চালনার অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন। কোনারিকে যিনি অভিযুক্ত করেছেন তাঁর নাম জেমস বণ্ড। ইনি একজন পুলিস সার্জেণ্ট। সার্জেণ্ট বণ্ড সাংবাদিকদের বলেন, আমি কী করব। জন্মের পরেই আমার নাম রাখা হয় জেমস বণ্ড।

শিশু রংমহল সিনে ক্লাব

আগামী রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমতী নন্দিং. সংপথি সি এল টি সিনে ক্লাবের উদ্বোধন করছেন। পৌরোহিত্য করবেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। ডিসেম্বরের গোড়ার দিক থেকেই সিনে ক্লাবে শিশুদের নিয়মিতভাবে ফিল্ম দেখানো হবে। চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি সাময়িকভাবে একটি নতুন ১৬ মি মি প্রজেকটর দিয়েছেন। অবনমহল প্রেক্ষাগৃহে পরে ৩৫ মিলিমিটারে ছবি দেখানো হবে।

শিশু রঙমহলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য শাখা টিন এজারস থিয়েটার। শ্রীশম্ভু মিত্র ও

তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনায় এই থিয়েটারে শিশু রঙমহল প্রাঙ্গনে বৎসরে অন্তত ছয়টি নাটক অভিনয় হবে। অল্পকালের মধ্যেই অভিনয় শুরু হচ্ছে।

শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরীর পরিচালনায় শিশু রঙমহলের কয়ার আরম্ভ হবে এই উৎসবেই। ফেস্টিভালও আগত প্রায়। বাৎসরিক পরীক্ষান্তে পক্ষকালীন উৎসব আরম্ভ হবে অবনমহলে।

ফেস্টিভালের পূর্বেই মঞ্চের কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে। এতে শিশু রঙমহলের অভিনয় ছাড়াও বাইরের নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়ের সুবিধা হবে।

রাজকমল কলামন্দিরের রজত-জয়ন্তী

প্রখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক ভি শান্তারামের রাজকমল কলামন্দির স্টুডিওর ২৫ বছর বয়স পূর্ণ হবে আগামী ৯ নভেম্বর। ওই দিন ওখানে এক বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। স্টুডিওর রজত-জয়ন্তী উৎসব।

বোমবাইয়ের এই স্টুডিওতে এ-পর্যন্ত পাঁচিশটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয়েছে। ছাব্বিশ নম্বর ছবি "বুঁদ জো বন গয়ী মোতী" এখন মুক্তির অপেক্ষায়। এ-ছাড়া শ্রী শান্তারাম একটি শিশুচিত্রও করেছেন।

শ্রী শান্তারাম কৃত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : "ডকটর কোটনিস" (ইংরাজী ও হিন্দী), "অমর ভূপালী", "দাহেজ" "ঝনক ঝনক পায়েল বাজে", "দো আঁখেঁ বারহ হাথ।" শিশুচিত্রটির নাম "ফুল আওর কলিয়াঁ।"

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত "বালুচরী" ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অনিল ও মলিনা দেবী

মঞ্জু দে পরিচালিত "শজারুর কাঁটা" ছবিতে বাসবী নন্দী ও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ফটো-দেশ

হিজ মাস্টার্স ভয়েস লং-প্লেয়িং রেকর্ডে (৩৩⅓ আর-পি-এম) জনপ্রিয় লোক-সংগীতশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর বারোটি গানের সংকলন সম্প্রতি বের করা হয়েছে। নির্মলেন্দুর (একাধিক গান সহশিল্পীদের সংগে) মনমাতানো গান শোনার আনন্দ ছাড়াও রেকর্ডটিতে বাংলার লোকসংগীতের ঐতিহ্য বিশেষভাবে লভ্য। বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর লোকসংগীত এই রেকর্ডের জন্য নির্বাচিত। যেমন গাজী, বৌ-নাচ, দেহতত্ত্ব, ছাদ-পেটা, বিচ্ছেদ, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল, প্রেমসংগীত, চটকা, ভাদু, সারি (নৌকা প্রতিযোগিতা)। বিভিন্ন বিভাগে গানের নির্বাচন চমৎকার। নির্মলেন্দুর কণ্ঠে কয়েকটি গান আগেই প্রভূত জনসমাদর লাভ করেছে। যথা, সাগর কূলের নাইয়া রে, সোহাগ চাঁদবদনী, ও মোর নদীরে ও মোর তিস্তা, নাইয়ারে সুজন নাইয়া, পান দিলাম সুপারি দিলাম, ও রাঙ্গা বৌ মাছ কুটে রে ইত্যাদি। তবে সারি গানে পুরুষ কণ্ঠ প্রাধান্য পেলে গানটি আরও সার্থক হত। প্রখ্যাত শিল্পীর গাওয়া গানগুলি এক সঙ্গে পেয়ে শ্রোতারা যারপর নাই সুখী হবেন বলা বাহুল্য। রেকর্ডটি ঘরে ঘরে সমাদর পাবে। গ্রামোফোন কোম্পানি এই রেকর্ড প্রকাশের জন্য রসিকজনের ধন্যবাদার্হ হবেন সন্দেহ নেই। কারণ এতে আমরা মনের মত গান শুনি এবং বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিচয় পাই।

এইচ-এম-ভি রেকর্ডে সুবীর সেনের পুজোর গান (সারাদিন তোমায় ভেবে এবং মোনালিসা, তুমি কে বলো না) শুনে ভাল লাগল। অভিজিতের কথা ও সুরে শিল্পী গান দুটি গেয়েছেন।

জোহরের মন্তব্যে হংকংয়ের ভারতীয়রা ক্ষুব্ধ

অভিনেতা আই এস জোহর কিছুদিন আগে হংকং বেতারের এক সাক্ষাৎকারে ভারত সম্পর্কে একটি বিরূপ মন্তব্য করেন বলে শোনা যায়। "জোহর-মেহমুদ ইন হংকং" ছবির শুটিঙের জন্য তিনি হংকং-এ আছেন। উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি নাকি বলেন তাঁর দেশ বর্তমানে "দেহে মনে নোংরা।" হংকংয়ের ভারতীয় বাসিন্দারা এই মন্তব্যে বিক্ষুব্ধ; তাঁরা ব্যাপারটির প্রতি ভারতীয় দূতাবাসের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং এর প্রতিবিধানও দাবি করেছেন।

পরে শ্রীজোহর ওখানকার "চায়না মেল" পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলেন : "আমি জানি না, আমার মন্তব্যের জন্য ভারত সরকার আইনত কিছু করতে পারেন কি না।

পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত "আদ্যাশক্তি মহামায়া" ছবিতে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তবে আমার পাসপোর্টও তাঁরা কেড়ে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ভারতের বাইরে আর আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।"

'নোংরা' শব্দটি কী-অর্থে তিনি ব্যবহার করেছেন, এই প্রশ্ন করা হলে শ্রীজোহর বলেন, তাঁর দেশে "দুর্নীতি আর নিষ্ক্রিয়তার যে-পীড়াদায়ক লক্ষণ" প্রকট হয়ে উঠেছে সেই কথা ভেবেই ওই বিশেষণ তিনি প্রয়োগ করেছেন, অন্য কোনও অর্থে নয়।

চিত্রপরিচালক রয় বোল্টিংয়ের (৫৩) সঙ্গে অভিনেত্রী **হেইলি মিলসের** (২১) প্রণয়-সংবাদ সম্প্রতি লণ্ডনে বেশ আলোড়ন এনেছে। বোল্টিংয়ের বয়স মিলসের দ্বিগুণ। কিছুদিন আগে বোল্টিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী (ইনি আগে মডেল গার্ল ছিলেন) বিচ্ছেদের মামলা আনেন। গত সপ্তাহে এই মামলায় হেইলি মিলসের নাম ওঠে। রয়টারের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, "দি ফ্যামিলি ওয়ে" ছবি উপলক্ষে বোল্টিং ও হেইলির পরিচয় হবার কিছুদিন পর থেকেই তাঁরা বিয়ে করার পরিকল্পনার তথা বলেন। হেইলির বাবা অভিনেতা জন মিলস নাকি বলেন, এ-বিয়েতে তাঁর সম্মতি আছে।

পরিচালক **শ্রীতপন সিংহের** কয়েকটি ছবি নিয়ে সম্প্রতি বোম্বাই শহরে একটি উৎসব হয়ে গেল। ফিল্ম ফোরাম সংস্থা ছিলেন ওই উৎসবের উদ্যোক্তা। প্রদর্শিত ছবিগুলির নাম ঃ "অতিথি", "নির্জন সৈকতে", "ক্ষণিকের অতিথি", "জতুগৃহ", "কালামাটি" এবং "হাঁসুলি বাঁকের উপকথা।"

বোম্বাইয়ের তারাবাঈ হল-এ গত ২০ অক্টোবর উৎসবের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে শ্রীতপন সিংহ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগজানন জাগীরদার শ্রীসিংহকে অভ্যর্থনা করেন এবং ফিল্ম ফোরামের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানান শ্রীব্রজেন্দ্র গৌর।

পরিচালক শ্রীসিংহ তাঁর বক্তৃতায় পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের প্রসংগ তোলেন। তিনি বলেন, এ-ব্যাপারে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের সাহায্য এবং সহযোগিতা খুবই জরুরী। সাধারণ চিত্র-ব্যবসায়ীরা পরীক্ষামূলক ছবির কথা শুনলে স্বভাবতই ভয় পান এবং পিছিয়ে পড়েন। অথচ পরীক্ষা ছাড়া যে-কোনও শিল্পের মত চলচ্চিত্র-শিল্পেরও উন্নতি অসম্ভব। শ্রীসিংহ তাই মনে করেন এ-কাজে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের এগিয়ে আসা উচিত। শ্রীসিংহ বলেন, কর্পোরেশনের উচিত এই কাজের জন্য কয়েকজন, ধরা যাক পাঁচজন, প্রতিভাসম্পন্ন পরিচালককে বেছে নেওয়া এবং তাঁদের ইচ্ছামত পরীক্ষামূলক ছবি করবার সুযোগ করে দেওয়া। পরিচালক দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেন, এখনও পর্যন্ত ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্র প্রশস্ত করতে পারেননি। তাঁদের লিখিত নীতি ভালই; ত্রুটি লক্ষণীয় রূপায়ণে।

✻

পশ্চিম জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে চতুর্থ **এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে।** সেই উৎসবে অন্যান্য ছবির সঙ্গে রয়েছে সুনীল দত্ত-কৃত "ইয়াদে" এবং রাজকুমার-অভিনীত "কাজল"। দুখানিই হিন্দী ছবি। এই উপলক্ষে সুনীল দত্ত এবং রাজকুমার যথাক্রমে ২১ ও ২২ অক্টোবর বোম্বাই থেকে ফ্রাংকফুর্ট গিয়েছেন। শ্রীদত্ত এই মাসের প্রথম সপ্তাহেই দেশে ফিরবেন। অভিনেতা শ্রীরাজকুমার স্ক্যানডিনেভিয়া ও ক্যানাডা সফর করে নভেম্বরের শেষের দিকে বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করবেন।

রয়টারের একটি সংবাদে জানা গেল, সুনীল দত্ত-কৃত "ইয়াদে" চিত্রটি ফ্রাংকফুর্টে এশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বোচ্চ স্থান পেয়ে ওই উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার অর্জন করেছে।

✻

সিডভ লেকালি বর্তমানে এম অ্যাণ্ড এম প্রোডাকশন্সের "দি ইয়ার অব দি ক্রিকেট" চিত্রটি বোম্বাইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে পরিচালনা করছেন। ছবিটির কাহিনী-পটভূমি বোম্বাই। প্রতীচ্যের এক পুরুষের উপর প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রভাব চিত্রনাট্যের প্রধান উপজীব্য। মেরি মারে ছবিটি প্রযোজনা করছেন। চিত্রনাট্যও তাঁরই। ছয় সপ্তাহ ধরে মেহবুব স্টুডিওতে শুটিঙের পর বোম্বাই এবং তার নিকটবর্তী নানা স্থলে ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। ম্যাডালিন রুয়ে ও জিম ব্রাউন ছবিটির প্রধান দুই শিল্পী। কয়েকজন ভারতীয় শিল্পীও এতে কাজ করছেন। চরিত্রশিল্পী নীলাম তাঁদের অন্যতম।

✻

ভারতীয় অভিনেত্রী রানী দুবে আর শুধু "গ্ল্যামার গার্ল" হিসাবে নিজেকে জাহির করতে চাইছেন না। দশ বছর আগে রানী দুবে লণ্ডন যান। সেখানে তিনি টেলিভিশন-চিত্রে ক্রমশ গ্ল্যামার স্টার রূপে স্বীকৃতি পান। সত্যিকারের অভিনেত্রী রূপে আত্মপ্রকাশের বাসনা এখন তাঁর মনে জেগেছে। তিনি দেখাতে চান যে, অভিনয় করার ক্ষমতা তাঁর আছে। তিনি নিজে একটি ভারতীয় উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। তাতে তিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। টেলিভিশনের জন্য ছবিটি তৈরী হচ্ছে। তিনি নিজেও কিছু টেলিভিশন-চিত্র তৈরি করেছেন। বি-বি-সি'র সঙ্গে তিনি অভিনেত্রী ও প্রযোজিকা হিসাবে যুক্ত আছেন।

অরণ্যদেব

লী ফক

ফটক খুলে আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে গ্রামবাসীরা ছুটে আসছে!
অরণ্যদেব! অরণ্যদেব! অরণ্যদেব!

এখুনি এসো না, ফিরে যাও!

গ্রামবাসীরা সে-কথা শুনতেই পেল না!
উনি ভূত-সিংহ খতম করেছেন!
আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন!
অরণ্যদেব! অরণ্যদেব! অরণ্যদেব!
এমন বীরত্ব আর কখনও কেউ দেখেনি!
কুয়া-ভূতও আপনার কাছে হেরে গেল!

ওই দেখুন সিংহের গায়ে কুয়া-ভূতের ছাপ!
ওই দেখুন!
কুয়া-ভূতের ছাপ! তাই কি?
এ-ছাপ যেন আগেও কোথাও দেখেছি...
5/21

সব কটা এখনও মরেনি। দুটো সিংহী আর একটা সিংহ ওই ঘাসের জঙ্গলে পালিয়েছে!
?!

হীরোকে গ্রামে নিয়ে যাও। আমি একটু পরে আসছি।
আয়রে ডেভিল!
??

আমাদের কি প্রভুর সঙ্গে থাকা উচিত নয়?
উনি যখন গাঁয়ে যেতে বলেছেন, তখন যাওয়াই ভাল।
প্রভুর কথা অমান্য করা চলে না।

অরণ্যদেব গিয়ে ঘাসের জঙ্গলে ঢুকলেন।
ক্রমশ (৭)

মণিপুর রাজ্যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সংকট এ সপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভারতীয় পার্লামেন্টারী ইতিহাসে ইহা একটি নতুন নজির। কংগ্রেস থেকে ৮জন সদস্যের পদত্যাগের ফলে ৩২জন সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় যুক্ত ফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭ জন। গত ৫ অকটোবর কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং ১৭জন সদস্য নিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কংগ্রেস ১৫জন সদস্য নিয়ে বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। ১২ অকটোবর দলত্যাগী একজন কংগ্রেস সদস্য আবার কংগ্রেসে ফিরে যান। কাজেই যুক্ত ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা হয় ১৬—১৬। অর্থাৎ সমান সমান। কংগ্রেস এমতাবস্থায় মনে করেছিল যে, স্পীকারকে বাদ দিয়ে যুক্ত ফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা যখন ১৫, তখন অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটাভুটির সময় যুক্ত ফ্রন্টের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে ভোট গ্রহণের আগেই স্পীকার পদত্যাগ করেন। এ ক্ষেত্রে স্পীকারের অভাবে বিধানসভার অধিবেশন চীফ কমিশনারের আদেশে বন্ধ রাখতে হয়। বন্ধ রাখলেও কিন্তু আইনত যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা টিকে থাকে। এই অচল অবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পর্যালোচনার পর একমাত্র পন্থা হিসাবে মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হলেও মণিপুর বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয় নি। উপরন্তু এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে মন্ত্রিসভা গঠনে কোন দল সক্ষম হলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার করা যেতে পারে

দেশী সংবাদ

২৩ অকটোবর—ভূমিরাজস্ব ও নিবারক-নিরোধ আইনে সরকারী কর্মচারীদের আটক রাখার প্রশ্নে এস এস পি ও সি পি আই মন্ত্রীদের পদত্যাগের ফলে উদ্ভূত উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটাবার জন্য লখনউ-এ যে নতুন আপসসূত্র স্থির হয়েছিল, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট নেতারা আজ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বাঙলা কংগ্রেসের ৯ জন এম এল এ বাঙলা কংগ্রেস ত্যাগ করে 'ভারতীয় ক্রান্তিদল' নাম দিয়ে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। এই ৯ জন এম এল এ যুক্ত ফ্রন্টের আহ্বায়কদের একথা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে তাঁরা বিধানমণ্ডলীতে পৃথক ব্লক হিসাবে কাজ করার সিদ্ধান্তও জানিয়েছেন।

২৪ অকটোবর—কংগ্রেস সংসদীয় দলের সেক্রেটারী শ্রীচন্দ্রশেখর দেশে ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ছাড়া ব্যাংকের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এ-সম্পর্কে তিনি কংগ্রেস সভাপতির কাছে এক পত্র দিয়েছেন।

অর্থসংকটে কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ার দশা। কমিশনার শ্রীদুলালগোপাল মুখারজি আজ দায়িত্বশীল অফিসারদের নিয়ে যে বৈঠক করেন, তাতে কর্মীদের এ মাসের বেতন পর্যন্ত মেটানোর উপায় মেলেনি।

২৫ অকটোবর—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বৈঠকে পুরো রেশন এলাকার বাইরে লাইসেনসধারী ডিলার হিসাবে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের পাইকারী চালের ব্যবসা করতে দেওয়ার কথা স্থির হয়েছে। আর রেজিসটারড ডিলার হিসাবে খুচরা বিক্রেতারা চাল কেনাবেচা করতে পারবেন।

আজ নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটির পক্ষে শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেন মারকসবাদী কম্যুনিসট পার্টির শতকরা প্রায় ৫০ জন সদস্য তাদের সমর্থক।

২৬ অকটোবর—হাওড়া রেল ইয়ারডে প্রায় পনের হাজার টন নানা রকম ডাল, জনার প্রভৃতি খাদ্যশস্য দিনের পর দিন পড়ে আছে।

বহু অনুরোধেও মালিকরা তা খালাস করছেন না। ফলে কলকাতার বাজারে খাদ্যশস্যের দাম আরও বেড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

দুই মাসাধিককাল পর হেভি ইনজিনিয়ারিং করপোরেশনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মচারীরা আজ সকালে কাজে যোগ দেন। কিন্তু করপোরেশনের অধীন ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানার প্রায় ৬ হাজার কর্মচারী সরকারের বিভেদপ্রবণ মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে কাজ বন্ধ করেছেন।

২৭ অকটোবর—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আজকের সকালের বৈঠকে এ-কথাটা বেশ পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে যে, নেতারা এখন ব্যাংক রাষ্ট্রীকরণের পক্ষে নন। তবে ব্যাংকগুলিকে 'কার্যকর সামাজিক নিয়ন্ত্রণে' আনার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে শ্রীমোরারজী দেশাই তা ব্যাখ্যা করেন।

প্রাক্তন কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল শ্রীঅশোককুমার চন্দ 'প্রফ স্মৃতি বক্তৃতায়' বলেন যে, জনসাধারণ সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকথায় আগ্রহী নন। তাঁরা চান জীবনযাত্রার মান উন্নত হোক এবং অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের দাম নাগালের মধ্যে আসুক।

২৮ অকটোবর—খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আজ সাংবাদিকদের জানান যে, আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় সপ্তাহ-প্রতি ২ হাজার গ্রাম হিসাবে রেশন দেওয়া সরকারের অভিপ্রায়। রেশন বাড়ানোর দিন থেকে চালের দাম বাড়বে। কারণ সরকার স্থির করেছেন, চাল বাবদ কোন ভরতুকি দেওয়া হবে না। না-লাভ, না-লোকসান ভিত্তিতে রেশন বিক্রি করা হবে। আংশিক রেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বাড়তি দাম চলবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচণ্ড ধরনের আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার মনে করেন যে, কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য দিতে অনিচ্ছুক বলেই রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির এই অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গকে স্বভাবত যে সাহায্য দেওয়া উচিত, কেন্দ্র তাও দিতে অস্বীকার করছেন।

২৯ অকটোবর—পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পুরাতন কার্যনির্বাহক সমিতিকে পুনরুজ্জীবনের অনুরোধ জানিয়ে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ আজ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের কাছে এক যুক্ত আবেদন পেশ করায় প্রদেশ কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

২৩ অকটোবর—ভুটান সরকারের ডাক ও তার বিভাগ মহাকাশ বিজ্ঞানে মানবের অসাধারণ সাফল্যের স্মারক হিসাবে এক নতুন ডাক টিকিটের একটি সিরিজ বের করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ৩০ অকটোবর এই ডাক টিকিটগুলি ছাড়া হবে।

২৪ অকটোবর—আজ রাতে পাকিস্তান রেডিয়ো খবর দিয়েছে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রাম জেলার ককসবাজারে প্রলয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে ১৯ জন লোক নিহত হয়েছে এবং পাঁচ শত লোকের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যাদের সন্ধান মিলছে না তাদের প্রায় সকলেই জেলে।

২৫ অকটোবর—সুয়েজ খালের দক্ষিণে তউফিক বন্দরের মিশরী বাহিনীর সঙ্গে গতকাল তিন ঘণ্টা ধরে ইজরায়েলী বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলি বিনিময় হয়। সুয়েজ বন্দরে অবিরাম কামান দাগার ফলে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়েছে। শহরটি প্রায় বিধ্বস্ত। তৈল শোধনাগার, একটি সার কারখানা, বন্দরের সাজসরঞ্জাম আর বহু শিল্পকারখানা হয় সম্পূর্ণরূপে নয় আংশিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে।

২৬ অকটোবর—গতকাল সন্ধ্যায় নিরাপত্তা পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাতে পোর্ট সৈয়দের নিকটে ভূমধ্যসাগরে ইজরায়েলী ডেসট্রয়ারকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য মিশরকে এবং বোমাবর্ষণ করে তৈল শোধনাগারগুলি সহ সুয়েজ বন্দর ধ্বংস করার জন্য ইজরায়েলকে তীব্র নিন্দা করা হয়।

২৭ অকটোবর—তুরস্কের বিচার মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছেন যে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আদাম মেনদেরিস ও অপর দুইজন মন্ত্রীর মৃতদেহ ৩০ নবেমবর বন্দীশালার কবরখানা থেকে অপসারিত করা হবে। অপর দুইজন মন্ত্রী হলেন—পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফাতিন রুস্তু জরলু ও অর্থমন্ত্রী হাসান পোলাটকান।

২৮ অকটোবর—মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আবার ইজরায়েল ও পাঁচটি আরব দেশকে অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত করেছে। কিন্তু জরডনকে অস্ত্র সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত মুলতুবি রেখেছে। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিম এশিয়ায় এক নতুন অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

২৯ অকটোবর—ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শত আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্র গতকাল ক্যামব্রিজে প্রধানমন্ত্রী শ্রীউইলসনকে ঘিরে ধরে নানা ধ্বনি দেয় এবং তাঁর দামী লিমুইসিন গাড়িটিতে লাথি মারতে থাকে। তাঁরা ভিয়েতনামের হত্যাকারী দক্ষিণপন্থী 'জারজ সন্তান' প্রভৃতি ধ্বনি দেয়।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅরুণকুমার সরকার

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

*

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২
শনিবার ২৪ কার্তিক ১৩৭৪

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪৯

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭ ০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষাণ্মাসিক ,,	২৩.০০
ত্রৈমাসিক ,,	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 11 Nov. 1967

শিল্প সংকট ঃ পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে শিল্প সংকট চলছে তার গুরুত্ব কারও পক্ষে না বোঝার মতন নয়। এ ব্যাপারে সরকার যতটা বিচলিত, শিল্পপতিরা তার চেয়ে কিছু কম নয়; একের পক্ষে সমস্যাটি যেমন দায়িত্ব পালনের ও রাজ্যের অর্থনীতিকে দৃঢ় রাখার সমস্যা, অন্যের পক্ষেও তেমন শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখা ও চালু রাখার সমস্যা। এতদ্‌সত্ত্বেও সরকার ও শিল্পপতি অপেক্ষা সাধারণ মানুষ, শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যারা জড়িত, যাদের রুজিরোজগারের অবলম্বন কলকারখানা, তারা এবং শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় যারা সেই জনসমাজও এই বিরাট সংকটকে আরও তীব্রভাবে অনুভব করছে। একথা বলা ভুল যে, শিল্প সংকট শুধু মাত্র এই রাজ্যে এবং অতি সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। সমস্যাটি পুরোনো এবং ভারতের সর্বত্রই এই সংকটের ছায়া দেখা যায়। তবু পশ্চিমবঙ্গে গত আট মাসে পুরোনো সমস্যাটিকে আরও তীব্র করা হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এঁদের যুক্তি মোটামুটি এই যে, যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের হাতে ক্ষমতা আসার পর রাজ্য সরকার শ্রমিকদের পক্ষে বেহিসেবী সহানুভূতি দেখিয়েছেন ও মালিকপক্ষের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেছেন, ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে; কলকারখানায় ছাঁটাই হয়েছে, বেকারী বেড়েছে: লক্‌ আউট, লে অফ, ধর্মঘট ইত্যাদির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে--আর শেষ পর্যন্ত রাজ্যের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই যুক্তি একেবারে মনগড়া নয়।

অপর পক্ষে, একদল মনে করেন, বর্তমানে শিল্পের এই যে ভয়াবহ অবস্থা এর কারণ গত দু বছরের খরা। খাদ্যাভাবে ও মূল্য বৃদ্ধির দরুণ আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা ভেঙে পড়ছে। উপরন্তু পরিকল্পনা কমিশনের অবাস্তব ধারণাও এই সংকটের জন্যে দায়ী। অস্বীকার করার উপায় নেই, প্ল্যানিংয়ের দোহাই দিয়ে বিস্তর টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু এগুলি কাজে আসেনি, জিনিসপত্র তৈরী হয়নি, প্রতিযোগিতার ফলে শুধু দামই চড়েছে। সম্ভবত এই কারণে ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পসমিতির গবেষণা শাখা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যে মন্দা ভাবের জন্যে খরাকে দায়ী করা যায় না, দায়ী মুদ্রাস্ফীতি; ফাঁপাই টাকার চাপে আমাদের শিল্পোদ্যোগ ভেঙে পড়ছে।

গবেষক ও বিশেষজ্ঞের মতামত যাই হোক, আমাদের চোখের সামনে আপাতত আমরা যা দেখছি তা ভয়াবহ। শিল্প সংস্থাগুলি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, শ্রমিক অসন্তোষ নিদারুণ হয়ে উঠেছে, এমন কি সরকার পরিচালিত শিল্প সংস্থাগুলিতেও শ্রমিক সমস্যা কাঁটার মতন ফুটে আছে। পশ্চিমবঙ্গে এই অসন্তোষ হয়ত আরও তীব্র, কারণ গত আট মাসে আমাদের রাজ্যে অতিমাত্রায় বিক্ষোভও যেমন হয়েছে, তেমনি লক আউট, লে অফ থেকে শুরু করে ছোট ও মাঝারী শিল্পসংস্থাকে ঝাঁপ ফেলে বসে থাকতে হয়েছে। পরিণামে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ লোক শুধু বেকারই হয়েছে।

যুক্ত ফ্রণ্ট সকারকে আমরা শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করতে বলি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারপ্রদত্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে 'নিজের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে' না লড়েও তো রাজ্যের শিল্পকে বাঁচাবার চেষ্টা করা যায়। স্বীকার করি খরা ও অন্যান্য কারণে এই মন্দাভাব কিন্তু খরার রোষ তো ভারতের প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই শিল্পে এই ভয়াবহ অবস্থা কেন হল? কেন এত শ্রমিক অসন্তোষ, বিক্ষোভ, ধর্মঘট, লে-অফ, লক আউট? বলা বাহুল্য, এর কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা বৃথা, কেননা দেখাই যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি তাঁদের অনিচ্ছাকৃত হঠকারিতার কিছু কিছু শোধরাবার চেষ্টা করছেন, উদাহরণস্বরূপে বলব ঃ যুক্ত ফ্রণ্ট আপাতত শ্রমিক-মালিক বিরোধে নিরপেক্ষ থাকার নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাছাড়া সরকার শীঘ্রই তাঁদের নতন শিল্প ও শ্রমিক নীতিও স্থির করবেন। যাই হোক, এ বছরে খরার অভিশাপ থেকে আমরা বেঁচেছি; পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলি পুনরায় সজীব হলেই সকলের মঙ্গল।

অতঃ কিম? প্রশ্নটা সকলের। গোটা পশ্চিম বাংলার। খাদ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করেছেন। তিনি একা পদত্যাগ করে যুক্ত ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এলে এই সংকটটা দেখা দিত না। প্রশ্নটাও উঠত নাঃ এর পর কি? প্রশ্নটা উঠেছে এই কারণে যে ডাঃ ঘোষের সঙ্গে আরও ১৭।১৮জন বিধানসভার সদস্য যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন। এঁরা সবাই মিলে বেরিয়ে আসার একটাই অর্থ হয়ঃ যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকল না। বিধানসভায় মনোনীত সদস্যদের নিয়ে ২৮৪টি আসনের মধ্যে একটি খালি হয়েছে একজন সদস্যের মৃত্যুতে এবং আর একটি আসন আইনের বিরোধের মধ্যে পড়েছে। কাজেই ২৮২ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেসের মোট সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩০ এবং সেই সঙ্গে যদি আরও ১৮ জন যুক্তফ্রন্টের বিরোধী দলে চলে যায় তা হলে ফ্রন্ট সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা চলে যায়।

এই অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখার জন্যই পশ্চিম বাংলার গভর্নর শ্রীধরমবীর পাহাড় থেকে নেমে ছুটে এসেছেন কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি ও ডাঃ ঘোষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। যে-সব সদস্য যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন তাঁদের মতামত নিয়েছেন এবং স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন পশ্চিম বাংলার সংবিধানগত মন্ত্রিসভা গঠন করে তার স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠেছে। রবিবার ৫ নভেম্বর পর্যন্ত যে অবস্থা ছিল, তাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অনিশ্চয়তার কোন নিরসন হয়নি। বরং উদ্বেগটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। চারদিকে আওয়াজ উঠেছে মধ্যবর্তী নির্বাচন। আজ আর এই আওয়াজ দুটি মহল থেকে উঠছে না, প্রায় সব কয়টি দলের ভিতর থেকেই আসছে এই ধ্বনি। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে, কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের বিরোধী। কিন্তু এটাও কংগ্রেসের কোন কোন মহল থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে, যুক্ত ফ্রন্ট সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে এবং সেই কারণে, এই মন্ত্রিসভাকে উচিত রাজ্যপালের খারিজ করা। মন্ত্রিসভা খারিজ করার একটাই পন্থা আছে। সংবিধানের ৯৩ ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতির হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেওয়া।

এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে, কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের কাছ থেকেও মধ্যবর্তী নির্বাচনের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের অ্যাড হক কমিটি গঠন নিয়ে যখন শ্রীঘোষ তার বিরোধিতা জানিয়ে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজকে চিঠি দেন, তাতে তিনি এটাই বলেছিলেন যে, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তন তিনিও কামনা করেন; কিন্তু সে পরিবর্তন করতে হবে জনসাধারণের সম্মতি নিয়ে, দলত্যাগীদের সমর্থন দিয়ে নয়। জনসাধারণের সম্মতি নির্বাচনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। কাজেই শ্রীঘোষও নির্বাচন বিমুখ নন; তবে এখনি সে-নির্বাচন হওয়া উচিত কিনা সে-কথাটা তিনি কোথাও প্রকাশ করেননি। প্রকাশ করা হয়ত সম্ভব নয়, কারণ এই রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দলগতভাবে আলাপ-আলোচনা না করে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

কিন্তু কংগ্রেসকে বাদ দিলে দেখা যাচ্ছে আর সকল দলের সকল নেতার কাছ থেকেই দাবি উঠেছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য। ভারতীয় ক্রান্তি দলের নেতা শ্রীহুমায়ুন কবীর এই দাবি জানিয়েছেন এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে। এই বিবৃতিটা তিনি যখন দিয়েছেন, তখন অবশ্য পশ্চিম বাংলায় রাজনীতির চাকা বেশ কিছুটা ঘুরে গিয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য মোড় নিয়েছে, ২ অক্টোবর শ্রীঅজয় মুখার্জির পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার পর। বেশ কিছুদিন ধরেই শ্রীকবীর একটা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর অস্থিরতা এবং উদ্বেগের মূল কারণ ছিল কম্যুনিস্টদের সর্বনাশা খেলা।

আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নকে যেভাবেই দেখা যায় না কেন, পশ্চিম বাংলায় যে এর অবনতি ঘটেছে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তা অস্বীকার করা যায় না। যুক্ত ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরদিন থেকেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শহরে গঞ্জে প্রচার করা হয়েছে, ফ্রন্ট সরকারকে 'অগ্নিমুখী বাণ' হিসাবে ব্যবহার করে জনগণের সংগ্রামকে আরও সুতীক্ষ্ণ করে তুলতে হবে। প্রচার করা হয়েছে নক্সালবাড়ী 'হঠকারিতা' বর্জন করে কৃষি বিপ্লবকে সুসংবদ্ধ করে তুলতে হবে। জোরদার করতে হবে। ধানকাটার মুখে এই প্রশ্নটা আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখা দিয়েছে। কারণ, প্রতিটি জেলায় ধানের ভাগ নিয়ে আওয়াজ তোলা হয়েছে 'জোতদারকে এক কণাও নয়'; কৃষক শ্রমিককে বলা হয়েছে 'ফসল রক্ষার লড়াই' শুরু করতে হবে। কালিকটে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় শেষে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছেনঃ পশ্চিম বাংলায় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আওতায় শ্রেণী সংঘর্ষকে তীব্র করে তোলাই হবে কম্যুনিস্টদের প্রধান কর্তব্য।

শ্রীকবীর এই প্রশ্নটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সব চাইতে বেশী। তাই ২ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বের কোন প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন নি। সমর্থনও করেছিলেন শেষ মুহূর্তে। কিন্তু শ্রীমুখার্জির পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার পর শ্রীকবীরের পক্ষ থেকে সমগ্র স্ট্র্যাটেজিটা আমূল পরিবর্তন করে দেওয়া হল। তিনি অত্যন্ত তীব্র ভাষায় শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বকে আক্রমণ করে বললেন যে, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রশাসন যন্ত্রকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে, দেশকে অরাজকতার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা শ্রীঅজয় মুখার্জির নেই। এই বিরোধকে কেন্দ্র করেই শ্রীকবীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার।

এই ভাঙ্গার কাজ শুরু করতে গিয়েই শ্রীকবীরকে সংগঠিত করতে হল পশ্চিম বাংলার ভারতীয় ক্রান্তি দলের শাখা সংগঠনকে। যে সাংগঠনিক কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল তার বিলুপ্তি ঘটিয়ে তাকে পশ্চিম বাংলা শাখা কমিটি হিসাবে সংগঠন করে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ জানান হল শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বপুষ্ট বাংলা কংগ্রেসকে। এই বিরোধের সুযোগটা অবশ্য করে দেওয়া হয়েছিল বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কারণ শ্রীকবীরের নেতৃত্বকে প্রধানত খর্ব করার উদ্দেশ্যেই শ্রীঅজয় মুখার্জি দাবি জানিয়েছিলেন বাংলা কংগ্রেসকে ক্রান্তি দলের একমাত্র রাজ্য প্রতিনিধিমূলক সংগঠন হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই স্বীকৃতির দাবির পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলা কংগ্রেস নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ইন্দোর কনভেনসনে পাঠিয়ে শ্রীকবীরের সমর্থকদের পঙ্গু করে দেওয়া। এটা উপলব্ধি

করেছিলেন বলেই শ্রীকবীর অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে এই দাবিকে ব্যর্থ করে দেবার সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেললেন। এই পাকা বন্দোবস্তের ফলেই শ্রীকবীর সামনে তুলে ধরলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্ব। ডাঃ ঘোষকে ক্রান্তি দলের পশ্চিম বাংলা শাখার সভাপতি হিসাবে গ্রহণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

এই প্রতিশ্রুতির পিছনেই ছিল যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারকে এবং শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বকে পংগু করার প্রধান প্রচেষ্টা। ডাঃ ঘোষের নেতৃত্বকে সামনে রেখেই ১৮ জন সদস্যের ফ্রন্টের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক সম্মতি আদায় করা। এই সম্মতির উপর নির্ভর করেই ডাঃ ঘোষ পদত্যাগ করে ফ্রণ্ট সরকারের সংকট সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এই অবস্থাটা না থাকলে এই সংকট দেখা দিত কিনা সন্দেহ। কারণ, ডাঃ ঘোষ মন্ত্রিসভায় নির্দলীয় সদস্য হিসাবে ছিলেন। ডাঃ ঘোষের পদত্যাগ করার প্রত্যক্ষ একটা কারণ যে ছিল না তা নয়। বেশ কিছুদিন ধরে ডাঃ ঘোষ যুক্ত ফ্রণ্ট কমিটিকে উপেক্ষা করে আসছিলেন। প্রধানত, তাঁর নীতি ও নিষ্ঠার প্রতি ফ্রন্টের বিভিন্ন দলের পক্ষে থেকে অনাস্থাসূচক আক্রমণকে তীব্রতর করা হচ্ছিল। বার বার ডাঃ ঘোষ বলতে চেষ্টা করেছেন যে, খাদ্য নীতি তাঁর নিজস্ব নয়; মন্ত্রিসভার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। তবু খাদ্য নীতি চালু করার পদ্ধতিকে নানা-ভাবে বানচাল করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক আক্রমণ দিনের পর দিন চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষত এই কারণেই ডাঃ ঘোষ বেশ কিছুদিন ধরে যুক্ত ফ্রণ্ট কমিটির বৈঠকে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হয়ত এরই পাল্টা জবাব হিসাবে যুক্ত ফ্রণ্ট কমিটির পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসে নূতন খাদ্য নীতি চালু করার কাজ পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রিসভায় একটি সাব-কমিটি গঠন করা হোক। এটাকে ডাঃ ঘোষ তাঁর উপর পুলিসী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা বলেই মনে করেছিলেন এবং পদত্যাগ করার আগের দিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব তোলা হলে তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করে সভা ছেড়ে চলে আসেন।

এটা যে-কোন মন্ত্রীর পক্ষে অপমান-জনক মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই রকম অপমানকর পরিস্থিতি ডাঃ ঘোষকে আগেও সহ্য করতে হয়েছে। এবং হয়ত সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে ডাঃ ঘোষ তাঁর পদত্যাগের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছেন। তবু পদত্যাগের সময় নির্বাচনের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা ওঠা বিশেষ অবাস্তব মনে হবে না। তাই স্ট্র্যাটেজীর কথাটা উঠেছে। কারণ, হয়ত এটা অনুমান করেই শ্রীঅজয় মুখার্জি বাংলা কংগ্রেস সম্বন্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ *সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দিল্লীতে* ভারতীয় ক্রান্তি দলের ক্রিডেন্সিয়াল কমিটির যে বৈঠকে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার কথা, ঠিক তার পূর্ব-মুহূর্তে শ্রীমুখার্জি সরাসরি বাংলা কংগ্রেসকে ভারতীয় ক্রান্তি দলের সংগে মিশিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে, শ্রীকবীরের পক্ষে নিশ্চয়ই একটা অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল। যে কারণ দেখিয়ে তিনি বাংলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করার দাবি জানিয়েছিলেন, সে-কারণটা সামনে থেকে সরে গেল শ্রীমুখার্জির সিদ্ধান্তের ফলে। হয়ত এরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বের প্রতি প্রত্যক্ষ অনাস্থা প্রকাশ করে শ্রীমখার্জির দলকে ক্রান্তি দলের আওতা থেকে সরিয়ে রাখা। দিল্লী বৈঠকের পূর্বে পদত্যাগের সিদ্ধান্তটা সময়-নির্ধারণের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

হয়ত, আরও একটা কারণ ছিল। সে-কারণটা পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জব্বলপুরে অধিবেশনে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের কথাই শোনা গিয়েছে বেশী; বিশেষ করে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্তব্য এবং সিদ্ধান্তে। জব্বলপুরে শ্রীসেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের অ্যাড-হক কমিটি নিয়ে যে-কথাটা বলতে চেয়েছিলেন, তার দুটো প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক, অ্যাড-হক কমিটির ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুই, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনের মুলতুবি। প্রথমটা এবং দ্বিতীয়টা বিচার করে দেখলে এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়। কারণ, অ্যাড-হক কমিটি নিযুক্ত পরি-দর্শকদের রিপোর্টের মধ্যে কয়েকটি জেলা কমিটি সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল। নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত সদস্য-তালিকা সম্বন্ধেও কয়েকটি অভিযোগ পেশ করা হয়েছিল। তাই শ্রীসেনের মতে, প্রয়োজন হয়েছিল কয়েকটি জেলা সংগঠনকে বাতিল করে দেওয়া, তা ছাড়া, শ্রীসেন নির্বাচন মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করেছিলেন, এই কথাটাই সামনে রেখে যে, যে-দলের সংগে তাঁর বিরোধ দেখা দিয়েছে, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সংগঠন নিয়ে নির্বাচনে সেই দলের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করা হয়ত সম্ভব না-ও হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ দুটো প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করে দেন। কারণ, তাঁর মতে, নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা সংগঠনকে জোরদার করা সম্ভব। আরও একটা কথা এই প্রসংগে শ্রীকামরাজ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, হাই--কমান্ডের অনুমতি না নিয়ে কোন কংগ্রেস নেতার পক্ষে বিকল্প সরকার গঠন বা সমর্থন সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেবার ক্ষমতা নেই। কথাটা বলা হয়েছিল অবশ্যই শ্রীসেনকে উদ্দেশ্য করে। কারণ, তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল বলেই শ্রীঅজয় মুখার্জি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন আগাম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। তাই কংগ্রেসের মধ্যে একটা বাহ্য নিরুত্তাপ লক্ষ করা যাচ্ছে। তবু কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থার বিরোধী বলে, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস দলকে এই রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। হয়ত সে-মোকাবিলা হবে কংগ্রেসের নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে। এটা অজানা নেই বলে আজ যুক্ত ফ্রণ্টের বিভিন্ন দলের কাছ থেকে আওয়াজ তোলা হয়েছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের। মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত গড়ে তোলা হয়েছে, তা প্রতিরোধ করতে হবে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, মধ্যবর্তী নির্বাচন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা। ডাঃ ঘোষের পদত্যাগ এই প্রশ্নটাই সামনে এনে দিয়েছে।

ও বিচ্ছেদ .....
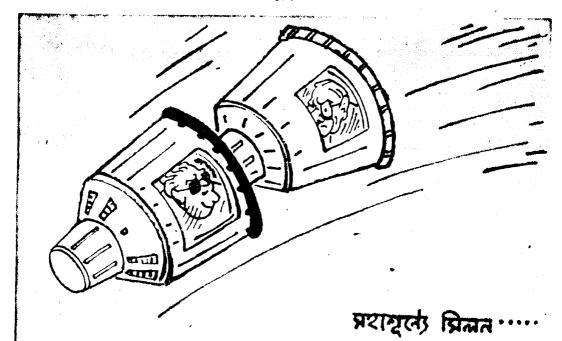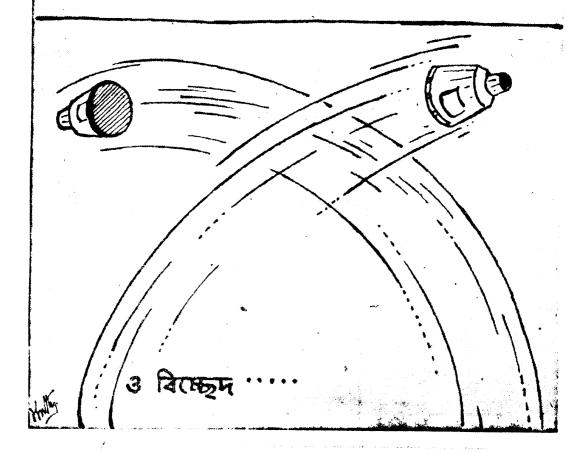
বলশেভিক জুবিলী

রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের পঞ্চাশ বর্ষ-পূর্তি উৎসব আন্তর্জাতিক ঘটনা হিসেবে হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন অন্তত নয়, পনেরো-কুড়ি বছর আগে স্টালিন আমলে এ-রকম উৎসব অনুষ্ঠান হতে পারত কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় রাজসূয় যজ্ঞ-সমান। তখনকার কালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল কম্যুনিস্ট জগতের রাজচক্রবর্তী এবং মস্কো তার একমাত্র পীঠস্থান। এখন সে-রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। এককালে সারা পৃথিবীর কম্যুনিস্ট মহলের ধুয়া ছিল, সোভিয়েট ইউনিয়ন হল দুনিয়ার মেহনতী জনতার পিতৃভূমি; এখন সে-ধুয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি অনুরাগী কম্যুনিস্টরাও মুখে আনেন না, আনতে সাহস করেন না, কিংবা পছন্দ করেন না। বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস অতএব একরঙা, এক সুরে বাঁধা নয়; গত পঞ্চাশ বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নে চলেছে নানা রং-এর আলো আঁধারি খেলা, কখনও ভয়ঙ্কর কালিমা, কখনও হঠাৎ শুভ্রতার আভাস, অনেক সুর ওঠানামা করেছে, কখনও দৃপ্ত বলিষ্ঠ নিনাদ, কখনও ভ্রূকুটি ভয়াল তর্জন-গর্জন, কখনও অনেকটা শান্ত সংযত ধ্বনি; কত যে অসহায় আর্তকণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে তারও সীমা নেই। সব মিলিয়েই বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস; সে ইতিহাসের ভালো-মন্দ তাৎপর্য বিচার চলছে এবং চলবেই। তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশিষ্ট অস্তিত্বকে স্বীকার না করে উপায় নেই।

বলশেভিক বিপ্লব সফল হয়েছে কি হয় নি, এটা আদৌ বিপ্লব কিনা, এ-সব প্রশ্ন নিয়ে তর্কবিতর্ক এখনও বিস্তর। কারো কারো অভিমত রাশিয়ায় শ্রমিক বিপ্লব যে আগে হতে পারে সেটা স্বয়ং মার্ক্সই বিশ্বাস করেন নি। এর জবাবে বলশেভিকরা অবশ্য রাশিয়া সম্পর্কে মার্ক্স-এর কোন কোন উক্তি হাজির করেছে তাদের সমর্থনে। কেউ কেউ আবার এমনও বলে থাকেন যে, জারের আমলে রাশিয়ার অবস্থা খুব খারাপ ছিল না, তা ছাড়া জার নিকোলাস শাসনব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে গণতান্ত্রিক ধারা চালু করছিলেন; সুতরাং বলশেভিক বিপ্লব নাকি রাশিয়ার ভালোর চেয়ে মন্দই করেছে। এইভাবে মার্ক্স থেকে শুরু করে লেনিন স্টালিন ক্রুশ্চভ এবং এখনকার কালের সোভিয়েট নেতৃত্ব পর্যন্ত বলশেভিক রাশিয়ার জন্ম, তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিকাশ, প্রত্যেকটি পর্বের দোষত্রুটি, অনাচার, অত্যাচার ও বিকারের বিস্তারিত বৃত্তান্ত ও ব্যাখ্যা দিয়ে দেখানো হয় বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশটি বছর আগাগোড়াই ব্যর্থ; অথবা একেবারে ব্যর্থ না হলেও নিদারুণভাবে বিড়ম্বিত এবং ভয়ানক সব রকম ভুলে ভর্তি।

বলশেভিক বিপ্লবের সার্থকতা বা ব্যর্থতা সম্পর্কে নানা পরস্পরবিরোধী অভিমত ও তথ্যের বিষম কণ্টকিত পথে পা বাড়াতে সাহস হয় না। বলশেভিক বিপ্লব যে এ সমস্ত সত্ত্বেও দিব্যি টিকে আছে সেটাই পরম বিস্ময়। প্রখ্যাত দার্শনিক উইলিয়ম জেমস বলেছিলেন, আমেরিকানরা কুক্কুরী-দেবী সাফল্য—“বিচ-গডেস সাকসেসের” ভক্ত। উইলিয়ম জেমস বলেছিলেন এটা নিন্দার্থে; কিন্তু এটা প্রকৃতই নিন্দাযোগ্য কিনা সন্দেহ, কুক্কুরী-দেবী সাফল্যের ভক্ত কেবল আমেরিকানরাই নয়, সব দেশের প্রায় সব মানুষ, অন্তত সাধারণ মানুষ, সাফল্য কামনা করে, সাফল্যের তারিফ করে থাকে। সেই সাফল্যের নিরিখে বলশেভিক বিপ্লবের সোভিয়েট ফসল বোধ হয় একেবারে ফেলবার মত নয়। ব্রিটিশ রাজনীতিক কবডেন গত শতাব্দীর মাঝামাঝি বলেছিলেন, আমেরিকা এবং রাশিয়া এই দুটি দেশ হবে পৃথিবীতে মহাশক্তিধর বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। কবডেনের কথা মোটামুটি মিলছে; মহাশক্তিধর হিসেবে আমেরিকার পরেই এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থান।

বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বৎসরপূর্তি কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম ত্রিশ-চল্লিশ বছরের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখতে পারছে না। “প্রাভডা” পত্রিকার শিরোনামায় এখনও রোজ ছাপা হয়, আদি মার্ক্সীয় বচন, “দুনিয়ার মজুর এক হও।” দুনিয়ার মজুর এখন বহুধা বিভক্ত; কেবল কম্যুনিস্ট অকম্যুনিস্ট দুটি ভাগ নয়, কম্যুনিস্ট দুনিয়ার মজুররাও মার্ক্সীয় বচন অনুযায়ী এখন আর ঐক্যবদ্ধ নেই। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সংগঠনেরও সেই অবস্থা। কমিনটার্ন, কমিনফর্ম কবেই বিলুপ্ত হয়েছে; এখন মস্কোর ডাকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট পার্টি মহাসম্মেলনে যোগ দিতেও সব কম্যুনিস্ট পার্টি রাজী নয়। চীন এবং আলবানিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি তো মস্কোর নেতৃত্বকে “নয়াশোধনবাদী” বলে স্রেফ অস্বীকারই করছে। অন্য আরও কম্যুনিস্ট পার্টিও মস্কোয় মহাসম্মেলনে যোগ দিতে উৎসাহী নয়। ঘরের পাশে রুমানিয়া, চীন এবং পশ্চিম জার্মেনী সম্পর্কে নিজের মতে চলছে, মস্কোর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা আর নয়। প্রেসিডেন্ট টিটোর যুগোশ্লাভিয়া স্টালিনের আমল থেকেই দলছুট। কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকতার তত্ত্বগত সংকল্প কম্যুনিস্ট দুনিয়াতেই এখন কার্যত অচল।

বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরে কেবল সোভিয়েট ইউনিয়নের চেহারা চরিত্র শক্তি-বিন্যাস ইত্যাদি বদলায়নি, বদলিয়েছে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের চিন্তা ও চরিত্র-বিন্যাসও অনেকখানি। একটি ছোট্ট উদাহরণ। ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল এতকাল মস্কোর একান্ত বশম্বদ, আজ্ঞাবহ। সেই ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টিও সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, মস্কো কিংবা পিকিং, কোনও একটিমাত্র কেন্দ্র তথা পীঠস্থান থেকে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলন পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া চলতে পারে না। প্রত্যেকটি দেশের সমস্যা এক রকম নয়, কর্মপন্থাও এক হতে পারে না, জাতীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রত্যেকটি দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি তার কর্মপন্থা স্থির করবে। “পলিসেন্ট্রিক” অর্থাৎ বহুকেন্দ্রিক কম্যুনিস্ট সংগঠনের প্রস্তাব প্রথমে তুলেছিলেন ইতালিতে তোগ্লিয়াত্তি। এককালের গোঁড়া ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টিও এখন এই রকম স্বচ্ছন্দ স্বাধীন সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সমঝোতার পক্ষপাতী। তার মানে মস্কো অথবা পিকিং-এর হুকুমত নয়, বিভিন্ন কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও বোঝাপড়া হবে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট ঐক্য বজায় রাখার পদ্ধতি। পিকিং অবশ্যই এর প্রচণ্ড বিরোধী। তাতে আরও প্রমাণ হয় যে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের আন্তর্জাতিক ঐক্য পিকিং কিংবা মস্কো কেউই আর ফিরিয়ে আনতে পারে না। বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বৎসরপূর্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের সাফল্য-সূচক হলেও আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সফলতার আশ্বাস দেয় না।

৬।১১।৬৭

বায়োলজি

কবিতা সিংহ

ভেবেছিলাম বুকেই পাবো কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!
খুঁজে পেলাম পায়ের তলায় রক্তঝরা গোড়ালিটায়
লটকে আছো পেরেক্ ওঠা ছেঁড়া চটির শুকতলাতে
একটি শুধু নাম।

হায় রে কোথা ইচ্ছে ছিল ব্লাউজ-ভরা নীল গোলাপে
গন্ধ করে পাপড়ি খুলে বন্ধ করে রাখব ভরে
ঠিক বলোত কি মন্তরে গড়িয়ে গেলে যথাস্থানে
এস্‌প্লানেডে হারিয়ে যাওয়া ক্লান্তি মাখা লাল রুমালে
একটুখানি ঘাম।

চোখ বুঝেছি ঘুম খুঁজেছি কোথায় গেলে ভালোবাসা?
মন বলেছে আছে—আছে খোঁজ খোঁজ খোঁজ তন্ন-তন্ন
শরীর খুঁজি আঁতি-পাঁতি ঠোঁটের তিলটি উল্টে দেখি
কোথায় গেলে? এ পাঁচ ফুটে বাহুর ভাঁজে সিঁথির শুঁড়ি
পথের মধ্যে দিব্যি তুমি খেলছ নাকি কানামাছি!
ঝাঁঝ উঠেছে নীল বোতলে উপচে ওঠে উপস্থিতি—
একটুখানি কাম।

কোনোদিন না

কালীপদ কোঙার

আমি সহজভাবে তোমাকে
কোনোদিন ছোঁব না।

জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে,
সিগারেটের ঘন ঘন ধোঁয়ার অস্থিরতা;
হৃদয় মেলে ধরলে
সমুদ্রকে ক্ষুদ্র নালা বলে ভুল কর।

আমিও বনস্পতির মত দৃঢ় ঋজুশির হব
সাধ যায় তুমি আমার সান্নিধ্যে এস,
তোমার জন্য হৃদয়টাকে লণ্ঠনের মত
জ্বালিয়ে রাখতে রাজী নই,
দরকার মনে হলে তুমি নিজেই
অন্ধকারে দেশলাই জেবলে আসবে।

নিজেকে কোনো সময়েই সহজ করতে নেই
কেননা সেটা সুলভতা বলে ভুল হয়॥

বেল ফুল

শিবশম্ভু পাল

তেমন কবরী ছাড়া বেলফুল দু আনার শুভ্র ক্রীতদাস
চরিত্রবিহীন:
অথচ দু আনা দিয়ে কেনা ফুলই বিপ্লবের আরক্ত আকাশ
তেমন খোঁপায় যদি লগ্ন হয় কোন কোন দিন।

পোড়ামাটি দিয়ে তৈরী দুর্গ অস্ত্রাগার
লুটে নেয় পরাক্রান্ত দস্যুদল হাতে নিয়ে চাঁদের মশাল
স্মৃতির মুখোশ এঁটে পদাঘাতে ভেঙে দেয়
বিস্মরণ-আঁটা সিংহদ্বার;
আমার সর্বাঙ্গে লাগে বিপ্লবের পতাকার লাল।

তোমার খোঁপায় দেখলে আপাতনিরীহ বেলফুল
রক্তপাত ঘটে যায় চুপিচুপি দুশোহীন অনিদ্র ছুটিতে
তখন বিপ্লবে আসে নির্জনতা কবিতাসংকুল:
নিতান্তই ক্ষণিকতা। টেবিলে সেই তো রোজ
জলের গেলাশ, লাল ফিতে॥

গান

এডিথ সিটওয়েল

হৃদয়ে ফুলন্ত ছিল উষ্ণতায় স্ফুরিত গোলাপ
আন্দোলিত নির্ভয়ে আবেগে
শোণিত প্রবাহে কম্প্র তরঙ্গিত সূর্যের প্রতাপ
দীপ্ত দীর্ঘ গ্রীষ্মের সংরাগে।

তপ্ত প্রান্তরের বুকে হেঁটে গেছি, রৌদ্র আর ছায়া
লুকোচুরি খেলেছিল মেঘে
কখনো বা হঠকারী অপরাহ্ণ বর্ষণের মায়া
বিরহের শংকা ছিল জেগে।

আনন্দিত গ্রীষ্মে আমি বলাকার মুক্তপক্ষ হাসি
চূর্ণ করে আকাশে ছুঁড়েছি
শালিখ চড়ুই আরো নাম-নেই বিহঙ্গের রাশি
ওড়ে যেন স্বপ্নের মৌমাছি।

গোলাপের নম্র চোখে রাত্রির শিশির হলে জমা
একটি পাখীর বুক-ভাঙা
গানের বেদনা বুঝি আমার একান্ত প্রিয়তমা
সময়ের স্বৈরাচারে রাঙা।

পালকের মত ওড়ে জনপদ দুরন্ত বাতাসে
পদাতিক মুহূর্তে থামি না,
লীডের সড়ক বেয়ে মানুষেরা মৃতের মুখোশে
কেন চলে, তা সুদ্ধ জানি না।

ভালবাসা খাক করে গোলাপের শিশির মাড়িয়ে
আকাশের রক্তচোখ পাখী
সূর্যের দ্যাখোরে, আহা বেলা যায় নির্জনে একাকী।

অনুবাদ : অমিতাভ দাশগুপ্ত

আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের ডিনামাইট বিক্রীর ব্যবসা ছিল

'রবার্ট গ্রেভস উচ্যাতে'

ইংরেজ গ্রীক সাহিত্যের স্কলার এবং ঔপন্যাসিক (অন্তত তাঁর দুটি বই আমি পড়েছিঃ 'হোমার-নন্দিনী' আর 'আমি, ক্লডিয়াস') রবার্ট গ্রেভ্‌স্‌ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে কিছু চমক-লাগানো মন্তব্য করেছেন। সে মন্তব্য নোবেল-পুরস্কার প্রাপকদের সম্পর্কে। সংবাদের কৃপণ পরিবেষণে তাঁর বক্তব্য যা জানা গেছে তা মোটামুটি এইঃ 'নোবেলিত' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাহিত্য-জীবনও ইতি শেষঃ। 'তারপরে তাঁদের লেখায় পাঠযোগ্য একটি পংক্তিও আমি খুঁজে পাইনি।' রবার্ট গ্রেভ্‌স্‌ নিজেকে এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন যে

ভাগ্যিস তিনি এখন পর্যন্ত ওই পুরস্কারটি পাননি—পেলে তাঁর সাহিত্য-চর্চার পাট তৎক্ষণাৎ মিটে যেত।

আমরা যারা স্বদেশেই রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, কিংবা সেই সব অন্যান্য বিদেশী লেখকের লেখা পড়েছি—যাঁরা 'নোবেলিত' হওয়ার পরেও ভালো লিখেছেন— আমাদের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত চট করে মেনে নেওয়া শক্ত। তবু সন্দেহ হচ্ছে, কথাগুলোর মধ্যে বোধ হয় কিছু সত্য আছে আর সে সত্য গ্রেভ্‌সের উক্তির চাইতেও মারাত্মক।

তার মানে, নোবেল্‌-পুরস্কারপ্রাপ্তি-মাত্রেই কেবল সাহিত্য থেকে বিদায় নয়—একেবারে ধরাধাম থেকে প্রস্থান। হালে অন্তত সেই রকমই দেখছি। আলব্যার কামিউ-র মৃত্যুর বয়েস হয়েছিল এমন কথা কেউ বলবে না—বেঁচে থাকলে এখন তাঁর তিপান্ন-চুয়ান্নর বেশি হত না; আর্নেস্ট্‌ হেমিংওয়ের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল কিনা জানি না—নোবেলের 'শক্‌'টাই বোধ হয় সহ্য হল না—আত্মহত্যাই করে বসলেন খুব সম্ভব; টি-এস-এলিয়টের না হয় কিঞ্চিৎ বয়েস হয়েছিল, কিন্তু প্রাক্তন যোদ্ধা এবং নিপুণ 'শৃগাল-শিকারী' উইলিয়াম ফক্‌নার স্বচ্ছন্দেই আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারতেন; কবি, অনুবাদ এবং সমালোচক বরিস পাস্তেরনাক রুশীয় প্রস্তৃত্‌ পর্যন্ত হয়েই সুখে-দুঃখে এক রকম ছিলেন, কিন্তু কী কুক্ষণেই উপন্যাস লিখে নোবেল-প্রাপ্তি আর তার পরে যে টানা-পোড়েন—তাতে কবি কেন, 'লৌহতম মানবে'রও হার্ট-ফেল ঘটে যেত। অবস্থা বুঝেই বোধ করি জাঁ পোল সার্ত্র উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছেন, আরো কিছুকাল পৃথিবীর আলো-বাতাসে টিঁকে থাকবার অভিলাষ পোষণ করছেন সেই ভদ্রলোক।

মনে পড়ে গেল, বাংলাদেশের সর্বপ্রধান শিক্ষা-সংস্থার একটি স্বর্ণ-পদক আছে—কৃতী সাহিত্যিকদের সেটি অর্পণ করা হয়ে থাকে। পদকটির নামের সঙ্গে শব্দ-সামঞ্জস্য করে একটি চল্‌তি রসিকতা আছে—ওটি হচ্ছে 'জগৎ' থেকে 'বিতাড়নী' পদক—যিনি একবার পান তাঁকে আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় না, একেবারে ওই ছাড়পত্রটি হাতে নিয়ে ভবপারে যাবার জন্যে পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে হয়। ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সেটা বোধ হয় নিয়মেরই প্রতিপাদক।

আগে দেখতুম, নোবেল প্রাইজ পাবার

পরে সেই সব লেখকেরা কিছুকাল বাজার বেশ গরম করে রাখতেন—আমরা পরমোৎসাহে তাঁদের বই সংগ্রহ করতুম এবং পড়তুম। এখন দেখা যাচ্ছে পুরস্কৃত হওয়ার সাহিত্যিক তুবড়িবাজির পরেই তাঁদের অধিকাংশই 'অব্লিভিয়ন'-এর যাত্রী। হয়তো নিয়ন্ত্রিত-ডলারের কল্যাণেই এদেশে বই-পত্র বিশেষ আসে না, কিন্তু বিদেশের সাহিত্য-আলোচনায়ও তো তাঁদের তেমন উল্লিখিত হতে দেখি না? কোথায় গেলেন ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক? চিলির সেই মহিলা কবি গারিয়েলা মিস্ত্রালের আর কোনো খবর নেই কেন? ফিন্ল্যান্ডের ফ্রান্স্ এমিল সিলান্পা সাতাশ-আঠাশ বছর আগে আমাদের শিহরিত করেছিলেন—এখনো বেঁচে আছেন কিনা জানি না, কিন্তু এই দুই যুগ ধরে কেউ কি তাঁর উপন্যাসের বিশেষ পাত্তা পেয়েছেন? একদা আমাদের চিত্তকে যিনি বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিলেন—সেই আশ্চর্য সুইডীশ লেখক পার লাগের্কভিস্টই বা কোথায়? আইসল্যান্ডের ল্যাক্সনেস আর কি উপন্যাস লেখেন না? কোথায় গেলেন 'লা কিতা নন্ আ সোগ্নো'র কবি সাল্ভাতোর কাসিমোদো—এই অসাহিত্যিক সুনন্দও পরমানন্দে একদা যাঁর দুটি একটি কবিতার অনুবাদ করতে প্রলুব্ধ হয়েছিল?

তাহলে কি রবার্ট গ্রেভ্সের কথাই ঠিক? নোবেল-পুরস্কার পেলেই কি আর বিশেষ লেখবার থাকে না, উল্লেখযোগ্য কিছুই না? স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া মানুষের দীর্ঘতম জীবিতার জন্যে খ্যাত, কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরস্কার কি সাহিত্যিকের ব্যক্তি আর শিল্পজীবনকে হ্রস্বতম করবার একটি অমোঘ ট্যালিজম্যান?

একথা ঠিক, যে লেখকের জীবনে গোধূলি নামলে, তাঁর সাহিত্য-জীবনে 'বিস্মরণের বেলা' ঘনিয়ে এলে—তবেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁকে পুরস্কৃত করবার সদিচ্ছাটা জেগে ওঠে। ভাবটা এই রকমঃ 'হি (অথবা

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর দীর্ঘজীবী হলে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিতে পারে

শী) ইজ্ এ "গনার"—অতএব কিছু দেবার থাকলে এই বেলাই চটপট দিয়ে দাও।' অথবা 'ও যখন আর কিছু লিখতে পারছে না—কিংবা যা কিছু লিখছে তা ভয়ংকর রকমের বাজে—তখন ওকে পুরস্কৃত করবার এই সময়। অর্থাৎ এতদিন সম্রাটের মতো মাথা তুলে যাচ্ছিল, আমাদের পরোয়া করত না; কিন্তু এইবারে ও ব্যক্তিটি আমাদের কৃপার পাত্র—অতএব এই সময়েই ওকে নোবেল-পুরস্কারের তকমা দিয়ে আমাদের বশম্বদ করে রাখো, এই পিঁজরাপোলে ওকে এবারে দয়া করে আশ্রয় দাও।'

তবু সব ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি নয়। শরীর আর কলমে জরা এসে পেঁছোবার আগেই তো অনেকে নোবেল-প্রাইজ পেয়েছেন। কিন্তু তারপরেই তাঁরা বাসি মুড়ির মতো মিইয়ে যান কেন? নিশ্চয় কোনো গুরুতর মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে। আমার সন্দেহ হয়, একবার আন্তর্জাতিক খ্যাতির চূড়োয় পেঁছুলেই তাঁদের মারাত্মক রকমের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এতদিন বেশ ছিলেন, নিজে যা ভালো বুঝছিলেন তাই লিখছিলেন—বিশ্ব নিয়ে (রাজনীতি এবং যুদ্ধটুদ্ধ ছাড়া) তাঁদের এমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু একদা এক সুপ্রভাতে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে নিজের দেশ এবং ভাষার মধ্যে আর তাঁরা সীমাবদ্ধ নেই—একেবারে বিশ্ব-পৃথিবীর চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন তাঁদের প্রতিটি লাইনের বিচার হবে আন্তর্জাতিক মহা-সাহিত্যের মানদণ্ডে—তাঁদের প্রতিটি বাণীকে ভাষ্য করবার জন্যে হাজার হাজার ক্রূর চক্ষু সমালোচক মুখিয়ে রয়েছেন!

তারপর? তারপর আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ডের না হলে যে আর লেখাই চলে না। কী সেই স্ট্যাণ্ডার্ড? পৃথিবীর কোনো লেখক তা অবগত আছেন বলে তো মনে হয় না। অতএব আতঙ্কে আর অনিশ্চয়তায় হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ। কলমের কালি শুকনো। একবার রাজা হওয়ার পরে আর তো পদাতিকের চপলতা চলে না। আমার ধারণা, সেই বিশ্বগত মহৎ-সাহিত্যের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই 'নোবেলিত' লেখকেরা ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট গর্টের মতো 'নোবল্ রিট্রীট্' আশ্রয় করেন, কিংবা কম্পিত শঙ্কিত হৃদয়ে এক আধটু যা লিখে ফেলেন, 'তার এক লাইনও পাঠযোগ্য হয় না।'

তাই রবার্ট গ্রেভ্স্ নোবেল-প্রাইজ পেতে চান না। ভাগ্যিস আমাদের বাঙালী লেখকেরাও পাচ্ছেন না। পেলে কি তাঁরা এমন সব মোটা মোটা বই লিখে সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে-বর্তে থাকতে পারতেন?

ফুল্লরার পতিগৃহে

মনোজ বসু / যাত্রা

সিংছিপুকুর — দামে-আঁটা মজাপুকুর একটা। পাড় ঘেঁষে সদর-রাস্তা সোজা চলে গেছে। জিনিসপত্রের মধ্যে হালকা স্যুটকেশ একটা—স্যুটকেশ হাতে নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে সাইকেল-রিক্সা এইখানে ছেড়ে দিল। সামান্য কিছু আগে রাস্তার পাশেই মিলিটারি তাঁবু। বাইশ বাইশটা দিনের লড়াইয়ে একটিবারও বন্দুক ছুঁড়তে হয়নি। হাত নিশপিশ করছে ওদের—একতরফা পেলে ছেড়ে কথা কইবে না। মিলিটারি এড়িয়ে নেমে পড়ো অতএব চষা-ক্ষেতে খেজুরবনে জলায় জঙ্গলে—

ফুল্লরা মনে করিয়ে দেয়ঃ সাজপোশাক হবে তো এইবার?

এদিক ওদিক চেয়ে দেখে রঙ্গলাল বলে, পুকুর-খোলে গিয়ে কাপড় বদলে নাওগে। লুঙ্গি বের করে দাও, এইখানে আমি পরে নেবো।

বেশ-বদল—ঝকমকে বেনারসি ছেড়ে ফুল্লরা সাদামাটা তাঁতের শাড়ি পরেছে, রঙ্গলাল পরেছে লুঙ্গি।

আলের উপর উঠল। কায়ক্লেশে একখানা করে পা ফেলা চলে, দুটো পা এক সঙ্গে নয়। দাঁড়াবে তো এক পায়ে ভর দিয়ে।

ফুল্লরা দমে নাঃ খুব অভ্যাস আছে আমার। ছোটবয়সে একপায়ে কত নেচেছি। খোঁড়া ন্যাং—ন্যাং—ন্যাং কার দুয়ারে গিয়ে· ছিলি কে ভেঙেছে ঠ্যাং'—নেচে নেচে কত ছড়া কাটতাম। দেখাব?

রক্ষে করো। পারো তা তুমি—মেনে নিচ্ছি। এখন মুলতুবি থাকুক—মিলিটারি বড্ড কাছাকাছি, নাচের নামে তারাও এসে পড়তে পারে।

নৃত্য-পরিকল্পনা বানচাল তো ফুল্লরা অন্য কথায় আসেঃ এত লোকের চলাচল,

পথ একটু ভাল করে নেয় না কেন?

ভাল হলে রক্ষে আছে, সংগে সংগে মিলিটারি বসাবে। ব্ল্যাকের পথ এই রকমই। মোকামের মোটামুটি আন্দাজ আছে, যেমন-তেমন ভাবে পৌঁছনো নিয়ে কথা। হেঁটে যেতে হবে—তা পায়ের নিচে মাটি পেয়ে যাচ্ছ, আর বেশি কি চাই?

ফুল্লরা বলে, মাকে কিন্তু বলেছিলে পালকি নেবে সিংহিপুকুরের মোড় থেকে।

বলালো কে শুনি? গুরুজনের কাছে মিথ্যে বলিয়ে মহাপাতকের ভাগী করেছ আমায়।

ফুল্লরার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে কৈফিয়তের সুরে রঙ্গলাল আবার বলে, নিতে তো পারি পালকি। গাড়ির জন্যে চাই গতর-এলানো জায়গা, পালকি আ'লের পথেও চলে। পালকি ভাড়া করে স্বচ্ছন্দে তোমায় ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ব্ল্যাকে যাচ্ছি তো হাঁটতেই হবে—হাঁটা ভিন্ন গতি নেই।

ফুল্লরা তর্ক করে: বাচ্চা ছেলেপুলে কি বুড়ো অথর্ব লোক যদি সঙ্গে থাকে? কিংবা ধরো পথের মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ল কেউ—

অসুস্থ কেন, একেবারে মরেই গেছে ধরে নাও। তবু হাঁটতে হবে। হাঁটা ছাড়া বর্ডারে যাওয়া যায় না। ল্যাজা মুড়ো ভিন্ন হয়ে যেদিন দুই-বঙ্গ হলাম তখন থেকেই নিয়ম চলছে। মিলিটারি বসে গিয়ে নিয়মটা বেশি কড়া হয়েছে।

নতন বউ ফুল্লরা—বিয়ের পর একটিবার মাত্র শ্বশুরঘর করে এসেছে। ঠাকুরমা এখন-তখন শুনে শেষ দেখা দেখতে বাপের বাড়ি এসেছিল। বুড়ি সামলে উঠলেন, কিন্তু লড়াই লাগল পাকিস্তানে হিন্দুস্থানে। বর্ডার শিল করে দিল—এপারে যুবতী বউ ওপারে জোয়ান বর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে। লড়াই কবে খতম হয়েছে—অদ্যাপি পথ খোলেনি। চিঠিচাপাটি চলছে শুধু—

ফুল্লরা লিখেছিল: ভালই বাস না—ভাল যে বাসে, তার পথ কে রুখতে পারে?

পৌরাণিক নজির আছে—প্রেয়সীর টানে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর মড়ায় চেপে নদী পার হয়েছিলেন, সর্পপুচ্ছ ধরে পাঁচিল টপকে-ছিলেন।

ভালবাসার প্রমাণ দিতে অতএব রঙ্গ-লাল একদিন বর্ডার পেরিয়ে শ্বশুরবাড়ি হাজির। অনভিজ্ঞতার দরুন সর্পপুচ্ছ ধারণের দশাই হয়েছিল পথের মধ্যে। ফিরতি মুখে এবারে ঘাঁতঘোঁত সব জেনে গিয়েছে। বিশদভাবে জানতে হল যেহেতু ফুল্লরা পতিসংগ নিয়েছে। সে-ও এক কাণ্ড। মেয়ে জামাই উভয়ে মিলে মাকে মোটামুটি বুঝিয়ে ফেলেছিল। রিক্সা থেকে পালকি—পালকি যে-ই না বর্ডারে গিয়ে নামাল ওপারে ট্যাক্সিগুলো ভক-ভক করে ভেঁপু দিচ্ছে, টুক করে লাইন পার হয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেই হল। মা নিমরাজি হলেন বটে, কিন্তু অন্য সকলের ঘোরতর আপত্তি। ফুল্লরা সোজা তখন বেরিয়ে এলো বরের পিছু পিছু। সেকালে সীতা এসেছিলেন তো একালের এরাই বা খাটো হব কিসে?

রঙ্গলাল বলছে, হাঁটতে হাঁটতে চুপিসাড়ে বর্ডারে গিয়ে উঠি, পুলিশে দেখতে পায় না। বন্দোবস্তের ব্যাপার—ভিন্ন দিকে চোখ তাকিয়ে স্বভাবের শোভা দেখে তখন। কিন্তু পালকি হাঁকিয়ে যদি যাও, চিরকালের বউরা যেমন গিয়েছে—সেটা হবে হাঁকডাক করে আইন-অমান্য। অনিচ্ছা থাকলেও চাকরির দায়ে তখন তাকিয়ে পড়বে। হাঁটার নিয়ম সেইজন্য।

নাবাল ক্ষেতের একটুকু জায়গায় জল সেঁচে মাছ ধরছে। মাছ যত না হোক, হৈ-চৈ করে কানে তালা ধরিয়ে দেয়। অনেক লোক ঘিরে বসে দেখছে, একটি তার মধ্যে তড়াক করে উঠে পড়ল। ছুটছে।

অন্যেরা চুকচুক করে: মক্কেল ধরেছে গো—উই দেখ একজোড়া। নজর বটে জব্বর মিঞার। মাছে মজে আছি আমরা, জব্বরের চোখ তখন চৌদিকে চক্কোর মেরে বেড়াচ্ছে।

তেরো শ' মাইল জুড়ে বর্ডার, উভয় পারেই দালাল। যাঁরা দেশ ভাগ করেছেন, মহাশয় লোক তাঁরা—কত লোকে অন্ন করে খাচ্ছে ভাগাভাগির দৌলতে।

ফুল্লরা বলেছিল, দালাল কেন লাগবে, কেন লাগবে, জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় চলে যাব আমরা।

রঙ্গলালও ঠিক তাই ভেবেছিল শ্বশুর-বাড়ি আসার সময়টা। দালাল এলে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। বাপ রে বাপ, এক ফার্লংও যায়নি—দেশপ্রেম উথলে উঠল চতুর্দিকে। আধ ডজন ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়াল, আরও বিস্তর রে-রে—করে আসছে।

দেশ ছাড়ছ তো পাশপোর্ট-ভিসা দেখাও। এমনি যেতে দেবো না।

রঙ্গলাল সত্যি কথাই বলেছিল, দেশ-ভুঁই ছেড়ে কোন্ চুলোয় যেতে যাব? কুটুম্ববাড়ি যাচ্ছি—দিন দশেক বাদে ফিরে আসব দেখো।

সবাই বলে তাই। ভারত স্বাধীন হওয়া ইস্তক এক বয়ানই শুনে আসছি।—

লোকগুলো খলখল করে হাসে: নাম কি সেই কুটুম্বের, নিবাস কোথা? তোমার নিজের কোন্ জাত ঠিক ঠিক বলো দিকি—হিন্দু না মোসলমান? মানুষ তো আজকাল সব নাস্তিক—মোসলমানে দাড়ি কামায়, হিন্দুতে দাড়ি রাখে। চেহারায় ধর্ম ধরা যায় না।

প্রশ্নের বাণ ডেকেছে, থামাথামি নেই। শেষটা রঙ্গলাল চটেমটে উঠেছিল: কারা বট হে তোমরা, এত জেরা কিসের? ঠোঁটে এই কুলুপ আঁটলাম—এক আধলাও আর জবাব দিচ্ছি নে।

চলো তাহলে। পিছন ধরে আমরাই গিয়ে কুটুম্বর তত্ত্বতালাস আনব—

যার মুখে যা আসে বলছে: যত কুটুম্ব বুঝি বর্ডারে গিয়ে বসত গেড়েছে! গোটা মুল্লুক ফাঁকা করে ফেলল গো। টাকাকড়ি গয়নাগাটি জিনিসপত্তোর মায় মাছিটা পিঁপড়েটা অবধি পাচার হয়ে গেছে—মানুষ ক'জন হলেই হয়ে যায়। জবাব আমাদের কাছে না-ই দিলে, সরকার যাদের পাহারায় রেখেছে—আখমাড়াই কলে ফেলে তারাই জবাব বের করে নেবে।

রীতিমত সোরগোল। দালালি খরচা বাঁচাতে গিয়ে ধুন্দুমার লাগে আর কি। দীর্ঘকালের জানাশোনা প্রীতিপ্রণয় ও লেনদেনের কারণে, ধরে নিলাম, বর্ডার-পুলিস ডাল-ভাতের শামিল হয়ে গেছে। এমনি নিশ্চয় দেখতে পেত না—কিন্তু কলহ করে টেনেহিঁচড়ে চোখের উপর নিয়ে তুললে দেখতেই হত বেচারিদের। লড়াইয়ের পর থেকে নতুন এক ফিকির বেরিয়েছে—চরবৃত্তির রব তুলে দেওয়া। হেন অবস্থায় শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াতে পারত, ঠিকঠিকানা নেই—হাতে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে হয়তো হাজতে পুরত, অথবা সরাসরি গুলি মেরে মাথার খুলি দিত ছিদ্র করে। সেই এক যাত্রাতেই রঙ্গলাল ষোল-আনা পাকাপোক্ত হয়ে এসেছে।

ফুল্লরা বলছিল, দালাল কেন আবার—দালালে কি কাঁধে করে ঘাটে দিয়ে আসবে?

রঙ্গলাল জবাব দিল: তীর্থস্থানে লোকে পাণ্ডা ধরে নির্ঝঞ্ঝাটে ঠাকুরের পাদপদ্মে পৌঁছে দেয় বলে। পাণ্ডা বাদ দিয়ে তীর্থদর্শন তবু হতে পারে, বিনি দালালে স্লাকের পথে নৈব নৈব চ।

হেনকালে জব্বর মিঞা খেজুরবন পার হয়ে আ'লের উপর উঠল। রঙ্গলাল বলে, বলেছি না? দালালই তেড়ে এসে ধরবে, আমাদের খুঁজে বেড়াতে হবে না।

কাছে এসে দালাল পোশাকপরিচ্ছদ দেখে তারিপ করে: বাঃ, বাঃ! নিজের মাথার কিস্তি টুপিটা রঙ্গলালের মাথায় বসিয়ে দিয়ে একগাল হেসে বলে, বেড়ে দেখাচ্ছে। বাবুমশায় সদ্য যেন হজ করে ফিরলেন। তা কটমবাড়ি তো? আসুন, পথ চিনিয়ে নিয়ে যাই। বাক্সটা আমার হাতে দেন।

রঙ্গলালের ফুল্লরায় চোখাচোখি। দুই মুখে হাসি। অর্থাৎ: কেমন, মিলছে তো? হ্যাঁ, ঠিক ঠিক তাই বটে।

স্যুটকেশ জব্বর মিঞা হাতে ঝুলিয়ে নিল। ছোটখাটো জিনিস দালালই ঘাটে পৌঁছে দেয়—আসলের সঙ্গে ফাউ।

বেশ লাগছে, যাই বলুন। মা-ঠাকুরমা'দের আমলে কোন বউ গেছে শ্বশুরবাড়ি

এমনিভাবে হেঁটে হেঁটে নেচে নেচে? হাঁটবে কি ফজ্লরা, দেখেই তো কূল পায় না—কৌতূহলী দৃষ্টি ফ্যালফেলে করছে এদিক সেদিক। হাত বাড়িয়ে সহসা সামনে দেখায় : তিন দৈত্য—ঐ দেখ।

পাশাপাশি বিশাল তিন বটগাছ। ফজ্লরা খাসা খাসা উপমা দেয়। মেয়ে-কালিদাস বলতে পারেন। ক্ষেত শেষ হয়ে আবার ভাঙা-গাঁ গ্রাম, রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ি। তিন বটগাছ দেখে পুরানো স্মৃতি ঝলক দিয়ে উঠল—দালালকে রঙ্গলাল শুধায় : পায়রার হাটখোলা—তাই না?

হাট নেই তার হাটখোলা। পুরানো নামটা কেউ কেউ বলে—আর বেশি দিন বলবে না।

ক্ষেপে যায় যেন জব্বর মিঞা। রাস্তায় উঠে পিছন ফিরে দু-হাতের বুড়োআঙুল নাচায় : ফৌজ বসিয়ে পারল রুখতে? সেই রাস্তায় আবার তো উঠে এলাম। মাঝরাস্তায় কষে পাহারা দে তোরা দিনরাত—কলা দেখিয়ে আমরা এই ঘাটে চলে যাচ্ছি।

কত সব মনে পড়ে যায়। রঙ্গলাল এতটুকু তখন। ছোটকাকার বিয়েয় নিতবর হয়ে যাচ্ছিল। জাঁকের বিয়ে—চারখানা পালকি, আটজোড়া ঢোলকাঁসি। বরকর্তা পালকিতে যাচ্ছেন, পুরুতঠাকুরও যাচ্ছেন। আর একটায় গোটা পাঁচেক বাচ্চা ছেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে—বরযাত্রী তারা; কিন্তু হাঁটার তাগত হয়নি। সকলের বড় পালকি বরের—ছোটকাকার সঙ্গে নিতবর রঙ্গলাল এবং ছোট কাকার নিজস্ব হাত-বাক্সটাও সেই পালকিতে। চুল নিয়ে ছোট কাকা ব্যতিব্যস্ত—মাঠের এলোমেলো বাতাসে ফাঁপানো এলবার্ট-টেড়ি ভেঙে বড় বড় চুল বারম্বার কপাল ঢেকে পড়ছে, আয়না ধরে ছোটকাকা টেড়ি মেরামতে লেগে পড়ে আছেন। বেয়ারারা হাটের এই বটতলায় পালকি নামিয়ে কাঁধের গামছা দিয়ে বাতাস খেতে লাগল, শিশু রঙ্গলাল টুক করে ভুঁয়ে নেমে পড়ল—চতুর্দিকের অগণ্য ঝুরিতে বেশ কেমন ঘর-ঘর দেখাচ্ছিল জায়গাটা—

রঙ্গলাল প্রশ্ন করে : হাজু ময়রার দোকান ছিল না এই হাটখোলায়?

ছিল বাবুমশায়। হাজু মারা গেছে, তার ছেলে ছিল। বর্ডার এলাকায় কেনা-বেচা বন্ধ—দোকান তাই তুলে দিতে হল। হাজুর ছেলে বাসনকোশন বেচে দিয়ে বট-তলায় পা ছড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। ছেলেপুলে মারা গেলেও লোকে এমন কান্না কাঁদে না।

এদিকের যে লোকই আসুক, হাজুর রস-গোল্লা দু-এক গণ্ডা মুখে না ফেলে নড়বে না। ক্ষিদে থাকুক আর না-ই থাকুক। রস-গোল্লার এমনি নাম পড়ে গিয়েছিল। চতুর্দিক তোলপাড় করে ঢুলিরা ও চার পালকি এসে পড়ল। পায়ে-হাটা বর-যাত্রীরা আগেই এসে হাজুর দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চিতে ঠাঁই নিয়েছেন। ওস্তাদ খাইয়ে নরেশ্বর ঘটক রসগোল্লায় কামড় দিয়ে মুখ বিকৃত করে বললেন, মিষ্টি কম—মালে কারচুপি করেছ বাপু। এ মানুষের কাছে লুকানো বৃথা—হাজু মুখ কাচুমাচু করে বলে, চিনির সের আট-আনা—পোষাতে পারিনে ঘটকমশায়, চিনি কমিয়ে ছানা দিয়ে পূরণ করি। নরেশ্বর হিঁ-হিঁ করে ওঠেন : ভেজাল চাউর হয়ে গেলে তোমার দোকানে খদ্দের ঢুকবে না, মারা পড়বে কিন্তু হাজু—।

তখনকার বালক রঙ্গলাল কথাগুলো অবিকল মনে রেখেছে।

জব্বর মিঞা এক সময়ে বিরক্ত হয়ে বলে, বড্ড ভিটির-ভিটির করেন আপনারা মশায়। ফৌজ বসিয়ে দিয়েছে, খেয়াল রাখবেন। তার উপরে পরীর পারা বিবি সঙ্গে যাচ্ছেন, নজর এমনিই তো টেনে ধরে। ঘাট অবধি চুপচাপ চলুন, ভালয় ভালয় পার হয়ে যান, তাবৎ হিন্দুস্থান পড়ে রইল—কথাবার্তা কেন, ঝগড়া কোন্দল ঘুষোঘুষি লাঠালাঠি যেমন হচ্ছে করবেন।

মৌনী হতে হল অতএব। রাতের যাত্রী জলজঙ্গলের কুমির-বাঘ ডরায় না—ভয়ের জায়গা সদর-রাস্তা, লোকালয়। মানুষের বড় শত্রু মানুষের চেয়ে হয় না।

আর সেই যে একদিন রঙ্গলাল নিতবর হয়ে যাচ্ছিল। এই পথেই।

বড়জেঠামশায় বরকর্তা। স্ফূর্তিবাজ মানুষ—সদর-রাস্তায় উঠে সর্দার-বেয়ারার উপর ক্রমাগত হাঁক পাড়ছেন : গলা ছাড়িস নে কেন রে মাদার? ভাত খাসনি, বার্লি-সাবু খেয়ে এসেছিস? বাজনদারদের উপর তড়পাচ্ছেন : আট ঢোল আট কাঁসিতে আকাশ ফেটে চৌচির হবার কথা, এ যেন বাইজির ঘুঙুর বাজানো হচ্ছে—

তা আকাশ না ফাটুক মানুষের কানের পর্দা ফেটে চৌচির হচ্ছে। বড়জেঠার তবু সন্তোষ নেই—পালকি থেকে মুখ বাড়িয়ে বারম্বার চেঁচাচ্ছেন : বাজা রে বাজা—

আর আজকে। ফৌজি নজর এড়ানোর জন্য রাস্তা ছেড়ে ক্ষণে ক্ষণে নেমে পড়তে হচ্ছে—কখনো ঝুপসি জঙ্গল কখনো বাঁশবন কখনো ক্ষেতখামার। আর দালাল চাপা গলায় তর্জন করছে : চুপচাপ চলেন, অত কথা কিসের? সন্ধ্যা হল, চাঁদ দেখা দিল আকাশে। পথের শেষ নেই তবু। থপথপ করে মহাকালের মতো ক্লান্তিহীন পাদবিক্ষেপে জব্বর মিঞা আগে আগে চলেছে, পিছনে এরা দু'টি।

এক সময়ে অধীর হয়ে ফজ্লরা বলে, আর কদ্দুর গো মিঞা?

বলেছি তো, আধক্রোশ—

বিকেলবেলা বলেছিলে, আর এখন ঘোর হয়ে গেছে—

সগর্বে জব্বর মিঞা বলে, তাই দেখুন। লোকে কত ফালতু বলে, আমার কাছে এখন এক কথা তখন এক কথা নেই।

রঙ্গলাল এবারে আগুয়ান হল : দেখছি তো তাই। কিন্তু তোমার ঐ আধক্রোশ পথ কখন শেষ হবে বলতে পারো?

ঘাটে গিয়ে।

বাস বাস, আর বলতে হবে না। জলের মতো পরিষ্কার—

ফজ্লরাকে রঙ্গলাল ভাষ্যিলোর ভঙ্গিতে বলে, কদ্দুরই বা নেবে! উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর নয়তো দক্ষিণে বে-অব-বেঙ্গল। তার আবার জিজ্ঞাসার কি আছে?

মাটির পাঁচিলে ঘেরা এক খোড়ো বাড়ির দরজায় এসে জব্বর মিঞা সুটকেশ মাটিতে নামাল : পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেন বাবুমশায়। টুপিটাও দিয়ে দেন। ঘাটে পৌঁছে গেছি।

মাঝবয়সি একজন ঘরিতে বেরিয়ে এসে কথার বাকিটুকু শেষ করল : মীরবহর ঘাট। আসুন—ভিতরে চলে আসুন। ওয়েটিংরুম টিকিটঘর সমস্ত ভিতরে।

ঘাট কোথা? কৌতূহলী চোখে ফজ্লরা এদিক ওদিক তাকায়।

এই তো এই যেখানটা দাঁড়িয়ে আছেন।

পার হবে তো নদী-নালা দেখিনে তো—

মীরবহর ঘাট ডাঙার উপরে। চরণ-খেয়ায় পারাপার।

হাসাহাসির মধ্যে পাঁচিল পার হয়ে তিনজনে ভিতর উঠানে এলো। মানুষটি আনোয়ার—ঘাটের ভাগিদার, এপারের কর্তাব্যক্তি। আদি ঘাটোয়াল অতুল মীর-বহর হিন্দুস্থানের পারে আছেন—ডাঙার উপরে পারঘাটা বছর পনের আগে তিনিই চালু করেন। আনোয়ার পরে জুটেছে।

উঠানের পাশে লম্বা দোচালা ঘরের একটা অংশ কাচনির বেড়ায় ঘেরা। মেয়ে-দের জায়গা।

আনোয়ার সদুঃখে বলে, মেয়েলোক কোথা আর! ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছেই না মিলিটারির ভয়ে। ও বেটারা ঘুমোয় না তো, ঘুমোতে জানেই না বোধ হয়—দিন-রাত্রি মাঠে মাঠে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

মেয়েজাতির এত বড় কলঙ্কে ফজ্লরা মুখ বুজে থাকে কেমন করে? বলে, আমি তো বেরিয়েছি।

আমার ভাগনিও। আছেন বই কি আপনারা দু-চারটি। বলি তো তাই—

ধূর্ত হাসি হেসে আনোয়ার আবার বলে,

মিলিটারি দেখতে পেলে তো! ওরা বেড়ায় ডালে ডালে, আমরা বেড়াই পাতায় পাতায়।

রঙ্গলাল প্রশ্ন করে: বন্দোবস্ত হয়ে যায়নি এখনো?

হবে কি করে বলুন। কথা বলে, ঠিক যেন ঠেঙার বাড়ি মারছে—বুকের মধ্যে গর-গর ওঠে। হাসতেও জানে না বেটারা—

একটু থেমে আবার বলে, তবে মানুষ যখন, হাল ছাড়ব কেন? বন্দোবস্ত হবেই—না হয়ে যাবে কোথা? সদ্য এসেছে—জলকাদা ভেঙে শুক্তোঘণ্ট খেয়ে নরম হয়ে আসুক, তারপরে।

ফুল্লরা বলে, রওনা কোন সময়?

অন্ধকার হবে, তবে তো—

ঊর্ধ্বে আঙুল দেখিয়ে আনোয়ার বেজার মুখে বলে, শালা চাঁদ ঐ যে আকাশে চড়ে বসেছে। দশমী তিথি, বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না, ততক্ষণ ভোগান্তি আছে। তো শুয়ে বসে কাটিয়ে দিন ততক্ষণ। উঠানে চক্কোর মারতে পারেন, ব্যাপার-বাণিজ্যও হতে পারে। যা করবেন পাঁচিলের ভিতরে। একা-দোকা বেরুবেন না—খবরদার! সময় হলে একসঙ্গে সকলে বেরিয়ে পড়ব।

বলে দিল আনোয়ার শুয়ে বসে সময় কাটানোর কথা। হাসানীটি তার তেমনি পাত্রী কিনা! যেই না ফুল্লরা ঘরে ঢুকেছে, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। কথার ফুল-ঝুরি। বলে, কেমন খেলাম—বেঁচে গেলাম রে ভাই। রাত দুপুরে একলা মেয়ে মাঠ ভেঙে বাঁই-বাঁই করে ছুটেছি, ডাইনে-বাঁয়ে আলো দিচ্ছে পুরুষের নজর—ভাবো তো কী দুঃসাহস! এ তবু দুজন হলাম।

ফুল্লরা অবাক হয়ে বলে, ছুটতে হয় নাকি?

একেবারে আনকোরা তুমি ভাই। হয় কিনা দেখতে পাবে। রাত ঝাঁঝাঁ করছে, তেপান্তরের মাঠ, নীহার পড়ে শক্ত মাটি পিছল হয়ে আছে—পড়ে গেলাম পা হড়কে। হি হি হি। হ্যাঁ ভাই, নাম কি তোমার? পড়ে গিয়ে অন্ধকারে চোখে তো দেখছিনে—নাম ধরে তখন ডাকতে হবে। আমার নাম তারাফুলি—তারাফুলি বেগম। 'ফুলি' 'ফুলি' করে ডাকে। ওমা, ফুল্লরা-তো তোমার ডাকনামই বা 'ফুলি' কেন হবে না? এখন থেকে তাই। এক-নামের মিতা আমরা।

দু-হাতে ফুল্লরাকে জড়িয়ে ধরে ছিল, মিতের পরিচয় স্বরূপ দুই গালে দুটো শব্দ চুমু। পাগল নাকি মেয়েটা? চুমুতে শেষ নয়—শূন্যে আড়কোলা করে সারা ঘর এক পাক নেচে নিল। কী প্রচণ্ড শক্তি ধরে, বাপরে বাপ!

নেচে কুঁদে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ফুলি বলে, ঐ যে ক'দিন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা হল, সেই থেকে হাঙ্গামা। আগে ফৌজ ছিল না, অন্ধকার লাগত না, ছুটতে হত না, দিনে রাত্রে যখন খুশি হেলে দুলে গল্প-গাছা করে চলে যেতাম।

ফুল্লরা বলতে যাচ্ছিল, আপনি বুঝি—

পাগলি যেন ক্ষেপে যায় : দেবো এক চাঁটি। 'তুমি' ডাকছি, তার জবাবে 'আপনি' 'হুজুর'। কেন রে, পাহাড়-পর্বতের বয়স বুঝি আমার—আর তুমি কচি খুকিটি? 'তুমি' বলতে হবে, বলো—

একগাল হেসে ফুল্লরা বলে, তুমি।

'তুমি' 'তুমি' চলুক আপাতত—

ডান হাত ঘুরিয়ে তারাফুলি হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলে, চলবে এইরকম কাঁটায় আধঘণ্টা। আটটার সময় 'তুই' ধরব। তুমিও 'তুই' বলবে তখন। কিন্তু এটা কি হল ভাই, একছিটে 'তুমি' বলেই চুপ। 'আপনি'র সঙ্গে আরও কত সব বলতে যাচ্ছিলে—বলো এবারে শুনি।

ফুল্লরা বলে, খুব বুঝি এপার-ওপার করে বেড়াও?

অন্য সকলের এপার-ওপার, আমার এপাড়া-ওপাড়া। অঢেল চেনাজানা, অগুন্তি আপনলোক। পালপার্বন বিয়ে-খাওয়া যাত্রাজারি হরবখত লেগে আছে। কত সময় এমনিও গিয়ে গুলতানি করি। রাজধানীর কড়া কড়া আইন খালবিল মাঠ-জঙ্গল পার হয়ে এদ্দুর ঠিকমতো পৌঁছয়নি কখনো। এপার-ওপার জিনিসটা এই হালে বুঝতে পারছি—লড়াইয়ের সময় থেকে। আচ্ছা, বলো তো ভাই—দিনক্ষণ বারতিথি হিসাব করে লোকে শ্বশুরবাড়ি ঘরকন্না করতে যায়—মন কেমন করে উঠল, তক্ষুনি যদি ছুটে না গেলাম তেমন যাওয়ায় সুখটা কি?

ফুল্লরা শুধায় : তোমার বাড়িতে কিছু বলে না?

তারাফুলি হেসে বলে, বলে না আবার! শুধু কি মুখের বলা, মা ধরে ধরে ঠেঙানি দিত। চুলের মুঠো ধরে চক্কোর দিয়েছে কত। তা চুলের মুঠো দিনরাত চব্বিশঘণ্টা ধরে বসে থাকতে পারে না—ছাড়া পেলে সঙ্গে সঙ্গে পিঠটান। এখন আর কিছু বলে না, দেখেশুনে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

বলতে বলতে থেমে গেল। ফুল্লরার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে মাথায় মতলব ঢুকেছে। বলে, পারাপার অনেক রাত্রে—ততক্ষণ কি করা যায়? খিচুড়ি রাঁধিগে চলো, তোমার ক্ষিধে পেয়েছে।

ক্ষিধের দোষ নেই, সেই কোন সকালে বেরিয়ে সমস্তটা দিন কয়েক মুঠো চিঁড়ের উপর আছে। তা বলে ক্ষিধে স্বীকার করতে চায় কোন মেয়ে? ঘাড় নেড়ে ফুল্লরা বেকবুল গেল : নাঃ—

না পাক ক্ষিধে, তবু খেতে হবে। মামুর বাড়ি আমার—তা জানো? মামি না থাক, আমি রয়েছি। নতুন বউ বাড়ির উপর উপোসি থেকে যাবে, কিছুতে তা হতে দেবো না।

তর্কাতর্কিতে না গিয়ে ফুলি হাত ধরে হিড় হিড় করে ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতর-বাড়িতে আনোয়ারের বউ-ছেলেপুলে থাকত, এখন বর্ডার এলাকার বাইরে এক আত্মীয়-বাড়ি চলে গেছে। এখানে থাকতে আইনত যে বাধা আছে তা নয়। কিন্তু ঐ যে বলে 'খেদাই নে তোর উঠোন চষি' সেই গতিক। একছিটে ধান গোলায় থাকবে না, মাঠে গরু-বাছুর ছাড়লে বিপদ, হাটবাজার-দোকানপাট বন্ধ, পড়শিরা বাস ওঠাচ্ছে—ঘরবসত সেখানে কী করে চলবে?

তারাফুলি উনুন ধরাতে লেগে গেছে। ফুল্লরাকে বলে, রাঁধাবাড়া আমিই করব। উনুনে জ্বালটা ঠেলে দিলে কি বাটিটা ঘটিটা এগিয়ে দিলে, এর বেশি তোমায় কিছু করতে হবে না।

ফুল্লরা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, তা বই কি! যশ একলা নিতে দিচ্ছি নে। একজনে বাটনা করবে, একজনে জ্বাল ঠেলবে। হাঁড়িতে চাল চাপাবে একজনে, আর একজনে ডাল। বলি জিনিসপত্তরের জোগাড় হবে তো বটে?

সগর্বে তারাফুলি বলে, বর্ডারে আবার জিনিসের অভাব : তাবৎ হিন্দুস্থানে পাকিস্থানে যা পাও না, বর্ডারে খোঁজ করো—ঠিক মিলে যাবে। লেডিজ ওয়াচ চাই—এই আমার মতন? কোন্ জিনিসটা চাই তোমার বলো।

ফুল্লরা হেসে বলে, চাই চাল-ডাল—খিচুড়িতে যা লাগবে।

সে জিনিস রান্নাঘরেই পাওয়া গেল। বউ চলে গেছে, কিন্তু ক্ষিধেটা নিয়ে যায়নি। আনোয়ার নিজে রান্না করে খায়।

দুই বাংলার মাঝে—(ভুল বললাম, নাক মলছি কান মলছি—পূর্ববাংলা নাম ভূগোলে বাতিল—পূর্ব-পাকিস্তান। পশ্চিম-বাংলা বিহারের গর্ভগত হতে হতে কপাল গুণে বেঁচে রয়েছে।) তেরো শ' মাইলের মতো এজমালি বর্ডার। পাহাড়পর্বত নেই নদ-নালাও তেমন যে আছে, তা-ও নয়। খোঁটা পুঁতে পিতৃসম্পত্তি বাঁটোয়ারা করে, সেই রকমটা। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের উপর সালিশির ভার—নিজেরা পেরে উঠলাম না সাহেব, দু-শ' বছর ধরে বিস্তর কল্যাণ করে এসেছ, যাবার মুখে আমাদের সীমানাটা চিহ্নিত করে দিয়ে যাও। ভারতবর্ষের ম্যাপ সামনে বিছিয়ে দিল (ভুল ম্যাপ, শুনতে পাই), পেন্সিল দিল মুঠোর মধ্যে গুঁজে। সাহেব তখন কী মেজাজে ছিল, কোন মতলব মাথায় ঘুরছিল, খোদায় মালুম। ম্যাপের উপর পেন্সিল বুলিয়ে দিয়েই— প্লেন তৈরি ছিল—সঙ্গে সঙ্গে পিঠটান। সেই পেন্সিলের টানে কত লক্ষ মানুষ, এবং তাদের ঘরবাড়ি ধনসম্পত্তি মানইজ্জত কাটা পড়ে গেল, কোন দিন তার হিসাব হবে না। যাক গে—

ঘাটের ওয়েটিংরুমে দেয়াল ঠেসান দিয়ে রঙ্গলাল চোখ বুঁজে ছিল। আনোয়ার ডাকল, উঠুন—

ধড়মড় করে রঙ্গলাল উঠে পড়ল। স্যুটকেস হাতে নিচ্ছে।

আনোয়ার হেসে বলে, যাওয়া নয়। হাতা-বেড়ি না ধরে মেয়েলোকে কতক্ষণ পারে? রাঁধাবাড়া করল, খেতে ডাকছে।

আলাপ-পরিচয় খাওয়া-দাওয়া লম্বা শপের উপর পাশাপাশি শুয়ে ঘুমানো—সেকালে পায়ে হাঁটার যুগে এই সব চলত। বাপ-দাদাদের মুখে গল্প শুনেছি। রেল-মোটরের তাড়াহুড়োয় উঠে গিয়েছিল—র‍্যাকের পথে আবার এখন চালু হচ্ছে।

একটা গ্রাস মুখে তুলেছে কিনা—তারাফুলির প্রশ্ন : কেমন রান্না হয়েছে?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ফুল্লরা বলে, ভাল হয়েছে—তাই না?

জবাবের অপেক্ষা করে না—ফুল্লরা আবার বলে, নুন তেল আর শুকনো লঙ্কায় রান্না।

তারাফুলি জুড়ে দেয় : এর উপর মশলাপাতি পড়লে কী দাঁড়াত ভেবে দেখুন। এক্ষুনি তো ছুটোছুটি লেগে যাবে, সেজন্যে দেরি করতে পারলাম না।

রঙ্গলাল বলে, এক্ষুনি কেন হবে? হিসেবের ব্যাপার। দশমীতে বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না। তার মানে, রাত দুটোর আগে তো নয়ই—

আগে—অনেক আগে। কপাল ভাল আমাদের—আকাশ দেখুন।

যেই মাত্র বলা, আকাশের দিকে সবগুলো চোখ। দাওয়া থেকে ভাল দেখা যায় না তো উঠানে নেমে পড়ল। কালো মেঘের নিঃশব্দ দ্রুত আয়োজন—ঝড়ঝাপটা বৃষ্টিবাদলা না হয়ে যায় না। দেরিও নেই তার।

তারাফুলি খিল খিল করে হাসে : দায়ে না পড়লে কে আকাশমুখো তাকাতে যায়? লড়াইয়ের সেই ক'টা দিন হরদম আকাশে তাকাতাম—বোমা-টোমা মারে নাকি। আর র‍্যাকের পথে এখন তাকাচ্ছি—অন্ধকার কতদূর?

ক'দিন আগেও রাত্রিবেলা দিব্যি দুর্যোগ হয়ে গেছে। দুর্যোগ মানেই কম্বলের নিচে ফৌজের দল এবং পারার্থীদের মজা। আজকেও তাই—পারের হুকুম পাঁজির হিসাবের আগে এসে যাবে। বহুদর্শীরা বুঝে ফেলেছে— গোণাগুণতি এরা কয়েকটি মাত্র ছিল, কোথা থেকে কারা সব পিল পিল করে এসে আনোয়ারের উঠান ভরে ফেলল।

পারে যাবার মানুষ, তাদের সঙ্গে সঙ্গে

ভিন্ন কাজের মানুষও এক দঙ্গল। পার হবে না এরা, কিঞ্চিৎ ব্যাপারবাণিজ্য করবে। রাজ্যময় মাথা খুঁড়ে যা পেলেন না, খোঁজ করে দেখুন দিকি, সে জিনিস এখানে পেয়ে যেতে পারেন। সর্বদেশে এই ব্যাপার—দেশের চৌহদ্দির মধ্যে না পেলে বর্ডারে গিয়ে খোঁজে। কী চাই বলুন না। তারাফুলি ফুল্লরাকে যেমন হাতঘড়ির কথা বলছিল—লেডিজ জেণ্টস যে প্যাটার্নের যেমন মূল্যের অভিরুচি। অথবা জর্মানির ক্যামেরা, জাপানের ট্রানজিস্টার ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীদের শখ মেটানোর জিনিসই শুধু নয়, ঘরব্যাভারি নিত্য দিনের যতেক জিনিসপত্র। যথা : সুপারি পাট হলুদ লবঙ্গ বিড়িপাতা ধানচাল—মন ও কুইণ্টাল হিসাবে গাড়ি ভরতি যার চলাচল। সেজন্য অবশ্য মীরবহর ঘাট নয়—বিভিন্ন স্থান, আলাদা মানুষ, পৃথক ধরনের বন্দোবস্ত।

কী পেতে চান বলেই দেখুন না। আকাশের চাঁদ বাঘের দুধ এমনি পাঁচ-সাতটা জিনিস বাদ দিয়ে বলবেন। মেঘ-ভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় ব্যাপারিরা খদ্দের শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। চোখ টিপে দিন কোন একটির দিকে—যেন মাটিতে হেঁটে নয়, বাতাসের উপর ভেসে নিঃসাড়ে কাঁছে এসে দাঁড়াবে। জিনিস বলে দিন ফিসফিসিয়ে—জোব্বার কোন একটা ছিদ্রে হাত ঢুকিয়ে ম্যাজিকের মতো বের করে আনবে। নিতান্ত হাতে হাতে না পারলে দশ-বিশ মিনিটের সময় চেয়ে নিয়ে খন্তা হাতে খনি খুঁড়তে ছুটল। মাটির নিচে এখানে সেখানে গোপন খনি। বোমা-টোমা পড়ে ধরুন আমরা সব খতম হয়ে গেছি, দেশের মাঝখান দিয়ে একদা বাঁটোয়ারার লাইন টেনেছিলাম—ইতিহাসের পাতা ছাড়া কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই। চাষীর লাঙলের ফলায় তখন দামি দামি মালপত্র উঠে পড়ছে—এক গাঁটরি সিল্ক, তিন গ্রোস ঘড়ি, পাঁচ বাক্স ফাউন্টেন-পেন—কী মজাটা ভাবুন দিকি!

জ্যোৎস্না কমতে কমতে দপ করে নিভে গেল প্রদীপ নেভার মতো। ভারি সুলগ্ন—ঘনান্ধকার রাত্রি তায় ধারাবর্ষণ। মিলিটারি চলাচল থেকে সিগন্যালিং বস্তুটা ভাল রপ্ত করে নিয়েছে। ওপারের ঘাট থেকে মীরবহর মশায় আলো ফেলবেন—নিশানা পেলেই রওনা। আনোয়ার কখন ইতিমধ্যে পাঁচিলের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মাঠপারে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। যেমন স্টিমারের সারেং তাকিয়ে থাকে। ঈশ্বরও নাকি—ধার্মিকেরা বলে থাকেন।

চৌকাঠ থেকে হঠাৎ আনোয়ার লাফ দিয়ে পড়ল। দৌড়। পিছনে কে-একজন মৃদু কণ্ঠে বলে, জয় হোক!—ব্যাপারিদের কেউ হবে। কানে ঢুকল না কারো। আনোয়ারের পিছু পিছু সকলে দৌড়চ্ছে। বিপদ যত-কিছু লোকালয়ের মধ্যে। কপালগুণে বৃষ্টি-

যাদলা অন্ধকার পেয়েছ তো এক ছুটে লোকালয়-সীমা পার হয়ে যাও।

তারাফুলি ফুল্লরার হাতে হাত জড়িয়েছে। ছুটোছুটির মধ্যেও রঙ্গরস। ফুল্লরা বলে, কামানের গোলা হয়ে ছুটেছি—মামার উঠোন থেকে তেপান্তরের মাঠে এক ঝাঁক গোলা ছুঁড়ে দিয়েছে।

গোলাই বটে! পরিপাটি উপমা। মানুষ-গুলোর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই—অপর ইন্দ্রিয়গুলো অকর্মণ্য। আছে শুধুমাত্র পা—দৌড়ানো সেই পাগুলোর একমাত্র কাজ এখন। তল্লাটে ছেড়ে মাঠে গিয়ে পড়া। সেই মাঠের পারে পুনশ্চ লোকালয়—হিন্দুস্থানের লোকালয়। জওয়ানেরা সেখানেও বন্দুক তাক করে আছে। কিন্তু বন্দুক ডরাবেন তো ব্লাকের পথে কেন. খিল এঁটে দিয়ে ঘরে থাকলেই তো ভাল।

তারাফুলি থেমে দাঁড়িয়ে বলে, হাঁপ ধরে গেছে ভাই। তোমার বর দেখ কত পিছনে। কী ছুটছেন—আহা রে! বউ হরণ করে নিয়ে গেল, ভয়টা বোধহয় সেই। বসা থাক কোনখানে—সকলে এসে পড়ুক।

কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। খানিক দূরে এগিয়ে উঁচু জায়গা মিলল। ঝোপঝাড়, ইট ছড়ানো চতুর্দিকে—জোড়াপিলপে। পিলপের উপর ধপ করে বসে পড়ল।

তারাফুলি বলে, কোথায় বসলে জানো? সীমানার পিলপে। তুমি পাকিস্তানের পিলপেয় আমি হিন্দুস্থানের পিলপেয়।

ফুল্লরার সময়োচিত প্রস্তাব : লড়াই হোক তবে—

তারাফুলিও রাজি : হয়ে যাক একচোট—

বক্সিং-এর ভঙ্গিতে দু-হাত মুঠো করে এ-ওর দিকে কটমট চোখে তাকায়। এরই মধ্যে ফুল্লরা চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল : দেব-দৈত্য যক্ষ-রক্ষ গন্ধর্ব-কিন্নর নাগ-নিষাদ সর্বভূতে চেয়ে দেখ আমাদের লড়াই—

বাহু দিয়ে কঠিন পাকে গলা জড়িয়ে ধরল। তারাফুলি বলে, আঁ-আঁ, দম আটকে সত্যি সত্যি যে মারা যাই—

ফুল্লরা গম্ভীরভাবে বলে, লড়াইয়ে মৃত্যু—নাক কাঁদতে নেই।

সকলে এক জায়গায় হয়েছে। বৃষ্টি থেমে গেল হঠাৎ—কালবৈশাখীর যা দস্তুর। বাতাসটা খর—ঝোপের ডালপালা বাতাসের তোড়ে সপাং-সপাং করে গায়ের উপর চাবুক মারছে।

তারাফুলি আঙুল তুলে দেখায় : মাঠ-কিনারে ঝুপসি মতন ঐ যে —

কিছুই দেখে না ফুল্লরা। নীরন্ধ্র অন্ধকার শুধু।

তারাফুলি বলে যাচ্ছে, মীরবহর মশায়ের তেঁতুলগাছ ঐ। পিছনে অফিস। আর কি, ভয়ের জায়গা পার হয়েছি—হেলেদুলে যাওয়া যাবে এবার।

বিশ্রাম নিয়ে ফুর্তির সব উঠে পড়ল। যাচ্ছে—যাচ্ছে—

আঁধার মাঠ চিকচিক করে উঠল যে হঠাৎ। কী সর্বনাশ, এক-আকাশ মেঘ বাতাসে সমস্ত উড়িয়ে নিয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশে চাঁদও দেখ শয়তানি হাসি হাসছে। আধ ঘণ্টা আর মেঘ-চাপা থাকলেই চুকে-বুকে যেত।

তারাফুলির কানে কানে ফুল্লরা বলে, কেন যে ওঠে চাঁদ বর্ডারে—সকলের গালি খেয়ে মরে।

বিপদটা আরও হয়েছে, দুর্যোগের উল্লাসে মাঠ কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে একেবারে জওয়ানদের ঘাটির সামনে এসে পড়েছে। রাত দুপুরে মাঠ পার হয়ে মানুষের দল পিল পিল করে ওপারের দিক থেকে উঠে আসছে—অবস্থাটা ভাবুন একবার।

সে যাই হোক, আনোয়ার ঘাবড়ায় না। ব্লাকের কাজে নামত না তাহলে—পাঠশালে গুরুগিরি করত আর উপোস করত। অভয় দিল সকলকে : কিছু না, ঠিক চলে যাব। তবে মেয়েলোক রয়েছেন। ফুলিকে নিয়েও নয়—আরও একজন ঐ যে—

ফুল্লরা রাগে টগবগ করছে : তুমি পারো আর আমি পারিনে—সেটা কোন বস্তু, শুনি?

ফুলি বলে, জ্যোৎস্নার মধ্যে খাড়া হয়ে চললে দূর থেকে নজরে এসে যায়। মামু তাই বলছে, গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটলে কেমন হয়? একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে?

ফুল্লরা লুফে নিল : সাপে তো তাই করে। টিকটিকি-গিরগিটি কেন্নো-বিছের পর্যন্ত করে। আস্ত মানুষ হয়ে সামান্য এইটুকু পারব না? ছিঃ—

টুক করে মাটির উপর পড়ল। এবং গড়াচ্ছে অন্য সকলের মতো।

সকরুণ কণ্ঠে তারাফুলি বলে উঠল, এত কষ্ট বরের বাড়ি যেতে—

কষ্ট কিসের—মজা। মজাই তো। গাড়ি-পালকি হাঁকিয়ে অন্ধ খঞ্জ সবাই যেতে পারে। আমার মতন যাওয়া কটা বউ গিয়েছে শুনি?

কিন্তু কিছুতে কিছু হল না, তীরে এসে বুঝি তরী ডোবে। আবছা জ্যোৎস্নায় দেখা যায়, ছায়ামূর্তি অনেকগুলো ধেয়ে আসছে। জওয়ানরা বেরিয়ে পড়েছে তবে। আর কী হবে! খাড়া হয়ে দু-হাত তুলে দাঁড়াও। হাত উঁচু দেখলে গুলি করবে না।

দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্বাসও বুঝি পড়ে না।

কাছে এসে পড়ল—জওয়ান নয়, বন্দুকও নেই। খোদ মীরবহর লোকজন নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, দেরি দেখে শঙ্কা হচ্ছিল। আনোয়ারের উপর ধমক দিয়ে উঠলেন : আচ্ছা মানুষ তো! আমার উপরে এইটুকু ভরসা করতে পার না! কালবৈশাখীর বৃষ্টি-ঝড় কতক্ষণ থাকতে পারে, তার একটা হিসেব নেই বুঝি? মিলিটারির ভয় থাকলে আরও রাত করে আসতে বলতাম, ক্যাম্প খালি করে কোথায় ওরা সব চলে গেছে। ভয় যা কিছু তোমাদের ওদিকে। বস্তু ভাবনার মধ্যে ফেলেছিলে তোমরা।

আর সেই সঙ্গের লোকগুলো ছেঁকে ধরেছে পারের মানুষদের : কী এনেছ বলো। ব্লাকে এসেছ খালি-হাতে তামা-তুলসি ছুঁয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। দর আমরা দিতে পারিনে, শুধু বুঝি গঞ্জের লোকেই দেয়? বের করো কি আছে—

*

শেষরাত্রে বাস পেয়ে গিয়েছিল, সকাল-বেলা ইস্কুলবাড়ির সামনে বাস থেকে নামল। বাড়ি এখান থেকে—জম্ববমিঞার মাপে নয়, চেনের মাপে ঠিক ঠিক আধ ক্রোশ। সাইকেল-রিকশা ভাড়া করে ক্লান্ত রঙ্গলাল উঠে পড়ছিল। ফুল্লরা মনে করিয়ে দেয় : সাজপোশাক হবে না?

কাল রিকশা থেকে নেমে এক সাজ বদল করে নতুন সাজ পরেছিল, এখন আবার সেই আগের সাজে ফিরবে। সুবিধাও আছে—সকালবেলা ইস্কুলবাড়ি খালি। একটা ঘরে ঢুকে গেল ফুল্লরা। বেরুল যখন, পরনে ঝকমকে বেনারসি—একেবারে পটের পরীটি। আর রঙ্গলালই বা এতক্ষণ একলা বসে বসে কি করে—লুঙি ছেড়ে শান্তিপুরে ফিনফিনে ধুতি পরেছে, কাদা-মাখা সার্ট ছেড়ে গরদের পাঞ্জাবি পরেছে। শ্বশুরবাড়ি জামাই হয়ে ঢুকেছিল তখনকার সেই মূর্তি।

সাইকেল-রিকশা। বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিল। শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিতে তিনি জড়িয়ে ধরে বললেন, পথে কষ্ট হয় নি তো?

প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে ফুল্লরা বলে, না মা—

চেহারা এবং বেশবাসেও তাই বোঝা যাচ্ছে বটে।

ফুল্লরা বলে, কষ্ট কিসে হবে মা, পারা-পারের দরাজ বন্দোবস্ত। ট্যাক্সি একেবারে বর্ডারের গায়ে নামিয়ে দিল। লাইনটুকু পার হয়েই দেখি, বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাস থেকে নামলাম তো রিকশা। মাটিতে পা-ই ঠেকল না—কষ্ট হবে কেন? কাপড়-চোপড়ই বা ময়লা হবে কিসে?

অল্পে তুষ্ট (২)
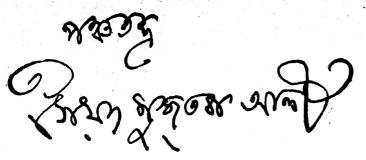
ব্যক্তি বিশেষের বেলা পুরুষকারই যে রকম শেষ কথা নয়, একটা জাতি বা দেশের বেলাও তাই। আমরা যতই ভেবে চিন্তে পারলামেনটে তর্কাতর্কি করে, কাগজে কাগজে পাবলিসিটি দিয়ে আটঘাট বেঁধে একটা প্রোগরাম বা প্ল্যান চালু করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তার ফল যে কি উতরাবে সে-সম্বন্ধে আগের থেকে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না। একটা দেশের ধর্ম, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলো এমনই বিরাট বিরাট ব্যাপার যে এগুলোকে মানুষ আদৌ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কি না সে নিয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহের উদয় হয়; মনে হয় কি যেন এক অদৃশ্য নিয়তি মানব সমাজকে শাসন করে চলেছে, তার উপর আমাদের কর্তৃত্ব যদি বা থাকে সে অতিশয় যৎসামান্য। তা হলে প্রশ্ন উঠবে, এসব বিষয় নিয়ে আমাদের কি তবে চিন্তা করবার কিছুই নেই? অন্ধ নিয়তিই সব! তার নাম অদৃষ্ট, কর্মফল, কিস্মৎ—যে নামেই তাকে ডাকুন।

হজরৎ মুহম্মদ একদিন বেদুইনদের সামনে পুরুষকার ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পর এক বেদুইন তাকে শুধালে 'তবে কি, হজরৎ উটগুলোকে আমরা দড়ি দিয়ে না বেঁধে আল্লার ভরসায় (কিস্মতের উপর) ছেড়ে দেব?' হজরৎ বললেন, 'না, দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে তারপর আল্লার উপর ভরসা রাখবে।' অর্থাৎ আমরা আটঘাট বেঁধে যতই প্ল্যানিং করি না কেন, সকালবেলা বেদুইনের মতই হয়তো দেখবো, উট হাওয়া, প্ল্যান ভণ্ডুল। কিন্তু তবু উট বাঁধতে হয়, প্ল্যানিং করতে হয়।

বৌদ্ধধর্মও নাকি বলেন, মানুষের জীবন নদীস্রোতে নিচের দিকে চলমান গাছের গুঁড়ির মত; ধাক্কাধাক্কি করে সেটাকে খানিকটে ডাইনে বাঁয়ে সরানো যায় কিন্তু স্রোতের উল্টো দিকে চালানো যায় না।

এবং কারল মারকসও নাকি বলেছেন, ইতিহাসের নিয়তি নানা সামাজিক প্যাটার্ন পরিবর্তন করতে করতে সর্বশেষ প্রলেতারিয়া-রাজ আনবেই আনবে। মানুষ সজ্ঞানে আপন চেষ্টা দ্বারা তার গতি দ্রুততর করে দিতে পারে মাত্র।

অতএব তর্কবিতর্ক করি, চেষ্টা দি:—কিন্তু জানি, শিক্ষার্থী আজ দোভাষীই হোক, আর ত্রিভাষাই বলুক—আখেরে সে একটি ভাষাই শিখবে, তাই দিয়ে জ্ঞানার্জন করবে, কাজকর্ম চালাবে।

পাঠককে ফের বলছি, এখানে আমি বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলছি। অর্থাৎ জোর করে দেশের তাবৎ ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীকে দুটো বা তিনটে ভাষা শেখাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তারা নিছক পরীক্ষা পাশ করার জন্য ভাষা শিখবে কিন্তু পরবর্তী জীবনে দ্বিতীয় বা/এবং তৃতীয় ভাষার চাবি দিয়ে ঐ সব ভাষার জ্ঞান ভাণ্ডার খুলে ওই জ্ঞান জীবনে সঞ্চারিত করে চিন্তাধারাকে বহুমুখী করবে না—অথচ বিদেশী ভাষা শেখার প্রধান উদ্দেশ্য তো ওইটেই।

এবারে একটি উদাহরণ নি।

নরমানরা ইংলণ্ড জয় করে সেখানে চালালো ফরাসী ভাষা। শুধু যে রাজ-দরবারেই ভাষা ফরাসী হয়ে গেল তাই নয়, শিক্ষাদীক্ষার বাহন, সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের মাধ্যম, নাট্যশালা সঙ্গীতের ভাষা সব কিছুই তখন ফরাসী এবং ফরাসীর মাধ্যমে তার জননী লাতিন। পাকা তিন শ'টি বছর চললো ফরাসী ভাষার একচ্ছত্রাধিপত্য। ইংরিজীতেও যে কোনো প্রকারের চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করা যায় সে-কথা দেশের ভদ্রজন সম্পূর্ণ ভুলে গেল। ফরাসী ভাষা নাকি আল্লাতালা স্বয়ং এমনই মধুর এমনই পরমপ্রিয় করে নির্মাণ করেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি (এদেশেও আমরা সংস্কৃতকে দেবভাষা খেতাব দিয়েছি এবং সন্ত তুকারাম তাই বক্রোক্তি করেছিলেন, "সংস্কৃত যদি দেব-ভাষা হয়, মারাঠী কি তবে চোরের ভাষা?")। ...পুরো তিন শ'টি বছর পর ইংলণ্ডের রাজার মাতৃভাষা আবার হল ইংরিজী কিন্তু হলে কি হয় ফরাসী যদিও ক্রমে ক্রমেই হটে যেতে লাগলো তবু দেখা যাচ্ছে এই সেদিন—১৭ শতাব্দী অবধি আইন-আদালতের ভাষা ছিল ফরাসী।১

ইংরিজী একদিন পদ পেল বটে, তাই বলে কি ফরাসী 'কর্তার ভূত' কাঁধ থেকে

---

১ আইন ব্যবসায়ীদের মত রক্ষণশীল প্রাণী ত্রিলোকে দুর্লভ। ইংরিজী অবহেলিত বা বিতাড়িত হলে এই বেহেশতী ভারতভূমি যে কোন্ দোজখে পরিণত হবে তারই কল্পনায় অধুনা শ্রীযুত ছাগলা (ওটা ছাগলাই, স্যর, চাগলা নয়। পর পর পুত্রসন্তান মারা গেলে যে রকম আমরা 'এককড়ি' 'ফকির' 'নফর' নাম রাখি গুজরাতীরা তেমনি 'ছাগলা' (ছাগল), মাকড় (পিঁপড়ে, ক্রিকেটার), ঝিঁড়া (জিন্না, ছোট) রাখে) করুণ আর্তনাদ করে বলেছেন: এই এক শ বছর ধরে আইন ব্যবসা যে (পর্বত প্রমাণ) আইনের কেতাব পত্র ইংরিজীতে রচনা করেছেন সেটা লোপ পাবে, তার ব্যবহার থেকে ভারতবাসী বঞ্চিত হবে। এর উপর দীর্ঘ মন্তব্য না করে শুধু বলবো, 'এদেশ থেকে ইংরিজীকে নিরঙ্কুশ বিতাড়িত করার জন্য এই একটি মোক্ষম যুক্তি পাওয়া গেল বটে!' এবং ছাগলা সম্প্রদায়কে সবিনয় প্রশ্ন : 'তবে কি প্রলয়াবধি এদেশে আইনের বাহন ইংরিজীই থাকবে?' কারণ যত দিন যাবে, পর্বত যে 'পর্বততর' হতে থাকবে! মায়া যে 'মায়াতর মায়াতম' হতে থাকবে! অবশ্য আমি ইংরিজী বিতাড়নের জন্য হন্যে হয়ে উঠিনি, একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়ের মত।

এত সহজে নামে? ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত M.Edরা বলতে পারবেন কবে বিলেত থেকে ফরাসী কমপালসরি সবজেকটরূপে লোপ পেল। কিন্তু তারপরও, আজ অবধি, ঐ ফরাসী অপশনাল হিসেবে পড়াবার জন্য বিলেত প্রতি বৎসর কত খরচা করে?

এবং আজও ইংরেজ মুখে ফরাসীকে নিয়ে যতই মস্কারা করুক না কেন, জেবে দুটি কড়ি জমামাত্রই হালিডে করার জন্য 'পরাণ ভয়ে হরিণের' মত ছুটে লাগায় প্যারিস পানে২—মনে আশা সেইসব কুকীর্তি করবে, যেগুলো আপন দেশে করা যায় না—সিম্‌প্লি নট ডান্। ইংরাজী সাহিত্য যে ফরাসী সাহিত্যের কাছে কতখানি ঋণী তার জরিপ করা আমার কর্ম নয়। শব্দবিদ না হয়েও বেপরোয়া আন্দাজ বলি, ইংরিজীর শতকরা নব্বইটি চিন্ময় শব্দ (অ্যাবসট্রাকট ভকাবুলারি) হয় ফরাসী নয় ওরই মারফত লাতিন গ্রীক থেকে নেওয়া।

আরো কত শত বাবদে আজো ইংরিজী ভাষা, সাহিত্য, রান্নাবান্না (মেনুটা এখনো ৮০% ফরাসিস; বীফ, মাটন্, পর্ক্, ভীল, ভেন্‌জন্—গরু, ছাগল, শুয়োর, বাছুর, হরিণের মাংস—সবকটা শব্দ ফরাসী থেকে এসেছে), আদব-কায়দা (R. S. V. P থেকে P. P. C.), মদ্যাদি (কন্যাক্ থেকে শ্যাম্পেন) ফরাসীর কাছে ঋণী—বস্তুত বিলেতে, আজো, সভ্যতা ভদ্রতার কোন্ না বস্তু ফরাসী প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল, বা আছে?

---

২ এস্থলে বক্ষ্যমান রচনাটি যদি আমাকে কপালের গর্দিশবশত ইংরিজীতে লিখতে হত তবে 'পরাণ ভয়ে হরিণের' ছোটাটা হুবহু ফরাসী ইডিয়মে লিখতুম—Ventre a terre—অর্থাৎ with belly to ground; এমনি সামনের দিকে ঝুঁকে প্রাণপণ ছুটেছে যে মনে হয় মানুষটার পেটটা বুঝি মাটি ছুঁয়ে ফেলেছে! (ফরাসী শব্দতত্ত্বের জন্য 'ভাঁৎর' (ভেনট্রিলিকুইস্‌ট্, পেট থেকে যে কথা বের করে; 'তের' টেরেস্‌ট্রিয়াল=পার্থিব তুলনীয়)

*

একদা কতিপয় শিক্ষাবিদ ইংরেজের মনে প্রশ্ন জাগলো, এই যে আমরা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য শেখানোর জন্য আমাদের দেশে প্রায় হাজার বছর ধরে এত টাকা ঢেলেছি, দেখি তো, তার ফলটা কি হয়েছে? জনৈক ফরাসী ভদ্রলোককে নাবানো হল লণ্ডনের রাস্তায়। যারই বেশভূষা আচার আচরণ দেখে মনে হল লোকটি মার্জিত উচ্চশিক্ষিত তাকেই ফরাসী ভদ্রলোক ফরাসীতে শুধলো, 'আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি; বলতে পারেন, কোন্‌দিকে গেলে সবচেয়ে কাছের টূাব স্টেশনে পৌঁছব?' কথিত আছে ৯৩ না ৯৭ নম্বরের ভদ্রলোক প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন বটে কিন্তু ফরাসীতে উত্তর দিতে পারলেন না। ১০৩ না ১০৭ নম্বরের জন্য বুঝি কোনোগতিকে অতি ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে উত্তরটা দিলেন।

এরপর আরো নানা উদাহরণ, নানা যুক্তি দেখিয়ে প্রাগুক্ত গবেষকগণ অতিশয় ন্যায্য প্রশ্ন শুধিয়েছেন, তাহলে ঐ 'পোড়ার' ফরাসী শেখাবার জন্য এ-দেশে অত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালার কি প্রয়োজন?

*

এ বিষয়টি আরো সবিস্তর আরো উদাহরণ দিয়ে গুছিয়ে বলতে হয়। আমার শক্তি অতিশয় সীমাবদ্ধ। তদুপরি যখন জানি, যা হবার তা হবেই, তখন কেমন যেন উৎসাহের অভাবে কলমের কালি শুকিয়ে যায়। তবু লিখছি, এলোপাতাড়ি হাবি-জাবি বিস্তর বেহুদা একসপেরিমেনট করার পর মার খেয়ে খেয়ে যখন মাত্র একটি ভাষাই বাধ্যতামূলক করা যায় এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার করবো, যা অন্যান্য স্বাধীন দেশে করে ফেলেছে, তখন কেউ যেন না বলে, এ-যুগের, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যুগের লোকের বিন্দুপরিমাণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শক্তি ছিল না।

ইংরিজী তো এদেশে প্রায় এক শ' বছর ধরে কমপালসারি ছিল। ইংরেজী শিখলে আর্থিক সামাজিক উন্নতি হবে বলেই লোকে ইংরিজী শিখেছে। জ্ঞানার্জন করে চিত্তপ্রসারের জন্য ইংরিজি শিখেছে এ-কথা বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। এখন বলুন, কটা লোক অবসর সময় ইংরিজী বই পড়ে, ইংরিজী বই কেনে? এতো সাধারণ জনের কথা, কিন্তু প্রত্যয় যাবেন না, আমার পরিচিত একটি ছোকরা ইংরিজীর লেকচারার সর্বক্ষণ বাঙলা বাঙলা করছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার সুন্দর দখল, কৌতূহল প্রশংসনীয়। ওদিকে ইংরিজীর বেলা সেখানে পড়াশুনো করে আরো চৌকশ হবার কোনো চাড় নেই। জানে, যেটুকু ইংরিজী রপ্ত আছে সেইটে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে সে একদিন রীডার ও যথারীতি প্রফেসরও হবে।

এই সেমি-কমপালসরি সংস্কৃত, ফারসী, আরবী (বা পালি লাতিন) নিন। সায়েনসে সীট পায়নি বলে, বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, প্রায় অনিচ্ছায় বি এ পাশের সময় সংস্কৃত ছিল। হয়তো বা অনার্সও ছিল। তাদের কজনকে আপনি অবসর সময় সংস্কৃত (বা ফারসী) পড়তে দেখেছেন, তার শেলফে নূতন কেনা সংস্কৃত বই দেখেছেন? ফারসী তো অতি সরল ভাষা—ক'জন ফারসী অনার্সওলা গ্রাজুয়েট ফারসী 'আউট-বুক' পড়ে?

অবশ্য যাঁরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় দুই বা তিনটি ভাষা শেখেন—বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। অধ্যাপক সত্যেন বোস স্বেচ্ছায় ফরাসী জরমন শিখেছেন। এখনো ওই দুই ভাষায় বই পড়েন॥

'কি লিখলে? পিওতমো? ভালো লিখেচো।"—নাকছাবিটা মুচকে একটু হাসলো সোনা, বললো—"ওই নামেই তো ভালোবাসার লোককে ডাকতে হয়। তাই না?" পুরো চিঠিটা পড়ে শোনালাম তারপর: "দু' মাস আগে এসেছিলে, বলে গিয়েছিলে পরের শনিবার এসে দুদিন থাকবে, অথচ তোমার দেখা নেই! আমাকে ভুলে গেছ নিষ্ঠুর? আমার কথা তোমার মনে পড়ে না? চিঠি লিখছি আর আমার ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে কুচবিহারে চলে যাই, তোমার বাড়ির ছাদে গিয়ে বসি, দেখি, কী রত্ন পেয়ে তুমি আমাকে ভুলে গেছ পাষাণ"...ইত্যাদি। সোনা খুব খুশী। তোরঙ্গের ভেতর একটা গয়নার বাক্স, তার ভেলভেটের নিচে চিরকুটে ঠিকানা লেখা রণজিৎ পোদ্দার মশাইয়ের, যার প্রতি এই প্রেমপত্রটি নিক্ষেপ করা হচ্ছে। খুব যত্ন করে খামে জিভ বোলালো সোনা, সাঁটলো, মোহন চাকরকে দিয়ে তক্ষুণি, সেই রাত দশটায় দিল ডাকে পাঠিয়ে। এবং কৃতজ্ঞতাবশত একপাত্র মদ খাওয়ালো পত্রলেখককে।

ইচ্ছে করছে, পাখি হয়ে, উড়ে কুচবিহার চলে যাই তোমার বাড়ির ছাদে গিয়ে বসি

বললাম, "আমার কিন্তু ভালো লাগছে না। কে এমন কার্তিক ওই রণজিৎ পোদ্দার লোকটা, যে অত অনুনয়-বিনয় করে আসতে বলছিস? আবার আমাকে দিয়েই পেয়ারের নাগকে চিঠি লেখাচ্ছিস!"

"এই দেখ খোকার হিংসে হয়েচে আবার!" সোনা একটু আদর করে বললো—"রাগ করে না লক্ষ্মী ছেলে। আসলে কী জানো, ওই লোকটা মাসে মাসে আমায় দু'শো টাকা দেয়। ব্যবসা আছে কিসের যেন। কলকাতায় কাজে আসে মাসে একবার-দু'বার, তখন এখানেই ওঠে। একটা বাঁধা রোজগার—বুঝতেই পারচো। উটকো লোকের ওপর ভরসা করে কি পেট চলে এ-লাইনে!...চলে গেলে তো অন্য কোনো মেয়ের ঘরে বসবে, তাই আমি ধরে রাখতে চাইচি। নইলে, গেরস্ত মানুষ যদি ঘর-সংসার ভালো বেসে এদিকে আসা বন্ধ করে দেয়, তাতে কি আমি বাদ সাধবো? আমি কে তোমাদের ভালো চাই না? গণিকার মুখে আত্মীয়তা-ভরা প্রবোধ শুনলে স্ত্রৈণও স্বৈরাচারী হয়ে যায়। আমরা তো দুঃখী, ভবঘুরে, স্নেহ পাবার জন্যে ব্যাকুল।

আরেকদিন, কিঞ্চিৎ উত্তুঙ্গ অবস্থায় শরণাপন্ন হয়ে দেখা গেল, দিদির ঘরে দরজা বন্ধ পরদা ফেলা নেইকো ঠাঁই! ব্যাপার কী? মোহন সংবাদ বহন করে নিয়ে গেল ভেতরে: সেই জংলা-জামা লোকটা এসেছে। অমনি দেবীর আবির্ভাব—পেটিকোট বুকের ওপর পর্যন্ত তুলে উদ্ভাসিত নাকছাবিটি নেড়ে ফিসফিস করে বললো "সে এসেছে। তোমার লেখা চিঠি পেয়ে ছুটে এসেচে বেচারি। জানো, ওর বউয়ের খুব অসুখ করেছিল কিনা, তাই ও কামাই করেছিল এতদিন। আজ আর কাল—এ দুদিন থাকবে। তুমি পরশুদিন এসো লক্ষ্মীটি—অনেক কথা আছে। লক্ষ্মী ভাই আমার। কিছু মনে করে না। আসবে কিন্তু মাথার দিব্যি।

সে এসেছে

যদি দুপুরবেলা আসো তো দুজনে মিলে সিনেমা দেখবো।" খানকির মুখে ভাই-ডাক শুনলে শরীর জল হয়ে যায়।

ফিরে গেলেও খুশী না হয়ে পারা যায় না। আমার লেখা প্রেমপত্র লক্ষ্যভেদ করেছে, তারই আনন্দ। ছেলেবেলায় যাদের প্রেমপত্র পৌঁছে দিয়েছি নিজ হাতে, তাদের কিছুই সুবিধে হয়নি শেষ পর্যন্ত; নিজের প্রেম-নিবেদনগুলো কীভাবে ক্রিকেট বলের মতন ফিরে এসেছে দ্বিগুণ বেগে—সে খবর তো আপনারা অনেকেই জানেন। তবু, চোখের সামনে একটি মেয়ের সঙ্গে একজন পুরুষের (পুরুষ না আপদ!) পুনর্মিলন ঘটিয়ে দিলাম তো। কিন্তু মাথার দিব্যি দিলেই তো পরশু আসা যায় না। আবার কবে একটু নেশা হ'লে ওর মুখখানি মনে পড়বে, ওর নাকছাবিটার জন্যে মন কেমন করবে, সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা।

মাস দুয়েক হবে, কি তারও কিছু বেশি। এর মধ্যেই এত পরিবর্তন হয়েছে যে আগের ঘরখানাকে চেনা যায় না। গদিসুদ্ধ বিছানাটি ওর মেজে থেকে নতুন খাটের ওপর উঠেছে। একজোড়া সোফা বসেছে ঘর জুড়ে, ঘরের কোণে টেলিফোন। কালী রামকৃষ্ণ ও জগন্নাথের ছবি সরিয়ে-নড়িয়ে দেয়ালের মাঝখানে একটা আয়না-দেয়া টেবিল। সোনার অবস্থা ফিরে গেছে।

—"এ-সব কি কুচবিহারের টাকায় কেনা?" প্রশ্নের জবাব দিল না সোনা। প্রতিপ্রশ্ন করলো, "তুমি সেদিন এলে না কেন? আমি সারা সন্ধেবেলা তোমার জন্যে বসেছিলাম। দুটো লোক ফিরিয়ে দিলাম..." তারপর বললো—"এ-সব ছাড়াও

আরো কী দিয়েছে দেখবে?' ব'লে আলমারি থেকে বার করে একটা নেকলেস দেখালো। "ও কি বলে জানো? বলে, আমায় নাকি ভালোবাসে! বেটাছেলে হয়ে কাঁদলো জানো, বলে, আমাকে ও বিয়ে করতে চায়। পাইকপাড়ায় বাড়ি কিনে দেবে আমার নামে; যেন এ-লাইন ছেড়ে দিই। শোনো কথা! মেয়েছেলের কি দুটো বিয়ে হয়?"

এইখানেই সোনার মতন বারবনিতাকেও বোঝা যায় না। ওর যে ছোট বেলায় একটা বিয়ে হয়েছিল, ওর স্বামী যে মুর্শিদবাদ জেলার কোনো এক গ্রামে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে—অভাব কিংবা জৈবিক তাড়না যে সোনাকে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল তিন বছর আগে—এসব তুচ্ছ কথা সোনা ভুলতে পারেনি। নিরক্ষর ব'লেই হয়ত বাঙালী মেয়ের সংস্কার ওর চোখে-মুখে অত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। মনে হলো সোনা আমাদের কারো কারো মতন জীবিকাকে বিশ্বাস থেকে পৃথক করে রাখতে পেরেছে। বহু ব্যবহৃত শরীরটাকে পচতে দেয় নি।

বললাম, "স্বামীর জন্যে ভাবিস এখনো? তা হলে ছেড়ে এলি কেন? সে তো খেতে-পরতে দিতে পারে না, বউকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করে—সেই টাকায় নিজে গিলছে দুবেলা বেহায়ার মতন। ও তো কুকুরেরও অধম।" অমনি সোনা ছুটে এসে মুখ চেপে ধরে। "খবরদার, ও কথা বলতে নেই। কিচ্ছু না পারুক, সে তো আমার স্বামী, আমার সিঁথির সিঁদুর।...তুমিই তো বলেছিলে, সিঁদুর পরলে আমায় সুন্দর দেখায়। একবার ভাবো তো, এই সিঁথিটা সাদা হয়ে গেছে—আমি বিধবা হয়েছি। তখন কী নিয়ে বাঁচবো?"—সোনার চোখ ছলছল করছে—"যতই পাপ করি না কেন একটা খুঁটি তো আমার আছে, একটা অহংকার।"

নিরক্ষর সোনা এইভাবে ক্রমশ আরো রহস্যময় হয়ে যেতে লাগলো। শুনলে ওর অহংকারকে ঈর্ষা করতে প্রবৃত্তি হোত না আপনার; কিন্তু সেই কুচবিহারের কুষ্মাণ্ডটির জন্যে মায়া হতো। এত আসবাবপত্র গয়নাগাটি দিয়েছে যে, মফস্বলের লোক—হয়ত ভালোও বেসে ফেলেছে অসাবধানে, যা পেলে মাঝারি-গোছের একটি সামাজিক মেয়ের জীবন ধন্য হয়ে যায়; কিন্তু সোনার মতন গণিকার হৃদয় সে জয় করতে পারেনি। ভাবুন তো, সেই পঙ্গু লোকটা মুর্শিদাবাদ জেলার এক নগণ্য গ্রামে অবশ পোকায়-ধরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে নবাব হয়ে বসে রয়েছে নির্বিকার। তক্তপোশের মতো দেখতে ওর মসনদটি টলাতে পারে এমন সাধ্য আছে কার?

আমেরিকান কবিতায় এলিয়ট-বিরোধী

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আমেরিকান কবিতায় এলিয়ট-বিরোধী একটি ঐতিহ্য (ধারা?) ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে। এই বিরোধিতা অবশ্য শুরু হয়েছিল দীর্ঘকাল আগে—বস্তুত 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ ১৯২২ সালে। বিরোধীপক্ষের কুলচূড়ামণি ছিলেন উইলিয়মস কারলস্ উইলিয়মস, যাঁকে অনেক সাম্প্রতিক আমেরিকান সাহিত্যিকই এলিয়টের যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি অবশ্যই বিতর্ক-সাপেক্ষ, কিন্তু আমার বক্তব্যের বিষয় স্বতন্ত্র। 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে'র প্রকাশ-মুহূর্ত সম্পর্কে উইলিয়মসের মন্তব্য হলো, 'মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটা জিনিসের তলা খসে গেছে। হুইটম্যান যে আমাদের কতোটা আপন, তা হুইটম্যানকে সরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনোই এভাবে বুঝতে পারি নি।' 'পেটার্সন'-এর প্রসঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে। ঈডিথ হিল্ সম্পাদিত ও ও সংকলিত উইলিয়মসের রচনাবলী-ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে উইলিয়মসের জবানীতে লেখা হয়েছে : 'আমার দৃঢ় ধারণা যে এলিয়ট আমাদের আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এলিয়ট চাইছেন পেছনের দিকে তাকাতে, আমি সামনের দিকে। এলিয়ট হচ্ছেন রক্ষণশীল,—তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি, তাঁর পড়াশুনো কোনো কিছুই আমার আয়ত্ত নয়, ফ্রেঞ্চ, লাতিন, অ্যারাবিক—ঈশ্বর জানেন আরো কতো কিছু জানেন ভদ্রলোক। কিন্তু আমার মনে হলো যে উনি আমেরিকাকে, অর্থাৎ আমাদের খারিজ ক'রে দিয়েছেন। খারিজ হ'তে আমি মোটেই রাজি ছিলুম না—সুতরাং এলিয়টের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ শুরু হ'লো।'

এলিয়টকে উইলিয়মসের এত শত্রুভাবাপন্ন মনে হয়েছিলো কেন? একাধিক কারণ স্বভাবতই মনে পড়ে। প্রথমত এলিয়ট আমেরিকাকে আক্ষরিক অর্থেই বর্জন করেছিলেন, এবং তিনি যে ইংল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন সে-বিষয়ে তাঁর স্বদেশবাসী অনেক আমেরিকানই প্রসন্ন ছিলেন না। দ্বিতীয় কারণটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—এলিয়টের রক্ষণশীলতা, যাকে উইলিয়মস এবং তাঁর সঙ্গীরা পশ্চাদপসরণের সঙ্গে অভিন্ন ক'রে দেখেছিলেন। তৃতীয় কারণ এই যে, এলিয়টের কবিতা হ'লো বুদ্ধিনির্ভর, মস্তিষ্কপ্রসূত, কৃত্রিম এবং জীবনবিমুখ। এই বিশেষণমালার প্রত্যেকটিই এলিয়টের কবিতা এবং সাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কে উইলিয়মস কোনো না কোনো সময়ে লিপিবদ্ধ করেছেন—সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধকারের এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নেই। এলিয়টের কবিতার বিপরীত মেরুতে আছেন হুইটম্যান, যিনি উইলিয়মসের নমস্য, এবং সব অর্থেই 'আমেরিকান' কবি।'। বলা বাহুল্য, এলিয়টের কবিতার যে 'ত্রুটি-বিচ্যুতি' খুঁজে পেয়েছিলেন উইলিয়মস তার একটিও উপস্থিত নেই হুইটম্যানের কবিতায়। হুইটম্যানের কবিতা সজীব, সংরক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আবেগনির্ভর বা হৃদয়নির্ভর—অর্থাৎ উইলিয়মসের মনের মতো কবিতা। এলিয়টের প্রতিতুলনায় হুইটম্যানকে অনেক 'বড়ো' কবি বলা এক ধরনের সাহিত্যিক গুণ্ডামি। কিন্তু এ-কথাও প্রায় সমানভাবে সত্য যে আমরা সম্প্রতিকালে হুইটম্যানকে যে অবাস্তু ক'রে রেখেছি (যেমন রেখেছি শেলী কিংবা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-কে) তার পেছনেও কোনো টেকসই যুক্তি নেই। সুতরাং, হুইটম্যানকে নিয়ে উইলিয়মস যে বাড়াবাড়ি করেছেন তা হয়তো একহিসেবে ন্যায্য এবং অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হুইটম্যান এমনই এক লেখক যে তাকে বিভিন্ন খাতে ব্যবহার করবার চেষ্টা চলেছে সাম্প্রতিক আমেরিকান কবিতায়। উইলিয়মসের কাছে হুইটম্যান হলেন 'সৎ' বা 'প্রকৃত' কবিতার জনক (এবং এলিয়ট হলেন প্রধানত কুশলী পণ্ডিত), এবং যে সংস্কারহীনতা, সজীব ও চিত্রল কল্পনা, আবেগনির্ভরতা, ও বস্তু-প্রীতি উইলিয়মসের কবিতায় চোখে পড়ে তার উৎস বহুলাংশে যে হুইটম্যানের কবিতা সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবার্ট ব্লাই জেমস রাইট, ডোনিস লেভেরটভ্, উইলিয়ম ডাফি, ডব্লু, এস মেরুইন প্রমুখ যে-সব তরুণ আমেরিকান কবি এখন সহজ, স্বচ্ছন্দ, চিত্রল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কবিতা লিখতে শুরু করেছেন তাঁদের শিক্ষক এক হিসেবে, উইলিয়মস কারলস উইলিয়মস—এবং পরোক্ষ, স্বয়ং হুইটম্যান। কিন্তু হুইটম্যানের উচ্ছ্বলতা, তাল-মান-ছাড়া গান, নির্বাধ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ইত্যাকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু উইলিয়মসের কবিতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না—যেমন পাওয়া যাবে না উল্লিখিত উত্তরসূরীর কবিতায়। ওপরের যে লক্ষণগুলি সচেতনভাবে বা অচেতনত বর্জন করেছিলেন উইলিয়মস এবং তাঁর সমমর্মী তরুণ কবিরা, ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই যেন হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন আমেরিকারই আরেকদল তরুণ কবি, যাদের আমরা সাধারণত 'বীট'-লেখক ব'লে থাকি। একজন অ্যালেন গীনস্বার্গের কবিতার সঙ্গে একজন রবার্ট ব্লাইয়ের কবিতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য, কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় দুজনেরই কুলগুরু হলেন ওয়াল্ট হুইটম্যান, এবং আরো আশ্চর্যের বিষয়, এই দুই দল থেকেই মহামান্য এলিয়ট প্রায় বহুলাংশেই বাতিল।

(২)

এলিয়ট-বিরোধিতা উইলিয়মসের আলোচনাতেই সব চেয়ে প্রকট, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে উইলিয়মস-ও শেষাবধি তাঁর আদর্শ বজায় রাখতে পারেন নি। তাঁর 'প্যাটার্সন' কাব্যগ্রন্থে তিনি বহুলাংশে এলিয়টীয় রীতিই ব্যবহার করেছেন; পাণ্ডিত্যপূর্ণ উল্লেখ, বুদ্ধিনির্ভর বিশ্লেষণ, ইতিহাসের ব্যাখ্যা, ইত্যাকার অনেক বৈশিষ্ট্যই 'প্যাটার্সনে' চোখে পড়ে আমাদের। উইলিয়মস কারলস উইলিয়মস আদর্শভ্রষ্ট হ'তে পারেন, কিন্তু যে তিন চারজন তরুণ আমেরিকান কবির কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি তারা কিন্তু এখনও 'এলিয়টীয়' কবিতার বিরুদ্ধে অকুতোভয় জেহাদ চালিয়ে চলেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন রবার্ট ব্লাই, 'ফিফ্‌টিস' ও 'সীক্স্‌টিস'-ম্যাগাজিনের সম্পাদক, এবং 'Silence in the Snowy Fields' গ্রন্থের লেখক। 'ফিফ্‌টিস' ও 'সিক্স্‌টিস' দুটি স্বতন্ত্র পত্রিকা নয়, একই ম্যাগাজিনের কালানুক্রমিক সংস্করণ—অর্থাৎ 'পঞ্চাশের' ম্যাগাজিন এবং 'ষাটের' ম্যাগাজিন। নিজের পত্রিকাতেই 'লরকা ও রোনে শার সম্পর্কে কয়েকটি ভাবনা' নামে এক প্রবন্ধে ব্লাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এলিয়টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁদের কাব্যাদর্শের গুণগত পার্থক্যের কথা লিখেছেন। অনুবাদে এই 'স্পষ্টতা' সংকুচিত হতে পারে ভেবে আমি মূল উদ্ধৃতিটিই তুলে দিচ্ছি :

"It is unfortunate that both Eliot and Pound had a puritan streak, which prevents their sinking deeper into the mind",

এবং এই নিবন্ধেরই অন্যত্র মন্তব্য করেছেন যে "These other poetries (The French and Spanish poetry) have passed through Surrealism: We have not. Lorca was a friend of Salvador Dali. Char did not appear suddenly from the snow. * * His early immersion in the Surrealists is symbolic of the baptism of the French poetry of the 19th century in similar dark waters."

ব্লাইয়ের মতে রক্ষণশীল মনোভঙ্গীর

জন্যেই এলিয়ট (এবং পাউন্ড) অবচেতনের অন্ধকারকে কবিতায় কাজে লাগাতে চান নি, ফলত—এবং এখানেও আমি ব্লাইয়ের ধারণারই প্রতিধ্বনি করছি—তাঁদের কবিতা নিপুণ হওয়া সত্ত্বেও কৃত্রিম, চাতুর্যময় হ'য়েও নীরক্ত, অনুভূতিহীন। 'স্যুরিয়ালিজম' ব্লাইয়ের কাছে সব দিক থেকেই একটি অস্ত্যর্থক শব্দ, তবে এখানেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে 'স্যুরিয়ালিজমের'র অসংখ্য বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রলক্ষণ থেকে ব্লাই শুধু তাই বেছে নিয়েছেন যা তাঁর প্রতিপাদ্যের প্রাণস্বরূপ। বস্তুত, ব্লাইয়ের 'ফর্মুলা' হ'লো অনেকটা এই রকম : কবিতা যদি শুধুমাত্র 'চেতন' মনের অভিব্যক্তি হয় তাহ'লে তা প্রধানত মস্তিষ্কপ্রসূত, এবং শুধুমাত্র মস্তিষ্ক-নির্ভর অভিব্যক্তির সঠিক মাধ্যম 'কবিতা' নয়, অন্য কিছু; কবিতাকে গুণগতভাবে 'কবিতা' হ'তে হ'লে, তাকে 'অবচেতন' থেকেও উপাদান সংগ্রহ করতে হবে (এই উপাদানকে ব্লাই নাম দিয়েছেন 'অবচেতনের উদ্ভিদ')—নইলে নৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য ও অন্যান্য শ্লাঘনীয় গুণপঞ্জী সত্ত্বেও কবিতা শেষাবধি ঠকিয়ে যাবে, তাতে নবীনতার লেশমাত্র থাকবে না। এখন প্রশ্ন হলো যে 'অবচেতনে'র আক্রমণে কবিতা কি দুরূহতর হয়ে উঠবে না? 'স্যুরিয়ালিজমে'র সংজ্ঞা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই এখানে, আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু ব্লাইয়ের 'স্যুরিয়ালিজমে'র আদর্শের প্রতি ইংগিত করতে পারি। স্যুরিয়ালিস্ট শিল্পী সালভাডোর দালির একটি বিখ্যাত ছবির কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—যে ছবিতে ক্যানভাস-জোড়া একটি গাছের ডালে ও আকাশে একাধিক ঘড়ি টান-টান হ'য়ে ঝুলে আছে। 'গাছ'কে নিঃসন্দেহে গাছ বলে চেনা যায়, আকাশকেও মনে হয় আকাশ, ঘড়িগুলো একটু বেশি চ্যাপটা হয়তো বা, কিন্তু নিঃসন্দেহে ঘড়ি। অর্থাৎ, আলাদা আলাদা-ভাবে ছবিটির প্রতিটি উপাদান বহুলাংশেই 'বাস্তবিক', কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা ওদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি অনুধাবন করবার চেষ্টা করি তখনই ছবিটি অতি-বাস্তবতায় আস্তীর্ণ হয়ে পড়ে। প্রশ্ন ওঠে —গাছের ওপরে ঘড়ি ভাসছে কেন, কিংবা আকাশেই বা ভাসমান কেন সে? এই যে আপাত-উদ্ভট সম্পর্ক তা শুধুমাত্র কাল্পনিক খামখেয়ালি নাও হতে পারে, বা একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে যে আমাদের 'অবচেতনে' 'ঘড়ি' ও 'গাছের ডাল' একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে, এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছে একটি বিশিষ্ট মুহূর্তে এই তথাকথিত 'অ-বাস্তব' সম্পর্কটিই হয়তো একমাত্র, এবং অনস্বীকার্য সত্য। এখানে যে দুরূহতা তৈরী হচ্ছে তা কোনো বই ঘেঁটে, বা পণ্ডিত শিক্ষকের সাহায্যে জয় করা চলে না—শুধুমাত্র অনুভূতি, কল্পনাশক্তি, এবং প্রাপ্তবয়স্ক রুচির ওপর নির্ভর করে এই 'ছবি'র দুরূহতাকে অনুধাবন করা যেতে পারে। এবারে কবিতা থেকে উদাহরণ দেয়া যাক:

"Two athletes
Are dancing in the Cathedral
of the wind.
A butterfly lights on the branch
of your green voice."
(Spring Images : James Wright)

কিংবা

"The fall has come, clear as the eyes of chickens,
Strange muffled sounds come from the sea."
(Silence : Robert Bly)

বা

"Rising from a bed, where I dreampt
of long rides past castles and hot coals,
The Sun lies happily on my knees;"
(Poem in three parts : Robert Bly)

লক্ষ করলে দেখা যাবে, ওপরের প্রতিটি উদ্ধৃতিতেই একটি চিত্রকল্পের সঙ্গে আরেকটি চিত্রকল্প বিষমভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে—কিম্বা এক ধরণের চিত্রকল্পের সঙ্গে তীর্যকভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে আরেক 'গোত্রে'র চিত্রকল্প : হাওয়ার গীর্জে'য় নৃত্যপর দুই ক্রীড়াবিদের সঙ্গে সবুজ কণ্ঠস্বরের শাখায় আলগ্ন প্রজাপতি, মুরগীর চোখের মতো স্বচ্ছ হেমন্ত ঋতুর সঙ্গে সমুদ্র-থেকে-আসা অদ্ভুত, অসংলগ্ন স্বর, এবং পুরনো দুর্গ আর গরম কয়লার স্বপ্নের সঙ্গে জানুতে-বসানো সূর্য 'অবচেতনে'র নির্দেশেই পরস্পরের সঙ্গে, আশ্লিষ্ট হয়ে আছে। 'অবচেতন' এখানে কোনো ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের প্রতিনিধি নয়—বরং অপ্রত্যাশিত, শ্লাঘনীয় কোনো অভিজ্ঞতার আবিষ্কার-নিয়ন্তা। ব্লাইয়ের 'Silence in the Snowy Field'. (ষাট পৃষ্ঠার বই)—বইটিতে "dark" শব্দটি ঠিক চল্লিশবার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই শব্দ কখনোই নঙর্থক কোনো অন্ধকারের প্রতীক নয়, বরং স্বাদু, বীজ-বহুল এক নিবিড় উপত্যকা যেখানে সমস্ত 'সৃষ্টি'র জন্ম হয়। প্রসঙ্গত আরেকটি তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্লাই, রাইট প্রমুখ কবিদের কবিতা মূলত চিত্রকল্পনির্ভর হ'লেও, "ইমেজিস্ট" রচনা থেকে তাঁদের কবিতা গুণগতভাবে স্বতন্ত্র। এই নতুন কবিরা 'চিত্রকল্প'কে রচনায় অবচেতনের ভূমিকাকে বিশেষভাবে স্বীকার করেন, এবং তার চেয়েও বড়ো বিষয়, তাঁরা সেই 'চিত্রকল্পকেই পাস-মার্ক' দেন যা অবচেতন-আক্রান্ত, অপ্রত্যাশিত, নবীন। ইমেজিস্টদের সঙ্গে এ'দের পার্থক্য প্রধানত এখানেই।

ব্লাই, সুতরাং, কবিতার দুরূহতাকে মূলত দুভাবে ভাগ করছেন : এক, যে দুরূহতার উৎস আমাদের অবচেতনের অন্তহীন শিকড়, কিন্তু যার প্রকাশ স্বভাবতই ব্যঞ্জনাময়, গভীর, এবং বহুস্তর-প্রসারী; দুই, যে দুরূহতার কারণ বুদ্ধির মারপ্যাঁচ বা আরোপিত পাণ্ডিত্য (বা সং-পাণ্ডিত্যের আরোপিত ব্যবহার) এলিয়ট, ব্লাইয়ের মতে, এই দ্বিতীয়োক্ত দুর্বোধ্যতার জনয়িতা, এবং এজন্যেও তিনি এ'দের কাছে এতো পরিত্যাজ্য—অন্তত আপাতত পরিত্যক্ত। মাদাম সোসোস্ট্রিস্ কে ছিলেন, ট্যারট কার্ডের কি তাৎপর্য, কোন পঙ্ক্তিটি গোল্ডস্মিথ থেকে নেয়া এবং কোন পঙক্তি সোফোক্লিশীয়, যে দুটি লাইন মীড্ল-জর্মানে লেখা আছে তার অর্থোদ্ধার কিভাবে হবে—ইত্যাকার অসংখ্য ছোটো ছোটো সমস্যা এলিয়ট পড়তে গেলে কোনো 'শিক্ষিত' ব্যক্তিও পুরো এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই দ্বিতীয়-শ্রেণীর দুর্বোধ্যতা'র প্রমাণ হিসেবে এই ধরনের সমস্যাকে দাখিল করা যেতে পারে। ব্লাই তাঁর একটি নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে, এলিয়ট এবং এলিয়ট ভক্তরা ব্যবহার করেন "distinction", "natural "time", "mortality" প্রমুখ বিমূর্ত, এবং অতীন্দ্রিয় শব্দগুচ্ছ,—পক্ষান্তরে, যে স্প্যানিশ এবং ফরাসী কবিদের কবিতা তাঁরা পছন্দ করেন, যাঁদের কবিতা এই তরুণ আমেরিকান কবিদের প্রেরণা, তাঁদের প্রিয় শব্দগুচ্ছ হ'লো "সমুদ্র", "অন্ধকার", "পেঁচা", ইত্যাদি—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্পর্শসহ শব্দ।

ব্লাই, রাইট, ডেনিস লেভেরটভ, মেরুইন, ডাফি প্রভৃতি যে সব আমেরিকান কবি "এলিয়টীয়" কবিতার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ করেছেন তাঁদের অধিকাংশ সাহিত্য-গুরুই কিন্তু স্পেন এবং লাতিন-আমেরিকার লেখক—লরকা, মাচাদো, নেরুদা, গীয়েন, সেজার ভাল্লেহো এবং আরো কেউ কেউ। এই তথ্য থেকে কি এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে আমেরিকান কবিরা (অন্তত বড়ো এক দল) তাঁদের যন্ত্রসভ্যতা এবং পার্থিব ধনাঢ্যতায় কথঞ্চিৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তাঁরা সেই সেই দেশকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান, অন্তত প্রেরণার উৎস বলে ভেবেছেন যেসব দেশ অপেক্ষাকৃত অনাগরিক এবং যন্ত্রসভ্যতার মাপকাঠিতে অনগ্রসর? একথা যদি আমরা মানি, তাহ'লে এ'দের এলিয়ট-বিরোধিতাও প্রকারান্তরে পাশ্চাত্যের নাগরিক-সভ্যতার প্রতি প্রতিক্রিয়া বলে মনে হতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যিক-আন্দোলনই কি কোনো প্রতিক্রিয়া থেকে শুরু হয় নি?

পঁচিশ

বিদ্যাসাগরের দয়ার অন্ত নেই। সেই সুযোগে কেউ-কেউ বিদ্যাসাগরকে অবাধে বঞ্চনা করেছেন।

একবার একজন লক্ষপতি ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরকে বলে-কয়ে একটি গরীবের ছেলেকে বিনে মাইনেয় মেট্রোপলিটনে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর বিদ্যাসাগরের চোখে পড়ল, ছেলেটির গায়ে চমৎকার পোশাক-আশাক, ছেলেটি রসগোল্লা-টসগোল্লা খাচ্ছে টিফিনে। ভারি আশ্চর্য তো! গরীবের ছেলে এত সব পোশাক-টোশাক পায় কোথায়, গরীবের ছেলের টিফিনে পান্তুয়া-রসগোল্লা আসে কোত্থেকে?

খোঁজ-খবর নিলেন বিদ্যাসাগর। জানতে পারলেন, ছেলেটি ওই লক্ষপতি ভদ্রলোকের আত্মীয়। ওই লক্ষপতি ভদ্রলোক এই ছেলেটির জামাইবাবু।

লক্ষপতি ভদ্রলোককে ছাড়লেন না বিদ্যাসাগর। গিয়ে তাঁর মুখের উপর বললেন—আমার সঙ্গে বঞ্চনা! তোমায় ধিক! কি করে তুমি নিজের শালাকে বিনা মাইনেয় ভর্তি করালে?

কারো অন্যায় একবিন্দু সহ্য করতে পারেন না বিদ্যাসাগর।

মেট্রোপলিটনের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা কী একটা অন্যায় করেছে। ক্লাসের সমস্ত ছাত্রকে একদিন তাড়িয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

পরদিন ওরা বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়ে উঠল। কাতর হয়ে ক্ষমা চাইল। বিদ্যাসাগর বললেন—যা আর একাজ করিস না। এবার মাপ করলাম।

দুপুর তখন বারোটা বাজে।

হাসতে-হাসতে ছাত্রের দল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। একজন ছাত্র আস্তে-আস্তে বলল—কী কঠোর প্রাণ! এতখানি বেলা হল তা একবার বললে না, একটু জল খেয়ে যা।

কথাটা বিদ্যাসাগরের কানে গেল। সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে নেমে এলেন তিনি। বললেন—ঠিক বলেছিস, আমার কঠোর প্রাণ বটে, মনের ভুলে তোদের একটু জল খেতেও বলিনি। আয়, আয়, একটু-একটু জল খেয়ে যা।

ছাত্রেরা তো মহা অপ্রস্তুত। কেউ-কেউ হাতজোড় করে ক্ষমা চাইল। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল কেউ-কেউ।

কিন্তু কেউই যেতে পারল না। সকলকে ধরে উপরে নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। কিছু না খেয়ে কাউকেই যেতে দিলেন না।

সারদাচরণ মিত্র স্বনামধন্য পুরুষ। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সারদাচরণের খুব ঘনিষ্ঠতা।

সারদাচরণের মেজোছেলের নাম শরৎকুমার। শরৎ তখন মেট্রোপলিটনের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। সারদাচরণের সঙ্গে শরৎ একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গেল।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কী পড়িস? কোথায় পড়িস?

শরৎ বলল আপনারই স্কুলে শ্যামবাজারে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি।

—তোর কিছু নালিশ আছে?

—হ্যাঁ, আছে। আমাদের পণ্ডিতমশায় আমাকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

—কেন?

—বর্ণের উচ্চারণস্থান মুখস্থ বলতে পারিনি।

—বটে। তোদের হেডমাস্টার তো মহেন্দ্র গুপ্ত।

—হ্যাঁ।

পরদিনই বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটনের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চের ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে উপস্থিত। তারানাথ পণ্ডিত পড়াচ্ছেন তখন। শরৎও ক্লাশে আছে। বিদ্যাসাগর তারানাথকে জিজ্ঞেস করলেন—বর্ণের উচ্চারণস্থান মুখস্থ বলতে পারেনি বলে একে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—বর্ণের উচ্চারণস্থান কি এই ক্লাসের ছেলেরা বুঝতে পারে?

—আপনার উপক্রমণিকা তো পাঠ্য। তার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণের উচ্চারণস্থান।

—তুমি অতি নির্বোধ। পাণিনি অনুসরণে উপক্রমণিকা লেখা। তাই বর্ণমালার পরেই বর্ণের উচ্চারণস্থান আছে। তোমার বোঝা উচিত ছিল যে এই ক্লাসে ওটা বাদ দিতে হবে।

বিদ্যাসাগর তারপর ক্লাসের ছাত্রদের বললেন—মাস্টারদের নামে যদি তোদের কিছু নালিশ থাকে, হেডমাস্টারকে বলে দিবি।

আর শরৎকে বললেন—দিনকয়েক পরে তুই আবার আমার কাছে আসিস।

মাসখানেক পরে বাবার সঙ্গে আবার বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গেল শরৎ।

সেবার বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—আর মাস্টাররা জ্বালাতন করছেন না?

চতুর্দিকে আলমারি ভর্তি বই। সব বই ভালোরকম বাঁধানো। সব একরকম বাঁধাই। বইয়ের আলমারি দেখতে-দেখতে শরতের জবাব দিতে বুঝি দু-এক সেকেণ্ড দেরি হল—না।

বিদ্যাসাগর বললেন—মাস্টারদের নামে শুধু নালিশ করলে চলবে না। তাঁরা যা বলবেন বা পড়াবেন তা কিন্তু মন দিয়ে শুনতে হবে। চারদিকে কী দেখছিস?

চারদিকে বই। আলমারি ভর্তি বই।

শরৎ বলল—এত বই কি আপনি পড়েন? কখন পড়েন? আপনি খেলা করেন না?

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন—ওসব কি পাড়ি? কিন্তু বইর হাওয়া ভালো।

খেলি বইকি। এই তো তোর সংগে খেলা করছি।

—কি হয় এত বই পড়ে?

—তোর বাবাও অনেক বই পড়ে—পড়ে-পড়ে দশ হাজার টাকা পেয়েছে। তা বলে মনে করিসনি যে তোর বাবা আমার চেয়ে পণ্ডিত। আমি দশ হাজার টাকা পাইনি, কিন্তু তোর বাবাকেও পরীক্ষা করি।

সারদাচরণের দিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগর বললেন—ছেলেদের মারা আমি পছন্দ করি না। আমার স্কুলে মারা তুলে দিয়েছি।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত—উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ—মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র।

কী একটা কাণ্ড দেখে নরেন একদিন ক্লাসের মধ্যে অন্যান্য ছেলেদের সংগে গলা মিলিয়ে হেসে উঠেছে। মাস্টারমশাই রাগ করে নরেনের কান মলতে লাগলেন। এমন-ভাবে মললেন যে নরেনের কান থেকে রক্ত পড়তে লাগল।

সেই মুহূর্তে বই নিয়ে ক্লাসের বাইরে চলে যাচ্ছে নরেন, হঠাৎ বিদ্যাসাগর এসে উপস্থিত। ব্যাপার কি? ক্লাসের মধ্যে ঢুকে পড়লেন বিদ্যাসাগর।

সমস্ত ঘটনা শুনলেন। মাস্টারমশাইকে গালমন্দ করলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—আমি জানতাম, তুমি একজন মানুষ। এখন দেখছি, তুমি একটা পশু।

নরেনকে আশ্বস্ত করেছেন বিদ্যা-সাগর।

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছে ছাত্রেরা। সে এক আশ্চর্য নেমন্তন্ন।

মেট্রোপলিটনের ছাত্ররা একবার বিদ্যা-সাগরের কাছে পৌষ-পার্বণের ছুটি চাইল। ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন বিদ্যাসাগর। তারপর ছাত্রদের বললেন—তোমাদের অনেকের তো বিদেশে বাড়ি। কলকাতার বাসায় পিঠে পাবে কোথায়?

ছাত্ররা বলল—আপনার বাড়িতে।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—ভালো। তাই হবে।

তাই হল। বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ছেলেদের জন্য বিস্তর পিঠের ব্যবস্থা হল।

ছাত্রদের জন্য যেমন, মাস্টারমশাইদের জন্য তেমনি প্রাণের টান বিদ্যাসাগরের। ছাত্র কিংবা মাস্টারমশাই—বাড়িতে কেউ দেখা করতে গেলে বিদ্যাসাগর সব কাজ ছেড়ে আগে তাকে কিছু খেতে দেন। নিজের হাতে আম কেটে দিয়েছেন পর্যন্ত।

মেট্রোপলিটন কলেজের দু-দল ছাত্রের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে। একদল আরেক দলের পিছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে। কলেজের একদল ছাত্র সেদিন বাড়ি যেতে পারছে না। ছুটি হওয়ার পরেও গুণ্ডার ভয়ে কলেজের মধ্যেই আছে।

বিদ্যাসাগরের শরীর সেদিন অসুস্থ। কলেজে আসেননি। কে একজন গিয়ে বিদ্যাসাগরের কানে খবরটা তুলে দিয়ে এল।

খবর শুনেই একটা পাল্কিতে উঠলেন বিদ্যাসাগর। নামলেন এসে কলেজে। প্রথম যে-গুণ্ডাটার সংগে দেখা হল, তাকে ধমক দিয়ে বললেন—আমার কলেজের ছেলেদের তোরা মারবি?

পায়ের চটি বিদ্যাসাগরের হাতে উঠে এসেছে। গুণ্ডার পিঠেই বুঝি বিদ্যা-সাগরের চটির বাড়ি পড়ে।

বলা-কওয়া নেই, টিপ করে বিদ্যা-সাগরকে প্রণাম করল গুণ্ডাটা। তারপর কেটে পড়ল। দেখাদেখি অন্য গুণ্ডারাও উধাও হয়ে গেল।

নিয়ম ছিল, মেট্রোপলিটনে কোনো মাস্টারমশাই ছাত্রদের সংগে রূঢ় ব্যবহার করতে পারবেন না, ছাত্রদের গায়ে বেত মারতে পারবেন না, ছাত্রদের কোনো শারীরিক শাস্তিই দিতে পারবেন না।

মেট্রোপলিটনের শ্যামপুকুর শাখায় একদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেল। বিদ্যা-সাগরের স্পষ্ট নির্দেশ আছে যেন ছাত্রদের কোনো শারীরিক শাস্তি দেওয়া না হয়। সেই নির্দেশ অমান্য করে হেডমাস্টার মশাই একটি ছাত্রকে বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আর সে-খবর, কেমন করে কে জানে, বিদ্যাসাগরের কানে চলে এল।

পাল্কির জন্য সবুর করতে পারলেন না, খবর পেয়েই বাসা থেকে পায়ে হেঁটে ঝড়ের মতো চলে এলেন বিদ্যাসাগর। একটি ছাত্রকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, হেডমাস্টার মশাই সে কথা কবুল করলেন। সেই মুহূর্তে হেডমাস্টার মশাইকে বরখাস্ত করে দিলেন বিদ্যাসাগর।

হেডমাস্টার মশাইকে এভাবে বরখাস্ত করা হল, এই কারণে কয়েকজন মাস্টার-মশাইও ইস্তফা দিয়ে দিলেন। অনেকেই বিদ্যাসাগরকে ব্যাপারটা আরেকবার বিবেচনা

করে দেখতে বললেন, কিন্তু তিনি কারো কথায় কান দিলেন না। বরং ইস্কুল বন্ধ করে দেবেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের নির্দেশ অমান্য করা হলে বিদ্যাসাগর তা সহ্য করবেন না। শেষপর্যন্ত নতুন মাস্টারমশাই বহাল করে বিদ্যাসাগর ইস্কুল চালাতে লাগলেন।

ভোলানাথ বসু নামে একটি ছেলে বিদ্যাসাগরের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। হঠাৎ একদিন বিদ্যাসাগর এসে সেই ক্লাসে ঢুকলেন। ভোলানাথকে বললেন—তোমার মতো ছাত্রকে আমার স্কুলে রাখতে পারব না। তুমি চলে যাও।

ভোলানাথকে চলে যেতে হল। কিন্তু ভোলানাথের অপরাধ কি?

একটু আড়ালে গিয়ে বিদ্যাসাগর মাস্টার-মশায়দের বললেন—ভোলা ঠাকুরবাড়ির 'বিশ্বাসনের' থিয়েটারে বিদ্যা সেজেছিল, বঙ্গরঙ্গীতেও ও সখী সাজে।

আশ্চর্য স্বভাব বিদ্যাসাগরের. আগে কোনো খবর-টবর না দিয়ে হঠাৎ চলে আসেন মেট্রোপলিটনে। হয়তো একটা ক্লাসে ঢুকে পড়লেন, আস্তে আস্তে মাস্টার-মশায়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন; হয়তো মাস্টারমশাই বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বিদ্যাসাগর তাঁকে বলতেন—তুমি পড়াতে-পড়াতে উঠো না। তোমার কাজ তুমি করে যাও। আমাকে খাতির করতে গিয়ে যেন তোমার কাজে ত্রুটি না হয়।

পরীক্ষার ফল যেন ভালো হয়। পরীক্ষার ফল যদি ভালো না হয় তো সব পণ্ড।

সেবার কলেজ থেকে বত্রিশটি ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। ক্ষুদিরাম বসু সে সময়ে মেট্রোপলিটনে পড়ান। বিদ্যাসাগর একদিন ক্ষুদিরামকে বললেন—দ্যাখো, পরীক্ষার ফল যদি ভালো না দাঁড়ায়, তাহলে সার্কুলার রোড ধরে বাগবাজার হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে সেই যে কার্মাটারে চলে যাব, কলকাতায় আর মুখ দেখাব না।

পরীক্ষার ফল অবশ্যি খারাপ হয়নি।

এককালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রোপলিটন কলেজে দু-ঘণ্টা করে সাহিত্য পড়াতেন। সেজন্য মাসে দুশো টাকা পেতেন তিনি। প্রত্যেকদিন ঠিক সময়ে গাড়ি করে আসতেন, ছুটে লাইব্রেরিতে যেতেন, ওয়েবস্টারের ডিকশনারিখানা সঙ্গে নিয়ে ছুটে ক্লাসে যেতেন।

আনন্দমোহন বসু সিটি কলেজ খুললেন।* আনন্দমোহনের সঙ্গে কথা হল, সুরেন্দ্রনাথ সিটি কলেজেও একঘণ্টা করে পড়াবেন, সেজন্য মাইনে পাবেন একশো টাকা।

বিদ্যাসাগরের কানে গেল একথা। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের প্রিন্সিপালকে ডেকে বললেন—সুরেনকে বলো, সিটি কলেজে সে পড়াতে পারবে না। আমি তাকে তিনশো টাকা করে দেব। আর তা যদি না হয় তো আমার এখানে কাল থেকেই আসা বন্ধ করতে বলো।
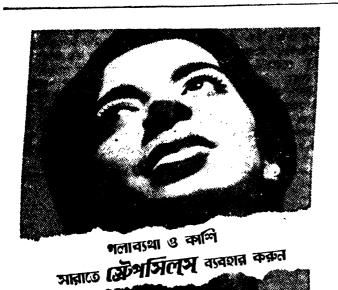
সুরেন্দ্রনাথকে যখন সব কথা জানানো

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে।" (বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ ৩৪৩)

হল, তিনি বললেন—তিনি একথা বললেন, তাই তো,—কিন্তু আনন্দমোহনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব আছে—তাকে কথা দিইছি—তাই তো—

মেট্রোপলিটন ছেড়ে চলে গেলেন সুরেন্দ্রনাথ। ছাত্রদের খুব প্রিয় ছিলেন তিনি। ছাত্ররা তাই মনমরা হয়ে রইল।

বিদ্যাসাগর বললেন—এই কলেজে সুরেন্দ্র কতটুকু represent করে? সে যা পড়ায় তাতে হিসেব করে দেখলে যে কটা পেপার হয় এগজামিনের জন্য তাতে সে মাত্র ওয়ান-টেনথ represent করে। তা এতে করে যদি সুরেন্দ্র না থাকলে কলেজ না চলে, তাহলে বলতে হবে আমি কেউ নই, আমি তাহলে মরে গেছি! ছেলেদের বলে দাও সুরেন না থাকলে যারা এ-কলেজে থাকতে না চায় আমি তাদের সকলকে সার্টিফিকেট দেব।

নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস বিদ্যাসাগরের।

তারপর সুরেন্দ্রনাথ একটা কলেজ খুললেন। রিপন কলেজ। রিপন সাহেব তখন বড়োলাট।

দেখে-শুনে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—সুরেনকে জিজ্ঞেস করো, আনন্দমোহনের প্রতি সেন্টিমেন্ট এখন কোথায় গেল?

কলেজের একটি ছাত্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছে। ফলে বাবা তার কলেজের মাইনে টাইনে বন্ধ করে দিলেন।

ছাত্রটি এল বিদ্যাসাগরের কাছে। সব কথা খুলে বলল।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোন কলেজে পড়ো?

—আমি আপনারই মেট্রোপলিটন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।

বিদ্যাসাগর বললেন—বাপু, আমি তো ব্রহ্ম নই আর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার কোনো যোগই নেই। যা হোক, তুমি ভালো বুঝে যে ধর্ম ধরেছ তার উপর আমার কিছুই বলবার নেই।

ছাত্রটিকে বিদ্যাসাগর প্রত্যেক মাসে দশ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মাসে-মাসে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে ওই টাকা নিয়ে আসত ছাত্রটি।

অত্যন্ত আশ্চর্য পথে কিছুদিনের জন্য একটি মাদ্রাজী ছেলে এসেছিল মেট্রোপলিটনে।

হ্যাঁ, একটি মাদ্রাজী ছেলে। মা-বাপ নেই। ছেলেটির লেখাপড়া শেখার খুব ইচ্ছা। লেখাপড়া শিখতে টাকা লাগে। টাকা কই? যথাসর্বস্ব বেচে কিছু টাকা যোগাড় হল। কিন্তু যা যোগাড় হল, তাতে লেখাপড়া হয় না।

সাহায্যের জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াল সে। কার পরামর্শে কে জানে, শেষ পর্যন্ত চলে গেল সিংহলে। অনেক কষ্টে যে টাকা জোগাড় করেছিল, দু-একদিনেই তা ফুরিয়ে গেল।

খাওয়া জোটে না। চোখে ঘুম নেই। সিংহলের পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল ছেলেটি। এখানে সে কাউকে চেনে না, এ-রাজ্যের সে কিছুই জানে না। অচেনা-অজানা জায়গায় কাউকে সে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না।

সিংহলের রাস্তায় একদিন জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন একজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক। কী মনে হল কে জানে, ছেলেটি তাঁকে নমস্কার করল। ভদ্রলোকের দয়া হল। ছেলেটির সব কথা তিনি মন দিয়ে শুনলেন। ভদ্রলোক ওকে নিজের জুড়ি-গাড়িতে তুলে নিলেন, নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

দুনিয়ায় এমন কি কেউ নেই যে এই ছেলেটির ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে? ওর লেখাপড়া শেখার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে?

সেই ভদ্রলোক বললেন—তুমি যেমন মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছ, তেমনি মানুষ এদেশে কোথাও নেই। শুনেছি, কলকাতায় বিদ্যাসাগর নামে একজন মহৎ মানুষ আছেন। যদি তুমি তাঁর কাছে গিয়ে চাইতে পারো, হয়তো যা চাও তাই পাবে।

ভদ্রলোক ছেলেটিকে কিছু টাকা-পয়সা দিলেন।

বহু কষ্টে ভারতবর্ষে এল ছেলেটি। চলল কলকাতার দিকে। পথে শুনল, বিদ্যাসাগর তখন কাশীতে। তাহলে আর কলকাতায় গিয়ে লাভ কি কাশীর দিকে চলল ছেলেটি। কিন্তু কাশীতে পৌঁছে, হা ঈশ্বর, শুনল, বিদ্যাসাগর কাশী ছেড়ে চলে গেছেন। কার্মাটারে গেছেন।

সিংহলী ভদ্রলোক যা টাকাকড়ি দিয়েছিলেন, এতদিনে তা শেষ হয়ে গেছে। দু-তিনদিন কাশীতেই কাটাল ছেলেটি। অন্নসত্রে খেল ঘুমোলো নদীর পাড়ে। তারপর কার্মাটারের দিকে হাঁটাপথ ধরল।

একদিন দুপুরে ছেলেটি কার্মাটারে এসে পৌঁছল। বিদ্যাসাগরের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। যাক, এতদিনে তবু আসা গেছে।

বাড়ির চারদিকে বেড়া। একটিমাত্র দরজা। কেন কে জানে, বাড়ির চাকর তখন কাউকে দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

রোদের মধ্যে সর্বস্বান্তের মতো দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটি। জানালার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

হঠাৎ দেখতে পেল, হাতের ইশারায় ঘরের ভিতর থেকে কে যেন ডাকছেন। ডাক যখন পাওয়া গেছে তখন আর কথা কি, ছেলেটি দরজা পার হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজায় কেউ বারণ করল না।

যিনি ডেকেছিলেন, তিনিই বসতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন—রোদের মধ্যে তুমি এমন করে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? তোমার কি খাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ছাড়া এমন-ভাবে আর কে ডাকবেন, এমন করে আর কে কথা বলবেন।

কত দেশ-দেশান্তর ছেলেটি ঘুরে এসেছে, কই, এমন করে কেউ তো তাকে কিছু বলেনি। দু-চোখ তার জলে ভরে উঠল। বিদ্যাসাগরের প্রশ্নের জবাব সে মুখের কথায় দিল না, চোখের জলে দিল।

সেই মুহূর্তে ছেলেটির স্নানাহারের ব্যবস্থা হল। তারপর ছেলেটির মুখে তার আদ্যন্ত ইতিহাস শুনলেন বিদ্যাসাগর।

নিজের সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে এলেন ছেলেটিকে। ভর্তি করে দিলেন মেট্রোপলিটনে।

কিন্তু বাঙলা দেশের জল-হাওয়া ছেলেটির সহ্য হল না।

তাই কিছুদিন পর মাদ্রাজের ছেলেকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। দরকারী জিনিসপত্র ওর সঙ্গে দিয়ে দিলেন। ব্যবস্থা হয়ে গেল, বিদ্যাসাগর মাসে-মাসে ওকে পনেরো টাকা পাঠাবেন। ও মাদ্রাজে গিয়ে পড়াশোনা করুক।

চোখের জল মুছতে-মুছতে ছেলেটি মাদ্রাজের গাড়িতে উঠল।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মেট্রোপলিটন বিদ্যাসাগরের ধ্যানজ্ঞান ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল আগে বিদ্যাসাগর বলেছেন—এখন জীবনের শেষ হওয়াই ভালো। তবে কলেজের একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না, এই যা দুঃখ। আর একটি মর্মান্তিক দুঃখ এই, যাঁরা আমার বিদ্যালয়ের জন্য জীবনাতিপাত করেছে তাঁদের বৃত্তির কোনো ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না।

ক্রমশ

পণ্ডস
ড্রীমফ্লাওয়ার
ফেস পাউডার
আপনাকে দেবে
ফুলের
মতো
রমণীয় মুখশ্রী
পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার সারা মুখে ফোটায় সুষম লাবণ্য। ছোটখাট খুঁতগুলো আড়াল করে এবং কোথাও লেগেও থাকে না! আপনার স্বাভাবিক মুখের রঙ আরো মনোরম করে তুলতে চমৎকার রকমারি রঙে পাবেন।
চীজব্রো-পণ্ডস ইনক্
(সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

ছাত্রদের গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশ মিলেছে, প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ, ইস্পাতী পাখির মতো, দিকবিদিকের পাহাড়-সমুদ্র ডিঙিয়ে নতুন কোনো দেশের দিগন্তকে উন্মোচিত করছে তরুণ ইওরোপকে সচেতন, সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে। তারুণ্য বিস্তার চায়, ব্যাপ্তিকে খোঁজে। ভ্রমণের আগ্রহ, দূরের আকর্ষণ হয়তো আপনাকে বিস্তৃত করবার ইচ্ছারই প্রতিফলন। ফরাসী ছাত্রদের ভেতর এই ভ্রমণের নেশা প্রতি বছরই চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে চলেছে।

ভ্রমণ করা আর নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরুনো এক জিনিস নয়। ভ্রমণ একটি শিল্পের মতো। এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। ইতিহাস-ভূগোল পরীক্ষার গণ্ডীর বাইরে যেখানে যথার্থ সত্য, সেখানে তার গুরুত্বকে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করে জ্ঞান আহরণের উৎসাহ তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগে। বিশেষত কোন দেশই আজ হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে ট্যুরিস্টের সামনে আবির্ভূত হয়নি। বহুকালের বহু মানুষের বহু যত্নে তার সৃষ্টি। তার "আজ"কে বুঝতে তার "গতকালের" কাহিনীকে জানা চাই অতি অবশ্য। তার বেদনাকে জানলেই তবে তার স্বপ্নকে বোঝা সম্ভব। সঠিক কী দেখতে যাচ্ছি, সচেতনভাবে দেখা এবং পরে কী দেখে এলাম এই ইচ্ছে যেন ভ্রমণের তিনটি পর্ব। নতুবা ভ্রমণ সম্পূর্ণ হল না। এ যেন দেশ বিদেশ ঘুরে জীবনের মালমা সংগ্রহ করা; চিত্তের, বুদ্ধির, দৃষ্টির পরিধিকে আরও একটু বিস্তৃত করা। ভ্রমণ কেবল আমাদের ছুটীর দিনের অলস বিলাস নয়, আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের অনির্বাণ প্রেরণার উৎস।

বিশ্বের সংস্কৃতির সমুদ্রতীরে বিচিত্র ঝিনুক কুড়োন ভ্রমণের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য। যিনি বাহাদুর, তিনি ডুবুরীর মতো হয়তো মুক্তোটি তুলবেন। উপলব্ধি যতো গভীর এ সম্ভাবনা ততই বেশী। আধুনিক গ্রীসকে জানার প্রস্তুতি হিসেবে তাই প্রাচীন গ্রীসকে জানতে হবে। দেশের নিসর্গ চিত্রটি যেমন, তেমনি তার বিমূর্ত চেহারাটিকেও দেখা চাই। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তার রসটুকু আহরণ ক'রে তা থেকে সারটুকু গ্রহণ করা চাই—নয়তো তার যা দেবার ছিলো তার সবটুকু নেওয়া হ'ল না।
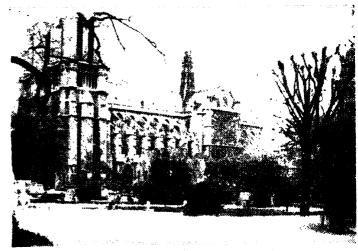
বিখ্যাত নত্রদাম্ গির্জা

শুধু বিদেশ ভ্রমণই বা কেন, স্বদেশ সম্পর্কে জানবার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তার অতীতকে জানবার ভেতর দিয়েই তার আগামী কাজের চেহারাটিকে যেমন কল্পনা করা চলে, তেমনি এই চেহারাটিকে গড়ে তোলবারও শক্তি জাগে।

ভ্রমণ সার্থক তখনই যখন ভ্রমণান্তে একটি বা একাধিক নতুন তরুর বীজ সংগ্রহ ক'রে আনা গেল, যখন উদ্যানে আরও নতুন কিছু ফুলের দেখা পাওয়া গেল বা দেখা পাবার সম্ভাবনাটুকু রইল। যেমন নিশ্চিত মিলটুকু না ভুড়িয়ে বিভিন্ন অমিলের বৈচিত্র্যে প্রাণ সঁপে দেওয়া গেল, যেদিন ভিন্ন মহাদেশগুলোকে একই পৃথিবীর ভূখণ্ড ব'লে চেনা গেল, সেদিন ভ্রমণ সফল সম্পূর্ণ। দেশ-দেশান্তর ঘুরে যেদিন টের পাওয়া যায় যে যেন একটু বিস্তৃত হয়েছি, যেন মনের ধনশালায় নতুন কোন রত্ন জমা প'ড়েছে, সেদিন ভ্রমণ জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে।

যদি বলে থাকি যে ফরাসী দেশের তরুণেরা বিভিন্ন ভূখণ্ডের আত্মাকে আবিষ্কার করতে উদ্যত গ্রীষ্মের অবকাশে, তো সে কথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে ফরাসী তারুণ্য তার আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ-লাভ করেছে। সমস্যা অনেক, সংগ্রামও নিরন্তর। পশ্চিমী তারুণ্যকে এইখানেই তারিফ করতে হয়। তার আর্তি, হতাশা, বিদ্রোহ যে উত্তেজনাকে প্রজ্জ্বলিত করে, তারা তাকে ব্যর্থ হতে দেয় না, বঞ্চিত করে না। তাদের মনে লক্ষ্য সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে যদি বা দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়, তবু লক্ষ্যকে উপলক্ষ্যের উপহাসে পর্যবসিত না করার জন্য প্রশংসা করতে ইতস্তত করব না। উচ্ছল, স্পর্ধিত, প্রগল্ভ তারুণ্যের চেহারা নিঃসন্দেহে তার পরাজিত, মূক, নিষ্প্রভ চেহারার চেয়ে কাম্য...।

ভারতীয় তারুণ্যের চেহারা বড় ম্লান, বিষণ্ণ। বর্তমানে ভারতীয় তারুণ্যে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে তাকে সৃষ্টিশীল ক'রে তোলবার প্রচেষ্টা হোক, রাজনীতির উন্মত্ত আবর্তে সে শক্তির অপচয় ঘটানো নির্বুদ্ধিতা। আমাদের একত্রিত বেদনাকে নিষ্ফল উত্তেজনার পথে নিষ্ক্রমণ ক'রে তাকে বন্ধ্যা ক'রে রাখা অন্যায়—রাখতে চাওয়া ছলনা। আমাদের তারুণ্যের সম্মুখে সমস্যা বিস্তর, তাই দায়িত্ব সীমাহীন। তার ক্ষোভ, তার যন্ত্রণা, তার স্বপ্নকে সহজ উত্তেজনার বাষ্পে বিলীন করতে চাওয়াটা তার আত্মাবলুপ্তি ঘটানোর সামিল।

শক্তি সম্পদের মতোই, ব্যবহারে বাড়ে, পুষ্টিলাভ করে। শক্তির বিকাশ কেবল-মাত্র অসংযম প্রকাশের উচ্ছৃঙ্খলতায় সম্ভব একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। যদি আপনাকে ব্যক্ত করবার আকুতি বোধ হয় তো সেই সঙ্গে এ কথা জানতে হবে যে অভিব্যক্তিই সৃষ্টি এবং সৃষ্টি নিয়ম-নির্ভর। শৃঙ্খলা না মানা আর শৃঙ্খলা বজায় রাখা কোনো স্ববিরোধী কথা নয়। একমাত্র উদ্দামেরই উদাম আছে—এ কথার কোনো বাস্তবিক ভিত্তি নেই। সংযম

বলিষ্ঠতার অভাব নয়। দুর্বলতার নামান্তর নয়।

আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব লক্ষিত হচ্ছে দু'ভাবে। প্রথমত বিদেশী সংস্কৃতির অনুকরণে তার সারটুকু গ্রহণ ক'রে সমৃদ্ধ হওয়া নয়, বরঞ্চ সেটুকু বর্জন ক'রে তার হনুকরণে। দ্বিতীয়ত প্রকাশ দেখতে যাওয়া যায় বাস্তববোধশূন্য ভিত্তি-হীন শূন্য আস্ফালনে। এ দুই-ই মানসিক দৈন্যের অভিব্যক্তি, পঙ্গু মনের পরিচয়। আজকে আমাদের সচেতনভাবে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে, জেনে নিতে হবে, আমাদের ঐশ্বর্যের খনিটি ঠিক কোথায় এবং কেন সেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। কেন আমাদের এই দৈন্য, কেন আমরা নাবালক-সুলভ পরানুকম্পার প্রত্যাশী। আসলে, নিজের শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞানতাই আমাদের দুর্বলতার কারণ। নিজেদের অসহায় বলে মনে করি বলেই আমরা পরমুখাপেক্ষী, আত্মসম্মানবোধ লুপ্ত ব'লেই আমরা অপরের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত। অন্যের মহত্ত্বের উপর জীবন নির্ভর করাকে যে মুহূর্তে আমরা আত্মবমাননার কারণ ব'লে বুঝব সেই ক্ষণেই হবে আমাদের সত্যকারের জাগরণ।

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পটভূমিতে তার অর্থনৈতিক পরাধীনতা বড় প্রকট এবং টেলিভিশন-সংবাদপত্র--বেতার মাধ্যমে তা' সর্বত্র প্রচারিত হ'চ্ছে। নিষ্ফল প্রতিবাদের মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়নি—এ প্রত্যক্ষ। শক্তির অপচয় ঘটেছে এ নিশ্চিত। ভারতবর্ষের শক্তিকে তার নিজের ভেতরে খুঁজে নিতে হবে। সহজ অনুকরণের হাস্যকর পন্থায় কোনো অসম্ভব সাফল্যের স্বপ্ন দেখে তা সম্ভব হবে না। ভারতীয় তারুণ্য তার সঞ্জীবনীসুধা বাইরে থেকে পাবে না।

ইওরোপ আপনাকে শ্রদ্ধা করে, সেখানেই তার শক্তি। ওরা যে নিজেদের সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখে, তার যথার্থ মূল্য সম্পর্কে তারা সজাগ। এই সচেতনতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভূত হয় তাদের জাতীয়তাবোধ ও আত্মসম্মানবোধ।

ভারতবাসীকেও ভারতের ঐহিক এবং আত্মিক জীবনের স্রোতের সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের দেহ, অর্থাৎ তার ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সত্তার সঙ্গে যেমন যোগ রাখা, তেমনি তার আত্মার স্পন্দনও অনুভব করা...। ভারতবর্ষের আত্মা হচ্ছে সেই বস্তু যা' অন্য পাঁচটা ভূখণ্ড থেকে তাকে পৃথক করেছে—সে তার চিরন্তন সত্তা।

আমাদের অতীত সাংকেতিক। পূর্বপুরুষের গর্বে মত্ত হয়ে থাকার জন্য এ পরামর্শ নয়। যে কারণে আজ সপ্তদশ শতাব্দীর গির্জে দেখিয়ে ফরাসীরা আত্মগৌরব অনুভব করছে (তা' অবশ্যই আজ হাত গুটিয়ে বসে থাকার জন্য নয়!) ঠিক সেই কারণেই অতীত সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করতে হবে। ভারতবর্ষ কী ছিলো সে-কথা ভেবে লম্ফ-ঝম্প করবার জন্য নয়—ভারতবর্ষকে উপেক্ষা করে বাইরের ব্যর্থ অনুকরণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। ভারতবর্ষের এই আত্মবিস্মৃত অবস্থা খুবই ভয়াবহ। আত্ম-সম্মানবোধ তো শূন্যকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না...। আপন শক্তির বলে আত্মবিকাশের উদ্যমকে গতিময় করে তুলতে হবে। সব জাতই তাই করে।

অতীতের সামান্যতম শিল্পবস্তুকে এরা সমাদরে সংগ্রহ করে রেখেছে। অতীতকে যদি এরা এতই হাস্যকর রকমের মৃত বলে মনে করত তাহলে এ প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই হতো না। এদের শিল্পসংগ্রহশালার অন্ত নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সে নাকি অদূর ভবিষ্যতেই আর-একটি সংগ্রহশালা উদ্বোধনের তোড়জোড় চলেছে। দেশের শিল্পবস্তুগুলোকে সংরক্ষণের আপ্রাণ প্রয়াস করার, জাতির সম্পদ ঠিক কোনগুলো সে সম্বন্ধে যথার্থ মূল্যবোধ জাগ্রত হবার, সময় কি আমাদের এখনও আসে নি?

ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন শিল্পবস্তু অবহেলায় পড়ে আছে—যার একটা মূল্যবান অংশ নাকি বিদেশী মুদ্রার্জনের বাঁকাচোরা পথে ব্যবহৃত হচ্ছে। শুনে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। ভারতবর্ষে আজ সমঝদার লোকের এমনই অভাব? যা অন্যদেশ সংগ্রহ করতে লালায়িত, আমরা তা' হারাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না। ভারতীয় ঐতিহ্যকে মৃত বলে পরম নিশ্চিন্তে বসে থাকতে আমাদের বাধে না।

জাতির ইতিহাসে স্বভাবতই বেদনা-পরাজয়-গ্লানি সবই থাকে—সব জাতিরই আছে। ভারতবর্ষ এ ব্যাপারে একক, অনন্য নয়। এই অন্ধকার পর্বগুলিকে দীর্ঘতর করায় কোন ফল নেই। এবং এর সমাপ্তি ঘটাতে চাই আলোকিত পর্বগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। তাই আমাদের সত্যকারের শক্তি যোগাবে। যেদিন অন্ধকার পৃথিবীতে ভারতবর্ষ সোনার প্রদীপ জ্বালিয়েছিল সেদিনের কথা জানতে হবে বই কি।

তবে সেই জানার প্রেরণা আসা উচিত এক গভীরতর চেতনা থেকে—কেবল শূন্যগর্ভ বাক্যের আবৃত্তি করে নয়। এখানেই ভারতীয় তারুণ্য আপন শক্তির উৎস খুঁজে পাবে।

রুশ-মার্কিন সভ্যতার অন্ধ গুণকীর্তন করে ফরাসী তারুণ্য সবল হয়ে উঠছে না। তার শক্তি, তার আপন ঐতিহ্যকে সচেতনভাবে জানার মধ্যে; অন্য দেশের সভ্যতা তাকে যদি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তা' সেই যোগ্যতা সে অর্জন করেছে তার আপন স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে।

অনিন্দিতা নিয়োগী

ক্যানাডার মহিলা প্রেস ক্লাবের আন্তর্জাতিক সেমিনার

এবার ক্যানাডার শতবর্ষপূর্তি সমারোহ উৎসবের আয়োজন হয়েছিল নানারকম। কৃষ্টিগত হিসাবে ক্যানাডা ইংলণ্ডের চেয়ে আলাদা ও নিজস্ব ধারায় দীক্ষিত এবং ভৌগোলিক অবস্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে থেকেও তাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন নয় এ কথা জগৎকে ভাল করে জানিয়ে দেবার জন্য তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। নিত্য নূতন ব্যবস্থায় তার প্রচার হচ্ছে। এ বছরে তো কথাই নেই। নানা প্রতিষ্ঠান, সমিতি ও সংগঠনের তরফ থেকে আয়োজন হয়েছে বিভিন্ন রকম। তার মধ্যে অবশ্য Expo-67 মেলাটি গত মার্কিন মেলার সঙ্গে টেক্কা চালিয়েছে। এই অবসরে ক্যানাডার মহিলা প্রেস ক্লাবও একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার বা আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রায় ত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করা হয়। মহিলা সাংবাদিক, রেডিও এবং টেলিভিশন কর্মীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব করার আয়োজন ছিল। তার সঙ্গে বিদেশিনীরা যাতে বেশ করে ক্যানাডা দেখার সুযোগ পান সেজন্য তাদের চার সপ্তাহ সফরের প্রোগ্রাম ছিল। ক্যানাডার মহিলা প্রেস ক্লাব বলতে গেলে এ ধরনের মহিলা সংগঠনের প্রথম। প্রায় ৬০০ সভ্য সংখ্যা। বৃত্তিধারী মেয়েদের মধ্যে যারা মানুষের যোগাযোগ রক্ষা ও আলাপ আদান-প্রদানের কাজে লিপ্ত আছেন তাঁরাই সভ্য হতে পারেন। সাংবাদিক, বেতার কর্মী টেলিভিশন কর্মচারী, পাবলিক রিলেশন ও বিজ্ঞাপন কর্মী সবাই আছেন এই ৬০০ সভ্যের মধ্যে। সংস্থার ১৬টি শাখা বিভিন্ন বড় শহরে ছড়িয়ে আছে।

এ বছরের উৎসবে ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিলেন শ্রীমতী মীরা মজুমদার। শ্রীমতী মজুমদার অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রোগ্রাম বিভাগে কাজ করেন। পাটনা, কলকাতা ও দিল্লির পরে বর্তমানে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর অফ প্রোগ্রামস।

শ্রীমতী মজুমদার ক্যানাডার সমারোহসভায় যোগ দিয়ে খুব খুশী হয়ে ফিরেছেন। নিমন্ত্রণকারিণীরাও ছিলেন বিশেষ মনোযোগী। মীরা মজুমদারকে তাঁরা টোকিও হয়ে ক্যানাডার এদিককার সীমানায় ভ্যাঙ্কুভারে পৌঁছোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ভ্যাঙ্কুভার থেকে ওদিকের সীমায় টোরোণ্টো। তিন দিন তিন রাত প্রায় হোটেলের কামরার মত আরামদায়ক ট্রেনের কামরায় বসে প্রেইরী পার হয়েছেন, রকি পর্বতমালা দেখেছেন আর লেক গোষ্ঠীর ধারে ধারে চলেছেন। বলছিলেন সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। টোরোণ্টো থেকে মনট্রিল, সেখান থেকে অটাওয়া। মনট্রিলে এক্স পো আর অটাওয়াতে শতাব্দী সমারোহ। সমারোহে রাণী এলিজাবেথ উপস্থিত ছিলেন। তারপর কুইবেক।

সেমিনার বসেছিল টোরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে। বক্তৃতা ও তারপর প্রশ্ন এবং বিভিন্ন দলের আলাদা আলাদা আলোচনা বৈঠক এই নিয়ে হয়েছিল সেমিনার। বক্তৃতা যাঁরা দিয়েছিলেন তার মধ্যে অতিথি হিসাবে ছিলেন কলকাতার সরোজনলিনী সংস্থার শ্রীমতী আরতি দত্ত। বর্তমানে শ্রীমতী দত্ত ACWW-র আন্তর্জাতিক সভাপতি। ঠিক ঐ সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডার শাখাগুলি পরিদর্শনে এসেছিলেন। পশ্চিম বাংলার

বামে মীরা মজুমদার, দক্ষিণে ক্যানাডার মহিলা প্রেসক্লাবের টোরোণ্টো শাখার প্রেসিডেণ্ট জয় কার্সন

গ্রামের মেয়েরা ও উদ্বাস্তু মেয়েরা হাতের কাজ শিখছে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের কিছু কিছুও শেখানো হয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে। এই বিষয় তিনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মহিলাসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। নিজেদের দেশে ও অন্যত্র মহিলা সমাজের কি কি কাজ হচ্ছে তা মহিলা সাংবাদিক মহল প্রচার করলে দেশ-বিদেশের সাধারণ লোকের মধ্যে একটি সংযোগ সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে।

ক্যানাডায় মেয়েদের মর্যাদা সম্বন্ধে যে Federal Royal Commission for the Status of Women in Canada হয়েছে তার বিষয় বলেন শ্রীমতী অ্যান ফ্রান্সিস। তিনি এই কমিশনের প্রেসিডেন্ট। শ্রীমতী ফ্রান্সিস সাংবাদিক এবং বেতারশিল্পী। ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবের দুটি পুরস্কার পেয়েছেন ও ক্যানাডার মহিলাদের অবস্থা সম্বন্ধে বই লিখেছেন। শ্রীমতী মীরা মজুমদার বলছিলেন ক্যানাডার মত প্রগতি-প্রাপ্ত ও সম্পন্ন দেশে এমন একটি কমিশনের প্রয়োজন হতে পারে তা শুনেই তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু ক্যানাডার আলোকপ্রাপ্ত মহিলামণ্ডলী সত্যই বিশেষ চিন্তিত কারণ মেয়েরা প্রায় সর্বত্র কাজ করবার সুযোগ পেলেও উচ্চ পদমর্যাদা বা দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত মহিলার সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া সাধারণ মেয়ে রাজনীতি, সরকারী কাজকর্ম পদ্ধতি, সমাজকল্যাণ কোন কিছুতেই বিশেষ আগ্রহ-শীল নয়। এমনকি ভোট দেবার বেলায়ও তারা নিতান্ত উদাসীন। বরং ক্যানাডার নারী পুরুষ সবাই নূতন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার কাজে ভারতীয় মহিলাদের অংশ গ্রহণের

আন্তর্জাতিক সেমিনারে অতিথি শ্রীমতী আরতি দত্ত

কথায় ভরপুর। "যে দেশে প্রধানমন্ত্রী মহিলা সে দেশে মহিলা সমাজের মর্যাদার সমস্যা কি?" এই তাদের মনোভাব। গান্ধীজীর প্রেরণা ও আদর্শে দলে দলে ভারতীয় মহিলা যে গতিবেগ সংগ্রহ করেছিল, উত্তরকালে সেই গতিবেগ তাকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

কথাটা হয়তো অনেকটাই সত্য কিন্তু সবটা নয়। ভারতীয় মহিলা সমাজের যে অংশ বিদেশীদের চোখে পড়ে তারা ভারতীয় সমাজের বয়মে ভরা কারুকার্য খচিত ঢাকনিমাত্র। বয়মে ভরা আছে অনেক দুঃখ গ্লানির কথা, গায়ে গায়ে আঁকা আছে নিরন্ন জীবনের নির্বাণোন্মুখ আশা ভরসা। সেখানে সুস্থ সবলতা সঞ্চারের কি চেষ্টা হয় বলা শক্ত।

সত্যকাম

পাশ্চাত্য দেশে অবিবাহিত বা কুমারী মায়ের সমস্যা এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে নানা দিক বিবেচনা করে বহুদেশ সমাজকল্যাণ হিসাবেই সমস্যার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত হয়েছেন। নিতান্ত নিন্দনীয় হিসাবে অন্ধকারে লোকচক্ষুর অগোচরে চেপে রাখার কুফল তারা স্বীকার করেন এবং অপেক্ষাকৃত সহনশীল মনোভাব গ্রহণের চেষ্টা করেন। কুমারীর মাতৃত্বকে সমাজে যতই গর্হিত মনে করা হ'ক না কেন, অল্প বিস্তর সর্বত্রই এ রকম দুর্ঘটনা ঘটে থাকে এবং পাশ্চাত্য জগতের পরিবেশ ঘটনা ঘটার পক্ষে ক্রমশই সহায় হয়ে উঠছে।

বিবাহিতা পত্নী এবং সন্তানের জননীর জগতে যতই সমাদর ও সম্মান, কুমারীর স্খলন ততই বড় অপরাধ। আইন দিয়ে বা সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে তার লোকলজ্জা ঢাকা অসম্ভব। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় অবৈধ সন্তান সারাজীবন ধরে তার অবৈধতার খেশারত দেয়। অপরাধ যত বড়ই হ'ক তার তো নিজের জন্মের জন্য সে দায়ী নয় এবং অন্যের অন্যায়ের শাস্তি তাকে সমাজ বহন করায়। পশ্চিমী দুনিয়াতেও সর্বসমক্ষে বিবাহ সভায় প্রয়োজন হলে রেজিষ্ট্রারকে বলতে হয় যে বর বা বধূ অবৈধ সন্তান। সবার সামনে, বিশেষ করে অপর পক্ষের পরিবারস্থ সকলের সামনে এমন একটা পরিচয়ে নিশ্চয়ই কেউ খুশী হয় না।

১৯৬৬ সালের প্রথমার্ধে একমাত্র হল্যাণ্ডের মত ছোট্ট দেশে ২৩৮৯টি অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। এই সংখ্যা সমস্ত শিশু জন্মের শতকরা প্রায় দুই, ঠিক অংক হিসাবে ১·৯৪ পারসেন্ট। এর মধ্যে ৪১·৬ বেশ নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক পরিবারে, ৩২·৬ পারসেন্ট প্রাচীনপন্থী প্রটেস্টাণ্টদের মধ্যে ঘটেছে। বাকী ২৫·৮ পারসেন্ট বরং গোঁড়ামির সীমানার বাইরে বেপরোয়া সমাজের ব্যাপার। অবশ্য এর মধ্যে রক্ষিতা বা উপপত্নীদের সন্তানকেও ধরা হয়েছে। অবিবাহিতা হলেও এরা প্রায় স্ত্রীর মতই পুরুষের সঙ্গে থাকে। এ ক্ষেত্রে অবৈধ সন্তান আশ্রয়হীন হয় না। ভরণপোষণও বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না। তবে পিতার পরিচয় তারাও অনেকক্ষেত্রেই দিতে পারে না। নামের বা বংশ পরিচয়ের বেলায় মায়ের নাম দিয়ে তারা কাজ চালায়। এমনকি দৈনন্দিন ব্যাপারে পিতৃ পরিচয় ব্যবহার করতে যারা পারে, তারাও সরকারীভাবে স্বীকৃতি পায় না। বিয়ের সময়, উত্তরাধি-কারের প্রশ্নে, স্কুলে ভর্তি হতে হলে, সামরিক বিভাগে যোগ দিতে তারা জারজ সন্তান তা স্বীকার করতেই হয়। উপপতি

জাত পুত্র কন্যা তখন মায়ের নাম ভিন্ন আর কিছু উল্লেখ করতে পারে না। তারা বেজন্মা হিসাবে জীবন কাটিয়ে দেয়। নিজের সম্পূর্ণ নির্দোষিতা সত্ত্বেও এটুকু কালিমা বয়ে চলা ভিন্ন গতি নেই।

এতো গেল সমাজের একটি দিক। অন্যদিকের ভয়াবহ জটিলতার সৃষ্টি হয় অনভিজ্ঞ অল্প বয়স্ক মা ও ভাবী মাকে নিয়ে। পরিবারের আপনজন পর্যন্ত বিরূপ হয়ে ওঠে, কর্তব্য নিরূপণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই হল্যাণ্ডেই কুমারীর মাতৃত্ব সমস্যায় শতকরা ৪৫টি অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালিকা মাত্র। ছেলে বন্ধু অথবা বাগ্‌দত্ত প্রণয়ীর পাল্লায় অবাধ মেলামেশায় সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বাগ্‌দত্তের বাগদান মূল্যহীন হয়, বিয়ে হয়তো হয় না। কখনও এমন হয় যে মেলামেশার পর বাগ্‌দত্তা নিজেই অসুখী ভবিষ্যৎ হবে মনে করে বিবাহের অঙ্গীকার ফিরিয়ে নেয়। তেমন তেমন মেয়ে হয়তো অবৈধ সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে নিতে বরং রাজী কিন্তু যার সঙ্গে উত্তরজীবন কাটানো কঠিন হতে পারে এমন পুরুষকে বরণ করতে রাজী হবে না। ভুলটা বুঝতে দেরি হয়েছে। এই সব মায়েরা বড় সমস্যা। তারা সহানুভূতি পায় না, পরিবার পরিজন তাদের ক্ষমা করে না। ভাগ্য তাদের শ্লীর কশাঘাতে কাবু করে রাখে।

পাশ্চাত্য জগতে কর্মী মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হলে তার চাকরি যায় না। গর্ভাবস্থা বরখাস্ত করার আইনসংগত কারণ নয়। যতক্ষণ সে অবস্থা তার কাজের পক্ষে বাধা হয় না ততক্ষণ তার ভয় নেই। অবশ্য আইন তো সব নয়। কাজের পরিবেশ, নিয়োগ কর্তাদের বিরূপতা, সহকর্মীদের বিরুদ্ধভাব তার জীবন বিষময় করে দিতে পারে।

ইউরোপের বহুদেশে এ ক্ষেত্রে অনেকভাবে সাহায্য করার নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থায় মা ও শিশু অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থায় থাকতে পারে। হল্যাণ্ডে এই প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে কাজ করেন। এই সংযুক্ত সংস্থার নাম—

Fedeation of Institutions for Unmarried Mothers and their Child অথবা F.I.O.M. যাতে কুমারী মা বিপদগ্রস্ত জীবনকে অজানা অন্ধকারময় পথে পা বাড়িয়ে আরও বিপন্ন না করে সেজন্য সংস্থাগুলি সদা সচেতন। চিকিৎসক, ধর্মযাজক, সমাজসেবী সবাই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয় জানেন। বিপন্ন মায়ের সন্ধান পেলে তাঁরা যোগাযোগ করে দেন। যেসব মেয়েদের কোথাও স্থান নেই, তাদের স্থান করে দেবার ব্যবস্থা আছে। শিশু জন্মের আগে ও পরে অবিবাহিত কুমারী আশ্রয় পাবে, কর্মসংস্থানে সাহায্য পাবে, কর্মসন্ধানে মা শিশুকে সেই আশ্রয়ে রেখে যেতে পারবে, উত্তরকালে তাকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করায় সাহায্যও করবে। অবশ্য অন্যায়কে যাতে প্রশ্রয় দিয়ে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সমাজে সংশয় না হয় এজন্য মনস্তাত্ত্বিকেরা যুক্ত থাকেন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে। কুমারী মাকে তাঁরা সৎপথে আনতে চেষ্টা করেন, কখনও বা নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সাবধান করে দেন।

অবৈধ সন্তানের অভিভাবক আইনত মা। মা যদি নাবালিকা হয় অথবা তার আচরণ আপত্তিজনক হয় তবে আদালত অভিভাবক নিযুক্ত করেন। আদালত শিশুর মঙ্গল চিন্তা করে অভিভাবক নিযুক্ত করেন। কখনও বা নাবালিকা মা সাবালিকা হয়ে অভিভাবকত্ব পাবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করেন, কখনও কোন প্রতিষ্ঠান হয় অভিভাবক। কখনও বা পিতা তার পিতৃত্ব স্বীকার করে, কখনও বা প্রমাণ করা হয়। সে ক্ষেত্রে পিতাকে শিশুর প্রতি-পালনে অর্থসাহায্য করতে বাধ্য করা হয়। অবশ্য বহু সময় অতি সামান্য হয় সাহায্যের পরিমাণ। মা যদি শিশুকে না রাখতে চায় তাহলে কি হয়? শিশুকে পণ্য হিসাবে বিকিয়ে দেওয়া অথবা গোপন ব্যবস্থায় বিলিয়ে দেওয়ার পথে বাধা দেয় চাইল্ড প্রটেকশন কাউনসিল। যদি মা শিশুর জন্য পালক পিতামাতার সন্ধান পান তবে এই সংস্থা ভাল করে খোঁজ নিয়ে দত্তক গ্রহণের ব্যাপারে রাজী হন। মা যদি শিশুকে ত্যাগ করতে কৃতসংকল্প হয়, তবে শিশু রক্ষা সমিতিই পালক পিতামাতার সন্ধান করে দেন। সেখানে শিশু যে আশ্রয় মাত্র পায় তা নয়, পরিবারের সন্তানই হয়ে যায়।

আমাদের দেশে কুমারী বা বিধবার মাতৃত্ব যে হয় না তা তো নয়, তবে সমাজ হিসাবে একেবারে মুখোমুখি হবার প্রশ্ন হয়তো কঠিন হতে পারে। সেই অজানার পথেই হয়তো সমস্যা লুকোচুরি করে থাকবে, বিপন্ন হবে। দত্তক গ্রহণ ব্যাপারে আইনটা একটু সহৃদয় হলে ভালই হতো। কত অসহায় শিশুর যন্ত্রণা ভবিষ্যতের পথে দত্তক আইন বাধা হয় তার খবর আমরা সর্বদা রাখি না। বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্নের বাইরে দলে দলে শিশু আছে যারা অনাহারে, অযত্নে অকালে কালের কবলে যায় অথবা বিপথের অধোগতিতে তলিয়ে চলে। যে সংসার সাগ্রহে তাকে আমন্ত্রণ জানায় কেন তাদের স্বীকৃতিকে সহজভাবে মানা হয় না জানি না। হতে পারে আইন ব্যবস্থার কড়াকড়ির কারণ আছে কিছু কিছু। কিন্তু কারণগুলি অনুসন্ধান করলে হতো না একবার? অন্যান্য দেশে তো ব্যবস্থা অনেক সরল করা হয়েছে।

শ্রীমতী

শুক্রের সঙ্গে প্রথম আলিঙ্গন

শুকতারাকে আমরা দেখতে পাই হয় শেষ রাত্রে নয় তো সন্ধ্যায়। চাঁদের মতই সে সূর্যের আলোকিত। মহাজগত বিজয়ের পথে প্রথম লক্ষ্য চাঁদ। তারপরেই শুক্র ও মঙ্গল। ১৯৬১ সালে ১২ ফেব্রুয়ারী সোভিয়েটের প্রথম শুক্রগামী মহাকাশযান ভেনাস-১ পৃথিবী থেকে যাত্রা করে। তার ওজন ছিল ৬৪৩·৫ কিলোগ্রাম। সেটি সোজাসুজি পৃথিবী থেকে শুক্রের দিকে যায়নি। একটি প্রকান্ড স্পুৎনিককে বসিয়ে সেটি প্রথমে মহাকাশে পাঠানো হয় পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তনের পথে। সেইখানে স্বয়ং-চালিত যন্ত্র কৌশলের দ্বারা তাকে শুক্রের দিকে যাত্রা করানো হয়। কিন্তু মহাকাশ-যানটি শুক্রে পৌঁছতে পারেনি—প্রায় লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে সেটি শুক্রের পাশ কাটিয়ে যায় ১৯শে মে। ১৮ মাস পরে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসের ২২শে আমেরিকার মেরিনার-১ পৃথিবী ত্যাগের ৫ মিনিট পরেই ফেটে নষ্ট হয়ে যায়।

তার এক মাস পরে মেরিনার-১—এর পদাংক অনুসরণ করে মেরিনার-২ (২০২·২ কিলোগ্রাম) শুক্রের ৩৫ হাজার কিলোমিটার দূরে দিয়ে চলে যাবার সময় কিছু সংকেত পাঠিয়েছিল। এর পরে সোভিয়েট পাঠায় ভেনাস-২ (৯৬৩ কিলোগ্রাম) এবং তারপরেই ভেনাস-৩। প্রথমটি ১২ই এবং দ্বিতীয়টি ১৬ই নভেম্বর। ভেনাস-২ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শুক্রের ২৪ হাজার কিলোমিটার দূরে দিয়ে চলে যায় কিন্তু গতিপথ একটু শুধরে দেবার পর ভেনাস-৩ ১৯৬৬ সালের ১লা মার্চ তার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিল কিন্তু সজোরে শুক্রের মাটিতে আঘাত করার সেটি নষ্ট হয়ে যায়। মহাশূন্যে এইভাবে দুটি মহাকাশযানের একই লক্ষ্যের দিকে উড়ে যাওয়া এর আগে আর হয়নি। যাই হোক ভেনাস-৪ এবার শুক্রের ভূমিস্পর্শ করে সংকেত পাঠাচ্ছে। প্রথম স্পুৎনিকের মহাকাশযাত্রার দশম বার্ষিকীতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এই নতুন সাফল্য লাভ করল অর্থাৎ মহাজাগতিক অভিযানের দশম বৎসরে।

পৃথিবীর মানচিত্র অংকিত এই গোল কেতনটি শুক্রে পরিবাহিত হয়েছে

শুক্রগামী পথ মোটেই সহজ নয়, অত্যন্ত জটিল। যদিও শুক্র অন্যান্য গ্রহের তুলনায় আমাদের সবচেয়ে কাছে সবচেয়ে দীপ্তিমানও বটে। প্রতি দেড় বছর অন্তর শুক্র একবার করে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে। তখন তার পৃথিবী থেকে দূরত্ব দাঁড়ায় ৪ কোটি কিলোমিটারের মত। সুতরাং সেটাই হচ্ছে গ্রহটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সেই সুযোগ গ্রহণ করতে না পারলে শুক্র পৃথিবী থেকে সাড়ে ১৭ কোটি কিলোমিটার দূরে চলে যাবে এবং সেক্ষেত্রে মহাকাশযানের সঙ্গে বেতার সংযোগ বজায় রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। উৎক্ষেপণের সময় তার গতিবেগ নির্ধারণ করতে হবে সেই সময়ে তার উপর সূর্য, পৃথিবী, চাঁদ শুক্র ও বৃহস্পতির আকর্ষণ ও অবস্থান নির্ভুল-ভাবে বিচার করে যাতে তার পরাবৃত্তাকার গতিপথ থেকে সে ভ্রষ্ট হতে না পারে। এই ক্ষেত্রে গতিবেগের প্রতি সেকেন্ডে যদি ১ মিটারও ভুল হয় তাহলে মহাকাশযানটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শুক্রের ৫৮ হাজার কিলোমিটার দূরে দিয়ে চলে যাবে। তাছাড়া একেবারে ষোল আনা নির্ভুলভাবে মহাকাশ-যানটি পরিকল্পিত গতিপথে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ। সেইজন্য ভেনাস-৩ মহাকাশযানটির উড্ডন্ত অবস্থায় গতি সংশোধিত করা হয়েছিল। এই শিক্ষা গ্রহণ করেই ভেনাস-৪কে পাঠানো হয়।

নিজের হাতে তৈরি দূরবীনের সাহায্যে শুক্র পর্যবেক্ষণ করে ১৮শ শতাব্দীর রুশ বৈজ্ঞানিক মিখাইল লোমোনোসফ মন্তব্য করেছিলেন, "মনে হচ্ছে পৃথিবীর মতই শুক্রেরও একটি আবহমণ্ডল আছে।" শোনা যায় তাঁর আগে শুক্রের আবহমণ্ডলের কথা কেউ বলেননি। তিনি এমন একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন যা ঘটে বহু বছর অন্তর অন্তর যার ভিত্তিতে তিনি শুক্রের আবহ-মণ্ডলের অস্তিত্ব বুঝতে পারেন। শুক্রগ্রহ পরীক্ষার সময় লোমোনোসফ দেখেন যে তখন গ্রহটি সৌরগোলকের উপর দিয়ে যাচ্ছে। তখন তাঁর আলোকিত দিকটি ছিল সূর্যের দিকে, অন্ধকার দিকটি ছিল পৃথিবীর দিকে। সেই সময় তিনি দেখেন যে শুক্রকে একটি অল্প উজ্জ্বল বলয় ঘিরে আছে। তাই থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে সেই বলয়টি হচ্ছে সূর্যের আলোকে আলোকিত আবহমণ্ডল। পৃথিবী ও সূর্যের ঠিক মাঝখান দিয়ে শুক্র এইভাবে চলে যায় অনেক বছর অন্তর অন্তর। যেমন লোমোনোসফের সময় ওই ব্যাপারটি ঘটার পর আবার ঘটেছিল ১৮৮২ সালে এবং ২০০৪ সালে আবার ঘটবে যখন আমাদের অনেকেই বেঁচে থাকব না।

১৯৩২ সালে মিঃ অ্যাডামস ও মিঃ ডানহ্যাম নামে দুজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক মাউন্ট উইলসনের মানমন্দিরের দূরবীনের

সাহায্যে শুক্রের বর্ণচ্ছত্রের অবলোহিত অংশে শুক্রের কার্বনিক অ্যাসিডের অস্তিত্বের প্রমাণ পান। তারপর মিঃ অ্যাডেল ও মিঃ স্লাইফার শুক্রের মেঘাবগুণ্ঠনে কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ মেপে বলেন যে শুক্রের ওই গ্যাস পৃথিবীর আবহ চাপ ও তাপে তিন কিলোমিটার পুরু ওই গ্যাসের সমতুল্য।

১৯৫০ সালে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক আচার্য কজিরেফ ও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আচার্য ওয়ার্নার শুক্রের আবহমণ্ডলে আমাদের সুমেরুজ্যোতির মত আয়নিত নিরপেক্ষ নাইট্রোজেন ও পারমাণবিক অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। কিন্তু শুক্রের নৈশ আকাশের দীপ্তি পৃথিবীর তুলনায় ৫০ গুণ বেশি। সেটা সম্ভবত পৃথিবীর চেয়ে শুক্র সূর্যের অনেক কাছে বলে।

মুক্ত অক্সিজেন ও জলের অস্তিত্ব সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। আগেকার দিনে অনেকের ধারণা ছিল যে ঐ রকম অক্সিজেন বা জল শুক্রে নেই কারণ বর্ণচ্ছত্রে এমন কোন ব্যাণ্ড বা বন্ধনী তাঁরা পাননি যা থেকে বলা যায় যে মুক্ত অক্সিজেন বা জল আছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে কেলাসিত
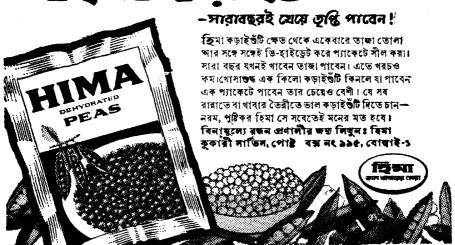
তুষারে নির্মিত অনচ্ছ কুণ্ডল মেঘের আবরণের নিচের দিক সম্পর্কে এইসব মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। সেই মেঘের স্তর শুক্রের আকাশে ৪৫ মাইল উপর থেকে আরম্ভ করে ৬০ মাইল পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিকরা আর একটি জিনিস লক্ষ করেছেন যা হচ্ছে সেই মেঘে আয়নার মত একটা প্রতিফলন। তাই থেকে মনে হয় শুক্রের চেহারা সেইভাবে মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিজ্ঞানাচার্য বারাবাশফ এবং মেনজেল ও হুইপ্‌ল্‌ নামে আরো ২জন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, ঐ ধরনের প্রতিফলন জল থেকেই হতে পারে। শেষের দুজনের মতে শুক্র এক মহাসাগরে আবৃত। এই মতের কারণ হিসাবে তাঁরা বলছেন যে শুক্রে পৃথিবীর মত অঙ্গার থেকে হাইড্রোকার্বন তৈরি হয়নি এবং ঐ গ্রহে কোন স্থল ভাগ নেই। স্থলভাগ থাকলে সমুদ্রের জল খনিজ পাথরের সঙ্গে মিশে বিভিন্ন ধরনের কার্বনেট তৈরি হতো যার ফলে আবহমণ্ডলের এত বেশি শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ কার্বনিক অ্যাসিড পাওয়া যেত না। পৃথিবীতে যেক্ষেত্রে অক্সিজেন হচ্ছে ২১ শতাংশ এবং জলীয় বাষ্প ০ থেকে ৪ ভাগ পর্যন্ত, সেক্ষেত্রে ভেনাস-৪ শুক্রের আবহমণ্ডলে পেয়েছে শতকরা ০·৪ ভাগ অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প মিলিয়ে পেয়েছে শতকরা মোটে ১·৬ ভাগ। শুক্রে তাহলে অক্সিজেন গেল কোথায়? এত অক্সিজেন থেকে যদি হাইড্রোকার্বন তৈরি হয়ে থাকে তাহলে ব্যাপারটা ঘটেছে পৃথিবীর ঠিক বিপরীত। এমনও হতে পারে যে শুক্রের অক্সিজেন গিয়ে মিশেছে তৈলের সঙ্গে। যদি তাই হয় তাহলে শুক্রের মেঘে তৈল বিন্দু থাকতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন যে শুক্রের সাগর তৈলসাগর হতে পারে। অবশ্য এ সবই এতদিন পৃথিবী ভিত্তিক গবেষণা লব্ধ অনুমিতি। আমরা আশা করি ভেনাস-৪-এর কাছ থেকে আমরা শুক্র সম্পর্কে বহু নতুন খবর পাব। শুক্রে পাহাড় পর্বতের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বৈজ্ঞানিক যেমন আমেরিকার রোলান্ড কার্পেন্টার এ রিচার্ড গোল্ডস্টাইন (ক্যালিফর্নিয়া) শুক্রে রেডিও রশ্মি প্রতিফলিত করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে শুক্রে অন্তত দুটি পর্বতমালা আছে—একটি পূবে থেকে পশ্চিমে, অন্যটি উত্তর থেকে দক্ষিণে। প্রথমটির নাম দেওয়া হয়েছে আলফা, দ্বিতীয়টি বিটা। শুক্রে প্রেরিত কিছু রেডিও রশ্মি অন্য রেডিও রশ্মির চেয়ে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসছে দেখেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। তাঁদের মতে যে রশ্মিগুলি পাহাড়ে গিয়ে প্রতিফলিত সেগুলি আগে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে, আর যেগুলি সমতল ক্ষেত্রে
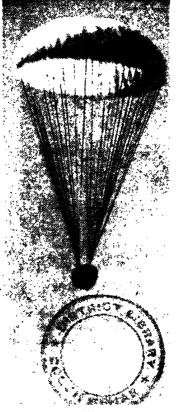
প্যারাস্যুটের সাহায্যে শুক্রে অবতরণের মহড়ায় ভেনাস-৪

পৌঁছে প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলির ফিরে আসবার সময় দীর্ঘতর পথ অতিক্রমণ করতে হয়েছে বলে সেগুলির বেশি সময় লেগেছে।

শুক্রের তাপমাত্রা সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। এটা ঠিক যে পৃথিবীর তুলনায় শুক্র সূর্যের অনেক কাছে বলে সে পৃথিবীর চেয়ে আলো ও তাপ পায় দ্বিগুণ পরিমাণ। সেই সঙ্গে এটাও ধরে নেওয়া হয় যে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তন বেগের তুলনায় শুক্রের সেই বেগ অনেক। সেখানকার একটি দিন পৃথিবীর কুড়ি দিনের সমান এবং কেউ কেউ বলেন যে, তার একটি পিঠ বরাবর সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, অন্য দিকটিতে সবসময় রাত্রি, যেমন রয়েছে চাঁদের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি তাই হতো তাহলে আলোকিত ও অন্ধকার দিক দুটির মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য হত খুবই বেশি। কিন্তু আচার্য পেটিট ও আচার্য নিকলসন বলেন যে ঐ তাপমাত্রার পার্থক্য ৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়। যদি তাই হয় তাহলে শুক্র ঠিক পৃথিবীর মতই আবর্তন করে, তবে অনেক ধীরে ধীরে। যাঁরা শুক্রে তৈলসাগরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁদের মতে তৈলের ভারত্বের জন্যই শুক্রের আবর্তন বেগ এত কম। আরো একদল বিজ্ঞানী আছেন যাঁদের ধারণা শুক্র পূবে থেকে পশ্চিমে আবর্তন করে। আচার্য কুজমিন ও আচার্য ক্লার্কের মতে শুক্রের মেঘস্তরের তাপমাত্রা ২৪০ ডিগ্রী কেলভিনের মত এবং মন্দায়িত আবর্তন বেগের ফলে শুক্রের আবহমণ্ডলে ক্রমাগত বৈদ্যুতিক 'চার্জ' হতে থাকে। আচার্য লেবেদিনস্কি মনে করেন যে শুক্রের জমির উপর তাপ মাত্র ৫০।৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়। অন্য এক গোষ্ঠী তা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে যে সৌর তাপ শুক্রে পৌঁছায় মেঘাবরণের জন্য তা আর বাইরে আসতে পারে না বলে শুক্রের তাপমাত্রা নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি হবে। কিন্তু সেকেণ্ডে ১১ কিলোমিটার বেগে শুক্রে অবতরণের সময় ভেনাস-৪, ৪০ থেকে ২৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে বলে খবর এসেছে। আর ব্যারোমিটারের চাপমাত্রা ছিল ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত। অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায় ১৫ থেকে ২২ গুণ বেশি। ভেনাস-৪ শুক্রে অবতরণ করে তার আলোকিত ও অনালোকিত সীমান্ত থেকে (বিষুব রেখা) ১৫০০ কিলোমিটার দূরে।

ভেনাস-৪ মহাকাশযানের প্রেরিত সংকেত অনুসারে শুক্রের চৌম্বিক ক্ষেত্র প্রায় নেই বললেই চলে। যা আছে তা হচ্ছে পৃথিবীর তুলনায় তিন অযুত ভাগের ১ ভাগ। ভেনাস-৪ শুক্রের পৃথিবীর ভান স্যালান বেল্টের মত কোন বিকিরণ বলয় পায়নি। ১ মিটার ব্যাসের ও ৩৮৩ কিলোগ্রাম ওজনের এই মহাকাশযানটিকে অবতরণের সময় ১০ থেকে ১১ হাজার ডিগ্রি উত্তাপ সইতে হয়। এক্ষেত্রে যেটা লক্ষ করার জিনিস সেটা হচ্ছে যে গ্রহমাত্রেরই চৌম্বক ক্ষেত্র আছে, এতদিনকার এই ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়ে গেল।

এ হেন অবস্থায় শুক্রে জৈব বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কি বলা যায়? গ্রহ হিসাবে শুক্র মঙ্গল পৃথিবী ও চাঁদের সমগোত্রীয়। তবে তার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ৩১৭ মাইল কম (৭,৬১০ মাইল)। প্রথম কথা শুক্রে যদি মুক্ত অক্সিজেন না থাকে তার মানে সেখানে আলোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটবার অনুকূল অবস্থা নেই অর্থাৎ সবুজ গাছপালা জন্মাবার সম্ভাবনা নেই। তা যদি না থাকে তাহলে অণ্ডলালাভিত্তিক প্রাণীর অস্তিত্ব থাকাও অসম্ভব। তারপর শুক্র যদি সাগরে আবৃত থাকে এবং সেখানে তাপমাত্রা যদি অত বেশি হয় তাহলে সেই সাগর হবে পৃথিবীর ফুটন্ত জলের চেয়েও
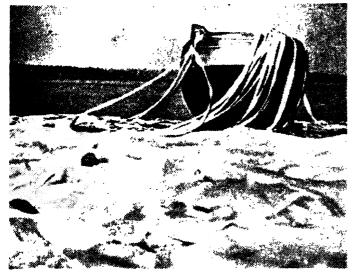
মহড়ার সময় ভেনাস-৪ প্যারাসুটের সাহায্যে মাটিতে নেমে এসেছে

বেশি গরম। কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণ প্রস্রবণে এমন সব উদ্ভিদ দেখা যায় যেগুলির রং সবুজ নয়। সেই ধরনের উদ্ভিদ শুক্রে থাকলেও থাকতে পারে। বিজ্ঞানাচার্য বারাবাশফ মনে করেন যে বহু লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর আবহাওয়া যখন খুব উত্তপ্ত ছিল তখন পৃথিবীতে যেসব উদ্ভিদ বা জীব ছিল শুক্রে এখন সেই ধরনের উদ্ভিদ বা জীব থাকতে পারে। এই ধারণা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে একথা বলা অন্যায় হবে না যে শুক্রের জৈবজগৎ আজ বিবর্তনের পথে চলেছে।

এই রকম শুক্র সম্পর্কে বহু প্রশ্নের জবাব যে আমরা ভেনাস-৪ মহাকাশযানের কাছ থেকে আশা করি সে কথা বাদ দিলেও যে বিজ্ঞানী যন্ত্র কৌশলবিৎ ও কর্মীদের অক্লান্ত গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মেহনতের ফলে ভেনাস-৪-এর এই অভূত-পূর্ব সাফল্যলাভ তাঁদের কৃতিত্ব অভিনন্দন যোগ্য। শুক্রগামী ৩৫ কোটি কিলোমিটার দীর্ঘ পথের দিকটুকু নিয়েই তাঁদের মাথা ঘামাতে হয়েছিল সবচেয়ে বেশি কারণ শুক্র ও তার আবহমণ্ডল সম্পর্কে তথ্য যেগুলি তাঁদের হাতে ছিল সেগুলি হরেক রকমের অনুমিতি ও বহু ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। অথচ সেগুলি থেকে সম্ভাব্য নির্ভুল তথ্য-গুলি বেছে নিয়েই তাঁদের ভেনাস-৪ নির্মাণ করতে হয়েছে এবং মাসের পর মাস ধরে বহু মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে। ভেনাস-৩ থেকে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে তাঁরা সাহায্য পেয়েছেন। শুধু ভেনাস-৩ কেন, তার আগেকার দুটি শুক্র-গামী মহাকাশযানের ভুলত্রুটি থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে সেই সব ভুল শুধরে নিয়ে, এমন বহু নতুন ও মৌলিক কৌশল তাঁরা ভেনাস-৪ মহাকাশযানে সন্নিবিষ্ট করেন যাতে এবার সে ঠিক মত লক্ষ্যভেদ করতে পারে শুধু নয় সেই সঙ্গে শুক্রের আবহমণ্ডলের পরিমিতি (প্যারামিটার) সম্পর্কে নির্ভুল রেডিও সংকেত পাঠাতে পারে। প্রথম বার ভেনাস-১ মহাকাশযানের সঙ্গে কয়েক নিযুত মিলো-মিটার দূর পর্যন্ত রেডিও যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৬৪-৬৫ সালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চেষ্টায় প্রায় শেষ পর্যন্ত সেগুলির পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া লুনা ও জণ্ড্ মহাকাশযানগুলিও ঐ ব্যাপারে কম সহায়তা করেনি কারণ সেগুলি শুধু চাঁদে উড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়নি। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উড়ে যাবার উপায় উপকরণ সম্পর্কেও বহু তথ্য পরিবেশন করেছে।

শুক্রের আবহমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে নামবার সময় ভেনাস-৪কে প্রচণ্ড তাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রথমে তাকে পৃথিবী থেকে বায়ুশূন্য পথে প্রচণ্ড মহাজাগতিক শৈত্য সহ্য করে যেতে হয়েছে এবং তারপরে হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাপ ভেদ করে শুক্রে গিয়ে নামতে হয়েছে। এই গরম ও ঠাণ্ডা সহ্য করার শক্তি তাকে দান করা হয় পৃথিবীতে হিম ঘরে এবং তাপ ও চাপের চেম্বারের মধ্যে পরীক্ষা করতে, ঘূর্ণায়মান কেন্দ্রাতিগ যন্ত্র বা সেণ্ট্রিফিউজের সজোরে কম্পমান মঞ্চের উপর বসিয়ে এবং প্যারাশুটের সাহায্যে জলে ও স্থলে নামিয়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি যন্ত্রাংশ এই সব কঠিন ও দুঃসহ অবস্থা সহ্য করে শুক্রগামী পথ পার হতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ তাপ ও চাপ যুক্ত চেম্বারের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় থাকতে না পারে ততক্ষণ বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হননি। সেজন্য পরীক্ষার মধ্যে বহু যন্ত্রপাতি ভেঙে একটি সংশোধন করে আবার নতুন-ভাবে নির্মাণ করতে হয়। মোটকথা শুক্রে যাবার পথে যত রকমের বাধাবিপত্তি কল্পনা করা সম্ভব তার প্রত্যেকটি জয় করতে ভেনাস-৪কে 'শেখানো' হয়।

এই সব পরীক্ষায় বিশেষ করে উৎক্ষেপের মাহেন্দ্রক্ষণ বিচারের ব্যাপারে বোধ হয় গণিতশাস্ত্রীদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে আধুনিক পরিগণনা যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরাই নির্ধারণ করেছেন রকেট উৎক্ষেপের নির্ভুল সময়; সবচেয়ে সুবিধাজনক গতিপথ এবং সেই গতিপথ সংশোধনের সময়। তাঁরা জ্যোতিষীর মত ভেনাস-৪-এর শুভযাত্রার স্বার্থে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বিচারবিবেচনা করেই রকেটের যাত্রাকাল নির্ণয় করেন। তাঁরা এটাও হিসাব করে দেখেন যাতে মহাকাশযানটি ঠিক এমন সময় শুক্রের ভূমিস্পর্শ করে যখন গ্রহটি রেডিও দূরবীণের পাল্লার মধ্যে আসে। সে হিসাব দিন ঘণ্টা বা মিনিট দিয়ে হয় না, হয় সেকেণ্ড দিয়ে। তার এক চুল এদিক-ওদিক হলেই ভেনাস-৪ লক্ষভ্রষ্ট হয়ে যেত।

আজ হাজার বছর ধরে চেষ্টা করেও মানুষ যে শুকতারার ওড়না উন্মোচন করতে পারেনি দুনিয়ার প্রথম গ্রহান্তরগামী মহা-শূন্যযান ভেনাস-৪ তার অন্তত কিছুটা যে অনাবৃত করবে তাতে সন্দেহ নেই।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

আটচল্লিশ

আবার না, বারে বারে ফিরে ফিরে বলতে হয়, এর নাম অচিনবাবু। নইলে এমন দৃশ্য দেখতে পেতে না ছাতিমতলার মেলায়। এক গোরা বয়স্ককে জড়িয়ে ধরে কালো সাঁওতালী। তাও কি, দেখ একবার, দামী পশমী জামা আলোয়ানের সঙ্গে কি না, ধুলোয় মাথা ছেঁড়া কম্বলের জড়াজড়ি। এর সঙ্গে আরো খবর যোগ কর, গোরা বয়স্ক অচিনবাবু লখ্নৌ থেকে সোজা এসেছেন নিজের বিলাতী হাওয়া গাড়িতে। চাকরির বিনিময়ে তাঁর মাসিক মূল্য বত্রিশ শো টাকা। যাকে জড়িয়ে ধরেছেন, তাকে দেখলে বোঝা যায়, বিহান থেকে তার দিন কাটে মাঠে। সাঁঝবেলাতে ঘাটে পা ধুয়ে যে ঘরে ফেরে।

বলবে, এমন বহিরাঙ্গনের দামাদামির বিচার কেন হে। কারণ ঘর নিয়ে যে মন। নিচুতে না, উঁচুতে না, মাঝখানে যে মধ্যবিত্তের মন, তার সেই ছোট জায়গাটাই আগে নাড়া খেয়ে যায়। তাই অবাক লাগে। তারপরে উঁচু নিচু মাঝখানের ঘর না, তার বাইরে, সে-ই এক, যার দ্বিতীয় নেই, প্রাণে প্রাণে জড়ানো দেখে, নিজের প্রাণের ভিন স্রোতের বাঁধ খুলে যায়। তখন কেবল অবাক লাগে না। টলটলিয়ে ওঠে মুগ্ধ রসের ঢেউয়ে।

একবার মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীতের দিকে ফিরতে যাই। প্রথমেই চোখ পড়ে যায় ঝিনির দিকে। চোখ পড়তে চোখোচোখি হয়ে যায়। সে তখন আমার দিকে চেয়ে কেন, কে জানে। একটু যেন লজ্জা পেয়ে যায়। বলে ওঠে, 'অদ্ভুত।'

অবাক খুশিতে বেজে ওঠে রাধা, 'কে, অচিনদা তো? সত্যি।'

লিলি বলে, 'দেখেছ, ও'র খাতিরের লোক সব আলাদা।'

আমি আবার চোখ ফিরিয়ে অচিনদাকে দেখি। দেখি, তখন আর বরহম সাঁওতাল একলা না। পাশে দাঁড়িয়ে তার কাছাকাছি বয়সের এক সাঁওতালনী। সেও যেন হেসে হেসে অচিনদাকে কী বলে। আর উনি হেসে হেসে জবাব দেন। তারপরে পকেট থেকে কী নিয়ে বরহমের হাতে গুঁজে দিতে যান। সে হাত ফিরিয়ে নেয়। শুনতে পাই, বলে, 'না রে না, তুই চল ক্যানে। উ আমি চাই না।'

অচিনদা বলেন, 'তুই চল না। সব নিয়ে টিয়ে গিয়ে বোস, আমি যাচ্ছি।'

রাধা বলে, 'কী দিচ্ছেন?'

লিলি বলে, 'মনে হচ্ছে টাকা দিচ্ছেন যেন।'

আমি আবার এদিকে চোখ ফেরাই। ঝিনিও সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে চায়। তার চোখেও জিজ্ঞাসা। যার জবাব আমার জানা ছিল না। তারপরে হঠাৎ ঝিনি যেন কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না। চোখ নামিয়ে নেয়।

জিজ্ঞেস করি, 'কিছু বলছেন?'

ঝিনি চোখ তুলে বলে, 'আপনার মুগ্ধতা দেখছি।'

বলি, 'আমিও আপনাদেরটা দেখছি।'

'আপনার সঙ্গে আমাদের একটু তফাত আছে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'যথা?'

ঝিনি বলে, 'বুঝিয়ে বলতে পারছি না। কেবল মনে হল, আপনি একেবারে আত্মহারা।'

তবু অবুঝের মত চেয়ে থাকি। কথার ঠিক জায়গা ধরতে পারি না। ঝিনি আবার বলে, 'ছেলেমানুষের মত। যেন আপনিও পারলে, লোকটাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতেন।'

দার্শনিকেরা কল্পনা করে কি না জানি না। দার্শনিকারা করে, ঝিনি তার প্রমাণ। নইলে এত বাড়িয়ে বলবে কেন। অচিনদার বন্ধু আর বন্ধুত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছি বটে। বরহম সাঁওতালকে জড়িয়ে ধরতে চাইব কেন। বন্ধু হলে ধরতাম। অমন খোলা প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় আর মুগ্ধতায় আমার মন ভেপেছে।

আমরা যখন কথা বলি, তখন বাকীদের ধেয়ান অচিনদার দিকে। ঝিনি আবার বলে, 'আপনার সেই গাজীর কথা আমার মনে পড়ছে।'

জিজ্ঞেস করবার অবকাশ পাই না, অচিনদা আর বরহমকে দেখে কেন গাজীর কথা তার মনে পড়ে। অচিনদার ধমক শোনা যায়, 'নিবি না তা হলে?'

ফিরে চেয়ে দেখি, বরহম তখন পৌঁছিয়ে গিয়েছে অনেকখানি। তার বোঁচা নাক কালো মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। সাঁওতালনীরও সেই রকম। বরহম নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়ে জানায়, নেবে না। বলে, 'তুই আয়, আমরা যেয়ে বসি।'

অচিনদা বলেন, 'ঠিক থার্কাব তো?'

'হুঁ রে হুঁ, মিছা ক্যানে বইলব?'

'তো যা, তোরা যা, আমি একটু বাদে যাচ্ছি।'

বরহম ঘাড় কাত করে, সাঁওতালনীকে নিয়ে চলে যায়। অচিনদা ফিরে আসেন। মুখে তাঁর টেপা টেপা হাসি। এসে বসতে না বসতেই রাধা জিজ্ঞেস করে, 'ও কে অচিনদা।'

সুপর্ণাদি বলে ওঠেন, 'আগে কফিতে চুমুক দিতে দাও, ওটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

যাঁর যেদিকে নজর। কফির পাত্রে চুমুক দেবার আগে অচিনদা বলেন, 'ছেলেবেলার বন্ধু।'

এক চুমুকে কফির পাত্র শেষ করে, চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলেন, 'দেখেছ তো কীরকম বন্ধু? এখনও ভেবে দেখ, আমার সঙ্গ করা চলবে কি না।'

তাঁর কথায় সবাই হেসে বাজে। তিনি চুরুটে আগুন জ্বালেন।'

লিলি জিজ্ঞেস করে, 'আপনার ছেলেবেলার বন্ধু মানে? আপনি কি এদের সঙ্গে ছিলেন নাকি ছেলেবেলায়?'

'তা, একরকম তা-ই বলতে পার। সঙ্গে না থাকলেও কাছাকাছি তো ছিলাম। আমরা ছিলাম আশ্রমে, ওরা ছিল কোপাইয়ের ধারে। ওরা যখন কোপাইয়ের ধারে গরু চরাতো, আমরা তখন ছেলেবেলায় অনেকবার সেখানে গিয়েছি। তবে এইটুকু বলতে পার, সব ছেলেরাই কি আর কোপাইয়ের সাঁওতাল ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতো? তা করতো না, আমার মত দু একজনের সে রোগ ছিল। রোগটা যে কেমন, বুঝতেই পারছ, এখনো দেখা হলে আগের মতই ছেলেমানুষি করতে ইচ্ছে করে।'

কথা বলতে বলতে ও'র চুরুট নিবে যায়। আবার আগুন জ্বালেন। আর সেই আগুনের আলোয় দেখি, ও'র মুখের হিজিবিজি রেখায় তরঙ্গের দোলা। রাধা বলে, 'আপনারা বেশ মজায় ছিলেন।'

অচিনদা বলেন, 'মজা? তা একরকম বলতে পার। আমাদের যুগের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এ যুগের অনেক তফাত। তুমি যাকে মজা বলছ, আমাদের কাছে সেটাই ছিল খাঁটি চেহারা, ওরিজিনাল। তবে তর্ক আসতে পারে, সে কথা থাক, সময় তার কাজ করে যায়। তার ওপরে কারুর হাত চলে না। তবে কি না, "ওর অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপে চিরন্তন॥ অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন।" হারিয়ে যাওয়ার পিছনেও কিছু জেগে থাকে। সময় চলে যায় ঠিকই, তার ওপারেও কিছু থেকে যায়। কেবল যে চোখ বুজলেই তা দেখতে পাই, তা নয়। মাঝে মাঝে বরহমের মত কেউ কেউ পুরনো সুরে ডেকে ওঠে, সামনে এসে দেখা দেয়।'

সবাই এমন নিবিষ্ট হয়ে শুনি, কখন যেন, মেলার এই কফি ঘরে স্তব্ধতা নেমে আসে। আমি আবার দেখি, সেই মানুষকে। যে মানুষ হাবাগোবা ছেলেটির মত অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছেন। ইতিমধ্যে আমরা সবাই চোখচোখি করি। সকলেরই যেন এক উৎসুক বিস্ময়। সকলেরই চোখে যেন রূপকথা শোনার আবেশ।

কিন্তু নৈঃশব্দই চমক দিল অচিনদাকে। হঠাৎ বলেন, 'এই দেখ, বকে চলেছি। এবার ভাই আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। আবার কাল—।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ঝিনি যেন ব্যাকুল উদ্বেগে বলে ওঠে, 'এত তাড়াতাড়ি?'

অচিনদা অমনি চোখ ঘুরিয়ে বলেন 'খুব তাড়াতাড়ি বুঝি?'

ও'র ভুরু তুলে, চোখ ঘোরানোর মধ্যে যেন কী এক ইশারা খেলে যায়। এমন করে বলেন, বাকীরা যখন হাসে, ঝিনির ডাগর চোখ দুটি তখন হঠাৎ লাজে লাজিয়ে যায়। মুখ নত করে। কিন্তু রাধা ওর ঘাড় অবধি ফাঁপানো চুলে ঝটকা দিয়ে বলে 'খুব তাড়াতাড়িই তো হচ্ছে। আপনি এখুনি চলে যাচ্ছেন কেন। সেরকম কথা তো ছিল না।'

লিলি বলে, 'তা ছাড়া, আমাদের তো আবার বাউল গান শুনতে যাবার কথা।'

অচিনদা বলেন, 'আহা, সবাই তো আর চলে যাচ্ছে না। তোমরা রয়েছ, একেও রেখে যাচ্ছি।'

বলে, আমার দিকে একবার চোখের ইশারা করে দেখান। তারপরে ঝিনির দিকে তাকান। আমার চোখোচোখি হয় রাধা লিলির সঙ্গে। সবাই হাসি। কিন্তু মনে মনে ভাবি, অচিনদা পথ চলার কোন দিকেতে ইশারা দেন। নিত্য উধাও পথের ধারে, কোন বাগিচা রচেন। কী ফুল ফোটান।

রাধা ওর ছেলেমানুষি মিঠে মুখখানি, গ্রীবার বৃন্তে দুলিয়ে বলে, 'তা জানি, তবু একটু থাকুন।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝিনি বলে ওঠে, 'আর তা নইলে আমরাও আপনার সঙ্গে যাই।'

অচিনদা প্রায় চমকে উঠে বলেন, 'আঁ বল কী? নাঃ এ মেয়েটা দেখছি সত্যি সেই "যোগিনী হয়ে যাব সেই দেশে, যেথায় নিঠুর হরি।"'

আবার হাসি বেজে ওঠে। কিন্তু লিলি বলে ওঠে, 'না না, সত্যি, আমরা সবাই মিলে আপনার সঙ্গে যাব।'

অচিনদা খলখলিয়ে হেসে বলেন, 'সর্বনাশ, এ কাদের নিয়ে বেরিয়েছেন সুপর্ণাদি? এ তো সব দেখছি বাউল বৈরাগিনী। কাল মানে না, লোক মানে না, স্থান মানে না, বলে সঙ্গে চলে যাবে?'

লক্ষ করেছিলাম, সুপর্ণাদি বারে বারেই বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। হেসে বলেন 'আমি ওদের নিয়ে বেরোইনি। ওরাই আমাকে নিয়ে বেরিয়েছে।'

বলে, সস্নেহে তাকাল তিন সখীর দিকে। অচিনদা বলেন, 'কিন্তু আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে এ সময়ে তো তোমাদের নিয়ে যেতে পারব না ভাই। তা হলে এস, সবাই মিলে আর এক পাত্র করে কফি খাই, গল্প করি।'

ইচ্ছা নেই, তবে অগত্যা। আবার কফির অনুমোতি হয়। ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাবেন?'

'বরহমদের আড্ডায়।'

'কোপাইয়ের ধারে?'

শুনেই রাধা উচ্ছাসে আর উল্লাসে বেজে ওঠে, 'ইস, কী সুন্দর! আমাদেরও নিয়ে চলুন না।'

অচিনদা ততক্ষণে হাসতে আরম্ভ করেছেন। বলেন, 'উঃ এ কী কলকাত্তাইয়া পাগলীদের পাল্লায় পড়েছি দেখ। আরে বোকা, কোপাই কি এখানে নাকি? আমি কি বরহমদের আস্তানার কথা বলেছি? আমি বলেছি, ওদের আড্ডায় যাব একটু। এখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, সেখানে তোমাদের নিয়ে যেতে পারব না।'

সকলেরই মুখে ছায়া ঘনায়। জমাটি আসর হঠাৎ ভাঙার হতাশা। ভাঙবার আগেই গরম কফির উষ্ণতা যেন জুড়িয়ে যায়।

ঝিনি আবার জিজ্ঞেস করে, 'এই মেলার মধ্যেই তো?'

'না। তা হলে আর তোমাদের নিয়ে যেতে বাধা কী ছিল। আমি যাব উত্তরের খাল পেরিয়ে।'

বলে, চুপচাপ কয়েকবার কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে আবার বলেন, 'অথচ এককালে পৌষ মেলায় বরহমরা ছিল অনেক বড় শরিক। মেলাটা ছিল, ওদেরই অনেকখানি।'

এবার আমার বেজে ওঠার পালা। বলি, 'হ্যাঁ, ওরা তো শুনেছি দল বেঁধে আসে, নাচে, গান করে।'

আমার কথায় অচিনদা ঘাড় দুলিয়ে সমর্থন জানাতে জানাতে, তারপরে উল্টোদিকে নাড়াতে থাকেন। বলেন 'কিন্তু আর ওদের এ মেলায় দেখতে পাবে না। স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দলিলেও ওদের উৎসবে আমন্ত্রণের নির্দেশ ছিল। কিন্তু ওরা আসে না, আসবে না কোনদিন।'

কেন, তা জিজ্ঞেস করবার দরকার হয় না। অচিনদা নিজেই বলেন, 'বোধ হয়, বছর আট দশ আগেও এসেছে। উত্তরায়ণের সামনে নয়া পোস্টঅফিসের রাস্তার ধারে যে মাঠ, সেখানে ওরা নিজেরা নাচে গানে

কি ধবধবে ফরসা ! কি পরিষ্কার ! সত্যিই, সার্ফে পরিষ্কার করে কাচার আশ্চর্য্য শক্তি আছে ! আর, কী প্রচুর ফেনা ! শাড়ী, চোলি, শার্ট, প্যান্ট, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় ... আপনার পরিবারের প্রত্যেকটি জামাকাপড়ই সার্ফে কেচে সবচেয়ে ফরসা; সবচেয়ে পরিষ্কার হবে। বাড়ীতে সার্ফে কেচে দেখুন।

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

... আমা, ... চোখের সেই ... স্রোত। সহজলভ্য ... সাঁওতাল মেয়েদের গায়ে হাত ... তার পরিণতি যা হয়, তাই ... প্রতিবাদ আর সংঘর্ষ। সেই ... মেলার উৎসব থেকে ওরা বিদায় ...।'

কথা শেষ করে, অচিনদা কফির পাত্রে চুমুক দেয়। অপরেরা তাও ভুলে যায়। সকলেরই মুখে রুদ্ধ বিষণ্ণতা। আমার চোখে ভেসে ওঠে মলুটি গ্রামের মৌলীক্ষার মাঠ। কালী পুজোর ভাসানে যেখানে দেখেছিলাম, আদিম বিশ্বাসের অপরূপ লীলা। হয় তো এই ছাতিমতলার মেলার, মৌলীক্ষার মাঠের মত, নিরাবরণ পুরুষ প্রকৃতির গর্ণমিল হত না কিন্তু, সহস্রের নাচের দোলায় তরঙ্গায়িত মাঠ ভেসে ওঠে চোখে।

ঝিনি যেন ইংরেজীতে কী বলে ওঠে, খেয়াল করি না। অচিনদা বলেন, 'ঠিক বলেছ, আমরা সবই পিতৃতান্ত্রিক নগর সভ্যতার চোখে দেখি।'

রাধা তো অস্থিরতেই বাজে। বলে ওঠে, 'কতগুলো নোঙরা লোকের জন্য আমরা বঞ্চিত হয়েছি। লোকগুলোকে তীর ধনুক দিয়ে ওরা মেরে ফেলতে পারেনি?'

অচিনদা বলে ওঠেন, 'আরে তা হলে আমরাই যে আবার কাঁদতে বসতাম গো। যাদের মারতো, তারা তো সব আমাদেরই ভাই ছেলে স্বামী।'

নাগরিকা রাধা ওর ঘাড় ছাঁটা চুলে ঝাপটা মারে। বলে, 'ভাই ছেলে স্বামী না ছাই।'

রূপে বেশবাসে বোঝা যায় না, রাধা এমনি ভাষণ করতে পারে। ওর কথা শুনে ফোঁসানি দেখে সবাই হাসে। অচিনদা আমাকে বলেন, 'কী হে, তুমি যে বড় উদাস হয়ে পড়লে।'

বলি, 'উদাস না। আপনার কথা শুনে, দৃশ্য মনে পড়ে গেল।'

'সাঁওতাল নাচের? কোথায়?'

'মলুটি গ্রামে। রামপুরহাট থেকে যেতে হয়।'

বিসর্জনের সেই সন্ধ্যাবেলার কথা বলি। সেই নাচের অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তের কথা যখন বলি, সকলের চোখে যেন একটা দ্বিধার বিস্ময়। কেবল অচিনদা ছাড়া। আর ঝিনি যেন চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যায়।

রাধা বলে ওঠে, 'সত্যি?'

ওর বিস্ময়ের তীব্রতায়, দৃষ্টির জিজ্ঞাসায় আমিও প্রায় লজ্জা পেয়ে যাই। লিলি বলে, 'সত্যি নয় তো মিথ্যে বলছেন নাকি?'

রাধা যেন হঠাৎ কেঁপে উঠে বলে, 'না, আমি বোধ হয় দেখতে পারতাম না।'

সবাই হাসে। ঝিনি চোখ তুলতে গিয়ে আবার লজ্জা পায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলে, 'আশ্চর্য।'

অচিনদা বলে ওঠেন, 'আর একেই বলে দ্বন্দ্ব।'

বলে, আমার দিকে ইশারা করে দেখান। বলেন, 'এদিকে শঙ্কাশঙ্কিত নেই, ওদিকে সব দেখে শুনে ভক্কাটি হয়ে বসে আছেন।'

সবাই খিলখিলিয়ে বাজে। অচিনদা আবার একটু গলা নামিয়ে বলেন, 'তা, সেখানে ওসব দেখে, ভায়ার কোন গোলমাল হয়নি তো?'

তাঁর প্রশ্নের ঢঙে, সবাই আরো জোরে হেসে ওঠে। আমি বলি, 'না। তবে এত অবাক কখনো হইনি। মনে হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগের ভারতবর্ষের এক রূপ দেখলাম। এমন সৌভাগ্য কজনের হয়?'

অচিনদা পিঠে হাত দিয়ে বলেন, 'ঠিক, ঠিক বলেছ।'

সুপর্ণাদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন 'আচ্ছা, আপনার মনে কোন বিকার আসেনি?'

আমি বলি, 'না সুপর্ণাদি। মনে প্রশ্ন এসেছিল। তার জবাবও আমি পেয়েছি। শুনেছি কোনারকের মন্দিরের মূর্তি দেখে নাকি অনেক রুচিবাগীশ ভদ্রলোকের রুচিতে আঘাত লাগে। আমার লাগেনি। আমি দেখেছিলাম, বিশ্বসংসারের এক চিরন্তন রথ, স্বাস্থ্য আর আয়ুর আকাঙ্ক্ষায় সৃষ্টির লীলা করে চলেছে। আর মলুটির সাঁওতালদের সেই গণ মিলনের ছবি যেন, কোনারকের মন্দিরের গায়ের জীবন্ত রূপ।'

'অপূর্ব!'

অচিনদা আমার পিঠে চাপ দেন। বলেন, 'তোমার কথার জন্যে বলছি না, তোমার দেখার নজরের কথা বলছি। বুঝলে অলকা, এ হল অন্য চোখের কথা। তোমার ফিলজফিতে, তুমি একমত তো?'

ঝিনি বলে, 'ফিলজফির কথা জানি না, কিন্তু এক মত।'

অচিনদা তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, 'অতএব, আর নয়। ওহে, পয়সাটা নিয়ে যাও।'

বলে, তিনি পকেটে হাত দেন। আমিও দিই। আর একই সঙ্গে ওরা তিন সখীতে কুটুস কুটুস ব্যাগ খুলে ফেলে। অচিনদা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলেন, 'কী হল? সবাই যেন একেবারে মুখিয়ে ছিলে মনে হল। দেখুন তো সুপর্ণাদি, এদের ডেঁপোমি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

তারপরেও আর হাত তোলার সাহস কারুর থাকে না। সুপর্ণাদি স্নিগ্ধ হেসে বলেন, 'ছেলেমানুষ তো।'

পয়সা দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়াতেই আমিও দাঁড়াই। অচিনদা বলেন, 'কী হল?'

সঙ্কোচে জিজ্ঞেস করি, 'আমি গেলে আপনার অসুবিধে হবে?'

অচিনদা তাঁর কোঁচকানো ভুরুর তলা থেকে একটু লাল লাল চোখে ঝলকে একবার সবাইকে দেখে নেন। তারপরে বলেন, 'তুমি যাবে মানে, এঁদের—।'

তাঁর কথা শেষ হয় না। হঠাৎ ঝিনি উঠে দাঁড়ায়। দেখি কখন সহসা বায়ু কোণে মেঘ জমে গিয়েছে। ঘন গরজনের আভাস, ঝঞ্ঝার ঝিকিমিকি। বলে, 'না না, উনি কেন মিছিমিছি ও'র অসুবিধে করে থাকবেন। আমাদের কোন দরকার নেই ও'কে।'

আমিই যেন বিব্রত লজ্জায় অধোবদন। অচিনদাকে কী বলব, বুঝতে না পেরে, তাড়াতাড়ি ঝিনির দিকে ফিরি। এই তো, এত কথা, এত হাসি। এই তো মুহূর্ত আগেও ঝিনি এত 'এক মত।'

তবু—তবু কখন, কোন মুহূর্তে চিকুর হেনে গেল বায়ু কোণে।

আমি কিছু বলবার আগেই ঝিনি আবার বলে ওঠে, 'বুঝতেই তো পারছেন অচিনদা, আমাদের সঙ্গে থাকতে ও'র ভাল লাগছে না। তা ছাড়া নীরেনদা অনেকক্ষণ গেছেন, এখনো এলেন না। শুভেন্দুর জন্যে আমার একটু ভাবনা হচ্ছে। আমিও আর থাকতে পারব না, চলি। আবার দেখা হবে।'

বলেই, পা বাড়িয়ে দেয়। দিয়ে পিছন ফিরে ডাকে, 'আসুন সুপর্ণাদি। রাধা লিলি আয়।'

কী বা বলিহারি দেখ, ঝিনির ডাকে সবাই দেখি, সুড়সুড়িয়ে উঠে যায়। রাধা লিলি, এমন কি সুপর্ণাদির ঠোঁটের কোণেও একটু হাসি দেখা দেয়। তবে বড় সন্তর্পণে। 'আচ্ছি' বলে সবাই বিদায় নেয়। কেবল সুপর্ণাদি অচিনদাকে বলেন, 'আজ বড় বেগতিক দেখছি।'

অচিনদা গলা নামিয়ে বলেন, 'কিংবা এটাই হয় তো গতিক।'

সুপর্ণাদি হেসে চলে যান। আর অচিনদা আমার দিকে প্রায় দুর্গা প্রতিমার অসুরের মত, চোখ পাকিয়ে রুক্ষে তাকান। প্রথমে কেবল উচ্চারণ করতে পারেন, 'বর্বর কোথাকার!'

আমি কিছু বলতে যেতেই হুমকে ডাকেন, 'চোপ! দেখাচ্ছি তোমাকে, চল।'

ক্রমশ

ছায়ানট সংস্থা সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার গ্যালারীতে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সংস্থাটি নূতন কয়েকজন তরুণ ও উৎসাহী যুবক স্থাপনা করেন। সভ্যদের মধ্যে রঞ্জন দে সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্র, অবশিষ্ট কয়েকজন চিত্রকলা ভালবাসেন, খেয়াল ও খুশিমত ছবি আঁকেন ও সেই সঙ্গে দুই একজন হাতের নানা সূক্ষ্ম কাজও করে থাকেন। প্রদর্শনীতে সভ্যবৃন্দ রচিত ছবি, এনগ্রেভিং ও সূচিকার্যের নিদর্শন পেশ করা হয়।

প্রথমেই বলেছি এঁরা শখের শিল্পী, সুতরাং এঁদের কাছ থেকে বিশেষ কোনও কাজের আশা করা যায় না—তাছাড়া এটি এঁদের প্রথম প্রচেষ্টাও বটে। তবে রঞ্জন দে অজয় দাশ ও অঞ্জন ধর রায়ের নাম করা যায়। প্রথম জনের ছবিতে রুচিসুলভ মন, দ্বিতীয় জনের রচনায় তুলি ব্যবহার করার ক্ষমতা ও তৃতীয় জনের কাছে সোচ্চার ও উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। (ভাইবোন, গতানুগতিক ও স্বর্গের উদ্যান)। সুতার সাহায্যে রচিত শংকর গুপ্তের সূচিশিল্প উল্লেখযোগ্য। অসিত দত্তের প্লেট এনগ্রেভিং প্রশংসনীয় (৩২)। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে সভ্যদের উদ্যম ও উৎসাহ সাধুবাদের যোগ্য। আশা করি ভবিষ্যতে আপন আপন মাধ্যমে কাজ করে ছায়ানটের তরুণ সভ্যবৃন্দ প্রতিভার পরিচয় দেবেন।

*

শিল্পী নির্মল দত্ত তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে—উদ্বোধন করেন কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রী ডি জি মুখার্জী। নির্মল দত্ত কলিকাতায় অপরিচিত নন, কারণ গত বৎসরই তিনি এখানে তাঁর প্রথম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। এবারের প্রদর্শনীতে শিল্পী ২৮খানি ছবি পেশ করেন।

এই শিল্পী জল ও তেলরঙ মাধ্যমে কাজ করেন। তাহলেও মনে হয় জল রঙের মধ্য দিয়ে ইনি সহজভাবে স্বীয় বক্তব্যটুকু প্রকাশ করতে পারেন। লম্বমান রেখাছন্দ ও রচনা-ক্ষেত্রের কারুকার্যের জন্য এঁর জলরঙে আঁকা ছবিগুলি সকলেরই চোখে পড়ে। বিশাল পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে সাপের পথরেখাটুকু এঁকে-বেঁকে গিয়ে দূরে কোনও

ভাইবোন —রঞ্জন দে

শৈলখণ্ডের পশ্চাতে বিলীন হয়ে গেছে; কোথাও বা এহেন দুরূহ পথের ওপর দিয়ে তীর্থযাত্রীদল অতি কষ্টে হেঁটে চলেছে বদরীনাথের উদ্দেশে, আবার হয়ত নীচে, সমতলভূমিতে, অখ্যাত কোনও গ্রাম অবিরাম বৃষ্টি ধারায় ম্লান—গরুবিহীন গরুর গাড়ি এক প্রান্তে পড়ে আছে, আর দুজন গ্রামবাসী অতি সন্তর্পণে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে—এহেন নানা দৃশ্য শিল্পীর অনুসন্ধানী চোখে ধরা পড়েছে এবং সেগুলি রেখা রঙ ও বিশেষ করে রচনাক্ষেত্র চাতুর্যের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে পর্বতারোহণ, বদরীনাথের যাত্রী ও বৃষ্টিস্নাত গ্রামের নাম করা যায়। এ পর্যায়ে অপরাপর ছবির মধ্যে ভক্ত, নর্তকী ও অরণ্যরূপ উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর তেলরঙে রচিত ছবিগুলি দেখে মনে হয় বুঝি বা এখনও তিনি এ-মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করে চলেছেন, অর্থাৎ এ মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করার সঠিক ভাষার যেন এখনও সন্ধান পাননি। তবে যেক্ষেত্রে তিনি প্রথাগত রীতি ও আধুনিক অঙ্কনপদ্ধতির সমন্বয় সৃষ্টি করেছেন সেখানে তিনি সফলতা লাভ করেছেন—যেমন বারাণসীর ঘাট। আবহমান কাল থেকে বারাণসী ও পবিত্র গঙ্গাতীরব্যাপী সুবিখ্যাত ঘাট ও সোপানশ্রেণী বিদেশী পর্যটক ও দেশের শিল্পীবৃন্দকে নানাভাবে প্রেরণা দান করেছে। বাস্তবিকপক্ষে বারাণসীর কথা মনে হলেই এক সঙ্গে অনেক শিল্পীর কথাই যুগপৎ মনের মধ্যে জেগে ওঠে। তা সত্ত্বেও শিল্পীর বারাণসী ঘাট ছবিখানি দেখে তৃপ্তি-লাভ করেছি—বিশেষ করে হলদে রঙের প্রাধান্যের ভিতর দিয়ে তিনি বারাণসী ঘাটের চিরপরিচিত অথচ চিরনূতন রূপটুকু সুন্দর-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

*

আন্তর্জাতিক পর্যটক সপ্তাহ উপলক্ষে সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং সমসাময়িক শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি ছবি এই প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। বিদেশ থেকে আগত পর্যটকগণ সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলাধারার সঙ্গে যাতে পরিচিত হতে পারেন সেটাই হল এ প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রচেষ্টা যে মহৎ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে মনে হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে—ফলে মনোনয়ন আশানুরূপ হয়নি। কলিকাতা তথা পূর্ব ভারতে চিত্রকলার প্রসার ও প্রচার ব্যাপারে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর অবদান অনস্বীকার্য। নানা প্রদর্শনী, বিশেষভাবে সমসাময়িক চিত্রকলার এক স্থায়ী গ্যালারী স্থাপন করে কর্তৃপক্ষ দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তাহলেও পরিকল্পনা সহকারে বর্তমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে বিদেশী পর্যটকগণ এদেশের শিল্পকলা বিষয়ে উচ্চ ধারণা নিয়ে যেতে পারতেন। অন্তত আকারে ছোট করে সুপরিচিত কয়েকজন শিল্পীর রসোত্তীর্ণ ছবি পেশ করলে কর্তৃপক্ষের এই শুভ

বৃষ্টিস্নাত গ্রাম —নির্মল দত্ত

প্রচেষ্টা হয়ত সাফল্যমণ্ডিত হত—হয়ত দুই-একজন শিল্পীও লাভবান হতেন।

*

'লিপিকা'-র উদ্যোগে আকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে হাতে তৈরি কাগজ ও কাগজজাত নানা ব্যবহারযোগ্য বস্তুর এক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়।

দেশের বস্ত্রশিল্পে খাদির যে ভূমিকা কাগজশিল্পে হাতে তৈরি কাগজের ভূমিকাও প্রায় তাই—অর্থাৎ গ্রামীণ শিল্প হিসাবে অর্থনীতির দিক দিয়ে দুটিরই স্থান এক বললেই চলে।

প্রথমেই উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে তাঁরা জনসাধারণের কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দিয়েছেন। অর্থাৎ অনেকেই জানতেন যে হাতে তৈরি কাগজ মোটা, মলিন ও কর্কশ এবং আদৌ টেঁকসই নয়; তাছাড়া সূক্ষ্ম ছাপার কাজের অনুপযুক্ত। সুখের বিষয় প্রদর্শনীতে রাখা বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন রঙের কাগজ দেখে সত্যিই বিস্মিত হয়েছি। চিঠি লেখা ও বিমান ডাকযোগে পাঠাবার উপযুক্ত পাতলা, অথচ টেঁকসই ও সুদৃশ্য কাগজের নমুনা দেখে মনে হয় অচিরেই রুচিবান সম্প্রদায়ের কাছে এ শ্রেণীর কাগজের চাহিদা বেড়ে যাবে। তাছাড়া সোনালী ও বিভিন্ন কালিতে ছাপা ছবির নিদর্শন দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সূক্ষ্ম স্ক্রীনযুক্ত ব্লক ছাপার উপযুক্ত কাগজও আমাদের দেশবাসী হাতে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রদর্শনীতে সিল্ক, ফিলটার ব্লটিং, কার্ড র‍্যাপিং, ড্রয়িং, কভার ও বন্ড কাগজের নানা নিদর্শনও পেশ করা হয়েছিল। মনোগ্রাম জাতীয় ছোট ছোট ভারতীয় চিত্র মুদ্রিত রঙীন চিঠি লেখার কাগজের প্যাড এবং খাম ও এ জাতীয় বিভিন্ন ফাইলের নিদর্শন দেখে সকলেই আকৃষ্ট হন। যাঁরা শৌখীন ও যাঁদের রুচিবোধ আছে তাঁরা যে এখন থেকেই এহেন হাতে তৈরী কাগজের সদ্ব্যবহার করতে শুরু করবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। প্রদর্শনীটির সজ্জাপ্রণালীর মধ্য দিয়ে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়—এজন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিই।

চিত্রপ্রিয়

মহাস্থবির জাতক
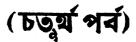
তিনজনে মহা-উৎসাহে আমাদের রান্নাঘর অর্থাৎ পাদ্রীদের ভূতপূর্ব পায়খানা ঘরে তো ঢোকা গেল। তখনো ঘরের মেঝেতে দুটো তিনটে কমোডের দাগ ঝকমক করছিল কিন্তু জীবনে উন্নতি করতে গেলে ওসব ছোটো-খাটো দাগকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে চলবে না।

হাত-পা মোছা ও সর্দার-প্রদত্ত সেই তিন-গাছা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে ঘরের মেঝে যতখানি পরিষ্কার করা সম্ভব তা করে রান্নার জন্য প্রস্তুত হলুম। উনুনের জন্য তিনখানা পাথর আগেই সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছিল। ঠিক হল আধখানা চিচিঙ্গে এখন রাঁধা হবে আর আধখানা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া হবে। কিন্তু আধখানা চিচিঙ্গে ছুরি দিয়ে কুচিয়ে মনে হল রান্না হবে কিসে! পাত্র কোথায়? রাঁধবার একটা পাত্র কিনে আনা হয়নি ব'লে আপসোস হতে লাগল। শেষকালে সর্দারের দেওয়া হাঁড়ির অংশ—যা এই দু'দিন আমাদের জলপাত্রের অভাব দূর করেছে, তাইতে জল দিয়ে আগুনে চাপিয়ে দেওয়া গেল। জল একটু সোঁ সোঁ করতেই কুচনো চিচিঙ্গে তাতে ছেড়ে দিয়ে নুন খোরের মতো যে পাত্রটা আনা হয়েছে আজকের মতন সেটাতে তরকারি রেখে, যে হাঁড়িভাঙায় তরকারি রান্না হচ্ছে সেইটেতেই কোনোরকমে রুটিগুলো সেঁকে নেওয়া যাবে—এইরকম নানা কথা চলেছে—এমন সময় টাঁই ক'রে এক বিরাট আওয়াজে চমকে উঠলুম। পর মুহূর্তেই অর্থাৎ চমক ভাঙবার আগেই একটি বজ্রনির্ঘোষ এবং তারপরেই অগ্নিবৃষ্টি—মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মুখ হাত পিঠ গরম চিচিঙ্গে চূর্ণে চড়চড়িয়ে উঠল।

—বাপরে—ব'লে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চিচিঙ্গের টুকরোগুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি—মেঝেতে তরকারির টুকরোগুলো প'ড়ে রয়েছে। সেই ভাঙা হাঁড়ির কানা—আবর্জনা বহন করে যার শেষ জীবন কাটছিল অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে সে দেহরক্ষা করেছে।

ভাবতে লাগলুম—হাঁড়ি ভাঙা তো দেহরক্ষা করলে কিন্তু আমাদের এখন দেহরক্ষার উপায় কি! তখন সেই নিবন্ত আগুনে ময়দার ঢেলাগুলো পুড়িয়ে নিয়ে আর আধখানা চিচিঙ্গে যে ছিল তাই দিয়ে দু'দিন নিরম্বু উপবাসের পর পরমানন্দে পারণে প্রবৃত্ত হলুম।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে সে যুগে কলকাতার বাঙালী হিন্দুরা এমন সর্বভূক জাতিতে পরিণত হয়নি। চিচিঙ্গে

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

॥ ২ ॥

জঙ্গলে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যে হয়ে এলেও একটু আলো ছিল। ওরি মধ্যে এক রাশ শুকনো কাঠি যোগাড় করে নতুন পাত্রে জল ভরে ঘরে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। বাড়ি থেকে ফিরে আসবার মুখে সন্ধ্যার আবছায়ায় কালীচরণ একটা চিচিঙ্গে ছিঁড়ে এনেছিল। সে বললে—এই রুটি খাওয়ার অভ্যেস তো কখনো নেই, এই চিচিঙ্গের কালিয়া দিয়ে রুটি মারা যাবে।

প্রায় তিনদিন একরকম নির্জলা উপবাসের পর এই মহাভোজের আয়োজন দেখে মনটা খুশীই হয়ে উঠল। যাই হোক দিয়ে আমরা আটা মাখবার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম।

মাটিতে কোঁচার খুঁট পেতে তাতে সেই ধুলোরূপী বাজরার গুঁড়ো ঢেলে একটু একটু করে জল দিয়ে মাখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মধ্যে মধ্যে উনুনে কাঠি দেওয়াও চলতে লাগল। ছোট ছোট লেচি ক'রে থাবড়ে থুবড়ে রুটি গড়বার চেষ্টা করছি—উনুনে থেকে সোঁসাঁ চোঁচোঁ শব্দ আসছে—মধ্যে মধ্যে কাঠি দিয়ে এক-আধ টুকরো তরকারি নামিয়ে দেখা হচ্ছে—সেদ্ধ হয়েছে কি না। কখনো বা পরামর্শ করছি যে রুটিগুলো সেঁকা হবে কি করে! —ঠিক হল যে জলপাত্র ঢাকা দেবার জন্য
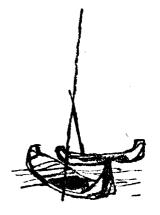
জিনিসটা অনেক হিন্দুর বাড়িতে ঢুকতেই পেত না। অনেকের বাড়িতে সভয়ে ঢুকত—কেন তার কারণ বলতে পারি না।

যাই হোক সে রাত্রে রান্না করার চেষ্টা করে আমরা বুঝতে পারলুম যে নিজে রান্না করে খেয়ে এখানে কাজ করা চলবে না।

সকালবেলা সর্দার আমাদের কাজের তদন্ত করতে এলে তাকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বললুম—রোজ রান্না করে খাওয়া আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। আমরা ঠিক করেছি—সকালে কিছু খাব না, রোজ বিকেলে স্টেশনে গিয়ে খেয়ে আসব। আমাদের বেলা চারটের সময় ছুটি দিতে হবে আর সেই সময় রোজের মজুরি চুকিয়ে দিতে হবে।

সর্দার অনেক ভেবেচিন্তে বললে—আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু সকালবেলা কিছু না খেয়ে কাজ করবে কি করে?

বললুম—ছ'-পয়সা মজুরিতে এক বেলাই পেট ভরে খাওয়া হয় না তো দু'বেলা!

সর্দার চটে বললে—এত লোক ওই মজুরিতে দু'বেলা পেট ভরে খাচ্ছে—আর তোমরা কি নবাব এসেছ যে ওতে দু'বেলা খাওয়া হয় না? তোমাদের সেধে কেউ এখানে আনেনি! ওতে পোষায় তো কাজ কর—নইলে সোজা রাস্তা পড়ে রয়েছে—সরে পড়!

সেদিন বেলা চারটের সময় সর্দারের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ইস্টিশনে গিয়ে সেই তল্লাটে খুঁজে খুঁজে রুটি-গোস্ত-এর দোকানে বসে আহার করা গেল। তিনজনে মিলে সেখানে দু' আনার খেয়ে পরদিন দুপুরবেলা খাবার জন্য এক আনার রুটি কিনে নিয়ে ফিরে এলুম। আমাদের থাকবার জায়গায় এসে তখনো অনেকখানি বেলা রয়েছে দেখে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখে বেড়াতে লাগলুম।

সেখানকার একটা দৃশ্য আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এক জায়গায় দেখা গেল—একটা বিরাট গাছকে বেড়ে একটা লতা ওপরে উঠে নিজের ডালপালা দিয়ে গাছটার ডালপালাকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, আর সেই লতায় ফুটেছে ছোট ছোট সাদা ফুল। এত ফুল যে, গাছ আর লতা সে ফুলে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ওপর থেকে সেই ফুল ঝরে ঝরে গাছটার চারিদিকের মাটিতে যেন ফুলের বিছানা পাতা হয়েছে। আর সেই ফুলের সৌরভে বন আকুল হয়ে উঠেছে। আমরা কাছে যাওয়া মাত্র মৌমাছির দল ভোঁ-ও-ও ক'রে আপত্তি জানাতেই পেছু ফিরে পালিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপরে সেই ফুল-সৌরভে মন-প্রাণ দেহ ভরে নিয়ে নেশায় টলতে টলতে ডেরায় ফিরে এলুম।

ফুলের গন্ধে নেশা লেগেই হোক কিংবা কয়েকদিন অনশন ও অর্ধাশনের পরে শক্ত শরতের পুরাতন বলদের মাংস পেটে পড়েই হোক—ঘরে এসে দোর জানলা দিয়ে বসতে না বসতেই আমাদের কালীচরণের কি রকম ভাবদশা লেগে গেল। সে সুর জুড়ে দিলে—কি ছার আর কেন মায়া—কাঞ্চন-কায়া তো রবে না।

অনেককাল আগে তাদের পাড়ায় একবার বিল্বমঙ্গল না ওই নামে কি একটা নাটকের অভিনয় হয়েছিল। কালী একটার পর একটা সেই নাটকের গান গাইতে লাগল। সেদিন অনেক রাত্রি অর্থাৎ সন্ধ্যে থেকে প্রায় দু' ঘণ্টা গল্প করে আমরা শুয়ে পড়লাম।

ঘুমের মধ্যে বিরাট একটা শব্দ কানে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। আচমকা ওই রকম আওয়াজে আমি যেন জ্ঞানহারা হয়ে গেলুম। আমার পাশেই যে বন্ধুরা শুয়ে আছে সে কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে ভয়ে দিলুম দৌড়, কিন্তু আছড়ে পড়ে মাথা ও মুখে বিষম আঘাত লেগে সম্বিত ফিরে পেলুম। ততক্ষণ কালী ও পরিতোষ উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেললে।

সেই স্বল্পালোকেই দেখতে পেলুম ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে আর হাত কাঁপছে একটু একটু ক'রে। আওয়াজ তখনো সমানভাবে চলেছে। মনে হতে লাগল—হাজার হাজার রাজহাঁস যেন একটা গলা দিয়ে চীৎকার ক'রে চলেছে।

পরিতোষ ও কালী আমাকে সেইরকম দেওয়ালের কাছে দেখে মনে করেছিল আমার সঙ্গে সেই আওয়াজের কোনো প্রত্যক্ষ যোগস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যখন তাদের বুঝিয়ে দিলাম যে আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরে আমি ওই রকমভাবে ছুটে গিয়েছিলুম তখন তারা কথঞ্চিৎ শান্ত হল।

কিন্তু শান্ত হবার যো কি! ওদের আওয়াজের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ঘরের পূর্বদিকে চারটে দরজার বড় বড় সমান আকারের জানলা ছিল। মনে হতে লাগল যেন পালা ক'রে এক একবার এক একটা জানলার কাছে আওয়াজ হচ্ছে আর তারই ধমকে জানলাগুলো থরথর ক'রে কাঁপছে।

আমরা আস্তে আস্তে ভূমিশয্যা ত্যাগ ক'রে পা টিপে টিপে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কেন যে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম তা ঠিক জানি না। দরজার কাছে যেতেই জানলার দিকের আওয়াজ কমে গেল। বেশ মনে হতে লাগল আওয়াজটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে। একটুখানি প্রাণে ভরসাও এল। কিন্তু তখনি আমাদের ভ্রম ছুটে গেল। বুঝতে পারলুম যে আওয়াজটা জানলা ছেড়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিতোষ অনেক গবেষণা ক'রে বললে, এ মনে হচ্ছে হাঁস-ভূত।

অতি দুঃখেও হাসি পেল। হংসদূতের কথা শোনা আছে, কিন্তু হংসভূতের কথা তো কখনো শুনিনি বাবা! ওদিকে হংস-ভূতের গর্জনের ঠেলায় মনে হতে লাগল ঘরের মধ্যে যমদূত এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভয়ে আমাদের দেহে কালঘাম ছুটতে আরম্ভ করলে। সন্ধ্যাবেলার রুটি-গোস্ত ও কালরাত্রের কাঁচা চিচিঙ্গে ও কাঁচা ময়দার ঠলি জল হয়ে দেহ বেয়ে ঝরতে লাগল।

কতক্ষণ ধরে এই দুর্ভোগ আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল তা ঠিক বলতে পারি না। আমাদের তো মনে হয়েছিল—এই গর্জন শুনতে শুনতেই জীবন অবসান হবে।

হংসভূতের গর্জন থেমে যাওয়ার পর বুকের ধড়ফড়ানি থামতে থামতে রাত্রিভোর হয়ে গেল।

সকালবেলা কাজে লাগবার খানিক পরে সর্দার যখন 'রোঁদে' এল তখন তাকে কাল-রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বললুম। সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি এমন সময় দেখলুম আমাদের চারপাশে অনেকগুলি মজুর এসে দাঁড়িয়েছে। দেখলুম আমাদের কথা শুনে তাদের মধ্যে জন্তুর মত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। আস্তে কথা বলার রীতি তাদের মধ্যে নেই—তারা নিজেদের ভাষায় সশব্দে কি সব আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিলে। সর্দার একটা বিরাট ধমক ও তাড়া দেওয়ায় তারা যে যার কাজের দিকে চলে গেল। সর্দার আমাদের একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—এ সব কথা তোমরা ওদের বলেছ নাকি?

—না তো।

সর্দার বললে—খবরদার! ওদের কিছু বোলো না, তা হলে ওরা সব কাজে আসা বন্ধ ক'রে দেবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—ওটা কি জানোয়ার?

সর্দার তার হাঁড়ি-মুখে হাসি আনবার চেষ্টা ক'রে বললে—ও জানোয়ার না, ও হচ্ছে দেও। জঙ্গলে কত রকমের জিনিস আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

মনে মনে বললুম—একরকম জিনিসেই যা অবস্থা হয়েছে—

সর্দার বললে—তোমরা কিছুতেই দরজা কিংবা জানলা খোলো না—তা হলে বিপদে পড়বে বলে দিচ্ছি।

সর্দার রোঁদ দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেই চারিদিকে মজুরের দল—যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এসে আমাদের নানারকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। এ কয়েকদিন তাদের কথা শুনে শুনে সে ভাষা বলতে না পারলেও কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ

করেছিলুম। আমাদের রাত্রের অভিজ্ঞতা শুনে তারা যা বললে—তার তাৎপর্য হচ্ছে —এ জঙ্গলে অনেকদিন থেকেই দেবতারা বাস করছেন। এ জায়গাটা পরিষ্কার করার ফলে তাঁরা এখন সদলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে ওই বাড়িটাতে এসে কেউ কেউ হানা দিয়ে থাকেন। ওইখানে সায়েবেরা থাকত। দেবতারা এসে চলে যেতে বলায় তারা বাড়ি ফেলে চলে গিয়েছে।

মজুরেরা নানারকম মন্তব্য ক'রে চলে গেল।

আমরা তখন একটা লাঙ্গল-চষা জমিতে পাথর ও আগাছা বাছবার কাজে লিপ্ত ছিলুম। আমার কাছেই একটা অল্পবয়সী মেয়ে কাজ করছিল।

তার বয়স বোধ হয় পনেরো-ষোলো বছর হবে। অত্যন্ত রোগা, কিন্তু বসন্তের বাতাস পেলে যেমন কোনো কোনো শুকনো কাঁটা গাছেও ফুল ধরে, তেমনি তার দেহে যৌবনের আগমনীর সামান্য সুরের আমেজ লেগেছে মাত্র। কাজ করতে করতে একবার দুজনে খুব কাছাকাছি এসে পড়ায় সে আমাকে কি যেন বললে। তার কথা ভালো ক'রে বুঝতে না পারায় আমি আরও কাছে স'রে যাওয়ায় সে আবার বললে—কাল রাতে কি হয়েছিল তোমাদের?

বললুম—তুমি কি করে জানলে?

সে বললে সবাই বলছে কাল রাতে তোমাদের ঘরে নাকি দেও এসেছিল।

বললুম—দেও কিনা জানি না, তবে এসেছিল কেউ।

মেয়েটিকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে [illegible] ডাকলে। মা দূরে আমাদের [illegible] করছিল, মেয়ের ডাক শুনে একরকম [illegible] কাছে এল। মায়ের দেখাদেখি বাপ, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে যারা সকলেই [illegible] কাছি কাজ করছিল—ছুটে এগিয়ে এল। মেয়েটি সকলকে কি সব বলায় মা এগিয়ে এসে আমাদের বললে—ও বাড়িতে আর তোমরা থেকো না। দেও বড় সব্বনেশে জিনিস!

আমরা বললুম—কিন্তু সর্দার বলে দিয়েছে ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে আর কোনো ভয় নেই—আমরা দরজা কিছুতেই খুলব না।

তারা বলতে লাগল—প্রথম প্রথম মনে হয় বটে কিছুতেই দরজা খুলব না, কিন্তু দেওদের এমন মায়া যে দরজা না খুলে থাকা যায় না। ওই বাড়িতে পাদরী সায়েবেরা থাকত। কয়েকদিন ভয় পাবার পর দু'তিনজন সায়েব পালাল—দু'তিনজন থেকে গেল। একদিন দেখা গেল যে ঘরের দরজা খোলা আর দরজার সামনে দুজনে মরে পড়ে রয়েছে।

খবরটি শুনে আমরা যে কীরকম খুশী হ'য়ে উঠলুম সে কথা বোধ হয় কাউকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। সর্দার তো বলে গেল—হাজার গোলমাল হলেও দরজা খুলবে না, কিন্তু দেওদের মায়ার প্রভাবে যদি খুলে ফেলি! হায়! হায়! শেষকালে জঙ্গলে এসে ভূতের হাতে প্রাণ খোয়াব! কিং-কর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে সেই চষা মাঠে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু সংসারে অনাবিল সুখও যেমন নেই তেমনি অনাবিল দুঃখও দুর্লভ। এই দুঃখের অবকাশেই আমার অরণ্যমাতা রূপ ধরতে আরম্ভ করলেন।

আমাদের অবস্থা দেখে সেই মেয়েটির মা বাবা সবাই সহানুভূতি জানাতে লাগল। তারা বলতে লাগল—ও জায়গায় আর থেকো না। আমাদের বাড়ি কাছেই তোমরা থাকবার একটা ঝোপড়ি তৈরি করে নিয়ে সেইখানেই বসবাস কর। আমরা অনেক ঘর সেখানে কাছাকাছি বাস করি ব'লে দেওরা আর সেদিকে বাস করেন না।

এই বলে তারা বারবার কার উদ্দেশে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।

তাদের মন রাখবার জন্য আমরা বললুম —আচ্ছা তাই করা যাবে—কিন্তু আপাতত ঝোপড়ি যতদিন না তৈরি করতে পারছি ততদিন অন্য কোনো একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

সেদিন বিকেলে স্টেশনে গিয়ে ঠিক করা গেল যে, আজ রাতে আর ফেরা নয়। খাওয়া-দাওয়ার পর সেইখানেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রাম করবার ঘরে এক কোণে প'ড়ে থেকে রাত্রি কাটিয়ে, খুব ভোর থাকতে উঠে বাগানে এসে কাজে লেগে গেলুম।

এই রকম করে তো দিন কয়েক কাটিয়ে [illegible] গেল। দুপুরে বেলা খাবার জন্য [illegible] কয়েক রুটি আনা হতো। ঝরনার [illegible] করে খাবার জল তুলে আমাদের [illegible] খেয়ে একটু গড়ানো যেত। তারপর আন্দাজ মতো উঠে কাজে লেগে বেলা চারটের সময় সর্দারের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে [illegible] গিয়ে খেয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়তুম। এই ছিল আমাদের নিত্য-কর্মপদ্ধতি।

এর মধ্যে কোনো সপ্তাহে দু'বার, কোনো সপ্তাহে [illegible] একবার মেটাজী আসতেন। তিনি এসেই আমাদের ওপর তম্বী লাগাতেন। বলতেন—সর্দার বলছে, তোমরা রোজ দু'ঘণ্টা ক'রে কাজে ফাঁকি দাও। তোমাদের আর ছ'পয়সা ক'রে 'রোজ' দেওয়া চলবে না—আসছে সপ্তাহ থেকে পাঁচ-পয়সা ক'রে দেওয়া হবে।

মেটাজী আরও বললেন—সর্দার আরও বলছে মন না দিয়ে কাজ করলে সে আর তোমাদের রাখবে না।

আমরা কাজ করতে করতে ভাবলুম যে মেটাজী এলেই তাঁকে আমাদের 'রোজ' কিছু বাড়িয়ে দিতে বলব। কিন্তু তিনি এসেই আমাদের ওপর যে রকম চাপ লাগাতেন, তাতে আমরা আর ভরসা ক'রে 'রোজ' বাড়াবার কথা তাঁকে বলতে পারলুম না। কিন্তু মেটাজী হাজার চেঁচামেচি করলেও আমরা বেশ বুঝতে পারতুম যে পাছে 'রোজ' বেশি ক'রে চাই তাই আগে থাকতেই এইসব চালের কথা বলে আমাদের থামিয়ে দেবার চেষ্টা হতো।

আগেই বলেছি, আমাদের সঙ্গে এক ক্ষেতে কাজ করত সেই যে মেয়েটা ও তার মা-বাবা, তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। তারাই একদিন এসে বললে—তোমাদের 'রোজ' থেকে ওরা দু'পয়সা ক'রে মারে। আমরা সকলেই 'রোজানা' দু'আনা ক'রে পেয়ে থাকি।

এ সব কথা শোনা সত্ত্বেও আমরা ওই ছ'পয়সাতেই দিন চালিয়ে নিতে লাগলুম। কিন্তু আর বেশি দিন ওরকম চলল না। প্রতিদিন জঙ্গল থেকে স্টেশন এবং স্টেশন থেকে জঙ্গল—এই প্রায় দশ মাইল হাঁটা তার ওপরে দিন ভোর রোদে পরিশ্রম, এক বেলা প্রায় উপবাস ও সন্ধ্যাবেলায় অর্ধাহার রাত্রে শয্যাহীন পাথরের মেঝেতে শোয়া, এইসব কারণে আমাদের সকলের শরীরই খারাপ হয়ে চলেছিল। কালীচরণ আমাদের মধ্যে বেশ মোটাসোটা ছিল কিন্তু সেও খুব রোগা হয়ে পড়ল। স্টেশন থেকে ভোরবেলা জঙ্গলে আসবার সময় আমরা পাঁচ-ছ'মাইল দৌড়েই পার হতুম। কিন্তু ক্রমেই আমাদের গতির বেগ কমে আসতে লাগল। ইদানীং আসতে যেতে পথে অনেকখানি সময় বিশ্রাম করতে হতো।

একদিন আমার অবস্থা এমনি হল যে স্টেশন থেকে আর জঙ্গলে পৌঁছতে পারি না। বন্ধুদের বললুম—আমায় একখানা রুটি দিয়ে তোরা চলে যা। আমি এইখানেই প'ড়ে থাকি—বিকেল বেলা স্টেশনে যাবার সময় আমায় তুলে নিয়ে যাস।

তারা আমার কথা মানলে না। বললে —ধীরে ধীরে নিয়ে যাব।

কিন্তু তখন আমার দু' পা ও দেহ অবশ হয়ে আসছিল। দু'কদম চলেই আবার বসে পড়লুম।

কালী বললে—আচ্ছা তুই আমার পিঠে চড়।

ধীরে ধীরে তার পিঠে চড়ে দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরলুম। কিন্তু এক রশি পথ যেতে না যেতে কালীর অবস্থাও সংকটাপন্ন হয়ে উঠল। সে আমাকে নামিয়ে দিয়ে একেবারে শুয়ে পড়ল। [illegible] উঠল [illegible] কিন্তু [illegible] নিতে [illegible] এবার [illegible] পিঠে

সওয়ার হলুম। কিন্তু তার অবস্থাও আমাদের চাইতে ভাল থাকবার কথা নয়। কিছু দূর চলতে না চলতে সে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বললে—একটু বিশ্রাম ক'রে নিই, তারপরে আবার চড়িস।

কিন্তু তার অবস্থা দেখে আমি বললুম—এবার আমি নিজেই যেতে পারব।

যাই হোক কোনোরকমে বসে শুয়ে গড়িয়ে হেঁটে কর্মস্থলে তো গিয়ে পৌঁছনো গেল। আমার অবস্থা দেখে সহকর্মীরা সকলেই সহানুভূতি দেখাতে লাগল। কেউ কেউ বললে—তোমাদের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।

কিন্তু সেই মেয়েটি ও মা বললে না, না—তা হলে সরদার আজকের রোজ দেবে না। তার চেয়ে তুমি এইখানেই বসে থাক। বসে না থাকতে পারলে শুয়ে থাক। সরদার আসছে দেখতে পেলে আমরা তোমায় তুলে দেব—তখন একটু কাজের ভান কোরো।

তখনি আমাদের কাছাকাছি যত মজুর ও মজুরানী কাজ করছিল তাদের মধ্যে খবর চালাচালি হয়ে গেল যে সর্দারকে দূরে দেখতে পেলেই যেন আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়।

আমি তো আর ক্ষণবিলম্ব না ক'রে মাটিতে দেহ বিছিয়ে দিলুম। কিছুক্ষণ বাদে সর্দারকে দূরে দেখতে পেয়ে সেই মা এসে আমায় তুলে দিলে। তখনো আমার অচ্ছন্ন অবস্থা কাটেনি। তবুও সেই অবস্থাতেই ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে কাজের ভান করতে লাগলুম। সর্দার এসে যথারীতি চেঁচামেচি করে চলে গেল। সবাই মিলে বলতে লাগল সর্দার চলে গেছে—এবার শুয়ে পড়।

বলা মাত্র আমি শুয়ে পড়লুম। সেইখানে পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম বলতে পারি না। কালীচরণ আমায় ঠেলে তুলে বললে—চল, ঘরে চল।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম লাভ করায় কথঞ্চিৎ সুস্থবোধ করছিলুম। এতক্ষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলুম বটে, কিন্তু দেহে কোনো তাপ ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করে ঘরে উঠে এলুম। ঝরনার ঠাণ্ডা জলে স্নান করে অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলুম। তারপর রুটি আর জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়া গেল।

যথাসময়ে উঠে আবার কাজ করতে গেলুম বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে আবার শরীর খুব খারাপ বোধ করতে লাগলুম। কাছেই সেই রোগা মেয়েটির মা কাজ করছেল। শরীরে আমি যে অস্বস্তি বোধ করছিলুম আমাকে দেখেই সে তা বুঝতে পেরে তার ভাষায় ও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে যে এখন আর সর্দার এখানে আসবে না—তুমি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়তে পার।

আমি নিশ্চিন্তে ধরণীর কোলে নিজেকে বিছিয়ে দিলুম।

তখন দিন প্রায় অবসান হয়ে এসেছে, পাখিদের চীৎকারে বনভূমি সরগরম। চোখ চেয়ে দেখলুম আমার বন্ধুরা ও আরও কয়েকজন মজুর-মজুরাণী আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিতোষ বললে—তুই ইস্টিশন অবধি হেঁটে যেতে পারবিনে। আজ রাত্তির মতো এদের বাড়িতে গিয়ে থাক। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—আমরা চললুম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চারদিকের আরও অনেকে অনেক কথা বলতে লাগল। তাদের ভাষা অবোধ্য হলেও বুঝলুম যে তারা

আমায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি তখন প্রায় অজ্ঞান—নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। তাদের সেই প্রবোধবাক্য কানেই যাচ্ছিল মাত্র কিন্তু অন্তরে কোনো প্রতিক্রিয়াই হচ্ছিল না। তারপর বন্ধুরো কখন চলে গেল—কখন সেই স্ত্রীপুরুষের দল আমাকে তুলে—কখনো চ্যাংদোলা ক'রে কখনো ঝুলিয়ে—কখনো হিঁচড়ে—কখনো হাঁটিয়ে নিয়ে চলল তাদের ঘরের দিকে। এ যাত্রার স্পষ্ট চেতনা আমার নেই।

শুধু মনে পড়ে—আমি চলেছি তো চলেইছি। কখনো অর্ধচেতন—কখনো বা অচেতন অবস্থায়। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন যুগযুগান্ত ধরে এই জরাভাব বহন করে চলেছি—এই বন্ধুর পথ বেয়ে—কত জীবন পার হয়ে চলেছি—এর আরম্ভও নেই—শেষও নেই। চলতে চলতে কখনো সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা, কখনো বা পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ সম্বন্ধে সামান্য চেতনা—তারপরে সম্পূর্ণ অচেতন। যখন সামান্য জ্ঞান ফিরে এল তখন বুঝতে পারলাম আমি একটা ঝোপড়ির মধ্যে শুয়ে আছি। মাথার ওপরে পাতার আচ্ছাদন, তারই শত-সহস্র রন্ধ্র দিয়ে অজস্র ধারায় চন্দ্রালোক ঝরে পড়ছে আমার অঙ্গে, আমার চারদিকের মাটিতে—এখানে, ওখানে, সেখানে।

চোখ চেয়েই আমার মুখ দিয়ে মাতৃনাম উচ্চারিত হল। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলুম—মা—মা।

কণ্ঠ দিয়ে শব্দ বেরুনো মাত্র একখানি শীর্ণ কঙ্কাল হস্ত আমার কপালে এসে পড়ল। সে হাতের স্পর্শ কঠিন ও কর্কশ হলেও স্পর্শের অতীত মাতৃহৃদয়ের যে বাৎসল্য—সেই অনুভব আমার মনে শরীরে সঞ্চারিত হয়ে আমায় যেন মৃত্যুর দুয়ার থেকে টেনে নিয়ে এল।

আজ মনে ভাবি সৃষ্টিকর্তা কি অপূর্ব কৌশলে সেই অরণ্যের মধ্যে আমার জন্য একখানি মাতৃহৃদয় সঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন।

আমার অরণ্য মাতা বিড়বিড় ক'রে কি বলতে বলতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদেই সেই মেয়েটি যার মাধ্যমে আমরা এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম সে এগিয়ে এসে দু'হাতে দিয়ে আমার দু'হাত ধরে টেনে তুলে বসালে। আমি ততক্ষণে অনেকটা আরাম বোধ করছিলুম। মেয়েটি তার বাবা ও ভাই সকলে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল।

ছোট একখানা নিচু ঘর—পাহাড়ের গায়ে ঘেঁষা অর্থাৎ একদিকের দেওয়াল হচ্ছে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে শেওলা ধরে আছে, তাই বয়ে নিরন্তর জল পড়ছে। তাই সেইদিকে বেশ চওড়া একটা নালা করে রাখা হয়েছে, কারণ বর্ষাকালে পাহাড়ের গা বেয়ে বেশ তোড়ে জলধারা নামে। ঘর নিচু—কোনো রকমে ঘাড় নিচু ক'রে একজন পুরুষ মানুষ দাঁড়াতে পারে।

গাছের সরু সরু ডাল লম্বা ও আড়াআড়ি-ভাবে সাজিয়ে চাল করা হয়েছে। কোনো কোনো ডাল মধ্যে ঝুলে পড়ে সাংঘাতিক খোঁচার মতন হয়ে আছে। অনভ্যস্ত ব্যক্তির চোখে নাকে লাগলে বিষম কাণ্ড হতে পারে। চালের সহস্র অবকাশ দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। ঘরের তিনদিকের দেওয়ালও সেই মেকদারের। ঘরের মেঝে অত্যন্ত সোঁতসোঁতে। তারই মধ্যে এক জায়গায় স্রেফ কাঁচা ও শুকনো পাতার শয্যায় একটি বালক ঘুমুচ্ছে—এদেরই ছোট ছেলে। অদূরে এক কোণে একখানা বড় পাথরের ওপরে ছোট্ট একটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। কোণে মেঝে খুঁড়ে একটা উনুন করা হয়েছে। সরু ও ছোট ছোট শুকনো গাছের ডাল জ্বালানো হয়েছে। বাড়ির বড় মেয়ে অর্থাৎ আমাদের সেই প্রথম বন্ধু তারই সামনে বসে রুটি তৈরি করছে। আধ-ইঞ্চি মোটা ও গ্রামোফোনের দশ ইঞ্চি রেকর্ডের মতো গোল বাজরার রুটি তৈরি হচ্ছে। চাকি নেই বেলুন নেই, —বড় বড় কালো কালো সেই বাজরার আটার তাল অর্থাৎ লেচি দিয়ে স্রেফ দু'হাতে পটাপট শব্দে পিটে পিটে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে রুটি তৈরি ক'রে সেই গনগনে আগুনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আবার লেচি ছিঁড়ছে। আশ্চর্য এই যে প্রত্যেকটি রুটি সমান মাপে গ্রামোফোনের দশ ইঞ্চি রেকর্ডের মত গোল ও প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা। রুটি তৈরি করতে করতে ঠিক সময় বুঝে সে আগুনের রুটিখানা আবার উল্টে দিচ্ছে।

আমি বসে বসে সেই দৃশ্য দেখছিলুম, এমন সময় আমার অরণ্য মাতা উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা সদ্য ভাঙা গাছের ডাল টেনে নিয়ে এসে তা থেকে পড়পড় ক'রে কতকগুলো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে হাতের তেলোয় ফেলে দু'হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেগুলোকে থেঁতো করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

কিছুক্ষণ এই প্রক্রিয়ার পর পাতাগুলো নরম হয়ে এলে আমাকে হাঁ করতে বললে। তারপর কয়েক ফোঁটা সেই পাতার রস নিংড়ে আমার মুখে দিয়ে বললে—যা এবার তুই ভালো হয়ে যাবি।

আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর রুটি তৈরি হয়ে গেল। সবার ভাগে একখানা ক'রে রুটি। সেই পাঁচ বছরের শিশু ও ঘরের কর্তা—আধবুড়ো, সবারই সমান ভাগ। বলা বাহুল্য আমিও একখানা রুটি পেলুম। কালো কাঠের মতো শক্ত বাজরার রুটি, তার মধ্যে এক আধটা আস্ত বাজরা বা বাজরার খোসা খোঁচার মত সিং উঁচিয়ে রয়েছে যা বেকায়দায় গলায় বেধে গেলে সাংঘাতিক মাছের কাঁটার কাজ হতে পারে। আমি অন্য সবার দেখাদেখি তাই একটু একটু ভেঙে মুখে দিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলুম। খেতে খুব খারাপ নয়, তার ওপর খিদের মুখে সে খাদ্য অমৃতের মতন লাগতে লাগল। বিনা তরকারিতে খেতে অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পেরে মেয়েটি তার মা'কে কি বললে। মেয়ের কথা শুনে মা কাছেরই একটা ছোট্ট গর্ত থেকে কী সব বেছে বেছে তুলে আমার হাতে দিয়ে বললে—এই দিয়ে খাও, ভাল লাগবে।

দেখলুম কালো কালো কতকগুলো নুনের টুকরো।

আমাকে সেই নুনটুকু দেওয়ামাত্র ছেলে-মেয়েরা সকলেই বায়না ধরলে। তখন মা আবার সেই গর্ত থেকে কারুকে বেছে—কারুকে মাটি চেঁছে নুন দিয়ে নিজে খানিকটা সেই নোনতা মাটি চেঁছে নিয়ে তাই টাকনা দিয়ে দিয়ে রুটিখানা খেয়ে ফেললে।

একখানা সেই রুটি খেতে আমার প্রায় পনেরো মিনিট সময় লেগে গেল ও পেটও ভরে গেল। কিন্তু অন্য সবাই দেখলুম দু'তিন মিনিটের মধ্যেই রুটি নিঃশেষ ক'রে ফেললে। সকলেরই এমন কি সেই

হল যে খেয়ে তাদের পেট ভরল না। পাঁচ-ছ' বছরের বাচ্চাটারও মুখ দেখে মনে আরও অন্তত গড়ে দু'খানা ক'রে রুটি খেতে পারলে হত। কিন্তু উপায় নেই।

ঘরের কোণে একরাশ শুকনো পাতা জড়ো করা ছিল। আমি এতক্ষণ মনে করেছিলুম যে উনুনে জ্বালাবার জন্যে সেগুলি সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছে। কিন্তু খাওয়ার পরই দেখা গেল এক এক জনে দু'হাতে ক'রে এক এক বোঝা পাতা তুলে এনে একটুখানি ক'রে জায়গায় তাই বিছিয়ে বিছানার মতন ক'রে সেখানে যে যার শুয়ে পড়ল। মাথায় বালিশ নেই, ভূমির ওপর একখণ্ড ছেঁড়া বস্ত্র পর্যন্ত নেই।

তাদের কাণ্ড দেখছি—এমন সময় আমার অরণ্য মাতা এক বোঝা পাতা এনে এক কোণে বিছিয়ে আমায় ইঙ্গিতে বললে—শুয়ে পড়।

ঘরের কোণে টিমটিম ক'রে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছিল, সেটাকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে সেও শুয়ে পড়ল। আমি কোঁচা খুলে সেই পাতাগুলোর ওপর বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। যদিও মাটিতে বিনা উপাধানে শোওয়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল—তবুও সেই প্রায় ভিজে মাটির ওপরে শুতে প্রথমটা বেশ অসুবিধা হতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করতে করতেই চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেলুম—দেহের অসুবিধার কথা আর মনেই রইল না।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার, এক কোণে সেই উনুনের আগুন ভস্মরাশির ভেতর থেকে একটু চকচক করছে, আমার চারপাশে প্রায় নগ্ন কয়েকটি নরনারীর কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর আধপেটা সিকিপেটা খেয়ে স্রেফ শ্রান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। বাইরে নিস্তব্ধ বনানী, স্তব্ধ নিঃঝুম—তারই মধ্যে মাঝে মাঝে কিসের যেন চীৎকার উঠছে—হয়তো কোনো রাত পাখির কিংবা কোনো জানোয়ারের কিংবা কোনো 'দেও'—সবই হতে পারে।

আমার চোখে ঘুম নেই। সমস্ত দিনই ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। মাথার মধ্যে নানারকম চিন্তা এসে জুটতে লাগল। মনে হতে লাগল—আমি কোথাকার লোক—কেমন ক'রে এদের মধ্যে এসে এখানে রাত্রে শুয়ে আছি। কী অসম্ভব সংঘটন! আমার চারপাশে এই যে যারা শুয়ে আছে, যারা কিছুদিন আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল অথচ আজ তারা পরমাত্মীয়ের মতন আমার জীবন রক্ষা করেছে,—এদের সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ! কোন অজ্ঞাত বন্ধনের মায়ায় আমার প্রতি বাৎসল্য জেগে উঠেছে এই অরণ্যমাতার হৃদয়ে! এই পরিবারের ছেলেমেয়েরা সকলেই আমাকে ভাইয়ের মতন শুশ্রূষা ক'রে সুস্থ করবার চেষ্টা করছে। ভাবতে ভাবতে এদের প্রতি এমন কি সেই বনভূমির প্রতি আমি যেন আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করতে লাগলুম।

মনে হতে লাগল—কোন জন্মান্তরে এই বনভূমিই ছিল আমার মাতৃভূমি, এখানকার ছেলেমেয়েরা ছিল আমার সেদিনের খেলার সঙ্গী ও সঙ্গিনী। বিশেষ করে এই পরিবারের সঙ্গেই ছিল আমার বিশেষ সম্বন্ধ। সেই আকর্ষণেই আজ আমি অভাবিতরূপে এদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি। তা না হলে আজ আমি অসুস্থ না হয়ে পরিতোষ কিংবা কালী এদের মধ্যেই যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারত। ভাবতে লাগলুম—এখান থেকে কিছু দূরেই তো সুন্দরী বোম্বাই নগরী; কিন্তু সেখানকার সুখ-দুঃখ-ভোগ-ঐশ্বর্য-সমারোহের কিছুই এরা জানে না, সেখানকার জীবনযাত্রার কোনো প্রতিক্রিয়াই এদের জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হয়নি। সকাল-সন্ধ্যা দু'খানা মোটা মোটা অখাদ্য বাজরার রুটি—তাও আবার বিনা তরকারীতে। যেখানে একদিন সামান্য একটু নুন রাখা হয়েছিল সেখানকার মাটি চেঁছে নিয়ে তাই দিয়ে খাওয়া—এমনি ক'রে একদিন এই মাটিতেই এখানকার জীবন শেষ ক'রে দিয়ে চলে যাবে। ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। কয়েকবার উঠে বসলুম। সেই জীর্ণ কুটীরের চাল ও আশপাশের দেওয়ালের শত-সহস্র ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে অজস্র ধারায় চন্দ্রকিরণ বর্ষিত হচ্ছিল। সেই আলোতে দেখতে লাগলুম চারদিকের ঘুমন্ত সেই মানুষগুলিকে—অনেক বাল্যকালে রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে যেমন দেখতুম আমার আপনজনকে। আবার আমি এদের মধ্যে ফিরে এসেছি। এই ফিরে আসার মধ্যে কোনো প্রাকৃতিক রহস্য, কোনো ইঙ্গিত কি লুকিয়ে আছে?

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে লাগলুম—এদের অবস্থা, এদের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টিকর্তা আমায় এদের মধ্যে এনে ফেলেছেন। এদের নগ্ন অঙ্গে বস্ত্র দিতে হবে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে এদের বুকে। এই সব কথা চিন্তা করতে করতে আনন্দে আমার বুকের মধ্যে গুরুগুরু করতে লাগল, কাঁপতে কাঁপতে আবার শুয়ে পড়লুম।

একদিন এই সংকল্প মনের মধ্যে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে জীবন তরণী ভাসিয়েছিলুম। তারপরে সুখ-দুঃখ, শোক-তাপ, ভোগ-দুর্ভোগ, সাচ্ছল্য-দারিদ্র্যের তরঙ্গাঘাতে চলেছিলুম—কখনো স্রোতের মুখে কুটোর মতন, কখনো বা তরঙ্গের বিপরীতে। কখনো এসেছে তমোময়ী ঝটিকাচ্ছন্ন রাত্রি, কখনো বা নাতিশীতোষ্ণ আনন্দময় স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাত। ঘাটে ঘাটে বন্দরে বন্দরে নতুন অভিজ্ঞতা-সম্ভার বোঝাই ক'রে—অতীতে কখনও কোন একদিন কোন দীনদরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের অন্তরে ভাই ব'লে আলিঙ্গন করেছিলুম তাদের মাকে মা বলে মেনেছিলুম, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করব, তাদের অবস্থার উন্নতি করব ব'লে একদিন গভীর রাত্রে নিজের অন্তরের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—কোথায় মনের কোন অতলে তলিয়ে গেল—তার অস্তিত্ব—তার লেশমাত্রও মনে রইল না।

তাদের স্থানে কত লোককে ভাই বললুম, কত শয়তানকে আলিঙ্গন করলুম ভাই ব'লে, কত মহৎকে পদাঘাত করলুম শত্রু বলে। এমনি ক'রে বহুদিন—বহু বৎসর দুর্লভ মানব জীবনের তৃতীয়াংশ ক্ষয় করে একদিন জীবন-তরণী চড়ায় আটকে গেল। আকস্মিক বজ্রপাতের মতন অভাবিতরূপে মনে পড়ে গেল সেই আমার জীবন প্রভাতের ফেলে আসা দিনটির কথা। সেই কথাটিই আগে শেষ করি।

কল্যাণে এসে দুটি বিষয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার একটি হচ্ছে অতিলৌকিক, আর একটি ইহলৌকিক। অতিলৌকিক অভিজ্ঞতার সূত্রপাত ঠিক কবে হয়েছিল বলতে পারি না, তবে হংস-ভূতের কণ্ঠে তার প্রথম সরব আমন্ত্রণ শুনেছিলুম। পরবর্তী জীবনে এই অদৃশ্য রহস্যের বিপুল বৈচিত্র্য অনুভব করলেও সে দেশের কথা আজও আমার বুদ্ধির অগম্য হয়ে আছে। (ক্রমশ)

১৬।৯।৬৭ তারিখের দেশ-এ প্রকাশিত সি-৩৬২৬নং বিজ্ঞাপনে —প্রকাশকের নাম "মিতানী"-র পরিবর্তে "মিত্রানী" পড়িতে হইবে।

(২৪৭৭)

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তেইশ

সিংহর কান্না বড় অদ্ভুত। গর্জনের রেশ আছে, একটা চাপা আক্রোশ ফেনিয়ে-ফেনিয়ে বাতাসে কাঁপছিল কিন্তু বিক্রমের প্রকাশ নেই। সারাদিন থেকে থেকে মুমূর্ষু ভোলা কেঁদে উঠছিল। দিনের বেলা এত স্পষ্ট করে তার কান্না শোনা যায় নি। তখন বাস-ট্রামের আওয়াজ হচ্ছিল, গাড়ি ট্যাক্সির হর্ন বাজছিল—শব্দের এক-একটা ক্লান্তিকর ঢেউ শ্রবণের পর্দার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছিল বলে জানোয়ারের আর্তনাদ বেশী দূরে ছড়িয়ে যেতে পারে নি।

প্রথম অন্ধকারেও মৃতপ্রায় একটা সিংহের অদ্ভুত কান্নার ধ্বনি এমন অভিভূত করে তুলতে পারে নি লীলাকে। তখন ব্যাণ্ড বাজছিল খুব জোরে, হাততালি পড়ছিল, লীলার মন উন্মুখ, দেহ অর্ধনগ্ন। তার মনের কান্না যন্ত্রণা, ছুরির ফলার মতন এক-এক অনুভূতি ঢাকা পড়েছিল অসংখ্য দর্শকের চোখের দৃষ্টিতে, জোরালো আলোর কড়া আঁচে। তখন জানোয়ারের কান্না শোনবার এবং তা শুনে অভিভূত হওয়ার সময় ও মন লীলার কোনটাই ছিল না।

এখন চারপাশ বড় নীরব। অন্ধকারও গাঢ়। বাইরে আলোর কোন রেখা কোথাও পড়ে আছে কি-না বোঝা যায় না। এক-একবার রাতের গাছগুলো নিঃশ্বাস ছাড়ার মতন ফাল্গুনের অস্থিরতা ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছিল এবং এখনো মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে হাতি নিজের দেহের ওপর লেজ ও কানের ঝাপটা মেরে বিরক্তি প্রকাশ করছিল।

খুব আস্তে, চেপে চেপে নিশ্বাস ফেলছিল লীলা। ইচ্ছে করে না, লীলার মনে হচ্ছিল তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও যেন ভয়াবহ একটা ক্লান্তির মতন একবার তার দেহ ও মনের ভিতরে গিয়ে তাকে অবশ আচ্ছন্ন করে তুলছে, পরেই বেরিয়ে এসে অন্ধকার আরও ঘন, আরও অর্থবহ করে তাকে জানোয়ারের মতন যন্ত্রণা দিচ্ছে।

এক-একবার চোখ বন্ধ করছিল লীলা—ভোলার কান্না তার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যাচ্ছিল এবং এক-একবার চোখ খুলে লোহার সিক ঘেরা একটা খাঁচার কথা ভাবতে-ভাবতে সে-ও কাতর আর্তনাদের মতন চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চাচ্ছিল।

কিন্তু তার চোখ শুকনো, খট-খটে, হাত-পা অসাড়। লীলা মড়ার মতন পড়েছিল। তার বাঁ হাত বুকের ওপর, ডান হাত ঈষৎ বেঁকে কপালের ওপর পড়েছে। চিৎ হয়ে সে শুয়েছিল। পা টান-টান, তার এক পায়ের ওপর আর এক পা। লীলা সিংহর কান্না শুনছিল। তা শুনতে শুনতে তার মন থেকে রোমকূপ থেকে রক্তের কণিকা থেকে এবং দেহের এক-এক খাঁজ থেকে তার প্রেম দম্ভ তেজ সাহস যশোলিপ্সা—এই সব আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি ফোঁটা ফোঁটা শীতল কান্নার মতন গাঢ় অন্ধকারে ঝরে যাচ্ছিল।

লীলার মতন কিছু দূরে আর একটা খাটে নবীনও বড় চুপচাপ হয়ে পড়ে আছে। তারও সাড়া নেই, নড়াচড়ার শব্দ নেই। তারও নিঃশ্বাস হয়তো খুবই আস্তে আস্তে পড়ছে কেননা লীলা কিছু শুনল না। সিংহর কান্না, অন্ধকার এবং মড়ার মতন নবীন তাঁবুরে মধ্যে একটা রহস্যময় ভীতিও ছড়িয়ে দিচ্ছিল। লীলার মনে হচ্ছিল আর একটু পরে আজ রাতেই চারপাশ আরও নীরব হয়ে যাবে, অন্ধকার আরও ঘন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠবে এবং এক সময় সিংহর কান্নাও সে আর শুনতে পাবে না।

লীলার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে নবীন। এক-একবার সে শুধু তার দিকে তাকায়। রাগ নেই নবীনের দৃষ্টিতে, ঘৃণাও না—তার চোখের ভাষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না লীলার কাছে। হয় তো নবীন তাকে মেরে ফেলবার কথাই ভাবছে। মৃত্যুর কথা মনে হলেও ভয় হয় না লীলার। তবে নবীন না, মারতে হলে হারকু সাহেবই তাকে মারুক। মরার কথা ভাবলেও হারকু সাহেবের ভাবনা আসে লীলার মনে।

খুব রাগ হয়েছে হারকু সাহেবের। লীলা জানে সে তার সাহস দেখে প্রথম প্রথম খুব খুশী হয়েছিল, পরে শিবনাথবাবুকে অত রাতে টেনে না নিয়ে এলে এমন মড়ার মতন তাঁবুর মধ্যে পড়ে থাকতে হত না লীলাকে, আগের মতন সে আবার হারকু সাহেবের কাছে লুকিয়ে-লুকিয়ে যেতে পারত। হারকু সাহেব তাকে মেরে ফেলতে চাইলে সে গলা উঁচু করে তার মুখের ওপর বলত, "মরার ভয় আমার নাই, মরলেই আমি বাঁচব হারকু সাহেব।"

খুব ভয়ে ভয়ে লীলা ছিল কয়েকদিন। সে ভেবেছিল হারকু সাহেব হঠাৎ এসে হাজির হবে তাঁদের তাঁবুতে, জিনিসপত্র বাইরে টেনে-টেনে ফেলে দেবে বলবে, "অভি নিকালো।" কিম্বা রঘুনাথ ডেকে পাঠাবে নবীনকে। ধমকাবে, তাড়িয়ে দেবে।

এখনো কেউ আসে নি, কিছু বলে নি। কিন্তু এই নীরবতার মধ্যেও ভয়ংকর একটা উপসংহারও যেন স্থির হয়েছিল। কেউ তাকে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও লীলার মনে হচ্ছিল, এমন করে আর চালানো যাবে না। একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে—সব তোলপাড় হয়ে যাবে।

ভয়ংকর কিছু ঘটবার অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারাল লীলা, তার সব বোধ

আস্তে আস্তে এক সময় ভোঁতা হয়ে এল। দেহের মতন মনও অসাড়। তার খেলায় যেন কোন কৃতিত্বের প্রকাশ নেই, হাততালির আওয়াজ বড় বিরক্তিকর—তার মধ্যে কোন মোহ নেই। জানোয়ারের মতন খাঁচার মধ্যে আপন-মনেই বন্ধ হয়ে থাকল লীলা।

একবার তার মনে হয়েছিল সে যেমন করে লুকিয়ে লুকিয়ে হারকু সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমন করেই যাবে শিবনাথের সামনে। ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে নয়, সে মাথা উঁচু করে কৈফিয়ত চাইবে তার কাছে, "এটা কী করলেন শিববাবু? বড় মানুষ আপনি, লেখাপড়া জানেন, আমার মতন একটা দুঃখী মেয়েকে এমন করে বাবুর সামনে অপদস্থ কেন করলেন?"

কপালের ওপর আস্তে আস্তে হাত ঘষছিল লীলা, খসখস একটা শব্দ উঠছিল। শেষবারের মতন খুব জোরে সিংহ কেঁদে উঠেছিল, এখন আরও চুপচাপ। কিন্তু এখনো খুব উৎকর্ণ হয়ে থাকলেও নবীনের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল না লীলা। তার যে সব অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এসেছিল, সে-সব খুব তীক্ষ্ণ না হয়ে উঠলেও লীলার

[illegible] অখণ্ড নীরবতা বড় চুপেচুপে তাকে আবার প্রবল এক অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল লীলা এবং এমন করে শুয়ে থাকতে এখন তার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

হঠাৎ খাটের ওপর উঠে বসল নবীন। লীলা দেখল সে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে নবীনের মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পারল না লীলা, সে কল্পনা করে নিতে পারল, এখন তার মন হিংস্র—খুনে করার নেশায় অন্ধ। আজ না, দু-একদিন আগে আর এক রাতে লীলা ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে তার খাটের কাছে এসেছিল নবীন মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল এবং ঈষৎ জড়ানো স্বরে দু-একবার একটা কথাই উচ্চারণ করেছিল "রেণ্ডি।" সেদিন প্রথম লীলার মনে হয়েছিল নবীন তাকে খুন করবে। কিন্তু একটাও কথা বলে নি লীলা, নবীনের সঙ্গে ঝগড়া করবারও তার ইচ্ছে হয় নি। হয় তো সে বুঝতে পারে নি, যে লীলা জেগেই ছিল।

পরে, সে-রাতে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে লীলা ঘুমতে পেরেছিল। নবীন তাকে যত বড় কথাই বলুক, যত দুর্নাম দিক—তার অস্ফুট এবং ভয়ংকর উচ্চারণ লীলার মনে অদ্ভুত এক তৃপ্তি সঞ্চারিত করে দিচ্ছিল। একটা ভীতু মানুষ যেন তার সব ভালবাসা, সব মোহ ও আকর্ষণ খসিয়ে ফেলে তাকে হঠাৎ মুক্তি দিতে পেরেছে। তন্দ্রার মতন একটা ঘোরে পূর্ব জীবনে পৌঁছে যেতে পারছিল লীলা। এবং তার শিয়র থেকে প্রেতচ্ছায়ার মতন নবীন যখন সরে গেল তখন মন্ত্র পড়বার মতন নিজেরই উদ্দেশে লীলা তারই উচ্চারিত ছোট একটা কথা বারবার বলতে চেয়েছিল, "রেণ্ডি।"

সেই মুহূর্তে—ঘুম না, জাগরণ না, তার চেতনার সরব জগৎ থেকে ক্ষণিকের অবসর ছেঁকে তুলতে তুলতে মেয়েমানুষকে চূড়ান্ত অপমান করবার অশ্লীল কথাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে তার মাথার মধ্যে বেজে উঠেছিল। তার মনে হচ্ছিল এত পরে তার সম্পর্কে সতীত্বের সব চেয়ে বড় বিশেষণ প্রয়োগ করতে পেরেছে নবীন।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে এখন নবীনকে লীলার বড় ভাল লেগে যাচ্ছিল এবং তার জন্যে সে একটা মমতাও অনুভব করছিল। আর একটু পরে লীলা ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে হয়তো আজও তার কাছে আসবে নবীন, কয়েক মুহূর্ত তার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকবে চুপচাপ নির্বিকার সন্ন্যাসীর মতন, পরে সেই কথাটা সে আবার তাকে শুনিয়ে যাবে। তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে শুয়েছিল লীলা।

মাটিতে নামল নবীন। হাত ও পা টান-টান করে আলস্য ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিল; লীলার কাছে এল না। তাঁবুর কাপড় সরিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে থাকল। তার নড়া-চড়ার কোন শব্দ নেই। লীলার মনে হল ইচ্ছে করেই সে সাবধানতা অবলম্বন করছে। হয়তো তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে নবীন। আপনমনেই হাসল লীলা। আশ্চর্য, এখন নবীনের হাতে মরতেও তার কোন আপত্তি ছিল না।

নবীন বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, লীলা স্থির থাকতে পারল না, একটা অস্বাভাবিক কৌতূহলের বশেই হঠাৎ বলে ফেলল, "কোথায় যাও?"

নবীনের মুখের ওপর এবং তার গোটা দেহের ওপর অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বলে এখনো তাকে অপচ্ছায়ার মতন মনে হচ্ছিল লীলার। তার মুখ স্পষ্ট করে সে দেখতে পারল না কিন্তু বুঝল এত রাতে লীলার স্বর শুনে চমকে উঠেছে নবীন। তার মাথা ঈষৎ নড়ে উঠেছিল এবং সে বাইরে যেতে পারল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল নবীন। নড়ল না। কথা বলল না।

আর শুয়ে থাকতে পারল না লীলা। নবীন দু-একদিন কথা না বলে থাকলেও সাহস করে মান ভাঙাবার ইচ্ছায় সে তার কাছে এসে হাত ধরে টানল এবং চোখে মুখে কৌতুক ছিটিয়ে হালকা গলায় বলল, "কথা নেই কেন গো মুখে? বোবা নাকি তুমি?"

এখনও নড়তে পারল না নবীন। লীলার এমন স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সে লীলার দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারল না। অপরাধীর মতন বিমূঢ় হয়ে থাকল। কিন্তু লীলার এমন আকস্মিক স্পর্শ তার মনের মধ্যে সিংহের কান্নার মতন থমথমে একটা গর্জন ফেনিয়ে তুলছিল। তার দৃষ্টি বাইরে কিছু দূরে সিংহের খাঁচার দিকে। খাঁচাও অন্ধকারে ঝাপসা। কিছু দেখতে পাচ্ছিল না নবীন।

"কথা বলবে না?" নবীনের মুখের কাছে মুখ আনল লীলা। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তাঁবুর কাপড় নবীনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নামিয়ে দিল এবং তাকে খাটের কাছে ঠেলে এনে এক ধাক্কায় বসিয়ে দিয়ে বলল, "এত রাতে কোথায় যাও?"

কিছু পরে অন্য দিকে তাকিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কথা বলার মতন ফিস-ফিস করে উঠল নবীন, "কেন?"

নবীনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তার গালে মুখ ঘষতে ঘষতে পাগল একটা মেয়ের মতন খুব হাসল লীলা, "আমি সব জানি।"

"কী?"

লীলা কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়ে থাকল, পরে নবীনকে ছেড়ে দিয়ে কিছু দূরে সরে এল, "আমাকে মেরে ফেলার কথা ভাব, না?"

নবীন লীলার কথা শুনে তার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেলল। অল্প অল্প তাকিয়েছিল লীলা। তাকে দেখতে দেখতে নবীন বলল, "কেন?"

"আমি কী জানি, বাঃ—" নবীনের দৃষ্টিতে একটা বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, তা দেখে অস্থির হয়ে লীলা বলে উঠল।

নবীন হাসল, "হারকু সাহেব তা-ই বলে বটে।"

"কী?"

"তোমাকে খুন করার কথা।"

লীলা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। হারকু সাহেবের নাম শুনে তার মুখও নিবে এসেছিল। জড়ের মতন এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠবার খুব চেষ্টা করছিল বলে সে আবার নবীনের কাছে সরে এসে তার গা ঘেঁষে বসল। কিছু পরে মুখ অনেকটা তুলে তার একটা হাত জোর করে টেনে নিজের গলার ওপর রেখে লীলা নবীনকে বলল, "চাপ দাও না গো।"

"দিলে কী হবে?"

"আমি মরব।"

লীলার উন্মুখ যৌবন মনে মনে উপভোগ করতে করতে অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল নবীন, সে তাকে নিবিড় করে চেপে ধরে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, "না।"

"কেন গো? এত পাপ করেছি, আমাকে মেরে ফেলবে না তুমি?"

লীলাকে বুকের ওপর তুলে নিল নবীন, দু-হাত দিয়ে তাকে খুব জোরে বাঁধল, এবং ভয়ংকর এক প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হলেও থেমে থেমে বলল, "বউকে যে খুন করতে পারে সে করুক, আমি পারি না—" নবীন লীলাকে আদর করতে থাকল অপ্রকৃতস্থ মানুষের মতন।

নবীনের কাছ থেকে কোনদিনও এমন আদর-সোহাগ চায় নি লীলা। নবীনের দেহ ও মনের এই রকম উলঙ্গ উৎকট প্রকাশ তার কাছে বড় যন্ত্রণার। অল্প আগে সে তার প্রতি নবীনের ঘৃণা ও আক্রোশের কথা ভেবে একটা তৃপ্তি অনুভব করেছিল এবং তার ধারণা হয়েছিল সে তাকে ছেড়ে দিতে পেরেছে—খুন করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এখন লীলা বুঝল তার ধারণা ভুল। নবীন আছে যেমনকার তেমন। এমন পুরুষ তাকে রাতের পর রাত উপভোগ করবার অধিকার রাখে বলে বড় অস্বস্থি হচ্ছিল লীলার।

লীলা অসহায় মেয়ের মতন খুব করুণ করে নবীনের কানের কাছে মুখ এনে বলল, "আগে চলে যাবার কথা বলেছিলে না?"

নবীন কিছু না বুঝে জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

"ঘর-সংসারে। বলেছিলে না, সার্কাস ভাল না? এখানে মানুষ থাকে?"

লীলা কিছু উষ্মা প্রকাশ করে বলল, "সার্কাস ছেড়ে দিয়ে ঘর-সংসার করার কথা বলে কত ঝগড়া করেছ—মনে নেই?"

নবীন হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "হুঁ, তা কী?"

"চল না গো, আমরা সার্কাস ছেড়ে পালিয়ে যাই?"

নবীন হেসে বলল, "তুমি যাবে না—"

"যাব মাইরি, বলছি।"

একটা নিশ্বাস ফেলল নবীন, খুব আস্তে কথা বলল, "কোথায় যাবে লীলা? যাবার কোন জায়গা আছে নাকি?"

"নেই?"

"না।"

"তবে যে আগে বলেছিলে, ঝগড়া করেছিলে?"

"তুমি রাজি থাকলে তখন যা-হয় করতাম।"

"আমি রাজি আছি মাইরি," নবীনের বিশ্বাস জাগাবার জন্যে গলার স্বর আরও খানিকটা তুলে লীলা বলল, "সার্কাসে থাকতে আর মন চায় না। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি আমি যাব—ঠিক যাব। আমি রান্না করব, বাসন মাজব—সব করব—"

নবীন লীলাকে বাধা দিয়ে আবার হাসল, "দূর, এখন যাব কী গো? বাঘ-সিংহর সাথে খেলব না? রিং মাস্টার হব না?"

বাঘ সিংহর কথায় ভোলার কান্নার কথা মনে পড়ে গেল লীলার। সে জিজ্ঞেস করল, "সিংহটা কেমন করছিল, একবার দেখলে না?"

"যাচ্ছিলাম তো, তুমি না আটকালে—যেতে দিলে কই।"

লীলা পাশ ফিরে পড়ে থাকল। এত সময় সে ভুল ভাবনা করে এসেছে— তাকে খুন করবার কল্পনাও করতে পারে নি নবীন। তার মতন জেগে-জেগে সে-ও সিংহর কান্না শুনেছিল এবং খাঁচার কাছে যাবার জন্যেই বাইরে পা বাড়িয়েছিল। নবীনের ঘৃণা ও আক্রোশের কথা মনে করে তার প্রতি যে মমতা জেগে উঠেছিল লীলার, এখন তা বাসি হয়ে এল। নবীনের পাশে আর বেশী সময় তার থাকবার ইচ্ছে হল না। কিন্তু এই মুহূর্তে উঠবার শক্তি ছিল না লীলার। এক খাট থেকে আর একটা খাটের দূরত্ব যেন অনেক, লীলা নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারল না। তার ভয় হচ্ছিল এখুনি মেজাজ খারাপ হবে এবং নবীন ভালবাসার আর দু-একটা কথা বললেই আবার ঝগড়া-তর্ক শুরু হবে। লীলা সিংহর কান্না শোনবার জন্যে কান পেতে থাকল।

লীলার গায়ের ওপর তখনো নবীনের একটা হাত ছিল। গাঢ় সুখে এখন সে নীরব, ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। কথা বলবার মতন অবস্থা তারও ছিল না। লীলার ঘাড়ের কাছে নবীনের নিশ্বাস সুড়সুড়ির মতন ফুটছিল। এখন তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল লীলা। পুলিস ফাঁড়িতে ঘণ্টা বাজল।

আর কিছু পরে, লীলা ও নবীন হারকু সাহেবের কড়া গলার আওয়াজ শুনে ছটফট করে উঠল। নিজের তাঁবুর মধ্যে থেকে না, সিংহর খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে মধ্যরাতে ক্ষিপ্তের মতন চিৎকার করে উঠল হারকু সাহেব, "এ মদনবাবু, এ শালা রিং মাস্টার—আও, জলদি আও! দেখো, শালা কেতনা লোকসান কর দিয়া কোম্পানীকা—"

লীলা ভয় পেয়ে বলল, "কী হল গো?"

খাট থেকে লাফিয়ে নামল নবীন, ধুতি ঠিক করতে করতে বলল, "যাই দেখে আসি—"

সবচেয়ে আগে হারকু সাহেবের পাশে এসে দাঁড়াল নবীন। পরে এল মাহুত অনন্ত কাশী বাচ্চু জোসেফ—একজন ছুটল রঘুনাথকে খবর দিতে। রিং মাস্টার মদনমোহন এল সকলের শেষে।

হারকু সাহেবের টর্চের আলো এখনো খাঁচার মধ্যে কাঁপছিল। সেই আলোয় নবীন দেখল চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ভোলা। তার দেহ টান-টান, গলার নিচে মাংসের স্তূপ বড় বীভৎস। ভোলার চোখ খোলা, কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে, এখন শুকনো, দাগ লেগে আছে। সিংহী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সিংহকে দেখছে। সার্কাসের সব মানুষ খাঁচার কাছে এসেই বুঝল ভোলা মরেছে।

হারকু সাহেব রিং মাস্টার মদনমোহনের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে বিদ্রূপ করার মতন বলল, "ব্যাস, ফেনিশ! আভি খুশ হলেন?"

অঘোরে ঘুমুচ্ছিল মদনমোহন। কাশীর ডাকাডাকিতে উঠে এসেছে। তার নিজের শরীর কয়েকদিন থেকে ভাল নেই। জ্বর হয়েছে। হারকু সাহেবের কথার অর্থ বুঝল না মদনমোহন। তার খুশী হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে!

হারকু সাহেব টর্চ নিবিয়ে দিল। অন্ধকারে

মানুষগুলো ছায়ামূর্তির মতন। তারা হারকু সাহেবের আদেশের অপেক্ষা করছিল। সিংহর মৃত্যুর খবর পেয়ে রঘুনাথ এদিকে এগিয়ে আসছে। কোন দোষ না থাকলেও মদনমোহন বুঝতে পারছিল তাকে আরও অনেক কড়া কথা শুনতে হবে—যেন সে-ই বিষ খাইয়ে ভোলাকে মেরেছে।

"ভোলা চলে গেল বাবু", হারকু সাহেব আবার খাঁচার মধ্যে টর্চের আলো ফেলে রঘুনাথকে বলল, "ওই দেখেন।"

রঘুনাথ কাতর একটা শব্দ করল, "খুব খারাপ হল। দিন ভাল চলছিল এই ক্যাম্পে —এখানেই বেচারা শেষ হল—" সে কপালে হাত ছুঁইয়ে যারা-যারা তার কাছে ছিল তাদের প্রত্যেককেই লক্ষ করে বলল, "এখানে যা লিখা আছে তা তো হবেই—মানুষ কী করবে বলেন!"

হারকু সাহেব বলল,"সার্কাসের মানুষের মায়া দয়া কিচ্ছু নাই বাবু। বেচারা ভোলা সাঁঝ থেকে চিল্লাচ্ছিল, একটা লোকও খবর করল না। বেচারার মুখে একটুক পানি-টানি দিলে কত ভাল হত। আমি এসে দেখলাম সব ফিনিশ।"

রঘুনাথ তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলল, "মদনবাবু, আমি আপনাকে ওয়ার্নিং দিলাম—"

"সে আগে অনেক দেয়া হল—" কিছু শোক কিছু শাসন হারকু সাহেবের ভারী গলার স্বর অদ্ভুত করে তুলল, "এখন ডিশ-মিশ। শুনেন মদনবাবু, কাল সকালবেলা এখান থেকে ভেগে যাবেন, আপনার মতন মানুষ আমার সার্কাসে আউর থাকবে না—"

জ্বরের ঘোরে মাথা দপদপ করে উঠল মদনমোহনের। সে জানে হারকু সাহেব যা বলেছে তা করবেই। কিন্তু কাল সকালে কোথায় যাবে মদনমোহন! তার যাবার কোন জায়গা নেই। চেনাজানা মানুষ, আত্মীয়-বন্ধু—তার কেউ নেই। অন্ধকারে তার চোখ ভিজে উঠল।

"বাবু—হারকু সাহেব", এই আস্তানা অন্তত আর কিছুদিন আঁকড়ে ধরে রাখার ব্যাকুল ইচ্ছায় মদনমোহন বলল, "আমি কোথায় যাব?"

"ভোলা যেখানে গেল সেইখানে যাবেন—"

মদনমোহন রঘুনাথের পায়ের ওপর পড়তে গেল, "আমাকে কিছুদিন টাইম দিন টাইম দিন বাবু, এখানে যতদিন ক্যাম্প আছে—"

"না-না" মদনমোহনের কান্নার মতন স্বর এবং খাঁচার মধ্যে ভোলার নিথর দেহ হারকু সাহেবকে আরও নিষ্ঠুর করে তুলল, "আপনার সাথে যে দোস্তি করবে, সে ভোলার মতন ফিনিশ হবে। আউর কোই বাত নেই, কাল সকালে ভাগবেন। এ নবীন—"

"এই যে হারকু সাহেব?"

"সহদেব আউর বাহাদুরকে বলবি মদন-বাবুর হিসাব চুকিয়ে দিবার জন্যে। আউর তুই এখন পুরা তৈয়ার তো? কাল থেকে তুই শালা রিং মাস্টার। বাস, এ বাচ্চু, এ কাশী, গাড্ডা বানাও। ভোলাকো নিকালো। আভি মাট্টি দেনা চাইয়ে।"

ভদ্র পাড়ার মধ্যে তাঁবু পড়েছে। কাছা-কাছি অনেক বাড়ি, অনেক মানুষ। রাতের অন্ধকারেই ভাল, দিনের বেলা গর্ত খুঁড়ে সিংহকে কবর দিলে কৌতূহলী হয়ে উঠবে আশেপাশের মানুষ—এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখবে।

হারকু সাহেবের কথা মতন একটু পরেই শাবল কোদালের আওয়াজ উঠল। সার্কাসের জমির এক কোণে কয়েক ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে ধরাধরি করে নামিয়ে দেয়া হল ভোলার হাড় জিরজিরে দেহ। কাজ শেষ করে মাটি চাপা দিতে সময় লাগল ঘণ্টা তিন-চার। হাওয়া ঝির ঝির করছে ভোর হয়ে এল।

সকলে তাঁবুতে ফিরে যাওয়ার পরেও সিংহর কবরের ওপর একটা মূর্তির মতন কিছু সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পদচ্যুত রিং-মাস্টার মদনমোহন। শেষ রাতের হাওয়ায় তার বুকের হাড় কনকন করছে, জ্বর বাড়ছে। সে পা ঘষল, চোখ তুলে আকাশ দেখল এবং আরও কিছু পরে হঠাৎ নিচু হয়ে জানোয়ারের মতন নখ আঁচড়াতে-আঁচড়াতে মাটি তুলে হাত মুঠো করল এবং চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ভাঙা, অস্পষ্ট স্বরে তার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে থাকল।

"আর শালার মানুষ হওয়ার দরকার নাই আমার। ফের দুনিয়ায় এলে আমাকে তুমি জানোয়ার বানিয়ে দিবে ভগবান। না মরলে কোম্পানী জানোয়ারকে ডিশমিশ করবে না।"

মুঠি শিথিল হয়ে ঝুরঝুর করে মাটি পড়তে থাকল মদনমোহনের হাত থেকে, "তোকে অনেক চাবুক মেরেছি ভোলা! তুই-ও শালা আমাকে ফিনিশ করে গেলি—একদম ডিসমিস!"

রুগীর মতন বিকারের ঘোরে এই রকম সব কথা বলে যাচ্ছিল মদনমোহন। তার বুকের ভিতর কান্না নিঙড়ে উঠছিল। কিন্তু চোখ শুকনো, কাঁদবার একটুও ইচ্ছে ছিল না মদনমোহনের।

ক্রমশ

পারমাণবিক শক্তি-সংক্রান্ত নীতি

পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বেশী থোরিয়াম সঞ্চয় আছে—থোরিয়াম অক্সাইড হিসাবে প্রায় ৫০০,০০০ টন। নিউট্রন দীপ্তিকরণে থোরিয়াম বিদারণীয় ইউরেনিয়াম-২৩৩-এ পরিণত হয় এবং ঐ প্রক্রিয়ায় প্রতি টন থোরিয়াম সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ৩০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট কয়লার সমান তেজ পাওয়া যায়।

কেরালার কুইলন'র কাছে চাবর এবং মাদ্রাজ রাজ্যে কন্যা কুমারীর অদূরে মানবলকুরিচি এই দুই সৈকতের বালি সোনার মতো মূল্যবান। কেরালায় মনাজাইট সঞ্চয়ের পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ টন।

থোরিয়ামের গুরুত্ব

ভারতে থোরিয়াম পাওয়া গিয়েছিল মনাজাইট আকারে কেরালা ও মাদ্রাজের সমুদ্রতটে। ১৯০৯ সালে জার্মানীতে এক রসায়নবিৎ পীতাভ সবুজ বালি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দৈবাৎ ত্রিবাঙ্কুরের মনাজাইট আবিষ্কার করে। ফলে ঐ বালি প্রত্যেক বছর শত শত টন অবাধে রপ্তানি হতে লাগলো।

থোরিয়ামের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারত সরকার ১৯৪৭ সালে মনাজাইটের অনিয়ন্ত্রিত রপ্তানি বন্ধ করে দ্যায়। ১৯৪৮ সনে পারমাণবিক শক্তি কমিশন গঠিত হবার পর তার প্রথম কাজ হল মনাজাইট পরিশোধনের জন্য কেরালার আলওয়েতে একটি কারখানা স্থাপন। ঠিক তার পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে অংশী হিসাবে নিয়ে ভারতীয় দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকা লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হল তিনটি : কেরালা ও মাদ্রাজের সৈকত-বালি থেকে তার উপাদানগুলি বের করা, রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মনাজাইট হতে ফসফেট, দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকা ও থোরিয়ামের পৃথকীকরণ এবং দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকা কারখানার কাঁচা থোরিয়াম পিন্ড থেকে থোরিয়াম নাইট্রেট ও অক্সাইড উৎপাদন। পৃথিবীর প্রয়োজনের প্রায় একের তিন ভাগ দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকা যোগান দিয়ে এবং বিপুল পরিমাণের খনিজ পদার্থ রপ্তানি করে প্রাগুক্ত প্রতিষ্ঠান মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। ১৯৬৬-৬৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ ছিল ১·০৫ কোটি টাকা।

শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার

ভারতের থোরিয়াম ভান্ডারকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ হচ্ছে যা দেশের শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি স্বরূপ সেই বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন। টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস পারমাণবিক কারখানার খরচ কিঞ্চিত বাড়িয়ে দিলেও, পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ তাপীয় কেন্দ্রে সঞ্জাত বিদ্যুতের চাইতে সস্তা হবে। এক ধারার শিল্পোন্নয়ন—যেমন, সার, অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তি বৈপ্লবিক ভূমিকা নেবে : দৃষ্টান্ত হিসাবে, সার তৈরির খরচ কমে যাবে মনে হয়।

ট্রম্বে, তারাপুর, রাণা প্রতাপ সাগর ও কল্পক্কম্ এই কেন্দ্রগুলিতে ভারতের পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া হচ্ছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিদ্যুতের উৎস হিসাবে ঐ শক্তি কাজে লাগানো এবং কৃষি, কারখানা শিল্প, জীববিদ্যা ও চিকিৎসা কার্যে ব্যবহারের জন্য রেডিও আইসোটোপ উৎপাদন। একটি ইউরেনিয়াম ধাতু কারখানা একটি ইন্ধন নির্মাণ ব্যবস্থা, একটি ভারী জল উৎপাদন কল এবং একটি প্লুটোনিয়াম যন্ত্র—এগুলি হচ্ছে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে ভারতের অগ্রগতির কয়েকটি ধাপ।

পারমাণবিক অস্ত্র পরিকল্পনা

শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ছাড়াও, পারমাণবিক শক্তি প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। হিসাব করা হয়েছে, ১০০ প্লুটোনিয়াম বোমা, ৫০টি মাঝারি-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৩০ থেকে ৫০টি ছোট বোমারু-বিমান নিয়ে একটি পরিমিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী গড়ে তুলতে ১০ বছর ধরে বার্ষিক প্রায় ১৩০ কোটি টাকা খরচ পড়বে। ১,৩০০ কোটি টাকার নূনে মোট ব্যয় ভারতের দেশরক্ষা বাজেটের শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ। পারমাণবিক বাহিনীর এই খরচ চলিত প্রথার প্রতিরক্ষা ব্যয় কমিয়ে মেটানো যাবে না; বস্তুত, পারমাণবিক শক্তি হবার সিদ্ধান্ত নিলে (বাইরের নতুন চাপ সৃষ্টির দরুন) দেশের চলিত রীতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার দরকার হতে পারে। সুতরাং পারমাণবিক সংঘের সদস্য হতে হলে ভারতকে দেশরক্ষার উপর খরচ অন্ততপক্ষে শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ বাড়াতে হবে। এর তাৎপর্য : চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায়, ধরা যাক, কৃষি উন্নয়ন খাতে প্রস্তাবিত মোট ব্যয়ের অর্ধেকের বেশী ছেঁটে ফেলা। অবশ্য জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার বড়ো রকমের এবং জরুরী আশঙ্কা দেখা দিলে ঐ গুরু ব্যয়ভার বহন করা সাধ্যাতীত হবে না। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র পরিকল্পনার কাজ শুরু করলেই যে আশঙ্কা দূর করা যাবে এমন নয় : পারমাণবিক বোমা তৈরি করার পর তার প্রত্যক্ষ সামরিক প্রয়োগের সমস্যা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার যে, একটা পারমাণবিক বাহিনী থাকলে দেশ কয়েকটি রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করবে। পারমাণবিক অস্ত্র পরিকল্পনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিবিধ সূক্ষ্ম জটিল রাজনৈতিক কারণ এবং তার মূল্যায়নের উপর নির্ভর করবে : পরিকল্পনার অর্থনৈতিক সম্ভবপরতার প্রশ্ন আসবে আগে নয়, পরে। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিতর্কের অবকাশ নেই ; পারমাণবিক অস্ত্র পরিকল্পনা ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ সহজ নয়।

পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কারিগরী কৌশলের ক্ষেত্রে ভারত সম্ভবত খুব বেশী পেছিয়ে নেই। একটি পরিমিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক বাহিনী গঠনের অর্থনৈতিক বোঝা কি দাঁড়াবে তা রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক নিযুক্ত ১২ জন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সাম্প্রতিক বিবরণ থেকে ধারণা করা যায়। পূর্বোক্ত বলা হয়েছে, ভারত যেখানে ১৯৬৪ সালে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে যথাক্রমে ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৫৪ কোটি ২০ লক্ষ ডলার খরচ করেছে, দেশরক্ষার উপর তার ব্যয় সেখানে ছিল ১৭০ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। এই প্রতিরক্ষা বাজেটের উপর (প্রতি বছর) দেশের আরো ১৭টি কোটি ডলার লাগবে পারমাণবিক (সামরিক) শক্তি হতে গেলে। অর্থব্যয়ের চাইতে প্রচন্ড সমস্যা দেখা দেবে আবশ্যক উপাদান ও জনবল নিয়োগের ব্যাপারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গঠনমূলক কর্মকান্ডে নিযুক্ত প্রযুক্তিবিৎ ও উপকরণের অধিকাংশ পরিবর্তন না করেও ভারতের পক্ষে ঐ ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব।

শান্তিকুমার ঘোষ

সাম্যবাদ ও প্রগতির পথ :
অন্য মত

গত ১২ই আগস্ট 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক অম্লান দত্তের 'সাম্যবাদ ও প্রগতির পথ' পড়লাম। প্রথমেই 'দেশ' কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ যে বহু আলোচিত এবং বিতর্ক-মূলক একটি বিষয়বস্তুকে একটি বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার সুযোগসৃষ্টির জন্য। অধ্যাপক অম্লান দত্তকে ধন্যবাদ যে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুনিপুণ ভঙ্গীতে তিনি একটি দুরূহ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যকে সহজভাবে পরিবেশন করতে পেরেছেন। আশা করি তিনি অপছন্দ করবেন না যদি তাঁর মতামতের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও উক্ত প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমার ভিন্নমত প্রকাশ করি।

মূল বক্তব্যে যাবার আগে দুটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে নিই। এক, প্রবন্ধের প্রায় গোড়াতেই অধ্যাপক দত্ত লিখেছেন, 'সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার সহানুভূতি আছে' (১৩১/২)। এই সহানুভূতি কোন্ ধরনের সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি—মার্ক্সবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, না, কল্পনাবিলাসী সাম্যবাদ? আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মার্ক্সবাদী চিন্তার সীমাবদ্ধতা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলের উল্লেখ করেছেন, এবং উপসংহারে তাঁর মতামত 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদী' বলে মনে হয়েছে। অন্য পক্ষে বহু ক্ষেত্রে 'সাম্যবাদী মত' হিসাবে এমন বক্তব্য হাজির করেছেন যা কোন মার্ক্সবাদী গ্রহণ করবে না। উদাহরণ স্বরূপ ১৩৪ পৃষ্ঠার অর্থ-নৈতিক সাম্যের আলোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

দুই, অধ্যাপক দত্ত তাঁর সুস্পষ্ট গণ-তান্ত্রিক সমাজবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শকে আপাত-নিরপেক্ষতার বুদ্ধিজীবি খোলসে ঢেকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। যেমন, 'ধনতান্ত্রিক ও সমাজবাদী উভয় ব্যবস্থাতেই দোষ ত্রুটি আছে' (১৩৪/১), বা 'মনে রাখা ভালো যে কোন ব্যবস্থাই নির্দোষ নয় আর বিশেষ কোন একটা পথই দেশের পক্ষে সমান উপযোগী না' (১৩৭/২), অথবা, 'এ কথা মনে মনে জেনে রাখাই ভালো যে ধনতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী কোন উপায়েই সমাজ অনিন্দ্যসুন্দর হবে না' (১৩৮/২), ইত্যাদি বক্তব্যের শেষে তিনি যে, পথের নির্দেশ দিয়েছেন তা সংশোধিত ধনতন্ত্র-বাদের নামান্তর, বা 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ।' পাঠকের জেনে রাখা ভালো যে অধ্যাপক দত্ত রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নন। অপরপক্ষে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মার্ক্সবাদী কখনও মনে করেন না যে, সাম্যবাদ দোষ-

ত্রুটি মুক্ত একটি নিখুঁত ব্যবস্থা বা পৃথিবীতে স্বর্গলোক এনে দেবে। প্রশ্ন এই নয় যে, উভয় ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি আছে কিনা—নিশ্চয়ই আছে। প্রশ্ন—এই যে, কার ত্রুটি কত বেশী এবং কত কম, এবং কার বিচারে। সমাজতান্ত্রিক শাসনেও দ্বন্দ্ব বা সমস্যার শেষ হবে না—এবং তার সমাধানের জন্য নতুন মত ও পথেরও সৃষ্টি হবে; কিন্তু মার্ক্সবাদী বিচারে 'সমাজতন্ত্র' 'ধনতন্ত্রের' উপর আর একটি ধাপ যেহেতু এই সমাজের আদর্শ শোষণহীন এবং শ্রেণীহীন ব্যবস্থা কায়েম করা। এ বক্তব্যে অধ্যাপক দত্তের ভিন্নমত থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু দাঁড়ি-পাল্লার দুপাশে ঠিকমত ধনতন্ত্র এবং সাম্য-বাদকে বসালেই আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না—দুই পাল্লার ভারের পার্থক্যটাও হিসাব করতে হবে।

ব্যক্তিস্বার্থ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

এবারে মূল বক্তব্যে আসা যাক। প্রথমেই একটি মৌলিক প্রশ্ন : ব্যক্তিস্বার্থ ও অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক কতটুকু? অধ্যাপক দত্তের ভাষায়, 'আর্থিক জীবনে স্বার্থবুদ্ধির গুরুত্ব অস্বীকার করা ভুল।... অতএব মানুষের মহত্তম আদর্শনিষ্ঠাকে নয় বরং দৈনন্দিন জীবনের প্রবলতম প্রবৃত্তিকে, অর্থাৎ স্বার্থবোধকে ধনোৎপাদনের কাজে কিভাবে নিযুক্ত করা যায় সেটা আর্থিক উন্নতির আলোচনায় বিশেষভাবে বিবেচ্য' (১৩১/৩)। এ কথা স্বীকার করে নেয়া ভালো যে ধনতান্ত্রিক সমাজে স্বার্থবোধই 'দৈনন্দিন জীবনের প্রবলতম প্রবৃত্তি', যেহেতু ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগ ছাড়া তাঁর পক্ষে অর্থনৈতিক সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমাজ তাকে বাধ্য করছে স্বার্থপর হতে, যেহেতু ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া এই সমাজে তার বাঁচবার এবং ন্যূনতম দৈহিক এবং মানসিক প্রয়োজন মেটাবার কোন উপায় নেই। অবশ্য এ কথাও সত্যি যে, কোন কোন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে, যেমন ব্রিটেনে, রাষ্ট্র বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিম্নতম চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে। কিন্তু সেখানেও আয় সম্পদ এবং সুযোগের বৈষম্য ব্যক্তিস্বার্থবোধকে জাগ্রত রাখে। ধন-তান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সাফল্যের পথও অনেক দূরে : যার বাড়ি আছে সে গাড়ি চায়, যার গাড়ি আছে সে ছ' মাসে একবার কন্টিনেন্টে হলিডে করতে চায়, যার সম্পদ আরও বেশী সে প্রমোদতরণী ক্রয় করে বা অতলান্তিক মহাসাগরের একটি ছোট দ্বীপ ইজারা নিয়ে মধুচক্র নির্মাণ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব ব্যক্তিস্বার্থের সড়ক বেয়ে অর্থনৈতিক সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় উঠবার আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই হয়। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজেও বহু সময়ে মানুষ মানুষকে সাহায্যের জন্য বিনা আয়োজনেই এগিয়ে আসে, ধনসম্পদ ত্যাগ করে পুলিসের গুলীতে আত্মত্যাগের ঝুঁকি নিয়ে গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মোটের ওপর ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার মূলে নিরিখ আর্থিক সাফল্য, যার ওপর সম্মান, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, স্বাচ্ছন্দ্য সবকিছু নির্ভর করে।

অপর পক্ষে সাম্যবাদে যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে তা নয়, মানুষের সামাজিক মূল্যমানও আর একরকম থাকে না। ব্যক্তিস্বার্থের প্রয়োজন হয় কম, এবং তুলনামূলক অর্থনৈতিক সাফল্যের পথও একজন ব্যক্তির সামনে সংকুচিত হয়ে ওঠে। যেহেতু বেকারত্বের সংকট নেই, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যের মোটামুটি ব্যবস্থা রাষ্ট্রই করে, কোন ব্যক্তিকে তার নিজের বা পরিবারের নিম্নতম দৈহিক বা মানসিক প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বার্থের আশ্রয় নিতে হয় না। আবার ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সাফল্যের পরি-সীমাও যেহেতু ছোট, সম্পদ এবং সুযোগের বৈষম্য যেহেতু নেই, এবং জীবন মনের পার্থক্য যেহেতু কম, 'সমষ্টিগত সাফল্য' 'ব্যক্তিগত আর্থিক সাফল্যের' স্থান দখল করে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুই রাষ্ট্রায়ত্ত খামারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের প্রতিযোগিতার মতোই সমষ্টিগত রূপ নেয়। 'সামাজিক স্বীকৃতি-লাভ' আর অর্থনৈতিক সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে না।

এই সঙ্গে এটাও বলা ভালো যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সংঘটিত হয় না। শত শত বছরের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব রাষ্ট্রের কাঠামো পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। সোভিয়েট দেশেও প্রথম দুই দশক এই ব্যক্তিস্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে প্রচুর লড়াই হয়েছে। শুধু শ্রমিক আইনের ক্ষেত্রে নয়, অধ্যাপক দত্ত যার উল্লেখ করেছেন (১৩২/২), কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও বহু দরিদ্র কৃষক অনুৎপাদনশীল ছোট্ট একটুকরো জমি আঁকড়ে থেকেছে, যেহেতু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং ব্যক্তি-গত মালিকানায় সে অভ্যস্ত এবং রাষ্ট্রের কল্যাণকামী রূপ তার অপরিচিত। রাষ্ট্র বহুদিন পর্যন্ত বহু সাধারণ মানুষের মনে পুঁজিবাদী আমলাতান্ত্রিক শাসনের

প্রতিচ্ছবি বহন করে, যাকে সে শৈশব থেকে এবং নিজস্ব বহু অভিজ্ঞতায় ভয় ও ঘৃণা করতে শিখেছে। (এই আজন্ম ভীতির জন্যই ভারতে স্বেচ্ছামূলক সমবায় চাষ সফল হচ্ছে না, এবং কংগ্রেস সরকারও এক সময়ে জোর করে 'সমবায় চাষ' চালু করবার কথা ভেবেছিলেন।) গত অর্ধশতাব্দীর নানা ঘটন-অঘটনের স্রোতে সোভিয়েট নাগরিকরা এই 'ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সাফল্যের' মাপকাঠি প্রায় বর্জন করে এনেছে—যদিও পুরোপুরি পেরেছে এমন কথা বলবো না। সোভিয়েট দেশ এখনও 'সাম্যবাদী' নয়, 'সমাজতান্ত্রিক' মাত্র—এই দুটি শব্দের অর্থগত পার্থক্য অধ্যাপক দত্তকে বোঝাবার ধৃষ্টতা আমার নেই।

এর সঙ্গে এটুকুও বলা চলে যে দিনের পর দিন ব্যক্তিগত আর্থিক প্রতিষ্ঠার লড়াই সোভিয়েট দেশে গৌণ হয়ে আসছে। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বার্থের অভাবে সেখানে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না, কৃষকরা ফসলকাটা বন্ধ রেখে ভদ্‌কা গিলছে না, বা মহাকাশ অভিযানের কার্যক্রমে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে না। 'সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ অনুপস্থিত বলে উৎপাদন ব্যাহত হয়'—(এটি সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি পুরনো অভিযোগ যদিও উদ্ধৃতিটা অধ্যাপক দত্তের আলোচনা থেকে নয়)—'এই অভিযোগকে পিছনে ফেলেই জগৎ আজ এগিয়ে চলেছে; ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের তুলনায় এ কথাটা আর উপেক্ষা করা ঠিক নয়' (আর একটি প্রসঙ্গে অধ্যাপক দত্তের আলোচনা থেকে উদ্ধৃত—১৩৪/১)।

আয়ের সাম্য ও মার্ক্সবাদ

অধ্যাপক দত্তের আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত আয়ের পার্থক্য থাকে না বা আয়ের একটি সুনির্দিষ্ট উচ্চসীমা থাকে, (১৩৪/২) যদিও নিশ্চয়ই তিনি একথা বলতে চান নি। কিন্তু এই ব্যাপারে মার্ক্সবাদী বক্তব্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। সমাজতন্ত্রেও (সাম্যবাদী রাষ্ট্রে নয়) আয়ের বৈষম্য থাকে, এবং সোভিয়েট দেশ বা চীনেও আছে। কিন্তু এই আয়গত বৈষম্য মোটামুটিভাবে যোগ্যতা বা পরিশ্রমগত পার্থক্যেরই পরিমাপ। ভারত সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও (কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের কথা বলছি না, এ কথা বলা বাহুল্য) সত্যজিৎ রায় বা রবিশংকর আমার বা আপনার চেয়ে বেশী আয় করবেন, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার পরিচালকের মাইনে সাধারণ মজুরের থেকে ঢের বেশী থাকবে। কিন্তু তফাতটা হবে এই যে, পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে কারো ভবিষ্যতের ঠিকুজি রচনা হয়ে যাবে না, 'সুযোগের সাম্য' স্থাপিত হবে, বিড়লার সন্তান এবং একজন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে পেট চালানো মজুরের সন্তানের কারখানার পরিচালক হবার পুরোপুরি সমান সুযোগ থাকবে। একই শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকেও যদি একজন বেশী পরিশ্রমী বা কুশলী বলে বিবেচিত হয়, তার সমাজের কাছ থেকে কিছু বেশী পাবার অধিকারও জন্মাবে। সঙ্গে সঙ্গে, যোগ্যতা বা পরিশ্রমের বিচারে যাই হোক, প্রত্যেকেই একটি ন্যূনতম জীবনমানের প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাবে।

অতএব, 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দারিদ্র্যে টেনে নামাবার চেষ্টায় দেশে আত্মপীড়নে ও পরপীড়নে অভ্যস্ত এক ধরনের অসহিষ্ণু নেতৃত্ব সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে' (১৩৪/২), এই বক্তব্য অন্তত পক্ষে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নয়।

শিক্ষা সংস্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক দত্তের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত, যা সুযোগের বৈষম্য কিছুটা কমাবে, এবং মধ্যবিত্তরা কৃষিজীবীদের শিক্ষাপ্রাপ্তিতে রুষ্ট হবেন, একথা মনে করি না। কিন্তু মূল সমস্যা সম্পদের অসাম্য, যার প্রতিফলন আয় ও সুযোগের অসাম্যে। দারিদ্র্য এবং আকাশছোঁয়া পাশ্চাত্যপ্রভাবিত বিলাস-ব্যসনের পাশাপাশি উপস্থিতি একই দেশে দুটো সমাজ বা প্রায় দুটো জাতি তৈরি করেছে, যাদের মধ্যে মনের যোগাযোগ বড় কম। সম্পদ-বণ্টনের বিরোধিরা প্রায়ই বলেন যে সম্পদবৃদ্ধির সুযোগ না থাকলে ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ হ্রাস পাবে এবং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু ভারতের প্রকট দারিদ্র্যের মধ্যেই সাধারণ মানুষের সামনেই অনাস্বাদিত বিলাস এবং স্বাচ্ছন্দ্যের চোখ ধাঁধানো উপস্থিতি কি তাকে নিজের জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ করে তুলছে না, এবং কর্মে উৎসাহ এবং আনন্দ শুষে নিচ্ছে না? অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা পরিকল্পনা তাই সাধারণ মানুষের কাছে অর্থহীন, এবং জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণে তাই সে পরাঙ্মুখ। ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে রাতারাতি সাধারণ মানুষের জীবনমান পাল্টাবে না—সোভিয়েটেও বহু দিন পর্যন্ত লোকে আধখানা করে রুটিও পুরো পরিবারের জন্য পায় নি—কিন্তু সম্পদের সুযোগের বৈষম্য দূর হবার ফলে তার নিস্ফল আক্ষেপের কারণ থাকবে না, এবং সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে জাতীয় উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে তার স্বল্প উদ্যোগটুকু সে সানন্দে যোগ করবে। এর ফলে, আজ না হোক, জীবনমান উন্নয়নের একটি নিশ্চিত ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি হবে।

সরকারী বনাম বেসরকারী শিল্প

এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক দত্তের সরকারী মালিকানার শিল্প পরিচালনার বিরুদ্ধে বক্তব্য আলোচনা করা যাক। তাঁর মতে, 'শিল্প পরিচালনার পিছনে স্বার্থবুদ্ধি না থাকলে কাজে অনেক সময় শৈথিল্য আসে। আমাদের দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর এর উদাহরণের অভাব নেই' (১৩২/৪)। এর পাল্টা যুক্তিগুলি নিম্নরূপ।

এক, ভারতের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্রে কোন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়। কলকাতা শহরের স্টেট বাস চড়া মানুষ সরকারী মালিকানার খুব বড়ো সমর্থক হবেন এমন আশা অন্যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে দোষটা কতটুকু 'নীতিগতভাবে' সরকারী মালিকানার এবং কতটা সরকারের প্রশাসনিক অদক্ষতার, এ কথাটা ভেবে দেখা দরকার। একথা সকলেই বলেন যে ব্রিটেনের রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাশিল্প ব্যক্তিগত মালিকানার আমলের চেয়ে অনেক ভালোভাবে চলছে যেমন চলছে রেলপথ, পোস্টাফিস বা গ্যাসবোর্ড। অর্থাৎ ধনতন্ত্রের মধ্যে থেকেও সরকারী মালিকানায় 'শিল্পগত দক্ষতা' বেসরকারী মালিকানার চেয়ে কম হয় না। ব্রিটেন বা ফ্রান্সে 'যোগ্যতার' মাপকাঠিতে সরকারী প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে থাকেনি বিশেষত এই কারণে যে, বেসরকারী শিল্পের তুলনায় সেখানে কর্মচারীদের মায়না কম নয় —কাজেই দক্ষ এবং কুশলী কর্মী পাওয়া সম্ভব। সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতাও ওই সব দেশে বেশী।

দুই, উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে অধ্যাপক দত্ত কি ধরনের স্বার্থবুদ্ধির উল্লেখ করেছেন সেটা পরিষ্কার নয়। বর্তমনাকালে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদদের অনেকেই বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে জোর দেন : প্রতিষ্ঠান আয়তনে যতো বড় হয়, মালিক ও পরিচালকের মধ্যে পার্থক্য ততো বৃদ্ধি পায়। একটি বড় বেসরকারী কর্পোরেশনে দৈনন্দিন প্রশাসন এমনকি মূলধন নিয়োগের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত গ্রহণ করে মায়নাকরা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা, তাদের স্বার্থবুদ্ধি সমপর্যায়ে নিযুক্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের স্বার্থবুদ্ধিরই সমতুল্য। কর্মে শৈথিল্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির দুই ক্ষেত্রেই একই রকমের সম্ভাবনা; উভয় ক্ষেত্রেই মালিক এবং পরিচালক, এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, এক নয়।

তিন, সরকারী ও বেসরকারী শিল্পে 'শিল্পগত দক্ষতা' বা 'যোগ্যতার' মাপকাঠি কি? মুনাফা, উৎপাদন ব্যয়সংক্ষেপ, না অন্য কিছু? কারখানা যখন ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে তখন মুনাফাই যোগ্যতার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়, যদিও এই মুনাফা অন্য শিল্প বা সামগ্রিক অর্থনীতির প্রতি ক্ষতিকারক হতে পারে। এই ব্যক্তিগত মুনাফা যে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই নতুনভাবে বিনিয়োজিত হবে—অর্থহীন প্রতিযোগিতা বা অনাবশ্যক বিলাস সামগ্রী আমদানিতে ব্যয় হবে না—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্য দিকে, সরকারী মালিকানায় উদ্ভূত লাভ সার্বিক প্রয়োজনে ব্যয় করা চলে। সরকারী মালিকানায় যে সবসময় লাভই করতে হবে তেমন নয়। ইস্পাত শিল্পে বা সারশিল্পে

সরকার ইচ্ছে করেই লোকসান মেনে নিতে পারেন জাতীয় অর্থনীতিকে বলিষ্ঠ করবার জন্য। বেসরকারী মালিকানা স্বভাবতই জাতীয় স্বার্থে লোকসান স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে না।

চার, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেয়া যায় যে, মুনাফাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার একমাত্র মাপকাঠি, সেক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সফল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনা করা যুক্তিসম্মত নয়। সাধারণত আমরা আলোচনার সময় শুধু সফল ব্যবসায়ীদেরই ধরি, অথচ অসংখ্য ক্ষুদ্র এবং ব্যর্থ ব্যবসায়ী প্রচেষ্টা হিসাবের বাইরে থেকে যায়। এই সাফল্য এবং অসাফল্য সর্বসমেত যোগ করলে বেসরকারী শিল্পে লোকসানটাই বড় হয়ে দেখা দেবে।

পাঁচ, উপরোক্ত যুক্তিগুলো অসম্পূর্ণ এই কারণে যে ধনতান্ত্রিক সমাজে সরকারী মালিকানার উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা সমাজতান্ত্রিক সমাজের সরকারী মালিকানার উদ্দেশ্য এবং ভূমিকার মধ্যে আকাশ-জমিন পার্থক্য এবং যোগাবিয়োগের নিয়মটাও আলাদা। তাই, ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ছকে সমাজতন্ত্রের ভালোমন্দ বিচার করা প্লাস্টিকের গোলাপ হাতে নিয়ে ফুলের সৌরভ এবং রঙ বিচার করারই সামিল।

ক্ষমতার অসাম্য ও আমলাতন্ত্র

অধ্যাপক অম্লান দত্ত এর পর কয়েকটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, সমাজতন্ত্রে ক্ষমতার অসাম্য দূর হয় না, যেহেতু আমলাতন্ত্রের আধিপত্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসার বিপুলত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ও সংহত আকার ধারণ করে, এবং 'বিরোধী প্রতিষ্ঠানের অভাবে আমলাতন্ত্র অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে', (১৩৬/২ ও ১৩৬/৪)। এই যুক্তি নানা কারণে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না।

ধনতন্ত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতা যে স্বল্প কয়েকটি বিত্তবান পরিবারের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় এই সত্য বারবার বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, যার বিস্তারিত আলোচনা করার জায়গা এখানে নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশাল দেশে মাত্র দুশো পরিবার শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের অর্ধেকের বেশী নিয়ন্ত্রণ করে, যার রাজনৈতিক প্রকাশেরও প্রমাণ আছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সংখ্যা আরও কম এবং—বিশ্বের বাজারের তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও ভারতের অনুন্নত অর্থনীতির পটভূমিকায়—ক্ষমতা অনেক বেশী। এ কথা সঠিক যে এই শক্তিশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতা সমাজতন্ত্রে সরকারী কর্মচারীদের হাতে বর্তায়, কিন্তু সেই ক্ষমতা গোষ্ঠীস্বার্থে নিয়োজিত হবার সুযোগ কম যেহেতু এদের সংখ্যা প্রচুর, দায়িত্ব পরিবর্তনশীল, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সোভিয়েট দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে লেনিন পুরোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের অনেককেই মাহিনা দিয়ে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনও কম্যুনিস্ট পার্টির হস্তচ্যুত হয় নি। এ কথা সত্যি যে, শিল্প-বিশেষের পরিচালক বহু সময় স্বীয়নিয়ন্ত্রিত শিল্পের স্বার্থে জাতীয় নীতির রদবদলের চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়েছে এমন প্রমাণ নেই। আমলাতন্ত্রের আধিপত্যের সবচেয়ে বড় বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি, যার সংগঠনের বিস্তার এবং প্রভাব রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালকদের ওপরও। এ ছাড়া, বিভিন্ন শিল্পের পরিচালকদের মধ্যেও জাতীয় শিল্পে অগ্রাধিকার পাবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। ভারী শিল্পের সঙ্গে ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের, কৃষির সঙ্গে শিল্পের লড়াই সোভিয়েটের ইতিহাসে অভিনব নয়। এই প্রতিযোগিতা, আর যাই হোক একটি সুসংহত, সর্বশক্তিমান আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অপ্রতিরোধ্য আধিপত্যের চিহ্ন নয়।

সমাজতন্ত্র ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র

অধ্যাপক অম্লান দত্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দলের অনুপস্থিতির সমালোচনা করেছেন এবং 'গণতান্ত্রিক' পথ সুপারিশ করেছেন। এ ব্যাপারেও বিস্তারিত বলবার সুযোগ এখানে নেই; কিন্তু এইটুকু সংক্ষেপে বলা চলে যে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা একপেশে এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত। শুধু একাধিক দল, চেঁচামেচির কিছুটা অধিকার এবং কিছুদিন পর পর নির্বাচনের আয়োজন হলেই গণতন্ত্রের ঘটপূজা শেষ হয় না। একথা সত্যি যে ব্রিটেনে তিনটি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রধান দল রয়েছে, যেখানে সমাজতান্ত্রিক দেশে (বা আফ্রিকার বহু ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে যেমন টাঙ্গানিয়া বা কেনিয়া) দলের সংখ্যা মাত্র একটি। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি বা জাতীয় নীতির ক্ষেত্রে ব্রিটেনে টোরি-লেবার লিবারেলের নীতিগত পার্থক্য কতটুকু? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি দলের পার্থক্য কি আতসকাঁচ দিয়ে দেখলেও চোখে পড়বে? যেটুকু পার্থক্য উক্ত দুটি দেশে প্রধান দলগুলির মধ্যে আছে তার চেয়ে ঢের বেশী পার্থক্য সোভিয়েট বা চীনে এক পার্টির মধ্যেই রয়েছে। ম্যালেনকভ-বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের অপসারণ কর্মনীতির ক্ষেত্রে সংগঠিত বিরোধীতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। বর্তমান চীনের সংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে যার যা বক্তব্যই থাক, দুটি কর্মসূচীর মধ্যে স্পষ্ট বিরোধীতা একই পার্টির কাঠামোর মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রশ্ন এই নয় যে ক'টি দল এবং ক'টি কর্মসূচী, মূল প্রশ্ন: ক'টি মূল বক্তব্য বা নীতি এবং ক'টি মূল শ্রেণী। যেহেতু ব্রিটেনে ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর আধিপত্য, দলগুলিও তাই সেই ভাবধারার অনুগামী—কর্মসূচীর উনিশবিশ পার্থক্য সত্ত্বেও। সমাজতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য তাই সেই শ্রেণীর ভাবধারা দলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়— যদিও বিভিন্ন কর্মসূচীর পার্থক্য এবং বিরোধীতা একই পার্টির কাঠামোর মধ্যেই রয়ে যায়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 'সহনশীলতা' ততক্ষণই, যতক্ষণ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট আন্দোলন 'বিপদজনক সীমারেখা' অতিক্রম না করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় বেআইনী বললেই চলে। প্রয়োজনমত ব্রিটেন বা ভারতেও কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কর্মের ক্ষেত্রে কম্যুনিস্টদের প্রতি বৈষম্য, নিরাপত্তার নামে বিনাবিচারে আটক, যা বুর্জোয়া-আইন-সম্মত কম্যুনিস্ট সরকারের উচ্ছেদ—ইত্যাদি বহু ঘটনাই ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে মনে পড়বে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'গণতন্ত্র' অচল, যেহেতু বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক নির্বাচনেও সেখানে কম্যুনিস্টদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অপর পক্ষে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিরাপত্তার প্রয়োজনে রাষ্ট্র-বিরোধী মতামত প্রচার বন্ধ রাখা হয়েছে—যে নিরাপত্তার নামে বুর্জোয়া রাষ্ট্রও কম্যুনিস্টদের 'গণতান্ত্রিক অধিকার' দিতে নারাজ। 'বে অফ পিগ'-এর ঘটনায় সি, আই, এর ভূমিকা আশা করি পাঠক বিস্মৃত হননি।

অন্য পক্ষে, সমাজতন্ত্র মানুষকে শিক্ষা দেয়, অর্থনৈতিক ক্লেশ দূর করে এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শিক্ষিত এবং আত্মবলে বিশ্বাসী জনতার চেয়ে বড় আর কোন গ্যারান্টি আছে আমি জানি না।

ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতের অর্থনীতি

১২ অগস্ট, ১৯৬৭ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারতের অর্থনীতি' বিভাগে নিবন্ধের উপর ২৮ অক্টোবর, ১৯৬৭ সংখ্যায় শ্রীদিলীপ গুহ একটি চিঠি লিখেছেন। মূল নিবন্ধের শিরোনামা ছিল 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি: পয়লা নম্বরের সমস্যা'। সেখানে ঝোঁকটা ছিল জনসংখ্যা স্ফীতি রোধের উপর। নিবন্ধের চতুর্থ অনুচ্ছেদের গোড়ায় আছে: "কয়েকটি (ভিন্ন মতের) ছোট অংশ বাদ দিলে, সারা দেশে আজ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ রোধ করার জরুরী প্রয়োজন স্বীকার করা হয়।" নিবন্ধের প্রথম অংশে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে—পত্র-লেখককে তা আবার পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই।

নিবন্ধের শেষ অংশে অতিপ্রজতা সমস্যার সমাজতান্ত্রিক দিকগুলি বিবেচনা করা হয়েছে। সেই সূত্রে বলা হয়েছে, "পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের পথে নানা

বাধার মধ্যে...প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার অভ্যাস, প্রথা, জাতি সম্পর্ক, পক্ষপাত, ধর্ম ও আচার প্রতি পদে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে।" জন্মরোধের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন সমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যোগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত। জন্মনিরোধের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে ফলবান করতে হলে প্রয়োজন : জীবন, বস্তু ও মন, আত্মা ও ঈশ্বর, সগোত্র মানুষ ও সম্প্রদায়, নিজের সন্তান ও পরিবার—এ সমস্তর প্রতি জনগণের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। কেবল শহরের লোক নয়, দূরবর্তী গ্রামবাসীদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, তাদের আর্থিক সঙ্গতি ও সম্পদের উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে (পরিকল্পনামূলকভাবে) পরিবারের আকার (শুধু সন্তানের জন্ম নয়) নির্ধারণ খুবই দরকার। এইভাবে পরিবার পরিকল্পনা প্রচার অভিযানে পারিবারিক কল্যাণ বৃদ্ধির একটা বড়ো স্থান থাকবে : উপযুক্ত পরামর্শের সাহায্যে সম্ভব হবে ছোট কিন্তু সংহতরূপে পারিবারিক জীবনের পুনর্গঠন।
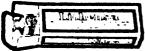
"য়ুরোপে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উৎসাহ দারিদ্র্য থেকে আসেনি"—আমার এই উক্তির সমর্থনে একটি সাক্ষ্য উপস্থিত করাই যথেষ্ট হবে।

"The experience of Europe shows that the stimulus to control population was other than poverty. There was a clash between new opportunities and large families. Economic growth opened up new ways of gaining wealth, new means of rising socially, new symbols of status, to take advantage of which the individual and his children required education, special skills, capital and mobility. To avoid the threat of large families to their socio-economic position, individuals tended to postpone or avoid marriage and to limit reproduction." — J. Mayone Stycos (Director, International Population Programme, Cornell University, Ithaca, New York), 'Birth Control: The Restrictions of the Western Approach." The Lancet, December 11, 1965, page 1231.

শান্তিকুমার ঘোষ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দিল্লির ডায়েরি

"দেশ"-এর ২৭ মে তারিখের সংখ্যায় "দিল্লির ডায়েরি"তে জার্মান সংবাদিকদের খুব বেশী প্রশংসা করা হয়েছে বলেই এই পত্র লিখছি।

ভারতীয় কলাকুশলী ও কর্মীদের আন্তরিকতা ও পারদর্শিতা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। এই সঙ্গে একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না, তারা ক্রমশই পশ্চিম জার্মেনীর সঙ্ঘবদ্ধ "প্রপাগাণ্ডিস্ট"-দের বিদ্বেষের শিকার হয়ে পড়ছেন। আমি শ্রীসরকারের সঙ্গে একমত যে, "ডেমোক্রাসি", "পঞ্চায়েত রাজ" অথবা "এশিয়া মিনিয়েচার"-এর মত ছবি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আমি তাঁর এই কথা মেনে নিতে পারি না যে, ছবিগুলি অক্ষত অবস্থায় অর্থাৎ কোন পরিবর্তন না করে জার্মান টেলিভিশন-এ দেখানো হচ্ছে।

দীর্ঘকাল জার্মেনীতে আছি। আজও পর্যন্ত ডঃ ওয়াল্টার বার্গ প্রযোজিত এবং তাঁর নেপথ্য ভাষণ-সম্বলিত এমন কোন ছবি দেখিনি যা ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলে নয়। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী এবং সমাজতন্ত্রের অন্ধ শত্রুদের পশ্চিম জার্মান তল্পিবাহকরা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কুৎসা প্রচারে অতিরিক্ত বিদ্বেষপ্রণোদিত। সত্যি বলতে কী, বাইরে ভারতের সম্মান ক্ষুণ্ণ করার জন্য ভারতীয় প্রতিভাকে অতি সুকৌশলে কাজে লাগানো হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ্য। অতি-প্রশংসিত ডঃ বার্গ একটি বিতর্কিত "প্রেস কনসার্ন"-এর একজন প্রধান সংবাদদাতা। ওই প্রতিষ্ঠানের নষ্টামি সম্প্রতি এত বেশী বেড়েছে যে জার্মেনীর কোন কোন অঞ্চলের বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরা সংস্থাটি বরবাদ করার জন্য দাবি তুলেছেন। জার্মেনীতে প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদপত্র—প্রায় পঁচাত্তর ভাগ ওই সংস্থার কবলে।

আলোচ্য প্রেসে যে সংবাদপত্রগুলি ছাপা হয় সেগুলিতে ইজরায়েলে অস্ত্রসরবরাহের প্রতি সমর্থন, ভারতে পাকিস্তানীর অনুপ্রবেশ অনুমোদন, ভারতে গত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের বিরূপ সমালোচনা, ভারতে যে হিন্দুরাষ্ট্র এবং সেখানে মুসলমানেরা নির্যাতিত এই ধারণার প্রচার এবং ভিয়েতনামে আমেরিকান অত্যাচারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি নীতি হামেশাই প্রকাশ পায়। এমন জনশ্রুতিও আছে, এই সংস্থার সঙ্গে সি-আই-এ'এর নিয়মিত যোগাযোগ আছে।

আমার বক্তব্য আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের (দেশ-এর ওই সংখ্যায় প্রকাশিত) লেখার উল্লেখ করতে পারি। কিছুকাল আগে তিনিও স্বচক্ষে দেখে গিয়েছেন, পশ্চিম জার্মেনীর টেলিভিশন ভারতের জন্য কী করছে।

আমাদের নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে এবং "ডেভেলপমেণ্ট এইড" বা উন্নয়ন-সাহায্য পরিকল্পনার অন্তরালে যে সব বিদেশী-চক্র ভারতের গণতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির অবমাননা ও ক্ষতিসাধনে তৎপর তাদের প্রতিরোধ করার কাজে আমাদের সচেতন হবার সময় এসেছে। ইতি—

এস কে চট্টোপাধ্যায়
বার্লিন

২

গত ৭।১০।৬৭ তারিখের "দিল্লির ডায়েরী"তে বাঙালী চিত্রশিল্পীর কথা পড়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। খগেনবাবু, শ্রীবিমল দাশগুপ্তের মত শিল্পীর পরিচিতি আমাদের কাছে তুলে ধরলেন সেইজন্য আমি তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

খগেনবাবু লিখেছেন শিল্পী বিমলবাবুর এককালের সহপাঠী আদিনাথ মুখোপাধ্যায় সুদূর ইতালীতে মারা গেছেন, কিন্তু এই সংবাদটি ভুল। আদিনাথবাবু, নিউআলিপুরের টালিগঞ্জ সারকুলার রোডের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

প্রেমাংশু ঘোষ,
কলিকাতা-৫৩

উমিচাঁদ

চিত্তপ্রিয় মিত্র

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ক্লাইভ উমিচাঁদ সম্পর্কে গোপন জাল দলিল করেছিলেন। জাল দলিলটি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনার সহায়ক হয়েছিল। বাংলা দেশে বৃটিশ রাজত্বের সূত্রপাত হয় মীরজাফরের সংগে গোপন দলিলের ভিত্তিতে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাতকে ওই দলিল কলুষিত করেছে। ক্লাইভ বলেছিলেন প্রয়োজন হলে তিনি হাজারবার অনুরূপ জাল দলিল তৈরি করতে প্রস্তুত। কারণ উমিচাঁদের মত নীচমনা দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সংগে ওইরূপ প্রতারণা উপযুক্তই হয়েছে। প্রতারককে প্রতারণা করা দোষণীয় নয়।

কাশীমবাজারের অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেবের চাতুরী ও কূটনৈতিক কথাবার্তায় ইংরেজ কোম্পানী ও মীরজাফরের সংগে যে গোপন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন উমিচাঁদের কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি মুর্শিদাবাদের অর্থভাণ্ডারের শতকরা পাঁচভাগ অর্থ না পেলে ওই গোপন চুক্তি সিরাজকে জানাবেন ভয় দেখালে ক্লাইভ তাঁকে তিরিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়ে গোপন দলিলে স্বাক্ষর করলেন।

উমিচাঁদ ছিলেন পাঞ্জাবের মালোরা অঞ্চল থেকে আগত একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রায় তিরিশ বৎসর কলিকাতা ইংরেজ বসতিতে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। তখন রাজনীতি ও বাণিজ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইংরেজরা তাঁর মাধ্যমে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ থেকে এদেশীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য তিনি কোম্পানী সরকারের কাছে প্রচুর দাদন বা অগ্রিম টাকা পেতেন। ক্রমে তিনি কলিকাতার দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে উঠলেন। ইংরেজদের সংগে বহুদিনের সংস্পর্শে তিনি ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। কলিকাতার অধিকাংশ সুন্দর অট্টালিকাই ছিল তাঁর। বাগানবাড়ী ছিল মারাঠা খাল পরিবৃত কলিকাতার পরিধি উত্তর-পূর্ব কোণে যে স্থান এখন হালসীবাগান বলে পরিচিত। বর্তমান ডালহৌসী স্কোয়ারের নিকটবর্তী পূর্বতন ফোর্ট-উইলিয়ামের নিকটে ইংরেজ পাড়ায় তাঁর প্রাসাদ ছিল। ক্লাইভ উমিচাঁদের প্রাসাদের পাশে অবস্থিত এজরা সাহেবের প্রাসাদে বাস করতেন। অন্য কোন দেশীয় লোকের ইংরেজ মহলে বসবাসের অনুমতি ছিল না। ব্যবসায়ী হলেও উমিচাঁদ রাজার হালে থাকতেন। বহুমুখী ব্যবসার জন্য তাঁর অধীনে অনেক কর্মচারী ছিল এবং কোম্পানীর অর্থে তাঁর অধীনে ব্যবসায়ের নিরাপত্তার জন্য একদল রক্ষীবাহিনীও ছিল।

ইংরেজ অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব উমিচাঁদের সাহায্যে নবাবের সংগে কূটনৈতিক কথাবার্তা আদানপ্রদান করতেন। ইংরেজরা উমিচাঁদকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না। কারণ তাঁর স্বভাব ছিল দুর্নীতিপূর্ণ। সবার উপরে তিনি অর্থলোভী ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কূটনৈতিক চালে দুপক্ষকেই সমর্থন করতেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে স্বজনপ্রীতি, জাতীয়তা বোধ সবই তিনি বিসর্জন দিতে পারতেন। নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক জেনেও ইংরেজরা কার্যসিদ্ধির জন্য তাঁর সাহায্য নিতেন।

ঢাকার ডেপুটি নবাব রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস পুরীর জগন্নাথ দর্শনের অছিলায় বহুমূল্য ধনরত্নাদি সংগে করে কলিকাতার ড্রেক সাহেবের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণদাস উমিচাঁদের অতিথি ছিলেন। সিরাজের গুপ্তচর নারায়ণ দাস ছদ্মবেশে গঙ্গা দিয়ে একটি ছোট ডিঙ্গি করে এসে কলকাতায় অবতরণ করেন ও গোপনে উমিচাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উমিচাঁদ তাঁকে ইংরেজ অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের নিকট পরিচয় করিয়ে দেন। সিরাজ গুপ্তচরের মারফত ড্রেক সাহেবকে আদেশ দেন যেন কালবিলম্ব না করে কৃষ্ণদাসকে ধনদৌলত সহ মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লিখিত কোন পরিচয়পত্র না থাকায় ড্রেক সাহেব সিরাজের চরকে স্বীকৃতি না দিয়ে কলিকাতার সীমানার বাহিরে তাড়িয়ে দেন।

সিরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে কলিকাতা আক্রমণ স্থির করেন। তিনি কলিকাতা আক্রমণের প্রাক্কালে উমিচাঁদকে গোপনে ইংরেজবসতি ছেড়ে চলে আসতে আদেশ দেন। ড্রেক সাহেব খবর পেয়ে উমিচাঁদকে বন্দী করতে আদেশ দেন যাতে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করার সুযোগ না পান। ইংরেজ সৈন্যরা উমিচাঁদের ধনদৌলত লুট করতে আরম্ভ করে। তাঁর অর্থভাণ্ডারে তখন চারিশত হাজার টাকার কম ছিল না। ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে প্রহরীরা বাড়ির চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। প্রধান প্রহরী জগন্নাথ ক্ষাত্রবীরদের মত চরম পন্থা অবলম্বন করেন। বাড়ির পরদানশীন মহিলাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা করতে পারবেন না বুঝতে পেরে তিনি অন্দরমহলে ঢুকে নিজহাতে তেরজন মহিলাকে একে একে হত্যা করে আত্মাহুতি দেবার জন্য নিজের কণ্ঠনালীতে তরবারির আঘাত করেন। কিন্তু তিনি আত্মোৎসর্গের চেষ্টা করেও বেঁচে গেলেন। সিরাজের সৈন্য যখন কলিকাতার নিকট এসে পৌঁছাল, তখন মৃতপ্রায় আহত জগন্নাথ অশ্বারোহণ করে সিরাজের অগ্রগামী সৈন্যবাহিনীকে কলিকাতা আক্রমণের পথ দেখিয়ে আনলেন।

কলিকাতা অবরোধ ও আত্মসমর্পণের পর সিরাজদৌল্লা যখন ফোর্ট উইলিয়ামে বসে ছিলেন, উমিচাঁদ ও কৃষ্ণদাসকে বন্দী অবস্থায় তাঁর সম্মুখে আনা হল। নবাবের আদেশে তাঁরা মুক্তি পেলেন। কলিকাতা শহর হতে ইংরেজরা সমূলে বিতাড়িত হন। কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। নবাব সরকারের রাজস্ব

মুর্শিদাবাদে উমিচাঁদের বাড়ির ভগ্নাবশেষ? ফটো—লেখক

ও শুল্ক বিভাগের আয়ে ঘাটতি দেখা দিল। পলায়নপর ইংরেজরা ফলতার নিকট আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইংরেজদের চরম দুর্দশায় খাদ্যদ্রব্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহের জন্য কলিকাতার দেশীয় ব্যবসায়ীরা সহায্য করেন। উমিচাঁদও নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে একজন। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে লাভ। ব্যবসায়ীদের আনুকূল্যে ইংরেজরা প্রায় বিনা বাধায় কলিকাতা পুনর্দখল করে নিল। সিরাজ পুনরায় কলিকাতা আক্রমণ করার জন্য উমিচাঁদের বাগানবাড়ির পাশে গোবিন্দ মিত্রের বাগানবাড়িতে যুদ্ধশিবির স্থাপন করলেন। উমিচাঁদ ইংরেজপক্ষ সমর্থন করে সিরাজকে বুঝিয়ে বললেন, ইংরেজরা বিশ্বাসী জাতি। তাদের ব্যবসা করতে দিলে রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা দিয়ে সন্ধি চুক্তি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আলী নগরের (সিরাজ কর্তৃক কলিকাতার পরিবর্তিত নাম) সন্ধি চুক্তিতে ইংরেজ উমিচাঁদের বাড়িতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ নবাবকে এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত করেছিলেন।

ইংরেজরা উমিচাঁদকে হুগলির ফৌজদার নন্দকুমারের নিকট পাঠিয়ে দেন। পলাশী প্রান্তরে উমিচাঁদ রায়দুর্লভের সঙ্গেও দেখা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজ সৈন্য ফরাসী চন্দননগর আক্রমণ করলে নন্দকুমার ও রায়দুর্লভ যেন ইংরেজদের বাধা না দেয়। উমিচাঁদ অর্থের বিনিময়ে সব কাজই করতে পারেন। ইংরেজদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েও তিনি তাঁদের সাহায্যে অগ্রসর হলেন।

পলাশী যুদ্ধের অবসানে জগৎশেঠের প্রাসাদে ইংরেজ অধ্যক্ষ ও দেশীয় প্রধানরা যখন মুর্শিদাবাদ রাজকোষের অর্থ ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য ফরাসের উপর বসে-ছিলেন, উমিচাঁদ তখন উল্লিখিত গোপন চুক্তির বলে তিরিশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করবার জন্য ওই স্থানে উপস্থিত। কিন্তু তাঁকে ফরাসে বসতে দেওয়া হল না। ফরাসের পাশে তিনি অপেক্ষা করছেন, এমন সময় ক্লাইভের আদেশে স্ক্র্যাফটন ও ওয়াটসন সত্বর উমিচাঁদকে লাল রঙের কাগজে লিখিত চুক্তিপত্র যে প্রতারণামূলক একটি জাল দলিল, তা জানিয়ে দিলেন। ইতিহাসে জাল দলিলটি রেড ট্রিক নামে পরিচিত। বস্তুত সাদা কাগজে লেখা মূল দলিলে উমিচাঁদ সম্পর্কে টাকা দেওয়ার কথা উল্লেখ ছিল না। বিশেষ লক্ষণীয়, এডমিরাল ওয়াটসন, রাজকীয় নৌবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ, ক্লাইভের জাল দলিলে স্বাক্ষর করেন নাই। ক্লাইভ অন্যের দ্বারা ওয়াটসনের স্বাক্ষর জাল করে-ছিলেন। উমিচাঁদ প্রতারিত হয়েছেন জানতে পেরে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়েন এবং সঙ্গের সহচররা তাঁকে ধরে যত্ন না করলে ওই স্থানেই তাঁর মৃত্যু হত।

তিনি কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে না থেকে এর পর মুর্শিদাবাদে স্থায়ী বসবাস করা মনস্থ করেন। শোনা যায় পরে আম্বেয়া বা মালদহে তাঁর কোন আত্মীয় বাড়িতে তিনি অজ্ঞাত ও অখ্যাতভাবে বিষণ্ণতা ও অবসাদ রোগে ভুগে জীবনের শেষ কটি দিন অতিবাহিত করেন। ক্লাইভ হেস্টিংসকে উমিচাঁদের অবস্থান ও গতিবিধির অনুসন্ধানের আদেশ দেন। উমিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর উইল অনুযায়ী লণ্ডনে ম্যাকডেলেণ্ড ও ফাউন্ডলিং হাসপাতালে ৩৭৫০০্ টাকা দান করা হয়। অনেকের মতে, তাঁর ওয়ারিশরা ওই টাকা ইচ্ছা করে কোম্পানীর হাতে তুলে দেন তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য। উমিচাঁদ ইংরেজদের জন্য টাকা দান করে যাবেন, এর কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ পাওয়া যায় না।

এখনও অনেক স্বার্থপর উমিচাঁদ নীতিবিগর্হিত কাজ করে দেশের ও দশের স্বার্থহানি করছে। ব্যবসায়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সর্বদাই সচেষ্ট। পরিণামে শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত, তা নীতি-জ্ঞানহীন ব্যবসায়ীকুলের মনে আসে না।

সেণ্ট হেলেনার একমাত্র শহর জেমস্ টাউন ও তার পোতাশ্রয়

বিস্মৃত দ্বীপ : বিশ্রুত নির্বাসন

মিহির উপাধ্যায়

মানচিত্রের পাতায় দক্ষিণ আটলাণ্টিকের নীলবিস্তৃতির মাঝে এক অতি ক্ষুদ্র স্থলবিন্দু। আজ থেকে প্রায় দেড় শ' বছর আগে ১৮২১-এর এক ধূসর অপরাহ্ণে একটি নির্বাসিত জীবন নির্বাপিত হয়ে গেছে ওই সাগর-ঘেরা দ্বীপের একমাত্র শহর জেমস্‌টাউনের উপকণ্ঠে। বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ত মানুষ হয়ত ভুলে গেছে ওই দ্বীপকে কিন্তু ইতিহাস ভোলেনি তার দিগ্বিজয়ী বীরের অপমৃত্যু। কলরবহীন জেমস্-টাউনের উপর আজো দাঁড়িয়ে আছে সেই বীরের মুক্তি-নিরুপায় আস্ফালনের শোক-সৌধ। সেখান থেকে অতীতের দিকে তাকালে মনে পড়বে দূরে কর্সিকার সেই প্রশস্ত-কপোল যুবককে—দূরে দৃষ্টিক্ষেপ করলে চোখে পড়বে দ্বীপের বন্দরে উপকূলে লজ্জস্থলের বিষণ্ণ আলিঙ্গন—কান পাতলে সিন্ধু তাণ্ডবে শোনা যাবে নির্বাসিত নেপোলিয়নের হাহাকার। দ্বীপটির নাম সেণ্ট হেলেনা।

দৈর্ঘ্যে আট মাইল এই দ্বীপটির সবটাই উঁচু-নীচু পাহাড় দিয়ে ঢাকা। কোন বিস্মৃত অতীতে মহাসাগরের জলমগ্ন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সেণ্ট হেলেনা একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। সমুদ্র থেকে ৩০০০ ফুট উঁচু ডায়না গিরিশৃঙ্গের প্রস্তর স্তর সেই জন্মপরিচয় বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে স্বচ্ছ জলের ঝর্ণাধারা 'রান' বয়ে গেছে উপত্যকার কোলে দোল খেতে খেতে। ১৬৭২-এর এক আকস্মিক মুহূর্তে সেণ্ট হেলেনা ইংরাজ বণিকের মহা-সামুদ্রিক আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়—তারপর প্রথম জেমসের রাজত্বকাল থেকে আজ পর্যন্ত সেণ্ট হেলেনা ক্রাউন কলোনী। আর তখন থেকেই চ্যাপেল ভ্যালির নাম বদলে হয়েছে জেমস্‌টাউন। জেমস্‌টাউনের সেই চ্যাপেল আজও বর্তমান—কিন্তু প্রাচীন কৃষ্টির আর কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। জেমস্‌টাউনের সেই জেমস ফোর্ট তথা কাস্‌ল ইংরেজ গভর্নরের বাসভবন ও প্রশাসনিক দপ্তরখানা। এখানে বসেই গভর্নর তাঁর কার্যনির্বাহক পারিষদ ও ৮ জনের উপদেষ্টা পারিষদ নিয়ে সেণ্ট হেলেনার ৫০০০ লোককে শাসন করেন। এই প্রশাসনের উপদেষ্টা পারিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশ রয়েছে। গত বছর প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই নির্বাচন উদ্দীপনার বন্যা বইয়ে দিয়ে গেছে অর্ধশিক্ষিত এই দ্বীপ কলোনীতে।

দক্ষিণ আফ্রিকার নিরক্ষীয় অরণ্যানী থেকে বারো শ' মাইল দূরে সেণ্ট হেলেনা বিশ্বের কোলাহল থেকে দূরে নিভৃত নির্বাসনে দিন কাটায়। মাসের শেষে সওদাগরী যাত্রী-জাহাজ 'হারবারে' যখন দাঁড়ায়—সেণ্ট হেলেনা জেগে ওঠে—বিরহীপ্রিয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর জাহাজী ডাকে চিঠি পায়—খাদ্য আসে, মধুর মাদক পানীয় আসে—প্রয়োজনের পণ্য এসে পৌঁছয়—জাহাজের পেট খালি হয়—প্রবাসী প্রিয়জন পশ্চিমের হাট থেকে ঘরে আসে ফিরে—সেণ্ট হেলেনার ঘরে ঘরে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'-এর ধূম পড়ে যায়। বিশ্বের নাড়ীর স্পন্দন পাহাড়-ঘেরা সমুদ্রতটে দুদিনের জন্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। তারপর জাহাজ ছাড়ে। দু'হাতে গ্রহণ করে সেণ্ট হেলেনা তার দুদিনের অতিথিকে শূন্য হাতেই ফেরায়। মাত্র সিকিভাগ কর্ষণকর জমির উৎপাদনে এবং গো-মেষ প্রভৃতি পশপালনে তার নিজেরই পেট ভরে না—খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের অপেক্ষায়—সত্যিই তো তার কি-ই বা আছে দেবার। বর্ষাঝরা ঢালু পাহাড়ে শাক-সবজি এবং কফি জন্মায়। কিন্তু সে কতটুকু? তাই কিছু শনের গাঁট মাথায় করে জাহাজ রওনা হয় কেপটাউনের দিকে।

তবু সেণ্ট হেলেনা সুখে আছে। সুখে আছে সেখানকার হাজার খানেক ভারতীয়—ইংরাজী ভাষায় ভাববিনিময়ে—ইংরাজী পোশাকের আচ্ছাদনে—প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলিত উৎসবে, আন্ত-সাম্প্রদায়িক ভালবাসার দাম্পত্য বন্ধনে। বাঙালীর মত এরা মাছ-ভাতে মানুষ। তেলমসলার সাযুজ্যে বাঙালীরই মত অন্নব্যঞ্জন রসনাকেন্দ্রিক—ইংলণ্ডের মত অর্ধসিদ্ধ ও নিতান্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক নয়। আমাদের দেশের মতই এদের বাগানে আম, জাম, কলা, পেঁপে, পেয়ারা লেবু ও ন্যাসপাতি; আমাদেরই মত এদের বাজারে মাছ, চাল, চিনি—মাছ বারো আনা সের ও পর্যাপ্ত—চাল, চিনি উৎপাদন না করেও খোলা বাজারে আমাদের চেয়ে সস্তা পায়—চৌদ্দ আনা সের দরে।

সেণ্ট হেলেনার সব চেয়ে পুরনো অধিবাসী

সেণ্ট হেলেনার প্রবীণতম অধিবাসী কে? জেমস্‌টাউনের অনতিদূরে গভর্নরের পল্লীভবনের প্রাঙ্গণে গেলে তাঁকে দেখতে পাবেন—২০০ বছরের বৃহদাকার সেই কচ্ছপটিকে। কিন্তু সেণ্ট হেলেনার প্রধান আকর্ষণ নেপোলিয়ন হাউস। কুড়ি বছরের সংক্ষিপ্ত রণ-ঝটিকায় পৃথিবীতে যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী আলোড়ন এনেছিলেন—'যাহার চরণভরে ধরণী করিত টলমল', সেই বন্দী বীর তাঁর রাহুগ্রস্ত জীবন-অপরাহ্ণ এখানে যাপন করেন। এই ঐতিহাসিক গৃহের মুক্তঅঙ্গনে নেপোলিয়নের মুক্তবিহারের অধিকার ছিল—কিন্তু গর্বিত সম্রাট লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকতে পছন্দ করতেন। বন্দী শাজাহানের মত প্রাসাদের গবাক্ষ (Spy-hole) থেকে সেণ্ট হেলেনাকে দেখতেন—তাকিয়ে থাকতেন তাঁর প্রোষিতভর্তৃকা ফ্রান্সের দিকে। এই বাসভবনের উদ্যানে ১৮৪০ সালে তাঁর নশ্বর দেহ ফ্রান্সে স্থানান্তরিত হওয়ার পর দেহহীন কবর এখনও আছে পড়ে, শয়নকক্ষে রিক্ত শয্যা এখনও আছে পাতা।

দীর্ঘ বিস্মৃতির পর সেণ্ট হেলেনায় আবার বিশ্বের কৌতূহল নিবদ্ধ। কয়েক দিন আগে অক্সফোর্ডের অদূরে হারওয়েল আণবিক গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকরা এক নূতন সংবাদ রচনায় তৎপর। নেপোলিয়নের কয়েক গুচ্ছ চুলের উপর গবেষণা চালিয়ে তাঁরা প্রমাণ করতে বসেছেন—সেণ্ট হেলেনায় কর্কটরোগে নেপোলিয়নের স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা মিথ্যা। আর্সেনিক জাতীয় মৃদু বিষপ্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল! শুধু নির্বাসন নয়—সেণ্ট হেলেনা এক ঐতিহাসিক অপমৃত্যুর ঘটনাস্থল।

মাঝ আটলান্টিকে সেণ্ট হেলেনা আজ ইংরাজের সমুদ্র শাসনের অপরিহার্য পতাকা স্থান। তার ডাকটিকিটে রূপসী এলিজাবেথের প্রতিচ্ছবি, বাজারে ব্রিটিশ মুকুটলাঞ্ছিত পাউণ্ড শিলিং পেন্স, হাতে লণ্ডনের সংবাদপত্র—গত মাসের টাট্‌কা, আর লণ্ডনে সূর্য উঠলে ৪৮ বর্গমাইলের এই ছোট্ট দ্বীপে (দ্রাঘিমাংশ ০°) সকাল হয়। ব্রিটেনের পালিতা কন্যা নাবালিকা সেণ্ট হেলেনা। সে হয়ত চিরকাল নাবালিকাই থাকবে। তার জনতা নেই—মিছিল নেই, রাজনীতি নেই—নেই তার জনমতের কম্বুকণ্ঠ। কে তার সহায়, কোথায় তার সম্পদ—আর কোথায়ই বা তার নিকটপ্রতিবেশী—যার সঙ্গে রাজনৈতিক গাঁটছড়ায় সে স্বাধীন জীবনের বাসা বাঁধবে? বিংশ শতাব্দীর শেষে উপনিবেশবাদ যদি কবরের তলায় ঢাকা পড়ে, তবু তার স্মারকশিলারূপে লজ্জানম্র নীরবতায় দাঁড়িয়ে থাকবে অবলা মেয়ে সেণ্ট হেলেনা।

জওহরলালের হাত থেকে বালিকা মুক্তি ছবি-আঁকার পুরস্কার নিচ্ছে ১৯৬১ সনে উপলক্ষে

প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুক্তি গিয়ে সেদিন পেয়েছে একটি বাণী তার প্রদর্শনী উপলক্ষে

যাদের জগত শব্দহীন, তাদের ভাবাবেগ উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে কঠিন, আমাদের মানে যাদের জগত শব্দময় ও বাঙময়। প্রথমোক্ত জগতের লোকেরা অনেক ভাবুক, অনেক ক্ষেত্রে তাদের আবেগ খুব বেশি।

মুক্তি দাসের আঁকা ছবি দেখতে দেখতে এই কথাগুলো ভাবছিলাম। মুক্তি দাস মূক-বধির মেয়ে, বয়েস এখন ২৩। এই প্রথম একক প্রদর্শনী করল এখানকার ত্রিবেণী গ্যালারিতে। স্থানীয় কলা সমালোচকরা প্রায় সকলেই প্রশংসা করেছেন মুক্তি দাসের তেল-রঙ ছবিগুলোর।

মাত্র এই বছর দিল্লী কলেজ অব্ আর্টস থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। সুতরাং, শিল্পের পথে তাকে আরো অনেক চলতে হবে, অনেকদিন, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা তাকে করতে হবে রঙ তুলি আর আবেগ নিয়ে।

ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকার ঝোঁক এবং কয়েকবার শংকরস্ উইক্লি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। মুক্তির বাবা হলেন পাহাড়গঞ্জের ডাক্তার সুধাংশুবিমল দাস, যিনি ১৯৪২ থেকে এখানে প্র্যাক্টিস্ করছেন এবং সুপরিচিত। বাবা মা মূক বধির মেয়েকে নিয়ে স্বভাবতই চিন্তিত ছিলেন। মেয়ে তাদের প্রথম সন্তান, জন্ম থেকেই অমনি। মুক্তির মা বললেন : "ও যখন গর্ভে তখন চট্টগ্রামে অনেক জাপানী বোমা পড়েছিল। আমরা তখন ওখানেই ছিলাম। অনেকে মনে করেন যে, আমার মনের শংকা-ভয় ইত্যাদির কুফলে হয়তো মুক্তি অমনি হল।" অনেক চিকিৎসা করা হয়েছে। মুক্তির ঠাকুরদাও ডাক্তার ছিলেন। কলকাতার বড় বড় চিকিৎসকরা দেখেছেন। কিন্তু কিছুই হল না।

ছয় বৎসর মুক্তি কলকাতার (আপার সার্কুলার রোডে) মূক-বধির বিদ্যালয়ে পড়ে। তারপর পড়ল এখানকার লেডি নয়েস্ মূক-বধির বিদ্যালয়ে, এবং ১৯৬১-তে হিন্দীতে ম্যাট্রিক পাশ করল। তার পরের বছর থেকে পাঁচ বৎসর আর্ট কলেজে।

ছবি আঁকার বাইরেও মুক্তির পারদর্শিতা আছে। সে ভাল খেলোয়াড়। ব্যাডমিনটন টেবল্ টেনিস্, লং জাম্প, দৌড়, ইত্যাদি। মূক-বধিরদের সর্বভারতীয় খেলাধুলো প্রতিযোগিতা হয়েছিল ১৯৬৫ সনে। সেখানেও সে কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছে। মুক্তি নাচেও ভাল। দু বৎসর হল শ্রীবাল্মীকি ব্যানার্জি'র ব্যালে গ্রুপে শিখছে। পুজোর সময় অনেক প্যাণ্ডেলে তার ডাক পড়ে।

তা সত্ত্বেও মুক্তির আসল জগত ছবির জগত। সেখানেই তার আরো বেশি মন দেওয়া উচিত। মনের রঙ বাস্তবে ক্যান্ভাসে আনা খুব সহজ নয়। অধ্যবসায় ও সাধনা না-থাকলে ছবির জগত আপনার হয় না মুক্তির পিতা মহাশয় কন্যাকে ছোট থেকে উৎসাহ দিয়ে আসছেন, এখনো দিচ্ছেন। (উনি চট্টগ্রামের প্রাক্তন বিপ্লবীদের একজন

মূক এবং বধির শিল্পী মুক্তি দাশ দিল্লীতে নিজের ঘরে

ছিলেন। বছর আটেক ইংরাজের কয়েদখানায় কাটিয়েছেন।)

অনেকগুলো ছবি আমরা দেখলাম। শিল্পীর কল্পনা অত্যন্ত আবেগময়ী, যার প্রকাশ রঙের উজ্জ্বলতায়। কয়েকটি ছবিতে এসেছে বাঙময় জগতের শব্দ তরঙ্গের প্রতীক। এবং অন্যান্য ভাবাবেগের মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত বেদনা মুক্তি দাসের কাজে বেশি প্রকাশ।

আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, মূক-বধির শিল্পী মুক্তির প্রয়োজন সংযত ভাবাবেগের, এবং আরো ড্রইং-এ হাত পাকানো তার মন একান্ত শিল্পী-মন এবং সৃষ্টিমূলক কাজের মজবুত ভিত্তি তার আছে।

মুক্তির একটি তেল-রঙা চিত্র

ওর কথা আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। কিন্তু তার মা বেশ বুঝতে পারেন। মুক্তিও মায়ের কথা বুঝতে পারে। লিপ্-রিডিং প্রথা, অর্থাৎ মুখ-ঠোঁটের ভঙ্গিমা দেখে বুঝে নেওয়া। মুক্তির মা জানালেন, মেয়ে আরো আঁকা শেখার জন্যে দিনরাত্র তাগিদ দিচ্ছে। সে শিখতে চায় বরোদার আর্ট কলেজে। তার পক্ষে সরকারী জলপানি পেয়ে বরোদায় গিয়ে শেখাটা খুব অসম্ভব কিছু নয়।

মায়ের মাধ্যমে সে বলে : "মূক-বধির হওয়া আমার শিল্পের প্রতিবন্ধক মোটেই নয়। আমার মনের আবেগ সাধারণ মানুষদের চাইতে বেশি গভীর।"

খগেন দে সরকার

সর্বশেষ সংবাদে শুনিলাম বাংলা কংগ্রেস দল ক্রান্তি দলে যোগদান করিয়াছে।—"সঙ্গত কারণেই ক্রান্তি গঠন করতে পারেন—মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল, মাথায় আমায় ধরতে দাও, ওগো পরতে দাও"—শ্যামলাল মন্তব্যটা সুর করিয়াই শুনাইল।

সর্বভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত সভায় দশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"প্রকাশ থাকে, এর সঙ্গে দশমদশার কোন সম্পর্ক নেই!!"

'**জওহর** জ্যোতি' তাসখন্দে লইয়া যাওয়ার সংকল্পের কথা শুনিলাম। —"দেওয়ালি আগে নিয়ে যেতে পারলে রোশনাই জমতো ভালো"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

প্রসঙ্গত মনে পড়িল, এবারে রাষ্ট্রপুঞ্জে নাকি কালীপুজোর অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে ভারতীয় নৃত্যগীতের ঢালাও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ পড়িলাম। শ্যামলাল বলিল —"খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু কালী-পুজোয় বাজিবারুদ পোড়ানো হয়েছিল কিনা তা সংবাদে বলা হয়নি। রাষ্ট্রপুঞ্জে তুবড়ি ত আকছার জ্বলে, হাউইও আকাশে ওঠে, ছুঁচো বাজিটাই বা বাকী থাকে কেন, তা ছাড়া আনন্দে নিয়ম নাস্তি!"

শ্রীকামরাজ রচিত বাংলার অ্যাড কমিটির অকাল মৃত্যুতে কেহই অশ্রুপাত করিতেছেন না ইহাই আশ্চর্য—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী। খুড়ো বলিলেন—"এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু

নেই, শাস্ত্রকারের মতে পণ্ডিত ব্যক্তি মৃতের জন্য শোক করেন না।"

আলিপুরে জেলা-শাসকের বাংলোর কাছে নাকি হাজার হাজার পান-কৌড়ি আসিয়া গাছের ডালে ডালে ভিড় করিত আর সারারাত কুরকুর করিয়া ডাকিত। তাদের শব্দে বিরক্ত হইয়া জেলা-শাসক তাদের নিধনের হুকুম দেন এবং সরকারী শিকারী আসিয়া দুই দফাতে

পাঁচশত পানকৌড়ি হত্যা করে।—"এ যুগে নব বাল্মীকির আবির্ভাব হলে নিশ্চয়ই তিনি বলতেন—মা জেলা-শাসক প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম" সখেদে মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

আগামী মরসুমে কী রেশন, কী খোলা বাজার, পঃ বঙ্গের সর্বত্র রাজ্য সরকার চালের দর এক রাখিবেন,

সম্ভবত দর হইবে কে জি প্রতি ১ টাকা ৩৭ পয়সা। সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"ক্ষেতে ধান, ভিতে শান!!"

বোম্বাইয়ে গান্ধী স্মারকনিধি আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া শ্রীঢেবর পায়ের জুতো জোড়া খোয়াইয়া আসিয়াছেন। সহযাত্রী জনৈক বাঙ্গরসিক কথিত একটি মজার গল্প শুনাইলেন, বলিলেন: "কোন এক সভায় জনৈক মৌলবী টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন—আইজের এই সভার উদ্দেশ্য হইল হিন্দু-মুসলমানের মিলন। আপনারা মনে রাখবেন, আমরা ভাই ভাই, দেখবেন আর কাইজ্জা নাই, মনে রাখবেন আমরা ভাই ভাই। আমার আর কিছু কওনের নাই। অতঃপর তিনি টেবিল থেকে নেমে এসে দেখেন তাঁর জুতো জোড়া নেই। খানিক খোঁজাখুঁজির পর মহাবিরক্ত হয়ে তিনি আবার লাফ দিয়ে টেবিলের ওপর চড়লেন এবং চড়া গলায় বললেন,—এক মিনিট আগে জুতাটা রাখছি আর এক মিনিটেই চুরি। আমি জানি, এই জুতা চুরি করছে হিন্দু হালারা!!"

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন নাকি বলিয়াছেন, লেখাপড়া না শিখিয়াও মন্ত্রী হওয়া যায়। খুড়ো বলিলেন—"খুব ভালো কথা শুনলাম। বর্তমানে লেখাপড়ার যা অবস্থা তাতে ভবিষ্যতে লেখাপড়া-জানা মন্ত্রী খুঁজলে আর মন্ত্রী পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না!!"

একটি বৈদেশিক সংবাদে সক্রিয় শয্যা আবিষ্কারের সংবাদ শুনিলাম। কোন হাসপাতালের রোগীর যদি শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়, যদি তার 'কোমা'-র অবস্থা দেখা দেয় বা সে খাট হইতে পড়িয়া যায় তবে সেই শয্যা আপনা হইতেই হাসপাতাল কর্মীদের সেই সংবাদ জানাইয়া দিবে। খুড়ো বলিলেন—"চমৎকার, চমৎকার। তবে একটা উর্দু শের শোনাচ্ছি, উর্দু বিরোধীরা কানে আঙুল দিতে পারেন,—কাবারে শিক হ্যায় হাম, কে হরসু করোয়াট বদলতে হ্যায়, যো জ্বল উঠতে ইয়ে পহলু, উ-ও পহলু বদলেতে হ্যায়। রোমান্সে শয্যাকণ্টক হলে সেই শয্যা কি যথাস্থানে সে খবর পৌঁছে দেবে।"

জুতা প্রসঙ্গে অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'য় তখন প্রায়ই আলোচনাচক্র বসত। একদিন সেখানে কথা শিল্পী শরৎবাবু উপস্থিত হলেন। তাঁর পায়ে একজোড়া নূতন জুতো দেখে জনৈক ভদ্রলোক তাঁকে সতর্ক করে বললেন—দাদা হয়ত জানেন না, এখানে প্রায়ই জুতো চুরি হয়। শরৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে জুতো খুলে একটা কাগজে মুড়ে বগলদাবা করে সভাতে গিয়ে বসলেন। ভদ্রলোক চুপি চুপি রবীন্দ্রনাথকে গিয়ে শরৎবাবুর জুতোর কথাটা বললেন। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে দিতে এক সময় শরৎবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—শরৎ, তোমার পোঁটলাটায় কী, পাদুকা-পুরাণ বুঝি"

প্রথম বাঙ্গালী মহিলা অভিযাত্রী দলের রোনটি শিখর জয়ের সংবাদ শুনিয়া সহযাত্রী বলিলেন—"তাঁদের জন্য আমাদেরও রইল সোচ্চার অভিনন্দন।

আমরাও তাই ভাবছিলাম, অলঙ্ঘ্য মাথায় চড়া যাঁদের মজ্জাগত, দুর্গম পর্বত শিখর তাঁদের কাছে লস্যি; যা হোক বিলম্বে হলেও এই কৃতিত্বের পথিকৃৎ তাঁরা হয়ে থাকবেন।"

রবার্ট গ্রেভসের খেয়াল

কবি রবার্ট গ্রেভস বক্তৃতা-সফরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে থাকতে থাকতেই এবছরের নোবেল পুরস্কারের খবর বেরুলো। নোবেল পুরস্কার এ পর্যন্ত যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা অনেকেই ও সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু যাঁরা এখনও পাননি, তাঁরা ও সম্পর্কে কিছু বলেন না, কেননা যদি কেউ মনে করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে আঙুর ফল টক। রবার্ট গ্রেভস নোবেল প্রাইজ পেলেও পেতে পারতেন এবারের কবি, কিন্তু তিনি আগেই নোবেল প্রাইজ সম্পর্কে নিন্দা করে বসেছেন। তিনি বলেছেন, নোবেল প্রাইজ মানেই শিল্পীর মৃত্যু। তিনি নিজে নোবেল প্রাইজ না পাবার জন্য দুঃখিত নন্। তিনি এমন কোনো লেখককে জানেন না— যিনি নোবেল প্রাইজ পাবার পর সার্থক কিছু লিখেছেন। (বলাই বাহুল্য, তিনি সব লেখকের খবর রাখেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাবার পরই, আমাদের মতে, তাঁর বিশুদ্ধতর রচনাগুলি লিখেছেন।)

হয়তো, রবার্ট গ্রেভসের বক্তব্য এই যে, নোবেল প্রাইজ সাধারণত বেশী বয়সের লেখকদের দেওয়া হয়, আত্মিক মৃত্যু হোক বা না-হোক, নোবেল প্রাইজ পাবার পরই অনেক লেখককে টপাটপ মরে যেতে দেখা যায়। কিন্তু কম বয়েসে দিলেও তো তেমন সুবিধে হচ্ছে না। নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে সম্ভবত সর্ব কনিষ্ঠ আলবিয়ার কাম্যু, তিনিও তো প্রাইজ পাবার পর বিশেষ কিছুই লিখতে পারলেন না—আচমকা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে অকারণে মরে গেলেন। অর্থাৎ আজকাল কে না জানে, নোবেল পুরস্কারটা আর সাহিত্যের ভালো মন্দ স্বীকৃতির কোনো ঘটনা নয়, গুচ্ছের টাকা জমা আছে—এবং সুইডেনের কিছু আদযড়ো লোক তাই নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন—প্রতি বছর কাউকে না কাউকে তো দিতেই হবে—তাই লটারিতে যার নাম ওঠে। লটারিতে যে টাকা পায় তার আবার গুণ অগুণ কি? আমরা কিছুকাল আগে এই বিভাগে আলোচনা করে দেখিয়েছিলাম যে, পুরস্কার সম্পর্কে আলফ্রেড নোবেল যে শর্ত রেখে গিয়েছিলেন (যথেষ্ট নিষ্ঠাবান শর্ত)—তার কিছুই আজকাল আর মানা হয় না। পুরস্কারটা এখন যে-পায়, শুধু তারই লাভ, ও নিয়ে এখন আর আপত্তি তোলার কোনো মানে হয় না।

বহু চমকপ্রদ তথ্য অবশ্য রবার্ট গ্রেভস আগেও পরিবেশন করেছেন। এক সময় তিনি বলেছিলেন যে, হোমারের ওডিসি আসলে হোমারের লেখা নয়। হোমারের মেয়ের লেখা। এই তথ্য প্রমাণ করবার জন্য তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ওডিসি'র স্টাইলের মধ্যে মেয়েলি ছাপ আছে।

রবার্ট গ্রেভসের আর একটি বিশ্বাস এই যে, ক্রুশকাষ্ঠে যীশুখৃষ্টের মৃত্যু হয়নি। রেসারেকশান আসলে মানব দেহ নিয়েই যীশু আবার বেঁচে উঠেছিলেন। এ তথ্য অবশ্য তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। ক্রুশের ক্ষত থেকে নিরাময় হয়ে যীশু দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং পরিব্রাজক হিসেবে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরে এসে তাঁর মৃত্যু হয়—এবং সেখানে তাঁর কবর আছে—এরকম একটা গুজব বহুকাল প্রচলিত।

গ্রেভসের সাম্প্রতিক খেয়াল—ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ সম্পর্কে। পারস্যের কবি ওমর আলি শাহ-এর সহযোগিতায় তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর একটি সুফি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও অনুবাদ কার্যে ব্যস্ত। তাঁর মতে, ওমর খৈয়ামের রচনা গভীর ভগবৎ-বিশ্বাসে অনুপ্রেরিত, কিন্তু ১৮৮৯ সালে এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড যে অনুবাদ প্রকাশ করে বিশ্বে চাঞ্চল্য এনেছিলেন—সেটা একেবারেই অমূলক এবং অসৎ। সেটা হয়ে গেছে ভোগবাদী দর্শন আর মাতালের প্রলাপ। রবার্ট গ্রেভস এবার তাঁর শুদ্ধ রূপ দিতে চান। ফিটজেরাল্ডের বিশ্বস্ততা নিয়েও এর আগে বহু প্রশ্ন উঠেছে, রূপান্তরও অনেক বেরিয়েছে, কিন্তু তবু ওই ভোগবাদী দর্শন এবং মাতালের প্রলাপের কবিতাই পাঠকদের বেশী প্রিয়। এবং রবার্ট গ্রেভসকৃত অনুবাদের যে-নমুনা টাইম সাপ্তাহিকে বেরিয়েছে—তা যতই বিশ্বস্ত হোক, কবিতা নয়।

মতান্তর

শিল্প এবং সাহিত্যে নগ্নতা কতখানি বাঞ্ছনীয়—এ সম্পর্কে বহু মতভেদ আছে। নগ্ন শরীর (সংক্ষেপে আলোচনার জন্য আমরা এখানে শুধু নারীর কথাই ধরছি) চিত্রিত করা উচিত বা প্রয়োজনীয় কিনা, কিংবা প্রয়োজনীয় হলেও তা কি উদ্দেশ্যে করা হবে—সে নিয়ে প্রশ্ন আছে। শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং নগ্ন শরীরকেই গ্রীকদের আমল থেকে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য বলা হয়ে আসছে—কিন্তু তার প্রতিরূপ এমন হবে—যা পাঠক-দর্শকের মনে সাধারণ কামনা বাসনা জাগাবে না—অপার্থিব আনন্দের উদ্রেক করবে—এটাই বহু স্বীকৃত বিশ্বাস। এ সম্পর্কে দুটি বিপরীত মতামত উদ্ধার করছি।

'বিউটি অ্যান্ড আদার ফর্মস অব ভ্যালু' গ্রন্থে অধ্যাপক আলেকজান্দার বলেছেন, "যদি কোনো নগ্ন চিত্র এমনভাবে আঁকা হয়—যা দর্শকের মনে বাস্তব বিষয় অনুযায়ী কামনা বাসনা জাগায়—তবে তাকে বলা উচিত ভুল শিল্প এবং গর্হিত নীতিবোধ।" দার্শনিক অধ্যাপক আলেকজান্দারের এই উক্তিটি বহু নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় উদ্ধৃত হয়ে থাকে। এর প্রতিবাদ করেছেন অক্সফোর্ডের ফাইন আর্টসের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং ব্রিটেনের আর্টস কাউন্সিলের সভাপতি স্যার কেনেথ ক্লার্ক। স্যার কেনেথ বলেছেন, শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই কথা অবাস্তব এবং আত্মপ্রতারণামূলক। স্যার কেনেথের মন্তব্য "কোনো নগ্ন চিত্র, যতই বিমূর্ত হোক, দর্শকের মনে খুব সামান্য অস্পষ্ট ছায়ার মতো হলেও, যৌন-বাসনা জাগাবেই। যদি তা না পারে, তবে সেটাকেই বলা উচিত গর্হিত শিল্প এবং ভুল নীতিবোধ।
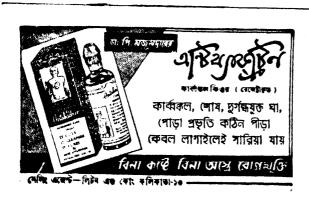
উপন্যাস

পাতাল থেকে আলাপ। বুদ্ধদেব বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দাম পাঁচ টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাসটি যখন অন্য নামে কোন একটি সাময়িক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় বেরোয় তখন পাঠকমহলে বেশ গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। নতুন ধরনের লেখা—এই মন্তব্য তো অনেকেই করেছিলেন। কেউ কেউ আবার বলেছিলেন, সমসাময়িক কালের একটি বিশেষ জীবনধারার উপর এমন 'স্যাটায়ার' এর আগে পড়িনি। 'বিশেষ জীবনধারা' মানে ফিল্মের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবন।

প্রথম অভিমত সর্বাংশে সত্য। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে একটু বেশী কিছু বলবার আছে। জনপ্রিয় ফিল্ম স্টারের জীবন নিয়ে শুধু 'স্যাটায়ার' বললে 'পাতাল থেকে আলাপ'কে খর্ব করা হয়। বরঞ্চ বলতে পারি, আধুনিক ফিল্ম স্টারের জীবনের একটি নিখুঁততম বাস্তব প্রতিচ্ছবি রাজীব, রাজীবলোচন, রাজীবকুমার, রাজীব নন্দী। ঘটনার অমিল হয়ত থাকতে পারে। রাজীবের জীবনে এমন কিছু ঘটেছে যার নজির বাস্তবের কোন ফিল্ম স্টারের জীবনে নেই। এটা এহ বাহ্য। প্রকৃত সাদৃশ্য উন্নাসিকতা, উচ্চাশা ও যন্ত্রণায়। নায়কের মনের গভীরতম স্তরে অবলীলায় পৌঁছে গিয়েছেন লেখক। ফিল্ম স্টারের জীবনের ভিত্তিতে এতকাল যেসব কাহিনী পেয়েছি—বইয়ের পাতায় অথবা সিনেমার পর্দায় তা ভাসা ভাসা। বুদ্ধদেব বসু পাতাল খুঁড়ে তাঁর গল্প টেনে নিয়ে এসেছেন।

এতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন রঙ নেই। চরিত্রাঙ্কনের প্রতিটি আঁচড় সম্পূর্ণ, অর্থপূর্ণ। এক একটি আঁচড়ে সমগ্রের আভাস। এমনও মনে হয়, রাজীব, যূথিকা, সরমা, পদ্মিনী ও ঊর্মিলা বুঝি বিশেষ কোন পরিবেশের মানুষ নয়। এরা শুধু একালেরই মানুষ—আধুনিক জীবনযন্ত্রণার প্রতীক। উপরিপাওনা হিসাবে ফিল্ম লাইনের চালচলন ও রকমসকমের সুন্দর চিত্ররূপ লেখকের উপন্যাসে পাওয়া যায়। লেখাটির টেকনিকটিও অভিনব। তেমনি চমৎকার ভাষা। জায়গায় জায়গায় সরস তো বটেই। হিউমারের প্রলেপ বেশ সুখভোগ্য। সব কিছুর উপরে, রাজীবের ট্র্যাজেডির চিত্রটি মনকে অভিভূত করে। এবং সব মিলিয়ে বলতে গেলে, উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

(২৪৪।৬৭)

কিশোর সাহিত্য

শিশু ভারতী। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান প্রেস (পাবলিকেশন্স) প্রাঃ লিঃ। এলাহাবাদ। প্রাপ্তিস্থান : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। মূল্য ঃ ১৬·০০।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'শিশু ভারতী'র পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এই গ্রন্থগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা কিশোর সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। আলোচ্য খণ্ডটি পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থগুলির কোনোটির পরিবর্ধিত সংস্করণ নয়, এটি 'সংযোজনী খণ্ড'। অর্থাৎ এই খণ্ডে পরবর্তী বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের চিন্তা যুক্ত করা হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল।

শিশু ভারতীকে আমরা বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ছোটদের বিশ্বকোষ হিসেবেই জেনে এসেছি। আলোচ্য খণ্ডে তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটেনি। মহাকাশ, ভারতীয় সংস্কৃতি, জন্তু জানোয়ার, ভারতের স্বাস্থ্য, শিল্পকলা, প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ, গল্প, কবিতা, সাহিত্যালোচনা ইত্যাদি সর্ববিষয়ের আলোচনাই রয়েছে। লেখকরাও সকলেই বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক। ছবি প্রচুর, সম্পাদনা চমৎকার। আশা করি শিশুভারতীর এই সংযোজনী খণ্ডটি সমাদরে সর্বত্রই গৃহীত হবে।

সাধক জীবনকথা

ভারতের সাধক (সপ্তম খণ্ড) শঙ্করনাথ রায়। প্রাচী পাবলিকেশনস। মূল্য—আট টাকা।

শঙ্করনাথ রায়ের 'ভারতের সাধক' গ্রন্থটির পরিচয় পাঠকদের কাছে নতুন করে দেবার কিছু নেই। এই গ্রন্থের পূর্ব খণ্ডগুলি ঘরে ঘরে সমাদৃত। লেখক ভারতের বিখ্যাত এবং অল্প-খ্যাত অনেক মহাপুরুষ ও সাধকের জীবনকাহিনী রচনা করে ধর্মানুরাগী পাঠকদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের বাসনা যাঁদের তাঁদের কাছেও 'ভারতের সাধক' অপরিহার্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত। সপ্তম খণ্ডে লেখক আটজন সাধকের জীবনকাহিনী বিবৃত করেছেন। গুজরাটের নরসিং মেহতা কিংবা শ্রীহট্টের তিব্বতী বাবার জীবনের সব ঘটনা পাঠকদের জানার কথা নয়। জীবনীকার বহু পরিশ্রম করে তাঁদের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মহাপুরুষদের সাধনজীবনের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর রচনার ঢঙটিও সহজ, সরল। গল্পের মত সুখপাঠ্য। 'ভারতের সাধক'-এর অন্যান্য খণ্ডের মত আলোচ্য গ্রন্থটিও পাঠকের কাছে আদরণীয় হবে সন্দেহ নেই।

(২৫১।৬৭)

সংসারীর সাধনা। মনোরঞ্জন সেন সংকলিত। প্রাপ্তিস্থান ঃ ক্যালকাটা লাইব্রেরী, ৪৪/১এ, বেনেটোলা লেন, কলকাতা-৯। ৬·০০ টাকা।

পরমপুরুষের জীবনী ও সাধনাসংক্রান্ত কিছু উপদেশামৃত আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ভূমিকায় গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন লেখক ঃ "পরম কারুণিক ঠাকুর তো আর শুধু সাধু, ভক্ত, ত্যাগীদের জন্যই আসেন নি। যুগগুরু তিনি সংসারীদের জন্যও তো উপদেশ দিয়াছেন; তাহাই হইবে মাদৃশ বিষয়ী লোকের প্রকৃত অবলম্বন ও পথপ্রদর্শক।"

লেখকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় পূরিত হয়েছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সহজ, সরল, ভক্তিপ্লুত ভাষায় তিনি গার্হস্থ্যধর্মে আশ্রিত অবস্থায় সাধন-ভজনের প্রকৃত পন্থাটি আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কাজটি অবশ্যই ব্যাখ্যাতার, তবু দুরূহকর্ম সন্দেহ নেই। সাধারণ লোকের মনের যাবতীয় দ্বিধা-জড়তা-সংশয়-মিশ্রিত প্রশ্নাদি তিনি অনুধাবন করেছেন বলেই আলোচনার বিষয় সর্বাত্মক হতে পেরেছে।

পুণ্য পুরুষের কর্মসাধনার সংগে পরিচয় ঘটাবার পূর্বে যে-গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন তা মিটেছে মহান জীবনীর অবতারণায়। জীবনী-অংশে লেখকের মাত্রাবোধ ও প্রামাণিকতা দৃষ্টি এড়ায় না। সব মিলিয়ে বলা যায়, গ্রন্থটি যাদের উদ্দেশে রচিত তাদের কাছে সমাদর পাবে।

১৮৪/৬৭

কথাসাহিত্যের অভিধান

সাহিত্য কোষ : কথা সাহিত্য—আলোক রায় সম্পাদিত। বাগর্থ, ১।৩ কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলকাতা-৪। দশ টাকা।

সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্যের তত্ত্বগত আলোচনার সংকলন। ইংরেজীতে এই জাতীয় সহায়ক-গ্রন্থ প্রচুর পাওয়া যায়। বাংলায় ঠিক এই ধরনের অভিধান নেই। বর্তমান সম্পাদক ইতিপূর্বে 'নাটক'-বিষয়ে

একখণ্ড কোষগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য খণ্ডটি আরও ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। এতে গল্প-উপন্যাসের যাবতীয় আঙ্গিক ও তত্ত্বগত প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাহিত্য-পরিভাষার ব্যাখ্যা। উত্তর-রচয়িতা এক নয়, বহু। প্রায় সকলেই শিক্ষকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে, আলোচনা প্রায় ক্ষেত্রেই অ্যাকাডেমিক ধাঁচের। তবে এরই মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর 'প্লট ও থীম' (রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া), অশ্রুকুমার সিকদারের 'দার্শনিক উপন্যাস', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছোট গল্পের সংজ্ঞা ও উৎস', দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আঞ্চলিক উপন্যাস', শিশির চট্টোপাধ্যায়ের 'চেতনা প্রবাহ' প্রভৃতি রচনাকে সাহিত্যপ্রবন্ধের রমণীয়তা দুর্লভ নয়। সরোজ দত্ত, অলোক রায়ের কয়েকটি আলোচনাও প্রয়োজন মেটানোর দিক থেকে সুলিখিত। পক্ষান্তরে, দু-একটি ক্ষেত্রে আলোচনার মধ্যে স্বচ্ছতাও প্রাঞ্জলতার অভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ল। এই জাতীয় গ্রন্থে এই ত্রুটি মারাত্মক। অভিধান দেখার জন্যে আরেকটি অভিধান লাগার মত। আরেকটি কথা, আলোচকরা প্রায় ক্ষেত্রেই বিদেশী সাহিত্যের উদাহরণ এনেছেন, তুলনায় বাংলা গল্প-উপন্যাসের প্রসঙ্গ-স্বল্পতা দৃষ্টিকটু। পরবর্তী সংস্করণে এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন কারণ, ইংরেজী সাহিত্যভাণ্ডার কাছে এ-জাতীয় গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে লভ্য। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের ইতিহাস আলোচনাও কেমন ছাড়াছাড়া, অসংহত। প্রত্যেকের প্রতি সুবিচারও করা হয়নি। পূর্ববঙ্গের সাহিত্য সংক্রান্ত রচনাটি তুলনামূলকভাবে গভীর ও বিস্তৃত। এ-সমস্ত সত্ত্বেও গ্রন্থটির সমাদর হবে আশা করা অন্যায় নয়। ১৮।৪।৬৭

বাংলা ইংরেজী অভিধান

Pick up words. Compiler: Rakhaldas Chakravorty. Lipika: 30/1, College Row; Calcutta 9. Rs. 6.00.

আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষ করে ছাত্রদের জন্যে সংকলিত একটি অভিধান—বাংলা থেকে ইংরেজী অভিধান। কতকগুলি বাংলা শব্দ নির্বাচন করে তাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ পাশাপাশি দেওয়া আছে এতে।

অভিধান হিসেবে এ গ্রন্থটি বর্তমান সমালোচককে খুশী করতে পারেনি। কারণঃ—

(১) সমালোচকের ধারণা, এ অভিধানটিতে সংকলিত শব্দসংখ্যা যথেষ্ট নয়; ছাত্রদের অনুবাদকালীন অনেক প্রয়োজনই এর দ্বারা মিটবে না। অথচ, সংকলক অভিধানটির আকৃতি বৃদ্ধি না করেও আরও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় শব্দ এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন—যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর টাইপে সলিড করে একলেড করে ছাপতেন।

(২) প্রতিটি শব্দের একাধিক ইংরেজী প্রতিশব্দ এ গ্রন্থে খুব কম ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও দুটি প্রতিশব্দ যে একেবারে নেই, তা নয়; তবে ততোধিক একেবারেই দুর্লভ বলা চলে। ছাত্রদের উপযোগী অভিধানে যত বেশী সম্ভব প্রতিশব্দ থাকাই উচিত বলে বর্তমান সমালোচক মনে করেন।

(৩) প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দের সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শব্দেরও প্রতিশব্দ থাকা অভিধানে উচিত। যেমন—কোনও একটা বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে সেই শব্দ-জাত বিশেষণের ও ক্রিয়ার, এবং

বিশেষণ শব্দের ক্ষেত্রে বিশেষ্যের। আলোচ্য গ্রন্থে স্থানে স্থানে এ নীতি অনুসরণ করা হলেও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা করা হয়নি।

(৪) ক্রিয়ার প্রতিশব্দের পাশে সেগুলি সকর্মক না অকর্মক ক্রিয়া, তার উল্লেখ অবশ্যই করা উচিত ছিল। তা ছাড়া, ক্রিয়াগুলির অনুসারী "অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন"-এর উল্লেখ থাকলে এটি ছাত্রদের পক্ষে খুবই উপকারী হত।

(৫) সবশেষে দাম। অভিধানের দাম সাহিত্য-পুস্তক তো বটেই, এমন কি পাঠ্যপুস্তকের তুলনায়ও কিঞ্চিৎ সুলভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাত্র কিঞ্চিদধিক আঠাশ ফর্মার অভিধানের দাম ছ টাকা বেশ বেশী বলেই মনে হয়। (৩৪৯।৬৭)

কালীভক্ত শিল্পী

নীরদ মজুমদার অঙ্কিত রামপ্রসাদী ছবি— সুবর্ণরেখা ঃ ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা। মূল্য ২২·৫০।

গ্রন্থটিতে আছে দশটি রামপ্রসাদী গান, সেগুলির ফরাসী অনুবাদ এবং নীরদ মজুমদারের চিত্রালঙ্করণ। নীরদ মজুমদার যশস্বী শিল্পী। বহুকাল ফরাসীদেশে অবস্থান করার পর দেশে প্রত্যাগমন করেছেন বছর দশেক আগে। স্ত্রী ফরাসী। কিন্তু শিল্পী মনেপ্রাণে হিন্দু এবং কালী ভক্ত। রামপ্রসাদী গান তাকে অভিভূত করে। গানগুলি শুনে বা পড়ে শিল্পীর ব্যক্তি-মানসে যে প্রতিফলন হয়েছে ছবিগুলি তারই প্রকাশ। ছবিগুলি এক রঙা হলেও অত্যন্ত আকর্ষণীয়, বিশেষ করে হাফটোনে ছাপা নিদর্শনগুলি। ছবিগুলি হিন্দু চিত্রবিদ্যার নিয়মানুসারে প্রতীকধর্মী এবং রচিত। হাফটোনে ছাপা রচনাগুলির মধ্যে পেইন্টিং-এর মেজাজ অনুভব করা যায়। আকর্ষণীয় বাঁধাই। চমৎকার ছাপা।

শারদ সাহিত্য

পাঞ্চজন্য। সম্পাদক ঃ শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঁথি মৈত্রি সংঘ ঃ ৩।৪ সেন্টার সিঁথি রোড, কলিকাতা-৫০। মূল্য ১·০০।

সিঁথি মৈত্রি সংঘের এই মুখপত্রখানি সাহিত্যরসিকদের কাছ থেকে সুখ্যাতি লাভ করবে। ছোট ছোট লেখা হলেও বেশ একটা মান বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। পত্রিকাখানিতে দুটি বিভাগ আছে। বড়দের বিভাগে বিমল করের 'শীর্ণ আত্মীয়তা' প্রবন্ধটি চিন্তাশীল পাঠকদের ভাল লাগবে একটা সোজা কথা স্পষ্টভাবে বলার গুণে। এছাড়া লিখেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কুমারেশ ঘোষ, শক্তিপদ রাজগুরু, হিমানীশ গোস্বামী, সুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রকুমার সরকার প্রভৃতি। ছোটদের বিভাগে লিখেছেন নচিকেতা ভরদ্বাজ, শান্তশীল দাশ, প্রভাকর মাঝি, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্খ সেন প্রভৃতি।

ছন্দিতা। সম্পাদক ঃ গৌরগোপাল দাশ। বি-৫৯ রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮। মূল্য এক টাকা।

এই শারদীয়া সংখ্যাখানিতে আছে ঃ প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, রম্য রচনা ও কবিতা প্রভৃতি। লেখকগণের মধ্যে আছেন— শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী, বেলা দে, আভা পাকরাশী, উষা ভট্টাচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, শংকর চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী প্রভৃতি। রচনাগুলি ভালই হয়েছে। প্রচ্ছদপট মনোরম।

পথের সংগ্রহ। সম্পাদক ঃ রমাপ্রসাদ পাত্র কর্মকার। ৩১১ রামপুর বাঁকুড়া। দাম ৫০ পয়সা।

আলোচ্য পূজো সংখ্যাখানি মফস্বল শহরের একখানি ছাত্র পত্রিকা। এই ছোট্ট পত্রিকাখানিতে আছে বহু সংখ্যক কবিতা, দুটি গল্প এবং একটি ভ্রমণ কাহিনী। লেখকগণের মধ্যে আছেন, সুভাষ চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ কর্মকার, চিত্ত দাশ, অশোক ভট্টাচার্য, শ্যামলী সিংহ, সুনীলকুমার পাল প্রভৃতি। নবাগত সাহিত্যিকদের এই উদ্যম ও প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

পূর্বকোণ। সম্পাদক ঃ শ্রীবাদল বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮১/১ সি, আচার্য জগদীশ রোড, কলকাতা-১৪। মূল্য ১·২৫।

এই শারদীয়া সংখ্যাখানিতে আছে ঃ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, রহস্য গল্প এবং গান। লিখেছেন—দ্বিজেন চক্রবর্তী, শিবরাম চক্রবর্তী সুষমা দেবী, সত্যজিৎ রায়, দেবীপ্রসাদ মৈত্র, বিমল মিত্র, মৈত্রী দেবী, চম্পক দাশ, শ্রীদশানন, বাদল বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনা এবং প্রচ্ছদ ফটো নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাবার উপযোগী।

উত্তরবাহিনী। সম্পাদক ঃ শ্রীবিদ্যুতানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ২৯।১ দেবনাথপুরা, বারাণসী-১। মূল্য ১·০০।

উত্তর বাঙলার প্রবাসী বাঙালীদের মুখ-পত্র উত্তরবাহিনী রচনা সম্পদের দিক থেকে প্রশংসনীয় প্রকাশন। রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র ছাড়া এ সংখ্যার বিশিষ্ট প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, নির্মলচন্দ্র সান্যাল, সনাতন সেন, পরমেশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস মুখোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্প লেখকদের মধ্যে আছেন কৃষ্ণপদ গোস্বামী, শ্রীমতী গঞ্জন সরকার, সুধাংশুকুমার ঘোষ, ননী-গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় পত্রিকা পরিচালকদের মধ্যে।

আরোহী। সম্পাদক ঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষচন্দ্র কর। ৫/২৫ সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলিকাতা-২৫। মূল্য ১·০০।

ক্ষুদ্র হলেও সুপাঠ্য এই ত্রৈমাসিকখানির লেখকদের মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, কুমারেশ ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, তারাপদ রায়, রণজিৎকুমার সেন, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, মলয় দাশগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, বিমল চক্রবর্তী প্রভৃতি। কবিতা গল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া এ সংখ্যায় চলচ্চিত্র বিভাগে লিখেছেন মণি বর্মা, রবি ঘোষ ও পীযূষকান্তি চক্রবর্তী।

মধুপর্ণী। সম্পাদক ঃ সুধীর করণ। পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ ঃ বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্রখানির রচনাবলী সাহিত্যগুণে গুণান্বিত। খ্যাতিমান লেখক না হলেও রচনাগুলি বেশ সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় দেয়। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা এবং ভ্রমণ কাহিনীর সমাবেশে সংখ্যাখানি সুখপাঠ্য।

সুপ্রভাত। সম্পাদক ঃ নকুল চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী, কল্যাণ চক্রবর্তী। ১৯২এ ঘটক লেন, কলিকাতা-২৭। মূল্য ০·৪০।

চৌদ্দটি কবিতা, একটি ছোট গল্প এবং ষাটের দশক ও ওয়েসেলিয়ান কবিতা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য ত্রৈমাসিকের এই সংকলনটি। কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, তারাপদ রায়, সুনীল বসু, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মৃণাল দত্ত, কল্যাণ চক্রবর্তী প্রভৃতি। গল্প ও প্রবন্ধের লেখক যথাক্রমে সুভাষ সিংহ ও আশিস সান্যাল।

অনুষ্টুপ। সম্পাদক ঃ অনিল আচার্য। ১৬৭ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৭। মূল্য ২ টাকা।

এই শারদীয়া সংখ্যাখানিতে আছে কয়েকটি সুচিন্তিত এবং তথ্যমূলক প্রবন্ধ, কয়েকটি গল্প, কবিতা, অনুবাদ সাহিত্য এবং একখানি উপন্যাস। লেখকগণের মধ্যে আছেন—সরোজ আচার্য, চিরঞ্জীব, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, রাম বসু, রাজলক্ষ্মী দেবী শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অগ্নিমিত্র প্রভৃতি। রচনাগুলি বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে।

বেদুইন। সম্পাদক ঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা। "তাসের ঘর", পোঃ তমলুক, জেলা মেদিনীপুর। মূল্য ১·০০ টাকা।

আলোচ্য সংখ্যাখানির বিশেষ আকর্ষণ ঃ কালিদাস রায়, গোপাল ভৌমিক, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিদের কবিতা; ডাঃ

আশ্‌্‌তোষ ভট্টাচার্য, ডঃ ভবেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীবনবিহারী দাশ প্রমুখের প্রবন্ধ; কুমারেশ ঘোষ, ডাঃ বিভূতিভূষণ রক্ষিত এবং অন্যান্যের গল্প। এ ছাড়া অন্যান্য রচনাগুলিও সুখপাঠ্য। নবাগত লেখকদের লেখাও প্রশংসার দাবি রাখে।

অনুভব। সম্পাদক : গৌরাঙ্গ ভৌমিক। ১৯ পন্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা-২৯। দাম ২·৫০ পঃ। ...

আধুনিক বাংলা কবিতার ত্রৈমাসিকের এই সংকলনখানি পূজোর প্রাক্কালে প্রকাশিত হয়েছে বলে একে শারদ সংখ্যা হিসাবেই অভিহিত করা হলো। মূল কবিতা এবং কবিতার অনুবাদ এই সংখ্যাখানির বৈশিষ্ট্য। অনুবাদ এবং রচনাকারীদের মধ্যে আছেন—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সামসুল হক, স্বপনকুমার গুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অরুণাভ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর প্রভৃতি। রচনাগুলি বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে।

শারদীয়া চলন্তিকা—সম্পাদক : শান্তি সরকার। চলন্তিকা কার্যালয়, পোঃ এবং জেঃ মুর্শিদাবাদ। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বহু গল্প এবং কবিতা ছাড়া গোটাদুই প্রবন্ধ এবং রম্যরচনার সংকলনে সমৃদ্ধ এই সংখ্যায় যারা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন:—নরেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেজাউল করিম, মণীশ ঘটক, আনন্দ বাগচী, শিবরাম চক্রবর্তী এবং শান্তনু দাস প্রভৃতি।

বালার্ক—সম্পাদক : বৈশ্বানর গোষ্ঠী। বহরমপুর। মূল্য এক টাকা।

এই শারদীয়া সংখ্যাখানিতে অসংখ্য কবিতা, কয়েকটি গল্প এবং প্রবন্ধ স্থানলাভ করেছে। রচনাগুলি মোটের উপর পাঠোপযোগী হয়েছে। লেখকগণের মধ্যে আছেন:—ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, ফজলুল হক, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অরুণাভ দাশগুপ্ত, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং দীপককুমার দত্ত প্রভৃতি। প্রচ্ছদপট মন্দ নয়।

পঁচিশ পল্লী—সাধারণ সম্পাদক : শ্রীসমীর দত্ত। বত্রিশ এ হরিসভা স্ট্রীট কলকাতা তেইশ (খিদিরপুর)।

যাবতীয় শারদীয় সংস্করণের গতানুগতিক পন্থা পরিহার করে আলোচ্য এই শারদস্মরণীতে এক অভিনব রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এর রচনাবলীর মধ্যে "উদ্ধৃত, বরণীয় নাম স্মরণীয় ঘটনা, প্রবাদ প্রবচন, এশিয়ার মর্মবাণী, নামের আড়ালে (বাংলাদেশের ভূতপূর্ব এবং বর্তমান খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের ছদ্মনামের তালিকা), চয়ন প্রভৃতি রচনা বিশেষভাবে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি থাকলেও পঠিতব্য বিষয়বস্তু তথ্য এবং তত্ত্বসম্ভারে পরিপূর্ণ। কাগজ ছাপা এবং প্রচ্ছদপট অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

অরুণোদা—সম্পাদনায় : শ্রীঅমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়। সারঙ্গাবাদ, বজবজ। মূল্য ৪০ পয়সা।

মফস্বলের এই শারদ সংখ্যাখানি প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। স্বামী প্রেমানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, ধীরেন্দ্রনাথ ধর, দীনেশ সিংহ, সুধীর ভট্টাচার্য প্রভৃতি লেখগণ এতে লিখেছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

ওরাও জানে বাসতে ভাল। শিশির চৌধুরী। চিত্রাংশু : ৩৯ রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য ২·০০।

রাজ্যজুড়ে রূপকথা। সুজিতকুমার নাগ। পম্পা পাবলিসিটি : ৯১৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ১·৫০।

বাংলা নাটক ও নাট্যকার। সম্পাদনা : সূত্রধার। অপেরা : ২৭।৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·৫০।

মনের আলোয় দেখা। সুনীলকুমার নাগ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং প্রাঃ লিমিটেড : ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৫·০০।

রেসের নায়িকা। মদন চক্রবর্তী। শান্তি লাইব্রেরী : ৮।২এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০।

নিখোঁজ মুসাফির। শ্রীভব রায়। শ্রীমতী ভক্তিরানী রায় : আনন্দ কুটির, মসিয়াড়া, বাঁকুড়া। মূল্য ৩·৫০।

এলেবেলে। সুদর্শন চক্রবর্তী। শ্রীমতী মহামায়া চক্রবর্তী : ৮৭ দেবীনিবাস রোড, কলিকাতা-৮। মূল্য ২·৭৫।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী। ব্রহ্মচারী অরূপ চৈতন্য। অশোক প্রকাশন : এ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৭·৫০।

গল্প বলি গল্প শোনো। শিবরাম চক্রবর্তী। অশোক প্রকাশন : এ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·৫০।

ভারতের ভাষা। গোপাল হালদার। লেখক সমবায় সমিতি : ৭৩বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ৪·০০।

বন-বাসর। বুদ্ধদেব গুহ। গ্রন্থ প্রকাশ : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

স্বর্গের পুতুল। স্বদেশরঞ্জন দত্ত। বাংলা কবিতা প্রকাশনী : ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য ১·০০।

মণিমালা। বিভূতি বিদ্যাবিনোদ। কবি কুটির : সংগৎ বজার, মেদিনীপুর। মূল্য ১·৫০।

আমার কবিতা। শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য। নিউ স্টুডেন্ট স্টোর্স : ৫৫।২ শিবচন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পোঃ বেলুড় মঠ, বেলুড়, হাওড়া। মূল্য ২·০০।

প্রথম দশজন (স্কুল ফাইনাল ১৯৬৭)। স্কলার্স সিন্ডিকেট : ১৭০এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪। মূল্য ১·০০।

বিহঙ্গের গান। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

চাঁদের দেশে সুনীলকুমার। অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ। অশোক প্রকাশন : এ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

আকাশ প্রদীপ। সুখরঞ্জন রায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স : ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প। সম্পাদনা : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড : কলিকাতা-১২। মূল্য ৮·০০।

রূপসী অন্ধকার। অজাতশত্রু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড : কলিকাতা-১২। মূল্য ৭·০০।

গান্ধী মানস। রত্নমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, নির্মলকুমার বসু। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় : ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩·০০।

রহস্যময় মোহেন-জো-দড়ো। বিমলেন্দু চক্রবর্তী। ঋত্বায়ন : ২২।২এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। মূল্য ২·০০।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারী প্রগতি। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কে সি ব্যানার্জী অ্যান্ড কোং : ১৯২।ডি বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৪·০০।

ভোর হোল। মদন চৌধুরী। চৌধুরী প্রকাশনী : ৫সি অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫। মূল্য ৩·৫০।

আর্য সংগীত। কথা ও সুর : ডাঃ পবিত্রকুমার মিত্র। ১৭ ব্লক ডি বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৫৫। মূল্য ৩·০০।

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জাক নিকো, লুই মাল ও মারি জোসে-নাত —ফটো দেশ

আধুনিক ফরাসী চিত্রের উৎসব

ফেডারেশন অব দি ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে এবং ফরাসী দূতাবাসের সহযোগিতায় গত সপ্তাহে কলকাতায় আধুনিক ফরাসী চিত্রের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতিপূর্বে দিল্লিতে ছবিগুলি দেখানো হয়। কলকাতার পর মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ছবিগুলি দেখানো হচ্ছে। উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি হল: "লে ফ্য ফলে" (এ টাইম টু লিভ অ্যান্ড এ টাইম টু ডাই) —লুই মাল; "ও হাজার বালথাজার" (বালথাজার)—রবার ব্রেসোঁ; "লে সুপিরাঁ" (দি স্যুটর)—পিয়ের এতে; "পিয়েরো লে ফু" (পিয়েরো দি ফুলিশ)—জাঁলুক-গদার; "লা পো দুস" (সিল্কেন স্কিন)—ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো; "লা ভি দে শাতো" (লাইফ অ্যাট এ কাস্‌ল)—জে পি রাপেনো; "অ্যানম এতুন ফেম" (এ ম্যান অ্যান্ড এ উওম্যান)—ক্লোদ লেলুশ; লা গ্যার এ ফিনি (দি ওয়ার ইজ ওভার)—আলাঁ রেনে।
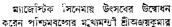
ম্যাজেস্টিক সিনেমায় উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র উৎসব দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন কেমন দৃঢ় করে তুলতে পারে মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা বলেন। শ্রীসত্যজিৎ রায় অসুস্থতাবশত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীঅরুণ প্রামাণিক। শ্রীপ্রামাণিক সুষ্ঠুভাবে উদ্বোধন-অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এবং তিনি সময়োচিত ভাষণে আধুনিক ফরাসী চলচ্চিত্র ও পরিচালক লুই মালের ছবির কথা বলেন। তিনি বিশেষ করে লুই মালের "জাজি" ছবিটির কথা উল্লেখ করেন এবং মন্তব্য করেন, এমন একটি ছবি হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ফরাসী অভিনেত্রী জোসে-নাত

উৎসব উপলক্ষে ফ্রান্স থেকে লুই মাল, জাক নিকো এবং অভিনেত্রী মারী জোসে-নাত ভারতে এসেছেন। তাঁরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লুই মাল সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, যা-কিছু আমার বলবার তা ছবিতেই বলি। সভায় বলার অভ্যাস আমার নেই। লুই মাল আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-অনুশীলনের প্রশংসা করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায়কে এ-যুগের একজন "গ্রেট ফিল্ম-মেকার" বলে উল্লেখ করেন।

জাক নিকো এবং অভিনেত্রী জোসে-নাত সংবর্ধনার উত্তরে দু'য়েক কথায় সকলকে ধন্যবাদ জানান। ফরাসী দূতাবাসের ডঃ

দীপক গুপ্ত পরিচালিত "মহাবিপ্লবী অরবিন্দ" ছবিতে দিলীপ রায় ও নির্মল ঘোষ

ফ্র্যান্সিস দোর বলেন, আধুনিক ফরাসী চলচ্চিত্র দেখবার উপযুক্ত স্থান যদি ভারতে কোথাও থাকে তবে সে কলকাতা। তিনি এই শহরের সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বিশেষ করে বাংলা চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রথম দিন লুই মালের "লে ফ্য ফলে" দেখানো হয়।

শনিবার সকালে ফরাসী-প্রতিনিধিদল একটি প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। এই বৈঠকে আধুনিক ফরাসী চলচ্চিত্রের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বহু প্রশ্নের উত্তর দেন লুই মাল। তাঁর চলচ্চিত্রকর্ম ও চিন্তার কথাও সাংবাদিকরা জানবার সুযোগ পান।

লুই মাল ছিলেন রাজনীতির ছাত্র। কিন্তু আকস্মিকভাবে "দি সায়লেন্ট ওয়ার্ল্ড" নামে একটি তথ্যচিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। ছবিটি ১৯৫৬ সনে কান উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করে। মালের প্রথম কাহিনীচিত্র একটি রহস্যমূলক ছবি। "দি লাভারস্" তাঁর দ্বিতীয় ছবি। "এ ভেরি প্রাইভেট অ্যাফেয়ার"-এ তিনি ব্রিজিত বার্দোকে নতুন ইমেজ-এ উপস্থিত করেন।

ফরাসী চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে লুই মাল সাংবাদিকদের বলেন বক্স-অফিসের সমস্যা আমাদের দেশেও আছে। পরীক্ষার ক্ষেত্রে অল্প বাজেটের ছবি ছাড়া উপায় নেই। অল্প বাজেটের ছবি তৈরি করতেও প্রায় বারো লক্ষ টাকার মত লাগে।

তাঁর নিজের ছবি "লে ফ্য ফলে" (এ টাইম টু লিভ এ টাইম টু ডাই) সম্পর্কে শ্রীমালে বলেন, "ওই সময়ে আমার নিজের মন নৈরাশ্যে ভারাক্রান্ত ছিল। ওই ছবি করবার সময়েও আমার মানসিক ক্লেশ কম হয়নি; ক্রমশ যেন নায়কের যন্ত্রণার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিলাম।"

অভিনেত্রী মারি জোসে-নাত বলেন, রোমান্টিক ছবিতে অভিনয় করতে আমার খুব ভাল লাগে। "নুভেল-ভাগ"—দলের ছবিতে আমি অভিনয় করিনি। "জোসে-নাত নয় বৎসরে এ পর্যন্ত তেরোখানা ছবিতে অভিনয় করেছেন। "নুভেল ভাগ"-গোষ্ঠীর কোন পরিচালকের বড় ছবিতে তাঁর রোমান্টিক ভূমিকায় অভিনয় করার খুব ইচ্ছা।

জাক নিকো বলেন, ভারতবর্ষে আর্ট থিয়েটার তৈরি হওয়া দরকার। তা হলে এ দেশের দর্শকরা আধুনিক উৎকৃষ্ট বিদেশী ছবি দেখবার সুযোগ পাবেন।

(ফরাসী চিত্র সম্পর্কে আলোচনা আগামী সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে)

এডুকেশানাল ফিল্ম ক্লাবের ছবি

"রুনকির সুবচনী" একটি ছোট ছবি, ছোট্ট একটি মেয়েকে নিয়ে তোলা। আর দশটি মেয়ের মতই রুনকি। অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে সে সব কিছু দেখে। দু' চোখ ভরে কাছে ও দূরের সব কিছুই সে দেখতে চায়। দূরবীণ নিয়ে সে ঢোকে চিড়িয়াখানায়। দূরের অনেক বস্তু দেখা হয়ে যাওয়ার পরেও রুনকির আরও বুঝি কিছু দেখবার বাকি। সে-সব রুনকি দেখে কল্পনার চোখে। আফ্রিকার জঙ্গল, পুরো-কালের যুদ্ধ ইত্যাদি।

শিশুমনের সুন্দর বিশ্লেষণে ছবিটি চিহ্নিত। শৌভিকের পরিচালনায় এবং দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে তৈরি এডুকেশানাল ফিল্ম ক্লাবের প্রথম প্রচেষ্টা "রুনকির সুবচনী"। এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি হিসাবে "রুনকির সুবচনী"-কে উপেক্ষা করা যায় না। তরুণ চিত্রনির্মাতার দুঃসাহসের পরিচয় এতে আছে। কোনো কোন দৃশ্যে

"রুনকির সুবচনী" : মণিকা দত্ত

পূর্বসূরীর বা খ্যাতিমান পরিচালকের চলচ্চিত্ররীতির স্পষ্ট প্রভাব দেখা গেলেও স্বকীয়তার লক্ষণও ছবিটিতে অল্প নয়। অবনীন্দ্রনাথের "বুড়ো আংলা"-র প্রসঙ্গ এই ছবির ক্ষেত্রে অবান্তর। দূরবীণ দিয়ে রুনকির বিশ্ব পর্যবেক্ষণের আইডিয়া "বুড়ো আংলা" থেকে নেওয়া হয়েছে হয়ত। মিল ওইটুকুই। তারপর দেখি পরিচালকের নিজস্ব বক্তব্য—ভিস্যুয়াল ইমেজ-এ, ক্যামেরার ভাষায়। বন্ধন-অসহিষ্ণুতার কথা তিনি

বিজয় বসু পরিচালিত "বাঘিনী" : রবি ঘোষ ও সন্ধ্যা রায়। ফটো—দেশ

বলেছেন। চিড়িয়াখানায় শিকলে বাঁধা হাতি এবং বনে বিচরণরত হাতির দল তিনি পর পর দেখিয়েছেন। কিন্তু রুনকির মানসিক প্রতিক্রিয়া বা চিন্তায় মুক্তির ভাবনা কতখানি স্থান পেতে পারে সে-বিষয়ে পরিচালক অসচেতন। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়েও রুনকির মনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে না। এ-সব কথাই হয়ত পরিচালকের। কিন্তু রুনকি উপলক্ষ কেন? শিশু-নায়িকা হওয়া সত্ত্বেও ছবিটি যে শিশুদের জন্য নয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু শিশুমনস্তত্ত্বের উপর যে ছবিটি তোলা তাতে সন্দেহ নেই। বক্তব্যের অস্পষ্টতা ও বক্তব্যময়তা একটি শিশুমনের পরিচয় অনেকাংশে আবৃত করে রাখলেও পরিচালক এ-ছবিতে "ফিল্ম মিডিয়মে"র উপর তাঁর দখল দেখাতে পেরেছেন। বক্তব্য উপস্থাপনে ফিল্মের ভাষা নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তাঁর আছে।

ছবির প্রতিটি শট সুন্দর। চমৎকার ফটোগ্রাফি ও শট কম্পোজিশনের জন্য প্রশংসা পাবেন শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এডিটিং-ও-উঁচুদরের। সব মিলিয়ে, তরুণ কলাকুশলীদের এই উদ্যম সার্থক। সংগীতের ব্যবহার (ভি বালসারা ও রবীন সরকার) মনোরম। রুনকির বেশে মণিকা দত্তকে ভাল লাগে।

শরৎচন্দ্রের "পরিণীতা"
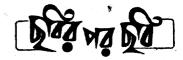
একটি নতুন চিত্রপ্রযোজনা সংস্থার নাম "চিত্রলিপি ফিল্মস"। চিত্রলিপি ফিল্মস-এ আছেন সুখ্যাত চিত্রপরিচালক অজয় কর এবং "ছিন্নমুল" ছবির প্রযোজক বিমল দে। একটির পর একটি ছবি তৈরির পরিকল্পনা তাঁদের আছে। এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের চিত্রস্বত্ব তাঁরা ক্রয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের "মাল্যদান"-এর বাংলা চিত্রস্বত্ব এবং "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর হিন্দী চিত্রস্বত্ব তাঁদের হাতে। চিত্রলিপির প্রথম ছবি অবশ্য শরৎচন্দ্রের "পরিণীতা"। এই বহুপঠিত কাহিনীর ভিত্তিতে বেশ কয়েক বছর আগে একটি বাংলা ছবি তৈরি হয়েছিল। চিত্রলিপির "পরিণীতা" পরিচালনা করবেন অজয় কর।

অগ্নিযুগের কাহিনী

স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই ত্যাগী পুরুষদের জীবনের ঘটনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে নিউ এরা পিকচার্সের "অগ্নিযুগের কাহিনী। বিপন্নপালক বসু চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ভূপেন রায় ছবিটি পরিচালনা করবেন। বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের রূপ দেবেন বিকাশ রায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলি, দিলীপ রায়, সুলতা চৌধুরী প্রভৃতি। এ-সপ্তাহেই ছবির শুভ-মহরৎ।

এম বি প্রোডাকসন্স-এর "প্রতিদান" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী) ছবিতে সুখেন ও সুচেতা

'গড় নাসিমপুর' (পরিচালনা : অজিত লাহিড়ী) ছবিতে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ। ফটো—দেশ

"আপনজন"-এর লোকেশান সুটিং—স্বরূপ দত্ত (শায়িত) ও পার্থ মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন তপন সিংহ, পাশে ক্যামেরাম্যান বিমল মুখোপাধ্যায়। —ফটো দেশ

"শজারুর কাঁটা"

মঞ্জু দে'র প্রযোজনা ও পরিচালনায় "শজারুর কাঁটা"-র সুটিং প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রেম ও ক্রাইমের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটির চিত্রনাট্য শ্রীমতী দে নিজেই রচনা করেছেন। সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ও বাসবী নন্দীকে ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে।

রঙমহলে "ছায়ানায়িকা" : (বাঁদিক থেকে) মিণ্টু চক্রবর্তী, সরযূ দেবী, দ্বিজু ভাওয়াল, হরিধন মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, জহর রায়, ইন্দিরা দে, মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও অজিত চট্টোপাধ্যায়। —ফটো দেশ

রঙমহলে "ছায়ানায়িকা"

অশরীরী ছায়ানায়িকার ভয়াল ও রহস্য-ঘন আবির্ভাব ঘটে অনেক পরে, একেবারে শেষে। তার আগে থেকেই কিন্তু রঙমহলে "ছায়ানায়িকা"-র দর্শকেরা বুদ্ধিগ্রস্ত উত্তেজনা ও সুখ-অস্থিরতায় উদ্দীপ্ত। কে প্রকৃত অপরাধী—এই রহস্যভেদে তাঁরা ব্যস্ত। অর্থাৎ কখন অলক্ষ্যে তাঁরা গোয়েন্দার

প্রেক্ষাপটের 'মেঘ' নাটকে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সীমন্তিনী রায়—সম্প্রতি বিশ্বরূপায় এই নাট্যাভিনয় প্রশংসিত হয়
ফটো—দেশ

কাজে লেগে যান নিজেরাই হয়ত তা বুঝতে পারেন না। কাজটি তাঁদের পক্ষে কঠিন বলা বাহুল্য। কারণ নাটকে অনেক চরিত্র। প্রায় প্রত্যেকেরই গতিবিধি ও আচরণ সন্দেহের উদ্রেক করে। কখনো মনে হয় বাড়ির পুরাতন ভৃত্য পঞ্চাননই বুঝি অপরাধী। নাকি বিল্টুমামা? যিনি কলকাতা রওনা হয়ে গিয়ে সেই রাত্রেই আবার গোপনে বাড়ি ফিরে আসেন? পঞ্চানন ছাড়া তাঁর গোপন অবস্থান আর কেউ জানে না। এবং ওই রাত্রেই ডাক্তার অবনীশের স্ত্রী মল্লিকা বাড়ির সংলগ্ন নন্দীপুকুরে ডুবে মারা যায়। মল্লিকার মৃত্যু হত্যাকাণ্ড বলে আদালতে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু এই মৃত্যু নেহাত দুর্ঘটনা বলেও কেউ সহজে উড়িয়ে দিতে পারছে না। প্রায়-অপ্রকৃতিস্থা চরণদি অভিশপ্ত বাড়ির চারিদিকে এবং নন্দী-পুকুরের পাড়ে দিনে-রাত্রে প্রবল প্রতিহিংসার যন্ত্রণা নিয়ে ঘুরে বেড়ান। চরণদি হঠাৎ ফটিককে (ডাক্তার অবনীশের অনুজপ্রতিম প্রতিবেশী) প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে বলে ওঠেন যে, তিনি দেখেছেন কে খুন করেছে মল্লিকাকে। ফটিকের মুখ এমন ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে কেন? ডাক্তার অবনীশ মল্লিকার মৃত্যুর সেই রাত্রে হঠাৎ কল পেয়ে বাইরে গিয়েছিল। এক বন্ধু এসে খবর দিলেন, অবনীশ সেই রাত্রেই দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত। নিদারুণ আহত অবস্থায় তার বাড়িতে আশ্রিত। অবনীশের উপর আক্রোশ কার? মল্লিকার মৃত্যুর সঙ্গে এই ঘটনার কোন যোগাযোগ আছে কি?

নানা প্রশ্নে দর্শকের মন তখন জর্জরিত। এক রহস্যময় জগতের প্রান্তে উপনীত। সাসপেন্স-এর উপাদান দ্বিতীয়ার্ধে ঘনীভূত। অবনীশের অবর্তমানে ওই বাড়িতে দেখা যায় নতুন ভাড়াটে। অন্ধ, চলৎশক্তি-হীন সদা ইনভ্যালিড চেয়ারে উপবিষ্ট অমিতাভ সেন এবং তার বোন সুতপা। অবনীশ বাড়িতে ফিরে আসার পরে রহস্য যেন আরও বেশী জট পাকাতে শুরু করে। নতুন ভাড়াটে সম্বন্ধে অবনীশের মনে সংশয় জাগিয়ে দিয়ে যান তার বন্ধু উকিল। এবং দুটি পাখি সম্বন্ধে, সুতপা যাদের নাম দিয়েছে "ভালবাসার পাখি" (লাভ বার্ডস)। ওই দুটি পাখির ঠোঁটে বিষ। পাখি দুটিকে ছুঁতে গেলেই প্রাণনাশের আশঙ্কা। অমিতাভ কেন পাখি দুটো বাড়িতে এনে

নির্মল চৌধুরীর পরিচালনায় "চারণকবি মুকুন্দদাস"-এর শুটিং প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—ছবির নামভূমিকায় সবিতাব্রত দত্ত।
ফটো—দেশ

রেখেছে? অবনীশের মনে সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে সুতপার প্রতিও তার অনুরাগ গাঢ় হয়।

এমনি ধরনের নানা জটিলতার ভিতর দিয়ে নাটকটি ক্লাইম্যাক্স-এ উপনীত। নাট্যকার পার্থপ্রতিম চৌধুরী সাসপেন্স গঠনে যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি রহস্য-উদ্ঘাটনের পর্বেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

এ-আর-সি প্রোডাকশন-এর "অদ্বিতীয়া" (পরিচালনা : নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে দিলীপ রায় ও লিলি চক্রবর্তী। ফটো—দেশ

দিয়েছেন। আসল অপরাধীর পরিচয় পেয়ে দর্শক হতভম্ব। এবং খলচরিত্রের মুখোশ উন্মোচনের প্রণালীও রোমাঞ্চক। ওই দৃশ্যে আলোকসম্পাতের কাজ (তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত কৃত) রীতিমত বিস্ময়কর। সিনেমার ইলিউশন-এর মতই এক অবাক কাণ্ড। মঞ্চপরিকল্পনাও চমৎকার।

একটি দৃশ্যপটে নাটকটি উপস্থাপিত। ওই অল্পপরিসর পটভূমিতে রহস্যের উপকরণ সাজানো সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য সতর্ক, সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন। ইংরেজিতে যাকে বলা যায় "ওয়েল-প্ল্যান্ড"।

পরিচালকদ্বয় সলিল সেন ও পার্থপ্রতিম চৌধুরী সেদিক থেকে দক্ষতা দেখিয়েছেন। পুকুরটিকে ঘিরে, একটি-দুটি ঘটনার মাধ্যমে, দর্শকের মনকে ক্ষণে ক্ষণে কৌতূহলী ও রোমাঞ্চিত করে তোলার অনায়াস ক্ষমতা পরিচালকরা দেখিয়েছেন। বিশেষ কোন সময়ে কোন একজনের দ্রুতপদে আগমন ও প্রস্থান, এবং বিশেষ আচরণ ও কথা বলার ভঙ্গিই যথেষ্ট। এক কথায়, দর্শকের অনুমান নিয়ে তাঁরা লুকোচুরি খেলেছেন। কে খুনী তা নিশ্চিতভাবে জানার সুযোগ দর্শক পাননি। ক্রাইম নাটক হিসাবে সেদিক থেকে "ছায়ানায়িকা" সার্থক। দর্শকরা এই নাটক দেখে উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, কৌতূহল ও রোমাঞ্চের সুখ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাবেন। কৌতুকের উপকরণেও নাটকটি সুখভোগ্য করে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

নাটকের প্রথম কয়েকটি দৃশ্যে অনাগত রহস্যের প্রস্তুতি। তারপরেই নাটকটি জমে ওঠে। প্রথমভাগে কিছু অনাবশ্যক কথা ও ঘটনা হয়ত আছে। ফটিকের (পার্থপ্রতিম চৌধুরী অভিনীত) মুখের অর্থহীন সংলাপ বিরক্তিদায়ক, হাস্যকর। দর্শকের হাসির উদ্রেকের জন্যই হয়ত নানা বিষয় ও বস্তুর সঙ্গে উপমা সম্বলিত কথা (যা আরও সহজ ও সরস হতে পারত) ব্যবহৃত। এই অপটু এক্সপেরিমেণ্ট-এর কী প্রয়োজন ছিল? ফটিকের মুখে যখন-তখন ফিল্মি গানও যে খুব কার্যকর হয়েছে তা নয়। এ-ব্যাপারে নাট্যকার আরও সুবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারতেন। ছোট-খাটো ত্রুটি সত্ত্বেও, আবার বলি, "ছায়ানায়িকা" উপভোগ্য, যা দেখে দর্শকরা আকাঙ্ক্ষিত সুখ পাবেন।

অভিনয়ের গুণেও "ছায়ানায়িকা" বিশিষ্ট। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে দ্বিজু ভাওয়াল, জহর রায়, দীপিকা দাস, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা দে, সরযূ দেবী প্রভৃতি অতি উঁচুদরের অভিনয় করেছেন। সব চাইতে বেশী অবাক করেন জহর রায়। সংযত তাঁর অভিনয়। মুহূর্তের উপস্থিতি ও অভিব্যক্তিতে তিনি চরিত্রটির সাসপেন্স-ধর্মী লক্ষণ অটুট রেখেছেন, চরিত্রটির প্রতি দর্শকের কৌতূহল সমানে নিবদ্ধ রেখেছেন। অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণও বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তাঁর বাচনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর মঞ্চোপযোগী।

পার্শ্বচরিত্রের শিল্পীরাও কম যান না। মুগ্ধ করে মৃণাল মুখোপাধ্যায়ের (পঞ্চানন) চমৎকার চরিত্রচিত্রণ। পার্থপ্রতিম চৌধুরীর ফটিক প্রাণোচ্ছল। অল্পক্ষণের জন্য সামনে এসে যাঁরা অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তাঁরা হলেন হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মিণ্টু চক্রবর্তী (তাঁর কৌতুকসৃষ্টি খুবই উপভোগ্য), লক্ষ্মীজনার্দন মুখোপাধ্যায়, গৌতম রায় প্রভৃতি।

শব্দপ্রক্ষেপণ (প্রভাত হাজরাকৃত) কৃতিত্বপূর্ণ।

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "দুরন্ত চড়াই" ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্ত—ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে সবিতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

ফিজিতে মান্না দে ও সহশিল্পিবৃন্দ

জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার মান্না দে বিশেষ আমন্ত্রণে ফিজি ঘুরে এলেন।

মান্না দে

১৯৬৫ সনে শিল্পী যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ -এ যান তখনই তাঁর ফিজি সফরের কথা ছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে শ্রীদে ফিজি পাড়ি দেন। বিদেশ-ভ্রমণের পর শিল্পী 'দেশ'-এর প্রতিনিধিকে বলেন, ফিজিতে বসবাসকারী ভারতীয়ের সংখ্যা প্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগ। কিন্তু ভারতীয় সংগীতের প্রতি ফিজির অধিবাসীরাও কম অনুরক্ত নন।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন শহরে মান্না দে প্রায় চৌদ্দটি আসরে গান করেন। নানা ধরনের গান তাঁকে গাইতে হয়েছে। ফিজির গভর্নর একটি আসরে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। শিল্পীকে তাঁরা জানান যে ভারতের মার্গসংগীতের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে। রাগপ্রধান ব্যতীত অন্যান্য গানের আস্বাদ নিতেও তাঁরা ইচ্ছুক। শ্রীদে তাঁদের অনুরোধে রাগভিত্তিক লঘুসংগীত, ঠুংরি, গজল ও লোকসংগীত পরিবেশন করেন। পাশ্চমী সংগীতের ভিত্তিতে হিন্দীগানও তিনি শোনান। সবশেষে তিনি "জনগণ মন" গেয়ে শোনান। এর আগে গাইলেন "আমি চিনি গো চিনি তোমারে"।

প্রতি আসরেই অসংখ্য শ্রোতার চিত্তবিনোদন করেছেন শ্রীদে। সর্বত্রই তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত। নন্দী এয়ারপোর্টেও ভারতীয় শিল্পীদের সংবর্ধনা জানানোর জন্য প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল। বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে শ্রীদে বলেন, রাজধানী সুভার অধিবাসীরা 'পপ' সংগীতের ভক্ত। কিন্তু ভারতীয় সংগীত তাঁরা যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। অন্যান্য প্রসঙ্গে শ্রীদে বলেন, ওখানকার ভারতীয়রা নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। স্বদেশের রাজনীতিক এবং অন্যান্য সকল বিষয়ের সংবাদই তাঁরা রাখেন।

শ্রীদে'র সঙ্গে আর যে দুজন শিল্পী ছিলেন তাঁরা হলেন চিরঞ্জীৎ সিং (যন্ত্রসংগীতশিল্পী) ও দিলীপ দত্ত (কৌতুকশিল্পী)। শ্রীসিংয়ের গীটার ও ম্যান্ডোলিন বাজনা এবং অন্যান্য যন্ত্রসংগীত শ্রোতাদের আনন্দ দেয়। প্রখ্যাত গায়কের গান শুনে তাঁরা বুঝি আরও মুগ্ধ। প্রথম অনুষ্ঠানের পর যে শহরেই শ্রীদে গেছেন সেখানেই অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছে। গানের পর গান গেয়ে ফিজি মাতিয়ে দিয়ে শ্রীদে অক্টোবরের শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

"জীবনসংগীত" : সন্ধ্যা রায়। ফটো—দেশ

উত্তর কলকাতার **শরতায়তন** গোষ্ঠীর প্রথম বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীপাহাড়ী সান্যাল। বিজন পালের সৌজন্যে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানের পর গোষ্ঠীর সভ্যরা শ্রীঅপ্রিয় রচিত "কেন ?" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাট্যাভিনয় সকলকে সন্তুষ্ট করে। একটি ছেলের অধঃপতন নিয়ে এই নাটক। কেন এই অধঃপতন? —এই জিজ্ঞাসাই নাটকের বক্তব্য। শেখর দত্ত, সুখেন্দু সুর, অলোক ঘোষ ও কানাইলাল ঘোষ প্রভৃতি সুঅভিনয় করেন। নাট্যকার শ্রীঅপ্রিয় সুষ্ঠুভাবে নাটকটি পরিচালনা করেন। নেপথ্যে কণ্ঠদান ও আবহসুর রচনা করেন অলোক ভট্টাচার্য। তাঁর কাজও প্রশংসনীয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমের বাজারে ভারতীয় ছবির চাহিদা আছে; সেই চাহিদা আরও ভালভাবে গড়ে তুলতে হলে ছবির দৈর্ঘ্য আরও কমানো দরকার। বিশেষ করে নাচ-গানের অংশ। —এই অভিমত পরিচালক স্টীভ সেকীলির।

✱

টেনেসি উইলিয়ামসের চিত্রনাট্য "গো ফোর্থ-এ নায়িকা এলিজাবেথ টেলরকে সম্প্রতি একটি "নগ্ন দৃশ্যে" অভিনয় করতে বলা হয়। ছবির নায়ক যদিও তাঁর স্বামী রিচার্ড বার্টন, তবু শ্রীমতী টেলর এই প্রস্তাবে রাজি হননি। তিনি বলে দিয়েছেন, তাঁর দ্বারা ওই দৃশ্যে অভিনয় সম্ভব নয়। স্থির হয়েছে, ওই দৃশ্যে তাঁর "ডাবল"কে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হবে। ওই দৃশ্যে নগ্ন নায়িকার সংলাপ : "এই ঘরখানি ধনসম্পদে ভরা; তার মধ্যে আমিও আছি।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজনৈতিক সংকট আলোচ্য সপ্তাহের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৩ নবেম্বর রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ রাজ্যপালের কাছে সরাসরি তার পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। ডঃ ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে আরও ১৮ জন এম এল এ যুক্ত ফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন। এর ফলে মনোনীত চারজন সদস্য নিয়ে ফ্রন্টের মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৩। রাজ্য বিধানসভায় মোট সদস্য সংখ্যা ২৮২। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে সভার পরিস্থিতি জানালে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের সংখ্যা লঘিষ্ঠতা মেনে নিয়ে পদত্যাগ করতে পারেন; অথবা বলতে পারেন সভার অধিবেশন ডেকে শক্তি পরীক্ষা করা হোক। জানা যায় এই-সব পরিকল্পনা প্রায় পক্ষকাল আগেই পাকাপাকি হয়েছিল দিল্লি এবং কলকাতায়। এই পরিকল্পনা অনুসারে কংগ্রেসের সহযোগে বা সমর্থনে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে এবং এই নতুন সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য ডঃ ঘোষকেই আহ্বান জানানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে, আর শক্তি পরীক্ষায় নামলে জটিলতা আরও কিছুকাল চলবে। প্রকাশ: মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজে থেকে মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র দাখিল না করেন তাহলে রাজ্যপালই তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবেন। রাশিয়া যাত্রার পূর্বে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নাকি শ্রীধর্মবীরকে প্রয়োজনীয় অনুমতিও দিয়ে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সংবিধানগত এবং আইনগত বিধি-নিষেধ বিবেচনার পর সংকটের অবসান অনতিবিলম্বে ঘটবে বলে মনে হয়।

দেশী সংবাদ

৩০ অকটোবর—কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করার জন্য কেন্দ্র বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকেও অভিযুক্ত করেন।

প্রথম বাঙালী মহিলা পর্বত অভিযাত্রী দল গত শনিবার বিকালে ১৯,৮৯৩ ফুট উঁচু রোনটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছে। গাড়োয়াল হিমালয়ে অবস্থিত রোনটি এতদিন অজেয় ছিল।

৩১ অকটোবর—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যে কর্ম-সমিতিকে ভেঙে দিয়েছিলেন তাকেই আবার পুনর্বহাল করেছেন। শ্রীকামরাজ গত ১২ অকটোবর কর্মসমিতির পরিবর্তে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে আহ্বায়ক করে সাতজনের একটি অ্যাড-হক কমিটি গঠন করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যনীতি সম্পর্কে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া যায়। ১। আগামী মরসুমে কী রেশন, কি খোলাবাজার পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রাজ্য সরকার চালের দাম এক রাখবেন। সম্ভবত সে দর হবে কে জি প্রতি ১ টাকা ৩৭ পয়সা। ২। প্রায় আট লক্ষ লোকের উপর লেভি নোটিস পড়বে। ৩। ধান চাল কেনা-বেচায় ব্যাপারে মোট ১৮০ কোটি টাকা খাটবে। গ্রামে গ্রামে ২২০০ কেন্দ্রে ক্রয় বিক্রয় চলবে।

১ নবেম্বর—খাদ্যনীতিকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে মন্ত্রিসভার একটি খাদ্য সাব-কমিটি গঠনের জন্য যুক্ত ফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অনুরোধ জানিয়েছেন। আজ যুক্ত ফ্রন্টের সভায় এই অনুরোধ জানানো হয়। এই সভায় খাদ্যনীতি সম্পর্কে মন্ত্রিসভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহে সামান্য সংশোধন সহ অনুমোদিত হয়।

ভাটপাড়ার ঘটনা সম্পর্কে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রীরঘু ব্যানারজী তদন্ত করে রাজ্য সরকারের কাছে যে প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে ভাটপাড়ার সাম্প্রতিক ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। রাজ্যের গোয়েন্দা দফতরের উচিত ছিল—এ ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া। কিন্তু তা না করে গোয়েন্দা দফতর ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

২ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কংগ্রেস ও ক্রান্তি দলের রাজনীতি আজ এক নাটকীয় মোড় নিয়েছে। এইদিন বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সর্বভারতীয় ক্রান্তি দলের সংগঠন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী টি কুন্তেকে তারযোগে জানিয়েছেন, "বাংলা কংগ্রেস ক্রান্তি দলে যোগ দিয়েছে।"

৩ নবেম্বর—রাজ্য সরকার মোটামুটি স্থির করেছেন, হাওড়া রেল শেডে জমা করা ডালের মালিক খুঁজে না পাওয়া গেলে সরকার এই ডাল বাজেয়াপ্ত করবেন। এ ব্যাপারে আইনগত খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

ধান কাটার সময় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-বাসন্তী-জয়নগরের অন্তত পাঁচশত বর্গমাইল জুড়ে ব্যাপক হাঙ্গামার আশংকা ক্রমেই বাড়ছে। সর্বত্র একই কথা—দুই পক্ষই প্রস্তুত। কে কতটা তৈরী তার প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যাবে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে, ফসল তোলা শুরু হলে।

৪ নবেম্বর — পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি বিধানের উপায় নির্ধারণ করার জন্য বণিকসভার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সরকার পক্ষের যে বৈঠক হয়, তাতে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং তথ্যমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী নাকি জানান যে, শ্রমিকরা নিজেরাই এখন ঘেরাও-এর অসারতা বুঝতে পেরেছেন।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী সাদিক আলি বলেছেন যে, ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সহকারী প্রধানমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীর ছকে দেওয়া পন্থা অনুসারে বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলিকে দুটি পথের একটিকে বেছে নিতে হবে। হয় সীমিত ক্ষমতাকে ভাল মনে মেনে নিতে হবে নয়ত মেনে নিতে হবে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণকে।

৫ নবেম্বর—আজ কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনডে এক বিশাল জনসমাবেশে বাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর 'ষড়যন্ত্র'কে ব্যর্থ করতে দলীয় কর্মী ও জনসাধারণকে 'চরম আত্মত্যাগ' ও 'কঠিন সংগ্রামের' জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান।

বিদেশী সংবাদ

৩০ অকটোবর—মিশর, জরডন এবং সিরিয়ার অধিকৃত এলাকাগুলি থেকে ইজরায়েল বাহিনীকে অবিলম্বে সরে আসতে হবে, ভারতের এই খসড়া প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে বলে জানা গিয়েছে।

৩১ অকটোবর—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানিয়েছেন যে, পৃথিবী থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে রাশিয়া 'কসমস-১৮৬' মহাকাশযানটিকে পূর্বনির্দিষ্ট একটি জায়গায় ধীরেসুস্থে নামিয়ে এনেছে। রাশিয়া অতিশীঘ্রই যে মহাকাশে একটি অভূতপূর্ব চমক দেখাতে চলেছে, সে বিষয়ে এখন আর পূর্বের বা পশ্চিমের কারো মনেই কোন সন্দেহ নেই।

১ নবেম্বর—সুয়েজ খাল এলাকায় যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্ট আজ নিরাপত্তা পরিষদে এক প্রস্তাব পেশ করেছেন।

২ নবেম্বর—পশ্চিম এশিয়া সংকট সম্পর্কে পনেরো নিরাপত্তা পরিষদের দশটি অস্থায়ী সদস্যের মধ্যে আলোচনার পর তাঁদের মধ্যে তিন জন সদস্য—ভারত, আরজেনটিনা ও ডেনমারককে নিয়ে একটি খসড়া রচনাকারী কমিটি গঠিত হয়েছে।

৩ নবেম্বর—আজ ক্রেমলিনে বলশেভিক বিপ্লবের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান মিঃ লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেন রাশিয়া বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্রের অধিকারী। যতদিন না মারকিন সেনাবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যাবে, ততদিন ক্রেমলিন উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য দিয়ে যাবে।

৪ নবেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেকটর জেনারেল শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন আজ রোমে সংস্থার সাধারণ সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনের উদ্বোধন করে বলেন, বুভুক্ষা এবং অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এক নতুন ও সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে বুভুক্ষু লোকের সংখ্যা যে কোন সময় অপেক্ষা বেশী।

৫ নবেম্বর—মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আজ ইনদোনেশিয়াকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করেছে। আজ মারদেকা প্রাসাদে ইনদোনেশিয়ার অস্থায়ী প্রেসিডেনট জেনারেল সুহারতো ও মারকিন ভাইস-প্রেসিডেনট হুবারট হামফ্রের মধ্যে দু'ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর প্রাসাদের জনৈক মুখপাত্র এই ঘোষণা করেন।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট—	... ...	২২১
দেশ দর্পণ—	... ...	২২২
ব্যঙ্গচিত্র—	... ...	২২৪
বৈদেশিকী—	... ...	২২৫
মেঘে আকাশ ঢাকা (কবিতা)	—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র ...	২২৬
এল এস ডি (কবিতা)	—শ্রীমতী মঞ্জু মিত্র	২২৬
বাতাসিয়া লুপ ঘুরে (কবিতা)	—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ	২২৬
সুনন্দর জার্নাল—	... ...	২২৭
আরশোলা	—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ	২২৯
বিজ্ঞান ও প্রগতির পথ	—শ্রীঅম্লান দত্ত	২৩৭
পঞ্চতন্ত্র	—সৈয়দ মুজতবা আলী	২৪৩
মহাস্থবির জাতক	—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	২৪৫

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীরজতকুমার বড়ুয়া

এখনও দাগ লুকোতে হয়?
ডিয়ারবর্ন মারকোলাইজড ওয়াক্স্ সবরকম দাগ নিশ্চিহ্ন করে
আপনার গাত্রবর্ণ মসৃণ
মোলায়েম ও উজ্জ্বল করতে
আপনি কি সত্যিই আগ্রহী?
তাহলে ডিয়ারবর্ন মারকোলাইজড
ওয়াক্স্ মেখে দেখুন আপনার ত্বকের সৌন্দর্য
কেমন বিকশিত হয়ে ওঠে!
রোজ রাত্রিতে মুখে, ঘাড়ে ও গলার চারপাশে
ভালভাবে সমান করে বুলিয়ে ডিয়ারবর্ন মাখুন।
ডিয়ারবর্ন আরামপ্রদভাবে ফুসকুড়ি এবং ব্রণর দাগ
এবং চিহ্ন একেবারে নির্মূল করে দেয়; ত্বককে মসৃণ করে
এবং ত্বকের তামাটে বর্ণ আর থাকে না।
ডিয়ারবর্ন-এর তেলের গুণে কেবলমাত্র যে আপনার
ত্বক নরম ও মোলায়েম হয়, তা নয়, আপনার ত্বকের তারুণ্য অটুট
থাকে এবং মুখে কোন রকম ভাঁজের দাগ দেখা দেয় না। সকালে গরম
জল দিয়ে মুখ বেশ করে ধুয়ে ফেলবেন, দেখবেন মুখের দীপ্তি কত বেড়ে
গেছে, মুখশ্রী কত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হয়ে উঠছে।
একমাত্র ডিয়ারবর্ন-এর কোমল হাত দিয়ে আপনার ত্বকের পরিচর্যা করুন।
Dearborn
ডিয়ারবর্ন মারকোলাইজড ওয়াক্স্
ব্যবসাসংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য
এম. জি. সাহানী এণ্ড. কোং (দিল্লী) প্রাঃ লিঃ
৩৪-বি কনট প্লেস, নিউ দিল্লী-১

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

*

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩
শনিবার ১ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষাণ্মাসিক „	২৩.০০
ত্রৈমাসিক „	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, 18 Nov. 1967

যুক্ত ফ্রণ্টের সংকট

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা রীতিমত হৃদরোগের রুগীর মতন আমাদের কাছে উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। গত এক মাসে এই মন্ত্রিসভার, যা বলা যাক—যুক্তফ্রণ্টের দুটি মারাত্মক ফাঁড়া কাটল। পুজোর মুখে মুখে প্রথম যে জোর ফাঁড়াটি এসেছিল তা কোনো রকমে সামলে নেবার পর আমাদের ধারণা হয়েছিল আপাতত রুগী কিছুটা নিশ্চিন্ত; কিন্তু সদ্য আরও একটি 'স্ট্রোক' হওয়ায় আশঙ্কা হচ্ছে এবারের ফাঁড়া এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে কি ঘটবে না ঘটবে সঠিক বলা যায় না। হয়ত এ যাত্রাতেও রুগী টিকে যেতে পারে, আবার নাও পারে, রাজনীতিতে সাদামাটা অঙ্কের হিসেব বড় একটা মেলে না।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় হয়ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া সঙ্গত ও আইনসম্মতভাবেই স্থির করেছেন—মন্ত্রিসভা ভেঙে দেননি বা পদত্যাগ করেন নি; আর রাজ্যপালও কোনো রকম বাধ্যতামূলক চাপ সৃষ্টি না করে সংবিধানের নৈতিক শর্ত রক্ষা করায় ভালই হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থা এখনও এমন হয় নি যাতে মনে করা যেতে পারে সংকট কেটে গেছে। বিধানসভার অধিবেশনের পরই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

আপাতত গোলমালটি এই বিধানসভার অধিবেশন ডাকা নিয়ে। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীরা ছ সপ্তাহ সময় নিতে চাইছেন, অর্থাৎ আঠারোই ডিসেম্বরের আগে তাঁরা অধিবেশন ডাকতে নারাজ; রাজ্যপাল চান অধিবেশন আরও আগে ডাকা হোক; বিরোধী কংগ্রেসদলও সেটা চান। কেন না, যুক্তফ্রণ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছে বলেই রাজ্যপাল এবং বিরোধী কংগ্রেসদল মনে করেন; ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও (সতেরোজন বিধানসভার সদস্য নিয়ে যুক্তফ্রণ্টের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করার পর) সেই অভিমত পোষণ করেন। এক্ষেত্রে আইনসঙ্গত প্রশ্নটি এই দাঁড়াচ্ছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কি করে মন্ত্রিসভা গঠন করে থাকতে পারেন? অপর পক্ষে যুক্তফ্রণ্ট বলতে চাইছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্পষ্টই বোঝা যায় এই বিবাদের একমাত্র সরল সমাধান বিধানসভার রণাঙ্গন। দুঃখের বিষয় সেই রণাঙ্গণের যে সময় নির্দিষ্ট করা হচ্ছে তাতেই বিরোধীদের ঘোরতর আপত্তি, কেননা এ রকম সন্দেহ করা হচ্ছে যে, এই সময়ের অজুহাতে যুক্তফ্রণ্ট তাঁর দল ভারী করার চেষ্টা করবেন এবং সেটা সব সময় শান্তশিষ্ট রাজনৈতিক চালে নাও হতে পারে। ইতিমধ্যেই দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা যেভাবে ও যেসব ভাষায় 'জনগণকে' উত্তেজিত করছেন তা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেরই অস্বস্তির কারণ হতে বাধ্য। স্পষ্ট শাসানি ও হুমকি ছাড়াও 'বিশ্বাসঘাতক' বলে বর্ণিতদের ওপর প্রতিশোধ নেবার বেপরোয়া ক্ষমতা 'জনগণ'কে দেওয়া হচ্ছে বলে দেখি। দুঃখের বিষয়, এটা ভয়ের কথা; আর বিরোধীরা সেই ভয়ে ভীত হতে পারেন।

যুক্তফ্রণ্ট এযাবৎ—গত আট মাস জনসাধারণকে যা দিয়েছেন তাঁরা তা অবগত আছেন। অবশ্য আট মাস আগে বড় বড় প্রতিশ্রুতি অনেক ছিল। এই আট মাসে যুক্তফ্রণ্টের ব্যর্থতা তাঁরাও ভাল বুঝতে পেরেছেন। খাদ্যের ব্যাপারে তাঁদের ব্যর্থতা শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে অশান্তি, অরাজকতা চূড়ান্ত মাত্রায় পেঁৗছে দেবার পর যখন নাভিশ্বাস উঠেছে তখন শিল্পে শান্তি ও উৎপাদন হার নিয়মিত বজায় রাখার জন্যে তাঁদের ব্যাকুলতা দেখা যাচ্ছে। কেন? কারণ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে এ অবস্থা চললে যুক্তফ্রণ্টের পরিণাম ভয়াবহ হবে। কংগ্রেস আমলে দুর্নীতি আর কালোবাজারের কথা যেসব নেতারা অহরহ বলতেন তাঁদের চোখের সামনে (নাকি আড়ালে) কলকাতার বড় বড় বাজারের সামনে রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায় চাল বেচা চলছে। এসব কেমন করে হয়? কেন হয়? যুক্তফ্রণ্টের প্রতি জনসমর্থন আছে বলেই এ হেন কাজ হচ্ছে নাকি? মন্ত্রীদের কেউ কেউ বলেন, জনসাধারণের দুর্গতি সত্ত্বেও জনসমর্থনের জন্যে কোথাও গণ্ডগোল হয় না। এ ধারণা যে হাস্যকর তাতে সন্দেহ নেই, গণ্ডগোল আদপেই হয় নি এমন নয়, তবে এটা ঠিক কলকাতায় ট্রামবাস পোড়ে নি বা এখনও আন্দোলনের নামে দাহকর্ম হয় নি। তার যথার্থ কারণ মন্ত্রীদের নিশ্চয় জানা আছে, ট্রামবাস পোড়াবার লোকরা নিশ্চয় উধাও হয়ে যায় নি, আর জনসমর্থন দ্বারা তারা বোধ করি চালিত হয় না। মন্ত্রীরা দায়িত্ববান হোন, সঙ্গত কথাবার্তা বলুন, আইনের মূল্য দিন—জনসাধারণ নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমত তার পথ বেছে নেবে।

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের চোখের সামনে থেকে রাজনৈতিক সংকটের কালো পর্দাটা এখনও স'রে যায়নি। তবু ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের ভাষায়, "হৃদরোগের দ্বিতীয় ধাক্কাটা" সামলে উঠেছে। অর্থাৎ প্রথম আক্রমণটা যদি এসে থাকে ২ অক্টোবর, দ্বিতীয়টা এসেছে ২ নভেম্বর। তবে দুটো ধাক্কার মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে। চরিত্রগত পার্থক্য। প্রথম আক্রমণটা এসেছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এবং ভিতর থেকে। দ্বিতীয়টা, দলত্যাগীদের কাছ থেকে। এই ১৬।১৭ জন দলত্যাগীদের সামনে আছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ২ অক্টোবরের সংকটের মূলে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি একা এবং সেই সময় আজ যাঁরা যুক্তফ্রণ্ট ছেড়ে বাইরে চ'লে এসেছেন তাঁদের পক্ষ থেকে তখন এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি যার ফলে সংকটটা দীর্ঘদিন ধ'রে চলতে পারে। তাই শ্রীমুখার্জি যখন পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন, তখন সংকট বলতে আর কিছু যুক্তফ্রণ্টের সামনে রইল না। এমন কি ঠিক তারপরেই শ্রীহুমায়ুন কবীর যে চেষ্টা তখন করেছিলেন, শ্রীঅজয় মুখার্জির মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দেবার সে-চেষ্টাও সফল হয়নি। তাই অনিশ্চয়তা বেশীদিন থাকেনি।

বর্তমান সংকটের মূল কথাটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আজ যাঁরা যুক্তফ্রণ্ট থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁরা একমাস আগেও আসতে পারতেন। কিন্তু তখন আসেননি, হয়ত প্রস্তুতিপর্ব তখনও শেষ হয়নি ব'লে। কিন্তু সেটাও হয়ত ঠিক কথা নয়। আজকের দিনে যাঁরা যুক্তফ্রণ্ট ছেড়ে চ'লে এসেছেন তাঁদের সামনে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন বোধটা একমাস আগে হয়ত তেমন প্রবলভাবে দেখা দেয়নি। তা যদি হয়, তাহ'লে প্রশ্ন ওঠে, কি সে-প্রয়োজন বোধ যার জন্য আজ দল ছেড়ে আসতে হ'ল?

সামনে একটা উত্তরই নজরে আসে। ফসল কাটার দিন। মাঠের কাঁচা ধানে সোনালী রং ধরতে সুরু করেছে। সরকারীভাবে ১৫ ডিসেম্বর থেকে ধান কাটা মরশুম সুরু। তাই ইতিমধ্যে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে গ্রামে গঞ্জে, মাঠে শহরে। এ চাঞ্চল্য কৃষক সংগঠনকে কেন্দ্র ক'রে। মাঠের উদ্বৃত্ত ধান কার হাতে যাবে, এটাই বড় ক'রে তুলে ধরা হ'য়েছে কম্যুনিস্ট সমর্থিত কৃষক সংগঠনের সামনে। ফলে, আজ আওয়াজ তুলতে হ'চ্ছে, উদ্বৃত্ত ফসল জোতদারের হাতে তুলে দেওয়া হবে না। উদ্বৃত্ত ফসল বণ্টনের ভার থাকবে কৃষক সংগঠনের উপর। আবার এই আওয়াজও শোনা গিয়েছে যে, যতটুকু ন্যায্য পাওনা তার বেশী এক কণাও দেওয়া হবে না জোতদারকে। এমন কি বিরোধ দেখা দিলেও না। ফসলের কোন অংশ নিয়ে বিরোধ থাকলে সে-শস্য যাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত কোন এজেণ্টের হাতে।

মোট কথা, যারা ফসলের অংশীদার তাদের মনে অনিশ্চয়তা নেই এ কথা বলা যায় না। কৃষক সংগঠনের পাল্টা প্রস্তুতি কোন কোন জায়গায় যে নেই তা নয়, তবু সরকারের নীতি যেখানে স্পষ্ট সেখানে পাল্টা প্রস্তুতি অক্ষম হবারই সম্ভাবনা দেখা দেয় বেশী। একথাটাও অস্বীকার করা যাবে না যে, আজ যাঁরা যুক্তফ্রণ্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে ফসলের বড় অংশীদার কেউ নেই। বরং এই প্রশ্নটাই বড় হ'য়ে দেখা দেবে এই কারণে যে, ডঃ ঘোষের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ক্যানিং সহরে যে সম্মেলন হ'য়ে গেল তাতে শ্রীহুমায়ুন কবীর সবচাইতে বেশী জোর দিয়ে বলেছিলেন মন্ত্রিসভা বদলের কথাটা। ক্যানিং সহরের সম্মেলনকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, শ্রীকবীরের বক্তৃতার এই অংশটাই সম্মেলনের রাজনৈতিক চেহারাটা স্পষ্ট ক'রে দিয়েছে। শ্রীকবীর বলেছিলেন এই সম্মেলনে যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। ক্যানিং-এর সম্মেলনে এই আশ্বাস দেবার প্রয়োজন না থাকলে শ্রীকবীর কথাটা এত জোর দিয়ে বলতেন না।

বরং শ্রীকবীরের এই বক্তৃতা দলত্যাগীদের পিছনে যে রাজনৈতিক পটভূমি থাকতে পারে সেটাই সামনে এনে দিয়েছে। এর ফলে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে এক বিশেষ শ্রেণী-চরিত্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। তাই এই সংকটকে সামনে রেখে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির ব্রিগেড প্যারেড মাঠের সমাবেশে বলা হ'য়েছে, বিগত সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামেরই প্রতিফলন হ'য়েছে এবং যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হবার পর সে-শ্রেণী সংগ্রামের চরিত্র বদল হ'য়েছে। যুক্তফ্রণ্ট সরকরের এই শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ অস্বাভাবিক মনে হবে না যদি শ্রীকবীরের ক্যানিং সম্মেলনের বক্তৃতাটা সামনে রাখা যায়। মূলত শ্রীকবীর এবং যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বড় সরিক মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি—দুয়ের পক্ষ থেকেই শ্রেণী সংগ্রামের কথাটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হ'য়েছে, স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। হয়ত এ কারণেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে বলা হ'য়েছে, খাদ্য সংগ্রহের মধ্যেও শ্রেণী সংগ্রাম রয়েছে, এক শ্রেণীর উদ্বৃত্ত ফসল অপর শ্রেণীর জন্য হস্তান্তরে। কংগ্রেসী শাসনকালে ১৯৬৬ সালে যে খাদ্য সংগ্রহ নীতিকে বানচাল করার জন্য চারদিকে অরাজকতা ছড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছিল, অনুরূপ খাদ্যনীতিকে কেন্দ্র ক'রে আজ শ্রেণী সংগ্রামের কথা প্রচার করা হ'চ্ছে।

খাদ্য সংগ্রহের এই শ্রেণী সংগ্রাম কি রূপ ধারণ করবে তা হয়ত ১৫ ডিসেম্বরের আগে সঠিক বলা যাবে না। কিন্তু আতঙ্কিত হবার মত কারণ আছে মনে ক'রেই আজ এমন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চ'লেছে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে সরিয়ে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করা, যার নেতৃত্ব করবেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে সরিয়ে দেওয়াই বড় কথা নয়। মূল কথা, ১৫ ডিসেম্বর বা ধান কাটা শুরু হবার বেশ কিছুদিন আগেই ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করা। শ্রীকবীরকে তাই ক্যানিং সম্মেলনে বলতে হ'য়েছিল ১৫ নভেম্বরের মধ্যে ডঃ ঘোষের নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবে। কারণ শ্রীকবীর বা দলত্যাগীদের নিয়ে নবগঠিত প্রগ্রেসিভ ডেমক্রেটিক ফ্রণ্টের কাছে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের সময়টা অনেক বেশী জরুরী সে কারণেই, ডঃ ঘোষকে পদত্যাগের পর বারবার বলতে হ'য়েছে মাঠের ফসল রক্ষা করার কথা।

এ কথাটা যে যুক্তফ্রণ্টের কাছে অজানা নেই, তা বোঝা যায় রাজ্য বিধানসভা ডাকার দিন নির্বাচনের মধ্যে। তাই পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল যখন মন্ত্রিসভার কাছে বিধানসভা "যত শীঘ্র সম্ভব" ডাকার সুপারিশ করলেন, তখন তাঁর কাছে ২০ নভেম্বরের মধ্যেই ডাকা হবে এইরকম একটা ধারণা হয়ত ছিল। ঐ তারিখের

মধ্যে বিধানসভা ডাকা হ'লে এমন কি শ্রীকবীরেরও বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ১৮ ডিসেম্বরের আগে বিধানসভা ডাকতে নারাজ। এই পিছিয়ে দেওয়া তারিখটা গভর্নর বা ডঃ ঘোষের কাছে গ্রহণযোগ্য নিশ্চয় নয়; কারণ তারিখটা ১৫ ডিসেম্বরের তিনদিন পরে। রাজ্যপাল নিজে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জিকে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রে-ছিলেন যাতে আরও আগে বিধানসভা ডাকা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর মন্ত্রিসভা এর আগে বিধানসভা ডাকতে কিছুতেই রাজী নন; কারণ এ'দের বক্তব্য, ১৫ ডিসেম্বরে যে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান সুরু হবে তাকে সফল করার কাজে মন্ত্রিসভার প্রতিটি সদস্য ব্যস্ত থাকবে। কাজেই তখন বিধানসভায় উপস্থিত থেকে ভোটগ্রহণে যোগ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। মোট কথা, যুক্তফ্রণ্ট সরকার শক্তি পরীক্ষার আগে প্রস্তুতির জন্য বেশ কিছুদিন সময় হাতে রাখতে চায়।

হাতে সময় থাকলে অনেক ঘটনাকে যে ফিরিয়ে দেওয়া যায় এমন নজীরের অভাব নেই। সাম্প্রতিক কালেও ঘটছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং সে-সব রাজ্যেও বিধানসভা ডেকে শক্তি পরীক্ষার কথা উঠলেও বিধানসভা ডাকা হ'চ্ছে না। এ নজীর আছে বলেই, রাজ্যপালের পক্ষে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়েছিল। তাই তাঁকে ছুটতে হ'য়েছিল দিল্লী পরামর্শ নেবার জন্য; রাজ্যপাল সম্মেলনে কথাটা পরিষ্কার ক'রে নেওয়ার জন্য। ডঃ ঘোষ এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদক ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রও সেই সঙ্গে দিল্লী [illegible]। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় ডঃ ঘোষ ও ডঃ চন্দ্রের উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছুটা তফাৎ ছিল। ডঃ ঘোষ শ্রীকবীরের সঙ্গে একমত যে তাড়াতাড়ি বিধানসভা ডাকা না হ'লে রাজ্যপাল কর্তৃক রাষ্ট্রপতির আদেশে আনিয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বরখাস্ত করা উচিত। তাঁর মতে, যে সরকার বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারিয়েছে সে-সরকার আর একদিনও গদিতে বসে থাকতে পারে না। অতি দ্রুত যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে সরাবার জন্য প্রয়োজন হ'লে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা উচিত।

কিন্তু ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বা তাঁর কংগ্রেস দলের মতটা ঠিক তা নয়। এটা ঠিক যে, আজ পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস পরিষদীয় দলের পক্ষে ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই; কারণ রাজ্যপাল এবং ডঃ ঘোষ দুজনেই দাবি করেছেন যে, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিতভাবে কোয়ালিশন সরকারের প্রতি কংগ্রেস দলের সমর্থন রাজ্যপালকে জানিয়ে দিয়েছেন। নেতা হিসাবে শ্রীদাশগুপ্ত হয়ত এই সমর্থন নিজ দায়িত্বে দিতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস পরিষদীয় দলের কার্য-নির্বাহক কমিটির সভায় এই সমর্থনকে এখনও স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়নি। তবু এই অঙ্গীকার স্বীকার ক'রে নিয়েই কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বলা হ'য়েছে যে, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই বলে যুক্ত-ফ্রণ্ট সরকারের উচিত পদত্যাগ করা এবং তা যদি না করে, তাহ'লে বিধানসভা ডেকে শক্তি পরীক্ষা করাই হবে একমাত্র পন্থা।

দিল্লীতে সেই কথাটাই নেতাদের বোঝাতে গিয়েছিলেন ডঃ চন্দ্র। প্রধান-মন্ত্রী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের কাছে এই কথাটাই স্পষ্ট ক'রে দেওয়া হ'য়েছে যে, যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে জোর ক'রে সরিয়ে দিলে রাজনৈতিক সুবিধাটা পুরো কাজে লাগাবে কম্যুনিস্টরা। মনে হয় এটা কেন্দ্রীয় নেতারাও উপলব্ধি করেন। না করার কোন হেতু নেই। কারণ আধুনিক-কালে পরিষদীয় গণতন্ত্রে এক বা একাধিক দলের সমর্থিত সরকার অস্বীকৃত নয়। ইংলণ্ডে আজকাল এমন কথাও বলা হ'চ্ছে যে, একাধিক দলের সমর্থনে সরকারের শাসন ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ যেসব দল সরকারের সমর্থক তাঁরা পরিষদীয় গণতন্ত্রে আস্থাশীল হ'য়ে ওঠে। পশ্চিম বাংলায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে কিনা একথা বলার সময় হয়ত এখনও আসেনি, কিন্তু এটা প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তফ্রণ্টের সকল সরিকরা, যে-কোন উদ্দেশ্যেই হোক, "গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে" [illegible] "সংগ্রামকে" জোরদার করার জন্য [illegible]। এর পিছনে রাজনৈতিক স্ট্রাটেজী [illegible] আছে; কিন্তু এটাও স্বীকার [illegible] নিতে হয় যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কংগ্রেসের পক্ষে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার পথটাকে একমাত্র পথ বলে মেনে না নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। [illegible] সামনে রেখে রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসাবে শক্তি পরীক্ষাকে মেনে না নেওয়ার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

এই শক্তি পরীক্ষার জন্য যদি ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তাহ'লে যুক্তফ্রণ্টকে অপসারিত করা সম্ভব হবে কিনা, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। কারণ হাতে সময় থাকলে যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে [illegible]দের সমর্থক দল অক্ষুণ্ণ রাখার যে চেষ্টা [illegible] তার ফলে আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নও উঠতে পারে। হয়ত, দলত্যাগীদের উপর রাজ-নৈতিক চাপ সৃষ্টিরও চেষ্টা হ'তে পারে। পরিষদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা অভিনব নয়। দেখা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই সে চেষ্টা হ'য়েছে ইন্দোরে ভারতীয় ক্রান্তি দলের সংগঠক সম্মেলনে। এই সম্মেলনে পরিষ্কারভাবে শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হ'য়েছে ক্রান্তি দলের সদস্য হিসাবে কোন নেতা বা তাঁর সমর্থক গোষ্ঠী সেই দলেরই আর একজন নেতার নেতৃত্বে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালাতে পারে কিনা। তাছাড়া এ প্রশ্নও তোলা হ'য়েছে যে, ক্রান্তি দলের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোন পাল্টা কোয়ালিশন সরকার গঠন করা উচিত কিনা। স্বভাবতই এই প্রশ্নগুলি শ্রীহুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে। শ্রীকবীর কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, যদিও এরই পাল্টা যুক্তি তিনি দেখিয়ে-ছিলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গত নির্বাচনের সময়। তবু দেখা যাচ্ছে ক্রান্তি দলের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ ক'রে শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে। শ্রীসিংহের সমর্থক নিশ্চয়ই শ্রীকবীরের সমর্থকের সংখ্যার অধিক। কাজেই এই রাজনৈতিক চাপটা যে ডঃ ঘোষের ১৬ জন সমর্থকের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না একথা জোর করে বলার নিশ্চয় কোন সুযোগ নেই।

এই পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েই আগামী শক্তি পরীক্ষার কথাটা বিচার ক'রে দেখতে হবে। অন্য কোন পথে নূতন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে কিনা, তা আপাতত অনুমান করা সম্ভব নয়।

বাম কম্যুনিস্টদের কর্তৃত্ব

নবীন-প্রবীণ

শাসক অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন আজকাল অনেক দেশেরই সমস্যা। সচ্ছল দেশ বলে কথা নেই; অসন্তোষ সচ্ছল দেশের ছাত্র মহলেও দানা বাঁধে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাক্ষ্য। বিপরীত প্রান্তে দরিদ্র দুর্গত দেশের দৃষ্টান্ত। ইন্দোনেশিয়ার ছাত্ররা প্রেসিডেণ্ট সুহর্তের কাছে কৈফিয়ত দাবি করছে, জিনিসপত্রের চড়া দাম কমছে না কেন? নিয়মমাফিক আচরণবিধি মানলে ছাত্ররা এরকম কৈফিয়ত চাইতে পারে না। উল্টে ছাত্রদের ধমক দেওয়া যায়, তোমাদের এসব বিষয়ে নাক-গলানো কেন? প্রেসিডেণ্ট সুহর্ত ধমক দিতে পারেন নি, বলেছেন জিনিসপত্রের দাম যে কমছে না সেজন্য দোষ তাঁরই। ছাত্ররা অবশ্য তাতেও খুশী হয়নি, বলেছে কোন্ কোন্ মন্ত্রী এ ব্যাপারে দায়ী সেটা তারা এরপর খোঁজ নেবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ কাজ ছাত্রদের নয়, রাজনীতিকদের। ইন্দোনেশিয়ায় একটা পার্লামেণ্টও আছে, তবে রাজত্বের কর্তৃত্ব ফৌজী। পার্লামেণ্টের সদস্যরা দামী বিলিতী মোটরগাড়ি কিনছেন শুনে ছাত্ররা সেটা হৈচৈ করে বন্ধ করেছে। ইন্দোনেশিয়ায় ফৌজী নায়কদের এবং সৈন্যদের বেতন যৎসামান্য, কাজেই বাঁ-হাতের কারবার তাদের চালাতেই হয়। ছাত্ররা এসব নিয়ে খুঁত খুঁত করছে; তবে অভাবগ্রস্ত দেশে ও সমাজে এসব রোগ সহজে সারে না।

মূল সমস্যায় ফেরা যাক। ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রদের রাজনীতি করতে বারণ করা হলে তারা তা শুনবে মনে হয় না। কারণ সেরকম নিষেধ করা এখন হবে ভণ্ডামি। গত দু বছর ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলের ছাত্রদের হাতেই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে উলট-পালটের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, জেনারেল সুহর্তের সেনাবাহিনী ছিল তাদের সহায়। ছাত্রদের আন্দোলন বিক্ষোভে জড়ো করার কাজে লাগানো হয়েছিল মিলিটারী ট্রাক, লরী ইত্যাদি যানবাহন। এখন এসব ছাত্রদের শান্ত সুবোধ হতে বললে তারা সহজে মানবে কেন? প্রায় একই প্রশ্ন আমাদের দেশেও স্বাধীনতাপরবর্তীকালে। এখন তো আরও বিচিত্র পরিস্থিতি। কেরলের ছাত্ররা মুখ্যমন্ত্রী কমরেড নাম্বুদ্রীপাদকে স্বস্তিতে রাজত্ব চালাতে দিচ্ছে না। কমরেড মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রদের যেসব নতুন সদুপদেশ দিচ্ছেন ছাত্ররা তা মানছে না। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আচরণের পূর্বাপর সঙ্গতি রাখা খুবই

কঠিন, ছাত্রদের বোঝাতে পারা আরও শক্ত। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাদের একবার টেনে আনলে তারপর আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। রাজনীতি হচ্ছে মানুষখেকো বাঘের মত। অতএব ছাত্র রাজনীতির হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতির উপায় দেখা যায় না।

ইন্দোনেশিয়ায়, ভারতবর্ষে ছাত্র অসন্তোষ বিক্ষোভের রাজনীতি তবু বুঝতে পারা সহজ—বুঝতে পারা মানেই সমর্থন করা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মেনীর মত সচ্ছল সুশৃংখল দেশেও কেন ছাত্র বিক্ষোভ? মার্কিনী ছাত্র মহলের বিক্ষোভ একাধিক কারণে। একটা হল ভিয়েতনাম যুদ্ধ সংক্রান্ত। এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আপত্তি সবখানি অবশ্য নীতিগত নয়, ছাত্রদের সকলকেই নীতিগত-ভাবে শান্তিবাদী মনে করবার কারণ নেই। লেখাপড়া মুলতুবী রেখে ভিয়েতনাম-যুদ্ধের জন্য সৈন্যদলে ভরতি হতে অনেকের বিষম আপত্তি। এদের প্রতিবাদের প্রতিবাদী ছাত্রও আছে। সবটাই একতরফা নয়; ছাত্র অসন্তোষ যেমন সত্যি তেমনই প্রেসিডেণ্ট জনসনের সন্তোষবিধানে উৎসাহী ছাত্ররাও আছে।

সমাজতাত্ত্বিকরা অনেকে বলছেন, রোগটা আরও গভীর। ভিয়েতনাম, নিগ্রো আন্দোলন, মাদকসাধন, এসবই রোগ লক্ষণমাত্র। মূল হল প্রবীণ ও নবীনে বিরোধ; "জেনারেশন গ্যাপ" অর্থাৎ পরিণত বয়স্ক এবং অল্পবয়সীদের মধ্যে ব্যবধান, এমন একটা ফাঁক যা নীতি উপদেশ, ধর্মকথা ইত্যাদি দিয়ে ভরাট করা সম্ভব হচ্ছে না। নবীন-প্রবীণ বিরোধ, তরুণের বিদ্রোহ, এসব তো এই প্রথম নয়। তাহলে এখন এটা বিষম ভাবনা ধরাচ্ছে কেন? মার্কিন সমাজের যে ভাবনা সেটা আপাতত কেবল সচ্ছল সমৃদ্ধ দেশেই খাটে। বিষয় সম্পদ প্রচুর, উপার্জনের সুযোগ সকলের নয়, অনেকের পক্ষে সহজ লভ্য। তবু অতৃপ্তি, অসন্তোষ, নিয়ম বন্ধনের বিরুদ্ধে তরুণদের বিক্ষোভ। এর কারণ নাকি মার্কিনী প্রাচুর্যের সমাজে জীবন ও জীবিকার তাড়না প্রায় সকলকেই ক্রমাগত ইঁদুরদৌড় করায়। অভাবগ্রস্ত দেশের লোক আমাদের পক্ষে এটা ঠিকমত বুঝতে পারা সম্ভব নয়; আমাদের যন্ত্রণা, সমস্যা, ভাবনা সবই অন্য রকম। এটুকু বোঝা যায়, মার্কিনী ছাত্রঅসন্তোষের কারণটা পুরোপুরি রাজনৈতিক নয়। তবে অসন্তোষের লক্ষ্যস্থল রাষ্ট্রনেতারাই।

মার্কিন রাষ্ট্রনেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলনকে নাম দেওয়া হচ্ছে "নিউ লেফট্" "নয়া বামপন্থী।" নয়া বা পুরোনা যাই হোক, এ বিক্ষোভের সামাজিক উৎসটা মোটামুটি স্পষ্ট, রাজনৈতিক চেহারা বহুরূপী—হিপি, চরমপন্থী নিগ্রো, ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী, দারিদ্র্য-মোচনের উগ্র দাবিদার, শান্তিবাদী, ট্রটস্কীপন্থী, কম্যুনিস্ট, সকলেই এ-ক্ষেত্রে সমবেত। বিক্ষোভ, সত্যাগ্রহ, রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঠোকাঠুকি, এসব পদ্ধতি গণতান্ত্রিক রাজ-নৈতিক বিধানে অচল, আপত্তিকর, তবু মার্কিন গণতন্ত্রেও এসব ঝোঁক দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছিল এর আগেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর, আবার উত্তর-তিরিশে দারুণ ব্যবসামন্দার যুগে। এখন প্রাচুর্যের আমলে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ মার্কিন ছাত্র এবং তরুণ মহলে তার মূল কারণ মামুলী রাজনীতির বাম-দক্ষিণ হিসাবে ধরা যায় না।

জাপানে ছাত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রধানত রাজনৈতিক। জাপানী ছাত্র সংগঠন "জেংগাকুরেন" গোড়াতে ছিল কম্যুনিস্ট পরিচালিত। গত কয়েক বছরে এই সংগঠনে ভাঙাগড়া চলেছে বিস্তর। সম্প্রতি এরা আবার মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ আন্দোলনে তৎপর দেখা যাচ্ছে। জাপানী ছাত্রদের অসন্তোষ সবটাই কিন্তু বামপন্থী রাজনীতি প্রণোদিত নয়। সচ্ছল শিল্পসমৃদ্ধ জাপানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুল, শিক্ষার সুযোগ অপ্রচুর, বৃত্তি ইত্যাদির সাহায্য সুবিধাও ছাত্ররা খুব বেশী পায় না। আমেরিকার এবং জাপানের ছাত্র অসন্তোষের মধ্যে তফাৎ অনেকখানি। সুশৃংখল পশ্চিম জার্মেনীতে ছাত্র আন্দোলন যে আমেরিকার মত উগ্র রূপ নিচ্ছে সেটাই আশ্চর্য।

১৪।১১।৬৭
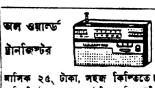
মেঘে আকাশ ঢাকা

হরপ্রসাদ মিত্র

পর্দাগুলোর ওপরে ফাঁক—
আকাশ কথঞ্চিৎ
যায় দেখা ঠিক,—তাতেই দেখি
ঝাপ্‌সা এ সংবিৎ।
শ্রাবণ শুধু, শ্রাবণ শুধু
উপর্ঝরণময়—
টনটনে রোদ লাগুক,
লাগুক আশ্বিনে নির্ভয়।

অনেকখানিই পর্দা-ঢাকা,
যেটুকু যায় দেখা—
দেখো তাতেই আলোর খুঁটি, টেলিফোনের তার—
সেইটুকুতেই চোখের আরাম,
আর কী বা দরকার?

বাইরে যখন বাতাস ওঠে
পথের পথিক সবাই ছোটে,

বাইরে যখন বিষ্টির ছাট
ভেজায় চতুর্দিক—
শুনতে শুনতে সে-সব ধ্বনি
ঘরের ঘড়ির আওয়াজ শুনি—
এক টেবিলেই বাজায় বুকের
নিরন্ত ধিক্‌-ধিক।

বাজলো ও কার টেলিফোনের ঝঞ্ঝনা-ঝংকার?
ওপার বলে,—'কিহে ক্যামন?' এপার বলে 'ভাল।'
এপার বলে,—'তুমি ক্যামন?' উত্তর তার—'ভাল।'
একযোগেতেই বললে দুজন 'আচ্ছা, নমস্কার'।

শ্রাবণ শুধু, শ্রাবণ শুধু,—মেঘে আকাশ ঢাকা।
টন্‌টনে রোদ না এলে এই ঘরে কি যায় থাকা?

এল-এস-ডি

মঞ্জু মিত্র

তখন থেকেই চক্ষু মেলে দেখছো সোনা
দেখছ কি পাহারাদার কাকতাড়ুয়া!
পলক ফেলো মাঝে মাঝে বন্ধ রেখে উলবোনা।

সোনা আমার লক্ষ্মী সোনা
সময় পেলে মাটিতে হেঁটো সোনার ডানা
টেবিলে রেখে।

দেখবে চেখে তুরীয় হবার মারীহুআনা?

সোনা আমার লক্ষ্মী সোনা
দরকার কি বিবেচনায় টালবাহানা
নষ্ট ধুলোয় গড়াগড়ি
সবার চোখে বেমানান; ভাবছ কি

সোনা আমার লক্ষ্মী সোনা
লুকিয়ে রাখো সর্গে যাবার এল-এস-ডি॥

বাতাসিয়া লুপ ঘুরে

শান্তিকুমার ঘোষ

বাতাসিয়া লুপ ঘুরে ট্রেনের বাঁশি

কুয়াশার মধ্য দিয়ে।

পাহাড়ের ধার বরাবর উঠেছি তোমার ঘরেঃ

ঘিরে-থাকা জাল ভালোবাসার এই রাত্রি...

দুটো মানুষ পালঙ্কে যত ঘন হতে পারে

প্রাণবন্ত গাছ যেরকম বেড়ে ওঠে বিদ্যুতের ঝলসানিতে

ড্যাম ফাটিয়ে গর্জন ক'রে নেমে পড়ে নদী উপত্যকায়

ঘূর্ণি ঝড়

লোকজন বাড়িগুলোকে ছিনিয়ে নিয়ে

তুলে ধরে উত্তুঙ্গ আঁধারে।
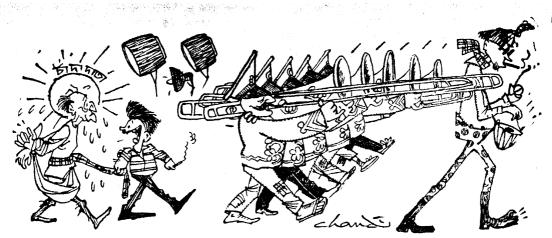
'বিসর্জনের বাজনা'

'বিসর্জনের বাজনা' বললে সোজা বাংলায় যা বোঝায় তা খুব সুখকর নয়; তার ভেতরে সব আনন্দ ফুরিয়ে যাওয়ার—সব আলো নিবে যাওয়ার একটা করুণ শূন্যতা আছে। অলংকৃত অর্থ ওর যা-ই থাক—বিসর্জনের ঢাকের শব্দ আমাদের মনে আর এক ছবি নিয়ে আসে। দেখতে পাই, আমাদের বাড়ির প্রতিমা খালের ঘাটে নৌকোয় উঠে চলে গেল—এখন অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চণ্ডীমণ্ডপের টিনের চালে—আশেপাশে সুপুরি-নারকেল গাছের দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া পড়েছে, শূন্য বেদীতে একটি মাত্র প্রদীপের শিখা কাঁপছে, ম্লান কুয়াশা যেন ঘনিয়ে আসছে চারদিকে—কতদিন পরে বাদুড়ের ডানার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—নির্জনতার সুযোগে সাড়া দিয়েছে তক্ষক, আর মণ্ডপের সামনে ছায়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে বাড়ির কে একটি মেয়ে—এখান থেকে তাকে চিনতে পারছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে কান্না বাংলা দেশের প্রাণের কান্না।
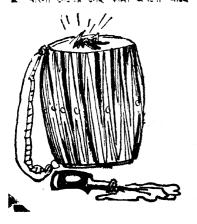
বাংলা দেশের সেই কান্না এখনো আছে কিনা জানি না; না থাকাই স্বাভাবিক—সমাজ বদলাচ্ছে, মন বদলাচ্ছে। পূর্ব বাংলার কথা ভেবে আর লাভ নেই, এ পারেও হয়তো পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ-বাড়িতে বিসর্জনের পর এখনো মেয়েদের চোখে জল আসে—শূন্য মণ্ডপের দিকে তাকিয়ে বয়স্ক পুরুষের মন হুহু করে ওঠে। কিন্তু শহরের, বিশেষ করে কলকাতার বারোয়ারী শুধুই উৎসব। আর বিসর্জন হচ্ছে উৎসবতর—অথবা উৎসবতমই হয়তো বলা উচিত।

সেদিন একটি বারোয়ারী শ্যামা পুজোর পুস্তিকায় চোখ পড়ল। এই অনুষ্ঠানটিকে চিনি. এ'রা নির্ধারিত সময়ের পরে মাইক বাজান না, হিন্দী ফিল্মী গানের প্রায় জৈবিক ধ্বনি-তরঙ্গ বিস্তারের বদলে এ'রা শোভন বাংলা গানের অনুরাগী, এ'দের বিসর্জনের লরীতে 'টুইস্ট' কিংবা 'চা-চা-চা' চোখে পড়ে না, কিছু কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ মধ্যে মধ্যে এ'রা হিতকর প্রতিষ্ঠানে দানও করে থাকেন।

এ'দের হিসেবের মোটা অঙ্ক দেখছি আলো-প্যাণ্ডাল ইত্যাদি—পাঁচ শোর ওপরে খরচ হয়েছে— হতেই পারে। প্রতিমা এবং পুরোহিতে শ'-দুয়েক, পুজোর খরচ এক শো' আশির মতো—এবং বিসর্জন? ছ' শো টাকার ওপরে। অর্থাৎ পুজোর আসল অংশই বিসর্জন। আনন্দটা তা হলে বিসর্জনেই—পুজোর নয়। আর এ যদি শ্যামাপুজোর হিসেব হয়, তা দুর্গাপুজোতে কি রকম দাঁড়ায় সেটা সহজেই নিশ্চয় অনুমান করা চলে।

এবারের দুর্গোৎসবের সময় আপনাদের কাছে নিবেদন করেছিলুম—উৎসবের মধ্যেও একটা নিরানন্দ চোখে পড়ছে, দেখছি ক্লান্তির ছায়া। কিন্তু সেটা আমারই মানসিক বিভ্রম, অচিরগত শ্যামাপুজোতেই সেই নিমূঢ় বিভ্রান্তি দূর হয়ে গেল। পঞ্চাশ-ষাট গজ অন্তর অন্তর এক-একটি বারোয়ারী—তাদের অনেকগুলিই নবোদ্‌গত। নানা ধরনের প্রতিমা সে-সব কোথাও চিরকালের কালী-মূর্তি—পঞ্জিকা আর পট থেকে অবিকল বেরিয়ে এসেছে. কোথাও এক-আধটা

ভক্তদের নাচ দেখে কালীর জিভ লজ্জায় আরও বেরিয়ে এল

ভেরিয়েশ্যান—যাকে বলা যায় আর্টিস্টিক টাচ'; কোথাও কালীর রঙ একটু মাজা, পরনে শাড়ি—মা দুর্গার ভঙ্গিতে অসুর বধ করছেন—শিব পায়ের তলা থেকে ছাড়া পেয়ে ধ্যান করছেন হিমালয়ের চূড়োয়; কোথাও বা দেবী খাঁড়া উ'চিয়ে দাঁড়িয়ে—তাঁর ডাকিনী-যোগিনীরা গণ্ডাখানেক অসুরের সঙ্গে সমানে লড়ে যাচ্ছে।

এগুলো শাস্ত্রীয় মূর্তি কিনা—এ নিয়ে এখনকার পুরুতেরা তর্ক তোলেন না—কারণ তাঁরাও আর্ট বোঝেন। প্রতিমা দেড়হাতই হোক আর প্যান্ডালজোড়া 'ম্যাগনাম ওপাস'ই হোক— আসলে সবই আর্টের ব্যাপার। আর প্যান্ডালের আলোর খেলা, ডাকিনীদের চোখে লাল বাল্বের হিংস্র ঝলক, পাহাড়ের শোভা —এসব ছাপিয়েও রিয়্যাল আর্টিস্টিক ব্যাপার হচ্ছে বিসর্জন। যেমন বিয়ে বাড়িতে বিয়েটা সম্পূর্ণ গৌণ—বর-কনেকে চোখে না দেখলেও চলে, ভোজটাই (অবশ্য গেস্ট কন্ট্রোল আর দুঃসহ রাধাবল্লভীতে আজকাল একটু বেসুরো হয়ে গেছে) মুখ্য—তেমনি বারোয়ারীতে বিসর্জনই হচ্ছে লক্ষ্য—পুজোটা উপকরণমাত্র।

এবার বোধ করি, প্রতিপদ পর্যন্ত অমাবস্যা একটু বিলম্বিত ছিল, তার ফলে অন্তত দিন ছয়েক ধরে পরমোৎসাহে আলো জ্বলল, মাইক চলল, তারপর শুরু হল বিসর্জনের রাজসূয়। অন্যান্য বছর অজস্র প্রতিমার ভেতরে ঠিক ডিংসটিকটিভ হওয়া যায় না—পাল্লা দিয়ে চে'চিয়ে এবং যথাসাধ্য নেচে প্রাণপণে আত্মঘোষণা করতে হয়। এবারে অফুরন্ত অবসর—আয়োজন করবার দরাজ সুযোগ—'রুম এনাফ ফর অল।'

অতএব সেদিন সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টা ট্রামে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে বসে থেকে, নেমে পড়তে হল। এবং নেমেই বুঝতে পারলুম অত্যন্ত সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি। সেটি পুজোর পরে চতুর্থ দিন। দেখলুম, কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে বালকদের ব্যান্ডপার্টিটি-অর্থাৎ ভ্যানগার্ড যেখানে মোড় ঘুরছে—সেখান থেকে প্রতিমাটি যে কতদূরে ঠিক বোঝা গেল না—মনে হল বিবেকানন্দ রোডের কাছাকাছি। বালকদের বাদ্যভাণ্ড, চিৎপুর অঞ্চলের 'নেশনাল বরাস বেণ্ড' (ন্যাশনাল ব্রাস ব্যান্ড বোধ হয়) ইত্যাকার বিবিধ তো আছেই, সেই সঙ্গে আসছে একটির পর একটি আলোকিত তোরণ—সেই তোরণের কোনোটিতে গণেশ, কোথাও গণেশ-জননী—আরো কে কে আছেন জানা গেল না। প্রতিটি তোরণের পেছনে শব্দিত ইলেকট্রিক ডাইন্যামো—পদচারী বাহকদের কাঁধে সেকেলে অভ্রের থাস-গেলাস নয়—বাল্বের সম্ভার। সঙ্গীতে আলোয় পথ-মুখরিত—ফুটপাথে বিস্মিত-মুগ্ধ নরনারী—এবং এই অতি-মন্থর নিশ্চল শোভাযাত্রা যখন ট্রামকে রাস্তা ছেড়ে দেবে তার অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে আমি পদব্রজে শ্যামবাজারে পে'ছে যাব।

ভিড় ঠেলে চলতে চলতে মনে হল, কে বলে কলকাতা ডেড সিটি? কোন্ দুর্জন রটনা করে—বাঙালী মধ্যবিত্তের দিন চলে না, র‍্যাশনে চাল পাওয়া যায় না—দুর্মূল্যের বাজারে প্রতি মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে আসে? কেন খবরের কাগজগুলো রটায়—বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষের ছায়া নাচছে—মাঠভরা 'বাম্পার ক্রপের' প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও? দুঃখ নেই, অভাব নেই—আনন্দ উছলে পড়ছে শত ধারায়—নইলে কেন এমন করে জমাট হয়ে ওঠে বিসর্জনের উৎসব? এ তো ছ' শো টাকার বিসর্জন নয়—এই আলো বাজনা-মত্ততার পেছনে যে কত হাজারের হিসেব—তা কে বলবে?

কিংবা কে জানে—সমস্ত জাতটারই বোধ হয় বিসর্জনের বাজনা বাজছে। তাই এই উৎসবটাই এত ভালো লাগে আমাদের। না খেয়ে যে পথে পড়ে মরে—তারও একটা উজ্জ্বল চিতা জ্বলে—অত আলো হয়তো সে লোকটা জীবনে দেখেওনি।

আরশোলা

গৌর কিশোর ঘোষ

গিরীশ ভদ্র জোয়ান বয়সে যেদিন বাজি রেখে পর পর দু-দুটো তাগড়াই মেয়েমানুষের কাপ ছটকে দিয়ে এসে পরক্ষণে পেঙ্গুইন সিরিজের কাফকার বইখানা টেনে নিয়েছিল, তারপর অনায়াসে মেটামরফসিস গল্পটা শেষ করে একটা তৃপ্তির ঘুম দিয়েছিল, সেদিন কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল যে, পঁয়তাল্লিশ বছরে এসে নিজেই আরশোলা বনে যাবে?

কেন এমনটা হল, সে ব্যাপারে মন দেবার আগেই তার মনে পড়ল, কাল সন্ধ্যেবেলা কি ঘটেছিল। মাল খেতে বসে হঠাৎ মন-

গুমরানি ভাবটা কেমন ঘাড়ে চেপে বসল। যেন ভূতে ভর করেছে। দুস্ শালা বলে চাট ছুঁড়ে বার কয়েক সে সেটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। তারপর সে কয়েকটা কুইক্ মারল। একবার যেন বিলাতী বারে যাসার জন্য আফসোসটা উসখুস করে উঠেছিল। তার চেয়ে খালাসিটোলার তেজস্ক্রিয় মাল আউন্স কয়েক পেটে ঢাললে মগজে ঢের বেশি শানান দিত এতক্ষণে। আর তারপরই সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে বলে উঠেছিল, ঈশ্বর যদি কাজেই না লাগল, তবে এই মেরুদণ্ডটা ফালতু কেন দিতে গেলে। এখন দ্যাখ তো, রোদের দিনে ওয়াটারপ্রুফের মতন ওটা শুধু শুধু বয়ে বয়ে হাল্লাক হয়ে যাচ্ছি। তারপর টকাটক সে আরও দুটো নীট মেরে দিয়ে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছিল। আর আশ্চর্য হয়ে দেখেছিল, মাল দিতে আসে যে ছোকরা, তাকে মাইরি অবিকল কেমন ভগবানের মত দেখাচ্ছে। খপ করে তার হাতটা চেপে ধরে সে বলে উঠল, শ্‌শালা এই আমি আমার বউ মা আমার ছেলেপুলে এই সব মানুষ গাধা পশু পাখী বন জংগল নদী সমুদ্দুর পাহাড় পৃথিবী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এ-সব ঝঞ্ঝাট তো তুই-ই জন্ম দিইছিস। খুব ফুর্তি না! নাও ঢের হয়েছে, এবার তুমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং কর। ভগবান লুপ পর। আর—তারপর দু-হাত জোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলেছিল, আর তোমাকে যে অমূল্য অ্যাডভাইসটি গ্র্যাটিসে দিলাম, তার বদলে তুমি আমার শিরদাঁড়াটা খুলে নাও। তাহলে বুকে হাঁটতে আর আমাকে কসরত করতে হবে না।

আমায় তুমি আরশোলা করে দাও। আর আশ্চর্য, ভগবান টেবিলের উপর যত্ন করে মালের গেলাসটি রাখলেন, মুচকি মুচকি হাসলেন, তারপর অভয় মুদ্রা দেখিয়ে বললেন, তথাস্তু।

বেশ হাল্কাভাবে দেওয়াল বেয়ে বেয়ে উঠতে উঠতে শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে সে বলল, তবু লোকে বলে ভগবান নেই! যত শুশা— গুলবাজি। তারপরই তার উপলব্ধি হল পঁয়তাল্লিশ বছরের গদগদে দেহটার চেয়ে আরশোলার বডি ঢের বেশি ফনফনে। নাহলে এই ভোরে সে এমন অনায়াসে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত নাকি? পিঠ কোমর হাঁটু, কনুইয়ের গিঁট কেমন জাম মেরে থাকত না? টন টন করত না? বায়ুপূর্ণ পেটটা উদ্বেগে অস্থির করে ছাড়ত না?

এখন ছখানা পা আর দুটি শুঁড়ের দৌলতে সে কেমন তর তর করে খাড়া দেওয়াল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। কই বুক ধড়ফড় করছে না তো। তবে নাকি তার ব্লাড প্রেসার হয়েছে। সেই শালা ডাক্তার এসে বিছানায় চিত করে পেড়ে ফেলে যন্তর দিয়ে এখানে টিপে ওখানে ঠুকে কত রংগই না করলে। একটু সাবধানে থাকবেন মশাই, ডায়াসটলিকটা একশ দশ, সিসটলিক নিয়ে অত ভাবিনে, দু-শ পনের। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এটা তিনটে করে খান, ওটা পাঁচ বার করে খান। নুন একদম না। আর মোটে এ ব্যাপারে ভাববেন না। অফিসে যাওয়া বন্ধ করার দরকার নেই। (ভিজিটের টাকা নাহলে আসবে কি করে?) চিন্তারও তেমন বিশেষ কিছু নেই। এই সব পেঁয়াজি শুনলেই ওর গা জ্বালা করে। ঘাবড়াবার যদি কিছু নেই-ই, তবে কথাটা এতবার করে বলছিস কেন? আবার তার বউয়ের দিকেও ডাক্তারটা চাকুম চাকুম চাইছিল। শুধু তাকে পেড়েই সুখ হয়নি শালার, এখন বোধ হয় বউটাকেও শোয়াতে চায়।

বুঝলেন মশাই, ভোরে উঠবেন, ঘাসের উপর খালি পায়ে ঘুরবেন, গঙ্গা স্নান চলুক, হাঁটাচলা যত ইচ্ছে করুন। তবে উপরে উঠবেন একটু সাবধান হয়ে। ধীরে ধীরে। একটা একটা সিঁড়ি উঠবেন, পাঁচ মিনিট করে দাঁড়াবেন, হাঁফটা জিরিয়ে নিয়ে তবে আবার একটা সিঁড়ি উঠবেন। কেমন। আর হ্যাঁ, অযথা ভয় পাবেন না। ভেবেছিল ডাক্তারের পুরুষ্টু পাছায় গদাম করে একটা লাথি ঝাড়বে। পারেনি।

তার বদলে তাকে ভিজিট দিয়েছে, গাড়ি ভাড়া দিয়েছে। দেঁতো হাসি হেসে চিঁচিঁ গলায় বলেছে, আবার বিষ্যুতবারে প্রেসারটা মেপে যাবেন কিন্তু।

তর তর করে দেওয়াল বেয়ে আরও খানিকটা উঠে গেল। দ্যাখ শালা, দেখে যা। সিঁড়ি নয়, একেবারে খাড়া দেওয়াল বেয়ে উঠছি। চটা ওঠা দেওয়ালের এক জায়গায় একটু খোঁড়ল হয়েছিল। রোখের মাথায় উঠতে গিয়ে ঝপাং করে তার মধ্যে পড়ে গেল। বাঁ-দিকের দ্বিতীয় ঠ্যাংটায় একটু চোট লাগল। শুঁড় বুলিয়ে সেটা ভলে নিল। তারপর আস্তে নিচু দিকে মুখ ঘুরিয়ে থ মেরে দাঁড়িয়ে গেল। তার ছেড়ে-আসা বডিটাকে চিনতেই পারল না। সেই পেল্লায় ঘুমন্ত দেহটার দিকে চেয়ে আতংকে তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। শুঁড় দুটো খাড়া হয়ে উঠল। ছখানা পায়ে, পাখায় তিরতির করে কাঁপুনি শুরু হল। ওই মন্দার পাহাড়ে গা ঘষে সে রাত কাটিয়ে দিয়েছে! বাবাস রে! চিপটে যে ডাল গলে যায়নি, এই তার বাপের ভাগ্যি। সে ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলেছিল। একটু ধাতস্থ হয়ে পিট পিট করে আবার চাইতে লাগল। ফস ফস করে নিঃশ্বাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে যেন সাইক্লোন বইছে। ওই বিশাল লাসের থ্যাবড়া থ্যাবড়া বুক পেট কী প্রচণ্ড শক্তিতেই না ওঠানামা করছে। নাঃ পাহাড় নয়, সে ভ্রম সংশোধন করল। এ হচ্ছে খ্যাপা ঝড়ো সাগরে ভাসা একটা যেন আস্ত মানোয়ারি জাহাজ। বিছানাটার দিকে চাইল। কুল-কিনারা পাওয়া গেল না। চাদরের ভাঁজে ভাঁজে অজস্র ঢেউ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে দেখতে অবাক বিস্ময়ে তার শুঁড় দুটো ফাঁক হয়ে গেল। ওপাশে শুয়ে আছে যেন গোটা দুই দত্যি-দানোর ছানা। মাঝে মাঝে হুম-হাম আওয়াজ করে উঠছে। হাত ছুঁড়ছে পা ছুঁড়ছে।

আরে ব্বাস, একটা ছোকরা তাকেই তাক করে মুতের পিচকিরি ছুটিয়ে দিলে। আর একটু হলেই ভেসে যেতো। হাঁফাতে হাঁফাতে রেনজের বাইরে গিয়ে কোনমতে বেঁচে গেল। একটু জিরোতে না জিরোতেই ফরুরুর্ ফরুরুর্ আওয়াজ শুনে উপরে চাইল। একটা মাদী আরশোলা ওর দিকে পিছন ফিরে ফরফর করে পাছার পাখা ঝাড়ছে। কি বাহার মাইরি! সে ভাবল, মাদীটার বেশ টসক আছে তো। একটু বেয়ে-চেয়ে দেখবে না কি?

কিন্তু তখন, যেহেতু সে মানুষ নয়, তাই মেয়ে দেখেই তার শরীর চনমন করে উঠল না। আরশোলার জগতে যখন তখন কেউ মাদীতে থাবল মারে না। ওদের সব সিজিন আছে।

মাদীটা ওকে দেখে নেমে এল। একটু দূরে থমকে দাঁড়াল। সেও শুঁড় ঘুরিয়ে মাদীটার মুখোমুখি হল। মাদীটা উপরের সবচেয়ে রংদার পাখনা দুটো খুলে এক ফাঁকে বিশ্বসুন্দরীর স্টাইলে শরীরটা দেখিয়ে দিলে। ভরা যৌবন টস টস করছে। ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাদীটা এবার আর একটু এগিয়ে এসে শুঁড় দুটো বাড়িয়ে দিল। দুবার তিরতির করে নাড়াল। এবারে তার শুঁড়েও সাড়া জাগল। তার জোয়ান কোমরটা ফরফর করে নাচিয়ে সে কাছে এসে দাঁড়াল। মাদীটা মিনমিন করে জানতে চাইল, নতুন না-কি।

—হ্যাঁ, সবে এসেছি। কী করে বুঝলে।

—হাবভাব দেখলেই বোঝা যায়। নতুন না হলে কেউ হাঁদার মত মরণের দিকে পোঁদ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে?

—মরণ?

হ্যাঁ গো। স্বয়ং যম। টিকটিকি। ওই তো, ওই খোঁড়লে বাসা। খপ করে একবার ধরলে আর বাপ ডাকার সময় দেবে না।

এটা তার মনেই হয় নি। সে বিলক্ষণ ভড়কে গেল। তার শুঁড় ঝুলে পড়ল। ভয়ে ভয়ে সে উপরের দিকে চাইল। নাঃ টিকটিকি আপাতত নেই। এবারে সে কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হল। পরক্ষণেই সে ভাবল, আরশোলা হওয়ার এই একটা মস্ত সুবিধে। ভয় পেলে সেটা চাপা দেবার জন্য মানুষের মত এখানে ভড়ং মেরে সিংহ সাজবার দরকার হয় না। এখানে যারা ভয় পায়, তারা সকলের সামনেই ভয় পায়। তাতে সময় থাকতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। অথচ আগের জন্মে ভয় চাপা দেবার জন্য কী লম্ফঝম্ফই না তাকে করতে হয়েছে। বুকের ধুক ধুক শব্দ যাতে কেউ শুনতে না পায় তার জন্যই তো হাক-ডাকে পাড়া মাথায় করে রাখত। অথচ রাত্রে ঘরের বাইরে বাথরুমে যেতে হলে বউ সঙ্গে যাওয়া চাই। বউ যেদিন উঠত না, সেদিন তক্তপোশের তলায় বসে ঘরের নালিতেই কম্মটি সারত। এ নিয়ে বউ মাঝে মধ্যে খোঁচা দিলে তার প্রেসটিজ ঢিলে হয়ে যেত। তাকে খুন করতে ইচ্ছে যেত।

পারেনি।

তার বদলে তাকে শাড়ি কিনে দিত, সিনেমা থিয়েটারে নিয়ে যেত, সোহাগ করত। ভাব দেখাত এমন, যেন প্রেম একেবারে উথলে পড়ছে। অথচ যেদিন স্বপ্নে দেখত বউকে বেধড়ক পিটচ্ছে, সেদিন যত সুখ পেত, তত সুখ সে গোটা বোতল গলায় ঢেলেও পায়নি। মানুষ হবার শালা ওই এক জ্বালা, কথাটা সে সবাইকে জানিয়ে বলতে চাইল, সব সময় নিজেকে ঢেকে রাখতে হয়। শালারা মুখোশ এঁটে থাকতে কী ভালই না বাসে?

মাদীটা শুঁড় বেঁকিয়ে বলল, আমার সাবধান করার কথা, করলাম। এখন পালিয়েই বাঁচ কি যমের পেটেই যাও, আমার কি?

সে কাঁচুমাচু হয়ে বললে, তোমাদের ওখানে আমার একটু জায়গা হবে?

মাদীটা তার দিকে একটু চোখ কুঁচকে তাকাল।

—হ্যাঁ-গা, সত্যি করে বলতো, তুমি কোথাকার আমদানি।

—কেন?

—এ তল্লাটের কোনও আরশোলাকে তো এমনি ধারা হেঁয়ালি কথা কইতে শুনিনি। তোমার দরকার থাকে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। যেখানে আমরা যখন থাকি, সেইটেই তখন আমাদের জায়গা। এর আবার আমার তোমার কী? যাবে তো চল নইলে থাক, আমি চললাম। এমন চারদিক হাট করে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা কইতে আমার বড় ভয় করে বাপু।

মাজার পাখনায় ঝটকা মেরে তরতর করে মাদীটা এগিয়ে চলল। সে-ও তার পিছনে পিছনে। দেখে সে অবাক হল মাদীটা এত তো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনাল, কই তাকে তো মারতে ইচ্ছে গেল না।

॥ দুই ॥

মাদীটার সঙ্গে থেকে সুখ আছে সাইরি। আরশোলাটা ইঁটের নিচ থেকে শুঁড় বার করে তিরতির করে নাড়িয়ে বিপদ আপদের তত্ত্ব নেবার চেষ্টা করছিল। না সত্যিই সে তোয়াজে আছে। বহু ভাগ্য-ফলে এমন একটা মাদী মেলে। এই ক'দিনের মধ্যে সে মাদী তো নিতান্ত কম মন্টালো না। কিন্তু এর একটা শুঁড়ের যুগ্যিও কেউ নয়। শুধু যে দেখতে সুন্দর তাই নয়। কাজে কম্মেও বেশ দড়। আর বুদ্ধিখানা কী? ও না থাকলে কবেই সে ফৌত হয়ে যেত।

আরশোলাটা শুঁড় ঘোরাতেই বাঁ দিকে বিপদের গন্ধ পেল। অমনি সে সুড়ুক করে ইঁটের ফাঁকে সেঁদিয়ে গেল। এসব ফিকির মাদীটাই ওকে শিখিয়েছে। শুঁড় বুলিয়ে সোহাগ করতে করতে মাদীটা বলেছে, আরশোলাদের কক্ষনো ফাঁকা জায়গায় থাকতে নেই। সব সময় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। দেওয়ালে টিকটিকি আর মেঝেয় কোলা ব্যাঙ, আরশোলার এই হল দুই যম। পাখিরা অবিশ্যি ঘরের ভিতরে ঢুকতে পার না, সেই যা বাঁচোয়া। তবুও যে কোনও পাখির কাছ থেকেই দূরে থাকা ভাল। তবে ব্যাঙই বল, টিকটিকিই বল আর পাখিই বল—ওরা আরশোলা খায়, তাই আরশোলা মারে। এরা শত্রু। আর শত্রুমাত্রেই ভয়াবহ। তবু মানুষের তুলনায় এরা দেবতা। ও জাত এমনই খচ্চর যে ওরা অকারণে যন্ত্রণা দেয়। দগ্ধে মারে।

আরশোলাটা ইঁটের ফাঁকে নিজেকে মিশিয়ে রেখে দেখল, বিপদটা কাছে এগিয়ে এসেছে। এ বাড়ির রাম টেঁটিয়া পাঁচকে ছেলেটা। কী-ই বা বয়েস। মুখ টিপলে এখনও হাফ লিটার দুধ বেরোয়, কিন্তু কি সাংঘাতিক হিংস্র। ভাবা যায় না। ছেলেটার হাত থেকে সেদিন নেহাত পরমায়ুর জোর ছিল বলেই সে বেঁচে গিয়েছে।

অথচ এই ছোঁড়াটাকে একেবারে দেব-শিশুর অবতার বলে ধরে নিয়েছিল সে। কারণ ও দেখেছিল, রোজ রাতে শুতে এসে বিছানার খালি জায়গাটা দেখে ছোঁড়াটা প্রায়ই জিজ্ঞেস করত, মা, বাবা কোথায় গিয়েছে। যতক্ষণ না উত্তর পাচ্ছে, ততক্ষণ সে ঘ্যান ঘ্যান করত, মা বাবা কোথায়? তারপর তার মা এক সময় বিরক্ত হয়ে জবাব দিত,

আমেরিকায়। নে ঘুমো। এই জাতীয় কথোপকথন শোনার পর তার ধারণা হয়েছিল, ছোড়াটার মনটা বোধ হয় নরম। তারপর ছোঁড়াটা যেদিন বলের এক ঘায়ে একটা টিকটিকির লেজ খসিয়ে দিলে, সেদিন সে সত্যি বলতে কি, ছোঁড়াটার হাতের টিপের প্রশংসাই করেছিল। মাদীটা বলেছে ঠিকই, মানুষ চেনা দায়। কি কুক্ষণেই সেদিন মাদীর কথায় কান না দিয়ে খোঁড়ল থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছিল। ছোঁড়াটা এক মনে খেলছিল দেখেই সে ভয় পায় নি। কিন্তু ওইটুকু ছেলের পেটে যে এত শয়তানি, তা সে বুঝবে কি করে। শয়তানটা ওকে দেখবা মাত্র করলে কি, ধাঁ করে একটা ঝাঁটা থেকে সুঁচলো কাঠি ভেঙে নিয়ে চোখের পলকে ওর পাছায় শূলের মত ঢুকিয়ে দিলে। যন্ত্রণায় ওর প্রাণটা বেরিয়ে যাবার জো হল। তার শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে বেঁকে উঠতে লাগল। কাঠির ডগায় সে ছটফট করতে লাগল। পায়ে শুঁড়ে দেহের মাংসে খিচুনি শুরু হল। নিদারুণ ব্যথায় সর্ব শরীর টনটন করছে। মনে হল যেন বিষ-জ্বর এসে গিয়েছে। কাঠির ডগায় শূলে বেঁধা অবস্থায় ও পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল। কিন্তু ছোঁড়াটার কি ফুর্তি। ওকে বেঁধা কাঠি নিয়ে ঘরময় নেচে কুঁদে বেড়াতে লাগল। এই যে আনাচে কানাচে, যে-সব জায়গায় আরশোলারা থাকে, এখন ছোঁড়াটা কাঠি নিয়ে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে, কাউকে পেলে আস্ত রাখবে! অন্যের পিছনে কাঠি দিয়ে আমোদ করা, এ কাজ শালা একমাত্র মানুষের জাতের পক্ষেই সম্ভব। সাহস যে এদিকে কত তা তো সেদিনই দেখা গিয়েছে। ওঃ সাহস বটে মাদীটার। ওর চীৎকার শুনে জীবন বিপন্ন করে ছোঁড়াটার মুখের উপর ফরফর করে যদি উড়ে না পড়ত, তাহলে আর দেখতে হত না। সেই দিনই তার আরশোলা জন্ম ঘুচে যেত। ছোঁড়াটা আচমকা ভয় পেয়ে কাঠি ফেলে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে দৌড় দিতেই আরশোলাটা জখম শরীরটা নিয়ে সেদিন কোনক্রমে পালিয়ে বেঁচেছিল।

ইঁটের ফাটলে শরীরটাকে প্রাণপণে সেঁপটে রেখে সে ঘেন্নায় শুঁড় ঘষতে ঘষতে বলে উঠল, এই সব খচ্চরই আবার বড় হয়ে ভিয়েতনামে শান্তি চাই, বলে ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল বার করবে।

সেইদিনই ছোঁড়াটার হাত থেকে বাঁচিয়ে করিৎকর্মা মাদীটা তাকে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিল। তার পশ্চাদ্দেশ তখনও যন্ত্রণায় অসাড়। ডাক্তার ডাকলে সে এসে নির্ঘাত রায় দিত, টেমপোরারি প্যারালিসিস। কোনক্রমে মাদীটার দেহে ভর দিয়ে পা কটাকে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বাথরুমের দরজার চৌকাঠে একটা সূক্ষ্ম ফোকর ছিল, এর আগে কোনদিন তার নজরে পড়েনি। মাদীটার পিছু পিছু সেই ফোকর দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখে বাঃ এ যে দিব্যি ব্যবস্থা। দরজার ফ্রেমটা যে এমন ফোঁপরা, তা বাইরে থেকে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই। ভিতরে প্রচুর জায়গা আর ঠাসা অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের ভিতর হাজার হাজার আরশোলা চাপ বেঁধে রয়েছে। মাদীটা তাকে নিয়ে সটান একেবারে দলপতির কাছে গেল। বললে, একটা মানুষের বাচ্চা এটাকে খুব জখম করে ছেড়েছে। সময়মত আমি গিয়ে না পড়লে ওর দফা রফা হয়ে যেত।

দলপতি বললে, থাক, এই অন্ধকারে থাক। অন্ধকারই আদি। অন্ধকারই জননী। আদি মাতা। আমরাও অন্ধকারের অন্তরঙ্গ। অতিশয় প্রাচীন। কোটি কোটি বছর ধরে আমরা আছি। আমরা থাকব। ভূমিকম্প, প্লাবন, প্রলয়, বিবর্তন আমাদের বদলাতে পারেনি। যেমন এসেছিলাম, তেমনি আছি। তফাৎটা দেখ। আমাদের আবির্ভাবের পরে কত কোটি কোটি মক্কেল এল কারও শুঁড়ে জোর, কারও দাঁতে ধার, কারও পায়ে ভার। অনেকে দিন কতক কত ফুটুনি মারলে, কত রোয়াবি, আবার স্বাভাবিক নিয়মে ফৌতও হল। মাটির ভাঁজে ভাঁজে এখন ইতিহাসের মশলা হয়ে তারা পড়ে আছে। তাদের মত্ততা ছিল কিন্তু মানুষের মত অহং ছিল না। মানুষের মত "আমি ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কাউকে রাখব না", এমন সর্বনাশা প্রতিজ্ঞা নিয়ে অন্য কাউকে উদয় হতে দেখিনি। কী ক্রুর, কী খল কী নিষ্ঠুর, কী উন্মাদ ওরা! হত্যার পিপাসা ওদের কখনও মেটে না। মানুষ ছাড়া আমরা আর সবাই এই বিরাট বিশ্বে মিলে মিশে ছিলাম। নিপাট সহাবস্থান। সৃষ্টির কুটোটি কেউ কখনও নষ্ট করিনি। আমরা শত্রুর কাছ থেকে দূরে থেকেছি, অসতর্ক হলে জীবন দিয়েছি, কিন্তু পাইকারি হত্যায় মেতে উঠিনি কেউ। কিন্তু দেখ, মানুষকে দেখ। ওরা যা চায় না, ওদের যা মোনাসিব নয়, তাকে ঝাড়ে বংশে নির্মূল করে ছাড়ে। গাছপালা তৃণ গুল্ম কীট পতঙ্গ মাছ পাখী পশু—মানুষের হাতে কেউ রেহাই পায়নি। অন্যে পরে কা কথা, অনাবশ্যক মনে হলে ওরা গায়ের লোম পর্যন্ত ছেঁটে ফেলে। ওরা আলোর উপাসক। আলো মাতৃদ্রোহী। অন্ধকার থেকে আলোর জন্ম। সেই আলো অন্ধকারকে ফালা ফালা করে চিরবার জন্য সতত ছুরি শানাচ্ছে। হত্যার এই সহজাত প্রবৃত্তি মানুষ শয়তান আলোর কাছ থেকে ধার করেছে। সাবধান, আলোর ফাঁদে পা দিও না। মরবে। আলো হচ্ছে ধাঁধাঁ, মায়া, আলো মোহ, ছলনা, আলোই যন্ত্রণা। তাই বলি অন্ধকারে থাকো। মাতৃগর্ভ অন্ধকার, মৃত্যুতে আত্মসমর্পণ অন্ধকারে ফেরা। অন্ধকারই নিশ্চিন্ত আশ্রয়। এসো আমরা এই নিশ্ছিদ্র, নিস্তরঙ্গ, নিরবধি অন্ধকারেই থাকি।

হাজার হাজার আরশোলা সমস্বরে এই সামমন্ত্র পুনরাবৃত্তি করতে লাগল, এসো আমরা এই নিশ্ছিদ্র, নিস্তরঙ্গ, নিরবধি অন্ধকারেই থাকি।

এক সময় সে অবাক হয়ে দেখল, তার শুঁড়ও কখন যেন সুর মিলিয়ে কাঁপছে।

এই মন্তর পড়তে পড়তে দলপতি তার জখমি শরীরটা বেশ করে ঝেড়ে দিল। তারপর ঝিম মেরে পড়ে রইল। আর আরশোলাটা অনুভব করল অন্ধকারের অনাবিল করুণাধারায় তার জ্বালা-যন্ত্রণা সব নিঃশেষে মুছে গেল। কি শান্তি! কি শান্তি! তার চোখ ভরে ঘুম এল। সে মাদীর গায়ে ঠেস দিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেদিন থেকেই অন্ধকারকে সে আপন করে নিল। তারপর অনেক অনেক দিন সে চৌকাঠের ফোকরের অন্ধকারে কাটিয়ে দিল। আরশোলার ঝাঁকে যত সহজে মিশতে পেরেছিল, ঠিক ততটা সহজে কিন্তু ওদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি সে রপ্ত করতে পারেনি। সময় লেগেছিল। আগের জন্মে সে হালে পানি না পেয়ে এক দাদার শরণ নিয়েছিল। দাদা তাকে বীজ মন্তর দিয়েছিলেন, "মানুষ যুক্তিশীল।" সেই পেঁয়াজি কলেবর পাল্টাবার পরও কিছু-দিন কুটকুট করেছে। আগের জন্মে সে যুক্তির পিছনে ছুটেছে। সে অভ্যাসটা প্রথম প্রথম তাকে কিছুটা অসুবিধেয় ফেলেছিল। এখন আরশোলা হয়ে তাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছে সংস্কারের উপর। আরশোলার দৃষ্টিতে এখন সে আবিষ্কার করল, যুক্তিশীলতার আদি ও অন্তের গোঁজামিলটা ফাঁকা বুকনির ফুলঝুরি দিয়ে কেমন বিলক্ষণ ঢাকা। ভূতের ঘরে চুরি করতে মানুষের চেয়ে ওস্তাদ তো আর কেউ নেই। নিছক যুক্তি মানুষকে কী দিয়েছে? দিয়েছে বিজ্ঞান, দিয়েছে সংগঠন। বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত কী দিয়েছে? ব্যাপক ধ্বংসের আণবিক হাতিয়ার। নাও শালারা এবার দমাদম ফাটাও বোমা। কেরদানি কেলিয়ে যাবে। এতদিন আর সবাইকে সাবড়েছ, এবার ঝাড়ে বংশে নিজেরাই নির্মূল হও। আমাদের কী।

আরশোলাটা শুঁড় দুলিয়ে বলে উঠল, যাদের মেরুদণ্ড নেই, আণবিক রেডিয়েশন তাদের একগাছা রোঁয়াও ছিঁড়তে পারবে না। প্রকৃতির সেই রকমই ইচ্ছে।

তারপর সে ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ ঝিম

মেরে পড়ে রইল। আরশোলারা মানুষের মত অবিরাম উচ্চ ভাবনা ভেবে যেতে পারে না। তাই মাথার খুপরিতে উচ্চ চিন্তা একবার ঘাই মেরে উঠলেই বেশ কিছু-ক্ষণের জন্য ওদের শরীরটা নেতিয়ে পড়ে। বেশ খানিকটা পরে ওর নির্জীব শরীর আবার চনমন করে উঠতেই বোঝা গেল আরেক কিস্তি গভীর চিন্তা ডেলিভারি দেবার মত শক্তি ওর মগজে জমা পড়েছে।

শুঁড় দুটো তিরতির করতে করতে ও ভাবতে লাগল, যুক্তিশীলতার আরেকটি অবদান হল মানুষের জটিলতম সামাজিক সংগঠনের গ্যাঁড়াকল। এই জটিল যান্ত্রিকতার লেবেলের নামই আবার সভ্যতা। সভ্যতা! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। এমন চূড়ান্ত অসভ্যতা কেউ কখনও দেখেছে? নাও, শুধো—এখন নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে মর। অস্তিত্বের স্বাভাবিক পটভূমি থেকে অনেক রংবাজি করে তো নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিস। জটিলতার এই বিরাট বোঝা এখন হাতের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। একাকীত্বের অনন্ত অসহায় শূন্যতায় এখন খাও শুধো—ত্রিশঙ্কুর মত ঘুরপাক। সুখ মেটাতে রংবাজি করেছ, এখন জ্বালা মেটাতে জন্মভর ঝাঁপ দিতে থাক।

আরশোলার জীবনে বাপধন! এসব বালাই নেই, আমাদের জীবনে সংস্কারই সম্বল। কথাটা বলেই সে আবার নেতিয়ে পড়ল। একটু পরে ধড়মড় করে উঠেই বুঝল, সিজিনের টীন শুরু হয়েছে। বংশ-রক্ষার অন্ধ প্রবৃত্তি তাকে মাদীর কাছে টেনে নিয়ে চলল। ভাবনা চিন্তায় ঝাঁপ ফেলে, শুঁড় বাগিয়ে দিল দৌড়।

তার আর মাদীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় সেই চৌকাঠের ফোকরে ঝাঁক ঝাঁক আরশোলা জন্ম নিল। ছানা পোনা নিয়ে তারা বেশ ছিল। তারপর একদিন মহা-সর্বনাশ অতর্কিতে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাড়ির বউ একদিন পায়খানায় কিল-বিল একটা চালা চলতে দেখে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে তুলল। ও হলপ করে বলতে পারে, চালাটা বিন্দুমাত্র ক্ষতিও কারও করেনি। অথচ বাড়ির লোকেরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চালাটাকে মারবার জন্য যথারীতি তোলপাড় করে তুলল। চালাটা চৌকাঠের ফোকরে ঢুকে গা ঢাকা দেওয়ায় তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু ততক্ষণে ও বাড়ির সকলের মাথায় খুন চেপেছে। অল্পে ছেড়ে দেবার বান্দা মানুষ নয়। যখন কিছুতেই চালাটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন মানুষের যুক্তিশীলতা চৌকাঠটা উপড়ে ফেলতে ওদের পরামর্শ দিলে। আর যাবে কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রী ডেকে আনা হল।

দুমদাম ঘা মেরে সে চৌকাঠটা খসিয়ে দিল। অন্ধকারের অসহায় প্রজারা আলোয় এসে দিশাহারা। বাড়িসুদ্ধ লোক খুনের নেশায় কি বীভৎস উল্লাসে মেতে উঠল। আর তাদের সে কী উত্তেজনা, কী বাঁধভাঙা আনন্দ! যেন এটা একটা বেশ মজার পরব।

সে দেখল, ঝাঁটার নিষ্ঠুর ঘায়ে তার সন্তান সন্ততিরা কেমন দলে দলে প্রাণ দিল। বাঁচাও। বাঁচাও। তাদের করুণ আর্ত চীৎকারে বাথরুমের বাতাস ভরে গেল। কিন্তু আততায়ীদের কারও মনেই তা বিন্দুমাত্র দাগ কাটল না। এই অতর্কিত হত্যাকাণ্ডে সে এমনই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, যে পালিয়ে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটাও ক্ষণ-কালের জন্য অসাড় হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মাদীটা কোত্থেকে তার পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুঁড়ের ধাক্কায় তাকে সচকিত করে বলে উঠল, উপরের জানালা দিয়ে—পালাও।

সে দেখল, মাদীটা জানালা লক্ষ্য করে পাখা মেলে ফরফর করে মারল এক লাফ। সে-ও। কিন্তু ঝাঁটার সপাৎ ঘায়ে তার চোখের সামনে মাদীটা মুখ থুবড়ে নিচেয় পড়ল। ধড়ফড় করতে লাগল। তার কানে মাদীর শেষ কথাটা এসে ধাক্কা দিল—"পালাও।" সে প্রাণপণে উড়ে পায়খানার জল দেবার ছোট্ট ট্যাংকটার উপরে কোনমতে উঠে পড়ল। তারপর নিরাপদ আশ্রয়ে শরীর ঢেকে এই নিধন যজ্ঞ দেখতে লাগল। সপাং সপাং ঝাঁটা চলছে। একবার দেখল, মাদীটা চিত হয়ে ছটা পা তুলে আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করল। সপাৎ করে তার উপর ঝাঁটা পড়ল। সে দেখল, মৃত্যু যন্ত্রণায় মাদীটার সর্ব শরীর থরথর করে কাঁপছে। সপাৎ। আবার ঝাঁটা পড়ল। কয়েকটা অন্তিম খিঁচুনির পর শরীরটা নিথর হয়ে এল। সপাৎ সপাৎ। নিমেষে মাদীটার শরীর থেঁতলে একটা আকারহীন মণ্ড তৈরি হল। কাঠিতে কাঠিতে সেই আঠালো মণ্ড জড়িয়ে জড়িয়ে যেতে লাগল। তার শরীর গুলিয়ে উঠল। সে চোখ বুজে ট্যাংকের অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

॥ তিন ॥

গডরেজের আলমারিটার পিছনে সে কোনমতে দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে রইল। সংস্কারবশেই সে বুঝতে পেরেছিল, আশ্রয়টা খুব নিরাপদ নয়। কিন্তু উপায় কি, কদিন ধরে সারা বাড়িটা খুঁজে কোনও কোনায় এমন একটু আবর্জনা পেল না, যেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে দুদণ্ড বসতে পারে। আলমারির পিছনটা একটা আড়াল বটে, তবে একেবারে অরক্ষিত। দিনরাত তাই ভয়ে ভয়ে আছে। এত বড় একটা বাড়ি। কদিনের মধ্যেই সরেজমিনে তদন্ত করে বুঝতে পারল বাড়িটা তেরতলা। সরকারি দফতর। কিন্তু আগাগোড়া বাড়ি একেবারে সিমেন্ট কংক্রীট আর ইস্পাত দিয়ে তৈরি। ব্যাটাদের এমনই বজ্জাতি যে দরজা জানালা-গুলোতে অবধি কাঠের বদলে ইস্পাত লাগিয়েছে। দেওয়াল মেঝে ঝাড়া-পোঁছা।

কোথাও একদণ্ড দাঁড়াবার জায়গা নেই। রাত্তিরেও ঘরে আলো জ্বলে। বদমায়েশির আর শেষ নেই। তেরতলার উপরে কেয়ার টেকারের রান্নাঘরে কি একতলার ক্যানটিনে সুবিধেমত জায়গা পাবে ভেবেছিল। কিন্তু ও বাবা, কেয়ারটেকার গিন্নীর আবার যা আরশোলা-আরশোলা বাতিক। দিন রাত কীটঘ্ন রাসায়নিকের পিচকিরি হাতে নিয়ে ঘুরছে। দেখামাত্র সে আর ঝুঁকি নেয়নি, কেটে পড়েছে। আর ক্যানটিনে উঁকি মারা মাত্র 'ওই একটা' বলে একটা ছোকরা যেই ঝাঁটা উঁচিয়ে তেড়ে এসেছে, অমনি সে-ও ফর্‌র্‌র্‌।

অনেক কষ্টে খুঁজে পেতে সে এই দফতরে একটা গডরেজের আলমারির আড়াল পেয়েছে। ঝাঁটা খাওয়া আরশোলা মানুষের গোঁফ দেখলেই ডরায়। তার ভাগ্যি ভাল যে, যে-দুটো চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপর ঘর ঝাড়পোছের ভার, তারা দুজনেই ইউ-নিয়নের পাণ্ডা। বেতন বৃদ্ধি, লেট-ফাইন রদ, কাজের ঘণ্টা কমানো প্রভৃতি জনহিতকর দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগেই ভাগ্যিস তাদের সময়টা কেটে যায়, তাই সে সেখানে কোনমতে টিঁকে আছে। আর তার বড় বন্ধুর কাজ করেছে কীটঘ্ন সরবরাহকারী কন্ট্রাকটার। অমন দয়ার শরীর বড় একটা দেখা যায় না। উপরের মহলে বিলক্ষণ যাতায়াত, সেই সুবাদে তাঁর কীটঘ্ন রাসায়নিকে পচানব্বই ভাগ ভেজাল। যেদিন পিচকিরিওয়ালা এসে প্রেমসে হোলি খেলে যায়, সেদিন ওই শতকরা পাঁচ ভাগ কীটঘ্ন তার শরীরে কেমন একটা রিমঝিম নেশা ধরিয়ে দেয়। তার বেশ মৌতাত এসে যায়। ঝিম মেরে বসে সে সেই ঘোর লাগা চোখে এই ঘরের মানুষগুলোর বিভ্রান্তিকর কাজকর্ম দেখে, আবোল-তাবোল কথাবার্তা শোনে। এক একটা লোক যে কত বিভিন্ন লোকের সমষ্টি, এটা আবিষ্কার করে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

সেকশনের ইন-চারজ নিকুঞ্জবাবুর কথাই ধরা যাক। ও-বাড়ির বাথরুম থেকে পালিয়ে সে এই নিকুঞ্জবাবুর কোটের বুক পকেটেই একটা ফ্রেনচ পিকচারের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। সেই কোটের দৌলতেই সে এই দফতরখানায় এসে হাজির হয়েছে। আরশোলাটা এই ক'দিনেই লক্ষ্য করেছে:

(এক) নিকুঞ্জবাবু বাড়িতে জপতপ করেন। সকালে উঠেই ছাতে দাঁড়িয়ে মা মা বাবা বাবা ব্যোম ব্যোম হাঁক ছাড়েন,

(দুই) জাঁদরেল বউটার সামনে ভাম মেরে থাকেন,

(তিন) পুজোসংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় অশ্লীল গল্প প্রকাশিত হলে সম্পাদককে অভিসম্পাত দেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাতে সে-সব মাল তার ডাগর মেয়েদুটোর হাতে কোনক্রমেই না পড়ে,

(চার) অফিসে বড় সাহেবকে যথামতে তেল দেন, সেখানে তিনি কেঁচোর চেয়েও সুনীচেন,

(পাঁচ) নিরীহ অধস্তন কর্মচারীদের কাছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার,

(ছয়) অফিসের উন্নতিকামী যে-সব মেয়ে তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী তাদের মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক নিয়ে গিয়ে গা চেটে ছেড়ে দেন,

(সাত) গম খেলে পেটে বায়ু হয় তাই অপিসের বেয়ারাকে দিয়ে কালোবাজার থেকে চাল কিনে আনান,

(আট) যে ইংরাজি দৈনিকটি তাঁর দফতরের ভারপ্রাপ্ত প্রোগ্রেসিভ্ মন্ত্রী গীতা বাইবেলবৎ জ্ঞান করেন তার লেটারস কলমে দুর্নীতি দূর করার নানা প্রস্তাব দিয়ে চিঠি লেখেন,

(নয়) নিয়মিত রাম খেলে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো অধিক বয়েস পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে, তাই ফ্লাসকে সর্বদাই দ্রব্যটি ভরে রাখেন এবং তাই দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করেন

এবং (দশ) টপ প্রাইওরিটি ফাইল ক্লিয়ার করার জন্য প্রায়ই অফিসের ডবকা মেয়েটিকে ওভার টাইম দিয়ে আটকে রাখেন।

ক'দিন ধরে সে লক্ষ্য করেছে এই হল নিকুঞ্জবাবু নামক মানুষটির দশকর্ম। নাটক মন্দ নয়। সেদিন তার কি মতিভ্রম হল, নিকুঞ্জবাবুর গেলাসের তলানি থেকে রাম চাটবার মানসে ঢুক করে ড্রয়ারের ভিতর ঢুকতেই আটকা পড়ে গেল। পাছে বিপদ ঘটে, এই ভয়ে কিছুক্ষণ শিঁটিয়ে পড়ে রইল। তারপর উপরে নিকুঞ্জবাবুর গলার মোলায়েম আওয়াজ পেয়েই বুঝল ওভারটাইমের দিদিমণি এসে গিয়েছেন। এখনও তো ছুটি হয়নি। আজ এরই মধ্যে যে! যাক নিশ্চিন্ত। এবার, সে জানে, বেশ কিছুক্ষণ র‍্যালা চলবে। দিদিমণি ঠোঁটে অভিমান লাগিয়ে বকেয়া হিসেব নিয়ে গাওনা শুরু করবেন। বুড়ো ভাম তার মন ভেজাতে কথার তুবড়ি ছোটাবে। ছোটাক।

সে ধীরেসুস্থে শুঁড় লাগিয়ে গেলাসের গা থেকে সবে দুটি টান দিয়েছে, শরীরটা সবে চনমন করে উঠেছে, হঠাৎ এক ঝটকায় ডালাটা খুলে গেল ড্রয়ারের। আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির তাগিদে ফর্‌র্‌র্‌ করে সে দিল এক লাফ। আচমকা পড়ল গিয়ে দিদিমণির বুকে, তারপর গুটি গুটি সেঁধিয়ে গেল লো-কাট ব্লাউজের খাঁজে।

ম্যাগো, আরশোলা—বলেই দিদিমণি পরিত্রাহি এক চীৎকার দিয়ে চেয়ার উল্টে ভিরমি খেলেন। আরশোলাটা ভাবল, ব্যস্ খতম। অতঃ কিম্। মুহূর্তের মধ্যে সে অনুভব করল ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান হাত ধরাধরি করে এসে তার সামনে সারিবেঁধে দাঁড়াল। আর তার ভিতরের সুগভীর অন্ধকার থেকে প্রসন্ন এক মন্দ্রস্বর তাকে ডেকে বলল, দ্বিধা কেন? সৃষ্টি অনাদি অনন্ত অফুরন্ত প্রাণের স্রোত মাত্র। তুমি তারই একটি বিচিত্র বুদ্‌বুদ্। ওঠো, চল, ভেসে পড়। এই শ্বাশ্বত প্রবাহে নিজেকে মিশিয়ে দাও।

আর তারপরই তার হৃদয়স্থিত অভয়া মাতৃমূর্তি সেই ছিন্নমস্তা ঘোর অন্ধকার বেগবতী ফোয়ারা হয়ে ত্রিলোকে উৎসারিত হল। হাতছানি দিয়ে তাকে বললে, এই পথ।

ঘরভর্তি লোকের হই চই চীৎকারে তার চটকা ভাঙতেই দিদিমণির স্থিতিস্থাপক ব্রেসিয়ারে শুঁড় মুছে সে থোঁয়াড়ি ভেঙে নিল। হাঁচোড় পাঁচোড় করে সেই কমণীয় স্তূপের গা বেয়ে উপরে উঠে দ্যাখে ততক্ষণে এলাহি কাণ্ড শুরু হয়েছে। অফিসসুদ্ধ লোক সেই ঘরে জড় হয়ে ভিড় বাড়াচ্ছে আর একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে: সরে যাও, সরে যাও, হাওয়া আসতে দাও। বাতাস কর। ব্লটিং পুড়িয়ে নাকে ধর। দাঁতের ফাঁকে চাবি গুঁজে দাও।

এক জুনিয়র ছোকরা প্রভুর নজরে পড়ার জন্য বললে, স্যর, ওর কাপড়-চোপড় আলগা করে দিন না।

শাট্ আপ্, নিকুঞ্জ খিঁচিয়ে উঠল।

গুড্ অ্যাডভাইস্, স্যর। উনি একটু আরাম পেতেন। ওপাশ থেকে কে একজন আওয়াজ দিলে।

শাট্ আপ্। আবার নিকুঞ্জর হাঁক। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যাওয়ায়, সে কী করবে, ঠিক বুঝতে পারছিল না।

আরেকজন খপ করে নিকুঞ্জর ফ্লাসকটা নিয়ে অন্যজনকে এগিয়ে দিয়ে বললে, জল, জল ছিটিয়ে দিন ওর মুখে-চোখে। নিকুঞ্জ হাঁ হাঁ করে ওঠার আগেই একজন ফ্লাসক খুলে দিদিমণির মুখে দুটো ঝাপটা দিতেই ঘরময় রামের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। কে যেন চুচ্‌ক্ চুচ্‌ক্ করে জিভ টানল।

দিদিমণিও ওয়াক ওয়াক আওয়াজ তুলে ধড়মড় করে উঠে বসে চেঁচিয়ে বললে, এসব কি, অ্যাঁ এসব কি, ওয়াক ওয়াক, উঃ কি বিচ্ছিরি গন্ধ। বাবাঃ!

দিদিমণি পোষাক-আষাক সামলে নেবার আগেই আরশোলাটা ক্ষিপ্রগতিতে এক লাফে প্রথমে দিদিমণির গালে, তারপর চুলে, তারপর আরেক লাফে নিকুঞ্জর টাকে গিয়ে বসল।

দিদিমণি "বাবা গো—", নিকুঞ্জ "নুইসেনস" এবং ঘরভর্তি লোক, "ওই যে ওই যে শালা" বলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর যা কাণ্ড ঘটল, মানুষ হলে তাকে বলত, মহাযুদ্ধের ইতিহাস।

পুরো একটি ঘণ্টা ধরে সেই করে প্রচণ্ড হুল্লোড় চলল। তাবৎ মানুষ যেন মেয়ের ইজ্জতে হাত দেবার মারাত্মক অপরাধে আরশোলাটাকে খুন করার জন্য খেপে গেল।

ফাইল, পেপার-ওয়েট, পিন কুশন—যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে মহাবেগে আরশোলাটাকে আক্রমণ করল। আর আত্মরক্ষার প্রকৃতদত্ত সংস্কার সারথি হয়ে তাকে নিরাপদে সেই ব্যূহের ভিতর ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল।

"মার, মার, মেরে ফ্যাল"—বলে হিসটিরিয়া রোগীর মত চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দিদিমণির কণ্ঠস্বর একসময় ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। অমন সুললিত কণ্ঠ থেকে শেষ পর্যন্ত ফ্যাস ফ্যাস আওয়াজ আর খকখকখক কাশি ছাড়া আর কিছু বের হল না।

অতগুলো লোকের একটা অঙ্গও আরশোলার কেশস্পর্শ করতে পারল না যখন, তখন পরিশ্রান্ত লোকগুলো, "বড্ড টায়ারড্ স্যার, আজ বাড়ি যাই", বলে নিকুঞ্জর কাছে আবেদন পেশ করল। এবং তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই খেলাভাঙা মাঠের দর্শকদের মত দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেল।

ঘরের সেই তচনচ অবস্থা দেখে সেকশনের কর্তা নিকুঞ্জ মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর দিদিমণিকে উঠতে দেখে, "ও কি; তুমি কোথায় যাচ্ছ। আমি তোমাকে পৌ—" এই পর্যন্ত যেই বলেছে, অমনি দিদিমণি "থাক খুব হয়েছে, এই-মদের গন্ধ গায়ে মেখে আমি কোন মুখে বাড়িতে উঠব," বলে মুখ ঝামটা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আর আরশোলাটা সিলিং ফ্যানের পাখার পিঠে বসে বসে পুরো রঙ্গটা দেখল। পরিশ্রম তারও হয়েছিল। সে ঝিমোতে লাগল।

ক্রমে অফিস বাড়িটা নিস্তব্ধ অন্ধকারে ভরে উঠল। নিচে নিকুঞ্জর কাত হয়ে পড়ে থাকা ফ্লাসকটা অনেকক্ষণ থেকেই তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। গোটা ঘটনায় নিকুঞ্জ জীবন সম্পর্কে এমনই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে মালের ফ্লাসকটাকে বিষ্ণুপ্রিয়ার মত পরিত্যাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে তার একটুও বাধল না। আরশোলাটা ডানা মেলে সিলিং ফ্যান থেকে নেমে এসে ফ্লাসকে শুঁড় চুবিয়ে চুক চুক করে বেশ খানিকটা মাল খেয়ে বেশ ফ্রেশ বোধ করতে লাগল। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আর তারপরই মাল খেলে বরাবর তার যা হয়, দেখল আরশোলা হয়েও সেই মারাত্মক বদভ্যাসের হাত থেকে নিস্তার পায় নি। একটু মাল খেলেই তার আরও খেতে ইচ্ছে করে, তারপর আরও, তারপর আরও। অতঃপর জগতটাকে তার স্বাদ-বর্ণ-গন্ধহীন বিস্বাদ এক অ্যারারুটের পিণ্ড বলে মনে হতে থাকে। তার তলপেটে একাকীত্বের শূলবেদনা, মনে যুগ যন্ত্রণা, এবং অকুস্থলে অর্শের খোঁচা যুগপৎ চেগে ওঠে।

সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তাকে পেড়ে ফেলার আগেই সে বলে উঠল, ধুস্ শালা

আজ সুইসাইড করব। এই কথা বলে,. তার টলে টলে পড়া পা দু'টাকে সামলে নিয়ে আবার সিলিং ফ্যানটায় উঠে বসল। তারপর 'আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে' এই কথাটা বার কতক আউড়ে দিল লাফ। একটা টপ প্রায়োরিটি মার্কা ফাইলের উপর ঠপ করে এসে পড়ল। মরল না। বার কয়েক চেষ্টার পর যখন সে বুঝতে পারল মাধ্যাকর্ষণের ফেরেববাজির ফলে এই পথে আরশোলার পক্ষে মৃত্যু সম্ভব নয়, তখন মানুষের মত "সে শালা ঈশ্বর কোথায় গেল" বলে সে ফর্‌ফর্‌ করে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দাপিয়ে বেড়াল। তারপর আরশোলাটা পাগলের মত তুড়ি লাফ দিয়ে দিয়ে এ ফাইল থেকে ও ফাইল, ও ফাইল থেকে সে ফাইলে, আলমারির গায়ে, দেওয়ালে, শূন্যে তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। দেওয়াল থেকে গডরেজের গায়ে এমনি একটা লাফ মারতেই সে একেবারে তার মুখের কাছে গিয়ে পড়ল।

তারপর আরশোলাটাকে কোনপ্রকার পেঁয়াজি করার সুযোগ না দিয়ে টিকটিকিটা দুটো ঝটকানে তাকে মুখে পুরে নিমেষের মধ্যে কচমচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।

বিজ্ঞান ও প্রগতির পথ

অম্লান দত্ত

(১)

আমরা তার্কিক। অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এদেশের মাটিতে এখনও শিকড় গাড়তে পারল না। কেন?

পুরনো কথা দিয়ে শুরু করি। বৈদিক-যুগের শেষ দিকে আচার-অনুষ্ঠান, বিশেষত যাগযজ্ঞ, ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠলো। ব্রহ্মের ব্যক্তসত্তা এই বিশ্ব নিয়ত নিজেকে আহুতি দিচ্ছে অব্যক্ত ব্রহ্মের কাছে। যজ্ঞ ও মন্ত্রকে কেন্দ্র করে সমাজে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হল; সেই সঙ্গে বর্ণ-ভেদ প্রতিষ্ঠিত হল। পুরুষসূক্তে শুধু একটি চরাচরময় আহুতিই কীর্তিত হয়নি, চতুর্বর্ণের অলৌকিক ভিত্তিও কল্পিত হয়েছে।

আচার ও উচ্চবর্ণের এই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিতে দেরি হয়নি। বিদ্রোহ নানা রূপ নিয়েছে। রামায়ণে দেখতে পাই আত্মবিদ্যা ও আন্বীক্ষিকীর ভিতর বিভেদের সূচনা। আন্বীক্ষিকী তর্কে ও বিচারে বিশ্বাসী। মহাকাব্যে অভিযোগ শুনতে পাই যে তার্কিকদের তর্কে প্রাচীন বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে; আচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বিচার।

শুধু চার্বাকই বেদকে অস্বীকার করেন নি; জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মেও বেদ অস্বীকৃত। ভগবান সম্বন্ধে বুদ্ধ মৌন ছিলেন। মানুষের দুঃখ কি করে দূর করা যায় এটাই তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল। বুদ্ধ কার্যকারণ সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন। দুঃখ-বিষয়ক চিন্তায়ও সেই একই কথা: প্রথমে দুঃখের মূল কারণ আবিষ্কার করা আবশ্যক, তারপর সেই কারণ দূর করে তবেই দুঃখ-তপ্ত প্রাণীদের আর্তিনাশ সম্ভব। ধর্মীয় জীবনে বুদ্ধ ব্রাহ্মণের একাধিপত্য অস্বীকার করলেন; নিম্নবর্ণকেও তিনি ধর্মের সাধনায় উচ্চস্থান দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ ছিলেন জ্ঞানের পথের যাত্রী। তাঁর কাছে যাগযজ্ঞের চেয়ে সৎচিন্তা বড়। তিনি চিত্তকে সজাগ রাখতে বলেছিলেন। মৃত্যুর আগে রোরুদ্যমান শিষ্যদের জন্য বুদ্ধ বাণী দিয়ে গেলেন: অন্তরের আলোতেই নিজের পথ চিনে নিও, অন্য পথপ্রদর্শক নেই।

কিন্তু এই বিচারের ধারা ব্যবহারিক জীবনে খুব বেশী উন্নতি এনে দিতে পারে নি। ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা খানিকটা এগিয়ে থেমে গেছি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে আমরা পঞ্চভূতের কথা ভেবেছি এবং বস্তুর গঠন ও উপাদান সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করেছি; লৌহ প্রস্তুত করতে শিখেছি; অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞানলাভ করেছি; ইত্যাদি। কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে বৈজ্ঞানিক নিয়মের উপর এই জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রায়ই সম্ভব হয় নি। প্রাচীন ভারতের প্রতি অতিভক্তি হেতু আমরা অবশ্য অনেক সময় দাবি করে বসি যে, অদ্যাবধি বিশ্বের বৈজ্ঞানিকেরা যা-কিছু জেনেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন তা সবই আমাদের ঋষি ও পণ্ডিতদের জ্ঞাত ছিল। কথাটা বিচারে টেকে না। ঋষিদের আত্ম-বিদ্যা নিয়ে এখানে প্রশ্ন তুলছি না। বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারিক জ্ঞানের কথাই আপাতত আলোচনা করছি। এই জ্ঞানের ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের অধিকার বাড়ে; পার্থিব শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন ভারত যদি এই বিজ্ঞানপ্রদত্ত জ্ঞান ও শক্তিতে সত্যি অতুলনীয় হত তা হলে বহিঃশত্রুর কাছে সে বারবার পরাজিত হত না। এমন কোনো অতুলনীয় জ্ঞানলাভ যে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, এটা লজ্জার কথা নয়—ইতিহাসের সেই পর্যায়ে সেটাই স্বাভাবিক। তবে ঐ সত্যটাকে আজ স্বীকার করে নেওয়া ভালো। বিজ্ঞানের অতি আধুনিকতত্ত্ব দূরের কথা, প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতেরা মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও আবিষ্কার করতে পেরে-ছিলেন বলে মনে হয় না। অনেকে অবশ্য এ প্রসঙ্গে ভাস্করাচার্যের নাম উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহা এ বিষয়ে লিখেছেন: "এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। ...কিন্তু এই সমস্ত "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন না।...সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোনো হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহু পূর্বেই মাধ্যা-কর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নয়।" (মেঘনাদ রচনা সংকলন, পৃঃ ১৬১)। অতীতের মুগ্ধপ্রেমে ঐতিহাসিক বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দেওয়া বিবেচকের কাজ নয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের তার্কিকেরা তর্ক-বিদ্যায় নিঃসন্দেহে কুশলী ছিলেন। তাঁদের যে-ধীশক্তি বাহ্য জগৎকে জয় করতে পারে নি, অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্যের ক্ষেত্রে একান্ত নিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়ে বৃহৎ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, সেই বিশ্লেষণী শক্তিদ্বারাই আবার তাঁরা জগতকে মিথ্যা প্রমাণ করে গেছেন। শঙ্করাচার্য বা নাগার্জুনের চেয়ে বড় তার্কিক কে? অবশ্য ন্যায়দর্শনে জগৎকে মিথ্যা বলা হয় নি। কিন্তু বেদান্ত বা বৌদ্ধ দর্শনেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেশী। জগৎ সম্বন্ধে চিন্তার ভিত্তি হিসাবে যে আদি প্রত্যয়গুলি আমরা অনিবার্যভাবে গ্রহণ করি সমালোচনায় সেগুলিকেই 'মিথ্যা', অর্থাৎ আত্মবিরোধে চিহ্নিত, মনে হতে পারে। বুদ্ধি দিয়ে জগৎসৃষ্টি বোঝা যায় না। সৃষ্টির আগে কি ছিল? সৃষ্টির আগে তো কিছু থাকা সম্ভব নয়; অথচ শূন্য থেকেও কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। সৃষ্টি যদি রহস্যাবৃত হয় পরিবর্তনও কি তেমনই রহস্যময় নয়? ক থেকে খ-এর উদ্ভব; কিন্তু ক-এর ভিতরই কি খ নিহিত ছিল? তবে দুয়ের ভিতর পার্থক্য কি? ক-এর ভিতর কি খ নিহিত ছিল না? তবে খ এলো কোথা থেকে? জগৎকে অথবা পরিবর্তনকে সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়; কিন্তু সত্য বলে প্রমাণ করা কঠিন।

অথবা বলা যায় যে জগৎ সত্যাসত্যের সমন্বয়; অর্থাৎ, এক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে মিথ্যা। জগৎ সত্য কি মিথ্যা এই তর্কে বুদ্ধিকে আমরা ক্লান্ত করতে পারি, কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান তাতে বাড়ে না। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান বলতে যা বুঝি জগৎ সম্বন্ধে 'ব্যবহারিক' জ্ঞান নিয়েই তার কারবার। সেকালের পণ্ডিতেরা অধীতব্য বস্তুকে নানাভাবে সাজাতে পারদর্শী ছিলেন; তর্ক-জাল বিস্তারেও মধ্যযুগীয় মনের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কিন্তু সেই তার্কিক বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এক বস্তু নয়। আমরা আজও যতখানি তার্কিক ততখানি বৈজ্ঞানিক নই। এদেশের মন থেকে মধ্যযুগ এখনও বিদায় নেয় নি।

(২)

ঊনিশ শতকের গোড়ায় আশা জেগে-ছিল যে নতুন পাশ্চাত্ত্য চিন্তার প্রভাবে দেশের মন থেকে মধ্যযুগীয় জড়ত্ব দূর করা যাবে। বাংলার নবজাগরণের নেতারা এই চিন্তা থেকেই ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রামমোহন এদেশের প্রাচীন চিন্তার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন এবং উপনিষদের চিন্তায় তিনি তাঁর নতুন ধর্মের উপাদান খুঁজেছেন। কিন্তু আমাদের

পুরাতন দর্শন ও ভাবধারার সাহায্যে ব্যবহারিক জীবনকে নতুন করে গড়া যাবে না, এই প্রত্যয় তাঁকে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করেছিল। ১৮২৩ সালে সরকার যখন একটি নতুন সংস্কৃত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় জন্য অর্থ-মঞ্জুর করেন তখন রামমোহন প্রতিবাদ জানিয়ে বড়লাটকে লিখেছিলেন:

"This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use."

সংস্কৃত টোলে ব্যাকরণের নিয়ম শিক্ষায় ও প্রাচীন দর্শনের আলোচনায় আর যাই লাভ হোক, পৃথিবীকে নতুন করে গড়া সম্ভব হবে না; যেমন সম্ভব হয় নি বেকনের পূর্ববর্তী ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায়।

রামমোহনের উক্তিতে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ ও সেই সঙ্গে বেকনের নামোল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিষয়ে খানিকটা আলোচনা প্রয়োজন।

রেনেসাঁসের যুগে ইয়োরোপের মন প্রাচীন গ্রীক চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১—১৬২৬) কিন্তু কৈশোর থেকেই প্ল্যাটো এবং বিশেষ করে অ্যারিস্ট-টলের প্রতি বিরূপ হলেন। এই বিরূপতার কারণটি উল্লেখযোগ্য। বেকনের জীবনীকার ডঃ উইলিয়ম রলি (William Rawley) লিখেছেন:

"Whilst he was commorant in the university, about sixteen years of age, he first fell into dislike of the philosophy of Aristotle: not for the worthlessness of the author, but for the unfruitfulness of the way; being a philosophy (as his lordship used to say) only strong for disputations and contentions, but barren of the production of works for the benefit of the life of man."

অ্যারিস্টটল ও সেই সঙ্গে ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যকে বেকন ত্যাগ করলেন কারণ তাতে তর্ক বাড়ে, কিন্তু মানুষের পার্থিব অবস্থার উন্নতির উপযোগী জ্ঞান বাড়ে না। বিজ্ঞানকে বেকন চেয়েছিলেন জাগতিক উন্নতির সহায় হিসাবে।

বেকন ধর্মবিরোধী ছিলেন না। বরং তাঁর জীবনদর্শনকে তিনি বাইবেলের উপরই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বাইবেলে কথিত আছে যে ভগবান প্রথম মানুষকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন:

"Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it."

তিনি বলেছিলেন, এই পৃথিবীর উপর তোমাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হোক, তোমরা ধনবান হও, তোমাদের বৃদ্ধি হোক। পরে ভগবানের নিষেধ অমান্য করার ফলে মানুষের পতন ঘটে। কিন্তু মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য সেই প্রথম দিনেই স্থির হয়ে গেছে। ভগবানের অভিশাপে মানুষ তার নিষ্পাপ সারল্য হারিয়েছে; সেই সঙ্গে প্রকৃতির উপর তার কর্তৃত্ব স্থাপনের পথও ঐ অভিশাপেই কঠিন পরিশ্রম সাপেক্ষ হয়েছে। বেকন বলেছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান দুই-ই আমাদের চাই। ধর্মকে চাই সেই নিষ্পাপ সারল্য পুনরুদ্ধারের জন্য, আর বিজ্ঞান দেবে আমাদের প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব ও পার্থিব সম্পদ। বেকনের সেই বিখ্যাত উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"For Man through the Fall lost both his state of innocence and his lordship over the created world. Both these losses can, even in this life, be partially repaired; the former by Religion and Faith, the latter by Arts and Sciences." (**Novum Organon**).

ইতিহাসে মানবের প্রগতি সম্বন্ধে বেকনের চিন্তায় এক নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হল। বেকন বললেন যে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাসে যে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয় দিগ্‌বিজয়ী বীর ও সাম্প্রদায়িক গুরুদের শক্তি সে তুলনায় সামান্য। সম্রাটপূজায় অভ্যস্ত ইয়োরোপে, সাম্প্রদায়িক কলহে রক্তাক্ত ইয়োরোপে, বেকনের কণ্ঠধ্বনি মানুষকে আহ্বান করল শিল্প ও বিজ্ঞানের সাধনায়, গঠনমূলক কর্মের পথে।

সেই আহ্বান উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতে এসে পৌঁছেছিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের চিন্তায় তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

রামমোহন এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার আধিপত্য কমাতে চেয়েছিলেন যাতে নতুন চিন্তার স্রোত দেশে সহজে প্রবাহিত হতে পারে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন চিন্তার বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ধারণা অতি পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিনয় ঘোষ মহাশয়ের গবেষণার গুণে সেই পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা অনেকেই আজ পরিচিত।

বেকন যেমন প্ল্যাটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শন বর্জন করেছিলেন বিদ্যাসাগরও তেমনই সাংখ্য বেদান্তকে ভ্রান্ত বলেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন দর্শন ভ্রান্ত হলেও সমাজ সংস্কারকের সে-বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন এমন কিছু তরুণ পণ্ডিত তৈরী করতে যাঁরা একদিকে যেমন ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক দর্শনবিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত হবেন অন্যদিকে তেমনই সংস্কৃত ও প্রাচীন শাস্ত্র ভালোভাবে জানবেন। তা ছাড়া আধুনিক ভারতীয় ভাষায় জনসাধারণের জন্য নিজের মতামত প্রকাশ করবার দক্ষতাও এঁদের অর্জন করতে হবে। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য এই ছিল বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা। তিনি লিখেছিলেন:

"Youngmen thus educated wil be better able to expose the errors of ancient Hindu philosophy than if they were to derive their knowledge of philosophy simply from European sources."

শুধু ইংরেজীতেই যাদের বিদ্যা সীমায়িত তাঁদের ধ্যানধারণা দেশের মনে পৌঁছবে না। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন শাস্ত্রীয় সমালোচনায় অভ্যস্ত ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সঙ্গে পরিচিত এমন এক নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে যাঁরা দেশের মনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয় না যে ঈশ্বরচন্দ্রের সেই আশা পূর্ণ হয়েছে।

(৩)

এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর শতাধিক বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। বিজ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রায় একেবারেই ফলপ্রসূ হয় নি একথা বলা যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রথমভাগে এদেশে রেলগাড়ী ছিল না। বাষ্পীয় যানের প্রবর্তন নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। নিউইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন'-এর পৃষ্ঠায় মার্ক্স সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

"The railway system will become in India truly the forerunner of modern industry."

কয়েকটি আধুনিক শিল্প যে তারপর এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নি এমন নয়। বাষ্পীয় শকটের যুগ ছাড়িয়ে আমরা বিমানপথের যাত্রীও হয়েছি। কিন্তু শতবর্ষ পরে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণীর ঐ ক্রিয়াবিশেষণটি ("truly") এখনও যেন আমাদের সামনে তিরস্কারবাণী হয়ে আছে।

আবারও বলতে হয় যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এদেশের মাটিতে এখনও শিকড় গাড়তে পারেনি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়, আর্থিক জীবনে, রাজনীতিতে সর্বত্র এটা প্রকট।

কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর প্রচলন হয়েছে; পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় আধুনিক লেখকদের নামও খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু যে-মন নিয়ে আমরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করি, তাকে আধুনিক মন বলা যায় নি। সংস্কৃত টোলের ছাত্র ব্যাকরণ, সাহিত্য ও নানা শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করত; আজকের ছেলে পাঠ্যপুস্তক বিষয়ক ব্যাখ্যা-পুস্তক মুখস্থ করছে। আমরা মুখে বলি

যে, বিদ্যার্থীকে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হবে, নিজের মতো করে উত্তর লিখতে হবে। বিদ্যার্থী কিন্তু কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষা কক্ষে যায়, ধরাবাঁধা প্রশ্নের ভিতর উত্তরের সুবিধা না থাকলে পরীক্ষাকেন্দ্র ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। এদিক থেকে টোলের শিক্ষাব্যবস্থাই অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল।

বিজ্ঞানের যুগে জ্ঞান ক্রমশ বেড়ে চলেছে, শিল্পে অবিরত উন্নতি ঘটছে. প্রচলিত ধারণার বহু পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা এমন ছাত্র চাই যারা প্রশ্ন করতে শিখবে, নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে নিজ বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করতে জানবে। ধরাবাঁধা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থের ভিতর দিয়ে পরিবর্তনশীল জীবনের জন্য এই প্রস্তুতি অথবা বুদ্ধির এই বিকাশ সম্ভব নয়। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক যুগের উপযোগী মানুষ তৈরী করতে অক্ষম। সংস্কারের কোনো আন্তরিক চেষ্টাও অনুপস্থিত। কিছুদিন আগে সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ের একজন অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহ করেন। পরীক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের নামে অনেকেই চাইছেন যে, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হাতে প্রধান প্রধান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করবার ভার বেশী করে তুলে দেওয়া হোক। যেন পাঠ্যব্য বিষয়গুলি ইতিমধ্যে অবসর গ্রহণ করে বসে আছে! রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আজও জুড়ে বসে আছে এক মধ্যযুগীয় মন।

বিজ্ঞান পৃথিবীকে নতুন করে গড়তে পারে, আমাদের বৈজ্ঞানিকরাও এই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত নন। অতএব তাঁরা ব্যক্তিগত উন্নতি প্রচেষ্টার পারিবদনীতিতেই ব্যস্ত। তার উপর আবার এদেশের গবেষণাগারে বিজ্ঞানচর্চা যতটুকু হয় তার সঙ্গে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার, কৃষি ও শিল্পের, যোগাযোগ ক্ষীণ। এদেশে আধুনিক কৃষিগবেষণার সূচনা হয়েছে শতাব্দীর বাঁকে; জাপানেও প্রায় একই সময়ে ঐ জাতীয় কাজ শুরু হয়। কিন্তু জাপান শুধু গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেই সন্তুষ্ট থাকেনি; গ্রামে গ্রামে সমস্ত চাষীকে শিক্ষিত করে তুলেছে এবং কৃষি ব্যবস্থার বহু উন্নতি সাধন করেছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষও ওদেশে কৃষিকাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছে। আর এদেশে অধিকাংশ চাষী আজও নিরক্ষর। এদেশের মাটিকে সুজলাসুফলাশস্যশ্যামলা করবার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ উদ্যোগী হয় নি। এর নানা কারণ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই কারণগুলি দূর করবার জন্য আমরা যথেষ্ট সচেষ্ট নই।

এই কৃষিপ্রধান দেশে বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের বিচ্ছেদ মাঠে মাঠে মহৎ সম্ভাবনার ব্যর্থতায় প্রকট।

যেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভিতর গঠনমূলক প্রচেষ্টা অনুপস্থিত, সেখানে সেই নিশ্চেষ্টতার একটা বৈপ্লবিক কৈফিয়ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এ দেশে শিক্ষিতদের ভিতর এ কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, ছোট ছোট ক্ষেতে উন্নত ধরনের চাষ সম্ভব নয়; সেজন্য চাই বৃহৎ যৌথ কৃষিক্ষেত্র। যৌথ চাষ যতদিন চালু হচ্ছে না, ততদিন বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থা আশা করা যায় না। বৈজ্ঞানিক কৃষির নাম শ্রবণ মাত্র আমরা মুখস্থ শ্লোক উচ্চারণের মতো করে বলি "ট্র্যাক্টর"। যেন ঐ একটি বস্তুতেই বৈজ্ঞানিক কৃষি নামক অবয়বহীন একটি ভাব মূর্তি লাভ করেছে। এই ধারণায় পরিবর্তন প্রয়োজন। ট্র্যাক্টরের ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের সাহায্যে চাষ সম্ভব; যেদেশে জনশক্তির অপ্রাচুর্য সেখানে এই বিশেষ যন্ত্রটির ব্যবহার প্রয়োজনীয়। কিন্তু জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াবার জন্য ট্র্যাক্টর অপরিহার্য নয়। বরং প্রয়োজন উৎকৃষ্ট বীজ বপন, জল ও সারের ব্যবহার, কীটাদিনাশের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন। জাপানে কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে কারণ অপর্যাপ্ত সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ। এইসব উপায়ে ছোট ক্ষেতেও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। অবশ্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারকে কৃষিকাজে টানতে হলে অপেক্ষাকৃত বড় জোত প্রয়োজন। বাংলা দেশে জমির মালিকানার পঁচিশ একরের একটি ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই পঁচিশ একর জমিও ছোট ছোট বহু খণ্ডে বিভক্ত। মধ্যবিত্ত পরিবার সাধারণত এই খণ্ড খণ্ড জমি বর্গাদার বা ভাগচাষীর হাতে তুলে দেন। পঁচিশ একর জমি একটি অবিভক্ত ক্ষেত্র হিসাবে লাভ করলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষেও নিজস্ব পরিচালনায় কৃষিকর্মকে জীবিকা উপার্জনের পথ হিসাবে গ্রহণ করা সহজ হবে। কৃষির উন্নতিতে মধ্যবিত্ত মানুষ যেখানে নিজে মনোযোগী নয়, সেখানে জমির মালিকানার তার অধিকার সঙ্কুচিত করাই ভালো। যৌথ চাষ না হলেও চলে; কিন্তু বর্গাদারী ব্যবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। এটা এমন কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবিষয়ে উৎসাহিত হলে এই পরিবর্তনটুকু সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হবে না। দুঃখের বিষয়, এ দেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যদিও বেড়েছে, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছাত্রদের বিজ্ঞানস্পৃহা নির্জীব; ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের চেয়ে রাজধানীর অফিসঘর ও রাজনীতির উত্তেজনা তাঁদের কাছে বেশী আকর্ষণীয়।

আমাদের রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞানের মিত্রতা নেই। এর কোনো দীর্ঘ বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয়। দুয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই বক্তব্য শেষ করতে হবে।

প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ভিতর আমাদের মন দ্বিধায় দোদুল্যমান। ইংরেজ ও মুসলমানের প্রতি বিরূপতায় রক্ষণশীল হিন্দুয়ানীর সমর্থকদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। ইংরেজী হটাবার তোড়জোড়ে ও গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনে এই দৃষ্টির সংকীর্ণতা তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার কাম্য, এর সপক্ষে সুযুক্তি আছে। কিন্তু এই যুক্তি যাঁরা মেনে নিয়েছেন, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষার সঙ্গে একটি দ্বিতীয় ভাষাকে যুক্ত করা প্রয়োজন, তা নইলে আমরা মনে ও বুদ্ধিতে প্রাদেশিক হয়ে পড়ব। এ দেশে আমরা যদি বিজ্ঞান চিন্তাকে সবল রাখতে চাই তো মাতৃভাষার পাশে এই দ্বিতীয় স্থানটি দিতে হবে ইংরেজীকে। উচ্চশিক্ষায় বাংলা ও হিন্দীকে আবশ্যিক করার চেয়ে, হিন্দীভাষীর পক্ষে হিন্দী ও ইংরেজী এবং বাঙালীর জন্য বাংলা ও ইংরেজীর দ্বৈতবন্ধনই যে শ্রেয়, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মাতৃভাষা ও ইংরেজীর পর দ্বিতীয় ভারতীয় ভাষা যদি শিক্ষণীয় হয় তো সংস্কৃতের দাবিটাই আগে বিবেচ্য। এবিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কাছে আমাদের বিজ্ঞানবুদ্ধি পরাস্ত হতে চলেছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনে। গো-রক্ষার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে গান্ধীজীর ভূতপূর্ব সচিব ১৯৬৭ সালের ৬ জানুয়ারির তারিখে স্টেটসম্যান কাগজে প্রকাশিত একটি পত্রে লিখেছেন:

"We go against the principle of cow protection when we use leather goods made from the skins of the slaughtered animal; we condemn the cow and its progeny to death by slow starvation or under the butcher's knife when we throw them out of work by using the tractor for ploughing, the electric pump for irrigation, the diesel engine for oil pressing, crushing sugar cane, grinding corn or husking rice, the truck for transfer of farm products and chemical fertilizers in the place of composted manure. ... Let those who support the demand for stopping cow slaughter, therefore, if they mean business, launch a movement to restore to the cow and its progeny its due place in our economy."

যে-সমাজে গরুর মূল্য শুধু তার দুধে নয়, বরং কৃষি, শিল্প ও পরিবহণব্যবস্থায় গো-শক্তিই প্রধান চালক শক্তি, সেখানেই গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যুক্তিসংগত মনে হতে পারে। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গরুর দুধ, মাংস ও চামড়ার ব্যবহারই প্রাধান্য লাভ করে; শক্তির উৎস হিসাবে ধেনুর চেয়ে বিদ্যুৎই বড় হয়ে ওঠে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, জাপানে শিল্প-বিপ্লবের আগে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা গো-মাংস ভক্ষণ করতেন না, কিন্তু এখন করেন। তা-ছাড়া, গো-মাংস রপ্তানির প্রশ্নও আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দিয়ে গরুকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করলেই বিপদ। এই যুক্তিহীন রাজনীতিতে গো-মাতা রক্ষা পান না; সমাজের সংহতি ও প্রগতি বিপন্ন হয়।

দুঃখের বিষয়, এ দেশে মার্ক্সবাদও শেষ অবধি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়ক হয়নি। মার্ক্স স্বয়ং বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর চিন্তায় মানবতাবাদী ঐতিহ্যের ধারাও মিশেছে। ফয়েরবাখ্ খ্রীষ্টধর্মের একটি মানবতাবাদী ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিলেন। ধর্ম বলেছে যে, ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করলে সমাজকে শাস্তি ভোগ করতে হয়, আর ঈশ্বরের অন্য নাম প্রেম। ফয়েরবাখ্ অর্থ করলেন, মানবপ্রেমেই সমাজের ভিত্তি। ঈশ্বর মানুষ থেকে অন্তরিত মনুষ্যত্ববোধ।

মার্ক্স চেয়েছিলেন, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে, মনুষ্যত্বে বিধৃত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু ইতিহাসকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন শ্রেণীসংগ্রামের সূত্র ধরে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের দ্বন্দ্বই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তির পথে বড় বাধা। এই

স্বন্দ্বের মূলে আছে উৎপাদনের মূল উপকরণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার। শ্রেণী সংগ্রামের ভিতর দিয়েই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের অবসান ঘটতে পারে। শ্রেণী সংগ্রামের পথেই শুধু মনুষ্যত্বের জয়লাভ সম্ভব। মার্ক্সবাদের এটা মূলকথা।

শ্রেণী সচেতনতা থেকে যে-ঐক্যবোধ, তাকে মনুষ্যত্ব বলা চলে না; মানুষ হিসাবে যে-স্বাজাত্যবোধ, তারই নাম মনুষ্যত্ব। ইতিহাস থেকে এই মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে ইতিহাসের অন্তে তাকে খুঁজে পাওয়া অনেকের কাছে অতিনাটকীয় মনে হয়েছে। তার চেয়ে বিশ্বাস করা ভালো যে, ইতিহাসের ধাপে ধাপে মনুষ্যত্বের ক্রমশ বিকাশ ঘটছে, অর্থাৎ ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ও মানবিক সহযোগিতা দুই-ই উপস্থিত। ইতিহাস সহযোগিতারও ইতিহাস। মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে সমাজ একমুহূর্তও টিকতে পারে না। ভগবানকে যেমন শুধু সৃষ্টির আদিতে ও অন্তে কল্পনা করাই যথেষ্ট নয়, মানবিক সহযোগিতা ও মানুষের আন্তরিক ঐক্যবোধকেও তেমনই ইতিহাসের আদিতে ও অন্তে মাত্র প্রতিষ্ঠা করলে ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যায়।

মার্ক্সের আদর্শ ছিল মনুষ্যত্বের আদর্শ। কিন্তু যে-পরিমাণে শ্রেণীযুদ্ধের ঐকান্তিক ধারণা মার্ক্সবাদীর চেতনাকে অধিকার করেছে, সে-পরিমাণে একটি নতুন বিপদও সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানবুদ্ধি পরাস্ত হতে বসেছে জঙ্গীবুদ্ধির কাছে। তাই উত্তেজক বক্তৃতায় এ'দের যতটা উৎসাহ দেখা যায়, লোকশিক্ষায় ততটা নয়। গো-রক্ষা নিবারণী আন্দোলন উপলক্ষে বামপন্থীরা "দক্ষিণ-পন্থী চক্রান্তের" কথা বলেছেন, কিন্তু এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রচারে সক্রিয় হননি। পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায়ও এ'রা "সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত" দেখতে পান। মার্ক্সবাদীর মন যে-সুরে বাঁধা হয়ে গেছে, তাতে যুদ্ধের সুর যত অনায়াসে বাজে, যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা তেমন আসে না। স্বয়ং নেহরু তাই একবার বলেছিলেন যে, এ'দের শান্তি আন্দোলনের ইস্তাহারও কেমন যেন যুদ্ধনিনাদের মতো শোনায়!

মনুষ্যত্বের নীতি আর যুদ্ধের নীতি এক নয়। উগ্র জাতয়ীয়তাবাদী যেমন তার 'যুদ্ধং দেহি' ডাকে সমাজে বিপদ ডেকে আনেন, শ্রেণী সংগ্রামের ধ্বজাধারীও তেমনই দ্বন্দ্ববোধের তীব্রতায় সমাজকে বিপদের পথে ঠেলে দিতে পারেন। যুদ্ধের একটা উন্মাদনা আছে—সেটা ধর্মের নামেই হোক, আর শ্রেণীর নামেই হোক। সেই উন্মাদনায় অবশেষে মনুষ্যত্ব আচ্ছন্ন হয়। মার্ক্সবাদ এই বিপদ থেকে মুক্ত নয়। মাওবাদে এটা প্রত্যক্ষ। সোভিয়েত লেখক ফেদোসিয়েভ লিখেছেন:

"সমাজ যতদিন শ্রেণীবিভক্ত, ততদিন তার সমগ্র ইতিহাসই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, এই মার্ক্সীয় তত্ত্বের স্থলে মাও সে-তুঙ ইতিহাসকে যুদ্ধেরই ইতিহাস বলে তাঁর সমরবাদী ইতিহাসতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মাও সে-তুঙের বিচারে শ্রেণী সংগ্রামের নিয়মনীতি নয়, যুদ্ধের নিয়মনীতিই রাজনীতির পথ নির্ধারণ করবে।" (মার্ক্সবাদ ও মাওবাদ, সোভিয়েত সমীক্ষা, ২৫ মে, ১৯৬৭)। এই পরিণতি আকস্মিক নয়, মার্ক্সবাদেই এর বীজ নিহিত ছিল। অবশ্য চীনের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিও এজন্য অংশত দায়ী।

এদেশে অতিবৈপ্লবিক পদ্ধতিতে কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বরং এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে উগ্র দক্ষিণপন্থীরাই দিল্লীতে ক্ষমতায় আসবেন। আর বাংলা দেশে এতে অরাজকতা স্থায়ী হবে। শিল্পে ও আর্থিক উন্নয়নে আমরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ক্রমশ পিছিয়ে যাব। এই দুর্গতি ও আশাভঙ্গের ফলে আমাদের বৈপ্লবিক উন্মাদনাটাই যদি আরও বাড়ে, তাতে কারোরই মঙ্গল হবে না। আর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে আমাদেরই।

যে-প্রাণশক্তি নিয়ে বাংলা দেশ বৈপ্লবিক মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকেছে, তার ভগ্নাংশ নিয়েও যদি শিক্ষিত বাঙালী গঠনমূলক কাজে, লোকশিক্ষার প্রসারে, শিক্ষার সংস্কারে, বিজ্ঞানচর্চায় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচারে, এবং কৃষি ও শিল্পে তার প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করত, তা হলে ভারতের প্রগতির ইতিহাসে বাংলা দেশ আবারও একটি গৌরবে উজ্জ্বল অধ্যায় যোগ করতে পারত। কিন্তু সে আশা আজ সুদূরপরাহত। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ধারা এই বাংলায় জয়ী হবে, এ-সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে।

(৪)

বেকন বলেছিলেন, জ্ঞানই শক্তি। কথাটা নানাভাবে সত্য। যে-অন্ন ক্ষুধার্তের দেবতা বিজ্ঞানই শুধু সেই অন্ন জনে জনে বিতরণ করতে সমর্থ। বিজ্ঞানই পারে গ্রামে গ্রামে প্রদীপ জ্বালাতে। প্রকৃতির শক্তিকে বিজ্ঞান করে মানুষের ভৃত্য, মানুষকে সে করে প্রাণীজগতের অধিপতি। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের বার্তা বিজ্ঞান এক নিমেষে অলৌকিক ডাকহরকরার মতো আমাদের ঘরে পেঁছে দেয়, যেন এই বিপুলা পৃথ্বী ছোট একটি পল্লীমাত্র। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য শিল্প ও বিজ্ঞান অপরিহার্য; আবার পরমাণু-বোমার ভয়ংকর শক্তি মানুষের হাতে তুলে দিয়ে বিজ্ঞান মানুষকে বলে এক হও, নয়তো ধ্বংস হও। বিজ্ঞানই আমাদের আজকের রাজনীতিকে গ্রাম্য রাজনীতি বলে চিনিয়ে দেবে। এবং বিজ্ঞানই অবশেষে এযুগের একটি "বৈজ্ঞানিক" আশাকেও ভ্রান্ত বলে চেনাবে। বিজ্ঞানের বলে সমৃদ্ধিময় যে-নতুন জগৎ আমরা সৃষ্টি করবার আশা রাখি, স্বয়ং বুদ্ধেরও তা কল্পনার অতীত ছিল। তবু সে-সমৃদ্ধি যেদিন আমরা লাভ করব, জীবন থেকে দুঃখ সেদিনও দূর হবে না। মৃত্যু যদি থাকে তো ভয়ও থাকবে; পরিবর্তন যতদিন আছে, আশংকা ততদিন দূর হবে না। বিজ্ঞান আমাদের জাগতিক সমৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করে সুখের অলীক আশা থেকে আমাদের মুক্তি দেবে। বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই।

অল্পে তুষ্ট (৩)
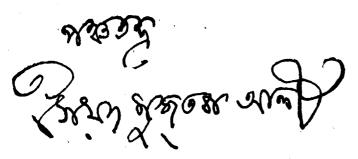
অগুনতি দফে প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, 'ইংরিজিতেই চলবে তো? অন্য কোনো ভাষা না জানলেও চলবে—না? কনটিনেনটে তো সবাই ইংরিজি বোঝে,—না?'

হুঁ, বোঝে। খুব বোঝে! তবে শুনুন। গল্পটি অবশ্য প্যারিস সংক্রান্ত নয়— যদিও খুদ প্যারিসেরই কোনো একটা মুদির দোকানে তেল নুন কেনার চেষ্টা করে দেখুন না ইংরিজির মারফৎ—তবে এটি যে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গা সম্বন্ধে প্রযোজ্য সেটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করেও বলা যায়।

প্রভাঁসের একটি দোকানের সামনে বেশ মোটা মোটা হরফে লেখা : 'ENGLISH SPOKEN'। এটার উদ্দেশ্য মারকিন টুরিস্টকে আকর্ষণ করা। ইংরেজকে নয়। কারণ ফরাসীজাত বিস্তর মার খেয়ে খেয়ে ভালো করেই জানে, ইংরেজ কিপটেমিতে প্রায় তাকেও হার মানায় এবং জাতটার আগাপাস্তলা বেনেদের হাড্ডি দিয়ে তৈরি বলে দোকানের প্রত্যেকটি জিনিসের পাইকিরি ভাও, খুচরো দর, কমিশন, সেল ট্যাক্স দফে দফে জানে। তা সে-কথা থাকগে। ...এস্থলে ঢুকেছে এক মারকিন। খাজা মারকিনি ড্রল (আড়) সমেত একাধিক বার মারকিনি জবানে বলে গেল তার প্রয়োজন অথচ কাউনটারের পিছনে ফরাসী দোকান-উলি শুধু মিটমিটিয়ে মৌরি হাসি চিবোয়—মাল কাড়বার কোনো নিশানাই নেই। মারকিন বার বার একই কথা বলতে বলতে হঠাৎ বুঝতে পারলো, মাদাম তার কথার একবর্ণও বুঝতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে তখন সে সেই সাইনবর্ড-টার দিকে আঙুল তুলে বললে 'তবে ওটা ওখানে ঝুলিয়েছ কি করতে? ইংরিজি যখন বোঝো না এক বর্ণও?' এবারে যেন মাদাম ব্যাপারটা বুঝেছে—নিশ্চয়ই এ ফারস্ আকছারই হয়—এক গাল হেসে তার ইংরিজিভাষা ভান্ডারের শেষ শব্দটি খরচা-করে বললে, 'উই, উই, ইয়েস ইয়েস, "এঙলিশ স্পোকেন!" সারতেনোঁ। আওয়ার কস্তোমারস্ স্পীক—উই নং স্পীক'—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, "ইংরিজি বলা হয়" বই কি! আমাদের খদ্দেররা বলেন। আমরা বলি না।'

এটি মনে রাখবেন। আপনার অন্য কোনো কাজে না লাগলেও এটি দিয়ে ব্যাকরণের প্যাসিভ ভইস এবং তস্য প্রসাদাৎ কি কি সুখ-সুবিধে হয় সেটা বাচ্চাদের শেখাতে পারবেন। মাদাম তো আর নোটিশে বলেনি, 'উই স্পীক ইংলিশ', বলেছে 'ইংলিশ স্পোকেন'—এবং ইহসংসারে কে কোথায় ইংরিজি বলে কি না বলে, সেটা কুইনস ইংলিশ না সাউথ ক্যারোলাইনার নিগার ইংলিশ সে খতিয়ান দেবার জিম্মেদারি তো বেচারী প্রভাঁসিনী দোকানওলীর নয়!

খোদ প্যারিসের মুদির কথা বলছিলুম। আপনি হয়তো বিরক্ত হয়ে বলবেন, 'তুমিও যামন! আমি কি আর প্যারিস যাচ্ছি ঘৃত-লবণতৈলতণ্ডুলের জন্য!' এস্থলে আমাকে একটু কথা কাটতে হলো। বলতে কি, আমার মনে হয়, এই সব বস্তু আপনি যদি প্যারিসে কিনে এদেশে চালান দিতে পারেন—অবশ্য অস্মদ্দেশীয় সদাশয় সরকার যদি তার উপর বেদরদ ট্যাকশো না চাপান—তবে আপনার প্যারিস ভ্রমণের খরচাটাই উঠে যাবে। আর ইতালির ব্রিন্দিসি, বারী অঞ্চলে চালের কিলো নিশ্চয়ই আড়াই/তিন টাকা নয়! সর্বোপরি অলিভ তেল! লাল হয়ে যাবেন, মোয়াই, লাল হয়ে যাবেন। ফ্রানসের মার্সেই অঞ্চলের পাঁচসিকের তেল হেথায়—কালো বাজারে—নিদেন পঞ্চবিংশতি তঙ্কা! তা সে থাকগে! ইংরেজের সংগে দু শ' বছর ঘর করে আমি—সৈয়দের ব্যাটা—আমিও বেনে বনে গিয়েছি—প্যারিস পৌঁছে কোথায় না সন্ধান নেবো উবিগাঁ কোতি'র ভুরভুরে খুশবাই!—তা না, ত্যালের কেলো, চেলের ৬.৭! লাও!

প্যারিসের—প্যারিসের কেন—পৃথিবীর পয়লা নম্বরী সর্ব হোটেলের ওয়েটার, 'রুমবয়', কাউনটারের কেরানী এরা সবাই অল্প-বিস্তর ইংরিজি বলতে পারে। কিন্তু আপনি সে-সব হোটেলে উঠবেন না—গ্যাঁটে আপনার অত রেস্তো নেই, থাকলে আমার লেখা পড়তেন না। আর যদি বলেন, না, আপনার সে রেস্তো আছে, তাহলে আর ভাবনা কি? আপনি কোন্ দুঃখে প্যারিস বারলিনে কে কতখানি ইংরিজি বোঝে না বোঝে তাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন? রেখে দিন, হাজার দুই আড়াইয়ের মাইনের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি—সে নিদেন আধা ডজন কন্টিনেনটাল ভাষা ঝাড়তে পারে, আপনাকে আর দেখতে হবে না। স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন তখন পোলাওই খান, ভাত খাচ্ছেন কেন, আর সে পোলাওয়ে ঘি ঢালতেই বা কঞ্জুসী কচ্ছেন কেন? বরদার মহারাজাকে দিনের পর দিন অনায়াসে মিশরে চলাফেরা করতে দেখেছি। কবীন্দ্র রবীন্দ্র যখন প্রাগ বা বুডাপেশটে বক্তৃতা দিতেন তখন সেখানকার য়ুনিভারসিটির সব চেয়ে সেরা ইংরিজিবাগীশ অধ্যাপক হতেন তাঁর দোভাষী। এঁদের কথা আলাদা। আপনি যদি সে পর্যায়ের হন তবে আমার লেখা পড়ছেন কোন্ বদ্কিস্মতের গেরোতে?

পক্ষান্তরে দেখুন, জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধ খঞ্জ শ্রীধামে পৌঁছয় না, কেদার-বদরীর পুণ্যসঞ্চয় করে না? ভারতীয় কত

কালা বোবা কপর্দকহীন প্রতি বৎসর মক্কায় গিয়ে হজ করে! রাখে আল্লা, মারে কে!

চলে যাবে, প্যারিসে ইংরিজি জানা না থাকলেও চলে যাবে, জানা থাকলে অল্প-স্বল্প সুবিধে হতে পারে। লনডনে যদি শতেকে একজন লোক ফরাসি বলে, তবে দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে প্যারিসের রাস্তায় হাজারে একজন ইংরিজি বলতো কিনা সন্দেহ। তাই আঁদ্রে মোরোয়া যিনি এই হালে গত হলেন, বা ল্যাগুঈ কাজামা্যা ফ্রানস দেশের আজব চিড়িয়া। প্যারিসবাসী তাজ্জব মেনে শুধোবে 'ওরা ইংরিজি শিখেছিল! কি করতে? মরতে?

জরমনিতে অবশ্য আপনার ইংরিজিজ্ঞান একটু বেশী কাজে লাগবে। যদ্যপি ওই দেশ ইংরেজের প্রতিবেশী নয়। তার অনেকগুলো কারণ আছে। তার একটা কারণ আমাদের মূল বক্তব্যের সঙ্গে বিজড়িত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জরমনির আপন ভূমির উপর কোনো সংগ্রাম হয়নি, অর্থাৎ কোনো বিদেশী সৈন্য সেখানে পদার্পণ করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিনিংরেজ লড়াই করতে করতে, কদম কদম এগোতে এগোতে জরমনির এক বৃহদাংশ দখল করে সেখানে থানা গাড়ে এবং কয়েক বৎসর সেখানে বাস করে। গোড়ার দিকের মার্কিনিংরেজ চালিত মিলিটারি শাসনকর্তাদের ভাষা তখন যে অতি সামান্যও বলতে পেরেছে সে-ই রেশন সহজে পেয়েছে, ফালতো রুটিটা আন্ডাটাও তার কপালে নেচেছে। আমার এক জরমন সতীর্থ ধরা পড়ে মার্কিন দল জরমন সীমান্তে প্রবেশ করা মাত্রই। ইংরেজি বলাতে তার ভালো অভ্যাস ছিল বলে (তার জন্য আমি স্বয়ং কিছুটা দায়ী। আমাদের পরিচয়ের গোড়ার দিকে আমি জরমন জানতুম না বলে সে তার টুটিফুটি ইংরিজি চালিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আমার জরমন খানিকটে সড়গড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে তার পুরনো অভ্যাস ছাড়েনি) মার্কিনরা তাকে 'পত্রপাঠ' দোভাষীর—শব্দার্থে—নোকরি দিয়ে দেয়। ফলে তার বাচ্চাদের দুধের অভাব হয়নি, বৃদ্ধা রুগ্না শ্বাশুড়ীর ওষুধ-পত্রেরও অভাব হয়নি। আর সে ভস ভস করে অষ্টপ্রহর হাভানা সিগার ফুঁকেছে যা ইতিপূর্বে তার জীবনে কখনো জোটেনি। মার্কিন সৈন্য চলে যাওয়ার পর মনোদুঃখে সে ধূমপান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। আমি তার জন্য গেলবারে বিড়ি নিয়ে গিয়েছিলুম। তার পুনরপি সেই মনস্তাপ। তবে আমি মাঝেমধ্যে এখনো তাকে দু'-পাঁচ বাণ্ডিল পাঠাই। ভয়ে বেশী পাঠাতে পারিনে—জরমন কস্টম্স্ আমাদের চেয়ে কম যান না।

১৯৪৪ থেকে জরমনির যা দুর্দিন গেছে বিশ্বের অর্বাচীন ইতিহাসে সেটা উল্লেখ-যোগ্য। মার্কিনিংরেজ সেখানে থানা গাড়ার পর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাকে না রেশনের সন্ধানে ছুটতে হয়েছে ওদের পিছনে? সবাই পড়িমড়ি হয়ে তখন শিখছে ইংরিজি। কবে কোন্ ঠাকুর্দা একবার বেখেয়ালে একখানা 'গাইডবুক টু ইংলিশ' কিনেছিলেন, এ আমলের ঠাকুর্দা তারই গা থেকে সন্তর্পণে ধূলি ঝেড়ে এক পরকলাওলা চশমা নাকে চড়িয়ে লেগে গেলেন ইংরিজি অধ্যয়নে—ছাপাখানা আবার কবে বসবে, চশমার দোকান কবে খুলবে কে জানে?

এর পর আর কি আশ্চর্য যে প্রথম ইস্কুল ফের খোলা মাত্রই আণ্ডাবাচ্চা যা ইংরিজি শিখতে আরম্ভ করলো তার তুলনায় আমা-দের ঊনবিংশ সালের ইংরিজি শেখার প্রচেষ্টা ধূলির ধূলি।

একমাত্র পরাধীনতাই মানুষকে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা শেখায়। চোখের জলে নাকের জলে শেখায়।

এই পরাধীনতার পিঠ পিঠ আসে আর্থিক পরাধীনতা। আজ জগৎজোড়া মার্কিনি ডলারের গরমাই। ইংরেজের তম্বী কমেছে, কিন্তু তিনিও আছেন। উভয়ের ভাষা মোটা-মুটি একই—ইংরিজি।

তাই আমরা আজ কল্পনাও করতে পারিনে ইংরিজি না শিখে গুষ্টিসুদ্ধ দোভাষী না হয়ে আমাদের চলবে কি করে?

এ-কথা খুবই সত্য, ইংরিজি নিরঙ্কুশ বর্জন করা অনুচিত।

কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোককে ঘাড়ে ধরে দোভাষী বানিয়ে সে-সমস্যার সমাধান নয়।

মহাস্থবির জাতক
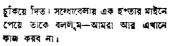
(চতুর্থ পর্ব)

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

॥ ৩ ॥

দিন কয়েকের মধ্যেই আমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হলুম।

আমি, কালী আর পরিতোষ—তিনজনে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলুম—এখানে সমস্ত দিন বিরামবিহীন পরিশ্রমের বিনিময়ে ছ' পয়সা রোজগার করি। একদিন অন্তর একবেলা চালভাজা কিংবা চিড়ে খেয়ে কাটাতে হয়। এর চেয়ে বোম্বাইয়ে গিয়ে মুটেগিরি করব। স্টেশনে মুটের কাজ করলে পরে দৈনিক এক একজন এক টাকার চেয়েও বেশি রোজগার করতে পারে। ইদানীং সর্দার হপ্তায় একদিন ক'রে আমাদের মাইনে চুকিয়ে দিত। সন্ধ্যেবেলায় এক হপ্তার মাইনে পেয়ে তাকে বললুম—আমরা আর এখানে কাজ করব না।

সর্দার বললে—আচ্ছা—যা।

তিনজনের পয়সা একত্র ক'রে প্রায় টাকা দেড়েক হয়েছিল। বোম্বাই যাওয়ার ট্রেনের ভাড়া তাতে কুলোয় না। সুতরাং বিনা-টিকিটের তিন যাত্রী হয়ে বোম্বাইগামী এক ট্রেনে চ'ড়ে বসা গেল। ট্রেনটা ছিল প্যাসেঞ্জার গাড়ি। অনেক দেরী ক'রে শহরের মধ্যে এসে পৌঁছল।

দাদর স্টেশনে আমাদের পাশের কামরা থেকে জনকয়েক বিনা-টিকিটের যাত্রীকে টিকিট-চেকাররা নামিয়ে নিয়ে গেল দেখে আমরা টপ টপ করে ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের দেয়ালে আঁটা বিজ্ঞাপন পড়তে লাগলুম।

ট্রেন চলে গেল, ভীড়ও পাতলা হয়ে গেল। আমরাও সাবধানে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

এখন চিন্তা হ'ল রাতটা কোথায় কাটাই। স্থির করা গেল নবাববিল্ডিং-এ কুঞ্জবাবুর ওখানে একবার ঢুঁ-মারা যাক। আমরা ভদ্রলোকের ছেলে জেনে শুনে যে রকম চাকরি আমাদের জুটিয়ে দিয়েছিলেন সেজন্য তাঁর প্রাপ্য ধন্যবাদটা তাঁকে দেওয়া উচিত। ওখানে ফাঁকা ঘর যদি থাকে তো সেইখানেই রাতটা কাটানো যাবে। নচেৎ ভিখিরিপাড়ার গিয়ে রাস্তায় শুয়ে থাকব। চেহারা ও পোশাকের যা খোলতাই হয়েছে তাতে সেখানে আমাদের বিশেষ বেমানান হবে না।

চলতে চলতে নবাববিল্ডিং-এর কাছে পৌঁছনো গেল। বাইরে থেকে দেখলুম—লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দরজা-জানলা সব বন্ধ। ভেতরে কোনো আলোও জ্বলছে না। বুঝলুম এ সময়ে কুঞ্জবাবুর দেখা পাওয়া যাবে না। জয় তারা—ব'লে বাড়ির মধ্যে তো ঢুকে পড়া গেল।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, অবারিত সিঁড়ি। পা টিপে টিপে আমরা ওপরে উঠতে লাগলুম। মাঝে মাঝে অন্ধকার এত ঘন যে দেশলাই জ্বালাতে হচ্ছিল। এইসব বাড়ি কারুর থাকবার জন্য তৈরি হয়নি। এখানে প্রত্যেক তলায় বড় বড় ঘর ব্যবসাদারদের ভাড়া দেবার জন্য। কোথাও দোকান হয়, কোথাও অপিস বসে। দোতলায় উঠে কুঞ্জবাবুর ঘরের কাছে গিয়ে দেখলুম যে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দোতলায় দু'একখানা ঘরে তালা লাগানোও দেখতে পেলুম। তখন তেতলার দিকে অগ্রসর হওয়া গেল।

সেখানে রাস্তার ধারের ঘরখানা তখনও খালি প'ড়ে ছিল। দরজা-জানলা সব খোলা। মেঝেতে ক্লান্ত দেহ বিছিয়ে দেওয়া গেল।

শুয়ে শুয়ে মনে হতে লাগল—কোথাকার কে নবাব, তার এই বিল্ডিং—কোথাকার কোন দূরদেশের ছেলে আমরা অন্ধকার এই ঘরে পড়ে আছি! এখন যদি এর মালিক পুলিশ নিয়ে এসে আমাদের গ্রেফতার করে! কথাটা ভাবতেও শিউরে উঠলুম। ওদিকে বাবাকালীর নাসারন্ধ্র ঘন ঘন গর্জন ক'রে জানিয়ে দিতে লাগল—যা হবার তাই হবে। এখন তো ঘুমিয়ে পড়।

খুব ভোরবেলা উঠে আমরা গরম গরম চা খেয়ে দোকানেই খানিকক্ষণ কাটিয়ে কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলুম। মনে করেছিলুম আমাদের দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে যাবেন, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে

হ'ল—তিনি যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

আমরা বললুম—খুব চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন—যা হোক! দৈনিক ছ' পয়সায় কি খাব, কীই-বা পরব।

তিনি সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললেন—কিন্তু তোমরা বাপু কি রকম বাড়ির ঠিকানা আমাকে দিয়েছিলে?

আমরা আশ্চর্য হবার ভান করলুম।

তিনি বললেন—আমি কলকাতায় আমার বাড়িতে চিঠি দিয়েছিলুম তোমাদের খোঁজ করবার জন্য। কিন্তু তারা গিয়ে জেনেছে—ও নামের ঠিকানায় কেউ থাকে না। আমাকে তা হলে তোমরা মিথ্যে ঠিকানা দিয়েছিলে।

এবার স্বরূপমূর্তি বার করতে হল।

—আমাদের ঠিকানা কেন চেয়েছিলেন?

তিনি বললেন—তোমরা এখানে কষ্ট পাচ্ছ সেকথা তোমাদের বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া উচিত বিবেচনা করলুম।

বললুম—কষ্ট পাচ্ছি ব'লেই তো আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলুম। বাড়িতে জানাবার হলে তো আমরা নিজেরাই জানাতুম।

আমাদের কথা শুনে ভদ্রলোক আর কোনো জবাব দিলেন না। তিনি নীরবে ঘরের কাজ করতে লাগলেন, আমাদের সঙ্গে আর কথাও বললেন না।

ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম।

অতঃপর কী করা যায়!

স্টেশনের দিকে পা চালিয়ে দেওয়া গেল।

মনের মধ্যে নবীন আশা নবীন উৎসাহ, জীবনের নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করব! ওঃ কী—উন্নতি! ভদ্রলোকের ছেলে—সুখে বিছানায় শুয়ে দুবেলা রাঁধা ভাত ছেড়ে দিয়ে এসে আজ ঝাঁকামুটে হতে চলেছি।

ঝাঁকামুটে বললেও অত্যুক্তি হয়, কারণ ঝাঁকা তখনও কেনা হয়নি। ঠিক করা আছে—স্টেশনে মুটেগিরি ক'রে কিছু পয়সা জমিয়ে ঝাঁকা কেনা হবে।

পায়ে পায়ে স্টেশনে পৌঁছনো গেল। রাস্তার দিকে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি—লোকজন খুবই চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। ক্যালকাটা মেল অর্থাৎ কলকাতায় যেটা বোম্বাই মেল তা এখনও এসে পেঁৗছয়নি। কুলিরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা তাদের। তাদের সামনে আমরা কিছুই নই। তবুও আমরা কোঁচা খুলে সেইটেকে বিড়ের মত পাকিয়ে তাদেরই পেছনে এক জায়গায় দাঁড়ালুম।

কিছুক্ষণের মধ্যে দূরে ট্রেন দেখা গেল।

তারপরেই বিরাট শব্দ ক'রে ট্রেন ঢুকে পড়ল স্টেশনের মধ্যে—সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ডিমোনিয়াম খাঁচাছাড়া।

প্ল্যাটফর্মে গাড়ীখানা ঢুকতেই স্টেশনে যে লোকগুলো এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা সব যেন দিগ্‌বিদিকে ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে। আমরাও যাত্রীগাড়ির একটা একটা জানলার ফাঁক দিয়ে তিন-চার জন বাঙালী প্যাসেঞ্জারকে লক্ষ্য ক'রে দৌড়তে লাগলুম।

স্টেশনের মধ্যে গাড়ি ঢুকেই আধমিনিটের মধ্যেই থেমে গেল। গাড়ি থামতেই লোকজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখলুম—সত্যিই তারা বাঙালী যাত্রী। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম—দেখুন, আমরা বাঙালী মুটে। আমাদের এরা মোট বইতে দেয় না।

কে দেয় না? বলেই এক ভদ্রলোক তাঁর সুটকেসটা আমাকে দিয়ে বললেন—এইটে নিয়ে বাইরে চল।

ঘরের মধ্যে প্ল্যাটফর্মের কুলি যে দু-চারজন উঠেছিল, তারা আমার হাত ধরে

ওদের বললে—না বাবু, তা হতে পারে না, এখানে মুটে-গিরি করতে হ'লে লাইসেন্স নিতে হবে।

বলেই লোকটা আমার কাঁধ খিমচে ধরে —'যা বাহার'—বলে আমাকে কামরার ভেতর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেললে।

আমি ছিট্‌কে গিয়ে একটা ভিড়ের মধ্যে পড়লুম। সম্বিত ফিরে আসতেই দেখলুম আমাদের কালীচরণের মুখখানা হ'য়ে উঠেছে ক্রুদ্ধ চিতাবাঘের মতো এবং সে একাধারে কতকগুলো প্ল্যাটফর্মের কুলিকে কামড়ে খিমচে মেরে অস্থির ক'রে তুলেছে। কোনো-রকমে জড়িয়ে ধরে কালীকে তো থামানো গেল।

ওদিকে আমাদের ঘিরে বেশ বড় রকমের একটা ভিড় জমে উঠেছিল। কি ভাগ্য—পুলিশ তখনো আসেনি। কারণ শহর তো দূরের কথা—ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনেও সর্বসময় পুলিশের ভিড় লেগেই থাকে।

সকলেই হাত পা মুখ নেড়ে আমাদের বুঝিয়ে দিতে লাগল যে লাইসেন্স না হলে স্টেশনের মধ্যে কারুকে মুটেগিরি করতে দেওয়া হয় না এবং লাইসেন্স্‌ড্‌ কুলিরও কেউ জামিন হওয়া চাই।

এক সেকেণ্ডেই আমরা "নিচল বলিয়া উচলে উঠিতে পড়িনু অগাধ জলে"।

আর বাক্যব্যয় করা বৃথা এই ভেবে ভিড় ঠেলে বাইরে আসছিলুম। এমন সময় একটি লোক, মোটা-সোটা তার দেহ, বোধহয় পাগড়ি বাঁধবার চেষ্টা করা হচ্ছিল কিন্তু তাড়াতাড়িতে তা আর হয়ে উঠেনি। মাথার সবখানিই প্রায় দেখা যাচ্ছে। গায়ে জামা পরা, গলায় একটা পৈতে ঝুলছে—যার শেষ অবধি গিয়ে পৌঁছেচে পায়ের গাঁটের কাছে —"কি হয়েছে, কি হয়েছে?" বলতে বলতে রণাঙ্গনে প্রবেশ করল।

অবিশ্যি তার অঙ্গে যথোচিত ফতুয়া, হাফকোট ইত্যাদি চড়ানো। তিনি আসরে প্রবেশ করা মাত্র দু'চারজন ক'রে এগিয়ে এসে বললে—এরা কুলিগিরি করছে। আমরা ধ'রে ফেলেছি।

এরই মধ্যে একজন কুলি চেঁচিয়ে আমাদের বললে—ইনি হচ্ছেন আমাদের সর্দার, ইনি সরকারকে কুলির যোগান দেন। এঁর 'গিরিণ্টি' না পেলে কুলি নেওয়া হয় না।

কুলির সর্দার আমাদের অপরাধ শুনে বললে—তোমরা খবর্দার আর এ কাজ করতে যেও না। তোমাদের কখনো কুলিগিরি দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে তোমাদের হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে রাত্রিবেলা ইঞ্জিনের সামনে ফেলে দেব। বুঝলে? যাও,আপনার কাজে যাও।

মনে হল আমাদের হাতে-পায়ের শেকল খুলে গেছে। গুটি গুটি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় একটি লোক আমাদের কাছে এগিয়ে এল। প্রায় সাড়ে ছ' ফুট উঁচু এবং দেহের বেড়ও সেই

মাপের। মাথায় একটা কালো মখমলের টুপি, বুকে চেনঘড়ি ঝুলছে। একটা চোখ বন্ধ ক'রে, ঠোঁট ও ডানহাতের তর্জনী বেঁকিয়ে আমাকে ইশারায় ডাকলে।

এগিয়ে যেতেই সে জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা চাকরি করবে?

—নিশ্চয়ই করব।

—আমার হোটেল আছে হর্ণবী রোডে—বোম্বে-বরোদা বেঙ্গল হিন্দু হোটেল। তোমরা স্টেশন থেকে হোটেলের জন্য লোক ধরে নিয়ে যাবে। খেতে পাবে, কিন্তু মাইনে কিছু পাবে না। আমি এখনি হোটেলে যাচ্ছি—তোমরা এসো।

তারপর কালীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে—কিন্তু ঐ লোকটাকে সঙ্গে করে এনো না।

হোটেলটা আমাদের জানা ছিল। তখুনি বেরিয়ে গিয়ে সেখানে উঠলুম।

লোকটা জাতিতে সিন্ধি। নাম সেদিন কি বলেছিল আজ আর তা মনে নেই। সে আরো বললে—দু'খানা লাইসেন্স আমার করা আছে।

এই বলে সে টিনে বাঁধানো দু'খানা ছোট ছোট লাইসেন্স আমাদের দিয়ে বললে—

সকালবেলা এগারোটার মধ্যে খেয়ে নেবে। তিনটে থেকে সন্ধ্যে অবধি চা হয়। তারপরে রাতের খাবার যত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে পার রাত্রিবেলা হোটেলেই থাকবে।

সে বার বার ক'রে বলে দিলে—মাইনে কিছু দিতে পারব না, আর ঐ লোকটাকে যেন সঙ্গে না নিয়ে যাই।

কালীকে দেখিয়ে কথাটা বলায় আমাদের তিনজনের বুকেই চাবুকের মতো কথাটা এসে লাগল। পরস্পরের মধ্যে সে সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্য না ক'রে আমরা হোটেলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম।

কালীর চেহারাটা সত্যিই খারাপ। এ নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে কত হাসাহাসি করেছি। কালী বলত—তোরা আমার যেগুলোকে খারাপ বুঝিস আসলে সেই-গুলোই হচ্ছে সুন্দর। ওসব রূপের ব্যাপার তোরা বুঝবিনি।

কিন্তু আজ বাইরের ঐ লোকটার কথা শুনে কালীর মুখখানাও ম্লান হয়ে গেল।

চলতে চলতে আমরা হোটেলের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালুম। কালী বললে—তোরা যা, আমি নবাবিবিল্ডিংএর ঐ [illegible]ই থাকব।

কালীকে বললুম—হ্যাঁ, তুই যা। আমাদের যে খাবার দেবে তা থেকে মেরে তোর জন্যে নিয়ে যাব।

কালী চলে গেল।

হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েও হোটেলের মধ্যে ঢুকতে আমার আর ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তবুও ঢুকে পড়লাম এবং আস্তে আস্তে [illegible] দরজার কাছে এসে দাঁড়ালুম।

কিছুক্ষণ পরে হোটেলের মালিক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে এই যে, তোমরা এসেছ!

তারপর আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে বললে—তোমাদের কিছুই করতে হবে না [illegible] সকালবেলা [illegible] কলকাতার [illegible] থেকে [illegible] নিয়ে আসবে। [illegible] তোমাদের নামে লাইসেন্স করিয়ে দেব [illegible] কথা ঠিক হবে। [illegible]

আমরা বললুম [illegible]।

মালিক রান্নাঘরের দুজন লোককে ডেকে নিয়ে এসে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে বললে—আজ থেকে এই দুজন লোক দুবেলা খাবে, দুবেলা চা'ও খাবে। এদের পেট ভরে, যত খুশী এরা খেতে পারে, খাওয়াবে। বুঝেলে?

হোটেলের বাইরে একটুখানি বারান্দা মত ছিল। মালিক আমাদের সেইখানে নিয়ে এসে বললে—এইখানে রাত্তিরে শোবে। এগারোটার সময় হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে—তখন আর তোমরা ভেতরে ঢুকতে পাবে না।

বারান্দায় একখানা তক্তপোষ পাতা ছিল।

আমরা দুজনে বসে বসে ভাবতে লাগলুম কালীকে এই রকম একলা ছেড়ে দেওয়াটা ভালো হল কি না! ভাবতে ভাবতে এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা কেটে গেল—কিছু ঠিক করতে পারলুম না।

ইতিমধ্যে রান্নাঘর থেকে লোক এসে ডাকলে—চল, খাবে চল।

কথাটা কানে যেন মধুবর্ষণ করলে। তার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর অবধি পৌঁছন গেল।

এইখানে রান্নাঘরের বিবরণ কিছু দেওয়া দরকার মনে করছি। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে কোনো প্রথম শ্রেণীর হোটেলের রান্না-ঘরে যদি কেউ হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হয় তা হলে তার খাবার প্রবৃত্তি তখনকার মত উবে যাবে। আর আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সেই হোটেলের রান্নাঘরের অবস্থা কি ছিল তা যতটুকু স্মরণে আছে তা বলছি।

রান্নাঘরটি বেশ বড় হলেও জিনিসপত্রে ঠাসা হয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, দাঁড়াবার জায়গাটি নেই। ঘরটিকে আধাআধি ভাগ করা হয়েছে। দেওয়ালের গায়ে চারটি উনুন—তাতে কাঠকয়লার আগুনে গনগন করছে। চারটে বড় বড় ডেক তাতে চাপানো। অ্যালুমিনিয়াম জিনিসটা তখনও ওঠেনি কিংবা জাতে ওঠেনি। ডেকচিগুলো সব পেতলের—তার ওপরে কলাই করা।

একটা লোক রান্না করছে। সে যে কোন্ দেশের কিংবা কি জাতের, তা বুঝতে পারা গেল না। তিন চারটে ছেলে তাকে সাহায্য করছে। ছেলেরা তাকে 'মিস্তিরি' বলে সম্বোধন করছে। এক দিকে এক তাড়া হাতে-গড়া রুটি পড়ে রয়েছে। তার ওপর ছোট বড় লাল কালো সাদা আরশোলার দল যদিচ্ছা ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। একটা ডেকে কিমা, আরেকটাতে ডাল, বিরাট একটা থালায় ঢ্যাঁড়সের তরকারি আর ঐরকম আর একটা থালায় চাঁদামাছ ভাজা স্তূপীকৃত। একটা ডেকচিতে ভাতও চুড়ো করা, তাতে মাছি ভনভন করছে—সবগুলি ডেক-ডেকচিরই মুখ খোলা, গোটা কয়েক বেড়াল চোখ বুজিয়ে বসে আছে। ঘরের আর এক দিকে বিরাট কাঠকয়লার পাহাড়, বাসন-পত্তর সাজানো, ঝ্যাটা ইত্যাদি রাজ্যের জঞ্জাল ও জঞ্জালসাফের যন্ত্র।

যে ছেলেটি আমাদের ডেকেছিল—সে আমাদের বললে—একটা করে প্লেট নিয়ে বসে যাও।

আমরা একটা করে প্লেট নিয়ে বসে গেলুম।

প্রথমেই দুটো করে চাপাটি আর এনামেলের চামচে হাতার এক হাতা করে সিদ্ধ ডাল। আমি সবায়ের অলক্ষিতে আধখানা রুটি খানিকটা ডালে জড়িয়ে পকেটে পুরে ফেললুম।

পকেটে ভরে ফেলে আবার খাবার দিকে মন দিলুম। ওদিকে পাতে চাপাটি পড়ামাত্র পরিতোষ একটা চাপাটি পকেটে ভরে ফেললে। আমাদের যে ছেলেটা পরিবেশন করছিল সে বোধ হয় পরিতোষের কাণ্ড দেখতে পেয়েছিল কেননা তার চোখে মুখে সন্দেহের ছায়া ফুটে উঠেছিল। যাই হোক সেই রুটি আর ডাল—'তাতল সৈকতে

খাবিবিন্দু সম' উবে গেল। কতদিন যে এই খাবার খেতে পাইনি তার ঠিকানা নেই। পাত খালি দেখে এবার তিনখানা করে চাপাটি ও আরো খানিকটা ডাল এল। মিস্তিরি ছেলেটাকে বললে—ওদের তরকারী কিমা—এই সব দাও।

আরো চাপাটি, তরকারী, কিমা এসে হাজির হতে লাগল। ওদিকে হয়েছে কি একটি ঝিমায়মান মার্জারতনয় গুটি গুটি অগ্রসর হতে হতে সকালের অলক্ষ্যে টপ করে একখানা মাছ তুলে নিয়ে দূরে পালিয়ে গেল। সংগে সংগে মিস্তিরি উনুন থেকে রুটি তোলবার চিমটেখানা নিয়ে ছেলেটাকে এক ঘা বসিয়ে দিলে। বিনা বাক্যব্যয়ে আবার এখানকার সংসার চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে পেট ও পকেট দুই-ই ভর্তি হওয়ায় আমরা উঠে পড়লুম। মিস্তিরি বললে—চারটের সময় চা হবে।

আমরা সেখান থেকে উঠে বাথরুমে ঢুকে কলে জল খেয়ে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লুম নবাব বিল্ডিং-এর উদ্দেশ্যে।

বেলা বারোটা—রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। নবাব বিল্ডিং-এর তেতলায় উঠে দেখি কালী ইজি চেয়ারে শুয়ে ঘুমুচ্ছে—বিষণ্ণ মলিন মুখ, শরীর প্রায় আধখানা হয়ে গিয়েছে। আমরা তাকে ডেকে পকেট থেকে খাবার বার করে দিলুম।

অনেক দিন পর খাবার পেয়ে কালী একেবারে গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করল। কিন্তু সে সবটা খেতে পারলে না। খান দুয়েক রুটি ও কিছু তরকারী রেখে দিয়ে বললে—পরে খাব।

বিকেলবেলা আমরা চা খেতে চলে গেলুম, কালীকে বলে গেলুম—তোমার খাবার নিয়ে আসব।

রাত্রি প্রায় নটার সময় আমাদের খাবারের ডাক পড়ল। দুই বন্ধুতে দুই পকেট ভর্তি করে কালীর জন্য খাবার নিলুম। কিন্তু হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখি—দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। চাবি মালিকের কাছে—সে খেয়ে ঘুমোচ্ছে। অতএব একদম অগত্যা সেই নিরাবরণ ফুটপাথেই পা মেলে দিলুম।

পরের দিন যথাসময়ে স্টেশনে গিয়ে জন চার পাঁচ বাঙালী ভদ্রলোক নিয়ে এলুম। মালিক খুব খুশী। ভদ্রলোকদের থাকবার জায়গা-টায়গাগুলো ঠিকঠাক করে দিয়ে ছুটলুম কালীর কাছে। কালী বললে—রাত্রে কিছু কষ্ট হয়নি—ঐ দুখানা রুটি খেয়েই কাটিয়েছি।

নতুন রসদের ভাণ্ডার তার কাছে খুলে দেওয়া গেল। সে রেখে দিয়ে বললে—এখন থাক।

এগারটা অবধি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খাবার সময় হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

দিন কয়েক এমনিভাবেই খেয়ে বেড়িয়ে কাটল।

কিন্তু ভাগ্যনদীতে দিন কয়েক জোয়ার এসেই আবার ভাটার টানে যে কে সেই হয়ে দাঁড়াল। কলকাতা মেলে বাঙালী যাত্রী বিরল থেকে বিরলতর হয়ে উঠল। আমরা আর লোক ধরতেই পারি না।

দিন কতক এই রকম দেখে হোটেলের মালিক আমাদের ডেকে বললে—একটু মন দিয়ে কাজকর্ম দেখ। লোক না আনতে পারলে হোটেল চলবে কি করে? বসিয়ে বসিয়ে তো আর খাওয়ানো চলবে না।

ভাবতে লাগলুম।

কিন্তু লোক আনি কোথা থেকে?

এই রকম চলেছে—এই সময় একদিন সকাল বেলা আমরা হর্ণবী রোড ধরে যাচ্ছি—এমন সময় অপর ফুটপাথ থেকে একটি পার্শী ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে আমাদের দাঁড়াতে বললে। ভদ্রলোকটি কালীকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলে তোমার নাম কি?

কালী নাম বললে। লোকটি বললে—তোমার কোনো ভাই কলকাতায় রেলী ব্রাদার্সে চাকরি করে।

—হ্যাঁ, করে।

—কি তার নাম?

কালী নাম বলতেই সে বললে—ঠিক আছে। তোমার ভাই ও আমি একসঙ্গে কাজ করি। বোম্বাই আসছি শুনে তোমার ভাই আমাকে বলেছিল তোমার সঙ্গে যদি দেখা হয় তো তাকে নিয়ে এসো। আমি তখন বললুম—তাকে আমি চিনব কেমন করে? সে তোমার চেহারার বিবরণ দিয়ে বলে দিলে যে, দেখলেই চিনতে পারবে। ঠিকই সে বলেছিল। তোমাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। কলকাতায় যাবে?

কালী ইতস্তত করছিল। আমরা তার হয়ে জবাব দিলুম—হ্যাঁ—যাবে যাবে—

—তা হলে কাল বেলা দশটা নাগাদ আমার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে।

ভদ্রলোক তাঁর ঠিকানা দিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় স্টেশনের কাজ শেষ করে কালীকে নিয়ে চললুম সেই ভদ্রলোকের বাড়ি। ফোর্ট অঞ্চলে একটি নির্জন গলিতে বাড়ি। দোরগোড়ায় একজন লোকের সঙ্গে দেখা হতে সে বললে—চলে যান দোতলায়—ঘরে তিনি বসে আছেন।

পার্শীর বাড়ি।

ঝকঝকে ঝকঝকে, কোথাও একটু মালিন্য নেই।

সিঁড়ি থেকে আরম্ভ করে ঘরের দরজা চৌকাঠ অবধি ছাপা আলপনা দেওয়া। ঘরের বাইরে গিয়ে বললুম—ভেতরে আসতে পারি কি?

তখুনি সেই ভদ্রলোক দরজার কাছে এসে আমাদের অভিবাদন করে ভেতরে নিয়ে এলেন।

ছোট্ট ঘর। কম আসবাবপত্রে সুন্দর করে সাজানো। দেওয়ালে এক জায়গায় ভগবান জরাথুস্ত্রের ছবি। তারই নীচে একটি অনির্বাণ দীপ জ্বলছে। খান কয়েক সোফা, তার একটিতে দুটি মহিলা আর তারই পাশের একটি গদি-আঁটা চেয়ারে একটি বৃদ্ধা বসে আছেন। আমাদের ভদ্রলোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকেই গুজরাটি ভাষায় মহিলাদের বললেন—এই এরাই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন।

আমরা সেই সোফায় বসতে সঙ্কুচিত হচ্ছি দেখে মহিলাদের মধ্যে একজন বললেন—বোসো, বোসো।

বস্তুত আমাদের চেহারা ও বসন এই পরিবেশের মধ্যে খাপ খাচ্ছিল না বলে আমরা বসতে সংকুচিত হচ্ছিলুম। আমরা বসতে না বসতেই প্রশ্নের বাণ বর্ষিত হতে শুরু হল—এ রকম করে বাড়ি থেকে কখনো পালাতে আছে? বাড়ি থেকে পালালে কেন? কে কে আছেন বাড়িতে—ইত্যাদি।

ভদ্রলোক বললেন—কাল বেলা সাড়ে তিনটের সময় নাগপুরের গাড়িতে আমি কলকাতায় যাব। সকালবেলাতেই আমি টিকিট কিনে রাখব। তুমি এসে তোমার টিকিটখানা নিয়ে যাবে।

তারপর ভদ্রলোক পাঁচটি টাকা কালীর হাতে দিয়ে বললে—যদি এখানকার কিছু খরচপত্র থাকে তো এই নাও।

টাকা পেয়ে আমরা তখুনি উঠে পড়লুম।

শেঠজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কালী তিনটে টাকা আমাদের দিয়ে বললে—এটা তোরা রাখ। পথের খরচা আমি এই দু টাকাতেই চালিয়ে নেব।

মনে পড়ে সেদিন প্রথম কাঁচি সিগারেটের প্যাকেট কিনে তিনজনে তিনটে আগেই ধরিয়ে ফেলা গেল। এই জাতকের গোড়াতেই বলেছি যে কালী হুঁকো টেনে নতুন কল্কে ফাটিয়ে দিতে পারত। সেই কালী কতদিন সিগারেটের আস্বাদ পায়নি। সে পরমানন্দে এক এক টানে মুখ দিয়ে ইঞ্জিনের মতন ধোঁয়া বার করতে লাগল।

যাই হোক, পরদিন সকালবেলা স্টেশনের কর্তব্য সমাধা করে আমরা শেঠজীর ওখানে গেলুম। তিনি আগেই টিকিট কিনে রেখে-ছিলেন। একখানা থার্ড ক্লাসের বি এন আর এ হাওড়ার টিকিট কালীকে দিয়ে বললেন—যথা সময়ে গিয়ে ট্রেনে চড়বে। ঐ ট্রেনে আমিও যাচ্ছি কলকাতায়—দেখা হবে। আর এই পাঁচটা টাকা নাও—পথে খাওয়া-দাওয়া ও অন্য খরচের জন্য।

এই পাঁচ টাকা থেকেও কালী আমাদের তিনটে টাকা দিলে। বেলা প্রায় চারটের সময় কলকাতা-যাত্রী গাড়িতে কালীকে চড়িয়ে দিলুম। সেই গাড়িতেই সেকেণ্ড ক্লাসে শেঠজীও গেলেন। ধীরে ধীরে চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল।

কালী চলে যেতেই মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। আমরা ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে পা চালিয়ে দিলুম।

কালীর কথাই থেকে থেকে মনের মধ্যে উঠছিল। সে বরাবরই হাসিখুশি আত্মভোলা লোক। কিন্তু কলকাতায় বাড়ির খাবার খেয়ে, বাড়ির যত্ন পেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে হাসি-খুশি থাকা এক কথা, আর নিত্য অনাহার, অর্ধাহার, অপমান এবং যত রকম ক্লেশকর অবস্থা হতে পারে তা সহ্য ক'রে হাসিখুশি থাকা আর এক কথা।

মনে পড়তে লাগল আমাদের অরণ্যবাসের সময় প্রতিদিন অর্ধাহার তো ছিল, কোনো কোনো দিন অনাহারেও কেটেছে। সন্ধ্যে-বেলায় কর্মাবসানে এক এক দিন শরীরের এমন অবস্থা হতো যে সেখান থেকে তিন মাইল দূরে ইস্টিশনে গিয়ে একমুঠো ছোলা-সেদ্ধ ও চালভাজা খেয়ে রাত্তিরে ফেরবার সময় জঙ্গলে জানোয়ার বেরিয়ে পড়ত। সেই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ক্লান্ত ও অনাহারক্লিষ্ট গলায় কালী এক এক দিন গান ধরত—

"কি ছার আর কেন মায়া
কাঞ্চন-কায়া তো আর রবে না—
দিন যাবে তো দিন রবে না—
কি হবে তোর তবে—
আজ পোহাবে কাল কি রবে" ইত্যাদি।

কালীর সেই গান শুনে কান্নার বদলে আমরা হেসে ফেলতুম। ভাবতে ভাবতে অনেকখানি পথ চলে এসে আমরা সমুদ্রের ধারে এসে পড়লুম।

বোম্বাইয়ে এসে এই জায়গাটির সঙ্গে আমাদের খুবই ভাব জমে গিয়েছিল। সমস্ত দিন এমন কি রাত্তিরেও অনেক সময় আমরা এখানেই কাটাতুম। জুতোচুরির পর এদিক থেকে সরে পড়তে হয়েছিল।

তখনকার এই শান্ত সমাহিত ও জনবিরল সমুদ্রতটের সঙ্গে আজকের এই মুখর ও ঘটনাবহুল চৌপাটীর কোনো তুলনাই হয় না। সমুদ্র-উপকূলে একটুখানি ঘাটের মত করা ছিল আর পেছনেই ছিল সমুদ্রকে বেষ্টন ক'রে বেড়াবার জন্য এক ফালি সরু রাস্তা এবং এই রাস্তার ধারে ধারে ভারী লোহার বেঞ্চি সার বেঁধে সাজানো ছিল আর তারপরেই ছিল চার্চগেট স্টেশন অবধি তৃণাচ্ছাদিত সুন্দর ময়দান।

সন্ধ্যের পরই এই সব বেঞ্চিতে আমরা শুয়ে পড়তুম।

বোম্বাই এসে এই জায়গাটিকেই আমরা ঘরবাড়ি ক'রে তুলেছিলুম। অন্ধকারে জনশূন্য প্রান্তরে সেই বেঞ্চিতেই শুয়ে শুনতুম একদিকে মহানগরীর ক্ষীণ জন-কল্লোল অন্যদিকে মহাসমুদ্রের সংগীতময়ী কলধ্বনি—আর এদের সঙ্গে মিলিত হত আমাদের অন্তরের আশা ও ভবিষ্যতের চিন্তা। পায়ে পায়ে এসে সমুদ্রের ধারে সেই ঘাটের মত জায়গাটিতে এবার আমরা বসে পড়লুম।

দেখতে দেখতে বেলা প'ড়ে যেতে লাগল। বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় পার্শী নর-নারীরা সেই জায়গাটিতে এসে অস্তমান দ্যুমণিকে প্রণাম জানাতে লাগল। কোমর থেকে পৈতে খুলে জলে ভিজিয়ে আবার তা কোমরে জড়িয়ে নতুন গ্রন্থি দিয়ে আবার শহরের দিকে ফিরে যেতে লাগল। আমাদের পেছনে একদল ফুলের মত শিশু খেলা করছিল—মাথায় তাদের জরির কাজ করা ভেলভেটের গোল টুপি—ছুটতে ছুটতে তারা হাসাহাসি ক'রে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল আর তাদের পেছনের বেঞ্চিগুলিতে এখানে সেখানে দু'টি চারটি করে নরনারী বসে গল্প করছিল।

সেদিনের সেই সন্ধ্যাটি আমার স্মৃতির কোন অতলে লুকিয়েছিল; আজ মানসপটে তা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে হচ্ছে যে সেদিন যাদের দিনমণিকে প্রণাম করতে দেখেছিলুম আজ তারা কোথায়! সেই যে ফুলের মতো ছোট ছোট শিশুগুলি আমাদের পিছনে কোলাহল করছিল তারাই বা আজ কোথায়! নিজের সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেছে—ওরে স্থবির! তুই বা কোথায় এসেছিস্? পথের সন্ধান কি হয়েছে? কি আছে পথের শেষে?

বসে থাকতে থাকতে আমাদের চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল। সময়ের কোনো জ্ঞানই ছিল না। কখন লোকজন সব ফিরে গিয়েছে—শহরের জন-কল্লোল ক্ষীণতর হয়েছে, তা বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে দূরে রাজাবাই টাওয়ারের ঘণ্টা-ঘড়ি বেজে উঠে জানিয়ে দিলে—সময়মতো পৌঁছতে না পারলে হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

অবশ্য হোটেলের দরজা আমাদের জন্য বেশি দিন খোলা থাকেনি। প্রতিদিন সকালে উঠে কলকাতা মেল ধরতে স্টেশনে ছোটা—তারপর খদ্দের জুটিয়ে না আনতে পারায় হোটেলের মালিকের মুখভঙ্গি—আমাদেরও আর ভালো লাগছিল না। ইতিমধ্যে মিস্তিরির দরাজ হাতও ক্রমশ কমতে কমতে ক্রমে কিমা, ঢ্যাঁড়শের তরকারী এমন কি রুটির ওপরেও কামড় বসালে। তারপর একদিন মালিকের নির্দেশেই আমাদের দরজা দেখিয়ে দিলে।

আমরাও বেঁচে গেলুম।

বেঁচে তো গেলুম—কিন্তু এখন আসল বাঁচার উপায় কি?

দুই বন্ধুতে মিলে নিত্যকার মতো সমুদ্রের ধারে এসে বসলুম পরামর্শ করতে।

(ক্রমশ)

পুষ্টির অভাবের পরিণাম

অপুষ্টি বা পুষ্টির অভাব কোন দেশ-বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের মত যে-সব দেশ হালে স্বাধীন হয়েছে, তাদের তো কথাই নেই, কথাই নেই আফ্রিক্যান দেশগুলির। অপুষ্টিকে যদি অসুখ বলতে আপত্তি না থাকে, তা হলে বলা যায়, এমন সর্বদেশব্যাপী অসুখ আর আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই অপুষ্টির ফল আখেরে গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে যা শৈশবে সাময়িক পুষ্টির অভাব হলে তার সুদূরপ্রসারী পরিণাম কি হবে, এ সম্পর্কে এখনো খুব বেশি কিছু কাজ হয়নি।

নাটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (দক্ষিণ আফ্রিকা) চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে পুরুষ ও স্ত্রী ইঁদুর পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি পায়নি, তাদের বাচ্চারা হয় খর্বকায়, তাদের বুদ্ধিশুদ্ধিও হয় কম। ভূমিষ্ঠ হবার পর তাদের খুবই ভাল করে খাওয়ানো দাওয়ানো হোক, তাতে কোন উন্নতি হয় না। তাই যদি হয়, তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, উপযুক্ত খাদ্যাভাবের অভাবের কুফল এক পুরুষের মধ্যে কাটিয়ে ওঠা যায় না। সুতরাং ভারতের মত দেশে প্রোটিন খাদ্যের যে অভাব রয়েছে, তার দীর্ঘমেয়াদী পরিণাম মারাত্মক হতে পারে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও তাদের কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধি কম হবে।

ফর্মোজার কিছু শিশু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, যাদের মায়েদের পুষ্টির অভাব ছিল না, তাদের চেয়ে যাদের মায়েদের পুষ্টির অভাব ছিল, তাদের শরীরের ওজন ঠিক রাখবার জন্য শতকরা ৩০ ভাগ বেশি খাদ্যের দরকার। তা হলে আমরা নিঃসন্দেহে দেখতে পাচ্ছি যে, অপুষ্টির ফলাফল উত্তরপুরুষে পরিবাহিত হয় এবং মায়ের অপুষ্টি শিশুর স্বাস্থ্যের চিরকালের মত ক্ষতি করে।

ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে আরো জানা গিয়েছে যে, এমনকি, অল্পকালও সে যদি পর্যাপ্ত খাদ্য না পায়, তার কুফল ভোগ করতে হয় জোয়ান বয়েসেও। জোয়ান বয়সে ভাল খাদ্য পেলেও সেই

শৈশবে পুষ্টির অভাবে এই কোলের ছেলেমেয়ে দুটি বড় হলে এদের স্বাস্থ্য ভাল হবে এটা কি কেউ আশা করতে পারেন? —('পীস কোর' পত্রিকা থেকে গৃহীত)

অল্পকালের অপুষ্টির কুফল দূর হয় না। কতকগুলি ইঁদুরকে জন্মের পর তিন সপ্তাহ ভাল খাদ্য না দিয়ে দেখা গিয়েছে যে, তারপর যতই ভাল খাদ্য দেওয়া যাক, তবু তাদের কায়িক ও মানসিক দুর্বলতা থেকেই যায়।

অবশ্য মানব শিশুর উপর অপুষ্টির ফলাফল বিচার করায় অসুবিধা রয়েছে কারণ, শৈশবে কাউকে পর্যাপ্ত খাদ্য না দেওয়াটা অন্যায়। সুতরাং যা করা যেতে পারে, তা হচ্ছে এই যে, এমন কিছু শিশু খুঁজে বার করা, যারা কোন না কোন সময়ে ভাল পুষ্টি পায়নি এবং তাদের সঙ্গে এমন কিছু নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা চালানো, যাদের কোনদিন পুষ্টির অভাব হয়নি। এদের বলতে পারা যায় কন্ট্রোল গ্রুপ। কিন্তু সেরকম ছেলেমেয়ে খুঁজে পাওয়াও সহজ নয়। খুঁজে বার করার একটি উপায় হচ্ছে, যে-সব শিশুকে অপুষ্টিজনিত রোগে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাদের ভাই-বোনদের কন্ট্রোল গ্রুপ হিসাবে ব্যবহার করা, কারণ, এদের সকলেরই মা-বাপ এক।

এই পদ্ধতিতেই কাজ করেছেন জামাইকার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের ট্রপিক্যাল রিসার্চ ইউনিটের অধ্যক্ষ ডঃ জে এস গ্যারো এবং মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের লণ্ডনস্থ ইউনিভার্সিটি কলেজ হাস-পাতালের মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক মিঃ এম সি পাইক। তাঁরা জামাইকায় এমন ৬৫টি শিশু খুঁজে বার করেন, যাদের কোন না কোন সময়ে অপুষ্টিজনিত অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের দুই থেকে আট বছর পর্যন্ত পরীক্ষাধীন রাখা হয়। জামাইকায়

সাধারণত শিশুদের ছয় মাস বয়সের মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা হয়। এইজন্য শিশুদের উপর পুষ্টির অভাবের ফলাফল সেখানে পরীক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই রকম মাত্র কয়েক মাস বয়সের শিশুদের উপর পরীক্ষা করার তাৎপর্য এই যে, ইঁদুরের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, যত কম বয়সে পুষ্টির অভাব হয়, ততই তার কুফল বেশিকাল, এমন কি বরাবর থেকে যায়।

জামাইকার শিশুদের উচ্চতা ও ওজনের সংগে তাদের খাদ্যের পুষ্টি গুণ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ডঃ গ্যারো এমন শিশু জোগাড় করেন যারা কোন না কোন সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল পুষ্টির অভাব-জনিত রোগের জন্য। এই রকম ৬৫টি শিশু নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন তাদের সংগে আরো কিছু শিশু নিয়ে যারা ঐ রুগ্ন শিশুদের সংগেই গড়ে বেড়ে উঠেছে কিন্তু তাদের ঐরকম কোন রোগ ছিল না। দুই দল থেকে একজন করে শিশু নিয়ে তিনি জোড়ায় জোড়ায় পরীক্ষা করেন, তাদের পায়ের এক্স রশ্মির ছবি তোলেন এটা দেখবার জন্য যে তাদের পায়ের মাংসপেশী, হাড় ও চর্বিতে কোন পার্থক্য হয়েছে কি না। আশ্চর্যের কথা এই যে সুস্থ ও আগেকার অসুস্থ ছেলেগুলির পায়ের পেশী হাড় ও চর্বির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কোন পার্থক্য দেখতে পাওয়া গেল না। বরং দেখা গেল যে যারা এক সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল তাদের ছাতি একটু বেশি চওড়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অল্প সময়ের জন্য পুষ্টির অভাব তারা পুষিয়ে নিতে পেরেছে। কিন্তু তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম যে ইঁদুরের উপর পরীক্ষার ফলাফল আর মানবশিশুর উপর পরীক্ষার ফলাফল এক হচ্ছে না। কিন্তু তাহলে এটাই বা কি করে হয়—পরিবার বিশেষের শিশুদের অপুষ্টির ফলে গড়ন-বাড়ন অন্য পরিবারের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া শিশুদের চেয়ে কম হচ্ছে? ডঃ গ্যারো বলছেন যে, ঐ যে সব শিশুর পুষ্টির অভাবের ফলে গড়ন-বাড়ন কম হয়েছে, পারি-বারিক দারিদ্র্যের জন্য হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েও তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য জোটেনি বলেই বাড় কম হয়েছে।

এই সংগে আর একটি কথা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে এই যে, ইঁদুরের এবং মানুষের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল দুই রকম হচ্ছে কেন? সে বিষয়ে ডঃ গ্যারো বলছেন যে, মানব শিশু ও ইঁদুরের বাচ্চার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ইঁদুর বাচ্চার তুলনায় মানবশিশু অনেক বেশি সময় জরায়ুর মধ্যে থাকে এবং দীর্ঘকালীন অপুষ্টি থেকে রক্ষা পাবার উপযুক্ত হয়েই সে ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে মাতৃগর্ভে থাকার সময় তার মা যদি দীর্ঘকাল অপুষ্টিতে ভোগেন তাহলে সেই অপুষ্টির কুফল থেকে শিশু রেহাই পাবে না অর্থাৎ এক পুরুষের কুফল উত্তর-পুরুষেও ঘটবে।

ডঃ গ্যারো আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন। তিনি দেখেছেন যারা অপুষ্টির জন্য এক সময় হাসপাতালে ছিল তারাই আবার পরে অন্যদের চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে। কোন পরিবারেরই সব ছেলেমেয়ে সমান লম্বা হয় না, কেউ কেউ বয়েসের তুলনায় একটু বেশি লম্বাই হয় অবশ্য যদি ভাল খাদ্য পায় তবেই। কিন্তু যে পরিবার দারিদ্র্যের দরুণ ছেলেমেয়েদের পর্যাপ্ত পুষ্টি দিতে অক্ষম হয় সেখানে ঐ বেশি লম্বা ছেলেমেয়েদেরই ক্ষতি হয় বেশি। কিন্তু তাদের তারপরে যদি ভাল খাদ্য দেবার বন্দোবস্ত করা যায় তাহলে তারাই আবার অন্য সকলের চেয়ে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে। সুতরাং দুনিয়ার অনুন্নত দেশগুলির কর্তব্য সমস্ত শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সুনিশ্চিত করা।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥
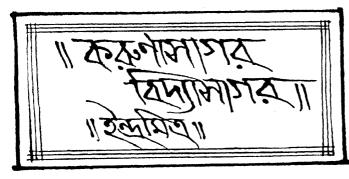
মাইকেল মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬০ সালের মে মাসে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে সেই প্রথম বাংলা ভাষায় কাব্য লেখা হল।

গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ পছন্দ করেন নি। ঠাট্টা করে বলেছেন:

তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ,
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।

কিন্তু কিছুদিন পরেই বিদ্যাসাগরের মত বদলে গেল। মাইকেল যা লিখেছেন তার মধ্যে "great merit" দেখতে পেলেন বিদ্যাসাগর। মাইকেল একখানা চিঠিতে তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছেন:

"The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it...."

দু বছরের মধ্যেই দেখা গেল মাইকেলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠেছে। ১৮৬২ সালের গোড়ার দিকে মাইকেল একখানা চিঠিতে রাজনারায়ণকে লিখেছেন:

"The great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection!"

মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বেরিয়েছে ১৮৬২ সালে। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' মাইকেল উৎসর্গ করেছেন বিদ্যাসাগরকে। উৎসর্গপত্রে মাইকেল লিখেছেন: "বঙ্গকুলচূড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া, কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল। ইতি। ১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।"

ঠিক হল, মাইকেল মধুসূদন বিলেত যাবেন, ব্যারিস্টারি পড়বেন। সে বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে উৎসাহ পাওয়া গেল। শুধু মুখের কথায় উৎসাহ দেননি বিদ্যাসাগর, কাজেও মাইকেলকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন।

মহাদেব চাটুয্যের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে মাইকেল পত্তনি দিয়ে দিলেন সুন্দরবন অঞ্চলের চক মনুকিয়া আর গদারডাঙা। চুক্তি হয়ে রইল, মাইকেলের প্রাপ্য টাকা মোক্ষদা দেবী চার কিস্তিতে মাইকেলকে ইউরোপে পাঠাবেন; আর মোক্ষদা দেবী মাসে-মাসে কলকাতায় দেড়শো টাকা দেবেন মাইকেলের স্ত্রী হেনরিএটাকে। মাইকেলের মেয়ে শর্মিষ্ঠা আর ছেলে মিল্টন দত্ত মায়ের সঙ্গে কলকাতায় থাকবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাইকেল যাতে চুক্তিমতো টাকাকড়ি পান, তা দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিলেন দিগম্বর মিত্র আর বৈদ্যনাথ মিত্র।

তারপর ১৮৬২ সালের ৯ জুন মাইকেল মধুসূদন 'ক্যান্ডিয়া' নামে একটা জাহাজে উঠে ইউরোপের দিকে পাড়ি দিলেন। জুলাই মাসের শেষাশেষি বিলাতে পৌঁছলেন। ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে ঢুকে পড়লেন গ্রেজ্ ইন্-এ। কিছুদিন নির্ভাবনায় কেটে গেল।

তারপর আরম্ভ হল দুর্দশা।

যাঁদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, কিছুকাল পরে তাঁদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আসা বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি, কলকাতায় হেনরিএটাকেও তাঁরা টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। বহু কষ্টে কিছু টাকা-পয়সা জোগাড় করে হেনরিএটা ১৮৬৩ সালের মে মাসে ছেলেমেয়ে নিয়ে মাইকেলের কাছে চলে এলেন। সুদূর বিদেশে টাকার অভাবে মাইকেল বিপদে পড়ে গেলেন।

পর পর কয়েকখানা চিঠি লিখলেন দিগম্বর মিত্রকে। কিন্তু কোনো ফল হল না। আর বৈদ্যনাথ মিত্র? তাঁর বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো।

১৮৬৩ সালের মাঝামাঝি মাইকেল বিলেত থেকে ফরাসী দেশে চলে এলেন। প্যারিসে। ভের্সাইয়ে।

বছরখানেক হল দেশ থেকে একটি কানাকড়িও আসেনি। মাইকেলের অতএব চূড়ান্ত দুর্দশা। জিনিসপত্র বন্ধক দিতে হল। ধার-দেনা করতে হল। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে মাইকেলের প্রায় জেলে যাবার দশা।

তখন মাইকেলের বিদ্যাসাগরের কথা মনে হল। মাইকেল বিদ্যাসাগরের শরণ নিলেন। পর পর দুখানা চিঠি লিখলেন। প্রথম চিঠির তারিখ ১৮৬৪ সালের ২ জুন; দ্বিতীয় চিঠির তারিখ ১৮৬৪ সালের ৯ জুন।

প্রথম চিঠিখানার প্রথম দুটি বাক্য উদ্ধার করি:

"My dear sir, If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written

to you so long. But you know well that we never fly to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends."

সমস্ত চিঠিখানা জুড়ে অতঃপর দুর্দশার বিস্তারিত বর্ণনা। পরিশেষে সাহায্যের প্রার্থনা।

দুখানা চিঠি লিখেও মাইকেল নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। কে জানে, যদি একখানা চিঠিও বিদ্যাসাগরের হাতে না পড়ে। তাই ১৮৬৪ সালের ১৮ জুন বিদ্যাসাগরকে আরো একখানা চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন কলকাতা পুলিশ আপিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের মারফৎ।

মাইকেলের তখন দারুণ দুর্দশা। স্ত্রীপুত্রকন্যা সমেত প্রায় উপোস করার অবস্থা। নিরুপায় হয়ে মাইকেল একজন পাদরীর কাছে ধার চাইলেন; পুওর-ফণ্ড থেকে পাদরী ধার দিলেন পঁচিশ ফ্রাংক (আমাদের সেকালের হিসেবে প্রায় ন টাকা)। দিন কয়েকের মধ্যে দিগম্বর মিত্রের কাছ থেকে আটশো টাকা এল। কিন্তু মাইকেলের যা ধার-দেনা তখন, ওই আটশো টাকা তার কাছে কিছুই নয়।

২৮ আগস্ট, ১৮৬৪ সাল। রবিবার। সকালবেলা। মাইকেল পড়ার ঘরে বসে-ছিলেন। হেনরিএটা এসে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ছেলেমেয়েরা মেলায় যেতে চাইছে। কিন্তু আমার কাছে মাত্র তিন ফ্রাংক আছে। দেশের লোকেরা আমাদের সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করছে কেন?

মাইকেল বললেন—আজই তাক আসবার কথা। নিশ্চয়ই আজ সুখবর আসবে। কেননা, যাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি তাঁর প্রতিভা আর জ্ঞান প্রাচীন কালের ঋষির মতো, তাঁর শক্তি-সামর্থ্য ইংরেজের মতো। তাঁর প্রাণ বাঙালী মায়ের মতো।

মাইকেল ভুল বলেননি। এক ঘণ্টা বাদেই বিদ্যাসাগরের চিঠি এল। দেড় হাজার টাকা এল। বিদ্যাসাগর পাঠিয়েছেন। মাইকেলের চিঠি পেয়েই বিদ্যাসাগর ১৮৬৪ সালের ২ আগস্ট, মাইকেলকে দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুদূর বিদেশে মাইকেলের দারুণ দুর্দিনে বিদ্যাসাগরই তাঁকে বাঁচিয়েছেন।

নিজের দায়িত্বে বিদ্যাসাগর অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ধার নিলেন তিন হাজার টাকা; আর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা। ধার করে টাকা পাঠালেন মাইকেলকে।

বিদ্যাসাগরকে যত চিঠি লিখেছেন মাইকেল, সবই ইংরেজিতে। বাংলায় লেখেননি, কেননা, মাইকেল নিজেই বলেছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের মতো বাংলা লিখতে পারেন না, অভ্যাসের অভাবে পারেন না।

১৮৬৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেলের একখানা চিঠির মধ্যে বাংলায় কয়েকটি লাইন আছে। বাংলা অংশটুকু তুলে দিচ্ছি: "আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদজলে পড়িয়াছেন। কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটি বন্ধু নাই, যে তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্যুর মতন মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরবদলে প্রবেশ করিয়াছেন; আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি: অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক; এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক! এ কথাটি যেন সর্বদা স্মরণ-পথে থাকে!"

তারপর ১৮৬৫ সালের ১৮ মে বিদ্যাসাগরকে এজেণ্ট নিযুক্ত করে ওকালতনামা পাঠালেন মাইকেল। মাইকেলের সম্পত্তি বন্ধক রেখে অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বারো হাজার টাকা নিয়ে মাইকেলকে পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

১৮৬৫ সালের শেষভাগে মাইকেল আবার লণ্ডনে চলে এলেন। ১৮৬৬ সালের ১৭ নভেম্বর গ্রেজ ইন থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাশ করলেন। পরীক্ষার পর আবার চলে এলেন ফরাসী দেশে। হেনরিএটা আর ছেলেমেয়েদের ফরাসীদেশে রেখে ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে কলকাতায় ফিরে এলেন মাইকেল।

মাইকেলের জন্য বিদ্যাসাগর সাকিয়া স্ট্রীটে একখানা বাড়ি সাহেবি কায়দায় সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু মাইকেল সে বাড়িতে উঠলেন না। উঠলেন গিয়ে স্পেনসেস হোটেলে। পুরো পাক্কা সাহেবি এলাকায়।

দিনকয়েক পরে রাস্তায় একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় বাসা নিলে?

মাইকেল হেসে বললেন—বামুনপাড়ায়, বামুনপাড়ায়।

বামুনপাড়া কি হে?

—পাড়াগাঁয়ে যে-পাড়া সকল পাড়ার সেরা, সেই পাড়াকে বামুনপাড়া বলে। কলকাতার মধ্যে সাহেবপাড়াই শহরের মাথা। আমি সেখানেই আছি।

অনেকেই স্পেনসেস হোটেলে মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বিদ্যাসাগরও এলেন। বিদ্যাসাগরকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন মাইকেল, দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে আলিঙ্গন করে নাচতে লাগলেন, বারংবার চুম্বন করলেন।

অনেক চেষ্টায় মাইকেলকে ক্ষান্ত করলেন বিদ্যাসাগর। চেয়ারে বসলেন। বললেন—এই হোটেলে অনেক খরচ। আপনার জন্য আমি একটা সুন্দর বাড়ি সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছি। আপনি সেখানে চলুন না, সুখে থাকবেন।

কিন্তু মাইকেল রাজী হলেন না। বললেন—এখানে বেশ আছি। এ নিয়ে আপনি আর ব্যস্ত হবেন না।

এবিষয়ে তখন আর কিছু বললেন না বিদ্যাসাগর। বিদায় নিলেন। আবার মাইকেল বিদ্যাসাগরকে আলিঙ্গন করে নৃত্য করলেন, চুম্বন করলেন।

পরেও বিদ্যাসাগর মাইকেলকে স্পেনসেস হোটেল থেকে সরিয়ে আনার জন্য বিস্তর চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারেননি।

কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করতে গিয়েও মাইকেল বাধা পেলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাধা-বিঘ্ন কেটে গেল। সে-ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর সাহায্য করেছেন।

ব্যারিস্টারি আরম্ভ করলেন মাইকেল। আস্তে-আস্তে বেশ টাকাকড়ি আয় করতে লাগলেন। আয় যা করেন, ব্যয় তার চেয়ে

বেশি করেন। একা মানুষ, কিন্তু স্পেনসেস হোটেলে তিনখানা বড়ো-বড়ো ঘর ভাড়া নিয়েছেন। ঢালাও হাতে খরচ করেন, বন্ধু-বান্ধবেরা ঘন-ঘন খাওয়া-দাওয়া করেন। মাসে হাজার টাকার কমে চলে না। তাছাড়া, হেনরিএটা আর ছেলেমেয়ের জন্য মাসে-মাসে তিন-চারশো টাকা পাঠাতে হয় ইউরোপে। আগের ঋণ শোধ হওয়া তো দূরের কথা নতুন করে ঋণ নিয়ে খরচ চালাতে হচ্ছে।

বিদ্যাসাগরের কাছে আবার সাহায্য চাইলেন মাইকেল।

আগেই বলা হয়েছে, মাইকেলের ঘোর দুর্দশার সময় অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার করে বিদ্যাসাগর মাইকেলকে পাঠিয়েছিলেন। যাঁদের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন—শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আর অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—টাকার জন্য বারংবার তাগাদা দিতে লাগলেন বিদ্যাসাগরকে। বিদ্যাসাগর তখন অসুস্থ। উত্যক্ত হয়ে তিনি মাইকেলকে একখানা চিঠি লিখলেন বর্ধমান থেকে। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি:

'সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্—অদ্য সাত দিন হইল বর্ধমানে আসিয়াছি, এ পর্যন্ত তাদৃশ উপকার বোধ হয় নাই। আসিবার পূর্বে আপনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, এ-জন্য লিপি দ্বারা জানাইতেছি। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোনক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, সুতরাং তাঁহারা অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ব লক্ষণ ঘটিয়াছে।

যৎকালে আমি অনুকূলবাবুর নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দি। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব, এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূলবাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই।

এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে, রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমায় পরিত্রাণ করেন। পীড়া শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চল যাওয়া এবং অন্তত ছয় মাসকাল তথায় থাকা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে যাইব স্থির করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোনমতেই যাইতে পারিব না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন, অধিক আর কি লিখিব, আমি নিজে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কার্য শেষ করিয়া লইব, আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না। অনেক লিখিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু অসুস্থতাবশত পারিলাম না। কিমধিকমিতি—

ভবদীয়স্য—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ"

এই চিঠি পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন মাইকেল। সেই মুহূর্তে একখানা চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগরকে। মাইকেলের সেই চিঠিখানা থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছি:

"Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you, of course you have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden . . ."

মাইকেলের অভাবের অন্ত হল না। আবার, আবার টাকার অভাব। ১৮৬৮ সালের ১৮ মার্চ বিদ্যাসাগর একখানা চিঠি লিখেছেন মাইকেলকে। সেই চিঠিখানার প্রতিলিপি তুলে দিচ্ছি:

My dear Dutt

I am still very unwell and confined to bed—and in consequence utterly incapable of mental or physical exertions of any kind. You will therefore be good enough to excuse my inability to work in furtherance of your object.

Yours truly
[illegible]

Please return by the bearer the two letters - Mr. Connell wants them back to enable him to reply to them

18-3-68

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে লিখিত বিদ্যাসাগরের একখানি চিঠির প্রতিলিপি

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, চিঠিতে একটি লাইন—

I am really very sorry to know that you are again in pecuniary difficulty—

লিখেও বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত কেটে দিয়েছেন। একবার লিখে আবার কেটেছেন কেন? হয়তো ভেবেছেন, দু-হাতে খরচ করার ফলে যাঁর অর্থাভাব হয়, তাঁর অর্থ-কষ্টে দুঃখিত হবার কোনো অর্থ নেই; তাঁর অর্থকষ্টে দুঃখিত হবার কথা লিখলে সত্য কথা লেখা হয় না।

বিদ্যাসাগরের মতো বন্ধু যে পরম মূল্যবান, এ-সত্য মাইকেল মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি। বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব চলে গেলে তো দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত। অন্তত মাইকেল সেই রকম কথাই বলেছেন। ১৮৬৮ সালের ১৭ অক্টোবর মাইকেল একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন:

"If you have ceased to be my friend, the sooner I hear of the calamity the better."

অভাব, অভাব, মাইকেলের নিদারুণ অভাব। অভাবের কোনো ইতি-অন্ত নেই। দু-হাতে ঋণ করেছেন। চতুর্দিকে ঋণ। পাওনাদারদের ভয়ে অনেক সময় বাড়ির বাইরে বেরোনোর উপায় থাকে না।

অভাব মাইকেলের স্বভাবে।

একখানা ঠিকাগাড়িতে করে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসেছেন মাইকেল। কোচম্যানকে দিলেন—আধুলি নয়, টাকা নয়, আস্ত একটি মোহর। কোচম্যানকে এত বেশি দেবার কোনো মানে হয়? এমন অপব্যয় আর যাতে না করে, সে-জন্য বিদ্যাসাগর দু-চার কথা বললেন মাইকেলকে।

মাইকেল বললেন—বিদ্যাসাগর, আজ দু'দিন যাবৎ এই কোচম্যান আমাকে নানা জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। ওকে বেশি আর কী দিলাম!

অনেক সময় বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে টাকা এনেছেন মাইকেল, কিন্তু সে-টাকায় সংসারের কোনো সুরাহা করেননি, সব টাকা আমোদ-আহ্লাদে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ব্যারিস্টারি ছেড়ে মাইকেল চাকরি করলেন কিছুকাল। অভাব কিছুতেই দূরে হল না। এদিকে শরীর ভেঙে গিয়েছে। চাকরি ছেড়ে ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে আবার ব্যারিস্টারি আরম্ভ করলেন। কিন্তু তখন তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে, নানা রকম অসুখ শরীরে। বিপুল ঋণ।

১৮৭২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মাইকেলকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠি:

"My Dear Dutt,

I have tried my best and am sadly convinced that your case is an utterly hopeless one—no exertion of mine, or that of any body else who is not a moneyed man, however strenuous it may be, can save you. It is too late to mend matters by patch-works. I am very unwell and am therefore unable to write more.

Yours sincerely,
Isvara Chandra Sarma"

এখানে বলে রাখা ভালো, মাইকেলের জন্য বিদ্যাসাগরকে কারো কাছে অপদস্থ হতে হয়নি। মাইকেলের জন্য বিদ্যাসাগর যত ঋণ করেছেন, সব টাকা মাইকেল নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে শোধ করেছেন, বিদ্যাসাগরকে দায়মুক্ত করেছেন।

বিদ্যাসাগর যে সময়ে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, সে সময়ে, যত দূর জানা যাচ্ছে, সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের সংস্কৃত-নাটক অভিনয়ে বিশেষ আমোদ ছিল। নিকটবর্তী বিশ্বাস-মহাশয়ের বাটী হইতে অলঙ্কার ও বস্ত্র আনিয়া তিনি ছাত্রদিগকে সাজাইতেন এবং কলেজের একটি গৃহে নেপথ্য করিতেন।"

কয়েকবার বাঙলা নাটকের অভিনয় দেখেছেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৮ সালের ২২ মার্চ বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়িতে বিদ্যাসাগর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছেন। ১৮৫৮ সালের ৩১ জুলাই পাইকপাড়ার রাজাদের বেল-গাছিয়ার বাগানবাড়িতে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় বিদ্যাসাগর 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখেছেন।

পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের পুরনো বাড়ির দোতলায় নাচঘরে একটি রঙ্গমঞ্চ হল। ঠাকুরবাড়িতে থিয়েটারের জন্য কমিটিও ছিল একটি। সেই কমিটিই ঠিক করে দিত, কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করবে। বিদ্যাসাগর সেই কমিটির একজন সভ্য।

১৮৫৯ সালের ২৩ এপ্রিল স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র সেন আর তাঁর দলের যুবক-দের উৎসাহে 'বিধবা বিবাহ' নাটকের প্রথম
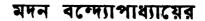
অভিনয় হল। বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহে'র অভিনয় দেখতে একাধিকবার এসেছেন; 'বিধবা বিবাহে'র অভিনয় দেখতে-দেখতে বিদ্যাসাগরের দু' চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়েছে।

এসব ঘটেছে অ্যামেচার থিয়েটারে, সখের রঙ্গালয়ে। ইচ্ছা হলেই কেউ এসে সখের রঙ্গালয়ে ঢুকতে পারেন না। কর্তারা যাঁদের নেমন্তন্ন করেন, তাঁরাই শুধু সখের থিয়েটারে ঢুকতে পারেন। ইচ্ছা হলেই পয়সা ফেলে টিকিট কেটে ঢুকতে হলে যেতে হবে সাধারণ রঙ্গালয়ে —ইংরেজিতে যাকে বলে পাবলিক থিয়েটার।

এবার তাহলে বেঙ্গল থিয়েটারে আসা যেতে পারে। বেঙ্গল থিয়েটার কিন্তু সখের রঙ্গালয় নয়।

বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার শরৎচন্দ্র ঘোষ, অবৈতনিক সম্পাদক প্যারীমোহন রায়। বেঙ্গল থিয়েটারের আগে বাঙালীর আর কোনো সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী দেখা যায়নি। বেঙ্গল থিয়েটার হবার আগে বাঙালীর সাধারণ রঙ্গালয়ে পুরুষ-মানুষেরাই স্ত্রীলোকে ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

শরৎচন্দ্র বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য আগেই একটা কমিটি করেছিলেন। সেই কমিটির সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন এবং আরো কেউ-কেউ।

মাইকেল মধুসূদন বেঙ্গল থিয়েটারকে পরামর্শ দিলেন—তোমরা স্ত্রীলোক নিয়ে থিয়েটার খোলো। আমি তোমাদের জন্য নাটক লিখে দেব। স্ত্রীলোক না নিলে কিছুতেই ভালো হবে না।

বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হল এবিষয়ে। অনেকেই রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই এ-প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। এসব খুব সম্ভব ১৮৭৩ সালের গোড়ার দিকের কথা। বিদ্যাসাগর তারপর থিয়েটারের সংগে আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি।

বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে লেখা মাইকেলের দুটি কবিতা তুলে দিচ্ছিঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য বলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সূরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে;
কোন্ পীড়ারূপে অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে রঙ্গরত্ন! এ হেন রতনে?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব, খুব সম্ভব মাইকেলই সকলের আগে বুঝেছেন, মর্মে-মর্মে বুঝেছেন। ১৮৬০ সালেই মাইকেল বিদ্যাসাগরের একটা স্ট্যাচু তৈরির জন্য নিজের মাইনের অর্ধেক টাকা চাঁদা দিতে রাজি হয়েছেন। মাইকেল, ১৮৬০ সালের ৩ আগস্ট, রাজনারায়ণ বসুকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন ঃ

"I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I.C. Vidyasagar as the promoter of widow-re-marriage."

বিদ্যাসাগরের উপর মাইকেলের অসীম বিশ্বাস। ১৮৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুআরি মাইকেল লন্ডন থেকে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন ঃ

"My trust is in God and after God in you!"

মাইকেলের চিঠিপত্রে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিস্তর আশ্চর্য উক্তি ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি তুলে দিচ্ছি ঃ

A splendid fellow; The first man among us; Above flattering any man; One of Nature's noblemen; The greatest Bengali that ever lived; A real friend and righteous man; A tower of strength; Noble and friendly heart; A thoughtful man; Not only Vidyasagara but Kuranasagara also

১৮৭৩ সালের ২৯-জুন মাইকেলের মৃত্যু হল। পরদিন বিকেলে লোয়ার সার্কুলার রোডে সমাধিক্ষেত্রে মাইকেলের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হল।

মাইকেলের মৃত্যুর একযুগেরও কিছুকাল পর কয়েকজন ভদ্রলোক উদ্যোগী হলেন—মাইকেলের সমাধিস্থানের উপর কোনো স্মৃতিস্তম্ভ নেই, কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই, কিছুই নেই; অতএব চাঁদা তুলে একটা স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে মাইকেলের অস্থি-পঞ্জর রক্ষা করতে হবে।

চাঁদার জন্যে বিদ্যাসাগরের কাছেও লোক এল। মাইকেলের সমাধিস্থানে স্মৃতিস্তম্ভের জন্য চাঁদা, মাইকেলের অস্থি-পঞ্জর রক্ষার জন্য চাঁদা। মাইকেলের কথায় বিদ্যাসাগরের চোখে জল এসে গেল। বললেন—দ্যাখো, প্রাণপণ চেষ্টা করে যাঁর জান রাখতে পারিনি তাঁর হাড় রাখবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।

(ক্রমশ)

শার্ঙ্গদেব

একবার আড়াই তিন দিন তিন রাত্তির গান-বাজনা শুনে পরিতৃপ্ত এক বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলুম—"কেমন লাগল?" তিনি হৃষ্টচিত্তে উত্তর দিলেন—"খুব ভাল, তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি লাইন গাইয়ে-বাজিয়েদের পক্ষে পরমপ্রযোজ্য। লাইনটি হচ্ছে—আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনই লীলা তব। অর্থাৎ—সঙ্গীত বস্তুটি একবার এ'দের আরম্ভে এলে সহজে শেষ হতে চায় না। গাইয়েই বল আর বাজিয়েই বল সঙ্গীতকে চালিয়ে যাওয়াই হচ্ছে তাঁদের লীলা।" অনেককে একথা কষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হয় যে, সঙ্গীতের একটা নির্দিষ্ট বিরতিকাল থাকা দরকার। কবিগুরু ওস্তাদদের নামে ভয় পেতেন এই লীলাটির জন্য। শরৎচন্দ্রও সভয়ে প্রশ্ন করতেন—থামে তো? পরম রসিক শ্রোতাও ধৈর্যচ্যুত হন যদি গান-বাজনা সহজে থামতে না চায়। অমিয় সান্যাল মশায়কে বলতে শুনেছি বড় জোর আধ ঘণ্টার পর খুব কম শিল্পীই নতুন জিনিস দিতে পারেন। তখন কেবল পুনরাবৃত্তিই চলতে থাকে। ওস্তাদদের মধ্যে হাফিজ আলী স্পষ্টই বলেন যত বড় রাগই হোক না কেন রসসৃষ্টি করবার মত তান বিস্তার অপরিমিত নয়। তার পরে একঘেয়েমির প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। বড়ে গোলাম আলী কোনও গানই বেশীক্ষণ গান না। তারও বোধ হয় কারণ ওই একই—পুনরাবৃত্তিকে পরিহার করা। বিজ্ঞানীদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—তাঁরাও বোধ হয় এই কথাই বলবেন যে খুব বুঝে শুনে স্বরের পারম্পর্য রক্ষা না করলে শ্রবণ ক্লান্তি বোধ করে এবং এই ক্লান্তিকে পরিহার করতে গেলে সঙ্গীতকে একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সমাপ্ত করাই ভাল। অনেকে হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন না কারণ অনেকেরই একটা বদ্ধমূল ধারণা যে একজন বড় ওস্তাদের পক্ষে এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টা কিছুই নয়—ঘণ্টা তিন-চারেক না হলে তাঁরা সঙ্গীতের প্রতি যথোচিত কর্তব্য করতে পারেন না। অথচ যাঁদের এরকম ধারণা বড় বড় ওস্তাদদের গানবাজনা শোনবার সময় তাঁরা যে কতবার উঠে গিয়ে চা, পান ইত্যাদি সেবন করে আসেন তা নিজের চোখেই দেখেছি। ওস্তাদদের মধ্যে অনেকে নিজেরা যেরকমভাবে শিখেছেন সেভাবেই গাইতে, বাজাতে ভালবাসেন। অনেকের হয়তো সারারাত্রি সাধনা করবার অভ্যাস ছিল তাই অনুষ্ঠানের সময় তাঁরা সেইরকম রীতি অনুসরণ করাই সমীচীন মনে করেন। অনেক গাইয়ে বাজিয়ে দুটি তিনটি স্বরের মধ্যে চলাফেরা করতেই অসম্ভব সময় নিয়ে থাকেন। তাঁদের ধারণা এইটিই হচ্ছে আমাদের সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশের পথ। অনেকে আছেন তাঁদের বারবারই মনে হয় ঠিক কাজটা বোধ হয় হচ্ছে না, তাই বার বার একই কাজ করে যেতে থাকেন। কিন্তু সব বুঝে শুনেও অনুষ্ঠানকে দীর্ঘায়িত করবার ইচ্ছা জনকয়েক বিশিষ্ট শিল্পীর মধ্যে দেখা যায়। আমার মনে হয়, যে স্ফীত অঙ্ক তাঁরা গ্রহণ করেন তাকে সমর্থন করবার জন্যই ঘণ্টা চারেক নানারকম কায়দাকানুন প্রদর্শন করাটা তাঁরা একান্ত আবশ্যক মনে করেন এবং মটন-মস্তিষ্ক একদল শ্রোতা এই জ্ঞানপাপীদের বাহবা দিতেও কার্পণ্য করে না।

আসলে ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ কী এবং বিকাশের রীতি কিরকমটা হওয়া দরকার সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। ভারতীয় সঙ্গীতের এমন উদ্দেশ্য কখনই হতে পারে না যে বিস্তারের অবকাশ আছে বলেই ক্রমাগত বিস্তার করে যাও বা বাদ্যযন্ত্রে কয়েকটা তার আছে বলেই ক্রমাগত আঘাত করে যাও। রাগ-সঙ্গীতের লক্ষণ ছিল দশটি—গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, সংন্যাস, বিন্যাস, বহুত্ব এবং অল্পত্ব। সমস্ত সঙ্গীতে স্বরগুলি স্থাপনের একটা সম্বন্ধ ছিল এবং সেইভাবে স্বরপ্রয়োগের ফলে সঙ্গীত একটি অখণ্ডরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত খুব বাঁধাধরা নিয়মে চলত। স্বর অলঙ্কার, মূর্ছনা, পদের সংখ্যা এমন কি পদে কটা শব্দ বসানো হবে—তাও নির্দিষ্ট থাকত। শিল্পীকে এই রীতি অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করতে হত; এর বিকৃতি কিছুতেই সহ্য করা হত না। হিন্দুসংগীত ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সংগঠনই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি কর্তব্যের একটি যুক্তি ছিল—কোন প্রয়োগই এলোমেলোভাবে হত না। রাগসঙ্গীতের যুগে যখন আলাপের প্রবর্তন হল তখন তার নিয়মও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। বিশিষ্ট স্বরসন্দর্ভে রাগের আবির্ভাব, স্থায়িত্ব এবং তিরোভাব ঘটানোর প্রক্রিয়াকেই আলাপন বলা হয়েছে। আমাদের সঙ্গীতে কলির বিন্যাসও সংগঠন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার পরিচয় প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের বর্তমান সঙ্গীতে চারটি কলির যদি উত্তম বিকাশ ঘটে এবং প্রতিটি কলির বিন্যাস সমানভাবে হয় তাহলে আমাদের মন ভরে ওঠে আমরা আর কিছু চাই না। শিল্পী কতক্ষণ ধরে গাইবেন বা বাজাবেন সেটা বড় প্রশ্ন নয়, তিনি একটি নিটোল রাগরূপ আমাদের সামনে ধরে দিতে পারলেন কি না সেটাই বিচার্য এবং সেটাতেই তাঁর কৃতিত্বের যাচাই হবে।

এ যুগের গানের আসরে আমরা সবচেয়ে

বড় অভাব যেটা বোধ করি সেটা হচ্ছে সংগঠনের অভাব। অনেক তৈরি গলা বা তৈরি হাতের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু একটা রাগের অখণ্ডরূপ অনেকেই মেলে ধরতে পারেন না। অনুষ্ঠানকে প্রলম্বিত করলে এই পরিচয় প্রদান করা কোনক্রমেই সম্ভব নয় কারণ কৌশলের প্রাধান্যে মূল বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘকাল ধরে বিশিষ্ট গুরুর কাছে যাঁরা গান বাজনা শিখেছেন তাঁরা প্রয়োগ-শিল্পে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছেন একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই দক্ষতাকে তাঁরা কিভাবে কাজে লাগাবেন সে বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনীয়তার প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না। সেতারে বা সরোদে যখন ঝালার কাজ শুনি তখন সামান্যকাল ঝঙ্কারের সহযোগে রাগের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করি তারপরেই তারের ওপর নিরন্তর আঘাত ছাড়া কিছুই বোঝা যায় না। বাজিয়েরা নিশ্চয়ই জানেন ঝালার উদ্দেশ্যটা কি। আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকে বিভিন্ন ঝালার কাজে কেমন বিচিত্রভাবে রাগসঙ্গীত রূপায়িত হয় তা দেখিয়ে দেবেন; কিন্তু আসরে বসে যা করবেন তা কেবল শব্দের সৃষ্টি। এই ইচ্ছাকৃত বিকৃতি আর কতকাল সমর্থন করব।

আমার মনে হয় সঙ্গীত সম্বন্ধে শিল্পীদের একটা "কোড" নির্ণয় করা দরকার। তাঁরা আলাপ করবেন, নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে রাগকে রূপায়িত করবেন, আলাপ এবং বিস্তারের পরিমাপে তান কর্তব করবেন—তারপরে অনুষ্ঠান শেষ করবেন। যন্ত্রসঙ্গীতেও আলাপ, জোড়, ঝালা প্রভৃতি এই সুসম্বন্ধ নিয়মেই চলবে। এতে যদি তাঁদের অনুষ্ঠান এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শেষ হয় তাতে ক্ষতি কি? রসিক শ্রোতার মন এই সময়ের মধ্যেই ভরে যাবে এবং তাঁরা যথেষ্ট সাধুবাদ অর্জন করবেন। গত ষোলো সতেরো বছর ধরে বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবার পর আজ বিনাদ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, এমন কোনও প্রতিভাবান শিল্পী নেই যিনি তিন চার ঘণ্টার অনুষ্ঠানে পুনরাবৃত্তি বা একঘেয়েমি বর্জন করতে পারেন। শ্রোতাদের নিয়ে এইরকম "ভালগার স্পোর্ট" অসহনীয় স্তরে এসে পৌঁছেছে। তাঁরা শ্রোতাদের সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য এবং রসের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দিন এবং ঠিক যতটুকু অনুষ্ঠান প্রয়োজন ততটুকুতেই ক্ষান্ত হোন এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রোতাদের বোধ হয় একথা বলা প্রয়োজন যে, রাগসঙ্গীতের একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো আছে। আমাদের শাস্ত্র সেই কাঠামোর তান, বিস্তার, মীড়, মূর্ছনা যোগ করে রাগের প্রতিমা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়। সেই প্রতিমার পরিচ্ছন্ন রূপটুকু তাঁরা উপভোগ করুন। যার যার রঙের তুলি বুলোলে বা এখানে সেখানে থাবা থাবা খড় কাদা বসিয়ে দিলে যে প্রতিমা তৈরি হবে তার পুজো করা কোনক্রমেই চলবে না।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এন এস রামচন্দ্রন যে ভাষণটি প্রদান করেন তার একটি কপি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এই ভাষণটির সংক্ষিপ্ত-সার ইতঃপূর্বেই দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। অধ্যাপক রামচন্দ্রন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মে প্রবেশ করেছেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত চিন্তার সম্যক পরিচয় প্রদান করেছেন এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তিনি রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সেগুলিরও উল্লেখ করেন। বাংলার বাইরে বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্য বিশেষ কৌতূহল দেখা যায়। এইরকম অনুষ্ঠান সেই অভাব মোচন করবে এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে যে সব অপ্রবুদ্ধ আলোচনা ইংরেজী পত্রপত্রিকায় মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তার প্রত্যুত্তর প্রদান করবে। বছর দু-তিন আগে কলকাতারই এক ইংরেজী দৈনিকে জনৈক মহিলা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অপব্যাখ্যা প্রচার করেছিলেন—এই প্রসঙ্গে সেই কথাই মনে [illegible]।

ঊনপঞ্চাশ

অচিনদা এমনভাবে হুমকে 'চোপ' বলেন, মনে হয়, হাত বাড়িয়ে মারতে আসেন বুঝি। কিন্তু মারেন না, হাত বাড়িয়ে পিছু ধাওয়ার ইশারা করে, নিজেই রেগে ধেয়ে যান। যেভাবে শাসালেন, এর পরে কী দেখাবেন, কে জানে। তবে পিছু ধাওয়ার ইশারা তো না, হুকুম। অতএব হুকুমবরদারের মত পিছু পিছু চলি।

তবু, ঝিনির মুখটা মনে পড়ে বারে বারে। কানে লেগে থাকে ওর কথাগুলো। অচিনদার সঙ্গে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল, তা-ই বলেছিলাম। বরহমদের ভাবনা আমার মাথায়। মনেতে কৌতূহলের ঝিকিমিকি, যাব তাদের আড্ডায়। আর কিছু না। আর কিছু ভাবিনি। কিন্তু একমাত্র কথায় যে, ঝিনির মুখে মেঘ ডেকে এনেছি, তা জানি নি। পূর্বাভাসেও এমন বার্তা ছিল না, অচিনদাকে ছেড়ে, অন্য দলে থাকব। এ যে দেখি পুরনো অপরাধ ভঞ্জন করতে গিয়ে, নতুন অপরাধের কলঙ্ক মিলে যায়। অথচ উপায় কী করি।

তবে, কেন, সেই জবাব কে দেবে। কেন অপরাধী হই, ঝিনি কেন অপরাধী করে। পথ চলার এই বিহঙ্গের কিচির-মিচিরে, যখন পাখায় লাগে রঙের ঝলক, হাসিতে ঝরে ফুলঝুরির রঙ বাহার, তখন আলো কেন নেবে। মুখের হাসি নিবিয়ে, এই অন্ধকারের দুঃখ কেন। দুঃখে এমন বিরাগ দিয়ে, এমন তীব্র দাহে বেঁধা কেন। এমন কথা কখন ভেবেছি, আমাকে ঝিনিদের দরকার আছে, যে-কথাটা ওকে সরোষে জানাতে হয়, আমাকে ওদের দরকার নেই। ওদের সংগ আমার ভাল লাগে না, সে কথা বা কখন ভেবেছি। শুভেন্দুর জন্যে ওর ভাবনার উদ্বেগে বাধা দেবার কথা তো ভাবিনি কখনো। ঝিনি আর থাকতে পারবে না, এমনভাবে বলে গেল, যেন পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলাম।

ছাতিমতলার মেলায়, এই জনারণ্যের মাঝখানে চলতে চলতে, একটু না হেসে পারি না। মন টাটানো হাসি। ভুলি কেন, কেবল অমৃত পান করে যাব। আমার কূলে কূলে কেবল অমৃত। তিক্ত রসের স্রোত কি কেবল তোমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে বহে যায়। আপন না জেনে, অলক্ষ্যে কখন সে-পাত্র তুলে নাও, অমৃতের আমেজে তা খেয়াল থাকে না। একটু যদি জ্বালা ধরে, ধরুক। 'জ্বালিস্ যদি দিবা নিশি, তবেই আলো দেখবি।' এমন গানের মত ভাববো না। তবু, পিছন ফিরে, পথের যে-আলোতে টান লাগে, সেই আলোতেই চলে যাব। হেথা, এই পথ চলাতে মানের কথা মনে রাখব না। অপমান গায়ে মাখব না। ঝিনির ওপরে রাগ আসে না, ওকে নিয়ে আমার বৈরাগ্যের কথাই বা কী। অতএব, সেই ভালো, সেই ভালো।

ঝিনিকে বুঝতে পারি না, বলব না। বিদুষী বলে একটু অবাক লাগে। সংসার আমার মনের অবাক দিয়ে বানানো না। যেমন যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে তেমনি সংসারের স্ব-ভাবেতেই অবাক বিরাজ করে। যা অসম্ভব ভাবি, জগতে তার সবই সম্ভব। অসম্ভব ভাবি কেবল, আপন মনের ছক দিয়ে।

বেশ, সেই ভালো, সেই ভালো। ঝিনি বাজে, ঝিনির মতই। বাজবেও। ওর মনের তারে তারে হয়তো এমনি সুরেই বাঁধা আছে, হাত লাগলে তা এমনি করেই বাজে। তার কার্য কারণ অতীত জানি না। খুঁজতে যাওয়া আরো বিড়ম্বনা। অতএব, আপন পথে, আপনাতে চলি। তিক্ত ঝাঁজের রস ছিটিয়ে, ঝিনির যেথায় মন, সেথায় থাক।

কিন্তু, অচিনদা কি থামবেন না। একবার ফিরেও দেখবেন না তাঁর পিছু ধাওয়ার হুকুম পালন হচ্ছে কি না। বাঁধ খুলিয়ে সেই যে চলেছেন আর থামবার নামটি নেই। রেগে আছেন জানি। না হয়, একবার রেগেই তাকিয়ে দেখুন। সার্কাস ম্যাজিক নাগর-দোল্লা, গ্রামীণ মেলার সীমানা পেরিয়ে, নাগরিকদের নগর ঝলকানো মেলাও পেরিয়ে যান। কারা যেন অচিনদার নাম ধরে ডাকা-ডাকি করে। সবাইকেই, হাত তুলে, ঘাড়

দুলিয়ে, কথা না বলে, ব্যস্ত মানুষ এগিয়ে চলে যান। যেন, থামবার উপায় নেই।

মেলা পেরিয়ে দেখি, পশ্চিমে হাঁটা দেন। কেন জানি না, মনে করেছিলাম, বরহমদের আড্ডা বুঝি পুব দিকে। একেবারে বাঁধানো সড়কের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ভাবি, ঘরে ফিরে যান নাকি? আমার ওপর গোসা করে, আসল যাত্রাই নাস্তি না তো!

বড় সড়কে পড়ে, আশ্রম সীমানার দিকে যান না। উত্তরে হাঁটেন। আমার উপায় নেই, জেলের পিছনে কেলে হাঁড়ি। লোক চলাচলের ভিড় সবখানেই, সব পথেতেই। তার মধ্যেই দেখি, ডান দিকে, হাসপাতালের পথের ধারে, এক বিলাতী মোটর গাড়ির কাছে থমকে দাঁড়ান। ডাক দেন, 'বিরিজ!'

ডাক দিতে না দিতেই, রাস্তার পাশ থেকে একজন ছুটে এসে আওয়াজ দেয়, 'জী হুজুর!' বিরিজ যার নাম, তাকে দেখে সন্দেহ হয়, সে গাড়ির চালক। ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরে। অচিনদা বললেন, 'না উঠব না। গাড়ির ভিতর থেকে বড় ঝোলাটা দাও তো।'

আমি যে কাছেই দাঁড়িয়ে আছি, তা যেন দেখতেই পান না। মুখের ভাব সেই দুর্গা-

প্রতিমার অসুরের মতই। তবে, বিরিজের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, একটু অন্যরকম। বিরিজ প্রায় কলের পুতুলের মত হুকুম পালন করে। ভিতর থেকে একটা কাপড়ের ঝোলা বের করে দেয়। কী আছে, কে জানে, তবে খালি ঝোলা না। সেটা হাতে নিয়ে, অচিনদা বলেন, ‘তুমি বাড়ি চলে যাও। আজ রাত্রে আর কোথাও যাব না। গাড়ি তুলে দিয়ে, তুমি খেয়ে দেয়ে, শুয়ে পড়গে’।’
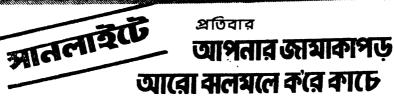
বিরিজ শিরোধার্য করে জবাব দেয়, ‘জী।’

কিন্তু সেদিকে আর তখন অচিনদার ধ্যান নেই। হঠাৎ দখিনমুখো একটা খালি সাইকেল রিকশা দেখে, হাত তুলে ডাক দেন, ‘এই, দাঁড়া দাঁড়া, এদিকে আয়।’

ব্যাপারের কিছু সুলুক সন্ধান পাই না। নিজের যানবাহন থাকতে কেন, মানুষে টানা তিন চাকা ডাক দেন, কে জানে। রিকশা-ওয়ালা রিকশা নিয়ে কাছে আসতে, মুখ এগিয়ে নিয়ে তার মুখ দেখেন। উসকো খুসকো চুল কালো লোকটা দাঁত দেখিয়ে হাসে। বলে, ‘ভাল আছেন বাবু।’

‘হ্যাঁ আছি। তুই কে?’

‘আমি তো নরোত্তম বোলপুরের সাঁকোর ধারে —।’

অচিনদা বলে ওঠেন, ‘গদাধরের বিটা।’

‘হুঁ হুঁ, চিনতে পাইরলেন?’

‘হুঁ, পেরেছি। এখন চল্ তো।’

[illegible], সেই লাল লাল চোখে, [illegible] দিয়ে আমার দিকে তাকান। হাত তুলে বলেন, ‘ওঠ।’

কথা নেই। এখানে পড়ে পড়ে চলবে না জানি। রিকশায় উঠে বসি। নরোত্তম, অর্থাৎ নরোত্তম জিজ্ঞেস করে, ‘কুথা যাবেন?’

‘খালের ধারে।’

বলে রিকশায় উঠে নির্দেশ দেন, ‘দুলিয়ে নে খালের দিকে চল্।’

নরোত্তম হাসতে হাসতে গাড়ি ঘোরায় উত্তরে। উত্তর পশ্চিমা হাওয়ার ঝাপটা থেকে থেকে চলতে থাকে। সে ঝাপটা মুখে এসে লাগতে মনে হয়, চামড়া চড়চড়িয়ে যায়। যেন ছুরি দিয়ে কাটে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, কোথায় চলেছেন। কেবল যে ভরসা পাই না, তা ই না। কৌতূহলের মজাটা মনে মনেই চাখি। দেখি, কোথায় গন্তব্য। কিন্তু একটি কথা না। অচিনদার দৃষ্টি সামনের দিকে। ভুরু দিয়ে যেন চোখ ঢাকা।

খালের সাঁকোতেই শেষ বাতি। তারপরে নিবিড় অন্ধকার। খালের জলের ধারা একবার চিকচিকিয়ে উঠতে না উঠতেই, রিকশা গড়িয়ে নেমে যায়, আর ঝনঝনিয়ে বাজে। শান্তিনিকেতনের পাকা মসৃণ রাস্তা আর নেই। এ সেই রাঢ় বীরভূমের খোয়াইয়ের বুক চিরে রাস্তা। যে রাস্তায় মাটি বালি কাঁকর পাথর ছড়ানো। পদে পদে উঁচু-নিচু। তিনটি মানুষকে নিয়েও যেন, রিকশাটাকে ধরে লোফালুফি নাচানাচি করে।

আলোর সীমানা পেরিয়ে আসতেই, ঘুট-ঘুটে অন্ধকারের গ্রাসে যেন অন্ধ হয়ে যাই। সামনে, আশেপাশে, কিছুই চোখে পড়ে না। কেবল, দু'পাশের খোলা মাঠ থেকে, ঠান্ডা হাওয়ার ধারালো নখে ছিন্ন-ভিন্ন হই। দাঁতে দাঁত চাপতে হয়। অথচ বয়স্ক প্রৌঢ় আমার পাশে বসে, স্থির নিশ্চল, কোনো বিকার টের পাই না।

জানি না, দু' পাশের এই খোলা তেপান্তরকে খোয়াই বলব কি না। কে জানে কোপাই কত দূরে। মলুটির পথে দেখেছি, বর্ষার জলে ক্ষয়ে যাওয়া, কাঁকর ছড়ানো নদীখাতের নাম খোয়াই। যে-নদীখাতে বর্ষার পরে আর জল থাকে না। কেবল, দিকে দিকে, উঁচু-নিচু ছোট বড় কাঁকর ছড়ানো গিরিমালার মত, দিগন্ত বিস্তৃত। লাল তার রঙ, বৈরাগ্যের গেরুয়ার প্রলেপ লাগানো, আর বালির বিস্তৃতি। থেকে থেকে, হেথা হোথা, হঠাৎ জলের রেখা চিক চিক করে।

কোপাই, বর্ষাতে বড় ভয়ংকরী শুনেছি। ভয়ংকরী না, সে-ই তার যৌবনের কাল। তার খোয়াইয়ের বিস্তৃতি যে কতদূর, কে জানে। রিকশা যে-ভাবে নেমে, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, তাতেই ভাবি, এ হয়তো খোয়াইয়ের বুক চিরে রাস্তা। ডাইনে বাঁয়ে, সবই শূন্য লাগে। কোথায় যে আকাশ নেমেছে, কোথায় এ বিস্তৃতির সীমা বুঝতে পারি না। কেবল, কুয়াশাহীন, আকাশে দেখি, তারায় ভরা।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ, অচিনদা চমকে উঠে বলেন, ‘এহে, বড় ভুল হয়ে গেছে, টর্চ লাইটটা আনা হয়নি।’

নরোত্তম জিজ্ঞেস করে, ‘যাবেন কুথা?’

‘বাঁশ ঝাড়ে।’

শোন এবার কথা! এ যাচ্ছে, অচিনদার কথা। আলোর সীমানা ফেলে এসে, এই শীতের থাবায় আঁচড়ানো অন্ধকারে তেপান্তরে, এখন আওয়াজ দিচ্ছেন, গন্তব্য বাঁশঝাড়ে। কে জানে, সেই বাঁশঝাড় কোথায়, এ মুলুকের কোনখানে। আমার মনটা যেন কেমন একটু উথাল পাথাল করে। এবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, সে বেণুবন কোথায়, কেনই বা সেখানে।

নরোত্তম কিন্তু যেন সহজেই আওয়াজ দেয়, ‘অ! অই উইটা বে?’

বলে ডান হাত তুলে দূরদিকে দেখায়। তখন অন্ধকারে একটু নজর সয়েছে, চোখ এসেছে। তাকিয়ে মনে হয়, আকাশের নিচে, তেপান্তরের বুকে, দ্বীপের মত কালো এক ঝুপসি। অন্ধকারের বুকে, আর এক প্রস্থ ঘন কালো পোঁছড়া। আর কিছু যখন চোখে পড়ে না, তখন ওটাই বোধহয় বাঁশ-ঝাড়।

অচিনদা বলেন, ‘হ্যাঁ, ওটাই। কিন্তু এত অন্ধকারে তো অসুবিধা হবে। তুই দাঁড়া নরোত্তম আর যাস্‌নে। এখন থেকেই হাঁটতে হবে।’

নরোত্তম রিকশা দাঁড় করায়। কাছে-পিঠে, কোথাও একটা আলো নেই। ছাতিমতলার মেলার বাতিও চোখে পড়ে না এ-পাশে। তার ওপরে, এই মাঠের বুকে, অন্ধকার বাঁশঝাড়ে গমন, ই কী কথা হে!

নরোত্তম রিকশা থেকে নেমে বলে, ‘এক কাজ কইরতে পারি বাবু। আমার গাড়ির বাতিটা নিয়ে, আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই। না হলে, যেতে লারবেন।’

অচিনদা তৎক্ষণাৎ আওয়াজ দেন, ‘ঠিক বলেছিস। তোর গাড়ির বাতিটাই খোল্। তাছাড়া তুই-ই আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবি, তোকে থাকতেও হবে। কিন্তু তোর রিকশা রাখবি কোথায়?’

‘সে হবে বাবু, রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রেখে দিচ্ছি। [illegible] গাড়িটাড়ি এসে পড়তে পারে।’

‘কিন্তু গাড়ি চুরি করবে না তো কেউ?’

নরোত্তম হাসে। বলে, ‘না বাবু, এখান থেকে আর রিকশা কে চুরি করবে।’

বাতিটা খুলে সে অচিনদার হাতে দেয়, বলে, ‘আলো একটু ধইরবেন বাবু।’

[illegible]

রহস্যের ঝিকিমিকি। ডাক দেন, 'এস হে। সাবধানে এস, পড়ে টড়ে যেও না. ঢালু আছে।'

সেটা লক্ষ্য করেছি। সাবধান না হয়েও উপায় নেই। পড়লে যে কোমল ধরিত্রীর বুকে পড়ব, সে আশা নেই। পদক্ষেপেই জানা যাচ্ছে, কাঁকরে পাথরে, এ মৃত্তিকা বড় কঠিন। নরোত্তম রিকশা রেখে, অচিনদার হাত থেকে আলোটা নিয়ে, আগে আগে যায়। অচিনদা আমার পাশে পাশে। পথ বলে ঠিক কিছু আছে, মনে হয় না। উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো পাথুরে মাটির এখানে ওখানে ঘাস গজানো। তার মাঝখানে, পায়ে চলা পথের একটা চিহ্ন চোখে পড়ে।

অচিনদার মুখের দিকে বারেক তাকাই। বিশেষ কিছু দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত যেন আমি না, আমার ভিতর থেকে অন্য কেউ জিজ্ঞেস করে ওঠে, 'আমরা ওই বাঁশ ঝাড়ে যাচ্ছি, না?'

'হ্যাঁ।'

ছোট জবাব। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কিন্তু ওখানে এ সময়ে—?'

কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠেন, 'ভয় হচ্ছে?'

'না, তা নয়, তবে এই অন্ধকারে, লোক-জন কেউ নেই, তা-ই।'

'দেখা যাক্ কী আছে না আছে। গেলেই দেখতে পাবে।'

অতএব, কথা থাক, চল অন্ধকারের পাথারে পাড়ি। অচিনদার এক হাতে সেই ঝোলা। গায়ে ভারী পশমী চাদর। তবু, চলেন যেন অনায়াসে। শীতের হাওয়া কিছু না, উঁচুনিচু আর একটি ক্ষীণ লাল বলয়ের আলো তাতেই বেশ স্বচ্ছন্দ। আবার পরিষ্কার কথায়, নিচু স্বরে গান ভাজেন, 'চোরা যায় চুরি করতে, গায়ে দিয়ে প্রেমাবলী।' প্রেমাবলী সম্ভবত নামাবলীর শব্দের ফের। গুনগুন করতে করতে, হঠাৎ থেমে বলেন, 'এদের কী বলে জান তো?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কাদের বলুন তো?'

প্রায় খেঁকিয়ে বলেন, 'বুঝলে না? ওই যে সব চোরারা প্রেমাবলী গায়ে দিয়ে চুরি করতে যায়। এদের বলে, শঠ. প্রবঞ্চক।'

এখন এই শীতের দারুণ পথে, প্রেমাবলী গায়ে দেওয়া চোরের ভাবনা তেমন মনে আসে না। তবু সায় দিয়ে বলি, 'তা ঠিক।'

'তা ঠিক মানে?'

আবার সেই হুমকোনি, 'তা ঠিক মানে কী। তুমিও তো তা-ই।'

'আমি?'

'নয়?'

অন্ধকারেও টের পাই তিনি আমার দিকে ফিরে চান। বলেন, 'প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের বুলবুলো! তুমি কী রকম লেখক।'

খেয়াল করতে সময় পাই না, এ গানের কলি কোথায় যেন শোনা ছিল। তবু না জেনে বুলি দিয়েছি কোথায়, জানি না। ছাতিমতলার এই সীমানায়, আমি তো লেখকের পরিচয়ে চলি না। তার ওপরে রকম কেমন, কবে বা তা জানতে পেরেছি।

অচিনবাবু থামেন না। বলেন, 'অত করে বললাম তোমাকে তখন। তবু জেনে শুনে মেয়েটাকে কষ্ট দিলে।'

'কষ্ট?'

'না, খুব আনন্দ দিয়েছ, তাই ফরফরিয়ে চলে গেল। আমার সঙ্গে না আসতে চাইলে তোমার কী হত?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না, আসলে আমি—।'

'আরে দূরে তোমার আসল। তোমার আসল নকল রাখ। তুমি ওদের সঙ্গেই থাকলে না কেন?'

'সে কথাটা ভাবিই নি।'

চমৎকার। এত দেখে শুনেও ভাবতে পারলে না।'

প্রায় অসহায়ের মত অচিনদার দিকে ফিরে তাকাই। তাঁর অবয়বটাই শুধু দেখতে পাই। মুখের ভাব দেখতে পাই না। কথা মনে আসে অথচ বলতে পারি না।

অচিনদাই আবার বলেন. 'এ কি তোমার নীতিবাগীশ মনের বিচার নাকি?'

মনে মনে বলি, তা-ই যদি হয় দোষ কোথায়। পথ চলার নীতি না হয় থাকুক। সংসারের নিজেরও তো কিছু নীতি আছে। তাকে লঙ্ঘন করি কেমন করে।

নিজের কথার জবাব তিনি নিজেই দেন, 'তা-ই যদি বল তোমার থেকে ওর নীতিবোধ কম নাকি।'

সে কথা ভাবতে দ্বিধা লাগে। ঝিনি যে সমাজ পরিবার পরিবেশের মেয়ে, সেখানে নীতিবোধ কমের কথা নেই। তার ওপরে ঝিনির নিজের একটা পরিচয় আছে। বলি, 'সেটা কী করে বলি বলুন।'

অচিনদা বলেন, 'তা যদি বল তা-ই বা মানব কেন, বলতে পার?'

হঠাৎ যেন অচিনদার গলায় ঝাঁজ চলে যায়। এই খোয়াইয়ের বুকে, অন্ধকারের পাথারে, আকাশের নিচে তাঁর গলায় বাজে যেন এক নৈরাশ্যের বিধুরতা। বলেন, 'মন বলে কি কিছু নেই?'

বলি, 'নিশ্চয়ই আছে।'

মনে মনে বলি, মন আছে চিরন্তনে। কিন্তু অচিনদা যেন আমার কথা শোনেন না, নিজের কথারই খেই টেনে চলেন। বলেন, 'তোমরা কী বল, ভাব, সব হয়তো জানি না। কিন্তু নীতি দিয়ে কোনদিন ব্রজের বাঁশী থামানো যায় নি। যার মন নিয়ে যমুনার জল উজানে গিয়েছে, তাও কখনো থামানো যায় নি। নীতি দুর্নীতি পাপ সব সেখানে তুচ্ছ।'

অবাক অসহায় হয়ে বলি, 'আর সমাজ সংসার।'

অচিনদা হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'তার মধ্যেই সে নিত্যকালে বহে। সমাজ সংসারকে বাদ দিতে চেয়েছে কে। সমাজ সংসার আছে বলে কি আর সব বাদ। যমুনা কি আকাশে না মাটিতে? আর এ কথাই বা ভাবলে কেন, ঝিনির মত মেয়ে সমাজ সংসার ভুলে যাবে। ওর কি কোন রুচি নেই বোধবুদ্ধি নেই।'

কিন্তু অচিনদা কেন এমন করে বলেন। জীবনের অনেকখানি যিনি দেখেছেন, যাঁকে দেখে মনে হয়েছে, মুখের হিজিবিজি রেখায় এ সংসারের অনেক নিষ্ঠুর আঁচড় লেগেছে, যাঁর চোখের ওপারে হাসিকে দেখেছি যেন কাঁদন ভরা, তিনি কেন এমন করে বলেন। বলি, 'কিন্তু অচিনদা—।'

অচিনদা বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'ভয় পাও, না? পাছে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড় তা-ই না?'

এ কথার জবাব দিতে পারি না হঠাৎ। হয়তো নানা আলো আঁধারে সে-ই আমার ভাবনা। অচিনদা নিজেই বলেন, 'সেটাও তোমার ভুল। ওকে চিনতে পার নি বলে ভয় পেয়েছ। মেয়েটার মধ্যে কোথায় একটা গোলক ধাঁধার যন্ত্রণা আছে। হয়তো চাঁদের মত অনেক দাগও আছে। কিন্তু বেঁধে অপমান করার মত মন আর রুচি নয় এটুকু জানি।'

বলতে বলতে আমাকে আর একটু নিবিড় করে জড়িয়ে বলেন, 'ওকে যদি একটু কাছে আসতে দাও, প্রীতির লেন-দেন কর ঠকবে না, বুঝলে। আমাকে ভুল বোঝার কোন কারণ নেই তোমার।'

আমি অবাক নির্বাক হয়ে অচিনদার দিকে তাকাই। অচিনদা হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে যেন চুপি চুপি বলেন, 'জেনো নারী নর সকলেরই একটাই মন, রূপে আলাদা। কিন্তু তাকে ছোট করে দেখো না। হয়তো দেখবে অলকাও তোমাকে কোন মন্ত্র দিয়ে যাবে, একদিন সে তোমার কাছে গুরুর মত জেগে উঠবে। তোমার তো অজানা থাকবার কথা নয়, "ও তোর আথিক গুরু পথিক গুরু গুরু অগণন। ওকে শুধু শুধু কষ্ট দিও না।'

অচিনদা চুপ করে যান। আমি যেন কেমন আবিষ্ট হয়ে পড়ি। অচিনদার কথাগুলো যেন আর কথা নয় কেবল। তার মধ্যে এই সংসারের সীমায় বসে যে অসীমে মন দোলা চলা করে, সেখানকার বার্তা বহে আনে। এখন অচিনদা আমার কাছ থেকে একটু সরে চলেন। আর গুনগুনিয়ে বাজেন, 'ও মন, ফিরি করে যা আপনারে। নগদ হিসাব পরে করিস, ধ্যানের হিসাব কর না রে।'...

শুনি আর মন যেন কোন অলক্ষ্যের স্রোতে ভেসে যায়। তবু বারে বারে ঠেক খায় এই পথ চলাতে। কিসের সন্ধানে ফিরি জানি না। কিন্তু অন্ধকারের সীমায় যেতে চাই না এইটুকু জানি।

এই সময়ে সহসা বাঁশ ঝাড়ের ফাঁকে যেন আলোর বিন্দু দেখতে পাই। আর তারই সঙ্গে মানুষের অস্পষ্ট গলা। সামনে তাকিয়ে দেখি বাঁশ ঝাড়ের মাটি ঢিবির মত উঁচুতে উঠে গিয়েছে।

ক্রমশ

সেকন্ডি-টাকোরাডির আটলাণ্টিক হোটেলের প্রবেশপথ ভ্রমরকৃষ্ণ পিচের তৈরি, সুপ্রশস্ত। কিন্তু ফুটপাথ নেই। অতিথি পায়ে হেঁটে আসবে, একথা অবিশ্বাস্য। এই বিরাট হোটেলের সংগে মানানসই চাই ক্যাডিলাক, জাগুয়ার কিংবা মার্সেডিস। পাঁচতালা হোটেলের ঘরভাড়া দৈনিক একশ' টাকারও বেশি, কলকাতার শহরতলীর অনেক হতভাগ্যের এক বছরের মাথাগোঁজার খেসারত। রাত্রের বড়হাজরির মূল্যায়ন ত্রিশ টাকা, অনেক দেহাতী পরিবারের উদরপূর্তির মাসিক দক্ষিণা।

এমন হোটেল আফ্রিকার দেশে দেশে এক বা একাধিক রয়েছে, যেমন আছে পৃথিবীর অন্য সর্বত্র। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর, বারের কাউন্টারের সামনে উঁচু উঁচু টুল, রিসেপশনের পাশে স্তবকিত বিদ্যুতের ঝাড়লণ্ঠন, সুইমিং পুল, বিলাতী ডিপ্লোমা পাওয়া নাপিতের সেলুন, আর পয়সাওলা টুরিস্টদের জন্য গলাকাটা দামের স্যুভেনিয়ারের দোকান। এর আফ্রিকানত্ব কতটুকু? এর সিঁড়ির কার্পেট ইতালীয়, ঘরের আসবাব জর্মন, রন্ধনশালার 'শেফ্' সুইস। লাউঞ্জে মিহিসুরে শুনতে পাবেন শোপ্যাঁর লা পোলোনেজ। মেনুতে ম্যাকারনি আর ইয়র্কশায়ার পুডিং-এর প্রভুত্বে "গারী' ও 'ফুফু'র মত স্থানীয় 'চপ' (অর্থাৎ আহার্য) হয়েছে নির্বাসিত। খানার সাহেবীয়ানা পোশাকের সাহেবীয়ানাকে চ্যালেঞ্জ করে। খানার ঘরে অ-টাইবিদ্ধ ক্ষুধার্তের প্রবেশ নাস্তি।

একবার এক ভদ্রলোক বনেজংগলে 'সাফারি' করে বহুদিন অনাহার-অর্ধাহারের শোধ তুলতে এমন এক হোটেলের ভোজন-শালায় সোল্লাসে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সাদাকাগজের মত মুখ জনৈক বেয়ারা তাঁর পথ আটকে দরজায় লটকানো বিজ্ঞপ্তি দেখাল। খাবারঘর তখন ভোজনরসিকের ভিড়ে টইটম্বুর রোস্ট করা মুরগীর মাংসের গন্ধে চতুর্দিক (ঠাকুরমার ঝুলির ভাষায়) ম' ম' করছে এবং ছুড়িকাটার টুংটাং শব্দ-মাধুর্য বেঠোভেনের প্যাস্টোরাল সিম্ফনিকেও হার মানাচ্ছে। বন্ধুটির করুণ মুখের দিকে চেয়ে বেয়ারার হৃদয় দ্রবীভূত হল। পকেট থেকে টপ করে একটা টাই বার করে সে বলে, "এইটা গলায় লাগিয়ে নিন, স্যার।" যেন স্বর্গ হাতে পেয়ে বন্ধুটি তাই করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বেয়ারাদের বড়কর্তার আবির্ভাব। এর মুখ সাদা কাগজের চেয়ে সাফ, অনুভূতির ছিটেফোঁটা পড়েনি একেবারে জন লকীয় 'ট্যাবিউল্যা রেইস্যা'র সাবয়ব আসন্নমান। মাথা নেড়ে সে জানায়, সম্রাট পঞ্চম জর্জের আমলের লোক সে। মেকী বিলাতীয়ানার সংগে তার আপোস নেই। হাওয়াই শার্টের ওপর টাইধারণ!! ছিঃ। বন্ধুটি হাল ছেড়ে দিয়ে যাবার পথে পা বাড়ায়। এবার বড়কর্তারও দয়া হল। ভদ্রলোককে নিয়ে যায় ওরা হোটেলের অন্যপ্রান্তে লম্বা এক দালানে, যার প্রবেশপথে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'দি হাংরী ম্যান।' সেখানে ও'রই মত অনেক টাইহীন, কোটহীনের দল ডবডবে চোখে এবং গোগ্রাসে ক্ষুন্নিবৃত্তিতে ব্যস্ত। বলা বাহুল্য, আমার বন্ধুটি বিনা কালক্ষেপ ও তকল্লুফে সে দলে মিশে যান। আফ্রিকার অনেক বড় বড় হোটেলে টাই ঝুলিয়ে রকম-বেরকমের খানা খেয়েছেন তিনি, কিন্তু 'দি হাংরীম্যানে'র রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আজও দুবেলা তাঁর গৃহিণীকে সক্ষোভে শুনতে হয়।

অথচ 'দি হাংরীম্যান' জাতীয় প্রত্যন্ত কক্ষে 'বুরোনি' অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের ভিড় বেশি। এরা পুরোনো যুগের কলোনিয়্যাল টাইপ নয়। টাইপরিধানে এদের অনীহা। অনেকের পরনে শুধু জাঙ্গিয়ার মত ছোট্ট প্যাণ্ট বা ইজের, চিবুক ঢাকা দাড়িতে, কারো কারো চুল আবার সে দাড়ির সংগে মিলনাভিলাষী। এরা অনেকে পায়ে হেঁটে, লরী চেপে কিংবা হিচহাইক করে কঙ্গোর জংগল আর সাহারার মরূদ্যান পাড়ি দেয়। চুল আঁচড়িয়ে, দাড়ি কামিয়ে আর গলায় টাই ঝুলিয়ে ইউরোপীয় আসবাবে সাজানো খাবার ঘরে বসে হুইস্কি-সোডা সেবনের পর মোৎসার্ট শুনতে শুনতে গাজর ও গোমাংস সিদ্ধ খাবার মত সময় বা স্পৃহা কোনটাই এদের নেই। টাই-এর ঘরে বরং দেখতে পাবেন আফ্রিকান সমাজের ওপরতালার প্রতিভূদের: স্বকীয় গুরুত্বে নিঃসংশয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, সরকারী আমলা, সামরিক অভ্যুত্থান না হয়ে থাকলে ক্যাবিনেটের, আর হয়ে থাকলে জাতীয় মুক্তি পরিষদের, সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ঘানায় কাষ্ঠব্যবসায়ী ও সম্পন্ন কোকোচাষী, নাইজেরিয়ায় ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মালিক, এবং সিয়েরালেওনে হীরক ব্যবসায়ী। এদের মাঝে ছড়িয়ে থাকে বুর্জোয়া কেতাদুরস্ত ইউরোপীয়রা: বয়সে উত্তর-চল্লিশ, চেহারায় স্থৌল্য-প্রবণতা, মাথায় শৈবত্যের আভাস। এরা হল বিদেশী দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বেসরকারী কোম্পানীর ম্যানেজার, রাষ্ট্রসংঘ প্রেরিত এক্সপার্ট আর টুরিস্ট।

আসল 'আফ্রিকান' হোটেল দেখতে হলে চলুন শহরের আফ্রিকান পাড়ায়, মফস্বলে যাবার বাসস্টেশনে (স্থানীয় ভাষায় লরী-দার্কে) কিংবা বাজারের আশেপাশে। এইখানে পাবেন ইংরাজীভাষী পশ্চিম আফ্রিকানের 'চপবার', খানিকটা কলকাতার পুরোনো যুগের পাইস হোটেলের মত। টিনের বা অ্যাসবেস্টসের ছাতের নীচে বেঞ্চপাতা, খরিদ্দাররা দু'চার আনায় মাছ বা মাংস নিয়ে বসে গেছে, সাথে আছে কেন্কে (ভুট্টার তৈরী এক ধরনের দেশী রুটি) কি ফুফু (কাঁচকলা ও ইয়ামের আটা)। কেমন রান্না? মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি পঞ্চাশ বছরের জীবনের পঁচিশ বছর রান্নাঘরে কাটানোর গর্বে গর্বিতা অনেক বঙ্গ দেশীয়ার মুখে ব্যংগের হাসি ফুটে উঠেছে। হে সুপাচিকাম্মন্যা। আমি নেমকহারাম নই। আপনাদের অনেকের রান্না অনেক খেয়েছি। এবং আশাকরি দেশে গিয়ে আরও খাব। কিন্তু তা বলে মিথ্যা নিন্দা করি কী বলে? পশ্চিম আফ্রিকার রান্নার কথা লিখতে গিয়েও রসনা সরস হয়ে উঠছে। চীনেবাদাম বাটা দিয়ে মুরগীর কষা মাংস, আমাদের পোলাও-এর প্রায় সমকক্ষ জোলোফ, কাস্তান মাছের ঝাল, এবম্বিধ পদ যে কোন

অন্নপূর্ণার গর্বস্বরূপ। খেতে খেতে যদি পিপাসার্ত হন, তবে জল পাবেন। যদি তাতেও তৃষ্ণা না মেটে আর যদি পকেট খালি না থাকে, তবে যান অনতিদূরের বারে। সেখানে আছে বীয়ার আর জিন এবং দামে সস্তা, স্থানীয় চোলাইকরা মদ 'পিটো' কিংবা 'সেফু', তালরসের তাড়ি। যদি বীরত্বব্যঞ্জক কিছু করতে চান আর যদি হিম্মৎ থাকে, তবে চাখতে পারেন 'আপাটেশি'। তবে এমন উপদেশ চট করে কারোকে দেওয়া অসমীচীন। দেবার আগে বরং একবার স্বাস্থ্যপরীক্ষা বিধেয়।

ওপরতলার হোটেলের নামকরণে আছে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। ইংরাজীভাষী পৃথিবী প্রায় সর্বত্র হিল্টন কণ্টিনেণ্টাল, গ্র্যান্ড প্যালেস প্রভৃতি নামের ছড়াছড়ি। আফ্রিকান চপবারের নামকরণে কল্পনার বন্ধনহীন উদ্দামতা প্রবীণ কথাশিল্পীর শব্দসৃজনপ্রতিভাকে লজ্জা দেয়। কয়েকটি নমুনা পরিবেশন করি; 'নিয়ামে বেচেরে চপবার' (ভগবান যোগান দেন চপবার), 'আফ্রিকা মাস্ট ইউনাইট চপবার' (বোধ হয় প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের জোয়ারে প্রতিষ্ঠিত), 'ব্ল্যাক মার্সেডিস চপবার' (এমন এক শহরে যেখানে কালো মার্সেডিস গাড়ির বাহুল্য), 'শুগার বিটল্‌স্ চপবার', 'ফিয়্যার উওম্যান চপবার', 'ডোণ্ট মাইণ্ড ইওর ওয়াইফ চপবার' (স্ত্রৈণদের সাহসদানার্থে)।

শুচিবাই না থাকলে কয়েক আনা পয়সায় আপনি যে কোন চপবারে পেটভরে ও পরিতৃপ্তিসহকারে খেতে পারবেন। একথাটা বলা প্রয়োজন, বিশেষ করে এই জন্যে যে উইনস্টন চার্চিল পাইস হোটেল সম্বন্ধে যেটুকু খবর রাখতেন, এসব দেশের চপবার সম্পর্কে আমাদের অর্থাৎ অনাফ্রিকানদের জ্ঞান বুঝি তার চেয়ে কম। পশ্চিম আফ্রিকায় অধিকাংশ ভারতীয়ের কাছে বন্ধুর বাড়ি হল একাধারে হোটেল, ক্লাব ও বার। চপবারে খাওয়া তো দূরের কথা, তথাকথিত 'ভদ্র' হোটেলে খাওয়া বা থাকা রীতিমত অভদ্রতা, যদি সেখানে কোন পরিচিত ভারতীয় থেকে থাকেন।

যাইহোক, চপবারে তো খাওয়া গেল, এখন সন্ধ্যাটা কাটাবেন কোথায়? এ অধমের উপদেশ : সিনেমার খোঁজ করবেন না। অবশ্যই বড় বড় শহরে ভালো সিনেমা-হল আছে। সেখানে হালআমলের মার্কিন, কি ইংরেজী ফিল্ম দেখানো হয়। কিন্তু সিনেমা-হল সর্বত্র ভালো নয়। অনেক শহরে 'মুক্তাঙ্গনে' ফিল্ম শো চলে। সেখানে কাঠের সুকঠিন চেয়ারে বসে আপনাকে রীতিমত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দেখতে হবে এমন সব হিন্দী ছবি। যাদের নাম দেশে থাকতে শোনেন নি। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, পোর্ট হাকুর্ট, বামাকো কি টিম্বুকটুতে বসে 'লাইমলাইট', 'বেকেট' কিংবা 'ডক্টর ঝিভাগো' দেখার কী সার্থকতা? হ্যাঁ, থাকতো যদি স্থানীয় ফিল্ম, তবু তার একটা মানে হত। 'তার চেয়ে চলুন কাফে, বার বা ডান্সহলে যেখানে পরিচিত হবেন নয়া আফ্রিকার নাটকধর্মী বাস্তব জীবনের সঙ্গে।

এসব জায়গায় শনিবারের সন্ধ্যায় জড় হবে হাল ফ্যাশানের যুবক-যুবতী। যুবকদের প্যাণ্ট ক্রমশ সরু হয়ে গোড়ালিতে প্রায় লেপ্টে গেছে। বেশির ভাগের গলায় টাই, কারো কারো মাথায় জমকালো টুপি। মেয়েদের মাথায় উত্তুঙ্গ পরচুলা, অনেকে পরেছে মিনিস্কার্ট। সকলেই নাচছে পশ্চিম আফ্রিকার জনপ্রিয় নাচ, 'হাইলাইফ', করছে বীয়ার-পান। আর মেয়েরা এর কোনটাতেই ছেলেদের চেয়ে কম যাচ্ছে না। ডান্সহলের এক কোণে বাজছে ব্যাণ্ড। সঙ্গে একটা মোটা লোক দুলে দুলে যে গান গাক, তার তালের স্পন্দনে যেন সৃষ্টির আদিম ছন্দ নন্দিত হচ্ছে।

সুদূর মফস্বল শহরের এমন একটি ডান্সহলে একবার গিয়েছিলুম। নাম : 'উইক-এণ্ড ইন সাও পাওলো'। প্রবেশদ্বারের দুদিকে দুটি ছবি। আঁকার সময় চিত্রকর কোন্ সুগভীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন জানি না। কিন্তু দরজার একপাশে এক লাস্যময়ীর ছবি আর অন্যপাশে একই মাপের একটি কোকাকোলার বোতল আঁকা। ভেতরে ঢুকে দেখি, বিরাট একটা উঠোন তার সিমেণ্টে বাঁধানো মেঝে, মাঝখানে নাচের জায়গা, ধারে ধারে চেয়ার-টেবিল সাজানো, আর তাদের পেছনে দেয়ালে দেয়ালে আঁকা 'ফ্রেস্কো'। সবচেয়ে যে বড় ছবি, সেটি একটি অর্ধশায়িতা যুবতীর। পোশাকের স্বল্পতায় প্রমাণ হয়, সে আধুনিকা। একগাল হেসে সে বলছে, "রোজ রাত্রে আমি ক্যাপ্টেন মর্গ্যানের স্বপ্ন দেখি।" ক্যাপ্টেন মর্গ্যান আবার কে রে বাবা! তাঁর পরিচয় নিয়ে আমাদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়ে গেল। কেউ বললে, নিশ্চয়ই আর্মির লোক। কেউ-বা বলে, কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন-ট্যাপ্টেন হবে। অন্য একজন অনুমান করে, বোধ হয় এই ডান্সহলের মালিক। শেষপর্যন্ত জনৈক বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করে জানা যায়, ক্যাপ্টেন মর্গ্যান হলেন আর্টিস্ট স্বয়ং। আদি নাম ছিল মর্গ্যান। গুরুত্বারোপের জন্য নিজেই 'ক্যাপ্টেন' উপসর্গ যোগ করেছেন। অঙ্কিতা যুবতীর সানন্দ স্বীকারোক্তি হল শিল্পীর স্বকপোলকল্পিত স্বেচ্ছাপূরন। ক্যাপ্টেন মর্গ্যানের আঁকা আর একটি ছবিতে মধ্যবয়স্ক একটি পুরুষ জনৈকা তরুণীকে ডাকছে। তরুণী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলছে, "মাগো! তুমি যে বুড়িয়ে গেছ।" পুরুষটি বলছে, "কিন্তু আমার টাকার তো আর বয়স হয়নি।"

'উইক এণ্ড ইন সাও পাওলো'র মত বার কি ডান্সহল পশ্চিম আফ্রিকার ছোট ছোট শহরে পর্যন্ত দেখতে পাবেন, আর এদের নামবৈচিত্র্যে আপনি মুগ্ধ হবেন : 'মণ্টে-কার্লো' 'হলিডে ইন হলিউড', 'হাডসন বে', 'ইভনিং ইন প্যারিস', ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবং এদের দেয়ালে দেয়ালে ক্যাপ্টেন 'মর্গ্যানের মত স্থানীয় শিল্পীদের প্রতিভার স্বাক্ষরে আফ্রিকার সনাতন সমাজের সাম্প্রতিক ভাঙাগাড়ার আবছা আভাস মিলবে।

'ফ্রেস্কো'র কথা বাদ দিলেও কাফে-চপবার-ডান্সহলে যারা ভিড় করে সেই তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে পরিচয় মেলে পশ্চিম আফ্রিকার নগরজীবনের। সেকণ্ডি-টাকোরাডির আটলাণ্টিক হোটেলেও আফ্রিকানরা যায়। কিন্তু যারা যায়, তারা নিজ সমাজের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। অন্যদিকে নগরায়িত পশ্চিম আফ্রিকানদের একটা বড় অংশের জীবনে জড়িয়ে আছে চপবার-ডান্সহল। এখানে দেখতে পাবেন, পরিবার, গ্রাম ও উপজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন ভিনদেশী বা ভিনগ্রামী আগন্তুক কীভাবে নতুন সামাজিক সম্পর্কের ভিত গাড়ছে। ওপরতলার জীবন অনেকাংশে আন্তর্জাতিক, —ইতালীয় কার্পেট ও 'লা পোলোনেজ'-এর প্যাকেটে মোড়া। সে-জীবনের ছাপ চপবার-ডান্সহলে কমই পড়ে। আটলাণ্টিক হোটেলের প্রবেশপথে ফুটপাথ নেই। অনেক চপবারে, ডান্স হলে শুধু পায়েচলার পথই আছে, মটরগাড়ি ঢোকার রাস্তা নেই।

অংশু দত্ত

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

চব্বিশ

হঠাৎ অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে যমুনা। জালের ওপর লাফিয়ে ওঠবার সময় তার কোমর চেপে আস্তে ঠেলা দিয়েছিল যুগল, যমুনা দড়ির সিঁড়ির কাছে এল এবং তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তরতর করে চলে এল পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচুতে-ট্রাপিজের কাঠের প্লাটফর্মের ওপর।

একধারে দাঁড়িয়ে আছে যমুনা তার পাশে উষা আর হাসি। আরও দুজন মাদ্রাজী ছেলে আছে-কোহিনুর সার্কাস থেকে পুষ্পরাজ বেশী মাইনের কথা বলে নিয়ে এসেছে তাদের। পুষ্পরাজই তাদের শিক্ষাগুরু—তার কথা মতন তারা চুপচাপ জুয়েল-এ চাকরি নিয়েছে। আর কারুর দিকে না, যমুনার চোখ ছিল পুষ্পরাজের দিকে।

কিছুদূরে যমুনার সামনাসামনি দোলনার মতন আর একটা ট্রাপিজ। সেখানে পা ঝুলিয়ে একা বসে আছে পুষ্পরাজ। মাত্র আর কয়েক মুহূর্ত। তার কাছ থেকে সংকেত পেলেই শুরু হবে শূন্যে সন্তরণ। বিশ মিনিটের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর খেলা। শেখাবার সময় অনেকবার বলেছে পুষ্পরাজ, সময়ের নির্ভুল হিসেব দরকার। এক মুহূর্তে এদিক-ওদিক হলেই হাত ফসকে ঝুপ করে নিচে পড়বে। নিচে মস্ত বড় জাল থাকলেও বেকায়দায় পড়লে সাংঘাতিক চোট লাগতে পারে। এসব কথা অতবার শোনাবার দরকার নেই। যমুনা সার্কাসে নতুন আসেনি। সে জানে অন্যান্য খেলার সময় সম্পর্কে এত বেশী সচেতন থাকতে হয় না বটে কিন্তু হাত-পা ফসকে জালের ওপর পড়লেই আঘাত এড়ান যায় না—মৃত্যুও হতে পারে।

কিন্তু এখন পুষ্পরাজের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ট্রাপিজের কথা যমুনা ভাবছিল না। মাটি থেকে অনেক ওপরে কাঠের ছোট একটা প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে সে তার কৃতিত্বের কথা ভেবে আপন মনেই কড়া আনন্দের স্বাদ পাবার চেষ্টা করছিল। হারকুসাহেব বলেছে, এর পরের ক্যাম্প তাকে সার্কাসে কুইন করে দেয়া হবে। পরের ক্যাম্প যেতে আর কতদিন বাকি আছে যমুনা মনে মনে তারও হিসেব করছিল। বেশী বাকি নেই, হয়তো আর দিন দশ-বার, কেননা টালিগঞ্জে জমি নেয়া হয়েছে ঠিক এক মাসের জন্যে। হারকুসাহেব আরও বলেছে, চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু একমাসের বেশী এ-জমিতে আর খেলাতে পারা যাবে না। জমির মালিক কিছুতেই রাজী নয়।

যমুনা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে, যেমন হতে চেয়েছিল তেমন হয়েছে। হারকুসাহেব তার কাছে এখন ভগবানের মতন। এত তাড়াতাড়ি আর সকলকে ছাড়িয়ে তাকে কে আর এত ওপরে তুলে আনতে পারত! খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিবনাথের ক্ষমতার কথা জেনে গেছে যমুনা। তার ওপর নির্ভর করে থাকলে এ সার্কাস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হত, একাংশে লীলার মতন মেয়েকে দাবিয়ে রেখে রাতারাতি এত উঁচুতে উঠে আসতে পারত না। শিবনাথের সঙ্গে আবোল-তাবোল বকে তাকে ভালবেসে ভুল করেছিল যমুনা। তবে এখন তার সুখ এই যে চাকা ঘুরে গেল বড় তাড়াতাড়ি এবং তার ভুল ভাঙল—লীলাকে সে ঠেলে নিচে ফেলে দিল। লীলার ওপর খানিকটা ঈর্ষা এখনো সম্ভবত আছে যমুনার।

"রেডি?" হাঁটুতে ট্র্যাপিজ আঁকড়ে মাথা নিচে ঝুলিয়ে সংকেত করল পুষ্পরাজ। প্রথমেই যমুনার পালা। সে দু-হাত দিয়ে ট্রাপিজের লোহার রড শক্ত করে ধরে স্যুয়িং নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হল।

কয়েকদিন আগেও প্রথম স্যুয়িং ছিল উষার। যমুনা ঠিক জানে না কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস হারকুসাহেব পুষ্পরাজকে বলে দিয়েছে, তাকে প্রথম স্যুয়িং করবার সুযোগ দিতে। এখনো ভল্ট দিতে পারে না যমুনা। খুব দেরী লাগবে না, আর কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলেই সে দুবার ভল্ট দিয়ে অন্য ট্রাপিজের রড ধরতে পারবে। তারপরই সে হয়ে যাবে উষার সমান-সমান। এবং আর একটু চেষ্টা করলেই সে হয়তো একদিন তিনবারও ভল্ট দিতে পারবে।

তখন উষাও তাকে ঈর্ষা করবে। যমুনা ঠিক বুঝতে পারে না উষা এখনো তাকে ঈর্ষা করে কি-না। কয়েকদিন থেকে সে বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। যমুনার দিকে তাকিয়ে আগের মতন হাসে না বেশী, কথাও বলে না। পুষ্পরাজ তাকে শুনিয়ে প্রায়ই যমুনাকে

বলে, "তুমরা মাফিক আর্টিস্ট ইন্ডিয়ামে আভি ভি নেই হ্যায়। এতনা জলদি-জলদি ট্রাপিজ কোই শিখতা নেই।"

মুগুরিং দিয়ে আবার প্ল্যাটফর্মে ফিরে এল যমুনো। পা নাচাতে-নাচাতে ট্রাপিজ ক্লাউন যুগল গেল এবার। তার মাথার টুপি খুলে পড়ল নিচে, জালের ওপরে। ঝুলতে ঝুলতে চিৎকার করছে যুগল, যেন খুব ভয় পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, দর্শকরা এখন চুপ—যুগলের ভাঁড়ামি দেখে হাসছে না।

কেন ক্লাউন হতে গেল যুগল যমুনো তা ও জানে না। কম বয়স তার, অনেক খেলা জানে। এমন কোন মানুষ হঠাৎ ক্লাউন হতে যায় না কিন্তু যুগল কোন আপত্তি করেনি, এক কথায় রাজী হয়ে গেছে। তাকেও খুব ভাল লাগে যমুনার। কম কথা বলে সে, ছেলে হিসেবে একটু বেশী লাজুক। অন্য খেলার সময় এরিনায় এলে কোন রকমে কাজ সেরে ফিরে যায় যুগল, দর্শকদের হাত নেড়ে অভিবাদন করলেও মুখ তুলে তাকায় না কারুর দিকে। হারকু সাহেবের প্রিয়পাত্র বলে যমুনাও তাকে পছন্দ করে।

"এত খেলা জানেন আপনি" যমুনা একদিন তাকে বলেছিল, "দুম করে

ট্র্যাপিজের ক্লাউন হলেন কেন? এ খেলাটাও শিখে নিলে হত না? ভয় লাগে নাকি?"

"ভয়?" মাথা চুলকোতে চুলকোতে হেসেছিল যুগল, যমুনার মুখের দিকে তাকায়নি, ডান পায়ের বুড়ো আঙুল উঁচু করে শুকনো মাটি দেখতে দেখতে বলেছিল, "আরে দিদি, সেসব আমার নেই। মরি তো মানুষের সামনে মরব, খেলা দেখাতে দেখাতে মরব। বিছানায় শুয়ে ধুঁকে-ধুঁকে ফিনিশ হয় মেয়েমানুষ—"

যমুনা চোখ পাকিয়ে বলেছিল, "এই চুপ!"

"মাইরি দিদি, রাগ করলেন?"

"আমি কি বিছানায় ধুঁকে-ধুঁকে মরব?"

"আরে না না, আপনার—আপনার বোনের সাহস কত! ট্র্যাপিজ খেলার সময় দেখি না।"

"দেখেন নাকি?"

"কে না দেখে! মাস্টার কী বলেছে, ইণ্ডিয়ায় আপনার মতন সাহস কারুর নেই, তা-ও শুনেছি।"

যমুনা যুগলের কথা শুনে খুব খুশী হয়েছিল, হাসিকে এক সময় বলেছিল, "একদিন ওকে রান্না করে খাওয়া না-রে।"

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করেছিল হাসি। প্রথমে ভাঙতে চায়নি, পরে খুব নিচু স্বরে যমুনাকে বলেছিল, "জানিস দিদি, ও ভারী অসভ্য।"

"কেন রে?"

"আমাকে সব যা-তা বলে, গায়ে হাত দেয়—"

হাসির স্বরে মৃদু অনুযোগ ছিল রাগ কিম্বা বিরক্তি ছিল না। যমুনা হাসির কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিল চুপেচাপে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে তারা। কিছু সময় কোন কথা বলতে পারেনি যমুনা, মোহনলালের কথা মনে পড়ছিল বলে তার মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিল। বয়স কম হাসির, ভালমন্দ বোঝবার মতন বুদ্ধি হয়নি। যুগলের সঙ্গে মাখামাখি করবার আগে মোহনলালের কথাটাও তার ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

যমুনা জিজ্ঞেস করেছিল, "যুগলকে মনে ধরেছে তোর?"

"যাঃ!"

"ন্যাকামি রাখ, আমার কাছে ঠিক কথা বল।"

"আমি কী জানি," হাসি অভিযোগ করবার মতন স্বরে বলেছিল, "ওই তো আমার সাথে যেচে যেচে কথা বলে, ইটি-ইয়ার্কি করে—"

"করুক না, ছেলে তো ভালই—" হঠাৎ যমুনা জিজ্ঞেস করেছিল, "মোহনলালের সাথে কথা নেই তোর?"

হাসির মুখ যমুনার কথায় ঝাপটায় পলকে ভিজে-ভিজে নরম হয়ে এল। সে যমুনার কথার উত্তর দিল অনেক পরে, দোষ স্বীকার করবার মতন ঠাণ্ডা গলায়, "সার্কাসে থাকবার ইচ্ছা নেই তার। ঘরে থাকবার সাধ—"

"তা কী?"

"তা-ও তো কিছু বলে না। বাবাকে রাখবার কথা বলেছিলাম একদিন, চুপ করেছিল।"

"বাবার দায় ঘাড়ে নেবে কে রে? যুগল নেবে নাকি ভাবিস? বাবার কথা ভেবে তুই নিজের পায়ে কুড়ুল মারবি?"

যমুনার কথা শুনে সব সংকোচ মুছে গিয়েছিল হাসির মন থেকে। সে তাকে অবজ্ঞা করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "হ্যাঁ মারব।"

"তবে মর!"

কিছু পরে হাসি যমুনাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে আরও বলেছিল, "মোহনবাবুকে যেমন বলেছি, যুগলবাবুকেও তেমন বলব —বাবার ভার যে না নেবে সে যেন আমার সাথে পীরিত করার বাসনা না করে।"

"উঃ, দরদ কত!" হঠাৎ মেজাজ বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল যমুনার, রাধানাথ বাবুকে নিজের খেয়ালে আঘাত করবার জন্যে সে মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গি করে বলেছিল, "মানুষ তোর সাথে পীরিত করবে না বাবার সাথে করবে?"

"দু-জনের সাথেই করবে।"

"সব দেখব আমি!"

যমুনা ভেবেছিল হাসি আর কথা বলবে না, চুপ করে থাকবে। কিন্তু হয়তো যুগল আর মোহনলালকে নিয়ে তার মনে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল বলে সে যমুনাকে ধমক দেয়ার মতন চড়া গলায় বলেছিল, "তুই তোর নিয়ে থাক দিদি। বাবার কথা বাদ দে, আমার কথা বাদ দে—"

কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে হাসির মুখের দিকে তাকিয়েছিল যমুনা, তার বিরূপ হয়ে ওঠার কারণ স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি, পরে সে-ও খুব জোরে বলে উঠেছিল, "নিজেকে নিয়ে থাকব না তো কাকে নিয়ে থাকব, শুনি? তোর পীরিতের বাপ ভাববে আমার কথা?"

"কার কথা ভাবিস তুই?" হাসি তীক্ষ্ণ গলায় নিজের মনের সব জ্বালা যমুনার মুখের ওপর ঢেলে দিয়ে বলে উঠেছিল, "শিবুদার কথা ভাবিস?"

যমুনা আর সহ্য করতে পারেনি, ধৈর্য হারিয়ে হাসির চুল ধরে তার গালে জোরে একটা চড় মেরে বলেছিল, "ছোট মুখে বড় কথা, বড় বাড় বেড়েছিস হাসি, সাবধান!"

"মারলে কী হবে?" হাসি কিছু দূরে সরে গিয়ে কান্না-কান্না গলায় বলেছিল, "তুই আমাকে মারবি, বাবাকে মারবি—মানুষের নামে মিছে কথা লাগিয়ে—"

"কার নামে মিছে কথা লাগিয়েছি, বল?"

"শিবুদার নামে তুই বলিস নি হারকুলাহেবের কাছে, বাবুর কাছে? তার মতন ভাল মানুষ হয়—" একটু চুপ করে থেকে বাইরে তাকিয়ে হাসি স্বর কিছু নামিয়ে বলেছিল, "এখন আমার সাথে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন চেনেই না!"

"কে আগে লাগিয়েছে তার নামে? তোর পীরিতের বাপ না—" প্রথম কয়েকটা কথা আস্তে বলেছিল যমুনা, পরে ভাঙা কাঁপা-কাঁপা গলায় হাসির মুখের কাছে মুখ এনে চিৎকার করার মতন বলে উঠেছিল, "লাগিয়েছি, বেশ করেছি। মিছে কথা বলে ধোঁকা দেয় যে মানুষ, তাকে মাথায় নিয়ে নাচব? সে তোকে না চিনলে কী এল-গেল। তোরই বা দরকার কী তার সাথে কথা বলবার!"

"না, দরকার আর কী।"

হাসিকে চড় মেরে থামিয়ে দিতে চাইলেও এখনো এক-একবার অস্থির হয়ে পড়ে যমুনা। ট্র্যাপিজের রড যেন বড় পিছল, তার হাত ফসকে যেতে চায়। স্যুয়িং নেয়ার সময় উরুতে হঠাৎ টান পড়ে ব্যথা

হয়। আলো তার চোখে ঝাপসা হয়ে যায়। এক ট্র্যাপিজ থেকে পিছন ফিরে আর এক ট্র্যাপিজে যাবার সময় তার মনে হয় সে পড়বে জালের ওপর—অক্ষম হয়ে যাবে। সার্কাস কুইন সে সম্ভবত কোনদিনও হতে পারবে না। সকলের চেয়ে ওপরে যা গিয়ে ওঠে মানুষ যেমন করে ওঠে, যমুনা তেমন করে ওঠেনি—একজন ভাল মানুষের ঘাড়ের ওপর পা রেখে সে শেয়ালের মতন উঠে এসেছে। সে-মানুষ তাকে ক্ষমা করবে না।

এসব কথা যখন যমুনার মনে হয়, তখন সে কৃতিত্বের অহংকার অনুভব করতে পারে না। এবং সার্কাস কুইন হওয়ার ইচ্ছেও জুড়িয়ে আসে। তখন সে ভাবে শিবনাথের কথা মতন তার সঙ্গে অন্য কোথাও চলে গেলেই হত। খেলার জন্যে জীবন তুচ্ছ করবার কোন মানে হয় না। এক ট্র্যাপিজ থেকে আর এক ট্র্যাপিজে যেতে যেতেই এত কথা কখনো কখনো মনে আসে যমুনার, আর তখন তার কাছে খেলা ও জীবন দুই-ই ঝাপসা হয়ে যায়।

সেদিন সকালে রঘুনাথের তাঁবু থেকে শিবনাথ চলে যাবার পরেও আরও অনেক সময় যমুনা হারকুসাহেব আর রাধানাথবাবু সেখানে বসেছিল। তার কথা শুনে রঘুনাথের কী মনে হয়েছিল যমুনা বুঝতে পারেনি। কিন্তু শিবনাথ চলে যাবার পর তার খুব লজ্জা হচ্ছিল—কেমন করে অত কঠিন কথা সে তাকে বলতে পারল সেদিন। রাধানাথবাবুর ওপর যমুনার কোন টান থাকবার কথা নয়—সেদিন তার হয়ে সে শিবনাথের সঙ্গে ঝগড়াই বা করল কেন!

শিবনাথ চলে যাবার পর হারকুসাহেব বলেছিল, "আঁখ দেখিয়ে গেল বাবু, আপনি শুনলেন সব বাত?"

"হাঁ, শুনলাম।"

"আভি বিচার আপনি করবেন। যমুনা আছে, রাধানাথবাবু আছে—তারা আপনার কাছে কোমপ্লেন করবার লিয়ে এল—"

রঘুনাথ শুকনো হেসে বলেছিল, "আমার বিশ্বাস হয়েছিল শিববাবু যমুনাকে সাদি করবে—"

রাধানাথবাবু আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের সামনে একটা হাত তুলে হেসে উঠেছিল হারকুসাহেব, "সাচ বাত কি-না বলুক যমুনা—" তার কথার অপেক্ষা না করেই সে বলেছিল, "শিববাবুর বাত বিলকুল ঝুট বাবু—"

"হাঁ ঝুট", রাধানাথবাবু হাঁটুর ওপর থাবড়া মেরে চিৎকার করে উঠেছিল, "বিয়ে করবার আর লোক পেল না যমুনা! বিয়ে করবার জন্যে সার্কাস কোম্পানীতে এসেছে ও?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বাত রাধানাথবাবু। সার্কাসে যমুনা এল খেলবার লিয়ে, সাদির ভাবনা ভাবলে খেল খতম হয়ে যাবে।"

ঠিক কথাই বলেছে হারকুসাহেব। তার কথা মেনে নিতে পারলেও রাধানাথবাবুকে সহ্য করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে যমুনার পক্ষে। রাধানাথবাবু তার বিয়ে দেয়ার জন্যে তাকে নিয়ে সার্কাসে আসে নি। যে জন্যে এনেছে তা করতে পেরেছে যমুনা—সে জেনারেল ম্যানেজারকে আয়ত্তে এনে নতুন খেলার সুযোগ পেয়েছে—মাইনে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছে। শিবনাথ যা করতে পারেনি, যা করতে পারত না—হারকুসাহেব তা-ই করে দিয়েছে।

এখন শিবনাথের ভাবনা ভাববার দরকার কী যমুনার!

পুষ্পরাজের নির্দেশ মতন সব আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। ঊষা একা দাঁড়িয়ে আছে ট্র্যাপিজের প্ল্যাটফর্মের ওপর। আর কাউকে থাকতে দেয়নি পুষ্পরাজ। ঝুপ-ঝুপ করে পর-পর কয়েকবার শব্দ হয়েছিল। খেলা শেষ করে একে-একে নিচে সাদা লম্বা জালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে হাসি যমুনা গোপালন বিজয়ন আর যুগল। এখন একদিকে পুষ্পরাজ আর একদিকে ঊষা।

"রেডি?"

"নেই", ঊষা স্যুয়িং দিতে পারল না। বড় অন্ধকার। নিচে দর্শকদের কথা ভুলে সে কাতর স্বরে বলে উঠল, "বাত্তি বুতার দিয়া কাহে?"

"আঁধারমে খেল হোগা। রেডি?"

"নেই, নেই। কুছ নেই দেখতা। হাম নেই সেকেগা।"

"ডরো মত, রেডিয়ম জ্বলতা দেখো। চলা আও—"

ঊষা পুষ্পরাজের কথা মতন ঘন অন্ধকারে দেখল তার গায়ে সরু তার বাঁধা, সেখানে রেডিয়ম চিকচিক করছে। ট্র্যাপিজে এবং পুষ্পরাজের গায়েও আলোর রেখা খেলছে। ইচ্ছে করলে ঊষা খেলা দেখিয়ে দিতে পারবে ঠিক, কিন্তু তার সাহস হল না। অন্ধকারের খেলা তাকে পুষ্পরাজ কখনো শেখায়নি।

অসহিষ্ণু পুষ্পরাজ তার নাম ধরে ডাকল, "ঊষা", এবং তার পাশে একই প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে বলল, "বহুৎ রুপেয়া মিলেগা, এয়সা খেলাই সার্কাসমে কোই নেই দেখা। দেখো হাজার আদমী খেলা দেখনে আয়া—"

নিচে তাকাল ঊষা। দেরী হচ্ছে বলে চিৎকার করছে দর্শকরা। ব্যান্ডের মাচা থেকে একটা বিলিতি সুর ভেসে আসছে। মাইকের মধ্যে দিয়ে আসা গোকুলবাবুর গলার স্বরও ঊষা শুনল। সম্ভবত মাইক বিকল হয়েছে।

"গোকুলবাবুর কথা কেটে-কেটে যাচ্ছিল।"

"এবার দেখুন আশ্চর্য খেলা। আঁধারে শূন্যে সন্তরণ। এই চমকপ্রদ সন্তরণ করছেন ভারত বিখ্যাত ট্র্যাপিজ শিল্পী পুষ্পরাজ ও ঊষা। আঁধারে শূন্যে সন্তরণ!"

পুষ্পরাজ ঊষার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, "গোকুলবাবু অ্যানাউন্স কর দিয়া। শুন ঊষা, হাম দোসরা ট্র্যাপিজ মে যাতা। দো মিনিট টাইম দেগা তুমরা। নেই খেলনেসে নিকাল যাও। হাম যমুনাকো খেলনে বোলেগা—"

কথা শেষ করে চলে গিয়েছিল পুষ্পরাজ, ঊষাকে স্যুয়িং নেয়ার জন্যে শেষবারের মতন সংকেত করছিল। তার এমন অদ্ভুত ব্যবহারের কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না ঊষা। আরও কয়েক মুহূর্ত সে ইতস্তত করল। এবার স্যুয়িং না করলে অসন্তুষ্ট হবে পুষ্পরাজ এবং সে যা বলেছে তা-ই করবে—যমুনার সঙ্গে খেলবে।

পুষ্পরাজের গায়ের সরু তার থেকে, তার ট্র্যাপিজের দড়ি থেকে রেডিয়মের যে আলো চিক্‌চিক্‌ করছিল তা লক্ষ করে স্যুয়িং করল ঊষা এবং প্রথমেই দু-বার ডল্ট খেয়ে তার হাত ধরল। কিন্তু এখন কী হবে? প্ল্যাটফর্মে আর কেউ নেই। সময়ের নির্ভুল হিসেব করে কে তার দিকে অন্য ট্র্যাপিজ ঠেলে দেবে?

"ঊষা, এত না টাইম লেতা কাহে?"

"ক্যায়সে জায়গা হাম?"

"প্ল্যামফর্মমে গোপালন হ্যায়। দেখো দোসরা ট্র্যাপিজ আ গিয়া। হামরা হাত ছোড়—"

"নেই। প্ল্যাটফর্মমে কোই নেই হ্যায়।"

আগে সন্দেহ করেনি ঊষা, এখন সে স্পষ্ট বুঝল পুষ্পরাজ ইচ্ছে করেই সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে, সকলকে সরিয়ে দিয়েছে। পুষ্পরাজের হাত ধরে অসহায় একটা মেয়ের মতন মাটি থেকে অনেক ওপরে ঝুলতে ঝুলতে তার চিঠির কথা মনে হল ঊষার এবং তার ভয় হল সে তাকে নিচে ফেলে দেবে।

"ঊষা, হামরা হাত জ্বল যাতা, ছোড়—"

"নেই ছোড়ে গা। তুমরা মতলব হাম সমঝ গিয়া।"

"কেয়া মতলব?"

"তুম হামরা গিরায় দেগা, দেশমে ভাগ যায়গা। উ নেই হোগা—কভভি নেই হোগা। হাম তুমকো যানে নেই দেগা—" কথা শেষ করতে পারল না ঊষা। তার পেটে খুব জোরে আঘাত করেছে পুষ্পরাজ জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। ঊষা জালের ওপর পড়ে ছটফট করছে। খুব গোলমাল হচ্ছে, তাকে ঘিরে আছে অনেক মানুষ। ঘাড়ে লেগেছে ঊষার। সে মাথা তুলতে পারছে না, কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

"মা—মা গো!" ঊষা যন্ত্রণায় চিৎকার করে খাটের ওপর উঠে বসল।

"কেয়া হুয়া?" নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল পুষ্পরাজ, ঊষার চিৎকার শুনে চোখ খুলল। বিরক্ত হয়ে তার খাটের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "পেটমে কুছ গড়বড় হুয়া?"

স্বপ্নের উত্তেজনায় শরীর কাঁপছিল ঊষার। ভয়ে তার স্বর বন্ধ হয়ে এসেছিল। পুষ্পরাজের একটা হাত শক্ত করে ধরে অন্ধকারে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে চুপচাপ বসেছিল।

"কেয়া হুয়া বোল না?" ঊষার হাত ঝাঁকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল পুষ্পরাজ।

ঊষা আরও কিছু সময় বোবার মতন তাকিয়ে থাকল পরে খুব নিচু স্বরে ছেড়ে ছেড়ে বলল, "এক স্বপন দেখকে বহুৎ ডর লাগা—"

বিরক্তির ছোট একটা শব্দ উচ্চারণ করল পুষ্পরাজ। ঊষার মুঠি থেকে হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের খাটে শুয়ে পড়ে অল্প শ্লেষের সঙ্গে হঠাৎ বলল, "কেয়া দেখা? এতনা জোরসে চিল্লায়া—কেয়া, কুন্দনলাল জুত্তিসে মারতা?"

কোহিনুর সার্কাসের কুন্দনলালের কথা এমন কি তার ছেলেমেয়েদের কথাও ভুলে গিয়েছিল ঊষা—পুষ্পরাজ আবার মনে পড়িয়ে দিল। ঊষা কী বলবে হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। একবার তার ইচ্ছে হল পুষ্পরাজের মুখের ওপর বলে, হ্যাঁ।

কিন্তু ঊষা তা বলল না। স্বপ্নের কথা মনে করে পুষ্পরাজকে তার আঘাত করবার ইচ্ছে হচ্ছিল বলে সে বলল, "হাম দেখা তুম হামরা ট্র্যাপিজসে গিরায় দিয়া।"

"হাম?" একটু ইতস্তত করে পুষ্পরাজ বলল, "কাহে?"

"কেয়া জানে!"

আর কিছু বলল না পুষ্পরাজ, পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। ঊষা তখনো তাকিয়েছিল তার দিকে। ঊষার ঘাড় সত্যিই এখন ব্যথায় টনটন করে উঠছিল। শুয়ে পড়লেও তার ঘুম আসবে না বলে সে সারারাত জেগে-জেগে পুষ্পরাজকে পাহারা দেয়ার কথা ভাবছিল। হয়তো স্বপ্নের জন্যে ঊষার ভয় হচ্ছিল সে আজ রাতেই তাকে এখানে একা ফেলে রেখে দেশে পালিয়ে যেতে পারে।

ক্রমশ

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনের বিভিন্ন গ্যালারীতে সম্প্রতি শিল্পী নীরদ মজুমদার, সুশীল মুখার্জি, সুবল পাল, সরিত নন্দী ও অনিল বসু রায় তাঁদের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এ ছাড়া শিল্পী সুধাংশু দাশ তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ম্যাক্সমুলার ভবনে।

নীরদ মজুমদার খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী; বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও নিজস্ব রচনাশৈলীর জন্য সমকালীন চিত্রকলাক্ষেত্রে এই শিল্পী এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। প্রদর্শনীতে তিনি ১৮খানি ছবি পেশ করেন। সুদীর্ঘকাল ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও তিনি বিষয়বস্তু বা অঙ্কনরীতি ব্যাপারে বিদেশ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন নি। তাঁর চিন্তাধারা, ধর্মবোধ ও শিল্প কাজের মধ্য দিয়ে ভারতীয় রূপটুকুই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। অননুকরণীয় রীতিতে আঁকা প্রত্যেক ছবিতেই তাঁর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর দেখা যায়। হিন্দু শাস্ত্রের ওপর শিল্পীর গভীর আস্থা এবং তারই এক বিশেষ অধ্যায় তিনি ছবির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। একই শাস্ত্রীয় বিষয়বস্তুকে (ষোড়শী কলা) কেন্দ্র করে শিল্পী এক রচনামালার সৃষ্টি করেছেন এবং মূলত সরল রেখামাধ্যমে সেই বিষয়বস্তুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন জগতের সন্ধান দিয়েছে। সুতরাং নীরদ মজুমদারের শিল্পচেতনার প্রধান উৎস প্রাচীন শাস্ত্র এবং কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু শাস্ত্রোক্ত মাতৃমূর্তি, যাঁকে শিল্পী কসমিক মাদার রূপে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; এবং এই রূপ ব্যাখ্যা করার জন্য শিল্পী সরল অঙ্কন প্রণালীর আশ্রয় নিয়েছেন—অর্থাৎ আলপনা জাতীয় রেখা ও নানা শাস্ত্রসম্মত প্রতীক ও শ্লোকের মধ্য দিয়ে উপবিষ্টা মাতৃরূপী মূর্তি ও তাঁর বিভিন্ন অবয়বের সংগে সৌরজগতের নানা বিশিষ্ট সম্বন্ধ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, বিষয়বস্তু জটিল ও অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য সন্দেহ নেই—অর্থাৎ একান্ত সহজ ও সাবলীল হওয়া সত্ত্বেও রচনাগুলি যেন বিমূর্ত ও আধুনিক চিত্রকলার মত ব্যক্তিগত ও আত্ম-কেন্দ্রিক। ফলে অনেকেই হয়ত অন্তর্নিহিত বক্তব্যটুকু সঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। তবে শিল্পীর রচনাবিন্যাসের জন্য ছবির রসগ্রহণ করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। শিল্পী যেন স্বচ্ছ ও বিরতিবহুল আলপনা-রেখাছন্দে একই মূর্তি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। আগেই বলেছি, রেখা নিরবচ্ছিন্ন নয়—বিষয়বস্তু ও রচনাক্ষেত্রের প্রয়োজনমত এই রেখা প্রায় বিচ্ছিন্ন অথচ দৃঢ় ও নিয়মানুগ—বুঝি এই বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়েই অখণ্ডরূপটুকু বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। শিল্পী রঙ অবশ্যই ব্যবহার করেছেন, তবে পরিমিতভাবে—ছোট ছোট জ্যামিতিক নানা কোণ ও ত্রিকোণগুলি লঘু ও শান্ত রঙে ভরিয়ে তুলেছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে যেন রঙীন কাচের বিচিত্র কারুকার্য ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়—অঙ্কন তথা রঙ ব্যবহারপ্রণালীতে শিল্পীর সংযম লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় একই মূর্তিকে তিনি বিভিন্ন ছবিতে রূপ দিয়েছেন, অথচ প্রত্যেক ছবিই আপন বিশিষ্টতায় স্বতন্ত্র ও সমুজ্জ্বল। নীরদ মজুমদারের চিত্রকলার

সূর্যগ্রহণ —নীরদ মজুমদার

সামগ্রিক রূপেরই রসগ্রহণ করা সম্ভব, অর্থাৎ পরস্পরযুক্ত ছবিগুলি বার বার যত্ন সহকারে দেখলেই শিল্পীর স্বকীয়তা ও রচনারীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়—সুতরাং এক্ষেত্রে বিশেষ কোনও ছবির উল্লেখ করা অবান্তর।

✲

দেশের সমকালীন শিল্পক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিচিত না হলেও সুশীল মুখার্জি পুরাতন শিল্পী। মাদ্রাজ আর্ট কলেজে শ্রীদেবীপ্রসাদের মেধাবী ছাত্র ও পরে সুযোগ্য শিল্পী হিসাবে সুশীল মুখার্জি কয়েক বৎসর পূর্বেও এদেশে সুনাম করেছিলেন এবং শিক্ষক হিসাবে কয়েকটি সুপরিচিত পাবলিক স্কুলের চিত্রকলা বিভাগের উন্নতি সাধন করেছিলেন। পরে ফুলব্রাইট বৃত্তিলাভ করে তিনি আমেরিকা যান ও শিক্ষক-শিল্পী ও সমালোচক হিসাবে সে দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। দেশে ফিরে আসার পর ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর উদ্যোগে তাঁর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। প্রদর্শনীতে তিনি অধুনা রচিত ২৫খানি নিদর্শন পেশ করেন, তার মধ্যে অধিকাংশই তেলরঙে আঁকা।

সুশীল মুখার্জির বৈশিষ্ট্য হল অঙ্কন তথা রঙ ব্যবহার পদ্ধতি। তাঁর রঙের পাত্রে নানা রঙ। প্রয়োজনমত কখনও তিনি প্যালেট্ ছুরি ভরে তীব্রগতিতে উজ্জ্বল ও সোচ্চার রঙের ওপর রঙের প্রলেপ দেন, আবার কখনও কোনও ক্ষেত্রে পরিচিত প্রিয়জনের প্রতীক্ষিত পদক্ষেপের মত তাঁর ব্রাশের মুখ থেকে নেমে আসে লঘু, শান্ত ও কোমল স্পর্শমাত্র। বাস্তবিক, ছবি দেখে

ভীষ্ম —সুশীল মুখার্জি

জেলে —অনিল বসু রায়

প্যালেসেস —সুবল পাল
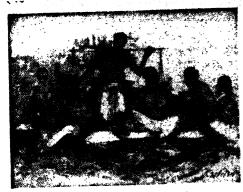
মনে হয় শিল্পী যেন অবলীলাক্রমে সুবৃহৎ ক্যানভাসগুলি নানা রঙে ভরে ফেলেছেন—তাই কয়েক স্থলে তাঁর ক্যানভাস-রঙ-সমুদ্রে পড়ে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে—একখণ্ড সাদা জমির জন্য যেন সারা চিত্ত লালায়িত হয়ে ওঠে। সুশীল মুখার্জির অঙ্কনরীতি এক্সপ্রেশনিস্ট জাতীয় এবং রচনার মধ্য দিয়ে চিন্তাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পীর ভাষা স্পষ্ট ও নির্মম। শিল্পী রচিত মূর্তিগুলি যেন বিকলাঙ্গ ও তাদের মুখে যেন আতঙ্ক ও যন্ত্রণায় বিকৃত। এরা যেন আমাদের খুব পরিচিত নয়, অথচ এদের অস্তিত্বকে যেন অস্বীকারও করা যায় না। বাস্তবিক কয়েকটি ছবির মধ্য থেকে যেন করুণ আর্তনাদের কাতরধ্বনি ভেসে আসে—যাঁদের কান আছে তাঁরাই সে ক্রন্দন শুনতে পান (স্কিমিং ম্যান, লুকিং ওভার এ ফেন্স ও অর্জুনের অব্যবস্থিতচিত্ত)। দীর্ঘকাল আমেরিকাবাসের ফলে শিল্পীর রচনা-রীতিতে হয়ত সমকালীন আমেরিকার চিত্রকলার কিছু প্রভাব দেখা যায়—বিশেষ করে দুই একটি রচনা দেখে আর্শিল গোর্কির কথা মনে পড়ে। তাহলেও এ প্রভাব শিল্পীর শিল্পচেতনাকে আদৌ খর্ব করেনি। অপরাপর ছবির মধ্যে রাবণ ও জটায়ু, ভীষ্ম ও প্রোশেসন-এর নাম করা যায়। জলরঙে আঁকা ছবির মধ্যে কিন্তু শিল্পীর দরদী ও স্পর্শকাতর মনের পরিচয় পাই। বিশেষ করে থ্রি ন্যুডস্ ছবিখানি অনেকের মনে থাকবে। সাবলীল রেখাছন্দের মধ্য দিয়ে তিনটি মূর্তিরই নিম্নাংশ ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ করে শিল্পী যেন এগুলিতে রূপকথার মৎস্যকন্যার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

শিল্পী সুবল পাল সুদীর্ঘকাল দিল্লীতে বসবাস করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। চিত্রকলা বিষয়ক সরকারী সংস্থায় দায়িত্ব-পূর্ণ পদে থেকেও এ-শিল্পী দিল্লীতে কয়েকটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন—তবে কলকাতায় এটি তাঁর প্রথম প্রয়াস। তিনি ২৪খানি নিদর্শন পেশ করেন।

সুবল পাল বিমূর্ত শিল্পী। এ-শিল্পীর কাজের মধ্যে নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন বস্তু শিল্পী যত্ন সহকারে লক্ষ করেছেন ও মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তারই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। শিল্পী শূন্যস্থানের মূল্য বিষয়ে সচেতন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূন্য-স্থানকে ভিত্তি করেই রচনা করেছেন—তার ওপর আছে রঙের প্রাধান্য। শুধু তাই নয়, রঙ ও শূন্য স্থানের সমন্বয় করে এ-শিল্পী নানা প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছেন। কয়েক ক্ষেত্রে বিমূর্ত শ্রেণীভুক্ত হলেও রচনাগুলি সরল ও সুবোধ্য হয়ে উঠেছে—যেমন প্যালেসেস। উদয়পুর রাজপ্রাসাদটি ঘুরে দেখবার পর প্রাসাদটিকে কেন্দ্র করে বিগত যুগের নানা কাহিনী শিল্পীর মনে উদয় হয় ও প্রধানত ইয়েলো ওকার রঙের কয়েকটি আঁচড়ের মধ্য দিয়ে তিনি প্রাসাদের অন্তর্নিহিত রূপটুকু প্রকাশ করেন। এক অপরূপ ও দুর্ভেদ্য রহস্যজালের আবরণে ঢাকা প্রতীকপ্রধান এই ছবিটি অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে। চিন্তাশক্তি ও রচনাকৌশলের দিক দিয়ে হেভন্‌স্ অ্যান্ড দি ওসান উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ছবির মধ্যে রঙের মায়াজালের জন্য ড্যান্সিং শ্যাডোজ, সুপরিকল্পিতভাবে লাল রঙ ব্যবহারের জন্য মহাশক্তি ও রেখাবিন্যাসের

গল্পে ল্যাবিরিন্থ অব দি ড্রিমস-এর নাম করা যায়। তবে বিমূর্ত রচনার বিপদও আছে। সব সময়ে সব নিদর্শন রসোত্তীর্ণ হয় না—এখানেও হয়নি, যেমন সিটিস্কেপ। তাহলেও বিমূর্ত শিল্পী হিসাবে সুবল পাল পরিণত মানসের পরিচয় দিয়েছেন।

✻

শিল্পী সরিৎ নন্দী সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করে কয়েক বৎসর যাবৎ খড়্গপুর ইন্ডিয়ান ইন্সস্টিটিউট অব টেকনলজিতে কলাশিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। কলিকাতায় এটি তাঁর দ্বিতীয় প্রদর্শনী।

এ-শিল্পী অধিকাংশ রচনাই তেলরঙ ও টেম্পারা মাধ্যমে এঁকেছেন এবং সেই সঙ্গে চিত্রকলার আধুনিকতম মাধ্যম, অর্থাৎ পেরেক, শিক, চট ইত্যাদি ব্যবহার করে পরীক্ষাও শুরু করেছেন। রচনারীতি অধিকাংশ স্থলেই মিশ্র, অর্থাৎ ছবিতে

রূপকথা —সুধাংশু দাশ
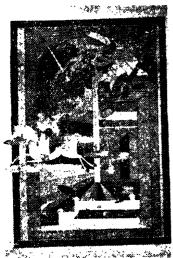
বিমূর্ত, আধুনিক ও প্রথাগত রীতি দেখা যায়। এই পর্যায়ে ল্যান্ডস্কেপ উল্লেখযোগ্য। কম্পোজিশন হিসাবে অ্যাগনি ও ইক্স্টেসি চোখে পড়ে। গার্ল উইথ ফ্লাওয়ারপট ছবিখানির নিম্নভাগটুকু যত্ন সহকারে আঁকলে রসোত্তীর্ণ হত সন্দেহ নেই। তবে শিল্পীর নূতনতম মাধ্যমে রচিত কাজগুলি দেখে আনন্দলাভ করেছি। শিল্পী টেকনলজি ইনস্টিটিউটের আবহাওয়ায় থেকে বিভিন্ন ফ্যাক্টরী ও উৎপাদন প্রণালী দেখেছেন এবং সেই অনুভূতিই নূতন মাধ্যমে বিমূর্ত রীতিতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ফ্যাক্টরীর চিমনি, বিভিন্ন শ্রেণী ও আকারের কলকব্জা, কর্মচারীবৃন্দ—এক কথায় ফ্যাক্টরীর ছোট অথচ সম্পূর্ণ রূপ এই শিল্পী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। একখণ্ড প্লাইউডের ওপর

ফ্যাক্টরী —সরিৎ নন্দী

কয়েকটি পেরেক, শিক ও ওই জাতীয় বিভিন্ন বস্তু সুপরিকল্পিতভাবে স্থাপনা করে শিল্পী স্বীয় বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন। গরম লোহার পাতে প্লাইউডের স্থানবিশেষ পুড়িয়ে ফেলে শিল্পী ফ্যাক্টরীর পরিচিত আবহাওয়াও তৈরি করেছেন। (ফ্যাক্টরী) তবে একটি কথা—শিল্পী যদি বৃহত্তর প্লাইউড খণ্ডের ওপরে কাজ করতেন ও উপরভাগে অন্তত ছয় ইঞ্চি পরিমাণ স্থান শূন্যে রাখতেন তাহলে এ রচনাটি বোধ হয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠত। তাহলেও এ-শিল্পীর প্রশংসা করি। এহেন মাধ্যমে এই জাতীয় কাজ সুপরিচিত কোনও শিল্পীর প্রদর্শনীতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। চট মাধ্যমে তৈরি রচনাগুলির মধ্যেও চিন্তাধারা ও স্থান ব্যবস্থাপনার পরিচয় পাই (কম্পোজিশন ১ ও ৩)।

✻

শিল্পী অনিল বসুরায় ছবি, ড্রয়িং ও গ্রাফিকের মোট ৩১খানি নিদর্শন পেশ করেন। এ শিল্পীর অধিকাংশ রচনাই তেলরঙে আঁকা—রীতিও রিয়ালিস্টিক। প্রদর্শনীতে স্কেচ, প্রতিকৃতি, স্টিল লাইফ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের নিদর্শন ছিল এবং দুঃখের বিষয় অধিকাংশই সাধারণ মানের। তবে কয়েকটি প্রশংসার যোগ্য—যেমন ডক কর্নার ও রেল স্টেশন। বিশেষ করে শেষোক্ত রচনায় রাত্রির স্বল্পালোকিত রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরম ও যাত্রীদলের ছবি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। শিল্পীর কয়েকটি ন্যুড ড্রয়িং অবশ্য ভাল (২৮ ও ২৫)। এই সঙ্গে তেলরঙে আঁকা ন্যুডের-ও (৬) নাম করা যায়। আধুনিক রচনা হিসাবে এটি চোখে পড়ে, তবে দুঃখের বিষয় ছবিখানির উপরঅংশ সুঅঙ্কিত নয়।

✻

শিল্পী সুধাংশু দাশ দিল্লী সরকা উকিল আর্ট স্কুল থেকে শিক্ষালাভ করে কলিকাতায় সরকারী আর্ট কলেজে ভর্তি হন ও শিক্ষা সমাপ্ত করে ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে গবেষণা করার জন্য ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করেন। এই তরুণ শিল্পী ১০খানি ছবি ও কয়েকটি স্কেচ পেশ করেন।

এ শিল্পীর অধিকাংশ রচনা প্রথাগত রীতিতে আঁকা, সুতরাং দর্শকদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এগুলিকে যুগোপযোগী বলে মনে করেন নি। কিন্তু বিষয়বস্তু লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে শিল্পী চিত্রকলার এক বিশেষ ধারার প্রতি অনুরক্ত এবং অলংকারগুণের পক্ষপাতী। অনাবশ্যক ও অহেতুকভাবে আধুনিকপন্থী রচনার সৃষ্টি করে ইনি আধুনিক পর্যায়ে পড়তে চাননি—সুতরাং তাঁর নিজস্ব মতবাদের জন্য তাঁর প্রশংসা করি। শিল্পীর কয়েকটি ছবি পাহাড়ী চিত্রকলার পর্যায়ে পড়ে এবং সে হিসাবে শিল্পীকে ক্লাসিকধর্মী বলা চলে। সূক্ষ্ম রেখাসৌষ্ঠব, তুলিচালনা ও উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার প্রণালী দেখে রঙীন জলছবির মত মিনিয়েচার মালার কথা মনে পড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে 'রূপকথা' উল্লেখযোগ্য। রাক্ষসপুরী থেকে বন্দী রাজকুমারীকে উদ্ধার করে রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে মেঘমালার মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছেন—এই চিরন্তন রূপকথাটি শিল্পী রেখা, রঙ ও তুলি সহযোগে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মুখ্যত অলংকারপ্রীতিই এই শিল্পীর বৈশিষ্ট্য এবং এঁর কয়েকটি ছবি সত্যই গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে উপযোগী। অপরাপর ছবির মধ্যে অশ্বমেধ ও গেম অব [illegible] উল্লেখযোগ্য। রিয়ালিস্টিক রীতিতে আঁকা শিল্পীর কয়েকটি স্কেচ, বিশেষ করে হনুমান সত্যই সুন্দর।

চিত্রপ্রিয়

সর্দি-কাশি থেকে সত্যিকার উপশম পেতে হ'লে

সিরোলিন 'রোশ' খান

সর্দি-কাশি কখনো অবহেলা করবেন না—নিরাপদে, তাড়াতাড়ি সত্যিকারের উপশমের জন্যে সিরোলিন খান। সিরোলিন যে কেবল আপনার কাশি বন্ধ করে তা নয়—যে সব অনিষ্টকর জীবাণুর দরুণ আপনার কাশি হয়, সেগুলিকেও ধ্বংস করে। সিরোলিন দ্রুত ও আরামের সঙ্গে গলার কষ্ট সারায়, শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে সাহায্য করে ও দুর্দমনীয় কাশিও আরাম করে। নিরাপদ, উপকারী এবং খেতে সুস্বাদু ব'লে সিরোলিন বাড়ীশুদ্ধ সকলের কাছেই প্রিয়। ছেলেমেয়েদের তো কথাই-নেই !

বাড়ীতে হাতের কাছেই সিরোলিন রাখতে ভুলবেন না

'রোশ'-এর তৈরী • একমাত্র পরিবেশক : ভলটাস লিমিটেড

লাগলো প্রসাদ পাবার জন্যে। ছোটবেলায় আমরা বলির আগে পাঁঠার দিকে চেয়ে যেমন জিভের জল ফেলতাম, তেমনি লুব্ধ।

—'চৈতন, বাবুকে জাগাও।' বিলাসের নেশাটা একটু বেশি হয়ে গেছে পাঁচমিশেলি খেতে গিয়ে। দু-একটা টান দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে ওকে জাগানো দরকার। বসানো দরকার। চৈতন ছুটে এসে 'বাবা শংকর' বলে একটা হুংকার ছাড়লো এবং দুর্ধর্ষ হাত দুখানি দিয়ে বিলাসকে মালিশ করতে লাগলো মাথায় পিঠে। আমরা ওর চাপড়ের শব্দ শুনে চমকে চমকে উঠছি—বিলাসের জন্যে মায়া হচ্ছে—কিন্তু উপায় নেই, রাত প্রায় একটা বাজে। আর বেশি দেরি করা চলবে না। কাল আপিস আছে।

একটু পর বিলাস হুড়মুড়িয়ে উঠে বসেছে। —'মালিশ করছো, না পকেট মারার ফিকির হারামজাদা!'

চৈতন্য একটু অপ্রস্তুত-হাসি হাসলো: 'বাবু ঘুমোয় নি, বাবু জেগে ছিল।' সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে বললো, 'আমি পকেট মারি নি বলছি বাবা শংকরের দিব্যি। মালিশ করতে করতে এইখানে হাত চলে গেছিল,

দুর্ধর্ষ হাত দুখানি দিয়ে বিলাসকে মালিশ করতে লাগলো

হেঁ হেঁ।' বলে বিলাসের পাছায় একটা আলতো চিমটি কেটে দিল আদর করে। কয়েকটা জোর টান দিয়ে বিলাস সুস্থ হয়েছে একটু। চোখ রগড়ে আমাদের দিকে ফিরে বললো, 'ওঃ, গায়ে ব্যথা করে দিয়েছে মেরে মেরে।' তারপর একটু হেসে—'ব্যাটা একটু হোমো আছে মনে হয়।'

এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা ওকে ক্ষমা করলাম।

সন্ন্যাসী একটু বিরক্ত হয়েছিলেন প্রথমে—যজমানদের কাছে চৈতনের উঞ্ছবৃত্তি ধরা পড়ে গেছে বলে। তিনিও ওকে স্নেহের মতন সাদা ছোট ছোট কয়েকটি এলাচদানা খেতে দিলেন। আমরাও চার আনা পয়সা দিলাম। ও তো গৃহীও না সন্ন্যাসীও না—ও বাউন্ডুলে, ওর কোনো আশ্রয় নেই। আসলে হয়ত ধোঁয়ার মাহাত্ম্য, কিংবা গঙ্গার ধার; ধুনি, সন্ন্যাসী, শ্মশান, ফুরফুরে বাতাস সব মিলিয়ে এমন একটা পরিবেশ, যেখানে রাগ রাখা যায় না। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎহীন মানুষগুলোর বুকের ভেতরের আলো দেখতে পাওয়া যায় হঠাৎ। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে মনে হয়, ওপরের চিক্কণতা ধুয়ে মুছে এই বুঝি উন্মোচনের সময়। মনে হয়, পৃথিবীতে কোথাও কোনো পাপ নেই; গঙ্গার জল ও বাতাস, জ্বলন্ত মৃত-দেহগুলি থেকে বেরিয়ে আসা চন্দনের গন্ধ এবং সন্ন্যাসী ও তার ভৃত্যের স্বচ্ছ হাসি সব সময় শ্মশানটিকে শুদ্ধ করে রেখেছে। এই বিচিত্র গন্ধ হয়ত ঈশ্বরের শরীর থেকে নির্গত, না হলে, জায়গাটি বিরক্ত ও মৃতদের এত আকর্ষণ করে কেন?

...বেশ রাত হয়েছে। বাড়ি ফেরা দরকার। খাঁচায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না অথচ, মনে হচ্ছে এখানেই স্তম্ভিত হয়ে যাই। ল্যাম্প-পোস্টের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুর্লভ শূন্যতা দেখি সারা রাত ধরে। খই ছড়াতে ছড়াতে যে-সব রাজপুরুষেরা আসছেন, তাঁদের অভিবাদন করি।

পাৎলুনের ধুলো ঝেড়ে তবু উঠে দাঁড়ালাম আমরা। —'বাবুরা চললে? বাবুরা বাড়ি যাচ্ছ?' চৈতন্য দাঁত বার করে হাসছে।.....চৈতন্য আমাদের পিছু পিছু আসছে গুটিগুটি। হাসিটা বড়ো কাতর লাগলো।...হয়ত গৃহাভিমুখী কয়েকজনের হাঁটা দেখে ওর বাড়ির কথা মনে পড়েছে হঠাৎ। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে। এত উদার উন্মুক্ত স্বাধীনতা চার-পাঁচ বছর ভোগ করে বাউন্ডুলেটার ডানা ব্যথা করছে। কোনো একটা নোংরা ঘর, টিনের চাল, স্ত্রীর দুর্গন্ধ শরীর প্রভৃতির স্মৃতি ও তাদের জন্যে লোভ ওকে আক্রমণ করেছে হয়ত।

এক ধরনের মন-কেমন ছলছল করছে দেখলাম যেন ওর চোখে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কলো করছো কেন বাবা চৈতন? আবার কী চাও?'

চৈতন দাঁড়ালো একটু। তালব্য-শ'য়ের মতন দাঁড়িয়ে, করমচার মতন লাল লাল চোখ মেড়ে একটু ভয়ে ভয়ে বললো, 'এমনি।' তারপর একটু দম নিয়ে যেন—'তোমরা তো বাড়ি যাচ্ছ। আমায় দু আনা পয়সা দিয়ে যাও না। জিলিপি খাবো।'

আশ্রয়-টাক্সি দিয়ে আমরা ট্যাক্সি ধরলাম।

হঠাৎ সঙ্গীন মুহূর্তে টর্চের দরকার হয়ে পড়ে

'এভারেডী' টর্চ রোজই আপনার কাজে লাগবে

ইউনিয়ন কারবাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড

বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার

১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য প্রদত্ত কোনো প্রকল্পের সংগে যুক্ত নয় এরকম ৯০ কোটি ডলার সাহায্যের মাত্র একের তিন ভাগ এ-বছর জুন পর্যন্ত ভারত কাজে লাগাতে পেরেছে। প্রতিশ্রুত সাহায্যকে দু'পক্ষের সম্মতি অনুযায়ী চুক্তিতে পরিণত করতে সময় লাগায় বৈদেশিক সাহায্যের দ্রুত ব্যবহার সম্ভব হয়নি। প্রথমে পাকিস্তানের সংগে সংঘর্ষ এবং পরে আর্থিক কাজকর্মের শিথিল অবস্থার দরুন ভারতের বৈষয়িক উদ্যোগ শ্লথ হয়ে পড়ে। নব-গঠিত পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক যোজনা প্রণয়নের কাজ স্থগিত রেখে ১৯৬৮-৬৯ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা রচনায় মনোনিবেশ করছে।

আমদানির অসুবিধা

প্রকল্পের সংগে যুক্ত নয় এরকম সাহায্য পুরোপুরি ব্যবহারের পথে একটা বাধা হল, মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পর আমদানিলব্ধ উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি। অনেক ক্ষেত্রে ঐ উচ্চ দামের উপকরণ উৎপাদনের কাজে লাগালে উৎপন্ন দ্রব্য অতিমাত্রায় ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। এখানে উল্লেখ্য, টাকার মূল্য হ্রাসের সময় যুক্তি দেখানো হয়েছিল, আমদানিজাত সামগ্রী ভারতের বাজারে আগে যে সুবিধা ভোগ করতো তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিনিময় হার পরিবর্তন করা হল। বিলাস-ব্যসনের ভোগসামগ্রী ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ওই যুক্তি আজ অকাট্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া, আমদানিজাত উপকরণ অথবা কলকব্জার উপর অনেক ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়।

অবাধ আমদানির আরেকটি প্রতিবন্ধক হল ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় কর্জের ব্যয় বৃদ্ধি (ব্যাংক হতে কর্জের পরিমাণ বেড়ে গেছে মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পর থেকে)। এই দিকে দৃষ্টি রেখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক সম্প্রতি তার টাকাকড়ি-সংক্রান্ত নীতির কড়াকড়ি খানিকটা শিথিল করেছে। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করে এমন বহু কোম্পানি প্রতি বছর কর্জ শোধের জন্য আবশ্যক অধিক পরিমাণে ভারতীয় টাকা যোগাড় করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

আভ্যন্তরিক অর্থসংগতির মতোই বৈদেশিক সাহায্যের একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনাকালে ভারত বৈদেশিক সাহায্যের যথাক্রমে শতকরা ৫২ এবং ৬৪ ভাগ ব্যবহার করতে পেরেছে (এই হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী আইন ৪৮০-র অধীন সামগ্রীর আকারে সাহায্য বাদ দেওয়া হয়েছে)।

১৯৬৫ সালেও ভারত বার্ষিক যে হারে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যেত তার সমান গতিতে সেই সাহায্য কাজে লাগিয়েছে। এ বছর পুরো ৬৭৫ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছিল ভারতের আমদানি পরিকল্পনার জন্য। চলতি প্রয়োজনের জন্য আমদানির অনুমোদিত পরিমাণ এবছর এবং গত বছর প্রায় একই স্তরে রাখা হয়েছে। পরিহাসের কথা, একদিকে আমাদের দেশের অতীতে গৃহীত কর্জ বাবত মূলধন পরিশোধ এবং সুদদানের বোঝা বেড়ে চলেছে, অন্য দিকে সেই ঋণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অব্যবহৃত রয়েছে। তৃতীয় যোজনার শেষে শক্তি, ইস্পাত, বন্দর ও কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশে সাহায্যের শতকরা ৫০ ভাগেরও কম কাজে লাগানো হয়েছে। স্পষ্টত, বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের হার সন্তোষজনক নয়। এমনতরো অবস্থায় সমৃদ্ধ (উত্তমর্ণ) দেশগুলি স্বভাবতই যুক্তি দেখাতে পারে যে, বড়ো বহরে বৈদেশিক সাহায্য কাজে লাগাবার ক্ষমতা ভারতের বর্তমানে নেই।

ঋণ শোধের বোঝা

অতীতে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বোঝা আজ উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। তৃতীয় যোজনার শেষ বছরে কর্জ শোধ ওই বছরের মোট বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৩০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। (টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের পর ভারতের কর্জশোধের বোঝা গেছে বেড়ে।) ১৯৬৭ সালের ৩১ মার্চ ভারতের মোট বৈদেশিক ঋণ ছিল ৪,৭৯৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩,০৩৩ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রার আকারে শোধ করতে হবে। যে সব প্রকল্পের জন্য ঋণ নেওয়া হয়, সেগুলি যাতে সময়মতো উৎপাদনক্ষম হয় এবং দেয় মূলধন এবং সুদ পরিশোধে সাহায্য করে, তা দেখতে হবে।

অতীতে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার জন্য ভারত যে অনুরোধ করেছে সে সম্বন্ধে সাহায্যকারী দেশগুলির সংঘ কি সিদ্ধান্ত নেবে তা এখনো অনিশ্চিত। আশ্বাসের কথা, এবছর ব্রিটেনকে পরিশোধ্য ২২·১ কোটি টাকা কর্জের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কানাডাকে দেয় ৯০ লক্ষ টাকা ঋণ একেবারে বাতিল করা হয়েছে।

সমৃদ্ধ দেশগুলো অনগ্রসর দেশগুলোকে কোন্ বহরে ঋণ দেবে তা এখন নির্ভর করবে প্রাপক দেশসমূহের মূলধন কাজে লাগানোর ক্ষমতা বা আর্থিক উদ্যোগের সাফল্যের উপর—পরিকল্পনায় নিহিত সদিচ্ছামূলক সংকল্প বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর নয়। গোড়ার দিকে কর্জ তেমন সুবিধাজনক কড়ারে নেওয়া হয়নি বলে ঋণ শোধের বোঝা এত ভারি হয়েছে। বৈষয়িক উন্নয়ন হতে এবং ঋণ প্রত্যর্পণ করতে যে সময় লাগে সেকথা আগে ভালো করে ভেবে দেখা হয়নি। উত্তমর্ণ দেশগুলি এখন কর্জশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারে; বিকল্পে, পরিশোধ্য পুরানো ঋণের জায়গায় যদি নতুন করে কর্জ দেবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শর্তগুলি সম্ভবত ভারতের অনুকূল হবে।

প্রকল্পের সংগে যুক্ত সাহায্য

এখন সরকারকে দেখাতে হবে যে, আর্থিক ব্যবস্থার যে সব অংশে কাজকর্ম শিথিল হয়ে পড়েছে সেগুলিকে উজ্জীবিত করতে বৈদেশিক সাহায্য বিচক্ষণতার সংগে ব্যবহার করা হচ্ছে। পর পর দুটো খরার বছর ভারত প্রকল্পের সংগে যুক্ত নয় এরকম বৈদেশিক সাহায্য বেশ কিছু পেয়েছে। এবার ফসল ভালো হয়েছে, আমদানির জন্য অনুমতিপত্র উদারভাবে দেওয়া হচ্ছে ঃ সামনের বছর শিল্প উৎপাদনের সম্প্রসারণ আশা করা যায়। সেই সংগে, দেশের রপ্তানির অবস্থার উন্নতি ঘটবে মনে হয়। এবম্প্রকার কারণে আগামী বছর ভারত প্রত্যাশিত বৈদেশিক সাহায্যের একটা বড়ো অংশ প্রকল্পের সংগে বাঁধা সাহায্যের আকারে পাবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা বন্দরের উপর চাপ কমাবার উদ্দেশ্যে হলদিয়ায় যে নতুন উপবন্দর তৈরি হচ্ছে, সেখানে ২৫ লক্ষ টন ক্ষমতার একটি তৈল শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভারত ফ্রান্স ও রুমানিয়ার সংগে একটা ব্যবসায়িক লেনদেনে সম্মত হয়েছে। প্রধান শোধনাগার

স্থাপনে ফ্রান্স ৭০ লক্ষ ডলার অর্থসাহায্য করবে; বিনিময়ে ভারত তার প্রয়োজনের শতকরা ৫০ ভাগ অশোধিত তৈল কিনবে পারস্য উপসাগরীয় ফরাসী পেট্রল কোম্পানি থেকে। অন্য দিকে, রুমানিয়া কর্জ দেবে জ্বালানি তৈল, শিলাজতু এবং সংঘর্ষ হ্রাস-কর তৈলের বন্দোবস্ত গড়ে তোলার জন্য। শোধনাগারের সমস্ত মালিকানা স্বত্ব ভারত সরকারের—সরকারই সব স্থানীয় খরচ বহন করবে।

দেখা যাচ্ছে, হলদিয়ায় পশ্চিম য়ুরোপের একটি এবং পূর্ব য়ুরোপের অন্য একটি দেশ এই প্রথম একসঙ্গে সহযোগিতা করছে। বর্তমান দশকের গোড়ায় রুমানিয়ানরা আসামে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি শোধনাগার নির্মাণে সাহায্য করেছিল। স্পষ্টত, হলদিয়ার বৃহত্তর প্রকল্পের জন্য ফরাসী কারিগরী-বিদ্যার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছে। তাছাড়া, এই প্রথম পশ্চিমের একটি তৈল কোম্পানি মালিকানা, পরিচালনা-ক্ষমতা, অথবা অশোধিত তৈল যোগানের একচেটিয়া অধিকার দাবি না করে সহায়তা করতে রাজী হয়েছে।

—শান্তিকুমার ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগ প্রসঙ্গে বিশ্বু খুড়ো বলিলেন—"ধান কাটা শুরু হয়ে গিয়েছে, লেভি আদায়ের প্রস্তুতি প্রায়-সম্পূর্ণ এমন সময় অকস্মাৎ তাঁর পদত্যাগে আমরা এবার

আর 'এ গড্ডম্যান গোজ' বলতে পারলাম না, বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ার কথাটাই আমাদের মনে পড়ল।"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী ইন্দোরে উপস্থিত হইয়া নাকি বলিয়াছেন, রাজ্যে সংকটের মূলে শ্রীকবির, তিনিই নাটের গুরু। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"শ্রীকবির কী বলেছেন জানতে পারিনি, তবে অনুমান করছি তিনি গান ধরেছেন—'কবির বলে শোন শোন শোন, ভাব গুরুর শ্রীচরণ, ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।'"

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য মন্ত্রীদের এবং বিরোধী দলের অনেকের দিল্লী গমনকে জনৈক সহযোগী নাটকের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু নাটকই যদি হয় তবে সেটা খুব উচ্চাঙ্গের হলেও দিল্লীতে অনুরাগী শ্রোতার অভাব হবে, বাংলায় নাটক কি-না তাই!"

গত কদিন ধরিয়া হাজার হাজার মানুষ রাইটার্স বিলডিংস-এর সম্মুখে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছে পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য। অনুরূপ একটি অপেক্ষমান জনতাকে লক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী নাকি বলিয়াছেন,—আপনারা কি কোন কাজ করতে দেবেন না, রোজ রোজ এখানে আসবেন, আপনারা পেয়েছেন কী। সহযাত্রী সংক্ষেপে বলিলেন—"মামার বাড়ি!!"

একটি সংবাদে বলা হইয়াছে, মালিক যদি না-মিলে তাহা হইলে রেল শেডে জমা ডাল বাজেয়াপ্ত হইবে।—"হলে এবং তারপর বণ্টন হলে আমাদের পরম আনন্দ হবে। কিন্তু আমাদের ভয়,

'সরকার কা মাল, দরিয়ামে ডাল' বলে যে একটি বিকল্প কর্মনীতি আছে সেটি গৃহীত হলেই যে ডালের গঙ্গা যাত্রা"— বলে আমাদের শ্যামলাল।

এক সংবাদে প্রকাশ, পৌর কথা প্রচারের জন্য আকাশবাণীর স্থানীয় সূচীতে মেয়রের জন্য সপ্তাহে অন্তত আধঘণ্টা সময় বরাদ্দ করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"অপূর্ব, চমৎকার। তবে আমাদের একটা নিবেদন আছে,—এতটাই যখন হল তখন প্রচারসূচীটাকে সংগীত সম্বলিত করে দিলে বোধ হয় খুব জুৎসই হয়!!"

দিল্লীতে বিশ্ব মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী যে-আটজন তুরস্ক হইতে আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে সংবাদ-পরিবেশক আধমণি কৈলাশের অনুকরণে 'এক টনি কৈলাশ' বলিয়াছেন, কারণ

তাঁহাদের সঙ্গে খাদ্য, পানীয়, ধূমপানের যে-দ্রব্যসামগ্রী আসিয়াছে তার ওজন নাকি এক টন। সহযাত্রী পূর্ববঙ্গের একটি প্রায়-অনুক্ত রসিকতার অনুকরণে সংক্ষেপে বলিলেন—"মার কৈলাশ"!!

মার্কিন সাংবাদিক ভিনসেণ্ট শীয়ান, যিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুরাগী ছিলেন—নাকি ভারতীয় ভিড়ের একটা আধ্যাত্মিক পরিচয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই যে ভারতের হাজার হাজার লোক একজন নেতাকে দেখিবার জন্য ভিড় করে তাহা একটি আধ্যাত্মিক "দর্শন" অনুষ্ঠান।—"হয়ত তাই। কিন্তু শ্রীশীয়ান চিত্রতারকা দর্শনের ভিড় বা ফুটবল মাঠের ভিড় দেখেন নি। 'দর্শন' অনুষ্ঠান সেখানে 'বিগ্-গান' অর্থাৎ কাঁদানে গ্যাস অনুষ্ঠানে পরিণত হয় আর ছ'নম্বর রুটের বাসের ভিড় দেখলে হয়ত বলতেন—বাবা দর্শন, তোমার ধনেপুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক,

আমাকে আর তোমার দলে টেনো না"—বলেন সহযাত্রী।

জনৈক ইংরাজ নাকি সাত হাজার টাকায় একটি ফরাসী পায়রা ক্রয় করিয়াছেন। এই সংবাদে শুনিলাম, পিজিয়ন শব্দটার অর্থ নাকি রূপবতী তরুণী। আগে শুনিলাম, নোয়ার বজরায় নূতন দিনের খবর যে-পাখিটি বহন করিয়া

আনিয়াছিল, সে "ডাভ" নামে বর্ণিত হইলেও আসলে সে পায়রা।—"সাত হাজার টাকা একটা পায়রা কিনতে যিনি খরচ করেছেন তিনি পিজিয়নের কোন্ অর্থটি গ্রহণ করেছেন—রূপসী তরুণী না, ঘুঘু বলেন সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম, পুনার মেয়র কোন এক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে গিয়া মেয়রের জন্য নির্দিষ্ট আসনে আসন গ্রহণ করেন নাই এবং গুমোট গরমের দোহাই পাড়িয়া মেয়রের গাউনটিও পরেন নাই। শ্যামলাল বলিল—"এটা এমন-কিছু নূতন নয়। নিটিং কা কাপড়া ছেড়ে দিয়েও অনেক কংগ্রেসী বহালতবিয়তে বেঁচে আছেন!!"

অভিযোগে শুনিলাম, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পুরস্কার প্রাপ্তির পর উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বিশু খুড়ো বলিলেন—"সাহিত্য আমাদের বড় একটা আসে-টাসে না। কিন্তু তবু বলব, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের দোষ কি, মন্ত্রিত্ব-পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে কেউ কি পুরস্কার প্রাপ্তির পর—না বাবা, বলব না!!"

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকট সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাকে লিখিতপত্রের উত্তরে শ্রীমতী ইন্দিরা নাকি জানাইয়াছেন যে, তিনি খাদ্য সংকট সম্বন্ধে অবহিত আছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"তবে? আমরা শুধু শুধু নেই, নেই, বলে হাহাকার করছি!!"

দিনটা ছিল অক্টোবরের আট তারিখ। সকাল আটটার কাছাকাছি পালাম বন্দরে এয়ার ইণ্ডিয়ার তরফে আমাদের জানানো হল যে, ৫১৫ নম্বর ফ্লাইটের যাত্রীরা এখন অপেক্ষমান হাওয়াই জাহাজে গিয়ে বসতে পারেন, একটু হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচলাম। আর ৮-৩০ মিনিটে যখন সত্যি সত্যি বোইং-৭০৭ প্রচণ্ড হুংকার ছেড়ে দৌড়াতে লাগল একশো' মাইল বেগে, আর মিনিট দু'-তিনে উঠে গেল আকাশে, তখন হাঁপটা ভালভাবে ছাড়লাম।

আমার মতো হয়তো সব যাত্রীদেরই অমনি মনে হয়েছিল। বিদেশ যাত্রার পেছনে এতো কাঠখড় পোড়াতে হয়, এতো দৌড়া-দৌড়ি করতে হয় যে, ভেতরে যেন একটা হেভো টেনশান জমা হতে থাকে। আকাশে না-ওঠা অবধি তার বিরাম নেই। পাসপোর্ট, টাকাপয়সা, বৈদেশিক মুদ্রার অনুমতি, কলেরার ইনজেকশন, টিকে, গোছগাছ ইত্যাদিতে কাঁচা চুল পেকে যায়, পাকা চুল ঝরতে আরম্ভ করে।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি ভারত সরকারের তথ্য-বেতার মন্ত্রণালয় থেকে সংবাদপত্রাদির প্রতিনিধিদের জানানো হল যে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মস্কো হয়ে যাচ্ছেন পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি সমাজ-তান্ত্রিক দেশে (পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া) এবং মিশরের রাজধানী কায়রোতে। নিজের খরচে যাঁরা যাঁরা যেতে চান প্রধানমন্ত্রীর এই সরকারী ভ্রমণ-রিপোর্ট করতে, তাঁরা যেন অবিলম্বে নাম পাঠান। প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েট মনস্থির করতে অনেক সময় নিল; সুতরাং আমরা পেলাম অল্পদিনের নোটিস। এবং তার জন্যে কী যে অসুবিধে হয়, উপরতলার সরকারী কর্মচারীরা তার জন্যে কেয়ার করেন না।

ধারণা ছিল আমার পাসপোর্ট ঠিকই আছে, এই বছরের নভেম্বর অবধি বলবৎ। খুলে চক্ষুস্থির। মেয়াদ ওটার ফুরিয়ে গেছে চার মাস আগে। প্রথম কাজ প্রথম, অর্থাৎ পাসপোর্ট ঠিকঠাক করা। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো বলল, কিছু ভেবো না, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি। সব্বার পাসপোর্ট, না-থাকলে কাগজপত্র ফরম ভরে, হ্যাঁ-হ্যাঁ কয়েকটা ঘরে ফটো নিশ্চয় লাগবে—এই সব দিয়ে যান। পরোয়া মৎ করিয়ে।"

পালামে বিদায় নিচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী ছোট্ট একটি মেয়ের কাছ থেকে

পরোয়া না হয় মৎ করলাম, কিন্তু সময় থাকতে হবে তো?

মনে পড়ল, ফটো তো নেই। তুলতে হবে আবার? কখন দেবে কে জানে? উপায় কী? জানাশোনা একজনের স্টুডিয়োতে গিয়ে বসলাম। তারা যেভাবে যে যন্ত্র নিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর ফোকাস মারতে লাগল আমার উপর, সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে, একটি মাথার উপরে—মনে হল যেন ফিল্মস্টার হয়ে গেছি। এদিকে চাও, ওদিকে তাকাও, মাথা তোলো কি নামাও, ঘেমে গেলাম।

"দয়া করে যে-কোনো ছবি তুলে দিন, একটা হলেই হলো। কোনো ভাবী-শ্বশুরের কাছে তার কন্যার মতামতের জন্যে যাবে না, দোহাই, দেরি করবেন না। বারোটার মধ্যে না-পেলে কেলেংকারি হয়ে যাবে।"

"পরোয়া মৎ করিয়ে (আমার নেই পরোয়া?)। হুজুরের চোখে চশমা আছে কিনা, তাই দেরি হচ্ছে, কাঁচে আলো ঠিকরে চোখ আপনার বিলকুল সফেদ দেখাবে কিনা, তাই। পরোয়া..."। পেয়ে গেলাম বারোটায় ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণ পি-আই-বির কর্মচারী অন্যান্যদের পাসপোর্ট নিয়ে চলে গেছেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী অক্ষুরস্পর্শ প্রয়োজনাতিরিক্ত দাড়ি-গোঁফে আদর জানিয়ে আমাকে আবার শোনালেন "পরোয়া" স্লোগান। খুব আশ্বস্ত হলাম না। পাস-পোর্ট অফিসার মিস্টার সেনগুপ্তকে ফোন করে জানালাম। উনি বললেন, "কিছু ভাববার নেই, একদিনে করে দেব।"

জানেন নিজের কাজ নিজে যতটা পারেন করবেন। তা না হলে ওই আমার মতো চুল পাকাতে হবে। কী কুক্ষণে দিলাম পি-আই-বির হাতে। তাদের বার বার বলে দিলাম, এবং একজন কাগজে টুকেও নিল। কিন্তু আমার পাসপোর্টের শুধু মেয়াদ বাড়ালেই চলবে না। ভিসা ছাপ দেওয়ার যতগুলো পৃষ্ঠা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সনের বিদেশ-ভ্রমণে। সুতরাং আরো একটি পাসপোর্ট "পুস্তিকা" আমারটির সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে।

মিস্টার সেনগুপ্তের কথানুসারে বিকেল সাড়ে চারটায় গিয়ে হাতে পেলাম তৈরি পাসপোর্ট। হায় হরি! ভিসা নেওয়ার পৃষ্ঠা কোথায়? জানালাম। উনি বললেন, "তাই তো! আগে তো কেউ বলেনি? অফিস তো

মস্কো এয়ারপোর্টে কোসিগিন ইন্দিরাকে স্বাগতবাণী জানাচ্ছেন আটই অক্টোবর অপরাহ্নে

এখন ছুটি হয়ে যাবে। যাক্, রেখে যান, কাল সকাল এগারোটায় আসবেন।"

এদিকে পাসপোর্ট না দেখালে বিমানের টিকিট পাওয়া যাবে না। ওদিকে আবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের "পি" ফরম না-হলে টিকিট দেবে না। ইনজেকশন নিতে হবে। ইনজেকশন নিলে জ্বর হবে। আবশ্যকীয় কেনাকাটা আছে। ডাক-তার বিভাগ থেকে বিদেশ থেকে প্রেস টেলিগ্রাম করার অনুমতিপত্র নিতে হবে। জামাকাপড় দিব্যি ছিল ডাইং-ক্লিনিং দোকানে। আনতে হবে। মাথার চুলের কী দোষ, যেখানে মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যেতে চায়!

পরদিন এগারোটায় মিস্টর সেনগুপ্ত একেবারে নতুন একটি পাসপোর্ট হাতে ধরিয়ে দিলেন। তাঁর কর্মতৎপরতার প্রশংসা প্রশংসাও উনি পেয়েছেন, পেয়ে আসছেন। যাক্, মাত্র আর দুদিন সময় হাতে। সেদিন শুক্রবার। পরদিন ব্যাংক বন্ধ বারোটায়। রবিবার সকালে যাত্রা। কিন্তু সব জায়গায় সকলেই বলছে পরোয়া যেন না করি। আর যাই করি, পরোয়া আর করবো না।

চোখ বুজে ইনজেকশন নিলুম। রক্তের ভিতর ঢুকিয়ে দিল একগাদা কী সমস্ত। ফল কী হবে তাও জানা। কিন্তু এক সাংবাদিক বন্ধু বললেন, "আরে ইনজেকশন নিলে কেন? ও ট্র্যাভেল এজেন্সিকে ২০ টাকা দিলেই ওরা সব তৈরি কাগজ দিয়ে দেয়।" জানি, তাও জানি। এও জানি, পোড়া-কপাল আমার দেশে কলেরা আর বসন্ত করতে হয়। শুধু আমার নয়, অন্যদের মহামারি লেগেই আছে। দু'শো কি একশো' বছর আগে হয়তো ইউরোপেও ছিল। তারা ঝেটিয়ে দূর করেছে তাদের দেশ থেকে। আমি কেন নিয়ে যাব সেই বীজাণু? হয়তো আমার কিছুই হবে না, কিন্তু আমি কেন হব বীজাণুপ্রবাহক, ক্যারিয়ার? তাও যেন হল। আরেকজন বন্ধু বললেন , "দ্যাখো, যে-সময়ের ব্যবধানে এই সব ইনজেকশন-টিকে নেওয়া উচিত, তাতো নিচ্ছ না। মস্কো এয়ারপোর্টে খুব সম্ভবত তোমাদের (মানে, আমাকে) আটকে রাখবে চৌদ্দ দিনের জন্যে।" অত্যন্ত আশ্বস্ত হলাম তার বাণীতে, কিন্তু জানালাম যে, তাতেও আমি পরোয়া করব না।

শনিবার সকালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র নিয়ে গেলাম টাকার বদলে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা (পাউণ্ড অথবা ডলার) আর টাকার ট্র্যাভেলারস চেক নিতে। বরাবর আমি যাই আমেরিকান এক্সপ্রেসের ব্যাংকে। এবার কী কুক্ষণে এক বন্ধুর উপদেশে গেলাম নামকরা একটি ইংরাজ ব্যাংকে। হায়! হায়! তাদের ভারতীয় কেরানীবাবু আমাকে আবার দৌড় করালো রিজার্ভ ব্যাংকে। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে ভারতের "রুপি এগ্রিম্যাণ্ট" আছে। অর্থাৎ, আমার রুপির বদলে তারা তাদের দেশের টাকা দেবে, তা আমি নগদ নিই কি চেক নিই। কিন্তু মিশর? হয় ডলার, না-হয় পাউণ্ড (ব্রিটিশ) নিতে হবে।

ব্যাংকের কেরানীবাবু আমাকে জানালেন, "রিজার্ভ ব্যাংক থেকে লিখিয়ে নিয়ে আসুন যে মিশরের জন্যে আপনাকে বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়া হচ্ছে।"

বললাম, "বৈদেশিক ছাড়া দেশী মুদ্রা তো ওখানে চলে না। "রুপি এগ্রিম্যাণ্ট নেই। সুতরাং, হয় ডলার দিন, নয়তো পাউণ্ড।" "সরি, লেখা নেই অনুমতিপত্রে।" আমিও সরি হয়ে আবার গেলাম রিজার্ভ ব্যাংকে ভার্গবমশায়ের কাছে। তিনি উক্ত কেরানী-

প্রধানমন্ত্রীর এই হাসি ছিল সব দেশে

বাব্‌কে স্মরণ করে রেগে আগ্‌ন। কিছ্‌-একটা লিখে দিলেন।

নিজস্ব অভিজ্ঞতা। বিদেশে আরো অনেক-বার গেছি। যেখানে বৈদেশিক মুদ্রার ট্র্যাভলারস চেক নিতে লাগতো কুড়ি-পঁচিশ মিনিট, আমার সেখানে লাগলো ইংরাজ ব্যাঙ্কের দৌলতে পুরো আড়াই ঘণ্টা। ততক্ষণ সত্যি সত্যি গায়ে জ্বর। ইনজেক-শনের ফল। রাতে আরো জ্বর। কলেরার মত বীজাণু (না জীবাণু!) হয়তো রক্তে কিলবিল করছে, আমার স্বাস্থ্য-সংরক্ষক লাল করপ্যাসলের সঙ্গে করছে যুদ্ধ, আর আমার গায়ে-হাতে ব্যথা, মাথা ঘুরছে, তবু যেতে হবে গাড়ি চালিয়ে আরো অনেক জায়গায়, অনেক কাজ বাকি।

ওদিকে বিকেলে ডেকেছেন মিস্টর হাক্‌সার, প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব। যাঁরা সঙ্গে যাবেন, তাঁদের জন্যে। কেন যাচ্ছেন, কী তার গুরুত্ব, কী ফল হতে পারে এই পরিদর্শনের পরে। ইত্যাদি যাকে আমরা বলে থাকি ব্যাক্‌গ্রাউন্ড, পরিপ্রেক্ষিত। যেতেই হবে, গায়ে জ্বর থাক্‌ক কি না থাকুক।

আমি জানি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে, ডান হাতের ওই ব্যথা নিয়ে বিদেশের এয়ার-পোর্টে আর হোটেলে নিয়ে যেতে হবে নিজের স্যুটকেস ইত্যাদি। 'এই কুলি ইধার আও', আজ্ঞে না, ও-সব চলে না, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক দেশে। টাকা ফেলুন, পাবেন পাশ্চাত্ত্য দেশে কুলি-বাবুকে, কিন্তু সমাজ-তান্ত্রিক দেশে নয়।

একটি ওভার-নাইট ব্যাগ কাঁধে। একটি টাইপরাইটার, একটি ওভারকোট। তার উপর একটি স্যুটকেস। চমৎকার! তবে অনেক জায়গায় বলেছে : "মে আই হেলপ্‌ ইউ?" ভাবলাম, বেঁচে গেলাম। চেয়ে দেখি একজন মহিলা, যিনি আমাদের (পরে জানলাম) ইন্‌টারপ্রেটার। জেগে গেল পুরুষত্ব। "না, না, কিছু না, মোটেই ভারি নয়। কিন্তু অনেক ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।" ততক্ষণ হাঁপাচ্ছি, আর হাঁপানি মিশিয়ে বলছি, 'মেয়ারসি বক্যু, মেয়ারসি'। কে যেন কোথায় হাসল।

পরোয়া মৎ করো। করলাম না। তার আগে গিয়েছিলাম কাস্‌টমস বিভাগের ভিতর দিয়ে, পালামে। কী সে হাওয়াই বন্দর! হায় ভগবান!! আমরা সাত-আটজন সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। বিদেশ-যাত্রায়। কিন্তু যাই বলুন, পরোয়া করিনি।

তাই শুরু এই ডায়েরি। দেশের পাঠকরা কয়েক সপ্তাহ তাই পান নি এই ডায়েরি, আমি বাইরে ছিলাম বলে। ভাবলাম, দেশে ফিরে বিদেশের ডায়েরি, একটু অভিজ্ঞতা, সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা, যেখানে আগে কোনোদিন যাইনি। তাই এটা দিল্লির ডায়েরির ভিতরে। প্রথম স্টপ্‌ মস্কো। (আরো চলবে)।

—খগেন দে সরকার

কিন্তু হকিন্স বাঁচায় আরো, আরো অনেক কিছু

প্রেশার কুকার কেনার আগে, যাচাই করে নিন (৫ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত) হকিন্স প্রেশার কুকার, অন্যান্য প্রেশার কুকারের তুলনায় অসাধারণ কেন? এর বৈশিষ্ট্য কি?

হকিন্স প্রেশার কুকার, অন্যান্য প্রেশার কুকারের চেয়ে স্বতন্ত্র। এর গঠন সুন্দর ও আধুনিক ব'লে হকিন্স আপনার রান্নাঘরে এক নবীন দীপ্তি, এক অনবদ্য শোভা নিয়ে আসবে।

হকিন্সে, খরচ অনেক কম পড়ে, এর দরুণ ইন্ধনের খরচ কমে যায় ৮০%, বারবার পার্টস বদলাবার ঝঞ্ঝাটও হবে না। গ্যাসেই হোক বা বিদ্যুতে, স্টোভ কিম্বা উনুনে-যে কোন অবস্থায় সুন্দর রান্না করা যায়। আর খাবারের স্বাদও হয় ভারী সুন্দর। একটুও ভিটামিন নষ্ট হয় না।

তাছাড়া, হকিন্স এর দরুণ খাবার নষ্ট হয় না; হঠাৎ অতিথি এসে পড়লেও চিন্তা করার কিছু নেই।

Hawkins

প্রেশার কুকার

PCA এর উৎপাদন

প্রস্তুতকারক:
প্রেশার কুকার্স অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাঃ লিঃ
পোঃ আঃ বক্স নং ১৩৪২ বোম্বাই—১

বিক্রেতা:
কিলিক, নিক্সন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
কিলিকস্ ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেজ ডিভিশন,
৩১, মর্জবান রোড, বোম্বাই—১

ওঁকে একটি হকিন্স দিয়ে দেখুন…এই উপহার উনি সারাজীবন মনে রাখবেন

পূর্বভারতের আঞ্চলিক ডিস্ট্রিবিউটর
আর চম্পকলাল অ্যাণ্ড কোং, ২৫, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

সাম্যবাদ ও প্রগতির পথ

আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্তের দীর্ঘ পত্রের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতিপূর্বে একবার সমালোচকদের উত্তরে আমার বক্তব্য জানিয়েছি। এবার আলোচনা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করছি; আশা করি ডঃ দাশগুপ্ত ক্ষুন্ন হবেন না।

ডঃ দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ "দাঁড়িপাল্লার দুপাশে ঠিকমত ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদকে বসালেই আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না—দুই পাল্লার ভারের পার্থক্যটাও হিসাব করতে হবে।" এ বিষয়ে আমার দু'টি ক্ষুদ্র মন্তব্য আছে।

ধনতন্ত্র ও সোভিয়েত ব্যবস্থা এ দুয়ের ভিতর একটিকেই আমাদের বেছে নিতে হবে, চিন্তার এই গোঁড়ামি ত্যাগ করা আবশ্যক। পথ দুটি নয়, বহু। বিভিন্ন ব্যবস্থার দোষ-গুণ বিচার ক'রে আমাদের নিজস্ব পথ তৈরী করে নিতে হবে। ভারের পার্থক্য হিসাব করার দাবীর পিছনে চিন্তার খানিকটা ভুল আছে।

উপরন্তু হিসাবটা ডঃ দাশগুপ্ত নিজে যেভাবে করেছেন সেটাও সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। পত্রলেখক দেখাতে চেয়েছেন যে চিন্তার স্বাধীনতা মস্কো-পিকিংয়েও আছে; আবার স্বাধীনতার পথে বাধা লণ্ডন-ওয়াশিংটনেও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু "ভারের পার্থক্যের হিসাব"টা কি ঠিক হল? ধনতন্ত্র সম্বন্ধে যতখানি বিরোধী মতবাদ নিয়ে ডঃ দাশগুপ্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েছেন সাম্যবাদ সম্বন্ধে ততখানি বিরোধিতা নিয়ে কেউ কি মস্কো অথবা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ লাভ করবেন? চিন্তার স্বাধীনতা কোথায় বেশী?

পত্রলেখক বলছেন ঃ "দিনের পর দিন ব্যক্তিগত আর্থিক প্রতিষ্ঠার লড়াই সোভিয়েট দেশে গৌণ হয়ে আসছে।" লেনিনী যুগের সঙ্গে তুলনায় এ কথাটা কি ঠিক? চীনা সমালোচকেরা বলছেন যে, সোভিয়েত সমাজ "বুর্জোয়া" বা ধনতান্ত্রিক পথ ধরেছে। অভিযোগটা সম্পূর্ণ সত্য নয়; কিন্তু খানিকটা সত্য বটে। সাম্যবাদী দেশ, সেখানকার আমলাতন্ত্র এবং তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ডঃ দাশগুপ্তের ধারণা যত-না তথ্যে সিদ্ধ তার চেয়ে কল্পনায় স্নিগ্ধ।

পত্রলেখক জানতে চেয়েছেন আমার "সহানুভূতি কোন্ ধরনের সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি"। বিভিন্ন সাম্যবাদীর ভিতর প্রধান পার্থক্য আদর্শ নিয়ে নয়, আদর্শে পৌঁছবার উপায় নিয়ে। সকলেরই আদর্শ সাম্যস্বাধীনতা। অবশ্য স্বাধীনতার অর্থ নিয়েও পার্থক্য সম্ভব।

আদর্শকে আদর্শ ও উপায়কে উপায় বলে চেনা চাই। বিপ্লব, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অথবা তার অবসান, এসবই উপায় হিসাবে বিচার্য, গ্রাহ্য অথবা পরিত্যাজ্য। উদাহরণত যৌথ চাষপ্রথার উল্লেখ করা যেতে পারে। সোভিয়েত দেশে ঐ ব্যবস্থা চাষীর উপর চাপানো হয়েছে অকথ্য অত্যাচারের ভিতর দিয়ে। যুগোস্লাভিয়া চাষীকে স্বেচ্ছায় যৌথ চাষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে দিয়েছে। স্বাধীন ও স্বচ্ছল চাষীই আমাদের লক্ষ্য; যৌথ চাষ ব্যবস্থা উপায় হিসাবে বিবেচ্য অথবা পরিত্যাজ্য। এ ব্যাপারে যুগোস্লাভিয়ার উদাহরণই শ্রেয়।

সর্বোপরি প্রয়োজন দেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার। সোভিয়েত দেশ একাজে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, যেমন হয়েছে জার্মানি ও অন্যান্য দেশ। মার্কসীয় গোঁড়ামি ও-দেশে ধীরে ধীরে দুর্বল হবে, কিন্তু বিজ্ঞানের দান অক্ষয় থাকবে। সেই বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ সোভিয়েত দেশকে আমি স্বাগত জানাই। তার কাছ থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় আছে।

—অম্লান দত্ত

ভাষা সমস্যা

সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখার মধ্যে দিয়ে বাঙালী পাঠক পৃথিবীর অনেক দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছে ও আরো জানবার আশা রাখে। কিন্তু বর্তমান সংখ্যার (৪।১১।৬৭) দেশের পঞ্চতন্ত্রে এক ভাষিত্বের সপক্ষে যেসব বিদেশী নজির তিনি তুলে ধরেছেন, সেগুলি সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ নেই কি?

প্রথমে 'জনপদবাসী অর্ধশিক্ষিত'দের কথাই ধরা যাক। আমাদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাতেই আমরা দেখেছি রোমের হোটেলের পোর্টার ফরাসি বলছে, পশ্চিম বার্লিনের স্বল্পমূল্যের পেনসানবাড়ির মেড ইংরাজি বলছে বা জুরিখের পথচারীরাও কেউ কেউ ইংরাজি বলে বিদেশীকে সাহায্য করছে। মস্কোর ট্যাক্সি ড্রাইভারকেও ভাঙা ভাঙা ইংরাজি বলতে শুনেছি। তাছাড়া প্যারিস প্রভৃতি বড় বড় শহরের বড় বড় দোকানেও লেখা থাকে—We accept American Express travellers' cheques. সে সব দোকানেও কি কেউ ইংরাজি বলেন না? হয়ত এর উত্তর হবে—তারা বলে 'পেটের ধান্দায়'—যেমন আঞ্চলিক ভাষা নীতি (বা দুর্নীতি) প্রবর্তিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারী কাজ পাবার ধান্দায় আমরা হিন্দি শিখতে বাধ্য হব।

এবার শিক্ষিতদের প্রসঙ্গে আসি। এক নরওয়েজিয়ান মহিলা বলেছিলেন তাঁরা মাতৃভাষা ছাড়া ইংরাজি, জার্মান এ দুটি ভাষা শিখেছেন ও বলতে পারেন। রুমানিয়াতে দেখেছি শিক্ষিত লোক মাত্রেই মাতৃভাষা ছাড়া অন্তত একটি বিদেশী ভাষা ভালভাবে বলতে ও পড়তে পারেন। রুমানিয়ার খবরের কাগজের দোকানে এখানকার ইংরাজি কাগজের মতই 'প্রাভদা' ও 'অগনিতক' বিক্রী হয়। আমাদের পরিচয়ের স্বল্প পরিসরেই যদি এতজন বিদেশী ভষা জানা লোক দেখা দিয়ে থাকে, সৈয়দ আলীর মত বহুদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংগে তারা ও তাদের মত আরো সকলে ষড়যন্ত্র করে লুকোচুরি খেলে নি নিশ্চয়।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নজির খুঁজতে যদি বৈদেশিক মুদ্রার এই কড়াকড়ির দিনে ফিনল্যান্ড বা বলিভিয়া-ই যেতে হয়, তাহলে ঘরের পাশের 'ফরেন স্টেট' পূর্ব বাংলাতেই দেখি না না কেন? ওখানে কি সিলেটি বা চট্টগ্রামী যাদের মাতৃভাষা তারা সেই ভাষাতেই পড়াশোনা করে? অহমিয়া বা ওড়িয়া যদি বাংলার থেকে পৃথক হয়, ও দুটি ভাষাকে নিশ্চই বাংলা বলা যায় না। 'লাভুরা পোয়া হেলা হাচ্ছে' বা 'ছয়ছিমায় দিনো কিওর উট্টা ঘট্টো' কি ভাষা তা ক'জন বাঙালী বলতে পারবেন?

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে আমাদের দেশেও ঐ সব ভাষাভাষী যাঁরা আছেন তাঁরাই বা সে ভাষায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন না কেন? সৈয়দ আলীর যুক্তি-অনুসারে ইংরাজি যেমন করে ফারসিকে হটিয়েছে, বাংলা হিন্দি তামিল তেলুগু প্রভৃতি ভাষা তো বটেই, গুরুমুখী, মৈথিলী, সিন্ধী, তুলু, সিলেটি প্রভৃতি ভাষাও কেবলমাত্র অনুবাদের জোরেই সেভাবে ইংরেজিকে হটাবে আশা করতে ভালই লাগে। কিন্তু ইংরাজি যখন ফরাসিকে হটিয়েছিল, তখন যাবতীয় ফরাসি বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ করার প্রয়োজন হয়েছিল কি?

জাপানী 'ক্যানসার'-গবেষণা প্রসঙ্গে আলী সাহেবের লেখা থেকেই বোঝা যায়, ও রোগে 'আপ টু ডেট' হয়ে 'স্পেশ্যালিস্ট' খ্যাতি পেতে হলে ইংরাজি জানা অপরিহার্য। অবশ্য পৃথিবীতে যেমন সকলেরই 'প্রোফেকশনাল' দোভাষীর প্রয়োজন হয় না, তেমনি সকলেই কর্কট রোগ-বিশেষজ্ঞ হবে না। কিন্তু যারা হতে চাইবে কোন অপরাধে তাদের গোড়া মেরে দেওয়া হবে?

ছোটবেলায় মাস্টারমশাই ধিক্কার দিতেন, বিলেতের চাষারাও যে-ভাষায় কথা বলে, তোরা সে-ভাষাটাও জানিস না। আজ শুনছি, ফ্রান্স-জার্মানীর চাষারাও যে-ভাষা জানে না, এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা সে ভাষা শিখেও ভুলবে না কেন? চতুরঙ্গের দামিনীর কথাটাই মনে পড়ে—তোমাদের এক ভক্তরা এক মংলবে এক বন্দোবস্ত করবেন, আরেক ভক্তরা আরেক মংলবে আরেক বন্দোবস্ত করবেন, মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ পঁচিশের ঘুঁটি?

ভূতের পায়ের মতন আমাদের চোখ যদি উল্টো দিকেই রাখা স্থির করি, তাহলে পৃথিবীর তাবৎ দেশের নজির দেবার দরকার কি? আমাদের সমস্যাকে অন্য দেশের মডেলে সমাধান করতে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করাটা কি স্বাধীন চিন্তার পরিচয়? আর নকলই যদি করি, শুধু ভাষা কেন, নকল করার তো অনেক জিনিসই আছে। শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া ঘুরে এসে তাদের শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছেন। ইতিপূর্বেও তিনি সেই উদাহরণ দেখিয়েছিলেন, সৈয়দ আলী 'মেরামত' করার অনুমতি দিয়েছেন বলেই এ কথা তুলছি। সোভিয়েট রাশিয়া তো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাও সমাধান করেছে। সেটা কি আমাদের দেশে হয়েছে বা হবে? সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স বা আমেরিকার তো কুলিমজুর চাষীরাও খবরের কাগজ পড়তে পারে। আমাদের 'স্বাধীন সভ্য' দেশে তা সম্ভব হল না কেন?

শিক্ষামন্ত্রীকে ও তাঁর সঙ্গে 'টায় টায় গলা মিশিয়ে' যিনি দোয়ারকি করছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—উচ্চশিক্ষার মাধ্যমের সমস্যা তো শতকরা ২৪ জনের; বাকি ৭৬ জনের নিরক্ষরতা আরো কত দিন অপেক্ষা করবে? পৃথিবীর কোন সভ্য স্বাধীন দেশের নিরক্ষরতার হার এত বেশি? শিক্ষা যদি সভ্যতার অঙ্গ হয়, তাহলে এই সংখ্যাটাকে চোখের সামনে রেখেও শিক্ষা-মন্ত্রীর এত সভ্যতার আত্মপ্রসাদ কেন?

—অমিতা রায়
কলিকাতা-৬

॥ ২ ॥

গত ৪ঠা নভেম্বর তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পঞ্চতন্ত্র' বিভাগে সৈয়দ মুজতবা আলী যা বলেছেন সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

আলী সাহেব জানিয়েছেন যে, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, তাহলে এটা তিনি নিশ্চয় জানেন যে, বিজ্ঞানশিক্ষা কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না, বর্তমানে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা-সমূহ প্রকাশিত হয়ে থাকে, সার্থক শিক্ষার পক্ষে সেগুলি অত্যাবশ্যক। পাঠ্যপুস্তক-গুলির অনুবাদ সম্ভব হলেও এই পত্রিকা-গুলির অনুবাদের কি ব্যবস্থা হবে? এ সম্পর্কে আলী সাহেব অন্যান্য দেশের যে উদাহরণ দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, ফিনল্যাণ্ডের কথা ঠিক জানিনে কিন্তু বলিভিয়া সমেত প্রায় সমস্ত লাতিন আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার মাধ্যম একটিই এবং তা হলো স্প্যানিশ।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের কথা আমি জানিনে, তবে একটি দেশের কথা জানি—সেটি সোভিয়েত রাশিয়া. সেখানে পাঠ্য-পুস্তক এবং পত্রিকা সমস্তই অনুবাদ করা

হয় (প্রসঙ্গত বলে রাখি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক পত্রিকার শতকরা ৭৫ ভাগই ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়।) এবং এর জন্য তারা যে অর্থ ব্যয় করে, তা আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যয়িত অর্থের প্রায় সমান। আমাদের ক্ষেত্রে তো ব্যয়টা হবে এর ১৪ গুণ কারণ আমাদের অনুবাদ করতে হবে ১৪টি ভাষায়। সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে এ অর্থব্যয় সম্ভব কিন্তু আমাদের পক্ষে সম্ভব কি?

মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার ফলটাও একবার ভেবে দেখা যাক। এর ফলে এক প্রদেশের কোন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর সমস্ত যোগ্যতা সত্ত্বেও তাঁর নিজের প্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও শিক্ষকতার কাজ পাবেন না। অর্থাৎ আজকে শিবসেনা যা করতে চাইছে, ঠিক তাই করা হবে। এছাড়া উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার পথ তো একেবারেই বন্ধ। এর সমাধান হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী যে প্রস্তাব করেছেন, তা আরও হাস্যকর। তিনি বলেছেন যে, একটি অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে ইংরিজী তাদের এত ভালভাবে শিখিয়ে দেওয়া হবে যে, ইংরিজীতে প্রকাশিত যে কোন বিষয় তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। সেটাই যদি সম্ভব হয়, তবে আর ইংরিজী থেকে আঞ্চলিক ভাষায় পরিবর্তনের প্রয়োজন কি?

প্রশ্ন উঠতে পারে তবে কি অনন্তকাল আমাদের ইংরিজীর বোঝা বহন করতে হবে। এ সম্পর্কে আলী সাহেব নিজেই বলেছেন যে, সাতশ' বছরের পুরনো ফারসীকে ভুলতে আমাদের একশ' বছরও লাগেনি। তিনি নিশ্চয় জানেন যে এর জন্য কোন জোর জবরদস্তির দরকার হয় নি। 'একশ' বৎসরের মধ্যে ফারসী ভুলিতে হইবে' —এমন কোন সরকারী বিজ্ঞপ্তিও প্রচারিত হয়নি। কিন্তু তবু আপনা থেকেই ফারসী আমরা ভুলেছি। তেমনি যদি ভোলবার হয়, ইংরিজীও আমরা একদিন আপনা থেকেই ভুলব। কিন্তু তাড়াতাড়ি তাকে জোর করে তাড়াবার এই অপচেষ্টা কেন?

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আলী সাহেব প্রশ্ন করেছেন 'পৃথিবীর কোন স্বাধীন সভ্য দেশে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়'? সবিনয়ে তাঁদের একটি পাল্টা প্রশ্ন করি—ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন্ স্বাধীন সভ্য দেশে ১৪টি ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে?

—রুদ্রজিৎ দাশগুপ্ত
গড়িয়া

ক্রীড়াক্ষেত্রে ভাষার জুলুম

৩ সপ্তাহের (১৭ই কার্তিক, ১৩৭৪) দেশ পত্রিকায় ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রাখাল ভট্টাচার্যের বিবরণী পড়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা জানতে পারলাম। বারাণসীতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের সাঁতার সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে চাই না। কারণ এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ভিন্নতর। রাজনীতির বাইরে যে খেলাধুলোর আসর, সেখানেও হিন্দীভাষার "নাৎসী দৌরাত্ম্য" সম্বন্ধে দু-চারটি কথা না বলে পারছি না। হিন্দীওয়ালাদের ইংরেজীবিদ্বেষ ও স্বভাষার প্রতি উৎকট প্রীতি কারো অজানা নয়। হিন্দীভাষীদের মুখে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, তাঁদের জেহাদ শুধুমাত্র ইংরেজীভাষার ওপর, অন্য প্রাদেশিক ভাষার প্রতি তাঁদের কোন বিদ্বেষ নেই। প্রসঙ্গত বলা যায়, সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলি নিজেদের মধ্যে মিলে মিশে একটি সহৃদয় ঐতিহ্যময় ভারতীয় পরিবেশ গড়ে তুলবে এ আশাই আমরা করেছিলাম। কিন্তু উৎকট হিন্দীপ্রেমীদের নাৎসী দৌরাত্ম্যে তা' কোনদিন সম্ভব হবার নয়। কারণ এদের একমাত্র উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলিকে যেন তেন প্রকারে দাবিয়ে রেখে হিন্দীকে ভারতের একমাত্র রাজভাষায় পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন পন্থাই এরা অবলম্বন করতে পারে। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার ঘোষণায় সামান্য দু-চারটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের প্রতিবাদে একটি ছাত্র জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল (আত্মহত্যার জন্য কিনা সন্দেহ হয়)। এতেও আমার প্রতিবাদ করবার বিশেষ কিছুই ছিল না। কারণ ইংরেজী তথাকথিত বিদেশী ভাষা তার বিরুদ্ধে এরা তো জেহাদ ঘোষণা করবেই। এতে দুঃখ হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু হিন্দী না জানবার অপরাধে ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন জগৎ আইচের প্রতি যেভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, তাতে আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় জাগে। আকাশবাণীর পক্ষ থেকে মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন রিমা দত্তের হিন্দীভাষণ টেপ রেকর্ড করা হয়েছে কিন্তু জগৎ আইচের বাংলা ভাষণ (ইংরেজীর বদলে) রেকর্ড করবার প্রস্তাব অপমানজনকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই কি আমাদের বহুঘোষিত জাতীয় সংহতির স্বরূপ?

—দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-৭

বাংলা গদ্যের প্যারাগ্রাফ

চতুস্ত্রিংশত্তম বর্ষের (২৮-১০-৬৭) "দেশ" পত্রিকার সাহিত্য-সংবাদে সনাতন পাঠকের "বাংলা গদ্যের প্যারাগ্রাফ" শীর্ষক রচনাটির জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। বেশ কিছুদিন যাবৎ এই 'লাইন ভাঙার কারচুপি' চলছে। নামী ও জনপ্রিয় সাহিত্যিকের অনেক বইয়েরই নাম উল্লেখ করা যায়—যা যথাযথ রীতিতে ছাপা হলে বাজারে ক্রয়মূল্য অর্ধেক হয়ে যেতো—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যমূল্য বোধ হয় বৃদ্ধি পেতো কিছুটা। অকারণ (ঠিক অকারণ নয়, ব্যবসায়িক দিকটাই আসল) পুনরুক্তির ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। অনেক কবিতার বইয়ের বেলাতেও একই ধরণের কাণ্ড লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু সে বিষয়ে বোধ হয় উচ্চবাচ্য না করাই সমীচীন—কারণ, তাতে কবিকুলে তীব্র আপত্তি উঠতে পারে। অরসিক আখ্যাপ্রাপ্তিও বিচিত্র নয় সমালোচকের। সেসব কবি কাব্যলক্ষ্মীর বর পান হয়তো—কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় শুধু প্রকাশকের ওপরই সদয়। আর এর অনিবার্য পরিণতি হল পুস্তক ক্রয়ে ব্যয়বৃদ্ধি—অন্তত যাঁরা বই কিনে পড়েন। 'দেশ'-এর মতো প্রভাবশালী ও বহুলপ্রচারিত সাহিত্যপত্রিকায় বিষয়টির আলোচনাই যথেষ্ট প্রতিবাদ বলে মনে করি।

দিলীপনারায়ণ দে
বেহালা, কলিকাতা-৩৪

Pond's
Angel Face

Angel Face

পেঙ্গুইনের গায়ের রং

বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট সংক্রান্ত একটি পত্রিকায় অতিশয় একটি কৌতুক-উদ্দীপনক রচনা দেখালেন এক বন্ধু। রচনাটি পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতনামা পুস্তক প্রকাশ ভবন পেঙ্গুইন সম্পর্কে। ব্যাপারটা জানতে এ বিভাগের পাঠকরাও আগ্রহী হবেন মনে হয়।

পেঙ্গুইন পাবলিশিং-এর পরিচালকদের সভাপতি স্যার অ্যালেন লেন-এর বয়েস এখন ৬৫, কিছুকাল আগে শুনতে পাওয়া গিয়েছিল স্যার অ্যালেন এই কোম্পানিতে তাঁর অংশ বিক্রি করে দেবেন। কিন্তু যে-কোনো লোকের কাছে নয়, সবচেয়ে বেশী টাকা যে দেবে তার কাছে নয়, স্যার অ্যালেন বলেছিলেন, তিনি তাঁর সম্ভাব্য ক্রেতাদের ইণ্টারভিউ নেবেন এবং যে ব্যক্তির সাহিত্যপ্রীতি এবং মানুষের জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে —তাকেই মালিকানা দেবেন—এমনকি উচিত-মূল্যের চেয়ে কম দাম পেলেও। এই কোম্পানিতে স্যার অ্যালেনের অংশ—সব মিলিয়ে ৫৭%, তিনি ওই কোম্পানির প্রত্যক্ষ পরিচালনা-কার্য থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ তিনি মত বদলেছেন, বিক্রি করার ইচ্ছে দূরে থাক, তিনি আবার পেঙ্গুইনের পরিচালনা-ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তার কারণ, যেমন অন্যান্য জায়গায় হয়—কোম্পানি দুর্দশায় পড়লে প্রাক্তন বিশেষজ্ঞের আবার ডাক পড়ে—এক্ষেত্রে কারণটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত, গত কয়েক বছরে পেঙ্গুইন অসম্ভব বেশী জনপ্রিয়তা ও আর্থিক লাভ করেছে—স্যার অ্যালেন সেই কারণেই উদ্বিগ্ন। তাঁর ধারণা, পেঙ্গুইন তার গাম্ভীর্য ও বিশেষ চরিত্র হারিয়ে খেলো বই-এর ব্যবসা শুরু করছে—তিনি তা বন্ধ করতে চান। তাঁর মতে, প্রকাশনার ব্যবসা অন্য পাঁচটা ব্যবসার মতন নয় যে—যে কোনো উপায়ে লাভ করাই বড় কথা। 'পাবলিশিং ইজ আ ভেরি পারসোনাল বিজনেস'—এই তাঁর দৃঢ় ধারণা।

গত সাত বছর ধরে স্যার অ্যালেন পেঙ্গুইনের বই নির্বাচন কিংবা প্রোডাকশান নিয়ে মাথা ঘামান নি—কিছু তরুণ কর্মচারীর ওপর সে ভার ছিল—প্রধান সম্পাদক ছিলেন টনি গডউন। এই সময়ে ব্যবসার লাভ হুহু করে বেড়েছে। এর আগে মোট বই বিক্রির সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ—এখন তা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৮০ লক্ষ। গত বছর লাভ হয় ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউণ্ড—আগেকার বার্ষিক লাভের প্রায় দ্বিগুণ। ব্যবসায়ের এই উন্নতিতে অন্য যে কোনো মালিকের খুশী হয়ে কর্মচারীদের মাইনে বাড়িয়ে দেবার কথা—কিন্তু এ-ক্ষেত্রে স্যার অ্যালেন টনি গডউইনকে বরখাস্ত করেছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ—অতিরিক্ত লাভ করতে গিয়ে পেঙ্গুইনের সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে। এতকালের চেষ্টায় ক্রেতা ও পাঠকদের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, পেঙ্গুইন কখনো খেলো বা বাজে বই ছাপে না, পেঙ্গুইনের যে কোনো বই চোখ বুঁজে কেনা যায়। কিন্তু পাঠকদের এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এখন ভুষি মাল গছানো হচ্ছে। লাভের অংশ কমিয়েও স্যার অ্যালেন পেঙ্গুইনের সেই পুরোনো সম্মান আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চান। বুদ্ধিমান এবং রুচি-সম্পন্ন লোকদের জন্যই শুধু তিনি বই প্রকাশ করতে চান।

লাভ করার জন্য বীটলসদের অন্যতম জন লেননের বই কিংবা লেন ডেটনের 'ফিউনারাল ইন বার্লিন' জাতীয় রচনায় স্যার অ্যালেনের মতে পেঙ্গুইনের আদর্শের পরিপন্থী। স্যার অ্যালেনের আর একটি অভিযোগ, পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য পেঙ্গুইনের বই-এর মলাটে চাকচিক্য আনা হচ্ছে, এমনকি ছবি ছাপা হচ্ছে। সাবানের বাক্সের মতন বই-এর মলাটকেও রঙচঙে করার দরকার নেই। পেঙ্গুইনের বেশীর ভাগ বই-এর মলাটই আগে ছিল এক রকম—সবুজ আর সাদা। গত কয়েক বছরের লাভের হিড়িকে মলাটে অনেক বদল হয়েছে। ১৬ বছর বয়েসে কাকার ব্যবসায়ে সামান্য কর্মী হিসেবে ঢুকে অ্যালেন লেন তারপর সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পেঙ্গুইন প্রকাশনীর বিশাল ব্যবসার পত্তন করেছিলেন—রুচি এবং আদর্শ বজায় রেখে। এই দুটো জিনিসকে বর্জন করে তিনি ব্যবসায়ে আরও বেশী লাভ করতে কিছুতেই রাজী নন দেখা যাচ্ছে।

ধাটের কবিতা

আশিস সান্যালের সম্পাদনায় বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের একটি কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এতে রয়েছে ৩৮ জন যুবক-যুবতীর কবিতা। মনে হয়, এঁদের অনেকের বয়েস ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, প্রায় অর্ধেক কবিরই পেশা শিক্ষকতা, অনেকের আলাদা কোনো কাব্যগ্রন্থ এখনো বেরোয় নি। বাংলাদেশের তরুণতম কবিরা এখন কী রকম লিখছেন, তাঁদের কাব্যরীতি এবং ভাষাপ্রবাহ এখন কোন্ দিকে—তা সমগ্রভাবে জানতে হলে এই বইখানি বেশ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

একটা জিনিস চোখে পড়ে, অধিকাংশ কবিতাতেই গঠনের নিপুণতা আছে, অনেকেই শুদ্ধ ছন্দে লিখেছেন, লাইনের শেষে মিল-দেওয়া কবিতাও রয়েছে বেশ-কিছু। বিষণ্ণতাই গ্রন্থটির মূল সুর। কোনো প্রকার অ্যানার্কি, ব্লাসফেমি, শরীরকে ভাঙা বা যৌনভোগ নিয়ে উন্মত্ততা তেমন চোখে পড়ে না—তাতে খানিকটা আশ্চর্যই লাগে। যুব-মানসে ধ্বংস কিংবা তাণ্ডবের বাঞ্ছা যেন স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা ইঙ্গিত। কিন্তু বাংলাদেশের তরুণতম কবিরা সময়ের বিষণ্ণ অসুখে আক্রান্ত হয়ে যেন ক্রমশ ঔদাসীন্য ও প্রশান্তির দিকে ঝুঁকছেন। কবিতা হিসেবে এই সংকলনে অধিকাংশ রচনাই সার্থক এবং বারংবার পাঠযোগ্য।

একজন কবি, অনাময় দত্ত, মাত্র ২১ বছর বয়েসেই যাঁর মৃত্যু হয়েছে ক্যানসার রোগে, তাঁর কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি।

"আমার বুকের মধ্যে কোনো হৃদয় নেই এখন
মাংস অথবা অস্থিও নেই
আমার পিঠের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে
মাটির পুতুলের মতন
বুকের ভিতর সব দেখা যায়—
আমার বুকের ভিতরে কোনো
দুঃখ আর নেই..."

সনাতন পাঠক

বেঙ্গলি লিটারেচারের বিজয়া সম্মেলন

গত ১০ নবেম্বর সন্ধ্যায় সাউথ পয়েণ্ট ক্লাবে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' পত্রিকার বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সভায় পৌরোহিত্য করেন ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসতীকান্ত গুহ। সর্বশ্রী মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মোহিত লাহিড়ী, রমেশ মাথুর প্রমুখ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পত্রিকাটির সম্পাদক শ্রীআশিস সান্যাল সকলকে ধন্যবাদ জানান। তরুণতম কবিরা কবিতা পাঠ করেন।

উপন্যাস

রূপমঞ্জরী। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সূচীপত্র, ৩৫ সি সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। ৩·৫০ টাকা।

রূপমঞ্জরী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্প্রতি-প্রকাশিত গ্রন্থ হলেও এর রচনাকাল বহু পূর্বে। 'বহুবচন' নামে এটি অধুনালুপ্ত স্বল্প পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ বলেছেন: "'রূপমঞ্জরী'তে রূপ ঠিকই আছে, নাম বদলেছি। গ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা এই আমার দ্বিতীয় উপন্যাস।"

রূপমঞ্জরীকে ঠিক উপন্যাস বলা যায় কিনা এ-বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ অবশ্য রয়েছে। আকারে-প্রকারে বরং এটি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি বড়ো গল্পই বলা যায়। তাছাড়া, গল্পকার নরেন্দ্রনাথ উপন্যাস-রচয়িতা নরেন্দ্রনাথকে নানাভাবে ছাপিয়ে গেছেন, এখনো হয়তো যান। তবু, রূপমঞ্জরী একটি অতিশয় সুখপাঠ্য গল্প সন্দেহ নেই। পূর্ববঙ্গের ঢুলী-সমাজের কথা নিয়ে বাংলাসাহিত্যে খুব বড়ো কিছু লেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। নরেন্দ্রনাথ রূপমঞ্জরীর স্বল্পায়তন পরিবেশে নিপুণ কয়েকটি আঁচড়ে সেই সমাজজীবনের গভীরতাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। ভুঁই-মালী ও ঢুলীসমাজ-এর নানা সংস্কার, প্রবণতা, সমস্যা ও জীবনযাপন পদ্ধতি টুকরো টুকরোভাবে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম দিকের রচনায় মানুষের ছোটখাট বেদনা-অভিমান-হাসি-আহ্লাদ মেশানো জীবন কেমন সহজে গভীর তাৎপর্যময় গল্পের আকার পেত, তা নিশ্চয়ই এখনো অনেকের মনে আছে। রূপমঞ্জরীতে গগন ঢুলীর সংসারের কাহিনীতে সেই পুরনো নরেন্দ্রনাথকে বারবার মনে পড়বে। এ-ও বড়ো কম লাভ নয়। ৩০৪/৬৭

দ্বিতীয় বর্ষণ। নমিতা চক্রবর্তী। গ্রন্থ-প্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আধুনিক কালে উপন্যাসের যে-সংজ্ঞাই আমরা দিই না কেন, রোমান্স যে তার প্রাণ-ভোমরা তা অস্বীকার করবে কে? প্রেম-বিরহ-মিলন-দ্বন্দ্বই উপন্যাসের প্রধান উপকরণ—পটভূমিকা এবং বহিরঙ্গ তার আর যাই হোক। নমিতা চক্রবর্তীর প্রত্যেকটি উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু ঐ রোমান্স; কিন্তু কোনো বইখানাই রোমান্স-সর্বস্ব নয়। পটভূমিকা, বহিরঙ্গের বাহার তাঁর প্রতিটি বইতেই আছে, কিন্তু তা একান্তভাবেই বিষয় ও চরিত্রানুগ। তাঁর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা রক্তমাংসের মানুষ—অলস কল্পনায় তাদের জন্ম নয়, নয় তারা ভুয়ো আইডিয়ার প্রতীক। আর, সবচেয়ে বাহাদুরি তাঁর—মহিলা হওয়া সত্ত্বেও—আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রা ও তার বিভিন্নমুখী বৃত্তির সম্যক পরিচয় জানা।

বর্তমান গ্রন্থটিই ধরা যাক। ডক্টর সিদ্ধার্থ রায়ের বয়স আটচল্লিশ। ছেলেবেলা ছিল তাঁর ভয়ানক দুর্যোগের বেলা। "মুড়ির সঙ্গে একটু গুড়, সাংঘাতিক একটা বাবা, মায়ের করুণ মুখ আর অগুণতি ভাইবোন।" অনেক প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে, অবশেষে স্কলারশিপ পেয়ে বিলেতে পড়াশুনো করে, তিনি প্রখ্যাত রসায়নবিদ হয়েছেন। আজ জীবনযুদ্ধে তিনি সফলকাম, কৃতী। "মস্তবড়ো সুশ্রুত কেমিকেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। মস্ত বড়ো এয়ারকনডিশনড বাড়ি, তিনখানা গাড়ি। ধনী সিদ্ধার্থ রায় বিয়ে করতে পারতেন, আজো পারেন সমাজের সেরা মেয়ে, কিন্তু প্রবৃত্তি নেই।......যৌবনের দীপ্ত দিনে শীলাকে নিয়ে পেতেছিলেন প্রেমের বাসর-শয্যা। বাসরশয্যা কণ্টকশয্যা হলো—সেবায়, সৃষ্টিতে, প্রেমে লোভনীয়া, অপ্রাপনীয়া হয়ে উঠলো না শীলা।" এলো ডিভোর্স। তাই আজ আর "স্ত্রীতে মন লাগে না সিদ্ধার্থর। প্রতি রাতে এক নারী—অকুলি টেস্টলেস্! ......পাত্রপাত্র ভরে দিতে, রোমাঞ্চকর করতে রাত মেয়েদের দরকার।......" সেই সিদ্ধার্থ রায়কে ভালোবাসলো একটি মেয়ে। চব্বিশ বছরের ক্ষীণ-তনু, শুকনো মুখ, তাঁর দুঃস্থা, বিধবা বোনের ভাসুরঝি যে তাঁরই আশ্রিতা। তারপর একটি পরমক্ষণে, অনুভূতির স্পর্শ লেগে ক্ষরিত হলো সেই নির্বাস, শুক্তির উপরে বর্ষিত হলো স্বাতী নক্ষত্রে ধরা বৃষ্টির জল, মস্ত বড়ো কেমিস্ট বড়োলোক, নৈতিক চরিত্রহীন প্রৌঢ় ডকটর সিদ্ধার্থ রায়ের জীবনে এলো আশ্চর্য আলো, আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির চেয়ে যার তেজ, শক্তি বেশী,—ভালোবাসা। জীবন যখন শুকিয়ে

গিয়েছিল তখন করুণাধারায় নামলো দ্বিতীয় বর্ষণ।

সিদ্ধার্থ রায়ের জীবন, জীবিকা, পরি-পার্শ্ব ও পিতৃপরিবারকে কেন্দ্র করে অতি স্বল্প পরিসরের মধ্যে আমরা পাই বাঙালী নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের নিখুঁত চিত্রাবলী। পাই টুকরো টুকরো অনেক চরিত্রের মেলা, কলমের এক একটি আঁচড়ে যা পূর্ণ প্রকাশিত। আর পাই, আধুনিক সমাজ-জীবন ও আর্থনীতিক জীবনের, পুরুষ মানুষের বৃত্তি ও কর্মের জগতের এক প্রামাণ্য পরিচয়।

১৪৭/৬৭

গল্প

মানুষ যখন পশু হয়। বীরু চট্টোপাধ্যায়। প্রফুল্ল গ্রন্থাগার, ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। ৪·৫০ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যে-মধ্যে একধরনের অদ্ভুত প্রবণতা চলতে থাকে। এই রম্য-রচনায় বাজার সরগরম, এই ঐতিহাসিক উপন্যাস গরম কেক, এই নাইট ক্লাবের কেচ্ছা-কাহিনী লেখক-প্রকাশকের নাম গোপন না করেই ঝাঁকা-ভর্তি প্রকাশ্যে ছাপা হচ্ছে। এখন আবার অন্য চাহিদা। গোয়েন্দা-অপরাধ-অন্তর্ধান-খুন এই সবের চাঞ্চল্যকর সত্য কাহিনী চাই। মুশকিল এই যে, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ হলেও ভারতবর্ষে এখনো কথায়-কথায় পিস্তল গর্জায় না, অগত্যা বিদেশের দুয়ারে ধরনা দিতে হয়। পি-এল ৪৮০-র জাহাজে গোপন চালান হয় এই সব সত্য-মূলক বিচিত্র কেচ্ছাকেতাব।

বীরু চট্টোপাধ্যায়ের বইটিও সম্ভবত এই চাহিদারই বিশেষ যোগান। না-হলে এত বিষয় থাকতে তিনি মানুষের পশুস্বভাবের গল্প রঙ্ চড়িয়ে বাংলাভাষায় আমদানি করলেন কেন। তিনি অবশ্য অভয় দিয়েছেন, 'সৌভাগ্যক্রমে এই ধরনের উন্মাদ নরপশু লাখে একটা পাওয়া যায়, নয়ত এ সংসার মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়ে উঠত।' কিন্তু এই গ্রন্থের বারটি গল্পের এগারোটিতেই এ-জাতীয় নরপশু পাওয়া গেল। ব্যতিক্রম যে-গল্পটিতে, সেটি একটি বিশুদ্ধ বাঘ-শিকারের বর্ণনা। বইয়ের নাম ও পরিচয় ('বিচিত্র অপরাধ কাহিনী') কিছুর সঙ্গেই সঙ্গতি নেই গল্পটির। এ-গ্রন্থের পাঠ্য গল্প বলতেও ওটি। সুতরাং, ভুল করে ছাপা হলেও শেষ পর্যন্ত ভালই হয়েছে বলতে হয়।

২৬৫/৬৭

ভ্রমণ-কাহিনী

দেশে দেশে। পি সি সরকার। ইন্দ্রজাল পাবলিকেশনস্, ২৭৬/১ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৯। ৬·০০ টাকা।

তাঁর 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনের সূত্রে পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে, পৃথিবীর অগণিত দর্শক কুণ্ঠাহীন বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে দেখেছে তাঁর অভাবনীয় কৌশল, একটির পর একটি জয়ের মালা জড়ো হয়েছে তাঁর কণ্ঠে, আন্তর্জাতিক জাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে ভারত-বর্ষের সম্মানের আসনটিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছেন তিনি—আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে দু চোখ ভরে দেখেছেন বিপুলা পৃথিবীর নগর-রাজধানী-কীর্তিচিহ্ন। সেই দেখার বৃত্তান্তই এবার গ্রন্থাকারে পরি-বেশন করেছেন যাদুসম্রাট পি সি সরকার। অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বিশ্ব-বিশ্রুত নাম।

আফ্রিকা, মিশর, ইরাণ, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান ও বর্মা মোটামুটি এই কটি দেশভ্রমণের গল্প করেছেন শ্রী সরকার। তাঁর দেখার চোখ আছে, আছে নানা বিষয়ে কৌতূহল, তদুপরি গুছিয়ে লিখতে পারেন। ফলে, প্রতিটি লেখাই আকর্ষণ করে। 'স্কটল্যাণ্ডঃ কৃপণতার দেশ' ভ্রমণের গল্প নয়, কয়েকটি সুন্দর অ্যানেক-ডোটস উপহার দিয়েছেন তিনি স্কচদের বিষয়ে।

গ্রন্থের মধ্যে বেশ কিছু আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। এগুলি দেখতে ভাল লাগে। শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা রচনা করেছেন। পি সি সরকারের সামগ্রিক একটি মূল্যায়ন করেছেন তিনি এই মূল্যবান আলোচনায়।

২১২/৬৭

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রাপ্তি স্বীকার স্তম্ভে একটি পুস্তকের নাম আর্য সঙ্গীত ছাপা হয়েছে। উহা অর্ঘ্য সঙ্গীত হবে।
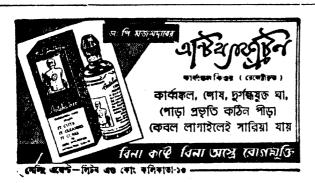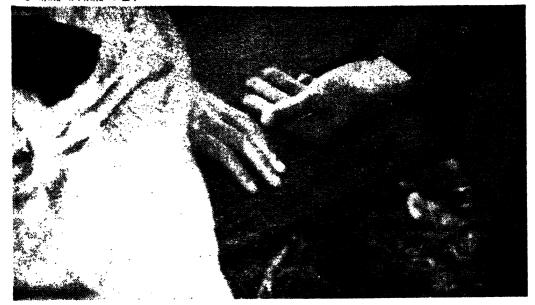
Where the young Italians see a solution to the antimony between non-revolutionary art and a need for social revolution, the French newcomers seek one between a national classical tradition (their films are full of tributes to Feuillade, Vigo, Renoir) and a revolutionary, non-traditional (vie., non-Carne non-Clouzot, non-Clair) form. On the one hand, this form blends all manner of incongruous influences .... on the other, it jumps across space and time.

Peter John Dyer.

এই দশকের ফরাসী চিত্র

ষাট দশকের ফরাসী ছবির তালিকায় রোবের ব্রেস'র **"বালথাজার"** না থাকলে আমরা একটি বিরাট বিস্ময় থেকে বঞ্চিত হতাম। অন্যান্য ছবিতে সমসাময়িক ফরাসী চিত্রের পরিচয় পেয়েছি। "বালথাজার"-এ দেখলাম একটি মহৎ সৃষ্টি। গদারের **পিয়েরো দি ফুল** কিংবা আল্যাঁ রেনের সর্বাধুনিক ছবি **দি ওয়ার ইজ ওভার** নিঃসংশয়ে নতুন অভিজ্ঞতা। লুই মালের "লা ফ্য ফোলে" বা **এ টাইম টু লিভ অ্যান্ড এ টাইম টু ডাই**-এর কয়েকটি মুহূর্ত স্মরণীয়। পিয়ের এতের **'দি স্যুটার'** (লা সুপিরাঁ) অতি সাধারণ। হাসির ছবি, কমেডি কখনও স্ল্যাপস্টিক, কখনো চ্যাপলিন বা বাস্টার কিটন-ধর্মী। কিছু মজার কাণ্ড পরিচালক নতুন দেখিয়েছেন।

"I find myself longing to see a film with a well-told story."

Truffaut.

নিরাশ হয়েছি ফাঁসোয়া ত্রুফোর "লা পো দ্যশ' বা **সিলকেন স্কিন"** (নাকি সফ্‌ট্‌ স্কিন?) দেখে। "ফোর হানড্রেড ব্লোজ"-এর ত্রুফো কিংবা "কাহিয়ে দ্যু সিনেমা'র ত্রুফো (নভেল

ভাগের কথা না-ই বা তুললাম) এমন একটি কনভেনশানাল ছবি কেন তৈরি করলেন সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। ত্রুফোর নায়কের (৪৩) সমস্যা এবং তার বিবাহিত জীবনের জটিলতা (খুব জটিল কি?) অন্তত বাংলা গল্পের পাঠক এবং বাংলা ছবির দর্শকের কাছে নতুন নয়। ত্রুফো তাঁর ছবিতে গল্প বলেছেন বলেই বাংলা গল্পের কথা উঠল। এইটুকু স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে বিবাহিত জীবনে তাঁর নায়কের বিস্বাদ এবং এয়ার হোস্টেসের প্রতি গোপন আসক্তির মধ্যে জীবনবোধের লক্ষণ যৎসামান্যই পেয়েছি। গভীরের প্রতি ত্রুফোর অনীহা, না গভীরে যাওয়ার অক্ষমতা জানি না—তবে ছবিটি আমাদের যুক্তি ও চেতনাকে আন্দোলিত করতে পারেনি। পরিশেষে নায়কের স্ত্রীর পাপ-প্রবৃত্তি (স্বামীকে প্রকাশ্য স্থানে সে হত্যা করেছে) এবং কাহিনীর মেলোড্রামাসুলভ পরিণতি ত্রুফোর কাছে অনিবার্য মনে হলেও শিল্পবোধসম্পন্ন দর্শকের কাছে তা আর্টের কণ্ঠরোধ বলেই মনে হবে। অবশ্য ত্রুফোর এই 'কাহিনী'-চিত্রে আর্টের বালাই এমনিতেই নেই। ফিল্ম তৈরির স্টাইলও না।

এ টাইম টু লিভ অ্যান্ড এ টাইম টু ডাই-এর নায়কের (৩০) জীবনানুগ সংকট, বিশ্বাসযোগ্য। নায়কের জীবনের শেষ আটচল্লিশ ঘণ্টার ঘটনা নিয়ে ছবি। নায়ক অ্যালা জীবন ভোগ করেছে, করে যেতে চায়। যখন সে বুঝতে পারে সে রিক্ত, অক্ষম, বাসনায় তাড়িত তখনই তার যন্ত্রণা। ত্রিশের কোঠায় এসে সে বুঝতে পারে কামনা ও পরিতৃপ্তির রঙিন জগতে আর তার প্রবেশের অধিকার নেই। বাতিলবস্তুর মত সে পড়ে থাকতে নারাজ। এবং আত্মহত্যাই তখন তার কাছে একমাত্র সমাধান। এবং সে আত্মঘাতী হয়। কিন্তু মৃত্যুই কি এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য? মৃত্যু তো অতি সহজ পরিণতি, ট্র্যাজেডির অবসান, স্বাভাবিক সমস্যার আকস্মিক অবরোধ। তবে নায়কের হতাশা ও চিন্তার জট বিশ্লেষণে লুই মাল অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন।

"When I am asked why there are references to Vietnam in my films, or to Jacques Anquetil, or to some lady who's deceiving her husband, I refer the questioner to his daily paper." .... I don't know to tell stories. I want to cover the whole ground, from all possible angles, saying everything at once. If I had to define myself. I would say

"দি ওয়ার ইজ ওভার' : আল্যাঁ রেনে

that I was a painter in letters, as one says man of letters.

Jean-Luc Godard.

গদারের পিয়েরো দি ফ্ল ছবিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন মন্তাজ নেই। অর্থাৎ সিনেমার সেই বিশেষ টেকনিক অনুপস্থিত। কিন্তু পরিচালকের অস্ফুট কথা ও ভাবনা-গুলো যেন মন্তাজের মতই মিশে গিয়েছে ছবিটিতে। বক্তব্য মোটেই সাজানো নয়, হয়ত বক্তব্যই নেই। মানুষের অগোছালো চিন্তার মত ছবির স্ক্রিপট। চিন্তার সূত্র আপাত-দৃষ্টিতে ছিন্ন, অদৃশ্যে অটুট। জীবনের প্রতি বীতরাগ ফার্দিনানদ। মারিয়ানের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা। মারিয়ান তাকে পালিয়ে যাবার কানমন্ত্র দেয়, উভয়েই নিরুদ্দেশ। ফার্দিনানদ ও মারিয়ানের ভ্রাম্যমাণ, পলাতক জীবন "গ্যাংগস্টার" ছবির কাহিনীর মত। কখনও ক্রাইম ছবির ধরণ। ক্রাইম চিত্রের নায়কের কাজ একটির পর একটি করে যাচ্ছে মারিয়ান। বুঝতে অসুবিধা হয় না পুরো ব্যাপারটাই ফ্যান্টাসি। কমেডির আভাসে হত্যাকান্ড ও পাপাচার সংগঠিত। গ্যাংগস্টার ছবি কিংবা ক্রাইম চিত্রের প্রতি গদারের কটাক্ষ? অবাস্তব কর্মকান্ডের প্রতি শ্লেষ? কিছুটা হয়ত তাই। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। জীবনের "নেগেশন" এক্ষেত্রে জীবনের গভীর রহস্য মেলে ধরার জন্য। মানুষের আবেগ অনির্দেশ্য, আত্মজিজ্ঞাসা অস্পষ্ট, নিজস্ব সত্তা নিজেরই অপরিচিত। মানুষ এ সব কিছুই জানতে চায়। কীভাবে জানবে তাও জানে না। জানতে চাইলেও অনেক সময় তা অজ্ঞাত থেকে যায়। এবং জানার চেষ্টাও বুঝি সরলরেখায় এগোতে পারে না। গদারের স্ক্রিপটও তাই বিধিবদ্ধ নয়, এতে অনিয়মের রীতি। ফিল্মের বিধিহীনতা এবং আপাত-অস্পষ্টতার মধ্যে স্বাভাবিক জীবন-ক্রিয়ার রূপটি কিন্তু স্পষ্ট। চেনা-অচেনার মেশা নিজের সঙ্গে মানুষের অন্তহীন লুকোচুরির খেলা। এর মধ্যে "ইটারনিটি"-র পরিচয় আছে। গদারের ক্যামেরা তাই ছবির শেষে, গুলিবিদ্ধ নায়িকার মৃত্যুর পর, সমুদ্রের বুকে নিবদ্ধ। গদারের ফিল্ম স্টাইল-এ দর্শক মুগ্ধ। এই স্টাইলে মননশীলতার প্রখরতাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর মননশীল মন শুধু সিনেমার টেকনিক নিয়েই ব্যস্ত নয়। সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গ—রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ভিয়েতনাম প্রভৃতি গদারের চিন্তার পরিধি থেকে বাদ যায়নি।

Resnais has asked several times for the spectator "not to reconstruct a story coldly from the outside, but to live it at the same time as the characters, and from the inside."

Sight And Sound

আল্যাঁ রেনের নিজস্ব চলচ্চিত্ররীতির প্রভাব দর্শকমনে গভীর। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁর ছবিতে একীভূত, অনন্ত বর্তমানের মত প্রতিভাত। শুধুই যেন অস্তিত্ব, যার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নেই। এই বিশেষ প্রকাশরীতির জন্য আমরা গল্পবস্তুর অন্তঃস্থলে পৌঁছে যেতে পারি। সাধারণত গল্প বলা ও গল্প শোনা বা দেখার মাঝখানে যে ব্যবধান থাকে এবং দর্শক ও ছবির চরিত্রের মধ্যে যে অনাত্মীয়তা গড়ে ওঠে, রেনের ছবিতে তা বিলুপ্ত। চরিত্রদের আমরা খুব কাছে থেকে দেখতে পাই, কখনো বা তাদের সঙ্গে একাত্ম। এর আরও একটি কারণ, রেনের চলচ্চিত্ররীতির হার্দ্যগুণ। আবেগের অবাস্তবতা ছবিতে মোটেই নেই। তবু কেমন যেন হৃদয়ের সুর আমরা তাঁর ছবিতে অনুভব করি, লা গোর এ ফিনি বা "দি ওয়ার ইজ ওভার"-এ যা পেয়েছি। স্পেনের এক বিপ্লবী দলের গোপন কার্যকলাপের ছবি। কিন্তু তথাকথিত 'অ্যাকশন' ছবিতে নেই। মনস্তাত্ত্বিক স্তরে ঘটনার বিস্তার। অক্লান্ত বিপ্লবীর জীবনেও ক্লান্তি দেখা যায়, কখনো বা হতাশা। প্রেমের প্রয়োজনও তার আছে। তার জীবনে নারীর স্থানটিও নির্দিষ্ট। রেনের ছবিতে গোটা মানুষের পরিচয় পাই, দিয়েগো ও মারিয়ানের মধ্যে যা লভ্য। আসলে বিপ্লবী দলের ঘটনা এহ বাহ্য, কয়েকটি মানুষকে বিশ্লেষণ করাই রেনের কাজ।

জাঁ পোল রাপনোর লা ভি-দ শাতো বা লাইফ অ্যাট এ ক্যাসল ছবিতেও

"এ ম্যান অ্যান্ড ওম্যান" : শিল্পী আনুক এমি

"লা ভিদ শা তো" : রাপনো

'রেজিসট্যান্স'-এর কাহিনী। কিন্তু ছবিতে অ্যাকশনের পরিমাণ বেশী, হলিউডের ছবির সমতুল্য। হলিউড অবশ্য অ্যাকশন আরও ভাল দেখাতে পারে। নায়িকা মারি নাৎসী-বিরোধী এক ফরাসী যুবকের মধ্যে তার হিরো খুঁজে পেয়েছে। স্বামীকে সে বরাবরই মেরুদণ্ডহীন অকর্মণ্য বলে জেনে এসেছে। তারপর যখন তার স্বামী বিরাট সাহসের প্রমাণ দেয়, তখন মারির কাছে সে-ই আবার হিরো হয়ে ওঠে। একটি সাধারণ, অনুল্লেখ্য ছবি।

ক্লোদ লেলুশের রঙিন ছবি **আঁনম এ উন ফাম**-এর (ম্যান অ্যান্ড ওম্যান) বড় গুণ, ছবিটি দেখতে ভাল লাগে। লেলুশের লাবণ্য সৃষ্টির প্রতি ঝোঁক বা এসথেটিক মেজাজ ছবিটিতে স্পষ্ট। ট্রিটমেন্টও সুন্দর, বিশেষ করে অতীত ঘটনা উপস্থাপনে। ফ্ল্যাশব্যাকের ধরণটি সুন্দর। গান ছবিতে বেশী। হৃদয়ের ধর্ম দেখাবার জন্যই গান। স্বভাবতই তা দর্শকের মন আকৃষ্ট করে। নায়িকার স্বামী পরলোকে। বিবাহিত জীবনের সুখের দিনগুলির স্মৃতি তার মনে ভিড় করে আসে। বিপত্নীক যে ব্যক্তিটিকে সে ভালবেসেছে তার সঙ্গে মিলনের মুহূর্তেও নায়িকার চোখে জল। স্বামীর ভালবাসার কথা সে ভুলতে পারছে না। তবে যেহেতু প্রেমের শক্তি মানুষের চেয়ে বেশী (গানের মধ্য পরিচালক তা জানিয়েছেন), তাই শেষ পর্যন্ত সে ওই ব্যক্তির কাছে ধরা দিয়েছে। বেশ সুখভোগ্য ছবি, শেষের দিকে মেলোড্রামার সংক্রমন।

"Yes, the story of the ass throughout history. A lot of little episodes, the ass that carried Abraham, the one that Moses rode, the ass that bore the Virgin and Child into Egypt, the one on which Christ entered Jerusalem on Palm Sunday; Balaam's ass, the ass in the manger."

Bresson

এবার বার্লিন উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবির কথা —ব্রেস'র ও আজার বালথাজার। ব্রেস' চিরাচরিত কোন নিয়মই মানতে রাজী নন। ছবিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখ্যত কিছু করবার আছে বলে তিনি মনে করেন না। বার্গম্যানের মত তিনিও দার্শনিক শিল্পী। আত্মিক সমস্যার কথা তাঁর ছবিতেও থাকে। তবে ব্রেস'র ছবির সিনেমাটিক ফর্মও কম বিস্ময়কর নয়। খুব অল্প ছবিই তিনি করেছেন। মোট ছয়টি সম্ভবত। তার দুটির বোধ হয় খরচ উঠেছে। নিজের ভাবনা নিয়েই তিনি ছবি করেন, জনসাধারণের কথা ভেবে নয়।

ও আজার বালথাজার-এর গভীরে যদি কেউ ঢুকতে না চান তাতে ক্ষতি নেই। বালথাজার একটি গাধা। বালথাজারকে প্রতীক-চরিত্র না ভেবেও ছবিটির বিচার করা চলে। বালথাজার প্রধান চরিত্রে রূপান্তরিত। সে-ই নায়ক। বালথাজার কথা বলতে পারে না। কিন্তু তার দুটি চোখ আছে। ওই যথেষ্ট। চোখ দিয়ে চরিত্রের কথা বলিয়ে দেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ব্রেস'র। ছবির শিল্পীদের বেলায়ও তা দেখা গেছে। বালথাজার কিংবা যে-কোন চরিত্রের ক্ষেত্রে, দুটি চোখই যেন মনের অথবা আত্মার প্রতিবিম্ব। ব্রেস'র বক্তব্যের প্রকাশ। ব্রেস' 'কম্যুনিকেশন'-এর জন্য সংলাপ বা অভিনয়ে বিশ্বাস করেন না। তাঁর আস্থা দুই নয়নের উপর—কী পশুর কী মানুষের।

ছবিতে কাহিনী যাঁরা খোঁজেন তাঁদেরও নিরাশ হবার কারণ নেই। মারি ও তার বাবা, মারি ও জাক, মারি ও জেরার, এবং মারি ও বালথাজারের কাহিনী আছে। জাকের মত সচ্চরিত্র যুবকের ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করে মারি নীতিজ্ঞানহীন জেরারের প্রতি কেন আকৃষ্ট? "সাসসেপটিবিলিটি টু ইভিল" বা দোষানুগমন কি এ যুগের মজ্জাগত? ব্রেস'র বক্তব্য সম্ভবত অনেকটা এই রকম। মূল্যবোধ এযুগেও সম্পূর্ণ নিঃশেষ নয়। সে প্রমাণ মারির বাবার চরিত্র। এবং আরনলডের (যে মদ্যপ ও দুষ্কৃত) মনের আলো-অন্ধকারে। বালথাজার কথনও-সখনও বুঝি সনাতন সততা ও সতোর প্রতীকরূপে আরনলডের সামনে এসে দাঁড়ায়। আবার এমন মুহূর্তও দেখা যায় যেখানে আরনলড বলেথাজারকে সহ্য করতে পারে না (নিজের দুর্বলতার কাছে হেরে গিয়ে মদ খাবার সময় আরনলড ক্ষিপ্ত হয়ে যে-সময়ে বালথাজারকে তাড়া করে ওই মুহূর্তটি স্মরণীয়)। মনে রাখার মত অনেক দৃশ্যই ছবিতে আছে। অন্ধকারে, অলক্ষ্যে মারি ও বালথাজারকে নিয়ে যেখানে জেরার ও তার সঙ্গী বলাবলি করছে। মারি ও বালথাজারের প্রাণের সম্পর্কটি তাদের দিকে তাকিয়ে ওই একটি নিঃশব্দ মুহূর্তে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। বালথাজার এ-যুগের অধঃপতন, মূল্যবোধহীনতা ও আদর্শভ্রষ্টতার নীরব সাক্ষী। বালথাজার এ-ছবিতে মানুষের চৈতন্যোদয়ের শুভসংবাদ বয়ে নিয়ে আসেনি। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এ-কালের নৈতিক অবক্ষয়ের সংবাদ

"পিয়েরো দি ফুল" : গদার

পৌঁছিয়ে দিয়েছে। সার্কাসের খাঁচাবন্ধ পশুগুলির মুখোমুখি যখন বালথাজার, তখন তাদের মধ্যেও যেন ভাববিনিময়। চোখের দৃষ্টিতে (ব্রেস' জাদু জানেন) তা প্রতীয়মান। বালথাজার বুঝি বলতে চেয়েছে, আমিও খাঁচায় বন্ধ। নীতি-ভ্রষ্টতার শিকলে বাঁধা। শেষ সময়ে বালথা-জার গুলিবিদ্ধ, নিহত। সীমান্তরক্ষীদের গুলির লক্ষ্য ছিল চোরাকারবারী। তা এসে লাগল বালথাজারের গায়ে। বালথাজার কি ক্রুশবিদ্ধ? এ-কালে মারির পরিণামও আমরা দেখলাম। সেও কি কোন এক মুক্তিদাতার জননী হতে পারত না?

ছবির কিছু কিছু ঘটনা খৃষ্টীয় কাহিনী মনে করিয়ে দেয়। খৃস্টীয় উপাখ্যানের আলোকে এ-যুগের আত্মিক রিক্ততার বিশ্লেষণ। প্রয়োজনে কিছু খৃষ্টীয় প্রতীক ব্যবহৃত। তবু 'বালথাজার' ধর্মচিত্র নয়।

ও আজার বালথাজার : ব্রেস'

কিন্তু ধর্ম ও অধর্মের কথা সিনেমায় এমন করে কে-ই বা বলতে পেরেছেন? পুরো-পুরি সিনেমা হয়েও কোন ছবি দার্শনিক বক্তব্যে এমন মহৎ হতে পেরেছে কি? ব্রেস' কতবড় শিল্পী, কী-রকম চিন্তাশীল, 'বালথাজার'-ই তার প্রমাণ।

বিভিন্ন ফরাসী ছবিতে কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর চমৎকার স্বাভাবিক চরিত্রচিত্রণ দেখা গেল। যেমন ইংগ্রিড থুলিন (দি ওয়ার ইজ ওভার) বেলমনদো ও আনা কারিনা (পিয়ারো দি ফুল), আনু এমি (ম্যান অ্যান্ড ওম্যান), ক্যাথারিন দেনিউভ (লাইফ অ্যাট এ ক্যাসল), আনি উইয়াজেমস্কি (বালথাজার), মরিস রনে (এ টাইম টু লিভ অ্যান্ড এ টাইম টু ডাই) প্রভৃতি।

অল্প দৈর্ঘ্যের ফরাসী চিত্রগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। পিকাসোর শিল্পকর্মের চিত্র কিংবা লিওনেল টেরির পর্বতারোহণের ছবি দেখে দর্শক মুগ্ধ। ছোট ছোট ছবি-গুলিতে ক্যামেরার নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট দেখা গেছে। ভার্সাই শহর দেখার কৌশল সুন্দর। রাস্তার ট্রাফিক ও ফুটপাথের কিছু লোকজন নিয়ে ক্যামেরার অসাধ্য-সাধনের চিত্রটিও চমৎকার। এবং মহিলা সাঁতারুর নগ্ন মূর্তি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের শিল্পকল্পনাটিও দেখবার মত।

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবে ভাল যা পেয়েছি তা আশাতীত। আশাভঙ্গের দুঃখও কম নয়। ত্রুফো কিংবা রাপানো অথবা পিয়ের এতের ছবি দেখে যেমন আমরা আশাহত। চিত্রনির্বাচন আরও ভাল হতে পারত। তবে সব ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে 'বালথাজার'।
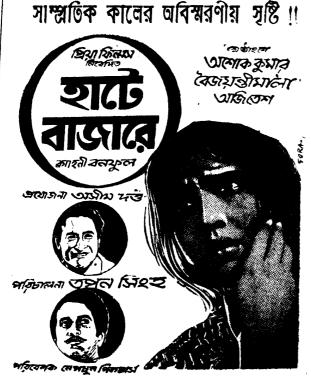
চিত্র সমালোচনা

হাটে বাজারে

পরিচালক তপন সিংহের প্রশংসা করব এই কারণে যে, তিনি একটি প্রমোদ-চিত্র তৈরি করতে গিয়ে অযথা আর্টের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাননি। বনফুলের "হাটে বাজারে" কাহিনী নির্বাচনও সেদিক থেকে উল্লেখ্য। ছিপলির নাচ-গান, ও ভ্রাতৃস্নেহ, লছমনলালের ভিলেনি, ডাক্তার সদাশিবের মহত্ত্ব এবং নাটকীয়তা ও অ্যাকশন-এর আরও বিবিধ উপকরণের মাধ্যমে পরিচালক সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকের মনোরঞ্জনের কথাই প্রধানত ভেবেছেন। তবে ছবিটি যেহেতু তপন সিংহের তাই এতে তাৎক্ষণিক উপভোগের বস্তু ছাড়াও কিছু অন্য গুণ আছে। সর্বাগ্রে প্রশংসনীয় ছবির লোকেশান—চমৎকার জায়গা, পাহাড়ী নদীর ধারে। পরিচালক সেজন্য বোধ হয় "ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা" রবীন্দ্র-সংগীত ব্যবহারেরও প্রেরণা পেয়েছেন। তাই বলে মোটর মেকানিকের মুখে এই গান? তাও আবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে? যাক সে কথা। বলছিলাম, সুন্দর একটি জায়গায় পরিচ্ছন্ন (লছমনলালের নারী-ধর্ষণের ব্যাপার এবং ডাক্তারের হাতে তার মৃত্যুর ঘটনা সত্ত্বেও) একটি ছবি তৈরির কৃতিত্ব শ্রীসিংহের। ছবির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কেমন যেন একটা ছন্দ আছে। স্বচ্ছন্দ ঘটনার স্রোত সহজ গতিতে প্রবাহিত, তারই ফাঁকে ফাঁকে হার্দ্যরসের পরিবেশন—বিশেষ করে ডাক্তার ও তার রুগ্না স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে ঘিরে, ডাক্তারপত্নীর অকালমৃত্যু এবং ছিপলি ও বস্তিবাসীদের প্রতি ডাক্তারের মমতাকে কেন্দ্র করে। ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে আবেগের যে প্রকাশ তাতে আতিশয্য নেই। ঘটনাগুলি সবই পরিমিত এবং স্বাভাবিক। অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে চিত্রনাট্যের পরিণতিতে এবং অন্যত্র। ওই সব ক্ষেত্রে দেখি বাস্তবের প্রতি পরিচালকের উপেক্ষা। আদর্শবাদের নামে গোঁড়ামি সিনেমায় চলনসই। ডাক্তারের মৃত্যুর পর সংকারের আগেই ছিপলি সহ (যাকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে ডাক্তারের মৃত্যুবরণ) আর সকলের মহৎ কাজে রওনা হওয়ার ব্যাপারটি আদর্শবাদের অযৌক্তিক উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কী? প্রত্যাশিত ও বাস্তবসম্মত পরিণাম এড়িয়ে গিয়ে পরিচালক তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় বেশী ব্যস্ত। এই ভ্রান্তি অন্য স্থলেও দেখা গেছে। যেমন, লছমনলালের কাছে টাকা চেয়ে ছিপলির নাচ ও পরে টাকা মাড়িয়ে যাওয়া। পরের ঘটনাটি খুবেই সংকল্পিত — যেখানে ডাক্তার ছিপলির নাচের কথা শুনে তাকে চড় মেরেছে। কিন্তু এই ঘটনার মূল্য রইল কই? ছিপলি তো অপাপবিদ্ধা, "আন-রিয়্যাল"। কোন দোষ করা যেন তার পক্ষে সম্ভব নয়। টাকার জন্য (যার সারাদিনের রোজগার—পরনের পোশাক দেখে মনে না হলেও—এক টাকার সামান্য বেশী) মুহূর্তের দুর্বলতাও তার মধ্যে দেখা গেল না। ছিপলি তো টাকা মাড়িয়ে যায়নি, 'রিয়ালিটি'কে মাড়িয়ে গেছে।

"হাটে বাজারে" : বৈজয়ন্তীমালা, পার্থ মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার ও শমিতা বিশ্বাস

সিনেমার নিয়ম, যে মহৎ তাকে অবিশ্বাস্যরূপে মহৎ করে তোলা। যে সৎ, তাকে সততায় সর্বক্ষণ সাজিয়ে রাখা, যাতে ভুলচুকের ছিটেফোঁটা তার চরিত্রে না লাগে। যে অন্যায় করেছে তাকে অচিরেই অনুতাপে দগ্ধ করে আদর্শবাদীরূপে দেখানো (ডেক্কারের কাছে অনিমেষের অনুতপ্ত হয়ে আসতে কিংবা জনসেবার কাছে আত্মোৎসর্গ করতে বিলম্ব হয়নি)। তপন সিংহ এই গতানুগতিক নিয়মগুলি পালন করেছেন।

তবে শ্রীসিংহের 'ট্রিটমেনট'-এর বিশেষত্ব এই, তিনি খলনায়কের কার্যকলাপ দেখাবার বেলায় বাড়াবাড়ি করেননি। এবং কাহিনী যে মুখ্যত ডাক্তারের তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। যদিও লছমনলালের পাপকাণ্ড দিয়ে ছবির শুরু কেন তা দুর্বোধ্য। আর্ট-অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ছবির কিছু দুর্বলতা হয়ত ধরা পড়বে। কিন্তু ছবিটি (কাহিনীর বিচারেও) দর্শককে সিনেমা দেখার সুখ পর্যাপ্তভাবে দেবার জন্যই তৈরি। সেদিক থেকে তপন সিংহ নিঃসংশয়ে সফল। উপরিপাওনা হিসাবে রয়েছে তাঁর সুষ্ঠু প্রয়োগকর্ম, কিছু সুখভোগ্য ও লাবণ্য-

খণ্ডিত দৃশ্য এবং যা তপনবাবুর ছবির বৈশিষ্ট্য, একাধিক মুহূর্তে 'এসেথেটিক' মেজাজ।

অশোককুমার (ডাক্তার) ও বৈজয়ন্তী-মালাকে (ছিপলি) যে অভিনয়ের প্রয়োজনেই নেওয়া হয়েছে তা ছবিটি দেখলেই বোঝা যায়। ওঁরা দুজনেই উঁচুদরের অভিনয় করেছেন। বাংলা বলায় অনভ্যাস সত্ত্বেও অশোককুমারের চরিত্রচিত্রণ অসাধারণ। বৈজয়ন্তীমালার অভিনয়ও মনোগ্রাহী। তাঁর গাওয়া বাংলা গান এক নতুন আকর্ষণ। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লছমনলাল পুরোপুরি ভিলেন। তাঁর অভিনয় কিছুটা মঞ্চানুগ হলেও চরিত্রের সঙ্গে তা মানিয়ে গেছে।

"হংসমিথুন" : অপর্ণা সেন ও বিকাশ রায়

চরিত্রাভিনয় সকলেই ভাল করেছেন। নতুন ধরনের ভূমিকায় পার্থ মুখোপাধ্যায় রীতিমত অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। চরিত্রবিশ্লেষণে বিশেষ প্রশংসা শমিতা বিশ্বাস (ডাক্তারের স্ত্রী) ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের (রিটায়ারড সাব-জজ) প্রাপ্য। ছিপলির প্রতিবেশী এক যুবকের চরিত্রে চিন্ময় রায়ের চরিত্রাঙ্কণ অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবার মত। অবাঙালী চরিত্রের অভিনয়ে অবাক করে দেন ছায়া দেবী। অজয় গাঙ্গুলীর অভিনয়ও মনোজ্ঞ। অন্যান্যদের মধ্যে নির্মল চট্টোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, সমিত ভঞ্জ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, বিনয় লাহিড়ী প্রভৃতি তাঁদের অভিনীত ভূমিকা প্রাণবন্ত করেছেন। একটি দৃশ্যে প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাচনভঙ্গি ও অভিব্যক্তি মনে রাখার মত।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উন্নত স্তরের। বিশেষভাবে দীনেন গুপ্তর ফটোগ্রাফি — যা ছবিটিকে ভিস্যুয়াল সৌন্দর্যে ভরে তুলেছে। অন্ধকারে ক্যামেরার কাজ (যেখানে গাড়ির লাইট রাস্তায় পড়ছে) সবিস্ময়ে লক্ষণীয়। সুবোধ রায়ের এডিটিং কৃতিত্বপূর্ণ। সেটের কাজ ছবিতে খুব বেশী নয়। ডাক্তারের বাড়ির বাইরের দিকের সিঁড়িগুলো কেমন যেন কাদায় ভেজা মনে হয়েছে। আসল বাড়ির 'ইলিউশন' তৈরি হয়নি।

সংগীতপরিচালক হিসাবে শ্রীসিংহ একাধিক গানের সুরে ভালই দিয়েছেন' আবহসংগীতে রসবোধের পরিচয় আছে।

*

একটি সংবাদে প্রকাশ, এলিজাবেথ টেলর চলচ্চিত্র থেকে অবসর নেবার কথা ভাবছেন। তিনি নাকি বলেছেন, "সর্বোচ্চ ধাপে উঠে গেলে তারপর শুধু নীচেই নামা যেতে পারে। আমি আর বেশীদূর যেতে চাই না। সম্মানের সঙ্গে নীচে নেমে আসতে চাই।" বয়োপ্রাপ্তির পর থেকেই শ্রীমতী টেলর ছবিতে অভিনয় করছেন। এখন তাঁর সাধ, শুধু মিসেস রিচার্ড বার্টনরূপে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়া। "এলিজাবেথ টেলর পরিচয় আমার ভাল লাগে না। আমি রিচার্ডের স্ত্রী হয়ে থাকতেই চাই"—শিল্পী সম্প্রতি এই কথা বলেন।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

মানুষ-খেকো সিংহের পাল খতম--
অরণ্যদেব সিংহ মেরেছেন
জয় অরণ্যদেবের জয়!

লড়েদের আজ উৎসবের দিন!

খবর রটে গেছে দিকে দিকে--- জ্বলছে শত শত মশাল-----
বুয়া-ভুতের সিংহগুলোকে অরণ্যদেব মেরেছেন!
সব কটা খতম!
6/4

গ্রামবাসীরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে!
খতম! খতম! খতম---

শুনতে পাচ্ছি, কে
এতে আমাদের কাজের কোনও অসুবিধে হবে না তো খুকনরাজ?
না না, কাজের আরও সুবিধে হবে। তুমি যাও হে, বার্না!
যাচ্ছি হুজুর!

গ্রামবাসীরা আনন্দে মত্ত, কিন্তু অরণ্যদেবের স্বস্তি নেই।
সিংহের গায়ে ওই ছাপটা কিসের? ছাপটা আমি আগেও যেন কোথায় দেখেছি!

মূর্খ গ্রামবাসীদের ধারণা, ও-ছাপ বুয়া-ভূতের। আসল ব্যাপারটা কিন্তু আমি জানি!
কে তুমি? কী জানো?

আমার নাম বার্না। আমি জানি, শিকারী হোগার ওই সিংহগুলোকে এখানে এনে ছেড়ে দিয়েছিল!
হোগার? সে ওই সিংহগুলোকে নিয়ে এসেছিল?

শিকারী হোগার--
কে জানে, সিংহগুলো এতদিনে কত মানুষ মেরেছে!
কী বলছ?
ক্রমশঃ (৭)

ইনদোরে ভারতীয় ক্রান্তিদলের জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন বর্তমান সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। ১২ নবেম্বর ক্রান্তি দলের তিনদিনব্যাপী অধিবেশন শেষ হয়েছে। সম্মেলনে অধিকাংশ সদস্যই কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকুন্তে বিষয়টি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার আগেই দর্শকদের একাংশ থেকে চিৎকার করে বলা হতে থাকে— 'কংগ্রেস এজেন্ট ও মার্কিন এজেন্ট সম্পর্কে সাবধান। কবির সাহেবকে বলতে হবে কংগ্রেসের সঙ্গে কোন কোয়ালিশন হবে না।' সভাপতি শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিং বলেন কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে, অতএব কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আগামী বছরের জন্য দলের সভাপতি হিসাবে শ্রীমহামায়াপ্রসাদের নাম প্রস্তাব করা হলে শ্রীহুমায়ুন কবির, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান প্রভৃতি তা সমর্থন করেন। শ্রীকবিরের গোষ্ঠীর শ্রীফণি দত্ত অন্য একটি নাম সভাপতি হিসাবে উত্থাপিত করতে চাইলে সভায় প্রচণ্ড গোলমালের সৃষ্টি হয়। এমন কি ধস্তাধস্তিও শুরু হয়। শ্রীমহামায়াপ্রসাদ শ্রীমুখার্জীর গোষ্ঠী থেকে আরও প্রতিনিধি নেওয়ায় কবিরের সমর্থকরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং গত দু'দিন থেকে তারা শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের পরিবর্তে শ্রীচরণ সিংকে সভাপতি করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ভারতীয় ক্রান্তিদলের প্রতিনিধিদের একাংশ রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য দলের সমস্ত বিধানসভার সদস্য এবং দলত্যাগীদের নিয়ে একটি সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

দেশী সংবাদ

৬ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে শান্তির জন্য সমস্ত রকম ঘেরাও, ধর্মঘট, লক-আউট, লে-অফ এবং ছাঁটাই আপাতত স্থগিত রাখা হোক। আজ মহাকরণে রাজ্য মন্ত্রিসভা এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে সর্বসম্মত এই অভিমত ব্যক্ত হয়। বৈঠকে সভাপতি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

৭ নবেম্বর—সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটে গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ক্রান্তি দলের ভূমিকা সম্পর্কে নয়াদিল্লিতে বেশ বিভ্রান্তি ও সংশয় দেখা দিয়েছে। শ্রীহুমায়ুন কবির চেয়েছিলেন যে, এই রাজ্যে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেস-ক্রান্তি দল কোয়ালিশন গঠিত হোক। তাঁর পরিকল্পনা-মাফিক কাজ এখন যে হল না এতে কোন সন্দেহ নেই।

৮ নবেম্বর—রাজ্যের সর্বশেষ রাজনৈতিক এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট নিয়ে আজ সকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর দিল্লি যাচ্ছেন। একই বিমানে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদক ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং নবগঠিত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও রাজধানীতে যাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যাবশ্যক পণ্য আইন (১৯৫৫) অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্য সংগ্রহ আদেশ (১৯৬৭) জারি করেছেন। এই আদেশ দ্বারা আউশ ও বোরো ছাড়া অন্য ধানের উপর পর্যায় ভিত্তিতে লেভি ধার্য হবে এবং গত ৬ নবেম্বর তারিখ থেকে এই আদেশ বলবৎ বলে ধরা হবে।

৯ নবেম্বর—গতকাল সম্পূর্ণ মহারাণী সমিতির যে ৪২ জন এম এল এ-কে স্পীকার সাসপেনড করেছিলেন তাঁদের ভেতর ৩৩ জন আজ দুপুরের পর স্পীকারের আদেশ অমান্য করে বিধান পরিষদে জোর করে ঢুকবার অটুট সঙ্কল্প নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে বিধানসভার সিংহদ্বারে পৌঁছলে পুলিস তাঁদের সকলকে গ্রেফতার করে।

১০ নবেম্বর—গত মাসে আসাম সেক্রেটারিয়েট ভবন উড়িয়ে দেবার চেষ্টার পর, অন্তর্ঘাতিকরা আজ আবার ডেপুটি কমিশনারের আদালত ভবন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। সন্ধ্যা সাতটায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে

আদালত ভবন কেঁপে ওঠে। জানালার কাচ ও দরজা ভেঙে যায়, দেয়ালের প্লাসটার খসে পড়ে।

রাজ্য সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গতকাল এক অর্ডিনান্স জারি করে বিলাস দ্রব্যাদি, কৃষি থেকে আয়, বিদ্যুৎ ও প্রমোদ শুল্কের হার বৃদ্ধি করেছেন। এর ফলে রাজ্য সরকারের বার্ষিক আয় প্রায় সোয়া চার কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

১১ নবেম্বর—নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পূরনের আর কোন অবকাশ নেই। এমন দৃষ্টি দিতে হবে ব্যয় সংকোচের উপর। রাজ্যপাল সম্মেলনে আজ একথা বলেছেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। শ্রী দেশাই আরও বলেন, রিজারভ ব্যাংক থেকে ওভারড্রাফট নেওয়ার অভ্যাস রাজ্যগুলিকে ত্যাগ করতে হবে।

প্রবীণ দেশকর্মী লোকসভার সদস্য শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় আজ দিল্লিতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর। লোকসভার আসন্ন অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান কৃষ্ণনগর। ওই কেন্দ্র থেকেই নির্দলীয় সদস্যরূপে পর পর দু'বার তিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। স্বর্গত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তিনি ঢাকার

অভয় আশ্রমে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে তাঁর একমাত্র পুত্র সেকেনড লেঃ অভিজিৎ প্রাণ হারান। তাঁর স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং একটি নাতি বর্তমান।

১২ নবেম্বর—আজ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোরডের সভায় কোন আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও বোরড সাধারণভাবে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রনট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে কংগ্রেসের কোন বিকল্প সরকারকে সমর্থন করা উচিত।

বিদেশী সংবাদ

৬ নবেম্বর—হাসপাতালে আহতদের অনেকের মৃত্যু হওয়ায় গতকাল রাত্রে দক্ষিণ লনডনে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা আজ সকালে ৫১-তে উঠেছে। লনডন ডিজেল একসপ্রেস ট্রেনটি লাইনচ্যুত হলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

৭ নবেম্বর—বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ মসকোর রেড স্কোয়ারে রাশিয়ার সমরশক্তির বৃহত্তম মহড়া শুরু হয়। মহড়ায় রাশিয়ার হাইড্রোজেন বোমাবাহী ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ প্রদর্শিত হয়। রাশিয়া দাবি করে যে, ওই সব ক্ষেপণাস্ত্র পৃথিবীর যে কোন স্থানে হাইড্রোজেন বোমা ফেলতে পারে। রাশিয়া এ দাবিও করেছে যে, ওই সব অস্ত্রের সাহায্যে সে পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে।

৮ নবেম্বর—শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়েই পিকিং ক্ষেপণাস্ত্র চর্চায় এগিয়ে চলেছে। চীন শক্তিশালী রকেট মারফত মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিরিখ করে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বানানোর বদলে চীন পড়শীদের ভয় দেখাতে মাঝারি পাল্লার একটি ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে পারে। চীন বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী সিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে এই কথা বলেন।

৯ নবেম্বর—গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আববা ইবান আরব দুনিয়ার মুখপাত্র হিসাবে কাজ করছে বলে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ইবনের মতে নিরাপত্তা পরিষদে "ভারতের খসড়া" বলে যে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আসলে সেটি আরবের খসড়া।

১০ নবেম্বর—"পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধানে কোন্ নীতি সর্বাধিক উপযোগী হবে, স্বস্তি পরিষদকে তা পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে হবে।" স্বস্তি পরিষদের গত রাত্রের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীপার্থসারথি এই দাবি জানান।

১১ নবেম্বর—প্রেসিডেনট জনসন নি[illegible] এলাকায় মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে [illegible]চনার জন্য আজ হানয়ের কাছে আ[illegible]দন জানিয়েছেন। সমুদ্রের উপর কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা সম্পর্কে এই আলোচনা চলতে পারে বলে তিনি জানান।

১২ নবেম্বর—আজ টোকিয়োতে তাদানোসিন উই (৭৩) নামক এক বৃদ্ধ আইনজীবী প্রধানমন্ত্রী সাটোর সরকারী বাসভবনের সামনে নিজের মাথায় পেটরোল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ওয়াশিংটন পরিদর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর এই প্রতিবাদ। তাঁকে গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। /

ওদের দেখতে একরকম নয় কিন্তু ওরা সকলেই ব্যবহার করে

ক্রুকস্ ল্যাক্টো-ক্যালামাইন-

সর্বাঙ্গসুন্দর মেকআপ

ক্রুকস্ ল্যাক্টো-ক্যালামাইন কমনীয় ত্বকের পক্ষে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রলেপ। প্রসাধনচর্চায় আপনার ত্বকের জন্য অন্য কোন প্রসাধনদ্রব্য সত্যিই আর দরকার হবে না! অপরূপ মোলায়েম ক্রুকস্ ল্যাক্টো-ক্যালামাইন ত্বকের সমস্ত ত্রুটি সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করে ও ত্বককে নিখুঁত করে তোলে।

সৌন্দর্যচর্চায় একটি গোপন কথা

আপনি কি আপনার ত্বকের ত্রুটির জন্য সত্যিই চিন্তিত? তাহ'লে প্রত্যহ ত্বকের ওপর ক্রুকস্ ল্যাক্টো-ক্যালামাইন-এর মনোরম প্রলেপ দেওয়া শুরু করুন। এর বিশিষ্ট উপাদান ক্যালামাইন-এর স্নিগ্ধ আরামদায়ক স্পর্শে ও উইচ হেজেল-এর তীব্র কার্যকারিতার গুণে আপনার ত্বকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ তা আরো পরিষ্কার, আরো কমনীয়, আরো লাবণ্যময় হয়ে উঠবে।

নিখুঁত অনুপম সৌন্দর্যের জন্য

ক্রুকস্ ল্যাক্টো-ক্যালামাইন

সব সময় ক্রুকস-এর প্রতীকটি ও
শিলকার-এর ক্রুকস্ সীল দেখে নেবেন

আপনার সৌন্দর্যবিকাশে অন্যান্য প্রসাধনদ্রব্য
ল্যাক্টোক্যালামাইন ট্যালকম পাউডার ও ক্রীম
ক্রুকস ইনটারফ্রান লিমিটেড, বোম্বাই-২০

CIL. 72 BN

স্মরণীয় ৭ই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপকুমার দাশ

রূপসীদের সাধের স্বপ্ন এই সু-কোমল, রঙিল-সুন্দর বিনীর খাঁটি সিল্কের শাড়ী। কী ঝলমলে‥ অপরূপ…

বিনীর খাঁটি সিল্কের শাড়ী ঠিক আপনার স্বপ্নকেই ফুটিয়ে তুলেছে রূপে, রঙে, সমুজ্জ্বল সুষমায়। বিনীর খাঁটি সিল্কের শাড়ী, খাঁটি জর্জেট, কোমল সিল্ক, শট সিল্ক

W CLUES

(1) The face of Nature as presented to us is infinitely varied, but to those who love her it is ever Beautiful|Wonderful and interesting.

(2) The highest form of Beauty|Morality is that which is joyful and spontaneous; and the highest form of art is that which can transform nature itself into its theme.

(3) The natural condition of all living beings is the condition of Calmness|Happiness.

(4) If Civilization|Education is to be bound up with material advancement we must accept its inevitable consequence, loss of freedom in exact proportion to the forward march.

(5) We must face the hard truth of history that mere political merger does not lead to national unity, unless there be an under-current of Cultural|Emotional unity.

(6) There will always be a gulf between principles and practice, between the ideal and the actual. That is unavoidable in this Deceptive|Defective world.

(7) Even Defeat|Despair is a grim teacher when one doesn't lose balance.

(8) In the small as well as in the big things of life, we have to sacrifice ourselves, our desires, our interests, our ambitions, for the General|National good.

(9) Ego is not pride alone as commonly thought. It can lurk very well in Humility|Sanctity too.

(10) Unfortunately, the world is so constituted that Ideal|Moral conduct, more often than not, pays no dividends in material goods or comfort.

(11) All the great Ideals|Ideas of humanity are pang-born.

(12) So long as life lasts nothing can be Ignoble|Inactive.

(13) The artist's approach to Infinity|Reality is different from both the scientist's and the religious man's.

(14) If freedom, if democracy, is to survive in the world along with Justice|Peace, then we must look to religion with its faith in man to realize it for us.

(15) Affection and Loyalty|Magnanimity are of the heart, they cannot be purchased in the market-place, much less can they be extorted at the point of the bayonet.

(16) In India cultural diversity is most pronounced in the realms of religion and philosophy, while the realm of the individual in economic and Political|Social matters needs to be widened.

(17) Selfishness|Weakness of any kind is the root of all evil.

দ্রষ্টব্য :—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে সিটিকুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

বাংলা সূত্রের জন্য আগামী সংখ্যা দেখুন।

॥ সমরেশ বসুর ॥

নবযুগের সূচনাকারী দু'খানি সমগোত্র উপন্যাস

বিবর

সপ্তম মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

স্বীকারোক্তি

দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

সমরেশ বসুর "বিবর" সম্বন্ধে আজ নতুন করে বলার কিছু নেই। এই উপন্যাসটির খ্যাতি এখন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পরিব্যাপ্ত। "স্বীকারোক্তি" তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস; এখনও পর্যন্ত অনেকেই হয়তো এ বইটি পড়ে উঠতে পারেন নি। সুতরাং এটি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করা যাক। বক্তব্যটি অবশ্য আমাদের নয়, "দেশ" পত্রিকার সমালোচকের—৪ নভেম্বর, ৬৭ তারিখে প্রকাশিত।

"বিবরের পর স্বীকারোক্তি—সমরেশ বসুর সাম্প্রতিক চিন্তার উত্তরণের স্পষ্টতর চিহ্ন। বলা যায়, দুটি উপন্যাসই একই জমির ফসল। বিবরে যে মন্তব্য যে আকারে পরিবেশিত হয়েছিল তাতে আকস্মিকতার চমক ছিল বলেই হয়তো সকলে সমানভাবে মেনে নিতে পারেন নি। স্বীকারোক্তিতে পরিণতির দীপ্তি আরও সহজ, সাবলীল। ......এক নির্মম কঠিন স্থির সত্য ও উন্মোচনের মুখোমুখি *নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেয়—স্বীকারোক্তির সর্বোপরি সার্থকতা এইখানে।"*

আশাপূর্ণা দেবীর

রাতের পাখি

আশাপূর্ণা দেবীর "রাতের পাখি" উপন্যাস একই পুরুষকে ঘিরে দুই যমজ বোনের অভিনব প্রেমের কাহিনী।

দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

মনোজ বসুর

স্বর্ণসজ্জা

দক্ষিণ বাংলার বাদা অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত "স্বর্ণসজ্জা" গাঙ-খাল আর নৌকো-মানুষদের রোমাঞ্চকর উপাখ্যান।

দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

॥ বুদ্ধদেব বসুর ॥

একখানি অনন্যসাধারণ উপন্যাস এবং একখানি অভূতপূর্ব নাটক

পাতাল থেকে আলাপ

দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

"জনপ্রিয় ফিল্ম-স্টারের জীবন নিয়ে শুধু 'স্যাটায়ার' বললে 'পাতাল থেকে আলাপ'কে খর্ব করা হয়। বরঞ্চ বলতে পারি, আধুনিক ফিল্ম-স্টারের জীবনের একটি নিখুঁততম বাস্তব প্রতিচ্ছবি রাজীব, রাজীবলোচন, রাজীবকুমার, রাজীব নন্দী।......ফিল্ম-স্টারের জীবনের ভিত্তিতে এতকাল যেসব কাহিনী পেয়েছি—বইয়ের পাতায় অথবা সিনেমার পর্দায়, তা ভাসা-ভাসা। বুদ্ধদেব বসু পাতাল খুঁড়ে তাঁর গল্প টেনে নিয়ে এসেছেন।" (দেশ—১১ নভেম্বর, ৬৭)

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ৩·০০

"তপস্বী ও তরঙ্গিণী" একটি চার অঙ্কের দৃশ্যকাব্য। এক অপাপবিদ্ধ তরুণ ঋষিকুমার এবং স্বর্ণপ্রতিমা পরম কলাবতী এক বারাঙ্গনার পুরাণোক্ত একটি প্রণয়-কাহিনীকে স্বনামধন্য কবি বুদ্ধদেব বসু এ নাটকে এক অসামান্য শিল্পরূপ দান করেছেন। সঞ্চার করেছেন এতে আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দুজন মানুষ, দুটি নরনারী, কেমন করে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো—নাটকটির মূল বিষয় হলো এই।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

অফিস: ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্র: ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৬৪

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪
শনিবার ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক "	১৪.০০
ত্রৈমাসিক "	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক "	১৪.০০
ত্রৈমাসিক "	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষাণ্মাসিক "	২০.০০
ত্রৈমাসিক "	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
আসামে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH

Saturday 25 Nov. 1967

নতুন কর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক অবস্থা আপাতত বিশেষ সুবিধের নয়। বাজেটে ইতিপূর্বে যে ধরনের ঘাটতি দেখানো হয়েছিল তা থেকে পূর্ববর্তী বছরের উদ্বৃত্ত অর্থ বাদ দিলেও মোটামুটি আঠারো কোটি টাকার মতন দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে সে ঘাটতি আরও বেড়েছে। স্বভাবতই সরকারের আর্থিক দুর্গতি যথেষ্ট, আর অর্থ বিনা সরকারের দিন চলা দায়। ঘাটতি পূরণের জন্যে নতুন কিছু কর বসানো হবে বলে আগেই শোনা গিয়েছিল; সম্প্রতি তার বিবরণ জানা গেল। অবশ্য শ্রীজ্যোতি বসু এ-যাবৎ নতুন কর কী ধরনের হতে পারে তার কোনো আভাস দেন নি। আকস্মিকভাবেই নতুন কর বসানো হয়েছে যে তা হয়ত নয়, কিন্তু যেভাবে হয়েছে তাতে আমরা খানিকটা বিস্মিত হতে পারি। অর্ডিনান্স মারফত গত শুক্রবার নতুন করের নির্দেশনামাটি কার্যকর করা হয়েছে। এটি সঙ্গত হয়েছে কি হয় নি তার সম্পর্কে কিছু বলা চলে।

সরকারী প্রশাসনের জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নেই, রাজ্য সরকারের তহবিলের ঘাটতি পূরণও প্রয়োজন। কিন্তু ঠিক এইভাবে অর্ডিনান্সের আশ্রয় নিয়ে কর বসানোর প্রয়োজন কি সত্যিই ছিল? আমরা, যারা কথায় কথায় গণতন্ত্রের দোহাই পাড়ি, এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে গণতন্ত্র রসাতলে গেল বলে চেঁচাই—তারা নিশ্চয় অর্ডিনান্সের আশ্রয়ে এই নতুন কর বসানোর ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করতে চাইছি। সাধারণত এইভাবে কর বসানো যায় না, গণতন্ত্রে নয়। বিধানমণ্ডলীর অধিবেশনেই এটা হয়ে থাকে; নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জ্ঞাতসারে। বস্তুত নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই সে এক্তিয়ার দেওয়া আছে। সরকারের প্রস্তাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিধানমণ্ডলীই নেবেন—এটাই রেওয়াজ। দুঃখের বিষয় রাজ্য সরকার, যাঁরা সব বিষয়েই জনতার সম্মতি, জনগণের সমর্থন খোঁজেন, তাঁরা জন-প্রতিনিধিদের বিন্দুবিসর্গ না জানিয়েই এই নতুন কর বসালেন। এর প্রয়োজন ঠিক যে কতটা ছিল জানি না। এই ক'মাস যদি নতুন কর না বসিয়ে রাজ্য সরকার তাঁদের আর্থিক অনটন সামলে রাখতে পেরে থাকেন তবে আর মাত্র একটা মাস কি তাঁদের চলত না? বিধানসভার অধিবেশনেই ব্যাপারটি চুকিয়ে ফেলা যেত! কিংবা যদি এমনই হয়, আর্থিক সংকট অতি তীব্র, তবে এই ক'মাসের মধ্যে বা অচিরে অধিবেশন ডেকে কাজটা হতে পারত। বলা বাহুল্য, রাজ্য সরকারের পক্ষে যেভাবে তড়িঘড়ি কাজটি সারা হয়েছে তাতে জনপ্রতিনিধিদের অধিকার তাঁরা ক্ষুণ্ণ করেছেন।

নতুন করের সবচেয়ে বিসদৃশ ব্যাপার হল 'শো ট্যাক্স'। এ ধরনের একটি ট্যাক্স এ-রাজ্যে ছিল না। প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের কাছ থেকে এই কর নেওয়া হবে, প্রতি 'শো'-তে দর্শকসংখ্যা অনুযায়ী। শোনা যাচ্ছে, এর ফলে প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহের পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা বাড়তি খরচ হবে মাসে। সিনেমা-টিনেমা যাঁরা দেখেন, কেই বা না দেখেন, তাঁদের বাড়তি খরচও কিছু কম হবে না—অর্থাৎ এখনকার থেকে দেড় গুণ বেশী দামে টিকিট কাটতে হবে। অন্যান্য করসংক্রান্ত প্রস্তাব অবশ্য পুরোনো কিছু ট্যাক্সেরই হেরফের : বিক্রয়-কর, কৃষি-আয়ের উপর ট্যাক্স, বিদ্যুৎ-শুল্ক, প্রমোদ-কর—এরই কিছু হেরফের। বিলাসদ্রব্যের ওপর বিক্রয়-কর কিঞ্চিৎ বাড়ানো হয়েছে, তার আওতাও বাড়ানো হয়েছে, গুটি দশ-বারো জিনিস বিলাসের ফর্দে ঢুকেছে। বিজলী-করের বেলায় ছোট সংসারের পক্ষে সুবিধে হয়েছে, বড় সংসার ও অফিস-টফিসের বেলায় অসুবিধা হবে, কারণ ষাট ইউনিটের ওপর বিদ্যুৎ-শুল্ক আদায় করা হবে চড়া হারে। প্রমোদ-কর মন্দ বাড়ছে না, অন্তত বেশী দামের টিকিটের বেলায়। কৃষি-আয়ের ওপরও কর বাড়ছে।

একটা হিসাব-মতন দেখা যাচ্ছে, সরকার নতুন কর বসিয়ে পুরো বছরে যা আয় করতে পারতেন তার পরিমাণ সাড়ে চার কোটি টাকার বেশী নয়। এই ভাঙা বছরে তার পরিমাণ মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হতে পারে বড় জোর। অথচ আমাদের ঘাটতির আনুমানিক পরিমাণ হয়ত শেষ পর্যন্ত তিরিশ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঘাটতি মেটানো দূরের কথা, ইতিমধ্যে সরকার অনেকগুলি দায় কাঁধে নিয়ে ফেলেছেন, ফলে ঘাটতি বেড়েছে। কিভাবে যে আর্থিক দিকটা সরকার সামলাবেন জানি না।

সারা কলকাতা জুড়ে যে কথাটা জোরাও করে প্রচার করা হচ্ছে সেটা 'বেইমান'। কিছু কিছু দলগত পত্রপত্রিকায় তর্জনী তুলে বলা হচ্ছে "সোনার বাংলায় আবার দেখা দিয়েছে মীরজাফর-উমিচাঁদ।" ঘোষণা করা হচ্ছে, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে এবং এই চক্রান্তের "নাটের গুরু" রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সামনে আগেও যে সংকট দেখা দিয়েছিল তখনও বলা হয়েছিল, চক্রান্তের পিছনে ছিলেন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। অভিযোগ করা হয়েছে লোকসভায় যে, কেন্দ্রের দলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজ্যপালকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সংবিধানকে সামনে রেখে রাজ্যপালের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা যার ফলে, রাজ্যপাল নিজ দায়িত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে দিতে পারেন।

প্রশ্নটা সংবিধানগত। রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতা আছে কি নেই? যদিই বা থাকে কোন অজুহাতে রাজ্যপাল সে ক্ষমতা প্রয়োগ করে মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে দিতে পারে? সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে বলে? ওই একই কারণে, অর্থাৎ রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে, মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, রাজ্যপাল কি নির্দেশ দিতে পারেন মন্ত্রিসভাকে তাঁর মনোনীত দিনে বিধানসভা আহ্বান করার জন্য? এমনিতর আরও কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো সংবিধান বহির্ভূত নয়। আছে বলেই মন্ত্রিসভা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোনরূপ সরকারী [illegible] জারি করার আগে সংবিধানগত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামতটা জেনে নেওয়া উচিত। সুপ্রিম কোর্টের মতামত জানার একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি অনুসারে, রাজ্য মন্ত্রিসভা ইচ্ছে করলে, সংবিধানগত প্রশ্নগুলোর মীমাংসা দাবি করতে পারেন ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার এ দাবি রাষ্ট্রপতি মেনে নেবেন কি না, সেটা পরের কথা। মূল কথা রাজ্য মন্ত্রিসভা ইচ্ছে করলে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্ট সরকার রাজ্যপালের কাছে নালিশ জানিয়েছেন। এই নালিশ করার সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে এমন একটা শেষ মুহূর্তে যে সময় পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, বিধানসভার অধিবেশন এগিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত না নিলে, মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে পারে। রাজ্যপাল বরখাস্ত করতে পারেন। ঠিক এমনি একটা আশঙ্কার মধ্যেই মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত করেছেন রাষ্ট্রপতির কাছে, সুপ্রিম কোর্টের কাছে, সংবিধানের প্রশ্নগুলো মীমাংসা করে নেওয়া।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যুক্ত ফ্রন্ট সরকার আত্মরক্ষার স্ট্র্যাটেজী হিসাবেই এই পথ বেছে নিয়েছেন। এমনকি এ-ও বলা চলে যে, সংবিধানগত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে রাখার এক নূতন চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে তুলে ধরেছেন। মন্ত্রিসভার এ সিদ্ধান্ত নেবার কয়েকদিন আগেই বামপন্থীর সংসদ সদস্য শ্রীঅরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জি এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করেছিলেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে। শ্রীচ্যাটার্জি একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এবং তিনি যখন সংবিধানগত নির্দেশগুলো ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন এই সন্দেহটাই থেকে গিয়েছিল যে, রাজ্যপালের পক্ষে হয়ত মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করা খুব সহজসাধ্য নয়। হয়ত সংবিধানগতও নয়।

এ সম্পর্কে একটা যুক্তি দেখান হয়েছে যে, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে 'নিয়োগ' করেন, এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রিসভার সদস্যদের 'নিয়োগ' করেন। সংবিধানে 'নিয়োগ' কথাটা কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা স্পষ্ট করা হয়নি বলেই অনুমান করে নেওয়া হয়েছিল যে, 'নিয়োগ' করার ক্ষমতা যার হাতে আছে 'বরখাস্ত' করার ক্ষমতা তাঁর হাতে। অর্থাৎ রাজ্যপালের হাতে। কিন্তু বিপক্ষ আইনজ্ঞদের মতে, রাজ্যপাল ও মন্ত্রিসভার সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের মত নয়। কারণ, মন্ত্রিসভা রাজ্যপাল কর্তৃক 'নিযুক্ত' হলেও তার প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব রাজ্য বিধান সভার কাছে। রাজ্যবিধান সভা রাজ্যপাল কর্তৃক 'নিযুক্ত' নয়। সে-কারণেই, মন্ত্রিসভাকে জবাবদিহি করতে হয় বিধানসভার কাছে, রাজ্যপালের কাছে নয়। সে কারণেই মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত বা বাতিল করতে পারে একমাত্র বিধানসভা।

এ প্রশ্নও যদি তোলা হয় যে, মন্ত্রিসভা বিধানসভার আস্থা হারিয়েছেন বলে রাজ্যপাল মনে করেন এবং তা [illegible] রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার উপর পরোয়ানা জারি করতে পারেন, তাহলে পাল্টা প্রশ্ন নিশ্চয় উঠতে পারে যে, সে ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিধানসভার অধিকারগত প্রশ্নের উপর আঘাত করছেন কি না। কারণ, মন্ত্রিসভার উপর খবরদারি করার দায়-দায়িত্ব বিধানসভার এবং এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংবিধানে।

কাজেই আজ যদি সংবিধানগত প্রশ্নগুলো বিচার করে দেখার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানান হয়, তাহলে এটা অনুমান করে নিতে হবে যে, নিছক রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও নীতিগত পদ্ধতির কথা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এই নীতিগত প্রশ্নগুলো এসেছে বলেই আজ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কথাটা গৌণ হয়ে পড়েছে। সেই একই কারণে, আজ যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পক্ষে রাজনীতিকে নীতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে না করার হেতু নেই। এই প্রতিষ্ঠাবোধ সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে বলেই আজ 'বেইমান', 'চক্রান্ত' এই সব কথাগুলো খুব সহজভাবে কলকাতার বুকে এঁকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সহজ হয়েছে 'প্রতিবাদের তুফান উঠুক' বলে শ্লোগান তুলতে।

রাজনীতির পাল্লায় ভারসাম্য দেখা যাচ্ছে না বলেই আজ একটা অসহায়ভাব দেখা দিয়েছে যুক্ত ফ্রন্টের প্রতিপক্ষ দলে। প্রতিপক্ষ দলের নেতা হিসাবে শ্রীহুমায়ুন কবীর ঘোষণা করছেন, শ্রীঅজয় মুখার্জির মন্ত্রিসভাকে আর একদিনও বরদাস্ত করা উচিত নয়। সেই সঙ্গে এ কথাও বলছেন, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে কম্যুনিস্টদের মত "প্রতিক্রিয়াশীলদের" রাজনীতির আসরে অপাঙক্তেয় করে দিতে হবে। অর্থাৎ রাজনীতির লড়াইয়ে, শ্রীকবীর তাঁর সামনে, এবং সেই সুবাদে তাঁরই হাতে গড়া ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের "প্রগ্রেসিভ" ডেমক্র্যাটিক্ ফ্রন্টের সামনে, দুটি বিভিন্ন ধর্মী প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করেছেন। শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বের বিরোধ অনেকদিনের এবং ২ অক্টোবরের পর সে বিরোধকে শ্রীকবীর অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়েছেন, যার নিষ্পত্তি ইস্তোহারে হয়নি। কারণ হওয়া সম্ভব ছিল না বলে। যে বিরোধকে সামনে রাখার জন্য তিনি তাঁর রাজনীতিকেও ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে তাঁকে নির্বাচনের আসরে নামতে হয়েছিল, সেই প্রচারকে ব্যর্থ করে দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করতে-হয়েছে ইস্তাহার কমেন্সমেন্টে।

ফলে, শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে রাজনীতির চাকাটাকে আর এক পাক ঘুরিয়ে আনতে কোন অসুবিধা হয়নি। গত ২ অক্টোবরের

ঘটনার পর. শ্রীঅজয় মুখার্জির রাজনৈতিক চেহারায় যে মালিন্য দেখা দিয়েছিল, সেটা আরও বেশী মলিন করে দেবার চেষ্টাই হয়ত করেছিলেন শ্রীকবীর। কিন্তু দুই প্রতিপক্ষকে সামনে রেখে রাজনীতির লড়াই দুর্বল হতে বাধ্য। শ্রীকবীর যদি তাঁর রাজনীতির লড়াইটা ভারতীয় ক্রান্তি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলে হয়ত শ্রীমুখার্জির পক্ষে অবস্থাটা এত সহজ হয়ে উঠত না। কিন্তু যে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে শ্রীকবীর স্লোগান দিলেন, সেই কম্যুনিস্ট পক্ষ 'প্রতিবাদের তুফান' তুলে শ্রীঅজয় মুখার্জির রাজনৈতিক চেহারাটা অনেক উপরে তুলে দিয়েছে। যুক্ত ফ্রণ্টের সংকটকে সামনে রেখে, আজ এক শক্তিশালী ক্যাম্প গড়ে উঠেছে কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে। এই সম্মিলিত অ-কংগ্রেসী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে শ্রীঅজয় মুখার্জির মালিন্য সম্পূর্ণ দূরে সরে গিয়েছে। শ্রীকবীর বা যুক্ত ফ্রণ্ট দলত্যাগী গোষ্ঠীর তুলনায় এই নূতন অ-কংগ্রেসী সম্মিলিত ক্যাম্প অনেক বেশী শক্তিশালী। এই নূতন রাজনৈতিক অবস্থায় বিধানসভায় যুক্ত ফ্রণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কি, নেই —সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক প্রশ্নটাই বড় করে দিয়েছেন শ্রীকবীর।

তাই, তীব্র শ্লেষ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি বলেছেন, এই সংকট যুক্ত ফ্রণ্টের মধ্যে একতা এনে দিয়েছে। এবং মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক মিল আছে। এই মিলের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজতে গেলেও দেখা যাবে শ্রীকবীর এবং কম্যুনিস্টদের মধ্যে কোন অমিল নেই। যুক্ত ফ্রণ্টের বর্তমান সংকট একটা কথাই তুলে ধরেছে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের সামনে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা আছে বলেই দলত্যাগ করে সংকট সৃষ্টি সহজ হয়। এই সংকটকে দূরে সরিয়ে রাখা তখনই সম্ভব যখন রাজনৈতিক অস্পষ্টতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পোলারাইজেশন সম্ভব হয়। এই পোলারাইজেশনের দিকে দৃষ্টি রেখেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি অন্তর্বর্তি-কালীন নির্বাচনের স্লোগান দিয়েছে। শ্রীকবীরও মনে করেন কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে নির্বাচনী আসরে শক্তি পরীক্ষা হয়ত সহজ হবে।

সহজ হবে কিনা, সেটা পরের। বর্তমানের কথা, কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট গোষ্ঠী হিসাবে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিকে ভাগ করে নেওয়া। কিন্তু যুক্ত ফ্রণ্টের সংকটে এখনি তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, শ্রীঅজয় মুখার্জির মত মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদেরও বলতে হচ্ছে, ব্যাপক গণ আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে, তুফান তুলতে হবে দিকে দিকে, যে তুফানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গের "মেহনতী মানুষের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার, রক্ষিত হবে গণতন্ত্র, বাঁচার পথ পাবে যুক্ত ফ্রণ্ট সরকার, জয়ী হবে কৃষকের ফসল রক্ষার লড়াই।" যে-কোন কারণেই হোক, আজ মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতৃত্বকে গণতন্ত্রের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের আহ্বান দিতে হয়েছে। যুক্ত ফ্রণ্টকে বাঁচিয়ে রাখার আবেদন জানাতে হয়েছে।

কিন্তু সামনে যে স্লোগানই রাখা হোক, পিছনের একটা দ্বন্দ্বকেও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতৃত্বর পক্ষে চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এই পিছনের দ্বন্দ্বের চ্যালেঞ্জটা এসেছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের সমগোত্রীয় উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে। এই চ্যালেঞ্জের রূপটাকে বদলে দেবার জন্যই হয়ত যুক্ত ফ্রণ্টকে বাঁচিয়ে রাখার স্লোগান দেবার সঙ্গে মার্ক্সিস্ট নেতৃত্বকে বলতে হয়েছে উগ্রপন্থীরা যুক্ত ফ্রণ্টের পতন ঘটিয়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসাতে চায়। এক কথায় বলা হয়েছে, উগ্রপন্থীরা "কংগ্রেসের দালাল।" বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উগ্রপন্থীদের আঁচ থেকে পার্টির কাঠামোকে বাঁচাবার জন্যই এই দ্বন্দ্বকে যুক্ত ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে "চক্রান্ত"র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদ এসেছে উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে। প্রতিবাদের জের টেনে বলা হয়েছে, "আমরা চাই যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের মুখের দিকে না তাকিয়ে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে চালিয়ে যান, কৃষিবিপ্লবের সহায়ক শক্তি হয়ে দাঁড়ান।" চ্যালেঞ্জের সুরেই বলা হয়েছে, যুক্ত ফ্রণ্ট-সরকার যদি এই আন্দোলনে এবং কৃষিবিপ্লবে সহায়তা না করে বাধা সৃষ্টি করেন তাহলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেমন আগুন জ্বালা হয়েছিল, তেমনি যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধেও "জনগণের রোষ-বহ্নি আমরা জাগ্রত করবই।" মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতৃত্বকে "অপাঙক্তেয়" করার জন্য আজ উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য আওয়াজ তোলা হয়েছে পার্টির ভিতরে যে-সব উগ্রপন্থী সদস্য আছেন তাদের উদ্দেশ্যে। এ আওয়াজ দেওয়া হয়েছে পার্টিকে কব্জা করার জন্য, তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের জন্য নয়।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের কাছে এ কথাটা অজানা নেই। অজানা নেই বলেই, পার্টির নেতৃত্বকে আজ যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারকে বাঁচাবার জন্য "কংগ্রেস বিরোধী রোষ ধারা" বইয়ের দেবার জন্য সর্ব সংগঠন নিয়োগ করতে হচ্ছে। বর্তমান নেতৃত্বের আওতায় পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচনের দাবি জানাতে হয়েছে। সে নির্বাচনে যদি পোলারাইজেশন সম্ভব হয়, তাহলে কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট দুই ক্যাম্পে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিকে ভাগ করে নেওয়া সম্ভব হবে। এই রাজনৈতিক ভাগাভাগির একটা বড় অংশ যদি মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির আওতায় চলে আসে, তাহলে শুধু উগ্রপন্থীদের নয়, কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনীতির মোকাবিলা করা হয়ত সম্ভব হবে।

শ্রীকবীরের পক্ষে এই সম্ভাবনা যে-ভাবেই দেখা দিক না কেন, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে এটা হবে বড় চ্যালেঞ্জ। কংগ্রেসের সংগঠন যদি শক্তিশালী হবার সুযোগ পায়, তাহলে হয়ত এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। কিন্তু সে-শক্তি দুর্বল হবার আশঙ্কা থাকবে যদি যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের বর্তমান সংকটকে রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রয়োগের প্রলোভনের পথ খুলে দেবার জন্যই হয়ত যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ১৮ ডিসেম্বর বিধানসভা ডাকার যে সুপারিশ করেছিল তা থেকে এগিয়ে আসতে সম্মত হয়নি। এর পিছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে তার একটা সম্ভাবনা অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচন। সে-সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে হয়ত রাষ্ট্রপতির কাছে সরাসরি আবেদন করা হয়েছে সংবিধানগত প্রশ্নগুলো সমাধানের জন্য। এই আবেদনের রাজনৈতিক চমক আছে বলেই প্রলোভনের পথটা আপাতত এড়িয়ে যাবার সুযোগ এনে দিয়েছে। এ সুযোগ উপেক্ষণীয় নয়।

দড়ি অনেকখানি ছাড়া হয়েছে —
N Kutty

ভারত-জারমান মৈত্রী

জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের ফেডেরল চ্যানসেলর ডঃ কুর্ট জর্জ কিসিংগার এ-সপ্তাহে ভারতের মহাসম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথি। ডঃ কিসিংগার এ-দেশে অপরিচিত নন; ভারতবর্ষে তিনি এর আগেও কয়েকবার এসেছেন। গত বছর যখন এসেছিলেন ডঃ কিসিংগার তখন ব্যাডেন-উরটেমবার্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ডঃ কিসিংগারের এবারের ভারত-সফর অন্যান্য-বারের তুলনায় আরও বেশী স্মরণীয় এবং অবশ্যই ভারত-জারমান মৈত্রী ও সহযোগিতার পক্ষে আরও আশ্বাসপ্রদ। ডঃ কিসিংগার এখন জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী; তাঁর পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী ডঃ এরহার্ড ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় সফরে আসবেন ঠিক হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে আসতে পারেন নি। ডঃ কিসিংগারের শুভাগমন তাই বিশেষভাবে উৎসাহব্যঞ্জক. জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী ডঃ কিসিংগারকে সকলেই আনন্দ সংবর্ধনা জানাবে, আশা করবে, ভারত সম্পর্কে তাঁর মত বিচক্ষণ সহৃদয় রাষ্ট্রনেতার আন্তরিক আগ্রহ আমাদের বহু বাস্তব ও জরুরী সমস্যা সমাধানের সহায়ক হবে।

জার্মেনীর সংগে ভারতের ভাবগত অন্তরংগতা অনেক কালের। ভারত সফরের প্রাক্কালে ডঃ কিসিংগার তাঁর শুভেচ্ছা বাণীতে তার উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শন প্রায় দুই শতাব্দীকাল ধরে জার্মান সুধীসমাজে বিশেষ সমাদর পেয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সাহিত্য শিল্প-দর্শনের লুপ্ত ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধারে জার্মেনীর বিদ্বজ্জনমণ্ডলীই আমাদের পথিকৃৎ। কান্ট হেগেল, গ্যয়টে ম্যাকসমূলার এবং আরও বহু খ্যাতনামা জারমান দার্শনিক সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। ভারত-বিদ্যার জন্ম ও প্রতিষ্ঠা খুঁজতে গেলে সর্বপ্রথম জার্মেনীতেই। জার্মেনীও প্রাচীন ভারতীয় ভাবৈশ্বর্য আবিষ্কার অনুশীলন ও চর্চা থেকে তার নিজের সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধি করতে পেরেছে। ঋণ এক্ষেত্রে দুদিকেই। ডঃ কিসিংগার তাঁর শুভেচ্ছাবাণীতে তার আভাস দিয়েছেন, কারণ তিনিও আরও বহু জার্মান সুধীর মত ভারত-বিদ্যার অনুরাগী।

জার্মেনীর কৃতিত্ব ও গৌরব অবশ্য কেবল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়। আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে জার্মেনীর বিচিত্র ও বিপুল যন্ত্রশিল্প কৌশল এবং জার্মেনীর শক্তিমত্তা। জার্মান জাতির শৌর্যবীর্য অধ্যবসায় ও কঠোর নিয়মনিষ্ঠা অতুলনীয়, আমরা সে-বিষয়ে অবহিত হয়েছিলাম বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকেই। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ বিরোধ ও ক্ষমতাদ্বন্দ্বের ইতিহাস জটিল; সে-ইতিহাসের ভালোমন্দ

জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ডঃ কিসিংগার

বিচার, কার দোষ কতখানি সে-হিসাব আপাতত নিরর্থক। তবে ব্রিটেনের সংগে জার্মেনীর বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এককালে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়তা করেছিল, সেটা ভুলবার নয়। বহু ভারতীয় বিপ্লবী জার্মেনীতে আশ্রয় পেয়েছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাংলার বিপ্লবীদের বিদ্রোহ চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় বটে; কিন্তু সে-বিদ্রোহ চেষ্টার জন্য জার্মেনী অকাতরে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সাহায্য দিতে উদ্যোগী হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালে জার্মেনীতে নেতাজীর উদ্যোগ আরও বৃহৎ। জার্মেনীর কাইজার-তন্ত্র এবং নাৎসীতন্ত্রের গুণাগুণে বিচারের কূটতর্ক এখানে টেনে আনবার দরকার নেই। ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন জার্মেনীর সহৃদয় স্বীকৃতি ও সাহায্য পেয়েছে, সেটাই উল্লেখযোগ্য।

সেই জার্মেনী আজ দ্বিধা বিভক্ত, তার ইতিহাসবিশ্রুত রাজধানী বার্লিনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত, জার্মান জাতির পক্ষে এটা নিশ্চয়ই মর্মান্তিক শোকাবহ। কেন কীভাবে জার্মেনীর আজ এ-দশা সে দীর্ঘ বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কী উপায়ে এই বিভক্ত জার্মেনী জোড়া লাগতে পারে, জার্মানজাতি আবার একই রাষ্ট্রীয় পতাকাতলে সমবেত হতে পারে, সে-প্রশ্নের সুনিশ্চিত জবাবও কেউ দিতে পারেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে জার্মেনীর এই বিপর্যয়। সে-যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব কেবল জার্মেনীর একলার নয়, তবে সারা য়ুরোপ জুড়ে নাৎসী সমর-শক্তির তাণ্ডব কোটি কোটি মানুষের জীবনে যে ভয়াবহ দুর্গতি সৃষ্টি করে তার দায়ভাগী জার্মেনীর পশ্চিম এবং পূর্বভাগের জার্মানরা প্রায় সকলেই। খ্রুশ্চভ যখন বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে সব অনাচার অত্যাচারের জন্য দায়ী একমাত্র স্টালিন, তখন সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, অশ্রদ্ধেয়: নাৎসী জার্মেনীর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও সেই কথা কেবল হিটলার অথবা তাঁর নাৎসীগোষ্ঠীকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা অন্যায়, তাতে অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

অতীত সম্পর্কে এ-সব আক্ষেপ এবং অপ্রিয়-আলোচনা জার্মেনীর বর্তমান সমস্যা সমাধানে বিশেষ সাহায্য করে না। জার্মেনী য়ুরোপের হৃৎপিণ্ড, সেই হৃৎপিণ্ড দ্বিখণ্ডিত থাকায় রক্ত-চলাচলে বাধার ফলে অসুস্থ উত্তেজনা, অস্বাভাবিক অবস্থা। কাজেই দুই জার্মেনীর, পশ্চিম ও পূর্ব খণ্ডের মিলন ঘটা প্রয়োজন, কেবল জার্মেনী ও জারমান জাতির মঙ্গলের জন্য নয়, প্রয়োজন য়ুরোপের এবং সারা পৃথিবীর শান্তির জন্য। ভারতবর্ষ এ-মিলন আন্তরিকভাবে কামনা করে। কিন্তু তার বেশী আর কীই বা করবার সাধ্য? বিভক্ত জার্মেনীর ভবিষ্যৎ-নিয়ন্তা কার্যত এখন দুই মহাশক্তিধর আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে জার্মেনীর এই বিড়ম্বিত অনিশ্চিত অবস্থা সত্ত্বেও জার্মান জাতির অধ্যবসায়, নিয়মনিষ্ঠা এবং সর্বাংগীণ উন্নয়ন চেষ্টা পশ্চিম জার্মেনীকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে সেটা সারা পৃথিবীর বিস্ময়। কেবল বিস্ময়ই নয়, পশ্চিম জার্মেনীর এই অসাধারণ কৃতিত্বের অনেক কিছু সুফল ভারতের মত উন্নতিকামী দেশও পেয়েছে ও পাচ্ছে। শিল্পায়নে, কারিগরী বিজ্ঞানচর্চায় পশ্চিম জার্মেনীর সাহায্য ও সহযোগিতায় ভারতবর্ষ খুবই উপকৃত। ডঃ কিসিংগারের আগমন উপলক্ষে সেটা কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণযোগ্য।

২০-১১-৬৭

সুনন্দর জার্নাল

'মার্জার-দর্শন'

রোজ সকালে ডাক্তারের হুকুমমাফিক আমাকে এক পেয়ালা করে দুধ খেতে হয়। 'গো-রস ফিরে গলি গলি'—ভক্ত কবীরের সেই স্বর্ণ-যুগ আর নেই—অতএব দুধটা আনতে হয় সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র থেকে, লাইন দিয়ে। ছেলেবেলা থেকেই দুধ-দই ইত্যাদি সম্পর্কে আমার প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল—এখন প্রকৃতির প্রতিশোধ—প্রত্যেকদিন আধা-সিনথেটিক দুধ গলাধঃকরণ করে সেই অজ্ঞান-পাপের প্রায়শ্চিত্ত চলছে।

এই সুকঠিন কাজে যে নিয়মিত আমার দুঃখ কিঞ্চিৎ লাঘব করতে আসে—সে একটি ছোট বেড়াল—বয়সের দিক থেকে তাকে কিশোর আখ্যা দেওয়া যায়। বলা অনাবশ্যক —তাকে আমার চেষ্টা করে সংগ্রহ করতে হয় নি। তার মা সম্পূর্ণ অনাহূতভাবে বাড়িতে এসেছে, বার বার তাড়া খেয়েও জবর-দখল ছাড়ে নি, এটি তারই শাবক। শৈশব থেকে কিছু প্রশ্রয় পেয়েছে, ফলে আমার দুধের পেয়ালার সে অনিবার্য ভাগীদার, খাওয়ার টেবিলের তলায় তার পাওনাদারের মতো উপস্থিতি।

বেড়ালের বাবা

অতএব সকালে বিছানা ছাড়লেই পায়ে পায়ে ঘুরতে থাকে—ল্যাজ এবং মাথা ঘষে ঘষে বিনীত বশ্যতা জানায়। শেষ পর্যন্ত দুধের 'কোটা' আদায় হয়ে গেলে—বারান্দায় যেখানে প্রথম শীতের নরম রোদটি পড়েছে, সেখানে গোল হয়ে কিঞ্চিৎ সুখনিদ্রা। বেশ আছে!

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত একটি ক্ষুধিত মার্জারীর ভেতরে সর্বহারার প্রতিনিধি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু আমি তো দেখছি বেড়াল মূর্তিমান বুর্জোয়া। নিতান্তই সুবিধে পায় না বলে আনাচে-কানাচে আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই আর কথা নেই—যেমন নিদ্রা-বিলাস তেমনি ভোজন-বিলাস। শোওয়ার জন্যে সবচেয়ে নরম জায়গাটি তার দরকার, শীতের দিনে লেপের মধ্যে তার নিঃশব্দ অনুপ্রবেশ। ভাগ্যবানদের গৃহ-মার্জারেরা মাছের কাঁটায় কিছু সারবস্তু না পেলে মুখ ফেরায়, রুটির টুকরোয় দুধ না থাকলে উপেক্ষায় উদাস হয়ে বসে থাকে। বাজারে মাছের খবর, কিংবা দুধের লাইনে দাঁড়াবার দুর্ভাগ্য—এদের কোনো কিছুর জন্যেই সে মাথা ঘামায় না। "মানুষের প্রথম বন্ধু" কুকুরের আনুগত্যের পাশাপাশি সে অকৃতজ্ঞতা আর স্বার্থপরতার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। ইঁদুর ধরে সে গৃহস্থের মহৎ উপকার করে—এমন একটা জনশ্রুতি আছে, কিন্তু ও কাজটি সে করে নিতান্তই খেয়ালে, কখনো বা খিদের তাড়ায়। একটি বিদেশী ছড়ায় পড়েছিলুম : 'সারা রাত ধরে ফুর্তি করে ইঁদুরেরা—নাচে, গান গায়। আর প্যারী শহরের সাদা-কালো-ছাইরঙা বুর্জোয়া বেড়ালেরা কী করে? তারা ঘুমোয়।' নিশ্চয় ঘুমোয়—কারণ 'স্নুথ'-ও বোধ হয় বেড়ালের মতো ঘুমোতে ভালোবাসে না।

তা হলে বেড়ালের ইউটিলিটি কী? ইন্দো চায়না কিংবা মেক্সিকোর মতো দেশে অবশ্য বেড়ালের মাংস একটা ডেলিক্যাসি—সেখানে এই জীবগুলো নিশ্চয়ই ভেড়া-মুরগীর মতো লালিত হতে পারে—'গ্রাসফেড মাটনে'র মতো ঔদরিক স্বার্থেই জীবানন্দ লাভ করতে পারে; কিছু কিছু

বেড়ালের মা

ল্যাবরেটরীতেও বোধ হয় বাঁদর-বাং-খরগোশ গিনিপিগের সঙ্গে বেড়ালকেও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এরকম দু'টি-একটি ক্ষেত্র ছেড়ে দিলে পৃথিবীর কোটি কোটি বেড়াল অন্নধ্বংসক, অকারণ এবং লক্ষ লক্ষ টন সুখাদ্যের (মাছ - মাংস-চাল-গম-দুধ-ক্ষীর পনীর ইত্যাদির) অবৈধ 'কনসিউমার'। পাড়ার দালদায় ভাজা (এখন ঘি নেই) নেড়ী কুকুরও তার চাইতে উপকারী—সে-ও রাত-বিরেতে চোর আর পুলিসকে নিরপেক্ষভাবে তাড়া করে, অন্য পাড়ার মানুষকে চমকে দেয়। তা হলে বেড়াল?

একজন জীব-বিজ্ঞানী লিখেছিলেন, বেড়াল যদি কুকুরের গুণের শতাংশও পেত—তা হলে তার মতো মানুষের উপকার আর কেউ করতে পারত না। প্রহরী হওয়ার এমন যোগ্যতা আর কার? অন্ধকারে তার চোখ জ্বলন্ত, নিঃশব্দতম তার গতি, তার অগম্য জায়গা নেই—এক জল আর আগুন ছাড়া। সে যদি বুনো বেড়ালের হিংস্রতা নিয়ে অন্ধকারে চোরের টুঁটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তা হলে—

তা হলে বাড়িতে ঢোকবার আগে চোর তিনবার চিন্তা করত—নিঃসন্দেহ! কিন্তু ওই 'যদি'! বেড়াল কখনো কুকুর হয় না।

একদা না হয় মা-ষষ্ঠীর বাহন হিসেবে আমাদের দেশে তার কিছু খাতির ছিল, কিন্তু এ কালে আর ষষ্ঠীর দরাজ দাক্ষিণ্য কে চায়? অবশ্য পৃথিবীর শিশু-মহলে খেলার সঙ্গী হিসেবে বেড়ালের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে—কিন্তু তাকে বাদ দিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। বেড়ালদের অনেকে দেখতে শুনতে বিশেষ খারাপ তা নয়—কিন্তু পোষবার জন্যে তার চাইতে সুন্দরতর জীবেরও অভাব নেই।

বেড়ালের চরিত্র সম্বন্ধে সবাই ওয়াকিবহাল। পাষণ্ড দীর্ঘকর্ণ মার্জারের কথা কে না জানেন? ষষ্ঠীভক্ত বাঙালীর ঘরেও বেড়াল ভালো ক্যারাকটার সার্টিফিকেট পায় নি: 'বেড়াল বলে, মনিব অন্ধ হোক, পাত থেকে মাছের মুড়োটা তুলে নিই!' মেতারলিংকের সাংকেতিক নাটক 'নীল পাখি'তে বেড়ালকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলেই চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে। লুই ক্যারলের 'হাস্যময়' বেড়ালটি অথবা 'বেড়ালহীন হাসিটি, বোধ হয় তার চরিত্রেরই প্রতীক।

তবু কী আশ্চর্য—শিশুরাই নয়—পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নরনারী বেড়াল-বিমুগ্ধ। কিছু দিন আগে কাগজে পড়েছিলুম, আমেরিকায় নাকি কুকুরের চাইতে বেড়াল প্রিয়তর। লক্ষ টাকা খরচ করে বেড়ালের শুভ-বিবাহ সেদিনের বাংলা দেশের ঘটনা। আমার এক কড়া সাম্যবাদী বন্ধু আছেন—পরম কন্ট্রাডিকশানের মতো বাড়ির বুর্জোয়া বেড়াল-বাহিনী সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত সন্তান-স্নেহ!

এবং তারও চাইতে আশ্চর্য—অসংখ্য বুদ্ধিজীবীরও বেড়ালের প্রতি কী অদ্ভুত পক্ষপাত! লোকান্তরিত রাজশেখর বসুর মতো যুক্তিবাদীর বিড়াল-চক্ষু সুনন্দন মতো অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছেন। কালো বেড়াল নিয়ে বিলিতী সংস্কার যাই থাক, বেড়ালের ওপর একটি চটি কবিতার বই-ই লিখে ফেলেছেন এলিয়ট। ছবি আর সাহিত্যের সঙ্গে তেওফিল গোতিয়ের তৃতীয় বাসন ছিল মার্জার; আর তাঁর পরম অনুরাগী কবি বোদ্‌ল্যারও বেড়াল সম্পর্কে অচেতন ছিলেন না—'কালো ভেনাসের' মধ্যে যে বৈড়ালিক উন্মাদনা তিনি পেয়েছেন, তার সবটাই নিন্দাত্মক নয়।

এই অনুরাগের মনস্তত্ত্ব কোথায়?

কুকুরের মতো যে নিঃশেষে আত্মনিবেদন করে—সে কি আমাদের কাছে বড়ো বেশি সহজ আর চেনা হয়ে যায়? তাই যে ধরা দিয়েও ধরা দেয় না—ছলনাময়ীর মতো প্রতি মুহূর্তে যে ভোলায় আর বিশ্বাসঘাতকতা করে—আমরা কি তার সেই রহস্যের টান বেড়ালের মধ্যেও অনুভব করি? তাই তাকে চিনেও না চেনায়—ভালোবাসা আর কৃতঘ্নতার বিষাক্ত নেশায় চেতনে-অচেতনে বেড়াল সম্পর্কে আমরা এইভাবে রোম্যাণ্টিক? নাকি, বনের বাঘের উদ্দাম হিংস্র শক্তিকে বশ করতে পারি না বলেই তার 'সিম্বল' হিসেবে বেড়ালকে লালন করে আমাদের কল্প-কামনা মেটাই?

এসব অতি গূঢ় প্রশ্ন। আপাতত দুধের লোভে ছোট বেড়ালটি আমার টেবিলের নীচে উপস্থিত। আমার দুঃখের পেয়ালায় অংশীদার হয়েছে বলে অন্তত এই মুহূর্তে তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ॥

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, আমাদের বার্ষিক উৎসবের প্রথম পর্যায় শেষ হল। এইবার আরম্ভ হবে আজকের বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান 'কালপুরুষ।' কিন্তু তার জন্যে মণ্ডটি তৈরি করে নিতে একটু সময় লাগবে। অতএব সেই অবসরে 'কালপুরুষ' সম্পর্কে দু-একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই।

আমাদের সম্পাদকের বিবৃতিতে আপনারা শুনেছেন যে, এই নৃত্যের পরিকল্পনা এবং পরিচালনা যাঁর ছিল, সেই সৌম্যেন লাহিড়ী আর আমাদর মধ্যে নেই। একটি পথ-দুর্ঘটনায় শোচনীয়ভাবে তাঁর অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। আপনারাও এ-ও শুনেছেন যে সেই কারণেই আমাদের এই বার্ষিক উৎসবটি প্রায় দু-মাস পিছিয়ে দিতে হয়েছে। সৌম্যেন বেঁচে থাকলে আজ সে-ই এই নৃত্যনাট্যের ভাষ্য আপনাদের কাছে উপস্থিত করত। কিন্তু সে নেই বলেই তার সহযোগী হিসেবে এই দায়িত্ব আমার ওপরে এসে পড়েছে।

কিন্তু দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণ পালন করতে পারব না। তার কারণ, 'কালপুরুষে'র মধ্য দিয়ে সৌম্যেন ঠিক কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছিল, কোন্ সত্যটি তুলে ধরতে চেয়েছিল আমি নিজেও তা সম্পূর্ণ বুঝেছি এ দাবি করতে পারি না। যদি মনে করা যায় যে, আমরা প্রত্যেকে নানা রঙের কাচের আবরণ দিয়ে ঘেরা—তা হলে এই নাটকের যে একটা নিজস্ব আলো আছে, তা আলাদা আলাদা রঙ নিয়ে অমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হবে। অর্থাৎ এই নাটকের তাৎপর্য একার্থক নয়, তার একটা সর্বজনীন আর স্বীকৃত সীমারেখা নেই; আমরা সবাই নিজেদের মতো করেই একে গ্রহণ বা বর্জন করব। এ যেন সহস্র কোণিকা—আমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন কোণ থেকে একে দেখব, হয়তো একজনের দেখার সঙ্গে আর একজনের দেখার আদৌ মিল থাকবে না। সুতরাং এই নাটককে আমি কিভাবে বুঝেছি সে আলোচনা এখানে থাক। সৌম্যেন আমাকে যা বলেছিল, তারই প্রতিধ্বনি করে বলছি : আপনাদের নিজস্ব দর্পণগুলোতেই 'কালপুরুষ' তার ভালোমন্দ নিয়ে প্রতিবিম্বিত হক।

আর একটি কথা গোড়াতেই জানিয়ে রাখি। এটি মিশ্র-চরিত্রের নাটক। নৃত্যনাট্য আছে, মূকাভিনয়ও আছে। আপনারা দেখবেন—যখন তখন নাচের তাল কাটবে, বাজনা বেসুরো হয়ে উঠবে, মঞ্চে আলোক-সম্পাতের মধ্যে পুরো শৃঙ্খলা থাকবে না। অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, এগুলো এই নাটকেরই অঙ্গ। সৌম্যেন বলেছিল, সত্য যদি তাল-কাটা হয়, নাচেও তাল থাকে না; সাইক্লোনের হাওয়া আসে অনিয়মের মতো—বাজনাতেই ব নিয়ম থাকবে কেন? অন্ধকার আর আলো

কালপুরুষ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

যখন এ-ওকে ছিঁড়ে খেতে থাকে, তখন সেই বিদ্যুৎ-চমকানো ঝড়ের অরণ্যকে কোন্ নিয়ম দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? এই কথাগুলো মনে রেখে—দয়া করে অন্তত আপনারা 'লাইট-লাইট' বলে আবেদন জানাবেন না। সব বিশৃঙ্খলার ভেতরেও কোনো শৃঙ্খলা আছে কিনা, নাটক শেষ হলেই তার বিচার করবেন।

আমাদের যে 'সুভ্ৰনির' আপনাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখবেন, 'কালপুরুষ' নাটকের বিষয়টি কী তা কিছুই সেখানে বলা হয় নি। সৌমেন বলেছিল, অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার আগে সে নিজেই সেটি আপনাদের কাছে তুলে ধরবে। কিন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য তার কথা সে আর কোনোদিন বলবে না। তাই অল্প কথায় আমিই সেটি উপস্থিত করছি। আগেই বলেছি—কোনো ভাষ্য আমি করব না। আমি কেবল বিষয়টি পেশ করছি—আপনারা আপনাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটিকে দেখুন এবং বিচার করুন।

নাটকের সূচনাতেই দেখবেন এর নায়ক—যার নাম জীবন—অথবা নামে কী আসে যায় —আপনারা যা খুশি বলে তাকে ভেবে নিতে পারবেন—সে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। তার পেছনে সবুজ আর সোনালীতে মেশানো একটা পটভূমি, মেঠো বাঁশির মতো একটা অস্পষ্ট সুর ভরে রেখেছে তাকে। স্বপ্ন দেখছে জীবন। তারপরই আসছে একটি মেয়ে, তার গলায় শিউলি ফুলের মালা; আর একজন এল—তার হাতে নতুন ধানের একটি মঞ্জরী—তার নাচের ছন্দে মনে হবে যেন হেমন্তের ধানের খেতের ওপর দিয়ে বাতাস ঢেউ খেলে খেলে বয়ে যাচ্ছে; তারও পরে আরও একজন—তার পরিচয় আমি দেব না—দেখলেই তাকে চিনতে পারবেন—চিরদিন ধরে আমরা সবাই যাকে আমাদের রক্তের ভেতরে আসতে দেখেছি, যে মানুষের প্রথম ছবিতে রঙ লাগিয়েছে, প্রথম গানে সুর ফুটিয়েছে।

সুরে, আলোয়, অভিনয়ে নাটকের এই অংশটি সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক। দেখা যাচ্ছে —আমাদের নায়ক ধীরে ধীরে জেগে উঠল! তারপরে তার আনন্দ-নৃত্য। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। ক্রমেই একটা লাল আভায় ভরে উঠল আকাশটা—কালো কালো দীর্ঘ ছায়া ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার ভেতরে। মিলিয়ে গেল তিনটি মেয়ে—মনে হল আমাদের নায়ককে ঘিরে ঘিরে কতগুলো লোহার গরাদ নেমে নেমে এসেছে।

সেই লালচে আলোটা পোড়া ছাইয়ের মতো বিমর্ষ হয়ে গেল—শুধু কয়েকটা আরক্তিম বিন্দু জেগে রইল এখানে ওখানে—যেন নিবে-যাওয়া চিতায় কয়েক টুকরো অঙ্গার জ্বলছে এখনো। চিৎকার করে উঠল আমাদের নায়ক। চাবুকের আওয়াজের মতো শিস্‌টানা তীক্ষ্ণ শব্দ উঠতে লাগল থেকে থেকে—চাবুকের মতোই লিকলিক করে যেতে লাগল এক-একটা আলোর বিদ্যুৎ। তারপর শব্দের কতগুলো ঘূর্ণি—কেউ হাসছে—কেউ গোঙিয়ে উঠছে যন্ত্রণায়—কেউ বা কেঁদে উঠল বুক-ফাটা চিৎকারে —কোথায় যেন ডেকে উঠছে একপাল শিকারী কুকুর। তারই মধ্যে দেখতে পাবেন আমাদের নায়ককে—সে মাথা ঠুকছে, আকাশের দিকে হাত তুলে যেন অভিসম্পাত দিচ্ছে কাকে—অমানুষিক বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখ, চাবুকের মতো আলোর প্রত্যেকটা ঝলক যেন মর্মঘাতী আঘাত করছে তাকে; একটু আগেই যে স্বপ্ন দেখছিল তাকে আর আপনারা চিনতে পারছেন না।

এরপরে সম্পূর্ণ অন্ধকার। শুধু সেই শব্দের ঘূর্ণি চলল কিছুক্ষণ। আবার ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে একটা আলোয় মঞ্চটা ভরে উঠল। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের নায়ককেই। তার পেছনে এমন একটা পটভূমি —যা অসংলগ্ন, ছায়া-ছায়া, ছেঁড়া-ছেঁড়া—আপনারা যে-ধরনের স্যুররিয়্যালিস্টিক ছবি দেখে থাকেন, অনেকটা সেই রকম। নায়ককে ভালো করে লক্ষ করলে দেখবেন তার দুটো মণিবন্ধে লোহার শেকলের মতো কী দুলছে, তাকে সাপের ছেঁড়া খোলস বলেও ভেবে নিতে পারেন।

সে কিছু একটা খুঁজছে। কী খুঁজছে? কারাগার থেকে পালিয়ে এসে কোথাও এমন একটা জায়গা—যেখানে শিউলি ফুলের মালা পরে সেই মেয়েটি আবার এসে দেখা দেবে? সেই আর একজন বয়ে আনবে একটি পাকা ধানের মঞ্জরী—যাকে ঘিরে ঘিরে ঢেউ দিয়ে যায় শিশির-জড়ানো হেমন্তের হাওয়া? কিংবা সে খুঁজছে চিরকালের সেই তাকে—যে প্রথম ছবি, প্রথম গান—যাকে চিনিয়ে দিতে হয় না—আমাদের রক্তের কণাগুলো চিরদিন ধরে যাকে চিনে আসছে?

একদল মানুষ আসছে এরপর। তাদের জনতা বলতে পারেন, ভিড় ভাবতে পারেন—যা খুশি কল্পনা করতে পারেন। তাদের প্রত্যেকের হাতে এক-একটুকরো ছেঁড়া সাপের খোলস। আমাদের নায়ককে ঘিরে ঘিরে তাদের নাচ চলবে। নায়ক সেই নাচের তালে দুলে উঠতে গিয়েও পা ফেলতে পারবে না—একটা অদ্ভুত শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণায় সে যেন ছিন্ন-বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে—তারপরে আস্তে আস্তে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। এইখানে আপনারা লক্ষ করবেন তার মূকাভিনয়।

একটা ঝোড়ো-হাওয়ার পরিবেশ তৈরি করে বেরিয়ে যাবে নাচের দলটা। তাদের হাত দূরের আকাশের দিকে—সেখানে তারা কী যেন দেখেছে, কী যেন একটা খুঁজে পেয়েছে। তারা চলে যাওয়ার পর বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ উঠবে কয়েকটা। যেন সমুদ্রের গর্জন দুলে দুলে উঠবে

কিছুক্ষণ। তারপর স্তব্ধতা। একটা নিঃসঙ্গ বেহালা কাঁদতে থাকবে একটানা। উঠে দাঁড়াবে আমাদের নায়ক।

তখনো তার পা টলছে। সে কোথাও যেতে চায়—যেতে পারছে না। একবার সামনে এগিয়ে আসবে, একবার পেছনে সরে যাবে; একবার ডাইনে যেতে চাইবে, একবার বাঁয়ের দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াবে।

তখন আসবে কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি মূর্তি। তার মুখে দেখা যাবে শাদা দাড়ি—তার চোখের দিকে তাকালে দেখবেন সেখানে যেন অতলান্ত অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

আমাদের নায়ক মুর্কাভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাকে প্রশ্ন করবে, 'তুমি পথ জানো?'

সে মাথা নেড়ে বলবে, 'জানি।'

'তবে বলে দাও পথের নিশানা।'

সে হাত পেতে বলবে, 'তা হলে দক্ষিণা দাও।'

'আমার তো কিছুই নেই।'

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলবে : 'আছে তোমার বুকের ভেতরে।'

আমাদের নায়ক থমকে যাবে প্রথমটায়। তারপর ছিন্ন জামাটিতে হাত পুরে দিয়ে বুকের ভেতর থেকে বার করে দেবে একটি শিউলি ফুল।

কালো আলখাল্লায় ঢাকা বুড়ো আর দাঁড়াবে না। ফুলটি প্রায় কেড়ে নিয়ে, পেছনের সেই অবাস্তব—সেই সুর-রিয়্যালিস্টিক পটভূমিটির দিকে একবার হাত বাড়িয়ে দিয়েই সে চোরের মতো পালিয়ে যাবে।

সে যেতে না যেতেই আর একজন এসে হাজির হবে। বাজে-পোড়া মাটির মতো তার আলখাল্লার রঙ—যে রঙ দেখলে মনে হবে পৃথিবীর শেষবিন্দু জলকেও সে শুষে নিয়েছে, তার তৃষ্ণায় ঘাসের বীজগুলোও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারও মুখে শাদা দাড়ি, তারও চোখ অন্ধকার।

'পথ জানো?'

'জানি।'

'বলে দাও।'

সেও দক্ষিণা চাইবে। নিয়ে যাবে যুবকটির বুকের ভেতর থেকে একটি ধানের শিস। তারপর সেই অসংলগ্ন অবাস্তব—ছেঁড়া-ছেঁড়া পটভূমিটি দেখিয়ে দিয়ে সেও পালিয়ে যাবে।

তৎক্ষণাৎ আসবে তৃতীয় জন। রক্ত জমে এলে যে রঙ ধরে সেই রঙের আলখাল্লা তার। তারও পাকা দাড়ি, কোটরে-ডোবা অদৃশ্য চোখ, শুধু বাড়তির ভেতরে তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি—সে হাসি যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি কপট। সে-ও পথ দেখাতে চাইবে—তারপর হাত বাড়িয়ে বলবে : 'দাও—দাও—'

অনেকক্ষণ দ্বিধা করবে আমাদের নায়ক। এখানেও তার মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করবেন আপনারা। একেবারে দেউলে হয়ে যাচ্ছে যেন,

হারিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে সব। বিভ্রান্ত চোখে, মুখের প্রত্যেকটি রেখায় রেখায় তার মনের অসংখ্য ভাঙচুর দেখতে পাবেন আপনারা। শেষে কাঁপা হাতে বুকের ভেতর থেকে সে বার করে আনবে একটি সোনার কৌটো। ঝলমল করে জ্বলতে থাকবে সেটা।

কিসের কৌটো এটা? সৌম্যেন থাকলে বুঝিয়ে বলতে পারত—আমি শুধু অনুমানই করতে পারি, আপনারাও তাই করবেন। হয়তো এ সেই সোনার ঝাঁপিটির প্রতীক—যার ভেতরে আমরা প্রথম রঙ, প্রথম গান আর প্রথম স্বপ্নকে সঞ্চয় করে রাখি। এই কৌটোটা তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে—যেন শেয়াল ডেকে উঠবে—যেন হা-হা করে শ্মশানের হাওয়া বয়ে যাবে খানিকটা।

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, আমাদের নাটকের এই অংশে গ্রীক-পুরাণের একটি গল্পের কথা আপনাদের কারো কারো মনে পড়ে যেতে পারে। সেই রাজপুত্র আর তিন দিশারী শকুনের কাহিনী। আপনারা এও লক্ষ্য করবেন—বুড়োদের আলখাল্লা নাড়াবার ভঙ্গিতে খানিকটা ডানা-ঝাপটানোর সাজেসান আসবে। আমিও সৌম্যেনকে সে-কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। সে জবাব দেয়নি, একটু হেসেছিল কেবল। আমাদের সততার যাতে কোনো সংশয় আপনাদের না থাকে, সেই জন্যেই আমি এটুকু আপনাদের জানিয়ে রাখলুম।

এইখানে আমাদের নাটকের তিন মিনিট বিরতি।

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হলে দেখা যাবে যেন একটা পাহাড়ের চূড়োয় বসে আছে সে। এখানে একটা পরিচিত বিলিতি অর্কেস্ট্রা থেকে কয়েকটা সুরের টুকরো তুলে নিয়েছি আমরা। সে সুরে মনে হবে—যেন হাজার হাজার বছর আগে যারা মরে গেছে, তাদের স্মৃতি 'থমকে আছে এখানে, আশপাশে কয়েকটা ক্যাকটাসের আভাস পাবেন আপনারা—আচমকা মনে হবে যেন গভীর কোনো সমুদ্রের তলা থেকে তুলে আনা কতকগুলো শ্যাওলার কঙ্কালের হাত বালি আর পাথরের মধ্যে পুঁতে রেখেছে কেউ; মনে হবে বহুকাল আগে মরে-যাওয়া সাগরের ঢেউ এখনো কেঁদে ফিরছে এই নগ্ন নির্জন বালির ওপর, চারদিকে যে ছাড়া ছাড়া পাথরগুলোকে দেখতে পাবেন—তারা কোন্ আদিম যুগের উল্কা, এইখানে আছড়ে পড়ে নিবে গেছে, কিন্তু তাদের সেই ভয়ংকর জ্বালা এখনো স্তব্ধ হয়ে আছে এর চারিদিকে। মাথার ওপর ধু ধু করবে একটা দীপ্ত দীর্ঘ আকাশ—সমুদ্রের তরঙ্গগুলো উতরোল কান্নায় চোরাবালির মধ্যে ডুবে যাওয়ার পরে যে আকাশে একটি মেঘের বিন্দুও কখনো দেখা দেয়নি।

বিলিতী অর্কেস্ট্রার সঙ্গে কিছু দেশী সুর মিলিয়ে এই পরিবেশটি আমরা তৈরি করতে চেষ্টা করেছি। আমাদের নায়ক এই চূড়োর ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। তারপরেই কী একটা যন্ত্রণা তাকে বিদ্ধ করতে থাকবে—তার মুখে আত্মতৃপ্তির একটুকরো হাসি ছিল—ক্রমশ হতাশায় সেটা বিকৃত হয়ে যেতে থাকবে। নিজের বুকে হাত দিয়েই চমকে সরিয়ে নেবে—যেন কতগুলো ভাঙা কাচ ছিল কোথাও—তার আঙুল থেকে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়বে কয়েক ফোঁটা রক্ত।

মাথার চুল ছিঁড়তে থাকবে—আকাশে দু হাত তুলে চিৎকার করে উঠবে, তারপর পাগলের মতো ছুটে নেমে আসবে সে; চোরাবালি তার পা টেনে নিতে চাইবে—শ্যাওলাধরা কঙ্কালের হাতের মতো ক্যাকটাসগুলো যেন তাকে আঁকড়ে ধরবে—মনে হবে নিজের সঙ্গে সে যুদ্ধ করছে চাইছে। বাজনা বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে—সব আলো এলোমেলো হয়ে যাবে—যেন সব কিছু দুলছে, টলমল করছে—যেন ভূমিকম্প ঘটে যাচ্ছে—আবার একটা বীভৎস চিৎকার তুলবে নায়ক।

অন্ধকারে ডুবে যাবে মঞ্চ। আলো হলে দেখবেন, আর এক পৃথিবী। পেছনের পটভূমিতে এখানে আমরা কিছু ছায়া ব্যবহার করব। তা দেখে বুঝবেন—? কোনো একটা বড় শহর—তার উঁচু উঁচু বাড়ি মাথা তুলে আছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনার, দেখা যাচ্ছে কারখানার চিমনি। ক্রেন উঠছে নামছে—গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—জাহাজের ভোঁ উঠছে।

এইখানে—কী বলব কমিক রিলিফ? একটি ছোট মুখোশ-নৃত্য দেখতে পাবেন। দেখবেন নেকড়ে বাঘ হরিণের সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছে গোলাপ হাতে নিয়ে—বুকে ঘাড়-বাঁধা ভালুক আসছে ঘুমুতে ঘুমুতে—দেখবেন শেয়াল আর মুরগী এ-ওর গলা

জড়িয়ে রসালাপ করছে। কিন্তু এ-সবের বিস্তৃত বিবরণ আমি দিতে চাই না—নিজেদের চোখেই দেখবেন আপনারা।

বাজনায় এরপর আপনাদের চেনা সুর শুনতে পাবেন। সে সুরে রক্তে নেশা ধরায়—মনকে মাতাল করে তোলে। আমাদের নায়ক একটি মেয়ের সঙ্গে নাচতে নাচতে আসবে মঞ্চে। এই নাচটি এতই স্পষ্ট যে, এর কথা আপনাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। মেয়েটির চোখে আগুন, সারা শরীরে লালসার ছন্দ। আমাদের নায়ককে মনে হবে মন্ত্রমুগ্ধ—একটি ক্ষুধিত হায়নার মতো সে মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে—বার বার সাপিনীর মতো পিছলে সরে যাচ্ছে মেয়েটি।

এই উদ্দাম নাচের ভেতর দিয়ে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাবে তারা—সেই বাজনাই চলতে থাকবে, তারপর অন্য দিক দিয়ে তারা ফিরে আসবে আবার। কিন্তু এইবারে একটু বিশেষত্ব দেখা যাবে—মেয়েটির মুখ গাঢ় লাল একটা ওড়নায় ঢাকা। ছেলেটি তখন আরো বিহ্বল, আরো অসংযত হয়ে উঠেছে, তার তাল কাটতে থাকবে ঘন ঘন, যেন আকণ্ঠ নেশা করেছে এমনি মনে হবে তাকে। তারপর এক সময়—সম্পূর্ণ পরাভূতের মতো—টলতে টলতে সে মেয়েটির পায়ের কাছে বসে পড়বে।

তখন মুখের ওপর থেকে টকটকে লাল ওড়নাটি সরিয়ে দেবে মেয়েটি। একটু আগেই একখানা সুন্দর মুখ দেখেছিলেন আপনারা—তার চোখে তখন আগুন খেলছিল। এবার সেখানে দেখবেন একটা অদ্ভুত মুখোশ। কংকালের? ঠিক তা নয়। সে মুখ শাদা মার্বেল পাথরের মতো—তার নাক নেই—চোখ নেই—ঠোঁট নেই—যেন একটা বন্ধ দেওয়ালের মতো; যদি মানুষের শরীর হয়—তার রক্তের শেষ কণাটি পর্যন্ত চুষে নিংড়ে খেয়েছে কেউ; যদি পাথর হয়—সে পাথর চিরকালের মতো মৃত—তার একটি ফাটল দিয়েও একটি জলের বিন্দু কোনোদিন নেমে আসেনি।

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে নায়ক—যেন সেও পাথর হয়ে গেছে। চারদিকে উঠতে থাকবে শহরের শব্দ—গাড়ি চলছে, বিমান উড়ছে ভোঁ বাজছে, ক্রেন ওঠা-নামা করছে। নায়ককে এই অবস্থায় রেখে আমরা মঞ্চ অন্ধকার করে দেব।

এইবারে যা ফুটে উঠবে, তা একটা পোড়ো বাড়ি। আপনারা হানা, বাড়িরই সুর শুনতে পাবেন। আলোয় অন্ধকারে দেখা যাবে—কোথাও তার ইট ধসে পড়েছে, কোথাও কালো কালো গর্ত রাক্ষসের করোটির শূন্য চোখের মতো তাকিয়ে আছে, কোথাও মাথা তুলেছে বটের চারা। মঞ্চের পেছন দিয়ে হিস হিস করতে করতে চলে যাবে একটা কালো রঙের প্রকাণ্ড সাপ। হয়তো দু-একবারের জন্যে বুকের ভেতরে ছমছম করে উঠবে আপনাদেরও।

এইখানে—যন্ত্রের মতো পা ফেলে ঢুকবে আমাদের নায়ক। তার চলা দেখে মনে হবে —সে মানুষ নয়—যেন একটা 'রোবোট' এগিয়ে আসছে। সে এসে থেমে দাঁড়াবে। তখন সেই হানা বাড়ির একটা অন্ধকার গর্ত থেকে দুটো সার্চলাইটের মতো জ্বলে উঠবে একজোড়া চোখ। আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না—একটা প্যাঁচার চোখ সে দুটো।

আমাদের নায়ক প্রশ্ন করবে, 'কে তুমি?' উত্তর আসবে প্রতিধ্বনির মতো: 'তুমি।' 'আমি।'

'হাঁ—হাঁ—হাঁ।' —শুধু প্যাঁচা নয়—বাজনার সুরে সুরে সারা বাড়িটা কথা কয়ে উঠবে—সাড়া দেবে প্রত্যেকটা ভাঙা ইট, রাক্ষসের করোটি চোখের মতো প্রত্যেকটা গর্ত-গহ্বর, প্রতিটি অশ্বত্থের চারা। সাপটাও থেমে দাঁড়িয়ে ফণা তুলে হিস্‌হিস্‌ করে উঠবে।

আমাদের নায়ক শুনবে: 'তুমি—তুমি—তুমি!'

'আমি!'

'তুমিই তো। চিনতে পারছ না নিজেকে? কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছো এখানে—ভুলে গেলে সে কথা?'

'কিন্তু—'

'আমি যে তোমারই দর্পণ!'—সার্চলাইটের মতো দুটো চোখের আলো নায়কের পাংশু মুখের ওপর এসে পড়বে—উদ্ভাসিত করে তুলবে তাকে। চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি উঠতে থাকবে: 'আমি যে তোমারই দর্পণ—হা-হা-হা।'

হা-হা-হা করে এই হাসির আওয়াজ আকাশ-বাতাস ভরে তুলবে—মনে হবে আপনাদেরও কান সেই শব্দে বধির হয়ে যাচ্ছে। তারপর বেরিয়ে আসবে কতকগুলো ছায়ামূর্তি—তাদের চেনা যাবে না, দেখা যাবে না—কখনো বোধ হবে কতকগুলো কবন্ধ প্রেত, কখনো মনে হবে কতকগুলো অদ্ভুত জীব—মানুষের আদল আসে অথচ তারা মানুষ নয়। তারা আমাদের নায়ককে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, চলবে এক বেসুরো খেয়ালি তাণ্ডব—আলোর রঙ বদলাবে ঘন ঘন, বাজনায় কোনো সংগতি থাকবে না।

আমাদের নায়ক হাহাকার করে জিজ্ঞেস করবে: 'কারা—কারা তোমরা?'

তারা সেই তাণ্ডব নাচের তালে-বেতালে সুরে-বেসুরে যেন জবাব দিতে থাকবে: 'তুমি—তুমি—তুমি!'

চিৎকার করে বলে উঠবে নায়ক: 'আমি তোমাদের হত্যা করব—আমি তোমাদের হত্যা করব।'

কোথা থেকে কে একখানা তলোয়ার এগিয়ে দেবে নায়কের হাতে। সে পাগলের মতো আঘাত করতে চাইবে ছায়ামূর্তিগুলোকে। কিন্তু সে আঘাত তাদের কাউকে স্পর্শ করবে না। শূন্যে তলোয়ার ঘুরতে থাকবে—লক্ষ খুঁজবে চারদিকে, কিন্তু কাউকে পাবে না—প্রত্যেকটা আঘাত যেন কারা ঘুরিয়ে দেবে তার দিকে—তারই তলোয়ার ঘুরে-ফিরে এসে বার বার তার বুকে-পেটে বিঁধতে থাকবে।

তালে-বেতালে নেচে যাবে ছায়ামূর্তিগুলো। বাজনায় ঝড় চলবে, অসংলগ্ন আলোয় তুফান ছুটবে উথাল-পাথাল। অন্ধকার কোটরের মধ্যে হা—হা করে হাসতে থাকবে প্যাঁচাটা—আর মূর্তিগুলো পরম আনন্দে ঘন ঘন করতালি দিয়ে বলতে থাকবে: 'তুমি—তুমি—তুমি!'

সেই তাণ্ডবের মধ্যে অন্ধকার নেমে আসবে। যখন আলো হয়ে উঠবে, তখন আপনারা শুনতে পাবেন সেই প্রথম বাজনার সুর—যখন তিনটি মেয়ে এসেছিল শিউলি ফুল, ধানের মঞ্জরী আর চির-চেনা প্রাণ-রহস্যের সেই সোনার কৌটোটি নিয়ে।

কিন্তু এই মিউজিকের কনট্রাস্টে দেখা যাবে আমাদের নায়ক সেই ভাঙা বাড়ির মাটিতেই পড়ে আছে। সেই ছায়ামূর্তিরা নেই, সেই প্যাঁচার চোখও না। শুধু দেখা যাবে—হাতের তলোয়ারখানা তার বুকে বেঁধানো, সে মৃত। শুধু তার মাথার কাছে ফণা ধরে আছে সেই সাপটা।

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ এই হল আমাদের নাটক 'কালপুরুষে'-র বিষয়বস্তু। এ নাটক ট্র্যাজিডি কিংবা কমেডী, রূপক না প্রহসন—তা আমি জানি না, হয়তো সৌমেন জানত। কিন্তু সে আর বেঁচে নেই—তার কথা সে বলতে পারল না। বন্ধুগণ, আমার কখনো কখনো সন্দেহ জাগে, এ নাটক কি তারই আত্মকাহিনী? কিংবা তার মতো আরো অনেকের—যাদের আমরা চিনি, যাদের আমরা চিনি না?

কিন্তু আগেই বলেছি—আমি এর কোনো ভাষ্য করব না। একে যদি সহস্রকোণিক বলে ভাবি—তা হলে বিভিন্ন কোণ থেকে এ আপনাদের মনে প্রতিফলিত হোক, আপনারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী এর তাৎপর্য গ্রহণ করুন।

আমি আপনাদের অনেকখানি সময় নিয়েছি—সেজন্যে আমাকে মার্জনা করুন। কিন্তু আমাদের মঞ্চ এবং শিল্পীরা প্রস্তুত—এখুনি অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। নমস্কার"

গল্পগুচ্ছের ভূমিকা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ছোটগল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে, আমার জানা নেই। এইটুকু শুধু জানি যে, জন্ম মুহূর্তেই তিনি পূর্ণ যৌবনা—গ্রীক পুরাণে বর্ণিত দেবী প্যালাস্ এথেনার ন্যায় born in full panoply। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনব্যাপী প্রস্তুতির ইতিহাস আছে, কিন্তু ছোটগল্পের আবির্ভাব যেমন অকস্মাৎ, বিকাশ তেমনি দ্রুত।

সব দেশেই দেখা গিয়েছে ছোট গল্প সাহিত্যের পরিণত বয়সের সন্তান। সাহিত্যে এই এক অভিনব ব্যাপার—আগে বড় জিনিসে হাত পাকিয়ে তবে ছোট জিনিসে হাত দিতে হয়। মহাকাব্য আগে, গীতিকাব্য পরে; উপন্যাস আগে, ছোট গল্প পরে। বলা বাহুল্য এরও সঙ্গত কারণ আছে। ছোট জিনিসের কারুকলা বড় জিনিসের চাইতে সূক্ষ্মতর, সেজন্যেই এর আবির্ভাবে বিলম্ব। সূক্ষ্মকে আয়ত্ত করতে সময় লাগে। কলাকৌশল যথেষ্ট পরিণতি লাভ করলে তবেই সূক্ষ্ম জিনিসের সৃষ্টি সম্ভব। সূক্ষ্ম বলতে বুঝি, যার ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে বৃহতের আভাস লুক্কায়িত। এদিক থেকে বলা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি ছোট গল্প এক একটি বালখিল্য উপন্যাস। বালখিল্যগণ আকারে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, তথাপি তাঁরা ঋষি। ঋষিত্বের পরিমাপ গঠনে নয়, মননে। ছোট গল্পের কৃতিত্ব তার বিস্তারে নয়, গভীরতায়।

সাহিত্যের যত সন্তানসন্ততি আছে, ছোট গল্প তার মধ্যে সব চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। বাংলা ছোটগল্পের বয়স সত্তর পঁচাত্তরের বেশি নয়। অথচ বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ছোট গল্পের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে এমন আর কিছুতে নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রথম গল্প রচয়িতা। গল্পগুচ্ছে যে শিশুর জন্ম, গল্পগুচ্ছেই তার পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তি। ক্ষণে ক্ষণে তার মূর্তি বদল হয়েছে। হিতবাদী এবং সাধনার পাতায় যাকে দেখেছি কমনীয় কান্তি, সবুজপত্রে তার পেশী-সবল সুদৃঢ় মূর্তি। বাংলা ছোটগল্পের জন্ম এমন একটি শুভমুহূর্তে হয়েছে, যখন বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের ধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তার ফলে জন্মমুহূর্তেই ও প্রবীণের সমাজে ভিড়েছে। অর্বাচীনের দলে ওকে অনাবশ্যক কাল কাটাতে হয়নি। কাব্যসাহিত্যে, গদ্য সাহিত্যে গোড়ার দিকে আমরা আধ আধ বুলি শুনেছি। কিন্তু আমাদের কথা সাহিত্যের মুখে ধরেই পাকা কথা। বঙ্কিম রবীন্দ্রের যুগ আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ। সেই যুগে জন্মেছে বলে তার সমস্ত প্রসাদ গুণ ও একাধারে লাভ করেছে।

গল্প মানুষের মনকে যেমন টানে এমন আর কিছুতে নয়। এজন্যে আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্য প্রধানত গল্পই বলে আসছে। মহাকাব্য যখন লেখা হয়েছে তখনও কবিরা গল্প উপন্যাসই লিখেছেন তবে ছন্দোবদ্ধ কাব্যে লিখেছেন। অবশ্য যাদের সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁরা আমাদের চেনা জানার আওতায় নয়; তাঁরা দেব দেবী, রাজা রাজড়া, বাদশা বেগম। গল্প উপন্যাসের পাত্র হিসাবে আজকের দিনে এঁরা অপাত্র। প্রকৃত গল্প উপন্যাসের সৃষ্টি তখনই হয়েছে যখন কবি সাহিত্যিকরা একথা উপলব্ধি করেছেন যে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনই একেকটি গল্প। এ গল্পের যে রোমাঞ্চ তার সঙ্গে আর কোন রোমাঞ্চের তুলনাই হয় না। আমরা যখন কোন ঘটনাকে উল্লেখ করে বলি গল্পের চাইতেও রোমাঞ্চকর তখন 'গল্প' কথাটাকে আমরা কদর্থে ব্যবহার করি। ধরেই নিই যে গল্প জিনিসটা একটা অবাস্তব উদ্ভট ব্যাপার, সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। গল্প যখন প্রগলভতা প্রকাশ করে, বলে, সত্যকেও হার মানিয়েছি তখনই সে আত্মঘাতী হয়। মানুষের জীবনই চরমতম রোমাঞ্চ। সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, রাগ বিরাগ, ভালো মন্দের কত ঘাত প্রতিঘাত। চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার, সদিচ্ছার সঙ্গে স্বভাবের, দৃষ্টের সঙ্গে অদৃষ্টের, দৈবের সঙ্গে জৈবের সংঘাতে কত আবর্তন। নদী যেমন নিত্যবহমান জলধারা, মানুষ তেমনি নিত্যবহমান গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পর দেখা হলেই প্রশ্ন, এই যে কি হল হে, কি খবর, তার পরে? এই 'তার পরে'র সঙ্গে, 'তার পরে' বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে। একেই বলে জীবনের কাহিনী। গল্প উপন্যাসই মানুষের প্রকৃত ইতিহাস।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই গল্প আছে, যিনি গল্প লেখেন তাঁর জীবনে তো বটেই। বহু অভিজ্ঞতায় মন যাঁর সমৃদ্ধ তিনিই গল্প বলার অধিকারী। কাব্য, সাহিত্য প্রধানত বহুদর্শনের ফল। বহুদর্শনের সুযোগ সকলের জীবনে আসে না। রবীন্দ্র-নাথের ন্যায় অভিজাত বংশোদ্ভবের পক্ষে সে সুযোগ সহজলভ্য ছিল না। এদিক থেকে গল্পগুচ্ছ রচনার ইতিহাসটিকেই একটি গল্প বলা যেতে পারে। রবীন্দ্র জীবনের অন্যতম বৃহৎ ঘটনা জমিদারি পরিচালনার ভার গ্রহণ। কবি মানুষকে কেউ জেনে শুনে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেয় না। মহর্ষির ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি আর সব ছেলেকে বাদ দিয়ে কি ভেবে সর্ব-কনিষ্ঠ কবি পুত্রটির হাতেই উক্ত ভার অর্পণ করেছিলেন তা বুঝে ওঠা কঠিন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ নিয়ে পরিবারে খানিকটা মনকষাকষিরও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বলা আবশ্যক যে মহর্ষি নানা ব্যাপারেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয়
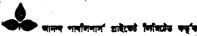
দিয়েছেন কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি যে প্রতিভা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। তাঁর কবি-পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তিনি যেমন সুস্পষ্টভাবে দেখেছিলেন এমন আর কেউ নয়। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-প্রতিভার প্রথম পুরস্কার পিতার হাত থেকেই পেয়েছিলেন। কবিকে পুরস্কৃত করা রাজার কর্তব্য, দেশে আজ রাজা নেই, সে কর্তব্য আমাকেই পালন করতে হল—মহর্ষির এই উক্তি দৈববাণীর ন্যায়।

দেশের যিনি মহাকবি হবেন, দেশ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জমিদারি পরিচালনার ভার চাপিয়ে দিয়ে দেশকে জানবার এবং চেনবার পথ মহর্ষি সুগম করে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে তিনি আগেও উৎসাহ দিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে যৌবনারম্ভে রবীন্দ্রনাথের একবার খেয়াল গিয়েছিল, গরুর গাড়িতে করে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে পেশোয়ার পর্যন্ত যাবেন। পরিবারস্থ কেউ এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নি। "কিন্তু পিতাকে যখনই বলিলাম তিনি বলিলেন, এ তো খুব ভালো কথা; রেল গাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে।" (জীবনস্মৃতি) মহর্ষি নিজে যে এক সময়ে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়িতে নানা স্থান পর্যটন করেছিলেন সে সব কথাও উৎসাহের সঙ্গে পুত্রকে বলেছিলেন। যা হোক মহর্ষির মনে যে উদ্দেশ্যই থাক একথা নিশ্চিত যে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দেবতার বর লাভের ন্যায় হয়েছে। এটি তাঁর জীবনের এক বৈপ্লবিক ঘটনা। এ যাবৎ রবীন্দ্রনাথের জীবন কেটেছে আপন পরিবারের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে—অনেকটা যেন এক বিরল বসতি দ্বীপের অধিবাসীর মতো। দেশের জনসমাজ থেকে তিনি একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিলেন। 'ছবি ও গান'-এর ভূমিকায় নিজেই বলেছেন: "আমি ছিলাম বাতায়নবাসী, বৃহত্তর সংসারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না।" মনের পরিণতির জন্য এই যোগাযোগ অত্যাবশ্যক ছিল। এতদিনে সেই শুভ যোগাযোগ ঘটল। দেশের কবি এই প্রথম দেশকে দেখলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'বাংলা দেশের হৃদয়ে সেই প্রথম প্রবেশ করেছি।' সেই প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্রটি 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। আমি গল্পগুচ্ছের ভূমিকা লিখতে বসেছি কিন্তু গল্পগুচ্ছের প্রকৃত ভূমিকা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই লিখে গিয়েছেন। 'ছিন্নপত্র' একাধারে গল্পগুচ্ছের ভূমিকা এবং টীকাগ্রন্থ। অনেক গল্পের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে এখানেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। কোন কোন গল্পের পরিবেশ এবং পটভূমিকাও এই গ্রন্থের নানা বর্ণনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজ মুখের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—"ছিন্নপত্র যখন লিখছিলুম—স্রোতের শেওলার মতো ছোট ছোট দৃশ্য ঘটনা সেই সঙ্গে ভেসে এসেছিল..." তখনই লিখলুম 'গল্পসপ্তক'।

শিলাইদা এবং পতিসরে যখন নিয়মিত কাছারি করতে শুরু করলেন তখন দেশের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হল। দেশ বলতে শুধু তো দেশের মাটি নয়। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, দেশ জিনিসটা মৃন্ময় নয়, চিন্ময়। অর্থাৎ দেশ বলতে বোঝায় দেশের মানুষ। সে মানুষ যে কী দরিদ্র, কী অসহায়—এ তিনি নিজ চোখে না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতেন না। নদীমাতৃক বাংলার পল্লীশ্রী একদিকে যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, এই একান্ত দুর্বল অসহায় মানুষগুলিও তেমনি তাঁর মনকে নিরন্তর টেনেছে। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে বলেছেন, এখানকার শস্যক্ষেত্র এবং স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে এবং লোকালয়ে মানুষ যে সুখ-দুঃখময় ভালোবাসার নীড় রচনা করেছে, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন আর কোথায় পাওয়া যেত। বলেছেন, "আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে; যেন এর মনে আছে, 'আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে; আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে; জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।...এত অসহায়, অসমর্থ অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর—।' সংসারের সমস্ত ট্র্যাজেডীর মূলেই এই কথা—মানুষ অসহায়, জীবন অসম্পূর্ণ। গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পেই এই ট্র্যাজেডীর সুরটি আছে। ছিন্নপত্রের ১৮নং চিঠিটি (ঐ যে মস্ত বড় পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ইত্যাদি) গল্পগুচ্ছের বহু গল্পের পটভূমিকা রচনা করেছে। গল্পগুচ্ছের মূল সুরটি ঐ একটি চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে।

এই জন্যেই বলছিলাম যে গল্পগুচ্ছের প্রথম অলিখিত গল্পটি হল রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনার ভার গ্রহণ। এ যদি না করতেন তো বাংলা দেশকে চেনা হত না, দেশের মর্মমূলে কখনো পৌঁছোতে পারতেন না। অবশ্য এ পরিচয় না ঘটলেও গল্প-উপন্যাস হয়তো তিনি লিখতেন কিন্তু সে গল্প হত ইতিহাসের মোড়কে ঢাকা বৌ-ঠাকুরানীর হাট, মুকুট, দালিয়া জাতীয় গল্প। বড় জোর কবিমনের যাদু মিশিয়ে 'দুরাশা' গল্পের কুয়াশাচ্ছন্ন মোহের সৃষ্টি করতে পারতেন। ওই গল্পে অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছেন, সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না, তথাপি বলতে হবে এ ঠিক গল্প নয়, কাহিনী। খুব ফিকে ধরনের হলেও এখানেও ইতিহাসের একটু ছোপ লেগেছে। সত্যিকারের গল্পের জন্ম হল পদ্মাতীরে লোকালয়ের কোলে, আমাদের একান্ত পরিচিত লোক-সমাজকে আশ্রয় করে। গল্পগুচ্ছের প্রথম দুটি গল্প—'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' গল্প নয়, গল্পের ছাঁচে ঢালা আজকাল যাকে বলে রম্যরচনা। ভারতীতে প্রকাশিত এ দুটি গল্প লেখা হয়েছিল ১২৯১ সালে, তখনও ছিন্নপত্রের বাংলা দেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। গল্পগুচ্ছের প্রথম আসর বসেছে সাপ্তাহিক হিতবাদীর পাতায়। প্রথম খাঁটি গল্প 'দেনা পাওনা' ১২৯৮ অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯১

সালে লেখা; ততদিনে সাজাদপুর, পতিসর, শিলাইদহ অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর মোটামুটি পরিচয় হয়ে গিয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষ করবার কথা যে ইতিপূর্বে ছিন্নপত্রের যে চিঠিটির কথা আমি উল্লেখ করেছি সেটিও ওই ১৮৯১ সালে লেখা। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে গল্প রচনার উপযোগী মেজাজটি তখনই তৈরি হয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যে বাঙলা দেশের নিবিড়তম ছবি সর্বপ্রথমফুটে উঠল গল্পগুচ্ছের গল্পে। বাঙলা দেশের নদী-জল, আকাশ-বাতাস, আলো-আঁধারি—প্রতিটি গল্পের মজ্জায় মিশে গিয়েছে। পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে পল্লীবাসী মানুষের স্বভাব মিশে গিয়ে প্রত্যেকটি গল্পকে বিশেষ একটি বাঙালী চরিত্র দিয়েছে। গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যতখানি বাঙালী, এমন আর কোথাও নন। তাঁকে বাঙালী কবি, বাঙালী নাট্যকার বললে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করে শুধু ভৌগোলিক পরিচয়টিকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে বাঙালী গল্প রচয়িতা। আমাদের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না সরলতা-কপটতা, শত্রুতা-মিত্রতা, হিংসা, বিদ্বেষ, স্নেহ-প্রেম, ঔদার্য-মাধুর্য সমস্ত মিলিয়ে বাঙালী জীবনের একটি সমগ্র রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। অবশ্য আপন দেশের মানুষকে ভাল করে জানলেই সকল দেশের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়। সব দেশেরই শ্রেষ্ঠ গল্প রচয়িতা একান্তভাবে আপন দেশের কথা বলেছেন এবং সেই কথাই সকল দেশের, সকল মানুষের কথা হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "লোকের চিত্ত থেকে, দেশের মাটির থেকে বিশ্বের রস আকর্ষণ করেছি।" (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ)

আমি যাকে গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প বলছি, সেই 'দেনা-পাওনা' গল্পটি বাঙালী জীবনের একটি অতি পুরাতন মর্মবেদনার ইতিহাস নিয়ে রচিত। কন্যার বিবাহে বরপক্ষের দাবি মেটানো যে কী প্রাণান্তকর এবং মেটাতে না পারলে কী মর্মান্তিক তার পরিণতি, বাঙলা দেশের পিতামাতা এককালে তা মর্মে মর্মে টের পেয়েছে। কন্যার পিতার মত অবহায় জীব সংসারে কমই ছিল। এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। এ-জন্যে ওই বিষয়টি একাধিকবার তাঁর গল্পে ফিরে ফিরে এসেছে। দেনা-পাওনার বহুকাল পরে লেখা 'অপরিচিতা' গল্পে ওই একই সমস্যা, 'হৈমন্তী' গল্পেও এরই আভাস। গোড়ার দিকে বেশির ভাগ গল্পেই একটি বিবাদের আভাস আছে। ঐ যে ছিন্নপত্রের পূর্বোল্লিখিত চিঠিটিতে বলেছেন, আমাদের এই পৃথিবীর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে, প্রথম যুগের অধিকাংশ গল্প সম্বন্ধেই ওই কথাটি বলা চলে। এদেরও মুখে একটি বিষাদের ছায়া লেগে আছে। বিশ্ব সংসারের মধ্যে কোথাও একটা যেন অসম্পূর্ণতা আছে—কোন কাজের আরম্ভ যে-ভাবে, অবসান সে-ভাবে হয় না, কাছের মানুষ দূরে চলে যায়, আত্মীয় অনাত্মীয় হয়ে ওঠে। মিলন সেখানে বিচ্ছেদের ছায়ায় ম্লান, জীবন মৃত্যুর ভয়ে ম্রিয়মান। ছিন্নপত্রের সেই চিঠির কথাই বারংবার মনে আসে। মাতা বসুন্ধরার আদিমতম বেদনাটি নিয়ে মানব-সন্তানের জন্ম হয়েছে—'আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে. আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারিনে, জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।' বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে একটি অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ-বেদনা আছে, 'পোস্টমাস্টার', 'ব্যবধান' ইত্যাদি গল্পে তারই প্রকাশ। লক্ষ করবার বিষয় যে, 'যেতে নাহি দিব' কবিতা এবং 'পোস্টমাস্টার' গল্প একই সময়ে—১২৯৮—৯৯ সালে লেখা। মৃত্যু যে কী ভয়ংকর ব্যবধানের সৃষ্টি করতে পারে, 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বিনী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মরলে তো কথাই ছিল না, মরেছে এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই বিশ্ব সংসারে তার আর স্থান হল না। 'তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্ব-নিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।' এক দিকে যেমন বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, অপর দিকে তেমনি বিশ্বপ্রকৃতির আত্মীয়তা এইসব গল্পে বিশেষ একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। কোথাও কোথাও প্রকৃতি দেবী স্বয়ং একটি চরিত্র হিসাবে দেখা দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সুভা' গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।' মূক বধির কন্যা সুভার ট্র্যাজেডি আর কিছু নয়, পরিচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে তার বিচ্ছেদ।

'আপদ' এবং 'অতিথি' গল্পের দুই বালক নীলকান্ত এবং তারাপদ বাংলা পল্লী-প্রকৃতির দুই সন্তান। আকারে প্রকারে মনে হয়, দুই যমজ ভ্রাতা, কিন্তু স্বভাবে বিপরীত—একটি স্নেহের কাঙাল, আঁকড়িয়ে ধরতে চায়, অপরটি স্নেহ-প্রীতির কোন বন্ধনে ধরা দিতে নারাজ, সে নিরুদ্দেশের যাত্রী। অধিকাংশ গল্পেই একটি প্রচ্ছন্ন বেদনায় আকাশ বাতাস মন্থর; মেঘ ও রৌদ্র দুই-এ মিলে এক করুণ মধুর মায়া বিস্তার করেছে। বেশির ভাগ গল্পেরই মর্মকথাটি—সব-সুখ-দুখ-মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এসো হে। এর মানে এই নয় যে, গোড়ার দিকের গল্পে বৈচিত্র্যের কিছু অভাব আছে। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানব-চরিত্রের বিচিত্র লীলা মিশে আশ্চর্য বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। অতিশয় সরলচিত্ত গ্রাম্য মানুষের জীবনেও আকস্মিক বিপাকে বিষম জটিলতার সৃষ্টি হয়। দুখিরাম রুই আর ছিদাম রুই যেমন, তাদের ঘরের বউ চন্দরাও তেমনি মাটি কাদা. রোদে জলে মেশা পঞ্চভূতে গড়া আদিম প্রকৃতির মানুষ। 'এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।' অতিশয় সরলচিত্ত বলেই এদের ক্রোধ যেমন হিংস্র, অভিমান তেমনি প্রচণ্ড। মিথ্যা বলতে শেখেনি; অনভ্যাসের মিথ্যা অনর্থ বাধায়, নিরপরাধের মৃত্যু ঘটায়। এমন নিটোল নিখাদ গল্প (শাস্তি) সাহিত্যে বিরল। চান্দরার দেহ-সৌষ্ঠবের সঙ্গে গল্পটির অঙ্গসৌষ্ঠবের যথেষ্ট মিল আছে। 'শরীরটি অনতিদীর্ঘ, আঁট-সাঁট, সুস্থ সবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও কিছু বাধে না......কোথাও কোন গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই।' গল্পটির মধ্যেও কোথাও এতটুকু শিথিলতা নাই।

ক্রমে সংসারের ক্ষয়-ক্ষতি, বিচ্ছেদ-বেদনা ছাড়াও জীবনের নানা রহস্য, নানা কৌতুক উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। গল্পের আসর বিস্তৃত হল, গ্রাম ছাড়িয়ে শহরে এল। শহুরে শিক্ষিত মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা গল্পের বিষয়বস্তু হল। ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান উপাদান প্রেম। রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমের গল্প লিখেছেন, তা স্বাদে গন্ধে একেবারেই আলাদা। 'নষ্টনীড়' অনন্য চরিত্রের গল্প। অনন্য এই কারণে যে, সমস্ত গল্পটি প্রেমের রসে অভিষিক্ত, কিন্তু প্রেমের কথা একটিও নাই। অনির্বচনীয়কে রবীন্দ্রনাথ বচন দেবার চেষ্টা করেননি। চারু এবং অমল Kindred Spirit, এরা একজন আরেকজনের মনকে টানবেই, চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তেমনি। নিরাকার ব্রহ্মের ন্যায় প্রেমও নিরাকার। বাতাসকে যেমন চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, প্রেমও তেমনি—ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু সমস্ত দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আধুনিকরা যাই বলুন, সত্যিকারের প্রেমের স্বরূপ এ-ই। 'নষ্টনীড়' এবং 'পয়লা নম্বর' গল্পের বিষয়বস্তু এক। উভয় আখ্যায়িকাতেই নীড় নষ্ট হয়েছে। শেষোক্ত গল্পের অনিলা এবং সিতাংশুমৌলী Kindred Spirit নয়, বরং দু'জনকে বিপরীতধর্মী বলা চলে। তথাপি পুরুষের পৌরুষ রমণীর মনকে টেনেছে। পণ্ডিতম্মন্য অহংসর্বস্ব স্বামীটি যখন বড় বড় তত্ত্বকথায় আলোচনা করেছেন, প্রতিবেশী সিতাংশুমৌলী তখন অশ্ব-চালনায়, এসরাজ বাজনায় কিংবা টেনিস খেলায় অনায়াস নৈপুণ্যে দ্বারা রমণীর মনকে জয় করেছে। স্বামীর মুখে যখন বড় বড় আদর্শের বাণী উচ্চারিত হয়েছে, প্রতিবেশীর গোপন লিপিতে তখন রমণীর স্তবগান ধ্বনিত হয়েছে। প্রণয়-প্রার্থীর প্রতি প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ের কোন প্রমাণ নেই, অথচ তার প্রতি রমণীর গোপন অনুরাগটি জানতে বাকি থাকে না। এখানেই গল্পের মহিমা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এক্ষেত্রেও প্রেম নিরাকার। অনিলা যদি গিয়ে সিতাংশুমৌলীর কাছে আত্মসমর্পণ করতেন তো গল্পের ছন্দপতন হত। 'এক রাত্রি' গল্পে এক পুরুষ এবং এক রমণী ভয়ংকর দুর্যোগের রাতে একান্ত নির্জনে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল। একে অন্যের পরিচিত, বাল্যকালে একসঙ্গে পাঠশালায় গিয়েছে, খেলাধুলো করেছে, একদা বিবাহ-বন্ধনের প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছিল, তথাপি বাক্য বিনিময় মাত্র হল না, অথচ একে অন্যের উপস্থিতির রোমাঞ্চ সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করেছে। ব্রাউনিং-এর The last ride together কবিতায় নায়কের উক্তি স্বভাবতই মনে হবে—Who knows but the world may end to-night? সেই রাত্রি যদি অনন্ত-রাত্রি হত, তবে আর কথা ছিল না, কিন্তু রাত্রি শেষ হল, দুর্যোগেরও অবসান হল। "সুরবালা কোন কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোন কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।" আজকের দিনের পাঠক এ-কে সহজে মেনে নেবেন না, তাঁরা বলবেন, রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে মানেননি, সামাজিক সম্পর্কটাকেই মনে রেখেছেন; পরস্ত্রী আর পরপুরুষের বাধা অতিক্রম করতে পারেননি। দেহ এবং মন—দুই নিয়ে মানুষ। কোনটাই অপ্রধান নয়। রুচি অনুযায়ী কেউ একটিকে প্রাধান্য দেন, কেউ অপরটিকে। কিন্তু তাই বলে একজন খাঁটি কথা বলছেন, অপরজন বে-খাঁটি, এমন কথা কেউ বলবে না। তবে এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, রবীন্দ্রনাথ মদনকে মনোজাত মনসিজ হিসাবেই দেখেছেন।

বাঙালী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটিকে রবীন্দ্রনাথ নানা দিক থেকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এই বিষয়টিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ, প্রধানত এর উপরেই সংসারের সুখ শান্তি নির্ভর করে। আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটিকে শাস্ত্র এবং সমাজ বিধানের দড়িদড়া দিয়ে যথাসাধ্য মজবুত এবং টেকসই করে বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে, তথাপি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি করে ধীরে ধীরে

estrangement বা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, এই সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন। সম্পর্কটা এত বেশি স্পর্শকাতর যে, সহজেই বন্ধন শিথিল হবার আশংকা থাকে এবং একবার ভাঙচুর ঘটলে সহজে আর জোড়া লাগে না।

"একটা জড় পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয়...পরে আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ মন জিনিসটা সজীব পদার্থ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্তন।" (দিদি, গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ড) 'দিদি' এবং 'মধ্যবর্তিণী' গল্পের বিষয়বস্তু এক। উভয় ক্ষেত্রেই এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাবে একে অন্যের প্রতি একান্ত অনুরক্ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হল। একটিতে এক শিশু ভ্রাতার প্রতিপালন, অপরটিতে প্রথমা পত্নীর আগ্রহাতিশয্যে সপত্নী গ্রহণ—দুর্দৈবের কারণ। দু ক্ষেত্রেই ঘোরতর ট্র্যাজেডি—একটি মরণান্তিক, অপরটি মর্মান্তিক। 'নিশীথে' গল্পের বিষয়বস্তু অনুরূপ কিন্তু গল্পের গঠন প্রণালী ভিন্নরূপ, অধিকতর চমকপ্রদ। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি একই শ্রেণীভুক্ত; পূর্বোক্ত গল্পগুলির মত এখানেও একটি ট্র্যাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু অকস্মাৎ সেটি কমেডিতে পরিণত হয়েছে। এই কারণে গল্পটি অন্য গল্পগুলির মতো সুসম্বদ্ধ নয়, একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত। অর্থাৎ গল্পটা যেভাবে শুরু হয়েছে সেভাবে শেষ হয়নি, শেষটুকু অনাবশ্যকরূপে নাটকীয়। যে মানুষ আপন দুরদৃষ্টকে বিধাতার অভিপ্রায় বলে মেনে নিয়েছে তার জীবনে নাটকীয়তার অবকাশ কোথায়? অপর পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে 'মানভঞ্জন' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই নাটকীয় পরিণতি লাভ করেছে। পারস্পরিক ভালোবাসার ওপরেই উক্ত সম্পর্কটি স্থাপিত; সেই ভালোবাসা মানুষের সূক্ষ্মতম অনুভূতি। এর ওপরে কোন প্রকার জবরদস্তি চলে না। অনাবশ্যক ভার চাপাতে গেলে সমস্ত সৌধটি ধ্বসে পড়বার আশঙ্কা। অপর পক্ষে ভালোবাসার যাদুবিদ্যা যার জানা আছে নিতান্ত অকরুণার মনকেও সে জয় করতে পারে। 'সমাপ্তি' গল্পের অপূর্ব সে কথাটি প্রমাণ করে দিয়েছে। ভালোবাসা এমনি জিনিস, একদিকে যেমন মানুষকে অন্ধ করে অপর দিকে তেমনি তাকে দিব্যদৃষ্টি দান করে। 'ত্যাগ' গল্পটি এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হেমন্ত কুলীন ব্রাহ্মণ, না জেনে বিয়ে করেছে এক কায়স্থ কন্যাকে। প্রকৃত তথ্য যেদিন জানল বহু যুগের সংস্কারে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। জাত বাঁচাবার জন্যে স্ত্রীকে ত্যাগ করাই স্থির করেছিল। কিন্তু ভালোবাসা যেখানে অকৃত্রিম সেখানে জাতি ধর্মের ব্যবধান যে কত কৃত্রিম তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। হেমন্তও বুঝতে পেরেছে। সমস্ত সংস্কার ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলতে পেরেছে, "আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।" পিতা হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, "জাত খোয়াইবি?" হেমন্ত কহিল, "আমি জাত মানি না।"

উপরে যে ক'টি গল্পের উল্লেখ করেছি তার সব ক'টিই ১২৯৯ থেকে ১৩০৫ সালের মধ্যে লেখা। মনে হয় একটা সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টা নিয়ে নানা দিক থেকে ভেবেছেন। এর বহুদিন পরে ১৩২১-২২ সালে এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের গল্পে আবার ফিরে এসেছে। হালদার-গোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর গল্পের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব গল্পে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটেছে সেটা কোন ঘটনা সংঘাতের ফলে নয়, চারিত্রিক বৈষম্যের ফল। 'হালদার গোষ্ঠী' এবং 'স্ত্রীর পত্র'—গল্প দুটি একই theme-এর variation। বনেদি পরিবারের ছেলে বনোয়ারিলাল একটু বিশেষ ধরনের মানুষ, গতানুগতিক জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা; এজন্যে বনেদি পরিবারের হাল-চালের সঙ্গে নিজেকে সে একেবারেই মেলাতে পারেনি। কিন্তু কৌতুকের বিষয় যে বনোয়ারিলালের স্ত্রী কিরণ বাইরে থেকে এসেও এই পরিবারের জীবনযাত্রার সঙ্গে অতি সহজে নিজেকে খাঁজে খাঁজে মিলিয়ে নিয়েছে। হালদার গোষ্ঠীর বড় বউ হবার যোগ্যতা যে পরিমাণে সে অর্জন করেছে ঠিক সেই পরিমাণে বনোয়ারিলালের কাছ থেকে সে দূরে চলে গিয়েছে। এর ঠিক উল্টোটি ঘটেছে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে। এখানেও একটি বনেদি পরিবার, স্বামীটি বনেদি পরিবারের আদর্শ সন্তান, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার বাইরে কখনো পদক্ষেপ করেন না। এর স্ত্রী মৃণাল এ পরিবারের পক্ষে বেমানান তো বটেই বিপজ্জনকও বলতে হবে। কারণ স্ত্রীলোকের যা থাকতে নেই তাই ওর আছে—আছে প্রচুর পরিমাণ বুদ্ধি, তার ওপরে আবার কবি সুলভ একটি মন। এমন মেয়ে সাবেকিচালের নিতান্ত গতানুগতিক জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবে কি করে? 'পয়লা নম্বর' গল্প এরও তিন বছর পরে লেখা। এ গল্পের তুলনা নেই। স্ত্রী অনিলা ধরণীর ন্যায় ধৈর্যশীলা, কিন্তু স্বামীর হৃদয়হীন শুষ্ক পাণ্ডিত্যের দৌরাত্ম্য সেও সহ্য করতে পারেনি। আশ্চর্যের বিষয় যে অত্যন্ত অরসিক স্বামীটিকে নিয়ে কবি অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছেন। ঐ আত্মকেন্দ্রিক স্বামীটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ যতখানি শ্লেষ বর্ষণ করেছেন আর কোথাও কারো প্রতি এতখানি করেছেন বলে মনে হয় না। অপর পক্ষে এই গল্পের রমণীটি যে এত কম কথা বলে, নিজেকে এমন নির্বাক, নির্বিকার রেখেও এতখানি মাধুর্য বিকীর্ণ করতে পেরেছে—চরিত্র রূপায়ণে এটি অপূর্ব কলাকুশলতার পরিচায়ক।

এ পর্যন্ত আমার আলোচনা প্রধানত গল্পগুচ্ছের প্রথম তিন খণ্ড নিয়ে। চতুর্থ খণ্ডের গল্প ভিন্ন জাতের, এর স্বাদ গন্ধ আলাদা। প্রথম দিককার গল্প বেশির ভাগ গ্রাম বাংলার গল্প, পদ্মাতীরে বসে লেখা। বোধ করি সেই কারণেই ঈষৎ একটি আর্দ্র হাওয়া

প্রতিটি গল্পের মধ্যে প্রবাহিত। তাতে গল্পগুলিকে ভারি একটা সজীবতা দিয়েছে। যেখানে শহরে শিক্ষিত মানুষের কথা বলেছেন সেখানেও সেই সজীবতা অব্যাহত অথচ কোন প্রকার উগ্রতা নেই। গ্রামের গল্প গ্রাম্যতা দোষ মুক্ত, শহুরে গল্পগুলিও আত্যন্তিক নাগরিক দোষে দুষ্ট নয়। কিন্তু শেষ পর্বের গল্প ক'টি ভয়ংকর রকমে শহুরে গল্প। ভালো মন্দের প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় এদের স্বভাব আলাদা। গ্রামের হোক, শহরের হোক আদ্য মধ্য পর্বের গল্পগুলিতে একটা open air atmosphere ছিল, শেষ পর্বে এসে হঠাৎ যেন গল্পগুলো হুড়মুড় করে খুব একটা ফ্যাশনেবল্ ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়েছে। সেখানকার ঝকঝকে গৃহসজ্জা আর ঝলমলে আলো যেমন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, এদের বাকচাতুর্য তেমনি ভালো মানুষ পাঠকদের বিভ্রান্ত করে তোলে। সবাই ভয়ংকর রকমের তুখোর লোক—বিদ্যায় বুদ্ধিতে বাক্যে কর্মে। আগেকার গল্পে মানুষগুলোকে যতখানি পরিচিত মনে হয় এরা ততখানি নয়। বলা বাহুল্য যাঁরা এসব গল্পের পাঠক তাঁরা বেশির ভাগ উচ্চশিক্ষিত শহুরে মানুষ কিন্তু তাঁদেরও অনেকের কাছে

এরা—অভীক, বিভা ডক্টর সেনগুপ্ত, অচিরা, নন্দকিশোর, মোহিনী, নীলা—খুব যে একটা পরিচিত এমন মনে হয় না। অথচ শহুরে পাঠকদের কাছেও গল্পগুচ্ছের গ্রামবাসীরা তেমন অপরিচিত মনে হবে না। খাঁটি মানুষ কারো কাছেই অপরিচিত নয়, অপর পক্ষে কৃত্রিম মানুষ সকলের মনেই সন্দেহের উদ্রেক করে। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' মালতী বলেছিল,

"রাম রাম! এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়!
আর তারা কি সবাই অসামান্য,
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।"

এই গল্পগুলো পড়লে আমাদেরও সেই কথাই মনে হয়— এত ছেলেমেয়ে আছে আমাদের এই পোড়া দেশে যারা সবাই অসামান্য, যাদের এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।

লক্ষ করবার বিষয় যে রবীন্দ্রকাব্যের আদ্য মধ্য অন্ত্য কোন পর্বেই Sophistication নেই কিন্তু অন্ত্য পর্বের গল্প অতিমাত্রায় Sophisticated। এটা অস্বাভাবিক এমন কথা বলব না কারণ সমাজজীবনে Sophistication এলে সাহিত্যের কোন না কোন বিভাগে তা প্রতিফলিত হবেই। আমার শুধু বক্তব্য এই যে এ গল্পগুলোর স্বভাব আলাদা। 'শেষের কবিতা'র যে বাকাচ্ছটা বাংলা দেশকে চমকিত করে দিয়েছিল সে বাক্যের সম্মোহন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। চরিত্রচিত্রণে, ভাষার বৈদগ্ধ্যে এ গল্পগুলো 'শেষের কবিতা'র off-shoots। সেই যে সিসিলিসদের বৈঠকখানায় ঢুকে পড়েছিলেন সেখান থেকে আর বেরোতে পারেন নি। এই সূত্রে আরেকটি কথাও লক্ষ করবার আছে। অন্ত্য পর্বের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় পেছন ফিরে তাকিয়েছেন। ছিন্নপত্রের সঙ্গে গল্পগুচ্ছের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথা আগে উল্লেখ করেছি। শেষ পর্বের কোন কোন কবিতায় ছিন্নপত্র ফিরে এসেছে, বহুকাল আগে দেখা অনেক ছবি চোখের সমুখে ভেসে উঠছে—আর nostalgia-র মন-কেমন-করা ভাব দেখা দিয়েছে সেই সব কবিতায়। অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে কবি তাঁর একটি বাল্যস্মৃতির উল্লেখ করেছেন—"বহুকাল হল ছেলেবেলায় বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম, একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনিনি।" (ছিন্নপত্র—৩৬নং চিঠি, ১৮৯১ সালে লেখা) এবার গল্পগুচ্ছের 'অতিথি' গল্পের একটি বর্ণনা দেখুন—"এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট স্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল; দাঁড় মাঝি সকলেই হাঁদারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল......নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে সকল নৌকা চলিতেছিল, তাহাদের আরোহীগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল।" (১৮৯৫ সালে লেখা)

এবার এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন 'আরোগ্য' কাব্যের ৪নং কবিতার একটি অংশ—

মনে এল কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে,
দুপহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।

*

সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দ শূন্য নিশীথ আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের,
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর
বেগে।

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ।
(১৯৪১ সালে মৃত্যুর মাত্র সাত মাস পূর্বে
লেখা)

ছিন্নপত্রে উল্লেখ নেই এমনও অনেক পূর্বদিনের স্মৃতিচারণ শেষ পর্বের কাব্যে স্থান পেয়েছে কিন্তু গল্পগুচ্ছের শেষ পর্বে পেছন ফিরে তাকাবার কোন অভিরুচি নেই। (অন্ত্য পর্বের কাব্যে এবং অন্ত্য পর্বের গল্পে এই চারিত্রিক বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।) ছিন্নপত্রের সঙ্গে গল্পগুচ্ছের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক এখানে এসে সেই সম্পর্কটি ছিন্ন হয়ে গেছে। এসব গল্পের দৃষ্টিভঙ্গি, বাকভঙ্গি সবই আলাদা—ভাবে ভাষায় প্রথম পর্বের স্নিগ্ধ ভাবটি নেই। প্রথম দিকের গল্পে কবি ধর্মের সঙ্গে বাস্তবধর্মের আশ্চর্য মিল ঘটেছে। আমাদের দীন দরিদ্র দেশের মানুষকে এবং তার প্রাত্যহিক জীবনকে তিনি দরদী প্রেমিকের চোখ দিয়ে দেখেছেন, শেষ দিকের গল্পে তিনি আধুনিক জীবনের কৌতুককে প্রধানত স্যাটায়ারিস্টের দৃষ্টিতে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকারে আধুনিক ভাবাপন্ন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তাঁর আধুনিকতা সর্ববিষয়ে তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্যবোধের দ্বারা শোধিত এবং পরিস্রুত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অতি আধুনিকদের প্রতি অবশ্যই তাঁর একটি স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয়ের ভাব ছিল কিন্তু প্রশ্রয় সত্ত্বেও যেখানে বাড়াবাড়ি দেখেছেন সেখানে স্নেহ মিশ্রিত ব্যঙ্গ বর্ষণ করতে ছাড়েন নি। প্রথম দিকের গল্পে বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত যাই ঘটুক human dignity কোথাও ক্ষুণ্ন হয়নি। এমন যে ছিদাম রুই-এর বউ চন্দরা—সেও dignified. কিন্তু শেষ দিকের গল্পে সকল চরিত্রে সেই dignity রক্ষা করা হয়নি। বোধ করি সেটা ইচ্ছাকৃত। আধুনিকতার প্রগলভতা ডিগনিটির পক্ষে অনুকূল

নয়। স্বামীর আদর্শ রক্ষার জন্যে সোহিনীর জোর গলার ঘোষণার মধ্যে এমন একটা অতিশয়তা আছে যে সমস্ত জিনিসটা প্রতি-ক্রিয়া বলে সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সমস্ত সৌধটি ধ্বসে পড়বার উপক্রম হয়েছে। মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ মনে মনে হাসছেন। 'ল্যাবরেটরি' গল্পটাকে অনেকে দুঃসাহসিক আখ্যা দিয়েছেন। সাহিত্যে দুঃসাহসিক কথাটা নিতান্তই অবান্তর। যা রসগ্রাহ্য সাহিত্য শুধু তাই প্রকাশ করবে, সেটার প্রকাশে সাহসের প্রয়োজন হয় না, শুধু রসবোধের প্রয়োজন। সাহিত্যে যাকে আজ দুঃসাহসিক বলা হচ্ছে সেটা আর কিছু নয় সমাজে প্রচলিত নীতি দুর্নীতি বোধকে বাতিল করে দেওয়া। এটাকে সাহস বা দুঃসাহস বলে না, একে বলে বাহাদুরি দেখানো। রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় সস্তা বাহাদুরি কখনো দেখাতে চান নি, কাজেই তাঁর বেলায় দুঃসাহসিক আখ্যাটি অপপ্রয়োগ। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে এইটুকু শুধু বলতে চেয়েছিলেন যে, উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তাহলে ছোটখাটো চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষণীয়। তবে এটা হল গিয়ে তত্ত্ব কথা। গল্পটার দুর্বলতা ঐখানে। তত্ত্ব কথা দিয়ে গল্প হয় না। গল্প উপন্যাসের চরিত্রকে সর্বাগ্রে convincing হতে হবে; বহু আস্ফালন সত্ত্বেও সোহিনী পাঠককে convince করে না। অথচ এমন যে supernatural বা অতিপ্রাকৃতের কাহিনী —'ক্ষুধিত পাষাণ' কিম্বা 'মণিহারা' গল্প— যেখানে সমস্ত ব্যাপারটাকেই অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, সেখানেও গল্পের যাদুতে পাঠকের মনকে লেখক বশ করতে পেরেছেন। কোলরিজ যাকে বলেছেন suspention of disbelief—পাঠকের কাছ থেকে সেটি আদায় করতে পারাই গল্পরচয়িতার প্রধান কৃতিত্ব। যে যাদুগুণে নবাবী আমলের সোহিনীকেও আমরা বিশ্বাস করতে পেরেছি তার অভাবে এ আমলের সোহিনীকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় এবং চিত্তের দৃঢ়তায় সোহিনী নিজেকে অসাধারণ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছে। সেই আপ্রাণ চেষ্টাই তাকে undignified করে তুলেছে। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি মনে পড়ছে—"কোন মেয়েকে যখন আমরা অসাধারণ বলি, তখনই সে অসি ধারণ করে বসে। তাতেই তার পতন হয়।" (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ) সোহিনীর সম্পর্কে ঐ কথাটি অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে।
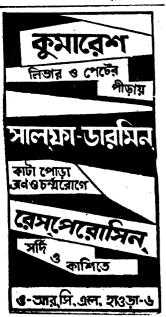
এই জন্যেই বলছিলাম যে, শেষ দিকের একাধিক গল্পে আধুনিকতার আস্ফালনের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সামান্য একটু কারণও ছিল। এক সময়ে আমাদের নব্য সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথকে সেকেলে আখ্যা দিয়ে নিজেদের আনকোরা আধুনিকতাকে সরবে সগর্বে জাহির করবার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে মনে ক্ষুব্ধ হন নি এমন নয়। কিন্তু অল্পবিস্তর আস্ফালন যে যৌবনের স্বভাবগত, একথা বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না কাজেই তাকে উপেক্ষা করা সহজ হয়েছে। জবাব, যা দেবার প্রসন্ন কৌতুকে এসব গল্পের মধ্য দিয়েই দিয়েছেন। 'শেষের কবিতা' থেকেই শুরু। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে 'শেষের কবিতা'ও একটি স্যাটায়ার। অক্সফোর্ডের ডিগ্রীধারী দুর্দ্ধর্ষ সায়েব অমিট্ রায়ে কেটি মিত্তির, বিমি বোসকে ছেড়ে প্রেমে পড়ল গিয়ে লাবণ্যর—কাজ করে গবর্নেসের, ওদের সমাজে বলতে গেলে অপাংক্তেয়। ভাবে স্বভাবে ওদের তুলনায় সেকেলে ধরনেরই বলতে হবে। তথাপি লাবণ্যকে মনে ধরল। এর মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন allegory আছে, সেটি উপভোগ্য। লাবণ্য কি? না grace অমিত এতদিনে আবিষ্কার করেছে যে, এতকাল যে রমণী সমাজে সে মিশে এসেছে তাদের রমণীয়তা নেই অর্থাৎ কিনা grace নেই; চাতুর্য আছে, মাধুর্য নেই। লাবণ্যর সঙ্গে তার যে মিলন হল না তার কারণ লাবণ্য বুঝতে পেরেছে যে বহুস্পর্ধিত যৌবন সত্ত্বেও অমিতের মনটি অপরিণত। সে ছেলেমানুষ, নিজের মনকেই সে জানে না। একদিন কেটি মিত্তিরের হাতে পরিয়েছিল হীরের আংটি, আজ পরিয়েছে লাবণ্যর হাতে। প্রথম আংটির মর্যাদা সে রাখেনি, দ্বিতীয়টির রাখবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? অপর পক্ষে দেখেছে যতই রূঢ় তার আচরণ তথাপি কেটি মিত্তিরের প্রেম খাঁটি। অমিতের দেওয়া আংটি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে এনামেল করা গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। লাবণ্য সেই মুহূর্তেই মন স্থির করে ফেলেছে। অমিতের তুলনায় লাবণ্যর মন ঢের বেশি পরিণত। প্রেমের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ত্যাগে। যে জিনিস তার হাতের মুঠোয় ছিল তাকে সে এক মুহূর্তে ত্যাগ করেছে। কচ ও দেবযানীর কাহিনীতে এই ত্যাগের মহিমা দেখিয়েছে কচ, দেবযানী দেখাতে পারেনি অথচ কচ দেবযানীকে কিছু কম ভালোবাসেনি। একজন পারে, অপরজন পারে না' তার কারণ একজনের মন mature, অপরজনের immature প্রেম, ভালোবাসা জীবনের বৃহত্তম এবং মহত্তম ব্যাপার। অপরিণত মন নিয়ে ভালোবাসতে গেলে কি হাস্যকর পরিণতি ঘটে গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডের 'অধ্যাপক' গল্পটি তার কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত। তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি অমিট্ রায়ের প্রেম কাহিনীটিকে হাস্যকর বলতে চাইছি। করুণে মধুরে মিলিয়ে এটি অতি সুখপাঠ্য একটি ট্র্যাজিকমেডিতে পরিণত হয়েছে। অমিত কেটি মিত্তিরের কাছেই ফিরে গিয়েছে কিন্তু তাকে গ্রহণ করবার আগে নৈনিতালের সরোবর জলে তাকে শোধন করে নিয়েছে। কেটি মিত্তির হয়েছে কেতকী মিত্র। (বলা বাহুল্য অমিট্ রায়েও হয়েছে অমিত রায়)। দেখা যাচ্ছে আধুনিকতার রং ক্রমেই ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। অমিতের বোন লিসি বলেছে, কেটিকে এখন নাকি চেনাই যায় না, কেননা ওকে বড্ড বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। এই কথাটির মধ্যেই শেষ পর্বের গল্প সম্বন্ধে আমার মূল বক্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছে এবং এই জন্যেই 'শেষের কবিতা' সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে এত কথা বলেছি। আধুনিকে আর স্বাভাবিকে যে কতখানি তফাত শেষের দিকের সব গল্পে না হলেও কোন কোন গল্পে সেই কথাটি বোঝাবার একটি প্রচ্ছন্ন প্রয়াস আছে।

ভণ্ড বনাম কুলীন
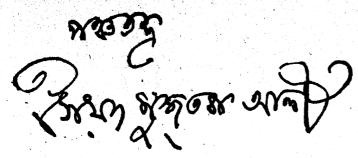
যে-ভাষার প্রশংসার এক শ্রেণীর মহাজন অধুনা পঞ্চমুখ সেই ভাষায় একটি প্রবাদ আছে; 'হে গভীর-সংকট-সংকুল-অরণ্যের-পথভ্রান্ত-পথিক, অরণ্য ভেদ করে জনপদে না পৌঁছবার পূর্বে হর্ষধ্বনি করো না।' অধম আপ্তবাক্যটি বিস্মরণ করে হর্ষোল্লাস করে বসেছি, এমন সময় দেখি, আমি গভীরতর অরণ্যে। সেই শ্রেণীর সজ্জনগণ এখন আরো প্রাণপণ লড়াই দিচ্ছেন, ইংরিজী যেন সর্বাবস্থায় কলেজাদিতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বিরাজমান থাকে। বোধ হয়, অধুনা শিক্ষামন্ত্রী যে প্রাদেশিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে ফেলবেন বলে মনস্থির করে বসেছেন, এ সংবাদ এঁদের বিচলিত করেছে।

এই শ্রেণীর একাংশ কোনো তর্কাতর্কি না করে তারস্বরে ইংরিজী ভাষা-সাহিত্য ও তার প্রসাদগুণ কীর্তন করেন। সে কীর্তনের ঢংটি বড়ই মজাদার। সর্বপ্রথম তাঁরা বলেন, যাঁরা বাংলা বা হিন্দী বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে চান তাঁরা অজ্ঞ; তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মূল নীতিই জানেন না। যেহেতু এঁদের প্রবন্ধাদি ও ইংরিজী কাগজে ছাপা চিঠিতে এঁদের নাম থাকে তাই প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, এঁরা বুঝি সুনীতি চাটুয্যের গুরুসম্প্রদায়। কারণ এঁনারা যখন বলেন, আমরা লিনগুইস্টিক্স জানি না, তখন আমরা ধরে নি, আমরা জানি আর নাই জানি, ওনারা অতি অবশ্যই জানেন। এবং লিনগুইস্টিক্স তো আর মাত্র একটি বা দুটি ভাষা শিখেই আয়ত্ত করা যায় না—অতএব এঁরা নিশ্চয়ই এন্তের, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় ভাষা, বিলক্ষণ রপ্ত করার পর আমাদের 'অজ্ঞ' বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। কিন্তু কই, এঁদের নাম তো ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের নাম করার সময় কেউ বলে না। এঁরা তা' হলে নিশ্চয়ই ইংরেজ কবির আদেশানুযায়ীতে

অসংখ্য রত্নরাজি বিমল উজল
খনির তিমির গর্ভে রয়েছে গভীরে।
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে॥

'বিফলে' নয় 'বিফলে' নয়—আমরা সন্ধান পেয়ে গিয়েছি। এবং চুপি চুপি বলছি, তাঁরা যে-প্রকারের ঢক্কানিনাদ করছেন তার থেকে সন্দ হয়, তাঁরাও নিঃসন্দেহ ছিলেন, আবিষ্কৃত হবেনই।

আইস সুশীল পাঠক, এবারে আমরা সেই সব 'জেম্'দের জলুস দেখে হতবাক্ হই (ইংরিজীতে অবশ্য 'জেম্' বক্রোক্তিতেও ব্যবহার হয়; যেমন কেউ যখন বলে, 'এই প্রেশাস 'জেম্'টি তুমি পেলে কোথায়?' তখন তার অর্থ 'এই আকাট পণ্টকটিকে তুমি আবিষ্কার করলে কোত্থেকে?' আমি কিন্তু, দোহাই ধর্মের, সেভাবে বলছি নে), এঁদের সৌরভ শুঁকে কৃতকৃতার্থ হই।

কেউ কেউ বলেন, বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে ইংরিজী ভাষার বৃদ্ধি (গ্রোথ) অধ্যয়ন করলে রোমাঞ্চ হয় (এ থ্রিলিং স্টাডি)! অবশ্যই হয়! আমরা শুধোব, কোন্ ভাষার ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস পড়লে রোমাঞ্চ হয় না? তবে ইংরিজীর বেলা একটু বেশী হয়। কেন বেশী হয়? এই সম্প্রদায় বলেন, ইংরিজী তার শব্দসম্পদ আহরণ করেছে অন্যান্য বহু ভাষা থেকে—যেমন লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, হীব্রু, আরবী, হাঙ্গেরিয়ান, চীনা—এস্তেক হিন্দী-বাংলা থেকে। তবেই নাকি সম্ভব হয়েছে, এঁদের মতানুসারে—শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ারড্স্ওয়ারত্, টেনিসন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিস্তর ভাষা থেকে এন্তের শব্দ নিয়েছে বলে ইংরিজীতে অত-শত উত্তম কবি—এ-সিদ্ধান্তটি পরে আলোচনা করা যাবে।

এই যে থ্রিলিং স্টাডি সেটা সম্ভব হয়েছে ইংরিজী অন্যান্য ভাষা থেকে বিস্তর শব্দ নিয়েছে বলে? সাধু প্রস্তাব!...এস্থলে আমরা তা' হলে এ তথ্যের আরেকটু পিছনে যাই—যথা, ইংরিজী অত বিদেশী শব্দ নিল কোথায়, কেন, কি প্রকারে? আমি কথা দিচ্ছি, এটা আরো থ্রিলিং হবে।

১) কোনো দেশ পরাধীন হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও পরাধীন হয়ে যায়। নরমান বিজয়ের পর ইংরিজী যে প্রায় তিন শ' বছর অবহেলিত অপাঙক্তেয় ছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি। এস্থলে বিজয়ী জাত যদি শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতায় বিজিত জাতের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয় তবে বিজিত ভাষা ক্রমে ক্রমে বিদেশী ভাষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যায়। তাই আজো ইংরেজ সবচেয়ে বেশী ঋণী ফরাসীর কাছে। এমন কি, যে সব গ্রীক লাতিন শব্দ নিয়েছে তার চোদ্দ আনা ফরাসীর মারফত।

হুবহু এই ঘটেছিল ইরানে, সে দেশ আরব বিজয়ের ফলে। তাদের শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম হুবহু তিন শ' বছর ছিল আরবী। সে ভাষার প্রভাব ফারসীর উপর এতই প্রচণ্ড যে, আজ আরবী শব্দ বর্জন করলে ফারসী এক কদমও ('কদম' শব্দটাও আরবী) চলতে পারবে না। হুবহু তেমনি উর্দুর উপর (বা প্রাকৃত হরিয়ানার উপরও বলতে পারেন) ফারসীর প্রভাব পড়েছিল ও ফারসীর মারফত আরবীর।

পক্ষান্তরে ফ্রান্স বা জরমনির উপর কোনো বিদেশী বেশী কাল রাজত্ব করেনি বলে ফরাসী-জরমনে বিদেশী শব্দ—ইংরিজী যে রকম বে-এক্তেয়ার হয়ে গিয়েছে তার তুলনায় মুষ্টিমেয়।

২) এর পর যদি সেই বিজিত জাত—এস্থলে ইংরেজ—বিধির লেখনে আপন দেশ ছেড়ে বাণিজ্য করতে বেরয়, সেই বাণিজ্য রক্ষা করতে গিয়ে রাজ্য জয় করতে আরম্ভ করে, এবং সর্বশেষে রাজত্ব করার ছলে ডাকাতি করে—চরকা পুড়োয়, আফিঙ গেলাবার জন্য সঙীন চালায়, শত্রু ঠেকাবার জন্য কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, ড্রাই আরথ পলিসি এক্তেয়ার করে, নিরস্ত্র বাগ-আবদ্ধ অসহায় নরনারীকে যারা পাশবিক হুহুঙ্কার বলে গুলি করে মারে তারা দেশে ফিরে স্বয়ং সম্রাটের আশীর্বাদাভিনন্দনসহ সুপ-প্লেট সাইজের মেডেল পায়—তবে, তখনই, সেই 'বাণিজ্য', সেই 'রাজত্ব', সেই ডাকাতি—এক কথায় সেই রক্তশোষণ, সেই এক্সপ্লয়টেশনের চোকশ সুবিধার জন্য সেই সব মহাপ্রভুরা বহু ভাষা শেখেন এবং তারই

ফলে তাদের আপন ভাষাতে বেনোজলের মত হুড়হুড় করে বিদেশী শব্দ ঢোকে।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ করার জিনিস, যে-বিজিত জাত ইতিপূর্বেই বিজয়ী জাতের কাছ থেকে অকাতরে শব্দ নিয়ে নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে তারাই পরবর্তী কালে অন্য জাতকে শোষণ করার সময় আরো অকাতরে শব্দ নিতে পারে। এদের তুলনায় ফরাসী-জরমন অনভিজ্ঞ বালখিল্য। তদুপরি এরা চেয়েছিল প্রধানত রাজত্ব করতে; 'বাণিজ্য' করতে নয়। এরা 'নেশন অব্ শপ্-কীপারজ্' বা 'শপ্-লিফ্টারস্' নয়। 'বণিকের মানদণ্ড' যখন 'পোহালে শর্বরী দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে' তখন সে 'রাজ-দণ্ডের' সর্বাঙ্গে বেনে-দোকানের কালি-ঝুলের চিত্রবিচিত্র ছোপ আর সপসপে ভেজাল তেলের দুর্গন্ধ।

শুনেছি, কোনো কোনো আন্তর্জাতিক গণিকা বাইশটি ভাষায় অনর্গল কথা কইতে পারে। তাদের সেই ভাষাজ্ঞান নমস্য কিন্তু পদ্ধতিটা গ্রহণ না করাই ভালো। ইংরেজের শব্দভাণ্ডার হয়তো বা নমস্য—আমি এস্থলে তর্ক করবো না কিন্তু তার পদ্ধতিটা ঘৃণ্য। পাঠক এটা দয়া করে ভুলবেন না। যদ্যপি এস্থলে এটা ঈষৎ অবান্তর তবু মনে রাখবেন, প্রথম গোলাম হতে হবে, পরে ডাকাত হতে হবে, তবেই শব্দভাণ্ডার সঞ্চিত হয়। এবারে চরে খান্ গে—যার যা খুশী করুন। এবং স্বীকার করুন, এ স্টাডি থ্রিলিংতর নয় কি না?

কিন্তু দোহাই ধর্মের, পাঠক ভাববেন না, গোলামির কড়ি তথা লুটের মাল দিয়ে ভরতি ইংরিজী ভাষা ব্যবহার করতে আমি অনিচ্ছুক। ডাকাতির মোহরও মোহর, পুণ্য-শীলের মোহরও মোহর। ফোকটে পেয়ে গেলে ব্যবহার করবো না কেন? মধুভাণ্ডের রস তো আগাপাস্তলা চোরাই মাল—সেটা জেনেও তো কবিগুরু সিলেটের কমলা-মধুর জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন। এটা তো তবু নির্দোষ উদাহরণ। শাহ-জাহানের হারেম ছিল ফেটে-যাওয়ার-মত ভরতি। তথাপি তিনি মাঝে-মধ্যে বাজার থেকে রমণী আনাতেন। অনুযোগ করাতে বললেন, 'হালওয়া মিষ্টি, তা সে যে দোকান থেকেই আসুক।' 'হালওয়া নীক অস্ত্—আজ্ হর্ দুকান্ বাশ্‌দ'—না কি যেন বলে ফারসীতে।

কিন্তু প্রশ্ন, মিশ্রিত ভাষা হলেই বুঝি তিনি অতুলনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ একচ্ছত্রাধিপতি? ফরাসী ভাষা লাতিনসম্ভূতা, এবং সে কিছু গ্রীক শব্দ নিয়েছে। ইটিকে প্রায় অবিমিশ্র ভাষা বলা চলে। তবে কেন মিশ্রিত ভাষার পদগৌরবদম্ভমদমত্ত 'সায়েব-লোগ' হন্যে হয়ে অবিমিশ্রা ফরাসী ভাষার পিছনে পাড়মাড় করে? আসলে ভণ্ডাজ চৌষট্টি-আঁসলা সর্বত্রই কুলীনের জন্য ছোঁক ছোঁক করে।

মিশ্র বলেই নাকি ইংরিজী শেক্সপীয়র, মিলটন পেয়ে ধন্য হয়েছে।

তা' হলে হায় কালিদাস! তোমার কি গতি হবে, বাছা? তোমার শকুন্তল, রঘুবংশ, মেঘদূতের পেটে বোমা মারলেও যে তাদের জবান থেকে বিদেশী লবজো বেরুবে না!

হায় হোমর, ইস্কিলস, আরিসতো-ফানেস, ইউরিপিদিস!

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজ তো এখনো প্রতি বৎসর এ'দের কাব্য লক্ষ লক্ষ ছাপায়—নয়া নয়া অনুবাদ করে!)

প্রাচীন যুগের আধা-মিশ্র আরবী ভাষার কবিকুল, ওল্ড টেস্টামেন্টের সল্, দায়ুদ সলমনের 'সঙ অব সঙ্জ'—তোমরা তো বানের জলে ভেসে গেলে। দান্তের স্মরণে দীর্ঘনিশ্বাস দীর্ঘতর হল। সান্ত্বনা, চীন-জাপানের কবিদের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাঁরা অন্-ওয়েপ্ট, অন্-অনর্ড, অন্-সাঙ হয়ে রইলেন।

পাপমুখে কি করে বলি, এক পাল্লায় মিশ্রিত ভাষার কবি, অন্য পাল্লায় অবিমিশ্র ভাষার কবিকুল তুললে কোন্‌টা ওজনে ভারি হবে সে নিয়ে আমার মনে সন্দ আছে। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলতে পারেন, ইংরিজী কাব্যে যে ভেরাইটি আছে অন্য কাব্যে নেই। উত্তরে বলি, ফরাসী গদ্যে যে ভেরাইটি আছে, ইংরিজী গদ্যে তা নেই। এবং অনেকে বলতে পারেন, 'বত্রিশ-ভাজা'ই দুনিয়ার সর্বোত্তম খাদ্য নাও হতে পারে। 'সিংহের এক বাচ্চাই ব্যস!'

বী বী সী সম্প্রতি এক্স বারের মত পুনরাবৃত্তি করলেন, 'ইংরিজীই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে চালু ভাষা।' অবশ্যই। কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে সেটি চালু হল—যার বয়ান এই মাত্র দেওয়া হল—সেটি বলতে ভুলে গেলেন। হয়তো বা সে-স্থলে সেটি অবান্তর ছিল। তার পর সগর্বে বললেন, 'হালের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে—থুড়ি, সেমিনারে—দশটি প্রবন্ধ পড়া হয়; তার ন'টি ছিল ইংরিজীতে।'

আমি বলি, 'অধুনা ডাক্তারদের একটি সেমিনারে দশটি প্রবন্ধ পড়া হয়। তার ন'টি ছিল ক্যানসার সম্বন্ধে', তবে নিশ্চয়ই ক্যানসারের গর্ব অনুভব করা উচিত।

পদ্ধতিটা কি সম্পূর্ণ অবান্তর?

ইংরেজ তার মিশ্রিত ভাষার প্রশংসা করে। তাই শুনে শুনে এদেশের অনেকেই ইংরেজের গলার সঙ্গে বেসুরো গলা মেলান। কিন্তু তর্কস্থলে একবার যদি ধরে নি, ইংরেজের ভাষা যদি ফরাসীর মত অপেক্ষাকৃত ঢের ঢের অবিমিশ্র হত, তা' হলে সে কি করতো? নিশ্চয়ই উচ্চতর কণ্ঠে বলতো, 'ভো ভো ত্রিভুবন! শৃণ্বন্তু বিশ্বে... ইত্যাদি ইত্যাদি...এই যে আমাদের ভাষা সে কী নির্মল, কী নির্ভেজাল! সে কোনো ভাষার কাছে ঋণী নয়, সে স্বয়ংপ্রকাশ। ওহো হো হো, সে কী পূত, পবিত্র—পর্বতনির্ঝরিণীর ন্যায় অপাপবিদ্ধ। আইস, ইহাতে অবগাহন করিবা!'

এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? সে তার আপন রক্ত অমিশ্র রাখতে চায়, অন্তক তার ঘোড়া, তার কুকুরটাকে পর্যন্ত দে-আঁসলা হতে দেয় না। এদেশের হুদো হুদো পকেট-ছুঁচোর-কেত্তনওলা খাঁ লাট্‌রা আপন আপন রক্তের বিশুদ্ধতা (অবশ্য কিঞ্চিৎ নরমান বেআইনী ভেজাল আছে বইকি!) ভাঙিয়ে মারকিন মুলুককে পয়সাউলী শাদী করছেন। প্রত্যয় যাবেন না, এই হালে বী বী সী-তেই এক ইংরেজ চারচিলের বিদেশী মাতার প্রতি ইঙ্গিত করে (যদ্যাপি মাতা অধিকাংশ মারকিনের মত গোড়াতে ইংরেজই বটেন) বলেন, 'হী উয়োজ নেভার কুআইট ওয়ান অব আস্।' শুনেছি চারচিল পার্লামেন্টে তাঁর জীবনে মাত্র একবার হুট্ হয়েছিলেন, তাঁর বক্তৃতা চিৎকারে অসমাপ্ত থেকে যায়—তিনি যখন ড্যুক অব্ উইন্‌জারের মারকিন রমণী বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন করতে চান।

সব বাবদে ইংরেজ অবিমিশ্র থাকতে চায়—শুধু ভাষার বাবদে ব্যত্যয়!

আসলে ভাষাটা বর্ণসংকর হয়ে গিয়েছে যে! এখন এরই প্রশংসায় আসমান ফাটাও!

আমরাও হুক্কা হুয়া করি। দু'-একটা নরস্‌মেন, গোটা-দুই ফরাসীও করেছে। কেউ কিছু বললে, ওদের দোহাই দেব।

হিটলার পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদি পোড়ালে নরডিক্ রক্ত অমিশ্র রাখার জন্য।

ইংরিজী ভাষা নির্মিত হল কত পরাধীন জাতের রক্তশোষণের পিঠ পিঠ।

কিন্তু ইহসংসারের সর্বাপেক্ষা মিশ্রিত, বর্ণসংকর ভাষা কোন্‌টি—ইংরিজী যার এক শ' যোজনের পাল্লায় আসতে পারে না? বেদে-দের, জীপসিদের ভাষা। নর্থ-পোল থেকে সাউথ-পোল, পৃথিবীর নগণ্যতম ভাষার অবদানও এ-ভাষাতে আছে। বস্তুত, মূলত ইটি কোন্ দেশের ভাষা, আর্য সেমিতি না মঙ্গোলীয় জাতের, সেই তর্কেরই এখনো সমাধান হয়নি।

বিবেচনা করি, এ ভাষাতে আরো ডাঙর ডাঙর শেক্সপীয়র-মিলটন গণ্ডায় গণ্ডায়—'অসংখ্য রতন, ডেজার্ট-ফ্লাউয়ারের ন্যায়'—ঘাপটি মেরে আপোসে আপোসে আব্‌জাব্ করছেন!

একাধিক গুণী বলেন, বেদেদের ভাষা মূলে ভারতীয়। বৎস! আর কি চাই! কেল্লা ফতেহ। আইস ভ্রাতঃ! সবে মিলি বেদেদের ভাষা শিখি॥

মহাস্থবির জাতক

॥ ৪ ॥

আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বোম্বাই শহর ছিল অন্যরকম। এই সময়ের মধ্যে তার আঙ্গিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তন যা হয়েছে তা দেখে সে সময়ে কি ছিল তার আন্দাজ করা যাবে না। সে সম্বন্ধে কিছু বললে হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আজ যেখানে মেরিন ড্রাইভের চওড়া রাস্তা ও প্রাসাদের মত বড় বড় বাড়ি দেখা যাচ্ছে সে সব জায়গা ছিল সমুদ্রগর্ভে। এত নাম-করা ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম—তাও ছিল জলের মধ্যে। বাড়ি-ঘরের এমন বাহার ছিল না বললেই হয়। বড় বড় পাঁচতলা-ছ'তলা হেলে-পড়া বাড়ি। মাথায় খোলার চাল। সেগুলোকে বলা হতো চৌল। তাতে সব রকমেরই লোক অসংখ্য বাস করত। হিন্দুরা প্রকাশ্যে মাছ-মাংস খেত না, তা তিনি মহারাষ্ট্রীয়ই হন বা গুজরাটীই হন। কোনো হিন্দু ইরানীর দোকানে ঢুকত না।

তখনকার দিনে বোম্বাই শহরে হামেশাই এখানে-সেখানে আগুন লাগত। মাথায় টুপি-বিহীন লোক রাস্তায় চলতে দেখলে লোকেরা দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে থাকত। আমাদের মাথায় টুপি নেই দেখে কতবার যে পুলিস-কনস্টেবল ধরে নিয়ে গিয়েছে থানায় তার ঠিকানা নেই। আরো কত বলব।

আমরা একবার শুনলাম—কোনো বিশেষ একটি চৌলে একজন বাঙালী ভদ্রলোক থাকেন। তিনি এখানে বড় চাকরি করেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত দয়ালু এবং কোনো বাঙালী সাহায্যপ্রার্থী হয়ে গেলে কখনো তাকে নিরাশ করেন না।

এমন দুর্লভ সংবাদ বহুদিন শুনিনি। রাত্রি পোয়াতে না পোয়াতে আমি আর পরিতোষ চললুম সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে। শহরের এক কোণে হেলে-পড়া একটা চৌল, তারই পাঁচতলায় থাকেন ভদ্রলোক সপরিবারে। বাড়িটাতে গুজরাটী ভাড়াটেই বেশি। একতলায় দোকানপত্র আছে।

জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে পাঁচতলায় গিয়ে উঠলুম। দরজাটা খোলা ছিল। উঁকি মেরে দেখলুম দূরে একটা ঘরে বোধ হয় একখানা সাপ্তাহিক বসুমতী পেতে তার ওপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে ভদ্রলোক কাগজখানা পড়ছেন।

আমরা দু'জন হা-পিত্যেশ করে সেইদিকে তাকিয়ে রইলুম। কালো রোগা লম্বা মতন চেহারা। হঠাৎ একবার মুখ তুলে আমাদের দিকে চোখ পড়তেই তক্তাপোশ ছেড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলতে লাগলেন—এসেচো বাবা! এই ছ' মাস হল দুটোকে বিদেয় করেচি। আবার দুই মূর্তি হাজির। দেশে কি দুর্ভিক্ষ লেগেছে? কোথায় বাড়ি?

আমরা বললুম—আজ্ঞে বর্ধমান জেলায় কাটোয়া সাব-ডিভিসনে।

এমন সময় কোন এক ঘর থেকে নারী-কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। ভদ্রলোক সেইখান থেকেই চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন—আজকাল জোড়ায় জোড়ায় আসচে।

এবার নারীকণ্ঠ স্পষ্টতর হয়ে উঠল—কোঁতায়? দেঁকি—ইঁদিকে পাঁটিয়ে দাঁও।

ভদ্রলোক বললেন—ওই ঘরে যাও। গিন্নী ডাকছেন।

গুটি গুটি সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। একটি নারী—বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে। রঙ ফরশা, স্বাস্থ্যবতী বলেই মনে হল। কোঁকাতে কোঁকাতে প্রতিটি শব্দের আদিবর্ণে একটি করে আনুনাসিক যোগ করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কি জাত?

বললুম—আজ্ঞে, আমরা সদ্গোপ।

—দুইজনেই কি এক জাত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ আমার মাসতুতো ভাই।

—রাঁধতে-বাড়তে জানো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাল ভাত চচ্চড়ি—এই গেরস্ত বাড়ির রান্না।

—ব্যস! সোজা চ'লে যাও ওই রান্নাঘরে। চাল-ডাল আছে। মশলা-পাতি বেটে নাও। বাড়ির কর্তা দশটায় আপিস যান। ওঁকে রোজ ঠিক সময়ে ভাত দিতে পারবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব।

—তো ব্যস্—গিয়ে শুরু কর। অন্য কথা পরে হবে। আমাকে যখন হয় খেতে দিও।

ফ্ল্যাটের রান্নাঘর। বেশ গুছোনো। উনুনের জায়গা রান্নাঘরের মধ্যেই। কল, ছোট চৌবাচ্চা, কয়লা রাখবার জায়গা—সবই বেশ গুছোনো। আমরা কেরোসিন তেল যোগাড় করে তখুনি উনুনে অগুন ধরিয়ে দিলুম। বাড়ির গিন্নী তখনো শুয়ে। গিয়ে বললুম—মা, চাল-ডাল মশলা-পাতি কোথায় আছে?

—হতভাগারা সেই ওটালে তবে ছাড়লে। ব'লে দশ মিনিট ধরে চেষ্টা করে উঠলেন। তারপর আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এসে চাল-ডাল তেল-নুন ইত্যাদি সব দেখিয়ে দিয়ে ক্যাঁকাতে ক্যাঁকাতে পাশেই চানের ঘরে মুখ ধুতে লাগলেন।

কাঠকয়লার উনুন, ধরতে সময় লাগল না। চাল ধুয়ে চড়িয়ে দিয়ে মশলা-বাটা ও অন্যান্য কাজে মন দিলুম। গিন্নী ততক্ষণে আবার শুয়ে পড়েছেন। খানিকক্ষণ বাদে গিন্নীর গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম। চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে বলছেন—এই—এই—এই—

কাছে গিয়ে দেখি কর্তাও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে বললেন—ও কোথায়, ডেকে নিয়ে এসো—

পরিতোষকে ডেকে আনলুম। কর্তা বললেন—দেখো, আমাদের সংসার ছোটো কিন্তু কাজ অনেক। রান্না-করা বাসন-মাজা ঘর ঝাঁট-দেওয়া। সব এখন মনে পড়ছে না—সব কাজই করতে হবে। খাবে-দাবে আর ওইখানে বিছানা করে শুয়ে থাকবে। মাইনের নামটি কোরো না। বুঝলে?

বুঝলুম, এবং বুঝে ফিরে যাচ্ছিলুম। এমন সময় গিন্নী আবার চ্যাঁ চ্যাঁ করে জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম—!

বললুম—আমার নাম প্রফুল্ল ঘোষ আর এর নাম বিশ্বনাথ সুর।

বন্ধু পরিতোষ নির্বিকার। সে তখন কানে একেবারেই শোনে না। এই নামের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এক-তলায় না গিয়ে আর উপায় নেই। তবে সে ছিল ইঙ্গিতজ্ঞ। দু'-চারবার বিশে বিশে—বিশ্বনাথ বলে ডাকতেই নতুন নামকরণ বুঝতে পারল।

ওদিকে ভাত ফুটে গেল। আলোচাল একটু তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়। ডাল চাপিয়ে দেওয়া গেল, কাঁচামুগের ডাল। সে আর হ'তে কতক্ষণ! ততক্ষণে কর্তা চানটান করে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, রান্না রেডী?

বললুম—আজ্ঞে রেডী। আপনি ঘরে বসুন, সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

—আচ্ছা।

কর্তা তাঁর কামরায় চলে গেলেন। ভাত বেড়ে বাটিতে ডাল আর গেলাসে জল নিয়ে ঘরে গেলুম। কর্তার দেখলুম এ'টো কিংবা সকড়ির বালাই নেই। তিনি তক্তপোশের

ওপরে বসেই খেতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই তিনি বললেন—এতো বেড়ে রেঁধেছিস রে!

বললুম—আজ্ঞে, ঘরে কিছু নেই—রাঁধতে পারলুম না। আজকে বাজারে গিয়ে তরকারি আর ডাল কিনে নিয়ে আসবো।

কর্তা বললেন—বলিস কি? তরকারি রাঁধবি?

—আজ্ঞে, চেষ্টা করে দেখবো। দেখুনই না।

কর্তা কোট পরে বিড়ি ধরিয়ে গিন্নীর ঘরে ঢুকে কি সব ব'লে আপিসে বেরিয়ে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর রান্নাঘর গুছিয়ে দুজনে গিন্নীকে গিয়ে বললুম—মা, এখন কি খাবেন?

তিনি বললেন—না, চান করবো, মুখ ধোবো, আমার খেতে সেই বারোটা।

—তাহ'লে আমাদের কিছু পয়সা দিন, আমরা বাজার থেকে তরকারি কিনে নিয়ে আসি।

গিন্নী বললেন—তরকারি রাঁধতে পারবি তো? কিসের তরকারি রাঁধবি?

—আলু-পটলের ডালনা।

গিন্নী কপালে করাঘাত ক'রে বললেন—একি তোদের বর্ধমান পেয়েচিস? এদেশে কি পটল পাওয়া যায়?

—পটল না পাওয়া যায় অন্য তরকারি তো আছে!

গিন্নী মাথার তলা থেকে একটা টাকা বার ক'রে দিয়ে বললেন—যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাস। আর দুজনে যাচ্ছিস—একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস।

বাজারে যেতে যেতে দুজনে পরামর্শ করা গেল। ভগবান যখন দিন দিয়েছেন তখন তার সদ্ব্যবহার করতে হবে, আবার কবে তিনি পথে দাঁড় করাবেন কিছুই তার ঠিক নেই। পথে দুজনে মিলে স্থির করলুম যে দৈনিকের নানান কাজে অন্তত আট আনা পয়সা সরিয়ে রাখতে হবে।

সেদিন বাজার করে ফিরে গিন্নীকে খাইয়ে নিজেরা খেয়ে সারা দুপুর ধরে ঘরদোর ঝেঁটিয়ে জিনিসপত্র ঝেড়ে ঝকঝকে তকতকে করে ফেললুম। আমাদের কাজ দেখে গিন্নীর সদাক্লিষ্ট মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর সেদিন রাত্রে কর্তাগিন্নী আমাদের আলুর দম খেয়ে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন।

মোট কথা, কদিনেই আমরা তাঁদের একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে তো উঠলুমই, তার সংগে আমাদের ব্যাংকও বেশ মোটা হ'তে লাগল।

আমাদের অন্নদাতার নাম সদানন্দ বিশ্বাস। ভদ্রলোক সেখানে একটা বিলিতী ওষুধের আপিসে পাম্ফলেট লিখতেন। ইংরেজী বাংলা গুজরাটী মারাঠী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। আপিসে বেশ মোটা মাইনে পেতেন। তাছাড়া ইন্সিওরেন্সের দালালি করতেন—তাতেও তাঁর ভালো রোজগার ছিল। ছুটির দিনে তাঁর আর নাইবার-খাবার সময় থাকত না। কাপড়-চোপড়েরও কোনো বাবুয়ানি ছিল না। ধুতি কোট ও দু'জোড়া জুতো ছিল তাঁর—যাতে কখনো কালি পড়ত না। আমরা এসে তার সংস্কার করলুম। দুটো পেণ্টুলান ছিল, বিশেষ বিশেষ দিনে সেগুলো পরতেন। সদানন্দ তাঁর নাম ছিল বটে, কিন্তু তিনি কেন জানি না সদাই নিরানন্দ থাকতেন। সন্ধ্যেবেলা বোতল-গেলাস নিয়ে বসতেন। এই সময়টা তাঁকে একটু প্রফুল্ল দেখতে পাওয়া যেত। তাঁর এই সান্ধ্য-আসরে গুজরাটী মারাঠী ও বাঙালী অনেকেই এসে জুটতেন। এই সব দিনে আমাদের অন্নদাতার প্রফুল্লতার মাত্রা একটু বেড়ে যেত।

এই আসরে একটি বাঙালী ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসতেন এবং শ্যামাসংগীত গাইতেন। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ছিল মধুর এবং গানগুলিও আমাদের ভালো লাগত। প্রত্যেক গানের আগে ভদ্রলোক "ম্যা ম্যা" বলে খানিকক্ষণ ভীষণ চেঁচাতেন। আমরা যে পরিবেশে জন্মেছিলুম সেখানে শ্যামা-সংগীতের বিশেষ প্রচলন ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে দেখেছি—শ্যামা-সংগীত গাইবার আগে ওইরকম দু'-চারবার "ম্যা ম্যা" বলে "চিঙ্কুর পাড়া"র রীতি আজও প্রচলিত আছে।

কর্তার এই সব সান্ধ্য-আসরের জন্য আমরা মাঝে মাঝে ইরানীদের দোকান থেকে মাছ-মাংস কিনে এনে দিতুম। এই সব আহার্যে গিন্নীও বঞ্চিত হতেন না। মৎস-মাংসে তো বটেই—নিষিদ্ধ মাংসেও তাঁর অরুচি ছিল না।

আমাদের এই রকম কর্তাভজা ভাব দেখে মনিব-মশাই খুশী হয়ে প্রথম মাসেই আমাদের দু' টাকা ক'রে মাইনে ঠিক করে দিলেন। হোটেলে কাজ করবার সময় সকাল দশটা অবধি স্টেশনে থাকতে হতো—তারপর সারা দিন ছিল ছুটি। এই অবসরের অধিকাংশ সময়ই আমরা রান্নাঘরে কাটাতুম। হোটেলে দু'বেলা কিমা রান্না হতো এবং এই বস্তুটি আমাদের খুবই প্রিয় ছিল। রান্না দেখে দেখে আমরাও কিমা তৈরি করতে শিখেছিলুম।

একদিন গিন্নীর কাছে কিমা রাঁধবার প্রস্তাব করে ফেললুম। গিন্নী তো প্রথমে শুনেই শিউরে উঠলেন এবং বললেন—ওরে বাবা, এ-বাড়িতে এ-সব চলবে না।

আমরা বললুম—কেউ টের পাবে না, কিছুই গন্ধ বেরুবে না।

কর্তা আমাদের প্রস্তাব শুনে নিমরাজি হ'য়ে গেলেন। ব্যাস, আর যায় কোথায়! একদিন কর্তাগিন্নীকে না জানিয়ে আমরা বোম্বাই এক সের অর্থাৎ আটাশ তোলা কিমা এনে দুপুরবেলা চড়িয়ে দিলুম।

সেদিন রাত্রে কিমা খেয়ে কর্তাগিন্নী যেমন অবাক হ'লেন তেমনি খুশীও হ'লেন। সেই থেকে কর্তাগিন্নীকে হঠাৎ অবাক এবং খুশী করে দেবার ইচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে জমা হতে লাগল। বোম্বাই শহরকে মাছের দেশ বললেই চলে। সেখানকার বিখ্যাত মাছ—চাঁদামাছ যিনি পমফ্রেট নামে সর্বদেশবিদিত এবং যেমন সুস্বাদু তেমনি অপর্যাপ্ত। তা' ছাড়া ইলিশ চিংড়ি ইত্যাদিও প্রচুর পাওয়া যায়। ইরানীর দোকানে চাঁদামাছগুলোকে সেদ্ধ করে এক-রকম নরম করে ভাজে। তাই খাবার জন্যে সন্ধ্যের পর মাতালের দল সেখানে ভিড় জমায়। এইখান থেকে চাঁদামাছ মধ্যে মধ্যে নিয়ে যাওয়া হতো বটে, কিন্তু আমাদের বাঙালীর জিহ্বা তাতে পরিতৃপ্ত হতো না। বেশ করে প্যাজ আর কাঁচা লংকা দিয়ে চাঁদামাছের তেল-ঝোল খাবার বাসনা মনের মধ্যে প্রায়ই গর্জে উঠত। একদিন কর্তা-মশায়ের কাছে এই মাছ নিয়ে আসবার প্রস্তাবও ক'রে ফেললুম। কর্তা তো শুনে লাফিয়ে উঠে বললেন—না, না—অমন কাজও করিস নি। এই ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার সময় আমাকে মুচলেকা দিতে হয়েছে—এখানে কখনো মাছ হবে না। যদি ধরা পড়ি তো তৎক্ষণাৎ এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে।

ওখানকার কোন এক শেঠ সস্তায় গরিব নিরামিষভোজীরা যাতে থাকতে পারে সেই-জন্যে এই বাড়ি ঠিক করেছেন এবং নামমাত্র ভাড়ায় তাদের বাস করতে দেন। কাঁচালঙ্কা দিয়ে চাঁদামাছ খাবার বাসনা তাই পরিত্যাগ করতেই হল।

সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যেই কর্তামশাই খেয়ে-দেয়ে আপিসে চলে যেতেন। আমরা ইদিক-ওদিক একটু-আধটু কাজ শেষ করে ফেলতুম। গিন্নী শুয়ে গড়িয়ে এগারোটা সাড়ে-এগারোটার সময় উঠে স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে আবার কাঁকাতে কাঁকাতে বিছানা নিতেন।

সারা দুপুরে কিছু করবার নেই। পরিতোষের সঙ্গে যে একটু গল্প করব তার উপায় নেই, কারণ তিনি ছোটকথা বড়-একটা কানে তুলতে চান না। বাড়িতে একখানা সাপ্তাহিক বাংলা কাগজ আসত, সেটা পড়বার ইচ্ছা হতো বটে, কিন্তু চাকরে খবরের কাগজ পড়ছে—এ দৃশ্য মনিবেরা সহ্য করতে পারবে কিনা সন্দেহ হতো। কাজেই সে সময়টা আমি খুঁটিনাটি কাজ করে বেড়াতুম।

সেদিন কি একটা কাজে দুপুরবেলা

গিন্নীর ঘরে ঢুকে পড়েছিলুম; এ সময়টা তিনি প্রায়ই নিদ্রাগত হতেন। সেদিনে ঘরে যেতেই তিনি চোখ থেকে হাতখানা সরিয়ে ফেললেন। দেখলুম তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে চলেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—একি মা! আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে তুই গাঁজার দোকান চিনিস?

ভাবলুম—কি সর্বনাশ! গাঁজা দিয়ে কি হবে? কর্তা সন্ধ্যেবেলা মাল টানেন, গিন্নী কি দুপুরবেলা গাঁজা টানবেন? জিজ্ঞাসা করলুম—গাঁজা দিয়ে কি হবে মা?

তিনি বললেন—গাঁজার দোকানে আফিং বিক্রি হয় না! আমি তোকে দশটা টাকা দিচ্ছি, তুই আমায় এক ভরি আফিং কিনে এনে দে। বাকি টাকা তুই নিয়ে নে।

—আফিং দিয়ে কি হবে মা?

ভদ্রমহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না—আমি আফিং খেয়ে মরব।

একবার মনে হল এক দৌড়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই। ভদ্রমহিলা বলে চললেন—এই [illegible] শরীরে সমস্ত জীবন ধরে এই যন্ত্রণা সহ্য করা যে কি পাপ, তা আর কি বলব! আমি জিজ্ঞাসা করলুম [illegible] [illegible] কি [illegible]?

গিন্নী বললেন—[illegible]। তুই [illegible]?

[illegible]

বললুম—[illegible] মা! [illegible]

[illegible]

বললুম—[illegible] ডাক্তারের [illegible]।

তিনি বললেন—হ্যাঁ, তারা [illegible] কিন্তু শেষকালে পুরুষ ডাক্তারে [illegible] দিয়েছে [illegible] করতে হবে। আর পুরুষ ডাক্তারে [illegible] করবে! পুরুষ ডাক্তার দিয়ে দেখানোর চেয়েও এই যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে মরে যাওয়াই শ্রেয়।

কর্তা যে ঘরে থাকতেন, সে ঘরে [illegible] দিকে একটা জানলা ছিল। [illegible] দুপুরবেলা আমি সেই জানলার ধারে গিয়ে বসতুম। নিচে বিপুল জনস্রোত বয়ে চলেছে—বোম্বাই শহরে কোনো জায়গায় ভিড়ের কমতি নেই। অত উঁচু থেকে লোকগুলোকে দেখে মনে হতো কত ছোট। তারই ভেতর দিয়ে বিরাট সরীসৃপের মত মন্থরগতিতে ট্রাম যাচ্ছে। এই সব রাস্তায় ট্রামের গতি একেবারে বাঁধা।

দেখতে দেখতে বাইরের চিন্তা চলে যেত। নিজের মনে ভাবতে থাকতুম—এই বাড়িতে প্রায় পঞ্চাশটা ফ্ল্যাট আছে; প্রত্যেক ফ্ল্যাটেই একটা করে পরিবার। বিচিত্র তাদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস। প্রত্যেক লোকেরই মনস্তত্ত্ব ভিন্ন। আমরা আজ যে পরিবারে আশ্রয় পেয়েছি তাদের কথা ভাবতুম।

কর্তাগিন্নীর এই সংসারে কেউ নেই। কর্তার ইচ্ছা কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে স্বামী-স্ত্রীতে কাশীতে গিয়ে বাস করবেন। গিন্নীর ইচ্ছা—অন্তত তিনি যা প্রকাশ করতেন—মৃত্যু এসে এখুনি তাঁকে গ্রাস করুক এবং কর্তা আর একটি বিবাহ করে সুখী হোন।

সংসারের চেহারা আমার চোখে দিনদিনই অন্য রূপ ধারণ করছিল। যে নেশার ঘোরে আমি সংসারকে দেখতুম, ক্রমেই সেই নেশা কেটে যাচ্ছিল। আগে আমি এই দুনিয়াকে নিজের মনের মতন করে দেখতুম—সেটা ছিল আমার মনে পৃথিবীর ভাবমূর্তি। নেশা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নগ্ন চেহারা আমার চোখে ফুটে উঠত। বেশ বুঝতে পারছিলুম, অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা রূপকথাতেই থাকে, সংসারের কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। কোনো বড় ব্যবসাদারের চোখে পড়ে গিয়ে তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে ভবিষ্যতে সেই ব্যবসার মালিক হয়ে ওঠা—এই [illegible] দিকেই পাওয়া যায়। [illegible] [illegible] কিছু নেই। [illegible] আছে [illegible]। সংসার রাজকন্যা ও [illegible] কথা [illegible] চিন্তা হতো, যে বয়সে মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি তৈরি হয় [illegible] কী করব! চিরকালই কি [illegible] কাটাব! [illegible] আমার ভবিষ্যৎ-জীবনের ভিত্তি সেই অবস্থাতেই গড়ে উঠছিল।

বাড়ির আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনদের কথা-মত এবং ইচ্ছামত নিজেকে তৈরি করবার শপথ কতবার মনে মনে করেছি। কিন্তু কিছুতেই তা পারি নি। কী এক অদ্ভুত শক্তি আমাকে ঘরছাড়া করে বাইরের জনসমুদ্রে এনে ফেলত; এই শক্তিই আমার জীবনকে গড়ে তুলেছে তার মনের মতন করে। এই শক্তিকে আমি নিজের মনে যত স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি অন্য কেউ তা পেরেছে কি না তা জানি না।

মাঝে মাঝে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দারুণ দুর্ভাবনা এই শক্তিকে চাপা দিত। একদিন পরিতোষের সঙ্গে পরামর্শ করে তাই আগ্রার সত্যদাকে আমাদের বর্তমান জীবনের কথা লিখে পাঠালুম এবং তিনি আমাদের এই পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবেন এই আশাও জানালুম।

ওদিকে আমাদের গাঁড়াব্যাঙ্ক বেশ স্ফীত হয়ে উঠছিল। তিন মাস সময়ের মধ্যে প্রায় শতখানেক টাকা আমরা জমিয়ে ফেলেছিলুম।

কিছুদিন থেকে কর্তা ও গিন্নী দুজনের মুখেই শুনেছিলাম যে, কর্তা তিন-চারটে বড় বড় মক্কেল ধরেছেন এবং তাদের দিয়ে অনেক টাকা জীবনবীমা করাবার চেষ্টা করছেন; যদি খেলিয়ে তুলতে পারেন, তবে কয়েক হাজার টাকা এখখুনি পাওয়া যাবে এবং পঁচিশ বছর ধরে মাসে মাসে বেশ মোটা রকমের আমদানি হবে। এই সব কাজে কর্তামশাই ইদানীং খুবই ব্যস্ত থাকতেন।

[illegible] একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, হরিদ্বার থেকে তাঁর গুরুদেব শীগগিরই [illegible] লছমন ঝোলার পারে হিমালয় পাহাড়ে তাঁর আস্তানা—স্বর্গদ্বারে। হরিদ্বারেও তার আস্তানা আছে। গুরুদেবের না কি অনেক বয়স হয়েছে। সে প্রায় দুশোর কাছাকাছি। শীগগিরই তিনি

দেহরক্ষা করবেন। তার আগে একবার নানান দেশ পরিভ্রমণ করছেন।

গুরুদেব সম্বন্ধে আমরা অনেক আজগুবী খবর শুনতে লাগলাম। ইতিমধ্যে তিনি একদিন স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। কর্তা নিজে গিয়ে তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে এলেন।

ছোটখাট্ট মানুষটি, মাথায় সামান্য জটা চূড়ো করে বাঁধা। গায়ে নতুন মার্কিনের ছোট্ট একটা চাদর, কোমর থেকে হাঁটু অবধি নতুন কাপড়ে ঢাকা। শুনলুম গুরুদেব সাধারণত নেংটিই পরে থাকেন, জনসমাজে এলে ওই রকম বেশ ধারণ করেন।

গুরুদেবের সঙ্গেই তাঁর একজন চেলা ছিল। চেলার বয়স অল্প। এই একুশ-বাইশ বছর হবে। মাথায় লাল লাল লম্বা লম্বা চুল। মনে হয় যেন মেহেদী মাখানো হয়েছে। অল্প দাড়ি, দেহ রোগা।

কর্তা যে ঘরটায় থাকতেন, তার পাশে একটা ঘর ছিল। সেই ঘরে আগে থাকতে গুরুদেবের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কম্বলপাতা, বালিশ আনা ইত্যাদি সব তৈরি। গুরুদেব এসে অঙ্গ ও কটি থেকে নতুন বস্ত্র খুলে ফেলে কম্বলে বসে পড়লেন। একটু বারান্দা মত জায়গায় আমরা থাকতুম। তারই একপাশে চেলার থাকবার ব্যবস্থা হল এবং তারই এক কোণে ইঁট দিয়ে উনুন তৈরি করিয়ে গুরুদেবের রান্নার ব্যবস্থা করা হল।

ভারতবর্ষে তখনো সন্ন্যাসীর ছিল একটা বিপুল আকর্ষণ। সন্ন্যাসীর আগমন-সংবাদ পেয়ে দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করল। তাদের সব পরে আসতে বলে তখনকার মতো তাড়িয়ে দেওয়া হল, কিন্তু বিকেল থেকে মেয়েদের আগমন আর বন্ধ করা গেল না।

অধিকাংশ গুজরাটী মহিলা। এসেই লম্বা হ'য়ে প্রণাম করেই বসে পড়ে। সন্ন্যাসী গুজরাটী ভাষা জানেন না, তারাও হিন্দী ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পারে না। সন্ন্যাসী মাতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করে উপদেশ দেন। তারাও ঘাড় নেড়ে এমন ভাব দেখায় যেন সবই বুঝতে পেরেছে। এই সব মহিলাদের অধিকাংশই এই বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। সন্ন্যাসী দেখার পর্ব শেষ করে পুরুষরা যেমন বাইরে বেরিয়ে যেতেন নারীরা কখনো তেমন করতেন না। তাঁদের কৌতূহল প্রবল। এই ঘরে কে শোয়, সন্ন্যাসী কি খান, কর্তা একলা শোয় কেন, বাড়ির গিন্নী কোথায় ইত্যাদি বলতে বলতে গিন্নীর ঘরে ঢুকে গেলেন। দুই পক্ষেই কথা চলতে লাগল—এ গুজরাটীতে ও বাংলায়: কেউই কারুর ভাষা জানে না—উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে লাগল। ওই ফাঁকেই এক ঝলক উঁকি মেরে রান্নাঘরের বৃত্তান্ত সব জেনে নিয়ে বাথরুমটাও দেখা হয়ে গেল। এই রকম প্রায় রাত্রি দশটা অবধি চলতে লাগল।

সন্ন্যাসী আহার অতি স্বল্পই করতেন। সকালবেলায় এক পেয়ালা দুধ প্রায় আধ-ঘণ্টা ধরে ধীরে ধীরে পান করতেন। তাঁর জন্যে একটা নতুন বাটলোই এসেছিল, তাইতে বিকেলবেলায় আশি তোলায় এক সের মোষের দুধ জ্বাল দেওয়া হতো। রাত্রি প্রায় দশটার সময় একখানি রুটি দিয়ে তিনি সেই দুধটুকু পান করতেন। চেলামহারাজকে রোজ সিধে দেওয়া হতো। ডাল আটা ঘি তরকারি।

সন্ন্যাসী রোজ বিকেলবেলা একটা বড় মার্বেলের আকারে হালুয়া খেতেন। একটা টিনের মধ্যে হালুয়া জমা করা থাকত, চেলা এসে খাইয়ে যেত। একদিন আমরা দুজনে সেখানে উপস্থিত ছিলুম। বোধ হয় তাঁর পদসেবা করছিলুম। তিনি টিন থেকে দুটো কাবলী মটরের আকারের হালুয়া নিয়ে আমাদের দুজনকে দিয়ে বললেন—খা-খা।

চমৎকার খেতে লাগল; আধঘণ্টার মধ্যে বেশ নেশা বোধ হ'তে লাগল। পৃথিবী রঙিন হয়ে উঠল। ওদিকে ক্ষিদেও বেশ চনচনে হয়ে উঠল। চেলার কাছে শুনলুম সেটা গাঁজার হালুয়া। চেলাকেও দেখতুম রোজ বেশ একটি বড় গুলি নিয়ে গালে ফেলতেন।

আমরা দুজনে সন্ন্যাসীর দুই পদ সেবা করতুম। সন্ন্যাসী বলতেন—এরা বড় প্রেমিক বালক। অবিশ্যি মিনিট পাঁচ ছয় পা টিপিয়ে পরেই তিনি আদর করে আমাদের বলতেন, এবার যা, খেলতে যা।

গুরুদেব আসার পর থেকে গিন্নী বিছানা ছেড়ে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসে বসতেন। গুরুদেব তখন বলেছিলেন—তোর ব্যায়রাম সেরে যাবে। কর্তাগিন্নীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। এই ক' মাসে তাঁদের মুখে হাসি ফুটে উঠতে কখনো দেখিনি। গুরুদেব গিন্নীকে প্রতি সপ্তাহে সোমবারে বারো ঘণ্টা মৌনী থাকতে বলে দিলেন। কিছুদিন হই-হই হবার পর গুরুদেব চলে গেলেন পুণার দিকে। সেখানে উদাসীবাবার মঠে দিনকতক কাটিয়ে ফিরে যাবেন আবার তাঁর আশ্রমে। দিন দশেক খুব হই-হই হবার পর আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গিন্নী নিলেন আবার তাঁর বিছানা—কর্তা তাঁর সেই কোণটি।

গুরুদেব বোধ হয় বুধবারে চলে গেলেন। গিন্নীমার মৌনী থাকার কথা আমরা একেবারেই ভুলেই গিয়েছিলুম। পরের সোমবার সকালে আমি রান্নাঘরে চা তৈরি করছি এমন সময় গিন্নীর চ্যাঁ চ্যাঁ চীৎকার কানে এসে পৌঁছল। ছুটে তাঁর কাছে যেতেই দেখি খাটের সামনে পরিতোষ উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছে আর গিন্নী চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে ইশারায় তাকে কি বলবার চেষ্টা করছেন। অন্য অন্য দিন গিন্নী সকালবেলায় কথার মাথায় একটা করে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা কইতেন, কিন্তু সেদিন সবটাই চন্দ্রবিন্দু শুনে চট করে মনে পড়ে গেল—আজ তাঁর মৌন থাকার দিন। তখুনি ছুটে গিয়ে চা এনে দিলুম। চা দেখে তখনকার মত চ্যাঁ চ্যাঁ করা থামালেন বটে, কিন্তু সেদিন সারাদিন তিনি ঐ রকম চ্যাঁ চ্যাঁ করে কাটালেন। মনে হলো এ রকম নীরবতার চেয়েও সানুনাসিক সরবতা যে ছিল ভালো। যাই হোক বেলা পাঁচটার সময় তিনি মৌনতা ত্যাগ করলেন; তিনিও বাঁচলেন, আমরাও বাঁচলুম।

এই রকম দু তিন সপ্তাহ কাটাবার পর একদিন কর্তা জানালেন—যে কটি মালদার লোককে বীমা করাবার চেষ্টা তিনি করছিলেন, সে কটির বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন। একদিন অপিস থেকে দুটি তিনটি বন্ধু নিয়েই তিনি বাড়ি ফিরলেন। তাদের মধ্যে সেই গাইয়ে ভদ্রলোকও ছিলেন। ঘণ্টা দুয়েক খুব হুল্লোড় হল—ইরানীর দোকান থেকে চাঁদামাছ ও পাঁটার মাংস এলো। তারপর তাদের সামনেই আমাদের ডেকে কর্তা বললেন—একদিন বন্ধুবান্ধবদের ডেকে খাওয়াবো। তোরা মাংস রাঁধতে পারবি?

আমরা তো উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব পারবো।

পাঁচ-ছয়জন লোক খাবে। ঠিক হল ইরানীর দোকান থেকে ভাজা মাছ কিনে আনা হবে আর মাংসটা ঘরেই রান্না হবে। পাঁউরুটি দিয়ে খাওয়া হবে; আর জারকরস বলো, সোমরস বলো, সে তো আছেই। পাঁচ-ছজন নিমন্ত্রিত ও আমরা বাড়ির কজন। কত মাংস লাগবে হিসেব করে দেখা গেল অন্ততঃ বোম্বাই দশ সের মাংস আনতেই হবে। রাঁধবার পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? গুরুদেব যখন ছিলেন, তখন আমাদের ওপরতলার বাসিন্দে এক কর্তাগিন্নীর সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। বললুম—আলুর দম বানাবো বলে একটা বড় পাত্র ওদের কাছ থেকে চেয়ে আনলেই হবে। তারপর ভালো করে মেজে দিলে কোনো গন্ধই থাকবে না। যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে আগে গিয়ে ওদের বাড়ির গিন্নীর কাছ থেকে একটা বড় পাত্র চেয়ে আনা হল। আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের যেমন গোল লম্বা চোঙার মত ডেকচি হয়েছে, সেই রকম একটা পেতলের ডেকচি। ভেতর দিকটা কলাই করা। ওদের গিন্নী বলে দিলেন—দেখো কলাইটা যেন উঠে না যায়।

সকালবেলা দুই বন্ধুতে গিয়ে মাংস কিনে আনলাম। কাপড়ে ও তার পরে কাগজে মুড়ে নিয়ে এলুম। সকালবেলা রান্নাবান্না শেষ করে মশলা বেটে দই নিয়ে এসে মাংসতে মশলার সঙ্গে মাখিয়ে চড়িয়ে দেওয়া গেল। এর আগে কিমা রাঁধার অভিজ্ঞতা ছিল—সে সময়ে বিশেষ কিছু গন্ধ বেরোয়নি। কিন্তু মাংস চড়াবার কিছুক্ষণ পরে গন্ধে চারদিক ভরপুর হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে দেখি মাংসের ঝোল সাদা দুধের মত হয়ে উঠেছে। একটুখানি

চেখে দেখলুম দারুন টক। তখখুনি তাতে কতকটা চিনি ঢাললুম—ঢেলে আবার চাখলুম; দেখলুম কিছু সাম্যভাব এসেছে বটে, কিন্তু মাংস সেদ্ধ হয়নি।

পরিতোষ বললে—সুপুরি দিলে মাংস সেদ্ধ হয়।

সুপুরি কোথায় পাওয়া যায়! পানের পাট তো বাড়িতে নেই। সংসার খরচের টাকা আমাদের কাছেই থাকত। পরিতোষকে চার আনা দিয়ে বললুম—সুপুরি নিয়ে আয়।

পরিতোষ পানওয়ালার দোকান থেকে একরাশ চিকিসুপুরি নিয়ে এলো। লাল টকটকে তাদের চেহারা। সুপুরিগুলো ন্যাকড়ায় বেঁধে সেই পুঁটুলিটাও একটা ফালিতে বেঁধে মাংসের ঝোলে নামিয়ে দেওয়া গেল। দেখতে দেখতে সেই সুপুরির লাল রঙ বেরিয়ে মাংসের ঝোলের রঙ একেবারে খুনী লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সুপুরির পুঁটুলি তুলে ফেললুম। মাংস ফুটতে লাগল কিন্তু সেদ্ধ আর হয় না! ওদিকে যত জল শুকোতে লাগল, ততই ঠাণ্ডা জল ঢালতে লাগলুম। পাঁচ-ছ ঘণ্টা বাদে সেই অপূর্ব রান্না নামিয়ে আমরা হাঁপাতে লাগলুম। একটুখানি মাংস তারই মধ্যে চেখে ফেলা গেল—দেখলুম সে রকম মাংস জীবনে খাইনি! ইতিমধ্যে কর্তা একেবারে অভ্যাগতদের নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। সোডা আমরা আগেই এনে রেখেছিলুম, যজ্ঞ শুরু হতে বিশেষ দেরি হল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই চেঁচামেচি হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল।

অভ্যাগতদের মধ্যে জনতিনেক বাঙালী আর দুজন বোধ হয় মারাঠী ছিলেন। কাগজ ছিঁড়ে প্লেট তৈরি করে এক এক জনকে এক একটা মাছ দেওয়া হল। তাঁরা পরমানন্দে মাছের চাট দিয়ে আসব পান করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাংসের তলব পড়ল। অতগুলো বাটি বাড়িতে ছিল না। পাত্র অপাত্র ঘটি-বাটি গামলা চায়ের-পেয়ালা ইত্যাদি নিয়ে কোনোটিতে ঝোল কোনোটিতে মাংস নিয়ে দুই খানসামা ইন্দ্রসভায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। পাত্রগুলি নামিয়ে রাখতে না রাখতে সপাসপ শুরু হয়ে গেল। আঃ উঃ—ইত্যাদি আরামব্যঞ্জক বিবিধ ধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হয়ে উঠল। সকলেই বলতে লাগলেন—মাংস রান্না খুব চমৎকার হয়েছে।

কর্তার বুক ফুলে দশখানা। তিনি বললেন—দুবেটা খায় বেশি বটে, কিন্তু রাঁধে যা ভাই—একেবারে অমৃত!

আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা ছিল তার উল্টো। আমরা খেতুম কম কিন্তু রাঁধতুম অতি বিশ্রী। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্তার ডাক পড়ল। তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে! আর আছে?

নিজেদের জন্যে ও গিন্নীর জন্যে খানিকটা মাংস আলাদা করে রেখেছিলুম। বললুম—সামান্য কিছু আছে।

একজন অতিথি বললেন—তাহলে নিয়ে এসো সেটুকু! কার জন্যে রেখেছ?

গিন্নীমাকে গিয়ে বললুম—আপনি এই বেলা খেয়ে নিন, না হলে কিছুই থাকবে না।

তাঁর জন্যে একটু রেখে বাকি সমস্তটা তাঁদের দিয়ে দিলুম।

রাত্রি দশটা নাগাদ অভ্যাগতেরা চলে গেলে মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় যেখানে যত ছিল কাগজে পুঁটুলি করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসা হল। মাছ কিংবা মাংস যেদিনে আসত সেদিনেই এই কার্যটি করতে হত। কয়েক টুকরো পাউরুটি পড়েছিল তাই চিনি দিয়ে খেয়ে সে রাত্রে শুয়ে পড়লুম। পরের দিন ভোর বেলা উঠেই ডেকচি মাজা শুরু হয়ে গেল। গন্ধ আর কিছুতেই ছোটে না শেষকালে পাত্রটা উপুড় করে জ্বলন্ত উনুনের ওপর ধরতে মনে হল গন্ধটা চলে গেছে। ডেকচিটা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসেই ভাত চড়িয়ে দিলুম। মনে পড়ে সেদিনটা ছিল শনিবার।

শনিবার দিন কর্তা একটু তাড়াতাড়ি আপিসে বেরুতেন। সেদিনও আমাদের তাড়া দিয়েছিলেন। ভাত আর একটু নিরিমিষ তরকারি নাবিয়ে ডাল চড়িয়েছি এমন সময় আমাদের ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে খানিকটা জায়গা ছিল সেখানে বহুজনের গোলমাল ও বচসা শুনতে পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুনলুম আমাদের মনিব উচ্চকণ্ঠে আমাদের ডাকছেন।

ডালটা তখনকার মত নামিয়ে দুজনে বাইরে গিয়ে দেখলুম বাড়িওয়ালা শেঠ ও ভাড়াটেদের অনেক স্ত্রীপুরুষ সেখানে এসে জমেছে। আমরা বাইরে যেতেই একজন সেই ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—এই দুটোই কালকে মাংস কিনছিল।

বাড়িওয়ালা শেঠ আমাদের মনিবকে বলতে লাগলেন—তুমি কথা দিয়েছিলে মাছ-মাংস তোমার এখানে হবে না; তাই তোমাকে বাড়িভাড়া দিয়েছিলুম। তুমি আজই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে চলে যাও। না হলে বিপদে পড়বে।

কর্তা কাঁচুমাচু হয়ে বলতে লাগলেন—আমি তো সকালে আপিসে চলে যাই ভীশিতে (হিন্দু হোটেলে) খাই। রাত্তিরে সেখান থেকেই আমার ও স্ত্রীর খাবার নিয়ে আসি। আমার স্ত্রী রুগ্না। কোনোদিন খায়, কোনো দিন বা খায় না। এরা সারাদিন কি করে বলতে পারিনে তো!

আমরা বললুম—মাছ-মাংস আমরা খাইও না—রাঁধিও না।

আর একজন লোক বললে—এরা রোজ ইরানীর দোকানে ঢোকে। আমরা দেখেছি।

আমাদের মাথার ওপরে যে ভাড়াটেদের পাত্র আমরা নিয়ে এসেছিলুম তাদের বাড়ির কর্তার হাতে দেখলুম ডেকচিটা রয়েছে। ইনি বললেন—এই পাত্রে মাংস রেঁধেছে, এখনও গন্ধ ছাড়েনি।

বাড়িওয়ালা শেঠ আমাদের কর্তাকে বললেন—এখুনি এদের তাড়িয়ে দাও। নচেৎ তুমিও বিদেয় হও।

আমাদের কর্তা বললেন—ওরা এখনও অভুক্ত আছে; আজই খেয়ে দেয়ে চলে যাবে। আপনাদের সামনেই বলছি—

কর্তা আমাদের দিকে ফিরে বললেন—তোমরা আজই চলে যাও।

এক মুহূর্তেই ভাগ্যের কাঁটা ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—কিছুদিন পূর্বে মাংস খাওয়ার অপরাধে এক জায়গায় চাকরি গিয়েছিল। আজ মাংস রান্না করবার অপরাধে চাকরি চলে গেল।

ফিরে এসে আধসেদ্ধ ডাল উনুনে চড়িয়ে দিলুম। কর্তা গোঁজ হয়ে চান সেরে গিন্নীর ঘরে ঢুকে তাঁকে কি সব বলে না খেয়েই আপিসে চলে গেলেন। আমরা স্থির করেছিলুম বেলা তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় চলে যাব। গিন্নীমাকে চান করে নিতে বললুম। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে চান করে খেয়ে নিলেন। ইদানীং সংসার খরচের কিছু করে টাকা আমাদের কাছেই থাকত। তখনও গোটা পনেরো টাকা খরচ হয়নি। আমরা গিন্নীমাকে সেই টাকা কটা ফেরত দিতে গেলুম।

তিনি বললেন—ও টাকা তোদের কাছেই থাক। যদি কিছু দরকার লাগে খরচ করিস।

স্নান সেরে খেতে বসেছি এমন সময় পিয়ন এসে প্রফুল্ল ঘোষের নামে একখানা খাম দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খুলে দেখলুম আগ্রা থেকে সত্যদা লিখেছেন—তোমরা
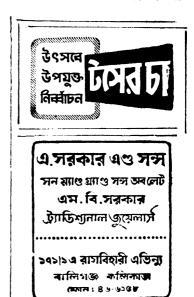
কোথায় আছ? তোমাদের জন্যে কাজ ঠিক করে রেখেছি, শীগগির এসে যোগ দেবে।

আনন্দের চোটে ভালো খেতেই পারলুম না।

আমাদের গ্যাঁড়াব্যাঙ্ক খুলে দেখা গেল সেখানে এই ক'মাসে প্রায় একশ' তিরিশ টাকা জমেছে। তা ছাড়া গিন্নীমায়ের দেওয়া এই পনেরো টাকা যোগ হল। টাকাটা আধাআধি করে দু'জনের কাছায় বেঁধে নিলুম। কি জানি যদি চুরি যায় কিংবা কোনো রকমে খোয়া যায় তাহলে অন্তত অর্ধেক তো থাকবে! এই ক'মাসে আমাদের নিজেদেরও কিছু সম্পত্তি হয়েছিল। দু'খানা ছোট শতরঞ্চি, দুটো বিছানার চাদর, দুটো বালিশ, একজোড়া করে ধুতি আর দুটো জামা। আমরা ঠিক করেছিলুম রাত্তির ন'টায় জি আই পি'র দিল্লিযাত্রীর গাড়িতে আগ্রায় যাব। বেলা তিনটের সময় আমাদের সম্পত্তি বাঁধা-ছাঁদা করছি এমন সময় ধপ ধপ করে কর্তা আপিস থেকে ফিরে এলেন। তিনি সিধে নিজের ঘরে না গিয়ে একেবারে আমাদের কাছে এসে বললেন—কি রে! তোরা যাবার যোগাড় কচ্ছিস?

বললুম—হ্যাঁ।

কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যাবি?

কর্তার মুখ দিয়ে তখন ভুরভুর করে মধুর গন্ধ বেরুচ্ছে। বললুম—দেখি কোথায় যাই।

কর্তা একটুখানি চুপ করে থেকে ধরাধরা গলায় বললেন—তোদের বিনে দোষে তাড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু কি করব বাবা—উপায় নেই।

দেখলুম তাঁর দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে। তিনি পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে দু'খানা দশ টাকার নোট আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—রেখে দে। যদি বোম্বাইয়ে থাকিস তাহলে মাঝে মাঝে দেখা করিস।

এই বলে তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গিন্নীমার ঘরে গেলুম। দেখলুম তিনি মুখে হাত দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। বললুম—মা, আমরা যাচ্ছি।

তিনি কোনো কথা বললেন না। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম; কিন্তু তখনও তিনি নীরব রইলেন দেখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

সারা জীবন তো চাকরি করেই যেতে হয়েছে। অন্যায়ভাবে তাড়িত হলেও এমন মনিব ও মনিব-পত্নী আর পাইনি।

সেইদিনই রাত্রি ন'টার ট্রেনে দু'খানা রাজা-কি-মণ্ডির টিকিট কেটে আমরা আগ্রা রওনা হলুম। (ক্রমশ)

লেবেল

ভোগ্যপণ্যের সংগে যে বিবরণ আঁটা থাকে সেই লেবেল নিয়ে এ বছরের ISI-এর কনফারেন্সে বিশদভাবে আলোচনা হয়। Informative labelling of consumer goods সম্বন্ধে বৈঠকটির সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজে বলেন যে, বিবরণ আঁটার ব্যাপারে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারীর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কিনতে গিয়ে জিনিসটি কেমন, তার মান আর গুণ কি জানলেই চলবে না, ভবিষ্যতে তার ব্যবহার, মান বজায় রাখার নিয়ম ইত্যাদিও জানতে হবে। এতদিন ভারতে উৎপন্ন consumer goods বা ভোগ্যপণ্যে লেবেল সম্বন্ধে যত্ন নেওয়া যথেষ্ট হয় নি। বিদেশে পণ্যের মান-এর সংগে সংগে লেবেলের বিবরণ হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়েছে। প্রেসার কুকার, টিনের খাবার, বিজলীচালিত ইস্তিরি, রেফ্রিজারেটর সবই ব্যবহারবিধিসাপেক্ষ জিনিস। বিধির অভাবে কত দুর্ঘটনা পর্যন্ত হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উৎপাদনকারীরা লেবেল ব্যবস্থার উন্নতি না করলে আইন দ্বারা করাতে তাদের বাধ্য করা দরকার। কমলা দেবী বলেন, আমাদের এই বিরাট উপমহাদেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকের সংখ্যা কম। ছবি দিয়ে ব্যাপক ভাবে লেবেল তৈরির আয়োজন প্রয়োজন হবে। লেবেল বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আঁটবার ব্যবস্থা ভালভাবে চালু হলে নিম্ন মানের জিনিস বাজার থেকে আপনা থেকেই বহুল পরিমাণে অপসারিত হবে।

ছবি দিয়ে লেবেল প্রথা প্রবর্তনেও ISI অগ্রসর হয়েছেন। ছবিগুলি মোটামুটি সহজ এবং সাধারণের বোধগম্য হবার উপযুক্ত করে তৈরি হচ্ছে। কাপড় কাচা ও ইস্তিরির ব্যাপারে লেবেলের বিশেষ দরকার। কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার এখন যথেষ্ট চালু হওয়া সত্ত্বেও আমরা তার যত্ন সম্বন্ধে অনেকে জানি না। পশমের বেলায়ও সাবধানতা অবলম্বন নিতান্তই প্রয়োজন। জল কতটা গরম বা

ঠাণ্ডা হবে কাচবার জন্য তার লেবেল দাঁড়াবে:

বিশেষ কোন সাবধানতা না নিয়ে কাচা চলবে।

বেশ গরম জলে ধুতে পারেন। তাপ ৬০° সেন্টিগ্রেড বা হাতে সয় এরকম গরম জলই চরম ধরা উচিত।

ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

হাতে ধোবেন। ঈষদুষ্ণ জল দরকার।

চরম গরম ৪০° সেন্টিগ্রেড ধোওয়া কাচা চলবে না।

ইস্তিরির বেলায়ও ঐভাবে ছবি দিয়ে বোঝানো হবে। নীচে তার নমুনা দিচ্ছি:

গরম ইস্তিরি চলবে।

খুব বেশী গরম নয়। ১৫০° সেন্টিগ্রেড পার হবে না।

হালকা গরম। ১২০° সেন্টিগ্রেড যথেষ্ট

ইস্তিরি করবেন না।

1st ড্রাই ক্লিনিং সম্বন্ধেও নমুনা বের করছেন:
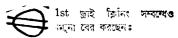
Perchloroethylene অথবা স্পিরিট দিয়ে ড্রাই ক্লিন ঠিক হবে

সাদা স্পিরিট মাত্র চলবে।

ড্রাই ক্লিন চলবে না

এভাবে রোদে দেবার নিষেধ-এর নির্দেশ হবে * আবার রোদে যা শুকিয়ে নেবেন তার বেলায় হবে *। অনেক রকম খবরই ছবি দিয়ে বোঝাবার লেবেল বের হবে। লেবেল লাগাতে হবে ভালভাবে সেলাই করে নয়তো স্থায়ী কালিতে ছেপে। বোনা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু লেবেলও যেন ধোপে না মুছে যায় লক্ষ রাখতে হবে। সাদা পটভূমিতে কালো রং-এর ছাপ হলে ভাল, অন্তত যেন স্পষ্ট পড়া যায় এমন রং হবে।

এতো গেল লেবেল ব্যবস্থা। তবে কাপড়ে লাগবার সময় দাঁড়াবে বেশ লম্বা বিবরণ।

ছবিতে দেখুন চারটি সংকেত আছে। প্রথম হচ্ছে জলের তাপ ইচ্ছামত, তারপর ইস্তিরি গরম, ড্রাইক্লিনিং-এ স্পিরিট এবং Perchlorothylene দুই চলে এবং রোদে শুকোতে পারেন। একটি কাপড়ের এরকম লেবেল হবে। এখন কথা হচ্ছে সংকেত তো না হয় তৈরি করলেন। তার যথেষ্ট প্রচার তো আবার একটি পর্ব। প্রচার করতে হলে গ্রামে, পল্লীতেও প্রচার প্রয়োজন এবং সংগে সংগে সেই লেবেল সম্বন্ধে ক্রেতাদের দৃঢ় হওয়াও দরকার। লেবেল সম্বন্ধে ভোগ্যপণ্যের ভোক্তা যদি জিদ করে তবে খুচরো দোকান অনুরোধ করবে লেবেল যাতে ঠিক হয়। এই ভাবে ক্রমশ একেবারে উৎপাদক পর্যন্ত সচেতন হবে। তাতে লেবেল তো হবেই, লেবেল সম্বন্ধে সতর্ক হতে গিয়ে বাজে মাল গছিয়ে দেবার ব্যবস্থা কমে যাবে। আমাদের কিন্তু মনে হয় ISI পরিকল্পিত চিহ্ন সব আরও সুস্পষ্ট হতে পারে যেমন ধরুন খুব গরম জলের উপর ধোঁয়া থাকলে সহজে বোঝা যায়।

এই আলোচনাচক্র উপলক্ষে ভোগ্যপণ্য সম্বন্ধে শ্রীমতী মনমোহিনী সাইগল (অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স সেণ্ট্রাল ফুড কাউন্সিল)

একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন আগের দিনে যা ছিল বিলাস, আজ তা প্রায় নিত্যব্যবহার্য হয়ে উঠেছে, এজন্য ক্রেতাকে ক্রয় সম্বন্ধে নির্দেশ বা সাহায্য দেওয়া নেহাত দরকার হয়েছে। আমাদের দেশে এযাবৎ ওষুধ ইত্যাদিতে কিছু লেবেল ব্যবহার করা হয়েছে। তার অনেকাংশ চিকিৎসকের দিকে লক্ষ্য রেখে। সর্বসাধারণ বরং ওষুধের লেবেল পড়ে ডাক্তারী করতে গিয়ে অনেক সময় ক্ষতিই করেন। অথচ সাধারণ জিনিস, প্রসাধন সামগ্রী সাবান, তেল সবেতেই লেবেল বিশেষ দরকার। লেবেলে সম্ভব হলে স্বল্প কথায় নির্দেশের অংশ হিসাবে মানা কিছু থাকলে তার উল্লেখ ভাল। স্থানাভাব হলে টিন কৌটোর তলাটিও কাজে লাগানো চলে। শ্রীমতী সাইগল আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন, সেটি হল তুলে রাখা বা Storage। ইলেকট্রিক সামগ্রীর তার বর্ষায় কিভাবে যত্ন নিতে হয়, ব্যবহার না করলে কোন জিনিস কিভাবে রাখা দরকার, সব কিছু লেবেলে সম্ভব না হলে কাগজের টুকরোয় লিখে দেওয়াতে উপকার হবে। রেফ্রিজারেটর ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ধাতুনির্মিত ফলকে লেখা থাকলে সে নির্দেশ দীর্ঘকাল চোখের সামনে থাকবে। একখানা বই বা ছোট্ট পুস্তিকা কোথায় হারিয়ে যায় তার সন্ধান থাকে না। মোটা মোটা কথা গায়ে আটকানো ফলকে থাকলে হারাবার ভয় নেই ও নিত্য চোখে পড়বে। কলকব্জায় কবে কবে তেল দরকার তা আপনার কুলুঙ্গিতে রাখা কাগজে না থেকে সেলাই করার মেশিন অথবা পাখা বা এই ধরনের সামগ্রীর গায়ে থাকা কাজে লাগবে বেশী। মনে রাখতে হবে সাধারণ ক্রেতা বিশেষজ্ঞ নয়। তার বিশ্বাস আর ভরসা আসবে লেবেল থেকে। উৎপাদক সম্প্রদায়ও লেবেল-এর মান রাখতে পণ্যের মান সম্বন্ধে সচেতন হবেন।

আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও ভোগ্যপণ্য পরিস্থিতি অনেকটা একরকম। অর্থনীতি ক্ষেত্রে জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুঁয়ে চলেছে অথচ recession বা পশ্চাদ্‌পসরণ আটকান যাচ্ছে না। একই বিচিত্র গতি হয়েছে পণ্যের বাজারে। নিত্যব্যবহার্য সব জিনিসের নিতান্ত অভাব অথচ পণ্যদ্রব্য যাচঞাকারিণী-দের জ্বালায় দিবানিদ্রাটুকুও দায় হয়েছে। অলস দ্বিপ্রহরের সামান্য শান্তিটুকুও কেড়ে নিয়ে কড়া নড়ে উঠবে। আগন্তুক হয় ফিনাইলের নমুনা দেখিয়ে টিনটি আপনাকে গছিয়ে দেবে নয়তো সাবান প্রসাধনী সম্বন্ধে আপনার পক্ষপাতিত্বের মনস্তাত্ত্বিক খবর সংগ্রহ করবে। যে সব কথা আপনার অবচেতন মনেও আছে কিনা সন্দেহ, সেই সব নোট-বইতে টুকে নিয়ে চলে যাবে। লেবেল মারার কড়া নিয়ম হলে ভুঁইফোঁড়, অকস্মাৎ আবির্ভূত সব ভোগ্যপণ্য সরল সহজবুদ্ধি গৃহিণীকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না, অন্তত কম পারবে এটা ঠিক।

খবরের টুকরো

ভ্যাটিকান সিটির সংবাদ। সেখানকার কর্তৃত্ব ও শাসনে মেয়েরা ভালভাবে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছেন। পাঁচটি মহিলা বেশ উচ্চপর্যায়ে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন। কয়েক বছর আগে এ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। গত সপ্তাহে একটি আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক সম্মেলনে মহিলাদের রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মসম্বন্ধীয় কাজকর্মে অধিকতর অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মহিলাদের পুরুষের সকল পর্যায়ে সমান অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। পোপের যাবতীয় কর্মক্ষেত্রে, ধর্মের গভীর তত্ত্ব শিক্ষায় মেয়েরা থাকবেন ও ধর্মানুষ্ঠানের এবং ধর্মসেবার অধিকারী দলভুক্ত হবেন। এই ছিল সম্মেলনের একটি সিদ্ধান্ত।

সভায় সিদ্ধান্তটি পেশ হলে বিপক্ষদল সেন্টপল থেকে উদ্ধৃত উক্তিতে যুক্তি দেখিয়ে বললেন,

"Let women keep silence in the churches for it is not permitted them to speak, but let them be submissive as the law says."

গীর্জায় মেয়েরা চুপ করে থাকবেন। তাঁদের কথা বলা মানা। তাঁরা নিয়মের বিধানে বাধ্য হয়ে বশ্যতা মানবেন।

আবার সেন্টপল থেকেই আর এক উদ্ধৃতি দিয়ে সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করা হয়

"There is neither Jew, nor Greek, there is neither slave nor freeman, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus."

ইহুদী, গ্রীক, দাস এবং স্বাধীন মানুষ, নারী ও পুরুষ কোথাও বিভেদ নেই। সবাই যীশুতে এক হয়ে লীন।

শ্রীমতী

"ভারতীয় নারীগণ অশিক্ষিত ও অত্যাচারিত, এই অভিযোগ কোনও ক্রমেই সত্য নয়। অন্যান্য দেশের চেয়ে এখানে নারীজাতির প্রতি অত্যাচার কম। ভারতীয় নারীর মহৎ চরিত্র তার জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আধুনিক অর্থে তারা অজ্ঞ বটে, অর্থাৎ লিখতে প্রায় কেউই পারে না; অক্ষর পরিচয়ও অতি অল্প স্ত্রীলোকের আছে। কিন্তু তাই বলে কি তারা অশিক্ষিত? যদি তাই হয়, তবে যে সব মা, ঠাকুরমা, দিদিমা ছেলেমেয়েদের কাছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও নানা উপাখ্যান বর্ণনা করেন তাঁদের সকলকেই অশিক্ষিত বলা যেতে পারে। আবার এঁরাই যদি ইউরোপীয় উপন্যাস এবং কতকগুলি বাজে ইংরাজী পত্রিকা পড়তে পারতেন, তবে আর অশিক্ষিত বলে অভিহিত হতেন না। এটা কি পরস্পর বিরুদ্ধ বলে মনে হয় না?"

বলেছেন সিস্টার নিবেদিতা

ভারতীয় মহিলাসমাজের প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে উৎসর্গীকৃত প্রাণ নিবেদিতার ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তার সামান্য এতটুকু উল্লেখ করলাম মাত্র। আবার বিদগ্ধ, সুধী-সমাজে এই বিদেশিনী তপস্বিনীর কি স্থান ছিল তার একটু উদ্ধৃতি দেবার ইচ্ছা হচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী। শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তাঁকে। তাই একজায়গায় বলছেন, "সুন্দরী সুন্দরী কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠলো।

...সাজগোজ ছিল না। পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত। নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল। কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।"

জন ট্রেসী ক্লিনিক

একটিমাত্র ছেলে "জন" যখন মায়ের ডাকাডাকিতে সাড়া দিল না, তখন তার মা শ্রীমতী স্পেন্সার ট্রেসী মৃদু কর-স্পর্শে তাকে জাগিয়ে তুললেন, কিন্তু তার মনে রয়ে গেল একটা সংশয়—"কেন এমন হলো? তবে কি জন কানে শুনতে পায় না?" এই অশুভ চিন্তায় কণ্টকিত হয়ে তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটে গেলেন স্বামী স্পেন্সার ট্রেসীর কাছে, যিনি ছিলেন রঙ্গমঞ্চের একজন প্রখ্যাত অভিনেতা। স্ত্রীর কথা শুনে তিনি ধারণাটা অলীক বলেই হেসে উড়িয়ে দিলেন; কিন্তু মায়ের মনের সেই আশংকা অতি শীঘ্রই সত্য বলে প্রমাণিত হলো যখন ডাক্তাররা বহু পরীক্ষার পর অভিমত দিলেন যে জন কানে বেশ কম শোনে—সে বধির।

সেদিন থেকেই শ্রীমতী ট্রেসীর শুরু হলো বধির জীবন রূপায়ণের কৃচ্ছ্র সাধনা—সে যেমন বেদনাময়, তেমনি কঠোর। এবার জননী ছাত্রী হয়ে দেখা দিলেন, কত বিনিদ্র রাত কাটালেন বই-এর স্তূপের মধ্যে—চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, শিশুমনস্তত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব ইত্যাদি কিছুই তিনি বাদ দিলেন না পড়তে। আর সারা দিনমান অপলক-চোখে চেয়ে থাকতেন শিশুপুত্রের মুখের দিকে, তাকে জানায় আকুল আগ্রহ। তিলে তিলে তিনি আবিষ্কার করলেন বধির জীবনের নিষ্ঠুর মর্মকথা আর সেই সঙ্গে তার সম্ভাবনায়ময় দিকটি, যা তিনি সারা বিশ্বকে না জানিয়ে থাকতে পারলেন না। তাই তার বেদনার উৎস থেকে রূপায়িত হল আমেরিকায় লস-এঞ্জেলেসে ওয়েস্ট অ্যাডামস নামক স্থানে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান "জন ট্রেসী ক্লিনিক।" সেখান থেকে সারা পৃথিবীর বধির শিশুর অভিভাবকরা শুনতে পাচ্ছেন মূককে মুখর করে তোলার নির্দেশ-বাণী আর নিজেদের বিভ্রান্তময় জীবনকে সুসংযত করার ইঙ্গিত। সন্তানের বধিরত্বের ফলে পিতামাতার অন্তর্জ্বালার সঙ্গে যখন সমস্ত পরিবারের বিক্ষুব্ধতা জড়িত হয়ে এক আবিল ও সমস্যাসঙ্কুল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তার ফলে অবহেলিত বধির শিশুর জীবন যে দুঃসহ হয়ে ওঠে তাতে কোন সন্দেহই নেই। সেই জন্য শ্রীমতী ট্রেসী যে ক্লিনিকটির ভিত্তি স্থাপন করলেন, তা একান্তভাবেই "পিতামাতা-কেন্দ্রিক"। বধির শিশুর পিতামাতারা যাতে তাদের শিশুকে সর্বপ্রথমে শিশু বলে গ্রহণ করতে সক্ষম হন ও পরে তার বাক্যস্ফুরণে সহযোগিতা করতে পারেন সেই মূলগত উদ্দেশ্যে ক্লিনিকটি স্থাপিত হলেও এর পরিকল্পনা যেমন অভিনব, তার সংগঠনটিও তেমনি বহুমুখী ও ব্যাপক।

মিসেস স্পেন্সার ট্রেসী

সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে অভিভাবক-দের পাঠচক্র, গ্রীষ্মকালীন স্কুল, নারসারী বিভাগ, গবেষণাকেন্দ্র, আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত বিরাট লেবরেটারী, মনস্তত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিভাগ, শ্রবণ পরীক্ষা নেবার কেন্দ্র ইত্যাদি। পৃথিবীর দূর দূরান্ত থেকে বহু বিদ্যার্থীর মধ্যে বধির শিশুর মা-বাবাদের সংখ্যাও কম নয়। তাঁরা আসেন তাঁদের বধির শিশুকে সঙ্গে নিয়ে এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে। ক্লিনিকে পাঠ গ্রহণ করার সময় অভিভাবকদের কাছ থেকে কোনরূপ বেতন নেওয়া হয় না; তবে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মূল্য দিয়েই শিক্ষালাভ করতে হয়। যে সব অভিভাবকরা এখানে আসতে সক্ষম নন, তাঁরা অনুরোধ করলেই এখানের পত্র-বিনিময় মাধ্যম পাঠ্য তালিকা বা correspondence course তাঁদের বিনা-মূল্যেই পাঠান হয়, যাতে তাঁরা অনায়াসেই ঘরে থেকে তাঁদের বধির শিশুকে ভাষা স্ফুরণের সঙ্গে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করতে পারেন।

শিশুর ভাষা-স্ফুরণের সময় যে তার শৈশবকাল আর তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে মা-বাবা ও সমস্ত পরিবারের সেটিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করেই এই পাঠ্য-তালিকা কয়েকটি শিক্ষার উপর বিশেষ আলোকপাত করেছে, যেমন—ওষ্ঠপাঠ, auditory training (অডিটরী ট্রেনিং) বা শ্রবণ অনুশীলন শিক্ষা। ওষ্ঠপাঠ বলতে বোঝায় যে কথা বলার সময় বক্তার ঠোঁট নাড়া আর মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ করে তাঁর বক্তব্যকে অনুধাবন করা। বধির শিশুর যেটুকু শ্রবণ শক্তি থাকে, তাকে কার্যকরী করা ও তার ধ্বনি-সচেতনতা-

বোধকে উত্তরোত্তর উন্মেষিত করার উদ্দেশ্যে 'অডিটরী ট্রেনিং' বা শ্রবণ অনুশীলন শিক্ষা দেওয়া হয়। এই দুটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা বধির শিশু অতি শৈশবকাল থেকে লাভ করলে একদিকে যেমন সে ওষ্ঠপাঠের দক্ষতা অর্জন করে অন্যের কথার অর্থগ্রহণ করতে পারবে, অন্যদিকে পরিবেশের শব্দ প্রবাহ বিশেষ কথ্যভাষাকে বিশ্লেষণ ও অনুকরণ করে ধ্বনির সাহায্যেই সে আত্ম-প্রকাশ করতে সচেষ্ট হবে। ক্লিনিকের পাঠতালিকার পাঠক্রম অনুসরণ করে অভি-ভাবকরা অনায়াসেই বধির শিশুকে বাঙ্ময় করে তুলে সার্থক করতে পারেন একটা ব্যর্থ জীবনকে।

কল্যাণময়ী এই ক্লিনিকের দাক্ষিণ্যে পৃথিবীর অনেক দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের বহু অভিভাবকরা বধির শিশুর সমস্যা ও সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে তাকে সুষ্ঠু পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

অনুভূতি বসু

ঐতিহাসিক দ্রব্য সংরক্ষণের নতুন উপায়

শাহজাহান যখন তাজমহল নির্মাণ করিয়েছিলেন, তখন যমুনার নীল জলধারা বয়ে যেত ঠিক তার পাশ দিয়ে। পরে নদীর অববাহিকা বহু দূরে সরে গিয়েছে। কিন্তু এবারকার বর্ষায় যমুনা নাকি আবার তাজমহলের পায়ের কাছে এসেছে, স্মৃতি-সৌধটি বিপদাপন্ন করে তুলেছে। এ হলো প্রকৃতির মার যার ওপর মানুষের কোন হাত নেই কারণ মানুষ এখনো আবহ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেনি। কিন্তু মানুষও সময় সময় এমন সব কাজ করে বসে যাতে লাভের সংগে কিছু ক্ষতিও হয়। ধরুন ডি ভি সি বাঁধের কথা। এটা জানা কথা যে কোন নদীতে বাঁধ দিলেই সেখানকার মাটি বাঁধের চাপে কিছুটা বসে যাবে এবং সেক্ষেত্রে সামগ্রিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রকৃতি কিছু দূরে মাটি ঠেলে উপরের দিকে তুলতে পারে। মাটি ঠেলে উপরের দিকে তোলার মানেই সেখানকার জমি আলগা হয়ে যাওয়া যার ফলে সেখানকার গাছপালাগুলির শিকড় আলগা হয়ে মরে যেতে পারে। আমাদের এই কলকাতা শহরের রাস্তার দুধারে যে সব বড় গাছ ছিল হঠাৎ সেগুলি অতি অল্প দিনের মধ্যেই মরে গেল। এই ব্যাপারটার সংগে ডি ভি সির বাঁধের কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেটা চিন্তার বিষয়। তারপর ধরুন মিশরের অস্বান বাঁধ ও নাসের হ্রদ নির্মাণের ফলে নীল নদীর জল এত ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে বহু প্রাচীন আবু সিমেল স্মৃতিসৌধের (৩০০০ বছর আগে নির্মিত রাজা দ্বিতীয় রামেসিস ও তাঁর রাণী নেফেরতেতির দেউল) আজ জলমগ্ন হবার ও ভেসে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে। এতক্ষণে ইঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের টনক নড়েছে, কি করে এই প্রাচীনতম মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শনটি বাঁচানো যায়। এক ফরাসী কল্পনায় স্মৃতিসৌধটির সামনে বাঁধ বেঁধে জলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এক ব্রিটিশ পরিকল্পনা অনুসারে ভূগর্ভে গ্যালারী নির্মাণ করে জলমগ্ন অবস্থায় স্মৃতিসৌধটি পরিদর্শন করতে হবে। কিন্তু এক ইতালীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে সৌধটি খণ্ডিত করে দূরে উঁচু জমিতে তুলে নিয়ে গিয়ে খণ্ডগুলি আবার জোড়া লাগাতে হবে। এই শেষের প্রস্তাবটিই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়েছে।

৩২০০ বছর আগে খোদাই করা আবু সিমেল স্মৃতিসৌধে মিশর সম্রাট ২য় রামেসিস ও তাঁর রানী নেফেরতারির মূর্তি উপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

গ্রাহ্য তো হয়েছে, কিন্তু খণ্ডগুলি জোড়া লাগাবে কি দিয়ে? হিন্দু ও মোগোল আমলে নির্মিত ভারতের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিতে কি করে পাথরগুলি জোড়া লাগানো হয়েছে, পালিশ করা হয়েছে তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। সেই আঠাজাতীয় জিনিসগুলি সে যুগের তুলনায় এক আশ্চর্য বাহাদুরী ও কুশলতার ব্যাপার। এখনো আমাদের দেশে ওই রকম কোন আঠা বা প্ল্যাস্টার তৈরি হয়েছে বলে জানিনা। অথচ তাজমহলে ফাটল ধরছে, হুমায়ুনের সমাধিসৌধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আশার কথা এই যে, হালে ঠিক ঐ ধরনের এক আঠার মত প্ল্যাস্টার উদ্ভাবিত হয়েছে আমেরিকায় যা দিয়ে যে কোন বহু প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা যাবে। জিনিসটি এক রাসায়নিক পলিমার জাতীয় পদার্থ। দুটি টিউবের মধ্যে দুই রকম রাসায়নিক পদার্থ থাকে। সেই দুটি মিশিয়ে নাকি এমন এক আঠা বা জেলির মত পদার্থ তৈরি হয় যার ১টি ফোঁটার জোরে আস্ত একটা মোটরগাড়ি ঝুলিয়ে রাখা যায়। রজন জাতীয় এই পদার্থটির নাম এপোক্সি এবং এরই মধ্যে এটি দিয়ে বহু জিনিস জোড়া লাগানো হচ্ছে, এমন কি দুটি ধাতুকে

আবু সিম্বেল স্মৃতিসৌধের মূল। এখন মূর্তিগুলি খণ্ড খণ্ড করে অনেক উপরের জমিতে এপোক্সির সাহায্যে আবার আগে কার মত যুক্ত করা হয়েছে। নীল নদের উত্থানশীল জলধারা রুখবার বাঁধটি রয়েছে সামনের দিকে

একসঙ্গে ওয়েল্ড করে দেওয়া যাচ্ছে যার ফলে তৈরি করা যাচ্ছে বহু নতুন জিনিস, গুণগত উন্নতিসাধন করা যাচ্ছে বহু পুরানো জিনিসের।

বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের যোগ-বিয়োগ করে নানা রকম এপোক্সি তৈরি হয়। প্রথম দিকে যেসব জোড়াতাড়া লাগানোর কাজ বিভিন্ন জৈব পদার্থ দিয়ে হত আজ কাল সেগুলি এপোক্সি দিয়ে হয়। এমন কি শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানের বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগানোতেও এপোক্সি ব্যবহার হচ্ছে।

কয়লা ও তৈল থেকে উৎপন্ন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ এক সঙ্গে "রান্না" করে এপোক্সি তৈরি হয়, যেমন এপিক্লোরোহাইড্রিন ও বিস্‌ফেনল। তবে এই দুটিকে এক সঙ্গে মেশানোর কায়দাটা খুবই জটিল।

এই ধরনের রজন জাতীয় জিনিস তৈরি করার প্রথম চেষ্টা করেন আচার্য পি, কাস্তান (সুইস) এবং ডঃ এস গ্রীনলে (মার্কিন) ১৯৩৮ সনে। কিন্তু পদার্থটিকে তরল অবস্থা থেকে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত করার চেষ্টা যুদ্ধের আগে আর হয়নি। এই থার্মোপ্লাস্টিক জিনিসটি তরল অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু তার সংগে অন্য একটি জিনিস মিশিয়ে দিলে সেটি বরাবরের মত কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এমন কি যতই গরম করুন সেটি আর তরল অবস্থায় ফিরে যাবে না। দুটি জিনিসের মাঝখানে স্যান্ডউইচের মত লাগিয়ে দিয়ে ২ দিক থেকে চাপ দিলে জিনিস দুটি চিরকালের মত 'ওয়েল্ড' হয়ে যাবে। এইখানেই আসছে আবু সিম্বেলের সমাধি সৌধের প্রশ্ন, কারণ নীল নদের উজান থেকে এই অমূল্য রত্নটি বাঁচাতে হলে এটিকে খণ্ডিত করে তুলে নিয়ে গিয়ে অনেক উঁচুতে বসিয়ে খণ্ডগুলি জোড়া লাগাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে বেলেপাথরের পাহাড়ের উপর তৈরি এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি কয়েক খণ্ডে কেটে নাসের হ্রদ থেকে ২১১ ফুট উপরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হবে খণ্ডগুলি আবার জোড়া লাগানো হবে।

সর্বপ্রথমে ১৯৬৪ সালে উত্থানশীল নদীর জল যাতে জিনিসটির কোন ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য এক ১২০০ ফুট বাঁধ দেওয়া হল। মূর্তিগুলির উন্মুক্তগুলি বাঁচাবার জন্য প্রচুর বালি এনে সেগুলির সামনে গাদা করা হল। তারপর সৌধের মাথার উপরকার মাটি এবং ৫০ লক্ষ ঘন মিটার চুনাপাথর সৌধের চারপাশ থেকে অপসারণ করা হল। বাকি রইল শুধু দেয়াল আর দুই আড়াই ফুট থামগুলি। তারপর ১৯৬৫ সালে ছাদটিও যখন সরিয়ে নেওয়া হলো তখন বাইরের সূর্যের আলোর মানুষ সেই মূর্তিগুলিকে দেখল সর্বপ্রথম। তার আগে কোন দিন কেউ সে-গুলিকে খোলা অবস্থায় দেখেনি।

মূর্তিগুলি আয়তনে বিরাট হলেও অত্যন্ত ভঙ্গুর, কারণ লিউবিয়ান বেলে পাথর স্ফটিক ও একরকম ক্যালসিয়াম ঘটিত জিনিস মিশিয়ে তৈরি যেগুলির কোনটিই মজবুত নয়—অনেকটা আমাদের কোনার্ক মন্দিরে ব্যবহৃত পাথরের মত।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সৌধের ৩০ টন ওজনের পাথরের ব্লকগুলির মধ্যে দেড় থেকে দুই ইঞ্চি গর্ত করে সেগুলির মধ্যে লোহার ডাণ্ডা চালিয়ে দিয়ে গর্তের মধ্যে এক বিশেষ এপোক্সি ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর এক বিরাট কপিকলের সাহায্যে ঐ রকম ৩০০০টি পাথরের ব্লক নির্বিঘ্নে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই অমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শনটির নতুন জমিতে পুনঃসংস্থাপনার কাজ চলেছে, চলেছে তার অংশগুলিতে জোড়াতাড়া লাগানো। এইভাবে আধুনিক রসায়নবিদ্যার সাহায্যে ৩২ শতাব্দী আগেকার এই শিল্প-কলার নিদর্শনটির সংরক্ষণ সম্ভব হল।

দ্বিতীয় রামেসিস ও রাণী নেফেরতেরির প্রতিমূর্তিগুলিতে ব্যবহৃত এপোক্সির আয়ু কত দিন, এই প্রশ্নের জবাবে ইঞ্জিনীয়াররা বলেন সেই আয়ু প্রতিমূর্তিগুলির চেয়ে বেশী বই কম হবে না। এমন কি তাঁদের মতে নির্মাণের সময় মূর্তিগুলি যত মজবুত ছিল এখন তার চেয়েও বেশী মজবুত হবে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

৫০
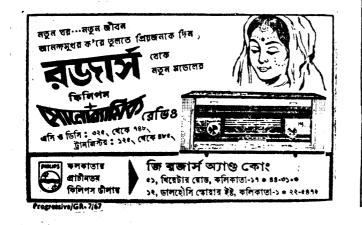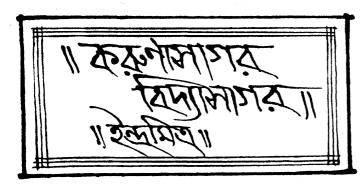
বিদ্যাসাগরের বাবা তখন কাশীতে। বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন, দিনকয়েকের জন্য কাশীতে বাবার কাছে যাবেন।

কে একজন বারণ করল। বলল—বিদ্যাসাগর, এখন গরমের দিনে কাশী যাবে, বড় ভয়ের কথা।

কিন্তু বিদ্যাসাগর একবিন্দু ভয় পেলেন না। বললেন—ডিউটি করতে যাব, তাতে প্রাণের ভয় করলে চলবে কেন।

বিদ্যাসাগর নির্ভয়ে সারাজীবন আপন কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের কি কোনো তুলনা আছে! 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগরের করুণার কথা সকলেই জানে। রাস্তা থেকে কলেরা রুগীকে কোলে করে নিয়ে এসেছেন বিদ্যাসাগর, অচেনা-অজানা মানুষের দুঃখে অস্থির হয়ে দু-হাত ভরে সাহায্য করেছেন তাকে। বিস্তর অনাথা বিধবার সংসার চলেছে বিদ্যাসাগরের টাকায়। অসংখ্য গরীব ছাত্রের খাওয়া-পরা লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছেন বিদ্যাসাগর। যা আয় করেছেন বিদ্যাসাগর, তার অধিকাংশই ব্যয় করেছেন গরীব-দুঃখীদের জন্য।

বিশাল হৃদয় বিদ্যাসাগরের। তবু, অথবা সেইজন্যই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঞ্চনা করেছে অনেকে।

উত্তরপাড়া ইস্কুলের একটি বালকের চিঠি এল একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে। চিঠির সারমর্ম অত্যন্ত করুণ। পিতৃমাতৃহীন, সহায়সম্বলশূন্য দরিদ্র বালক। পরের বাড়িতে একমুঠো খেয়ে অনেক কষ্টে ইস্কুলে পড়ছে। বিদ্যাসাগর যদি দয়া করে পাঠ্যপুস্তকগুলি পাঠিয়ে দেন তো ছেলেটি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়াশোনা করতে পারে।

আর কথা কি। বিদ্যাসাগর দরকারী বইগুলি পাঠিয়ে দিলেন ডাকে, ছেলেটির নামে, ইস্কুলের ঠিকানায়। তারপর বছর বছর চিঠি আসে—আজ্ঞে, নতুন ক্লাসে উঠেছি, আবার নতুন বই দরকার।

বিদ্যাসাগর ডাকে বছর বছর ছেলেটিকে নতুন নতুন বই পাঠিয়ে দেন।

কয়েক বছর পরের কথা। উত্তরপাড়া ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাই দেখা করতে এসেছেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। কথায় কথায় বিদ্যাসাগর সেই ছেলেটির কথা তুললেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার ইস্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ছেলেটি কেমন পড়াশোনা করে বলো তো।

কিন্তু নাম শুনে ছেলেটিকে ঠাহর করতে পারলেন না হেডমাস্টার মশাই। বললেন—আমার ইস্কুলের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও-নামের কোনো ছেলে নেই তো।

ও-নামের কোনো ছেলে নেই কি? বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি দিব্যি মাস্টার তো হে। একটা ছেলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়ছে তোমার ইস্কুলে, বছর বছর ক্লাসে উঠছে, চিঠি লিখে আমার থেকে বই নিচ্ছে, বছর বছর, ডাকে বই পাঠাচ্ছি, সে-ও ঠিকঠাক বই পেয়ে যাচ্ছে, আর তুমি বলছ কি না ও-নামের কোনো ছেলেই নেই তোমার ইস্কুলে! সব ছেলেকে তুমি চেনো না নাকি?

ভালোমানুষ হেডমাস্টার মশাই সেদিন চুপ করে গেলেন। পরদিন ইস্কুলে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে আরম্ভ করলেন। সব ক্লাস তন্নতন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কোথায় কে। এ-ইস্কুলে ও-নামের কোনো ছেলে নেই। বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখে এ-ইস্কুলের কোনো ছেলে বই যোগাড় করেনি। তা হলে ব্যাপার কী?

ব্যাপার গুরুতর। অত্যন্ত জটিল সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান হল শেষ পর্যন্ত।

উত্তরপাড়া ইস্কুলের কাছেই একখানা বইয়ের দোকান। সব সেই দোকানদারের কীর্তি। বছর বছর কাতর ভাষায় অব্যর্থ চিঠি লিখে বিদ্যাসাগরের থেকে নতুন নতুন বই এনেছে, বিক্রি করেছে।

অচেনা-অজানা মানুষ তো দূরের কথা, নিতান্ত আত্মীয়স্বজনও বিদ্যাসাগরকে বঞ্চনা করতে ছাড়েনি।

একখানা খাতায় নাম-ঠিকানা লেখা আছে। মাসে মাসে কাকে কত টাকা পাঠাতে হবে, সে সব কথা লেখা আছে। সেই খাতা দেখে বিদ্যাসাগর টাকা পাঠান, প্রত্যেক মাসে এ-বাবদে বিদ্যাসাগরের খরচ হয় আটশো টাকার কিছু বেশি।

একবার একটানা তিন মাসের জন্য বিশ্রাম করতে কার্মাটারে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। যাবার আগে একজন আত্মীয়ের হাতে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন—মাসে মাসে যাকে যা দেবার, ঠিকমত দেবে।

বিদ্যাসাগর তিন মাস কার্মাটারে কাটাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এক মাসও কাটল না, দিগ্‌বিদিক থেকে বিদ্যাসাগরের কাছে খবর আসতে লাগল—আমাদের পেটে ভাত নেই, উনুনে হাঁড়ি চড়ে না, মাসহারার টাকা পাইনি।

কেউ মাসহারার টাকা পায়নি কেন? সেই আত্মীয়কে চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু সে চিঠির কোনো জবাব এল না।

দিগ্‌বিদিক থেকে তাগাদার পর তাগাদা। মাসহারার টাকা কই? মাসহারার টাকা কই? অস্থির হয়ে কার্মাটার থেকে কলকাতায় ছুটে এলেন বিদ্যাসাগর। সেই আত্মীয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—লোকে মাসহারা পায়নি কেন?

আত্মীয়টি জবাব দিল—অন্য কাজের বড় ভিড় ছিল, তাই পেরে উঠিনি।

বিদ্যাসাগর বললেন—আচ্ছা, না পেরেছ, টাকাগুলি এনে দাও, যাকে যা দেবার আমি নিজে দিয়ে যাই।

আত্মীয়টি আমতা আমতা করে বলল—হ্যাঁ—তা—টাকা-টা—অন্য—বাবদে খরচ হয়ে গেছে।

কী আর বলবেন বিদ্যাসাগর। তখনই আড়াই হাজার টাকা ধার করে আনলেন, হিসেব করে তিন মাসের টাকা দিয়ে দিলেন সকলকে, তারপর কার্মাটারে চলে গেলেন।

টাকা, টাকা, টাকার জন্য অনেকে মুখে বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দেখিয়েছেন। বিদ্যাসাগর কি তা বোঝেননি? বুঝেছেন, মর্মে মর্মে বুঝেছেন।

রামকমল ওরফে গুজে নামে একটি শিশু দৌহিত্রকে খুব ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর। গুজে চাইলেই তার হাতে দিতেন নতুন নতুন সিকি, দুআনি, আধুলি টাকা।

বিদ্যাসাগর গুজেকে জিজ্ঞেস করতেন—দাদা, তুমি কাকে ভালোবাসো?

গুজে বলত—দাদামশাই, তোমাকেই খুব ভালোবাসি। আর তোমার চেয়েও তোমার ওই নতুন নতুন সিকি-দুআনিকে বেশি ভালোবাসি।

বিদ্যাসাগর বলতেন—সকলেই তাই

ভালোবাসে। তবে তুমি শিশু কি না, বোঝো না, তাই আসল কথাটি বলে ফেলো। অন্যেরা মুখে বলে না।

বিদ্যাসাগর সংসারে সুখ পাননি, শান্তি পাননি। সকলকে সন্তুষ্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে চেষ্টা ষোলোআনা সার্থক হয়নি।

বিদ্যাসাগরের পাঁচটি সন্তান : এক পুত্র, চার কন্যা। সন্তানদের মধ্যে পুত্রটি সকলের চেয়ে বড়।

বাংলা ১২৭৪ সালের শ্রাবণ মাসে গোপালচন্দ্র সমাজপতির সংগে বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার বিবাহ হয়। বাংলা ১২৭৯ সালের ২৩ মাঘ গোপালচন্দ্রের মৃত্যু হয়। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "দাদা, জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যুর পর, তাহার মাতা, ভগিনী ও ভ্রাতাকে কলিকাতায় আনিয়া, স্বতন্ত্র বাটীভাড়া করিয়া রাখিলেন। নিজ হইতে সমস্ত ব্যয় দিয়া, তাহাদের রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।...ঐ কন্যার পুত্রদ্বয়কে এরূপভাবে লালনপালন ও শিক্ষিত করিলেন যে, উহারা পিতৃহীন হইয়াও উহাদিগকে একদিনের জন্যও কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হইল না। ঐ কন্যার

দেবরের পালন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন...।"

গোপালচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশচন্দ্র বিলেত যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ঠিক করলেন, বিদ্যাসাগরকে না জানিয়ে গোপনে মায়ের অনুমতি নিয়ে চলে যাবেন।

গোপন আয়োজন দেখে হেমলতা সুরেশচন্দ্রকে বললেন—তুমি ছেলে হয়ে যেমন আমাকে না বলে যেতে পারছ না, তোমাকে যেতে দেবার আগে মেয়ে বলে আমারও কি বাবাকে একথা জিজ্ঞেস করা উচিত নয়?

অর্থাৎ, বিদ্যাসাগরের অনুমতি ছাড়া যাওয়া হবে না। কথাটা বলার জন্য অনেকবার সুরেশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সামনে গেছেন, কিন্তু বলে উঠতে পারেননি। সুরেশচন্দ্রের ভাবগতিক দেখে বিদ্যাসাগরের সন্দেহ হল। একদিন সুরেশচন্দ্রকে বললেন—তোর কিছু দরকারী কথা আছে বলে বোধ হয়, তা কিছু থাকে তো বল না।

সুরেশচন্দ্র বললেন—আমি বিলেত যাব?

বিদ্যাসাগর রঙ্গ করে বললেন—কি? ব্যারিস্টার হয়ে এসে চাকরির জন্য আমারই উমেদারি করবি তো?

তারপর রঙ্গ ছেড়ে বললেন—টাকাকড়ির বড় অনটন হয়ে পড়েছে, এ অবস্থায় আর হয় না।

পরে একদিন বাড়ির মধ্যে কথায় কথায় সুরেশচন্দ্র মাকে বললেন—আমার বাবা থাকলে কি আর তোমার বাবার কাছে আবদার করতে যেতাম?

উপরের ঘরে বিদ্যাসাগরের কানে গেল কথাটা। সুরেশচন্দ্রকে ডাকলেন। ওই কথায় বিদ্যাসাগরের দু-চোখ জলে ভরে উঠেছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—তোরা আমাকে পর ভাবিস। সে থাকলে তোদের জন্য যা করত, আমি তার চেয়ে কি কম করছি?

বাংলা ১২৭৯ সনের আষাঢ় মাসে বিদ্যাসাগরের মধ্যমা কন্যা কুমুদিনীর সঙ্গে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

বাংলা ১২৮২ সনের ৩০ আষাঢ় বিদ্যাসাগরের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনীর সঙ্গে সূর্যকুমার অধিকারীর বিবাহ হয়।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "ইনি (সূর্যকুমার অধিকারী) একুশ বৎসর বয়সের সময় হেয়ার-স্কুলের শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিবাহের পর অগ্রজ মহাশয়, সূর্যবাবুকে ঐ পদ পরিত্যাগ করাইয়া, মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এবিষয়ে সূর্যবাবু প্রথমত অসম্মতি প্রকাশ করেন; অনেক বাদানুবাদের পর, দাদার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন। সূর্যবাবু, হেয়ার স্কুলের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন।"

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সূর্যকুমারকে মেট্রোপলিটান থেকে বরখাস্ত করে দিতে বাধ্য হলেন বিদ্যাসাগর।

বাংলা ১২৮৪ সনের বৈশাখ মাসে বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর সঙ্গে কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

বিদ্যাসাগর একদিন ছোট ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে বললেন—তুমি বিষয় সম্বন্ধে আমার নিন্দা করেছ? তুমি বলে বেড়াও যে, সংস্কৃত প্রেস আর ডিপজিটারী আমাদের দুজনের সম্পত্তি? ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে ঐ ডিপজিটারী দান সম্পর্কে তুমি নানা রকম কথাবার্তা বলে থাকো?

দীনবন্ধু বললেন—বিধবাবিবাহাদি কাজে আপনার প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ আছে। অন্য লোকে যখন ত্রিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে সংস্কৃত ডিপজিটারী নিতে উমেদার, তখন ব্রজবাবুকে বিনা টাকায় কেন দেওয়া হল? অন্যকে দিলে সে টাকায় আপনার অনেক ঋণ শোধ হত। লোকের কাছে এই কথাই আমি বলেছি। আপনি যেমন উদারপ্রকৃতি তাতে সমস্ত বিষয়ই নষ্ট করতে পারেন।...সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারী আপনার একার সম্পত্তি নয়, সুতরাং ওতে আপনার একলার স্বত্ব নেই। ওতে আমার স্বত্ব আছে। কারণ আমাদের দুজনের টাকায় আর পরিশ্রমে ওই দুই সম্পত্তি অর্জিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—ও আমি ব্রজবাবুকে দিয়েছি।

দীনবন্ধু বললেন—আপনার অংশ আপনি যা-খুশী করতে পারেন, আমার অর্ধেক অংশ আপনি দান করতে পারবেন না।

বিদ্যাসাগর বললেন—তোমাকে অর্ধেক দিতে পারি না। চার ভাই ও পিতামাতা বর্তমান অতএব ওই সম্পত্তি যুক্তি অনুসারে ছ ভাগ হতে পারে।

আদালতে যাবার কথা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আদালতে না গিয়ে সালিসী মানা হল। সালিসী হলেন দ্বারকানাথ মিত্র আর দুর্গামোহন দাস।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন লিখেছেন: "তিনি (বিদ্যাসাগর) দুই শত টাকা কর্জ করিয়া আনিয়া দেন, সেই দুই শত টাকা অবলম্বন করিয়া পুরাতন অক্ষর ও একটি অকর্মণ্য কাষ্ঠের প্রেস ক্রয় করিয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও আমি উভয়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালাবধি বেলা নয় দশ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ছাপাখানার কার্য নির্বাহ করিয়াছিলাম।"

বিদ্যাসাগর লিখেছেন: ......"ঐ যন্ত্রের সহিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কখন কোনো সংস্রব নাই। তিনি কহিতেছেন সংস্কৃত যন্ত্রের সংস্থাপনে ও উন্নতিসাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এজন্য উহাতে তাঁহার অংশ আছে, কিন্তু আমি তাঁহাকে কখনও উক্তরূপ পরিশ্রম করিতে বলি নাই ও দেখি নাই।..."

দুই ভাইয়ের এই বিবাদে একজন সাক্ষী ছিলেন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। দীনবন্ধুকে এ ব্যাপারে তিনি কখনো পরিশ্রম করতে দেখেননি। গিরিশচন্দ্র সাক্ষ্য দিয়েছেন যে সংস্কৃত প্রেসে দীনবন্ধুর অংশ থাকার কথা তিনি দীনবন্ধু কি বিদ্যাসাগর কি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মুখে শোনেননি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য দাবি ত্যাগ করেছেন দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। ১৮৬৮ সালের ১৭ অক্টোবর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন লিখেছেন: "...সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত সহোদরে সহোদরে বিরোধ করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য বিবেচনা করিয়া লিখিয়া দিতেছি যে, সংস্কৃত যন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ে আমার স্বত্ব ও অংশ থাকার যে দাবি করিয়াছিলাম আমি সে দাবি পরিত্যাগ করিলাম।"

বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে মাসে মাসে টাকা পেতেন দীনবন্ধু। অতঃপর সে টাকা নেওয়া দীনবন্ধু বন্ধ করে দিলেন।

বিদ্যাসাগর গিয়ে গোপনে একদিন দীনবন্ধুর স্ত্রীর আঁচলে টাকা বেঁধে দিয়ে বললেন—মা, এই নাও, দীনোকে বলো না, আমি জানি, তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, এই টাকার সংসার খরচ চালাবে।

দীনবন্ধু জানতে পারলেন। এবং ওই টাকা সেবার দীনবন্ধুর স্ত্রী ফেরত দিলেন। বিদ্যাসাগরকে ফেরত নিতে হল।

পরে আবার বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে মাসে মাসে টাকা নিতে রাজি হয়েছেন দীনবন্ধু। এবং নিয়েছেন।

বছরখানেক বাদে মনোমোহিনী নামে একটি বিধবার বিবাহ হল। সেই বিধবা-বিবাহের ফলেই বিদ্যাসাগরকে চিরকালের জন্য বীরসিংহ ছেড়ে চলে আসতে হল।

ঘটনাটি গোড়া থেকে বলা যেতে পারে।

কলকাতা থেকে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় আর মনোমোহিনী এলেন বীরসিংহে, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে। সঙ্গে নারায়ণচন্দ্রের চিঠি নিয়ে এসেছেন। চিঠিতে নারায়ণচন্দ্র যা লিখেছেন তার সারমর্ম: "ক্ষীরপাই-নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মনোমোহিনী নাম্নী একটি বিধবা কন্যা সঙ্গে করিয়া এখানে বিবাহ করিবার মানসে আসিয়াছিলেন। পিতৃদেব মহাশয় আপাতত ইহাদিগকে বাটী যাইতে বলিলেন। পিতৃদেব ত্বরায় বীরসিংহার বাটীতে যাইবেন, তথায় যাইয়া যাহা হয় করিবেন। ইহারা ক্ষীরপাই যাইতে ভয় পায়, যেহেতু তথায় অনেকেই বিধবাবিবাহের দ্বেষ্টা। কিন্তু ইহারা আপনাকে না জানাইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, এজন্য আমায় পত্রসহ আপনার নিকট যাইতেছেন। পিতৃদেব যে পর্যন্ত বাটী

না যায়, সেই পর্যন্ত যাহাতে ইহারা নিরাপদে থাকিতে পায়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন।"

শম্ভুচন্দ্র আশ্রয় দিলেন মনোমোহিনীকে।

যথাসময়ে বিদ্যাসাগর বীরসিংহে এলেন। ক্ষীরপাইয়ের হালদারবাবু বিদ্যাসাগরের কাছে সকাতরে প্রার্থনা করলেন যেন মুচিরামের এই বিবাহ না হয়।

হালদারবাবুদের প্রার্থনা পূর্ণ করতে রাজি হলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—আপনাদের অনুরোধে আমি এই বিবাহের কোনো সংস্রবে থাকব না।

অগত্যা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হল মনোমোহিনীকে। চলে গেল সনাতন বিশ্বাসের বাড়িতে। কাছেই সনাতন বিশ্বাসের বাড়ি। সেখানে মনোমোহিনীকে সংগে নিয়ে গেল দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের পুত্র গোপালচন্দ্র। রাধানগরের কৈলাসচন্দ্র মিশ্র আর বিদ্যাসাগরের আরেক ভাই ঈশানচন্দ্রের পরামর্শে।

শম্ভুচন্দ্র আর রাধানগরের চৌধুরীবাবুদের নায়েব উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের কাছে বসে ছিলেন। বিদ্যাসাগরের ইচ্ছায় শম্ভুচন্দ্র লোক পাঠিয়ে সনাতন বিশ্বাসকে ডাকিয়ে আনলেন। কিন্তু কারো কথায় সনাতন মনোমোহিনীকে তাঁর বাড়ি থেকে বের করে দিতে রাজি হলেন না।

উমেশচন্দ্র তখন সনাতন বিশ্বাসকে বললেন—তোমরা এ'র মাসহারা খাও, একটা কথা শুনলে না।

সনাতন বিশ্বাস বললেন—আমরা পুরুষানুক্রমে কৈলাস মিশ্রের বাড়িতে চাকরি করে আসছি। তিনি নিজে আমাকে এইমাত্র বলেছেন, 'তুমি মেয়েটিকে বাড়িতে রাখো, কারো কথায় বের করে দিও না। আমি কাল সন্ধ্যার আগে এসে এই বিধবার বিবাহ দেব।' আমি কোনো মতে তাঁর কথার অবাধ্য হতে পারব না। বরং যে-ক'টাকা মাসহারা দিয়েছেন তা ফেরত দিতে রাজি আছি।

সনাতন বিশ্বাস চলে গেলেন।

গোপালচন্দ্র আর ঈশানচন্দ্র চাঁদা করে বিবাহের সমস্ত আয়োজন করল। বিবাহ হয়ে গেল। বাঙলা ১২৭৬ সনের আশ্বিনে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "সম্প্রতি জাহানবাদে একটি বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বর কেচকাপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ক্ষীরপাই। পাত্রী কাশীগঞ্জ নিবাসী শ্রীকাশীনাথ পালধির কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী।"

উত্তরকালে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরের নামে অভিযোগ করেছেন : "মুচিরামের বিবাহের সময় উক্ত বিবাহ ন্যায্য ও শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিয়াও বিধবাবিবাহবিদ্বেষী ক্ষীরপাই নিবাসী হালদারবাবুদের অনুরোধে (বিদ্যাসাগর) পশ্চাৎপদতার ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই বরং ঐ সময়ে তিনি ঐ বিবাহের প্রতি যারপরনাই বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।"

বিবাহের পরদিন সকালে বিদ্যাসাগর ঈশানচন্দ্রকে বললেন—ঈশান, তুমি কেন বিবাহ দেওয়ালে, এতে আমার বড় অপমান হয়েছে।

ঈশান বলল—কৈলাস মিশ্র ও আমি গত পরশু আপনাকে জিজ্ঞেস করি, 'এই বিধবা-বিবাহ ন্যায্য কি না?' আপনি উত্তর দিয়েছেন, 'এ শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায্য বলে আমি স্বীকার করি, কিন্তু হালদারবাবুদের মনে দুঃখ হবে।' লোকের খাতিরে এই সকল বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়া আপনার মতো মানুষের পক্ষে দোষের কথা।

বিদ্যাসাগর রাগ করে বললেন—তুই কি এখনো সেইরূপ দুর্মুখ আছিস এবং এই-

রূপেই কি চিরকাল থাকবি?

আরো দু-চার কথার পর বিদ্যাসাগর বললেন—আমি আর দেশে আসব না।

কয়েকদিন বীরসিংহে থেকে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাখালস্কুল, বালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করে বিদ্যাসাগর চিরদিনের জন্য বীরসিংহ ত্যাগ করলেন।

কলকাতায় আসার সময় ভাইদের আর সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীদের বললেন—তোমরা আমাকে দেশত্যাগী করালে।

সত্যিই দেশত্যাগী হয়েছেন বিদ্যাসাগর। জীবনে আর কখনো বীরসিংহে যাননি।

উত্তরকালে শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন: "অগ্রজ মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে আমি আর ঐ বিষয়ে (মুচিরামের বিবাহ) লিপ্ত রহিলাম না......।" কিন্তু, শম্ভুচন্দ্র যাই বলুন, মুচিরামের বিবাহের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব শম্ভুচন্দ্রের। কেননা উত্তরকালে স্বয়ং মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "আমি ধর্মত অঙ্গীকার করিতেছি যে কেবল উক্ত মহাশয়েরই (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন) সম্পূর্ণ যত্ন এবং অনুগ্রহেই উহা (আমার বিবাহ) নির্বাহিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা আমার চিরকালই মনে থাকিবে।"

তারপর তিন ভাইয়ের প্রত্যেককে আলাদা করে চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগর। প্রত্যেক চিঠিরই মূল সুর: "নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।"

কারো সঙ্গে আর কোনো সংস্রব রাখতে অনিচ্ছুক হয়েও বিদ্যাসাগর ভাইদের মাসহারা বন্ধ করেননি।

মাকে একখানা চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগর:

"শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মাতৃদেবী শ্রীচরণারবিন্দেষু—
প্রণতি পূর্বকং নিবেদনমিদম্—

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষত ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্বের মত নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি। মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। এজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত মাস মাস যে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া থাকি আপনি যতদিন শরীর ধারণ করিবেন কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। তদ্ব্যতিরিক্ত আপনকার পিতৃকৃত্য ও মাতৃকৃত্যের ব্যয় নির্বাহার্থে বার্ষিক দুই শত টাকা প্রেরিত হইবেক। যদি কখন কোন বিষয়ে আমায় কিছু বলা আবশ্যক বোধ করেন পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি অনেকবার আপনকার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি এবং পুনরায় শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি যদি আমার নিকট থাকা অভিমত হয় তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব এবং আপনকার চরণ সেবা করিয়া চরিতার্থ হইব ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মনঃ—"

একই দিনে স্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগর:

"শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

গুণালংকৃত শ্রীমতী দিনময়ী দেবী
কল্যাণনিলয়েষু

শুভাশীর্বাদ পূর্বক নিবেদনমিদম্

আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে বিষয়ে অণুমাত্র স্পৃহা নাই। বিশেষত ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে...। এক্ষণে তোমার নিকট এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখন কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তোমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, বিবেচনা পূর্বক চলিলে তদ্দ্বারা সচ্ছন্দরূপে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন্ন হইতে পারিবেক। পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য অবলম্বন করিয়া চলিবে, নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেশ পাইবে এবং অন্যেরও বিলক্ষণ ক্লেশদায়িনী হইবে। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ—"

একই দিনে বিদ্যাসাগর বীরসিংহের গদাধর পালকে লিখেছেন:

"নানা গুণালংকৃত শ্রীযুত গদাধর পাল
ভাইজী

কল্যাণভাজনেষু

শুভাশীর্বাদ পূর্বক নিবেদনমিদম্

নানা কারণ বশত স্থির করিয়াছি আর আমি বীরসিংহায় যাইব না। তুমি গ্রামের প্রধান, এজন্য তোমাদ্বারা গ্রামস্থ সর্বসাধারণ লোকের নিকট এজন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম নমস্কার ও আশীর্বাদ জানাইয়া বিনয় বাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখনও কোন দোষ করিয়া থাকি, সকলে দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। সাধারণের হিতার্থে গ্রামে যে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্থ লোকদিগের মাস মাস যে কিছু কিছু

আনুকূল্য করিয়া থাকি, আমার শক্তি থাকিতে ঐ সকল বিষয় রহিত হইবে না। কিছুকাল হইল আমার মনের ও শরীরের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। সুতরাং অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। যত দিন বাঁচিব, যদি শুনিতে পাই, তোমরা সকলে সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছ, তাহা হইলে যারপর নাই সুখী হইব। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ—"

পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌

ভবসুন্দরি,

আমি তোমাদের নিকট এ জন্মের মত বিদায় লইলাম। তোমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত, আপাতত মাসিক ১৫০. এক শত পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম। ইতি

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা"

বিদ্যাসাগর বাবাকে লিখেছেন :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু—
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্‌—

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষত ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এই সংকল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভৃতিকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার প্রতিলিপি শ্রীচরণসমীপে প্রেরিত হইতেছে, যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবেন।

সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এই প্রাচীন কথা কোন ক্রমেই অযথা নহে। সংসারী লোকে যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের এক জনেরও অন্তঃকরণে যে আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশ মাত্র নাই সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশ ভোগ

করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

একণে আপনকার শ্রীচরণে আমার বক্তব্য এই, পিতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। অতএব কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরবচনে শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবেন।

কার্যগতিকে ঋণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছি। ঋণ পরিশোধ না হইলে, লোকালয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। একণে যাহাতে সত্বর ঋণমুক্ত হই, তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। ঋণে নিষ্কৃতি পাইলেই কোন নির্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব। ...আপনকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহার্থে [illegible] হইয়া থাকে, যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন, কোন কারণে [illegible] ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। ইতি ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ।"

ঠাকুরদাসের চিঠির উত্তরে লেখা বিদ্যাসাগরের আরেকখানা চিঠির অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি: "আপনি লিখিয়াছেন, আমি যে চোরের উপর অভিমান করিয়া [illegible] খাইতেছি, এ অতি অনুচিত [illegible] সংসার বৈরাগ্য অবলম্বন [illegible] আমার মনে [illegible] আমার [illegible] পরিত্রাণ করিতে [illegible] অনুমতি [illegible] সম্পূর্ণ ক্ষান্ত [illegible] অনেক প্রকার [illegible] আন্তরিক যাতনা ভোগ করিতেছিলাম, একণে সকল প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়াছি। অধিক আর কি নিবেদন করিব, আমার যেন নরকভোগের পর স্বর্গবাস লাভ হইয়াছে। এমন স্থলে আমার চোরের উপর অভিমান করিয়া ভূমিতে ভাত খাওয়া হইতেছে, একথা সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা হউক এ বিষয়ে আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা উদ্বিগ্ন হইবেন না। অতঃপর আমি অনেক অংশে মনের সুখে কাল যাপন করিতে পারিব তাহার সন্দেহ নাই, তবে আমি এরূপ করাতে আপনকার মনে বেদনা জন্মান হইয়াছে লিখিয়াছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি, আমি বহু দিন অবধি সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরক্ত হইয়াছি। তথাপি আমার নিতান্ত মানস ছিল, আপনকার ও জননীদেবীর জীবদ্দশা পর্যন্ত সংসারে লিপ্ত থাকিয়া কালযাপন করিব। কিন্তু উত্তরোত্তর সকলেই আমার উপর এত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সকল পক্ষ হইতেই এত অত্যাচার হইতে লাগিল যে, আমার ক্ষমতায় আর সে সকল সহ্য করিয়া কাল হরণ করা হইয়া উঠিল না। আমি আপনকার শ্রীচরণে অকপটহৃদয়ে নিবেদন করিতেছি, নিতান্ত অসহ্য না হইলে, আপনাদিগের জীবদ্দশায় কদাচ সংসারের বিসর্জন দিতাম না। বিশেষ সকল বিষয়ে সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে আপনকার ক্ষোভ করিবার সঙ্গত কোন কারণ নাই। পুত্রের ক্লেশ নিবারণ হইয়াছে এবং পুত্র মনের সুখে কালযাপন করিতেছে, ইহা শ্রবণ করিলে, পিতার অন্তঃকরণে নিরতিশয় আনন্দ উদিত হইবেক। আমি সমস্ত ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি এবং মনের সুখে কাল-হরণ করিতে পারিব, তাহার উপায় করিয়াছি, সুতরাং এ বিষয়ে আপনকার দুঃখিত না হইয়া বরং আহ্লাদিত হওয়াই সম্ভব।"

সাংসারিক জীবনে বিদ্যাসাগর অসামান্য দুঃখী। তাঁর একমাত্র পুত্রের প্রতিও বিদ্যাসাগর বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। [illegible] ১২৮২ সালের ১৮ [illegible] বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি।"*

পুত্রের আচার-ব্যবহারে কী পরিমাণ ব্যথিত হলে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ এমন কথা লিখতে পারেন তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

না, আত্মীয়-বান্ধবের কাছে সহৃদয় ব্যবহার বিদ্যাসাগর পাননি। ১৮৮৯ সালের

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মন্মথমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার অনেকগুলি ক্লাস একেবারে dismiss করিয়া দেন। সেই সব ছাত্রদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ও একজন। পরে প্রত্যেক ছাত্রকে জরিমানা দিয়া পুনরায় ভর্তি হইতে হইবার আদেশ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রবাবুর পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "কি হে কার্তিক কি মনে করে?" কার্তিকেয়বাবু সব খুলিয়া বলিলেন, শেষে বলিলেন, "এ জরিমানাটা ছেলেকে না ছেলের বাপকে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "ছেলের বাপকে, এসব ছেলে জন্ম দেয় কেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তা যদি ঠিক, তবে তুমি নিজে শাস্তি না নিয়ে তোমার ছেলে নারায়ণকে শাস্তি দিলে কেন?" বিদ্যাসাগর বলিলেন, "থাক, বারেন্দ্র বামুন এসে সব গুলিয়ে দিলে।" দ্বিজেন্দ্রলালকে জরিমানা না নিয়ে ভর্তি করা হল, এবং যাহারা যাহারা জরিমানা দিয়াছিল তাহাদের জরিমানার টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইল।" (স্মৃতি-সম্পুট, পৃঃ ৯৮-৯৯)

কিন্তু এটি নিছক গল্প। কেননা দ্বিজেন্দ্রলাল কস্মিনকালেও মেট্রোপলিটনে পড়েননি।

২৭ জানুয়ারি বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর কাছে একখানা চিঠিতে আক্ষেপ করে লিখেছেন : "আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন।"

বিদ্যাসাগরের দয়ায় একজন বাবু উঁচুদরের সরকারী চাকরি পেয়েছেন। নামডাক আছে সেই বাবুর, কিন্তু তাঁর নাম বলা যাবে না। তাঁর কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি নিয়ে একটি লোক এসেছে।

বাবু তখন সোফায় বসে আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন। ইয়ার-বন্ধুরা বসে আছেন চারদিকে। বিদ্যাসাগরের চিঠিখানা পড়ে বাবু তামাক টানতে টানতে একটুখানি হাসলেন। ইয়ার-বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কী?

বাবু বললেন—ব্যাপার আর কী। বিদ্যাসাগর ব্যবসা ধরেছে। চাকরি করে দাও!

বিদ্যাসাগরের চিঠি নিয়ে যে এসেছে, বাবুর কথা শুনে সে অবাক হয়ে রইল। তারপর চুপচাপ চলে গেল।

সব কথা শুনলেন বিদ্যাসাগর।

ক্রমশ

অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস গ্যালারীতে সম্প্রতি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন শিল্পী গণেশ হালুই, মিঃ অ্যালফ্রেড হারবিথ, জে এস বোথরা ও শ্রীমতী কুসুম মালহোত্রা। এ ছাড়া শিল্পী তপন ঘোষ তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন প্রিয়দর্শিনী গ্যালারীতে এবং জহর দাশগুপ্তের ছবি প্রদর্শিত হয় বিড়লা অ্যাকাডেমি অব্ আর্ট অ্যাণ্ড কালচার গ্যালারীতে।

শিল্পী গণেশ হালুই তাঁর প্রদর্শনীতে ১৭ খানি ছবি পেশ করেন—সব কয়টিই

সবরখেরোবাসী —গণেশ হালুই

জলরঙে আঁকা। তরুণ শিল্পীমহলে গণেশ হালুই সুপরিচিত। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল তিনি অজন্তার চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণা করেন এবং সেই উপলক্ষে সবরখেরো গ্রামের নরনারী ও ছেলেমেয়েদের সরল জীবনযাপন-প্রণালী দেখে মুগ্ধ হন। বলা বাহুল্য তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন রূপ তিনি জলরঙ মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথমেই বলে রাখি এ শিল্পীর কাজ ভিন্ন গোত্রের—স্পর্শকাতর ও কাব্যধর্মী। বিভিন্ন চিত্রপ্রদর্শনী পরিক্রমা করার পরে এ শিল্পীর প্রদর্শনীতে প্রবেশ করলে মনে হয় বুঝি

ষাঁড় —তপন ঘোষ

করে দূরে অপরিচিত, পরিত্যক্তপ্রায় কোনও ছোট গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। শিল্পীর প্রদর্শনীভুক্ত ছবির প্রতি পুরুষ, নারী ও শিশুর মুখ সরল, নিষ্প্রভ ও মলিন—কোথাও অহেতুক রঙের জলুস নেই, অর্ধনগ্ন দেহে বেশভূষার বাহুল্য নেই। বাস্তবিকই মনে হয়, সবরখেরার বাসিন্দারা যেন অন্য যুগের মানুষ—সন্ধ্যার প্রদীপশিখার মতই এরা ভীরু, অথচ নিষ্পাপ। বুঝি নিজেদের ছোট ও সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে কোনও জগতের সঙ্গে তাদের কোনও পরিচয় নেই।

শিল্পীর অঙ্কনরীতি সরল ও রেখাসর্বস্ব—অনেক ক্ষেত্রে সিজানের রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়, যদিও তাঁর সুমনোনীত, মুখর রঙবিন্যাস এস্থলে দেখা যায় না। শিল্পী রঙ ব্যবহার করেছেন, তবে সে রঙ হালকা ও রচনার পরিপূরক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পী এ গ্রামের বাসিন্দাদের দেহ ও মুখ ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘতর বা বিকৃত করে এঁকেছেন, তবে সেগুলি বিসদৃশ বলে মনে হয় না। শিল্পীর ভাষা স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত এবং সামান্য রেখামাধ্যমেই সেই ভাষা ফুটে উঠেছে—যেমন ২ নং ছবি। মাত্র চোখ ও ঠোঁটের স্বল্প ও ক্ষীণ রেখামাধ্যমেই শিল্পী সবরখেরা বালকের ঔৎসুক্যটুকু সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। নূতন পরিকল্পনা হিসাবে রচিত শিল্পীর 'সুখের আশ্রয়' ছবিখানি আমার ভাল লেগেছে—এটির মধ্য দিয়ে তিনি মা ও শিশুর নূতন রূপ দেখিয়েছেন। এই জাতীয় আর একখানি রচনাও চোখে পড়েছে—প্রাউড ডটার। ছোট কুমারী কন্যা নির্ভয়ে ও পরম শান্তিতে পিতার কোলে বসে আছে, এই বক্তব্যটুকুই শিল্পী প্রকাশ করতে চেয়েছেন—তবে পিতার মুখে যথাযোগ্য বয়সের চিহ্ন থাকলে রচনাটি রসোত্তীর্ণ হতো। অপরাপর ছবির মধ্যে জাহানারা, অরণ্য ও দি মেন স্টেপল্‌-এর নাম করা যায়। তবে একটি কথা, ছবিগুলি শিল্পী তিন বৎসর পূর্বে রচনা করেছেন—সুতরাং এ প্রদর্শনীর আয়োজন আরও পূর্বে করলেই ভাল হতো। তা' হলেও সবররেখার সরল বাসিন্দাদের ও সেই সঙ্গে শিল্পীকেও অনেকের মনে থাকবে। শহরের লাউড-স্পীকার মাধ্যমে পরিবেশিত ফিল্ম-সংগীতের আসরে ক্ষণিক বিরতির মধ্যে শিল্পী যেন বাউলের একতারা ঝংকারে সকলকে চমকিত করে চলে গেলেন।

*

শিল্পী তপন ঘোষ তরুণ, সরকারী আর্ট কলেজ থেকে মাত্র দু' বছর পূর্বে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কলকাতায় এটি তাঁর দ্বিতীয় প্রদর্শনী। ছোট হলেও প্রিয়দর্শিনী গ্যালারী শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত, সুতরাং এখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে তরুণ শিল্পী ভালই করেছেন। ড্রয়িং ও রচনা সমেত তিনি ১৭ খানি নিদর্শন পেশ করেন। শিল্পীর কালিকলমে আঁকা ড্রয়িং-এর কাজগুলি সূক্ষ্ম ও অনুভূতি সাপেক্ষ—অনেকটা এনগ্রেভিং জাতীয়। এই প্রসঙ্গে ঘোড়া ও শায়িত মূর্তিখানির নাম করা যায়। রচনার মধ্যে কয়েকটি বিমূর্ত জাতীয়; দুঃখের বিষয় সেগুলি ঠিক রসোত্তীর্ণ হয়নি। তবে আধুনিক রীতিতে আঁকা কয়েকটি রচনার মধ্যে শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন ষাঁড়। রেখামাধ্যমে বহিরাবয়বের সীমা নির্দেশ না করে মাত্র লাল রঙের আঁচড়ের মধ্য দিয়ে শিল্পী এই চতুষ্পদ জন্তুটির অতি পরিচিত ভঙ্গিটুকু প্রকাশ করেছেন। প্রতীক হিসাবে সে-কলকোলাহলমুখরিত শহরের গণ্ডি অতিক্রম

ক্ষেত্রে শিল্পী বিভিন্ন সরীসৃপজাতীয় জীব স্থাপনা করে রচনাক্ষেত্রটি সুসম্বন্ধ করেছেন সেখানেও স্থান-বিন্যাসের পরিচয় পাই।

তবে কয়েকটি রচনাতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত-ভাবে শিল্পী প্রাচীন লোকচিত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। বাস্তবিক পুরান মন্দিরের গায়ে আঁকা লোকচিত্রের বিভিন্ন সরল প্রতীক ব্যবহার করার ফলে কয়েকটি রচনা কাশ্মীরের পশমশিল্পের পর্যায়ে পড়ে গেছে—অর্থাৎ এগুলি দেখে কাশ্মীরের নামদা-র কথা মনে পড়ে। এই প্রসঙ্গে পেণ্টিং ই, এ ও এচ্‌ উল্লেখযোগ্য।

*

শিল্পী জহর দাশগুপ্ত তিন বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এটি তাঁর প্রথম প্রদর্শনী।

ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী জয়ারচাঁদ দাশানী-র ছবির আলোচনা করেছি এই স্তম্ভে এবং বর্তমানে এ শিল্পীরও কাজ দেখলাম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেও উভয় শিল্পীই বেন সেই শিক্ষায়তনের প্রভাব পরিহার করে নূতন চিন্তাধারা ও অংকন-রীতির পরিচয় দিয়েছেন। এক হিসাবে জহর

টুইস্ট —জে এস বোথরা

দাশগুপ্তের এই মনোভাবের প্রশংসা করতাম যদি আধুনিক রীতিটুকু তিনি যথাযথরূপে আয়ত্ত করতে পারতেন। প্রদর্শনীভুক্ত ১৬ খানি নিদর্শন দেখে মনে হয়, তাঁর রচনা-পদ্ধতি মিশ্র—অর্থাৎ বিমূর্ত, প্রায়বিমূর্ত ও স্যুরিয়ালিস্টিক, সব রীতিতেই তিনি কাজ করেছেন, ফলে অল্প ছবিই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। রচনাক্ষেত্রটি তিনি অযথা অতিরিক্ত রেখামাধ্যমে ভাগ করে বিভিন্ন অংশ নানা মুখর রঙে ভরে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, অহেতুকভাবে তিনি মানুষের মুখ ও দেহ দীর্ঘ ও বিকৃত করেছেন। তার ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘ ও বক্ররেখা ব্যবহারের জন্য প্রায় প্রত্যেক ছবিতে আতঙ্ক, হতাশা ও বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছে। অবশ্য এজন্য শিল্পীকে দোষ দিই না। সম্ভবত বর্তমান সমাজজীবনে শিল্পী কেবলমাত্র ব্যর্থতা ও হতাশারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছেন (প্রসঙ্গত, এ জাতীয় কয়েকটি ছবি দেখে জাপানী শিল্পী নোবুয়া আবে-র রচনার কথা মনে পড়ে যায়)। তা' হলেও এ মনোভাব প্রকাশ করার মত সঠিক ভাষা যেন তিনি ব্যবহার করতে পারেন নি, তাই অধিকাংশ স্থলেই অতিরিক্ত রেখাজালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ছবির মূল বক্তব্য হারিয়ে গেছে—যেমন ৪ ও ১৪ নং ছবি। শিল্পী সম্ভবত নিরাশাবাদী, তাই 'প্রেম' ছবিখানির মধ্য থেকে বিশ্বাস ও ভালবাসার পরিবর্তে যেন সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সুর বেজে উঠেছে। পরিকল্পনার দিক দিয়ে বৃক্ষরোপণ রচনাটিতে কিছু নূতনত্ব আছে—তা' হলেও রেখাভিত্তিক মূর্তিগুলি যেন অনমনীয় ও দৃষ্টিকটু, ফলে এহেন সুন্দর বিষয়বস্তু-টুকুর বক্তব্য আদৌ বোঝা যায় না। অথচ শিল্পী রঙ ব্যবহারে সুপটু ও তাঁর রঙের পাত্র সর্বদাই নানা রঙে উচ্ছল; এবং রঙের মুনশীয়ানা প্রায় প্রতি রচনাতেই চোখে পড়ে। অপরাপর ছবির মধ্যে ৫ ও ১০ নং উল্লেখযোগ্য। কথাগুলি বললাম, তার কারণ শিল্পীর মতবাদ ও দৃষ্টিকোণ প্রশংসনীয় ও সবচেয়ে বড় কথা তাঁর প্রতিভা আছে। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে শিল্পী তাঁর যোগ্য রচনারীতির সন্ধান পাবেন ও নূতনতর ছবির পরিচয় দেবেন।

মিঃ অ্যালফ্রেড হারবিখ (Mr. Alfred Harbich) জার্মান শিল্পী। জার্মানীতে শিক্ষালাভ করে তিনি অংকনপদ্ধতি বিষয়ে নানা পরীক্ষা করেন। বর্তমানে তিনি ভারত-বাসী, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন ও পাটনাতে বাস করেন। ম্যাক্সমুলার ভবনের অধ্যক্ষ ডঃ লিসনার ও জার্মান কনসাল মিঃ রেনট্রপ শিল্পীর পরিচয় দেন। বিভিন্ন ঋতুতে গঙ্গার বিভিন্ন রূপ শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করে ও তারই প্রতিক্রিয়া তিনি রঙ-মাধ্যমে দীর্ঘ ঝুলায়মান কাপড় বা ক্যানভাসে রূপায়িত করেন। ছবিতে স্থাপত্যশিল্পের আয়তনিক বিরাটত্ব যোজনা করাই এ শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রদর্শনীতে শিল্পী কয়েকটি সুবৃহৎ কাপড়ে আঁকা রচনার নিদর্শন পেশ করেন, তাছাড়া দ্রুতরচিত সাদা-কালো ও রঙের নানা বিমূর্ত স্কেচের নমুনাও ছিল। দেখে মনে হয়, ব্রাশ সমেত শিল্পীর বাহু যেন যুগপৎ এক দিক থেকে অপর দিক পর্যন্ত ধাবমান চাকার মত দুর্বার গতিতে ঘুরে চলে এবং সেই সঙ্গে ফুটে ওঠে নানা রঙের নানা আকার। হয়ত কয়েকটি দেখতে ভালই লাগে কিন্তু শিল্প হিসাবে এর মূল্য কতটুকু সে কথা বলা কঠিন। মিঃ হারবিখ একদিন তাঁর রচনাপ্রণালী দেখান এবং শিল্পীদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেন। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ম্যাক্সমুলার ভবন-কর্তৃপক্ষ খ্যাতনামা জার্মান শিল্পী ফ্রিজ উইণ্টার (Fritz Winter)-এর অংকনপদ্ধতি বিষয়ে এক ফিলম প্রদর্শন করে সকলের ধন্যবাদভাজন হন।

বৃক্ষরোপণ —জহর দাশগুপ্ত

*

শিল্পী জে এস বোথরা প্রদর্শনীতে মোট ৩১ খানি ছবি পেশ করেন এবং প্রায় সব-গুলিই বিমূর্ত রীতিতে রচিত। শিল্পীর কয়েকটি ছবি সম্প্রতি ম্যাক্সমুলার ভবনে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে দেখার সুযোগ হয়েছিল, সুতরাং এখানে সেগুলি পুনরায়

ন্য রাখলেই তিনি ভাল করতেন।

এ শিল্পী সাধারণত জ্যামিতিক আকার-মাধ্যমে রচনাক্ষেত্রটিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে নেন ও পরে প্রয়োজনমত রঙ ব্যবহার করেন। সুতরাং এ'র রচনাকে আকারভিত্তিক বলা চলে। কোনও ক্ষেত্রে লম্বমান আবার কখনও আড়াআড়িভাবে ছোট ও বড় নানা আকারের সৃষ্টি করে সেগুলির শূন্যস্থানের মাপ ও প্রয়োজনমত সংস্থাপনই এ'র কাজের বিশেষত্ব। সে হিসাবে এ'র রচনায় বেন নিকল্সনের প্রভাব দেখা যায়। তবে সকলেই স্বীকার করবেন যে, আকারপ্রধান বিমূর্ত রচনা সৃষ্টি খুবই কঠিন এবং আকারের মধ্য দিয়ে নূতনতর জগতের সন্ধান না দিতে পারলে এ জাতীয় রচনা রসোত্তীর্ণ হয় না। এখানেও তাই হয়েছে—অর্থাৎ অধিকাংশ রচনা একঘেয়ে মনে হয়। তা হলেও কয়েকটি চোখে পড়ে—যেমন মিটিং ও রাত্রি। শিল্পী হালকা ও চাপা রঙের পক্ষপাতী এবং সে দিক দিয়ে 'দে রেডিয়েট লাইট' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসংগে বুমিং ও তীর্থংকর-এরও নাম করা যায়। অপরাপর ছবির মধ্যে 'রিট্রসপেকসন' চোখে পড়ে।

শিল্পী শ্রীমতী কুসুম মালহোত্রা দিল্লীর বাসিন্দা ও দিল্লী ত্রিবেণী কলা সংগমে অংকনবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইতিপূর্বে কোন স্থানে তিনি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন নি. এটিই তাঁর প্রথম প্রয়াস। তেলরঙ-মাধ্যমে কাজ করলেও এই শিল্পী এখনও কোনও বিশেষ রীতি সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি। ফলে তাঁর ১৯ খানি নিদর্শনের মধ্যে প্রথাগত থেকে শুরু করে রিয়ালিস্টিক, এক্সপ্রেশানিস্টিক ও ইমপ্রেশানিস্টিক রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিচার করে দেখলে মনে হয়, রিয়ালিস্টিক রীতিতে তিনি বক্তব্যটুকু ভালভাবে প্রকাশ করতে পারেন। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকটি রচনায় সুধীর খাস্তগীরের প্রভাব দেখা যায়—যেমন রিদ্‌ম্‌। শিল্পীর 'রাস্তার দৃশ্য' ছবিখানি সকলের চোখে পড়ে। পৃষ্ঠভূমিতে উচ্চ ইমারতশ্রেণী ও পুরোভাগে রাস্তার ওপর চলমান কয়েকজন পথচারীর রূপ মাত্র নীলরঙ-মাধ্যমে শিল্পী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে জাহাজ ও গ্রাম্য কুমারী উল্লেখযোগ্য।

*

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস কর্তৃপক্ষ পঞ্চম শারদীয় শিশু চিত্রপ্রদর্শনী আয়োজন করেন। ছয় থেকে বার বৎসর বয়স্ক যে সব বালক-বালিকা অ্যাকাডেমির স্টুডিওতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করে তাদের আঁকা ৬০ খানি ছবি প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। দেখে মনে হয়, সকলেই আপন আপন খেয়াল ও খুশীমত ছবি এঁকে গেছে ও ইচ্ছামত রঙ ব্যবহার করেছে। তবে এদের মধ্যে সূর্য চক্রবর্তী, সরিৎ দত্ত, সংঘমিত্রা পালচৌধুরী ও কোয়েলি সেনের নাম উল্লেখ করা যায়। অবশ্য বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে নবকুমার ঘোষ।

চিত্রপ্রদর্শনী ছাড়াও অ্যাকাডেমি ভবনের দ্বিতলের একটি গ্যালারীতেও সম্প্রতি বহু জনসমাগম হয়—উপলক্ষ পুরাতন শাল প্রদর্শনী। কাশ্মীর থেকে লেডি রাণু মুখার্জি কয়েকটি মূল্যবান পুরানো শাল সংগ্রহ করেন এবং সেগুলির সঙ্গে নিজ পরিবারে রক্ষিত পুরাতন কয়েকটি মূল্যবান শালও অ্যাকাডেমির স্থায়ী গ্যালারীতে দান করেন। এই উপলক্ষে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। হালকা ও কোমল পশমিনার ওপর অতি সূক্ষ্ম পশম সুতোয় বোনা জামাওয়ার, রুমাল ও নানা রকমের দোরখা শাল প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। কল্পনা ও সূক্ষ্ম পশমশিল্প কার্যে বিগত যুগের কাশ্মীরী শিল্পিগণ যে কি অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা কানি, তিলি ও আমলি (বিভিন্ন সূক্ষ্ম কারুকার্যের নাম) প্রথায় তোলা ১৫০।২০০ শত বৎসর পুরানো বিভিন্ন শালের নক্‌শা, কল্‌কা ও বিশেষভাবে ময়ূরের ডিজাইন দেখে বোঝা যায়। প্রদর্শনীতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল মহারানী ভিক্টোরিয়া ব্যবহৃত একখানি শাল। কাশ্মীরের মহারাজগণ প্রতি বৎসর তদানীন্তন ব্রিটিশ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে দু'খানি শ্রেষ্ঠ শাল উপহার দিতেন। কয়েক বৎসর ব্যবহার করার পরে মহারানী আমেরিকার কোনও বিশিষ্ট মহিলাকে শালখানি উপহার দেন। আমেরিকা ভ্রমণকালে কোন শহরে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে শ্রীমতী মুখার্জি শালখানি দেখেন ও সংগ্রহ করে ফেলেন। প্রদর্শনীর অপর পাশে কাশ্মীর সরকার এম্পোরিয়ম আধুনিক যুগ, রুচি ও ব্যবহারের উপযোগী কয়েকটি নূতন শালের নমুনাও পেশ করেন।

চিত্রপ্রিয়

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

পঞ্চাশ
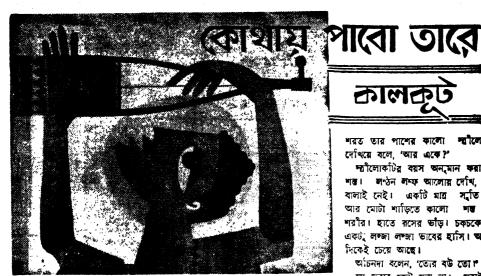
বাঁশ ঝাড়ের মাটি যেখানে ঢিবির মত উঁচুতে উঠে গিয়েছে, নরোত্তম বাতি হাতে, সেই উঁচুতেই আরোহণ করে। আলোর ইশারা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। গলার স্বর আরো স্পষ্ট। অচিনদা আমার হাত টেনে ধরেন। একটু বাঁক নিয়ে ওপরে উঠতেই দেখি, জয় ভোলা মন! একেবারে তকতকে উঠোনের মত পরিষ্কার জায়গা। চারদিকেতে বাঁশ ঝাড়ের ঘেরাও। মাঝখানে লাল মাটির পরিচ্ছন্ন বিস্তৃতি। ঝাড় ঘেঁষে, একদিকে এক পাতার ঘর। এর নামই বোধ হয় ঝোপড়ি। তার সামনে কিছু হাঁড়ি কলসী, একেই বলে ... এক জায়গায় এক টিমটিমে লণ্ঠন, আর এক জায়গায় কেরোসিনের লম্ফ। মাঝখানে কাঠকুটোর সঙ্গে আগুনের শিখা। ... থরথরানো আলোয় যাদের কিম্ভূত ছায়া কাঁপে, তাদের সকলের সামনেই একটি করে কোঁড়ে। হাতে একটি করে মাটির ভাঁড। গন্ধ যদি পেট ঘুলিয়ে ওঠে, তা হলেও জানবে, হেথায় রসের আসর জমেছে। বিলিতী কথায় সেই কী যেন বলে, 'পাব্' না আর কিছু, এও সেই প্রকারের যেন। রাস্তা থেকে খোয়াইয়ের মাঠ পেরিয়ে বাঁশঝাড়েতে পানশালা। তবে কি না এমন আর জন্মে দেখিনি। কেবল যে অবাক মানি, তা না। একটু অচিন অজানার, আঁধার রাতের শিউরোনি লাগে। ই কুথা লিয়ে এলেন গ অচিনদা। পরিচয়টা এখনো যে পেছনে ফেলে আসা ভদ্দর-লোকের ছেলে। প্রাণটি অটুট নিয়ে ফেরা হবে তো।

আমরা গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, অভ্যর্থনার উল্লাস বেজে ওঠে। বরহম দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে উঠে, হাত বাড়িয়ে বলে, 'এস্যাছিস্?'

অচিনদা খেঁকিয়ে বলেন, 'তুই কি ভেবেছিলি আসব না?'

'হঁ হঁ, তু কি মিছা বুইলবি? ত, ক্যানে রাস্তা থেকে হাঁক দিলি না। বাতি লিয়ে যেতাম।'

অচিনদা সকলের মুখের দিকে দেখতে দেখতে বলেন, 'হ্যাঁ, তাড়ি গিলে সব ভোম্ হয়ে বসে আছ, আমি অন্দুর থেকে চেঁচিয়ে মরব, কেউ শুনতেও পাবে না। ওটা কেরে, শরত না?'

অমনি মাঝবয়সী সাঁওতাল একজন দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'হঁরে, চিনতে পারলি?'

'তুই চিনতে পারলি?'

অচিনদার কথা শুনে সবাই হাসে। শরত তার পাশের কালো স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়ে বলে, 'আর একে?'

স্ত্রীলোকটির বয়স অনুমান করা একটু শক্ত। লণ্ঠন লম্ফ আলোয় দেখি, শীতের বালাই নেই। একটি মাত্র সুতি জামার আর মোটা শাড়িতে কালো শক্ত পুষ্ট শরীর। হাতে রসের ভাঁড়। চকচকে চোখে একটু লজ্জা লজ্জা ভাবের হাসি। অচিনদার দিকেই চেয়ে আছে।

অচিনদা বলেন, 'তোর বউ তো?'

সে জবাব কেউ দেয় না। সবাই মিলে হাসাহাসি করে। তার মানে বুঝতে হবে, ঠিক বলা হয়েছে। হাসির মানে এই না যে, ভুল হয়েছে। এ মানুষদের হালচালের ধরতাই একটু ভিন্ন রকমের। অতএব বরহমও তার মেলায় দেখা বউটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তবে ইটো কে বল্ দেখি?'

অচিনদা বলেন, 'তোর মুন্ডু।'

সকলেই হেসে বাজে। কেবল যে এই দু জোড়া তা না। জোড়াবিহীনও জনা চারেক আছে। তা ছাড়া আছে বুড়ো শুন্ডি নিজে, পানশালার মালিক। কেবল একজনের জুটি কে, বুঝতে পারি না। যে বসে আছে বুড়ো শুন্ডির কাছ ঘেঁষে। এ সেই কষ্টিপাথরে কাটা কালো যুবতী। মনে তো হয়, বুঝি সাঁওতালনিই হবে। এ যে কালোতে আলো, তা না। কালোতে

অপনে। আগুনে তার লাল ফলফলে জ্বলায়। যেখানে বৃকের ঔদ্ধত্যকে সামনে নিয়ে বাঁক নিয়ে বসেছে মন্দিরের মূর্তির ভঙ্গিমায়। এক হাতে কলসীর গলা জড়িয়ে ধরে, যেন বড় আদরে তুলে নিয়েছে বাঁ উরুতের ওপর। ডান পা ছড়ানো। চুলে বাঁধন আছে, তবু কপালের এক পাশে ভেঙে পড়েছে। লম্ফর লাল আলোয় মনে হয়, টানা চোখে তরল আগুনের স্রোত বয়ে যায়। ডান হাতের ভাঁড়ে চুমুক দেয়, আর ফিক্-ফিক্ হাসে। এমন আসর আর কখনো দেখিনি।

সকলেরই একটু টলমল চলচলে ভাব। সবাই হাসে। সবাই অচিনদাকেই বেশী দেখে। কিন্তু ভাবি, অচিন্ত্য মজুমদার এই আসরে আসেন কেমন করে। এ মানুষের কি সন্ধান কাল পায় বলে কিছু নেই। সমাজের প্রতিষ্ঠার, বিত্তের যে সীমা থেকে তাঁর আবির্ভাব, সেই সীমার পর কি এমন আশ্চর্য বাঁশঝাড়ে এসে ঠেকে।

বোঁচা শুঁড়ি উঠে বলে, 'এস গ অচিন-বাবু, আমার কাছে এসে বস।'

অচিনদা সেদিকে এগোতে এগোতে

বলেন, 'আসব তো, আমার জিনিস রেখেছ?'

বড়ো ফোগলা দাঁতে হেসে বলে, 'তা আর না রাখি। বরহম এসে বইলছে তুমি আসছ। পুরো এক কলসি রেখে দিয়েছি।'

সর্বনাশ, অচিনদাও কি এখন এই আসরে, রসের কেঁড়ে নিয়ে বসবেন। তা হলে আমি কোথায় যাই। এখন বলতে ইচ্ছা করে আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না।' কেন, তখন যে বড় সাধ হয়েছিল, বরহমের আস্তানায় যাব অচিনদার সংগে। এখন এত হাঁসফাঁস আঁকুপাকু কিসের।

অচিনদা বলেন, 'ভাল জিনিস তো?'

বড়ো বলে, 'খারাপ কোনদিন দিয়েছি? তুমি হলে পুরনো লোক।'

শোন কথা। এর পরেও তুমি ভাববে, এ লোক বিলাতী গাড়িতে বেড়ায়। মাইনের কথায় লোকে বলে, তিন হাজারি মসনবদার! বাঁশঝাড়ের বুড়ো শুণ্ডি বলে কিনা পুরানো লোক। কত পুরনো। সেই পড়ুয়া বেলা থেকে নাকি। অচিনদা গিয়ে তার পাশ ঘেঁষে বসতেই বরহম শরতেরাও এগিয়ে যায়। বউরাও বাদ যায় না। বউ কলসি ভাঁড়, সব নিয়ে অচিনদাকে ঘিরে বসে। শুণ্ডি একটা কলসী এগিয়ে দেয় অচিনদার দিকে। আর আমি যেন এক চাঁচিয়ে যাওয়া ফেলে। কার কাছে কোথায় যাই, ভেবে পাই না।

বরহম তাড়া দেয়, 'কই, আমাদিগের পাওনাটো দে।'

অচিনদা বলেন, 'দিচ্ছি রে দিচ্ছি।'

বলে এবার আমার দিকে ফিরে ডাকেন, 'কই হে, এস, তুমি যে অচেনা লোকের মত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে।'

বরহমই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আমাকে ডাকে, 'হঁহঁ', আয়নারে ছোকরা বাবু, বিটিছাওয়াদের মত দূরে দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানে।'

হরিণী যেমন ভয়ে ভয়ে পা ফেলে এগোয়, তেমনি হেসে হেসে এগিয়ে যাই। জবাইয়ের ছুরি যেন চার পাশে ঝিলিক হানে। বরহমই আবার জিজ্ঞেস করে, 'ইটোকে?'

'আমার বন্ধুই বলে।' অচিনদা বলেন, 'বন্ধু।'

শরত বলে, 'ছোকরা বন্ধু ধরেছিস।'

'হ্যাঁ, নষ্ট করব বলে।'

কথা শুনে, আমিই সাজিয়ে যাই। বাকীরা হাসে। বরহম তার ওপরে তাল দেয়, 'বিটা ছেলেকে আর তুই কি নষ্ট কইরবি। উয়াদের নষ্ট করবে বিটিছেলে।'

'চুপ কর।' ধমকের সুরে বলেন অচিনদা। বলেন, 'খালি ওই এক নষ্টই শিখেছ, না? কই হে, বস না আমার কাছে।'

বরহমই সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে বলে, 'হঁ হঁ বস।'

অগত্যা, তবু একবার বলি, 'এখানেই, মানে—।'

অচিনদার এখন অন্য রূপ। প্রায় ধমকে ওঠেন, 'তবে কি অন্ধকার মাঠে গিয়ে বসবে? কেন, বরহমদের আড্ডায় আসতে চেয়েছিলে তো, এস। আড্ডায় বস। এবার বুঝতে পারছ তো, মেয়েদের কেন নিয়ে আসা যায় নি। ব্যাপারটা তো জানে না, খালি যাব যাব করে।'

তা বটে, মেয়ে তো দূরের কথা। জলজ্যান্ত ছেলে হয়ে, আমার বায়ু জমে যাচ্ছে। মেয়েদেরও নিয়ে আসার ভূত যে ওঁর মাথায় চাপে নি, তাই অনেক ভাগ্য। অচিনদার চোখের দিকে আর একবার তাকাই। চোখে একটু ইশারা করে, পাশে ডাকেন। সেই ইশারায় ভরসা দিয়ে ঠোঁটের কোণে একটু হাসেন। ধুলোর কথা ভাবতে গেলে চলে না। এখানে বাঁশঝাড়ের এই পান-শালায় লাল ধুলোতেই ধুলোট জমেছে। অতএব, যতটা সম্ভব অচিনদার গা ঘেঁষে বসি। তবু গোটা দিনের পরিচয়। বাকীরা তো এই মুহূর্তের। অচিনদা রাখলে আছি, নইলে গিয়েছি। এখন তো আর একলা পারানির কোন কথা নেই। আমার প্রাণের ভাঙা নৌকার মাঝি এখন অচিনদা।

অচিনদা জিজ্ঞেস করেন, 'লোক বড় কম কম লাগছে। আর কেউ নেই?'

জোড়া-হীন চারজনও কাছে এসে বসেছে। বরহম বলে, 'তুই আসবি, কেউ জানে নাই ত কী হবে। আর দু'-চারজন আছে ইদিক-উদিক।'

অচিনদা বলেন, 'তা, তাদেরও ডাক আর বাকী থাকে কেন। আর ইটি কে, চিনতে পারছি না তো?'

বুড়ো শুণ্ডির অন্য পাশে আগুন-কালো মেয়েটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন। শুনে

আবার সবাই হাসে। যেন হেসেই আছে, কারণ বোঝ বা না বোঝ—কারণ আছে বইকি। অকারণে এত হাসি, কারণের কারণেই। রক্তে যে কারণদেবীর খেলা। অচিনদার কথা শুনে কালো মেয়েটিও হাসে। শব্দ তার অল্পই, শরীর কাঁপে বেশী। চোখে যেন চিকুর হানাহানি, অবিশিা হাসিতে।

বরহমের বউ জবাব দেয়, 'চিনতে লারলি? ই তো মাংরির রে, আমার বিটি।'

'অ।'

বরহম তাড়াতাড়ি ঘাড় দুলিয়ে জানায়, 'হঁয় হঁয় হঁয়।'

অচিনদা জিজ্ঞেস করেন, 'জামাই কোথায়? বিয়ে হয়েছে তো?'

বরহম হাত ছাড়ে বলে, 'সি কুথা যেইয়ে বসে রয়েছে, গোঁসা হয়েছে।'

স্বামী রাগ করে কোথায় গিয়ে বসে আছেন, গিন্নি এখানে রসের কলসি কোলে নিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বসে আসেন। মাটির ভাঁড়ে ঢালছেন, ঢুকুঢুকু খাচ্ছেন। এ সব রীতি বুঝতে যেও না। হেথায় গোঁসা-পীরিতের রঙ্গ-রীতি আলাদা। মাংরির দিকে চেয়ে দেখি একবার। মুখ ফিরিয়ে ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে। দিয়ে বার-কয়েক ঢোক গেলে। গিলতে গিলতে ভাঁড় এগিয়ে দিয়ে বলে, আমাকে টুকুস দে বাবু।'

অচিনদা বলেন, 'দেব দেব। তারপরে আবার মারামারি দাঙ্গা বাধিয়ে দিস না বাপু।'

বলে অচিনদা তাঁর ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একেবারে লেবেল-আঁটা বোতল বের করেন। অমনি কার কার যেন জিবে ঝোল টানার শব্দ বাজে। শুনতে পাই, কে যেন বলে, 'বেলাতি।'

রহস্য এবার একটু একটু পরিষ্কার হয়। আসল উৎসবের উপকরণ তা' হলে এ-ই! এক না, দুই দুই বোতল বেরোয় ঝোলা থেকে। যেন ঝাঁপি থেকে দু'-দুটো কালনাগ ফণা তুলে ওঠে। অবাক হয়ে অচিনদার দিকে তাকাই। অচিনদা বলেন, 'কী হে ভায়া, খুব খারাপ লাগছে তো এবার?'

খারাপ-ভাল বিচারের অবকাশ কোথায়। তার আগে যে মন আর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পথচলার এই সবুর বিহনে এমন বিচিত্র তো আর দেখিনি। বলি, 'খুব অবাক লাগছে।'

'এই সব দেখে তো?'

'এ সবের থেকে আপনাকে দেখেই বেশী।'

'নীতিবাগীশের মত এ কথা ভাবছ না তো, অচিনদার মত লোক টাকা দিয়ে এ লোকগুলোকে অন্য কিছু না দিয়ে এ সব খাওয়াচ্ছে?'

ভাবিনি। ও'র কথা শুনে ভাবতে ইচ্ছা করে। যদি ভাবি, তার মধ্যে নীতিবাগীশতার কথাই বা আসবে কেন। যে কথা উনি বলেন, সে কথাটাই তো আগে মনে আসে। বোতলের মুখ খুলতে খুলতে নিজেই আবার বলেন, 'আমার বন্ধু-বান্ধবরাও দু'-চারজন এরকম বলেন কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

জবাবটা ঠিক আসে না, চুপ করে থাকি। অচিনদা নিজেই একটু হেসে বলেন, 'তা যদি মনে হয় তোমাকে দোষ দেব না ভায়া। শুধু ক্ষমা চাইব।'

অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি বলি, 'না না, ক্ষমা চাইবেন কেন।'

'নিজের এই প্রকৃতির জন্যে। এর চেয়ে ভাল আর হতে পারলাম না। এ সবের ওপরে আর যেতে পারলাম না। সংসারে কিছু কিছু অন্যায় আছে, যেগুলোকে একটু ক্ষমাঘেন্না করে চলতে হয়, সেই রকমই করো। কিন্তু এখন এই যে বছরে একবার আসি, ওদের সঙ্গে একটা রাত্রে খানিকক্ষণ থাকি, তখন আর মেঠাই-মণ্ডার

কথা মনে থাকে না। ওরাও আমার কাছে তা চায় না। একদা এই বাঁশঝাড়ে ওদের কাছে হাতেখড়ি হয়েছিল, এখনো ওদের কাছেই একটা দিনের এক সময়ে এখানে আসি।'...

অচিনদা কথা বলেন, আর তাঁর হিজি-বিজি গোরা মুখের ছাঁদ যেন বদলাতে থাকে। যেন নিজের মধ্যে নিজেই ডুবে যান। সেই রূপকথা বলার স্বপ্ন যেন অন্য রূপে দেখা দেয়। আমার কথা ফুরিয়ে যায়। আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাই।

কথা থামিয়ে অচিনদা বোতল থেকে সবাইকে একটু একটু ঢেলে দেন। সবাই মাটির ভাঁড় এগিয়ে ধরে। এমন কি বুড়ো শুণ্ডি আর বরহমের মেয়ে মাংরিও। অচিনদা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলেন, 'নাও হে, একটা পাত্র নাও।'

অবাক চমকে বলি, 'আমি?'

'নয় কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে?'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বরহম চেঁচিয়ে ওঠে, 'হঁ্য হঁ্য, আজ খেতে হয়। ই কি যে সে দব্য?'

সঙ্গে সঙ্গে মাংরি একটা মাটির ভাঁড় আলগোছে ছুঁড়ে দেয় আমার কোলের ওপর। এ কি বিপদ দেখ হে। বিদেশ-বিভুঁয়ে, অচিন অজানা, খোয়াইয়ের মাঠের ধারে বাঁশঝাড়ে খোয়ার দেখে যাও। যাতে পৃথক ফল না হয় তার জন্যে এখানেই বেতাল বেহুঁশ হয়ে থাক। প্রায় করুণ আর্ত চোখে অচিনদার দিকে তাকাই।

অচিনদা পরম স্নেহে হাসেন। বলেন, 'ভয় লাগছে? আচ্ছা, তা' হলে থাক।'

বলেই হাঁক দেন, 'কইরে, নরোত্তম কোথা গেলি?'

একেবারে পিছন থেকে উদ্বেগ ব্যাকুল গলা যেন কঁকিয়ে ওঠে, 'না না, উটি লারব বাবু। উ আমি খেতে লারব।'

অবাক হয়ে ফিরে দেখি, সত্যি সত্যি যোয়ান ছোঁড়া কালনাগ দেখছে যেন। এ যে দেখি আমার থেকেও এককাঠি সরেস। চোখ জুড়ে ভয়, ঘনঘন হাত নাড়ে। আমি মনে মনে ভাবি, আহা থাক্ না বেচারা। এ সবে অরুচি, ভয়-ডর পায় যখন, থাক।

বুড়ো শুণ্ডি ভুরু কুঁচকে চেয়ে বলে, 'ক্যানে রে, আঁ? তুই না একা বইসে এক লাগাড়ে দু' কলসি খাস?'

নরোত্তম ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'তা হক, উ বেলাতি আমি খেতে লারব, গা ঘুলোয়।'

এবার বোঝ ভয় কোথায়! আমি ভাবি ছেলেমানুষ, ও-সব শেখেটেখে নি। আসলে ও'য়ার বেলাতিতে ভয়। মূলে উনি এক ঠাঁইয়েতেই দু' কলসির খদ্দের! অচিনদা বলেন, "তুমি একেবারে খাঁটি দিশি দেখছি, এতে তোমার গা ঘুলোয়।'

বলেই প্রায় হুমকে ওঠেন, 'নিয়ে আয় একটা পাত্র।'

কাকে বলেন গ! তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় বলে, 'মাইরি বইলছি বাবু, হাত জোড় করে বইলছি, উ আমার হবে না।'

সত্যি প্রায় আতঙ্কে যোয়ানের চোখ ছলছল। এর থেকে আর বেচারি কেউ হয় না। এখন আবার মনে হয়, আহা, থাক না বেচারা। ময়ানের গ্রাস ভাল, তবু কেউটের ছোবল সইবে না। ভাবটা প্রায় সেই রকমেরই। দেখে মনে হয়, আর বেশী বললে দৌড় মারবে। সেটা কোনদিক থেকেই সুবিধার হবে না। অচিনদাও সেটাই অনুমান করেন বোধ হয়। তা' হলে বহুদূরে হাঁটিতে হবে। অতএব, অচিনদার শেষ বক্তব্য, 'ব্যাটা, তোর দ্বারা কিস্সু হবে না। তবে তাড়ি খেয়েই মরো গে।'

এবার নরোত্তমের মুখে একটু স্বস্তির হাসি দেখা দেয়। বড় শান্তি বোধ করছে। অচিনদা একবার আমার দিকে চেয়ে ঠোঁটের কোণে হাসেন।

বুড়ো শুণ্ডি অচিনদাকে বলে, 'তুমি লিলে না?'

'হবে হবে, আমার দ্রব্য তো তুমিই রেখেছ। তোমরা খাও।'

সবাই এক এক চুমুকে রেচকের ঝাঁঝালো কাঁচা পানীয় গলায় ঢেলে দেয়। বরহম চাপা শব্দ করে 'আহ্!' আর শরতের বউ গিলেই মুখে কাপড় চেপে ধরে। সকলেরই বেশ ঝাঁঝ লেগেছে বোঝা যায়। সকলেই একটু-আধটু শব্দ করে, মুখ কোঁচকায়। বুড়ো শুণ্ডি বলে, 'বড় মজার জিনিস।' মাংরি ঘনঘন ঢোক গিলছে, যেন তার মুখ রসে ভেসে যাচ্ছে। এবার রেচকের কাঁচা আরক, বোতলটা তুলে ধরে অচিনদাও গলায় ঢেলে দেন। প্রৌঢ় মানুষটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। কী আশ্চর্য, কোথায় এসে কোথায় বসে কী করেছেন। এখনো এত ধকল সয়?

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলেন, 'রাগ করছ না তো ভায়া?'

জবাব দিতে যাই, তার আগেই বলেন, 'আমার এক বন্ধু বলে, "অচিন, বছরে একবার আস, তা তোমার এ সব সাঙ্গ-পাঙ্গদের একদিন বেশ করে মাংস-ভাত খাইয়ে দিলেই পার। এ সব কেন?"

কথা শুনতে খুব ভাল, কিন্তু কী জবাব দেব বুঝতে পারি না। যেন বলতে চায়, "ভাল করতে পারি না মন্দ করতে পারি, কী দিবি তা দে।" সেটাই আমার কলঙ্ক। ওদের সারা বছরের একটা দিনের কয়েক ঘণ্টায় কী মন্দ করতে পারি। বাড়ি-ঘরদোর পুজো-পার্বণের ব্যাপার নয় যে বসিয়ে খাওয়াব। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে যাওয়া। তা এদের সঙ্গে তো ব্রিজ খেলে কফি খেয়ে আড্ডা দেবার অর্থ হয় না। যার যাতে মৌজ, তা' ছাড়া নিজের কথাটাই মনে রাখতে হবে তো। যেমন, রামকেষ্ট ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন, "বাবা, যা খাচ্ছ তারই ঢেকুর তুলছ?" তার মানে বঙ্কিমচন্দ্রের খাবারে গরহজম। যা ভাবেন তাই ওগরান। আমার রামকেষ্ট বন্ধুদেরও সেই কথাই বলি, "আমি যা, আমি তা-ই। নিজেকে আর হজম করতে পারলাম কই।" সত্যি, আপন নিয়ে এমনভাবে কাল কেটে গেল। পরের কথা আর ভাবতে পারলাম না।'...

অন্য দিকে বরহমরা হাত বাড়ায়, 'দে বাবু।'

'হ্যাঁ, এই যে।'

বলে অচিনদা আবার জনে জনে ঢেলে দেন। আমি দেখি হিজিবিজি গোরা মুখে সেই স্বপ্নের ভর। তবে, কেবল যেন রূপকথার না। এই স্বপ্নের ঘোরে যেন কী এক সুর বেজে যায়। সবাইকে দিয়ে আবার নিজের গলায় ঢালেন। তারপরে বলেন, 'বিভূতি বাঁড়ুজ্জের আরণ্যক পড়েছ?'

'পড়েছি।'

তা' হলে জান, এক জায়গায় লেখক আক্ষেপ করছেন, নিবিড় অরণ্য কেটে সেখানে কয়েক বিঘা ফসল বোনা দেখে। বলতে চেয়েছেন, এই অরণ্যের শরীর কেটে এই ফসলটুকু না ফলালে মানুষের এমন কী ক্ষতি হত। প্রথম যখন পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম আনসায়েন্টিফিক। খুবই অবৈজ্ঞানিক উক্তি। এখন কিন্তু ভাবি, প্রেমে কী না হয়। অরণ্যে যাঁর প্রেম, তিনি তো ওরকমই বলবেন। আমারও সেই রকম, আমি যে এমনি করে বসে এই আসর ভালবাসি।'...

বলতে বলতে থেমে আবার সকলের শূন্য পাত্রে ঢেলে দেন। যাদের দেন তারা এখন নিজেদের মধ্যে নানা কথায় নানান হাসিতে ব্যস্ত। বোঝা যায়, তাদের রক্তে নতুন জোয়ার লাগে। অচিনদা আবার আমাকে কী যেন বলতে যান। তার আগেই বরহম হেঁকে ওঠে, 'অই, তু খেলি না?'

অচিনদাকে বলে। সেদিকে ঠিক নজর আছে। অচিনদাও ঢালেন। তারপরে বলেন, 'সেবার সেই শেষ বছরের পরীক্ষা সামনে। এই বাঁশঝাড় দূরে থেকে দেখেছি। বরহমদের চিনতাম, ওদের যাতায়াত করতে দেখেছি। কেন, তাও জানতাম। আর পানের ব্যাপারটা যে নিজেদের কারুর মধ্যে তখন দেখি নি তা নয়। আমরা তখন বিদ্যাভবনের ছাত্র, কিছু পালক-টালক গজিয়েছে—অর্থাৎ তোমরা যাকে এম-এ ক্লাসের ছাত্র বল, সেই রকম বয়স। পরীক্ষার শেষ বছরেই হঠাৎ একদিন বিকেলবেলায় এই বাঁশঝাড়ে এসে উঠেছিলাম। পান করতে নয়, তার জন্যে এখানে আসার দরকার ছিল না। সেদিন একটা নিশির ঘোর আমার। অনুভূতিগুলো যেন সব মরে গেছে। আশ্রম থেকে কখন হাঁটতে হাঁটতে কোপাইয়ের ধারে চলে গেছি, নিজেরও যেন সাড় ছিল না। শরৎকাল এসে গেছে। খোয়াইয়ের এখানে ওখানে কোপাইয়ের ধারে ধারে কাশের দোলানি। কোপাইয়ে তখনো জল কম না। কিন্তু সে সব চেয়ে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। খালি পায়ে চলাফেরা করা অভ্যাস ছিল আমাদের, খালি পায়েই বেরিয়েছিলাম। ঠিক কী বললে তোমাকে বোঝাতে পারি জানি না। বোধ হয় অনেকটা সাপের কামড়ের মত, বিষে অচৈতন্য।'

বলে একটু হাসেন। আবার বলেন, 'অবিশ্যি সাপের কামড় কোনদিন খাই নি, তা-ই জানি না। ওটা উপমা, তবে কামড় একটা খেয়েছিলাম।'...

বলতে বলতে আবার ঢেলে দেন। কখন দ্বিতীয় বোতল খোলা হয়ে যায় টের পাই না। বরহমদের অস্থিরতা বাড়ে। ইতিমধ্যে কখন আরো দুটি জোড়া এসে ভিড়েছে। বোধ হয় কলসি আর ভাঁড় নিয়ে জুটি জুটি বসেছিল কোল আঁধারে। সকলেরই কেমন যেন এক দোলা চঞ্চলতা। গলার স্বর চড়ে। তার মধ্যেই একটি মেয়ে-গলার গুনগুনানি শোনা যায়।

অচিনদা নিজের গলায় ঢেলে বলেন, 'সেখান থেকে ফিরে হাঁটতে হাঁটতে কখন এই বাঁশঝাড়ে এসে উঠেছিলাম। তখন এই বরহম ওর বউকে নিয়ে এখানে বসেছিল। আমাকে দেখে হাত ধরে বসালো। ওদের সঙ্গে খেতে লাগলাম, যেন কোন জ্ঞান নেই। ওই যে বললাম বিষে অচৈতন্য, সেই রকম। জীবনে যা ভাবিনি কোনদিন, তাই করলাম। তারপরে সেই রাত্রে আর বাঁশঝাড় থেকে ফেরা হয় নি। আসলে বিষের পুরিয়াটা ছিল বুকেই—মানে বুক-পকেটে।'

বলে আমার ঘোর-লাগা কৌতূহলিত অবাক মুখের দিকে চেয়ে হাসেন। মনে হয় ওঁর চোখ দুটো দেখতে পাই না। কোথায় যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কেবল অন্ধকারে ক্ষীণ স্রোতরেখার মত কী যেন দেখা যায়। মুখটা একটু এগিয়ে নিয়ে এসে বলেন, 'তোমাকে একটা বস্তাপচা গল্প শোনাব, শুনবে?'

আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলি, 'শুনব।'

(ক্রমশ)

ক্যানাডা কনফেডারেশনের একশো' বছরের ইতিহাসে ক্যুবেক তথা ফরাসী ক্যানেডিয়ানগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রাম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাম্প্রতিক কালে এই সংগ্রামের স্বরূপ যে স্পষ্ট আকার নিয়েছে তা এক দিকে যেমন এই কনফেডারেশনের উগ্র ইংরেজ-চরিত্র ও ক্যুবেকের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক পরাধীনতাকে স্পষ্টগ্রাহ্য করে, অন্য দিকে তেমন ফরাসী ক্যানেডিয়ানদের আত্মসম্মান ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার আপোসহীন মনোভাবকে সূচিত করে। সত্যি বলতে, ক্যুবেক ও অটাওয়ার মধ্যে একটা চরম সংঘর্ষের সম্ভাবনা ক্যানাডা কনফেডারেশনের বর্তমান কাঠামোর ভবিষ্যৎ ক্রমশই অনিশ্চিত করে তুলছে।

ফরাসী-ভাষী ক্যানেডিয়ানদের সম্পর্কে এদেশে সরকারী ও বেসরকারী মহলে যে বিমাতৃসুলভ মনোভাব প্রকট, তার প্রভাবে ক্যুবেকের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বহুকাল ধরেই বিশেষভাবে সংকুচিত ও বিড়ম্বিত। শিক্ষা ও চাকরির সীমিত সুযোগ, নানাবিধ নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধা, এবং ফরাসী-ভাষীর ভাষা, সংস্কৃতি ও সামগ্রিক জীবনে ইংরেজ-ক্যানাডার অবিরাম বাহুবিস্তার ও আধিপত্য স্বভাবতই ফরাসী ভাষাগোষ্ঠীকে উত্তরোত্তর ক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু করে তুলেছে। ফরাসীদের সম্পর্কে ইংরেজ-ক্যানাডার এই বিভেদমূলক মনোভাব ও আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ ক্যুবেকে গত কয়েক বছর ধরে একাধিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভূমিকা ক্রমশই স্পষ্টলক্ষ্য। শুধুমাত্র কনফেডারেশনের মধ্যে থেকে ন্যায়-সঙ্গত ও সংবিধানসম্মত অধিকার অর্জনের প্রয়াসেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ নয়। এই আন্দোলনের একটা ক্রমবর্ধমান অংশ ক্যানাডা কনফেডারেশন থেকে ক্যুবেকের সর্বাঙ্গীণ বিচ্ছেদ ও ফরাষী-ভাষীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। RIN (Rassemblement pour l' Independence Nationale) এই বিচ্ছেদকামী আন্দোলনের প্রধানতম প্রবক্তা।

মাস-দুয়েক আগে ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গল এক্সপো উপলক্ষে ক্যানাডা সরকারের আমন্ত্রণে ক্যুবেকে পদার্পণ করেই মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছিলেন। 'Vive la Quebec libre' ('স্বাধীন ক্যুবেক দীর্ঘজীবী হোক') এই বাণী উচ্চারণ করে তিনি ইংরেজ-ক্যানাডার মানসিক শান্তি প্রবলভাবে বিঘ্নিত করেন এবং দ্য গলের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যে অভূতপূর্ব বিরোধী প্রতিক্রিয়া উচ্চকিত হয়ে ওঠে সে উত্তেজনার রেশ আজও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি। ক্যুবেকের জাতীয়তাবোধ, বলাই বাহুল্য, মাতৃভূমি ফ্রান্সের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান একাত্মবোধের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। উপরন্তু, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পশ্চিমী অনুচরদের বিরুদ্ধে 'একা কুম্ভ' দ্য গলের উদ্ধত বিরোধিতা ফরাসী যুবসমাজের কাছ থেকে বিশেষ সম্ভ্রম ও প্রীতি অর্জনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। সব মিলিয়ে, দ্য গল ফরাসী ক্যানেডিয়ানদের বর্তমান স্বাজাত্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অতি অর্থপূর্ণ প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। ফলত, সমগ্র ক্যুবেক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, প্রীতি ও আবেগের সঙ্গে দ্য গলকে অভ্যর্থনা জানায়। দ্য গলও ক্যুবেকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা জ্ঞাপন করে স্বাধীন ক্যুবেকের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎগতিতে ক্যানাডার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ইংরেজদের প্রবল প্রতিবাদ ও বিরাগ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে দ্য গলের উক্তির সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা ও তিক্ত সমালোচনা ছাড়া আর সবকিছু গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিবাদপত্র, টেলিগ্রাম, স্বাক্ষরসংগ্রহ, বিভিন্ন নাগরিক সংস্থার পক্ষ থেকে কৈফিয়ত দাবি ইত্যাদিতে ক্যানাডা সরকারও ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 'স্বাধীন ক্যুবেক' বলতে দ্য গল ক্যুবেকের বিচ্ছেদকামী আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন, নাকি ক্যুবেকের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের দাবিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, এই চুলচেরা বিতর্কে আকাশ-বাতাস আলোড়িত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনৈতিক ভব্যতা ও সরকারী আচরণবিধির মাপ-কাঠিতে অতিথি দ্য গলের এবংবিধ আচরণ যে শালীনতার বাইরে অশুদ্ধ করে এই আহত বোধকে কেন্দ্র করে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী মহলে হুলস্থূল শুরু হয়। ইতিমধ্যে যদিও এই নাটকীয় উত্তেজনা, অনিশ্চিতি ও ডামাডোলের মধ্যে দ্য গল তাঁর সরকারী ভ্রমণসূচী হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে এবং প্রধানমন্ত্রী পিয়ারসনের সঙ্গে আয়োজিত সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে ক্যানাডা পরিত্যাগ করেন, এদেশের রুদ্ধ, তিক্ত, আন্দোলিত আবহাওয়া বিশেষ প্রশমিত হয় না—এমন কি, এখনও তার জের চলেছে।

অথচ ক্যানাডা কনফেডারেশনের শত-বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইংরেজ-ক্যানাডার গর্ব ও উল্লাসে ক্যুবেক যে সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক এবং ক্যুবেকের স্বাতন্ত্র্যবোধ যে ইংরেজদের স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না—এই বাস্তব উপলব্ধিকে এড়িয়ে থাকা ইংরেজ-ক্যানাডার পক্ষে আজ আর সম্ভব নয়। ১৯৬৭ সালে কনফেডারেশনের শত-বার্ষিকী পালনের উচ্চকিত উৎসাহে ইংরেজ-ক্যানাডা ১৮৬৭ সালে কনফেডা-রেশনের পত্তন ও তার পরবর্তী ইতিহাস মনে রাখতে রাজি নয়। কিন্তু ফরাসী-ভাষী ক্যুবেক আজ শুধু এই ইতিহাস সম্পর্কে নিজেই সম্পূর্ণ সচেতন নয়, ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের ভিত্তিতে তা আজ সমগ্র ক্যানাডার মনোযোগ দাবি করছে। কনফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা জন ম্যাক-ডোনাল্ড, আলেকজান্ডার গল্ট, জর্জ ব্রাউন প্রমুখ যে-সব 'পুণ্য-নাম' নিয়ে ইংরেজ-ক্যানাডা ভক্তি-গদগদ, তাঁদের স্বার্থপর,

অর্থশক্তি ও উৎপাদিকাশক্তিকে নতুন করে পর্যালোচিত হওয়ার প্রয়োজন আজ বিশেষভাবে অনুভূত। ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এই ধনিক-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং ইংরেজ ধনতান্ত্রিকগোষ্ঠীর সাগ্রহ সহযোগিতায় এঁরা কনফেডারেশনকে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিবৃদ্ধির উপায় হিসেবে ধারণা করেছিলেন। সত্যি বলতে, কনফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা ক্যানাডাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেনি। কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার পঁয়ষট্টি বছর পরে 'স্ট্যাটিউট অফ ওয়েস্টমিনিস্টার' গৃহীত হওয়া পর্যন্ত ক্যানাডার কোনো স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয়নি। তার আগে বৈদেশিক নীতি বিষয়েও সরকারীভাবে ক্যানাডার কোনো স্বাধীনতা ছিল না। এমন কি, আজও ক্যানাডার শাসনতন্ত্র সরকারীভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আয়ত্তাধীন। (বেসরকারীভাবে অবশ্য ক্যানাডার বৈদেশিক নীতি যে ওয়াশিংটনে স্থিরীকৃত হয়, অটাওয়ার পক্ষে এ অভিযোগ খণ্ডন করার কোনো উপায় নেই; প্রধানমন্ত্রী পিয়ারসনের বক্তৃতাবলীতে তাই এই অবস্থার পরোক্ষ স্বীকৃতি দুর্লক্ষ্য নয়)।

এদেশের নাগরিকদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে ক্যানেডিয়ানরা আজ গর্বিত, তা-ও কনফেডারেশনের স্বতস্ফূর্ত উপঢৌকন নয়। কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই উইলিয়াম লিয়ন ম্যাকেঞ্জির নেতৃত্বে কলোনিয়াল শাসকগোষ্ঠী (যা 'ফ্যামিলি কমপ্যাক্ট' এবং 'শ্যাটো ক্লিক' হিসেবে পরিচিত ছিল) ও তাদের পৃষ্ঠপোষক ধনী ভূমিপতি ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ফরাসী-ক্যানাডাতেও লুই জোসেফ পাপিনোর নেতৃত্বে চাষী ও ক্ষুদ্র-পণ্যবিক্রেতা সম্প্রদায় ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কতিপয় শোষক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই ইতস্তত বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হলেও এ-দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের প্রয়াসে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়, গণতন্ত্র নয়, ক্যানাডার জাতীয় স্বরূপের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন নয়, কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ভিত্তি মূলত ক্যানেডিয়ান ধনতান্ত্রিকগোষ্ঠীর পুঁজি-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ব্রিটিশ কলোনিয়াল শক্তির সহযোগিতায় তাঁরা এক দিকে ক্যানাডার প্রেয়ারি ভূমি ও পশ্চিম উপকূলের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ করায়ত্ত করতে ব্যাকুল ছিলেন এবং অন্য দিকে এই সম্পদ যাতে শক্তিমান প্রতিবেশী যুক্তরাষ্ট্রের লোভের শিকার না হয়, সে সম্পর্কে যথা-কর্তব্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রায় একটা অর্ধ-মহাদেশ যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত তখন কোনো মূল্যই অতিরিক্ত নয়; সুতরাং ক্যানাডার এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করার ও আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ পূর্ণতর করে সম্ভাব্য মার্কিন অনুপ্রবেশের বিপক্ষে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার মহদুদ্দেশ্যে বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ ট্রেন্স-কন্টিনেন্টাল রেলরোডের সূত্রপাত। এই সূত্রে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি বিশেষ প্রাসঙ্গিক :

"Intercolonial railways were the necessary physical basis of Confederation; but at the same time, Confederation appeared to be the necessary political basis for intercontinental railways.... Railways were not mere adjuncts to Confederation, they were of its essence." (British North America at Confederation, a study of the Royal Commission on Dominion-Provincial Relations.)

কীভাবে উৎকোচ, পারস্পরিক পৃষ্ঠ-পোষকতা, জনসাধারণের অর্থশোষণ, মাত্রাধিক্য লাভ ইত্যাদি ঘৃণ্য উপায়ের গণনাতীত উদাহরণ এই রেলওয়ের পত্তন ও সম্প্রসারণের দীর্ঘ ইতিহাস কালিমালিপ্ত তা আজ আর চেষ্টা করেও গোপন রাখা সম্ভব নয়। সে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে বরং ব্রিটিশ-ক্যানেডিয়ান ধনতান্ত্রিকগোষ্ঠীর পুঁজি নিয়োগ ও সম্প্রসারণের উপায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরেকটি উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করা যাক। ফরাসী-ক্যানেডিয়ান-গোষ্ঠীকে পদানত করার সুযোগ গ্রহণও কনফেডারেশন-পিতাদের অভিসন্ধির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাপিনোর নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ প্রায় সূত্রপাতেই ব্রিটিশ কলোনিয়াল শক্তির হিংস্র আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছিল সে বিদ্রোহের সূত্রসন্ধান করার জন্য অব্যবহিতকাল পরেই লর্ড ডানহামকে কলোনি-পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়। তিনি কলোনির বিচ্ছিন্ন প্রদেশসমূহকে একত্রিভূত করে বৃহত্তর ইংরেজ আধিপত্য বিস্তার করার এবং ক্যুবেকের স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পরামর্শ দিলেন। তাঁর মতে :

"I have little doubt that the French, when once placed .... in a minority, would abandon their vain hopes of nationality."

ক্যুবেক অধিবেশনে সংবিধান গৃহীত হবার পরেই কনফেডারেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ব্রাউনের লেখা চিঠির অংশও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"....Constitution adopted — a most creditable document—a complete reform of all the abuses and injustices we have complained of!! Is it not wonderful! French Canadianism entirely extinguished!"

কিন্তু জর্জ ব্রাউনের উল্লাস ও দিবাস্বপ্ন সার্থক হতে দিতে ক্যুবেকবাসী রাজি নয়। কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার কালে যা অস্বীকৃত ছিল, বর্তমানে ক্যুবেক-তথা-ফরাসী ক্যানেডিয়ানদের সেই সমানাধিকার বিশদ ধারা ও উপধারার মাধ্যমে সংবিধানস্বীকৃত হলেও, বস্তুত ভাষা, সংস্কৃতি ও কর্মক্ষেত্রে ফরাসীরা আজও সম্পূর্ণভাবে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যের শিকার। এক দিকে ইংরেজ প্রভুত্ব ও অন্য দিকে মার্কিন অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ক্রমসম্প্রসারণের ফলে চাকরি-জীবী ক্যুবেকবাসী শুধু ইংরিজী শিখতেই বাধ্য নয়, তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনও আজ 'হট্ ডগ্-কোকা কোলা' সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশে বিশেষভাবে পীড়িত। ক্যানেডিয়ান ধনতন্ত্রের প্রধান নির্ভর, যেহেতু আজ ব্রিটেন নয়, যুক্তরাষ্ট্র, এবং রাষ্ট্র হিসেবে যেহেতু ক্যানাডা আজ যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার মাত্র, সেহেতু মার্কিন অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ক্যুবেকবাসীর জেহাদ যে প্রবল হবে এটা খুবই প্রত্যাশিত। উপরন্তু, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ফ্রান্সে মার্ক্সীয় ভাবধারার যে ক্রমপ্রসার বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিবাদীগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করেছে, তার প্রভাব ক্যুবেকের ফরাসী-ভাষী সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশকে বিশেষত যুবসমাজকে, স্পষ্টত চিহ্নিত করে। অর্থাৎ শুধুমাত্র স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নয়, ক্যুবেকের নবজাগরণ আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সমাজতান্ত্রিক স্বরূপ অর্জনে আগ্রহী। ক্যুবেক শুধু স্বাধীন হতেই চায় না, সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও ওই আন্দোলনের একটা বৃহৎ অংশের উদ্দেশ্য ও দাবির অন্তর্ভুক্ত।

সংবিধান পরিবর্তনের ভিত্তিতে ক্যানাডা কনফেডারেশনের মধ্যে থেকেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা, সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে কোনো এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা, অথবা কনফেডারেশন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজতান্ত্রিক ক্যুবেক রাষ্ট্রগঠন—শেষ পর্যন্ত ক্যুবেকের বহুমুখী আন্দোলন মুখ্যত কোন্ দিকে ঝুঁকবে বলা মুশকিল, কিন্তু ক্যুবেকে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্বের ভিত্তিমূলে ফরাসী-ক্যানেডিয়ানরা আজ যে প্রবল নাড়া দিতে শুরু করেছে তার ফলাফল যে সুদূরপ্রসারী হবে, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

—সত্রাজিৎ দত্ত

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পঁচিশ

শুধু একজন মানুষের সঙ্গেই সামনা-সামনি যুদ্ধ করতে চেয়েছিল শিবনাথ, যার আসন তার চেয়ে অনেক নিচে—যে তার শত্রুর মতন। তাকে পরাস্ত করে শিবনাথ একমাত্র যমুনার কাছেই কথা রাখতে চেয়েছিল, এবং নিজের বুদ্ধি ও শক্তিরও প্রমাণ দিতে চেয়েছিল। কেননা শেষ যেদিন যমুনার তাঁবুর বাইরে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে, সেদিন যমুনার অবিশ্বাস ও অসন্তোষ তাকে বড় পীড়া দিচ্ছিল। তার কথা রূঢ়, শাসনের মতন। সেসব নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল শিবনাথকে, সেদিন তাকে আশ্বাসের একটি কথাও বলতে পারেনি সে।

কিন্তু শিবনাথ জানত সুযোগ হবে, সময় আসবে। যমুনাকে যা কথা দিয়েছিল শিবনাথ সে তা একদিন রাখবেই। তার পথ সুগম হয়ে আসছিল। হারকু সাহেবের মিথ্যা কথার জন্যে শিবনাথের ওপর প্রথম প্রথম কিছু অসন্তুষ্ট হলেও রঘুনাথ তাকে আবার আগের মতন বিশেষ মান-মর্যাদা দিচ্ছিল এবং শিবনাথের বিশ্বাস হচ্ছিল সে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যমুনার সঙ্গে তার মধুর সম্পর্কের দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে পারবে। হারকু সাহেব আসলে যা, তা আর একবার নতুন করে রঘুনাথকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল শিবনাথ।

যেদিন যশোদা জিলুয়ায় ফিরে গেল এবং রঘুনাথকে স্পষ্ট করে তার সঙ্গে যমুনার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করতে পেরেছিল শিবনাথ, সেদিন তার ইচ্ছে ছিল সাহস করে যমুনার তাঁবুতে যাবে, রাধানাথবাবুর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করবে এবং সময় মতন মোহনলালের নাম করে হাসির সঙ্গে হালকা রসিকতা করার চেষ্টাও করবে। এ কদিনের দূরত্ব ও ভুল বোঝাবুঝি কয়েক মুহূর্তেই মিটিয়ে ফেলবে শিবনাথ।

কিন্তু তার বাসনা চরিতার্থ হল না। হারকু সাহেবের সঙ্গে যমুনা ও রাধানাথবাবুকে রঘুনাথের তাঁবুতে আসতে দেখে প্রথমে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল শিবনাথ এবং সতর্ক প্রহরীর মতন তাদের রক্ষা করতে চেয়েছিল বলে সেখান থেকে উঠে যেতে পারে নি। রঘুনাথকে সেদিন কিছু আগে সে তার বিয়ের কথা জানিয়েছিল এবং হারকু সাহেবকেও বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যে এরা তার খুব কাছের মানুষ।

পরে বিমূঢ় হয়ে গেল শিবনাথ। রাধানাথবাবুর ব্যবহার বড় অদ্ভুত, রহস্যের মতন। যমুনাও যেন অনেক দূরের, বড় অচেনা। তার দৃষ্টিতে কিম্বা ভঙ্গিতে পূর্ব পরিচয়ের কোন ইঙ্গিত ছিল না। যে মানুষের কার-

লাজিতে এমন ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল সে-ও ছিল শিবনাথের ঠিক সামনেই। তার দিকে তাকিয়ে একটা অন্ধ আক্রোশ শিবনাথের মনে ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। কিন্তু দৈব এমনই প্রতিকূল সে সব দুবলেও শত্রুকে লক্ষ করে একটা কড়া কথাও উচ্চারণ করবার সুযোগ হল না শিবনাথের—সবই নিক্ষিপ্ত হল যারা তার আপনার জন তাদেরই উদ্দেশে। সে সম্পর্ক যে আবার সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে তুলতে চেয়েছিল তা আরও তিক্ত ও জটিল হয়ে উঠল।

রঘুনাথের সামনেই বড় উগ্র হয়ে উঠেছিল শিবনাথ—সকলকে শাসিয়ে এসেছিল। এবং কয়েকদিন যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের মতন একটা অস্থিরতার মধ্যে হিমসিম খেতে খেতে সে বুঝল তার করবার কিছুই নেই। তার কথা তার নিজের কাছেই প্রলাপের মতন মনে হল। এখন ঘোলা জল অনেকটা উপচে উঠেছে, তা পার হয়ে যমুনার কাছে আবার পৌঁছনো বড় কঠিন।

কিন্তু তার কাছে আর ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল না শিবনাথের। সব শেষ হয়ে গেছে। যা খুশী তা করুক যমুনা, যার কাছে খুশী

তার কাছে যাক। শিবনাথের আর কোন রাগ নেই, কোন আকর্ষণ নেই। আস্তে আস্তে রাগ নিবে এল শিবনাথের, অস্থিরতাও প্রশমিত হয়ে এল। রঘুনাথের কাছে তার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছে বলে বড় লজ্জা পেল সে এবং তা গোপন করবার জন্যে সকলের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল।

শিবনাথের মনে হল সে-ও এতদিন নিজেকে অসম্মান করেছে, তার শত্রুর মতন হীন কাজ করে অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। সার্কাসের গুরুভার বহন করে মেয়েমানুষের হাতের পুতুল হয়ে ওঠবার জন্যে সে আসে নি এখানে। সে এসেছে শক্তিচর্চা করতে, সাধনা করতে—সে এসেছে তার দুরূহ ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে একটা সার্কাস পার্টিকে বড় করে তোলবার জন্যে—ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নিয়ে বিভোর ও বিব্রত হয়ে থাকতে নয়। এতদিন ভাবনায়-ভাবনায় তার শক্তির ক্ষয় হয়েছে, ব্যাঘাত হয়েছে শরীরচর্চায়, সাধনায় বিঘ্ন ঘটেছে। নিজেকে ধিক্কার দিল শিবনাথ, অনুতাপ করল। তার জগদ্বিখ্যাত হওয়ার যে-স্বপ্ন সার্কাসের ভিতরের পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল, তা আবার তুলে আনল শিবনাথ এবং একনিষ্ঠ আবেগে প্রথম জীবনের মতন আবার মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করল দুরূহ ক্রীড়াসাধনে।

"নোয়েল সাহেব, কাগজ দিন—"

"কী লিখবেন শিববাবু, চিঠি ?"

"না", দৃঢ় গলায় শিবনাথ প্রোগ্রাম মাস্টার রেজাক খানের তাঁবুর মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল, "চিঠি-ফিঠি লেখবার সময় আমার নেই। দুটো-একটা নম্বর করতে দেবেন না আমাকে। আমি প্রত্যেক খেলায় চারটে নম্বর করব। আমি দাঁত দিয়ে বোঁঞ্চ তুলব, ঘোড়া তুলব। ওয়েট লিফটিং করব, হাতিও বুকে তুলব। এসব নম্বরের কথা লিখুন, আমি সই করে দিচ্ছি।"

কোন কারণে শিবনাথ খুব উত্তেজিত হয়েছে মনে করে কৌতূহল প্রকাশ করল প্রোগ্রাম মাস্টার, "কী হল শিববাবু, এত রাগ হল কেন ?"

শিবনাথ হেসে বলল, "রাগ হবে কেন ? ফাঁকি দিলাম না অনেক দিন ? খেলায় বেশী করে মন না দিলে একদম গাড্ডায় পড়ে যাব নোয়েল সাহেব। শক্তি কমে যাবে, খেলা পড়ে যাবে। তাই আগে থেকেই সাবধান হতে চাই।"

"বাঃ বাঃ, শিববাবু ! এমন মেজাজ থাকলে আপনি বহুৎ দিন ফিট থাকবেন—দুনিয়া-জোড়া নাম হবে আপনার।"

"তাই তো চাই নোয়েল সাহেব।"

খেলার মধ্যে ডুবে গেল শিবনাথ। দর্শকের দিকে তাকায় না, হাততালির শব্দ শুনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না। এমনকি, তার খেলার সময় গোপাল আর করালীকান্ত যখন তার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে আসে, তখনো হাসে না সে—ধাক্কা মেরে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়।

নিজের শক্তি ও প্রতিভায় আবার অগাধ আস্থাবান হয়ে উঠলেও এখনো এক এক সময় হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে যায় শিবনাথ, ভিতরে ভিতরে পরাজয়ের একটা জ্বালা অনুভব করে। অসংখ্য মানুষ তার শক্তির পরিচয় পেয়ে চমকে যাক, মুগ্ধ হোক—যমুনার কাছে সে ভীরু এবং দুর্বল হয়েই থাকল, শক্তির কোন পরিচয় সে তাকে দিতে পারল না।

আজকাল রাতে আর বাইরে যায় হয় না রাধানাথবাবু, হারকুসাহেব রোজই তাকে তার তাঁবুতে ডেকে নিয়ে যায় এবং সে-ই তাকে ধরে ধরে পৌঁছে দেয় হাসি আর যমুনার কাছে। জোর করে অন্য দিকে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেও তখন বড় দুর্বল হয়ে পড়ে শিবনাথ। কেননা হারকু সাহেব অনেক সময় বসে থাকে বেহুঁশ রাধানাথ বাবুর তাঁবুতে। শিবনাথ ধরে নেয় সে তখন তার মতন পাশে বসে যমুনার, তার সঙ্গে গল্প করে, গায়ে হাত দেয়। এসব ভাবতে ভাবতে শিবনাথের জগদ্বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্ন আবার ঝাপসা হতে থাকে, একটা যন্ত্রণায় গভীর রাতে আবার সে বড় অস্থির হয়। হারকুসাহেবের পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে কান পেতে থাকে শিবনাথ। সে যমুনার তাঁবু থেকে বার হবে কখন।

ইংরেজী মাসের প্রথমেই এবার গেল পূর্ণিমা। দু-একদিন আগে রঘুনাথ গেছে শিলংয়ে। হারকুসাহেবও কাল রাতে বেরিয়ে গেছে। এখনো ফেরে নি। মাঝে মাঝে সে অল্প সময়ের জন্যে বাইরে যায়। কোথায় যায় কেউ খবর রাখে না।

দোলের দিন দুপুরের খেলা বন্ধ। মালিক কিংবা জেনারেল ম্যানেজার দুজনেই ছিল না বলে সকলে একটু বেশী ফূর্তি করছিল। একটা বড় পিচকিরি কিনেছে বামন ক্লাউন গোপাল, বালতিতে রং গুলে সে বেলা আর শান্তার পিছনে ছুটছিল। কে বেগুনি কালির বড় ছাপ মেরে দিয়েছে গোপালের পিছনে। লেখা আছে, গাধা।

বাঘ-সিংহর খাঁচায় আবীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল নবীন। সে নতুন রিং মাস্টার এখন। জন্তু-জানোয়ারের গায়ে রং না দিয়ে থাকতে পারবে কেন। হাতির চোখ বাঁচিয়ে তাকেও আবীর মাখিয়ে লাল করে দিয়েছে নবীন। ভাল্লুকের সাদা কপালেও আবীরের ছিটে পড়েছে। ঘোড়ার গায়েও লাল আভা।

"এই গোপালবাবু, কী করলেন ?" চোখ রগড়াতে রগড়াতে শান্তা বলল, "একটাই শাড়ি যে আমার, তা-ও ভিজিয়ে দিলেন ?"

"দেব না ? বাগে পেয়েছি আজ—" বালতিতে পিচকিরি ডুবিয়ে গোপাল বলল "শাড়ি ভিজেছে তো কী হয়েছে, খুলে

কেন না মাইরি, ভাল করে দেখ তোমার—"

"যাঃ, ভারী অসভ্য আপনি!"

টুনি মাসী গোপালের কথা শুনতে পেয়েছিল, মুখ ফিরিয়ে হাসল। তাকে লক্ষ করে পিচকিরি তুলেছিল গোপাল, টুনি মাসী হাত তুলে বলল, "আরে থাম থাম গোপাল, আমাকে ভিজিয়ে আর কী করবে?"

"ছুঁড়িদের ভিজিয়ে দিয়েছি টুনি মাসী।"

"তা বেশ করেছ, এবার ধর না একটাকে। একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চুমু খাও—"

গোপাল টুনি মাসীর কথা শুনে একটা সলজ্জ ভঙ্গি করে বলল, "ধোৎ!"

"কেন, বামন বলে কি যৌবন নেই তোমার?"

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে গোপালকে দেখতে দেখতে ফিক ফিক করে হাসছিল বেলা আর শান্তা। তাদের দিকে তাকিয়ে বড় করুণ স্বরে গোপাল বলল, "যৌবনের প্রমাণ দেয়ার মেয়ে পাই না টুনি মাসী, বামন বলে কেউ কাছে আসে না। দূরে দাঁড়িয়ে হাসে, টিটকিরি দেয়—ওই দেখনা।"

"এই বেলা, এই শান্তা—চুপ—" তাদের ধমক দিয়ে টুনি মাসী রং-এর বালতি উপুড় করে দিল গোপালের মাথায়।

"এই এই এই, হাক থুঃ—" বালতি আর পিচকিরি ফেলে রেখে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল গোপাল।

তাঁবু থেকে বার হয় নি শিবনাথ। তার কাছে রং নেই, পিচকিরি নেই। তার পায়ের কাছে লোহার দুটো বড় বড় বল, বারবেল ছোট বড় থালার মতন লোহার কয়েকটা প্লেট। শিবনাথ নিচু হয়ে কখনো লোহার বল, কখনো এক-একটি প্লেট পরীক্ষা করে দেখছিল। এবং এক-একবার বাইরে তাকাচ্ছিল। সকাল হলেও এর মধ্যে রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে। হাওয়া গরম। শিবনাথের ঘাম হচ্ছিল। তার হাতের কাছে রুমাল ছিল না, মাঝে মাঝে সে ধুতির একাংশ তুলে ধরে কপাল ও গলায় বুলিয়ে নিচ্ছিল।

প্রত্যেক বছর দোলের দিন শিবনাথের উৎসাহ থাকে সবচেয়ে বেশী। কাউকেই ছাড়ে না সে। প্রত্যেককে তাঁবু থেকে টেনে-টেনে বের করে রং দেয়। গত বছর মোটিয়া-বুরুজে হাতির পিঠে চড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল শিবনাথ, আবীর ছড়াতে ছড়াতে ঘুরে বেড়িয়েছিল এদিক-সেদিক। মিছিলের মতন লোক যাচ্ছিল তার সঙ্গে সঙ্গে। ফিরে আসার পর তার কিম্ভূত চেহারা দেখে খুব হেসেছিল যমুনা। তার মুখের কাছে মিষ্টি তুলে ধরে বলেছিল, "আপনাকে আর চেনাই যায় না যে শিববাবু!"

"তোমাকেই কি চেনা যায়—" যমুনার সিঁথিতে লাল আবীর সিঁদুরের দাগের মতন মনে হয়েছিল শিবনাথের, সে তা দেখতে দেখতে বলেছিল, "একেবারে বউ সেজেছ যে!"

"যাঃ!"

"দেখনা আয়নায়, মনে হচ্ছে যেন সিঁদুর দিয়েছ!"

শিবনাথের সামনে আয়নায় মুখ দেখে নি যমুনা, একটু সরে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারপর যত সময় শিবনাথ ছিল তার তাঁবুতে, সে তার সঙ্গে আর মুখ তুলে কথা বলতে পারে নি।

এ বছর অন্য মানুষ হয়ে গেছে শিবনাথ। হোলি খেলায় তার মন নেই, উৎসাহ নেই। অনেকে এসেছিল কিছু আগে তাকে রং দিতে, সে বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কাউকে ঢুকতে দেয় নি তাঁবুর মধ্যে। রাস্তায় আজ ট্রাম-বাসের শব্দ নেই, গাড়ির হর্নও কম। তা হলেও মানুষের গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল, চিৎকার ভেসে আসছিল, "হোলি হ্যায়।" তা শুনতে শুনতে গুরুর ছবির দিকে তাকিয়ে মনে মনে একই কথা বার বার বলে যাচ্ছিল শিবনাথ "জয় গুরু! জয় গুরু!"

শিবনাথ দেখতে পায় নি তার তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল হাসি। হঠাৎ ভেতরে ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না তার। হাসির হাতে রং-এর ঠোঙা, গায়ে-মুখে আবীরের দাগ, চুল উস্কোখুস্কো। সে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, তার ভয় হচ্ছিল শিবনাথ তাকেও ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

কিছু পরে তাকে দেখতে পেল শিবনাথ, কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কী খবর হাসি?"

হাসি খুব ভয়ে ভয়ে বলল, "আপনাকে রং দিতে এলাম শিবুদা।"

শিবনাথ হাসল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "রং দেবে? দাও না।"

হাসি চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে শিব-নাথের তাঁবুর মধ্যে এল, ঠোঙা থেকে আবীর নিয়ে তার পায়ে রেখে সে প্রণাম করতে

যাচ্ছিল, শিবনাথ তাড়াতাড়ি দু-হাতে তাকে তুলে ধরে বাধা দিয়ে বলল, "আরে, কর কী হাসি! থাক থাক প্রণাম করতে হবে না—" সে হাসির কাছ থেকে কিছু আবীর নিয়ে তার মাথায় ছিটিয়ে দিল, "তোমরা সকলে ভাল আছ তো?"

"হ্যাঁ", হাসি খুব নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেমন আছেন?"

"ভালই।"

"এ বছর রং খেলতে বার হন নি?"

শুকনো হাসল শিবনাথ। হাসির সহজ প্রশ্ন যেন তার দুর্বলতা মনের ভিতর থেকে আঁজলা ভরে তুলে নিয়ে মুখে মাখিয়ে দিল। শিবনাথ তা মুছে ফেলবার জন্যে পা দিয়ে ঠেলে একটা বল কিছু দূরে সরিয়ে দিল, বারবেলের প্লেট ঠং ঠং করে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "তুমি খুব রং খেলেছ দেখছি।"

"জোর করে সকলে রং দিয়ে দিল শিবুদা—"

"কে, মোহনলাল?"

"না", করুণ একটা ছায়া কাঁপছিল হাসির মুখে, "সে না। গোপালবাবু শান্তা বেলা—এরা সব রং-এর বালতি নিয়ে এসেছিল, আপনার কাছে আসে নি?"

"এসেছিল, ভাগিয়ে দিয়েছি।"

হাসির রং-এর ঠোঙা ফুটো হয়ে মাটিতে ঝুরঝুর করে আবীর পড়ে যাচ্ছিল। একটা টুলের ওপর ঠোঙা নামিয়ে রেখে সে ভিজে গলায় আস্তে বলল, "আপনার কাছে আসতে আমার খুব ভয় করছিল শিবুদা। ভেবেছিলাম, আপনি আমাকেও ভাগিয়ে দেবেন—"

"আমি কি তা পারি হাসি!"

শিবনাথের সঙ্গে কথা বলবার সময়ও হাসি বাইরে তাকাচ্ছিল, একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল তার চোখে-মুখে। তা হলেও সে এত তাড়াতাড়ি শিবনাথের তাঁবু থেকে চলে যেতে পারল না, মৃদু অভিযোগ করার মতন বলল, "কথা বলেন না তো।"

শিবনাথ বলল, "তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে কি আমার ইচ্ছে হয় না হাসি। খুবই হয়। কিন্তু রাধানাথবাবু আবার রেগে যাবে, আমাকে গালাগাল করবে—তাই চুপচাপ থাকি।"

"বাবার স্বভাবই ওই রকম। আপনি মাপ করবেন শিবুদা, আমাদের ওপর রাগ করবেন না।"

হাসির কথা শুনতে শুনতে শিবনাথের মন বড় নরম হয়ে আসছিল। সে তার জগদ্বিখ্যাত হওয়ার যে-স্বপ্নকে সতর্ক ও যত্নবান হয়ে লালন করবার চেষ্টা করছিল, ভিন্ন আর এক বাসনা এখন তা আবার ঢেকে দিল। কিছু সময় ইতস্তত করল শিবনাথ। লোহার বলের ওপর আপন মনে পা ঘষল। হাসির ছেঁড়া রঙের ঠোঙা থেকে কিছু আবীর তুলে ইতস্তত ছড়িয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, "যমুনা জানে তুমি এখানে এসেছ?"

"না।"

"জানলে বকবে না?"

"না, বকবে কেন," হাসি জটিলতার ঘন জালটা মুহূর্তের মধ্যে ছিঁড়ে ফেলে যমুনা ও শিবনাথের সম্পর্ক আবার আগের মতন স্বচ্ছন্দ করে তোলার ইচ্ছায় বলল, "আপনার সাথে ঝগড়া করেছে বলে আমিই দিদিকে বকেছি।"

বারবেলের বড় একটা প্লেট হলুদ রোদের আভায় চকচক করছিল, সেদিকে তাকিয়ে সুখের অনুভূতিতে শিবনাথের মুখও খুব প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার স্বর বড় রুক্ষ এবং কথা বলবার সময় তার প্রসন্ন মুখও এক-একবার কয়েকটা ভাঙাচোরা রেখায় ঈষৎ কঠোর দেখাচ্ছিল, "যমুনাকে বকে, রাধানাথবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই হাসি—" শিবনাথ মাথা ঘষে-ঘষে বলল, "সবই ভাগ্যের ব্যাপার।"

"জানি", হাসি কিছু পরে অনুনয় করবার মতন বলল, "আপনি দিদিকে সব খুলে বলুন না শিবুদা?"

শিবনাথ মাথা নাড়ল, "না। যমুনা আমার কথা শুনবে না, আমাকে গাল বাড়িয়ে জুতো খেতে হবে—"

"ইস, মারুক দেখি একবার আমার সামনে আপনাকে জুতো—" হঠাৎ উত্তেজনা দমন করে নিল হাসি, আস্তে বলল, "আপনার সাথে ঝগড়া করে দিদির খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। বেশী কথা বলে না, হারকু সাহেবের সামনেও কাঠ হয়ে বসে থাকে—"

"হারকু সাহেব রোজ যায় নাকি তোমাদের রাউটিতে?"

শিবনাথের গলার স্বর কিছু কর্কশ। হাসি তার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নিচু করল। শিবনাথের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "আমাদের রাউটিতে আসবেন?"

"আমি? এখন? না-না—"

"আসুন না শিবুদা", হাসির গলায় একটা আবেগ উথলে উঠছিল, "এখন কেউ নেই, বাবাও বেরিয়েছে। আমার ভাল লাগছে না শিবুদা আপনি আসুন।"

অল্প অল্প ঘাম ফুটে উঠছিল শিবনাথের কপালে, গলায় তৃষ্ণা উঠছিল। মনে মনে এখনো সংগ্রাম করে যাচ্ছিল সে, তার স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে হাসিকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছিল। রাস্তায় চিৎকার, সার্কাসের আর সব মানুষের খুশীর এলোমেলো বর্ষণ। শিবনাথ লোহার বল দেখল, বারবেলের ছোট বড় প্লেট দেখল, গুরুর ছবির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, "না-না।"

হাসি আবার ডাকল, "শিবুদা?"

তার দিকে তাকিয়ে শিবনাথ হাসল। তার শক্তিচর্চার সব সরঞ্জাম, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার আকাঙ্ক্ষা, তার গুরুর বাণী মানুষী দুর্বলতার দীপ্তিতে ম্লান, বিবর্ণ হয়ে এল। এখন রং খেলবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছেঁড়া একটা শার্ট পরল শিবনাথ, টুলের ওপর থেকে হাসির আবীরের ছেঁড়া ঠোঙা সাবধানে তুলে নিয়ে বলল, "চল তবে।"

হাসি আর সব মানুষের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল, তার পিছনে শিবনাথ খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছিল। তার কপালের ঘাম হাওয়া মুছে দিয়েছে, তার গায়ে আবীরের মিষ্টি গন্ধ। শিবনাথের মনে হচ্ছিল লোহার একটা খাঁচা থেকে হাসি তাকে হঠাৎ বাইরে বের করে এনেছে। অবসর-যাপনের মতন কয়েকটা হালকা মুহূর্ত শিবনাথকে তার একনিষ্ঠ সাধনার কৃচ্ছ্রসাধন থেকে মুক্ত করে আবার যমুনার তাঁবুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

ক্রমশ

রূপপ্রসাধনে অপরিহার্য

আপনার সৌন্দর্যের সহজ রূপটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে তা আরো মনোমুগ্ধকর, আরো আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে হ'লে বসন্ত মালতী ব্যবহার ক'রতে সুরু করুন। ছুলি, ব্রণ, মেচেতা বা অন্য বহু প্রভৃতি চর্মরোগও এর ব্যবহারে নিরাময় হয়।

বসন্ত মালতী

সি. কে. সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা-১২

রুমাটিক আর্থরাইটিস নামে চমৎকার একটি ব্যাধি আছে। শরীরের চঞ্চল গ্রন্থিগুলোকে সে অবশ করে দেয়, নাড়তে গেলে অভিমান করে তারা। ফলে, দ্রুত জীবনযাপন করা যাদের অভ্যেস, তারা হঠাৎ শান্ত ও নির্বিকার হয়ে যাবার সুযোগ পায়।

একটা গোলাপছড়ি কেনা হয়েছে। সেটির ওপর ভর করে আস্তে আস্তে ট্যাক্সিতে উঠছি। মধ্যমগ্রামের মতন মফস্বলে আমার চিকিৎসা করবেন না, বলেছেন বিশেষজ্ঞ। আমায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। অসুখ সারতে হয়তো এক মাস, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে আরো তিন মাস সময় লাগবে। আমরা বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় আসা স্থির করলাম। পাঁচ বছর পর চলে যাচ্ছি।... বিদায়।

—আমাদের ছেড়ে চললে! মণিদা একটু ক্ষোভের সঙ্গে বলল। সুধীর বলল, সেরে উঠে অন্তত লাইব্রেরীটার জন্যে—মাঝে মাঝে এসো। লালু বলল, কলকাতায় গেলে আমাদের কি মনে থাকবে?

বিচ্ছেদের মুহূর্তেও পুরনো জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গার অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে এক রকম ভালো লাগে। বলেছিলাম, যদি মনে থাকে তোমাদের, নিশ্চয় আবার আসব। কথাটা রূঢ় শোনায় কিন্তু প্রচণ্ড সত্যি—অর্থাৎ কি করে তোমরা ভাবছ, কলকাতায় গিয়ে পড়লে, অসুখ সেরে আবার যদি সচল হয়ে উঠি, অংগ-প্রত্যংগ ফিরে পাই, তখন এখানকার জন্যে আমার মন কেমন করবে? এতই অসহায় নাকি যে, আমি বদলাবো না, বিশাল শহরটার মধ্যে আমার আত্মীয় খুঁজে পাবো না? শুনে ওরা ক্ষুন্ন হয়েছিল সম্ভবত। মানুষ এত ভাবপ্রবণ।

শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা সেই রকমই দাঁড়ালো। নতুন খুঁজে পাওয়া বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে নিঃশ্বাস নিয়ে আমি পূর্বাশ্রমকে একেবারে ভুলে গেছি। কৃতঘ্নতা বলবেন একে? আমি বলবো না। কারণ, আপনারাও জানেন—ব্যবচ্ছেদের পর আবার আগের মতন সব জোড়া লাগে না। জোড়া লাগলেও দাগ থেকে যায়। চোখের সামনে থেকে সরে গেলে দৃশ্যের স্মৃতি হয়ে যায় ঝাপসা। যারা বেখাপ্পা প্রকৃতির, তারাই পিছন ফিরে মিশরের দিকে চেয়ে হৃতরাজ্যের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। রিভিয়েরায় গড়াগড়ি খায়। চোখের সামনে স্নেহ ছড়াবার ক্ষমতা তাদের নেই।

কিংবা, আমাদের অনেকের স্বভাব—বড় দ্রুত শিকড় মেলা। কিছুকাল পরে টেনে ছিঁড়তে কষ্ট হয়। অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের শিকড় তো কোথাও নেই। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দেশ বিভাগের পর তেমন মাটিই নেই কোথাও, যা এক মুঠোয় ধরে রাখতে পারলে আরেক মুঠোয় ফুল ছড়ানো যায় আকাশে। তার চেয়ে অনেক ভালো সঙ্গ থেকে সঙ্গান্তরে যেতে থাকা, এক বন্দর থেকে আর-এক বন্দরে। পৃথিবী ভর্তি অক্সিজেন, যেখানেই যাও তোমার ঘরবাড়ি সেখানে রাখা আছে। শুধু যাবার সময় যেন বলো না—বিদায়, যাবার সময় যেন দুঃখ দিও না। বলে যাও—'আসি, আবার ফিরে আসবো'। মধুর মিথ্যা কিছু না পেলে ওরা কী নিয়ে বাঁচে!...

রাসেল স্কোয়ার নামে এক রেল স্টেশনে ভিরা নাম্নী একটি মেয়ে চুম্বনের মতো নিবিড়ভাবে করমর্দন করে বলেছিল, (আসলে, চুম্বন করেই। কী কেলেঙ্কারী!)—'আবার দেখা হবে। সৌর জগতের মধ্যে পৃথিবী খুব ছোট একটা বৃত্ত, ঘুরতে-ঘুরতে আমাদের আবার দেখা হয়ে যাবে কোনোদিন।' আশা কুহকিনী জেনেও প্রেমিকাকে তো বলা যায় না—'সে সম্ভাবনা আদৌ নেই সখি; আমার দেশের বিদেশী মুদ্রা এতো বেশী নেই যে, প্রেমিক-প্রেমিকার পুনর্মিলন ঘটাতে তা নষ্ট করতে দেবে; তুমি বাড়ি যাও আমি
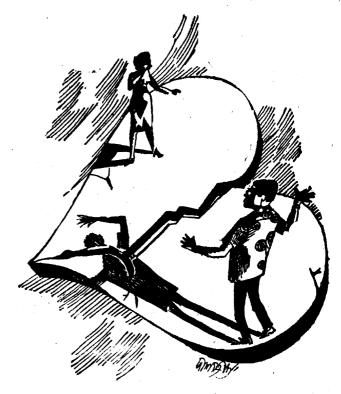
বিচ্ছেদের জন্য শোক কোরো না, দেবযানী

ফিরে যাই আমার দেশে।' আমরা আবার ফিরে যাই যে যার ঘরে। বিচ্ছেদের জন্যে শোক জন্মে না, দেবযানী—এ বিচ্ছেদের দুঃখ আমরাই পা মেলে ভুলে যাবে।'

...এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে মুন্সেফদের মতন এক ধরনের নির্লিপ্ত অনাসক্ত বন্ধুত্ব গড়ে তুলি আমাদের চারপাশে। কোয়ার্টারের সামনে বাগান করি সযত্নে, আবার সেই বাগান ভর্তি ডালিয়া ফেলে চলে যাই। ঘনিষ্ঠতা আর তেমন জমে না কারো সঙ্গে। কাছাকাছি থাকলে পোড়া মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, সরে গেলে পোড়া মন বিষণ্ণ হয় না। একটি রমণীকে মাঝখানে রেখে যে-দুজন বন্ধু দু'পাশে বসে তার যৌবন, ঐশ্বর্যে ভাগ বসিয়েছে একাধিকবার, জুয়া খেলতে-খেলতে আঘাত লেগে একজনের রক্ত ছিটকেছে আর-একজনের জামায়, তারাও পরস্পরকে অবলীলায় 'আপনি' সম্বোধন করতে পারে গ্লানিহীন। পরস্পরের কাঁধে হাত রাখে না। সম্পূর্ণ পৃথক জীবনযাপন করে উপর্যুপরি অনেকগুলো প্রহর, একজন অন্যের স্ত্রীকে যথার্থ পরস্ত্রীর মতনই শ্রদ্ধা ঘৃণা বা ঈর্ষা করে আজকাল। অতর্কিত কোন এক সন্ধ্যায় দুজন পুরনো বন্ধুর যদি দেখা হয়ে যায় কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে হঠাৎ, তখন একটিমাত্র প্রশ্ন ভদ্রলোকের মতো, সশব্দে নিক্ষেপ করা যায়—'এই যে এই যে, মনেই নেই যে!'

...খাপে ঢুকে গেছি বেশ

আর অনেক প্রশ্ন করা যায় না: যেমন—'কেমন চমৎকার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি আমরা দেখ। যতীন, তুমি সুখে আছ কি না জানতে আমার আগ্রহ নেই; অন্তত আগের চেয়ে অন্য রকম আছ নিশ্চিত। সেই ভালো। পুরনো আত্মীয়তার টান বাড়িয়ে লাভ নেই, আমরা দুভাবে ছড়িয়ে গেছি। যাত্রাদলের তলোয়ারের মত আমরা বিভিন্ন খাপে ঢুকে গেছি বেশ। একটা খাপই তো খুঁজছিলাম। সেই খাপের ভেতরে কোমল অন্ধকার, বাস্তুভিটের গন্ধ। আমাদের শান দেওয়া কিনার বেয়ে আলোকময় রক্ত বয়ে লোক বা শত্রুর শোণিত অবশ্যই না; তার বদলে ঈষৎ মরচে-রঙের এক মসৃণ মলম মাখানো থাকে ইস্পাতের ফলায়। স্তিমিগারের মধ্যে ঝোলানো আয়নাকাটার মত আমরা জ্বলজ্বল করে কাচের বাইরে চেয়ে থাকি।

সেই আরামে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অনেক দিন, এমন এক সময় এসে পড়বে, যখন জীবনটা আবার বোর লাগবে ভীষণ। সর্বশরীর আবার মুক্তির জন্যে নিশপিশ করে উঠবে। ঠিক মুক্তি নয়, এক বন্দিত্ব থেকে আর-এক বন্দিত্বে যাওয়া। আবার শিকড়ে পড়বে টান, টনটন করে উঠবে পুরনো ইস্পাত। মায়া কতখানি গভীর হয়েছে, পানের ছোপের মত কতটা যৌবন তখনো লেগে আছে ঠোঁটে, তার ওপর নির্ভর করবে ফলাফল। শিকড় ছিঁড়বে বা ছিঁড়বে না।

হাতে গোলাপছড়ি নিয়ে ঠুকঠুক করে ফের যদি ট্যাক্সিতে উঠে পড়া সম্ভব হল তো ভালো; নতুন হাকিম হয়ে নতুন শহরে জাঁকিয়ে বসা গেল; ডালিয়ার চারা লাগানো গেল; উৎপলের মত তিনবার সিমেন্টে পা ঠুকে উড়োজাহাজে উঠে পড়া গেল। আর, না হল যদি, সেও ভালো, এক-বিছানায় প্রতি রাত্রে শরীরকে শান্ত করে শুইয়ে রাখা—চুড়ি হয়ে কারো হাতের চারপাশে ঘুরে ঘুরে করা—রিনঝিন রিনঝিন—সে-ও মন্দ কী। তারপর এক সময় ঠুন করে বাসনে ঠুকে যাক সেই চুড়ি, অর্থাৎ পতন। অর্থাৎ সংগীত-খণ্ডের মত ঈষৎ মূর্ছনা ও মূর্ছা। একটিমাত্র মানুষজন্ম, তাকে উল্টে-পাল্টে উপভোগ করাই আনন্দ।...

কলকাতায় আর ভালো লাগছে না; আমায় কোথাও বদলি করে দাও না ঈশ্বর॥

ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সরকারির জাতীয়করণের বিকল্প হিসাবে ব্যাঙ্কগুলির সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় যে প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে তার জাতীয়করণ না হলে ভারতে মুদ্রা, ঋণ তথা ব্যয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে ব্যাঙ্ক কর্তৃক অবলম্বিত নীতির সঙ্গে সরকারের অর্থ সংক্রান্ত নীতির সংহতি ও সাযুজ্য রক্ষা করা কঠিন হবে। কিন্তু সরকারী শাসনযন্ত্র বর্তমানে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ ও ব্যাঙ্কগুলির উন্নত স্তরের পরিচালন করতে পারবে কি সে-সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে। জাতীয়করণ আপাতত সম্ভব না হলে, দেশের অর্থসম্পদ যাতে পরিকল্পনামূলক-ভাবে (জাতীয় অগ্রাধিকারের আলোকে) ব্যবহৃত হয় তা দেখতে হবে।

দেশের বৈষয়িক কাজকর্মের একটা বৃহত্তর অংশ তার আওতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যে সম্প্রসারণ দরকার তার রীতিপ্রকৃতি নির্ধারণ হবে ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম অভীষ্ট। বলাই বাহুল্য, ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় যথাযথ রদবদল ছাড়া সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। ব্যবসাশিল্প ও ব্যাঙ্ক দুয়ের নিয়ন্ত্রণ একই ব্যক্তিবর্গ করলে অর্থনৈতিক ঘনীভবন কমাবার উদ্দেশ্যে মূলধন নিয়োগ কঠিন হবে। ব্যাঙ্ক কর্তৃক অগ্রিম দানের ধারা বা রীতির দ্রুত পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়—নইলে ব্যাঙ্কের অর্থসম্পদ স্বার্থপর কয়েকজন মাত্র আত্মসাৎ ক'রে থাকে এরকম সংশয় লোকের মন থেকে দূর করা যাবে না।

জাতীয় ঋণ পরিষৎ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক, পরিকল্পনা কমিশন, যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় ঋণ পরিষৎ গঠন করার কথা হয়েছে। আগাম দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলিকে প্রাগুক্ত ঋণ পরিষৎ পথনির্দেশ করবেঃ অগ্রাধিকার অংশগুলির প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে। ফটকা ব্যবসায় অথবা জিনিসপত্র মজুত রাখতে যাতে গৃহীত ঋণ ব্যবহার করা না হয় তা দেখবার জন্য কোনো বিশেষ লেনদেন, আমানত অথবা কোনো বিশেষ দেনদারের সঙ্গে লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব পরীক্ষা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে। সেই সঙ্গে, কোনো একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ আগাম দেওয়া যাবে তার

একটা ঊর্ধ্বসীমা (সংগৃহীত মূলধন ও সংরক্ষণের শতকরা ১০ ভাগের সমান) নির্ধারণ করার কথা হয়েছে। কোনো ব্যাঙ্ক নির্দেশ, নিয়ম বা আইন না পালন করলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার কাছ থেকে (আর্থিক) জরিমানা আদায় করতে পারবে। ক্রমাগত নিয়মকানুন মেনে না চললে সেই ব্যাঙ্ককে সরকার যাতে নিজের হাতে গ্রহণ করে তার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সুপারিশ করতে পারে।

ব্যাঙ্কগুলির পুনর্গঠিত বোর্ডের অন্তত অর্ধেক ভাগে অর্থনীতিবিদ, হিসাব-পরীক্ষক এবং অগ্রাধিকার অংশ-সমূহের—যেমন, কৃষি সমবায় সমিতি, ছোট ও মাঝারি বহরের শিল্পের প্রতিনিধিদের মনোনয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাতে ব্যাঙ্কগুলির বোর্ডের বৈচিত্র্যকরণ সম্ভব হবে। প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে তার বোর্ডে একজন পুরো সময়ের সভাপতি নিয়োগ করতে হবে--সেই সভাপতির রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই।

বঞ্চিত অংশগুলিকে অর্থসাহায্য

কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ব্যাঙ্ক সাধারণত অবহেলা করে থাকে। নতুন সংগঠক বা শিল্পক্ষেত্রে নবাগতদের কর্জ দেবার ব্যাপারে বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলি অতি-মাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি জামিন বা বন্ধক হিসাবে নির্ভরযোগ্য কিছু দিতে অক্ষম, কিন্তু যার উদ্যোগ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা এবং নিজের ভাবনাগুলিকে রূপ দেবার সামর্থ্য আছে, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থেকে তার ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কৃষি ও ছোট বহরের শিল্প খাতে প্রয়োজনের অনুপাতে অর্থসাহায্য সঞ্চালিত হয়নি। এমনতরো অবস্থার সংশোধন করাই হবে ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। নির্ধারিত নীতি, পরামর্শ ও নির্দেশ কোনো ব্যাঙ্ক অনুসরণ না করলে তখন সরকার সেই ব্যাঙ্ককে নিজের হাতে নেবে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমানে যে ক্ষমতা আছে এবং প্রস্তাবিত ঋণ পরিষৎ থেকে অতিরিক্ত যে ক্ষমতা পাওয়া যাবে সেই সব ক্ষমতার বলে অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং বর্তমানে বঞ্চিত অংশগুলিতে অর্থসাহায্য দেওয়ার বন্দোবস্ত করা কঠিন হবে না। জলসেচ পাম্প ও অন্য কৃষির যন্ত্রপাতি খরিদ করা যাতে সহজ হয় সেজন্য ধারে কেনার সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। সার, কীটনাশক দ্রব্য প্রভৃতির খুচরো বিক্রেতাদের উদারভাবে কর্জ দিয়ে ব্যাঙ্ক সাহায্য করলে ভালো হয়। পরে দাম দেবার করারে চাষীদের যাতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডগুলিকে ঋণ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সদস্য-ব্যাঙ্করা যেখানে নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ গ্রহণ করে থাকে, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাদের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। অর্থ-বল ও আইনের দিক থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে স্থান, সুদের হার পরিবর্তন জনসাধারণের কাছে সরকারী কাগজ বিক্রয় এবং যে-উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া হয় তার নিয়ন্ত্রণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সব ক্ষমতা আছে তাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা অসম্ভব নয়।

বৈষয়িক উন্নয়নে অর্থসম্পদের ব্যবহার

কেবল দেশের অর্থনৈতিক স্থিতি রক্ষার জন্য টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ নয়, ব্যাঙ্কগুলি যাতে বৈষয়িক উন্নয়নে সর্বতোভাবে সাহায্য করে সেদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের লক্ষ্য রাখা উচিত। ব্যাংকসমূহে যাতে তাদের আমানতের একটা ক্রমবর্ধমান অনুপাত শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কে জমা রাখে তা দেখতে হবে; নইলে পরিকল্পনার অগ্রাধিকার অনুসারে অর্থসম্পদের ব্যবহার করা যাবে না। ব্যাঙ্কগুলি যেন তাদের পরিচালক এবং যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের পরিচালকরা যুক্ত আছে তাদের আমানত না দেয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

সুতরাং জাতীয় কর্জ পরিষৎকে আলোচনার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র বা মঞ্চ হিসাবে দেখা যেতে পারে; সেখানে আর্থিক ব্যবস্থার সমুদয় অংশ থেকে দেনদার ও উত্তমর্ণদের একত্রিত করা যাবে। এই সব আলাপ-আলোচনা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে টাকাকড়ি ও ঋণ-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সাহায্য করবে, সন্দেহ নেই।

—শান্তিকুমার ঘোষ
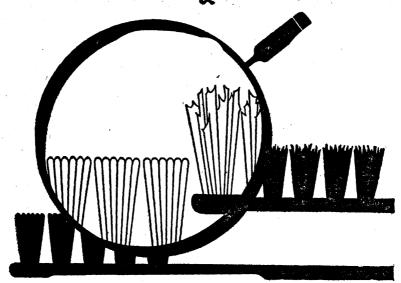
(প্রধানমন্ত্রীর সফরে—২)

পালাম থেকে মস্কোর আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে আর কী। ঘণ্টা ছয়েক যদি সোজা উড়ে যান, তাসখন্দে না থেমে। কিন্তু অনুন্নত অথবা উন্নতিকামী দেশে, যথা ভারতে, সময়ের কাণ্ড-জ্ঞান আমাদের একটু কমই থাকে। পালাম বন্দরে পৌঁছে, এয়ার ইণ্ডিয়ার বোইং-এ উঠে বসতে লাগল প্রায় আড়াই ঘণ্টা, বাড়ি থেকে বন্দরে পৌঁছুতে পনেরো মিনিট, আর পাকিস্তান-আফগানিস্থান দুই দেশের আকাশ পেরিয়ে মস্কো পৌঁছুতে ছয় ঘণ্টা। ওটা কেমন জানেন? কলকাতা থেকে দিল্লি এলেন উড়ে কারাভেল (কারাভেলি নয়, অনেকে যেমন বলে থাকেন, এমন কি ক্যারাভ্যাল-ও নয়) বিমানে। লাগল পৌনে দু' ঘণ্টা। আপনার নিজের সহগামী স্যুটকেস পেতে লাগবে অন্তত আধ ঘণ্টা, এক বছর আগে আরো বেশী ছিল।

সাধারণত, আন্তর্জাতিক বিমান-ভ্রমণের ক্ষেত্রে যাত্রীকে হাওয়াই বন্দরে যেতে হয় বিমান ছাড়ার এক ঘণ্টা আগে। কিন্তু যেহেতু এয়ার ইণ্ডিয়াতে এবার যাচ্ছেন একজন "ভি-ভি-আই-পি" (ভারতে মাত্র দুজন "ভি-ভি-আই-পি", রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। অন্যরা শুধু "ভি-আই-পি", —অতি-অত্যন্ত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক), যাত্রীদের বলা হল দু' ঘণ্টা আগে যেতে। ছাড়বে সাড়ে আটটায়। পৌঁছুতে হবে সাড়ে ছ'টায়। সুতরাং, বিছানা থেকে উঠতে হবে অন্তত পাঁচটায়। মনে আছে সেদিন শুতে গেলাম রাত দেড়টায়, আর উঠতে হল সাড়ে চারটেয়। হাতে ঘড়ি বেঁধে কি ঘুম হয়?

কিন্তু পালামে পৌঁছে চক্ষু স্থির! পিল্‌পিল্ করছে যাত্রীরা, বিদায়-কারী-কারিণীরা, গোটা হলঘরে কনুই-এর গোঁত্তা না দিয়ে এক পা এগুনো যায় না। হট্টগোল। আর ক্রমাগত আসছে আরো লোক, ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়ী-জোয়ান-জোয়ানী, আর আসছে কতো রকমের স্যুটকেস্, কতো রঙের, আর কতো দেশের লোক। সেদিন প্রায় একত্র সময়ে দুটো ফ্লাইট, "বিয়োইসি" লণ্ডনে, এয়ার ইণ্ডিয়া মস্কো হয়ে লণ্ডনে। যাত্রীদের অর্ধেক মনে হল পাঞ্জাবী, অনেকের গায়ে গাঁয়ের গন্ধ। পোশাকে, সুটে ও স্যুটকেসে, এবং গলার গাঁদা ফুলের মালায়। যেমনি আমাদের রেলের প্ল্যাটফরম তেমনি আমাদের হাওয়াই বন্দর। একই ধাঁচ, বাহার আর তেপান্তর।

হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ। কে কোথায় ফুঁপিয়ে কাঁদছে, বিদায়-বেদনার বিরহের কান্না। আওয়াজে ঠিক বোঝা যায়। একটি যুবতীর (ভারতীয়) বুকফাটা কান্না, তার সামনে একজন যুবক-যাত্রী (গলায় মালা)। সে কী যেন বলছে বিড়বিড় করে। ভাবলাম, শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" বইয়ের মতো তো নয়? সেই যে রেঙ্গুনে জাহাজে ওঠার আগে প্রেমিক বর্মী প্রেমিকাকে বলেছিল—তোমাকে কদলী প্রদর্শন করে, তোমার টাকা-পয়সা নিয়ে এবার পাড়ি দিচ্ছি, তোমাকে আর আশা না করলেও চলবে যে, আমি ফিরে আসব তোমার কাছে—(এমনি কিংবা ইত্যাদি)। না, মেয়েটিও পোশাকে পানজাবী, ছেলেটিও। কতক্ষণ যে সে কাঁদল।

কে জানে তাদের কাহিনী। হয়তো জলন্ধরের গ্রাম থেকে আসা কিষাণ-ছেলে। তারা টাকা জমায় গম-বাজরা বেচে। ইংল্যাণ্ড থেকে কোনো আত্মীয় বলে, চলে এসো, অনেক পয়সা উপার্জন করতে পারবে। তারা অনেক চেষ্টা করে পায় ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কাজ করার অনুমতি (অনেক সময় ঘুষ দিয়ে), জমানো টাকা দিয়ে কেনে টিকিট, পাড়ি দেয় সাত সমুদ্র তেরো নদী, গিয়ে পৌঁছে সায়েবের দেশ ইংল্যাণ্ডে। কয়েক বছর পরে সে নিজে ফিরে আসে দেশী-সায়েব হয়ে।

এখনো কানে আসছে যেন একটা কান্নার শব্দ। ফোঁপানো কান্না একটি যুবতীর। কে জানে সে কোনো দিন যাবে কিনা ইংল্যাণ্ডে, কে জানে তার স্বামীও তাকে কদলী প্রদর্শন করে গেল কিনা।

দুটো আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের যাত্রী, কোন্ কোম্পানি কার তদারক করে। যাত্রীরা সহায়তা পায় না বললেও চলে। তারা রুটিন্ মতো চলে। প্রথম ইমিগ্রেশন্ পুলিস। তারা যেন ধরে নেয় সব যাত্রীই বদমায়েশ, জাল-জোচ্চোর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, এমন কি আপনার মুখের সঙ্গে পাসপোর্টের ছবির মিল আছে কিনা। অবশ্য তাদের কর্তব্য, কিন্তু এতো সময় নেয়। তারপর কাস্টমস। ঐ ল্যাঠা! ওখানে গিয়ে আমাদের চক্ষু শুধু স্থির নয়, উপরের দিকে উঠে গিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল। বাক্স, ট্রাংক, স্যুটকেস্, লেপ্, হ্যাঁ যাকে এখানে বলে রেজাই, হোল্ডঅল্, ঝুড়ি, কী নেই? আর গাদা গাদা।

দেহাতী পানজাবীরা বিলেতে লেপ নিয়ে যাবেই। দড়ি দিয়ে লেপকে যথাসাধ্য ছোট আকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কতো আর হবে। কাস্টমস্ বাবুরা লেপ-কাঁথা খুলে হাতড়িয়ে দেখছে, কঠোর নজরে। মনে হল, আমাদের স্যুটকেসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে আমাদের বিমান ছেড়ে যাবে। অন্যান্যবার তো এতো কড়াকড়ি দেখিনি; বুঝলাম, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার একটা দিক হল ঐ মালপত্র সার্চ করা। ধরুন, কথার কথা, আপনার লেপের ভাঁজে লুকোনো একটি টাইম-বোমা। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কোথায় কী রূপ নেবে কে জানে? ঐ তো ১৯৫৩ সনে হংকং থেকে জাকার্তা যাওয়ার সময়ে আমাদের একটি ভারতীয় অসামরিক বিমান টাইম-বোমার বিস্ফোরণে যাত্রীদের
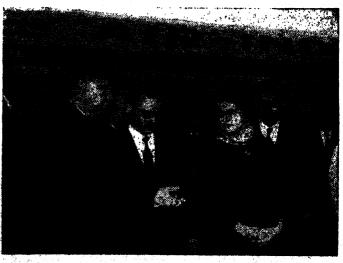
মস্কোর আন্তর্জাতিক এয়ার পোর্টে ইন্দিরাজীর অভ্যর্থনায় কোসিগিন (বাঁয়ে)

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মস্কোতে জানাচ্ছেন ভুকোভো এয়ারপোর্টে

নিয়ে ফেটে চৌচির, হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সমুদ্রে। কে বা কারা চেয়েছিল তদানীন্তন চৈনিক বৈদেশিক মন্ত্রী চৌ-এন লাইকে বিনষ্ট করতে, যদিও তারা জানতো না চৌ মশাই সেই বিমানে ছিলেন না, কিন্তু থাকার কথা ছিল।

সিকিউরিটি কর্মচারী আর গোয়েন্দায় হলঘর ভরা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এদিক-ওদিক ফোকাস্ মারছে। আমরা দুজন সাংবাদিক একজন কাস্টমসবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হলাম। তিনি এসেই বললেন, "খুলুন স্যুটকেস।" খুলতে হবে? "হ্যাঁ, বইকি।" তা হলেই হয়েছে, মনে মনে বলি। জামা-কাপড় স্যুট সব তছনছ, আবার সেই গলদ-ঘর্ম কর্তব্য করতে হবে, মানে স্যুটকেস্ গোছানো। আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লাম। একটু খাটো গলায় বললাম, আমরা দুজনেই প্রধানমন্ত্রীর দলের শামিল, এবং...। "ও. ও. তাই বলুন। ঠিক আছে।" সাদা চকের দাগ পড়ে গেল স্যুটকেসে। দু মিনিটে কাজ শেষ।

একে একে বহির্গামী যাত্রীদের লাউনজ ভরে গেল। কিন্তু যাত্রার আহ্বান আর আসে না। তারপর লাউডস্পীকারে আমাদের কর্মচরীরা যে ধরনের ইংরিজীতে ঘোষণা করে (দোষ ইংরিজীর নয়—ঘোষকের গলার এবং লাউডস্পীকারের) তাতে বুঝবার উপায় নেই কোন বিমান এবার ছাড়বে। ওদিকে বাইরে লেগেছে শামিয়ানা। প্রধানমন্ত্রী বিদেশে যাবেন। তাঁকে বিদায় জানাতে আসবেন অন্যান্য মন্ত্রীরা ও কংগ্রেস দলের নেতারা, আসবেন সেই-সমস্ত দেশের দূতেরা যেসব দেশে উনি যাচ্ছেন। তার জন্যে পুলিস প্রহরা ইত্যাদি। খানিক বাদে হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত টাইমস অব ইন্ডিয়ার জি কে রেড্ডি। রেগে আগুন। "কোথায় এয়ার ইন্ডিয়ার লোকেরা? ভেবেছে কী? একজন লোক নেই যাকে একটু জিজ্ঞেস করব, একটু সাহায্য করবে? ভেবেছে কী? কোথায় তারা?" একজন অবশেষে এসে পড়লেন একেবারে তোপের মুখে। এবং যথারীতি আরম্ভ হল তোপ দাগানো। কর্মচারী হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলেন। তোপ থামলো, কিন্তু ধোঁয়া অনেকক্ষণ বেরুলো।

যাত্রা যখন শুরু হল, ততক্ষণ খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। ভোর রাত্রে কে প্রাতরাশ করে আসে। এদিকে বিমান আকাশে উঠে গেছে। এয়ার হোস্টেস্রা এটা-ওটা করছে। পাশের বন্ধু বিশ্ববন্ধু গুপ্তকে (ইনি "এজ্" উর্দু কাগজের সম্পাদক), "কি গো, ব্রেক্‌ফাস্ট দেবে না? এদিকে যে—"। তারও সেই অবস্থা। "যা বলেছ, চাইব নাকি?" চাওয়া তো যায় না অভদ্রের মতো। আমরা ভদ্রভাবে এগুতে লাগলাম। "দেখুন, এক কাপ চা, কিংবা কিছু একটা সফ্‌ট্ ড্রিংক্ পেতে পারি কি?" "নিশ্চয়, এক্ষুনি।" আবার একজন বলে, "কফি পেতে পারি কি?" "নিশ্চয়, এক্ষুনি।"

এয়ার ইন্ডিয়ার সেবাযত্নকে কেউ খারাপ বলতে পারবে না। যতটুকু সম্ভব মুখে হাসি নিয়ে মেয়েরা যাত্রীদের সেবা করেন। তাই বলে কোনো একজন যাত্রী যদি মনে করেন যে, শুধু তাঁর দিকেই এয়ার হোস্টেস্দের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকবে, তা হলে একটু ভুল হবে বইকি, তা তিনি পদাধিকারে কিংবা টাকাপয়সায় যতো বড়ই হোন না কেন। এমন দৃষ্টান্ত যে হয় না, তা নয়। আমাদের ব্রেকফাস্ট এল, এবং ভালই। সাধারণত, খাবারের পরিমাণ এত বেশী থাকে যে, কী ব্রেকফাস্ট, কি লাঞ্চ, কি ডিনারে আমার মত লোক অর্ধেকের বেশী খেতে পারে না। বেশী দেওয়ার কারণ হয়তো এই যে, কোনো যাত্রী, যত বুভুক্ষুই হোক কি "রাক্ষুসে" হোক, যেন বলতে না পারে, "আমার পেট ভরল না।" মস্কোর আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে নামবার কিছু আগে আবার লাঞ্চ।

নীচে প্রথম এল পাকিস্তানের সিন্ধু এলাকার উপরের দিক। বালি, এবড়ো-খেবড়ো। তারপর আরো [illegible], ছোট ছোট পাহাড়, প্রায় [illegible], এগুলো বেলুচিস্থানের উপর দিক, এলো আফগানিস্থানের পাহাড়ের ঢেউ, এলো প্রায় তেমনি দেখ রাশিয়ার এশীয় রিপাবলিক তাজিকস্থান, আর অকস্মাৎ যেন বদলে গেল রূপ—নদী, প্রান্তর, বন, পাহাড়, সবুজের মেলা।

এদিকে অন্য একটি বিমান, ভারতীয় বিমানবহরের "টি-ইউ—১২৪" (রাশিয়ান জেট) মস্কোতে আগে থেকে গিয়ে উপস্থিত। গেছে উল্টো দিক হয়ে—দিল্লি, জামনগর, বাহরিন, কায়রো, সোফিয়া, বুকারেস্ট, বেলগ্রেড, ওয়ারশ, মস্কো। এটা রওনা দিল ৪ঠা অক্টোবর। দুটো উদ্দেশ্য। মস্কো থেকে ঐ বিমানে প্রধানমন্ত্রী ভ্রমণ করবেন কায়রো পর্যন্ত। বিমানচালকরা নিজেরা আগে থেকে দেখে নিতে চায় এয়ার-পোর্টগুলো কেমন, যাওয়ার রাস্তাই বা কেমন। একটা ট্রায়েল। দ্বিতীয়ঃ উপহার দেওয়ার মালপত্র স্থানে স্থানে রেখে যাওয়া।

সরকারী পরিদর্শনের সময়ে এটা একটা আন্তর্জাতিক রীতি, প্রটোকল। প্রধানমন্ত্রী যে-সমস্ত দেশে যাচ্ছেন সেখানকার প্রধান-মন্ত্রী, তাঁর পত্নী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এমন কি যারা গাড়ি চালাবে তাদেরও দেবেন কিছু না কিছু উপহার। আবার অন্য প্রধানমন্ত্রীও দেবেন উপহার প্রধানমন্ত্রীর ডেলিগেশনের লোকদের। কাকে দেওয়া হবে তা ঠিক করেন দুই দেশের প্রটোকল প্রধান। তাই আমাদের চীফ অব প্রটোকল বিক্রম সিং গেলেন ঐ বিমানে। তিনি সব জায়গায় আলোচনা করে গেলেন আমাদের প্রধান-মন্ত্রীর কী ধরনের প্রোগ্রাম হবে, কোনটা কাম্য, কোনটা নয়, ইত্যাদি।

সেই বিমানে আরো ছিল কয়েকজন। প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি অফিসার শ্রী দত্ত, আকাশবাণীর সিনিয়র সংবাদদাতা কৃষ্ণ-কুমার সুদ (কলকাতার অনেক সাংবাদিক তাঁকে চেনেন), এবং পি আই বি ফটো-গ্রাফার জৈন। সুদের কাছে শোনা তাঁদের উল্টো রাস্তায় যাওয়ার বেলায় একটি ঘটনার কথা, ৪ঠা অক্টোবর। বাহরিন থেকে বিমান যাচ্ছে বেইরুটে। সিরিয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছে। দামাস্কাস সামরিক বিমানঘাটি থেকে রেডিয়োতে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কে?" "আমরা তোমাদের আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার জন্যে আগে থেকে অনুমতি চেয়েছি। আমরা অমুক, ইত্যাদি।" দামাস্কাস বলল, তারা কিছু জানে না, অত্যন্ত দুঃখিত, "আপনারা জানেন দিনকাল খুব খারাপ, আপনারা নেমে আসুন, আমরা চেক করব।" প্রশ্ন করল, বিমানে ভি আই পি আছেন কি না। না, নেই।

ততক্ষণ দুটো মিগ জঙ্গী বিমান উঠে এসেছে, একটি উপরে একটি নীচে। দুটো

আবার উপরে গেল, টি-ইউ নেমে এল দামাস্কাসে। "তারা আমাদের সংগে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে, বারবার ক্ষমা চেয়েছে। আমরাও তাদের অবস্থা বুঝলাম। ইসরায়েলের সংগে জুন মাসের যুদ্ধের পর তারা অত্যন্ত সতর্ক। ভারতীয় দূতকে তাঁরা খবর দিয়েছিলেন। তিনিও এলেন। ভি আই পি কক্ষে এল আমাদের জন্যে অনেক খাবার। আমাদের বিমানে তেল নেওয়া হল। তারপর বেইরুট না গিয়ে সোজা গেলাম কায়রো। আমরা মস্কো এসেছি তোমরা আসার আগের দিন, ৭ই, বলল সুদ।

মস্কোর হেমন্ত কাল। আশপাশে অনেকগুলো বন। তাদের একটা করুণ রূপ। পাতা ঝরে যাওয়ার আগেকার হলদে ধূসর রঙ, কোনো কোনো জায়গায় লালচে, কিন্তু হলদেই বেশী, কোথাও পাতলা, কোথাও গাঢ়। চাপ চাপ রঙের ছোপ, হেমন্তের রঙ, যেটা পরে দেখা পূর্ব ইউরোপের সব জায়গায়। আর মাঝে সবুজ ফার গাছের বন। কোথাও কোথাও একেবারে মেটে রঙের বন।

এয়ারপোর্টে নামতে না নামতেই চলো চলো হুকুম। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে। বিরাটবপু একজন রাশিয়ান সাংঘাতিক ইংরিজীতে জানাল, সাংবাদিকদের গাড়ির নম্বর হল আট থেকে বারো। মালপত্র রেখে তারা যেন অবিলম্বে গাড়িতে গিয়ে বসে।

কোনদিক দিয়ে যে তারা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিদায় হল, প্রায় দেখতেই পেলাম না। এত হাইস্পিড প্রিসিশন ওয়ার্ক। শুধু দেখলাম, এক নজর, সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ইন্দিরাজীকে অভ্যর্থনা করছেন। ফুল, ভিড়।

পলকে গাড়িগুলো আমাদের নিয়ে ছুটল এক শো কিলোমিটার বেগে। ইন্দিরাজী, কোসিগিন গেলেন মস্কোর রাস্তায় পড়ে এমন একটি "ডাশা"য়, মানে বাগানবাড়িতে। সেখানেই হল তাঁদের আলোচনা এবং দুপুরের খাবার। বাইরে গাড়ির ভিড়। ঠিক একটা বাজতে দেখা গেল কোনো গাড়িতে কোনো ড্রাইভার নেই, তা কোসিগিনের গাড়ির হোক, কি বৈদেশিক সচিব রাজেশ্বর দয়ালের গাড়ির হোক। কেউ ভাবল ড্রাইভাররা স্ট্রাইক করল কিনা। তা নয়। তারা খেতে গেছে সবাই। বাঁধা সময়। ততক্ষণ সকলকে অপেক্ষা করতে হবে।

আমরা গেলাম মস্কো শহরে সোভিয়েটস্কায়া হোটেলে। যাওয়ার রাস্তাটা দেখলাম নতুন, খুব প্রশস্ত। রুশ বিপ্লবের জুবিলি উপলক্ষে তৈরী। মাঝে মাঝে বড় বড় ব্যানার জুবিলির ঘোষণায়। শহরে ঢুকতে এক স্থানে একটা নতুন ধরনের মনুমেন্ট। যে স্থানে হিটলারের নাৎসী বাহিনীকে তারা সাফল্যের সংগে রুখেছিলেন, সেই স্থানে। মনুমেন্টটা দেখতে অনেকটা ট্যাংক আটকানোর ফাঁদের মত। যেন অনেকগুলো ক্রস কায়দা করে বসানো, কিন্তু খুব বৃহদাকারের।

ওয়ারস'র পথে মস্কোর ভুকোভো ভিসার্টপি এয়ার পোর্টে সাংবাদিকদের সংগে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

এখানে ওখানে রাস্তার ধারে বাসের জন্যে বসে লোকেরা। রবিবার বলে রাস্তায় লোকজন খুব কম। দু-এক জায়গায় দেখলাম বৃদ্ধারা সেই পুরনো দিনের মত জামাকাপড় গায়ে দাঁড়িয়ে, যেন টলস্টয়ের দিনের। জামা-কাপড় ভাল, রকমটা পুরনো। দোকানপাট সব বন্ধ। রবিবার।

বেশ বড় হোটেল। হাতমুখ ধোয়ার জন্যে আমাদের একটা স্যুইট দেওয়া হল। শোয়ার ঘর, বসার ঘর, একটি প্রসাধন-ঘর, বাথ। বসার ঘরে একটি পিয়ানো, একটি টি-ভি, একটি রেডিয়ো। এ অবধি কোনো হোটেলের কামরায় পিয়ানো দেখিনি। স্বভাবদোষ। আমার হাত নিশপিশ করতে লাগল। একটু না বাজিয়ে আর থাকতে পারলাম না। সংগীরা হাততালি দিলেন। আমি একেবারে চেম্বর অর্কেস্ট্রার বাদকের স্টাইলে "বাও" করলাম।

আবার লাঞ্চের ডাক। এ কী? লাঞ্চ তো হয়ে গেছে? আবার খেতে হবে। মস্কোর সংগে ভারতের সময়ের তফাত আড়াই ঘণ্টা। আমরা যখন প্লেনে খেয়েছি তখন মস্কোতে সকাল সাড়ে এগারো। তাদের লাঞ্চের সময়ে বসতে হল, এক দিনে দ্বিতীয় লাঞ্চ। টেবিল ভরা খাবার। মাছ মাংস চিকেন আ-লা কিয়েভ, বাটিভরা কাঁকড়ার মাংস (?), লাল আর কালো ক্যাভিয়ার, প্লেটভরা রাশিয়ান সালাড, গাদা করা ফল, আর ভডকা ও ওয়াইন।

রাশিয়ার সংগে ভারতের কোনো ক্ষেত্রেই বিশেষ কোনো মতানৈক্য নেই। দুই প্রধানমন্ত্রীই পরস্পরের বন্ধুত্বের উপর জোর দিয়েছেন, পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলেছেন। ভিয়েতনামে যুদ্ধ এবং পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধজনিত ফল সম্বন্ধে কথা হয়েছিল (অন্যান্য স্থানেও) স্বভাবতই। রুশ দেশ ভারতের একান্ত বন্ধু সন্দেহ নেই, না বললেও চলে। কিন্তু বন্ধুরে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হয়, আপসে থাকে না। এটা জানেন বলেই ইন্দিরাজী সফরে যাওয়ার রাস্তায় তিন ঘণ্টার জন্যে মস্কোতে থাকলেন। ঐ একই কারণে গেলেন ৭ই নভেম্বর সোভিয়েট দেশের বিপুল উৎসবে, বিপ্লবের ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উৎসবে।

ওয়ারশ রওনা হওয়ার আগে টেলিগ্রাফ কেন্দ্রে যেতে হল। খবর পাঠাতে হবে। দেখলাম, রবিবার সত্ত্বেও অনেক লোক সেখানে। যুবক-যুবতীরা নতুন নতুন স্টাইলে। মাথার চুলেরও আধুনিকতা। জুতো ও জামার স্টাইলেও। কিন্তু না, মিনিস্কার্ট নেই। বড় জোর হাঁটুর ঠিক উপরটি অবধি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমাদের অত্যন্ত তাড়া। তক্ষুনি যেতে হবে এয়ারপোর্টে। ক্রেমলিনের পাশ দিয়ে, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় কাটিয়ে নতুন এয়ারপোর্ট ভ্নুকোভোতে। এটা ভি-আই-পি এয়ারপোর্ট।

ইন্দিরাজীর সাংবাদিক সম্মেলন হল এয়ারপোর্টে। তারপর বিদায়। উনি নিলেন কোসিগিনের; আর আমি বিদায় নিলাম আমার পুরনো এক সহকর্মীর, জগমোহন মহাজন, তিনি এখন মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে "প্রেস আতাশে"। আকাশে উঠল টি-ইউ—১২৪। চালক ক্যাপটেন সিং ও স্কোয়াড্রন লিডর মুখার্জি। এবার ওয়ারশ।

—খগেন দে সরকার

সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী মহাশয় নয়াদিল্লি কালীবাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় নাকি বলিয়াছেন যে, বাংলার জনগণ কেন্দ্রের অবিচার ও পীড়ন সহ্য করিবে না, রক্তবন্যা বহিয়া যাইবে তবু মাথা নত করিবে না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সবিনয়ে বলব, অজয়বাবু 'রক্ত বন্যার' কথাটা বলে ভালো করেন নি, কেননা তা যদি হয় তাহলে রক্ত বন্যাত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁকেই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে!!"

শ্রীচাবন অসং অফিসারদের খুঁজিয়া বাহির করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।—'নির্দেশটি ভালোই বলব, তবে না দিলেই ভালো করতেন, কেননা ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে গেলে সে আবার আর এক বেমওকা অবস্থার উদ্ভব হবে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আনন্দবাজারে প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে—প্রতিযোগিতায় কোন বাঙ্গালী কুস্তিগীরের

নাম নাই। সহযাত্রী বলিলেন—"আনন্দবাজারেই প্রকাশিত সংবাদ শিরোনামায় আমরা পড়েছি,—'ইন্দোরে বাংলার দুই প্রতিনিধি দলে হাতাহাতি'—এটাকে আমরা বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম; ফারস্ট রাউণ্ডে ন্যাজেগোবরে না হলে নাম তালিকায় থাকত বই কি!!"

পি অ্যাণ্ড টি বোরড টেলি-কমিউনিকেশন ডেভেলপমেণ্ট-এর সদস্য শ্রী কে এন আর পিল্লাই-র "ভারতে টেলিফোন" শীর্ষক প্রবন্ধে টেলিফোনের আদি জন্ম কথা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে।—"জন্ম-কথার পর সাবালিকা বয়সে টেলিফোনের নাগাড় "এনগেজমেণ্টের" ইতিহাস এ প্রবন্ধে নেই" —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

নেহরুজীর জন্মবার্ষিকী দিবসে সর্বত্র 'শিশুদিবস' অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"চাচা বেঁচে থাকলে তিনি সাবালক-দিবস-এর ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই করে যেতেন, আমরা দেখছি সেটার প্রয়োজনই বেশি।"

সংবাদে শুনিলাম শেখ আবদুল্লার জন্য মাসিক খরচ পড়িতেছে ষোল হাজার টাকা। তাঁর পাচক-বেয়ারাদের খরচ সরকারই বহন করেন, তাঁর ব্যক্তিগত খরচের জন্য বরাদ্দ দেড় হাজার। বিশুখুড়ো বলিলেন— "তা হলেই বুঝুন দ্রব্য-মূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধের কথাটা কতটা ছেঁদো!!"

বাংলার পাখি সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনামা—'কোথায় গেল পাখি'।—"রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বলা যায়, 'ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি' কিংবা অজ্ঞাত কবির ভাষায় বলা যায়, 'যাও পাখি বলো তারে সে যেন ভুলে না মোরে' শুনে "সে"-র খোঁজে চলে গেছে; অকবির সাদামাটা বাংলায় বলা যায়, পাখি গেছে শিকারীর কবলে আর পেটুকের পেটে"—বলেন সহযাত্রী।

প্রসঙ্গত অন্য সহযাত্রী অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"পাখি সব করে রব শুনে যখন বোঝা যেত রাত পোহালো, তখন শুনতাম—'শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে', এখন পাঠের পাট উঠে গেছে সুতরাং পাখিরাও উড়ে গেছে।

এক সংবাদে শুনিলাম, সিংহল সরকার ভারত হইতে রপ্তানি-করা ভারতীয় শাড়ি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। শ্যামলাল

বলিল—"ভারতীয় শাড়ি পাছে সকলের মন জয় করে এবং সিংহলের বাজার ছেয়ে ফেলে তাই বুঝি এই সরকারী ব্যবস্থা। আমরা তবু হয়ত বলতে পারি, একদা যাহার শাড়ির বাহার হেলায় লঙ্কা করিল জয়!!"

অন্য এক সংবাদে পড়িলাম, ভারতে ইঁদুরের সংখ্যা ৪৮০ কোটি এবং এই সম্পর্কে 'খবরত্রয়' কলমে 'খবর-দার' বলিতেছেন—অর্থাৎ একজন মানুষপ্রতি মোটামুটি ছুঁচোর সংখ্যা কত সেটা জানতে পারলে জনসাধারণের উপকার হত।"

পঃ বঙ্গ মৎস্য দপ্তর দুর্গাপুরে একটি মিট প্রসেসিং ফ্যাকটরি খুলিয়াছেন। এই ধরনের ফ্যাকটরি ভারতে এই প্রথম, বলিয়াছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র। সহযাত্রী বলিলেন—"খুব ভালো কথা। ফ্যাকটরি তো হল, আমাদের বারবার মনে পড়ছে—থালা ভরা আছে মিঠাই দোয়াত আছে কালি নাই, সেই অবস্থা না হলেই হয়।"

শ্রীমোরারজী দেশাই বলিয়াছেন, মাদক বর্জন সম্বন্ধে যদি গণভোট গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে শতকরা আশি ভাগেরও

বেশি লোক মাদক বর্জনের পক্ষে ভোট দিবে। সহযাত্রী বলিলেন—"হিসেবটায় হয়ত ভুল আছে, কেননা আশি ভাগেরও বেশি লোকের ভোটাইতে চালু কারবার!!"

পরিবার পরিকল্পনার জন্য এখন হইতে লুপ-এর বদলে বড়ি বিতরণ করা হইবে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বড়িটির নাম শুনিলাম "ওভুলেন"। সহযাত্রী সংক্ষেপে বলিলেন—"ও ভুলে যান!!"

চীনের এক সংবাদে জানা গেল, সেখানে গৃহিণীরা বাসন-কোসন ক্রয় করিতে পারিতেছেন না, কারণ বাসন-কোসন প্রস্তুতের ধাতুদ্রব্য দিয়া বর্তমানে মাও চিহ্নিত ব্যাজ প্রস্তুত হইতেছে। শ্যামলাল বলিল— "বাসন-কোসনের প্রয়োজনটাই বা কী, হাতে কিছু চাউ চাউ আর মুখে হাঁউ মাঁউ (মাও) খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাউ বলতে পারলেই ত যথেষ্ট!"

বিশুখুড়ো বলিলেন—"খ্যাতকীর্তি শ্রী সি কে নাইডু তাঁর ইনিংস শেষ করে পরলোকের প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছেন। ১৯২৭ সালে গিলিগ্যানের টিমের বিরুদ্ধে তাঁর ১৩টি বাউনডারি আর ১১টি ওভার বাউনডারি দেখে সংবাদদাতা লিখেছিলেন— এ হিন্দু চ্যাপ নেমড নাইডু — — ইত্যাদি সেই নাইডু আর শুধু 'হিন্দু চ্যাপ' রইলেন না; ক্রিকেটের মাঠে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন সি কে।

"করুণাসাগর বিদ্যাসাগর"

দেশ পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। শ্রীইন্দ্রমিত্রর লেখা 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' আমি অত্যন্ত আগ্রহের সংগে পড়েছি। বাংলা দেশের এক মহৎচরিত্র মানুষের জীবনী তিনি সহজ ও সাধারণবোধ্য ভাষায় লিখছেন, এর জন্য পাঠকসমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তবু সম্প্রতি লেখক এমন কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করেছেন যেগুলির প্রতিবাদ না করলে সত্যের বিকৃতি ঘটতে দেওয়া হয় বলে মনে করছি। বিশেষ করে গত ১৭ই কার্তিকের পত্রিকায় লেখক মেট্রোপলিটান কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ 'সূর্যকুমার অধিকারী সম্পর্কে' এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা বিদ্যাসাগর চরিত্রের মহত্ব বাড়াতে সাহায্য করেনি, কিন্তু বাংলা দেশের আর একটি বিশিষ্ট মানুষের সুনামকে কলঙ্কিত করেছে। [পৃষ্ঠা ৪৩ : দ্বিতীয় কলম]

লেখক এই প্রসংগটি কোথায় আবিষ্কার করেছেন জানি না। লেখকের এবং দেশ পত্রিকার পাঠকসমাজের অবগতির জন্য, এবং ইতিহাসের বিকৃতিরোধের জন্য প্রসংগটির আলোচনা দরকার। কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে সূর্যকুমার অধিকারীর অবসরগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা আমিও করেছিলাম। বিদ্যাসাগর কলেজের পুরোনো রেকর্ডে এ বিষয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। সমসাময়িককালে বিদ্যাসাগরের জীবনী যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের কোন রচনাতে এ ঘটনার উল্লেখ নেই। থাকাও সম্ভব নয় কারণ ব্যাপারটি ছিল নিছক ব্যক্তিগত। একমাত্র বিদ্যাসাগর-বংশের কোন ব্যক্তির পক্ষেই যিনি সূর্যকুমারকেও ভালভাবে জানতেন—ঘটনাটি জানা সম্ভব হতে পারে। লেখক তেমন কোন চেষ্টা করেছিলেন কি? কিম্বা নিছক লেখার আনন্দে না লিখেছেন, তাতে একজন সম্ভ্রান্ত ও স্বর্গত ব্যক্তির মর্যাদাহানির প্রশ্নও যে জড়িত সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন?

সূর্যকুমার অধিকারী বিদ্যাসাগরের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। ১২৮২ সালের ৩০শে আষাঢ় (১৮৭৪ খৃঃ) বিদ্যাসাগরের ৬১নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসা-বাড়িতে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন রচিত জীবনচরিতের ২১৭ পৃষ্ঠায় আমরা পাই— "ইনি একুশ বৎসর বয়সের সময় হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিবাহের পর অগ্রজ মহাশয় সূর্যবাবুকে ঐ পদ পরিত্যাগ করাইয়া মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সূর্যবাবু প্রথমত অসম্মতি প্রকাশ করেন; অনেক বাদানুবাদের পর দাদার আগ্রহাতিশয় দেখিয়াও **অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন।"**

সূর্যকুমার কলেজের ভার নিলেন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। "১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে...সূর্যকুমার অধিকারী কলেজ এবং স্কুলের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়া আয় ও ব্যয়ের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।" [শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত পৃঃ ১৩৩]

সেই যুগে একটি সম্পূর্ণ বেসরকারী কলেজকে সূর্যকুমারই যে তাঁর অসামান্য কর্মকুশলতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তার পরিচয়ও বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকেই পাওয়া যায়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কলেজে বি-এ ক্লাস খোলা হয়, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ল' ক্লাস। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বি এল পরীক্ষায় মেট্রোপলিটান কলেজ প্রথম স্থান অধিকার করে। "সূর্যবাবু ১৩ বৎসর কাল মেট্রোপলিটানের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলেজের কার্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত হন।"

[চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৩১৭]

সূর্যবাবুর পরিচালনায় কলেজের যে অভাবিত সাফল্য—তার পরিচয় সরকারী রিপোর্টেও প্রত্যক্ষ।

"In the B.A. Examination the Govt. colleges passed 43.8 per cent, the aided colleges 40 p.c., while the un-aided Metropolitan Institution passed 45.3 p.c. The success of the Institution reflects great credit on its manager and the teaching staff." [Director's report 1882-83.]

"Natives have shown their capacity for maintaining institutions of a very high type and keeping up a very high standard of education ...." [Report of the Education Committee 1882-83.]

সূর্যবাবু যে কলেজের জন্য কিভাবে পরিশ্রম করেছিলেন তা শম্ভুচন্দ্রের বইতেও পাওয়া যায়—"প্রিন্সিপাল সূর্যবাবুর যত্নে শঙ্কর ঘোষের লেনে মহেন্দ্র নারায়ণ দাসের নিকট বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ন্যূনাধিক ত্রিশ হাজার টাকায় ভূমি ক্রয় করা হয়।" "...এ স্থলে ইহাও স্বীকার করা উচিত যে এই কয়েকটি স্কুল (শ্যামপুকুর, বউবাজার ও বড়বাজার ব্রাঞ্চ) স্থাপন সময়ে প্রিন্সিপাল সূর্যবাবু নিরন্তর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।" সূর্যবাবু যে বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন সে কথা জানা যায় সুবলচন্দ্র মিত্রর গ্রন্থ থেকে (পৃঃ ৬১৭)

"After the estrangement of his son Narayan Chandra he bestowed his whole paternal affection on Suryya Kumar."

সূর্যবাবুর সম্মানে এবং সূর্যবাবু বিদ্যাসাগরের বিশ্বাসভাজন ও প্রিয় হয়ে ওঠায় অনেকেই খুশী হতে পারেন নি। সূর্যবাবু নিজেও একজন বিশিষ্ট লেখক ও দার্শনিক ছিলেন। "প্রকৃতি-বিজ্ঞান" ও অন্য অনেক গ্রন্থের তিনি লেখক। 'কাননকুসুম' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসও তিনি রচনা করেন। তাঁর বহু প্রবন্ধ 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ফেলো ছিলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগেই তাঁর যোগাযোগ ছিল। "গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গংগোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, সূর্যকুমার অধিকারী এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি 'ভারত সভার' সভ্য হন [সাহিত্যসংখ্যা দেশ ১৩৭৪/৭৭

সূর্যবাবু যে কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য মোটেই ব্যগ্র ছিলেন না তা শম্ভুচন্দ্রের উক্তি থেকেই জানা যায়। কলেজ পরিচালনার কাজে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তার পরিচয় শম্ভুচন্দ্র ও চণ্ডীচরণ-এর গ্রন্থে এবং শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টে পাওয়া যায়। তাঁর সংগে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের কাছে জানা যায় যে, সূর্যকুমার অত্যন্ত আত্মাভিমানী ও জেদী স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁর শেষ জীবন কাটে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে। তাঁর শেষ জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতেও দেখা যায়

তিনি দাতা ছিলেন এবং বহু দুস্থ ছাত্র ও দরিদ্র ব্যক্তিকে পালন করেছেন।

লেখক ইন্দ্রমিত্র আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু তিনি একজন স্বর্গত ব্যক্তির চরিত্রে ধূলি লেপনের দায়িত্ব কেন গ্রহণ করেছেন, বুঝে উঠতে পারলাম না। লেখক হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করি বলেই দায়িত্বজ্ঞানহীন অমূলক উক্তি তাঁর কাছে প্রত্যাশা করি না।

সন্তোষকুমার অধিকারী
কলিকাতা-৩৪

লেখকের বক্তব্য

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার অধিকারীর চিঠি পড়ে এই ধারণাই প্রশ্রয় পায় যে, সূর্যকুমার অধিকারী কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে বিদ্যাসাগর সূর্যকুমারকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "(বিদ্যাসাগর) সূর্যবাবুকে পদচ্যুত করেন। এবং অঙ্কশাস্ত্রাধ্যাপক বাবু বৈদ্যনাথ বসুকে প্রিন্সিপালের কার্য চালাইবার ভারার্পণ করেন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৩১)

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে জানা যায় যে, বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ জামাতাকে কলেজ থেকে 'নির্মমভাবে বিদায়' দিয়েছিলেন। "অপর কোন যোগ্য ব্যক্তি কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিরাগভাজন হইলে, তিনি যাহা করিতেন, জামাতার বেলায়ও তাহাই করিয়াছেন।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৬)

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় জামাতা সূর্যবাবুর কোন কার্যের কর্তব্যত্রুটি বিবেচনায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন।...নিশ্চিতই সে কর্তব্যত্রুটিকে তিনি ক্ষমাতীত মনে করিয়াছিলেন।" (বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৫১৫)

বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই অকারণে সূর্যকুমারকে বরখাস্ত করেননি, নিশ্চয়ই অকারণে সূর্যকুমার বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের বিরাগভাজন হননি। কেন সূর্যকুমার বিদ্যাসাগরের বিরাগভাজন হয়েছেন, সূর্যকুমারের কোন কর্তব্যত্রুটিকে বিদ্যাসাগর ক্ষমাতীত মনে করেছেন, কেন বিদ্যাসাগর সূর্যকুমারকে বরখাস্ত করেছেন? দীর্ঘকাল এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি।

যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। কিছুকাল আগে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন।

বিদ্যাসাগর কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় যতীন্দ্রমোহনের ছাত্র ও সহকর্মী। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন যে, যতীন্দ্রমোহন অত্যন্ত সৎ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পক্ষে কোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন অমূলক উক্তি অসম্ভব ছিল।

বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গেও আমি দেখা করেছি। তিনি বলেছেন যে, যতীন্দ্রমোহন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং তাঁর পক্ষে কোনো অসত্য বিবরণ দাখিল করা অসম্ভব।

যতীন্দ্রমোহন ঘোষ লিখেছেন :

"এই কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) জামাতা 'সূর্য অধিকারী মহাশয়। তাঁহার উপরও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সজাগ ও কঠোর দৃষ্টির অভাব ছিল না। অধ্যাপক মুক্তিদারঞ্জন রায়ের (তখন বোধ হয় তিনি কলেজের এফ এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন) নিকট যেমন শুনিয়াছি তেমন লিখিতেছি।

একদিন কলেজের আয় ব্যয়ের খাতা দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় লক্ষ করিলেন যে হাজার ২।৩ টাকার ঘাটতি পড়িয়াছে। দেখিয়াই অধ্যক্ষ অধিকারী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন। "সূর্য্যি, হিসাবটা একবার দেখতো? আমি তিনদিন বাদে আবার আসিব।" তিনদিন বাদে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সূর্য্যি, হিসেবটা মিললো? অধ্যক্ষ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর সদুত্তর না পাইয়া তখনই ১৬ বছরের পুরাতন অধ্যক্ষকে বলিলেন, "টাকার যদি দরকার ছিল তো আমায় বললে না কেন? একি আমার বাপের টাকা? এ যে ছেলেদের টাকা। যাক্ আজ থেকে তোমায় আর প্রিন্সিপালগিরি করতে হবে না।" তারপরই উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "বদ্দিনাথ।" বৈদ্যনাথ বসু উপস্থিত হইলে বলিলেন, "আজ থেকে তুই কলেজের প্রিন্সিপাল"। একেবারে Summary trial." (বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৬০, পৃঃ ৩১)

মুক্তিদারঞ্জন দীর্ঘকাল বিদ্যাসার কলেজে অধ্যাপনা করেছেন, বিদ্যাসাগর ও সূর্যকুমার দুজনকেই তিনি সম্ভবত কাছ থেকে দেখেছেন, আলোচ্য বিবরণটি যতীন্দ্রমোহন মুক্তিদারঞ্জনের কাছেই পেয়েছেন। কী ধরনের মানুষ ছিলেন মুক্তিদারঞ্জন? বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য আমাকে বলেছেন যে, মুক্তিদারঞ্জন সত্য না জেনে কখনো কিছু বলতেন না।

যতীন্দ্রমোহনের বিবরণটি প্রকাশিত হবার পর একযুগেরও অধিক সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিবাদ হয়নি। এবং কোথাও এমন কোনো প্রমাণ আবিষ্কার করতে পারিনি যার উপর নির্ভর করে যতীন্দ্রমোহনের বিবরণটিকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে। আমি অতএব যতীন্দ্রমোহনের বিবরণটির উপর নির্ভর করেছি এবং অবশ্যই কোনো 'দায়িত্বজ্ঞানহীন অমূলক উক্তি' করিনি।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার অধিকারী জানতে চেয়েছেন : "একমাত্র বিদ্যাসাগর-বংশের কোন ব্যক্তির পক্ষেই যিনি সূর্যকুমারকে ভালভাবে জানতেন—ঘটনাটি জানা সম্ভব হ'তে পারে। লেখক তেমন কোন চেষ্টা করেছিলেন কি?" সবিনয়ে নিবেদন করি: না, তেমন কোন চেষ্টা করিনি, কেননা, বহুকাল আগেই বিদ্যাসাগরের বংশ লোপ হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র অনেককাল আগে লোকান্তরিত হয়েছেন। এবং নারায়ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র প্যারীমোহন অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন।

'একজন স্বর্গত ব্যক্তির চরিত্রে ধূলি লেপন' আমার উদ্দেশ্য নয়। সূর্যকুমার অধিকারীর নানাবিধ কৃতিত্ব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আমি কেন অযথা সূর্যকুমারকে অসম্মান করতে যাব, তাঁকে অসম্মান করে আমার কোন স্বার্থ সিদ্ধ হবে? বিদ্যাসাগর যে স্বজনপোষণের বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন সে-সত্য উপস্থিত করার জন্যেই আমি আলোচ্য বিবরণটি সন্নিবেশিত করেছি।

আমার সামান্য রচনা 'অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে' পড়ছেন বলে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার অধিকারীকে বারংবার ধন্যবাদ।

ইন্দ্রমিত্র

থিয়েটার প্রসঙ্গে সার্ত্র

"আলটোনার বন্দী" নাটকটি প্যারিসে প্রথম অভিনীত হবার সময় তুমুল আন্দোলন উঠেছিল, সেই সময় ফরাসী সাপ্তাহিক পত্রিকা "দি এক্সপ্রেস"-এর পক্ষ থেকে তিনজন সাংবাদিক জাঁ পল সার্ত্র-কে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে সার্ত্র যে-সব কথা বলেছিলেন, তাতে নাটক সম্পর্কে তাঁর সমগ্র [illegible] প্রতিফলিত হয়েছিল। ঘটনাটি আট বছর আগের কিন্তু সেই ইণ্টারভিউটি সম্ভবত বাংলায় অনূদিত হয়নি, তাই অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধার করছি।"

প্রশ্ন : আপনি "আলটোনার বন্দী" নাটকটা লিখলেন কেন? শুধু এই নাটকটার কথা বলছি না, মানে জানতে চাইছি, কিছু প্রকাশ করার জন্য আপনি থিয়েটারের মাধ্যমে বেছে নিচ্ছেন কেন?

সার্ত্র : প্রথম কারণ, আমি আমার উপন্যাসটা শেষ করতে পারছি না। 'দি রোডস অব ফ্রিডম'-এর চতুর্থ খণ্ড প্রতিরোধ আন্দোলন নিয়ে লিখবো ভেবেছিলাম। তখন এই রকম বিষয় নির্বাচন সহজ ছিল—পরে অবশ্য সেটা আঁকড়ে থাকা বেশ সাহসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান কালের উৎকণ্ঠা ১৯৪৩ সালের গল্পের পটভূমিকায় ফোটানো আমার পক্ষে অসুবিধে।

প্রশ্ন : আপনার কি ধারণা উপন্যাসের চেয়ে নাটকের মাধ্যমে আপনি বেশী লোকের কাছে পেঁছোতে পারবেন?

সার্ত্র : নাটক যদি সার্থক হয় তবে সেই লেখক বিশাল জনসমষ্টির কাছে সহজেই পেঁছোতে পারেন, অন্তত কিছুদিনের জন্য। তারপর, কি জানি...। একটা সার্থক নাটক যদি ১০০ রাত্তির চলে—তাহলে প্রায় ১ লক্ষ দর্শক...কোনো উপন্যাস ১ লক্ষ কপি বিক্রি হওয়া যথেষ্ট অভাবনীয়...

প্রশ্ন : আপনার অনেক বই তো পকেট বই সংস্করণে ১ লক্ষেরও বেশী কপি বিক্রি হয়েছে, তা ছাড়া একটা বই অনেকে পড়ে—

সার্ত্র : তা ঠিক। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম। একটা বই-এর সার্থকতা কত কপি বিক্রি হলো তার ওপর নির্ভর করে না। আমি এমন বেশ কয়েকটা বিস্ময়কর বই-এর কথা জানি—তিন চার হাজারের বেশী বিক্রি হয়নি—অথচ সেইসব বই একটা জেনারেশানকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। কাফ্কার বই ফ্রান্সে বেশী বিক্রি হয়নি, অথচ কাফ্কাকে বাদ দিলে আমার মতো অনেক বুদ্ধিজীবীরই রূপ অন্য-

রকম হতো। থিয়েটার যে-হেতু বেশ খরচের ব্যাপার—সেইজন্য তার তৎক্ষণাৎ সার্থকতা চাই। ব্যর্থ হলেই তার দায় নাট্যকারের। উপন্যাসে ঠাণ্ডা সুরে কথা বলা যায়, কিন্তু নাটকে উচ্চকণ্ঠ হতে হবেই। এই ব্যাপারটাই বোধ হয় থিয়েটার সম্পর্কে আমাকে আকর্ষণ করে।

প্রশ্ন : দর্শকরা নাটক থেকে কী আশা করে আপনার ধারণা?

সার্ত্র : আমিও তো সেটা জানতে চাই। থিয়েটার একেবারে জনসাধারণের সম্পত্তি। দর্শকরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই নাটকটা নাট্যকারের হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্তত আমার সব নাটকগুলোই এখন আমার অধীন নয়। ওরা এক একটা object হয়ে গেছে। পরে অবশ্য বলা যায়, "আমি তো ও কথা বলতে চাইনি"—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাইজার যে রকম বলেছিলেন—কিন্তু যা একবার হয়ে গেছে, তা হয়েই গেছে।

প্রশ্ন : সেটা সিনেমার ক্ষেত্রে খুবই সত্যি। জনসাধারণ সেটা "গ্রহণ" করার পর হয় মানেটা বদলে ফেলে কিংবা নতুন অর্থ চাপায়, কিন্তু নাটকের ব্যাপারে কি নাট্যকার রিহার্সালের সময় তাঁর মতামত জানাতে পারেন না?

সার্ত্র : না। নাটকটা যেভাবে উপস্থিত হয়েছে সেটাই বড়, অভিনেতা বা পরিচালককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অভিনেতাদের হাঁটা চলা, আলো, দৃশ্যসজ্জা, মুখভঙ্গী—সব মিলিয়ে নাটক একটা আলাদা সৃষ্টি হয়ে ওঠে—যেটা নাট্যকারের সীমানার বাইরে।...আধুনিক চিত্র শিল্পীরা যেমন বলেন, শিল্প প্রথমেই একটা object, মঞ্চের ওপর নাটকও তাই।

প্রশ্ন : আপনি কি এই সময় এই বদল পছন্দ করেন?

সার্ত্র : না। কিন্তু উপায় কি? 'পাবলিক' হচ্ছে একটা সমষ্টি—প্রত্যেক দর্শকই নাটক দেখার সময় শুধু নিজের অনুভূতির কথাই চিন্তা করে না, অন্যরা কি ভাবছে—সেটা নিয়েও মাথা ঘামায়।..

...আমার "নোংরা হাত" নাটকটা যখন প্রথম অভিনীত হলো—অনেকে সেটা ভালো বলেছিলেন। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল, ওটা কি সাম্যবাদ বিরোধী, কিংবা না? চরম বামপন্থী কাগজগুলো কোনো মতামত জানালো না। তারপর যখন তারা মন স্থির করলো যে ওটা সম্পূর্ণই ওদের পার্টিকে আক্রমণ করে লেখা (আমি মোটেই সে রকম কথা ভাবিনি)—তখন আমার দক্ষিণপন্থী কাগজগুলোতে ওর প্রশংসার ধুম পড়ে গেল। ফলে বামপন্থীরা আরও নিশ্চিন্ত হলো। সেই থেকে নাটকটা এমন একটা objective অর্থ গ্রহণ করেছে—আমি হাজার চেষ্টা করেও তা বদলাতে পারিনি।

প্রশ্ন : কিন্তু আপনি তো আলাদাভাবে আপনার মতামত জানাতে পারতেন!

সার্ত্র : সেটা হতো অরণ্যে রোদন। থিয়েটারে—আমি কি বোঝাতে চেয়েছিলাম তার কোনোই মূল্য নেই। একমাত্র দাম, কি বোঝা যাচ্ছে। নাট্যকারের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও ওই নাটকটির লেখক।...

আমাদের কালে দর্শকদের মধ্যে অনেক

শ্রেণী, তাদের মত ও রুচি পরস্পর বিরোধী। মোটের ওপর থিয়েটার এখনও বুর্জোয়া সমাজের দ্বারা পুষ্ট। তারাই বর্ধিত হারের টিকিট কিনে থিয়েটারকে বাঁচায়। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমন কি শাসক শ্রেণীর মধ্যেও এমন পরস্পর বিরোধিতা আছে যে—যে-কোনো একদিকের চিত্র ফুটিয়ে যদি একদলকে খুশী করা যায়—তবে অন্যদল হয়তো চটে যাবে। ফলে থিয়েটারে সাধারণত মানুষ ও পৃথিবীর পরিবর্তনের ছবি ফোটানো হয় না—বরং এমন একটা ছবি দেয়—যা এই অপরিবর্তিত বিশ্বের অপরিবর্তিত মানুষের।

সনাতন পাঠক

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য। সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২। ৪·৫০ টাকা।

প্রতিবেশী সাহিত্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যে একেবারেই আলোচনা হয় না তা নয়: কিন্তু তা হঠাৎ জোয়ারের মতো। নিয়মিতভাবে ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যের সংগে কোনো সংযোগ স্থাপন আমরা করিনি, আমাদের পাশাপাশি সমকালীন ভারতের তরুণ লেখকগোষ্ঠী কী ভাবছেন, কী লিখছেন তা আমাদের অগোচর রয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই উদাসীনতার কোনো সংগত ব্যাখ্যাও যে দিতে পারি এমন নয়। পক্ষান্তরে, সাগরপারের সাহিত্যের বাজারের দু-ঘণ্টা আগের হালচাল না জানলে আমাদের স্বস্তি নেই। ব্যাপারটি দুঃখজনক, সন্দেহ নেই।

অথচ অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর ঠিক বিপরীত চিত্রই দেখতে পাই। বাংলা ভাষার তরুণতর লেখকগোষ্ঠীও সেখানে শুধু নামে পরিচিতই নয়, অনুবাদের মাধ্যমে তাঁদের রচনাও সসম্মানে পরিবেশিত হচ্ছে। মূল কথা, বাংলা সাহিত্যের সংগে একটি সুগভীর টান ভারতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে পরিব্যক্ত।

শ্রীযুক্ত সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য' এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। শ্রী চট্টোপাধ্যায় চেয়েছেন, ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও অবদান সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করতে। তাঁর আলোচনা মুখ্যত হিন্দী-ওড়িয়া এবং অসমীয়া সাহিত্যকে ভিত্তি করে। অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের উল্লেখ থাকলেও সেসব ক্ষেত্রে প্রসংগ অতিরিক্ত ক্ষুদ্রায়তন। কিন্তু সব মিলিয়ে, একটি প্রত্যাশিত ও স্বল্পালোকিত আলোচনার সূত্রপাত তিনি যে করেছেন সেজন্য নিঃসন্দেহে তিনি ধন্যবাদ-ভাজন।

সুধাকরবাবু গ্রন্থটিকে সাতটি সুবিন্যস্ত অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রাচীন ও আধুনিক ভারত-সংস্কৃতিতে বাংলার ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। প্রাদেশিক সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রাক্-রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্যের অল্পবিস্তর পরিচয় তুলে ধরে রবীন্দ্র-প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। সুধাকরবাবুর প্রবন্ধের কয়েকটি অংশে এসে বিস্মিত হতে হয়ঃ সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রভাব এত আক্ষরিক অর্থে স্পষ্ট যে, লেখপর্যন্ত তাকে 'প্রভাব' না বলে অন্য কিছু ভাবতে ইচ্ছে হয়। অবশ্য, এ-প্রভাব মূলত রবীন্দ্র-কাব্যের। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য ও সমগ্র মানস কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে ভারতীয় সাহিত্যকে, এ-নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা সুধাকরবাবু এ-গ্রন্থে করেননি। পরবর্তী কালে এই প্রসংগে তিনি সমান গুরুত্ব দেবেন এমন আশা করতে পারি। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বক্তব্যের সংহতি বিশেষ করে চোখে পড়ে। ফলে, সাধারণ পাঠকের কাছেও তাঁর রচনা সমাদর পাবে।

সুধাকরবাবু এই গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য' নিয়ে একটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই অধ্যায়টি সম্পর্কে সামান্য দ্বিধা জাগল। প্রথমত, এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্যের সংগে অধ্যায়টির সম্পর্ক কম। দ্বিতীয়ত, এটি এমনই একটি প্রসংগ যা নিয়ে উনিশ পৃষ্ঠার আলোচনায় বিহংগ-চক্ষু নিরীক্ষাও অসম্ভব মনে হয়। বহু-আলোচিত হলেও এ-সম্পর্কে আলোচনা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বিশেষ করে, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এই প্রভাব-নির্ণয় স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থের উপাদান হতে পারে। সুধাকরবাবু সেক্ষেত্রে দু-তিন পৃষ্ঠার বেশী স্থান করতে পারেননি। এই সব দিক থেকে বিবেচনা করে মনে হয়, ভাসা-ভাসা আলোচনার পরিবর্তে অধ্যায়টি বর্জিত হলেও ক্ষতি ছিল না। হয়তো 'ভারতীয় সাহিত্য'—গ্রন্থের এই নাম সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ হতো না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিবেশী সাহিত্যের আলোচনা আরও বিস্তারিত ও পূর্ণাংগ হতো। ১০৫/৬৭

গল্প

বনবাসর। বুদ্ধদেব গুহ। গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

দৈনিকপত্রের সাহিত্য সাময়িকীতে বুদ্ধদেব গুহ রচিত "শিকার কাহিনী" মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। ওলটানো কথার অর্থ, লেখাগুলো আসলে শিকার কাহিনী নয়ঃ শিকার, অথবা বন-জংগলের পটভূমিকায় কতকগুলো গল্প যার বেশির ভাগই রোমান্টিক। অন্তত, 'বনবাসর'-এর দশটি গল্পই তাই।

অর্থাৎ, পটভূমিকা—চল্লিশ দশক থেকে সেই যে শুরু হয়েছে, নতুন নতুন সাধারণের অজানা, অচেনা, অদেখা পটভূমিকার গল্পের বিন্যাস, এই দশকে এসে নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সংস্পর্শে তা বহুধা-বিস্তৃত। তাতে আপত্তির কিছু নেই যদি লেখা রসোত্তীর্ণ হয়। কিন্তু, মুশকিল এই রস বস্তুটি নিয়েঃ ওটি সৃষ্টি করা বেশ কঠিন কাজ; মনে হয়, বাঘ-সিংহ

শিকার এবং বিজন বনে রোমান্স করার চেয়েও।

বুদ্ধদেব গুহর লেখায় বন-জঙ্গল, পাহাড়-ঝরনা-নদী, জন্তু-জানোয়ার-পাখি, নানান ধরনের মানুষ, এবং সুন্দরী দেশী-বিদেশী স্ত্রীলোক—সবই পাচ্ছি, পাচ্ছি ইংরেজী গানের কলি, উর্দু শায়র, হিন্দি বাত, স্মার্ট কথাবার্তা, টুকরো-টাকরা কাব্য, এবং আরো অনেক কিছু; কিন্তু সেই বস্তু ততটা পাচ্ছিনে যাতে মন ভরে। এগুলো যেন গল্পের জন্যেই গল্প—মনে হয় আগে থেকেই ছক কষে নেওয়া। তবে, হালকা-পাঠের পক্ষে এ-বই বেশ উপযোগী এবং অনেক বইয়ের চেয়ে ভাল।

(৩৫৮।৬৭)

কিশোর সাহিত্য

রহস্যময় মোহেন-জো-দড়ো। বিমলেন্দু চক্রবর্তী। ঋতায়ণ, ২২।২এ, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। মূল্য : দুই টাকা।

ছোটদের জন্যে সরল ইতিহাস লেখা কঠিন কাজ। মোহেন-জো-দড়োর ইতিহাস লেখা আরো কঠিন বোধ হয়—ভূমিকায় বলেছেন লেখক। কিন্তু এই দুরূহ কাজটি তিনি আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। অত্যন্ত স্বল্প-পরিসরে, সহজ, সরল ভাষায়, একেবারে গল্পের ছলে—অথচ গোটা মানব সভ্যতার বিস্তীর্ণ পট-ভূমিকায় লেখক কিশোর-কিশোরীদের উপ-যোগী একখানি চমৎকার বই লিখেছেন। পরিসর সংক্ষিপ্ত হলে কী হবে—মোহেন-জো-দড়োর প্রধান প্রধান তথ্যের সঙ্গে নানান টুকিটাকি খবরও এ-বইয়ে ঠাসা; কিন্তু কোথারও তা গুরুভার হয়নি।

(৩৫৬।৬৭)

কলকাতার লজ্জা

বাংলা দেশে ফিল্মের কতখানি উন্নতি হয়েছে, এবং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বাংলা যে সারা ভারতের পথপ্রদর্শক, এই কথা দীর্ঘকাল যাবত আমরা শুনে আসছি। রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশী চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনের সময় কিংবা চলচ্চিত্রলোকের অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই তত্ত্বটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। নানা জনের মুখেই আত্মতুষ্টির এই সব কথা নানা সময়ে উচ্চারিত হয়। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা কিংবা পণ্ডিতবর্গ ও জননেতারা সময় বিশেষে ও ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা ফিল্মের গুণগান করে থাকেন। ফিল্ম সোসায়েটি ও ক্লাবের কর্মকর্তারাও গর্বিত এই ভেবে যে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনের আন্দোলন কলকাতার মত ভারতের আর কোথাও তেমন ব্যাপক নয়। ফিল্ম সোসায়েটি বা ক্লাবের সভ্য সংখ্যা এই শহরেই সর্বাধিক।

কিন্তু কলকাতার লজ্জার কথা কেউ বলেন না, ভাবতেও বোধহয় চান না। সবাই যেন তা ঢেকে রাখতে ব্যস্ত। কলঙ্ক অপনোদনের কোন চেষ্টাও নেই। মাদ্রাজে আর্ট থিয়েটার আছে, বোম্বাইয়ে আর্ট থিয়েটার তৈরির জন্য অর্থসংগ্রহ চলছে। কলকাতায় আর্ট থিয়েটার প্রস্তুতির কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। এখানে এক্জিবিটাররা বড় তারকার ছবি দেখাবার জন্য আগ্রহান্বিত। বাংলা ছবি ছেড়ে অনেক সময় তাঁরা বোম্বাই চিত্রের পিছনেও ধাওয়া করছেন। অনুশোচনার কথা এই বাংলা চিত্রের জন্য যে-সব চিত্রগৃহ নির্দিষ্ট থাকতে পারত এবং ছিল ওই সব সিনেমায় হিন্দী ছবি দেখানো হচ্ছে। সামান্য যে কয়েকটি 'রিলিজ চেন' আছে তাতেও শিল্পসমন্বিত চিত্রের প্রবেশাধিকার নেই। স্টার-মার্কা ছবি দেখাবার ফাঁকে যদি দুয়েক সপ্তাহ মিলে যায় তবে ফিকস্‌ড বুকিং বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন কোন ছবির মুক্তির ব্যবস্থা হয়ত হয়। দীর্ঘকাল যাবত তৈরি হয়ে পড়ে আছে এমন এক্সপেরিমেণ্টাল ছবির সংখ্যাও একটি নয়, একাধিক। মুক্তির আশায় দরজায় দরজায় ঘুরে প্রযোজকরা এখন ক্লান্ত। মুক্তির আশা এখনও তাঁদের কাছে মনের বিলাসিতা মাত্র। অনেক কঠোর মন্তব্যও তাঁদের শুনতে হয়। চিত্রপ্রদর্শকরা যেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। তাঁরা বুঝতে পারেন কোন্ ছবি পয়সা দেবে, কোন্ ছবি দেবে না। ভ্রান্ত অভিজ্ঞতার উপর অটুট আস্থা রেখে তাঁরা একটির পর একটি স্টার-বর্জিত চিত্র বর্জন করে চলেন। অথচ তাঁদের অভিজ্ঞতা যে সদা সত্য হয় না তা "পথের পাঁচালী"-র পর অনেক ছবিই প্রমাণ করে দিয়েছে। এবং স্টাররাও যে সদা-সর্বদা সিনেমা গৃহকে টাঁকশালে পরিণত করতে পারেন না এই তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাঁদের আছে।

অতএব গৃহবিতাড়িত কিংবা গৃহহীন চিত্রগুলি যাবে কোথায়? অথচ এই ছবিগুলির মধ্যেও এমন শিল্পকর্ম থাকা সম্ভব যা নিয়ে আত্মপ্রসাদের গালভরা বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগও নেতাদের এসে যেতে পারে। বাংলা চলচ্চিত্রের মর্যাদাও বাড়তে পারে। অনাথ আশ্রমের মত একটি আর্ট থিয়েটারও কি তাদের জুটতে পারে না?

আধুনিককালে আর্ট থিয়েটারের সার্থকতা কী তা বিশদভাবে বলার প্রয়োজন নেই। সভ্য দেশের সর্বত্র যা আছে কলকাতায় তা অদৃশ্য। এই শহরেই নাকি আবার ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্ম। আমরা আজও কিন্তু লজ্জায় অধোবদন নই। সম্প্রতি ফরাসী চিত্র উৎসবের সময় যে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন, তাঁরাও সাংবাদিক সম্মেলনে আর্ট থিয়েটার তৈরির

"চিরদিনের" : উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী—অগ্রদূতের পরিচালনায় অনিমা চিত্রমন্দিরের এই ছবিটির কাজ আরম্ভ হয়েছে। —ফটো-দেশ

সলিল সেন পরিচালিত সরকার প্রোডাকশন্স-এর 'অজানা শপথ'-এর মুক্তি আসন্ন—ছবির একটি দৃশ্যে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমেন চক্রবর্তী

প্রয়োজনীয়তার কথা বলে গিয়েছেন। জাক নিকো বলেছেন, আর্ট থিয়েটার থাকলে তাঁরা ছবি পাঠাতে পারেন। মুনাফার আশা ছেড়ে দিয়েও তাঁরা ছবি পাঠাতে রাজী। লজ্জার সঙ্গে তাঁদের জানাতেই হল, আমাদের আর্ট থিয়েটার নেই। আর্ট থিয়েটার থাকলে আমরা বিদেশী ছবি দেখবার সুযোগ পেতে পারি। আর্ট থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা যে সামান্য হবে না তা হলপ করেই বলা যায়। বিদেশের ফিল্ম এক্সপেরিমেন্ট দেখার আগ্রহ কলকাতার দর্শকদের মধ্যে কত প্রবল সে-প্রমাণ আমরা পেয়েছি। সকলেই সোসায়েটি বা ক্লাবের সভ্য নন বলে ছবি দেখতে পারেন না। বিভিন্ন ক্লাব বা সোসায়েটির সভ্যসংখ্যাও বাড়ছে। আর সভ্য নেবার ক্ষমতাও ক্লাবগুলির নেই। আজও যদি আর্ট থিয়েটার তৈরি না হয় তো কবে হবে? আর্ট থিয়েটার থাকলে এখানকার কিছু এক্সপেরিমেন্টাল ছবিরও মুক্তির ব্যবস্থা হয়। পরিচালকদের মধ্যে ফিল্ম এক্সপেরিমেন্টের আগ্রহও তাতে বাড়বে। মূলত বাংলা চলচ্চিত্রই লাভবান হবে। আর্ট থিয়েটারের সপক্ষে কী কী যুক্তি আছে তা রাজ্য সরকার কিংবা ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন আন্দোলনের কর্মকর্তাদের অজানা নয়। এখন শুধু সদিচ্ছার প্রয়োজন। আর চাই আর্ট থিয়েটার নির্মাণের জন্য বলিষ্ঠ আন্দোলন। সোসায়েটি ও ক্লাব গড়ে তুলে যাঁরা ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন আন্দোলনকে সার্থক পরিণতি দান করেছেন তাঁরাই এই ব্যাপারে অগ্রণী হতে পারেন। আন্দোলন আরম্ভ হলে রাজ্য সরকারের সাহায্য পেতেও অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। "শুভস্য শীঘ্রম"—এই সারবাক্যটি ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের নেতাদের স্মরণ রাখতে হবে। রাজ্য সরকারও এ-বিষয়ে অবহিত হোন—এই অনুরোধ।

পাদপ্রদীপের আলোয়

বিশ্বরূপায় "আগন্তুক"

দ্বৈত চরিত্রে একই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ সিনেমায় হামেশাই দেখা যায়। মঞ্চে তা বিরল। কাজটি দুরূহও বটে। কিন্তু নাট্য পরিচালক তরুণ রায় অতি সহজেই এই অসাধ্য সাধন করেছেন। "আগন্তুক" নাটকে কে আসলে রণদেব চৌধুরী (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে হিল ভিউ হোটেলের মালিক) তা দর্শকের পক্ষে বোঝা কঠিন। মুহূর্তের ব্যবধানে একজন সামনে হাজির, অপরজন অদৃশ্য। আবার একাধিক দৃশ্যে একই সঙ্গে দুজনকে মঞ্চে দেখা যায়। শেষ দৃশ্যটি তো বিস্মিত করে—যেখানে রণদেব চৌধুরীর মৃতদেহের সামনে হুবহু তারই মত দেখতে একজন অপর এক পাপিষ্ঠকে গুলি করেছে। দ্বৈত চরিত্রের ব্যাপারটি যেন যাদুখেলা—দর্শকের সতর্ক দৃষ্টির সামনে সব ঘটছে অথচ কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

"আগন্তুক" (প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত) দেখার সুখ এখানেই শেষ নয়। গুপ্তচরবৃত্তির কাহিনী এবং ক্রাইম-নাটকের যা প্রধান আকর্ষণ, এক কথায় যাকে বলতে পারি রুদ্ধশ্বাস রহস্য বা সাসপেন্স, তা এই নাটকে পুরোমাত্রায় লভ্য। নাটকের পটভূমি হিল ভিউ হোটেল। হোটেলটি যে একটি পাপচক্র সেই আভাস নাটকের শুরুতেই। হোটেলের বাসিন্দা ও কর্মচারী সকলকেই গোড়ায় এক পলকে আলো-অন্ধকারে দেখিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওই মুহূর্তেই দর্শকের মনে কৌতূহল জেগে ওঠে। তাঁর মন উন্মুখ থাকে কখন কী ঘটছে দেখবার জন্য। নাটকের "ক্রিমিন্যাল" শুধুই অপরাধ-চূড়ামণি নয়, দেশদ্রোহীও বটে। শত্রু-রাষ্ট্রের সঙ্গে তার যোগসাজস। দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বানচাল করাই তার দলের কর্মসূচী। তা শেষ পর্যন্ত এক অসমসাহসী গোয়েন্দার তৎপরতায় কেমন করে ব্যর্থ হল তাতেই নাটকের পরিণতি। ওই গোয়েন্দা দেখতে খলনায়কের মত। ওইখানেই দর্শকের বিভ্রান্তির সুখ ও বুদ্ধির উত্তেজনা। নাটকটি যেভাবে রোমাঞ্চ ও রহস্যের উপকরণের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নাট্যঘটনার প্রতি দর্শকের মনোযোগ

বিশ্বরূপায় "আগন্তুক" নাটকে (উপরে) তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, রবীন মজুমদার নীচে) সুলতা চৌধুরী, প্রণত ঘোষ ও অজিত মিত্র। —ফটো-দেশ

"সমান্তরাল"-এর গান রেকর্ডিং অনুষ্ঠান। সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায় ও সবিতা চৌধুরী। —ফটো-দেশ

মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয় না। নাট্য-পরিচালনার প্রধান কৃতিত্ব এইখানেই, যার জন্য পরিচালক তরুণ রায় দর্শকের ভূয়সী প্রশংসা পাবেন।

অপরাধ-উপাদান এবং রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির ভিতরেও রয়েছে কৌতুকের আয়োজন। কৌতুকের মাত্রা একটু বেশী কিনা সে প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। তবে এক দিকে উৎকণ্ঠা, অপর দিকে কৌতুকরস এই দুইয়ের মাঝখানে দর্শকের আমোদপ্রাপ্তির যোগ আশাতীত। কৌতুকের সৃষ্টি হোটেলের বোর্ডারদের নিয়ে এবং বিশেষ করে এক রিটায়ারড জজের একান্ত সচিবকে কেন্দ্র করে। হোটেলের নর্তকী সরলা এবং রিসেপশনিস্ট নিমার (শেরপা মেয়ে) উপাখ্যানও নাটকের অংগীভূত। সরলা ভালবেসেছে ওই অঞ্চলেরই এক বিত্তবান যুবককে। কিন্তু সরলা অনেক চেষ্টা করেও পাপের রাজত্ব থেকে বেরোতে পারেনি। বেরিয়ে আসতে চাইলে ভিলেনের শিকারদের ভাগ্যে যা ঘটে সরলার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, যথাসময়ে সে নিহত হয়। নিমা দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে এবং বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে গোয়েন্দাকে সাহায্য করেছে।

নাটকের দৃশ্যকল্পনা (হোটেলের দৃশ্য) এবং পাপীদের কনট্রোল রুম দেখবার মত। মঞ্চসজ্জায় অমর ঘোষের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। অবাক করে দেবার মত হল আলোকসম্পাত (আশুতোষ বড়ুয়া-কৃত)।

সব শিল্পীরই অভিনয় চমৎকার। তবে তরুণ রায় দ্বৈত চরিত্রে যে অভিনয়-নৈপুণ্য দেখালেন তার বুঝি জুড়ি নেই। নিমা সেজেছেন দীপান্বিতা রায়। সুন্দর, প্রাণবন্ত তাঁর চরিত্রচিত্রণ। হোটেল নর্তকীর ভূমিকায় সুলতা চৌধুরীর অভিনয়ও উঁচুদরের। প্রণয়ের মুহূর্তে এবং বিপদের সময়েও তিনি সমান দক্ষতার সংগে চরিত্রটিতে প্রাণ সঞ্চার করে গিয়েছেন। তবে হোটেল নর্তকীর কোমরের দিকের কাপড় সব সময়েই নাভির নীচেই কি থাকতে হবে? হোটেলের ম্যানেজার তথা ভিলেনের পার্শ্বচর রূপে রবীন মজুমদার আবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিলেন। দর্শকদের যাঁরা খুব হাসিয়েছেন তাঁদের মধ্যে (সকলেই হোটেলের বোর্ডার) প্রণত ঘোষ, পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, অমৃতভূষণ গুজরাল ও সংযুক্তা গুজরাল উল্লেখযোগ্য। তবে এঁদের মধ্যে পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়ের কৌতুকাভিনয় খুবই ভাল। অন্য তিনটি বিশেষ ভূমিকায় চরিত্রানুগ কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন সমরেশ চক্রবর্তী, অজিত মিত্র ও অনুকূল দত্ত। পার্শ্বভূমিকায় বিভাস মুখোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, অমল মজুমদার, মিস পলিন প্রভৃতি সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখেন।

ভি বালসারার সংগীত পরিবেশানুগ। হোটেল-নর্তকীর মুখের গানটির সুরও বেশ হালকা।

শৌভনিকের নতুন নাটক

শৌভনিক-গোষ্ঠী এ-সপ্তাহেই দুটি নতুন একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করছেন। একটি বুদ্ধদেব বসুর "পাতা ঝরে যায়", অপরটি এডওয়ার্ড অ্যালবির "জু স্টোরি"-র ভিত্তিতে "চিড়িয়াখানার গল্প" (সোমেন্দ্র নন্দী-কৃত)। পরীক্ষামূলক নাট্যপ্রয়াস দুটির বিভাগীয় দায়িত্বে আছেন সুধাংশু মণ্ডল (নির্দেশনা), স্বরূপ মুখোপাধ্যায় (আলো), বিমল চক্রবর্তী (মঞ্চ) এবং অশোক মিত্র (সংগীত)। দুটি নাটকেরই চরিত্র দুটি করে। শৌভনিক-সংস্থার তিনজন শক্তিমান অভিনেতা নিমু ভৌমিক, গোবিন্দ গাঙ্গুলি ও অশোক মিত্র এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী অনুরাধা দাশগুপ্তা নাটক দুটিতে অভিনয় করবেন। মুক্ত-অঙ্গনে নাটক দুটির প্রথম অভিনয় ২৫ নভেম্বর।

আগামী ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে শৌভনিক মঞ্চস্থ করবেন মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য" এবং প্রফুল্ল রায়ের "নোনা জল মিঠে মাটি" (নাট্যরূপ : সুধাংশু মণ্ডল)। কৃষ্ণ কুণ্ডু ও গোবিন্দ গাঙ্গুলি যথাক্রমে নাটক দুটি পরিচালনা করবেন।

অন্ধ্র প্রদেশের নৃত্যগীত

আন্তঃরাজ্য সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্প্রতি কলকাতায় অন্ধ্র প্রদেশ থেকে নৃত্যগীতশিল্পীদের একটি দল এসেছিলেন। রবীন্দ্র-সদনে

শ্যাডো প্রোডাকশনস-এর "সমান্তরাল" (পরিচালনা : নির্মল দে) ছবিতে ললিতা চ্যাটার্জি। —ফটো-দেশ

আগামী রবিবার রবীন্দ্রসদনে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের (হাওড়া) সাহায্যকল্পে সংগীত পরিবেশন করবেন এম এস শুভলক্ষ্মী

গত ১২ ডিসেম্বর তাঁরা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। শ্রীউদয়শঙ্কর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

কর্মসূচীতে ছিল নৃত্য, গীত এবং লোকনাট্য। লোকনৃত্যে ও লোকসংগীত খুবই উপভোগ্য নয়। দেখবার মত ছিল ভরতনাট্যম ও কুচপুড়ি নৃত্য।

পরলোকে সংগীতপরিচালক রোশন

হিন্দীচিত্রের জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক রোশন (রোশনলাল নগর্থ) গত ১৬ নভেম্বর বোম্বাইয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০। লক্ষ্মৌ মিউজিক্যাল কলেজে শিক্ষালাভ করে তিনি দিল্লি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগ দেন। "নেকি ঔর বাদী" ছবিতে তিনি প্রথম সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেন এর পর বহু বিশিষ্ট ছবির সুরকার হিসাবে তিনি যশস্বী হন। তাঁর সংগীত পরিচালনায় তৈরি ছবিগুলির মধ্যে "আরতি", "হাম লোগ", "দাদী মা", "মমতা", "মেহবুবা", "বরসাত কী রাত", "দেবর", "বহু বেগম", "দুজ কা চাঁদ", "মল্লার", "তাজমহল" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রুশ সাংস্কৃতিক দল

রুশ প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচিত ছাব্বিশজন শিল্পীর একটি দল কলকাতায় গত সপ্তাহে রবীন্দ্র-সদনে তিন দিন (১৬, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর) নাচ-গানের অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন। রুশ-শিল্পীদের লঘু নাচ খুবই চিত্তাকর্ষক। রঙের বাহার ও ছন্দের সৌন্দর্য তাঁদের নাচে। ল্যাটভিয়ার লোকনৃত্য তো খুবই উপভোগ্য। জর্জিয়ার লোকসংগীতের সঙ্গে বাংলার পল্লীসংগীতের আশ্চর্য মিল। ইউক্রেনিয়ার লোকসংগীতও উল্লেখযোগ্য। শিল্পীরা দরাজ গলায় গানগুলি গেয়েছেন। যন্ত্রসংগীতের ব্যবস্থাও ছিল। নাচের সঙ্গে জাদুখেলার আয়োজন বেশ উপভোগ্য। "ইফ দি ফেলোজ অব দি হোল ওয়ার্ল্ড" অনুষ্ঠানে দলের সব শিল্পীদের একসঙ্গে দেখা গেল। সেটি ছিল শেষ অনুষ্ঠান। দর্শক-শ্রোতারা প্রতি অনুষ্ঠানের পরে তাঁদের মনের খুশির পরিচয় দিলেন করতালিতে।

তানসেন সংগীত সংঘ

রবীন্দ্র-সদনে গত ১৭ নভেম্বর তানসেন সংগীত সংঘের রজত-জয়ন্তী উৎসব এবং সংগীত সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅশোক-কুমার সরকার। তিনি তাঁর ভাষণে ধ্রুপদে ও টপ্পা গানের অনুশীলনে বাংলার ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেন। ধ্রুপদ ও টপ্পা যাতে সংগীতের আসরে মর্যাদা পায় তিনি উদ্যোক্তাদের সে অনুরোধ করেন। মাইক গানের স্বাভাবিক রূপ ও রস বিকৃত করে বলে সভাপতি মন্তব্য করেন। বিশেষ ক্ষেত্রে মাইকের প্রচলন বন্ধ করা যায় কিনা

"নল-দময়ন্তী" ছবিতে দীপিকা দাশ

বোম্বাইয়ে বাদল সরকার রচিত "বড়পিসিমা" নাটকের অভিনয়ে (বেরোয়া সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত) নির্মল মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়, ঝিলি চক্রবর্তী, বীরেশ রায়-চৌধুরী, সত্যবান সরকার ও প্রতাপ রায়

তা তিনি উদ্যোক্তাদের ভেবে দেখতে বলেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট টপ্পা-গায়ক শ্রীকালীপদ পাঠককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রারম্ভে সংঘের সম্পাদক সংগীত বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন।

বিধান সংগ্রহশালার উদ্বোধন

ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস অব ইণ্ডিয়ার অন্তর্গত বিধান সংগ্রহশালা এবং সভাষমঞ্চের উদ্বোধন হবে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে। ব্যারাকপুরের নিকট সোনা-জাফরপুরে সাত বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন নির্মিত। চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত বহু বস্তু, নথিপত্র, দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র এবং ঐতিহাসিক তথ্য সংবলিত পুঁথিপত্র ইতিমধ্যেই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। সভাষ-মঞ্চ একটি মুক্ত-অঙ্গন নাট্যমঞ্চ। শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়ের একক প্রচেষ্টায় ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস প্রতিষ্ঠিত। ডিসেম্বর মাসের শুরুতে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী জর্জর উৎসব আয়োজিত। তা ছাড়া সভাষমঞ্চে ২রা ডিসেম্বর কালীঘাট-মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত "দেবী ত্রিনয়নী" গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করবেন জয়রামকৃষ্ণ সোসায়েটি। শ্রীনাট্যম সংস্থার নাট্যাভিনয় উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। তাঁরা মঞ্চস্থ করবেন "দেবযানী", "রাজসিংহ", "সীতা" ও "গোলাপকাঁটা"। ১, ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠান হবে। শিল্পানুরাগী জনসাধারণকে এই উপলক্ষে সংগ্রহকেন্দ্রটি পরিদর্শনের জন্য সংস্থার শ্রীমুখোপাধ্যায় সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। উৎসব সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ জন্য আরকাইভস অফিসে (৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪) যোগাযোগ করা যেতে পারে।
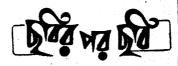
সরকার প্রোডাকসন্সের 'অজানা শপথ'-এর মুক্তির আর বিলম্ব নেই। স্বরচিত কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করেছেন সলিল সেন।

অজানা শপথ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, সোমেন চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, রেবা ঘোষ, নবাগতা শিবানী বসু, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, মিণ্টু চক্রবর্তী, সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছেন। সংগীত-পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

মুক্তি প্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে আরোরার 'আরোগ্য নিকেতন'। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা

আরোগ্য নিকেতন করেছেন বিজয় বসু। বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা, সন্ধ্যা রায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলি, বঙ্কিম ঘোষ, রমা দাস, ইন্দিরা দে, কালী সরকার প্রভৃতি ছবির শিল্পী। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরকার।

অপ্সরা ফিল্মসের 'তিন অধ্যায়'-এর শুটিং এখন শেষ অধ্যায়ে। শৈলেশ দে'র কাহিনীর ভিত্তিতে মঙ্গল চক্রবর্তী ছবিটি পরিচালনা করছেন। গোপেন মল্লিক, সংগীত পরিচালনা করেছেন। চরিত্র-

তিন অধ্যায় চিত্রণে আছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, ছায়া দেবী, জহর রায়, সুপর্ণা সেন, রবীন মজুমদার, অজয় গাঙ্গুলি, ইন্দিরা দে প্রভৃতি।

পূর্ণেন্দু প্রোডাকশন্স-এর 'বৌদি'-র চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্ত। পরিচালক দিলীপ বসু নিজেই কাহিনী রচনা করেছেন। সন্ধ্যারাণী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, পাহাড়ী

বৌদি সান্যাল, তরুণকুমার, জহর রায়, সুখেন দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধ গাঙ্গুলি, বনানী চৌধুরী, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন। দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় শিল্পী অনিল চট্টোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তী, রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগীতপরিচালক।

তপন সিংহের "আপনজন"-এ রোমি চৌধুরী। —ফটো-দেশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচনার বিষয়। মন্ত্রিসভা রাজ্যপালের আদেশে বিধানসভার অধিবেশনের দিন এগিয়ে আনতে অস্বীকার করে ১৮ নবেম্বর সাতটি বড় রকমের প্রশ্ন তুলে সংবিধানের ১৪৩ ধারা অনুসারে প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সুপ্রীম কোরটের মতামত জানবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে একজন সরকারী কর্মচারী মারফত এক জরুরী চিঠি প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার জন্য নয়া দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার "আভ্যন্তরীণ বিষয়ক কমিটির বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা চলে। বিষয়গুলি সুপ্রীম কোরটে পাঠাবার কোন কারণ নেই বলে কমিটি স্থির করেন। আলোচনায় দেখা যায় যে, সাংবিধানিক ব্যাপারে খুব মতভেদ না থাকলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে কমিটি এক-মত হতে পারেন নি। বৈঠকে নাকি একথাও বলা হয় যে, সাংবিধানিক সমস্যা বাংলা এবং বিহারে একই-রকম কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপর সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং বিহার সম্পর্কে কিছুই করা হচ্ছে না। আর একটি অভিমত হচ্ছে, রাজ্যপাল সর্বশেষ যে প্রস্তাব করেছেন (৩০ নবেম্বর) এবং সরকার (১৮ ডিসেম্বর) যে তারিখ প্রস্তাব করেছিলেন তার মধ্যে তফাত মাত্র ১৮ দিনের—এই কারণে মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। এই অভিমত অনেকেই সমর্থন করেছেন। কমিটির আলোচনা এখনও শেষ হয় নি।

খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে উত্তর কলকাতায় শুক্রবার রাত্রি থেকে শনিবার গভীর রাত্রি পর্যন্ত ১০ জন লোকের মৃত্যু ঘটে। এ ছাড়া আরও ৭ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, এটি বিষাক্ত কোন চোলাই মদ পানেরই এক মর্মান্তিক পরিণতি।

১৯ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আজ দুপুরে আবার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে অনুরোধ করেছেন : দেখুন না, বিধানসভার অধিবেশনের দিন কিছুটা এগিয়ে আনতে পারেন কিনা; আর সারাদিন ধরে কংগ্রেস, ক্রান্তি গোষ্ঠী এবং নবগঠিত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলের বীতশ্রদ্ধ নেতাদের জানিয়েছেন : কী করা যায় বলুন, দিল্লি থেকে এখনও পাকা খবর পাচ্ছি না।

দেশী সংবাদ

১৩ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের দোদুল্যমান রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি, কংগ্রেস সহ অধিকাংশ বড় দলই অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে রাজি। যুক্ত ফ্রনটের বড় শরিকদের প্রায় সবাই ও অবিলম্বে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে সরকারী-ভাবে রাজ্যপালের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের সুপারিশ করার পক্ষে।

গত ১১ সেপটেম্বর হাওড়া রেলওয়ে ইয়ারড এলাকায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গুলি করা হয়েছিল। এমন কি গুলিচালনার ৪৫ মিনিটের মধ্যে হাওড়া জেলা কর্তৃপক্ষকেও এ সম্পর্কে কোন সংবাদ দেওয়া হয়নি। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রীরঘুনাথ ব্যানার্জিকে নিয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট যে কমিশন নিয়োগ করেছিলেন তাতেই নাকি একথা বলা হয়েছে।

১৪ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গকে জানুয়ারি থেকে যে-পরিমাণ চাল সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি কেন্দ্র দিয়েছিলেন তা থেকে ১৬ হাজার টন চাল কম সরবরাহ করেছেন। খাদ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ সি সিনধে আজ লোকসভায় উপরোক্ত তথ্য জানান। সরকার রাজনৈতিক কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে চাল কম দিয়েছেন বলে কোন কোন কম্যুনিসট সদস্য যে অভিযোগ করেছেন, তিনি তা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী জে এল হাতি আজ লোকসভায় বলেন যে, ধর্মঘট, ঘেরাও ও বন্ধের ফলে পশ্চিম বাংলার শিল্প উৎপাদন অচল অবস্থায় উপনীত হয়েছে—একথা বলা ঠিক হবে না। তবে শিল্প উৎপাদন যে ব্যাহত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৫ নবেম্বর—মঙ্গলা বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ করায় পাক প্রেসিডেনট আয়ুব খাঁকে অভিনন্দন জানাবার ফলে আজ লোকসভার যে উত্তেজনা ও সমালোচনার ঝড় ওঠে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ়তার সঙ্গে তার সম্মুখীন হন এবং অভিনন্দনের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে বলেন।

রাজ্যপাল যদি নিঃসন্দেহ হন যে মন্ত্রিসভা বিধানসভায় গরিষ্ঠতা হারিয়েছে, তবে তিনি সেই মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে পারেন কি? আজ লোকসভায় এই বিতর্ক উঠলে বিরোধীপক্ষের অধিকাংশ সদস্য অভিমত দেন-না, রাজ্যপাল মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করতে পারবেন না।

১৬ নবেম্বর—যুক্ত ফ্রনট কমিটি অর্থাৎ সপ্তাহ ক্যাবিনেট মোটামুটি স্থির করেছেন শক্তিপরীক্ষার জন্য বিধানসভার অধিবেশনের দিন এগোনো হবে না—মন্ত্রিসভা প্রথমে যেমন ১৮ ডিসেম্বর দিন দিয়েছিলেন তেমনি থাকবে। তবে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ফ্রনট এ সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি এবং "দৃষ্টিকটু" হবে মনে করে এ সম্পর্কে মন্ত্রি-সভাকে কোনও নির্দেশও দেননি—গোটা ব্যাপারটা মন্ত্রিসভার উপর ছেড়ে দিয়েছে।

ডঃ আর কে হাজারি শিল্প লাইসেনস প্রথা সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত রিপোরটে "একই হাতে শিল্প ও ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা" যাতে পুঞ্জীভূত না হতে পারে সেজন্য ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণের সুপারিশ করেছেন। ডঃ হাজারি বলেছেন তার এই সুপারিশের ফলে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন সব ব্যক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে যতদিন বড় বড় ঋণদান সংস্থা-গুলি থাকবে ততদিন সুপরিকল্পিত ঋণদান ব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত করা শক্ত হবে।

১৭ নবেম্বর—বৃহত্তর কলকাতা রেশনিং এলাকায় রেশন কারডের ভিত্তিতে যে চিনি দেওয়া হয় তার পরিমাণ সপ্তাহে মাথা পিছু ২১০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ১৫০ গ্রাম করা হবে। আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত বলবৎ হবে।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি পি চালিহা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোরডকে বলেছেন যে, কেন্দ্রর উচিত আসাম পুনর্গঠন প্রশ্নে অশোক মেটা কমিটির সুপারিশ মেনে নিয়ে পার্বত্য জেলাগুলিকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দেওয়া।

১৮ নবেম্বর—যুক্ত ফ্রনট সরকারকে 'পতন ঘটানোর চেষ্টার' বিরুদ্ধে আজ কলকাতায় এক বিশাল মিছিলে প্রতিবাদ জানানো হয়। সভায়, মিছিলে সরকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানানো হয়। মিছিলের ফলে চৌরঙ্গী চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে প্রায় এক ঘণ্টার জন্য যানবাহন বন্ধ থাকে।

বিদেশী সংবাদ

১৩ নবেম্বর—প্রাক্তন পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তানের উভয় অংশে স্বায়ত্তশাসন সহ ফেডারেল ধরনের শাসনব্যবস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী। ঢাকায় সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা প্রকাশ করেছেন।

১৪ নবেম্বর—সিংহলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডবলু দানানায়ক এক আদেশ জারি করে সিংহলীরা ভারত থেকে যে সব শাড়ি এনেছে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করতে শুল্ক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক হিসাবে প্রকাশ, এই বছর সিংহলীরা ভারত পরিদর্শন করতে গিয়ে প্রায় ১০ হাজার শাড়ি নিয়ে এসেছে।

১৫ নবেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সাধারণ পরিষদ আজ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ভারতের ডঃ বি আর সেন ওই সংস্থার ডিরেকটর জেনারেল পদের জন্য আবার দাঁড়াতে পারেন না। শ্রী সেন ১৯৫৬ সাল থেকে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেকটর জেনারেলের পদে রয়েছেন।

১৬ নবম্বর—হিটলারের গেসটাপো বাহিনীর অধিকর্তা হাইনরিখ মুয়েলারকে পানামা সিটিতে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে আজ পশ্চিম বারলিনে ঘোষণা করা হয়। ফেরার নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে মুয়েলারের নাম ছিল সবার আগে। আসামীকে দেশে পাঠাবার আইনসঙ্গত ব্যবস্থাদি নেওয়া হচ্ছে।

১৭ নবেম্বর—ব্রিটেন গতকাল নিরাপত্তা পরিষদে আরব ইজরায়েল সংঘর্ষের শান্তি-পূর্ণ মীমাংসা সম্পর্কে যে প্রস্তাব পেশ করেছে তাতে ইজরায়েলকে অধিকৃত আরব এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ করতে বলা হয়েছে।

১৮ নবেম্বর—ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে এক বৈঠকের প্রস্তাব করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেনট নুয়েন ভান থিউ, হো চি মিনের কাছে একটি পত্র পাঠাবেন বলে জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ জানান।

১৯ নবেম্বর—গত রাত্রে ব্রিটেন পাউনড স্টারলিংয়ের বিনিময় মূল্য ১৪·৩ শতাংশ হ্রাস করেছে। এর ফলে এখন এক পাউনড স্টার-লিংয়ের মূল্য দাঁড়াল ২·৪০ মারকিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ টাকা, আগে ছিল ২১ টাকা।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কলার ও কাফ্
সবচেয়ে বেশী ময়লা হয়...

প্রচ্ছদ : শ্রীমানবেন্দ্র বড়ুয়া

শীতকালে আপনার
দেহত্বকে শুষ্কতা আসে....

নিভিয়া ক্রীম ব্যবহার করে তাকে কোমল ও
লাবণ্যময় করে তুলুন

শীতের সময় আপনার ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে ওঠে। তখন আপনার ত্বকের প্রয়োজনীয় তৈলসত্তার ক্ষয় হয়ে যায়—যে তৈলসত্তা আপনার ত্বককে কোমল, মসৃণ ও সুস্থ রাখে। সেইজন্যই আপনার চাই নিভিয়া। কেবলমাত্র নিভিয়াতেই আছে 'ইউসেরাইট'-একটি বিশিষ্ট উপাদান, যা দেহত্বকের স্বাভাবিক তৈলভাগ যোগায় এবং রুক্ষ ও শুষ্ক শীতল আবহাওয়া থেকে আপনার ত্বককে রক্ষা করে। কেবলমাত্র নিভিয়া দেহত্বক কোমল

NIVEA
creme

Kleertone
ইস্ত্রি ঃ
কেটলি ঃ
GRA
জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস্ লিমিটেড
বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, বাঙ্গালোর, সেকেন্দ্রাবাদ ও পাটনা
চান যদি উন্নত জীবনযাপন, নিন তবে ক্লীয়ারটোন উৎপাদন

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫
শনিবার ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৫১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষাণ্মাসিক „ ১৪.০০
ত্রৈমাসিক „ ৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষাণ্মাসিক „ ১৪.০০
ত্রৈমাসিক „ ৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)
বার্ষিক সডাক ৪৬.০০
ষাণ্মাসিক „ ২৩.০০
ত্রৈমাসিক „ ১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)
বার্ষিক ৩১.০০
ষাণ্মাসিক ১৬.০০
ত্রৈমাসিক ৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH

Saturday 2 Dec. 1967.

পশ্চিমবঙ্গের নতুন পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-নাটকের সাম্প্রতিক দৃশ্যটি একেবারে অপ্রত্যাশিত না হলেও কোনো কোনো মহলে কিছু বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে. অনেকের ধারণা, যা ঘটেছে তা অতিনাটকীয়। যুক্তফ্রন্ট বনাম রাজ্যপাল যদি এই দৃশ্যের বিরোধী দুই চরিত্র হয়ে থাকেন, তবে যে-বিষয় নিয়ে দুপক্ষেরই মতান্তর চলছিল তা সংবিধান, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে সেই রকম দেখাচ্ছিল। এই মতান্তর গণতন্ত্র, আইন, কেন্দ্র, রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধপত্র পেশ ইত্যাদি নিয়ে বেশ জটিল হয়ে ওঠায় অনেকেই ধারণা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পালাবদলের সময় খানিকটা বিলম্বিত হবে, অথবা রাজনীতি অন্য কোনো মোড় নিতেও পারে। একটা অনিশ্চয়তা নিশ্চয় ছিল। কিন্তু গত মঙ্গলবার, একুশে নভেম্বর, রাত আটটার সময় নাটকীয়ভাবে রাজ্যপাল একটি নির্দেশে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেন; আর তার পরই প্রবীণ নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ানো হয়। সেদিনই ঘোষ-মন্ত্রিসভার সদস্য হন আর মাত্র দুজন। পরের দিন থেকে কলকাতা, শহরতলী ও পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় অশান্তি দেখা দেয়।

রাজ্যপাল নিজ সিদ্ধান্তে যা করেছেন, এটা আইনসম্মত না কি বেআইনী—এ নিয়ে মতভেদ প্রচুর। একপক্ষের রায় অন্য পক্ষের রায়ের বিরোধী। মূলত এই বিরোধ বোধ করি সংবিধানের বিশেষ সূত্রটিতেই থেকে গেছে. ফলে আইন-বিশেষজ্ঞের পক্ষে একমত হওয়া সম্ভব নয়। আইন ছাড়াও যা আছে তা হল নৈতিক দিক। রাজ্যপাল মনে করছিলেন শ্রী মুখার্জির মন্ত্রিসভা লঘিষ্ঠ সরকারে পরিণত হয়েছে, শ্রীমুখার্জির মন্ত্রিসভা তা মনে করছিলেন না। এই মতবিরোধের মীমাংসা হতে পারত বিধানমণ্ডলীতে, রাজ্যপাল তার জন্যে খানিকটা সময় দিতে চেয়েছিলেন; শ্রীমুখার্জির মন্ত্রিসভা আরও বেশি—ডিসেম্বরের আঠারোই পর্যন্ত সময় নিতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে. বিধানমণ্ডলীর অধিবেশনে ভোট-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে গেলে সবচেয়ে ভাল হত. পরাজিত পক্ষের মেরুদণ্ড বেশ কিছুটা নুয়ে পড়ত। কিন্তু তা হয়নি। যুক্তফ্রন্ট যতটা সময় চেয়েছিলেন ততটা সময় দিলে সেটাও বেআইনী কাজ হত বলে অনেকে মনে করেন।

মুশকিল এই যে, রাজায় রাজায় যে যুদ্ধ ঘটছে তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। কলকাতা, শহরতলী ও সারা পশ্চিমবঙ্গে এই কদিনে যে ধরনের হাঙ্গামা ঘটেছে তাতে আমাদের পক্ষে স্বস্তি অনুভব করা কষ্টকর। পুলিসের গুলি, লাঠি, কাঁদানে গ্যাসের প্রতি কারও অনুরাগ থাকার কথা নয়। অসহায় কয়েকটি জীবনও এই হাঙ্গামায় চিরকালের মতন নির্বাপিত হল। এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে শান্তিকামী নাগরিক মাত্রই অনিশ্চয়তা বোধ করছেন, দোকানপত্র লুঠ হচ্ছে. গাড়ি, বাস, ট্রেন কোথাও কোথাও পুড়ছে। নতুন মন্ত্রিসভার পথ কণ্টকাকীর্ণ, ভবিষ্যতে কি হবে জোর করে বলা যায় না।

তবু একটা কথা আমরা মনে করি : আগামী উনত্রিশ নভেম্বর যে বিধান-মণ্ডলীর অধিবেশন ডাকা হয়েছে সেখানে সঙ্গতভাবে একটা শক্তি পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অজয়বাবু ও তাঁর মন্ত্রিসভা এই দিন অনায়াসে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, বরং তাঁদের সেই জয় আরও গৌরবোজ্জ্বল ও দীর্ঘ-স্থায়ী হবে। দুঃখের বিষয়, আগামী উনত্রিশের অধিবেশনকে বানচাল করার চেষ্টা হবে বলে ইতিমধ্যেই যা গুজব রটছে তা আমাদের অনিশ্চিত অবস্থাকে আরও অনিশ্চিত করছে। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, পশ্চিমবঙ্গের গত আট মাসের জীবনযাত্রা নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজেও কথাটা স্বীকার করেছিলেন। খাদ্যে, অর্থে, শিল্পে আমরা কোন অতলে নেমে যাচ্ছি তা বিবেচকমাত্রই বুঝতে পারবেন। যদি এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের বিন্দুমাত্র কল্যাণ চিন্তাও আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের থাকে তবে দেশের বর্তমান চেহারা দেখে তাঁদের শিহরিত হওয়া উচিত। কে গদিতে বসলেন না বসলেন তা নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, আমাদের উৎসাহ কে কতটা মঙ্গল করতে পারলেন। যাই হোক, হিংস্রতা, অরাজকতা, নির্মমতা পরিহার করে গণতান্ত্রিকভাবেই আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হোক এ-কামনা সুস্থ-মন সকল মানুষেরই।

দেশ দর্পণ

পাটনায় ফিরে গিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতীয় ক্রান্তি দলের সভাপতি শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ বলেছেন : আধুনিক যুগের মিরজাফর সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। রাগের কথা। বলেছেন অবশ্য পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে খারিজ করে দেওয়া সম্পর্কে। তাঁর রাগের কারণ নেই এ-কথা অবশ্য বলা যায় না। কারণ, ঠিক যে-মুহূর্তে তিনি শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি এবং শ্রীহুমায়ুন কবীরের মধ্যে বোঝাপড়ার চেষ্টা করছিলেন সেই মুহূর্তেই রাজ্যপাল এক আদেশ জারি করে শ্রীঅজয় মুখার্জির মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে দেন। রাজ্যপালের আদেশটা শ্রীঅজয় মুখার্জির হাতে যখন পৌঁছে দেওয়া হয়, তখন তিনি শ্রীসিংহের সঙ্গে চা-পান করছিলেন গ্রাণ্ড হোটেলের একটি কক্ষে।

ঐদিন সকালেই শ্রীসিংহ কলকাতায় এসেছিলেন শ্রীমুখার্জি ও শ্রীকবীরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্রান্তি দলের সেক্রেটারী শ্রীকুন্তে এবং শ্রীউদিতনারায়ণ শর্মা। ইন্দোর সম্মেলনে এঁদের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল শ্রীকবীর ও শ্রীমুখার্জির বিরোধটা মিটিয়ে দেবার জন্য। ইন্দোরে যে বিরোধ সর্বচেষ্টা সত্ত্বেও মেটান সম্ভব হয়নি, কলকাতায় তা মিটত কিনা সন্দেহ; কারণ, ব্যক্তিত্বের লড়াই যেখানে নেতৃত্ব নিয়ে সে ক্ষেত্রে বিরোধ মেটান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কারণে বিরোধ থাকলে আপোস সম্ভব হয়; নেতৃত্বের কোন আপোস হতে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। কাজেই এ-বিরোধের একটাই মীমাংসা সম্ভব ছিল। এক নেতাকে খর্ব করে, খারিজ করে, আর এক নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। হয়ত এ কথাটা শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিংহের অজানা ছিল না; বিশেষ করে শ্রীকবীরের সঙ্গে তাঁর একান্ত আলোচনার পর। শ্রীকবীর যখন গ্রাণ্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে যান তখন শ্রীসিংহ সাংবাদিকদের কোন আশার কথা শোনাতে পারেননি।

কোন আশার কথা শোনান সম্ভব ছিল না; কারণ, ইতিমধ্যেই শ্রীকবীর জানতেন, শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের পরোয়ানা তখন প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। সেটাই প্রমাণিত হল শ্রীঅজয় মুখার্জির হাতে যখন চিঠিটা পৌঁছে দেওয়া হল। শ্রীমহামায়া-প্রসাদ সিংহ এটা আশা করেননি নিশ্চয় এবং হয়ত তাঁর আশা ছিল, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলে হয়ত কিছু আশার আলোক দেখা যাবে। সেদিন রাতেই ডঃ ঘোষের সঙ্গে শ্রীসিংহের কথাবার্তা হবার কথা ছিল। ডঃ ঘোষ অবশ্য যাননি গ্র্যাণ্ড হোটেলে; কারণ ঠিক সে-মুহূর্তেই তিনি রাজ্যপালের কাছে নূতন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করছিলেন। শ্রীসিংহ এবং শ্রীমুখার্জি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, একটা অশোভন ব্যস্ততা দেখান হয়েছে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে খারিজ করে নূতন মন্ত্রিসভা পত্তন করা নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমুখার্জির হাতে রাজ্যপালের চিঠিটা পৌঁছবার আগেই রাজভবনে নূতন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে।

এই অশোভন ব্যগ্রতা অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। অনেকের ধারনা ছিল যে, যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে খারিজ করা হলে হয়ত রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হবে। কিন্তু তা না করে সরাসরি ডঃ ঘোষকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করতে। অবশ্য তার আগে কংগ্রেস দলের নেতা হিসাবে শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে রাজ্যপাল অনুরোধ করেছিলেন নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য। কিন্তু কংগ্রেস সদস্য হিসাবে তাঁর উপর নির্দেশ ছিল নূতন সরকার গঠনের কোন দায়দায়িত্ব না নেবার জন্য। শ্রীদাশগুপ্ত সে-দায়িত্ব গ্রহণ করেননি; কিন্তু এ-কথা রাজ্যপালকে জানাতে হয়েছিল যে ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হলে, কংগ্রেস পার্টি তাঁকে সমর্থন করবে। এই সমর্থনের আশ্বাসের উপর নির্ভর করেই রাজ্যপাল ডঃ ঘোষকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করতে আমন্ত্রণ জানান।

কোন মন্ত্রিসভাকে সংবিধান অনুসারে রাজ্যপাল খারিজ করতে পারেন কিম্বা পারেন না এ নিয়ে আইনের তর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যুক্তিটা অস্বাভাবিক মনে হওয়া অসংগত নয়। কারণ, রাজ্যপাল সংবিধানের যে অনুশাসন অনুসারে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে খারিজ করলেন তার মূল কথাই এই যে, রাজ্যপাল যদি মনে করেন মন্ত্রীসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন, তবেই সংবিধানের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে খারিজ করার আদেশ জারি করতে পারেন। রাজ্যপালের আদেশের সঙ্গে যে বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার উপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অবশ্য রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা

২০ নভেম্বর কলুটোলা স্ট্রীটের মুখে গুলি ছোঁড়ার আগ সশস্ত্র পুলিস

অচল হওয়া এবং সংবিধান অনুসারে যে কাজ হচ্ছে না এ কথাটাও উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার জনাই রাজ্যপালের পক্ষ থেকে বিধানসভার অধিবেশন তাড়াতাড়ি ডাকার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। এমন কি, খারিজ করার আদেশ জারী করার পূর্ব মুহূর্তেও রাজভবন থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জিকে জিগ্যেস করা হয়েছিল, তিনি ১৮ ডিসেম্বর বিধানসভা ডাকার তারিখটা কয়েকদিন এগিয়ে নিয়ে আসতে রাজী আছেন কি না। শ্রীমুখার্জী অবশ্য এ-প্রস্তাবে সরাসরি জবাব দিতে পারেননি এবং তার পরেই তাঁর মন্ত্রিসভাকে খারিজ করা হল। কাজেই এটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যুক্তফ্রণ্ট সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে বলেই রাজ্যপাল খারিজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাছাড়া বারবার কংগ্রেসের নেতা শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত দাবি জানিয়েছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের একদিনও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা বে-আইনী হবে, সংবিধান বিরোধী হবে।

অথচ ডঃ ঘোষের যে মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হল, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সমর্থক সংখ্যা ১৭। স্পষ্টতই ডঃ ঘোষের পিছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কংগ্রেস পার্টি ডঃ ঘোষকে সমর্থন জানাবে সত্য; কিন্তু যে-ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা কোন কোয়ালিশন ব্যবস্থার ভিত্তি করে গঠিত হয়নি সে-ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার একান্ত আপন সমর্থক সংখ্যার উপরেই নির্ভর করতে হয়। যতদিন বিধানসভায় কংগ্রেস দল ভোট দিয়ে ডঃ ঘোষের প্রতি সমর্থন না জানাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভাকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট বলেই গণ্য করতে হবে। ডঃ ঘোষের সমর্থক সংখ্যা ১৭ এটাও অজানা নয়। এ-ক্ষেত্রে ডঃ ঘোষকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানান অবাস্তব মনে না হওয়াই অস্বাভাবিক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আইন ও শৃঙ্খলা। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে এটাই বড় অভিযোগ। এই অভিযোগটা বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল নানা মহলে এবং বিশেষ করে দিল্লীর দরবারে। এই অভিযোগের পিছনে যে রাজনৈতিক কারণ নেই তা নয়; কিন্তু বাস্তব কারণটাও অগ্রাহ্য হবার নয়। গত কয়েক মাসে পশ্চিমবাংলার জনজীবনে নিরাপত্তাবোধ কমে এসেছিল, কারণ, শৃঙ্খলা মেনে চলার মূল্যবোধই হয়ত নানা কারণে কমে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক কারণ নিশ্চয় একটা, কিন্তু একমাত্র নয়। হয়ত সে কারণেই রাজনৈতিক কারণটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে-কথাটাই মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায়। অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কের উত্তর দিতে শ্রীঅজয় মুখার্জির একটা বিবৃতির উল্লেখ করেছেন। এই বিবৃতিতে শ্রীমুখার্জি অভিযোগ করেছিলেন যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির এক অংশ বাইরের এক শক্তির সাহায্য নিয়ে পশ্চিম বাংলায় বিপ্লব ঘটাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আরও বলেছেন যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে।

এই দুটো অভিযোগই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বা রাজ্যপালের কাছে বিশেষ কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে খারিজ করার প্রশ্ন নিয়ে। তাই কিছুদিন আগে একটা সার্কুলার জারি করে বলা হয়েছিল যে, যদি কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা যেমন রেল ইত্যাদি আটক করা হয় বা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থাও চালু করা হতে পারে বা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ হতে পারে। মোট কথা, শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগটা নূতন কিছু নয়, বিশেষ করে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা খারিজ করার প্রশ্ন যেখানে ওঠে। কিন্তু এই অভিযোগের সঙ্গে বাস্তব অবস্থাটাও সামনে রাখা উচিত ছিল। কারণ সেটাই শৃঙ্খলাভঙ্গের রাজনৈতিক চেহারা। গত কয়েক

নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ

আগামী সপ্তাহ থেকে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিত নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একটি ধারাবাহিক রচনা তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হবে। নিবেদিতার কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য চিঠি অবলম্বনে নিবেদিতা-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য এই রচনায় উদ্ঘাটিত হয়েছে।—সম্পাদক

১৪৪ ধারা ভংগ করে মির্জাপুর স্ট্রীটে ছাত্রদের মিছিল

এসেই দেখা যাচ্ছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এবং উগ্রপন্থী মার্ক্সিস্টদের মধ্যে বিরোধটা ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। এই বিরোধের মধ্যে আদর্শগত প্রশ্ন জড়িত নিশ্চয় আছে; কিন্তু বাস্তব প্রশ্নও আছে। সেটা নক্সালবাড়ী উপলক্ষ্য করে।

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে নক্সালবাড়ীর আন্দোলন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সে-সম্বন্ধে ফ্রণ্টের শরিক হিসাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির অভিযোগ খুব কম ছিল না। এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর নক্সালবাড়ীর নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সমালোচনাটা উঠেছিল উগ্রপন্থীদের তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে। উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যভাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতৃত্বকে নয়া-শোধনবাদীর ভূমিকায় দেখাবার আন্তরিক প্রচেষ্টা চলছিল। এই আক্রমণকে কিছুটা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই নক্সালবাড়ী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়েছিল।

কিন্তু এই বিরোধটা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করছিল। পার্টির ভিতরে গুঞ্জন উঠছিল নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে। সেই গুঞ্জনকে লক্ষ্য করেই মাদুরাই প্রস্তাবের পর অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটা বেশ কিছুটা বদলে গেল। উগ্রপন্থীদের বিভিন্ন নেতারা কলকাতায় বসে সমগ্র অবস্থাটা বিচার করে এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব পার্টির সামনে কোন বৈপ্লবিক প্রোগ্রাম রাখতে অক্ষম। তাদের অভিযোগ যে, ফসলকাটার দিনে কৃষককে যে বিপ্লবের পথে নিয়ে যাবার প্রোগ্রাম করা হয়েছিল তবুও বিরোধিতা আসছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নয়া-সংশোধনবাদী নেতাদের কাছ থেকে। স্বভাবত একটা প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ আসছিল উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। কলকাতায় আলোচনার পর উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছিল, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যদের আজ স্পষ্টভাবে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কোন কোন মহলে এই স্লোগানকে নূতন কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের ইঙ্গিত বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু উগ্রপন্থী নেতারা বলেন, তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি নয় মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের সামনে স্পষ্ট করে চ্যালেঞ্জটা ধরাই হবে তাদের কাজ। এক কথায় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ জেহাদ ঘোষণা করার প্রস্তুতি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল।

ঠিক যে মুহূর্তে এই অন্তর্দ্বন্দ্বটা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আকার নিচ্ছিল, সেই সময়ই এল যুক্তফ্রণ্ট সরকারের খারিজের পরোয়ানা। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এই পরোয়ানা নানাভাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে নানা বিড়ম্বনার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। আজ নয়া-সংশোধনবাদের যে মার্কাটা এদের মাথায় এঁটে দেবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। উগ্রপন্থীদের মতে, যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে খারিজ করে কেন্দ্র নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের মারফত সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের আশা পোষণ করে তাদের সচেতন করে দিয়েছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের আসল মুখোশ খুলে দিয়েছে। এমন কি একটা আপোসের সুরও ইতিমধ্যে শোনা গিয়েছে উগ্রপন্থীদের মহলে। আবেদন জানান হয়েছে যে, রাজ্যপালের আদেশের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ আন্দোলন শিল্পশহরে গড়ে তোলা হচ্ছে তাকে কৃষকের বিপ্লবের দিকে পরিচালিত করাই হবে প্রধান কর্তব্য। এর অর্থ এই যে, আজ চেষ্টা হচ্ছে রাজনৈতিক আন্দোলনকে কৃষকের "ফসলরক্ষা"র আন্দোলনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া।

দুটো আন্দোলনকে মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে কি না, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। আশু প্রশ্ন, আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রত্যক্ষ প্রতিশ্রুতি। যুক্তফ্রণ্টের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে ২৯ নভেম্বর তীব্র প্রতিবাদ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য। সে সংগ্রাম কি আকার নেবে অনুমান করা সম্ভব নয়; কারণ, ইতিমধ্যে হরতাল এবং প্রতিবাদ আন্দোলন দুটো অভিজ্ঞতার মধ্যে রাজনৈতিক তীব্রতা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি যদি সত্যিই আজ কৃষকের "বিপ্লবের" সঙ্গে মিশে যায়, ডঃ ঘোষের নূতন মন্ত্রীসভাকে গুরুতর বিশৃঙ্খলা এবং চরম নিরাপত্তাবোধের অভাবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সে অবস্থার সৃষ্টি হলে রাজ্যপালকে হয়ত আবার হস্তক্ষেপ করতে হবে। তখন রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থাকে ধরে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে।

কুড়িটি চিঠি : বন্ধুর উদ্দেশে

শিপ্রা রায়

গত কয়েক মাস স্ভেতলানা স্ট্যালিনের "20 letters to a friend" যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, বই-এর জগতে তা বিরল—"ডঃ ঝিভাগো"ও এর তুলনায় কিছু নয়। বইটির পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে স্ভেতলানার রাশিয়া পরিত্যাগের খবর যখন বেরোলো তখন অনেকেরই ধারণা হয়েছিল "কুড়িটি চিঠি" রাশিয়ার বিপক্ষে পাশ্চাত্যের প্রচারের আর একটি যোজনা এবং বইটি আমেরিকার সি-আই-এর ছাপ নিয়ে বেরোবে। রাশিয়ার কয়েকজন লেখক সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন, স্ভেতলানাকে তারা অনেকদিন জানেন। সে চিরকালই 'লাইমলাইটে' আসার চেষ্টা করেছে। রাশিয়া পরিত্যাগ ও বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত তারই প্রচেষ্টা। বইটি না বেরোনো পর্যন্ত রুশ সরকার একটা প্রচণ্ড অস্বস্তিবোধ করেছে। (সম্ভবত অস্বস্তিবোধ ও আশঙ্কা কিছুটা প্রশমিত হয়েছে)। এই সমস্ত বিরূপ সমালোচনার মধ্যে, নিঃসন্দেহে পুত্র যোশেফের (স্ভেতলানার প্রথম বিবাহের পুত্র।) বিরূপ সমালোচনা স্ভেতলানাকে সবচেয়ে বেশী আঘাত করেছে। মস্কোর ফ্রন্টে কিছু সংবাদিকদের কাছে যোশেফ মন্তব্য করেছে যে, তার মায়ের ভারতীয় স্বামীর মৃত্যুতে হয়তো তার মানসিক ভারসাম্যের ক্ষতি হয়েছে। আশ্চর্য হয়েছে এই দেখে যে, তার মা তাঁর পনেরো বছরের কন্যা কাটিয়াকে (স্ভেতলানার দ্বিতীয় বিবাহের কন্যা) রেখে কেমন করে রাশিয়া পরিত্যাগ করতে পারলো।

বইটি বেরোনোর পর বহু আশঙ্কার অবসান হয়েছে। বইটি সম্বন্ধে এখানকার প্রকাশক 'হাচিন' কম্পানীর রবার্ট ল্যাস্টির বিশেষ মন্তব্য হল : "রাশিয়া সম্বন্ধে আমরা যাই ভাবি না কেন, এরকম বই নাৎসী জার্মানী থেকে কখনই বেরোতে পারত না। স্ভেতলানা নিজেকে প্রচণ্ডভাবে দেশপ্রেমিক প্রমাণ করেছেন।"(১)

পনেরোটি ভাষায় বইটির অনুবাদ ইতিমধ্যেই হয়েছে। গ্রেটবৃটেনে প্রথম প্রকাশনে বইটির এক লক্ষ কপি ছাপা হয়—পঁয়ষট্টি হাজার কপি প্রকাশনের আগেই বিক্রি হয়। এছাড়া "পেঙ্গুইন"-এর কাছে পঁচিশ হাজার

স্ভেতলানা

পাউণ্ডে বইটির 'পেপারব্যাকে' ছাপাবার অধিকার বিক্রি করা হয়েছে। 'বইটির প্রকাশ স্বত্বের একটি শর্ত হিসাবে 'হাচিন' কম্পানী বইটির রুশ ভাষার অনুবাদও ছেপেন। মজার খবর হল লন্ডনের রাশিয়ান ট্রেড ডেলিগেশান থেকে টেলিফোনে ম্রিয়মান কণ্ঠে অনুরোধ এল, "তোমরা হয়তো মজাবোধ করবে—যা হোক বইটির একটি রুশ অনুবাদ আমাদের পাঠালো হলে কৃতজ্ঞ হবো।"(২)

১৯৬৩ সালের গ্রীষ্মে মস্কোর অনতিদূরে "জুকোভ্‌কা" গ্রামে (এখানে স্ভেতলানার জীবনের প্রথম ছয় বছরের স্বর্গীয়সুন্দর শৈশবকাল তার বাবা ও মায়ের সঙ্গে কেটেছে) এই 'কুড়িটি চিঠি' লেখা। প্রথমটির শুরুতেই স্ভেতলানা বইটিকে নাটক, জীবনী বা স্মৃতিকথা মনে না করতে পাঠকদের অনুরোধ করেছেন। সাধারণ ভাষায় লিখিত, সচ্ছল, স্বতঃস্ফূর্ত কুড়িটি চিঠি—পঁয়ত্রিশ দিনে লেখা। বইটি মাকে উৎসর্গীকৃত। পাঠককে অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যেন এই কুড়িটি চিঠি তাঁদেরই লেখা মনে করেন।

ইভারাক ম্যাকডোনাল্ডের অনুসরণে (অবজার্ভারে ছাপা প্রবন্ধ—(The Dictator who lived in one room). এই বিয়োগান্ত কাহিনীটিকে চার অঙ্কে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম অঙ্কে ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত স্ভেতলানার শৈশব জীবন। এই স্ট্যালিন পরিবার যে কোন সাধারণ উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সফল চিত্র (পৃঃ ৪০)। পরিবারের মধ্যমণি তার একত্রিশ বছরের তরুণী আদর্শবাদী মা (স্ট্যালিন তার স্ত্রী থেকে প্রায় বাইশ বছরের বড় ছিলেন)। যৌথ পরিবারের মত এই পরিবারে আছে বহু আত্মীয়স্বজন—স্ভেতলানার মামা-মাসী, মাতামহ, মাতামহী, গৃহশিক্ষক, পরিবারের কর্মচারী, তার বৈমাত্রের ভাই ইয়াকভ (স্ট্যালিনের প্রথম বিবাহের পুত্র। এর সম্বন্ধে স্ভেতলানার ভালবাসা ও শ্রদ্ধায়

১ "Whatever one thinks of Russia, such a book could never have come out of Nazi Germany. Svetlana emerges as a tremendous patriot". (The Times Diary)

২ "You will think this very funny, but we would be grateful if we could have copy of the Russian-edition". ("The Times Diary").

প্রকাশ পেয়েছে আর স্ট্যালিনের উদাসীনতা আর নির্দয়তা), তার আপন ভ্রাতা ভ্যাসিলি উনবিংশ চিঠিতে এই মদ্যপ ব্যক্তিকে ভ্রাতাকে স্ভেতলানা 'অসুস্থ ব্যক্তি' হিসাবে গণ্য করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন এর একমাত্র দরকার চিকিৎসার!) বইটির সর্বত্র মায়ের প্রতি স্ভেতলানার ভাবপ্রবণতা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ছাপ রয়েছে। স্ভেতলানার মতে তার মা আদর্শবাদী, কর্তব্যপরায়ণ, স্বাধীনচেতা ও পুত্র-কন্যা সম্পর্কে কঠোর ছিলেন। তাদের কখনো আদর দিতেন না পাছে তারা নষ্ট হয়ে যায়। অথচ তাদের শাসন ও শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচণ্ড সচেতন। তিনি লিখেছেন, "কদাচিৎ মা আমাকে চুমো খেয়েছেন বা আদর করেছেন। অপরপক্ষে বাবা সব সময় আমায় কোলে নিতেন, আদর করতেন এবং 'ছোট্ট পাখী' বা 'ছোট্ট মাছি' বলে ডাকতেন।" (৩) নবম ও ত্রয়োদশ পত্রে ছোট্ট স্ভেতলানাকে লেখা স্ট্যালিনের অনেক চিঠি ছাপা হয়েছে এবং এই সমস্ত চিঠিতে এক স্নেহপ্রবণ পিতার ছবি পরিস্ফুট।

দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু ১৯৩২ সালে, স্ভেতলানার মায়ের আত্মহত্যার পর। এই শোচনীয় মৃত্যু সমগ্র স্ট্যালিন পরিবারের ও স্ট্যালিনের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। স্ভেতলানার মতে তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে স্ট্যালিনের নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তা বাড়তে থাকে। এই উক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ স্ট্যালিনের নির্দয়তা তার স্ত্রীর আত্মহত্যার কারণ। মৃত্যুকালে স্ট্যালিনের স্ত্রী একটি 'ভয়ংকর' চিঠি লিখে যান, স্ভেতলানার মতে তা আংশিক রাজনৈতিক ও আংশিক ব্যক্তিগত। স্ভেতলানার বিশ্বাস স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই স্ট্যালিন একক ও সঙ্গীহীন হতে থাকেন। পরবর্তী জীবনে সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর তাচ্ছিল্য, অবিশ্বাস-প্রিয়তা ও Prosecution mania 'দমননেশা' এই নিঃসঙ্গতা থেকে উৎপত্তি। স্ত্রীকে তিনি বিশ্বাসী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে দেখেছিলেন। স্ত্রীর আত্মহত্যা তাই তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতকতা তুল্য মনে হয়েছে ও বন্ধু ও লোকের উপর বিশ্বাস ধ্বংস করে দিয়েছিল। রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে স্ট্যালিনের বাস করবার জন্য বাড়ি থাকলেও তিনি প্রায় একটি কক্ষেই বাস করতেন। একই ঘরে একটি সোফায় ঘুমাতেন, বিরাট টেবিলে আহার করতেন, সেখানেই পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা স্ট্যালিনের সঙ্গে বসে আলোচনা করতেন। স্ট্যালিনের বিভিন্ন বাড়ির ঘর প্রায় একই রকমভাবে সাজান থাকতো। সম্ভবত মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা যে, এই একই ঘরে থাকবার প্রবণতার মধ্যে স্ট্যালিনের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্নতা এবং বারান্দা দরজা আসবাবপত্রে কোথাও শত্রু লুকিয়ে থাকতে পারে—এই ধরনের একটা ভীতি তাঁর ছিল। এই কাল্পনিক শত্রু ও গুপ্তঘাতকভীতি Paranoia স্ট্যালিনের মধ্যে একটা মানসিক রোগে পর্যবসিত হয়েছিল।

তৃতীয় অঙ্কে স্ট্যালিনের স্বৈরাচারের আরও বৃদ্ধি। ফলে স্ট্যালিন সমগ্র পরিবার ও আত্মীয়স্বজন থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন এবং বহু নিকট আত্মীয়-স্বজনের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটল। সমস্ত ঘটনা ঘটেছে ১৯৩৬-৩৮ সালের 'শোধন' বা 'পার্জ'-এর ফলে এবং মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়। স্ভেতলানা তাঁর মায়ের পরিবার সম্বন্ধে লিখেছেন যে, এ'রা সবাই সংবেদনশীল, ভাবপ্রবণ, স্নেহশীল ছিল। বিপ্লব ও যুদ্ধের জীবনকে এ'রা সাহসের সঙ্গে বরণ করে নিলেও এই কঠোর জীবন কেউ-ই সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর মায়ের প্রিয় ভ্রাতা প্যাভেল ৩৮ সালের 'শোধনে' যখন বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের বন্দী হতে দেখলেন, তখন হঠাৎ একদিন অফিসে হৃদরোগে মারা গেলেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর স্ত্রী স্বামীকে বিষ দিয়ে হত্যা করার ও গুপ্তচর হিসাবে অভিযুক্ত হয়ে জেলে গেলেন। মায়ের ভগ্নী অ্যানাও জেলের নির্জন কক্ষে প্রেরিত হন। অ্যানার স্বামীকে শোধনে গুলি করে হত্যা করা হয়। (এ'দের সম্বন্ধে স্ট্যালিনের অভিমত হল এ'রা বেশী কথা বলে, জানে বেশী ও শত্রুপক্ষকে সাহায্য করেছে।) ১৯৫৪ সালে অ্যানা যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তিনি প্রায় মানসিক বিকারগ্রস্ত রুগী। এই সাময়িক জীবন মায়ের অপর ভ্রাতাকেও প্রায় মানসিক রোগে পঙ্গু করে দিয়েছিল। স্ট্যালিনের প্রথমা স্ত্রীর ভ্রাতা ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই পণ্ডিত ও অর্থনীতিবিদ ছিলেন। এ'রা দুজনেই বন্দী হন। স্ত্রীর ভ্রাতাকে গুলি করে হত্যা করা হয় ও ভ্রাতার স্ত্রী, হত্যার সংবাদে জেলে মারা যান। স্ভেতলানার জীবনেও এই সময় পরিবর্তন এলো। মায়ের মৃত্যুর দশ বছর পর্যন্ত বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু ১৬ বছর বয়সের কিশোরী জীবনে তিনি যখন চল্লিশ বছর বয়স্ক এক ইহুদী চিত্রনির্মাতার প্রেমে পড়লেন, সে বন্ধুত্ব স্ট্যালিন মোটেই পছন্দ করলেন না। দশ বছরের জন্য চিত্রনির্মাতাকে মস্কো থেকে বহিষ্কৃত করা হয়, পরে তাকে বন্দীশিবিরেও পাঠানো হয়। এই সময় স্ট্যালিন হঠাৎ একদিন তাঁর ঘরে এসে তার গালে আঘাত করলেন। চিৎকার করে বললেন(৪) "নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। কে তোমায় চাইবে? তুমি একটা বোকা। ওর চারপাশে মেয়েমানুষ আছে" (পৃঃ ১৯২)। এ ছাড়া এই সময় স্ভেতলানা একটি বিদেশী পত্রে আবিষ্কার করেন যে, তাঁর মা আত্মহত্যা করেছিলেন। এর পর থেকে স্ভেতলানার মনে হল কী যেন একটা তাঁর ভেতর ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি আর তাঁর পিতার আজ্ঞা বা ইচ্ছা প্রশ্ন ছাড়া গ্রহণ করতে পারলেন না (পৃঃ ১৮১)। ১৯৪৪ সালে স্ভেতলানা একটি ইহুদী ছাত্রকে বিবাহ করেন। বহু ইউরোপীয়র মত স্ট্যালিনের ইহুদীবিদ্বেষ Anti-Semitism সর্বজনবিদিত। তিনি স্ভেতলানার স্বামীর সাথে একবারও সাক্ষাৎ করেননি। যদিও তাঁদের পুত্র জোসেফ সম্বন্ধে স্নেহপ্রবণ ছিলেন। ব্যক্তিগত কারণে এই বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং ১৯৪৯ সালে Zhadnov পরিবারে স্ভেতলানা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই পরিবারের সাথে স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও এই পরিবারের ছেলেদের সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল না। এই বিবাহে তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। স্ভেতলানার এই বিবাহও স্বল্পস্থায়ী।

৩ "She seldom kissed me or stroked my hair. My father, on the other hand, was always carrying me in his arms, giving me loud, moist kisses and calling me pet names likes, "little sparrow' and 'little fly'."

([illegible] পত্র, পৃঃ ১০৬)

৪ "Take a look at yourself who'd want you? You fool! He's got women all around him."

পৃঃ ১৯২

সমস্যেরে স্ট্যালিনের সম্বন্ধে স্ভেতলানার মন্তব্য কয়েকটি অংশে পরিস্ফুট। প্রথম পত্রে পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "আমার বাবা কষ্টকর মৃত্যুবরণ করেছে। এই প্রথম আমি মৃত্যু দেখলাম। ভগবান সৎলোকেদের সহজ মৃত্যু দেন।"(৫) বই-এর শেষে মন্তব্য—"বিচারের দায়িত্ব আগামী যুগের ছেলেমেয়েদের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক, যাদের সঙ্গে বর্তমানের কোন পরিচয় নেই। বিচারের দায়িত্ব সেই সব নূতন যুগের মানুষদের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক—যারা তাঁদের নিজস্ব মন ও মতামত নিয়ে সমস্ত জিনিস বিচার করতে পারবে এবং 'ভয়ঙ্কর আই ভ্যানের' সময়ের মতই এই সময় তাদের কাছে অনেক সুদূর অপরিচিত ও ভয়াবহ লাগবে।"(৬)

স্ট্যালিনের ছবি কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তাই বইটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হবে এবং তার দ্বারাই বইটির মূল্যায়ন অনেকখানি নিরূপিত হবে। স্ট্যালিন সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা। (বিশেষ করে ১৯৫৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ অধিবেশনে ক্রুশ্চেভের গোপন বক্তৃতার পর) কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ও 'কন-ট্রাডিকশানের' উপর ভিত্তি। স্ট্যালিন এ যুগের সবচেয়ে বড় স্বৈরাচারী, তার নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা (৩৬-৩৮ 'শোধন' প্রায় ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক গ্রাস করে), তার ভুলভ্রান্তি (অনেকের মতে ভুলের মাশুল লেলিনগ্রাড 'মহাযুদ্ধে' ১০০ দিন শত্রু কবলিত ও প্রায় ১৩ লক্ষ অসামরিক জীবন ক্ষতি) সব সত্য। কিন্তু তাঁরই নেতৃত্বে রাশিয়ার বিস্ময়কর অগ্রগতি বর্তমান ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। স্ভেতলানা সম্ভবত নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন। প্রথম পত্রে স্ট্যালিনের মৃত্যুর সময় লিখেছেন প্রত্যেকেই, বিশেষ করে নেতারা (ব্যতিক্রম ব্যারিয়া) আন্তরিক অশ্রুজল ফেলেছে, প্রত্যেকেরই দুঃখ আন্তরিক কেউ শোকের ভান করে নি (পৃঃ ১৯)। টাইমসের সাংবাদিক কিরিল টিডমার্স (kyirl Tidmarsh) একটি প্রবন্ধে স্ট্যালিনের প্রতি বর্তমান রাশিয়ার নীতি আলোচনা করেছেন ও সদ্য প্রকাশিত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির একটি বই-এ ("Collectivism, the highest principle of party leadership") এই নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার উল্লেখ করেছেন। বইটিতে বলা হয়েছে, পার্টির প্রধান সচিব হিসাবে, মার্কসবাদ বিশ্লেষক হিসাবে ও নিপুণ সংগঠক হিসাবে স্ট্যালিন পার্টিকে পরিচালনা করেন এবং "লেনিনবাদ" অনুসরণ করেই তিনি ট্রট্স্কিবাদ, দক্ষিণপন্থী, বুর্জোয়া মতবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। শ্রেণী যুদ্ধে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক অধিকারের সংকোচনের উল্লেখ করে বইটি যে, শ্রেণীদ্বন্দ্ব অধিকারের আংশিক সংকোচন ছাড়া উপায় ছিল না। রাশিয়ার ভিত্তিই গণতান্ত্রিক—যে গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে কোন স্বৈরাচারীই খর্ব করতে পারবে না। এই নীতি স্টালিনস্তুতি বা 'ব্যক্তিপূজার' পুনঃ আগমনের চিহ্ন নয়। স্ট্যালিনের অবদান রাশিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে যদিও তারা 'স্ট্যালিন যুগে' ফিরে যেতে কখনই ইচ্ছুক নয়।

ব্যারিয়ার ভূমিকা বইটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। স্ভেতলানা লিখেছেন যে, স্ট্যালিনের মৃত্যুকালে ব্যারিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেন এবং নিষ্ঠুরতা, ধূর্তামি ও ক্ষমতালোভের একটা আশা তাঁর সারা মুখে ফুটে উঠেছিল (পৃঃ ১৫।) স্ট্যালিনের বহু নিষ্ঠুর কাজের সহায়ক ছিলেন ব্যারিয়া। স্ভেতলানা বুদ্ধিমতী তিনি ব্যারিয়াকে "স্কেপগোট" করার চেষ্টা করেন নি। স্ট্যালিন সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে, একবার কোন লোক সম্বন্ধে তাঁর মন বিষাক্ত হলে, সেই মত তিনি পালটাতে পারতেন না। এই মনবিষাক্তের কাজে ব্যারিয়া সদাসর্বদা নিয়োজিত ছিল। স্বাভাবিকভাবে কন্যা হিসাবে তিনি পিতার কার্যের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্ট্যালিনের নির্মমতা তাঁর চরিত্রের মধ্যেই কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি ব্যারিয়া, ইয়েজহভ প্রভৃতিকে সাহায্যকারী হিসাবে পেয়েছিলেন। ব্যারিয়ার মস্কোর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের বহু পূর্বেই স্ট্যালিনের 'শোধনকার্য' অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বইটি রাশিয়ার বর্তমান নেতাদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে গৌরবান্বিত করেছে তিনি হলেন ক্রুশ্চেভ।

বইখানি বহু ভ্রান্ত ধারণা দূর করবে। স্ট্যালিনকে হত্যা করা হয় নি, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। তাঁর স্ত্রীকেও হত্যা করা হয় নি মানুষ স্ট্যালিনের এই বোধ হয় প্রথম চিত্র।

স্ভেতলানা পেশাদার লেখিকা নন। এ ধরনের লেখায় কিছুটা ভাবপ্রবণতা থাকবেই। লেখিকা হিসাবে তাঁকে টুর্গেনিভ, টলস্টয়, চেকভ, বা পাস্তেরনাকের পর্যায়ে তুলনায় অতিশয়োক্তি মন্ত করেও (যা এডওয়ার্ড ক্র্যাঙ্কশ বই-এর 'ডাস্টকভারে' করেছেন) বলা যায় চিঠিগুলি স্বচ্ছ ঝরঝরে। স্ভেতলানার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। পাঠকের মনে হবে স্ভেতলানা যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন তাই লিখেছেন। মনে হবে না 'প্রচার মাহাত্ম্য' অথবা অন্য কোন "উদ্দেশ্য" বইখানি লিখতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। বইটিতে ব্যক্তিগত কথাই বেশী মনে হয় স্ট্যালিনের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্বল্প। সংবাদ রটেছিল রাশিয়া পরিত্যাগের সময় তিনি কিছু গোপন কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন। এ খবর কতখানি সত্য অনুমান করা কঠিন। হার্পার কোম্পানীর মিঃ ল্যাসিট অবশ্য আশা করেছেন যে, স্ভেতলানা আর একখানি বই নিশ্চয়ই লিখবেন। সে বই না বেরোনো পর্যন্ত, সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।

৫ "Why father died a difficult and terrible death. It was the first and sofar the only time I have seen somebody die. God grants an easy death only to the just." (Pp. 17.)

৬ "Let the judging be done by later generations, by men and women who didn't know the times and the people we knew. Let it be left to new people, people with minds of their own to whom the years, I've described will be as remote and inexplicable, as terrible and strange, as the reign of Ivan the Terrible." (Pp 245-46).

চিনতে পারো নি?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
তুমি আমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী,
মনে পড়ে না?
কেন তোমার ব্যস্ত ভঙ্গি?
কেন আমায় এড়িয়ে যাবার চঞ্চলতা
আমার অনেক কথা ছিল, তোমার জামার বোতাম ঘিরে
অনেক কথা
এই মুখ, এই ভুরুর পাশে চোরা চাহনি,
চিনতে পারো নি?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
আমি তোমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী,
মনে পড়ে না?
আমরা ছিলাম গাছের ছায়া, ঝড়ের হাওয়ায় ঝড়ের হাওয়া
আমরা ছিলাম দুপুরে রুক্ষ
ছুটি শেষের সমান দুঃখ—
এই দ্যাখো সেই গ্রীবার ক্ষত, এই যে দ্যাখো চেনা আঙুল
এখনো ভুল?

মনে হয় না তোমার সেই নিরুদ্দেশ সখার মত?
কেন তোমার পাংশু চিবুক, কেন তোমার প্রতিরোধের
কঠিন ভঙ্গি
চিনতে পারো নি?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
শত্রু নই তো, আমরা সেই ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না?
আমরা ছিলাম নদীর বাঁকে ঘূর্ণিপাকে
সন্ধ্যেবেলা
নিষিদ্ধ দেশ, ভাঙা মন্দির, দু' চোখে ধোঁয়া
দেবী মানবীর প্রথম দ্বিধা, প্রথম ছোঁয়া, আমৃত্যু পণ
গোপন গ্রন্থে এক শিহরন, কৈশোরময় তুমুল খেলা...
লুকোচুরির খেলার শেষে কেউ কারুকে খুঁজে পাইনি
হারিয়ে গেলাম, দ্যাখো সে মুখ, চোরা চাহনি
একই আয়না
চিনতে পারো না?

আমার আলোকতীর্থের বন্ধুরা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

আমি ও আমার আলোকতীর্থের বন্ধুরা
শচীশ হিমাদ্রি আর রমল সৌরেন,
সৃষ্টির সমস্যা নিয়ে বড় বেশী চিন্তিত ছিলাম;
এবং নিত্যদিন আমরা কজন,
বিবিধ বিষয় নিয়ে ডজন ডজন,
লিখতাম যত না,
তার চেয়েও বেশী,
—বকতাম কথা কইতাম।

আমি ও আমার আলোকতীর্থের বন্ধুরা
শচীশ হিমাদ্রি আর রমল সৌরেন,
আমাদের মুখে ছিল এঞ্জেলো, দ্য ভিনচি, অ্যালিয়েট্
লরেন্সের নাম:
এবং নিত্যদিন আমরা কজন,
খুদে চায়ের কাপে ডজন ডজন,
জানতাম যত না,
তার চেয়েও বেশী,
—বিদ্যে জাহির করে তর্কের ঝড় তুলতাম।

আমি ও আমার আলোকতীর্থের বন্ধুরা
শচীশ হিমাদ্রি আর রমল সৌরেন,
স্নাতক-উত্তর শ্রেণী অহংকারে ঝলমল মুখ.
স্থির বিশ্বাস ছিল,
যা কিছু হয়েছে লেখা,
পুরোনো যা কিছু শেখা,
হাস্যকর; আমরাই একদিন ভরে দেব সৃষ্টির বন্ধ্যতার বুক।

আমি ও আমার আলোকতীর্থের বন্ধুরা
শচীশ হিমাদ্রি আর রমল সৌরেন,
অনেক বছর বাদে এর ওর টুকরো টুকরো খবর পেলাম;
শচীশ কেরানী আর হিমাদ্রি স্টেনো,
রমল ওষুধ বিক্রি করে,
বাস-স্টপে সৌরেন
এক গাল হেসে বলে, বিয়ে করে ফেললাম,
পুটিয়ারী ইস্কুলের মাস্টারী জুটে গেছে।
আমি ও আমার আলোকতীর্থের এক বন্ধু
সেই উপলক্ষেই বহুদিন পরে,
আনন্দে যত না,
তার চেয়েও বেশী,
—খুচুকার রেস্তোরাঁয় বাসী মাংস
আহারে এলাম।

আমরা তিন পুরোন বন্ধু সেদিন বিকেলে অতি পুরোন এক বিষয় নিয়ে তর্কে মেতেছিলাম। আলোচনার বিষয় ছিল সৌন্দর্যতত্ত্ব। জীবনের ওপর সৌন্দর্য-চর্চার সত্যিই কোন প্রভাব আছে কিনা, শিল্পচর্চায় চারিত্রিক উন্নতি হয়, না তার অবনতি ঘটে এই একান্ত পুরোন প্রসঙ্গ আমাদের পুরোন বন্ধুদের মধ্যে কী করে যে উঠল ঠিক মনে নেই। আমার দুই বন্ধু নীলাম্বর দত্ত আর প্রিয়শঙ্কর সেন দুজনে দুপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। দুজনেরই পেশা এক—অধ্যাপনা। বয়স একই রকম, পঞ্চাশের কাছাকাছি। আর্থিক অবস্থাও মোটামুটি একই স্তরের। কিন্তু সৌন্দর্য সম্বন্ধে দুজনের বিস্তর মতভেদ লক্ষ করছিলাম।

নীলাম্বর সৌন্দর্যের পরম মূল্যে বিশ্বাসী। তার ধারণা সৌন্দর্য শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জোগায় না তা চিত্তকেও উন্নত করে। প্রিয়শঙ্করের অভিজ্ঞতা এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। তার অভিমত সৌন্দর্যের কোন স্থায়ী মূল্য নেই। কি সৃষ্টির দিক থেকে কি সম্ভোগের দিক থেকে তা একান্তই ক্ষণিক। সাময়িক চিত্ত-বিনোদনেই তার কাজ শেষ। বরং রূপের চর্চায় উল্টো ফল ফলতেই বেশি দেখা যায়। প্রিয়শঙ্করের বক্তব্য: 'সৌন্দর্য যদি মানুষকে রক্ষাই করত তাহলে সমস্ত লিখিয়ে আঁকিয়ে গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ের দল এক একজন সাধুপুরুষ হয়ে উঠত। অথচ এদের মধ্যে নড়বড়ে দুর্বল চরিত্রের মানুষই বেশি। একটু খোঁজ নিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে এদের ব্যক্তিগত জীবনে সৌন্দর্যের জায়গা কত কম। কেউ অহংকারী, দম্ভের কাঁটা

স্তাব দিয়ে ঘেরা, কেউ বা যশ অর্থের কাঙাল, কেউ বা নেশা ভাঙ আর যৌন-বিকারের শিকার। এই স্ববিরোধ তোমার সৌন্দর্য-সাধকদের মধ্যে যত দেখি তত আরো কারো মধ্যেই নয়।

প্রিয়শঙ্কর তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নানা ধরনের উপাখ্যানও আমাদের শোনাচ্ছিল। সবই মানুষের ক্ষুদ্রতার কাহিনী। তাঁর স্খলন পতনের ইতিবৃত্ত।

প্রিয়শঙ্করের গলার স্বরে মাদকতা আছে। বলার ভঙ্গিও মনোহর। সৌন্দর্যের মূল্যে বিশ্বাসী নীলাম্বর ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। সে মহৎ শিল্পী আর মহৎ মানুষের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছিল, কিন্তু প্রিয়শঙ্করের গলার জোরের কাছে তার হার না মেনে উপায় ছিল না।

প্রিয়শঙ্কর বলছিল, 'ও'দের কথা ছেড়ে দাও। অলৌকিকতা দিয়ে আমরা ও'দের ঘিরে রেখেছি। ওসব সাধুসন্তদের জীবন-বৃত্তান্তে কত পরু চুনকাম লাগানো হয়েছে তার হিসেব তোমার কাছেও নেই, আমার কাছেও নেই।'

নীলাম্বর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কল্যাণ, প্রিয়শঙ্কর যে তোমার জাতভাইদের একেবারে কচুকাটা করে ছাড়লে তুমি কোন কথা বলছ না যে।'

আমি বললাম, 'যারা কচুগাছ কাটতে আসে তারা শুধু কচুগাছই দেখে আর কাটে। তারা বড়জোর ডাকাত হয়। তার বেশি আর কী হবে?'

এই তর্কের আসরে আর এক ভদ্রলোক চুপচাপ বসেছিলেন। কোণের ছোট সোফাটায় বসে তিনি এক কাপ চা খেয়েছেন। একটি সিগারেট শেষ করেছেন। তারপর আমাদের এই তর্কযুদ্ধ বসে বসে দেখছেন আর শুনছেন।

আমার এই প্রতিবেশী বন্ধুস্থানীয় ভদ্রলোকও উত্তরপঞ্চাশ। ব্যবসায়ী মানুষ। নানারকম উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে দিন কাটিয়েছেন। যতদূর জানি এখনকার পালাটা ঠিক উত্থানের নয়। জীবনকৃষ্ণবাবু আমার কাছে এসেছেন একটা দরকারী কাজে। যে বাড়িটা তিনি কিনেছেন তার স্বত্ব নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলছে। ও'র উকিল কলকাতায় নেই। আমার অ্যাডভোকেট বন্ধু নৃপেন গাঙ্গুলির কাছে ও'কে আমি আজ সন্ধ্যায় নিয়ে যাব বলে কথা দিয়েছি। জীবন-বাবু তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। নীলাম্বররা বিদায় নিলেই আমি ও'কে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

ইতিমধ্যে জীবনবাবুর সঙ্গে আমি আমার দুই বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে গৃহকর্তার দায়িত্ব শেষ করেছি। দুপক্ষ পরস্পরের নাম শুনেছেন, পেশার বৃত্তান্তও শুনেছেন, নমস্কার বিনিময় করেছেন কিন্তু তারপর ও'দের আলাপ আর এগোয়নি।

আমার দুই অধ্যাপক বন্ধু অবৈষয়িক আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। আর এই প্রতিবেশী নিজের বিষয়-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

আমি নিজে থেকে এ'দের মধ্যে সেতু-বন্ধনের কোন চেষ্টা করিনি।

কিন্তু প্রিয়শঙ্কর নিজেই উপযাচক হয়ে হঠাৎ ও'কে দলে টেনে নিল, 'রক্ষিতমশাই, আপনি কী বলেন?'

জীবনকৃষ্ণ একটু চমকে উঠলেন, 'কোন সম্বন্ধে?'

প্রিয়শঙ্কর বলল, 'এই রূপ রস সম্বন্ধে আপনার কী মত?'

জীবনকৃষ্ণ সবিনয়ে বললেন, 'আজ্ঞে আপনাদের সামনে কথা বলতে পারি আমার কি সেই সাধ্য আছে? আমি কি ওসব বিষয়ের রসিক? কলেজ ছাড়বার পর মা সরস্বতীর সঙ্গে আমি আর কোন সম্পর্ক রাখিনি।'

প্রিয়শঙ্কর বলল, 'ভালোই করেছেন। সরস্বতীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও মা ছেলের নয় বড়জোর মাসী বোনপোর। ওসব কথা থাক। আপনি আপনার লক্ষ্মীর সাধনার কথাই বলুন।'

জীবনকৃষ্ণ মৃদুস্বরে বললেন, 'তাই বা হল কই মশাই। লক্ষ্মী সরস্বতী কারো সাধনাই হল না। কারো কৃপাই শেষ পর্যন্ত পেলাম না। লোকে বলে দুষ্টা সরস্বতী। কিন্তু লক্ষ্মীও কম দুষ্টা নন। কিন্তু ও'দের দুই বোনকে গালাগাল দিলে কী হবে, নিজেদের কুকর্মের জন্যে দায়ী আমরা নিজেরাই।'

প্রিয়শঙ্কর হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার মতামত আছে। আমি সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে রাজি নই। আমি কাউকে কাউকে কিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে চাই।'

নীলাম্বর বিরক্ত হয়ে বলল, 'আর কথা দিয়ো না ও'কে বলতে দাও। আপনি বলুন জীবনবাবু।'

জীবনবাবু বললেন, 'আমি কি আপনাদের মত বলিয়ে-কইয়ে? আপনাদের আলোচনা শুনে অনেকদিন আগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছিল। সেই গল্প সংক্ষেপে বলব। কিছু ভাববেন না। আজ আমার একটু তাড়া আছে। তা ছাড়া মনটাও তেমন স্থির নেই।'

একটু চুপ করে থেকে জীবনবাবু ফের শুরু করলেন, 'অনেকদিন আগেকার কথা। মহম্মদ আলি চৌধুরী তখন পাকিস্তানের প্রাইমমিনিস্টার।'

প্রিয়শঙ্কর হেসে বলল, 'শুরুতেই বেশ একটু ঐতিহাসিক গন্ধ লাগিয়ে দিলেন দেখছি। আমিও তাই পছন্দ করি। গল্প হবে দূরকালের আর দূরদেশের। নিজেদের থোড় বড়ি খাড়া-চচ্চড়ির কথা শুনে শুনে কান পচে গেল। বলুন বলুন। শুরুতেই রোমাঞ্চিত হচ্ছি। আমাদের কাছে মহম্মদ আলিও যা হারুণ অল রসীদও তাই।'

আমরা দুই শ্রোতাই বিরক্ত হয়ে প্রিয়-শঙ্করকে থামিয়ে দিলাম, 'তুমি একাই বকবক কর। আমরা সবাই উঠে চলে যাই। আপনি বলুন জীবনবাবু।'

মৃদু হেসে জীবনবাবু ফের বলতে লাগলেন, 'মহম্মদ আলির সঙ্গে আমার মোটামুটি বন্ধুত্বই ছিল। এক শহরে থেকেছি, একই স্কুল-কলেজে পড়েছি। তারপর ও যখন খুবই বড় হয়ে উঠল আমি দূরে সরে এলাম। নিজের মান নিজের কাছে। শুধু একটা সরকারী চাকরিবাকরী নেওয়ার জন্যে ও কয়েকবারই আমাকে বলেছিল। কিন্তু অল্পবয়েস থেকে আমার গোঁ পারের গোলামি করব না। তখন বুঝতে পারিনি গোলামি মানুষকে করতেই হয়। গোলামি কি আর এক ধরনের?

যাক ওসব কথা। যা বলছিলাম। আমার পার্টনার তখন এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। নামটা কি দরকার? নাম বীরচাঁদ সুরেকা। বহু টাকার মালিক। নানারকম বিজনেস আছে। আমরা ঠিক করলাম মাদ্রাজ থেকে চাটগাঁয়ে হাজার দেড়েক বেল হ্যান্ডলুমের কাপড় পাঠাব। কিন্তু পারমিট নেই। এই পারমিট আমাকে আদায় করে নিতে হবে। বীরচাঁদ শুনেছে আমার সঙ্গে ওপারের মহলের জানাশোনা আছে। আমাকে দিয়ে সহজেই কাজ হাসিল হবে। দুজনে মিলে করাচী গেলাম। উঠলাম গিয়ে ... বিরাট হোটেল। বড় বড় ঘর। সবকটাই সুসজ্জিত। এক সপ্তাহের জন্যে সবচেয়ে দামী একটা ঘর ভাড়া নিলাম আমরা। বীরচাঁদ নিজে নিরামিষ খায়। শুদ্ধাচারের ... ধুতি। মাথায় শাদা টুপি। তার চালচলন ধরন-ধারণ দেখলে মনে হবে না সে কয়েক লক্ষ টাকার মালিক। কিন্তু নিজে সে অমন কৃপণের মত থাকলে কী হবে আমার সম্বন্ধে তার উদারতার সীমা ছিল না। আমাকে সে টাকাও হুকুম দিয়ে রেখেছিল, 'প্রাণ যা চাই তাই করো। পয়সার জন্যে চিন্তা করো না। আমোদ-কর, ফুর্তি-কর ওসবের বয়েস তো এই, তোমরা বাঙালী-বাবুরা জানো জীবনকে কী করে ভোগ করতে হয়। আমরা তা জানিনে।'

প্রদীপের সলতে যেমন একজন উসকে দেয় আমাকেও বীরচাঁদ তেমনি উসকে দিত। কিন্তু কেউ আমাকে হাত ধরে দেখিয়ে দেবে তবে আমি দেখব, সুখের সামগ্রী চিনিয়ে দেবে তবে আমি চিনব? এসব ব্যাপারে পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার বয়েস আমি অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি। কেউ

ঠেলে দিলেই আমি সেই পথে হুমড়ি খেয়ে পড়ব তেমন অবস্থা আমি নই। আমার কোন বাধানিষেধ ছিল না, শর্তটাই ছিল না। তবু এসব ব্যাপারে নিজের গরজটাই গরজ। পরের গরজে আর যাই হোক [illegible] করা যায় না।

একই ঘরে পাশাপাশি দুই খাটে আমরা থাকতাম। একই ডাইনিং হলে একই টেবিলে মুখোমুখি বসে আমরা খেতাম। বীরচাঁদ নিরামিষ খেত, আমি আমিষ-নিরামিষ কিছুই বাদ দিতাম না। বীরচাঁদ চর্ব্যচোষ্যলেহ্যেই এসে থেমে যেত। পানীয়ের মধ্যে খেত শুধু জল দুধ আর ওভালটিন। আমার সবই চলত। হোটেলের লাগা বার ছিল। আমি মজা করবার জন্যে বীরচাঁদকে মাঝে মাঝে সেখানে নিয়ে যেতাম। বলতাম, বীরচাঁদ একটু চেখে-টেখে দেখো না। তুমি নিজে পুণ্যবান থেকে আমাকে পাপের পথে ঠেলে দিচ্ছ, এটা কি ধার্মিকের কাজ?

বীরচাঁদ বলত, 'ভাই, আমার বয়স হয়েছে। ঘরে বউ ছেলেমেয়ে আছে। আমার ওসব সয় না, তোমার সয় তুমি করে যাও। তোমার তো কোন বাঁধনছাঁদন নেই। [illegible] আর কজন?'

পাশাপাশি খাটে শুয়ে অনেক রাত অবধি আমাকে ঘুমোতে দিত না বীরচাঁদ। নিজে খুব ফিলসফী পড়ত। কিন্তু [illegible] গল্প বলতে বীরচাঁদের আগ্রহের সীমা ছিল না। সংসারে এমন মানুষ আপনারাও দু-চারজন দেখে থাকবেন যারা পরের মুখে শুধু ঝাল নয়, [illegible] থাকে।

[illegible]

বীরচাঁদ আফসোস করে বলত, 'তোমার [illegible] এ বয়সে এসে এমন সন্ন্যাসী হয়ে বসে আছো কেন? এখনো খাপসুরৎ কি কিছু চোখে পড়েনি?'

আমি জবাব দিতাম, 'পড়বে না কেন। আগে যে কাজের জন্যে এসেছি তা সেরে নিই। তারপর তোমাকে সরেজমিনে দেখাতে নিয়ে যাব।'

বীরচাঁদ জিভ কেটে বলত, 'কী যে বলো। আমার কি সেই বয়েস আছে না এই বুড়ো শরীরে কোন শক্তিসামর্থ্য আছে? তুমি ভোগ-সুখ করো আমার শুনেই সুখ।'

বীরচাঁদ অবশ্য মোটেই বুড়ো ছিল না। আমার চেয়ে মাত্র পাঁচ-সাত বছরের বড় ছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারে এমন ভাবে দেখাত যেন ওর বয়সের গাছপাথর নেই।

আমি আনমনে সব শুনেছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম একটি পরীর কথা।

খাওয়াদাওয়ার পরে আমি শুতে গেলাম। চাকরবাকরের অভাব নেই। তারা আমার আরাম-আয়েসের সব রকম ব্যবস্থা করে দিল। বুড়ো ভদ্রলোক নিজেও এসে আমার খোঁজ-খবর নিয়ে গেলেন।

খাওয়ার সময় তবু দু-একবার দেখেছি। শুতে যাবার আগে রোশেনাকে একবারও দেখতে পেলাম না। ওর বাবা ওকে মাঝে মাঝে ডাকছিলেন আর ও আড়াল থেকে সাড়া দিচ্ছিল, সেই মিষ্টি গলাটুকু শুধু শুনতে পেলাম।

অনেক রাত অবধি আমার ঘুম এল না। আমি যাকে দেখেছি শুধু তার কথাই ভাবতে লাগলাম। তার ছবিই আমার চোখের সামনে স্থির হয়ে রইল। আসলে আমি তো একখানা ছবিই দেখেছি। একখানি দেয়াল চিত্র। সেই ছবিকে কামনা করার কোন মানে হয় না। সেই ছবি আমাকে মুখ ফুটে কিছু বলবে আমাকে হাতে ধরে কিছু দেবে একথা ভাবনার কোন মানে হয় না। এর সঙ্গে দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধই আলাদা। যা দেবার আমাকে একাই দিতে হবে। যা নেবার একাই নিতে হবে। তবু ঠিক যেন আমি পুরোপুরি নিঃসঙ্গও ছিলাম না।

সারা রাত আমি প্রায় জেগে কাটালাম। কিন্তু সেই রাত্রি জাগরণের মধ্যে কোন অস্থিরতার জ্বালা ছিল না। বাইরে মরুভূমির শুকনো প্রকৃতি জ্যোৎস্নায় ভরে উঠেছিল। চারদিকে শান্ত নির্জন, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। তবু এই পুরী যেন কিসের এক পরিপূর্ণতার নরক।

অপূর্ব সুন্দরী একটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে একই প্রাসাদে আমি আছি, একই পৃথিবীতে আমি বেঁচে আছি—এর চেয়ে বড় বিস্ময়ের যেন কিছু নেই।

আমার মনে হতে লাগল বড় তুচ্ছ কাজে আমার দিন কেটে যাচ্ছে। আমার যা হওয়ার কথা ছিল তা আমি হলাম না। আমার যা দেওয়ার কথা ছিল আমি তা দিয়ে যেতে পারলাম না।

আমার ইচ্ছা করতে লাগল আমি ওকে সব দিয়ে যাই। সব? কিন্তু আমার সব যে ওর কাছে কানাকড়ি।

পরদিন সকালে আমি ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে আমার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়েছে কিনা।

আমি বললাম 'এমন ঘুম আমি জীবনে ঘুমাইনি।'

তিনি আমাকে আরো একটা দিন থেকে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন।

আমি বললাম, 'না, আমার কাজ আছে।'

তিনি বললেন, 'কিন্তু তুমি কী কাজে এসেছিলে তা তো বললে না বাবা।'

এক রাতের মধ্যে বৃদ্ধ আপনি থেকে তুমি-তে নেমেছেন। অনাত্মীয়তা থেকে উঠেছেন আত্মীয়তায়।

আমি বললাম, 'কাজে আসিনি। অমনি বেড়াতে এসেছি। দেখতে এসেছি।'

তিনি বললেন, 'আবার এসো।'

রোশেনাও সেই কথাই বলল, 'ফির আয়েঙ্গে।' তারপর চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল।

শেষবারের মত সেই ফুটন্ত শ্বেত পদ্মটিকে দেখে নিয়ে তার মৃদু সৌরভে সমস্ত বুক ভরে নিয়ে আমি উটের পিঠে উঠে বসলাম। এবার আমার মনে হল এমন পরম সুন্দর জীব আমি আর দেখিনি। এমন আরামদায়ক বাহন আমি আর জীবনে কখনো পাইনি।

স্টেশনে ফিরে এসে খাঁসাহেবের সেই লোকটিকে সাধ্যমত বকশিস দিলাম। আর উটের গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে ওকে প্রাণভরে আদর করে নিলাম।

বীরচাঁদ বিশ্বাসই করল না আমি পারমিট আদায় করতে পারিনি। আমি মিছিমিছিই অত কষ্ট করে মরুভূমির বালি ঘেঁটেছি।

সে আমাকে আট-দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল। পেলাম না। লোকসান হয়ে গেল। হোটেলের খরচও নগদে আমার কাছ থেকে সে আদায় করে নিল।

করাচীতে আরো কিছুদিন থেকে বীরচাঁদ পারমিটও আদায় করেছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে সেই যে ছাড়াছাড়ি সে আর জোড়া লাগেনি।

তারপর আরো কত পার্টনার জুটেছে, [illegible]। বিনা পার্টনারেও ব্যবসা চালিয়েছি। সোজা পথেও হেঁটেছি, বাঁকা পথেও হেঁটেছি। কিন্তু যার হবার নয়, তার কোন পথেই হয় না। যার যাবার তার সবই যায়।

অবশ্য এখন আর আমি বন্দরে বন্দরে ঘুরিনে। ঘরসংসার হয়েছে। ছেলেমেয়ে আছে। সেদিক থেকে একরকম শান্তিতেই আছি।

কিন্তু মানুষের এক শান্তি কি অন্য অশান্তি দূর করতে পারে? এক রকমের পাওয়া কি অন্য রকমের না-পাওয়ার জ্বালা মেটাতে পারে?

সাধুসন্তরা বলেন, পাওয়ার মত পাওয়া হলে পারে।

কী জানি।

কতদিন হয়ে গেল। মরুভূমির উট কিন্তু মশাই আমাকে আজো ছাড়েনি। সে এখনো মাঝে মাঝে এসে হানা দেয়। কখনো স্বপনে কখনো দিবাস্বপনে।'

জীবনবাবু থামলেন।

প্রিয়শঙ্কর বলল, 'বলেন কি? শুধু উট?'

জীবনবাবু এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালেন।

ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহী কবি খাইরিল আনোয়ার

শিবনারায়ণ রায়

তরুণ বয়সে দৃষ্টি ছিল মুখ্যত পশ্চিমের দিকে। চিত্রকলার জগতে সুররেয়ালিস্টরা, কবিতার জগতে এলিয়ট, উপন্যাসে জয়েস, দর্শনে লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা যেমন কল্পকারখানা শুরু করেছিলেন তাতে কলকাতায় বসেও আমাদের পক্ষে চঞ্চল না হয়ে উপায় ছিল না। তা ছাড়া মস্কো ট্রায়াল এবং মিউনিকের বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের মর্মাহত মনে গভীর আলোড়ন তুলেছিল।

ফলে প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ঐ সময়ে যেসব বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছিল তা নিয়ে আমরা বড় একটা মাথা ঘামাই নি। এই অঞ্চলের সঙ্গে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে বছর দশেক আগে, জাপান থেকে ফেরার পথে। তারপর গত পাঁচ বছরের মধ্যে অনেকবার এই দেশগুলিতে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছে, এবং মাঝে মাঝে 'দেশ' পত্রিকায় সে সম্পর্কে লিখেছি। আশা রাখি বাংলা দেশে এখন যাঁরা তরুণ তাঁরা এইসব দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী হবেন এবং তাঁদের উদ্যোগে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে আবার আত্মীয়তা গড়ে উঠবে।

এই অঞ্চলের প্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা দশ কোটির ওপরে। পঞ্চাশ বছর আগেও কিন্তু এই সাড়ে সাত লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ছড়ানো দ্বীপপুঞ্জের কোনো জাতীয় ভাষা ছিল না। ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন সাহিত্য জাভানীজ, সুন্দানীজ, মিনাংকাবাউ ইত্যাদি প্রায় শ দুয়েকের মত আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এখানে বৈদেশিক ডাচ্ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়, এবং তখন নেতারা ডাচ্ ভাষার পরিবর্তে দেশজ একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করেন। এই প্রয়োজনের তাগিদে বিশের দশকে বাহাশা ইন্দোনেশিয়ার উদ্ভব ঘটে। হাটে-বাজারে যে বাজার মালয়ী ভাষা চলিত ছিল, অনেকটা তারই ভিত্তির ওপরেই ইন্দোনেশিয়ার এই নব জাতীয় ভাষা প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া মালায়ার সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকেও বাহাশা ইন্দোনেশিয়া প্রচুর পরিমাণে সম্পদ আহরণ করেছে।

ফলত ইন্দোনেশিয়ার এখন যেটি জাতীয় ভাষা তার বয়স বছর চল্লিশের বেশী নয়। অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যেই আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্য আশ্চর্য রকমের সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। নানা কারণে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক বিবর্তন মোটেই আশাপ্রদ নয়, কিন্তু তা থেকে বাহাশায় লেখা সাহিত্য সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত করলে অত্যন্ত ভুল হবে। স্বভাবতই এই সাহিত্যে আধুনিক পশ্চিমের প্রভাব বিশেষ প্রবল। কিন্তু এখানকার সুজলা সুফলা প্রকৃতি, ইসলাম ধর্ম, এবং একটির পর একটি ট্রাজেডির তীব্র অভিজ্ঞতা এই সাহিত্যে এমন একটি স্বকীয়তা এনে দিয়েছে, যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথা স্মরণে আনে।

১৯২৮ সালে ইন্দোনেশীয় যুব কংগ্রেস জাতীয় ভাষা সম্পর্কে প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারপর তিরিশের দশকে বাহাশা ইন্দোনেশিয়ার দ্রুতগামী বিকাশ এবং সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ঘটে মুখ্যত অল্প কয়েকজন শক্তিশালী লেখকের সমবেত প্রচেষ্টায়। এঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন সুতান তকদির আলিশিয়াবানা (জন্ম ১৯০৮), আমির হামজা (১৯১১-৪৬) এবং আরমীন পানে। এঁরা ১৯৩৩ সালে "পুজঙ্গা বারু" (Pudjangga Baru) অর্থাৎ নবীন লেখক নামে একটি পত্রিকা বার করেন, এবং তারই মারফত ভাষা এবং ভাবনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটান। আধুনিক বাংলার ইতিহাসে "বঙ্গদর্শন" এবং "সবুজ পত্রে"র যে দাম তার চাইতে আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে "পুজঙ্গা বারু"র দাম তার চাইতে কম স্মরণীয় নয়। পুজঙ্গা বারু আন্দোলনের নেতা আলিশিয়াবানার প্রতিভা বিচিত্রমুখী। একই সঙ্গে ইনি কবি, ঔপন্যাসিক এবং বহুবিদ্য প্রাবন্ধিক — ইন্দোনেশীয় ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, বিবিধ ক্ষেত্রে ইনি নতুন ভাষায় প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থপ্রবন্ধাদি লিখেছেন। রাজনীতির দিক থেকে ইনি ডেমোক্রাটিক সোস্যালিস্ট; ফলে কয়েক বছর আগে সুকর্ণর একনায়কত্বে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইনি স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নেন। বর্তমানে ইনি কুয়ালালমপুরে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক। বাহাশা ছাড়াও ফরাসী, ইংরেজী এবং ডাচ ভাষায় এঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

"পুজঙ্গা বারু" প্রথম পর্যায়ে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২। প্রথম পর্যায়ের প্রধান ভাবুক যদিও আলিশিয়াবানা, এই যুগের শ্রেষ্ঠ ইন্দোনেশিয়ান কবি হলেন আমির হামজা। ইনি অভিজাত বংশের ছেলে; নীচু ঘরের একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু আত্মীয়দের বিরোধিতার ফলে তাঁকে বিয়ে করতে পারেননি। প্রেম এবং নিঃসঙ্গতা এঁর কবিতার মূল বিষয়—যে নারীকে পাননি এবং যে ঈশ্বর ধরাছোঁয়ার বাইরে দুইই তাঁর লিরিক কল্পনায় পরস্পরে যুক্ত। এঁর ভাই অমল হামজা বাহাশায় "গীতাঞ্জলি" অনুবাদ করেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ইন্দোনেশিয়ান সাহিত্যে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। পুজঙ্গা বারুর ভাবুকরা ছিলেন মেজাজের দিক থেকে ধ্রুপদী; নতুন ভাষা গড়তে গিয়ে মালয়ী ঐতিহ্যকে তাঁরা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু ১৯৪৫-এর পর যে তরুণ লেখকরা দেখা দিলেন তাঁরা সংরক্ষণ এবং সংস্কারের চাইতে আমূল রূপান্তরকেই বেশী জরুরী মনে করলেন। এঁদের বলা হয় "পঁয়তাল্লিশের সন্তান" (Angkatan '45)। প্রচলিত রীতিনীতি আদর্শ প্রতিষ্ঠান সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এঁদের লেখার মূল প্রেরণা। এঁদের নেতা হলেন খাইরিল আনোয়ার, এবং অধিকাংশ সাহিত্যরসিকের মতে ইনিই আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার সবচাইতে প্রতিভাবান কবি।

সুমাত্রার অন্তর্গত মেদানে ১৯২২ সালের ২৬শে জুলাই আনোয়ারের জন্ম। গরিব ঘরের ছেলে, তাই স্কুলের পড়া বেশী দূর এগোয়নি। কিন্তু তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায় আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ব্যাপক পরিচয় ছিল। রিলকে, এলিয়ট, লর্কা প্রভৃতির কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন। তার চাইতেও বড় কথা, পশ্চিমী কাব্যাদর্শে এইসব কবিরা যে গভীর রূপান্তর ঘটিয়েছেন তার সঙ্গে আনোয়ারের আত্মীয়তা ছিল, এবং বাহাশার কাব্যজগতে তিনি যে বিপ্লব আনেন তা এঁদের সঙ্গে তুলনীয়। অন্য তরুণ কবি এবং ভাবুকদের নিয়ে তিনি পুজঙ্গা বারু নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তার মুখপত্রের নাম "রঙ্গক্ষেত্র" (Gelanggang)। এই

আন্দোলনের ঘোষণাপত্রে বলা হয়, আধুনিক মন কোনো দেশের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী থাকতে পারে না, সে বিশ্বসাহিত্যের উত্তরাধিকারী। বিশিষ্টভাবে ইন্দোনেশিয়ান কোনো সংস্কৃতি নেই, ইন্দোনেশিয়ার কবি. শিল্পী, ভাবুকেরা যা কিছু সৃষ্টি করবেন তারই নাম ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতি।

অনেকের মতে, খাইরিলের ওপরে কম্যুনিস্ট চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছিল। তাঁর লেখা থেকে কিন্তু মনে হয় তিনি আসলে ছিলেন নিঃসঙ্গ নৈরাজ্যবাদী। পঞ্চাশের দশকের ইন্দোনেশিয়ান কম্যুনিস্ট সমালোচকেরা তাঁকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কবি বলে আক্রমণ করেছেন। নিজের জীবনে তিনি ছিলেন আমাদের দেশের নজরুল ইসলামের মতই পুরো বোহেমিয়ান বিদ্রোহী। এক দিকে অপরিসীম দারিদ্র্য এবং অন্য দিকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার ফলে অল্প বয়েসেই ক্ষয়রোগ ধরে, তাতে যোগ দেয় উপদংশ। ১৯৪৯ সালে ২৮শে এপ্রিল মাত্র সাতাশ বছর বয়সে এই অসামান্য প্রতিভাধর কবি জাকার্তার হাসপাতালে মারা যান।

খাইরিলের লেখা পরিমাণে খুব অল্প; অনুবাদ এবং টুকিটাকি রচনা বাদ দিলে তিনি সত্তরটির বেশী কবিতা লেখেন নি। তাঁর জীবদ্দশায় অধিকাংশ কবিতা পাণ্ডুলিপির আকারে পাঠকদের হাতে হাতে ঘুরেছে। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সংকলন তিনটি : Deru Tjampur Debu (ধুলো-মেশানো আওয়াজ); Kerikil Tadjam dan Jang Terampas dan Jang Putus (ধারালো পাথরকুচি); এবং Tiga Menguak Takdir (ভাগ্যের বিরুদ্ধে তিনজন)। শেষের সংকলনটিতে খাইরিল ছাড়াও কবি আসরুল সানি এবং

ম্রিবাই আপিনের লেখা আছে। মার্কিনের নিউ ডাইরেকশনস্ খাইরিলের কবিতার ইংরেজীতে একটি তর্জমা সংকলন প্রকাশ করেছেন (Chairil Anwar; Selected **Poems**, New Directions, 1963)। তা ছাড়া, বার্টন র‍্যাফেল সম্পাদিত **An** Anthology of Modern Indonesian **Poetry** (University of California Press, 1964) গ্রন্থেও খাইরিলের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়েছে।

নীচে খাইরিলের চারটি কবিতার তর্জমা দেওয়া গেল।

তুতির আইসক্রিম (Tuti Artic)

বর্তমান আর ভবিষ্যতের সুখের মাঝখানে
অনাবৃত অতল গহ্বর।
তন্বী চোষে সরস আইসক্রিম :
আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার প্রিয়তমা,
সংবর্ধনা করি তোমায় কেকে এবং
কোকাকোলায়
খেলা খেলার বউ।
আপাতত ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ বন্ধ থাকুক।

তোমার চুমো চতুর এবং যায় না মোছা।
বাইক চড়ে আমার সঙ্গে ঘরে এলে—
টগবগানো রক্তে তোমার নিশ্চয়তা
এবং দেহের ঋজু বড়ো স্বপ্ন দেখালো
যে স্বপ্ন চাঁদ ডিঙিয়ে কোথায় হারায়।
প্রতিদিনের নাগর ডাকে আপন ঘরে,
প্রতিদিনের নাগর তোমার ভিন্ন পুরুষ।
কালকে যখন দেখা হবে কেউ কাউকে
চিনব না ত :
স্বর্গ শুধু এই প্রহরের খুশির খেলায়।

আমিও সখি তোমার মত, পাশ দিয়ে
সব গড়িয়ে গেছে,
আমি, তুতি, গ্রীতি ও আমর......
ভাঙাচোরা মনের মালিক।

ভালবাসা বিপদ বটে যদিও তা
স্বল্পস্থায়ী ॥

মসজিদে (Dimesdjid)

চেঁচিয়ে ৰাক যতক্ষণ না আসে।
এবার আমরা দাঁড়িয়ে মুখোমুখি,
তারপর সে জ্বলে আমার বুকে।

নেবাই আগুন শক্তি এত নেই।
গোঁয়ার শরীর হার মানতে নারাজ,
ক্লান্ত অংগ ঘামেতে জবজবে।

মল্লক্ষেত্র নিরালা মসজিদ,
পরস্পরকে ধ্বংস করার লড়াই,
একজন সে ছুঁড়ছে গালাগাল,
অন্যজনও হয়েছে উন্মাদ ॥

বন্ধুর প্রতি (Kepada Kawan)

শূন্যতা ঘনিয়ে আসার আগে,
শেষ ধাপ্পা পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার
আগে,
যতক্ষণ শিরায় বইছে খুন, বুকে
আবেগের ওঠাপড়া,
হতাশা পাপড়ি মেলেনি অথবা অন্ধ ভয়,
মনে রেখো সন্ধ্যা মিলোয় হুঁশিয়ারির
আগেই
আঁধারে ডুবে যায় সিঁদুরবরণ পাল,
বন্ধু, এই ত বিদায় নেবার ক্ষণ :
যে শূন্যতা আমাদের টানছে সে নিজেই
আত্মঘাতী।

এবার তা হলে খালি কর পেয়ালা,
দুনিয়াটাকে এপিঠ ওপিঠ ফোঁড়ো অথবা
ওলটাও,
পিয়ার কর সাকীকে (মোসায়েবরা কেটে
পড়ুক),
বুনো ঘোড়ায় দড়ি পরিয়ে ছোটাও
হাওয়ার বেগে
দুপুরে কিংবা মাঝরাতের খোঁটায়
তাকে বেঁধো না,
আর জীবনভর যা করেছ সমস্ত মুছে
দাও,
রেখো না ওয়ারিশান অথবা পরিজন,
চেওনা মার্জনা, করোনা মার্জনা।

এবার তা হলে ছাড়াছাড়ি,
অন্তিম যন্ত্রণা টেনে নিক আমাদের
শূন্য আকাশে।
বন্ধু, এবার চুকিয়ে দাও শেষ করণীয় :
ঢেকোও আমলে তোমার তলোয়ার
তাদের দেহে
নির্মল মধ্যেও ভেজাল মেশানো
যাদের পেশা ॥

প্রলয়ের আগে (Hampa)

বাইরে নীরবতা। নীরবতা ঠাসছে,
ঠেলছে।
গাছগুলি সিধে, ঋজু, নিস্পন্দ আগা
পর্যন্ত।
নীরবতা ছিঁড়বে কি? আশঙ্কা টেনে
বদলাতে
পৃথিবীকে নবরূপে। সব কিছু
অপেক্ষমাণ।

বাড়ছে নীরবতা যতক্ষণ সামর্থ্য
না মেলে
নিজের ভারের নীচে দুনিয়াকে
নিশ্চিহ্ন করার।
বাতাস বিষাক্ত। আর্ত চেঁচায় শয়তান।
নীরবতা
থমথম অপেক্ষক, তার অপেক্ষার
ক্লান্তি নেই ॥

সাম্যবাদ ও প্রগতির পরিচয়

'দেশ'-এর আলোচনা-বিভাগে প্রকাশিত ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্তের বক্তব্যের উপর কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই। প্রথমেই নিজের সম্পর্কে বলে রাখি যে আমি সমাজবাদে বিশ্বাস করি এবং সমাজবাদে বিশ্বাস করি বলেই মনে করি যে 'গণতন্ত্র'কে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রগতি সম্ভব নয়। এবং এও বিশ্বাস করি যে বুদ্ধিজীবীরা সমাজতান্ত্রিক (সাম্যবাদী) দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসাবে আজ সজোরে বলতে পারেন, "গণতন্ত্র ও মানবিকতাবিহীন সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রের প্রহসন মাত্র"। আশংকা হয় ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত প্রশ্ন করবেন, (যেমন করেছেন অধ্যাপক অম্লান দত্তকে) : মহাশয় আপনার বিশ্বাস কোন্ ধরনের সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি—"মার্কসবাদ", "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ" না "কল্পনাবিলাসী সাম্যবাদ"। প্রশ্নটার জবাব দেবার আগে ডঃ দাশগুপ্তের কাছে জানবার ইচ্ছা হয় "আপনি কোন্ ধরনের মার্কসবাদের কথা বলছেন?" "সোভিয়েট মার্কসবাদ", "চৈনিক মার্কসবাদ", "যুগোশ্লাভ মার্কসবাদ", "পোলাণ্ডের মার্কসবাদ"—কোন্ মার্কসবাদকে আপনি "প্রকৃত মার্কসবাদ" মনে করেন? মার্কসবাদ আজ নানা শাখায় ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এবং এই সাম্প্রদায়িক জনারণ্যের মধ্য থেকে 'প্রকৃত মার্কসবাদ' খুঁজে বার করা নেহাৎই দুঃসাধ্য। তাছাড়া মার্কসের চিন্তাভাবনারও পর্যায় আছে। প্রথম দিকে মার্কস দার্শনিক সাম্যবাদের প্রবক্তা। পরের দিকে মার্কস প্রধানত পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণ ও সমাজ বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলের আলোচনা করেছেন। তবুও 'জার্মান মার্কসবাদ' ও লেনিনের "রুশী মার্কসবাদ"-এর মধ্যে আত্মা খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। বিশেষ করে ১৯৫৬ সালে মার্কসের Economic & philosophic Manuscripts 1844' প্রকাশিত হবার পর তো মার্কসীয় চিন্তার নিত্যবস্তু নিয়েও মতপার্থক্যের অবকাশ আছে। আমার মতে মার্কস মানসে 'আত্মচ্যুতি'র (alienation) সমস্যাই সর্বকালের মানবিক সমস্যা হিসাবে কাজ করেছে। আত্মচ্যুতির বিচারই মার্কসবাদ, আত্মচ্যুতি-মুক্ত প্রবুদ্ধ, স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানুষের মানবিক (সামাজিক) বিকাশের জন্যই মার্কস সাম্যবাদ চেয়েছেন। এ' বক্তব্য রাখলে, জানি, রাজনৈতিক দিঙনাগেরা রুষ্ট হবেন, তবুও এ বক্তব্য অনুশীলনযোগ্য বলেই আমি মনে করি। ফলে 'কোন্ মার্কসবাদ' এই প্রশ্নের জবাব **না পেলে ফলপ্রসূ আলোচনা প্রায় অসম্ভব।**

অধ্যাপক অম্লান দত্ত লিখেছেন : ধনতান্ত্রিক ও সমাজবাদী উভয় ব্যবস্থাতেই দোষত্রুটি আছে, বা "মনে রাখা ভাল যে কোনো ব্যবস্থাই নির্দোষ নয় আর বিশেষ কোনো একটা পথই দেশের পক্ষে সমান উপযোগী নয়।" তিনি আরও লিখেছেন : "একথা মনে জেনে রাখাই ভালো যে ধনতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী কোন উপায়েই সমাজ অনিন্দ্যসুন্দর হবে না।" ডঃ দাশগুপ্ত আধুনিক সমাজতান্ত্রিক (সাম্যবাদী) সমাজসমূহ কেমন,—অনিন্দ্যসুন্দর কিনা সে আলোচনা না করে অধ্যাপক দত্তের 'মনস্তাত্ত্বিক' বিশ্লেষণ করেছেন, বলছেন : "পাঠকের জেনে রাখা ভাল যে অধ্যাপক দত্ত রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নন। তিনি যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন তা সংশোধিত ধনতন্ত্রবাদের নামান্তর বা 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'।" পাঠক হিসাবে জানলাম অধ্যাপক দত্ত রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে 'নিরপেক্ষ' নন। তাতে কি এসে গেল? সংশোধিত ধনতন্ত্রবাদের নামান্তর যদি 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' হয় আর অধ্যাপক দত্ত যদি গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পক্ষে হন তাতে তিনি কেন স্বধর্মভ্রষ্ট হবেন? আজ সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। ধনতন্ত্র সংশোধিত হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে, লেনিনীয় সমাজতন্ত্রও সংশোধিত হয়ে নতুন রূপ নিচ্ছে। ফলে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর দাবী বরং জোরদারই হচ্ছে। তাহলে ডঃ দাশগুপ্তের এই অবৈজ্ঞানিক ঢং এ কথা বলা কেন?

অধ্যাপক দত্ত বলেছেন "এ কথা জেনে রাখাই ভালো যে ধনতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী কোনো উপায়েই সমাজ অনিন্দ্যসুন্দর হবে না।" এ বক্তব্য খুবই সহজ ও সরল এবং লৌকিক অভিজ্ঞতা দিয়ে সমর্থিত। কিন্তু ডঃ দাশগুপ্ত এই সহজ কথাটি না মেনে তর্ক তুলেছেন, বলছেন: "দাঁড়িপাল্লার দুপাশে ঠিকমত ধনতন্ত্র এবং সাম্যবাদকে বসালেই কর্তব্য শেষ হয় না, দুই পাল্লার ভারের পার্থক্যটাও হিসাবে ধরতে হয়।" তাঁর মতে সাম্যবাদের ভারটাই বেশী কেননা "মার্কসবাদী বিচারে সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্রের উপর আর একটি ধাপ; যেহেতু এই সমাজের আদর্শ শোষণহীন ও শ্রেণীহীন ব্যবস্থা কায়েম করা"। পাঠক হিসাবে **প্রথম অসুবিধা এই হয়েছে যে, ডঃ দাশগুপ্ত যদৃচ্ছা 'ধনতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র'** 'সাম্যবাদ', এই পদগুলি ব্যবহার করেছেন। আসলে আলোচনার বিষয় হোল 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' এবং 'সাম্যবাদ'। অধ্যাপক অম্লান দত্ত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে বরবাদ করেননি। সরকারী মার্কসবাদীরা যে সাম্যবাদের কথা বলেন, সেই সাম্যবাদের কথাও মনে রেখেছেন। যাই হোক, ধরে নিলাম "সমাজতন্ত্র (অর্থাৎ সাম্যবাদ) ধনতন্ত্রের (আজ অনেকখানি সংশোধিত) উপর একটি ধাপ। তাতে কি প্রমাণ হবে? 'পরবর্তী', শুধু এই কারণেই সমাজতন্ত্রের (সাম্যবাদ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবে? তাই যদি হোত তবে যৌবনের পর বার্ধক্য এলে সবাই তো খুশীই হতাম, আর ধনতন্ত্রের পর ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব হলে বলতাম "ফ্যাসিবাদ পরবর্তী, অতএব অধিক শ্রেয়" কিন্তু তাই কি আমরা বলি?

অবশ্য ডঃ দাশগুপ্ত অন্য যুক্তিও দিয়েছেন। তার মতে সাম্যবাদ অধিক শ্রেয় কেননা "এই সমাজের আদর্শ শ্রেণীহীন ও শোষণহীন ব্যবস্থা কায়েম করা।" কিন্তু কেন? "ব্যবস্থা কায়েম করা" নিশ্চয়ই উপায়, উদ্দেশ্যটা কি? কি জন্য এই 'ব্যবস্থা কায়েম করা', ইষ্ট হিসাবে স্বীকৃতি পাবে,—সে আলোচনা ডঃ দাশগুপ্ত করেননি। মার্কসের মার্কসবাদ থেকে সে আলোচনা করা যেত। মার্কস বলতেন, ব্যক্তির বাধামুক্ত বিকাশের জন্য স্বাধিকারলব্ধ, আত্মচ্যুতিমুক্ত, প্রবুদ্ধ মানুষের জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন। ফলে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সেতুবন্ধন দেখানো যেত। ডঃ দাশগুপ্ত সে পথে যাননি। ফলে ব্যবস্থার উপকরণ মূল্যকে তিনি চরমমূল্য দিয়ে ফেলেছেন।

তা ছাড়াও কথা আছে। 'শ্রেণী' কাকে বলে, 'শ্রেণীহীন ব্যবস্থা' বলতে কী বোঝায়, মিলোভান জিলাস [illegible] যে, সোভিয়েট ও অন্যান্য [illegible] 'নতুন শ্রেণী'র উদয় হচ্ছে, এ সব সমস্যার তথ্যভিত্তিক আলোচনা ছাড়া ডঃ দাশগুপ্তের বক্তব্য গ্রহণ করা কঠিন। বর্তমান সংশোধিত ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী [illegible] রূপান্তর ঘটেছে কিনা, এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিক। কথাটা যে অন্তত অপ্রাসঙ্গিক নয় মার্কস-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই তা স্বীকার করবেন। 'শোষণহীন ব্যবস্থা' সম্পর্কেও ঐ একই কথা। 'শোষণ' কাকে বলে, শোষণ কতপ্রকারের,—'বাড়তি মূল্য' আদায় থেকেই যদি শোষণ জন্মে তবে সাম্যবাদী সমাজেও 'শোষণ' আছে কি না, অর্থনীতিসঞ্জাত কিন্তু সরাসরি অর্থনৈতিক **নয় এমন শোষণ,—যথা রাষ্ট্রীয় শোষণ,**

ধর্মের শোষণ, পার্টির শোষণ, আমলাতন্ত্রের শোষণ—এ'সবের বিচার না করলে 'শোষণ-হীন সমাজে'র যে সংজ্ঞা পাবো তা অতি-ব্যাপ্তি (overapplicability), অব্যাপ্তি (non-inclusiveness) এবং অসম্ভব (non-applicability) দোষ-দুষ্ট হবে।

এবং 'শোষণহীন', 'শ্রেণীহীন' ব্যবস্থার মূল্যায়নে সাম্যবাদী দেশের বাস্তব ইতিহাসও দেখতে হবে। সে সব দেশে কতখানি 'গণতন্ত্র' ও 'মানবিকতা'র প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে বিচারও প্রাসঙ্গিক। এবং আজ সে সম্পর্কে তথ্য যা প্রাপ্তব্য তাতে নানা-দিকে এ'সব দেশের অসামান্য কীর্তিকে স্বীকার করেও বলা কঠিন যে 'মানবিকতা ও গণতন্ত্রে'র নিরিখে এদের দিকে পাল্লা ভারী। অন্তত ইরেনবর্গের 'আত্মচরিত' কিম্বা জিলাসের "দি নিউ ক্লাস" মনে এ বিষয়ে সংশয় জাগায় এবং স্টালিনোত্তর বরফ গলার যুগের সাম্যবাদী দলের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ইতিহাস ঘাঁটিয়ে পড়লে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের বীভৎস বিকৃতি ও দানবিকতার পরিচয় পেয়ে নির্ভেজাল শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না। তার মানে এই নয় যে, সমাজতন্ত্রের মার্কসীয় আদর্শকে পুরোপুরি বর্জন করতে হবে। অধ্যাপক দত্তও তা করেননি। তিনি যা বলতে চান বলে আমার মনে হয় তা হোল এই যে, সাম্যবাদ সর্বরোগহর মাদুলী নয় এবং 'গণতন্ত্র'কে বাদ দিলে সমাজতন্ত্র মনুষ্যের 'ইষ্ট' হিসাবে স্বীকৃতির দাবীও করতে পারে না।

অধ্যাপক দত্তর বক্তব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে ডঃ দাশগুপ্ত অর্থনীতির প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। সেই আলোচনা পাঠ করে আমার মতো সাধারণ পাঠকের উপকার খুব বেশী হোল না। এটা বুঝলাম সমাজতন্ত্রে (সাম্যবাদে) বেকারত্বের সংকট নেই। চাকুরি সকলেই পায়। কোথায় পায়, অভিরুচি অনুযায়ী পায় কিনা, চাকুরির স্থান নির্বাচনে ইচ্ছা-অনিচ্ছা কতখানি কাজ করে বাধ্যতা-মূলক প্রথাগুলির কেন থাকে, এ সব প্রশ্ন হয়তো অনাবশ্যক বলেই ডঃ দাশগুপ্ত স্পর্শ করেন নি। শিল্পোন্নত প্রাগ্রসর, আধুনিক সব সমাজেই চাকুরি প্রায় সবাই পায়, যৎসামান্য বেকার যারা থাকে, কখনো কখনো, তাদেরও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা সে সব দেশে হয়। শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জীবনধারণের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মোটামুটি ব্যবস্থা কি সাম্যবাদী সমাজে, কি সাম্যবাদী নয় এমন শিল্পায়িত সমাজে, সমকালীন রাষ্ট্রই করে। ফলে 'কল্যাণরাষ্ট্র' না হলেও, কি সুইডেনে, কি ইংলণ্ডে অথবা সুইডেনে কোন ব্যক্তিকে তার নিজের বা পরিবারের নিম্নতম দৈহিক বা মানসিক প্রয়োজনে শুধুই ব্যক্তিস্বার্থের আশ্রয় নিতে হয় না। অবশ্য সমাজতন্ত্রে (সাম্যবাদ) "ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সাফল্যের পরিসীমা" ছোট কিনা, সম্পদ ও সুযোগের বৈষম্য সত্যই অনুপস্থিত কিনা এবং জীবনমানের পার্থক্য সত্যই কম কিনা এ সম্পর্কে আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের তথ্যভিত্তিক বক্তব্য রাখা শক্ত। তবে একটা কথা বলা যায় নির্ভয়ে যে, সমকালীন সোভিয়েট সাহিত্যিকদের লেখা কিম্বা ইরেনবর্গ প্রমুখ সাহিত্য-মহারথীদের জীবনস্মৃতি পাঠ করে সাম্যবাদী সমাজের যে চিত্র পাই সে চিত্র ডঃ দাশগুপ্তের বর্ণনা থেকে আলাদা।

প্রশ্ন হবে: যদি সুযোগের সাম্য ও সম্পদের সাম্য সমাজতন্ত্রের (সাম্যবাদ) বৈশিষ্ট্য নাই হলে, তবে এইসব সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের এত সাজুয্য কেন? ডঃ দাশগুপ্ত বলতে চান যে, এই সাজুয্য থেকেই প্রমাণ হয় যে, এইসব সমাজ বৈষম্যহীন সমাজ। এ বক্তব্যে অনেক ফাঁক থেকে গেল। হিটলারী রাষ্ট্রের সঙ্গে জার্মান জনসাধারণের সাজুয্য থেকে কি একথাই বলবো যে ফ্যাসিস্ট সমাজ বৈষম্য-হীন সমাজ ছিল। সমাজে যদি একদলীয় শাসন থাকে সেই দলের শাখা প্রশাখা যদি ছড়িয়ে থাকে সমাজের সব প্রতিষ্ঠানে—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ট্রেড ইউনিয়নে, লেখক সংঘে, কর্মচারী সংঘে, খেতে-খামারে, পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীতে—সেই দলের রাজনীতি যদি সংবাদপত্রে, রেডিওতে, টেলিভিশনে, জনসভায়, সর্বত্র নিরন্তর প্রচারিত হয়, জনমানসে বিকল্পের চিত্র যদি তুলে ধরা না যায়, তবে ধনবৈষম্য ও শক্তি-বৈষম্য থাকলেও উপর থেকে নির্ধারিত নীতি অলীক চৈতন্যের (false consciousness) দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে সাজুয্যের 'মায়া' সৃষ্টি করতে পারে।

আসলে ডঃ দাশগুপ্ত দুটি নির্বিশেষ সামান্য (abstract universal) ধরে নিয়েছেন,—একদিকে 'ধনতন্ত্র' অন্যদিকে 'সমাজতন্ত্র' (সাম্যবাদ)। অথচ বিশেষতার পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে ১৯ শতকের বল্গাহীন ধনতন্ত্র আজ অনেকখানি সংযত, সংশোধিত, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে অপাপবিদ্ধ, নিত্য-নিরঞ্জন সমাজতন্ত্রও (সাম্যবাদ) পৃথিবীর কোথাও নেই। ধনতন্ত্র বহুলাংশে রূপান্তরিত হয়ে সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন হচ্ছে। সমাজতন্ত্রও (সাম্যবাদ)—(অন্তত সোভিয়েট দেশে, পোল্যাণ্ড ও অন্যত্র—অনেক পুরাতন প্রত্যয়ের দাসত্ব পরিহার করে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে (যে কারণে চীনের সমালোচনা)। নাকগোলহীন অংশীদারদের মালিকানা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, গণতান্ত্রিক শক্তির চাপ, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রভাব প্রভৃতি পরিমাণের (Quantity) অস্পষ্ট পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে সংশোধিত ধনতন্ত্র গুণগতভাবে অধুনা রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে এ আলোচনার স্থান এখানে নেই। অধ্যাপক অম্লান দত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সাম্যবাদী সমাজে এক বিপুল সুসংহত, অপ্রতিরোধ্য 'আমলাতন্ত্র' গড়ে ওঠে, বিশেষত বিরোধী প্রতিষ্ঠানের অভাবে। ফলে এই সমাজে "ক্ষমতার (power) অসাম্য" অনেকখানি পূর্ণতা লাভ করে। ডঃ দাশগুপ্ত যে সব যুক্তি দিয়ে এই মত খণ্ডন করেছেন সেই যুক্তি আমাদের মতো পাঠকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আমি কল্পনায় ধরে নিলাম ভারতবর্ষে সর্বশক্তিমান একটি মাত্র সাম্য-বাদী দল আছে এবং সেই দলের কর্তৃত্ব সমাজদেহে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যেহেতু এই দলকে অপসারিত করবার জন্য বিকল্প কোন দল নেই, ফলে যতোদিন না এই দল স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়ে ততদিন একে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব নয়। দলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠী বা উপদল গঠন বিশ্বাস-ঘাতকতার নামান্তর। ফলে আন্তপার্টি সংগ্রামের সুযোগ ও সম্ভাবনা যৎসামান্য। আন্তপার্টি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি নিজেকে সংশোধন করে এই কেতাবি তত্ত্ব আজ আর বোধ হয় কেউই বিশ্বাস করেন না। এ হেন 'এক এবং অদ্বিতীয়' দলের সদস্যরা বা সমর্থকরা যদি ক্ষেতে, খামারে, গণকমিটিতে, কলকারখানায়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সৈন্যবাহিনীতে, সংবাদপত্রে, রেডিওতে, প্রকাশন বিভাগে সর্বত্র নেতৃত্ব দেবার দাবী রাখে 'জনতা'র নামে, তবে এই পার্টি ও সরকারী আমলাতন্ত্রের সামনে আমি তো অন্তত মাথা খাড়া রাখতে সাহস পাবো না। কেননা প্রাণের মায়া তো আমার আছে। সাম্যবাদীসমাজে এই আমলাতন্ত্রের যে বিপুল দুর্নিবার শক্তি, সে শক্তি এতই অমোঘ যে, তার বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করা চলে না। (ক্রুশ্চেভ রিপোর্ট দেখুন)। ক্ষমতার সব উৎস যদি একদলীয় নায়কতার করায়ত্ত হয়, তবে সেই ব্যবস্থা থেকে উৎপন্ন 'আমলাতন্ত্র'-কে সর্বশক্তিমান না বলে উপায় নেই। তাই ডঃ দাশগুপ্ত আজও যখন অতিসারল্যের সঙ্গে বলেন, "আমলাতন্ত্রের আধিপত্যের সবচেয়ে বড় বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি" তখন তিনি পাঠকদের সমকালীন ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে বড় বেশী বিশ্বাস করবার কথা বলেন। সর্ষের মধ্যেই ভূত, কাজেই সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়ানো চলে না।

অধ্যাপক দত্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে (সাম্য-বাদী) বিরোধী দলের অনুপস্থিতির সমালোচনা করেছেন এবং 'গণতান্ত্রিক' পথের কথা বলেছেন। ডঃ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে

সরকারী মার্কসবাদীদের অতি-পরিচিত বক্তব্য পুনরায় হাজির করেছেন। বলছেন যে, "গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা একপেশে ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত। শুধু একাধিক দল চেঁচামেচির কিছুটা অধিকার এবং কিছুদিন পর পর নির্বাচনের আয়োজন হলেই গণতন্ত্রে ঘটপূজো শেষ হয় না।" সত্যই তাই। শুধুই একাধিক দল রইল, পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন হল তাহলেই 'গণতন্ত্র' সার্থক হোল এ দাবী হাস্যকর। কথা হোল শাসকদের অপসারণের ক্ষমতা জনসাধারণের উপর ন্যস্ত হবে, তার জন্য ব্যবস্থা চাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আইনী স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র বিচারালয়, হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার প্রভৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার চাই। শিল্পী সাহিত্যিক-দার্শনিকদের পার্টিয়তার দাসত্ব থেকে মুক্তি চাই। অমানবিক ঘটনা ঘটাবার পর আত্ম-সমালোচনা শুনতে চাই না "সমাজতান্ত্রিক আইনভঙ্গ হয়েছিল"। ডঃ দাশগুপ্তের যুক্তি কিন্তু অন্য ধরনের। এ যুক্তি স্বাধীনতা হরণের যুক্তি। অন্যান্যের থেকে লেনিনের একটি যুক্তির উল্লেখ করে সরকারী মার্কসবাদীদের এই সর্বনাশা যুক্তির খণ্ডন করতে চাই। মার্কসবাদী মহলে এক সময় 'অবাধ প্রেমের' দাবী সোচ্চার ছিল। এই মতাবলম্বীদের একটি খসড়া পুস্তিকায় বলা হয়েছিল,—

"Even fleeting passion, a passion liaison, is more poetic and pure than the loveless kisses exchanged as a matter of habit between husband and wife"

লেনিন বলছেন, এ কি রকম যুক্তি হোল? বলছেন :

"Loveless kisses which a husband and wife exchange as a matter of habit are **impure.** Agreed, what do you want to make the contrary? A loving kiss, it would appear. No. You make the contrary a passing passion (why passion?) (why not love?)

সরকারী মার্কসবাদীদের 'গণতন্ত্র' সম্পর্কে যুক্তিটাও এই ধরনের উদ্ভট যুক্তি। বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পূর্ণ নয়, এর মধ্যে সারবস্তু সামান্য, এর মধ্যে ফাঁকিবাজি আছে। অতএব? এটা নয় যে সাম্যবাদীরা এই অপূর্ণ গণতন্ত্রকে আরও পূর্ণতা দান করবে, ব্যক্তি স্বাধীনতার সার্বিক প্রতিষ্ঠা করবে, আইনানুগ অধিকারকে সংরক্ষিত করবে ও এগিয়ে নিয়ে যাবে, হেবিয়াস কর্পাসের সুযোগ আরও বিস্তৃত করবে, ঘটপূজোর জায়গায় অন্তত প্রতিমা পূজোর আয়োজন করবে। সিদ্ধান্ত হল : এ গণতন্ত্র অপূর্ণ, অতএব 'গণতন্ত্র' সংহার কর, যেমন প্রেমহীন চুম্বন অপবিত্র, অতএব প্রেমবহির্ভূত আবেগের উপর নির্ভর করে তাৎকালিক উন্মাদনার আশ্রয় নাও। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একাধিক দলের শুধু চেঁচামেচির জায়গায় সমাজতান্ত্রিক (সাম্যবাদী) গণতন্ত্রে সার্থক মতবাদগত লড়াই, নীতির লড়াই চালু করা হোল না কেন? পার্টির মধ্যে যদি বিরোধিতা থাকে, তবে সেই বিরোধিতা বিভিন্ন সমাজ-তান্ত্রিক দলের মাধ্যমে প্রকাশিত হবার বাধা কি? ধরেই নিলাম "শ্রেণীর" ভিত্তিতে দল তৈরী হয়। ইংলণ্ডে একই বুর্জোয়া-শ্রেণীর যদি বিভিন্ন দল থাকতে পারে, তবে শ্রমিক শ্রেণীরই বা বিভিন্ন দল থাকবার বাধা কি? সমাজতন্ত্র মেনে নিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ না করে ক্রুশেভ আমলে তাহলে মলোটভ

নতুন শ্রমিক কৃষক দল গঠন করতে পারতেন, যেমন লিউ-সাও-চি পারেন চীনে। নয়তো সর্বশক্তিমান একপাথুরে ঐক্যের পূজারী পার্টি' ও পার্টি নেতার নিরংকুশ ক্ষমতা নিপীড়নের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, 'গণতন্ত্র'-নিধনযজ্ঞও গণতন্ত্রের চরম প্রকাশ বলে প্রচারিত হয়। "বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সহনশীলতা সত্যই ততক্ষণ যতক্ষণ বিপ্লবী আন্দোলন বিপজ্জনক সীমারেখা অতিক্রম না করে।" কিন্তু প্রশ্ন হবে : সমাজতান্ত্রিক যুগের সমাজতান্ত্রিক (সাম্যবাদী) রাষ্ট্রের সহনশীলতা সর্বদাই বিপজ্জনক সীমা-রেখার কষ্ট-কল্পনা ক'রে নিরন্তর সহন-শীলতাকে বর্জন করে কেন? ফলে শিল্পে, সাহিত্য, দর্শনে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে—সর্বত্র এক পথ, এক মত, এক পার্টির জয়গান। এবং একবার এই পথ থেকে ভ্রষ্ট হলে সংশয়াকুল হলে আত্মিক অপমৃত্যু। আমেরিকার মতো দেশে কমিউনিস্ট পার্টি সত্যই প্রায় বে-আইনী। তবুও ঐ দেশের প্রগতিশীল ভাবুকদের বক্তব্য আমাদের হাতে আসে। পল সুইজি, পল বারাণ, লিউ হুবার ম্যান, সোমারভিল প্রমুখ সুধীবৃন্দ মার্কসবাদের সপক্ষে কলম ধরেও আমেরিকার বিপক্ষে লিখেও চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা ভোগ করেন। সমকালীন সমাজতান্ত্রিক (সাম্যবাদী) রাষ্ট্রে অন্য কোনো পার্টি নেই। তবুও অন্যো শুধুর নাম করে পার্টি-অনুমোদিত বক্তব্য ছাড়া অন্য কিছু পরিবেশন কার্যত সে দেশে বে-আইনী কেন? সমাজতন্ত্র বিরোধী কোনো বক্তব্য উপস্থাপিত করবার প্রশ্ন সে সব দেশে তো ওঠেই না। ফলে বাস্তব সমাজতান্ত্রিক (সাম্যবাদী) রাষ্ট্রের অধীন ব্যক্তির স্বাধীনতা, আইনী স্বাধীনতা, হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার প্রভৃতি প্রশ্নের বিচার করলে এ রায় দেওয়া শক্ত যে সমাজ-তন্ত্রে (সাম্যবাদে) স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করে যদিও মার্কস সেই কথাই ভেবেছিলেন।

আসলে "মার্কসীয়" মার্কসবাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। মার্কস-সাহিত্যের তত্ত্বচিন্তামণি 'Economic & PhilosophicManuscripts'-এর মানবিক মার্কসকে উদ্ধার করতে হবে। মার্কস সাম্যবাদকে 'ইষ্ট' মনে করেছেন কেন? একন্য নয় যে এই সমাজে শুধুই সামাজিক মালিকানা চালু হবে, প্রাচুর্য সৃষ্টি হবে, কর্মদক্ষতা বাড়বে, 'সমষ্টি' সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে। সাম্যবাদ মার্কসের 'ইষ্ট' এইজন্য যে, ইতিহাসগত শ্রমবিভক্ত অসুন্দর জগতের যুপকাষ্ঠে মনুষ্যস্বরূপ বলি হয়েছে। "মানবিক প্রকৃতি"কে আপন ক'রে নিয়ে (humanism of nature) আনন্দ ও সৌন্দর্যোপলব্ধির পথে মানুষ সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি আজও। অথচ মার্কস বরাবরই ভেবেছেন যে, শোষণ ও শ্রমবিভাগের অবসান হলে স্বাধিকার-প্রাপ্ত মানুষ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হবে, যে স্বরূপে সৃজনশীল কর্মের ও মুক্তির অপার আনন্দ অনুক্ষণ মানুষকে বিশ্বানুগ করে তুলবে। সংস্কৃতি প্রেমিক ও সাহিত্যরসিক মার্কস সাহিত্যে ও শিল্পকলায় তাই সুন্দরকে পরম ইষ্ট বলে স্বীকার করেছেন। ফরমায়েসি শিল্পসাহিত্য নিয়ে পরিহাস-রসিকতা করেছেন। সমাজকল্যাণ, নীতি-উপদেশ, পার্টিরতা, এমনতরো কোনো বহিরঙ্গ দাবির কাছে শিল্পসাহিত্য যে মাথা নত করতে পারে না, বারবার একথা বলেছেন। যে সংগ্রামী মার্কস শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেছেন, সুন্দরের প্রকাশে পার্টি-নায়কতার নিয়মকে স্বীকার না করে 'সুন্দরের নিয়মাবলী' আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, ঠাট্টা ক'রে বলেছেন, গোলাপ ফুল ভায়োলেট-ফুল থেকে আলাদা এতে যখন আপত্তির হেতু নেই, তখন ভাবলোকের প্রকাশবৈচিত্র্য দেখে আতংকে উঠবার হেতু কি,—সেই মার্কসই সাম্যবাদ চেয়েছেন আত্মচ্যুতিমুক্ত প্রবুদ্ধ মানুষের জন্য। মার্কস তাই বলেছেন, সাম্যবাদ কাম্য, কেননা—

"Communism as the positive transcendence of private property, as human self-estrangement, and therefore as the real **appropriation of the human** essence by and for man; communism therefore as the complete return of man to himself as a social (i.e. human) being—a return become conscious and accomplished within the entire wealth of previous development. This communism, as fully developed naturalism, equals humanism and as fully developed humanism equals naturalism"

মার্কসের এই fully developed humanism, অর্থাৎ মানবিকতার পূর্ণ বিকাশের পটভূমিতেই অন্য তত্ত্বের সার্থকতা। অর্থাৎ সাম্যবাদের উপকরণ মূল্যেই শুধু আছে, চরমমূল্য ব্যক্তি মানুষের। ফলে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করে সাম্যবাদ সার্থক হতে পারে না। সমাজতন্ত্র কিম্বা সাম্যবাদ—সব ব্যবস্থারই সার্থকতা ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশে—যে বিকাশের পথে বাধা 'রাষ্ট্র', 'ধর্ম', 'শ্রমবিভাগ', 'সম্পত্তি', 'টাকার দাসত্ব'—এক কথায় আত্ম-চ্যুতি। এই আত্মচ্যুতির সমস্যার সঙ্গে অন্য সব সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এবং এই আত্মচ্যুতিমুক্তির পথে 'গণতন্ত্র' একটি বড় পদক্ষেপ, সমাজতন্ত্র যার পরিণত ফল। মনে হয় ডঃ দাশগুপ্ত মার্কসবাদকে ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বৈপ্লবিক পথ হিসাবেই শুধু দেখেছেন। আর অধ্যাপক দত্ত মার্কসবাদকে দেখেছেন আদি, মধ্য ও অন্ত। এই মার্কসীয় মার্কসবাদ গণতন্ত্রকে বর্জন করবার দর্শন নয় বলেই মনে হয়। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—প্রগতির এই পথ—অন্য পথ এ যুগে আর নেই।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কলিকাতা-১৯

ভাষা সমস্যা

ভাষা সমস্যার ওপর শ্রদ্ধেয় মুজতবা আলী সাহেবের লেখার সমালোচনামূলক পত্র দুটি বর্তমান সংখ্যায় (১ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪) পড়ে পত্রলেখকদের কয়েকটি কথা না বলে পারছি না।

—"সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখার মধ্যে দিয়ে বাঙালী পাঠক পৃথিবীর অনেক দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছে ও আরো জানবার আশা রাখে"—এত বড় (!) স্বীকৃতি দেওয়ার পরও ভাষা সমস্যা সম্পর্কে আলী সাহেবের যুক্তিগুলো নস্যাৎ করার উৎসাহে পত্রলেখিকা অমিতা রায় যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন সেগুলো নেহাৎই ফাঁপা বলে মনে হয়। কারণ একজন নরওয়েজিয়ান মহিলার বক্তব্য তাঁর সমগ্র জাতির ভাষা সমস্যার প্রকৃতি বোঝাতে নিশ্চয়ই সাহায্য করে না। আমার মনে হয় আলী সাহেবের বক্তব্য লেখিকার মত সোজাসুজি এক ভাষিত্বের সপক্ষে নয়। তিনি তাঁর প্রবন্ধ দুটির মধ্যে দিয়ে বিশেষ একটা সমস্যার কয়েকটা রূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন মাত্র। শিক্ষামন্ত্রীকে টায়টোয় সায় দিয়ে জোরালো করা কথাটা—খুব লাগসই মনে হলেও এক্ষেত্রে শালীনতার সীমা অবশ্যই লঙ্ঘন করেছে। আলী সাহেব কারুর পিঠচাপড়ানি পাবার আশায় কিছু লেখেন না—তবে তিনি পাঠকের মতামত অবশ্যই চান এবং তাঁদের মূল্যবান সময়ের অনেকটা যে পাঠকরা তাঁকে বিচার করতে ব্যয় করেন এটাও আশা করি তিনি ভালভাবেই নেন।

দ্বিতীয় পত্রের লেখক—ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত, খুব যুক্তিপূর্ণ ভাবেই প্রশ্ন করেছেন, পৃথিবীতে ভারতের মত আর কোন স্বাধীন সভ্য দেশে ১৪টি ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে? সন্দেহ নেই কঠিন প্রশ্ন কিন্তু তাঁকে যদি প্রশ্ন করি সেটা আমাদের দেশের প্রগতির পরিচায়ক না ধ্বংসের পরিচায়ক? তার উত্তরে তিনি কি বলবেন?

প্রয়োজন মানুষকে অনেক কিছু গ্রহণ করতেও যেমন শেখায় তেমনি বর্জন করতেও শেখায়। তার অর্থ এই নয় যে, যা সমকালীন পরিস্থিতির বিবেচনায় অপরিহার্য আবেগের তাড়নায় তাকেও বিদায় দেওয়া।

—একমাত্র পরাধীনতাই মানুষকে মাতৃ-ভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা শেখায়—এই পরাধীনতার পিঠ পিঠ আসে আর্থিক পরাধীনতা। আজ জগৎ জোড়া মারকিনি

পড়ছি ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের মতো পারলো পাঠকদের আগ্রহও বিন্দুমাত্র কমবে না এ-কথাও মানি, কিন্তু বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকাটি যে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর House Magazine-এ রূপান্তরিত হতে চলেছে এ কথা কী আপনি অস্বীকার করতে পারেন? পত্রিকা যতই জনপ্রিয় হক না কেন পত্রিকার নীতিভ্রষ্টতা পাপ এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে মিথ্যাকথা লেখা আরও পাপ।

দীপক মিত্র
কলিকাতা-২৯

৩

আজ প্রায় বছর আটেক ধরে আমি দেশের নিয়মিত পাঠক। অবশ্য আমি এর জন্যে এই পত্রিকার বাৎসরিক কিংবা ষান্মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক এই ধরনের সদস্য নই। নিয়মিত 'দেশ' পড়ি বটে তবে এই 'দেশ' আমি পত্রিকার অফিস থেকে আনাই না— যে-কোন 'স্টল' থেকে নিয়মিত কিনি আর পড়ি, পড়া হয়ে গেলে বাঁধিয়ে রাখি।

হ্যাঁ, দেশ যে শুধু পড়ি তাই নয়, পড়ে এই পত্রিকাটি আমার এতই ভাল লেগেছে যে এর সম্বন্ধে দুটো কথা বলতে কি বন্ধু-বান্ধব (কি বাঙালী কি অবাঙালী) অনেকের কাছে এই পত্রিকাটি সম্বন্ধে বড়াই করতেও ছাড়ি না—কি জানি কেন? হয়তো পত্রিকাটাকে ভালবেসে ফেলেছি বলেই কি না কে জানে!

কিন্তু আজ বেশ কিছুদিন ধরে আমি নিজে লক্ষ করছি এবং যাদের কাছে বড়াই করে আসতাম তাঁরাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, যত দিন যাচ্ছে পত্রিকাটির কয়েকটি জিনিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম কথা হল এর কাগজ। ওপরে দু-একটা সাদা কাগজ দেবার পরই তারপর যা কাগজ আরম্ভ হয় তা শুধু চোখে পড়ার মতন বুঝি থাকে না। আর তা পড়তে গেলে চোখ খারাপের চান্স! এই রকমের কাগজ দিয়ে শেষ হয় সিনেমার খবর অর্থাৎ "রঙ্গজগৎ"-এর কাছাকাছি। অর্থাৎ বলতে গেলে এক কথায় এই বলতে হয় যে, প্রথম এবং শেষে গুটি কয়েক সাদা বা ভাল কাগজ আর মাঝখানে সব বালির কাগজের মতো ধোঁয়াটে রং-এর এক রকম কাগজ দিয়ে ভর্তি।

দ্বিতীয় কথা এর ছাপাই। ছাপাইতেও অনেক জায়গায় অনেকগুলি সংখ্যাতে আমায় ওই একই ভাবে দেখানো হয়েছে। কোন জায়গায় কালি এত বেশী পড়েছে যে সমস্ত লেখাগুলো ধেবড়ে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে কিছুই পড়া যায় না? কোনও জায়গায় আবার কলমের পাশের কিছু অংশে ছাপ-ই পড়েনি, সুতরাং সেখানে তো পড়ার কোনও প্রশ্নও উঠতে পারে না।

এখন মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আমার শুধু এই মাত্র নিবেদন যে, তিনি যেন দয়া করে একটু এইদিকে নজর দেন? আমার শুধু এই মাত্র বক্তব্য যে, 'দেশের' মূল্য অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকার মত থাকলেও 'দেশের' ছাপাই এবং কাগজের দিকে নজর দেওয়াও কর্তব্য বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে আসে। পত্রিকাটির মূল্য প্রথমে সাঁইত্রিশ পয়সা, পরে চল্লিশ পয়সা এবং বর্তমানে পঞ্চাশ পয়সা করা হয়েছে। এবং এই পঞ্চাশ পয়সা মূল্য ধার্য করার সময় সম্পাদক মহাশয় আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে যে, "এর কাগজ এবং অন্যান্য দিকে নজর দেওয়া হবে এবং নিউজপ্রিন্ট পাওয়া যাচ্ছে না বলে এর দাম বাড়ানো হল।" পাঠকরা প্রত্যেকেই সহাস্য চিত্তে এর মূল্য মেনে নিয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদেরও কি এই পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তুলতে মন যায় না! আমার একান্ত অনুরোধ তাঁরা নিশ্চয় একটু লক্ষ করবেন। 'দেশ'কে সত্যিই ভালবাসি বলেই এত কথা লিখে ফেললাম।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
গোলাঘর, পাটনা।

বাংলা গদ্যে প্যারাগ্রাফ

বিগত ১০ই কার্তিক, ১৩৭৪ (বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৫১) দেশ পত্রিকায়, সনাতন পাঠক লিখিত 'সাহিত্য সংবাদ' পর্যায়ে তাঁর বক্তব্য পড়েছি, তা আমার নিজের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। লেখক আমার মনের কথাই তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

সাহিত্যসৃষ্টি একটি শিল্প বিশেষ। মনে হয় বর্তমানকালে লেখকগোষ্ঠী (দু-একজন বাদে) সে কথা ভুলতে বসেছেন। ইদানীংকার গল্প-উপন্যাসে ভাষার দৈন্য আমার পাঠক মনকে বিশেষভাবে পীড়া দেয়। যদি বলেন বর্তমান ভাষা আধুনিক ধারা বজায় রাখে, তবে বলবো আধুনিকতার দোহাই দিয়ে নিম্নমুখী মানকে সমর্থন **করা যায় না। এর উপর বাদ যোগ হয়** পুনরুক্তির পালা, তখন লেখক সম্পর্কে যে ধারণা হয়, তা সহজেই অনুমেয়। কোন এক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের রচনা শুধুমাত্র এই পুনরুক্তির ঝামেলায় আমি পড়ার উৎসাহ পাই না।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে লেখকদের নিকট পাঠকের একটা চাহিদা আছে। বাঙলা দেশের সাহিত্যোপপাসুরা অর্থের বিনিময়েও যদি তাঁদের সে চাহিদার প্রতিদান না পান, তবে হয়তো বাঙলা সাহিত্যের পাঠকের সংখ্যা অতি দ্রুত হ্রাস পাবে।

বর্তমানে আবার নতুন উপসর্গ হয়েছে প্যারাগ্রাফ সাজাবার নতুন কায়দা। কায়দাটা নিঃসন্দেহে ব্যবসায়িক এবং সেই হেতু দৃষ্টিকটু, যতদূর জানি বাঙলা দেশের কোন একজন বিখ্যাত (?) রহস্যোপন্যাস লেখক এই কায়দাটা প্রথম প্রচলন করেন এবং আজ সংক্রামক ব্যাধির মত তা ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় প্রতি গল্প-উপন্যাসে। এই নিন্দনীয় ধারার যত শীঘ্র বিনাশ হয় ততই মঙ্গল।

সাহিত্যসৃষ্টি কখনোই ব্যবসায়িক মনোভাবের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না। অর্থকরী যে লাভ হয় সেটা গৌণ, সেটা উপরি-পাওনা। অর্থ উৎসাহ এনে দিতে পারে কিন্তু কখনোই প্রেরণা দিতে পারে না। স্রষ্টার সৃষ্টি যদি অপরকে আনন্দ দিতে না পারে, তবে সে সৃষ্টি ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই সহজ তথ্যটি যতদিন হৃদয়ঙ্গম না হচ্ছে, ততদিনই বাঙলা সাহিত্যের বিপদাশঙ্কা।

এই প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আজকের পাঠক শুধু অন্তরালে বসে দিনের পর দিন সাহিত্যের এই অবমাননা সহ্য করে যেতে পারেন না—একদিন তিনি প্রতিবাদ করে উঠবেন। বর্তমান ধারা যদি বজায় থাকে, তবে সে প্রতিবাদ অদূর ভবিষ্যতেই সোচ্চার হয়ে উঠবে।

সমীরকুমার দাশগুপ্ত
কলিকাতা-২৯

পাতাল থেকে আলাপ

"দেশ" এর ৩৫বর্ষ ২ সংখ্যায় "পুস্তক-পরিচয়" বিভাগে বুদ্ধদেব বসুর "পাতাল থেকে আলাপ" উপন্যাসের সমালোচনায় লেখা হয়েছে—"এই উপন্যাসটি যখন অন্য নামে কোন একটি সাময়িক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় বেরোয়.."

আমি যতদূর জানি গতবার শারদীয় উল্টোরথে উপন্যাসটি "পাতাল থেকে আলাপ" নামেই প্রকাশিত হয়েছিল।

—মহম্মদ আকাশ
শান্তিনিকেতন

এখানে আসিলে সবাই সমান

'ক্ষুধিত বাঘ এবং মাংস খণ্ড'

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। ট্রেনে করে বিহারের রামগড়ে যাচ্ছিলুম। কামরায় আমরা তিনজন ছিলুম, তৃতীয় সহযাত্রীটির জন্যে শেষ রাতে আমাদের দুজনের ঘুম ভেঙে গেল।

তৃতীয় সঙ্গীটি শিখ ভদ্রলোক, রেলের কোনো বড়ো কর্মচারী হবেন খুব সম্ভব। তাঁর গন্তব্য মুরি জংশন। অতএব রাত থাকতেই তিনি উঠে পড়লেন, কামরার সব কটি আলো জ্বালালেন, তারপর তাঁর চুল এবং দাড়ির যে প্রসাধনপর্ব আরম্ভ করলেন তা যে-কোনো বাঙালী কেশবতীকেও লজ্জা দেবে।

অগত্যা আমরা দুজন মুখোমুখি উঠে বসলুম এবং গল্প শুরু করলুম। আমার দ্বিতীয় সহযাত্রীটির নাম ডি-সুজা কিংবা ডি-কস্টা কিছু হবে, মনে হল তিনিও কোনো সরকারী চাকুরে। তিনি দেশের কথা বললেন, গান্ধীজীর মহৎ অবদান নিয়ে অনেকটা আলোচনা করলেন, তারপরেই বেরিয়ে এল তাঁর মোক্ষম প্রশ্নটি : 'আমি অনেকদিন বিহারে আসিনি, তুমি বলতে পারো—বিহার এখন ড্রাই প্রভিন্স কি না?'

বললুম, 'সেইরকমই শুনেছি।'

শ্রী ডি-সুজা অথবা ডি-কস্টার মুখে ছায়া পড়ল। গাড়ি তখন ইন্ করছিল মুরি স্টেশনে। শিখ ভদ্রলোকটি স্যুটকেস হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন, আমাদের দিকে ফিরে প্রসন্ন হাসিতে বললেন, 'কিছু ভাবতে হবে না, কান্ট্রি-মেড জিনিসের অভাব নেই।'

ভোরের আলোর সঙ্গে মিস্টার ডি-সুজা অথবা ডি-কস্টাও একটু আলো হয়ে উঠলেন বলে মনে হল।

আবগারী বস্তুটি সরকারী রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস বলে জানি। কিন্তু এ ব্যাপারে অনন্তকাল ধরে একটি সমান্তরাল প্রতিযোগিতাও চলে আসছে সারা ভারতবর্ষে। 'হাঁড়িয়া' আছে, 'পচাই' আছে, 'মহুয়া' আছে, 'তাড়ি' আছে—চোলাই মদ তো আছেই। দার্জিলিঙের বাজারে পাতার ওপর সাজানো সাদা প্যাঁড়ার মতো একটি বস্তু দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলুম, দোকানদার হেসে বললে, 'দারু-কা মশলা।' যত দূর শুনেছিলুম, ভুট্টা থেকে তৈরি। এই সব বে-আইনী নেশার বিরুদ্ধে আবগারী বিভাগ থেকে বোধ হয় অভিযানও চলে—বিশেষ কিছু সুফল ফলে বলে মনে হয় না।

ফলা হতেই পারে না। 'অনাদ্যপানম্-প্রবাহম্'—এ পিপাসা চিরদিন ধরে আছে, থাকবেও। তবে আরো অনেক শাস্ত্রনিন্দিত কাজের সঙ্গে মানুষ যেমন করে আসছে, করে যাবে। এত সতর্কতা এবং তৎপরতাতেও কি বন্ধ করা গেছে বে-আইনী আফিম-কোকেনের আমদানি, আমেরিকা থামাতে পেরেছে এল-এস-ডিকে? 'জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ'—ডাক্তারের চাইতে ভালো করে কেউ জানে না পেথিড্রিনের পরিণাম কী, অথচ কখনো কখনো ডাক্তার নিজেই তার শিকার হয়ে ওঠেন।

মানুষের শরীরের জন্যে মাদক কতটুকু দরকার, অথবা আদৌ দরকার কিনা সে বিচার বৈজ্ঞানিকেরা করুন। সুনন্দর মতো যারা ও-সব রসে একেবারে বঞ্চিত কিংবা সেই যারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন এমন কি পান-সিগারেট পর্যন্ত (এখানে সুনন্দর কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে, এ ক্ষেত্রে সে মার্ক-টোয়াইনপন্থী : 'ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন, তারপর সৃষ্টি করলেন নারীকে; তারপর পুরুষের জন্যে দুঃখিত হয়ে সৃষ্টি করলেন তামাক'—স্মৃতিগত উদ্ধৃতির ত্রুটি মার্জনীয়) বর্জনযোগ্য, তাঁদের মতামত ব্যক্তিগত এবং নীতিবাগীশ বলে সরিয়ে রাখা যেতে পারে; কিন্তু 'অনাদ্যপেয়ম্'—এই দেশেও সোমরসের বন্দনায় ঋগ্বেদ মুখর, মাধ্বী ও পৈষ্টী ইত্যাদি বহুকাল থেকেই নন্দিত; সেই ঐতিহ্য স্মরণ রেখেই ভারত-বর্ষের সর্বত্র 'প্রোহিবিশন' চালু করা সম্ভব হয়নি—যাঁরা করেছিলেন, তাঁরাও আমিল-

ভাঁড়ের খোলে, মেঠোপথে, পানের দোকানের লণ্ঠনের ইঙ্গিতে নিষিদ্ধ পানীয়ের সন্ধান মেলে

মাদের মতোই ভাবছেন—'পুনরাগমনায় চ'
'দুষ্ক' বোম্বাই সম্বন্ধে একটি রসিকতা মনে পড়ে গেল : 'বোম্বাইয়ের দোকানে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ, কিন্তু যে-কোনো ঝোপের আড়ালে হাত বাড়ালেই বোতল পাওয়া যাবে!'

আমাদের নেতারা নিশ্চয় স্বীকার করেন, পরিমিত মদ্যপান দূষণীয় নয়, নইলে সারা দেশেই তাঁরা কঠোর হাতে সেটা বন্ধ করে দিতেন। পাঞ্জাবের মোলানে যে ব্রুয়ারীটি দিনে দিনে পূর্ণিমার চাঁদের মতো বিকশিত হচ্ছে, সেটি নিশ্চয়ই অননুমোদিত নয়। অর্থাৎ তাঁরা প্রলোভনটি সাজিয়ে রাখবেন—অথচ তার পথটি করবেন কণ্টকাকীর্ণ, সেইটিই বোধ হয় সুরাপান-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি! এ সেই রাজা ক্যানিউটের সমুদ্র-শাসনের রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আত্মার শান্তি

দেশসুদ্ধ লোকের চরিত্র-সংশোধনের জন্যে যদি সরকার এবং নেতারা একটা সর্বব্যাপী মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন চালান—আমার কোনো আপত্তি নেই; এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাঁরা মদ্যপানের স্বপক্ষে দাঁড়াবেন, তাঁদের সম্পর্কেও আমার বক্তব্য নেই। কিন্তু নেশার যৌক্তিকতাকে স্বীকার করা হবে অথচ তার সামনে তুলে দেওয়া হবে কাঁটা তারের বেড়া—এর কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না। ক্ষুধার্ত বাঘের নাগালের বাইরে মাংসপিণ্ড নাচানোর মতো এ এক মারাত্মক খেলা।

যারা অ্যালকোহলিক, তাদের কেউ সমর্থন করবে না, তারা তো ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু আইনত যারা 'পরিমিত মদ্যপানের অধিকারী', তাদের অধিকাংশই নীচের তলার মানুষ, শ্রমিক, ভূমিজীবী এবং নানা স্বল্পায়ী সম্প্রদায়। কলকাতার হোটেলের একটি পার্টিতে যাঁরা কয়েক শো টাকার মদের বিল দিতে পারেন তাঁদের কথা ভাবছি না, কিন্তু যে-সব সাধারণ মানুষে, যে-সব 'হ্যাণ্ডনটস্'-দের জন্যে দেশী মদের দোকান খুলে রাখা হয়, অথচ অতি-মূল্যের জন্যে যা তাদের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যায়—তাদের জন্যে পরোক্ষে চোলাই মদের ব্যবসা সরকারই খুলে দিয়েছেন। লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডারের দোকানে ঢোকবার সামর্থ্য যাদের নেই, 'অনুমোদিত' নেশার তাগিদেই তাদের বে-আইনি দোকানে ছুটতে হয়। তাই ভবনাথ সেন স্ট্রীট কিংবা হাওড়ার শোচনীয় প্রাণহানির ট্রাজিডীর জন্যে কোনো বারিক বা হাজরাই দায়ী নয়—যাঁরা 'সাপের মুখে ভেক নাচানো'র কৌতুক করেন, এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণই তাঁদের। যদি চোলাই মদ তাঁরা বন্ধও করেন (এমন অঘটনের আশা নেই, ব্যক্তিগতভাবে জানি, পাড়ার বে-আইনি ভাঁটিখানার বিরুদ্ধে বারবার পুলিসে খবর দিয়ে শেষে অভিযোগ-কারীকেই প্রাণের দায়ে পাড়া ছাড়তে হয়েছে), তা হলে হয়তো তার বিকল্প হয়ে আরো মারাত্মক সেই "বার্ণিশ" দেখা দেবে। নেচার অ্যাভরস্ ভ্যাকুয়াম।

'মদ্যমপেয়মগ্রাহ্যম্'-এর ঝাণ্ডা-পতাকা তুলে যদি দেশের মনীষীরা নৈতিক পুনর্জীবনের অভিযানে বেরিয়ে পড়েন, আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাব; আশা করব —তাঁদের বাণী দূরদূরান্তে গ্রামে-কন্দরে পাহাড়-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়বে—হাঁড়িয়া, পচাই, তাড়ি, দারু বা মশলা সব দূরে হয়ে গিয়ে নির্মলতার স্নিগ্ধ বাতাস বইতে থাকবে। আর নেশাকে যদি তাঁরা বৈধ স্বীকৃতিই দেন, তা হলে তাকে নিয়ে এই ধরনের রসিকতা কিছুতেই চলবে না, কণ্টকাকীর্ণ এই প্রলোভনের পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে—উত্তর কলকাতা আর হাওড়াতে তা আরো একবার নিদারুণ ভাবে প্রত্যক্ষ করা গেল!

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় সুনন্দর জার্নালে 'রাজশেখর বসুর বিড়াল চক্ষু' স্থলে ভ্রম ক্রমে বিড়াল চক্ষু ছাপা হয়েছে।

৫১

এক সরকারী অফিসে লোক নেবে। প্রিয়নাথ দত্ত সেই অফিসের একজন বড়োবাবু। উঁচুদরের সরকারী চাকুরের কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি নিয়ে চাকরির উমেদারি করতে গিয়ে যে লোকটি চুপচাপ ফিরে এসেছিল, সে আবার এল বিদ্যাসাগরের কাছে। আবার একখানা চিঠি চাই, বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠি নিয়ে সে এবার প্রিয়নাথ দত্তের কাছে চাকরির উমেদারি করতে যাবে।

কিন্তু প্রিয়নাথ দত্তকে এক বিন্দু চেনেন না বিদ্যাসাগর, এক কণা আলাপ নেই তাঁর সঙ্গে। কেমন করে বিদ্যাসাগর তাঁকে চিঠি লিখবেন, এই লোকটিকে চাকরি দিতে বলবেন।

কিন্তু লোকটি নিতান্ত নাছোড়বান্দা। অগত্যা বিদ্যাসাগর অচেনা-অজানা প্রিয়নাথ দত্তকে একখানা চিঠি লিখে দিলেন।

আশ্চর্য কাণ্ড, এবার কাজ হল। উপরওয়ালে বড় বাবু প্রিয়নাথ দত্ত সেই লোকটিকে একটা চাকরি দিলেন।

খবর শুনে বিদ্যাসাগর বললেন—বিচিত্র সংসার! যার উপকার করেছি সে আমার কথা রাখলে না। আর, উপকার করা তো দূরের কথা, যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পর্যন্ত নেই, তিনি আমার মান রাখলেন।
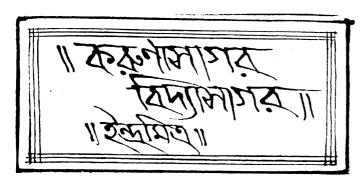
তারানাথ তর্কবাচস্পতির নাম মনে এসে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগরের দৌলতেই সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের তক্তে বসেছেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি। সেসব কথা এককালে তর্কবাচস্পতি বিন্দুমাত্র মনে রাখেননি।

পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে খুব জাঁকজমক করে একটা শ্রাদ্ধ হচ্ছে। সেই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের কর্তা হলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

পণ্ডিতবিদায়ের ফর্দে রাজকুমার ন্যায়রত্নের নামে আট টাকা লিখে রাখলেন তারানাথ। অর্থাৎ, রাজকুমার ন্যায়রত্ন আট টাকা বিদায় পাবেন।

ফর্দ দেখে বিদ্যাসাগর বললেন—ন্যায়রত্নের পক্ষে অবিবেচনা হয়েছে।

বলে বিদ্যাসাগর আট টাকার জায়গায় বারো টাকা করে দিলেন। অর্থাৎ, রাজকুমার ন্যায়রত্ন বারো টাকা বিদায় পাবেন।

বিদায়কালে রাজকুমার ন্যায়রত্ন বারো টাকা পেলেন। বারো টাকা পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন—উচিত বিবেচনা হয়নি।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি তখন একটা আশ্চর্য কথা বললেন। বললেন—বললে বিদ্যাসাগর বিরক্ত হবেন, কিন্তু না বললে নয় এজন্য বলতে হল। আমার বিবেচনায় ন্যায়রত্ন এর চেয়ে বেশী পেতে পারেন। কিন্তু আমি যে পক্ষ, ন্যায়রত্নও সেই পক্ষ। অর্থাৎ, আমি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বইয়ের উত্তর লিখেছি, ন্যায়রত্নও লিখেছেন। সেই অপরাধে বিদ্যাসাগর রাগ করে ন্যায়রত্নের বিদায় কমিয়ে দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের নামে অক্রোশে ডাহা মিথ্যে কথা বললেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি। অথচ, এই তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য এককালে বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছেন বিদ্যাসাগর।

সে সময়ে বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি করেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের চাকরি খালি হল একটা। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে সেই চাকরি নিতে বলেছেন। সেই চাকরি নিলে মাইনে অনেক বেড়ে যেত, কিন্তু বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সেই চাকরি নেননি। তারানাথ তর্কবাচস্পতি যাতে সেই চাকরিতে বহাল হতে পারেন, বিদ্যাসাগর বরং সেই চেষ্টা করেছেন।

তারানাথ তখন কলকাতায় ছিলেন না, অম্বিকাকালনায় ছিলেন। চিঠি লিখলে পাছে দেরি হয়ে যায়, বিদ্যাসাগর তাই সারা রাত হেঁটে কলকাতা থেকে কালনায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়িতে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের অদ্ভুত চেষ্টা এ কষ্টের ফলেই তারানাথ তর্কবাচস্পতি অধ্যাপকের তক্তে বসেছেন। তারানাথের মান-সম্ভ্রম খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবকিছুর মূলে বিদ্যাসাগর।

সেসব পুরনো কথা তারানাথ ভুলে গেছেন। বিদ্যাসাগরের যাতে মর্মান্তিক হয়, সে চেষ্টায় এককালে তাঁর বিন্দুমাত্র আলস্য দেখা যায়নি।

কত মানুষের কত উপকার করেছেন বিদ্যাসাগর। যাঁদের উপকার করেছেন, তাঁদের মধ্যেও এককালে বিদ্যাসাগরের নিন্দুকের অভাব হয়নি। জীবনের শেষ দশায় বিদ্যা-

সাগরের মনে হয়েছে, যারা উপকৃত হয় তারাই নিন্দা করে। কে একজন নিন্দা করেছে বিদ্যাসাগরের নামে? সে খবর কানে এলে বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ করে বলতেন—রও, ভেবে দেখি, সে আমার নিন্দা করবে কেন? আমি তো কখনো তার কোনো উপকার করিনি।

বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'য় 'অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক' নামে একটি রচনা আছে:

"এক কৃষকের এক টাট্টু ঘোড়া ছিল। সে একদিন আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘোড়া বাজারে বেচিতে যাইতেছে। সে সময়ে ঐ পথ দিয়া কতকগুলি বালক হাস্য ও কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, কৃষক ও তাহার পুত্রের উল্লেখ করিয়া, আপনার সহচরদিগকে বলিল, তোমরা ইহাদের মত নির্বোধ কখনও দেখ নাই। অনায়াসে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারে; না যাইয়া আপনারা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ, বালকের উপহাসবাক্য শুনিয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিল, আপনি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথের ধারে কয়েকজন বৃদ্ধ, কোনও বিষয়ে, বাদানুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, কৃষকের পুত্রকে

ঘোড়ায় চড়িয়া আর কৃষককে ঘোড়ার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া, বলিলেন, দেখ, আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা যথার্থ কি না। এ কালে বৃদ্ধের সম্মান নাই; ঐ দেখ, বেটা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর বুড়া বাপ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে। এই বলিয়া, তিনি কৃষকের পুত্রকে ধমকাইয়া বলিলেন, আরে পাপিষ্ঠ, বৃদ্ধ পিতা চলিয়া যাইতেছেন আর তুই ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিস; তোর কিছুই বিবেচনা নাই?

কৃষকের পুত্র অতিশয় লজ্জিত হইল, এবং আপনি ঘোড়া হইতে নামিয়া, পিতাকে চড়াইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর গেলে পর কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, কে জানে এ মিন্সের কেমন আক্কেল; আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর ছোট ছেলেটিকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইল।

এইরূপে খানিক দূরে গেলে পর এক ব্যক্তি কৃষককে বলিল, অহে ভাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এ ঘোড়াটি কার? কৃষক বলিল, ও আমার ঘোড়া। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, তোমার আচরণ দেখিয়া তোমার বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার হইলে, তুমি উহার উপর এত নির্দয় হইতে না। কোন বিবেচনায়, এমন ছোট ঘোড়ার উপর দুইজনে চড়িয়া বসিয়াছ? ঘোড়াকে এতক্ষণ যেমন কষ্ট দিয়াছ, অতঃপর উহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত।

এই ভর্ৎসনা শুনিয়া, তাহারা পিতা পুত্রে ঘোড়া হইতে নামিল, দড়ি দিয়া ঘোড়ার পা বাঁধিল, এবং পায়ের ভিতর বাঁশ দিয়া, কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বাজারের নিকট একটি খাল ছিল। তাহারা ঐ খালের পুলের উপর উঠিলে, বাজারের লোকে এই তামাশা দেখিতে উপস্থিত হইল। মানুষে জীবন্ত ঘোড়া কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া, সকল লোকে এত হাসি তামাশা করিতে ও হাততালি দিতে লাগিল যে, ঘোড়া ভয় পাইয়া, জোর করিয়া, পায়ের দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং দড়ি ছিঁড়িবা মাত্র, খালের জলে পড়িয়া, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিল।

কৃষক লোকের ঠাট্টা তামাশায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও লজ্জিত হইল, এবং হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, আমি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়া, কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না; লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল।"

এই রচনার কথা তুলে বিদ্যাসাগর এককালে দুঃখ করে বলেছেন—সন্তুষ্ট কাউকেই করতে পারলাম না। আমার কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ।

উত্তরকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ লিখেছেন: "আসলে বিদ্যাসাগর দেবত্ব ও ব্রাহ্মণ্যের সকল গৌরববর্জিতভাবে মানুষকে মানুষরূপেই মহৎ ও মহনীয় দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহা চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গরু ও শালগ্রামশিলার দেশে তাঁহাকে অপরিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অকারণ আঘাতে আঘাতে তাঁহার কুসুম-কোমল মন পাষাণ-কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিয়াছেন, কিন্তু এই অসহায় নিপীড়িত সমাজের জন্য তাঁহার কল্যাণ-হস্তকে নিরস্ত করেন নাই; বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মানব-প্রীতিই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু।"

কত লোক 'দেব' বলে টাকা নিয়ে চলে গেছে, টাকা ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা, আর দেখা পর্যন্ত দেয়নি। ফেরত দেবার যাঁদের সামর্থ্য নেই তাঁদের কথা না-হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরাও সব সময় বিদ্যাসাগরের ধার শোধ করেনি।

একবার একটা আশ্চর্য কান্ড হল।

কৈলাসচন্দ্র বসু বিদ্যাসাগরের চেনা-জানা ভদ্রলোক। কৈলাসচন্দ্র একজন বন্ধুকে নিয়ে একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসে উপস্থিত। বন্ধুটি নাটোরের দারোগা।

কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বললেন—আমার এই বন্ধুটি বড়ো বিপদে পড়েছেন। নির্দোষ হয়েও ইনি এক মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, ভদ্রলোকের মিছিমিছি ছ মাসের জেলের হুকুম হয়েছে। অগত্যা ইনি হাই-কোর্টে মোশান করেছেন, সাতশো টাকা ফি-তে মনোমোহন ঘোষকে ব্যারিস্টার লাগিয়েছেন। বাড়ি থেকে কাল টাকা আসার কথা ছিল, কিন্তু আসেনি। আজ প্রথম শুনানির দিন। আপনি দয়া করে ঘোষ মশায়কে একটু চিঠি লিখে দিন, আজকের কাজটুকু যেন উনি টাকা বাকি রেখে করেন, টাকা এলেই ওঁকে দিয়ে দেওয়া হবে। টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন বিদ্যাসাগর। তারপর বললেন—একজনের এক পা জেলে আরেক পা বাইরে, তার টাকা বাকি রেখে আমি ঘোষকে কাজ করতে বলব কেমন করে? ঘোষই বা কী মনে করবেন? আমি পারব না, এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

বিদ্যাসাগরের কথা শুনে দারোগাবাবু কেঁদে ফেললেন। বললেন—শুনেছি, কোথাও যার কূল-কিনারা হয় না, সে আপনার এখানে এসে আশ্রয় পায়। আমার তাও রইল না।

একজন বিপন্নের আর্তস্বরটুকু ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। বিদ্যাসাগর বিচলিত হলেন। যে কাজ তাঁকে দিয়ে হবার নয়, সেই কাজেই হাত দিলেন। মনোমোহন ঘোষকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। 'মাই ডিয়ার ঘোষ' পর্যন্ত লিখে

ফেললেন। তারপর কলম আর চলে না। সব চুপচাপ। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। 'কাই ডিয়ার ঘোষ' পর্যন্ত লেখা হয়েছে, আর একটি অক্ষরও লেখা হয়নি, তারপর শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর বললেন—না, এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

দারোগাবাবু তখন কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—তবে কি আমি জেলেই যাব?

সামান্য একটি প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের দু চোখ জলে ভরে উঠল।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতে তখন টাকা নেই। না, ব্যাঙ্কেও নেই। তবুও বাক্স থেকে ব্যাঙ্কের চেকবই বের করলেন বিদ্যাসাগর। সাত শো টাকার একখানা চেক দিলেন দারোগাবাবুর হাতে। বললেন—দেখ, ব্যাঙ্কেও আমার টাকা নেই। এই চেকখানা ঘোষকে দিয়ে ব'লো, উনি যেন কাল সাড়ে এগারোটার আগে এই চেক ব্যাঙ্কে না পাঠান।

হাইকোর্টের বিচারে দারোগাবাবু খালাস পেয়ে গেলেন। চারদিনের দিন সাতশো টাকা নিয়ে তিনি এলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। সঙ্গে কৈলাসচন্দ্র আছেন।

বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করে দারোগাবাবু সাতশো টাকা রাখলেন তাঁর সামনে। হাসিমুখে বললেন—হাইকোর্টের বিচারে আমি খালাস পেয়েছি। আর আজ সকালবেলা বাড়ি থেকে টাকাও এসে গেছে। তাই আমার খালাসের সংবাদ আর আপনার সাতশো টাকা দিতে এলাম।

বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই খুশী হবেন, দু-একটা মিষ্টি কথা বলবেন—এই আশায় দারোগাবাবু আর কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কোথায়!

বিদ্যাসাগর দারোগাবাবুকে বললেন—তুমি ভদ্রসন্তান হয়ে আমাকে বঞ্চনা করলে?

তারপর কৈলাসচন্দ্রকে বললেন—আমার চেনা-জানা হয়েও তুমি আমার সঙ্গে চাতুরি করলে?

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দু-জনে। হয়তো ভাবতে লাগলেন, কখন বিদ্যাসাগরকে বঞ্চনা করা হল, কোন মুহূর্তে চাতুরি করা হল তাঁর সঙ্গে।

খানিকক্ষণ বাদে বিদ্যাসাগর দারোগাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি না বলেছিলে, তুমি পুলিসে চাকরি কর?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বিদ্যাসাগর বললেন না, একথা কিছুতেই সত্য হতে পারে না। তুমি মিথ্যে বলেছ।

—আজ্ঞে না। খোঁজ করলেই জানতে পারবেন, আমি নাটোরের পুলিস সাব-ইনস্পেক্টর।

এতক্ষণে কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথার ভঙ্গি থেকে অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু রহস্য আছে, নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগর রাগ করেননি। কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনি কী বলতে চান বলুন তো। আমরা আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছি মনে করছেন কেন?

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন—মিথ্যে কথা ছাড়া আর কী মনে করব? কত লোক আমার থেকে 'দেব' বলে টাকা নিয়ে গিয়েছে, টাকা ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা, আর দেখা পর্যন্ত দেয়নি। গরীবদের কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি, টাকাওলা লোকেরা পর্যন্ত সবসময় ধার শোধ করেনি। যে-দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে-দেশে পুলিসের দারোগা হয়ে একজন সাতদিনের কড়ারে টাকা নিয়ে চারদিনের দিন ফেরত দিতে এসেছে, একথা কেমন করে বিশ্বাস করি?

কৈলাসচন্দ্র আর দারোগাবাবু মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের বসতে

বললেন বিদ্যাসাগর। তারপর দারোগা-বাবুকে বললেন—হাইকোর্টের জজেরা অনেক সময় মামলা না বুঝে আসামীকে ছেড়ে দেয়; তোমার ব্যাপারেও দেখছি তাই হয়েছে। তোমার তো জেলে যাওয়াই উচিত ছিল। সাতদিনের কড়ারে টাকা নিয়ে চারদিনের দিন যে ফেরত দেয়, দারোগাগিরি করে সে জেলে যাবে না তো জেলে যাবে কে?

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

"দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকের প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যাচরণ প্রভৃতি দেখিয়া মানুষের আচরণের প্রতি তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) এক প্রকার বিজাতীয় ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। একদিকে প্রেমিক হৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় মানবের প্রতি মহাপ্রেমে অনুপ্রাণিত, অপরদিকে মানুষের আচরণে ভগ্নহৃদয় ও বিশ্বাসবিহীন!...

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ দশায় অতি আর্তভাবে নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ দেশের ভাল হয়"..."

রাজনারায়ণ বসুকে একবার একটা ছড়া শুনিয়েছেন বিদ্যাসাগর :

পৃথিবীতে যত বেটা, সব বেটা গরু।
যে যারে ঠকাতে পারে, সেই তার গুরু।

এই ছড়া মিলিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা দেশে বিদ্যাসাগরের গুরুর আর আদি-অন্ত নেই। অনেকেই বিদ্যাসাগরকে ঠকিয়েছেন। যাঁদের কাছে বিদ্যাসাগর ঠকেছেন, তাঁদের অনেকেরই ভদ্রলোক বলে নামডাক আছে।

এক ভদ্রলোকের অসুখ করেছে। চিকিৎসক তাকে হাওয়া-বদলের পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে চলে এলেন।

চিকিৎসকের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চেনা-জানা আছে। সেই সুবাদে তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনার কার্মাটারের বাড়িটি যদি দিনকয়েকের জন্য ছেড়ে দেন তো বড়ো ভালো হয়। আমার এই রোগী সেখানে থেকে দিনকয়েক হাওয়া-বদল করে আসতে পারেন।

কিন্তু রোগীটিকে বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র চেনেন না। কণামাত্র আলাপ নেই ও'র সঙ্গে। তাই চিকিৎসক রোগীটির পরিচয় দিলেন বিদ্যাসাগরকে। তারপর বললেন—ইনি অত্যন্ত ভদ্রলোক।

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন—ও'র সঙ্গে যখন আমার আলাপ নেই, তখন আপনার কথা স্বীকার করে নিতে আমি বাধ্য। এ পর্যন্ত যাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ভদ্রলোক তো বড়ো একটা পাইনি!

চেহারা দেখে কি ভদ্রলোক চেনা যায়? যদি চেহারায় না যায় তো কিসে ভদ্রলোক বোঝা যাবে?

এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর একবার কথা বলেছেন নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ছাত্র। তিনি নিমতলায় কাঠের গোলা খুলেছেন। খবর শুনে বিদ্যাসাগর একদিন সেই কাঠের গোলা দেখতে এলেন। সমস্ত পথ হেঁটে এলেন।

নগেন্দ্রনাথ তো বিদ্যাসাগরকে আসন দেবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগর আসন পাততে বারণ করলেন। কাঠের গোলায় এসেছেন, কাঠের উপরেই বসে পড়লেন।

নগেন্দ্রনাথের হাতে তখন একখানা ইংরেজী মাসিকপত্র। বিদ্যাসাগর বিরক্ত হলেন। বললেন—ব্যবসা করতে এসেছিস, হাতে ইংরেজী মাসিকপত্র কেন? যদি একান্তই বই রাখতে হয়, ব্যবসাদারের মতো রামায়ণ-মহাভারত রাখ না।

বিদ্যাসাগর এসেছেন। বিদ্যাসাগর এসেছেন। অতএব রাস্তায় ভিড় হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন—এত ভিড় কেন?

নগেন্দ্রনাথ বললেন—আপনাকে দেখবার জন্য এত ভিড় হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—তুই তবে ঘণ্টা বাজা, ঘণ্টা বাজা।

তারপর ব্যবসার কথায় এলেন বিদ্যাসাগর। জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, কি রকম ব্যবসা করছিস?

—আজ্ঞে, ধারেও বেচি, নগদেও বেচি।

—ধারে কীভাবে বেচিস?

—আজ্ঞে, ভদ্রলোক দেখে ধার দি।

—ভদ্রলোক কী করে বুঝিস?

—চেহারা-অবস্থা দেখে ভদ্রলোক বুঝি।

—দূর মূর্খ! তোর কিছু হবে না। ব্যবহার করে করে যখন দেখবি মানুষটি

খাটি, তখন ধার দিবি।—ভদ্রলোক চেনার উপায় বলে দিলেন বিদ্যাসাগর—ভদ্রলোক ঠিক করবি ব্যবহারে, চেহারায় নয়।

বিদ্যাসাগর নিজের মনের মতো একখানা বাড়ি করেছিলেন কার্মাটারে। শেষ জীবনে শরীর-মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত, শহরের হট্টগোল যখন অসহ্য হয়ে উঠত, বিদ্যাসাগর মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্য কার্মাটারে চলে যেতেন।

কার্মাটার সাঁওতাল পরগনায়।

সাত-আট ঘর বাঙালী কার্মাটারে, কিন্তু কারো ভাগ্যে মাছ জোটে না। সকলে একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—আমরা মাছ খেতে পাই না।

খোঁজ-খবর নিয়ে বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন, মাছ নিয়ে বাবুরা দাম দেয় না বলে জেলেরা এদিকে মাছ বেচে না।

তখন থেকে নিজেই মাছ কিনতেন বিদ্যাসাগর। ভাগ করে বাড়ি-বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। এ-ব্যবস্থা এমন চালু হয়ে গিয়েছিল যে কার্মাটারে কোনো বাড়ির ছেলেরা সকাল-সকাল ভাত খাবার বায়না ধরলে তাদের বলা হত—ঈশ্বর জেলে এখনো মাছ দিয়ে যায়নি, ভাত দেব কি।

বিস্তর সাঁওতাল কার্মাটারের বাসিন্দা। সাঁওতালদের ভালোবেসে ফেললেন বিদ্যাসাগর। বলতেন—সাঁওতালদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার আনন্দ হয়। ওরা গালি দিলেও আমার তৃপ্তি। ওরা অসভ্য বটে, কিন্তু সরল ও সত্যবাদী।

সাঁওতালদের দু-হাত ভরে দিতেন বিদ্যাসাগর। অষুধ-বিষুধ, কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল। থালা-গেলাস, ঘটিবাটি। যে যা চাইত, দিতেন।

একবার কার্মাটারে পৌঁছতেই তো ছোটো-ছোটো সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা বিদ্যাসাগরকে ঘিরে ধরল—দাদা, আমাদের জন্য কি এনেছিস?

আগেই অবশ্য ওরা বিদ্যাসাগরকে ফরমাশ দিয়ে রেখেছে। ওদের ফরমাশ মাফিক জিনিসপত্র এসেছে তো? আরশি কই? চিরুনি কই? ঘুনসি কই?

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—সব এনেছি। সব দিচ্ছি।

একে-একে সকলকে দিলেন। চিরুনি, ঘুনসি পরিয়ে দিলেন। তারপর বাগান থেকে গোলাপ ফুল নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। সব মেয়ের মাথায়, কানে গোলাপ ফুল পরিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগরেরও আনন্দ, ওদেরও আনন্দ।

মিষ্টি-মিঠাই খাইয়েছেন সাঁওতালদের যত্ন করে। একবার খেজুর নিয়ে গিয়েছিলেন। খেজুর খেয়ে ওদের ভালো লেগেছিল, আরো খেজুর খেতে চেয়েছিল ওরা। বিদ্যাসাগর তাই আরেকবার দশ-বারো বস্তা নিয়ে গেলেন।

ইচ্ছা হলে বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের নাচ দেখতেন। ওদের নাচ দেখে খুব আনন্দ পেতেন।

সাঁওতালদের ছেলেরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, সেজন্য বিদ্যাসাগর কার্মাটারে নিজের খরচে একটা ইস্কুল খুলে দিয়েছেন।

সাঁওতালেরা বিদ্যাসাগরকে একবিন্দু ভয় করত না, ভক্তি করত, ভালোবাসত। নির্ভয়ে বিদ্যাসাগরের হাত থেকে খাবার জিনিস কাড়াকাড়ি করে নিত।

বিদ্যাসাগর কার্মাটারে এলেই সাঁওতালদের আনন্দ। প্রত্যেকবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে আসার সময় সাঁওতালেরা বিদ্যাসাগরের জন্য উপহার নিয়ে আসত। তরিতরকারি, শাকসবজিই বেশী আসত।

একবার একজন সাঁওতাল একটা মুরগির ছানা নিয়ে এল। মুরগির ছানা বিদ্যাসাগর কেমন করে নেবেন? নিজের পইতে দেখিয়ে বিদ্যাসাগর বললেন—আমি তো ওই মুরগির ছানা নিতে পারব না।

হায়, বিদ্যাসাগরের জন্য যা নিয়ে এসেছে, বিদ্যাসাগর তা নিতে পারবেন না। সাঁওতালটি কাঁদতে লাগল। বিদ্যাসাগর তখন অগত্যা সেই মুরগির ছানা হাতে নিলেন।

কারো দুঃখ-কষ্ট দেখলে বিদ্যাসাগর কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে পারেন না।

কার্মাটারে একদিন সকালবেলা একজন মেথর এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমার ঘরে মেথরানীর কলেরা হয়েছে। বাবা, তুমি কিছু না করলে তো আর উপায় নেই।

সেই মুহূর্তে তিনি রওনা হলেন। অষুধের বাক্স আর একটা মোড়া নিয়ে একজন চাকরও চলল তাঁর সঙ্গে। সারাদিন বিদ্যাসাগর রইলেন রোগিণীর কাছে, সাধ্যমতো অষুধ দিলেন। রোগিণীর অবস্থা অনেকখানি ভালো হবার পর প্রায় সন্ধ্যার সময়ে বাড়িতে ফিরে এসে স্নানাহার করলেন।

একদিন একজন সাঁওতাল বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছে। সঙ্গে একটি মেয়ে। তাকে দেখিয়ে সাঁওতালটি বিদ্যাসাগরকে বলল—একে একখানা কাপড় দিতে হবে।

একটু রঙ্গ করার ইচ্ছা হল বিদ্যাসাগরের। বললেন—কাপড় নেই। আর ওকে দেব কেন?

সাঁওতালটি বলল—তা হবে না। কাপড় দিতেই হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—কাপড় নেই।

সে কথা বিশ্বাস হল না। সাঁওতালটি বলল—দে তোর চাবি। চাবি খুলে সিন্দুক দেখব।

হাসিমুখে বিদ্যাসাগর চাবি দিলেন। সিন্দুক খুলে ফেলল সাঁওতালটি। বিস্তর কাপড় সিন্দুকে। একখানা ভালো কাপড় বের করে এনে সাঁওতালটি মেয়েটিকে দিয়ে দিল। আর এতেই বিদ্যাসাগরের অগাধ সুখ।

আরেকদিন একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন

বিদ্যাসাগর। এমন সময় দুটি সাঁওতাল মেয়ে এসে উপস্থিত।

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে সংক্ষেপে কথাবার্তা শেষ করলেন বিদ্যাসাগর। তাকে বিদেয় দিলেন।

তখন একটি সাঁওতাল মেয়ে আরেকটিকে ধরে নিয়ে এল বিদ্যাসাগরের কাছে। বলল—ইটা আমার বিহান হয়, তুই একে একটা কাপড় দে।

বিদ্যাসাগর ঠাট্টা করে বললেন কাপড় কোথায় পাব?

—ইস, তোর আবার কাপড় ন্যাই?

বিদ্যাসাগর বললেন—হ্যাঁ রে, কাপড় কোথায় পাব?

—চল তো, সিন্দুকটা খুলবি।

—চল, দেখবি।

সিন্দুক খুলে দিলেন বিদ্যাসাগর। কাপড়ে ভর্তি।

মেয়েটি বলল—ইরেঃ, তুইও মিছা কথা শিখলি হেঃ?

বিদ্যাসাগর বললেন—আর তোদের দেশে এসেই তো শিখলাম।

মেয়েটি দুঃখ করে বলল—আমরা মিছা কথাটা কই না, আমরা জানতাম তুই মিছা কথাটা বলিস না।

দুজনে দুখানা নতুন সুন্দর শাড়ি নিয়ে চলে গেল।

প্রত্যেক বছর কার্মাটাঁরের সাঁওতালদের তিন-চারশো টাকার কাপড় কিনে দিতেন বিদ্যাসাগর। কলকাতার দোকানে নিজে গিয়ে কিনতেন।

একদিন এক দোকানে কাপড় কিনতে এসে তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই দোকানের সামনে দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হল। কিন্তু কথাবার্তার পর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনাকে আমরা এত সম্মান করি, আর আপনার এই রকম দোকানের ঘরে বসে তামাক খাওয়া যেন কি রকম কি রকম ঠেকে।

বিদ্যাসাগর বললেন—দেখ, ওদের নিয়েই আমাদের ঘরকন্না, ওদের কাছে তেল-নুন কিনতে আসতে হয়, কাপড় কিনতে আসতে হয়, রাজা-মহারাজাদের নিয়ে তো আর আমাদের ঘরকন্না নয়। তা যদি বলো তো না-হয় তোমার ওখানে আর যাব না। তোমাদের ছাড়তে পারি কিন্তু ওদের ছাড়তে পারি না।

জীবনের একটা অংশ কার্মাটাঁরে কাটিয়েছেন বিদ্যাসাগর। সেখানকার সাঁওতালেরা বিদ্যাসাগরকে তাদের পরমাত্মীয় বলে জেনেছে। বিদ্যাসাগর তাদের নিতান্ত আপনজন হয়ে থেকেছেন।

কার্মাটাঁরে বিদ্যাসাগরের একটি দিনের খবর শুনিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সকালবেলা। রোদ উঠতে-না-উঠতেই একজন সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা নিয়ে এসে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে উপস্থিত হল। বলল—ও বিদ্যেসাগর, আমার পাঁচগণ্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হবে না। তুই আমার এই ভুট্টা কটা নিয়ে আমার পাঁচগণ্ডা পয়সা দে।

বিদ্যাসাগর পাঁচগণ্ডা পয়সা দিয়ে সেই ভুট্টা কিনলেন। নিজের হাতে তাকে তুলে রাখলেন।

ভুট্টা নিয়ে আবার আরেকজন সাঁওতাল এল। বলল আমার আটগণ্ডা পয়সার দরকার।

আটগণ্ডা পয়সা দিয়ে আবার বিদ্যাসাগর ভুট্টা কিনলেন।

একের পর আরেকজন সাঁওতাল আসছে। ভুট্টা নিয়ে আসছে। বিদ্যাসাগর সব ভুট্টা কিনে তাকে রেখে দিচ্ছেন। কোনো দরাদরি নেই। যে যা দাম বলছে, বিদ্যাসাগর বিনাবাক্যব্যয়ে সেই দাম দিচ্ছেন। সকাল আটটার মধ্যে চারদিকের তাক ভর্তি হয়ে গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নেই।

হরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন—এত ভুট্টা নিয়ে আপনি কী করবেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—দেখবি রে দেখবি।

ভুট্টা কেনা চলছে সমানে। ইতিমধ্যে দুটি সাঁওতাল মেয়ে এসে উঠানে দাঁড়াল। বলল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের কিছু খাবার দে।

আগের দিন বিকেলে হরপ্রসাদ কার্মাটাঁরে এসেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন—ওরা খাবার চাচ্ছে, আপনার এত মতিচুর ছানাবড়া আছে, দু-একটা দিন না।

বিদ্যাসাগর বললেন—দূরে হ, ওরা কি ওসবের স্বাদ জানে, না রস জানে? ওদের খাবার হলেই হল, ভালোমন্দ খাবার ওরা বোঝে না। ওসবের জন্য অন্য লোক আছে, এখানে সাঁওতালদের সঙ্গে থেকে তারা সাঁওতালদের মতো হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের জিভ আছে, জিনিস চেনে। আর এদের কাছে মাড়ি-চিঁড়েও যা, সন্দেশ-রসগোল্লাও তাই।

হরপ্রসাদ বললেন—তাহলে আমার সঙ্গে পরশুর ভাজা কতগুলো লুচি আছে, সেগুলো এদের দিয়ে দি।

বিদ্যাসাগর বললেন—আছে নাকি? কই দেখি।

কলাপাতায় বাঁধা প্রায় দু বিঘত লুচি আছে হরপ্রসাদের কাছে। দু দিন কলাপাতায় বাঁধা আছে, লুচিতে কলাপাতার গন্ধ হয়ে গেছে। হরপ্রসাদ সাঁওতাল মেয়ে দুটিকে লুচি দিতে যাচ্ছেন, বিদ্যাসাগর বললেন—আমায় দে, ওদের কি অমন করে দিতে আছে?

কলাপাতা খুলে বিদ্যাসাগর লুচিগুলো খানিকক্ষণ বাতাসে রাখলেন। বললেন—এই দেখ, কিছু গন্ধ নেই।

মাঝখান থেকে চারখানা লুচি তুলে নিয়ে বেশ সাবধানে রাখলেন।

হরপ্রসাদ বললেন—আপনি ও কি করছেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—খাবো রে। তোর মায়ের হাতে ভাজা?

—না বড়ো বউয়ের।

—তবে আরো ভালো। নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বিধবা পত্নীর? নন্দ আমার বড়ো প্রিয়পাত্র ছিল।

উপর থেকে দু-খানা লুচি তুলে নিয়ে সাঁওতালনীদের দিলেন বিদ্যাসাগর। টপ করে লুচি খেয়ে ফেলল ওরা। বিদ্যাসাগর হরপ্রসাদকে বললেন—দেখলি? ওরা কি স্বাদ জানে, না রস জানে?

ভুট্টা কেনার বিরাম নেই। কী একটা কাজে হরপ্রসাদ একটু অন্য দিকে গিয়েছেন, ফিরে এসে দেখেন, বিদ্যাসাগর নেই। কোথায় গেলেন চোখের পলকে?

খানিকক্ষণ পরে হরপ্রসাদ দেখলেন, একটা আলপথে বিদ্যাসাগর হনহন করে হেঁটে আসছেন, দরদর করে ঘাম পড়ছে, বিদ্যাসাগরের হাতে একটা পাথরের বাটি।

কোথায় গিয়েছিলেন এভাবে?

বিদ্যাসাগর হরপ্রসাদকে বললেন—ওরে, খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনী এসেছিল। সে বলল, 'বিদ্যেসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু-হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস।' তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটিতে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য দেখলাম একডোজ ওষুধে ছেলেটার রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। এরা তো বেশি ওষুধ খায় না, অল্প ওষুধেই এদের উপকার হয়। কলকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে-খেয়ে পেট চড়া পড়ে গেছে, বেশি ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না।

হরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কতদূর গিয়েছিলেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—ওই যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে। মাইল দেড়েক হবে।

একটা সাঁওতাল ছেলের জন্যে সকাল-বেলা পাথরের বাটিতে ওষুধ নিয়ে বিদ্যাসাগর পায়ে হেঁটে এক কথায় লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন।

এদিকে সামনের উঠোনে সাঁওতালে 'ভর্তি' হয়ে গেছে। ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হয়ে বসে গেছে তারা। কোনো দলে পাঁচজন, কোনো দলে আটজন, কোনো দলে দশজন। প্রত্যেক দলের মধ্যিখানে কতগুলো শুকনো পাতা, শুকনো কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখে সাঁওতালের দল বলে উঠল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার দে।

তখন বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করতে বসলেন।

শুকনো কাঠ-পাতায় আগুন জ্বালিয়ে সাঁওতালেরা মহানন্দে ভুট্টা সেঁকে খেল। তাদের রাশিকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরিয়ে এল। সাঁওতালেরা উঠে বলল—খুব খাইয়েছিস বিদ্যেসাগর।

সাঁওতালেরা চলে যেতে লাগল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন।

(ক্রমশ)

মহাস্থবির জাতক

(চতুর্থ পর্ব)

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

॥ ৫ ॥

আগ্রায় পৌঁছে সত্যদাকে গিয়ে যখন প্রণাম করলুম তখন তিনি আমাদের দেখে কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। দু' বছর আগে একদিন সেইভাবে অদৃশ্য হওয়ার কথা তো তুললেনই না, বরঞ্চ এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন কাল সন্ধ্যেবেলাতেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে।

সত্যদা বলতে লাগলেন—কোথায় থাকো? তোমাদের জন্য কাজকর্ম সব ঠিক করে রেখেছি আর তোমাদেরই দেখা নেই। এখন স্নান করে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম কর—

আয়া হুজুর। বলেই ভেতরের ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। লম্বা মতন, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স, চেহারা বেশ দড়, মুখ হাস্যময়। লোকটি এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই সত্যদা বললেন—এই আমাদের ওস্তাদ।

পরিচয় করিয়ে সত্যদা তাকে বললেন—বাবুরা এসেছে কলকাতা থেকে। এখানে যে পাথরে পাওয়ার দেওয়া হয় সে কথা বিশ্বাসই করতে চাইছে না।

ফারজন্দ আলি আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন—আর একটু বাদেই আমরা কাজ আরম্ভ করব। একটু অপেক্ষা করলেই আপনারা চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করতে পারবেন।

বিকেলবেলা তোমাদের কর্মস্থানে নিয়ে যাব।

সত্যদার ওখানে এক-পেট ভাত ও মাছের ঝোল খেয়ে দ্বিপ্রহরে টেনে একটি ঘুম লাগানো গেল।

সন্ধ্যেবেলা সত্যদার সঙ্গেই গেলুম আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মস্থলে।

চশমার কারখানা।

বলা বাহুল্য, সত্যদা যখন এর সঙ্গে জড়িত আছেন তখন বুঝতে হবে স্বদেশী চশমার কারখানা।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় আমাদের দেশে কোনো কিছুই তৈরী হত না। দু-একটা সাবানের কারখানা এখানে-সেখানে গজিয়ে উঠে কয়েক মাসের মধ্যেই ফেল পড়ছে। তখন দেশের এইরকমই অবস্থা। অতি সুন্দর প্রসারিত কল্পনাতেও দেশে ইঞ্জিন তৈরির কথা কেউ ভাবতেও পারেন নি।

স্বদেশী চশমার কথা শুনে সামান্য বিস্ময় প্রকাশ করা মাত্রই সত্যদা এক লম্বা লেকচার ঝাড়লে। তারপর কতকগুলো ছোট ছোট টিপির মত পাথর দেখিয়ে বললেন—এই-গুলোর ওপর ঘষে ঘষে পাওয়ার দেওয়া হয়।

আমাদের চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছায়া ঘনিয়ে উঠছে দেখে সত্যদা হাঁক দিলেন—ফারজন্দ আলি।

সেকালে ব্রেজিলের পাথরের চশমা নামে একটি বড় গোছের ধোঁকা কলকাতায় চালু ছিল। পাথরের চশমা নইলে সেটা যে নিকৃষ্ট দরের চশমা হবে, এই আমরা জানতুম। কিন্তু পরে জানা গেল ওটা একটা মস্ত ধোঁকা।

পাথর কোত্থেকে আসে সে কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই সত্যদা আবার আরেকটা লেকচার দিলেন—ভারতবর্ষের নানান পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ টন স্বচ্ছ পাথর রয়েছে। আমরা সেই-সব জায়গা থেকে পাথর সংগ্রহ করি।

কারখানা থেকে এবার আপিসে গিয়ে বসা গেল। আমাদের যিনি আসল মনিব, ধরা যাক তাঁর নাম হীরালাল—তাঁর আর কোনো কথা বলবারই দরকার হয় না। প্রতি কথাতেই সত্যদা একটা করে লেকচার দেন।

অবশ্য সেই যুগই ছিল লেকচারের যুগ। স্বদেশী আমলে ছোট বড় সকলেই লেকচার দিতেন। এদের অনেকের চাইতেই সত্যদা ভাল লেকচার দিতে পারতেন এবং মিথ্যে কথাকে গুছিয়ে সত্যের রূপ দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। সেইখানে বসেই আমাদের চাকরি ঠিক হয়ে গেল। উভয় পক্ষে চিঠি বিনিময় হল এবং উপরিপাওনার মধ্যে মনিবের বাড়িতে সান্ধ্য আহারের নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় মনিবের বাড়িতে এক প্রায়ান্ধকার জায়গায় আমাদের জন্য আসন পাতা হল। সেখানে বসে গরম গরম মোটা মোটা পুরী, করলা, ওল ও উচ্ছের আচার দিয়ে ভোজন সমাধা হল। বোধহয় কিছু মিষ্টিও খেতে দিয়েছিল।

একটা মেসে আমাদের থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা হল। পরদিন থেকে আমাদের রীতিমত তালিম দেওয়া হতে লাগল। সকাল-বেলা থাই—সতাদা দশটা-এগারোটা অবধি তালিম দেন। তালিমের পর কারখানায় গিয়ে বসি। অন্যান্য কাজ তো চলতই, সেই সঙ্গে আমাদের শিক্ষাও দেওয়া হত। একদিন লক্ষ্য পড়ল যে, কারখানার এক কোণে ছোট বড় কাটা টিনের ওপর একটি ভদ্রলোক ছবি এঁকে যাচ্ছেন—একই ছবি। ধুতি-পরা, কোঁচা উল্টে কোমরে গোঁজা, গায়ে শার্ট, এক কাঁধে চাদর ঝুলছে, এক হাতে একটা ছাতি, দাড়িওলা মূর্তি। এই এক ছবিই ভদ্রলোক এঁকে চলেছেন। তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলুম তিনিও বাঙালী। জিজ্ঞাসা করলুম—এ কার ছবি আঁকছেন মশাই?

ভদ্রলোক বললেন—এই তো বাবা, তোমাদের নেতাকে চিনতে পারলে না! এ হচ্ছে সুরেন বাঁড়ুজ্জের চেহারা।

সুরেন বাঁড়ুজ্জের মূর্তি'র স্বদেশী চশমার ফ্যাক্টরিতে কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তা চোখে না দেখে বিশ্বাস করা যায় না। শুনলুম এবং দেখলুমও। কতকগুলোতে লেখা রয়েছে—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন: "এই চশমা স্বদেশে তৈরী হচ্ছে—এবং ইহা অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র।" শুনলুম প্রতিদিন ডজন ডজন এই প্ল্যাকার্ড চারিদিকে পাঠানো হচ্ছে এবং সেখানকার রাস্তায় রাস্তায় দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেওয়া হচ্ছে।

ইতিমধ্যে আমাদের চোখ দেখা সম্বন্ধে তালিম দেওয়া হতে লাগল। বর্তমান সরকারী ভাষায় যাকে "প্রকৃষ্টরূপে প্রশিক্ষণ" বলে তাই হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে লেকচারে প্রশিক্ষণও চলতে লাগল। এক রকম শ্রেণীর লোককে কি রকম ধাঁচের লেকচার দিলে কার্যকরী হবে, সত্যদা নিজে তার তালিম দিতে লাগলেন। আমার জন্য কোট-পেণ্টুল্যান তৈরী হল—কালো কাপড়ের উপরে সাদা-সুতোর ডোরা। যে কাপড়ের পেণ্টুল্যান সেই কাপড়েরই কোট। শার্টের বদলে পাঞ্জাবি তৈরী হল যা ধুতিতেও চলবে, পেণ্টুল্যানেও চলবে। এক জোড়া জুতোও কেনা হল। যত দূর মনে পড়ছে ক্যান-ভাসের জুতো এক টাকা জোড়া।

নানা রকম পাথর পূর্ণ বাক্স একটা দেওয়া হল। কোনোটা স্বচ্ছ, কোনোটা বা ঘষা কাঁচের মত। প্রত্যেক পাথরের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। আরো একটা বাক্স দেওয়া হল—তা লেন্স ও ফ্রেমে ভরা। এই সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে একদিন সকালবেলা দুর্গা বলে যাত্রা করা গেল।

বিকেল নাগাদ দিল্লী শহরে গিয়ে পৌঁছলুম।

গ্রীষ্মকাল। শহর ঝিমিয়ে পড়েছে।

ষাট বছর আগেকার দিল্লীর সঙ্গে আজকের দিল্লীর কোনো তুলনাই হয় না।

তখনও দিল্লীবাসীর মন থেকে বাদশাহী নেশা একেবারে ছুটে যায় নি। তাদের আচারে ব্যবহারে তখনও বাদশাহী ঢঙের প্রাচুর্য আমার চোখে একটু অদ্ভুত ঠেকেছিল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডান দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বাঁ দিকে যে চওড়া রাস্তা একেবারে ফতেপুরী মসজিদের কাছে গিয়ে পড়েছে, তার মোড়েই পাশাপাশি যে দুটো বড় সরাইখানা আছে তারই একটাতে গিয়ে আস্তানা গাড়লাম।

এই সঙ্গে বলে রাখি, এর পরে সেদিন পর্যন্ত কতবার যে দিল্লীতে গিয়েছি তার ঠিকানা নেই। কিন্তু প্রতিবারই দেখেছি, সেই সরাইখানা তখনও রয়েছে।

এখানে চার আনা দৈনিক হিসাবে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে জিনিসপত্তর তো রাখা গেল, কিন্তু ঘরের মধ্যে গরমে টেঁকা দুঃসাধ্য। সরাই-এর প্রাঙ্গণে অনেক দড়ির খাটিয়া পড়েছিল, সেখানে যার ইচ্ছা সেই গিয়ে বসত। আমি দরজায় তালা লাগিয়ে একটা খাটিয়ায় গিয়ে বসে পড়লুম।

আজ ভারতবর্ষে যে কোনো প্রদেশই হোক না কেন, বাঙালীকে দেখলেই 'মার জুতো—মার জুতো' করে। সেদিন কিন্তু বাঙালীর এ অবস্থা ছিল না। তার ওপরে সদ্য ক্ষুদিরামের বোমা ফাটার জন্য বাঙালীর খাতির চারদিকে খুবই বেড়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে বসতেই আমার চারপাশে লোক এসে বসতে লাগল।

—বাবুজীর বাড়ি কোথায়?

—বাংলার অবস্থা কি রকম?

—কি রকম স্বদেশী চলছে?—ইত্যাদি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ ছাড়া বোমার কথা, আমাদের সামাজিক চাল-চলনের কথা অনেক কিছুই আলোচনা হতে লাগল। আমার সামনের খাটিয়ায় সরাইয়ের মালিক এসে বসলেন। তিনি আমায় জানালেন যে আমি তাঁদের সরাইয়ে আসায় তাঁরা বেশ খুশীই হয়েছেন।

কথাবার্তায় বেলা পড়ে এল। গ্রীষ্মকালের বিকেলবেলায় পশ্চিমে গরম অসহ্য হয়ে ওঠে। সরাইয়ের হাতেই হাতপাখা ঘুরতে থাকে।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় কথাবার্তা যখন বেশ জমে উঠেছে এমন সময় একজন পাঠান এসে হাজির। মাথায় কুল্লা পাগড়ি ও পরিধানে শালোয়ার, ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। আমায় সেলাম করলে। আমি সেলাম করে অন্যদের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় সে বললে—বাবুসাহেব, আমাকে মনে আছে তো?

আমি বললুম—কই, চিনতে পারছিনে তো।

লোকটি মৃদু হেসে বললে—আজ চিনতে পারবেন কি করে? নেশা কেটে গিয়েছে যে!

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম—কে তুমি, বল?

লোকটি হেসে বললে—কালরাত্রে আপনি আমার কাছ থেকে শরাব কিনেছিলেন—ভুলে গেছেন?

কথাটা শুনে ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করে

উঠল। আমি হোটেলের মালিককে ডেকে বললুম—এই দেখুন, আমি তো এইমাত্র আপনার সরাইয়ে এসেছি, এ লোকটা কি বলছে শুনুন।

আমার কথা শোনামাত্র আমার চারপাশের লোকেরা হো হো করে হেসে বললে—বহুরূপী হ্যায়—বহুরূপী। লোকটা আপনার কাছে কিছু চাইছে।

আমার তখন রাগ চড়ে গিয়েছে। বললুম—একটি পয়সাও দেব না।

সে লোকটাও ছাড়বে না। শেষকালে সকলের কথামত তাকে এক পয়সা অর্থাৎ এক ডবল দিয়ে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার জো কি? দিল্লী শহর। নতুন আগন্তুকের—বিশেষ করে সে যদি কোনো সরাই কিংবা হোটেলে আশ্রয় নিয়ে থাকে তবে নানা উৎপাতে তার জীবনটি দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। অন্তত তখনকার রীতি এই রকম ছিল।

বহুরূপী চলে গেল। সকলের কাছে কলকাতার ও বোমা ইত্যাদির গল্প করছি এমন সময় পেশোয়াজ পরিহিতা এক তরুণী ঘুঙুর পায়ে ঝমঝম করে এসে আমার সামনে নাচতে ও সেই সঙ্গে গান গাইতে শুরু করল। সারেঙ্গীওলা পেছনেই ছিল। সেও কাঁও-কাঁও করে সংগত শুরু করে দিলে।

আমি অন্যমনস্ক হবার ভান করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলুম কিন্তু পরিত্রাণ কোথায়? চারপাশের লোকেরা বলতে লাগল -আপনার কাছেই এসেছে।

তর্ক করে কোনো লাভ নেই বুঝেও আমি বললুম—একটি পয়সাও আমি দেব না।

শেষকালে চারটি পয়সা দিয়ে তবে রফা হল। চারটি পয়সা অর্থাৎ চার ডবল।

আর এখানে বসা উচিত নয় ভেবে হাত মুখ ধুয়ে দিল্লী শহর দেখতে বেরিয়ে পড়া গেল।

সে সময়ে দিল্লীতে সৈয়দ হায়দার রেজার খুব নামডাক ছিল। তাঁর 'আফ্‌তাব' নামক কাগজে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে খুব কড়া সমালোচনা বের হত এবং বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনের অনুকূলে অনেক কিছুই তিনি লিখতেন। কাজেই সৈয়দ সাহেব পুলিসের চিহ্নিত ব্যক্তি। এই সম্পর্কে দু' একবার হয়তো তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছে। আমি আগ্রায় তাঁর নাম শুনেছিলুম এবং 'আফ্‌তাব' নামক পত্রিকায় তাঁর ঠিকানা জেনে নিয়েছিলুম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আফ্‌তাব আপিসের দিকে রওনা হলুম। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে ঘুরে একটা সরু গলির মধ্যে আফ্‌তাব আপিসে গিয়ে চড়াও হওয়া গেল। সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে সেইখানেই দেখা হল। বেঁটেসেঁটে রোগা মতন লোকটি। বয়স তাঁর তিরিশের মধ্যেই হবে। আমি বাংলা দেশের লোক শুনেই যেন একটু বিশেষ রকমের খাতির করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় আছেন?

সরাইয়ে থাকি শুনে তিনি আঁতকে উঠে বললেন—ছি ছি, ওসব জায়গায় কোনো ভদ্রলোক থাকে?

আমি বললুম—দিল্লীতে আমি কাউকে চিনি না, তাই বাধ্য হয়ে সরাইয়ে উঠতে হয়েছে।

সৈয়দ সাহেব বললেন—আপনার জিনিস-পত্র সব এইখানেই নিয়ে আসুন। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে এইখানেই থাকুন, আমার এখানে জায়গার অভাব নেই।

সৈয়দ সাহেবের পরিজনবর্গ থাকতেন অন্য মহল্লায় তাঁদের নিজেদের বাড়িতে। আর এই বাড়িটা হচ্ছে আপিস-বাড়ি। এখানকার একটা ঘরে একটা লিথোপ্রেস আছে—তাতে সাপ্তাহিক আফ্‌তাব ছাপা হয়। বাকি ঘর-গুলো পড়েই থাকে। তিনি এই ঘরগুলোর মধ্যে একটা ভালো ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার জিনিসপত্র এখুনি নিয়ে আসুন, আমি এখানে বেলা বারোটা অবধি

আছি। আমি থাকতে থাকতে মালপত্র নিয়ে আসুন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বাক্স ও বিছানা নিয়ে ফিরে এলুম। আমার জন্য একটা ঘর খুলে দেওয়া হল। ঘরের সামনে একটু বারান্দা। ঘরের ভেতরে যে নেয়ারের খাটটা ছিল সেটিকে বার করে দিয়ে বারান্দাতেই থাকবার ব্যবস্থা করে নেওয়া গেল।

সৈয়দ সাহেব প্রেসের কয়েকজন লোককে ডেকে বলে দিলেন—ইনি এখানেই থাকবেন। কিসিমত যেন এ'র খিদমত করা হয়।

খাবার সময় সৈয়দ সাহেব হঠাৎ ফিরে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি খাওয়া-দাওয়া কোথায় করছেন?

আমি বললুম—ঐ ফতেপুরী মসজিদের দোকান থেকে মাংস পরোটা কিনে নিয়ে গিয়ে তাই খেয়েছিলুম।

সৈয়দ সাহেব আঁতকে উঠে বললেন—ছি ছি, একাজ আর করবেন না। ওখানকার খাবার খেলে দু' দিনে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আপনি ওখান থেকে খাবার কিনে খান—তাহলে আমার বাড়ির খাবার খেতেও বোধহয় আপনার কোনো আপত্তি হবে না।

বললুম—কিছুমাত্র না।

সৈয়দ সাহেব বললেন—ঠিক আছে। ঠিক সময়ে আপনার জন্য খাবার আসবে। এই বলে তিনি বেরিয়ে চলে গেলেন। বেলা তখন প্রায় ন'টা।

শুধু এ ক্ষেত্রে নয়। আমি আমার জীবনে বহুবার দেখেছি বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে, সংকটপূর্ণ আবহাওয়ায় চারিদিক অন্ধকার হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় মেঘদূয়ার মুক্ত হয়ে নেমে আসে আমার মিত্র, মা কিংবা ভাই। তার প্রশ্রয় হস্ত বিস্তারিত করে আমাকে রক্ষা করে। আজ মনে হচ্ছে দেশে দেশে কে ছড়িয়ে রেখেছে আমার বন্ধুর দল। নেয়ারের খাটে বসে এই সব নানা কথা চিন্তা করছি!

বেলা তখন বেশী হয় নি। কিন্তু তা হলেও দিল্লীর গ্রীষ্মকালে প্রভাতেই মনে হয় দ্বিপ্রহর। একবার উঠে বাইরে যাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু গরমের চোটে ফিরে আসতে হল। বসে আছি। সৈয়দ সাহেব চলে গেছেন অনেকক্ষণ। কিন্তু তখনও খাবারের কোনো চিহ্ন নেই। হঠাৎ চমক দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে একটি লোক বারান্দায় এসে উপস্থিত হল।

লোকটা বেশ লম্বা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে মুখখানা ভরা, মাথায় বাবড়ি চুল, গায়ে একটি সুতীর শেরওয়ানি। তাতে লাল-নীল-সাদা-কালো নানা রঙের কাপড়ের তালি মারা, জামার একটা হাত ছিঁড়ে গিয়ে নিচের দিকে ঝুলছে। লোকটি গটগট করে এসে কোণে একটা মোড়া সতরঞ্চি ছিল ওটাকে পেতে বসে পড়ল।

ছিল। সেটাকে খুলে খান কতক বই বার করে নিয়ে সে তার মধ্য থেকে একটা বই বেছে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলে।

আমি কিছুক্ষণ তাকে দেখে আবার আমার নিজের চিন্তায় মগন হলুম। দুদিন হল এখানে এসেছি এখনও কাজকর্ম কিছুই আরম্ভ করতে পারিনি।

এই সব ভাবছি এমন সময় হঠাৎ সেই লোক চীৎকার করে উঠে উর্দুতে কি সমস্ত বয়েৎ পড়তে আরম্ভ করলে। সেই অতি উচ্চ শ্রেণীর ভাষার একটি বর্ণও আমার বোধগম্য হল না। তবে এটুকু বুঝতে পারলুম—অভিবাদন করছে। অর্থাৎ এতক্ষণ সে আমায় দেখতেই পায়নি, এইবার তার চোখে পড়ায় সে আমায় অভিবাদন করলে।

খানিক বাদে সে বললে—বাবুসাহেবের বাড়ি বাংলা দেশে তো?

আমি বললুম—হ্যাঁ।

সে বললে—কলকাতায় এখন খুব গোলমাল হচ্ছে শুনেছি।

তখন কলকাতায় খুব স্বদেশীর হাঙ্গামা চলছিল। আমি বললুম—হ্যাঁ।

সে বললে—বাবুসাহেব, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আমাদের এই দিল্লীতে এইরকম স্বদেশীর হাঙ্গামা হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি কি সে হাঙ্গামা দেখেছিলেন?

সে বললে—না, আমি আমার ঠাকুর্দা ঠাকুমার কাছে শুনেছি। তখন আমি জন্মেছিলুম বটে কিন্তু সেসব কথা আমার স্মরণে নেই।

কথাগুলো বলেই সে আবার পড়তে শুরু করে দিলে।

সৈয়দ সাহেব খাবার পাঠাবেন বলে গিয়েছিলেন। কিন্তু খাবার পাঠাতে দেরি হচ্ছে দেখে আমি খাটের ওপর শুয়ে পড়লুম।

একটুখানি ঘুমের আমেজ এসেছিল, তাই শুধু হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলুম, সেই ভদ্রলোক আগের মতই হাঁটু গেড়ে দুই হাত আমার দিকে প্রসারিত করে আবার সেইরকম ভাষায় কী সব বলতে আরম্ভ করেছে।

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি ভেবে শুনতে লাগলুম তার সেই দুর্বোধ্য প্রশস্তি। ওরই মধ্যে একবার 'খানা', আরেকবার 'ফরমাইয়ে' শুনে উঠে বসলুম।

দেখি মাথার কাছে একটি প্রিয়দর্শন বালক টিফিন-কেরিয়ারে করে আমার খাবার এনেছে।

ছেলেটি দেখলুম খুবই চটপটে।

আমি বসামাত্রই সে চারপায়ার ওপরেই দস্তরখান বিছিয়ে আমাকে খাবার পরিবেশন করলে। হাতে গড়া রুটি, একটুখানি ডাল, ও দু রকম নিরামিষ তরকারি। অনেক দিন তৃপ্তিবোধ হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করলুম।

সেদিনটা তো এমনি কেটে গেল। সৈয়দ সাহেব সেই যে সকালবেলায় চলে গিয়েছিলেন আর ফেরেন নি।

রাত্রিবেলা যথারীতি খাবার এল।

এবারে রুটি-মাংস।

পরমানন্দে সেই খাদ্য শেষ করে বারান্দাতেই শুয়ে পড়া গেল। ছাপাখানার দু-একজন লোক দেখলুম এসে বারান্দার মেঝেতে শুলো। একবার মনে হল—একটা দিন কোনো কাজ হল না। কাল একবার কাজে বেরুতেই হবে।

পরদিন সকালবেলা আবার সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—খাওয়া-দাওয়া-থাকার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

বললুম—মোটেই না, বরঞ্চ বেশ সুখেই আছি।

একবার ভাবলুম—কাজকর্মের বিষয়ে কোনো সাহায্য করতে পারবেন কিনা একবার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু লজ্জা হল। বিশেষ করে তাঁর অযাচিত সৌজন্যের কথা স্মরণ করে।

সৈয়দ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—মীরসাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

বললুম—দুপুরবেলা যিনি এসেছিলেন, তাঁর নাম কি মীরসাহেব?

সৈয়দ সাহেব বললেন—হ্যাঁ, তিনি। রোজ দুপুর বেলাটা এইখানেই কাটান। চালচলন একটু পাগলাটে ধরনের হলেও তিনি পণ্ডিত লোক। দিল্লী শহরের ইতিহাস তাঁর ভালো করে জানা আছে। আপনার সঙ্গে মিলবে ভালো।

সৈয়দ সাহেবকে বললুম—আজ এখন একটু কাজে বেরুব বলে মনে করছি।

হয়ে কাজে বেরিয়ে যান। ঠিক সময় আপনার খাবার আসবে। কিছু অসুবিধে হলে আমাকে জানাতে তকলুফ করবেন না যেন।

কাজে তো বেরিয়ে পড়া গেল।

এক হাতে ব্যাগ, আর এক হাতে কাঠের একটি সরু বাক্স। তার মধ্যে নানান নমুনার ফ্রেম আছে। শহরের রাস্তায় ঘুরতে লাগলুম। কোথায় যাই, কার কাছে যাই। সারে সারে সব দোকান। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম এমন সময় দোকানদার সামনে এসে বললে, 'আসুন, ভেতরে আসুন।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছিলুম। দোকানদার ডাকামাত্র ঘরে গিয়ে ফরাসে বসে পড়লুম। সে জিজ্ঞেস করলে—কি চাই আপনার?

আমি বললুম—আমার কিছু চাইনে। আমি চশমার ফেরি করি। আপনার চশমার দরকার আছে?

সে বললে—না, না, আমার চোখ খুব ভালো আছে। আমি দিনের বেলাতেও তারা দেখতে পাই।

বললুম—তা হলে তো চোখের অবস্থা খুবই খারাপ দেখতে পাচ্ছি। আপনার চোখটা—চশমা নেন না-নেন—একবার চোখ দুটো পরীক্ষা করব?

সে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাতে ক্ষতি কি?

আমার কাছে চক্ষু পরীক্ষা করবার কার্ড ছিল। তাতে খুব ছোট অক্ষর থেকে বড় অক্ষর পর্যন্ত ছাপা। লোকটি কার্ডখানা হাতে নিয়ে দু-তিনবার ঘাড় বেঁকিয়ে চতুর্থ স্তবক থেকে পড়তে আরম্ভ করলে। বললে—আগের তিনটি স্তবক কিছুই বুঝতে পারছি না।

—একদিন বুঝতে পারবেন। বলে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আপনার কত বয়স হয়েছে?

সে বললে—পঁচাশ হুয়া।

আন্দাজ করে তাকে পড়বার লেন্স দিলুম।

মুখেতে মুখটা ভঙ্গীসহ করে লোকটা বলে উঠল—হাঁ অব সব সাফ দিখতা।

যা হোক, একটু নাড়াচাড়া করে তাকে লেন্স দিলুম। সে বললে—এবার বেশ পরিষ্কার দেখছি।

তাকে বললুম—এবার অর্ডার দাও।

দরকষাকষি ঠিক করে সে অর্ডার দিলে—আট আনা অগ্রিমও দিলে। তাকে রসিদ দিয়ে উৎসাহভরে আমি অন্য শিকারের সন্ধানে চললুম।

ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করেও আর কারুকে বধ করতে পারলুম না। ওদিকে দিল্লীর রোদ চড়বড় করে আকাশের মাঝখানে আসতে আরম্ভ করল, আমিও রণে ভঙ্গ দিয়ে চললুম বাসার দিকে।

দিল্লীতে এসে একদিন মাত্র স্টেশনে ওয়েটিংরুমে ঢুকে স্নান করেছিলুম, এখানে আসবার পর দু'দিন অস্নাত অবস্থায় কেটেছে। তাই মনে করলুম আজ বেশ ভালো করে স্নান করা যাবে। বাসায় ফিরে দেখলুম সৈয়দ সাহেব তখনও রয়েছেন। দু'-এক দিনের মধ্যেই তাঁর কাগজ বেরুবে কাজেই সেই সময়টা তাঁকে একটু ব্যস্ত থাকতে হয়। ওদিকে মীরসাহেব এসে গেছেন। তিনি তাঁর

নির্দিষ্ট আসনে বসে একমনে পড়ছেন।

আমি জিনিসপত্র রেখে, জামা খুলে তোয়ালে সাবান বার করে কলের দিকে আসছি এমন সময় সৈয়দ সাহেব বললেন—কোথায় চললেন?

আমি বললুম—দিন দু'-এক স্নান হয় নি, আজ স্নান করব।

সৈয়দ সাহেব যেন আঁতকে উঠে বললেন—আঁ—বলেন কি! এখন স্নান করবেন? জলের অবস্থা দেখেছেন? কলটা খুলে, একবার হাত দিন তো দেখি!

কল খুলে হাতে জল নিয়ে দেখি, জলের বদলে তরল অনল বেরুচ্ছে। সৈয়দ সাহেব বললেন—আমরা সকালের দিকে জল তুলে রাখি, আর স্নান করি সেই রাত্রি দশটায়।

এই অবধি বলেই তিনি চাকরদের হাঁক-ডাক শুরু করলেন। দু'জন চাকর আসতেই তাদের হুকুম দিলেন—এক্ষুনি দু' ড্রাম জল তুলে স্নানের ঘরে রেখে দাও। বাবুসাহেব দুপুরবেলা স্নান করবেন। রোজ এঁর জন্য তোমরা সকালবেলাতেই জল তুলে রাখবে। ইনি আমার সম্মানিত মেহমান। সর্বদা এঁর খিদমতে হাজির থাকবে, আর যেন বলতে না হয়।

তারপর মীরসাহেবকে ডেকে বললেন—আমার এই মেহমানটির সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে?

মীরসাহেব বললেন—হাঁ হাঁ, হুজুর।

আমার দিকে ফিরে সৈয়দ সাহেব বললেন—দিল্লীর ইতিহাস এঁর চেয়ে ভালো আর কেউই জানে না।

তারপর মীরসাহেবের দিকে ফিরে বললেন—আপনি আমার বন্ধুকে দিল্লী শহরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

মীরসাহেব উৎসাহে একরকম লাফিয়ে উঠে বললেন—জরুর—জরুর। কালই আমার গাড়ি নিয়ে আসব, রোজই আপনাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দিল্লী শহর দেখিয়ে আনব।

সেদিন আরো কিছুক্ষণ গল্প করে সৈয়দ সাহেব উঠে গেলেন। মীরসাহেবের কথার কিন্তু আর শেষ নেই। তিনি দিল্লী শহরের গুণকীর্তন গাইতে লাগলেন—আপনি এমন মেহমান লোক হয়ে কাল আমায় যদি বলতেন তা হলে কাল থেকেই কাজে লেগে যেতাম। কিন্তু যাক, কাল দুপুর থেকে আমরা কাজে বেরোব।

সেদিনটা তো একরকম কাটল। পরের দিন খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়াবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় মীরসাহেব হন্ত-দন্ত হয়ে এসে বললেন—দয়া করে তশরীফ্ তুলুন, আপনার গাড়ি হাজির।

তশরীফ্ তুলে বাইরে দেখি এক অদ্ভুত জিনিস আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সেটাকে গাড়ি বলব না কী বলব—হাসব না কাঁদব, দস্তুরমত বিড়ম্বনায় পড়া গেল। জমি থেকে হাত দেড়েক উঁচু একটা তক্তা, তার নিচে চাকা বসানো। কোনো পুরাকালে একদা সেটি বোধহয় একটা এক্কা ছিল এখন সেটি ফক্কায় দাঁড়িয়েছে। একটি ছাগলের আকৃতি ঘোড়া, দুটো বাঁশ দিয়ে তৈরী কম্পাস, জীর্ণ দড়ি ও জীর্ণ চামড়ায় গেরো বেঁধে বেঁধে তৈরী রাশ—এই হচ্ছে গাড়ির সাজ-সরঞ্জাম। ঘোড়ার কানের কাছে দু' দিকে দুটো ছেঁড়া ধুলধুকোড় ন্যাকড়া ঝুলছে, সেই রকম ন্যাকড়া কম্পাসে ও আরো অনেক জায়গায় এখানে ওখানে সেখানে ঝুলতে দেখলুম। কাছে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে বুঝতে পারলুম, সেগুলো এক সময় রঙিন কাপড়ের টুকরো ছিল এবং গাড়ি ও ঘোড়ার বাহার-স্বরূপে বাঁধা হয়েছিল।

গাড়ির ছত্রী নেই। যে চারটে ডাণ্ডায় ছত্রী লাগানো থাকে তাও নেই। অতএব কী ধরে এ গাড়িতে বসে থাকব আমার কাছে তা একটা সমস্যা হয়ে থাকল।

গাড়ি ও ঘোড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গাড়োয়ানটির চেহারা। এদিকে মীরসাহেব তো 'তশরীফ্ রাখিয়ে' 'তশরীফ্ রাখিয়ে' বলে তাড়া দিতে লাগলেন—তারপর নিজেই কি রকম করে রাস্তা থেকে লাফিয়ে উঠে ধপ করে গাড়িতে বসে পড়লেন। কিন্তু আমি চাকার 'গুলো'তে পা দিয়ে এক হাতে গাড়োয়ানকে, অন্য হাতে মীরসাহেবকে ধরে উঠে তো বসলুম। কিন্তু জায়গা এতো সংকীর্ণ যে তাতে তিনজনের সংকুলান হয় না। তবুও যেখানে বসেছি সেই তক্তাটাকেই দু'হাতে ধরে রইলুম। ভাবলুম—রাস্তার লোকে হাসবে তো হাসুক এখন প্রাণটা বাঁচলে হয়। ওদিকে গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে।

ধীরে সন্তর্পণে মাতালের মতো গাড়ির চাকা একবার এদিকে, একবার ওদিকে হেলে-দুলে এঁকে-বেঁকে করতে করতে চলতে লাগল। চাকা তো চলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আমার অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠল। সেই অল্প পরিসর জায়গায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে থাকবার উপায় নেই। মীরসাহেবের মতন যে পা ঝুলিয়ে বসব তাও ভয়ে পারছি না। ওদিকে মীরসাহেব ক্রমেই ঠেলে ঠেলে আমাকে একেবারে ধারে এনে ফেলেছেন। শেষকালে উবু হয়ে বসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলুম। কিন্তু তিনি মস্তলোক—তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। আমাদের গাড়ি চলতে লাগল চকের ভিতর দিয়ে।

মনে করেছিলুম যে গাড়ি-ঘোড়া ও সওয়ারীদের অবস্থা দেখে রাস্তার লোক হাসাহাসি করবে কিন্তু দেখলুম তারা কেউ ভ্রূক্ষেপই করছে না। দিল্লীর এইসব রাস্তায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে সব হাসি-কান্নার স্রোত বয়ে গিয়েছে, যার নিশ্বাস এখানকার আকাশে-বাতাসে মিশিয়ে আছে, এখানকার পথের ধুলোর রেণুতে যা ছড়িয়ে আছে—দিল্লীবাসী সেদিনের জীর্ণতার মধ্যে পড়ে পড়েও গত দিনের ঐশ্বর্য-সমারোহের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। কোথা দিয়ে একটা ভাঙা গাড়ি গেল কি না গেল তা তারা গ্রাহ্যই করে না। আমাদের অশ্বরাজটিও তাদের ঔদাসীন্যকে উপেক্ষা করে টুকটুক এগিয়ে চলেছে এমন সময় হঠাৎ মীরসাহেব প্রকাণ্ড এক চীৎকার দিলেন—রুক্-ও-ও-ও ও—

ফট্ করে গাড়ি থেমে গেল। মীরসাহেব লাফ দিয়ে পথে নেমে চীৎকার করতে লাগলেন—এই বাড়ি—এই বাড়ি—

সেই দিবা-দ্বিপ্রহরে পথের লোক খুব কমই চলছিল। যা দু' একজন চলছিল তারা মীরসাহেবের অভিনয় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম।

সামনেই একটা বাড়ি। যতদূর মনে পড়ছে মোটা মোটা থামও আছে সে বাড়িতে। রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে। মীরসাহেব বলতে লাগলেন—এই সিঁড়িতেই দিল্লীর বাদশাহী শেষ হয়েছে।

চুপ করে রইলুম। সিঁড়িতে বাদশাহী শেষ হয় কি করে তাই ভাবতে লাগলুম, এমন সময় মীরসাহেব বলে উঠলেন—ভারতবর্ষের শেষ তিনজন রাজপুত্রকে হত্যা করে এই সিঁড়ির উপর ফেলে রাখা হয়েছিল দর্শনীয় বস্তুরূপে।

(সি-৩০০৫/২)

বলতে বলতে মীরসাহেব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে উঠতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন—হারামজাদা মিছিমিছি বিনা দোষে এই রাজপুত্রদের হত্যা করে এইখানে এনে ফেলে রেখেছিল।

তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে আরো অনেক সাংঘাতিক সাংঘাতিক কথা বলতে আরম্ভ করলেন। দিল্লী শহরে দিবা-দ্বিপ্রহরে সেই প্রচণ্ড রোদে তপ্ত পাথরের ওপর দিয়ে লোক-চলাচল তখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মীরসাহেবের হাল চাল দেখে দুটি একটি করে লোক দাঁড়াতে আরম্ভ করলে। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উবে গেছে, আবার মোগল যুগ ফিরে এসেছে। কিন্তু আমি তো কলকাতার লোক—আমি সেকথা ভুলি কি করে। এবং এখানে দাঁড়িয়ে এই সব সাংঘাতিক বিশেষণাবলী শোনায় বিপদ আমারই সর্বাপেক্ষা বেশী। এই ভেবে মীরসাহেবকে একরকম টেনে নিয়ে গাড়িতে চড়িয়ে দিলুম।

গাড়ি মীরসাহেবের নির্দেশক্রমে ঘুরে ঘুরে যে পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সেই পথ দিয়েই ফিরে চলল। কিছুদূর গিয়ে বাগানের সামনেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটা ছোটমত মসজিদ দেখিয়ে তিনি বলতে লাগলেন—এই সোনা মসজিদে দাঁড়িয়ে নাদির শা এই মহল্লার হত্যাকাণ্ড দেখেছিলেন। প্রায় লক্ষ নর-নারী ও শিশু হত্যা হবার পর দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শা মুখে কুটো নিয়ে হাত জোড় করে এসে নাদির শাকে সেই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে অনুরোধ করায় নাদির শার হুকুমে সেই হত্যা বন্ধ হল।

কিন্তু নাদির শা দিল্লী শহরের ছোট বড় সমস্ত 'রইস'-এর ওপর হুকুম জারি করলেন—তাদের ঘরে যত ধনরত্ন আছে সব নিয়ে আসতে হবে। দিল্লীর বাদশাদের সাত-পুরুষ ধরে জমা-করা যে সব ধনরত্ন দিল্লী ও আগ্রার দুর্গে জমা করা ছিল, সেইসব নিয়ে দিল্লীর বাদশার একটি মেয়েকে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নাদির শা দেশে ফিরলেন।

কিন্তু সেসব ধনরাশি তিনি তাঁর দেশে নিয়ে যেতে পারেন নি। পথে শিখ ও জাঠেরা সেসব লুঠতরাজ করে নিলে।

একে সেই প্রচণ্ড রোদ, তার ওপর কেঁপে-কেঁপে উঠে বলতে থাকা মীরসাহেবের মুখে এই সব বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আমার চাঁদি গরম হয়ে উঠতে লাগল। আমি আর বেশীক্ষণ সহ্য করতে না পেরে বললুম—এবার চলুন যাওয়া যাক, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।

আমার কথা শুনে তাঁর সংবিৎ ফিরে এল। তিনি গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন—ফিরে চল।

বাসায় ফিরে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগলুম। মীরসাহেব কি সব বকে যাচ্ছিলেন—সেদিকে কান দেবার মত সামর্থ্য আর খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আমি সোজা লুটিয়ে পড়লুম।

আমাকে শুয়ে পড়তে দেখে তিনি বললেন আচ্ছা, আপনি আরাম করুন, আমি কাল দুপুরটায় গাড়ি নিয়ে আসব।

মীরসাহেব তো আমাকে আরাম করতে বলে চলে গেলেন—কিন্তু আমার মনে হতে লাগল, বুঝি সর্দিগর্মি হয়েছে। মাথার মধ্যে কী রকম যেন করতে লাগল। মনে হতে লাগল যে, দিল্লী শহরের অতীত ইতিহাসের সমস্ত ভার আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে। [illegible] এই অবস্থা, [illegible] পারলুম না, কারণ মীরসাহেব বলে গেছেন—কাল দুপুরের সময় আবার গাড়ি নিয়ে আসবেন। সময় বুঝে একটু পালাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হত, কিন্তু শরীরের এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, ওঠবার মতন অবস্থা আর রইল না। বোধ হয় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম।

সন্ধ্যেবেলা জেগে উঠে ঠান্ডাজলে স্নান করে কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হতে লাগল। হোটেলের দু-একজন লোক এসে আমার কাছে [illegible] দেখে—যদিও তারা ঘুমিয়ে ছিল—আমার একটু ভরসা হল। অনেকক্ষণ বসে আমার খাবারটুকু খেয়ে—আবার লম্বা হওয়া গেল।

পরের দিন বেলা দ্বিপ্রহরে মীরসাহেব ঠিক এসে হাজির। গোলাপী নেশায় মজে একটু ঘুম এসেছিল, কিন্তু মীরসাহেবের ডাকার চোটে 'তশরীফ' ওঠাতেই হল। বাইরে গিয়ে দেখি—মীরসাহেবের গাড়ির ভোল-নলচে দুই-ই বদলানো হয়েছে।

সেই ছোট্ট পাটাতনটুকুর চারপাশে চারটি রঙিন দণ্ড লাগানো হয়েছে, তার ওপরে সাদা ধপধপে ছত্রী। মেয়ে সওয়ারির জন্য তিন দিকে তিনটি পর্দাও ঝুলেছে।

সব থেকে মজা লাগল, সেই বাহাদুর ঘোড়ার দুই চোখের মধ্যিখান থেকে প্রায় নাসারন্ধ্র অবধি লম্বিত একটি সোনার কদমফুল দেখে। বেশ বোঝা গেল, অনেক দিন পর নতুন অলংকার পেয়ে ঘোড়াটিও গর্বিত বোধ করছে। গতকাল আমার এখান থেকে বিদায় নিয়ে বোধহয় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে মীরসাহেব আমার আরামের জন্য তাঁর সেই গাড়ির এই সংস্কারসাধন করেছেন।

মীরসাহেব [illegible] সাহেবের মতন অবস্থাপন্ন লোক নন, সে কথা বেশ বুঝতে পারা যেত; কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যে পয়সা খরচ করে তিনি আমার জন্য যে গাড়ির এই সংস্কারসাধন করলেন—এতে তাঁর জন্য আমার দুঃখ হতে লাগল। কিন্তু দুঃখ হলেও, কি জানি তাঁকে আমার পরম বন্ধু বলে মনে হল। আমি সারা জীবন ধরে এই ভাবে স্বল্প-পরিচিত নর-নারীর কাছ থেকে কত যে সাহায্য পেয়েছি তার আর অন্ত নেই। মীরসাহেবকে ভালো করে না চিনলেও, তাঁর ভাষা ভালো বুঝতে না পারলেও আমার অন্তর তাঁকে বন্ধু বলেই স্বীকার করে নিল।

যাই হোক, [illegible] একটা ডাণ্ডা বাগিয়ে [illegible] মীরসাহেবের নির্দেশে কোচোয়ান গাড়ি চালাতে লাগল।

এ গলি, সে গলি, এ পথ, ও পথ দিয়ে [illegible] প্রায় সমস্ত দিল্লী শহরটা ঘুরিয়ে [illegible] বেড়ালুম। মীরসাহেব দেখাতে লাগলেন—এই পথ দিয়ে বন্দী দারাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এইসব রাস্তা দিয়ে তাঁর মুণ্ডহীন দেহ হাতিতে করে ঘুরিয়ে বেড়ানো হয়েছিল—এই রকম কত কথা। এইখানে অমুক 'রইস'-এর বাড়ি ছিল, এটার ওদিকে ওমরাহের অমুক অনুগৃহীতা থাকতেন—ইত্যাদি কত লোকের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত কাহিনী তিনি গড় গড় করে বলে যেতে লাগলেন। সেসব শুনতে শুনতে এমন সব ছবি প্রত্যক্ষবৎ আমার সামনে ভেসে উঠতে লাগল যে, তার সত্যাসত্য নির্ধারণ করবার ইচ্ছাও আমার মনে উদয় হল না। তিনি যা বলতে লাগলেন তাই সত্য বলে বিশ্বাস করলুম। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সন্ধ্যেবেলা বাসায় ফিরে এলুম।

ক্রমশ

চিত্র প্রদর্শনী

দৈনন্দিন শিক্ষাদান কাজের মধ্যে অধ্যাপকবর্গের অবসরযাপন ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য সম্প্রতি নিজস্ব অতিথি ভবনে যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একটি ফ্যাকাল্‌টি ক্লাবের উদ্বোধন করেন ও

নারী (১) —যামিনী রায়

সেই উপলক্ষে স্বনামখ্যাত শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের প্রথম জীবনে আঁকা কয়েকটি ছবি ও সেই সঙ্গে বাংলা দেশের পুরান লোক-চিত্রের কয়েকটি নমুনা পেশ করেন। ছবির সংখ্যা অতি অল্প, সুতরাং এটিকে প্রদর্শনী বলা হয়ত সঙ্গত হবে না। তবে ক্লাবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে খ্যাতনামা শিল্পী রচিত কয়েকটি ছবি দেখবার সুযোগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন, এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

মাত্র কয়েকটি ছবি দেখে কোনও শিল্পী, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় যামিনী রায়ের মত শিল্পীর রচনাধারার ব্যাখ্যা করা চলে না। সুদীর্ঘ ও কর্মবহুল জীবনে তিনি বহু ছবি এঁকেছেন ও তাঁর চিত্রসম্ভার বিশাল সমুদ্রের মতই গভীর ও ব্যাপক—সুতরাং সে চেষ্টা করব না। তবে প্রথম জীবনে আঁকা ছবির মধ্য দিয়ে শিল্পীর মানস ও ভবিষ্যৎ চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এখানে সাধ্যমত ও সংক্ষেপে সেটুকুই বোঝাবার চেষ্টা করব।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথম দিকে শিল্পী কলিকাতায় আসেন ও সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষালাভ করেন। পরে তেলরঙ মাধ্যমে প্রতিকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি এঁকে সুনাম অর্জন করেন। তা হলেও বিদেশী অংকনপদ্ধতি ও মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর শিল্পী-চিত্ত যেন তৃপ্ত হয়নি। নূতন মাধ্যম ও নূতনতর রচনাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে মনের ভাব ও ভাষাটুকু প্রকাশ করার জন্য তাঁর চিত্ত অস্থির হয়ে ওঠে। বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে তাঁর জন্ম, বাঁকুড়ার পটুয়া ও পটশিল্পী বিশেষ করে কালীঘাটের পুরান পট দেখে তিনি যেন নূতন পথের সন্ধান পান। সম্ভবত দ্বিতীয় শতকের মধ্য-ভাগ থেকেই শিল্পী এই নূতন পথ ও ধারার মাধ্যমে নানা পরীক্ষা শুরু করেন, যদিও দেশের পুরাতন, বিশেষ করে অজন্তার প্রাচীরচিত্র থেকে তখনও তিনি উৎপ্রেরণা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হননি। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৩৩ সালে মিউজিয়াম ভবনে অনুষ্ঠিত বর্তমান আ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনীতে 'ভিক্ষা' শীর্ষক তাঁর যে ছবিখানি সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে সেটিও ছিল অজন্তার অনুপ্রেরণায় আঁকা। কালীঘাট পট তথা বাজার চিত্রের রেখা-ভিত্তিক সরলতা দেখে শিল্পী যেন নূতন জগতের সন্ধান পান এবং অজ্ঞাতনামা

রেনি ডে —অরুণ সরকার

নারী (২) —যামিনী রায়

শিল্পীদের আঁকা ছবির মধ্যেই তিনি বিরাট সম্ভাবনার বীজ দেখতে পান। বাংলা দেশের ছোট গ্রাম, তার পরিচিত ছোট কুটীর, বাংলা দেশের সরল ও নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরী ও লাজনম্র ষোড়শী শ্যামলা বধূ ও তার কোলে নধর নিটোল ছোট শিশু—এসবের মধ্যেই শিল্পী যেন তাঁর ঈপ্সিত বিষয়বস্তুর সন্ধান পেলেন। কালীঘাটের পট তথা বাজারচিত্রেও রেখাবাহুল্য ছিল, কিন্তু সে রেখায় কেবল বহিরবয়বের রূপই ফুটে উঠত, প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যেত না; সমকালীন সমাজের বিভিন্ন স্তরের ইতিহাসের সন্ধানই তার মধ্যে পাওয়া যেত—এক কথায় পট ছিল ইতিহাসধর্মী। কিন্তু যামিনী রায় সেই রেখাকেই দিলেন চেতনা ও অনুভূতি। ছোট ও বড়, সরু ও মোটা বক্র ও অর্ধবক্রাকার রেখার মধ্যে তিনি সৃষ্টি করলেন সুমধুর কাব্যের গতি, লালিত্য ও ঝংকার। ফলে তাঁর পরবর্তী কালের রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল অনাদৃত ও অবহেলিত বাংলারই এক নূতন রূপ ও আলেখ্য। শুধু তাই নয়, বিদেশী মাধ্যম বর্জন করে শিল্পী নানা দেশীয় রঙও ব্যবহার করতে শুরু করেন। খড়ি দ্বারা পৃষ্ঠভূমি তৈরি করে অনেক সময়ে তিনি গোময় লেপন করে তার ওপর দেশীয়

রঙে ছবি এঁকেছেন। তাই শ্রেষ্ঠ সমকালীন ভারতীয় শিল্পী হলেও যামিনী রায় মুখ্যত বাঙালী ও বাংলারই শিল্পী। আর তাই তাঁর ছবিতে বাংলা দেশের গ্রাম ও বাংলা দেশের শাড়ি-পরিহিত কিশোরী ও যুবতীর পরিচয় পাই। বাস্তবিকই, পরবর্তীকালে যামিনী রায় এ দেশের বহু শিল্পীকেই অনুপ্রাণিত করেন এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যাঁরা তাঁর কাছে ঋণী তাঁদের মধ্যে শিল্পী জর্জ কীট ও শ্রীরামমুন্দর নাম উল্লেখযোগ্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কয়টি ছবি পেশ করেছিলেন তার মধ্যে শিল্পীর প্রথম জীবনের ক্রমপরিবর্তনশীল চিন্তা ও অংকনধারার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশী প্রথায় রচিত ছোট প্রাকৃতিক দৃশ্য অপরাপর ছবি দেখলেই এই পরিবর্তন চোখে পড়ে। দুটি নারীর ছবির মধ্যে প্রথমটিতে পটপ্রাধান্য দেখা গেলেও দ্বিতীয়টির মধ্য দিয়ে সাবলীল রেখাছন্দ ও শিল্পীর স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই বলেছি যে সরল ও সাবলীল রেখার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাই শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য এবং সেই হিসাবে হাতী ও ষাঁড়ের ছবি দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যবন হরিদাস ও

কীর্তন সম্প্রদায় এবং কৃষ্ণ বলরাম ছবি দুখানি আড়াআড়িভাবে রচিত এবং অঙ্কন-রীতি, বিশেষভাবে গতিশীল ও বলিষ্ঠ রেখা-সৌষ্ঠব দেখে শিল্পীর সচেতন ও পরিণত মানসের পরিচয় পাই। দুটি ছবির মধ্যে প্রথমটি পুরাতন ও অনেক স্থলেই বিবর্ণ হয়ে গেছে—তাহলেও দুটিই শিল্পীর স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। সুকবি সুধীন দত্তর ব্যক্তিগত সংগ্রহসম্ভার থেকে শিল্পীর ছবি কয়টি সকলকে দেখবার সুযোগ দান করে শ্রীসৌরীন দত্ত কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। স্কুল জাতীয় দীর্ঘ পট গণেশজননী ও যাদুপটের নিদর্শন শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত, সেজন্য তিনিও ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন। এ জাতীয় পুরাতন পট সাধারণত চোখে পড়ে না। দশভুজা ও জননীরূপী শ্রীদুর্গার কাহিনী অবলম্বনে রচিত স্কুল ও বাঁকুড়ার একদাখ্যাত যাদুপটের নমুনা দেখে বাংলার পুরাতন লোকশিল্পী ও লোকচিত্রের জনপ্রিয়তার কথাই মনে জাগে এবং সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয় যে, লুপ্তপ্রায় এহেন জাতীয় সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই ও আশা করি ফ্যাকালটি ক্লাবের স্থায়ী শোভা বর্ধনের জন্য তাঁরা অবশ্যই কয়েকটি সমকালীন চিত্রকলার নিদর্শন সংগ্রহ করে চিত্রকলা তথা শিল্পীদের প্রতি যথার্থ অনুরাগ প্রকাশ করবেন।

শিল্পী ধর্মনারায়ণ ও লালু শা এক স্থানে, অর্থাৎ আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেও তাঁদের কাজ ভিন্নধর্মী। ধর্মনারায়ণ মোট ১২ খানি নিদর্শন পেশ করেন। চিন্তাধারা ও রচনারীতি দেখে শিল্পীর দুটি রূপ চোখে পড়ে। এক শ্রেণীর রচনার মধ্য দিয়ে যেন আতঙ্কই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

ফ্যান্টাসি—২ **—ধর্মনারায়ণ**

শিল্পী নানাভাবে ছয়টি মুণ্ড এঁকেছেন এবং কি জন্তু বা কি মানুষ, অধিকাংশের মধ্য দিয়েই একটি ভীষণ বা হিংস্র রূপ প্রচ্ছন্ন-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যতদূর মনে হয় আধুনিক সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী ইচ্ছাকৃতভাবেই ভয়াবহ রূপ দেখাবার চেষ্টা করেছেন এবং কয়েক স্থলে সফল হয়েছেন। লাল রঙবিন্দু দ্বারা চোখের দুটি তারা এঁকে 'হেড—এ ডিকটেটর'-এই শিল্পী একচ্ছত্র নায়কের নিষ্ঠুর চরিত্রটি রূপায়িত করেছেন! 'হেড—এ টৌরবুল্'-ও এ হিসাবে সার্থক রচনা। অন্য শ্রেণীর রচনায় রঙবিন্যাসই প্রধান ও তার মধ্য দিয়ে শিল্পীর অনুভূতিশীল মনের পরিচয় পাই। মনে হয় শিল্পী বুঝি খেলাচ্ছলে নানা মুখর রঙ ইচ্ছামত ঢেলে দিয়েছেন ও তার মধ্য থেকে সুকৌশলে সৃষ্টি করেছেন নানা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মূর্তি; যেমন নীল রঙে তৈরী ৯নং ফ্যান্টাসি ও নীল ও হলুদে রঙের সুন্দর সংস্থাপনায় রচিত ১০নং ফ্যান্টাসি। তবে প্রত্যেক রচনা রসোত্তীর্ণ হয়নি, তার কারণ এ-হেন কাজের প্রয়োগপদ্ধতি স্বভাবতই সীমাবদ্ধ।

শিল্পী লালু শা রেখাধর্মী, অর্থাৎ প্রধানত রঙীন রেখা ও প্রতীক অবলম্বন করেই তিনি নানা আকারের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রচনারীতি মিশ্র, অর্থাৎ বিমূর্ত, প্রায় বিমূর্ত ও সুররিয়ালিস্টিক। এই শিল্পী মোট ১৩ খানি নিদর্শন পেশ করেন, তার মধ্যে রেখা ও প্রতীকের সুচিন্তিত সংস্থাপনের জন্য 'সিম্বল' ছবিখানি সকলের চোখে পড়ে। রেখার ওপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার ফলে শিল্পী রেখা ও শূন্যস্থানের সমন্বয় সব স্থলে করতে পারেন নি—তাই কয়েকটি ছবি দেখে পুনরুক্তি বলে মনে হয়। তাহলেও ৮নং পেন্টিং, ৬নং পেন্টিং এবং 'অ্যাডজয়নিং ফর্মস' বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্টস ইউনিয়নের উদ্যোগে শিল্পী অরুণ সরকারের প্রদর্শনীর আয়োজন হয় মোনা লিসা গ্যালারীতে। স্কেচ ও গ্রাফিক সহ শিল্পী মোট ১৮ খানি নিদর্শন পেশ করেন।

শিল্পী তরুণ—সম্প্রতি ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। এ প্রদর্শনী তাঁর প্রথম প্রয়াস। বিভিন্ন কাজ ও রচনা-কুশলতা দেখে মনে হয় গ্রাফিকের মধ্য দিয়ে তিনি যথাযথভাবে বক্তব্যটুকু প্রকাশ করতে পারেন। বিশেষ করে উডকাট ও লিনোকাটের কয়েকটি নিদর্শন দেখে শিল্পীর চিন্তাধারা ও সূক্ষ্ম কারুকার্যকুশলতার পরিচয় পাই—যেমন স্ট্রাগল ও রেনি ডে। শেষোক্তটিতে বর্ষাকালের জলপ্লাবিত শহরের একাংশের রূপটুকু শিল্পী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পীর আঁকা স্কেচ-গুলির মধ্যে একমাত্র রিক্সওয়ালা ছাড়া কোনটি উল্লেখযোগ্য নয়।

চিত্রপ্রিয়

পেন্টিং—৬ **—লালু শা**

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে!

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি দ্বিগুণেরও বেশী সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীগগির শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা রোধ ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুসী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • বাতের বেদনা • জ্বর-জ্বর-ভাব • ফ্লু ডেঙ্গু জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার যত বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে দ্রুত এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়!

থেকে, সফরের একদিন আগে টোকিওতে এসে জড় হয়। রাত্রি জেগে টোকিওর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে তাদের কর্মসূচী তৈরি করে। আপাতত পুলিস বলছে যে মারপিটের জন্য লাঠিসোঁটা যোগাড় করার অন্যতম উদ্দেশ্য। খবরে বলা হয়েছে যে দলের ছেলেরাই সংখ্যায় বেশী। কারণ, কম্যুনিস্ট গ্রুপের ছেলেরা নাকি বড় বেশী বাইরের আন্দোলনের জন্য মাথা ঘামাচ্ছে না। তারা নিজেরা আপাতত নিজেদের খুঁটি মজবুত করতেই ব্যস্ত। সে যাই হোক, এই বিক্ষোভের পেছনে তথাকথিত সরকার-বিরোধী ছাত্র-প্রতিষ্ঠানই জড়িত ছিল। সব থেকে লক্ষ করবার বিষয়, এই বিক্ষোভে নাকি এই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকারী ছাত্র সংখ্যাই বেশী। যদিও এদের মতবাদের বা চেতনাবোধের মূলে খুব সবল নয়, তবুও আমার চোখে আজকের জাপানের নতুন উঠতি সম্প্রদায়ের ভিতর একটা নতুন ধরনের জাতীয় চেতনাবোধ লক্ষ করছি। এই কাঁচা একরোখা চেতনাবোধের লাভ ক্ষতি সম্বন্ধেই আজকে জাপানের শাসকবর্গ বেশী পরিমাণ সচেতন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয় কাটিয়ে, যা উপলব্ধি করে যে সম্প্রদায় আজ একটা স্থায়ী স্থিতিশীলতায় এসে পৌঁছেছে, শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রাকে তুলে ধরতে পেরেছে সেখানে সূক্ষ্ম কয়েকটা অনুভূতির মূল্য দিতে আবার কি সব ছারখার করে দেবে? কিন্তু ইতিহাসকে কেউ কি রুখতে পারে?

একটা ছেলের মৃত্যু ঘটনাটাকে আরও জটিল করে তুলেছে। ছেলেটিও এ বছরের নতুন বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। যদিও খবরে প্রকাশ, যখন ছেলেরা পুলিসের গাড়িগুলো কেড়ে পুলিসের দিকেই চালনা করছিল, তখনই চাকার নীচে পড়ে মৃত্যু হয় এই ছেলেটির। মৃত্যু মৃত্যু। সেখানে কারণ একটা নিমিত্ত মাত্র। এই ঘটনাই মনে করিয়ে দিল ১৯৫২ সালে "Blood May Day"তে Hosei Universityর এক ছাত্রের মৃত্যু। আর শেষবার হয়েছিল ১৯৬০ সালে Japan—US Security treatyর প্রতিবাদে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার জাপান সফর স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন সেদিনের এমনই এক মৃত্যুতে।

আজকের পূর্ব-এশিয়ার দিকে চোখ তুলে তাকালে ছাত্র-বিক্ষোভের যে দৃশ্য চোখে পড়বে তাকে ভয় পাবে না এমন শাসকবর্গ বোধ করি এই দশকে নেই। আজকের জাপানের ছাত্র আন্দোলনের পেছনে যে চিন্তাধারাই থাক না কেন, একে সমূলে বিনাশ করে সমস্ত ছাত্র সমাজের ভিতর একটা সুষ্ঠ নিয়মানুবর্তিতা (discipline) প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টার অন্ত নেই। সেটা গোড়ার প্রথম থেকে শুরু হওয়াই বাঞ্ছনীয় যদি শাসকবর্গ নিজেদের উপর কঠিন আস্থা রেখে বলতে পারেন বা বোঝাতে পারেন যে, আজকের জাপানের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের আন্দোলনের ফল মোটেই শুভ নয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট (আমাদের দেশে যেমন ভাইস-চ্যান্সেলর) এই প্রথম খোলাখুলিভাবে এই ধরনের ছাত্র বিক্ষোভের তীব্র নিন্দা করলেন। এ ছাড়া এখানের আরও চারটি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা একই ভাষায় এই বিক্ষোভের সমালোচনা করেছেন। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কোন ছাত্রের কার্যকলাপের উপরই শুধু নজর রাখা হত; এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও ছাত্রদের কার্যকলাপের উপরও নজর রাখা হবে এবং সেই সব কার্যকলাপকে ভিত্তি করে যে-কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এমন কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কথা উঠেছে প্রয়োজনে এর জন্য হয়ত নতুন আইন তৈরী হবে। এ ধরনের একটা সন্দেহ অবশ্য এখানের কর্মকর্তারা কিছুদিন আগেই পেয়েছিলেন। গত কয়েক বছর আগে পর্যন্তও বহু ছাত্রকে সুযোগ দেওয়া হত লাল-চীন ঘুরে আসবার জন্য। সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। শেষের দিকে লালচীনে দেখা দিল সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। কে না চায় ক্ষমতা! অতএব কোন একটা কিছু সামনে রেখে যদি ছোটদের দল বা ছাত্র-সমাজও নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে শুরু করে এবং সেটা উপর মহল, যেমন পাড়ায় কিছু কিছু 'দাদা'র দল, এক্ষেত্রে দেশের শাসকবর্গ সমীহ করে এবং বাহবা দেয়, তখন তো মেতে উঠবেই। পুরাতন কোনদিনই নতুনের আধিপত্য সহ্য করতে পারে না। যদি করে, সেটা অনেকটা উপায়হীন বলেই ধরে নিতে হবে। চীনের আজকের শাসকবর্গকে ঘিরে যখন teen-aged-এর দল উল্লাস করছে—সে দেখে অনেক সময় মনে হয় যেন 'নিরুপায়-দাদা'র দল কষ্টে হাসি হেসে স্বাগত জানাচ্ছে। তা না করলে এই বিক্ষোভের ভয়ঙ্কর

বিভীষিকা বাবুমেনুং হয়ে তাদের কাছেই ফিরে আসবে। লাল-চীন থেকে প্রত্যাগত জাপানী ছাত্রদলকে দেখা যাচ্ছে—তারা যেন "মস্তিষ্কে পরিশোধিত" বা (Brain-Washed) হয়ে আসছে। এসেই প্রথম শুরু করছে সরকার বিরোধী কার্যকলাপ। হাতে একটা মাও-সে তুং-এর বই। অবশ্যই ভাববার কথা। সেই থেকে লাল-চীনে ছাত্রদের বেড়াতে যাওয়া আইন করে করা হল নিষিদ্ধ। গত বছর প্রায় ৫০০ ছেলে লাল চীনে যাবার অনুমতির জন্য আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু জাপান সরকার সরাসরি নিষেধ করেছেন।

প্রত্যেকটি দৈনিক সংবাদপত্র যথাসম্ভব সংযতভাবে এই ধরনের বিক্ষোভের নিন্দা করেছেন। একজন ছাত্র কোন কাগজে একটা চিঠি লিখেছে। তার মূল বক্তব্য বিষয় হচ্ছে: "...যে শান্তির জন্য ছাত্র-সমাজ এত বড় একটা দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়েছিল—তাদের কার্যকলাপে কি এইটা প্রমাণিত হল, তারা সত্যই শান্তিকামী?..."। ভবিষ্যৎ ছাত্র-মিছিলের সরকারীভাবে অনুমোদন দরকার হবে—এবং সে আইন আরও কড়াকড়িভাবে পালন করা হবে। Zengakuren একে দলগতভাবে [illegible] করবার জন্য সরকারী ভাবে কোটা সব ঘোষণা করা হয়েছে। প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক জনমতকে বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। এই ধরনের সরকারী কার্যকলাপকে জনসাধারণের সমান নানান যুক্তি দিয়ে দেখানো হচ্ছে, আইনের দিক থেকে যাতে কোন ফাঁক না থাকে, কোন ভুল বোঝাবুঝি যেন না হয়। কারণ, এই ধরনের বিক্ষোভ জন-চেতনা দেশের মধ্যে অঙ্কুরেই নষ্ট হবার আগেই যাতে সমূলে বিনাশ সাধন হয় তার চেষ্টা চলছে। সেদিনকার বিক্ষোভকারীদের কারণ স্বরূপ দেখানো হয়েছে যে, ছাত্ররা গাড়ি জোর করে দখল করেছে, কাছাকাছি পেট্রোলের দোকান থেকে জোর করে বিনা পয়সায় পেট্রোল নিয়েছে, গাড়িতে আগুন দিয়েছে সব শেষে একটি ছেলের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। সুস্থ চেতনাবোধে সবগুলিই অন্যায়। আজকের শাসকবর্গ এমন কোন সংযত বিধিনিষেধ প্রয়োগ করতে দ্বিধা করছেন না যাতে করে এই ধরনের বিক্ষোভের মূল ধ্বংস করা সম্ভব হবে। অপর দিকে এখানের সরকার-বিরোধী সব থেকে বড় দল জানিয়েছে যে, যদিও তাদের প্রধানমন্ত্রীর সফর সম্বন্ধে নানান মতবিরোধ আছে, কিন্তু সেই কারণে তাঁরা কোনভাবেই এই ধরনের ধ্বংসাত্মক ছাত্র বিক্ষোভকে সমর্থন করেন না। এইসব শুনিয়ে ছাত্র বিক্ষোভের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন যুক্তি খাড়া করা অবশ্যই আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি যে, ছাত্রাবস্থায় চিন্তাশক্তির প্রখরতায় সবিশেষ আস্থাশীল হয়ে পরিচালকবর্গের বিরোধ-সূচক, নিজেদের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে, যে-কোন কার্যকলাপে বেশী উৎসাহ পেতাম। মনে পড়ে আমাদের সময় প্রথম শুরু হয় প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ায় হল থেকে বার হয়ে আসা। ১৯৫৪ সালে স্কুল ফাইনাল-এ ইতিহাসের পরীক্ষা দিয়ে যখন মন-মরা হয়েছিলাম তখন সন্ধ্যায় রেডিওতে শুনলাম —"পরীক্ষা বাতিল"। খুশী হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। কিন্তু কয়েক মাস আগে দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়ির রাস্তার দিকের জানলার কাঁচগুলোর যে অবস্থা দেখলাম এবং লোকমুখে যা শুনলাম তাতে নিজেকে দোষী মনে করে সান্ত্বনা পাওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করার আছে। অবশ্য জাপানের ছেলেরা এসব ব্যাপারে অতটা সাবলম্বী হয়নি। এখনও পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন এ ধরনের কোন উত্তর উপর বিক্ষোভ করবার মত মানসিক প্রবণতা এখনও আসেনি। কিন্তু আসতে কতক্ষণ?

এই বিক্ষোভ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এখানের কোন এক শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, ছাত্রসমাজ এমনই এক সম্প্রদায় যাদের দাবিকে উপেক্ষা করে এগোবার উপায় নেই, হয়ত উচিতও নয়। অপর অন্য দিকে এমনই একটা বয়স যেখানে সম্পূর্ণরূপে মানসিক পরিচ্ছন্নতা আসতে পারে না। সেদিন আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইজেনহাওয়ার তাঁর জন্মদিনের ভাষণে তার দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছেন, "...আমাদের সময়ে দেশের চরম দুঃসময়ে আমরা আমাদের নিজস্ব মতামতটা বড় বেশী প্রকাশ করতাম না...বড়দের ভাবনাগুলো সবকটিই দেশ নেতাদের উপরই ছেড়ে দিতাম। তাতে আশু ফল যাই হোক না কেন; ভবিষ্যতে সুফলই পাওয়া গেছে।..." হয়ত এমনই একটা মতবাদ আজকের জাপানের শাসকবর্গের মনে উদয় হয়েছে। উদ্দেশ্য শুভ। কারণ আজকে জাপানের শাসকবর্গ বাস্তবতার দিক থেকে সে দাবি করতে পারেন। আমি এমন দু-একজন বৃদ্ধ উগ্র পুরাকালের গোঁড়া জাতীয়তাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিকে জানি যাঁরা প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অনেকেরই সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছি। তাঁরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, আজকের জাপান জীবনধারার মান নির্ণয়ের দিক থেকে এবং সুখসুবিধার দিক থেকে আগের চাইতে অনেক সুখী এবং স্বাচ্ছন্দ ভোগ করছে। চমক লাগাবার মতন আজ জাপানের যাবতীয় সব কিছুই নতুন করে ঢেলে সাজানো। পুরনো যা কিছু আছে তাতে অবশ্যই একটা পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধতা আছে, যদিও সেটা কম কিছু নয়, তবুও ধাঁধা লাগার মতনও কিছু নয়। সমস্ত পৃথিবীর চোখে বাহবা পাবার মতন যা কিছু আজকের জাপানের তা সবই নতুন এবং তা বর্তমান শাসকবর্গের হাতেরই তৈরী। হয়ত তার ভিতর একটু রাজনৈতিক বদবদল আছে কিন্তু নীতিগত দিক থেকে মূলগত বৈশিষ্ট্যে কোন পার্থক্য নেই। ভিত্তি একই। যদিও আজকের বিক্ষোভ প্রমাণ করেছে অন্তত কিছু সম্প্রদায় ভিয়েতনামের এই যুদ্ধে আমেরিকার নীতির বিরোধে জাপানের দক্ষিণ ভিয়েতনামে রপ্তানি করে বাৎসরিক দু শ মিলিয়ন ডলারের লাভের অংশীদারও তারা হতে চায় না। কিন্তু আর একদিকে শাসকবর্গ বুকে হাত রেখে বলতে পারেন "আমাদের বিশ্বাস কর, আমাদের উপর আস্থা রাখ। পেছনে ফিরিয়ে দেখ তোমার সুখ তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছে; তোমার সন্তানই হবে তার অংশীদার।"

সব দেশের শাসকবর্গ কি তা বলতে পারে? না পারে না। পারে তারাই যাদের পেছনে তাকানো নিয়ে লজ্জার কিছু নেই; যাদেরকে বিশ্বাস করে টিকেছে আজকের সন্তানদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। বিক্ষোভ দেখা হইল সেই সব দেশের শাসকবর্গের জন্য; যাদের আর অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হবে সেই সব দেশবাসীকে। সেখানে আজকের জাপানের খুব একটা ভয় পাবার কিছু নেই।

বিকাশ বিশ্বাস

পাবো তারে

কালকূট

একান্ন

উতিমধ্যে বরহমশরতের দল কখন দাঁড়িয়ে পড়েছে খেয়াল করিনি। দেখি, ওদের পুরুষেরা একদিকে, মেয়েরা আর একদিকে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে না, ওদের দোলানি শুরু হয়ে গিয়েছে। উভয় পক্ষ সারি সারি। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মলুটির, মৌলীক্ষার মাঠের ছবি। এখানে, এই বাঁশঝাড়ে তার আর এক রূপ। এখানে আগে থেকে কোন আয়োজন ছিল না। কোন বিশেষ উৎসবের অনুষ্ঠান নেই।

এখানে মেয়েদের গলায় গলায় গান বেজে ওঠে প্রাণের আপন ধ্বনিতে। পায়ে পায়ে নাচ লেগে যায়, প্রাণের দোলাতে। উৎসবের হেতু খোঁজায় নেই কেউ। এ আঙিনায় উৎসবের প্রাণ আপনি এসে ধরা দেয়। এমন দিনে যাদের আসর জমে ওঠার কথা ছাতিম তলার মেলার আঙিনায়, আজ তারা সেখান থেকে দূরে। তাদের কয়েকজনের উৎসব লেগে যায় বিনা আয়োজনে। এখানে দূরে ছড়ানো মাঠ নেই, বাঁশঝাড়ের ঘের। শুণ্ডি বুড়ো উসকে দেয় কাঠ-কুটোর আগুন। টিমটিমে লণ্ঠন আর লম্ফর লাল আলো। সেই আলোতে মানুষ কাঁপে, ছায়া কাঁপে। বাঁশঝাড়ের ঝুপসি ঝুপসি কালোয় আগুনের আলোর ছিটায়, সকলই যেন কোন দূর কালে টেনে নিয়ে যায়।

ওদের গানের ভাষা বুঝি না। সুরের উত্থান পতনে ঘুরে ফিরে একটা সুরই বাজে। যেন ঝিঁঝির ডাকের মত, প্রকৃতির স্পন্দনে বাজে। কেবল একটা কথাই বুঝতে পারি। গানের মধ্যে, একবার করে 'অচিন বাবু' উচ্চারিত হয়। শুনে অচিনদা ঘাড় দুলিয়ে হাসেন। হাত তুলে বলেন, 'আচ্ছা রে, আচ্ছা।'

আমার দিকে ফিরে বলেন, 'ওরা বলছে, আমার মত এমন মানুষ কোনদিন দেখে নি আমি মাটির পাত্র নই, ভেঙে যাই না, খাঁটি পিতলের জিনিস।'

বলে আবার হাসেন। কথা কন, হাসেন কিন্তু সেই ঘোর লেগে থাকে মুখে। স্বপ্ন-ঘোরের ওপার থেকে এপারে আওয়াজ দেন। এদিকে শুণ্ডি বুড়ো একটি মাটির কলসি বসিয়ে দিয়েছে অচিনদার সামনে। সঙ্গে একটি ভাঁড়। বুড়ো ঢেলে ঢেলে দেয় অচিনদা চুমুক দেন। এমন আজব পান দেখি নি কখনো।

একদিকে নাচ গান দোলা চলা। এখন আর বরহমের বউকে প্রৌঢ়া মনে হয় না। মেয়েদের থেকে মা কম যায় না। সুরের দোলায় সকলেই এক, ফণা তোলা সাপিনীর আঁকাবাঁকা ঢেউ। নরোত্তম বসেছে একটু দূরে, অন্ধকার ঘেঁষে। একটা সহবত বলে কথা আছে তো। শত হলেও কলসি ভাঁড় নিয়ে বসেছে। একেবারে অচিনদার সামনাসামনি বসে কী করে। আর জোয়ানটি দু চোখ ভরে নাচ দেখছে।

বরহম একবার অচিনদাকে হেঁকে ওঠে, 'ই নাচবি না?'

অচিনদা বলেন, 'না বাবা, আমার কোমরে আর তত জোর নেই।'

তারপরে দূরের অন্ধকারে চোখ মেলে দেন। যে মানুষের যে মুখ দেখেছিলাম মেলার প্রাঙ্গণে এখন আর সে মুখ নেই। এ যেন অন্য এক মুখ। কেবল রক্তের লাল না, আগুনের আলোর রাঙা হিজিবিজি মুখটি এখন যেন কেমন মসৃণ দেখি। আমার দিকে না তাকিয়েই বলেন 'বুক-পকেটের বিষের পুরিয়াটা আসলে যে চিঠি, সে কথা বোধহয় তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

বলে মুখ ফিরিয়ে তাকান। তাকান, কিন্তু আমি ভাবি, সেই জাগর চোখ দুখানি কোথায়। কেবল দুটি চিকচিকে বিন্দু ছাড়া কিছুই যেন দেখতে পাই না। নজরের ভাব বুঝি না। তবে বুক-পকেটের বিষের পুরিয়া যে চিঠি, তা বুঝতে পারি নি। সেই কৌতূহলের নিরসনে নতুন কৌতূহল মন চকিত হয়।

অচিনদা বলেন, 'চিঠিটা সেইদিনই এসে পৌঁছেছিল কলকাতা থেকে। চিঠির বক্তব্য ছিল, "তোমার প্রস্তাব নাকচ হয়েছে। তোমার বংশকৌলীন্য তেমন জোরালো নয়, পাস করে বেরিয়ে অর্থকৌলীন্যেও যে তুমি খুব উঠতে পারবে, সে বিশ্বাস অভিভাবকদের নেই। তা ছাড়া, তুমি ভাল নও, তুমি যে প্রেম কর। আমাদের পরিবারে শিক্ষা-দীক্ষা আধুনিকতা যতই থাকুক, কিন্তু এ কথা কেউ ভুলবে না, তুমি আমাকে খারাপ করেছ। কেননা, আমার মধ্যেও যে তুমি প্রেমের বিষ ঢুকিয়েছ। তুমি খারাপ, খুব খারাপ। তাই তো, ওখানকার আত্মীয়দের ওপরেও ভরসা করা গেল না কলেজের পড়া সাঙ্গ হবার আগেই আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে হল। তোমার আওতায় থাকলে আমার সর্বনাশ। তুমি খারাপ, তুমি যে বিষের মত খারাপ। তোমার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করাও যায় না, কারণ কথা পাঁচ কান হবে, তাই যেখানে তুমি আছ, সেখান থেকে নিঃশব্দে আমাকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। আমার এতবড় ক্ষতি তাঁরা চোখ চেয়ে দেখবেন কেমন করে। আমার এতবড় অধঃপতন তাঁরা সইবেন কেমন করে। তাই আমার বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। যাঁর সঙ্গে স্থির হয়েছে, তিনি সাহেবদের কলেজ থেকে পাস করেছেন, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়েছেন, তিনি সব দিক থেকেই তোমার থেকে বড়। আমি ভাবি, বাহুবলেও কি তিনি তোমার থেকে বড়?"

অচিনদা একটু থামেন। একটু যেন হাসতে চেষ্টা করেন ঠোঁট দুটো বাঁকা দেখায়। ওদিকে গানের রব উঁচুতে উঠেছে। নাচের তাল দ্রুত। আর আমার চোখের সামনে, সব ছাপিয়ে ভাসে এক অচেনা অজানা মুখ। কেন জানি না, দেখি তার অলকে কুসুম নেই, শিথিল কবরী। চোখেতে কাজল নেই, কিন্তু সজল দিঠি না। জল এসে থমকে আছে চোখের কূলের ওপারে। ব্যথার চেয়ে যেন বেশী দেখি ঠোঁটের কোণ বিদ্রূপে

বাঁকা। অথচ সে যেন উদাসিনী। কখন বুঝি কেঁপে যায় ঠোঁটের কোণের বাঁকখানি।

অচিনদা যেন ঠেক খেয়েছিলেন। ঠেক কাটিয়ে আবার বলেন, 'চিঠিতে আরো লেখা ছিল, যার মোদ্দা কথা, "পুরুষের বাহুবলের কথা ছাড়া, আর কী ভাববো। সমাজ সংসার পারিবারিক সম্মান, সব কিছুর মাঝখানে, আমি সে-ই তো অবলা। বিষ যদি খেলাম, একেবারে মরণ হল না কেন। এখন যে জ্বলে যাচ্ছি, তাই মরণের কথা মনে আসছে, তাই পুরুষের বাহুবলের কথা মনে আসছে। সভ্যতা আধুনিকতা সংস্কারের ওপরে উঠতে পারল কোথায়। তাই বাহুবলের কথা বলতে ইচ্ছা করে। অথচ সভ্যতার এমনই ছলনা, বাহুবলকে নাকি তার বড় ঘৃণা। কিন্তু কী করি, অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে সে-ই দিন, মাঝখানে শুধু কার্তিক মাসটুকু। সামনে তোমার পরীক্ষা, সে কথাও ভুলতে পারছি না। তা-ই এখন কেবল, এক জপ, এক তপ, তোমাকে খালি বলছি, অচিনদা, তুমি খারাপ খুব খারাপ, বিষের মত খারাপ। যে বিষেতে মরণ নেই, সে বিষ কেন দাও। এখন তুমি যা বুঝবে, তাই করবে। তবে তোমার কোন ক্ষতি ক'রো না। ইতি—"'

অচিনদা চুপ করেন। আমি বলে উঠি, 'ইতি—?'

অচিনদা যেন একটু অবাক হন। তারপরে হাসির মত শব্দ করে বলেন, 'ও, নামটা জিজ্ঞেস করছ? সেটাও আমাদের কালের মতই, নীরজা।'

শুণ্ডি বুড়ো ভাঁড় এগিয়ে দেয়। অচিনদা হাত নাড়েন, আর চান না। এখন চেতন ব্রহ্মের আর কোন রসের দরকার নেই। এখন সে রস প্রাণের ভিতর থেকে, স্মৃতির কলস গড়িয়ে মাতাল করেছে। এখন আর অন্য রসে দরকার নেই। ঝাঁজ তিক্ততা মাদকতা এর চেয়ে তীব্রতর আর কী দেবে।

নাচ গান তখনো চলে। যেন বরহমরা নিজেরা চালায় না। তাদের রক্তের মধ্যে কে যেন চালিয়ে যায়। অচিনদা একটা চুরুট ধরান। ধরিয়ে বলেন 'সেইজন্যেই বলছিলাম, একটা বস্তাপচা গল্প শোনাব তোমাকে।'

জিজ্ঞেস করি, 'বস্তাপচা কেন?'

'প্রেমের গল্প বলে। এমন প্রেমের গল্প তোমরা কত শুনেছ। তুমি সাহিত্যিক, কত লিখছ, কত রকমের বিচিত্র চমকপ্রদ প্রেম-কাহিনী। তোমাদের যুগে হলে কী হত জানি নে, আমাদের যুগের কাহিনী নিতান্তই বস্তাপচা।'

শত মুখে শোনা কথার এই বিচার আমার জানা নেই। সমালোচক হওয়া যে আমার ভাগ্যে ঘটে নি। চিঠির কথা না, বিষের পুরিয়ার কথা যতটুকু শুনেছি, তাতে এ যুগ সে যুগের কথা মনে আসে নি। তাজা পচার বিচার আসে নি মনে। কেবল, সেই দুটি চিরপ্রাণের কথা মনে হয়েছে, যাতে কোনদিন পচন ধরে না। যার কোন সেকাল-একাল নেই। তাই না বলে পারি না, 'কেবল তো রূপের হের ফের।'

অচিনদা চুরুটে টান দিয়ে বলেন, 'সেটাই কি কম নাকি হে। নইলে রূপ লাগি আঁখি ঝুরে কেন। নইলে, জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল, কেন? তোমরা তো তোমরা, দেখ স্বয়ং গুরুদেব পর্যন্ত, পঞ্চশরের শর বেঁধানো খেলা জমাতে শিলং-এর পাহাড়ের রাস্তায় নায়কের গাড়ি বিকল করে দেন, চমকে দেখি নায়িকাও সেখানে। আমার গল্পের শুরু থেকে শেষ অবধি সেরকম কোন ঝলক চমক নেই।'

বিষের নীলে আর হুল ফোটে না। তবু দেখ, অচিনদা আপনার হুলে আপনাকে বিঁধতে চান আরো। হয়তো ব্যথা যেখানে গভীর, সেখানে একটু আত্মবিদ্রূপের হনন থাকে। আসলে, অচিন-নীরজার সহজের মধ্যেই গভীরতায় অনেক বেশী ডুবেছিল। বনে গিয়ে কাঁদার চেয়ে ঘর করার সহজে যে কাঁদে, সেটা দেখা যায় না। কিন্তু বনে গিয়ে কাঁদা থেকে এ কাঁদাটা অনেক গভীরে বেঁধানো। আটপৌরে ঘরকন্নাতে সাজিয়ে কিছু দেখানো যায় না। কিন্তু সেখানে জীবনের লীলা চলেছে অহরহ। ঘটনার চমক যদি অচিনদার না থাকে, তাতে আসলের ক্ষতি হয় না। বরং বেশী গভীর মনে হয়। শুধু পত্রের বাচনিকে যতটুকু শুনেছি, তাতেই যেন মনের কোথায় একটা বন্ধ মুখের ধারা খুলে যায়। একটু যেন ব্যথা ধরার টনটনানি। কাঠের আগুনের আলোয় অচিনদার মুখ আর গলা শুনে আমিও কল্পনার ছবি দেখি।

তবু কথা থেমে যায়, তাই বলি, 'কী আছে না-আছে, তা জানব কেমন করে। গল্পটাই তো শোনা হল না এখনো।'

অচিনদা আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে আস্তে চাপড় মারেন। বলেন, 'তা বটে। সেই চিঠিটাই জীবনে একটা পর্বের শেষ চিঠি। সেই চিঠি আসবার আগে মনের মধ্যে অনেক রকমের গুনগুনানি ছিল। মৌমাছির যেমন মধুর আশা, যেন অনেক আহরণ করে চাকে জমিয়ে রেখেছি। সেই পূর্ণিমার দিনের আশা, যেদিন মধুক্ষরায় জীবন ভেসে যাবে। তার আগে পর্যন্ত নীরজার যে ক'টি চিঠি পেয়েছি, কোনটাতেই আমার নাকচ হয়ে যাবার সংবাদ ছিল না। বিয়ের পাত্র দিনক্ষণ স্থির হয়ে যাবার কোন কথা ছিল না। তখনো আশা, আমার পরীক্ষা শেষ হয় যাবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতাও এসে যাবে। তখন আমাকে আর নাকচ করে কে।'

বলে হাসেন নাকি ঠোঁট উল্টে একটু হাসির মত শব্দ করেন, বুঝি না। বলেন, 'আসলে কী জান, তখন মস্তিষ্ক জুড়ে অনেক স্বপ্ন। আদর্শের ঠাসবুনোটে মাথা ভরা। বেশী জটিলতা মনে আসতো না। ভয় করতে শিখি নি একটুও। কোন বিষয়ে ভয় ধরলে তো আত্মরক্ষায় সাবধান হতে হয়। যে জন্যে মৌমাছির কথা বলছিলাম। সে কি আগে থেকে জানতে পারে, শুক্লপক্ষের শেষ দিনে তার চাক-ভরা মধুর দিকে কখন মানুষের হাতে আগুনের মশাল এগিয়ে আসছে। তাই ওর চিঠিটা আচমকা একেবারে বিষের তীরের মত বিঁধেছিল। এমনই বিভ্রান্ত যে, কোপাইয়ের ধার ঘুরে কখন এই বাঁশঝাড়ে এসেছিলাম, জানতে পারি নি। এই যে দেখছ বরহম ও তখন কাঁচা জোয়ান। ওর বউকে মনে হয়েছিল এই মাদিরের থেকেও ঝলকানো। আলাপ ওদের সঙ্গে আগেই। সেই দিন সংলাপ-প্রলাপের পালা। ওরা খাচ্ছিল, আমাকে ডেকে বসালো, আমিও খেতে লাগলাম।'

একটু থামেন। আমি একবার বরহমের দিকে তাকাই। দেখি, তখন আর সে মুখোমুখি নয়, বউয়ের দুই কাঁধে দুই হাত রেখেছে। দুজনেরই শরীর টলমল, পায়ে বেতাল লেগেছে। ওদের পুরনো বন্ধুর কথা আমি শুনেছি। যে কথা ওরা হয়তো কোনদিন জানতে পারে নি। জানতে পারে নি, একদা বিকালে ওদের বন্ধু কেন এখানে এসেছিল। বরহম এখনও বউকে নিয়ে নাচে। অচিনদা আজও যেন বাঁশঝাড়ের সেই মানুষটাই আছেন। আর আমি রাঢ়ের শীতে আঁচড়ানো রাত্রে বসে জগৎ-সংসারের অপরূপ দেখি। এই অপরূপের চাবিকাঠি কার হাতে, কে জানে। কে খোলে, কে দেখায়, জানি না। এখন যেন নিজেকে নতজানু মনে হয়। মনে হয়, বুকের কাছে দু হাত আমার। এখন যেন আমার ভিতরে কে বলে, নমি নমি নমি, জীবন হে, নমি নমি নমি।

(ক্রমশ)

দিল্লীর অভিজ্ঞতা

কলকাতা আমাদের নানাদিক দিয়ে নির্মম-ভাবে বেঁধে রেখে দিয়েছে। মাঝে মাঝে ছাড়া পেতে ইচ্ছে করে। তাই যখন ন্যাশনাল স্কলারশিপের নির্বাচন সমিতিতে যোগ দেবার জন্য আহ্বান এল দিল্লি থেকে তখন দু-চার দিনের জন্য একটু বাইরের হাওয়া গায়ে লাগবে ভেবে পুলকিত হয়ে উঠেছিলুম। এখনকার রৌদ্রকরোজ্জ্বল স্নিগ্ধ শীতল দিল্লি সত্যিই মনোরম। চাকরির জন্য দিল্লি দুঃসহ কিন্তু স্বল্পভ্রমণের জন্য দিল্লি তৃপ্তিপ্রদ। প্রবাসী পরিচিত প্রিয়জনের সঙ্গে দেখ হল—নতুন কয়েকজনের সঙ্গেও পরিচয় হল। অল্পকদিনের ভ্রমণে একটি মনোজ্ঞ স্মৃতি নিয়ে ফিরেছি।

ভারত সরকার তরুণ সংগীতশিল্পীদের দু বৎসরের জন্য মাসিক দুশো পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করেন। শিল্পীরা এই বৃত্তিকে দু-দিক থেকে দেখে থাকেন—একটি প্রয়োজন অপরটি সম্মান। অভিজাত সমাজ থেকেও কিছু কিছু প্রতিযোগী এসেছেন—উদাহরণ একজন কালেক্টরের স্ত্রী। বলা বাহুল্য এঁরা এই স্কলারশিপকে প্রেস্টিজ হিসাবে দেখেন। আবার সুরবাহারবাদিনী এক ভদ্রমহিলা বললেন নিছক প্রয়োজনের জন্যই তিনি এই বৃত্তির জন্য আবেদন করেছেন। তিনটি বালক মিলে একটি শানাই-এর দল গড়তে চায়। তাদের মুখপাত্র হিসেবে একটি কিশোর নিতান্ত প্রয়োজনেই বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করেছে বলে মনে হল। আসলে প্রয়োজন ও সম্মান এই দুটিই শিল্পীদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করায়, কারণ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ মানেই সম্মান এবং বৃত্তিটি হচ্ছে যোগ্যতার পুরস্কার, দয়ার দান নয়। তথাপি প্রথম শ্রেণীর বহু তরুণ শিল্পীই এই বৃত্তির জন্য আবেদন করে না—তার কারণ অনেকেই একটা পরীক্ষা দিতে নারাজ, ইণ্টারভিউকে তারা সম্মানের হানিকর বলে মনে করে; আর অনেকের বোধ হয় নানা কারণে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর তেমন আস্থাও নেই। অতএব সমবেত শিল্পীদের যে মান দেখা গেল তাতে মাত্র দু-একজনকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে —বাদ বাকী সবই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর। এদের মধ্যে বাংলা থেকেই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী আবেদন আসে এবং বাংলা যে সংগীত চর্চার পুরোভাগে, প্রতিযোগিতায় সেটিও প্রমাণিত হয়। খেয়ালে শ্রীমতী অনীতা বসুর গায়নভঙ্গী খুব ভাল লাগল। চর্চা অক্ষুণ্ণ থাকলে মেয়েটি সুনাম অর্জন করবে। আমাদের অনেকেরই এই বিশ্বাস। তবলায় শ্রীমান স্বপন চৌধুরীর বাজনাও খুবই সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির নিদর্শন। এই বৃত্তিটিকে উপলক্ষ করে বাংলার তরুণ শিল্পীরা যে পরিশ্রম করে প্রতি বৎসর দিল্লিতে এসে পরীক্ষা দিয়ে উত্তর ভারতের মানের একটা প্রত্যক্ষ ধারণা নিয়ে যায় এটি খুবই ভাল লক্ষণ। আশা করব তাদের এই অনুসন্ধিৎসা এবং প্রচেষ্টা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

নির্বাচনের স্থানটি দিল্লির জাতীয় মিউজিয়ামে মনোনীত করার জন্য কর্তৃপক্ষের শ্রীসুধাংশু সাহাকে সাধুবাদ প্রদান করব। কেউ কেউ অবশ্য মিউজিয়ামের প্রশস্ত রঙ্গমঞ্চকে এই কাজে ব্যবহার করবার জন্য বাহুল্য বলে মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় এইটিই উপযুক্ত হয়েছে। হলটি চমৎকার এবং অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থলে অবস্থিত। এ ছাড়া তরুণ শিল্পীরা মিউজিয়ামটি দেখবার জন্যও আকৃষ্ট হবে। শুধু সংগীত নয় নৃত্য, নাটক এবং চিত্র—এই তিনটি বিষয়ের পরীক্ষাও এই গৃহেই নেওয়া হবে। অতএব ললিতকলার সঙ্গে যুক্ত বহিরাগত বহু তরুণ মিউজিয়ামটি দেখবার সুযোগ পাবে যেটি শিক্ষার দিক থেকেও প্রয়োজন। গতবারে মিউজিয়ামটি সাধারণ-ভাবে দেখেছিলাম, এবারে কিউরেটার ডক্টর প্রিয়তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সযত্নে আর্ট সংগ্রহগুলি দেখালেন। হিন্দুস্থানের বহু বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর একতন্ত্রী স্বরবু প্রভৃতি বহু বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন কলকাতা মিউজিয়ামের মত দিল্লিতেও দেখতে পাওয়া যাবে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করলুম যদি মধ্যপ্রাচ্যের বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহ দিল্লিতে প্রদর্শন করা যায় তাহলে গবেষণার পক্ষে অনেক সুবিধা হবে। তিনি এবিষয়ে বিবেচনা করবেন বলেছেন। তাঁর অপর একটি বিরাট গবেষণার নিদর্শন—"The way of Buddha" নামক গ্রন্থটিও বিশেষ আগ্রহ সহকারে দেখলুম। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর বহু বিখ্যাত স্থান থেকে বুদ্ধের জীবনের নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য চিত্রসম্পদ সংগ্রহ করে তিনি চিত্রে বুদ্ধজীবন রূপায়িত করেছেন, সঙ্গে যুক্ত করেছেন বিস্তারিত টীকা টিপ্পনী। এসবই তাঁর একক প্রচেষ্টায় সম্পাদিত হয়েছে যার জন্য তিনি নিজের পকেট থেকেও ব্যয় করেছেন প্রচুর। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর নামটি পর্যন্ত এই গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হয়নি, তাঁর সম্পাদনা আদৌ স্বীকৃত হয় নি। যেহেতু তিনি সরকারী কর্মচারী এবং গ্রন্থটি পাবলিককেশন ডিভিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেহেতু নাকি তাঁর নামটির উল্লেখ না করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, প্রেসিডেণ্ট রাধাকৃষ্ণন বা প্রাইম মিনিস্টার নেহেরুর প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসের ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁরা কি সরকারের বাইরের লোক ছিলেন? সরকারী কানুনে কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থের

সম্পাদক বা রচয়িতার নাম উহ্য রাখবার নির্দেশ আছে এমন শুনিনি, এটি নিশ্চিত-ভাবেই উদ্দেশ্যপূর্ণ উপেক্ষা। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? বোধ হয় বাঙালী হওয়াটাই অপরাধ। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় Author's Copy হিসাবে তিনটি মাত্র গ্রন্থ পেয়েছেন। এইভাবে চুপি চুপি একটি চিঠিতে তাঁর অথরত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

দিল্লির বাঙালীরা যে বাংলার সংগীত সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল একথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। কলকাতার বহু খ্যাতনামা সংস্থা দিল্লিতে সার্থকতার সংগে অনুষ্ঠান করে আসছেন। জানা গেল এবারে দিল্লিতে একটি বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন সম্পর্কে কথাবার্তা চলছে। সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেংগল অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় স্থাপিত বঙ্গ-ভারতী বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ'রা রীতিমত শিক্ষাসূচী অবলম্বন করে আপাতত তিন বছরের একটি সার্টিফিকেট কোর্স নির্ধারণ করেছেন। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করছেন। কালী-বাড়ীতে এবং বিনয়নগরে অনুষ্ঠিত দুটি আসরে মৈত্র মহাশয়ের পরিচালনায় সংগীত বিশেষভাবে উপভোগ করা গেল। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ধ্রুপদগুলি খুবই কৃতিত্বের সংগে গাইল। তাদের রবীন্দ্রসংগীত ও অপরাপর সংগীতও উল্লেখযোগ্য। এখনও প্রস্তুতিপর্ব চলেছে। আশা করা যায়, কিছুকালের মধ্যেই এরা যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। তবে বঙ্গভারতীর সিলেবাসে বাংলা গানের সূচী অস্পষ্ট। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও ভারতীয় সংগীত বা বাংলার সংগীতের প্রতি তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি বলে মনে হল। অবশ্য এসবই পরে অ্যাকাডেমিক দিক থেকে আরও কিছুটা অগ্রসর হলে সম্ভব হবে। বঙ্গ-ভারতীর জন্য আমাদের শচীনদা পরিণত বয়সেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে তাঁর একাগ্রতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসংগে একটি কথা বলি—শিক্ষাসূচী বা শিক্ষা-প্রদানের রীতি তাঁরা নিজেরা স্বাধীনভাবে নির্ণয় করুন। আমার বিশ্বাস জ্যোতিরিন্দ্র-বাবু এবং তদীয় সহযোগীরা এদিক থেকে যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি। এ বিষয়ে তাঁরা যদি একটা সত্যিকারের প্রগতিশীল মনোভাব অবলম্বন করেন তাহলে সেটিই হবে উত্তম পন্থা। কলকাতার কোনও একটা ইউনি-ভার্সিটির সংগে অ্যাফিলিয়েশনের জন্য তাঁদের নির্দেশে শিক্ষাক্রম অবলম্বন করার চেয়ে তাঁদের স্বাধীন অবস্থিতি এবং আলোকপ্রাপ্ত যুগোপযোগী শিক্ষাধারার প্রবর্তন অনেক বেশী কাম্য। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা যদি একটা যোগ্যতর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন তাহলে কলকাতার কাছ থেকে আরও কয়েকটি পদক্ষেপের অগ্রসরতা তাঁরা হরণ করে নিতে পারবেন। দিল্লিতে বাংলা গানের জন্য গুণী শিক্ষাব্রতীর প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু নানা কারণে দিল্লিতে কেউই অবস্থান করতে চান না। তথাপি প্রগতিপন্থী এবং অভিজ্ঞ কোনও শিক্ষক যদি দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তাহলে দিল্লির বাঙালী সমাজ উপকৃত হবে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনীল-রতন সেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রবাবু হায়দরাবাদে আহূত আগামী নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে সংগীতবিষয়ক একটি ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি সেমিনার গঠন করতে চান। বাংলা সাহিত্যের সংগে বাংলা সংগীত সম্বন্ধেও একটি উচ্চশ্রেণীর আলোচনা হয় এইটিই অনেক সদস্যের কাম্য। হায়দরাবাদের অভ্যর্থনা সমিতি ইতিমধ্যেই এর আয়োজনে তৎপর হয়েছেন। প্রস্তাবটি খুবই সমীচীন এবং বাংলার সংগীত সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা সকলেই এবিষয়ে সহায়তা করবেন বলে আশা করি।

—শার্ঙ্গদেব

রোণ্টিশৃঙ্গ বিজয়িনী

রোণ্টিশৃঙ্গ বিজয়িনীদের অভিনন্দন জানাতে আমাদের দেরী হ'য়ে গেল। কিন্তু মহিলাসমাজের তরফ থেকে আমাদের এ অভিনন্দনের গভীরতা অনেক, আন্তরিকতা বহুমুখী। মেয়েদের এমন অভিযানের সার্থকতা বাংলার নারীসমাজকে সাহস ও শক্তি দেবে সন্দেহ নেই। দুর্গম পথে পর্বতারোহণের মতই আজ সব

রোণ্টিশিখর বিজয়িনী স্বপ্না মিত্র

বাঙ্গালী মেয়েদের জীবন চ্যালেঞ্জ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিপদে তার পরীক্ষা। তাই কঠিন পরীক্ষায় কৃতকার্য কন্যারা তাদের প্রেরণা, তাদের জীবনসংগ্রামের উৎসাহ।

সাধারণ মেয়ের কাছে তাদের প্রেরণা যতটা সত্য তার চেয়েও বড় সত্য হ'ক তাদের রণের কাছে ও কাজে আমাদের এই প্রার্থনা। নিত্যদিনের কাজে তাদের বল ও সাহস আর যারা দুঃসাহসিক কাজে অগ্রসর হবেন তাঁদের যেন এই পথপ্রদর্শিনীদের কথা মনে থাকে; তাঁরা এ পথে যান। গিরিশৃঙ্গ অভিযান বাংলাদেশে এমন কি সারা ভারতে নূতন। জয়-পরাজয়ের ক্রীড়াকৌতুকের অতিক্রান্ত অসমসাহসী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। অবিচলিত চিত্তে বাঙ্গালী মেয়ে বিপদসঙ্কুল ক্রীড়াকে অবলীলাক্রমে আপন করেছে এ সংবাদ আগামী দিনের আশার সংবাদ। বিধাতার কাছ থেকে এতদিনে তারা আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার সত্যই পেয়েছে।

কৃষ্ণা হাতী সিং

বিজয়িনী বরণোৎসবের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এল একটি দুঃখের খবর। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণা হাতী সিংএর মৃত্যু সংবাদে দেশে বিদেশে সবাই দুঃখিত। রাজনীতির আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়ে কৃষ্ণা নেহরু রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন ও কারা বরণ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহিত্য সাধনা ও সমাজ সংস্কার তাঁর ব্রত হয়। তাঁর লেখা কয়েকটি বই রয়েছে এর মধ্যে একটি প্রাচীনকালের রূপ সাধনা ও রূপ-টনের উপর লেখা। ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ এই বই লেখায় কৃষ্ণা হাতী সিংএর সহযোগিতা করেছেন।

কৃষ্ণা হাতী সিং আমেরিকা সফরের পর দেশে ফিরবার পথে লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন। লণ্ডনেই তাঁর দেহান্ত হয় এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ। রানী এলিজাবেথ কৃষ্ণা হাতী সিংএর জন্য শোক প্রকাশ করে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে তাঁর সান্ত্বনা জানিয়েছেন। প্রতিভাদীপ্ত পরিবারের মেয়ে কৃষ্ণা হাতী সিংও ভারতবর্ষের মহিলা প্রগতির ইতিহাসে একজন সন্দেহ নেই।

রং দিয়ে বৈচিত্র্য

মানুষের চোখ বৈচিত্র্য চায়। এমন কি রেশনের বাজারে হতাশা আর আকাশ ছোঁয়া দরদামের দরুণ ব্যাহত জীবনধারাও মাঝে মাঝে এদিক ওদিকে একটু পরিবর্তনের স্পর্শে সজীব হ'বার আশা করে। একটু হেরফের আর একটু নূতনত্ব ঘর সাজানোতে এনে গৃহিণী পারিবারিক জীবনের একঘেয়ে একটানা ভাবকে কমাতে পারেন। অনেক পয়সা খরচ করে যাঁরা গৃহাভ্যন্তর সজ্জা-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ চান তাঁদের কথা বাদ দিয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে কি করতে পারি সে কথাই ভাবছি।

সস্তায় গৃহাভ্যন্তরকে ঝকঝকে করার সবচেয়ে বড় সহায় রং, আমরা একথা আগে অনেকবার আলোচনা করেছি। এক নং ছবিতে দেখুন বাঁদিক ও সামনের দেওয়ালের খানিকটা করে নিয়ে ইঁটের রং দিয়ে ইঁটের নমুনা করা হয়েছে। তাতে এই কোণটিতে বৈচিত্র্য এসেছে অনেক। আগে বিদেশ এবং পাহাড়ী বাড়িতে দেওয়ালে কাগজ ব্যবহৃত হতো। সৌন্দর্য ভিন্ন তার হয়তো আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল। কাগজ দিয়ে ঢাকাতে ঠান্ডা কিছুটা কমতো, স্যাঁতসেঁতে ভাব বাইরে আসতো না। আধুনিক বহু বাড়িতে দেখেছি ফলকরা দেওয়াল কাগজের মত দেওয়ালে সামান্য রঙ্গীন নমুনা নক্সা আঁকা। যেমন ধরুন হাল্কা নীল দেওয়ালে গাঢ় নীল বর্ডার। চারটি দেওয়ালের মধ্যে যেদিকে এরকম দেওয়াল থাকবে সেদিকে মনে হবে ঘরটি গভীর হ'য়ে গেছে। এখানে দেওয়ালের অংশবিশেষ ইঁটের রংএ রং করায় ঘরে কেমন একটা গভীরত্ব এসেছে আর এসেছে সাজানোর একটা শৌখিনতা। বাঁদিকের দেওয়ালে পাশাপাশি তিনটি রং করা বাঁশ দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেখানে

১নং চিত্র

২নং চিত্র
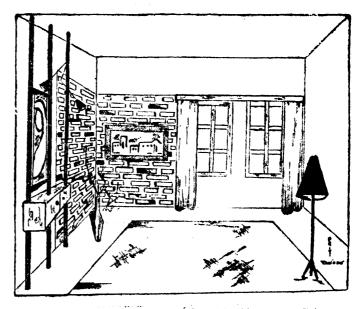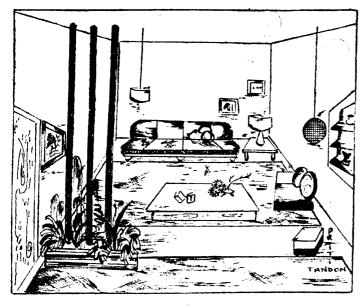
ইঁটের বাহার শেষ হয়েছে সেখানে। বাঁশের রং আপনার ইচ্ছামত দেবেন। ঘরে আর যা কিছু আছে তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। বাঁশকে বেষ্টন করে ছোট দেরাজ। দেরাজের উপরে একখানা ছবি। অন্য দেওয়ালের মাঝেও একটি ছবি যাতে ইঁটের বাহারও একঘেয়ে না দেখায়। পরদা আরম্ভ হয়েছে ইঁট সাজানোর সঙ্গে একই উচ্চতায়। নূতন ঘরবাড়িতে ছাদ বেশ নীচু হয়। সমান্তরেখার টানা পরদা সেই নীচু ছাদকে একটা কোমলতা দেবে।

২নং ছবিতে দেওয়ালে রং করা হয়নি কিন্তু বাঁশের পাইপ তিনটি আছে। তার তলায় কাঠের বাক্স। বাক্সে সাজানো ফুল ও পাতাবাহার টব। ছবির বাকিটা অবশ্য রুচিমত করা যায়। একটু সবুজের স্পর্শ একটু মৌসুমী ফুলের বর্ণবিন্যাস ঐ রঙ্গীন বাঁশ তিনটিকে ঘিরে একটি পরিপূর্ণ "কম্পোজিশন" গড়ে তুলতে পারে। মাটি ফেলে বাক্সে ফুলপাতা জন্মানোর চেয়ে টব রাখা ভাল। টবকে ইচ্ছামত পাল্টে দিতে পারবেন। মাঝে মাঝে বাইরের হাওয়া, রোদ, শিশির লাগিয়ে তাজা করে তুলতে পারবেন। ফ্ল্যাটের পক্ষে চমৎকার এমনি একটু সাজানো বাগান। রচনা কৌশলের অন্ত নেই। যেরকম ইচ্ছা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজাতে বাধা নেই। বাঁশের গায়ে money plant তুলে দিতে পারেন অনায়াসে। এরকম একটি দৃশ্য সামনে থাকলে ঘরের বাকি সজ্জা খুব অনাড়ম্বর হতে পারে। নীচু একটি মেজ, দু একটি বসবার ব্যবস্থা হলেই ঘর সম্পূর্ণ দেখাবে।

আমরা দুটি সজ্জার কথা বললাম এভাবে নানা ধরনের হেরফের করা চলে। একটি ঘরকে দুভাগ করে খাওয়া ও বসা ব্যবস্থা এখন চালু হচ্ছে। বাঁশ ও ফুলের একটি সামান্য আড়াল রচনা করে দুদিকে অস্পষ্টিকতার আব্রু দেওয়া যায়। আমাদের গৃহস্থ ঘরে খাওয়া-দাওয়ার পাট সব সময় বাইরের লোকের সামনে ধরে দিতে অনেকেই পছন্দ করেন না। এ ধরনের পার্টিশন ঘরের সৌন্দর্যবর্ধন করবে অথচ ঘরকে সংকীর্ণ করবে না। আড়াল হবে অথচ ঘর বিভক্ত হবে না। পৃথকীকৃত অংশ ক্ষুদ্র হবে না একটুও।

শোবার ঘরেও এমনি একটু আড়াল দিয়ে একটু বসবার ব্যবস্থা করা যায়। যেদিন তার আর প্রয়োজন থাকবে না অনায়াসে সরিয়ে দিতে পারবেন। বাঁশ-এর রং কাঠের বাক্সের রং সবই হবে ঘরের আসবাব, পরদা ইত্যাদির সঙ্গে রং মানিয়ে। বসবার ঘরে যদি উজ্জ্বল রং-এর কুশন বসবার ব্যবস্থায় ব্যবহার করেন, তবে সেই উজ্জ্বলতা বাঁশে দিতে পারেন। কাঠের বাক্সের বেলায় রং বাছতে কিছু অসুবিধা হলে সবুজ আছে। গাছপাতা ফুলের সঙ্গে মিশে যাবে, ঘরের কোনও রং-এর সঙ্গে তার বেখাপ্পা সম্পর্ক হবে না একেবারেই। উজ্জ্বল রং ঘরে যথেষ্ট থাকলে, দেওয়ালের বেলায় হাল্কা ভিন্ন গতি নেই। একটি দুটির বেশী ছবি সাজানো ভাল দেখাবে না। বাতির শেড সাজাবার টুকিটাকিও মোলায়েম হলে মিলবে মনের মতন।

সবার শেষে রং সম্বন্ধে সবচেয়ে সাধারণ কথাটি আর একবার উল্লেখ করতে ইচ্ছা করছে। রং মানুষের মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। কে বা কারা ঘরে আনাগোনা করবে, কি হবে সেই ঘরে তার সবটা বিচার বিবেচনা করে রং ফলাবেন। সেকালের চেয়ে একালে রং-এ ঔদার্য এসেছে অনেক। নিয়মভাঙ্গা সব মিল অমিল দারুণ সাহস নিয়ে গৃহসজ্জায় সাহায্য করছে। তবে সব গড়ার মাঝে আছে একটি জিনিস সেটি রচয়িত্রীর আপন সৌন্দর্য-অনুভূতি।

খবরের টুকরো

"সুগন্ধী আর মসলাই একদিন প্রাচ্যের পানে প্রতীচ্যকে টেনেছিল। বিলাসীদের ভোজসভায় মসলা মাখানো সুস্বাদু পরিবেশন অভিজাত রুচির পরিচায়ক মাত্র ছিল না, ছিল ধনীর ধন আর পদমর্যাদার চিহ্ন। বহুমূল্য এলাচ লবঙ্গ আর সুঘ্রাণ মিষ্টস্বাদ দারুচিনি দিয়ে আরব ব্যবসায়ী বণিক বেঁধেছিল দেওয়া নেওয়ার সূত্র। তার জন্য মূল্যমানের সীমারেখা পর্যন্ত বিচার্য ছিল না। তাল তাল সোণা দিয়ে জাহাজ বোঝাই মসলা যেত ইউরোপের বাজারে চড়া দরে বিকোতে। বিলাস আর শৌখিনতার ধারা ক্রমে বদলে গেছে। কড়া মশলা শরীরের ক্ষতি করে এই ধারণা ক্রমে ক্রমে পশ্চিমী সমাজে বেশ বদ্ধমূল হয়েছে। আমাদের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাস করেন মশলা শরীরের পক্ষে হানিকর। অতিরিক্ত মশলাপাতি হয়তো সত্যই হানি করে কিন্তু মশলারও খাদ্যমানে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং আমাদের আয়ুর্বেদে মশলার পৃথক পৃথক গুণের উল্লেখ আছে। নূতন করে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরা খাদ্যের মশলার সন্ধান শুরু করেছেন। ভারতীয় মশলাদার খাদ্য জনপ্রিয়তা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন কি জানি এর ফলাফল কি। চাটনী, আচার, কারি, কাবাব ভোজনরসিককে কাবু করেছে বলেই বেশী করে জানা দরকার উপকারের তথ্য। এই তো বছরের পর পর বছর ধরে জার্মানীর কোলোন শহরে যে খাদ্যপ্রদর্শনীর পর্ব আয়োজিত হয় তাতে দিনের পর দিন ভারতীয় স্টলটি দারুণ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। তাই পশ্চিম জার্মান বিশেষজ্ঞ হান্স্ গ্লাথেল পরীক্ষা চালালেন মশলাপাতির উপর। জার্মান রাসায়নিকদের সভা বসেছিল পশ্চিম বার্লিনে। দেশ বিদেশের রাসায়নিক সমাবেশে তিনি বললেন পুষ্টিতত্ত্বে মশলা ঘ্রাণের বিশেষ স্থান রয়েছে। মানুষের

পরিপাক শক্তির উপর সম্বন্ধে, লংকা গোলমরিচের মত কড়া কড়া সব মশলারও প্রভাব হয়। কড়া স্বাদে যে লালা সহজে আসে সে কথা স্বীকার করতে হবে। সেই লালা হজমী শক্তিকে সাহায্য করে। কাজেই যেখানে শারীরিক কোন বিশেষ কারণে ক্ষতিকর হবার সম্ভাবনা নেই, সেখানে পরিমিত মশলা খাদ্যকে, বিশেষত গুরুপাক আহারকে সহজপাচ্য করে। হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্ত চলাচলে যে মশলার প্রভাব আছে তাও পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। বুকে ধড়ফড় করা অথবা বেশী খাওয়ার দরুণ হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন বা অস্থিরতা মশলার গুণে কম হতে পারে। দারুণ পরিশ্রমে ক্লান্ত শরীর মশলার উপকার বোধ করবে। প্রায় ২,০০০ রাসায়নিক একত্র হ'য়ে বলেছেন কুছ পরোয়া নেই, মশলা খাও, মশলার মৌতাত ভেঙে ফেলা ভুল। তবে বেশি পরিমাণে নয়। সেটা তো সব জিনিসের বেলায়ই বলা চলে।

টুকিটাকি

বাজারের হাল দেখে রান্নাবান্না সম্বন্ধে প্রায় হাল ছাড়বার অবস্থা! আলোচনা করাও প্রায় আমরা ছেড়ে দিয়েছি। যে রান্নাই মনে আসে, দামে যাই এক মুহূর্তে। কি মিলবে না মিলবে জানা নেই, তার উপর দামের অংক তো দমবন্ধ করে রেখেছে।

পাঁউরুটির একটা অতি সহজ রান্নার কথা ভাবছি অনেক দিন কিন্তু যখন দেখি আমার প্রতিবেশীর পাঁচ বছরের মেয়ে বলে "বাবা পাউরুটি খাবো" আর অসহায় বাবা মুখ নীচু করেন অথবা তার চেয়ে ছোট যারা তারা পাঁউরুটি আর ফ্যারার এডিশন দাঁতিকেউ এক পর্যায়ে ফেলে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে তখন আর কোন মুখে বলি পাঁউরুটি দিয়ে সহজ রান্না সারুন! যেখানে যা পাবেন বলে ভরসা তার একটু যদি বাঁচাতে পারেন রান্নাটি পরীক্ষা করে রাখবেন। উত্তরকালে হয়তো বা কাজে লাগবে। টাটকা রুটি হ'লে ভাল হয়। সামান্য নুন দেওয়া জলে পাঁউরুটির স্লাইস ডুবিয়েই তুলে নেবেন ও চেপে জল বের করে ফেলবেন। স্লাইসের চারপাশ কেটে নেবেন আগে থেকেই। সেই ভেজা রুটিতে যা ইচ্ছে পুর পুরে পাশবালিশের মত 'রোল করবেন। ভিজে থাকার দরুণ বেশ সহজেই রোল লেগে যাবে। প্রথম বেশ গরম ঘিতে দিয়ে আঁচ কমিয়ে দেবেন। বাদামী করে ভেজে গরম পরিবেশন করবেন।

আমরা অনেকেই বাড়িতে কেক, বিস্কুট তৈরী করার চেষ্টা করি সাধারণ অল্প পয়সার চুল্লীতে। ইলেকট্রিক বা গ্যাস-এর তাপ কণ্ট্রোল করা oven-এ কাজ করা সহজ। তবে সবার পক্ষে তেমন সুবিধা থাকে না। একটি সাধারণ নিয়মে চুল্লী বা oven-এর তাপ দেখতে পারেন। একটি সাদা কাগজ চুল্লীর মাঝখানের তাকে রাখবেন মিনিট পাঁচেক। যদি কাগজ হালকা বাদামী হয়, তবে জানবেন oven-এর তাপ ঢিমে। মাঝামাঝি বাদামী হ'লে তাপও মাঝামাঝি মনে করে নেবেন। গাঢ় বাদামী হ'লে ধরতে হবে চুল্লী বেশ গনগনে গরম। আর যদি আপনার কাগজটি কালচে হ'য়ে যায় তবে চুল্লী অতিশয় গরম অথবা যাকে বলে Quick। Quick oven কোনও কোনও ব্যাপারে কাজে লাগে। এভাবে তাপ পরীক্ষা করে মোটামুটি কাজ চলে যায় একেবারে নিখুঁত না হ'লেও। যদি বই দেখে রান্না করা হয় তবে চুল্লীর তাপও বই-এর নির্দেশ অনুযায়ী করবেন।

শ্রীমতী

পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস

পাউণ্ডের সাম্প্রতিক মূল্যহ্রাস (নতুন হারে ১৮ টাকার বিনিময়ে এক পাউণ্ড পাওয়া যাবে) মনে হয় ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারতীয় টাকার বিনিময় হার পরিবর্তনের অভিঘাতকে খানিকটা প্রশমিত করবে। ১৯৪৯ সনে যখন পাউণ্ড স্ট্যার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস করা হয় সে সময়ের তুলনায় ভারত বর্তমানে ব্রিটেনের আর্থিক ব্যবস্থার উপর কম নির্ভরশীল। ব্রিটেনের মোট আমদানির শতকরা মাত্র ২ ভাগের জন্য ভারত দায়ী। ১৯৬৫-৬৬ সালে ব্রিটেন নয়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছিল ভারতের বৃহত্তম বাজার। অন্য দিকে, ব্রিটেন থেকে আমাদের আমদানি যে ক্রমাগত কমে এসেছে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। তার কারণ, বৈদেশিক সাহায্য আজ আমদানির একটা বড়ো উৎস। এবং ভারতকে সব চেয়ে বেশী সাহায্যকারী দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেন পড়ে না।

ভারতের রপ্তানি

আমাদের মোট রপ্তানির শতকরা ১৭ ভাগ ব্রিটেন কেনে। স্টার্লিংয়ের (টাকায়) মূল্য কমে গেছে বলে যুক্তরাজ্যকে এখন ভারতীয় সামগ্রীর জন্য বেশী দিতে হবে। যুক্তরাজ্য তার সরকারী ব্যয় এবং আভ্যন্তরিক ভোগ কমিয়ে ফেলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে তার আমদানির উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করলে ভারতের ঐ দেশে রপ্তানি কিছুটা ব্যাহত হতে পারে।

যুক্তরাজ্যে আমরা যেসব দ্রব্য রপ্তানি করে থাকি সেগুলির চাহিদা মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে খুব পরিবর্তনশীল নয়। যুক্তরাজ্যে ভারতের মোট রপ্তানির যা শতকরা ৭৫ ভাগ সেই চা, তামাক, চামড়া, তৈল-পিষ্টক ও পাটদ্রব্যের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। ব্রিটেন এখনো আমাদের মোট চা রপ্তানির শতকরা ৪৫ ভাগ কেনে। এখানে বলা দরকার, সিংহল তার মুদ্রামূল্যে (শতকরা ২০ ভাগ) হ্রাস করার ফলে ভারতের চা রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—সেজন্য ভারত সরকার কর্তৃক সংশোধনমূলক ব্যবস্থা (রপ্তানি শুল্কের হ্রাস) অবলম্বন বাঞ্ছনীয়।

পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেন তার ভোগ বা ব্যবহার কমিয়ে দেবার যে সংকল্প গ্রহণ করেছে ভারতীয় কার্পাস-বস্ত্রের জন্য ব্রিটেনের চাহিদার উপর তার অভিঘাত দেখা যেতে পারে। ব্রিটেনকে কার্পাসবস্ত্রের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী হংকং তার মুদ্রার মূল্য হ্রাস করেছে : যুক্তরাজ্য স্বভাবত হংকংয়ের কার্পাসদ্রব্য কেনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারে, কেননা তুলনায় ভারতীয় বস্ত্রাদি ব্যয়বহুল হবে। সে অবস্থায় রপ্তানির জন্য উৎসাহ-

মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ব্রিটেন অবশ্য ভারত ও হংকং উভয় দেশ থেকে নির্ধারিত অংশের কার্পাসবস্ত্র কেনে।

আমাদের পাটদ্রব্যের মোট রপ্তানির শতকরা ১০ ভাগেরও কম যায় ব্রিটেনে। পাকিস্তান মুদ্রামূল্য হ্রাস করেনি বলে ঐ রপ্তানি প্রভাবিত হবে না। ভারতের মোট তামাক রপ্তানির শতকরা প্রায় ৫০ ভাগের ক্রেতা হচ্ছে ব্রিটেন। পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস ব্রিটেনে ধূমপানকে আরো ব্যয়বহুল করে তুলবে কিন্তু তাতে ব্রিটেনের ভারতীয় তামাক ক্রয় বিশেষ কমবে মনে হয় না। ব্রিটেন আবার ভারতীয় চামড়ার মোট রপ্তানির প্রায় এক তৃতীয়াংশের বাজার। ঐ দ্রব্যের জন্য ব্রিটেনের চাহিদা, দেখা গেছে, খুব পরিবর্তনশীল নয়। সেইরকম, আমাদের তৈল-পিষ্টকের মোট রপ্তানির প্রায় একের তিন ভাগ কেনে ব্রিটেন। আফ্রিকা ও এশিয়ার যেসব দেশে ভারত লঘু ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি করে সেখানে ব্রিটেনের সামগ্রী এখন কম দামের হবে। অর্থাৎ পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের অনুপাতে ব্রিটেনের ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য সস্তা হয়েছে। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যকে বিশ্বের বাজারে তাই ব্রিটেনের তীব্রতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। সে-ক্ষেত্রে ভারতকে তার জিনিসের দাম কমাতে হতে পারে।

ব্রিটেন থেকে আমদানি

স্টার্লিং মূল্য হ্রাসের দরুন যুক্তরাজ্য থেকে ভারতের আমদানি আগের চাইতে সস্তা হবে। আমাদের মোট আমদানির শতকরা ১০ ভাগ আসে ব্রিটেন হতে এবং তার বেশির ভাগই হচ্ছে মূলধন দ্রব্য, ধাতু ও রাসায়নিক দ্রব্য। এগুলি এখন টাকায় (এবং অন্যান্য দেশ থেকে আমদানির তুলনায়) সস্তা হবে। কিন্তু ব্রিটেন থেকে আমাদের আমদানির একটা বড়ো অনুপাতের খরচ মেটানো হয় ঐ দেশ থেকে গৃহীত সাহায্য হতে। পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস যুক্তরাজ্য থেকে বৈদেশিক সাহায্যের (টাকায়) মূল্যে কমিয়ে দিয়েছে।

ব্রিটেন ছিল বৈদেশিক ঋণের একটি প্রধান উৎস—ভারতের স্টার্লিং দেনা তার স্টার্লিং আকারে দেয় মোট বৈদেশিক কর্জের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ। পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসের দরুন যুক্তরাজ্যকে পরিশোধ্য ঋণ ও সুদদানের বাজেট-সংক্রান্ত বোঝা (ভারতীয় টাকায়) শতকরা ১৪·৩ ভাগ কমে যাবে।

স্টার্লিং সঞ্চয় ও ঋণের উপর অভিঘাত

ভারতের স্টার্লিং সঞ্চয় হচ্ছে (পুরোনো বিনিময়-হারে) প্রায় ৭৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ তার সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রার মোট সঞ্চয়ের প্রায় একের ছয় ভাগ। এই সংরক্ষণের সোনায় মূল্য—পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসের অনুপাতে (শতকরা ১৪·৩ ভাগ)—কমে গেছে। অবশ্য ব্রিটেনে পাওনা মেটানোর ব্যাপারে ঐ সংরক্ষণের মূল্য অটুট রয়েছে।

পাউণ্ডের সাম্প্রতিক মূল্য হ্রাসকে ব্রিটেনের দিক থেকে য়ুরোপের সাধারণ বাজারে যোগ দেবার প্রস্তুতি হিসাবে দেখা যেতে পারে। ব্রিটেন য়ুরোপের সাধারণ বাজারে প্রবেশ করলে ঐ সংস্থার সদস্য দেশগুলির উৎপন্ন-দ্রব্যের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন এবং ভারতের মতো অসদস্য দেশের রপ্তানির পথে বাধানিষেধ আরোপ ব্রিটেনে রপ্তানি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সংকুচিত করে দেবে।

যুক্ত রাজ্যের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হতে পারে সাধারণ বাজার গঠন এবং সমুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাড়াবাড়ি রকমের প্রয়াসের মতো বাধা-নিষেধমূলক নীতি দ্বারা, পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস থেকে নয়। নূন ব্যয়ের উৎপাদন থেকে লাভবান হবার জন্য যে সময় শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যকার শুল্ক প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, সে সময় বেশ খানিকটা প্রাকৃতিক সুবিধা আছে এ রকম উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে জিনিসপত্র অগ্রসর দেশগুলিতে প্রবেশ করতে না দেওয়া যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না।

যা হওয়া উচিত ভারতের সংরক্ষণ তার চেয়ে এখন কম। আন্তর্জাতিক টাকাকড়ি-সংক্রান্ত ভাণ্ডার থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমরা আগেই কর্জ নিয়েছি। চা, পাট ও কার্পাস দ্রব্যের মতো চিরাচরিত রপ্তানির গুরুত্ব থাকলেও রপ্তানি সম্প্রসারণের প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে আকরীয় ধাতু, চামড়ার দ্রব্যের মতো নতুন বস্তু এবং রাসায়নিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পজাত বিবিধ সামগ্রী। উৎপাদনের বৈচিত্র্যকরণ, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি দ্বারা বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করা কোনো শিল্পগুলির পক্ষে এখন সব চাইতে দরকার।

শান্তিকুমার ঘোষ

৩

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ছবি: বিমল

'দিদি, শিবুদা এসেছে।'

পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল যমুনা। হাসির কথা শুনে চমকে শিবনাথকে দেখল। তার গায়ে অল্প অল্প রং-এর দাগ, হাতে আবীরের ঠোঙা। যমুনার দিকে চোখ পড়তেই মনের বিশৃঙ্খল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে হাত মুঠো করে থাকল শিবনাথ।

সে অনেক পরে হঠাৎ আবার যমুনার কাছে এল। প্রথমেই কথা বলতে পারল না। এমন করে এক কথায় এখানে চলে আসার সঙ্কোচ তাকে বড় দুর্বল করে রাখল। কিন্তু চুপ করে বাইরে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেও আস্তে আস্তে একটা অপ্রীতিকর সকাল, মনোমালিন্যের সব গ্লানি শিবনাথের মন থেকে মুছে যাচ্ছিল।

পলকে যমুনাকে দেখে নিয়েছে সে—দেখেছে যমুনার শাড়ি সাদা, রং-এর ছোপ নেই, আবীরের দাগও নেই তার দেহের কোথাও। তার মতন যমুনারও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কারণ বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল শিবনাথের কাছে। তার মুঠি আলগা হয়ে এসেছে। তার খেয়াল ছিল না যে, ফুটো ঠোঙা থেকে সব আবীর মাটিতে পড়ে গেছে।

তাঁবুর ভিতর মাটি স্যাঁতসেঁতে। কিছু আগে জল ঢালবার সময় যমুনার হাত ফসকে জল পড়েছিল মাটিতে, তার পায়ে কাদার মতন দাগ লেগেছিল—তা ধুয়ে ফেলবার এখন ইচ্ছা হচ্ছিল যমুনার। সে পা কাত করে তার পায়ের ময়লা দেখছিল। প্রথমে বিস্ময় এবং খুশির একটা চমক তার অনুভূতিকে খুব চোখা করে তুললেও পরে শিবনাথের সঙ্গে কথা বলবার ভাষা তার মুখে এল না।

এখন হারকু সাহেব নেই, রাধানাথবাবুও বাইরে গেছে। সুযোগ বুঝে এই সময় এসেছে শিবনাথ—সেদিনকার অপমানের শোধ নেবে। কয়েকদিন থেকে বড় অবসন্ন হয়ে আছে যমুনা। তার এখন তর্কাতর্কি করবার ইচ্ছা ছিল না—ভয় হচ্ছিল, শিবনাথ যে আবার তার কাছে এসেছে সে কথা হারকু সাহেব শুনবে, আর সকলে জেনে যাবে এবং তা হলে হয়তো পরের ক্যাম্পে লীলা সার্কাস কুইন হয়েই থাকবে—তার জন্যে কিছু করবে না হারকু সাহেব।

যমুনা শিবনাথকে ভেতরে ডাকল না, বসতে বলল না। তার পায়ে নরম মাটির দাগ দেখতে দেখতে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'রং খেলতে এসেছেন?'

শিবনাথ ছেঁড়া ঠোঙা মাটিতে ফেলে দিয়ে তার হাতের রং শার্টে ঘষতে ঘষতে বলল, 'হাসি ডেকে আনল, তাই এলাম—।' যমুনার শাড়ি ও মুখ গলা পা এইসব একবার ভাল করে দেখে সে হাসল, 'আমি এ বছর রং খেলি নি—।' যমুনা কিছু না বললেও কথা বলতে বলতে শিবনাথ অন্যমনস্কের মতন তাঁবুর ভেতরে ঢুকল, 'তুমিও দেখছি রং খেলতে বার হও নি, শাড়ি একেবারে সাদা—'

শিবনাথের স্পষ্ট প্রশ্নের মধ্যে এমন এক অন্তরঙ্গতার সুর বেজেছিল যা যমুনাকে কিছু সময়ের জন্যে অপ্রস্তুতের মতন করে তুলল এবং তার কথার উত্তরে একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেওয়ার আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেও যমুনা হঠাৎ স্থির করতে পারল না কী বলবে। এই সময় রং-এর বালতি নিয়ে কেউ এখানে এসে পড়লেই যেন ভাল হত।

যমুনা অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওসব আর ভাল লাগে না। ছেলেখেলা করবার সময় কোথায়!'

'তা ঠিক। আমারও সেইরকম মনে হয়েছিল—'

'আপনি তো খেলেছেন দেখছি।'

শিবনাথ এখনো রং ঝাড়তে ঝাড়তে বলল 'এসব হাসির কাণ্ড।'

'বসুন না শিবুদা—।' যমুনার শুকনো মুখ, কাঠ-কাঠ ভাব হাসির ভাল লাগছিল না বলে খাট থেকে দু-একটা ময়লা কাপড়, পাউডারের টিন আর রাধানাথবাবুর ভিজে গামছা সরিয়ে দিয়ে সে শিবনাথকে বসবার কথা বলল।

হাসির কথায় শিবনাথ বসতে পারল না। এবং হঠাৎ এখান থেকে কেমন করে চলে যাবে তা-ও ভাবতে পারল না। এ যেন কোন অন্যায় না করে উপযাচক হয়ে হার স্বীকার করার মতন। তা করতেও হয়তো কোন দ্বিধা করত না শিবনাথ, ইতস্তত করত না যদি যমুনাও তার দিক থেকে কিছু কোমল হত—সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে তার সঙ্গে আবার আগের মতন ব্যবহার করবার চেষ্টা করত।

শিবনাথের হাতে আবীর ছিল না, রং খেলবার কোন সরঞ্জাম নিয়ে সে যমুনার কাছে আসে নি, হাসির কথায় কেন হঠাৎ চলে এসেছে তা তাকে বুঝিয়ে বলবার সময় এখন নয়, সুযোগও নেই। শিবনাথের মনে হল, সে যমুনার কাছে তার দুর্বলতার পরিচয় দেওয়ার জন্যেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে এবং নিজেকে তার কাছে আরও ছোট করে তুলেছে।

এইরকম অসংলগ্ন ভাবনা আসছে

ভাবতে শিবনাথ বলল, 'রাধানাথবাবুর সেদিনের কথা শুনে আমার মাথাটা হঠাৎ বড় গরম হয়ে উঠেছিল, উনি যা-তা বলেছিলেন বলে—'

যমুনা বলল, 'সেসব এখন আর বলে লাভ কী। যদি কিছু বলবার থাকে, বাবাকেই বলবেন।'

শিবনাথ হাসল, 'তিনি আমার কথা কি আর শুনবেন, কোথা থেকে কী হয়ে গেছে, তুমি তো সবই বুঝতে পার।'

যমুনা তার ঠান্ডা এবং বিষণ্ণ মুখ তুলে শিবনাথকে দেখল, কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে আস্তে বলল, 'কী আবার হবে, কিছুই হয় নি—।' আরও পরে শিবনাথকে সুযোগ মতন আঘাত করার তীব্র ইচ্ছা তার বুক ঠেলে উঠছিল বলে সে বলল, 'কিছু হয়ে থাকলে তো ভালই—আমার ভাল হয়েছে তো।'

যমুনার ভাল কী হয়েছে তা শিবনাথ বুঝতে পারল না। তার মনে হল, সে তাকে বিদ্রূপ করছে। কেননা, যমুনার স্বরে সুখের কোন প্রকাশ ছিল না, তার এক-একটি কথা ভিজে, ভারী—দুঃখ প্রকাশ করার মতন। তার দুঃখের কারণও ধরতে পারল না শিবনাথ।

তা হলেও নিজের দুর্বলতা ও কৌতূহল দমন করবার খুব চেষ্টা করতে করতে সে বলল, 'ভাল হলেই ভাল, কিন্তু কী হল?'

এক পা দিয়ে আর এক পা ঘষে ঘষে ময়লা তুলে ফেলেছে যমুনা, এখনো তার দৃষ্টি ছিল পায়ের দিকেই, 'পরের ক্যাম্পে আমি সার্কাস কুইন হব, শুনেছেন?'

খুব জোরে বলে উঠল যমুনা এবং তাকিয়ে থাকল শিবনাথের মুখের দিকে। কিন্তু সে তখনো হাসছিল, 'শুনিনি, তবে আঁচ করতে পারছিলাম এমন একটা কিছু হবে—'

যমুনার মনে হল শিবনাথ তাকে খোঁচা মারছে, তার হাসি কতকটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করবার মতন। যমুনা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করে বুঝলেন?'

'ওসব আমি বুঝতে পারি', শিবনাথের মুখ থেকে অল্প অল্প হাসির রেখা মিলিয়ে গিয়েছিল, মৃদু ঝাঁজের আভাস ছিল তার কথায়, 'এসব না হলে সার্কাস চলে কী করে!'

যমুনা শিবনাথের কথার অর্থ না বুঝে উচ্চস্বরে বলল, 'কী বলছেন, বুঝি না।'

শিবনাথ বলল, 'থাক যমুনা, বুঝে আর কাজ নেই। তোমার ভাল হয়েছে, সুখের কথা—'

'হ্যাঁ, খুব ভাল হয়েছে।'

'ব্যস, ফুরিয়ে গেল', শিবনাথের কথাও ফুরিয়ে গিয়েছিল, এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার আর কোন মানে হয় না, তা হলেও তার মনে হল, যমুনা বড় অসহায়, সে ভুল করেছে। তাকে আরও দূরে ঠেলে দিতে মন চাইল না শিবনাথের। সে তার ভুল সংশোধন করে দেখার আর অল্প চেষ্টা করল, 'তবে কী জান যমুনা, সময়ে তোমার আরও ভাল হত—' একটু চুপ করে থেকে শিবনাথ হাসির শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাল-মন্দ বোঝবার মতন বুদ্ধি আছে তোমার, আমি আর কী বলব!'

যমুনা বলল, 'আগে ছিল না, এখন হয়েছে—।' শিবনাথের সঙ্গে ঝগড়া করবার মতন স্বরে সে কিছু পরে আরও বলল, 'সময়ে আর কী ভাল হত আমার, বলতে পারেন?'

'দেখতেই পেতে।'

যমুনা বারবার বাইরে তাকিয়ে দেখছিল, পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠছিল। শিবনাথের সঙ্গে এমন অস্থির হয়ে সে ছাড়া-ছাড়া কথা বলছিল, 'সার্কাসের মেয়ের সময় বড় কম শিববাবু, বেশীদিন বসে থাকলে বয়স বেড়ে যায় না?'

'আমি সার্কাসের কথা ভাবি না।'

'তবে কিসের কথা ভাবেন?'

শিবনাথ ভেবে ভেবে আস্তে আস্তে বলল, 'আরও পরের কথা—যখন খেলবার সময় ফুরিয়ে যাবে, মালিক কিংবা জেনারেল ম্যানেজার আর টানবে না—'

যমুনা শিবনাথের সব কথা শুনতে পারল না, বাধা দিয়ে বলল, 'সে তো অনেক পরের কথা, কিন্তু যতদিন খেলা দেখাবার ক্ষমতা আছে ততদিন নিজের ভালমন্দ নিজে না বুঝলে চলবে কেন!'

'তা তো ঠিক,' চলে যাচ্ছিল শিবনাথ, বার হতে গিয়ে থামল, পিছন ফিরে বলল, 'এই ভাল-মন্দ আগে বুঝলে অনেক ভাল হত যমুনা, আর এক-জনের ঘাড়ে শুধু শুধু দোষ চাপাতে হত না।'

যমুনা এত সময় ধৈর্য রেখেছিল, আর পারল না। তার বুকের মধ্যে যে ব্যথা দপদপ করে উঠছিল, এখন তা গলা ঠেলে বেরিয়ে এল, 'মিছে কথা বলবেন না, আমি কারুর ঘাড়ে দোষ চাপাইনি—'

'তা তুমিই জান', শিবনাথ বলল, 'একটা বাজে লোকের ভাঁওতায় ভুলে তোমরা সকলে মিলে আমাকে জব্দ করে দিলে।'

'বাজে লোক বলছেন কাকে?' যমুনা কিছু উচ্চস্বরে বলল, 'ওসব আর বলবেন না। যে কথা রাখে, মানুষের উপকার করে তাকে যদি বাজে লোক বলেন, তবে আপনি নিজে কী?'

শিবনাথ রাগল না, যমুনার কথায় ঝাঁজের প্রকাশ দেখে হাসল, 'তা-ও তুমি জান যমুনা।'

কথা শেষ করে শিবনাথ আর দাঁড়িয়ে থাকল না, বাইরে রোদে বেরিয়ে এল। হাসি দাঁড়িয়ে ছিল এক দিকে চুপচাপ। শিব-নাথ তার দিকেও আর দেখল না, পালিয়ে যাবার মতন সে পা টিপে টিপে হাঁটছিল। মান সম্মান আর কিছু ছিল না তার, নির্জনে কোথাও কিছু সময় সে আত্মগোপন করে থাকতে চাচ্ছিল। কিন্তু নির্জন জায়গা এখানে নেই, শিবনাথকে যমুনার তাঁবু থেকে বার হতে দেখেছে অনেক মানুষ। তারা রং খেলতে খেলতে চিৎকার করতে থাকলেও শিবনাথের মনে হচ্ছিল তারা তাকে লক্ষ করেই হাসাহাসি করছে।

শিবনাথ বার হয়ে যেতেই হাসির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যমুনা, তার কাঁধে হাত রেখে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কেন তুই ডেকে আনতে গেলি মানুষটাকে? কেন, বল?'

যমুনার বিবর্ণ মুখ ও একটা অস্থিরতা লক্ষ করতে করতে হাসির ধারণা হয়েছিল, শিবনাথকে দেখে সে খুশী হবে, আবার হাসাহাসি করবে এবং আগের মতন মিষ্টি করে কথা বলবে—আজ কেউ ছিল না বলেই শিবনাথকে জোর করে টেনে এনেছিল হাসি। কিন্তু যত সময় ছিল শিবনাথ তত সময় যমুনা ও তার কথা শুনতে শুনতে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হাসি, তার দুঃখ হচ্ছিল। সে ভাবছিল দোলের দিন তার জন্যেই যমুনার কড়া কথা শুনতে হল শিবনাথকে।

'ভাল বুঝেছিলাম, তাই ডেকেছিলাম—' যমুনার অপ্রকৃতিস্থ ভাব দেখে একটুও ভয়

পেল না হাসি, তার হাত সরিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করল না, গলার স্বর যমুনার চেয়েও অনেক বেশী তুলে বলল, 'মানুষটার সাথে যেমন ব্যবহার করলি—আর আসবে না।'

'কে চায় তার মুখ দেখতে?' যমুনা আরও জোরে হাসিকে নাড়া দিতে দিতে বলল, 'কেন তুই তার রাউটিতে গেছিলি, শুনি? বাবা যদি জানতে পারে, হারকু সাহেব যদি টের পায়?'

'কী হবে তবে?' হাসি অবোধ মেয়ের মতন যমুনার মুখের ওপর দু' চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল।

'জানিস না? লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে—'

হাসির জেদ চেপে গিয়েছিল, এত পরে সে জোর করে যমুনার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তা বলে মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে হবে? তাড়িয়ে দেবার হলে অনেক আগেই দিত—বুঝলি?'

যমুনার মাথার ঠিক ছিল না, তার চোখ দপদপ করছিল, গলা শুকিয়ে আসছিল—হাসির সঙ্গে ঝগড়া করলেও মনে মনে সে যেন নিজেকে শাসন করছিল—কথা বলে বলে নিজেকেই বোঝাতে চাচ্ছিল যে, সে কোন ভুল, কোন অন্যায় করেনি।

'যাকে দিয়ে কোন উপকার পাব না, যার কোন ক্ষমতা নেই তার সাথে ভাল ব্যবহার করে কী লাভ হবে আমার? সে মানুষ যত দূরে দূরে থাকে ততই আমার ভাল।'

'দূর করে তো দিলি, এখন যাকে দিয়ে উপকার পাবি তাকে মাথায় রাখ—' যমুনাকে

আরও কিছু শোনাতে যাচ্ছিল হাসি কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে চুপ হয়ে গেল। সে দেখল উত্তেজনার আর কোন প্রকাশ নেই যমুনার মুখে। হঠাৎ বড় শান্ত হয়ে গেছে সে এবং তার চোখ থেকে জল পড়ে যাচ্ছে।

কিছু সময় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হাসি, পরে যমুনার গায়ে হাত রেখে খুব আস্তে বলল, 'দিদি, কাঁদছিস কেন রে?'

যমুনা হাসির হাত জোরে ঠেলে দিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'আমার যা খুশি আমি তাই করব। তোর কী? তুই যা আমার সমুখ থেকে—' সে খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে মুখ ঢাকল।

হাসি যমুনার গায়ে আর হাত রাখল না, কথাও বলল না, কিন্তু খুশির একটা আভা ফুটে উঠেছিল তার মুখে—শিবনাথকে আর একবার এখানে নিয়ে আসবার ইচ্ছা হচ্ছিল হাসির।

ইচ্ছা হলেও হাসি জানত সে আর কোন-দিন শিবনাথের সামনে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারবে না। আজও তার তাঁবুতে আবীরের ঠোঙা নিয়ে যেত না, কয়েক দিন থেকে হাসির মন খুব সংশয়

ছিল না বলেই সে গিয়েছিল। মোহনলাল তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়, ভাল করে কথা বলে না। হাসি ভেবেছিল, আজ সে অন্তত একবার আসবে—রং খেলবে। মোহনলাল এল না।

কাল রাতে হাসি একসময় যমুনাকে বলেছিল, 'দিদি, মোহনবাবুর কী হয়েছে জানিস?'

আজকাল যমুনার মেজাজ কোন সময় প্রসন্ন থাকে না, হাসির প্রশ্ন শুনে সে আরও বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'কে জানে। রাজ্যের মানুষের মনের খবর রাখার গরজ আমার নেই।'

'মোহনবাবু রাজ্যের মানুষ হল?'

'থাম, থাম—।' তাড়া দিয়ে হাসিকে থামিয়ে দিয়েছিল যমুনা। ঘুমবার ভান করে অন্য পাশ ফিরে শুয়েছিল। কিন্তু হাসি জানে, রোজকার মতন কালও অনেক রাত অবধি ঘুমতে পারেনি যমুনা—ছটফট করছিল, এক-একবার জোরে জোরে ভারী নিশ্বাস ফেলছিল। তখন শিবনাথের কথা মনে হয়েছিল হাসির এবং রং খেলবার ছল করে সে তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসার কথাও ভেবে রেখেছিল।

যমুনার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না হাসির। সে যেমন ভেবেছিল তেমন হল না। হাসি জানে, এর পর যমুনার মেজাজ আরও খারাপ হবে এবং শিবনাথকে ডেকে আনবার জন্যে পরে সে তাকে আবার বকাঝকি করবে। মোহনলালের সব কথা হাসি তাকে শিগগির বলতে পারবে না।

টালিগঞ্জে এসে অনেক বদলে গেছে মোহনলাল। সার্কাসে সে আর বেশী দিন থাকবে না। এই ক্যাম্প শেষ হলেই সে কাজ ছেড়ে চলে যাবে। শুধু সার্কাস ছেড়ে নয়, টালিগঞ্জে আসবার কিছু পরেই হাসির মনে হয়েছে তাকেও তার ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা—সে কথা স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছে মোহনলাল।

খেলার সময় সে মুখ নিচু করে গীটার বাজায়, হাসির দিকে আগের মতন তাকিয়ে দেখে না। প্র্যাকটিসে যাওয়া-আসার সময় কিংবা হঠাৎ কখন দেখা হয়ে গেলে মোহনলাল তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যায়—এমন ভাব দেখায় যেন সে হাসিকে দেখতে পায়নি। কয়েকদিন সকালবেলা মোহনলালকে খুঁজেছিল হাসি, দেখা পায়নি। সকালে সে আজকাল তাঁবুতে থাকে না, কোথায় যায় হাসি জানে না—চাকরি খুঁজতে কিনা, কে জানে।

'কোথায় যান রোজ রোজ?' একদিন প্র্যাকটিস শেষ হয়ে যাওয়ার পর মোহনলালকে দেখতে পেয়ে যমুনাকে এগিয়ে যেতে দিয়েছিল হাসি, নিজে একটু পিছিয়ে পড়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'অন্য কাজ পেয়েছেন নাকি?'

'কাজ? না। তবে এই, কাজের মতন আর কী!'

'কী?'

'বাড়ি বাড়ি গিয়ে গীটার শেখাতে হবে। মাইনে ছাড়ার সার্কাসের চেয়ে অনেক বেশী। আর খাতিরও কত!'

মোহনলালের কথা বুঝতে পারেনি হাসি, আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কাদের বাজনা শেখাবেন?'

'কত মেয়ে শিখতে চেয়েছে আমার কাছে—' মোহনলাল আঙুল তুলে বলেছিল, 'ওইসব বাড়িতে থাকে। সার্কাস দেখতে আসে, দেখনি? কী সুন্দর দেখতে এক-একজন!'

'ওদের শেখাবেন?'

'শেখাব না?' মোহনলালের চোখে অহঙ্কার দপদপ করে উঠেছিল, 'খেলা দেখতে এসে ওরা কান খাড়া করে গীটার শুনেছে—যেচে আলাপ জমিয়েছে আমার সঙ্গে—বাড়িতে ডেকেছে—'

'গিয়েছিলেন?'

'রোজই তো যাই—' তেমন সব মেয়েদের কথা ভাবতে ভাবতেই সার্কাসের পাঁচিলের ওপারে সাদা আর হলদে রং-এর বাড়ি দেখতে দেখতে মোহনলাল বলেছিল লেখাপড়া জানা ভদ্রমানুষের কথাবার্তা বলবার ধরনই আলাদা। তারা বাজনা শোনে, গুণের কদর বোঝে। সার্কাসের মানুষের মতন এমন আকাঠ নয়।'

মোহনলালের কথা শুনতে শুনতে হাসির মনে হয়েছিল, সার্কাসের মানুষ বলে সে তাকেও এখন ধরে নিয়েছে, কেননা তার দৃষ্টিতে অবজ্ঞার এমন অদ্ভুত প্রকাশ ছিল, যা হাসির মনে কাঁটার মতন ফুটেছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে বলেছিল, 'কাজ ছেড়ে চলে যাবেন আপনি, মোহনবাবু?'

'হ্যাঁ, যাব। আর না খুব হয়েছে। অনেক পাপ করেছিলাম তাই এতদিন থাকতে হল।'

হাসির কথা ভাবল না মোহনলাল, সে নিজে কোথায় থাকবে, কোন্নগরের পাকা বাড়িতে চলে যাবে কিনা তা-ও বলল না। হাসির চুপ করে সরে যাওয়া উচিত ছিল, সে যেতে পারল না—আরও স্পষ্ট করে মোহনলালের কথা শুনতে চাইল।

'কোথায় থাকবেন?'

এখানে প্রথম এসে যেখানে ছিলাম, মেসে। কথাবার্তা বলে রেখেছি। এই ক্যাম্প শেষ হবে—ব্যস আমিও নেই—।' হাসির দিকে দেখেনি মোহনলাল, তাকে আর কোন কথা বলবার সুযোগও দেয়নি, আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে গিয়েছিল।

সেই শেষ। তারপর মোহনলালের সঙ্গে আর কথা হয়নি হাসির। এ সময় যমুনার মন প্রসন্ন থাকলে সে তাকে সব বলতে পারত, মোহনলালকে ডেকে এনে কখনো তা হলে খোলাখুলি জেনে নিতে পারত, সে কী করবে। এইসব ভেবেই শিবনাথের কাছে গিয়েছিল হাসি।

কলের কাছে ভিড় জমেছে। হাসির দিকে তাকিয়ে যুগল হাসছে। হাসি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু এখন সে মনে মনে যুগলকেই ডাকছিল। এবং এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাধানাথবাবুর ওপর টান অনেক কমে আসছিল হাসির।

'দিদি, হারকু সাহেব—' কিছু দূরে হারকু সাহেবকে দেখে যমুনাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে হাসি বলল।

এত তাড়াতাড়ি হারকু সাহেবের ফেরবার কথা নয়, যমুনা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তাদের তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে করালীকান্তর সঙ্গে কথা বলছে হারকু সাহেব।

চোখে দ্রুত আঁচল বুলিয়ে হাসিকে আবার ধমক দিল যমুনা, 'হল এবার?'

'কী?'

'কেন এসেছে হারকু সাহেব, জানিস না? শিবনাথের কথা যদি জিজ্ঞেস করে তবে কী বলব আমি?'

হাসির ভয় লাগছিল। তার মনে হচ্ছিল, এখুনি একটা গোলমাল হবে, তাঁবুর মধ্যে এসে তাকে খুব বকবে হারকু সাহেব—মারবে। এখন রাধানাথবাবুও নেই যমুনাও তাকে বাধা দেবে না। হাসি ভাবছিল, তা হলে সে আবার শিবনাথের কাছেই ছুটে যাবে—তাকে গিয়ে বলবে, আপনাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে এরা যে মেরে ফেলল—আমাকে বাঁচান! ক্রমশ

বিশুখুড়ো বলিতে লাগিলেন : "বিলেতে পাউণ্ড ডি-ভ্যালুড হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পঃ বঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা "ডি-ভ্যালুড" করলেন রাজ্যপাল ধর্মবীর। পাউণ্ডের ক্ষেত্রে পণ্যের বাজারের

হালচাল যেমন আমাদের বুদ্ধির অগম্য তেমনি আইন এবং রাজনীতির চালচলতিও আমরা একেবারেই বুঝিনে। তবু বারবার মনে হচ্ছে, 'পেনি ওয়াইজ' কথাটার সঙ্গে যেন কোথায় এর মিল আছে!!"

সহযাত্রী বলিলেন—"মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কোন কোন মন্ত্রী শহীদ-বেদীতে মাল্যদান করেছেন। আজীবন নো চেঞ্জার-খ্যাত ডঃ ঘোষও হয়ত গান্ধীজীর স্মৃতি-স্তম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন শুধু কারফু বলবৎ থাকায় আমরা তা দেখতে পাইনি!!"

'**আইন** পরীক্ষাও পিছিয়ে গেল'—একটি সংবাদ-শিরোনামা।—'এতে খুব একটা ক্ষতি হবে বলে ত মনে হয় না; গোটা আইন-এর অবস্থাই যেখানে টলমল সেখানে আইনের পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়াটা বড় কথা নয়'—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শ্রীমোরারজী দেশাই জানাইয়াছেন যে এ যাবৎ ঋণ করিয়া কোন ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। খুড়ো বলিলেন—"অন্তত ঋণ করে ঘৃতং পিবেৎ সম্ভব হয়েছে কিনা সে কথাটা দেশাইজী জানাতে পারতেন!!"

সংবাদে শুনিলাম, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব ছাত্র প্রাক-স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ইংরেজীতে ফেল করিয়াছে তাহাদিগকে পাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—"তা হলে এমন আর কী হল, সব বিষয়ে ফেল-করা ছাত্রদের যদি পাস করিয়ে দিতে পারতেন তাহলে বুঝতাম মগধ একটা কাজের কাজ করেছে"—বলেন সহযাত্রী।

কেন্দ্র নাকি পঃ বঙ্গকে পরামর্শ দিয়াছেন—আয়ের কথা জানিয়া ব্যয় করুন। সহযাত্রী বলিলেন—"কাঁদানে গ্যাস, গুলিবারুদ কিন্তু আয় বুঝে ব্যয় করা যায় না!!"

সাপ্তাহিক সংবাদ : অবিবাহিত বা অবিবাহিতারা কর বাবদ রেহাই পাইবেন না। —"না পাওয়ারই কথা। কর পীড়ন না করেও যে কর দিতে হয় সেটাই ত সত্যিকারের কর; তার ভারে যদি একদিন সাতপাকের দাম বুঝতে পারে তাহলে আর ঘুরপাক খেয়ে মরতে হয় না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলিতে নাকি অস্বীকার করেন।—"হয়ত 'কু-কথা বলিও না' নীতিবাক্যটি তাঁর মনে পড়েছে। কিন্তু

তিনি নাকি আবার বলেছেন—যা বলবার তা লিখে পাঠাবেন। এ ক্ষেত্রেও ডঃ ঘোষের মনে করা উচিত ছিল—শতংবদ মা লিখ"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

মদ্যপান বর্জিত হইলে রাজ্যগুলির যে অর্থ ক্ষতি হইবে সেই আয়ের ঘাটতি কেন্দ্র মিটাইতে পারিবে না—বলিয়াছেন শ্রীমেটা। —"তা হলে আর কেন বাবা ঘা করছ খুঁচিয়ে" জড়িত কণ্ঠে মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম, জনাব ভুট্টো নাকি গোটা আসামই পাকিস্তানের জন্য দাবি করিয়াছেন।—"কয়েকদিন আগে জনাবের রবীন্দ্র-প্রীতির কথা শুনেছিলাম, এখন দেখছি তিনি শুধু রবীন্দ্র-কাব্যই নয়, উপনিষদও পড়েছেন এবং বুঝে নিয়েছেন নাল্পে সুখমস্তি"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

সোনারপুরের নিকটবর্তী কোন এক স্থানে কুঁড়িজনের এক নারী বাহিনী নাকি আঁশবটি লইয়া একটি পুলিস

বাহিনীকে আক্রমণ করে।—"কে বলে মা তুমি অবলে"—সংক্ষেপে বলেন সহযাত্রী।

জোতদাররা নাকি এই প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন করিলেন।—"একবারে মোক্ষম ইউনিয়ন। রাজাগজার সঙ্গে আইজ্ফ ফাজলামি মারাতি"—নাটকের প্যারডি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় সরকার খোলা বাজারের জন্য আংশিক চিনি ছাড়িয়াছেন।—"না ছাড়লেও চলত। আমরা চিনির চেয়ে চুমো মিঠে-র কথাটাই আবার নূতন করে ভাবছি"—বলেন সহযাত্রী।

ভারতের অধিনায়ক পতৌদি বলিয়াছেন, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতকে পরাজিত করা সহজ হইবে না। সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা পাডিংটা খাওয়ার পরেই এর গুণাগুণ সম্বন্ধে মন্তব্য করব।"

বন্ধুটির নাম বলবো না। বেচারা এখন গৃহস্থ হয়েছে। মনে করুন না, ওর নাম মণীন্দ্র। মণীন্দ্র আর আমি একদিন সন্ধ্যেবেলা বশিরের গুহায় ধরা পড়লাম। বশিরের বৌ কমলা সবে মাত্র গেলাস-টেলাস আনিয়ে দিয়েছে, পাতায় করে ডিম ভাজা আনিয়ে দিয়েছে দুটো, এমন সময় বন্ধ দরোজায় ধপাধপ আওয়াজ—দরজা খোল শিগগির। কমলা একটু হতচকিত, এখন তো পুলিসের আসার কথা নয়, তবে কি চৌধুরী সাহেব টহল দিতে বেরিয়েছে! কমলা কারবারের অংশীদার হলেও পুলিস-ফুলিস সামলানো ওর কর্ম নয়। আমরা জিজ্ঞেস করলুম—"বশির কোথায়?"

—লালবাজার থেকে ওকে ডেকে পাঠিয়েছে, কমলা বললো, দেখুন তো দাদা কী মুশকিল, চীনে পাড়ায় খুন হলেই ওর ডাক পড়বে এ অন্যায় নয় তাছাড়া, এখনও নয়, পাশের গলিতে কাল রাত্তিরে মারামারি করতে গিয়ে একজন ছুরি খেয়েছে—বশির তার কী করবে? উপরন্তু এই পুলিসের হামলা, ভালো লাগে? একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না এরা!

—এই, দরওয়াজা খোল, কোন্ হায়?

কমলা বললো, "আপনারা যেমন আছেন তেমনি বসে থাকুন দাদা, আমি দেখছি।" এই বলে ও দরজা খুললো। অমনি চার পাঁচজন সিপাহী হুড়মুড় করে ঢুকলো ঘরে—হাতে হাণ্টার ও টর্চ। সংগে আবার একজন সার্জেণ্ট। ফটাস ফটাস করে ঘা মেরে বোতল গেলাসগুলো ভাঙলো, একটা নিরীহ কুপী জ্বলছিল ঘরটার কোণে, সে বেচারাও হাণ্টারের এক বাড়ি খেয়ে গেল উল্টে। প্রকাণ্ড ঘরটা অন্ধকার ঘুটঘুটে। কমলা অবাক হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে। ভাগ্যিস ব্লাডার থেকে ঢালে নি তখনও!

—আর কেউ আছে ভেতরে? ওরা জিজ্ঞেস করল। কমলা মোম জ্বেলে জানালাতে বলল, "দেখুন না, নিজেরাই খুঁজে দেখুন। এই দুজন ভদ্দরলোক একটু খেতে এসেছেন, আর আপনারা, এসে করছেন কী?"

সত্যি কথা বলতে কী, আমি একটু ভ

হুড়মুড় করে ঢুকলো

পেয়ে গেছি। এদের হাণ্টারের ঘা যদি পিঠে পড়ে তো খুব চোট লাগবে। স্কুলে কখনো প্রহার খাই নি, আর এখানে এসে..! আসলে, এই ভাঁটিখানায় তো আমাদের আসার কথা না। আবার ভাবছি, কাল সকালেই আপিস, হাজতে পুরে রাখলে যাবো কী করে। মণীন্দ্র কিন্তু নির্ভয়। ওর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট দিল আমায়, নিজে ধরাল। টান দিয়ে আলতো করে চিমটি কাটলো আমার পায়ে—অর্থাৎ ধৈর্য ধর, নার্ভাস হয়ে লাভ নেই; তোমার আপিস, আর আমার কাল পাকা-দেখা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটু পরে যখন দরজার মুখে দুজন বাদে আর সব সিপাহীরা চলে গেছে, তখন কমলাকে জিজ্ঞেস করল—"এতো দেরী হচ্ছে কেন বশিরের? যে ছেলেটির কথা ও বলেছিল সে কি এসেছে?"

অমনি এক সিপাহী—বাঙালী—ছুটে এসে প্রশ্ন করে, কার কথা বলছেন?

মণীন্দ্র পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে নাড়াতে-নাড়াতে কিঞ্চিৎ অবহেলার সংগে জানাল, মণীন্দ্রের আপিসে একটি ছেলের চাকরী করে দেবার কথা বলেছিল বশির অনেকবার; আজ সন্ধ্যে আটটায় এখানে তার দেখা করার কথা, অথচ এমন দায়িত্ববোধ-শূন্য এরা—দুজনের কারো দেখা নেই। কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়! কারো উপকার করতে নেই এই যুগে, বলে উঠে পড়ল বেঞ্চি থেকে, দরোজার দিকে অগ্রসর হলো তারপর, এবং কমলাকে ডেকে জানাল—বশির এলে বলিস আমরা অপেক্ষা করে-করে চলে গেছি।" সেপাইবাবু একটু মুচকে হেসে বলল—"চাকরী দেবার জন্যে এই গহ্বর পর্যন্ত ছুটে এসেছেন আপনারা? আহা, এমন দয়ালু..." তারপর দরজার মুখে মণীন্দ্রকে আটকে দিয়ে সবিনয় জানাল, এখন বেরোবেন না, যেখানে ছিলেন থাকুন, আগে অফিসার আসুন, তারপর দেখা যাবে। অর্থাৎ বন্দী।

—"কী ঝামেলায় পড়া গেল বাবা!" মণীন্দ্র বেশ বিরক্ত।—"কোথায় আপনাদের অফিসার, মশাই? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ডাকুন না, ওঁকে বলে চলে যাচ্ছি না হয়। এখানে অনন্তকাল বসে থাকবো নাকি?"

সেপাই বলল—"রাগ করছেন কেন স্যার। উনি রাউণ্ডে গেছেন। ধরপাকড় সেরে ফিরবেন এখুনি, তখন দেখা হবে। এই দরজায় আমাদের ডিউটি। আপনারা বেঞ্চিতে গিয়ে বসুন।"

কমলা বেচারি খুব লজ্জিত। সে একবার সেপাইদের কাছে গিয়ে মিনতি করল—"এদের ছেড়ে দিন ভাই, এরা বড়ো মানী লোক, এঁদের হেনস্তা করতে নেই।"

বারোয়ারী ওপাশে গলির উল্টোদিকে একটা পেচ্ছাপখানা, তার ওপরের ট্যাঙ্কে বসে থাকে জগ্‌গু নামে একটা বাঁদর—কমলার পোষা বাবুদের উচ্ছিষ্ট মদ খায় ভাঁড়ে করে, নয়তো ঝিমোয়; উত্তেজনা দেখে সে জেগে উঠেছে, চ্যাঁক চ্যাঁক করে ডাকছে—ব্যাপার কী, এত উৎপাত কিসের? সেপাই দুজন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, চোপ।

যথাসময়ে অফিসার এলেন। একদল হিন্দু মুসলমান চীনে ও নেপালীর সঙ্গে আমাদের দুজনকে বড়ো রাস্তার দিকে হেঁটে যেতে বলা হল। সেখানে পুলিস ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, আমরা গুটি-গুটি খাঁচার ভিতরে ঢুকলাম। থানায় যাওয়া হবে। কয়েদীদের সঙ্গে এক সারিতে বসে হাতমুঠোটিকে মুখের ভেতর রেখে চুষছি। পকেটের বিপজ্জনক কাগজগুলো একটি একটি করে ছিঁড়ছি, যাতে পরিচয় না পায় ওরা। সকালের চাকরীটি যাতে না খোয়াতে হয়। হঠাৎ মণীন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল—"করছো কী? ভিজিটিং কার্ডগুলো ছিঁড়ো না। ওই দেখিয়েই বেরোতে হতে পারে দরকার হলে...উঃ কী দুর্গন্ধ লোক-গুলোর গায়ে!...এই, তুম্‌লোগ সাবান নেই মাখ্‌তা হ্যায়?...এই বেটা আবার ঝিমোচ্ছে, আফিং খেয়েছে মনে হয়...বরং চশমাটা খুলে পকেটে রাখো, রাস্তায় লোকজন কেউ দেখে চিনতে পারে...কই মশাই গাড়িটা ছাড়ুন। উঃ, থানায় পৌঁছলে বাঁচি। এখন থেকে মুখুজ্যেকে একটা ফোন করতে হবে, তাহলেই খাপ্‌-খাপ্‌ করে ছেড়ে দেবে ওরা।" নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মণীন্দ্র।

থানায় পৌঁছে আবার গুটি-গুটি নামা। কয়েদীদের সঙ্গে সার বেঁধে আমিও ঢুকছি, দেখি আশেপাশে মণীন্দ্র নেই। গেল কোথায়, পালালো না কি? নাকি, হঠাৎ ইনকেলাব জিন্দাবাদ বলে থানায় ঢুকবে? ও সব পারে। পেছনে চেয়ে দেখলাম, এক সেপাইয়ের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর মৃদু হাসতে হাসতে সিগারেট টানছে। ভাবটা—ও বন্দী নয়, ও মজা দেখছে। তারপর আমরা ঢুকে গেলে পর ও সেপাইটির সঙ্গে এল। ওর স্কন্ধটি ধার দেওয়ার জন্যে চার আনা ভাড়া দিয়েছে। একচোট বকুনি দিল—"চোর-ছ্যাঁচোড়দের সঙ্গে লাইন বেঁধে যায় কেউ উজবুকের মতন? কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার।" বাস্তবিক, বনেদী ঘরের ছেলে ও, যার-তার সঙ্গে মিশতে পারে না।

ভেতরে ঢুকে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি। এক-এক ক'রে ডাইরী লেখা হচ্ছে আর লক-আপে পাঠানো হচ্ছে।—ভদ্রবেশী আমরা এই দুজন। আমার বুক দুরদুর করছে ভয়ে, অথচ মণীন্দ্র হঠাৎ দারোগা-বাবুকে জিজ্ঞেস করে বসলো, "ওই চেয়ারটায় একটু বসতে পারি স্যার?" দারোগা রসিক ব্যক্তি, ঘাড় নাড়লেন। চেয়ারে বসে আমরা অন্য কয়েদীদের থেকে পৃথক হলাম। মণীন্দ্রের তাতেও মন ওঠেনি। সিকি-খাওয়া সেই সেপাইটিকে ডেকে বলল—"পারে তো এক গেলাস জল দেবেন ভাই, বড়ো তেষ্টা পেয়েছে।" সেও মৃদু হেসে দেখছি জল এনে দিল। ভয়ে-ভয়ে আমি বললাম—"মণি, এখানে যেন সিগারেটটি ধরিয়ো না, চাল বাড়তে গিয়ে ওদের চটিয়ে দেওয়া হবে। বরং হাত দুটো প্রার্থনার ভঙ্গীতে জোড়া করে রাখো।"

চ্যাঁক চ্যাঁক করে ডাকছে—ব্যাপার কী...

অবশেষে ডাক পড়লো আমাদের। দারোগাবাবু সামনের চেয়ারে বসতে বললেন, নাম-ঠিকানা চাইলেন। আপত্তি সত্ত্বেও মণীন্দ্রের দেখাদেখি ঠিক ঠিক খবর দিতে হল আমাকে। ঘেমে ভিজে গেছি একেবারে। ওই উপ্‌ধারের ভরসা।

—"আচ্ছা, আপনারা এতো জায়গা থাকতে ওই চামড়ার গুদোমে ঢুকেছিলেন কেন? জানেন, ওটা ক্রিমিনালদের আড্ডা, ওই অঞ্চলে মাসে একটা-দুটো খুন হয়?" দারোগা চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করেন—"আপনাদের মতলবটা কী?"

এইবার মণীন্দ্রের হাতে তাস পড়েছে। একটা রহস্যময় জায়গায় সস্তায় কিছু চোলাই মদ গিলতে গেছি—বললো না। বললেই চালান করে দেবে। একটু হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে—"তেমন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের। জীবনের কর্কশ দিকটা একটু দেখা, এই আর কি! (আমার হাসি পাচ্ছে) আমরা লিখি-টিখি কিনা, এইসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগে (লজ্জায় মরে যাচ্ছি)। পৃথিবীতে কত বিচিত্র মানুষ আছে, জানেন, সারা জীবন ধরে দেখেও দেখা ফুরোয় না।" তারপর আমার দিকে ইশারা করে বললো—"এই বন্ধুটি একজন কবি, ফরাসী কবিতা অনুবাদ করেছেন, আমিও (মিথ্যে কথা), তাছাড়া, আমার বাড়িতেই অমুক পত্রিকার অফিস।"

কাজ হলো। ফরাসী বা কবিতার নামে দারোগা বিচলিত। কবিরা একটু উচ্ছৃঙ্খল হয় শুনে থাকবেন।—"তা, এর জন্যে ওখানে যেতে হবে এইভাবে?...না হয়, আমার সঙ্গে আসুন একদিন; ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবো রাফ সাইড অফ লাইফ। শখ মিটিয়ে দেবো।...কবে আসছেন? আগামী বুধবার? সন্ধ্যে আটটা? আপনারা এলে তবে রাউণ্ডে বেরোব।"

একটু হেসে বললেন—"আচ্ছা কোক আপনারা! চা খাবেন?"

ধোলাই দেবার বদলে পুলিস সাহেব দুজন কয়েদীকে চা খাওয়ালেন। দারোগা-বেশে দেবদূত।

বিধবা-বিবাহের প্রথম বর

শৈলেনকুমার দত্ত

বিধবা-বিবাহ আর বিদ্যাসাগর নাম দুটি যেন অচ্ছেদ্য! বিধবা-বিবাহ প্রচলন বিদ্যাসাগরের একটি মহৎ কর্ম। বিদ্যাসাগর নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন—"বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।"

কিন্তু বিধবা-বিবাহের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নাম অঙ্গাঙ্গী হলেও বাংলা দেশে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন অতি প্রাচীন। বিদ্যাসাগরের দেড়শত বছর আগে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। বিদ্যাসাগরের আগে কোটার রাজাও একবার বিধবা-বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনিও সফল হননি। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় সংকলিত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে' জানা যায় যে, বিদ্যাসাগর পরাশর সংহিতার যে বচনটি নির্ভর করে এই আন্দোলন শুরু করেন, নবদ্বীপের রাজা শ্রীশচন্দ্র বহু পূর্বেই সেই উক্তি নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেছিলেন।

শুধু তাই নয়। ধনকুবের মতিলাল শীলও যে একবার বিধবা-বিবাহ দিতে চেষ্টা করেছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫২ সালে পটলডাঙ্গার শ্যামাচরণ দাস নামে এক কর্মকার তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন। তাঁর এ উদ্যোগে সহযোগিতা করেন কাশীনাথ তর্কালংকার, ভাস্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ বিবাহও হয়নি।

বিদ্যাসাগরের এ-আন্দোলনে উদ্যোগী হবার দুটি ঘটনা জানা যায়। উমেশচন্দ্র মিত্র বিধবা-বিবাহ নামে যে নাটক রচনা করেন সেটি কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয় ১৮৫০ সালে। বিদ্যাসাগর বেশ কয়েকবার এ অভিনয় দেখেন। তিনি এ অভিনয় দেখে এত বেদনা অনুভব করতেন যে প্রায়ই তিনি কেঁদে ফেলতেন। বিদ্যাসাগরের এই ব্যাকুলতার কথা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'লাইফ অ্যান্ড টিচিংস অব কেশবচন্দ্র সেন' নামক ইংরেজী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন সুন্দর ভাবে—

"The pioneer father of the widow marriage movement Pandit Iswar Chandra Vidyasagar came more than once and tender hearted as he is, was moved to floods of tears."

এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি বীরসিংহ গ্রামে গিয়ে তাঁর এক আবাল্য-সহচরীর অকাল বৈধব্য জনিত নানা দুঃখের কাহিনী শোনেন। এতে তিনি খুবই বিচলিত হন। তখনই তিনি এই অকাল বিধবাদের পুনর্বার বিবাহ দানের কথা চিন্তা করেন। এর পর থেকেই তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহে উদ্যোগী হন, যাতে বিধবা-বিবাহ

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

অনুষ্ঠানকে একটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানরূপে প্রমাণ করা যায়।

তারপর দীর্ঘদিন প্রচেষ্টার পর ১৮৫৩ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি একটি শ্লোক উদ্ধার করেন। পরাশর সংহিতার সেই শ্লোকে বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ রূপে প্রমাণ করার উপায় আছে—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

'স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।' বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে এই শ্লোককেই অমোঘ অস্ত্ররূপে মনে করে বিদ্যাসাগর অগ্রসর হন। এরই ফলস্বরূপ ১৮৫৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী তিনি 'বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত' কিনা পুস্তিকা প্রচার করেন।

বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনের প্রস্তুতির কথা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা দেশে আগুন ধূমায়িত হয়েছিল। এই পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। উত্তাল তরঙ্গমালার মত আন্দোলিত হয়ে উঠতে লাগল বাংলা দেশ।

যশোহর - কলকাতা - আটপুর - কাশীপুর সব জায়গা থেকে রক্ষণশীল হিন্দুরা পাল্টা অস্ত্র হানতে শুরু করলেন। সর্বত্র সভা ডাকা হল। যশোহরে মহামহোপাধ্যায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সভাস্থ মহা-পণ্ডিতগণ সোচ্চার হয়ে ঘোষণা করলেন—বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয়।

বিপক্ষ শিবিরেও 'রণং দেহি' ভাব দেখা গেল। বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে 'ব্রজবিলাস' ও 'রত্নপরীক্ষা' নাটক রচিত হল। ব্রজবিলাসে নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে আর রত্নপরীক্ষায় মধুসূদন স্মৃতিরত্নকে আক্রমণ করা হল। ধনকুবের মতিলাল শীল ঘোষণা করলেন, যিনি বিধবা কন্যার বিবাহ দেবেন এবং যিনি বিবাহ করবেন তাঁদের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন—'যে ব্যক্তি প্রথম বিধবা-বিবাহ করিবেন তাঁহাকে

রজত জয়ন্তী রজত

প্রবেশের শেষ তারিখ

ডাকে প্রেরিত সকল প্রবেশপত্র ঃ ৭-১২-৬৭
অ্যাডভান্সে সমাধান ঃ ১০-১২-৬৭

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাইতে পারেন বুধবার ৬-১২-৬৭ তারিখে, কিন্তু উহা এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে পাঠান।

সমাধান ফেরৎ পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রসহ নিজ ঠিকানা লিখিত ৬ পয়সার পোস্টকার্ড পাঠান।

১, টাকা পাঠান এবং লিট্‌কুইজ উইকলির ৫টি সংখ্যা লাভ করুন।

বিনামূল্যে ক্যালেণ্ডার

যে সকল প্রতিযোগী ৪টি কুপন পাঠাবেন তাঁরা প্রতি ৪টি পেড কুপনের জন্য একটি বড় ওয়াল ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে পাবেন।

২৫ লিট্‌কুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম

ADDRESS:—LITQUIZ No. 25, ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7 (WB).

দ্রষ্টব্য ঃ—(১) প্রত্যেক কলমে, আপনার বাতিল করা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন; (২) আপনি যদি শুধুমাত্র একটি কুপন পাঠান, তাহলে দ্বিতীয় কুপনটি বাতিল করে দিন; (৩) আপনি যদি মানি অর্ডারযোগে এন্‌ট্রি ফী পাঠান, তাহলে এই এন্‌ট্রি ফর্মের সঙ্গে, ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি অবশ্যই পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এন্‌ট্রি বাতিল করা হবে; (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। লিট্‌কুইজ নং - ২৫ বোম্বাই - ৭-এর টাকা অনুকূলে পাঠান।

1	Re. 1	2	Re. 1	3	Re. 1	4	Re. 1
1 BEAUTIFUL	WONDERFUL	1 BEAUTIFUL	WONDERFUL	1 BEAUTIFUL	WONDERFUL	1 BEAUTIFUL	WONDERFUL
2 BEAUTY	MORALITY	2 BEAUTY	MORALITY	2 BEAUTY	MORALITY	2 BEAUTY	MORALITY
3 CALMNESS	HAPPINESS	3 CALMNESS	HAPPINESS	3 CALMNESS	HAPPINESS	3 CALMNESS	HAPPINESS
4 CIVILIZATION	EDUCATION	4 CIVILIZATION	EDUCATION	4 CIVILIZATION	EDUCATION	4 CIVILIZATION	EDUCATION
5 CULTURAL	EMOTIONAL	5 CULTURAL	EMOTIONAL	5 CULTURAL	EMOTIONAL	5 CULTURAL	EMOTIONAL
6 DECEPTIVE	DEFECTIVE	6 DECEPTIVE	DEFECTIVE	6 DECEPTIVE	DEFECTIVE	6 DECEPTIVE	DEFECTIVE
7 DEFEAT	DESPAIR	7 DEFEAT	DESPAIR	7 DEFEAT	DESPAIR	7 DEFEAT	DESPAIR
8 GENERAL	NATIONAL	8 GENERAL	NATIONAL	8 GENERAL	NATIONAL	8 GENERAL	NATIONAL
9 HUMILITY	SANCTITY	9 HUMILITY	SANCTITY	9 HUMILITY	SANCTITY	9 HUMILITY	SANCTITY
10 IDEAL	MORAL	10 IDEAL	MORAL	10 IDEAL	MORAL	10 IDEAL	MORAL
11 IDEALS	IDEAS	11 IDEALS	IDEAS	11 IDEALS	IDEAS	11 IDEALS	IDEAS
12 IGNOBLE	INACTIVE	12 IGNOBLE	INACTIVE	12 IGNOBLE	INACTIVE	12 IGNOBLE	INACTIVE
13 INFINITY	REALITY	13 INFINITY	REALITY	13 INFINITY	REALITY	13 INFINITY	REALITY
14 JUSTICE	PEACE	14 JUSTICE	PEACE	14 JUSTICE	PEACE	14 JUSTICE	PEACE
15 LOYALTY	MAGNANIMITY	15 LOYALTY	MAGNANIMITY	15 LOYALTY	MAGNANIMITY	15 LOYALTY	MAGNANIMITY
16 POLITICAL	SOCIAL	16 POLITICAL	SOCIAL	16 POLITICAL	SOCIAL	16 POLITICAL	SOCIAL
17 SELFISHNESS	WEAKNESS	17 SELFISHNESS	WEAKNESS	17 SELFISHNESS	WEAKNESS	17 SELFISHNESS	WEAKNESS

SEND THESE 2 COUPONS & ENTER MINIQUIZ FREE • No. 25 • SEND THESE 2 COUPONS & ENTER MINIQUIZ FREE

MINIQUIZ — 10 CLUES FREE COUPON 1

BEAUTIFUL	WONDERFUL	IDEAL	MORAL
CIVILIZATION	EDUCATION	IDEALS	IDEAS
CULTURAL	EMOTIONAL	IGNOBLE	INACTIVE
DECEPTIVE	DEFECTIVE	JUSTICE	PEACE
DEFEAT	DESPAIR	POLITICAL	SOCIAL

MINIQUIZ — 10 CLUES FREE COUPON 2

BEAUTIFUL	WONDERFUL	IDEAL	MORAL
CIVILIZATION	EDUCATION	IDEALS	IDEAS
CULTURAL	EMOTIONAL	IGNOBLE	INACTIVE
DECEPTIVE	DEFECTIVE	JUSTICE	PEACE
DEFEAT	DESPAIR	POLITICAL	SOCIAL

২৫
দেশ

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য ভর্তি ফি ঃ ১, টাকা। আমি এম-ও রসিদ/আই-পি-ও/লিট্‌কুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর.....................পাঠালাম।

CAPITAL LETTERS

NAME ....

ADDRESS ....

....

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান

এক সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রদান করিব।' হুকোটার রাজাও অর্থব্যয় করতে রাজী হলেন।

প্রায় একই সঙ্গে ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে বিদ্যাসাগর 'বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' পুস্তিকার দ্বিতীয় খণ্ড প্রচার করলেন। বিধবা-বিবাহকে অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করার জন্যে যে সমস্ত পন্ডিতের মতামত ছিল, এ পুস্তিকায় তাঁদের প্রত্যেকের যুক্তিতর্ক খণ্ডন করা হল।

ক্রমশ দুটি শিবিরই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। একদিকে বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ বাচস্পতি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ,—অন্যদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল তর্কালঙ্কার, উমাকান্ত তর্কালঙ্কার প্রমুখ।

শুরু হল তর্ক-যুদ্ধ। গুপ্ত কবির ভাষায়—

লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত॥

বাংলা দেশের প্রতিটি গৃহে তখন এই একটি আলোচনা। দুয়ারে-পথে-ঘাটে-দেউড়িতে-মণ্ডপে সর্বত্র চলল এই আলোচনা। পক্ষবিপক্ষের নানান মতবাদ। গুপ্তকবি মুখর করলেন রঙ্গ রসিকতায়—

শুনিয়া বিয়ের নাম, 'কোনে' সেজে বুড়ি।
কেমনে বলিবে মুখে 'খুড়ী খুড়ী খুড়ী?'
পোড়া-মুখ পোড়াইয়া, কোন পোড়া-মুখী।
'দুখী' 'সুখী' মেয়ে ফেলে কেঁদে হবে খুকী?

পাঁচালিকার দাশরথি রায় লিখলেন—

বিধবার বিবাহ কথা কলির প্রধানস্থান কলিকাতা,
নগরে উঠেছে অতি রব।
কাটাকাটি হচ্ছে যান ক্রমে দেখছি বলবান,
হবার কথা হয়ে উঠেছে সব॥

শান্তিপুরে 'বিদ্যাসাগরপেড়ে' শাড়ি উঠল। সে-কাপড়ের পাড়ে গান লেখা হল—

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমনদিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল কাচকলার মুখে দিয়ে ছাই,—
এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে॥

পক্ষ-বিপক্ষের ঝড় ক্রমশই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে লাগল।

ইংরাজ শাসকদের দৃষ্টিগোচরের জন্যে 'বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হল। তারপর ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর ভারতের বড়লাটের কাছে এক হাজার লোকের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি আবেদনপত্র পেশ করা হল। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পরম শুভার্থী নবদ্বীপের রাজা শ্রীশচন্দ্র প্রথম স্বাক্ষর করলেন, তারপর বর্ধমানের মহারাজা এবং অন্যান্যরা। সঙ্গে একটি আইনের খসড়াও পাঠানো হল।

১৭ই নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য গ্রান্ট সাহেব আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করলেন। গ্রান্ট সাহেবের আইন

M CLUES

(1) The face of Nature as presented to us is infinitely varied, but to those who love her it is ever Beautiful|Wonderful and interesting.

(2) The highest form of Beauty|Morality is that which is joyful and spontaneous; and the highest form of art is that which can transform nature itself into its theme.

(3) The natural condition of all living beings is the condition of Calmness|Happiness.

(4) If Civilization|Education is to be bound up with material advancement we must accept its inevitable consequence, loss of freedom in exact proportion to the forward march.

(5) We must face the hard truth of history that mere political merger does not lead to national unity, unless there be an under-current of Cultural|Emotional unity.

(6) There will always be a gulf between principles and practice, between the ideal and the actual. That is unavoidable in this Deceptive|Defective world.

(7) Even Defeat|Despair is a grim teacher when one doesn't lose balance.

(8) In the small as well as in the big things of life, we have to sacrifice ourselves, our desires, our interests, our ambitions, for the General|National good.

(9) Ego is not pride alone as commonly thought. It can lurk very well in Humility|Sanctity too.

(10) Unfortunately, the world is so constituted that Ideal|Moral conduct, more often than not, pays no dividends in material goods or comfort.

(11) All the great Ideals|Ideas of humanity are pang-born.

(12) So long as life lasts nothing can be Ignoble|Inactive.

(13) The artist's approach to Infinity|Reality is different from both the scientist's and the religious man's.

(14) If freedom, if democracy, is to survive in the world along with Justice|Peace, then we must look to religion with its faith in man to realize it for us.

(15) Affection and Loyalty|Magnanimity are of the heart, they cannot be purchased in the market-place, much less can they be extorted at the point of the bayonet.

(16) In India cultural diversity is most pronounced in the realms of religion and philosophy, while the realm of the individual in economic and Political|Social matters needs to be widened.

(17) Selfishness|Weakness of any kind is the root of all evil.

দ্রষ্টব্য:—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিটেরারি উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

বাংলা সূত্রের জন্য আগামী সংখ্যা দেখুন।

১০,৫০০ টাকা
৪৯-সং-এর নগদীর জিতেছেন
শ্রী এইচ ডি সরকার, C/o. আর্চার,
বি বি জেড-এন-৪০, গাজীয়াবাদ (অস্থ)

বাংলা

১। প্রকৃতি তার অনন্তরূপ আমাদের কাছে উন্মোচন করে, কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমিকদের কাছে তা চিরকালীন সুন্দর/অদ্ভুত এবং চিত্তাকর্ষক।

২। সৌন্দর্য/নৈতিকতা-র উন্নত রূপ হ'ল সেইটি, যা আনন্দময় এবং স্বতঃস্ফূর্ত এবং শিল্পের সবচেয়ে উন্নত রূপ হ'ল সেটি, যা প্রকৃতিকে তার বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করতে পারে।

৩। প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর প্রাকৃতিক অবস্থা হ'ল শান্তি/প্রসন্নতা-র অবস্থা।

৪। যদি সভ্যতা/শিক্ষা-কে পার্থিব প্রগতির সঙ্গে সমন্বয় করতে হয়, তাহ'লে আমাদের এর অনিবার্য পরিণতিকেও মেনে নিতে হবে, সম্মুখ পদক্ষেপের সমানুপাতেই স্বাধীনতার লোপ।

৫। আমাদের ইতিহাসের রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হতে হবে যে কেবল রাজনৈতিক মিলনই জাতীয় ঐক্য আনে না যদি না তার মধ্যে নিহিত থাকে সাংস্কৃতিক/আবেগময় ঐক্য।

৬। মূল নীতি এবং সম্পাদিত কাজের মধ্যে, আদর্শ ও যথার্থ কাজের মধ্যে সব সময় প্রভেদ থাকবেই। এটি বর্তমানের প্রতারণা-জনক/ত্রুটিপূর্ণ জগতে অপরিহার্য।

৭। মানুষ যদি ভারসাম্য না হারায়, তাহ'লে এমন কি পরাজয়/নিরাশ-ভাবও কঠোর শিক্ষা দিতে পারে।

৮। সার্বজনীন/রাষ্ট্রীয় কল্যাণের জন্য জীবনের ছোট এবং বড় ব্যাপারে আমাদের আত্মত্যাগ করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে আমাদের ইচ্ছা, আমাদের স্বার্থ, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

৯। অহং বলতে কেবল গর্বকে বোঝায় না, যদিও এটিই প্রচলিত ধারণা। এটি বিনয়তা/নির্মলতা-র মধ্য দিয়েও উঁকি দিতে পারে।

১০। দুর্ভাগ্যবশত পৃথিবী এমনভাবে গঠিত যে আদর্শ/নৈতিক ব্যবহার পার্থিব বস্তু বা আরামের পথে বেশীর ভাগ সময়ে আদৌ লাভজনক হয় না।

১১। মনুষ্যত্বের সমস্ত মহান আদর্শ/ভাবনাসমূহ কষ্টপ্রদ সাধনা থেকে উদ্ভূত।

১২। যতদিন জীবন আছে, কোন কিছুই হীন/নিষ্ক্রিয় হতে পারে না।

১৩। অনাদি (অনন্ত)/বাস্তবতা-র প্রতি শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক এবং ধার্মিক উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক।

১৪। যদি পৃথিবীতে স্বতন্ত্রতা, গণতন্ত্রকে ন্যায়/শান্তি-সঙ্গে বেঁচে থাকতে হয়, তাহ'লে আমাদের মানুষের প্রতি বিশ্বাস আছে এমন ধর্মের দিকে তাকিয়ে তার মর্ম বুঝতে হবে।

১৫। স্নেহপ্রীতি এবং বিশ্বস্ততা/উদারতা-র বাস মানুষের মনে। এ সব বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না এবং বন্দুকের সঙ্গীন উঁচিয়েও তা কম ক্ষেত্রেই আদায় করা যায়।

১৬। ভারতে ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা প্রকট অথচ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক/সামাজিক ব্যাপারে ব্যক্তিগত পরিধি আরো বিস্তারিত হওয়া দরকার।

১৭। স্বার্থপরতা/দুর্বলতা, তা সে যে কোন প্রকারের হোক, সমস্ত অমঙ্গলের মূল।

প্রচলনের পক্ষে প্রদত্ত সমস্ত যুক্তি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস কলভিন সমর্থন করলেন। পরের বছরে ১৭ই মার্চ আইনের খসড়া নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে পেশ করা হল। গ্রান্ট এবং কলভিন ছাড়া এই নির্বাচকমণ্ডলীতে অপর দুইজন সদস্য ছিলেন মিঃ ইলিয়েট ও মিঃ জেইট। সুতরাং আইন প্রবর্তনে আর কোন বাধার সম্ভাবনা রইল না।

কিন্তু দিকে দিকে রব উঠল। এ অন্যায়, এ অশাস্ত্রীয়! আইন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিদিন হাজার হাজার আবেদনপত্র আসতে লাগল। শেষকালে সাঁইত্রিশ হাজার লোকের স্বাক্ষর-সম্বলিত এক আবেদনপত্র এসে পৌঁছাল আইন প্রবর্তন বন্ধ করার দাবি জানিয়ে। নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত প্রকাশে বিলম্ব ঘটতে লাগল।

কিন্তু সমস্ত প্রতিবন্ধ, সমস্ত সংশয় নস্যাৎ করে দিয়ে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই পাশ হল বিধবা-বিবাহ আইন।

গুপ্তকবি লিখলেন—

হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার।
বহুকাল হতে যার নাহি ব্যবহার॥
সে বিষয়ে যাতায়াত না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দেশ॥
শত শত প্রজা তার ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্তনাদ নাহি শুনিলেন কানে॥
গ্রান্ট করি গ্রান্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাস॥

আইন পাশ হবার পরও বিরোধীপক্ষ হাল ছাড়লেন না। নানা ভাবে তাঁরা এ আইন প্রবর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাই বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান যাতে কোথাও না হয় তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগলেন।

কিন্তু সেই বছরেই বিধবা-বিবাহ সম্ভব হল। উদ্যোক্তা স্বয়ং বিদ্যাসাগর। দিন স্থির হল রবিবার, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬ সাল। স্থান ঠিক হল কলিকাতার ১২নং সুকিয়া-স্ট্রীটস্থ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। বিদ্যাসাগরের তদানীন্তন বাসস্থান। বাংলা দেশের এক অবিস্মরণীয় বিবাহবাসর হবার উপযুক্ত স্থান। বর স্থির হল প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ট পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কনে ঠিক হল পলাসডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বার বছরের বিধবা মেয়ে কালীমতী।

বর হিসাবে শ্রীশচন্দ্র যে যোগ্য ছিলেন সেকথা বলাই বাহুল্য। শুধু পণ্ডিতের পুত্র, বা কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান বলেই নয়—শ্রীশচন্দ্র নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধনী কাব্যে'ও তাঁর সে-গুণের প্রশস্তি আছে—

সাহিত্য-সবিতা শ্রীশ সুমিষ্ট পাঠক,
বিধবা সধবা করা পথ-প্রদর্শক,
লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমৎকার,
কবিতার পুরস্কার একায়ত্ত তার।

এহেন বর তার ওপর বাংলাদেশে এক অভাবনীয় ঘটনা। রথ যাত্রার মত ভিড় হল। সারা বাংলাদেশের লোক ভেঙে পড়ল সে-অনুষ্ঠান সভায়। শ্রীশচন্দ্র এ দৃশ্য আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন বলেই বোধহয় ২৯ শে নভেম্বর থেকে বিয়ের তারিখটি নানান অজুহাতে পিছিয়ে নিয়েছিলেন সাত আট দিন। উদ্যোক্তরাও তাই পুলিশ মোতায়েন করতে ভোলেননি।

যাই হোক সেজন্য অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি হল না। স্বাভাবিক প্রথামত কনের বাড়িতে বিবাহ বাসর বসেনি বলে দুপক্ষকেই আসতে হল বিদ্যাসাগরের বাসভবনে। ব্রহ্মানন্দ বাবুর অবর্তমানে কনের মা লাল কালিতে লিখে চিঠি বিলি করলেন। সে চিঠিতে লেখা হল—

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যা ঃ—

সবিনয়ং নিবেদনম্।

২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক। মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকেস স্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম।

—ইতি তারিখ

২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দ ঃ ১৭৭৮।

নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে বিবাহ বাসরে উপস্থিত হলেন—প্রাচ্যের বার্ক বাগ্মীবর রামগোপাল ঘোষ, রামমোহন রায়ের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র প্রথম বাঙালী জজ রমাপ্রসাদ রায়, রাজা দিগম্বর মিত্র, স্বনামধন্য প্যারীচাঁদ মিত্র, স্বনামধন্য নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা।

রাত প্রায় এগারটার সময় ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বর এলেন। আনুষ্ঠানিক সব কর্ম শেষ করে বরকে ঘরে আনা হল।

তারপর বিবাহ পর্ব শুরু হল। সমসাময়িক সংবাদপত্রের ভাষায় "বিবাহ সময়ে বর বাহাদুর আসনোপবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষের পুরোহিতেরা বিবাহমন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কিছুই রূপান্তর করেন নাই, লক্ষ্মীমণি কন্যাদান করেন, দান সামগ্রী অলঙ্কার সকলই ছিল, পরে বর স্ত্রী-আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথানুসারে 'দ্বারষষ্ঠী ঝাটাকে প্রণাম করেন, ও স্ত্রী আচারস্থলে উলুউলু ধ্বনি, নাকমলা, কানমলা ও "কড়ি দে কিনলেম, দড়ি দে বাঁধলেম, হাতে দিলাম মাকু, একবার ভ্যা করত বাপু' রমণীগণের একান্ত প্রার্থনীয় বর বাহাদুরও ভ্যাও করিয়াছিলেন।"

(সংবাদ প্রভাকর)

নির্বিঘ্নেই শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিবাহপর্ব সমাপ্ত হল। সর্বসাকুল্যে খরচ হল দশ হাজার টাকা। হবারই কথা! একে প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘটাপটা, তার ওপর যে সমস্ত কুলীন ব্রাহ্মণগণ বিবাহ বাসরে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের বিদায় দক্ষিণা দিতেও বহু টাকা খরচ হয়েছিল।

এই বছর কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে আর একটি মাত্র বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তারপর পর পর কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি। বিদ্যাসাগরের ঋণের বোঝাও বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত মোট ষাটটি বিধবা-বিবাহ দিতে গিয়ে মোট বিরাশি হাজার টাকা খরচ হয়। বিদ্যাসাগরের আর্থিক অনটন চরমে ওঠে। পাইকপাড়ার রাজমহিষীর কাছেই তাঁর পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ ছিল, আর মহারানী স্বর্ণময়ীর কাছে আট হাজারের মত। তার ওপর ষড়যন্ত্র!

শেষ পর্যন্ত শুধু আর্থিক অনটনের বিপর্যস্ততাই নয়, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা শুরু হল। বিদ্যাসাগরের পথ হাঁটাও বিপদের হয়ে উঠল। নানা দিক থেকে নানা রকমের আক্রমণ আরম্ভ হল। বীরসিংহ গ্রামে একটি বিধবা-বিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর এত লাঞ্ছনাগঞ্জনা পান যে, রাগে ক্ষোভে সেখান থেকে চলে আসেন। তারপর জীবনে আর কখনও তিনি বীরসিংহ গ্রামে যাননি।

কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ বা ঐকান্তিকতা যে এতটুকুও কমেনি তার নজীর পাওয়া যায়। ১৮৭০ সালে ১১ই আগস্ট বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবা বিবাহ করেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ষোড়শী বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করার প্রস্তাব জানিয়ে তিনি পিতার কাছে একটি পত্র লেখেন। শম্ভুচন্দ্র অগ্রজকে যে পত্র লেখেন তার জবাবে বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদরকে লেখেন—"নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে।" (৩১ শ্রাবণ. ১২৭৭)

কিন্তু বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহকে জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম" মনে করে জীবনপাত করলেও বিধবা-বিবাহ জনপ্রিয় হয়নি। আইন প্রচলিত থাকলেও প্রায় তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ অভিযান বন্ধ হয়। তবে ইতিহাসের ছায়াপথে রঙ্গরসিকতা এবং সংগ্রামমুখর পর্ব হিসাবে বাঙালীজীবনের এই অধ্যায়টি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বৃটিশ কবিতায় আন্তর্জাতিকতা

দ্বীপবাসীদের চরিত্র একটু আলাদা হয়। জাপান এবং বৃটেনের লোকদের চরিত্রের কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। জাপান বেশ কিছুকাল বাকি পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চেয়েছিল, ছিলও বেশ কিছুদিন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বৃটেনবাসীরা দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে সারা পৃথিবীকে জয় করতে চেয়েছিল অবশ্য, কিন্তু নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিদেশের ছাপ পড়তে দিতে চায়নি।

খুব সম্ভব এক ধরনের অপরাধ বোধ থেকেই এই বিদেশী সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীনতার জন্ম। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবেই, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে অন্যান্য দেশের সাহিত্য শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ দেখাবার হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বৃটেনে। সাহিত্যেও তার ছাপ পড়ে। আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় গল্প-উপন্যাস লেখা শুরু হয়, বিদেশী চরিত্র এবং বৃটিশ চরিত্রের অ-খাঁটি-বৃটিশ হাবভাবের আমদানি হয়, অন্য দেশের শব্দাবলী ঢুকে পড়ে ইংরেজিতে।

প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। সুতরাং প্রতিক্রিয়ারও প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে। এই হিসেবে, বৃটিশ সংস্কৃতিতে এই আন্তর্জাতিক মনোভাবেরও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৃটেনের নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন এবং 'গেল' 'গেল' রব ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। অনেকে বলতে শুরু করেন, টমাস হার্ডি এবং উইলফ্রেড ওয়েন-এর পর গৌরবময় নেটিভ ইংলিশ ট্র্যাডিশন একেবারে জলাঞ্জলি যেতে বসেছে। ইংরেজী সাহিত্যকে এই অবমাননা থেকে বাঁচানো দরকার। সুতরাং "ঘরে-ফেরা"র উদাত্ত আহ্বান দিকে দিকে শোনা যায় যুদ্ধের পর। "হরাইজন" কিংবা "পেঙ্গুইন নিউ রাইটিং" জাতীয় পত্র পত্রিকা ও সংকলনে বিভিন্ন দেশের লেখকদের সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের যে পালা চলেছিল তা ঝিমিয়ে আসে। অনেক লেখক বলতে শুরু করেন, আন্তর্জাতিকতার হুজুগ কেটে গেছে, বৃটিশ সাহিত্য আবার স্বাতন্ত্র্য হতে চায়। কিংসলে অ্যামিস্ বলেছিলেন কিছুকাল আগে, "বিদেশী শহর-টহর নিয়ে লেখা কবিতা এখন আর কেউ পড়তে চাইবে না।"

এডুইন মরগান নামে একজন তরুণ বৃটিশ কবির লেখা একটি প্রবন্ধ আমাদের হাতে এসেছে। প্রবন্ধটি বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস কর্তৃক প্রচারিত। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মরগান ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭—এই গত দশ বছরের বৃটিশ কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, তরুণ বৃটিশ কবিদের রচনায় আবার একটি সুস্থ আন্তর্জাতিকতার প্রবাহ এসেছে। জন ওয়েন এবং কিংসলে অ্যামিসের ভবিষ্যৎবাণী ঠিক নয়। শুধু কবিরাই নয়, পাঠকরাও এ সম্পর্কে অতিশয় আগ্রহী।

কিছুকাল আগে, লণ্ডনে ১৯৬৭'র আন্তর্জাতিক কবিতা নামে একটি উৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, একই মঞ্চে বিভিন্ন দেশ ও ভাষার কবিরা কবিতা পাঠ করবেন। কোনো বিশেষ ধরন বা মোড়ক বাদ দিয়ে সমগ্রভাবে "কবিতা" যা একটি চিরন্তন ও সার্বজনীন শিল্প—তার রস পাওয়াই প্রধান কথা—এবং এই ভাবেই "কংক্রিট পোয়েট্রি" আন্দোলন সার্থক হবে। পাঁচ দিনের সেই উৎসবে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং আমেরিকার নির্বাচিত কবিরা ছাড়াও উপস্থিত হয়ে কবিতা পাঠ করেছিলেন উনগারেত্তি, পাবলো নেরুদা, জিবিগনিয়েভ হারবার্ট, অকটাভিও পাজ, হানস্ ম্যাগনাস এনজেনবারগার, ইনগেবর্গ বাখমান, ইভ বনফোয়া প্রভৃতি ইতালিয়ান, স্প্যানীশ, জার্মান ও ফরাসী ভাষার কবিরা। সেই উৎসবে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল, বহু দর্শক টিকিট পাননি।

ইংরেজ কবিদের মধ্যে এখন তিনটি ধারা আছে—যাঁরা আন্তর্জাতিকতা বিষয়ে উৎসাহী। প্রথম দল চান, বৃটেনে পৃথিবীর কবিতা সম্পর্কে একটি নিখুঁত ধারণার সৃষ্টি করতে—যার একমাত্র উপায় সুনিপুণ অনুবাদ এবং অনুবাদগুলি যেন ইংরেজী কবিতা হিসেবেই সার্থক ও পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। দ্বিতীয় দলের ধারণা, অতি নিপুণ অনুবাদে মূলের রস নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং সেদিকে বেশী কড়াকড়ি না করে, কবিদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে তার প্রচার। তৃতীয় দল, সরাসরি এক আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী হতে চান।

এই তিনটি দলেরই উদ্যমের চিহ্ন প্রতিফলিত হয় একটি পত্রিকায়। যার নাম "মডার্ণ পোয়েট্রি ইন ট্রানস্লেশান" সংক্ষেপে এম পি টি। বিশ্ব কবিতার নির্বাচিত প্রতিফলন এতে পাওয়া যায়। আমরা ও পত্রিকা দেখিনি. এডুইন মরগানের কথা মতন জানাচ্ছি। সত্যি সত্যিই পৃথিবীর সব দেশের কবিতার পরিচয় ওখানে পাওয়া যায়—এ সম্পর্কে আমরা অবশ্য সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারছি না। বহু সাহেব-সমালোচক এখনও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে "পৃথিবী" বলতে ইওরোপ-আমেরিকাই বোঝেন। মরগানও প্রায় সেই কথাই বলেছেন, শুধু তার সঙ্গে আফ্রিকা সম্পর্কে নতুন কৌতূহল যুক্ত হয়েছে।

যাই হোক। ওই সমস্ত অনুবাদের সার্থকতার কারণ এই মরগান বলছেন, অনুবাদ করছেন ইংরেজ কবিরাই। সুতরাং, সেগুলির পাঠযোগ্যতা সুনিশ্চিত—এবং অনুবাদক-কবিদের নিজেদের রচনাতেও আন্তর্জাতিক মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

পরিচয়। বিমল কর। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। চার টাকা।

গভীর কথা সহজ করে বলার প্রবণতা বিমল করের গত কয়েক বৎসরের রচনার প্রধান একটি লক্ষণ। তাঁর পূর্ববর্তী রচনাবলীতে তিনি বহু ক্ষেত্রেই প্রতীক, সংকেত ও ব্যঞ্জনাত্মক বর্ণনার ব্যবহার করেছেন, মনোবিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বপ্ন ও অন্যান্য যে-অনুষঙ্গের প্রসঙ্গ টেনেছেন, তা বিশুদ্ধ বিজ্ঞাননির্ভর, ফলে ব্যবহৃত শব্দাবলী, বাক্যগঠন ইত্যাদি অনিবার্য কারণেই ছিল অপেক্ষাকৃত দুরূহ, মননপ্রধান। কিন্তু 'খড়কুটো' থেকেই তিনি আরেক ধরনের ভাষাশিল্প নির্মাণ করছেন। সচেতন, বেগবান, স্রোত-স্বচ্ছন্দ ভাষায় তিনি অননুকরণীয় একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছেন। ধনুকের ছিলার মত ঋজু, টানটান, মেদবর্জিত তাঁর রচনা, আপাত-সহজ সুরে পাঠককে টেনে নিয়ে যায় গভীর প্রত্যন্ত দুরধিগম্য এক প্রদেশে যেখানে রচনার দার্শনিকতা মনে হয় না আরোপিত, তত্ত্ব বা বক্তব্য আলাদাভাবে সাঁটা থাকে না ডাকটিকিটের মতো। রূপ এবং ভালবাসা সমান স্তোলায়।

'পরিচয়' উপন্যাসটি বিমল করের পূর্বোক্ত শ্রেণীর রচনা। একদল তরুণ-তরুণীর বিচিত্র, জটিল সম্পর্কের স্বরূপটি তিনি উন্মোচন করেছেন, বাইরে থেকে যাদের উজ্জ্বল, স্ফূর্ত, সরল বলে মনে হয়। এর সমান্তরাল উপকাহিনী এক প্রৌঢ়-দম্পতির, যাদের পরিণত বেদনা ও দুঃখ, হাহাকার ও আর্তি আপাত-সুখের জগতে আত্ম-নির্বাসনের একটি অগোচর দ্বীপ রচনা করেছে। লেখকের কৃতিত্ব এইখানে যে, কাহিনীর শেষে পাঠকের মনে অনির্দেশ্য গহন এক বেদনার সুর সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন।

পরিচয়ের গল্পাংশ একদল তরুণ-তরুণীর হাজারিবাগ ভ্রমণ নিয়ে। পুজোর ছুটিতে অল্প কদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে তারা। কমলা, প্রমীলা, বুলা তিন বোন, পারিবারিক বন্ধু সুধীর, জ্যোতি, নবেন্দু ও মুকুল। বন্ধুত্বের রঙ গাঢ় হয়ে প্রমীলা জ্যোতির সম্পর্ককে নিবিড় করেছে। কমলার মনের জট সুধীর ও নবেন্দুকে নিয়ে। সমর্থ, সবল, উপকারী সুধীর; অসুস্থ, রুগ্ন, কৃশকরুণ নবেন্দু। কমলার ভালবাসা তবু নবেন্দুরই প্রতি অপ্রতিরোধ্য রূপে প্রবল। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নখরে বিক্ষত কমলার এই মন আশ্চর্য সমতায় বিশ্লেষণ করেছেন বিমল কর। বিশ্লেষণ করেছেন, সুধীর এবং নবেন্দুর অন্তর্দ্বন্দ্বকেও। এবং শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু পরিণতি টেনেছেন। এদের সঙ্গেই বেড়াতে এসেছেন সুখলতা এবং মনোমোহন। ট্রেনের কামরা থেকে পরিচয়ের সূত্রপাত। সুখলতা সকলের অলক্ষে বহন করে এনেছেন তাঁর নিজস্ব একটি অতীত, একটি হারিয়ে-যাওয়া মুখ, মনোমোহনকে লুকিয়ে তিনি খুঁজে বেড়ান তাঁর বঞ্চিত বাৎসল্য। মনোমোহন তাঁকে সবই দিয়েছেন, তবু কোথায় যেন তাঁর অপূর্ণতা।

সুখলতার এই নিঃসঙ্গ, বঞ্চিত সত্তাটি গাঢ় গভীর রঙে এঁকেছেন বিমল কর, গল্পের সমাপ্তিতেও যার রেশ থেকে যায়। পরিচয়ের যে বৈশিষ্ট্য সব থেকে বেশী আকর্ষণ করে তা হল প্রতিটি চরিত্রের পূর্ণতার প্রতি লেখকের সতর্ক-দৃষ্টি। বুলার বয়ঃসন্ধির প্রগল্‌ভতা, মুকুলের প্রাণপ্রাচুর্য, মনোমোহনের সরস সজীব কৌতুকপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে, পার্শ্ব চরিত্রের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় লেখক কি পরিমাণ সজাগ।

'পরিচয়' [illegible] রচনা

যে, এক সময় মনে হয়, অজান্তে হাজারি-বাগের টিকিট কেটে আমরাও এই দলের সঙ্গে ভিড়ে গেছি। ২৪৫।৬৭

কবিতা

প্রটোপ্লাজম। সামসুল হক। বাংলা কবিতা প্রকাশনী, ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা-২০। তিন টাকা।

তরুণতর কবি সামসুল হকের এটি তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। সামসুল হক বিশিষ্ট না হয়েও বেশ কিছু ভাল কবিতা রচনা করেছেন। বিশিষ্ট অর্থে বলতে চাই, তাঁর কবিতার নিজস্ব পরিমণ্ডল এখনো নির্মিত হয় নি। অব্যবহিত পূর্বজ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভাবনা ও ভাষার একটি বিশেষ অংশ অধিকার করে আছেন। প্রটোপ্লাজম-এর একাধিক কবিতা এর সাক্ষ্য দেবে। উদাহরণত দুটি কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিঃ

সহসা বারান্দা কেন হাহা করে হেসে উঠলো জোরে।

প্রতিশোধ? কেন প্রতিশোধ?
বারান্দার সীমারেখা পার হয়ে ঘরে ঢুকবো বলে প্রতিশোধ?
ঘরও আমাকে চায়, তার একা থাকতে ভয় করে,
আমিও মাঠের মধ্যে ঘুমুতে পারি না,
অথচ বারান্দা কেন হাহা করে হেসে উঠলো জোরে।
(স্বর্গ থেকে বিদায়)

এবং

মায়ের কাছে পাওয়া সাহস, দাঁড়িয়েছিলাম মুখে
তাদের সম্মুখে আমি তাদের মুখে মুখেঃ
নিজেকে ঠিক মনে হচ্ছে প্রজাপতির,
স্বপন আমার করে দিচ্ছে জীবন অলৌকিক।
(জন্মান্তর)

যথাক্রমে সুনীল এবং অলোকরঞ্জনকে মনে পড়ায়। তবে সামসুল তাঁর নিজস্ব মেজাজটিকে স্থির করে নিতে পারবেন এমন আশাব্যঞ্জক বহু পংক্তিও 'প্রটোপ্লাজম' গ্রন্থে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে 'ট্রাপিজ', 'পথিক নিহত', 'জীবন জায়ের প্রতিবাদ' 'কোলাহল মিশ্রিত শান্তি, তার কাছে' 'সমুদ্রবাত্রা' সেই দিক্‌বদলের চিহ্নবহ। প্রটোপ্লাজমের শেষ কবিতা 'কালো বিড়াল'—দীর্ঘ রচনা। কিছু ক্ষেত্রে গদ্যগন্ধী হলেও কবিতাটির কয়েকটি অংশ বিশেষ উজ্জ্বল। ৩১।৬৭

ধর্ম

সহস্র পদাবলী—আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস প্রণীত। শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস কর্তৃক শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৪্ টাকা।

লীলাকীর্তনের বই। পুস্তকখানির বিশেষত্ব রহিয়াছে। আমাদের বাংলা দেশে লীলাকীর্তন বলিতে আমরা শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্তিত ও পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীকারগণের দ্বারা বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক বিভিন্নভাবের বিভিন্ন পালাকীর্তন বুঝিয়া থাকি। আলোচ্য গ্রন্থখানি দাক্ষিণাত্যের প্রেমোন্মাদ আড়বাড়গণের দ্বারা সংকলিত অবতার স্বরূপে নারায়ণ এবং তাঁহার অবতারগণের মাহাত্ম্য কীর্তন পদাবলী লইয়া বিরচিত হইয়াছে। আড়বাড়গণের কীর্তনসমূহ তামিল ভাষায় রচিত হইয়াছে। সহস্র পদাবলী সেই সব তামিল পদের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদিত পদাবলীতে সৃষ্টি সুর ও তাল যুক্ত করিয়া সেগুলিকে গান করিবার উপযোগী করা হইয়াছে। তামিল ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় এইভাবে কীর্তনের অনুবাদ করা সহজ নহে। ভাবাবিষ্ট ভক্তের অন্তররস শ্রীভগবানের রূপ গুণ লীলা স্বতঃস্ফূরিত হইয়া পদাবলীতে রূপায়িত হইয়া থাকে, সেই ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া এবং তাহাতে সুর তাল সংযোজিত করিয়া কীর্তনের পালা সাজানো শুধু অনুভবসম্পন্ন সাধকের পক্ষেই সম্ভব হইয়া থাকে। গ্রন্থকার নিজে ভক্ত, অধিকন্তু তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর রসজ্ঞ ব্যক্তি এবং নিজেও একজন কীর্তন গায়ক, এজন্য তাঁহার পক্ষে এমন দুরূহ কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। অনুবাদ অপূর্ব এবং মধুর। ভক্তিরসপিপাসু সমাজে এই গ্রন্থ সর্বত্র সমাদৃত হইবে।

"ছোট্ট জিজ্ঞাসা" : শিশুশিল্পী প্রসেনজিৎ ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

রঙ্গজগৎ

হলিউডে এক্সপেরিমেণ্ট

"এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি তৈরির কাজে হলিউডও এখন পিছিয়ে নেই"—সাংবাদিক-দের কাছে এই মন্তব্য করেন, বিখ্যাত মার্কিন চিত্রসমালোচক ডোনাল্ড রিচি। ডোনাল্ড রিচি দীর্ঘকাল যাবৎ বাইরে আছেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র জাপান। সেখানে তিনি একাধিক পত্র-পত্রিকায় চিত্রসমালোচনা করেন। ফিল্মের উপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই তিনি রচনা করেছেন। বিভিন্ন আন্ত-র্জাতিক ফেস্টিভ্যালে তাঁর যাতায়াত আছে। নিউ ইয়র্কে মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্টে তিনি জাপানের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং আমেরিকায় জাপানের আণ্ডারগ্রাউণ্ড সিনেমা সফরের ব্যবস্থা করেন। দেশবিদেশের সমসাময়িক চলচ্চিত্রের সব খবরই তিনি রাখেন।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি ডোনাল্ড রিচি দেখেছেন। 'তিনি এ যুগের একজন 'লিভিং ফিল্ম মেকার'—শ্রীরিচি সাংবাদিক-দের কাছে এই মন্তব্য করেন। সোমবার (২০ নভেম্বর) ইউ-এস-আই-এস প্রেক্ষা-গৃহে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সত্যজিৎ রায়ের ছবি ছাড়া আর কোন বাংলা ছবি তিনি দেখেন নি। তবে দেখবার ইচ্ছা তাঁর আছে। বোম্বাইয়ের হিন্দী চিত্র তাঁকে নিরাশ করেছে।

আমেরিকার এক্সপেরিমেণ্টাল ছবির দর্শক অনেক। ডোনাল্ড রিচি জানান, নিউ ইয়র্কে পাঁচটি থিয়েটারে নিয়মিতভাবে এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি দেখানো হয়। হলিউডের বর্তমান হালচাল সম্পর্কে শ্রীরিচি বলেন, "বড় বাজেটের ছবি তৈরির ঝোঁক ক্রমশই কমে আসছে।" সাংবাদিকদের সঙ্গে শ্রীরিচি কয়েকজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-কারের ফিল্ম-রীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। যেমন আন্তোনিওনি, গদার, ফেলিনি, রেনে, কুরোসাওয়া প্রভৃতি।

ডোনাল্ড রিচি আমেরিকার এক্সপেরি-মেণ্টাল ছবির রীল সঙ্গে নিয়ে এসে-[illegible] ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইণ্ডিয়া আয়োজিত আলোচনা-সভায় শ্রীরিচির বলবার বিষয় ছিল : "মার্কিন সিনেমা : এক্সপেরিমেণ্টাল ওয়ার্ক"।

চিত্র-সমালোচনা

জুয়েল থিফ

পরিচালক বিজয় আনন্দই বা নতুনত্ব দেখাবেন না কেন? আর সব হিন্দীচিত্রে দেখি, নায়িকার অনুরাগ লাভের জন্য নায়ক বেহারার মত সর্বত্র তার পিছু ধাওয়া করে। "জুয়েল থিফ" (নবকেতন) ছবিতে নায়কের এই কাজটি সম্পাদন করেছেন তনুজা। নায়কের (দেব আনন্দ) মনে মোহ বিস্তারের জন্য তনুজাকে নানা বেশ ধারণ করতে হয়েছে। ছলাকলাও বাদ যায়নি। তনুজাকে

কলকাতায় অদূরে শরৎচন্দ্রের "মেজদিদি"র হিন্দী চিত্ররূপ "মঝলিদিদি"র আউটডোর স্যুটিং হয়—ছবির (পরিচালনা : হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়) একটি দৃশ্যে মেহমুদ ও শিশুশিল্পী শচীন ফটো—দেশ

এই ভূমিকায় ও বেশে কী পরিমাণ বিশ্রী লেগেছে তা বলে লাভ নেই। একটি দৃশ্যে তো তনুজা রীতিমত 'ভ্যাম্প' যেখানে নায়ককে কাছে ধরে রাখবার জন্য পোশাক পালটে তাঁকে গান গাইতে হয়েছে। ভাগিস, গানটি (আশা ভোঁসলের মুখে এস ডি বর্মণ সুরারোপিত) শোনবার মত। নতুবা ওই 'সিন' তো সহ্য করা যায় না।

"জুয়েল থিফ" নামেই মালুম, ক্রাইম ছবি। রত্নচোরটিকে যাতে দর্শক চিনে ফেলতে না পারেন সে ব্যাপারে পরিচালক নিশ্চয়ই সচেষ্ট ছিলেন। স্ক্রিপট তাঁর হাতে, ইচ্ছা মত ঘটনা সাজিয়েছেন। বৈজয়ন্তীমালা, অশোককুমার এবং আর সকলে উদ্ভট কল্পনার শিকার। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা ঘটনা ও কথা যেখানে গলাধঃকরণ করতে হয় সেখানে রহস্যের সুখ কোথায়। তা-ছাড়া 'জুয়েল থিফ'কে দর্শক চিনেছেন ছবি শেষ হবার অনেক আগে। ওই পর্বে অপরাধীর অবিশ্বাস্য পাপকাণ্ড। শেষ দৃশ্যে ক্রিমিন্যালকে ধরবার জন্য নায়কের অবাস্তব পশ্চাদ্ধাবন। যেন ম্যাজিক। সেই পুরনো নিয়ম নতুন টেকনিকে পরিবেশিত। টেকনিক্যাল কাজ, সেট, রঙ সবই উন্নত মানের সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এই বাহার? মনোরঞ্জনের জন্যও তো কিছু বিষয়বস্তু চাই।

ছবির অবাস্তবতার আর একটু পরিচয় দিই। এ-ছবিতে পুলিশ কমিশনার চোর ধরার জন্য রাস্তায় ওঁত পেতে থাকেন, আংটি চুরির এজাহারও পুলিশ কমিশনারের সমীপে। এক কথায় সাব-ইনস্পেক্টার বা ইনস্পেক্টারের যাবতীয় কাজ ছবিতে পুলিশ কমিশনাররূপী নাজির হোসেনই সম্পন্ন করেছেন।

ছবির পর ছবি
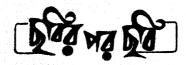
বোম্বাই থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে গোরা রোডের উপর বিশ্বজিৎ, শশিকলা, পম্মা, অসিত সেন, জহর রায়, ইফতেকার প্রভৃতিকে নিয়ে পরিচালক তরুণ মজুমদার গীতাঞ্জলি-চিত্রপীঠের "[illegible]" ছবির রাহ্‌গীর ("পলাতক"-এর হিন্দী) মুখ্য [illegible] গ্রহণ করেছেন। সন্ধ্যা রায়, কানহাইয়ালাল, নিরুপমা রায়, [illegible], পাহাড়ী সান্যাল ও আনোয়ার হোসেন প্রভৃতি ছবির অন্যান্য শিল্পী। কালারে তৈরী হচ্ছে ছবিটি। কানাই দে আলোকচিত্র শিল্পী। হেমন্তকুমার ছবির সহ-প্রযোজক ও সংগীত পরিচালক।

বাংলা চিত্র "দীপ জেলে যাই"-এর কাহিনীর ভিত্তিতে প্রযোজক হেমন্তকুমার আর একটি হিন্দী চিত্র তৈরি করছেন। ছবির প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। ওয়াহীদা রেহমান ও রাজেশ খান্না ছবির দুটি মুখ্য চরিত্রের শিল্পী। নাজির হোসেন, ললিতা, আনোয়ার হোসেন প্রভৃতি অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করবেন। অসিত সেন (বাংলা ছবিটিরও তিনি পরিচালক) ছবিটি পরিচালনা করবেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব হেমন্তকুমারের।

চিত্রসংগঠনের প্রথম নিবেদন "পান্না" ষষ্ঠীদিনের আগেই মুক্তি পাবে। দুটি বালক ও একটি বালিকার কাহিনী নিয়ে তৈরী "পান্না"। কিন্তু এটি শিশুচিত্র নয়। বালক অভিনেতা রমাপ্রসাদ ও তরুণ চট্টোপাধ্যায় এবং কুমারী কৃষ্ণকলি প্রধান তিনটি পান্না চরিত্রের শিল্পী। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন শম্ভু মিত্র, আরতি দেবী, শিখা ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, বলাই গুপ্ত, দেবতোষ ঘোষ, পঙ্কজ মিত্র, মণি শ্রীমানী, সুনীল রায় প্রভৃতি। অমিত মৈত্র ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সুররচনার দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন ভি বালসারা।

সাহা চিত্রপীঠের প্রথম প্রয়াস "শেষ থেকে

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত "তিন অধ্যায়" : জহর রায় ও উত্তমকুমার

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "দুরন্ত চড়াই" : সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ রায়

চারণ কবি মুকুন্দ দাস

দর্শকের মনকে দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করে তোলার মত নাটক "চারণকবি মুকুন্দদাস"। সংগীতবহুল এই নাটকের বড় গুণ, এতে দেশপ্রেমের ভাবধারার সঙ্গে একটি আবেগপূর্ণ নাট্যকাহিনী সম্পৃক্ত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে নাটকের বিষয়বস্তু রচিত। স্থান : বরিশাল। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালের যুবকদল কেমন করে গঠনমূলক দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তার পরিচয় নাটকে পাই। অপর দিকে রয়েছে মুকুন্দদাসের পারিবারিক কাহিনী। বলা বাহুল্য, মুকুন্দদাসের পারিবারিক আখ্যানবস্তুতে কল্পনার স্থান আছে। তবুও তাঁর পিতা-মাতার এবং স্ত্রীর দুঃখবরণের ঘটনা দর্শকের মনকে অভিভূত করে। মুকুন্দদাস এই নাটকের অহিংস বিপ্লবী, তাঁর মুখে সংলাপ সামান্য, গান বেশী। মুকুন্দদাসের কারাবরণ নিয়ে বলবার কিছু নেই। কিন্তু নাটকে পুলিশের নির্যাতন তাঁকে যে

"শুরু"র সুটিং শুরু হয়েছে। টাকিতে একটানা সাতদিন চিত্রগ্রহণের পর গত

শেষ থেকে শুরু

সপ্তাহে ইনডোরের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় নাটকের ভিত্তিতেই এই ছবি। এতে অভিনয় করছেন সবিতাব্রত দত্ত এবং "ইঙ্গিত"-গোষ্ঠীর শিল্পিবৃন্দ। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অনিল বাগচী ও নচিকেতা ঘোষ।

প্রোগ্রেসিভ এণ্টারপ্রাইজ-এর "অনুরাগের ছোঁয়া"-এর চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হতে আর বিলম্ব

অনুরাগের ছোঁয়া

নেই। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন শ্রীবিমল রায়। উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী মুখ্য চরিত্রের শিল্পী। সুর-রচনার দায়িত্বে আছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সমরেশ বসুর কাহিনী নিয়ে বি কে প্রোডাকশন্স-এর "অগ্নিবন্যা" তৈরি হচ্ছে।

অগ্নিবন্যা

সুশীল মজুমদার ছবিটি পরিচালনা করবেন। প্রধান দুটি চরিত্রের রূপ দেবেন উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক।

"মুক্ত-অঙ্গনে কালচারাল সেমিনার"

আগামী ১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় মুক্ত-অঙ্গনে কালচারাল সেমিনার নতুন নাটক "দধীচি" মঞ্চস্থ করবেন। সমর মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নাটকটিতে অভিনয় করবেন সুকুমার দাস, রমেন সরকার, গৌরীশংকর লাল, সমর মুখোপাধ্যায়, মানস দে, গোবিন্দ দে, সঞ্জীব ঘোষ, সন্দীপ ঘোষ, দীপক রায়, সুনীল দত্ত, কাকু, কমলা সুর, তৃপ্তি দাস। একই দিনে দিলীপ ভট্টাচার্য রচিত "নেপথ্যে" (একাঙ্ক) নাটিকাটি অভিনীত হবে।

অনামীর "প্রতিচ্ছবি"

উত্তর শহরতলির প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা 'অনামী' নীলোৎপল দে রচিত "প্রতিচ্ছবি" নাটকটির নিয়মিত অভিনয় করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। 'মিনার্ভা মঞ্চে', প্রতি মঙ্গলবার নাটকটি অভিনীত হবে। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে থাকবেন, বিশু চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা সাহা, নীলোৎপল দে, রাণু রায় প্রভৃতি।

প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে "চারণকবি মুকুন্দ দাস" নাটকে (উপরে) দীপক মুখোপাধ্যায় রমা দাস, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, (নীচে) সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী ও মুকুন্দদাসবেশী অলোক বাগচী ফটো—দেব

পরিমাণ সইতে হয়েছে তা নিয়ে বিতর্কের সুযোগ থাকলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে, মঞ্চে যা কিছু ঘটেছে তার নাট্য-আবেদন দুর্নিবার। পুলিশ অফিসার কর্তব্যের দায়ে মুকুন্দদাসকে প্রহার করে বিবেকের দংশনে পীড়িত। এ ক্ষেত্রে প্রহারের মাত্রা আরও কম হতে পারত কিনা সে প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে। কিন্তু তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরে চাকুরিত্যাগের ঘটনার মধ্যে ভাবাবেগের উপকরণ যথেষ্ট। আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে

অগ্রদূতের "কখনো মেঘ" ছবিতে উত্তমকুমার ও বঙ্কিম ঘোষ

মুদ্রপ্রতাপ রায়ের কাহিনী উল্লেখ্য। মুক্তি-যোদ্ধা প্রলয়ের সাহসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে বাংলার সন্ত্রাসবাদের রূপটিও এক পলকে দেখানো হয়েছে। অল্পপরিসর নাটকে তথ্য ও কল্পনা সংবলিত বহু ঘটনার সমাবেশ। অথচ নাটকটি ঘনবদ্ধ এবং লক্ষ্যচ্যুত নয়। অর্থাৎ চারণকবি মুকুন্দদাসের গান ও দেশভক্তির পরিচয় এই নাটকে পুরো মাত্রায় লভ্য। উপরি-পাওনা হিসাবে রয়েছে বরিশাল জাগরণে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ভূমিকা, তদানীন্তন বাংলার মুক্তিকামী তরুণদলের সংগ্রাম, এবং ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ নাট্য-উপকাহিনী। এইখানেই নাটকরচনার (অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ও পরিমল দাশগুপ্ত) বিশেষ কৃতিত্ব। এবং নাটকটি সুপরিচালিত বলে (নাট্যপরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়) কোন মুহূর্তেই ক্লান্তিকর নয়। প্রতিটি দৃশ্য পরিমিত, অথচ বক্তব্য ও রস সুপরিস্ফুট।

মুকুন্দদাসের গান নাটকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। গানগুলি চমৎকার দরাজ গলায় গেয়েছেন নামভূমিকায় শিল্পী অলোক বাগচী। তাঁর গান শোনার জন্যই নাটকটি বার বার দেখতে ইচ্ছা করে। শিল্পীর অভিনয়ও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

সামগ্রিক সুঅভিনয় নাটকের অনেক ত্রুটি সহজেই ঢেকে দিয়েছে। অশ্বিনী-কুমারের ব্যক্তিত্ব অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। অন্তরের দেশপ্রেমিক, বাইরে নির্মম পুলিশ অফিসারের চরিত্রে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় অতুলনীয়। পুলিশ-সুপার কেম্পের রূপসজ্জায় প্রভাত বসুর চরিত্র-চিত্রণও খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। দীপক মুখোপাধ্যায়ের মুদ্রপ্রতাপ মনে রাখার মত একটি চরিত্রসৃষ্টি। অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রলয়ের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীর দৃঢ়তা ও কঠোর সংকল্পের পরিচয় মেলে। চরিত্রটিকে শিল্পী স্বাভাবিক করে তুলেছেন। অন্যান্য-দের মধ্যে মণি শ্রীমানী, পরিমল দাশগুপ্ত, দেবেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতির চরিত্রোচিত অভিনয় প্রশংসনীয়।

মহিলা শিল্পীদের অভিনয়ও উঁচুদরের। মুকুন্দদাসের স্ত্রী সুভাষিণীর চরিত্রে মলা দাস খুবই মনোগ্রাহী অভিনয় করেছেন। সুভাষিণীর কথা বলার ধরনটি সুন্দর, অভিব্যক্তিও ভাল। সুমিতা চট্টো-পাধ্যায়ের চারু প্রাণবন্ত। তাঁর গান গাওয়ার ক্ষমতাও লক্ষণীয়। গভীর মাতৃস্নেহ এবং সমস্ত দুঃখ শান্তচিত্তে সহ্য করার শক্তি মুকুন্দদাসের জননীর চরিত্রে অতি সহজেই আরোপ করেছেন বাণী গঙ্গোপাধ্যায়। মঞ্জরা সরকার, শিপ্রা ও মীনা বসুর অভিনয় যথাযথ।

এক কথায় বলতে গেলে, প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে রঙ্গবাণীর "চারণকবি মুকুন্দদাস" যে-সব কারণে অবশ্যদ্রষ্টব্য তার একটি অভিনয়ের সৌকর্য। এবং সব গুণ মিলে "চারণকবি মুকুন্দদাস" একটি বিশিষ্ট নাট্যোপহার, যা পেয়ে নাট্য-রোগীরা নিঃসন্দেহে নাট্যপ্রযোজকদের অভি-নন্দন জানাবেন।

স্বল্পায়তন মঞ্চে যথাযোগ্য দৃশ্যপট রচনা ও আলোকসম্পাতের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন সুরেশ দত্ত ও তাপস সেন। শেষ দৃশ্যে শ্রীসেনের আলোক-নিয়ন্ত্রণের কাজ দেখবার মত।

সুধীর মুখার্জির পরিচালনায় নির্মীয়মাণ প্রোডাকশন সিন্ডিকেটের "আঁধার পেরিয়ে" দীপ্তি রায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ফটো-দেশ

হিন্দুস্থানের পূজা রেকর্ড

হিন্দুস্থান রেকর্ডস-এর পূজার উপহারে বৈচিত্র্য আছে। রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন দেবব্রত বিশ্বাস। শিল্পীর অনুরাগীর সংখ্যা অনেক। তাঁদের কাছে শ্রীবিশ্বাসের দুটি গান—তোমার কাছে এ বর মাগি ও মরি এ মধুর খেলা—আদরণীয় হবে। নিজস্ব ঢঙে ও দরাজ গলায় দুটি পল্লীগীতি গেয়েছেন অমর পাল (আরে ও আমার রসিকা দেওরারে এবং আরে ওরে ভাটিয়ালি গাঙের পানি)। শিল্পীর পল্লীগানের রীতি "আনসফেসটিকেটেড", যে কারণে তা খুবই চিত্তাকর্ষক। পূর্ণদাস বাউলের বাউল ("দুই সতীনেরে ঝগড়া লেগে" ও "সংসারে সেজে সং"), পূরবী দত্তের নজরুলগীতি (আমি পূরব দেশের পুরনারী এবং রুমঝুম ঝুম ঝুম) এবং রাধারানী দেবীর কীর্তন (ঈষৎ হাসিয়া রাই পানে চেয়ে ও শুন হে পরান প্রিয়া) হিন্দুস্থান পূজা রেকর্ডের বিশেষ আকর্ষণ। জপমালা ঘোষের ছড়াগান (অভিজিৎ সুরারোপিত) খুবই জনপ্রিয় হবে। "অ-য় অজগর" কিংবা "হারাধনের দশটি ছেলে" ছড়া হিসাবে ছোটদের খুবই প্রিয়। ছড়া দুটি গান হিসাবে পেয়ে শিশুরা খুবই খুশী হবে। তাদের হাতে তুলে দেওয়ার মত একটি সুন্দর উপহার এই রেকর্ড। মীনাক্ষী বসুর দুটি কীর্তন গান (বিশেষ করে "উদয় চৈতন্য আমার") এবং হীরালাল সরখেলের শ্যামাসংগীত খুবই প্রশংসনীয়। শ্রীমতী বসু সুগায়িকা। শ্রীমতী কোহিনুর মুখোপাধ্যায় (শ্যামা-সংগীত), ভাগবতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পল্লী-গীতি) এবং প্রভাষ মুখোপাধ্যায়ের (ভক্তি-মূলক) গান উল্লেখযোগ্য। মঞ্জু বসুকে (ঘুমপাড়ানির গান) আরও অনুশীলন করতে হবে।

আধুনিক গানের মধ্যে অশোক বাগচী ও কৃতিকা দাশগুপ্তের দ্বৈত সংগীত (এই রাত তুমি আর আমি) খুব ভাল লেগেছে। ভি বালসারা-কৃত সুরও সুন্দর। শ্রীমতী দাশগুপ্তের একক গানটিও সুগীত। দিলীপ সরকারের দুটি আধুনিক গানে শিল্পীর সুনাম অক্ষুণ্ণ। সুখশ্রাব্য গান আর যাঁরা গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে উৎপলা গোস্বামী, হিরণ্ময়ী সরকার ও শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এঁদের গানের সুর যথাক্রমে দিয়েছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রবীর মজুমদার ও হিমাংশু বিশ্বাস। আধুনিক গানে অনিল মুখো-পাধ্যায়, শ্যামলেন্দু দত্ত, অনুপম মুখো-পাধ্যায়, নিতাই গোস্বামী, শ্রীআনোয়ার এবং অরূপকুমার (পল্লীগীতি) প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "তারকা সংবাদ" কৌতুক-নকশা মোটামুটি উপভোগ্য। তবে আরও ভাল হতে পারত। দীপেন মুখো-পাধ্যায় গেয়েছেন "প্যারডি" গান। ছোটিসি মুলাকাত-এর গানের প্যারডির রেকর্ডের ভাল কাটতি হবে তাতে সন্দেহ নেই। শিল্পী গাইতেও পারেন ভাল। তবে "একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি" গানের প্যারডি না করাই উচিত ছিল। যে গান শোনা মাত্র দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে সেই গানের প্যারডিতে শ্রোতারা স্বভাবতই আঘাত পেতে পারেন। এ বিষয়ে শিল্পী ও কোম্পানি অবহিত থাকলে ভাল হয়।

সম্প্রতি [illegible] পাবলিক লাইব্রেরী "বাণী-নিকেতনের" অত্যাহলাদে সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হয়। প্রতিষ্ঠান্ত গ্রন্থাগারের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে পঞ্চাশ-প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবভাষ [illegible] অঞ্জলা-

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তৈরি হচ্ছে "তিনভুবনের পারে" : তনুজা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফটো-দেশ

এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক দেখান হয়েছে। পরবর্তী দৃশ্যে চৌত্রিশ বছরের ব্যবধানে ১৯৬৭ সালে একই বিদ্যালয়ের বিবর্তিত রূপ উপস্থিত। মাত্র একটি সেটের পট-ভূমিকায় আলো, কিছু বিচিত্র ধ্বনি এবং দুটি সুপরিকল্পিত ফ্রিজ শট্ সমন্বিত প্রয়োগনৈপুণ্যের জন্য সাধুবাদ পাবেন প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়। তা ছাড়া হেড-মাস্টার রূপেও তিনি সপ্রাণ। অন্যান্যদের মধ্যে কল্পনা ভট্টাচার্য এবং জীবন ঘোষ, শচী দত্ত, শিবব্রত মজুমদারের অভিনয় চরিত্রানুগ।

"নল-দময়ন্তী" ছবিতে অসীমকুমার এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

স্মরণ ও স্বর্গত ও জীবিত প্রতিষ্ঠাতৃবর্গকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের পর সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন হলে সভাপতি শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এক সারগর্ভ ও মর্মগ্রাহী বক্তৃতা দেন। এই সভায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভ্যবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন শিশির-নাট্য-মঞ্চের উদ্বোধন হয় এবং প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের চিত্র মাল্যভূষিত করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর জহর গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, কানু বন্দ্যো-পাধ্যায়, জীবেন বসু, কেতকী দেবী, গীতা দে প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ অভিনেত্রী সঙ্ঘ, নান্দিক ও শতপর্ণা গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ "আলমগীর" নাটক অভিনয় করেন।

তৃতীয় দিন পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার সৌজন্যে "চণ্ডালিকা" নৃত্যানুষ্ঠান, চতুর্থ দিন শৌভনিক গোষ্ঠীর "এবং ইন্দ্রজিৎ" অভিনয়, এবং পঞ্চম দিনে সারা রাত্রিব্যাপী সঙ্গীত অনুষ্ঠানে শ্রী এ টি কানন, ভি জি যোগ, এমারত হোসেন, ধ্যানেশ খাঁন প্রভৃতি যোগদান করেন। ষষ্ঠ দিবসে নটনাট্যমের "পাখীর বাসা" এবং সপ্তম দিনে চতুর্মুখ নাট্য সংস্থার "জনৈকের মৃত্যু" অভিনীত হয়। অষ্টম ও শেষ দিন শিশুদের পাপেট-ফিল্ম-শো দেখান হয়।

সম্প্রতি সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে "ইন্দ্রধনু" সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করলেন চণ্ডী সেনগুপ্তের "অন্ধজনে দেহ আলো"। নাটকের বক্তব্য এবং উপজীব্য, সাম্প্রতিক সমাজের গলদ, বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাহীন অসঙ্গতি।

নাট্যকার নবাগত। কিন্তু তাঁর চিন্তার বৈশিষ্ট্য স্বীকার্য। সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথম দৃশ্যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকালীন শিক্ষাব্যবস্থা

চিকাগো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মালয়ালম চিত্র "চেম্মিন" শ্রেষ্ঠ শিল্প-গুণান্বিত চিত্র (বেস্ট আর্টিস্টিক ফিল্ম) হিসাবে পুরস্কৃত। ছবির পরিচালক রামু কারিয়াত উৎসব উপলক্ষে আমেরিকায় গিয়ে-ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "চেম্মিন" ভারতে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছিল।

মার্চেন্ট - আইভরি প্রোডাকশন্স-এর পরবর্তী ছবি দি গুরু ("শেকসপীয়ার-ওয়ালার" পর)। জেমস আইভরি ছবিটি পরিচালনা করবেন। এক ইংরেজ তরুণীকে (পপ্ শিল্পী) নিয়ে ছবির কাহিনী। সে ভারতে এক বিখ্যাত সংগীতজ্ঞের কাছে শিক্ষালাভের জন্য আসে। ব্রিটেনের রিটা টুশিংহাম ও মাইকেল ইয়র্ক ছবির দুই প্রধান শিল্পী।

"আলেয়ার আলো : জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়   ফটো-সে.

কোথায় গেল লোকটা?

আমাদের ছেড়ে দাও! কে তুমি? কী চাও?
গোটাকয়েক প্রশ্নের জবাব চাই।

এবারে আমাকে চিনেছ? এখন বলো, মানুষ-খেকো সিংহীগুলোকে ভাড়া করে জঙ্গলে এনে ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?
আমার দোষ নেই অরণ্যদেব!

চারজন মানুষ ঐ সিংহগুলোর পেটে গেছে! ভাল চাও তো আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

আছে, ব্যাপার আছে!
6/18

আর নয়, আমার ছাপ দেগে দিয়ে এগুলোকে এবারে জঙ্গলে ছেড়ে দাও।
ছেড়ে দেব?
হ্যাঁ।

ওই ছাপটা তাহলে খুকেমরাজের প্রতীক! এতক্ষণে সব বুঝলুম!

তোমার সব কথা অরণ্যদেবকে বলেছে।
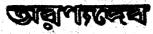
বর্তমান সপ্তাহের বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে রাজ্যপাল কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের আদেশ শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। ২১ নবেম্বর মঙ্গলবার রাত আটটায় রাজ্যপাল সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুসারে এই আদেশ জারি করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নতুন মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রিরূপে শপথ গ্রহণ করেন। আপাতত শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং ডঃ আমির আলি মোল্লা এই দুজনকে মন্ত্রিরূপে গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেস এই নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে লিখিতভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। ২৯ নবেম্বর বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার দিন স্থির হয়েছে। তার পরে কংগ্রেসও কোয়ালিশনে যোগ দিতে পারেন এবং তখনই পূর্ণ মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। যুক্ত ফ্রন্ট এই দিন রাত ৯টার মধ্যেই বুধবার (২২ নবেম্বর) রাজ্যব্যাপী হরতালের ডাক দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরেই রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি বৃহস্পতিবার (২৩ নবেম্বর) সারা বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল ঘোষণা করেন। ডঃ ঘোষ তখনই বলেন—আইন ও শৃঙ্খলা ভাঙার চেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতারিও শুরু হয়ে যায়। পুলিস বৃহত্তর কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সৈন্যদলও শহরে ঢুকতে আরম্ভ করে। ২২/২৩ নবেম্বর বৃহত্তর কলকাতা সহ বাংলায় সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল প্রতিপালিত হয়। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওই একই দিনে হরিয়ানায় বিধানসভাও বাতিল হয়ে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়।

দেশী সংবাদ

২০ নবেম্বর—লোকসভা আজ ভারতে মারকিন গোয়েন্দা সংস্থা 'সিয়া'র কার্যকলাপে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি মসকোর 'লিটারারী গেজেট' পত্রিকায় 'সিয়া'র একজন ভূতপূর্ব মারকিন কর্মকর্তা শ্রীজন স্মিথ ভারতে 'সিয়া'র কার্যকলাপের বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। শ্রীস্মিথ সোভিয়েট রাশিয়ায় চলে গিয়ে সেখানেই বসবাস করছেন।

হাওড়ার শিবপুর থানা এলেকার শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোডের (সাঁতড়াগাছির মোড়ে) একটি চোলাই মদের দোকানে মদ খেয়ে রবিবার এবং সোমবারের মধ্যে ১৬ জন মারা গিয়েছেন। তার মধ্যে ১০ জন হাসপাতালে এবং ৬ জন মরেছেন নিজেদের বাড়িতে। তা ছাড়া ওই একই কারণে আরও ১৫ জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

২১ নবেম্বর—রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে সুপ্রিম কোরটের মতামত নেওয়ার জন্য শ্রীঅজয় মুখারজির অনুরোধ গতকাল নাকচ করে দেওয়া হয়। আর তার পর থেকেই শোনা যেতে থাকে যে, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা নিতে ভারত সরকর এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই জি আজ রাত্রে রাজভবনে সাংবাদিকদের বলেন যে, মন্ত্রিসভা বাতিল করার পরে কোনরূপ অভাবিত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। পুলিসের রিজারভ ফোরস থেকে পুলিস এনে রাজ্যের পুলিস বাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২২ নবেম্বর—যুক্ত ফ্রন্ট বাতিলের পরদিন আজ বুধবার, বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যব্যাপী হরতালের রূপ নেয়। কলকাতায় বিকালের দিকে গুরুতর হাঙ্গামা ঘটে। পাঁচটি জায়গায় গুলি চলে—তা ছাড়া লাঠি, গ্যাস তো চলেছেই। গুলিতে আহতের সংখ্যা উনিশজন।

আজ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামার ঘটনায় এবং নিবারক নিরোধ আইনে কলকাতা সহ সারা রাজ্যে পাঁচশত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতায় ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা দুশ-রও বেশী। এদিন প্রাক্তন সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখারজি, নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের নেতা শ্রীচারু মজুমদার, বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীসুকুমার রায় গ্রেফতার হয়েছেন।

২৩ নবেম্বর—আজ হরতালের দ্বিতীয় দিন কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলেকা জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী ডকটর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও এক বিবৃতিতে স্বীকার পান, এদিন রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। সংঘর্ষ বাধে, অন্তত আঠারটি জায়গায় ৬০ রাউনড গুলি বর্ষিত হয়, সারা রাজ্যে প্রায় এক হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়। লাঠি, গুলি, পটকা ও বোমায় প্রায় ৭০ জন আহত হয়। গুলিতে তিন জন লোক মারা যায়। কলকাতা ও শহরতলি অঞ্চলের দশটি এলাকায় কারফু জারি করা হয়।

গতকাল (বুধবারই) রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বহত্তর কলকাতায় সৈন্যবাহিনীকে ডাকতে মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাতে রাজী হননি। আজ গভীর রাত্রে খবর নিয়ে রাজ্যপাল জানতে পারেন, কলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে শুধু গুলি আর বোমা চলছে। ঘোর অন্ধকারে জনগণ বিভিন্ন অঞ্চল নিজের দখলে নিয়ে গিয়েছে। পুলিস এগোতে সাহস পায় নি।

২৪ নবেম্বর—আজ মধ্য কলকাতা ও যাদবপুরে গুলিতে চারজনের মৃত্যু হয়। বাস ও ট্রাম গুমটিতে আগুন লাগে। ছাত্র-পুলিসে সংঘর্ষ বাধে। তবুও একটানা দুদিন হরতালের পর এদিন প্রধানত ওই দুটি এলাকা ছাড়া কলকাতা ও শহরতলির জনজীবন কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। সন্ধ্যার পরে বাস-ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শিয়ালদহ অঞ্চলে দুটি ক্ষেত্রে গুলিতে তিনজন, যাদবপুরে এক জনের মৃত্যু হয়।

আগামী সপ্তাহ থেকে (২৭ নবেম্বর) কলকাতার শিল্পাঞ্চলসহ বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় চালের বরাদ্দ মাথাপিছু ১০০ গ্রাম করে বাড়িয়ে মোট ৫০০ গ্রাম করা হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে মাথাপিছু ২৫০ গ্রাম।

২৫ নবেম্বর—আজ পাঞ্জাবের বিবাদী যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীলছমন সিং গিল পাঞ্জাবের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। শ্রীলছমন সিং বলেন, সোমবার তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করবেন এবং ওই দিনই অন্যান্য মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করবেন।

আজ কলকাতার নানা বিক্ষিপ্ত ঘটনায়, দুটি ট্রামে, দুখানি বাসে এবং একটি বাস গুমটিতে আগুন লাগানো হয়। রাত্রে বরানগরে জনতা-পুলিস সংঘর্ষে পুলিস দু' রাউনড গুলি ছোড়ে। একজন আহত হন। এছাড়া ইতস্তত বোমা-পটকাও নিক্ষিপ্ত হয়।

২৬ নবেম্বর—কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ আজ কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশাতেই কংগ্রেস ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভাকে "নিঃশর্ত সমর্থন" জানাচ্ছে। শ্রীঘোষ বলেন, কংগ্রেস এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করে না।

বিদেশী সংবাদ

২০ নবেম্বর—বৃটেনের শ্রমিক সরকারের দাবি : পাউনডের মূল্যহ্রাস সফল হয়েছে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, প্রধানমন্ত্রী উইলসনের সামনে রাজনৈতিক ঝটিকা অপেক্ষমাণ। শাসকদলে বড়-রকমের ভাঙনের আশঙ্কা। সরকার ও উইলসনের ভাগ্য নির্ভর করছে শ্রমিকদলের সাধারণ সদস্যদের মেজাজের উপর।

২১ নবেম্বর—ইজরায়েলী জঙ্গী-বোমরু বিমানবহর আজ সকালে জরডন নদীর পূর্বপারে জরডনীয় ট্যাঙ্কগুলির উপর আক্রমণ চালায়। এক ইজরায়েলী মুখপাত্র বলেন, 'শত্রুদের অবস্থানগুলি ঠাণ্ডা করে দেওয়ার জন্যই আমরা বিমান পাঠিয়েছি।

২২ নবেম্বর—সিংহলী টাকার দাম ২০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে বলে সিংহলের অর্থমন্ত্রী শ্রী ইউ বি বাণানায়ক আজ ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ পাউনডের মূল্য হ্রাসের পর চারদিনব্যাপী আলোচনা শেষে মন্ত্রিসভা আজ এই সিদ্ধান্ত নিলেন। এর ফলে এখন এক পাউনডের বদলে ১৩·৩৩ টাকার পরিবর্তে ১৪·২৯ টাকা এবং ডলারের ক্ষেত্রে ৪·৭৫ টাকার পরিবর্তে ৫·৯৫ টাকা পাওয়া যাবে।

২৩ নবেম্বর—পাউনডের মূল্য হ্রাসের জন্য শ্রমিক সরকারের সিদ্ধান্ত আজ হাউস অব কমনসে ৩৩৫-২৫৮ অর্থাৎ ৭৭টি বেশী ভোটে অনুমোদিত হয়। শ্রমিক দলের বিশিষ্ট সদস্য প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীরিচারড ক্ল্যাওশ ভোটদানে বিরত থাকেন।

২৪ নবেম্বর—বৃটেন পাউনডের বিনিময় মূল্য হ্রাস করার পর ইয়োরোপের বাজারে সোনা কেনার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। সঞ্চয়কারীরা ইয়োরোপীয় বাজারে ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের সোনা কিনেছেন। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ৬০ কোটি ডলার মূল্যের সোনা হারিয়েছে।

২৫ নবেম্বর—নিরাপত্তা পরিষদ আজ সাইপ্রাস বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এমন কোন কাজ করতে বিরত থাকতে বলেন, যাতে অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে।

২৬ নবেম্বর—সাইপ্রাস তথা গ্রীস সম্পর্কে তুরস্কের মনোভাব অনমনীয়। তুরস্ক পুরোদমে যুদ্ধ-প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও শান্তির জন্য মারকিন কূটনৈতিক প্রয়াস অব্যাহত আছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনন্দদুলাল কুণ্ডু

এখনও দাগ লুকোতে হয়?
ডিয়ারবর্ন মারকোলাইজড ওয়াক্স্ সবরকম দাগ নিশ্চিহ্ন করে
আপনার গাত্রবর্ণ সম্পূর্ণ মোলায়েম ও উজ্জ্বল করতে আপনি কি সত্যিই আগ্রহী? তাহলে ডিয়ারবর্ন মারকোলাইজড ওয়াক্স্ মেখে দেখুন আপনার ত্বকের সৌন্দর্য কেমন বিকশিত হয়ে ওঠে!
রোজ রাত্রিতে মুখে, ঘাড়ে ও গলায় চারপাশে ভালভাবে সমান করে বুলিয়ে ডিয়ারবর্ন মাখুন। ডিয়ারবর্ন আরামপ্রদভাবে ফুসকুড়ি এবং ব্রণের দাগ এবং চিহ্ন একেবারে নির্মূল করে দেয়, ত্বককে তরুণ করে এবং ত্বকের তামাটে বর্ণ আর থাকে না।
ডিয়ারবর্ন-এর রেসিলিয়া তেলের গুণে কেবলমাত্র যে আপনার ত্বক নরম ও মোলায়েম হয়, তা নয়, আপনার ত্বকের তারুণ্য অটুট থাকে এবং মুখে কোন রকম ভাঁজের দাগ দেখা দেয় না। সকালে গরম জল দিয়ে মুখ বেশ করে ধুয়ে ফেলবেন, দেখবেন রূপের দীপ্তি কত বেড়ে গেছে, মুখশ্রী কত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।
একমাত্র ডিয়ারবর্ন-এর কোমল যত্ন দিয়ে আপনার ত্বকের পরিচর্যা করুন।
Dearborn
ডিয়ারবর্ন মারকোলাইজড ওয়াক্স্
ব্যবসাসংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য
এম. জি. সাহানী এণ্ড.কোং (দিল্লী) প্রাঃ লিঃ
৩৪-বি কনট প্লেস, নিউ দিল্লী-১

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৬
শনিবার ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষান্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক "	১৪.০০
ত্রৈমাসিক "	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক "	১৪.০০
ত্রৈমাসিক "	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৮.০০
ষান্মাসিক "	২০.০০
ত্রৈমাসিক "	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষান্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
আসামে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 9 Dec. 1967.

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নাটক

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক নাটকের আরও একটি অঙ্ক সমাপ্ত হয়েছে। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের অভিপ্রায় পর্যন্ত কয়েকটি নাট্য-দৃশ্য মাঝারী গতিতেই চলছিল, তারপর গত এক মাসে নটকের গতি রীতিমত বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলে তা শেষ হয়। এই রকম একটা উত্তেজনাময় দৃশ্যের পর কি হবে—এ প্রশ্ন ছিল স্বাভাবিক। গত উনত্রিশে নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হলে মাননীয় স্পীকার তাঁর রুলিংয়ে নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি সমাপ্ত করে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন, অতঃপর? পঞ্চমাঙ্কে কি হবে? রাষ্ট্রপতি শাসন, অন্তর্বর্তী নির্বাচন? গতি সেদিকেই।

নাটক কতটা জমেছে সে-প্রশ্ন থাক, একটা বিষয় কিন্তু আজ সন্দেহ হয়, যুক্তফ্রন্ট সত্যি সত্যিই বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা দিতে রাজী হতেন কিনা। শ্রীমুখার্জি যে বেশ বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেছেন এবং বর্তমানে বিধানসভার অধিবেশন ডাকলে তাঁরা পরাজিত হবেন তাতে এখন সন্দেহ করা মুশকিল। অনেকে যে অনুমান করছিলেন, বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষায় পরাজয়ের লজ্জা এড়াবার জন্যেই শ্রীমুখার্জি ও তাঁর অনুগামীরা সভা আহ্বান করতে নারাজ হচ্ছেন—এই অনুমানও এখন সত্য বলে মনে হতে পারে। কে জানে, শ্রীমুখার্জি যতদিন না বুঝতে পারতেন তাঁরা আবার সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন ততদিন বিধানসভা ডাকতেন কিনা!

গণতন্ত্রে বিধানসভা ও বিধানপরিষদের মতন রণক্ষেত্র আর নেই। এখানে সম্মুখ সমরটাই নীতি এবং ন্যায়। গরিষ্ঠ বনাম লঘিষ্ঠের এই সমরক্ষেত্র খোলা থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে কখনো কখনো আমরা তার সম্মুখীন হতে সাহস পাই না। কেন? কিসের কারণে? এমন উপযুক্ত ও সঙ্গত ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও রাজপথের লড়াইকে প্রশ্রয় দিয়ে কি কোনো উপযুক্ত ফল লাভ করা যায়! বোধ হয় যায় না। রাজনৈতিক দিক থেকে এর কিছু সুবিধা আছে, নতুবা এ-খেলা মারাত্মক।

বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে শান্ত ও স্থিরভাবে যা হতে পারত তা হল না। যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই তাকে আজকের অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের দুর্গতি ও দুঃখের কথা বাস্তবিকই কেউ চিন্তা করেন নি; কার ঘরে কতটা ফসল উঠবে সেই হিসাবে চোখ রেখে সকলে বসে থাকলেন। তার ফলে অবস্থাটা এখন অচল হয়ে ওঠার উপক্রম।

বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা ঘটলে ফলাফল কি হত অনুমান করা যায়। কিন্তু তা ঘটে নি। বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাময়িক সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে যে রুলিং দেন তাতে দেখি—যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে রাজ্যপাল বেআইনী কাজ করেছেন, ডঃ ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠনও অবৈধ, কাজেই আলোচ্য বিধানসভার অধিবেশনও অবৈধ। স্পীকার রুলিংয়ের পর বিধানসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে বিধান পরিষদের অধিবেশনে চেয়ারম্যান ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় রাজ্যপালের কাজ এবং ডঃ ঘোষ-মন্ত্রিসভাকে বৈধ বলেই রুলিং দেন। ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার ওপর আস্থা জ্ঞাপন করে সমর্থকরা একটি প্রস্তাবও নেন।

খুবই আশ্চর্য যে, বিধানমণ্ডলীর দুই সভায় একেবারে ভিন্ন ধর্মের রায় পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য, বিষয়টি যে বিতর্কমূলক তাতে সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই বিতর্কটি প্রবল হয়ে উঠেছে এবং দেখা যাচ্ছে, বহু বিশিষ্ট আইনবিশেষজ্ঞরা যেমন স্পীকারের রুলিংকে অসমর্থন করছেন, তেমনই আবার কিছু আইনবিদ স্পীকারের রুলিং সমর্থন করছেন। আইনগত এই বিতর্কের শেষ কোথায় আমরা জানি না। তবে একটি প্রশ্ন সকলেরই মনে হচ্ছে, গোটা বিষয়টাই যদি অবৈধ, ও বেআইনী তবে মাননীয় স্পীকার এই বেআইনী বিধানসভায় উপস্থিত হলেন কেন, কেনই বা সভা মুলতবী রাখার নির্দেশ দিলেন? স্পীকার যদি সমবেত জনপ্রতিনিধিদের সামনে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করবার জনাই উপস্থিত হয়ে থাকেন, তবে সমবেত জনপ্রতিনিধিদের সম্মুখ সমরে নামতে দিতেই বা আপত্তি কি ছিল?

অনেক চমকপ্রদ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে কেটে গিয়েছে আরও একটা সপ্তাহ। আরও একটা 'সর্বাত্মক' হরতাল। আরও কিছু ছোটখাট 'সংঘর্ষ' পুলিস-জনতার মধ্যে। এ.ই মধ্যে বসেছিল পশ্চিম বাংলা বিধানসভার অধিবেশন। দশ বারো মিনিটের জন্য। এই স্বল্পকালের মধ্যে শুধু শোনা গিয়েছে স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জির ঝড়ের বেগে লিখিত রুলিং পড়া, যুক্ত ফ্রণ্ট সদস্যদের উল্লাস আর বিমর্ষ কংগ্রেস সদস্যদের পক্ষ থেকে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের প্রতিবাদ। এই অধিবেশন উপলক্ষ করেই বিধানসভার ঘরে বাইরে জমে উঠেছিল অস্ফুট উত্তেজনা, সবার আনাচে কানাচে বার বার শোনা গিয়েছে একই প্রশ্ন "কি হবে বলুন ত?"

কি হতে পারে বা হতে পারে না সব কিছুই ভেবে রাখা হয়েছিল কংগ্রেস সংসদীয় দলের আলোচনায়। সেই আলোচনা মত সকল কংগ্রেস সদস্যকে ভোরবেলা হাজির থাকতে বলা হয়েছিল বিধানসভার ভবনে। সেই কথামত সবাই ছিলেন নির্দিষ্ট সময়ে বিধানসভা কক্ষে সরকার পক্ষীয় আসনে। ছিলেন না দুজন শ্রীজগন্নাথ কোলে এবং শ্রীআফাক চৌধুরী। আর ছিলেন না বিরোধী আসনে কোন সদস্য। যুক্ত ফ্রণ্টের সদস্যরা ছিলেন তাঁদের কমিটি রুমে এবং মিছিল করে সভাকক্ষে ঢোকেন বিধানসভা বসার নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে। তাঁরা যখন ঘরে ঢোকেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করেই যুক্ত ফ্রণ্ট সদস্যরা নানা ধ্বনি দিয়ে সভাকক্ষ সরগরম করে তোলেন। অনেকের ধারণা ছিল, এরপরই হয়ত শুরু হবে তাঁর বিক্ষোভ সভাকক্ষ মধ্যে, কারণ যুক্ত ফ্রণ্টের মতে এটা ছিল 'বেআইনী' সভা।

এর পরই এলেন স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জি। কিন্তু কোন প্রশ্ন ওঠার আগেই তিনি একটি লিখিত রুলিং দিয়ে সবাইকে এবং বিশেষ করে কংগ্রেস ও প্রগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রণ্টের সদস্যদের চমকে দিলেন। কংগ্রেস পক্ষ থেকে শ্রীবিজয়সিং নাহার এবং ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তাঁর আপত্তি জানাতে লাগলেন। কিন্তু স্পীকার তা অগ্রাহ্য করে নিজের রুলিং পাঠ করে সভাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী রেখে বেরিয়ে গেলেন। কারণ, স্পীকার শ্রীব্যানার্জির অভিমতে, বিধানসভা এই অধিবেশন যেভাবে ডাকা হয়েছে, তা সংবিধানবিরোধী; কারণ সভার মত বা সিদ্ধান্ত না নিয়ে যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে খারিজ করা সংবিধানবিরোধী এবং সে-কারণে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করাও সংবিধান অনুযায়ী হয়নি। শ্রীব্যানার্জি মনে করেন, বিধানসভাকে উপেক্ষা করে রাজ্যপাল যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে যে আদেশ জারি করেছেন তা 'বে-আইনী'।

তাই স্পীকার সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যুক্ত ফ্রণ্ট সদস্যরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ ঘোষকে লক্ষ্য করে বিরোধী আসন থেকে কাঠের টুকরো, দোয়াত ইত্যাদি ছুড়ে মারা হয়। ডাঃ ঘোষ সামান্য আহত হন। সভাকক্ষের ভিতরে এইরকম উচ্ছৃঙ্খলতা যে এর আগে কখনও দেখা যায়নি তা নয়; কিন্তু রাজনৈতিক বিচারে এটা শুধু অশোভন নয়, দুর্বলতার চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। যুক্ত ফ্রণ্ট সদস্যদের নিশ্চয় অজানা ছিল না যে, বিধানসভায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়ত সত্যিই সেদিন ছিল না। যদি তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকত, তাহলে কংগ্রেস ও পি ডি এফ-এর পক্ষ থেকে যে ১৪০ জনের সই করা ডাঃ ঘোষের প্রতি আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আনার নোটিস দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যথার্থই কোন বাধা থাকত না।

রাজনৈতিক বিচারে যুক্ত ফ্রণ্টের দুর্বলতা ছিল বলেই সেদিনটি উপলক্ষ করে বিধানসভার সামনে বিক্ষোভ জানাবার জন্য ১৪৪ ধারা আইনকে ভঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে-কারণেই হয়ত ভোট গ্রহণের সুযোগটা সদস্যদের দেওয়া হয়নি। হয়ত সে-কারণেই কোন প্রশ্ন ওঠার আগেই স্পীকারকে রুলিং দিয়ে বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রাখতে হয়েছিল।

তবু বাস্তব অবস্থাটা মেনে নিলে হয়ত অনেক অস্পষ্টতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে-বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে স্পীকারের রুলিং-এ। এটাও হয়ত অবান্তর মনে হতে পারে, কারণ, এ-প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে যে, স্পীকারের পক্ষে এইরকম রুলিং দেওয়া আইনসম্মত কিনা। মনে হতে পারে, বিধানসভার কাজ পরিচালনার ব্যাপারে স্পীকারকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে, সেই ক্ষমতাকে রাজ্যপালের আদেশ, নির্দেশ বা সিদ্ধান্তকে পণ্ড করে দেবার জন্য ব্যবহার করা যায় কি না। এ-প্রশ্ন তাঁরাই মীমাংসা করতে পারেন, যাঁরা সংবিধানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত, অথবা যাঁদের হাতে আইনের চুলচেরা বিচার করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু স্পীকারের রুলিং বিশেষভাবে এ-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে বিধানসভার অধিবেশন সম্বন্ধে। স্পীকারের মতে, বিধানসভাই মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী এবং যেহেতু সেই বিধানসভার মতামত গ্রহণ না করেই যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে খারিজ করা হয়েছে, সেই হেতু ডাঃ ঘোষের নূতন মন্ত্রিসভা বিধানসভার অধিবেশন ডাকার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়া অসঙ্গত এবং সংবিধানবিরোধী। এই যুক্তি অনুসারে বিধানসভার অধিবেশন ডাকাও সংবিধানবিরোধী।

দেখা যাচ্ছে, এই বক্তব্য বা যুক্তিকে কেন্দ্র করেই শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে এমন কি বিদেশে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিতর্কে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের অনেকেই আইন এবং সংবিধান সম্বন্ধে দিকপাল। এই বিতর্ক থেকেই অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে, স্পীকারের রুলিং সম্বন্ধে যে-মন্তব্যই করা হোক না কেন, একে মুছে ফেলা যায় না। উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। তা যদি না হয়, তাহলে বর্তমান মন্ত্রিসভার পরামর্শ নিয়ে বিধানসভার কোন অধিবেশন ডাকা সম্ভব কিনা তা-ও বিচারযোগ্য। কারণ, ডাঃ ঘোষের পরামর্শ অনুসারে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হলে তা নিশ্চয়ই স্পীকারের রুলিং উপেক্ষা করা হবে। হয়ত তা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে স্পীকারের রুলিংকে অমান্য না করে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা সম্ভব নয়। তা সম্ভব না হলে স্পীকারের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী প্রস্তাবও বিধানসভায় পেশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই সংবিধানগত অচলায়তন কি উপায়ে ভেঙে ফেলা যেতে পারে, সেটা নির্ধারণ করা বিশেষজ্ঞ এবং সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু অচলায়তন রাজনৈতিক অবস্থাকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করেছে। যুক্ত ফ্রণ্টের ভিতরে এবং বাইরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মত দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে, যে-কোন কারণেই হোক, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি যুক্ত ফ্রণ্ট সরকার

খারিজ ক'রে রক্ত বন্যায় যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সে বন্যাটা যথার্থই আসেনি। তোড়জোড়ের নিশ্চয়ই অভাব ছিল না; কারণ যুক্ত ফ্রণ্ট এবং রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে বারবার ঘোষ-মন্ত্রিসভাকে বরবাদ ক'রে দেবার জন্য তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান হ'য়েছিল। শিল্প এলাকা, শহরের অফিসে অফিসে প্রস্তুতির সবরকম তোড়জোড় যে ছিল না তা নয়। তবু যে অশান্তির কথা চিন্তা ক'রে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল সকলের মুখে সেটা আর দেখা যাচ্ছে না। ১৯৬৬ সালেও খাদ্য উপলক্ষ্য ক'রে যে, অশান্তির আগুন দেখা দিয়েছিল পশ্চিম বাংলার নানাদিকে, তার দুশ্চিন্তা দূর হয়নি বহুদিন।

অনেকের ধারণা স্পীকারের রুলিং হয়ত এর জন্য কতকাংশে দায়ী; কারণ যে রাজনৈতিক কারণে যুক্ত ফ্রণ্ট এবং রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছিল তা অনেকাংশে স্তিমিত হ'য়ে গিয়েছে স্পীকারের স্পষ্ট রায়ে। তবু এ কথাও অজানা নেই যে, যুক্ত ফ্রণ্ট মহলে আন্দোলন সম্বন্ধে নানা গুঞ্জন উঠেছিল। একথাও শোনা গিয়েছিল যে, আন্দোলনের প্রকৃতি ও আকৃতি নিয়ে নানামত দেখা দিয়েছিল। এবং ছোটখাট দলগুলোর ভিতরে একথাও বলতে শোনা গিয়েছে : কেন আন্দোলন করব? অর্থাৎ আন্দোলনের মারফত কোন দলের কতটুকু রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা সম্ভব হবে এটা যাচাই করার চেষ্টা যে হয়নি তা বলা যায় না। যুক্ত ফ্রণ্টের বড় শরিক মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি [illegible] লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই পার্টির পক্ষ থেকে যে আন্দোলনের কথা বলা হ'য়েছে [illegible] কথা কৃষকদের সম্বন্ধে। বলা হ'য়েছে যে, শ্রমিক-কর্মচারী ও কৃষকের [illegible] দাবিদাওয়ার লড়াই বর্তমানে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামের সাথে যুক্ত হ'য়ে পড়েছে। পার্টির সেক্রেটারী শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন : বে-আইনী শাসনের অবসানের সংগ্রামে কৃষকের ফসলের লড়াই এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের ছাঁটাই, বেতন সম্পর্কিত দাবির লড়াই এক সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পড়েছে।

এই পার্টির পক্ষ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে পার্টি সদস্যদের কাছে তার মূল কথা এই যে, এখন থেকে, অর্থাৎ ৩০ নভেম্বরের হরতালের পর থেকে প্রতিদিন চলবে সরকারী দপ্তরগুলোকে অচল করার অভিযান এবং সঙ্গে সঙ্গে চলবে কৃষকের ফসল রক্ষার জন্য জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই। এই নির্দেশ নিছক নির্দেশ নয়। এর পিছনে রাজনৈতিক পরিকল্পনাও নিশ্চয়ই আছে। এটা আজ তার যুক্ত ফ্রণ্টের কোন দলের কাছে, এমন কি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কাছেও অজানা নেই যে, গত নয় মাসের ব্যবধানে শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বিভিন্ন স্তরে সাংগঠনিক সংস্থাগুলোকে সক্রিয় রাখার কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠন কাজ করছে অনেকদিন ধ'রে; কিন্তু মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি তার নিজস্ব সংগঠনগুলিকে জোরদার ও সক্রিয় করেছে বেশী। কৃষকদের ক্ষেত্রেও তাই। সেখানে যুক্ত ফ্রণ্টের অন্যান্য দলের সংগঠন থাকলেও সেগুলো তেমন সক্রিয় নয়। কাজেই আজ "এই বেআইনী সরকারকে মানবো না" ব'লে যে স্লোগান তুলে শহরের রাজনৈতিক আন্দোলনকে কৃষকের "ফসল রক্ষার" লড়াইয়ে পরিণত করার প্রচেষ্টা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, যুক্ত ফ্রণ্টের অন্যান্য শরিকদের কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির এই প্রচেষ্টা যুক্ত ফ্রণ্টের সকল শরিকদের কাছে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে নাও হ'তে পারে। কারণ এই প্রচেষ্টার অর্থই হবে রাজনৈতিক আন্দোলনকে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির হাতের মধ্যে তুলে দেওয়া। সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কারণ এদেরই পাল্টা সংগঠন "ভারতের (মার্কসবাদী) কম্যুনিস্ট পার্টির বিপ্লবী কমরেডরা" অর্থাৎ উগ্রপন্থীরা, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের প্রচেষ্টাকে একটা ভিন্ন রকমের সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। তাদের মতে, "নয়া-সংশোধনবাদী নেতৃত্ব জনগণ ও পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" এদের পক্ষ [illegible] স্পষ্ট ক'রেই রাখা হ'য়েছে। [illegible] হ'য়েছে, রাজ্যব্যাপী গণআন্দোলনের যে দাবিগুলো সামনে রাখা হ'য়েছে, তাতেই [illegible] "বিপ্লবের লক্ষ্য এবং মতলব" পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। [illegible] "বিপ্লবের" মূল দাবি হচ্ছে: (১) রাজ্যপালের অপসারণ, (২) বে-আইনী ঘোষ মন্ত্রিসভার অপসারণ, (৩) ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ইত্যাদি। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কৃষক আন্দোলনের ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে স্লোগানগুলো সামনে রাখা হ'য়েছে তার মধ্যে যে দুটো বড় ক'রে বলা হচ্ছে তা হ'ল "বিধানসভা ভেঙ্গে দাও ও মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই" এবং "[illegible] সংগ্রাম চালিয়ে যাও"। এই দুটো স্লোগানকে লক্ষ্য ক'রেই আজ উগ্রপন্থীদের [illegible] অক্রমণ মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে। এদের পক্ষের মূল বক্তব্য : মার্কসবাদী নয়া সংশোধনবাদী নেতারা যে লড়াইয়ের ডাক দিচ্ছেন তার উদ্দেশ্য জনসাধারণকে সংসদীয় রাজনীতির গোলকধাঁধার মধ্যেই আটকে রাখা।

মোট কথা, বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই আজ মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি তার বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের স্ট্রাটেজী ঠিক ক'রে নিয়েছে। এই স্ট্রাটেজী যুক্ত ফ্রণ্টের অন্যান্য শরিকদের কাছে অজ্ঞাত যে নেই তা বোঝা যায় ছোটখাট দলগুলোর দিকে তাকালে। তাদের কাছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের একটাই অর্থ পরিষ্কার হ'য়ে আছে : সংসদীয় গণতন্ত্রের অংশীদার হওয়া দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠবে। তাই যুক্ত ফ্রণ্টের মধ্যে আজ আন্দোলনের প্রকৃতি ও আকৃতি নিয়ে মতভেদ দেখা দিচ্ছে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির ছায়াটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হ'চ্ছে না ব'লে।

একথাটা শ্রীঅজয় মুখার্জিও যে বোঝেন না, তা নয়। তিনি জানেন আজ মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য আন্দোলনের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব তাঁর নিজস্ব দলের যতটা না কাজে লাগবে, তার থেকে বেশী কাজে লাগাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি। আজ শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে যুক্ত ফ্রণ্টের নেতৃত্বের আসনে বসে থাকা ছাড়া অন্য কোন পথ আপাতত খোলা নেই। কারণ যে কংগ্রেসের উপর তিনি একবার নির্ভরশীল হ'য়েছিলেন, সে কংগ্রেসের নেতৃত্ব আজ পুরোপুরি শ্রীঅতুল্য ঘোষের হাতে। সে নেতৃত্বের অংশীদার পশ্চিম বাংলায় নেই ব'লেই আজ আর শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে যুক্ত ফ্রণ্টের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। অথচ এই যুক্ত ফ্রণ্টের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক চেহারা নেই। যদি মধ্যবর্তী নির্বাচনের আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁকে দিতে হয়, তাহলে সে নেতৃত্বের চাবিকাঠি থাকবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে।

শ্রীঅতুল্য ঘোষও পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের একটা মত জানিয়ে দিয়েছেন স্পষ্ট ভাষায়। মধ্যবর্তী নির্বাচন যদি হয়, তাহলে কংগ্রেস তার মোকাবিলা করতে নিশ্চয়ই প্রস্তুত থাকবে। মোট কথা, একদিকে যেমন মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি, অপরদিকে তেমনি কংগ্রেস সমানভাবে রাজনৈতিক অবস্থাকে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে প্রস্তুত। এই প্রস্তুতির মধ্যে বিধানসভার স্পীকারের রুলিং একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। কারণ সংবিধানগত অচলায়তন যদি সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, তাহলে তার অবসান ঘটাতেই হবে। [illegible] সেটাই বর্তমানে [illegible]।

অফ্ সাইড
উইনার এবং রানার্সআপ
বঙ্গশ্রী
শ্রীযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ
কংগ্রেস
Kutty
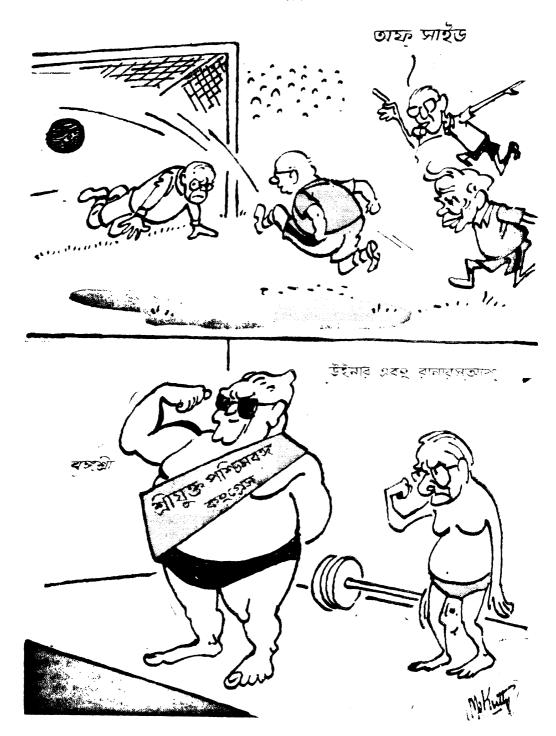
ভাঙা-গড়া

কিছুকাল আগেও যারা ছিল প্রচণ্ডভাবে পরস্পর-বিরোধী দুর্ভাগ্যের তাড়নায় তারাই এখন একই শয্যায় পাশাপাশি। রাজনীতিতে অতএব শেষ কথা নেই, কোন-কালেই নেই; নেই তেমনই কৃতজ্ঞতাবোধের মৌরসী পাট্টা। এ-সব বিষয়ে সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দু' একটা উল্লেখ করা যায়। ১৯৫৬ সনের সুয়েজ যুদ্ধের সময় থেকে ছিল ব্রিটেনের সঙ্গে মিশরের বিষম শত্রুতা। গত জুন মাসের আরব-ইজরায়েলী যুদ্ধ পর্যন্ত সে-শত্রুতার মনোভাব একটুও বদলায়নি। তারপর কী ঘটেছে? যুদ্ধ থামলেও সুয়েজ খাল বন্ধ। তার ফলে ব্রিটেনের ব্যবসা-বাণিজ্যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে বিস্তর। খাল বন্ধ থাকায় লোকসান আরও অনেক দেশের, প্রেসিডেণ্ট নাসেরকেও তাঁর জিদ বজায় রাখতে খেসারত দিতে হচ্ছে প্রচুর। তবে যে-দেশ বেশী স্বচ্ছল, বৈদেশিক আমদানি রপ্তানির উপর নির্ভর তারই দুর্ভোগ বেশী। ব্রিটেনের পাউণ্ড যে মার খেয়েছে, দর নামাতে বাধ্য হয়েছে তার একটা কারণ অন্তত ওই সুয়েজ খালের অচলাবস্থা। ব্রিটেন তাই হঠাৎ অকারণে মিশরের শয্যা-সঙ্গী হওয়ার তাগিদ অনুভব করেনি। এ-শয্যা অবশ্য এখনও কণ্টক-শয্যা, অথবা বলি, সেই গ্রীক-পুরাণ-মাফিক "প্রকাস্টিস্ বেড্", যার ওপরে পা বিছিয়ে শোয়া সব দিক দিয়ে প্রাণান্তকর।

সে যাই হোক, প্রেসিডেণ্ট নাসের ও মিশরের বড় সমঝদার এখন ব্রিটেন ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজর্জ ব্রাউন। সুয়েজ খাল বন্ধ থাকায় দু-পক্ষের হৃদয়ের কবাট যদিও না এখন খোলা গেল, ও দিকে কিন্তু পাউণ্ডের দর কমিয়েও পশ্চিম ইউরোপের বারোয়ারী বাজারের দরজা ব্রিটেন খুলতে পারছে না। বাদ সাধছেন ফ্রান্সের প্রেসি-ডেণ্ট দ্যগল। ব্রিটেন ও মিশর পুরনো রাজনীতির আড়াআড়ি পেরিয়ে একই শয্যায় পাশাপাশি গা বিছিয়েছে, কিন্তু পুরনো দিনের উপকারের কথা স্মরণ করিয়েও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড উইলসন প্রেসিডেণ্ট দ্যগলের মন গলাতে পারছেন না। শ্রীউইলসন মনে করিয়ে দিয়েছেন, আজ প্রেসিডেণ্ট দ্য গল ব্রিটেনের দুর্দিনে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, পশ্চিম ইউরোপের বারোয়ারী বাজারে ব্রিটেনকে ঢুকতে দিচ্ছেন না, কিন্তু ব্রিটেন যদি ইউরোপকে নাৎসী দখল মুক্ত করার চেষ্টায় সর্বস্বপণ না করত তবে কোথায় থাকতেন দ্যগল, ফ্রান্সের কী গতি হত? শ্রী উইলসনের অনুযোগ মিথ্যা নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কাতেই ব্রিটেনের আজ প্রায় দেউলিয়া অবস্থা। তবে মুশকিল ওই যে, কোন দেশের রাষ্ট্রনীতিই কৃতজ্ঞতা, দয়া ইত্যাদিকে বড় একটা দাম দেয় না।

পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স, আমদানি-রপ্তানী, কলকারখানার উৎপাদনের গড়পড়তা খরচ, ব্রিটেনের এ-সব বিষয়-আশয়গত সমস্যার আর একদিকে তার বনেদী সাম্রাজ্যিক দায়-দায়িত্ব। পশ্চিম এশিয়ার আরব মুলুক হোক অথবা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মালয়-সিঙ্গাপুর-বোর্নিও হোক, ব্রিটিশ সৈনাঘাটি ছিল এককালে এ-সব অঞ্চলে সর্বশক্তিমান। গত কুড়ি বছরে উলটপালট হয়েছে বিস্তর, সব যেতে যেতেও এখানে সেখানে সমুদ্র-পথের গলির মোড়ে "ব্রিটিশ উপস্থিতির" কিছু ক্ষুদ-কুঁড়া এতদিনও টিঁকে ছিল; যেমন ছিল এডেন, দক্ষিণ আরবভূমির শেখশাহীর খবরদারী। এবার সে সবও ছাড়বার পালা। তবু ভালো, পাথুরে জিব্রালটরের অধিবাসীরা ফ্রাঙ্কো-স্পেনের "স্বদেশী" শাসনের চেয়ে বিদেশী ব্রিটিশ শাসনই পছন্দ করেছে, নতুবা ভূমধ্য-দরিয়ার পশ্চিম প্রান্তের এই ঘাটি থেকেও ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে নিতে হত।

এখন ইউনিয়ন জ্যাক গুটিয়ে নিতে হচ্ছে এডেন ও দক্ষিণ আরবভূমি থেকে। গত বছরেও ব্রিটিশ সরকারের সাধ ছিল সুয়েজের পূব দিকে ব্রিটেনের উপস্থিতি কিছুটা অন্তত টিঁকিয়ে রাখা। সে-সাধ এখন ব্রিটেনের সাধ্যের বাইরে। সাধ কেবল ব্রিটেনের নয় কেন, প্রেসিডেণ্ট নাসেরও চেয়েছেন, চেষ্টা করেছেন গোটা আরবভূমির উপর মিশরের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। যা নিয়ে সৌদী আরব ও জর্ডানের সঙ্গে ছিল তাঁর বিরোধ; যার জন্য ইয়েমেনে প্রজাতন্ত্রী রাজত্ব খাড়া রাখবার চেষ্টায় নাসের পুরো পাঁচটি বছর প্রচুর অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র ঢেলেছেন। এখন আর সাধ নেই, যেমন ব্রিটেনের, তেমনই মিশরের এবার দক্ষিণ আরব ভূমিতে খেলা-ভাঙার পালা। "আগে প্রাণ করিবেক দান-এ" ব্রিটেন অথবা মিশর কারোরই আর উৎসাহ নেই; দক্ষিণ আরবভূমি থেকে ব্রিটেন ও মিশর দুয়েরই তাগিদ তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটানোয়।

ইয়েমেনের প্রজাতন্ত্রী সরকার ছিল প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সাহায্য-পুষ্ট; তার প্রতিবাদী রাজতন্ত্রীদের পিছনে ছিলেন সৌদী আরবের রাজা ফয়জল। আরব ইজরায়েলী যুদ্ধের পর নাসের ও ফয়জল ইয়েমেন সম্পর্কে বোঝাপড়ায় অগ্রসর হন। গত অক্টোবর মাসে ইয়েমেন থেকে মিশরী সৈন্যদল সরিয়ে আনেন প্রেসিডেণ্ট নাসের। তার পরিণাম ইয়েমেনের উগ্রপন্থী রাষ্ট্রপতি শালাল সম্প্রতি গদিচ্যুত হয়েছেন। ইয়েমেনের রাজতন্ত্রীদের অবশ্য তাতে সুবিধা হচ্ছে না। নাসের ও ফয়জলের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে ইয়েমেনের রাজনীতি স্বাভাবিক ধারায় চলবে, কোন পক্ষেই বিদেশী মুরুব্বিয়ানা থাকবে না, আপাতত এইরকম আশা। ইয়েমেনে এখন যাঁদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁরা নাকি নরম-পন্থী, পাশ্চাত্ত্য শক্তিগোষ্ঠীর উপর প্রচণ্ড ভাবে বিরূপ নন। তবে সোভিয়েট সাহায্যও তাঁরা নিতে থাকবেন; লক্ষ্য করবার বিষয়, ইয়েমেনে ক্ষমতা হাতবদলের পরেও সোভিয়েট রাশিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান সরবরাহ করা হয়েছে। এর পর ইয়েমেনের উপর মার্কিন-সোভিয়েট শক্তিদ্বন্দ্ব ভর করবে কিনা কে জানে?

দক্ষিণ আরব ভূমির স্বাধীন রাষ্ট্রের সমস্যা আরও কঠিন। এই অঞ্চলের স্বাধীনতা দাবি দমনের চেষ্টায় ব্রিটেন কিছুকাল আগে পর্যন্ত নানা রকম বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। তার জের সহজে মিটবে মনে হয় না। ব্রিটিশ-আশ্রিত শেখরা আমাদের দেশের সামন্তরাজাদের মত সুবোধ নাও হতে পারেন; সৌদী আরবের রাজা ফয়জল কী ভূমিকা নিতে পারেন সেটাও ভাবনার বিষয়। তাছাড়া দক্ষিণ আরব-ভূমির জাতীয়তাবাদীরা দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত, ব্রিটেন তার ক্ষমতা হস্তান্তর করছে একটি গোষ্ঠীকে। কাজেই এক্ষেত্রেও রাজনীতির শেষ কথা কেউ বলতে পারে না।

৪।১২।৬৭

আমি যেন সে-প্রবাসী হই

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এ-মুহূর্তে তাসের শৌখিন
গৃহস্থ-বাড়ির মতো
খিড়কি-দুয়ারের পাশে কাঠবাদাম...
জানলা বন্ধ, হুলো
এখন চৈতন্য খুলে, প্রবাসী সে, শয্যামূলে শুলো!

কারণ, অঙ্গাঙ্গী দামী রাত-পোশাক, দুরন্ত রঙদার
এ-মুহূর্তে—
বিস্তৃত পাহাড়
চারদিক চাষবাসে ক্ষিপ্ত, ছই
জীবনে-মরণে ভ্রান্ত, আমি যেন সে-প্রবাসী হই॥

কবিতা হারালে

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

একটা কবিতা খুঁজে পাচ্ছি না—
কোন্ খাতায় যে উত্তেজনায় রাত্রিবেলার অশ্রুমোচন
—খুঁজে পাচ্ছি না।

একটি পঙ্‌ক্তি
মনে পড়ছে কি—একটা শব্দ?
না পড়লে আর কোনোদিন সেই কবিতা আমার ফিরবে না
সে যে অভিমানী, সে যে প্রেমিক
আমার, বিপ্রলব্ধ!

সারা দিন ভেবে ক্লান্ত হলাম
তারপর রাত, হৃদয় শান্ত—
তখনই হঠাৎ মনে চমকালো
সেই কবিতাটি লিখবো ভেবেছি
—লেখা তো হয় নি।

অনেক কবিতা লেখাই হয় না—
এমনি অনেক কবিতা আমার অসহায়
তারা ঠোঁট ছুঁয়ে যায়, করে না জব্দ!

বকুল-জাতক

শক্তি ভট্টাচার্য

মস্ত একটা ফুল ফুটলো তোমার পদতলে।—
লোকে বললো : সকাল। আমি সকাল দেখি নি;
জন্মাবার আগেই আমার পূর্ব-পুরুষেরা
পাটে পাটে যত্নে দু-চোখ রুমালে বাঁধলেন।

আমার উদ্যানে তাই ফুলগুলি ধূপাধারে জ্বলে।

বকুল কি আর ফিরে আসবে? কবে আসবে আবহাওয়া-তাত্ত্বিক?
ভুলে যেন আসবেন না পিছন-বন্দরে।
সবুজ বনরাজি দেখুন প্রস্তাবিত সেচে
দুরাদয়শ্চক্র—গভীর হাইওয়ে গড়েছি—

ফুলগুলি দুর্মর তাই আঁধারেও দ্বি-প্রহর জ্বলে।

ক্ষমা করবার সন্ধ্যা আসবে, পা রাখবার ফুল ফোটাবার মাটি,
টুকরো টুকরো হাওয়া ভাসবে অসংবদ্ধ প্রাকৃতে পৈশাচী,
দুলে উঠবে কালবোশেখী।—ফুট-নোটসে পড়ে থাকবে রাত,
গোলাপ জ্বলবে আলাউদ্দীন, আগুন হবেন পদ্মিনী-সমাজ।

ফুলগুলি ঝরে যাবে তৎক্ষণাৎ বোধিদ্রুমমূলে॥
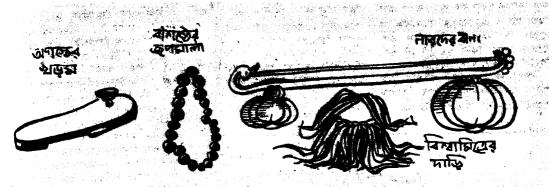
‘একটি নস্যদানী’

কল্পনা করা যাক—প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছোট একটি দ্বীপ। বিলিতী কার্টুনে যেমন দেখা যায়—হাত-দশেক লম্বা আর হাত পাঁচ-ছয় চওড়া সেই প্রবাল দ্বীপটিতে একটি মাত্র নারকেল গাছ এবং সেই গাছের তলায় জনৈক ভদ্রসন্তান উপবিষ্ট—যিনি জাহাজ-ডুবি কিংবা অন্য কোনো কারণে হঠাৎ সেখানে পেঁাছে গেছেন।

নগদ এক লক্ষ পাউণ্ড আছে লোকটির সঙ্গে। এক লক্ষই হোক আর বিশ লক্ষই হোক, পাউণ্ডের তাড়ায় ভেলা বেঁধে কেউ সমুদ্র পাড়ি দিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের এই মানুষটি সমুদ্র পেরুবার কথাও ভাবছেন না এখন, আরো জটিল সমস্যা তাঁর সামনে। খাদ্য এবং পানীয়? না—গাছে গুটি-কয়েক পুরুষ্টু নারকেল দেখা যাচ্ছে। আসলে, লোকটি আফিং খেয়ে থাকেন। এই দ্বীপে পেঁাছুবার সময় টাকাগুলো সঙ্গে আনতে পেরেছেন, কিন্তু আফিঙের কৌটোটি বিসর্জন দিয়ে এসেছেন সমুদ্রের জলে। আর এখন তাঁর মৌতাতের সময় হয়েছে। অতএব—

ধরা যাক, দু'দিক থেকে দু'টো নৌকো এল আদিম অধিবাসীদের। এক নৌকো বললে, ‘তোমাকে আমরা উদ্ধার করব, চার-দিন লাগবে তীরে পেঁাছুতে। কিন্তু সঙ্গে আমাদের আফিং নেই।’ দ্বিতীয় নৌকোটি জানালে: ‘তোমাকে আমরা নিতে পারব না, তবে এক লক্ষ পাউণ্ড আমাদের দিলে এক ভরি আফিং দিতে পারি।’ অতঃপর জিজ্ঞাসা—মৌতাত-তাড়িত লোকটি কী করবে?

যতদূর অনুমান করা যায়—দ্বিতীয় প্রস্তাবটিই সানন্দে মেনে নেবে সে।

একুশ হাজার পাউণ্ড দিয়ে একটি নস্যদানী কিনে যে অনামা অথবা অনাম্নী সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী খ্যাতিলাভ করলেন, তিনি সম্ভবত নিছক নেশার তাড়াতেই এমন একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার ঘটান নি। সে প্রয়োজনটা অনেক অল্প খরচেই তাঁর মিটতে পারত। তিনি যদি প্রাচীন বাংলার গঙ্গা-সরস্বতী তীর-নিবাসী কোনো নৈয়ায়িক হতেন এবং মধ্য রাত্রে যখন একটা কূট প্রশ্নের প্রায় মীমাংসায় এসে আবিষ্কার করতেন তাঁর শামুকের খোলায় এক টিপও নস্য নেই—তা' হলে তিনি হয়তো মরিয়া হয়ে এমন একটা কিছু করে বসতে পারতেন; কিন্তু তিনি এক খোলা নস্যির জন্যে বড় জোর এক ঝুড়ি ‘তিন্তিড়ী-পত্র’ দিতে পারেন—গরিব ব্রাহ্মণের ‘উপপত্তি’ ওই পর্যন্তই!

একুশ হাজার পাউণ্ডের নস্যদানীটি যিনি কিনলেন—তিনি এই অর্থে নেশাখোর নন। নস্যের নেশার জন্যে তাঁর ‘টু-পেন্স’ হলেই কুলিয়ে যেত। কিন্তু তাঁর নেশা আরো দুর্নিবার। তিনি যদি আফিংখোর না হয়ে সংগ্রহকারী হতেন, ওই রকম একটি দ্বীপে এক লক্ষ পাউণ্ড কিংবা আরো বেশি নিয়ে বসে থাকতেন, যদি ওইভাবে দুটি নৌকো এসে দেখা দিত এবং দ্বিতীয় নৌকো যদি এসে বলত: ‘তোমাকে উদ্ধার করতে পারব না, কিন্তু তোমার সব টাকাগুলো দিলে স্যার ওয়ালটার র‍্যালের তামাক খাওয়ার প্রথম হুঁকোটি তোমায় দিতে পারি,’ তা' হলে তিনি আর পার হতে চাইতেন না, হুঁকোটাই কিনে বসতেন!

হাতে কাজ না থাকলে লোকে কী করে? খুড়োর গঙ্গাযাত্রা—এই হচ্ছে বাংলাদেশের একটি খনেদী রসিকতা। আর হাতে অনেক টাকা থাকলে? কী করে আমি ঠিক বলতে পারব না—কারণ ও ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই (আমার এক বন্ধু বলে-ছিলেন, লাখ টাকা? লাখ টাকা আবার হয় নাকি? লোকে বানিয়ে বলে'); তবে অনুমান করতে পারি—তারা পৃথিবীর যাবতীয় ভালো খাদ্য এবং পানীয় ভোগ করে, বিরাট বিরাট বাড়িতে থাকে, মস্ত মস্ত গাড়িতে চড়ে, বিশ্ব-সংসার টহল দিয়ে বেড়ায়, বান্ধবীর জন্মদিনে দু' লক্ষ ডলারের আতরের শিশি (বানিয়ে বলছি না—সংবাদ প্রমুখাৎ লব্ধ) উপহার দেয়। এবং তারপর? কেন, সংগ্রহ!

জীবনের যে-কোনো বিলাসিতায় অধিকার তো যে-কোনো ধনবানেরই আছে। তাতে

একদা কাচের চুড়ির বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গরা স্বর্ণপিণ্ড সংগ্রহ করেছিল

আজ লাখ মুদ্রার বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গরা কিনছে নস্যির কৌটো

করে বিশিষ্ট হওয়া যায় না। অতএব এমন কিছু আহরণ করা দরকার—যা দুর্লভ, যা দুষ্প্রাপ্য, যা অসাধারণ। ঐতিহাসিক মণি-মুক্তো? নিশ্চয়। কিন্তু তার চাইতেও দামী কিছু কি নেই? আছে—আর্ট-ট্রেজার।

শিল্পী বেঁচে থেকে যে ছবি পাঁচ পাউণ্ডে বেচতে পারেন নি, এখন লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড দিয়েও তার নাগাল পাওয়া যায় না। একখানা রুবেন্স নীলামে ওঠবার খবর পেলে পৃথিবী পাগল হয়ে যায়; এক টুকরো সেজান কিংবা আধখানা ভান গথের জন্যে কোটিপতিদের আহার-নিদ্রা বন্ধ; মিউজিয়ম আর আর্ট গ্যালারিগুলোতে চুরির হিড়িক চলে; বিশ্ববিখ্যাত ছবির 'রেপ্লিকা'র নাম করে দেশে দেশে চলতে থাকে জালিয়াতির অবাধ ব্যবসা।

যাঁরা এ-সব ছবি কেনেন, তাঁরা কি সবাই আর্টের 'কন্যাসার?' দু'-চারজনকে বাদ দিয়ে অধিকাংশ সম্পর্কেই এমন অপবাদ অতি বড়ো শত্রুতেও দেবে না। শুধু বিশিষ্ট হওয়ার আনন্দ, অন্যের যা নেই, আমার তা থাকবার অসামান্য গৌরব। 'জক হিয়ার স্যার, দিস্ ইজ্ অ্যান ওরিজিন্যাল টার্নার!'

শুধু ছবি নয়, আরো চাই। ছুঁচের সুখম্। সংগ্রহ করো দেশ-বিদেশের জিনিস—সুতরাং নরখাদকদের ছুরি থেকে আরম্ভ করে বাঙালী ঠাকুরমাদের হরিনামের ঝুলিতে পর্যন্ত টান পড়ে। (কলকাতায় যেমন অনেক বসবার ঘরে মহীশূরের খেলনার সঙ্গে কালিম্পং-এর ওয়াল-প্লেটের কদাকার অ্যাসর্টমেণ্ট চোখে পড়ে।) তারও পরে সুভ্নির।

অতএব ইয়োরোপে ফলাও কারবার।

'এই যে চেয়ারটা—এ হল খাঁটি এলিজা-বেথান। যদিও দুটো পায়া ভাঙা—কেউ বসতে পারবে না, তবু কী অত্যাশ্চর্য সুভ্নির!'

'এই যে কানা ভাঙা বড় চামচেটা, এটার করে মেটারনিচ্ পরিজ খেতেন।'

'নেপোলেয়'র গ্র্যাণ্ড আর্মির জেনারেল মঁসিয়ো অমুকের পিস্তলের এটা হাতল। অনেক কষ্টে সংগৃহীত, স্যার। চোর তাড়াতে পারবেন না, কিন্তু—'

'এই যে আধ-ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন দেখছেন, এটা মাদাম পঁপাদুরের ব্যাঙ্কোয়েট হলে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

যিনি ফরাসী কারিগরের তৈরি নস্যের ডিবেটি একুশ হাজার পাউণ্ডে কিনেছেন, তিনি নিশ্চয় এই সুভ্নির-সংগ্রাহকদের একজন—বিশিষ্টতায় অভিলাষী। তাঁর অনেক টাকা আছে। কাজ না থাকলে আমরা খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করাই—হাতে টাকা থাকলে ও'রা এই সব অসাধারণ জিনিস কিনে থাকেন। খুড়োর গঙ্গাযাত্রার চাইতে ওটা ভালো, কারণ খুড়ো আপত্তি করতে পারেন, কিন্তু সুভ্নির-বিলাসীরা এ রকম অযাচিত পরোপকার করেন না।

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের একটা টিপ্স দিচ্ছি। সম্রাট আকবরের পিকদানী, মধু দিয়ে কোকিলের ডিম মেড়ে খাওয়ার জন্যে (পরশুরাম দ্রষ্টব্য) তানসেনের খলনুড়ি, বিক্রমাদিত্যের সোনার খড়কে—এ সব যোগাড় করা যায় না? নিশ্চয় যায়। দুর্দান্ত জমার আর্নার হবে।

শিবরাম চক্রবর্তী

জীবনরহস্যের কোনো হদিশ পেলাম না ভাই', দুঃখ করছিল আমার বন্ধু সোমনাথ ডাক্তার : 'সারাজীবন ধরে এত চেষ্টা করেও।'

'তোমাদের পাবার ত কথা নয়', তার খেদোক্তিতে আমি বাধা দিই—'ওতো আমাদের ...লেখকদেরই একচেটে এলাকা ভাই! তলিয়ে যাবার ভয় থাকলেও, ওর গভীরে আমরাই ত ডুব দেব...থই না পেলেও...থ হয়ে গেলেও। তোমাদের কারবার তো জীবন্মৃতদের নিয়েই। জীবনসংশয়দের সঙ্গেই ত যতো সম্পর্ক তোমাদের।'

'জীবনরহস্য মানে দীর্ঘ জীবনের রহস্য। বলে সে প্রাণীমাত্রের আদিমতম প্রাণের কথাটি প্রকাশ করে—'কি করে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় অনেকদিন বেঁচে থাকা যায়—সেই সমস্যার কথাই আমি বলছিলাম হে।'

'ও, এই কথা!' বলে আমি হাঁফ ছাড়লাম।

'অবশ্যি কিছু কিছু কিনারা যে পাওয়া না গেছে তা নয়। মিতাহারী মিতাচারী হলে মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেটা প্রকাশ পেয়েছে। আহার-বিহারে সংযমীদের অকালমৃত্যুর আশঙ্কা ঢের কম। এই মিতাহারের কথাটাই ধরা যাক না... মিতাহার মানে পরিমিত আহার...'

মিতাহারের কথায় আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

সত্যি, পরির মতই মেয়ে ছিল বটে মিতা। কিন্তু ওই মিতাহারের চেষ্টাতেই...

হ্যাঁ, মিতাহারী হবার সুযোগ পেলে আমি দীর্ঘজীবী...আরো একটু দীর্ঘজীবী হতে পারতাম হয়ত! এই সংক্ষিপ্ত জীবনে যে কটা দিন বেঁচেছি তার ভেতরেই আরো একটু বেশি দিন বাঁচা যেত, অনেক দিন অনেক রাত আরো অনেক বেশী জীবন্ত হত, সেই তরুণগর্ভাঙ্গিনীকে ক্ষণকালের জন্যেও সঙ্গিনীরূপে পেলেও এই এক জীবনেই অনেক জীবন-যাপন করা যেত, এই জনমেই 'জন্ম-জনমান্তর' লাভেরও কোনো অন্তরায় ছিল না। কিন্তু মিতালীর মুখপাতেই যেভাবে চড়চিত হতে হলো মনে পড়ায় এতদিন পরেও দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল আমার।

'মিতাহারের কথা ত বলছ।' আমি ফোঁস করে উঠলাম : 'কিন্তু মিতাচার কিরূপ অম্লমধুর, যদি জানতে! আঙুর ফলের মতই ভারী টক ভাই! ওর talk পর্যন্তই ভালো, তার বেশি এগুলেই মারাত্মক।'

সেই বিপজ্জনক আচার-ব্যবহারের কথা স্মরণ করে এতদিন পরেও আমি শিউরে উঠি।

সে হাতের কাগজের একটা অংশে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—'আজকের এই খবরটা পড়েছ? এইটে পড়েই ওই দীর্ঘজীবনের প্রশ্নটা আমার মাথায় উঠেছে।'

খবরটায় নজর দিলাম—খবরের মত খবর বটে।

'একালের এক দীর্ঘজীবী মানুষ—গতকাল ভট্টপল্লীর শ্রীভট্টশালী মহাশয়ের ১০৬-তম জন্মোৎসব হয়ে গেল। তাঁর নিজের বিবেচনায় তাঁর বর্তমান বয়স ১০৯ বছর, প্রাথমিক গণনার ভুলহেতু তিন বছর বাদ পড়ে গেছে...'

'ইস্। লোকটা নিজের জীবনটাকে নিয়ে নয়-ছয় করছে।' খবরটা পড়ে আমি বিরক্তি প্রকাশ করি—'অ্যাদ্দিন ধরে বেঁচে থেকে কী যে হয়। বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকার কি কোনো মানে আছে?'

'আরে, আজ যদি আমরা দীর্ঘজীবনের কিনারা করতে পারি তো কাল দীর্ঘ যৌবন-লাভের কিনারে গিয়ে পৌঁছব, তা জানো?' বলল সোমনাথ : 'চলো যাই ভাটপাড়ায়। ভদ্রলোকের ইনটারভিউ নিইগে। জীবন-রহস্যের যদি কোনো হদিশ পাওয়া যায়।'

ভাটপাড়ায় পা দিয়েই একজনের কাছে শ্রীভট্টশালীর বাড়ির ঠিকানাটা শুধালাম।

'অ্যাঁ? ভট্টশালার বাড়ি খুঁজছেন আপনারা?' লোকটা যেন খেঁকিয়ে উঠল।

'ভট্টশালা। তার মানে।' আমরা ত অবাক।

'এক নম্বরের বদলোক মশাই। আমরা ওকে ভট্টশালাই বলি। শ্রীশ্রী ভট্টশালা।'

'এমন কথা বলছেন কেন?' সোমনাথ একটু মৃদু প্রতিবাদ জানায় : 'এত দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে রয়েছেন—উনি ত আপনাদের ভট্টপল্লীর গৌরব।'

'গৌরব! গৌরবই বটে!' লোকটার মুখ-ভঙ্গী দেখবার মতই—'খেয়ে না খেয়ে অ্যাদ্দিন ধরে খালি বেঁচেই রয়েছেন, এ ছাড়া আর কী করেছেন উনি? শুনি একবার?'

'কিছুই করেননি?' ভদ্রলোকের কথায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কী কী করা উচিত ছিল উক্ত ভট্টশালীর মনে মনে তাই খতাই।

'দীর্ঘজীবনবাবুর কথা আর বলবেন না!' এই কথা বলে বিষবৎ আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যায় লোকটা।

ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত আমরা ভট্টশালী মশায়ের অট্টচালায় গিয়ে পৌঁছলাম।

চতুষ্পাঠীতেই বসেছিলেন ভট্টশালী। নমস্কার করেই কথাটা পাড়া গেল—'কলকাতার থেকে আসছি আমরা। আজকের কাগজে খবরটা পড়েই ছুটে এলাম, আপনার এই দীর্ঘজীবনলাভের কারণগুলো আমরা জানতে চাই—যদি দয়া করে আমাদের জানান...আমি একজন ডাক্তার। ইনি লেখক।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দীর্ঘজীবনলাভের যদি কোনো শর্টকাট থাকে...' সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুযোগ।

'আসুন আসুন। বসুন আপনারা।' আমাদের অভ্যর্থনা করে বললেন ভট্টশালী।

—'দেখুন, দীর্ঘজীবনের রহস্য কিছু নেই। দীর্ঘজীবনলাভের সোজা পথ হচ্ছে সহজ পথ। জীবনের আঁকা বাঁকা চোরা গলিতে না যাওয়া—ভুল পথগুলো এড়িয়ে চলা। সর্বদা সোজা পথে চলবেন—সেইটেই হচ্ছে সোজা পথ। সহজভাবে জীবন-যাপন করলেই দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। মিতাহার, মিতাচার, আহার-বিহারে সংযম, নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবন—এইগুলিই দীর্ঘায়ুলাভের সহায়ক। সংযত জীবন-যাপন করলে যে পরমায়ু বাড়ে তা আর না জানে কে?'

'আজ্ঞে, আমিও সেই কথাই বলছিলাম আমার বন্ধুকে, এই মিতাহার মিতাচারের কথাই। এখন আপনিও আবার সেই কথাই বলছেন।' নিরুক্তি করল সোমনাথ।

'দেখুন আমি আজীবন নিরামিষাশী, জীবনে মদ্যমাংস স্পর্শ করিনি, কোনো নেশাভাঙ নেই আমার, কিছুর জন্যেই কোনো উদ্বেগ দুশ্চিন্তা নেই কো, মনে হয় এই সবই হয়ত আমার দীর্ঘজীবনলাভের হেতু হবে।' বলে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন : 'তবে আমার এ আর কী দীর্ঘজীবন। আমার চেয়েও দীর্ঘতরজীবী ব্যক্তি এই অঞ্চলেই রয়েছেন। এই ভট্টপল্লীতেই।'

'বলেন কি! কই, তাঁর খবর তো...'

'পাবেন কি করে, তিনি কখনো নিজের পরমায়ু কারো কাছে প্রকাশ করেন না। কিন্তু আমি তো জানি। এইটুকুন বয়েস থেকে দেখে আসছি তাঁকে।'

'তাঁর বয়স কত এখন?' আমি জানতে চাই।

'তিনি ত বলেন চুরাশী।' ভট্টশালী বললেন, 'কিন্তু তাঁর এই চুরাশীই আমি চুরাশী বছর ধরে শুনে আসছি। আমার আট বছর বয়সে যেমনটি তাঁকে দেখেছিলাম, এখন এই একশো আটের গোড়া পেরিয়েও ঠিক তেমনটিই দেখছি তাঁকে। কোনো বৈলক্ষণ্য নেই। কিছুমাত্র না। ডাবল আশী পার করে দিয়েও...'

'বলেন কি!' শুনেই আমি আঁতকে উঠি : 'ডবল আশীর চূড়ায় চুর হয়ে বসে আছেন—তাঁর চিরকালের চুরাশীতে? আশী আশী করেও আসেননি এতদিনে! আশ্চর্য! দীর্ঘজীবনের চূড়ান্ত যদি বলতে হয় তো একেই। এইটেই পরাকাষ্ঠা।'

'শুধু তাঁর চুলগুলো পেকেছে কেবল।' বলে ভট্টশালী নিজের বক্তব্য সম্পূর্ণ করলেন।

'এক চুলের তফাৎ মাত্র।' আমার টিপ্পনি কাটলাম।

'নামটি কী তাঁর?' সোমনাথ শুধায়।

'কেউ তাঁর নাম জানে না। কাউকে বলেনও না তিনি। তবে আমরা সবাই তাঁকে যোগেন্দ্রজী বলে থাকি। ঐ নামেই ডাকি আমরা। যোগবলেই তাঁর এহেন দীর্ঘজীবন—আমাদের ধারণা।'

'হিন্দুস্থানী সাধক টাধক বুঝি?'

'না না, সাধক ফাধক নয়। হিন্দুস্থানীও না। সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক। তবে ওঁর দীর্ঘজীবনের কোনো কিনারা করতে না পেরে, হয়ত তান্ত্রিক ক্রিয়া টিয়া যোগ টোগ কিছু করে থাকেন এই ধারণায় সবাই ওঁর ওই নাম দিয়েছে। এ—ই আর কি!' বলেন শ্রীভট্টশালী : 'তাহলেও তাঁর কাছে যান না একবার। হয়ত এখানে আসাটা আপনাদের সার্থক হতে পারে। যে গুহ্য রহস্যের সন্ধানী আপনারা, তার চাবিকাঠি হয়ত তাঁর কাছেই রয়েছে।'

গেলাম তাঁর কাছে।

যোগেনবাবুকে দেখে কিন্তু চুরাশী দূরে থাকে, চৌষট্টির বেশি বলে মনে হয় না কিছুতেই। নাদুসনুদুস দেহ—স্বাস্থ্যখানা রেখেছেন মন্দ না। পঁয়ষট্টি পেরুতে এখনো বেশ দেরি আছে বলেই মনে হয়।

'এখানকার একজন বলছিলেন—' কথায় কথায় ভট্টশালীর কথাটা পাড়া গেল—'যে আপনি নাকি চুরাশী বছর ধরে চুরাশীতেই রয়ে গেছেন, দেখতেও রয়েছেন সেই একরকমটিই প্রায়, বয়স নাকি আপনার বাড়ছে না আদপেই।'

শুনে তিনি হো হো করে হাসলেন। বললেন—'দেখুন, অস্তিত্বের একটা স্থির-বিন্দু আছে—তাকে ঈশ্বরই বলুন আর অক্ষরই বলুন—তার সঙ্গে কোনোরকমে যুক্ত হতে পারলে—সময় তখন তার স্তব্ধ হয়ে যায়। অস্তিত্বের সেই বিন্দুমাত্রায় বিন্দুমাত্রই অবস্থিতি থাকে কেবল। কিন্তু আমরা তো তা আর পারি না, সেই কেন্দ্র-বিন্দুর থেকে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে প্রবৃত্তির বশে ক্রমাগত বৃত্ত থেকে থেকে বৃত্তান্তরে গিয়ে পড়ি—তখন তার অনিবার্য পরিণামে নানান পরিণতি এসেই পড়ে স্বভাবতই। সেই বৃত্ত বৃত্তান্তই আমাদের এই ধারাবাহিক জীবনদশা।'

কিছু না বুঝেও আমি ঘাড় নাড়ি—'কেন এমনটা হয় মশাই?'

'নিছক মায়া বাড়াতে গিয়েই। আবার কি?'

'তিনি কিন্তু আপনার যোগবলের কথাও বলছিলেন।' সোমনাথ বলল।

'যোগবলের চেয়ে বড় হচ্ছে বিয়োগবল। যোগ হচ্ছে বিধাতার। মানুষের নয়। কেন না যোগানদার তিনিই। আমাদের সব কিছুই বিয়োগান্তক। তিনি দশ হাতে আমাদের যুগিয়ে যাবেন, আর আমরা দশ দিকে তা বিলিয়ে বিলিয়ে যাব। যাবার রাস্তা পরিষ্কার না রাখলে আসার পথ বন্ধ। উত্তুরে বাতাস ঘরে ঢুকতেই পারবে না যদি না আমরা দক্ষিণের জানালাটা খুলে রাখি—বাইরে যত ঝড়ই বয়ে যাক্ না কেন? তাঁর কৃপার উত্তরণ তখনই সম্ভব হবে যখন দক্ষিণার দ্বার মুক্ত থাকবে আমাদের। ধন ঐশ্বর্য, অর্থ সামর্থ্য, স্নেহ ভালোবাসা যাই বলুন—সবই আমাদের অপরকে দিয়ে নিয়ে পেতে হবে—না দিয়ে পাওয়ার কোনো উপায় নেই—পেয়েছি কি না সত্যিই, দিলে পরে তবেই সেটা টের পাই। পুঁজি করে রাখলে সেটা পুঁজ হয়ে থাকে—তার থেকেই যতো আধিব্যাধি—কী দেহের—কী সমাজের—কী রাষ্ট্রের তামাম দুনিয়ার।'

'কিন্তু তার সঙ্গে বয়স না বাড়বার সম্বন্ধটা কি?' সোমনাথ শুধালো।

'বয়স বাড়ে ঠিকই, কিন্তু তার কোনো দাগ পড়ে না কেবল। বহতা নদী যেমন, তার কি কোনো বয়স আছে? পার্বতীর তার জলযোগ আর ঘাটে ঘাটে জল বিলিয়ে সমুদ্রগর্ভে গিয়ে সেই জলবিয়োগ—যেমন পাওয়া তেমনি তার দেওয়া—এই জন্যেই সে ফুরোয় না কখনো, অফুরন্ত, কানায় কানায় ভরা সব সময়—সময়ের কি কোনো ছাপ আছে তার গায়?'

'কিন্তু ঐ মায়া বাড়ানোর কথাটা বললেন যে?' আমি ওঁকে মনে করিয়ে দিই।

'শূন্যবিন্দুর থেকে যে-বৃত্তটি টানি—যে বৃত্তেই যাই সবই ত শূন্যাকার। শূন্যের থেকে শূন্যেরই সৃষ্টি হয়—বৃত্তাকার ধারণ করলেও তা শূন্যবিন্দুরই সমষ্টি মাত্র। সবই শূন্যাকার, মায়া। ফাঁকি—ফক্কিকার। উপনিষদের সেই বিখ্যাত বচনটা বদলে নিয়ে হয়ত বলা যায়—শূন্যমদঃ শূন্যমিদং শূন্যাৎ শূন্যমুদচ্যতে। শূন্যস্য শূন্যমাদায় শূন্যমেবাবশিষ্যতে।'

'কিন্তু ঐ বৃত্তের?' সোমনাথ তাকে ধরল।

'সবই হচ্ছে আমাদের দানবৃত্তি—আত্মদানের প্রবৃত্তি। শূন্য তো আসলে পূর্ণই, [illegible], সম্পূর্ণ। শূন্যের আত্মপ্রসার থেকেই তো বৃত্ত। তাই নিছক মায়া হলেও, যে কোনো বৃত্তিই, তা আমাদের কলাবৃত্তিই হোক বা যৌন প্রবৃত্তিই হোক দেহদানই কি আর স্নেহদানই কি, সবই আমাদের নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া তো কিছু নয়। যেতে যেতে দেওয়া, নিতে নিতে যাওয়া—পেয়ে পেয়ে দেওয়া আর দিয়ে দিয়ে পাওয়া—সব বৃত্তের সব বৃত্তির এই এক বৃত্তান্ত।'

'দেওয়ার কথাটা যা বলেছেন।' সায় দেয় সোমনাথ : 'না দিলে তো ত্রিভুবনে কিছুই মেলে না মশাই! না হৃদয়, না ভিজিট।'

'আসলে মেলা মানেই ত দেওয়া নেওয়া, আদানপ্রদান।' মেলাই কথার ওপর আমার এক কথা।

'আর এ সমস্তই আমাদের মায়া বাড়ানো মাত্র।' যোগেনবাবু যোগ দেন : 'মায়া ত ব্রহ্মের সম্প্রসারণ ছাড়া কিছু নয়; ব্রহ্মের নানারূপে নানান বৃত্তিলাভ। ব্রহ্মের আত্মদান। আত্মদানে আত্মচরিতার্থতা।

তাঁর এই দানযোগে যদি আমরা ঠিক ঠিক যোগদান করতে পারি তাহলে এর সব কিছুই শূন্যমাত্র হলেও, শেষ ফল সেই শূন্য হলেও, সেই শূন্যতার মধ্যেই আমরা পূর্ণতার স্বাদ লাভ করব। দেশকালপাত্রের সীমানা উপচে সেই পরিতৃপ্তি।'

তত্ত্বকথার এই সব গোঁজামিলের গর্তে আর মাথা না গুঁজে সোমনাথ তার ডাক্তারি-সত্তায় ফিরে আসে এবার।—'আচ্ছা, এই দীর্ঘজীবনে কি কোনো অসুখবিসুখ করেনি আপনার?' জিজ্ঞেস করে বসে হঠাৎ।

'করেনি আবার? শরীরম ব্যাধি-মন্দিরম্। কোন অসুখটা করেনি? যে অসুখ একবার এসেছে সে আর যায়নি, যেতে চায়নি, খুঁটি গেড়ে বসেছে এই দেহে। কোন অসুখটা নেই বলুন আমার? বাত আছে, হাঁপানি আছে, ডায়াবিটিসও চাগাড় দেয় মাঝে মাঝে উচ্চরক্তের চাপ ত রয়েইছে—তবে রক্তের সেই চাপল্যটা নেই তেটা নেই আর।'

'কিন্তু দেখে তো তা মনে হয় না মোটেই।'

'অসুখও যেমন আছে তেমনি তার ওষুধও রয়েছে যে। সবই আছে তবে প্রশমিত হয়ে আছে।'

'কি করে দমিয়ে রেখেছেন এত সব অসুখ?' আমার প্রশ্ন।

'ওষুধ খেয়ে—আবার কি করে? অসুখের আঁচ পেতেই ওষুধ খাই, শরীরকে বেশি ভোগাই না। সুখভোগে অরুচি না থাকলেও অসুখভোগে আমার নিতান্ত অনীহা। আমার দেহে অসুখ আর ওষুধের সহাবস্থান—' বলে তিনি সোমনাথের দিকে কটাক্ষ করেন—'আপনারা ডাক্তাররা অসুখ হলে তার পরে ওষুধ দিয়ে তা সারান, আর আমি, অসুখের সম্ভাবনা দেখলেই ওষুধ খেয়ে তাকে সরিয়ে রাখি। আমার ঐ সেলফটার দিকে চেয়ে দেখুন না একবার! এফিড্রিন, অ্যা ড্রি না লি ন, প্যাথিডিন, বীসক্রেকস্ উইথ অ্যাডেলফিন, ইনসুলিন, আর যতো রাজ্যের ভিটামিন—এ বি সি ডি থেকে ই পর্যন্ত কী নেই?'

সোমনাথ সেদিকে তাকাল না। মার কাছে মামার বাড়ির গল্পের মত ডাক্তারের কাছে ওষুধের তত্ত্ব ব্যাখ্যানা তার ভালো লাগল না বোধহয়। 'আচ্ছা, এবার আমরা আসি তাহলে।' বলে সে উঠে পড়ল। নমস্কার ঠুকে বিদায় নিলাম আমরা।

ফিরে এলাম ফের সেই ভট্টশালীর সমীপে।

'কী বললেন যোগেনবাবু?' শুধোলেন শ্রীভট্টশালী।

'আসল কথা ফাঁস করলেন না কিছু।' জানালে সোমনাথ : 'তবে আমাদের জ্ঞান দিলেন বহুত!'

'উনি ঐ রকমই। মচকান ত ভাঙেন না।' সহাস্যে বললেন ভট্টশালী : 'কারো কাছে ভাঙেন না কিছু কখনো। ওঁর রহস্য উনিই জানেন কেবল।'

'কিন্তু জীবন রহস্যের আসল কথাটা ত...' সোমনাথ বলতে যায়।

'আসল কথা আপনারা আমার কাছে শুনুন।' বাধা দিয়ে তিনি বললেন—'দীর্ঘ-জীবন যদি পেতে চান ত আমার পথে আসুন। সংযত জীবনযাপন করুন, নেশা-ভাঙ করবেন না, বিড়ি সিগ্রেট খাবেন না, মদ ছোঁবেন না কখনো......'

এমন সময় সদর রাস্তার দারুণ একটা সোরগোল তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিল—

'ঐ যে ভট্টশালা! ভট্টশালা! ভট্টশালা কি জয়!'

নিজের জয়ধ্বনি শুনেই কি না কে

জানে, উনি মুখ বিকৃত করে সদুপদেশ বিতরণে ক্ষান্ত হলেন।

'ব্যাপার কি?' জানতে চাইলাম আমরা।

'ও কিছু না। আমার বাবা আসছেন।'

'অ্যাঁ? আপনার বাবা?' অবাক হয়ে যাই আমরা : 'উনি বেঁচে আছেন এখনো?'

'আছেন বলে আছেন! রীতিমত সজীব। ও'র জন্বালায় আমরা ত বটেই, পাড়াপড়শী—ভাটপাড়ার ইতরভদ্র সবাই অস্থির।' বলে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন —'আরো কতোকাল জন্বালাবেন কে জানে!'

'ও'র নামটি কি আমরা জানতে পারি?'

'শ্রীশ্রীভট্টশালী। আমার শ্রী একটা, ও'র দুটো শ্রী—উনি নিজেই এটা নিয়েছেন। কিন্তু মশাই, শ্রীশ্রী না বলে ও'কে বিশ্রী বলাই উচিত বরং। পাড়ার ছোঁড়ারা ও'কে ভটৃশালা বলে খাপায়। এককালের ভারত বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় জীবন ন্যায়রত্নের [illegible] এই দশা—তাঁর ছেলে হয়ে নিজের চোখে আমায় দেখে যেতে হল......'

তাঁর খেদোক্তি শুনতে হয় আমাদের, 'পিতৃনিন্দা মহাপাপ জানি, কিন্তু ও'র [illegible] আচার ব্যবহার...আমরা মুখ দেখাতে পারি না লোকসমাজে। বলা উচিত নয়, [illegible] হেন নেশা নেই যা ও'র নেই। বিড়ি সিগ্রেট তো মুখে লেগেই আছে। তা ছাড়া, গাঁজা আফিং চরস গুলি কিছু বাদ যায় না। কোকেন পেলেও খেতে ছাড়েন না উনি......'

'তাহলে তো ও'র জবানীটাই নিতে হয় সব আগে।' সোমনাথকে আমি উসকাই : 'জীবন সম্বন্ধে জীবনবাবুর বক্তব্যটাই [illegible] দরকার আমাদের।'

[illegible]

[illegible]

প্রতিবাদটা শুনে রাখুন সবাই......আমি ভাটিখানার মালিকের কাছে একের এক চেয়েছি, বলেছি তুমি আমায় একের এক দাও। সে আমাকে একের এক দিয়েছে... আমি একের এক খেয়েছি কিন্তু...কিন্তু... কিন্তু.....'

বলতে বলতে এক অবাক যন্ত্রণায় তাঁর সারা মুখ যেন কেমনধারা হয়ে যায়--

'কিন্তু ওরা আমাকে সত্যি সত্যি একের এক দেয়নি, আমি একের এক খাইনি, আমি একের এক খেয়েছি কি? আপনারাই বলুন একবার ?...'

তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে আমাদের দিকে তাকান। ন্যায়রত্ন মশায়ের ন্যায়ের কূটতর্কে আমরা বিড়ম্বিত বোধ করি।

'না, খাইনি। প্রকৃতপক্ষে আমি একের এক খাইনি। প্রমাণ চান তার? একের এক যে কী বস্তু নিশ্চয় তা আপনাদের অজানা নয়......'

আমার জানা ছিল না। 'একের এক-টা কী রে?' সোমনাথকে আমি শুধোলাম।—'কী চীজ?'

'একশ নম্বর ওয়ান-এর এক বোতল। সোমনাথ বলল— মাতালদের পরিভাষায় ঐ একের এক।'

'একশ নম্বর ওয়ান? তাহলে তো উনি বমি করে এখনি সব একশা করবেন।' বলে আমি তাড়াতাড়ি উঠে ওঁর সামনে থেকে সরে দাঁড়াই।

[illegible] থাকেন ন্যায়রত্ন— সত্যি সত্যি একের এক খেলে আমি এরকম দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারতাম না। আপনারা [illegible] না করে তাহলে আমি কী করতাম? আমি বলুন একের এক খেলে আমি এইরকম করে মূর্ছিত পড়ে যেতাম নাকি ...'

বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধপাস করে পড়ে গেলেন মেঝেয়। আর উঠলেন না। তারপর আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই তাঁর।

সোমনাথ ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাঁর নাড়ি টিপে দেখে স্টেথিসকোপ বসিয়ে বুক পরীক্ষায় লাগলেন।

বাধা দিলেন শ্রীভট্টশালী—'দেখতে হবে না ও'কে। কিছু হয়নি ও'র। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন মাত্র। দিনে দশবার অমন উনি পড়ছেন, উঠছেন, আবার ছুটছেন ওই ভাটিখানার দিকে। একের এক না হলে তাঁর একদণ্ড চলে না।'

একবাক্যে উভয় ভট্টশালীকে নমস্কার জানিয়ে আমরা ভট্টশালার থেকে বের হলাম।

সোমনাথ চুপ। আমিও। ওর চোখে নির্বাক জিজ্ঞাসা—'? ? ?' (জীবনের একি রহস্য?)

আমার চোখে তার অবাক জবাব— '! ! !' (জীবন-রহস্যই বুঝি এই ভাই!)

কিন্তু একের এক কি সে পেয়েছিল? জীবনরহস্যের সব কিছু ছাপিয়ে জীবন-ন্যায়রত্নের সেই প্রশ্নটাই যেন কানে বাজতে থাকে আমাদের।

জীবন জিজ্ঞাসার সেই প্রশ্ন মীমাংসা কোথায়? হায় তা কি কখনো পাওয়া যায়। সেই একের একটিকে। সেই মাতাল কন্যা তাকে? মিতা-কে।

চতুর্থ যোজনার প্রস্তুতি

এপ্রিল ১৯৬৯ সাল থেকে একটি নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হবে। ঐ পরিকল্পনাকে চতুর্থ যোজনা (১৯৬৯—৭৪) এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যবর্তী তিন বছরের ফাঁককে বিরামকাল বলা যাবে। সুতরাং আগামী বার্ষিক পরিকল্পনাকে মূলত চতুর্থ যোজনার প্রস্তুতি হিসাবে ধরা হবে। সেখানে ঝোঁকটা পড়বে কোনো বড়ো রকমের বৈষয়িক উদ্যোগ নয়, আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতি অর্জনের উপর। অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়নকর্ম আরম্ভ করার একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তিভূমি করে তোলা হবে ১৯৬৮-৬৯ সালকে।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, সামনের বছর পরিকল্পনা-খাতে মূলধন নিয়োগ এ বছরের স্তরে ২,২০০ কোটি টাকায় রাখা হবে; মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা ঘটিত বাজেট পূরণের নীতি পরিহার করা হবে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি অর্থ-সম্পদ সংগ্রহে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। সেই উদ্দেশ্যে কৃষি আয়করকে সাধারণ আয়করের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে আয়করের একটি সর্বভারতীয় অখণ্ড ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বিদ্যুৎ ও জলসেচ বাবদ কর বাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের পথে বাধা

চলতি বছরে প্রচুর শস্য হওয়ায় জাতীয় আয় শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে, আশা করা হচ্ছে। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানির সম্ভাবনা সম্বন্ধে বর্তমানে বেশ অনিশ্চয়তা রয়েছে। অবস্থা প্রতিকূলে হলে অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ, দ্রব্যমূল্য ও বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের উপর বিষম চাপের কারণ হয়ে উঠবে। বৈদেশিক সাহায্য ক্রমশ কমে আসায় এবং ঋণশোধের বোঝা বেড়ে যাওয়ায় দেশকে নিজের অর্থসংগতির উপর বেশী নির্ভর করতে হবে। আমদানি কমে যাচ্ছে এবং জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। পি এল ৪৮০ আমদানি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য বিক্রি থেকে সরকারের অর্থাগম কমে যাবে। তাছাড়া, আপৎকালের জন্য ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টনের একটি শস্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে প্রয়োজন হবে অর্থসংগতির।

যে-সব প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি শেষ করা, অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতা কাজে লাগানো, দক্ষ পরিচালন এবং উদার আমদানির উপর গত দু' বছর ধরে জোর দেওয়া হয়েছে। শীঘ্র সরকারী ব্যবস্থার বড়ো বড়ো অংশগুলিতে আধুনিক পরিচালনার কলা-কৌশল প্রবর্তন এবং শ্রমিকদের সাথে

বোঝাপড়ার একটা চেষ্টা দেখা যেতে পারে। উৎপাদনের উপর এসবের প্রভাব অনুকূল হবে, সন্দেহ নেই। শক্তি, জলসেচ ও সারের অনেকগুলি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে অথবা শেষ হয়ে চলেছে। অবশ্য কলকব্জা, ইস্পাত ঢালাই, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের মতো কয়েকটি শিল্পের পক্ষে শিথিল কাজকর্মের অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে; অপর দিকে, ফসল উত্তম হয়েছে বলে চাহিদার সম্প্রসারণ অন্য শিল্পগুলিকে তাদের উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ নিয়োগে অবিলম্বে সাহায্য করবে, আশা করা যায়।

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি

ফসল ভালো হওয়ায় চাষীদের হাতে আগের চাইতে বেশী টাকা আসবে। কাপড়-চোপড় ও কেরোসিনের মতো ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার উন্নতি প্রথম ঘটবে। তারপর বাড়বে সেলাই কল, বাইসাইকেল, বৈদ্যুতিক পাখা, বাসনকোসন ও বাড়ি তৈরির উপকরণের মতো স্থায়ী ভোগ্য-সামগ্রীর জন্য চাহিদা। ক্রমে মূলধন-দ্রব্যের চাহিদা এবং তার উৎপাদনের সম্প্রসারণ হবে।

গত কয়েক বছর ধরে কৃষি উন্নয়নে যে বিপুল মূলধন নিয়োগ করা হয়েছে, তার যাথার্থ্য এত দিনে বোঝা যাচ্ছে। পাঁচ কোটি একর জুড়ে যে অধিক ফলনের ফসল লাগানো হয়েছে, তার থেকে কয়েক বছরের মধ্যে উত্তরোত্তর বেশী ফল আশা করা যায়। উত্তম ফসল দ্রব্যমূল্যের স্থিতি অর্জনে সহায়ক হবে; পল্লী অঞ্চলের উপর উপযুক্ত করভার আরোপ এবং চতুর্থ যোজনার জন্য অর্থসংস্থানের কাজ আগের মতো দুরূহ থাকবে না। সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির উচিত, চাষীদের নতুন উপার্জিত আয়ের যতটা সম্ভব কর প্রভৃতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের জন্য এবং শিল্প উৎপাদনে আবশ্যক মৌল কাঁচামালের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী। বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অবস্থা খারাপ হয়েছে কেবল আমদানি বৃদ্ধির দরুন নয়, কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পে উৎপন্ন-সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয়নি বলে। শস্য ও কাঁচা মাল আমদানির জন্য বিদেশের উপর ভারতের নির্ভরশীলতার জন্য দুটো কারণ দায়ী: কর্ষিত জমির একক প্রতি কৃষির নিম্ন উৎপাদিকা-শক্তি, এবং বার্ষিক উৎপাদনের ঘন ঘন ওঠা-নামা। শেষোক্ত ব্যাপারটির পিছনে আছে জলের যোগানের জন্য আমাদের দেশের বৃষ্টিপাতের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা। ভরসার কথা, এ বছর বৃষ্টি ভালো হওয়ায় কৃষিজাত-দ্রব্য রপ্তানির সম্ভাবনা গেছে বেড়ে। চা, [illegible] কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানির পরিবর্তকরণ

যত দিন না বৈষয়িক কাজকর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে, তত দিন পর্যন্ত কল-কব্জার মতো মূলধন সামগ্রী এবং ইস্পাতের মতো মধ্যবর্তী দ্রব্যের চাহিদা বর্তমান উৎপাদন-ক্ষমতার পেছনে পড়ে থাকবে। উৎপাদন-ক্ষমতা কাজে লাগাবার ব্যাপারে সরকার রপ্তানি ভালোরকম বাড়িয়ে তোলার উপর এখন আশা রাখছে। ইস্পাতের কারখানাগুলি যে গত বছর তাদের রপ্তানির পরিমাণ ৯২ ভাগ সম্প্রসারণ করতে পেরেছে, সে কথা সন্তোষের হিসাবে উল্লেখ করা হয়। বিশেষত ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য [illegible] চুক্তি সম্পাদনের সাফল্য নতুন [illegible] সঞ্চার করেছে।

বলা হয়েছে, [illegible] উৎপাদন ব্যবস্থায় [illegible] এখন যে-সব দ্রব্য আমদানি করা হয়, সেগুলির কয়েকটি অন্তত তৈরি করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, [illegible] উৎপাদন [illegible] সংরক্ষণের জন্য আমদানি করতে দেওয়া হবে না, এমনি আশ্বাস আগে থেকে দেওয়া চাই। মোট আমদানি-ব্যয়ের [illegible] জন্য যা দায়ী, সেই খাদ্য ও [illegible] পরিবর্তে উৎপাদনের [illegible] যা আমদানি-খরচের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, সেই খাদ্য আমদানি বন্ধ করতে হলে অর্থাৎ আভ্যন্তরিক খাদ্য উৎপাদন শীঘ্র বাড়াতে গেলে চাই সার, কীটনাশক দ্রব্য, জলসেচ, পাম্প ও পাম্পের জন্য আবশ্যক শক্তি যোগান দেবার সুবন্দোবস্ত।

এক কথায়, আরো এক বছরের জন্য আমাদের চেষ্টা হবে পরিকল্পনামূলক কাজকর্মের সংহতিসাধন। বলাই বাহুল্য যে, সংহতিসাধনের মানে পশ্চাদপসরণ নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা।

—শান্তিকুমার ঘোষ

বাজারে, টিম্বাকুটু থেকে আসা সাদা আলখাল্লাপরা ৬ ফিট লম্বা ইয়াম বিক্রেতার কাছে গিয়ে বসতেন 'সালাম আলায়কুম' বলে। বেলা গড়িয়ে এলে যেতেন সমুদ্রের ধারে, যেখানে এবে ছেলেরা বাজনা বাজাতে বাজাতে আধমাইল লম্বা জাল ফেলে মাছ ধরছে। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এলে উঁকি মারতেন হাওয়াই গীটারের সুরধ্বনিত 'ওতেল মাইিএফিক' কিংবা 'ম্যাজেস্টিক-এর বারে। এক কোণে বসে কোকাকোলা খেতে খেতে দেখতেন, বুরোনি অর্থাৎ সাহেব-মেমদের লীলাখেলা।

এক মাসকাবারী 'বাজারের' পর গোপালদা বলে দিতেন, কোন্ পাড়ায় কাদের বাস, কী ভাষায় তারা কথা বলে, কী তাদের প্রধান খাদ্য, কেমন তাদের নাচ, তাদের ড্রাম লম্বা না চ্যাপ্টা, আর তাদের উপজাতীয় চিহ্ন কী। গোপালদার মত জীবনপিপাসুর প্রয়োজন আছে এখানে, কারণ আমরা আফ্রিকায় কর্মরত ভারতীয়রা আফ্রিকানদের অল্পই জানি।

এখানে নতুন এসে জনৈক ভারতীয় ভদ্রলোককে জিগ্যেস করেছিলুম, তিনি আফ্রিকার কোন্ কোন্ দেশ দেখেছেন। ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক আমার এ অপরাধ আজও ক্ষমা করেননি। খানিকক্ষণ রোষকষায়িত চোখে চেয়ে, শেষে প্রশ্রয়ের হাসি হেসে তিনি উত্তর দেন, "আমি দুবার ইওরোপে গেছি।" কথাটা ঠিক শুনতে পাইনি এই ভেবে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করি। এবার ওঁর বিরক্তির ঝাঁজ লুকোনো থাকে না। বলেন, "আমি দু'দুবার ইওরোপের সব বড় বড় শহরে ঘুরে বেড়িয়েছি। আবার—"। এমন সহজ কথাটা আগে বুঝিনি বলে আমি জিব কাটি। সত্যি তো, ইওরোপে যখন এত বেড়িয়েছেন, তখন অন্যত্র আর কীসের খোঁজে ঘুরবেন? সেই যে গণেশকে বলা হয়েছিল বিশ্বসংসার ঘুরে দেখে আসতে, আর উনি স্রেফ পার্বতীর চতুর্দিকে এক চক্কর মেরেই বললেন, ওঁর সব দেখা হয়ে গেছে। খানিকটা সেইরকম ব্যাপার। শুনলে নিশ্চয় অবাক হবেন, এ অভিজ্ঞতার পরও আরেকজনকে একই প্রশ্ন করার দুঃসাহস হয়েছিল। ইনি আমার অজ্ঞতায় মর্মাহত হন। ধৈর্যহীন স্বরে বলেন, আরে মশায়, সবই তো সেইরকম। সিয়েরালিওনে ছিলুম তিন বছর। আর কী বিশেষ দেখার আছে আফ্রিকায়?" এখানে জনান্তিকে বলে রাখি, আয়তনে সিয়েরা লিও সমগ্র আফ্রিকার ·২৫% মাত্র।

ভদ্রলোক যে কটা দেশের নাম জানতেন সবগুলি বলে গেলেন, "যাই সিয়েরালিওন তাই হল ঘানা, তাই আবার নাইজেরিয়া, কেনিয়া আর ওই আপনাদের লুমুম্বার দেশ, কী নাম যেন? সবই এক।" ভয় হল এবার বলবেন, সেই শ্যাণ্টি শহরগুলি, কাপড় দিয়ে পিঠে ছেলেবাঁধা স্থূলকায়া ব্যাপারিনী, সেই কালো কালো মানুষগুলি, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল, ইত্যাদি ইত্যাদি। পশ্চাদপসরণে বাধ্য হই। কিন্তু সবই এক? বৈচিত্র্যের অভাব? ভাবি, অভাব দেখার চোখের, দেখার লোকের, এককথায় অভাব গোপালদার।

❋

কিন্তু কৈশোরে সদগুরুর শিক্ষা বিফলে যায়নি। এক একদিন লেখাপড়া, খাওয়াদাওয়া, নিদ্রাবিশ্রাম সবকিছু মনে হয় যান্ত্রিক চর্বিতচর্বণ। হঠাৎ আবিষ্কার করি, অনেক কিছু বাজার করা বাকী আছে। অতএব বেরিয়ে পড়তে হয়। অবশ্যই মুখ্য উদ্দেশ্য মাসকাবারী সওদা, তবু অন্য কিছু যদি চোখে না পড়ত, তবে বলতুম বৃথাই এতদিন গোপালদার ভ্রমণ কাহিনী শুনেছি। যা দেখেছি, যা শুনেছি তার একাংশ নীরস গদ্যে আফ্রিকার চিঠির পাঠক-পাঠিকাদের নিবেদন করি। পাড়ার ভক্ত বালকবৃন্দ এখনও জোটাতে পারিনি।

আফ্রিকার সব বড় শহরেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে আছে ইওরোপীয় পাড়া, সাধারণত শহরের মর্মকেন্দ্রে কিংবা শহর থেকে একটু দূরে পাহাড়ের ওপর, সমুদ্রের ধারে অথবা এয়ারপোর্টের আশেপাশে, বনেদীয়ানার গা-বাঁচিয়ে-চলা উন্নাসিক বিযুক্তি। এর এক অংশে দোকান-বাজার, অন্যত্র বাংলো আর বাগান, খেলার মাঠ আর ঝাউ, বাদাম কি নিমের বন। ফরাসী উপনিবেশে সাহেবপাড়ার নাম ছিল 'সিতে অরোপীয়েন।' আর তার বাইরে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, নোংরা রাস্তা এবং ছোট ছোট দোকান পরিবৃত এলাকা থাকত আফ্রিকানদের জন্য নির্দিষ্ট, নাম 'সিতে অ্যাঁদিজেন' ইংরাজীতে আফ্রিকান বা নেটিভ টাউন। সাম্রাজ্যের অস্তমনে এ বিভেদ পুরোপুরি থাকেনি। তবু নাম দুটো আজও চলছে যেমন অংশত টিকে আছে দু এলাকার প্রভেদ বৈশদ্য। সিতে অরোপীয়েনে বেড়ালে মনে হবে দক্ষিণ ইওরোপের কোন মফস্বল শহরে এসেছেন। অবশ্য আজ কৃষ্ণাঙ্গরাও এখানে থাকতে পারে। কিন্তু তাদের হওয়া চাই সঠিক শোভন, কেতাদুরস্ত, ফরাসীতে যাকে বলে 'কম-ইল-ফো'। তাদের জানা চাই লিকার আর ওয়াইনের মধ্যে পার্থক্য, বিকালে খেলা চাই টেনিস, হাইলাইফ না শিখলেও ফক্সট্রট আর ট্যাঙ্গোয় তাদের পারদর্শিতা দরকার। আর চাই পদমর্যাদার ভ্রমাতীত প্রতীক প্রমাণসই মার্সিডিস বা জাগুয়ার। এদের নিয়েই না আক্রার নাইটক্লাবের এককালের জনপ্রিয় গান: বীন টু (বীন টু ইওরোপ অর্থাৎ বিলাতফেরত), জাগুয়ার (অর্থাৎ জাগুয়ার গাড়ির মালিক), ফ্রিজফুল (অর্থাৎ বাড়িতে রেফ্রিজারেটর আছে।)। সিতে অরোপীয়েনে নিওন-লাঞ্ছিত ২০০ ফিট চওড়া বুলভার, তার দু-পাশে বিরাট বিরাট ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স, ব্যাঙ্ক ইন্সিওরেন্স কি একচেটিয়া সওদাগরী কোম্পানীর হেড অফিস। এত ইলাহী কাণ্ড। অথচ এখানে বাজার করার হাঙ্গামা কত। একটু দেরি হলে চলবে না। বড় পোস্ট অফিসের ঘড়িতে ৫টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর দোকান কী! ঢুকতেই ভয় করে। দোকান-কর্মচারীদের ভাট বা কত। হয়ত কথাই বলবে না। আর বলার দরকারই বা কী? দাম লেখা আছে কাগজের লেবেলে। দর-দস্তুরের বালাই নেই। সব ব্যাপারটা যান্ত্রিক। এমনকি হিসাবটাও হয়ে যায় যন্ত্রে। এতে পকেট খালি হয়, অথচ মন ভরে না। কী ভাগ্যি আরো জিনিস কেনার থাকে।

অতএব যেতে হয় 'সিতে অ্যাঁদিজেন বা আফ্রিকান পাড়ায়। এখানে পুরোনো শহরের প্রাচীনতম অংশে স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতির বাস। সরু সরু গলি ও সঙ্গে তার তুলনীয় খোলা নর্দমা, গলির পাশে বুকের ওপর টোম্যাটো বিক্রি করছে পিঠে ছেলে বেঁধে আফ্রিকান যুবতী। গোপালদা হলে তার কাছে বাজার থেকে বেশি দামে টোম্যাটো কিনতে কিনতে ইংরাজী ও স্থানীয় ভাষায় খিচুড়ি পাকিয়ে গল্প করতেন আর দেখতেন, রাস্তার ওপাশে অর্ধোলঙ্গ শিশুরা খেলছে পুরোনো টেনিস বল। একটু দূরে কিশোরী মেয়ের কোঁকড়ানো চুল একটা একটা করে সোজা করে সরু সরু বিনুনী বেঁধে দিচ্ছে তার দিদিমা।

আফ্রিকান টাউনের একপাশে এমন সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকে, যাদের ধর্ম-সংস্কৃতি পৃথক ও যারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না। উত্তর নাইজেরিয়ার হাউসা-ফুলানি প্রভাবিত অঞ্চলে এমন পাড়ার নাম ছিল সাবোন গারি বা নবপল্লী। এখানে থাকত দক্ষিণ নাইজেরিয়া থেকে আসা য়োরুবা ও ইবোরা। ধর্মে এরা বেশির ভাগ খৃষ্টান; পেশায় অফিস-আদালতের কর্মচারী, কারিগর, স্বাধীন বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ী; দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক, মূলত পাশ্চাত্যপন্থী। কানো, জারিয়া, কাদুনা প্রভৃতি শহরের মাটির পাঁচিল-ঘেরা প্রাচীন হাউসা শহরের বাইরে সাবোন গারিতে তাই ছিল এদের বাস। নাইজেরিয়ার বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতির শুরুতে হাউসাদের একাংশ সাবোন-গারিতে হানা দিয়ে ইবোদের যেভাবে পাইকারী হারে হত্যা করে, পরবর্তীকালে বিআফ্রার স্বাধীনতা ঘোষণায় তা অনেকখানি ইন্ধন যুগিয়েছে।

উত্তরে যেমন উপকূলের লোক গিয়ে পৃথক শহরতলি সাবোন গারির পত্তন করেছে। দক্ষিণে তেমনি উত্তরে লোকে এসে গড়েছে জোঙ্গো। এরা প্রায় সবাই হল অদক্ষ শ্রমিক, দিনমজুর, অল্পদক্ষ কারিগর, ছোটখাট ব্যবসায়ী, কসাই, অফিস কি গুদামের দারোয়ান, পুলিস কনেস্টবল ও

পেন্সন পাওয়া সৈনিক। সাধারণত বাজারের পেছনে কি পাহাড়ের গায়ে এইসব সম্মানীয় আগন্তুকেরা টিন, কাঠ আর অ্যাসবেস্টস দিয়ে ঘর বাঁধে, আর বানায় কুর-আন শরীফ শেখানোর মক্তব, মসজিদ আর ভূতঝাড়ানোর কবচ, চাকরিতে প্রোমোশন পাওয়ার মাদুলি ইত্যাদি বিক্রির দোকান। উত্তরের ঝাড়ফুঁক, মালিস আর কবচের কথা দক্ষিণে শ্রদ্ধাভরে উল্লেখিত হয়। স্থানীয় লোকেরা তাই জোঙ্গোয় এসে উত্তরের লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বিশেষ শক্তিশালী কবচ কি মাদুলি বাগাবার ফিকিরে থাকে।

কুমাসি, কতনু কি ইবাদান শহরে যখন গেছি, সেখানকার আফ্রিকান বাজারে যেতে ভুলিনি। বাজার দৈনিক হয়। কিন্তু সপ্তাহে দুদিন বসে হাট। সে এক দৃশ্য। ছুঁচ সুতো থেকে শুরু করে গরু ছাগল পর্যন্ত পাবেন এখানে। আক্ষরিক অর্থে হাজার হাজার লোক বেচছে, কিনছে, চলছে, বসছে এমন এক জায়গায়, যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় এক মাইল করে। দূর দূরান্ত থেকে লোকে আসে পায়ে হেঁটে, বাসে করে, নদী বা সমুদ্র থাকলে নৌকো বেয়ে। তাদের পোশাক দেখে অবাক হয়ে ভাববেন, পৃথিবীতে এত রঙও থাকতে পারে। কুমাসির সেন্ট্রাল মার্কেটে কি ইবাদানের মাকোলা বাজারে সওদা করতে গিয়ে দেখবেন দোকানীর পেছনে বসে দরজী বানাচ্ছে ফুল-লতাপাতার প্যাটার্ন বসানো শার্ট-পাঞ্জাবি; কারিগর তৈরি করছে বাহারে চটি; বেচা-কেনার ফাঁকে ফাঁকে কাঠকয়লার উনুনে টোম্যাটো আর লঙ্কা বেটে শুঁটকি মাছের ঝোল রেঁধে 'ফুফু' ও 'গারির' সঙ্গে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিচ্ছে। আর সন্ধ্যায় বাজার সরগরম হচ্ছে হাউসা, য়োরুবা আর জাবরামা ড্রাম আর নাচের আওয়াজে। এমনিভাবে বছরের পর বছর ব্যাপারীরা তাদের দোকানঘরে রয়ে গেছে। এই দোকান-ঘরেই অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। শোকার্ত ছেলেরা সেই পুরোনো দোকান-ঘরেই ব্যবসায়ের ভার তুলে নিয়েছে।

এক মাসকাবারী ভ্রমণে কুমাসি শহরে মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ খুঁজতে খুঁজতে এমন জায়গায় এসে পড়েছিলুম যার নাম ম্যাগাজিন নাম যেভাবেই এসে থাকুক, ম্যাগাজিন আসলে হল গাড়ির কবরখানা। মহাভারতের যুদ্ধের পর কুরুক্ষেত্রের যা অবস্থা হয়েছিল, তার সঙ্গে ম্যাগাজিনের তুলনা চলে। তফাত শুধু, নরদেহের বদলে এখানে পড়ে আছে মোটরগাড়ি। তাদের বৈকল্য পরাকাষ্ঠা দেখে প্রায় শ্মশানবৈরাগ্য এসে যায়। মনে হয়, এ সংসারের সব কিছুর মত রোলস রয়েসও নশ্বর, বুর্জোয়ারা যত স্পীডেই চালান না কেন, এই নশ্বরত্বের প্রমাণ ছড়িয়ে আছে প্রায় আধমাইল ধরে। রক্ষণশীল হিন্দুর শ্মশানে জাতিভেদের মত এখানেও কট্টর পংক্তিভেদ। মার্সিডেসের পাড়ায় ফিয়াট পাবেন না। স্কোডাককে মরতে হবে তার স্বধর্মীদের মধ্যে। এই মহা-শ্মশানে যন্ত্রাংশ যত না খুঁজলুম, তার চেয়ে বেশি ঘুরে বেড়ালুম এইসব দেখতে দেখতে আর গল্প করলুম ফিটারদের সঙ্গে। আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল বলতে হবে। যখন খেয়াল হল তখন দেখি রোদের তেজ পড়ে এসেছে। বাতাসে হিমের ঈষৎ আভাস। গোপালদার শেষ ট্রেনের সময় গড়িয়ে এসেছে। এবার ঘরে ফেরার পালা। জানি, বাড়ি থেকে অনুযোগ হবে, মৃদু ভর্ৎসনা চলবে, শরীর খারাপ উপেক্ষা করে এইসব অত্যাচারের জন্যে। কী অজুহাত দেব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ গোপালদার ওপর ভয়ানক রাগ হয়ে যায়। সারাদিন হটরাপিটে বেড়াবার গল্প এত শুনিয়েছেন, আর শেষ ট্রেনে ফিরে কী কৈফিয়ত দিতেন সেটা বেমালুম চেপে গেছেন।

অংশু দত্ত

বিজ্ঞান সাধনা

অধ্যাপক অম্লান দত্ত (দেশ ১ অগ্রহায়ণ) বিজ্ঞান সাধনা আমাদিগকে জাগতিক সমৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়া যে সব যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তবে অধ্যাপক ব্লেকেট (Blackett) সাম্প্রতিক নেহরু-স্মৃতি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কার্যকারিতা ও শক্তি সম্বন্ধে এখনও ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। প্রয়োগ বিদ্যার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা বিদ্যমান। আমাদের অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি নাকি মনে করেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অধিক অর্থ-বরাদ্দ জাতির সমৃদ্ধির হেতু হইবে। ভারতীয় ধারণার এই মূল্যায়ন ভিত্তিহীন প্রমাণ করিবার জন্য অধ্যাপক ব্লেকেট যেসব তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, তাহা হইল : জাপান গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্রিটেন-এর কিঞ্চিতাধিক অর্ধেক ব্যয় করিয়া ব্রিটেনের তিন গুণ অধিক উৎপাদন করে। আবার ইউরোপের কৃতি বিজ্ঞানী ও ইন্‌জিনীয়ার-এর সর্বাধিক সংখ্যা ব্রিটেনে থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর উৎপাদন ব্রিটেন অপেক্ষা বেশী। অতএব বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কত বরাদ্দ হইল বা কতজন বিজ্ঞানী ও ইন্‌জিনীয়ার-এর সৃষ্টি হইল তাহা বড় কথা নহে। বিজ্ঞান কোন যাদুকাঠি নয়। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও লোকবল কতটুকু দক্ষতার সহিত কাজে লাগানো হইবে, তাহাই আসল কথা। ইহা অনস্বীকার্য যে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মূলধনী অর্থ অবশ্যই প্রয়োজন। অধ্যাপক দত্তের যুক্তিকে শুধু ভাবাবেগ দ্বারা গ্রহণ না করিয়া, অধ্যাপক ব্লেকেট-এর তথ্য-সমন্বয়ে যাচাই করা বাঞ্ছনীয়।

অধ্যাপক দত্ত বেকনের উক্তি "জ্ঞানই শক্তি" উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই শক্তি কি আর্থিক না পারমার্থিক? বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীন্স (Sir James Jeans) বলিয়াছেন বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি বিশ্লেষণ করেন এবং বিশ্লেষণের শেষ পর্যায়ে যখন উপনীত হন, তখন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মধ্যে কোনও তফাত থাকে না। দার্শনিকের মনন ও বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ একই স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যানে নিবদ্ধ থাকে।

জাগতিক সমৃদ্ধির জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ শিল্প সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে যেখানে সেতুবন্ধ হয় নাই, সেখানে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও শিল্পে অর্থ থাকা সত্ত্বেও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি ইহাই।

অধ্যাপক অমূল্যধন দেব
কলিকাতা-১৪

বিজ্ঞান ও প্রগতির পথ

বিজ্ঞান ও তার প্রগতি সম্পর্কে অম্লানবাবু যে কথাগুলি বলেছেন তা খুবই প্রণিধান যোগ্য। কিন্তু এই বিজ্ঞান-দৃষ্টি আসবে কিসে? বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই তিনি বলেছেন। কথাটি সত্য। কিন্তু তার আগে আমাদের দৃষ্টিকে সর্বপ্রথম মুক্ত করতে হবে। বিদ্যাসাগর রামমোহন এঁদের দৃষ্টি মুক্ত ছিল। সেই মুক্ত দৃষ্টি বুদ্ধি, নিছক বিজ্ঞানের সত্য। বিজ্ঞানের সাথে চেতনা যোগ করলেই হয় প্রজ্ঞান, আর চেতনা বাদ দিলে হয় অজ্ঞান। তার জন্য আত্মসম্মান অথবা আত্মানুসন্ধান দরকার গোড়াতে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করার জন্যেও চৈতন্যদৃষ্টি দরকার—সুস্থ সংস্কারমুক্ত আত্মজ্ঞানের সন্ধানী দৃষ্টি এবং জিজ্ঞাসা। নইলে বিজ্ঞান আমাদের লোভ ও ভোগের প্রবৃত্তিকেই আরও বিকৃত করে দেবে মাত্র, এখন যেমন হয়েছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই; যেটুকু আছে তাও সুস্থ নয় এবং তা হলে সেটা বৈজ্ঞানিক বা প্রৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়, বিজ্ঞানের নামে এই অবৈজ্ঞানিক মনোভাব জানে শুধু আত্মতর্পণের উপায় মাত্র। প্রেমে আত্মদান করা যায়, কিন্তু ক্ষুধা ত প্রেম নয়। অন্ন যেমন ক্ষুধিতের ভগবান, ক্ষুধাকে বেশী আস্কারা না দেওয়াও আত্মচৈতন্যের ভেতর দিয়ে প্রেমের উপায়। আমরা ক্রমেই আত্মচৈতন্য বিস্মৃত হয়ে ক্ষুধার্ত এবং কামার্ত পশু হব, আর বিজ্ঞানকে শোষণ করে প্রকৃতি আমাদের ক্ষুধা মেটাবে এটাই জীবনের ও বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে পারে না। বিজ্ঞানের যথা ব্যবহারে ব্যবহারিক জীবন উন্নত করার জন্যও সর্বপ্রথম আত্মজ্ঞানের সন্ধানচেতনা আবশ্যক, নইলে বিকৃত মনোভাবের দ্বারা বিজ্ঞানদৃষ্টি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান উন্নত হলে মানুষ উন্নত হবে। কিন্তু বিজ্ঞানকে উন্নত করতে হলে চৈতন্যের দাবি সর্বাগ্রে মিটাতে হবে। রামমোহন বিদ্যাসাগর বিজ্ঞানকে মানুষের এই চৈতন্যের সেবাতেই নিয়োজিত ও উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন; এবং সেই দৃষ্টিই যথার্থ বিজ্ঞানের প্রজ্ঞানদৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে এই বিজ্ঞান ও চৈতন্যের পূর্ণ সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র দাস
কলকাতা-১২

ভাষা সমস্যা

৪ঠা নভেম্বর আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধটি পড়ে কয়েকটি কথা মনে হল। সবিনয়ে নিবেদন জানাচ্ছি। আলী সাহেব যেন ধৃষ্টতা মার্জনা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেন মহাশয় থেকে শুরু করে সুপণ্ডিত মুজতবা আলী পর্যন্ত প্রত্যেকেই শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে ফ্রান্স, জর্মানী, জাপান অথবা ফিনল্যাণ্ড কিংবা রাশিয়ার উদাহরণ দিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে উপরোক্ত দেশগুলির তুলনা কি ঠিক চলে? ফ্রান্সই হোক বা জাপানই ধরা যাক, সেগুলি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র, মোটামুটি সে সব দেশে (রাশিয়া বাদে অবশ্য) একটি ভাষাই চালু আছে। শিক্ষা থেকে শুরু করে চাকরি বা ব্যবসা মাতৃভাষায় হওয়া কিছু মুশকিল নয় বরঞ্চ যথেষ্ট সুবিধের এবং স্বাভাবিক। কোন ফরাসী দম্পতিকে সপরিবারে আজ ইতালী, কাল জার্মানী অথবা ফিনল্যাণ্ডে চাকুরির ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি সে কথা খাটে? বাঙলা অথবা বিহার, মাদ্রাজ কিংবা কেরলা কেউ স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। তারা বৃহত্তর ভারতবর্ষেরই অংশ। ভারতের সংবিধানে আছে চোদ্দটি ভাষা, আসলে ভাষার সংখ্যা আরও অনেক বেশী। ধরা যাক আজ আমি বাঙলায় আছি, আমার ছেলেমেয়ে বাঙলায় লেখা পড়া শুরু করল। আসছে বছর তারা কাশ্মীর কি কেরলায় স্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে পারে? এরকম হাজার হাজার চাকুরে মা-বাপের ছেলেমেয়ে আছে। তারা কোন্ মাতৃভাষায় শিক্ষা পাবে? আবার এই যে সর্বভারতীয় চাকুরি—সে কাজ যারা চালাবে তাদের কি কেবল মাতৃভাষার সম্বল নিয়ে চলবে? অথবা তারা চোদ্দটি ভাষা

শিখবে? শুধু পুনা শহরেই এমন কয়েকটি সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র আছে যেখানে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের শিক্ষার্থীরা আছেন। বলা বাহুল্য সেখানে শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজী। এ রকম বহু বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এখানে জাপান, জার্মানী বা আফগানিস্তান টেনে আনা কি অপ্রাসঙ্গিক নয়? (রাশিয়া সম্বন্ধে যা বলবার রুদ্রজিৎ দাশগুপ্ত বলেছেন—সেজন্য পুনরুক্তি করলাম না)। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন এক ধরনের 'ফ্যালাসী'র সৃষ্টি করে আসল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় শুরু হলে যে খুবই ভালো হয় সন্দেহ নেই। যাদের সে উপায় নেই (তাদের সংখ্যা নগণ্য নয়) তাদের জন্য মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী থাকা উচিত।

উমা চট্টোপাধ্যায়
পুনা।

॥ ২ ॥

গত সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীমতী অনিতা রায়ের 'ভাষা সমস্যার' উপর লিখিত পত্রখানাতে প্রসঙ্গক্রমে সিলেটী ভাষাকে (প্রকৃতপক্ষে কথ্য ভাষা) টেনে এনে বিকৃতভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজী কি আঞ্চলিক ভাষা হবে, তা বহু বিতর্কিত বিষয়। শিক্ষার বাহন হিসেবে বা পৃথক সত্তা হিসেবে সিলেটী ভাষার প্রশ্ন কোনদিনই উঠেনি; কিন্তু এক্ষেত্রে হয়ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও সৈয়দ মুজতবা আলীর ভায়া সিলেটী বলেই শ্রীমতী রায় গুরুমুখী, সিন্ধী বা মৈথিলীর সঙ্গে সিলেটীকে সমপর্যায়ে এনে উল্টোভাবে ধৃষ্টতারই পরিচয় দিয়েছেন। সিলেটের লোকেরা চিরকালই নিজেদিগকে বাঙালী বলেই জেনে আসছে। সাত বছর আগেও সিলেটী যুবক-যুবতীরা আসামের অন্যতম রাজ্য-ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবিতে শিলচরে বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছে।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে বরাক উপত্যকার (সিলেট, কাছাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের) কথ্য ভাষা বাংলা ভাষার লিখিত রূপ হতে কিছুটা পৃথক। পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতেই লিখিত রূপ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে কথ্য ভাষার ভিতর কিছুটা তারতম্য থাকে। 'সিলেটী ভাষা বাংলা নয়', লেখিকা তাঁর এ নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রমাণের জন্য যে একটা বাক্যকে সিলেটী বলে বেনামীতে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন, তা আদৌ সিলেটী নয়।

যাদবরঞ্জন ভট্টাচার্য
শিলচর

উচ্চাঙ্গ সংগীতে একঘেয়েমি

গত ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৭ তারিখের দেশে গানের আসর বিভাগে দেখলাম শার্ঙ্গদেব উচ্চাঙ্গ সংগীতে একঘেয়েমি বর্জন করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি একটি "কোড"ও নির্ণয় করার পরামর্শ দিয়েছেন।

তাঁর সঙ্গে আমি একমত যে আজকালকার উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটিই বিষয় অতি দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে একঘেয়ে হয়ে পড়ে। একঘেয়েমির দরুণ প্রকৃত রসগ্রহণে বঞ্চিত হতে হয়—বিরক্তি আসে, অশ্রদ্ধা জন্মায়। যতক্ষণ পারা যায়, যেমন ক্ষমতা কুলায় সেইমত সাজিয়ে-গুছিয়ে, পরিচ্ছন্নভাবে, আপ্রাণ রসসমৃদ্ধ করার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। সংগীতজ্ঞ হিসেবে আমি মনে করি রসসৃষ্টির দিকে নজর না দিয়ে দীর্ঘায়িত করার এবং দীর্ঘায়িত করার তাগিদে অতি নাটকীয় ভাব। অতিরিক্ততা, মাত্রাহীনতার প্রবণতাকে প্রশ্রয় একেবারেই না দেওয়া উচিত। সময় হয়েছে; এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে গিয়েছে—রসসৃষ্টির তাগিদকে মূল করার সময় এসেছে।

আমি শার্ঙ্গদেবকে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি গান বাজনার একঘেয়েমি সম্বন্ধে তিনি যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি আজকালকার রাগসংগীতে রসহীন অলংকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করুন। আজকালকার রাগসংগীতে দেখা যায় এমন সমস্ত অলংকরণ করা হয় সময়ে সময়ে যা হয়ত স্টান্ট সৃষ্টি করে—সংগীত-অজ্ঞদের বাহবা এনে দেয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রস সৃষ্টি করে না। আসল শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এইসব আজগুবি বাহাদুরিকে প্রশ্রয় না দিয়ে শিল্পকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রসোত্তীর্ণ করার দিকে মন দেওয়া উচিত।

সুললিত সিংহ
কলিকাতা-৫৩

অ্যাপোলো প্রোগ্রামের নতুন মহড়া

কিছুদিন আগে অ্যাপোলো মহাকাশযানে পরীক্ষার সময় ভিতরের কৃত্রিম অক্সিজেন আবহ আগুন হয়ে জ্বলে ওঠার ফলে অপঘাত-মৃত্যু ঘটে ভার্জিল গ্রিসম, রবার্ট হোয়াইট এবং রজার চ্যাফির। এই ধরনের দুর্ঘটনা মহাশূন্যে ঘটতে পারে বলেই লোকে ভাবতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটি ঘটে গেল মহাকাশে নয়, পৃথিবীর ভূমির উপর, যা কেউ আশা করেনি। গ্রহ-গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়া যাঁদের লক্ষ্য, এই ধরনের বিপদ ঘটতে পারে জেনে-শুনেই তাঁরা সেই ঝুঁকি নেন। সেইরকম ঘটনা ঘটতে পারে এটা ধরে নিয়ে হোয়াইট মন্তব্য করেছিলেন, "সেরকম একটা কিছু যদি ঘটেই যায় তার জন্য আমাদের

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জর্জ ওয়াল্ডকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ১৯৬৭ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে যে ২ জন ঐ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের ১ জন হচ্ছেন রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হাল্ডান কেফার হার্ট লাইন এবং স্টকহল্ম্-এর বৈজ্ঞানিক ডঃ রাগ্নার গ্র্যানিট। এঁরা তিনজনেই চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন
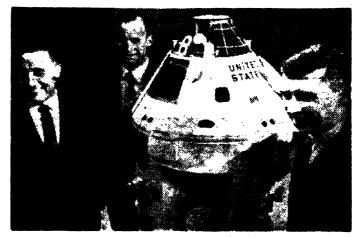
অ্যাপোলো মহাকাশযানের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, শহীদ ভার্জিল গ্রিসম, এডোয়ার্ড হোয়াইট ও রজার চাফি

মহাশূন্যের কর্মসূচী মুলতুবি করা বা বাতিল করা হবে না।"

বাতিল করা যে হয়নি, নবতম ও প্রথম অ্যাপোলো মহাকাশযানের সাফল্য তার প্রমাণ। তবে হ্যাঁ, চন্দ্রলোকে যাত্রার প্রোগ্রাম বেশ খানিকটা পেছিয়ে গেল। রাশিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। কারণ, 'সোয়ুজ' মহাকাশযানের মধ্যে কোথাও কোন গণ্ডগোল থাকার দরুন কোমারফকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তবে ২টি স্বয়ংচালিত মহাকাশযানের (যার মধ্যে কোন মানুষযাত্রী ছিল না) মহাশূন্যে পরস্পরের সংলগ্ন হওয়ার রাশিয়া আর একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করল বা চন্দ্রমুখী পথে যে এক ধাপ এগিয়ে গেল সেটা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনিই অনস্বীকার্য আমেরিকার ৩৬ তলা উঁচু এবং ২০ কোটি অশ্বশক্তির স্যাটার্ন রকেটে মহাকাশ যাত্রা ও তার দ্বারা পরিবাহিত অ্যাপোলো ক্যাপ্সুলের ঘণ্টায় ৪০ হাজার কিলোমিটার বেগে আবহমণ্ডল ভেদ করে নিরাপদে পৃথিবীতে অবতরণ করা। আমেরিক্যানদের মতে, এত শক্তিশালী রকেট নাকি রাশিয়ার নেই। মার্শাল স্পেস ফ্লাইট সেণ্টারের অধ্যক্ষ ডঃ ভার্নার ভন ব্রন তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত এই রকেটকে "আগাগোড়া একটি পাঠ্যপুস্তক" বলে অভিহিত করেন। ডঃ জর্জ মুলারের (ন্যাশনাল এরোনটিক অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রশাসক) মতে, মিশরের পিরামিড, পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের প্রকল্প এবং শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান নির্মাণ, মিলিয়ে যে কেরামতি, কৌশল ও মেহনতের প্রয়োজন হয়েছিল, স্যাটার্ন রকেট নির্মাণকে সেই কেরামতি ও মেহনতের সমতুল বলা যেতে পারে। নানা জায়গায় বসানো ১২৫টি কম্পিউটারের দ্বারা মহাকাশযানটি পরিচালিত হয়। নাসার উপাধ্যক্ষ রবার্ট সিম্যানস্ মন্তব্য করেছেন যে, "এই অ্যাপোলো প্রোগ্রামের চাঁদে যাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য নয়, মহাশূন্যে আমাদের দেশের প্রয়োজনে এই প্রোগ্রাম কাজে লাগানো যেতে পারবে।"

এই ঝকঝকে বিরাট রকেটটি তৈরি করতে লেগেছে বছর ছয়েকের মত। এই রকেটের উচ্চতা ৩৬৩ ফুট এবং ইন্ধন সহ ওজন ৩১১০ টন (একটি মাঝারি আয়তনের যুদ্ধজাহাজের ওজন ২২০০ টন)। স্যাটার্ন রকেটের তিনটি ভাগ বা পর্যায়। প্রথম

ডঃ হাল্ডান কেফার হার্টলাইন

ভাগের ৫টি ইঞ্জিন মিলে রকেটটিকে ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড চাপে ঠেলা দিতে পারে। অর্থাৎ ঐ ঠেলা ১৬ কোটি অশ্বশক্তির মত। তিনটি পর্যায়ের মোট ১১টি ইঞ্জিন মিলে ২০ কোটি অশ্বশক্তি উৎপন্ন করতে সক্ষম। তার কর্তব্য ছিল অ্যাপোলো মহাকাশযানটি ১৮২৪০ কিলোমিটার উপরে তুলে গতিপথ বেঁকিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা। সেই কর্তব্যে সে সাফল্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই অ্যাপোলো মহাকাশযানের ওজন ১৪০ টন।

তারপর অ্যাপোলো মহাকাশযান নিজের ইঞ্জিনের সাহায্যে ৪০ হাজার কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর দিকে ফিরে এসেছে যখন আবহের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২৪০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং পৃথিবীর কাছাকাছি এসে ৫১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। সেই প্রচণ্ড তাপ সহ্য করার জন্য মহাকাশযানকে এক বিশেষ ধরনের বর্ম দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। সেই উত্তাপ ২৩০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তির সমতুল্য। অর্থাৎ সারা ওয়াশিংটন শহরকে ৭ সেকেণ্ড আলোকোজ্জ্বল করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। ভবিষ্যতের চন্দ্রলোকের

চাঁদে গিয়ে পৃথিবীর যাত্রীরা সেখানে এইরকম সব যন্ত্রপাতি বসিয়ে আসবেন

যাত্রীদের ঐ ধরনের উত্তাপের মধ্য দিয়ে ফিরে আসতে হবে। ঐ ধরন মানে অন্তত ৫১০০ ডিগ্রীর ছ ভাগ তো বটেই। অ্যাপোলো মহাকাশযানে তিনযাত্রীর জন্য জায়গা আছে এবং সেই সঙ্গে আছে চাঁদে নামবার গাড়ী এবং ফিরে আসবার রকেট ও ইন্ধন।

২টি টেকনোলজিক্যাল উপগ্রহ

এ ছাড়াও ৭ দিনব্যাপী প্রোগ্রামে আমেরিকা আরো কতকগুলি সাফল্য লাভ করেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে সেগুলি হল:

স্যাটার্ণ-৫ রকেটের প্রথম ভাগ বা পর্যায়

একটি বহু-উদ্দেশ্যমূলক টেকনোলজিক্যাল উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপ করা. যেটির সাহায্যে এমন অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে যেগুলি এই পৃথিবীতে মানুষের উপকারে আসতে পারে। ভবিষ্যতের যোগাযোগ, আবহ, সমুদ্রে জাহাজ চলাচল ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর ঐ উপগ্রহটির আলোকপাত করার কথা। এটির নাম "এ টি এস—৩।" "এ টি এস—৩" উপগ্রহটিকে ব্রেজিলের মাথার উপর রাখা হয়েছে পৃথিবীর গতির সঙ্গে তার গতি সমান রেখে। এই ধরনের উপগ্রহের কল্যাণে বহু আগে থেকে ঘূর্ণিবাত্যা ও ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে বহু প্রাণ ও সম্পত্তি বাঁচানো যাবে। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, মহাকাশে ভাসমান ঐরকম উপগ্রহ থেকে লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ও বিদ্যালয়গুলিতে টেলিভিশনের ছবি প্রতিফলিত করা যাবে, যা হবে শিক্ষার সহায়।

এ টি এস—৩ উপগ্রহের রঙিন টেলিভিশন ক্যামেরায় মেঘাবরণ সহ গোটা পৃথিবীর ছবি তুলে পাঠানো যাবে. যা থেকে সময়বিশেষে মেঘের উচ্চতা জেনে আবহ পূর্বাভাস দেবার সুবিধা হবে।

মহাসমুদ্রের যেসব অংশে এখনো জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই, এ টি এস্—৩ সেইসব জায়গার বাণিজ্য-পোতের সঙ্গে উপকূলবর্তী আবহ-কেন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে।

এ টি এস্—৩ ছাড়ার পরের দিন আমেরিকা থেকে চন্দ্রগামী সার্ভেয়ার—৬, যেটি চাঁদের 'সাইনাস-মেডি' উপসাগরে নেমে আবার ৪০ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে চাঁদের ছবি তুলে পাঠাচ্ছে বিশেষ করে সেইসব জায়গার যেখানে তার নিজের পদচিহ্ন আঁকা হয়ে গিয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাবী মানুষযাত্রীদের জন্য নামবার উপযুক্ত জায়গা ঠিক করা এবং চাঁদের মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা।

তার পরের দিন ছাড়া হয়েছে আর একটি আবহ-উপগ্রহ, যার নাম এসো—৬। সেটির কক্ষপথ পৃথিবীর মেরুর মাথার উপর যেখানে ঘুরছে আরো ৫টি ঐ ধরনের উপগ্রহ।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

অ্যাপোলো মহাকাশযানের ভবিষ্যৎ যাত্রীকে এই রকম পোশাক পরতে হবে যাতে মহাশূন্য থেকে কোন জীবাণু তাঁরা পৃথিবীতে সংক্রামিত করতে না পারেন

শ্যামলাল বলিল—শ্রীরাজাগোপালাচারী মাঝে মাঝে রাজনীতি নিয়ে দু'একটি হুল ফুটিয়ে থাকেন; কিন্তু তাতে মধুও থাকে। এবারে তিনি বলেছেন, কেন্দ্র ডঃ ঘোষকে বলির পাঁঠা করেছেন। সন তারিখ মনে নেই, বোধ হয় শ্রীরাজাগোপালাচারী যখন পঃ বঙ্গের গবরনর

ছিলেন তখন কালীঘাটে পাঁঠা বলি বন্ধ করো, ভ'য়সা বলি বন্ধ করো আন্দোলন চলছিল। সুতরাং বলির পাঁঠা উপমা যৌক্তিক হয়নি!!

সরকারের নির্দেশে বিধানসভা মুলতুবি হইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, যে পালার বুধবার সেখানে অভিনয় হইবার কথা ছিল সেটার বদল হইলেও সেদিনের নুতন পালাও কম নাটকীয় নয়।—"যা বলেছেন; "প্রফুল্ল" নাটক কিনা তাই 'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' অঙ্কে এসেই আপাতত থেমে গেল"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

আর এস পি-এর পঃ বঙ্গ কমিটির পক্ষ হইতে নাকি বলা হইয়াছে যে, ঘোষ সরকারের নির্যাতন মানুষের ধর্মের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। শ্যামলাল সংক্ষেপে বলিল—"ধর্মের বাইরে হলেও ধর্মবীরের বাইরে নয়!!"

বিধানসভায় যে-নাটক জমিল না, সেই নাটক পরিষদের প্রেক্ষাগৃহে জমিয়াছে। সংক্ষেপে শুনিলাম, সভার কাজ শুরু হইবার ঘণ্টা বাজার আগেই যুক্তফ্রন্টের কতিপয় সদস্য হলে ঢুকিয়া শ্লোগান দিতে থাকেন, একজন চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসিয়া পড়েন, অন্য একজন টেবিলে গিয়া দাঁড়ান। শেষোক্ত জন নাকি জনৈক শিক্ষক। সহযাত্রী বলিলেন—"তিনি হয়ত স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ ভুলতে পারেন নি এবং প্রোগ্রেসের ফলে স্ট্যাণ্ড আপ অন দি টেবিল করলেন!!"

বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান মঙ্গলবার রাত্রি হইতেই নাকি বিধানসভা ভবনে ছিলেন এবং সঙ্গে আনিয়াছিলেন

চাল এবং মুগের ডাল। "এই চাল এবং ডাল বেশ পরিমাণ এনে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়ালে দেখা যেত অজয়বাবু এবং প্রফুল্লবাবু এক সঙ্গে তা উপভোগ করছেন, সঙ্গে সঙ্গে জনগণও পাত পেড়ে বসে যেতেন, নিমেষে বিবাদ বিসম্বাদ খিচুড়ির হাঁড়ির তলায় তলিয়ে যেত; খাদ্যের দাবিটাকে অখাদ্য রাজনীতির হাঁড়িতে চাপিয়েই হাটে হাঁড়ি তাঁরা ভাঙলেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

প্রেসিডেন্ট দ্য গল বলিয়াছেন, স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্তন সম্ভব।—"আমরা ঐখান থেকে বেরিয়ে যাইনি এবং ফিরে আসার প্রশ্নও তাই আমাদের সম্পর্কে ওঠে

না। বিশ্বাস না হয়, পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং যাঁরা করেন তাঁদের জিজ্ঞেস করুন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

রাশিয়ায় হাতীর হাড়ে প্রস্তুত প্রস্তর যুগের বাসগৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"আমরা এখানে প্রস্তর যুগের মানুষ আবিষ্কার করেছি, বাসগৃহ আবিষ্কার করতে পারিনি। কেন না আমাদের অবস্থা 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে'।"

সংবাদে প্রকাশ, পানজাব মন্ত্রিসভার ন'জন ম্যাট্রিকের বেশি পড়াশোনা করেন নাই।—"তাঁরাই বুঝি শুধু কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নীতিতে বিশ্বাসী, কেননা শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন, মন্ত্রী হতে লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই"—মন্তব্য করেন সহযাত্রী।

'চালের দর কমছে, মাছের দর চড়া'—একটি সংবাদ শিরোনামা। সহযাত্রী তাঁর শূন্যে মাছের ঝোলাটি শূন্যে তুলিয়া বলিলেন—"তাহলে কি চাল ধুয়ে মাথায় ঢালব?"

শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন, অতীতের ভারতের চেয়ে বর্তমান ভারতের ভবিষ্যৎ

আরও অনেক উজ্জ্বল। সহযাত্রী বলিলেন—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, একবারে ফরসা!!"

কেরলে বাম এবং দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের মধ্যে নাকি তিক্ততা বাড়িয়াই চলিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"হবেই হবে, করলা তেতোই হয়ে থাকে।"

শ্রীমোরারজী দেশাই বলিয়াছেন, মানুষের জীবনে ভাগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে। খুড়ো বলিলেন—"তা জানি এবং জানি বলেই পঞ্চ বার্ষিক কেন, শতবার্ষিক যোজনা-ফোজনাতেও আমাদের আর বিশ্বাস নেই; আমরা সহজ কথাটা জানি এবং মানি অর্থাৎ কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি!!"

শ্রীহুমায়ুন কবিরকে বেতারে বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। শ্যামলাল বলিল—"শ্রীকবির নিশ্চয়ই ভাবছেন, বেতারে 'অনুরোধের আসর' উঠিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয়নি।"

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, অল ইণ্ডিয়া রেডিও পরীক্ষামূলকভাবে কোন কোন হাল্কা গানের সঙ্গে হারোনিয়াম ব্যবহার করিতে দেওয়ার কথা বিবেচনা করিতেছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সংবাদটা শোনার দিন রাত্রি বেলা কোন এক অজানা বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে-আসা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যেন শুনলাম—হারমানি-হাম, হার মানি হাম!!"

নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য

শংকরীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার প্রকৃতি ও পরিমাণ নিয়ে অল্পবিস্তর লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধ এবং 'লোক-মাতা' শব্দটি বাংলা দেশে আজ সুপরিচিত। নিবেদিতা শতবার্ষিকীতে এমন কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না সন্দেহ, যেখানে রবীন্দ্রনাথের নিবেদিতা-বিষয়ক উক্তি পুনরুচ্চারিত হয়নি! ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় নিবেদিতাকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন, তিনি কয়েকটি সভায় নিবেদিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সবিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসে নিবেদিতার চরিত্র-প্রতিফলন কতখানি, রবীন্দ্র-জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থে তাও আলোচিত হয়েছে। এবং আরও কিছু তথ্য আছে, যা কিছু সন্ধানেই আমরা পেয়ে যাই। সেগুলির বিস্তারিত উল্লেখ আমরা অন্যত্র করব। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ —নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্র-সংবাদ এবং সেই সূত্রে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যের পরিবেশন। অধিকাংশ পত্র পেয়েছি রেমণ্ড-সংগ্রহ থেকে, শ্রীমৎ অনির্বাণের আনুকূল্যে যেগুলি পরীক্ষা করার সুযোগ আমাদের হয়েছে।

সূচনাতেই কিছু চাঞ্চল্যবর্ষণ করা যায়। বাংলা দেশের শিক্ষিত মহলে একটি প্রচলিত ধারণা—রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের কোনো চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি।১ এই ধারণা কিছুদিন আগে কিছু পরিমাণে সংশোধিত হয়। ডঃ কালিদাস নাগ ১৩৬৮ সালের মাঘ সংখ্যার উদ্বোধন পত্রিকায় 'বিবেকানন্দ-জীবনীর উপাদান সংগ্রহ' নামক রচনায় দেখান, রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতী দেবীর সঙ্গে কৃষ্ণ-কুমার মিত্রের বিয়েতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে গায়ক দল রবীন্দ্রনাথের লেখা ও শেখানো গান গেয়েছিলেন, গায়কদের মধ্যে ছিলেন "নরেন্দ্র দত্ত মহাশয়"ও।

রবীন্দ্রনাথের গান যে ঐ বিবাহ-উৎসবে গাওয়া হয়েছিল, তা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও পাওয়া যায়, যদিও নরেন্দ্র-নাথের নাম সেখানে ছিল না, ২ এবং যদি

১। রবীন্দ্র-জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে পাই :

"রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমসাময়িক: উভয়ের জন্ম কলিকাতায়—সিমলা ও জোড়াসাঁকো শহরের এ-পাড়া ও-পাড়া এক মাইলের মধ্যে। 'কিন্তু দুইজনের দুই জগতে বাস ছিল। তাই সমসাময়িক হইয়াও তাঁহারা সমান্তরাল রেখায় চলিয়া-ছিলেন, **জীবনে কাহারও সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই।**"

২। ডঃ নাগ প্রদত্ত তথ্য আমরা বিশ্ববিবেক গ্রন্থে (আষাঢ়, ১৩৭০) উদ্ধৃত করি। কিছুদিন পরে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন কথা সাহিত্য পত্রিকার ফাল্গুন, ১৩৭০, সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ' নামক প্রবন্ধে ঐ বিবাহ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন। তাতেই দেখেছি, তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার ১৮০৩ ভাদ্র সংখ্যায় 'কোনো ব্রাহ্ম সুকবি' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ রচিত গান গাওয়ার উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু গায়কদের নাম সেখানে ছিল না। ঐ প্রবন্ধ থেকে আরও জানা গেছে, ডঃ কালিদাস নাগ, লীলাবতী মিত্রের ডায়েরী থেকে প্রাপ্ত যে তথ্য দিয়েছেন, সেই একই তথ্য 'লীলাবতী মিত্র' নামক পুস্তকে রয়েছে, যে বইটি "সম্ভবত কৃষ্ণ-কুমার সহায়তায় তাঁর কন্যা কুমুদিনীর রচনা।"

সত্যই রবীন্দ্রনাথ উক্ত সভার সকল গায়ককে গান শিখিয়ে থাকেন, তাহলে প্রথম যৌবনে নরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবেকানন্দ হবার আগে "সঙ্গীত কল্পতরু" নামে গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে (বিস্তৃত ভূমিকা নরেন্দ্রনাথেরই রচনা), তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান রয়েছে। ঠাকুরবাড়িতে বাল্যকাল থেকেই স্বামীজীর যাতায়াত ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের দীপ্ত তরুণ রূপে তিনি ঐ মহলে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং এক পাড়ার প্রায় সমবয়স্ক (এবং অসাধারণ রূপবান!) দুই-জনের মধ্যে অন্তত চোখের চেনা অবশ্য-স্বীকার্য হয়ে পড়ে।

তবু "উভয়েই পরস্পর সম্বন্ধে আশ্চর্য-উদাসীন"—এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হল কেন, অন্তত রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত-কুমারের মত ব্যক্তির, এবং তাঁর সূত্রে বা নিজস্বভাবে বহু ব্যক্তির? এর মূলে প্রভাতকুমার-নির্দেশিত কারণটিই বর্তমান সন্দেহ নেই, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথের লেখার অল্পতা এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, বিবেকানন্দের লেখার শূন্যতা।৩

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নাম করে কিছু লেখেননি, তা স্বীকার্য। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমার সন্দেহ ছিল (যা এখন বিশ্বাসে পর্যবসিত হয়েছে) 'পরি-ব্রাজক' গ্রন্থে স্বামীজী নাম না করে রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁর অনুকারীদের ভাব ও রচনারীতিকে বিদ্রূপ করেছেন।৪

অপরপক্ষে আমি, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা-বাণীকে সৌজন্যসম্মত কিছু উক্তির অতিরিক্ত মনে করতে পারি না, যদিচ স্বামীজীর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন —রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বলে—তার মধ্যে সতর্ক ঐতিহাসিক মূল্যায়ন রয়েছে, তাতে স্বামীজীর ভূমিকার মূল তাৎপর্যের একটা আভাস পাওয়া যায়, এবং বিবেকানন্দের জীবনের সেইটুকু অংশের বিষয়েই উক্তি আছে, যাকে নানা মানসিক বাধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না, এবং অধিকন্তু ঐ কথাগুলি নির্গলিত হতে পেরেছিল নিবেদিতার উত্তাপে। ভবানীপুরে স্বামীজীর যে স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন, তাতে মূল বক্তা ছিলেন নিবেদিতা, ধরে নেওয়া যেতে পারে নিবেদিতার ইচ্ছাতেই তিনি ঐ সভায় গিয়েছিলেন এবং বেংগলী কাগজের অতি সংক্ষিপ্ত যে রিপোর্ট পাই, তাতে দেখি, নিবেদিতা স্বামীজীর প্রচন্ড নির্ভয় দেশপ্রেমের কথাই বলেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন সেই ধরনের কথাই। নিবেদিতাই যে ১৯০৫ সালে বেলুড়ে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রমুখকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাও অনুমান করতে বাধা নেই।

অনেকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ মাত্র একবার কি দুবার বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সত্যত আবেগের সঙ্গে কিছু কথা বলেন। তখন একদিকে পূর্বতন পারিপার্শ্বিকের বাধা অপসৃত হয়ে গিয়েছে, এবং তিনি মধ্যবর্তী ইতিহাসে বিবেকানন্দের প্রচণ্ড প্রভাবের ঐতিহাসিক দর্শক হয়েছেন, অন্যদিকে নূতন সংকীর্ণ এক পারিপার্শ্বিক মাথা তুলে তাঁকে আতঙ্কিত করে তুলেছে—তিনি ঐ বেড়া-ভাঙার কাজে বাংলার যুব-শক্তির নৈতিক জাগরণ চেয়েছেন—সোজা কথায়, গান্ধীনীতির সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের বাণীর প্রচণ্ড মোচনশক্তিকে

৩। এখানে সবিনয়ে একটি কথা জানাতে চাই ঃ দেশ পত্রিকার গত সাহিত্য সংখ্যার (২২ বৈশাখ, ১৩৭৪) 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারত চিন্তা' নামক প্রবন্ধে আমি বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি সুপ্রচারিত উক্তির ("যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো, কারণ তাঁর মধ্যে নেতিবাচক কিছু ছিল না, সবই ইতিবাচক") উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম; উত্তরে কয়েকটি চিঠি দেশে প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলিতে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তি উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি। যাই হোক, আমার প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যে আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি; রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল, এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসীকে বলেছিলেন। মনে হয় রবীন্দ্র-নাথের জীবৎকালেই উক্তিটি প্রচারিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ, যাঁরা সহৃদয়তার সঙ্গে আমার প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলিকে উপস্থিত করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ দিই, কিন্তু সেই সঙ্গে জানাই, ঐ উক্তিগুলি এবং আরও কিছু তথ্য চার বছর আগে আমি বিবেক-বিবেক গ্রন্থে সংকলন করে দিয়েছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, বেলুড় মঠে আয়োজিত একটি জনসভাতেও নাকি রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন, —না, তিনি বক্তৃতা দেননি, কিন্তু বেলুড়ের বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব সভায় (১৯০৫) উপস্থিত ছিলেন, উদ্বোধন পত্রিকা থেকে তার সংবাদও আমরা ঐ গ্রন্থেই দিয়ে দিয়েছি।

৪। "ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়ে-মানুষের মত বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন—"

স্মরণ করেছিলেন। সে ঘটনা অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তীকালের।

এইবার মূল কথায় আসা যাক। নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী বলতে পারি :

এক. আমেরিকা থেকে ফিরবার পরেও বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে;

দুই. বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না বরং তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন।

স্বামীজী ১৮৯৭ সালের গোড়ায় আমেরিকা থেকে ফেরার পরে সর্বভারতে যে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে তাঁর পূর্বে সে সংবর্ধনা আর কেউ পাননি; এবং সর্বদিকে প্রকাশ্য বা গুপ্ত আক্রমণে যেভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন, তারও কোনো তুলনা ছিল না। বাংলা দেশে কোনো সংগঠিত সম্প্রদায় তাঁর সমর্থনে প্রস্তুত ছিল না, কারণ তিনি কোনোভাবে আপোসে প্রস্তুত ছিলেন না। এরই মধ্যে কিছুকালের জন্য ন্যূনতম সংঘাতের পথে চলতে তাঁকে তাগিদ দেওয়া হয়েছিল, কাজের ব্যাপারে অন্তত অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুটা বোঝাপড়ায় আসতে বলা হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে, বিশেষভাবে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে এই যোগাযোগ ঘটানোর ব্যাপারে যোগসূত্রের কাজ করতে চেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, কারণ ১৮৯৮ সালে কলকাতায় আসার পরেই ঠাকুর পরিবার এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁরা নিবেদিতাকে যথেষ্ট মনোযোগ দেন; তাঁর মননশীলতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করেন। নিবেদিতা স্বতঃই উৎসাহিত হয়ে তাঁদের ঔৎসুক্যকে স্বামীজীর কর্মপ্রচেষ্টার দিকে সঞ্চারিত করতে চান। নিবেদিতার উৎসাহে স্বামীজী বাধা দেননি, কারণ জিনিসটা ঘটলে তাঁর থেকে আনন্দিত কে, কিন্তু ঐ সহযোগিতা-চেষ্টার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। এইকালে সরলা রায়, প্রসন্নকুমার রায়, সরলা ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে স্বামীজীর নানা আলোচনা হয়, এবং স্বামীজী একবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনে জোড়াসাঁকোয় যান। সেখানে ঠাকুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গে আলাপে বেশ খানিকক্ষণ কাটান। সরলা ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বরে আগমন সহযোগিতার পথ বহুলাংশে প্রশস্ত করে। এই সমস্ত প্রয়াটিতে নিবেদিতা সোনার স্বপনে মশগুল। কিন্তু রূঢ় আঘাতে তা ভেঙে গেল, যখন সরলা ঘোষাল এক উদ্ভট দাবি তোলেন। দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের কথাই সত্য। ইতিহাসের এই অংশ সম্বন্ধে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য আমাদের হাতে থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধে তার অবতারণা করতে চাই না। শুধু জানাতে চাই, এমনি এক পারস্পরিক আলোচনার চা-পান সভাতেই বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ একত্র উপস্থিত ছিলেন।

ঘটনা ঘটেছিল এই। নিবেদিতার উৎসাহে সাড়া দিয়ে এক সময়ে স্বামীজী নিজেই সকলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য একটা চা-পান সভার আয়োজন করতে বলেন। তা শুনে বলাই বাহুল্য, নিবেদিতার জ্বলন্ত উদ্দীপনা। ১ জানুয়ারী, ১৮৯৯ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা এক চিঠি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

"রাজার (স্বামীজীর) সঙ্গে একঘণ্টা কাটিয়ে ফিরেছি। গতকাল রাত্রে তিনি এসেছিলেন। আজ সকাল ৮টায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। একেবারে দিব্য—**অপূর্ব দেখাচ্ছিল**—যদিও জানালেন যে, তিন রাত্রি শ্বাসের জন্য (হাঁপানির কারণে) লড়াই করে কেটেছে—কিন্তু পরিকল্পনায় পূর্ণ। এরকম মুডে তাঁকে আগে কখনো দেখিনি। সারদানন্দ ও আমাকে ক্রুশেড চালিয়ে যেতে হবে, বিভিন্ন মঞ্চে বক্তৃতা করে কলকাতাকে জাগাতে হবে। 'ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকে পড়।' এটা কি তাঁর একটা হঠাৎ-ঝোঁক? ব্রাহ্মদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ফল, যা তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে? বলতে পারি না।

সে যাই হোক, একটা চা-পান সভার আয়োজন করতে বললেন; তাতে আমন্ত্রিত হবেন সকল ব্রাহ্ম বন্ধু; সে সভায় তিনি আসবেন, এবং কথা বলবেন!!! আয়োজন করব কিনা অনুমান করতেই পারো। বসুদের আসতে বলব, রায়দের [অপর রায়দের (?)...], মিঃ মুখার্জি, মিঃ মোহিনী, মিঃ টেগোর,৫ সরলা ঘোষাল এবং তাঁর মাকে। আমন্ত্রণকর্ত্রী হতে পারছি আবার—রীতিমত উত্তেজনা বোধ করছি—যেখানে ওহেন মহাসিংহের প্রদর্শনী!

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে (ব্রাহ্মদের) সমালোচনার কথা শুনে স্বামীজী রীতিমত জ্বলে উঠলেন; বললেন, ওসব কথা শুনে আমার ধৈর্য যে নষ্ট হয়েছিল, তাতে কিছুমাত্র অন্যায় হয়নি। তখন দেখবার মত চেহারা!...

টি-পার্টি যে ডাকব, তা তো তোমাকে বললাম; টি-স্টেট শুক্রবার এখানে নিয়ে আসা হবে। বাইরে উঠোনেই অবশ্য চা-সভা হবে; কিংবা পায়রাগুলি যদি সরে যায় তাহলে স্কুল-বারান্দায়। সেক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি চেয়ার প্রভৃতি সাজিয়ে দেওয়া যাবে।...

(বুধবার সন্ধ্যা)। রাজা সর্বদা টি-পার্টির কথা জিজ্ঞাসা করছেন। আশা করি তা পরের সোমবার হবে।"

প্রস্তাবিত "সরকারী" টি-পার্টি কিন্তু হয়নি, কিন্তু ঘরোয়া এক চা-সভা হয়েছিল, ২৭ জানুয়ারী, ১৮৯৯, শনিবার। এই স্মরণীয় সভাতে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ এই সভার জন্য বিশেষভাবে রচিত কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। সভার সকলে 'অত্যুৎকৃষ্ট পোশাকে এসেছিলেন, উঠানে বসে চা খেয়েছিলেন।' অবশ্য চায়ের ব্যবস্থা খুব উচ্চাঙ্গের হয়নি, কারণ 'দুধের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল, এবং কখনোই চা তৈরী হতে পারত না, যদি না মিসেস পি কে রায় ঝি ও টি-পটের ভার নিজে নিতেন, এবং আমাকে (নিবেদিতাকে) কথাবার্তার জন্য ছেড়ে দিতেন। তারপরে আমরা সকলে উঠে এসেছিলাম, এবং বাতির আলোয় স্বামীজী অপূর্বভাবে কথা বলেছিলেন।'

৫ অনুবাদ করার সময়ে অনেক সময়ে মিঃ টেগোর রাখতে বাধ্য হয়েছি, যদিও 'ঠাকুরবাড়ি', 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' ইত্যাদি পাওয়া যাবে।

him. He is just divine - Almost everyday I take a meal with him - yesterday he came to the party. - On Saturday also I had a sort of unarranged party. Mrs P.K. Roy & young Mr Mukerji. Mr Mohini & the Poet - & presently Swami with Dr. Sirkar. It was quite a brilliant little gathering - for Mr Tagore sang 3 of his own compositions in a lovely tenor. - Swami was lovely.

At this moment the Evensong gongs & bells are sounding in the homes all round me - It is the hour that they call "Candlelight" - the hour of worship - I cannot forget the lovely poem "Come O Peace" ("Escho Santi") - with its plaintive minor air that Mr Tagore composed & sang for us the other day at this time.

এ বিষয়ে ৩০ জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ম্যাকলাউডকে লেখার পত্রের অংশ—

"স্বামীজী একেবারে দিব্য ব্যাপার। প্রায় প্রতিদিন একবার তাঁর সঙ্গে আহার করি। গতকাল পার্টিতে এসেছিলেন। শনিবারও বন্দোবস্ত ছাড়াই এক ধরনের পার্টি হয়ে গিয়েছিল। মিসেস পি কে রায় এবং তরুণ মিঃ মুখার্জি, মিঃ মোহিনী, এবং কবি এবং অনতিবিলম্বে ডাঃ সরকার সহ স্বামীজী। অতি চমৎকার ক্ষুদ্র এক সমাবেশ, কারণ মিঃ টেগোর তাঁর মনোরম চড়া সুরে স্বরচিত তিনটি গান গাইলেন। স্বামীজীও অনবদ্য।...

ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠির অংশ
৩০ জানুয়ারী, ১৮৯৯

He is just divine. Almost every-day I take a meal with him and yesterday he came to the party. On Saturday also I had a sort of unarranged party. Mrs. P. K. Roy and young Mr. Mukerji, Mr. Mohini and the Poet and presently Swami with Dr. Sirkar. It was quite a brilliant little gathering, for Mr. Tagore sang 3 of his own compositions in a lovely tenor, and Swami was lovely—

At this moment the evensong gongs and bells are sounding in the hours all round me. It is the hour that they call "Candlelight" —the hour of worship—I cannot forget the lovely poem "Come O Peace" (Escho Santi)—with its plaintive minor air that Mr. Tagore composed and sang for us the other day at this time.

"এই মুহূর্তে আমার চারপাশের বাড়িতে সন্ধ্যার ঘণ্টা ও ঘড়ি বাজছে। এই সময়কেই এখানে বলা হয় সেঁজুতি—সন্ধ্যাদীপের কাল—প্রার্থনার প্রহর। সেই অপূর্ব কবিতাটি—'এসো শান্তি'—তার মৃদু উদাস সুর—যেটি কবি আমাদেরই জন্য রচনা করেছিলেন এবং গেয়েছিলেন এমনি সময়ে সেই সন্ধ্যাটিতে—ভুলতে পারছি না সে কথা।"

এই চা-পান সভায় 'মহাসিংহের প্রদর্শনী' উত্তমভাবে হয়েছিল সন্দেহ নেই, নিবেদিতা সংক্ষেপে তা জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের গানেও তিনি অভিভূত, কিন্তু বিবেকানন্দ বাঙ্ময় থাকলেও রবীন্দ্রনাথ কি তাঁর সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন? বলা শক্ত। সেই সভায় আলোচ্য বিষয় কি ছিল, আলোচনায় কে কে অংশ নিয়েছিলেন, নিবেদিতা সে কথা বলেননি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিবেদিতা রবীন্দ্র-প্রতিভার যেরকম অনুরাগিণী হয়েছেন, তাতে মনে হয়, সৌজন্য বিনিময়ের অতিরিক্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলে তিনি নিশ্চয় লিখতেন। এখানে একটি কথা জানানো যায়, ঠাকুরবাড়ি বা ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেলামেশার সংবাদ নিবেদিতা মিসেস ওলি বুলকে বেশী লিখতেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁকে লেখা কোনো চিঠি আমরা পাইনি। যাই হোক, নিবেদিতার উদ্ধৃত পত্রটি পরবর্তীকালের একটি জিজ্ঞাসার অন্তত নিরশন করেছে।

রবীন্দ্রনাথ নীরব ছিলেন, হয়ত নীরব থাকতেই চেয়েছিলেন, অন্তত নিবেদিতার কাছে স্বামীজীর বিষয়ে এমন কিছু

বলেননি যা তিনি মিস ম্যাকল্যাউডকে চিঠিতে লেখা প্রয়োজন মনে করেছেন। এমনও হতে পারে, ম্যাকলাউডকে লেখা যেসব চিঠিতে তেমন কথা আছে, সেগুলি আমরা পাইনি।

স্বামীজী কিন্তু স্পষ্টভাবেই নিবেদিতার কাছে ঠাকুরবাড়ি এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মহর্ষির প্রতি তাঁর অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি সরাসরি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ঠাকুরবাড়ির আদর্শ বাঙালীর জীবনে পৌরুষ-জাগরণের সহায়ক নয়। ঠাকুরবাড়ির কোনো একজনের রচিত (রবীন্দ্রনাথের?) কিছু কবিতা পড়ে শোনাবার পরে (কড়ি ও কোমলের কবিতা?) তিনি কঠোরভাবে বলেন—এর ফলে দেশে ইন্দ্রিয়রসের বিষ-বন্যা বয়ে যাচ্ছে। জ্বলে উঠে বলেছিলেন, "আমার জীবনোদ্দেশ্য—রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্ত নয়, কিছু নয়, শুধু জনগণের মধ্যে **পৌরুষ আনা।**" সরলা ঘোষালকে পরে লিখেছিলেন :

"আমার লোকগুলি অমার্জিত, কর্কশ হতে পারে, কিন্তু বাংলা দেশে তারাই শুধু **পুরুষালি** পুরুষ। ইউরোপের পৌরুষ নারীদের দ্বারা সংরক্ষিত থেকেছে, যারা পুরুষের মেয়েলিপনাকে ঘৃণা করে। বাংলা দেশের মেয়েরা কবে এই ভূমিকা নেবে, পুরুষের প্রতিটি মিনমিনে ভাবকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপে তাড়াবে?"

এই কঠোর ঐতিহাসিক তথ্যগুলি আমি উপস্থিত করছি কোনো বিবাদ বা বিতর্ক সৃষ্টির জন্য নয়, শুধু এইটুকু দেখাবার জন্য—বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ জীবন-বোধের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভূমিতে অবস্থিত ছিলেন। এঁদের দুজনের চিন্তায় ও সিদ্ধান্তে ঐক্য আছে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার উপর নির্ভর করে উভয়কে এক ভূমিতে দাঁড় করানো যাবে না, কারণ প্রতিভাবানদের মধ্যে চিন্তার ঐক্য থাকেই, কিন্তু জীবনদৃষ্টিতে এঁরা এক ছিলেন না, থাকতে পারেন না, যেহেতু একজন সন্ন্যাসী, অন্যজন কবি। সন্ন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব বিদ্রূপ করেছেন, বিশেষত নবীন সন্ন্যাসীদের (বিস্ময়ের কথা, বৌদ্ধ সন্ন্যাস প্রশংসা পেয়েছে!), বিবেকানন্দ ঐ সন্ন্যাসকেই জীবনাদর্শ করেছিলেন। মোহ-মুক্ত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অপরপক্ষে যখন লোকজীবনের সমস্যায় প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন মানুষের প্রতি ভালবাসায় অস্থির হয়েছেন, ভারতবাসীকে জড়বৎ দেখে অধীর দুঃখে হাহাকার করে বলেছেন, এই মৃত্যুর শান্তির চেয়ে দানবের অশান্তিও ভাল। সকল উপনিষদ থেকে মূল বাণী রূপে তিনি 'শক্তি' শব্দ পেয়েছিলেন, তাকেই দিতে চেয়েছেন, তাঁর মনে হয়েছিল, ললিত প্রেম, প্রকৃতির মধুর গান এখন মনোবিলাস ছাড়া কিছু নয়, মানুষকে ঘুম পাড়াবে তা, মানুষ যেখানে না খেয়ে মরে যাচ্ছে সেখানে বজ্ররূপে বিদীর্ণ হতে দেবে না তাদের। মনে রাখা ভাল, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ভূমিকা তখনো উন্মোচিত হয়নি। সর্ববিধ লোককল্যাণের অভিপ্রায় ও যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও এইকালে তিনি মুগ্ধ কবি।৬

৬। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবি পরিচয় সম্বন্ধে কতখানি অবহিত ছিলেন, বলা শক্ত। ধরে নেওয়া যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে যখন তিনি উপনীত হয়েছেন, তখনকার রবীন্দ্র-কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। প্রভাতকুমার লিখেছেন—"তাঁহার (নরেন্দ্রনাথের) বয়স যখন একুশ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসেন;... তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চব্বিশ বৎসর, 'বালক' পত্রিকা পরিচালনা করিতেছেন, 'কড়ি ও কোমল' লিখিতেছেন, আলস বিলাসে, ভাব-উচ্ছ্বাসে, সৌন্দর্যচর্চায় দিন যায়।" কড়ি ও কোমলের রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের জীবদ্দশাতেই আরও অনেকখানি এগিয়েছিলেন—'নৈবেদ্য'কে পর্যন্ত পেয়েছিলেন, যার কয়েক বৎসর আগে 'কথা ও কাহিনী'র বরণীয় ত্যাগের মহিমা-বাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বৃহৎ রাজপথের এই পরিব্রাজক সেই সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ।

তাছাড়া, আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম সৃষ্টিকেও বিবেকানন্দ হয়ত সাহিত্যের সর্বোত্তম সৃষ্টি মনে করতে সমর্থ ছিলেন না। বিবেকানন্দ মহাকাব্যের মানুষ, ক্লাসিক মহিমায় পূর্ণ তাঁর চিত্ত, বিন্দুতে সিন্ধু নয়, তাঁর বৃহৎ চেতনায় সিন্ধুও বিন্দু, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস তাঁর কবি (আধুনিক বাংলার মধুসূদন), শেক্সপীয়ার ও মিল্টনও, ইতিহাস যখন ভালবাসেন তখন তা থুকিদাইদিস, গিবন, কার্লাইলের বৃহৎ ধ্বনিকে পান করে। রোমান্টিক অনুভূতি তাঁরও ছিল, এত প্রখর, তীব্র সে অনুভূতি যে, ক্ষণমুহূর্তকে অসহ বেদনায় শিহরিত করে তুলতে পারতেন, অতি বড় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের পক্ষেই যা সম্ভব; বৈষ্ণব পদাবলী বা গীতগোবিন্দ যখন গাইতেন, তাঁর বেদনা বিগলিত হত অজস্র আঁখিতে—তবু তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলেন; রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ততোধিক রবীন্দ্র-অনুকারীদের আচার-আচরণকে পৌরুষ-নাশী মনে হয়েছিল তাঁর। বিবেকানন্দ,

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, সৃষ্টিকে কখনই অখণ্ড শুভ বলে মনে করতেন না; প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ভাল ও মন্দ আছে; মানুষকে সম্মুখস্থ উদ্যত মন্দের সঙ্গে সংগ্রামে নামতে হবে, সেটাই তার পৌরুষ-লক্ষণ, এবং ঐ সংগ্রাম হবে তার মুক্তির কারণ। সুতরাং কিছু সময়ের জন্য সুমিষ্ট কবিতার স্বাদ যদি বাংলা বা ভারতবর্ষের মানুষ ভোলে, ক্ষতি নেই, যা লাভের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অল্প।

এইকালে কথিত স্বামীজীর কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করলে কোন্ যন্ত্রণা থেকে তাঁর ঐ উদ্গিরণ বোঝা যাবে :

"Yes ! The older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. That is my new gospel. Do even evil like a man ! Be wicked, if you must, on a great scale !"

"I love terror for its own sake, despair for its own sake, misery for its own sake. Fight always, fight and fight on, though always in defeat. That's the ideal. That's the ideal".

এই পটভূমিকায়, রবীন্দ্রনাথ যদি বিবেকানন্দের অধিক স্তুতি না করে থাকেন, নিশ্চয় আমরা অধিক রাগ করব না। এই কথাই বলব, মৌখিক প্রশস্তির মিথ্যাচার না করে রবীন্দ্রনাথ নৈতিক সাধুতাই দেখিয়েছেন। বিবেকানন্দকে বেশী পছন্দ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

নিবেদিতা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং স্বভাবের সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করেছিল। বালীগঞ্জীয় ঠাকুরবাড়ির চা-পান সভার আলাপ গুঞ্জনে যখন তিনি বীতশ্রদ্ধ, তখনো কবি তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে গেছেন। মনে হয়, তাঁর মনে আক্ষেপ ছিল, স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ কেন পরস্পর আরও গভীরভাবে পরিচিত হলেন না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও চরিত্রে নিবেদিতা কতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার পরিচয় পাই ২৩ মার্চ, ১৮৯৯, তারিখে লেখা এক চিঠিতে—

"ইতিমধ্যে ব্যানার্জিদের কাছ থেকে [illegible] পেয়েছি গরমে দার্জিলিঙ যাবার জন্য। কিন্তু সত্যই যদি অবকাশ যাপন করতে চাই, ঠাকুরদের কাছে যাওয়াই বেশী পছন্দ। কবি যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। আর ঐ বাড়িতে সব-সময়েই রয়েছে কাব্য, সঙ্গীত ও ভাব-[illegible] সুযোগ-সম্ভাবনা, যাতে উৎকৃষ্ট [illegible]।"

৮ মে তারিখে একটি বিবরণ :

"[illegible] [illegible] কল্পনাতীত। [illegible] [illegible] [illegible] বেরিয়ে পড়লেন। [illegible] [illegible] আমি দিন দুয়েকের জন্য [illegible] ঠাকুরদের সঙ্গে নৌকাযাত্রা [illegible]।"

এই চিঠির বিষয় সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। এই সময় স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্যযাত্রার কথা চলছিল। নিবেদিতার তখন এদেশেই থেকে যাবার কথা। আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে [illegible] দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন। নিবেদিতা স্থির করেন, তাঁর সঙ্গে কিছুদিন অবকাশ যাপনে যাবেন। [illegible] মিস ম্যাকলাউডকে উপদেশ [illegible] দেবেন, এবং রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দেন। এর আগে ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী কিন্তু নিবেদিতাকে য়ুরোপে ফিরে যেতে বলেছিলেন, কারণ তাঁর আর্থিক সামর্থ্য সীমাবদ্ধ, নিবেদিতার বিদ্যালয় চালানোর ক্ষমতা স্বামীজীর নেই। নিবেদিতা স্বরূপানন্দের সাহায্যে আরও কিছুদিন চালাই করার অনুমতি নেন। এর পরে প্লেগ-সেবা, ব্রাহ্ম-সংযোগ, নিবেদিতার বক্তৃতা ইত্যাদি ব্যাপার ঘটে, এবং তাঁর পাশ্চাত্ত্যযাত্রার কথা চাপা পড়ে, যদিও স্বামীজীর যাওয়ার কথাবার্তা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে নিবেদিতার বোনের বিয়ে ঠিক হয়, এবং স্বামীজী, সম্ভবত ভদ্রতা করেই তাঁকে বিবাহোৎসবে যোগদান করতে বলেন। স্বামীজীর মন বুঝে এবং যাতায়াতের খরচ প্রভৃতির চিন্তা করে নিবেদিতা রাজি হন না। তারপর এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে মিস ম্যাকলাউডের এক চিঠি আসে, যাতে নিবেদিতার ইংলণ্ডে যাওয়ার সুস্পষ্ট ব্যবস্থার কথা থাকে (নিশ্চয় খরচের দায়বহনের প্রতিশ্রুতিসমেত)। নিবেদিতা তখন আনন্দে আত্মহারা। মিস ম্যাকলাউডের ধীরতা ও বাস্তববুদ্ধির প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা অগাধ, তিনি যাত্রার প্রস্তাবে সায় দেন, কারণ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বক্তৃতা ও আবেদনের দ্বারা নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে পারবেন। এই সময়কার নানা চিঠিতে এই পরিকল্পনা ও উল্লাসের পরিচয় আছে। নিবেদিতা অতঃপর স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য যাত্রা করেন, জাহাজে ছিলেন

এই ছবিটির মধ্যে শিল্পীর অস্পষ্ট স্বাক্ষর থেকে মনে হয় Mand Stumm-এর আঁকা। নিবেদিতার বোন বলেছেন, Mand Stumm-এর স্কেচ সম্পূর্ণ বাস্তবানুমোদিত নয়, অনেকাংশে আদর্শায়িত। নিবেদিতা অতখানি সুন্দর ছিলেন না। তাঁর নাক অত চমৎকার নয়। তাঁর সৌন্দর্য আসলে অপার্থিবতার—যার আলোক যেন তাঁর আকারে দেখা যেত

২০শে জন থেকে ৩১শে জলাই, এই-কালকে তিনি নিজ "জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল বলেছেন", বলেছেন, গুরুর সংগে আমার এই যাত্রা "তীর্থযাত্রা।" কিন্তু ঐ কারণে আবার নিবেদিতার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য স্বীকার করা সম্ভব হল না। দুঃখ স্বীকার নিবেদিতা যে চিঠি লেখেন, তা "চিঠিপত্রের" ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে, তারিখ ১৬ জন, ১৮৯৯। কথা ভংগের জন্য পত্রে স্বভাবতই বিনীত সৌজন্যের সংগে ত্রুটি স্বীকার করা হয়েছে, এবং উক্ত নৌকাযাত্রা করতে না পারার জন্য নৈরাশ্য জানানো হয়েছে। এই চিঠির আগেকার চিঠিগুলিতে পাশ্চাত্য যাত্রার সম্ভাবনায় উল্লাস, এবং এখানে দুঃখ, এর মধ্যে সংগতি নেই মনে হলেও আসলে তা নয়। প্রথমত পাশ্চাত্য সৌজন্যের ভাষা অনেকটা এই ধরনেরই, দ্বিতীয়ত নিবেদিতা সত্যই রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সংগীত ও সংগের ভক্ত, অন্যপ্রাপ্তি যত বড়ই হোক, এই অপ্রাপ্তির দুঃখও কম আন্তরিক নয়।

পত্রটি :

প্রিয় মিঃ টেগোর,

মনে হয়, আপনি অনেক আগেই শুনেছেন, এই গ্রীষ্মে আমাকে ইংলণ্ড যেতেই হচ্ছে; সেজন্য আপনার নৌকা-আবাসে আতিথ্য গ্রহণের পরম আকর্ষণীয় আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারব না, যার জন্য এতদিন বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলুম। দু'একদিনের মধ্যে আপনার কাছে লিখতে যাচ্ছিলাম যে, স্বামীজী যাত্রা করার পরেই, যদি আপনি চান, আপনাদের ওখানে হাজির হব। তখন কি জানতাম, তা লেখার আগেই আমার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে!

ভারত থেকে যেতে হল বলে—যত অল্প দিনের জন্যই হোক—আমি সত্যই সুখী নই। পরিকল্পনা বদলের ফলে যে নানাপ্রকার নৈরাশ্য ঘটল, তার মধ্যে, সব ধরনের মনোহারী বিষয়ে আপনার সংগে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা থেকে বঞ্চিত হওয়া অন্যতম। তাছাড়া, ইতিমধ্যে এদেশে যে-সকল নূতন বন্ধুলাভের সৌভাগ্য পেয়েছি, তারও সংখ্যাবৃদ্ধি আমি চাই, এবং আপনি আমার বন্ধু ডাঃ বসুর এত প্রিয়—সুতরাং আপনি আমারও বন্ধু হবেন, এই আশা না করে পারি না।

কিন্তু মনে হয়, থাকার চেয়ে গেলেই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তা যদি সত্যই হয়, তাহলে আপনি নিশ্চয় আমার সংগে একমত হবেন যে, এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রশ্নটি গৌণ।

পুনরায় সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত বিদায়! ইতিমধ্যে আপনার স্বাস্থ্য ও সুখশান্তি যেন রক্ষিত হয়, তার জন্য প্রভূত শুভেচ্ছা জানাই। মিসেস টেগোরকে অনুগ্রহ করে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাবেন। ভালবাসা দেবেন আপনার চমৎকার শিশু সন্তানদের।

ইতি আপনার পরম বিশ্বস্ত,

নিবেদিতা

রবীন্দ্রনাথের নৌকাবাসে এই স্থগিত ভ্রমণ পরে সত্যই ঘটেছিল। পরবর্তীকালে নিবেদিতা শিলাইদহে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নানা কথাপ্রসংগে সে বিষয়ে বলেছেন। তেমনি একটি স্মৃতিকথার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :

"আমি যখন শিলাইদহে থাকতাম, তখন নিবেদিতা কখনো কখনো এসেছেন। এক-দিনের ঘটনা—পদ্মার চরের মধ্য হতে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়া হচ্ছে। চাষীরা ভোরের সময় লাঙ্গল কাঁধে মাঠে আসছে। গেরুয়া বসন পরিহিতা গৌরাংগী এক মেমসাহেবকে আমার সাথে দেখে তারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নিবেদিতার সহিত আর একটি মেয়ে ছিল, তাঁর সহচরী। কোথায় গেল সূর্যোদয় দেখা! নিবেদিতা দৌড়ে চাষীদের কাছে চলে গেলেন। বললেন, ভাই, তোমরা এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা বলল, আমরা মেমসাহেবকে দেখছি। তিনি বললেন, মেমসাহেবকে দেখবার কিছু নেই, চল, তোমাদের বাড়ি যাই, তোমাদেরই দেখব আমি। চাষীরা শশব্যস্তে তাঁকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—নিবেদিতা যেন আমাকে চিনতে পারেন না। আমার জমিদারীর যতগুলি গ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রাম তিনি গিয়েছেন এবং ঐ দরিদ্র নরনারীর সংগে প্রাণ মিলিয়ে, মন মিলিয়ে, তাদের সুখ দুঃখের সমভাগিনী হয়েছেন। তাদের সংগে চিঁড়ে কুটেছেন, ধান ভেনেছেন, তাদের নাড়ু মোয়া খেয়েছেন—তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের জন্য কত সাহায্য করেছেন।"৭

ক্রমশ

৭। এই অংশটি উদ্বোধন পত্রিকায় (কার্তিক ১৩১৯) শ্রীমতী লীলা সরকারের রচনার অংশ। গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী লেখাটি উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থে। সেখান থেকে আমি নিয়েছি। ঐ গ্রন্থে অনুরূপ আরও একটি উদ্ধৃতি আছে।

মহাস্থবির জাতক

(চতুর্থ পর্ব)

মীরসাহেব বললেন—এই জায়গায় গালিবের বাড়ি ছিল। গালিব সাহেবের নাম শুনেছেন তো?

বললাম—তাঁর নাম হিন্দুস্থানের কে না জানে? তিনি সুবিখ্যাত উর্দু কবি। ফারসি কবিতা তিনি অনেক লিখেছেন।

গালিব সাহেব মহম্মদ শা'র দরবার থেকে মাসোহারা পেতেন, কিন্তু তাতেও তাঁর খরচে কুলোত না। তাঁকে ঘিরে কত যে গল্প তৈরি হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই এবং সে-সব কাহিনী দিল্লীবাসীর মুখে মুখে এখনও ফিরছে। তাঁর লেখার মধ্য থেকেই জানা যায় যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত গরীব। তাঁর সম্বন্ধে গল্প শুনতে শুনতে যে লোকটির ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে তাকে ভালো না বেসে আর থাকা যায় না। এমন একটি লোক দিল্লীতে সারাজীবন বাস করলেন এবং এইখানেই মারা গেলেন, অথচ দিল্লী-বাসীরা তাঁর বাড়ির ঠিকানা রাখলে না—এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা সন্দেহ নেই।

দিন কয়েক রাস্তায় ঘোরাঘুরির পর মীরসাহেব একদিন বললেন—কাল আমরা ইন্দ্রপ্রস্থে যাব। সেই কুতুবমিনার থেকে আরম্ভ করব। তারপরে একটু একটু করে এগোনো যাবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঘোড়া অত দূরে এগোতে পারবে?

তিনি বললেন—দরকার হলে এ-ঘোড়া আপনাকে আগ্রায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে। আজকাল রোজ ওকে এক সের করে চানা দেওয়া হয়।

সে সময় দিল্লী শহরে এক পয়সা কি দেড় পয়সা দিলে এক সের ছোলা পাওয়া যেত। আমি বললুম—আরো কিছু বেশি দানা ওর জন্যে বরাদ্দ করুন।

মীরসাহেব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন—ওর চেয়ে বেশি ও হজম করতে পারবে না।

বাস্তবিকপক্ষে মীরসাহেব, তাঁর গাড়ি-ঘোড়া ও তার চালক—এই তিনের দুর্লভ সমাবেশকে আমার অদ্ভুত বলে মনে হত। ঘোড়া ইঙ্গিতে চলে, চালকের মুখ থেকে এত দিনেও 'হাঁ' কিংবা 'না' কিংবা অন্য কোনো কথা একটাও শুনতে পাইনি। আর মীরসাহেবের অনর্গল বক্তৃতার তো শেষই নেই!

যাই হোক—পরের দিন থেকে আমাদের পুরোতন দিল্লীর ধ্বংসস্তূপ পরিক্রমা আরম্ভ হল। সেই পুরোতন ইতিবৃত্ত মীরসাহেবের কথায় নতুন রূপে ধরতে লাগল। কয়েক দিন ঘুরে ঘুরে মীরসাহেব হুমায়ুনের সমাধিতে করলেন ভর। বেলা দুটো আড়াইটার সময় আমরা হুমায়ুনের সমাধিতে এসে বসতুম।

বেশ উঁচু প্রশস্ত চাতাল, তার উপরে সমাধি মন্দির। মন্দিরও বেশ প্রশস্ত। সেইখানে ঠাণ্ডায় বসে মীরসাহেবের কথা শুনতুম। শুনতে শুনতে দিল্লীর ঐ নিদারুণ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেও সান্ধ্য নেশা জমে উঠত।

একদিন মীরসাহেব সমাধি মন্দিরের কোণে একটা ঘর দেখিয়ে বললেন—এটা কি জানেন?

—আজ্ঞে না।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

॥ ৬ ॥

পরের দিন থেকে প্রতিদিনই আমরা বেরুতে লাগলুম। এই রকমভাবে ঐতিহাসিক নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমারও কেমন একটা নেশা চড়ে গেল। সমস্ত দিনটা যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে কেটে যেতে লাগল।

একদিন আমরা একটা নির্জন স্থানে এসে পৌঁছলুম। সেখানে বাড়ি-ঘর-দোর সব ভাঙা ভাঙা পড়ে রয়েছে। লোকজন আর সেখানে বাস করে না। স্থানটা বোধ হয় কেল্লার পেছন দিকে।

মীরসাহেব বলতে শুরু করলেন—দিল্লীর সেই দুর্দিনে দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শা আত্মরক্ষার জন্য সপরিবারে পালিয়ে এসে এই ঘরে লুকিয়ে বসেছিলেন। গুপ্তচরেরা গিয়ে ইংরেজদের খবর দিলে আর তক্ষুনি তারা সদলবলে এসে তাঁদের গ্রেফতার করে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে টেনে নিয়ে গেল।

বলতে বলতে মীরসাহেব ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন—একবার কল্পনা করুন সেই দৃশ্য। হুমায়ুন বাদশার আগে যিনিই ভারতের সিংহাসনে বসুন না কেন, সত্যি করে বলতে গেলে হুমায়ুন বাদশাই মোগল সাম্রাজ্য দেশে কায়েম করে গিয়েছিলেন। ঐ কোণে তাঁর বেগম হামিদাবানুর সমাধি রয়েছে—ঐ দেখুন! এঁদের সামনে দিয়ে এদেরই শেষ বংশধরদের ইংরেজ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলে গেল। দিল্লী তখন আগুনে ফুটছে। এক দিকে ইংরেজ সৈন্যদের অত্যাচার, অন্য দিকে সিপাহীদের গোলমাল। তার ওপরে দস্যু-তস্করেরা প্রকাশ্য দিবালোকে লোকের বাড়িতে ঢুকে লুঠ-তরাজ করছে। হডসন বলে একজন সেনানী এঁদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা জনতার চিৎকার শুনে সেইখানেই তৎক্ষণাৎ হাতীর পিঠ থেকে তিন রাজপুত্রকে টেনে রাস্তায় নামিয়ে দমাদ্দম গুলি করে মেরে ফেললো। রাজপুত্রেরা এই রাস্তার ওপরেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাত জোড় করে অনুনয় করেছিল আগে দয়া করে অনুসন্ধান করুন—আমরা নির্দোষ কিনা! কিন্তু সে-কথা কে শোনে!

বলতে বলতে মীরসাহেব দৌড়ে গিয়ে হুমায়ুনের সমাধির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিড়বিড় করে কি সব বলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে সমাধিতে মাথাও ঠুকতে লাগলেন।

মীরসাহেবকে যতই দেখতে লাগলুম, ততই অভিনব বলে মনে হতে লাগল।

নিত্য নতুন রূপ।

তাঁর সঙ্গ আমার শেষ পর্যন্ত নেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

একদিন হুমায়ুনের সমাধিতে আমরা বসে আছি, এমন সময় বৃষ্টি নামল।

বেশ লাগছিল।

চারদিকের সেই তপ্ত পাথরের মধ্যে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি আমার মনের মধ্যে কাব্য-সৃজন করছিল। মীরসাহেবের বগলে একটা করে দপ্তর থাকতই। সেদিন এই দপ্তর থেকে একটি চটি লম্বা মতন বই বার করে তিনি চেঁচিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। পড়তে পড়তে তাঁর কণ্ঠস্বরে অশ্রুর আমেজ এসে লাগল। তারপরে এল

একটু সুরে। তারপর তিনি দস্তুরমতো গান ধরলেন।

করুণ সে কবিতা। তার ধ্বনি-মাধুর্যেই ধরা যায় যে, সে কবিতার করুণার প্রস্রবণ ছুটেছে। মীরসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলুম—কার লেখা?

তিনি বললেন—এ কেতাবের নাম দেওয়ান-এ-জাফর-শা। সে কেতাব ভারতের শেষ বাদশা বাহাদুর শাহের লেখা।

এই বলে তিনি কবিতার খানিকটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গান ধরলেন।

গাইতে গাইতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

অশ্রু জিনিসটা অত্যন্ত সংক্রামক। তাঁর চোখে অশ্রু দেখে আমার চোখেও অশ্রু উদ্‌গত হল।

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি ঝরছে, আমরা দুটিতে সেই সমাধি মন্দিরের মধ্যে বসে আছি। মনের মধ্যে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে — 'দেওয়ান-এ-জাফর-শা'য়ের বয়েৎ— হায় জাফর, তামাম হিন্দুস্থানের সম্রাট ছিলে তুমি—কিন্তু আজ তোমার সমাধির জন্য সাড়ে তিন হাত জমিও জুটল না!

আজ অতীতের সেই দিনগুলি টুকরো টুকরো হয়ে মানসসাগরের উপরে ভেসে উঠছে দুর্দিনের দুঃস্বপ্নের মতো। মনে হচ্ছে, সেদিনের সেই অভিজ্ঞতাগুলো আমার জীবনে কোন কাজে লেগেছে!

মীরসাহেবের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি কি করে হল, সেই কথাটা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। আগেই বলেছি, মীর-সাহেবের সঙ্গ আমার একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঠিক দ্বিপ্রহর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি অনুভব করতুম সেই দূরের ধ্বংসস্তূপ যেন আমাকে আকর্ষণ করছে। মীরসাহেবের আসতে একটু দেরি হলে তাই আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতুম।

একদিন দ্বিপ্রহরে আমি ও মীরসাহেব শের-মণ্ডল পরিক্রমণ করছি। ছাতের ওপর উঠে চারদিক দেখে নামবার উপক্রম করছি, এমন সময়ে মীরসাহেব চিৎকার করে বললেন—এইখান দিয়ে নামতে গিয়ে হুমায়ুন বাদশা পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি আর সংজ্ঞা ফিরে পাননি। সেই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

সত্যি বলতে কি, সেই জায়গাটি এমন সঙ্গীণ যে, সাধারণ লোকেরও ওঠা-নামা করতে ভয় হয়। বাদশা তো কোন ছার! যাই হোক, আমরা তো নামছি,—মীর-সাহেব আগে আর আমি পেছনে। এমন সময় হঠাৎ মীরসাহেব একটা পা শূন্যে তুলে টাল খেয়ে নিচে পড়ে যাবার উপক্রম করলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে মুণ্ডুটা টেনে ধরে উপরে ছাতে তুলে আনলুম। তারপর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে, একরকম দৌড়ে রাস্তায় এসে গাড়িতে পড়লুম।

বেশ খানিকক্ষণ পরে মীরসাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে একরকম ধমকের সুরে বললেন—বেশ তো আপনি! আমি পড়ে গিয়ে দেখছিলুম, বাদশার মতো অজ্ঞান হয়ে পড়ি কিনা, আর আপনি কিনা আমায় ধরে সব নষ্ট করে দিলেন!

আমি আর এ-কথার কি জবাব দেব! আমার বুকের মধ্যে তখনও ধড়ফড় করছিল। গাড়ি ঘুরে অভ্যাস মতো হুমায়ুন বাদশার কবরের দিকে চলতে লাগল, কিন্তু আমি মীরসাহেবকে বললুম—আমার শরীর ভালো লাগছে না—বাড়ি ফিরে চলুন।

শরীর ভালো লাগছে না শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বলতে লাগলেন—নিশ্চয়ই আপনার সর্দিগর্মি হয়েছে।

মীরসাহেব গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন—বাড়ির দিকে চল।

এদিকে সর্দিগর্মি হয়েছে শুনে আমার তো বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি আরো বেড়ে গেল।

বাড়িতে পৌঁছিয়েই বিছানায় লেটিয়ে পড়লুম। মীরসাহেব কানের কাছে কি সব বকর বকর করতে লাগলেন—সেদিকে মন দিলুম না।

—কাল আবার যথাসময়ে আসব—এই বলে মীরসাহেব বাসায় চলে গেলেন।

শুয়ে শুয়ে কেবল মনে হতে লাগল—আজ হাতে দড়ি পড়েছিল আর কি! মনের মধ্যে কে যেন বলতে লাগল—'দিব্যি আছো যাদু, পরের বাড়িতে থাকছ, দু'বেলা পলান্ন পরম পরিতোষের সঙ্গে আহার করছ আর দ্বিপ্রহরে একটা পাগলার সঙ্গে নেচে নেচে দিন কাটাচ্ছ। বেশ চুটিয়ে চাকরি হচ্ছে!

এতদিন বৃথাই কাটিয়েছি বলে সত্যিই আফসোস হতে লাগল। সংকল্প করলুম, কালই এখান থেকে বুম্বা দিতে হবে।

পরের দিন সৈয়দ সাহেব আসামাত্র জানালুম—আজ এক্ষুনি আমি দিল্লী ত্যাগ করছি। আপনি যা উপকার করেছেন, তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

আমি চলে যাচ্ছি শুনে সৈয়দ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের দিক থেকে 'মেহ্‌মান-নেওয়াজী'র কোনো 'খিলাফ' হয়েছে, কি?

আমি বললুম—কিছুমাত্র না। কিন্তু আরো দশটা শহরে আমাকে যেতে হবে তো।

সৈয়দ সাহেব বললেন—আবার দিল্লিতে এলে আমার এখানে এসেই উঠবেন। এই ঘর সর্বদা আপনার জন্য খোলা থাকবে।

এখানে বলে রাখি, বছর দু'তিনেকের মধ্যেই একবার দিল্লিতে গিয়েছিলুম। কিন্তু "আফ্‌তাব" তখন অস্তমিত এবং সৈয়দ সাহেব যে কোথায় ডুব মেরেছেন তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

যাই হোক সৈয়দ সাহেবকে বলে তো তখুনি ইস্টিশনে চলে এলুম। আগে থাকতেই ঠিক হয়ে ছিল আমি পাঞ্জাবের দিকে খানিকটা অগ্রসর হয়ে আগে চলে আসব কিন্তু কেন জানি না আমার আর ওপরের দিকে উঠতে ইচ্ছে হল না। বেলা চারটের সময় জি আই পি-র গাড়িতে চড়ে আমি বোম্বাই-য়ের দিকে যাত্রা করলুম।

ভোর বেলা গাড়ি এসে থামল ঝাঁসী স্টেশনে। এর আগেও বার দুএক এই রাস্তায় আসা-যাওয়া করেছি। ঝাঁসী
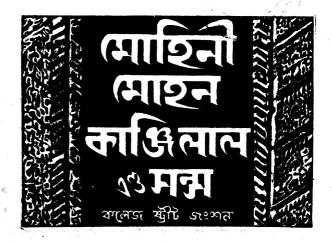
স্টেশন থেকে পাহাড়ের ওপরের ছোট দুর্গটি আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে। এবারে স্টেশনে গাড়ি থামা মাত্র বাক্স-বিছানা নিয়ে আমি নেমে পড়লুম। টাঙ্গা-ওয়ালা একটা সরাই খানায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছল।

সেই মামুলি সরাই! একটি ঘরে একটি দরজা।

যাই হোক জিনিসপত্তর রেখে, আমি আমার ব্যাগে ব্যবসার পক্ষে জরুরী জিনিস নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কয়েকদিন দিল্লিতে বৃথা কাটিয়ে মনের মধ্যে অনুশোচনা হচ্ছিল, তাই সকাল থেকেই কাজে লেগে গেলুম।

তখনও লোকজন ওঠেনি। আমি খুঁজে খুঁজে একটা চায়ের দোকান বার করে সেখানে চা-খাওয়ার নামে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে গ্রাহক পাকড়াবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে এ-বাড়ি সে-বাড়ি দরজা ঠেলে সেদিন বেলা বারোটার মধ্যে জন পাঁচেক লোককে গেঁথে ফেলা গেল। একদিনের পক্ষে অনেক কাজ হয়েছে মনে করে এক ময়রার দোকান থেকে বেশ করে

কচুরি-আলুরদম ঠেসে, সরাইয়ে ফিরে. টেনে একটি ঘুম দেওয়া গেল।

ঝাঁসীতে আশাতীতভাবে আমার কাজ হতে লাগল। দিল্লিতে যে ক'দিন বৃথাই কাটিয়ে ছিলুম, ঝাঁসীতে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তার চেয়ে বেশি কাজ পেয়ে গেলুম।

আগেই বলেছি বিকেলে কাজেই বেরুতাম না, কিন্তু একদিন কি খেয়াল হল বিকেল বেলাতেও আমার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু কাজ করতে মন লাগছিল না। তাই কেল্লায় পাহাড়েই উঠে পড়া গেল।

পাহাড় মানে পাথরের খানিকটা উঁচু ঢিপি। আমার জিনিসপত্র একটা কালো পাতলা কাঠের বাক্সের মধ্যে থাকত। সেইটে বয়ে নিয়ে বেড়ানো ছিল সুবিধাজনক। পাহাড়ে উঠে আমি কেল্লার এদিক ওদিক দেখছি এমন সময় একটা নোটিশের দিকে নজর পড়ল। তাতে লেখা রয়েছে—এই কেল্লার কোনো জায়গার ফোটো যদি কেউ নেয় তাহলে সে আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হবে।

ছোট্ট কেল্লা।

বাইরে থেকে দেখবার বিশেষ কিছু নেই।

আমি সেদিক থেকে সরে এসে সূর্যাস্ত চেয়ে দেখছি এমন সময় আমার পাশ থেকে একটি ভদ্রলোক ইংরেজিতে বললেন—এখানে ফোটো-নেওয়া বারণ।

আমি বললুম এটা ক্যামেরা নয়, এতে অন্য জিনিস আছে।

লোকটির বয়স বেশি নয়, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হবে, সুন্দর চেহারা। আমায় হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার বাড়ি কোথায় ?

আমি বললাম—কলকাতায়।

তিনি সবিস্ময়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—আমরা বহুকাল কলকাতায় বাস করেছি। বাঁশতলা গলিতে আমরা থাকতুম। আমি এন্ট্রান্স পাশ করবার পর আমার বাবা রিটায়ার করে আমার লেখাপড়ার জন্য আগ্রায় বাস করছিলেন। আগ্রা থেকেই আমি বি এল পাশ করি।

আমি বললাম, তাহলে তো আপনি বাংলা বলতে পারেন।

তিনি ইংরেজিতেই বললেন—আমি ভালো বলতে পারি না, কিন্তু আমার বোন, সে বাংলা ইস্কুলে পড়ত, সে আপনাদের মতোই বাংলা বলতে পারে।

কথাবার্তা এগোতে লাগল। কথাবার্তা শুনে মনে হল তিনি বেশ অমায়িক লোক। একবার কথা বলতে বলতে আমার কাঁধের কাছে তাঁর মুখটা এনে গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হচ্ছে। আপনাদের খাদ্য তো এখানে সহজে মেলে না।

আমি হেসে বললুম—তাই আপনাদের খাদ্য খেতে হচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন—এখানকার কাজ শেষ করে আপনি আমাদের ওখানে চলে আসুন, আমি কথা দিচ্ছি—সেখানেও আপনার অনেক কাজ হবে। তাছাড়া আমার বোন খুব ভালো মাংস রাঁধতে পারে। আপনাদের 'লোচি'-ও সে ভালো ক'রে তৈরি করতে পারে। তা আপনি মেহ্‌মান—আপনার জন্য এসব তৈরি হলে রোজ সন্ধ্যাবেলা আমারও কিছু জুটবে। কতদিন যে 'মাস' খাইনি।

বলতে বলতে ভদ্রলোক জিহ্বা ও তালুতে চটাং করে একটা আওয়াজ করলেন।

তাঁর বাড়ির সংবাদ নিলুম। এই শহর থেকে দূরে অন্য মহকুমার একটা শহরে তিনি বাস করেন। তিনি সেখানকার উকিল এবং কথাবার্তায় বুঝলুম পশারও ভালো আছে। ভদ্রলোক আমার নাম জেনে নিলেন এবং বললেন—আমার নাম দেওকীনন্দন ভার্গব।

কথা বলতে বলতে আমরা পাহাড়ের নিচে নেমে এলুম। তাঁকে টেনে একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গেলুম। চা খেতে খেতে আলাপ রীতিমত জমে গেল। তিনি বললেন—এই রবিবারেই আসুন। সেখানে কিছুদিন থেকে আমার না হয়ে আসবেন।

ভদ্রলোককে কথা দিলুম—নিশ্চয়ই যাব।

তিনি বললেন—চলুন, আপনার বাসা দেখে আসি। সরাইখানায় আমার বাসা দেখে তিনি অনুতাপ করে বললেন—ছি ছি, এ রকম বাসায় থাকলে আপনি অসুখে পড়ে যাবেন। মনে মনে হাসলুম।

সরাইয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন—আমিও সান্ধ্যকালীন আহার্যের ব্যবস্থায় মন দিলুম।

কচুরি আর রাবড়ি ! তবে তখনকার দিনে খাঁটি ঘি আর খাঁটি দুধের অভাব ছিল না। এখনকার মত সাপের চর্বি আর পচা গুঁড়ো দুধের কারবার যদি তখন থাকত তাহলে যেখানে সেখানে ঐ সব খাবার খেয়ে এই জাতক লিখতে বসবার সুযোগ ঘটত না।

কয়েকদিন যেতে না যেতে একদিন সকাল বেলায় দেখি দেওকীনন্দন এসে হাজির। উনি আমাকে একেবারে তুমি সম্বোধন করে বললেন—চল বন্ধু, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। কাল একটা কাজে এখানে এসেছিলুম—মনে করলুম রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে তোমায় নিয়ে যাব।

এই বলে সে আমার বিছানাপত্তর বাঁধতে আরম্ভ করে দিলে। তার এই আগ্রহ-ভরা আহ্বান উপেক্ষা করা সম্ভব হল না। বাইরেই টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল—সরাইওলাকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে সওয়ার হওয়া গেল।

ঝাঁসী থেকে ঘণ্টাদেড়েক ট্রেনযোগে গিয়ে সেখানে পৌছলুম। স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে তাঁদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে যখন পৌছলুম, তখন বেলা এগারটা বেজে গেছে। বাড়ির মধ্যে ঢুকে একটু গিয়েই দেওকীনন্দনের বাবার ঘর। সে আমায় নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে বললে—এইটি আমার অফিস।

ঘরখানি সাজানো-গোছানো। চকচকে আলমারীতে আইনের বইগুলি ঝকঝক করছে। মফঃস্বলের উকিলের ঘরে সাধারণত এ দৃশ্য দেখা যায় না। ঘরের খানিকটা জায়গা আলমারী সাজিয়ে পার্টিশন করা হয়েছে। ঘরের মধ্যে ঘর হলেও এ জায়গাটিতেও বেশ আলো-বাতাস, সেখানে একখানি তক্তাপোশ পাতা রয়েছে।

দেওকীনন্দন আমায় বললে—এইখানে থাকতে তোমার কোনো অসুবিধে হবে কি ? না হলে ওপরেও ঘর আছে—সেখানেও থাকবার ব্যবস্থা হতে পারে।

আমি বললুম—না, না—এতো চমৎকার জায়গা। আমি কি রকম ঘরে থাকতুম, দেখেছ তো।

সে নিজেই তক্তাপোশের ওপর আমার বিছানা পেতে পরিষ্কার ঝরিষ্কার করে দিলে। ভাঙ্গা টিনের বাক্সটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতর দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে—গোরি !

ভেতর থেকে ক্ষীণ নারীকণ্ঠের জবাব এল—আয়ি।

একটু পরেই হাত মুছতে মুছতে যিনি ঢুকলেন—কি ব'লে তাঁর বর্ণনা করব ঠিক বুঝতে পারছি না। "গোরী" তো তিনি বটেনই একেবারে যাকে বলে 'গোরোচনা গোরী।' সোনা রঙের মধ্যে লালের আভা, তার ওপরে দীর্ঘাঙ্গী। পরিপূর্ণ নিটোল যৌবন। কিন্তু পরিপূর্ণ নিটোল যৌবন বললেও তার সবখানি বলা হয় না। এমন সৌষ্ঠব ও সুষমাময়ী নারী এত কাছে এর আগে কখনো দেখিনি।

অঙ্গে তাঁর একখানি মোটা আধময়লা থান, বাড়িতে কেচে কেচে সেখানা প্রায় লাল হয়ে এসেছে। গায়ে সেই রকমই সাদা একটি জামা।

দেওকীনন্দন আমাকে সম্বোধন করে বললেন—এই আমার বোন—নাম সুভগা। আমরা গোরি বলে ডাকি।

বোনকে সম্বোধন করে সে বললে—বাবুজীকে ধরে এনেছি, ইনি এখন এখানে কয়েকদিন থাকবেন। এঁকে রোজ মাংস রেঁধে খাওয়াতে হবে।

মুখখানা আমার দিকে ফিরিয়ে স্মিত-

হেসে দু'খানি নিরাভরণ হাত তুলে আমাকে নমস্কার করে পরিষ্কার বাংলায় বললেন নমস্কার। আমার ভাই আপনার কথা আমায় বলেছেন। আপনার দেশে আমি জন্মেছি। বাঙালীদের ইস্কুলে অনেকদিন পড়েও ছিলুম।

আমি বললুম—আপনি তো বেশ পরিষ্কার বাংলা বলেন।

গোরি বললে—পরিষ্কার বাংলা বলতুম, কিন্তু এখন আদৎ ছুটে গেছে।

দেওকীনন্দন বললেন—বাবুজীকে যত্ন আত্তি করবার ভার তোমার ওপরে রইল। আমি তো সারাদিন কাজের চাপেই থাকি।

সুভগা আমায় জিজ্ঞাসা করলে—এ বেলা ভাত খাবেন না রুটি খাবেন? আমি তো একবেলা ভাত আর এক বেলা রুটি খেতুম।

বললুম—ভাতই খাব। অনেকদিন ভাত খাইনি।

সুভগা আবার জিজ্ঞাসা করলে—চা-টা খাবেন?

চায়ের কথা শুনে দেওকীনন্দন লাফিয়ে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—দু' কাপ চা-ই পাঠিয়ে দাও।

সুভগার চেহারার মধ্যে পুরুষকে আকর্ষণ করবার শক্তি ছিল প্রবল। এই শক্তি শুধু চেহারার 'খুব-সুরতির' উপর সব সময় নির্ভর করে না। এ এক অন্য বস্তু। অন্তত আমাকে তার সে চেহারা এমনভাবে আকর্ষণ করলে যা ইতিপূর্বে কোনো নারী করেনি।

তারপর চা এল, চা খেতে খেতে দেওকীনন্দন তার সংসারের কথা কিছু কিছু আমায় শোনালে। সুভগার বিয়ে হয়েছিল—তার স্বামী বিলেতে পড়তে গিয়েছিল এবং সেখানেই সে মারা যায়।

চা খাওয়া হল।

কিছুক্ষণের বিশ্রামের পর স্নান সেরে আহারাদি সারা হল, কিন্তু আমার মনের মধ্যে সারাক্ষণই সুভগার চিন্তা ও তার চেহারা ঘুরতে লাগল।

আহারাদির পর দেওকীনন্দন বললে—এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।

বিছানা পেতে শুয়ে পড়লুম। ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু ঘুম কোথায়। মন ঘুরতে লাগল সেই সুভগার আশে-পাশে। মাঝে মাঝে তার চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। বিকেলবেলা দেওকী-নন্দনের কাছে তার দু' একজন বন্ধু এল। আমি দেশটাকে দেখবার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বেরোবার সময় সে বলে দিলে—সন্ধ্যাবেলায় চা খাওয়ার আগে ফিরে এসো।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। থেকে থেকেই সুভগার চেহারা আমার মনের মধ্যে ঘুন্‌ঘুন্‌ করতে লাগল। যতই তার চিন্তা থেকে মনকে ছাড়িয়ে নিতে চাই—একটু পরেই দ্বিগুণ বেগে ততই আমার মন তারই চিন্তার দিকে ছুটে যায়। সে যেন আরব্য উপন্যাস-বর্ণিত সেই বিরাট চুম্বকের পাহাড় আর আমি সিন্ধবাদ নাবিকের জাহাজের পেরেকের মত ছুটে গিয়ে তারই অঙ্গে লেগেছি।

যাই হোক রাত্রিবেলা মাংস রুটি খেয়ে শুয়ে পড়া গেল। মনে হল সকালবেলা মন শান্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু পরদিন ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে তার চিন্তা শুরু হল। আমি আমার জিনিসপত্তর নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়লাম ভাবলুম কাজে ব্যাপৃত থাকলে মন হয়তো অন্যত্র সরে যাবে। কিন্তু কোথায় কি! দু' একটা খদ্দেরের সঙ্গে কথাবার্তাও হল। কিন্তু মনের আর এক দিকে তার চিন্তা পাক খেতে লাগল। মনে মনে ভাবলুম—এই কি ভালবাসা—এই কি প্রেম?

প্রেম একদিন এসেছিল আমার জীবনে কৈশোরের প্রারম্ভে অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে। প্রকৃতির সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপচে সে তার সমারোহ এনে ঢেলে দিয়েছিল আমার জীবনে। অস্বাভাবিক হলেও সে তার মর্ম-নিঙড়ানো মধুপাত্র এনে ধরেছিল আমার মুখের কাছে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণেই তাকে আবার ফিরে যেতে হয়েছিল আমার জীবনযজ্ঞকে পণ্ড করে দিয়ে। এই কারণেই নারী এবং নারীর সঙ্গকে আমি সর্বদাই এড়িয়ে চলতুম। কিন্তু সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করেই মন আমার অনিবার্যরূপে সুভগার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ক্রমেই গোরিকে কাছে পাবার, তার সঙ্গে কথা কইবার—মোট কথা, তার সঙ্গ লাভ করবার প্রবল ইচ্ছা মনের মধ্যে তাড়া দিতে লাগল। সকালবেলা কাজকর্ম সেরে যখন বাড়ি ফিরতুম, তখন দেওকীনন্দন বাড়ি থাকত না। আমি বাড়ির ভেতর ঢুকে গুরগুরু করে এটা ওটা সেটা—নানান কথা গোরিকে জিজ্ঞাসা করতুম। সে নিশ্চয়ই আমার মতলব বুঝতে পেরেছিল এবং মেয়েদের চারিদিকে যে রক্ষাকবচের আবরণী তাদের সমস্ত বিপদ থেকে আড়াল করে রাখে, তা ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়ছিল, অর্থাৎ আমাকে সে প্রশ্রয়ই দিচ্ছিল।

একদিন নিচে তাকে দেখতে না পেয়ে ঝিকে জিজ্ঞাসা করলুম—সে কোথায় আছে?

ঝি খানিকক্ষণ বাদে আমায় এসে বললে—আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

আর বেশি কথা বলতে হল না, তড়াক করে তিন লাফে দোতলায় উঠে গেলাম।

উঠে দেখি গোরি একটা তক্তাপোশে পা ছড়িয়ে বসে কি যেন সেলাই করছে।

চেয়ার-টেবিল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো ঘর।

সে বললে—এটি আমার ঘর আর ঐ পাশে আমার বড় ভাইয়ের ঘর।

সেদিন বিশেষ কিছু কথা হল না।

কিন্তু দিনের পর দিন ক্রমেই আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হতে লাগলুম।

ঝাঁসী থেকে হঠাৎ চলে আসার দরুন কতকগুলো জরুরী কাজ ফেলে আসতে হয়েছিল। সেখান থেকে তাগাদা আসায় ইতিমধ্যে আমাকে একবার ঝাঁসীতে ফিরে যেতে হল।

দেওকীনন্দন তো কিছুতেই ছাড়বে না, কারণ, এখানেও অর্ডার বেশ ভালোই পাওয়া যাচ্ছিল। শেষকালে—পাঁচ ছ'দিনের মধ্যে ফিরে আসব—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে ঝাঁসীতে ফিরে যেতে হল। কিন্তু গোরির প্রবল আকর্ষণে সেখানে টেঁকাও আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল।

দিন দু'এক কোনো রকমে কাটিয়ে আবার ফিরে গেলুম।

একদিন দুপুরবেলা গোরিকে ইংগিতে জানিয়ে দিলুম যে, আমি কিছু কিছু হাত দেখতে পারি। কথাটা শোনামাত্র সে তার কনকচম্পকবর্ণ দক্ষিণ হস্তটি আমার সামনে প্রসারিত করে বললে—এটা দেখো তো!

আমি দু' হাতে তার হাতখানা একরকম জড়িয়েই ধরলুম।

সেই স্পর্শের অনুভূতি বর্ণনা করা আজ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

গোরির জীবন-বৃত্তান্ত প্রায় সমস্তই আমি দেওকীনন্দনের কাছে শুনেছিলুম। তারই এক-একটি টিপে টিপে ছাড়তে লাগলুম। আর সে-ও অবাক হবার ভাণ করতে লাগল।

কিন্তু এসব "এহ বাহ্য" কথার পর আসল কথাটি ছাড়লুম সবার শেষে। বললুম—কোনো লোক তোমাকে ভালবাসে এবং সে তোমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

কথাটা শুনে সে মৃদুভাবে একবার হাতটা নিজের দিকে টেনেই আত্মসমর্পণ করলে। তারপরে তার বাঁ-হাতখানাও নিজের হাতে নিয়ে দেখতে লাগলুম এবং কে যে তাকে ভালোবাসে—কিছুক্ষণ বাদেই তা প্রকাশ করে ফেললুম।

গোরি মোটেই আশ্চর্য হল না, কারণ, সে আমার হাল-চাল দেখে আগে থাকতেই সব অনুমান করে নিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য হলুম আমি যখন শুনলুম—সে-ও আমার প্রতি বিরূপ নয়। গোরি বলতে লাগল—আমি অতি হতভাগিনী, বিয়ের পরই বিধবা হয়েছি। বাপ-মা নিরন্তর মনে করতেন, বাড়িতে কালসাপ পোষা হয়েছে। আজ তাঁরা চলে গিয়েছেন কিন্তু নতুন করে আবার আজ তোমার দুঃখের কারণ হলুম।

আমি বললুম—দুঃখের কারণ কেন? তুমি আমার জীবনে অতি সুখের কারণ।

সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—কি করে? আমাদের মিলন কি করে সম্ভব হতে পারে?

আমি বললুম—তুমি আমার সংগে কলকাতায় যাবে, সেখানে আমি তোমায় বিয়ে করব। তারপর আমাদের সংসার একরকম চলেই যাবে।

—আবার বিয়ে! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!—এই বলে সে আমার কাছ থেকে এমনভাবে একটু দূরে সরে গেল যে, আমি একেবারে দমে গেলুম। তার দুই চোখ দু'ফলা ছুরির মত ঝকঝকিয়ে উঠল।

কয়েক দিন গোরি আর আমার সামনে এল না। খাবার দাবার সে দিত বটে, কিন্তু মুখের দিকে চাইত না। আমি মনে মনে তাতে শেলাঘাত অনুভব করলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলুম না।

এদিকে দেওকীনন্দন আমার সংগে যেন আরো হৃদ্য-ব্যবহার করতে লাগল। আমার বিমর্ষ মুখ দেখে সে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে, এ-বাড়িতে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না! তার সরল মনের আন্তরিকতা ও ব্যগ্রতা দেখে আমার মনে লজ্জা এলো—এ আমি করছি কি! যে বন্ধু তার পরিবারের মধ্যে অবাধে মেলামেশার সুযোগ দিলে, প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করলে, আমি তার কি প্রতিদান দিতে উদ্যত হয়েছি! মনে করলুম—আর এখানে থাকা নয়।

পরদিন দেওকীনন্দনকে বললুম—এবার ভাবছি পুনায় যাব। সেখানেও কিছু অর্ডার হয়তো পেতে পারি। এখানে তো অনেকটা কাজই হল। কিন্তু আমাকে দশটা শহর ঘুরতে হবে তো!

দেওকীনন্দন জিজ্ঞাস করলে যে, আমি আবার ফিরে আসছি কি না। কিন্তু আমি বললুম—অনেক দিন দেশছাড়া আছি, ইচ্ছে আছে একবার কলকাতা ঘুরে আসব।

দেওকীনন্দন আর কিছু বললে না। আমি জিনিসপত্তর গোছগাছ করছি, দেওকীনন্দন তার কাজে বেরিয়ে গেছে। এমন সময় ছায়ামূর্তির মত ধীর পদ-সঞ্চারে গোরি আমার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখলুম তার চোখ দু'টি ছলছলে। ধীরে ধীরে সে বললে—আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলে—নিয়ে যাবে?

আমার সামনে সারা দুনিয়া তার কথা শুনে চক্কর খেতে শুরু করলে। জীবনে যত সুন্দর মুখ স্মৃতিপটে আঁকা ছিল, সব যেন গোরির রূপ ধরে বলতে শুরু করলে—আমায় নিয়ে যাবে? আমায় নিয়ে যাবে?

আমার সারা অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল—না—না। মুখে কিছু বললুম না—মাথা নামিয়ে বিছানা বাঁধতে লাগলুম। একটু পরে গোরি ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। তার সংগে আর আমার দেখা হয়নি।

(ক্রমশ)

যৌবনের কমনীয়তা...কোমল লাবণ্য

চব্বিশ পরগণার মন্দির

মহেশপুর

অসীম মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার দেবদেউল নিয়ে আলোচনা ইতিমধ্যে বহুবার হয়েছে, বিশেষ করে বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার মন্দিরের উপর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় চব্বিশ পরগনার মন্দিরগুলি আজও তেমন করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। এ কথা মানি যে, বাঁকুড়া ও বীরভূমের মন্দিরগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অভিনবত্বে নিঃসন্দেহে প্রশংসা ও আলোচনার দাবি রাখে। তবুও বলব যে, চব্বিশ পরগনার বিভিন্নাংশে, বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলে, এমন কয়েকটি মন্দির জরাজীর্ণ অবস্থায় টিঁকে রয়েছে যে, যদি প্রকৃতির রুদ্ররোষে না পড়তে হত, তা হলে তারা একটা আঞ্চলিক সংস্কৃতির মৌল উপাদান হিসাবে অন্যান্য অঞ্চলের মন্দিরগুলির সমকক্ষতা অর্জন করতে পারত।

চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাংশে (সুন্দরবন সহ) আজও কয়েকটি বাংলা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় যাদের টেরাকোটা অলংকরণ প্রথম শ্রেণীর এবং প্রতিটি প্যানেল-এর বিষয়বস্তু এত প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত যে, কয়েক শতকের ব্যবধানেও তা আমাদের শিল্পী-সত্তাকে অভিভূত করে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ অঞ্চলে মানুষের কোন কীর্তিকেই স্থায়িত্ব দেয়নি। জঙ্গল হাসিল করে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে আর প্রকৃতি হেসেছে আড়াল থেকে। সাইক্লোন এবং ম্যালেরিয়ার বলি হয়েছে অগণিত মানুষ আর গৃহপালিত পশু, গ্রাম হয়েছে জনশূন্য।

ওমালির চব্বিশ পরগনার গেজেটিয়ারে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রমাণ পাওয়া যাবে। গোবিন্দপুরে (বিষ্ণুপুর থানা, ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা) গ্রামের জনৈক বন্ধু আমাকে বলেছেন যে তাঁদের গ্রামের আটচালা বাংলা মন্দিরটির বর্তমান জরাজীর্ণ দশার জন্য দায়ী এই অঞ্চলের ভিজে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ১৮৬৪ সালের সাইক্লোন চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাঞ্চলের সমূহ ক্ষতি করেছিল। যে সমস্ত পুরাকীর্তি এতদিন পর্যন্ত প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়ে আসছিল এই দুর্যোগ তারা আর এড়াতে পারল না। বর্তমান ডায়মণ্ড হারবার ও তার আশেপাশের অঞ্চলের কি অবস্থা হয়েছিল, তার খানিকটা আন্দাজ করা যাবে ওমালির গেজেটিয়ার থেকে। সাগরদ্বীপের ষাট হাজার অধিবাসীর মধ্যে মাত্র পনেরো শ' বেঁচেছিল। ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল যথেষ্ট।

এরই ঠিক তিন বছর পরে ১৮৬৭ সালের ১লা নভেম্বর আর একটি বড় সাইক্লোন বয়ে যায় বারুইপুর, ক্যানিং, ডায়মণ্ড হারবার ও বসিরহাট অঞ্চলের উপর দিয়ে। সর্বাপেক্ষা

মন্দিরের পূর্বদিকের বারান্দার ২নং কাষ্ঠ স্তম্ভ : কৃষ্ণকে স্তন্যদানরত যশোদা
ফটো : অমল সেনগুপ্ত

২নং স্তম্ভে অপর একটি খোদিত মূর্তি : নারদ
ফটো : অমল সেনগুপ্ত

উত্তর দিকের বারান্দার ৪নং স্তম্ভে কাষ্ঠ খোদিত মূর্তি : কৃষ্ণ শাসন
ফটো : কালিদাস দত্ত

বেশী ক্ষতি হয় ক্যানিং এলাকার।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও একটি দুটি প্রাচীন কীর্তি আজও দাঁড়িয়ে আছে এই অঞ্চলে—যেমন জটার দেউল; মনোবিবির গোর, কিন্তু এদের ব্যতিক্রম বলেই ধরা উচিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে মন্দিরের সংখ্যাল্পতার কারণস্বরূপে আমি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মাত্রাতিরিক্ত দায়ী করছি এমন কথা যেন কেউ ভাববেন না। আমার যুক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্য অপেক্ষাকৃত ভিন্ন একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে রাখছি। এ পর্যন্ত বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলের মন্দিরগুলির টেরাকোটা অলংকরণ নিয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু যে শিল্পীরা এমন অভিনব সজ্জায় মন্দিরগুলিকে সাজাতেন, আজ পর্যন্ত তাঁদের সম্বন্ধে এক প্রকার কোন আলোচনাই হয়নি। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও বেশ কয়েক ঘর সূত্রধরের বাস ছিল এবং এই সূত্রধরদের পূর্বপুরুষরাই যে একসময় টেরাকোটা আর্ট-এ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার প্রমাণও পাওয়া যায়। ১২৯২ সালে গোটা বাঁকুড়া জেলা জুড়ে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলা ছাড়া আর কেউ রক্ষা পাননি। গ্রামের বহু সূত্রধর চিত্রশিল্পীও এই সময় মারা যান। বাংলার এই সূত্রধর শিল্পীরা শুধু যে মন্দির গড়তেন তা নয়, পাথরে মাটিতে কাঠে আর পটে প্রাণ প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সমান দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে, বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে, ভ্রমণ করার সময় বসতিহীন অঞ্চলেও ঘন অরণ্যের মধ্যে অবহেলিত, জরাজীর্ণ বেশ কয়েকটি মন্দির আমি দেখেছি, উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলির আলোকচিত্র ও নির্মাণেতিহাস সংগ্রহ করে চলেছি, যাতে প্রকৃতির কাছে হার মানলেও ছাপার হরফের মাধ্যমে তাদের আত্মিক অমরত্ব লাভ হয়। আজকে বলছি মহেশপুর গ্রামের (মন্দিরবাজার থানা, ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা) বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের কথা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক অতি পুরাতন গ্রাম এই মহেশপুর। গ্রামের আদি বাসিন্দা হালদাররা পোদ শ্রেণীর চাষী। ঠিক কোন সময়ে তাঁরা এই গ্রামে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁদের আদিপুরুষ কে তা জানা যায়নি। তবে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে এঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং তাঁরা গ্রাম্য সমাজের উচ্চকোটির স্বীকৃতি লাভ করেন। মনে হয়, হালদারদের এই সমৃদ্ধির সময়েই মহেশপুর গ্রামে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরটি নির্মিত হয়। কিন্তু এই মন্দির-নির্মাতা কে এবং কার সময় থেকে মহেশপুরের পোদদের অবস্থার উন্নতি হয়, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না, তবে অন্যভাবে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। মহেশপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে মন্দির-বাজারে যে বৃহৎ বাংলা মন্দিরটি আছে, তার শিল্পী বাসুদেবই মহেশপুরের মন্দিরটি তৈরি করেন। মন্দির-বাজারের এই কেশবেশ্বর মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৭০ শক অর্থাৎ ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। সংগৃহীত তথ্য থেকে আরও জানতে পেরেছি যে, কেশবেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করার আগে শিল্পী বাসুদেব কাজ করেছিলেন মহেশপুর গ্রামে এবং তাঁর সমসাময়িক গ্রামপ্রধান ছিলেন বাসুদেব হালদার। তা হলে সম্পূর্ণ সত্য না হলেও অংশত সত্য হিসাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, বাসুদেব হালদার বা তাঁর পিতার জীবিতকালেই মহেশপুরের পোদদের আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ ঘটেছিল এবং ঐ সময়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল, অর্থাৎ ১৭১৭ থেকে ১৭৪৮ সালের মধ্যে।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মূল মন্দির এবং বাসুদেব হালদারের বাসগৃহ, কোনটাই আজ আর দাঁড়িয়ে নেই; প্রাচীন মন্দিরের আকৃতি কি ছিল তাও বোঝার উপায় নেই; কিন্তু টিকে থাকলে এই মন্দিরটি যে স্থাপত্য ও

মন্দিরের অভ্যন্তরে পাথরে তৈরি বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ ফটো : অমল সেনগুপ্ত

ভাস্কর্যের বৈচিত্র্যে এবং অভিনবত্বে আজ বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে আসন লাভ করত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এগারটি কাষ্ঠ-স্তম্ভ খুঁজে পাওয়া গেছে কয়েক বছর আগে। বর্তমানে ইট ও টালির তৈরী একটি নেহাত আধুনিক মন্দিরের বারান্দায় এই স্তম্ভগুলি প্রোথিত অবস্থায় আছে বারান্দার ছাতের ভার বহন করার জন্য। এই কাষ্ঠ-স্তম্ভগুলির গায়ে শিল্পী বাসুদেব ও তাঁর সহকর্মীরা কাঠ খোদাই-এর যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল দেখিয়েছেন, তা আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শিল্পী বাসুদেব কাঠ খোদাই ছাড়াও পোড়া মাটির অলংকরণে এবং পাথর কুঁদে মূর্তি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মন্দির-বাজারের কেশবেশ্বর মন্দিরটির সম্মুখভাগ একসময় অসংখ্য টেরাকোটা প্যানেলে সুসজ্জিত ছিল, বর্তমানেও মন্দিরটির গায়ে কয়েকটি প্যানেল আছে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসাও অযৌক্তিক হবে না যে, বাসুদেব বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরটিও নিশ্চয় অনুরূপভাবে টেরাকোটা প্যানেল দিয়ে সাজিয়েছিলেন।

বর্তমানে যে মন্দিরটির বারান্দায় এই স্তম্ভগুলি প্রোথিত রয়েছে সেটি একটি ছোট কোঠাঘর, ওপরে টালির ছাদ, ভিতের দৈর্ঘ্য তেইশ ফিট আড়াই ইঞ্চি, প্রস্থ সাড়ে বার ফিট, ভিতের উচ্চতা অতি সামান্য মাত্র—এক ফুট আট ইঞ্চি। মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্য চোদ্দ ফিট পাঁচ ইঞ্চি, প্রস্থ আট ফিট এবং ভিত্তি সহ উচ্চতা এগার ফিট। মন্দিরটির প্রবেশপথ উত্তর দিকে, প্রবেশপথটিও নেহাত ছোট। উচ্চতায় চার ফিট চার ইঞ্চি, প্রস্থ দুই ফিট পাঁচ ইঞ্চি। প্রবেশপথের উপরে কাষ্ঠনির্মিত পত্রাকৃতি খিলান। খিলানের দুই পাশে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কাজ দেখলাম না।

কাষ্ঠ-স্তম্ভগুলির সঠিক দৈর্ঘ্য কত ছিল, তা আজ বলা কঠিন। এক নজরে দেখলেই বোঝা যায়, জলো আবহাওয়া ও কীটের আক্রমণে স্তম্ভগাত্রের বহু অংশেই সূক্ষ্ম কাজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। স্তম্ভগুলির বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় সাত ফিট। কিছুদিন আগে যখন এই স্তম্ভগুলি নতুন মন্দিরের বারান্দায় স্থাপন করা হয়, তখন স্থানীয় ছুতাররা উপরের ও নীচের কিছু কিছু জীর্ণ অংশ কেটে বাদ দিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, স্তম্ভগাত্রের যেখানে সেখানে র‍্যাঁদা চালিয়ে কীটদষ্ট অনেক অংশ বাদ দিয়ে দেয়, ফলে দু-একটি স্তম্ভের গায়ে বর্তমানে কোন কাজ নেই বললেই চলে। কয়েকটি স্তম্ভের গায়ে লতা পাতা ফুল ইত্যাদির বহু বিচিত্র নকশা, জীবজন্তু ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বিভিন্ন মোটিফগুলির মধ্যে যখন আমাদের দৃষ্টি ইতস্ততঃ বিচরণ করবে, ঠিক সেই সময়েই দুই তিন ইঞ্চি তফাতে ছুতারের এলোপাথাড়ি র‍্যাঁদা চালানোর দাগ নেহাতই বিরক্তিকর ও ক্লেশদায়ক।

কাষ্ঠস্তম্ভগুলি মূল মন্দিরের কোন অংশে ছিল, তা গ্রামবাসীরা সঠিক বলতে না পারলেও আমার মনে হয়, মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিতরে বিগ্রহ বৃন্দাবনচন্দ্রের জন্য হয়ত একটি সুবৃহৎ সিংহাসন স্থাপিত ছিল। এই সিংহাসনের আকার ছিল গোল এবং সিংহাসনের ছাদটির ভার বহন করার জন্যই নিশ্চয় এই স্তম্ভগুলি সিংহাসনের চার-পাশে বৃত্তাকারে প্রোথিত ছিল। গর্ভগৃহে বিগ্রহের জন্য এই ধরনের সিংহাসন স্থাপন করার নজির বাংলা দেশের এবং ভারতের অনেক স্থানের মন্দিরে পাওয়া যায়।

বর্তমান মন্দিরটির বারান্দার তিন দিকে (পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম) এই স্তম্ভগুলি প্রোথিত আছে। পূর্ব দিকে তিনটি, উত্তর দিকে চারটি এবং পশ্চিম দিকে তিনটি। আর একটি স্তম্ভ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে মন্দিরেরই ভিতরে। স্তম্ভগুলির আকৃতি হুবহু একরকমের নয়। তবে প্রায় প্রত্যেকটিই পাদদেশে চতুষ্কোণাকৃতি, একটু উপরে দুইটি চতুষ্কোণ ধাপ কাটা, এর উপর থেকে খানিকটা অংশ ধীরে ধীরে বেলনাকৃতি হয়ে গেছে, তারপর আবার খানিকটা অংশ চতুষ্কোণাকৃতি, পরবর্তী অংশ মোচাকৃতি। প্রতিটি স্তম্ভই একসময় অপূর্ব কারুকার্যখচিত ছিল, যদিও কয়েকটির একেবারেই জরাজীর্ণ দশা উপস্থিত হয়েছে। দুটি স্তম্ভ

সোলার কাজে ব্যস্ত একটি চাষী পরিবার
ফটো : অমল সেনগুপ্ত

সোনার ঘোড়া ফটো : অমল সেনগুপ্ত

বর্তমানে আশীটি প্যানেল আছে এবং প্যানেলগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক বিষয়ক মোটিফ স্থান পেয়েছে। কয়েকটি স্তম্ভের অঙ্গসজ্জার বিস্তৃত বর্ণনা দিচ্ছি।

পূর্ব দিকের বারান্দায় বাঁ দিক থেকে এক নম্বর স্তম্ভটির পাদদেশে চারদিকে চারটি প্যানেল আছে। প্যানেলগুলির সঠিক মাপ নেওয়া সম্ভব নয়, কেননা প্রতিটি স্তম্ভই খানিকটা প্রোথিত অবস্থায় আছে; ফলে প্যানেলগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় সমান সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হলেও বর্তমান মাপ মোটামুটি এই—দৈর্ঘ্য সাড়ে সাত এবং প্রস্থ আট। রামলীলা বিষয়ক মোটিফ এই প্যানেলগুলিতে স্থান পেয়েছে। স্তম্ভটির প্রায় মাঝামাঝি অংশ থেকে চারদিকে চারটি শিকল ঝুলছে, শিকলগুলির শেষ প্রান্তে একটি করে ঘণ্টা বাঁধা রয়েছে; শিকল-গুলির উপর দিকে স্তম্ভটিকে বেষ্টন করে চারপাশে অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের চারটি প্যানেল আছে। এই প্যানেলগুলির দৈর্ঘ্য গড়ে ছয় ইঞ্চি এবং প্রস্থ গড়ে চার ইঞ্চি। প্রথমটিতে একটি নারীমূর্তি রয়েছে, সম্ভবত ইনি রাধা; কেননা, বাকী তিনটি প্যানেলে কৃষ্ণ, বলরাম ও হনুমান রয়েছে। তখনকার সূত্রধর শিল্পীদের রীতিই ছিল যে, মন্দিরের গায়ে বা স্তম্ভের গায়ে ঠিক যেখানে দেবমূর্তি খোদাই করবেন সেখানে কোন লঘু বিষয়বস্তু স্থান পাবে না। প্রথাগত ভাস্কর্যের রীতি অনুসরণ করে তাই বলা যেতে পারে যে, মূর্তিটি রাধারই, অপর কোন নারীর নয়। বাঁ পায়ে ভর দিয়ে অলস ভঙ্গীতে পিছনের দিকে ঈষৎ হেলে রাধা দাঁড়িয়ে আছেন, ডান পা মোড়া অবস্থায় বাঁ পায়ের উরুর উপর রাখা, বাঁ পায়ের কাছে একটি কলস, হাত দুটি ভাঁজ করা অবস্থায় মাথার দিকে রয়েছে এবং ঠিক এই-খানেই মূর্তিটির সমস্ত সৌন্দর্য যেন একত্রিত হয়েছে। মনে হয় যে, এইমাত্র এসে রাধা এই অপূর্ব ভঙ্গিমায় দাঁড়ালেন। প্রতিটি প্যানেলের চার পাশে জ্যামিতিক নক্‌শার দেড় ইঞ্চি চওড়া বর্ডার রয়েছে। প্রতিটি স্তম্ভেই অবশ্য উপর দিকের প্যানেলগুলির অঙ্গসজ্জা হিসাবে এই ধরনের নক্‌শাযুক্ত বর্ডার দেখা যায়। প্যানেল-গুলির উপর দিকে স্তম্ভটিকে বেষ্টন করে চারপাশে দুটি করে আটটি লতাকৃতি হংস দেখা যায়, এক নজরে হাঁস বলে বোঝাই কঠিন। এই হাঁসগুলির পিঠে চার কোণে চারটি দণ্ডায়মান মনুষ্যমূর্তি, উচ্চতায় প্রতিটি চার ইঞ্চি; এগুলি কোন প্যানেলে আবদ্ধ নয়। হংসলতা দুটির মাঝখানে পত্রপুষ্পশোভিত অতি ক্ষুদ্র একটি বৃক্ষ-শাখা উল্টো করে বসান। ফুলটির দু পাশে দুটি ছোট ছোট পাখী বসে ফুলের মধু পান করছে। স্তম্ভের এই অংশটির কাজ এত সূক্ষ্ম ও বর্তমানে ঘুণের উৎপাতে এত অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ভাল করে না দেখলে বোঝা দুঃসাধ্য। স্তম্ভটির পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে একেবারে শীর্ষ পর্যন্ত লতাপাতা ও ফুলের সমারোহ ছিল—অন্যান্য স্তম্ভগুলির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

পূর্ব দিকের বারান্দায় বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় যে স্তম্ভটি আছে, সেটিও দর্শনীয়। এই স্তম্ভটিতে বর্তমানে মোট পনেরটি প্যানেল আছে। স্তম্ভের পাদদেশে চার দিকে চারটি প্যানেল আছে। এদের গড় মাপ দৈর্ঘ্যে নয় ইঞ্চি এবং প্রস্থে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। একটিতে রাম ও হনুমান, একটিতে চতুর্ভুজ নারায়ণ, একটিতে সম্ভবত লক্ষ্মী এবং আর একটিতে শিবলিঙ্গ পূজারত রাম ও লক্ষ্মণ। খানিকটা উপরে স্তম্ভটিকে বেষ্টন করে চারপাশে ছোট-বড় আটটি প্যানেলে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মোটিফ খোদাই করা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শিশু-কৃষ্ণকে নিয়ে দণ্ডায়মান যশোদার প্যানেল দুটি অতি চমৎকার। স্তম্ভটির প্রায় মাঝামাঝি অংশে চার কোণে দুটি করে আটটি সিংহ। এদের মুখ থেকে শিকল ঝুলছে। শিকলের গায়ে ঘণ্টা বাঁধা। এই সিংহ-মূর্তিগুলির ঠিক উপরেই চারপাশে চারটি ছোট প্যানেল ছিল। বর্তমানে একটি নেই। বোধ হয় কোন ধারাল যন্ত্রের সাহায্যে চেঁচে তুলে নেওয়া হয়েছে। বাকী তিনটির গড় মাপ হল দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এবং প্রস্থে তিন ইঞ্চি। একটি প্যানেল দেবর্ষি নারদ তারযন্ত্র বাজিয়ে গান করছেন। ডান পা ভাঁজ করে মাটিতে রেখেছেন, তার উপর তারযন্ত্রটি স্থাপিত। তারযন্ত্রের উপরের অংশ বাঁ কাঁধের উপর হেলান—বাঁ হাতে তারযন্ত্র বাজাচ্ছেন দেবর্ষি; শ্মশ্রুগুম্ফ-পরিবেষ্টিত মুখের এক পাশ দেখা যাচ্ছে, চক্ষু নিমীলিত, মাথার জটা চূড়ার আকারে বাঁধা, ডান হাতটি ভগ্ন। বেশ গভীরভাবে খোদাই করা হয়েছে এই মূর্তিটি। নারদের ডান পাশের প্যানেলটি আরও সুন্দর। যশোদা উপবিষ্ট অবস্থায় শিশু-কৃষ্ণকে স্তন্যদান করছেন। আশিটি স্থায়ী প্যানেলের মধ্যে বোধ হয় এটিই সবচাইতে জীবন্ত। নীরস কাঠের

গায়ে অমর শিল্পী যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আজ বহু বছর পরেও তার স্পন্দন পেলাম এই প্যানেলটির দিকে তাকিয়ে। নারদের বাঁ পাশের প্যানেলটিতে হনুমানের মূর্তি। প্রতিটি প্যানেলের চার পাশেই জ্যামিতিক নকশার বর্ডার রয়েছে।

উত্তর দিকের বারান্দায় বাঁ দিক থেকে চার নম্বর স্তম্ভটিও অতি সুন্দর। এই স্তম্ভটির পাদদেশে চারপাশে চারটি প্যানেল, দৈর্ঘ্য সাড়ে আট থেকে সাড়ে নয় ইঞ্চি ও প্রস্থে সওয়া আট ইঞ্চি। একটি প্যানেলে নারায়ণ ও তাঁর দুই পাশে দণ্ডায়মান লক্ষ্মী ও সরস্বতী, আর তিনটি প্যানেলের বিষয়বস্তু বর্তমানে বোঝা কঠিন। স্তম্ভটির প্রায় মাঝামাঝি অংশ থেকে শিকল ঝুলেছে, শিকলগুলির শেষে একটি করে ঘণ্টা বাঁধা। শিকলগুলির উপরে স্তম্ভটিকে বেষ্টন করে চারপাশে চারটি প্যানেল আছে। এই প্যানেলগুলির মাপ—দৈর্ঘ্যে সাড়ে ছয় ইঞ্চি, প্রস্থে চার থেকে সাড়ে চার ইঞ্চি। একটি প্যানেলে যশোদা দুরন্ত শিশু-কৃষ্ণকে শাসন করছেন। যশোদার শাড়িটিতে অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর নকশা করা হয়েছে। যশোদা জানু মুড়ে মাটিতে বসে কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বাঁধছেন। কৃষ্ণের ভঙ্গীটি আত্মসমর্পণের, কিন্তু তিনি অভিমানে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন। এর ডান পাশের প্যানেলটিতে শিশু-কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে উপবিষ্ট যশোদা, সম্মুখে দণ্ডায়মান বলরাম। আর একটি প্যানেলে শিশু-কৃষ্ণ পুতনাকে বধ করছেন, যশোদা কৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য আকুল হয়ে ছুটে এসেছেন। প্রতিটি প্যানেলই সওয়া ইঞ্চি চওড়া জ্যামিতিক নকশার বর্ডার দ্বারা বেষ্টিত। এই প্যানেলগুলির উপর দিকে স্তম্ভগাত্র বেষ্টন করে চারপাশে দুটি করে আটটি হংসলতা। হংসলতার উপর বিভিন্ন ভঙ্গীতে উপবিষ্ট এবং দণ্ডায়মান মনুষ্যমূর্তি, এদের দৈর্ঘ্য সাড়ে চার ইঞ্চি।

পশ্চিম দিকের স্তম্ভগুলির গায়ে খোদাই-এর প্রায় কিছুই আর বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। প্যানেলগুলি অতি জীর্ণ, বিষয়বস্তু পোকা ধরে ও জল লেগে এতই অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বোঝা একেবারেই যায় না, তবুও প্যানেলের আকার মোটামুটি আছে, এইজন্য এগুলি প্যানেল বলেই ধরেছি। মন্দিরের পূর্ব দিকের দেওয়ালে জানালার উপরের অংশে পত্রপুষ্পের খোদাই-এর এমন নিদর্শন আছে যে, দেখলেই চোখ সরিয়ে নেবার ইচ্ছে হয় না। দু পাশে একটি করে লতা এমন চমৎকারভাবে এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে আছে যে, মনে হয় একটি নয়, একাধিক লতা, স্ক্রোল ওয়ার্কের একটি সুন্দর নিদর্শন। ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটি প্যানেল ছিল। বর্তমানে সেখানে একটি আয়তাকার গর্ত রয়েছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস হল স্তম্ভগাত্রের শিকলগুলি। সাধারণত মনে হবে যে, লোহার শিকলের অনুকরণে এগুলি খোদাই করা হয়েছে একটি আংটার সঙ্গে অন্যটিকে জুড়ে দিয়ে। কিন্তু খুব কাছ থেকে লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, কয়েকটি মনুষ্যমূর্তিকে এমনভাবে পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় রাখা হয়েছে যে, এক নজরে আংটা বলেই মনে হচ্ছে। উত্তর দিকের বারান্দায় বাঁ দিক থেকে চার নম্বর স্তম্ভের দুটি শিকল খুবই উল্লেখযোগ্য। একটি শিকলের বর্ণনা দিচ্ছি। ঘণ্টার উপরে হাঁটু মুড়ে, মাথা নত করে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি। তার কাঁধের উপর আর এক ব্যক্তি উপবিষ্ট, এই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাঁধের উপর অপর আর এক ব্যক্তি উপবিষ্ট, তার দুটি পা দ্বিতীয় ব্যক্তি দুটি হাত দিয়ে দৃঢ়ভাবে ধরে আছে। তৃতীয় ব্যক্তির উপর চতুর্থ ব্যক্তি উপবিষ্ট; সে দুই হাত দিয়ে মাথার উপরে কোন অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে দেহের ভার রক্ষা করছে। আর একটি শিকলেও প্রায় অনুরূপ দৃশ্য খোদাই করা হয়েছে। এই শিকলগুলিকে "Chain of Aerobatic" নাম দেওয়া যেতে পারে। আর একটি কথা এখানে বলে রাখি। বর্তমান মন্দিরটিতে যে বিগ্রহটি রয়েছে তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। বৃন্দাবনচন্দ্রের মূল বিগ্রহটি রয়েছে অন্য এক বাড়িতে।

প্রাচীন বাংলা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও মহেশপুরের আর একটি দর্শনীয় বস্তু হল মাটির তৈরী প্রাচীন দোলমঞ্চ। গ্রামের লোকের বিশ্বাস, এই দোলমঞ্চের দুই পাশে দুইটি সোনার ইট গাঁথা রয়েছে। তিনটি খুব উঁচু মাটির বেদীকে পাশাপাশি রেখে জুড়ে দিলে যেমন হয় অনেকটা সেইরকম। তিনটি বেদীই দৈর্ঘ্যে নীচের দিকের তুলনায় উপর দিকে অনেক ছোট। প্রতিটি বেদীর উপর দুটি করে ধাপ আছে। দ্বিতীয় ধাপটি প্রথমটি অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ঈষৎ ছোট, কিন্তু উচ্চতায় অনেক বেশী। এই দ্বিতীয় ধাপগুলির আকৃতি হুবহু বেদীগুলির অনুরূপ। প্রতিটি বেদীতে ওঠবার জন্য সম্মুখভাগে পৃথক পৃথক সিঁড়ি আছে, মাঝের বেদীটি অপর দুটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। এই দোলমঞ্চটির আনুমানিক মাপ তুলে নিলুম, দৈর্ঘ্য বাট ফিট সাত ইঞ্চি, প্রস্থ সাতাশ ফিট, উচ্চতা কুড়ি ফিট। গ্রামের বৃন্দাবনচন্দ্র ছাড়াও আরও দুটি বিগ্রহ আছে—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও রঘুনাথ। দোলপূর্ণিমার দিন এই দোলমঞ্চের তিনটি চূড়ায় এঁদের তিনজনকে বসিয়ে পুজো করা হয়।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির আর দোলমঞ্চ ছাড়াও মহেশপুর গ্রামের অধিবাসীদের গর্বের বস্তু হল তাদের শোলার শিল্প—প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে গ্রামের হালদাররা এই শোলা-শিল্পের চর্চা করে আসছেন। বর্তমানে গ্রামের প্রায় প্রতি ঘরেই শোলার পুতুল, চাঁদমালা, টোপর, কদম ইত্যাদি বানানো হয়ে থাকে। সম্পন্ন চাষী এই গ্রামে কেউই নেই বললে চলে, সামান্য কয়েক বিঘে জমি আর শোলা এরই উপর নির্ভর করে তাদের সংসার চলে। গ্রাম-বাংলার সনাতন রূপটি আজও দেখতে পাওয়া যাবে এই মহেশপুর গ্রামে; ছায়াঢাকা গ্রাম্য পথ, ভগ্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, ঝোপ ঝাড়ে লৌকিক দেবতার থান, আর নিরীহ, সরল গ্রাম্য নরনারী, যারা মাঠে সোনা ফলায় আর নীরস শুকনো শোলায় সুন্দরের জন্ম দেয়।

বুধবার সাড়ে আটটায় আমরা দুজন থানায় হাজির হলাম। আজ আর তালা দেওয়া গাড়িতে নয়, ট্যাক্সি থেকে নামলাম। খটখট করে ঢুকলাম ভেতরে। আমরা নিমন্ত্রিত। সিপাহীরা দু' পাশে সেলাম ঠুকলো—বেশ আশ্চর্য লাগছে। মিঃ মৈত্র স্বাগত জানালেন, "আপনারা লেট, আমি আটটা থেকে বসে আছি। ভাবছিলাম, বোধ হয় আপনারা, এই রসকষহীন দারোগার কি আসবেন। হয়তো কমুদির আড্ডা থেকে ধরে আনতে হবে আবার।"—বলে হো-হো করে হাসলেন নিজের রসিকতায়। পুলিশেরা এইরকমই। ওঁর সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন উপস্থিত, তিনি নাকি একসময় কবিতা-টবিতা লিখতেন, এখন বিয়ে-থা করে খবরের পাতা ছেড়ে নিয়েছেন (বিয়ে হয়ে গেলে কবিতার আর কি প্রয়োজন থাকে)। আমাদের নাম শুনেছেন, পরিচয় নাম শুনেছেন, বললেন—"মৈত্র, তুমি কেমন এঁদের আবিষ্কার করলে?" মৈত্র উত্তর দেবার আগেই মণীন্দ্র বললো—"কমুদির ডেন-এ মৈত্রের অনুচরেরা আমাদের পাকড়ে পেয়েছিল। সেদিন উনি না থাকলে সারা রাত হাজতবাস লেখা ছিল কপালে।" মৈত্র বেচারী লজ্জিত হলেন একটু। বন্ধুটি আবার বললেন—"আরে, এঁদের ধরেছো কেন, এরা আধুনিক কবি, ক্রিমিনাল নয়। এক-একসময় ক্রিমিনালদের মতো বিক্ষোভ করতে পারেন বটে, কিন্তু এঁরা প্রচণ্ড শান্তিপ্রিয় শতদল।" —ভেড়ে দিলেও দেখছি কবিত্বের তেজটুকু ভুলেননি ভদ্রলোক বিয়ের পরও।

যাই হোক, তারপর বেরোলাম আমরা। সেই ভয়াবহ মোটরভ্যানটি সামনে দাঁড়িয়ে, আজ আমরা জাফরির ভেতরে না বসে সামনের সিটে বসলাম মৈত্রের পাশে। উনি রাউণ্ডে বেরোলেন।

—"প্রথমে চলুন একটা রহস্যময় বাড়িতে যাওয়া যাক। রোজ-ই ওখানে কিছু না কিছু গেম পাওয়া যায়।" আমরা এ গলি ও গলি ঘুরে একটা অন্ধকার বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম, বাইরে থেকে তালা বন্ধ। মৈত্র নামলেন লাফ দিয়ে, হান্টার দিয়ে মচড়ে তালা খুললেন, ভেতরে ঢুকলেন,

ঘাগড়া-পরা ছায়া মূর্তিকে বিদ্ধ করল

টর্চ ফেলে ফেলে এগোতে লাগলেন। ভেতরে একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ বেরোচ্ছে—একতলায় কেউ নেই, অন্ধকার। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে উঠলাম। দোতলায় অনেকগুলো ঘর, প্রত্যেকটা ঠেলে ঠেলে খোলা হল—অন্ধকার, শূন্য। মণীন্দ্র-কে বললাম, "পেছন থেকে যদি কেউ ছুরি মারে, জানতেও পারবো না। চলো পালাই।"

মৈত্র আশ্বাস দিলেন—"আমি থাকতে ছুরি মারবে কে? আপনারা না কর্কশ দিকটা পছন্দ করেন, এতেই ঘাবড়াচ্ছেন? চলুন, তিনতলায় যাই।" আবার কাঠের সিঁড়ি, অনেকগুলো অন্ধকার ঘর পার হয়ে একটি ঘরে দেখা গেল গুটিকয়েক লোক প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে জুয়া খেলছে, খুচরো পয়সা ছড়ানো—তাদের পাশে একটা প্রকাণ্ড হুঁকো-নলচে—এবং একজন মোটা চীনা মেয়ে সন্তারমাণ। মৈত্র বললেন, "চণ্ডু আর জুয়া দুই চলছে দেখছি।" বলেই হঠাৎ লোকগুলোকে প্রচণ্ড পিটুতে লাগলেন হান্টার দিয়ে—"বাঞ্চোৎ আবার তোরা এসেছিস?"

—"মিঃ মৈত্র," আমি মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করলাম," নিরিবিলিতে এরা একটু নেশা করছে, কেন জ্বালাতন করছেন, চলুন না আমরা অন্য কোথাও যাই।"

—"আরে ক্ষেপেছেন? মাঝরাত্তিরে এদেরই একজন আর একজনকে খুন করবে হয়তো। এরা সবাই ক্রিমিনাল, দাগী। তা ছাড়া, প্রথমেই না মারলে ওদের হিংস্রতা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না।"

সিপাহীরা ওদের সবাইকে আটক করলো। আগের দিনের মতো ওদের নিয়ে গেল মোটর-ভ্যানের দিক। একদল কিংকর্তব্যবিমূঢ় সাদাসিধে লোক, রোগাটে, বোকা চেহারা প্রত্যেকের; এরা দাগী হয় কী করে? মৈত্রর ওপর আমার একটু রাগই হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, সারা দুনিয়াটাতে ও এখন ক্রাইম ছাড়া কিছু দেখতে পায় না। আসলে ও নিজেই একটা ক্রিমিনাল হয়ে গেছে পুলিসের চাকরি করে। সব মানুষের মধ্যে যে একটা মজার দিক আছে, কে ওকে বোঝাবে।

খটখট করে আমরা ফিরছি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। সামনে চলছেন মৈত্র, হাতে টর্চ জ্বলছে, টর্চের ফলা হঠাৎ একতলায় একটা ছায়ামূর্তিকে বিদ্ধ করলো। ঘাগরা পরা একটা ছায়ামূর্তি। —"কে ওখানে?" জবাব নেই, ছায়ামূর্তি দেয়ালের আড়ালে লুকিয়েছে। ছুটলেন মৈত্র তার পেছনে। আমি বললাম, "সাবধান।" মৈত্র হাঁকলেন, "বেরিয়ে আয় বলছি।"

ঘাগরা পরা মূর্তি বেরিয়ে এল—"আমি কমলি।" আমরা শিউরে উঠেছি। কাছে এগিয়ে এসেছি, দেখি আমাদের কমলা, বশিরের বউ, একটা ঘাগরা পরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একা। টর্চের আলোয় সে আমাদের চিনতে পারলো। —"দাদা, আপনি! আপনি দারোগা বাবুর সঙ্গে!"

কমলি কেন ওখানে, সে কৌতূহল ছাড়িয়ে এবার আবার লজ্জিত হবার পালা। এই কমলাই সেদিন সিপাহীদের মিনতি করেছিল—এঁরা মানী লোক, এঁদের হেনস্তা করবেন না। আজ কমলা দেখছে, আমরা

আসলে পর্লিসের লোক, হয়তো গর্প্তচর। আবার ভাবলাম, কম্‌লি তো মদই বেচে, পোষা বাঁদরকে উচ্ছিষ্ট মদ খাওয়ায়, ওর স্বামী অকারণে খর্নের দায়ে ধরা পড়ে জানতাম, কিন্তু সে এখানে কেন? আমাদের এতো প্রিয় বারমেড কম্‌লি তো এ নয়। কর্কশ জীবনের মজার দিকটা থেকে হঠাৎ যেন গম্ভীর দিকটায় ঢর্কে পড়েছি।

কম্‌লিকে আজ ভ্যানের পেছনে বসতে হল। অথচ আমরা সামনে অফিসারের পাশে। অপরাধবোধে মরে যাচ্ছি। চুপি চুপি বললাম—"মিঃ মৈত্র, ছেড়ে দিন, আমাদের ভালো লাগছে না। একটা তৈরি করা বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে। কমলা তো আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি। ও যদি খর্নীদের দলভুক্ত হয়েই থাকে, তাতে আমাদের কি? আমরা ওর অন্য দিকটা দেখেছি, সেটাই থাক। তা ছাড়া, আজ তো কোনও দর্ঘটনা ঘটেনি। কেন এই অত্যাচার করা। আমাদের ছেড়ে দিন।"

—"একবার বেশ্যাপাড়াটা ঘর্রে যাবেন না? বেশ মজার জায়গা। খাটিয়ার তলা থেকে কোঁচা ধরে বাবর্দের টেনে বার করবো, দেখবেন না? ওদের চোর-চোর মর্খ দেখতে মজা লাগে। অন্তত তাড়িখানার ভেতরটা? হোমোসেক্সওয়ালদের আড্ডা—ছোট ছোট ছেলেরা লিপস্টিক মেখে নাচে দেখবেন না?" মণীন্দ্র ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—"চলো না, একটা মার্ডার যদি দেখতে পাওয়া যায় আজ?" কমলা পেছনের বেঞ্চি থেকে কাতর স্বরে বলছে—"দাদা, দারোগাবাবর্কে বলে আপনি আমাকে ছাড়িয়ে দিন না। আমি আর ওখানে যাবো না। দাদা আপনার পায়ে পড়ি, দারোগাবাবর্কে বলে ছাড়িয়ে দিন।"

এ কী হল! এক সন্ধ্যেয় কম্‌লির চোখে আমরা হীন হয়ে গেলাম, ও আমাদের চোখে অপরাধী! গা ঘিনঘিন করছে। অপমানে হীনমন্যতায় বর্কের ভেতরটা জবলে যাচ্ছে। মণীন্দ্র বলল—

ওদের চোর চোর মর্খ দেখতে বেশ মজা লাগে

"হেল্‌। এমন জানলে কে আসতো এভাবে। এর চেয়ে ক্রিমিনালরা অনেক ইন্টেরেস্টিং। পর্লিস জাতটাই প্রচণ্ড বেরসিক। রুড।"

মৈত্র ব্যাপারটা বর্ঝলেন বোধ হয়। বড় রাস্তায় এসে বললেন, "ঠিক আছে, আজ আপনাদের অনারে কম্‌লিকে নামিয়ে দিচ্ছি। আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বরং আসর্ন আমরা থানায় গিয়ে একটর গল্প-সল্প করি।"

—"আজ থাক," মণীন্দ্র জের ধরল, "আজ আমরাও এখানে নেমে পড়ি, বাড়ি যাই। নার্ভের ওপর প্রবল চাপ পড়ছে। আর একদিন এসে আপনার এলাকায় অন্যান্য মজার অঞ্চলগর্লি দেখে যাব।" রাস্তার মোড়ে আমরা দর্জন নামলাম। তারপর হর্শ্‌ করে চলে গেল পর্লিসভ্যানটা। মৈত্র হাত বাড়িয়ে বললেন—"গর্ড নাইট, গো হোম।"

রাত দশটা বাজে। কমলাও নেমেছে। একবার পেছন ফিরে তাকালো। চোখে হয়তো ওর ঘৃণা ছিল, কিম্বা সন্দেহ। তবর সেই পর্রনো সর্রে ডাকলো—"দাদা, এখনই বাড়ি যাবেন? আসর্ন না, পাঁচ আউন্স করে খেয়ে যান।" আমরা ইতস্তত করছি দেখে বলল—"বেশ তো, ভেতরে না-হয় না গেলেন, সামনে পানের দোকানে বলে দিচ্ছি; সেদিন বড়ো কষ্ট পেয়েছেন। বলে দিচ্ছি, ও দাম নেবে না।"

দাদার প্রতি স্নেহবশত খাওয়াতে চাইছে কম্‌লি, না পর্লিশের গর্প্তচরকে ঘর্ষ দিতে চাইছে—বর্ঝতে পারছি না। মণীন্দ্র বলল—"গিভ আপ্‌। আজ সোজা বাড়ি ফেরা দরকার। জায়গাটা নরক-বিশেষ।"

ঘাড় ঘর্রিয়ে চেয়ে রয়েছে কম্‌লি, ওকে পেছনে ফেলে আমরা হনহন করে এগিয়ে গেলাম ট্রাম-রাস্তার দিকে।

২৯
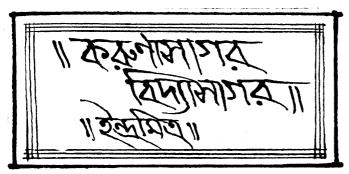
বিদ্যাসাগর তখন কলকাতায়। শরীর ভেঙে পড়েছে তাঁর। একদিন দুপুর-বেলা বাড়িতে একলা বসে আছেন, এমন সময় হাইকোর্টের উকিল শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য দেখতে এলেন তাঁকে। প্রণাম করলেন। জিজ্ঞেস করলেন—আজ আপনি কেমন আছেন?

—ভালো নয়। ক্রমেই অসুখ বেড়ে যাচ্ছে। তার উপর এখানে অনেক কাজ, সুস্থ হবার উপায় নেই।

—আপনি কার্মাটারে গেলে ভালো থাকেন। আর সেখানে আপনার বিশ্রামও হয়। কিছুদিন সেখানে গিয়ে থাকুন না।

আমার পক্ষে আজকাল সবই সমান। সেখানেও বড়ো ভালো থাকি না।—খানিক-ক্ষণ চুপ করে রইলেন বিদ্যাসাগর, তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—বাপু, সেখানে গেলে ভালো থাকি বটে। আমার যদি অতুল ঐশ্বর্য থাকত, তাহলে সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতাম, শরীর-মন ভালো থাকত। কিন্তু, আমার সে-অদৃষ্ট কই? আমার সে-ক্ষমতা কই? দেখো, কার্মাটারে এক সের চালের ভাত, আধসের অড়হর ডাল, আধসের আলু আর একসের মাংস যে অনায়াসে খেতে পারে, তাকে আজকাল পোয়াটাক ভুট্টার ছাতু খেয়ে থাকতে হয়, তার বেশি আর জোটে না। আমি সেখানে গিয়ে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করব, আর আমার চারদিকে সাঁওতালেরা না খেয়ে মারা যাবে দেখব—এ কি সইতে পারি?

বিদ্যাসাগর আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বাঙলা, হিন্দী ও সংস্কৃতে বিদ্যাসাগর সাকুল্যে বারোখানা বই সম্পাদনা করেছেন: অন্নদামঙ্গল। বৈতাল পচ্চীসী। রঘুবংশম। কিরাতার্জুনীয়ম। সর্বদর্শনসংগ্রহঃ। শিশুপালবধ। কুমারসম্ভব। কাদম্বরী। মেঘদূতম। উত্তরচরিতম্। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্। হর্ষচরিতম্।

বিদ্যাসাগরের 'মেঘদূত' সংস্করণ সম্পর্কে একটি বলবার মতো খবর আছে।

বিদ্যাসাগর বিশ্লেষণ করে দেখালেন, 'মেঘদূত'-এর কয়েকটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। অর্থাৎ, সেই শ্লোকগুলো কালিদাস লেখেননি, পরবর্তীকালে আর-কেউ লিখে 'মেঘদূত'-এর মধ্যে জুড়ে দিয়েছে, কালিদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'মেঘদূত' সংস্করণ বেরোবার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরের কথা। কাশ্মীরে একখানা পুঁথি পাওয়া গেল। 'মেঘদূত'-এর প্রাচীনতম টীকাকার বল্লভদেবের টীকাখানা আছে সেই পুঁথিতে। দেখা গেল, বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় 'মেঘদূত'-এর যে-কটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, বল্লভদেবের টীকায় সেসব শ্লোকের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই।

১৮৫১ সালের নভেম্বরে বেরল বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'। বাঙলায় লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণের বই। 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "এই গ্রন্থে অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রথম শিক্ষোপযোগী স্থূলে স্থূলে বিষয় সকল সংকলিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবেক না যথার্থ বটে কিন্তু উপদেশ-সাপেক্ষ হইয়া সহজ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সহজে অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা জন্মিবেক, সন্দেহ নাই। এবং ইহাই এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার মুখ্য তাৎপর্য।"

বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণের উপক্রমণিকায় চমৎকৃত হয়ে একজন পণ্ডিতমশাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দেখা করে বললেন—মশায়, আপনি ব্যাকরণের রেলরোড করেছেন বলে আপনাকে দেখতে এসেছি। রেলরোডে যেমন ছ-মাসের পথ ছ-দিনে যাওয়া যায়, আপনার উপক্রমণিকা পড়ে সেইরকম ছ-মাসের ব্যাকরণ ছ-দিনে শেখা যায়।

'ঋজুপাঠ' নামে একখানা সংস্কৃত বই তিনভাগে বের করেছেন বিদ্যাসাগর। প্রথম ভাগ বেরল ১৮৫১ সালের নভেম্বরে; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫২ সালের মার্চে; তৃতীয় ভাগ ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরে। বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার, বেণীসংহার এই কয়েক গ্রন্থ হইতে বালকদিগের পাঠোপযোগী অংশ সকল সঙ্কলন করিয়া ঋজুপাঠ নামে তিনখানি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে।"

১৮৫১ সালে বেথুন সোসাইটিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নামে বাঙলা ভাষায় লেখা নিজের একটি রচনা পড়ে শোনালেন। ১৮৫৩ সালের মার্চে সেই রচনাটি বই হয়ে বেরল। বাঙলাদেশে—না, শুধু বাঙলাদেশে নয়—ভারতবর্ষে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এই প্রথম প্রচেষ্টা।

'ব্যাকরণ কৌমুদী' নামে বাঙলাভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের বই লিখেছেন বিদ্যাসাগর। চারভাগে বেরিয়েছে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ বেরিয়েছে ১৮৫৩ সালে। তৃতীয়ভাগ বেরিয়েছে ১৮৫৪ সালে। চতুর্থভাগ বেরিয়েছে ১৮৬২ সালে।

রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের যে উপক্রমণিকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশমধ্যে সাধারণত সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। পূর্বে অনেকদিন হইতেই ইংরেজি ভাষায় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষ হইত, কিন্তু উহার দ্বারে যে ভীষণমূর্তি ব্যাকরণ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে দেখিয়া কেহই নিকটেই ঘেঁষিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে কি পল্লী, কি নগর সর্বত্রই বিদ্যানুশীলনরত কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই যে, কিছু না কিছু সংস্কৃতের চর্চা করিতেছেন, উপক্রমণিকাদ্বারা ব্যাকরণের দুর্গমপথ পরিষ্কৃত হওয়াই তাহার মূল কারণ।...ফলত বিদ্যাসাগরের যদি আর কোন কার্যও না থাকিত, তথাপি উপক্রমণিকাদি রচনাদ্বারা সংস্কৃতভাষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া রূপ এই একমাত্র কার্যের জন্যও দেশীয় লোকদিগের নিকট তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেন সন্দেহ নাই।"

আগেই বলা হয়েছে, সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় বিদ্যাসাগর সংস্কৃতে অনেক রচনা লিখেছিলেন। একদিন একজন আত্মীয় বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে অনেকগুলো রচনা পড়তে নিয়ে গেলেন। কথা দিয়ে গেলেন, পড়ে তাড়াতাড়ি ফেরত দেবেন। কিন্তু কথা রাখলেন না তিনি। বারংবার লেখা-

গুলো ফেরত চেয়েছেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু ফেরত পাননি। পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে বিদ্যাসাগর ছেলেবেলায় লেখা কয়েকটি সংস্কৃত রচনা পেলেন: সেগুলোর সঙ্গে আপন মন্তব্য জুড়ে 'সংস্কৃত রচনা' নামে একখানা বই বের করলেন ১৮৮৯ সালের নভেম্বরে।

বিদ্যাসাগরের 'শ্লোকমঞ্জরী' বেরল ১৮৯০ সালের মে মাসে। 'শ্লোকমঞ্জরী'তে বিদ্যাসাগর সাকুল্যে দুশো তেরোটি উদ্ভট শ্লোক সংকলন করেছেন। উদ্ভট শ্লোক কাকে বলে? বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "যে সকল শ্লোক কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত নহে, উহারাই উদ্ভট শব্দে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।"

'শ্লোকমঞ্জরী'র পরিশিষ্টভাগে বিদ্যাসাগর কয়েকটি আদিরসাশ্লিষ্ট শ্লোক সন্নিবেশিত করেছেন। কোনো কোনো শ্লোকে বিদ্যাসাগর পাদটীকা যোগ করেছেন। একটি শ্লোকের (তব তন্বি কুচাবেতৌ নিয়তং চক্রবর্তিনৌ। আসমুদ্রকরগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ॥) বিদ্যাসাগর কৃত পাদটীকা উদ্ধৃত করি:

"এই শ্লোক সংক্রান্ত কিংবদন্তী সংক্ষেপে নির্দিষ্ট হইতেছে।

কালিদাসের আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া, সরস্বতী দেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে, প্রভূত ভক্তিযোগ সহকারে বারংবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কালিদাস সরস্বতী দেবীর বর্ণনা করিলেন। এই বর্ণনা আরাধ্য দেবতার বর্ণনার অনুযায়িনী হয় নাই; সামান্য নায়িকার বর্ণনা যে প্রণালীতে প্রণীত হইয়া থাকে, তদনুযায়িনী হইয়াছিল। এজন্য সরস্বতী দেবী সাতিশয় অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন, তুমি সামান্য নায়িকার ন্যায় বর্ণনা করিয়া, আমার অবমাননা করিলে। এই অপরাধে, সামান্য নায়িকার হস্তে তোমার প্রাণান্ত ঘটিবেক।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রক্ষিতা এক বারবণিতা ছিল। রাজপ্রসাদে এই বারবণিতার সুখ, সম্পত্তি ও আধিপত্যের সীমা ছিল না। কালিদাস তাহার নিরতিশয় প্রণয়ভাজন ছিলেন; প্রত্যহ গোপনে তাহার ভবনে গিয়া, আমোদ করিতেন। এক দিন, তিনি তাহার সহিত আমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা বারবণিতার আবাসে উপস্থিত হইলেন। তদীয় আগমনবার্তা শ্রবণে, কালিদাস ও বারবণিতা উভয়ে ভয়ে অভিভূত ও যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইলেন। উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে কালিদাস পার্শ্ববর্তী গৃহে লুকাইয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা বারবণিতার নিকটে উপস্থিত হইলে, উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া, ইষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। রাজা, বারবণিতার স্তনে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "তব তন্বি কুচাবেতৌ নিয়তং চক্রবর্তিনৌ"। রাজকৃত স্তনবর্ণনা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, কালিদাস, এককালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, ঐ বর্ণনার সমর্থনার্থে বলিলেন,

"আসমুদ্রকরগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ"॥

রাজা, কালিদাসের স্বরশ্রবণ মাত্র, চকিত ও অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন, এবং এ স্থানে কালিদাসের গতিবিধি আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, ভয়ানক ঈর্ষার আবির্ভাব বশতঃ, বারবণিতার উপর যৎপরোনাস্তি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া, আজ অবধি আমি তোমার সংস্রব ত্যাগ করিলাম, তাহাকে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। কালিদাসের নির্বুদ্ধিতা ও অবিমৃশ্যকারিতার জন্যে, আমি এ জন্মের মত রাজপ্রসাদে বঞ্চিত হইলাম, এই ভাবিয়া ক্রোধে অন্ধ ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, বারবণিতা তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে কালিদাসের মস্তকচ্ছেদন করিল। এইরূপে সরস্বতীর অভিসম্পাতবাক্য সর্বতোভাবে কার্যে পর্যবসিত হইল।"

মনে আছে নিশ্চয়, সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় ১৮৩৯ সালে ভূগোল-খগোল সম্পর্কে কতগুলো শ্লোক লিখে বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর সেই শ্লোকগুলো বই হয়ে বেরল 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্' নামে—১৮৯২ সালের এপ্রিলে। চারশো আটটি শ্লোক আছে 'ভূগোলখগোলবর্ণনমে'।

বিদ্যাসাগর রচিত, সংকলিত ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনাই অনুবাদ, অনুসৃতি অথবা ছাত্রপাঠ্য।

রাজনারায়ণ বসু বলেছেন: "অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী-শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল-রচনা-শক্তি নাই, এমন কথাই বলিতে পারিবেন না। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পরিমাণে নির্মাণ ও পরিমার্জনকার্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আছে।"

একটা গল্প আছে।

কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে শাস্ত্রের কী একটা বিষয় নিয়ে বিচার হচ্ছে। বিচারের সিদ্ধান্ত একজন ইস্কুলের পণ্ডিত বাংলায় লিখলেন। সেই লেখা শুনে একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা করে বললেন—এ কি হয়েছে!—এ যে বিদ্যাসাগরী বাংলা হয়েছে! এ যে অনায়াসে বোঝা যায়!!

অধ্যাপকমশাই মিথ্যে বলেননি। বিদ্যাসাগরের বাংলা সত্যিই সহজ। সেকালের যে কোনো লেখকের ভাষার চেয়ে সহজ। সহজ এবং মধুর।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।...

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন; গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

"বাঙ্গালা গদ্যে প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর দেন বিদ্যাসাগর। বিভিন্ন বাক্যাংশ শব্দের পরস্পর সমাবেশে অভিজ্ঞতার [illegible] যে আর একটি অলক্ষণীয় রূপের সৃষ্টি হইতে পারে, এই অপূর্ব সত্য তিনিই সর্বপ্রথম মনে মনে অনুভব করিয়া, লেখনীর দ্বারা তাহার সন্ধানদানও করিয়া [illegible] দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, [illegible] আর্য [illegible] সম্ভব হইয়াছে।

ভাষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর [illegible] ও [illegible] ছিলেন না, বরং ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে। সময় ও বিষয়ের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি [illegible] পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিতেন। তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির প্রায় প্রত্যেকটির অনেকগুলি করিয়া সংস্করণ হয়; প্রত্যেক সংস্করণে তিনি কিছু-না-কিছু সংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই সংস্কারগুলি [illegible] করিলে [illegible] তাঁহার [illegible] রীতির [illegible] দেখিতে [illegible]।...

গদ্য রচনার ছন্দ বিষয়ে তিনিই ছিলেন প্রথম দ্রষ্টা ও স্রষ্টা; গদ্যপাঠের ধ্বনিসামঞ্জস্যে যে পাঠক ও শ্রোতা আনন্দ পাইতে পারে এই সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁহার ছিল।...বাংলা

ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে যখন কেহ চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত অর্জন করে নাই, সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে এ বিষয়ে তাঁহার সার্থক চিন্তা—বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি লইয়া এখন যাঁহারা গবেষণা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিদ্যাসাগর স্বয়ং যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ—এই অন্তর্নিহিত ছন্দোগুণের জোরেই সে যুগের অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার রচনাগুলিই মাত্র স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।..."

ছাপার অক্ষরে প্রথম বিদ্যাসাগরের যে বইখানা বেরল, তার নাম 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। ১৮৪৭ সালে বেরল। "কালেজ আফ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মেজর জি টি মার্শাল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত শ্রীযুত পি এস ডি রোজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত সংবৎ ১৯০৩।"

ভাষা সংস্কার ও বিরামচিহ্ন প্রয়োগ বিষয়ে বিদ্যাসাগর কীভাবে কাজ করেছেন, 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র কয়েকটি সংস্করণ থেকে একই অংশ উদ্ধার করে তার একটি উদাহরণ:

"কিন্তু আমি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি। যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এবং তদনুসারে কার্য করিলে দীর্ঘ জীবী হইয়া নিরুদ্বেগে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি বিস্মিত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যক্ষও ক্ষণমধ্যে সমরশ্রান্তি পরিহার পূর্বক বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধন করিয়া অভিপ্রেত উপাখ্যানের উপক্রম করিল।"—প্রথম সংস্করণ থেকে।

"কিন্তু আমি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি। যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শুনিয়া তদনুসারে কার্য করিলে দীর্ঘজীবী হইয়া নিরুদ্বেগে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি বিস্মিত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যক্ষও ক্ষণমধ্যে সমরশ্রান্তি পরিহার করিয়া বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া অভিপ্রেত উপাখ্যানের উপক্রম করিল।"—সপ্তম সংস্করণ থেকে।

"কিন্তু আমি তোমায় আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি, এজন্য এরূপ বলিতেছি। যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তদনুযায়ী কার্য করিলে, দীর্ঘজীবী হইবে, এবং নিরুদ্বেগে, অখণ্ড ভূমণ্ডলে, একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি, অতিশয় বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া, যক্ষের বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হইলেন। যক্ষও, ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তিপরিহার পূর্বক, বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া, তদীয় জীবন সংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে আরম্ভ করিল।"—দশম সংস্করণ থেকে।

এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন: "বাঙ্গালা গদ্যের এই ধ্বনি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি (বিদ্যাসাগর) ধীরে ধীরে কিভাবে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন, এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখানো যাইতে পারে। এই ভাষা চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে, শেষ বয়সে রচিত তাঁহার কতকগুলি বেনামী পুস্তিকায়।..."

১৮৪৮ সালে বেরল বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)'। এই বই সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

"বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্বক, সংকলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ, অনাবশ্যক বোধে, পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং কোনও কোনও বিষয়, আবশ্যক বোধে, গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলন পূর্বক, সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে, অতি দুরাচার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি চিরস্মরণীয় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয়ের অধিকার সমাপ্তি পর্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।.... "

১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে 'জীবনচরিত' নামে বিদ্যাসাগরের আরেকখানা বই বেরল। বইখানা ইংরেজি থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর। এই বই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "বাঙলায় ইংরেজির অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম: ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনা প্রণালী পরস্পর নিতান্ত বিপরীত; এই নিমিত্ত, অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান হইলেও অনুবাদিত গ্রন্থে রীতিবৈলক্ষণ্য, অর্থপ্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূল্যার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম করিবার আশায় অনেক স্থলে অবিকল অনুবাদ করি নাই......।"

বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' বেরয় ১৮৫১ সালের এপ্রিলে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—অনেকে আমাকে বলেন, বিদ্যাসাগর ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানা বই লিখলেন, ছেলেদের জানবার মতো সব কথাই এতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কেনো কথা নেই, কেন নেই?

বিদ্যাসাগর একটু হেসে বললেন—যাঁরা তোমার কাছে ওকথা বলেন তাঁদের বলো, এবার যে 'বোধোদয়' ছাপা হবে তাতে ঈশ্বরের কথা থাকবে।

পরে বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়' ঈশ্বরের কথা লিখেছেন, 'ঈশ্বর' নাম দিয়ে লিখেছেন। বিদ্যাসাগরের সেই 'ঈশ্বর' নামের রচনাটি 'বোধোদয়' থেকে তুলে দিচ্ছি: "ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; এ নিমিত্ত, ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।"

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গব্যঙ্গে সিদ্ধহস্ত। বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলেছেন—ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য-আকাশের Halley's Comet, যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহার প্রভায় দশদিক আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে, কাহার কোন অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর দেশসুদ্ধ লোকে তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাত-তালি দিবে।

এই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিন বিদ্যাসাগরের দেখা। বয়সে ইন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের চেয়ে প্রায় তিরিশ বছরের ছোট। বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—ইন্দির, তুই তো আমাকে নিয়ে কোনোরকম পরিহাস করিসনি। আমি কারণ ঠাওরে উঠতে পারিনে।

ইন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন—যখন অনুমতি পেলাম, তখন করব।

কিছুদিন পরেই বঙ্গবাসীতে 'নষ্টে মূতে'র ব্যাখ্যা বেরল, বোধোদয়ের ব্যঙ্গ বেরল।

ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মারফত ইন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করে পাঠালেন বিদ্যাসাগর। আর ইন্দ্রনাথ বললেন—এতদিন পরে আমার একটা রঙ্গ করা সার্থক হল।

'নীতিবোধ' নামে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা প্রবন্ধের বই বেরল ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে। 'নীতিবোধে'র 'বিজ্ঞাপনে' রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম,

স্বাধীনচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ স্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা।"

'নীতিবোধ' থেকে বিদ্যাসাগরের 'বিনয়' নামে একটি রচনা তুলে দিচ্ছি :

'যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিংবা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে, সে নিঃসন্দেহে উপহাসাস্পদ হয়। আমাদিগের আপনাকে সামান্য জ্ঞান করা উচিত, এবং লোকেও যেন বুঝিতে পারে যে আমরা, আপনাকে সামান্য জ্ঞান করি।

আর অন্যে যখন আমাদের প্রশংসা করে, তৎকালে বিনীত হওয়া কর্তব্য। ইহা অতি যথার্থ কথা যে বিনয় সদ্গুণের শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু যথার্থ সদ্গুণও আত্মশ্লাঘাসহকৃত হইলে সকলের ঘৃণিত হয়। আর আমাদিগের যে সকল বিদ্যা গুণ, অথবা পদ নাই, যদি আমরা উহা আছে বলিয়া লোকের নিকট ভান করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আরও উপহাস্যাস্পদ হইতে হয়। যেহেতু আমাদের ওই সকল ভান অমূলক বলিয়া লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে। লোক নির্গুণ ব্যক্তিকে যত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, নির্গুণ হইয়া গুণ আছে বলিয়া ভানকারী ব্যক্তিকে তাহা অপেক্ষা অধিক অবজ্ঞা ও অধিক ঘৃণা করে।

অনেকের এরূপ রোগ আছে যে, আপনার সিদ্ধান্তকে অখণ্ডনীয় ও অন্যের সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই মহৎ রোগের প্রতীকারে সযত্ন হওয়া অতি কর্তব্য। আমরা অপসিদ্ধান্ত বোধ করিলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অভ্রান্ত হইতে পারে; আর আমাদিগের সিদ্ধান্ত আমরা অভ্রান্ত বোধ করিলেও বাস্তবিক ভ্রমাত্মক হইবার আটক কি। সকলেরই বিশেষ বিশেষ মত আছে, এবং সকলেই আপন আপন মত অভ্রান্ত বোধ করিতে পারে। অতএব সকলেরই মত ভ্রান্তিমূলক কেবল আমারই প্রমাণিক ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। আমার ভুল হইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া কর্ম করা সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক'।

১৮৫৪ সালের ডিসেম্বরে বেরল বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'। 'শকুন্তলা' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তলম সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যানভাগ সংকলিত হইল।..."

'শকুন্তলা থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি :

"অতি পূর্বকালে ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট ছিলেন। তিনি একদা, বহুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যবহারে, মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া রাজা শরাসনে শর সন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে, দ্রুত বেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন মৃগের পশ্চাৎ রথচালন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎক্ষণ রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, দূর হইতে, দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে

কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি, শুনিয়া, অবলোকন করিয়া কহিল, মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রাজা, তপস্বীর উল্লেখ-শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া রথের বেগসংবরণ কর। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল।
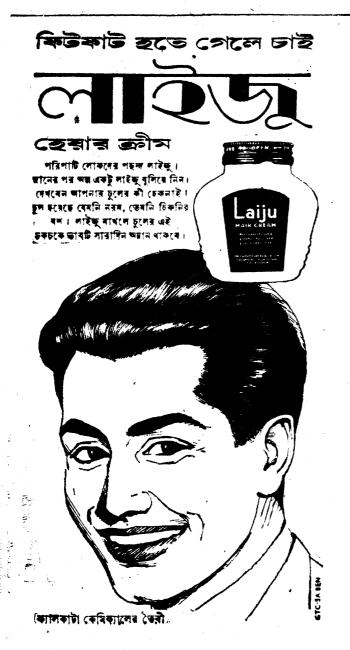
এই অবকাশে, তপস্বীরা, রথের সন্নিহিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে। শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনকার শস্ত্র আর্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধের প্রহারের নিমিত্ত নহে।"

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেনঃ "সুপ্রসিদ্ধ 'প্যারীচরণ সরকার মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। যাঁহারা অকৃত্রিম প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন তাঁহার কার্যকলাপের সহিত অক্ষুণ্ণ যোগ রাখিয়া চলিয়াছিলেন, সরকার মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন। প্যারীবাবুর সদর বাটীর বৈঠকখানা ঘরে সর্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সমাগমে মজলিস হইত। একদিনকার ঐরূপ মজলিসে বঙ্গদেশীয় বালক বালিকাগণের শিক্ষা লাভের সদুপায় সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠে। সে দিনকার বৈঠকের কথাবার্তায় স্থির হয় যে, প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ইংরাজী বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের প্রথম পাঠ্য কতকগুলি ইংরাজী পুস্তক রচনা করিবেন; আর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের উপযোগী কতকগুলি বাংলা পুস্তক রচনা করিবেন। এইরূপ স্থির হওয়ার পর উভয় বন্ধু ঐ উভয় ভাষায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে বাহির হইয়া পথে পালকিতে বসিয়া বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ রচনা করেন।"

'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ' সম্পর্কে একই রকম বিবরণ দাখিল করেছেন বিহারীলাল সরকার ও সুবলচন্দ্র মিত্র।

কিন্তু নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেনঃ "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন চরিতগুলিতে লিখিত হইয়াছে যে একদিন প্যারীবাবুর চোরবাগানস্থ বাটীর বৈঠকখানায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে কথা উঠিলে, স্থির হয় যে প্যারীচরণ ইংরাজি ভাষায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষায় বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুলপাঠ্য প্রাথমিক পুস্তকগুলি লিখিবেন, এবং সেই কথোপকথনের ফলস্বরূপ প্যারীবাবুর ফার্স্টবুক এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ আদি পুস্তকাবলীর সৃষ্টি হয়। উক্ত কথোপকথনের কথা শ্রবণ করিলে সাধারণের ধারণা জন্মিতে পারে যে প্যারীবাবুর ফার্স্টবুক ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ একই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাস্তবিক ঘটনা কিন্তু সেরূপ নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ খৃঃ ১৮৫৫ অব্দে প্রকাশিত হয়; তাহার প্রায় পাঁচ বর্ষ পূর্বে প্যারীবাবু বারাসতে অবস্থান কালে তদীয় ফার্স্টবুক রচনা, প্রকাশ ও স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করেন। সম্ভবতঃ খৃঃ ১৮৫৪ অব্দে যখন প্যারীবাবু হেয়ার স্কুলের কর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া নবীন উদ্যমে তদীয় ফার্স্টবুকাদি পুস্তকের সংস্করণ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন সেই সময়ে উক্ত কথোপকথন হয়। এবং উক্ত কথোপকথন সত্য হইলে বোধ হয় যে প্যারীবাবুর দৃষ্টান্তে বা তাঁহার পরামর্শেই তদীয় সোদরোপম সুহৃদ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা বর্ণপরিচয়াদি চিরস্মরণীয় স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনাকার্যে ব্রতী হয়েন।"

'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ' বেরিয়েছে ১৮৫৫ সালের এপ্রিলে। 'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগে'র '১৯ পাঠে' বিদ্যাসাগর গোপালের কথা লিখেছেনঃ

"গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।

গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভাল বাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায় হাত তুলে না। এ কারণে, তার পিতামাতা তাকে অতিশয় ভাল বাসেন।

গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে।

খেলিবার ছুটী হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা, খেলবার সময়, ঝগড়া করে মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে এক দিনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না।

পাঠশালার ছুটী হইলে বাড়ী গিয়া, গোপাল পড়িবার বইখানি আগে ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয়; পরে, কাপড় ছাড়িয়া, হাত পা মুখ ধোয়। গোপালের মা যা কিছু খাবার দেন, গোপাল তাই খায়; খাইয়া, আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলি লইয়া, খানিক খেলা করে।

গোপাল কখনও লেখাপড়ায় অবহেলা করে না। সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে, বাড়ীতে তাহা ভাল করিয়া পড়ে; পুরাণ পড়াগুলি দুবেলা আগাগোড়া দেখে। পড়া বলিবার সময়, সে সকলের চেয়ে ভাল বলিতে পারে।

গোপালকে যে দেখে, সেই ভালবাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।"

বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগে'র '২০ পাঠে' বিদ্যাসাগর রাখালের কথা লিখেছেনঃ

"গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। সে বাপ মার কথা শুনে না; যা খুসী তাই করে; সারা দিন উৎপাত করে; ছোট ভাই ভগিনীগুলির সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে দেখিতে পারেন না।

রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে; মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। আর আর বালকেরা পাঠশালায় গিয়া পড়িতে বসে। রাখালও দেখাদেখি বই খুলিয়া বসে; বই খুলিয়া হাতে করিয়া থাকে, এক বারও পড়ে না।

লেখা পড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ। সে এক দিনও মন দিয়া পড়ে না; এবং এক দিনও ভাল পড়া বলিতে পারে না। গুরু মহাশয় যখন নূতন পড়া দেন, সে তাহাতে মন দেয় না, কেবল এদিকে ওদিকে চাহিয়া থাকে।

খেলিবার ছুটী হইলে, রাখাল বড় খুসী। খেলিতে পাইলে, সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময় সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে; এ কারণে গুরুমহাশয় তাহাকে সতত গালাগালি দেন।

ছুটী হইলে, বাড়ীতে গিয়া, রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে কিছুই ঠিকানা থাকে না। কোনও দিন পাঠশালায় ফেলিয়া আইসে; কোনও দিন পথে হারাইয়া আইসে। রাখালের পিতা, এক মাসের ভিতর, চারিবার বই কিনিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এবার বই হারাইলে আর কিনিয়া দিবেন না।

রাখালকে কেহ ভাল বাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না।"

এই গোপাল-রাখালের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেনঃ

"বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন তিনি তাহার

ঠিক উল্টা করিয়া বসিতেন।...নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাশ করিয়া ভাল চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচী-মাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। 'রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।' কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতি-

কূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ রক্ষা।..."

শব্দের পর শব্দ গেঁথে বিদ্যাসাগর কত সুন্দর ছবি 'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগে' এঁকে রেখেছেন: "বড় গাছ। ভাল জল। লাল ফুল। ছোট পাতা।...জল পড়ে। মেঘ ডাকে।...কাল পাথর। সাদা কাপড়।... কপাট খোল।...কাক ডাকিতেছে। পাখী উড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে। গরু চরিতেছে। জল পড়িতেছে। ফল ঝুলিতেছে।"

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ 'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ' পড়েছেন। বড়ো হয়েও তিনি সে-বইয়ের কথা ভুলতে পারেননি। উত্তর-কালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগে'র কথায় একটা গল্প এসে যাচ্ছে। দুই বিদ্যাসাগরের নামে গল্প। গল্পের মতো, কিন্তু ঠিক গল্প নয়। সত্য ঘটনা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

চন্দ্রমোহন নামে একটি বামুনের ছেলে নদীয়া জেলার কোনো গ্রামের জমিদারবাড়িতে চাকরি পেয়েছে। রান্নাঘরে কাজ করবে। দিব্যি চালাক-চতুর ছেলেটি। কাজকর্ম করে। জমিদারবাড়ির সকলেই চন্দ্রমোহনকে খুব পছন্দ করেন।

জমিদারবাড়ির মহিলাদের ধরাধরি করে কাজের ফাঁকে চন্দ্রমোহন খানকয়েক বাঙলা বই পড়ে ফেলল। বই-টই পড়ে চন্দ্রমোহনের ইচ্ছা হল, লেখক হতে হবে, একখানা বই লিখে ফেলতে হবে।

কিছু কাগজ জোগাড় করে চন্দ্রমোহন একখানা খাতা বেঁধে নিল। পয়লা পাতায় বড়ো-বড়ো অক্ষরে অ-আ লিখল। পর-পর কয়েক পাতা জুড়ে নানারকম কারিকুরি করল। তারপর পাতার পর পাতায় দিনের পর দিন লিখে যেতে লাগল পাড়ার যাবতীয় সংবাদ। একদিন গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হল। হ্যাঁ, মলাটে চন্দ্রমোহনের স্বহস্তে অঙ্কিত ছবিও আছে একখানা। আর বইখানার নাম কী? খাতার যথাস্থানে চন্দ্রমোহন লিখেছে:

"বর্ণপরিচয়-প্রথম ভাগ চন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগর প্রণীত।"

হঠাৎ কি করে খাতাখানা বাড়ির কর্তাদের চোখে পড়ে গেল। হেসে আকুল সকলে। সকলেই একসঙ্গে বসে "চন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ" আদ্যন্ত পড়ে ফেললেন। সকলেই একবাক্যে বললেন—তুই যে রাতারাতি বিদ্যাসাগর হয়ে গেলি রে চন্দর!

এই বাড়িতে সেদিন থেকে চন্দ্রমোহনের নামই হয়ে গেল 'বিদ্যাসাগর'। দিনের পর দিন গেল, এই বাড়ির সকলেই ভুলে গেলেন

স্বামী বিবেকানন্দ

যে এই 'বিদ্যাসাগরে'র নিজের একটা নাম আছে। সকলের মুখেই বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর।

জমিদারবাবু সপরিবারে কলকাতায় এসেছেন একবার। আমাদের এই বিদ্যাসাগর তখন জমিদারবাবুর বাড়ির রান্নাঘরের ঠাকুর, অতএব তাকেও আসতে হল কলকাতায়। সেবার একটা কাণ্ড হল।

আসল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে জমিদারবাবুর চেনা-জানা আছে। সেদিন বিদ্যাসাগর জমিদারবাবুর বাড়িতে এসেছেন। জমিদারবাবু বাড়ির সকলকে আড়ালে বললেন—আজ কেউ চন্দ্রমোহনকে 'বিদ্যাসাগর' বলে ডেকো না। আজ আসল বিদ্যাসাগর এসেছেন। খবরদার।

কিন্তু বহুকালের অভ্যাস এক মুহূর্তে যাবার নয়। আসল বিদ্যাসাগর মাঝে-মাঝে ফিসফিসানি শুনেছেন: বিদ্যাসাগর, ডালে নুন হয়নি কেন? বিদ্যাসাগর। চুপ, চুপ। ও বিদ্যাসাগর, হাত চালিয়ে নাও, হাঁ করে দেখছ কী। চুপ, চুপ। ও বিদ্যাসাগর—। চুপ, চুপ।

আসল বিদ্যাসাগর কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। শেষপর্যন্ত তিনি জমিদারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি মশাই?

জমিদারবাবু তখন সহাস্যে আদ্যন্ত বললেন বিদ্যাসাগরকে। শুনে বিদ্যাসাগর হাসতে লাগলেন। ডেকে আনলেন চন্দ্রমোহনকে। সামনাসামনি বসালেন। বললেন—তা বেশ হয়েছে। তুমিও বিদ্যাসাগর, আমিও বিদ্যাসাগর। আজ থেকে তুমি আমার মিতা।

১৮৫৫ সালের জুনে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়—দ্বিতীয় ভাগ' বেরুল। সেই বই থেকে 'চুরি করা কদাচ উচিত নয়' নামে একটি রচনা তুলে দিচ্ছি:

"না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না। বালকগণের উচিত, কখনও চুরি না করে। পিতা মাতা প্রভৃতির কর্তব্য, পুত্র প্রভৃতিকে কাহারও কোনও দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে, তাহাদের শাসন করেন এবং চুরি করিলে কি দোষ হয়, তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

একদা, একটি বালক, বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের একখানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশবকালে, ঐ বালকের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তকখানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন! তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে কহিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তকখানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যত দিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই, চুরি করিত। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটীতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক হইত, এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছু কাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহুকাল চোর হইয়াছে এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইল। বিচারকর্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাঁসী হয়, তথায়

লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত, একবার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন এবং ভুবনকে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন কহিল, মাসি! এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাহার একটি কান কাটিয়া লইল। পরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, মাসি! তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার হইল।*"

১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' বেরল। বিদ্যাসাগর বিদেশী কয়েকটি নীতিগর্ভ গল্পের অনুবাদ করেছেন : 'কথামালা' সেই অনুবাদের সংকলন।

'কথামালা' থেকে 'বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক' নামে একটি গল্প তুলে দিচ্ছি:

"এক বৃদ্ধা নারীর চক্ষু নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল; এজন্য, তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। নিকটে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আমার চক্ষুর দোষ জন্মিয়াছে, আমি কিছুই দেখিতে পাই না; আপনি আমার চক্ষু ভাল করিয়া দেন; আমি আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব; কিন্তু, ভাল করিতে না পারিলে, আপনি কিছুই পাইবেন না।

চিকিৎসক, বৃদ্ধার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পর দিন, প্রাতঃকালে, তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধার গৃহে নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ দেখিয়া, চিকিৎসকের অতিশয় লোভ জন্মিল। তিনি স্থির করিলেন, প্রতিদিন, ইহাকে দেখিতে আসিব এবং এক একটি দ্রব্য লইয়া যাইব। এজন্য, যাহাতে শীঘ্র তাহার পীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ঔষধ না দিয়া, কিছুদিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন। পরে একে একে সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়া, তিনি রীতিমত ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধার চক্ষু অল্প দিনেই পূর্ববৎ নির্দোষ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, তাহার একটিও নাই; অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, চিকিৎসক, একে একে, সমুদয় লইয়া গিয়াছেন।

এক দিন চিকিৎসক বৃদ্ধাকে কহিলেন, আমার চিকিৎসায় তোমার পীড়ার শান্তি হইয়াছে। পীড়ার শান্তি হইলে আমায় পুরস্কার দিবে বলিয়াছিলে; এক্ষণে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া আমায় বিদায় কর। বৃদ্ধা চিকিৎসকের আচরণে, অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এজন্য কোনও উত্তর দিলেন না। চিকিৎসক, বারংবার চাহিয়াও পুরস্কার না পাইয়া, বৃদ্ধার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন। বৃদ্ধা বিচারকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং চিকিৎসককে স্পষ্ট বাক্যে চোর না বলিয়া, কৌশল করিয়া বলিলেন, কবিরাজ মহাশয় যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যদি আমার চক্ষু পূর্ববৎ হয়, কোনও দোষ না থাকে, তবে উঁহাকে পুরস্কার দিব। উনি কহিতেছেন, আমার চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে; কিন্তু আমি যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে আমার চক্ষু এখনও নির্দোষ হয় নাই। কারণ, যখন আমার চক্ষুর দোষ জন্মে নাই, আমার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, সে সমস্ত দেখিতে পাইতাম। পরে চক্ষুর দোষ জন্মিলে সে সকল দেখিতে পাই নাই; এখনও সে সব দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে উঁহার চিকিৎসায় আমার চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে, আমার সেরূপ বোধ হইতেছে না। এক্ষণে আপনাদের বিচারে যাহা কর্তব্য হয়, করুন।

বিচারকেরা, বৃদ্ধার উত্তরবাক্যের মর্ম বুঝিতে পারিয়া, হাস্যমুখে, তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং যথোচিত তিরস্কার করিয়া, চিকিৎসককে বিচারালয় হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন দুঃখ করে প্রিয়নাথ সিংহকে বললেন—দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর রে। ছোটো ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।

প্রিয়নাথ বললেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তো অনেকগুলি বই আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ উঁচুগলায় হেসে উঠলেন। বললেন—'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'—ওতে কোনো কাজ করে না। ওতে মন্দ বই ভালো হবে না।

স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের মুখ থেকে নির্গত হলেও বিদ্যাসাগরের রচনা সম্পর্কে এই উক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষাযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া বিদ্যাসাগরের রচনা সম্পর্কে এরকম অশ্রদ্ধেয় উক্তি আর কেউ উচ্চারণ করেননি।

ক্রমশ

---

* এই রচনাটি সম্পর্কে ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "এটিকে আমরা যথার্থ ছোটগল্পও বলতে পারি।...ভুবনের গল্প বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা নয়। এটি টমাস জেমস অনূদিত AESOP'S FABLES-এর অন্তর্গত 'The Thief and His Mother'-গল্পের প্রায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।" (দেবকুমার বসু সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৫)।

শিল্পী রমেন কুণ্ড সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করে শিল্পী বিভিন্ন সরকারী বিদ্যালয়ে চিত্রকলা শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি বালীগঞ্জ সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জলরঙ ও তেলরঙে আঁকা ১৫ খানি নিদর্শন তিনি এই প্রদর্শনীতে পেশ করেন।

শিল্পী প্রথম কয়েক বৎসর কালিম্পঙে ছিলেন, এবং তাঁর অধিকাংশ ছবিই পাহাড়ে-ঘেরা এই ছোট্ট সুন্দর শহরটিকে কেন্দ্র করে রচিত। কালিম্পঙের উঁচু-নীচু পাহাড়ী রাস্তা, ছোট ছোট সুদৃশ্য কুটীর, কমলালেবুর বাগান, এক কথায় এই শহরের নানা দৃশ্যই শিল্পী রঙ ও তুলির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ-জাতীয় ছবিগুলি রিয়ালিস্টিক রীতিতে আঁকা, যদিও কয়েকটিতে আধুনিক রচনাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 'সকালে ও সন্ধ্যায় কালিম্পঙ'-এর নাম করা যায়। শহরটি যে শিল্পী-চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল, সেটি তাঁর বিভিন্ন আলেখ্য, বিশেষ করে 'বিদায় কালিম্পঙ' ছবিখানি দেখলেই বোঝা যায়। শেষোক্ত ছবিখানি বেশ বড় পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এবং এখানি দেখে সেই শহরের একটি বিশেষ অংশ অনেকেরই মনে পড়ে যায়। প্যানেল জাতীয় এই ছবিখানি বাস্তবানুগ এবং সেই পদ্ধতিতেই আঁকা, সুতরাং সেদিক দিয়ে বিচার করলে শিল্পীর সচেতন মন ও অনুসন্ধানী চোখের প্রশংসা করতে হয়। এ-জাতীয় রচনায় প্রধান অবলম্বন রঙের বিভিন্ন স্তরভেদ; কারণ সেই স্তরভেদ মাধ্যমেই পরিপ্রেক্ষিত ও দূরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, সেদিক দিয়ে রচনাটি সুসম্পন্ন হয়নি, বিশেষ করে পৃষ্ঠভূমি ও আকাশের অংশটুকু যেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তবে যে স্থলে তিনি আধুনিক রীতি অবলম্বন করেছেন, সেখানেই তিনি সুফল লাভ করেছেন—যেমন 'পেপার বোট ডেজ' ও 'স্টিল লাইফ'। নানা রঙে ডোবান ব্রাশটি শিল্পী যেন রচনাক্ষেত্রটির স্থানে স্থানে অতি হালকাভাবে ছুঁইয়ে গেছেন—ফলে রচনাটি দেখে কোলাজের কাজ বলে অনেক সময়ে ভুল হয়। তবে জলরঙের ছবির মধ্য দিয়ে শিল্পীর যথার্থ পরিচয় পাই। বাস্তবিক, মনে হয়, এই মাধ্যমেই তিনি যেন স্বীয় বক্তব্যটুকু প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। বিশেষ করে প্রাথমিক রেখাঙ্কনের ওপর যে শিল্পীর দখল আছে, সেটা কয়েকটি রচনা দেখেই বোঝা যায়। যেমন, 'দেশবিভাগের বলি'। দেশবিভাগের পরই পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু নরনারীর জীবনে যে মর্মান্তিক অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়, তারই সামান্য আভাস শিল্পী মাত্র রেখা ও প্রতীক মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবিখানি অনেকের মনে থাকবে। হালকা রঙ মাধ্যমে কয়েক ক্ষেত্রে শিল্পী কয়েকটি বিচিত্র আকারের সৃষ্টি করেছেন —এগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পীর চিন্তাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আকার-ভিত্তিক রচনা হিসাবে এগুলি দেখতে ভাল লাগে। উদাহরণস্বরূপ 'সন্ধ্যার মায়া' ও 'ফ্যানটাসি অন গল্পগাথা'-র নাম করা যায়।

কমলালেবুর বাগান —রমেন কুণ্ড

*

শ্রীমতী শেফালী সিংহ তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে। এই শিল্পী কাগজ ও ক্যানভাসের স্থলে ছোট-বড় নানা আকারের কাঠ ব্যবহার করেছেন ও তার ওপরেই ছবি এঁকেছেন—অবশ্য রঙের ব্যবহার ত আছেই। এই প্রথায় রচিত ৪০খানি নিদর্শন প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়।

ছোট কাঠের টুকরা বা প্লাইউডের ওপর ছবি আঁকার প্রচলন নূতন নয়। গাছের সরু নরম ডালের ওপরের অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে সমতল ক্ষেত্রের ওপর আঁকা ছবির নমুনাও ইতিপূর্বে দেখেছি। ছোট-বড় নানা গাছের স্বাভাবিক ডালপালার গঠনপ্রণালীর মধ্যেও অনেক সময়ে নানা বিচিত্র আকারের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এ-হেন নানা সুন্দর ও অদ্ভুত আকার আবিষ্কার করে মিসেস

অর্জন রায় কয়েক বৎসর পূর্বে দিল্লীতে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ও সকলের প্রশংসাভাজন হন। শ্রীমতী সিংহের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমতল কাঠের স্বাভাবিক রেখা ও দানা (Texture and Grain) বজায় রেখে তারই ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ছবি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর অনুসন্ধানী চোখ কাঠের কঠিন রেখাজালের মধ্য থেকে স্বচ্ছ ও সাবলীল বিষয়বস্তু ধার করেছে এবং নানা হালকা রঙ সহযোগে তাতে নূতন রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কয়েক ক্ষেত্রে ইচ্ছামত নানা মূর্তিও রচনা করেছেন। সুতরাং শিল্পীর অনুসন্ধানী চোখ এবং ধৈর্যের প্রশংসা করি। এ-জাতীয় কাজের একটা আলংকারিক মূল্য আছে, এবং গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে এক শ্রেণীর গ্রাহকের মধ্যে এ-জাতীয় বস্তু হয়ত জনপ্রিয়তা লাভ করবে। তা হলেও কয়েকটির মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত শিল্পগুণটুকু ফুটে উঠেছে। যেমনঃ 'কনসোলেশন', 'হার্স স্মাইল', 'দি রোপ অব পার্লস' ও 'দি চ্যাটারিং ফ্যামিলি'। পূর্বেই বলেছি, মৌলিক ছবির গুরুত্ব ও লালিত্য না থাকলেও গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে এ-হেন কাজের মূল্য আছে।

*

সম্প্রতি নিখিল ভারত হস্তনির্মিত কারুকার্যসম্ভারের ত্রয়োদশ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ

শিল্পসংস্থার উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে বাংলা দেশে হাতে তৈরী নানা কারুকার্যের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সুন্দর ও বিচিত্র ও মৌলিক কারুকার্যের জন্য বাংলা দেশ ভারতবর্ষ তথা বিদেশের শিল্পক্ষেত্রে সুপরিচিত। বিশেষ করে এ বিষয়ে বাংলার ঐতিহ্য ও অবদান অনস্বীকার্য। বস্তুতপক্ষে, বাংলা দেশের বিভিন্ন শহর ও বিশেষভাবে অপরিচিত গ্রামে সকলের অলক্ষ্যে অজ্ঞাত কারুশিল্পীগণ বিভিন্ন মাধ্যমে যে কত রকমের বিচিত্র ও অপূর্ব বস্তু তৈরি করে চলেছেন, তা দেশবাসী জানতে পারেন এ-হেন প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। সুতরাং দেশের জনসাধারণকে এ সুযোগ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। তবে একটা কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন বোধ করি। উদ্যোক্তাদের মনে রাখা উচিত যে, আধুনিক যুগে সজ্জাকরণও প্রদর্শনীর একটি বিশেষ অঙ্গ; কারণ, এর মধ্য দিয়ে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রদর্শিত বস্তুসম্ভারেরও রূপ ও ঐশ্বর্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মাত্র একটি গ্যালারীতে বাংলা দেশে তৈরী বিভিন্ন বস্তু বাজারের দোকানের মত পেশ করা হয়েছিল—তাতে রুচি বা সজ্জাকরণের বিশেষ কোনও পরিচয় পাইনি। এই প্রসঙ্গে দিল্লীতে আয়োজিত অন্যান্য রাজ্য সরকারের প্রদর্শনীগুলির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সেসব ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ সজ্জাকরণের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্য দেন। উদ্যোক্তাগণ যদি অন্ততঃ আর একটি গ্যালারীও সংগ্রহ করে যাবতীয় সামগ্রীসম্ভার সুরুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে রাখতেন, তা হলে প্রদর্শনীটিতে স্থানসংকুলান হত ও এটি সত্যই আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। কাঁসা-পিতলের জিনিস থেকে শুরু করে বেত ও বাঁশ, চীনামাটি, পোড়ামাটি, চামড়া, হাতীর দাঁত, শিং, মাদুর, পুতুল ও কাঠ-খোদাইয়ের নানা নিদর্শন প্রদর্শনীতে ছিল। তা ছাড়া, দার্জিলিং ও কালিম্পঙবাসী পাহাড়ী শিল্পীদেরও হাতের কাজের নানা নমুনা ছিল। বিশেষ করে শোলার তোরণ, চাঁদমালা ও অন্যান্য কয়েকটি চমৎকার বস্তুর কারুকুশলতার জন্য বারুইপুরের পরীক্ষারত কর্মকেন্দ্রের শিল্পীগণ অশেষ প্রশংসা দাবি করতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শোলা শিল্পে প্রতিবেশী মধ্য রাজ্য ওড়িশার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। দিল্লী 'ক্র্যাফট্‌স মিউজিয়মে রক্ষিত এক বিরাট শ্রীদুর্গা মূর্তি, বিশেষ করে চালচিত্রের সূক্ষ্ম ও অপূর্ব কাজ দেখে শিল্পীদের কারুকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

—চিত্রপ্রিয়

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

বাহান্ন

অচিন্দাও বোধ হয় বয়স্ক দম্পতিকেই দেখেছিলেন। হয়তো একই কথা ভাবছিলেন। আমি ওঁর দিকে তাকাতে যেন খুব সহজ ভাবেই বলেন, 'পরের দিনই চলে গেলাম কলকাতা। কেন যে গিয়েছিলাম, তা ঠিক করে বলতে পারি না। চুপ করে থাকতে পারছিলাম না। এখানে বসে থাকতে পারছিলাম না। তখন মাথার মধ্যে একটা কথারই ঘুরপাক, বাহুবল। কী বলতে চেয়েছে নীরজা বাহুবলের কথা বলে। ওকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব ওদের বাড়ি থেকে? ওকে হরণ করে নিয়ে আসব? পরীক্ষার চিন্তা মাথায় উঠে গিয়েছিল।

কলকাতায় আমার নিজের আত্মীয়ের বাড়ি ছিল। বাবা মা বরাবর দেশের বাড়িতেই থাকতেন। আত্মীয়দের অবাক করে দিয়ে সেখানে উঠলাম। কৈফিয়ত হল, একটু দরকারে হঠাৎ কয়েক দিনের জন্যে আসতে হয়েছে। কিন্তু কলকাতা গেলে কী হবে, কোনদিন তো নীরজাদের বাড়ি যাই নি। ঠিকানা দেখে বাড়ি চিনে নিতে ভুল হয় নি। তারপর? নিজেকে যে কী রকম হতচ্ছাড়া মনে হয়েছিল, সে কথা এখন বলে বোঝাতে পারব না। বাড়িটাই না-হয় চিনলাম, ঢুকব কেমন করে, সেটাই তো ভাবনা। বাহুবলটা প্রকাশ করব কোথায়।' বলে হঠাৎ হেসে ওঠেন অচিন্দা। খানিকক্ষণ ধরে ফুলে ফুলে হাসেন। আমি যেন কেমন স্থির নিশ্চল হয়ে যাই। আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করতে থাকে। হাসি যখন থামে, দু হাত দিয়ে সারা মুখটা মোছেন। বলেন, 'আসলে অপমানের ভয়ে ঢুকতে পারছিলাম না। নীরজার বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনেই পরিচয় হয়েছিল, অতএব চেনা লোক। তবু তাঁর কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করতে গেলেই যে একটা প্রচণ্ড গোলমাল লেগে যাবে, বুঝতে পারছিলাম। হয় তো তার ধাক্কা গিয়ে শান্তিনিকেতনেও লাগতে পারে। তাই কেবল, বাড়িটার আশে-পাশে দু' দিন ধরে টহল দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, কোনরকমে নীরজার সঙ্গে যদি একবার দেখা হয়ে যায়। সে কি একবার বাইরে বেরুতে পারে না! একবার কি ছাদেও উঠতে পারে না!

তখন তবু ওরকম ভাবতে পেরেছিলাম। এখন ভাবি, অমন পাগলের মত সেদিন একটা বাড়ির দরজার কাছে কেমন করে দু'দিন দাঁড়িয়েছিলাম। ভেবে দেখেছিলাম, একমাত্র নাটকের নায়কের মত বাড়িতে ঢুকে চেঁচিয়ে বলতে পারতাম "নীরজা, আমি এসেছি।" তারপরেই ওর বাবার আবির্ভাব, বিতাড়ন, গর্জন, প্রতি-গর্জন, নীরজাকে আহ্বান সে এক কাপড়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু মুশকিল হল, জীবনে মনে কোথাও অমন নাটুকে রুচি ছিল না।

শেষ মুহূর্তে যখন স্থির করে ফেললাম, ওদের বাড়ি যাব, শান্তভাবে ওর বাবার সঙ্গে দেখা করব, তখনই মনে পড়ে গেল, ওদের বাড়িতে একটা টেলিফোন আছে। তোমাদের এখনকার মত অটোমেটিক নয়, কলকাতার ম্যানুয়াল লাইন তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। গাইড দেখে, ডিপি কে দিয়ে ওদের নম্বরটা খুঁজে বের করেছিলাম। ওর বাবার নামেই ফোন ছিল। তবে কিনা তার" তোমাদের যুগ নয়, আগেই বলেছি। অপারেটারের কাছে নাম্বার চেয়ে জিভটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গলার এক ফোঁটা স্বর ছিল না, দরদরিয়ে ঘাম ঝরছিল। "হ্যালো" বলে যিনি ফোন ধরেছিলেন, তিনি যে নীরজার বাবা, তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করবার পরে আমি হঠাৎ বলে উঠেছিলাম, অনু[illegible] একটু, নীরজাকে ডেকে দিতে হবে।

বলেই একটা প্রচণ্ড চিৎকারের ভয়ে রিসিভারটা কানে চেপে ধরেছিলাম। কিন্তু বুঝলে ভাই, সংসারটা বড় ঘোরালো, মানুষ তার চেয়ে ঘোরালোতর। তিনি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, একটু অবাক হয়ে, ভারী মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলেন "কে, আমাদের শান্তিনিকেতনের অচিন্ত্য নাকি?" তখন আমারই যেন একটু বেকুব অবস্থা। বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত শান্ত শালীনভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কলকাতায় এসেছ নাকি? কবে এলে?" সে জবাব দিলাম। তিনি খুব চিন্তিত হয়ে জানতে চাইলেন, "এই পরীক্ষার সময় তুমি কলকাতায়, আপদ-বিপদ কিছু ঘটে নি তো?" বললাম, "সে রকম কিছু না, নীরুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছিলাম।" তখন যেন কেমন একটু সাহস ফিরে আসছিল। তিনি বললেন, 'ও, আচ্ছা, তুমি একটু ধর, আমি দেখছি খুকুন কোথায়, একটু ধর।'

'খুকুন হল নীরজার বাড়িতে ডাক নাম। ও নামে ডাকবার অধিকারটা সে পরিবারের বাইরে আমাকেই দিয়েছিল। অনেক দিন পরে সেই নামটা শুনে যেমন মনটা টলমলিয়ে উঠেছিল, তেমনি ওর বাবার ব্যবহারে বিস্ময়ে প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছিলাম। সে যেন আগুনের ভয়ের কাছে জলের মত মনে হয়েছিল। ঝড়ের বদলে শান্ত স্তব্ধতা। নীরজার চিঠির সঙ্গে যেন তাঁর কথা, গলার স্বরের কোন মিল ছিল না। কিন্তু সময় চলে যাচ্ছিল, কতক্ষণ গিয়েছিল, খেয়াল করিনি। তবে বেশ খানিকক্ষণ। একসময়ে হঠাৎ মনে হয়েছিল, তাই তো, কেউ ধরে না যে! ছেড়ে দিল নাকি? যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন ওপারে খুট্ করে একটা শব্দ হল, আর আমার শরীরে মনে ঝংকার দিয়ে বেজে উঠল, "হ্যালো!"

শুনেই চিনতে পারলাম, নীরু—নীরজা,

কিন্তু গলার স্বরটা বড় নিচু, ভেজা ভেজা। যেন সেইমাত্র কেঁদেছে ও। বলে উঠলাম "আমি অচিন, আমি এসেছি।''

বলতে বলতে অচিনদা আবার ফুলে ফুলে হেসে উঠলেন। যেন কী এক হাসির গল্প বলছেন। হাসতে হাসতেই আস্তে একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'আমার সেই বলার ভঙ্গিটা মনে করে তারপরে একলা একলা অনেক দিন হেসেছি। আমি আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম, টেলিফোনের নিভৃতিটা আসলে নিভৃতি নয়। নীরু যেখান থেকে কথা বলছে, সেই ঘরে ওর বাবা মা দাদা ওকে ঘিরে আছেন। আমার কথা বলার যেমন স্বাধীনতা, ওর তা নেই। কিন্তু ওধারে ও কী বলেছিল জান? যেন প্রায় অবাক হয়ে কোনরকমে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন?" কেন? আমার হাত কেঁপে গেল, গলাও। মুহূর্তে যেন অন্ধকার দেখলাম। এ কোন্ নীরজা কথা বলছে আমার সঙ্গে? আমি আবার বলে উঠলাম, "আমি, আমি অচিন বলছি, আমি তোমার জন্য কলকাতায় এসেছি।" কয়েক মুহূর্ত কোন জবাব নেই। আমি আবার বলে উঠলাম, "নীরু, তুমি বাহুবলের কথা লিখেছ, আমি তাই এসেছি।" একটু পরে ওপার থেকে শব্দ এল, "ও!" যেন নীরজা বড় ক্লান্ত, অসুস্থ, দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছে না। তারপরেই হঠাৎ বলে উঠল, "তুমি আমাদের বাড়িতে এস একবার।" বলেই লাইনটা ছেড়ে দিল। আমি রিসিভারটা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন্ কথা থেকে যে কোন্ কথা হল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। নীরজাকে যেন অচেনা লাগল একটু পরেই, হঠাৎ খেয়াল হল, ও আমাকে ওদের বাড়ি যেতে বলেছে। মনে হতেই রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। মনে হল, নাকচ নয়, আমার আশা আছে। নিশ্চয়ই আছে, নইলে নীরু ওদের বাড়ি যেতে বলবে কেন। দেরি না করে তখনই আমি ওদের বাড়ি চলে গেলাম। এখনো চোখের সামনে ভাসছে, দু দিকে দুটো গ্যারেজের মাঝখানে গেট। গেটটা খোলাই ছিল। ঠেলে ভিতরে ঢুকে সামনে বারান্দাওয়ালা একতলা বাড়ি। দরজা জানালা সবই ভিতর থেকে বন্ধ। বারান্দার দু পাশে আরো দুটো ঘরের দরজা, সেগুলোও বন্ধ। সামনের দরজার গায়েই ঠকঠক করে টোকা দিলাম। তখন শুধু কানে বাজছে, "তুমি আমাদের বাড়িতে এস একবার।" নীরু ডেকেছে, আর আমার ভয় নেই, কাউকে আমার ভয় নেই। শুধু ভাবছি, দরজা খুলেই নীরজা আমাকে বলবে, "অচিনদা, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।" একবারও ভেবে দেখি নি, কোথায় নিয়ে যাব।

'দরজা খুলছে না দেখে আবার টোকা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। নীরজা নয়, বুঝতে পারছ, ওর বাবা। আমাকে দেখেই সাদরে ভিতরে ডাকলেন, "এস, এস অচিন, এস বস।" চিনতেন তো আমাকে আগে থাকতেই। ব্রিটিশ আমলের সরকারী অফিসার, ওদের ব্যাপারই আলাদা। গায়ে গাউন, পরনে পায়জামা, ঢিলেঢালা আরামে সকাল কাটাচ্ছিলেন। আপ্যায়নটা একটু বেশী বেশী মনে হল, তার ওপরে, বুঝলে ভায়া, বাঙাল তো আমি। ঘরের সাজগোছের ঝকমকে কেতা-কায়দা দেখে কেমন যেন মিইয়ে যেতে লাগলাম। আমি একটা সোফায় বসতে উনিও বসলেন। বললেন, "একটু চা দিতে বলি কেমন?" আমি বললাম, "না, থাক। না।" আমার লক্ষ্য তখন বাড়ির ভিতরের দিকের দরজায়। কিন্তু সেখানে এত মোটা পর্দা যে, কিছুই দেখা যায় না। ভিতরের দিকে জানালাগুলো খোলা, কিন্তু সেখানেও সেই মোটা পর্দা। সবই এত চুপচাপ, বাড়ির ভিতরে লোক আছে বলে মনে হয় না।

'নীরজার বাবা বললেন, "না, না, থাকবে কেন, একটু চা খাও।" বলে চাকরকে ডাকলেন। চাকর এসে পর্দা সরিয়ে চায়ের হুকুম নিয়ে চলে গেল। এক পাশে পিয়ানোর ওপরে টাইমপিস ঘড়ি। সেখানে টিকটিক শব্দ ছাড়া কিছু নেই। আমি কিছুই বলি না। একটু পরে উনি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কলকাতায় কোথায় উঠেছি। পড়াশুনো কেমন চলছে। পাস করলে কী করব, এইসব নানান সাত-সতেরো, যার অর্থ হল সময় কাটানো। আসল কথায় কেউ নেই। ইতিমধ্যে চা এসে গেল, তার সঙ্গে কিছু টা-ও বটে, তবে খেতে ইচ্ছে করল না। চা-টাই কোনরকমে শেষ করলাম। তারপরে দেখলাম, ভদ্রলোকের মুখের আকৃতি আর রঙ বদলাতে লাগল। হঠাৎ বললেন, "তোমার কথা আমি সব শুনেছি, মানে খুকুনিকে নিয়ে যেসব কথাবার্তা হয়েছে। দেখ, তুমি বোকা নও, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, আমাদের মনোভাব বুঝতে তোমার কোন অসুবিধে হওয়া উচিত নয়। তোমাকে আমি সমবেদনাও জানাচ্ছি, কেননা খুকুনিও একটু দোষ করে ফেলেছে, তোমাকে ভুল বোঝার অবকাশ দিয়েছে, আসলে ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব।"

'অসম্ভব শব্দটাকে এমন করে বললেন, যেন তারপরে আর কোন কথাই থাকতে পারে না। আমি তখন ঘামতে আরম্ভ করেছি, কথা বলতে পারছি না। অপমান আর প্রত্যাখ্যানের ঠিক এ চেহারাটা আমার দেখা বা জানা ছিল না। চেঁচামেচি করলে, তাড়িয়ে-টাড়িয়ে দিলে, তবু যা হোক, তখুনি কিছু বলতে পারতাম। তিনি সেই সুযোগে আমাকে আরো বুঝিয়ে যেতে লাগলেন, এসব ভাবনা ছেড়ে, ভালভাবে লেখাপড়া শেষ করে নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলি যেন। কত ভাল মেয়ে আমার জীবনে তখন আসবে, তখন নাকি আমি নিজেই এসব কথা মনে করে লজ্জা পাব, হাসব।'

বলতে বলতে সত্যি অচিনদা হেসে ওঠেন। কে যেন কাঠের আগুনে উসকে দেয়। একটা বড় শিখা দপ করে জ্বলে ওঠে। পশ্চিমা বাতাসে কাঁপে থরথর। মনে হয়, নাচের আসর ঝিমিয়ে গিয়েছে। সবাই যেন নেই। কারা কেউ বা নাচতে নাচতে হারিয়ে গিয়েছে বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে। আমি দেখি, আগুনের আলো কাঁপে অচিনদার মুখে। তিনি হাসেন আপন মনে। এখন বোধ হয় তাঁর শ্রোতার কথা ওঁর মনে নেই। আর নিজে নিজেই যে বলেন, 'তা হ্যাঁ, হাসি বইকি, এখন হাসি, খুব হাসি, তবে লজ্জা পাই কিনা, বুঝতে পারি না।'

হঠাৎ একটু থামেন, তারপরে ঘাড় নেড়ে বলেন, 'না, লজ্জা পাই না। কী পাই, তা জানি না, তবে হাসি। তারপরে তিনি যখন কথার পাট একেবারে চুকিয়ে দিতে চাইলেন, "অতএব এটা সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছ" তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" তিনি শক্ত মুখে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু রাগ করলেন না, হেসে ফেললেন। বললেন, "তা হলে আর তোমাকে এতক্ষণ কী বললাম। যেসব কারণে সম্ভব নয়, সবই তোমাকে বলেছি।"

'কিন্তু আমার যুক্তি অন্যরকম। তাই বললাম, "কিন্তু নীরজার তো আপত্তি নেই।"

'তিনি আবার গম্ভীর হলেন, মুখ আরো শক্ত হল। আমার মনে হল, বাড়ির ভিতরের জানালা এবং দরজার পর্দার কাছে কে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে আড়ালে। অর্থাৎ কথাবার্তার শ্রোতা ছিল। নীরজার বাবা এবার কঠিন। গলায় বললেন, "জানি, সে লজ্জার কথাটাও জানি। কী করে এরকম ঘটল, জানি না; তবে এ বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের আপত্তি-সম্মতিটা বড় কথা নয়, অভিভাবকদের কথাই কথা। আর, খুকুনির বিয়ের কথাবার্তা অনেক আগে থেকেই অন্য জায়গায় পাকা হয়ে আছে, এখন এসব কথা নিরর্থক। আর..." এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। শক্ত মুখে বারেবারেই মুঠি পাকাতে লাগলেন। আসলে তিনি রাগ চাপছিলেন। তারপরে মুখ খুললেন, "আর তারপরেও যদি এটা নিয়ে কোনরকম বাড়াবাড়ি কর, তাতে আর কিছু লাভ হবে না। আমাদের পরিবারের কিছু দুর্নাম হবে, লোকে নানান কথা বলবে। তা হলে আমিও ব্যাপারটা ছেড়ে দেব না, বুঝতেই পারছ—ফ্যামিলি স্ক্যান্ডাল মেনে নিতে পারি না কিছুতেই। তবে তোমাকে এটুকু বলতে পারি, তোমার সঙ্গে খুকুনির

কিন্তু কোন মতেই হতে পারে না, এইটুকু ভেবে অন্তত তুমি যেন সামলে নিয়ে কোনরকম কেচ্ছা-কেলেংকারি কোরো না।" বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আবার বললেন, "তুমি বসো, আমি খুকুনিকে ডেকে দিচ্ছি।"

'তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি ভেবেছিলাম তারপরেও নীরজাকে দেখতে পাব আশা করি নি। এবার হয় যুদ্ধ, নয় পলায়ন। কিন্তু উনি নিজেই খুকুনিকে ডেকে দিচ্ছেন বলায় আমার ক্রোধ বেড়ে উঠতে পারল না। তিনি যেন আমাকে চমকে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, আর আমি—আমি যেন এক অপরূপ দর্শনের আশায় দরজার দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। বুকটা ধড়ক-ধড়ক করতে লাগল। প্রতিটি পল যেন বিরাট, শেষ হতে চায় না। পর্দার নিচে দিয়ে, ওপাশে কেউ কেউ যাতায়াত করছে মনে হল।

'সময়ের হিসাব দিতে পারি না, দেখলাম পর্দা উঠল, নীরজা ঢুকল। ঢুকে দরজার কাছেই দাঁড়াল। একবার আমার দিকে তাকাল, তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিল। দেখলাম, ওর চোখ তখনো লাল। নাকের ডগা লাল। সমস্ত মুখটা ভার, এই মাত্র চোখ মুছে এসেছে যেন। একটা বাসী বিনুনি পিঠে এলানো, জামা-কাপড় তেমন ফিটফাট নয়, বোধ হয় শুয়ে ছিল বা বসে ছিল। এরকম অবস্থায় ওকে একবারই দেখেছিলাম, যেদিন ওকে শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে আসে, তার আগের দিনের শেষ দেখায়।

'আমার চেতনা ছিল না যে, দরজা জানালার পর্দার ওপারে অনেক শ্রোতা, অনেক সাক্ষী। আগেকার মতই, কাছে যাবার জন্যে আমি ব্যগ্র। আমি উঠে দাঁড়ালাম, কোনরকমে ওকে একবার ডাকতে পারলাম। তার জবাবে ও আমার দিকে না তাকিয়ে দরজা আর জানালার দিকেই চোখের একবার দেখে নিল। তখনই আমি টের পেলাম, ওখানে সবাই রয়েছে। নীরজা পায়ে পায়ে কাছে আসতে আসতে বলল, "বসো।"

'বসতে বলল, কিন্তু ওর গলার স্বর খুব স্থির নয়। চোখও পরিষ্কার নয়, একটু যেন ঝাপসা মতই। আমি যন্ত্র-চালিতের মত বসলাম। ও একটু দূরে বসল, বসেই রইল চুপ করে। আমি থাকতে পারলাম না, বলে উঠলাম, "তুমি আমাকে মঙ্গলের কথা লিখেছিলে, আমি তাই এসেছি।"

'তার জবাবে ও মুখ না তুলেই আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগল। সেইভাবেই বলল, "লিখেছিলাম, কিন্তু তা সম্ভব নয়।" বলে ও আমার দিকে তাকাতেই ওর চোখে জল এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে লাগল।'

অচিনদা থামলেন। এখন আর হাসেন না। কোন্ দিকে তাকিয়ে আছেন, বুঝতে পারি না। ভুরুর ঢাকায় চোখ দেখতে পাই না। এখন যেন অনেকটা ভাবলেশহীন মুখে নিবে যাওয়া চুরুটে বার কয়েক টান দেন। ওদিকে মনে হয়, নাচের আসরটা আশেপাশের অন্ধকারে চলে গিয়েছে। জীবন কেন বিচিত্র, তার জবাবে শুনি, অচিনদা যখন নীরজার কান্নার কথা ভাবেন, তখন বাঁশঝাড়ের কোথায় যেন রঙ্গিণীর খিলখিল হাসি বেজে ওঠে। বুড়ো শুণ্ডি ঝিমোয়। মাধরি বা কোথায়! নরোত্তমকেও দেখি না। অথচ টের পাই, সবাই যেন আশেপাশেই আছে।

অচিনদা নেবানো চুরুট আর ধরাবার চেষ্টা করেন না। বলেন, 'ইচ্ছে হল, উঠে নীরুর কাছে যাই। পারলাম না, কারণ মনে হল, অনেক চোখ আমাদের দেখছে। কোন দিন তো কারুর সামনে ওর কাছে গিয়ে হাত ধরিনি। আর, সাহিত্যিক তারার অজানা নেই, ছেলেরা কখনো কাঁদে না। তবে নিরুর ঘাড় নাড়া, কেঁদে ওঠা দেখে, কথা শুনে, হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম, ঝড়ে আমার দুয়ার ভাঙা, বুক-জোড়া অন্ধকার। তবু ডাক দিলাম, "নীরু।"

'ডাক শুনে নীরজা একটু স্থির হল। আঁচলে চোখ মুখ মুছল। একবার কোন-রকমে আমার দিকে তাকাল। মুখ নিচু করেই বলল, "কথাটা লিখেছিলাম এক মন নিয়ে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তার পরিণতি ভাল হবে না। তোমার জীবন ক্ষতি হবে।"

'আমি যেন একেবারে অসহায় ছেলে-মানুষের মত বলে উঠলাম, "তা হলে কী হবে নীরু?" ও চুপ করে রইল। আমি আবার বললাম, "তুমি আমাকে আসতে বললে, মনে করেছিলাম, তবে বুঝি সব শুভ।"

'নীরজা ঘাড় নেড়ে বলল, "না। ওরা টেলিফোনেই তোমাকে সব কথা বলতে চেয়েছিল। আমি তা পারি নি। আমি তোমাকে চলে আসতে বলেছি হঠাৎ, তাতে ওরা খুশী হয় নি। কিন্তু আমি—আমি একবার না ডেকে পারলাম না।"

'জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" নীরজা একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে তাকাল। আমার চোখের দিকে। তারপরে বলল, "আমার সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞেস কোরো না, হয় তো এই শেষ কথা, এই শেষ দেখা।" কথাটা শোনা মাত্র বাতি যেন একেবারে নিভে গেল। এখন বলতে পারি তার, তখন কথা শেষ, বেহাগের সুর বেজে উঠেছে, এবার বিদায়। কিন্তু ব্যাপারটা তো তেমন সোজা নয়। নীরজার চোখ ভেসে গিয়েছে, আমার যে কোথায় ভাসছে, জানি না। কতখানি হারিয়েছি, তার হিসাবও জানি না। তখন ভাব অ-ভাবের মাঝে একটা আচ্ছন্নতা। কেবল এইটুকু বলতে পারি। নীরুর ওপর রাগ হয় নি, ওকে দোষ দিয়ে নালিশের কথা মনে আসে নি, ওর মন সম্পর্কে আমার কিছু মনে হয় নি, কারণ ওর মন ছোট, এ আমি বিশ্বাস করি না। কেন জানি না, তখন গুরুদেবের মুখখানি একবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।...'

অচিনদা চুপ করেন। ওঁর চোখ বোজা। ভুরু ওপর দিকে টেনে তোলা। আমি স্থান কাল পাত্র ভুলে যাই। চেয়ে থাকি নিমেষহারা চোখে। অচিনদার গলা বেজে ওঠে, 'ভিতরের দরজার পর্দাটা একবার দুলে ওঠে। যেন কেউ ঢুকতে এসে ফিরে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর একবার ইচ্ছে করল, ওর কাছে যাই, পারলাম না। মনের জোরের অভাবে নয়, দূষিত চোখগুলোকে করুণা আর উদারতা দেখাতে দিতে ইচ্ছে হল না। বললাম, "নীরু, হয় তো শেষ, তবু আছি, জেনো। চলি।"

'আমার কথা শুনে ও যেন চমকে উঠল। ঝাপসা ভেজা চোখ নিয়েই চমকানো ভাবে নিয়ে তাকাল। বলল, "চলে যাচ্ছ?"

'আমি তখন উঠে দাঁড়িয়েছি। বললাম, "হ্যাঁ যাই। দুপুরের গাড়িতেই ফিরব।" বলে দরজার কাছে যেতে যেতেও মনে হল, কী কথা যেন বলা হয় নি। পুরুষের মন তো, একটা কী যেন তার মনের মধ্যে থেকে যায়। তাই আর একবার ফিরে তাকিয়ে বললাম, "নীরু, চিঠিতে যে লিখেছ, 'তুমি বড় খারাপ, নিজের মত খারাপ' এখনো তা-ই আছি তো?"

'কথাটা শুনে নীরু স্থির থাকতে পারল না। আবার দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল, ফুলে ফুলে উঠে চাপা চাপা গলায় বারে বারে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।" দরজা খুলে পথে বেরিয়ে এলাম, সবই একটু ঝাপসা লাগছিল। কিন্তু বুকের মধ্যে কোথায় যেন ভরে ভরে উঠল হাসির ভরা নয়, কিন্তু সেও যেন এক সুখের ভরা। কানে বাজতে লাগল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ" সেই দিন দুপুরেই ফিরে এসেছিলাম শান্তিনিকেতনে। কিন্তু তারা, এমন রাত্রি দুপুরে, এর পরে আর বলতে পারা গল্প জমবে না। নতুন উত্তরের খোঁজ করতে হয়।'

পরিপাটি...

(আপনার চলতি সাথী)

ছিমছাম...

(দেখতে ঘড়ির মত)

সব সানিও ট্রানজিস্টর রেডিও মাত্রই দেখতে সুন্দর...প্রত্যেকটি সাজসরঞ্জাম ওয়াকো কর্তৃক সযত্নে তৈরি ও পরীক্ষিত...বিজ্ঞানসম্মত নিখুঁত পন্থায় সেগুলিকে সন্নিবেশ করা হয়। সেইজন্যেই এইসব সেটের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা অপরাপর সেটকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে।

একবার ওয়াকো ডীলারের কাছে গিয়ে নিজেই পরখ কোরে দেখুন না কেন? এইসব পরিপাটি ও ছিমছাম সেটগুলি সবাইয়ের জন্যেই চমৎকার উপহার—নিজেকে সমেত।

মডেল ১০ এসপি-১০ ডব্লিউ

মডেল ৮ ইউ-পি-৩৫

ওয়াকো-হাই-ফাই ধ্বনির জন্য

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সাতাশ

ফাল্গুনের শেষ বেলায় পড়ন্ত বিকেলের আলো ঈষৎ ফিকে, অস্থির বাতাস থেকে থেকে অধীরতা প্রকাশের মতন একটা ধ্বনি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। কেননা, আকাশ ভরে প্রতীক্ষার দীপ্তি এখন বড় শুভ্র। দোলপূর্ণিমার চাঁদ হঠাৎ দপ্‌ করে ফেটে পড়বে।

শূন্যতার একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করতে করতে মনে মনে ভয়ঙ্কর রকম হিংস্র হয়ে উঠছিল করালীকান্ত। এখনো তার চুল লাল-লাল রুক্ষ। দুপুরে স্নানের সময় বিকট জ্বালায় অস্থির হয়ে সে খুব জোরে জোরে মাথায় সাবান ঘষেছিল। চুলের রং তুলে ফেলবার জন্যে নয়, যে দাহ তাকে অস্থির ও হিংস্র করে তুলেছিল তা কিছু প্রশমিত করবার জন্যে।

কাল রাতে টুনি মাসীর তাঁবুতে যেতে পারে নি করালীকান্ত। গোপালকে দিয়ে তাকে বলে পাঠিয়েছিল যে, তার শরীর খারাপ এবং টুনি মাসীর উঁকি মেরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলে সে ঘুমের ভান করে পড়েছিল। কিন্তু তার পক্ষে ঘুমনো একেবারেই অসম্ভব ছিল।

কাল আর একটা চিঠি এসেছিল করালীকান্তর। তার বউ শোকে অপ্রকৃতিস্থর মতন হয়ে কিছু কঠিন কথাও লিখেছে। করালীকান্তর প্রাণ নেই, হৃদয় নেই। তাই সে এল না তার মেয়ের মৃত্যুশয্যায়। যা হোক, শান্তি লিখেছে—আর তার আসবার দরকার নেই। তার মেয়ে শেষ অবধি ধনুষ্টঙ্কার হয়েই মরেছে। শেষের দিকে তার শরীর আরও ছোট হয়ে এসেছিল, ফেনা ঝরছিল মুখ থেকে, জ্ঞান ছিল না।

শান্তির চিঠি করালীকান্ত পেয়েছিল কাল দুপুরে। ম্যাটিনি শোর দেরি ছিল না বলে ইচ্ছে করেই চিঠি খোলে নি সে। তা ছাড়াও তার মনে হয়েছিল, সেই এক কথা লেখা থাকবে চিঠিতে। পরে ছিল রাতের খেলা। আরও পরে সার্কাসের পোশাক বদলাবার সময় চিঠিটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল করালীকান্তর ছেঁড়া শার্টের পকেট থেকে।

করালীকান্তর গালে মুখে লাল ও সাদা রং, মাথায় বড় পরচুলা, লাঠি পড়ে ছিল পায়ের কাছে। চিঠি পড়বার পর শোকের কোন অনুভূতি তাকে ঈষৎ বিচলিত করে নি, শুধু তার হাত শক্ত হয়ে এসেছিল এবং মেয়ের মৃত্যুর খবরের ছোট কাগজটা সে মুঠো করে ধরেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে, পরে একটা অশুচি জিনিসের মতন তা টুকরো টুকরো করে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তারপর খুব সংযত এবং স্বাভাবিক স্বরেই গোপালকে বলেছিল, "শরীরটা ভাল নেই রে। আমি শুয়ে পড়লাম। যা, টুনিকে বলে আয় যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।"

একটা কিছু করা দরকার—করালীকান্ত কী করবে তা হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। সারা সকাল আবীর পড়েছে তার গায়ে, রং-এর ঝাপটায় বুক পিঠ ভিজে গেছে। সে বাধা দেয় নি, অল্প অল্প হাসছিল এবং শান্তির চিঠির দু-একটা কথাই তার মনে পড়ছিল—প্রাণ নেই, হৃদয় নেই। এসব কিছুই নিজের বুকের ভিতর খুঁজে পাচ্ছিল না করালীকান্ত। শুধু একটা কঠিন শূন্যতা তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল এবং তার হিংস্র চোখ হারকু সাহেবকে খুঁজছিল।

হারকু সাহেব ফিরেছে অল্প আগে। সন্ধ্যার খেলা শুরু হতে এখনো কিছু দেরি। দোলের দিন বেশী লোক আসবে না বলে অফিস টেণ্টে বসে অকারণে সে মেজাজ খারাপ করে যাকে সামনে দেখছিল তাকেই গালাগাল করছিল। অনেক মদ খেয়ে এসেছে হারকু সাহেব। তার তাঁবুর ভিতরে মদের উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে ছিল।

হারকু সাহেবের কাছাকাছি আর কে কে ছিল লক্ষ করল না করালীকান্ত, আস্তে আস্তে তার টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলল, "হারকু সাহেব, একটা জরুরী কথা ছিল আমার আপনার সাথে—"

হারকু সাহেব অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখল করালীকান্তকে, শব্দ করে কাঠের ছোট টেবিল নিজের আরও কাছে টানল, "আপনার বাত শুনবার টাইম আজ আমার হবে না, করালীবাবু—"

করালীকান্ত রূঢ় স্বরে বলল, "শুনতেই হবে।"

"জো হুকুম! বাপ রে বাপ! আপনি কোম্পানীর মালিক বনে গেলেন মশাই মালুম হচ্ছে—"

"হ্যাঁ, মালিক!"

হারকু সাহেব নেশার ঘোরে চিৎকার করার মতন বলল, "কী জরুরী বাত আপনার? বিবি বাচ্চা পয়দা করল? বেটীর বীমার? ছুট্টি চাই, রুপেয়া চাই? বলেন কী দরকার?"

তোমার বাপের শাদি দিবার দরকার—করালীকান্ত মনে মনে বলল। তার মুখ

ঈষৎ কঠিন, বুক ঠেলে একটা ঝাঁজ উঠে আসছিল; কিন্তু ঝগড়া করবার মন এখন ছিল না করালীকান্তর, সে বলল, "আমি ছুটি চাই ফারুক সাহেব—"

"মিলবে না, ক্যাম্প যখন ভাঙবে তখন ছুটি মিলবে—"

করালীকান্ত নত স্বরে চেপে চেপে বলল, "আমি আজ রাতের গাড়িতে বাড়ি যাব—"

"না।"

"ফারুক সাহেব, আমি বলছি বাঘের খেলায় আমি রিং-এ যাব না—"

"আপনার নোকরি থাকবে না, [illegible]।"

"দরকার নেই, আপনি অন্য লোক দেখুন।"

"যান, ফিনিশ! আপনি আভি নিকাল যান—" ফারুক সাহেব এত সময় বসেছিল, এখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "লেকিন এক পইসা আমি এখন দিব না আপনাকে। আপনি খালি হাতে যাবেন, নবাবের মতন বাত শুনাবেন—চুক্তির বাত খেয়াল নাই আপনার?"

"ওসব ছাড়ুন, যা পারেন করবেন।"

"হাঁ-হাঁ, ওইরকম বেতাব আমি বহুত দেখছি।"

অফিস টেন্ট থেকে বেরিয়ে এল করালীকান্ত। শাওলার মতন আলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। এখন চাঁদনি মাসীও তাকে টানল না। এখনো একটা দাহ আছে তার বুকের মধ্যে। ফারুক সাহেবকে কঠিন কথা শুনিয়ে এসেও শান্ত হতে পারল না সে। করালীকান্ত বুঝল না আসলে কার ওপর তার রাগ।

এখন এক-একবার নবীনের মনে হয়, একটা কঠিন রোগ থেকে সে কোন অলৌকিক উপায়ে আরোগ্য লাভ করে হঠাৎ সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেছে। এ নবীন সে নবীন নয়, যে নিজের ঘরে একা-একা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে থাকত—ঈর্ষার যন্ত্রণায় ছটফট করত। এ নবীন অন্য মানুষ। লীলা এখন তাকে সম্মান করে—ভালবাসে কিনা তা যদিও নবীন স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। তবে এখন একটা বিশ্বাস জন্মেছে তার যে, লীলা আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে তার কাছে এগিয়ে আসবেই।

"এখন কেমন?" সকালবেলা লীলাকে রং মাখাতে মাখাতে তার মাথা বুকে চেপে ধরে নবীন জিজ্ঞেস করেছিল, "ভীতু মানুষ বলবে আর আমাকে?"

"অন্য কেউ না বললে আমি বলব কেন?"

"সকলের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি না?"

লীলা খুব করুণ করে বলেছিল, "হুঁ।"

"এখন হয়েছে কী, দেখবে লীলা, বাঘকে আমি বাছুর মতন খেলাব! মাইরি রিং-এ গেলে হাতির বল আসে আমার গায়ে, ভয়-ডর থাকে না।"

লীলা হেসে বলেছিল, "ভীতু মানুষের ধরনই এমন।"

"কেন?"

লীলা জিব কেটেছিল, "ভুল করে বলে ফেলেছি গো।"

দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় [illegible] কিছু কম। কতকগুলো চেহারা মানুষগুলোর [illegible] নবীনকে দেখছে। তার হাতে চাবুক, গায়ে লাল কোট, আঁট প্যান্ট—তার চোখে হিংস্র পশু বশ করার আগ্রহ জ্বলছে। বাঘের খাঁচার দরজা খোলা। সুরথ আর চাঁদনী বেরিয়ে এসেছে। নবীনের নাকে বাঘের গায়ের উৎকট ঘ্রাণ বড় মধুর লাগছিল। একটা বিলিতী মিউজিক সুর বাজাচ্ছে ব্যাণ্ড মাস্টার তা নবীনের মনে আরও তেজ—আরও সাহস সঞ্চারিত করে দিচ্ছিল।

লীলাকে যে কথা দিয়েছিল নবীন বাঘকে কুকুরের মতন খেলাবার তা প্রমাণ করে দেওয়ার জন্য সে অস্থির হয়ে ওঠে, রিং-এর মধ্যে এসে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে না। অন্যান্য রিং মাস্টার যেমন করে জানোয়ার খেলায় দূরে দাঁড়িয়ে চটাস চটাস চাবুকের শব্দ করে দর্শকদের ফাঁকি দেয়, নবীন তেমন করে না। সে এগিয়ে যায় বাঘের কাছে তার গায়ে হাত দেয়, হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

"এ নবীন," জোসেফ চাপা গলায় বলে, "জান দিবি? বেশী বাহাদুরি করিস না, বুঝলি? জানোয়ার বড় শয়তান।"

নবীন হেসে বলে, "সাহস থাকলে জানোয়ার ভয় পায়।"

"থাম থাম!" ঈর্ষায় টক টক করে জোসেফের দুচোখ, "দুদিন রিং মাস্টার হয়ে তুই আমার চেয়ে বেশী চিনিস জানোয়ার?"

"জানোয়ার আমাকে চেনে তো বটে।"

"ঝাপটা মারলে বুঝবি, যা বলি তা শোন—"

কিন্তু জোসেফের কথা শোনে না নবীন। সে পুরনো লোক। রিং মাস্টার মদন-মোহনের সঙ্গে প্রথম থেকেই আছে এ সার্কাসে। তারই এখন রিং মাস্টার হওয়ার কথা। নবীনের সহকারী হয়ে খেলা দেখাবার সময় তারও মুখ বাঘের মতন হিংস্র হয়ে ওঠে, নবীনের হাত টেনে সব সময় তাকে সতর্ক করে—তখন রাগ হয় নবীনের। তার মনে হয় জোসেফ তাকে ভীতু অপদার্থ প্রমাণ করে নিজে রিং মাস্টার হয়ে বাঘ খেলাতে চায়।

সুরথের প্রকৃতি খুব ঠাণ্ডা, কতকটা নবীনের মতন। এক একবার বড় বড় হাঁ করে জোর আওয়াজ তোলে। তার অনেকটা কাছে এগিয়ে যায় নবীন, পিঠে চাবুক বুলোয়। কিন্তু চাঁদনী এখনো অবাধ্য। আক্রমণ করবার সুযোগ খোঁজে, থাবা আঁচড়ায় সব সময়। রিং মাস্টারকে গ্রাহ্য করে না। চাবুক তুললে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে—বেশী গর্জন করে।

"চাঁদনী!"

নবীনের সামনে সামনে পা [illegible] জোসেফ, তাকে আর একবার সাবধান করবার জন্য বলল, [illegible]

[illegible] খাঁচার [illegible] দাঁড়িয়ে ছিল নবীন, চাঁদনীর [illegible]। লীলার কথা ভাবল নবীন। [illegible] সে জোসেফকে [illegible] চাঁদনীর আরও কাছে এগিয়ে গেল।

[illegible]

[illegible]

না, আর সময় লাগবে না—নবীন মনে মনে বলল, অনেক ট্রেনিং দিয়েছি আমি একে। আজ আমার হুকুম মানতেই হবে চাঁদনী। দেখ কত মানুষ, [illegible] আওয়াজ শুনছ না? জোর হাততালি পড়লে লীলা শুনবে, ফারুকসাহেব শুনবে। চাঁদনী, আমার ক্ষমতা ভোজবাজির মতন সব মানুষকে তাক লাগিয়ে দেবে।

অন্য রিং মাস্টারের মতন পশুকে ভয় দেখাবার জন্যে নয়, চাবুক নামিয়ে নবীন চাঁদনীর কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল তাকে মানুষের অনুরোধের ভাষা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে। এই সময় সে পলকে তাকিয়ে নিয়েছিল সব শ্রেণীর দর্শকদের দিকে। তাদের চোখের কৌতূহল ও বিস্ময় নবীনকে আরও সাহসী করে তুলেছিল।

"চাঁদনী!"

"আরে নবীন, তফাত যা—" প্রথমে

জোসেফ বুঝতে পারেনি যে নবীন চাঁদনীর প্রায় মুখের কাছে গিয়ে পড়বে। সে তার হাত টেনে সরিয়ে আনবার আগেই লাফ দিল চাঁদনী—নবীনের পেটে থাবা মারল।

হিংস্র চাঁদনী নবীনের ঘাড় লক্ষ করে এগিয়ে যাবার আগেই ধাক্কা মেরে নবীনকে সরিয়ে দিল জোসেফ, তার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে উন্মত্তের মতন বাঘিনীকে প্রহার করতে থাকল—যেন সে ভয় পেয়ে খাঁচায় ঢুকে যায়। দড়ি টিলে করে দিয়েছে রিং-বয়রা, খাঁচা বাঘের আরও কাছে ঠেলে নিয়ে এসেছে।

মাটিতে পড়ে আছে নবীন, তার পেট চিরে রক্তের ধারা নেমেছে। দর্শকরা ভয় পেয়েছে, চিৎকার করছে। অনেকে বেরিয়ে গেছে, কেউ কেউ হুড়মুড় করে বাইরে যাবার চেষ্টা করছে। এরকম দুর্ঘটনা জুয়েল সার্কাসে আগে কখনো ঘটেনি। ব্যান্ডের মানুষেরা প্রথম কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে চুপচাপ বসেছিল, পরে আরও জোরে ড্রামে [illegible] মারল, ক্ল্যারিওনেটে ফুঁ দিল। এবং ঠিক সেই সময় হারকুসাহেবের উচ্চস্বর ভেসে এল [illegible] নিয়ে।

[illegible] ঘাবড়াবেন না, চুপচাপ জায়-[illegible] কিছু হয়নি। রিং মাস্টারের [illegible] ঠিক ছিল না। এখন [illegible] নম্বর [illegible]—"

[illegible] নবীনকে নিয়ে যাওয়া হল। [illegible] নেই। তাকে সাবধানে [illegible] করে [illegible] নিয়ে যাওয়া হল তার [illegible]। [illegible] পরেই ছিল লীলার [illegible] [illegible] সাইকেল [illegible] [illegible]

[illegible] ছিঁড়ে টেনে [illegible] [illegible] আগেই সে [illegible] [illegible] চিৎকার করে উঠল, [illegible]"

[illegible] লীলার দিকে। [illegible] যেন শুধু বিস্ময় [illegible] [illegible] না। কিন্তু লীলার [illegible] অদ্ভুত কে অর্থনীতের মতন [illegible] হল হারকুসাহেবের। সে দেখল লীলাকে। নম্বর করবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল লীলা। তার মাথায় লাল রিবন, গায়ে গোলাপী সাটিনের ফ্রক ও জাঙিয়া, চোখে সুর্মার ঘন রেখা। এখন মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে লীলাও তাকিয়ে আছে হারকুসাহেবের দিকে।

অনেক দিন পর এত মানুষের সামনেও লীলার সঙ্গে কথা বলল হারকুসাহেব, "নবীনকে চাঁদনী চাপড় মারল লীলা?"

"বাঁচবে না?" লীলার স্বর নিস্পৃহ, মুখ রুক্ষ। সে এক দৃষ্টিতে হারকুসাহেবের দিকে তাকিয়ে তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানতে চাইছিল।

"হাঁ-হাঁ, জরুর বাঁচবে।"

লীলা বলল, "না, হারকুসাহেব, ও বাঁচবে না। উঃ, কত রক্ত—"

"আরে তোরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস, এ বাচ্চু, উঠাও উসকো জলদি—অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালমে লে যানে হোগা।"

নবীনের চোখ বন্ধ, মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত। তার দু-হাত পেটের ওপর। জামা ছিঁড়ে গেছে। তার কাপড়ের রক্তের ধারায় লাল হয়ে গেছে। আর বেশী সময় তাকে এখানে রাখা যায় না। সুবলবাবুকে ডাকল হারকুসাহেব। এবং আর অল্প পরেই নবীনকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। কাছেই সরকারী হাসপাতাল।

এরিনায় তখন অন্য নম্বর চলছে। বামন ক্লাউন গোপাল আর সহদেব চরকি চরকি লাঠির আওয়াজ করে হালকা রসিকতা করছে। কিন্তু দর্শকরা বড় চুপচাপ, যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল কিছু আগে তার ছাপ এখনো আছে তাদের মনে। ক্লাউন তাদের হাসাতে পারছে না।

হারকুসাহেবের নেশা ছুটে গেছে। কিন্তু অস্থিরতার একটা বেগ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে সেখানে। এখন রঘুনাথ নেই, তার দায়িত্ব অনেক বেশী, অনেক কাজ। নবীন বাঁচবে কি-না কে জানে। অনেক মানুষে প্রশ্ন করবে তাকে—হয়তো পুলিশও আসবে। কিন্তু নবীন বাঁচুক মরুক—তা পরের কথা। টাউনশিপে আরও কিছুদিন খেলা চলবে। এরিনা থেকে আজ রাতে ভাঙা মন নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না এত দর্শক। তাহলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে কোম্পানীর।

"লীলা, নবীনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর বড় নম্র স্বরে বলল হারকুসাহেব, "যাবি?"

"কোথায়?"

"হাসপাতালে, নবীনকে দেখবার লিয়ে?"

"না-না।"

"তবে চুপচাপ থাক। তোর নম্বর আজ বন্ধ—"

হারকুসাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা অলৌকিক কাজ করে তাকে চমকে দেওয়ার জন্যে মন থেকে যন্ত্রণার সব কাঁটা তুলে ফেলে লীলা বলল, "কেন, আমার তো কিছু হয়নি হারকুসাহেব।"

হারকুসাহেব অবাক হয়ে লীলাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত, পরে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "নম্বর করতে পারবি লীলা? ঠিক বাত বল। কুছ গড়বড় হবে তো ডবল একসিডেন হয়ে যাবে—"

"কিছু হবে না হারকুসাহেব, ঠিক পারব।"

"সাবাস!" লীলার পিঠে জোরে হাতের আওয়াজ তুলে হারকুসাহেব বলল, "তুই তৈয়ার থাক লীলা। আমি আউর এক কাম করি—তোর সাথে থাকবে করালীবাবু। বাস্, মানুষ তবে জরুর হাসবে—"

কিন্তু করালীকান্ত কোথায়! হারকুসাহেবের মনে পড়ল সে বিকেলবেলা ঝগড়া করেছে তার সঙ্গে—কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখনো সে এখানে আছে কিনা কে জানে। হারকুসাহেব কাউকে ডাকল না, নবীনের রক্তের দাগ ছিল তাঁবুর মধ্যে, বাইরে ঘাসের ওপরেও—তা মাড়িয়ে মাড়িয়ে হারকুসাহেব একটা উত্তেজনার বশে খুব তাড়াতাড়ি করালীকান্তর তাঁবুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

করালীকান্তর তাঁবু অন্ধকার। ইচ্ছে করেই সে আলো জ্বালেনি, জ্যোৎস্নার হালকা রেখা তাঁবুর মধ্যে স্থির হয়েছিল। তা এখন ভাঙ্

লাগছিল না তার। আলো বাজনা এবং সার্কাসের চিংকার তাকে বড় অপ্রসন্ন করে তুলেছিল। এখানে থাকবার তার আর দরকার নেই। এখন চলে গেলেই হয়। অল্প জিনিস-পত্র যা আছে, সব বেঁধে নিয়েছে করালী-কান্ত। সন্ধ্যার খেলা আরম্ভ হওয়ার আগেই সে গেট অবধি গিয়েছিল, এতক্ষণে তার ট্রেনে থাকবার কথা। গোপাল যেতে দেয়নি, খবর পেয়ে টুনি মাসীও তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। দোলপূর্ণিমার রাতে গিয়ে কাজ নেই; কাল আর সব মানুষ ঘুম থেকে ওঠবার আগেই সে চলে যাবে।

টুনি মাসী বলেছিল, "ভগবান মুক্তি দিচ্ছে গো তোমাকে! সার্কাস থেকে বার হওয়ার পথ করে দিল। বুঝি সব, কিন্তু বুক তো বাঁধতে হবে!"

টুনি মাসীর ভিজে চোখ, নরম গলার স্বর কিছু বিব্রত করেছিল করালীকান্তকে, তার শোক যন্ত্রণা দাহ কিছু সময়ের জন্যে নিবে এসেছিল। টুনি মাসীর কথা শুনল করালীকান্ত, আজ যেতে পারল না।

তাঁবু অন্ধকার হলেও হারকুসাহেব করালীকান্তকে দেখল। এবং ভিতরে এসে তার একটা হাত ধরে অসংযত স্বরে বলল, "করালীবাবু, নবীনকে বাঘ খুব উন্ডেড করে দিল—শুনেছেন?"

"হাঁ।" নির্বিকার করালীকান্ত বিড়ি টানতে টানতে ধোঁয়া ছাড়ল হারকুসাহেবের মুখের ওপর, বিরক্তি প্রকাশ করার মতন ছোট একটা শব্দ করল।

"আপনি উঠেন, রেডি হোন—"

"আমি কী করব?"

"রিং-এ যাবেন, সব মানুষের সথে হাসি-ঠাট্টা করবেন। না হলে জহান্নামে যাবে জুয়েল সার্কাস—"

"যাক!"

"করালীবাবু, এই সার্কাসের নিমক আপনি বহুত রোজ খেয়েছেন—শুনেন, নবীন ফিনিশ হয়ে যাবে, লেকিন সার্কাস থাকবে—"

"হারকুসাহেব, আমি কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আমাকে পয়সা দেননি, আমার বিপদের কথা শোনেন নি—" করালীকান্ত হঠাৎ অন্ধকার তাঁবুতে উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকল, "নিমক খাওয়ার কথা আপনি আমাকে শোনাবেন না—"

"করালীবাবু, সেসব বাত বিলকুল ভুলে যান। এখন বাবু নাই। আপনি আছেন, আমি আছি—করালীবাবু, লীলাও রয়েছে। সার্কাসের প্রেসটিজ রাখবার জিন্যে সে নম্বর করতে নারাজ হল না। সার্কাসের তাঁবুতে আপনার জীবন কাটল কেন আপনি প্রেসটিজ রাখবেন না, বলেন।"

হারকুসাহেব যেমন মানুষ হোক, যতই ক্ষমতা থাক তার—করালীকান্তর মনে হল এখন সে তাকে বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করছে। এখন করালীকান্ত তার কথা না শুনে তাকে ফিরিয়ে দিলে সুনাম নষ্ট হবে জুয়েল সার্কাসের—যে সার্কাস তাকে অন্ন দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে এবং তার নিজের সংসারের সব কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়ে তাকে পাথর করে রেখেছে।

বিড়ি নিবিয়ে ফেলল করালীকান্ত, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে হারকুসাহেব আমি তৈরী হচ্ছি—"

হারকুসাহেব লীলাকে যে কথা বলেছিল, করালীকান্তকেও তা বলল, "সাবাস!"

নবীনের রক্তের কিছু কিছু দাগ রয়েছিল রিং-এর ভেতর, লীলা দেখল না, করালীকান্তও না। রোজকার মতন আজও হাসছিল লীলা, এক-একবার মুখ তুলে দর্শকদের দিকেও তাকাচ্ছিল। ফাঁকা ফাঁকা আসর। বেশী মানুষ আসেনি আজ, অনেকে ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেছে। এখনো একটা আতঙ্ক থরথর করছিল। করালীকান্ত হাসাতে পারল না একটি মানুষকেও। লীলার দুরূহ ব্যালেন্সের খেলা চললেও হাততালির শব্দ হল না একবারও।

মানুষ হাসছে না। করালীকান্ত দেখল হারকুসাহেব এসে বসেছে প্রথম শ্রেণীর একটা চেয়ারে। করালীকান্তকে দেখতে দেখতে একমাত্র সে-ই হাসছে। কিন্তু শুধু তাকে হাসাবার জন্যে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরেও আবার রিং-এর মধ্যে এসে দাঁড়ায়নি করালী-কান্ত। সে এসেছে জুয়েল সার্কাসের দর্শকদের আতঙ্ক-মুক্ত করে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিতে। তা যদিও আজ না করতে পারে করালীকান্ত, তা হলে যে বিশেষ মর্যাদা একটু আগে তাকে দিয়েছে হারকু-সাহেব তার কোন অর্থ থাকবে না। এসব ভাবতে ভাবতে নতুন কোন ভঙ্গি দেখাতে চাইল করালীকান্ত, নতুন কথা শুনিয়ে ভীতু গম্ভীর মানুষগুলোকে হাসাতে চাইল।

"হেই মাডাম—হালুম! আই টাইগার—" লাঠি পায়ে মেরে চরর্ চরর্ শব্দ করল করালীকান্ত, বড় হাঁ করে হামাগুড়ি দিয়ে লীলার কাছে এগিয়ে এল, "ঘোঁত-ঘোঁত। এই যে সাবেরা, মাডামরা! বাঘ ঘোঁত-ঘোঁত করে আবার হালুম-হালুমও করে—হালুম! হালুম! হালুম! নো ফিয়ার, ভয় পাবেন না!"

কথা বলছে করালীকান্ত যন্ত্রের মতন। তার হাতের লাঠির আওয়াজও আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে আস্তে হচ্ছিল। শুকনো গলার স্বর। ভাঙা আসরে রিং-এর আলোর নিচে দাঁড়িয়ে করালীকান্ত বুঝতে পারছিল, তার কথা কিংবা ভঙ্গিতে প্রাণের কোন স্পর্শ নেই। শান্তির চিঠির কথা আবার মনে হল তার, মেয়ের কথা মনে হল। রাস্তায় খেলা করতে গিয়ে কাচের টুকরো ফুটেছিল তার পায়ে, ধনুষ্টংকার হয়ে শরীর বেঁকে বেঁকে সে শেষ হয়ে যায়।

"কাচকা টুকরা কাচের গুঁড়ো—" দেহ বেঁকিয়ে চলতে চলতে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে জোরে বলে উঠল করালীকান্ত, "কাচকা টুকরা পায়ের মে ঢুক গয়া—" সুর করে এসব কথা বলতে বলতে সে খুব তাড়াতাড়ি চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

কিন্তু পরে হঠাৎ থেমে পড়ে একটা পা তুলে প্রায় চোখের কাছে নিয়ে এসে দর্শক-দের দিকে তাকিয়ে করালীকান্ত বলল, "এই পা ছোট হবে, আরও ছোট হবে—আরও—আরও—" হঠাৎ পড়ে যাওয়ার একটা ভঙ্গি করে সে মাটিতে বসল এবং জিব দিয়ে পা চাটতে চাটতে চোখ-মুখ হাত ও পায়ের এমন অদ্ভুত ভঙ্গি করল যে তাকে একটা জানোয়ার বলেই মনে হচ্ছিল দর্শকদের।

খেলা শেষ করে চলে যাচ্ছিল লীলা, মাটিতে রক্তের দাগ দেখতে দেখতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল করালীকান্ত, লীলার পিঠে আস্তে লাঠির আঘাত করে সে আর একবার বলল, 'ঘোঁত!'

"কাচকা টুকরা পায়ের মে ঢুক গয়া—ঘোঁত—" করালীকান্ত গান গাইতে গাইতে ছুটোছুটি করছিল, তার চোখ থেকে জল পড়ছিল। এখন করালীকান্তের মনে হচ্ছিল মুখও অন্যরকম দেখাচ্ছে। কেননা, তার তার কথায় ও ভঙ্গিতে প্রাণের ছোঁয়া লেগেছে এত বছরের সার্কাস-জীবনে রিং-এর মধ্যে এসে কোনদিন সে এমন কাঁদবার সুযোগ পায়নি।

ক্রমশ

এলোমেলো

আমার প্রতিবেশীর কাঁচা বয়সের কন্যা এম এ পাস করে পি এইচ-ডির জন্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখছে। বিষয় তার সমাজবিজ্ঞান বা সোসিয়লজি। থিসিসের জন্য সমাজবিদ্যার যে শাখাটি সে বেছেছে তাতে নূতনত্ব আছে। যেসব মহিলা সমাজসংস্কার করেন অথবা যেসব মহিলা-প্রতিষ্ঠান সমাজসংস্কারব্রতী তার একটা সমীক্ষা সে পেশ করবে। এই কলকাতা শহরে অনেক রেজিস্টার্ড সমাজ-সংস্কার প্রতিষ্ঠান আছে, ছোটখাটো সংগঠন ও সমিতি যা রেজিস্টার্ড হয় না এবং বেশী প্রচারও হয় না তার অভাব নেই। তবে সে বেছে নিয়েছে গুটিকতক বড় বড় সংস্থা। কারণ, ব্যাপকভাবে সবটা তার পক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করা, বিচার করা, নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আমার আরও কৌতুহল বেড়ে গেল শুনে যে, মেয়েটির প্রতিপাদ্য বিষয় হ'লো সমাজসংস্কারব্রতী সংস্থাই দেশের দশের উন্নতির একটি বড় অংশ। অবশ্য সমাজসংস্কার কথাটি বহু-প্রসারী অর্থে অনেককিছুই বোঝায়। যে সব অগ্রগামী মহিলা অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে দীপ জেলেছেন, রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজের নানান অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁরা সবাই সংস্কারব্রতী। অনেক বড় সম্ভ্রান্ত সংস্থা সমান্তরে সমাজসেবা করেন, তাতে আত্মাভিমান ভুলে বহু মহিলা নিজেদের বিলিয়ে দেন অপরের কল্যাণে। কাজেই সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য মহান। সমাজ-সেবাব্রতী কর্মী আমাদের নমস্য। কিন্তু তথাকথিত social workerরা সবাই কি দেশের উন্নতির দিকে?

একে তো আজকাল যুবকদের মধ্যে তার উপর কাঁচা বয়সের চোখে সংস্কারব্রতীদের কেমন ঠেকেছে জানতে আমার কৌতূহল অস্বাভাবিক নয়। যাঁরা সমাজসংস্কার করেন তাঁদের social behaviour কেমন? মেয়েটি আমার সঙ্গে এক ব্যাপারে একেবারে একমত। যাঁরা প্রকৃত কর্মী, তাঁরা দেশের কত উপকার করেন বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু যাঁরা আর কোনও কারণে social worker হ'য়ে যান তাঁরা ভিন্ন জগতের জীব। কেউ বা যান একটু মেলামেশার সুযোগ সন্ধানে, কেউ বা পদমর্যাদা বাড়াবার বা পায়াভারী করবার সহজ পথ মনে করেন সমাজসংস্কারকে, কেউ বা যশের প্রার্থী, আবার কেউ বা যান ঘরের চার দেওয়ালের বাইরের জগতে একটু জিরিয়ে বা নিশ্বাস ফেলে নেবার আশায়। এর মধ্যে যাঁরা বিত্তবান প্রতিষ্ঠাবান সমাজের মেয়ে

যাঁদের আশা আরও বেশী। লাটসাহেবের ঘরে নেমন্তন্ন হ'তে পারে, খেতাব আজকাল মেয়েদেরও মেলে, বিদেশে সফর সহজ হয়, এমন কত কি। সংস্কারের এই দিকটা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। সেই

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

কুশলী কূটনীতিবিদ্ বলে ভলেয়ারের খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাঁর মহিলাদের সম্বন্ধে উক্তিগুলি চমৎকার। তিনি বলেছেন, 'যে মহিলা উগ্র ও অবজ্ঞাপূর্ণ তার নিশ্চয় কোথাও লজ্জা পাবার মত কিছু আছে। লজ্জায় লাল হ'য়ে যে ওঠে না তার লজ্জার কারণ বড্ড বেশী, আরক্তিম হওয়া সে ভুলে গেছে। বন্ধুত্ব ও ভালবাসার কথায় বলেছেন, যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের বন্ধন অনুভব করে না সে ভালবাসতে পারে না। যদি কোনও পুরুষ প্রেমিকাকে বলে তাকে ভিন্ন সে আর কাউকে ভালবাসে না, নারীর সে পুরুষ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া দরকার।

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

লড়াইয়ের কালে ব্যাণ্ডেজ বানাবার হিড়িক পড়েছিল চারদিকে। মেমসাহেবদের সঙ্গে মাখামাখি করে কল্যাণব্রত অনেকেই বেশ তৃপ্তির তাকিয়ে স্বাদ গ্রহণ করতেন। লাট সাহেবের বাড়ির চায়ের পেয়ালা আর লাটসাহেবের গৃহিণীর পরিবেশন বন্দনা সমাজে বিশেষ পদবীর সিঁড়িতে পদক্ষেপ করবার খোরাক হ'তো। বর্তমান পরিবর্তন সেখানে লাট আর লায়ন সাহেবের অপসরণ। তাঁরা দূর হ'য়েছেন, তবে শূন্য স্থান অপূর্ণ হয়নি। স্বদেশী মেমসাহেবেরা পরম নৈপুণ্যে জাঁকিয়ে বসেছেন। ধারাও অনেকটা একই রকম আছে। স্বামীর পদমর্যাদায় leadership বা কর্তামো করার অধিকার। তার উপর স্বামীর পকেট ভারী হ'লে তো কথাই নেই। রাজনীতিও তো অর্থভিত্তিক, কাজেই সমাজকল্যাণ কি করে নিস্পৃহ হয়, বলুন? সাম্যবাদের প্রথম অবলম্বন অর্থ। প্রচুর, অঢেল অর্থ। চারদিকে তাকিয়ে তাই দেখুন ক'টি বিত্তবিহীনা কল্যাণী খুঁজে পাবেন? অন্তত নাম তাঁদের জানতে পারবেন না। কোথাও বা তুলসীতলার প্রদীপটির মত টিমটিম করছে কেউ, কিন্তু শহরবাজারের বেজায় কড়া আলোয় তাদের দেখা কঠিন। ব্যাণ্ডেজ বানানোর কালেও ঠিক এমনটিই ছিল। সেই যে নবাবজাদী আম্মেরা বেগম সেবার কাইজার-ই-হিন্দ মেডেল পেয়ে চিঠির কাগজ থেকে নিয়ে বালিশের খোলে পর্যন্ত খুদে দিলেন সেই খবর, তিনি কি সব চেয়ে বেশী ব্যাণ্ডেজ পাকিয়েছিলেন? না, খাটাখাটি কি নবাব-বাড়ির মেয়েরা কোনদিন করেছে? আসল কথা অন্য। আম্মেরা বানু তখন নূতন নূতন পর্দার বাইরে কদম রেখেছে। তার অন্দর আলো-করা রূপ লাটসাহেবের মনে ধরেছিল, আর তার ঘরের কাবাব, বিরিয়ানী মন্ত্রিমহলে মহাসমাদর লাভ করেছিল। আজও একইভাবে সমাদর পর্ব সমাধা হয়।

পি এইচ-ডির গবেষণা করা মেয়েটি অবশ্য বললো, এখন কিছু না থাকলে হাতে উদ্বৃত্ত সময় থাকে না। রেশনের ধান্দা, ঘরের আর পাঁচটা কাজের চিন্তা আর চেষ্টায় যারা কাবু, তাদের পরের কল্যাণ ভাববার অবসর কই? আমি কিন্তু দেখেছি, স্বল্পবিত্ত সংসারের সামান্য বিশ্রামের সময়-

টুকু পর্যন্ত দিয়ে মেয়েরা কল্যাণব্রত পালন করে এবং সেটা সবাই জানতে পারে না বলেই কথাটা চাপা থাকে। আরও একটি প্রশ্ন এখানে আসে। এই প্রশ্ন উন্নতিশীল আধুনিক দুনিয়ার নূতন প্রশ্ন। সমাজ-সেবা সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে ধনী-গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ থাকলে সংস্কার ও কল্যাণ-কাজ সম্পূর্ণ ও সার্থকভাবে করা হয় কি না। সমাজের জটিলতা ও পরিবর্তনের সংগে সংগে কল্যাণব্যবস্থাও বিশেষ বিশেষ রূপ নিচ্ছে। আমাদের যৌথ পরিবারে অসুস্থ মানুষ, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সংগীহীন হ'তেন না। আজকের পশ্চিমী দুনিয়ার সমাজসেবীরা ঘটা করে সংগী-হীনের সংগ দেবার জন্য সংঘবদ্ধ হন! আমরাও যন্ত্রযুগে যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি তাতে সংঘবদ্ধ সমাজসেবা সর্ব স্তরে সর্ব ক্ষেত্রে দরকার। সরকার যতটা কল্যাণসচেতন হ'য়ে নানা কল্যাণকাজে বেতনভোগী সেবাকর্মীর ব্যবস্থা করেছেন, প্রয়োজনের তুলনায় সেটা বেশী নয়। কাজেই কল্যাণের প্রয়োজন যত দিন সরকার সম্পূর্ণ না নিতে পারেন অথবা যতদিন আর্থিক সম্পত্তি দেশের যথেষ্ট না হবে, ততদিন অবৈতনিক সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাকে ভালভাবে বাঁচাতে হবে। সেই বাঁচানোতে চোখ ঝলসানো, লোকদেখানো আয়োজন যেন প্রকৃত মঙ্গলকে গ্রাস না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার এলে এগিয়ে যাওয়া শহুরে জীবের দুর্বলতা। থাক না অল্প বিস্তর সেই জাহির করার ইচ্ছা। কিন্তু যদি নীরব কর্মীদের ঠেলে দিয়ে তাঁরা এগিয়ে যান আর কাজের বেলায় ক্লান্ত হন তবেই বিপদ। এই তো দিন কতক আগে পুজোর আয়োজনের অংশ হিসাবে জনকতক কল্যাণী দরিদ্র শিশুদের হাসপাতালে মিষ্টি নিয়ে গেলেন। সমিতির তরফ থেকে সংবাদপত্র-গুলিকে যথাযথ খবর দেওয়া হয়েছিল। কল্যাণীদের কেউ কেউ ক্যামেরায় কাটবে এমন সাজে মেঠাইয়ের ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে 'পোজ' দিলেন। দ্বিতল হাসপাতালের নীচের কক্ষে ক্যামেরা কাজ করে চলে গেল। মহিলাদের অনেকেই তখন অবসন্ন, ক্লান্ত। কারও হাঁটুতে ব্যথা, কারও সিঁড়ি চড়লে বুক ধড়ফড় করে ইত্যাদি। সাদামাটা দু' চারজন যা ক্যামেরার কাছে যেতে পারেননি, তাঁদের ক্লান্তি কম। তাঁরাই উপরে গিয়ে বিলিয়ে এলেন মেঠাই। কাজেই বলছিলাম সমাজসংস্কারকে একটু সংস্কার করে নিলেই চলবে। একেবারে বাদ দিলে আমরা আটকে যাবো।

IFUWA কি?

১৯২০ সালের ২৪শে জুলাই Federation of University Womenএর পত্তন হয় কলকাতায়। তখন কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কোডাই-কানালে একটি করে স্নাতক সমিতি ছিল। সেই মিলিত সমিতির নামই এখন Indian Federation of University Women's Associations বা IFUWA। আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলকাতা, কয়ম্বাটোর, দেরাদুন, দিল্লি, ত্রিবান্দ্রম, তিরুচি, এর্নাকুলম, সুরত, কোডাইকানাল, লখনৌ, মাদ্রাজ, নাগপুর ও পুনায় একটি করে এখন স্নাতক সমিতি হ'য়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক সমিতি গড়ে উঠবে। IFUWAর লক্ষ্য—

১। শিক্ষিত মহিলাদের নাগরিক দায়িত্ব এবং জাতীয় জীবনে আগ্রহ বাড়ানো।

২। উন্নত কর্মজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থা করা।

৩। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

৪। বিদেশের স্নাতক সমিতির সভ্যা আমাদের দেশে এলে সাহায্য করা।

IFUWA একক সমিতিগুলির সংঘবদ্ধ সংস্থা। তবে একক সমিতি সব যথেষ্ট স্বাধীন। আয়ব্যয় এবং পরিচালনায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হাত দেয় না। কেন্দ্রীয় কমিটি IFUWAর কয়েকটি বিষয় নিজের হাতে রেখেছে, যেমন—

১। আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সংগে যোগাযোগ।

২। স্নাতকোত্তর শিক্ষায় বিদেশে যাবার বৃত্তি।

৩। একক সমিতিগুলির শিক্ষার মানে সাম্য।

৪। খবরের আদানপ্রদান।

৫। আলোচনা ও কনফারেন্স।

৬। ভারতবর্ষে ও বিদেশে প্রীতির সংযোগ।

এই ছয়টি বিষয় সম্বন্ধে আর একটু বললে হয়তো ভাল বোঝা যাবে। (১) আন্তর্জাতিক সমিতি বা International Federation of University Womenএর সংগে ১৯২১ সাল থেকে IFUWA অর্থাৎ তদানীন্তন FUWI যুক্ত। আন্তর্জাতিক সমিতির পত্তন হয় হয় ১৯১৯ সালে ১১ই জুলাই। তার কেন্দ্রীয় কার্যালয় লণ্ডনে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতিসঙ্ঘে একটি observer এ'দের রাখবার অধিকার আছে। UNESCO এবং ECOSOCএও উপদেষ্টার মর্যাদা পেয়েছেন। ৫১টি জাতীয় সংস্থা আন্তর্জাতিক সমিতিটির সঙ্গে সংযুক্ত। এই সংযোগের একটি আমাদের ভারতীয় সংগঠন।

(২) বিদেশে যবার নানা বিষয়ের বৃত্তি ব্যবস্থা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সমিতি। প্রায় ৩০টি বৃত্তিধারী মহিলা গত কয়েক বছরে বিদেশে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা করে এসেছেন। শিশু মনস্তত্ত্ব থেকে নিয়ে গ্রীক গণিত পর্যন্ত অধীতব্য বিষয়ের পরিধি।

(৩) শিক্ষার মান সম্বন্ধে সমিতি সতর্ক। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা স্নাতকদের খবর সমিতি সংগ্রহ করেন।

(৪) প্রত্যেক অ্যাসোসিয়েশন আলাদা আলাদা সংবাদ-পত্রিকা প্রকাশ করে। IFUWA আবার সম্মিলিত তথ্য সংগ্রহ বুলেটিন প্রকাশ করে। এ ছাড়া নানা ধরনের বই, খবর, সাহিত্য ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সংস্থার সাহায্যে আদানপ্রদান করা হয়।

(৫) বিদ্যা ও বুদ্ধির উন্নততর মানের জন্য কনফারেন্স ইত্যাদির এ'রা প্রায়ই ব্যবস্থা করবেন।

(৬) নানা ধরনের সংযোগ-ব্যবস্থার মধ্যে বিদেশের স্নাতক সমিতির সাহায্যে আমাদের দেশের মহিলাদের বিদেশে থাকা ও অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা অন্যতম।

বিদেশিনীরা যদি আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান, তার জন্য ব্যবস্থাও IFUWA আরম্ভ করেছেন। কোন কোন একক সমিতি আলাদাভাবেও বিদেশিনীর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা লাভের জন্য বৃত্তির আয়োজন করেছেন।

পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় IFUWA নিজের ভূমিকায় আরও একটু তৎপর হ'লে আমরা খুশী হ'তাম। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান্তরে সব চেয়ে বেশী বিপর্যয়ের মুখোমুখি হ'তে হয় মেয়েদের। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়ের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। IFUWA, এমন কি একক শাখা সব অনেকভাবে শিক্ষিত মেয়েদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারেন। সভ্যা সংখ্যাই বা তাঁদের এত সীমায়িত কেন? কিছু ত্রুটি আমাদের শিক্ষিত মেয়েদের আছে। তাঁরা হয়তো চট্ করে এগিয়ে আসেন না। কিন্তু যদি সংস্থার সাহায্য যথেষ্ট হয়, সংস্থার আকর্ষণ আপনা থেকেই বাড়বে। অনেকদিন পর্যন্ত প্রায় না মানা সংগঠনের মত স্নাতক সমিতির অনেকগুলিই অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় কাটিয়েছে। সম্প্রতি তাদের তৎপরতার অল্পবিস্তর নিদর্শন চোখে পড়েছে। উত্তরোত্তর সেই তৎপরতা বাড়া দরকার। শিক্ষিত মেয়েরা এখন জীবন-সংগ্রামে নেমেছে। পোশাকী ব্যবস্থায় আর তার চলে না। কার্যকরী আয়োজনের বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীমতী

আয়ুর্বেদের ধ্যান ও সংস্কৃতি

মাধবেন্দ্রনাথ পাল

আয়ুর্বেদ কি ও কেন?

ধারাপাতের পড়া 'চারে বেদ'। জ্ঞান বাড়লে জানা গেল, ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব নামক চারিখানি বেদ হিন্দুদের আদি ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীর সংকলন। হিন্দুদের চিকিৎসাশাস্ত্র সাধারণভাবে আয়ুর্বেদ নামে পরিচিত। কিন্তু পূর্বের তালিকাতে তো তার নাম দেখা যায় না! তবে, হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের বেদ নাম ধারণের কারণ কি, এরূপ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

পুরাণে দেখা যায়, পূর্বেই বলা হয়েছে, হিন্দু চিকিৎসা-বিদ্যার বীজ জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মার চিন্তাভাবনার মধ্যে ওতপ্রোত ছিল। স্বয়ং তিনিই প্রজাপতি দক্ষকে শিক্ষাদান করে ঐ বিদ্যা প্রচার করেন। তাছাড়া, বেদগুলিতে বিশেষভাবে অথর্ব বেদে চিকিৎসা-বিদ্যার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। সেজন্য দৈবীভাবনাপ্রসূত চিকিৎসাশাস্ত্র বেদ আখ্যায় ভূষিত হবার মর্যাদা অবশ্যই দাবি করতে পারে। তাই হিন্দুদের চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ নামে পরিচিত।

যদি রোগের চিকিৎসা করাই এই শাস্ত্রের কেবলমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে তো আয়ুর্বেদ না বলে চিকিৎসা-বেদ বললেই হত। 'আয়ু' শব্দের অবতারণা কেন করা হল, তাও ভাববার বিষয়। চলন্তিকায় দেখা যায়, আয়ু শব্দের একটি অর্থ "জীবিত কাল", ইংরাজীতে যার রূপ "স্প্যান অব লাইফ" (span of life)। জন্মলাভের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত সময় মানুষের চলা-ফেরা, খাওয়া-পরা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা প্রভৃতি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এক একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, সেই সমস্ত সময়কে তার আয়ু বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, জীবন-যাপনে চলা-ফেরা, খাওয়া-পরা, আচার-আচরণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার বিশদভাবে জানার অধিকার ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের এলাকাভুক্ত। ব্যক্তিগত সকল প্রকার ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মানুষের মনে যে সমস্ত ভাব-ভাবনা জাগে, সেই সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা, তার উপায় ও ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দেওয়ার দাবি এই চিকিৎসাশাস্ত্রের আছে। বোধ হয়, সেইজন্য সংকুচিত ও সীমিতার্থে চিকিৎসা-বেদ না বলে বৃহত্তর অর্থে এই শাস্ত্রকে 'আয়ুর্বেদ' নামের সম্মান দেওয়া হয়েছে।

আয়ুর শ্রেণীবিভাগঃ

এই ব্যাপক সংজ্ঞাটির মধ্যে আয়ুর্বেদের লক্ষ্য ও ধ্যানের আভাস সুপ্ত। সুন্দর ও সুচারু জীবন-যাপন কিভাবে করা যায়, সেই পথের নিশানা দেওয়াই আয়ুর্বেদের চরম লক্ষ্য ও ধ্যান। আয়ুর্বেদমতে দেহ ও মনের নিবিড় ও অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সংযোগ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

অথচ, কেবলমাত্র দেহযন্ত্রের বৈকল্যের জন্য রোগের উদ্ভব হয়, এইরূপ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ও বস্তুগত একটি মতবাদ ঊনবিংশ শতক কাল পর্যন্তও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে প্রচলিত ছিল। মনের অস্তিত্ব মানা হত সত্য, কিন্তু মনের বিরূপ ও প্রতিকূল তৎপরতার ফলে রোগের কারণ ঘটতে পারে এমন ধারণা ছিল না। তখন সে দেশের চিকিৎসকের নিকট রোগী ছিল কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপ অংশের সমষ্টিতে রচিত একটা কল (machine) বিশেষ। তাদের কোন একটি অংশ বিশেষ বিকল হয়ে রোগের জন্ম, এই ছিল তাদের ধারণা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া রোগীর ভিতর আত্মা (soul বা spirit) বিদ্যমান এবং মনের বিকারের ফলে যে রোগের জন্ম হতে পারে, এসব ধারণা চিকিৎসকদের চিন্তাভাবনার মধ্যে তখনও স্থান পায়নি। হিস্টিরিয়ার মত ব্যাধির অস্তিত্ব যে সব চিকিৎসক মানতেন, তাঁরা পর্যন্ত মনে করতেন, কোনরূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈকল্যের মধ্যেই তার কারণ নিহিত। তাঁদের ধারণা ছিল, হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত মহিলার গর্ভাশয় স্থানচ্যুত হয়েছে, কিন্তু তার মানসিক কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের ফলে এইরূপ ব্যাধি সৃষ্টি হয় না!

পূর্বের মত আজকাল অবশ্য পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণ অত দূর যান্ত্রিক মনোভাব আর পোষণ করেন না। নিজে ব্যক্তিগতভাবে যতই বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবের পূজারী হন না কেন, কার্যগতিকে এখন তিনি রোগীর অবস্থা বিষয়ে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। মানসিক ও শারীরিক উভয় প্রকার অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে চিকিৎসার বিধান দিতে শুরু করেছেন। ফ্রয়েড (Freud), এডলার (Adlar), কার্ল জুঙ্গ (Carl Jung) এবং প্যাভলভ (Pavlov) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের অবদান এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আধুনিক গবেষণাতে এখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে, মানুষের মনও কলের মত কাজ করে সত্য। তা বলে মন সম্পূর্ণরূপে কল নয়। বরং মন এমন একটি কল যার মধ্যে কলের অতিরিক্ত কিছু একটা বর্তমান।

আজ যে সত্য ক্রমশ আধুনিক বিজ্ঞানী-দের নিকট প্রকাশিত হচ্ছে, সেই সত্য পূর্ণরূপে কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের জানা ছিল। তাই, দেহ ও মনের সতত সংযোগ ও সন্নিধানের ফলে যেসকল কর্মচাঞ্চল্য ব্যক্তির জীবনে প্রকটিত হয়, সেই সকল কর্মচাঞ্চল্যকে সুন্দর জীবন-যাপনের পথে কিভাবে পরিচালিত করা যায়, এই উদ্দেশ্যকেই নিয়ত পুরোভাগে রাখা আয়ুর্বেদের প্রথম ও প্রধান এবং এক-মাত্র ধ্যান। আরও একটি স্বীকার্য আয়ুর্বেদে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে উল্লিখিত হয়েছে। মানসিক শান্তি লাভ করাই মানুষের উচ্চতম লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া উচিত।

এই দুটি স্বীকার্যের আলোকে মানুষের জীবিতকাল বা আয়ুকে প্রধানত দুই ভাবে দেখা হয়েছে—আয়ু হিতকর ও সুস্থ হওয়া উচিত। সুন্দর জীবন-যাপনের সহায় হিসাবে প্রত্যেকেরই উচিত অহিতকর কার্যে কালক্ষেপ না করে হিতকর কার্যে রত থাকা এবং অসুস্থ অবস্থা পরিহার করে সুস্থভাবে ঐসকল হিতকর কার্য করার ক্ষমতা অর্জন করা। আয়ুর্বেদমতে সেজন্য আয়ুকে চার প্রকারে ভাগ করা হয়। মানুষের জীবিত-কালের যে সময় হিতকর কার্যে ব্যয়িত হয় তাকে 'হিত আয়ু', যে সময় অহিতকর কার্যে অপচিত হয়, তা 'অহিত আয়ু', যে সময় সুস্থভাবে অতিক্রান্ত তা 'সুস্থ আয়ু' এবং যে সময় অসুস্থভাবে অপচিত হয়, তা সুস্থভাবে অতিক্রান্ত তা 'সুস্থ আয়ু' এবং পরস্পরের পরিপূরক: প্রথমটি বেশী বা কম মাত্রায় অর্জন করতে পারলে পরেরটি বেশী বা কম মাত্রায় লাভ করা যায়। সেইরূপ অসুস্থ ও অহিত আয়ুর সম্পর্ক। সুতরাং হিত আয়ু ও সুস্থ আয়ুই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত।

হিত ও সুস্থ আয়ু লাভের চাবিকাঠিঃ

কিভাবে সুস্থ ও হিত আয়ু লাভ করা যায়, সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া আয়ুর্বেদের ভাবনার অন্তর্গত। মনোবল বৃদ্ধি করে মানসিক স্থৈর্য ও সাম্য বিধান করা প্রথম ও

সর্বতোভাবে প্রধান কর্তব্য। মনোবল বৃদ্ধির বিবরণমূলক বহু উপায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে লিপিবন্ধ আছে। উদাহরণ হিসাবে, দু-একটি সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা যেতে পারে। যেমন, যাঁরা আপন কল্যাণ কামনা করেন ও মানসিক শান্তিলাভের ব্যাপারে নিরত, তাঁদের উচিত কায়, মন ও বাক্যে অসৎ প্রবৃত্তি ও হঠকারিতা পরিহার করা। তাঁদের উচিত, লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ, অভিমান, মূঢ়তা, ঈর্ষা, অতি আসক্তি এবং অসময়োচিত ভাষা প্রয়োগের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা। যাঁরা এইভাবে নিয়মনিষ্ঠ ও সংযত, তাঁদের মানসিক স্থৈর্য বিচলিত হয় না বরং মনোবল বৃদ্ধি পায়। ফলে, সংযত ও প্রশান্ত মনের প্রভাবে দেহের বলবৃদ্ধিতেও সহায়তা ঘটে। দেহের বলবৃদ্ধি হলে, রোগ আক্রমণের আশঙ্কা এবং রোগে আক্রান্ত হলে রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জিত হয় এবং পরিণামে দূরীভূত হয়।

জীবন-যাপনে যাঁর চিন্তা, বাক্য ও কার্যের মধ্যে সুসমঞ্জস মিলন বা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাঁর মন অবিক্ষিপ্ত ও সংযত, বুদ্ধি নির্মল ও পরিচ্ছন্ন এবং যিনি জ্ঞানবান, নিয়ম-নিষ্ঠ ও শান্তিলাভ করার ব্রতে নিমগ্ন, আয়ুর্বেদমতে সেজন্য তিনি কখনই রোগ-ভোগ করেন না।

নিয়মের পথে কিভাবে মনকে আনা সম্ভব সে বিষয়ে আয়ুর্বেদে বিশদভাবে উল্লেখ করা আছে। কোন অহিতকর অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে একবার বুঝতে পারলে সাধারণ লোকে সেই অভ্যাস তখনই ছেড়ে দেবার সংকল্প করে এবং হয়ত তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে বসে। দু'একদিন যেতে না যেতেই পূর্বের অভ্যাসদোষে অহিতকর কার্যটি করার ইচ্ছা পুনরায় জাগ্রত হয় এবং পূর্বের অভ্যাসে আবার ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তেমনি, কোন ভাল সংকল্প কার্যে পরিণত করার জন্য রাতারাতি উঠে পড়ে লাগলে সচরাচর দেখা যায় যে, দু'-একদিন পর থেকে কখন যেন সংকর্মটি পালনের প্রবৃত্তি কোথায় তিরোহিত হয়ে গেছে। সেজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তি অহিতকর অভ্যাস হতে নিজেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করেন এবং অনুরূপভাবেই ক্রমশ হিতকর অভ্যাস আয়ত্ত করেন। কু-অভ্যাস এইভাবে পরিত্যাগ করলে, পুনরায় আর কখনই সেটি ফিরে আসে না। হিতকর অভ্যাসও এইভাবে আয়ত্ত করলে সেটি স্বভাবে সুদৃঢ়ভাবে পরিণত হয়ে যায়।

এত সহজ, সরল ও দৃঢ় প্রত্যয়ে আয়ুর্বেদের উপায়গুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আধুনিক কালেও বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন চিন্তাভাবনার মধ্যে এইসকল সত্যকথার ছায়া লক্ষ করা যায়। "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল" (Health is at the root of all happiness), "স্বাস্থ্যই সম্পদ" (Health is wealth), "সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বাস" (Mens sana in corpore sano) প্রভৃতি প্রবাদবাক্যগুলির মধ্যে তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত।

ঐভাবে প্রদর্শিত পথে চলার কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে এবং বাইরের পরিবেশ থেকে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে, দেহে রোগের আক্রমণ ঘটে। সে ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণ থেকে মুক্তিলাভ করাই প্রথম উদ্দেশ্য ও কর্তব্য। মুক্তিলাভের নানা উপায় ও ব্যবস্থা বিশদভাবে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। রোগের লক্ষণসমূহ কিভাবে দেখা দেয়, রোগমুক্তির জন্য যে ভেষজ ব্যবহার করা হয় তা বলতে কি বুঝায় ইত্যাদি বিষয়ে আয়ুর্বেদে যে সকল ধারণা প্রচলিত আছে, পরবর্তী অংশে সেগুলি সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

আপাতত এইটুকু স্পষ্ট যে, কোন কারণে আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হলে দেহের অন্তর্বল ও শক্তি ক্ষয় হয়। ক্ষয়ের ফলে, অন্তর্বল ও শক্তি যখন ঐরূপ বিঘ্ন প্রতিরোধ বা দূর করার পক্ষে আবশ্যক ক্ষমতার যথোপযুক্ত মাত্রার নীচে নেমে যায়, তখনই রোগ আক্রমণ সম্ভব হয়। সুতরাং ভেষজ প্রয়োগ এবং/অথবা অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে অন্তর্বল ও শক্তি বাঞ্ছনীয় মাত্রাতে উন্নীত করতে পারলেই রোগ-মুক্তি ঘটে, আয়ুর্বেদ মতে এই সত্য স্বীকৃত হয়েছে।

স্বীকার্যটি যে কতদূর সত্য, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রকাশিত "ইমিউনিটি" (Immunity) বা দেহের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ সম্পর্কিত ক্ষমতা সেই দিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে, সে কথা বোধ হয় আজ আর অনেকের কাছে অবিদিত নাই।

সুতরাং অন্তর্বল ও শক্তিবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখতে হবে। সেজন্য মানসিক স্থৈর্য-বিধান করা একান্তভাবে আবশ্যক। অতএব সতত সকল আয়াস সেদিকেই কেন্দ্রীভূত করা আয়ুর্বেদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে মনের ক্রিয়াকলাপ বিশদভাবে জানতে হবে। এই সকল ক্রিয়াকলাপ জৈবিক কারণে যেভাবে আমাদের তাড়িত করে সেইভাবে চললে মানসিক স্থৈর্য লাভ করা অনেক সময়ে সম্ভব তো হয়ই না, বরং স্থৈর্য বিচলিত হবার আশঙ্কা বেশীভাবে দেখা দেয়।

আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি হিসাবে ভয় মানুষের সকল ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। মৃত্যু মানুষের অনিবার্য বাস্তব পরিণতি। অপ্রতিরোধ্য তার গতি। মৃত্যুকে তাই সর্বতোভাবে স্বীকার করে নেওয়াই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। অথচ মৃত্যুভয় মনের মধ্যে সুপ্ত আছে। সেই ভয় জাগ্রত হলে মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে হয় না, ও মনের পীড়ার কারণ ঘটে। সেজন্য মৃত্যুভয় আয়ুর্বেদমতে মারাত্মক ব্যাধিরূপে পরিগণিত। সুতরাং মৃত্যু স্বীকার করে নিয়ে কেবলমাত্র আয়ুকে হিতকর ও সুস্থ করাতেই আয়ুর্বেদের লক্ষ্য নিবদ্ধ। সম্ভবত এই শাস্ত্রে কোথাও মৃত্যুকে অতিক্রম করার কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয় না। হিতকর ও সুস্থ আয়ু আয়ত্ত করা সম্ভব হলে কিভাবে তা যাপন করতে হবে, সে বিষয়ে উপদেশ ও ব্যবস্থা এমনভাবেই দেওয়া হয়েছে যে, সেইভাবে জীবন যাপন করলে হিতকর ও সুস্থ আয়ুর মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে মাত্র। কিন্তু কোনক্রমেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না। জন্মের পটভূমিকে উজ্জ্বল ও তাৎপর্য-মণ্ডিত করবার জন্য মৃত্যুকে তাই চরমপত্র ও অবধারিত রূপে, মহনীয়রূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

পরমার্থই লক্ষ্য ঃ

উপরে আলোচিত পথ অনুসরণ করে হিতকর ও সুস্থ আয়ু লাভ করা উচিত। তবেই পরমার্থ বা শ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক চতুর্বর্গের ফললাভ করা সম্ভব। ধর্ম বলতে কোনরূপ অদৃশ্য দেবতা বা শক্তির আরাধনা বা ভজনা করা এখানে সম্ভবত বুঝান হয়নি। ধারণ করা অর্থে 'ধৃ' ধাতু হতে ব্যুৎপন্ন 'ধর্ম' বলতে যথাবিহিত কর্তব্য পালনের ইঙ্গিত আছে, যার সাহায্যে জীবন ধারণ করা যায়। ধর্ম পালিত হলে 'অর্থ' লাভ করা যায়, বা বৈষয়িক সম্পদ আয়ত্ত করার পথ সুগম হয়। সম্পদ আয়ত্ত হলে 'কাম' বা বাসনা চরিতার্থ হয়ে ভোগ সম্পূর্ণ হয়। পরিশেষে ভোগ-বাসনা পরিপূর্ণ হলেই নিবৃত্তি ঘটে ও বৈষয়িক সম্পদের প্রতি আসক্তি দূর হয়ে যায় এবং 'মোক্ষ' বা মানসিক শান্তি লাভ করা যায়।

এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে জীবন-যাপন প্রণালী যে কতদূর বাস্তব ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন তার ইঙ্গিত আয়ুর্বেদে পরিষ্কারভাবে পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাধি বা রোগে আক্রান্ত হলে চতুর্বর্গ পরমার্থ লাভের পথে বাধা উপস্থিত হয়। সেইজন্যই রোগের প্রতিবিধান এবং আক্রান্ত হলে তার কবল হতে মুক্তিলাভ করা আয়ুর্বেদের বিরাট ভাবনার বিষয়।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

এই সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহের আলোচনা হতে স্পষ্ট জীবন-যাপন ব্যাপারে আয়ুর্বেদের স্বতন্ত্র একটি দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গী বর্তমান। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সার কথাটি প্রধানত নিছক জড়-বাস্তবতার মধ্যে নিহিত। কোনরূপ হেঁয়ালি বা ভাবালুতার মধ্যে তা আকীর্ণ হয়নি। একটা কথা এই যে, মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তিগুলিকে প্রাকৃতিক ও সহজাত

শক্তিরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। প্রবৃত্তির তাড়নাতে মানুষের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যেমন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, অহংকার, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি প্রবৃত্তির আবেগ বা তাড়না বর্তমান। এইসকল প্রবৃত্তির তাড়নার আপেক্ষিক মাত্রানুসারে মানুষের সকল প্রকার তৎপরতা কম-বেশী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রবৃত্তি সমূহ একেবারে নির্মূল করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণে সেগুলি লোপ বা বিনাশ পায়। তবে, যদি কোন উপায়ে ঐ সকল প্রবৃত্তির তাড়না অতিক্রম করার ক্ষমতা লাভ করা যায়, মানুষ তখন আর মানুষের স্তরে থাকে না, দেবতা বা অতি-মানবের (Superman) স্তরে উন্নীত হয়ে যায়।

এই সকল কথা স্বীকার করে নিয়ে আয়ুর্বেদ-দার্শনিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জড় পদার্থ ও চৈতন্যের মধ্যে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ সতত বর্তমান। জড়ের প্রকাশ দেহে ও চৈতন্যের বিকাশ মনে। জড় পদার্থ হতে ধাপে ধাপে চৈতন্যের স্তরে পৌঁছানোর ইঙ্গিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে। সাধারণভাবে ধাপগুলি সংক্ষেপে এইরূপ।—(১) জড় পদার্থ (অন্ন), (২) জীবন (প্রাণ-শক্তি), (৩) চৈতন্য (মন), (৪) আত্ম-চৈতন্য (বিশেষ জ্ঞান) এবং (৫) সার্বজনীন চৈতন্য (আনন্দ)।

সর্বনিম্ন ধাপ জড় পদার্থ হতে জীবন আরম্ভ হয়েছে। ধাপে ধাপে ক্রমশ তা উপরের স্তরে উঠবার সম্ভাবনায় আবিষ্ট। কিন্তু কোন ধাপেই জড় ও চৈতন্যের সহাবস্থিতি (Co-existence) কখনই বিচ্ছিন্ন হয়নি—পরস্পর ওতপ্রোত হয়ে জড়িত থাকে। ঊর্দ্ধ-গতির সহায়ক নিম্নতম প্রান্তে কেবলমাত্র জড় সজাগ আর চৈতন্য সুপ্ত এবং উচ্চতম প্রান্ত শীর্ষদেশে চৈতন্য সজাগ আর জড়-পদার্থ সুপ্তাবস্থায় লীন। মাতৃজঠরে সুপ্ত ভ্রূণ প্রথমোক্ত অবস্থার ইঙ্গিত বহন করছে। প্রশান্তিতে প্রোজ্জ্বল সমাধি-নিমগ্ন (Super consciousness) সাধু-সজ্জন ব্যক্তির অবস্থা ঊর্দ্ধতম প্রান্তে উপনীত কেবলমাত্র জাগ্রত চৈতন্যের আভাস দিচ্ছে। সেখানে উপস্থিত হলে সমস্ত বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত ও জড়ভাব তিরোহিত হয়ে যায়, বলে শোনা যায়। যে যেমন যতটা সম্ভব অভ্যাস ও অনুশীলন করে সুপ্ত চৈতন্যকে ঊর্দ্ধ-গতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা বা সাধনা করে, তার উপরে নির্ভর করছে সেই ব্যক্তির মধ্যে কম-বেশী কতটা জড়-ভাব লীন

[illegible] অনুচ্ছেদের অবস্থায় [illegible]।

উপনিষদের [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible]। সম্পূর্ণ [illegible] উদ্বোধিত [illegible] কার্যে পরিণত করার উপরেই আয়ুর্বেদের চরম ধ্যান-জ্ঞান নিবদ্ধ [illegible]। উপনিষদের ঋষিবাক্য, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" [illegible] (Self reliance), আত্ম-সংযম (Self control) এবং আত্মত্যাগের (Self sacrifice) পথ। সেই পথের নির্দেশ [illegible] আয়ুর্বেদের [illegible] নিবদ্ধ।

সংস্কৃতির পথে ঃ

জৈবিক প্রবৃত্তিসমূহ ক্রমশ বশীভূত করে তাদের প্রভাব অতিক্রম করার মধ্যে সংযত ও সুন্দর, উদার ও উচ্চতর জীবনযাপনের স্পষ্ট ইঙ্গিত আয়ুর্বেদে লক্ষ করা যাচ্ছে। এই-ভাবে সংযত ও সুন্দর জীবন-যাপন করাই বোধকরি আধুনিকতার ধ্বজাধরদেরও

[illegible] অনুসারে [illegible] [illegible]। মন যদি কোন [illegible] করতে ইচ্ছা করে তো অমনি [illegible] ঘাড়া উঁচিয়ে [illegible] সামনে, [illegible] পঙ্কি হবে তার কাজ করে, আমি যা বলি তাই কর— [illegible]। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালিত হচ্ছি কিনা, নিজ নিজ মনকে জিজ্ঞাসা করলেই তার উত্তর পেতে পারি। 'সৎ' ও 'কু' ভাবের দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে অহরহ মানুষের সৃষ্টিকাল থেকে চলে আসছে। সেই দ্বন্দ্বে কু-ভাবের জয় যখন প্রতিষ্ঠিত, সৎ-ভাব পরাজিত, তখন দুর্দশার অন্ত থাকে না। সেজন্য দুর্দশা এড়াতে গেলে, কেবলমাত্র সৎ-ভাবের উদ্বোধন করলেই চলবে না, সৎ-ভাবের বিজয় প্রতিষ্ঠিত করার যত্ন বা সাধনা সর্বতোভাবে অবশ্যকরণীয়। অথচ কু-ভাব মনের মধ্যে আজন্মমৃত্যু বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তাকে নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। সে-কারণ মনকে এমনভাবে শাসন করা উচিত, যাতে সৎ-ভাবের প্রভাব অত্যধিক মাত্রায় ও সর্ব-প্রকারে তৎপর হয়ে উঠতে পারে ও সতত বর্তমান থাকে।

এইভাবে মনের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপার মনের সংস্কার ছাড়া আর কিভাবে হতে পারে? অনুশীলন ও চর্চার পথে মনের সংস্কার করার ব্যাপারকে সংস্কার বা সংস্কৃতি (Reform বা Culture) নামে অভিহিত করা হয়, সে কথা প্রায় সকলের নিকট সুবিদিত। যে ব্যক্তি এইভাবে জীবনযাপন করতে সফলকাম হন তাঁকে সংস্কৃতিবান বা অনুশীলিত-রুচি (Cultured) বলে গণ্য করা হয়।

সংস্কৃতি-সম্পন্ন জীবনযাপনের পক্ষে কিভাবে সহায়তা ঘটতে পারে, সেই বিষয়ে নানাবিধ উপায়ের আভাস আয়ুর্বেদে পাওয়া যায়। সংস্কৃতিময় জীবনযাপনের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার জন্য এইসকল উপায় অবলম্বন করে আমাদের প্রতিদিন চলার অভ্যাস করা উচিত। বাগভট্ট রচিত "অষ্টাঙ্গ-হৃদয়" নামক আয়ুর্বেদগ্রন্থে "দিনচর্যা (Daily conduct) অধ্যায়ে জীবন-যাত্রা প্রতিদিন কিভাবে পরিচালনা করা উচিত, সে বিষয়ে বিশদ ও ব্যাপক নির্দেশ লিপিবদ্ধ আছে। কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক অনূদিত বাংলা 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়' হতে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নির্দেশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"শুভকার্যে উপদেশাদি দ্বারা যাঁহারা সহায়তা করেন, সেই কল্যাণমিত্রদিগকে বিনীতভাবে ভজনা করিবে। আর পাপ মিত্র-দিগকে (পাপজনক কার্যে সাহায্যকারীদের) নিকট হইতে দূরে থাকিবে অর্থাৎ তাহা-দিগকে দূর হইতে বর্জন করিবে।

"অবৃত্তি (জীবিকোপায়রহিত) ও ব্যাধি [illegible] জানিবে।

[illegible] রাজা ও অতিথিদের অর্চনা করিবে। যাচক-দিগকে প্রত্যাখ্যান দ্বারা বিমুখ করিবে না; পরকে বচন দ্বারা পরিভব করিবে না, এবং তাহাদের অবমাননা করিবে না।

"অপকারপরায়ণ শত্রুর প্রতিও উপকার-পরায়ণ হইবে। সুতরাং উপকারীর যে উপকার করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? সম্পৎকালে ও বিপদকালে সমচিত্ত হইবে অর্থাৎ সম্পদকালে বিরত ও বিপদকালে বিষণ্ণ হইবে না। হেতুতে ঈর্ষা করিবে ফলে ঈর্ষা করিবে না অর্থাৎ এই ব্যক্তি এমন বিদ্বান ও দাতা আমি কেন তাহার মত না হইব? এইরূপ হেতুতে ঈর্ষা করা ভাল। কিন্তু অমুক ব্যক্তির এমন বস্ত্র অলংকারাদি আছে আমার নাই—এ প্রকার ফলে ঈর্ষা করা উচিত নয়।

"কোন প্রস্তাবকালে হিতকর, পরিমিত সত্য ও মনোজ্ঞ বাক্য বলিবে। আলাপকালে প্রথমে কথা বলিবে। কথা কহিবার সময় সুমুখ (ভ্রূকুটিহীন), সুশীলপ্রকৃতি ও করুণার্দ্রচিত্ত (মাতা যেরূপ পুত্রের প্রতি করুণার্দ্র সেইরূপ) হইবে।

"বুদ্ধিমান ব্যক্তির সকল কার্যে লোকই উপদেষ্টা। অতএব সাংসারিক সকল বিষয়ে লোকের অনুকরণ করিবে। অর্থাৎ বুদ্ধিমান লোক যেমন ব্যবহার করেন সেই প্রকার ব্যবহার করিবে।

"সকল জীবে দয়া, দান এবং কায়, বাক্য ও চিত্তের দমন, পরপ্রয়োজনে স্বার্থবুদ্ধি (পরের কাজ নিজের কাজ বলিয়া সম্পাদন) এইগুলি পর্যাপ্ত সদ্বৃত্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সদাচার।

"সম্প্রতি আমার দিনরাত্রি কিভাবে যাইতেছে অর্থাৎ আমার কার্য ভাল কি মন্দ হইতেছে, এই বিষয়ে সর্বদা স্মরণ করিলে মানব দুঃখভাগী হয় না।

"সংক্ষেপে সদাচার সমূহ কথিত হইল। যিনি এই সকল সদাচার পালন করেন, তিনি আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য, যশঃ, স্বর্গাদি শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

ভালভাবে একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝা যায় যে, এই সকল সদাচার (Good conduct) দেশ, কাল, মত নির্বিশেষে সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণীয় ও পালনীয়। এই ধরনের নির্দেশ-পালন ক্রমশ অনুশীলন ও স্বভাবের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারলে সংস্কৃতি-সম্পন্ন রুচিবান হওয়া কত সহজ, তাও বিশেষভাবে স্পষ্ট। আয়ুর্বেদে উল্লিখিত এই সকল মৌলিক ও ধ্যানগম্ভীর সাংস্কৃতিক দিকের প্রতি বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণীয়, সেকথা বলাই বাহুল্য।

(প্রধানমন্ত্রীর সফরে—৩)

এবার আসল যাত্রার শুরু। মস্কো থেকে ওয়ারশ', যাকে পোল্যাণ্ডবাসীরা বলে ভারসাভা, প্রায় সাতশো বছরের পুরোনো শহর। ভারতীয় বিমান বাহিনীর টি-ইউ—১২৪, দুই ইন্জিনের জেট বিমান। এটি বিমান বাহিনীর যাতায়াত শাখার অনেকগুলোর ভেতর একটি—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এমনি গণ্যমান্যদের জন্যে।

সামনের দিকে সিঁড়ি (একটি মাত্র সিঁড়ি) দিয়ে আমরা সবাই আগে উঠে গেলাম ভিতরে। প্রধানমন্ত্রী আসবেন শেষে। কিন্তু নামবার বেলায় প্রথাটা উল্টো: প্রধানমন্ত্রী প্রথম, তারপর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা, অতঃপর রাম-শ্যাম-যদু-মধুদের দল। বিমানের ভিতরটি তিন ভাগে বিভক্ত। ঢুকেই প্রথম প্রধানমন্ত্রীর কেবিন। একটি টেবিল, দুটো বসার জায়গা, একটি ডিভানের মতো শয্যা ঘিরে রঙের পর্দার পেছনে। তারপরে একটি কেবিন, উচ্চপদধারী কর্মচারীদের জন্যে।

প্রটোকলের নকশা, পৌছুনোর সময়ঃ
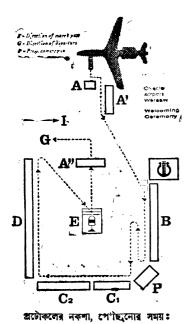
পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীকে অভ্যর্থনা করছেন।

চারটি টেবিলে, চারটে করে বসার জায়গা। ওই কেবিনে রইলেন বৈদেশিক সচিব রাজেশ্বর দয়াল, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হাকসার, চীফ অব প্রটোকল বিক্রম শা, যুগ্ম সচিব (বাণিজ্য), রামচন্দ্রন, যুগ্ম সচিব (বৈদেশিক) জগত মেহতা, প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের ডাইরেকটর নটবর সিং, প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসক ডক্টর মাথুর, একান্ত সচিব শেষণ। বাকি জায়গায় যাত্রীদের যে কেউ বসতে পারে। কারোর আপত্তি নেই। এর পরের অংশটি যাত্রিবাহী অন্যান্য বিমানের মতো। রামশ্যাম সকলের জন্যে।

প্রধানমন্ত্রীর সরকারী দলে আরো রইলেন কয়েকজন: সোস্যাল সেক্রেটারি শ্রীমতী উষা ভগৎ, দুজন সিকিউরিটি অফিসার দত্তমশায় ও যোশী, ব্যক্তিগত সহকারী গুপ্তজী, প্রধানমন্ত্রীর ভৃত্য নাথুরাম, আকাশবাণীর রিপোর্টার কৃষণকুমার সুদ, সিনে ক্যামেরাম্যান অগ্নিহোত্রী এবং ফটোগ্রাফার জৈন। (নাথুরাম হল জহরলাল নেহরুর পুরাতন ভৃত্য হরির ছেলে। হরি একবার উত্তর প্রদেশ বিধানসভার সভ্যও হয়েছিল। কয়েক বছর আগে মারা গেছে।)

আমাদের মতো অন্যান্যদের দলে রইল: টাইমস অব ইণ্ডিয়ার জি কে রেড্ডি, পি টি আইয়ের মস্কো রিপোর্টার ভাটস, ইণ্ডিয়ান একসপ্রেসের মস্কো রিপোর্টার দেব মুরারকা, ইউ এন আইর অ্যাকটিং জেনারেল ম্যানেজার রাজাগোপালন, দিল্লির তেজ্ নামক উর্দু কাগজের সম্পাদক ও মালিক বিশ্ববন্ধু গুপ্ত, হিন্দী হিন্দুস্থানের রিপোর্টার চন্দ্রাকর। সকলেই বিশেষ সংবাদদাতা।

প্লেন ছাড়ল। বায়েলো রাশিয়ার উপর দিয়ে উড়ে আমরা যাব পোল্যাণ্ডের আকাশে। এয়ার হোসটেস দুজন, এয়ার ইণ্ডিয়া থেকে ধার নেওয়া—শকুন্তলা থাডানি এবং মিস হিদর কার্টিস। লাউডস্পীকারে যাত্রীদের আদর আহ্বান জানাতে গিয়ে তাঁরা আমাদের স্বাগত জানালেন এয়ার ইণ্ডিয়ার তরফে। অমনি হাসির রোল। ঘোষণাকারিণী অমনি নিজেকে শুধরে নিলেন। দোষ দেওয়া যায় না। বরাবর তাঁরা যাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে আসছেন এয়ার ইণ্ডিয়ার তরফে—বম্বে-লণ্ডন-নিউইয়র্ক, দিল্লি-মস্কো-লণ্ডন ইত্যাদি লাইনে। অভ্যাসবশত প্রচারও হল তাই। তারপর থেকে আমরা স্বাগতবাণী পেতে লাগলাম ভারতীয় বিমান বাহিনীর তরফে।

প্লেন চালাচ্ছিলেন স্কোয়াড্রন লীডার মুখার্জি। ক্যাপটেন সিং-এর অধীনে এঁরা একুনে দশজন। তিনজন পাইলট—সিং, মুখার্জি আর গোয়েল; নেভিগেটর মেহতা, ফ্লাইট ইনজিনিয়ার কৃষ্ণমূর্তি, নেভিগেটর ভাস্করণ, সিগন্যালার মহাজন, গ্রাউণ্ড ইনজিনীয়ার মিনহাস ও তার দুজন সহকারী শর্মা ও গীল। অতি চমৎকার একটি দল। প্রত্যেকের মুখে হাসি, অতি ভদ্র, আলাপে, কর্তব্যনিষ্ঠায় প্রশংসনীয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁদের অনেকে আমাদের বন্ধুস্থানীয় হয়ে গেলেন।

পোল্যাণ্ডের আকাশে ঢুকতে না ঢুকতেই যাত্রীদের মুখে "লে বাবা!" ধ্বনি। বিশ্রী আবহাওয়া। কালচে মারা গোমড়ামুখো আকাশ আর মেঘ, তাকালে আর কিছু চোখে পড়ে না। "ফাসন ইওর বেল্ট" অনুপাদেয় আদেশ বৈদ্যুতিক আলোকে লেপ্টে আছে
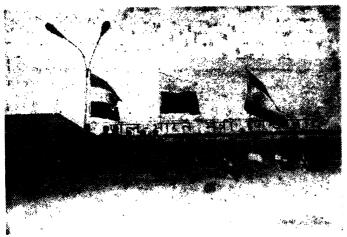
"পোল-ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ"। একটি ফেসটুন

সামনে। আর কী গোঁত্তা, ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে। মিসেস ভগৎ বেচারা বমি করতে করতে কাহিল। কাহিল আমরা সবাই প্রায়, বমন কার্যটি না করলেও। ওয়ারশ এয়ার-পোর্টে নামার দশ মিনিট আগে অবধি চলল আমাদের গোঁত্তা খাওয়া। তা থেকে ইন্দিরাজী রেহাই পাননি, প্রধানমন্ত্রী হলে কি হবে। তবে উনি মোটেই কাহিল হননি, বেশ সামলে নিয়েছেন।

যাই বলুন আর তাই বলুন, রেলে যাওয়ার মতো জিনিস আর হয় না। কতো-বার কতো জায়গায় বিমানে গেছি। কিন্তু যেমনি মাটির মায়া ছেড়ে আকাশে ওঠা, তখন থেকে মাটিতে ফিরে না-আসা অবধি মনে যেন স্বস্তি থাকে না। মাটির কাছা-কাছি থাকলে কেমন যেন থাকে একটা নিরাপত্তার ভাব।

প্লেন এবার নামবে। চীফ অব প্রটোকল আমাদের জানালেন, প্রধানমন্ত্রী প্রথম নামবেন, তারপর আমরা। ঠিক আছে। কিন্তু ভারত সরকারের সিনেক্যামেরাম্যান অগ্নি-হোত্রীর মুখ চুন। তাকে যে নামতেই হবে আগে। তা না হলে কী করে সে ছবিতে রেকর্ড রাখবে প্রধানমন্ত্রীর নামার, অভ্যর্থনার ইত্যাদির? সে অনুমতি পেল, এবং ফটোগ্রাফার জৈনও।

বিকেল পাঁচ, কিন্তু সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাব। ঘোলাটে আকাশ থেকে পিটিপিটে বৃষ্টি। ওদিকে প্রথামত অভ্যর্থনা। রকমটা এমনি (পরবর্তী স্থানগুলোতেও) : আমাদের প্রধানমন্ত্রী সিঁড়ি বেয়ে নামলেন। পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এসে কর-মর্দন করলেন। কয়েকটি সুসজ্জিত ছেলে-মেয়ে (নিজেদের জাতীয় পোশাকে, কিম্বা পাইওনিয়রদের পোশাকে) এসে দিল ফুলের তোড়া। ইন্দিরাজী তাঁর কর্মচারীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পোল্যাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী পরিচয় করিয়ে দিলেন (একটি বিশেষ স্থানে তাঁরা সারি দিয়ে দাঁড়ালো) অন্যান্য মন্ত্রীদের।

এ-বি-সি-ডি করে সব একেবারে ছক-কাটা। কিছু কাছে দাঁড়ালো সামরিক ব্যাণ্ড অমনি বাজাল প্রথম ভারতের জাতীয় সংগীত, তারপর পোল্যাণ্ডের। দুই প্রধান মন্ত্রী বি-নামক স্থানে দণ্ডায়মান সৈনিকদের কাছে এগুলেন। অমনি তাদের কমাণ্ডিং অফিসার একটি তলোয়ার নাকের সামনে সোজা করে ধরে গটগট করে এসে ইন্দিরাজীকে জানালো তার সৈনিকরা তাঁকে সম্মান জানানোর জন্যে তৈয়ার। তিনি তাদের পরিদর্শন করুন। প্রধানমন্ত্রী প্রথম অভিবাদন করেন সৈনিকদের পতাকা। তার-পর কাদের তাসে তালে পরিদর্শন। শেষ হলো ইন্দিরাজী একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন, "জয় হিন্দ"। উত্তরে সৈনিকরা সমস্বরে গর্জন করে ওঠে। (ওটা গর্জন নয়, নিজে-দের ভাষায় অভিনন্দন)। অতঃপর সি-ওয়ান ও সি-টুতে দণ্ডায়মান গণমান্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়।

প্রটোকল এখনও শেষ হয়নি। ততোক্ষণ বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে জোরে। বেশ ঠাণ্ডাও পড়েছে। আমার গায়ের ওভারকোট দুই কাজই সারে—বর্ষাতি বাইরে, ভিতরে পশম। তাতো হলো। কিন্তু মাথা? ভিজে একশেষ, সেদিন ভিজেছিল কয়েক শো ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য পোল্যাণ্ডবাসীরা, যারা ইন্দিরাজীকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। অনেকের কাছেই ছাতা নেই। তাতে মনে হলো বৃষ্টি হয়তো অপ্রত্যাশিত। ভয় পেলাম, এবার নিমুনিয়া না হয়।

দুই প্রধানমন্ত্রী বৃষ্টির মধ্যেই এগিয়ে গেলেন ই-নামক স্থানে একটি অনুচ্চ মঞ্চে। প্রথম ভাষণ পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী জোসেফ সিরিয়ানকিয়েভিচ মহাশয়ের। একজন ছাতা ধরে আছেন তাঁকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে, আরেকজন ইন্দিরাজীর মাথার উপর ধরলেন একটি ছাতা। ভাষণে তিনি পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার কথা তুললেন, জানালেন ভারতের প্রতি তাঁর দেশবাসীর বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য। (সবই ঠিক, কিন্তু এদিকে মাথা ভিজে গায়ে কাঁপুনি দিচ্ছে যে! পা পা করে এগিয়ে একজন ছত্রধারী পোল্যাণ্ডবাসীর কনুইর মতো কাছে পারি এগিয়ে গেলাম, অনুমতির অপেক্ষা না করে। দেখলাম আরো দুজন সহকর্মীও সেই আশ্রয়ে উপস্থিত)।

আমাদের প্রধানমন্ত্রীও ভারত সরকার ও দেশবাসীদের বন্ধুত্বের কথা জানালেন পোল্যাণ্ডবাসীদের প্রতি, গত মহাযুদ্ধে তাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের প্রশংসা করলেন, প্রশংসা করলেন তাদের নতুন তৈরি দেশের যা কিনা ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগেছে গত ২১ বৎসরে। (হে প্রটোকল! দোহাই, এবার ক্ষামা দাও!)

ইন্দিরাজীর ভাষণ একজন পোলীশ কর্মচারী অনুবাদ করছেন দেশের ভাষায়: বৃষ্টি ওদিকে অনবরত এবং জোরদার, মুষলধারে না হলেও। অনুবাদক তার হাতের নোটবুকে টুকে নিচ্ছেন ইন্দিরাজীর বক্তৃতা, তারপর অনুবাদ করছেন। পোলীশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের মাথার উপর ধরা ছাতাটি পাশের লোকটির হাত থেকে নিয়ে, নিজে গিয়ে ধরলেন অনুবাদকের মাথার উপর। এই উদাহরণটি নিজেদের চোখের সামনে দেখে আমরা চমৎকৃত না হয়ে পারলাম না।

জানি না, পোল্যাণ্ডে এটা হামেশাই হয় কিনা—একজন প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের কথা না ভেবে ভাবলেন সামান্য একজন অনুবাদকের কথা। এবং এই একটি মাত্র ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা যেন দেখতে পেলাম শুধু প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত মহত্ত্ব নয়, তাঁর দেশের মহত্ত্ব। এবং পোল্যাণ্ডের কৃষ্টিগত উৎকর্ষতা, যা অনেক শতাব্দী ধরে গোটা ইউরোপের প্রশংসাভাজন। অন্য দেশের নেতা-দের কথা না জানাই ভাল। তবে অনেকটা এই ধরনের সহানুভূতি এক সময়ে আমরা দেখেছি জওহরলালের। তাঁকে দেখেছি ড্রাইভারকে সাময়িকভাবে অচল মোটর-গাড়িকে অন্যান্যদের সঙ্গে নিজ হাতে ধাক্কা দিয়ে চালু করতে। কিন্তু আজকালকার কথা না বলাই ভাল। কে কার খোঁজ রাখে, সব চাচারাই আপন প্রাণ বাঁচানো নিয়েই ব্যস্ত। তোমার মাথায় বৃষ্টি পড়ুক কি বাজ পড়ুক তা আমার কী?

বুঝলাম এবার প্রটোকলের নিয়মকানুন শেষ হয়ে আসছে। ওদিকে আমাদের বলা হয়েছে আমরা যেন কালবিলম্ব না করে গাড়িতে চড়ে বসি। ওই একই নম্বর, গাড়ির সামনে কাঁচে আটকানো—আট থেকে বারো। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশের অভ্যর্থনার

একটা শেষ অংশ আছে, যা আর অন্য দেশে দেখিনি। হয় কি, যখন ইতি-আদি হয়ে গেল তখন যে-সমস্ত সৈনিক গার্ড অব অনার দিয়েছে, তারা প্রধানমন্ত্রীর পাশ দিয়ে মার্চ করে যাবে। অর্থাৎ বক্তৃতার শেষে ইন্দিরাজী এসে দাঁড়ালেন এ"-নামক স্থানে। চমৎকার লাল পোশাক-পরা, হাঁটু অবধি বুট-আসা পায়ে লম্বা লম্বা কদমে সৈনিকরা চলে যায়, সামরিক বাদ্যের তালে তালে, প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন করে। এই মার্চ-পাস্ট হল যাকে বলা হয় গজ-স্টেপ। অর্থাৎ পা-কে সোজা সামনে তোলে উরু অবধি, আর বুট জুতো শব্দ করে নামে মাটিতে। ফলে একটা আওয়াজ ওঠে "দড়াম দড়াম—দ্রাম-দ্রাম।"

ব্যস, গুডবাই প্রটোকল। এবার দে-দৌড় দে-দৌড়। কোথায় কোন নম্বর গাড়ি, খুঁজে নাও এবং খুঁজে নাও তক্ষুনি। কেননা, সবাইকে যেতে হবে মোটরের দ্রুত মিছিলে। সব ছক-কাটা। সবগুলো গাড়ি, একুনে গোটা ত্রিশেক, লাইন করে দাঁড়ালে পরপর। প্রথম একটি পাইলট গাড়ি, তারপর একটি সিকিউরিটি গাড়ি, তারপর প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি যার দু পাশে ইনজিন চালিয়ে অপেক্ষমান দর্শনীয় মোটর সাইকেলবাহী শিরস্ত্রাণ পরিহিত আউটরাইডারস, তারপর এক দুই তিন চার করে নম্বর দেওয়া গাড়ি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী গেলেন একটি প্রাসাদে যার নাম "মিসলিয়েভেস্কি প্রাসাদ", পোলীশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। কর্মচারীরা এবং যদুমধুরা গেলেন একটা নতুন হোটেলে যার নাম হল "ক্রোনোভা"। তাঁর সঙ্গে গেল ডাক্তার মাথুর, শেষণ, যোশী, মিসেস ভগৎ, গুপ্তজী আর নাগরাজ। বাদবাকি সবাই ঐ ক্রোনোভা হোটেলে।

একেবারে নতুন। আমরাই নাকি প্রথম অতিথি। বড় হোটেল নয়, অনেকটা গেস্ট হাউস, তিনতলা। গোটা বাড়িটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। অতো ঠাণ্ডা বাইরে, কিন্তু একবার ভিতরে এলে শুধু শার্ট গায়েই চলে যায়। তবে আদবকায়দা আছে, কমিউনিস্ট দেশ হোক, সমাজতান্ত্রিক দেশ হোক। কোট নাকি রাখতেই হয় গায়ে, কামরার বাইরে এলে। কেয়ার করে কে? গলার টাই-টা ঢিলে করে দাও, বোতামটা খুলে, দেখাও কী ভীষণ ব্যস্ত, হাত গুটিয়ে নাও এখানে ওখানে, সবাই ভাববে কী কাজের মানুষ গো! তবে কিনা, খাওয়ার হলঘরে ওই ব্যস্ত-সমস্ত ভাবের অ্যাকটিং চলে না। তখন সেজেগুজে আসতে হবে। ওভারকোট রেখে অন্য স্থানে, হলের কাছেই ক্লোকরুমে। আমাদের মধ্যবিত্ত অর্থাৎ বিত্তহীন প্রাণ; সুতরাং ক্লোকরুমে রাখবার আগে পকেটে যাতে কিছু না-থাকে তা সবাই দেখে নিত। অনেক হোস্টেলে ক্লোকরুমে কর্মচারী থাকে না। শুধু হুকে ঝুলিয়ে রাখো। সুতরাং মধ্যবিত্ত প্রাণে সহজাত সন্দেহটা উঁকিঝুঁকি মারে: যদি কেউ মেরে দেয়? আবার এও সন্দেহ হয়েছে যে, যদি বাইরের কেউ আমারটা মেরে দেয়। তার সস্তা দামেরটা রেখে? কী আর বলব, মধ্যবিত্ত প্রাণ, আর চোর-ছ্যাঁচড়দের দেখে দেখে দেশে হয়েছি হয়রান! কিন্তু ও-সব দেশে কেউ কিছু মেরে দেয়নি। কোথাও।

ক্রোনোভা হোটেলে একেবারে নতুন গন্ধ, এমন কি রঙের। শোয়ার একটি কামরা, একটি বাথ, বাথটা প্ল্যাসটিকের পর্দা দিয়ে ঘেরা। দুটো জামাকাপড় রাখার আলমারি। চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। একটি ছোট টেবিলে রাখা এক গাদা ফল, একটি সোডার বোতল। বড় টেবিলে সাজানো কাগজপত্র। প্রধানমন্ত্রীর ছাপানো প্রোগ্রাম, পোল্যাণ্ডের ইতিহাসের ছোট একটি বই। তাদের নেতৃস্থানীয়দের জীবনী (টাইপ করা) ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রীর দলবলের কে কোথায় আছেন, কী টেলিফোন, সমস্ত লেখা সামনে।

কিন্তু সাংবাদিকদের প্রথম প্রশ্নই হলো, "হোয়াট অ্যাবায়োট ফাইলিং স্টোরিজ?" মিস্টর ভোয়টোভিচ হলেন আমাদের প্রেস অফিসার। খুব অমায়িক লোক, ইংরিজী জানেন, ফরাসীও কিছু কিছু। তিনি এক-গাল হেসে যা বললেন, তা আমি মুখস্ত করেছি দিল্লিতে। সফরে বেরুনোর আগে: "পরোয়া মৎ করো।" ইনি বললেন, 'ডোণ্ট কেয়ার, এভরি থিং উইল বি ফাইন।' ডোণ্ট কেয়ার? হাজার হাজার মাইল এলাম কেয়ার করতে, আর উনি বলছেন ডোণ্ট কেয়ার। লোকটা বলে কী?

বুঝলাম উনি কেন বলছেন, পরোয়া করো না। এক সিঁড়ি নিচেই, একতলায়, সংবাদ পাঠানোর দপ্তর। সেই অফিসে সকলেই মেয়ে। মুখে হাসির প্রাচুর্যে প্রায় ভুল বুঝার ব্যাপার আর কি! আমরা সাময়িক-ভাবে তাদের রাঙানো ঠোঁটের হাসিকে ডোণ্ট কেয়ার করে শুধু জানালাম, এই সমস্ত সংবাদ জলদি করে পাঠাও ভারতে, যেভাবে পারো, কেবল, কি টেলেক্স।

প্রেস অফিসার জানালেন, তোমরা নিজে-দের কামরা থেকে তোমাদের অপিফে টেলি-ফোন করতে পার। সব বন্দোবস্ত আছে এই হোটেলে। ভাবলাম, করে দেখি না কেন। অন্দরে থেকে কথা বলব, কী মজা। করেও ছিলাম। টেলিফোন বেজে চলল, তারা জানালেন, টেলিফোন কেউ ধরছে না। মনে নেই কতো রাত্রি তখন।

হোটেল ক্রোনোভায় এবার খাওয়ার সময়, রাত্রে। পেট চোঁ-চোঁ। সেই খাবার, অর্থাৎ ইংরিজী খাবার, সব সেদ্ধ, মুরগী সেদ্ধ, কপি সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, মাছ অবধি সেদ্ধ। একগাদা স্যালাড। "কোথায়, তোমাদের দেশীয় খাবার কোথায়?" বললাম। তারা দুঃখের সঙ্গে জানালেন, এখন আর হবে না। তারা ধরে নিয়েছেন আমরা ওই ইংরিজী খাবারেই সন্তুষ্ট। (পরদিন থেকে ওটা তারা সারিয়ে নিয়েছিল।) খাবারের সঙ্গে চমৎকার ঝাল-ঝাল "হরস র‍্যাডিস" বাটা।

বললেন মিস্টর ভোয়টোভিচ: জানো, আমার মার কথা মনে পড়ছে। যখনই বাড়ি যেতাম, দূরে গ্রামে, তখনই মা খাবারের সঙ্গে দিতেন এই ঝাল-ঝাল হরস-র‍্যাডিশ। আমরা খুব ভালবাসি।' মনে মনে বললাম, তোমাদের অশ্ব-মুলো আমাদের লংকার কনে আঙুলও ছুঁতে পারে না। প্রকাশ্যে বললাম, 'চমৎকার! চমৎকার!! আমাদের সর্ষে-বাটার মতো'। (আরো চলবে)

—খগেন দে সরকার

অন্ধের গ্রন্থপাঠ

দিল্লীর রাজসভায় দেওয়ান চমনলালের আনা অশ্লীলতা বিষয়ক ভারতীয় পিনাল কোডের সংশোধন প্রস্তাব নিয়ে আর এক দফা জোরালো আলোচনা হয়ে গেল। সিলেক্ট কমিটির অভিমত, এই আইনকে কিছুটা উদার করে অশ্লীলতার একটি সংজ্ঞা নির্ণয় করা হোক। কিছু কিছু মাননীয় সদস্য এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করে বলেছেন, এর ফলে নীতি ও শুচিতা গোল্লায় যাবে, এ দেশের যুব সম্প্রদায়ের সর্বনাশ হবে। কেউ কেউ স্বপক্ষেও বক্তৃতা দিয়েছেন। —পুরোনো ইতিহাস!

সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখলুম, কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় সিলেক্ট কমিটির মনোবাঞ্ছার সমালোচনা করে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অশ্লীলতার সংজ্ঞা নির্ণয় করে দেওয়া বিপজ্জনক, তা' হলেই হাত বাঁধা পড়বে, বিচার আবদ্ধ হবে স্ট্রেট জ্যাকেটে। তার চেয়ে আদালতের হাকিমের ওপর নির্ভর করাই ভালো, কেননা, হাকিম শুধুমাত্র শুষ্ক আইন প্রয়োগের একটি যন্ত্র নয়, তিনি একজন মানুষ, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত বাস্তব ঘটনার দিকে চোখ খোলা রাখবেন।

আনীত বিলটিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, অভিযুক্ত গ্রন্থ বা চিত্র বা দৃশ্য বা বস্তুটি সম্পর্কে সেই সেই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের অভিমতও গ্রহণ করা উচিত বিচারের আগে। আমরা জানি, বিলটি পাস বা অগ্রাহ্য হবার আগে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক বাদানুবাদ চলবে।

অশ্লীলতার অভিযোগে আইন প্রয়োগের ব্যাপারটির আলোচনা এক হিসেবে বড়ই ক্লান্তিকর। কোন্‌টা শ্লীল কোন্‌টা অশ্লীল সে তর্কে যেতে চাই না, জানিনা কিছু ও-বিষয়ে, কিন্তু এ কথা মনে হয়—আমাদের দেশে অশ্লীলতা বিষয়ক আইন নিয়ে পুলিস বা আদালতের মাথা ঘামানো এক হিসেবে সময় নিয়ে বিলাসিতা—নিছক সময়ের অপব্যয়ও বলা যায়। এ কথা আমরা জানি—আদালতে হাজার হাজার মামলা এ-দেশে জমে থাকে, সময়ের অভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের মামলা (যেমন খুন-জখম, বিবাহ-বিচ্ছেদ, জমির মালিকানা, চোরাকারবার, ট্যাক্স ফাঁকি—এই সমস্ত বাস্তব ও জীবনযাত্রার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) বছরের পর বছর চলতে থাকে—খরচ বাড়ে নামান্তর নয়! আমাদের দেশে সাধারণ অপরাধ ও অনাচারের সংখ্যা এত বেশী যে, তার তাল সামলাতে পুলিস হিমসিম খেয়ে যায়। বাড়িতে ছিঁচকে চুরি হলে কিংবা রাস্তায় পকেটমার হলে—আজকাল আর কেউ থানায় খবর দিতেই যায় না—কারণ লোকের ধারণাই হয়ে গেছে, পুলিসের এখন এ সব ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় নেই! সুতরাং, আদালত এবং পুলিসকে এর ওপরেও অশ্লীলতার অপরাধের জন্য সক্রিয় রাখা কতখানি যুক্তি-যুক্ত? অশ্লীলতা অপরাধ কি অপরাধ নয় সে প্রশ্ন পরে, কিন্তু এক ব্যক্তির সংসারের যাবতীয় বস্তু চুরি হয়ে গেল—আর সেই লোকটির ছোট ছেলে অশ্লীল বই পড়ে—এর মধ্যে কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ?

সুতরাং, মনে হয়, বর্তমান ভারতবর্ষে অশ্লীলতা বিষয়ে মাথা ঘামানো নিছক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণ ও ফ্যাশান। যে-দেশে শতকরা ২৩ জন লোক মাত্র কোনো-রকমে নাম সই করতে পারে, শতকরা ১ জন লোকও ইস্কুল-কলেজের বাইরে বই পড়ে কি পড়ে না সন্দেহ, সে-দেশে শিল্প-সাহিত্যে অশ্লীলতা অন্বেষণকে প্রায় কাটা মুণ্ডের দিবাস্বপ্ন বলা যেতে পারে। বই পড়ে কে খারাপ হচ্ছে না হচ্ছে দেখার আগে বই না পড়ে যে কত লোক খারাপ থাকছে—সেই বিষয়ে আশু দৃষ্টিপাত করা আরও অনেক জরুরি মনে হয়। উচ্ছৃঙ্খল বা দুর্নীতিগ্রস্ত বা গোল্লায়-যাওয়া নরনারীর মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই যে কখনো কোনো বই পড়ে না—এ সম্পর্কে সবাই নিঃসন্দেহ।

অশ্লীলতা ব্যাপারটা কি? যে যতই বাগাড়ম্বর করুক এ বিষয়ে, সংক্ষিপ্ত সত্য কথাটি এই যে, নর-নারীর মিথুন-চিত্রের অতি ঘনিষ্ঠ বর্ণনা বা সেই রকম ভাব-উদ্রেককারী শব্দ প্রয়োগকেই সবাই অশ্লীল বলে থাকেন। ওই চিত্রের নিপুণ বর্ণনা দেবার প্রয়োজন আছে কি নেই—তা আমরা জানি না, সে সব লেখকরা বুঝবেন, আমরা শুধু বিশ্বাস করি—লেখকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, লেখার আগে কোনোরূপ শর্ত প্রয়োগ করা উচিত নয়—তাঁর যে রকম ইচ্ছে সেই রকম লিখবেন, তারপর আমরা বিচার করবো, সেই লেখাটা ভালো কি খারাপ। আমরা জানি, ওইরূপ নিপুণ মৈথুন চিত্র-সম্পন্ন পৃথিবীর অনেক রচনা চিরায়ত শিল্পের অন্তর্গত হিসেবে সর্বস্বীকৃত—এবং আরো অসংখ্য ওই রকম রচনা অসার্থক হিসেবে পরিত্যক্ত। অর্থাৎ শিল্পের মানদণ্ড ওই চিত্রের ওপরে একেবারেই নির্ভরশীল নয়।

এবং, আর একটি সহজ কথা, ওই মিলন-চিত্র যতদূর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখা যায়, তার চরম এর আগে বহুবার লেখা হয়ে গেছে। আজ পৃথিবীর এমন কোনো আধুনিক লেখক এমন কোনো যৌন চিত্র রচনার নিজস্বতা দাবি করতে পারবেন না, যা কালিদাসে নেই, ভলটেয়ারে নেই...আরও কত নাম করবো, পাতা ভরে যাবে! কিন্তু আগেকার সবগুলিকে ক্লাসিক কিংবা ধর্মের অঙ্গ-আখ্যায় যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে শুধু এ-কালের শিল্পীদেরই আক্রমণ করার ব্যাপারটা কি রকম যেন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এর চিহ্ন বলে মনে হয়।

আর একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। বই না পড়েও যে অসংখ্য লোক দুর্নীতি-গ্রস্ত তা তো জানিই, কিন্তু বই পড়ে যে কেউ কখনো খারাপ হয়েছে তার কি কোনো প্রমাণ আছে? বই পড়ে বখে গেছে—এ রকম একটি লোককেও আমরা কখনো দেখিনি বা কথা শুনিনি। বরং, আমাদের মতন আরও অনেককে জানি যারা ছেলেবেলা থেকেই এটাসেটা পাঠক, হাতের কাছে যা বই পেয়েছে বাছবিচার না করে পড়েছে, গুরুজনের বইটা লুকিয়ে পড়ার দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল, কিন্তু তারা তো সকলেই সুস্থ সামাজিক ব্যক্তি এখন। গ্রন্থপাঠে একমাত্র ক্ষতি হতে পারে তাদের, যাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি খুব খারাপ। তাদের পক্ষে অন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং অন্ধ ছাড়া গ্রন্থপাঠ আর সকলের পক্ষেই উপকারী।

ঘনিষ্ঠ মিলন-চিত্র পাঠ করলে পাঠকের মনেও এক প্রকার উত্তেজনা জাগতে পারে, কিন্তু সেই জাগরণ কি অপরাধ না কোনো অপরাধের জন্ম দেয়? (এ কথা মনে রাখা দরকার, কোনো অবৈধ সম্পর্কের নারী-পুরুষ, অবিবাহিত যুবক-যুবতীর মিলন-দৃশ্য আর বৈধ স্বামী-স্ত্রীর মিলন-দৃশ্য—দুটোরই বেশী বর্ণনা আইনের চক্ষে অপরাধ, সম্পর্কের বৈধ-অবৈধতা আইনের চোখে এক্ষেত্রে সমান) আমরা সকলেই এই ধরনের বর্ণনামূলক কোনো রচনা পড়ে ভাবি—এটা আমি পড়লুম পড়লুম, আমার মত দৃঢ় চরিত্র আর কজনের, কিন্তু আমার ছোট ভাই বা অমুকের কিছুতেই পড়া উচিত নয়। বলা বাহুল্য, ছোটভাইরাও লুকিয়ে সেই সব রচনা পড়ে ফেলায় পর—তাদের কখনো খুনে কিংবা গুণ্ডা হয়ে উঠতে দেখা যায় না। বরং, যতদূর জানি, সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিদ্‌রা গ্রন্থপাঠের ফলে যৌনচেতনার উন্মেষকে কখনো অপকারক বলেন না, বরং স্বাস্থ্যকরই

বলে থাকেন। সমাজ সম্পর্কে যাঁদের কোনো দার্শনিক এবং টেকনিক্যাল জ্ঞান নেই, তাঁরাই সাধারণত এই সমস্ত রচনায় সমাজের ক্ষতি হবে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে থাকেন। সুতরাং, সব মিলিয়ে মনে হয়, অশ্লীলতা এবং কুরুচি বিচারের ভার আইন বা ধর্মাধিকরণের আওতা থেকে সরিয়ে এনে শুধু সমালোচক এবং পাঠকদের ওপরই রাখা ভালো। সব লেখকই ওদের কাছে সব সময় দায়ী।

অশ্লীলতা কোনো কংক্রিট ব্যাপার নয়। এমন কি মানহানির মামলার মতনও নিছক সাবজেক্টিভ নয়। অশ্লীলতার অভিযোগে বহু বই এ পর্যন্ত আদালতে গেছে, কখনোও অভিযোগের সমর্থনে কোনো কংক্রিট প্রমাণ দাখিল করা হয়নি। অর্থাৎ উকিল-মোক্তাররা বক্তৃতার তোড়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—সেই রচনার দ্বারা সমাজের ক্ষতি হবে, কিন্তু সত্যিই কোনো সামাজিক ব্যক্তির ক্ষতি হয়েছে কি না কখনো তা প্রমাণিত হয় নি, অথচ বহু লেখক শাস্তি পেয়েছেন। গ্যোয়টে যখন "তরুণ হেবর্টেরের দুঃখ" নামক বইটি লেখেন, তখন সেই ব্যর্থ প্রেমিকের শেষ পর্যন্ত গুলি করে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবার এত লোমহর্ষক বর্ণনা পড়ে সেই সময়ের ইওরোপে ব্যর্থ প্রেমিকদের মধ্যে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ একটি বই পড়ে সত্যি সত্যি অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট হয়েছে, কিন্তু তখনোও কেউ ওই বই লেখার জন্য গ্যোয়টে-কে শাস্তি দেবার কথা ভাবেন নি। যে-কোনো সুস্থ ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন, গ্যোয়টে নিশ্চিত কোনো প্রকারে দায়ী নন। অথচ, অশ্লীল রচনার কল্পিত ক্ষতির সম্ভাবনায় কত লেখককে যে এ-পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

প্রেমের চেয়ে বড়—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। বারো টাকা।

কথাসাহিত্যিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আসন সুনির্দিষ্ট। জগৎ ও জীবনকে দেখা এবং ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে তিনি এক দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর প্রত্যেকটি রচনাতে জীবনায়নের নব নব অভীপ্সা পাঠককে সদা কৌতূহলী করে রাখে। 'প্রেমের চেয়ে বড়' তাঁর সাম্প্রতিককালের উপন্যাস। রচনাটিকে লেখকের অবিরাম অন্বেষার এক নতুন পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই উপন্যাসে তিনি এক মহৎ জীবনাভিমুখিনতার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

উপন্যাসের নায়ক পরিমল। দীপ্তিমান তরুণ যুবক। সে বিশাখাকে ভালবেসেছিল। বিশাখা সেই চিরন্তন নারী, যার রক্তে আছে ভয়ঙ্কর নেশা। সে আর এক যুবককে প্রশ্রয় দিয়েছিল। পরিমলের বন্ধু, মলয়কে। পরিমল জানতে পেরে মলয়কে হত্যা করল। আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে প্রমাণ করল, তার প্রেম খাদহীন। বিশাখাকে মামলায় জড়াল না। তারপর, দশ বছরের কারাজীবনের নিঃসঙ্গতার শেষে সে এক গভীর প্রশ্ন নিয়ে ফিরে এল বাইরের আলো হাওয়ায়। পিতা এবং সংসারী মেজোভাই পরিতোষের সন্দিগ্ধ চোখে সে খুনী। একমাত্র পরিতোষের শিশুপুত্র এবং প্রকৃতি তাকে গ্রহণ করল। সংসারত্যাগী ছোটভাই সুকোমল এবং পরিতোষের স্ত্রী রমলা তাকে অন্যতর চোখে দেখে, তার অন্তর্দাহকে উপলব্ধি করতে পারে। পরিমলের আপাত গাম্ভীর্যের অন্তরালে, তার বিক্ষত এবং সন্তাপদগ্ধ আত্মা যা সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল, সেই পরিমল পরিবেশের বিরূপতায় ভ্রূক্ষেপহীন। আত্মকৃত পাপস্খালনের জন্যেই সে কি অক্ষয়বাবুর পরিবারের সাহায্যার্থে ছুটে এল। পুত্রহন্তা পরিমলকে দুঃস্থ অক্ষয়বাবু মেনে নিলেন। তারপর, ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মলয়ের ছোটবোন বুলাকে নিয়ে হৃদয়পুর যাত্রা। বুলা পরিমলকে চিনতে পেরেছিল। সে জেনেছিল, মানুষটা আর দশজনের চেয়ে অনেক বড়। তারপর যুবক অমূল্য-বুলার অন্তরঙ্গতাকে কেন্দ্র করে পরিমলের ভেতর পাপপুণ্যের সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত প্রেমের চেয়ে বড় যে আত্মা, যা অপাপবিদ্ধ, তার জাগরণ ঘটল। সেই পবিত্রবোধের স্বর্ণধারায় স্নান করে পরিমল মুক্ত হল। জীবনের মহত্তম সত্যের সন্ধান পেল। চলে এল জগদ্বল্লভপুরে, সুকোমলের আশ্রমে।

পরিমল, যার অপরাধ একটা সাময়িক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়, লেখকের অন্তর্দৃষ্টির ফলে সেই চরিত্র জীবনের মতাক্ত বন্ধুর পথযাত্রার শেষে এক মহান সমুন্নতি লাভ করেছে। পরিমল যেন ট্রাজেডীর নায়ক। দুঃসহ আত্মদুঃখের মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখকের অস্তিবাদী জীবনদর্শন এই চরিত্রকে অপরাজেয় হিসেবে দেখিয়েছেন। এইখানেই পরিমল চরিত্রের অনন্যতা।

উপন্যাসের অন্যান্য পাত্রপাত্রী, লেখকের বাস্তবতাবোধ এবং পর্যবেক্ষণ নিপুণতার ফলে যেমন সজীব-সচল হয়ে উঠেছে, তেমনি জীবনের আপেক্ষিক সমগ্রতাকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। পুত্রের আবির্ভাবে পিতা জগমোহনের মানস পরিবর্তন লক্ষণীয়। তার সহযোগী হল পরিতোষ। পরিমল খুনী, এ-সত্যটা তাদের কাছে বড়

হয়ে ওঠার মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতের সৃষ্টি হল। আর সেই অভিঘাতের প্রাতিস্বিক প্রতিক্রিয়া কুশলী লেখক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। বিবরী জগমোহন ছেলেকে এড়াতে চাইছেন, পিতা জগমোহন সন্তানের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছেন না। আর পরিমলের প্রতি রমলার নীরব সমর্থন পরিতোষকে উত্তেজিত করে, যার পরিণতি দাম্পত্যকলহ। বিশাখা চরিত্রটিও উল্লেখ-যোগ্য। আত্মরক্ষার তাগিদে সে এক অধ্যাপককে বিবাহ করে প্রবাসী হয়েছিল, কিন্তু তার হৃদয়ের পরিমলের প্রতি ভাল-বাসার যে আগুন চিরবহ্নিমান, তাকে সে প্রশমিত করতে পারল না। ফলত বিবাহ-বিচ্ছেদ অন্তে কলকাতায় ফিরে এল, ঠাঁই মিলল না সংসারে। আত্মদহনে পুড়ে পুড়ে পরিমলের জন্যে সে পাগলিনী হয়ে গেল। আর শেষ পর্যন্ত, আত্মহত্যার মধ্যে তার জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি। আশ্রমবাসী সুকোমল ঘটনাবস্তুর প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে যেন এক অবিচল সংযম এবং বৈরাগ্যের প্রতীক। প্রতিটি ঘটনা সংস্থান লেখকের শিল্প-সামর্থ্যের গুণে যথাযথ এবং অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

পরিবেশ সৃজনে লেখক এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। হৃদয়পুরের নিসর্গ বর্ণনা ক্যানভাসের ওপর রঙের আঁচড়ের মত বর্ণাঢ্য। আর ভাষা, মাঝে মাঝে মন্ত্রোচ্চারণের মত আমাদের চেতনাকে নাড়িয়ে দেয়, শুদ্ধ করে তোলে। গ্রন্থের আয়তনিক প্রসার সুবিস্তৃত হলেও, এর ঘটনাংশ বিপুল নয়। এ রচনার সিদ্ধি অন্যত্র। প্রথমত, শিল্পনৈপুণ্য। প্রতিটি ঘটনাকে বেগবান ভাষার দ্বারা এমনভাবে গ্রথিত করা হয়েছে যে, পাঠকমাত্রেই উপন্যাসের বিষয় ও চরিত্রের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতে কখন সৃষ্টির সামিল হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়ত, লেখকের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং মহত্তর জীবনবোধ, যা এই উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী মর্যাদা দেবে।

৩৪৬।৬৭

প্রবন্ধ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের নারী প্রগতি। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কে সি ব্যানার্জী এণ্ড কোং, ১৯২/ডি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। চৌদ্দ টাকা।

বৃহদায়তন এই পুস্তকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বত্রিশটি দেশের নারী প্রগতির পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে লেখক কোনো কোনো মহিলার জীবন ও সংগ্রামের কাহিনীরও উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জর্মানী, সুইডেন, রাশিয়া ও জাপান ইত্যাদি দেশের নারী সপর্কে পরিচয়দান অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। অন্যান্য বেশির ভাগ দেশের নারী প্রগতির যা পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা এতো সংক্ষেপ যে তা থেকে সম্যক কোনো ধারণা করাই সম্ভব হয় না। অবিশ্যি লেখক ভূমিকায় বলেছেন যে, তার এই কাজের ব্যাপারে অন্যান্য দেশ থেকে তিনি বিশেষ সহযোগিতা পান নি।

এই বইয়ের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ নিঃসন্দেহেই "ভারতের নারী" শীর্ষক সুদীর্ঘ আলোচনাটি, যদিও নিজ দেশের ক্ষেত্রেও সংবাদ সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন মহলের অনাগ্রহের সম্মুখীন হয়েছেন।

রচনা যতো সংক্ষিপ্তই হোক, অন্যান্য ত্রুটি আর যাই থাক, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী নিরপেক্ষ এবং তাঁর পরিশ্রমের জন্যে তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। রেফারেন্স বই হিসেবে এ-বই বেশ কাজে লাগবে। ৩৪৬।৬৭

ক্লার নিকোবর স্কুলের অধিনায়ক উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির কাছ থেকে সুব্রত কাপ গ্রহণ করছে

ফয়শলাও হয়ে গেল। আমরা তো অবাক।'

গল্প শেষ করে শ্রীসান্যাল বললেন, 'রেফারির ক্ষমতা আছে বলেই তো তিনি গোল না হওয়া সত্ত্বেও গোলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংগঠনও রেফারির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। এখানে বিধানসভার রেফারিরও ক্ষমতা আছে বিধানসভার 'খেলা' আরম্ভের আগেই সভা ভেঙ্গে দেবার, তাই তিনি সভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। আইন ও ন্যায়-অন্যায় পরের কথা। বিধানসভার অধ্যক্ষ আর ফুটবল রেফারির ক্ষমতা তো একই ধরনের, কি বলেন?' বলে শ্রীসান্যাল আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললাম, সত্যিই তাই। ফুটবলের রেফারি বিচারক হলেও তাঁর ক্ষমতা বিচারকের চেয়েও বেশী। আদালতের বিচারে হেরে গেলে অসন্তুষ্ট পক্ষের উচ্চ আদালতে আপীল করার বিধান আছে, সেখানে হারলে হাই-কোর্টে পুনর্বিচারের আবেদন করার অধিকার আছে, হাইকোর্টে হারলে আছে সুপ্রিম কোর্টে আপীলের অধিকার। কিন্তু রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার নেই অসন্তুষ্ট পক্ষের। হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না—কথাটি রেফারির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন বিধানসভার অধ্যক্ষের রুলিং-এর বিরুদ্ধে আপীল খাটে না, কোন কিছু করণীয় নেই, তেমন রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও কিছু করণীয় নেই।'

সত্যিই বিধানসভার অধ্যক্ষের ক্ষমতার মতই ফুটবল রেফারির ক্ষমতা বেশ কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যদিও আইনে সব কিছু নির্দিষ্ট করে বলা আছে। কি পদ্ধতিতে গোল হবে, কি ত্রুটিতে হবে না; কোন অবস্থায় খেলা আরম্ভ হতে পারে না, কোন অবস্থায় খেলা ভাঙ্গার আগেই খেলা শেষ করা যেতে পারে—সব কিছুই ফুটবল আইনে পরিষ্কার করে বলা আছে। তবু ফুটবলের ৫ নম্বর আইন রেফারিকে নিজ বিবেচনা মত কাজ করার যে ক্ষমতা দিয়েছে সেই ক্ষমতা বলে গোলের মধ্য দিয়ে বল না গেলেও তিনি গোল দিতে পারেন, বল গোলে ঢুকলেও গোল না দিতে পারেন। ইচ্ছে করলে খেলা আরম্ভের আগে খেলা বন্ধ করতে পারেন, খেলা শেষ না হলেও পারেন খেলার শেষ বাঁশী বাজাতে। এবং নিজ বিচার-বিবেচনামত আরও অনেক কিছু করতে।

যত অযৌক্তিক এবং পক্ষপাতমূলকই তাঁর সিদ্ধান্ত হোক, ঐ খেলায় তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁর সিদ্ধান্ত নাকচ করার কোন ক্ষমতাই নেই সাংগঠনিক সমিতির। অবশ্য সাংগঠনিক সমিতি রেফারির অযৌক্তিক কাজের জন্য পরে তাঁকে সাসপেন্ড করতে পারেন; কিন্তু ঐ খেলায় তাঁর দেওয়া সিদ্ধান্ত কিছুতেই বদলাতে পারেন না। রেফারির এই ক্ষমতা আন্তর্জাতিক ফুটবলেরই সংবিধান-সম্মত।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষের রুলিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে ফুটবল আইনে রেফারির ক্ষমতা সম্বন্ধে ক্রীড়ামোদীরা কিছু আভাস পেতে পারেন বিবেচনায় ঘটনাটির উল্লেখ করলাম।

একলব্য

অবিরাম হাঁটা প্রতিযোগিতায় সম্প্রতি নতুন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ব্রিটিশ প্যারাসুট বাহিনীর স্টাফ সার্জেন্ট লুই গিবসন ১৫৬ মাইল হাঁটার পর দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন এবং এরপর ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে আর ৫ মাইল হেঁটে ১৬১ মাইল অবিরাম হাঁটার নতুন রেকর্ড করেছেন। ১৬১ মাইল হাঁটতে লুই গিবসনের সময় লেগেছে সাড়ে ৪২ ঘণ্টা

দীপালী সিংহ

এ বছর পদক্ষেপে রোপ্তি পর্বত অভিযান [illegible] পরিচালনা করেছিলেন মেয়েরা। এ সপ্তাহে লিখছি রোপ্তি অভিযানের দল-নেত্রী দীপালী সিংহ সম্বন্ধে দু-চার কথা।

দেশ-এর পাঠকদের হয়তো মনে আছে, অনেক বছর আগে খেলাধুলোয় মহিলা সম্বন্ধে মীনাক্ষী গোস্বামীর কথা লিখতে গিয়ে বলেছিলাম—এই সেই ধরনের মেয়ে, যে গান বাঁধে এবং চুলও বাঁধে। সেই ধরনের আর একটি মেয়ে রোপ্তি পর্বত অভিযানের সফল দল-নেত্রী, পথিকৃৎ-এর প্রতিষ্ঠাত্রী কুমারী দীপালী সিংহ। একাধারে বহু গুণের অধিকারিণী এমন মেয়ের হয়তো বাংলা দেশে অভাব নেই। কিন্তু দীপালীর মত কটা মেয়ে মেলে, যে প্রাণ-প্রবর্তনার স্বতঃই প্রেরণার উৎস? যাঁর শিক্ষার আগ্রহ ও সংগঠনের প্রয়াস নব নব পথে প্রবাহিত? শুধু মেয়েদের নিয়ে দল গড়ে দুর্গম পর্বত অভিযানের যাঁর দুঃসাহস?

খেলাধুলো ও অভিযানের নেশাটা হয়তো দীপালীর পারিবারিক সূত্রেই পাওয়া। বাবা দেবেন্দ্রচন্দ্র সিংহের আদি বাড়ি ছিল ময়মনসিংহে। ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল থেকে ডাক্তারি পাসের পর কলকাতাকেই ব্যবসায়ের স্থল হিসাবে বেছে নিয়েছেন। যৌবনে বেশ ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। দাদা দীপক সিংহও ডাক্তার এবং বাবার মতই খেলাধুলোর কিছুটা সুনামের অধিকারী। অধিকন্তু ডাঃ দীপক সিংহ দুটো সাকসেস-ফুল মাউন্টেন এক্সপিডিশনের মেম্বার।

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম বালিকা বিদ্যা-পীঠ থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পাস করবার পর দীপালী গ্রাজুয়েট হয়েছে শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ থেকে। ইতিমধ্যে ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোরের সভ্যা হয়েছে, বছর বছর ক্যাম্পে যোগদান ছাড়াও হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে বেসিক কোর্স করেছে ১৯৬৪ সালে, অ্যাডভান্স কোর্স ১৯৬৭তে। রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশনে দিল্লীর প্যারেডে যোগ দিয়েছে। এরো মডেলিং ট্রেনিং এবং অল ইণ্ডিয়া এরো মডেলিং র‍্যালিতে অংশ-গ্রহণ করেছে। আশুতোষ ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে হিন্দিতে ডিগ্রী নিয়েছে, বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে নিয়েছে নার্সিং-এর শর্ট কোর্সের সার্টিফিকেট।

এখন চারটি জায়গায় দীপালীর শিক্ষা-সূচী। আইন কলেজে আইন (ত্রিবার্ষিক শ্রেণী), ইউনিভার্সিটির এম এ ক্লাসে ইংরাজী, পার্ক স্ট্রীটের অ্যালে ফ্রাঁসে-এর ক্লাসে ফ্রেঞ্চ, আর গভর্নমেন্টের বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী হিসাবে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে বিমান চালনার শিক্ষা। এ ছাড়া সংগঠনের কাজ তো আছেই। খেলাধুলোর মধ্যে ব্যাডমিণ্টন, সাঁতার ও আছেই। গানবাজনায় কিছু দখল আছে।

রাইফেল ছোঁড়া। ঘোড়ায় চড়া শিখছে।

দীপালীকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আর কী কী বিষয় শিখতে চাও?'

—'শেখার তো অনেক কিছুই বাকি। প্যারাট্রুপিং, আর ডিপ সী ডাইভিং শেখার ইচ্ছে আছে। কিন্তু একটি দুঃখ রয়ে গেছে —আমি মেয়ে বলে একটি বিষয় শেখার সুযোগই পাইনি। কাগজে আপনারা লিখতে পারেন না?'

—'কি শিক্ষা?'

—'রোয়িং।' মাত্র ইউনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাব হলেও ওখানে ছাত্রীদের রোয়িং করার কোন সুযোগ নেই। অনেক ঘোরাঘুরি

১৯৬৪ সালে বেসিক কোর্স করার পর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে দীপালি সিংহের জামার ব্যাজ এঁটে দিচ্ছেন তৎকালীন প্রধান নির্দেশক তেনজিং [illegible] চৌধুরী

করেছি। কিন্তু [illegible] [illegible]।'

—[illegible] [illegible] একটি রোয়িং ক্লাব [illegible] তোমরা পথিকৃৎ হয়ে [illegible] পারো?'

—'চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। এখনো আমার রোয়িং করার শখ।'

—'পর্বত অভিযানের খেয়াল মাথায় এল কবে?'

—'১৯৬৪তে বেসিক কোর্স করার পর থেকেই পরিকল্পনাটা মাথায় ঘুরছিল। অনেক ঘোরাঘুরি করেছি। অনেকের সঙ্গে যোগা-যোগ। পর্বতারোহী সংস্থার কাছে আবেদন করেও বিশেষ সাড়া পাইনি। আবার কেউ কেউ উৎসাহও না দিয়েছেন এমন নয়। সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল যা হচ্ছে উৎসাহী মেয়ের অভাব।

—'উৎসাহী মেয়ে মিলল কবে?'

—'এ বছরই। এ বছর আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। এবং ওই উদ্দেশ্য নিয়েই অ্যাডভান্স কোর্স করতে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। ওখানেই পেলাম বাংলার আর পাঁচটি মেয়েকে, যারা আমার মতই অভিযানে উৎসাহী। হিমালয়ের কোলে বসেই পরিকল্পনাটি প্রায় পাকা করে ফেললাম।'

—'তারপর?'

—'তারপর কলকাতায় এসে পথিকৃৎ-এর সংগঠন এবং বন্ধুর পথে পথ চলা শুরু।'

—'রোপ্তি অভিযানে তোমাদের কত টাকা খরচ হয়েছে?'

—'হাজার বত্রিশের মত।'

—'অভিযানে যাবার আগে সাধারণের কাছ থেকে তোমরা কেমন উৎসাহ পেয়েছ?'

—'অনেকের কাছ থেকেই উৎসাহ ও সহানুভূতি পেয়েছি। আবার উপহাসও কম পাইনি, ভ্রূকুঞ্চনও কম দেখিনি।'

—'যাঁরা উপহাস করেছেন এখন তাঁরাও তো খুশি।'

—'হয়তো খুশী। কিন্তু এখনো অনেকের ধারণা, পর্বত অভিযান ব্যাপারটা খুব কষ্টসাধ্য নয়। বিশেষ করে আমরা যখন সাফল্যের জয়মাল্য পরেছি। কিন্তু এর পেছনে যে কত প্রচেষ্টা, কত প্রস্তুতি, কতখানি মানসিক উত্তেজনা, কি পরিমাণ ঝুঁকি ও কষ্টসহিষ্ণুতা আর কতখানি বিপদ রয়েছে, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো তো তা বুঝবার কথা নয়।'

—'দল-নেত্রী হিসাবে শিখর আরোহিণী স্বপ্না মিত্র সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?'

—'যে আমার স্বপ্ন সার্থক করেছে তার সম্বন্ধে যে ধারণা হওয়া উচিত। তবে আমাদের দলের কারো কৃতিত্বই কম নয়। স্বপ্না সত্যিই সার্থকনামা।'

মুকুল

[illegible]

ফিল্ম ফিনান্স ও সেন্সরশিপ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ সম্প্রতি লোকসভায় বলেছেন, ফিল্ম সেন্সরশিপের নিয়মাবলী ও বিধিনিষেধ পুনর্বিবেচনা করে দেখবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। সেন্সরশিপ-পদ্ধতির উন্নতি বিধানের জন্যই এই কমিটি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশনের সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান যে, ১৯৬০ সনে ২৫ মার্চ করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হবার পর মোট ১২,৬৬,০৮৯ টাকা অনাদায় হেতু খারিজ করে দিতে হয়েছে। কারণ, দেনদাররা দেনা শোধের ব্যাপারে কোন আগ্রহই দেখান নি। তিনি আরও জানান যে, এগারোটি ক্ষেত্রে (আটাশটির মধ্যে) আইনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যেও করপোরেশন রাখার যৌক্তিকতা শ্রীশাহ উল্লেখ করেছেন। করপোরেশনের আর্থিক সম্পত্তি কীভাবে বাড়ানো যায় [illegible] বিষয়ে সরকার [illegible] আছেন বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে সিনেমা-গৃহের 'চেন' তৈরি করার কথাও সরকার ভাবছেন।

চিত্র-সমালোচনা

রাম অওর শ্যাম

দ্বৈত ভূমিকায় দিলীপকুমারকে দেখতে পেয়ে দর্শকরা উৎফুল্ল হবেন, বলা নিষ্প্রয়োজন। এ ছাড়াও "রাম অওর শ্যাম" (বিজয়া ইন্টারন্যাশনাল) রঙিন হিন্দী চিত্রের আরও কিছু আকর্ষণ আছে। বহু অর্থব্যয়ে তৈরি এই ছবির আঙ্গিক জাঁকজমক ও চমৎকার ফটোগ্রাফি যেমনি চোখধাঁধানো, তেমনি রোমাঞ্চকর এর দ্রুত ঘটনাপ্রবাহ। 'অ্যাকশন' ছবিতে যথেষ্ট। প্রথম ভাগে দেখি, শ্যালক রামের (বিরাট ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র) উপর ভগিনীপতি গজেন্দ্রর (প্রাণ) নাদিরশাহী অত্যাচার। হান্টার দিয়ে যেভাবে রামকে সে মেরেছে তা মধ্যযুগীয় নির্যাতনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। গজেন্দ্র, বলা বাহুল্য, শ্যালকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অপপ্রয়াসে মরিয়া। সে ঘরজামাই। গজেন্দ্রর স্ত্রী অর্থাৎ রামের দিদি (নিরূপা রায়) এই পীড়ন-পর্বের নীরব সাক্ষীর মতই প্রায়। ভাইয়ের কষ্ট [illegible] না পেয়ে সে তাকে [illegible] গজেন্দ্রর কথামতই চলে। এমন কি, দলিলেও (যা দ্বারা গজেন্দ্র পুরোপুরি শ্যালকের সম্পত্তি বেদখল করতে পারে) যেন সই করে। এবং কোন একটি সময়ে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে যখন ভগবানের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করে বলে, কে আমায় বাঁচাবে, তখনই প্রথম শ্যামকে পর্দায় দেখা যায়।

দিলীপকুমার হয়েছেন রাম ও শ্যাম। দুজন দুই প্রকৃতির। রাম মেরুদণ্ডহীন নিরীহ, ভীতু। গজেন্দ্রর অত্যধিক অত্যাচারের

"[illegible]" ছবিতে দীপিকা দাস

"রাম অওর শ্যাম" : দিলীপকুমার ও মমতাজ

ফলেই তার এই মানসিক পরিণতি—অনেকটা "কমপ্লেক্স"-এর মত। ডাক্তার জানিয়ে দিয়ে গেছেন, মনুষ্যত্ব বা প্রেমের স্পর্শে সে আবার স্বাভাবিক হতে পারে। শ্যাম স্বভাবে রামের বিপরীত। সে ডানপিটে, দুষ্কৃতদমনে সদা তৎপর। ঘটনাচক্রে ছবিতে রামকে শ্যাম এবং শ্যামকে রাম সাজতে হয়। রামরূপী শ্যাম যখন গজেন্দ্রকে শায়েস্তা করে তখন স্বভাবতই দর্শক উল্লসিত। শেষ পর্যন্ত খলনায়কের সংগে রাম-শ্যামের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে দেখা যায় (তখনই গজেন্দ্রর পতন ও পরে হৃদয়ের পরিবর্তন) যে, রাম হৃত মনোবল অনেকটা ফিরে পেয়েছে। তখন তার পাশে রয়েছে প্রেয়সী (মমতাজ)। শ্যামের ছদ্ম-পরিচয়ে গ্রামে বাস করার কালেই রাম গ্রাম্য বালিকা শান্তার (সে শ্যামের প্রণয়িনী হতে পারত) প্রেমে পড়ে। এবং শহরে রাম-পরিচয়ধারী শ্যাম অঞ্জনার (রামের জন্য নির্বাচিত পাত্রী) মন জয় করে। অঞ্জনা সেজেছেন ওয়াহীদা রহমান। শেষ দৃশ্যে রাম ও শ্যাম যথাক্রমে শান্তা ও অঞ্জনার সংগে মিলিত।

রাম ও শ্যাম যে যমজ ভাই তা ক্রমে প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের চেহারায় অবিকল সাদৃশ্য কেন্দ্র করে নাটকীয় জটিলতা ও কৌতুক আরও জমে উঠতে পারত। পরিচালক চাণক্য ছবিতে হাতাহাতি, মারপিট এবং পাপ-উপাদানকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। কাহিনীর অবাস্তবতা সত্ত্বেও কিন্তু ছবিটি রোমাঞ্চক উপকরণের জন্য দর্শকের কৌতূহল সর্বক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখে। কৌতুকের দৃশ্যগুলিও মজার। এক কথায়, উপভোগ্য ছবি "রাম অওর শ্যাম"।

দ্বৈত চরিত্রে দিলীপকুমারের অভিনয়ও দেখবার মত। ওয়াহীদা রহমান, মমতাজ, নাজির হোসেন, প্রাণ, নিরূপা রায় প্রভৃতি নিজেদের ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন।

নৌশাদ সুরারোপিত গান আরও মন-মাতানো হলে দর্শকের সুখ বাড়ত।

এ সপ্তাহের নতুন বাংলা ছবি একটি, হিন্দী দুটি। বাংলা ছবিটির নাম [illegible] শপথ (সরকার প্রোডাকশনস্)। সলিল সেন স্বরচিত কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করেছেন। মাধবী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সোমেন চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী প্রভৃতি ছবির মুখ্য শিল্পী। সুর-রচনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আখরী খত হিন্দী চিত্রটি চেতন আনন্দের। ছবির একটি বিশেষ ভূমিকায় রয়েছে পনেরো মাসের শিশু বান্টি। "আখরী খত" মূলত প্রেমের গল্প। এর

সলিল দত্তর পরিচালনায় নির্মীয়মাণ 'অপরিচিত' ছবিতে অপর্ণা সেন

ফটো—দেশ

"আখরী খত" : শিশুশিল্পী বান্টি

অন্যান্য চরিত্রের রূপ দিয়েছেন ইন্দ্রাণী মুখার্জি, রাজেশ খান্না, নানা পালসিকর, মোহন চোটি প্রভৃতি। খৈয়াম সংগীত পরিচালনা করেছেন।

ঘর কা চিরাগ ছবির পরিচালক জগদেব ভামরি। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সতেন বসু। ধর্মেন্দ্র, ওয়াহীদা রেহমান, বিশ্বজিৎ, বলরাজ সাহনী, ইন্দ্রাণী মুখার্জি, দেবকুমার প্রভৃতি ছবির প্রধান শিল্পী। মদনমোহন সুরকার।

অনিমা চিত্রমন্দিরের প্রথম ছবি "চির দিনের" শুটিং আরম্ভ হয়েছে। অগ্রদূত-গোষ্ঠীর বিভূতি লাহা ছবিটি পরিচালনা করছেন। এক আপন ভোলা

চির দিনের সংগীত সাধকের কাহিনী "চির দিনের"। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। সুপ্রিয়া চৌধুরী ছবির নায়িকা। গৌরী-প্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তৈরি হচ্ছে। সুর রচনায় রয়েছেন নচিকেতা ঘোষ।

শ্রীলেখা মুভীটোনের সংগীতবহুল চিত্র "পথে হল দেখা" অচিরেই মুক্তি পাচ্ছে। শচীন অধিকারী পরিচালিত এই ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়

পথে হল দেখা করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চ্যাটার্জি, দিলীপ গুপ্ত, অমর মল্লিক, ভারতী দেবী, রেণুকা রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা ও জহর রায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন ভি বালসারা।

কিনে ইউনিটের "শীলা" আশু মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিগুলির অন্যতম। নরেন্দ্র মিত্রর কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

শীলা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, গীতা দে, গঙ্গাপদ বসু, রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু প্রভৃতি ছবির প্রধান শিল্পী। রাজেন সরকার সুরকার।

রাধারানী পিকচার্সের "বালুচরী" আগত-প্রায়। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনীর ভিত্তিতে অজিত গাঙ্গুলি ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়,

বালুচরী অনিতা চট্টোপাধ্যায়, অনুপ-কুমার, পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, অজয় গাঙ্গুলি, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, দীপিকা দাস ও জহর রায় বিশিষ্ট চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন। রাজেন সরকার সংগীত পরিচালনা করেছেন।

পরিচালক দীপক গুপ্ত একেবি ফিল্মস-এর "মহাবিপ্লবী অরবিন্দ"-র আউটডোর দৃশ্য গ্রহণের জন্য তাঁর ইউনিট নিয়ে চিল্কা অঞ্চলে যাত্রা করেছেন। দিলীপ রায় ছবির নামভূমিকার শিল্পী। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ নির্মল ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, এন বিশ্বনাথন, জহর রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস প্রভৃতি। ভারতের মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নায়ক শ্রীঅরবিন্দের জীবন কাহিনীর সংগে ছবিতে বাংলার অগ্নিযুগের পরিচয়টিও তুলে ধরা হবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন।

আগামী সপ্তাহে "কেদার রাজা"

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী জিন্দেল ফিল্মস-এর "কেদার রাজা" আগামী সপ্তাহে রাধা, পূর্ণ, অরুণা এবং শহরতলির বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তপন সিংহ। বলাই সেন চিত্র পরিচালক। নাম-ভূমিকার শিল্পী পাহাড়ী সান্যাল। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রের শিল্পী অসিতবরন, দিলীপ রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, দীপিকা দাস প্রভৃতি। কালীপদ সেন সংগীত পরিচালক।

রাজশ্রীর বিয়ে

গ্রেগরি ও রাজশ্রীর প্রথম দেখা হনলুলুর সমুদ্র-সৈকতে। "অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড" ছবির শুটিংয়ের অবসরে সাগরকূলে বসেছিলেন রাজশ্রী। হয়ত মুগ্ধ নয়নে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন শিল্পী। আর অলক্ষ্যে তাঁকে মুগ্ধ চোখে দেখছিলেন আমেরিকান গ্রেগরি চ্যাপম্যান। রাজশ্রীর দিকে এগিয়ে এলেন গ্রেগরি, কথা হল।

রাজশ্রীকে পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন গ্রেগরি। প্রথমে একটু দ্বিধা, তারপরেই সম্মতি। বন্ধুত্ব, এরপর প্রণয়। কয়েকদিনের মধ্যেই ওঁরা আবিষ্কার করলেন, একজনকে ছাড়া অপরজনের চলবে না। মনস্থ করলেন, ওঁরা বিয়ে করবেন।

দেশে ফিরে রাজশ্রী নিজের মনের কথা জানালেন তাঁর মাকে। রাজশ্রীর মা জয়শ্রী চলে গেলেন আমেরিকায়। গ্রেগরিকে

"পলাতক"-এর হিন্দীচিত্ররূপ "রাহগীর"-এ (পরিচালনাঃ তরুণ মজুমদার) বিশ্বজিৎ

আগামী বছর ভারতে **টেলিভিশন সেট** তৈরির কাজ শুরু হতে পারে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডিরেক্টর-জেনারেল ডাঃ ভি কে নারায়ণ মেনন সম্প্রতি সাংবাদিকদের এই কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, একটি সেটের দাম আনুমানিক ১,৮০০ টাকা পড়তে পারে। শ্রীমেনন আরও বলেন, দুটি কোম্পানিকে টেলিভিশন সেট তৈরির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই দশ হাজার সেট তৈরি করবেন। "বিশ্ব সুন্দরী" প্রতিযোগিতার মহিলা বিচারক আইরিশ অভিনেত্রী মরিন ওহারা চিত্র

দেখতে। পাত্র খুবই পছন্দ হল তাঁর। ভাল লাগল পাত্রের বাবা-মা, ডোনাল্ড ও ক্রিশ্চিন চ্যাপম্যানকে। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট গ্রেগরি, দেখতে সুন্দর, ছয় ফুট লম্বা। জয়শ্রী বিয়ের পাকা কথা দিয়ে এলেন।

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ে গ্রেগরি রাজশ্রীর বিয়ে হল। তাঁদের বিয়ে উপলক্ষে দুটি অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে রেজেস্ট্রি করে, পরে বৈদিক মতে। রাজশ্রীর পিতা ভি শান্তারামও অনুষ্ঠান দুটিতে উপস্থিত ছিলেন। বৈদিক মতে বিয়ে হবার আগে গ্রেগরিকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিতে হয়েছে। তখন তাঁর নাম রাখা হয় গৌতম। অগ্নি-সাক্ষী রেখে রাজশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন গৌতম।

পোলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র গ্রেগরি ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক অধ্যয়ন করেছেন। হিন্দী ও মারাঠি ভাষা তিনি ভালই বলতে পারেন। বিয়ের আসরে অতিথিদের সঙ্গে হিন্দীতে তিনি কথা বলেছেন। রাজশ্রীর সঙ্গেও তিনি হিন্দীতে কথা বলেন। রাজশ্রী ও গ্রেগরি মধুচন্দ্রিকা যাপন করবেন ব্যাংককে। রাজশ্রী এখন চারটি ছবিতে কাজ করছেন। এরপর তিনি আর ছবিতে অভিনয় করবেন না।

রাজশ্রীর মার্কিন বর বিয়েতে পণ নেননি। নেবার ইচ্ছা অবশ্য তাঁর ছিল না। ভি শান্তারাম পণপ্রথার ঘোরতর বিরোধী। বিয়ের অনুষ্ঠানে ভি শান্তারাম নাকি বলেছেন, আমি ছেলের বিয়েতে কোন পণ নিইনি, নেব না; মেয়ের বিয়েতে পণ দিইনি, দেব না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পণপ্রথার বিরুদ্ধে শান্তারাম "দহেজ" ছবিটি তৈরি করেছিলেন।

পরিচালিকা হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। এবং অ্যাকশন ছবি তৈরির আগ্রহ তাঁর আছে বলে জানা গেল।

সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় ভারতের টেলিভিশন চিত্র **টোয়েন্টি প্লাস লুক অ্যাট লাইফ** (আকাশবাণীর টেলিভিশন সেন্টার) বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছে। **এস মল্লিক** ছবিটি পরিচালনা করেছেন। তিনজন কলাকুশলী আট ঘন্টার মধ্যে ছবিটি তোলেন। বিশ বৎসর বয়সের পাঁচজন তরুণ-তরুণীকে নিয়ে এই ছবি। তাঁদের স্বপ্ন, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা হয়েছে ছবিতে। পাঁচজন তরুণ-তরুণীর নিজস্ব স্বাভাবিক পরিবেশে তাঁদের বক্তব্য বলেছেন। ছবির মাধ্যমে সমসাময়িক কালের তরুণ-তরুণীদের রুচি ও মানসিকতার পরিচয় মেলে। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে ষোল মিলিমিটারে ছবিটি প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত হয়।

শিল্পী-দম্পতি রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলরের ছবি 'ডাঃ ফাউস্টাস' সবে মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিতে এলিজাবেথ টেলরের মুখে কোন সংলাপ নেই। নানা বেশে হেলেন অব ট্রয়ের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায়। ডাঃ ফাউস্টাস সেজেছেন রিচার্ড বার্টন। এলিজাবেথ টেলরের পরবর্তী ছবি 'গোফোর্থ'। বিশ্বের সব চাইতে ধনী মহিলা। বহুবিবাহ সত্ত্বেও যিনি বরাবর বিধবা। সেই ফ্লোরা গোফোর্থের চরিত্রে অভিনয় করছেন শ্রীমতী টেলর। তাঁর রাজত্বে কবি-শিল্পী রূপে রিচার্ড বার্টন অনাহূত অতিথিরূপে এসে উপস্থিত হবেন। 'ম্যান, ব্রিং আপ দিস রোড' ছোট গল্প অবলম্বনে ছবিটি তৈরি হচ্ছে।

অর্ধেন্দু সেন পরিচালিত "পরিশোধ" ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

সম্প্রতি রঙমহলে আলো দাশগুপ্তার "সুখের পায়রা" নাটকটি অভিনয় করলেন ইন্দো—জাপানী ক্লাস (কলিকাতা) রিক্রিয়েশান্ ক্লাব। প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ এই নাটকের অভিনয় দর্শকের প্রশংসা অর্জন করে। প্রধান ভূমিকায় রাধাগোবিন্দ গুপ্ত অজন্তা চৌধুরী, সুধাংশু নাথ সুতপা ভট্টাচার্য ও শোভন লাহিড়ী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিভিন্ন চরিত্রে রামপ্রসাদ রায়, সুধাংশু ঘোষ, দিলীপ চক্রবর্তী ও মীরা বসু সুঅভিনয় করেন। ডঃ লেচনার (পরিচালক/ম্যাক্সমূলের ভবন) ও শ্রীইয়ামোমতো (কর্মাধ্যক্ষ/মিট্সুবিশি সোজী কাইসা) যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ঐ দিনের অনুষ্ঠানে।

বিগত ২৯ নবেম্বর বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রুলিংয়ের ফলে উদ্ভূত অভূতপূর্ব সাংবিধানিক সঙ্কট এই সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এই দিন বিধানসভার অধিবেশনে এক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে স্পীকার সভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রেখে ঘোষণা করেন ঃ আপাত দৃষ্টে আমি নিঃসন্দেহ যে, শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা, ডঃ পি সি ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করা এবং তার পরামর্শক্রমে এই অধিবেশন আহ্বান করা সংবিধান বিরোধী ও অবৈধ। অপরপক্ষে ওই একই অবস্থার রাজ্য বিধান পরিষদে এইদিন কংগ্রেস পক্ষ থেকে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়। তুমুল উত্তেজনা, চিৎকার পাল্টা চিৎকারের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনের স্থায়িত্ব প্রায় মিনিট দশেক হলেও এর জের দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি ও ঘুষাঘুষিতে পরিণতি লাভ করে। যুক্ত ফ্রন্টভুক্ত বামপন্থী দলগুলির আহ্বানে ওইদিন শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৪৪ ধারার আদেশ ভঙ্গ করে বিধানসভায় অভিযান চালানো হয়। বহু বৈদেশিক সাংবাদিক এই অধিবেশনের বিবরণ সংগ্রহের জন্য নানা দেশ থেকে কলকাতায় আসেন। এদিন গভীর রাত্রে রাজ্যপাল জানিয়ে দেন যে, ৩০ নবেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা স্থগিত (প্ররোগড) রইল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সঙ্কট সম্পর্কে সংসদের অধিবেশনে কংগ্রেস ও বিরোধী দলের সদস্যগণের মধ্যে বর্তমানে তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলছে।

দেশী সংবাদ

২৭ নবেম্বর—শেষ পর্যন্ত হয়ত রাজ্য বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা হতে পারবে না, এই আশংকায় কংগ্রেস ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নবগঠিত দল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী একটি নতুন পথ ধরেছেন। দুই দলের সব সদস্যের সই দিয়ে বিধানসভায় একটি প্রস্তাব ও একটি মোশন আনছেন। দুটিরই এক ভাষা ঃ এই সভা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর মন্ত্রিসভার উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করছে।

প্রবীণ বিপ্লবী সেনাপতি বাপাত আজ মধ্যরাত্রে ৮৮ বছর বয়সে উত্তর বোমবাইয়ের একটি বেসরকারী হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। আহমদনগরের পারনার গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। এ দেশ থেকে বি এ পাশ করে তিনি ইনজিনিয়ারিং পড়বার জন্য বিলাতে যান। কিন্তু সেখানে বোমা তৈরির কৌশল শেখাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

তিনি বিলাতের পারলামেনট ভবন বোমার সাহায্যে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বীর সাভারকরের পরামর্শে সে কার্যে নিবৃত্ত হন। ১৯০৬ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ব্রিটিশ শাসনে সেনাপতি বাপাত ২০ বৎসর কারাবাস করেন। তিনি কংগ্রেস থেকে অবশেষে ফরওয়ারড ব্লকে যোগদান করেন। গোয়ার মুক্তি আন্দোলনে তিনি সত্যাগ্রহী দলটি পরিচালনা করেন।

২৮ নবেম্বর—আগামী ১৯৬৭-৭০ সাল থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনার কাল ধরা উচিত বলে যোজনা কমিশন যে প্রস্তাব করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ তা অনুমোদন করেন। এর তিন বছর আগেই চতুর্থ যোজনার কাজ আরম্ভ করার কথা ছিল।

২৯ নবেম্বর—যুক্তফ্রনট মন্ত্রিসভা বাতিল সম্পর্কে স্পীকারের রুলিং এবং বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবির ঘোষণার ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধীপক্ষ আজ লোকসভায় বারবার একটি মুলতুবী প্রস্তাব

আনতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রাজ্য সভাতেও বিরোধী সদস্যরা অনুরূপ দাবি তোলেন। উভয় সভার বিরোধী সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গ পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের কাছে একটি বিবৃতি দাবি করেন।

৩০ নবেম্বর—আজ কলকাতা ও মফস্বল—বাংলার সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়। যুক্তফ্রনট মন্ত্রিসভা বরখাস্তের প্রতিবাদে এবং রাজ্যপালের অপসারণের দাবিতে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ও যুক্তফ্রনট ওই হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। গত ৯ দিনে এই তৃতীয় হরতাল। এইদিন কলকাতা ও শহরতলির কোন এলাকা থেকেই বড়-রকমের কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে, মফস্বলের দু-এক জায়গায় লাঠি চালনা ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ার সংবাদ পাওয়া যায়।

১ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অজয় মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে 'সংখ্যালঘু' মন্ত্রিসভা গঠিত করায় বিরোধী দলের সদস্যরা আজ লোকসভায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আরেক দফা আক্রমণ চালান। দুটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ওই নতুন সুযোগ তাঁরা পান। ডান কমিউনিসট ও পি এস পি সদস্যরা যুক্তভাবে একটি প্রস্তাব এনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে বরখাস্তের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দাবি জানান।

শ্রীকামরাজ আজ ঘোষণা করেন তাঁর এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে এই মর্মে এক বোঝাপড়া হয়েছে যে, মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এ নিজলিঙ্গাপ্পা পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হবেন। শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা কামরাজের সঙ্গে দেখা করার পর পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি মনোনয়নের ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে ঠিক হয়।

২ ডিসেম্বর—আগামী বছরের বার্ষিক যোজনা চলতি বছরের যোজনার চেয়ে অনেক ছোট হবে। উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে এই মর্মে ইংগিত দেন। আগামী বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার চলতি বছরের তুলনায় মোট বরাদ্দের পরিমাণ কম হবে। কারণ সম্পদ সংগ্রহ অবস্থা ভাল চলছে না। উপরন্তু রাজস্ব সংগ্রহের প্রবণতা কমতির দিকে।

৩ ডিসেম্বর—ঘোষ-মন্ত্রিসভাকে হটিয়ে দেওয়া, মুখার্জি-মন্ত্রিসভার পুনর্বহাল প্রভৃতি পাঁচ-দফা দাবি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে না নিলে যুক্ত ফ্রনট ১৮ ডিসেম্বর থেকে ব্যাপকভাবে সমস্ত বিধি-নিষেধ ভঙ্গ আন্দোলন শুরু করবে। এই আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় হল, ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন।

বিদেশী সংবাদ

২৭ নবেম্বর—আজ 'নিউজ উইক' পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেনট জনসন সম্প্রতি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের কাছ থেকে একটি গোপন পত্র পেয়েছেন। পত্রের সুর আপসমূলক। তার ফলে আগামী বসন্তে এক রুশ-মারকিন শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেনট উৎসাহী হয়ে উঠেছেন।

২৮ নবেম্বর—মসকোস্থিত মারকিন ও বৃটিশ দূতাবাসের সামরিক বিষয়ে সর্বোচ্চ উপদেষ্টাদের টেনে এনে তল্লাসী করা হয়েছে ও তাঁদের মারপিট করা হয়েছে। এই ব্যাপারে মারকিন ও বৃটিশ দূতাবাস সোভিয়েট সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

২৯ নবেম্বর—বৃটেন আজ দক্ষিণ আরবে ১২৯ বৎসরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রজাতন্ত্র ইয়েমেনের জন্ম হল।

৩০ নবেম্বর—ভিয়েতনাম যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে প্রেসিডেনটের সঙ্গে মতানৈক্যই প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীরবারট ম্যাকনামারার পদত্যাগের করণ নয়—সরকারীভাবে বারবার বলা হলেও লোকের মনে কিন্তু এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। প্রেসিডেনট প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মতে সায় না দিয়ে জেনারেলের কথাতেই চলছেন। বিরোধ সেইখানে।

১ ডিসেম্বর—প্রেসিডেনট কোয়াতান মহম্মদ আল-সাবি দক্ষিণ ইয়েমেন গণ-প্রজাতন্ত্রের নতুন সরকার গঠন করেছেন। তিনি নিজেই হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভায় মোট ১১ জন সদস্য আছেন। শ্রী আল শাবি সশস্ত্র বাহিনীরও অধ্যক্ষ হবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন সেখ আমেদ আল ধালে।

২ ডিসেম্বর—গতকাল লাহোরে পাকিস্তানের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তান পিপলস পারটি নামে একটি নতুন বামপন্থী দল গঠন করেছেন। এটি সরকার বিরোধী দল এবং পাকিস্তানে "ঐসলামিক সমাজবাদ" প্রতিষ্ঠা করাই এই দলের উদ্দেশ্য।

৩ ডিসেম্বর—দক্ষিণ ভিয়েতকঙের রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গত অকটোবর মাসে সেক্রেটারি জেনারেল উ থানটের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই কথা ফাঁস করে দেয় যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ২২তম অধিবেশনে মুক্তি ফ্রন্ট একটি প্রতিনিধি দল পাঠাতে যে সিদ্ধান্ত করেছিল, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ভিসা দিতে নারাজ হওয়ায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন

কালিন্দী ॥	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭·৫০
শুকশারী কথা ॥	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮·৫০
গন্নাবেগম ॥	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮·০০
কবি ॥	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·৫০
অভিযান ॥	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	৬·৫০

রাজস্থান কাহিনী ॥	কালিকারঞ্জন কানুনগো	৮·০০
কুমুদ কাব্যসম্ভার ॥	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১০·০০
একদা কী করিয়া ॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	১৩·০০
বহ্নিবন্যা ॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৮·৫০
নীলকণ্ঠ হিমালয় ॥	অবধূত	৮·৫০
উত্তর হিমালয় চরিত ॥	প্রবোধকুমার সান্যাল	১১·০০
দুর্গম পন্থা ॥	অবধূত	৪·০০
সুবর্ণলতা ॥	আশাপূর্ণা দেবী	১৩·০০
প্রথম প্রতিশ্রুতি ॥	আশাপূর্ণা দেবী	১৪·০০
মৃগমদ ॥	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৮·৫০
নগরপারে রূপনগর ॥	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৮·০০
কাল, তুমি আলেয়া ॥	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১২·৫০
ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার ॥	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১২·৫০
কলধ্বনি ॥	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৪·৫০
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ॥	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৯·০০
ঝড় ॥	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	১০·০০
মুক্তো ॥	প্রফুল্ল রায়	৫·০০
বঙ্কিম সরণী ॥	প্রমথনাথ বিশী	১০·০০
লালকেল্লা ॥	প্রমথনাথ বিশী	১৪·০০
নদী থেকে সাগরে ॥	প্রশান্ত চৌধুরী	৮·০০
স্বপ্নতনু ॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪·৫০
দোলগোবিন্দের কড়চা ॥	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৬·০০
সাজবদল ॥	মনোজ বসু	৫·০০
আঁধার মানিক ॥	মহাশ্বেতা দেবী	১২·৫০
সুবর্ণরেখার তীরে ॥	মৈনাক	৫·৫০
গহন গিরি কন্দরে ॥	শঙ্কু মহারাজ	৬·০০
বনরাজীনীলা ॥	সুমথনাথ ঘোষ	৭·০০
বড়বাবু ॥	সৈয়দ মুজতবা আলী	৭·০০
অমৃতসমান ॥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·৫০
পূর্বাচল ॥	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১১·০০
ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ॥	সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন	৫·০০
একক দশক শতক ॥	বিমল মিত্র	১৪·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতার সংকলন "বিভূতিবিচিত্রা" ১২॥
ইহার মধ্যে অধুনা চলচ্চিত্রায়িত "কেদার রাজা" বইও আছে।

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

উঁচুদরের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কোহিনূরের কাপড়
কোহিনূরের কাপড় নিন।
উঁচুদরের রুচি? তবে কোহিনূরের
কাপড়ের জন্য আজই চলে আসুন।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীনৃপেন সেন

তার অধরের পরশ

মেঘেরা পাল তুলে যায় কোন্ দেশে

কেমন ক'রে চিরদিন ধ'রে রাখা যায় ?

তীর ও তরঙ্গ

জ্যোৎস্না ও গোলাপ

শোভাযাত্রার সমারোহ

খোকন সোনা

শিকারের শিহরণ

কত দিনের কত স্মৃতির রেখা মনের কোণে জট পাকিয়ে থাকে। কি ক'রে সেই ক্ষণিকের স্মৃতিকে চির-উজ্জ্বল ক'রে রাখা যায়? ফটোতে হুবহু ছাপ থাকে কিন্তু প্রাণের উত্তাপ ফোটে না। শালিমার আর্টিস্টস্ মেটিরিয়্যালস্ আপনার সেই পালিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলো জীবন্ত হয়ে থাকবে—বছরের পর বছর, যুগ যুগ ধ'রে

আপনার আঁকার ক্ষমতা ষোলআনা খুলবে
শালিমার
আর্টিস্টস্ মেটিরিয়্যালসে

শালিমার আর্টিস্টস্ কালার পাওয়া যায় শালিমার পেন্টস-এর কলিকাতা, নয়াদিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর ও গৌহাটী অফিসে, তাছাড়া, আর্টিস্টস্ মেটিরিয়্যালস্ বিক্রির সব বড় বড় দোকানে।

18 CLUES

Lit Quiz No. 38

(1) As the history of the world abundantly proves, power, when it is wielded too long, corrupts even men of discrimination and Ability|Nobility.

(2) Beauty|Duty and Love must go together.

(3) The development of Cultural|Ethical values and mastery of the physical world are both necessary for the progress of mankind.

(4) It is the very nature of the ego to know itself as Everything|Existing.

(5) A society truly free from Exploitation|Privation can be created only through non-violence.

(6) Make Food|Money available in plenty, make it cheap and you lay the foundation of a sound economy for the country.

(7) One should never depend on others for one's Happiness|Success.

(8) Humanity|Morality has all its force only when it is intimately connected and ultimately rooted in religion.

(9) In India it is the Indivisibility|Universality and impersonality and not the finitude and separation of the self that are posited.

(10) Self-conquest is the real conquest, abstinence from Indulgence|Violence is real strength.

(11) Indeed the question of war and peace involves a profound Moral|Spiritual issue for mankind.

(12) The common man of India, illiterate, poor, exploited as he is, is still a Noble|Whole man.

(13) A philosophy which draws inspiration exclusively from the past scriptures cannot free a country from the evils of the Past|Present.

(14) We should not forget that religion is something immensely Personal|Practical.

(15) Everything in fact that a scientist discovers has a Philosophical|Spiritual meaning.

(16) No sentiment is more spontaneous in its origin than the Racial|Religious sentiment, more persistent throughout human history, and more far-reaching in its influence.

(17) Were Rationality|Spirituality to guide our destiny wars would have become extinct long ago.

(18) The world offers us many pleasant things no doubt. But they never give us Satiety|Tranquillity.

১। পৃথিবীর ইতিহাস প্রচুররূপে প্রমাণ করে যে ক্ষমতা দীর্ঘদিন হাতে রাখলে এমন কি বিবেক এবং সামর্থ্য/কুলীনতা সম্পন্ন ব্যক্তিকেও দুর্নীতিপরায়ণ করে।

২। সৌন্দর্য/কর্তব্য এবং ভালবাসা একসঙ্গে চলা উচিত।

৩। মনুষ্যজাতির অগ্রগতির জন্য সাংস্কৃতিক/নৈতিক মূল্যের বিকাশ এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের উপর প্রভুত্ব উভয়ের প্রয়োজন।

৪। অহং-এর স্বভাবই হ'ল নিজেকে সর্বস্ব/অস্তিত্বপূর্ণ বলে জানা।

৫। কেবল অহিংসার মাধ্যমেই সত্যিকারের শোষণ/ক্লেশ—মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

৬। লোকে যাতে প্রচুর খাদ্য/অর্থ পায় এমন ব্যবস্থা করুন আর এর দাম সস্তা করুন, তাহলেই আপনি দেশের জন্য একটি দৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলবেন।

৭। কোন ব্যক্তিরই নিজের প্রসন্নতা/সফলতার জন্য অপরের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।

৮। মানবতা/নৈতিকতা-র পুরো শক্তি তখনই থাকে যখন এর সঙ্গে ধর্মের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ও পরিশেষে তার মূল্যও থাকে।

৯। ভারতে আত্মার অখণ্ডতা/সর্বব্যাপকতা এবং ব্যক্তিত্বহীনতাই যথার্থ বলে ধরা হয়েছে, তার সঙ্কীর্ণতা এবং বিচ্ছিন্নতা নয়।

১০। আত্ম-বিজয়ই হ'ল যথার্থ বিজয়, আসক্তি/হিংসা বর্জনই হ'ল যথার্থ শক্তি।

১১। যুদ্ধ এবং শান্তির প্রশ্নটি বাস্তবিকই মানবজাতির পক্ষে এক প্রগাঢ় নৈতিক/আধ্যাত্মিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২। ভারতের সাধারণ মানুষ বর্তমানে অশিক্ষিত, দরিদ্র, শোষিত, তবুও সে সজ্জন/হৃদয়বান মানুষ।

১৩। যে দর্শন কেবল প্রাচীন গ্রন্থ থেকেই প্রেরণা পায়, তা অতীত/বর্তমান-এর পাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারে না।

১৪। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ধর্ম খুবই ব্যক্তিগত/ব্যবহারিক জিনিষ।

১৫। বাস্তবে প্রত্যেকটি জিনিষ যা একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন, তার একটি দার্শনিক/আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে।

১৬। বর্ণাত্মক/ধার্মিক ভাবনার চেয়ে কোন ভাবনাই তার উদ্ভবে এত স্বতঃস্ফূর্ত, মানবজাতির ইতিহাসে এত স্থায়ী, এবং প্রভাব বিস্তারে এত সুদূরপ্রসারী নয়।

১৭। যদি বিবেক/আধ্যাত্মিকতা আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত, তাহলে বহুপূর্বে যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত।

১৮। নিঃসন্দেহে পৃথিবী আমাদের অনেক মনোরম জিনিষ দেয়। কিন্তু সেগুলি কখনও আমাদের তৃপ্তি/শান্তি দেয় না।

দ্রষ্টব্য :—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিটকুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

তারাও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছে। এ গ্রন্থ অস্ট্রেলিয়ার পটভূমিকায় রচিত।

প্রকাশিত হল

সমসাময়িক দুষ্প্রাপ্য বহু ছবি বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে।

শংকরীপ্রসাদ বসুর

নতুন ক্রিকেটের বই

লাল বল লারউড

দাম ১·০০

ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ বডিলাইন। সে এমন ভয়াবহ সংঘাত, যাতে জড়িয়ে পড়েছিল দুটি বিরাট দেশ, এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের উপক্রম হয়েছিল।

ক্রিকেট-বই, কিন্তু উপন্যাসের স্বাদ।

বডিলাইনের পটভূমিকায় লেখা এই ক্রিকেট-বইয়ে আবির্ভূত ক্রিকেটের মহানায়কেরা — ব্র্যাডম্যান, জার্ডিন, লারউড, হ্যামণ্ড, উডফুল এবং আরও বহুজন।

শংকরীপ্রসাদ বসুর

আর একখানি অনবদ্য ক্রিকেট-সাহিত্য

নট আউট

দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

খেলাধুলা সম্পর্কিত আর একখানি বই

ফুটবলের আইনকানুন ॥ মুকুল দত্ত

চতুর্থ মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

• আশাপূর্ণা দেবীর তিনখানি বই •

সেই রাত্রি এই দিন ৫·০০

লক্ষ্মণ আর ঊর্মিলা—একূল আর বেকূল। ভালোবেসেছিল তারা পরস্পরকে—আবিষ্কার করেছিল অরূপকে পরস্পরের মধ্যে। কিন্তু সমাজের তা ভালো লাগেনি। তাই তাদের ক্রোধ পাথর গেঁথে দিতে চেয়েছিল দুজনের মধ্যে। আশ্চর্য এ দেশ, আশ্চর্য এর সমাজ! এখানে সব প্রেমই ভ্রষ্টের, নয় শুধু মানব-মানবীর সহজাত প্রেম—যা চিরন্তন, যা নিত্যকালের, যা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত তারই প্রতিচ্ছবি নিয়ে এসেছে। "সেই রাত্রি এই দিন" আশাপূর্ণা দেবীর সম্প্রতি প্রকাশিত অভিনব প্রেমের উপন্যাস।

দোলনা ৫·০০

উপন্যাস ॥ তৃতীয় মুদ্রণ

রাতের পাখি ৪·০০

উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ

 আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

অফিস: ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্র: ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৬৮

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৭
শনিবার ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
৫৩-২২৮৩ ৫৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষাণ্মাসিক " ১৪.০০
ত্রৈমাসিক " ৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষাণ্মাসিক " ১৪.০০
ত্রৈমাসিক " ৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)
বার্ষিক সডাক ৪৬.০০
ষাণ্মাসিক " ২০.০০
ত্রৈমাসিক " ১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)
বার্ষিক ৩১.০০
ষাণ্মাসিক ১৬.০০
ত্রৈমাসিক ৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 16 Dec. 1967

ছাত্র আন্দোলন

ইদানীং স্কুল-কলেজের মামুলি ছুটিছাটার সঙ্গে আরও একটা মোটা রকম ছুটি যোগ হয়েছে—যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'আন্দোলন ছুটি'। গত কয়েক বছর ধরে এটা বার্ষিক-ছুটির অন্যতম হয়ে গেছে। নিতান্ত ছুটি হলেও বা কথা ছিল কিন্তু এই ধরনের ছুটি বা স্কুল-কলেজ বন্ধের সঙ্গে নানা রকম অশান্তি ও সমস্যা জড়িয়ে থাকে। হাঙ্গামা, হট্টগোল, আপদ-বিপদ এ-সব তো গেল অশান্তির দিক, আর সমস্যা হল ঃ নিয়মিত পড়াশোনা, পরীক্ষা ইত্যাদি বন্ধ। গত কয়েক বছর ধরে দফায় দফায় যত রকম আন্দোলন হয়েছে তার প্রায় সব ক'টির সঙ্গেই ছাত্রসমাজের যোগাযোগ ঘটেছে, আর তার ফলে স্কুল-কলেজ বন্ধ থেকেছে, পড়াশোনা হয় নি, পরীক্ষা নামক জিনিসটা আন্দোলনের লাগির ঠেলায় ঠেলতে ঠেলতে কোথায় যে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

এবারের মাতামাতিটা যুক্তফ্রন্ট সরকার খারিজ করা নিয়ে। বাংলাদেশের ছাত্র-সমাজ যেহেতু রাজনীতিগত ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন সেহেতু বোঝাই গিয়েছিল, এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে যাবার পর সরস্বতী ঠাকরুনের দরজায় কিছু ইট-পাটকেল না পড়ে যাবে না। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল, ইট-পাটকেল বোমা ইত্যাদি—বেশ ভালভাবেই পড়েছে; এখনও পড়ছে। অভ্যস্ত বলে আমরা আর ততটা বিচলিত হই না, কিন্তু লক্ষ করলে বুঝতে পারব এই ছাত্র-রাজনীতি ক্রমশ কোথায় চলেছে।

সকলেই জানেন, নভেম্বর মাসের শেষ এবং ডিসেম্বরের প্রথম দিক স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার সময়, তা' ছাড়া এ-সময় কলেজের টেস্ট পরীক্ষাও হয়ে থাকে। স্কুলের চৌকাট ডিঙোনোর টেস্ট পরীক্ষা, প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের টেস্ট—এ-সবই এই মরসুমে। অথচ ছাত্র-আন্দোলনের ফলে এ বছরের এই প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-গুলি সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। কলকাতার বেশ-কিছু স্কুলে নিয়মিত বার্ষিক পরীক্ষা শুরুর চেষ্টা করেও বাতিল করে দিতে হয়েছে, কারণ কখনও সেই স্কুলের কিছু ছাত্র, কখনও বাইরের ছাত্র পরীক্ষা হতে দেয় নি। তাদের দাবি, পরীক্ষা বিনাই ক্লাস প্রমোসান দিতে হবে। এই দাবি প্রতিষ্ঠা করতে তারা স্কুলে ইট-পাটকেল ছুঁড়েছে, দু'-এক জায়গায় বোমা ছোঁড়ার ঘটনাও ঘটেছে। ছাত্র ও শিক্ষকদের আহত হবার সংবাদও শুনেছি। মধ্য কলকাতার কোনো স্কুলে নীচু ক্লাসের ছাত্রদের পরীক্ষার সময় এমনভাবে বাইরে থেকে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়েছে যে, শার্সির কাঁচ ভেঙেছে, কিছু কিছু শিশু রীতিমত জখম হয়েছে। মধ্য কলকাতার আরও দু'-চারটি স্কুলে বোমা ছুঁড়ে পরীক্ষা ভেস্তে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতাতেও এ ধরনের কাণ্ড না ঘটেছে এমন নয়, উপরন্তু টেস্ট পরীক্ষায় সকলকে উতরে দেবার দাবি নিয়ে মাস্টারমশাইদের ঘেরাও করাও হয়েছে। অর্থাৎ এবারের পরীক্ষা-পর্বটা প্রহসনের মতন, কোথাও নামমাত্র হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না, কোথাও বা পরীক্ষার খাতায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাঁপা হাতের নম্বর পড়ছে।

অনেক ছাত্র, বিশেষ করে অল্পবয়সী ছাত্র এবং একেবারে শিশুর দল ইট-পাটকেল বোমার আতঙ্কে এমনই ভীত হয়ে পড়েছে যে, তাদের পক্ষে মন স্থির করে আর পরীক্ষা দেবার উপায় নেই। মনের দিক থেকে এদের মধ্যে যে আতঙ্কের ছাপ পড়েছে তার ক্ষতি অনুভব করার মতন বিবেচক ব্যক্তি বুঝি কমই আছে। স্কুলে পরীক্ষা দিতে বসলে যে বোমা খেতে হয় এ-শিক্ষা বাংলাদেশের ছেলের বাল্যকাল থেকেই হয়ে যাওয়া ভাল—এ রকম যুক্তিও নেতাদের কারও কারও থাকতে পারে, বলা যায় না।

যাই হোক, আমাদের শিক্ষার গতি কোন্ দিকে চলেছে এবং তার সঙ্গে রাজনীতির দুষ্ট প্রভাব যে ছাত্রসমাজকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা আজ অনুভব না করার কারণ নেই। যত দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে, মুষ্টিমেয় ছাত্রের এবং ছাত্রনামধারী কতিপয় অর্বাচীনের দৌরাত্ম্যে সমগ্র ছাত্রসমাজের কী অপরিমেয় ক্ষতি হতে পারে। বিদ্যাস্থানে যে সত্যি সত্যি এত ভীতির সঞ্চার হতে পারে এ অনেকেরই কল্পনায় ছিল না। রাজনীতির মন্দ প্রভাব সামাজিক জীবনের নানা দিক নষ্ট করেছে যে তাতেও যেমন সন্দেহ নেই—তেমনই সন্দেহ নেই, কিছু অপরিণামদর্শী বুদ্ধিহীন বেপরোয়া অসুস্থ প্রকৃতির ছেলে-ছোকরাও এই প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন; তারা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছে, মারামারি হাঙ্গামা বোমার দাপটে সব কিছু আদায় করার অধিকার তাদের আছে—এমন কি পরীক্ষার ফলাফলও।

কাগজের বাঘ। কথাটা চালু করেছেন বিশেষ প্রসঙ্গে চীনের কম্যুনিস্ট নেতা মাও সে-তুঙ। ঠিক তেমনি বিশেষ অবস্থায় যদি আজ কথাটা ফিরিয়ে দেওয়া যায় পশ্চিম বাংলার বর্তমান অবস্থাটা দেখে অসংগত হবে না। মাও সে-তুঙ 'কাগজের বাঘ' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন আমেরিকার আণবিক শক্তির উল্লেখ করে, সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ারকে লক্ষ্য করে। কথাটার পিছনে রাজনৈতিক যুক্তি কিছু ছিল কি না, সেটা বিচার্য বিষয় নয়। মূল কথা, আণবিক শক্তি যেভাবে রাষ্ট্রক্ষমতাকে আক্রমণ করেছিল, সেটাকে লক্ষ করে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল কথাটা। আজ পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক আকাশকে যে শক্তি আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করছে হয়ত সে-ক্ষেত্রেও কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কথাটা উঠেছে যুক্ত ফ্রন্ট-এর ১৪ দলীয় শক্তি সম্পর্কে। যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যখন পতনের মুখে তখন সারা পশ্চিম বাংলায় একটা আতঙ্কের চেহারা ফুটে উঠেছিল। [illegible] বিতাড়িত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি প্রকাশ্য সভায় সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে পশ্চিম বাংলায় আইন ও শৃঙ্খলা বলতে কিছু থাকবে না, রক্তের স্রোত বয়ে যাবে সারা রাজ্যে, বিশেষ করে কলকাতায়। অনেকটা [illegible]

হরিয়ানায় দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করা হচ্ছে কলকাতার রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। শুধু বিদেশে নয়, ভারতের নানাস্থানে প্রকাশিত কিছু কিছু কাগজে সবিস্তারে বর্ণনা দেওয়া হ'ল কিভাবে কলকাতার রাস্তায় 'রক্তস্রোত' বয়ে চলেছে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা খারিজ করার প্রতিবাদে। খাস বৃটেনে টেলিভিশনে প্রতিদিন দেখান হ'ল, কি ভাবে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলছে পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে। পশ্চিম বাংলার বাইরে যাঁরা থাকেন তাঁদের ধারণা কলকাতায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে; রাস্তায় চলাফেরা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠেছে; আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে।

এই আতঙ্কের ছায়াটাকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সারা দেশে। অথচ কলকাতাবাসীরা নিজ অভিজ্ঞতায় লক্ষ করেছেন যতটা গর্জন শোনা গিয়েছিল ততটা বর্ষায়নি। হাঙ্গামা যেটুকু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ঘটেছিল তা ছড়িয়ে পড়েনি, যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে বা আগে যে-সব রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা গিয়েছে কলকাতায় বা কলকাতার বাইরে। এমনকি ছাত্রদের পক্ষ থেকে যেটুকু প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে পুলিসের সঙ্গে মোকাবিলা করার তা-ও কোন সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়নি। একথা সত্য যে, পুলিসকে গুলী চালাতে হয়েছে কয়েকবার কয়েক জায়গায়, [illegible] কিন্তু এ-সত্ত্বেও [illegible] আইন ও [illegible] পশ্চিম বাংলায় [illegible] কলকাতার [illegible]।

এ-সত্যটা যুক্ত ফ্রন্টের নেতাদের কাছেও পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে গত দু সপ্তাহের ঘটনায়। পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে এ-কথাটা যে, নির্বাচনের আগে যে রাজনৈতিক অবস্থার ভারসাম্য নির্ভর করত বামপন্থী দলগুলোর উপর সে-অবস্থাটা অনেক বদলে গিয়েছে গত নয় মাসে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শাসনকালে। যে উদ্বেল জনতা যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পর বিজয়োল্লাসে আনাচে কানাচে জয়ধ্বনি দিয়ে পশ্চিম বাংলার প্রথম অকংগ্রেসী সরকারকে অভিনন্দিত করেছিল সে-জনতা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। রাজনীতির চেহারাটাই হয়ত বদলে গেছে এই নয় মাসে। তাই আতঙ্কের ছায়াটা যতই ঘুরে বেড়াক, সেই জনতাকে আর দেখা যায়নি যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর।

এটা রাজনীতিবিদ যাঁরা তাঁরাও বোঝেন। সবিশেষভাবে হয়ত উপলব্ধি করেন শ্রীঅজয় মুখার্জি এবং তাঁর প্রধান সমর্থক কম্যুনিস্টরা, সবিশেষ মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টরা। সে-কারণেই যুক্ত ফ্রন্টকে আবার বিচার করতে হয়েছে, রাজনীতির হাওয়াটা কি ভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এ-বিচারের একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। সে-উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে ঘোষিত হলেও খুব স্পষ্ট নয়। হয়ত সুস্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে। এই মতবিরোধ দেখা দেবার দুটো মুখ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। একদিকে শ্রীঅজয় মুখার্জির রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তাঁর বাংলা কংগ্রেস দল। অন্যদিকে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক চাপ।

যুক্ত ফ্রন্টের নয় মাসের জীবনে অনেক ঝড়, অনেক সংকট দেখা দিয়েছে এবং মীমাংসাও ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু এ-সবের মূল কারণ ছিল, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির একরোখা নীতি। বৃহত্তম দল হিসাবে সব সময় এই পার্টির তরফ থেকে যুক্ত ফ্রন্টের একটা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলেছে। হয়ত এই রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন ছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। কারণ যুক্ত ফ্রন্টের নীতি বা প্রোগ্রাম যা-ই থাক না কেন মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সংসদীয় নীতি হিসাবে যদি কোন নীতি থেকে থাকে তাহলে যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা ছাড়া ভিন্ন কোন পথ ছিল না। এই চাপের ফলেই এক সময় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে [illegible] করতে হয়েছিল [illegible]। [illegible]

থেকে এটা স্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার একটাই পথ খোলা থাকে। সেটা শ্রীঅজয় মুখার্জির নিজস্ব রাজনৈতিক চেহারাটা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের ছাঁচে ঢেলে দেওয়া। তবু ২ অক্টোবরের ঘটনা যখন ঘটল না, তখন এটাই অনুমান ক'রে নিতে হবে যে, শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে মার্ক্সিস্টদের ছাপমারা রাজনীতিটা অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য।

সেই কথাটাই প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন শ্রীঅজয় মুখার্জি নিজে। তাঁর নিজের বিবৃতিতে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে। তিনি ২ অক্টোবর পদত্যাগ করার পর (যদি তিনি তা করতেন) যে বিবৃতি দেবেন ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন তাতে এই অভিযোগটাই করেছিলেন যে, চীনের সাহায্য নিয়ে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের একাংশ পশ্চিম বাংলায় তীব্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছে এবং সাধারণভাবে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টরাই পশ্চিম বাংলায় আইন ও শৃঙ্খলার বিচ্যুতির জন্য মুখ্যত দায়ী। তিনি পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে এ কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রকৃত কোন জনকল্যাণ কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য নিয়ে যে রাজনৈতিক গুঞ্জন শোনা গিয়েছে নানা মহলে সেটা আর যাই হোক যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটবার পর শ্রীঅজয় মুখার্জি বা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট কারো পক্ষে সেটা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

হয়ত সে কারণেই শ্রীঅজয় মুখার্জি কয়েকদিন আগে একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করেছেন, যে বিবৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁর ২ অক্টোবরের বক্তব্যকে (অপ্রত্যাশিত হলেও অপ্রকাশিত নয়) খণ্ডন করা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন : "আমি মনে করতাম, তাদের ভয়ংকর কোন ধারণা ছিল না ভুল। তিনি আরো মনে করতেন যে, যারা চীন ও পাকিস্তানকে ভারতের উপরে চড় তাদের 'বাধাদান করতে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টরা আন্তরিক নয়—একথা বলে আমি হয়ত তাদের প্রতি কিছু অবিচার করেছি। কারণ মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টরা চীন ও পাকিস্তান সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবেই প্রচার চালাচ্ছিলেন।" শুধু তাই নয়, তিনি পদত্যাগ না ক'রে তিনি "উৎসাহব্যঞ্জক" ফল পেয়েছিলেন।

শ্রীঅজয় মুখার্জির এই বিবৃতি অনেকটা কম্যুনিস্ট কায়দায় 'কনফেশন' বা স্বীকারোক্তির মত শোনাবে। কিন্তু এ বিবৃতি অপ্রত্যাশিত নয়। শ্রীমুখার্জির কাছে আজ এটা অস্পষ্ট মোটেই নয় যে, তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক অস্তিত্ব অত্যন্ত অসম্ভিত্তজনকভাবে বিপন্ন। কারণ তিনি যে ভারতীয় ক্রান্তি দলে তাঁর বাংলা কংগ্রেসকে ভিড়িয়েছিলেন সেই ক্রান্তি দলও আজ অবলুপ্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এমন কি অবলুপ্ত না হ'লেও ক্রান্তি দলের এমন কোন রাজনৈতিক রূপ দেখা দেয়নি যা শ্রীমুখার্জি বা তাঁর বাংলা কংগ্রেসকে কোন রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য এনে দিতে পারে। ফলে শ্রীমুখার্জির পক্ষে তাঁর সংকুচিত বাংলা কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল করতে হ'য়েছে যুক্ত ফ্রণ্টের উপর। যুক্ত ফ্রণ্টের উপর নির্ভর করতে হ'য়েছে বলেই শ্রীমুখার্জিকে বলতে হ'য়েছে "জনগণ সুস্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিলেন যে, যুক্ত ফ্রণ্ট বহাল থাকুক।"

শ্রীমুখার্জির এ উক্তির পিছনেও কোন যুক্তি নেই। কারণ আজ পর্যন্ত জনসাধারণ এমন কোন সুযোগ পায়নি যার ফলে যুক্ত ফ্রণ্টের পক্ষে কোন রায় দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে। গত নির্বাচনে যুক্ত ফ্রণ্টের কোন অস্তিত্বই ছিল না। এমন কি, যে দুই দলগোষ্ঠী নিয়ে যুক্ত ফ্রণ্ট গঠিত হ'ল, সেই দুই গোষ্ঠী নির্বাচনের আসরে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই লড়াই করেছে। তাহ'লে শ্রীমুখার্জি জনগণের "সুস্পষ্ট" রায়টা পেলেন কোথায়? পাননি বলেই নেতা হিসাবে শ্রীমুখার্জিকে যুক্ত ফ্রণ্টকে সামনে রেখে তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে। তিনি এটা জানেন যে যুক্ত ফ্রণ্টের নেতা হিসাবেই যেন তাঁকে থাকতে হবে এবং তা থাকতে হ'লে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কোন বিরোধের নীতি নিয়ে চলা সম্ভব হবে না। হয়ত সে কারণেই শ্রীমুখার্জিকে তাঁর ২ অক্টোবরের বক্তব্যকে খণ্ডন ক'রে বিবৃতি দিতে হ'য়েছে।

তাছাড়া অপর একটা প্রত্যক্ষ কারণও যে অনুমান করা যায় না, তা নয়। এ কথাটা শ্রীমুখার্জি বা তাঁর দলের মত অন্যান্য অ-কম্যুনিস্ট দল নেতারা জানেন যে, মার্ক্সিস্ট পার্টি একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই যুক্ত ফ্রণ্টকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। সে উদ্দেশ্য : "বিধানসভা ভেঙ্গে দাও : মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই"। এটা কোন নূতন দাবি নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এই দাবিটি সকলের সামনে রাখছিলেন। তখন যুক্ত ফ্রণ্ট সরকার বর্তমান এবং সেই সরকারকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার ক'রে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই দিনের পর দিন বলা হ'য়েছে জনআন্দোলনের কথা। বলা হ'য়েছে যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারকে জনআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার কর। যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা খারিজের পরও সেই একই শ্লোগান সামনে তুলে ধরা হয়েছে পার্টির পক্ষ থেকে। এই শ্লোগানকে কেন্দ্র ক'রেই পার্টির পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা চলেছে যুক্ত ফ্রণ্টকে সামনে রেখে রাজনৈতিক আন্দোলনকে পরিচালিত করা। তাই পার্টির প্রতিটি ইউনিটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং জনগণের প্রতি আবেদন জানান হ'য়েছে "বে-আইনী সরকারকে মানি না, বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে অবিলম্বে মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই—এই রাজনৈতিক আওয়াজকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রত্যেককে সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে সারা রাজ্যে আরও বৃহত্তর সংগ্রাম সংগঠিত ক'রে তুলতে হবে"।

এটাই পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে পার্টির রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপ। এই স্বরূপটা আরও তীব্র ভাষায় প্রকাশ করা হ'য়েছে উগ্রপন্থী মার্ক্সিস্টদের পক্ষ থেকে। বলা হ'য়েছে যে, মার্কসবাদী পার্টি নেতৃত্ব চান "বিপ্লবী গণআন্দোলনকে অর্থনীতিবাদ ও সংসদীয় রাজনীতির মধ্যে আটকে রাখতে।" আরও বলা হ'য়েছে : "মন্ত্রিত্বের ভিতরে থেকে তারা যেমন কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রেছিলেন, মন্ত্রিত্বের বাইরে থেকেও তারা তাই করতে চান, এটা তাদের রাজনীতি"। এ রাজনীতি স্পষ্ট হ'লেও হয়ত যুক্ত ফ্রণ্টের সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; হয়ত শ্রীমুখার্জির কাছেও না। তাই যুক্ত ফ্রণ্টকে আজ সরকারকে বানচাল ক'রে দেবার জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের কথা বলতে হ'চ্ছে। শ্রীঅজয় মুখার্জিকে তাঁর নিজের বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে নূতন ক'রে আন্দোলন শুরু করতে হবে ব'লে। "নব পর্যায়ের" আন্দোলন নির্ভর করে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সমর্থনে। এই "নবপর্যায়ের" আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত "মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই" এই শ্লোগানের মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টপার্টি নিশ্চয়ই করবে; কিন্তু তার আগে প্রয়োজন আন্দোলন সংগঠিত করা। কারণ যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটার পর আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েনি। আতঙ্কটা ছড়াবার অবকাশ পায়নি।

তাই আজ প্রয়োজন হ'য়েছে 'ঐক্যবদ্ধ' আন্দোলন নূতন ক'রে গড়ে তোলার জন্য পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করা। যুক্ত ফ্রণ্ট নেতাদের কাছে, বিশেষ ক'রে শ্রীঅজয় মুখার্জির কাছে, এ ছাড়া আর কোন পথ হয়ত খোলা নেই। কারণ শ্রীমুখার্জির মন্ত্রিসভা খারিজের উত্তাপটা বিশেষ নজরে পড়ছে না।

পূর্ণ সমর্থন

দুটি কবিতা

শিবরাম চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

ও...ওই বাড়ির ছাদে একটি মেয়ে।
আর আমি একলা এখানে
আমার ব্যালকনির ডেক চেয়ারে।
মেয়েটি আমার দিকে ভুলেও কখনো তাকায় না।
কিন্তু আমি তাকালেই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
কি করে যে টের পায় কে জানে!

॥ ২ ॥

একটা বয়েস এলেই নাকি ব্যর্থতাবোধ এসে যায়।

কিন্তু কেউ কেউ আবার ব্যর্থতাবোধ নিয়েই জন্মায়;
সে খুব ভাগ্যবান।
সে কিছুই আশা করে না,   কেননা তার পাবার কিছু নেইকো,
পাওনা নেই তার কোনোখানেই।
(তবুও এই দুনিয়ায় একেবারেই কিছু না পেয়ে
শুধু হাতে যাবার কারো যো আছে নাকি?)
তাই যখন সে যা পায় তাই তার কাছে অভাবিত;
তাই তার কাছে পরমাশ্চর্য—পরমার্থ-উপায়!
কেননা কোনো কিছুর পরেই নেই তার কোনো দাবী তো;
তাই একটুখানি বর্ষণেই তার ধুসর মরু প্লাবিত।

তাই সর্বদাই তার মনে হয় সে বুঝি ব্যর্থ নয়,
পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনাই ত   লাভ তার!
যদিও সেই চোদ্দ আনার ষোলো আনাই ফাঁকি॥
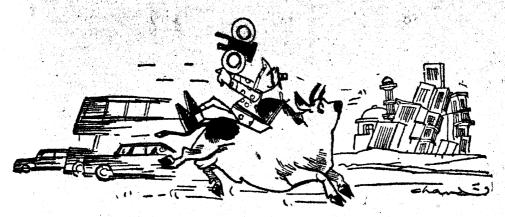
'বিদেশীর চোখে'

প্রবন্ধটি কয়েক মাস আগে একটি বিদেশী পত্রিকায় বেরিয়েছে। আমি হাতে পেয়েছি সংপ্রতি। বাইরের কাগজপত্র প্রায়ই আজকাল অস্বাভাবিক দেরি করে আসে—ঃ ব্যথিত হয়ে লাভ নেই।

রাজনীতি সুনন্দর এক্তিয়ার নয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে, ভারতবাসী হিসেবে স্বদেশ-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বেদনাবোধ তার আছে। অতএব বিদেশীদের বিরূপ বক্রতায় গায়ে জ্বালা ধরবে না—এখনো তার গাত্রত্বক অতটা ঘনত্ব লাভ করে নি। এই প্রবন্ধটি আমাকে চাবুক মারল।

এ ধরনের লেখা বাইরের পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই প্রকাশিত হয়ে থাকে। এবং এ সত্যও অনুভব না করে উপায় নেই যে বৃহত্তর পৃথিবীতে ভারতের বন্ধু সংখ্যা ঈর্ষাযোগ্য ভাবে বেশি নয়। কিন্তু আমাদের সমালোচনা যাঁরা করেন, তাঁরা সবাই-ই নিছক নিন্দাবাদী নন। তাঁদের কারো কারো মন্তব্য কটুস্বাদ, গলাধঃকরণ করা শক্ত—কিন্তু অপ্রিয় সত্য-গুলোকে অস্বীকার করা আরো শক্ত।

ফরাসী সাংবাদিক পিয়্যার দারকুর (Pierre Darcourt)-এর দীর্ঘ প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ অনুবাদ করে দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সুনন্দর পাতায় স্থানাভাব—তা ছাড়া যোগ্যতর সাংবাদিকেরা তো আছেনই। আজ বাইরের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ কী মহিমায় উদ্ভাসিত হচ্ছে, তারই নিদর্শন হিসেবে লেখাটি থেকে মাত্র কয়েকটা টুকরো তুলে ধরছি।

প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে দিল্লীতে 'গো-হত্যানিবারণ আন্দোলন' এবং 'নাঙ্গা' সাধুদের অভিযান নিয়ে। একটির পর একটি মনোরম ফটোগ্রাফ : গ্যাস-মাস্ক-পরা সশস্ত্র পুলিস বাহিনী, পথে গুলি-বর্ষণ, সাধুদের ওপর নির্মম প্রহার (মন্তব্য : 'এই সাধুরা ভারতে নাকি সর্বত্র পূজিত'), কলকাতার ময়দানে মানুষ এবং গোরুর নিশ্চিন্ত সহাবস্থান। ফরাসী ফোটোগ্রাফারদের ধন্যবাদ—ছবিগুলো তাঁরা ভালোই তুলেছেন।

আলোচনা সেইখানেই শেষ হয় নি। তার পরে এসেছে এক-একটি নির্মম সমালোচনা। বান্দুং সম্মেলন, চীন-ভারত এবং পাক-ভারত সংঘর্ষ, বিবিধ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিশ্লেষণ, দুর্ভিক্ষ-তাড়িত ভারতের অবস্থা, আমেরিকার দ্বারে ভিক্ষা-পাত্র হাতে ঘুরে বেড়ানো, একদিকে অপরিমেয় ঐশ্বর্য আর একদিকে দারিদ্র্যের বীভৎসতা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অভিযান, এমন কি, ইঁদুরে কত লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য প্রতি বছর ধ্বংস করে—তার হিসেব। আর গোরু-মহিষ সম্পর্কে মন্তব্য : "পৃথিবীর মধ্যে এদের সংখ্যা ভারতে সবচাইতে বেশি (২৩ কোটি), এই বিশাল সংখ্যাকে এক তৃতীয়াংশে পরিণত করলে এরা অনেক উন্নত, পরিপুষ্ট ও কার্যকর হত।"

কিন্তু এসব সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপার। বর্তমান ভারতবর্ষ সম্পর্কে মোটামুটি লেখকের প্রেক্ষাপট এই :

"ভারতবর্ষে হিংস্রতা যখন একবার আত্ম-প্রকাশ করে, তখন তা মহামারীর মতো ছড়িয়ে যায়। আর দিনের পর দিন, সপ্তাহ ধরে—ক্রমবর্ধমান ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। দক্ষিণের ত্রিরুচিতে একজন হোটেল কর্মচারী এক শিশি কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করে— তার শবের পাশে চিরকুট : 'হিন্দীর চেয়ে মৃত্যু ভালো।' [illegible]

বোল্টম-বোল্টমী হিপি

বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিসে গুলি চালায়। কলকাতায় চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পণ্ডিচেরীতে জনতা রেল স্টেশন ধ্বংস করে দেয়। তিরুভানিতে পাঁচ শো হাঙ্গামাকারী দরজা ভেঙে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের পৈতৃক আবাসে ঢুকে তাঁর গ্রন্থাগার তচনচ করে। যাতে পঞ্চম তৈল শোধনাগার তাদের রাজ্যে কোথাও স্থাপিত হতে পারে, সেই আন্দোলন উপলক্ষে অন্ধ্রপ্রদেশের ছাত্রেরা বিস্ফোরক দিয়ে ট্রেন উড়িয়ে দেয়। দিল্লী এবং মাদ্রাজের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন করা হয়। পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলো রণক্ষেত্রে পরিণত হয়—নৌ-বাহিনীর সাহায্যে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। চারজন পুলিস কর্মচারী সহ চব্বিশ জন নিহত হয়—শত শত আহত হয়...

ভারতবর্ষ—এই উন্মত্ত জনতার আলোড়ন-বিলোড়নে আজ কি খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে? গুলিবর্ষণ, আত্মহত্যা, লুটতরাজ, রেল লাইন ধ্বংস আর ছুরি-ছোরার খুনোখুনিতে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র, শান্তিবাদী এবং সহিষ্ণু গান্ধীর ধ্যানে বিধৃত এবং নেহেরুর প্রচারে উদ্ভাসিত হওয়া সত্ত্বেও আজ তার ওপর থেকে সব মোহাবরণ সরে গেছে (a cesse de faire illusion !)

প্রবন্ধকার প্রশ্ন করছেন, আজ কি একটি ভারতবর্ষ, না অনেক ভারতবর্ষ? অগণ্য জাতি, উপজাতি, ধর্ম, বিশ্বাস, ভাষা নিয়ে এই বিরাট মানব সংঘ ইংরেজ আসবার আগে কোনো দিনই একতাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু, মুসলিম, ক্রীশ্চান, বৌদ্ধ ইত্যাদির সঙ্গে সাড়ে ছয় কোটি অস্পৃশ্য মিলে এ কোন্ দেশ?

"একটি জাতীয় ভাষা, কিন্তু চৌদ্দটি সরকারী ভাষা (যার মধ্যে তামিল Tamoul, কান্নাড়া, তেলেগু এবং মালায়ালামও আছে), তিন শো ভাষা, চার শো বিরাশিটি উপভাষা।" সেনা-বাহিনীতে হলদে পাহাড়ী সৈন্যের সঙ্গে দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ শিখ, তার পাশে নিকষ কালো দক্ষিণী।

"বছরের পর বছর ধরে মহান রাজনীতিক গান্ধীর অহিংসার বাণী...সারা পৃথিবীতে ঘোষণা করেছেন শ্বেতবসন নেহরু—হাতে তাঁর ফুলের তোড়া—আর এই ভাবেই জগতের 'নেতৃত্ব' নিয়েছে ভারতবর্ষ। সমুচ্চ শিখর থেকে ভারত বর্ষণ করেছে মহৎ উপদেশ, বুঝিয়েছে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পার্থক্য, জানিয়েছে ইয়োরোপ হিংসার দেশ আর এশিয়া অহিংসার তীর্থ!" সাম্রাজ্যবাদী আর ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্যের বিষাক্ত প্রভাব দূর করে— মানুষ এবং জীবনের মহিমা প্রতিষ্ঠা করে এক অনাহত শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে ভারতবর্ষে। "সেই মোহময়

সঙ্গীতে অনেক পাশ্চাত্ত্যবাসীরই প্রাণ মন দুলে উঠেছিল।"

তারপরে? অনেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, অনেক জলাধার, বিদেশী সাহায্যে বহু শিল্প-প্রকল্প, কৃষির উন্নতি ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং? সমগ্র প্রবন্ধে তার জবাব আছে।

"আশ্চর্য আর ভয়ঙ্কর সেই দেশ যেখানে পথে পথে, গ্রামে নগরে দলে দলে ভিক্ষুক" আর ঐশ্বর্যে ফাঁপা বোম্বাইয়ের কোটিপতিরা—

"যখন ভারতের সর্বাধিক ধনী মহারাজ প্রবল প্রতাপান্বিত হায়দ্রাবাদের নিজাম মসনদ ছাড়লেন, তখন তাঁর বহু মূল্য হীরে-মাণিকের দাম কষবার জন্যে কলকাতা থেকে একজন জহুরী গিয়েছিলেন। ছ' মাস পরে সেই জহুরী অর্ধ-উন্মাদ হয়ে ফিরে আসেন" —দাম কষা দূরে থাক, হীরে-মুক্তোর জেল্লায় তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

কিন্তু আর দরকার নেই—এতেই যথেষ্ট। অত্যুক্তি এ প্রবন্ধে নিশ্চয় আছে, কিন্তু সবটাই কি উড়িয়ে দেওয়া চলবে? এই মুহূর্তেই ভারতীয় ভাষা বিল নিয়ে যে মেঘ ঘনাচ্ছে—আমি সে সম্পর্কে পিয়্যার দারকুর-এর দ্বিতীয় প্রবন্ধটির জন্যে অপেক্ষা করছি।

অফিস ছুটির পর হঠাৎই একদিন বীণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাদের সেই যাদবপুরের বীণা। যার বাড়ির রোয়াকে আমাদের আড্ডা বসত। কখনো বা ভিতরে যাওয়ারও পারমিট পেতাম আমরা মাসীমার কাছ থেকে। মাসীমা নারকেল মুড়ি খাওয়াতেন, কখনো তেলে ভাজা, কখনো আবার চা-কফিও জুটে যেত। আমরা মাঞ্জা মেরে শানিয়ে থাকতাম, কথায় কথায় জগৎ অন্ধকার করে দিতাম—সেই দিনগুলোর কথা সুন্দরভাবে মনে পড়ে গেল।

দেখলাম, হালকা একটা ছাপা শাড়ি পরে বীণা ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বেতের বোনা ব্যাগ, মৌচাকের মত খোঁপা; একটু যেন মুটিয়েছে মেয়েটা। এ সময় চোরের মত এগিয়ে গিয়ে ওর চোখ দুটো টিপে ধরলে কেমন হয়? বল তো কে? উঁহু, আগে নাম বল! বেশ মজা হয়। কিন্তু চারপাশে তখন অফিস ছুটির ভিড়; বেশ কিছু যাত্রী হা হা করে তাকিয়ে থাকবে। রাস্তার মাঝে ঢ্যামনাগিরি না করলেই কি চলে না দাদা! অগত্যা শান্তভাবে এগিয়ে, 'আরে বীণা যে! কি খবর? কিংবা, কি সৌভাগ্য আমার!' বললে কেমন হয়।

এগোলাম, 'মাই গুডনেস, তুমি এখানে? কি মনে করে?'

'ওম্‌মা প্রেম! তুমি কোত্থেকে?' বীণাও পালটা বিস্ময় প্রকাশ করল। যেন লটারীর টিকিট লেগে গেছে। তারপর তড়বড় করে বলল, 'কি আশ্চর্য। দুদিন আগেই কিন্তু তোমার খোঁজ করছিলাম আমরা। জানো, বুলাকির বিয়ে হয়ে গেছে!'

আমার প্রেমাংক নামটাকে ওরা ছোট করে 'প্রেম' বলে ডাকত। প্রায় বছর খানেক পরে সেই 'প্রেম' ডাকটা যেন খট করে কানে এসে বিঁধে গেল। আমাদের বাসা বদলির খবর শুনে বীণা বেশ মজা করে একটা কথা বলেছিল। বলেছিল, 'আর কি, এবার তো যাদবপুরের প্রেম চলে যাচ্ছে বেহালায়। আমরা এখন প্রেম-বিহীন হয়ে থাকব।'

অবশ্য বীণার সঙ্গে আমাদের ঐ রকমই টার্ম ছিল। পাছে আরো বেশী দূর এগোতে হয় এই ভয়ে বেহালায় বাসা বদলির পর একদিক থেকে যেন বেঁচেই গিয়েছিলাম। বীণার যিনি পতি দেবতা হবেন তাঁর লাইফ

যে একেবারে অন্ধকার এড়িয়ে আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করতাম, সিক্রেট আলোচনা, বলবি না কিন্তু, হ্যাঁ? বলব না।

শুধোলাম, 'কার সঙ্গে হল শেষ পর্যন্ত?'

'কার সঙ্গে আবার সেই মাদ্রাজী ছেলেটাই। যাকে ও বাংলা শেখাতে শুরু করেছিল, মনে নেই!' বীণা চোখ টিপে হাসল। 'সে অনেক ইতিহাস।'

'তাই বুঝি?'

'তাই বুঝি কি! তোমার তো আর পাত্তাই নেই, পাড়া পালটেছ বলে কি আসতে নেই নাকি!'

'না, না, সেজন্য নয়। সময় পাই না একদম।' খুব বিনয় করে বললাম। যেন কতই না উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি তোমার জন্য, অথচ অফিসের চাপ, বাড়ির ঝামেলা—'তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ে।' বীণাকে খুশী করতে হলে ঐভাবেই বলতে হয়। বললাম।

বীণা তড়বড় করে আরো একগাদা কথা বলল। ওটা ওর স্বভাব। ভীষণ বকবক করতে পারে মেয়েটা। মিনিটে বোধ হয় পঞ্চাশ ষাটটা শব্দ বলতে পারে।

আমার খুব গা ঘেঁষে এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল বীণা। বলল, 'কতোকাল পরে দেখা হল, তাই না! চল না একটু চা খাই।'

বললাম, 'চায়ের দোকান মানেই তো ঘনঘন বেয়ারাদের আর কি খাবেন! তার চে' চল মাঠে কোথাও নির্জন জায়গায় বসি। এক ফাঁকে ভাঁড়ের চা খেয়ে নেব। ভাঁড়ের চায়ে আপত্তি আছে নাকি তোমার?'

'তা নেই। তবে কোন মাঠে বসবে, ময়দানে? ভীষণ বাজে জায়গা। তার চে' চল লেকের দিকে এগোই। খবরেও কিছুটা এগিয়ে থাকা যাবে।'

মন্দ প্রস্তাব করে নি বীণা। বললাম, 'তাই চল। ট্রামেই যাবে, না বাসে? বাসেই বরং তাড়াতাড়ি হবে।'

'তুমি বড় কিপটে হয়ে গেছ প্রেম। প্লীজ, ট্যাক্সি কর না একটা। কথা বলতে বলতে চলে যাব।'

মরেছে! ট্যাক্সি! তাও আবার এখান থেকে লেক, বেশ কিছু ফক খেতে হবে আজ। তবু অনেক দিন পর দেখা বলেই রাজী হয়ে গেলাম। তা ছাড়া বীণাকে একটু নতুন নতুন লাগছিল। সন্ধ্যাটা বেশ জলজ্যান্ত একটা মেয়ে সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। বললাম, 'কিন্তু ট্যাক্সি পেলে তো!'

'না পেলে হাঁটব। চল হেঁটেই এগোতে থাকি।'

আমরা ধর্মতলার দিকে হাঁটলাম, তারপর অভাবনীয়ভাবেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম।

'তোমার কপাল ভাল।' ট্যাক্সিতে উঠে বীণাকে বললাম।

বীণা বলল, 'ভীষণ ভালো। নইলে তোমার সঙ্গে দেখা হয়।'

'কোথায় যাবেন?' ড্রাইভার ছোকরা গাড়ির হর্ন দিল বার তিনেক, পিছনে তাকাল।

বললাম, 'লেকে চলুন। একটু নির্জন মত জায়গা দেখে আমাদের নামিয়ে দেবেন। বুঝতেই পারছেন।'

ড্রাইভার কি বুঝল কে জানে। তার চোখের সামনে আয়নাটাকে একটু হেলিয়ে দিল। 'আপনারা ভিক্টোরিয়ার কাছেও যেতে পারেন। ওখানে অনেকেই যায়।'

বীণা আমার দিকে তাকাল। চতুর ভাবে হাসল। হাসিতে এমন কিছু বোঝাতে চেষ্টা করল, যা আমরা ছেলেরা হলে স্পষ্ট গলায় বলতাম, মাল ক্যাচেড রে।

'না, আপনি লেকেই চলুন। রেড রোড ধরে চলুন।'

নেতাজীর স্টাচু পার হয়ে ট্যাক্সি সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চলল।

বীণা পিছনে হেলান দিয়ে বসতে বসতে বলল, 'তুমি আস না কেন প্রেম? আমাদের আড্ডাটা দিনে দিনে ভেঙে যাচ্ছে।'

মনে মনে বললাম, বাঁচা গেছে। মুখে বললাম, 'এক বুলেকির বিয়েতেই গুবলেট। এরপর কবে হয়ত শুনব তোমারও হয়ে গেছে।'

'হবেই তো। তোমাদের জন্য বসে থাকব নাকি!' বীণা চটপট উত্তর করল। 'মাঝখানে আমার এক সম্বন্ধ এসেছিল, সেটা জান না বুঝি? ভারী মজার ঘটনা।'

বীণা এখন এক লম্বা কাহিনী শুরু করবে। ড্রাইভার ছোকরা নিশ্চয়ই কান পেতে আছে এদিকে। তা ছাড়া আয়নাটাকে ঘুরিয়ে রাখার মধ্যেই ওর মতিগতি বোঝা গেছে।

বললাম, 'সব কথা যদি ট্যাক্সিতেই বলে ফেলবে তাহলে কিন্তু ফুরিয়ে যাবে সব। তারপর লেকে গিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবুক হয়ে বসে থাকতে হবে শেষটায়।'

'আহা, শোনই না। শ্রীমান নাকি কোন এক কারখানায় চাকরি করে। করকরে সাড়ে তিন শ' টাকার চাকর।'

'প্লীজ!' হাত জোড় করলাম। বীণার মুখে কাহিনী শোনা এক বিরক্তিকর ব্যাপার। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য বললাম, 'বীণা তুমি কিন্তু একটু মুটিয়েছ।'

'ধেৎ!' বীণা ছোট্ট করে একটা চিমটি কাটল হাঁটুতে। 'মুটিয়েছটা কোন দেশী ভাষা! তুমি না, এখনো সেই গেঁইয়াই রয়ে গেলে।'

'না, মানে কেমন যেন একটু—'

'বলো না স্বাস্থ্যবতী হয়েছি।' বীণার ধবধবে দাঁত দেখা গেল।

'মোটা হলেই স্বাস্থ্য হয়েছে বলা চলে না। তবে—'

ভিক্টোরিয়ার কাছ দিয়ে ট্যাক্সি পার হচ্ছিল।

'এই, এই, ওদিকে ঐ গাছের নীচে দেখ।' খুব চাপা গলায় বলল বীণা।

দেখলাম, ঝাপসা অন্ধকারে এক যুবক আর এক যুবতীর মন ভোলাবার চেষ্টা করছে। ভারী ইনটারেস্টিং কেস তো।

ড্রাইভার ছোকরা বলল, 'এ আর কি দেখছেন, আর একটু ভিতরে যান, অনেক মজার মজার দৃশ্য দেখবেন।'

বীণা কৌতুকে আমার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, ভীষণ নাক গলাবার টেণ্ডেন্সি তো লোকটার!

আমি ড্রাইভারকে পাত্তা না দেবার ভঙ্গি করে বীণাকে ইশারা করলাম উত্তর না দিতে। বললাম, 'সুরেশ আসে আজকাল?'

'মাঝে মাঝে।'

'বটু?'

'আসে। টিউমারটা অপারেশন করিয়ে নিয়েছে বটু। এখন মুখের কাটিং ওর অন্য রকম হয়ে গেছে। দেখলে ভাবতে হয় বটু তো!'

'তাই নাকি! কারো সঙ্গেই আর দেখা হয় না। অফিস করি আর চিনে বাদাম চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরি। একদিন পাল্লায় পড়ে রেসের মাঠে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি সুরেশের ছোট ভাই। সাঁ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কাটিং।'

'সুরেশের ছোট ভাই রেস খেলে নাকি? ভীষণ ভিজে বেড়াল তো!'

'মাঠে একদিন গেলে অনেকেরই তুমি চিনতে পারবে। ও এক মজার জায়গা।'

বীণা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল।

কিছু লোক আছে, যারা নবদ্বীপ গেলে তিলক কাটে, ঘোড়ার মাঠে এসে জ্যাকপট খেলে, আবার মিছিলে নেমে রাজনীতি করে। যখন যেটা দরকার।

'তুমিও আবার রাজনীতি টাজনীতি করছ নাকি আজকাল?'

'মরতে! বেশ আছি বাবা।' একটা সিগারেট ধরালাম অনেকক্ষণ পর।

হরিশ মুখার্জী পার হয়ে ভিড়ের রাস্তা জগুবাবুর বাজার। তাও পার হয়ে হাজরার দিকে ট্যাক্সি চলল। বাইরে ফ্লুরেসেন্ট লাইটের আলো, ট্রাফিক কন্ট্রোলের পুলিশগুলো যেন কার্তিকের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একটা হল্লা পুলিস আসছিল বোধ হয়, হকাররা অদ্ভুতভাবে গলির দিকে লুকোচ্ছিল। ফলঅলার গড়িয়ে পড়া একটা আপেল গড়াতে গড়াতে একটা গাড়ির নীচে সেঁধিয়ে গেল। সামনেই লাল আলো বলে গাড়িটা থেমে আছে। আপেলটা চাকার নীচে পড়লে বেশ শব্দ করে ফাটতে পারত। বীণাকে আঙুল তুলে দেখালাম, 'ঐ গাড়ির নীচে একটা আপেল ঢুকে আছে বীণা।'

বীণা ঘাড় ঘ্‌রিয়ে দেখল। 'কোনটা?'

'ঐ যে কোর কোর জিরো ফাইভ। দেখছ না?'

ততটুকু সময়ের মধ্যে আবার লাল আলো নীল হয়ে গেল। ট্যাক্সিটা সাঁ করে ওভার-টেক করে বেরিয়ে গেল।

বললাম, 'দেখলে না যখন, ছেড়ে দাও।'

বীণা আবার হেলিয়ে পেছন দিকে গড়িয়ে বসল। 'বেশ উৎসব উৎসব লাগছে বাইরেটা, না? যাই বলো তোমাদের বেহালার ওদিকটা আজকাল বড়বাজারের মত হয়ে গেছে। ভিড়, ঠেলাঅলা, সর্‌ সর্‌ রাস্তা, কি নেই?'

'সে তোমাদের এদিকে যাদবপুরেও আছে। তবে, বেশী আর কম।'

ড্রাইভার ছোকরা আবার কথা বলল। 'যা বলেছেন। ভিড় সব রাস্তাতেই, গাড়ি বেড়েছে কত।'

বীণ আবার কৌতুকে আমার দিকে তাকাল। চাপা ভাবে হাসল এবার।

বললাম, 'তা যা বলেছেন!' বলার মধ্যে একটু বিরক্তি মেশাবার চেষ্টা করলাম।

লোকটা পিছনে ঘাড় ঘ্‌রিয়ে বীণার দিকে এক পলক তাকাল। শালা।

রাসবিহারীর মোড় পার হচ্ছিল। লোকটা বলল, 'কুড়ি মাইলের বেশী স্পীড চাপালেই গড়বড় হওয়ার ভয় থাকে।'

'এখন কত মাইল চলছে?'

'কত আর, দশ পনের। ফাঁকা রাস্তা পেলে কুড়ি পঁচিশ।'

সাদার্ন এভিনার ছিমছাম রাস্তা পড়ল এবার। সামনেই লেক স্টেডিয়াম। বাঁ ফুটের সম্পন্ন বাড়িগুলোয় রহস্যময় আলো জ্বলছে। বাতাসে ঠান্ডা একটা আমেজ। বেশ ঝরঝরে লাগছিল।

লোকটা বোধ হয় কেরামতি দেখাতে হঠাৎ তিন চার গুণ স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে এবার। ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে দিয়েছে। বীণা কৌতুকে আবার আমার দিকে তাকাল।

'রোককে, রোককে। হ্যাঁ, বাঁ পাশে রাখুন। চল, এখানেই নেমে পড়ি।

বীণা বলল, 'নামলেই হল।'

ট্যাক্সি থামতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। লোকটা কিন্তু মহা ধড়িবাজ। যেন ইয়ার পেয়েছিল আমাদের। নেমে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে এগোতে যাচ্ছি, ড্রাইভার ঝুঁকে তাকাল, 'বকশিস করবেন না কিছু?'

'কেন? কিসের বকশিস?' কৌতুকে বীণার দিকে তাকালাম।

'না, মানে এখানে এলে অনেকে দেয় কিনা। তাই।'

'ও, সে জন্য বলছেন। তা ঠিকানাটা দিয়ে যান, বিয়ের দিন নেমন্তন্ন করব।'

ছোকরা অদ্ভুত চোখে হাসল।

বীণা বলল, 'কী অসভ্য, ভাগ।'

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমরা এরপর পায়ে পায়ে হেঁটে লেকের জলের দিকে এগোতে লাগলাম।

আবছা অন্ধকার। বড় বড় গাছ ঝোপ। বিক্ষিপ্ত কিছু বায়ুসেবী। নরম ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। বেশ ঠান্ডা একটু বাতাস লাগছিল চোখে মুখে। গাড়ি ঘোড়ার ধুলো নেই। আর যাই হোক এইরকম শান্ত বিশেষ জায়গায় বসে থাকলেও মন ভাল হয়।

বীণা বলল, 'তুমি অমন করে লোকটাকে বললে কেন। ও কি ভাবল!'

'কচু ভাবল। আর যাই ভেবে থাকুক আমরা যে একসঙ্গে লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি না তাও জেনে

গেছে। ওরা এরকম বহু লোককেই এখানে বা ভিক্টোরিয়ায় পেঁৗছে দেয়।'

বীণা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাশ দিয়ে লাঠি ঘোরাবার কায়দায় চলে গেলেন। খানিক দূরে এগিয়ে লোকটা একটা গাছের গুঁড়িতে মূত্রত্যাগ করতে বসে গেলেন। আচ্ছা ফোর টোয়েণ্টি লোক রে বাবা!

আমরা এগিয়ে একটু অন্ধকারমত জায়গা বেছে পেলাম। একটা ছোট্ট কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বেশ পরিষ্কারমত মনে হল। পাশেই অবশ্য বাঁশঝাড়মত জঙ্গল। তা ছাড়া এদিকে লোকজন বড় কম। 'এখানেই বসি কি বল?' লেকের জল বেশ ঘন, কালো দেখাচ্ছে। ওপারে একটা রোয়িং ক্লাব। ক্লাবের আলো জলের উপর পড়েছে, কাঁপছে। খুব সেফ জায়গা বলে মনে হল আমার।

'এই এই, কি লেখা আছে, দেখে যাও।' বীণা ডাকল।

গাছের গায়ে এক টুকরো সাদা কাগজে কি যেন লেখা। দেশলাই জেলে লেখাটা পড়বার চেষ্টা করলাম।

'এই হয়েছে। ভারী মজার ব্যাপার তো!' লেখা আছে, 'এই গাছতলায় কেহ বসিবেন না। ইহা রিজার্ভ করা আছে, বসিলে দু টাকা ভাড়া দিতে হইবে।'

বীণার দিকে তাকালাম। বীণা বলল, 'কেউ ফিচকেমি করেছে। বসো দেখি। এখানটাই সব চেয়ে ভাল জায়গা।'

'তা অবশ্য ভাল জায়গা কিন্তু যারা নোটিশ টাঙিয়ে গেছে তারা হয়ত আশে-পাশেই আছে কোথাও। প্যাঁক করে এসে চেপে ধরবে।'

'তোমার মুণ্ডু। এটা কারো কেনা জায়গা নয়।'

'মস্তানদের তো আর চেনো না। ভাগাড় তুলে সামনে এসে যখন দাঁড়াবে, কই, ভাড়াটা দিয়ে আসুন দেখি স্যার। লাইন দেখছেন।'

'রাম ভীতু তুমি।' বীণা বসতে যাচ্ছিল, দাঁড়াল। 'কোথায় বসবে তা হলে?'

'চল না, একটু এগিয়ে দেখি। কি দরকার এসব ঝামেলায় থেকে।'

জলের ধার দিয়ে আমরা হাঁটলাম। ধীরে ধীরে। কোথাও ছায়া, কোথাও ঘোর অন্ধকারমত। তারই ফাঁকে জোড়ায় জোড়ায় সব বসে আছে। যেন প্রেমের কুঞ্জবন। কারো কারো দুটো একটা ভাঙা কথা কানে আসছিল, কেউ হাল্কা নীচু গলায় গল্প ভাঁজছিল। বেশ জমে গিয়েছিল কেউ কেউ।

অল্প দূরে কিছু উঠতি ছোকরা হঠাৎ চেঁচিয়ে সিনেমার গান ধরে বসল। বীণা ঐ দিকেই এগোচ্ছিল, বললাম, 'ওদিকে না, এদিকে এসো।' এ সব ছেলেদের সব সময় দৃষ্টির বাইরেই রাখা ভাল। আর একটু ঢালের দিকে নেমে এসে বীণাকে বললাম, 'এখানে বসবে?'

বীণা বলল, 'বসো।' বসে পড়ল। খানিকটা দূরে এক মারোয়াড়ী পরিবার ছোটখাট একটা সংসার পেতে বসেছে। টিফিন ক্যারিয়ার, ফ্লাস্ক, তোয়ালে, কত কি সরঞ্জাম। বেশ সুখে আছে লোকগুলো।

বীণার পাশে রুমাল বিছিয়ে বসলাম।

বীণা বলল, 'ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রেখো কিন্তু, ঠিক আটটায় উঠে পড়ব।'

'মাথা খারাপ! আমি আজ উঠছিই না। কত্তোকাল পরে লেকে এলাম। তাও আবার জলজ্যান্ত একজন প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে।'

'ইস রে! দেখো, আবার অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যেও না যেন। আমি কিন্তু অ্যামবুলেন্স ডাকতে পারব না তা আগেই বলে রাখছি।'

'অ্যামবুলেন্স ডাকতে হবে না। দয়া করে একটু ধাক্কা দিয়ে লেকের জলে ফেলে দিও, তা হলেই হবে।' হাসলাম।

অন্ধকারটা এখানে তেমন কিছু গাঢ় নয়। বীণার চকচকে চোখ দেখা যাচ্ছিল। খুব ঢিলে ঢালা ভঙ্গি নিয়ে বসেছে। কোলের ওপর বটুয়া। খুব আয়েসী হয়ে, একটু কাত হয়ে, যেন আজকেই কেবল নতুন নয়; এমন সহজ ভঙ্গিতে ও কথা বলছিল যেন কতকাল ধরে ও প্রেম করে যাচ্ছে। কেমন যেন খানিকটা ঘরনী ঘরনী চেহারা দেখাচ্ছিল বীণার। বীণা একটু কৌতুকের উত্তর খুঁজছিল মনে মনে। সহসা এক চিনেবাদাম অলার প্রবেশ।

'বাদাম দেব দাদাবাবু?'

বড় বিরক্ত করে। বললাম, 'না।'

বীণা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'পঞ্চাশ কত? গরম তো?'

বাদামওলা পঞ্চাশ গ্রাম বাদাম দিল। ঝালনুন দিল। তারপর পয়সা বুঝে নিয়ে চলে গেল।

'চা থাকলে চা খাওয়া যেত।' চিনেবাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বীণা বলল।

'খানিকক্ষণ বসে থাক, ঠিক আসবে।'

অনেকক্ষণ ধরেই অদৃশ্য কোন পোকা-মাকড়ের মিহি অথচ চিকন শব্দ হচ্ছিল। গা শিরশির করে ওঠে শুনলে। হয়ত বাঁশ ঝাড়ের ভিতর থেকেই শব্দটা বেরোচ্ছিল। শব্দটার দিকে কান পেতে পোকাটার প্রকৃতি ধরবার চেষ্টা করলাম। বিষধর কিছুও হতে পারে। এ বাঁশঝাড় লেকের ধারে বলেই ভয় নেই, কিন্তু অন্য কোন শ্মশান টশানের কাছে হলে আর দেখতে হত না। বীণাকে এ সময় একটু ভয় দেখালে কেমন হয়. 'তুমি ভূত বিশ্বাস করো বীণা?'

বীণা কৌতুকে তাকাল। তারপর দু দাঁতে চেপে একটা বাদাম ফাটাল, 'মানে?'

'না মানে সামনে বাঁশঝাড় কিনা, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'প্রেমালাপ বুঝি ভূত দিয়ে শুরু করতে হয়! তুমি না আস্ত একটা গোঁইয়া। কোথায় বলবে, আহা কি সুন্দর ঝিরঝিরে বাতাস জলটা যেন অমৃতের মত টলটল করছে। কোথায় চাঁদের বর্ণনা, ফুলের বর্ণনা, তা না, ফাজিল!'

'সরি। আর বলব না।'

মনে পড়ে গেল বটু বলত মেয়েদের যদি মন পেতে চাস কেবল ওদের প্রশংসা করবি। পেত্নীকে বলবি পরী। বীণার প্রশংসার বিষয়গুলো হাতড়াতে লাগলাম। কিন্তু ঐ সময় নতুন আর এক উপদ্রব।

'অন্ধকে পাঁচটা পয়সা দেবেন বাবু?'

লোক দিনেও এক প্রকৃতই অন্ধ। বাচ্চা একটি ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে রেখেছে। নাও, ঠেলা সামলাও এবার।

'না না, পয়সা নেই, ওদিকে যাও।'

শুনল না। কানের কাছে পাঁচ পয়সা কথাটা আবৃত্তি করতে লাগল।

'আরে মহা জ্বালায় পড়েছি! যাও না, পয়সা নেই।'

কোন কোন সময় ভিখিরি দেখলে ভীষণ রাগ হয়। এ সময়ও দাঁতে দাঁত চেপে আমি বিরক্তি প্রকাশ করলাম।

বীণা বলল, 'আহা, বেচারা অন্ধ।' যেন 'অন্ধজনে দেহ আলো' আবৃত্তি করল করুণ সুরে। তারপর নিজের ব্যাগ খুলে পয়সা দিয়ে বিদেয় করল।

অন্ধজন চলে যেতে আবার বলল, 'নিরিবিলিতে যে একটু প্রেম করব তারও উপায় নেই।' তারপর জিভ বাজিয়ে চুক চুক করে একটা সহানুভূতির শব্দ করল।

'উপায় নেই ঠিক বলব না। তবে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে গিয়ে নিবিড় হয়ে বসলেও কেউ দেখতে আসবে না। খুব চমৎকার জায়গা।'

'কোথায় বল না?' বীণা আবদার করার মত প্রশ্ন করল।

'অবশ্য এখনো আমাদের সেখানে যাওয়ার মত স্টেজ আসেনি। আর সে জায়গার নাম বললেই তুমি মারতে আসবে।'

'আহা বলই না, ঢং।' বীণা অদ্ভুত মিষ্টি একটা ভঙ্গি করল। বটু থাকলে এ সময় চুপি চুপি বলত, নেকু দি গ্রেট।

বললাম, 'কবরখানায়।'

'মানে?' গম্ভীর দেখাল বীণাকে।

'মানে বুঝলে না। যাদের প্রেমের জ্বালা খুব তীব্র, অর্থাৎ 'তীব্র দহন জ্বালো' যাদের তারা বিকেল বেলা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে, পার্ক সার্কাস চলিয়ে জী। সার্কুলার রোডের খ্রেস্টানদের কবরখানার সামনে এসে নামে। আট আনা দিয়ে এক গোছা রজনী গন্ধা কেনে, তারপর হেলে দুলে গেট পেরিয়ে ভিতরে যায়। দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, মাইকেল সাহেব যেখানে শুয়ে আছেন সেখানে এসে ফুলগুলো শুইয়ে রাখে। তারপর হঠাৎই যিনি প্রেমিক তিনি একটা ফুলের কলি ছিঁড়ে নিয়ে প্রেমিকার খোঁপায় পরিয়ে দেন। তখন প্রেমিকা বলে, চল না কোথাও বসি। ওরা অন্ধকারে কোন কবরের পাশে বসে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করে।'

'মাই গড! তুমি কবিতা লিখলে খুব নাম করতে পারতে।' বীণা ছোট্ট করে বলল।

'তা পারতাম। তবে কবি হলে দাড়ি রাখতে হয়। আর দাড়ি রাখলেই আমার সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে হয়। ফলে ও লাইনে আমি নেই বাবা।'

'তা ঠিক, লাইন তোমার একটাই।' বীণা মিষ্টি করে বলল, 'বিয়ের লাইন। একটা কলাবউ দেখে এবার বিয়ে করে ফেল না, খুব পেট ঠেসে নেমন্তন্ন খাই।'

'তা তো খাবেই, কিন্তু লেডিস ফার্স্ট

যে। আগে তোমার হয়ে যাওয়া দরকার। মুলাকির হয়ে গেছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এবার তোমার হোক।'

'ওরে আমার কে রে!' বীণা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু—

'এই যে বড়দা, হে' হে'।'

চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি দু'জন যুবক। হাতে খাতার মত কি যেন একটা বস্তু। ঠোঁটে কলম ঠুকতে ঠুকতে একজন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'বলুন।'

'রিলিফ ফাণ্ডের চাঁদাটা—'

যুবক শুকিয়ে গেল। 'কোন্ রিলিফ ফাণ্ড?'

দাদা যে একেবারে গাছ থেকে পড়লেন। বিহারে দুর্ভিক্ষ চলছে জানেন না? পাঁচটা টাকা ছাড়ুন দেখি, কেটে পড়ি।'

বীণা বলল, 'চাঁদা তো একবার দিয়েছি আমরা।'

'আবার দেবেন। সবাই দিচ্ছে। বিহারী ভাইরা না খেয়ে মরছে আর আপনারা সাহায্য করবেন না তাও হয়!'

'আমরা তো ভাই টাকা নিয়ে বেরই নি।' খুব বিনয়ের সঙ্গে বললাম।

'কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছেন দাদা, বুঝি না। দিয়ে দিন, চলে যাই।'

গলার স্বরে খানিকটা শাসানি ছিল। বীণা বলল, 'একটা টাকা দিয়ে দাও।'

শেষ পর্যন্ত দু' টাকাতে রক্ষা করতে হল। দু'টো টাকা ফালতু গচ্চা খেয়ে মেজাজ কারো ঠিক থাকে না, বললাম, 'খুব হয়েছে। আর আমার প্রেমের দরকার নেই, এবার উঠে পড় দেখি। এবার আবার বাপ মরেছে, সৎকার করতে পারছে না বলে কেউ হাজির হলেই হল।'

বীণা বলল, 'এই তো সবে সাড়ে সাত। আর কেউ আসবে না, তুমি ব'সো।'

'এ সব জায়গায় সন্ধ্যের পর বসা যায় না। রটন! যা সব রহস্যময় লোক ঘুরছে চারপাশে।'

'হাজার হাজার লোক বসে আছে, তোমারই কেবল ভয়। চাঁদা না দিলেই পারতে।' বীণা বিরক্তি প্রকাশ করে তাকাল।

'না দিলে পারতাম, বেশ বললে। লোক দু'টোকে দেখনি; একজনের আবার ভুরুর ওপর কেঁচোর মত পাকান একটা দাগ। ওরা যে চাঁদা চেয়েছে এই বেশী। আর কিছু চাইলেই হয়েছিল আর কি।'

'বিহারে দুর্ভিক্ষের জন্য না-হয় দু'টো টাকা দিলেই, এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

একটা অশ্লীল কথা মুখে আসছিল। ঢোক গিলে চেপে গিয়ে বললাম, 'যদি বলতো, সঙ্গে কি মালকড়ি আছে ছাড়ুন দেখি দিদি। মাঝখান থেকে আমার হাতের ঘড়িটা আর তোমার কানের দুল দু'টো সাফাই করে নিয়ে চলে যেত। প্রেম বেরিয়ে যেত তখন।'

'আমার দুল দু'টো গেলে ক্ষতি নেই। নকল সোনা।'

'কিন্তু আমার ঘড়িটা তো নকল নয়। ওটা গেলে আমি পথে বসব।'

'যদি যায়, চটপট একটা বিয়ে করে নতুন ঘড়ি আর একটা যোগাড় করে নিও।' খুব হেঁয়ালি মিশিয়ে বলল বীণা।

এরপর আর কথা চলে না। খানিকক্ষণ নীরব থেকে আবার একটা সিগারেট ধরলাম। বাঁশঝাড়ের সেই টিকন শব্দটা বোধ হয় থেমেছিল একটু, আবার শুরু হল। শব্দটার দিকে কান পেতে থাকলাম।

'এই, এই, দেখছ!' বীণা বাঁশঝাড়ের নীচে একেবারে জলের গায় গায় ঢালুতে আঙুল তুলে দেখাল। 'আর জায়গা পেল না ওরা!'

'কেন, বেশ তো বসেছে। অনেক কষ্টে ওরা ও জায়গাটা বেছেছে। চাঁদাঅলারা অতদূর গিয়ে বিরক্ত করবে না ওদের।'

'কিন্তু সাপে কামড়ে দিতে কতক্ষণ! বাব্বা, সাহস আছে!'

অন্ধকারে যুগল প্রেমিকদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। 'কাঁদছে নাকি রে বাবা! ফোঁস ফোঁস করে নাক টানার শব্দ আসছে, শুনেছ?"

'তোমার মুণ্ডু! মেয়েটা দেখছ না কেমন সোহাগী হয়ে কোলে মাথা রেখে শুয়েছে। পুলিসের চোখে পড়লে হয় একবার!'

'সত্যিকার প্রেম হলে পুলিসে ঘেচু করবে বড় জোর থানা অবধি নিয়ে যাবে, তার পরই আবার ছেড়ে দিতে হবে।' বীণা খুব স্বচ্ছ গলায় বলল।

'যাই হোক, প্রেম করলেও পুলিসে ধরে। আচ্ছা ধর, আমাদের যদি পুলিসে ধরে, থানায় যেতে হয় যদি এ সময়?'

'পুলিসের আর কাজ নেই। আমাদের ধরতে হলে এখনকার সকলকেই ধরতে হবে।'

'ধর না, পুলিস এসে আমাদের গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে গেল। একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে যাবে, না?'

'কি আর যাচ্ছেতাই হবে! থানার ও-সি হয়ত তোমাকে প্রশ্ন করবে, মেয়েটি আপনার কে হয়? যদি প্রশ্ন করে কি উত্তর দেবে শুনি?'

'কি আর! বলব, শী ইজ মাই লাভার। তুমি কি বলবে?'

বীণা একটু হাসল। 'বলব, চিনিই না। গায়ে পড়ে এসে আলাপ জমাতে চেষ্টা করছে স্যার! বড্ড বিরক্ত করছিল সেই তখন থেকে। প্লীজ দারোগাবাবু, একে আপাতত লক-আপে রাখুন।'

'খুব মজা, না?'

'খুব মজা!' বীণা ছেলেমানুষি কায়দায় খানিকটা সরে যাবার চেষ্টা করল। হয়ত পাছে আমি আক্রমণ করি এই ভয়ে খানিকটা তৈরি হচ্ছিল।

এমন সময় মাত্র কয়েক হাত তফাতেই এক ভদ্রলোক এসে প্যাঁট হয়ে বসলেন। কোলের ওপর একটা ট্রানজিস্টর। ফুল স্পীডে হিন্দী সিনেমার গান চালিয়ে দিলেন।

'ব্যাস, হল তো! এবার উঠে পড়। আর নয়, ঢের হল।'

'আহা, শোনই না।' বীণা আমাকে বাধা দিল। 'কোন্ বইয়ের গান যেন ঠিক মনে আসছে না। বেশ মিউজিকটা, না?'

'হুঁ, খুব ভাল মিউজিক, আমি উঠলাম।'

অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বীণা উঠল। উঠবার সময় একটু নাটক করে একটা হাত আমার দিকে এগিয়ে দিল। 'একটু টেনে তোল না প্রেম!'

ওর নরম হাতের কব্জি চেপে ধরে টেনে তুললাম। টানের হ্যাঁচকায় বীণা একটু এগিয়ে বুক দিয়ে আমাকে ছুঁয়ে দিল। . কেমু দি গেট।

'বাব্বা! বেশ ওজন হয়েছে তো তোমার!'

বীণা শাড়ি ঠিক করে নিতে নিতে বলল, 'তাও তো চার টাকা কিলো চাল খাচ্ছি। একবেলা।'

'গভর্নমেণ্ট তা হলে ঠিকই করছে বল।'

বীণা হাসল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার গম্ভীর হয়ে পড়তে হল। একটা চ্যাপ্টা মত পাতলুন-পরা লোক। লোকটা চোরাই জিনিস চালাবার মত ফিস ফিস করে

বলল, 'স্যার, ফাঁকা গাড়ি চাই? অন্ধকারে পার্ক করা আছে।'

'মানে?'

'ঘণ্টায় দশ টাকা ভাড়া স্যার। কোন ঝামেলা নেই।'

এ সময় কেন জানি বীণার দিকে তাকাতে সাহস হল না। বললাম, 'অন্য খদ্দের দেখুন।'

লোকটা হাওড়া স্টেশনের রিকশঅলার মত অনেকক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটল। তারপর এক সময় চলে গেল।

বীণা বলল, 'অদ্ভুত তো, প্রেম করার জন্য গাড়িভাড়া!'

'প্রেম নয়, অন্য কিছুর জন্য।' লেকের নরম ঘাসের উপর দিয়ে বীণার পাশে পাশে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটলাম। বীণা যা মেয়ে, হয়ত এখন কিছুই জানে না এমন ভাব করে প্রশ্ন করলে, তবে কি করার জন্য প্রেম, বল না। কিন্তু বীণাও কেমন নীরব হয়েই যেন হাঁটছিল।

আমরা রাস্তার কাছাকাছি এগিয়ে এলাম। একটা ন' নম্বর ট্রলি-বাস যাচ্ছে। ও-পাশ থেকে কিছু ঝকঝকে গাড়ি। বেশ আলো-ছায়ার পরিবেশ হয়েছে চারপাশে।

বললাম, 'তুমি কিছু মনে কর নি তো বীণা। তোমাকে বোধ হয় লোকটা স্ট্রীট গার্ল ভেবেছিল।'

'তাই বুঝি!' বীণা কেমন সহজ গলায় উত্তর করল, 'সেই রকম দেখতে বুঝি আমি?'

'স্ট্রীট গার্লদের গায়ে তো আর লেখা থাকে না আমি এই, তাই ও ভুল করেছে হয়ত। আর যা দিনকাল, একটু কিছুতেই লোকে সন্দেহ করে।'

বীণা আবার নীরব হল। আমরা ল্যান্স-ডাউন দিয়ে হেঁটে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এগিয়ে এলাম। এখান থেকেই বীণাকে বাসে তুলে দেব। বীণা যাবে যাদবপুর। আমি উলটোমুখো।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে বীণা বলল, 'তুমি প্রেম মাঝে মাঝে আস না কেন? বেশ ছিলাম কিন্তু আমরা। মা তো প্রায়ই তোমার কথা বলেন।'

বললাম, 'যাব।'

'উঁহু, যাব না। আমাকে ছুঁয়ে কথা দাও।' বীণা হাত এগিয়ে দিল।

ফলে বীণাকে ছুঁয়েই কথা দিলাম। অদ্ভুত ছেলেমানুষি করলাম যেন।

'কিন্তু এর পর যদি আবার কোনদিন পথে দেখা হয়, সেদিন আর লেক-টেক নয় আগেই বলে রাখছি, একদম দাঁড়াও পথিক-বরের কাছে। কবরখানায়।'

বীণা খানিকক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'ওখানেও কি বিনা ঝামেলায় বসতে পারবে না কি! আমার তো মনে হয়, বসবার মত জায়গা কোথাও নেই।'

একটা পাঁচ নম্বর আসছিল। বললাম, 'যাই বল, কবরখানাই কিন্তু বেস্ট জায়গা। অনেকেই যায় ওখানে। বেশ নিরিবিলি।'

তা যেতে পারে, কিন্তু, ধর একদিন তুমি আর আমি ওখানে গিয়ে বসলাম। তিন ফুট বাই ছ' ফুট একটা বাঁধান জায়গা, হয়ত সন্ধ্যায় কেউ মোম জেলে দিয়ে গিয়েছিল। মোমের আলোয় আমরা দু'জন দু'জনের মুখের দিকে তাকালাম। আমি বললাম, প্রেম, আজ আমার স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করছে। ভারি সুন্দর একটা সুখের স্বপ্ন; যেন আমরা পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে দু'জন ওপর দিকে হেঁটে যাচ্ছি। নীচে ছবির মত পৃথিবী—'

'রে ব্বাস, তুমি দেখছি সত্যিকারের কবি হয়ে গেলে!'

'ফ্যাত্, দিলে বারোটা বাজিয়ে, বেশ ভাব এসে গিয়েছিল আমার।'

'সরি, তারপর কি হল বল?'

'আর কি হবে। আমি তোমার কোলে মাথা রাখব। তুমি একটা পাহাড়ী ফুল ছিঁড়ে— আর ঠিক এমন সময় চারপাশের কবরখানা থেকে জ্যান্ত কিছু বডি উঠে এসে ঘেরাও করে দাঁড়াবে আমাদের, হচ্ছে কি শুনি? ফলে, বুঝেছেন বাবু, পৃথিবীতে প্রেম করার কোন জায়গা নেই, বেস্ট জায়গা হচ্ছে আমাদের বাড়ির রোয়াক।'

'যা যা বলেছ! বেশির ভাগ লোকই অপ্রেমী কিনা, তাই প্রেমিক-যুগল দেখলেই গা জ্বালায়।'

বীণা ম্লান হাসল।

আর একটা পাঁচ নম্বর এসে স্টপে দাঁড়াল। বললাম, 'থাক গে, নিশ্চয়ই যাব একদিন। আজ এবার উঠে পড়, বাসটা বেশ ফাঁকা যাচ্ছে।'

বীণা তার হাতের ব্যাগটাকে শক্ত করে ধরে বাসের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর একবার মাত্র ফিরে তাকিয়ে বাসের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

এর পর আমি প্রতিদিনের মত আবার একা, ভীষণ একা হয়ে গেলাম। ওই অবস্থায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় অকস্মাৎ পিছন থেকে কে যেন আমার চোখ দুটো চেপে ধরল, বল তো কে? উঁহু, আগে নাম বল!

আমি তার নরম হাতের উপর দিয়ে হাত বুলোলাম। চুড়ির ওপর, আংটির ওপর আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করলাম। চাঁপার কলির মত আঙুল, তার শাড়ির খসখস শব্দ পেলাম। উঁহু, নাম বল আগে?

আমি তার নাম মনে করবার চেষ্টা করলাম। অন্ধকারে, গভীরে, আরো গভীরে, কিন্তু কেবলমাত্র একটা নামই আমাকে তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাকে আমি খানিকক্ষণ আগেই বাসে তুলে দিয়েছি। সেই নামটাই আমি উচ্চারণ করলাম ভয়ে ভয়ে।

তারপর আমার ঘোর কেটে গেলে দেখলাম চারপাশে তখন আলো, অনেক আলো, যেন উৎসব লেগে গেছে।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

তিপ্পান্ন

অচিনদা কথা শেষ করেই, ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালেন। নিবে যাওয়া চুরুটে দেন আগুন। দু গালেতে ঢেউ তুলে, জোরে জোরে টানেন। কিন্তু আমি যেন দিশাহারা বিভ্রান্ত। যেন কার হাত ধরে চলেছিলাম অচিনের অন্ধকারে। সহসা হাত ছেড়ে যায়। পথ হারিয়ে ঠেক খেয়ে যাই, থমকে পড়ি। পথের কোন সীমানায়, কোন দুরত্বে আছি, টের পাই না। শুধু অচিনদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

রাত দুপুরের হিসাব কে মনে রেখেছে তো। অচিন-নীরজায়ন সংবাদ যেখানে এসে ঠেক খেয়ে গেল, সেখানে আমি পথহারা। সংবাদের শুরু শুনিনি। শেষ পেয়েছি বলেও মনে হয় না। অন্তরা শুনিয়ে গায়ক থামেন। শ্রোতা এখন আপন দায়ে অস্থায়ী আর আভোগের লাগি উৎকর্ণ। এখন তার স্থান কালের হিসাব নেই।

কিন্তু অচিনদার মুখে আবার সেই আগের মানুষ জাগেন। মিটি মিটি হেসে, হাত তুলে, কবজির ঘড়ি দেখান। বলেন, 'আর নয়, চল এবার ফেরা যাক।'

আমি বলি, 'কিন্তু শুরু আর শেষ পেলাম না।'

অচিনদা হাসেন। কেন যেন মনে হয়, উনি আমার কাছে এসেছেন আরো। অনেক বেশী চেনা, অনেক অন্তরঙ্গ। সময়, তুমি তফাত যাও। বয়স, তোমার বিবেচনা নিয়ে বিদায় হও। অচিন প্রৌঢ়ের কোন বয়স নেই। আমি দেখি, বহু দিনের চেনা এক বন্ধু আমার সামনে। বলেন, 'গল্প-লিখিয়েদের নিয়ে এই মুশকিল। তাদের মাঝখান দিয়ে কিছু বোঝানো যাবে না, শুরু চাই, শেষও চাই। কিন্তু ভায়া, আমি তো গল্প-লিখিয়ে নই। ওসব ধরতাই আর শেষ জানি না।'

আমি বলি, 'কিন্তু এদিকে যে মন মানে না।'

অচিনদা জোরে হেসে উঠে আমার পিঠে চাপড় দেন। আমার কথার জবাব না দিয়ে হাঁক দিয়ে ডাকেন, 'কই রে, তোরা সব গেলি কোথায়!'

প্রথম জবাব দেয় বুড়া শুণ্ডি। ঝিমুনি কাটিয়ে বলে, 'এই তো আছি।'

বলে সে কাঠ খুঁচিয়ে আগুন উস্কে দেয়। নরোত্তম অন্ধকার থেকে আলোয় উদয় হয়। দেখি, তার পিছু পিছু মাংরি। ক্যানে, ই দুটোতে কুথা ছিল হে। নরোত্তমের চোখে রসের ঝিকিমিকি। তবু রক্ষে, হাত পা টলোমলো না। সেই যে আমাদের সারথি।

মাংরি বলে নরোত্তমকে, 'কী রে, লাচ শিখবি না।'

বলে, হাসে খিলখিল করে, আগুনের যেমন শিস কাঁপে তেমনি শরীর কাঁপিয়ে। নরোত্তম যেন জবরো স্বরে জবাব দেয়, 'আর না, বাবুদের লিয়ে যেতে লাগবে না।'

অচিনদা বলেন, 'ও বাব্বা, এর মধ্যে আবার লাচ শেখাশিখিও হচ্ছিল। তা বাবা, লিয়ে যেতে পারবে তো।'

নরোত্তম বলে, 'অই কী বলেন গ বাবু, তা আর পারব না।'

মাংরি গিয়ে আবার বুড়া শুণ্ডির পাশে বসে। আর একদিক থেকে এগিয়ে আসে বরহম। অচিনদাকে বলে, 'চললি?'

অচিনদা উঠতে উঠতে বলেন, 'তবে কি সারা রাত এই জংগলে বসে থাকব নাকি!'

বরহম বলে, 'থাকলি তো ঐ খোকা-বাবুটার সংগে কথা বইললি। উকেস লাচ করালি না, গান করালি না।'

অচিনদা বলেন, 'আবার হবে।'

আমিও উঠি। বরহমের চোখ জিভ ভারী, তবু কথায় পেয়েছে। বলে, 'আবার কবে হবে! আর কি তুই আসবি! বইললি, ছেলেটোকে লষ্ট করবি, তাও করলি না, শুকনা মুখে লিয়ে যেইছিস্।'

অচিনদা একবার আমার দিকে চেয়ে হাসেন। বলেন, 'আরে, ওর কি কিছু আছে যে নষ্ট করব, এ ছেলেটা একেবারে পাক্কা নষ্ট।'

এবার আওয়াজ দেয় মাংরি, 'অই, মিছা ক্যানে বুইলছিস, লষ্ট মানুষ অইরকম লাগে না।'

তার জবাব দেয় বুড়ো শুণ্ডি, 'মাংরির হাতে দিলে দেখতে, কেমন লষ্ট করতে পারে।'

বলে সে হাসে। তার চেয়ে জোরে, খিলখিলিয়ে বাজে মাংরি। আর মাংরির বাবা স্বয়ং বরহম ঘাড় দুলিয়ে বলে ওঠে, 'হঁয় হঁয় হঁয়।'

অচিনদা নকল কোপে ভুরু কুঁচকে তাকান মাংরির দিকে। আমি অবাক লজ্জা মানি। কেমন কথা, কত সহজে সবাই ভাবে। আমার বাপ বলে হঁয় হঁয়। অচিনদা মুখ ফিরিয়ে বরহমকে জিজ্ঞেস করেন, এরা সব কোথায় গেল? শরৎ, তোদের বউয়েরা?'

বরহমের শরীরে একটা দোলা লাগে। হাতের ঝাপটা দিয়ে মাতাল ভঙ্গিতে বলে, 'আ দূর, অই উখানটোয় সব ঘুমাচ্ছে।'

'তবে যা বাবা, তুইও গিয়ে ঘুমো, আমি চলি। এস হে। চল রে নরোত্তম।'

অচিনদা পা বাড়ান। বরহম টলতে টলতে এগিয়ে আসে, 'না তুই অখন যাস না। বস ক্যানে, রস খাব না তোর সাথে?'

অচিনদা না থেমেই বলেন, 'খুব হয়েছে, আজ আর না।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। বরহমও সঙ্গে সঙ্গে এগোয়, বলে, 'না না, অই

অচিনবাবু, একটু থাক, যাস না। দুটো কথা হল না, তুই হাসলি না, কান্দলি না। একবারটো কেঁন্দে যা, আমরাও কান্দব, পীতি বছরের মতন।'

আমি অবাক হয়ে অচিনদার দিকে তাকাই। অচিনদা বলেন, 'বাজে কথা, মাতালের প্রলাপ, ওসব শুনো না।'

তবু আমার মনে ধন্দ লাগে। প্রলাপ বটে, তবু কথার মধ্যে কেমন একটা ঘটনার সংকেত ফোটে যেন।

বরহম প্রতিবাদে গোটা শরীর নিয়ে ঢলে পড়ে, 'অই, বাজে বুইলছিস ক্যানে। তুই কাঁদিস না? আমরা কাঁদি না?'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে অচিনদা বলেন, 'যা, এখন যা। মাতাল হলে সবাই সব করে।'

বরহম তেমনি বলতে থাকে, 'তুই কত কথা বলিস, কত কাঁদিস, অই অচিনবাবু।'

বলতে বলতে সে অচিনদার একটা হাত টেনে ধরে। অচিনদাকে দাঁড়াতে হয়। নরোত্তম হুকুমমাফিক বাতি জ্বালিয়ে গিয়েছিল। সে আমাদের আগে আগে। আমি দুই বন্ধুকে দেখি। দেখি, এখন আর অচিনদার হাসিটি তেমন এড়িয়ে যাবার ভোলানো হাসি না। বলেন, 'আরে, খালি কাঁদলে কি কাঁদা হয়! মনে মনে কাঁদা হয় না?'

বরহম একটু ভাবে, তারপরে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, 'হঁ্য হঁ্য। মনে মনে হয়। তবে তুই চলে যেইছিস।'

'হ্যাঁ।'

বলে অচিনদা একবার বরহমের হাতটা ধরেন। ওদিক থেকে বুড়ো শুণ্ডি বলে, 'আবার এস গ অচিনবাবু।'

'আসব।'

বরহম অচিনদার হাতটা ছেড়ে দেয়। ঘাড় নাড়িয়ে বলে, 'আচ্ছা, যা। আবার এক বছর পরে আসিস। ই বাবুটোকে লিয়ে আসিস।'

বলে সে আমার পিঠে একটু চাপড়ে দেয়। জিজ্ঞেস করি, 'তোমরা বাড়ি যাবে না?'

'না। কাল সকালে চলে যাব।'

অচিনদা এগিয়ে চলেন। আমার দিকে ফিরে আবার বলেন, 'মাতালের কথা।'...

মনে মনে বলি, তা জানি না। অচিনদা কেবল বরহমকে মাতাল বলেন, না নিজেকেও, বুঝি না। কেবল এইটুকু বুঝতে পারি অচিনদা ওদের সঙ্গে বসে কথা বলেন, হাসেন। ওরাও হাসে। অচিনদা কাঁদেন, ওরাও কাঁদে। ছবিটা মনে মনে আঁকি আর মনে মনে জিজ্ঞেস করি, কী বলে কাঁদেন অচিনদা। সেই ছবিটাও আমার একটু চাক্ষুষ করতে ইচ্ছা করে।

বাঁশঝাড়ের আড়াল ছাড়িয়ে ঢিবির নিচে নেমে আসতেই উত্তর-পশ্চিমা হিমেল হাওয়ার ধাক্কা বাঁপিয়ে পড়ে। গালে গলায় আঁচড়ে দেয়। তবু অন্ধকার যেন অনেক সহনীয়। নরোত্তমের আলোর চেয়ে চোখের জ্যোতি কাজ করে অনায়াস।

অচিনদা যেন নতুন করে কিছু শুরু করেন না, এমনি সহজ গলায় বলেন, 'শুরুটার মধ্যেও এমন কিছু নেই যে, তোমাকে চমকে দিয়ে অবাক করে দিতে পারি। আমরা সেকালের লোকেরা এখনো বলি, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে। মেয়ে-পুরুষ নিজেরা পেতে রাখে বলে বিশ্বাস হয় না। কে পেতে রাখে তাও জানি না। বিষয়টাকে যদি প্রকৃতি-ঘটিত মনে করি, তা হলে বলতে হয়, ফাঁদ পাতা যার কাজ, সেই পেতে রাখে। ধরা যাদের পড়বার, তারা ধরা পড়ে। তবে হ্যাঁ, ফাঁদের চেহারাটা নানাখানে নানারকম। আমাদের ফাঁদের রঙটা ছিল সবটুকু লাল। কারণ, তখন হেমন্তকালের শেষ, শীতের প্রায় আরম্ভ। শান্তিনিকেতনের শীতের আরম্ভ যারা দেখেছে—দেখেছে বলতে শুধু চোখের দেখাই বলি না, যে দেখাটা মরমের ভেতর অবধি কাজ করে সেই দেখার কথা বলছি, সে আর জীবনে কখনো তা ভুলতে পারবে না।

'যাই হোক, ফুল-ফলের কথা বলছি না, কিন্তু সব মিলিয়ে এত লাল অন্য সময়ে বোধ হয় দেখা যায় না। লাল মাটিতে তখন ধুলোর ছড়াছড়ি সবখানেই, মাঠে-ঘাটে-পথে, গাছের গায়ে গায়ে, পাতায় পাতায়, বাড়ি-ঘরের দেওয়ালে, বেড়ায়। তার ওপরে তখন খেলার মাঠের ওপারে পশ্চিমের কোণে সূর্য লাল টকটকে। বলতে পার সময়টা বিকেল। এক্কে তো লাল মাটির ধুলোয় সব রাঙা, তার ওপরে লাল সূর্যের ছটায় সবই আরো বেশী লাল। সেইজন্যেই বলছিলাম, ফাঁদটার রঙ ছিল লাল। রূপের সঙ্গে শব্দের কথাটাও আসে। বোধ হয় একটু বেশী করেই আসে। যদিও রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, তবু এ প্রসঙ্গে তোমাকে একটা কথা শুনিয়ে রাখি। তোমরা, হালের লেখকেরা, কীভাবে ভাবো সবটা জানি নে, গুরুদেব একবার বলেছিলেন, যদি দৃষ্টি আর শ্রবণ, দুটোর কোন একটা আমাকে হারাতে হয়, তবে আমি দৃষ্টিটাকেই ছাড়তে রাজী আছি, কিন্তু শ্রবণকে নয়। তার মানেই বুঝতে পারছ, বাণীর জগতেই এ মানুষের কাব্যের সংসার পাতা ছিল, শব্দ যেখানে নিত্য-অনিত্যের খেলায় লীলা করেছে। এ মানুষ কখনো গান না বেঁধে পারেন? সুর দিয়ে গান না গেয়ে পারেন?

'কিন্তু এসব কথা থাক। সামান্যের মধ্যে অকারণ এসব অসামান্যের আমদানি করা নিছে। এ আমার একটা দোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। যা বলছিলাম, ফাঁদের লাল রঙও শব্দ যোগালো। ছিল, তার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ছে, গলা খোলবার আগেই গলার আড় ভাঙবার জন্যে একটা কোকিলের অস্পষ্ট ভাঙা-ভাঙা ডাক। জানি নে, কখনো সেরকম ডাক শুনেছ কিনা, বলতে পারো ভেতরের আবেগটা গলায় তখনো ভাল করে ফোটে নি। সবেরই একটা সময় আছে তো। পাখিদের তখন ঘরে ফেরার সময় হয়ে এসেছে, তবে দল বেঁধে ডাকাডাকি আরম্ভ হয় নি, দু-চারটে হঠাৎ হঠাৎ শিস্, পিকপিক কিচকিচ গাছের ঝুপনিতে, ঝাড়ে। একটু ভাল করে কান পাতলে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়।

ঘরে যাবার আগে একলা-একলা শেষ পাক দিয়ে ফিরছিলাম রেল-লাইনের দিক থেকে। তখন নতুন সিগারেট খাওয়া শিখেছি। তবে আশ্রমের বাইরে বিকেল-সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়াবার সময়ে এক-আধটা। পকেটের মধ্যে সেটা খোঁচাচ্ছিল বলে খেয়ে ঢোকবার মনস্থ করলাম। আদি বাড়ির দক্ষিণে ফটকের কাছ থেকে খানিকটা বট-তলার দিকে এগিয়ে ঠোঁটে সিগারেট চেপে যেমনি দেশলাই জ্বালাতে যাব, পেছনে পায়ের শব্দ। চমকে সিগারেট নামিয়ে ফিরে তাকাতেই দেখলাম, ডোরাকাটা শাড়ি-পরা এক মেয়ে। বিকেলে বাঁধা চুল, একটু লম্বা মুখে ডাগর দুটো চোখ। চোখ দুটিতে কৌতুকের ঝিকিমিকি, পাছে হাসি ছিটকে পড়ে তাই মুখে হাত চাপা। আমার মুখে তখনো ধরা পড়ে-যাওয়া চমকের ভাবটা যায় নি। কয়েক মুহূর্ত সেই অবস্থায় থেকে মেয়েটি আমার সামনে দিয়েই এগিয়ে গেল। যাবার সময় কাছাকাছি আর একবার আমার মুখের দিকে তাকাতেই হাসি সে ধরে রাখতে পারল না, খিলখিল করে বেজে উঠলো। তার ডোরা শাড়ি-পরা শরীর বেঁকে গেল হাসিতে। কয়েক হাত গিয়ে আবার ফিরে তাকালো, আবার হাসি, তারপরে বাঁয়ে মোড় নিয়ে অন্তর্ধান। ব্যাপারটা বোধগম্য হয়ে যখন নিজেকে ঠাট্টা করে হেসে ফেললাম, তখন পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে। চোখ আর মনের সবখানে জেগে রইল শুধু একটি মুখ।

'তোমাদের ভাষায় এটাকে যদি একটা গল্পের শুরু বলা যায়, তবে মোটা যে বস্তা-পচা, তাতে সন্দেহ নেই। আরো সন্দেহ নেই, কারণ প্রেম বলে একটা ব্যাপার, তার মধ্যে কত কিছু থাকে, কত কথা, কত বিচিত্র তার গতিবিধি, রীতি, কিন্তু আমাদের ফাঁদে পড়ার প্রাথমিক আচরণে দেখা গেল চোখাচোখি হলেই কেবল হাসি। নীরজা তখন বোধ হয় নবম শ্রেণীর ছাত্রী—তোমাদের গল্পের আসরে যে মেয়েরা নায়িকার গোষ্ঠী পাবার একেবারেই অযোগ্য। ম্যাট্রিক পাস করে আমার তখন কলেজের শিক্ষা চলছে। দেখাদেখি চোখাচোখি হলেই কেবল হাসা-হাসি। নীরজার মুখে রঙ লেগে যায়, লজ্জায় অন্য রকম হয়ে যেত, তার নামই জানাজানি। আমার মুখের রঙ কতখানি বদলাতো জানি

ন, তবে কান-টান গরম হয়ে উঠতো, বুকের কাছটার রক্ত যেন ছলাত ছলাত করে আছড়াতো।

'এ সব যে কেমন করে ঘটছিল তা বলতে পারব না। প্রথম দিকে বলতে পার দেখাদেখি চোখাচোখি করাটা, লেখাপড়া করতে, চলায়-ফেরায় আপনা-আপনি যতটুকু হত ততটাই সম্বল। তারপরে দেখা গেল দুই মন, দুই প্রাণ তাতে তৃপ্ত নয়, নিজেদের ইচ্ছে আর চেষ্টা এসে যোগ দিল, কেমন করে একটু নিরিবিলিতে বেশী দেখাদেখি চোখাচোখি হয়। সে ইচ্ছে আর চেষ্টাও সফল হল, কিন্তু কাছাকাছি যাওয়া নয়। একটু দূরে দূরে থেকেই, "নয়নে নয়ন দিয়া" তাতেই ভায়া, "যৌবনের বনে মন হারাইয়া" যায়, আর "গায়ে আমার পুলক জাগে / চোখে লাগে ঘোর / হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে / রাঙা রাখির ডোর।" এমন একটা প্রেমোপাখ্যানকে তোমরা এক কথাতেই ঠোঁট উলটে নাকচ করে দেবে, এখন আমিও তাই দেব। কিন্তু আমার যে তখন, "আমি যে আর সইতে পারিনে / সুরে বাজে মনের মাঝে গো / কথা দিয়ে কইতে পারিনে।"

'তৃতীয় ধাপটা তোমাদের আধুনিকদের কাছে সব থেকে হাস্যকর মনে হবে, কিন্তু আমাদের সময়ে সেটাই অনেকখানি, শুরু হল পত্রালাপ। পত্রালাপের গতিবিধি এখনকার আমলের গোয়েন্দাদেরও হার মানায়। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অনেক লোমহর্ষক ঘটনায় দেখলাম, কবরখানায় দলিল রেখে পাচার হয়েছে, ফিল্মের রীল রেখে দিয়েছে পাচারের জন্য সামান্য একটা নিরীহ পার্কের রেলিং-এর ফুটোর মধ্যে, তেমনি করেই লক্ষ লক্ষ ডলার মার্ক পাউণ্ড বদল। কিন্তু তার বহু আগেই ছাতিমের গুঁড়ির খাঁজে, অমুক জায়গায় শালের ঢিড-খাওয়া ফাটলে, তমুক জায়গার নিচু আমগাছের মাঝখানে, নয় তো নিতান্ত কোন ঝোপে-ঝাড়ে আমরা অন্য দলিল পাচার করেছি, আর সে সপটও খুবই নিরীহ, নিতান্তই চোখের তৃষ্ণায় আর কাব্যের দৌলতে তার পরিচয়। অবিশ্যি আগের চিঠিতেই জানা-জানি থাকতো, পরবর্তী ডাকঘর কোথায় হবে, কোন্ গাছে, কোন্ ঝোপে, আর সেটা উভয় পক্ষ থেকেই। সেইজন্যেই বোধ হয়, বন্ধ আর প্রেম কোন লিখিত-কথিত রীতি-নীতির মধ্যে নেই। সে পত্রালাপের বয়ান যদি শোন, মাঝরাত্রে এ খোয়াইয়ের মাঠে পাগলের মত হেসে উঠবে। প্রথম দিকে তো কেবল কবিতার ছড়াছড়ি, নিজের কথার চেয়ে উদ্ধৃতিতেই ঠাসা, প্রাণ খুলে নিজেদের মনের কথা বলতেও যে লজ্জা! তখন কেবল বন্দী-দশার কান্নাকাটি, কাছে যাবার আকুলতা! তাতেই বছর ঘুরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বছরও ঘুরে যেত, কিন্তু—।'

অচিনদা হঠাৎ থামেন। এক মুহূর্তে

থেমেই আবার যেই শুরু করেন তখন ও'র গলার সুর বদলে যায়। বাঁশঝাড়েও যে স্বর শুনিনি, সেই স্বর বেজে ওঠে। হঠাৎ যেন কেমন চুপিচুপি ভয়-পাওয়া ব্যগ্র গলায় বলে ওঠেন, 'কিন্তু সে কথাটা বলতে এখনো কেমন যেন হয়ে যাই, গলার ঠিক থাকে না। এমন কি ওই বরহমের কথাই সত্যি হয়ে যাবে, ভেউ ভেউ করে কাঁদতে আরম্ভ করব। তখন তুমি এই বুড়োকে নিয়ে ভারী গোলমালে পড়ে যাবে ভায়া।'

বলেই সত্যি সত্যি কাঁদেন না, কাশি পাওয়া গলায় হা হা করে হেসে ওঠেন। শুনতে যতই ভারী লাগুক, এ হাসি যেন আমাকে বি'ধে যায়। অচিনদার দিকে ফিরে তাকাই। ও'র মুখ দেখতে পাই না। কিন্তু যেখানে এসে থামেন, তার ওপারের অন্ধকারে তখন আমার আপন খোঁজাখ'ুজি। আমার ব্যগ্র চোখের দৃষ্টি সেখানে আতুর হয়ে ফিরে মরে। তাই মুখ ফুটে আপনি বেরিয়ে যায়, 'তবু?'

'তবু?'

অচিনদা প্রায় হুমকে ওঠেন যেন। বলেন, 'খুবই প্রাণঘাতী লাগছে যেন, অ্যাঁ? আমি কাঁদি-মরি যাই হোক, শুনতেই হবে, না? অলকা আর আমিই তোমাকে ঠিক বুঝেছি। কপট আর নিষ্ঠুর। আসলে নিজের তৃপ্তি-টুকু নিয়ে সরে পড়া। আর লেখক যখন পাঠক হয়, সে পাঠকের জাত আলাদা, তাও জানি। এখন রস নিঙড়ে না বের করলে শান্তি নেই।'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না, না, অচিনদা, আমি—।'

'তুমি থামো হে ছোকরা। তুমি নতুন কিছু নও।'

'তা ঠিক।'

'সত্যি?'

বলে হেসে আমার কাঁধে হাত রাখেন। বলেন, 'বলব হে, তোমাকে বলব বলেই মুখ খোলা। আর এই মুখ খোলার মুখে—হ্যাঁ, এ একটা সুখ বলতে পার, যদি একটু কাঁদিই, না-হয় কাঁদবই। তবে অতটা গড়াবে না। আসলে পত্রালাপের বন্দীদশা থেকে যেদিন প্রথম ছাড়া পেয়ে দু'জনে কাছাকাছি হয়ে-ছিলাম, সেদিনটার স্মৃতি বড় বেশী উতলা করে তোলে। এমন উতলা আর কোন দিনের স্মৃতিই করে না, কেন, তা বলতে পারি নে ভায়া।

'শুরুর অঙ্কটা এই একটি দিনের কথাতেই শেষ করব, বাকিটা রেখো তোমার কল্পনার মধ্যে। দ্বিতীয় বছরটাও ঘুরে যেতে গিয়ে বসন্তোৎসব এসে গেল। সেবার নতুন গান, নতুন পালা। এই যদি তোমার প্রথম আগমন হয়, তবে বসন্তোৎসবের চেহারা তুমি জান না। শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ উৎসবই প্রকৃতির সঙ্গে মেলানো, সবগুলোকেই বলতে পার ঋতুর উৎসব। আমবাগানের যেখানে সবাই আসে, সভা বসে, সেখানে আলপনা ছবি আবীরের ছড়াছড়ি। সন্ধ্যে হতে-না-হতেই বাতির আয়োজন। আমাদের সকলের কাজ, সকলেই ব্যস্ত। নীরজা আলপনা দিয়েছিল মেয়েদের সঙ্গে। চুলে তেল দেয়নি, বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছিল। সন্ধ্যেবেলা সকলের মাঝখানে ওকে একটু আবীর ছোঁয়াতে গিয়েই বন্দীশালার গরাদে ভাঙন ধরেছিল। তারপরে সমস্ত ব্যাপারটা বলতে পার নিশি পাওয়ার মত। নীরু যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে কেবলই আমাদের চোখে চোখ পড়ছিল। কিন্তু একটাই আশ্চর্য, সেদিন লজ্জা আর হাসির চেয়ে যেন অন্য কিছু আমাদের মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল।

'ফাঁদের সেটা কত বড় কারসাজি, তুমি হয়তো কল্পনা করতে পারছ না। যে চাঁদ সেদিন অদি বাড়ির পাশ ঘেঁষে পুবু কোণ ঘেঁষে উঠেছিল, তার বর্ণনা দিতে পারি সে ক্ষমতা আমার নেই। মনে হল, আমবাগান থেকে আমলকীবনে দুটো কোকিল ডাকা-ডাকি করছে। গান শুরু হবার আগেই দেখলাম নীরু মেয়েদের কাছ থেকে উঠে চলে গেল। চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেলাম। বুকের কাছে যেন রক্তের উথাল-পাথালি ঢেউ। দেখলাম, সে আস্তে আস্তে দক্ষিণের ছায়ায় ছায়ায় চলে যাচ্ছে। বলতে পার চৌর্যবৃত্তি। কিন্তু স্থির থাকা দায়। নীরজা যদি এমন সাহসে বুক বাঁধতে পারে, আমি তবে কোন্ বসন্তোৎসবের শরিক। আমিও তবে চলি। বন্ধুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে গেলাম। একেবারে নির্জনে, সভার বাতির সীমানার বাইরে, কোল আঁধারের ছায়ায় এক গাছতলায় আবিষ্কার করলাম ওকে। কাছে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। গান তখন শুরু হয়েছে। একবার ডাকতে চাইলাম, দেখলাম গলায় স্বর নেই। শরীরও প্রায় বিকল, তবু কাছে গিয়ে ওর একটা হাত ধরলাম। ঠান্ডা ভেজা-ভেজা হাত, কিন্তু নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। আমি ওকে কাছে টেনে নিতেই বুকের কাছে নুয়ে পড়ল। সেবারে সেই আমার বসন্তোৎসব, "বসন্তে আজ ধরার চিত্ত / হল উতলা।" এর বেশী আর কিছু বলতে পারি নে।'

অচিনদা চুপ করেন। আর আমি আমার যুগের দূর-পারের কোন এক অন্যলোকে ডুবে যাই। আমার কাছে তখন আর জানা-চেনা বাক্যির মানে মূল্যহীন। তখন যেন সেকাল-একালের সময় ছাপিয়ে একটা চির সময়ের সুরে বেজে ওঠে,

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে,
তোমার আমার খেলা।

অচিনদা আমাকে টেনে থামান। বলেন, 'দাঁড়াও হে, ওকে এখন গাড়িটা ঠেলে তুলতে দাও। এবার রাস্তায় উঠতে হবে।'

চমক লাগে না। টান লাগাতেই দাঁড়িয়ে যাই। দেখি সামনে উঁচুতে রাস্তা। নরোত্তম ওপরে উঠে বাতি রেখে রিকশা টেনে তুলছে। অচিনদার দিকে তাকাই। তাঁর বুকের দিকে। সেই বুক, এক বসন্তোৎসবের সন্ধ্যায়, আমগাছের ছায়ায় এক ফুল ফুটে-ছিল। এখন সেখানে শূন্য। সে কথা বলতে গিয়ে উনি কাঁদেন নি জানি। কিন্তু এখনো বুকে গন্ধ, এখনো স্পর্শের অনুভূতি। এ মানুষের কাঁদবার সময় কোথায় এখন। এ মানুষ হয় তো এখনো কেবল খুঁজে খুঁজে ফেরে।

নরোত্তম রিকশা রাস্তায় তুলে ডাকে 'আসেন বাবু।'

(ক্রমশ)

সোসাইটি অব কণ্টেম্পোরারি আর্টিস্টস কলিকাতার শিল্পমহলে এক সুপরিচিত সংস্থা। নিয়মিতভাবে কলিকাতা ও অন্যান্য শহরে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে এই সংস্থার শিল্পী সভ্যগণ সুনাম অর্জন করেছেন এবং মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও এঁরা কলিকাতায় এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সভ্যই যে নিয়মিতভাবে শিল্পচিন্তা ও চর্চা করে থাকেন তার আরও একটি প্রমাণ পেলাম 'বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার গ্যালারীতে সম্প্রতি আয়োজিত এঁদের এক প্রদর্শনী দেখে। দশজন সভ্য

কম্পোজিসন —অরুণ বোস

রচিত ৫৪ খানি নিদর্শন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করলেও প্রত্যেক সভ্যই আপন আপন মাধ্যম, রীতি ও রুচি অনুসরণ করেছেন। ফলে, প্রদর্শনীটি প্রদক্ষিণ করলেই সর্বাগ্রে যেটি চোখে পড়ে সেটা হল এর বৈচিত্র্য। সাধারণভাবে বলতে গেলে অঙ্কনরীতি মিশ্র, যদিও অধিকাংশই বিমূর্ত রচনা এবং মাধ্যম তেল ও জল রঙ। প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর রচনাই মৌলিক ও পরিচ্ছন্ন। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে প্রদর্শনীর মান উচ্চ বলাই সঙ্গত, তবুও কয়েকটি নিদর্শন, বিশেষ করে রসোত্তীর্ণ রচনার পরিপ্রেক্ষিতে, অতি সাধারণ এমন কি কয়েক ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের ছিল। এহেন দুই-একটি রচনা বাদ দিলে প্রদর্শনীটি হয়ত সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠত। যাঁরা নূতন কাজ বা চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল দাস, অরুণ বোস ও গণেশ পাইনের নাম উল্লেখযোগ্য। কোলাজ (Collage) রীতিতে রচিত ছবির মধ্য দিয়ে বিকাশ ভট্টাচার্যের নূতন মনোভাবের সন্ধান পাই। সমসাময়িক হিসাবে এ শিল্পী বর্তমান মানব সমাজের বিকৃত ও বিভিন্ন রূপের ছোট ছোট ছবি ও স্থিরচিত্রের নিদর্শন নানাভাবে স্থাপনা করে বর্তমান যুগজীবনের পরস্পরবিরোধী একটি সামগ্রিক রূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। সে হিসাবে শিল্পীর এই জাতীয় রচনা পপ আর্টের গণ্ডিতে পড়ে। তথাকথিত খ্রীষ্ট-ধর্মের অন্তরালে থেকে পৃথিবীর এক প্রান্তে শোষণকারী ধনী সম্প্রদায়ের নরনারীর পাপ-পঙ্কিল জীবনযাত্রার দুর্বার স্রোত, অপর দিকে নিপীড়িত দরিদ্র জনসাধারণের নিত্য-নৈমিত্তিক অভাব-অভিযোগ, যুদ্ধবিগ্রহের ফলে নিরীহ অক্ষম ও দুর্বল দেশবাসীর আর্তনাদ ও অহেতুক আত্মবলিদান—শিল্পী সামগ্রিকভাবে সমসাময়িক যুগযন্ত্রণা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতীক হিসাবে খ্রীষ্ট ধর্মের পবিত্র ক্রুশ (লাইফ ইন নেম অব রিলিজিঅন) ও পশুস্বরূপ নৃশংস দানবের হিংস্র তাণ্ডবলীলা (প্রফেটিক বিস্ট) প্রকাশ করে শিল্পী স্বীয় বক্তব্যটুকু প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অপরাপর রচনার মধ্যে 'পেরেনিয়াল আদম ও ইভ' উল্লেখযোগ্য। তবে শিল্পী যে কি কারণে উগ্র ভার্নিশ জাতীয় রঙ ব্যবহার করেছেন তা বুঝতে পারলাম না। এই তীব্র রঙ-প্রীতির ফলে অনেক ক্ষেত্রে ছবিগুলি সাইনবোর্ড গোত্রীয় হয়ে গেছে।

অরুণ বোস কৃতী বিমূর্ত শিল্পী হিসাবে সুপরিচিত। তবে এবারে তাঁর অন্য পরিচয় পেলাম। প্রাচীন লোকচিত্র অবলম্বনে রচিত কয়েকটি ছবিতে রেখা ও আকারবৈচিত্র্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। জলরঙে আঁকা রেখাপ্রধান এহেন ছবি দেখে প্রাচীন মন্দির বা দেওয়ালে আঁকা অতি সরল শিল্পসৃষ্টির কথা মনে পড়ে যায়। যেমন মুদ্রিত ছবিখানি। বিমূর্ত রচনার মধ্য দিয়ে শিল্পীর অঙ্কন-শৈলী তথা শূন্যস্থান বিভাগ কৌশলের পরিচয় পাই, যেমন ২নং কম্পোজিশন। গণেশ পাইনের জলরঙে আঁকা ছবিগুলির একটি নিজস্ব মাধুর্য আছে। ছোট ছোট নিদর্শনগুলির মধ্যে রচনারীতির এক বিশিষ্ট স্বাক্ষর চোখে পড়ে। সরল অথচ স্বল্প রেখা ও বিশেষ করে গাঢ় রঙ ব্যবহার কৌশলের জন্য ছবির মধ্য থেকে যেন এক একটি প্যাটার্নের উদ্ভব হয়েছে—যেমন হালকা হলদে রঙ ও সবুজ রঙের রেখা মাধ্যমে রচিত 'হাউস।' আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন—'গেট।' অতি গভীর নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই ছোট ছবিখানি

মাই বিলাভেড —সুনীল দাশ

দেখে মনে হয় বুঝি বা স্বপ্নরাজ্যের কোনও মায়াপুরীর দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলাম। শ্যামল দত্ত রায় তাঁর বিশিষ্ট অঙ্কনরীতির জন্য পরিচিত এবং প্রদর্শনীতে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে। তবে এবারে অনেক ক্ষেত্রে তিনি যেন পাতলা রঙ মাধ্যমে নানা প্যাটার্ন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। মনে হয় শিল্পী বিভিন্ন পাতলা রঙ ঢেলে,

সেই রঙের ধারাকে খেয়াল ও খুশীমত চালনা করে এহেন প্যাটার্নের সন্ধান পেয়েছেন, যেমন ইস্ট। আবার কয়েক স্থলে এই পদ্ধতির সঙ্গে নিজস্ব বলিষ্ঠ শিল্পমুদ্রণ জাতীয় রেখাসৌষ্ঠব সমন্বয়ের ফলে গ্রাফিকের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে 'ডিজায়ারাস' ও 'এ স্টেজ শো' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুহাস রায়ের রঙীন রেখাবহুল ছবি দেখে স্বভাবতই শিল্পী নীরদ মজুমদারের রচনার কথা মনে পড়ে। চিন্তাধারার সঙ্গে শিল্পী যদি অঙ্কনরীতির মৌলিক ধারাটুকু বজায় রাখতে পারতেন তাহলে হয়ত কয়েকটি ছবি অতিরিক্ত রঙরেখাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত না। অর্থাৎ অধিকাংশ রচনার বক্তব্যই যেন রঙীন রেখাজালের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গেছে, যেমন 'ময়ূর।' তবে শিল্পীর সাপ ছবিখানি সকলেরই চোখে পড়ে। রঙ ও রেখাজালের সামঞ্জস্যের জন্য এই রচনাটি কারুকার্যখচিত কাচের (Stained glass) মত নানা রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। ইমপ্যাস্টো রীতিতে কাজ করলেও সূক্ষ্ম রঙের কারুকার্যের জন্য সমস্ত করের ছবিগুলি দূর থেকে বিন্দু প্রধান (Pointillistic) রচনা বলে ভুল হয়। অধিকাংশ নিদর্শনের মধ্যেই শিল্পীর সচেতন মনের সন্ধান পাওয়া যায়। এ শিল্পীর 'এলোকোয়েন্ট সাইলেন্স' ও ল্যান্ডস্কেপ' উল্লেখযোগ্য। সুনীল দাসের নূতনতম রচনাগুলি বৃহৎ এবং এগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পী তাঁর নূতন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন।

ইতিপূর্বে তাঁর একক প্রদর্শনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি এবং এখনো বলি যে, শিল্পী প্রতিভাবান এবং এঁর কাজ দেখে বোঝা যায় যে, নানা মাধ্যম ও রীতিতে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য ইনি ক্রমাগত নানা পরীক্ষা করে যান। এঁর নূতনতম রচনাগুলি আধুনিক পদবাচ্য হলেও বিমূর্ত নয়। পাত্র-পাত্রী সমসাময়িক জগতের বাসিন্দা—অর্থাৎ শিল্পীর চোখে তাঁরা অবহেলিত নির্যাতিত শ্রেণীভুক্ত। দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ও বুভুক্ষায় তাদের দেহ মন পীড়িত, তাই সম্ভবত তাদের চেহারা ও আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে বিদ্রোহের ভাব। মানসিক ও দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য বুঝি তারা সকলকে গ্রাস করতে চায়, সেজন্যই তারা বিকৃতমুখ ও বিকৃত দেহ। সম্ভবত এই জগতে পরাজয়ের গ্লানির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই শিল্পী আপন বিদ্রোহী মনোভাব ও নিধনকারী রূপ নিজ প্রতিকৃতির মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'আমার প্রেয়সী' 'নিজ প্রতিকৃতি—২' ও 'কংকার' উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে গুজরাতী শিল্পী হিম্মৎ শা-র রচনার কথা মনে পড়ে। দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তাঁর পাত্রপাত্রী আরও মুখর ও নির্লজ্জ বটে তবে এক হিসাবে তাঁর ও সুনীল দাসের সাম্প্রতিকতম রচনা একই পর্যায়ভুক্ত।

স্থূল রেখা ও রঙ সহযোগে শূন্যস্থান কিভাবে ভাগ করা যায় শৈলেন মিত্র তাঁর চারটি রচনায় তা বিশদভাবে প্রমাণ করেছেন। বিশেষ করে হাল্কা হলদে ও কালো রঙ মাধ্যমে রচিত ১নং পেন্টিং ও মুখ্যত নীল ও লাল রঙের সুকৌশল ব্যবহারের জন্য ৩নং পেন্টিং সকলের চোখে পড়ে। দর্শকের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য মানু পারেখ তাঁর পুরানো রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ইনিও কোলাজ মাধ্যমে কাজ করেছেন তবে এঁর কাজ অন্য জাতীয়। প্লাইউডের ওপর বিভিন্ন আকারের রঙীন কাগজের টুকরা স্থাপন করে কয়েক স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই কাগজ তুলে ফেলেছেন আবার অনেক সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে এক কোণ থেকে সামান্য অংশ একটানে ছিঁড়ে ফেলেছেন। ফলে প্রায় প্রত্যেক ছবি বিভিন্ন রঙ ও রচনা ক্ষেত্রের স্তরভেদে সার্থক হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে ১, ৫ ও ২নং পেন্টিং-এর উল্লেখ করা যায়। অনিলবরণ সাহার রচনাগুলি বিমূর্ত শ্রেণীর। দুঃখের বিষয় শিল্পীর রঙের পাত্র সীমাবদ্ধ ও প্রায় নীরব। অধিকাংশ রচনাই দুর্বল, তাই শিল্পী যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই সেটা অস্পষ্টই থেকে গেছে। তাহলেও 'সিটিস্কেপ—১'-এর মধ্য দিয়ে শিল্পীর শূন্যস্থান সমন্বয় ও রেখাসংস্থাপন ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়।

—চিত্রপ্রিয়

শাঙ্গর্দেব

ভাল রেকর্ড কিনুন

বাংলা গানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ রেকর্ড কোম্পানীর জনৈক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড তাঁরা দু' শো কপির বেশী প্রস্তুত করেন না এবং এরও সামান্য অংশই বিক্রি হয়। খুব জনপ্রিয় দু'-একজনের রেকর্ড অবশ্য ভালই বিক্রি হয় কিন্তু তাঁদের সংখ্যা ওই দু-একজনের বেশী নয়। তাঁদের গানেও নাকি আজকাল নানা রকম চমকপ্রদ বাদ্যের সমারোহ রাখতে হয় নইলে আশানুরূপ বিক্রির সম্ভাবনা কম। খুবই আশ্চর্য হলুম যখন শুনলুম যে কয়েকজন যথার্থ সুগায়ক, সুগায়িকার রেকর্ড মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ কপি বিক্রি হয়। এর তুলনায় যে কোনও সিনেমার গানের বিক্রি অনেক বেশী, জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকার আধুনিক বেশ ভালই চলে, এমনকি ভক্তিমূলক বা পল্লীসঙ্গীতের রেকর্ডও নেহাৎ মন্দ কাটে না। এর থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের কেতা অন্যান্য গানের তুলনায় খুবই অল্প। যে দেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এতগুলি শিক্ষায়তন বর্তমান এবং রবীন্দ্রালোচনা এত ব্যাপক সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড এত কম বিক্রি হওয়াটা কি খুবই অস্বাভাবিক নয়? আর, আমরা যারা আধুনিক গানের কঠোর সমালোচক তারা নিজেরাই যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অপরাপর ভাল ভাল গানের পৃষ্ঠপোষক না হই তাহলে সে সমালোচনার অধিকার আমাদের রইল কোথায়?

আজকালকার আধুনিক গান যে অকিঞ্চিৎকর এ সম্বন্ধে তথাকথিত বিদগ্ধসমাজ একমত বলাই চলে। অথচ, যে গান অসার তার শ্রোতা অনেক বেশী এবং যাকে আমরা মহৎ কাব্যসঙ্গীত বলি তার শ্রোতা স্বল্প—এরকম একটা বিক্ষুব্ধ ঘটনা ঘটে চলেছে কেন সে নিয়ে আমরা তেমন মাথা ঘামাইনি। উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের চাহিদা বাড়াতে গেলে আমাদের তরফ থেকে বোধ করি একটা আন্দোলন তোলা দরকার—"ভালো রেকর্ড কিনুন।" আধুনিক গানের পৃষ্ঠপোষকরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে আছেন। তাঁরা সাধুবাদের নিশ্চয়ই [illegible] হন না পকেট [illegible] পয়সা দিয়ে [illegible] আধুনিক গানের [illegible]। অতএব [illegible] [illegible]।

দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন দু' তরফের [illegible] কেমন। [illegible] [illegible] আর আমি যে [illegible] তা আপনাদের মধ্যে যাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁরাও বুঝতে পারবেন।

ডক্টর ব্যানার্জি হাই সোসাইটির লোক। তাঁর উন্নতরুচির পরিচয় প্রতিটি বাক্যে সুস্পষ্ট। খুব মার্জিত সংগীতের তিনি অতিশয় ভক্ত। যখনই রবীন্দ্রসংগীত অথবা অতুলপ্রসাদের গান হয় তখনই তিনি চোখ বুজে শোনেন। তাঁর বাড়িতে হাল আমলের খুব দামী রেকর্ড বাজাবার যন্ত্র বর্তমান। একদিন তাঁর বাড়িতে গেলুম। আমার ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি রচয়িতাদের শ্রেষ্ঠ এবং দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডগুলি তাঁর সংগ্রহে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু হায়, জানা গেল একখানিও বাংলাগান তাঁর রেকর্ডের আলমারীতে নেই। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের যাবতীয় মহার্ঘ্য সম্পদ তিনি সযত্নে সংগ্রহ করেছেন কিন্তু বাংলাগান কেনা তাঁর হয়েই ওঠে না। তাঁর সঙ্গে কথা বলুন, আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন বাংলা গানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচয় পেয়ে; কিন্তু তাঁর সংগ্রহ তো আমাদের জন্য নয়, তাঁর স্তরের সমাজের জন্য। সেখানে বাংলা গান-বাজনা অপাংক্তেয়।

আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীর বাড়িতে গিয়ে জেনেছিলুম তাঁর মেয়েরা ভাল ভাল গান রেডিও থেকে টেপ করে রাখেন; তারপর গলায় উঠে গেলে সেগুলি মুছে ফেলেন। রেকর্ড কেনবার কি দরকার?

অনেক উচ্চশিক্ষিত পরিবারের নানা দিকে এত কাজ যে রেকর্ড শোনবার অবসর কোথায়? "আগে আগে কিছু কিছু কিনতুম এখন আর সময়ও নেই, ইচ্ছেও হয় না"—এরকম কথা প্রায়ই শুনি। দৈনিক খবর শোনবার আগে, পরে যা দুটো চারটে গান বাজনা শোনা গেল রেডিও থেকে তাই যথেষ্ট।

এইভাবে খোঁজ নিয়ে দেখবেন সম্পন্ন গৃহস্থেরা নানা দিকে নানা কাজে ব্যাপৃত—রেকর্ড কেনবার মত অবসর, ধৈর্য এবং উৎসাহ তাঁদের নেই। অথচ, আজকালকার গানের সমালোচনায় সকলেই তৎপর। "ও, আপনি গানের ক্রিটিক? তা দেখুন মশাই এই যে আধুনিক গানগুলো বেরুচ্ছে [illegible] গুলোকে খুব করে ঠুকে দিতে পারেন? এসব রাবিশ তো আর সহ্য হয় না।"—এ কথা প্রায়ই শুনতে হয়। সবিনয়ে উত্তর দিই —"নাই বা শুনলেন ওগুলো। বেশী [illegible] গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার চেয়ে অগ্রাহ্য করুন।" "যা বলেছেন যত সব..." তার পরে এ প্রসঙ্গ আর অগ্রসর হয় না।

নিতাই মণ্ডল আমার পাড়ার [illegible] একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। [illegible] সকাল বিকেল তার সঙ্গে দেখা। [illegible] দুবার সে ডেকে নিয়ে আমাকে তার নতুন কেনা আধুনিক গানের রেকর্ড শোনায়। "দাদা একটা রেকর্ড প্লেয়ার কিনে ফেলেছি অনেক কষ্ট করে, নইলে [illegible] বাজানো যায় না। নতুন গানের নতুন [illegible] একবার শুনে যান দাদা, আমার বউ [illegible] রান্না ছেড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকে [illegible] শোনবার জন্যে।" বলতে পারি আজকাল এসব বাড়তি খরচ করতে নিতাইকে কম কষ্ট সহ্য করতে হয় না—ধার দেনাও করে যায়। কিন্তু ওই নীচু ঘরের মধ্যে [illegible] বান্ধবের সঙ্গে ওই নতুন কেনা রেকর্ড [illegible] সে খুব ভাল করেই উপভোগ করে।

অধর দাস কোনও এক সরকারী অফিসের পিওন। পুজোর আগে সে বোনাস পায় না, যে মাইনে পায় তাতে সব চাহিদা মেটানো যায় না। তবু একটা পুরোনো [illegible] কলকাতায় নিয়ে এসে বার বার মেরামত করিয়ে নেয় আর ভাই বোনের চাওয়া রেকর্ডও দু-একটা কিনে নিয়ে যায়। একটা রেকর্ডের দাম তো কম নয় আজকাল। অনেকবার আক্ষেপ করেও শেষ পর্যন্ত এই খরচটা সে করেই ফেলে ভাইবোনদের মুখ চেয়ে।

আধুনিক বা আর পাঁচ রকমের গান এইভাবে জনসমাজে বিক্রি হয়। [illegible] ভালবাসে বলে কেনে। এ গানগুলো শুনে তারা তৃপ্তি পায়। আধুনিক গানের [illegible] মধ্যে কৃত্রিমতা নেই আন্তরিকতা আছে। অতএব রেকর্ড কোম্পানী [illegible] চাহিদা সানন্দেই মিটিয়ে থাকেন। আমরাও যদি দাবী করি উন্নত রুচির কাব্যসঙ্গীত প্রকাশ করা হোক তাহলে আমাদেরও লৌকিক অ্যাপ্রিশিয়েশনের অতিরিক্ত কিছু কার্যত দেখাতে হবে। মাত্র দু' শো কেন—এই বিরাট বাংলাদেশে তার চেয়ে অনেক বেশী রেকর্ড বিক্রি হবার সুযোগ আছে। আমাদের অভিজাত এবং বিদগ্ধ সমাজ যদি ভাল রেকর্ড কিনে ব্যবসায়ীদের মনে [illegible] সম্বন্ধে একটা আশার সঞ্চার করতে পারেন তাহলে ভাল রেকর্ডের একটা প্রতিযোগিতা হওয়া সম্ভব এবং তখন আর অভিযোগ থাকবে না যে বাজার কেবল আধুনিক গানেই ছেয়ে যাচ্ছে। অতএব, [illegible] একটা স্লোগান তুলি "আরও ভাল রেকর্ড কিনুন" তাহলে আপনারা কি সাংস্কৃতিক স্বার্থেই তাতে যোগ দেবেন না?

ছেন। চিঠিপত্রের সংকলক-সম্পাদকের সঙ্গত অনুমান, উক্ত মহিলা ভগিনী নিবেদিতা।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে ক্রমান্বয়ে একই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন জগদীশ-চন্দ্রকে। (১২ ডিসেম্বর, ১৯০০, জানুয়ারী, ১৯০১, ২১ মে, ১৯০১, ৪ জুন, ১৯০১, ২৫ জুলাই, ১৯০১ প্রভৃতি তারিখের চিঠি। চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ড)।

এর পরের কাহিনীর খণ্ডাংশ নিবেদিতার ২৬ জুলাই, ১৯০১-র চিঠি থেকে দেখা যাক, যেখানে তিনি ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক মহলে ডাঃ বসুর বিরুদ্ধে শত্রুতার কথা জানিয়ে উল্লাসে উঠে বলেছেন "কুছ পরোয়া নেই, এভাবে ভারতের সর্বনাশ করা যাবে না। ওঁকে (বসুকে) কোনো কিছু না বলে আমি মিঃ ঠাকুরের কাছে লিখেছি কোনো হিন্দু রাজা কি এঁর এবং এঁর কাজের ভার নিতে পারেন না?"

"Dr. Bose's work is being attacked enough to make us think it the best thing yet done, in its **own line.** The physiologists are so **upset** that they are just like sparrows. Now **dismayed at his results, now** restored to spirit again because Burch of Oxford **says** he **has** repeated an experiment and finds the result due to uncertainty of contact. Not daring to tell him the remark of Burch, but utterly relieved by his letter to them all! Using their influence meanwhile to have our poor Hindu sent back straightway to Calcutta. Never mind! India won't be doomed that way. Without saying anything to him. **I have written to Mr. Tagore to ask, cannot some Hindu prince undertake the cost of him and his work?"**

(মিস ম্যাকলাউডকে লেখা

রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে এইক্ষেত্রে নিবেদিতার বিশেষ পরিচয় ঘটে এবং বসুকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে উভয়ে একই অভিপ্রায়ে আবদ্ধ হন। "চিঠিপত্রের" ষষ্ঠ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে ২৩ জুলাই, ১৯০১ তারিখে লেখা রমেশচন্দ্রের একটি চিঠি পাওয়া যায়, যাতে তিনি ইংলণ্ডে বসু-বিরোধী চক্রান্তের বিবরণ দিয়ে ডাঃ বসুকে সাহায্য করা ভারতবর্ষের মানুষের বিরাট কর্তব্য, প্রবল আবেগের সঙ্গে লিখেছেন, এবং এ পত্রেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে হলে ডাঃ বসুর কি পরিমাণ টাকার দরকার, তারও হিসাব দিয়েছেন, এবং লিখেছেন, "The suggestions I have **made** in this letter **are all my own."** রমেশচন্দ্রের সাজেশানগুলি ব্যক্তিগত হতে পারে, কিন্তু নিবেদিতা বা অবলা বসু সবই জানতেন। ২৩ জুলাই মিসেস ওলি বুলকে নিবেদিতা লিখেছেন—

"Mr. Dutt tells me that in his opinion the time **has** come when Dr. Bose should be released from his chains. He counts that in order to continue and complete his work he needs ...... **2 lakhs of rupees** ......This is only **£13000, and** seems impossible to me, but perhaps I am wrong. Anyway it has to be begged secretly in India. And I am to help in the begging. You know I have been lucky in money matters with regard to **him** before, and perhaps I could get some in this case. What do you think? I said, it would be of the greatest benefit to me to do the begging and of course it would. Mr. Dutt can send me to people from whom he could not well ask himself. **He has already written to Mr. Tagore in consultation with Mrs. Bose. But he**

মহাস্থবির জাতক

(চতুর্থ পর্ব)

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

॥ ৭ ॥

বোধ হয় উনিশ শ আট সাল কি ঐ রকম কোনো একটা সময়। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর শেষ হয়ে গেছে, বাংলার তখন তুঙ্গী অবস্থা। বাঙালীর ছেলে বাংলার বাইরে যেখানে যায় সেখানকার জনসাধারণ তাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে, খাতির করে। আর তেমনি অত্যাচার করে পুলিসের লোকে।

আমি তখন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছি পুনা শহরে। মাথা গোঁজবার স্থান নেই; মুখে খাতির করলেও ভয়ে স্থান দেয় না।

দিন কয়েক পুলিসের থানায় থানায় কাটিয়ে শেষকালে তাদের হাত থেকে ছাড়া পেলুম। পথে পথে ঘুরি। পেশা চশমা ফিরি করা। ঝাঁসী সফরের ফলে ট্যাঁকে যে অর্থ ছিল তা খরচ হয়ে গিয়েছে। ট্যাঁক খালির সঙ্গে পেটও খালি যাচ্ছে।

পকেটে যখন কিছু পয়সা ছিল তখন এক পাঞ্জাবী দোকান থেকে চা খেতুম। তারাই এখনো দুবেলা দু' কাপ চা দেয়, বলে পয়সা হলে দাম দিয়ে দিও। মধ্যে মধ্যে যেদিন তারা লুকিয়ে মাংস রাঁধে সেদিন সন্ধেবেলা আমার ভুরিভোজন হয়। এক সঙ্গে তিন-চার দিনের খানা পেটে পুরে নিই। এই অবস্থায় পরমানন্দে দিন কাটছিল।

এই সময়ে একদিন সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমায় বললে—এখানে একজন বাঙালী থাকেন। তাঁকে তুমি চেনো?

আমি বললুম—না, কোথায় থাকেন তিনি?

সে বললে—কোথায় থাকেন তা তো জানি না, তবে পুনার সব লোকই তাঁকে চেনে। মস্ত যাদুকর তিনি। আচ্ছা, আমি তাঁর বাড়িটা খোঁজ করে তোমায় দেখিয়ে দেব।

কয়েক দিন বাদে আমার সেই পাঞ্জাবী বন্ধু পরোটার বললে—চল, বাড়ির খোঁজ পেয়েছি।

কাছেই একটা গলির মধ্যে একটা ছোট্ট দরজাওয়ালা বাড়ি। বাড়ির একতলা ইঁটের তৈরি, দোতলায় কাঠের চাল। তার দরজা দেখিয়ে পরোটার বললে, এই বাড়ি।

তখন দরজায় তালা ঝুলছিল দেখে চলে গেলুম। তারপরে সারা দিন রাত্রি নটা অবধি খোঁজ করেছি, কিন্তু তালা তখনও খোলেনি। পরের দিন বেলা এগারোটা নাগাদ সেই বাড়িতে গিয়ে দেখলুম দরজা খোলা, হাট-খোলা।

আমি কড়া নাড়তেই উপর থেকে জানলা দিয়ে একখানি হাসিভরা মুখ বাড়িয়ে একটি ভদ্রলোক হিন্দীতে বললে—এই দরজা দিয়ে উপরে চলে আসুন।

সামনেই সিঁড়ি। উঠেই ঢুকলুম একখানি ছোট ঘরে। ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি ভদ্রলোককে নমস্কার করে বললুম—আমি শুনলুম আপনি বাঙালী, তাই দেখা করতে এসেছি।

ঘরের মেজেতে একখানি চাটাই-এর উপরে একখানি ঘোড়ার কম্বল পাতা। আমাকে তিনি হিন্দীতে বললেন—এইখানে বসুন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আপনার বাড়ি কোথায়?

তিনি বললেন—আমার বাড়ি চিতোরগড়।

এতক্ষণে ভদ্রলোককে বেশ ভালো করে দেখলুম। শ্যামবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, চওড়া বুক, সরু কোমর; আর চোখ দুটি তাঁর অপূর্ব এক জ্যোতিতে যেন জ্বলজ্বল করছে। জিজ্ঞাসা করলুম—আপনার চিতোর-গড়ে বাড়ি, তো এখানকার লোকেরা আপনাকে বাঙালী বলে কেন?

ভদ্রলোক হাত জোড় করে বললেন—না, না, আমি বাঙালী নই। আমি যা কিছু করি সবই যৌগিক ক্রিয়ায়। আমি বাংলা দেশে যাইনি পর্যন্ত।

এই কথা শুনে আমার মনে পড়ল যে,

যাদুকরকে বাংলা দেশের বাইরে অনেকে বাঙালী বলে অভিহিত করে। হঠাৎ চোখে পড়ল, ঘরের একটা কোণে তিনটে ইঁটের উপরে একটা মাটির হাঁড়ি, নিচে কাঠের আগুনে ধিকিধিকি করে জ্বলছে। কম্বলের একদিকে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, তার উপরে খান কয়েক কাগজ ও দোয়াত-কলম। ঘরের আশের দিকে দেয়ালের মধ্যে দুটো তিনটে তাকে কতকগুলো খবরের কাগজ ও আরো কি কি সব রয়েছে।

ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোথায় থাকো?

আমি বললুম—থাকবার কোথাও জায়গা নেই। একটা দোকানে আমার একটা বাক্স, একটা সতরঞ্চ ও একটা বালিশ আছে।

তিনি বললেন—আমার এখানে যদি অসুবিধা হয় না, এসে থাকতে পারো।

বললুম—তা হলে তো বেঁচে যাই।

তিনি বললেন—সেগুলো কত দূরে আছে?

পরতাবের দোকান কাছেই ছিল। বললুম—কাছেই আছে। নিয়ে আসব?

ভদ্রলোক বললেন—যাও, নিয়ে এসো।

তখনই পরতাবের দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম। জিনিসপত্র নিয়ে এসে দেখি, তিনি ভাতের ফ্যান গড়াচ্ছেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নাম কি?

নামমাত্র উচ্চারণ করে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আপনার নাম কি?

তিনি বললেন—আমার নাম ব্রিজশরণ। সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আমাকে ভাইয়া বলে ডেকো, আমিও তোমাকে ভাইয়া বলে ডাকব।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যাকে এর আগে কখনও দেখিনি, যার নাম কখনও শুনিনি সে হয়ে গেল আমার ভাই। এই রকম পথে পথে আরও দু-একটি ভাই পেয়ে হারিয়েছি। যাক সে কথা।

তাক থেকে খানকয়েক কাগজ নামিয়ে নিয়ে এসে ব্রিজশরণ কম্বলের উপর পাতলে। তারপরে হাঁড়ি উলটে সেই কাগজের উপর সমস্ত ভাত ঢেলে ফেললে। পাশেই একটা ঠোঙায় চিনি ছিল, ভাতের উপর সেই চিনি সবটা ঢাললে। চিনিতে ভাতেতে বেশ করে মাখা হয়ে যাবার পর আর এক টুকরো কাগজ নিয়ে আধাআধি ভাত তাতে রেখে আমায় বললে—খাও।

আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে খেতে আরম্ভ করলুম। সেও খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে কাগজগুলো জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হল। তারপর দুজনে নিচে গিয়ে কল খুলে মুখ ধুয়ে জল খেয়ে উপরে চলে এলুম।

সেদিন থেকে ব্রিজশরণের বাড়িতেই আশ্রয় নিলুম। সকালবেলা খাই। সন্ধ্যাবেলায় পরতাব যদি একবার চা দেয় তো কোনোদিন খাই, কোনোদিন তাও জোটে না। নিজের কাজকর্মের একরকম বন্ধই রইল।

আমার এই নতুন আশ্রয়দাতাকে যত দেখতে লাগলুম ততই অদ্ভুত বলে মনে হতে লাগল। ... নিয়ে ... কখনো সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, কখনো বা দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে ... ধমক দিতে থাকে। মাঝে মাঝে ... লাগল ... কি এক ... এসে পড়লুম।

একদিন অনেকগুলি লোক এসে ব্রিজশরণকে সন্ধ্যাবেলা নেমন্তন্ন করলে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ব্রিজশরণ আমাকে বললে—চল ভাইয়া, নেমন্তন্ন খেয়ে আসি।

দ্বিতীয়বার তার বলতে হলো না, ... তার সঙ্গ নিলুম। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক লোক জড়ো হয়েছে, তার মধ্যে নারী

সংখ্যাও কম নয়। ব্রিজশরণ এসে দাঁড়ানো মাত্র সকলে তাকে দড়াদ্দড় প্রণাম করতে লাগল। ব্রিজশরণ কিছুতেই পায়ে হাত দিতে দেবে না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে সে পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে পদ্মাসনে বসে পড়ল।

যা হোক, কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাবার পর একটি হাত দেড়েক বেশ মোটা ইস্পাতের ডাণ্ডা কোথা থেকে বার করে এনে তারা ব্রিজশরণের হাতে দিলে। সে ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা বলে সেটার দিকে চেয়ে রইল। দর্শক-দর্শিকারা নীরবে অনিমেষ দৃষ্টিতে তার হাতের দিকে চেয়ে আছে। আমি তো ব্যাপার দেখে অবাক। নেমন্তন্ন খেতে এসে এ কী কাণ্ড! ব্রিজশরণের দৃষ্টি ক্রমেই সতেজ হয়ে উঠতে লাগল। প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট সেই ডাণ্ডার দিকে সতেজে চেয়ে সে সেটাকে দুই হাতে ধরে তিন-চার-পাঁচটা পাক দিয়ে দিলে। অর্থাৎ দেড় ইঞ্চি দু' ইঞ্চি মোটা একটা ইস্পাতের লৌহ দণ্ডকে প্রায় ইস্ক্রুপ বানিয়ে ছেড়ে দিলে।

এর পর খাওয়া-দাওয়ার পালা। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দের আহার্যের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

আর এক দিনের কথা। ব্রিজশরণ প্রতিদিন একখানি ভজন গান গাইত। তারপরে পদ্মাসন হয়ে বসে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা স্থির হয়ে থাকত। এই ভজন গানটি আমার বড় ভাল লাগত। সে গানটির কথাও ছিল যেমন সুন্দর, সুরও ছিল তেমনি মধুর। ব্রিজশরণের ভাঙা গলাতেও সেটাই যা শুনতুম, বলে মনে হত না।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় ভজনগান ও স্থির হয়ে বসার পরে আমি তাকে বললুম—ভাইয়া, গানটি আমায় লিখে দেবে?

আমার কথা শুনে সে বললে—আলবত দিচ্ছি। আমি এখখুনি লিখে দিচ্ছি।

এই বলেই সে তাকের কাছে উঠে গেল। তাকের দিকটা অন্ধকার। ব্রিজশরণ বললে—ভাইয়া, ডিবেটা নিয়ে এসো তো!

ডিবেটা নিয়ে তার হাতে দিলুম। ডিবে হাতে নিয়ে সে একবার সেটার মধ্যে একবার তাকটার দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে—এই দেখ, আমি এইখানে দোয়াত কলম রেখেছিলুম। কে এইরকম কাজ করে? নিয়ে যায় তো ঠিকমত রেখে যায় না কেন? ইত্যাদি বলে মহা তম্বি করতে লাগল। আমি কেরোসিনের ডিবেটা যথাস্থানে রেখে এসে বসতে না বসতেই সে বললে—আচ্ছা, আর একবার নিয়ে এসো তো!

এইবার দেখা গেল তাকের ওপর দোয়াত কলম ও কতকগুলো কাগজ রয়েছে। ব্রিজশরণ খান দুই কাগজ ও দোয়াত কলম নামিয়ে তাকের দিকে তাকিয়ে বললে—ঠিক সময়ে নিয়ে যেতে মনে থাকে না বুঝি!

তার ছাপার অক্ষরের মতো সুন্দর দেবনাগরী হরফে সেই প্রায় এক পাতা ধরে ভজনটা লিখেই আমাকে বললে—নাও।

কাগজখানা মুড়ে পকেটে রাখছি, সে বললে—চল, এইবার শুয়ে পড়া যাক।

আলোটা নিবিয়ে শুয়ে তো পড়লুম। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মোটেই সুবিধের বলে মনে হল না। ভাবতে লাগলুম—এর চেয়েও যে বাবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম সেও ছিল ভালো।

এমন সময় বাইরের রাস্তায় একটি শব-বাহকের দল কি সব কথা বলতে বলতে চলে গেল। ব্রিজশরণ বললে—ভেইয়া, শহরে খুব পেলেগ লেগেছে, একটু সাবধানে থেকো।

ভাবতে লাগলুম—একে এই ভুতুড়ে ব্যাপার, তার উপরে আবার পেলেগ!

আর একদিন সন্ধ্যেবেলায় ভজন গেয়ে ব্রিজশরণ তার ধ্যানে বসেছে, আমি একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছি। অদূরে কেরোসিনের টামটেমিটা টিমটিম করছে। হঠাৎ যেন আমার মনে হল—সমস্ত ঘরখানা একটা ক্ষীণ সবুজ আলোয় ভরে উঠেছে, যেন খুব কম শক্তির নিওন লাইটের আলো। তারপরে দেখলুম খুব অস্পষ্ট সবুজ আলোর শিখা ব্রিজশরণের মাথার কাছে দপদপ করে কাঁপছে। আমি ভয় পেয়ে উঠে গিয়ে ব্রিজশরণকে ধাক্কা মেরে ডাকলুম—ভেইয়া, ভেইয়া—

ব্রিজশরণ কোনো কথা না বলে কম্বলের উপর ঢলে পড়ল এবং সেই মুহূর্তেই সেই ক্ষীণ আলো অন্তর্হিত হয়ে গেল। ব্রিজশরণ অনেকক্ষণ সেই রকম ভাবে পড়ে থেকে একবার উঠে বসে আবার তখুনি শুয়ে পড়ে বললে—শুয়ে পড়।

আমি বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রিজশরণ আমাকে বললে—ভেইয়া, আমি নিজের কাজের জন্যে আমার একটু দরকারে বাইরে যাচ্ছি। চল তোমার একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আমি বাক্স ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে চললুম। সে চলে যাবে শুনে মনের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করছিলুম, কিন্তু উপায় কি?

প্রায় মাইলখানেক পথ চলে আমরা একটা বাড়িতে এলুম। রাস্তা থেকে একেবারে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলা অবধি। উঠেই একটা বড় ঘর। আমি তার পিছু পিছু সেই ঘরে ঢুকে গেলুম। ঘরের একদিকে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে কি করছিলেন—ব্রিজশরণকে দেখে খুব খুশী হয়ে চীৎকার করে তার সংবর্ধনা করতে লাগলেন। তারপর আমার দিকে চোখ পড়তেই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কে?

ব্রিজশরণ বললে—উনি একজন চশমার ট্রাভেলিং এজেন্ট। এ দেশে এসে বিপদে পড়ে গেছেন। পয়সাকড়ি ফুরিয়ে গেছে, হেডকোয়ার্টারে চিঠি লিখে লিখে কোনো জবাব পাচ্ছেন না। আপনার এখানে একটু মাথা গোঁজবার স্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করে দেন তো বেচারীর বড় উপকার হয়।

ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আমাকে বললেন—তা আপনি এখানে থাকতে পারেন, যদ্দিন ইচ্ছা থাকতে পারেন। তবে ট্রাভেলিং এজেন্সিতে কিছু নেই। এ দেশে চাকরি-বাকরি করুন, বিয়ে-থা করে এ দেশের লোক হয়ে যান।

ব্রিজশরণ লোকটির সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা ব'লে আমাকে রেখে চলে গেল। আমার বাক্স ও ব্যাগ ইত্যাদি রাখবার জন্য একটা কোণ দেখিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—এখানে রাখো।

বাড়ির ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনেকগুলি মেয়ে সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। আমার আশ্রয়দাতা তাদের মধ্যে একজনকে

আমার সঙ্গে উড়িষ্যাবাসী পরিচালক শ্রীমান গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ নেই। শ্রীমান গোবিন্দ তদারক করে জিনিসপত্র তুলে দিয়ে তাদের জিম্মেয় দিয়ে আমার পেছু পেছু স্টেশন থেকে বেরোলো। স্টেশনের কাছেই বাসস্থান ঠিক হয়েছিল—হেঁটেই সহটুকু রাস্তা পার হয়ে এলুম।

একটা বড় মাঠের চারদিকে তার দিয়ে ঘেরা। ওরই মধ্যে কাঠের দুটো গেট দু'ও ঝুলে পড়েছে। মাঠের মাঝখানটা বেশ উঁচু। এই উঁচু জায়গায় মানুষভর উঁচু পাথরের চাতালের ওপর পাথরের একতলা বাড়ি। পাঁচ-ছটা সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে ওপরে উঠে একটা চওড়া বারান্দা—তার তিন দিক ঢাকা সামনের দিকটা খোলা। বারান্দার গায়েই দুটো বড় বড় ঘর—তার সঙ্গে এ-কোণে ও-কোণে চারদিকে আটটা-দশটা ঘর—পাথরের উঁচু দেয়াল, চাল খোলার। আমার সঙ্গে যেসব রাজকর্মচারী এসেছিল তারা বললে—ঘরগুলোয় সিলিং লাগানো নেই বটে তবে সিলিং-এর অর্ডার হয়ে গিয়েছে। এখন দোকানদার কাপড় দিতে পারছে না, কাপড় পেলেই সিলিং হয়ে যাবে।

দুটো বড় ঘরের পাথরের মেঝেতে মোটা

জিজ্ঞাসা করলুম—হ্যাঁ রে, সোডা আছে?

সে বললে—হ্যাঁ, আজ্ঞে। দু'টো সোডা একখানি এনেছি।

আমি তখন বললুম—যা, দু'টো জিঞ্জারেট নিয়ে আয়।

জিঞ্জারেট নিয়ে আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করলুম—হ্যাঁ রে, কি খেয়েছিস?

সে বললে—আজ্ঞে মাংস আর ভাত।

—বেশ করে জ্বরের ওপরে মাংস-ভাত খেয়েছ? রাত্রিবেলার জন্যে খান-কয়েক আটার লুচি বানা, দু'জনেই খাবো।

খাওয়া-দাওয়ার পর বসে বসে গল্প করতে লাগলুম। রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ গোবিন্দকে এক দাগ ওষুধ এক বোতল জিঞ্জারেট দিয়ে খাইয়ে দিলাম। মিনিট কয়েক পরে জিজ্ঞাসা করলুম—কি রকম লাগছে রে গোবিন্দ?

গোবিন্দর মুখখানা হাসিতে সমুজ্জ্বল। সে জোর করে ঘাড় নেড়ে বলল—ওষুধটা খুব ভাল্ আছে আজ্ঞে।

—দরজা-টরজা সব বন্ধ করেছিস তো?

—হ্যাঁ, আজ্ঞে।

প্রেতলোকের ঘড়ি একেবারে সূর্যের কাঁটা বললেও হয়। ঠিক এগারটার সময় আবার সেই দড়াম করে দরজা-জানলা সব খুলে গেল—সংগে সংগে ঘরের বাতি সব নির্বাপিত। টর্চটা আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিলুম। টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। মুরগির ঘরটা বাইরে থেকেই শেকল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হতো। হঠাৎ ঝনাৎ করে শেকল খুলে দরজাটা খুলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে মুরগির পাল ত্রস্ত হয়ে পিক্-পিক করে মাঠময় ছুটে বেড়াতে লাগল। বেশ বুঝতে পারা গেল—কে যেন তাদের তাড়া দিচ্ছে। বোধ হয় মিনিট দুই-তিন এই রকম চলেছিল। তারপর আবার তারা চীৎকার করতে করতে তাদের নিজেদের ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল। ইতিমধ্যে আমাদের জানলার সশব্দে উত্থান ও পতন চলতে লাগল।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—কিরে, আর একটু ওষুধ দেবো?

সে বললে—দিন, আজ্ঞে।

তারপরে—মানে গোবিন্দর ওষুধ সেবনের পরে আমিও কিঞ্চিৎ ওষুধ সেবন করে গোবিন্দকে বললুম—এবার শুয়ে পড়।

সে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু বৃথা, তখনি আরো জোরে আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল। দরজা-জানলা খোলা এবং আলো জ্বালা অবস্থাতেই আমরা ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন আপিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরেছি গোবিন্দ হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে—এই গাছটাতে ব্রেম্মদত্যি আছে, আজ্ঞে।

আমাদের মাঠে কোণের দিকে একটা বড় বটগাছ ছিল। গোবিন্দ সেই দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—আজ্ঞে, ওর তলায় ফুল আর এক বাটি দুধ আজ সন্ধ্যেবেলায় রেখে আসব, আজ্ঞে।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—এ সংবাদটি তোমায় দিলে কে?

সে বললে—চাচা দিয়েছে। চাচা বুজরুগ লোক। তিনি নিজে দেখেছেন।

—বলিহারি বাপ—এখানেও চাচা জুটিয়েছ? কোথায় থাকেন তিনি?

গোবিন্দ বললে—মাঠের মধ্যে যে দরগা আছে, তিনি সে দরগার মাতোয়ালি। তিনি আমাকে সস্তায় মুরগি ও ভালো মাখন কিনে দেন। তাঁকে সবাই মানে—কেউ ঠকায় না।

সন্ধ্যেবেলা একটা বাটিতে করে দুধ আর ফুল গোবিন্দ আগেই কিনে এনেছিল—আমরা দু'জনে গিয়ে সেই গাছতলায় রেখে এলুম। মনে মনে বললুম বাবা ব্রহ্মদৈত্য, একটু নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দিও বাবা।

গোবিন্দ তো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে গোবিন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে সেলেট নিয়ে ক খ গ ইত্যাদি লিখছে, সাবধানের মার নেই মনে করে সাড়ে দশটা নাগাদ তাকে এক দাগ ওষুধও দিয়েছি, এগারোটার সময় শোবার ব্যবস্থাও হচ্ছে—আবার সেই দড়াম দড়াম করে দরজা খোলা আর বন্ধ করা, বাতি নিবে যাওয়া আর জ্বলে ওঠা, মুরগি মাঠে বেরিয়ে যাওয়া আর ত্রস্ত হয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়া ইত্যাদি সমানে শুরু হয়ে গেল।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে, তোর চাচা কি বলে?

গোবিন্দ জবাব দেবে কি, ভয়ে তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি আর এক দাগ ওষুধ তাকে দিয়ে বললুম—শুয়ে পড়, কালই আমরা বোম্বে চলে যাব।

গোবিন্দ বললে—হ্যাঁ আজ্ঞে, তাই চলুন।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই গোবিন্দ ছুটল মাঠে। একটু বাদে ফিরে এসে বললে—ব্রেম্মদত্যি মশাই বাটি সুদ্ধ খেয়ে ফেলেছেন আজ্ঞে।

তার সংগে তক্ষুনি গিয়ে দেখলুম—গাছের নিচে সত্যিই বাটি নেই।

একটুখানি ভালো করে দেখতেই বেশ বুঝতে পারলুম, কোনো লোক সকালবেলা মাঠে এসে দুধটা গাছের তলায় ঢেলে দিয়ে বাটিটা নিয়ে সরে পড়েছে।

গোবিন্দকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে ভাবতে বসলুম—কি করা যায়! একটু পরেই সে বাজার থেকে ফিরে বললে—চাচা বলেছে আজ দুপুরবেলায় এসে বাড়িতে মন্ত্র পড়ে দিয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

অনেকদিন আগে আমার ওস্তাদের বাড়িতে এই রকম সব উপদ্রব আরম্ভ হয়েছিল, বন্ধ ঘরের মধ্যে ঝরঝর করে ময়লা এসে পড়ত। সেখানেও এক "চাচা" মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে কি সব লিখে দেওয়ালে কাগজ মেরে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাদের ও-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই কারণে মন্ত্রতন্ত্রের উপর আমার বিশেষ আস্থা ছিল না। যাই হোক, সেদিন দুপুরবেলা আপিসে গিয়ে জানিয়ে দিলুম—দু'-এক দিনের মধ্যে যদি আমার জন্যে অন্য বাড়ির ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব।

এতদিন আমার রাতের অভিজ্ঞতা শুনে যাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিতেন, দেখলুম সেদিন তাঁদের অনেকেই আমার কথা শুনে মুখ গম্ভীর করলেন। দু'-একজন এমন কথাও বললেন—ও-বাড়িটা সম্বন্ধে অনেক আগে নানা কথা শুনতে পাওয়া যেতো বটে কিন্তু কিছুদিন থেকে ওসব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এইসব মন্তব্য শুনে বেশ খুশী হয়ে ডেরায় ফিরে এলুম। ঘরের মধ্যে ঢুকে ধুপধুনো ও লোবানের গন্ধ পেয়ে গোবিন্দকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে, গন্ধ কোত্থেকে আসছে?

গোবিন্দ বললে—চাচা এসেছিল আজ্ঞে, তিনি নেমাজ পড়ে, ওই দেখুন দেওয়ালে মন্তর মেরে দিয়ে গেছেন।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পরে আশা হলো, আজ একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাবে। কিন্তু সেদিন আবার এক নতুন উৎপাত ঘটে গেল।

আমার ঘরের পাশের ঘরটিতে বাক্স-পেঁটরা রাখা ছিল। আমার ট্রাংকটার তলায় দু'টো চাকাও লাগানো ছিল। দেখলুম, পাথরের মেজে দিয়ে ঘড়াক্ ঘড়াক্ করে স্বয়ংচালিত হয়ে সেটা আমার ঘরে এসে ঢুকল। তারপরে সতরঞ্চির ওপর দিয়ে সেই-ভাবে ঘষড়াতে ঘষড়াতে এসে আমার খাটের সামনে স্থির হয়ে এসে দাঁড়াল। গোবিন্দের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে বিস্ফারিত লোচনে ট্রাঙ্কটার দিকে চেয়ে আছে অর্থাৎ এর পরে কি হয় বোধ হয় তারই দিকে নজর রাখছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি গোবিন্দ, তোর চাচা কোথায় ?

ওদিকে চ্যাঁ চ্যাঁ করে একটা আওয়াজ কানে যেতেই সামনে দিকে চেয়ে দেখি, ওদিককার ঘর থেকে গোবিন্দর টিনের বাক্সটা এগিয়ে আসছে। ডাকলুম—গোবিন্দ—ও গোবিন্দ—

কিন্তু গোবিন্দ হতবাক্। বলা বাহুল্য, গোবিন্দর বাক্স গোবিন্দর সামনে এসে দাঁড়াল। গোবিন্দকে ডেকে তাকে তাড়াতাড়ি এক ডোজ ওষুধ তৈয়ের করে দিলুম। তাকে বললুম—তোর বাক্সটা ঘরের কোণে রেখে দে। আর আমার ট্রাঙ্কটাও ঠেলে ঘরের এক পাশে রেখে দে।

কিন্তু তখুনি গোবিন্দর বাক্স গোবিন্দর কাছে আর আমার ট্রাঙ্ক আমার কাছে এসে পড়ল। এই রকম রাত্রি প্রায় বারোটা অবধি ভূতের সঙ্গে খেলা করে সর্বাঙ্গ টাটিয়ে গেল। আবার আমরা এক-এক ডোজ ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়বার মতলব করছি, এমন সময় দেখি পায়খানা থেকে কমোডটা সরতে সরতে ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। অবশ্য অবস্থাটা কমোডে বসবার মতই হয়েছিল কিন্তু ভরসা করে আর বসতে পারলুম না —কাজেই শুয়ে পড়া গেল।

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। দারুণ চীৎকারের চোটে আমরা দু'জনেই ধড়মড় করে উঠে পড়লুম। দেখি, আমাদের মাঠের মধ্যে গোটা-দশেক গাধা ঢুকে প্রাণপণে গলা সাধছে। এতদিন ভূতের অত্যাচারে যা না হয়েছে, একদিন গাধার চীৎকারে তা হয়ে গেল অর্থাৎ কিনা আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। গোবিন্দকে বললুম—গোবিন্দ, বিছানাপত্তর বাঁধ, বাসন-কোসন তুলে ফেল। শুধু এ-বেলা রাঁধবার জন্যে দু'-একখানা বাসন বইরে রাখ। একটা মুরগি মেরে ঝোল বানা আর ভাত। আজই আড়াইটার কিংবা সন্ধ্যের গাড়িতে চলে যাব।

গোবিন্দ বললে—মুরগি তো নেই, আজ্ঞে।

সে কি রে! অতগুলো মুরগি কি করলি ?

—চাচাকে দিয়ে দিয়েছি, আজ্ঞে।

—বেশ করেছ আজ্ঞে। তাহলে আর রেঁধে কাজ নেই আজ্ঞে। আমরা হোটেলেই খেয়ে নেব আজ্ঞে। একটা গাড়ি ডাক, একখুনি অপিসে যাব।

গোবিন্দ গাড়ি ডেকে নিয়ে এলে তখুনি বেরিয়ে পড়লুম। তাদের অপিসে গিয়ে জানালুম—আমি আজই চলে যাচ্ছি, বাড়ি ঠিক করে আমায় টেলিগ্রাম করবেন—আমি চলে আসব।

ওরা বললে—বাড়ি তো ঠিক হয়ে গিয়েছে।

একজন লোককে ডেকে আমাকে আরো বললে—এর সঙ্গে যান। এ আপনাদের নতুন বাড়ির দরজার তালা খুলে দেবে। এ কদিন বাড়িটা ধোয়া মোছা হচ্ছিল বলে আর আপনাদের জানানো হয়নি।

মনে মনে ভাবলুম—এখানে সবই ভূতগত ব্যাপার দেখছি।

ফিরে এসে তখুনি গোবিন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে জিনিসপত্তর তুলে নতুন বাড়িতে গিয়ে ওঠা গেল।

নিরিবিলি বাড়ি দোতলা। সামনে খানিকটা জায়গায় বাগান। ঘরে ঘরে আসবাবপত্র ঝকঝক করছে। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য সরকার থেকে এই বাড়িটাই নির্দিষ্ট আছে।

ভূতের কল্যাণে এখানেই কায়েমী হয়ে বসা গেল। এখানে ভূতগত নতুন অভিজ্ঞতা কিছু হয়নি বটে, তবে মানুষের জীবনে নিত্যই নতুন অভিজ্ঞতা যা সঞ্চিত হতে থাকে তাও কম কৌতুকপ্রদ নয়, কম মর্মান্তুদ নয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

"'ইয়ার্কি' হচ্ছে! দেশের এই দুর্দিনে মশকরা?"

এমন সময় এক ছোকরা হকার একগোছা কাগজ নিয়ে ছুটতে-ছুটতে এল মোড়ের দিকে—টেলিগ্রাফ, টেলিগ্রাফ! জোর খবর! তিনজন নেতা গ্রেপ্তার।

দেখতে-দেখতে ইতস্তত ছড়ানো ভিড় ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেটির ওপর। কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ওর সমস্ত কাগজ হাতছাড়া হয়ে গেল এক মুহূর্তে, টুকরো-টুকরো হয়ে রাস্তায় লুটোলো। টুকরো কাগজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে-পড়তে সেই জনতা আবার ছড়িয়ে পড়ল রাস্তার দু'পাশে। ছেঁড়া কাগজের আবার দাম কী?...গর্বিত ছেলেটা চোখের সামনে সর্বস্বান্ত হয়ে চুপসে গেল, কাঁদতে লাগলো, গালাগাল দিতে লাগলো জনতাকে, কিন্তু কে শোনে ওর কথা।...তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে! কেন করেছে? ক্ষমতা হাতে থাকলেই আইনকে যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করা চলবে না।

মোটা ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়ে হয়ত আমাকেই প্রতিপক্ষ ঠাউরে, উষ্মা প্রকাশ করলেন—'বাঙালী জাত এখনো মরেনি। এর জবাব দেবে।"

তখন সবেমাত্র আধ-খোলা দোকান থেকে ধারে একখিলি পান কিনে মুখে পুরেছি—শুনে বেশ বিরক্ত হলাম, বললাম, "যথেষ্ট গ্যাস এখনো জমেনি দাদা। জেগে ওঠার জন্যে বাঙালী জাতের আরো একটু গ্যাস দরকার। যান, বাড়ি যান, কপি-জোড়ার মালাইকারি খেয়ে বিনা পয়সার টেলিগ্রাফ পাড় দুপুরে একটু ঘুমোন গিয়ে।"

খানিক আগে অপমান করেছিলেন, এই না শুনে ভদ্রলোক কলকেপি তুলে মারতে এলেন আমায়: "ইয়ার্কি' হচ্ছে! দেশের এই দুর্দিনে মশকরা?"

কয়েকজন অমনি হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। সেই সঙ্গে বন্ধুবর নির্মলও। সে-ও ঘটনা খুঁজতে বেরিয়েছে। দেখা হওয়াতে যেন আশ্বস্ত হল।

—"কী করছো দুপুরবেলা? তাস খেলবে নাকি?"

ধড়ে প্রাণ এল যেন। একটা কাজের মতো কাজ পেলাম।—"চলো, খোঁড়ি যোগাড় করা যাক। আর কিছু রেজগি।"

তারপর আমরা দুজন পাড়ার দু-তিন জায়গায় ঢুঁ দিয়ে তাসের ব্যবস্থা পাকা করে ফেললাম। বাজারে কিছু পাওয়া যায় নি—কোনোরকমে নাকে-মুখে চাট্টি খিচুড়ি ও আলুভাজা গুঁজে বেলা একটা নাগাদ বসা গেল।

বিকেল পাঁচটায় মিছিল বেরোবে শোনা গেছে। ময়দানে মিটিং। যতীন যাবে বলেছিল। কিন্তু যখন ঠিক পাঁচটা বাজে, তখন মণীন্দ্র হারছে পাঁচ টাকা, আমি সাড়ে সাত টাকা মতন, নির্মল জিতছে টাকা তিনেক, আর যতীন—যে চিরকালই প্রথমদিকে হারে এবং পরে সর্বস্ব লুট করে নেয়,—জিতছে প্রায় দশ টাকা।

মণীন্দ্র বললো, "এখনি খেলা ভাঙা চলবে না। আমি ভালো হাত পাবো খুব শিগ্গীর। একবারে সব উশুল করবো, দেখো।" নির্মলও অল্প জিতে সন্তুষ্ট হয়নি। যতীন একটু হেসে বললো, "বেশ, মিছিল-ফিছিল বাদ দাও তাহলে; সবাই যখন চাইছ, খেলা চলুক। আজ জিতে ফাটিয়ে দেবো বোর্ড।"

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে একটার পর একটা রাউণ্ড খেলা চলছে। চার ঘণ্টার জমানো সিগারেটের ধোঁয়ায় বন্ধ ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে, দম আটকে যাবার যোগাড়।

একটু হাওয়া আসুক—মণীন্দ্র জানলাটা খুলে দিতে এগিয়ে গেল। খুলতেই কানে এল একদল জনতার সমবেত কণ্ঠস্বর—"চলবে না, চলবে না।"

—"বন্ধ কর্, জানলা বন্ধ কর্"—নির্মল চেঁচিয়ে উঠলো—"খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, একটা হুজুগ পেলেই হল। যত সব কলের পুতুল!"

একটি একটি করে নোট বুক পকেটে পুরতে পুরতে বললো—"তিনটে রাজা... আজ ময়দানে গুলি চলবে"

মণীন্দ্র তবু মিছিল দেখছে। যতীন হাঁক দিল—"এই মণি, শো কর্।"

তিনটে একরঙা তাস নিয়ে অনেক টাকা খেলেছে যতীন। ওর আর ধৈর্য নেই। মণি বেপরোয়া, জেদ করে তাস না দেখে পয়সা ফেলেছিল। খুচরোয় ও নোটে বোর্ড উঁচু হয়ে উঠেছে। আমরা দুজন অবশ্য অল্প খেসারত দিয়ে পালিয়েছি আগে-ভাগে।

সবাই উন্মুখ। কী হয়, কী হয়।

মণি একটি একটি করে তিনটে তাস ওলটালো। তিনটেই রাজা! হুররে বলে চেঁচিয়ে উঠলাম সবাই—ট্রায়ো পেয়েছে মণি।

ও কিন্তু নির্বিকার। দু হাত দিয়ে সযত্নে সব টাকা পয়সা কোলের কাছে টেনে আনলো, খুচরোগুলো রেখে একটি-একটি করে নোট বুক পকেটে পুরতে-পুরতে বললো—"তিনটে রাজা,...আজ ময়দানে গুলি চলবে।"

যে গর্দভ, তার সন্দেহ কি; গর্দভ না হইলে আমার কান লম্বা হইবেক কেন। এই বলিয়া রাজপুরুষকে সম্ভাষণ করিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! জন্মাবধি প্রাণপণে ইঁহার পরিচর্যা করিতেছি; কিন্তু কখনও প্রহার ভিন্ন অন্য পুরস্কার পাই নাই। শীতবোধ হইলে প্রহার করিয়া গরম করিয়া দেন; গরম বোধ হইলে প্রহার করিয়া শীতল করিয়া দেন; নিদ্রাবেশ হইলে প্রহার করিয়া সজাগর করিয়া দেন; বসিয়া থাকিলে প্রহার করিয়া উঠাইয়া দেন; কোনও কাজে পাঠাইতে হইলে প্রহার করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন; কার্যসমাধা করিয়া বাটীতে আসিলে প্রহার করিয়া আমার সংবর্ধনা করেন; কথায় কথায় কান ধরিয়া টানেন, তাহাতেই আমার কান এত লম্বা হইয়াছে। বলিতে কি মহাশয়! কেহ কখনও এমন গুণের মনিব ও এমন সুখের চাকরি পাইবেক না; আমি ইঁহার আশ্রয়ে পরম সুখে কাল কাটাইতেছি।"

১৮৭২ সালে 'দ্বাদশ কবিতা' নামে দীনবন্ধু মিত্রের একখানা কবিতার বই বেরল। এ বই দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করে লিখেছেন : "আপনি বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া।"

১৮৭৬ সালের নভেম্বরে দীনবন্ধুর আরেকখানা কবিতার বই বেরল—সুরধুনী কাব্য : দ্বিতীয় ভাগ। সেখান থেকে দীনবন্ধুর লেখা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি :

"বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর প্রবর,
দীনজন-মানস-পালন-তৎপর,
মাতৃভক্তি ভরা চিত্ত, কাছে গিয়ে যার,
অনাথ শিশুর মত করে আবদার;
বিধবা-বিবাহ বিধি যুক্তির বিচার,
খণ্ডাতে পারে কি কেহ শাস্ত্রমত তার;
অমিয়া-লহরী-যুত রচনা-নিচয়,
ললিত-মাধুরীমালা-কোমলতাময়,
সাহিত্য-সহজ-পথ উপক্রমণিকা,
পড়িয়া পণ্ডিত কত বালক বালিকা;
সংস্কৃত কালেজ যাঁর যতন কৌশলে,
লভিয়াছে এত যশঃ মানবমণ্ডলে;
দেশ-অনুরাগ-স্রোতঃ বহিছে হৃদয়ে,
বেঁচে থাক বিদ্যাসিন্ধু, চিরজীবী হয়ে।'..."

দীনবন্ধু মিত্রকে খুব ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর। ১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর দীনবন্ধু ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরেও বিদ্যাসাগর দীনবন্ধুর সংসারের খোঁজ-খবর নিয়েছেন সব সময়, দীনবন্ধুর স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন দুঃসময়ে, সাহায্য করেছেন।

মধুসূদন শর্মা 'বামনাখ্যানম্' লিখেছেন। এক শো সতেরোটি শ্লোক লিখেছেন সংস্কৃতে।

কেউ কেউ মধুসূদনকে বাঙলা অনুবাদ সমেত সংস্কৃত শ্লোকগুলো ছাপিয়ে দিতে বললেন। বাঙলা অনুবাদের জন্য মধুসূদন এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর শ্লোকগুলোর বাঙলা অনুবাদ করে দিলেন; এবং নিজেই টাকা-পয়সা খরচ করে মধুসূদনের 'বামনাখ্যানম্' ছাপিয়ে দিলেন। ১৮৭৩ সালের কথা।

রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন : "কেহ কেহ কহেন বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালা রচনা নৈপুণ্য বিষয়ে অদ্বিতীয়তা জন্মিয়াছে সত্য কিন্তু বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনীশক্তি বা মৌলিকতা (originality) নাই—অর্থাৎ বিদ্যাসাগর অনুবাদ ভিন্ন মূলগ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না। বিদ্যাসাগর রচিত যে সকল পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন না কোন পুস্তকের অনুবাদ, মূলগ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অল্পই আছে, এ কথা অযথার্থ নহে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগরের রচনা-প্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালাভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদয়কাল, ঐরূপ কালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদ-গ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগর যে নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই—সুতরাং তাঁহাকে মূল-গ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক করিতে হইয়াছে। কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস ও বহুবিবাহবিচার রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে মূল রচনা করিবার শক্তিবিহীন বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য হয়।"

১৮৮৮ সালের এপ্রিলে 'নিষ্কৃতিলাভ-প্রয়াস' নামে বিদ্যাসাগরের একখানা বই বেরল।

'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস'-এর কথা বলতে হলে আরম্ভ করতে হয় অনেক, অনেককাল আগে থেকে। মদনমোহন আর বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। সংস্কৃত কলেজে অনেক দিন একই সঙ্গে পড়েছেন দু-জনে।

সংস্কৃত কলেজের পড়া শেষ করে মদনমোহন তর্কালঙ্কার দু' মাস কাজ করেছেন হিন্দু কলেজ পাঠশালায়। তারপর কাজ নিয়েছেন বারাসত গবর্নমেণ্ট ইস্কুলে; এক বছর সেখানে কাজ করলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতি করেছেন; ১৮৪৬ সালের জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগর কলেজে পণ্ডিতি করেছেন।

সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। ১৮৪৬ সালের ১৩ এপ্রিল তিনি মারা গেলেন। সাহিত্যের অধ্যাপক কে হবেন এবার? নব্বই টাকা মাইনে পাবেন তিনি।

বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি, পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাচ্ছেন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত ঠিক করলেন, বিদ্যাসাগরকে ওই নব্বুই টাকার চাকরিতে বহাল করবেন। মাইনে পঞ্চাশ টাকা থেকে একটানে নব্বুই টাকা হয়ে যাবে—খুব সামান্য কথা নয়।

কিন্তু বিদ্যাসাগর সে চাকরি নিলেন না। মদনমোহন তর্কালঙ্কার যাতে ওই চাকরি পান, বিদ্যাসাগর সেইরকম অনুরোধ করলেন কর্তৃপক্ষকে। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে কাজ হল। ১৮৪৬ সালের ২৭ জুন মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হলেন।

১৮৪৭ সালে সংস্কৃত প্রেস খোলা হল। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায়, তিনি ও আমি, উভয় সমাংশভাগী ছিলাম।"

সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৮৫০ সালের নভেম্বরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হলেন। ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বরে মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। এক বছর পর কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন।

"ক্রমে ক্রমে, এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে"—স্বয়ং বিদ্যাসাগরের ভাষায় বলা হচ্ছে—"তর্কালঙ্কারের সহিত কোনও বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে।"

অথচ এককালে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল দু-জনের মধ্যে।

সংস্কৃত কলেজের উত্তর দিকের দোতলার একখানা ঘরে মদনমোহন ছাত্রদের পড়াতেন। সংস্কৃত কলেজের উত্তর দিকের একখানা বাড়ির একজন ভদ্রলোক একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে নালিশ করলেন—বললেন, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের জন্য তাঁদের স্ত্রীলোকেরা ছাদে উঠতে পারেন না। ছাত্রেরা

সব সময় আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিদ্যাসাগর অতএব মদনমোহনকে বললেন —মদন, ছেলেদের বারণ করে দিও, যেন ওদিকে না তাকায়।

মদনমোহন উত্তর দিলেন—দেখ বিদ্যাসাগর, বসন্তকাল পড়েছে। 'মেঘদূত' পড়ানো হচ্ছে। আর পড়াচ্ছেন কে? না, স্বয়ং মদন। এ অবস্থায় কেউ চঞ্চল না হয়ে থাকতে পারে?

উত্তর শুনে বিদ্যাসাগর খুশী হলেন। কিন্তু কাজের দিক ঠিক আছে। মিস্ত্রী ডাকিয়ে ওদিকের খড়খড়িগুলো স্ক্রু লাগিয়ে বিদ্যাসাগর এমনভাবে বন্ধ করে দিলেন যে, আর কোনো অভিযোগের কারণ রইল না।

বিদ্যাসাগরের চেয়ে মদনমোহন বয়সে বছর তিনেক বড়ো। তাই বিদ্যাসাগর মদনমোহনের স্ত্রীকে 'বউদিদি' বলে ডাকতেন। মদনমোহনের স্ত্রী বিদ্যাসাগরকে ডাকতেন—ঠাকুরপো।

মদনমোহন তখন কলকাতায়।

সেদিন কলেজ থেকে মদনমোহনের বাসায় গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। মদনমোহনের স্ত্রীকে

বললেন—বউদিদি, বড়ো খিদে পেয়েছে। কী খাব?
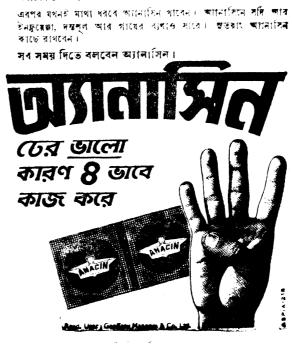
বউদিদি তখন মধ্যাহ্নের খাওয়া খেতে বসেছেন। বললেন—কেন ঠাকুরপো, এই ভাত আছে, খাও না।

তক্ষুনি বিদ্যাসাগর অম্লানবদনে বউদিদির পাশে বসে বউদিদির থালা থেকে হাম্‌হাম্‌ করে ভাত খেতে লাগলেন।

এমন সময় মদনমোহন এলেন। বললেন—আরে, কি করো, বিদ্যাসাগর। সকল মহাপ্রসাদ খেও না। আমি খাব কী?

মদনমোহনের স্ত্রী ভাতের থালাখানা হাতে নিয়ে উঠে বললেন—এই লও, মহাপ্রসাদ খাও।

মদনমোহন সেই থালা চাটতে লাগলেন।

অনেক দিন আগের কথা। এ দৃশ্য এখন পুরনো। সেই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের দিন এখন আর নেই।

না, বিদ্যাসাগর কিছুতেই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না।

বিদ্যাসাগর আর মদনমোহন তর্কালঙ্কার দুজনের সঙ্গেই পটলডাঙার শ্যামাচরণ দে-র বন্ধুত্ব।

এই সময়ে শ্যামাচরণকে লেখা মদনমোহনের একখানা চিঠি থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি: "ভ্রাতঃ! ক্রমশঃ পদোন্নতি ও এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটী পদপ্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলি বিদ্যাসাগরের সহায়তা বলে হইয়াছে, অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন তবে আর আমার এই চাকরি করায় কাজ নাই, আমার এখনি ইহাতে ইস্তফা দিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হয়। শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব, আমি এই সর্বাভিজ্ঞনে আসিয়া অবধি যেন মহাসাগরাধীর ন্যায় নিতান্ত [illegible] ও স্ফূর্তিহীনচিত্তে কর্মকাজ করিতেছি, অথবা আমার অসুখের ও মনোবেদনার পরিচয় আর কি মাথা মুণ্ডু জানাইব, আমার বাল্যসহচর, একহৃদয়, অমায়িক সহোদরাধিক, পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই, আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি। শ্যাম! তুমি আমার সকল জান, এই জন্যে তোমার নিকট এত দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম।"

এই শ্যামাচরণের মারফত বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস সম্পর্কে মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে একটা প্রস্তাব করে পাঠালেন। ভাগাভাগির প্রস্তাব। ছাপাখানা ভাগ হয়ে যাক দুজনের মধ্যে। অথবা, যা ন্যায্য প্রাপ্য হয় বিদ্যাসাগরকে তা দিয়ে মদনমোহন ছাপাখানা নিয়ে নিক। কিংবা, যা ন্যায্য প্রাপ্য হয় মদনমোহন তা নিয়ে বিদ্যাসাগরকে ছাপাখানা ছেড়ে দিক।—অর্থাৎ, মদনমোহনের সঙ্গে অংশীদার হয়ে বিদ্যাসাগর আর ছাপাখানায় থাকবেন না।

নিজের প্রাপ্য বুঝে নিয়ে মদনমোহন ছাপাখানা ছেড়ে দিতে চাইলেন বিদ্যাসাগরকে।

খাতাপত্র দেখে-শুনে হিসেব-নিকেশ দেনা-পাওনার মীমাংসা করে দিলেন শ্যামাচরণ দে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি আর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ব্যাপারে এঁরাই সালিসী হয়েছেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'শিশুশিক্ষা' নামে একখানা বই তিন ভাগে লিখেছেন। 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বেরিয়েছে ১৮৪৯ সালে, তৃতীয় ভাগ বেরিয়েছে ১৮৫০ সালে। প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা'র একটি কবিতার সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর নিঃসন্দেহে শৈশবকাল থেকে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। মদনমোহনের সেই কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তি: "পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল।"

মদনমোহনের ইচ্ছামতো সেই তিন ভাগ 'শিশুশিক্ষা' ছাপাখানার সম্পত্তি হয়ে গেছে। সালিসীতে ছাপাখানার ষোলো আনা স্বত্ব পেলেন বিদ্যাসাগর। অতএব, না বললেও চলে নিশ্চয়ই, ওই তিন ভাগ 'শিশুশিক্ষা'র স্বত্বও বিদ্যাসাগরের।

মদনমোহন একখানা চিঠি লিখে শ্যামাচরণকে জানালেন: "আমি এক্ষণে যাইতে পারিব না; আদালত বন্ধ হইলে, কলিকাতায় গিয়া আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইব।"

কিন্তু মদনমোহনের আর কলকাতায় এসে আপন প্রাপ্য বুঝে নেওয়া হল না।

কান্দীতে কলেরা হল মদনমোহনের। বাঁচার কিছুমাত্র আশা রইল না। অন্তিম কালেও মদনমোহন বিদ্যাসাগরের কথা ভুলতে পারেননি, মর্মে মর্মে বুঝেছেন বিদ্যাসাগরের উপর চিরকাল নির্ভর করা চলে।

স্বামীর শেষ শয্যার ধারে মদনমোহনের স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদছেন। মদনমোহন স্ত্রীকে বললেন—তুমি কেঁদো না। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি কিছুতেই নিরাশ্রয় হবে না। আমার প্রাণের বন্ধু ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে আশ্রয় দেবে। ঈশ্বর বেঁচে থাকতে তুমি আর আমার মেয়েরা কোনো কষ্ট পাবে না। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।"

১৮৫৮ সালের ৯ মার্চ মদনমোহনের মৃত্যু হল।

বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "তাঁহার (মদনমোহনের) পত্নী, কলিকাতায় আসিয়া, ছাপাখানা সংক্রান্ত স্বীয় পতির প্রাপ্য বুঝিয়া লয়েন।"

মদনমোহন যখন কলকাতায়, মুর্শিদাবাদে, কান্দীতে কাজ করতেন, তাঁর পরিবার তাঁর কাছে থাকতেন, আর তাঁর মা থাকতেন বাড়িতে, বিল্বগ্রামে। তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার, কোথায় আর যাবেন, বিল্বগ্রামের বাড়িতে গিয়ে রইলেন।

কুন্দমালাকে নিয়ে মদনমোহনের স্ত্রী একবার কলকাতায় এলেন। কুন্দমালা মদনমোহনের মেজো মেয়ে। কুন্দমালা বিধবা।

সেবার মায়ের সামনেই কুন্দমালা একদিন বিদ্যাসাগরকে বলল—দেখ, কাকা! বাবা অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন; মা বুঝে-শুনে চললে আমাদের সচ্ছন্দে চলে যেত। কিন্তু মা সবই উড়িয়ে দিচ্ছেন। আর কিছু দিন পরে আমাদের ভাত-কাপড়ের কষ্ট পেতে হবে। তাঁর অদৃষ্টে যা আছে হোক। কিন্তু আমার বয়স অল্প, আমি অনাথা, আমার অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে বলতে পারি না।

বলতে বলতে কুন্দমালা কেঁদে ফেলল।

কুন্দমালার কান্না দেখে বিদ্যাসাগরের মন দুঃখে ভরে গেল। তিনি বললেন—বাছা! কেঁদো না। আমি যতদিন বেঁচে আছি, তুমি ভাত-কাপড়ের কষ্ট পাবে না। আমি তোমাকে মাসে মাসে দশ টাকা দেব। তা হলেই তোমার অনায়াসে চলে যাবে।

মাসে মাসে কুন্দমালাকে দশ টাকা দিয়ে যেতে লাগলেন বিদ্যাসাগর।

এখানে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নামে দু-চার কথা না বললে নয়।

(ক্রমশ)

আমাদের দেশেও পথে ঘাটে এই সৃষ্টিছাড়াদের দেখা যায়। চণ্ডীগড় থেকে নিয়ে কটক, কাশী থেকে কন্যাকুমারী সর্বত্র এদের গতি। পোশাকে, না স্নান করা নোংরা অপরিষ্কার হাবভাবেই তাদের পরিচয়। নেশার জিনিস নাকি সহজে মেলে ভারতে। চরস বা bashish চাইলে মিলবে প্রচুর। ধূমপান কর আর যত্রতত্র ভোজন আর হট্টমন্দিরে শয়ন। আর কি চাই। ক্রমবিবর্তনের শেষ অধ্যায়।

আমাদের Youth Hostel Association-এর যে আস্তানাগুলি আছে, তার মধ্যেও মাঝে মাঝে এমনি আমদানি দেখা যায়। সস্তায় আস্তানা হলে যুবসমাজ, বিশেষত ছাত্রসমাজ দেশবিদেশ ঘুরতে পারবে এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক Youth Hostel ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কয়েক বছর আগে সংস্থা কাজ আরম্ভ করে। একটি চারপাই, পানীয় জল, আর দু'একটা সাধারণ ব্যবস্থার সামান্য দক্ষিণা ভিন্ন আশ্রয়ের বড় কোন দাবি নেই। কয়েকটি শর্ত আছে অবশ্য। নেশা করা মানা, অন্যায় আচরণ মানা ইত্যাদি। সারা ভারতে ৮৫টি এমন আস্তানা হয়েছে। কিন্তু মানাগুলি কতটা মানা হয় জানি না। বাংলা দেশেরও বহু জায়গায় ছোট বড় আস্তানা হয়েছে। কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে তার প্রাদেশিক অফিস। অবৈতনিক কর্মী শ্রীপ্রভাসরঞ্জন দে। ভারতীয় ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতী দল বেঁধে এদিক-ওদিক ভ্রমণেও আস্তানার ব্যবহার করেন। তবে বেশীর ভাগ আস্তানার আগন্তুক বিদেশী যুবক-যুবতী। আমিও একদিন একটি আস্তানায় বিদেশী যুবক-যুবতীদের দেখে ছিলাম। স্থান-এর নাম নাই করলাম। দৃশ্য মনোরম। শহর থেকে একটু দূরে। আস্তানার প্রবেশ দ্বার খোলা। কৌতূহল হলো বলেই ঢুকলাম। সময় দ্বিপ্রহর। একটি ঘরে পাশাপাশি রাখা খাটিয়াতে শুয়ে আছে লম্বা চুল, বিপর্যস্ত বসন মানুষ কয়েকটি। ছেলে কি মেয়ে বোঝা দায়। ডাকাডাকি শুনে তারা বিরক্ত হয়ে উঠে বসলো। প্রত্যেকের রক্তচক্ষু। কারও বা একদম তুরীয়ভাব। একটি লম্বা চুল আমার দিকে এগিয়ে এসে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত। তারপর আবার সব যে যার মত শুয়ে পড়লো। দুর্গন্ধ জামাকাপড়, হাঁটু অবধি টেনে তোলা মিনি প্যান্ট এদিক-ওদিক ছড়ানো খাবার জিনিস, বাইরে দাঁড়িতে টাঙানো ময়লা ধুতি, ছেঁড়া পায়জামা ইত্যাদি। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে হস্টেল ওয়ার্ডেন সবে মাত্র আটার তাল টিপে টিপে রুটি বানাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম এরা কি সব নেশা করে? "... নেশা করা মানা, তবে লুকিয়ে যদি কেউ করে বলতে পারি না।"

এমন সময় দুটি যুবক এগিয়ে এল। তারা আমার আগের পরিচিত লম্বাচুলের দল-এর নয়। এদের তুরীয় ভাব হয়তো কেটেছে। আমাকে দেখে একজন বললো, 'ওয়ার্ডেনকে বুঝিয়ে বল আমাদের টাকা চুরি গেছে, আমরা পয়সা দিতে পারছি না।' ওয়ার্ডেন বললেন পয়সা চুরি কখনও বা সত্যি, কখনও নয়। কি করে জানবো কে সত্যি বলে। তাই এদের সঙ্গে নিত্য কলহ। কখনও বা নেশার মালের চোরাকারবারও চলে, পুলিস আসে।

ওয়ার্ডেনের কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম। যদি নেশার টানের এই সর্বনাশা গতি আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবেশ করে তবে কি হবে? এখনও দারিদ্র্য আমাদের বাঁচোয়া, না হলে কি হতো বলা যায় না।

রৌপ্যযুগ

স্বর্ণ যুগের পরই রৌপ্যযুগ! মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যেমন লৌহযুগ, তাম্রযুগ তেমন বর্তমান যুগের অলংকারের বিবর্তনে স্বর্ণযুগ আর রৌপ্যযুগ। শাড়ির পাড় থেকে নিয়ে গহনার ফ্যাশনে সর্বত্র এখন রুপোর চলন বেড়েছে। রুপোও অবশ্য নিজের মান রাখতে চড়া দর হাঁকতে কসুর করছে না।

কয়েক বছর আগেও সচ্ছল সংসারে রুপোর মর্যাদা ছিল না বেশী। তেমন পায়ে সোনা ঠেকানো পাপ তাই রুপোকে পায়ের অলংকার করা হত। আজ কিন্তু সেই রুপোই রূপসীদের আদরের জিনিস। উদরপাতের কলকা থেকে নিয়ে সাঁওতালী কুণ্ডলাত পর্যন্ত চকচকে রুপোলী রুপো।

সোনার মত রুপোর খবরও মানুষ পেয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই। সোনার পরই রুপোর নমনীয়তা। তাই রুপোর গহনা গড়া সহজ। পিটিয়ে পাতলা পাত করবার বেলায় রুপো প্লাটিনামের ঠিক পরে। এক আউন্স রুপোকে ৩ মাইল লম্বা তারে পরিণত করা যায়। পিটিয়ে পাত করলে রুপোকে এক ইঞ্চির দশ হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত সরু করা চলে। এতদিন রুপো বেশীর ভাগ ব্যবহার হতো টাকা তৈরির কাজে। মুদ্রাই হক আর গহনাই হক চাঁদির সঙ্গে তামা মেশানো হয়। খাঁটি চাঁদি বড্ড নরম।

কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও স্পেনে রুপোর খনি আছে। অবিমিশ্র চাঁদি বড় একটা থাকে না। তামা ও সীসার সঙ্গে মিশে থাকে। হয়তো একদিন চাঁদির দামও চড় চড় করে বেড়ে যাবে তার রূপসীকে খুঁজতে হবে নূতন অলংকারের মাধ্যম।

টুকিটাকি

শীতের মৌসুমে গরম কাপড়ের বাজার এত গরম যে যা আছে তার যত্ন নিয়ে চালানো নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে। প্রথম কথাই হচ্ছে গরম কাপড় বেশী ময়লা হবার আগে ধুয়ে বা ড্রাই ক্লিন করে নেওয়া দরকার। সামান্য দাগ বা অল্পবিস্তর কিছু লেগে যাওয়া পেট্রোল বা স্পিরিটে ঘষে বেশ পরিষ্কার হয়। বেশী ময়লা হলে দোকানে দিলেই ভাল অথবা যাঁরা নিজেরা ভাল ড্রাই ক্লিন করতে পারেন তাঁরা ঘরেও কাজ চালিয়ে নিতে পারেন।

বোনা পশমী জিনিস কখনও বেশী গরম জলে দেবেন না। উল জমে যেতে পারে। হাতে সামান্য গরম ঠেকবে এমন তাপমাত্রা ভাল। ভাল পরিষ্কারক বস্তু ব্যবহার করবেন। আপাতত যদি খরচা সামান্য বেশীও হয়, শেষ পর্যন্ত সুফল পাবেন।

উলের বোনা জিনিস ছায়ায় শুকোতে দেবেন। সমতল জিনিসের উপর ছড়িয়ে দেবেন, ঝুলিয়ে নয়। উল্টো দিকে শুকিয়ে, হালকা গরম ইস্ত্রিও উল্টো দিকে চালাবেন। পাতলা ভিজে কাপড়ের উপর ইস্ত্রিতে ভয় আরও কম থাকে।

বোনা জিনিস হ্যাঙ্গারে টাঙাবেন না। গরম কোট ইত্যাদি সর্বদা হ্যাঙ্গারে রাখবেন। জামা কাপড় রাখার ঝোলানো আলমারি বা wardrobe থাকলে ভাল আর তা না হলে দেওয়ালের গায়ে মোটা হুক দিয়ে রাখতে পারেন। দেওয়ালে কাগজ বা আর কিছু লাগিয়ে নিতে হবে এবং কোটের উপর পাতলা কাপড় বা পলিথিন ইত্যাদির ঢাকা রাখতে হবে।

শীতে রেশমী শাড়িও ব্যবহার বেশী হয়। আজকাল ভারতীয় ফ্যাশনের বাহার রঙের দিকেও ঝুঁকেছে। সোনালী রুপোলী পাড়ের দাম চড় চড় করে বেড়ে যাচ্ছে বেনারসী বাহারের মতো বজায় রাখার কাজে লেগেছে রং। কিন্তু রঙের বিষয়ে রং ও তার আগের মত পাকা রং সব সময় হয় না। তাই রেশমী শাড়ি বা সুতোর মত সহজে কাচা যায় না তার বেলায় আরও বেশী সাবধানতা দরকার। রেশমী রঙীন বাহারে কাপড় প্রথমেই সাবান জলে দেবেন না। প্রথম বার দুই পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে তুলুন, তারপর সাবান দেবেন। সাবান দেবার সময় পাড়ে আঁচলে যদি আলাদাভাবে সাবান জলের স্পর্শ পরীক্ষা করে নিতে পারেন তবে ভালই হবে। আলাদা করে ধুতে পারলেও মন্দ হয় না।

ছায়ায় শুকোতে দেবেন। সাদা কাপড়ের বেলায় যেমন সূর্যালোক বিশেষ দরকার, রঙের বেলায় তেমন তাকে এড়িয়ে যেতে হয়।

সবচেয়ে মনে রাখার মত কথা হচ্ছে রঙীন জিনিস সাবান জলে কখনও যেন বেশীক্ষণ ফেলে রাখা না হয়।

—শ্রীমতী

সাপটা মরুক না মরুক, লাঠিটা শেষ পর্যন্ত অক্ষতই থেকে গেছে। রাজধানী ওয়াশিংটনে অবশেষে নতুন পৌরশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগেকার ব্যবস্থায় তিনজন কমিশনার ছিলেন, বর্তমানে সেখানে একজন পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার অধিষ্ঠিত। তিনি একজন নিগ্রো। এবং তাঁর বেসরকারী খেতাব : 'মেয়র'।

সব জিনিসের খুঁতধরা যাদের অভ্যেস, রাজধানী নগরীর প্রথম মেয়রের 'মেয়রত্ব' নিয়ে তারা ঠোঁট বেঁকাতে পারে, বলতে পারে তিনি সাক্ষীগোপাল, বলতে পারে তিনি গণনির্বাচিত প্রতিনিধি নন, কর্তাদের পেটোয়া লোক—তাদের যা খুশী তারা বলুক। এই শহরের নিজের নামে যাঁর নাম, সেই প্রথম নাগরিক ওয়াল্টার ওয়াশিংটনকে আর পাঁচজনের সঙ্গে জহুরী সদাগরও অভিনন্দন জানিয়েছে : তাঁর যাত্রা শুভ হোক, সফল হোক।

আজ বলতে লজ্জা নেই, প্রথম এদেশে এসে মনটা লজ্জা সঙ্কোচ হীনমন্যতায় কুঁকড়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকত। এদের কত আছে, আমাদের কত অভাব; এরা কত জানে, আমাদের কী নিদারুণ অজ্ঞতা ইত্যাদি। দু বছরে চোখ অনেকটা খুলেছে, আড়ষ্ট ভাবটা অনেকখানি কেটেছে। এ দেশের চোখ ধাঁধানো প্রাচুর্যের আলো চোখে সয়ে গেছে; পোড়া চোখে বৈষম্যগুলো এখন বড় তাড়াতাড়ি, বড় বেশি করে ধরা পড়ে। হঠাৎ বেফাঁস কোনো মন্তব্য করে ফেলে, পরক্ষণেই জিভ কামড়াই : মাৎসর্যের শিকার হয়ে পড়ছি নাকি?

দেশে থাকতে আমার জনকয়েক বিদেশী বন্ধুবান্ধবী জুটেছিল। তাদের অনেকেরই দেখতুম কেমন একটা অহেতুক মুগ্ধ মুগ্ধ ভাব। পাড়াগাঁয়ের পুকুরে-ডোবায় পাট পচছে, গন্ধে ভিরমি লাগার যোগাড়, সেই পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে মোহিত হয়ে পল্লী প্রকৃতির শোভা অবলোকন করছে। জানতে চাইছে লিলির সীজ্‌ন কবে। ঠিক একই মুগ্ধতা দেখেছি, এদেশে আসা আমার স্বদেশীয় বন্ধুদের মধ্যেও। অনেক ব্যাপারে তাঁদের উচ্ছ্বাস..."কী নিপুণ পূর্তব্যবস্থা, কী অসামান্য নাগরিকচেতনা, কী নিখুঁত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, আইন মেনে চলার কী সহজাত প্রবণতা...!" এই উভয় দলের কাউকেই আমি আদিখ্যেতার জন্যে নিন্দে করছি না। শুধু সবিনয়ে বলছি, এইসব দেখার মধ্যে আপন মনের মাধুরী মেশানোর ব্যাপারটা অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত সক্রিয় হয়।
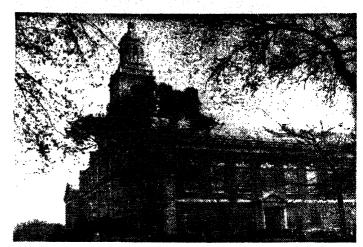
বিশ্ববিশ্রুত হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত শিক্ষায়তন। এখানে সাদা ছাত্রছাত্রী নেই বললেই চলে

মুদী-মনোহারী-সিনেমা-ডাক্তার সর্বত্রই লোকে কাতারে দাঁড়িয়ে নীরব ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে, কেউ আগ বাড়িয়ে, কাউকে ডিঙিয়ে, পাশ কাটিয়ে যেতে চায় না, এ কথা এদেশে সত্যি। কিন্তু লাইনের শেষ প্রান্তের লোকটিও বিফল হয়ে ফিরবে না, সেই গ্যারাণ্টিও এদেশে দেওয়া হয়। এটা এদের ধৈর্য ও শৃঙ্খলাপ্রিয়তার প্রমাণ নিঃসন্দেহে। কিন্তু অত্যন্ত সুচারু যানবাহন নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত সত্ত্বেও প্রত্যেকটি জাতীয় পর্বের দিনে, সারা দেশে যে হাজার হাজার লোক অপঘাতে মরে, সেটা এদের জাতীয় চরিত্রের অধৈর্য, বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও কাণ্ডজ্ঞান-শূন্যতার পরিচায়ক, একথাও সমভাবে সত্যি। যন্ত্রবিজ্ঞানে, প্রয়োগকুশলতায় চিকিৎসাবিদ্যায় এদের প্রাধান্য বিশ্ববিদিত; আবার মোটা ডিগ্রির অধিকারী, পাশকরা হেতুড়ের ভুল চিকিৎসায় গণ্ডায় গণ্ডায়, শুয়ে শুয়ে রুগী বিড়ম্বনা ভোগ করে সেটাও ভীষণভাবে সত্যি।

স্থাপত্যে এরা ময়দানব। পনেরো দিনের মধ্যে একটা বিরাট বনস্থলীকে লোকালয়ে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে। একশোটা কলোনিয়্যাল কটেজকে গুঁড়িয়ে ফেলে হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই সাতমহলা আধুনিক ম্যানসন তুলে ফেলছে। ভেকেশনে যাবার আগে পর্যন্ত একটা বড় ময়দানে গাড়ি পার্ক করে এসেছেন; ঘুরে এসে দেখলেন সে জায়গায় বহুতলবিশিষ্ট অফিসবাড়ি, তার কক্ষে কক্ষে টাইপের খটখট, টেলিফোনের ঝন ঝন। এত সম্পদ, এত যন্ত্রসম্ভার, এমন প্রয়োগ চাতুর্য! কিন্তু নাগরিক জীবনের সব স্তরে সব অসুবিধে কি দূর হয়েছে, সমস্ত জটিলতার অবসান ঘটেছে, ঐশ্বর্য কি সর্বসাকুল্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে? ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত আমেরিকান কি সেই স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী?

কথিত আছে এদেশে শ্রমশক্তি অত্যন্ত সুসংগঠিত। তার একটা জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়, সাম্প্রতিককালের নামকরা ধর্মঘটগুলোর চেহারায়। বিমান-মোটর-রেল ইত্যাদি বৃহৎ কর্মযজ্ঞ একেবারে অসাড় করে দেওয়ার হুমকি দেখিয়ে 'লেবার' সম্প্রদায় তাঁদের পাওনাগণ্ডা ষোলো আনা আদায় করে নিচ্ছেন। তাঁদের জয়জয়কার হোক। কিন্তু এইসব উচ্চবিত্ত 'সোনার থালায়' শ্রমিককুলই কি এদেশের একমাত্র শ্রমশক্তি? নির্ধন, নির্ভূমি, যেসব যাযাবর হাভাতে মজুর, দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চষে বেড়ায়, কোটিপতি ফার্মমালিকদের দুয়ারে দুয়ারে অত্যন্ত অস্থায়ী প্রকৃতির দিনমজুরীকে জীবিকা করে, তাদের ইতিবৃত্ত কি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমজীবীদের খাতায় লেখা হবে?

বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ থেকে মহত্তম গণতন্ত্রের দেশে পা দেবার পর থেকেই, আমার যোগবিয়োগে বড় বড় গরমিল দেখা যাচ্ছে। 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' বন্দোবস্তে, বোধ হয় চাঁদের অন্য পিঠের তামস অস্তিত্বকে অনুচ্চারিত স্বীকৃতি দেওয়াই বিধেয়। তা নিয়ে হইচই করে,

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের সামনে নিগ্রো শিক্ষার্থীরা

অবাক হয়ে 'সীন্' করাটা বোধ হয় কিছু নয়। তা নইলে, এই কিম্বদন্তীর এলডোরাডোয়, কিছু মানুষকে সত্যি সত্যি একবেলা আধপেটা খেয়ে, বাচ্চাকাচ্চার মুখ শুকিয়ে, পশুর খোঁয়াড়ে রাত কাটাতে হয়, আর সেই দৃশ্য দেখতে হয়...হোক না তাদের সংখ্যা হাজারে দুজন, কিংবা আরো কম!

শহর থেকে দূরে ফার্মগুলো দেখবার মত। ক্ষেতে ক্ষেতে থরে থরে ফসল ফলে রয়েছে, গাছে গাছে আপেল। ঝুড়ি বোঝাই করে টমেটো তুলছিল পিটার, সে একজন নিগ্রো, দিনমজুর। পরিবারবর্গ নিয়ে আজ এখানে, কাল সেখানে করে, ক্ষেতমজুরী করে গুজরান। কাছেই তার ধাওড়া। সেই ধাওড়ায় বেশ কয়েক শ' যাযাবর ক্ষেতমজুরের সাময়িক বসতি। ধারে-কাছে আর কোনো লোকবসত নেই। থাকবার উপায় নেই। নরক-কুণ্ডের মতন মলমূত্রআবর্জনা পচা একটি নালা, ধাওড়ার একমাত্র পয়ঃপ্রণালী, তার গন্ধে কয়েক ফারলং পর্যন্ত আমোদিত। সেই গন্ধে মিশে আছে মানুষ আর কুকুরের স্বেদমূত্রপুরীষ, কয়েক শত পরিবারের কয়েক শত দিবসের পুঞ্জিত আবর্জনার স্তূপ, আর ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির আঠালো শ্যাওলা।

যাযাবর শ্রমজীবীদের এই রকম ধাওড়া আছে শতাধিক। কয়েক হাজার মজুর, বউ-বাচ্চা-কুকুর-শুওর নিয়ে সেখানে অস্থায়ী আস্তানা পাতে। তারপর সেখানকার প্ল্যানটারের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ পুরো হলে, কিংবা বনিবনাও না হলে, অন্যত্র চলে যায়। সেখানেও ওমনি ধারার ধাওড়ার অভাব নেই। সুখ-সুবিধে সেখানেও একই প্রকার : কয়েক শো নরনারীর জ[illegible] [illegible]টো চান ঘর, একটা মেয়েদের, একটা পু[illegible] পনেরো জন মানুষের জন্যে একটা চৌবাচ্চা। শৌচাগার গুলোর সেই গৃহযুদ্ধের আমল থেকে আর ঝাঁটপাট পড়েনি। ধাওড়ার কেবিন থেকে শৌচাগার পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা ধাপার মাঠের বেহদ্দ।

এই সব কেবিনের জন্যে আবার কোথাও কোথাও মজুরদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়াও হয়, সর্বত্র নয়। ভাড়ার হার মাথা পিছু ডলার পাঁচেক, যা কিছু কম বেশি। এই সব ভাড়া কুড়িয়ে জায়গা বিশেষে হপ্তায় হাজার ডলার
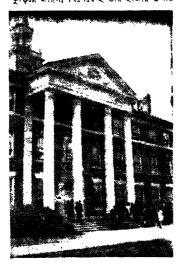
ইউনিভার্সিটির একটি বিল্ডিং : FREDERICK DOUGLAS স্মৃতি-মন্দির। মাথার ওপর Founder's Libraryর ঘড়িঘর। সোপানে একদল তরুণ নাগরিক

অবধি আমদানি হয়। অধিকাংশ, সব ধাওড়াতেই ভাড়া নেবার রেওয়াজ নেই। মজুরীর হিসেব হল : বোঝা পিছু দশ পনের সেণ্ট, আলু, শশা, ভুট্টা, টমেটো... ফসল হিসেবে দরের কিছু উনিশ-বিশ। মজুরদের প্রকৃত মালিক হল তাদের সরদার। খামার-মালিকের সঙ্গে রফা তার। পান থেকে চুন খসলে এই সব সরদাররা, মজুর-দের লিটার্যালি খাল খেঁচে নিলেও 'আহা' বলবার কেউ নেই। তাদের আধিপত্য, তাদের দাপট অপ্রতিহত, তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাই চূড়ান্ত। রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত, তাঁদের আঙুল, এত দুর্গন্ধ দূরেও পৌঁছোয়না। এলাকার কোতোয়াল তল্লাট মাড়ান না, সরদারের এত্তালা না পেলে। সরদারের চোখে মজুররা 'জানোয়ার', তিনি সেই নামেই ওদের ডাকেন। কাজকর্মে গাফিলতি দেখলে, খামোকা কথা বলে মুখ নষ্ট না করে—কিল-চড়, ঘুঁষি-লাথি, ছুরিচাকু-পিস্তল ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করেন। এঁদের সম্মান জ্ঞান অত্যন্ত টনটনে। শ্বেতাঙ্গ খামার মালিকরাও এঁদের সমীহ করেন, অন্তত মুখোমুখি (সরদাররা প্রায় সবাই নিগ্রো); কারণ এঁদের চটালে ভাড়াটে মজুর পাওয়া শক্ত হবে, এরা ঘোঁট পাকালে বাইরের মজুর আসতে সাহস করবে না; কারণ, এসব অঞ্চল একমাত্র প্রাকৃতিক ভূগোলের দিক থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত; অন্যথা শ্রমিক-যূথপতিদের হিসেবে একে মুক্তরাষ্ট্রও বলা চলে।

মজুর বা মুনিষ যাই বলুন, তাদের আয় হলো বুশেল পিছু পনেরো সেণ্ট, আর সরদারের লভ্যাংশ হলো দশ সেণ্ট। দিনের শেষে মাথা পিছু গড়ে দশ ডলার করে হলেও, সরদারের দৈনিক আয় হাজারখানেক ডলার হয়, কারণ কম করেও শ'খানেক লোক তার তাঁবে খাটে। কাজেই, সরদার 'মিস্টার টপহ্যাটের' পক্ষে ক্যাডিলাক-কণ্টিনেণ্টালে চড়ে, হীরের আংটি পরা আঙুল নেড়ে, শোফারকে হুকুম দেওয়া, কি তর্জনী ঘুরিয়ে মালিকপক্ষকে তম্বি করা, এমন কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।

ভ্রাম্যমাণ শ্রমজীবীদের এই নারকীয় জীবনযাত্রার খবর যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কানে ওঠেনি, তা নয়। তাঁরাও যে কিছু করতে চাননি, তাও নয়। কিন্তু সমাধান এত সহজ নয়। আঞ্চলিক আদালতগুলি অলংকৃত করে আছেন যাঁরা তাঁরাও প্ল্যাণ্টার ফার্মার সমাজেরই প্রতিনিধি। সেখানে রাজ্য কিংবা ফেডারেল সরকারের একজন কর্মচারী, বিধিগতভাবে কতটুকু প্রতিকার করতে পারেন? স্বাস্থ্য দপ্তরের কড়া নির্দেশ আছে, "হেন করতে হবে, তেন করতে হবে", কিন্তু সেসব বিধিনিষেধ পালি[illegible] [illegible] কী বিধান? [illegible] কাউণ্টি কোর্টে যাওয়া তো?

তা সেখানে কাদের বোলবোলাও? হাভাতে ভাড়াটে যাযাবর ক্ষেতমজুরেরও নয়, আর কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক দপ্তরেরও নয়। আর, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন, কিংবা খামার মালিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার দুঃসাহস আছে কার! কারুর না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, হাজার হাজার খেটে খাওয়া কালো মানুষ পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে রুজি-রোজগারে বাধ্য হচ্ছে, এদের অবরুদ্ধ ক্ষোভের সঞ্চিত বারুদ-গুলোর কী হবে? একটা দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল কেটে গেছে বলে, আবার একটা দীর্ঘতর, দুঃসহতর গ্রীষ্ম যে আসবে না, তারও তো গ্যারাণ্টি নেই।

ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি বড় বড় শহরে কালো বারুদের গুদাম ভরে উঠছে নিগ্রো-জাতীয়তাবাদীদের বিপ্লবের আড়তে মজুত হচ্ছে সর্বধ্বংসী বিস্ফোরক। এই আড়তদাররা গোটা দেশের আড়াই কোটি নিগ্রোর প্রতিনিধি নাই বা হল, তাবৎ কালো মানুষের দুর্দশার মূলধন নিয়ে, তাদের সাদাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে তাদের চেয়ে যোগ্যতর লোকও তো আর পাওয়া যাবে না। আর একথা তো জলবৎ স্বচ্ছ, যে কৃষ্ণকায়দের সমস্ত আধিভৌতিক দুরবস্থার মূলে যারা ছিল, তাদের গায়ের চামড়ার রঙটা সাদা। একথা তো সত্যি, যে শত কৃষ্ণপ্রেমিক হলেও, সাদা বনাম কালোর দাঙ্গা-লড়াই-ফৈজুদ্দিতে কোনো শ্বেতাঙ্গকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হলে তাকে শ্বেত-পক্ষেই যোগ দিতে হবে। কাজেই এই ধারণার ভিতটা যদি একবার গড়ে নেওয়া যায়, যে সাদারা তলে তলে কালো ধ্বংসের পরি-কল্পনা আঁটছে, তা হলে বাকিটা খুব সহজ। সামনে শুকনো ঘাস খড় তেতেই আছে: এ বছর সারা দেশের বেকার-খতিয়ান সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কারা? নিগ্রোরা। এশিয়ার অগ্নিকোণে আমেরিকা তথা আজাদ দুনিয়ার ইজ্জত রক্ষায় সবচেয়ে বেশি বলি যাচ্ছে কারা? এরও জবাব: নিগ্রোরা। অতএব ঝোপ বুঝে একবার কাঠিটা ধরিয়ে দেওয়ার দেরি। খাণ্ডবদাহন হতে সময় বেশি লাগবে না। ঘেটোয়-ঘেটোয় চলেছে তারই কখনো নিঃশব্দ, কখনো সঘোষ প্রস্তুতি।

রাষ্ট্রদেহের বিচক্ষণ ভিষকেরাও আজকাল 'ঘেটো' নামক গ্রন্থিস্ফীতির দিকে ভীতি ও উদ্বেগের দৃষ্টিতে দেখছেন। কে জানে কোথায় আলোর অগোচরে, ম্যালিগন্যাণ্ট বীজাণুরা পুষ্ট হয়ে উঠছে। ওয়াশিংটনের ঘেটো এলাকার ছোটখাট দোকানদাররা সন্ত্রস্ত, তাদের কারবার বুঝি গোটাতে হল। লুঠতরাজ, দাঙ্গা-ছিনতাই, ডাকাতির ক্ষতি-পূরণের বন্দোবস্ত উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে। বীমা কোম্পানীরা নোটিশ দিয়েছে, এই সব এলাকায় উপদ্রব বীমা বাতিল; কিংবা এমন দরের প্রিমিয়াম হাঁকছে, যে তাকে নিদেন হাঁকাও বলা যায়। কোনো কোনো দোকানী গাঁটের কড়ি খরচ করে ভাঙা দরজা-জানালা সারিয়ে নেওয়া, ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেবার চেয়ে সুবিধেজনক মনে করছে। এই সব দোকানের মালিক, ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক পক্ষের বৃহদংশই কিন্তু নিগ্রো। সেখানে শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে অন্তর্ঘাতী সংঘর্ষ বাধছে। উগ্রপন্থী কৃষ্ণ-সংগঠকদের হাতে এর কিছু প্রতিকার আছে, এমন মনে হয় না। দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে ওয়াশিং-টনের মতন বড় শহরে অবাঞ্ছিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা যদি বেধেও ওঠে, তাকে সাম্প্রদায়িক চেহারা দেওয়া শক্ত হবে, কারণ এক শ্রেণীর নিগ্রোদের একটি বড় দল, দাঙ্গাবাজ নিগ্রো-দের সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় বিরোধিতায় অংশ নেবে।

কালোর দোকানের কোলে দাঁড়িয়ে সাদা 'হ্যাণ্ডনট্' কাগজ বেচছে

না, বর্ণগত বিবাদকে পুঁজি করে যারা আবার একটা গৃহযুদ্ধ বাধাবার হুমকি দিচ্ছে, তাদের পথ নিষ্কণ্টক তো নয়ই, বরং সে পথে একের পর এক এমন বড় বড় অন্তরায় খাড়া হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সাফল্যলাভ করতে তাদের বিষম বেগ পেতে হবে। দু'টি রাজ্যের দু'টি বড় শহরের মেয়র নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন নিগ্রো প্রার্থী। ওহায়োর ক্লিভ্ল্যাণ্ডে—নিগ্রো কার্ল স্টোকস, ইণ্ডিয়ানার গ্যারিতে নিগ্রো রিচার্ড হ্যাচার। অথচ দু'টি কেন্দ্রের নির্বাচনপর্বেই ছিল চরম বর্ণগত উত্তেজনা—ব্যাকল্যাশ, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের ঘোরতর কৃষ্ণবিদ্বেষী প্রচারণা। এটা নিঃসন্দেহে একটা গণতান্ত্রিক জয়লাভ; কাজেই মারমুখী কালোরা, যারা ছলছুতোয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মুখে কালি দিচ্ছে, এতে তাদের নিজেদের মুখেও কিঞ্চিৎ চুন পড়লো। ঘটনাস্রোতের বিভিন্ন মুখী প্রবাহে যেমন প্রচুর জল ঘোলাটে হচ্ছে, যেমন নিত্যিনতুন সমস্যা গজিয়ে উঠছে, তেমনি এর একটা শুভ দিকও দেখা দিচ্ছে। আমার মনে হয়, বর্ণ-বিরোধকে দানা বাঁধিয়ে সাদা-আর-কালো এই দুই সমষ্টিকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে রেখে, মাঝখানের ফাটলকে প্রশস্ত ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলার কাজটা আজ আর সহজ নয়। আজ প্রত্যেকটি ফ্রণ্টে, বিবাদ-বিসম্বাদগুলো এমন বহু মুখী বিষফোড়ার মতন ঠেলে উঠছে, যাতে শ্রেণীগত বা বর্ণগত বা ধর্মগত সংহতির নামে জিগীর তোলার চেষ্টা বানচাল হয়ে যাবে। কিসের ধুয়ো তুলবেন? কালোরাই মার্কিন সমাজের গরীব শ্রেণী, সাদারা পুঁজিপতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক, বড় বড় চাকরি সাদাদের একচেটে, কালোরা কেবল মুটেমজুর, মুচিমেথর, জুতো পালিশ আর খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা ইত্যাদি সব কথা ভয়ংকরভাবে সত্যি। কিন্তু লক্ষপতি কালোর দোকানের সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সাদা 'হ্যাণ্ডনট্' কাগজ বেচছে, মাতাল ভিখিরি শ্বেতাঙ্গ, বিত্তবান গৃহস্থ নিগ্রো ভদ্রলোকের গাড়ির সামনে এসে একটা ডাইম অনন্তকালের জন্যে 'ধার' চেয়ে বিরক্তিভাজন হচ্ছে, এ দৃশ্য দেখতে আপনাকে স্বপ্নচারী হতে হবে না, পথে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন। দাঙ্গার দিনে কালোর দোকান কালোর লুটেছে, সাদার দোকানে হামা দিয়েছে কালো গুণ্ডার সাদা স্যাঙাৎ, এ তথ্যও কাল্পনিক নয়। এর মধ্যে কোনটাকে আপনি রেস্যাল ইস্যুতে তুলে ধরবেন।

কালো মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পৈগামবার মহামান্য এলিজা মুহম্মদ, উত্তর আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে তাঁর যে শ্বেতপত্র পেশ করেন, তার মধ্যে কয়েক দফা জোরালো শর্ত ও দাবি-দাওয়া ছিল। তাঁর অন্যতম দাবি ছিল: ন্যায়বিচার—বঞ্চিত নিগ্রোর নিরাপত্তা ও সুবিচার লাভের সমাধিকারকে সুরক্ষিত করতে হবে। তিনি বলেছেন, এ দেশে কালোরা বিচার পায় না। অথচ জর্জিয়ার গ্রিফিন শহরে, নিগ্রো গীর্জা লুণ্ঠন এবং নিগ্রোকন্যা ধর্ষণের দায়ে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ কিশোরের গ্রেপ্তার ও হাজতবাসের খবরটা অন্যান্য কাগজের মত তাঁর কাগজেও প্রকাশ পেয়েছিল। এই একটি ঘটনাই এলিজার অভিযোগকে খণ্ডন ও তাঁর দাবিকে অনাবশ্যক করার পক্ষে যথেষ্ট। আমেরিকার দু' কোটি নিগ্রো বাসিন্দার জন্যে এলিজা একটি স্বতন্ত্র, সার্বভৌম 'কৃষ্ণস্থান' দাবি করেছেন, সে এই মহাদেশেই হোক, বা অন্যত্রই হোক। তিনি বলেছেন, "চার শো বছর ধরে যারা আমাদের গোলাম করে রেখেছে, অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে, তারা, তাদের বংশধরেরা হঠাৎ রাতারাতি আমাদের 'ভাই-বন্ধু' হয়ে যাবে, একথা বিশ্বাস করার কোনো হেতু নেই। এটা একটা চূড়ান্ত ধাপ্পাবাজি। আলাদা বাস করাই আমাদের কাম্য, আর এতেই আছে স্থায়ী শান্তি। আমাদের পূর্ব-পুরুষের রক্তে স্বেদে যে-মাটি সোনা হয়েছে,

তার যে কোনো সম্মুখ এলাকার স্বয়ংশাসিত হয়ে বসবাস করাই আমাদের দাবি।"

তাঁর এ দাবির সাফল্যে আমার সন্দেহ আছে। কারণ, এতে শ্বেতকায়রা তো দূরে থাক কালোরাও রাজি হবে না। নিগ্রো নারী সমাজের জন্যে এলিজা চেয়েছেন: পৃথক শিক্ষা কেন্দ্র, উভয় অর্থেই। অর্থাৎ প্রথমত তারা কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বারা পরিচালিত কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষামন্দিরে পড়বে, দ্বিতীয়ত উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের পুরুষ-বর্জিত শিক্ষায়তনে পাঠাতে হবে। আর জোরালো আপত্তি জানিয়েছেন অসমবর্ণ বিবাহে। ডীন রাস্কের জামাইকে এলিজা হয়ত অধঃপতিত মনে করছেন, তবে বহু শ্বেতাঙ্গ যুবকই তার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত; কৃষ্ণাঙ্গরাও যে নয়, হলফ করে বলা যায় না। আবার এর বিপরীত ছবিতে দেখছি, বেশ কয়েকজন প্রতিভাময়ী কালো মহিলা শ্বেতাঙ্গ স্বামী নির্বাচন করেছেন। এলিজা মুহম্মদের বাণীতে তারা কেউ কর্ণপাত করেন নি। কৃষ্ণ-জাতীয়তাবাদীদের কথাতেও না। 'তুমি কালো, আর কালো বলেই তুমি সুন্দর'—এই বলে তাঁরা কোনো অসিতবরণকে মাল্যদান করেন নি। অথচ তাঁরা বুদ্ধিমতী। বিদূষী এবং দূরদর্শিনী।

আসলে, মুখ্যত নারী অধ্যুষিত নিগ্রো সমাজে পুরুষের ভূমিকা, কোথাও বশম্বদ, কোথাও দায়িত্বহীন, পলাতক অথবা হীনম্মন্য। কাপুরুষ। অবিশ্যি একটা গড়পড়তা হিসেব ধরে এটা বলা হচ্ছে। কৃষ্ণ সমাজের সর্বত্রই যে এই একই চিত্র দেখা যাবে এমন নয়। ধরুন, আজ গোটা যুক্তরাষ্ট্রে ষাট লক্ষ শিশু রয়েছে যারা আংশিক অনাথ; তারা এমন পরিবারে বাস করছে, যেখানে হয় বাপ নেই, নয় মা নেই। আর পিতৃহীন সংসারের সংখ্যাই বেশি। আবার এদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশই নিগ্রো শিশু। যেসব মা-রা বিধবা হয়েছেন, আর আবার বিয়ে করেন নি, তাদের একেবারে হিসেবের বাইরে রেখেও দেখা গেছে: ওয়াশিংটন শহরেই শতকরা সাড়ে তেইশজন নিগ্রো মহিলা স্বামী পরিত্যক্তা বা বিবাহ-বিচ্ছিন্না, ক স্বেচ্ছায় প্রোষিতভর্তৃকা; শিকাগোয় এই সংখ্যা—সাড়ে তেইশ; নিউইয়র্কে তিরিশ; ফিলাডেলফিয়ায়—পঁচিশ; বস্টনে—সাড়ে তেইশ। রাজধানীতে অবৈধ শিশু জন্মের হার, গত এক দশকে শতকরা আঠাশভাগ বেড়েছে। এই সব অনাথ পিতৃ পরিচয়হীন শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর সবাই কিছু সত্যকাম হয়ে উঠবে না। কী হবে? হবে—বিশ্বত্রাস, শ্বেতাশ্বেত নির্বিশেষে। কিংবা জীবনভর একটা অব্যক্ত অভাববোধ বহন করে করে বড় হবে, নির্মম হবে, নিউরোটিক হবে কি হৃদয়হীন হবে। ঘরে মাতৃতন্ত্রের প্রভাবে, ছেলের চেয়ে মেয়েকে বেশি কর্মঠ করে গড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হয়। বাইরে, লেখাপড়া বা চাকরির জগতেও নিগ্রো মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অগ্রবর্তিনী। প্রবেশিকোত্তর নিগ্রো ছাত্রছাত্রীদের জন্যে, যে বিশেষ কৃতিত্বের, বিশেষ কুশলতার পারিতোষিক বা উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, শতকরা সত্তর থেকে নব্বুইটি ক্ষেত্রে মেয়েরাই সে সুযোগ লাভ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতর শিক্ষায়তনে নিগ্রো ছাত্রীর সংখ্যা, নিগ্রো ছাত্রের তুলনায় অনেক বেশি। তার মানে, ভাল কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার দিক দিয়ে নিগ্রো ছেলেরা তাদের নিজের সমাজের মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। সংক্ষেপে, মার্কিন সমাজ সংস্কৃতির সব কটা ধাপে নিগ্রো পুরুষের ভূমিকা—পরাজিত সৈনিকের। ছাত্র হিসেবে, স্বামী হিসেবে, পিতা হিসেবে, নির্ভরযোগ্য কর্মী হিসেবে তার কোনো অন্য যোগ্যতা কোথাও স্বীকৃতি পাচ্ছে না। এর পর তার কাছে পরিবার বলুন, সমাজ বলুন, রাষ্ট্র বলুন কী প্রতিক্রিয়ার আশা রাখতে পারে, ধরনের অবক্ষয়ের প্রবণতা ছাড়া? গোটা ব্যাপারটা একটা চক্রের আকারে দুর্দৈবের চারপাশে ঘুরছে। অপরাধী, অক্ষম, জীবন্মৃত পিতার অস্তিত্ব, কিংবা আদৌ অনুপস্থিতি, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে নিগ্রো সমাজের ছেলেদের দুর্বল ও ভঙ্গুর করে দিচ্ছে। উত্তরকালে, দায়িত্বজ্ঞান বা দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য অর্জন না করেও, তারা নেহাতই জৈবিক কারণে সংসার করছে, সন্তানের জনক হচ্ছে। তারপর একদিন, সব ছেড়ে [illegible] এই পলায়নের [illegible] থেকে গৃহিণীতে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে নারীর উচ্চাধিকার ও প্রাধান্যের যৌক্তিক প্রতিষ্ঠা এবং পুরুষের প্রতিষ্ঠাহানি; ঘরে-বাইরে তার ধাপেধাপে মর্যাদাহানি। আবার সেই সঙ্গে একটা সুযোগের কথাও তার মনে কাজ করে। পিতৃহীন পরিবারের পক্ষে বাইরের সাহায্য পাওয়ার সুবিধে আছে। পরিবারকে এই

সুবিধা দেবার সংকল্প নিয়েও বহু নিগ্রো পুরুষ স্বেচ্ছায় ঘর ভাঙে। তাদের আর কিছু না থাক, পরিবারের প্রতি ভালবাসা অস্বীকার করা যায় না। সে যাই হোক, অধিকাংশ পিতৃহীন পরিবারের সন্তানেই ভবিষ্যতে সমাজের অবাঞ্ছিত শ্রেণীর পঙক্তি-ভুক্ত হয়েছে, একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষার ত্বরিৎ নিবৃত্তির পিপাসা নিয়ে। আর ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এদের মধ্যে বৃহদংশই কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ। এর জড় রয়েছে দূর অতীতের গর্ভে। যখন শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা নিগ্রো ক্রীতদাসকে মানুষের জন্মগত প্রত্যেকটি অধিকার থেকে সযত্নে বঞ্চিত রেখে রেখে তাদের অস্থিমজ্জা চরিত্রে জড়ত্বের পঙ্গুত্বের বিষ চারিয়ে দিয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মেই, নিগ্রো স্ত্রীলোক হয়ে উঠেছে বেশি প্রখর, আত্মরক্ষায় সন্তানের জীবন রক্ষায় বেশি তৎপর। দায়িত্বপালনে বেশি সচেতন। নিগ্রো সমাজে মাতৃতন্ত্র গড়ে উঠেছে। চিন্তায়, আচরণে চরিত্রে, অভ্যাসে নিগ্রো পুরুষ মক্ষিকাকুলের 'ড্রোণ' হয়ে পড়েছে। পরিণামে —নিজের অর্ধাঙ্গের কাছ থেকে (আক্ষরিক অর্থে বেটার-হাফ) দয়া, অনুকম্পা, অবজ্ঞা, প্রত্যাখ্যান... পীড়ন... নিজের আত্মজের কাছ থেকে উপেক্ষা আর তাচ্ছিল্য পেয়ে পেয়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আজ সেই আগুনেরই হলকা লাগছে সাদা-কালো-মেটে-বাদামী-নির্বিশেষে সমগ্র মার্কিন জনসমাজের গায়ে। অপরেরই, এ অনিবার্য। কাটা চামড়া পড়ে কালো হয়ে উঠলেও উপায় নেই।

খুব সতর্ক পদক্ষেপ, খুব সুবিবেচিত পরিকল্পনা, একান্ত অকপট সেবা এবং অকম্প্র সত্যোপচার—এই কার্বাংকলের মূলোৎপাটন করতেও করতে পারে। লোকপরম্পরায় শোনা গেল, ওয়াশিংটনের ওয়াশিংটন একজন পাকা মানবিক। রাজধানীর এই নতুন 'মেয়র'কে আমি তাই অভিনন্দন জানিয়েছি। তাঁর আলো প্রখর হোক। তাঁর অন্ধকার ক্ষীণায়ু হোক। শুভমস্তু!

✻

ভিয়েৎনামের ব্যাপার নিয়ে সরকারের নীতির রূঢ় নিন্দে অনেকেই করছেন। কিন্তু তাঁদের কারুর লক্ষ্য এক নয়, বক্তব্য নয় অভিন্ন। দেশে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের বন্দোবস্ত করে অন্য দেশের সামরিক প্রয়োজনে বিপুল অর্থ ব্যয় যাঁদের অপছন্দ, ব্ল্যাকপাওয়ার পন্থী যুদ্ধবিরোধীদের সংগে তাঁদের কোনো আত্মিক বা সাংগঠনিক, এমন কি নীতিগত ঐক্য নেই; ড্রাফ্‌টবিরোধী তরুণদের মধ্যেও ঘটেছে বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদের সমন্বয়। নির্যাতিত কৃষ্ণাঙ্গদের মুসলমান মুখপাত্র মনে করেন এ যুদ্ধ তাঁদের ধর্মবোধের পরিপন্থী; মননশীল শ্বেতাঙ্গ তরুণ বলেন, এ যুদ্ধ মানবতার বিরোধী; শ্বেতাশ্বেত নির্বিশেষে ছাত্রসমাজের বিপুল এক অংশ একে তাদের জীবন, স্বার্থ ও নিরাপত্তার হত্যাকারী বলে বিবেচনা করে; সুধী

রাস্তার পাশেই খোলা বাজার। তরিতরকারি বেচাকেনা হচ্ছে। পাড়াটা গরীব নিগ্রোদের। দু'চার ঘর সাদাও অবশ্য থাকে

সম্প্রদায়, যাঁরা যুদ্ধকে সমাধান বলে ভাবেন না, তাঁরা একে একটা সর্বাত্মক ও বীভৎস অপচয় বলে ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু, সেদিনকার বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের অবিশ্বাস্য তরঙ্গ গর্জনে: "হেল্‌ নো, উই ওণ্ট গো"...এই সম্মিলিত ধ্বনিতে কোনো কণ্ঠকে আলাদা করে চেনার উপায় ছিল না।

আর, সেদিন মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলা আকাশের নিচে, পুণ্যশ্লোক লিংকনের মূর্তির পাদপীঠে দাঁড়িয়ে যে হাজার হাজার আমেরিকান গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের বহু-রোহিত শপথ বাক্যে প্রাণ দিচ্ছিল, বিক্ষোভের আগুনে স্বাধীনতার অধিকারকে ঝলসে নিচ্ছিল... দিনের শেষে, তাদের রক্তের ধারা স্নানে শীতকাতর সন্ধ্যার মাটি আরো স্যাঁতসেঁতে, হিমেল বাতাস, আরো করুণ, আর মর্মরসোপান শ্রেণীর অনেক উঁচুতে, স্তম্ভিত বেদীর আসনে, মৃত্যুঞ্জয়ী লিংকনের মুখ আরো বিষণ্ণ, মাথা আরো অবনত হয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধ বিরোধী গণবিক্ষোভে যে নিগ্রো যোগ দেয়নি, সে কেন দেয়নি? যে নিগ্রো শ্বেতাঙ্গ সমমর্মীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমস্বরে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিল, সে-ই বা কেন করেছিল? কেউ পলাতক সৈনিকের ভূমিকা নিলো, কেউ রক্ত দিয়ে প্রতিবাদের দাম বাড়ালো, এমনই বা হলো কেন? মনে হয় এর একটাই জবাব: আজ আমেরিকার আড়াই কোটি কালো মানুষের লক্ষ্য এক নয়, পতাকা এক নয়, স্বার্থ এক নয়। ক্রোড়পতি কালো বণিক, আর মিসিসিপির বুভুক্ষু পরিবারের নিঃসম্বল জননীর সমস্যা আলাদা। এলিজা মুহম্মদ আর মার্টিন লুথারের ধর্মও এক নয়। তার ওপর নিত্যি-নতুন ঘটনা ঘটছে, পথ কোথাও পিচ্ছিল হচ্ছে, কোথাও বিসর্পিল হয়ে বিপজ্জনক মোড় নিচ্ছে। বিশ্ববিশ্রুত শান্তিপন্থী, নোবেললরিয়েট মার্টিন লুথার কিং, এতদিনকার গান্ধী শিষ্য, এখন ক্রমেই অহিংসার নীতিতে আস্থা হারাচ্ছেন। ইদানীং বেশ কিছু গরম গরম কথা বলেছেন, হালে কারাবাসও করে এলেন। অন্য দিকে কালো মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রতি শ্বেত-

[illegible] আপেক্ষাকৃত ভাল হাতে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা নিজেদের দেশে বাজাতে চাইছেন, [illegible] [illegible] মডেল রেখে। ওয়াশিংটনের [illegible] কৃষ্ণ বণিক সমাজের আদর্শ ঃ [illegible] ধনিক শ্রেণীর সাফল্য ও সাচ্ছল্য। বেল্‌জোনিয়র স্বামীহীনা মিসেস শ'র পাঁচ বছরের মেয়ের পেটে দীর্ঘ দিনের অনশনের দরুণ যা থেকে কতটা রক্তপাত হয়, তার হিসেব কে রাখবে? তাদের পরিবারের মাসিক [illegible] পাঁচ কৌটো আসে, কিংবা খানিকটা চাল-ডাল। ওহায়োর কোন শহরে সাদা প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়ে নিগ্রো মেয়র হয়েছে, সে খবরে তার উল্লাসই বা কিসে আসবে, মহম্মদ আলির কারাবাসে তার বিষাদই বা কেন হবে? ওরা শ' পরিবারের কে?

আমেরিকার [illegible] শ্রেণী-সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। [illegible] সমৃদ্ধির প্রসাদপুষ্ট স্যাদারা (এবং কালোরাও কেউ কেউ) এর হেতু বুঝতে চান না। তাঁরা অবাক হয়ে ভাবেন ঃ ওরা, অর্থাৎ ওই অশান্ত কালোরা কী চায়? খুবই ন্যায্য জিজ্ঞাসা।

এক সুধী ব্যক্তি একবার বলেছিলেন ঃ "গায়ের চামড়া সাদা হওয়ার দায়ে এদেশে কাউকে না খেয়ে থাকতে হয়নি। কিন্তু রঙ কালো হওয়ার অপরাধে বহু মানুষকে ভুখা মরতে হয়েছে।"

"ওরা কী চায়?" এই প্রশ্নের জবাবে আমার ওই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। আমার বোধ হয়, ওই জবাবটা দেবার জন্যেই ঘেটোয় ঘেটোয় এত অনিদ্রা!

*

ভারত মানেই অন্নাভাব, শস্যহানি, জন-স্ফীতি কিংবা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা... ভারতের দীপ্তিময়ী প্রধানমন্ত্রী, সুপণ্ডিত রাষ্ট্রপতি, অথবা ঝাকপটু উপপ্রধানমন্ত্রী আমেরিকায় এসে, হয়ত তাঁদের ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যে—ঐ অনুকম্পার ধারণা আংশিক-ভাবে দূর করে থাকতে পারেন, আমি সঠিক জানিনা। কিন্তু, এদেশে ভারতের 'এমন নাগরিকও আছেন, যাঁর দৌত্যে, আমেরিকার জনমানসে—ভারত মানেই মহিমা, ভারত মানেই আত্মার গভীর ঐশ্বর্যের জয়ধ্বনি, ভারত মানেই চিরায়ত আনন্দের অথৈ মহা-সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস...ভূগোলের কলুষ-কলংকিত সীমান্তের বহু ঊর্ধ্বে ভূমার আহ্বান...ভারতের এমনই একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে। মানুষটির নাম রবিশংকর।

সেদিন সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের কনস্টিটিউশন হলে সংগীতের অনুষ্ঠানে ছিল ঃ ভারতীয় কনসার্ট। রাত সাড়ে আটটায় ভেতরে ঢুকলুম। অডিটোরিয়ামে তখন একটি আসনও শূন্য নেই। কয়েক হাজার শ্রোতার অনুচ্চ সংলাপের ওপর যবনিকা নামিয়ে প্রেক্ষাগৃহের মাথার ওপরকার সব কটি প্রচ্ছন্ন আলো একে একে স্তিমিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত একটা হালকা কমলা রঙের আভাস জাগিয়ে রাখলো। কেবল হলের নৈঋত কোণ থেকে একটা জোরালো রশ্মি সোজাসুজি এসে মঞ্চের ওপর স্থির হয়ে রইলো। মঞ্চে একটি কাঠের বেদী, বেদীর ওপর গোলাপী গালচে। ডায়াসের পেছনকার আলো-আঁধারি পেরিয়ে প্রথমেই মঞ্চে এলেন একটি নারীমূর্তি, পরনে গেরুয়া রঙ শাড়ি, খোঁপায় জড়ানো মালা, একহাতে ধূপদানি, তাতে পাঁচটি ধূপ অন্য হাতে তানপুরা। বেদীর ওপর ধূপকাটি সাজিয়ে, তানপুরাটি একপাশে রেখে ঈষৎ নত হয়ে ভারতের মেয়ে কমলা দেবী, ভারতের নিজস্ব ভঙ্গিতে সমবেত শ্রোতাদের অভিবাদন জানালেন।

নিস্তব্ধ সভাকক্ষে এক ঝাঁক পায়রা যেন কলকূজনে মুখর হয়ে উঠলো। প্রায় আধ মিনিট ধরে শ্রোতারা করতালি বাজালেন।

একবার শুনলেই
মন কেড়ে নেবে
এই
নতুন ধারার
রেডিও!
ফিলিপস সোনোর‍্যামিক
রেডিও
গড়নে ও ধ্বনিতে নতুন ধারা : ফিলিপস
সোনোর‍্যামিক রেডিওর আওয়াজ ধ্বনির
জগতে এক নতুন দিগন্ত। কী গমগমে
জমাট আর অবিকল প্রাণবন্ত। কাছাকাছি
ফিলিপস বিক্রেতার দোকানে আজই এসে
দেখুন কত রকমের ফিলিপস সোনোর‍্যামিক
রেডিও! প্রত্যেকটিই আপনার চোখে
ধরবে এমন ছিমছাম সুন্দর গড়ন! ১২৫৲
টাকা থেকে ৭৪৮৲ টাকা দামের মধ্যে
পাবেন ফিলিপস সোনোর‍্যামিক রেডিও
—যে দামেরই কিনুন—সেরা জিনিস হবে।
কেনার পরেও সার্ভিসের পাকা ব্যবস্থা:
ভারতের সর্বত্র ফিলিপস-এর অনুমোদিত
বিক্রেতা রয়েছেন। রেডিও কেনার পর
গ্যারান্টির মেয়াদ যতদিন থাকবে ততদিন
থেকে বিনামূল্যে সার্ভিস পাবেন।
PHILIPS
ফিলিপস
সোনোর‍্যামিক রেডিও
কিনে নতুনকে বরণ করুন

দিন রাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আঠাশ

টালিগঞ্জের সরকারী হাসপাতালে পরদিন খুব সকালে নবীন মারা গেল। জোসেফ অনন্ত কালী হারকু সাহেবের কথামতন সারা রাত অপেক্ষা করছিল হাসপাতালের বারান্দায়, যন্ত্রণার কোন চিৎকার বার হয় নি নবীনের মুখ দিয়ে। অনিশ্রান্ত রক্তপাতের ফলে তার শিরা-উপশিরা ঝিমিয়ে এসেছিল। মধ্যরাতের পর থেকেই তার জ্ঞান ছিল না। মৃত্যুর পর একটা সাদা চাদরে তার দেহ ঢেকে রাখা হল।

ভোরের হাওয়া সিরসির করছিল কালী জোসেফ আর অনন্তর গায়ের ওপর। সারা রাত ঘুম না হওয়ার জন্যে গলা শুকনো, হাওয়ায় তন্দ্রার মতন মনে হচ্ছিল—তখন জুতোর খটখট শব্দ করে নার্স এসে দাঁড়াল, কোন ভূমিকা না করে খুব অল্প কথায় বলল, "আপনাদের পেশেণ্ট মারা গেছে।"

ওরা তিনজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল। চমক ঠিক নয়, কেননা কাল রাতেই ওরা বুঝে নিয়েছিল আর কোনদিনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে না নবীন—বেঁচে উঠলে বিকলাঙ্গ হয়ে থাকবে—তা হলেও নার্সের মুখ থেকে নবীনের আকস্মিক মৃত্যুর কথা শুনে তীব্র একটা উত্তেজনায় হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াবার সময় হাসপাতালের নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চ উলটে পড়ে গিয়েছিল।

নার্স ক্লান্ত, ঈষৎ বিরক্তও। সে চলে যাচ্ছিল, শব্দ শুনে অপ্রসন্ন মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "একটু আস্তে।"

জোসেফ বলল, "ভেতরে যাব মেমসাব?"

"এখন না, আটটার পরে আসবেন। ডেড বডি আপনাদের দেওয়া হবে কি পোস্ট-মর্টেম হবে, আমি জানি না।"

নার্স চলে যাওয়ার পরেও আর কয়েক মুহূর্ত হাসপাতালের লম্বা বারান্দায় নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জোসেফ কালী আর অনন্ত। মৃত্যু, দুর্ঘটনা এবং রাতারাতি দেহের বিকৃতি সার্কাসের মানুষের কাছে হয়তো কিছুই না, নম্বর করবার মতন এ খবরের জন্যেও তারা সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকে, কিন্তু কাল রাতে—মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে একটা মানুষ ছিল তাদের পাশে, তাদেরই মতন সুস্থ ও সবল—আজ একটু দূরে ঘরের ভেতর পড়ে আছে তার মৃতদেহ—এখনো বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

নার্স অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে এখন খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে জোসেফ অনন্ত আর কালী হাসপাতালের বারান্দা পার হয়ে যাচ্ছিল। যে বেঞ্চ উলটে গিয়েছিল, আসবার সময় খেয়াল করে তা আবার ঠিক করে রেখেছিল ওরা। চারপাশে ওষুধের কড়া গন্ধ, কোন কোন ঘরে থেকে থেকে দু-একবার রুগী চিৎকার করে উঠছিল। ওরা কথা বলল না—ট্রাম-লাইনের পাশে খুব সরু রাস্তা ধরে সাবধানে কয়েক পা হেঁটে সার্কাসের জমির গেটের ভেতরে ঢুকল।

আর কাউকে নয়, সবচেয়ে আগে খবর দিতে হবে হারকু সাহেবকে। তিনজনকে হাসপাতাল থেকে ফিরতে দেখে কেউ কেউ এগিয়ে এল তাদের কাছে, নবীনের খবর জিজ্ঞেস করল। শুকনো হাসল জোসেফ, "পরে শুনবি, আগে শুনুক ছোট মালিক—"

এত সকালে অন্য দিন ঘুম ভাঙে না হারকু সাহেবের। আজ এক পায়ের ওপর আর এক পা দিয়ে শুয়ে থাকলেও তার চোখ খোলা। জোসেফ অনন্ত আর কালী তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তাদের দেখে উঠে পড়ল হারকু সাহেব এবং তারা কিছু বলবার আগেই শব্দ করে গলা পরিষ্কার করে একটা ভীতি কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, "সব ফিনিশ?"

"হ্যাঁ।"

হারকু সাহেব খাট থেকে নামল, পিছনে দু হাত রেখে খুব তাড়াতাড়ি তাঁবুর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আপন মনেই বলল, "বেচারা!"

জোসেফ বলল, "আপনাকে হাসপাতালে একবার যেতে হবে—"

"জরুর যাব। এ অনন্ত, সুবলবাবুকে বোলাও। আভি বিলাইয়ার বাবুকে খবর ভেজাতে হবে।"

ভোরবেলা সার্কাসের ছোট ছোট সব তাঁবুতে হাওয়ার মতন নবীনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে গেল। এই সাংঘাতিক খবর চেপে রাখা যায় না। সকলের সামনে আহত হয়েছে নবীন—নিহত হয়েছে। হারকু সাহেবের মনে হচ্ছিল হঠাৎ সব গোলমাল থেমে গেছে, চারপাশ বড় চুপচাপ। এবং সে একটা প্রচণ্ড আর্তনাদের আশংকায় লীলার তাঁবুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

হয়তো এর মধ্যেই খবর পেয়ে গেছে লীলা—হাসপাতালে ছুটে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। একটা অপরাধ-বোধ হারকু সাহেবকে আতঙ্কগ্রস্তের মতন করে তুলেছিল—যেন নবীনের মৃত্যুর জন্যে লীলা তাকেই দায়ী করবে। তাকে শান্ত করবার জন্যে হারকু সাহেব তার কাছেই যাচ্ছিল।

হাঁটুর ওপর থুতনি ঠেকিয়ে বড় স্থির হয়ে মাটিতে বসেছিল লীলা। তার চোখ শুকনো, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্তের মতন। এক দিকে

বড় চায়ের ভাঁড়, অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে। কাগজের ওপর কয়েকটা সস্তা বিস্কিট—খুব সকালে কাউকে দিয়ে আনিয়েছিল লীলা—এখনো সেসব স্পর্শ করেনি।

হারকু সাহেবকে দেখে লীলার চোখ দুটো হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে এল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সে এক হাতে চায়ের ভাঁড় এবং অন্য হাতে বিস্কিট তুলে নিয়ে বলল, "খান।"

কঠোর এবং দুঃসাহসী হারকু সাহেব বেশী সময় লীলার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। তার মনে হচ্ছিল এখনো কিছু শোনেনি লীলা। নিজের বুক শক্ত করে চেপে সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করতে করতে হারকু সাহেব কিছু দূরে নবীনের একটা আবীর-লাগা রঙিন শার্ট দেখল, "ভাবড়াবি না লীলা, একটা খারাপ খবর শোন—"

হারকু সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই খুব শান্ত স্বরে লীলা জিজ্ঞেস করল, "শ্মশানে কখন নিয়ে যাওয়া হবে হারকু সাহেব?"

লীলা আস্তে কথা বললেও একটা বড় আঘাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল হারকু সাহেব, তার দৃষ্টির অর্থ বোঝবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "তুই যাবি হাসপাতালে?"

লীলা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়বার মতন শব্দ করল, "নাঃ, সে তো আর নেই—" হারকু সাহেব চা-বিস্কিট নিল না দেখে সে তা আবার নামিয়ে রেখে নরম গলায় বলল, "ভীতু মানুষটাকে কেন তুমি রিং মাস্টার করে দিলে হারকু সাহেব? যার একটুকু সাহস নেই সে কি বাঘের সামনে দাঁড়াতে পারে?"

লীলার গলায় কান্না ছিল না, হারকু সাহেবকে দায়ী করার কোন প্রকাশও ছিল না, তার স্বর একটা মৃত মানুষের প্রতি করুণায় আর্দ্র—হারকু সাহেব লীলার মন বুঝল না। তাকে এখনো স্থির ও শান্ত থাকতে দেখে সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছায় সে বলল, "সাহস দেখাল বটে নবীন, ভীতু মানুষ কে না! মরল, লেকিন বাঘ মানবার হিম্মত তার ছিল রে লীলা।"

নবীনের মৃত্যুর খবর টুনিমাসীর মুখে প্রথম শুনেছে লীলা। তাকে শক্ত করে চেপে ধরে আপনজনের মতন অকৃত্রিম সমবেদনার কথা বলছিল টুনিমাসি। সে-ও ভেবেছিল লীলা চিৎকার করে কেঁদে উঠবে। স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে সব মেয়েই ভেঙে পড়ে, দিশা হারায়। লীলা কাঁদতে পারল না। সে জানত, সেই এক কথা শোনাতে হারকু সাহেব তার কাছে নিশ্চয়ই আসবে। এবং সে এখন তাকে ঈষৎ বিচলিত হতে না দেখে ভালবাসছে কি ঘৃণা করছে, লীলা বুঝতে পারল না।

হারকু সাহেব বলল, "উপরওয়ালার যেমন খুশ তেমন হবে, তুই ঘাবড়াবি না লীলা।"

"না।"

"আমি এখন হাসপাতালে যাচ্ছি, তোর কী দরকার আমাকে বলবি—কোন ভাবনা করবি না।"

লীলা দু'এক পা এগিয়ে এসে কিছু দূরে বাঘের খাঁচা দেখতে দেখতে রুক্ষ নীরস স্বরে বলল, "[illegible] চাই আমার—"

"কী বললি?"

"বিধবা হলাম না" হারকু সাহেবের [illegible]

পারে না? মহা-মাংস—এ সব কিছু? আর [illegible]"

"চুপ কর লীলা। এখন কিছু করবি না—" লীলার তাঁবুর কাছাকাছি [illegible] মানুষ এসে জড়ো হয়েছিল, হারকু সাহেব ছিল বলে তারা ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করছিল, হারকু সাহেব সকলকে ডাকল, "ভিতর আসুন, এর সাথে বাতচিত বলেন, বেচারার বড় কষ্ট হল!"

একটা মৃত্যু কিছু সময়ের জন্যে সকলের মন ভারী করে তুললেও খেলা বন্ধ হল না। যারা আছে, সার্কাসের চক্রে ঘুরতে ঘুরতে তাদের বেঁচে থাকতে হবে জীবনপণ করে। সে চক্র অচল হয়ে থাকতে পারে না। যে জানোয়ার খেলাতে গিয়ে মরেছে নবীন, তাকে খেলাবে জোসেফ—জোসেফ না থাকলে আর একজন। চাবুকের ঘা এড়াবার জন্যে কটা মানুষকে মারবে চাঁদনী! অসংখ্য মানুষ বেঁচে থাকবার জন্যেই চাঁদনীর সঙ্গে [illegible]

[illegible] বলল, "হারকু সাহেব, আর না। [illegible]"

[illegible] হারকু সাহেব রঘুনাথের কথা [illegible] বলল, "কৃষ্ণনগরে ক্যাম্প ঠিক হল, [illegible] তিন-চারদিনের ভিতর।"

[illegible] হাসল রঘুনাথ। স্পষ্ট [illegible] হারকু সাহেবকে [illegible] পারছিল না।

[illegible]

[illegible] কৃষ্ণনগরে [illegible] একটা দীর্ঘ [illegible] আমার [illegible] এর চেয়ে ভাল ছিল। সেখানে [illegible] জীবননাশের ভয় ছিল না।"

[illegible] মনে করে তার [illegible] করবার জন্যে হারকু সাহেব [illegible] বলল, "নবীন বুদ্ধু ছিল [illegible] জান দিল।"

"কিন্তু ভোলা তো বুদ্ধু ছিল না।"

"সে মরল নিমকহারাম মদনমোহনের জন্যে—" রঘুনাথকে একটা সামান্য কারণে এমন ভেঙে পড়তে দেখে হারকু সাহেব

অপ্রস্তুতের মতন ছেড়ে ছেড়ে বলল, "টাইম হলে উপরওয়ালা বোঝাবে বাবু, কোন মানুষ রুখতে পারবে না—" সে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর কিছু তুলে বলল, "কৃষ্ণনগরে বহুত লাভ হবে—"

"নাঃ", রঘুনাথ কিছু সময় চুপ করে থাকল, পরে বলল, "টাকা হল, ধারও হল—তবে সুখ হল না হারকু সাহেব।"

'হবে বাবু, জরুর হবে।"

"নাঃ, আরও কত মানুষ জখম হবে, মারা যাবে—ভগবানের কাছে আমি কী কৈফিয়ত দিব হারকু সাহেব?"

"কৈফিয়ত আপনার কাছে কেউ তলব করবে না বাবু। হাঁ হাঁ, আমি বুঝি, নবীনের জন্যে আপনার মনে খুব কষ্ট হল। লেকিন একটা মানুষ মোটে মারা গেল। খেয়াল করবেন বাবু, আউর কত মানুষের জান আপনি বাঁচিয়ে রাখলেন।"

নবীনের মৃত্যুর জন্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য পরিবর্তন হয়নি রঘুনাথের, কিছুদিন ধরেই একটা অবসাদ-গ্রস্ত মানুষের মতন তার সব উৎসাহ হারিয়ে যাচ্ছিল এবং তার প্রতি যশোদার সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাকে বড় দুর্বল করে তুলেছিল। রঘুনাথের মনে হচ্ছিল তার গোটা জীবনটাই একটা ভিক্ষার ঝুলির মতন। যশোদার দাদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বেঁচে না উঠলেই যেন ভাল হত। কোন অবলম্বন নেই রঘুনাথের, তার নিজের বাড়িতেই সে লক্ষ্যহীন প্রবাসীর মতন।

"হারকু সাহেব, আমাকে এইবার ছুটি দিন।"

"কোথায় যাবেন বাবু?"

রঘুনাথ কথা বলল না, [illegible] কোথাও যাবে না সে, [illegible] যাবার কোন জায়গা নেই। পরে সে কী করবে তাও তার জানা ছিল না। আপাতত সে যশোদার সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করে তার কাছে এক নির্লোভ মহাপুরুষের মতন হয়ে উঠতে চাইছিল।

"নবীন যেখানে গেছে, সেইখানে—"

"বাবু, এইরকম বাত বলবেন না। জলদি জলদি নয়া ক্যাম্পে গেলে আপনার মন ঠিক হয়ে যাবে।"

"কাকে নিয়ে যাবেন নয়া ক্যাম্পে?" রঘুনাথ খুব ভেবে ভেবে কথা বলছিল, "খেলা জমবে না।"

"হাঁ বাবু, খেলা জমবে।"

রঘুনাথ হাসল, "শিববাবুর মাথা গরম। সে ছুট্টি চায়, দোসরা ক্যাম্পে যেতে নারাজ—"

"তার বদলি সুরেশ্বর আছে।"

"মোহনলাল যাবে। করালীবাবু গেল। উষার তবিয়ত ঠিক নেই। লীলা পাগলার মতন হল। ভোলা গেল, নবীন গেল—"

রঘুনাথের কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠল হারকু সাহেব, "এসব লিয়ে ভাবনা করবেন না বাবু। যার খুশি হবে সে যাবে, লেকিন হাজার খেলোয়াড় আসবে—"

মনে কোন জোর পেল না রঘুনাথ। মাথা চুলকোল, পা ঘষল এবং পরে অন্য দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতন বসে থাকল। আসলে কী কারণে সে এত নিরাশ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে তা বোঝা হারকু সাহেবের কাছে খুবই কঠিন, তার এখনো মনে হচ্ছিল এসব শিবনাথের কাজ—সে নতুন কোন ভাংচি দিয়েছে তাকে। হয়তো তাকে আর জেনারেল ম্যানেজার করে রাখতে চায় না রঘুনাথ, তাই এইরকম কথা বলছে।

আরও রাত হল। ছোট একটা বোতল একা একা শেষ করেছে হারকু সাহেব। নেশা না, নেশার সামান্য আমেজও নেই। তার চোখ খোলা। চিত হয়ে পীরের কবরের মতন নিচু খাটে শুয়ে আছে হারকু সাহেব—ঈষৎ তন্দ্রার ভাবও নেই। বাইরে হু-হু হাওয়া খেলছিল। হাওয়ায় অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দ।

আরও পরে হারকু সাহেবের মনে হল তাঁবুর মধ্যে মানুষের চলাফেরার মৃদু আওয়াজ হচ্ছে। তার বুকের মধ্যে কম্পনের অনুভূতি হচ্ছিল। সে জানত, মানুষের পায়ের শব্দ না, এমন শব্দ আর কখনো শোনে নি হারকু সাহেব। যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শাসনও করা যায় না—এমন কেউ কাগজের ছোট ছোট টুকরো ছড়াচ্ছে তাঁবুর মধ্যে এবং থেকে থেকে চাবুকের চটাস আওয়াজও করছে।

"কে?" হারকু সাহেব উপুড় হয়ে বালিশের নিচে টর্চ খুঁজল, আলো ঘোরাল [illegible] ভাঙা গলায় আর একবার বলল, "কোন [illegible]"

কেউ নেই। আর কোন শব্দও নেই। কিন্তু হারকু সাহেবের মনে হচ্ছিল, এখনো কেউ আছে তাঁবুর মধ্যে তার খুব কাছাকাছি। এমন অন্ধকারে লীলার কথা তার মনে হল। কিছু আগে চীৎকার একটা চিৎকার ভেসে এসেছিল। হয়তো ভয় পেয়েছে লীলা।

হারকু সাহেব শক্ত করে টর্চ চেপে ধরল হাতের মুঠোয়, তাঁবুর বাইরে এল এবং সাবধানে বারবার পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে সে লীলার কাছে যাচ্ছিল। কোন মানুষ ছিল না তার পিছনে কিন্তু হারকু সাহেব স্পষ্ট শুনল, ঘাসের ওপর খসখস শব্দ হচ্ছে

"লীলা?" তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে [illegible] হারকু সাহেব ডাকল। কোন সাড়া না পেয়ে কিছু পরে অল্প জোরে আবার ডাকল। এবং তারপর তাঁবুর ভিতরে এসে টর্চ জেলে দেখল, কেউ নেই। বিমূঢ় হয়ে কয়েক মুহূর্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল হারকু সাহেব। এত রাতে লীলা কোথায় গেল।

কিছু সময় হারকু সাহেব অপেক্ষা করল। তাও লীলা এল না। একটা আশঙ্কায় দেহ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল হারকু সাহেবের। সে বাইরে এল। এখন নোয়েল সাহেবের সঙ্গে কথা বলবার দরকার। কিন্তু সেখানেও যেতে পারল না হারকু সাহেব, বাইরে এসে সে লীলার জড়ানো অস্পষ্ট স্বর শুনল। বাঘের খাঁচার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে লীলা। হারকু সাহেব তার পিছনে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

সাদা একটা শাড়ি পরেছিল লীলা, খালি পা। গভীর রাতে একা একা সে চাঁদনীর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল, "মানুষটাকে সাবাড় করে দিলি চাঁদনী? বেশ করলি। আমার মনের কথা কেমন করে বুঝলি, বল না মাইরি—"

একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে কথা বলে যাচ্ছিল লীলা। তার খেয়াল ছিল না যে সে চাঁদনীর বড় কাছে চলে এসেছে। খাঁচার দিকে হাত রাখবার আগেই হারকু সাহেব তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল।

"এই, কে? আরে তুমি! তুমি রাতের বেলা আমার কাছে কেন এলে হারকু সাহেব?" হঠাৎ লীলা হেসে উঠল, "ভুলে গেছিলাম, এখন আমি আর কারুর বউ না। এসেছ—বেশ করেছ!"

হারকু সাহেবের গলা ভিজে, স্বর নরম। ঈষৎ ভীত হয়ে লীলার হাত ছেড়ে দিয়ে সে বলল, "পাগলার মতন বাত বলিস কেন? যা, ঘুমা—চল তাম্বুতে—"

"তোমার তাম্বুতে যাব হারকু সাহেব?"

"চুপ!"

"তবে কোথায় যাব?"

"নিজের রাউটিতে যা!"

"ভয় লাগে যে—" লীলার চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল, "সে মানুষটা ভাবছে আমি এবার তোমার সাথে—"

"লীলা, চুপ!"

খিলখিল করে হাসল লীলা। মাথা তুলে সাদা আকাশ দেখতে দেখতে বলল, "ভগবান আছে হারকু সাহেব।"

"জরুর আছে।"

হারকু সাহেব এগিয়ে যাচ্ছিল, লীলা হাঁটছিল তার পিছন পিছন। হালকা জ্যোৎস্নায় নরম ঘাসের ওপর দুজনেরই ছায়া কাঁপছিল অস্পষ্ট অদ্ভুত ভাঙাচোরা অশরীরীর মতন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

"বটেই তো, খেতে বেশ লাগছে।
লক্ষ্মী মেয়ে গীতা,
একেবারে পাকা গিন্নীর মতো
রাঁধছিস আজকাল!"
ওঁর মা নাকি
কুসুম
বনস্পতির
নামই
শোনেন নি।
"কুসুমের কথা সরলাই আমাকে প্রথম বলে। সত্যি, কুসুমের মতো এমন টাটকা, এমন খাঁটি বনস্পতি দুটি নেই। এতে খাবার যেমন স্বাদের হয়, তেমনি স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো। শাকসবজি বলুন আর মাংসই বলুন, মিষ্টি কি মুখরোচক যেকোন খাবার সবই আমি কুসুম বনস্পতি দিয়ে করি। সব খাবার খেয়েই বাড়ীর সবাই খুশী হন।"
আপনিও কুসুম দিয়ে
রান্নাবান্না করুন না কেন?
দেখবেন, বাড়ীর সবাইকে
তৃপ্তি দেবার কী আনন্দ!
KUSUM
VANASPATI
2
খাঁটি স্বাদ পেতে হ'লে কুসুম
বনস্পতি দিয়ে রান্না করুন!
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

উন্নয়ন খাতে ব্যয়

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে শেষ পর্যন্ত বাস্তবভিত্তিক না ধরে সদিচ্ছামূলক-রূপে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। বার্ষিক পরিকল্পনার আকার কি রকম হবে, তাতে আরো কার্যক্রম নেওয়া উচিত হবে কিনা তা নির্ভর করছে শুধু কি পরিমাণ ভারতীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা যাবে তার উপর নয়, দ্রব্যমূল্যে স্ফীতি নিবারণ করে অধিকতর নির্মাণকর্মের জন্য প্রকৃত উপাদানের সংস্থান কতখানি করা সম্ভব হবে তার উপর।

যে সব অনুমান ও হিসাবের উপর ভিত্তি করে চতুর্থ যোজনার খসড়া-লিপি প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেগুলির বেশীর ভাগের প্রাসঙ্গিকতা ও যাথার্থ সম্বন্ধে আজ সংশয়ের অবকাশ আছে। আর্থিক ব্যবস্থায় গত তিন বছরে নানা বিচ্যুতি ঘটেছে। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, অপেক্ষাকৃত কম দামে খাদ্যশস্য বিক্রির জন্য সরকার কর্তৃক অর্থ সাহায্য দান, কর্মচারীদের মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধি—এই সব কারণে তিন বছরে সরকারের অর্থাগম কমে গেছে। এমনতর পরিস্থিতিতে স্থির হয়েছে যে, চতুর্থ যোজনার থেকে স্বতন্ত্র ১৯৬৮-৬৯ সালের একটি বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা হবে।

সম্পদ নির্মাণের মন্দ গতি

মূলধন নিয়োগ ও সম্পদ নির্মাণের হার শ্লথ করার সপক্ষে একাধিক যুক্তি দেখানো যেতে পারে: (১) আর্থিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা; (২) অপ্রত্যাশিত ব্যাপার বা ঘটনার অভিঘাত কমানোর উদ্দেশ্যে আপৎকালীন ভাণ্ডার প্রভৃতি গড়ে তোলা; (৩) যাতে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশ এবং উপাদান সংগ্রহ সম্ভব হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে দ্রব্যমূল্যের যথাযথ সংস্থাপন দ্বারা একটি সঠিক ভিত্তি নির্মাণ; (৪) উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শিল্প-ব্যবস্থার উপযুক্ত বিন্যাস; এবং (৫) আর্থিক স্থিতির পুনরুদ্ধার।

আগামী বার্ষিক পরিকল্পনায় বড়ো রকমের বৈষয়িক উদ্যোগের স্থান না থাকলেও, আমাদের জনসংখ্যা যদি ভবিষ্যতেও শতকরা ২·৫ হারে বেড়ে চলে সেক্ষেত্রে মাথা পিছু আয় যাতে বর্তমান স্তরের নীচে নেমে না যায় তা দেখতে হবে। ওই উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকর্ম অব্যাহত রাখা দরকার।

মাত্র কয়েক বছর আগে যথেষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা নির্মিত হয়নি বলে আমাদের আমদানির উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়েছে। মূলধন দ্রব্য শিল্পে এখন অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা দেখা দিয়েছে। তার কারণ এই নয় যে, আমরা হঠাৎ ইস্পাত ও যন্ত্রের একটা বড়ো উৎপাদনকারী জাতি হয়ে পড়েছি। গত দু' বছরে দেশের সম্পদ নির্মাণের হার মন্দীভূত হওয়ার ফলে ব্যাপারটা ঘটেছে।

শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হারও কাঁচা মালের অনটনের ফলে কমে গেছে—গত বছরের একই সময়ের শতকরা ১·৫-এর তুলনায় এ বছরের প্রথম সাত মাসে শতকরা মাত্র ১·৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য খাদ্য-শস্যের উৎপাদন এ বছর স্বাভাবিক (৯ কোটি ২০ লক্ষ টন) হবে, আশা করা হচ্ছে।

দ্রব্যমূল্যের সাধারণ সূচক ১৪ অক্টোবর তারিখে ২২৪·১ থেকে ১১ নভেম্বরে ২১৬·৪-এ নেমে এসেছে। এর জন্য খাদ্য-সামগ্রী মূল্যের হ্রাস (শতকরা ৫·৪ ভাগ) প্রধানত দায়ী। দ্রব্য মূল্যের স্তর এখনো বেশ উঁচু বলে মূল্য স্ফীতি অর্জনের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে আনা দরকার।

অর্থসংগতির অবস্থা

আভ্যন্তরিক অর্থসঙ্গতির অবস্থা উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। চলতি বছরের সরকারী বাজেটে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি দেখা দেবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্তমান বছরে ১৩টি রাজ্যের বাজেটে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সরকারী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলি হতে প্রত্যাশিত আয় অর্জন করা যায় নি। উৎপাদন শুল্ক ও আমদানি-রপ্তানি কর থেকে সরকারের আগম কমে যাবে। শিল্প উৎপাদন শ্লথ হয়ে পড়লে আবগারী থেকে আগমের হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। দৃষ্টান্ত হিসাবে, চিনি উৎপাদনের হ্রাস আবগারী থেকে সংগৃহীত রাজস্বকে (প্রায় ৩০ কোটি টাকা কমে যাবে) প্রভাবিত করবে। করের বাকি পাওনা আদায় করার দিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এখন মনোযোগ দিচ্ছে: ৪,০০০টি বড়ো ব্যাপারে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বাকি-বকেয়া সংগ্রহ করার জন্য আয়কর সংস্থা চেষ্টা করছে।

এ বছর আমদানির বহর কমে যাওয়ায় আমদানি শুল্ক বাবদ আয় হ্রাস পাবে। একদিকে সুয়েজ খাল বন্ধ হওয়ার দরুন জিনিসপত্র প্রদান বিলম্বিত হয়ে পড়েছে, অন্য দিকে, কাজকর্মের বর্তমান শিথিল অবস্থায় আমদানি স্থগিত রাখতে হয়েছে বলে বহির্বাণিজ্য শুল্ক হতে আয় কমে গেছে।

বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য

ভারতের আমদানি এখন রপ্তানির চাইতে ১০০ কোটি ডলার বেশী। বৈদেশিক সাহায্যের বর্তমান আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় এবং যতদূর সম্ভব শীঘ্র স্বাবলম্বন অর্জনের তাগিদে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে দেশের ঐ ঘাটতি তাড়াতাড়ি কমিয়ে ফেলা দরকার। ঘাটতি শেষ পর্যন্ত একেবারে দূর করার উদ্দেশ্যে রপ্তানির সম্প্রসারণ এবং আমদানির পরিবর্ত উৎপাদন জরুরী।

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ (১৮২·৫২ কোটি টাকা মূল্যের সোনা না ধরে) ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে ২৭১·৩০ কোটি টাকা থেকে কমে গিয়ে এ বছর নভেম্বরে ২৫৪·১৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সংরক্ষণের এই হ্রাসের জন্য দায়ী হচ্ছে খাদ্যশস্য আমদানি বাবদ বিপুল ব্যয় এবং অতীতের ঋণশোধ ও সুদদানের প্রয়োজনীয়তা।

কোনো প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করতে দেরি হয়েছে বলে ঐ সাহায্যের অধীন যোগানের বিক্রি থেকে সরকারের হাতে টাকা কম এসেছে। অবশ্য যা বৈদেশিক সাহায্যের অন্তর্গত সেই আমদানি-লব্ধ খাদ্য বিক্রয় করে আগের চাইতে বেশী অর্থ পাওয়া গেছে। তা সত্ত্বেও ওই উৎস থেকে আগম হ্রাস ১০০ কোটি টাকার বেশী হবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে দেখলে, পরিকল্পনামূলক উন্নয়ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আপাতত সীমাবদ্ধ।

শান্তিকুমার ঘোষ

আমরা ঘোষ-মন্ত্রিসভা সম্পর্কে "প্রফুল্ল-নাটক" কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলাম। জনৈক পাঠক বলিয়াছেন—আপনাদের বলা উচিত ছিল "ঘোষযাত্রা"। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমরা নাটক বা যাত্রা কোনটারই পাস সংগ্রহ করতে পারিনি, সুতরাং এক্ষেত্রে অভিনয় সম্পর্কে নীরব থাকাই ঠিক।"

সংবাদে শুনিলাম, স্পীকার মহোদয়ের বাড়িতে কে বা কাহারা নাকি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—

"আমরা যদ্দুর জানি, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা গেলেও বোমার আওয়াজে কণ্ঠস্বর—বিশেষ করে স্পীকারের—বন্ধ করা যায় না, শুধু শুধু বোমাই গচ্চা!!"

ইস্পাত ও খনি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশেঠী জানাইয়াছেন যে, কয়লা খনিগুলি হাতে নেওয়ার ইচ্ছা সরকারের নাই। সহযাত্রী বলিলেন—"না থাকাই ভালো, এতে নানা ঝামেলা, একশ' বার ধোয়াধুয়ি করেও যে-কয়লা সে-কয়লাই থেকে যায়।"

সংবাদে শুনিলাম, লোকসভায় জনৈক সদস্য নাকি ভাষা বিলের একটি নকলে অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"রামায়ণে শুনেছি, লঙ্কাদহনে শুধু লঙ্কাই গেল না, দাহনকারীর মুখটিও নাকি জন্মের মতো অগ্নিদগ্ধ হয়ে রইল!!"

পাকিস্তান হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল, সেখানে নাকি হিন্দুদের কালচারাল কংকোয়েস্ট বা সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পর্কে জনাবরা ভীত হইয়া পড়িতেছে। জনৈক জনাব এক সভায় বলিয়াছেন—আমাদের মেয়েরা এখনও সিঁদুর পরে, এটা হুবহু হিন্দুয়ানি। সহযাত্রী বলিলেন—"নিশ্চয়ই জনাব সিন্দুরের দাগ আছে সর্বগায় গানটি শুনেছেন, সুতরাং কাজেকাজেই ভীত হবার কারণ আছে বইকি!!"

এক সংবাদে শুনিলাম, লন্ডনে জাল প্রথম সংস্করণের বই এবং অন্যান্য জাল বস্তু নিলামে ক্রয়ের উৎসাহীরা প্রায় ২,২৭,৭০০ টাকা খরচ করিয়াছেন।—"জালে না হলেও আমরা আরো অনেকগুণ বেশী টাকা দিয়ে নানা ভেজালের বস্তু ক্রয় করছি" —বলেন সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতায় নাকি সংবিধানের বই কেনার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"বই না কিনেই আমরা যে-হালে ট্রাম-বাস হাট-বাজার মুখর করেছি, এবারে গোটা কলকাতাকে বিদ্যারত্ন পাড়া না করে আর ছাড়ছি নে।"

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতার দুগ্ধ প্রকল্প সংকটের মুখে। পশু-পালন মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার বলিয়াছেন—প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার দুধের ভান্ডার নিঃশেষ করিয়া গিয়াছেন। সহযাত্রী

মন্তব্য করিলেন—"তা আমরা জানিনে। তবে মনে হচ্ছে, চাল-সংগ্রহ সুষ্ঠুভাবে না চললে আমাদের কপালে পিটুলি গোলাও জুটবে না, সুতরাং "ডুড়" খাবার বায়না ছেড়ে "টামাক"-ই ধরতে হবে।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় মহানাদ সম্পর্কে মারাঠা সৈনিক, জাঠ সৈনিক, ডোগরা সৈনিক, শিখ সৈনিকদের সমর-নাদ-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"দলীয় সমর-নাদ যা পথে পথে শুনি, তাতে প্রাচীর ফাটে না বটে কিন্তু নাদব্রহ্ম পর্যন্ত লজ্জায় অধোবদন হন!!"

হিন্দীপ্রেমীরা নাকি সম্প্রতি আংরেজী হটাও-এর এক নূতন আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছেন, ইংরেজীতে লেখা যে-কোন বিজ্ঞাপন তাঁরা দোকানপাট হইতে টানিয়া নামাইতেছেন, ইংরেজী হরফ দেখিলেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছেন। খুড়ো বলিলেন—"এ এক ধরনের পুংগবীয় রোগ,

আগে রেডর‍্যাগে হত, এখন ইংরেজী হরফে হয়!!"

কাঠমানডুতে নাকি হিপিবাদ প্রচারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক হিপি-মন্দির স্থাপিত হইতে চলিয়াছে।—"বাহার পীঠতো আছেই, সুতরাং তেপায় হতে আর আপত্তি কী, অংকশাস্ত্রের সহজ কথাটা আমরা সবাই জানি—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তেপ্পান্ন"—বলে শ্যামলাল।

শ্রীহুমায়ুন কবিরকে ক্রান্তি দলের সভাপদ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"অধ্যাপক কবির নিশ্চয় এতদিনে হিসেব করে দেখছেন, ক্রান্তি তো এক কড়ার তৃতীয় অংশ মাত্র!!"

রাজ্য পুলিসের আই-জি সকল জিলার পুলিস-সুপারদের নির্দেশ দিয়াছেন —ধানের মাঠে শান্তিরক্ষা করিতেই হইবে। আমাদের এক সহযাত্রী জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"আমরা খেলার মাঠেও শান্তি চাই, কিন্তু সেখানে পুলিস-ই যত ব্যাগড়া দেওয়ার গোড়া!!"

শল্য-চিকিৎসার বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা শুনিলাম, একজনের হৃৎপিন্ড অন্যজনের বুকে পাচার।—"কিন্তু বিনা অস্ত্রে কত হৃদয় যে হাতফের হয়েছে তার কি হিসেব-কিতেব আছে"—বলেন খুড়ো।

মাদ্রাজের খবরে জানিলাম, সেখানে নাকি পুলিসদের আয়োজনে হাঁসের দৌড় প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"এইবারে এসো, ঘোড়া উঠে গেলেই বা কোন্ ঘোড়ার ডিম হচ্ছে!"

"সাম্যবাদ ও প্রগতির পরিচয়"

"সাম্যবাদ ও প্রগতি" নিয়ে আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত চিঠিপত্রগুলি খুবই উপভোগ্য হয়েছে। তা' ছাড়া রুশ বিপ্লবের রজতজয়ন্তী বছরের পরিপ্রেক্ষিতে সময়োপযোগীও বটে। কিন্তু আর এক হিসেবে এই আলোচনা নিরর্থক—কারণ যতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সাম্যবাদ বিষয়ে লেখালেখি করা হোক, আসলে এটি একটি ধর্মীয় উন্মাদনা বা গোঁড়ামি ছাড়া কিছুই নয়, এবং যথাসময়ে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন বা মুসলমান ধর্মমতের পাশে এর স্থান হবে।

এক হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তার প্রাধান্যের সঙ্গে মধ্যযুগে মুসলমান ধর্মের উত্থান ও তার ফলস্বরূপ মুসলমান সাম্রাজ্যের আবির্ভাবের তুলনা সহজেই করা চলে। অল্প সময়ের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের বিজ্ঞানে ও শিক্ষায় অতুলনীয় উন্নতি ঘটে। তখন যদি আজকের মত এত আলোচনার প্রচলন থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সর্বদা শুনতে পেতাম যে, এই মত (মুসলমান ধর্ম) ছাড়া জগতের কোনও মোক্ষ নেই, তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে তুলে ধরা হত অল্প সময়ের মধ্যে আরব দেশ ও পরে তুরস্কের উন্নতি। যেমন আজ আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে রাশিয়া বা চীনের দৃষ্টান্ত। তখন ছিল বিধর্মী বা কাফের সবাই ঘৃণার পাত্র, এখনও অ-কমিউনিস্ট অথবা অধ্যাপক অম্লান দত্তের মত ব্যক্তিও হচ্ছেন উপহাসের পাত্র!

এই প্রসঙ্গে কতগুলি সার কথা জানা দরকার :

(১) অগ্রসর পাশ্চমী দুনিয়া আজ মেনে নিয়েছে যে, বিজ্ঞান, শিল্পোন্নতি ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা—এইগুলি কোনও মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে, গত মহাযুদ্ধে স্বদেশরক্ষায় কমিউনিস্ট শাসনে রাশিয়া যা কৃতিত্ব দেখিয়েছে, ঠিক তেমনি কৃতিত্ব তার ছিল জার-শাসনের আমলে নেপোলিয়নের আক্রমণ প্রতিহত করার বেলায়। আবার ফ্যাসিবাদের অধীনে জাপান ও জার্মানীর অসাধারণ কৃতিত্বের কথা অথবা ইটালীর দুর্বলতার কথা ভুললে চলবে না।

(২) ১৯১৭ সালের রাশিয়া ঠিক সামন্ততান্ত্রিক ছিল না, আমরা যে অর্থে কথাটা বুঝি। শিল্পে তখনও তার যথেষ্ট উন্নতি ছিল। ৫০ বছরে যেখানে আজ সেদেশ এসে পৌঁছেছে সেটা তার কৃতিত্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু তুলনামূলকভাবে তার থেকে ঢের বেশী কৃতিত্ব ছিল জাপানের--১৮৬০ সালে মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে ১৯০৪ সালে আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে রাশিয়াকে নৌ-যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে। এছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে, গত ২০ বছরে, ধ্বংসস্তূপ থেকে আজকের জাপান, জার্মানী অথবা ইটালীর শিল্পোন্নতি ভুললে চলবে না। একটা নিদারুণ সত্য কথা এই যে, গত ৫০ বছরে রাশিয়ার অভাবনীয় (?) উন্নতি হয়েছে কমিউনিস্ট মতবাদ সত্ত্বেও, ওই মতবাদের জন্য নয় (not due to, but in spite of communist ideals)!

(৩) বিজ্ঞানে রাশিয়ার ১৯১৭ সালের আগেও বেশ কৃতিত্ব ছিল। তার বর্তমান অগ্রগতিকে দলীয় আদর্শের অবদান বলা চলে না। তা'হলে ১৯৩০ থেকে ১৯৪৪ সালের ভিতর রকেট-বিজ্ঞান ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে জার্মানীর বিস্ময়কর অগ্রগতিকে নাৎসীবাদের অবদান বলতে হয়। অথবা জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রমণের কৃতিত্বের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বাহবা জানাতে হয়।

(৪) কমিউনিস্ট মতবাদীরা অন্য সকল মতবাদ অথবা সমাজ ব্যবস্থার 'অসঙ্গতি'র (contradiction) উপর খুব জোর দেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের অসঙ্গতিগুলি এড়িয়ে যান—যেমন, গণতন্ত্রের ফাঁকিবাজি নিয়ে গলাবাজি করতে গিয়ে গণতন্ত্রের ঢাকিসুদ্ধ বিসর্জনের ব্যবস্থা, 'জমি যার লাঙ্গল তার' বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত চাষীকে সরকারী কৃষি-শ্রমিকের রূপদান, শোষণ বন্ধ করতে গিয়ে সর্বাঙ্গীণ শোষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে আর একটি বিরাট অসঙ্গতি হল, দেশের জনসাধারণের তুলনায় শ্রমিক-শ্রেণীকে বিশেষ সুবিধেসম্পন্ন (privileged class) শ্রেণীতে তুলে আনার জন্য কমিউনিস্ট আন্দোলন। আমরা ভুলে যাই যে, টাটা-বিড়লাকে privileged class বলতে গিয়ে তাঁদের শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের আর একটি privileged class-এ আনা হচ্ছে। জামসেদপুর, বার্নপুর অথবা কলকাতার বহু বিদেশী শিল্পসংস্থার শ্রমিকদের গড় মাসিক উপার্জন ৪০০।৫০০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। যে পরিমাণ কাজ করে তাঁরা এত টাকা উপার্জন করেন, তার সঙ্গে গ্রামে চাষীর কাজ ও উপার্জনের তুলনা করলেই এর অসঙ্গতি চোখে পড়বে। ২।৪ হাজার উচ্চশ্রেণীর তুলনায় এই সকল শ্রমিকরা ২।৪ লক্ষ হয়ত হবেন, কিন্তু ৫০ কোটির তুলনায় তাঁরা কি মুষ্টিমেয় হলেন না? কমিউনিস্ট যুক্তি ধার করেই বলতে হয় যে, 'কৃষিক্ষেত্রে শোষণের ফলে যে পুঁজির জন্ম, সেই পুঁজিবাদ থেকে যে কলকারখানা চলছে, তার অংশ যদি টাটা-বিড়লার ন্যায্য প্রাপ্য না হয়, জনসংখ্যার তুলনায় মুষ্টিমেয় শ্রমিকই বা তা' পাবেন কেন?'

(৫) আগামী দিনের সমস্যা অনেক। কি করে এ সব সমস্যার সমাধান হবে জানি না। কিন্তু বিশেষ এক মতবাদের কাছে চিন্তাশক্তি বিক্রি করে অন্তত কোন সমস্যার সমাধান আশা করা অযৌক্তিক।

অশোক দত্ত
নিউ আলিপুর

॥ ২ ॥

১৫ই অগ্রহায়ণ 'দেশ'-এ সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আলোচনার উপর কয়েকটি বক্তব্য উপস্থিত করতে চাই।

(১) চক্রবর্তী মশাই-এর সমস্ত আলোচনাই একটা মূল বিষয়ে ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি 'সমাজতন্ত্র' ও 'সাম্যবাদ'কে সমার্থক মনে করেছেন। তাই সমাজতন্ত্র লিখেই বন্ধনীর ভেতর 'সাম্যবাদ' লিখেছেন, যেন এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'কোন মার্কসবাদ? সোভিয়েত? চৈনিক...ইত্যাদি।' এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি সমাজতন্ত্রের দোষত্রুটিকে সাম্যবাদের দোষত্রুটি হিসাবে দেখিয়েছেন।

এখন কথা হল—সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ এক নয়। মার্কস লিখেছেন, "ধনতন্ত্রবাদী আর সাম্যবাদী সমাজের মাঝখানে প্রথমোক্ত থেকে শেষোক্ত সমাজ বৈপ্লবিক উত্তরণের একটি পর্যায় আছে...।" লেনিন লিখেছেন, "ধনতন্ত্রবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য ঐতিহাসিক নিয়মেই সন্দেহাতীতভাবেই একটি বিশেষ স্তর থাকতে বাধ্য"।

এই বিশেষ স্তরকেই লেনিন ও অন্যান্য মার্কসবাদী পণ্ডিতেরা সমাজতন্ত্র আখ্যা দিয়েছেন। communism is the highest stage of Socialism—

এখন এই সমাজতন্ত্রে সাম্যবাদী সমাজের ন্যায় ও সাম্য অনুপস্থিত। এই সাম্য ও ন্যায়ের মধ্যে ধনতন্ত্রবাদের ন্যায় ও সাম্য উপস্থিত। কারণ, মার্কস বলেছেন—সমাজতন্ত্র "নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে উন্নত হয়নি, ধনতান্ত্রিক সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। সেইজন্য এই স্তর অর্থনীতি, নীতিবোধ, চিন্তাধারা ইত্যাদি সকল দিক থেকেই সেই সমাজের জন্মদাগগুলি বহন করে, যে পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে।"

লেনিন লিখেছেন, "বস্তুত পুরনো সমাজের অবশিষ্টাংশগুলি নতুন সমাজের মধ্যে টি'কে থেকে তার প্রকৃতি ও সমাজ এই উভয় দিক থেকেই জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের বাধা দেয়।...শোষকশ্রেণী ধনতন্ত্রবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা বুকে নিয়ে বার বার সেই আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে যাবে—দশগুণ উদাম ও শতগুণ বিদ্বেষ নিয়ে তারা তাদের হারানো স্বর্গ পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।"

সশস্ত্র বিপ্লবের ফলে যে সমাজতন্ত্রের (Social ontrol over the means of economic production) প্রতিষ্ঠা হয়, তার সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটাতে হলে চাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব (Social control over the means of mental production)

এই কারণেই প্রয়োজন হয় 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র'। চক্রবর্তী মশাই "সাম্যবাদী(!) রাষ্ট্রের বীভৎস বিকৃতি ও দানবিকতার" যে পরিচয় পেয়েছেন সেটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পুঁজিবাদের যে লেশ ও রেশ থেকে যায় তার মূলোচ্ছেদ প্রয়াসের অপব্যাখ্যা মাত্র। এই কারণেই প্রয়োজন হয় দলের শাখা-প্রশাখাকে ছড়িয়ে পড়ার সমাজের সব প্রতিষ্ঠানে—যাতে বুর্জোয়া চিন্তাধারা স্বাধীন(!) চিন্তাধারার মুখোশ পরে মাথা চাড়া দিতে না পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সতীন্দ্রবাবু সাম্যবাদী লক্ষ্যে পৌঁছাবার যাত্রাপথকেই সাম্যবাদ মনে করেছেন এবং যাত্রাপথের বেদনা ও যন্ত্রণাকে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের বেদনা ও যন্ত্রণা মনে করে অযথা কষ্ট পেয়েছেন।

(২) এরপর সতীন্দ্রবাবু প্রশ্ন তুলেছেন —"সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্রের উপর একটি ধাপ—এই কারণেই কি সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবে?" না তা হবে না। কিন্তু সমাজতন্ত্র যে দ্বান্দ্বিক নিয়মে (Dialectical method) ধনতন্ত্র থেকে উদ্ভূত ধনতন্ত্রের পরের ধাপ এ সত্য তিনি বিস্মৃত হলেন কিভাবে? দ্বান্দ্বিক নিয়মই গুণগত পরিবর্তন ঘটায় (Passage of quantity into quality).

দ্বান্দ্বিক নিয়ম সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও, সামাজিক নিয়ম দ্বান্দ্বিক নিয়মের বশবর্তী এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ নেই।

(৩) সতীন্দ্রবাবু 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এ বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলতে ঠিক কি বোঝায়? গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবাদে পৌঁছানো? অথবা কোনো উপায়(?) অবলম্বন করে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' নামক লক্ষ্যে পৌঁছানো? কিংবা গণতন্ত্র ও সমাজবাদ উভয়েই উপায় (means), 'আত্মচ্যুতিমুক্তি' লক্ষ্য? তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের অধিকার হেবিয়াস্ কর্পাস অধিকার ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। মনে হয় গণতন্ত্রটা উপায়। সমাজবাদও কি তাই? তাই যদি হয়, সে সমাজবাদের স্বরূপটা কি? সেই সমাজবাদরূপ "উপায়"-এ পৌঁছানোর জন্য কি উপায় অবলম্বন করতে হয়?

এ ছাড়া তিনি যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের অধিকার ইত্যাদির কথা বলেছেন সেগুলি কী বর্তমানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাবিহীন রাজনৈতিক ও আইনগত স্বাধীনতা? আমরা তো জানি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণীর স্বাধীনতার ধারণা সংখ্যাগরিষ্ঠের "অলীক চৈতন্যের (false consciousness) দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে স্বাধীনতার "মায়া" সৃষ্টি করতে পারে।" কারণ মার্কসেরই মতে, "Ruling idea of each age is the idea of the ruling class."

রবীন্দ্রনাথ সেনশর্মা
হুগলী

দেশ পত্রিকার নববর্ষ

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা-বিভাগে প্রকাশিত একটি পত্রে শ্রীদীপক মিত্র বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকা সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছেন সে-প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি।

আমি লেখক নই, তাই লেখক হিসাবে 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ থাকাও সম্ভব নয়। তবে পাঠক হিসাবে শ্রীমিত্রের মতো আমিও দীর্ঘদিন ধরে উক্ত পত্রিকাটির সঙ্গে পরিচিত। লেখা প্রকাশের ব্যাপারে দেশ-সম্পাদক কতটা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে থাকেন অথবা 'দেশ' বা 'আনন্দবাজারে'র কর্মী ছাড়া অন্য কোনও নতুন লেখকের সত্যিকারের ভালো লেখা প্রকাশ করার ব্যাপারে সম্পাদকের ঔদাসীন্য বা অনাগ্রহ কতখানি পাঠক হিসাবে আমার পক্ষে সে-কথা জানবার সুযোগ নিতান্তই কম। তবে আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা ও পত্রিকাটির সম্পাদনা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী পাঠক-পাঠিকার চিঠি প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদক যে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেন তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

শ্রীমিত্র 'দেশ' পত্রিকার বর্তমান নীতি সম্পর্কে যে মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন তা সত্য বা মিথ্যা যাই হক না কেন শ্রীমিত্রের চিঠিখানি প্রকাশ করে দেশ-সম্পাদক অধুনা দুর্লভ যে উদার ও বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা আমাকে একাধারে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে। শ্রীমিত্র কী এর পরেও বলবেন যে, 'দেশ' পত্রিকা বর্তমানে নীতিভ্রষ্ট?

অমূল্যধন দাশশর্মা
কলিকাতা-২৬

॥ ২ ॥

৩৫ বর্ষ ৫ম সংখ্যা 'দেশ'-এ শ্রীদিলীপ মিত্র 'দেশ পত্রিকার নববর্ষ' শীর্ষক সম্পাদকীয়র উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : 'যে তরুণ লেখকগণ বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন স্বাদ সংযোজন করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের কি গোষ্ঠী নিরপেক্ষ মন নিয়ে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে?' অপর একস্থানে বলেছেন, 'দেশ বা আনন্দবাজারের বংশবদ কর্মী ছাড়া কোন নতুন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস, বড়গল্প, রম্যরচনা 'দেশে' ইদানীংকালে প্রকাশিত হতে দেখলাম না।' অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমি শ্রীমিত্রের এই তথ্য পুরোপুরি মানতে পারলাম না। কারণ, আমিও আজ বহু বছরের 'দেশে'র নিয়মিত পাঠক। সেই দাবিতেই বলি, হ্যাঁ, 'দেশ' বা আনন্দবাজারের বংশবদ ছাড়াও বহু স্বল্পখ্যাত লেখক-লেখিকাদের রচনা বহুবার 'দেশে' স্থান পেয়েছে এবং পাচ্ছে। শ্রীমিত্র লিখেছেন, 'দেশ বা আনন্দবাজারের কর্মী ছাড়া কি অন্য কোন নতুন লেখক বাংলা সাহিত্যে নতুন স্বাদ সংযোজন করছেন না?' শ্রীমিত্রর এ মতকে আমি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে মনে করি। শ্রীমিত্র নাকি খুঁজে দেখেছেন যে, যাঁদের লেখাই 'দেশে' প্রকাশিত হয়, সবাই তাঁরা আনন্দবাজার-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আমি বলব এক্ষেত্রে শ্রীমিত্র কি সত্যিই অনুসন্ধান করেছিলেন? তাই যদি করেন, তা'হলে আশা করব, এ কথা তাঁকে প্রত্যাহার করে নিতেই হবে। আর শেষে শ্রীমিত্রকে জানাই, 'দেশ' তার নীতি থেকে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট নয় আর হুট্ করে একজনকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করাও অনুচিত। একজন প্রকৃত 'দেশ'-প্রেমিক বলেই কথাগুলো লিখলুম। তবে এটা অনুমান করা অনুচিত হবে যে, এটা একতরফা আলোচনা হয়েছে।

সুহাস ঘোষ
কলকাতা-৬

গত বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ওয়ারশ

শহর ওয়ারশ, সাতশো বছরের প্রাচীনতা ও ইউরোপের সংস্কৃতিবাহক নগরী-গুলির অন্যতম। শহর পুরোনো কিন্তু নতুন। গত বিশ্বযুদ্ধের ভস্ম-স্তূপ থেকে সে আবার বেরিয়ে এসেছে মাথা উঁচু করে, অথচ তার প্রাচীনত্বের আকৃতি যেন যায়নি, প্রবীণতাও যায়নি।

আমরা উঠলাম আন্কোরা নতুন একটি হোটেলে "ব্রোনোভা", ছোট, মাত্র তিনতলা, সরকারী গেস্ট হাউস্। সহজ সরল আরকিটেক্চর, গায়ে তখনো নতুন রঙের গন্ধ। কার্পেট নেই, কিন্তু গোটা হোটেল ঢাকা এক রকম তুলতুলে প্ল্যাস্টিক্ ফোম্ দিয়ে। ঘরে টেবিলে কাগজপত্র সাজিয়ে রাখা, কখন কী প্রোগ্রাম, শহর ও দেশের এবং প্রধান প্রধান নেতাদের পরিচিতি, কার টেলিফোন্ নম্বর কতো, কে কোন্ স্থানে আছেন, সমস্ত। অন্য একটি ছোট টেবিলে সাজানো (রোজ সকালে থাকত) কতগুলো ফল, দুটো কাচের গেলাস, এক বোতল ধাতব জল। (পরে দেখলাম, সমস্ত পূর্ব ইউরোপেই এমনি)।

বাথরুমে ঢুকে কেমন যেন চমক লেগে গেল। অতো বড়! আর এ-যে সব জোড়ায় জোড়ায়! দুটো মুখ-ধোয়ার জায়গা দুটো পর্দাঘেরা স্নানের টাব্। কিন্তু ভুল বুঝলাম তক্ষুনি। ঢুকে ডান দিকের গোটা দেয়ালটি একটি আয়না, তাই দেখাচ্ছিল জোড়া-জোড়া। কে বলে সমাজতান্ত্রিক ভাল প্লাম্বিং নেই? হয়তো আমেরিকার মতো অতো উচ্চাংগের নাও হতে পারে, কিন্তু আমাদের চাইতে অনেক ভাল।

চারদিকে শুধু কাচের দেয়াল। প্রথম শাদা পাতলা পর্দা, মলমলের মতো, তার উপর আবার পুরো পর্দা। সমস্ত বাড়ি কেন্দ্রীয় তাপকৃত। মানে, বাইরে বেরুবার আগে অবধি শুধু শার্ট গায়ে রাখলেই যথেষ্ট। নিচের তলায় হোটেলের কর্মচারীরা, রিসেপসন্ দপ্তর, ওভারকোট্ রাখার কামরা, খাওয়ার ঘর। উপরন্তু সরকারী কর্মচারীরা মোতায়েন আছেন, এবং চেহারা দেখে মনে হোল কয়েকজন "সাদা পোশাকী" নিরাপত্তা লোক। (কারণ ওই হোটেলে ভারতীয় ডেলিগেশনের কয়েকজন উপরয়ালা সদস্যরাও ছিলেন)।

অতো বাইরের লোক থাকায় এবং টেলিগ্রাম পাঠানোর ঘরে মেয়েরা থাকায় শুধু শার্ট গায়ে বেরুনোটা বেয়াদপি। কিন্তু আমাদের প্রায়ই নিচে আসতে হচ্ছে। আমার মতো দুয়েকজন একটা সহজ কৌশল নিলাম। কিনা, আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত, ভীষণ কাজের তাড়া, গলার প্রথম বোতামটা খোলা, টাইটা নিচের দিকে টেনে ঢিলে করা। ব্যস! কে দেখে আদপ কি বেয়াদপ। আমরা এতো ব্যস্ত আমাদের কি খেয়াল থাকে?

প্রথম দিন রাত্রেই দেখতে গেলাম বিখ্যাত অপেরা হলে সাইলেসিয়া প্রদেশের নামকরা লোক-নৃত্যগীত। ভিক্টরি স্কোয়ারে গোলাকৃতি বিরাট অপেরা হাউস অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং ইউরোপের ভিতর নাকি সব চাইতে বড়। বসবার জায়গা ২,২০০ লোকের। গত যুদ্ধে জার্মান বোমায় ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই বছর দেড়েক আগে ওটি আবার ওই স্থানেই নির্মিত হয়েছে, সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মৌলিক আকারে।

নাচ গান বাজনা, অনেকে মিলে। চমৎকার পোশাক, চমৎকার শিল্পীরা। অন্যান্য দেশের লোকসংগীতের মতো এদেরটাও রক্তে আনে দ্রুত তাল, পা দুটো আপনি আপনি ওঠানামা করে তালে তালে। প্রচুর লোক, দর্শকদের আসন ভরা। ইন্দিরাজী যখন পোলান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সংগে ঢুকলেন, সকলে দাঁড়িয়ে উঠে অভিনন্দন জানালেন, হাজারো হাতের তালিতে।

ওয়ারশতে অপেরাগৃহে লোক-নৃত্য-গীত

নৃত্যরত বালক-বালিকা

শোয়ের শেষে পিলপিল্ করে সকলে বেরুলেন অসংখ্য দরজা দিয়ে। আমরা তিনজন একসঙ্গে,— চন্দ্রাকর, বিশ্ববন্ধু, আমি। প্রথম কাজ যেখানে আমাদের ওভারকোট রাখা হয়েছে সেখানে যাওয়া, তারপর গাড়িতে। গোলাকৃতি বারান্দায় অনেকগুলো ক্লোকরুম, প্রতিটির সামনে পুরুষ ও মেয়েরা লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওদিকে ভিতর থেকে বেরুচ্ছে আরো লোকেরা। এদিকের মানুষ ওদিকে যায়, ওদিককার লোকেরা এদিকে, স্রোতে আমরা যেন খড়কুটো। আমাদের ক্লোকরুম কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। টিকিটে নম্বর লেখা আছে, কিন্তু সেই নম্বরের ঘরটি কোথায়?

ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে, অপেরা হাউসের একজন কর্মচারীর শরণাপন্ন হলাম। তিনিও কিছুক্ষণ ঘুরে আমাদের দিলেন অন্য একজন কর্মচারীর হাতে। নিজেদের ভাষায় অনেককে তারা প্রশ্ন করছে, কিন্তু ঘরটি তেমনি নিখোঁজ। কতো জায়গা এলাম—রেস্তোরাঁ, বার, দোকান (অপেরায় গোলক-ধাঁধাতেই)। হঠাৎ দেখি ডানদিকে ড্রেসিং রুম কয়েকটা। যাদের গানবাজনা শুনে এলাম, তারা জামাকাপড় বদলাচ্ছে, মেয়েরাও। কালো বিদেশীদের দেখে তারাও যেমন বিস্মিত, আমরা তেমনি, লজ্জাও লাগছিল। কোনো মতে না-তাকিয়ে কর্মচারী মহাশয়ের পদাংক অনুসরণ করে চললাম।

ততোক্ষণ প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। চন্দ্রাকর হিন্দীতে বলে : "আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করবে তো?" উত্তর দিলাম : "পরোয়া মৎ করো।" সবশেষে কোনায় একটি স্থানে এলাম আমরা। একটি বুড়ো লোক ঘরের দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে। পোলীশ কর্মচারী হুমড়ি খেয়ে পড়ল, নিবেদন জানাল তিনটি পেতলের টোকেন্-টিকিট দিয়ে। ইউরেকা! আমরা নানাভাবে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর চেষ্টা করলাম, নমস্কার করে, জাপানী ঢঙে কোমর দুলিয়ে, মের্‌সি, থ্যাংকু, নমস্তে বলে।

আসলে আমাদের ড্রাইভার এমন এক স্থানে আমাদের নিয়ে এসেছিল হলে ঢোকার সময়ে যে স্থান দিয়ে আমাদের যাওয়ার কথা নয়। ওটি অপেরা কর্তৃপক্ষদের জন্যে মাত্র। কিন্তু ওভারকোট্ গায়ে চড়িয়ে বাইরে এসে চক্ষু স্থির। কোথাও কোনো গাড়ির টিকিটি অবধি নেই। রাত হয়েছে। জেঁকে এসেছে ঠান্ডা, ইল্‌শে গুঁড়ি বিষ্টি। রাস্তাঘাট জানা নেই, শুধু জানি হোটেলের নাম। দুজন পুলিস এল। ভাষা বিভ্রাট। এইটুকু অন্তত বুঝল যে আমরা ট্যাক্সি চাই এবং গন্তব্যস্থল হোটেল ক্রোনোভা। আরো মিনিট পনেরো। একটি ট্যাক্সি পুলিসবাবুরা ডেকে দিলেন।

দোষ আমাদের, গাড়ির ড্রাইভারের নয়, দোষ কপালের। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভাবল আমরা হয়তো অন্য কোনো গাড়িতে চড়ে হোটেলে চলে গেছি। হোটেলে গিয়ে সে আবার ফিরে এসেছে অপেরায়। অপেক্ষা করে আবার ফিরে গেছে। সে কী করে জানবে যে আমরা আধঘণ্টা খুঁজে বেড়াচ্ছি ওভারকোট্?

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশে একটা ছক কাটা প্রটোকল আছে (সব প্রটোকলই অবশ্য ছককাটা থাকে)। যেমনি ধরুন : রাষ্ট্র-অতিথির প্রথম কাজ হল অজানা সৈনিকের সমাধিতে মাল্যদান করে সম্মান প্রদর্শন করা। এখানে হল রাজঘাটে গান্ধীজীর সমাধিতে যাওয়া, নেহরুর সমাধি স্থানে যাওয়া। ওয়ারশ বেলগ্রেড, সোফিয়া, রুমানিয়া, সকলেরই আছে অজানা সৈনিকের সমাধি। অর্থাৎ ওই অজানা একজন হলেন হাজার-লাখ সৈনিকদের প্রতীক, যারা জীবন-

দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা অর্জনে, যাদের আত্মদানে তারা নাৎসী জার্মানীর হাত থেকে আবার ছিনিয়ে আনতে পেরেছে তাদের সার্বভৌমত্ব।

সিপাহী বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে, কি তারও আগে সাঁওতাল ও কৃষক বিদ্রোহ থেকে, জালিয়ানওয়ালা বাগ, ১৯৪২, আর আজাদ্ হিন্দ ফৌজের আত্মবলির অধ্যায় পেরিয়ে আমাদের দেশেও কতো অজানা সৈনিকরা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের প্রতি আমাদের প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা কোথায়? আমাদের ওই ব্যক্তিপূজা। হ্যাঁ, ওসব দেশেও আছে, যেমন রেডস্কোয়ারে লেনিনের রক্ষিত-দেহ সমাধিতে, কিম্বা সোফিয়াতে অনুরূপ ডিমিট্রফের সমাধি স্থানে। কিন্তু তারা সমষ্টির আত্মবলির প্রতিও সমান সম্মান দেখান।

পরদিন সকালে ভিকটরি স্কোয়ারে অজানা সৈনিকের সমাধিতে গিয়ে এই নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম মনে পড়ছে। একপাশে ওই অপেরা গৃহ অন্য পাশে একটি গির্জা, মাঝে স্মৃতি-সমাধি। বড় করে লেখা : "এখানে শুয়ে একজন পোলীশ সৈনিক যিনি প্রাণ-দিয়েছেন পিতৃভূমির জন্যে।" গত মহাযুদ্ধে এমনি নিহত হয়েছে পোল্যাণ্ডে ৬৫ লক্ষ লোক। অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন অধিবাসীর একজন নিহত হয়েছে। একমাত্র ওয়ারশতেই নিহত হয়েছে ছয় লক্ষ অধিবাসী। ইউরোপে অন্য কোনো দেশে (রাশিয়া বাদ দিয়ে) অতো মানুষ মরেনি যেমন মরেছে পোল্যাণ্ডে হিটলারী জার্মানীর হাতে। গোটা আমেরিকায় সমস্ত মহাযুদ্ধে (দ্বিতীয়) অতো মানুষ জীবন দেয়নি যা' দিয়েছে পোল্যাণ্ডের মতো ছোট দেশ।

সেখানে দাঁড়িয়ে বুঝেছিলাম কেন পোল্যাণ্ড যুদ্ধ-বিরোধী, কেন সে চায় ইউরোপীয় নিরাপত্তা যাতে জার্মানীর মতো দেশ আবার যেন ধূলিসাৎ না করতে পারে পোল্যাণ্ডের মতো দেশের প্রগতি, সংস্কৃতি ও জনজীবন। বুঝেছিলাম সেই একটি সুন্দর সকালে কেন পোল্যাণ্ড এবং আরো কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ "ওয়ারশ প্যাক্ট" করতে বাধ্য হয়েছে, সামরিক নিরাপত্তার জন্যে, যেমন আছে ওদিকে "ন্যাটো প্যাক্ট"। আরো বুঝেছিলাম যখন একদিন একজন নতুন পরিচিত লোক, একজন পোলীশ সাংবাদিক, বললেন যে, তাঁর পরিবারে যুদ্ধের পরে বেঁচেছিল মাত্র দুজন, সে আর তার ভগ্নি। বুঝেছিলাম কেন সে পুরোনো কথা বলতে বলতে না-লুকিয়ে মুছেছিল দুফোটা চোখের জল।

আমরা ছিলাম একটা নামকরা রেস্তোরাঁয়, নাম তার "কুম্ভীর", অর্থাৎ "ক্রোকোডিল", রাস্তার নাম "রাইনেক স্টারেগো মীয়াস্তা"। বিস্তৃত মেঝেতে নাচছিল ছেলেমেয়েরা, যুবক-যুবতীরা, প্রৌঢ়-যুবতীরা, ব্যাণ্ডের

সংগীতপিপাসু, ওয়ারশ'তে একটি শিল্পী

সংগে তালে তালে খুশি মনের "কোন নব ছন্দে ছন্দে"। অমনি নৃত্যস্থান আরো অনেক ইউরোপীয়েনদিক হোটেল, ব্রিস্টল্ হোটেলে (কোথায় ব্রিস্টল্ কোথায় ওয়ারশ', —কলকাতায়ও একদা ছিল একটি ব্রিস্টল্ হোটেল)। কংগ্রেসেভা পালাস্ অব্ কালচার, কামেরালনা, ক্রেকৈা পালাস্ অব কালচার, ষ্টাদ্ গ্রইয়াজ্দামি, আরো কতো।

পোল্যাণ্ড কট্টর কমিউনিস্ট নয়। যদি সে দেশে এসে থাকে কমিউনিজম্, সে দেশ তার প্রাচীন কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করেনি, তার ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে ফেলো করে প্রোলেটেরিয়ান সংস্কৃতিকে অন্ধভাবে নেয়নি। নিয়েছে যা এসেছে অতি সহজ-ভাবে তার জনজীবনে।

আমি তাই লক্ষ্য করে দেখলাম যে, তাদের সমাজে আছে নাচ, গান, সহজ মেলামেশা, সংগীত ও বসনের আধুনিকতা, আছে জ্যাজ্ এবং অতি চমৎকার মার্গ সংগীত (অর্কেস্ট্রা এবং অপেরা ও ব্যালে)। কিন্তু নেই "মিনিস্কার্ট", আছে নাইট ক্লাবে নগ্ন-দেহী মানবীর মায়াখেলা, কিন্তু নেই প্যারিস ও লণ্ডনের বেলেল্লাপনা যার সংগে রুচি ও শিল্পের কোনো সম্বন্ধ নেই।

এটা প্রায় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে সত্য। তাদের একটা সংযম আছে যাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। সবগুলো দেশের মধ্যে সব চাইতে উঁচু মিনিস্কার্ট দেখলাম বেলগ্রেডে, তাও যে খুব বেশি সংখ্যায় তা নয়। এই সামাজিক সংযম তাদের পক্ষে কী করে সম্ভব হলো, জানিনে। কিন্তু সংযম আছে।

তিনদিন দেখে বেড়ালাম। ওয়ারশ থেকে বেশি দূরে যাইনি। অনেক গাছ-গাছড়া, যেখানেই আছে কিছু খোলা জায়গা। অনেক নতুন বাড়িঘর, পুরোনো ধাঁচের পাশাপাশি, অনেক কলকারখানা। মোটরে গেলাম ২০।২৫ মাইল দূরে তাদের একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থায়। পুরোনো একটি প্রাসাদ আজ হয়েছে বিজ্ঞান-কেন্দ্র।

কলেজ স্ট্রীট বিষয়ক চিন্তা

কয়েক দিন আগে কলেজ স্ট্রীটের একটি বই-এর দোকানে গিয়েছিলুম। তখন সন্ধ্যা ছটা, কাউণ্টারের ওপাশের ব্যক্তিটি হাসতে হাসতে বললেন, আজ একবারও বাক্সের ক্যাশ-মেমো বই-এর পাতা ওল্টাতে হয় নি। একটা লোকও আসে নি সারাদিন।

বলাই বাহুল্য, ক্যাশ-মেমো বই থেকে আমার অস্তিত্ব অনেক অনেক দূরে, সুতরাং এ বিষয়ে আমি কোনো সাহায্য করতে পারলুম না। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলুম। একটি অতিশয় [illegible] ছবি। দিনের পর দিন, বলতে গেলে মাসের পর মাস, কলেজ স্ট্রীটের দোকানগুলো প্রায় খালি পড়ে থাকছে। বাংলা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে কি রকম চাপ পড়েছে, আমরা খানিকটা জানি, কিন্তু এই চাপের ফলে পুস্তক ব্যবসায়ের মতন ছোটো একটি শিল্পের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছে, সে কথা জানা ছিল না। কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ লেগেই আছে, সুতরাং নিরাপত্তাবোধের অভাবে ক্রেতারা কলেজ স্ট্রীট পাড়া পরিহার করে চলেছেন। বহু প্রকাশক নতুন বই ছাপা একেবারে স্থগিত রেখেছেন, বহুদিন পুনর্মুদ্রণও প্রকাশ করবার আগ্রহ নেই, একটা বড়ো সংকটের [illegible] হয়েছে বলা যায়।

অথচ পুস্তক ব্যবসায়ে [illegible] বেশ ভালো সময় [illegible] বলা হয়। [illegible] লাইব্রেরীগুলো এই সময় বই কেনে, অন্য বছর এ রকম দিনে কলেজ স্ট্রীট পাড়া সরগরম থাকতো। খবর নিয়ে জানলুম, অন্য বছর যে দোকানে এই দিনে গড়ে এক হাজার টাকার বই বিক্রি হতো, এ বছর সেই দোকানেই বিক্রি হয়েছে পঞ্চাশ-ষাট টাকা। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশ বন্ধ হওয়ায় বাংলা বই-এর বাজারে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতি সামলে ওঠার আগেই এসেছে পর পর নতুন ধাক্কা। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, বই কিনে পড়বার মতো লোক বাংলা দেশে প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। ইংরেজী পেপার ব্যাক অবশ্য অনেককেই কিনতে হয়, কিন্তু অন্য রকম কোনো দরকার না থাকলে নিছক পড়ার জন্য একখানা বাংলা বই কেউ কিনে ফেলবেন — এমনটি আর ঘটে না। বই উপহার দেবার রীতিটিও হঠাৎ বাতিল হয়ে গেছে। এক সময় বইয়ের দোকানেও 'বিয়ের বাজার' বলে একটা কথা ছিল, পনেরো পরিবারের নেমন্তন্ন না থেকে শুধু একজনের নেমন্তন্ন থাকলেই বই উপহার দেবার রীতি চালু হয়েছিল। এই কারণেই জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির মলাটে বেশী কালো রং দেখা যেতো না, নামের মধ্যে দুঃখ, মৃত্যু, বিচ্ছেদ এসব শব্দগুলি থাকতো না—কিন্তু এখন লোকে এক ধরনের বিশ্রী ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি কিংবা সবরকমের গ্লাসের দিকে ঝুঁকেছে।

ক্রেতা এখন শুধু লাইব্রেরীগুলো। অধিকাংশ লাইব্রেরীই সরকারী দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল। কয়েক বছর ধরেই পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রায় দেউলিয়া অবস্থা, এ বছর তা চরমে পৌঁছেছে। বরাদ্দ অনিশ্চিত বলে ছাঁটাই হচ্ছে, প্রাপ্য বরাদ্দও সময় মতন মিলছে না, সুতরাং লাইব্রেরী থেকেও বই কেনা প্রায় বন্ধ।

এর আর একটা সাংঘাতিক দিক আছে। বই কেনার সময় মানুষ নিজের পছন্দমতো কেনে, কিন্তু লাইব্রেরীতে গিয়ে যা আছে, তারই যে-কোনো একটা নিয়ে আসে। আমরা কিন্তু লাইব্রেরীতে খবর নিয়ে দেখেছি, আমাদের দেশের লাইব্রেরীর পাঠকরা পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহী নন। অনেক মহিলা চাকর পাঠিয়ে 'যে-কোনো একটা বই' আনান। অন্তত শতকরা ৭০জন পাঠক আগে থেকে লেখকের নাম না জেনে, বই-এর নাম না জেনে, যে-কোনো একটা রগরগে, [illegible], ঝলমলে বুদ্ধিহীন টানা গল্প পড়তে চান। এই সমস্ত পাঠকদের দাবি মেটাতে লাইব্রেরীয়ানদের হিমসিম খেতে হয়। সুতরাং লাইব্রেরীয়ানরাও তাঁদের নিজস্ব রুচির ওপর নির্ভর না করে, অধিকাংশ পাঠকের রুচি অনুযায়ী বই কিনতেই বাধ্য হন। তা হলে, অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই, লাইব্রেরী ছাড়া যখন অন্য ক্রেতা নেই, তখন বাংলা সাহিত্যের উত্থান-পতন বাংলা দেশের আট কি দশ হাজার লাইব্রেরীয়ানদের ওপর নির্ভর করছে।

'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে বই-এর কেনা-বেচার খবর নিয়ে আলোচনা, অনেকটা আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়ে মাথা ঘামানোর মতন অবান্তর মনে হতে পারে। (যদিও, আমি জানি, একজন প্রখ্যাত আদা ব্যবসায়ী একটি জাহাজ মার্কা বাড়ি বানিয়েছেন)। কিন্তু, কলেজ স্ট্রীটের দোকানগুলি যখন দিনের পর দিন শূন্য থাকছে, তখন সাহিত্যের ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা যেন কি রকম পরিহাসের মতন মনে হয়। সাহিত্য অত্যন্ত সময়হরণকারী। একখানা সত্যিকারের সীরিয়াস বই লিখতে একজন লেখকের কতদিন সময় লাগে, আমি ঠিক জানি না, আমার জানার কথা নয়, কিন্তু নানান লেখকের জীবনী পড়ে যা মনে হয়, অন্তত চার-ছ' মাস নিবিষ্ট পরিশ্রম লাগেই। কিন্তু এই পরিশ্রম-প্রসূত বইটি যদি শুধু বই-এর দোকানের আলমারিরই শোভা বৃদ্ধি করে, পাঠকের হাতে না পৌঁছোয়, তবে কি করে আশা করবো, তিনি পরবর্তী বইখানি আরও বেশী নিবিষ্ট ও আন্তরিক হয়ে লিখবেন! লেখকরা তো একালে আর বায়ুভুক নন। শুধু বায়ুভক্ষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ভালোও না। আর, ঈশ্বর বিশ্বাসের মতন পারত্রিক অমরত্বে বিশ্বাসও এখন টলে গেছে। এখন না খেয়ে কষ্ট সহ্য করে লিখে যাবো, মৃত্যুর পর রচনা মূল্য পাবে—এই রকম চিন্তা করার মতন দৈবী-উন্মাদের দেখা আজকাল কদাচিৎ পাওয়া যায়। তাহলে, এই অবস্থায়, যাঁরা ইচ্ছে করে অসার, জোলো, অবাস্তব লেখা লিখতে চান না—তাঁদের এখন একমাত্র পথ লেখা ছেড়ে অন্য ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করা। এবং এই যে জোলো লেখার যুগ চলছে—এ রকমই চলবে? যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে, সবাই এতেই গা ভাসিয়ে দেবেন?

কলেজ স্ট্রীটের খালি কাউণ্টারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হয়, এই রকম ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও যে লেখক সত্য বর্জন করেন না, নিজের নিষ্ঠা বজায় রাখেন তাঁর মানসিক শক্তি কত বেশী। আর্থিক এবং শারীরিকভাবে বিনষ্ট না হয়েও যাঁরা সাহিত্যকে ধ্রুব বলে জেনেছেন, নিজের সঙ্গে বঞ্চনা করেন নি, এই কঠিন পরীক্ষার দিনে তাঁরা আরও অনেক বেশী শ্রদ্ধেয়। সুখের বিষয়, বাংলা দেশের প্রবীণ ও নবীন লেখকদের মধ্যে এই রকম লেখক বেশ কয়েকজন আছেন।

সনাতন পাঠক

প্রবন্ধ

বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা। ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : ছ' টাকা।

একথা অনস্বীকার্য যে স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের বক্তৃতা থেকে শুরু করে যাবতীয় রচনা ও ভাষণ এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানের এই বিজ্ঞানের যুগে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাশীলতাই তাঁর ধর্মীয় মতবাদকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছিল। শুধু করে তুলেছিল নয়, বর্তমানের অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার তমোনিসা অন্তে তা হয়তো আবার করে তুলবে।

স্বামী বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সহজাত, ভূমিকায় কথাটি বলেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। শৈশব থেকেই যা যুক্তিগ্রাহ্য তাকেই শুধু গ্রহণ করবার প্রবণতা এবং পরবর্তীকালে ধর্ম প্রবক্তা হয়েও সেই যুক্তিস্পৃহ মন বজায় রাখা বিবেকানন্দের চরিত্রের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। ঠিক এমনভাবে বেদান্তের ব্যাখ্যা আর কোন সন্ন্যাসী তাঁর পূর্বে করেছেন? আর ওই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়েই না প্রতীচ্যের মনীষীরা তাঁতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে এদের যোজনব্যাপী পার্থক্য। কিন্তু, বিবেকানন্দ তাঁর বাক্যে, মননে, চিন্তায় ও কর্মে দেখিয়েছেন, তা নয়। দর্শন ও বিজ্ঞান তো একই সত্যে পৌঁছনোর প্রয়াসী—শুধু তাদের পথটা আলাদা। ব্যাপক অর্থে, দর্শন তো বিজ্ঞানেরই একটি শাখা। আর ধর্ম? বৈদান্তিক ধর্মকে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসী হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। এবং এ-দুরূহ কাজে তিনি অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন।

এই সূত্র ধরে লেখক ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা নিয়ে এক সম্যক আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। এ বিষয়বস্তু অভিনব, সন্দেহ নেই। ধর্মপ্রবক্তা বিবেকানন্দ, সমাজ-সংস্কারক বিবেকানন্দ, সেবাব্রতী বিবেকানন্দ—সকলেই জানেন, বোঝেন; কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে—আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে—স্বামীজীর কী যোগাযোগ, এ বিষয়ে কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা খুব বেশি জনের আছে মনে হয় না। না থাকলেও এই চমৎকার গ্রন্থখানি পাঠ করলে তা হবে, এ বিষয়ে জোর দিয়েই বলা যায়।

ডক্টর মজুমদার তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও পরিশ্রমে স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার, ভারতবর্ষে ফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োগ, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ অথচ চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন। বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই মূল্যবান পুস্তকে লেখক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন এই সন্ন্যাসীর মনীষার এক নব-পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন। প্রথম অধ্যায় প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তো অসাধারণভাবেই একটি চমৎকার প্রবন্ধ।

লেখকের চিন্তা স্বচ্ছ ও ভাষা সাবলীল, খুবে সাধারণ পাঠকও এ গ্রন্থ পাঠে আনন্দ লাভ করবেন। ২৮২।৬৭

ছোটগল্প

পঞ্চকন্যা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যম, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী এই প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা নয়, একালের পতিত ও ব্রাত্য পঞ্চকন্যার কাহিনী তারাশঙ্করের "পঞ্চকন্যা"। পাঁচটি নাতিদীর্ঘ কাহিনীতে অগ্রজ লেখক পাঁচটি মেয়ের কাহিনী শুনিয়েছেন, ধরে তুলেছেন পাঁচটি স্মরণীয় চরিত্র—পড়লে পরে কেবল প্রাতঃকালে নয়, সকল কালেই যাদের কথা মনে পড়বে। এ পাঁচটি গল্প বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং অন্যত্রও প্রকাশিত; তবু একসঙ্গে এই সমধর্মী পঞ্চকাহিনী প্রকাশের একটা আলাদা তাৎপর্য আছে।

জাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের এই পাঁচটি ছোটো গল্পেই রয়েছে ধ্রুপদী উপন্যাসের ছাপ। এবং এ গল্পগুলো ঐ সত্যই প্রমাণ করে যে নগর পটভূমিকার চেয়ে পল্লীর পটভূমিকায় তারাশঙ্কর অধিকতর সার্থক। ৩৩৩।৬৭

সঙ্গীত

সলিল চৌধুরীর গান (প্রথম খণ্ড)। ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ার, কলকাতা-২৯। ১·৫০ টাকা।

মোট ২৪টি গানের সংকলন, এই পুস্তিকাটির কাগজ এবং ছাপা ভারী সুন্দর। এতে বিশেষ করে চোখে পড়বার মত জিনিস দুটি। এক, শ্রীসলিল চৌধুরীর একখানি আলোকচিত্র; ছবিটিতে তাঁর হাতে গীটার, বুকে ঠেকানো। দুই, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত আড়াই পৃষ্ঠা-ব্যাপী ভূমিকা।

ভূমিকা পাঠের পর গানগুলো পড়তে কিন্তু কষ্টই হয়। গান অবশ্য সুর ছাড়া অসম্পূর্ণ—তবু পড়বার সময় গানে কিছু কাব্যমূল্যও তো আমরা আশা করি। সেই বস্তুটি এখানে খুঁজে পাওয়া ভার। কোনকোনও গানে "হেই হেই" কিংবা "হো-হো-হো" ধ্বনি; আবার বেশ কিছুই কেমন যেন মিনমিনে। ভাবাবেগ কোথাও ফেনানো, কোথাও বা চড়া।

[illegible] : "যদি কিছু আমারে শুধাও/কি যে তোমারে কব/নীরবে চাহিয়া রব/না বলা কথা বুঝিয়া নাও।" "কে যাবি আয়/ওরে আমার সাথে আয়/ও সে রাঙা আলোর পানে ভুলে/ঝিকি মিকি হয়/আয় আমারে [illegible]।" "কৃষকের [illegible]/শোষণের হাতে/[illegible] প্রাণ শত প্রাণ গেল যে...।" "[illegible] পারবে না ভোলাতে মধুমাখা ছলনাতে/জনতাকে পারবে না ভোলাতে...।" "আমার মনের কিছু আশা/কিছু ভালবাসা/দিয়ে [illegible] আমার/বড় সাধের বাসা/তোরা দেখে যা রে।"

এই সব গানে যদি গণসংগ্রাম একলা এগিয়ে থাকে, তবে বলবার কিছু নেই। আবার গানগুলির প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের পুরনো দিনের কথা যদি কারও মনে পড়ে এবং অতঃপর যদি কারও চিত্ত ভাববিহ্বল হয়, তবে তারও মানে বুঝি। কিন্তু রসবিচারের সময় বিহ্বলতা কি সাজে? নিজেকে "সাধারণ শ্রোতার দলে" ফেলেও সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

লিখেছেন, "শ্রীচৌধুরীর [illegible] আত্ম-চেতনার [illegible] আমার মনের এবং সুরের স্বতন্ত্রতায় তাঁকে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-নজরুলের বংশে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবে।" সুরের কথা ছেড়েই দিলাম, "জীবন-চেতনা", "ভাষার নমস্ক" এই শব্দগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন থেকে কি শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বাক্যটি রচনা করেছিলেন? সারটিফিকেট দিতে হলেও বয়ানের বিশ্বাসযোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। আর একটি কথা। রবীন্দ্রনাথের নামটা চট করে তাঁর কলমে এলো কেন? শ্রীচৌধুরীর একাধিক গানের ধরুতাইয়ের অংশ রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতার দুই-একটি কলির উপর দাগা-বুলোনো বলে?

প্রাপ্তি স্বীকার

অজেয় বীর অজয়কুমার। রবিদাস সাহারায়। বসু বুক স্টল : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩.০০।

মহুয়াবনের মেয়ে। নিত্যগোপাল সামন্ত। স্বস্তি বিদ্যায়তন : ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৬.০০।

KESHAVSUT by Prabhakar Machwe. Sahitya Akademi: Rabindra Bhawan, Ferozshah Road, New Delhi. Price: 2.50.

ILANGO ADIGAL by M. Varadarayan. Sahitya Akademi: Rabindra Bhavan, Ferozshah Road, New Delhi. Price 2.50.

জনশিক্ষা ও সংস্কৃত। অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। শ্রীমতী উষা দেবী চক্রবর্তী : ঋষিধাম, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।

ঘাটের কবিতা। সম্পাদক : আশিস সান্যাল। ইণ্ডিয়ানা : ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫.০০।

চলতি তামিল শিক্ষা। ঈশ্বরচন্দ্র শেখর শাস্ত্রী। পি ৮২(৪১) সর্দার শঙ্কর রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য ১.৫০।

ছায়ানট। মুকুল চক্রবর্তী। নেপাল চক্রবর্তী : উদয়পুর, নিমতা, কলিকাতা-৪৯। মূল্য ১.০০।

প্রত্যয়। সুকুমার মাইতি। বজেশ্বর লাইব্রেরী : পোঃ তিলখোজা, মেদিনীপুর। মূল্য ৩.০০।

আলোকে ঝলকে। বামদেব মুখোপাধ্যায়। শিক্ষাব্রতী প্রকাশনী : ১৬/এ সুইনহো লেন, কলিকাতা-৪২। মূল্য ৩.০০।

গণতন্ত্রের লক্ষ্মী। নির্মলকুমার বসু। ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স : ৫১ বিমান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ২.৫০।

বিদ্যাসাগরের জাত্যা [illegible] দেবী। সতীকুমার নাগ। চন্দ্রিকা পাবলিশিং হাউস : ৩৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ১.৭৫।

[illegible]। [illegible]। [illegible] : ৮৭এ [illegible] রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৯.০০।

মোহিনীর বাগান। শ্রীমতিলাল মণ্ডল। মণ্ডল পাবলিশিং হাউস : ৮বি ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ১.৫০।

কর্মযোগ। অশ্বিনীকুমার দত্ত। বসু বুক [illegible] : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩.০০।

[illegible] মালা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড : ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩.০০।

হৃদয়ে কলঙ্ক। [illegible]। আনন্দ

বড়দিনের নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে খেলাধ্লো অন্যতম। কিন্তু এবার বড়দিনের খেলার বাজার বড় মন্দা। বিদেশী ক্রিকেট দলের সফর ব্যবস্থা নেই। ইংলণ্ডের মাইক স্টুয়ার্টের যে দলটির বোম্বাই ও মাদ্রাজে খেলার ব্যবস্থা হয়েছে তাঁরাও কলকাতায় আসছেন না। এশিয়ান টেনিসের সূচনা থেকে কলকাতার সাউথ ক্লাবই প্রতি বছর হয়ে এসেছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নের ক্রীড়াঙ্গন। এবার তারও ব্যতিক্রম। এবার সর্বপ্রথম কলকাতার বাইরে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসছে। এবারকার চ্যাম্পিয়নশিপের স্থান ঠিক হয়েছে ব্যাঙ্গালোরে। জাতীয় টেনিসও এ বছর কলকাতায় হচ্ছে না, হচ্ছে দিল্লিতে। আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় আরম্ভ হচ্ছে শুধু পূর্ব ভারত টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ।

বলা বাহুল্য, এশিয়ান বা ন্যাশনালের চেয়ে পূর্ব ভারত টেনিসের আকর্ষণ অনেক কম। যদিও বাইরের কিছু কিছু খেলোয়াড়ের এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের কথা আছে; তবু সম্ভাবিত আগন্তুকদের মধ্যে টেনিসের কোন গাল-ভরা নাম নেই। সুতরাং এবারে বড়দিনে ক্রিকেট ও টেনিস রসিকদের কাছেও মাঠের বড় আকর্ষণ কিছু নেই।

পোলো খেলা বড়দিনের এক বড় আকর্ষণ, যদিও সে খেলা আমার আপনার জন্য নয়। সাধারণেরও তেমন আগ্রহ নেই। তবু অভিজাত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর দর্শক আছেন, ঘোড়ার মাঠের ডাক যাঁদের কাছে ঘরের ডাকের চেয়ে বেশী। ফুটবল হকির চেয়ে ক্রিকেটে ও টেনিসে অপেক্ষাকৃত অভিজাত সম্প্রদায়ের আকর্ষণ। টেনিস ও ক্রিকেটের বড় আসরে উঁচু মহলের অনেক দর্শকই উপস্থিত থাকেন, যাঁদের ফুটবল হকির বড় আসরেও কচিৎ কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু ঘোড়দৌড়ের মাঠ বা ঘোড়-সওয়ারের পোলো খেলায় দেখা যায় সমাজের একেবারে চিলেকোঠার বাসিন্দা-দের। তার সঙ্গে প্রাক্তন শাসক বা শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের যাঁরা আজও ঐতিহ্যবাহী তাঁরা তো আছেনই। পোলো মাঠের আভিজাত্য ও পরিবেশ দেখলে মনে সন্দেহ জাগে 'জনগণমন অধিনায়কের' বদলে বুঝি 'গড সেভ দি কিং' সহসা বেজে ওঠে।

পোলো মাঠে অনেক গণ্যমান্যেরই সাক্ষাৎ

এজরা কাপ পোলো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দিনে আর্মি হাউস দলে ভারতের স্থল বাহিনীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল পি পি কুমারমঙ্গলম (বাঁদিকে থেকে দ্বিতীয়)

—ফটো-রেখ

মেলে। বর্ধমানের মহারাজা, কুচবিহারের মহারাজা এবং অনেক মহারাজাই ওখানকার পরিচালক এবং অনেক মহারাজাই পোলো খেলোয়াড়। আমার ক্রীড়া-সাংবাদিক জীবনে স্যার বীরেন মুখার্জিকে অন্য খেলার মাঠে এক-আধ দিনের বেশী দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু পোলো মাঠে বহু দিন তাঁর দেখা মিলেছে। বিড়লা-বাড়ির স্বনাম-ধন্যদের সম্বন্ধেও একই কথা।

এর কারণ পোলো যেমন বিলাস বহুল ও ব্যয়বহুল খেলা তেমন এর খেলোয়াড় এবং উৎসাহীরাও সমাজের উঁচু স্তরের বাসিন্দা। পোলো খেলায় সাধারণেরও যে আকর্ষণ নেই, এমন কথা বলব না। তবে তুলনায় অনেক কম।

সত্যি কথা বলতে কি, পোলো খেলা রাজা মহারাজা এবং অশ্বারোহীদের এক বিলাসের মত। বিপুল ব্যয়সাধ্যও বটে। যার ফলে সাধারণের মধ্যে কোনদিন খেলার জনপ্রিয়তা আসবে না। সাধারণ মানুষ কোনদিন খেলতেও পারবে না। কোথায় বা এত বড় মাঠ? এত টাকাই বা কোথায়?

ধরুন প্রতি দলে ৪ জন করে খেলোয়াড়ের একটি খেলায় চার চক্করে ৩২টি ঘোড়ার প্রয়োজন। প্রতি ঘোড়ার দাম কম করে পাঁচ হাজার টাকা করে ধরলে একটি খেলায় বাহনের মূল্যই এক লক্ষ ষোলো হাজার টাকা। রেসের ঘোড়া বা অন্য ঘোড়া দিয়ে পোলো খেলা যায় না। পোলো খেলার জন্য বিশেষ ধরনের ঘোড়া এবং ঘোড়ার বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। সামরিক বা পুলিস বাহিনীতে ঘোড়ার ব্যবস্থা আছে বলেই অনেক সামরিক ও পুলিস অফিসারের পক্ষে খেলোয়াড় হওয়া সম্ভব হয়েছে এবং ঐ দুটি সংস্থায় পোলো দলও গড়ে উঠেছে। অন্যান্য দল গড়ে উঠেছে রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্যদের আগ্রহ ও খেলার আকর্ষণে। সামরিক বাহিনীর প্রধানরা সাধারণত পোলো খেলার উৎসাহী এবং খেলোয়াড়ও। প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল জে এন চৌধুরীও নিজে পোলো খেলেছেন, খেলায় উৎসাহ দিয়েছেন। বর্তমান সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল কুমার-মঙ্গলমও নিজে খেলোয়াড় ও খেলার পরম পৃষ্ঠপোষক।

জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে এই খেলার অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও খেলাটি কিন্তু বিশেষ নৈপুণ্যের এক চিত্তাকর্ষক খেলা। বাহক ও বাহনের নৈপুণ্যগত উৎকর্ষ, অশ্বচালনার কলাকৌশল এবং হাতের কারিগরির মধ্যে খেলার মাধুর্য।

যাই হোক, কলকাতায় রেস কোর্সের পোলো মাঠে শীতের মরসুমে প্রতি বছরই পোলো খেলার অনেকগুলি আসর বসে। ভারতের সব প্রান্তের স্বনামধন্য খেলোয়াড়-দের সমাবেশ ঘটে। বিদেশ থেকেও আসেন কিছু কিছু কৃতী খেলোয়াড়।

স্থানীয় প্রতিযোগিতা স্টুয়ার্ট কাপের খেলা এ বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। ফাইনালে পুলিস 'এ' দল রাজস্থান

এজরা কাপের উদ্বোধনে দুইজন বিশিষ্ট দর্শক রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এবং কুচবিহারের মহারাজা —ফটো-দেশ

ওয়াণ্ডারার্সকে হারিয়ে আবার স্টুয়ার্ট কাপ পেয়েছে। এখন আরম্ভ হয়েছে সর্ব-ভারতীয় এজরা কাপের খেলা। এরপর আছে কারমাইকেল কাপ, দ্বারভাঙ্গা কাপ এবং আই পি এ চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। আই পি এ চ্যাম্পিয়নশিপই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

ক্যালকাটা পোলো ক্লাবের সভাপতি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ সেদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, এবার পোলো খেলা খুবই আকর্ষণীয় হবে এবং অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করবেন। তাছাড়া আগামী জুন মাসে ভারতের একটি পোলো দল কেনিয়া সফরে যাবে এবং কেনিয়ার একটি দল ভারতে আসবে ১৯৬৮-র ডিসেম্বর মাসে।

হকি খেলার মত পোলো খেলাতেও ভারতের প্রাধান্য ও ঐতিহ্য সর্বজনস্বীকৃত হলেও পৃথিবীর অনেক দেশ এখন পোলো খেলায় খুবই পটু। কেনিয়া, ইংলণ্ড, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি এমন কয়েকটি দেশ। গোলের হ্যাণ্ডিক্যাপ দিয়ে খেলোয়াড়দের গুণাগুণের বিচার। জয়পুরের মহারাজা এবং রাজারাও হনুৎ সিং যেমন ৫ গোল হ্যাণ্ডিক্যাপের খেলোয়াড় তেমন অন্যান্য দেশেও বেশী গোলের হ্যাণ্ডিক্যাপ খেলোয়াড়ের অভাব নেই। আর্জেন্টিনার নাকি এমন গুণী খেলোয়াড় আছেন, যাঁরা সাত আট গোল হ্যাণ্ডিক্যাপের অধিকারী। গত বছর ৬ গোল হ্যাণ্ডিক্যাপের অধিকারী এডওয়ার্ড মুর নামে আর্জেন্টিনার যে খেলোয়াড় কলকাতায় খেলে গিয়েছেন—বিশেষজ্ঞদের অভিমত এমন সুনিপুণ খেলোয়াড় কলকাতায় বেশী আসেননি। আলফ্রেডো গোমেজ ও [illegible] নামে আর্জেন্টিনার দুজন খেলোয়াড় এবার কলকাতায় খেলতে এসেছেন। আলফ্রেডো গোমেজ ৬ গোল এবং [illegible] ৫ গোল হ্যাণ্ডিক্যাপের খেলোয়াড়। এঁরা দুজনই খেলবেন রাজস্থানের রতনাদা দলে।

ইংলণ্ড থেকে এসেছেন ৪ গোল হ্যাণ্ডিক্যাপের খেলোয়াড় জুলিয়ান হিপউড এবং কেনিয়া থেকে এসেছেন এলান উইসডম। উইসডমও ৪ গোল হ্যাণ্ডিক্যাপের খেলোয়াড়। এঁরা দুজন খেলবেন ক্যালকাটা পোলো ক্লাবে।

সুনিপুণ খেলোয়াড় জয়পুরের মহারাজা খেলা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং তাকে হয়তো খেলতে দেখা যাবে না। তবে স্বনামধন্য রাজারাও হনুৎ সিং ও তাঁর ছেলে বিজয় সিংকে রতনাদা দলে খেলতে দেখা যাবে। আর্মি দলে কর্নেল কিষেণ সিং, মেজর পি কে মেহেরা ও ক্যাপ্টেন ভি পি সিং খুবই ভাল খেলোয়াড়। ক্যালকাটা পোলো ক্লাবের রসিক জইয়া এবং মহারাজ-কুমার জয় সিং-এর সুনামও পোলো রসিকদের সুবিদিত। সুতরাং আশা করা যায় এবার কলকাতার পোলো মরসুম ভালই জমবে।

*

সেদিন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট টেনিস ক্লাবে টেনিস মরসুমের উদ্বোধন দেখতে গিয়ে আইনজীবীদের সামাজিক মেলামেশার এক সুন্দর ছবি চোখে পড়ল। ছেলেমেয়ে, বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নী ও গিন্নীদের নিয়ে শ' আড়াই সভ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত। যেন পিকনিকের আয়োজন। সবার সঙ্গে সবার যেন এক পারিবারিক সম্পর্ক। খেলার আসর সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করবার যে এক বিশেষ অঙ্গন তারই ছোট্ট পরিচয়।

পোলো মরসুমের উদ্বোধন দিনে দর্শকদের একাংশ —ফটো-দেশ

"কেদার রাজা" : লিলি চক্রবর্তী ও পাহাড়ী সান্যাল

সেন্সরের বিরুদ্ধে

আর্টের ক্ষেত্রে ভারতীয় ছবির উন্নতি যে ব্যাহত তার কারণ চিত্রনির্মাতাদের সব সময়েই সেন্সর-কর্তাদের খেয়াল-খুশি মেনে চলতে হয় এবং চলচ্চিত্রকারদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ চলে। এই মন্তব্য করেছেন বিখ্যাত আমেরিকান চিত্রসমালোচক ডোনাল্ড রিচি। তিনি সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন।

কলকাতায় সাংবাদিকদের সংগেও তিনি কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, বাইরের কর্তৃত্ব মেনে চলার দায় থাকে বলেই প্রগতি-শীল চলচ্চিত্রকার আর্ট সৃষ্টির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ডোনাল্ড রিচি মনে করেন, ফিল্মের নীতি কী হওয়া উচিত তা চলচ্চিত্রকার নিজেই স্থির করবেন। বাইরে থেকে তা চাপানো উচিত নয়। ডোনাল্ড রিচি বলে গিয়েছেন, Film censorship in India is bureaucratic.

অজানা শপথ

কোন কাহিনীকার-পরিচালক যদি দর্শককে শুধুই নাট্যসুখ দিতে চান, এবং নাটক সৃষ্টির জন্য যদি তাঁকে আকস্মিক

অথবা কিছুটা সাজানো ঘটনার উপর নির্ভর করতে হয়, সেটা তেমন দোষের ব্যাপার নয়। কিন্তু অসহ্য লাগে যখন কৃত্রিম নাটকীয়তার মধ্যেও মহৎ বক্তব্য প্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতা দেখি। সুখের বিষয়, "অজানা শপথ" (সরকার প্রোডাকশন্স) ছবিতে এমন কোন "প্রিটেনশন" বা ভণিতা নেই। পরিচালক সলিল সেন (গল্প ও চিত্রনাট্য তাঁরই) এ ছবিতে সরলভাবে তিন বন্ধুর গল্প বলে-ছেন। মণিমোহন, সত্য ও শঙ্কর তিন অভিন্নহৃদয় সুহৃদ। সত্যর গোপন প্রেম ও পরিণয়ের কথা অপর দুই বন্ধু জানত না। সত্য ও শ্রীমতীর বিয়ের কথাও নয়। তিন বন্ধুর জীবনে প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটিয়ে দিল এই গোপন প্রণয় ও পরিণয়।

কাহিনী উপস্থাপনে পরিচালক যথাসম্ভব ফ্ল্যাশব্যাক পরিহার করেছেন। শেষে শঙ্কর যখন জেল থেকে বেরিয়ে মণিমোহনের বিচার করতে এল তখন অবশ্য মণিমোহন ও শ্রীমতীর মুখে. অতীত ঘটনার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ফ্ল্যাশব্যাকে বিন্যস্ত। সোজাসুজি গল্পটি উপস্থিত করা হয়েছে বলেই নাট্যরস দানা বেঁধেছে। কাপুরুষ সত্য সমাজের তথা অভিভাবকের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস পায় নি। মৃত্যুই তার কাছে বাঁচবার একমাত্র পথ। রিভলবারের গুলিতে প্রথমে শ্রীমতীকে মেরে তারপর নিজে মরবার জন্য তৈরি। শ্রীমতীর গর্ভে তখন সত্যর সন্তান। তাই শ্রীমতীর মরবার অধিকার নেই। শেষ পর্যন্ত সত্য আত্মহত্যা করেছে। শ্রীমতীকে মেরে সে মরতে পারে নি। সত্যর মৃত্যু কেন্দ্র করেই শঙ্করের কারাদণ্ডভোগ। এবং মণিমোহন ও শ্রীমতীর পলাতক-জীবন, দুঃখবরণ, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অভিনয়।

পরিচালক কাহিনীকার ছবিতে মণিমোহনের আত্মত্যাগ বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে সে বন্ধুপত্নী ও বন্ধু-কন্যার দায়িত্ব বয়ে বেড়িয়েছে। সত্যর কন্যা নিয়তির বিয়ের দিনেই দীর্ঘকাল পর শঙ্কর এসে তাদের বাড়িতে উপস্থিত। তখনই সে মণিমোহনের মহত্ত্বের কথা জানতে পারে। মণিমোহনের অন্তর-সন্ন্যাস (কাহিনীকারের 'সন্ন্যাসী' নাটকের ভিত্তিতেই চিত্রনাট্য) ও আত্মসুখবিসর্জন বাস্তবোচিত কিনা অথবা পলাতক, আত্মপ্রতারক ও মেরুদণ্ডহীন সত্যর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আজীবন অটুট রাখা শ্রীমতীর পক্ষে কী করে সম্ভব এসব প্রশ্ন বিচারশীল দর্শকের মনে অবশ্যই জাগতে পারে। শ্রীমতীকে হত্যা করে সত্যর আত্মহত্যার প্রবৃত্তি অথবা মণিমোহনের প্রতি শঙ্করের অবিশ্বাসও শুধু কাহিনী গঠনের

[illegible] পরিচালিত "[illegible]" ছবিতে রাখী [illegible]

প্রয়োজনেই মেনে নিতে হয়। এক কথায়, এই কাহিনীর অধিকাংশ ঘটনাই কৃত্রিম, এবং চরিত্ররাও জীবনসত্যের প্রতীক নয়। তবে কাহিনীতে নাট্যচমক প্রচুর। নাটক জীবনানুগ না হলেও সাময়িকভাবে দর্শককে কাঁদাতে ও হাসাতে পারে। এখানেই নাট্যক্রিয়ার সাফল্য, যা "অজানা শপথ"-এ যথেষ্ট বিদ্যমান। নাটকীয় আবেগ যাঁদের কাম্য, ছবিটি দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন। দুই পুরুষের কাহিনীর চিত্রনাট্যটিও সুসংবদ্ধ, এবং চিত্রপরিচালনার বড় গুণ, ছবিটি কোন মুহূর্তেই মন্থর নয়।

চরিত্রগুলি খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে প্রধান শিল্পীরা সর্বাংশে তাঁদের অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নি। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের স্কন্ধে গুরুভার অর্পিত। তিনি প্রথমে রোমান্টিক নায়িকা, পরে জননী। দুই রূপেই তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয়। শেষভাগে শিল্পীর চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা লক্ষ্যণীয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মণিমোহন যৌবনে প্রাণোচ্ছল, প্রৌঢ়ত্বে ব্যক্তিত্বপূর্ণ। পরিণত বয়সে চরিত্রটির ক্লান্ত, অবসন্ন রূপ শিল্পী ভাল ফুটিয়েছেন। শঙ্কররূপী দিলীপ রায়ের অভিনয়ও খুবই কৃতিত্বপূর্ণ, বিশেষ করে শেষ অঙ্কে যেখানে তিনি মণিমোহন ও শ্রীমতীর বিচার করতে এসেছেন। অপেক্ষাকৃত নবাগত শিল্পী [illegible] মতন চরিত্রটিতে প্রাণবান অভিনয় করেছেন। রোমান্টিক নায়ক হিসাবে তাঁকে বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হয়েছে।

পাহাড়ী সান্যাল ও ছায়া দেবী অবস্থাশালী বৃদ্ধ দম্পতির রূপসজ্জায় স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। ওঁরা দুজনেই দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা পাবেন। সত্য ও শ্রীমতীর পিতার চরিত্রে যথাক্রমে প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সত্য

বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ও নাজ্ঞ। নবাগতা শিবানী বসু সেজেছেন নিয়তি—শ্রীমতীর কন্যা। তাঁর অভিনয় প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। অন্যান্যদের মধ্যে যথোচিত অভিনয়ের জন্য জহর রায়, রেবা দেবী, হারাধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রশংসা পাবেন।

সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত একাধিক গান জনপ্রিয় হতে পারে। গেয়েছেন সুরকার নিজে এবং আরতি মুখোপাধ্যায়। বিমল মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজ এবং সুবোধ রায়ের চিত্রসম্পাদনা প্রশংসার যোগ্য।

আখরী খত

নায়িকার লেখা "আখরী খত" বা শেষ চিঠি নায়ক যথাসময়ে পায়নি। পত্র পৌঁছবার আগেই নায়িকা পরলোকে। "আখরী খত" (হিমালয় ফিল্মস) বিয়োগান্ত প্রেমের কাহিনী। নায়িকা লাজুর (পাহাড়ী মেয়ে) অকালমৃত্যু হয়েছে বলে দর্শকের নিরাশ হবার কারণ নেই। লাজু মারা যাবার পরেও অতীত ঘটনা ফ্লাশব্যাকে দেখা গেছে। কেমন করে নায়ক গোবিন্দের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটল দর্শক তা শেষ সময়ে জানতে পারেন। পরিচালক চেতন আনন্দ (কাহিনীকারও ইনি) ছবিতে ফ্লাশব্যাক উপস্থাপনে বিশেষ প্রয়োগ-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পটি সোজাসুজি বলা গেলে হয়ত ক্লান্তিকর হত। যদিও ছবিটিতে কোন কোন ব্যাপারে একঘেয়েমি আছে। যেমন

শ্রীলেখা স্টুডিওজের "পথে হল দেখা" চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ফিল্ম ক্লাসিকের "চারণকবি মুকুন্দদাস" (পরিচালনা : নির্মল চৌধুরী) চিত্রে সুভাষচন্দ্রের বেশে সমরকুমার, অশ্বিনী দত্ত রূপে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধুর রূপসজ্জায় শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নামভূমিকার শিল্পী সবিতাব্রত দত্ত

মায়ের মৃত্যুর পর পনেরো মাসের ছেলেটির একা পথে পথে ঘোরা। এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায়, শহরের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিরাশ্রয়, অসহায় শিশুটি ঘুরে বেড়াচ্ছে। মজার বিষয় এই, সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটিকে রাস্তার অনেক লোকই দেখেছে। কিন্তু কারো মনে ওকে নিয়ে কোন কৌতূহল জাগেনি। কেউ তাকে পুলিশের হেফাজতেও দিয়ে আসেনি। শিশুটি কখনও তার মাকে খুঁজেছে, কেঁদেছে, ফুটপাতের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। এবং সব বিপদ সে পার হয়ে এসেছে। রেল লাইনের উপর যখন সে শুয়ে তখন তার উপর দিয়ে ট্রেন চলে গিয়েছে। এদিকে নায়ককে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ইনসপেক্টার (পুলিশের যেন আর কোন কাজ নেই) শহরময় শিশুটিকে খুঁজে চলেছে। কয়েক সেকেণ্ড বা মিনিটের ব্যবধানে শিশুটি তাদের নজরের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই খোঁজার পালা যেন শেষ হতে চায় না। রীতিমত "বোরিং।" অবিশ্বাস্যও বটে। বিশেষ করে ওইরকম একটি শিশুর দিনরাত শহরে ঘুরে বেড়ানো।

শিশুটি (এই কনিষ্ঠতম চিত্রতারকার নাম বান্টি) "ওয়াণ্ডার চাইল্ড"। তাকে যেভাবে কাজ করানো হয়েছে তাও বিস্ময়কর। এবং বান্টিকে ছবিতে প্রাধান্য দেবার জন্যই মূল গল্প ফ্লাশব্যাকে এবং সংক্ষিপ্তভাবে দেখানো হয়েছে। প্রেমের কাহিনী বর্ণনায় যে পরিমিতিবোধ রয়েছে, বান্টিকে দেখানোর বেলায়ও তা থাকলে ছবিটি নিয়ে বিশেষ কোন ক্ষোভের কারণ থাকত না। মূল প্রেমের গল্পটি কৃত্রিম। অনেক ঘটনারই যুক্তি পাওয়া যায় না। নায়ক লাজুকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছে (দেবতা সাক্ষী রেখে তারা পরস্পরকে গ্রহণ করে)। তা সত্ত্বেও সে কেন লাজুকে নিজের কাছে শহরে নিয়ে এল না তা পরিষ্কার বোঝা গেল না। লাজু যখন গর্ভবতী তখন তার সৎমা জোর করে মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেন। লাজু সব কথা স্বামীকে বলার পর বেদম মার খেয়ে গোবিন্দের কাছে চলে আসে। তখন গোবিন্দ তাকে ভুল বুঝে তাড়িয়ে দেয়। পরক্ষণেই নিজের অন্যায় বুঝতে পেরে অনুতাপে দগ্ধ। সবই কৃত্রিম ব্যাপার তাই কি?

ছবির ক্লাইম্যাক্স অবশ্য ভাল। পরিচালককে ধন্যবাদ, তিনি পরিশেষে পাপ-উপাখ্যান নিয়ে আসেননি। ঘুরতে ঘুরতে লাজু নিজেই এসে গোবিন্দের বাড়িতে উপস্থিত। এসেই দেখতে পায় তার মায়ের মূর্তি (বলা হয়নি, গোবিন্দ ভাস্কর, সে প্রেয়সীর মূর্তি গড়েছিল)। ওই মূর্তিকে বান্টি আদর করতে থাকে। তা দেখে গোবিন্দের কান্না বুঝি থামে না। গোবিন্দর সত্যিকারের বান্ধবী রজনীও তখন এসেছে। তারও চোখে জল। পুলিশ অফিসারও এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যাবার সময় রজনীর দিকে তাকিয়ে এমনভাবে চোখ টিপে গেলেন যাতে দর্শক এই ভরসা নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন যে, রজনী গোবিন্দের স্ত্রী হবে।

চেতন আনন্দ ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে একটি নতুন ধরনের ছবি করতে চেয়ে-

ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা আংশিক সফল। ছবির দুই প্রধান শিল্পী রাজেশ খান্না (গোবিন্দ) ও ইন্দ্রাণী মুখার্জি (লাজু) ভাল অভিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালক খয়াম রচিত আবহসংগীত শ্রুতি-বিদারক। গানের সুরও তেমন মনমাতানো নয়।

এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে বলাই সেন পরিচালিত জিন্দেল ফিল্মস-এর **কেদার রাজা।** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তপন সিংহ। পাহাড়ী সান্যাল নাম-ভূমিকায় শিল্পী। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন লিলি চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, ছায়া দেবী, অসিতবরণ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা দাস প্রভৃতি। কালীপদ সেন সুরকার।

[illegible] শুটিং আরম্ভ হয়েছে। [illegible] আশুতোষ মুখো-পাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে **সাবরমতী** ছবিটি পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, দীপ্তি রায় প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট শিল্পী।

এরা পিকচার্সের "অগ্নিযুগের কাহিনী"-র নিয়মিত চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে ছবির কাহিনী (বীরেন রায় রচিত)। পরিচালনা করছেন ভূপেন রায়। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিপন্নপালক বসু। মাধবী মুখোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলি, সুলতা চৌধুরী, বিকাশ রায়, দিলীপ রায় প্রভৃতি প্রধান চরিত্রের শিল্পী।

অগ্নিযুগের কাহিনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী অরোরার "আরোগ্য নিকেতন" শীঘ্রই মুক্তি পাবে। বিজয় বসু ছবির পরিচালক চিত্রনাট্যকার। বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা, দিলীপ রায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রবি ঘোষ জহর গাঙ্গুলি ইন্দিরা দে, রমা দাস প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

আরোগ্য নিকেতন

এস এম ফিল্মের "বাঘিনী" মুক্তি-প্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির অন্যতম। সমরেশ বসুর কাহিনী নিয়ে ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিজয় বসু। গিরীন্দ্র সিংহ চিত্রপ্রযোজক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রবি ঘোষ, বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অজয় গাঙ্গুলি, রাখী বিশ্বাস, বাসবী নন্দী

বাঘিনী

রাধারাণী পিকচার্স-এর বালুচরী চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

বোম্বাইয়ে আসছেন। ছবিতে গুরুর ভূমিকায় অভিনয় করবেন উৎপল দত্ত। ওস্তাদ বিলায়েৎ খান সেতার বাজাবেন। 'পপ' গানের জন্য প্রযোজক ইসমাইল মার্চেণ্ট একজন বিখ্যাত পপ-সংগীতজ্ঞর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। বোম্বাইয়ে একটানা দুই মাস শুটিংয়ের পর বিকানীর ও বারাণসীতে দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। তিন মাসের মধ্যেই ছবি শেষ হবে আশা করা যায়। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স ছবির পরিবেশন-স্বত্ব ক্রয় করেছেন।

বিবিধপ্রসঙ্গ

ক্রাইস্টচার্চের এশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কারজয়ী ছবি "ইয়াদে"'র পরিচালক শ্রীসুনীল দত্তকে এখানে সম্প্রতি সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী চ্যবন। পরীক্ষামূলক ছবিটির জন্য শ্রী দত্তকে অভিনন্দন জানান। তিনি পরিচালক-অভিনেতাকে একটি হাতির দাঁতের সুদৃশ্য 'নৌকা' উপহার দেন।

ক্যালকাটা সিনে করনার আগামী মাসে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত চলচ্চিত্রের শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংবর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করবেন। একটি ঘোষণায় ওই সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শিল্পীদের সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি সংগীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। বাংলা দেশ এবং বোম্বাইয়ের বহু চিত্র-তারকা ও খ্যাতনামা সংগীত শিল্পীদের ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা।

প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পী বারট লার ৪ ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কের হাস-পাতালে নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। তাঁর বয়স ৭২ হয়েছিল। তাঁর অভিনীত কয়েকটি বিখ্যাত ছবি : "লাভ অ্যাণ্ড কিসেজ", "মিস্টার রডওয়ে", "মোসেট", "রোজ মেরি"। গায়ক-অভিনেতা হিসাবেই তিনি খ্যাত ছিলেন।

পাঠকের চোখে

এক্সপেরিমেণ্টাল ছবির প্রদর্শনী

কলকাতায় আর্ট থিয়েটার তৈরির প্রসঙ্গে সম্প্রতিত আলোচনাটির জন্য অনেক ধন্যবাদ। কলকাতার দুটি ফিল্ম সোসাইটির সভ্য হিসাবে আমার কিছু বক্তব্য পেশ করছি। আপনি লিখেছেন, কলকাতায় ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্য কর্মকর্তারা গর্বিত। সভ্যসংখ্যা যখন ক্রমবর্ধমান তখন গর্বিত হওয়া স্বাভাবিক। যদিও সোসায়েটির মাধ্যমে আমরা বহু বিদেশী ফিল্মের সঙ্গে পরিচিত হই; তবু একটা অপ্রিয় সত্যি কথা এই যে, অনেকেই ফিল্ম ক্লাবের সভ্য হওয়াকে একটা ফ্যাশান হিসাবে নিয়েছেন। অনেকের সঙ্গেই আলাপ করে দেখেছি, যুদ্ধচিত্র বা যৌনধর্মী ছবি ছাড়া অন্য ছবি ভাল বোঝেন না বা ভালবাসেন না। অবশ্য সৎ ও বোদ্ধা সভ্যের সংখ্যা সামান্য নয়। তাই বিভিন্ন ফিল্ম ক্লাবের কাছেই আবেদন করছি : বাংলা দেশে যেসব এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি তৈরি হয়ে পড়ে আছে সেগুলি যদি ওই সব ফিল্ম ক্লাবের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় তবে সে সব ছবির প্রযোজক ও পরিচালকগণ নতুন ছবি তৈরিতে উৎসাহ পাবেন এবং দর্শকরাও নিজের দেশের নতুন ধারাকে বুঝতে পারবেন। তাতে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পও বেঁচে থাকবে। "পথের পাঁচালী"ও একদা এক্সজিবিটারদের কাছে অবহেলিত হয়েছিল। কিন্তু আজ এ কথা কে না জানেন যে, এই ছবিই সবচেয়ে বেশী সম্মান ও বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছে। তাই আজ নতুন নতুন যে সব এক্সপেরি-মেণ্টাল ছবি তৈরি হচ্ছে তার মধ্যেও যে প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে নেই তা কে বলবে? আর্ট থিয়েটার তৈরি হোক, তা নিয়ে সার্থক আন্দোলন হোক; কিন্তু যতদিন তৈরি না হয় ততদিন বিভিন্ন ফিল্ম ক্লাবগুলিকে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন কলকাতা তথা ভারতে তৈরি এক্সপেরিমেণ্টাল ছবিগুলি তাঁদের ক্লাবের মাধ্যমে দেখান।

সত্য গুপ্ত
দক্ষিণ চাতরা, ২৪ পরগনা

সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ প্রোডাকশন সিণ্ডিকেটের "আঁধার সূর্য" ছবিতে রিনা ঘোষ ও মৃণাল মুখোপাধ্যায়

নজর রাখো!

আঃ– আঃ–

যুবকমরাজের দুর্গে ---
মরে গেছে?
না, অজ্ঞানই হয়েছে, শরীর তাতে অবশ হতে পারে, মৃত্যু ঘটে না...

ঘণ্টা কয়েক বাদে ---
?
অরণ্যদেব — অরণ্যদেব —

এই হচ্ছে সেই অরণ্যদেব! ব্যাটা আমাদের অসামান্য করেছিল। ট্যাকসো আদায় করতে দেয়নি। মনের সুখে শিকার করতে দেয়নি ---
যুবকমরাজ, তুমি জঙ্গল থেকে সিংহ ধরে এনে তাদের মানুষখেকো করে তুলেছিলে কেন? আবার সেগুলিকে জঙ্গলে নিয়ে ছেড়েই বা দিয়েছিলে কেন?
7/2

ওটা আর কিছুই নয়, তোমাকে এখানে নিয়ে আসবার চক্রান্ত।
কাজেও কাজ হয়েছে।
তোমার চক্রান্তে নিরীহ মানুষ সিংহের পেটে গেছে। তার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।

শাস্তি? হো হো, হাহা, ব্যাটা আমাদের শাস্তির ভয় দেখাচ্ছে!
আমাদের ট্যাকসো না-দিতে প্রজাদের উসকেছিস, আমাদের শিকারে বাধা দিয়েছিস, তার জন্য তোকেই আমরা শাস্তি দেব!
না যুবকমরাজ, শাস্তি তোমারই পাওনা!

যুবকম — আমি তোমাকে শাস্তি দিতে এসেছি!
হো হো, হাহা, ব্যাটা বলে কী!
শাস্তি আমিই দেব। তবে পিছনে একবার তাকিয়ে দ্যাখ।

সিংহ তো ছেড়েছিস, ওই বাঘকে এখানে ছাড়তে পারবি? হো হো, হাহা...

ইনডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ারকিং জারনালিসট-এর প্রাক্তন সভাপতি এবং হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডের প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক শ্রীঅধীরচন্দ্র ব্যানারজির মৃত্যু এই সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রীব্যানারজি ৮ ডিসেম্বর শম্ভুনাথ কারমানি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর। ২ ডিসেম্বর শ্রীব্যানারজির প্রসটেট গ্ল্যানড অস্ত্রোপচার হয়। তিনি তাঁর পত্নীকে রেখে গিয়েছেন। শ্রীব্যানারজি ১৯৪৬ সালে সহকারী সম্পাদকরূপে হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডে যোগ দেন এবং মাত্র তিন মাস আগে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সাল থেকে দু'বার আই এফ ডবলিউ জে-র সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সাংবাদিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাদের সর্বভারতীয় সংস্থা আই এফ ডবলিউ জে-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম ছিলেন। শ্রীব্যানারজি ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি জাকরতায় আফরো-এশীয় সাংবাদিক প্রতিনিধি সম্মেলনে ভারতীয় সাংবাদিকদের নেতৃত্ব করেন। এ ছাড়াও তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। শ্রীব্যানারজি পরলোকগত সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার সহযোগী ছিলেন।
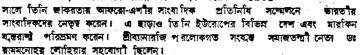
দেশী সংবাদ

৪ ডিসেম্বর—সংসদের উভয় সভা আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাজ সমর্থন করেছেন। বিরোধী দল অবশ্য ওই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁরা লোকসভা ও রাজ্যসভা কক্ষ ত্যাগ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবনের বিবৃতি লোকসভায় ১৯৫—২৯ ভোটে সমর্থিত হয়। অপরদিকে রাজ্যপালের অপসারণ দাবি করে কমিউনিসট দলের আনীত প্রস্তাবটি ২১৬—৭৯ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

আজ কলকাতায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী ছাত্র-পুলিস খণ্ডযুদ্ধে একদিকে কাঁদানে গ্যাস, লাঠি, অপরদিকে হাজার হাজার ইট, সোডার বোতল বাঁশ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। ইট ও কাঁদানে গ্যাসের আঘাতে প্রায় ২০ জন আহত হয়েছে।

৫ ডিসেম্বর—আজ নয়াদিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য কংগ্রেস নেতারা পৃথক পৃথকভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করলেও কংগ্রেস ও 'পি ডি এফ'-এর মধ্যে এখনই কোয়ালিশনের কোন সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

আজও কলকাতায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড পর্যন্ত কলেজ স্ট্রীটের কয়েক শ গজ এলাকায় ছাত্র পুলিসে খণ্ডযুদ্ধ চলে। আহতের সংখ্যা দশ। গ্রেপ্তার : তের জন। এক পক্ষের আক্রমণ ইট আর পটকা, অন্যপক্ষের লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস।

৬ ডিসেম্বর—আজ লোকসভায় জনসঙ্ঘ সদস্য শ্রীহুকুমচাঁদ কাচোয়াই বিতর্কমূলক সরকারী ভাষা (সংশোধন) বিলের প্রতিলিপিতে আগুন ধরিয়ে দিলে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। ব্যাপার দেখে সদস্যরা হকচকিয়ে যান। জনসঙ্ঘের একজন প্রবীণ সদস্য শ্রীকাচোয়াইর কাছ থেকে জ্বলন্ত বিলের প্রতিলিপিটি কেড়ে নিয়ে আগুন নিবিয়ে ফেলেন।

আজও কলকাতায় ছাত্র পুলিসে সংঘর্ষ হয়। তবে এদিনের 'যুদ্ধক্ষেত্র' সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে থেকে সূর্য সেন স্ট্রীট ও মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড় পর্যন্ত। অস্ত্র যথারীতি এক-পক্ষের ইট ও পটকা, অন্যদিকে লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস। গ্রেপ্তার : ৮। আহত : ৫।

৭ ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে

আলোচনা শেষে ডঃ পি সি ঘোষ এবং পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেস নেতারা এ আশা নিয়ে আজ কলকাতা রওয়ানা হয়েছেন যে, রাজ্যের বিধান-সভার অধ্যক্ষের রুলিং-এর ফলে সৃষ্ট সাংবিধানিক জটিলতার শীঘ্রই অবসান হবে।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আজ রাইটারস বিলডিংস-এ সাংবাদিকদের নিকট বলেন, এই রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) আইন শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে, শিল্পে শান্তি ফিরে আসে এবং সাধারণ মানুষের খাওয়া জোটে—এই তিনটি বিষয় সম্পর্কেই তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন।

৮ ডিসেম্বর—মধ্য কলকাতায় মৌলানা আজাদ কলেজের সামনে আজ ছাত্র-পুলিসে কিছু সময়ের জন্য বোমা, ইট-পাটকেল এবং লাঠি নিয়ে খণ্ডযুদ্ধ চলে। শুরু হয় বেলা দেড়টা নাগাদ, শেষ হয় সাড়ে তিনটায়। এই সময় ট্রাম-বাস এই রুটে চলাচল বন্ধ ছিল।

সরকারী বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব রাষ্ট্রীয় পরিবহণ করপোরেশনের অনুমোদন লাভ করেছে। সরকার রাজী হলেই ভাড়া বৃদ্ধি হবে। ভাড়া ১০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১৫ পয়সা করা হবে।

৯ ডিসেম্বর—হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে সরকারী ভাষা (সংশোধন) বিলের প্রতিবাদে উগ্র বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা আরও ছড়িয়ে পড়েছে। আজ এলাহাবাদে ছাত্ররা একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও দুটি ডাকঘর আক্রমণ করে সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। ছাত্রদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস লাঠি চারজ করে।

ওড়িশা রাজ্য সরকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীঅশোক দাশ গতকাল তদন্ত কমি-শনের কাছে এক অভিযোগপত্রে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মোট ৭০ দফা অভিযোগ করেন।

১০ ডিসেম্বর—আজ সাংলি-তে [illegible] তিলক চকে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট শোভাযাত্রার উপর সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকলে মারমুখী ওই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস ২৫টি কাঁদানে গ্যাস শেল ছোঁড়ে এবং চারবার বেত চালায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এই শোভা-যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। সাংলি, কোলাপুর ও সাতারা জেলার লক্ষাধিক কংগ্রেসকর্মী শোভাযাত্রায় যোগদান করেন।

বিদেশী সংবাদ

৪ ডিসেম্বর—সাইপ্রাস সংকটের অবসানের জন্য সেক্রেটারী জেনারেল উ থানট মধ্যস্থতা করার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, গ্রীস, তুরস্ক ও সাইপ্রাস তাতে সম্মতি জানিয়েছেন। এক সংবাদে প্রকাশ যে, তিন সরকারই স্বতন্ত্রভাবে উ থানটের মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব স্বীকার করেছেন। তাঁরা এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে পত্র প্রেরণ করেছেন।

৫ ডিসেম্বর—পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পাদনে নতুন করে প্রয়াস চালাবার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদের প্রধান রাজনৈতিক কমিটির সভায় দশটি রাষ্ট্রের একটি প্রস্তাব আজ গৃহীত হয়।

৬ ডিসেম্বর—চীনে আবার বড়রকমের হাঙ্গামা আরম্ভ হয়েছে বলে সোভিয়েট সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' খবর দিয়েছেন। ফুকিয়েন প্রদেশে সৈন্য নিযুক্ত হয়েছে ও সাংহাই-এ সংঘর্ষ চলছে। রাজধানী পিকিং-এর রাস্তায় ট্রাকবোঝাই সৈন্য ও লালরক্ষী নামানো হয়েছে।

৭ ডিসেম্বর—ভারতের একটি প্রস্তাব গত-কাল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের আইন কমিটিতে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কূটনৈতিক সুযোগসুবিধা সংক্রান্ত আন্ত-র্জাতিক আইনভঙ্গের নিন্দাবাদ করার জন্য প্রস্তাবে সাধারণ পরিষদকে আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ৮৫টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে কেউ ভোট দেননি। একজন নিরপেক্ষ ছিলেন।

৮ ডিসেম্বর—কেপ টাউনের এক খবরে প্রকাশ : যানবাহন দুর্ঘটনায় নিহত ২৫ বছর বয়স্কা এক নারীর হৃদ্‌যন্ত্র মিঃ লুই ওয়াশ-ক্যানস্কির (৫৬) দেহে সংযোজনের পর তাঁকে গতকাল চাকাওয়ালা চেয়ারে করে তাঁর ঘরের বাইরে আনা হলে তিনি ডাক্তারদের বলেন, আমি বেশ ভাল বোধ করছি।

৯ ডিসেম্বর—পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের দাবিতে সাধারণ পরিষদ একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছেন। এই সম্পর্কে গতকাল একটি সোভিয়েট প্রস্তাব পরিষদে গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৭৭ ভোট, বিপক্ষে একটিও না। ২৯ জন নিরপেক্ষ থাকেন।

১০ ডিসেম্বর—গতকাল জোহানেসবারগ জেনারেল হাসপাতালে এক চিকিৎসকমণ্ডলী মৃত এক যুবকের কিডনি (মূত্রাশয়) দুটি দুই রোগীর দেহে স্থাপন করেন। এইরকম অস্ত্রোপচার দক্ষিণ আফরিকায় এই প্রথম। চিকিৎসকমণ্ডলী বলেন, নতুন দেহে কিডনি দুটি ঠিকমত কাজ করবে কিনা এখনই তা বলা দুঃসাধ্য।

॥ এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস

নগরপারে রূপনগর

জ্যোতিরাণীর স্বামী শিবেশ্বরের লক্ষ লক্ষ টাকা—ঐশ্বর্যের শেষ নেই—তবু জ্যোতিরাণীর মন ভরে না—জ্যোতিরাণীর আশ্চর্য রূপ—তবু শিবেশ্বরের মনে তৃপ্তি নেই। এত রূপ যে দেখলেই ভয় তার—সর্বদাই মনে হয় জ্যোতিরাণী অন্যে আসক্ত ॥ সাহিত্যিক বিভাস দত্তকে শ্রদ্ধা করে জ্যোতিরাণী, কিন্তু বিভাস চান ভালবাসা। সত্য তার বাপের পশুস্বভাব পেয়েছে, তবে তার উর্ধ্বে ওঠারই তপস্যা। এই ক'টি মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে এক ক্লাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর এই নূতন গ্রন্থে। ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ—আঠারো টাকা ॥

জরাসন্ধের
সম্পূর্ণ ও অখণ্ড
লৌহকপাট
সুন্দর শোভন সংস্করণ
॥ কুড়ি টাকা ॥

আশাপূর্ণা দেবীর নবতম উপন্যাস
সুবর্ণলতা (প্রথম প্রতিশ্রুতির নায়িকা সত্যবতীর কন্যার কাহিনী) ১৩, (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

নীহাররঞ্জন গুপ্তের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯,

মন্মথনাথ ঘোষের
রোশনাই ৪॥ **নীলাঞ্জনা** ৭॥

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
এক আকাশে অনেক তারা ৬,

দেবেশ দাশের
সেই চিরকাল ৩॥

বিমল মিত্রের
কড়ি দিয়ে কিনলাম প্রথম—১৬, দ্বিতীয়—১৪,
একক দশক শতক ১৪,

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এক আশ্চর্য রচনা
ঈস্ট বাকল্যাণ্ড রোড ৮,

তরুণকুমার ভাদুড়ীর
সন্ধ্যাদীপের শিখা (২য় মুঃ) ৪॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অমৃতসমান ৫,

তারাশংকরের
কবি ৪॥ **অভিযান** ৬, **কালিন্দী** ৭,
গন্নাবেগম (নূতন মুদ্রণ) ৮, **সংকেত** ৫,
শুকসারীকথা ৮॥ **উত্তরায়ণ** ৫॥

অ-কু-ব'র
নূতন ধরনের নূতন উপন্যাস
মারিনা ক্যান্টিন ১০,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
একদা কী করিয়া
॥ তেরো টাকা ॥
এর কাহিনী কাল্পনিক—পৃষ্ঠপট ঐতিহাসিক।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র দীর্ঘকাল থেকে ঐতিহাসিক কাহিনী লিখছেন। বস্তুত বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে বন্যা দেখা দিয়েছে তিনিই তার পথপ্রদর্শক। ১৯৩২।৩৩ থেকে তাঁর ঐতিহাসিক ছোট গল্প প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর 'বহ্নিবন্যা' 'সোহাগপুরা' 'নারী ও নিয়তি' 'রক্তকমল' 'আকাশলিপি' 'দহন ও দীপ্তি' প্রভৃতি ঐতিহাসিক কাহিনী বাংলা সাহিত্যে এক ইতিহাস রচনা করেছে। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস "একদা কী করিয়া"তে তিনি নূতন পরীক্ষায় হাত দিয়েছেন—এই দু'এর এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর বর্তমান এই রোম্যান্টিক উপন্যাসে।

বিমল মিত্রের
সখী সমাচার
॥ ছ' টাকা ॥

বিমল মিত্র নামেই যাদু আছে। তাঁর সহজ সরল ভাষা, তাঁর সহজ বক্তব্য এবং তার কঠিন ইঙ্গিত সোজাসুজি মানুষের অন্তস্তলে পৌঁছয় বলেই তাঁর এত খ্যাতি। তাঁর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ত্রিশ টাকা দামের বই—সেই বইও এই অল্প-কালের মধ্যে দশ-বারো হাজার কপি বিক্রী হয়ে বাংলা বইয়ের বাজারে এক অভূতপূর্ব ইতিহাস রচনা করেছে—এক নূতন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'সখী সমাচারে' বিমল মিত্রের সমস্ত শক্তি তথা জাদুর নিদর্শন আছে—আশা করি এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে।

বিমল করের
সীমারেখা ৪॥ **পরবাস** ৪॥
(নূতন ২য় সং)

প্রবোধকুমার সান্যালের
আঁকাবাঁকা (নূতন মুদ্রণ) ৫॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
পঞ্চতপা (চতুর্থ মুদ্রণ) ৭,

অপূর্বমণি দত্তের
সম্রাট বাহাদুর শা'র বিচার (নূতন তৃতীয় মুদ্রণ) ৩॥
স্বর্গ হইতে বিদায় (২য় মুঃ) ৪॥

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
আধুনিক বাংলা কাব্য (নূতন মুদ্রণ) ৭,

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নবতম উপন্যাস
মৃগমদ ৮॥

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য কৃত
পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুবাদ
টলস্টয়ের
ওয়র য়্যাণ্ড পীস
দ্বিতীয় ৪॥০ তৃতীয় ৫,

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ : ৩৪-৮৭৯১

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠ
নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য	—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু	৭৬৫
মহাস্থবির জাতক	—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	৭৭৫
আলোয় কালোয়	—বিশঙ্কু	৭৮১
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর	—ইন্দ্রমিত্র	৭৮৩
টোকিওর চিঠি	—শ্রীবিকাশ বিশ্বাস	৭৯১
চিত্র প্রদর্শনী	—চিত্রপ্রিয়	৭৯৫
দিন রাতের মেলা	—শ্রীস[illegible] মুখোপাধ্যায়	৭৯৭
বিশ্ববিজ্ঞান	—শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়	৮০৩
ভ্রমণের স্বপ্নভঙ্গ	—শ্রীসুভাষ সেন	৮০৫
ট্রামে-বাসে	—	৮০৮

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীনৃপেন সেন

স্বপ্ন-সঘন
সুরভি
ক্যামেলিয়া
কোমল অলক্ষ্য কুহেলীর মতন এর মৃদু,
দীর্ঘস্থায়ী সুবাস আপনার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে
থাকবে। রুচি যাঁদের সূক্ষ্ম, তাঁরা
বলছেন : সুগন্ধি হিসেবে ক্যামেলিয়ার
কোনও তুলনা নেই।
Camellia
PERFUME
হিমানী লিমিটেড, কলিকাতা-২

নির্মল বার সাবান দিয়ে কাচলে
আপনার কাপড়-চোপড় হবে

বাংলা ভাষার সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৮
শনিবার ৭ পৌষ ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ২৫.০০
ষান্মাসিক ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষান্মাসিক " ১৪.০০
ত্রৈমাসিক " ৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষান্মাসিক " ১৪.০০
ত্রৈমাসিক " ৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)
বার্ষিক সডাক ৪৬.০০
ষান্মাসিক " ২৩.০০
ত্রৈমাসিক " ১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)
বার্ষিক ৩১.০০
ষান্মাসিক ১৬.০০
ত্রৈমাসিক ৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 23, Dec. 1967.

হিন্দীর তাণ্ডব

থেকে থেকে জ্বরের কম্পের মতন 'হিন্দী হিন্দী' কম্পনটা এদেশের নাড়িকে অনেকদিন ধরেই চঞ্চল করে তুলছিল, ইদানীং সে-কম্পন বার কয়েক রুগীকে বেশ খানিকটা শঙ্কিতও করেছে। হালে দেখছি হিন্দী-জীবাণুর আক্রমণ অনেকটা ফ্লুর মতন উত্তর ভারতকে কাবু করে ফেলেছে। আমাদের পক্ষে এটা স্বস্তির কারণ নয়, সুখেরও কারণ নয়। হিন্দীকে ভারতের আপামর জনসাধারণের একমাত্র রাজ-বুলি করাবার কী যে বাসনা জেগেছিল হিন্দীঅলাদের কে জানে, তার সমর্থনও জুটেছিল, তারপর থেকে হিন্দীর বেয়াড়াপনা ক্রমশই বাড়ছে। দেখেশুনে হিন্দীর নামে অহিন্দীভাষীদের মধ্যে ক্রমশই যে বিরক্তি ও আতঙ্ক জাগছে সেটা স্বাভাবিক। দক্ষিণ ভারতে হিন্দীকে একচোট অল্পবিস্তর জখমও হতে হয়েছে। তবু হিন্দীঅলাদের কোনো শিক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না। হালে উত্তর ভারতে হিন্দীর যে রকম তাণ্ডব দেখছি তাতে মনে হয়, এই ভাষার লড়াই এক ধরনের নোঙরা সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের চেহারা নিয়েছে। এর পরিণতি কি হতে পারে হিন্দীঅলারা বুঝতে পারছেন না।

ইদানীং হিন্দীঅলারা যে কী ধরনের বালখিল্য আচরণ করছেন তা ভাবলে হাসি পায়। দোকানের সাইন বোর্ড কিংবা গাড়ির নম্বরও ইংরেজীতে রাখতে দিতে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি, ফলে দোকানে দোকানে চড়াও হয়ে, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে ইংরেজীর বদলে হিন্দী হরফে নাম ধাম নম্বর লিখতে বাধ্য করা হচ্ছে। ভাষার জন্যে এমন দরদ ভূভারতে হিন্দীঅলাদেরই যে শুধু আছে তা দেখে অবশ্য আমাদের বুক ফাটছে না, বরং ভাবছি এই যদি ভাষাপ্রীতির রীতি হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে কোনোদিন আমরা, অহিন্দীভাষীরা, হিন্দী রাজ্যে কাজে-কর্মে বা বেড়াতে গেলে স্টেশনে নেমেই হিন্দী পাণ্ডা ভাড়া না করে পারব না।

অবাক হয়ে দেখছি, হিন্দীর নামে উত্তর ভারতে যে হিংস্র উন্মত্ততা দেখা দিয়েছে তার রূপ কী বীভৎস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্কুল কলেজ পথঘাটে যে অরাজকতা তার কথা বাদই দিলাম, মন্ত্রীরা পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনে নেমে পড়ছেন। এমনটি আর দেখি নি। উত্তর প্রদেশের দুজন মন্ত্রী হিন্দীর দাবিতে সংসদ ভবনের বাইরে আইন অমান্য করে যে ইতিহাস রচনা করলেন তার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই। উপরন্তু এমন কাজ নিয়মসঙ্গত ও মর্যাদাপূর্ণ নয়। সংসদে সরকারী ভাষা আইন সংশোধন বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার এক্তিয়ার সংসদ সদস্যদের, কোনো রাজ্যের মন্ত্রীদের নয়। খুবই দুঃখের কথা, সংসদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অধিকারভুক্ত ব্যাপারে এভাবে রাজ্যের মন্ত্রীরা পরোক্ষে নাক গলাবার চেষ্টা করেছেন। এই দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে সংসদ এবং কেন্দ্রের অস্বস্তি সৃষ্টি করবে বলেই মনে হয়।

ইংরেজী বিতাড়নের পথে হিন্দীঅলারা ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছেন। স্কুল কলেজ থেকে ওই বিধর্মী ভাষাটা প্রায় বাদ পড়েছে। এখন হিন্দীর দৌলতে বিদ্যার্থীরা না হোক পড়ুয়া নামধারীরা অনেকটা এগুতে পারছে। কিন্তু এ যাবৎ হিন্দী-সম্বলদের যোগ্যতা জাতীয় জীবনে কতটা কাজে লাগে তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি। সরকারী বেসরকারী চাকরিতে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিভিন্ন শিল্পে, গবেষণায় হিন্দী ভাষার পুঁজি-সম্বলকারীরা কতটা কাজে লাগেন তা দেখার অপেক্ষা রয়েছে। বোধ করি সেদিন হিন্দীর ক্ষমতার একটা হিসেব ধরা পড়বে।

আপাতত হিন্দীঅলাদের গরম মাথা নরম হবার আশা আর বড় নেই। চোঙা প্যাণ্ট, ছোট কুর্তা, চোখে গগ্‌লস্‌ পরে যেসব তরুণের দল রাস্তায় রাস্তায় হল্লা করছে, ঢিল ছুঁড়ছে, দোকানের সাইন বোর্ড নামাচ্ছে, গাড়ির নম্বর-প্লেট পালটাতে বাধ্য করছে তাদের ভাষাপ্রীতি নিশ্চয় অকৃত্রিম; কিন্তু ইংরেজীর অপ-দেবতা যে তাদের গায়ে মাথায় জড়িয়ে রয়েছে এ-জ্ঞান হবার পর তারা কি করবে তাই ভাবি? কি গতি হবে বোম্বাই সিনেমার—যার মধ্যে জঘন্যতম ইংরেজী ছবির নিকৃষ্টতম নকল লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছে এইসব বালখিল্যদের চক্ষু কর্ণের তৃপ্তি মিটিয়ে? মনে হয় না, এর কোনো সদুত্তর রয়েছে। কিন্তু এসব চিন্তা তো কারও কারও মাথায় আসতে পারে।

মোদ্দা কথাটা, আমাদের মনে হয়, হিন্দী ভাষার পতাকা সামনে ধরে যে মিছিলের আয়োজন চলছে তার মধ্যে ভাষাপ্রীতি, দেশ অথবা দেশীয় ঐক্যের বদলে যা রয়েছে তা হল সুবিধা। একদল স্পষ্টতই ভাষা সূত্রে বিশেষ সুবিধা দাবি করছে, এ দাবি অযৌক্তিক, অন্যায্য।
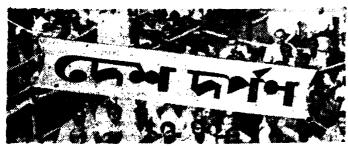
রাজনৈতিক সফরে বেরিয়েছিলেন শ্রীজ্যোতি বসু। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির অবিসম্বাদিত নেতা। খারিজ হয়ে যাওয়া যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সহকারী মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সফরে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গে। ঝোড়ো হাওয়ার মত ঘুরেছেন উত্তরবঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। দিনে তিন চারটে করে সভা করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। হাটে বাজারে লোকের সামনে হাজির হয়ে বর্তমান ঘোষমন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিটি সভায় রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেবার আবেদন জানিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

কিন্তু আরও একটা বিষয়ে তাঁকে প্রতিবাদ জানাতে দেখা গিয়েছে উত্তরবঙ্গের নানা সভায়। এই প্রতিবাদ দেয়ালের পোস্টারের বিরুদ্ধে। শ্রীবসু যে-সব জায়গায় গিয়েছিলেন সে-সব জায়গায় দেখা গিয়েছিল এই পোস্টারগুলো। এইসব পোস্টারের স্লোগান ছিল: "নির্বাচন নয়, সশস্ত্র আন্দোলনই একমাত্র পথ"। পোস্টারের নীচে স্বাক্ষর ছিল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (মাঃ)। পোস্টারগুলো যে তাঁকে উপলক্ষ্য করেই দেওয়া হয়েছিল সে-সম্বন্ধে শ্রীবসুরও কোন সন্দেহ ছিল না। তাই স্পষ্টভাবেই জানাতে হয়েছে এ পোস্টার তাঁর পার্টির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। তাঁকে বলতে হয়েছে এইসব পোস্টার যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বহুদিন আগে বহিষ্কৃত। পার্টি-বিরোধী কাজের জন্যই তাঁদের বহিষ্কৃত করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ তাই তাদের বিরুদ্ধে যাদের তিনি 'হঠকারী' বলে মনে করেন। কিন্তু যে কথাটা তিনি বোঝাতে পারেননি, তা হল তাঁরই পার্টির নাম এই সব পোস্টারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া।

শ্রীবসুর বক্তব্যের মধ্যে কোন অসত্য নেই। কিন্তু এটা আজ আর অজানা নেই যে উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত এলাকায় 'হঠকারী' বলে অভিযুক্ত উগ্রপন্থী কম্যুনিস্টরা বেশ কিছুদিন ধরে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে। এমনকি নক্সালবাড়ির আন্দোলনের সময় যখন পার্টির শিলিগুড়ি মহকুমা ও দার্জিলিং জেলা সংগঠন ভেঙে দেওয়া হল তখন উগ্রপন্থীরা এটা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিল যে তাদের রাজনৈতিক কর্মপন্থার তীব্রতা বৃদ্ধি করাই হবে একমাত্র কাজ। যে-কাজ উগ্রপন্থীরা বেশ কিছুদিন ধরে চালিয়ে এসেছে এবং ফলে, তাদের রাজনৈতিক সংগঠনকে বিস্তৃত করতে তেমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। এই রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তিতেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের কাছে ক্রমাগত আবেদন জানান হচ্ছিল: পার্টির নেতৃত্বকে সরিয়ে দাও, কারণ নেতৃত্ব নয়া-সংশোধনবাদের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে। তবু তৃতীয় কোন কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের কথা বলা হয়নি। কারণ, উগ্রপন্থীদের এই উপলব্ধি ছিল যে, কম্যুনিস্ট পার্টিকে ভেঙে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তাই তাদের সামনে একটা পথই খোলা ছিল: পার্টির নেতৃত্বকে অপসারিত করে পার্টি সংগঠন কবজা করা।

যতদিন পর্যন্ত মাদুরাই প্রস্তাব প্রকাশিত হয়নি ততদিন উগ্রপন্থীদের নীতি খুব বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু মাদুরাই প্রস্তাবের পর উগ্রপন্থীদের নীতিটা স্পষ্টরূপ নিয়েই পার্টির নেতৃত্বের সামনে দেখা দিল। মাদুরাই প্রস্তাব যখন গ্রহণ করা হয়, তখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেনি। তবু তখনই, অর্থাৎ মাদুরাই প্রস্তাবে এ-কথাটাই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের মত অ-কংগ্রেসী সরকারকে বাঁচিয়ে রাখাই হবে একমাত্র কর্তব্য। এই সিদ্ধান্তকেই কেন্দ্র করে উগ্রপন্থীরা তাদের নীতিকে স্পষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। এই প্রচেষ্টা শুরু হয় কলকাতায় ঠিক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করার সময়। তাদের ঘোষণায় বলা হয়েছিল : ভারতের (মার্কসবাদী) কম্যুনিস্ট পার্টির বিপ্লবী কমরেডরা সম্প্রতি কলকাতার এক বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, পার্টির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের "বিশ্বাসঘাতকতার" ফলে গৌরবময় শ্রেণীসংগ্রাম বিজয়ী হতে পারেনি। তাদের মতে "সুবিধাবাদীদের" হাতে পার্টি যন্ত্র থাকার ফলে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই কো-অর্ডিনেশন কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সংশোধনবাদ এবং নয়া-সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে সর্বস্তরে জঙ্গী ও বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলা এবং মাও সে তুঙ এর চিন্তাধারাকে "জনপ্রিয়" করে তোলা।

মূল কথা ছিল, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে অপসারিত করা এবং পার্টির সভ্যদের সাহায্যে পার্টি যন্ত্র দখল করা। এই নীতি অনুসরণ করেই শ্রীজ্যোতি বসুর সামনে পোস্টারগুলো রাখা হয়েছিল। শ্রীবসুর পক্ষ থেকে তাই বলতে হয়েছে বারবার যে পোস্টারগুলো মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়নি। কিন্তু নীতিগতভাবে উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকেও এই পোস্টার প্রচার করার কোন বাধা ছিল না। শ্রীজ্যোতি বসুও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির যে-নেতৃত্বকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন, সেই নেতৃত্ব যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর একটা স্লোগানই জনসাধারণের সামনে রাখবার চেষ্টা করেছেন: বিধানসভা ভেঙে দাও, মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই। এই 'নির্বাচন চাই' স্লোগানের মধ্যেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের বিভেদ ফুটে উঠেছে। কারণ, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর উগ্রপন্থীদের স্পষ্ট প্রস্তাব ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনকে বৈপ্লবিক আন্দোলনে পরিণত করার জন্য। নির্বাচনের স্লোগান তাই এই প্রস্তাবের বিরোধী এবং সে-কারণেই শ্রীবসুকে উত্তরবঙ্গে দেখতে হয়েছে উগ্রপন্থীদের পোস্টার। এটা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ।

এই চ্যালেঞ্জের মুখেই এসেছে ১৮ ডিসেম্বরে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রোগ্রাম। যুক্তফ্রন্টের শরিক হিসাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে এই রকম একটা আন্দোলনের ডাক দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা খারিজ হবার পর, যুক্ত ফ্রন্টের নেতাদের কাছে এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, জনসাধারণের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে কোন রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা দেয়নি। নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক জয়ধ্বনি যুক্তফ্রন্টের চারপাশে উঠতে দেখা গিয়েছিল সে জয়ধ্বনির আওয়াজ নয় মাসের রাজত্বে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে। তাই মন্ত্রিসভা খারিজ হবার পর পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ ক্ষোভে ফেটে পড়েনি। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 'বুলেটের' সামনে দাঁড়াবার জন্য অগণিত অজয় মুখার্জি অক্টারলোনি ময়দানে এসে দাঁড়ায়নি। মাঠে গ্রামে কৃষককে ফসলের কাজে কোন

[illegible] করা হয়নি। যুক্তফ্রন্টের কাছে [illegible] যে গত কয় মাসের রাজ্যের জন- [illegible] রাজনৈতিক সচেতনতা অনেকখানি [illegible]। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ ছিল শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীঅজয় মুখার্জির মত [illegible] নেতাদের [illegible] প্রচার [illegible]। এই প্রচার [illegible] ১৮ ডিসেম্বরের প্রস্তুতিপর্ব।

এই প্রশ্ন ওঠে : কিসের প্রস্তুতি? [illegible] ১৮ ডিসেম্বরের কর্মসূচীতে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। শুধু [illegible] হয়েছে, ব্যাপকভাবে [illegible] সরকারী হুকুমকে অগ্রাহ্য করে [illegible] সরকারী হুকুমকে অগ্রাহ্য করে [illegible] এ-কথাটিই [illegible] হয়েছে যে, [illegible] আন্দোলন [illegible] ছিল না [illegible] কিন্তু [illegible] তিনি [illegible] সম্বন্ধে।" শ্রীজ্যোতি [illegible] মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রী [illegible] যুক্তফ্রন্টের [illegible] ভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই [illegible] পার্টির [illegible] ভারতের [illegible] হবে। "আমরা সংবিধানকে এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।"

মোট কথা, ১৮ ডিসেম্বরের 'লড়াই' এই সংবিধান এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যই। এই কথাটা বোঝাবার জন্যই শ্রীজ্যোতি বসুকে যেতে হয়েছিল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলার জন্যই শ্রীবসুকে বারবার বলতে হয়েছে, 'অশান্ত আন্দোলনের' পোস্টারের জন্য মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি দায়ী নয়। এই কথাটা বোঝাবার জন্যই হয়ত মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের অপর শরিকদের একটা দাবি মেনে নিতে হয়েছে যে দাবি এতদিন পর্যন্ত তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। এই দাবিটা ছিল, বিভিন্ন জেলার যুক্তফ্রন্টের নিম্নস্তরের সংগঠন গড়ে তোলা নিয়ে। এ-দাবিটা উঠেছিল যুক্তফ্রন্ট গঠনের কয়েক মাস [illegible] মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে সে-প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির স্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে, নিম্নস্তরে যুক্তফ্রন্টের সংগঠনের প্রয়োজন নেই। কারণ, সেখানে বিভিন্ন পার্টির রাজনৈতিক সংগঠনই ছিল বড় কথা, বিশেষ করে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে। আজ রাজনৈতিক কারণেই সে-প্রস্তাবটা মেনে নিতে হয়েছে এবং সে-কারণটা অনুমান করতে অসুবিধা হবে না ১৮ ডিসেম্বরের উদ্দেশ্যটা মনে রাখলে। রাজনৈতিক কারণেই আজ যুক্তফ্রন্টকে সম্মিলিতভাবে বলতে হচ্ছে, নিম্নস্তরে ঐক্য স্থাপন করতে হবে।

তবু, ১৮ ডিসেম্বর সম্বন্ধে নানা রাজনৈতিক চিন্তার কথা বিক্ষিপ্তভাবে শোনা গিয়েছে। একটা বিশেষ চিন্তাধারার সূচনা দেখা গিয়েছে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে। এই চিন্তাধারার লক্ষ্যস্থলও শ্রীজ্যোতি বসু এবং তাঁর পার্টির নেতৃত্ব। কথাটা নেহাত অ-প্রাসঙ্গিকভাবে ওঠেনি। কারণ, যে-কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারকে অচল করে দেবার যে-অর্থটা ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে, তা হল সরকারকে সম্পূর্ণভাবে বানচাল করে দিয়ে অপসারিত করা। ইন্দোনেশিয়ায় এমনি একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল, যার প্রত্যুত্তর এসেছিল সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে এবং কম্যুনিস্ট পার্টির কাছ থেকে। সরকারকে বানচাল করে অপসারিত করার প্রচেষ্টা ১৮ ডিসেম্বরের আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলেই ইন্দোনেশিয়ার কথাটাও উঠেছে এখানকার রাজনৈতিক মহলে। হয়ত এ-রকম একটা সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই যুক্তফ্রন্টের কোন কোন বামপন্থী শরিকের মনে দ্বিধা দেখা দিয়েছে। এই [illegible] ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মহলে বলা হয়েছে 'ভারতবর্ষকে ইন্দোনেশিয়া করার পথে অনেক বাধা' এবং সে-কারণে 'বামপন্থী বন্ধুদের' এই সম্ভাবনার কথা স্মরণ করে 'শঙ্কিত' হতে নিষেধ করেছেন। বলা হয়েছে, সশস্ত্র বিপ্লব যেমন ইচ্ছা করলেই হয় না। সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবও তেমনি ইচ্ছা মত করা যায় না। বুঝতে অসুবিধা হয় না কথাগুলো কোনদিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, ১৮ ডিসেম্বরের আন্দোলন যদি 'শান্তিপূর্ণভাবে' পরিচালিত না হয়, তাহলে সশস্ত্র বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লবকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া হয়ত সম্ভব না-ও হতে পারে। হয়ত এই আশঙ্কার কথাই মনে রেখে, শ্রীবসুকে বারবার উত্তরবঙ্গে বলতে হয়েছে 'সশস্ত্র আন্দোলনের' কথা যারা প্রচার করতে চাইছে তাদের সঙ্গে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কোন সম্পর্ক নেই।

একই সঙ্গে, অন্য কথাও উঠেছে ঠিক একই রাজনৈতিক মহলে। বলাও হয়েছে যে, ভারতকে আজ অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কারণে সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হতেই হবে। এটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে বলেই এই মহলের ধারণা যে, ভারতের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় কাঠামো আজ কংগ্রেসের হস্তচ্যুত হবার লক্ষণ হয়েছে। অর্থাৎ, ভারতের রাজনীতির উপর সোভিয়েতের এবং পূর্ব ইউরোপের পরোক্ষ প্রভাবের কথাটা সামনে রাখার প্রচেষ্টা হচ্ছে। ১৮ ডিসেম্বরের পরিপ্রেক্ষিতেই কথাটা উঠেছে বলে, এটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এই রাজনৈতিক সম্ভাবনাগুলো মনে রাখলে ১৮ ডিসেম্বরের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচার বিবেচনা সামনে রাখা সম্ভব। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না, কেন ১৮ ডিসেম্বরে আন্দোলনের সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে; শ্রীজ্যোতি বসু বা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীকে নয়।

আগামী ৩৫ বর্ষ ৯ সংখ্যা (৩০ ডিসেম্বর) 'দেশ' বিশেষ বড়দিন সংখ্যা হিসেবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ সংখ্যাটিতে ছায়াচিত্র সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা থাকবে। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন :

সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, ঋত্বিককুমার ঘটক, বাসু ভট্টাচার্য, সমরেশ বসু, বিমল কর, তরুণ মজুমদার, দরবেশ, অরুণ বাগচী, পঙ্কজ দত্ত, জ্যোতির্ময় বসু রায়, আর ডি বনসাল, চণ্ডী লাহিড়ী এবং সুনন্দ।

পি ডি এফ-কে ভিত্তি করে
হুমায়ুন কবির একটি নতুন
দল গঠন করবেন।
বি কে ডি
নিরাপদ অবতরণ
পি ডি এফ
KUTTY

শক্তি ও উৎসাহের জন্য!
Bournvita
Bensons/I-CP.79 A Ben
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ভিটামিন।
বোর্নভিটা সহজেই তৈরী করা
যায় এবং খেতেও সুস্বাদু।
ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা

'কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস'

মনোরম একটি লং-প্লেয়িং রেকর্ড শুনছিলুম। তরুণ শিল্পী ব্রিজভূষণ কাবরার গীটার। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে বাদ্য হিসাবে গীটার কুলীন জাতের নয়, সাধারণত লঘু সঙ্গীত কিংবা কিছু জনপ্রিয় রবীন্দ্র-গীতিই সে পরিবেশন করে থাকে কিন্তু ওস্তাদ আলী আকবরের শিষ্য চমক লাগালেন। তাঁর গীটারে সেতারের কথা কয়ে উঠল, বেহাগে, যোগিয়ায়, ভৈরবীতে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করলেন তিনি। মনে হল, গুণীর ছোঁয়ায় যে-কোনো যন্ত্রই সরস্বতীর বীণা হয়ে উঠতে পারে।

বেশ খুশীচিত্তে বসে ছিলুম—এমন সময় ডাকটি [illegible]! এই সপ্তাহের ডাক এসে পৌঁছল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়ল 'গানের আসরে'—সম্পাদক বন্ধু শ্রোতাদের সকাতরে বলেছেন, "অতএব আমি যদি একটা স্লোগান তুলি

রেকর্ড ব্রেক

'আরও ভাল রেকর্ড কিনুন', তা হলে আপনারা কি সাঙ্গীতিক স্বার্থেই তাতে যোগ দেবেন না?"

স্লোগান তিনি তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর নিজের লেখাতেই যে-সব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, তাতে তো বিশেষ ভরসা পেয়েছেন বলে মনে হল না। তাঁরই আহরিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, আধুনিক গানের ভাগ্য ভালো, পল্লী-সঙ্গীত বা ভক্তি-গীতিও মন্দ চলে না—কিন্তু নিতান্ত দু-একজন বিশিষ্ট শিল্পী ছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তুমিষ্ঠ গায়ক-গায়িকারা একেবারে নৈরাশ্যের মহাতামসে বাস করছেন। তাঁদের রেকর্ড দুশোর বেশি ছাপা হয় না এবং কুড়ি-পঁচিশ-খানার বেশি বিক্রি হয় না। অপূর্ব! এ না হলে আর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবগুলো আমরা সুরের ঝর্ণাধারায় ভরিয়ে দিই কেন? আবার তো পঁচিশে বৈশাখ আসছে।

অনেক দিন আগের একটা স্মৃতি মনে এল। তখন ছাত্র-জীবন। আমরা দুটি বন্ধু শ্রীমতী কনক দাসের একটি সদ্য-প্রচারিত রেকর্ডের সন্ধানে তৎকালীন রসা রোড ও হাজরা রোডের মোড় থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত—অর্থাৎ গোটা কালীঘাট এবং বালিগঞ্জের সব দোকানগুলোয় হানা দিয়েছিলুম। রেকর্ডটি পাওয়া যায়নি। সবাই-ই বলেছিলেন, 'রবি ঠাকুরের গান? ও তো চলে না, তবে যদি চান, কাল আনিয়ে রাখব।' রবীন্দ্র-সঙ্গীত কি তাঁদের কাছে ছিল না? ছিল। কিন্তু তাঁদের সব কটিই তখন লোকপ্রিয় চলচ্চিত্রের কল্যাণে মুখে মুখে ফিরছে।

তারপরে তো দুই যুগের বেশি পার হয়ে গেছে—প্রায় আড়াই যুগ বলা যায়। হাওয়া একেবারে বদলে গেল, বাংলা দেশ আর বাঙালী রবীন্দ্র-সঙ্গীতে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। যেভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষায়তন গড়ে উঠতে লাগল, তাতে মনে হল—ভালো রবীন্দ্র-গীতি নিশ্চয় হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়—সংস্কৃতিবান বাঙালী সযত্নে তাদের সঞ্চয় করে থাকেন। কিন্তু শার্পদেবের একি ভয়াবহ আবিষ্কার! এখনো সেই ট্র্যাডিশ্যন!

কিছু দিন আগে খবরের কাগজে কে যেন লিখেছিলেন, দক্ষিণ কলকাতা

নাকি রবীন্দ্র-সংগীতের পীঠস্থান (কে জানে, শান্তিনিকেতনকেও ছাপিয়ে উঠেছে কি না!)। তাই যদি, তা হলে সেই রাবীন্দ্রিক মানস-পরিবেশেই তো অনেক হাজার রবীন্দ্র-গীতি বিকিয়ে যাবার কথা। কিন্তু স্ট্যাটিসটিকস্ হচ্ছে 'আর্ম গ্রাশ'—সে কঠোর এবং মর্মভেদী।

মনে পড়ছে অনেক বছর আগে রবীন্দ্র-সংগীতের স্বনামধন্যা একজন মহিলা শিল্পী (শাঙ্গর্দেব যাঁদের গান নানা বাদ্যযন্ত্রযোগে জনপ্রিয় করবার কথা বলেছেন—সে দলের নন) দুঃখ করে-ছিলেন, 'এবার দু-একখানা অন্য গান রেকর্ড করব ভাবছি—রবীন্দ্র-সঙ্গীত তো চলে না।' তখন তাঁর কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি। এখন দেখছি তিনি ঠিকই বলে-ছিলেন, রবীন্দ্র-গীতিকে চলচ্চিত্রের কোনো হৃদয়গ্রাহী অনুষঙ্গে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে 'হ্যাট' করে তুলতে না পারলে ওর বিক্রিমাত্র ভবিষ্যৎ নেই—তার 'তীর্থ-স্থান' দক্ষিণ কলকাতাতেও না।

রেডিয়ো দায়ী? চব্বিশ প্রহর নন্-স্টপ হরি-সংকীর্তনের মতো তার আঠারো ঘণ্টার অনুষ্ঠান, তার তিনটে চ্যানেল? হতে পারে খানিকটা, কিন্তু তাতে তো

রবীন্দ্র সঙ্গীতের বদলে চাই টেগোর মিউজিক

আধুনিক গানের বাজার নষ্ট হয় না। টেপ-রেকর্ডার? যা বাস্তবক্ষেত্রে সরকার, লোক-সংগীতের গবেষক, সাংবাদিক এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিকদের কাজে লাগে, অথচ টাকা থাকলে, যা একটা না কিনলে কৌলীন্য রক্ষা করা শক্ত—তাতেই কি আমরা ভালো ভালো গান তুলে নিই—আর সেইজন্যে আমরা রেকর্ড কিনি না?

তাও যদি মানা যায়, তা হলেও রেকর্ড বিক্রির খুব তর-তম হয় না, কারণ, বাংলা দেশে টেপ-রেকর্ডধারীর সংখ্যা এখন গণনীয়ভাবে বেশি নয়।

এখন জনশ্রুতির মতো মনে হয়, একদা বোধ করি—বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত না হোক, অন্তত রাগপ্রধান গানের একটা ভালো বাজার বাংলা দেশে ছিল। না হলে জ্ঞান গোস্বামী কিংবা ভীষ্মদেব জনপ্রিয় হলেন কি করে? নজরুলগীতির একটা প্রধান অংশই তো বিশুদ্ধ সুরের সঙ্গে কাব্যের হর-পার্বতী মিলন। এ-সব গানও কি আর চলে? এই পর্যায়ের একজন সুধাকণ্ঠ সুখ্যাত শিল্পীকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'অনেক দিন তো নতুন রেকর্ড কিছু করছেন না?' ম্লান মুখে মিতভাষী মার্জিত ভদ্রলোক বললেন, 'কী হবে? চলে না।'

আমি সামান্য কিছু কিছু গান শুনে থাকি, তার অতিরিক্ত কোনো দাবি রাখি না। কিন্তু সন্দেহ হয়—যে-কারণে গভীর ব্যাপ্ত রাগপ্রধান সঙ্গীত আমাদের আর ভালো লাগে না, সেই কারণেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ফ্যাশানকে আমরা নিতে পারি, কিন্তু তার অন্তরের ঐশ্বর্যকে নিতে পারি না।

হাল্‌কা গান কেন চলবে না? চিরদিন চলছে—লঘু মানসিকতার সঙ্গী হয়ে চিরকাল চলুক—আমরা সবাই, সব মুহূর্তে মনকে ধ্রুপদে বাঁধতে পারি না। জ্ঞান গোস্বামী-ভীষ্মদেব-কৃষ্ণচন্দ্র দের দুর্দান্ত যুগেও 'কে নিবি ফুল', আমার যৌবন বাগানে ফুটেছে ফুল', বাংলা দেশকে মাতিয়ে দিয়েছিল। ওয়েস্টার্ন মিউজিক এবং গান ভালো লাগে তো লাগুক না 'কাম সেপ্টেম্বর', 'মাই ফেয়ার লেডি' কিংবা 'সাউণ্ড অব মিউজিক'ও নিশ্চয় মন্দ করবার মতো। কিন্তু বাখ-বীটোভেন-শুবার্ট-দেবুসি-মোৎসার্ট?

ইয়োরোপে অনেকেই গ্রামোফোন ডিস্‌ককে বইয়ের লাইব্রেরি সাজানোর মতো সঞ্চয়যোগ্য মনে করেন—ইংরেজ লেখক কম্পটন ম্যাকেঞ্জি তো এক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত। শাঙ্গর্দেবের মতো শ্লোগান তুলে আমিও বলতে যাচ্ছিলুম, 'আরো ভালো রেকর্ড কিনুন'—বলতে যাচ্ছিলুম, ব্রিজভূষণ কাব্‌রার রেকর্ডটিও—কিন্তু সাহসে আর কুলোচ্ছে না।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান? কবির জিজ্ঞাসা। উঁহু, হাট মিলবে না। তবে 'হাটে-বাজারে'র কল্যাণে (মাপ করবেন, কোনো কটাক্ষ করছি না) দু-একটা গান নদীর মতো 'আপন বেগে পাগল পারা' হয়ে ছুটতেও পারে—এই যা ভরসা!

সন্ধিলগ্ন

বুদ্ধদেব বসু

প্রপিতামহের নাম জানি না।   মাতার অশ্রুত নাম
অতি কষ্টে মনে পড়ে। (তিনি, বিবাহিতা পত্নী, আসলে বালিকা,
আমার জন্মের জন্য কৃতকার্য প্রাণান্ত চেষ্টায়,
সবেমাত্র সক্রিয় যৌবনতাপে গ'লে গিয়ে, বিলুপ্ত হয়েছিলেন—
সম্পূর্ণ বিস্মৃত আজ—অথচ আমার রক্তে এই মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ
নামে তাঁর সঞ্চার) : মা, আমি প্রণাম করি তোমাকে,
মা, আমি চুম্বন করি তোমাকে, অপরিচিতা, অ-দৃষ্টা আমার,
নিরভিমানিনী! আমি তোমাকে দেখেছিলাম
একদা, অস্পষ্ট ম্লান সেপিয়াতে—চোখ বোজা, ঘুমন্ত ঠোঁটের প্রান্ত,
কোনো-এক ক্ষীণকায় যুবকের বাহুবন্ধে আপাতত তখনও পার্থিব,
অপর্যাপ্ত বিস্রস্ত চুলের গুচ্ছে এমনকি রূপান্বিতা—প্রায়।
—কিন্তু বলো, তুমি কি তখনই ছিলে অতিক্রান্ত, অন্য এক দিগন্তে উদীয়মান,
অথবা স্বপ্নের মতো ভাসমান যুগপৎ জাগর-নিদ্রায়—
যেমন বাতাসে ঝোলে ধূলিবিন্দু, উদ্ভিদের আঁশ—
মৃত্তিকায়—অথচ অনিশ্চিত, দিকভ্রান্ত, বাস্তুহারা?
তবে কি তখনই আমি
যন্ত্রণায় তোমাকে বিদীর্ণ ক'রে
নেমে এসেছিলাম আবহমান পথ বেয়ে
যে-পথে আমার পিতা আর সনাতন পিতৃগণ
নিজ-নিজ মৃত্যুবীজ অন্ধভাবে রোপণ করেছিলেন)
আশ্রিত আঁধার থেকে আলোকের ভগ্নাংশে, সংশয়ে,
অজ্ঞান, অব্যবধান তৃপ্তি থেকে দ্বন্দ্বময় দুরন্ত চেষ্টায়?
মা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি, ব্যর্থস্তনী তোমাকে সরিয়ে দিয়ে
অন্য পুষ্টি খুঁজেছি, নিয়েছি কেড়ে—যেহেতু জীবন অপ্রতিরোধ্য—
আর তুমি, অত্যন্ত সংবৃত, স্নেহময়ী,
আমাকে দিয়েছো ছেড়ে, নম্র হাতে, অমাবস্যা-পূর্ণিমার মাঝখানে,
শান্তিহীন, ঘূর্ণমান, ম্রিয়মাণ—অথচ জিগীষাদৃপ্ত, উৎসাহিত,
রাত্রিদিন অনন্তযৌবনা দুই প্রেমিকার
বাহুলগ্ন, রাত্রিদিন আকাঙ্ক্ষায় স্বতঃশ্চল—
যেন আমি অমর, যেন জীবন প্রকৃতপক্ষে ভালো,
যেন তুমি কখনো ছিলে না, কিংবা আমি যেন
তোমারই সহনাতীত পরিশ্রম নই!
তবু আজ মধ্যরাত্রে মনে হয়, তুমি
চঞ্চল, উৎসুক,
সঞ্চরণশীল;
ভোরবেলা, যখন ট্রামের শব্দে স্বপ্ন ছোঁড়ে, স্বপ্নের গুহায়
বিদ্ধ হয় ল্যাম্পোস্টের অবশিষ্ট, আর পর্দাকে ধর্ষণ ক'রে সদ্য রৌদ্র
তূর্যনাদে নূতন দিনের বার্তা এনে দেয় দেয়ালে, টেবিলে—
সেইমতো অনিবার্যতায়,
ঐকাহিক, পুনরুক্ত, পরবর্তী তারিখের মতো,
তুমিও আসন্ন যেন, চিরকাল আরব্ধ, এবং
চিরকাল অসমাপ্ত।

প্রপিতামহের নাম জানি না।   কিন্তু পিতামহ, লোকে বলে,
ছিলেন মদ্যপ, দাতা, বুদ্ধিজীবী—স্বল্পায়ু ফলত,
এবং সম্পত্তিহীন। তাঁর মেধা আমি কি পেয়েছি

উত্তরাধিকারসূত্রে? অথবা অবিবেচক আত্মবিতরণে প্রবণতা?
জানি না। কাকে বলে মেধা, তা জানি না,
কিংবা উত্তরাধিকার। দুর্নিরীক্ষ্য কোন শাখা-প্রশাখায়,
কোন জলে, কোন বীজে, কোন দূর দৈবের সংযোগে
কিংবা কোন নামহীন অগম্য অতল থেকে
আসে বুদ্ধি, স্মৃতি, রুচি, প্রেরণা, স্বভাব—
যার ফল আমার আমিত্ববোধ, ব্যক্তিসত্তা—
কিছুই ধারণা নেই।
অথচ—যদিও আমি তোমার উদ্দেশে
কোনো স্বপ্ন, কোনো চিন্তা না-পাঠিয়ে পেরিয়ে এসেছি বহু দীর্ঘ পথ, অস্তু
তবু আজ স্তব্ধ রাতে সঙ্গহীন অনিদ্রায়
মনে হয় তুমিই আমার রক্তে সূক্ষ্ম মদ, হৃদয়ে অদ্ভুত
চাঞ্চল্য—মা, তুমি! বালিকা, মৃতা, আত্মদাত্রী—আক্ষরিক—
(অর্থাৎ আমার মতো তির্যক সংকেতে নয়,
নয় কোনো নিরন্তর-নির্মিত রূপক তোমার ত্যাগ,
নিরন্তর সাধিত ও প্রত্যাখ্যাত—
কিন্তু এক অদ্বিতীয় পরিশ্রমে অনুষ্ঠিত তর্কাতীতভাবে।)
অদ্ভুত, এখনো তুমি সেপিয়াতে নিতান্ত কিশোরী,
আর আমি আমার মাথায় দেখি কত শাদা, শোচনীয় দাঁতের অভাব মুখে।
তবু—আরো অদ্ভুত—আমারই মধ্যে এই এক মুহূর্তে ও প্রতি মুহূর্তেই
এক শিশু এখনো জীবনলিপ্সু, এক যুবা এখনো ধরায় চুল্লি হৃৎপিণ্ডে,
এক বৃদ্ধ হামাগুড়ি দিয়ে চলে অন্তিম শয্যার দিকে।
যেন প্রতি মুহূর্তেই জন্ম আর মৃত্যুর সন্ধির লগ্ন,
উনষাট বৎসর ধ'রে সেই এক মুহূর্ত পুনরাবৃত্ত—
এক মৃত্যু, যুগপৎ নতুন জীবন:
অতএব তোমার মৃত্যুও যেন চিত্রকল্প, কোনো-এক নিগূঢ় ইঙ্গিত,
যার ফলে তোমাকে হারিয়ে, আমি
হয়েছি সমর্থ, অন্ধ—ক্ষতিগ্রস্ত নয়,
ভরিয়েছি উপকারী মৌলিক বঞ্চনা
আজীবন কবিতাকে ভালোবেসে—
আর মেয়েদের।

কে এই দু-জন? এই তন্বী তরুণী ও বিহ্বল যুবক, যারা
পরস্পর স্পর্শের কোমল ফাঁকে নিখিল বিশ্বকে ধ'রে আছে,
কিংবা যেন এখনো অপেক্ষমাণ বিশ্বের তারাই অগ্রদূত?
যুবকটি পেশলাঙ্গ, অথচ বলিষ্ঠ নয়—
অর্ধজাত, জায়মান, প্রস্তরে নিবদ্ধ জানু, যেন আদি জড়ের বন্ধনে
এখনো আধেক বন্দী—ইতিমধ্যে উর্ধ্বাঙ্গ সজীব, তাই চুম্বনে সক্ষম।
মেয়েটি সম্পূর্ণ কিন্তু, সবেমাত্র সক্রিয় যৌবনে কান্তিময়ী—অতি সুকুমার
অতি মৃদু আঙুলে ও স্তনস্পর্শে,
অতি নম্র কটির ভঙ্গিতে
মূর্ছাবিষ্ট জীবনলিপ্সুকে দেয় অবশিষ্ট আবশ্যক প্রাণশক্তি,
ঢেলে দেয় চুম্বনে নিমগ্ন তার ওষ্ঠাধরে
স্বীয় স্নিগ্ধ দেহের নির্বাস,
দুগ্ধ, মদ, মধু—
যাতে সে, নিশ্বাসে ভ'রে আফ্রোদিতি-পার্বতীর আগ্নেয় করুণা,
খোলা ভেঙে, জরায়ুর নাড়ি ছিঁড়ে, অমাবস্যা-পূর্ণিমার মোহানায়
হ'তে পারে উৎসাহী, জিগীষাদৃপ্ত, বলীয়ান,
হ'তে পারে ব্যক্ত, পরিণত—
যেমন আমিও চাই ব্যক্ত হ'তে, ঐ স্থির যুগল যেমন ব্যক্ত,
আর ঐ যুগলে যেমন ব্যক্ত কোনো-এক ব্যক্তির প্রতিভা।
সংক্ষেপে, আমিও স্রষ্টা হ'তে চাই।

মা, তুমি হেসো না, ভেবো না আমি আত্মম্ভরি।
আমি শুধু উৎসুক প্রেমিক

শব্দের, ও মেয়েদের।
কিন্তু প্রেম একাই যথেষ্ট নয়, চাই জ্ঞান, কষ্টকর গবেষণা,
অথচ কোথাও নেই জিজ্ঞাসার চরম উত্তর।
কখনো ভেবেছি, শিল্পী প্রকৃতির প্রতিযোগী, তার সব অভাব মেটান;
কিন্তু যদি প্রতিভাও প্রকৃতির চেষ্টায় উদ্ভূত,
তাহ'লে কবিতা, ছবি, কিছু নেই, প্রকৃতির অধীন যা নয়।
তাই মনে হয়, বুঝি জীব শুধু জন্ম দিতে পারে,
সৃষ্টি এক অনাদি রহস্যে ঢাকা;
ফলত, তারাই ধন্য, যারা শুধু ইন্দ্রিয়চর্চায় বাঁচে,
আর যাঁরা অনুচ্চার্য জ্যোতির সন্ধানী।
কিন্তু যারা প্রক্ষিপ্ত, যেমন আমি, মধ্যপথে,
এপারে বা ওপারেও বাসিন্দা না-হ'য়ে, শুধু
ভ্রমণে ও বিনিময়ে খুঁজে ফেরে অবৈধ কিমিয়া,
যাতে হয় ভাবনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং যা ইন্দ্রিয়ের দান,
তাও পায় চিন্তনীয় আয়তন, বোধগম্য হয় ধীরে-ধীরে—
কী বলবে তাদের তুমি? কী তাদের লক্ষ্য, লভ্য, ফলশ্রুতি?
আমি
যৌবনে ভেবেছিলাম কবিতাই প্রেম, কিংবা কামনার উপচে-পড়া
শোণিতের মন্থনে উৎপন্ন আরো সুস্বাদু মাখন;—
কিন্তু অন্য ধারণা সম্প্রতি
মাঝে-মাঝে হানা দেয় আমাকে—বিশেষভাবে
এইমতো স্তব্ধ রাতে, সঙ্গহীনতায়
মনে হয় কবিতাও প্রবঞ্চনা—সান্ত্বনা—বিকল্পমাত্র,
কবিতার চেয়ে কাম্য নারীর অঙ্গের মধু;
কিন্তু আমি বৃদ্ধ, সব হারিয়েছি।
কিন্তু কিছু হারায় না—সব থাকে—আছে—
যে-ঘটনা ঘ'টে গেছে তাও চলে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে,
এমনকি হয়তো বা ফিরে পাওয়া যায়,
এমনকি আমাদের কৃত্য আর-কিছু নয়, শুধু ফিরে পাওয়া।
—যদি বলো অসম্ভব, তবু পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও প্রশংসনীয়,
আর যার সম্বল কেবল শব্দ, তাকে বাধ্য হ'য়ে
শব্দেই চালাতে হবে সব কাজ—যতই কঠিন মনে হোক।
তাই আমি অবিরল পরিশ্রমী।

মা, কিছু মনে কোরো না, এ আমার স্বগতভাষণ।
জানি, তুমি অনভিজ্ঞা, নিতান্ত বালিকা।
কিন্তু তুমি মৃতা, আর মৃতের ব্যাপার
আমি এত অল্প জানি, কল্পনাও সেখানে পাণ্ডুর।
তাই বলি, কোনোমতে যদি বা সম্ভব হয়,
একবার এসো না, তোমাকে দেখি;
সবেমাত্র আরব্ধ যৌবন নিয়ে—অতি সুকুমার—
দাও স্পর্শ—স্পর্শাতীত;
আর, সেই অন্যখানে, এতদিনে
যদি কিছু শিখে থাকো, আমার যা এখনো অজানা,
তাও
ব'লে যাও।

ভারতের প্রথম ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টার
দ্বৈত এরিয়েল এবং
ফাইন টিউনিং ইণ্ডিকেটার সংযোজিত
অনেকগুলি কেন্দ্রের ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া যায় না।
এবং 'লুপ' লাগান হইয়াছে।
murphy

প্রিয় মধুবন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মাথা অনেক শূন্য লাগছে আজকাল। অনেক বেশী শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর। মাঝে মাঝে শুধু একটি কি দুটি শালিখ কি চড়ুইয়ের আনাগোনা। এরকম ভাল। এরকম থাকা ভাল। আমি জানি।

কালকেও আমার কাছে একখানা বেনামী চিঠি এসেছে। তাতে লেখা 'বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে!' লাল কালিতে লেখা চিঠি। নাম-সই নেই, তবু আমি হাতের লেখা চিনি। লিখেছে কুনাল মিত্র। আমার বন্ধু। এখনো বোধ হয় ফেরারী। প্রায় দশ বছর তার খোঁজ জানি না।

আমাদের ডাকঘরগুলির কাজে বড় হেলাফেলা। চিঠির ওপর ঠিকঠাক মোহরের ছাপ পড়েনি। আমি কাল সারাদিন আতস কাচ নিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম। না, কোথা থেকে যে চিঠিটা ডাকে দেওয়া হয়েছে তা পড়াই গেল না। জানি যেখান থেকেই দেওয়া হোক ডাকে, কুনাল

আর সেখানে নেই। সে সরে গেছে অন্য জায়গায়। রমতা যোগীর মতো ফিরছে মৃণাল, কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাচ্ছে। তবু বড় ইচ্ছে করছিল কুনাল কোথায় আছে তা জানতে।

কাল বিকেলের দিকে আলো কমে এলে আমি আতসকাচ নামিয়ে রাখলাম। মাথা ধরে গিয়েছিল সারাদিন আতসকাচের ব্যবহারে। তাই চোখ ঢেকে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। ভুল হয়েছিল। সে তো ঠিক চোখ-ঢাকা নয়! টের পেলাম দুটি হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে গড়িয়ে নামছে চোখের জল।

বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে! এ আমারই কথা। কুনাল কেবল কথাটা ফিরিয়ে দিয়েছে। যেন ও কথার আড়ালে উঁকি মারছে তার সকৌতুক দয়াহীন মুখ—রাস্তা তুমিই দেখিয়েছিলে, ঘর থেকে বের করে এনেছিলে তুমিই। তারপর সরে গেছ কোথায়! এখন কার এ'টো চেটে বেড়াচ্ছো মধুবন? তোমার ঘেন্না করে না?

চমৎকার এইসব শব্দভেদী বান কুনালের। মেঘের আড়াল থেকে লড়াই। প্রতিদিন পালটে যাচ্ছে তার ঠিকানা। আর আমি মধুবন—আমি বাঁধা পড়েছি স্থায়ী ঠিকানায়। কুনাল হয়ে গেছে ছায়া কিংবা মায়া। আমি এখন কোথায় পাবো তাকে? এ চিঠির তাই জবাব দেওয়ার দায় নেই।

কাল সন্ধ্যেবেলায় আমি ঘরের আলো জ্বালিনি। কুনালের চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। আমার বুকের মধ্যে টিকটিকির বাসা। ঘর ছাড়ার কথা মনে হলেই সে ডাক দেয় টিকটিক টিকটিক। যেও না। যাবো না যে তা আমি জানি। তবু চোখের জলে আমার দু হাতের আঙুল ভিজে গিয়েছিল। নিজের জন্য নয়, আমি কাল কুনালের জন্য কেঁদেছিলাম। তারপর ফাঁকা একখানা ঘরের মতোই শূন্য হয়ে গেল মাথা। মাঝে মাঝে একটি দুটি শালিখ কি চড়ুইয়ের মতো ভাবনা ও স্মৃতি আনাগোনা করে গেল।

অনেকক্ষণ আমার বাইরের কোনো জ্ঞান ছিল না। তারপর আমার বউ সোনা আমাকে ডাকল 'রাজা, একটু এ ঘরে এসো।'

গিয়ে দেখি সে কাপড় পালটাচ্ছে। বলল, 'দেখ, আমি তোমাকে সারাদিন একটুও জ্বালাইনি। তবু এখন জিজ্ঞেস করছি ও চিঠিটা কার? সারাদিন তুমি ওটা নিয়ে বসে আছো।'

আমি চিঠিটা এনে তার হাতে দিলাম। ও দেখল। তারপর অবহেলায় চিঠিটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, 'দেখ, কী বিচ্ছিরি ব্লাউজ পরেছি! পিছন দিকে বোতামের ঘর। কিছুতেই আটকাতে পারছি না, তুমি একটু বোতাম এ'টে দাও না।'

তখন সোনার সাজ আমি লক্ষ করলাম। কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা একটা ব্লাউজ পরেছে সে, গলায় আর হাতে খুব পাতলা লেস-এর ফ্রিল দেওয়া। ব্লাউজটা আরো কয়েকদিন ওকে পরতে দেখেছি। কোনোদিনই বোতাম এ'টে দেওয়ার জন্য আমার ডাক পড়েনি। তাই মৃদু হেসে আমি ওর পিঠের দিকে বোতাম আর হুক-গুলো লাগিয়ে দিলাম।

ও আস্তে করে বলল, 'ইস, কী ঠাণ্ডা হাত!'

'ঠাণ্ডা!' আমি অবাক হয়ে বললাম 'কই!' বলে হাত দুটো ওর গালে রাখলাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোনা বলল, 'না, সে ঠাণ্ডা নয়। নিস্পৃহতার কথা বলছিলাম।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সোনা ধীরে ধীরে আঁচল তুলে নিচ্ছিল শরীরে। হঠাৎ মুখ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আদর!'

তক্ষুনি কুনালের চিঠিটার কথা একদম ভুল হয়ে গেল।

সোনার ব্লাউজের বোতাম আর হুকগুলো আর একবার লাগিয়ে দিতে হল আমাকে।

তারপর সোনা টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে বলল, 'লাল কালিতে লেখা এই দেড় লাইনের চিঠিটা নিয়ে এখন আমরা কী করব? বাঁধিয়ে রাখবো?'

হেসে বললাম, 'ঠাট্টাটা আমাকেই লাগল, সোনা। চিঠির ও কথাগুলো একদিন আমিই বলতাম। বহুদিন পর অনেক খুঁজে খুঁজে আমার কাছে ফিরে এসেছে আমারই কথা।'

ও ভ্রূ কুঁচকে চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এটা কি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য?'

'না, না!' আমি মাথা নেড়ে হেসে উঠি,

'ওটা এমনিই, ঠাট্টার ছলেই আমার কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া।'

সামান্য দ্বিধা করে সোনা বলল, 'চিঠিটায় নাম-সই নেই। তবু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি একে জানো। কে?'

একটু ভেবে বললাম 'ও বোধ হয় আমারই এক সত্তা। অতীত থেকে লিখে পাঠাচ্ছে।'

'কবিতা!' সোনা হেসে ফেলল, 'এ তো কবিতা হয়ে গেল, রাজা!' হাসি থামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তো তোমার কাছে শুনেছিলাম যে আমি তোমার এক সত্তা। তোমার এরকম আর ক'টা সত্তা আছে, রাজা?'

হিংসুক! সোনা ভীষণ হিংসুক। ঘরে ওর রাজতন্ত্র। আমি ওর রাজা। ওকে এখন কিছুতেই বোঝানো যায় না, যে একদিন আমি কুনালের ছিলাম প্রিয় মধুবন।

না, কুনালের প্রিয় মধুবন হওয়ার জন্য আর একবার পিছু-হাঁটার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার। এখন আমি বেশ আছি। ফাঁকা, খোলামেলা শান্ত একটি ঘরের মতো শূন্য মাথা। মাঝে মাঝে এক আধটা শালিখ কি চড়ুইয়ের আনাগোনা। এক আধটা ভাবনা, এক আধখানা স্মৃতি। তার চেয়ে বেশী কী দরকার! এখন আমার আলো বাতাস ভাল লাগে, ছুটির দিন ভাল লাগে, অবসর আমার বড় প্রিয়। আমার প্রিয় সেলাই-কলের আওয়াজ, আমার শিশু-ছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। আর বুকের মধ্যে সেই টিকটিকির ডাক। যেও না। যেও না।

তবু মাঝে মাঝে যখন ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় চলি তখন হঠাৎ বড় দিশেহারা লাগে। কিংবা যখন মাঝরাতে হঠাৎ কখনো ঘুম ভেঙে যায় তখন লক্ষ করে দেখি পাথর হয়ে জমে আছে আমার অনেক আক্ষেপ। আয়নায় নিজের মুখ দেখে কখনো চমকে উঠি। মনে কয়েকটা কথা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কোন অলীক শূন্য থেকে এসে পড়ে। তুমি যে এসেছিলে কেউ তা জানলই না! হায়, মধুবন!

সত্য বটে এ সবই আবেগের কথা। নইলে আমার মনে স্পষ্ট কোনো আক্ষেপ নেই। না আছে পিছু-হাঁটার টান। খুব একটা স্মৃতিচারণও নেই আমার। মাঝে মাঝে সোনা যখন আমাদের ছেলেটাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যায়, বা বাপের বাড়িতে থেকে আসে একটি দুটি দিন, তখন কখনো সখনো সন্ধেবেলায় বা রাত্রে আমি ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপ চাপ বসে থাকি। একটি দুটি কথা অন্ধকারে মশা ওড়ার শব্দের মতো অন্ধকারে গুনগুন করে যায়। আমি

অকস্মাৎ আমার বাচ্চা ছেলেটার কান্নার শব্দ মনে মনে ডেকে আনি, সোনার গলার স্বরের জন্য নিস্তব্ধতার কাছে কান পেতে রাখি। আস্তে আস্তে সব আবার ঠিক হয়ে যায়। যদি কখনো হঠাৎ মনে হয় যে এরকম শান্ত জীবন হওয়ার কথা ছিল-না আমার, আরো দূরতর, ভিন্ন অনিশ্চয় এক জীবন আমার হতে পারত, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি হাতের কাছে যা পাই—হয়ত ওষুধের শিশি, ফাউন্টেনপেন কিংবা অন্য কিছু না পেলে হাতের আংটির পাথরের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মনকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসি। অতীত এবং ভবিষ্যৎ থেকে ফিরিয়ে নিই আমার মুখ। আস্তে আস্তে বলি, এরকমই ভাল। এরকম থাকাই আমাদের ভাল। তখন মাথা অনেক শূন্য লাগে। অনেক বেশী শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর।

অনেকদিন আগে কুনালের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হওয়ার কিছু পরে ওই রকম লাল কালিতে লেখা বেনামী আর একখানা চিঠি এসেছিল আমার সঠিক ঠিকানায়। তাতে লেখা 'জীবনে সৎ হওয়াই সব হওয়া নয়! আদর্শই সব! আদর্শ না থাকলে পুরোপুরি সৎ হওয়াও যায় না!' প্রতিটি বাক্যের পর একটি করে বিস্ময়ের চিহ্ন। আসলে ওগুলো সকথিত জিজ্ঞাসা। ছুঁচের মুখের মতো ওই চিহ্নগুলো আমাকে বিঁধে-ছিল। আমারই বলা কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া। সেই তার প্রথম বেনামা চিঠি। তারপর আমার বিয়ের কিছু পরে আরো একখানা। এইরকম 'বৃষ্টি হলেই মিছিল ভেঙে যাবে! দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে গাছতলায়! মাথা বাঁচাতে!' কি জানি সে গাছতলার বলতে এ ক্ষেত্রে ছাঁদনাতলায় বুঝিয়েছিল কিনা। চিঠিটা আমি সোনাকে দেখাইনি। শুধু মনে মনে বুঝতে পেরেছিলাম, সে আমার সব খবর রাখে, হদিস রাখে সঠিক ঠিকানায়। সে আমাকে ভোলেনি। সামান্য ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। কি জানি, আমি তাকে আরো তো কত কী শিখিয়েছিলাম! সে যদি সব মনে রেখে থাকে! তারপর ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম যে তা নয়। এ তার আমাকে নিয়ে খেলা। আসলে পুরোনো পুতুলের মতো ভেঙে সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার জীবন থেকে। মাঝে মাঝে সে কেবল দূর থেকে আমাকে ওইভাবে স্পর্শ করে দেখতে চায় আমি কতটা চমকে উঠি।

বলতেই হয় খেলাটা চমৎকার শিখেছে কুনাল। সে খেলতে জানে। গতকাল আমি সামান্য অন্যরকম হয়ে গেলাম। আজ সকালে তাই আমার মুখের দিকে ঘুমচোখে চেয়ে সোনা প্রথম প্রশ্ন করল 'আজও তুমি ওই ভুতুড়ে চিঠিটার কথা ভাবছো!' চমকে উঠলাম। বস্তুত তা নয়। চিঠিটার কথা আমি ভাবছিলাম না, কুনালের কথাও না।

হেসে বললাম, 'দূর!

সোনা হাসল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ করে ছেলের কাঁথা বিছানা গুছিয়ে রাখল, মশারি চালি করল, তারপর এক সময়ে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'কোন ভোরে উঠে জানালার কাছে বসে আছো! এত সকালে ওঠা বুঝি তোমার অভ্যাস!'

সে কথা ঠিক। ভোরে ওঠা আমার অভ্যাস নয়। কেন যে আজ অত ভোরে ঘুম ভেঙে গেল কে জানে। তারপর আর ঘুম আসছিল না। শীতকাল, তবু লেপের ওম ছেড়ে উঠে গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে এসে আমি জানালার ধারে বসলাম। খুব কুয়াশা ছিল, জানালার নীচের রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল আবছায়ায় নিঃশব্দে নদী বয়ে যাচ্ছে। আর দূরের কলকাতা খুব উঁচু গাছের অরণ্যের মতো জমে আছে হিমে। সিগারেট ধরাতেই একটি দুটি পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে সেগুলো ঠেকানোর চেষ্টা করে-ছিলাম। ঠেকানো গেল না। খুব ভোরে একদিন এক আশ্রমের ঋত্বিককে দেখে-ছিলাম ডান হাতখানি ওপরে তুলে চোখ বুজে আহ্বানী উচ্চারণ করতে 'তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান পুরুষ, ইষ্ট-প্রতীকে আবির্ভূত, বদবিদা চরণে তদু-পাসনাতেই ব্রতী হই। জাগ্রত হও, আগমন কর। আমরা যেন একেই অভিগমন করি...।' গান নয়, শুধু টেনে টেনে উচ্চারণ করে যাওয়া। কবেকার কথা! তবু গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা যেন একেই অভিগমন করি! ভোরের শান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে আমার মনে হয়েছিল—হায় মধুবন! হায়, কুনাল!

আমি আমার আংটির মদরঙের গোমেদ পাথরটার দিকে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আবছা অন্ধকারেও পাথরটা চিকমিক করছিল। আমি আস্তে আস্তে আংটির গোমেদ পাথরটায় আমার মনকে স্থির করার চেষ্টা করছিলাম। তখন হঠাৎ—খোলা জানালা দিয়ে যেমন ঘরের মধ্যে উড়ে আসে পোকামাকড়—তেমনি হঠাৎ অনেকদিন আগে শোনা কয়েকটা শব্দ বিদ্যুৎবেগে আমার মধ্যে খেলা করে গেল। প্রথমে আমি কিছুক্ষণ ভেবেই পেলাম না এই শব্দগুলি কী, কিংবা কোথা থেকে এল। চেনা শব্দ! বড় চেনা! কয়েকটি মুহূর্তের পর মনে পড়ে গেল, এ আমার বীজমন্ত্র নাম কৈশোরে শেখা। এতকাল আর মনেও ছিল না। মনে পড়তেই আমি আস্তে হেসে উঠলাম। বীজমন্ত্রের শব্দগুলি নিয়ে মনে মনে খেলা করতে করতে আমার সেই কৈশোরের ধ্যান অভ্যাস করার কথা মনে পড়ছিল। একটা সাদা-কালো চক্রের ছবির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতাম। তারপর চোখ বুজতেই সেই চক্রটা অমনি চলে আসত দুই ভুরুর মাঝখানে, নাসিকার মূলে যাকে বলা হয় আজ্ঞাচক্র। অনেক শিখেছিলাম আমি। পৈতের পর আমাকে শিখতে হয়েছিল পুজো পাঠ আহ্নিক। দণ্ডী ঘরে কয়েকটা কষ্টের দিন কেটেছিল, যার মধ্যে চুরি করে খেয়েছিলাম রসগোল্লা। মনে পড়ে এক শীতের খুব ভোরে দণ্ডী ভাসাতে যাচ্ছি ব্রহ্মপুত্রে, সঙ্গে জ্ঞাতিভাই তারাপ্রসাদ। হাফ-প্যাণ্ট পরা তারাপ্রসাদ নদীর উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল। আমি তার দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ঢালু বেয়ে জলের কাছে নেমে গেলাম। আমার পায়ে লেগে একটা মাটির ঢেলা আস্তে গড়িয়ে গিয়ে টুপ করে জলে ডুবে গেল। বিবর্ণ মেটে রঙের জলে ভেসে যাচ্ছিল আমার গেরুয়া ঝোলা আর লাঠি। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম। মাথার ওপর ফিকে নীল আকাশ, আর চারদিকেই মাটির নরম রঙ। কোথাও এতটুকু আবেগ বা অস্থিরতা নেই। সব শান্ত ও উদাসীন, আর বাতাসে মিশে থাকা সামান্য কুয়াশায় মৃদু নীল আভা। জলে আমাকে ঘিরে ছোটো ছোটো ঢেউ ভাঙার শব্দ। খুব সামান্য স্রোতে ধীরে ধীরে দুলে দুলে ভেসে যাচ্ছে গেরুয়া ঝোলা শুধু আমার দণ্ডী। খুব দূরে তখনো নয়। বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তাকে। যেন ডুবন্ত এক সন্ন্যাসীর গায়ের কাপড় ভেসে যাচ্ছে জলে। মনে হয়েছিল আর দু এক পা দূরেই রয়েছে জন্ম-মৃত্যু ও জীবন-রহস্যের সমাধান। আর মাত্র দু-এক পা দূরে। আমার চারদিকে বিবর্ণ মাটিরঙের চাইছে আমাকে। তার ইচ্ছে হয়েছিল আমার ওই দণ্ডী যতদূরে ভেসে যায়, নদীর পার ধরে আমি ততদূরে হেঁটে যাই। ফিরে গিয়ে কী লাভ? অনেকক্ষণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে জলে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে তারাপ্রসাদ আমাকে জোর করে তুলে এনেছিল। তারপরও বহুদিন আমার সেই ঘোর কাটেনি।

সেই কথা মনে পড়তেই আমি প্রাণপণে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছিলাম আজ ভোরে। বীজমন্ত্রের যে শব্দগুলি মনে এসেছিল আমি সেগুলো নিয়ে খেলা করছিলাম। আর আমার আংটির গোমেদ পাথরটায় স্থির করার চেষ্টা করছিলাম আমার সমস্ত অনুভূতি। বহুদিন বাদে কৈশোরের সেই ধ্যান করার ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল আমাকে।

কুনাল জানে না তার চেয়ে আমি অনেক বেশী ফেরারী।

অফিসে বেরোনোর সময়ে সোনা মনে করিয়ে দিল 'আজ আমাদের বিয়ের বার্ষিকী। মনে থাকে যেন।'

মনে ছিল না। চার বছর হয়ে গেল। এখন আমার ছত্রিশ, আর সোনা বোধ হয় আঠাশ পেরিয়ে এল। ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির তলা থেকে আমি সোনাকে একটু দেখলাম, আমার দিকেই চেয়ে আছে। হাসলাম। ও হাসল। পরস্পরকে বোঝার চেনা পুরোনো হাসি। রাস্তার রোদে পা দিতেই সরগরম কলকাতার উত্তপ্ত ভিড়ের মধ্যে মন হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল। একটা বেনামী চিঠির জন্য কাল আমার অফিস কামাই গেছে একথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছিল।

মিডলটন স্ট্রীটে আমার অফিস। দরজায় পা দিতেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ো দারোয়ান, রিসেপশন কাউণ্টারের চঞ্চল মেয়েটি মৃদু হেসে নড করল, 'মর্নিং স্যার'

ঝকঝকে রোদ্দুরে একটি অফিসের ছাতার আর একদিকে চলে গেল। আমি লিফট নিলাম না। অনেকদিন পর একটু হাল্কা লাগছে আজ। আমি জুতোর শব্দ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে দীর্ঘ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে এলাম আমার চারতলার অফিসে। টাইপিস্ট-দের ঘর থেকে অবিরাম টাইপ-মেশিনের শব্দ ভেসে আসছে। আমার ছোট অফিস-ঘরটার বাইরে অপেক্ষা করছে আমার ছোকরা চটপটে স্টেনোগ্রাফার। আমি তার দিকে চেয়ে একটু হেসে ঢুকে গেলাম ঘরে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ ছোট্ট ঘরটা আমার। সবুজ কাচে ঢাকা টেবিল, গভীর গদিওয়ালা চেয়ার, আর পিছনে প্রকাণ্ড কাচের জানালা। দূরে ময়দানের চেনা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কোট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিয়ে আমি কাচের শার্সি খুলে দিলাম। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে এল। পাতা-পোড়ানো ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ। উদাস রোদ হাওয়া আর মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ আমি আমার অন্তরে গ্রহণ করে নিচ্ছিলাম। বেশ নিশ্চিন্ত জীবন আমার। একটি দুটি ছোটোখাটো অভাব-বোধ এবং কখনো সখনো সামান্য একটু একঘেয়েমি ছাড়া কোনো গোলমাল নেই। আমি সুখী। একটি ছোটো শ্বাস ছেড়ে আমি চেয়ারে ফিরে এলাম।

দুপুরে হঠাৎ এল সোনার টেলিফোন। তার গলার স্বর শুনে চমকে উঠে বললাম 'কী হয়েছে!'

'কই! কিছু না!' বলে ও হাসল 'তোমাকে উল আনার কথা বলেছিলাম, রাজা! মনে আছে? মনে করিয়ে দিলাম। তোমার কোটের ডানদিকের পকেটে নমুনা দিয়ে দিয়েছি। চার আউন্স এনো।'

'দূর! আমি পারবো না। আবার অফিসের পর দোকানে ছোটাছুটি! তা ছাড়া উলের রঙ মেলানো বড় ঝামেলা...'

'পারবে।' বলে হাসল, 'তুমি না পারলে চলবে কি করে? তুমি ছাড়া আমার কে আছে আর?'

মৃদু হাসলাম। আমাকে পটাতে সোনা ওস্তাদ।

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ বিকেলের কথা মনে আছে তো!' বলেই আবার হাসি 'বলো তো আজ কী?'

'আজ?' আমি একটু ভাবনার ভান করে বললাম 'আজ তো খোকনের জন্মদিন!'

'বদমাশ!'

'ভাই না!'

'ঠিক আছে। তাই। শুধু সময়ে এসো!'

তারপর একটু চুপচাপ। টের পেলাম ও ফোন তখনো ছাড়েনি। আমিও ছাড়তে দ্বিধা করছিলাম। তখন হঠাৎ ও বলল,

রাজা, আমার ফোন পেয়ে তুমি চমকে উঠলে কেন?'

সামান্য গোলমালে পড়ে বললাম 'কই!'

'ভয় পেয়েছিলে?'

'কিসের ভয়!'

ও হাসে 'কিসের ভয় তার আমি কি জানি! ওই ছেলে চুরি যাওয়ার ভয় হতে পারে, ঘরে আগুন লাগার ভয় হতে পারে। কতো ভয় আছে মানুষের।

'বদমাশ!' বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

সত্য যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। সোনা যেভাবে বলল সেভাবে নয়। তবে অনেকটা ওরকমই অস্পষ্ট একটা ভয়।

বিকেলে আমি অনেক ঘুরে ঘুরে ওর ফরমাশী উল কিনলাম ,আর আজকের দিন উপলক্ষ্যে ওর জন্য কিনলাম কালো জমির ওপর হলুদ আর সুরকি রঙের এমব্রয়ডারী করা একটা কার্ডিগান, কিছু ফুল, গোটা দুই বাংলা উপন্যাস। বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পা দিয়েছি, সে সময়ে —কোথাও কিছু ছিল না—তবু হঠাৎ মনে হল যদি এই অবস্থায় কোনোদিন কুনাল আমাকে দেখে! কে জানে বাইরের এত অচেনা লোকজনের মধ্যে সে গা-ঢাকা দিয়ে আমাকে লক্ষ করছে কিনা! সে দেখছে তার প্রিয় মধুবনকে! পরনে স্যুট মধুবনের, উলের প্যাকেট, কাগজে মোড়া বউয়ের কার্ডিগান, হাতে ফুল আর উপন্যাস! কি জানি কেমন অস্বস্তি এল মনে রজনীগন্ধার ডাঁটিতে আমি অকারণে বোকার মতো আমার মুখ আড়াল করলাম। পরমুহূর্তেই হেসে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম আমি। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে কয়েক পলকের জন্য আমার দুর্বলতা এসেছিল।

সন্ধ্যেবেলায় আমাদের অনুষ্ঠান জমল খুব। আমার অনেককালের বন্ধু অতীশ এসেছিল তার বউকে নিয়ে, আরো দু একজন বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন। যখন সবাই চলে যাচ্ছে তখন সিঁড়ির গোড়ায় অতীশ আমাকে আলাদা ডেকে নিল 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার রে? শুনলাম তোর কাছে বেনামা একটা চিঠি এসেছে?'

মাথা নাড়লাম—হ্যাঁ। বললাম, 'কে বলল?'

'তোর বউ।' ও হাসল 'ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছিল কাল থেকে তুই নাকি কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস। কেঁদেছিস।

হাসলাম 'দূর!'

অতীশ নীচু গলায় প্রশ্ন করল 'কে লিখেছে?'

বললাম 'কুনাল। কুনাল মিত্র।'

'ওঃ!' বলে একটু ভাবল অতীশ 'বছর চারেক আগে সে আর একবার তোকে চিঠি দিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ। আমার বিয়ের ঠিক পরেই।'

'এবার কী লিখেছে সে?'

আমি বললাম 'অনেকদিন আগে আমি তাকে শিখিয়েছিলাম : সাবধান! বিপ্লবের পথ কিন্তু কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসীও ফিরে আসে ঘরে। সেই কথাই সে ফেরত পাঠিয়েছে আমাকে।'

হাসল অতীশ 'তোকে টীজ্ করছে না?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ।

ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতীশ, 'ওর বেশী আর কিছুই কুনালের করার নেই।'

আমি চেয়ে রইলাম অতীশের মুখের দিকে।

অতীশ ম্লান হাসল 'মধুবন, আমি কুনালের খবর রাখি। বছরখানেক আগে তার খবর পেয়েছিলাম। হাওড়া জেলার মফস্বলে একটা কারখানার সে চাকরি করছে। দুঃখে কষ্টে আছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে তোর কাছে আসতে বলেছিলাম। তুই বড় চাকরি করিস। সে মাথা নেড়ে জানাল আসবে না। বলেছিল, আমার খবর মধুবনকে দেবেন না। আমি কথা দিয়েছিলাম। আজ কথা ভাঙতে হল মধুবন, নইলে হয়ত তোর শান্তি থাকত না।'

একটু চুপ করে থেকে অতীশ আবার বলল 'ভাবিস না মধুবন। এই সব ছোটো-খাটো চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ওর জীবনে তো আর কিছু এখন করার নেই। ওরও ছেলেপুলে নিয়ে বড় সংসার, তোর খোঁজ-খবর রাখার সময় তেমন নেই। তবু মাঝে মাঝে ওই সব চিঠি পাঠায়, পাঠিয়ে মজা পায়।'

কুনালকে প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে অতীশ চলে গেল। আমি নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এলাম। দেখি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সোনা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে ফিরে এক ঝলক হেসে বলল, 'কিগো কুনাল মিত্রের বন্ধু, ভূতপূর্ব বিপ্লবী? এবার একটু হেসে কথা কও।'

হাসলাম। বুঝলাম অতীশ চিঠিটা আন্দাজ করে সোনাকে সব বলে গেছে। তবু কি করে আমি সোনাকে বোঝাবো যে আমি এখনো সুখী নই।

কুনাল কতদূর বিপ্লবী ছিল, সঠিক ফেরারী ছিল কি না তা নিয়ে আমার একটুও মাথা ব্যথা নেই। আমি স্বেচ্ছায় সরে এসেছি অনেক দূরে। এখন নিশ্চিন্ত জীবন আমার। তবু মাঝে মাঝে একজন ফেরারীর জন্য নয়, বিপ্লবের জন্যও নয়, এ সব কোনো কিছুর জন্যই এখন আর আমার একটুও ব্যস্ততা নেই। এখন আমার প্রিয়—সেলাইকলের আওয়াজ, আমার শিশু ছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। কেবল মাঝে মাঝে এ সবের ফাঁকে ফাঁকে একটু বিমনা হয়ে ভাবতে ভাল লাগে আমারই এক সত্তা পালিয়ে ফিরছে মাঠে জঙ্গলে, ক্ষেতে খামারে, পাহাড়ে পর্বতে। কুনালের কথা শুনে তাই আমি একটুও খুশী হইনি, অবাকও নয়। আমি তো জানতাম বিপ্লবের পথ গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে। আমি তো তা জানতাম।

রাতে শুয়ে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সোনা বলল 'কষ্ট পাচ্ছো?'

চমকে উঠে বলি 'কই! না। কিসের কষ্ট?'

'আমি জানি। পাচ্ছো।'

'কেন?'

'কি জানি!' বলে একটু চুপ থেকে বলল, 'বোধ হয় তোমার মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে করে, না? এমন উদ্দেশ্যহীন নিস্তেজ জীবন তোমার ভাল লাগে না। আমি জানি।'

'দূর!' বলে জোরে হেসে উঠলাম। তবু সোনার মুখ সামান্য বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

'বড় ভয় করে গো!' ঘুমের আগে আমার আদরে ভাসিয়ে যেতে যেতে সোনা বলল। অমনি আমার বুকের মধ্যে টিকটিক টিকটিক। যেও না। যেও না।

নিঃসাড়ে ঘুমের ভান করে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে আমি গভীর রাতে উঠে লেখার টেবিলে ছোটো বাতিটি জেলে বসলাম। কুনালকে একটা চিঠি লেখা দরকার। চেনা কুনালকে নয়। এ আর এক কুনালকে, যাকে আমি চিনি না।

সারা রাত ধরে আমি লিখলাম আমার চিঠি সিগারেটের পর সিগারেট জেলে। তারপর টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ভোরবেলা সোনা আমাকে ডেকে তুলল। তার চোখে মুখে ভয়, ঠোঁট কাঁপছে কান্নায় 'কী করছিলে তুমি, রাজা? সারারাত......সারারাত ধরে!'

আমি সুন্দর করে হাসলাম। তারপর ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম আমার চিঠিটা। ও প্রথমে বুঝতেই পারল না।

বললাম 'সারারাত ধরে আমি এ চিঠিটা লিখেছি সোনা! বেনামী একটা চিঠি।'

'ওমা!' ও অবাক হয়ে বলল 'এ তো মাত্র একটা লাইন!'

আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ও শব্দ করে চিঠিটা পড়ল 'ওরে কুনাল, বনের সন্ন্যাসীর চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

চুয়াল্ল

অচিনদার সঙ্গে গিয়ে রিকশায় উঠে বসি। নরোত্তম নিজের জায়গায় বসে রিকশা চালাতে পারে না। তাকে দু হাতে জোরে ঠেলে চালাতে হয়। ফেরবার পথ চড়াইয়ের মত উঁচু। অচিনদাই জিজ্ঞেস করেন, 'কী রে, নামব নাকি? ক্যানেলের ধার পর্যন্ত হেঁটে যাই চল।'

নরোত্তম বলে, 'না বাবু, বসেন। নিয়ে যাব ঠিক।'

এখন সে হয়তো তা পারে। ধ্রুবাভাবে এখন রক্ত তার টগবগানো। রসের উত্তাপে উষ্ণ। তা না হলে এই খোয়াইয়ের খোলা দিগন্তে, নিশীথে, পৌষ বাতাসের ছোবলানিতে দুটো মানুষ সুদ্ধ রিকশা চড়াইয়ে টেনে তোলা সহজ ছিল না। এখন তার বুকে পাঁজরায় জবর তেজ হে। ক্যানে কিনা, মাংরির কাছে যে নাচ শিখছিল, সে কথাটাও ভুললে চলবে না।

কিন্তু এসব হল বাহির দুয়ারের ঢেউ ছলছল। আমার ভিতর দুয়ারের খোলা স্রোতে জল চলন্তা। সেখানে টানের রীতি আলাদা, আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। অথচ ঘূর্ণিধাক্কায় ঠেক খেয়েছি। শুরুর অঙ্কটা এক দিনের ছবিতেই অনেক কল্পনার লাগাম খুলে গিয়েছে। অনেক দুপুরে সন্ধ্যার নিরালা নির্জনে, পাখী ডাকা ঝোপে-ঝাড়ে যেন দুটি ছেলেমেয়ের অনেক কূজন শুনেছি। হাসিতে কাঁদনে উদ্বেগে বেয়াকুল প্রাণের প্রেম থরথর। তারপর সন্দেহ জিজ্ঞাসা, সাবধান, শাসন, থাকতে পারি না। তাই জিজ্ঞেস করি, 'আর শেষ?'

অচিনদা ঘাড় নেড়ে বলেন, 'কী নেই-আঁকুড়ে তুই! এবার আভোগ চাই। কিন্তু "শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?"'

বলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলেন। দুঃখে না বিরাগে, বুঝতে পারি না। তাই অবাক হয়ে ফিরে দেখি। অচিনদার মুখ সামনের দিকে। মুখের ভাব বুঝি না। তবে 'তুই' ডাকেতে আমার যেমন মন ভরতরিয়ে যায়, মনে হয় তেমনি ও'রও কোথায় যেন চোখের জল গলানো হাসির জোয়ারে ভেসে যায়। মনে মনে ও'র কথাই আওড়াই। কিন্তু অর্থ কী! কথা কোন্ ধারাতে বহে।

সেই বহমানতা থেকেই আপনি ভেসে ওঠে, 'তা হলে তো আর এক কিস্যা বলতে হয়। সেটা তোমাদের সাহিত্যের ভাষায় বোধ হয় অ্যান্‌টি-ক্লাইমেকস্ বলে। এখনকার যুগে ওসব চলে কিনা জানিনে, তবে আমাদের যুগে ভাষা সব কিছুতেই প্রচুর ক্লাইমেস এ্যান্‌টি-ক্লাইমেকস্-এর ছড়াছড়ি। তোমার ভাল লাগবে কী?'

'লাগবে।'

'তা বটে। মাতালের যেমন একটু খেলেই আরো লাগে।'

এর পরে আর কথাকারের গৌরব করতে ইচ্ছা করে না। গৌরব দিই অচিনদাকে। বলেন, 'তবে শোন, মাতালের নেশাই যোগাই। আমার চাকরিটা যে একটু উঁচু, লম্বা ঘাড়ে গর্দানে, বুঝতেই পারছ। এর অচিন্ত্য মজুমদার, আমার সবই সয়। এই ধর, বছর তেরো আগের কথা বলছি তখন আমি কলকাতায় পোস্টেড। পদাধিকার-বলেই ছোট বড় মাঝারি অনেক অফিসারেরই আমি প্রায় বিধাতা। আর আমি মনে করি, সাধারণ কেরানী কর্মচারী নিয়ে তবু একরকম চালিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু এই যে একটি পদ, "অফিসার"—এটা আমার কাছে প্রায় অভিশপ্ত বলে মনে হয়। এদের সঙ্গে ঠিকমত চলা যাকে বলে ট্যাকল্ করা, বড় ভয়ংকর ব্যাপার। কার যে কখন পান থেকে চুন খসে, বোঝবার উপায় নেই। তা সেসব কথা যাকগে, নানা কারণে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার কয়েকদিন আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমার থেকে দু চার বছরের বড় হবেন।'

বলতে বলতে একটু থামেন। ক্যানেলের ধারে আলোটা ক্রমে স্পষ্ট হয়। নরোত্তম তখনো হেঁটে হেঁটে ঠেলে চলে। অচিনদা হঠাৎ আরম্ভ করেন, 'হ্যাঁ, ভদ্রলোকের চেহারাটি সুন্দর, কথাবার্তায় মনে হত রুচিসম্পন্ন, একটু বেশী গম্ভীর। অফিসের ব্যাপারে একটু অসন্তুষ্ট ভাব। কথা দিয়েছিলাম সুরাহা হয়ে যাবে। ভদ্রলোকের নাম মৃণ্ময় চৌধুরী। ছুটির পরে অফিস থেকে বেরোবার সময় এক আধ দিন দেখেছি একটা কালো রঙের ভক্সল্-এ করে বাড়ি যান। তখন আমি কলকাতায় মাত্র কয়েক মাস এসেছি। সব খবরাখবর নিয়ে উঠতে পারিনি।

'একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে দেখি, চৌধুরী বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, ও'র গাড়ি আসেনি। জিজ্ঞেস করতে বললেন, ও'র গাড়ি কারখানায় গেছে। একটু ভিড় কমলে ট্যাক্সিতে যাবেন। আমার তো জান, বাড়ি ফেরার কোন তাড়া নেই। অধিকাংশ দিনই আমার বেরোতে অনেক দেরি হয়ে যায়। প্রায়ই হোটেল থেকে খানাপিনা, একেবারে গানাবাজনা শেষ করে ফিরি। কোন কোন-দিন দু-একজন বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা। চৌধুরীকে বললাম, আমি ও'কে পৌঁছে দিতে পারি। শুনে ভদ্রলোক যত

'আমি বললাম, "আপনি দিতে চাইলেই কষ্ট লাগবে, তার কোন মানে নেই। প্রস্তাব তো আমার নিজের, আপনার কোন অসুবিধে নেই তো?"

'ভদ্রলোক অতিরিক্ত মাত্রায় বিব্রত আর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "না, না, স্যার মোটেই না। আমি আপনার জন্যেই বলছিলাম।"

'বললাম, "তবে চলুন।" গাড়িতে উঠে বললাম, "ড্রাইভারকে আপনার ঠিকানাটা বলে দিন একটু।" তিনি ঠিকানা বললেন, শুনলাম আলিপুর। তোমাদের আজকাল-কার নিউ আলিপুর নয়, সেকালের সাহেব-পাড়া। পথ চলতে যেটুকু কথাবার্তা হল, অধিকাংশই অফিসের। তবে তিনি যে মানুষ হিসেবে আমার সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, সেটাও জানিয়ে দিলেন। হয়তো আমার পদের জন্যেই ওরকম উচ্চ ধারণা, কেননা তা ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না। আমি একটু মাথা নাড়িয়ে না না বলে বিনয় করলাম। এক-সময়ে ওঁর বাগানওয়ালা ছোট সুন্দর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুলাম। সব দিকেই বেশ ঝকঝকে চকচকে, একটু বেশী নিঝুম, চুপচাপ।
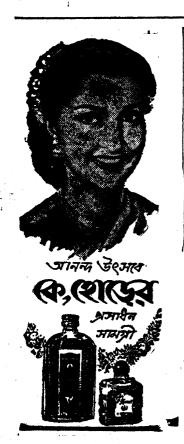
'চৌধুরী আমাকে কিছুতেই ছাড়লেন না, দয়া করে দু মিনিটও যদি বসে যাই তবে নাকি তিনি কৃতার্থ হন। দু মিনিট বসে কৃতার্থ করতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। গাড়ি থেকে নেমে গাড়িবারান্দা থেকে উঠে ওঁর সঙ্গে ওঁর বাইরের ঘরে গেলাম। ঘরে ঢুকেই একটু থমকে যেতে হল, একজন মহিলা একটি সোফায় বসে উল বুনছিলেন। বিনা বিজ্ঞপ্তিতে প্রবেশ, মহিলাও একটু অবাক হয়ে তাকালেন। চৌধুরী তখন আমাকে ডাকলেন, "আসুন, স্যার। ইনি মিসেস চৌধুরী, আমার স্ত্রী। ইনি মিঃ মজুমদার, আমাদের ডিরেক্টর, নতুন এসেছেন।"

'অতএব হাত তুলে নমস্কার। মহিলাও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছেন। নমস্কারও করলেন। চৌধুরী যে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আমার আসাতে, মনে মনে উত্তেজনা বোধ করছেন, তা বুঝতে পারছি। তিনি কোন দিকে লক্ষ করবারই সময় পেলেন না। স্ত্রীকে বললেন, "নীরজা, এক মিনিট কথা বল, আমি ভেতর থেকে আসছি।" আমাকেও বললেন, "কিছু মনে করবেন না, স্যার, এখুনি আসছি। আপনি বসুন।"

'বলতে বলতেই ভদ্রলোক ভেতরের পর্দা সরিয়ে উধাও হলেন। আর আমি সেই যে জোড় হাত তুলেছি, তার জোড় ভাঙতে ভুলে গেলাম, চোখ ফেরাতেও ভুলে গেলাম। আমার মুখোমুখি যিনি তাঁর অবস্থাও প্রায় তথৈবচ।'

বলে অচিনদা থামলেন। আমি থাকতে না পেরে বলে উঠি, 'তারপর?'

অচিনদা তবু চুপ। সামনের দিকে তাকিয়ে যেন ধ্যানে নিরীক্ষণ করেন সেই দৃশ্য। খালের ধারের আলো তখন অস্পষ্টভাবে পড়েছে তাঁর মুখে। আস্তে আস্তে ওঁর ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটে। বলেন, 'নামটা চৌধুরীর মুখে আগেই শুনেছি। চেয়ে দেখলাম, প্রায় নিটোল, চিবুকের কাছে এসে পাতার মত একটু লম্বা একখানি ফর্সা মুখ। বয়স যদি চল্লিশের কাছাকাছি হয়, কেননা আমার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ, সেই হিসেবেই বলতে হয় সামনের মুখখানিতে বয়সের স্রোতটা যেন কোথায় থমকে রয়েছে। অথচ তরুণী যুবতী বলতে যেমন বোঝায় ঠিক তাও নয়। কী যে, তা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। ওরকম কিছু বলে সেই মুখের ব্যাখ্যা আমি করতে পারি না, কেবল এইটুকু মনে হল, তার মুখে যেন এক বালিকার ভাব। চোখে একটু কাজলের আভাস। ঠোঁটে পানের রঙ নিঃসন্দেহে, ঠোঁট রাঙানোর রঙ দিয়ে ঠিক ওরকম রঙ করা যায় না। যাকে বলে বিদুষী, তা নয়। তার চেয়ে যেন বেশী, একটি চতুর বুদ্ধিমতী মুখ, যা তার টানা চোখের ফাঁদে ছিল। লম্বায় বেশী নয়, গড়নে একটু দোহারার ভাব। নিজের চোখের দেখায় বলতে ইচ্ছা করে, চোখে মুখে টলটলানো কেমন একটা রহস্যের ছায়া সেই মুখে। উক্তি যদি একটু বাড়াবাড়ি হয়, ক্ষমা করো তারা। ঘাড় খোঁপাটির কাছে ঘোমটা ভাঙা। আমার মনে হল, যেন অনেক দিনের চেনা একটা ছায়া এখনো স্পষ্ট। নামটা তার আগেই আমার কোথায় যেন বিঁধে গেছে। কোথায় যে একটা উলটো স্রোতের টান লেগে গেছে বুঝতে পারলাম না। এত জোর টান যে, কেঁপে যাবার মত।

'একটু পরেই প্রায় অস্পষ্ট গলা শোনা গেল, "তুমি—মানে—আপনি...।"

'আমি তখন ভাবছি, ম্যাজিস্ট্রেট কেন কলকাতায়, আমার বিভাগের চৌহদ্দিতে? তাই তো শুনেছিলাম, সে হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী। অবিশ্যি সরকারী চাকরিতেও আডবদলের অনেক পালা চলে। তবু কলকাতার বুকে যাকে একবারও ভাবতে পারিনি, বরং প্রায়ই একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতো, কোন এক মফস্বল শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের বাঙলো, সেখানে এক গরবিনী পত্নী সংসারের কাজে ব্যস্ত, একটি মা, তার ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে সাজাতে ছুটোছুটি করছে, সংসারের নিবিড়তায় এক গৃহিণী চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। আলিপুরের এক বিলিতী কটেজের কথা কল্পনায় আসেনি' তুমি-আপনির ধাঁধা দেখে আমাকেও মুখ খুলতে হল, "অচিন্ত্যকুমার মজুমদার। ভীষণ ভীষণ অবাক হয়েছি, এভাবে ঠিক—।"

'চোখ থেকে চোখ সরাবার সময় কেউ পাইনি। জবাব এল, "আমিও ঠিক ভেবে পাচ্ছি না। এখনো যেন—।" ওর কথা শেষ হল না। আমারও না। তার মাঝখানেই চৌধুরীর আবির্ভাব হল। এতক্ষণে ভদ্রলোকের চোখে পড়ল, ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। একটা অন্য কিছুর গন্ধও যেন পেলেন। বললেন, "কী ব্যাপার, মনে হচ্ছে আপনারা পরিচিত।"

'সেই প্রথম অবাক হওয়াটাকে এক লহমায় ভাসিয়ে দিয়ে নীরজা হেসে উঠলো। বললো, "তাই তো। উনি তো শান্তিনিকেতনে ছিলেন, আমাদের পরিচয় অনেক দিনের। উনি তো আমাদের অচিনদা।"

'আমি যেন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। 'নীরজার অচিনদা'র পরিচয়টা ওর স্বামীর কাছে তেমন ভাল লাগবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, অচিনদার বিষয় চৌধুরী কিছুই জানেন না। তিনি

নতুন খুশির উত্তেজনায় যেন উঠলেন, "তাই নাকি! আশ্চর্য যোগাযোগ তো! মিঃ মজুমদারকে নতুন পরিচয়ে পেলাম বলে মনে হচ্ছে।"

'নীরজা ওর চোখের তারায় কেমন একটু ঝলক দিয়ে হেসে বললো, "বসো, অচিনদা। অবাক হয়ে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। এভাবে দেখা যখন হয়েই গেছে।"

'ওর কথার ভাবে চৌধুরী হেসে উঠলেন। আর আমার মনে হল, এ যেন ঠিক সেই নীরজা নয়। এখন সে কথা বলে একটু ধীরে ধীরে। কিন্তু তার চোখে মুখে রঙে ছায়ায় কেমন একটা চকিত ভাব। ঠিক মেলানো যায় না। গলার স্বর বদলে গেছে। বদলানোর ভাবটা যে কেমন, তাও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নে, কেমন একটা রহস্যের আমেজ-ধরানো মিঠে। একটু বোধ-হয় প্রগল্‌ভ হয়ে উঠছি, কিন্তু কোন উপায় নেই তারা। কনুই-ঢাকা জামার, ঢাকাই শাড়িটা যে ভাবে সে ঘুরিয়ে পরেছে, তাতে কল্পনার দেখা ম্যাজিস্ট্রেট-গিন্নী ছেলেমেয়েদের মা-কে কোথাও খুঁজে পেলাম না। বললাম, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বসব, কিন্তু অবাক হওয়ার ধাক্কাটাই সামলাতে পারছি না যে।"

'বলতে বলতে বসলাম। চৌধুরী কেবল খুশী বা উত্তেজিত নন, আচমকা একটা বিশেষ উপরিপাওনা হয়ে গেল, লোকে যেমন একটু বেসামাল হয়ে পড়ে, সেইরকম অবস্থা ও'র। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "কই, কখনো তো তুমি ও'র কথা বলোনি। শান্তিনিকেতনের এত লোকের কথা বলেছ, এ নামটা কখনো শুনিনি।"

'আমি আবার অবাক হয়ে নীরজার দিকে চোখ তুলতে গেলাম। নীরজা হেসে ওর স্বামীকে বললে, "কোন কারণে ও'র প্রসঙ্গ ওঠেনি, তাই বলা হয়নি। যদি জানতাম, ইনিই তোমাদের সেই বিধাতা মিঃ এ কে মজুমদার, তা হলে নিশ্চয়ই বলতাম।" বলে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। এই চোখ, এই হাসি, আমবাগানের বসন্তোৎসবের আলোর দেখা সেই হাসি আর চোখ নয়। অথচ প্রৌঢ় বয়সে মনে হল, নদীতে ভাদ্রের কোটালের মত টেনে নিয়ে যায়।

'নীরজার কথা থেকে এও বুঝতে পারলাম, আমার কথা চৌধুরী কিছুই জানেন না। সম্ভবত বিশেষ যত্নেই সে-সব গোপন রাখা হয়েছে, আর সেটা বোধহয় ভালই হয়েছে। নইলে নীরজা আর মৃন্ময় চৌধুরীর জীবন হয়তো সুখের হত না। ভুল বোঝাবুঝি হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু ছিল না। চৌধুরী বলে উঠলেন, "স্যার পুরনো একটা পরিচয় যখন পাওয়া গেছে, একটু সময় থাকতে অনুরোধ করি।"

'নীরজা ভুরু বাঁকিয়ে একটু মিঠে শাসানির ভাব করে বললে, "অনুরোধ মানে? উনি এখন আর তোমার এক্তিয়ারে নন। আমি তো অনুরোধ করতে পারব না, আমি দাবি করব। আমি যেতে না দিলে অচিনদা যাবে কেমন করে।"

'চৌধুরী খুশিতে ডগমগ হয়ে হেসে উঠলেন। চৌধুরীর এত খুশির কারণ আশা করি বুঝতে পারছ?

'যদি চাকরি করতে তা হলে আরো ভাল বুঝতে পারতে। তবে সেসব কথা আমি ভাবছিলাম না, দেখছিলাম আর শুনছিলাম কত সহজে নীরজা তার দাবি ঘোষণা করছে। তারপরেই, এত বড় একটা ডিরেক্টরের সামনে তার সাবর্ডিনেট অফিসারকে বলে উঠলো, "আর দেখ বাপু, অচিনদাকে তুমি অফিসে গিয়ে স্যার স্যার করো আমার সামনে বাড়িতে অন্ততঃ করো না।"

'তখন আমাকেই তাড়াতাড়ি বলে উঠতে হল, "নিশ্চয়ই।"

'চৌধুরী খুশি আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে যাড় হেলিয়ে ধন্যবাদ জানালেন। নীরজা তখন শুধু কথায় নয়, সারা গায়ে, ভাবে-ভঙ্গিতে যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছে। বললে, "জানো অচিনদা, চৌধুরীর মুখে তোমার কথা শুনেছি। তোমার গুণগুণের কত প্রশংসা, কয়েক দিনই এসে বলেছেন, দিল্লী থেকে আমাদের এক ছোকরা কর্তা এসেছেন, এখনো তাঁর বিয়ে হয়নি। সত্যি অচিনদা, এখনো তোমার বিয়ে হয়নি?"

'নীরজার চোখের দিকে তাকাতে গেলাম,

পারলাম না। বললাম, "না, সেটা এখনো হয়ে ওঠেনি। কিন্তু চুলে পাক ধরে যাবার পরেও যে আমি ছোকরা আছি, এটা বুঝতে পারিনি।" চৌধুরী সঙ্কোচে রাঙা হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, "আপনি আমাদের থেকে অনেক জুনিয়র নিশ্চয়।" বললাম, "সামান্য দু-এক বছর হতে পারে।"

'কিন্তু আমি দেখছিলাম। নীরজা যেন আমার প্রতিটি কথাকে তার টানা চোখের কালো তারায় হাতড়ে দেখছে। ওর সেই দৃষ্টির সঙ্গে আমি চোখ মেলাতে পারছিলাম না। ও বললো, "ছেলেদের বিয়ে না হলে, তারা ছোকরাই থেকে যায়। চুলে তোমার পাক ধরেছে বটে, বিয়ের বয়স যায়নি।"

'বললাম "তাই নাকি। তা পঁয়তাল্লিশ বছরের ফোঁপরা ঢেঁকিকে দিয়েও যদি ধান ভানার কথা চিন্তা কর, তা হলে কিছু বলবার নেই। তবে, মরা গাছে আর ফুল ধরানো যাবে না।"

'নীরজা সে কথা মানল না। হাসি-ঠাট্টার মধ্যে এক-আধটুকু বাদানুবাদের পর সে এমন ইচ্ছেও প্রকাশ করলো, এবার আমার একটা বিয়ে না দিয়ে সে ছাড়বে না। আমি প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, "বাড়িটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে, তোমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায়?"

'কথাটা খুব স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। নীরজা তাড়াতাড়ি বললে, "সে পাট এখনো তোলা আছে তা-ই কিছু হয়নি। তোমরা একটু ব'সো আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।" বলে ও তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। দেখলাম, চৌধুরীর মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি, একটু অস্বস্তিও। বললেন, "আমাদের ছেলেমেয়ে কিছু হয়নি।"

'আবহাওয়াটা একটু ভারী হয়ে উঠলো। আমি কথাটা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু নীরজার কথাগুলোই আমার কানে বাজতে লাগলো, "সে পাট এখনো তোলা আছে, তাই কিছু হয়নি।" কথার মধ্যে একটু রহস্য আছে। যেন, হবে, কিন্তু হয়নি। হয়তো ব্যথা থেকেই এরকম ঠাট্টা। জানি না, তার মধ্যে আর কোন বিদ্রূপ ছিল কি না।'

খালের সাঁকোর ওপর এসে অচিনদা থামেন। আলোয় এখন ওঁর মুখ পরিষ্কার দেখা যায়। আরও ভাব আছে, কিন্তু দেখ, আবার যেন সেই অবুঝ, হাবাগোবা ছেলেটির ভাব এসেছে মুখে। একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, 'কন্ডাপচাতেই জমজমাটি, না কী বল হে ভায়া। বেশ জমেছে তো?'

সে জবাব আর মুখ ফুটে দিতে ইচ্ছা করে না। মনে মনে বলি, 'কী ছার গল্প লিখি। সংসারের আসল গল্পকারেরা কোথায় কী বেশে যে ঘুরে বেড়ান, দেখতে পাই না। অচিনদার কাছে কলম বন্ধক। চিরদিন যেন এমনি শুনে যেতে পারি। কিন্তু তেরো বছর আগে আলিপুরের কোন এক গৃহের বসবার ঘরে মজুমদার আর চৌধুরীর মাঝখানের নিঃশব্দে ঠেক খেয়ে থাকতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, 'তারপর?'

নরোত্তম এবার উঠে বসে রিকশা চালায়। অচিনদা বলেন, 'তারপর—"অনেক হল দেরি/আজো তবু দীর্ঘ পথের/অন্ত নাহি হেরি।" '

ঝাপসায় দাঁড়িয়ে হাতড়ে ফিরি। তাই আবার জিজ্ঞেস করি, "কেন?"

অচিনদা যে কোথায় হারান, কোথায় ডোবেন, দেখতে জানি না। বুঝতে পারি না। সেই হারানো গভীর থেকে স্বর ভেসে ওঠে, 'কারণ, "এখন এল অন্য সুরে/অন্য গানের পালা,/এখন গাঁথো অন্য ফুলে/অন্য ছাঁদের মালা।" আগেই বলেছি ভায়া, শেষ নাহি যে...। আলিপুরে সেই সন্ধ্যায়, আর একটা শুরু বলতে পার। চা পর্বের পরেই নীরজা ছেড়ে দেয়নি। চালচুলো-হীন বাউণ্ডুলে সাহেবকে সে তার কুঠিতে যেতে দিলে না। হোটেলের খানাপিনা নাচাগানার ঠোঁট উলটে বললে, "অভক্ষ!" ক্রমে চৌধুরী সাহস করে নিবেদন করলেন, আমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে পানীয় নিয়ে বসা যেতে পারে। চৌধুরীর পানাভ্যাস আছে। আমার তো সূর্য পাটে গেলেই ছোঁকছোঁকানি ধরে। অতএব, বসা গেল। নীরজা ঢাকাই শাড়িতে কোমরে বেড় দিয়ে মুখে গুঞ্জন পান, তার সঙ্গে সুগন্ধি জর্দা। একবার রান্নাঘরে, আর একবার আমাদের মাঝখানে, দু দিকে সমান তাল দিয়ে চললো। কথা কমই বললে। কিন্তু কথা শোনার এক, তার অর্থ আর এক। চোখের তারা ঘুরিয়ে চোখের কথাই বেশী বললে। তা শোনা যায় না বটে, কাজ এত বেশী, নেশাটা কিছুতেই জমতে চাইল না, কোথায় যেন কী একটা বিঁধেই রইল।

'অনুমান করতে পারছ নিশ্চয়ই, এক দিনেই এ পালা শেষ হল না, শুরু হল মাত্র। আর কলকাতার আমলাসমাজের ব্যাপার, যে জানে, সে-ই জানে। ক্রমে ক্রমে রটে গেল বার্তা, বড় কর্তার সঙ্গে মিসেস চৌধুরীর চলছে। এই "চলছে" শব্দ বড় মারাত্মক। কতরকমে যে তাকে চালানো যায়, তার ইয়ত্তা নেই। অবিশ্যি এটা সত্যি, নীরজাই তখন আমার পরিচালিকা। সে তখন আমার ঘরে বাইরে। তার জন্যে চৌধুরীর মুখে যে ছায়া ঘনালো, তা মোটেই নয়। তাঁর সংসারে আমার মত একটি নতুন শরিক পেয়ে তিনি খুশীই হলেন যেন। সন্দেহ অবিশ্বাস এসে যে তাঁকে বিচলিত করেছে, আজ পর্যন্ত তা বুঝতে পারিনি। লোকের কথায় যে তিনি কখনো কান দিয়েছেন, তাও মনে হয়নি। বরং আমার সঙ্গে যে নীরজার একটা পুরনো ঘটনা ছিল, সেটাও জানতে পেরেছিলেন। তার জন্যে কখনো কোন প্রশ্ন ওঠেনি। চৌধুরী মনের রহস্যের খোঁজ তুমি ক'রো, ভায়া। আমি কিছুই জানিনে। কেবল জানি, এখন আমি আর চৌধুরী বসে গল্প করি—বরং বলা যাক, সুর ধরি, গান করি, আমাদের মাঝখানে নীরজা বসে তাল দেয়।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এখন মানে?'

'এখন মানে, এখনো। চৌধুরী বদলি হয়ে এখন আছেন এলাহাবাদে। আমি লক্ষ্ণৌতে। অবিশ্যি, ওঁর বদলির বিষয়টা ওঁর ইচ্ছেতে আমার দ্বারাই হয়েছে। এখন ছুটিছাটায় আমি যাই এলাহাবাদে, নইলে ওরা আসে লক্ষ্ণৌতে। যদি বলতে পারতাম, এলাহাবাদ আর লক্ষ্ণৌয়ের দুটো সংসার নীরজা চালায়, তা হলেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। কিংবা বলা যায়, এখন তিনজনের একটাই সংসার......।'

হঠাৎ থেমে বলেন, 'নরোত্তম, ডাইনে চল্, বাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

তারপরে একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে ডাকেন, 'শেষ পেলে কি, ভায়া?'

জবাব দিতে পারি না। শীত নিশীথের ঝিঁঝিঁ ডাকা নিঃশব্দে বন্ধুর ঘুমন্ত বাড়ির সামনে রিকশা এসে দাঁড়ায়। আমি চুপচাপ নামি। অচিনদার দিকে চোখ তুলতে গিয়ে চমকে যাই। দেখি, তাঁর হিজিবিজি মুখে রেখার কাঁপন লেগেছে। চুপিচুপি স্বরে বলেন, 'এই অশেষের পালা আর সইতে পারি না, ভায়া।'

সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায় আদেশ করেন, 'চল্ রে, নরোত্তম। কাল দেখা হবে, ভায়া।'

নরোত্তম রিকশা ঘুরিয়ে চলে যায়।

ক্রমশঃ

নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য

শংকরীপ্রসাদ বসু

॥ ৫ ॥

এ পর্যন্ত যা পেয়েছি—নিবেদিতার ১৫ অক্টোবর, ১৯০৪-এর চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উল্লেখ। এর পরেও উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ চলে সন্দেহ নেই। এর সপক্ষে ১৯০৫ বা ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীমতী অবলা বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির অংশ উদ্ধৃত করতে পারি—

"নিবেদিতা যে আপনার ওখানে পীড়িত অবস্থায় তাহা আমি জানিতাম না—আমি একখানা বই চাহিয়া তাঁহাকে কলিকাতার ঠিকানায় কয়েকদিন হইল পত্র লিখিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যে সে পত্রের যেন তিনি কোনো নোটিশ না লন। তাঁহাকে আমার সাদর নমস্কার জানাইবেন এবং বলিবেন যে, উৎসুক চিত্তে তাঁহার আরোগ্য প্রত্যাশায় রহিলাম।"

একথা সত্য বলেই মনে হয় যে, স্বদেশী আন্দোলন যখন বিপ্লব আন্দোলনে পর্যবসিত হল, এবং নিবেদিতা তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগ কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। আবার তাঁদের মতান্তরের কথাও কবি জানিয়েছেন। রেমঁ-লিখিত নিবেদিতা-জীবনীতে পাই, রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে বলেছেন—"তোমার বিশ্বাস আছে, শক্তি আছে, তুমি হিংসাত্মক বিপ্লবের কথা বলতে পার, কিন্তু তোমার চারিদিকে যে-যুবকদল এসে জুটেছে, তাদের বিশ্বাসও নেই, শক্তিও নেই, তারা হাতের কাছে যেমন-তেমন একটা কাজ চায় মাত্র। তুমি না থাকলে তারা কিছুই করতে পারবে না।" এই সংলাপের উৎস কি জানি না, কিন্তু এ ধরনের সংলাপ অসম্ভব ছিল না। অরবিন্দমোহন বসুর সঙ্গে কথাবার্তার নোটে পেয়েছি—"নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সংঘর্ষ হত; নিবেদিতার উগ্র জাতীয়তা রবীন্দ্রনাথকে বিরক্ত করে তুলত; ও বস্তুটা তাঁকে ধাক্কা দিত, যার থেকে তিনি নিজে সরে এসেছিলেন।" একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, আন্দোলনের পাক-খাওয়া দিনগুলিতে দুজনে ভিন্ন ভূমিতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

সে যাই হোক, ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসই নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'স্বর্ণযুগ', কারণ এই সময়টির বহু প্রভাব পরবর্তীকালে থেকে যায়। এই অক্টোবর মাসে নিবেদিতার দলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন।

এই ভ্রমণের পিছনে একটা আধা-রাজনৈতিক কারণ ছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বহুকাল ধরে হিন্দু মোহন্তের হাতে ছিল। অনাগারিক ধর্মপাল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষে সেখানে বৌদ্ধ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সে নিয়ে মামলা-মকদ্দমা সুদীর্ঘ দিন ধরে বহু জল ঘোলা হয়। এ বিষয়ে বহু তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি। নিবেদিতা মনে করেছিলেন, হিন্দু মোহন্তকে উৎখাত করা অনুচিত। ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিনা বিবাদে থাকে, বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মেরই সংস্কৃত এক রূপ, বুদ্ধকে হিন্দুরা নিজেদের অবতার বলে মানে—হিন্দু মোহন্তের পরিচালনাধীন বৌদ্ধ মন্দির একালে তারই নিদর্শন। সুতরাং মোহন্তের বক্তব্য বিশিষ্ট ভারতবাসীদের গোচর করবার জন্য নিবেদিতা উদ্যোগী হন, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতবাসীদের সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। তদনুযায়ী ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঐ ভ্রমণ আয়োজিত হয়। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, নিবেদিতাই রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্র প্রভৃতিকে বুদ্ধগয়ায় যেতে উৎসাহিত করেছিলেন "চিঠিপত্র" ষষ্ঠ খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে যেভাবে লেখা আছে, "রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র সুহৃদ্‌বর্গসহ বুদ্ধগয়া যান; ভগিনী নিবেদিতাও এই সঙ্গে ছিলেন"—কথাটা ঠিক এইভাবে সত্য নয়।

অক্টোবর মাসের এই বুদ্ধগয়া ভ্রমণ নিবেদিতা-জীবনীতে মোটামুটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত। এ সম্বন্ধে বেশী তথ্য আমরা ডঃ যদুনাথ সরকারের নানা স্মৃতিকথা থেকে পেয়েছি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিছু সংবাদ তাঁর "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থে দিয়েছেন। সবচেয়ে মূল্যবান সংবাদ আছে সেইকালে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে।

অক্টোবর মাসের আলোচ্য ভ্রমণের আগে নিবেদিতা আরও দুবার বুদ্ধগয়া যান, জানুয়ারী ও মার্চে। জানুয়ারী মাসের

ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাই, মার্চ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নয়। জানুয়ারী মাসে বুদ্ধগয়া গিয়ে নিবেদিতা যখন মন্দির ও বোধিবৃক্ষ দর্শন করেন, তখন কি জাতীয় অনুভূতিতে পূর্ণ হয়েছিল চিত্ত, তার পরিচয় পাই মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা ৬ ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে—

"বুদ্ধগয়া গিয়েছিলাম। ব্যাকুল হয়েছিলাম সুজাতার গৃহ দেখবার জন্য। তাঁর বাড়ির জায়গাটি এখনো সকলের জানা আছে। যখন সেখানে গেলাম ('লাইট অব এশিয়াতে' পড়েছিলাম, সুজাতা নির্বাণের ঠিক আগে বুদ্ধকে অন্ন দিয়েছিলেন)—মনে পড়ল সুজাতার কোলে একটি শিশু ছিল, যাকে আশীর্বাদ করেছিলেন তথাগত। ভাবতে লাগলাম, কার জন্য তাঁর সেই আশীর্বাদ আমরা বহন করে নিয়ে যাব।......সদানন্দ স্বামীর দিকে ফিরে বললাম, 'আমাদের র‍্যাটক্লিফ-শিশুর জন্য তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে যাই, কি বলেন?' সদানন্দ [illegible], সম্মতিতে। বুকে দেখ, আমার প্রাণ কেমন করে উঠেছিল, যখন পরদিন প্রাচীন এক পুরাণের নির্দেশ পড়লাম—'তাঁর (বুদ্ধের) আশীর্বাদ অবশ্যই যাচ্ঞা করতে হবে নবজাতকের জন্য।'...

একদিন তুমি বুদ্ধগয়ায় যাবে। যদি ইচ্ছা কর কোনো ভারতীয় মঠের অতিথি হবে, এবং তোমার সন্তানকে রাখবে—তাঁর মন্দিরে, তাঁর পদতলে।"

জানুয়ারী মাসে বুদ্ধগয়া থেকে [illegible] [illegible] [illegible] এই তাঁর ইচ্ছা। নিবেদিতা [illegible] [illegible]।১২

অক্টোবর মাসে দলবলসহ আবার বুদ্ধগয়া যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন নিবেদিতা। ২১ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—

"৪ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত একটি দলকে বুদ্ধগয়া নিয়ে যেতে সচেষ্ট আছি। মোহন্তের সংগে জনমতের নায়কদের ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটাতে পারলে খুবই কৃতজ্ঞ হব। কিন্তু সর্বোপরি এই সংবাদিক আনন্দময় করতে চাই—জগদীশকে [illegible] এবং [illegible]।"

যাবার ঠিক আগে, এই ধরনের ভ্রমণের জন্য তিনি কতখানি উৎসুক, মিস ম্যাক[illegible] জানিয়েছিলেন।—তিনি কোনো বই পড়েই জানতে চান না, চান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। [illegible] কাজ করে, চিন্তা করে, এবং [illegible] যেতে হয়', তাহলে এই রকম [illegible] মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের উপর [illegible] ছাপ [illegible] তুলে নিতেই হবে, ইত্যাদি।

বুদ্ধগয়ার সেই অবিস্মরণীয় সপ্তাহটির [illegible] মন-প্রাণের উপরে নিবেদিতা কতখানি ছাপ তুলে নিয়েছিলেন এবং মননশীল আলোচনার কালে 'মানসিক বিনিময়ে' কতখানি পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন, ডাঃ যদুনাথ সরকার সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন:

"ভারতীয় [illegible], শিল্প এবং লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিবেদিতার অন্তঃপ্রবিষ্ট সুগভীর ব্যাখ্যায় চমৎকৃত হতাম। সে সকলের উচ্চপ্রশংসা করতেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য কবিরও নিজস্ব সুন্দর প্রকাশভঙ্গি ছিল। কিন্তু তিনি বলতেন, বস্তুর একেবারে মর্মে গিয়ে প্রবেশের ক্ষমতা আছে নিবেদিতার। আর সেগুলিকে অপূর্বভাবে তুলে ধরতেও তিনি পারতেন।"১৩

স্যার যদুনাথের ভাষণ ও রচনা থেকে১৪ এই বুদ্ধগয়া-ভ্রমণের একটা ছবি গড়ে তোলার চেষ্টা করা যায়।—

"১৯০৪, *অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে* নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী সদানন্দ, ব্রহ্মচারী অমূল্য (এখন স্বামী শঙ্করানন্দ, কিন্তু সেই কালে নিবেদিতা তাঁকে 'নেফু' অর্থাৎ Nephew বলতেন) বুদ্ধগয়ায় এক সপ্তাহের জন্য গিয়েছিলেন। আমন্ত্রিত হয়ে আমি পাটনায় দলটির সংগে যোগ দিই। মোহন্তের অতিথিশালায় আমরা উঠেছিলুম।

"প্রতিদিন ওয়ারেনের 'বুদ্ধিজম্ ইন ট্রানস্লেশন' পড়া হত। মাঝে মাঝে এডউইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' থেকেও। সেই সংগে কবির কিছু গান ও আবৃত্তি। দিনের বেলায় আমরা মন্দির-প্রাংগণে ঘুরে বেড়াতুম, কিংবা নিকটবর্তী গ্রামগুলি

দেখতে যেতুম। প্রদোষে বোধিবৃক্ষের নীচে গিয়ে নীরব ধ্যানে উপবিষ্ট থাকতুম আঁধারের মধ্যে। সেখানে এক আশ্চর্য চরিত্র দেখেছিলুম। এক জাপানী জেলে, নাম ফুজি, বহু বছরের কঠোর পরিশ্রমে পয়সা জমিয়েছেন—তাঁর জীবনস্বপ্ন, পুণ্যপুরুষ যেখানে বোধিলাভ করেছেন সেখানে যাবেন। অবশেষে আসতে পেরেছেন। সামান্য সংস্থানে অতি দীনভাবে থাকেন অতিথিশালার এক কক্ষে। প্রতি সন্ধ্যায় বোধিবৃক্ষের নীচে বসে প্রার্থনা করতেন, স্তোত্র পড়তেন—

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়,
নমো নমো গোতম চন্দ্রিকায়,
নমো নমো অনন্ত গুণেবরায়,
নমো নমো শাক্যনন্দনায়।

"সেই নীরবতায়, সেই অন্ধকারে জাপানী উচ্চারণে সংস্কৃত (প্রাকৃত) শব্দগুলি মন্দ্র ঘণ্টাধ্বনির মত কেঁপে কেঁপে উপরে উঠত, অভিভূত করে দিত আমাদের স্থানটির পবিত্র প্রভাবে। তখন মৌন সবাই—বাক্যের অতীত সে পরিবেশ।

"এক অপরাহ্নে আমরা উরবেল গ্রামে গেলাম,১৫ বুদ্ধের কালে নাম ছিল উরুবিল্ব। এখানে গ্রাম-প্রধানের মেয়ে সুজাতা থাকতেন। এঁর থেকে পায়সান্ন নিয়েই সম্বোধির পরে বুদ্ধ অনশন ভেঙে-ছিলেন। পুরাতন গৃহের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু নিবেদিতা ভাবে আত্মহারা। মাঠ থেকে খানিক মাটি তুলে নিয়ে বুকে ধরে বললেন, 'সমস্ত স্থানটি মহাপবিত্র। আদর্শ গৃহিণী সুজাতা! বিশ্বগুরুকে অন্ন দিয়েছিলেন!' তারপরে বিবেকানন্দের উক্তি শোনালেন : ৫২ লক্ষ (সেন্সাস অনুযায়ী) সাধু যে ভারতবর্ষে ধার্মিক গৃহস্থদের দ্বারা পালিত হচ্ছে, তা অপব্যয় নয়, কারণ এই অলস সাধুদের মধ্য থেকেই একবার এক রামকৃষ্ণ বেরিয়ে আসেন। আর কোনো সমাজে তাঁর আবির্ভাব হতে পারত না।"

স্বাক্ষরিত স্মৃতিকথায় স্যার যদুনাথ এক সন্ধ্যার এবং রাত্রির বর্ণনায় নিবেদিতার অতীত-প্রস্থানের কথা বলেছেন—

"মন্দির পার্শ্বে এক সন্ধ্যায় নিবেদিতা তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে একেবারে নীরব হয়ে বসে রইলেন। উপরে স্বচ্ছ শারদ আকাশে উজ্জ্বল তারকারাজি, লণ্ঠনগুলির আলো কমিয়ে সরিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে চোখের আড়ালে কোনো ঝোপের ধারে, আর তিনি যেন প্রবেশ করলেন ক্রমে অতীতের প্রাণ-লোকে। কিছু পরে বৌদ্ধযুগের কথা বলতে লাগলেন, ঐতিহাসিক সত্যকে ভাস্বর করে তুললেন অপূর্ব অন্তর্জ্ঞানের আলোকে।

"তিনি বললেন—'বৌদ্ধধর্ম আদিতে কোনো নূতন ধর্ম ছিল না। বুদ্ধ একজন বিরাট হিন্দু আচার্য ছিলেন, যদিও সম-সাময়িক সাধুদের তুলনায় পবিত্রতর, শ্রেষ্ঠতর। তাঁর অনুগামীরা হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তাঁরা নিজেদের নূতন ধর্মের মানুষ মনে করতেন না, তাঁরা হিন্দু কিন্তু আশ-পাশের মানুষ অপেক্ষা অধিক শুদ্ধ, অধিক বিশ্বাসী হিন্দু। সারা বৌদ্ধ যুগে হিন্দুধর্ম জীবন্ত ছিল, যদিও বৌদ্ধ লেখকেরা নীরব থেকেছেন সে বিষয়ে। যদি আমি আমার গুরুর জীবন ও শিক্ষার কাহিনী লিখি, তাহলে আমি স্বভাবতই বৈষ্ণবদের কথা তার মধ্যে অল্পই বলব; আমি আমার আচার্যের তুলনায় চৈতন্য সম্বন্ধে নিম্নগ্রামেই কথা বলব; আমার আচার্যকে স্বভাবতই আমি যুগের সর্ব-শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুরূপে বর্ণনা করব। কিন্তু পরবর্তীকালের কোনো ঐতিহাসিক যদি আমার গ্রন্থ অনুযায়ী বলেন, রামকৃষ্ণের সংসারী ভক্তরা বৈষ্ণবদের থেকে পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন, কিংবা বলেন, তাঁরা চৈতন্যের অনুবর্তীদের হিন্দুসমাজ থেকে দূর করে দিয়েছিলেন তিনি কি ঠিক কথা বলবেন? হিন্দুদের পীড়নে বৌদ্ধ-ধর্ম ভারত থেকে বিতাড়িত হয়েছে—একথা আমার কাছে মিথ্যা ইতিহাস মনে হয়। খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে যে ধরনের শত্রুতা, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সে শত্রুতা ছিল না। অধ্যাপক সিসিল বেন্ডাল নেপালী পুঁথি থেকে দেখিয়েছেন, উত্তর ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধরা সদ্ভাবের সঙ্গে বাস করত এবং বৌদ্ধধর্ম স্বাভাবিক-ভাবেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল—অধ্যাপকের এই কথা শুনে আমার কী যে আনন্দ হয়ে-ছিল কি বলব।' "

রবীন্দ্রনাথ ও পুত্র রথীন্দ্রনাথ

অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে সৃষ্টির সীমা ছিল না। ইতিহাসের গৌরবরাজ্যে তাঁরা স্বপ্নপ্রয়াণ করেছিলেন—যখন সেই রাজ্য থেকে নেমে আসতে হল—বুদ্ধগয়া ছেড়ে আসার আগের রাত্রের কথা স্যার যদুনাথ স্বাক্ষরিত স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"বুদ্ধগয়া ত্যাগের সময় এলে, সারারাত্রি নিজের ঘরে নিবেদিতা ভেঙে পড়ে কেঁদে-ছিলেন : 'ব্যর্থ হয়েছি আমরা; দেশের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি; এখনো জীবনসঞ্চার হয়নি তাতে। কিছু করতে পারিনি—না—কিছু না—! ভারতের আত্মা, যা একদিন তাকে পৃথিবীর দীপ করেছিল—এশিয়ার হৃদয় ভারত—সে আত্মা জাগেনি। কবে এদেশ তার অতীত মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হবে, মানুষের চিন্তায়, সভ্যতার নিজ অতীতের বিশিষ্ট স্থান সম্বন্ধে সজ্ঞান হবে!—কবে—কবে—আসবে সেই জীবন—সেই প্রাণ—!'"১৬

এইবার স্বয়ং নিবেদিতা ১৫ অক্টোবরের চিঠিতে এই ভ্রমণের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা উপস্থিত করা যাক। এই বিবরণে

মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠির অংশ—
১৫ অক্টোবর, ১৯০৪

The Poet, Mr. Tagore, was a perfect guest. He is almost the only Indian man I have ever seen who has nothing of the spoiled child socially about him. He has **a naif** sort of vanity in speech which is so childlike as to be rather touching. But he thinks of others all the time—as no one but a Western hostess could. He sang and chatted day and night—was always ready—either to entertain or be entertained—served Dr. Bose as if he were his mother—struggles all the time between work for the country and the national longing to seek mukty. In short—never was any man so **ridiculously** malaigned when suspected of things vulgar and immoral. But for all this, Mr. Tagore's is not the type of manhood that appeals to me. He is much more attractive to Christine.

I trust that for many of those there the experience may **prove** what Swamiji always said—"only when they go away will they know how much they have received!"

The Poet, Mr Tagore, was a perfect guest.
He is almost the only Indian man I have
ever seen who has nothing of the spoiled
child socially about him. He has a
naif sort of vanity in speech which is
so childlike as to be rather touching.
But he thinks of others all the time.
As no one but a Western hostess could.
He sang & chatted day & night. Was
always ready — either to entertain or
be entertained — served Dr. Bose as if
he were his mother — struggles all
the time between work for the country
& the national longing to seek mukti.
In short — never was any man
so ridiculously maligned when
suspected of things vulgar & immoral.

But for all this, Mr Tagore's is not the
type of manhood that appeals to me.
He is much more attractive to Christine.

I trust that for many of those there, the
experience may prove what Swamiji
always said — 'Only when they go away,
will they know how much they have
received'

[illegible] করেছে।

[illegible]

ওরকম মনে হওয়ার কারণ?—[illegible] বাঙালীর মত প্রাচীন [illegible] প্রাচীনই বাঙালীর [illegible] মনে? না—শুধু বললেন—

[illegible] গুরুত্বপূর্ণ—সেইকালেরই [illegible] এসেছিলেন একজন—মনে ও অনুভূতিতে যাঁর দেহ পর্যন্ত জ্যোতির্ময়—সাধারণের

...বৃক্ষের নীচে যে থাকে সেই বুদ্ধ'—এই ভেবে তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন।"

বুদ্ধগয়া? বুদ্ধের সময় [illegible] সেই মর্যাদিত প্রহরে নিবেদিতা [illegible] দিকে তাকিয়ে যেন প্রশ্ন করছেন—

কেন এই পথেই তিনি এলেন? এরই রাজগৃহে ও রাজধানী-নগরীতে পণ্ডিত-প্রবরেরা সমবেত ছিলেন—সেই জন্য? পরবর্তী যুগের বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় কি তখনই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল, যেখানে যুগের সমস্ত প্রজ্ঞার সংবাদ পাবার জন্য আসতে পারত সবাই? যে কারণেই হোক, এইখান দিয়েই তিনি গিয়েছিলেন, হৃদয় তখনি রত্নভরা, শুধু প্রয়োজন দীর্ঘ কিছু বৎসরের সঘন মনন, যাতে সমস্ত সত্তা ঝলসে ওঠে পরম বোধির আলোকে। এই স্থানে পৌঁছবার আগেই যদি নিশ্চিত প্রত্যয় তিনি লাভ না করেন, তাহলে কখনই জ্যা-মুক্ত তীরের মত জন-হীন বিজনবনের মধ্যে ছুটে যেতেন না, যেখানে নদীর উপরে ঝুঁকে আছে [illegible], এবং সেখানে—শস্যভূমি ও [illegible]।"

এবার পড়বার নিবেদিতার ১৫ অক্টোবরের পত্রের কয়েকটি কথা স্মরণ [illegible] তিনি [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ছিল অপূর্ব [illegible]। ... এখনই একটি সাধারণ কথা বলতে পারি, যা আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলে, শাক্যকুমার যখন সত্য-লাভের জন্য ধ্যান করছিলেন [illegible] দিন ধরে বুদ্ধত্বের আসনে বসে, দেবরাজ ইন্দ্র বা রক্ষা করে উপাসকদের যেন বজ্রাসন পাঠিয়ে দেন। বুদ্ধগয়ার ভ্রমণকালে আমরা বিরাট গোলাকৃতি পাথর দেখেছিলাম, যার সর্বপ্রান্তে বজ্রচিহ্ন খোদিত। নিবেদিতা মন্তব্য করলেন, যখন কেউ তাঁর সমস্ত কিছু লোককল্যাণে উৎসর্গ করেন, তখন তিনি দেবহস্তের বজ্রের মধ্যে দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠেন। এই কারণেই তিনি তাঁর গ্রন্থাদিতে বজ্রচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। স্যার জগদীশ-চন্দ্র বসুও তাই করেছেন।

মানবমঙ্গলের জন্য যখনি শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, তারই গৌরব দেখেছেন তিনি। একদিন তিনি বর্ণনা করেছিলেন—জাহাজ যখন জিব্রাল্টার প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে স্পেনের উপকূলের দিকে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করে উঠেছিলেন,—"ঐ—ঐ—তারিকের অধীনে মুর সৈন্যরা জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ছে—জয় করে নিচ্ছে স্পেনের দীর্ঘ পথ-সাম্রাজ্য—স্থাপন করছে নিজেদের বসতবাড়ি ও প্রশস্ত রাস্তা—সভ্যতার বেশসঞ্চার করেছে যাতে, রোম-সাম্রাজ্যের উপর বর্বরাধিপত্যের কালে খ্রীষ্টান ইউরোপ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন প্রাচীন গ্রীসের দর্শন ও বিজ্ঞান যে [illegible] কাছে রক্ষিত হয়েছে।"

এই বজ্রচিহ্নকে নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেখানে দধীচিকে ত্যাগের বজ্রচিহ্নরূপে উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু আরও বৃহ-ত্তরের কথা তাঁর মনে ছিল। পত্রে লিখেছেন—

"একে ভারতের প্রতীক করতে চাই। তুমি জানো, এটি বুদ্ধের চিহ্ন, এবং শিবের ত্রিশূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। স্বামীজী নিজের বিষয়ে এই বজ্র কথাটি ব্যবহার করতেন! তাছাড়া এটি মূর্তি নয় বলে মুসলমানদের আপত্তি করা সংগত নয়। আর দুর্গা একে ধরে রাখেন তাঁর একটি হাতে।"১৯

গয়ার বোধিবৃক্ষ

রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রমণ থেকে কতখানি নিয়ে গিয়েছিলেন? কে বলবে! রথীন্দ্র-নাথের কথায় এই তথ্যটুকু পাই—

"আমার বিশ্বাস, এই বুদ্ধগয়া-সন্দর্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে পিতৃদেবের অন্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় গভীর হয়ে উঠেছিল। শান্তি-নিকেতনে ফিরে এসে আমাকে তিনি ধম্মপদ আগাগোড়া মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন। পালি পড়াও শুরু হল এবং পিতারই আদেশক্রমে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত তর্জমার দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হলুম।"

বুদ্ধগয়ার জাপানী জেলে ফুজির কথা আগেই পেয়েছি স্যার যদুনাথের স্মৃতিতে। রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজায় ফুজি-উচ্চারিত বুদ্ধ-প্রণাম-মন্ত্রটি গৃহীত হয়েছে, স্যার যদুনাথ তারও উল্লেখ করেছিলেন। এই ফুজির কথা আছে নিবেদিতার ডায়েরীতে, মুক্তিপ্রাণার লেখায় দেখেছি। মন্দিরের মধ্যে মোহন্তের পুরোহিতদের ঢাক-ঢোল সহ আরতি ভাল লাগেনি বালক রথীন্দ্র-নাথের, কিন্তু—

"মন্দির দেখা হলে আমরা মন্দিরের পিছনের দিকে বোধিদ্রুমের নিকটে গিয়ে বসলুম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মন্দিরের গায়ে গবাক্ষগুলিতে প্রদীপ জেলে দেওয়া হয়েছে। চার দিক নিস্তব্ধ; তার মধ্যে কানে এল, 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'—বৌদ্ধ-মন্ত্রের মৃদুগম্ভীর ধ্বনির আবর্তন। কয়েকটি জাপানী তীর্থযাত্রী এই মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন; আর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে ধূপ জেলে রেখে দিয়ে যাচ্ছেন। কী শান্ত তাঁদের মূর্তি। কী গভীর তাঁদের ভক্তি। ইস্টপূজার কি অনাড়ম্বর প্রণালী।"

এখানে একথা জানানো উচিত, ১৯০৪ সালের এই ভ্রমণের অনেক আগেই রবীন্দ্র-চিত্তে বুদ্ধপ্রবেশ ঘটে গেছে। এর পাঁচ বছর আগে 'পূজারিণী' কবিতা লিখেছেন। তার কাহিনী নিয়েছিলেন 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থ' থেকে। তবু আবার যখন সেই কাহিনীই লিখলেন বহু বছর পরে নটীর পূজায়, তখন নতুন কিছু কি তাঁর অন্তরে আশ্রয় নেয়নি, কোনো এক অপরূপ ভ্রমণের স্মৃতি, যখন তাঁরা বুদ্ধের দেশে গিয়েছিলেন বুদ্ধভক্ত এক পরমা নারীর প্রবর্তনায়! পূজারিণী কবিতার সাহিত্য-গত উৎকর্ষ অসাধারণ, সে সঘন মহিমা এ-জাতীয় কবিতার ক্ষেত্রে অনতিক্রান্ত, কিন্তু সেই একই বিষয়ভিত্তিতে রচিত নটীর পূজায় অনেক কিছু নতুন সংযোজিত হয়েছে, দাবী হয়েছে নটী—স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে যায় নিবেদিতা-উল্লিখিত ভারতীয় মেরী ম্যাগডালেন—অম্বাপালীর কথা। [illegible] বুদ্ধক্ষেত্র যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা আগেই বলা হয়েছে, এবং বিম্বিসার ও [illegible] যে সংলাপ নিবেদিতা দিয়েছেন তাঁর প্রবেশ-গৃহীর গৃহবন্ধনের তুলনায় মুক্ত আকাশতলে পরম প্রার্থিত পরিব্রাজক জীবনের মহিমার কথা—নটীর পূজায় রানী লোকেশ্বরী তাঁর ভিক্ষুপুত্র প্রসঙ্গে সেই কথাগুলিই বলেছিলেন—

"লোকেশ্বরী। আমি হাত জোড় করে তাকে অনুরোধ করলেম বললেম, 'এক রাত্রির জন্য তোমার মায়ের ঘরে থেকে যাও।' সে বললে, 'আমার মায়ের ঘরের উপরে ছাদ নেই আছে আকাশ।' মল্লিকা। যদি না হতেন তো বুঝতিস কত বড় কঠিন কথা! [illegible] দেবতার হাতের কিন্তু সে তো [illegible] যায়নি! সেই [illegible] ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ওই যে [illegible] পরিব্রাজকের [illegible] হয়ে গেছে—[illegible]"

[illegible]

[illegible] সময় [illegible] ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]।

স্মৃতির [illegible] কী [illegible] জানে না। যা একদিন আলোচনার বিষয় ছিল, সাক্ষাৎ অনুভূতির ঐশ্বর্যে তা গভীর উপলব্ধিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় হয়ত—জানি না রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক বৌদ্ধ-সংস্কৃতি গ্রহণের পিছনে বুদ্ধগয়া ভ্রমণের সেই ভূমিকা ছিল কি না! হয়ত আমরা অনুমান করতে পারি, যে-নিবেদিতার তপস্যাকে বজ্রের আকারে দর্শন করে উমা-তপস্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর আত্মত্যাগের বজ্ররূপটির স্মৃতি আবার জেগে উঠেছিল যখন বুদ্ধবেদীতে নটীর প্রাণদানের কথা পুনরায় লিখেছিলেন।

[illegible] নটী ও তাপসী কি এক হয়ে [illegible] রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে, যখন তিনি [illegible] বন্দের (নিবেদিতা তাই মনে করতেন [illegible]কে) মর্যাদার জন্য নিবেদিতার [illegible] ত্যাগকে স্বচক্ষে দর্শন করেছিলেন।

[illegible] দর্শন করেছিলেন,—নমুনারূপে [illegible] সংবাদপত্রের একটি ক্ষুদ্র [illegible] পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। বেঙ্গলী [illegible] ২৩ অক্টোবর, রবিবার [illegible]—

THE VIVEKANANDA INSTITUTE. A correspondence writes from Gaya: The inaugural meeting of the Vivekananda Institute took place on the 13th instant. The Sister Nivedita spoke most eloquently on the life and teachings of her Guru. During her lecture, the audience had applauded her several times but she begged them clasped hands not to interrupt her in that way and break the "Dhyan" (contemplation) of her divine Guru. The audience then held their breath to hear her to the end. In the course of the lecture she remarked that an indomitable courage and most wonderful strength of purpose were the potent causes of her Guru's attaining to those enormous mental powers by which he had conquered the intellectual world, and she urged the students to be strong in their own purpose. She spoke an hour and a half. Dr. J. C. Bose, Professor Jadunath Sarkar, Babu Rabindra Nath Tagore and Sister Christina, another disciple of Vivekananda's, were present besides the gentry and the students of the place.

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা সম্বন্ধে বলেছেন—

"...একদিকে তাঁহার কাছ হইতে [illegible] [illegible] পাইয়াছি, [illegible]"

[illegible]

১২। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার [illegible] সম্পর্কের কথা কোথাও [illegible] পড়ে থাকি, এই সব [illegible] [illegible] শান্তি [illegible]! [illegible] বিষয়, [illegible] উক্তির [illegible] ঠিক ছিল না।

১৩। রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতির মধ্যে পাই—"অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তুলতেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্ক-বিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই।...বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পুণ্যস্থান বুদ্ধগয়ায় জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ তিন মনীষীর একত্র সমাগমে অপূর্ব এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র দু' তিন দিনের (চার দিনের) তীর্থবাস, কিন্তু তারই মধ্যে কত আলোচনা, কত পরামর্শই না হয়েছিল। বড় দুঃখ যে তার আজ কোনো অনুলিপি নেই।"

১৪। নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে ডঃ যদুনাথ সরকার ছদ্মনামে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় নিবেদিতার কিছু কথা লেখেন। ১৯৩৮ সালের ১৫ জুন তারিখে দার্জিলিঙ থেকে একটি স্বাক্ষরিত নিবেদিতা-স্মৃতি পাঠান রেম' ও হারবার্টকে। কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে প্রদত্ত এক ভাষণ প্রবন্ধ ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৩, জানুয়ারীতে। ১৯৫২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট অব কালচারে যে বক্তৃতা করেন, নভেম্বর মাসের ইন্স্টিটিউট বুলেটিনে তা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার ১৯৫২ পূজা সংখ্যাটিতেও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই সকল প্রবন্ধের বিষয় সাধারণভাবে এক হলেও প্রত্যেকটিতেই [illegible] কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যায়।

১৫। স্বাক্ষরিত স্মৃতিকথায় স্যার যদুনাথ এই ভ্রমণের পটভূমিকা দিয়েছেন—"বুদ্ধগয়ার বড়ুয়া [illegible] হলে তিনি ছিলেন, তারই ছাতে [illegible] [illegible] কাছে লাইট অব এশিয়ার কিছু অংশ পড়ে শোনান। তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] দেখিয়ে দিল বুদ্ধের জীবন ও কর্ম তাঁর সত্তাকে কিভাবে অধিকার করেছে। সন্ধ্যায় বললেন, 'চল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঠিক পাবে না, [illegible] ধর্মসম্প্রদায় নেই, শুধু তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তর। কিন্তু বড় পবিত্র স্থান। সুজাতা ছিলেন আদর্শ গৃহিণী। প্রভুকে তিনি প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য করেছিলেন; যখন প্রভু অনাহারে মৃত্যুমুখে তখন তাঁকে আহার্য দিয়েছিলেন।"

১৬। তাই বলে নিবেদিতা নিষ্ফল অতীত পূজারী ছিলেন না, যে-কোনো হিন্দু আচারের অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্যার যদুনাথ লিখেছেন—

"They knew not Sister Nivedita who describe her as a blind supporter of every Hindu superstition, and a champion of our existing social order."

১৭। নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী দলে ছিলেন কুড়িজন। কে কে ছিলেন, নানা তালিকা অনুযায়ী আমরা দিয়ে দিচ্ছি: স্যার যদুনাথের তালিকায়—ভগিনী নিবেদিতা, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী অমূল্য (স্বামী শঙ্করানন্দ)। আত্মপ্রাণার তালিকায় বাড়তি নাম—মথুরানাথ সিংহ। মুক্তিপ্রাণার তালিকায় বাড়তি নাম—শ্রীমতী অবলা বসু, সিস্টার ক্রিস্টিন, মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফ। লিজেল রেম'র তালিকায়—ত্রিপুরার রাজকুমার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, চন্দ্রকুমার দে। রেম', রবীন্দ্রনাথ-পত্নীর কথা লিখেছেন, মনে হয় অনবধানে 'সিস্টার'-এর আগে 'মিসেস' পড়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করার কালে। রথীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজকুমারের (দ্বিতীয় রাজকুমার) নাম জানিয়েছেন, ব্রজেন্দ্রকিশোর (লালুকর্তা), এবং বাড়তি নাম দিয়েছেন, তাঁর সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও ত্রিপুরার কর্নেল মহিম ঠাকুর। স্বামী শঙ্করানন্দের সঙ্গে কথোপকথনের রেকর্ড কৃত

নোটে দেখেছি, তিনি মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, চন্দ্রনাথ দে'র নাম দিয়েছিলেন। এই সঙ্গে অরবিন্দমোহন বসু জিন হারবার্টকে জানিয়েছিলেন, তিনিও দলে ছিলেন। নামগুলি যদি ঠিক হয়, তাহলে আমরা মোট আঠার জনের নাম পাচ্ছি।

১৮। মোহন্তের উদার আপ্যায়ন সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"মোহন্ত তাঁর অতিথিশালার বিরাট বাড়ির তেতলার ঘরগুলিতে থাকতে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের বিশেষ প্রয়োজন হয়নি, সামনে যে প্রকাণ্ড বারান্দা ছিল, তাতেই আমরা সুখে সচ্ছন্দে আসর জমিয়েছিলুম। আতিথ্যের অভাব হয়নি. উত্তম দুধ ঘি ফলমূল বহুবিধ খাদ্য সব সময়েই প্রস্তুত।"

এই মোহন্তের ব্যক্তিচরিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতা বিশেষ শ্রদ্ধাপর ছিলেন। স্যার যদুনাথ মোহন্তের প্রশংসা করে (নিবেদিতা যে মোটেই 'হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট' নন, আসলে তাই বোঝাতে গিয়ে) লিখেছেন—

"তিনি (নিবেদিতা) মোটেই প্রগতি-বিরোধী ছিলেন না, বা অতীতকে অন্ধ অনুকরণ করতে বলতেন না। বিবেকানন্দ যে-কথা প্রচার করেছেন, নিবেদিতাও তাই প্রখরভাবে অনুভব করেছিলেন—আধুনিক অর্থনৈতিক আন্দোলন বা আধুনিক বিজ্ঞান হিন্দু আধ্যাত্মিকতার বিবাদী কিছু নয়।... **বুদ্ধগয়ার সংস্কভাব সুপণ্ডিত মোহন্ত,** যিনি আমাদের আতিথ্য দিয়েছিলেন, কতকগুলি অধ্যাপক পদের জন্য অর্থদানের প্রস্তাব করেন। উদ্দেশ্য—জ্ঞান বিস্তার। ভগিনী নিবেদিতা (ডাঃ বসুও) জোর দিয়ে বলেন, সংস্কৃত বা দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা এদেশে যথেষ্ট আছে, সুতরাং ঐ অর্থ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত।"

১৯। বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত ত্যাগের এই বজ্র কিভাবে মহৎ চরিত্রকে আশ্রয় করেছে, নিবেদিতা তা বলতেন—স্যার যদুনাথের লেখায় পাই।

[লেখকের 'নিবেদিতা লোকমাতা' নামক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিতব্য আকর গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের সংক্ষেপিত রূপ]

মহাস্থবির জাতক

(চতুর্থ পর্ব)

এদিকে রাজপরিবারের লোকেদের ফাই-ফরমাশ খাটতে হয় বলে দিন-রাতের অধিকাংশ সময়ই রাজপ্রাসাদে কাটাতে হয়। আসল যে কাজের জন্য নিয়োজিত হয়েছি, সে কাজ অবহেলিত হয়। কিন্তু রাজপরিবারের অনুগৃহীত বলে কেউ সাহস করে আমাকে কিছু বলতে পারে না।

একটা ব্যাপার আমি বরাবরই লক্ষ করে আসছি যে, চাকুরি-স্থানে মনিব-সম্প্রদায় আমার চালচলন দেখে ও বাক্যটাক্য শুনে প্রথমটা খুবই খুশী হন এবং কেন যে আমি এতদিন বেকার বসে থাকি তার কারণ নির্ণয় করতে পারেন না। এদিকে চাকরিতে ঢুকেই মনিবের নেকনজরে পড়লে সহকর্মীরা হায় চটে, তাতে ক্ষেত্র খানিকটা তৈরি হয়ে থাকে। তার পরে মনিবের চোখে আমি নিজেই যত আবিষ্কৃত হতে থাকি অর্থাৎ আমার অকর্মণ্যতা, আলস্য এবং কাজের প্রতি ঔদাস্য যতই প্রকাশ পেতে থাকে ততই মনিব মহা মহা চটতে থাকেন। তারপর হঠাৎ একদিন আমার চাকরি ভাঙিয়ে সোজা পথ দেখিয়ে দেন। সহকর্মীদের কাছ থেকে একটুখানি সহানুভূতি বা একটা সমবেদনার কথা শুনতেও পাওয়া যায় না। এতাবৎকাল এই চলছিল। কিন্তু এখানে এসে দেখলুম

মহারাজার মোটরগাড়ির শখ। প্রতি বৎসর তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে তাঁর জন্য বিশেষ করে প্রস্তুত গাড়ি আমদানি করেন আর সেইসব গাড়িতে চড়ে, অনেকগুলি রাজকর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে সারা দিন ও সারা রাত্রি সবেগে শহর পরিক্রমা করে থাকেন। দৈহিক যন্ত্রণায় এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারেন না। 'চরৈবেতি' শব্দটি এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে ইতিপূর্বে আর দেখিনি।

মহারাজার রাজ্যে পুরুষানুক্রমে বাঘ-সিংহ প্রভৃতি নরখাদক জন্তু পরম স্নেহে প্রতিপালিত হয়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! দলে দলে খোলা বাঘ এক-এক খাটে এক-একটি করে খাবা গেড়ে বসে আছে। কারো নাম ভবানীপ্রসাদ, কারো নাম ভবানীশঙ্কর ইত্যাদি। প্রত্যেকের আলাদা চাকর, দিন-রাত্রি বাতাস করে চলেছে। গায়ে তাদের মাছিটি বসবার জো নেই। খাটের নিচে বড় বড় গামলা, তারা বসে বসেই মলমূত্র ত্যাগ করে। এইসব বাঘ আফ্রিকা থেকে বহুমূল্যে সংগ্রহ করা হয়, এদের নাম চিতা। এদের হরিণ শিকার করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইখান থেকেই শিক্ষিত চিতা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজারা কিনে নিয়ে যায়। এই বাঘের দ্বারা হরিণ শিকার একটা দর্শনীয় ব্যাপার। তা ছাড়া সিংহ, ভাল্লুক, এমন কি নানা

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

॥ ৮ ॥

এবার আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথা বলি।

এ আমার সেই প্রথম অরণ্যবাসের প্রায় ত্রিশ বছর পরের ঘটনা। আমি তখন এক ভারতীয় নৃপতির রাজ্যে চাকরি করি। সেখানকার নিয়মানুসারে রাজ্যের প্রত্যেকটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে প্রতিদিনই মহারাজার কাছে সেলাম বাজাতে যেতে হয়।

মহারাজা ও রাজপরিবারের মহিলারা আমাকে খুবই কৃপার চক্ষে দেখতেন। এর ফলে রাজ্যের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরাগভাজন হতে হয়েছিল।

সবই উলটো। কাজের লোকেরা পড়ে থাকে সবার পেছনে, কথার লোকেরা যায় এগিয়ে। ইতিপূর্বে দুটি-তিনটি ভারতীয় রাজ্য সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এখানে তা কাজে লেগে গেল।

আমাদের মহারাজার কোনো বিলাস-ব্যসন নেই বললেই চলে। কাপড়-চোপড়ে তিনি বাবু নন। দেহ বিপুল মোটা। আহার করেন অপরিমিত, তারই ফলে তাঁর দেহ-যন্ত্রটি একটি চিনির কলে পর্যবসিত হয়েছে। আহার সম্বন্ধে ডাক্তার তাঁকে প্রতিদিনই সতর্ক করেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে।
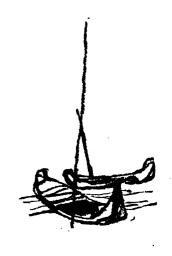
জাতের বেড়াল পর্যন্ত এখানকার চিড়িয়াখানায় সংগৃহীত হয়েছে। আর হরিণ তো আছেই। এসব কথা লিখতে গেলে আর একখানি কেতাব হয়ে যাবে।

মহারাজা এইভাবে যে শুধু ঘুরে বেড়ান তা নয়, মধ্যে মধ্যে কারুর না কারুর বাড়িতে গিয়ে হানা দেন।

একদিনের কথা বলি।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ দরজায় যেন ডাকাত পড়ল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম। দমাদ্দম দরজা ধাক্কা চলেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দেখি চার-পাঁচ মূর্তি দাঁড়িয়ে। তাঁরা সকলেই উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী।

শুনলাম, মহারাজা এসেছেন, আমায় ডাকছেন।

কি সর্বনাশ!

তাড়াতাড়ি জামাজুতো পায়ে দিয়ে বেরিয়ে দেখি, বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এক স্টেশন-ভ্যান। তাঁরা বললেন, মহারাজা ওই গাড়িতে রয়েছেন—চল। গাড়িতে উঠে গিয়ে দেখলুম, মহারাজা একটা বেঞ্চিতে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। একজন কর্মচারী তাঁর একখানি নগ্ন পদ কোলের উপর তুলে নিয়ে পায়ের তলায় জুতো-বুরুশের মতো হাত চালিয়ে যাচ্ছে। আর একজন পায়ের গোড়ালি থেকে কোমর অবধি দু'হাতে সমান তালে কিল মেরে চলেছে। মহারাজা আমায় দেখে বললেন—এসো শর্মা, কি করছিলে?

হাত জোড় ক'রে বললুম—আজ্ঞে মহারাজ, একটু বিশ্রাম করবার চেষ্টা করছিলুম।

মহারাজা বললেন—দূর! তার চেয়ে এখানে ব'সো। একটু গল্পসল্প করি।

ব'লে মহারাজা যত সব আবোল-তাবোল বাজে কথা—যেমন কলকাতার লোকসংখ্যা কত, কালীঘাট কলকাতা থেকে কত দূরে, আমরা শীগগিরই তীর্থ করতে যাব কালীঘাটে ইত্যাদি ইত্যাদি ব'লে চললেন।

মনে মনে বললুম—মহারাজ! তীর্থাদি করবার যদি ইচ্ছে থাকে তা হলে এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন। দেহের যে অবস্থা দেখছি—তাতে এর পরে যাওয়া নাও ঘটতে পারে।

ঘণ্টা দু'-তিন এইরকম সব বাজে কথায় সময় কাটিয়ে প্রায় ভোরবেলায় তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন।

বাড়িতে ঢুকে বিছানায় শুতে না শুতে আবার দরজায় ধাক্কা!

তাড়াতাড়ি উঠে আবার দরজা খুললুম। —একজন রাজকর্মচারী।

তিনি একদম বাড়ির মধ্যে ঢুকে বললেন —দরজাটা বন্ধ করুন।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা বলবার ধরন-ধারণ দেখে তো ভড়কেই গেলুম। খানিকটা দম নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ এসেছিলেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ বলেই তো মনে হল।

—কি রকম কথাবার্তা হল?

প্রশ্ন শুনে পেটের মধ্যেকার সুপ্তপ্রায় ও লুপ্তপ্রায় হুইস্কি ফোঁস ফোঁস ক'রে গর্জে উঠল। কিন্তু তা চেপে গিয়ে বললুম—এই-সব নানান কথা আর কি—

—তবু—তবু—

—মহারাজ শীগগিরই তীর্থ করতে কল-কাতায় যাবেন এইসব নানান কথা—

কর্মচারীটি তারপর অনেকক্ষণ ধানাই-পানাই ক'রে অবশেষে আসল কথাটি প্রকাশ ক'রে বললেন—আচ্ছা, আমার কথা কি বললেন?

—কিছুই বলেন নি।

কর্মচারীটি আমার কথা বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। তবু আরো খানিকক্ষণ নানা রকম প্রশ্নে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তিনি যখন বিদায় হলেন তখন ভোরের বাতাস ছেড়েছে।

শুধু মহারাজ নন রাজমাতা ও মহারাজার ভগিনী—এঁরাও আমাকে খুবই অনুগ্রহ করতেন। 'রাজভগিনী' শুনে আশা করি কেউ স্বপ্নাতুর হবেন না—কেননা তাঁর ঘর পাঁচ-নাতনীর কলগুঞ্জনে মুখরিত।

রাত্রিবেলা বাড়িতে ঘুমোচ্ছি, রাজবাড়ি থেকে গাড়ি এসে হাজির। রাজমাতা মহারাজ ও ভগিনী-মহারাজ তলব করেছেন। হুইস্কির ঢেঁকুর তুলতে তুলতে প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। সেখানে রাজমাতা ও রাজভগিনী আমার অপেক্ষায় বসে আছেন।

আমাকে দেখে খুশী হয়ে রাজমাতা বললেন—এসো শর্মা, কি করছিলে?

—হুজুর, ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম।

রাজভগিনী বললেন—কী ঘুমোবে! এসো গল্প করি।

বলতে না বলতেই চায়ের পট ও এক প্লেট স্ন্যাকসো বিস্কুট এসে হাজির। এখানে পরোক্ষ বলে রাখি, যত দিন রাজমাতা ও রাজভগিনী আমাকে প্রাসাদে ডেকে এনেছেন, এই স্ন্যাকসো বিস্কুট ও চা ছাড়া আমার কিছু জোটেনি। অবশ্য অন্য কোনো বিশেষ উৎসব ছাড়া।

প্রাসাদের মনুষ্যের সংখ্যা খুবই কম। যিনি আসল মহারানী তিনি অন্য প্রাসাদে থাকেন। মহারাজা কালেভদ্রে সেখানে যান দেখা করতে।

প্রাসাদে বালক ও বালিকা নামে একপাল ছেলে-মেয়ে সেখানে মানুষ হয়। রাজমাতা, রাজভগিনী ও উচ্চ কর্মচারীর অনুগৃহীত পরিবারের সন্তান এরা। তারা এখানেই মানুষ হয়, এখান থেকেই তাদের বিবাহ হয়। কিছু যৌতুকও পায় জমিদারি হিসাবে এবং এরা যখন বড় হয় তখন রাজ্যের যত কূট ব্যাপার সেইসবে লিপ্ত থাকে। কেউ কেউ অবশ্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীও হয়।

রাজভগিনী যিনি, তাঁর বিয়ে হয়েছিল অন্য এক দেশের রাজার সঙ্গে। কিন্তু সেখানে স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় প্রথমে বাপের বাড়িতে, পরে ভাইয়ের বাড়িতে ফিরে এসেছেন এবং সমারোহ সহকারে বাস করছেন। রাজমাতা মধ্যে মধ্যে মেয়ের এই অদৃষ্ট নিয়ে আমার কাছে দুঃখ করতেন। মেয়ের দুঃখে মাতার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে দেখেছি।

প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে কুকুরের দল। তাদের পিতা-প্রপিতামহদের ঠিকানা দরজায় ঝুলছে। পরম সমাদরে তারা প্রতিপালিত হচ্ছে।

প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রকাণ্ড বাগানে বড় বড় গাছে উঁচু-নিচু ডালে দামী দামী ভুবন-বিখ্যাত পাখিদের বাসা ক'রে দেওয়া হয়েছে। তারা পুরুষানুক্রমে পুত্রকলত্রাদি নিয়ে বাসায় বাস করছে। এদের প্রত্যেকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য, প্রয়োজন ও অভাব এবং প্রতিদিন তারা বাসায় আসছে কিনা বা এল কিনা রাজকুমারী নিজে তা জানেন এবং খোঁজ রাখেন।

একদিনের কথা বলি।

শেষরাত্রে প্রাসাদ থেকে জরুরী তলব এল। এখুনি যেতে হবে সেখানে।

তখুনি যাত্রা করা গেল।

গিয়ে দেখি প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানে সমস্ত অফিসার ও কর্মচারী ছুটোছুটি করছেন। রাজকুমারী ও রাজমাতা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করছেন। ব্যাপার দেখে আমার তখনই মনে হল—বোধ হয় মহারাজা তাঁর [illegible] দেহটি রক্ষা করেছেন। রাজকুমারী অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে আমায় বললেন—আমাদের একটি মদ্দা ম্যাকাও বাসায় ফিরে আসেনি।

শুনেই আমার বুকের মধ্যে প্রাণ [illegible] [illegible] পাখি [illegible] না [illegible] শিকল কেটে উড়ে যায়?

দেখি মাদী ম্যাকাওটাকে একটা খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছে। সে বেচারী জড়োসড়ো হয়ে অপরাধীর মতো খাঁচার এক কোণে বসে রয়েছে। রাজকুমারী চেঁচাতে লাগলেন—সে আসবে, ফিরে আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। তবে কিনা দিন কয়েক একটু ফুর্তি-টুর্তি করে নিয়ে তবে ফিরবে।

মাদীটাকে দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—এটাকে খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছে কেন?

রাজকুমারী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—না হলে এটাও যে পালাবে মদ্দার খোঁজে।

রাজকুমারী আকুল হ'য়ে বলতে লাগলেন —শর্মা, তুমি এক্ষুনি যাও কলকাতায়। সেখানকার টেরেটি বাজার থেকে এর একটা মদ্দা কিনে নিয়ে এসো।

মাথায় বজ্রাঘাত হল—কী সর্বনাশ!

ভয়ে ভয়ে বললুম—মহারাজ, আমি তো পাখি চিনি না, শেষকালে কি হতে কি হবে!

রাজকুমারী বললেন—চেনবার কোনো দরকার নেই।

এই বলেই তিনি একজনকে হুকুম দিলেন—এই অমুককে ডাকো তো!

অমুক ব্যক্তি প্রাসাদেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে ডেকে বললেন—এর জোড়া মদ্দাটার একটা ছবি এখুনি এঁকে দাও।

সে ব্যক্তি তখুনি কাগজ-রঙ-তুলি এনে আমাদের সামনেই ছবি আঁকতে লাগল। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ছবি তৈরী হয়ে গেল. দেখলুম মদ্দা ও মাদী পাখিতেও চেহারার অনেক তফাত!

রাজকুমারী আমায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন—কোথায় কি রেখা, কোন্‌খানে কেমন রঙ, জোয়ান পাখি কতটা লম্বা হবে, মুখ কি রকম হবে, সে চাইলেই বা কি রকমভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে হতে লাগল—পক্ষিতত্ত্বে এঁদের জ্ঞান কত গভীর! আরো মনে হচ্ছিল—যিনি বনের পাখিকে এমন করে চেনেন এবং পোষ মানান একটিমাত্র স্বামীকে তিনি পোষ মানাতে পারলেন না কেন?

যাই হোক, ভোর হবার আগেই পক্ষীযুগলের ছবি তৈরী হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যাবার উদ্যোগ হল। আমি কিন্তু সে রাতে কোনোরকমে কাজটা অন্য লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে অব্যাহতি পেয়েছিলুম। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই তেরোটি ডাক্তারের এক মজলিশ প্রাসাদে এসে ফিস্‌ফাস্ করতে লাগল।

আর একটি গল্প বলেই এই রাজকীয় ব্যাপারের পালা শেষ করি।

সেবার শীতের সময় মহারাজের শিকারে যাবার শখ দেখা দিল। মহারাজা স্থির করলেন—শহর থেকে দূরে জঙ্গলে গিয়ে বাস করবেন। রাজধানী থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে পাহাড়ের নিচে ছিল বিরাট জঙ্গল। সেখানে লোক চলে গেল পাঁচ-সাতটা হাতী নিয়ে জঙ্গল সাফ করাবার জন্য। তিন-চার মাইল জায়গা সাফ করে সেখানে দর্মার প্রাসাদ তৈরী হয়ে গেল।

মহারাজা যাবেন, সুতরাং রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও চললেন সঙ্গে। ওষুধপত্র, ঘোড়া, প্রিয়পাত্র যত লোক—সবাই চলল মহারাজার সঙ্গে। কদিনের মধ্যেই জঙ্গল শহরে পরিণত হয়ে গেল।

নতুন দর্মা-শহরে কারুরই কোনো কাজ নেই। সকালবেলা পুরুষেরা উঠে এক-এক পেট খেয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেলেন শিকারে। জঙ্গল খেদিয়ে শুয়োর তাড়া করে বার করবার লোক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। ফাঁকা জায়গায় শিকার বেরুতেই বল্লম হাতে শিকারী তাড়া করলেন তাকে।

সে এক উত্তেজনাপূর্ণ ভয়াবহ দৃশ্য। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে শুয়োর ছুটেছে নিচের দিকে তীরবৎ আর তারই পেছনে ঘোড়ায় চড়ে তাকে খোঁচাতে খোঁচাতে আসছে শিকারী। ঘোড়ার পা যদি একটু স্খলিত হয় কিংবা জিনের পেটি যদি ছিঁড়ে যায়—কিংবা বামকরধৃত রশ্মি যদি একটু আলগা হয় তাহলে শিকারী কোথায় গিয়ে যে পড়বেন তার কোনো ঠিকানা নেই। ওদিকে মেয়েরাও বেরিয়েছেন ঘোড়ায় চড়ে বল্লম হাতে নিয়ে। তাঁরা মারবেন হরিণ, [illegible]।

শহর থেকে অনেক দূরে এই জঙ্গল-নগর। এখানে দু শো লোকের আহারের জন্য নিত্য ছাগশিশু যোগানো সম্ভব নয়। তাই সেই ঘোড়ার মত বিরাট আকারের শম্বর আর হাতীর মতো শুয়োর মারায় দু বেলা সেই দু শো লোকের আহার তৈরী হত এবং সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী দু বেলাই আমাদের সকলকেই মহারাজের সঙ্গে আহারে বসতে হত। কাঁচা শালপাতা জোড়া দিয়ে তাতে খানা পরিবেশন করা হত। এই খানা দিন কতক খেয়েই আমার অসুখ করে গেল।

আগেই বলেছি, পুরুষেরা এক সঙ্গে প্রতিদিনই সকালবেলা শিকার করতে যেত। এই শিকারের পর্ব শেষ হলেই আহারের পর্ব শুরু হত। তখন আবার শিকারের গল্পই চলতে থাকত। একদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল শিকার পালিয়ে যাওয়া আর শিকার হাতে এসে পালিয়ে যাওয়াটা শিকারীর পক্ষে কত অপমানজনক। সেদিন একজন শিকারীর হাত থেকে শিকার ফসকে যাওয়ায় খুবই আপসোস চলছিল, এমন সময় "বীটার"রা এসে খবর দিলে যে সেই শুয়োরটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

যে লোকটির হাত থেকে শিকার ফসকেছিল, তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ঘোড়ারা বিশ্রাম করছিল। তিনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বর্শা হাতে ছুটলেন সেই শিকারের উদ্দেশ্যে।

ঘণ্টাখানেক পরে, খাওয়ার পর্ব তখন মিটে গিয়েছে, লোকেরা শিকার-ক্ষেত্র থেকে এক তাল মাংসপিণ্ড নিয়ে এসে উপস্থিত করলে। তার মধ্যে শিকারী, শিকার এবং ঘোড়া, তিনেরই মৃতদেহ জড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার মধ্যে শিকারীর দেহ সৎকার হয়ে গেল। তারপর আর তার নামও কেউ করলে না।

রাজা এবং রাজকীয় ব্যাপার সম্বন্ধে এত লম্বা করে বলবার কারণ হচ্ছে, স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে রাজা এবং রাজ্য লোপ পাওয়ায় রাজাদের এইসব খামখেয়ালিপনা—যা গল্পকথার শামিল—ভারতবর্ষ থেকে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়েছে। সে যুগের রাজকথা এ যুগে রূপকথায় পর্যবসিত। ধনতন্ত্রবাদ অস্তাচলের অভিমুখে এবং গণতন্ত্র আগমনের আগমনী পূর্বগগনে ধ্বনিত। গণতান্ত্রিক রাজারা যে কি অবস্থায় এসে দাঁড়াবে তার একটু-আধটু প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে।

যে কথাটি বলবার জন্য এই রাজা ও রাজ্যের গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছিলুম তাই বলে এখানকার পালা শেষ করি।

আমাদের শহর থেকে কিছু দূরে একটা পাহাড় ছিল। পাহাড়টা বেশী উঁচু না। মাত্র চার হাজার ফুট। তার মাথাটা বেশ খাবড়া আর পরিষ্কার। চারপাশের লোকেরা এইখানে এই পাহাড়ের চূড়োয় চড়ুইভাতি করতে যেত। আমরাও কয়েকবার সেখানে গিয়েছিলুম।

চমৎকার দৃশ্য সেখানকার। মনের মত জায়গা বটে! ওপরে কোনো বসতি নেই, কেবল মহারাজার একটি প্রাসাদ মাত্র। দরকার হলে প্রাসাদের বাইরের দিককার দু'একখানা ঘরও পাওয়া যেতে পারে। সেবার আমাদের বাড়ির সবাই এবং কাছাকাছি আরও দুটি তিনটি পরিবার মিলে ব্যবস্থা করলেন—সেখানে গিয়ে একদিন চড়ুইভাতি করতে হবে।

দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেল। জিনিসপত্র কেনা-কাটা শেষ। এমন সময় রাজবাড়ি থেকে এত্তেলা এল, সেইদিনই রাত্রের ভোজসভায় আমায় উপস্থিত থাকতে হবে। ঠিক হয়, আমার আর চড়ুইভাতিতে যাওয়া হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে রাত্রি চারটের সময় উঠে বাঁধা-ছাঁদা শুরু হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, বাড়ির আর সবাইয়ের সঙ্গে আমিও উঠে তাদের কাজে সাহায্য করতে লাগলুম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ি এসে উপস্থিত হতেই সবাই চড়ুইভাতিতে চলে গেলেন, আমার আর যাওয়া হল না।

সকলে বিদায় হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই কেন জানি না আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ লাগতে লাগল। মনে মনে কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলুম কিন্তু কোনো কারণই খুঁজে পেলুম না। বেলা যত বাড়তে থাকে, আমার মনের ভারও ততই বাড়তে থাকে। মনে আশঙ্কা হল এ কোনো অশুভ ঘটনার পূর্বাভাস নয় তো!

যাই হোক, আহারাদি সেরে কাজে চলে গেলুম। কাজের ভিড়ে সারাদিন ডুবে থাকায় মনের কোনো খোঁজ পাইনি। কিন্তু বিকেলবেলা বাড়িতে আসবার পর আবার সেই অবস্থায় ফিরে এলুম।

অগত্যা বেশ বড় দেখে একটি পাত্র চড়িয়ে দিলুম। ওদিকে সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির সবাই পাহাড় থেকে ফিরে এল। মন তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়ায় প্রাসাদে যাওয়ার ব্যবস্থায় মন দিলুম।

আমাদের মহারাজা কিছুকাল পূর্বে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্য এক রাজার রাজত্বে গিয়েছিলেন। ফিরবার সময় তিনি সেখানকার রাজাকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন। অনেকদিন পরে সেই রাজা সপারিষদ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমাদের রাজ্যে এলেন। প্রায় পনেরো দিন ধরে পান ভোজন ও নানা উৎসবের ঠেলায় একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলুম।

আজ উৎসবের শেষ রাত্রি।

আজকে বিদায়ভোজের পর কাল তাঁদের যাত্রার পালা শুরু হবে। ভারতবর্ষে এই-সব রাজন্যবর্গ ধরাধামে অবতীর্ণ হতেন মর্ত্যলোকে শুধু ইন্দ্রত্ব করবার জন্য। পেয় ও অপেয়, খাদ্য-সুখাদ্য-অখাদ্য-কুখাদ্য, বাছা বাছা দিব্যাঙ্গনা, পশুহত্যা, নরহত্যা, নারীহত্যা, ঘোড়দৌড়, নানাপ্রকার ক্রীড়ামোদ, সুরা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের মধ্যে জীবনটাকে পুড়তে দিয়ে উত্তরাধিকারীদের স্কন্ধে তাঁদের এইজাতীয় অসম্পূর্ণ কর্তব্যভার চাপিয়ে দিয়ে চ'লে

যেতেন অমরাবতীধামে। এক-একজনের খেয়াল খুশি ও কল্পনার কুহক চরিতার্থ করবার জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়ে যেত।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর তৎকালীন শাসনকর্তারা প্রথমেই এই অভিশাপের মূলে কুঠারঘাত করেছিলেন। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও টিকটিকির ল্যাজ যেমন কিছুক্ষণ লাফালাফি করে, তেমনি রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও কোনো কোনো রাজা কিছুকাল তুরতুর ক'রে লাফালাফি করেছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছেন। ভবিষ্যতে কোনো ঐতিহাসিক ইংরেজদের প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা এই রাজন্য-বর্গের কথা যদি লিপিবদ্ধ করতে পারেন তবে তা যে জগতের একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ হবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। এখন সে কথা থাক।

সেদিন আমাকে একটু তাড়াতাড়িই বেরুবার হুকুম করা হয়েছিল। এর কারণ আর কিছুই নয়, সেজেগুজে গিয়ে তাঁদের হুল্লোড়ে যোগ দেওয়া। মহারাজা হাসলে হাসা, মুখ গম্ভীর করলে নিজের মুখ গম্ভীরতর করা, আর বিলিয়ার্ডের টেবিলে ভাগ্যবিহীর মার-কেও বলে ওঠা—মহারাজ, এরকম অদ্ভুত মার খুব কম লোকের হাতেই বেরোয়!

আমাদের মহারাজা একেই তো অন্ধ, ডায়াবেটিস-জনিত গ্যাংগ্রিনে দিন-রাত ছটফট করে বেড়ান। তার ওপর এই ক'দিনে অভ্যাগত রাজা এবং তাঁর পারিষদবর্গের সঙ্গে একত্র আহার্য গ্রহণের ফলে ভোজন ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আধিক্য ঘটায় তিনি শয্যা নিয়েছিলেন। কাজেই আজকের ভোজ-সভার অতিথি-আপ্যায়নের ব্যাপারে তাঁর নিন্দে যেন না হয় সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ করে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল।

যথাসময়ে টেবিলে এসে বসা গেল। সেদিন টেবিলে কোনো মহিলা ছিলেন না। যখন অভ্যাগত সবাই টেবিলে এসে বসলেন তখন সকলের অবস্থাই টাঁ। অনেককেই বেয়ারারা ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিল। অনেকেরই পাগড়ি কপালের উপরে ঝুলে পড়েছিল। ভুরুরা প্রায়ই নিম্নগামী।

আমাদের আসল অভ্যাগত যিনি, তাঁর অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। আমার আসন নির্দিষ্ট হয়েছিল টেবিলের ল্যাজের দিকে। নিজে বেশ বুঝতে পারছিলুম যে, বিকেল থেকে পাত্র সেবন করে করে আমার অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। ছুরি-কাঁটা হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়—এমনই অবস্থা।

অভ্যাগতেরা কিছুক্ষণ চুপ করে খানা খাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজা সাহেবকে চাকরেরা ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে চলে গেল। তিনি চলে যেতেই পারিষদদের মুখ ছুটল, প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপরে সরবে উচ্চ-হাস্যে।

মিনিট দশেকের মধ্যে খানা-কামরা ফতেবাজের ময়দানে পরিণত হল।

আমার সামনে মাতালদের রকম-সকম দেখে মনে মনে হাসছিলুম বটে, এদিকে আমার অবস্থা দেখে যে অন্যদের হাসির উদ্রেক হচ্ছিল তা বোঝবার মত অবস্থা আমার ছিল না। ঢুলতে ঢুলতে একবার টেবিলে মাথাটা ঠুকে গেল। তারপরে কখন যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলুম তা জানি না।

হঠাৎ চটকা ভেঙে দেখি, আমার দেহের কোমর অবধি টেবিলের তলায় চলে গিয়েছে। চেয়ারের হাতল দুটো দু'হাতে আঁকড়ে রয়েছি। সম্বিৎ ফিরতেই ধড়মড় করে চেয়ারে উঠে বসলুম। অভ্যাগতদের অধিকাংশকেই টেবিল থেকে চাকরেরা তুলে নিয়ে গিয়েছে। দু'-চারজন এদিকে ওদিকে যারা তখনও খাবার ভান করছেন অথবা খাচ্ছেন, তাঁদের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। আমি উঠে বসতেই দু' একজন বয় এগিয়ে এসে আমায় বললে—আপনি তো বসেই ঢুলতে আরম্ভ করলেন। খাওয়া-দাওয়া তো কিছুই হয়নি, কিছু খাবেন?

আমি বললুম—নিয়ে এসো তো কিছু খাবার।

বলতে না বলতে তারা ব্যবস্থা করে দিলে, আমিও খেতে আরম্ভ করলুম।

খেতে খেতে একবার মুখ তুলে সামনের দিকে চাইতেই মনে হল—আমার দৃষ্টিটা যেন ঝাপসা হয়ে আসছে, কেমন যেন সব আবছায়ার মতো! এই আবছায়ার ভেতর দিয়ে জোর করে দৃষ্টি প্রসারিত করবার চেষ্টা করছি—দেখতে দেখতে হঠাৎ তারই মধ্যে গাছপালা, চষা মাঠ দূরের পাহাড় ফুটে উঠল।

মনে হতে লাগল—তখনও যেন সূর্যের আলো পৃথিবীতে স্পষ্ট ফোটেনি, স্বচ্ছ সেই প্রতিচ্ছায়ার ভেতর দিয়ে দেখতে লাগলুম, লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে!

টেবিলে বসে কেউ কেউ খাচ্ছেন তখন।

দেখতে দেখতে ধাঁ করে আমার মনে পড়ে গেল—এ যে কৈশোরের সেই অরণ্য-ভূমি! ওদিকে স্বচ্ছ প্রতিচ্ছায়ার ভেতর দিয়ে দলে দলে অরণ্যবাসী নরনারী শ্রমিকের দল আসতে আরম্ভ করেছে। তারা টেবিলের ওপর দিয়ে সিধে এসে আমার দু' পাশে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। সেই নিরন্ন শ্রমিকের দল বহুমূল্য স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র এবং বিবিধ ভোজ্য ও পানীয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে আসছে। সবার শেষে দেখলাম আমার সেই অরণ্যমাতাকে। দীর্ঘ কৃশ দেহ, জীবনব্যাপী কঠোর শ্রম ও অর্ধ-উপবাসজনিত কঠিন মুখমণ্ডল। দেহের উত্তরার্ধ এবং নিম্নার্ধ প্রায় উলঙ্গ। সম্মুখের দৃষ্টি প্রসারিত, যেন বর্তমানকে উপেক্ষা ক'রে কোন সুদূর ভবিষ্যতে সে দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। মুখে কোনো ভাব নেই, দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হতে আমার কাছে এসে সে মূর্তি মিলিয়ে গেল।

অরণ্যের প্রতিচ্ছায়া অন্তর্হিত হবার সঙ্গেই আমার নেশা চড়াক ক'রে যেন মাটিতে নেমে মিলিয়ে গেল। আমি চেয়ারে একবার নড়ে-চড়ে ঠিক হয়ে বসলুম। এইমাত্র যে দৃশ্য দেখলুম, আমার মনে তার প্রতিক্রিয়া হল আতঙ্কমিশ্রিত বিস্ময়! এতদিন ধরে যে কথা মনের কোন গোপন স্তরে থিতিয়ে পড়ে ছিল, হঠাৎ তা এমন অবস্থায় আজ আমার সামনে ফুটে ওঠার তাৎপর্য কি? একটা বেদনাকর অস্বস্তিতে দেহ-মন পীড়িত হতে লাগল।

হয়তো বাইরেও আমার মনের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। কারণ একজন বয় এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—হুজুর কি কিছু বলছেন?

লোকটি আমার পরিচিত। ইতিপূর্বে রাজবাড়িতে বহুবার তার সঙ্গে দেখাশুনো হয়েছে। আমি তাকে বললুম—দেখ, ড্রাইভারকে আমার গাড়ি নিয়ে আসতে বল। আমি বাড়ি যাব।

ওদিকে আমার মন সেই অরণ্যের ছবির কথা ভাবছিল, হঠাৎ মনে পড়ে গেল—এইখানে একদিন মুমূর্ষু অবস্থায় অরণ্য-মাতার জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলুম। সেখানে তারই সেবায় ও যত্নে প্রাণ ফিরে পেয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—এদের কল্যাণের জন্যই আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করব। সেই কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যই হয়তো প্রকৃতি-দেবী আজকের এই খেলা খেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল—হায়! হায়! জীবনটাকে তো ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছি। এতদিন কী করে সেই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে ছিলুম!

ইতিমধ্যে বয় এসে বললে—গাড়ি এসে গেছে হুজুর!
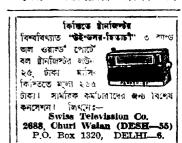
টেবিলে মন্ত্রী-শ্রেণীর একজন উচ্চ

রাজকর্মচারী তখনও বসে থেকে বাকি সবাইকে সঙ্গ দান করছিলেন। আমি তাঁকে বলে সিধে গাড়িতে এসে বসলুম।

বাড়ি এসে কাপড়-চোপড় ছেড়ে শয্যা পড়লুম বটে, কিন্তু চোখে ঘুম কোথায়! মনের মধ্যে তখন দারুণ অন্তর্দাহ শুরু হয়েছে। এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে রাত্রি কাবার হয়ে গেল। সকালবেলা শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, কিন্তু মনের মধ্যে চড়াক চড়াক করে সেই দৃশ্যের কথা জেগে উঠতে লাগল।

সে কথা কাউকে বলবারও উপায় নেই। কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? সেদিন যারা আমার সঙ্গী ছিল তাদের মধ্যে পরিতোষ অনেক দিন আগেই লোকান্তরে চলে গিয়েছে। কালী কোথায় আছে তা জানি না! তার সঙ্গে অনেক দিনই কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করলুম—এখানকার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এই কাজে লেগে যাব নাকি?

কিন্তু মন সংকুচিত হয়ে উঠল। এই প্রশ্নের কোনো সাড়াই পেলুম না। ছেলেবেলার সেদিন আর নেই—যেদিন মনে কোনো কথার উদয় হলেই সম্ভব-অসম্ভব বিবেচনা করিনি, আপদ-বিপদের বা ভবিষ্যতের চিন্তা করিনি।

কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। অনুস্যূত মনোবেগ পার হয়ে বড়ে যে অনন্তকালের দিকে চলে পড়েছি তার সম্বল কী? রোগ শোক, বিরহব্যথা ও বার্ধক্যের দেহ ক্লান্ত মন জর্জর। মনের সে শক্তি কোথায়, যেদিন চিত্তবলাকা স্বচ্ছন্দে, অনায়াসে মানস-সরোবরে কেলি করত! আজ কল্পনার রাজপথ অভিজ্ঞতার কণ্টক-তরুতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার ওপর স্বেচ্ছাঘটিত নানা দায়িত্বে হস্ত-পদ শৃঙ্খলিত—সযত্ন-পালিত নানা অভ্যাসদোষে জীবন দূষিত! এ অবস্থায় কি করে নতুন করে আরম্ভ করব?

তবুও— তবুও একটা কিছু করবার জন্য মন ছটফট করছিল। সামনেই ছিল আমার মার মৃত্যুদিন। আমি শহরে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলুম—সেইদিন আমার বাড়িতে কাঙালীভোজন হবে। নির্দিষ্ট দিনে নরনারায়ণ দেবতার সেবা শেষ হয়ে গেলে আমি ও আমার পরিবারের সকলে সেই অন্ন ভাগ করে আহার করলুম।

কিন্তু নিশ্চিন্ত সুখে রাজভোগে থাকা আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। আমি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলুম—আমি আর চাকরি করতে চাই না। মহারাজা আমাকে ডেকে বললেন—তুমি তো বলেছিলে, এই দেশকেই তোমার দেশ বানিয়ে নেবে? কি হল তার? তোমায় আমি জমি দিচ্ছি, বাড়ি তৈরি করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এইখানেই থাক।

আজ এই জাতক লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে, আর কেন। এইখানেই শেষ হোক। জীবনকে দেখলুম, মানুষকে দেখলুম। তবু নরনারীচিত্তে যে আদিম রহস্য আত্মগোপন করে আছে, আজও তার হিসাব শোধ করতে পারিনি। কেউই পারে না। সেইজন্যেই প্রতিটি যুগ আসে নতুন ভাবের ডালি নিয়ে। আজ সর্বসমক্ষে এই কথা বলে যেতে পারি যে, প্রান্তরের গান আমার এই জাতককে আমি কোনো কৃত্রিম ঘরবাড়ি বসাইনি। মানুষকে দেখেছি, কিন্তু তাকে সাজাইনি। তার বিষ ও তার অমৃত দুই-ই দু' হাতে ভরে নিয়ে সর্বাঙ্গে লেপেছি। কোনো চেষ্টা করে জাল ফেলে উড়ন্ত পাখির ডানা বাঁধতে চাইনি।

সম্মুখ দিয়ে বয়ে গেছে জগৎসংসার। তার তীরে বসে তৃষ্ণায় আকুল হয়ে কেঁদেছি, কিন্তু সে তৃষ্ণা মেটাবার পানীয় বাইরে থেকে কোনোদিনই যে পাওয়া যায় না, এ কথাও মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। এমন সংশয়ও এসেছে—এই যে অসংখ্য নর-নারীর জীবন আজ সামনে দিয়ে চলে গেছে, তাদের সঙ্গে সংযোগের সবটি পূর্ব-নির্ধারিত ছিল কিনা! কোন কবি অলক্ষ্যে বসে আমাদের নিয়ে খেলা দিয়েছেন কিন্তু ফল নির্ণয়ে এখনো পৌঁছতে পারেননি! জীবন তো সে চরিত্র হাতের কোনো সাপ্তাহিককল্পিত কাহিনী নয় যে, লাজ-মাথা এক দড়িতে বেঁধে ডাঙায় ডাং ডাঙুং ডাং করে সেইটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবো!

আজ মোহের কাজল চোখ থেকে অশ্রু-জলে ধুয়ে গেছে, তাই তো কোনো তত্ত্বের অঞ্জন-শলাকায় এ নেত্রতারকা বিদ্ধ হতে দিইনি। সেই খোলা চোখে মানুষ দেখার ইতিহাস এই জাতকে আমি বার বার জন্মেছি—বারবার মরেছি। আমার সেই অসংখ্য জন্মমরণের কথাই পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে আজ বিদায় নিলুম।

সমাপ্ত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন কবি নিখিলেশের সঙ্গে জীবন বদল করেছিলেন, করতে চেয়েছিলেন; তার ফলে অনেক গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত। কারণ শেষ পর্যন্ত এইভাবে জীবন বদলে তাঁর কোনও লাভ হয়নি বলে আক্ষেপ করেছিলেন। আসলে, জীবনটা হয়তো ঠিক হাত বদল করা যায় না। পরিবেশ-সুদ্ধ নিজের অস্তিত্ব এমন এঁটে জড়িয়ে থাকে গলার চারপাশে বকলসের মতন যে ইচ্ছে করলেই তা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসা যায় না। তবু ইচ্ছে যে করে তাতে সন্দেহ নেই।

একদিন মধ্যরাতে শ্যামবাজার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা দুজন বন্ধু; ঠিক যে সময় শ্যামবাজার বিশাল একটা সমুদ্রতীর হয়ে যায়। গৃহস্থেরা বাড়ি ফিরে যাবার পর উৎপাত যায় কমে। শহরের শাসনভার চার-পাঁচজন যুবক ও আমাদের পুলিসের হাতে ছেড়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তখন বিশ্রাম নেন। ঠিক সেই সময় আমরা দুজন পরস্পরের জামা বদল করে ফেলেছিলাম। আমার একটা টেরিলিনের শার্ট ছিল গায়ে, অতীনের গায়ে একটা চমৎকার জংলা বুশ-শার্ট। বদলে নেওয়ার পর আমরা ঠিক করলাম বাড়িও বদলে ফেলবো। আমি ওর উল্টোডাঙার বাসায় গিয়ে শুয়ে পড়বো, ও যাবে হালদার বাগানে। বাড়ির লোক নিশ্চিত চিনতে পারবে না ভুল লোক বলে। ভুলই বা কেন, আকৃতিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছাড়া আমরা উভয়েই তো একই চরিত্র, একই রকম আমাদের ভালোবাসা ও ঘৃণা। পরদিন সকালে কিন্তু আমরা যে-যার নিজের বিছানা থেকেই ঘুমিয়ে উঠেছিলাম। আসলে ওর বাসার দরোজা পর্যন্ত গিয়ে জায়গাটা কেমন অচেনা মনে হয়েছিল আমার। চুপচাপ ফিরে এসেছিলাম নিজের বাড়ি। এবং জামাটা কী করে বদলা-বদলি হলো, তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ত দিতে পারিনি। অত্যন্ত সহজ ব্যাপারগুলো এক-এক সময়ে কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য করে বলা যায় না।

আর একবার—প্রায় ওই সময়ে—হয়তো দেবতা এসে ভর করেন আমাদের হৃদয়ে তখন—রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে দর কষাকষি করতে গিয়ে মনে হলো, ও বেচারী চিনির বলদ, কখনো রিকশার গদীতে চড়ে নি। ইচ্ছে হয় নাকি ওর কখনো? বেরসিকের কাছে ব্যাপারটা পাগলামি বা মাতলামো মনে হতে পারে। অথচ যখন দৃঢ়স্বরে অনুরোধ করলাম, লক্ষ্মণ একটু হেসে রিকশায় চেপে বসেছিল, এবং গাড়িটা টেনে নিয়ে যেতে আমারও মন্দ লাগেনি। দুপাশে এক-আধজন লোক ('লোক না পোক' বলেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ) হয়তো কৌতুকে হেসেছিল গরম স্যুট পরা একজন রিক্‌শ টানছে দেখে কিন্তু সেটা ধর্তব্য নয়। সাহেবি পোশাক তো প্রতিভা বা কুশিক্ষার মতন আমাদের শরীরের বেড়-এর সঙ্গে বেড়ে ওঠে না, দরজীদের মর্জিতে তৈরি হয়। মূল ব্যাপারটা হলো, খানিকক্ষণের জন্য জীবন বদল। আমি রিক্‌শাওলা, তুমি আরোহী। তুমি ত্রিশঙ্কু, আমি লক্ষ্মণ। আমাদের দুজনের পক্ষেই ব্যাপারটা খুব উপভোগ্য হয়েছিল মনে আছে। উপরন্তু বাড়ি পর্যন্ত যাবার জন্যে আমার কোনও ভাড়া লাগেনি, সেইদিন লক্ষ্মণও ভাড়া দেয়নি আমাকে...

ভিক্ষে করতে আমার একদম ভালো লাগে না, চরিত্রের এটা অন্যতম দোষ। এই জন্যে বন্ধুরা যখন এক-একদিন অধিক রাত্রে পার্ক স্ট্রীট বা চৌরঙ্গী অঞ্চলে ভিক্ষে করে নেশার টাকা যোগাড় করে তখন আমি তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না। ওই অঞ্চলে আবার আমার অফিস। অন্তরালে দাঁড়িয়ে কি কুণ্ঠায়, পরে ভাগ বসাই। কিন্তু ব্যাপারটাতে আমার বিবেক সমর্থন আছে। হতে পারে—আমার ধারণা, বিশ্ব-সুদ্ধ ছোটলোকের সামনে হাত বাড়ালে ওদের বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বস্তুত আমরা যারা লেখক, আমাদেরই তো ঘোড়ায় চড়ে জমিদারের মতো বেড়াবার কথা, দৈব-দুর্বিপাকে সে সুবিধে পাচ্ছে ওরা। তা বলে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। ঈশ্বর যদি আমাদের লেখা পড়তেন!

অথচ সত্যিকারের ভিখিরী আমার ঈর্ষার পাত্র। কারণ ওদের কিছু হারাবার ভয় নেই। যা দেখছে শুনেছে পাচ্ছে সবটাই ওদের অর্জন, সবটাই লাভ। ওরা সরল প্রকৃতির, যেহেতু ভদ্রলোক সাজতে গিয়ে ওদের দৈন্য দেখাতে হয় না।

দুর্গাপুর রোড ধরে কলকাতা ফেরার সময় এইরকম এক ভিখিরী মেয়ের দেখা পেয়েছিলাম। পাঞ্জাবী হোটেল থেকে প্রচুর মাংস-ভাত খেয়ে আমরা বেরোচ্ছি, এমন সময় মেয়েটা সামনে এসে জিজ্ঞেস করল—"তোরা ভাত খেলি? কত চালের ভাত খেলি? আধসের? মাংস খেলি, আধসের?" ওর কদমছাঁট চুল ছিল মাথায়, খানিকটা ঘা ছিল কানের দুপাশে, সেইজন্য হয়তো দোকানদার ওকে পাগলী বলে তাড়াবার চেষ্টা করছিল। আমরা নিরস্ত করলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম—"তুই খাবি?"

ভিখিরিনী চোখ রাঙিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ করলো—"কতো ভাত খাওয়াতে পারিস? আধসের?"

তারপর সেই হোটেলে রাত দশটায় ছমছমে আলোর নীচে বসে ওকে মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত খাইয়ে গিয়েছিলাম। কৃতজ্ঞতায় বা আনন্দে অধীর হয়ে সেও দু'একগ্রাস আমায় খাইয়ে দিয়েছিল। তখনই কয়েক মুহূর্তের মতো আমার ও ভিখিরী মেয়ের মধ্যে কোন তফাত ছিল না। ও যখন ভাত-সুদ্ধ হাতটি আমার মুখে তুলে দিচ্ছে, দীনাতিদীনের মতন কিংবা শিশুর মতন আমার মুখ হাঁ হয়ে যাচ্ছে তখন, আর অদ্ভুত এক স্নেহ মাখানো মাতৃত্বের হাসিতে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। এ দৃশ্য দেখলে পাথর ফেটে গঙ্গাজল বেরিয়ে আসে।

কিন্তু বন্ধুরা যারা সাক্ষী ছিল, তারা সবাই যে অভিভূত হয়েছিল এমন নয়। অতীন তো ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে আমার পাশেই বসেনি তারপর; কিন্তু কী করে বোঝাই,দৃশ্যটা ঠিক তথাকথিত দরিদ্র-নারায়ণ সেবার ছিল না। এক-একটি আকস্মিক মুহূর্তে সব একাকার করে দেওয়া খোলস খসিয়ে ফেলা ভালো। কী করে বলি—মোটরযাত্রী ও ভিক্ষুক, আরোহী ও রিকশাওলা, ছোকরা কবি ও সন্ন্যাসী—এদের মধ্যেকার মেকী ব্যবধান-গুলো যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখনই আমরা মাটি ফেলে দিয়ে বিশুদ্ধ খড়ের শরীর নিয়ে এক কল্পনার স্বর্গরাজ্যে

পৌঁছে যাই। যেখানে সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী নয়, সেখানে জ্যোৎস্নার মতন শীতল নিঃশ্বাস পড়ে নশ্বর মানুষদের। জায়গাটা মফস্বলের হোটেল হলে ভেতরকার টেবিল-চেয়ার ও বেঞ্চিগুলো জ্যান্ত হয়ে যায়, খটখট ক'রে তাদের ক্ষুরের শব্দ করতে থাকে তখন, আর তাই শুনে অন্যান্য খদ্দের দর্শক দোকানের মালিক পর্যন্ত কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্তত—হিসেব ভুলে কৌতুক ভয় ও বিস্ময় মেশানো এক ধরনের অনুভূতিতে দূর দূর করতে থাকে।...

দুঃখের বিষয়, এই রকম ঘটনা প্রায় ঘটে না। গৃহস্থের জীবনে যখন ঘটে, তার রেশ থাকে না বেশীক্ষণ। কয়েক মুহূর্ত বিভোর হয়ে থাকা, তারপর হঠাৎ এক সময় পুণ্যে ও শুদ্ধতায়—ফলে-ওঠা আমাদের চর্মের শরীর ক্লান্ত গ্যালিভরের মতন সুড়সুড় ক'রে চুপসে ছোট হয়ে যায় আবার। প্রকাণ্ড দৈত্যমূর্তিদের করতলে পুতুলের মত নৃত্য করার জন্যে প্রস্তুত হই আমরা। এইভাবেই চলে জীবন। এই-ভাবেই আমাদের আর জীবন বদলা-বদলি করা হয়ে ওঠে না।

॥ একত্রিশ ॥

১৮৬৩ সালের কথা। যোগেন্দ্রনাথ তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। সেই সময় তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। বউয়ের নাম কৈলাসকামিনী। কয়েক বছর বাদে কৈলাসকামিনীর মৃত্যু হল।

কৈলাসকামিনীর মৃত্যুর দশ-বারো দিনের মধ্যেই যোগেন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন তাঁকে আবার বিয়ে করার জন্য অস্থির করে তুললেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। যোগেন্দ্রনাথ সব কথা শিবনাথকে জানালেন, শিবনাথের পরামর্শ চাইলেন।

শিবনাথ বললেন—যাও, যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। দশ-বারো দিন হল তোমার স্ত্রী মরেছে, এর মধ্যেই বিয়ের কথা। আর বিয়েই যদি করবে, একটি আট-ন' বছরের মেয়ে বিয়ে করবে তো, তাতে আমার মত নেই। তোমার যা ইচ্ছে হয় করো।

ক্ষুণ্ণ মনে যোগেন্দ্রনাথ চলে গেলেন। দু' দিন পরে আবার এসে শিবনাথকে ধরলেন। শিবনাথ তাঁকে বিধবাবিবাহ করার জন্য নাচিয়ে তুললেন। রাজী হয়ে গেলেন তিনি। ঠিক হয়ে গেল, মহালক্ষ্মী নামে একটি বিধবাকে বিয়ে করবেন যোগেন্দ্রনাথ।

সেই সংবাদ নিয়ে শিবনাথ গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর খুশী হলেন; বলে দিলেন যে, তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এ বিয়ে দেবেন। ১৮৬৮ সালের গোড়ার দিকে যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহালক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সমস্ত খরচ দিয়েছেন বিদ্যাসাগর।

১৮৬৯ সালে মহালক্ষ্মীর মৃত্যু হল।

তারপর, খুব সম্ভব ১৮৭১ সালে, যোগেন্দ্রনাথ আবার বিয়ে করলেন। এবার বিয়ে করলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ছোটো মেয়ে মালতীমালাকে। বিদ্যাসাগরের নির্দেশেই যোগেন্দ্রনাথ এ বিয়ে করেছেন।

মদনমোহনের মেজো মেয়ে কুন্দমালা সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথের 'মেজদিদি'। কুন্দমালাকে মাসে মাসে দশ টাকা দিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর।

যোগেন্দ্রনাথ একদিন এসে বিদ্যাসাগরকে বললেন—মেজদিদি বলেন, কাকা দয়া করে মাসে মাসে আমাকে দশ টাকা দিচ্ছেন। যদি তিনি দয়া করে 'শিশুশিক্ষা'র তিন ভাগ আমায় দেন, তা হলে আমার যথেষ্ট উপকার হয়।

বিদ্যাসাগর বললেন—কুন্দমালাকে বলবে, তার প্রার্থনামতো, 'শিশুশিক্ষা'র তিন ভাগ তাকে দিলাম। ওই বই থেকে যা আয় হবে তা কুন্দমালার।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন যোগেন্দ্রনাথ। তারপর বললেন—দেখুন, 'শিশুশিক্ষা'র তিন ভাগ আপনি দয়া করে তাঁকে দিচ্ছেন, এমন ভাববেন না। 'শিশুশিক্ষা' আইনত তর্কালঙ্কার মশায়ের উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি।

কথা শুনে চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। সহসা কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। যোগেন্দ্রনাথকে বললেন—তবে 'শিশুশিক্ষা'র বিষয় আপাতত স্থগিত থাকুক। সব না জেনেশুনে আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি না, কিছু করতে পারি না। যদি এমন হয়, আমি অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে দখল করছি, তা হলে কেবল বই তিনখানা দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে পারব না। যে ক' বছর ঐ বই তিনখানা আমার দখলে আছে, এ বাবদে সেই ক' বছরের যা আয় হয়, তাও তর্কালঙ্কারের উত্তরাধিকারীদের দিতে হবে। অতএব, তুমি কিছু দিন অপেক্ষা করো। এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসল বৃত্তান্ত জেনে আমি তোমাকে জানাব।

যোগেন্দ্রনাথকে বিদায় দিলেন বিদ্যাসাগর।

সব কাজকর্ম ফেলে বিদ্যাসাগর তারপর একমনে 'শিশুশিক্ষা'র স্বত্ব সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন।

যোগেন্দ্রনাথকে কিছু দিন অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর আর সবুর সইল না। বিদ্যাসাগরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করার জন্য তিনি গেলেন বাগবাজারে উকিলের বাড়িতে। উকিলের নাম দীননাথ বসু।

দীননাথকে যেমন বুঝিয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ, তিনি তেমন বুঝেছেন। দীননাথ কেমন করে জানবেন যে, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের নামে নির্জলা মিথ্যা বলছেন। যোগেন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে দীননাথ বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠি লিখলেন। উকিলের চিঠি।

চিঠি পেয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর। যা হোক, খোঁজাখুঁজি করে তিন-চার দিন পরেই শ্যামাচরণকে লেখা মদনমোহনের একখানা পুরোনো চিঠি পাওয়া গেল। এই ব্যাপারে চিঠিখানা খুব দরকারী।

চিঠিখানা নিয়ে বিদ্যাসাগর প্রথমেই গেলেন জজ দ্বারকানাথ মিত্রের কাছে। আদ্যন্ত বললেন তাঁকে। সমস্ত ইতিবৃত্ত শুনে আর চিঠিখানা পড়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগরকে বললেন—তর্কালঙ্কারের

উত্তরাধিকারীদের আর 'শিশুশিক্ষা' দাবি করার অধিকার নেই। আপনি সেজন্য উদ্বিগ্ন হবেন না।

তারপর বিদ্যাসাগর গেলেন উকিল দীননাথ বসুর কাছে। আদ্যন্ত ঘটনা বললেন তাঁকে। মদনমোহনের চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলেন। চিঠিখানা পড়লেন দীননাথ। বিদ্যাসাগরকে বারংবার জিজ্ঞেস করে তিনি এ বিষয়ে সব খবর জেনে নিলেন।

সব জেনেশুনে একটু সঙ্কোচ বোধ করলেন দীননাথ। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বিদ্যাসাগরকে বললেন—যোগেন্দ্রনাথবাবু যে এরকম চরিত্রের লোক, তা আমি জানতাম না। আমার কাছে এমন মিথ্যে কথা বলা তাঁর মতো সুশিক্ষিত লোকের পক্ষে খুব অন্যায় হয়েছে। আর তাঁর কথায় বিশ্বাস করে আপনাকে ওরকম চিঠি লিখে আমিও খুব অন্যায় কাজ করেছি। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

বিদ্যাসাগরকে অভয় দিলেন দীননাথ। বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। এজন্য আর আপনার উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ দেখছি না। তর্কালঙ্কারের পরিবারের 'শিশুশিক্ষা'য় আর অধিকার নেই।

তারপর বিদ্যাসাগর যোগেন্দ্রনাথকে পটলডাঙার শ্যামাচরণ দে-র বাড়িতে উপস্থিত হতে বলে পাঠালেন। উপস্থিত হবার দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন।

সেদিন যথাসময়ে বিদ্যাসাগর শ্যামাচরণের বাড়িতে এলেন। দেখলেন, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ উপস্থিত আছেন। এবং রামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আছেন। ইনি যোগেন্দ্রনাথের মামাশ্বশুর।

বিদ্যাসাগর তাঁদের মদনমোহনের চিঠিখানা দেখালেন। কিছু আর বলার উপায় নেই, চিঠিখানা পড়ে যোগেন্দ্রনাথ অধোমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর বিদ্যাসাগরকে বললেন, —তবে আপনি দয়া করে যেমন দিতে চেয়েছিলেন, তেমনি দিন।

না, তা আর হয় না। বিদ্যাসাগর এবার আর দয়া করতে রাজী হলেন না। বললেন—কুন্দমালার নাম করে তুমি যখন প্রার্থনা করেছিলে, আমি দ্বিরুক্তি না করে বই তিনখানি দিতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু তারপর তোমরা যে ফ্যাসাদ বাধিয়েছ, তাতে আর আমার দয়া করার ইচ্ছাও নেই, দরকারও নেই। তোমরা উকিলের চিঠি দিয়েছ, নালিশের ভয় দেখিয়েছ। এবং, আমি ফাঁকি দিয়ে পরের সম্পত্তি ভোগ করছি বলে নানা জায়গায় আমার কুৎসা করেছ। আমাদের দেশের লোক কুৎসা খুব ভালোবাসেন; তোমার মুখে আমার কুৎসা শুনে যথেষ্ট খুশী হয়েছেন। এবং, এ বিষয়ে কোনো খোঁজ-খবর না নিয়ে আমার কুৎসা করে ভারী-আমোদ করছেন। এ অবস্থায় আর আমার দয়া করতে ইচ্ছা হবে কেন? কুন্দমালাকে আমি মাসে মাসে দশ টাকা দিচ্ছি। কুন্দমালাকে বলবে, তোমাদের চালচলন দেখে অনেকে অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে সেটা বন্ধ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু কুন্দমালা নিতান্ত অনাথা। আর, আমি যত দূর বুঝতে পারছি, এ ব্যাপারে তার কোনো অপরাধ নেই। তাই, আমি তাকে মাসে মাসে যে দশ টাকা দিচ্ছি, তা দেব, কখনো তা বন্ধ করব না।

বিদ্যাসাগর চলে গেলেন।

ঘটনা এই পর্যন্ত। কিন্তু কুৎসার অনেক গুণ। এই ঘটনার বহু কাল পরেও অনেকে যোগেন্দ্রনাথের রটনার উপরে নির্ভর করে বিদ্যাসাগরের নামে অবাধে কুৎসা করেছেন।

এই ঘটনার সতেরো বছর পরে বিদ্যাসাগরের 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' বেরল। 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

"সপ্তদশ বৎসর অতীত হইল মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ, তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা উপলক্ষে, আমার উপর, পরস্বহারী বলিয়া, যে দোষারোপ করেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের অভিলাষে, তদ্বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য, লিপিবদ্ধ করিয়া, পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় ছিল। নানা কারণে, তৎকালে সে অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারি নাই; এবং এত দিনের পর, আর তাহা সম্পন্ন করিবার অণুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিতে পাই, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর আরোপিত দোষের উল্লেখ করিয়া, অদ্যাপি অনেক মহাত্মা আমার নামে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এজন্য, কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, স্বীয় বক্তব্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে হইল।

"যে মহোদয়েরা, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, আমি পরস্বহারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, অনুগ্রহ পূর্বক, কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এই পুস্তকে একবার দৃষ্টিসঞ্চারণ করেন; তাহা হইলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, যোগেন্দ্রনাথবাবু, উচিতানুচিত বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, আমার উপর যে উৎকট দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে, সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।"

শিশুশিক্ষার স্বত্ব সম্পর্কে আনুপূর্বিক ঘটনা বিদ্যাসাগর 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে' সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে, যোগেন্দ্রনাথ আপন শ্বশুরমশায়ের এ ক খা না জীবনচরিত লিখেছেন। সেই বইতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যা লিখেছেন তার অধিকাংশই অলীক। 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে'র শেষভাগে বিদ্যাসাগর সে বিষয়ে আপন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

'পদ্যসংগ্রহ' নামে একখানা বই দু ভাগে বের করেছেন বিদ্যাসাগর। প্রথম ভাগ বেরিয়েছে ১৮৮৮ সালের জুলাই মাসে। দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯০ সালে। প্রথম ভাগ কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' থেকে সঙ্কলিত। দ্বিতীয় ভাগ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' থেকে সঙ্কলিত।

বিদ্যাসাগর 'অপূর্ব ইতিহাস' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। এই পুস্তিকাটি সম্পর্কে ডঃ শ্রীসুকুমার সেন লিখেছেন:

"মনে হয় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণার্থে পুস্তিকাটি ছাপা হইয়াছিল বাহিরে প্রচারিত হইতে পারে নাই।

...উপকারের বদলে অকৃতজ্ঞতা পাওয়া বিদ্যাসাগরের পাওনা ছিল। কিন্তু তাঁহার শেষ বয়সে কোন কোন বিশ্বাস ও স্নেহের পাত্রের কাছে এমন আঘাত তিনি পাইয়াছিলেন যাহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে নালিশ মানিতে হইয়াছিল। বলিতে পারি পুস্তিকাটি সেই নালিশের রিপোর্ট।"

খাঁটি বাঙলা শব্দ সঙ্কলনের কাজে হাত দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর সেই শব্দ-সংগ্রহ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' (১৩০৮ সাল, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৭৪-১৩০) বেরিয়েছে।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগরের কয়েকটি রচনা বেরিয়েছে—অধুনালুপ্ত 'মুকুল', 'সখা', 'ধ্রুব' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায়। সেসব রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবন-চরিত আর 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'।

স্বরচিত জীবন-চরিতে বিদ্যাসাগর আপন শৈশবকালের কথা সংক্ষেপে লিখেছেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর সেই রচনা "বিদ্যাসাগর রচিত 'আত্মজীবনচরিতের' কয়েক পৃষ্ঠা" নামে 'সাহিত্য' পত্রিকায় (কার্তিক, ১২৯৮ সাল) বেরিয়েছে। পরের মাসের 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "এই সংখ্যায় ('সাহিত্য', কার্তিক, ১২৯৮) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। ইহাতে অলঙ্কার-বাহুল্য বা আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। পূজনীয় লেখক মহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই [illegible] একান্ত আক্ষেপের [illegible]। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালীদের পক্ষে শিক্ষার স্থল হইত। প্রথমত একটি অকৃত্রিম মহত্ত্বের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিত, দ্বিতীয়ত আপনার কথা কেমন করিয়া লিখিতে হয় বাঙ্গালী তাহা শিখিতে পারিত। সাধারণত বাঙ্গালী লেখকেরা নিজের জবানীতে কোন

* বিদ্যাসাগরের 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে'র প্রতিবাদে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—১৮৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে একখানা বই বের করেছেন। সে বইখানার নাম: "নিষ্কৃতি-লাভ-প্রয়াস" বিফল।

আরো জল চাই, আরো জল চাই। পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে প্রভাবতী। পিপাসায় আকুল হয়ে করুণ চোখে বিদ্যাসাগরের কাছে জল চেয়েছে। বিদ্যাসাগর জল দিতে পারেন নি, নানা কথায় প্রভাবতীকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। হায়, তখন যদি বিদ্যাসাগর ঘুণাক্ষরেও জানতেন যে, প্রভাবতীর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, তা হলে পিপাসার যন্ত্রণায় ওকে কিছুতেই অস্থির হতে দিতেন না, ওকে নিশ্চয়ই প্রাণ ভরে জল খেতে দিতেন।

তিন বছর বয়সে প্রভাবতী মারা গেল।

প্রভাবতী নেই, প্রভাবতী নেই। বিদ্যাসাগর স্থির হয়ে বসতে পারেন না, খেতে পারেন না, শুতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের এক কণা সুখ নেই। বিদ্যাসাগরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত পরম দুঃখে ভরে আছে।

বিদ্যাসাগর খেতে বসেন। অনেক দিন চোখের জলে খাবার নষ্ট হয়ে যায়। একা-একা যখন বসে থাকেন, প্রভাবতীর কথা ভাবতে ভাবতে চোখের জলে দশ দিক ভেসে যায়। রাত্রে বিছানায় শুয়েও নিস্তার নেই। অধিকাংশ সময়েই একমনে প্রভাবতীর কথা ভাবেন। ভাবতে ভাবতে এক এক সময় মনে

হয়, সত্যিই বুঝি প্রভাবতী কথা কয়ে উঠল, বুঝি প্রভাবতীর গলার স্বর শোনা গেল। বিদ্যাসাগর চমকে ওঠেন।

প্রভাবতীর মৃত্যুর দিন কয়েক পরের কথা। বিকেল বেলা। ঘুম এসেছে বিদ্যাসাগরের চোখে। স্বপ্নে দেখলেন প্রভাবতীকে। স্বপ্নের মধ্যে [illegible] বিদ্যাসাগর কোলে নিলেন প্রভাবতীকে, স্বপ্নের মধ্যে প্রভাবতীর মুখে চুমু, [illegible] হঠাৎ—এমন সময় কে একজন এসে বিদ্যাসাগরের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ঘুম ভেঙে গেল, স্বপ্ন ভেঙে গেল। তবু তো স্বপ্নের মধ্যে প্রভাবতী এসেছিল। তাই, এমন স্বপ্ন ভেঙে গেল। বিদ্যাসাগরের এ দুঃখ কাকে বলে [illegible]।

[illegible] প্রভাবতী [illegible] বিদ্যাসাগরের মনের মধ্যে [illegible] প্রভাবতী প্রভাবতী। প্রভাবতী মরে গেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মনের মধ্যে প্রভাবতী [illegible] বেঁচে আছে।

১৮৬৩ [illegible]

[illegible]

'প্রভাবতী সম্ভাষণ' [illegible]

[illegible]

বৎসে! [illegible] অবস্থাপিত হইয়াছে। [illegible] বিষম [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ছিল, আর কোনও বিষয়েই, কোনও অংশে, নিশ্চিন্তমনে সুস্থচিত্তে বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানীং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইত, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্বশরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের কার্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইদানীং তুমিই আমার জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে। সুতরাং, অসম্ভাবে, আমার কীদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি, ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে, স্বীয় অনুভবপথে উপনীত করিতে পার।

কিন্তু এক বিষয় ভাবিয়া, আমি, কিয়ৎ অংশে, বীতশোক ও আশ্বাসিত হইয়াছি। দেখিয়াছি, তুমি এরূপ শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে, যাঁহারাই, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি ও প্রভূত মাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী সন্দর্শন করিয়াছেন, নিরতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন। তুমি সকলের নয়নতারা ছিলে। সকলেই তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। এই নগরের অনেক পরিবারের সহিত আমার প্রণয় ও পরিচয় আছে; কিন্তু কোনও পরিবারেই, তোমার ন্যায়, অবিসংবাদে সর্বসাধারণের নিরতিশয় স্নেহভাজন ও আদরভাজন অপত্য, এ পর্যন্ত, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।...

বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিক ভাল বাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আর তুমি যে আমায় আন্তরিক ভাল বাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি তোমায় অধিক ক্ষণ না দেখিলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও, আমায় অধিক ক্ষণ না দেখিতে পাইলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে; এবং আমি [illegible] কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, অনুক্ষণ এই অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে, এতদিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া, আমি অতি বিষম অসুখে কালহরণ করিতেছি। কিন্তু, তুমি এতদিন আমায় না দেখিয়া, কিভাবে কালযাপন করিতেছ তাহা জানিতে পারিতেছি না। বোধ হয় তুমি, নিতান্ত নির্মম হইয়া, এ জন্মের মত, অন্তর্হিত হইয়াছ, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কি না, জানিতে পারিতেছি না। আর, হয়ত, এত দিন আমায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ; কিন্তু, আমি তোমায় কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি, চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যার পর নাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সতত পাঠ করিয়া, তোমায় সর্বক্ষণ স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিব। তাহা হইলে, আর আমার তোমায় বিস্মৃত হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা রহিল না।..."

'প্রভাবতী সম্ভাষণ' বিদ্যাসাগর নিজের জন্য লিখেছেন, নিজের পড়ার জন্য লিখেছেন। কী আশ্চর্য লেখা। বিদ্যাসাগরের বিশাল হৃদয়ের দুঃখ 'প্রভাবতী সম্ভাষণে'র প্রত্যেকটি অক্ষর অপার মাধুর্যে সিক্ত হয়ে আছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' নামে একটি সভা করেছেন। পরে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' নাম বদল করে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' হল। আগেই বলে রাখা ভালো, কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর।

'তত্ত্ববোধিনী সভা' থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে একখানা মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত—উত্তরকালের একজন স্বনামধন্য লেখক। সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারকে বিশেষ সাহায্য করেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বিদ্যাসাগর। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: "অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা পেপার কমিটি করেছেন। পত্রিকায় কোন লেখা ছাপা হবে, তা ঠিক করে দিত পেপার কমিটি। ওই পেপার কমিটির একজন সভ্য ছিলেন আনন্দকৃষ্ণ বসু।

আনন্দকৃষ্ণের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের আলাপ হয়ে গেল।

আনন্দকৃষ্ণের কাছে আসত অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলো। বিদ্যাসাগরও আসতেন আনন্দকৃষ্ণের কাছে। আনন্দকৃষ্ণের কথায় বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলো দেখে দিতেন।

কিছু দিন পরের কথা। আনন্দকৃষ্ণ একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—অক্ষয়বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বিদ্যাসাগর বললেন—আচ্ছা বেশ, তাঁকে আসতে বলবেন।

তারপর অক্ষয়কুমার একদিন এসে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন—আমার প্রবন্ধগুলো দেখে দিয়ে আপনি আমার উপকার করেন। অনুগ্রহ করে এরকম করলে বড়ো ভালো হয়। আমি চিরবাধিত হব, বিশেষ উপকৃত হব।

১৮৫১ সালে অক্ষয়কুমারের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (প্রথম ভাগ)' বেরিয়েছে। ওই বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' অক্ষয়কুমার লিখেছেন : "সকৃতজ্ঞ চিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পেপার কমিটির একজন সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য যেসব রচনা আসত, দরকার হলে রচনা অদল-বদল করা হত; পেপার কমিটির অধিকাংশ সভ্যের পছন্দ না হলে কোনো রচনাই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপা হত না। আর কারো কথা দূরে থাক, স্বয়ং বিদ্যাসাগরের রচনাও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপা হওয়ার আগে পেপার কমিটির অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি দরকার।

পেপার কমিটি কীভাবে রচনা নির্বাচন করত : দুটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :

"কবির পণ্ডিতদিগের বৃত্তান্ত বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি। যথা বিহিত অনুমতি করিবেন। নিবেদনমিতি।
তত্ত্ববোধিনী সভা
১৪ আশ্বিন ১৭৭০

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত
গ্রন্থ-সম্পাদক।

প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সংকলিত হইয়াছে। অতএব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম ইতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যর স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রেরিত পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশযোগ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।
শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গ ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন দৃষ্টি করিবেন। আপনারা দেখিবেন তাহা অতি সুচারু শুদ্ধ ভাষায় পরিপাটীরূপে লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। এতদ্ভিন্ন আমারদিগের পূর্বকার আচার ব্যবহারাদির যেরূপে নিদর্শন মহাভারতে পাওয়া যায় এমত আর কুত্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধীয় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগেরও উপকার হইবেক। নিবেদনমিতি।
তত্ত্ববোধিনী সভা
২৬ পৌষ ১৭৭০

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
গ্রন্থ-সম্পাদক।

গ্রন্থ-সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন ইহা অবশ্য প্রকাশ কর্তব্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

অতি সুললিত (সুললিত?) ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইরূপে প্রকাশ ক্রমশ হয় তাহা হইলে অনেক উপকার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

এইরূপে মহাভারতের অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে অতি লোকপ্রিয় করিবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।"

সন্দেহ নেই, বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে বিপুলভাবে সাহায্য করেছেন। ১৮১৩ শকাব্দের ভাদ্র মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "...এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে পরিচালিত হইয়া বঙ্গে একটি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ইহা জ্ঞানালোক ও ধর্মালোকে লোকের যারপর নাই উপকার করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে মহাভারত অনুবাদ করিতেন। এবং এই পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত তাহার সংশোধনের ভার তাঁহারও হস্তে ছিল। ফলত তত্ত্ববোধিনী দ্বারা এক সময় যে বঙ্গ ভাষার অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে বিদ্যাসাগরের অনেকটা সহায়তা ছিল।..."

হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রেরা সাব্যস্ত করলেন, 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' নামে নতুন একখানা মাসিক পত্রিকা বের করা হবে। কর্মকর্তারা বিদ্যাসাগরকে বললেন—আমাদের এই নতুন কাগজে প্রথম কী লেখা উচিত, তা আপনি লিখে দিন। প্রথম কাগজে আপনার লেখা বেরোলে, কাগজের গৌরব হবে, সকলে সমাদর করে কাগজ দেখবে।

'সর্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা বেরল ১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে। সেই প্রথম

সংখ্যাতেই বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।

বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরোধী।

বড়ো মেয়ে হেমলতাকে নিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে যাচ্ছেন। হেমলতার বয়স তখন ষোলো বছর, অথচ বিয়ে হয় নি। পথে হেমলতা বলল—আচ্ছা, বাবা, এত বয়সেও তুমি আমার বিয়ে দাও নি, এজন্যে পণ্ডিতমশায় তোমায় কিছু বলবেন না তো!

শিবনাথ বললেন—বিদ্যাসাগর সবরকম কুসংস্কারের বিরোধী, অতএব তোমার দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই, মা।

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পৌঁছনো গেল। নানা কথাবার্তার পর শিবনাথ, পথে হেমলতা যা বলেছিল, সে কথা খোলাখুলি বললেন বিদ্যাসাগরকে। কথা শুনে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন বিদ্যাসাগর। তারপর হেমলতাকে বললেন—কি গো, তুমি কি ভাবো, বেশী বয়সে মেয়ের বিয়ে দেবার ব্যাপারে তোমার বাবাই খুব বাহাদুর। তুমি বুঝি জানো না, বিয়ের সময় আমার মেয়েদের বয়স তোমার চেয়েও বেশী হয়েছিল। তা ছাড়া তোমার ভাবনা কী। তোমার বাবা যদি তোমার বিয়ে নাই ঠিক করেন, উপযুক্ত পাত্র হিসেবে আমি তো তোমার কাছেই হাজির আছি। তুমি যেদিন বলবে, সেদিনই তোমাকে গিন্নী করে আমার বাড়িতে নিয়ে আসব।

হেমলতার পিঠে হাত রাখলেন বিদ্যাসাগর। জিজ্ঞেস করলেন—কি গো, বাড়ো বর পছন্দ হয়?

১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর 'সোমপ্রকাশ' নামে একখানা সাপ্তাহিকপত্র সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর এক কীর্তি সোমপ্রকাশ। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিতেন—যে-সকল বাংলা কাগজ ছিল, তাহাতে নানা রকম খবর দিত; ভাল খবর থাকিত, মন্দ খবরও থাকিত; লোকের কুৎসা করিলে কাগজের পসার বাড়িত, অনেক সময় কুৎসা করিয়া তাহারা পয়সাও রোজগার করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন যদি কোনো কাগজে ইংরেজীর মত রাজনীতি চর্চা করা যায়, তাহা হইলে বাংলা খবরের কাগজের চেহারা ফেরে। তাই তাঁহারা কয়েকজন মিলিয়া সোমপ্রকাশ বাহির করিলেন; সোমবারে কাগজ বাহির হইত বলিয়া নাম হইল সোমপ্রকাশ।"

এবার 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র কথায় আসা যাক।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইংরেজী পত্রিকা, সম্পাদক ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৬১ সালের ১৪ জুন হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হল। হরিশচন্দ্রের সংসার গেল নিঃস্ব হয়ে। নিঃস্ব পরিবারের মুখ চেয়ে বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন। বিদ্যাসাগরের কথায় কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র স্বত্ব এবং ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম। কালীপ্রসন্নের ইচ্ছায় তাঁর বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ম্যানেজিং এডিটর। কিন্তু বেশী দিন থাকতে পারলেন না তিনি। নাম করা যাবে না, এমন একজনের চক্রান্তে বিরক্ত হয়ে শম্ভুচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছেড়ে চলে গেলেন।

কালীপ্রসন্ন এখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নিয়ে কী করেন? তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সমস্ত ভার বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দিলেন।

অল্প কিছু দিন বিদ্যাসাগর কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকীয় কাজ চালিয়ে নিলেন। তারপর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর বিদ্যাসাগর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদন-ভার নিতে অনুরোধ করলেন মাইকেল মধুসূদনকে।

কিছু দিনের জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক রইলেন মাইকেল মধুসূদন।

তারপর কৃষ্ণদাস পালের কথা।

কৃষ্ণদাস পাল তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে চাকরি করেন। কৃষ্ণদাসের উপর নজর হল বিদ্যাসাগরের। কৃষ্ণদাসকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' চালাতে বললেন তিনি।

কিন্তু কৃষ্ণদাসের বয়স অল্প তখন। তাই বিদ্যাসাগর কৃষ্ণদাসের উপর পুরোপুরি নির্ভর করলেন না। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র জন্য বিদ্যাসাগর নিজেই ইংরেজী লেখা কৃষ্ণদাসকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে লাগলেন। এই ব্যবস্থাই চলল কিছুকাল। অর্থাৎ কিছু দিনের জন্য কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগরের অধীনে থেকে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকের কাজ করেছেন। বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হয়েছেন। পরবর্তী কালে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন কৃষ্ণদাস পাল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার আলস্য একেবারেই ছিল না। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্বদাই উহার বাংলা পরিবর্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্তনেই ভাষা খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন—বুঝিতেন বহু দিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন। তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংস্কারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি (১৮৪৭) নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন।"

শেষ প্রুফ নিজে দেখে দিতেন বিদ্যাসাগর। শেষ প্রুফ দেখার পর কেউ যদি ভুল বের করে দিতে পারত সে টাকা পেত। এক একটি সেরকম ভুল ধরার জন্য এক এক টাকা করে পেত। সেরকম ভুল সুরেশ সমাজপতি ছাড়া আর কেউ কখনো ধরতে পারে নি।

ছাপাখানার উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর বিস্তর পরিশ্রম করেছেন। টাইপ-কেসে কোথায় কোন বাঙলা অক্ষরটি থাকলে সুবিধা হয়, ছাপার কাজ সহজ হয়, তারও একটা নিয়ম বের করেছেন বিদ্যাসাগর। 'বিদ্যাসাগর সাট' বলে তাকে।

সংস্কৃত প্রেস নিয়ে অনেক ঘটনা আছে বিদ্যাসাগরের জীবনে। আগে সামান্য কিছু বলা হয়েছে। এখানেও অন্তত দু-একটি ঘটনা না বললে চলে না।

সংস্কৃত প্রেস স্থাপিত হওয়ার কিছু দিন পরে প্রেসের জন্য একটি সরকার দরকার হয়ে পড়ল।

মদনমোহন তর্কালংকারের ভগিনীপতির নাম মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর জানেন, মাধবচন্দ্র অতি কষ্টে সংসার চালান। অতএব সেই মাধবচন্দ্রকেই প্রেসের সরকার বহাল করার কথা বললেন বিদ্যাসাগর।

কিন্তু মদনমোহন প্রথমে তাতে রাজী হন নি। বিদ্যাসাগরের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজী হতে হল। মাধবচন্দ্র প্রেসের সরকার বহাল হলেন। মাইনে দশ টাকা।

কিছুকাল পরে মাধবচন্দ্র মারা গেলেন।

মদনমোহনের বোন কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরের কাছে কেঁদে পড়লেন—দাদা! কাল কী খাব, তার সংস্থান নেই। দয়া করে আমার কোনো উপায় করো। নয় তো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমায় উপোস করে মরতে হবে।

সত্যি কথা। মদনমোহনের বোন এক বিন্দু বাড়িয়ে বলেন নি।

বিদ্যাসাগর মদনমোহনকে বললেন—যত দিন তোমার ভাগ্নেটি মানুষ না হয়, তত দিন ছাপাখানার তহবিল থেকে তোমার বোনকে মাস মাস দশ টাকা দিতে হবে।

নিতান্ত অনিচ্ছায় মদনমোহন রাজী হলেন।

ছাপাখানার তহবিল থেকে মাসে মাসে দশ টাকা পেতে লাগলেন মদনমোহনের বোন। কায়ক্লেশে সংসার চালাতে লাগলেন।

কিছু দিন পরে আর এক অভাবনীয় কাণ্ড হল। মুর্শিদাবাদ থেকে মদনমোহন লিখে

লিখলেন : আমার ভগিনীকে, ছাপাখানার তহবিল হইতে, মাস মাস যে দশ টাকা দেওয়া হয়, তাহা আমি, আগামী মাস হইতে, রহিত করিলাম।

খবর পেয়ে মদনমোহনের বোন কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরের কাছে কাঁদতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর বললেন—ছাপাখানার তহবিল থেকে আর আমি তোমায় টাকা দিতে পারব না। আমি এইমাত্র করতে পারি, আমার অংশের পাঁচ টাকা তুমি মাস মাস আমার কাছ থেকে পাবে; এর বেশী দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে।

তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি চলে গেলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বোন।

উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "তিনি (মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী) যতদিন জীবিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে, মাস মাস, পাঁচ টাকা পাইয়া, কোনওরূপে দিনপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই, তদীয় পুত্রটির প্রাণত্যাগ ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয়া বিধবা কন্যা, যতদিন জীবিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে মাস মাস দুই টাকা লইয়া, দিনপাত করিয়াছিলেন।"

ক্রমশ

জাপান আজ কিছুটা বিভ্রান্ত। বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ, রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক বিবর্তনই এর একটা কারণ। রাজনীতি ও জনমতের গভীরতায় এমন একটা সংঘর্ষ উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, তার শেষটা যে কী হবে, তাইতেই বিভ্রান্তি। দিকে দিকে ছুটে চলেছেন এখানের রাজনীতিবিদরা। নিজেদের খুঁটি আরও শক্ত করতে হবে এশিয়ার রাজনৈতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে। সেই সঙ্গে দেখতে হবে আধুনিক জাপানের প্রধান স্তম্ভ "Trade"-এর যেন কোন ক্ষতি না হয়। কারণ, আজকে ব্যবসায় সফলতা-বিফলতার উপরেই বিশেষ সম্মানবোধ নির্ভরশীল। রাজনীতির 'দর্শন'-এ জাপানকে যে আখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, নিজের বুদ্ধিমত্তা আর চাতুরির গুণে সে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে সমগ্র এশিয়ার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই একই কারণে যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সে সমগ্র জগৎকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে, তার গুরুত্বকে কি করে অস্বীকার করে? ব্যবসা-ক্ষেত্রের ভিত্তিকে অটুট রাখতে সে বদ্ধ-পরিকর। বাণিজ্যিক এবং মানসিক যে-কোন মূল্য দিতে সে প্রস্তুত।

কিন্তু [illegible] দিকে কিছু চিন্তাশীল [illegible] ক্ষেত্রে নূতন বিকাশ [illegible] শুরু হয়ে গেছে। আধুনিক জাপানে, বলতে গেলে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে, এইটিই প্রথম এবং প্রধান [illegible] সংঘর্ষের সূচনা। অবশ্য যে কোন [illegible] ক্ষেত্রে এইটিই স্বাভাবিক। [illegible] এবং [illegible] প্রথম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জাপান [illegible] [illegible] শুধু [illegible] নিজেদের [illegible] করে [illegible]। সেদিন সব কিছু [illegible] সে [illegible] নিজের সত্তাটুকু বিলিয়ে দিয়েছিল ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে সামরিক-প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তি আমেরিকা চিরকালই চেয়েছিল এশিয়াকে ব্যবসার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করতে। সে ক্ষেত্রে সে পেয়ে গেল এশিয়ার সব থেকে কর্মঠ জাতিকে। সেই থেকেই গড়ে তুলতে শুরু করল জাপান নিজেকে। একটা অস্থিচর্মসার মানুষকে পেট ভরে খেতে দিলে একদিন সে এমন শক্তির অধিকারী হবে যে, বন্ধন মুক্ত করতে তার কতক্ষণ? সেই সঙ্গে তার মাথায় একটু বুদ্ধি থাকলে তো কথাই নেই। এমনই ভাবে জাপান গড়ে উঠতে শুরু করল। একে একে অনেক ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সে পৃথিবীর পুরোভাগে দাঁড়াল। জীবনযাত্রার মান অনেক বেড়ে গেল। দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রেও তারা অনেক উন্নত। ঠিক সেই সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যশ ও প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা, হয়ত আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা। ইতিহাসের এ ব্যতিক্রম পৃথিবীর কোন দেশ, কোন জাতি হতে পারে নি, জাপানই বা হবে কেন?

নূতন জাগরণের প্রথম চাহিদাই হচ্ছে বিশ্বকে শুধু বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখালেই চলবে না, দেখাতে হবে মনের গভীরতায়; তৈরি করতে হবে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সৌহার্দ্য। তার দরুন যে চাপ সৃষ্টি হতে চলেছে তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি আজকের ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক সরকার। অবশ্য আজকের জাপানের আসল ভিত্তি Trade-কেও একই সঙ্গে দেখতে হবে বইকি। পৃথিবীর ইতিহাস বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই দ্বিমতকে সঠিক এবং সমানভাবে চালনা করা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষয় ও ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। উদাহরণ নিজেদের দিকে তাকালেই কিছুটা বোধ হয় পেয়ে যাবেন।

এদের প্রধানমন্ত্রী ভুটোলেন ফরমোসা। [illegible] তাঁর প্রধান লক্ষ্য। প্রত্যেক দেশেই আছে একদল উৎপন্থীর ভিড়। এখানেও [illegible] নেই। একদল রুখে দাঁড়ালেন। [illegible] প্রধানমন্ত্রী মিঃ [illegible] এশিয়ায় তাঁর আলাপ-আলোচনা। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের [illegible] উঠতে পারে [illegible] সম্পর্কেও [illegible] জাপানের প্রধানমন্ত্রী [illegible] চিয়াং কাইশেকের [illegible] জাপান [illegible] উপর চিয়াং কাইশেক [illegible] বলীয়ান। [illegible] বিরোধ আসন্ন। অপর পক্ষে লাল চীনের সঙ্গে তার [illegible]। জাপানের ব্যবসার একটা [illegible] চীনের বাজারের উপর নির্ভরশীল। [illegible] অনেক প্রতিষ্ঠান জানি, একই [illegible] রপ্তানি করছে ব্রিটিশ ও রোডেশিয়াকে, লাল চীন ও ফরমোসাকে, ভারত ও পাকিস্তানকে, ইস্রায়েল ও আরবকে, উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে, উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে, পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানীকে; কিন্তু সেখানে প্রতিষ্ঠানের নাম ভিন্ন, চালক এক। ব্যবসাই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। রোডেশিয়াকে ব্রিটিশ একঘরে করল। পৃথিবীর চোখে প্রশ্ন দেখা দিল, "এবার কি হবে?" আজকে রোডেশিয়ার বাজারে একটা চক্কর দিন, দেখবেন জাপানী রপ্তানিতে ভরে গেছে। শুধু তাই নয়, এখানকার কাগজ অতিমাত্রায় গুদামজাত করবার আশঙ্কায় আশঙ্কিত। ব্রিটিশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল রোডেশিয়া। সত্যই ব্যবসা-ক্ষেত্রে সেন্টিমেন্ট-এর কোনো মূল্যই নেই। লাল চীনকে ব্রিটিশ দেয়নি কেন? অতএব সুযোগের যদি সদ্ব্যবহার না করেছ, তুমি ঠকেছ। আর তুমি ঠকলে তোমার মহত্ত্ব কোন বাস্তব মূল্য পাবে না আজকের পৃথিবীর কাছ থেকে। এটা মন-প্রাণ দিয়ে বুঝেছেই শুধু নয়, বিশ্বাস করে আজকের জাপান, আর পালনও করে।

সাতো গেলেন তাইওয়ান সফরে। প্রথম আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই মতবিরোধ হল চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে লাল চীনকে কেন্দ্র করে। তাকে ধামাচাপা দেওয়া হল আলোচনার মেয়াদ বাড়িয়ে। তারপর সেই আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে যতটা সম্ভব বিবাদ-বিসংবাদ বাঁচিয়ে চলে যাওয়া হল ব্যবসাক্ষেত্রের আলোচনায়। সেখানে সফলতার সূর্য জ্বলজ্বল করছে। প্রথমত জাপানে এর একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, কিন্তু ব্যবসায়ী মন দিয়ে বিচার করলে আজকের সরকারকে সমর্থন করা অবশ্যই কর্তব্য হিসাবে মেনে নিল বেশির ভাগ লোক।

লাল চীন কিন্তু বসে থাকল না। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সঙ্গে সঙ্গে। লাল চীন থেকে বহিষ্কৃত করা হল জাপানের তিনজন সাংবাদিক। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এরা লাল চীনে বসে সেই দেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিকৃত সমালোচনা করেছে। এর কারণ যাই হোক, সেটা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। [illegible] বহিষ্কৃত হল সাতো-র তাইওয়ান সফরের সঙ্গে সঙ্গে। সেই সময় টোকিওতে সফররত একদল লাল চীনের বাণিজ্যিক [illegible] প্রতিনিধির মুখেও ধ্বনিত হল একই [illegible]। লাল চীনের কাগজে বলা হল— [illegible] সাতোর সঙ্গে সেদিনের জেনারেল [illegible] কোন প্রভেদ নেই। সেদিনের জাপান [illegible] অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল [illegible], আজকের সাতোর [illegible] উঠছে Expansion of Imperialism। [illegible] সেদিন ছিল [illegible] আজকে জাপান [illegible] আমেরিকার [illegible] সম্প্রসারণের সব-গুলি অস্ত্র যা আরও লজ্জাকর।" লাল চীন

সেই একই তালে নাচ শুরু করেছে। গলিতলায় উঠছে গগনচুম্বী প্রাসাদ, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সায়গনে তো কথাই নেই। সেখানে জাহাজ-ঘাটিতে গোটা বারো জাহাজ একসঙ্গে মাল খালাস করতে পারে। আমি যেদিন সায়গনে ছিলাম, সেদিনের জাহাজ-ঘাটিতে পাঁচটা বার্থ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পাঁচটি বিপুলাকায় জাপানী জাহাজ—জাপান থেকে আগত। কি ছিল জানি না, কারণ সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এইসব কেন্দ্র করে ভিয়েৎকঙ-এর দল আমেরিকার জাহাজে জাপানী নাবিকদের উপর গুলি চালাতে দ্বিধাবোধ করেনি। আর ব্যাঙকক, যেখানে সাপের মতন চলেছে হাইওয়ে, গড়ে উঠছে নতুন নতুন কলকারখানা আর বিমান-বন্দর। তার বদলে দিতে হচ্ছে "অনেক কিছু"। সেই "অনেক কিছু" যে যেভাবে পারছে গ্রহণ করছে। ধনতন্ত্রের সেই বীজটা এখন জাপানে ডালপালা বার করল—এটা সেই যুগ। একটিও জাপানী ছেলে আজ চাকরির উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায় না। যে কাজে সে নিযুক্ত তার জন্য সারা দিন পরিশ্রম করে। কোন ফাঁকি নেই, কোন আলস্য নেই। সেখানে সে সৃষ্টি করেছে এক জ্বলন্ত উদাহরণ। তার ধারে-কাছে পৌঁছবার কথা আমরা ভাবতে পারি না। কাজের পর ছড়িয়ে আছে চারিদিকে বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য। হাতে পয়সা আছে, সামনে বিলাস-ব্যসন কেবল দাঁড়িয়ে ডাকছে! ক্ষমতা কোথায়, সাধারণ মানুষ তা ছেড়ে 'দর্শন'-চিন্তা করবে? তা হয় না। কেউ তা পারে না। এইখানেই ধনতন্ত্রের ছিদ্র। তবে এরও সীমা আছে। সেই শাস্ত্রের কথা "প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করবার উপায় প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা।" এদের ভিতরেই দেখছি, ভিয়েৎনাম নিয়ে আলোচনা করতে, বন্দরে দাঁড়িয়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরোধিতায় লক্ষ লক্ষ নাম সংগ্রহ করছে।

এরই একদল দাবি উঠিয়েছে, "ওকিনাওয়া" ফেরত চাই। অনেক ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি জাপান। ওকিনাওয়া এমনই একটি ছোট দ্বীপ। তবুও সামরিক দিক থেকে এর গুরুত্ব অনেকখানি। গত যুদ্ধে এই দ্বীপটি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে আমেরিকার হাতে। রাজনৈতিক বিচারে সামরিক শক্তির যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমেরিকার কাছে ওকিনাওয়ার গুরুত্ব এত বেশী যে, সামরিক চুক্তিতে সমগ্র দেশকে বেঁধে রাখলেও ওকিনাওয়া সরকারীভাবে জাপানের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হল না। অতএব স্বাধীন জাপান চাইছে জাপানের নিজস্ব অংশ। কিন্তু সত্যই জাপানের স্বাধীনতা কতখানি সত্যকার রূপ পেয়েছে সেটা চিন্তার বিষয়। একদল চিন্তাশীলের মতে, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যতক্ষণ মার্কিন-জাপানের মধ্যে সামরিক প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন বিদ্যমান, ততদিন জাপানের নিজস্ব সত্তা এশিয়াতে খুঁজে পেতে অনেক দেরি। সেই হচ্ছে জাপানের পক্ষে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকে যুক্তভাবে এসিয়ার পুরোভাগে আসার সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা। পৃথিবীর যে-কোন ক্ষেত্রে যদি তুমি একটা স্বার্থহীন 'Sacrifice'-এর ছাপ না লাগাতে পার, তোমার যোগ্যতার উপযুক্ত সম্মান নেই। এখানেও অনেকটা তাই। এ বিষয়ে আজকের জাপানের কিছুসংখ্যক জনগণ বেশ সচেতন হয়ে উঠেছেন। সে "মত" এমনই একটা রূপ নিয়েছে যে, আজকের সরকারের পক্ষে খুব সহজে তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বৈদেশিক মন্ত্রী আমেরিকা সফরকালে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা অবশ্যই চালাবেন — এমনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। অতএব 'মতামত'কে সম্মান দিলেন। আর কেই বা নিজের দেশকে নিজের কাছে না চায়। তবে কোন বৃহত্তম শক্তিই তার নিজস্ব ক্ষমতা চট করে হাতছাড়া করতে রাজী হয় না। আবার যদি সেখানে রাজনৈতিক গুরুত্ব বিদ্যমান থাকে। ব্রিটিশও একদিন আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছিল পৃথিবীর চোখের সামনে। কিন্তু তৈরি করে গেল মানসিক গ্লানি, দ্বিখণ্ডিত ভারতে আজও যার ফল আমরা ভোগ করছি। আজকের জাপানও সেই সীমারেখা পার হয়ে এসে বুঝতে শুরু করেছে—শুধু স্বাধীনতার আখ্যা দিয়ে রাখলেই চলবে না, আমরা চাই পূর্ণ ক্ষমতা। এমনই এক জনমতের সঙ্গে আপোস করতে হচ্ছে আজকের সরকারকে। ওদিকে এশিয়ার উপর যে লাল মেঘ ঘনিয়ে এসেছে তাকে তো রুখতে হবে আমেরিকাকে। সেটা তাদের মতে 'পবিত্র কর্তব্য'? শুধু এশিয়াকে বাঁচানোই কি তার উদ্দেশ্য? নিজের ঘর সামলানোও আর এক কারণ হতে পারে। প্রথমত, ডীন রাসক সাহেব প্রথমেই জানিয়েছিলেন যে, ওকিনাওয়া হস্তান্তরিত করবার ব্যাপারে আমেরিকা কোনরকম আলোচনাতেই রাজী নয়। জাপানের এই বিরোধী গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়াস বলা যেতে পারে, অধুনা সরকারের মুখরক্ষার্থে আলোচনায় রাজী হলেন। অবশ্য আলোচনার সেই পুরনো পথ। কাটাকাটি-ঘাটা কথাবার্তা মুলতুবি রাখা, আলোচনার মেয়াদ বর্ধিত করা। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, এর পর যখন সাতো আসবেন তখন আরও খানিক আলোচনা এগুবে। তবে ইতিমধ্যেই সাতো জানিয়েছেন যে, ওকিনাওয়া হস্তান্তরিতের ব্যাপারে তিনি বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা আশাবাদী নন। ভবিষ্যৎ পথ তৈরির সূচনাই এঁদের প্রধান লক্ষ্য। আমেরিকা একটু কড়াভাবেই জানিয়েছিল—"যতদিন জাপান তথা ওকিনাওয়াকে সত্যকারের মরণ-জয়ী বা মৃত্যুকামী রণসজ্জে না সাজাচ্ছি ততদিন তো কিছুতেই ওকিনাওয়া তোমাদের হাতে দিতে পারছি না।" অনেক পুঁথিপত্র ঘেঁটে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, জনগণ জাপানে আণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক রূপের যতই বিরুদ্ধাচরণ করুক, জাপানের আইনে এমন কথা লেখা নেই যে, জাপানে আণবিক শক্তি রূপ পেতে পারবে না। অতএব অদূর ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে, চিন্তাশীল মাত্রই ভাল বুঝবেন। আর একটা কথাও আমেরিকা এই সঙ্গে ঘুরিয়ে বলে দিয়েছে যে, সত্যই তো তোমাদের নিজেদের বাহুবল বলতে এখনও কিছু নেই। আজকে বিশ বছরে জাপানের নিজস্ব সমর-সংস্থার কোন রকম অগ্রগতি সম্ভব হয়নি, বা করতে দেওয়া হয়নি। এমন মুহূর্তে আমেরিকা আজ যদি হুট্ করে হাত গুটোয় তা হলে সত্য কথা বলতে জাপানের নিরাপত্তা ভারতের চাইতেও কম। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই, আমেরিকা নিজের স্বার্থেই জাপান ছাড়বে না। এই সেদিন একজন সাধারণ জাপানী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"তোমাদের ওকিনাওয়া ফেরত চাইবার ভিতর আন্তরিকতা কতখানি?" উত্তরে বলেছিল, "আমরা জাপানী, জাপানের একটা অংশ কেন অপরের হাতে থাকবে? অবশ্য রাজনৈতিক যুক্তি দিয়ে বিচার করলে, ভিয়েৎনামের মত এও একটা সমস্যা।" বুঝলাম, সেই রূঢ় সত্যটা নিজেদের ক্ষেত্রে উচ্চারণ করতে কষ্ট হচ্ছে, "এখনও আমরা কি পূর্ণ স্বাধীন?" জাপানের বন্দরে একটা আণবিক সমর-সাজে সজ্জিত জাহাজ এলে আজকে যেভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে তাতে এই জাপানের নিজ ভূমিতে যদি আণবিক অস্ত্রের ঘাঁটি তৈরি শুরু হয়, সেটা সকলের চোখের সামনে তৈরি করার অসুবিধা আছে। ওকিনাওয়া যেতে গেলে আজও প্রয়োজন ভিসা আর পাসপোর্ট। খুব একটা কড়াকড়ি নেই, তবু যাতায়াতের একটা প্রতিবন্ধক রাখা হয়েছে, এইটাই যথেষ্ট। এ কথা সত্য যে, জাপানের রাজনীতিবিদ্ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা খুব ভাল করেই জানেন, বাণিজ্যিক উন্নতি এবং দেশের ঊর্ধ্বগতির মূলে সামরিক খাতে জাতীয় রোজগারের নামমাত্র পরিমাণ ব্যয় হয়—আজ বিশ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে মোট জাতীয় আয়ের দেড় শতাংশ। অতএব আমেরিকার সামরিক চুক্তি আজকের জাপানের রক্ষাকবচ। এমনিতেই বৃহত্তর প্রগতির ক্ষেত্রে লোকসংখ্যা পূর্ণ মাত্রায় সেখানে সামরিক ক্ষেত্রে লোকের ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী। জাপানের এখনকার সরকার চিন্তা করছেন, আরও পাঁচ বছর এই সামরিক চুক্তির পরিবর্তন। ভবিষ্যৎ-ই বিচার করবে এর ফলাফল।

বিকাশ বিশ্বাস

সুখ সঙ্গ
Brooke Bond Tea Red Label
Brooke Bond Tea Red Label
Brooke Bond Tea Red Label

সকলে লক্ষ করেছেন কিনা জানি না, তবে আমার মনে হয় ছবি আঁকা যাঁদের ঠিক পেশা নয় তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজকাল শিল্পচর্চায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন। ইতিপূর্বে এ জাতীয় দুই একজন শিল্পীর প্রদর্শনীর আলোচনা করেছি; সম্প্রতি এরূপ আর একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে। শিল্পী, শচী সেন—উদ্যোক্তা, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড অ্যাডমায়রার্স। শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিগত-ভাবে পরিচিত হতে পারলে খুশীই হতাম, কিন্তু সে সুযোগ মেলেনি—বিশেষ কোনও পারিবারিক কারণে উদ্বোধন দিনে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি।

তাঁর বন্ধু ও গুণগ্রাহীদের কাছে শুনেছি শিল্পী উত্তরচল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছেন এবং চিত্রকলার দিকে ঝোঁক থাকলেও তিনি ইতিপূর্বে কখনও ছবি আঁকার চেষ্টা করেননি। মাত্র দুই বৎসর পূর্বে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর মনে শিল্প-চেতনার উন্মেষ হয় ও সেই চেতনাকে রূপ দেবার জন্য সকলের অলক্ষ্যে তিনি ছবি আঁকতে শুরু করেন। অতঃপর বন্ধুবর্গ প্রচেষ্টা ও পরিণাম দেখে মুগ্ধ হন ও তাঁরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রয়াস অবশ্য প্রশংসনীয়, কারণ প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁরা সকলকে শিল্পীর রচনা প্রণালী দেখবার সুযোগ দিলেন।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, প্রদর্শনীতে বন্ধুগণ ছবির সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখলেই শিল্পীর প্রতি সুবিচার করতেন। শচী সেনের রচনা মূলত স্কেচ জাতীয় ও মুখ্য বিষয়বস্তু হল মানব মুখমণ্ডল। মাধ্যম প্রধানত প্যাস্টেল, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে তেলরঙের স্পর্শও ছিল। শিল্পী নানাভাবে নানা মুখমণ্ডল এঁকেছেন, সবগুলি নির্বিচারে প্রদর্শনীভুক্ত করার ফলে দর্শকের চোখ যেন আহত হয়। শিল্পীর অংকন প্রণালী, বিশেষ করে কয়েক স্থলে বলিষ্ঠ রেখাসৌন্দর্য দেখে কিন্তু মনে হয় শচী সেনের এককালে আঁকার হাত ছিল। কয়েকটি স্কেচ অবশ্য খুবই দুর্বল, তুলনা-মূলকভাবে বিচার করলে মনে হয় সেগুলি সম্ভবত পুরানো।

বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও নারী, ছেলে ও মেয়ে—এক কথায় এই প্রদর্শনীতে যেন আন্তর্জাতিক নরনারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রচনার কোনও নির্দিষ্ট ধারা নেই—কোনটি রিয়ালিস্টিক, কোনটি বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা, আবার কোনটি হয়ত বা সার্কাসের ক্লাউন জাতীয়। শুধু তাই নয়, কোনও কোনও স্কেচের মধ্য দিয়ে পরিচিত কোনও দেশনেতার প্রতিরূপ ফুটে উঠেছে—যেমন ১৯নং ছবি। স্কেচ-গুলি দেখে মনে হয় শিল্পী আপন মনে একের পর এক মুখ এঁকে গেছেন—কোনটিতে জাপানী আবার কোনটিতে নিগ্রো নরনারীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে (৩১নং)। তবে আমার ভাল লেগেছে ৪০নং স্কেচটি। মনে হয় অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে কোনও নারী বুঝি অতি সন্তর্পণে অপরিচিত কোনও পুরুষের দিকে চেয়ে আছে এবং দুটি চোখে ফুটে উঠেছে রমণী-সুলভ চিরন্তন কৌতূহলের ভাষা। অর্ধ ও প্রায় বৃত্তাকার কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখার মধ্য দিয়ে শিল্পী এই বিশিষ্ট রূপটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রদর্শনী দেখে শিল্পীর কবিসুলভ মনের পরিচয় পাওয়া যায় এবং মনে হয় কয়েকটি বিশেষ জাতীয় বলিষ্ঠ ও সাবলীল স্কেচ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিমূর্ত আকারেরও নাম করা যায়। আশা করি শিল্পচর্চা অব্যাহত রেখে শচী সেন ভবিষ্যতে নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন।
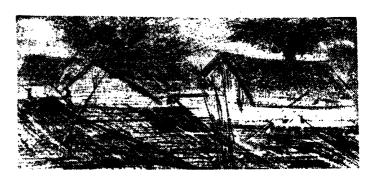
*

শিল্পী রাখাল দাস চৌরঙ্গী স্কোয়ারে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। রাখাল দাস ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন ও ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানও করেছেন। এই শিল্পী প্যাস্টেল মাধ্যমে আঁকেন, এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েকটি নিদর্শন তিনি পথচারীদের সামনে, জনবহুল চৌরঙ্গী স্কোয়ারের রেলিঙ শ্রেণীর ওপর প্রদর্শন করেন।

ঘরামি — রাখাল দাস

রাখাল দাসের অংকন পদ্ধতি রিয়ালিস্টিক, সে হিসাবে তিনি পুরাতন পন্থী। সুতরাং বাস্তবানুগ রচনা যাঁরা পছন্দ করেন তাঁদের অবশ্য প্রদর্শনীটি ভালই লেগেছে। কারণ প্রাথমিক অংকন ও প্যাস্টেল ব্যবহারে শিল্পীর কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে তিনি যা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তারই প্রতিরূপ রচনা মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মুখ্যত শিল্পী প্রকৃতির পূজারী—তাই প্রদর্শনীভুক্ত নানা নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও কয়েকটিতে শিল্পী গোপাল ঘোষের রচনারীতির ছাপ অতি স্পষ্ট। তাহলেও পরিপ্রেক্ষিত ও রচনা-গুণে কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলের চোখে পড়ে। দুঃখের বিষয় মানবমূর্তি অংকনে শিল্পী দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। বিষয়বস্তুটি করুণ হলেও মাতা ও পুত্রকে অবলম্বন করে তিনি চিত্রমালার মধ্য দিয়ে যে বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন উপযুক্ত ভাষার অভাবে সেটি অস্পষ্ট থেকে গেছে।

*

বর্তমান জগতে চলতে গেলে প্রতি পদক্ষেপেই প্রয়োজন হয় সংযোগ (Communication)-এর, এবং এই সংযোগের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্র, সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিসন উল্লেখ-যোগ্য। গণসংযোগের মাধ্যম হিসাবে আমাদের সমসাময়িক সমাজের ওপর এদের প্রভাব কত গভীর? স্বাধীন, ব্যক্তিগত জীবনেই বা এদের মূল্য কতটুকু? সাধারণ মানুষের জন্যই গণসংযোগ মাধ্যমের সৃষ্টি, না বর্তমান যুগে সাধারণ মানুষ এহেন মাধ্যমের সৃষ্টি, না বর্তমান যুগে সাধারণ মানুষ এহেন মাধ্যমের দাস মাত্র? এই জাতীয় বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান ও ভারতের গণসংযোগে ব্যবহৃত বিভিন্ন মাধ্যম ও মাধ্যমশিল্পীদের মত বিনিময়ের সুবিধার জন্য All India Federation of University and Teachers' Organisations এবং Industrial Legal Market Research

and Engineering Service (ILMERS) এর উৎসাহী ও চিন্তাশীল সভ্যবৃন্দ সংযোগ বিষয়ে একটি আলোচনাচক্রের (ABC Saminar on Communication) আয়োজন করেছেন। (উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা ছিল এই মাসেই Art Book and Craft Expositioa '67 অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু অনিবার্য কারণে এটি ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে)। রবীন্দ্র সদনে চারদিনব্যাপী আলোচনা-চক্রের প্রথম অধিবেশনে অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর, রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হুসেন স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন।

জানুয়ারী মাসের ১, ২ ও ৩ তারিখে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সংযোগ, বিভিন্ন মাধ্যমের ও সংঘবদ্ধ জাতির জীবনে সংযোগের স্থান বিষয়ে আলোচনা হবে এবং বিভিন্ন মাধ্যমের ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ আলোচনাচক্রে যোগদান করবেন। উদ্যোক্তাগণ এই উপলক্ষে একটি স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশ করার মনস্থ করেছেন।

চিত্রপ্রিয়

দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

উনত্রিশ

হঠাৎ ভারী একটা আঘাতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হারকু সাহেব একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। স্থির, নিস্তেজ। তার লোহার মতন শক্ত শরীর ও দাম্ভিক মন এমন নিদারুণ আঘাত সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। জীবনে প্রথম অলস নিষ্কর্মা হয়ে একা একা তাঁবুতে অনেক সময় বসে থাকল হারকু সাহেব—বুক শূন্য, মাথা যন্ত্রণায় প্রায় বিকল। সার্কাসের সব মানুষ তার চোখে এখন ছায়ার মতন—তাঁবু ঝাপসা, অন্ধকার। এখানেই শেষ আলো জ্বলবে, বাজনা বাজবে শেষবারের মতন। তারপর সব ছিন্ন ভিন্ন, বিশৃংখল—কে কোথায় যাবে ঠিক নেই। তবে বেশী দিন খেলোয়াড়রা চুপচাপ বসে থাকবে না। অন্য কোন সার্কাসে আর এক তাঁবুর তলায় তারা আশ্রয় পাবে—চাকরি পাবে। হারকু সাহেবের মনে হল তার মতন নিরাশ্রয়, নিঃসঙ্গ এবং নিঃসম্বল আর কেউই নয়। অন্য কোথাও সে হঠাৎ চাকরি পাবে না, কোথায় সে যাবে ঠিক নেই।

এই ক্যাম্পেই শেষ। যারা এত দিন একত্রে ছিল, যারা খেলেছে রাতের পর রাত একই তাঁবুর নিচে—নালিশ করেছে কথায় কথায়, ঝগড়া-বিবাদ ঈর্ষা করেছে এবং কখনো কখনো ভালও বেসেছে পরস্পরকে—তাদের সংসার ভাঙবার সময় হয়ে এল। সকলের সব দুঃখ বোঝবার মতন মন থাকলেও নিরুপায় এবং নিষ্ঠুর হয়ে থাকল রঘুনাথ।

সে এবার মনে মনে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল যে, সার্কাসের দায়িত্ব আর বহন করবে না—যশোদাকে বোঝাবে, আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আমি এক কথায় এত বড় লাভের ব্যবসা গুটিয়ে দিলাম। হারকু সাহেব জানত না, অন্য সার্কাস পার্টির সঙ্গে তার কিছু কিছু কথাও হয়ে গেছে।

গোটা জুয়েল সার্কাস কিনতে কেউ রাজী নয়; কেননা, এখনো অনেক ধার। খেলোয়াড়দেরও কেউ চায় না; কিছু কিছু সরঞ্জাম, তাঁবু আর জানোয়ার কিনতে চায়। সেই সার্কাস পার্টির লোক অনেক, তা হলেও তারা শুধু যমুনা আর লীলাকে কাজ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। হাসি আর রাধানাথবাবুর জায়গা সেখানে হবে না।

শেষ পর্যন্ত আশা ছিল হারকু সাহেবের, যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখবে জুয়েল সার্কাস। রঘুনাথকে বোঝাবে—অনুরোধ করবে। তাকে পর পর কয়েকটা ক্যাম্পের লাভ-লোকসানের হিসেব দেখিয়ে প্রমাণ করবে যে, লোকসানের চেয়ে লাভ অনেক বেশী হয়েছে এই ক' মাসে।

রঘুনাথ সব বুঝল, হাসল এবং মাথা ঝাঁকিয়ে তার শেষ কথা আর একবার শুনিয়ে দিল তাকে, "না হারকু সাহেব, তাম্বুতে আগ লাগবে—তার আগে আমি ছুট্টি নিব। ধার দেনা সব শোধ করে দিব।"

বিস্ময়ের অন্তিম আঘাতে মূঢ় পঙ্গু হয়ে গেল হারকু সাহেব। যে সার্কাস শিশুর মতন অল্প অল্প করে বড় করে তুলেছে সে, রঘুনাথ তার খেয়ালে তা শেষ করল। নতুন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করবার আর দরকার নেই, টালিগঞ্জ ক্যাম্পেই শেষ খেলা হয়ে যাবে আর দু-এক দিন পর। তারপর কী হবে জানে না হারকু সাহেব। তার সামনে শুধু অনিশ্চয়তার যন্ত্রণাময় গাঢ় অন্ধকার।

"যমুনা, সব শুনলে?" এত বড় সর্বনাশের কথা, বেদনা ও ব্যর্থতার কথা নিজের মুখে স্পষ্ট করে কাউকে বলতে পারে নি হারকু সাহেব। একবার লীলাকে তার বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, তাও বলা হয় নি। পর পর আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা কোন মানুষের থাকে?

সকালবেলা সব কাজ এড়িয়ে হারকু সাহেবকে তার তাঁবুতে আসতে দেখে খুশী হল যমুনা। তার বিমর্ষ চেহারা দেখে ভাবল, সে তাকে নবীনের মৃত্যুর কথাই আবার বলবে। একটা টুল হারকু সাহেবের দিকে ঠেলে দিয়ে যমুনা বলল, "বসুন।"

হারকু সাহেব বসল না, জুতো সুদ্ধ পা টুলের ওপর তুলে তাকিয়ে থাকল বাইরে। সার্কাসের মানুষরা এখনো নানা কাজে ব্যস্ত—এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। কেউ কেউ হারকু সাহেবকে দেখে আরও তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সার্কাসের সেইসব ছোট বড় মানুষকে নিজের অবোধ সন্তানের মতন মনে হল হারকু সাহেবের। তারা এখনো কিছু জানে না বলেই এমন নির্বিকার এবং নিঃসংশয়।

হারকু সাহেব বাইরে তাকিয়ে টুলের ওপর আরও জোরে পায়ের চাপ দিল এবং কিছু পরে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "খেল খতম হবার টাইম হল যমুনা, সব ফিনিশ হল!"

হারকু সাহেবের হালকা কথার ভিতরে বেদনার আভাস যমুনা ধরতে পারল না, সে বলল, "নতুন ক্যাম্প কোথায় ঠিক হল, কৃষ্ণনগরে?"

পা নামিয়ে নিল হারকু সাহেব, যমুনার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল, "কিছু শুনলে না?"

"না তো।"

হারকু সাহেব ইতস্তত করল, ওপরে নিচে তাকাল। তারপর যমুনার আরও কাছে সরে এসে একটা গোপন দুঃসংবাদ শোনাবার মতন খুব নিচু গলায় বলল, "বাবুর কী খেয়াল হল উপরওয়ালা জানে, এত মানুষকে বিলকুল বেকার বানিয়ে দিল!"

"কী হল হারকু সাহেব?"

"আউর খেল হবে না, আমার কোম্পানীতে লাল বাত্তি জ্বলবে। এইখানে লাস্ট ক্যাম্প—"

"সে কী!" যমুনার স্বর চাপা আর্তনাদের মতন। হারকু সাহেবের কথা বিশ্বাস করতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

"হাঁ যমুনা, সাচ বলছি।"

হারকু সাহেবের এলোমেলো স্বর, ম্লান মূর্তি এবং দিনের আলোয় তার এমন করে হঠাৎ এখানে চলে আসার অর্থ এত পরে বুঝতে পারল যমুনা। এই সার্কাস ভেঙে যাচ্ছে বলে নয়, হারকু সাহেবের প্রতি ঈষৎ সমবেদনায়ও নয়, কেননা রাতারাতি অনেক সার্কাস ঠিক এইরকম করেই বন্ধ হয়ে যেতে দেখেছে যমুনা এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে জায়গা বদলে নিয়ে আবার সাজ-পোশাক করে ছুটে ছুটে রিং-এ এসে হাত ঘুরিয়েছে—আজকের এই দুঃসংবাদ যমুনাকে বড় ভীত এবং আতঙ্কিত করে তুলছিল। এ খবর তার মনে হচ্ছিল তারই কোন অন্যায়ের কঠিন শাস্তির মতন। হারকু সাহেবের কথা না ভাবলেও সে তার মুখের দিকে তাকিয়েই বোবার মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

অন্য মানুষের মতন যমুনাও সার্কাস উঠে যাবে বলে বিমর্ষ হয়ে আছে এমন ধারণা করে হারকু সাহেব বলল, "তোমার লিয়ে ভাবনা নাই, নোকরি তোমার জলদি জলদি হবে।"

"নোকরি কে চায় হারকু সাহেব?"

"তবে?"

"আপনি বলেছিলেন না, আমাকে সার্কাস কুইন করে দেবেন—"

"হাঁ, হাঁ।"

যমুনা একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার দিশাহারার মতন হারকু সাহেবের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "এখন তার কী হবে? হারকু সাহেব, আপনি কিনে নিতে পারেন না এ সার্কাস?"

হারকু সাহেবের দাঁত চকচক করে উঠল। সে হেসে বলল, "অত রুপেয়া আমার নাই—"

"আস্তে আস্তে দেবেন। বাবু শুনবে না?"

"শুনত, লেকিন বাবুর বহুত ধার। সেসব শোধ করবার দরকার। আমার সাথে বাবুর বাতচিত হল—"

যমুনা পরের ক্যাম্পে সার্কাস কুইন হওয়ার আশা এখনো ছাড়তে না পেরে থুতু গিলে শুকনো গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, "আপনি কী করবেন হারকু সাহেব, কোথায় যাবেন?"

"আমি? জাহান্নামে যাব।"

"আর লীলা?" অনেক সময় ইতস্তত করেছিল যমুনা, কৌতূহল দমন করতে না পেরে ঈর্ষাকাতর হয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

আবার হাসল হারকু সাহেব, "সেও জাহান্নামে যাবে। তার মাথার ভিত্তর গোলমাল হল। চাঁদনীকে চুমা খেতে চায়—"

এসব কথা শোনার কোন আগ্রহ ছিল না যমুনার। তার তাঁবুতে হারকু সাহেবের অবস্থান, তার সঙ্গ এখন তাকে বড় পীড়া দিচ্ছিল। এবং তার মনে হচ্ছিল হারকু সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার তার আর কোন প্রয়োজন নেই। তাকে পিছনে ঠেলে রাখার জন্যে তার অলক্ষ্যে যে চক্রান্ত চলছিল তা বানচাল করবার কিংত ইচ্ছায় যমুনা ভগবানের কথা ভাবতে বাধ্য হল। কিন্তু মন বড় বিক্ষিপ্ত, উত্তেজিত ও আতঙ্কিত—কারুর ওপর বেশী সময় আস্থা রাখবার তার ক্ষমতা ছিল না।

এখন নেশা করবার সময়। হারকু সাহেব আজ ডাকে নি রাধানাথবাবুকে। সে জানত, এখন সুখ-দুঃখের গল্প করতে করতে মদ খাবার মতন মনের অবস্থা জুয়েল সার্কাসের কারুর নেই। সময় পেলেই বাইরে যাচ্ছে সকলে, কাজের চেষ্টা করছে। রাধানাথবাবুও সকাল থেকে ঘুরেছে—ছোট ছোট যত সার্কাস আছে কাছাকাছি, সব জায়গায় গেছে—কোথাও সুবিধা হয় নি।

মদ না খেয়েই শরীর কাঁপছিল রাধানাথবাবুর, আশ্রয়ের ভাবনা তাকে নেশার মতন পেয়ে বসেছিল। হাসি যমুনা খেলা দেখাচ্ছে এখন। সার্কাসের বাজনা বাজছে। বামন ক্লাউন গোপালের মিহি গলার স্বর এত দূরেও আসছিল—তা শুনতে শুনতে রাধানাথবাবুর মনে হচ্ছিল, হাত-পা থেকেও সে অলস, অক্ষম—হাসি আর যমুনার সংসারে বোকার মতন। সে এমন বড় বেশী দিন বেঁচে আছে।

হাসি আর যমুনার খেলা শেষ হয়ে যাবার পর টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রাধানাথবাবু, মাতালের মতন জড়ানো গলায় বলল, "কিছু হল না রে, কোথাও কাজ নেই। শীতকাল হলেও না হয়—"

"কী হত শীতকাল হলে? বড় কোম্পানীতে সার্কাস-কুইন হয়ে আমি তোমাকে সুখে রাখতাম—মদ খাওয়ার পয়সা যোগাতাম?"

যমুনার কথা শুনে রাধানাথবাবু আজ রাগল না, আরও কাতর হয়ে ভাঙা গলায় বলল, "আমার কথা বাদ দে। আমার আর ক' দিন! হয়ে এল রে! পেটের মধ্যে বড় ব্যথা হয়, বোধ হয় ঘা হয়েছে। তোদের কথাই ভাবি। এখন কোথায় যাবি তোরা?"

"আমার কথা ভাববার দরকার নেই। অলিম্পিক সার্কাসে কাজ হবে আমার। তুমি হাসির কথা ভাব, তোমার কথা ভাব।"

হাসি বলল, "বাবাকে থাকতে দেবে না অলিম্পিক, আমাকেও কাজ দেবে না—"

যমুনা উঁচু স্বরে বলে উঠল, "আমি তার কী করব? বাবার ভাবনা ভাববার জন্যে তুই আছিস না?"

হাসি ছোট অসহায় মেয়ের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যমুনার দ্রুত কাপড় ছাড়া দেখল। রাধানাথবাবুর চোখ ভিজে, দু' মেয়েকে দেখতে দেখতে সে হঠাৎ বলল, "অলিম্পিক সার্কাসে তুই একা থাকবি, যমুনা? বিপদের ভয় নেই তোর?"

রাধানাথবাবুকে বিদ্রূপ করবার জন্যে জোরে হাসল যমুনা, "না, নেই। আমি একা থাকব, শান্তিতে থাকব। সার্কাস কুইন হব, তবে মরব—বুঝলে?"

রাধানাথবাবুর চোখ ঠেলে জল আসছিল কিন্তু যমুনার সামনে তার কাঁদবারও সাহস হল না, সে ধরা গলায় হাসিকে জিজ্ঞেস করল, "মোহনলাল তোকে কিছু বলে যায় নি রে?"

হাসি কথা বলল না, মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, না। কারুর দিকে তাকিয়ে না, সার্কাসের পোশাক ভাঁজ করতে করতে যমুনা আপন মনেই বলতে থাকল, "পীরিত করবে নিজে, ঘাড়ে চাপাতে চাইবে বাপের ভার। এই বাজারে ঝক্কি পোয়াতে চায় কেউ—" সে আরও জোরে বলে উঠল, "এখন বোঝ মজা!"

রাধানাথবাবু নিজের কপালে জোরে চড় মেরে শব্দ করল এবং ছটফট করতে করতে বলল, "আমার জন্যেই তোদের এমন হাল। মজা আমার চেয়ে বেশী আর কে বুঝবে রে।"

যমুনা বড় নিষ্ঠুর। হাসি জানে, সে যা বলেছে তা করবে। নিজের ব্যবস্থা পাকা করে চলে যাবে অন্য সার্কাসে—শিবনাথকে যেমন করে তাড়িয়ে দিয়েছে তেমন করে ঠেলে ফেলবে হাসিকে, রাধানাথবাবুকে। এত সুন্দর

হাসির চোখের সামনে শুধু অন্ধকার ছিল, মনে কিছু জ্বালা, বেদনা, আশ্রয়ের ভাবনা—এইরকম সব টুকরো টুকরো অনুভূতি আস্তে আস্তে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। যমুনার কর্কশ স্বর, রাধানাথবাবুর কান্না এবং মোহনলালের পলায়ন তাকে এত বেশী আকুল ও বিচলিত করে তুলেছিল যে, সে একটা অবলম্বনের অন্বেষণে তাঁবুতে-তাঁবুতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাচ্ছিল, "বাঁচান—আমাদের বাঁচান! দিদির জন্যে আমাদের ওপর রাগ করে থাকবেন না। আমরা কোথায় যাব, শিবুদা!"

শিবনাথের কথা এমন বিপদের সময় হঠাৎ মনে এল হাসির। এবং আশ্চর্য, কিছু আগে অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে আতঙ্ক ও আশঙ্কার যে শীতল প্রবাহ তার রক্তের মধ্যে উথলে উঠছিল তা জুড়িয়ে গেল।

হাসির নিঃঝুম বুক একটা মনগড়া দৃঢ় বিশ্বাসের ঝাঁজে গমগম করে উঠল, "বাবা, আমি তোমার ভার নেব, আমরা এক সাথে থাকব।"

"রাতারাতি সার্কাস কুইন হয়ে যাবি নাকি রে হাসি?" তার মুখের সামনে হাত ঘুরিয়ে নির্দয়ের মতন জিজ্ঞেস করল যমুনা।

"ওসব শখ আমার নেই।"

"তবে? যুগল রাজী হয়েছে বুঝি?"

হাসি এতক্ষণ যমুনার বিদ্রূপ, কাটা কাটা কথা নিরুপায় হয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল, এখন কিছু ঝাঁজের সঙ্গে বলল, "কারুর ভার নেওয়ার ক্ষমতা আছে যুগলের? তার নাম কেন করিস? তুই তোর নিয়ে থাক না।"

যমুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, রাধানাথবাবু বাধা দিল। হাসির কথা বিশ্বাস করতে না পেরে কপালে হাত রেখেই সে বলল, "কপাল চাপড়ে আর হবে কী! সবই তো ছিল! ওরে হাসি, ওরে যমুনা—ভূতে পেয়েছিল আমাকে, তাই এমন দশা! তোদের সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর থাকার কথা—হায়, হায়, তোরা জুতো মার আমাকে, মেরে তাড়িয়ে দে—" মদ না খেয়েও মাতালের মতন এমন সব কথা বকে যাচ্ছিল রাধানাথবাবু।

যমুনা আর রাধানাথবাবুর নিশ্বাস এখন ঘুমন্ত মানুষের মতন। তা হলেও হাসির সন্দেহ হল তারা এখনো জেগে আছে। কিন্তু আর অপেক্ষা করবার ধৈর্য হাসির ছিল না। রাত অনেক, আর দেরি করলে ভোর হয়ে যাবে। রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে মানুষকে মনের যত কথা বলা যায়—হাসি ভাবল, দিনের বেলা তত কথা বলা যায় না। রাতে চোখ থেকে যত বেশী জল পড়ে, দিনে তত পড়ে না। হাসি আগেই বুঝতে পারছিল। শিবনাথের সঙ্গে কথা বলবার সময় তার চোখ থেকে জল পড়বেই।

নরম জ্যোৎস্না ঘাসের ওপর সিরসির করছিল। একটা ঘোরে উন্মাদরোগের মতন হাসি এসে দাঁড়াল শিবনাথের তাঁবুর কাছে। সে ইতস্তত করল না, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। একটু বেশী শব্দ হয়েছিল, লোহার একটা রডে পা বেধে হাসি উপুড় হয়ে পড়েছিল শিবনাথের খাটের ওপর এবং তখন এক অদ্ভুত উত্তেজনায় তার শরীর থরথর করছিল।

"কে?" খুব শক্ত করে হাসিকে চেপে ধরেছিল শিবনাথ। তার ঘুম পাতলা, অল্প শব্দেই ভেঙে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল, তার কোন শত্রু কিংবা চোর রাতের অন্ধকারে সুযোগ নিতে এসেছে।

হাসি কাতর স্বরে কোনরকমে বলল, "শিবুদা, আমি—"

"আরে হাসি", তাকে ছেড়ে দিয়ে কিছু সময় অপ্রস্তুতের মতন দাঁড়িয়ে থাকল

শিবনাথ। পরে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ছেড়ে ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, "এত রাতে? কী হয়েছে, হাসি?"

দূরে বসে যা যা বলবে ভেবেছিল হাসি, কাছে এসে সব এলোমেলো হয়ে গেল। এবং এখন তার মনে হচ্ছিল, শিবনাথের কাছে না এলেই ভাল হত। কিন্তু কিছু না বলে ফিরে যাওয়া যায় না। সে ভাবছিল, কী বলবে।

শিবনাথ হাসিকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাইরে তাকাল, উৎকর্ণ হয়ে মানুষের গলার স্বর শোনবার চেষ্টা করল। কেউ নেই কাছাকাছি, কোন চিৎকার, গোলমাল নেই কোথাও। শিবনাথ আবার বলল, "ভয় পেয়েছ? কে কী করেছে? হাসি কথা বল?"

"কিছু হয়নি, শিবুদা।"

"কাঁদছ কেন, হাসি?" শিবনাথের স্বর বড় নরম, মমতার আর্দ্র। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, এত রাতে তাকে কী বলতে এসেছে হাসি। উৎকণ্ঠায় সে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

"সার্কাস উঠে যাবে, শিবুদা—" হাসি থেমে থেমে খুব জোর করে কথা বলবার চেষ্টা করছিল, "আপনি কোন সার্কাসে যাবেন?"

"কিছু ঠিক নেই", শিবনাথ বলল, "কিছু দিন বাড়িতে বসে থাকব, বিশ্রাম করব। আর সার্কাস-ফার্কাসে যাবার ইচ্ছে নেই, ঘেন্না ধরে গেছে। দেখি, কী করতে পারি—"

"কী করবেন?"

"নিজেই যদি ছোটখাট দল গড়ে তুলতে পারি—" শব্দ করে একটা হাই তুলল শিবনাথ, "এখনো কিছু ঠিক করিনি, দেখি। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

"দিদি একা যাচ্ছে অলিম্পিক সার্কাসে।"

"তুমি?"
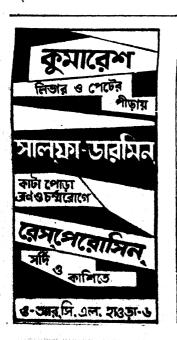
"আমাকে ওরা নেবে না, আমার আর বাবার থাকবার কোন জায়গা নেই—"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হাসি বলল, "শিবুদা, একটা কথা বলছিলাম—"

"বল না!"

"আপনার বাড়িতে ঝি-চাকরের দরকার নেই?"

শিবনাথ কিছু না বুঝতে পেরে বলল, "কেন?"

"আমরা থাকতাম, আমি আর বাবা—"

শিবনাথ হাসল, "দূর!"

"সত্যি বলছি, শিবুদা—আপনার সাথে আমাদের নিয়ে চলুন। আমি আপনার সব কাজ করে দেব। উনুনে ধরাব, রান্না করব, বাসন মাজব—"

এসব বলতে বলতে হাসি কাঁদল।

"হাসি, কাঁদে না, ছি!" শিবনাথ তার চোখে হাত ঘষে জল মুছতে মুছতে বলল, "আমার সঙ্গে যাবে, ভাল কথা। রাধানাথবাবু রাজী হবে?"

"বাবা খুব কাঁদছিল, শিবুদা—কোথায় দাঁড়াবে! দিদি যেমন মানুষ, তার দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

"আমার সঙ্গে গেলে যমুনা রাগ করবে না?"

"করুক", হাসি বলল, "আপনি দেবতার মতন মানুষ তাই সহ্য করলেন সব—অন্য কেউ হলে—"

"কী করত?"

"খুন করে দিত।"

"ও বাবা—" জোরে হাসল শিবনাথ, "তবে যে জেল হত হাসি—ফাঁসি হয়ে যেত—"

"আপনার কিছু হত না শিবুদা। আপনার মতন এমন মানুষ হয় না—" হাসি বেশী কিছু বলতে পারল না, একটা আবেগ তার মনে ফেনার মতন উপচে উঠছিল। সে শিবনাথের পায়ের ধুলো মাথায় নিল। হঠাৎ নিচু হয়ে প্রণাম করেছিল বলে বাধা দেওয়ার সুযোগ পেল না শিবনাথ।

হাসি চলে যাবার পর তিন-চার গেলাস জল খেল শিবনাথ, তবুও তার মনে হল, এখনো তৃষ্ণা মিটল না। গলায় যেন পাষাণের মতন কিছু আছে, জল গড়িয়ে যায়—গলা ভেজে না। শুয়ে শুয়ে সে যমুনার কথা ভাবছিল। হাসি থাকবে তার কাছে, রাধানাথবাবু থাকবে—যমুনা থাকবে না। সে হয়তো কখনো কখনো চিঠি লিখবে তার বোনকে, বাপকে। এবং খামের ওপর নিজের হাতে ঠিকানা লিখবে, শিবনাথের নামও লিখবে। আরও অনেক পরে একদিন সে দেখতে আসবে হাসি আর রাধানাথবাবুকে, তখন শিবনাথও দেখবে তাকে। সেই ভবিষ্যৎ বড় স্থির, বড় উজ্জ্বল হয়ে থাকল শিবনাথের মনে।

তার ঘুম এল না।

কালো বড় একটা ট্রাঙ্কে কোট প্যান্ট শার্ট এবং আরও অনেক জিনিস ঠেসে দিচ্ছিল পুষ্পরাজ। তার মুখ বড় গম্ভীর, ঈষৎ কুঞ্চিত—বিরক্তির কয়েকটা রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। একদিকে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল উষা। তার জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল, এত তাড়াতাড়ি কেন গোছগাছ করছে পুষ্পরাজ—সে কোথায় যাবে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার সাহস ছিল না উষার। সে জানত, কিছু না করলেও পুষ্পরাজ তাকে কড়া কথা শুনিয়ে দেবে।

ট্রাঙ্কে জিনিসপত্র ঠাসতে ঠাসতে এদিক-ওদিক দেখল পুষ্পরাজ, আর কিছু নেই। মেরীর নীল ছবি মাটিতে পড়েছিল, গাঁদা ফুলের সরু একটা মালা একেবারে বাসী হয়ে গেছে। মেরীর ছবি দেখতে পায় নি পুষ্পরাজ, সে ট্রাঙ্ক বন্ধ করে চাপ দিতে যাচ্ছিল, মাটি থেকে ছবি তুলে নিয়ে ফুলের মালা খুলে ফেলল উষা—পুষ্পরাজের কাছে এসে বলল, "এই লেও।"

বিরক্তির অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করল পুষ্পরাজ, উষার হাত থেকে ছবি টেনে নিয়ে বলল, "আগে কাহে নেই দিয়া?"

"দেখা নেই।"

"আউর কুছ নেই?"

"না।"

দু হাতে চাপ দিয়ে ট্রাঙ্ক বন্ধ করল পুষ্পরাজ, তালা লাগিয়ে শার্টের বুক-পকেটে চাবি রেখে উঠে দাঁড়াল, "বাস!"

পুষ্পরাজ প্যান্ট পরল, পায়ের কাছে জুতো টানল। এসব দেখতে দেখতে উষার বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল—তার মনে হচ্ছিল, এখুনি বেরিয়ে যাবে পুষ্পরাজ—তার কাছে আর ফিরে আসবে না।

"কাঁহা যাতা?"

"নোকরি নেই চাইয়ে?" পুষ্পরাজ রুক্ষ স্বরে বলল, "বহুৎ আচ্ছা থা কোহিনুর মে। তুমরা লিয়ে সব গড়বড় হো গিয়া—"

"হাম কেয়া করেগা।"

একটু চুপ করে থেকে পুষ্পরাজ বলল, "সুন্দরমকা পাশ কোহিনুরকা ম্যানেজার আয়াথা, ফের বোলায়া হামরা—বহুৎ জাস্তি রুপেয়া দেগা—"

এত সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল উষা, বেদনায় তার শরীর হিমের মতন। পেটের মধ্যে থেকে থেকে বাচ্চাটা নড়ছিল, বমি আসছিল। পুষ্পরাজের কথা শুনে উষা মাথা ঝাঁকিয়ে খুব জোরে বলে উঠল, "কোহিনুরমে হাম কভি নেই যায়গা।"

উষাকে খোঁচা দেওয়ার জন্যে পুষ্পরাজ হাসল, "কাহে? শরম আতা?"

উষার কোন অনুভূতি ছিল না, সে যন্ত্রের মতন বলল, "হাঁ।"

"কাঁহা যায়গা তুম ?"

"হামরা মা-বাবাকা পাশ।"

"ভুখ সে মরেগা ?" কিছু নরম হয়ে আস্তে বলল পুষ্পরাজ।

"হাঁ।"

"কর জো খুশ—" জুতোর ফিতে বেঁধে পুষ্পরাজ উঠে দাঁড়াল, "পাক্কা বাত করনে সে জো লিয়ে আভি হাম যায়গা সুন্দরবনকা পাশ। হুঁয়া রহেগা দো-চার রোজ, কোহিনুরমে জয়েন করেগা—"

যে কথা অল্প আগে বলেছিল পুষ্পরাজ, তাকে সেই এক কথা আস্তে বলল উষা, "কর জো খুশ—" এবং সে বড় কালো ট্রাঙ্কের দিকে খালি চোখে তাকিয়ে থাকল।

একটা শ্যাওলা ধরা ইঁটের ওপর একা বসে ছিল হারকু সাহেব। তার মাথার ওপর চিল উড়ছে, কাকের দল নেচে বেড়াচ্ছে পাঁচিলের ওপর। সার্কাসের জমি ফাঁকা, হাওয়ায় ধুলো উড়ছে। হারকু সাহেবের সামনে তার বিছানা, বালিশ এবং একটা বাক্স। লীলার সব জিনিসও জড়ো করা হয়েছিল তার পাশে। কাশ্মীর পটের কাচ সূর্যের আলোয় চিকচিক করছিল।

অন্য প্রান্তে যেখানে বাঘ-সিংহের খাঁচা ছিল, সেখানে চক্রাকারে ঘুরে যাচ্ছে লীলা। সে কখনো ব্যালেন্সের খেলা দেখাচ্ছে, কখনো সাইকেল চালাবার ভঙ্গি করছে এবং আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে। তার মাথায় ঘোমটা ছিল। দূরে থেকে তাকে দেখতে দেখতে এক-একবার হারকু সাহেবের কালো বোরখায় ঢাকা মূর্তির কথা মনে আসছিল।

একটাও তাঁবু নেই, মানুষ নেই। আশ্রয় পেয়ে গেছে সকলে। নতুন জায়গায় জন্তু-জানোয়াররাও খাওয়া পাবে ঠিক সময়। শুধু হারকু সাহেবই এখনো স্থির করতে পারে নি কোথায় যাবে—কোন জায়গার কথা ভাবতে পারল না। কিন্তু কী নিশ্চিন্ত হয়ে ফাঁকা জমিতে খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে লীলা! তার দিকে তাকিয়ে হাসল হারকু সাহেব।

সে এখনো ভাবছিল প্রথম থেকে শেষ অবধি জুয়েল সার্কাসের এক-একটি অধ্যায়ের কথা। আশ্চর্য, তার এত বড় কীর্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবার পরেও বেশী বিমর্ষ হয়ে পড়েনি জীবিকা অন্বেষণের পীড়নে অস্থির মানুষগুলো। তাদের জীবনেও হঠাৎ যেন ঐশী শৃঙ্খলা এসে গেছে।

কোহিনুর সার্কাসে ফিরে যাবে না পুষ্পরাজ। সে কিছু দিনের জন্যে দেশে ফিরে গেছে। উষাও গেছে তার সঙ্গে। প্রথমে ইতস্তত করেছিল উষা, যেতে চায় নি। পুষ্পরাজ বলেছে, তার প্রথম স্ত্রী বড় ভাল লোক—উষাকে যত্ন করবে বোনের মতন। তার ছেলেমেয়েরাও তাকে ভালবাসবে। যাবার সময় প্রথম দিনের মতন মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছিল উষার মুখে।

রাঘবন তার ট্রুপের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছোট একটা ম্যাজিক শো চালাচ্ছে। তাদের খেলা হচ্ছে হাওড়ায়, সাঁত্রাগাছিতে। হারকু সাহেবকে বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করে গেছে রাঘবন। নলিনী এখনো আছে তার ট্রুপে। তার বাপ তাকে নিতে এসেছিল, নলিনী যায় নি—ঝগড়া করে বাপকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমি বিয়ে করব মাস্টারকে।

রাঘবন হারকু সাহেবকে তাও বলে গেছে। তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট নলিনী, তা হলেও সে তাকে বিয়ে করবে। যাকে সে খেলা শেখাল, তৈরি করল—এখন বাপ এসে তার রোজগারে ভাগ বসাবে—তা কী হয়! বুড়ো বয়সে রাঘবনকে নলিনী না দেখলে কে দেখবে!

একটা টেম্পো ভাড়া করেছিল রাঘবন। তার পাশেই ছিল হেমলতা আর শ্রীধরন। নতুন জায়গায় যাবার জন্যে উৎসুক, অস্থির। এখান থেকে চলে যাবার সময় ওরা খুব হাসছিল।

কপালের সামনে একটা হাত মেলে রোদের তাপ এড়াবার চেষ্টা করল হারকু সাহেব। তাপ আরও প্রখর হয়ে উঠছিল। জুয়েল সার্কাসের এইসব স্মৃতি এবং ভাঙাচোরা দৃশ্য তাকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দিল না। আর থাকা যায় না, এখান থেকে চলে যেতেই হবে। পেট্রল পাম্পের কাছ থেকে দু-একজন কুলি ডাকবার জন্যে আস্তে আস্তে হেঁটে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল হারকু সাহেব—ইতস্তত করল, পিছনে তাকাল।

লীলা লক্ষ করছিল তাকে, ছুটে এসে ধরল—হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "পালাও কোথায়, হারকু সাহেব ?"

এখনো হারকু সাহেবের স্বর ধমক দেওয়ার মতন, "তুই কোথায় যাবি ?"

"ও মা, আমি আবার কোথায় যাব!"

"বাবুর পায়ের উপরে পড়তে পারলি না ?"

"কেন ?"

"তোর যাবার কোন জায়গা নাই, সেই বাত বাবুকে শুনোলি না কেন লীলা, বল ?"

"বাবুকে ওসব বলব কেন, তুমি আছ না ?"

হারকু সাহেব বলল, "আমি জাহান্নামে যাব—"

লীলা কলকল করে হাসল, "খুব ভাল জায়গা মাইরি, আমি যাব তোমার সাথে।"

হারকু সাহেব কুলি ডাকতে যাচ্ছিল, লীলা তার হাত টেনে রাখল, "এত জিনিস পড়ে থাকল যে ?"

"কুলি ডাকব, ছাড়—"

"ও মা, এইটুকু জিনিস—তার জন্যে আবার কুলি—" সে এক হাতে বাক্স তুলল, অন্য হাতে বিছানা চাপল, "ব্যস, ওগুলো তুমি নাও, হারকু সাহেব—"

হাত দেখিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামাল হারকু সাহেব। জিনিসপত্র তুলে ড্রাইভারকে বলল, "মৌলালি।"

"সেখানে কে থাকে, হারকু সাহেব ?"

"তোর আমার মতন দুঃখী মানুষ সেখানে বস্তির ভিতর থাকে।"

"আমরা দুঃখী মানুষ নাকি ?"

"হাঁ, হাঁ।"

"দূর!" হারকু সাহেবের বুকে মাথা রেখে লীলা বলল, "দুঃখী মানুষকে খেয়েছে—"

"লীলা, চুপ!"

ট্যাক্সির ছোট আয়নায় ঘর বাড়ি গাছ বাস ট্রাম লরী—এইরকম সব টুকরো টুকরো ছবি ফুটে উঠছিল—মুছে যাচ্ছিল। সেখানে হারকু সাহেবের মুখের ছায়াও পড়েছিল—বড় শান্ত, বড় প্রসন্ন। লীলার মাথা বুকে রেখে হারকু সাহেব অনেক সময় নিয়ে নিজেকেই দেখল।

সমাপ্ত

কয়নানগরে ভূকম্পনের কারণ কি

মহারাষ্ট্রের সেতারা জেলায় অবস্থিত কয়না-নগরে নির্মিত বাঁধের কথা আমরা শুনেছি। ওই বাঁধে একটি বহু উদ্দেশ্য-মূলক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। যেখানেই জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি কাজের জন্য নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করা হয় সেখানেই বাঁধে আটকা পড়া জল এক কৃত্রিম হ্রদ বা জলাশয় সৃষ্টি করে। কয়না-নগরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে আজ যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল তা শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে কোন পাহাড়ে শহরে ধস নামলে যেমন হয়। ভারতের সমগ্র দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপে সেই কম্পন অনুভূত হয়। শুধু তাই নয় কলকাতার আলিপুরের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভূকম্পন

দুই রকমের সিজমোগ্রাফ যন্ত্র

মানযন্ত্র বা সিজমোগ্রাফে সেই ভূকম্পন ধরা পড়ে।
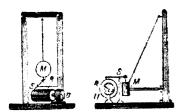
দাক্ষিণাত্যে এই ধরনের সর্বধ্বংসী ভূকম্পনের দৃষ্টান্ত অন্তত গত ২০০ বছরের মধ্যে দেখা যায়নি, এই হচ্ছে ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি কমিশনের ভূতাত্ত্বিক উপদেষ্টা ডঃ ডি এন ওয়াদিয়ার অভিমত। তিনি বলেন যে, শুধু ২০০ বছর কেন, গত লক্ষ লক্ষ বছর যাবৎ দাক্ষিণাত্যকে এক অত্যন্ত মজবুত এলাকা বলে ধারণা করা হয়েছে। তাই হায়দ্রাবাদে অবস্থিত জাতীয় ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষের মতে কয়নানগরের এই প্রচণ্ড ভূমিকম্প ভূমিকম্পের দিক থেকে দাক্ষিণাত্যের দৃঢ়তা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের এতদিনকার ধ্যানধারণা নিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরীপ দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান অধ্যক্ষ ডঃ এম এস কৃষ্ণান যে মত প্রকাশ করেছেন তা যদি ঠিক হয় তাহলে ভবিষ্যতে ওই ধরনের বাঁধ ও হ্রদ নির্মাণের প্রশ্নটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। তাঁর মধ্যে ঐ ভূকম্পনকে অস্বাভাবিক মনে করার কোন কারণ নেই। বড় বড় বাঁধের পিছনে বিরাট হ্রদের মত জলাধার নির্মাণ করলে সেই এলাকায় নিচের জমির উপর জলের যে প্রচণ্ড চাপ ও টানাপোড়েন হয় তাই থেকে সেখানে ভূমিকম্প সৃষ্টি হতে পারে। আর সিজমোগ্রাফেও দেখা গিয়েছে যে কয়নার ওই কৃত্রিম হ্রদটিই ছিল কম্পনের উৎপত্তি কেন্দ্রের (হাইপোসেণ্টার) ঠিক মাথার উপর (এপিসেণ্টার)। যদি তাই হয় তাহলে কয়নার ভূকম্পনের জন্য মানুষের ভেবেচিন্তে কাজ না করাকেই দায়ী করতে হয়। ভূকম্পনের প্রচণ্ডতার পরিমাপ করবার একাধিক মানদণ্ড আছে যার একটির নাম রিশার স্কেল যাতে কম্পন শক্তিকে দশভাগে ভাগ করা হয়েছে। রিশার স্কেল অনুসারে কয়নায় ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতার মান ছিল ৭·৫। সুতরাং সেই ভূকম্পনের প্রচণ্ডতা বড় কম নয়। অধ্যক্ষ ডঃ কৃষ্ণানের অভিমত এইজন্য প্রণিধান-যোগ্য যে ভূকম্পনের বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে ভূত্বকের প্রবণীয় শিলার মধ্যে জমির জল শিলা ক্ষইয়ে বড় বড় ফাঁক বা গহ্বর সৃষ্টি করতে থাকে যার পরিণামে সেইসব গহ্বরের ছাদগুলি ধ্বসে পড়তে পারে। তার ফলে ঘটে স্থানীয় ভূকম্পন। সেই কম্পনের পরিধি খুব বেশী দূরে যায় না, কিন্তু তার কেন্দ্রস্থলে প্রচণ্ড ধ্বংসসাধন করতে পারে। কয়নার ভূকম্পনের চরিত্রটা অনেকটা সেইরকম। আমাদের স্বরাষ্ট্রসচিব ঠিক সেই সময়ে কয়নানগর থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে কারাত নামক শহরে উপস্থিত থেকেও ভূমিকম্পের
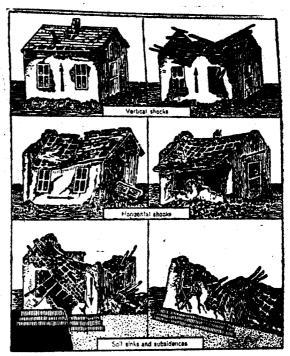
ভূকম্পনের গতি দিক অনুসারে বাড়ির ভাঙন

স্পেনে ভূমিকম্পের ফলে খাদ সৃষ্টি (১৮৮৪ সাল)

প্রচণ্ডতা টের পাননি। পরে তাঁর কাছে যখন খবর পৌঁছায় তখন সেদিনকার মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভা স্থগিত রেখে তিনি ঘটনাস্থলে যান। এই থেকেই বোঝা যায় যে, কয়নার ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতার পরিধি খুব বেশী দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। এপিসেণ্টার অঞ্চলেই সেটা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল।

গত ১৫০ বছরে আমাদের এই ভারত-ভূমিতে ৭টি বড় রকমের ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রচণ্ডতম ছিল ১৯৫০ সালে আসামের ভূমিকম্প যার ফলে প্রায় দেড় হাজার লোক মারা যায়। সেই কম্পন অনুভূত হয়েছিল পশ্চিমে বারানসী থেকে পূবে রেংগুন পর্যন্ত। সেই সময় প্রধান কম্পনের পর আরো ১৬ বার মাটি কেঁপে উঠেছিল এবং এই প্রাকৃতিক ঘটনার ফলে লোহিত ও দিহাং নদীর অববাহিকা পর্যন্ত বদলে গিয়েছিল যার ফলে দেখা দিয়েছিল বন্যা। আসামের ভূকম্পনের পরেই প্রচণ্ডতা ও ধ্বংসক্রিয়ার দিক থেকে বিহারের ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্প যা অনুভূত হয়েছিল সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে। তারপরেই হচ্ছে কচের আঞ্জার নামক জায়গার ভূমিকম্প যা ঘটে ১৯৫৫ সালে (এই কচে ১৮১৯ সালে এক ভূমিকম্পে দেড় হাজার প্রাণহানি ঘটেছিল।) এ ছাড়া আন্দামানে ১৯৪১ সালে এবং নিকোবরে ১৯৫৫ সালে বড় রকমের ভূকম্পন ঘটেছিল। প্রসংগত ১৯৩৫ সালে বেলুচিস্তানের দারুণ ভূমিকম্পের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে ৬০০০০ লোক মারা যায় এবং কোয়েটা শহর ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এগুলি ছাড়াও এই কলকাতা অঞ্চলেই ১৭৩৭ সালে এক ভূমিকম্পে ৩ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় বলে শোনা যায়।

ভূমিকম্পের আর একটি কারণ হচ্ছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার যার প্রশ্ন কয়না নগরের ক্ষেত্রে ওঠে না। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আগ্নেয়গিরির গর্ভ থেকে গলিত ধাতুস্রোত যে প্রণালী দিয়ে বার হয়ে আসে তখন সেখানে গ্যাসের চাপ কমে যায় গহ্বরগুলির মাথার দিকটা নিচের দিকে নুয়ে পড়ে। এইসব কারণ থেকে যে ভূমিকম্প হয় তাও স্থানীয়ভাবে অত্যন্ত বিধ্বংসী হলেও তার প্রসার বেশী দূর পর্যন্ত যায় না এবং কেন্দ্রটি ভূত্বকের বেশী গভীরে থাকে না।

ভূমিকম্পের তৃতীয় কারণ হচ্ছে ভূত্বকের নানারকম পরিবর্তন ও আলোড়ন যেমন নতুন বলি বা গ্রংসের আবির্ভাব ইত্যাদি। এই জাতীয় ভূমিকম্পই হয় সবচেয়ে বেশী। আসামে ও বিহারে যে ভূমিকম্প হয়েছিল বা হালে কাশ্মীরে যে ভূমিকম্প হয়ে গেল এগুলি এই জাতীয় ভূমিকম্প, কারণ সম্ভবত হিমালয় পর্বতমালার অঞ্চলে কোন আলোড়ন ঘটার ফলেই সেগুলি ঘটে। এই ধরনের ভূমিকম্পের কেন্দ্র সাধারণত ভূত্বকের বেশ গভীরে থাকে এবং যেসব অঞ্চলে কম্পন প্রচণ্ড হয় সেখানকার জমি ফেটে লম্বা চওড়া খাদের সৃষ্টি হয়।

ভূমিকম্পের আসল ধাক্কা আসার অগ্রদূত হচ্ছে কতকগুলি মৃদু কাঁপন। তবে সর্বক্ষেত্রেই যে এই হুঁশিয়ারী পাওয়া যাবে এমন কথা নেই। তাছাড়া মাটির নিচে থেকে এক গুরুগম্ভীর গুড় গুড় আওয়াজ হয় যেটা মানুষের চেয়ে অনেক আগে জীবজন্তুরা টের পায় কারণ তাদের শ্রবণ শক্তি মানুষের চেয়ে অনেক বেশী তীক্ষ্ন।

পৃথিবীতে কতকগুলি নির্দিষ্ট ভূমিকম্পগ্রস্ত অঞ্চল আছে যেগুলিতে-স্থানচ্যুতি ও আগ্নেয়ক্রিয়ার প্রাধান্য আছে। শতকরা ৪০টি ভূমিকম্প ঘটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে মেগেলান প্রণালী থেকে শুরু করে এলির্উশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হয়ে নিউজীল্যাণ্ড পর্যন্ত। এই এলাকায় আছে বহু আগ্নেয়গিরি। শতকরা ৫০টি ভূকম্পন ঘটে প্রধানত ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় যা মেক্সিকো থেকে শুরু করে অতলান্তিক পার হয়ে ভূমধ্যসাগর, কাস্পিয়ান সাগর ও ভারতে প্রসারিত। বাকি শতকরা ১০টি ভূকম্পন ঘটে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকায়, যেমন আফ্রিক্যান হ্রদগুলির কাছে, লোহিত ও মৃত সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তিয়েনশান পর্বতমালা ও বৈকাল হ্রদের এলাকায়। এইসব অঞ্চলের বলিগুলি অপেক্ষাকৃত নতুন এবং সক্রিয় বলেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। আরো দেখা গিয়েছে যে, ভূমিকম্প বেশী হয় শরৎ ও শীতকালে এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়।

ভূমিকম্প রোধ করার উপায় এখনো মানুষের আয়ত্তে আসেনি তবে ভূমিকম্পে ভাঙ্গবে না এমন বাড়ি তৈরি করার ব্যাপারে সে অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

তরুণের স্বপ্নভঙ্গ

সুভাষ সেন

ছাত্র উচ্ছৃংখলতা নিয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষবৃন্দ আজ বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত। নানা, পরীক্ষা নিরীক্ষা, উপদেশ, উপরোধ—কোনোটাই আজ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। বিজ্ঞ বিচক্ষণ বিচারপতিদের নিয়ে একাধিক কমিশন বসেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা জরুরী অধিবেশনে মিলিত হয়েছেন একাধিকবার। সমাজসংস্কারকেরা তাদের নিজের নিজের মত জাহির করেছেন। কত রকম জল্পনা কল্পনা যে এই সমস্যা নিয়ে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এসব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। ছাত্রদের নিয়ে অশান্তি বেড়েই চলেছে।

ছাত্র উচ্ছৃংখলতার কারণ সম্পর্কে নানান মুনির নানা মত। অনেকের মতে কারণটা পুরোপুরি অর্থনৈতিক, অর্থাৎ এক কথায় দারিদ্র্য। কেউ কেউ বলেন, পারিবারিক অশান্তিই এর জন্য দায়ী। আবার আর একদল এটাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখতে চান। তাঁরা বলেন, যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে সাবেকী ভালোমন্দ বিচারের বোধটাই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। ছাত্রদের সামনে কোনো আদর্শ নেই, শুভাশুভ সম্পর্কে কোনো দায়িত্ববোধ নেই। এক কথায় তাদের কাছে সামাজিক কোনো অনুশাসনেরই মূল্য আজ নেই। সুতরাং সমাজের শৃংখলা ও শান্তিরক্ষার দায় তাদের নয়।

আর একটা মত হালে খুব শোনা যায়। সেটা হল এই যে, অপরিপক্ক-বুদ্ধি ছাত্র সম্প্রদায়কে স্রেফ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ধুরন্ধর রাজনৈতিক খেলোয়াড়েরা খেপিয়ে বেড়াচ্ছে। দেশের কল্যাণের চাইতে নিজের এবং দলগত স্বার্থই যাদের কাছে বড়, ছাত্রদের মংগল নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ছাত্রদের সমষ্টিগত শক্তি যে বন্যার জলের মতোই দুর্বার এটা রাজনৈতিক পাশা খেলোয়াড়ের দল বুঝতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরেছে বলেই তারা আদর্শবাদের ভাঁওতা দিয়ে ছাত্র সম্প্রদায়কে ভুলিয়ে নিজের নিজের দল ভারী করছে।

উপরোক্ত কারণগুলি কোনোটাই বাতিল করবার মতো নয়। আংশিক সত্য প্রত্যেকটার মধ্যেই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে মূল সমস্যার প্রকৃত কারণ বা সমাধানের সঠিক নিশানা এর থেকে পাওয়া যায় না। সেটা পেতে হলে সমস্যাটির আরো অনেক গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

ছাত্র উচ্ছৃংখলতা বা ছাত্র-অশান্তি সম্পর্কে কখনো ছাত্রদের বক্তব্য কি জানতে চাওয়া হয়েছে? ঘটা করে 'কমিশন' বসিয়ে মাথা পিছু ৫।১০ মিনিট মাত্র সময় দিয়ে অথবা তথাকথিত স্ট্যাটিসটিকস করে ফলাফল বার করবার জন্য মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রদের মতামত গ্রহণ করে নয়। সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে যাতে ছাত্র সম্প্রদায় নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এর কারণ খুঁজে বার করে এবং সমাধানের চেষ্টা করে, তার উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এর জবাবে কোনো গবেষণা বা Survey-এর ভেতরে না গিয়েও অনায়াসে বলা চলে যে ছাত্রদের জবানবন্দী শোনবার অবসর বা আগ্রহ কারুরই নেই। কারণ সমাজপতিদের কাছে ছাত্ররা অর্বাচীন বালক মাত্র। তাদের মতামতের কী মূল্য?

কথায় কথায় আমরা শাস্ত্রবাক্য আওড়াই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার তাৎপর্য উপলব্ধি না করেই। ফলে শাস্ত্রের বহু মূল্যবান এবং গভীর অর্থবহ প্রবচন আজ প্রায় অর্থহীন অলংকারে পর্যবসিত হয়েছে। এরকমই একটি শাস্ত্রবাক্য—"প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ।"

পুত্রের ষোল বছর বয়স হলেই তার প্রতি মিত্রবৎ আচরণ করবে। অর্থাৎ আর তাকে অর্বাচীন নাবালক হিসেবে দূরে সরিয়ে রাখবে না। সংসারের যাবতীয় দায়িত্বের অংশীদার করবে তাকে। কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে তারও পরামর্শ নিতে ভুলবে না। অপরিপক্ক বুদ্ধির দোহাই দিয়ে তাকে কখনো অবহেলা করবে না। সে তখন তোমার মিত্রের মতন। তোমার পাশে দাঁড়াতে, সংসারে তোমার দায়িত্ব-ভারের অংশ নিতে উন্মুখ। এবং সক্ষমও বটে। এই হল প্রবচনটির তাৎপর্য। মূল কথা।

কিন্তু মুখে আওড়ালেও কজন এই অনুশাসন মেনে চলে। অন্তত আমাদের দেশে। বিশেষ করে বাংলাদেশে। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা যাই যাই করেও এখনো যেখানে বেশ ফলাও, সেখানে 'প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে...' প্রায় অর্থহীন। পিতার মৃত্যু না হওয়া অবধি এদেশে কেউ নাবালক হয় না। বয়সের প্রশ্ন এখানে নেহাত অবান্তর। অন্তত একটা স্থায়ী চাকরি পাওয়া এবং তদুপরি বিবাহ করার আগে নাবালকত্ব ঘোচার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এ অবস্থায় ষোল বছর বয়সেই পুত্রকে মিত্রবৎ দেখা তো এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। ওসব ছেঁদো কথা পুঁথিপত্রেই শোভা পায়, রোজকার জীবনে টেনে আনলেই অশান্তি।

ছেলে কোন বিষয় নিয়ে পড়বে, কোন স্কুল কলেজে পড়বে বা একাদশই পড়বে কিনা, কার সঙ্গে মিশবে, কী ধরনের জামা কাপড় পড়বে, কী খেলবে, সিনেমা থিয়েটার দেখবে কিনা, গানবাজনা করবে কিনা, ছাত্র সংগঠনে যোগ দেবে কিনা, ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই বাপমায়ের নির্দেশ ছাড়া ছেলেদের এক পা চলা নিষেধ। অথচ বাড়ির কোনো ব্যাপারে ছেলের মতামত নেবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই যেন কেউ মনে করে না। কেন? না, এখনো ছেলে-মানুষ। নিজের ভালোমন্দই বুঝতে শেখেনি তো অপরকে পরামর্শ দেবে! ছেলে স্কুলেই পড়ুক বা এম এ ক্লাসেই পড়ুক, এই অবস্থার কোনো হেরফের নেই। সে যে নাবালক সেই নাবালকই থেকে যাবে। বাড়িতেই যখন এই পরিস্থিতি, তখন বাড়ির বাইরেও যে এর কোনো উনিশবিশ হবে না সে তো বলাই বাহুল্য। যে বাড়ির ভেতর নাবালক, সে বাইরেও তাই। বাবার দলও ঘরে বাইরে একই মূর্তি। ছাত্র সম্প্রদায়ের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে

তারা অতিমাত্রায় সজাগ, কিন্তু ছাত্রদের প্রতি যে তাদের কোনো কর্তব্য বা দায়িত্ব থাকতে পারে এটা তাদের মনে যেন খেলেই না। বয়স্কদের একটা বদ্ধমূল ধারণা এই যে বুদ্ধিবিবেচনায়, অভিজ্ঞতায় এবং সর্বোপরি বয়সের পরিপক্কতার দরুন সংসার নামক অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিল ব্যাপারটি চালানো একমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব। ছেলেছোকরাদের এখানে নাক না গলানোই সমীচীন। সুতরাং দেশের শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি এমন কি খেলাধুলো— সব ব্যাপারেই বয়স্কদের আধিপত্য। তরুণেরা এখানে যেন থেকেও নেই। এ এক আজব পরিস্থিতি। 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ' যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই বুড়োদের সংসারের খুঁটি আঁকড়ে থাকার এই একান্ত হাস্যকর এবং অশোভন প্রবণতাই দেশের অধিকাংশ অশান্তির কারণ। এই নিদারুণ সত্যটি তারা যেন বুঝেও বুঝতে চায় না। ফলে জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি সংসারের প্রতিটি ব্যাপারে বৃদ্ধদের একাধিপত্য রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা। সভা-সমিতি, রাজনীতি, নির্বাচনী প্রতিযোগিতা, ব্যবসা বাণিজ্য সর্বত্র পককেশ বৃদ্ধদের উৎপাত। ভাবখানা এই যে তারা না থাকলে সমাজ সংসার সব ভেসে যাবে। তারা বুদ্ধি না যোগালে অপরিণতবুদ্ধি অস্থির-মতি তরুণের দল ক্রমাগত ভুল পথে যাবে এবং সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে।

আসলে সংসারে যে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে এই কঠোর সত্যটা মেনে নিতে বৃদ্ধদের বড় বাজে। সংসারের মায়া তাদের যেন কেটেও কাটতে চায় না। অথচ তাঁরা এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেন না বা চান না যে তাঁদের ভবিষ্যৎ ফুরিয়েছে। ভবিষ্যৎ এখন সম্পূর্ণভাবে তরুণদের। এবং ভবিষ্যতের দায়দায়িত্বও তাদের। এ ব্যাপারে বৃদ্ধদের হস্তক্ষেপ শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়; অন্যায় এবং অশোভনও বটে। অভিভাবকত্বেরও একটা মেয়াদ থাকে, সেটা এক সময়ে ফুরোয়। তখন জোর করে তাকে জীইয়ে রাখতে গেলেই অনর্থ ঘটে।

তাহলে পরিণত বয়স এবং অভিজ্ঞতার কি কোন মূল্য নেই? শুধু তারুণ্যের জোরেই কি সংসারের নানা বাধাবিঘ্ন সমস্যার সমাধান করা যাবে। স্বভাবতই এ প্রশ্ন অনেকে করবেন।

এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হয়। শুধু তারুণ্যের উদ্দামতায় যে সব কিছু সম্ভব নয় একথা অবশ্যই স্বীকার্য। উত্তর পঞ্চাশের অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার প্রয়োগ উপর থেকে চাপানো বেদবাক্য হলে চলবে না। অভিভাবকের সিংহাসন থেকে নেমে এসে তরুণের পাশে দাঁড়াতে হবে সমবয়সীর মতো মিত্র হয়ে। তবেই তরুণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহশঙ্কা, ভালোমন্দ সম্পর্কে বয়স্কদের ধারণা পরিষ্কার হবে। পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে শিখবে। দুপক্ষের সম্পর্ক কখনো সন্দেহজর্জরিত হবার সুযোগ পাবে না। নাবালকত্বের গ্লানি তরুণের মনকে বিদ্রোহী করে তুলবে না। এ অবস্থায় তখন সে নিজে থেকেই তার প্রয়োজন মতো পূর্ব পুরুষের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করবে।

তরুণের বিশ্বাসভাজন না হয়ে তাকে জ্ঞানদান করতে যাওয়ার মতো হঠকারিতা আর হয় না। এ একরকম অনধিকারচর্চা বই কিছু নয়। এখানে শিক্ষক ছাত্র বা পিতাপুত্র সম্পর্ক সম্পূর্ণ অবান্তর। ষোল বছর বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-দের মধ্যে যে আত্মসচেতনতা দেখা দেয়, সেটা আসলে তাদের সত্তার প্রথম উন্মেষ। এ বয়সে তারা এক নতুন জগতের সন্ধান পায় যেখানে তারা আত্মনির্ভর, নিঃসঙ্গ। শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের দিক দিয়েও তারা তখন দ্রুত পরিণত হচ্ছে। পূর্ণবয়স্ক যে কোনো পুরুষের সঙ্গে তাদের প্রভেদ তখন যতটা অভিজ্ঞতার স্বল্পতায়, বুদ্ধির স্বচ্ছতায় তত নয়। দেহেমনে সম্পূর্ণ পুরুষ হয়ে উঠতে তাদের আর দেরি নেই। এ এক দুঃসহ সময়। সদ্যশৈশব পেরিয়ে উদ্দীপ্ত তরুণের দল তখন বর্ষার ভরা নদীর মতো উদ্দাম উচ্ছল। বাঁধ দিয়ে তাদের ধরে রাখা যায় না। নদীর জল যদি পথ খুঁজে না পায় তবে তার দুর্বার স্রোত দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এই জলস্রোতই আবার সঠিক পথে চালিত হলে মানুষের পরম বন্ধু। ক্ষেতে ফসল ফলাতে, বিজলী উৎপাদন করতে তখনো এই জলই সহায়। তার ক্ষমতা অপরিসীম। তরুণদের বেলায়ও তাই। বন্যার দুর্বার স্রোতের মতো তারা
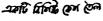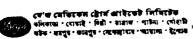
পথ খুঁজে মরে। কোনো বাধা বন্ধন মানে না। নিজেদের নবলব্ধ শক্তি ও বেগ চরিতার্থ না করা অবধি তারা অস্থির, অশান্ত। তাদের ক্ষমতা যেমন অপরিমেয়, একটা কিছু করবার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি তীব্র। কিন্তু সদ্য ঘুম থেকে ওঠা শিশুর মতো কতকটা যেন দিগভ্রান্ত। এ অবস্থায় এদের পথনির্দেশের দায়িত্ব বড়দের।

অপরিপক্কতার দোহাই দিয়ে দূরে সরিয়ে না রেখে যদি এই তরুণের দলকে সংসারের দশটা দায়িত্বের ভেতর টেনে নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে কোনোরকম অনর্থ ঘটা দূরে থাক, নির্ধারিত দায়িত্ব তারা সুষ্ঠুভাবে পালন তো করবেই, উপরন্তু নতুন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবার জন্য অধীর হয়ে উঠবে। কাজের নেশায় ও সাফল্যের আনন্দে তারা তখন এমন মত্ত হয়ে থাকবে যে কোনো বদ খেয়াল বা সমাজবিরোধী আচরণ তাদের চরিত্রকে কলুষিত করবে না। জীবনটা তাদের কাছে আনন্দময়, অর্থময় হয়ে দেখা দেবে। সব কিছুই তারা সুন্দর দেখবে। এ অবস্থায় কোনো-রকম উচ্ছৃংখলতা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক।

ভুলভ্রান্তি মানুষমাত্রেরই হতে পারে। কাঁচা বয়সে ভুলের সম্ভাবনা যে কিঞ্চিৎ বেশী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে সংসারের দায়িত্ব থেকে তরুণের দলকে দূরে সরিয়ে রেখে বুড়োর দল যদি ঘাঁটি আগলে বসে থাকে তবে সেটা কারুর পক্ষেই মঙ্গল-জনক হবে না। এর প্রমাণ তো আমরা হাতে হাতেই পাচ্ছি। দেশ জুড়ে যে গভীর অসন্তোষ ও উচ্ছৃংখলতা দেখা দিয়েছে তরুণদের মধ্যে সে এই অবিমৃষ্যকারিতারই প্রত্যক্ষ ফল।

কিন্তু তরুণদের সংসারের কাজে টেনে নেবার পথে বহু বিঘ্ন। দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এর অন্যতম। হাজার হাজার শক্তসমর্থ সুস্থবুদ্ধি তরুণকে ২০।২১ বছর বয়স পর্যন্ত অকেজো করে রাখাই হল এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিণাম। তা না হলে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি বছর হাজার হাজার বি এ, এম এ তৈরি করবে কেন? ম্যাট্রিকের পর আই এ তারপর বি এ, এম এ, কিংবা আই এসসি, বি এএসসি, এম এসসি। হালে শুরু হয়েছে এঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না পেরোনো অবধি ছাত্রদের সংসারে কোনো দায়িত্বই নেই। পাশ করে বেরোবার পরও দায়িত্ব বলতে কিছু থাকে না। যা থাকে সেটা হল সন্তানের কাছে বাপমায়ের প্রত্যাশা বা দাবি। আগেই বলেছি শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রদের স্বাধীনতা প্রায় থাকে না বললেই চলে। কী পড়বে, কোথায় পড়বে, কতদিন ধরে পড়বে—এ সবই অভিভাবকের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। কিন্তু একবার কলেজের গণ্ডি পেরোলে অভিভাবকদের আর কোনো দায়িত্ব থাকে না, থাকে বিরাট একটা 'চাওয়া'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রত্যাশার কোনো সুচিন্তিত বা সুস্পষ্ট রূপ থাকে না। অবশ্য মেয়েদের সম্পর্কে এটা সমভাবে প্রযোজ্য নয় কারণ তাদের ক্ষেত্রে বাপমায়ের প্রত্যাশাটা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট এবং সেটা হল সুপাত্রে বিবাহ। মেয়েকে চোখে চোখে রেখে স্কুল কলেজের সবগুলো গণ্ডি পার করে বাপমা তাঁদের দায়িত্ব পালনের প্রথম দফা শেষ করেন। তারপরই তাঁরা দিন গুনতে থাকেন কবে মেয়েকে পাত্রস্থ করবেন। বলা বাহুল্য, পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারেও তাঁদেরই শেষ কথা।

ছেলেদের বেলায় সমস্যাটা আরো কঠিন। কেন যে ম্যাট্রিক পাশ করে আই এ, বি এ, এম এ ডিগ্রীর পেছনে ৫।৬ বছর ধরে ছুটে বেড়াতে হবে এর জবাব বেশীর ভাগ ছেলেই জানে না। উদ্দেশ্যহীনভাবে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে বছরের পর বছর হাজার হাজার ছেলে এইভাবে ডিগ্রীর পেছনে ছুটে শক্তি, অর্থ ও সময়ের অপচয় করছে। এতে না হচ্ছে তাদের কোনো উন্নতি, না হচ্ছে দেশের কোনো উপকার। যে ক'বছর স্কুল কলেজে কাটছে, সমাজ সংসারের কোনো কাজেই তারা আসছে না। কারণ এ সময়টা পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া ব্যবহারিক জীবনের কোনো শিক্ষাই তারা পায় না। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে যখন তারা সংসারে প্রবেশ করবে তখনো তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কারণ বিচার করে দেখলে শতকরা নব্বুই ভাগ ছেলেই কলেজে ঢোকার অনুপযুক্ত। বেশীর ভাগ ছেলে কোনোমতে পাশ করে বেরোয় এবং তার ফলে তাদের আর্থিক বা পরমার্থিক উন্নতি কোনোটাই হতে চায় না। আসল কথা হল এই যে, শতকরা নব্বুই ভাগ ছেলের স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে কলেজে ঢোকারই কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যারা অধ্যাপনা বা গবেষণা করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে শুধু তাদেরই কলেজে ঢোকার অর্থ হয়। আর যাদের আর্থিক সঙ্গতি এবং বিদ্যোৎসাহ দুইই আছে তাদের পক্ষে কয়েক বছর কলেজে কাটানো যুক্তিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ছেলের বেলায় এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

স্কুল শিক্ষার প্রকৃতি ও পরিধি এমন হবে যাতে স্কুলের শেষধাপ পেরিয়ে যখন ছেলে বাইরে এসে দাঁড়াবে তখন তার মনে স্বাবলম্বী হবার মতো আত্মবিশ্বাস জন্মেছে এবং সংসারে চলবার উপযুক্ত জ্ঞান সে লাভ করেছে। এর বেশী যতটুকু দরকার সেটা আসবে তার ক্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে। অল্প বয়সে সংসারে ঢুকলে আত্মপ্রত্যয় গড়ে ওঠে সহজে। সেই সঙ্গে দায়িত্ববোধও জন্মায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তখন জীবনের মূল্যবোধ তার অজ্ঞাতেই তার চরিত্রকে শৃংখলাবদ্ধ হতে সাহায্য করে। নিজেকে সে সমাজের একজন বলে ভাবতে শেখে। কলেজী শিক্ষার প্রভাবমুক্ত থাকার দরুন তার মনে কোনো জীবিকা সম্পর্কে কখনো কোনোরকম হীনতাবোধ জাগতে পারে না। হাতে কলমে কাজ করতে সে পেছপা বা কুণ্ঠিত হয় না। ফলে তাকে দিনের পর দিন বেকারত্বের গ্লানি ভোগ করতে হয় না, যেমন হয় বহু কলেজে পড়া বাবুকে।

বাড়ির ভেতরেও অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা দরকার। সংসারের দশটা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বাপমা ছেলেকে পুরো-পুরিভাবে যদি জড়াতে পারেন, তবে অল্প বয়স থেকেই সে দায়িত্ব নিতে শিখবে এবং সংসারকে ভালোবাসতেও শিখবে। অন্যের প্রতি কর্তব্য, নিষ্ঠা, মমত্ববোধ, সহিষ্ণুতা স্বাভাবিকভাবেই সে অর্জন করবে। এর জন্য বাপ মাকে উপদেশ বা আদেশ কিছুরই সাহায্য নিতে হবে না। এরকম আবহাওয়ায় ছেলেদের দেহমন যে স্বভাবতই সুস্থ সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে সে কথা জোর করেই বলা যায়। কাজ করতে, বেড়াতে, আড্ডা মারতে, খেলাধুলো করতে তাদের তখন ভালো লাগবে। এক কথায় বেঁচে থাকাটাই তাদের কাছে তখন এক মহা আনন্দের ব্যাপার হয়ে উঠবে। এবং এ অবস্থায় উচ্ছৃংখল বা অসামাজিক আচরণ করার তাগিদ যে তারা অনুভব করবে না, এটা আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না।
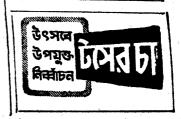
১৮ ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া শ্রীঅজয় মুখার্জি মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি 'গুরু দক্ষিণা' দিবেন।—"দক্ষিণার কথা শুনে

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ খুব প্রীত হয়েছেন বলে ত মনে হয় না। মহাভারতের কাহিনী স্মরণ করে তিনি নিশ্চয়ই একলব্য প্রদত্ত দক্ষিণা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটির কথা ভেবেছেন"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

কয়নানগরে সম্প্রতি যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হইয়া গেল তাহার কোন পুনরাবৃত্তি হবে কিনা এই প্রশ্ন অনেকেই করিতেছেন। শ্যামলাল বলিল—"আমরা ভূমিকম্প-বিশারদ নই সুতরাং আমাদের কোন মন্তব্য করা সাজে না। তবে একথা বলতে পারি, কয়নানগরে না হলেও কলকাতা নগরে ১৮ ডিসেম্বর তারিখের কাছাকাছি ভূকম্পন হওয়া অসম্ভব নয়।"

সংবাদে শুনিলাম, বাম এবং ডান কমিউনিস্টরা স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা আইন অমান্য করিবার জন্য শ্রীজ্যোতি বসু এবং শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী মহাশয়কে পাঠাইবেন না। বাহির হইতে নেতৃত্বদানের জন্যই তাঁহারা তাঁহাদিগকে বাহিরে রাখিতে চান। সহযাত্রী বলিলেন—"তাঁরা ঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন, বাইরে থেকে নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে বইকি। কিন্তু আমাদের ভয়, ও'রা হয়ত অন্তরাল থেকে বলবেন—'পার্বতীসুত লম্বোদর' এবং রাস্তায় আইন অমান্য-কারীরা হাঁক ছাড়বেন—পাক দিয়া সুতা লম্বা কর!!"

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, নেপাল হইতে নাকি হিপির পাণ্ডা বিতাড়িত হইয়াছেন। শ্যামলাল সংক্ষেপে বলিয়া উঠিল—"হিপ্ হিপ্ হুররে!"

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, ভারত হইতে নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেতার রপ্তানি করা হইবে, কেননা সেখানে সেতারের খুব চাহিদা।—"খুবই সুসংবাদ। তবে কিনা সেতার বাদ্য আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। বরং সেখানে বৈরাগীর লাউ পাঠিয়ে দেখতে পারেন এবং সেই সঙ্গে স্বরলিপি সংযোগে নির্মলেন্দু চৌধুরীর বাউল গানটি—অন্তরে বৈরাগীর লাউ বাজে গো সজনী, আমার অন্তরে বৈরাগীর লাউ বাজে—। বলেন বিশু খুড়ো।

রপ্তানি প্রসঙ্গে অন্য এক সংবাদ মনে পড়িল—কীভাবে ব্যাঙের ঠ্যাং কাটিতে হয়, কীভাবে কাটা ঠ্যাং ঠাণ্ডা করিয়া চালান দিতে হয় তৎসম্পর্কে অন্ধ্র-সরকার প্রকাশিত একটি পুস্তিকা লইয়া রাজ্যসভায় জনৈক সদস্য নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বুদ্ধ এবং মহাবীরের দেশে এইসব কী হইতেছে। সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা অতশত বুঝিনে; একটি অতি সহজ আদর্শবাদ শেখাবার জন্যই ব্যাঙের বেঁচে থাকা প্রয়োজন, সেটি হলো তার ডাক—কার কড়ি কে খায়!!"

মার্কিন সাহায্যে ভারতে খাদ্য মজুত ভাণ্ডার গড়িয়া তোলার আশা নাকি সরকার করিতেছেন।—"যশোদা বড় ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী"—সংক্ষেপে মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

জাতীয় সংহতি সাধনের জন্য কাজ করিয়া যাইব—বলিয়াছেন নব-নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পা। সহযাত্রী বলিলেন—"সংহতি সাধনের বৃহৎ কাজ হাতে নেবার আগে ইংরেজি 'কংগ্রেস' শব্দটির একটা জুৎসই হিন্দি-শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা করুন!!"

'বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ' —একটি সংবাদ শিরোনাম। সহযাত্রী বলিলেন—"এবং চাকরি-জীবনে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভও তাঁরাই জানাবেন, অবশ্য কর্মচারীরূপে—আপাতত বিক্ষোভ প্রাক্টিস ফর এভার।"

শ্রী বিনোবা ভাবেজী নাকি বলিয়াছেন, ভারতের উচিত কমিউনিস্ট চীনের শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুসরণ করা। বিশু খুড়ো

সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"ভূ-দান অন্তে জ্ঞান-দান।"

সংবাদে প্রকাশ, ভাষা বিল নিয়ে বিতর্কে প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীনাথ পাই নাকি বলিয়াছেন, হিন্দী পাটরাণী, ইংরাজী হইল ভারতীয় ভাষার পরিচারিকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু লোক রাণীর চেয়ে পরিচারিকাকেই বেশী পছন্দ করিতেছেন। শ্যামলাল শ্রীকান্তর টগরের কথাটা রকমফের করিয়া বলিল—"পরিচারিকা নিয়ে ঘর করছি বটে, কিন্তু কোনদিন হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েছি?"

কার্টুনিস্ট শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী তাঁর কার্টুনের মারফতে স্বর্গত আশুতোষের মুখ দিয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন—'এই নোংরা ক্যালেণ্ডারগুলো এখানে কেন?' "কিন্তু চণ্ডীবাবু হয়ত জানেন না, মরা রয়েল বেঙ্গলের ডাকে ফেরুপালও আজ ভীত নয়, জবাব কে দেবে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

আনন্দবাজার পত্রিকার "শিরোনামা" বিভাগে শ্রীরাজাগোপালাচারীর কথা লেখা হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"তাঁর অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি প্রভৃতি সবই লেখা হয়েছে, কিন্তু হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবলস-এর কথাটা বলা হয়নি; তিনি রাজাজী সম্পর্কে বলেছিলেন—রাজা অব গোপালাচারী। স্বরূপ উক্তি নয় কিন্তু রাজোচিত সম্মান তো বটে!"

কৃষিকর্মের বিন্যাস

আগামী দু' দশকে জনসংখ্যার প্রত্যাশিত দ্রুত বৃদ্ধিকে বহুলাংশে দেশের কৃষি অংশেই স্থান করে দিতে হবে। সময়ের বয়েক দশকের ভেতর জনপ্রতি এবং কৃষি-কর্মী পিছু জমির আয়তনের সম্যক হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। কর্মী পিছু জমি হ্রাসের ক্ষতি পূরণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে উৎপাদিকা-শক্তির বিস্তর উন্নতি সাধন। তার জন্য দরকার কৃষি ছাড়া অন্য কাজে কর্মী নিয়োগ, উৎপাদন ও চাহিদার সম্প্রসারণ। সে ধরনের কাজকর্মের প্রসার ঘটাতে হলে চাই শিল্পের বিকাশ ও শহরের বিস্তারের জন্য অতিরিক্ত জমি। প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনকারী একটা সরল সমাজ যাতে জটিল শিল্পোন্নত সমাজে রূপান্তরিত হয় সে উদ্দেশ্যে কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতিগুলি, কৃষিভিত্তিক সমাজের গঠন এবং দৃষ্টিভঙ্গী এ সবের একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার।

খাদ্যে স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা

যে দেশের জনসংখ্যা বৃহৎ এবং কৃষি-নির্ভরশীল সে দেশের পক্ষে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। না হলে খাদ্য আমদানির জন্য ঐ দেশের চাহিদা এত বিপুল আকার নিতে পারে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তা মেটানো কঠিন হবে।

কাজে কাজেই শুধু জীবনধারণের প্রয়োজন পূরণের জন্য চাষবাস নয়, ব্যবসা ভিত্তিতে কৃষিকর্মের পুনর্বিন্যাসের জন্য চাই জল ও শক্তি যোগানের ব্যাপক বন্দোবস্ত এবং সমস্ত অঞ্চলের সংগে যোগাযোগ রাখার মতো পরিবহণে সমন্বিত একটি সুসংহত আর্থিক ব্যবস্থা। তার জন্য দরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের। সন্দেহ নেই, শিল্প ও শহরের কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠলে কৃষিক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার প্রসার সহজ হবে।

বড়ো বড়ো নগর-কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং বড়ো বহরে জনসংখ্যার স্থানান্তরণ ব্যয়বহুল অথবা কষ্টকর বলে দেশের অভ্যন্তরে শিল্পোন্নয়ন যতদূর সম্ভব বহু বিস্তৃত হলে ভালো হয়। কেবল কৃষি-ভিত্তিক শিল্প স্থাপন নয়, সাধারণভাবে গ্রাম-দেশে শিল্পের বিকাশ হবে অন্যতম অভীষ্ট।

উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধিসাধন

উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে যাতে কৃষকরা উন্নত চাষবাসের প্রণালী প্রয়োগ করে সে জন্য তাদের জমি ভোগ দখলের ন্যায্য শর্ত দানের আশ্বাস দিতে হবে। স্থানীয় স্তরে তাই নিরীক্ষা-পরীক্ষার দরকার সেই রকম সংস্থা উদ্ভাবন করার জন্য যার দ্বারা অর্থনৈতিক আয়তন রক্ষা ও প্রেরণা যোগানো দুটোই সম্ভব হবে। সেই সংগঠনের মাধ্যমে ছোট ছোট উৎপাদনকারীরা তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বড়ো বহরের কাজকর্মের সুবিধা ও শক্তি অর্জন করতে পারবে। সমবায় সমিতি ঐ প্রয়োজন মেটাতে পারে।

ভরসার কথা, লাভের সন্ধানে এক শ্রেণীর বিত্তবান ভদ্র কৃষক অধুনা চাষবাসের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এদের মধ্যে আছে অবসর-প্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী, জরাগ্রস্ত রাজ্য-পারিষদ, বণিক, আইনজীবী এবং আগে যারা টাকা ধার দিতো এরকম ব্যক্তিরা। নতুন ধারার চাষবাসের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শক্তি—কলের লাঙল, পাম্পচালিত কূপ প্রভৃতির উপর তার নির্ভরশীলতা। ট্রাক্টর থাকলে, পশুর কম দরকার হয়; সেই রকম যেখানে বৈদ্যুতিক পাম্পযুক্ত কূপ আছে সেখানে কৃষিকর্মকে বৃষ্টিপাতের খেয়ালের মুখাপেক্ষী থাকতে হয় না।

নতুন শ্রেণীর কৃষক

যে সব অঞ্চলে খাল অথবা নলকূপ দ্বারা জলসেচের সম্ভাবনা আছে সেই অংশগুলিতে নতুন শ্রেণীর কৃষকদের উদ্যম দেখা যাচ্ছে। ফলে, ভূগর্ভের জল কাজে লাগাবার জন্য উপযুক্ত নয় এরকম এলাকাগুলি—যা দেশের কর্ষিত জমির একের তিন অংশ—অবহেলিত হচ্ছে। জল নিষ্কাশন সমস্যার দিকেও মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

জলের যোগান এবং অন্যান্য সুবিধার নিশ্চিত বন্দোবস্ত আছে এরকম প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ একর (অর্থাৎ মোট কর্ষিত জমির প্রায় ১০ ভাগ মাত্র) জমিতে বেশীর ভাগ সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ঐ অংশগুলি হচ্ছে দেশের অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চল। সরকারের বর্তমান নীতি অনুসারে যারা জমিতে বেশ কিছু মূলধন খাটাতে সক্ষম প্রধানত তাদেরই সাহায্য করা হবে। কৃষিক্ষেত্রে নবাগত সংগঠকরাও জলসেচের ব্যবস্থা সম্বলিত অঞ্চলগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছে।

খাদ্য যোগানের উপর চাপ খাদ্যশস্যের মূল্যকে ক্রমবর্ধমান করেছে। মূল্যবৃদ্ধির আবহাওয়ায় কৃষিকর্ম হয়েছে লাভজনক এবং ভদ্রলোক চাষী ও অন্যদের কাছে কৃষি আকর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার উন্নত অংশটির সংগে তুলনা করা চলে এমন একটি অগ্রসর অংশ কৃষির মধ্যে গড়ে উঠছে মনে হয়। সম্পন্ন চাষীদের কাছে কৃষি আর জীবনযাপনের একটা বিশেষ ধারা মাত্র নয়। যারা আধুনিক যন্ত্রপাতি কৃষি-কর্মে লাগাতে পারে তাদের কাছে কৃষি একটি শিল্প।

দেশের খাদ্য সংকট দূর করার জন্য সরকার ধনতান্ত্রিক রীতিতে কৃষির দ্রুত উন্নয়ন চাইছে। নির্বাচিত জেলাগুলিতে নিবিড় চাষ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য একই। ১৯৬০ দশকের আগে কেরল পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অংশ, মধ্য গুজরাট, কোইম্বাটোর এবং উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে সত্যকারের ধনতান্ত্রিক কৃষি দেখা গেছে। ইদানীং ভারতের গ্রাম দেশের সব অংশে নতুন রীতির চাষবাস মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ভারতের কৃষি যে পশ্চাদ্‌পদ তার জন্য আজ কেবল চাষীকে দায়ী করা যায় না। প্রশাসন ও শিল্প ব্যবস্থা তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারে নি। সার, পতঙ্গনাশক দ্রব্য, উন্নত ধরনের বীজ প্রভৃতি আবশ্যক উপকরণের অনটন কৃষির অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত, ভারতীয় শিল্প দেশের কৃষির প্রয়োজনগুলি মেটাতে সক্ষম হয়নি।

আগেই বলা হয়েছে, যে সব অংশে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয়েছে অথবা যেখানে 'ভালো' চাষীরা অর্থাৎ সচ্ছল ও উদ্যোগী কৃষকরা বসবাস করে, প্রধানত সেই অঞ্চল-গুলিতে উন্নত ধরনের চাষের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কৃষি-বহির্ভূত আধুনিক অংশের অধিবাসীদের মতোই, শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে মূল্য ও অন্য আর্থিক আকর্ষণগুলি সক্রিয়।

কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগতি হয়েছে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজে। পঞ্জাবে কৃষি-কর্মকে ব্যবসার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র লাভবান হয়েছে কাঁচা তুলোর মতো বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন করে—ঐ দ্রব্যগুলির বাজার গত দশকে কৃষকদের অনুকূলে এবং মূল্য ক্রমবর্ধমান ছিল। পল্লী অঞ্চলের বিদ্যুৎকরণে মাদ্রাজ সবচেয়ে এগিয়ে আছে: গ্রামগুলির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগে জল সেচ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা গেছে।

নিবিড় কৃষি পরিকল্পনার প্রয়োগের

অভিজ্ঞতা থেকে এটা অন্তত স্পষ্ট যে, ভারতীয় চাষী তার নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও নির্বোধ অথবা সংস্কারাচ্ছন্ন নয়। উৎপাদন শীঘ্র বাড়িয়ে তোলার জন্য এখন প্রয়োজন হল সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অঞ্চলসমূহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটা ব্যবসামূলক সংগঠিত শিল্প হিসাবে কৃষির রূপান্তর সাধন।

কেবল উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি নয়, জমির মালিকানা স্বত্বের সন্তোষজনক বন্দোবস্তের উপর কৃষির অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। নিজেদের জমি আছে এ রকম অন্য ভাগ্যবান কৃষকদের তুলনায় যে সব প্রজা বা ভাগ-চাষীদের ফসলের অর্ধেক জমির মালিককে দিতে হয় তাদের জমিতে খাটাবার জন্য কম মূলধন অবশিষ্ট থাকে।

যাই হোক, নতুন শ্রেণীর কৃষকরা কৃষিকার্যে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসেছে। এই নতুন ব্যাপারকে কৃষির উপরের থেকে আসা বিপ্লব বলা যেতে পারে। দ্রুত ও অধিক ফল দেয় বলে ধনতান্ত্রিক ধাঁচের চাষবাসের প্রসার কৃষি উৎপাদনের সম্যক উন্নতি ঘটাবে আশা করা যায়।

শান্তিকুমার ঘোষ

বিবাহ ও বিবাহের বয়স

১৯২৭ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখের Young India পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী বিবাহ সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশ করেন। বিবাহ ও অবাধ যৌনজীবন নিয়ে কোন অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল। মহাত্মা বলেছিলেন, "আমি নিশ্চয় জানি, বিবাহবন্ধনের বিরুদ্ধে যত প্রমাণ বা যুক্তি সবই পশ্চিমের হাওয়ায় জন্মেছে। তাই যদি হয়, তবে সে যুক্তি খণ্ডনও শক্ত নয়।" কিন্তু বহু আলোচনার পরও যুক্তি দিয়ে যুক্তি খণ্ডন মহাত্মা করে উঠতে পারেননি। বিশ্বাস ও নিষ্ঠার বলে মানুষকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। প্রাচ্যে, বিশেষত ভারতবর্ষে, বিবাহবন্ধন অতি পবিত্র, আত্মিক যোগ, sacrament বা আধ্যাত্মিক মিলন। অথচ এই ভারতবর্ষেই দেহগত কামলালসা-বিমুক্ত বিবাহে বিশ্বাসী সমাজে নিয়োগের পর্যন্ত বিধি ছিল। বিবাহবন্ধনের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে মহাত্মার মত আমাদের চিরন্তন সংস্কারও সত্যজ্ঞানের প্রত্যয় থেকে ভিন্ন নয় বলে তাঁর আলোচনাগুলি অনেকের হৃদয় স্পর্শ করে। অথচ পশ্চিমী চিন্তা-ধারায় বার্নার্ড শ'র মত লোকের তীব্র কঠিন সমালোচনাও শিক্ষিত সমাজকে কখনও বা নাড়া দেয়, আবার কখনও বা সংযমী জীবন থেকে সরে আসবার ওজর বা অজুহাত দেয়। আদর্শ ও বাস্তবের ব্যবধানকে আলোচনা দিয়ে পূর্ণ করবার শক্তি সাধারণের নেই। তাদের জীবনধারায় তাই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। বিবাহ যদি আত্ম সম্বন্ধীয় দেহাতীত মিলন হয়, তবে বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্ন আসে কোথায়? যৌতুক, বহুবিবাহ ইত্যাদিতে আধ্যাত্মিকতা দেখা যায় কি? বিবাহের বেলায় জাতিভেদ, বিবাহিত নারীপুরুষের অন্য নারী বা পুরুষে আসক্তি, অবাধ গণিকালয় অথবা অন্য নামে দেহব্যবসায় সমাজের এত বড় বড় সত্য যে, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেহাতীত প্রেম বিবাহের অন্য নাম—এ কথা বলা অসম্ভব। বিবাহ তখনই সার্থক ও সুন্দর হতে পারে যখন দুই পক্ষ প্রকৃতই সমান অধিকার দাবি করে ও জীবনের অতিবাস্তব কঠিন বাধাকে বলিষ্ঠ মনের সামনে সামান্য করে দিতে পারে। অন্যান্য পাঁচটা সহযোগিতার মত বিবাহ একটি নারী ও একটি পুরুষের ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা।

মহাত্মা গান্ধী যদি বলেন, "you must unlearn the lesson, if you have learnt it before, that marriage is for the satisfaction of animal appetite. It is a superstition. The whole ceremony is performed in the presence of fire.

Let the fire make ashes of all the bust in you."
যদি ভেবে থাকেন, জৈব প্রয়োজনের জন্য বিবাহ তবে তা ভুলে যান। এ বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র। অগ্নিসমক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিবাহ। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হোক সব কামনাবাসনা, এজন্য মহাত্মা গান্ধী কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে পরিবার পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে সংযম সাধনার পথ বেছে নিতে বলতে পেরেছিলেন। সে সংযম সমাধনাও যে সর্বসাধারণের জন্য নয়, উত্তরকালের ভয়াবহ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি তার প্রমাণ ও ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরিবার পরি-কল্পনা অভিযান একমাত্র বাস্তব। ১৯২৭ সালে যা Young India ছিল সে Young India আজ প্রবীণ, কেউ বা বৃদ্ধ স্থবির আদর্শও বদলেছে। মুক্ত মেলামেশার অনিবার্য পরিণাম কিছু যে আমাদের সমাজেও প্রবেশ করেনি—এ কথা কেউ বলতে পারবে না। এক দিকে জন্ম-নিরোধের বহুপ্রসারী শিক্ষার আয়োজন, অন্য দিকে আগলখোলা পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ার মাতা আধুনিক জীবন ও আজকের Young India আদর্শের সেই পাকেই জড়িয়ে থাকবে তাও জোর করে বলা চলে না। কাজেই মহাত্মার আদর্শবাদকে স্বীকার করে নেওয়া সময়ের চেয়েও আজকের বিবাহ-বন্ধন জটিলতর।

এই জটিল সমস্যাকে আমরা সংস্কার ও সংকোচের আবরণে চেপে রেখেছি। পাশ্চাত্ত্য জগতে যেমন একেবারে বাঁধভাঙা, দুর্নিবার অবস্থা প্রায় মেনে নেবার কাছা-কাছি, তেমনটি আমাদের সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এমন কথা এখনও মনে হয় না। শুনেছি, ইউরোপের কোন কোন দেশে যুবক-যুবতীর বিবাহপূর্ব যৌন মিলনে পরোক্ষভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়। মিলনের মাধ্যমেই নাকি শেষ পর্যন্ত মন দেওয়া নেওয়া ও বিবাহ। একাধিক মিলনকে অবলম্বন করে মনোনয়ন নাকি সহজ হয়। এখানেও তো একদিন marriages are made in Heaven এই মহান্ বাণী

প্রচার করা হতো। ভারতবর্ষের অনেক আদিবাসী সমাজ বিবাহোত্তর পবিত্রতা রক্ষা করে কিন্তু বিবাহপূর্ব জীবনে বাধানিষেধে কড়াকড়ি করে না। কাজেই, এ কথা মানতেই হবে যে, সমাজ ও কাল, যে বিধিব্যবস্থার উপযোগী সেই ব্যবস্থাই সমাজকে মানতে হয়। বিবাহবন্ধনের দায়িত্ব ও পবিত্রতা সমাজের প্রথম বন্ধনের সোপান। পারিবারিক জীবনকে অবলম্বন করে সমাজ গড়ে ওঠে, আর পারিবারিক জীবন গঠিত হয় সুখী-সংসারকে ঘিরে। সেই পারিবারিক জীবনের আদর্শের পরিবর্তন হয়েছে। যৌথ পরিবারে যে আপনজনকে একটি পরিবার অচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করতো, আজ আর তা নেই। নাগরিক জীবনে পরিবারপরিধি সংকীর্ণ হয়ে আসছে। তাই বিবাহবন্ধন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। ক্রমশ স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের সুখী ও সুস্থ সম্পর্ক সমাজের সুস্থ অবস্থার দায়িত্ব নেবার অধিকারী হয়ে উঠছে। বহুজনপরিপূর্ণ জীবনযাত্রায় কেমন যেন আকাশের গ্রহনক্ষত্রতারার মত একটা স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক আকর্ষণে পরস্পরকে যথাস্থানে রাখতে পারতো। আজ বহু ক্ষেত্রেই যৌথ দায়িত্বের আনন্দ, সুবিধা-অসুবিধা শেষ হয়েছে। তার বদলে স্বামী ও স্ত্রী একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তাদের দোষগুণে কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণে নিজেরাই সম্পূর্ণ দায়ী! সপ্তপদী গমনের আর মন্ত্রোচ্চারণের ফাঁকে ফাঁকে সরলা কিশোরীকে অপর একটি সংসারে নিতান্ত অজানা পরিবেশে বিধাতার নির্দেশের দোহাই দিয়ে কর্তব্য ও দায়িত্বের জালে জড়ানো হতো। স্বামীর পরিচয় সে পেত পরে। প্রথম সে পরিবারের বধূ, পরে সে তার পতির পত্নী। বালিকা বধূদের সকলকে দুঃখ কষ্ট সহ্য না করতে হলেও অনেক পত্নীই হারিয়ে যেত গুরুজনের গুরু শাসনে। সেদিন সে হয়তো সেও একটি পূর্ণ মানুষ; সেদিন তার জীবনে নূতন করে পাবার স্বাদ আর থাকতো না। কাজেই বিবাহবন্ধন অসমান অধিকারে মেয়েদের পদদলিত করে রাখতো অনেক ক্ষেত্রে। আত্মিক বন্ধনের কি তাই লক্ষণ?

পরিবার পরিকল্পনার সহায়ক হিসাবে বিবাহের বয়স বাড়িয়ে দেবার প্রশ্ন উঠেছে। কেবলমাত্র সন্তানসংখ্যা সামলানো এই ব্যবস্থার লক্ষ্য। অলক্ষ্যে আর একটি শুভ-সূচনা লুকোনো আছে। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স হলে বিবাহের আত্মিক যোগের সুযোগও হয়তো বাড়তে পারে। আত্মিক যোগ মানে সচেতনভাবে একে অন্যকে স্বীকার করে নেবে। সমর্পণের দেশ ভারতবর্ষ। হয়তো আমার কথা স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবো না। সমর্পণও পূর্ণ হবে, কি সমর্পণ করছে সেটা যদি উভয়েরই জানা থাকে।

একটু বেশী বয়সে বিবাহের প্রচলন হলে মেয়েরা উপজীবিকার জন্য প্রস্তুত হবার সুযোগ পাবেন। উপার্জন করতে চান অথচ উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এমন মেয়ের সংখ্যা এত যে, তাদের হিসাব কেউ রাখে না। পুত্রকে জীবিকার জন্য প্রস্তুত করা আমাদের সমাজের রীতি, কন্যার বেলায় বিবাহই যেন মাতাপিতার দায়িত্বের শেষ। কুমারীর দায়িত্ব পিতার, যৌবনে নারীর দায়িত্ব পালন করবেন পতি আর সবশেষে

তার নির্ভর করতে হবে পুত্রের কৃপামুষ্টির উপর—এ ব্যবস্থা আজ একেবারেই অচল। কাজেই বিবাহের পূর্বে কন্যাও নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা পাবে, এই যৌতুকই পিতামাতার দেওয়া শ্রেষ্ঠ যৌতুক। স্বর্গীয় বিবাহবন্ধনের পরম বাস্তব দিকটা তাতে সহজে রক্ষা হবে ও নারীর আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। পুরুষের সম্পত্তির অংশ হিসাবে তার গৃহ অলংকৃত করতে আর নারী চায় না। সমান হয়ে পাশে দাঁড়াবে

তবেই তো আত্মিক যোগ সম্পূর্ণ হবে!

A. M. S. H.

ঠিকানাটা মনে রাখা কঠিন। পি ১/১৪৪, মাকতলা, কলকাতা ৪৭। শহরের আওতার প্রায় বাইরে অ্যাসোসিয়েশন অব সোস্যাল অ্যান্ড মরাল হাইজিনের ছোট্ট একটি শাখা অফিস। একতলার ঘর। সোস্যাল ওয়ার্কার শ্রীমতী অমিতা দাশগুপ্ত।

A. M. S. H. অথবা Association for Moral and Social Hygiene in Indiaর একটি কর্মীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, moral কথাটির মানে কি? মর‍্যাল কথাটি শুনলেই মানুষ একটু ভাবনায় পড়ে। কেমন যেন একটু ধর্মোপদেশ-ঘেঁষা ব্যাপার মনে হয়। কর্মী অবশ্য বলেছিলেন, প্রধানত যৌন ব্যাপারে নৈতিকতা এই সংসদের লক্ষ্য। A. M. S. H-এর আওতার আর একটি প্রতিষ্ঠান চলে Family Life Institute. পারিবারিক জীবনকে উন্নততর করতে সাহায্য করেন Family Life Institute.

Family Life Institute যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন তার মধ্যে একটি হচ্ছে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণের শারীরিক, মানসিক ও আবেগ-অনুভূতি সংক্রান্ত পরিবর্তন। প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি অনেকটা এই পরিবর্তনের ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। বয়ঃসন্ধির এই সমস্যা এত দিন আমাদের এতটা চঞ্চল করে নি। যৌথ পরিবারে অনেকটা স্বাভাবিক পরিবেশে যৌবনে পদার্পণোদ্যত কিশোর-কিশোরী নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার ও যান্ত্রিক সভ্যতার লক্ষণ হিসাবে adolescentদের সমস্যা জটিল বিষয় হয়েছে। Family Life Institute পিতামাতা অভিভাবকদের পরামর্শ দিতে সর্বদা প্রস্তুত।

বিবাহিত জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্যও Family Life Institute প্রস্তুত। ভারতবর্ষে স্বামীস্ত্রীর মানসিক, সামাজিক, দৈহিক বা অনুভূতি সম্বন্ধীয় সমস্যার বাইরেও একটি সমস্যা আছে। সেটি আপনজনের সঙ্গে সম্পর্কের সমস্যা। পারিবারিক সকল সমস্যাতে সাহায্য করবার চেষ্টা করেন এই প্রতিষ্ঠান। উদাহরণ-স্বরূপে একটি কর্মী বিশেষ একটি পরিবারের উল্লেখ করলেন। পুত্র, পুত্রবধূ ও শাশুড়ীর সংসার। সুখী নয়। একমাত্র পুত্রের সন্তানাদি না থাকায় শাশুড়ী বিরূপ। পুত্রবধূ নীরবে নির্যাতন সহ্য করে। পরামর্শ নেবার সময় শাশুড়ী নিয়ে আসেন পুত্রবধূকে চিকিৎসকের কাছে। অনেক কথা না বলা থাকে; লজ্জায়, সংকোচে বধূটি অবনতমুখী। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক শ্বশ্রূঠাকুরানীকে বাদ দিয়ে বর ও বধূকে ডেকে আনলেন। সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে গেল। পুত্র ও বধূর জীবনের এমন একটা দিক থাকতে পারে যেখানে শাশুড়ী অবান্তর—এ কথা বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল! অথচ এর জন্যই শ্বশ্রূমাতার হাতে বধূর লাঞ্ছনার সীমা ছিল না।

আর একটি সমস্যা শিশু ও পিতামাতার সম্পর্ক। পিতামাতার অভাবে অভিভাবকের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক আরও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। একটি শিশুর কথা শুনলাম। তিন বছর বয়সে সে মাতৃহীন হয়। পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। শিশু মাসীর কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে। মাসী সম্পন্ন সংসারে গৃহিণী। মৃত ভগিনীর একটি শিশুর দায়িত্বের আর্থিক দিকটা তাঁকে বিব্রত করতো না, কিন্তু স্নেহ বা সময় দেবার পর্যাপ্ত অবসর তাঁর ছিল না। ক্লাব পার্টি নিয়ে মেতে থাকতেন তিনি। মাতৃহীন শিশু ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠলো। স্বাভাবিক বুদ্ধি তার বিকৃত। নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও শিশু বেপরোয়া। তারপর দেখা গেল, স্নেহের অভাব তার বিকারের একমাত্র কারণ। মাসী সাবধান হলেন। শিশু ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।

এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য কোনও খরচা নেই। প্রত্যেকটি কথা এঁরা গোপন রাখেন। যে-কোন লোক যে-কোন সময় উপদেশ পেতে পারেন। পত্রযোগেও আলাপ-আলোচনা সম্ভব।

শ্রীমতী

(প্রধানমন্ত্রীর সফরে)

লণ্ডন, প্যারিসের মতো বড় বড় শহরগুলো বাদ দিলে ইউরোপের শহরে যেন ভিড় নেই, যেমন ভিড়ে আমরা অভ্যস্ত, যেমন কলকাতায় ও বোম্বেতে। মস্কোতে ছিল রবিবার, লোকজন প্রায় নেই রাস্তাঘাটে। ওয়ারশতে কোথাও লোকজনের ভিড় দেখিনি। কোথাও কোলাহলও নেই।

প্রথম ব্যতিক্রম দেখলাম অক্টোবরের এগারো তারিখ দুপুরে। বেলগ্রাদ এয়ার-পোর্ট থেকে শহরে প্রবেশ করার কিছু আগে থেকেই, শহরতলী থেকেই রাস্তার দুপাশে ভিড় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্যে, তাঁকে স্বাগত অভিনন্দন জানানোর জন্যে। যেমন ভিড় হতো কলকাতার রাস্তায় জওহর-লাল নেহরু যখন আসতেন স্বাধীনোত্তর প্রথম কয়েক বছর। অধিকাংশ স্কুলের ছেলেমেয়েরা, যুবক-যুবতীদের দল। প্রচুর সংখ্যায়, বিশেষ করে সাভা নদী পার হয়ে (অর্থাৎ "নোভি বেওগ্রাদ", নতুন বেলগ্রেড) পার হয়ে বেওগ্রাড (বেলগ্রেড) শহরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে। কোনো জিন্দাবাদ চিৎকার নেই। হাততালি আর মাঝে মাঝে "আ-আ-ইন্দিরা" এমনি ধরনের সমস্বরে স্বরধ্বনি!

আমাদের গাড়ির নম্বর এবার ১১, ১২ আর তেরো। এয়ারপোর্টে হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়েছে পুস্তিকা যাতে ছাপার হরফে সমস্ত কার্যপ্রকরণ লেখা,—কে কোন গাড়িতে, কোন হোটেলে কি প্রাসাদে, প্রধানমন্ত্রীর কী কী প্রোগ্রাম ইত্যাদি। আমাদের গাড়ি বারো নম্বরের, কালো মার্সেডিস, তেরো নম্বরে বিশ্ববিন্দু, মারগোলিন আর শেখ মুবারক। মারগোলিন হল ক্যাথলিক খৃষ্টান। তেরো নম্বর দেখেই তার মুখটা যেন শুকিয়ে গেল। কী কারণে জানি না, সে গাড়িতে ঢুকতে বেশ সময় নিল, আর তেমনি বিনা কারণে আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু গড়িমশি চলবে না যদি মোটর মিছিলে যেতে হয়। যদু-মধুর বিয়ের মিছিল নয়, রাষ্ট্র অতিথির মোটর মিছিল, ঘড়ির কাঁটা ধরে ওঠানামা। দশ-বারোজন মোটর সাইকেল-চড়া আউটরাইডার ইঞ্জিন চালিয়ে বসে আছে। প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেণ্ট টিটো এবং মেজর-জেনারেল বাকোনোভিচ "এ"-মার্কা গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আর অবসর নেই। কেউ কারোর জন্যে দাঁড়াবে না। সুতরাং তেরো নম্বরে ভবিষ্যৎদুর্ভাগ্য বরণ করেও মারগোলিনকে ওই গাড়িতেই উঠতে হলো।

প্রেসিডেণ্ট টিটোর সংগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী

সংবাদপত্রের ভাষায় কাতারে-কাতারে জনতা। অবিরত স্বাগতধ্বনি। হঠাৎ মনে পড়ল, আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে তাদের প্রতি, অর্থাৎ তাদের স্বাগতাভিনন্দনকে গ্রহণ করা, জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতটি ঘনঘন নাড়লে। এক পাশে আমি অন্য পাশে চন্দ্রাকর। হাত নাড়তে নাড়তে হয়রান। তারা মিছিলের শেষ গাড়ি পার হতেই হাততালি বন্ধ করে, কিন্তু আমাদের গোটা রাস্তাই ওই করতে করতে যেতে হচ্ছে।

অতো হাজার হাজার হাসি মুখ দেখলে কে আর নিজের মুখকে গোমরা করে রাখে। জনতার আনন্দ যেন আমাদেরও, যদিও আইনত আমরা প্রধানমন্ত্রীর দলে নেই। তবে ওইটুকু সময় আমরা হতাম প্রথমত ভারতীয়, দ্বিতীয়ত সাংবাদিক। জানিনা, দুটোকে পৃথক করা যায় কিনা, আগে-পিছে অবশ্যই করা যায়।

ওটা ছিল বুধবার। কী ব্যাপার! অতো সব লোক রাস্তায়, এদের কি কাজকর্ম নেই? পরে জানলাম যে, আগের দিন যুগোশ্লাভিয়ার সোস্যালিস্ট এলায়েন্স নামক সংস্থা (যার অন্তর্গত কমিউনিস্ট দল ও অন্যান্যরা) জনসাধারণকে আবেদন করেছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তাদের অতি প্রিয় জওহরলালের কন্যাকে রাস্তায় এসে স্বাগত জানাতে। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা ছুটি পেয়ে এসেছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে মাত্র ওই একদিনের আবেদনে অতো সহস্র লোকেরা রাস্তায় আসতে পারে, ধারণা ছিল না। আমাদের দেশে (অনেক সময়) ভাড়া করে নাকি ভিড় জমানো হয় সভাসমিতিতে, এবং বিনাপয়সায় ট্রাকে চড়িয়ে শ্রমিকদের আনা হয় 'মহতী জনসভায়'। এক্ষেত্রে মাত্র একটি আবেদন।

এর একটা রাজনৈতিক দিক আছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ

ভারতীয় জ্ঞানপীঠের লক্ষ টাকার সাহিত্য পুরস্কার এ বছর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া হবে, তা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। গত ১৫ই ডিসেম্বর দিল্লীর মবলঙ্কর হলে সেই পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষণ দিয়েছেন তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলোঃ

"যে বিষ্ণুরূপী ভারতীয় সংস্কৃতি যুগে যুগান্তরের প্রলয় পয়োধিমধ্যে বেদ ধারণ করে রাখার মত, মহাকবি বাল্মীকি ও মহাকবি ব্যাসের কাব্যকে ধারণ করে আছেন, তাঁরই পদপ্রান্তে মিলিত পথ রেখার আধুনিকতম বিন্দুতে আজ আমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংকোচ আমার এই কারণেই। এ মহাকবি কালিদাসের সেই বামনের প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে উদ্বাহু হয়ে হাত বাড়ানোর মত। আমি নিশ্চিত জানি, আমাকে এ সমাদরের কারণ হল, আমাকে উপলক্ষ করে আমাদের পরম সমাদরের বাংলা সাহিত্যকে সম্মানিত করা, যে বাংলা সাহিত্য জয়দেব চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও আরও বহু বিশিষ্ট সাহিত্য সেবকের সেবায় সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে এবং আসছে। তাই বা কেন বলি? শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বাংলা সাহিত্যের হাত দিয়ে সমাদর করা হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যকে।...

"সর্বভারতীয় সাধারণ জীবনের কাহিনী বলে যে রচনাটিকে তাঁরা সম্মানিত করেছেন সে রচনাটি স্বাধীনতার পূর্বকালের।... সেকালে জীবনে এমন কিছু ছিল যা জীবনের আকাশ লোকে মহৎ আলোক-জালের মত অন্তর্লীন থেকে সমস্ত জীবনকে মহিমান্বিত করে রেখেছিল।...আজ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু ঐক্যের সে নিবিড়তা ও গভীরতা যেন অনুপস্থিত।...আজ ভারতের চারদিকে তাকিয়ে দেশের বহির্লোকে ও অন্তর্লোকে উজ্জ্বল কোন্ ছবি দেখছি? স্বাধীনতার পর তো জাতীয় সংহতি ও একত্রীকরণের জন্য কম প্রচেষ্টা হয়নি। আজ দেশের চারদিকে চেয়ে মনে হচ্ছে তাতে কোন ফলই হয়নি।...মানুষের হৃদয়-ক্ষেত্রে কামনাতে সিঞ্চনের কোনো কাজ হয়নি। বিদ্যা বিস্তার সত্ত্বেও সে বন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

"...আমাদের চলিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের আলোকোজ্জ্বল পাদ প্রদীপের অন্তরালে ও বহির্দেশে আমাদের অগোচরতার ছায়ায় যে বৃহৎ, প্রাচীন, বৃদ্ধ, সনাতন ভারতবর্ষ অতি অতি দীর্ঘকাল ধরে অতি নীরবে, গভীর প্রশান্তি ও ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে তার সংগে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক আজও বিচ্ছিন্ন।...

"দেশের এই আলোকিত ও ছায়াবৃত দুই পৃথক জীবনকে পরস্পরের সান্নিধ্যে এনে প্রেমের ও বিশ্বাসের স্বর্ণ সূত্রে যদি বন্ধনের পথ আবিষ্কার করা যায় তা হলে আমাদের সংস্কৃতির এক বৃহৎ জীবনক্ষেত্রে মুক্তি হয়তো সম্ভব হবে।...সেদিন ভারতবর্ষের যে-প্রান্তেই যে-প্রান্তীয় ভাষাতেই যে সাহিত্যই রচিত হবে সে এক মুহূর্তেই সর্ব ভারতীয় সাহিত্য হয়ে উঠবে।"

ভাষা বিল

ভাষা বিল নিয়ে লোকসভার ভিতরে ও বাইরে অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত কয়েকটি সংশোধন সমেত বিলটি পাশ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যে কয়েকটি আশ্চর্য ঘটনা সব সময়ই মনের মধ্যে ঘুরঘুর করছে, তা উল্লেখ না করে পারছি না।

ভাষা বিলের ব্যাপারে হিন্দী ভাষী রাজ্যগুলি এবং তামিল ভাষী মাদ্রাজই দুই প্রতিপক্ষ। বাংলাদেশ, আসাম, ওড়িষা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এসব জায়গা থেকে কোনো রকম উচ্চবাচ্যই শোনা গেল না। এই সব রাজ্যগুলির ভাষাও অনেক উন্নত যতদূর জানি, এবং এই সব ভাষাগুলির অস্তিত্ব ও সম্মান বজায় রাখার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিরও অভাব নেই মনে হয়—তবু, এঁদের প্রায় কারুর কাছ থেকেই ভাষা বিলের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রকার মতামত শোনা গেল না—এটা বিস্ময়কর ঘটনা নয় কি?

ভাষা সম্পর্কে সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার গুরুত্ব কম নয়। ভাষার পক্ষে সাহিত্যের প্রশ্নও জড়িত। কিন্তু ভাষা বিলের সম্পূর্ণ আলোচনায় সাহিত্যের কোনো স্থান হয়নি, নিছক সরকারী যোগাযোগের ভাষা এবং কোন প্রদেশের কত লোক সরকারী চাকরি পাবে—এই ধরনের আর্থিক বিষয়ের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য, ৪৮ কোটি মানুষের দেশে—এগুলো নিছক কয়েক লক্ষ মানুষের সমস্যা। সুতরাং অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যিকরা এ নিয়ে মাথা ঘামান নি। তবে, হিন্দী সাহিত্যিকরা সকলে প্রতিবাদ করলেন কেন? ক'জন কি ভাবে সরকারী চাকরি পাচ্ছে কিংবা পাটনার মন্ত্রীদপ্তর বোম্বাই-এর মন্ত্রী দপ্তরকে কী ভাষায় চিঠি লিখবে—এ সম্পর্কে হিন্দী সাহিত্যিকদের

উদ্বেগের কারণ কি? তাহলে মনে হয় এর মধ্যে কোনো রসের খবর আছে। সেটা কি? হিন্দী ভাষা যত বেশী সরকারী স্বীকৃতি পাচ্ছে ততই ভারতের সমস্ত মানুষের দেয় করের বেশী অংশ হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। আই এ এস পরীক্ষায় হিন্দী বা ইংরেজির মাধ্যমে পরীক্ষা দিলে কোন্ প্রদেশের কত লোক চাকরি পাবে—এর চেয়েও বড় কথা, শুধুমাত্র যারা হিন্দী জানে—তাদের জন্য বহু চাকরি তৈরি হচ্ছে। সব প্রদেশের সমস্ত চিঠির হিন্দী অনুবাদ—এই অনুবাদকদের চাকরির ক্ষেত্রে কোনো প্রতিযোগিতাই নেই, শুধুই হিন্দী ভাষীদের জন্য। হিন্দীর উন্নয়নের জন্য নতুন দপ্তর খোলা হচ্ছে। হিন্দী বই, পত্র পত্রিকা সরকারী আনুকূল্য বেশী পাচ্ছে। রেডিওতে হিন্দীর প্রচার বাড়ছে। হিন্দী লেখকরা এর পূর্ণ সুবিধে গ্রহণ করছেন, সেই সুবিধে তাঁরা আরও বেশী চান। আজ একজন মাঝারি বয়সের মাঝারি ধরনের হিন্দী লেখকের আয় ওই একই রকম অবস্থার কোনো বাঙালী লেখকের অন্তত দ্বিগুণ। প্রদেশ বা ভাষা অনুযায়ী সরকারী চাকরির অনুপাত নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু তাতে যোগ্যতার মান বজায় থাকবে না বলে পাত্তা পায় নি। কিন্তু হিন্দীর উন্নতির জন্য যত সরকারী টাকা খরচ হচ্ছে—তার আনুপাতিক অংশ ভারতের অন্য ১৪টি ভাষার জন্যও খরচ করা হোক—এবং রেডিওতেও সেইরকম স্থান দেওয়া হোক—এই রকম দাবি কেন তোলা হলো না?

হিন্দী ভারতের বেশী সংখ্যক লোকের ভাষা এবং জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। ইংরেজীর বদলে হিন্দীকেও জাতীয় ভাষার পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া উচিত—এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু কি ভাবে হিন্দীর সেই আসন স্থাপিত হবে তা বড়ই গোলমেলে প্রশ্ন, এর উত্তর আমরা জানি না। কিন্তু, ইংরেজী জানা লোকরা চিরকালই ইংরেজী না-জানা লোকদের একটা অবজ্ঞার চোখে দেখেছে, ইংরেজীকে বিদায় দিয়ে হিন্দী জানা এবং না-জানা লোকদের মধ্যে এ রকম দুটো উঁচু-নিচু ভাগ করা নিশ্চিত উচিত হবে না।

ভাষা বিলের ব্যাপারে আরও দু' একটি বৈষম্যও উল্লেখ করতে ইচ্ছে হয়। হিন্দী ভাষী প্রদেশগুলিই এ বিলের ঘোরতর বিরোধী—তাঁরা আরও বেশী চান্—বোঝা যাচ্ছে না। এ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, হিন্দী অথবা ইংরেজী যে-কোনো একটি ভাষায় জ্ঞানই সরকারী চোখে যথেষ্ট। উত্তর প্রদেশের সরকার বিহারের সরকারকে শুধু হিন্দীতেই চিঠি লিখবে, কিন্তু মাদ্রাজ সরকারকে চিঠি লিখতে গেলে হিন্দী চিঠির সংগে একটা ইংরেজী অনুবাদও পাঠাবে। ব্যাপারটা হাস্যকর, না? মাদ্রাজের একজন ইংরেজী জানা মন্ত্রী ইংরেজী অনুবাদটি পড়েই কাজ চালাবেন, হিন্দী চিঠিখানা নিয়ে তিনি কি করবেন বোঝাই তো যায়, একবারও চোখ না বুলিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবেন। তবুও টাইপ করে চিঠিটা পাঠাতেই হবে!

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী চান শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা। আজকাল ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখে চাকরি করার জন্য। বাংলাদেশের কোনো ছেলে বাংলার মাধ্যমে এম এ পর্যন্ত পাশ করে তারপর চাকরি করতে গিয়ে দেখলো ইংরেজী বা হিন্দী না জেনে সে কোনো কাজই করতে পারছে না। তখন কি শুধু শুধু সেই ছেলেটিকে বিপদে ফেলা হবে না? যে-ভাষা মানুষ অল্প জানে, সে ভাষায় কাজ চালাতে গেলে পদে পদে তার আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটে।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

লোকটা। শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা-৯। তিন টাকা।

বাংলা কথা সাহিত্যে 'ব্রজদার স্রষ্টা, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র খ্যাতিমান লেখক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের সাম্প্রতিক এই উপন্যাসটি বিষয়বস্তু, রচনারীতি ও ভাষা ব্যবহার সব দিক দিয়েই আধুনিক। হাল আমলের কয়েকটি বাংলা উপন্যাসের মত এই পরীক্ষামূলক রচনাটির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় শিক্ষিত নাগরিক মানুষের জীবন-সমস্যা নির্ভীকভাবে তুলে ধরার পরীক্ষা।

বলা বাহুল্য, উপন্যাসের বাঁধা ছকে পারিক্রম নিটোল একটি কাহিনী বুনে এই বিভক্ত অস্তিত্বের সংঘর্ষ উন্মোচিত করা শক্ত। এবং আরো শক্ত, সমসাময়িকতার অংশ নেওয়া লেখকের পক্ষে তার শিল্পকর্মের প্রতি নিরাসক্তভাবে তন্ময় থাকা। হয়ত তাই 'লোকটা'র নেপথ্যে সর্বত্রই একজন উগ্র আক্রমণাত্মক শিল্পীকে সনাক্ত করা যায়। এ আক্রমণ যেমন প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তেমনি উপন্যাসের প্রতিষ্ঠিত আঙ্গিকের বিরুদ্ধেও। যেহেতু মানসিক জড়ত্ব ও অবসাদ এ যুগের চরিত্র-লক্ষণ তাই প্রতিটি ঘটনার মানসিক প্রতিফলনই এখানে লেখকের কাছে বেশী জরুরী। বহুকৌণিক জটিলতায় আচ্ছন্ন—বহু বাসনায় ব্যস্ত একটি মানুষের ছবিকে জীবন্ত করে তুলতে শ্রীঘোষ বিনা দ্বিধায় কখনো নাটকীয়তা, কখনো নিছক সাংবাদিকতা, কখনো বা নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়েছেন। চরিত্র ফুটিয়েছেন সংলাপ বা একোক্তিকরণের সোচ্চার পথে। আর অন্তর্মুখিন ভাবনার কারুকর্মে গড়ে তুলেছেন পাপবোধ, বিবেক, সংকল্প ও দ্বিধার প্রতিটি জটিল মুহূর্ত। কদর্য মানুষের দুঃসাহসিক চিত্র। এর কতটুকু অনিবার্য শিল্পকর্ম আর কতটুকুই বা স্বেচ্ছাচার সে-প্রশ্ন ভবিষ্যতের জন্যে মুলতবী রেখে স্বীকার করা যায়, লেখক গতানুগতিক রোমান্টিক আখ্যানের সুলভ রাস্তা ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় এক কঠিন পরীক্ষার ব্রতী হয়েছেন।

স্বল্পায়তন এই উপন্যাসটির গল্পাংশ খুবই সামান্য। নিতান্ত সাধারণ একটি লোক বিচিত্র অভিজ্ঞতার পাঠ নিতে নিতে কি করে একটি বিশেষ মানসিকতায় উত্তীর্ণ হল এবং স্ব-বিরোধে জর্জর সেই লোকটা হতাশা আর গ্লানির সঙ্গে লড়তে লড়তে কিভাবে অপমৃত্যুর মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল তারই বিবরণ এর উপজীব্য। কিশোর বয়সের নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ লোকটাকে এক বীভৎস অভিজ্ঞতার নরকে পৌঁছে দেয়। তবু মধ্যবিত্তজনের অন্ধকার অধ্যায় পেরিয়েও সে যৌবনে জীবন সংগ্রামে নেমেছিল। তারই মত জীবিকার সন্ধানে পথে নামা অনেক শিক্ষার্থিনী তার ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী হয়ে বলেছিল 'আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখবো করবো।' কিন্তু ক্ষুধার কাতর, ক্লান্তিতে অবসন্ন, যৌন কামনায় তাড়িত লোকটা অনেক অন্যায় অনেক ছলনার চাবুক খেয়ে বুঝতে শেখে, মানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজনে ক্রীতদাসত্বই তার ভবিতব্য। নগর পরিবেশের শিক্ষারিত্রীকেও তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তার দেহ—তার কুমারীত্ব খুইয়ে নিতে হয়। কিন্তু তবু একবার অসম্মান, গ্লানি আর নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে নায়কের। দ্বিধা ও যন্ত্রণায় আন্দোলিত হয়ে ওঠে তার মুমূর্ষু বিবেক।

শেষ পর্যন্ত একটি মোটর দুর্ঘটনার মধ্যে কাহিনীর সমাপ্তি। উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্দুও এই দুর্ঘটনার দৃশ্যের মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। মরণ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া লোকটার বেঁচে থাকার ছটফটানি, বারবার চারপাশের নিষ্ক্রিয় দর্শকদের কাছে অথবা মৃত ড্রাইভারের কাছে একটুখানি মদতের আশা করা যেন মেট্রোপলিটান মানুষের জীবনযাত্রার প্রতীকে উন্নীত হয়েছে।

স্বভাবতই এই কাহিনীর বক্তব্য ও বিষয় বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণে লেখকের নতুন পরীক্ষার জন্যেও এই উপন্যাস স্বাতন্ত্র্য দাবি করবে। অবশ্য বক্তব্যের তুলনায় গল্পের আয়োজন হয়ত একটু বেশী রকমের উগ্র মনে হবে কারো কারো কাছে। যেমন প্রতিপক্ষের কবলে পড়ে বাঙ্গ নিপীড়িত হওয়ায় লোকটার মধ্যে যে মনোবিকলনের উদয় তার মধ্যে দিয়ে হয়ত লেখক স্থূল উপকরণের শৈল্পিক শুদ্ধির প্রতি জেহাদ জানিয়েছেন, কিন্তু প্রশ্ন ওঠে ফলশ্রুতির বিচারে এই অস্বস্তিকর ঘটনাটি অনিবার্য কিনা। এবং নিতান্ত আপতিক এই ঘটনার সাহায্যে প্রভাবিত চরিত্র তার ব্যাপকতা হারিয়ে ফেলে কিনা। আবার কমিটির চেয়ারম্যানের বিছানায় শুয়ে শিক্ষিকার ইণ্টারভিউ দেওয়া বা হাসতে হাসতে তাঁর মায়ের মৃত্যুর খবরের সঙ্গে সেই ইণ্টারভিউয়ের কদর্য তামাশা নিয়ে ঠাট্টা করার মধ্যে লেখক যতটা লাউড ততটা প্রতিষ্ঠিত নন। কারণ যে কোন বাস্তবতাকেই শিল্পসম্মতভাবে প্রত্যয়িত হওয়া দরকার। ব্যভিচার বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো বাঙালী তরুণীর অকপট একজিবিশনিজম-মনোভঙ্গি সাধারণ ঘটনা নয়। সুতরাং এ চরিত্রকে তিল তিল করে 'হয়ে' উঠতে হয়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এ সব ক্ষেত্রে একটি আক্রমণাত্মক মেজাজকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছে। অশ্লীলতার ভীতি বা ভাবুকতার দুর্বলতাকে তিনি সচেতনভাবে ভাঙতে চেয়েছেন। এবং সভ্য মানুষের চাপা দেওয়া কেলেঙ্কারির প্রতিই তার স্যাটায়ার সব চাইতে বেশী নির্মম।

সর্বোপরি ভাষা ব্যবহার এই উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এমন তাজা প্রাণবন্ত মুখের ভাষা বাংলা উপন্যাসে এখনও বিরলদৃষ্ট। মেয়ে শিকারী রকবাজ ছোকরা, ধুরন্ধর পলিটিশিয়ান, বদমেজাজী বড়সাহেব সবই এখানে একটি তথাকথিত অ-সাহিত্যিক স্থূল বাস্তব ভাষার কথা বলে। বিশেষ করে, অফিসবাবুর পানের রসে সিক্ত জড়ানো অপূর্ব পরিভাষা বারবার আমাদের রূপদর্শীকেই মনে করিয়ে দেয়।

প্রাপ্তি স্বীকার

মঙ্গললীলা সুধানিধি (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। লীলাপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। মহানাম সম্প্রদায় : মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১। মূল্য ৩·০০, ৩·৫০ ও ৩·৫০।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। বন্ধুদাস : ৩ অমদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ১·০০।

তার্থদান। তুলসী দাস। চলন্তিকা : নবদ্বীপ, নদীয়া। মূল্য ২·৫০।

G. D. R. Vanguard of Peace by A. S. R. Chari: G. D. R. Friendship Association, New Delhi. Price 2.50.

The Extremist Challenge by Amalesh Tripathi. Orient Longmans: 17, Chittaranjan Avenue, Calcutta-13. Price 18.00.

বিশল্যকরণী। অন্নদাশঙ্কর রায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

বিদ্যাসাগর। নমিতা চক্রবর্তী। জিজ্ঞাসা : ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৬·০০।

নিহিত পাতাল ছায়া। শঙ্খ ঘোষ। বিন্যাস : ৫৯এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·৫০।

একজন আর কয়েকজন। অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ডি এম লাইব্রেরী : ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·০০।

গানের সহজ পাঠ। মণীন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীসন্ত প্রকাশন : ২৫৪ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলিকাতা-৪৫। মূল্য ৩·৫০।

দ্বিমত

কোন একটি ছবি সম্পর্কে সকলেই একমত হবেন এমন আশা করা অলৌকিক। শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু যে শিল্পকর্ম ফেস্টিভালে সর্বোচ্চ পুরস্কারে ভূষিত, তা যদি কোন সমালোচক "কাঁচা ফিল্মের অপচয়" বলে একেবারে নস্যাৎ করে দেন তবে কৌতূহল হয় বইকি। একজনের মতে যা শ্রেষ্ঠ, অন্যের বিচারে তা অন্তত সাধারণ ত মনে হতে পারে। কিন্তু তাকে "কিছুই নয়" বলে উড়িয়ে দেওয়াটা কতখানি স্বাভাবিক সে প্রশ্ন অবশ্যই জাগতে পারে। সাধারণ বুদ্ধি বলে, যে ছবিকে কোন এক উৎসবের বিচারকমণ্ডলী সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলেন তার অন্তত কিছু গুণ নিশ্চয়ই আছে।

শিল্পী হুসেনের "থ্রু দি আইজ অব এ পেইন্টার" এবার বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভালে স্বল্পচিত্র বিভাগে (নাকি অল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র হিসাবে?) সর্বোচ্চ পুরস্কার গোল্ডেন বেয়ার লাভ করেছে। আমেরিকান চিত্রসমালোচক ডোনাল্ড রিচির চোখে ছবিটি নাকি "কাঁচা মালের অপব্যবহার" ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর মতে, এই ছবি অর্থহীন, "সিলি"। এই বলেই শ্রীরিচি ক্ষান্ত হননি। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে, চলচ্চিত্রকারের কোন সিনেমাটিক বোধ নেই। এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এ ছবি কেমন করে পুরস্কার নিয়ে এল। ছবিটি আমরাও দেখেছি। শ্রীরিচির মন্তব্যে আমরাও বিস্মিত।

কেদার রাজা

পুরো ছবিটাই বেশ নিবিষ্টমনে দেখা চলে। প্রথম থেকে প্রায় মাঝামাঝি অবধি "কেদার রাজা" দর্শককে নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দ দেয়। একটি বিশাল ভগ্নপ্রাসাদে, তার চারিদিকের জংগল ও অন্ধকারে, কখনও বা চাঁদের আলোয় বৃদ্ধ কেদার রাজা ও তার বিধবা মেয়ে শরৎ-এর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার মধ্যে কোন নাটকীয়তা নেই। তথাকথিত গল্পও না। শরৎ কড়াহাতে সংসার চালায়, বাবার ঔদাসীন্য দেখে রাগ করে। আবার সন্ধ্যায় প্রসন্নমনে সাবধানে প্রদীপটি ধরে ভাঙা মন্দিরের গৃহদেবতাকে প্রণাম করে আসে। তাদের বিশ্বস্ত অনুচর গণেশ তাকে চুপি চুপি চোখে চোখে রাখে। অন্য দিকে কেদার রাজা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী বেহালাটি নিয়ে কৃষ্ণযাত্রার দলের সঙ্গে গান গাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েন। গান-বাজনা শেষ হয় অনেক রাতে। গণেশ তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়। শরৎ ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দেয়।

এমনিভাবে চলে ভগ্নস্তূপের অধীশ্বর, আপনভোলা, গান-পাগল কেদার রাজার জীবন, এবং শরৎ-এর প্রাত্যহিক কাজকর্ম। মাঝে মাঝে শহরবাসিনী রাজলক্ষ্মী এসে শরৎ-এর নিঃসঙ্গতা ভেঙে দেয়। শরৎ কখনও বা রাজলক্ষ্মীকে ভয় দেখায়। এদের জীবন-যাত্রা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন পরিচালক বলাই সেন। কোথাও চমক দেবার চেষ্টা নেই, অস্বাভাবিকতাও অনুপস্থিত। ধ্বংস-রাশির মধ্যেও রাজ-পরিবারের জীবন অটুট, ছন্দময়। কেদার রাজার বেহালার সুর কাটে না, তার জীবনের সুরও নয়।

এই পর্যন্ত ছবিটি দর্শকের মনকে আচ্ছন্ন করে। পরিচালক শ্রী সেনকে ছবির প্রথমার্ধের "এসথেটিক" ও "লিরিক্যাল" গুণের জন্য প্রশংসা করতেই হয়। তার চেয়ে একটি বড় কাজ তিনি

লোকনাথ চিত্র-মন্দিরের "সাবরমতী" (পরিচালনা: হীরেন নাগ) ছবিতে সুপ্রিয়া চৌধুরী।
ফটো—দেশ

এবং সঙ্গীত নিয়ে [illegible] (নাটকীয় বাড়ির সেট উল্লেখ্য) খুবই প্রশংসার যোগ্য।

ডক্টর ঝিভাগো

ডেভিড লীনের "ডক্টর ঝিভাগো" দেখতে ভাল লেগেছে। বিপ্লবযুগের রাশিয়ার শহর, প্রান্তর, পথ ঘাট, যাত্রী-বোঝাই ট্রেন, বরফে ঢাকা পোড়ো বাড়ি এবং আরও অনেক কিছু। [illegible] ছবি, ঘটনার আকীর্ণ, কিন্তু [illegible] পরিচালনার পারিপাট্য আছে। অর্থাৎ পরিচালকের [illegible] সেখানে "টেকনিক্যাল এক্সিকিউশনে", প্রয়োগ-কর্মে। [illegible] চিত্রনাট্যও সুরচিত।

তবু কেমন যেন "ডক্টর ঝিভাগো" ছবিটি প্রাণহীন। ঝিভাগো ও [illegible] প্রণয় ও [illegible] ঘটনায় কোন গভীরতা নেই। [illegible] নিষ্প্রাণ [illegible] ঝিভাগোকে। [illegible] ঝিভাগোর আর কোন কাজ নেই। পরিচালকের দায়িত্ব ছিল ঝিভাগোর মনের প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তোলা। [illegible] সংবেদনশীল সমালোচকের সঙ্গে [illegible] পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সে কাজে [illegible]। [illegible] এই ছবিতে এই [illegible] জন্য নাম-ভূমিকার শিল্পী ওমর শরিফও কিছু অংশে দায়ী?

কাহিনীতে পাস্তেরনাকের বক্তব্য সুস্পষ্ট হলেও [illegible] নয়। উপন্যাসের এই [illegible] ছবিতে [illegible] নেই। [illegible] বলেছেন।

এই [illegible]। [illegible] ছবিটি [illegible] এবং [illegible] উপাদান [illegible]। [illegible] একটি [illegible] [illegible]।

"শজারুর কাঁটা"-র গান-রেকর্ডিং—কণ্ঠশিল্পী মান্না দে, গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রযোজিকা-পরিচালিকা: মঞ্জু দে, সংগীত পরিচালক: সুধীন দাশগুপ্ত ও শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

নিষিদ্ধ চিত্রের সংখ্যা এক

লোকসভায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ জানিয়েছেন যে, এই বছর ১ জানুয়ারি থেকে ২৮ [illegible] মধ্যে মাত্র একটি ভারতীয় ছবি সেন্সরের ছাড়পত্র পায়নি। তা-ছাড়া, ২২টি বিদেশী কাহিনীচিত্র এবং ২১টি বিদেশী চিত্রের ট্রেলারের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে আরও বলেন যে, তথ্যচিত্রের ব্যাপারে চন্দ-কমিটির ১০১টি পরামর্শের মধ্যে ৭৯টি কার্যকর করা হচ্ছে।

প্লে-ব্যাক শিল্পী প্রদত্ত আয়কর

অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি লোকসভায় জনৈক সদস্যের একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, নেপথ্য গায়িকা শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকর ১৯৬২—৬৬ এই পাঁচ বছরে তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাত শ একাত্তর (৩,৩৫,৭৭১) টাকা আয়কর বাবদ দিয়েছেন। নেপথ্য গায়ক মহম্মদ রফি ওইকালে আয়কর দিয়েছেন দু লক্ষ একুশ হাজার পাঁচ শ পনের (২,২১,৫১৫) টাকা। এ ছাড়া রেকরড বিক্রির রয়ালটি বাবদ প্রাপ্য আয়ের উপর আয়কর দিয়েছেন—শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকর বাষট্টি হাজার এক শ আটচল্লিশ (৬২,১৪৮) টাকা এবং মহম্মদ রফি এগারো হাজার সাত শ একান্ন (১১,৭৫১) টাকা।

কলকাতার অদূরে "মঝলিদিদি"-র আউটডোর শুটিং : একটি দৃশ্য গ্রহণের আগে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়—ছবিটি শরৎচন্দ্রের "মেজদিদি"র হিন্দী চিত্ররূপ। ফটো—দেশ

সলিল দত্ত'র "অপরিচিত" ছবিতে উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও রিনা ঘোষ। ফটো—দেশ

লীগ অব ইয়ুথ ফিল্ম সোসায়েটি

পশ্চিম বাংলায় প্রায় পঁচিশটির মত ফিল্ম সোসায়েটি বা সিনে ক্লাব জাতীয় সংস্থা রয়েছে। ইয়ুথ ফিল্ম সোসায়েটির জন্ম এই প্রথম। তরুণ চলচ্চিত্রকারদের তৈরী ছবি দেখানোই হবে এই সংস্থার প্রধান কর্মসূচী।

১৭ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে সংস্থার উদ্বোধন হয়। "টু নাইট এ সিটি ডাইজ" ছবিটি সহ কয়েকটি দেশী ও বিদেশী অল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়।

অপসরা ফিল্মসের "তিন অধ্যায়" ছবির বহির্দৃশ্য সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলে গৃহীত হয়েছে। শৈলেশ দে'র কাহিনী অবলম্বনে মঙ্গল চক্রবর্তী

তিন অধ্যায়

ছবিটি পরিচালনা করছেন। আউটডোর শুটিং-এ যোগ দেন সন্ধ্যা রায়, অজয় গাঙ্গুলি, অনুপকুমার ও শিবানী বসু। ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী অভিনয় করছেন। গোপেন মল্লিক সুরকার।

পূর্ণেন্দু প্রোডাকশন্স-এর "বৌদি"-র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রণব রায় ছবির চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান রচনা করেছেন। দিলীপ বসু চিত্র-

বৌদি

পরিচালক। সন্ধ্যারানী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, অনুপকুমার, জহর রায় প্রমুখ বিশিষ্ট

"শজারুর কাঁটা" ছবির নায়িকা বাসবী নন্দী। ফটো—দেশ

"আপনজন" ছবির সেটে নির্মলকুমার ও সুমিতা সান্যালকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক তপন সিংহ। ফটো—দেশ

চরিত্রের শিল্পী। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বজিৎ প্রযোজিত ট্রায়ো ফিল্মসের "ছোট্ট জিজ্ঞাসা" ছবির মুক্তি আসন্ন।

ছোট্ট জিজ্ঞাসা

বিশ্বজিতের চার বছরের ছেলে প্রসেনজিৎ এ ছবির নায়ক। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, সুরুচিবালা সেনগুপ্তা, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। গল্প গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের।

রিটা টাশিংগাম ও লিন রেডগ্রেভ কৌতুক-শিল্পী-জোড় হিসাবে দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। অনেকেই তাঁদের লরেল ও হার্ডি টিমের সঙ্গে তুলনা করছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কৌতুকে মহিলা শিল্পীদের কোন বিশেষ জুটি দেখা যায়নি। চার বছর আগে রিটা ও লিন "গার্ল উইথ গ্রীন আইজ" ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। তাঁদের অভিনয়ে কমেডির ধরণটি দর্শক-দের নজর এড়ায়নি। এবার তাঁরা পুরোপুরি "কমিক টিম" হিসাবে "স্ম্যাশিং টাইম" ছবিতে আত্মপ্রকাশ করছেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগে মারি ড্রেসলার ও পলি মোরান হলিউডের ছবিতে "কমিক টিম" হিসাবে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিলেন। এরপর এ-ধরণের "টিম" এই প্রথম বলা যেতে পারে।

স্যু লিয়ন ("লোলিটা"-খ্যাত) ২১ জানুয়ারী এটর্নি জর্জ রয়েসের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন।

এ-আর-সি প্রোডাকশন্স-এর "অদ্বিতীয়া" (পরিচালনাঃ নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তী। ফটো—দেশ

পশ্চিম ভারতের কংকন উপকূলে প্রচণ্ড ভূমি কম্প বর্তমান সপ্তাহের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত রবিবার রাত্রি ৪—২১ মিনিটের সময় এই ভূমিকম্পের ফলে উত্তরে সুরাট থেকে দক্ষিণে বাঙ্গালোর পর্যন্ত ৪০০ মাইল দীর্ঘ সমুদ্রোপকূল জুড়ে ব্যাপক জীবনহানি ও প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। গোয়া, রত্নগিরি, পুনা, সাংলি, কোলাপুর, সোলাপুর, হায়দরাবাদ হুবলি ধারোয়ার, বাঙ্গালোর ও ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে ভূমিকম্পের ধাক্কা কমবেশী পৌঁছলেও এর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাতারা জেলার কয়নানগর। এশিয়ার বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে অবস্থিত। দশ হাজার লোকের বাসভূমি এই শহরের প্রায় সমস্ত বাড়ি ভূমিস্যাৎ হয়েছে। সমগ্র এলাকায় ধ্বংসের বিভীষিকা। মারা গিয়েছেন কম করেও প্রায় ২০০ জন আহত প্রায় ২০০০ জন। হতাহতের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু। ভূমিকম্পের দরুন পশ্চিম ভারতের বিস্তৃত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। ইদানীংকালের এমন ভয়াবহ ভূমিকম্প পশ্চিম ভারতে আর হয়নি। এর উৎপত্তিস্থল বোমবাই থেকে ২৬০ মাইল দূরে বলে ভূকম্পন ধারক যন্ত্রে ধরা পড়ে। কয়েকবার মৃদু ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনের পরে শেষবারের প্রচণ্ড কম্পন প্রায় এক মিনিট স্থায়ী হয়। ১১ ডিসেম্বর (সোমবার) সকালে এই প্রচণ্ড কম্পনের পরে ওই অঞ্চলে মঙ্গলবার পর্যন্ত আরও শতাধিকবার মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

দেশী সংবাদ

১১ ডিসেম্বর—আজ রাইটারস বিলডিংস-এর রোটানডায় চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ শিল্পপতি এবং মালিকদের উদ্দেশে এক আবেদন জানান—তাঁরা যেন শ্রমিক ও কর্মীদের প্রতি যেরূপ আচরণ করা উচিত তা তাঁরা করেছেন কিনা তা বিচার করে দেখেন। তিনি শ্রমিক ও কর্মীদের অংশীদার হিসাবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ জানান।

প্রবীণ শিক্ষাবিদ, গান্ধীবাদী দেশকর্মী অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন আজ তাঁর কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। অধ্যাপক সেনের পত্নী ও দুই পুত্র বর্তমান। অধ্যাপক সেনের জীবন কর্মবহুল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে এম এ পাস করেন। ১৯৫২ সালে তিনি প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ বৃত্তি পান। দীর্ঘকাল তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

১২ ডিসেম্বর—দিল্লি পুলিস উত্তর প্রদেশের দুজন সমাজতন্ত্রী দলের মন্ত্রী শ্রীপ্রভুনারায়ণ সিং ও শ্রীরামস্বরূপ বর্মাকে আজ ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করবার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। মন্ত্রীরা সংসদে সরকারী ভাষা সংশোধন বিল প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে সম্ভবত এই প্রথম দুইজন মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হলো।

কমিউনিসট সদস্যগণ আজ লোকসভায় এই মর্মে অভিযোগ করেন, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে গত সাধারণ নির্বাচনের সময়ে তাদের নাক গলিয়েছিল এবং তারা যে টাকা ছড়িয়েছিল তা কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কয়েকজন সদস্যের পকেটে গিয়েছে।

১৩ ডিসেম্বর—সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার একটি পত্রিকায় "সিয়া" ত্যাগী জন স্মিথ যে সব কথা ফাঁস করে দেন, বিশেষ করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী গুপ্তচরদের কাজকর্ম সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি সংসদীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব আজ রাজ্যসভায় অগ্রাহ্য হয়ে যায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন জানান যে, এই বছরের গোড়ায় সাধারণ নির্বাচনের

সময় বিদেশী অর্থ দান ও জাল নথিপত্র যে প্রচার করা হয়েছিল তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।

১৪ ডিসেম্বর—উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন, ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিল-এ ডিরেকটর বোর্ডের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা থাকবে। বিল অনুযায়ী ব্যাঙ্ক পরিচালকরা এবং যে-সব সংস্থায় তাঁদের স্বার্থ রয়েছে, তাঁদের আগাম ও গ্যারানটি দেওয়া নিষিদ্ধ হবে।

দিল্লির কোন ম্যাজিসট্রেটের আদালতে উত্তরপ্রদেশের দুজন মন্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করা হয়েছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবন আজ লোকসভায় এই দাবি সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন। তবে তিনি দিল্লি প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারদের এ ব্যাপারে তদন্ত করতে আদেশ দিয়েছেন।

১৫ ডিসেম্বর—সংসদের তেরোজন সদস্যের একটি দল আজ সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে কলকাতা ও শহরতলির নানা জায়গায় ঘুরে সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় 'পুলিসী অত্যাচার' সম্পর্কে তদন্ত করেন। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয় ব্যানার্জির সঙ্গেও দেখা করেন।

১৮ ডিসেম্বর যে রেশন সপ্তাহ শুরু হবে সেই সপ্তাহ থেকে বৃহত্তর কলকাতার বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় চালের পরিমাণ প্রাপ্ত বয়স্ক মাথাপিছু বর্তমান ৫০০ গ্রাম থেকে ১৫০ গ্রাম বাড়িয়ে ৬৫০ গ্রাম করা হবে বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৬ ডিসেম্বর—আজ উত্তরপাড়া রাজা প্যারিমোহন কলেজ এলাকায় এক গণ্ডগোলে পুলিস ছয় রাউনড গুলি বর্ষণ করে, একজন গুলিতে আহত হন। এ ছাড়া পুলিসের লাঠির ঘায়ে আহত ৩৫ জনকে হাসপাতালে পাঠান হয়। রাত্রি পর্যন্ত এ ব্যাপারে চল্লিশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ লোকসভায় পাঁচটি সংশোধন সহ সরকারী ভাষা বিলটি অনুমোদিত হয়। কিন্তু অহিন্দীভাষী সদস্যের মতে ওই সংশোধনগুলি হিন্দীভাষী সদস্যদের চাপেরই ফল এবং এর ফলে বিলটির উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া সংশোধনের আকারে একটি প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়। এতে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে হয় হিন্দী নয় ইংরাজীর জ্ঞান আবশ্যিক।

১৭ ডিসেম্বর—ভারতীয় ক্রান্তি দলের উত্তরপ্রদেশ শাখা আজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিংকে ক্ষমতাধিষ্ঠিত সংযুক্ত বিধায়ক দল সমীপে পদত্যাগপত্র পেশের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী সে নির্দেশ পালন করেন। অতঃপর সংযুক্ত বিধায়ক দলের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতভাবে পদত্যাগপত্রটি নাকচ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বিদেশী সংবাদ

১১ ডিসেম্বর—নেপাল সরকার লি ত্রিভন নামের এক মারকিন হিপি পানডাকে (বয়স ৩০) বিতাড়িত করেছেন। হিপিটি প্রথমে আদেশ পালন না করে গা-ঢাকা দেয়। পরে তাকে এক তিব্বতী রেস্তোরাঁয় গাঁজা সেবনরত অবস্থায় পাকড়াও করে চালান দেওয়া হয়। এই হিপিটি তার দলবল নিয়ে ক্যালিফোরনিয়া থেকে এসেছিল।

১২ ডিসেম্বর—'আগ্রাসন'-এর সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটি খসড়া তৈরি করে রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের আগামী বৈঠকে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য পরিষদের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে ভারত এবং অন্যান্য ২২টি আফরো-এশীয় দেশ ও যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করেছে।

১৩ ডিসেম্বর—গ্রীসের রাজা কনসটানটাইন দেশের সামরিক ডিকটেটরশিপের বিরুদ্ধে একটি পালটা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করেন। এথেনস-এ সরকারী রেডিয়ো থেকে অবশ্য বলা হয় যে, এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে। রাজা পালিয়ে যাচ্ছেন এবং সামরিক জোটের হাতেই গ্রীসের কর্তৃত্ব রয়েছে।

১৪ ডিসেম্বর—গ্রীসের রাজা সপরিবারে রোমে পলায়ন করেছেন। আর এ দিকে গ্রীসে আজ গৃহযুদ্ধের উপক্রম দেখা দিয়েছে। দুই রাষ্ট্রপ্রধান ও দুটি সরকারের উদ্ভব হয়েছে এবং সেনাদলও দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

১৫ ডিসেম্বর—করনেল বুমেদিন আজ আলজিয়ারস-এ ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরকার গতকাল রাত্রে আলজিরিয়ায় একটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তিনি কারও নাম করেননি।

১৬ ডিসেম্বর—গ্রীসের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে পলাতক রাজা কনসট্যানটাইন আজ তাঁর দেশে ফেরার শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। যে সামরিক প্রশাসনকে রাজা উৎখাত করার চেষ্টা করেছিলেন রাজাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা এখন সবিশেষ উদ্যোগী।

১৭ ডিসেম্বর—অসট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হ্যারলড হোলট (৫৯) আজ সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী পোরটসীর জনপ্রিয় সৈকতাবাসে অবসর যাপন করতে এসেছিলেন।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

আপনি ও উষা
আর এই
চমৎকার চোলি
USHA
উষা
"অ্যারিস্টোক্র্যাট" ও "স্ট্রীমলাইনড"।
বিশ্বাসযোগ্যতা নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হয়েছে

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীঅলক ধর

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৯
শনিবার ১৪ পৌষ ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষান্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষান্মাসিক „	২৩.০০
ত্রৈমাসিক „	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষান্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 30 Dec. 1967.

শীতের মাস ও বড়দিন

মাসটা পৌষ, প্রথম শীতের মাস, কবির ভাষায় 'প্রথম শীতের মাসে, শিশির লাগিল ঘাসে, হুহু করে হাওয়া আসে, হিহি করে কাঁপে গাত্র।' ঘাসে যে শিশির লেগেছে তাতে সন্দেহ নেই, রাত্রে হিম পড়ছে, কখনও সখনও দমকা উত্তুরে বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছি, তবু আমরা, শহরবাসীরা, হুহু শীতের হাওয়ায় হিহি করে এখনও কেঁপে উঠছি না, তেমন শীত আশেপাশে কোথাও আছে বলেও মনে হচ্ছে না। শহুরে শীত এই রকমই মোটামুটি, তার আগমনের ভঙ্গিটা শহুরে-বাবুর মতন, কোট প্যাণ্ট শাল পরে আলতোভাবে আসে আর যায়, কাঁথা কম্বলে মুড়ি-দেওয়া গ্রাম্য চেহারাটা তার বড় দেখা যায় না। সেদিক থেকে শীতের দাপট পেতে হলে গ্রামই ভাল, যেখানে প্রকৃতি খোলামেলা পায়ে এখনও চলাফেরা করতে পারে। শহুরে শীত সব সময়ই অনেকটা বৈঠকখানা ঘরের শীতের মতন, আলস্য উপভোগের জন্যে, স্পর্শলাভের জন্যে নয়। আর সারা বছরের টানা হেঁচড়ায় যে শরীর অবসন্ন, ডিসপেপসিয়ায় অর্ধমৃত তাকে শীতের জলবাতাসে, শাকসবজিতে খানিকটা পুনরুজ্জীবিত করে তোলা।

তবু, অস্বীকার করে লাভ নেই শীত অল্পস্বল্প যা এসেছে তাতেই শহরবাসীর মুখ কিছুটা উৎফুল্ল। অবশ্য শহরের এখন যা অবস্থা, নিত্যই গোলোযোগ, আন্দোলন, পুলিসের গুলি, লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, ধর্মঘট, অগ্নিকাণ্ড—তাতে সাধারণ মানুষের দিন উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ বিনা কাটছে না; আর এই অশান্তি কতদিন চলবে তাও কেউ জানে না। এ হেন অবস্থায় শীতের রোদ বা আলস্য উপভোগের মনমেজাজ থাকে না। কিন্তু মানুষের মনের ধর্ম বিচিত্র, খানিকটা তার অভ্যাসের দ্বারা আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। শীতের মরসুম শুরু হলে দু চারটে গরম বস্ত্র, শীত থাকুক না থাকুক, বাক্স আলমারি থেকে বেরুবেই; না না করেও উলের দোকানে দু পাঁচবার যেতেই হবে; তাছাড়া শীতের দিনের সামান্য কিছু ফুর্তি-আনন্দ, ছেলেমেয়ে নিয়ে চিড়িয়াখানায় বা বটানিকাল গার্ডেনসে যাওয়া, কোনো নিরিবিলিতে গিয়ে ছুটির দিনে সপরিবারে বা সবান্ধবে চড়ুই-ভাতি, থিয়েটার সিনেমা দেখা, গানের জলসায় যাওয়া—এ সবের একটা ফর্দ থাকে। বাঙালী, শহুরে বাঙালীর কাছে এটাই শীতের উৎসব বা বড়দিন। বড়-দিনের এই শহুরে আসরে এবার আয়োজন কিছু কম এমন কথা বলা যায় হয়ত, তবে যা আছে তাতে হতাশ হবার কিছু নেই।

পৌষকে আমরা বলি লক্ষ্মীর মাস। গ্রাম বাংলার কাছে এই মাস আনন্দ ও আশ্বাসের। তার গোলা এখন শূন্য, ভরা নয়, তার মাটিতে শীতের ফসল, ঘরে ঘরে ঢেঁকিশালা মুখরিত। এবারে গ্রাম বাংলার মুখে খানিকটা প্রসন্নতা আশা করা যায়, ফসল ভাল হয়েছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে অন্যান্য দিক থেকেও কিছুটা সুবিধে হতে পারে। সুখের বিষয়, ইতিপূর্বে যে আশংকা দেখা দিয়েছিল—ধানের মাঠে শান্তি থাকবে কি থাকবে না—সে আশংকা আর ততটা নেই; ধানের মাঠে শান্তি অক্ষুণ্ণ আছে, আশা করি, এটা থাকবে। স্বস্তি এবং শান্তি না থাকলে গ্রামের জনজীবন যে বিপর্যস্ত হয় তা বলাই বাহুল্য।

একটা কথা প্রসঙ্গত বলা দরকার, আমাদের কাছে যেমন পৌষের এক বিশেষ আকর্ষণ আছে, সেই রকম ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ এবং ইংরেজী নববর্ষ কৃশ্চান ধর্মাবলম্বীদের কাছেও একটি সুন্দর উৎসবের মাস। যাঁর শুভ জন্মদিন নিয়ে এই বড়দিনের উৎসব তিনি যীশুখ্রীষ্ট, মানবসভ্যতার অন্যতম তীর্থংকর পুরুষ। মানব প্রেম ও কল্যাণের বাণী কণ্ঠে নিয়ে একদা তিনি এসেছিলেন, তারপর কত যুগ কেটে গেল এখনও তিনি সরল, সৎ, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী মানুষের কাছে প্রেমের মানুষ, ধ্রুবতারার মতন জীবনের দিশারী নক্ষত্র। এই প্রেমের মানুষটিকে নিয়ে যে উৎসব তার মধ্যে শুধু কৃশ্চান সম্প্রদায়েরই নয়, আজ অন্য বহু মানুষের আনন্দ উৎসব যুক্ত হয়েছে। আজকের বিশ্বজোড়া অশান্তি আর উৎকণ্ঠার দিনে খ্রীষ্টের সারল্য, তাঁর ভালবাসার বাণী, তাঁর আদর্শ অনুভব করার মতন মানুষ যত বাড়ে ততই মঙ্গল।...আমরা, নানা দুর্যোগের মধ্যেও, বড়দিনের এই উৎসবের সাফল্য ও সর্বজনের শুভ কামনা করি।

রাজ্যপাল
ভারতের বাকি অধিবাসী

ভিড়-ভড়াকার গলির মধ্যে বাজার। সেই বাজার দিয়ে **যাচ্ছিল** জর্মন আমেরিকান ইংরেজ ট্যুরিস্ট; **যাচ্ছিল** গাধার পিঠে বসে অতি ব্যস্ত আরবী কোতোয়াল। এই শহরে তো জুড়িগাড়ি হাঁকানোর মতন খোলামেলা এসপ্লানেড নেই, কাজেই পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল কোটিপতি শেইখ, তৈল-ব্যবসায়ী। যাচ্ছিল মোল্লা পাদ্রী ভিখিরি দোকানি দপ্তরের কেরানি। কফির পেয়ালা হাতে রাস্তাটা আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। সেই বাজারে যেখানে প্রায় দু-হাজার বছর আগে একদিন সকালে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল; জেরুজালেমের এই বাজারের ভুবনবিখ্যাত এই রাস্তায় ফুটপাথের একটা কফিখানায় বসে রোদ পোহাতে পোহাতে নিত্যকার অভ্যেস মতন আমি গেলাসে করে ধীরে সুস্থে ইতালিয়ান এক-জন পাদ্রী বন্ধুর সংগে তুর্কী কফি খাচ্ছিলাম। হাতে ছিল সুগন্ধি তামাকের গড়গড়ার সোনালি জরি লেপটানো শিরাজি নল। ঘটনাটা যে কিরকম হাস্যকর তা অবশ্য আজকের বিশ্ববাসী সবাই জানে। তবু মনে মনে আমি সেকেলে সেই মজাদার ঘটনাটা ছবি দেখার মতন করে ভাব-ছিলাম; আর অমনি তৎক্ষণাৎ চোখের পাতার উপর চড়াক করে ফুটে উঠল চিরপুরাতন-চিরনূতন সেই সমস্ত ঘটনাটা......

......গায়ের রঙ বিলেতি সাহেবদের মতন টকটকে ফরসা, বছর তিরিশের একজন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। জাতিতে ধর্মে আরবী ইহুদি। বাপদাদার পেশায় ছুতোর মিস্ত্রি। আপন মনে রাস্তা দিয়ে একা একা যাচ্ছিল, একটা দোকানে দোকানদারের সংগে জনৈক মহিলার শোরগোল তর্কাতর্কি শুনে আচমকা থমকে দাঁড়াল। শুনল, দোকান-দারটা বেদম ঠকিয়েছে মহিলাকে। তাই নিয়ে বচসা। এরকম দিনেদুপুরে জুচ্চোরি তো দুনিয়াসুদ্ধ নিত্যকার গা-সওয়া কারবার। যেমন এখন তখনও এ নিয়ে কোনো হামলা হুজ্জত করার সওয়াল ছিল না। কিন্তু সামান্য ছুতোর মিস্ত্রির বুকে, সেইদিন সকালে, কে কোত্থেকে সাহস জোগালো যীশু জানেন। হুড়মুড় করে দোকানে ঢুকে পড়ে সমস্ত দোকানটাকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিল যেন রকবাজ দস্যু; যেই না পেটমোটা বেনেটা হকমাফিক হাত-গুটিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে অমনি ছুতোরের

দরবেশ

প্রচণ্ড এক থাপ্পড় খেয়ে তৎক্ষণাৎ যাকে বলে কুপোকাত! আশেপাশের দোকানিরা মার-মার করে তেড়েমেড়ে ছুতোরকে ধরে মেরামত করতে এলো; এসে ভ্যাবাচ্যাকা। ছুতোরের পো তেড়ে উঠে বলে কি না, **'আমি বলছি, ভগবানের সংসারকে এভাবে ডাকাতের রাজ্য করে তুলতে আমি দেবো না।—বলছি দেবো না, —দেবো না......!'**

আমার সংগী ইতালিয়ান পাদ্রীসাহেব **খুব সম্ভব ভাবছিলেন, এই ছুতোরমিস্ত্রির** জন্মদিন উত্তরকালে জগতের সর্বত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী বারম্বার সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হবে, একথা দু-হাজার বছর আগের সেই লণ্ডভণ্ডের দিন কেউ ঘুণাক্ষরে টের পেয়ে-ছিল? যতদিন সূর্যালোকে মানুষ জন্মাবে কোটি কোটি মানুষের মুখে-মুখে ঐ "হুজ্জৎবাজের" নামকীর্তন হবে এই মহাশ্চর্য সত্য সেই সেদিনকার নরনারী কেউ ভাবতে পেরেছিল?

গড়গড়ার সোনালি নল মুখে সেই বাজারের ঠিক সেই রাস্তাটা তাকিয়ে তাকিয়ে আমি বুক ভরে দেখছিলাম নিঃশব্দে। সেই ছুতোর মিস্ত্রির জন্ম-ভূমিতে বসে। রাস্তাটা এতটুকু বদলায়নি। যদিও এই পথে বিস্তর রক্তারক্তি হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। আজও এই পথে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে তারা যাদের পূর্বপুরুষ তখন যীশুর সময় যেত। যাচ্ছে এখন ভিখিরি কুত্তা গাধা। আর আজও এই রাস্তায় বাইবেলে বর্ণিত টাকার বোঝা "পেট-মোটা" বেনেদের দাপট একরত্তি এতটুকু কমেনি।

কমবারও নয়। শয়তানকে শায়েস্তা করা এক যীশুর কর্ম নয়। সেই যীশুকে এই রাস্তা দিয়ে সেই ঘটনার মাত্র ছ-বছর পরে ওরা ফাঁসিমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল।

পাদ্রীসাহেব কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকালেন, যার মানে, কি উঠবে নাকি?

আমি জানি উনি এখন গির্জায় যাবেন। সেই গির্জায় যেখানে মৃত যীশুর ক্রস আজও আছে, যে ক্রসে পেরেক-গজাল দিয়ে ঠুকে-ঠুকে ওঁকে লটকে দিয়েছিল রোম

"সত্যজিৎ রায় সমসাময়িক শহুরে সমস্যা নিয়ে ছবি তোলেন না— এ ধরনের একটা মতবাদ বাজারে চালু হচ্ছে বলে কানে আসে।"

ছবিবাবু চলে যাবার আগে বুঝতে পারিনি বাংলা ছবি কী বিপজ্জনকভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। আজ যদি কোন গল্প উপন্যাস পড়তে বসে কোন জাঁদরেল জমিদার চরিত্র বা এক ধরনের কেতাদুরস্ত ভারভাত্তিক বাঙালী বা ইঙ্গ-বঙ্গ চরিত্রের সামনে পড়ি, তাহলে অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে মনে মনে বলতে হয় যে এ চরিত্র ছবিতে মূর্ত করার উপযুক্ত কোন অভিনেতা আজ আর বাংলা দেশে নেই। সত্যি বলতে কী এমন একজনও অভিনেতা নেই যাকে দিয়ে ইংরেজীতে যাকে বলে '[illegible]' এমন কোন চরিত্রের রূপ দেওয়ানো যেতে পারে।

তুলসী চক্রবর্তী চলে গিয়েও বাংলা ছবিকে আর আরেকটি দিক দিয়ে কানা করে দিয়ে গেছেন। শুধু কমিক চেহারা থাকলেই ত আর কমেডিয়ান হওয়া যায় না। আকৃতির সঙ্গে একটা বিশেষ ধরনের হাস্যরসবোধ বা কমিক সেন্স ও সূক্ষ্ম অভিনয় ক্ষমতা থাকলে তবেই তুলসী চক্রবর্তীর মত কমেডিয়ান হওয়া যায়। এখানে ভাঁড়ামোর স্থান নেই, যদিও দুর্ভাগ্যবশত এ কাজটাও তুলসীবাবুকে করতে হয়েছিল। একজন বহুগুণসম্পন্ন অভিনেতার কেবল দর্শক-সমর্থিত একটি গুণ বেছে নিয়ে, তাকে সেই ছাঁচে ঢেলে তার পূর্ণবিকাশের পথ বন্ধ করে দেওয়ার তাগাদাটা এদেশে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে এত [illegible] ক্ষেত্রে হয়েছে যে তার ইয়ত্তা নেই। ভাঁড়ামিতেই হোক বা আসল কমেডিতেই হোক, ঠিক তুলসীবাবুর জায়গা নিতে পারে এমন আর কেউ বাংলা দেশে নেই। তাই সাহিত্যের অনেক কমিক চরিত্রের চিত্ররূপ আর সম্ভবই নয়। পথের পাঁচালীই কি আর আজকের দিনে সম্ভব? [illegible] কারণ চুনিবালার মত অভিনেত্রীর আবির্ভাব ত আর দৈনন্দিন ঘটনা হতে পারে না।

এই ত গেল কাহিনী নির্বাচনের পথে বাধা। এ ছাড়া চিত্রনির্মাণের পথে (এবং সেই সঙ্গে কাহিনী নির্বাচনেও) একটা বাধা কিছুদিন হল মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যার অপসারণ কীভাবে হবে তা আমার জানা নেই।

সত্যজিৎ রায় সমসাময়িক শহুরে সমস্যা নিয়ে ছবি তোলেন না—এ ধরনের একটা মতবাদ বাজারে চালু হচ্ছে বলে কানে আসে। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে নাগরিক জীবনের ছবি তুলতে গেলে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে নগরের চেহারাটাকেও ছবিতে তুলে ধরতে হয়। অর্থাৎ সে ছবির কাহিনীকে স্টুডিওর চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী করে রাখা চলে না; মাঝে মাঝে তাকে শহরের রাস্তাঘাটে নিয়ে ফেলতে হয়। নাটকে নেপথ্যে ঘটনার যে রীতি হাজার বছর ধরে লোকে মেনে এসেছে, চলচ্চিত্র একেবারে প্রথম থেকেই সে রীতি বর্জন করেছে। তাছাড়া চলচ্চিত্রে বিশেষ করে আধুনিক সমস্যামূলক কাহিনীতে—বস্তুধর্মিতাই হল শিল্পের রীতি। সুতরাং স্টুডিওতে কৃত্রিম উপায়ে শহরের বাইরের চেহারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই ক্যামেরা নিয়ে রাস্তাঘাটে বেরিয়ে শুটিং করা ছাড়া কোন উপায় নেই। গত পাঁচসাত বছরের মধ্যে একাধিকবারও যিনি এ কাজ করতে চেষ্টা করেছেন, তিনিই জানেন এটা কী দুরূহ কাজ।

আসলে, ছবি তোলার কাজটা পরিচালক ও তার কর্মিবৃন্দের কাছে একটা শিল্পকর্ম হলেও, যারা বাইরে থেকে সে কাজটা দেখেন, তাদের কাছে সেটা একটা তামাশার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। তার উপরে যদি সে তামাশায় কোন জনপ্রিয় অভিনেতা অংশীদার থাকেন তাহলে ত সোনায় সোহাগা। বিনি পয়সায় Open air Theatre দেখার লোভ সামলাতে কে? কাজেই শহর বা শহরতলির [illegible]

এই ভীড়ের লোক যে শুধু শুটিং দেখতেই আসে তা নয়। যে দৃশ্যটি তোলা হচ্ছে তাতে অংশ গ্রহণ করার বাসনাও এঁদের অনেকেই পোষণ করেন। এখানে অংশ গ্রহণ বলতে বোঝায় ক্যামেরার একবার মুখটি দেখানো। যাঁরা এটা করেন, তাঁরা অবশ্য এই ভেবেই করেন যে, সে-মুখ তাঁরা আবার প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় দেখতে পাবেন। বার বার বলেও বোঝাতে পারিনি যে, এ সৌভাগ্য তাঁদের হতে পারে না। কারণ ছবির কোনো দৃশ্যেই অবান্তর কোন কিছুরই স্থান হতে পারে না।

বিদেশে যখন রাস্তাঘাটে শুটিং হয়, তখন কৌতূহলী জনতাকে কাজের গণ্ডির বাইরে রাখবার কাজে পুলিস সাহায্য করে। এদেশে পুলিশের ব্যবহারে যে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাটাই বেশি সেটা বলাই বাহুল্য। প্যারিসে নিউ-ওয়েভ পরিচালকদের দৌলতে বেশ কিছুদিন থেকেই শহরের যত্রতত্র শুটিং-এর রেওয়াজ চালু রয়েছে। সেখানে সাধারণ লোকে এতে এমনই অভ্যস্ত এবং হয়ত এ কাজে ভীড় করে ব্যাঘাত করলে কী-জাতীয় ক্ষতি হতে পারে সে-সম্পর্কে এত সচেতন যে, ভীড় সেখানে জমেই না। Champs-Elysee'র মত রাস্তায় নির্বিঘ্নে শুটিং চলতে দেখেছি; আশেপাশে মাথা ঘুরিয়ে পুলিসের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাইনি। জনসাধারণের এ মনোভাব এদেশে স্বপ্নের বাইরে।

'চিড়িয়াখানা' ছবির জন্য শহর থেকে বেশ কিছু দূরে গ্রামাঞ্চলে গোলাপ কলোনির সেট তৈরি করে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করার কথা ভেবেছিলাম। যতদিন বাগান তৈরি হয়েছে, ঘর বসেছে, পাঁচিল উঠেছে, ততদিন কোন উৎপাত হয়নি। শুটিং আরম্ভ হবার পর দিন থেকে ট্রেনে করে বিভিন্ন জায়গা থেকে কমপক্ষে [illegible] লোক দুপুর নাগাদ কলোনীতে এসে পাঁচিল ও তার পিছনের অশথগাছের ডালে চড়ে বসে তামাশা দেখা শুরু করেছে। সারা দুপুর [illegible] করে বসে থেকে, [illegible] কিছু না করেও কাজের অপরিসীম ক্ষতি করেছে, তারপর বিকেলে রোদ পড়লে পর গাছ থেকে পাঁচিল থেকে নেমে আবার স্টেশনের দিকে ফিরে গেছে। কীভাবে কাজ হয়েছে তা আমরাই জানি, এবং এটাও জানি যে যতদিন না বাংলাদেশের শহরের লোক ছবি করিয়েদের সুখ-সুবিধের কথা একটু চিন্তা করবেন, এবং চিত্রনির্মাণের প্রচণ্ড অর্থ ও শ্রমব্যয়ের দিকটা উপলব্ধি করবেন, ততদিন—আর যাই হোক—আধুনিক নাগরিক জীবন নিয়ে সার্থক ছবি তোলা সম্ভব হবে না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

‘অপরিণত বয়সের ঔদ্ধত্যের জন্যে কিনা জানি না, কুণ্ঠিতভাবে আজ স্বীকার করছি যে প্রচুর ঢক্কানিনাদ, সত্ত্বেও সে-যুগের অসামান্য চিত্র-কীর্তিগুলি দেখে ঈষৎ অনুকম্পা-মিশ্রিত কৌতুকই তখন অনুভব করেছিলাম।’

Consider what such artists as Michaelangelo, Riviera, Tolstoy & Balzac, could have done with the sound-colour Cinema.' They would one and all, I think, have cried to the heavens : Here is the medium I was striving to create. Here is the dynamic flow of world and mind, here is both past present and future, space and time, colour and sound, mind and matter fused into one unity ! Here is the answer to the cry of chorus in Shakespeares' Henry V : "Oh for a muse of fire that would ascend the brightest heaven of invention !"

সিনেমা শিল্প সম্বন্ধে [illegible] [illegible] একটি বই-এর ভূমিকায়।

ছবির সেকাল একাল

বেলা বালাংস-এর নাম আজকাল কজন মনে রেখেছেন জানি না। কিন্তু সিনেমা-শিল্পের বিবর্তনের আদি যুগে স্রষ্টা হিসেবে না হোক তাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর সমাদর সার্জেই আইসেনস্টাইন-এর চেয়ে অল্প ছিল না। ফিল্মের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে ইওরোপের বিদগ্ধ চিন্তাশীলদের মধ্যে তিনি একজন নমস্য অগ্রপথিক। বেলা বালাংস সিনেমা শিল্পের অনন্যতা ও অসীম সম্ভাবনা সম্বন্ধে যখন দিব্যদৃষ্টির ভবিষ্যৎবাণী করছেন, তখন বাংলাদেশে দূরে থাক ইংলণ্ড আমেরিকাতেও তাঁর কণ্ঠস্বর পৌঁছোয়নি। ১৯২২ খৃস্টাব্দেই বেলা বালাংস দৈনিক কাগজে নিয়মিতভাবে এক কলম করে যে ধরনের ফিল্মশিল্প আলোচনা শুরু করেছিলেন ইংলণ্ড-আমেরিকায় তা তখনো অভাবিত।

বেলা বালাংস জার্মান ভাষাতেই তাঁর রচনা প্রকাশ করেন বলেই যে, এমনটা ঘটেছে তা নয়। আসলে সিনেমার শিল্প-মূল্য সম্বন্ধেই ইংলণ্ড-আমেরিকার ইংরাজী ভাষী জগৎ তখন বেশ কিছুটা অচেতন ছিল বলা চলে।

সেখানেই যখন এই অবস্থা তখন বাংলাদেশে তথা ভারতে সিনেমা সম্বন্ধে মনোভাবটা কিরকম ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়।

উপভোগ্য অভিনব প্রমোদ উপকরণ হিসাবে ছায়াছবি তখন এ দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিদেশী মানে ইংরাজী ছবির আমদানি প্রচুর। সেই সঙ্গে দেশীয় উদ্যোগে হিন্দী ও বাংলা ছায়াছবি নির্মাণও শুরু হয়েছে। কিন্তু ছায়াছবির মধ্যে মহৎ শিল্পের সম্ভাবনা এদেশে নির্মিত ছবি-গুলির ভেতর তখন অন্ততঃ সম্পূর্ণ অকল্পিতই ছিল।

বিলাতী ছবিও প্রথম এদেশে যা এসেছে তা অধিকাংশই মারামারি কাটাকাটির উত্তেজনামূলক রোমাঞ্চকর সস্তা সিরিয়াল। ছায়াছবির মাধ্যমে অসামান্য মহৎ কিছুর যে সৃষ্টি হতে পারে আমেরিকা থেকে গ্রিফিথ ও চার্লি চ্যাপলিন-এর ছবিগুলি আমদানি হবার আগে তার চাক্ষুষ প্রমাণ অন্ততঃ পাওয়া যায়নি।

পড়াশুনার মারফৎ ছায়াছবির ক্ষেত্রে রাশিয়ার বিশেষ পরীক্ষানিরীক্ষার কথা অবশ্য বিদগ্ধ সমাজের কেউ কেউ তখন জেনেছেন। আইসেনস্টাইন পুডভকিন-নাম তখন একেবারে অজানা নয়। কিন্তু তাঁদের চিত্র-সৃষ্টির নমুনা দেখবার সৌভাগ্য এদেশে হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পূর্ণ হবার আগে রাশিয়ান ছবি সম্বন্ধে ত নয়ই ইওরোপের অন্যান্য দেশের চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও এদেশের সাধারণের কাছে কোনো খবরই পৌঁছোয়নি বললে হয়।

সে বিষয়ে কোনো উৎসাহও কোথাও ছিল বলে অন্ততঃ মনে পড়ে না।

সিনেমা-সাপ্তাহিক বলে এক বিশেষ ধরনের পত্রিকা সেই তখনই বোধহয় সবে দেখা দিয়েছে। তাতে ছায়াছবির জগতের মুখরোচক সংবাদ ও মনোহর ছবির প্রাচুর্য থাকলেও এ শিল্পতত্ত্ব নিয়ে মৌলিক আলোচনার বালাইও দেখা যায়নি।

হিন্দী ও বাংলা চিত্রশিল্প ব্যবসায় হিসাবে তখনই কিন্তু বেশ ফাঁপতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান তখন বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই ছবি নির্মাণ করে এ শিল্প ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত।

অপরিণত বয়সের ঔদ্ধত্যের জন্যে কি না জানি না, কুণ্ঠিতভাবে আজ স্বীকার করছি যে প্রচুর ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও সে যুগের সেই অসামান্য চিত্রকীর্তিগুলি দেখে ঈষৎ অনুকম্পা মিশ্রিত কৌতুকই তখন অনুভব করেছিলাম।

সাহিত্যে শরৎচন্দ্র যখন পথের দাবী লিখছেন, রবীন্দ্রনাথের কলমে যখন যোগাযোগ শেষের কবিতা লেখা চলছে, সে যুগে চণ্ডীদাস কি দেশের মাটি কি দিদি নিয়ে

......আধুনিকতার বাতুল বাহাদুরীর চেয়ে আমি নিজে অন্তত সে যুগের 'দেশের মাটি' কি 'মুক্তি' সাতবার দেখতে প্রস্তুত।

উৎসাহিত বোধ করতে না পারাটা খুব বড় অপরাধ বোধহয় নয়। যত দূর মনে পড়ে চণ্ডীদাসে রামীর পেছনে লাঠিয়ালদের ছোটাছুটি দেখে আক্রোশটা যেন বৈষ্ণব কবিতার ওপরই বলে অনুভব করেছিলাম। দেশের মাটিতে রাঢ়দেশের রুক্ষ বন্ধ্যা বন্ধুর প্রান্তরের গ্রামে মাঝে মাঝে অবাধে নারিকেল-কুঞ্জের দৃশ্য উপস্থিত হতে দেখে ভৌগোলিক ও উদ্ভিদবিদ্যার ভোজবাজিতে বিমূঢ় হয়েছি।

ছবির জগৎ খানিকটা ছেলেখেলার বলে মনে করবার প্রবণতা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সেখানে চমকে দিয়ে বিহ্বল করবার মত কিছু পাইনি এ কথাও সত্য নয়।

চণ্ডীদাস ও সোনার সংসার যদি তৃপ্তি না দিয়ে মনকে বিরূপ করে থাকে, সেই একই প্রণেতার সৃষ্টি নর্তকী দেখে কাহিনীর বিশেষত্বে ও তা বিন্যাসের সূক্ষ্ম গভীরতায় বিস্মিত অভিভূত হয়েছি।

নর্তকীর মত ছবি তখন কিন্তু একান্ত বিরল। ছবিটি জনপ্রিয় বোধ হয় হয়নি। সেই কারণেই হয়ত এ ছবির দেশের সেকালে দেখা হয়নি বললেই হয়।

সেযুগ থেকে এ যুগে ছায়াছবির আঙ্গিক পরিবর্তন যা হয়েছে, তা প্রায় কল্পনাতীত। নির্বাক ছবি সবাক হয়েছে তা অনেক আগেই। তারপর তার যবনিকা বিস্তৃত হয়েছে। রঙও ফুটেছে অঢেল। প্রয়োগ কৌশলে চিত্রগ্রহণের উপকরণে সম্পত্তিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সে পাল্লা রেখে চলেছে।

উপকরণের এই প্রাচুর্য, নির্মাণ কৌশলের এই পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও আধুনিক কালে চিত্র-শিল্পের সত্যকার বিবর্তন কিছু হয়েছে কি?

বেলা বালাজস যা বলেছিলেন এ যুগের সেই মহত্তম শিল্প স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য নিজস্ব মাইকেল এঞ্জেলো, টলস্টয় কি পেয়েছে?

পেয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সিনেমাজগতে বর্তমানে সদম্ভে যাদের নামকীর্তন চলেছে, তাদের মধ্যে সেসব স্রষ্টাদের খুব কম জনকেই পাওয়া যাবে।

সিনেমা-শিল্প এক দিক দিয়ে আদি-কালের মত তামাসার যোগানদার আর চারণ কথকের বদলী হয়েই আছে। তার এ ভূমিকা কিছু দোষের নয় এ ভূমিকার প্রয়োজনও আছে। পালাগান আর কথকতার আসরে যাত্রায় আর রঙ্গমঞ্চে মানুষ যে ক্ষুধার তৃপ্তি খুঁজে এসেছে, সিনেমা তা মেটাবার ভার নিয়েছে আরো পারপূর্ণভাবে।

এ ক্ষুধা নিছক গল্পের ক্ষুধা নয়,

কাপুরুষ

শিল্পমূর্তিতে জীবনকে প্রক্ষেপ করে তার ভয়াল মধুর রহস্য-মহিমা উপলব্ধি করার ক্ষুধা।

সত্যি কথা বলতে গেলে এ ক্ষুধা থেকেই সমস্ত শিল্পের জন্ম। শুধু তাই নয়, এ ক্ষুধা একান্তভাবে মেটানোতেই সমস্ত শিল্পের সার্থকতা।

সমস্ত শিল্পই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিমূর্ত বিশুদ্ধতায় পৌঁছোতে চায় হয়ত, কিন্তু বিমূর্ত বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও মানুষের মনের গড়নের ছন্দে বাঁধা।

মানুষের মনের এ ক্ষুধার অমার্জিত স্থূল প্রকাশ অবশ্য আছে এবং তা সিনেমার দ্বারা মেটাবার ব্যবস্থা একটা লাভের ব্যবসা যে হয়ে উঠেছে, হলিউড আর বোম্বাই থেকেই তার যথেষ্ট প্রমাণ মিলবে।

হলিউড কি বোম্বাই-এর সিনেমার ব্যবসা সম্বন্ধে বিরূপ হবার যদি কারণ থাকে, তাহলে সিনেমাশিল্পের আধুনিক চরমোৎকর্ষের নিদর্শনগুলি সম্বন্ধেও উৎসাহিত হবার কিছু আছে বলতে বাধছে।

আধুনিক সিনেমার আলোচনায় কয়েকটি বুলি যেমন তোতাপাখির মত কপচানো হয়, মুখে মুখে জপ করা হয়, তেমনি কটি নাম।

একটি নামই তার মধ্যে বেছে নেওয়া যাক্। ইঙ্গমার বার্গম্যান। বিশ্ববিখ্যাত নাম। এ-নাম উচ্চারণ করতে বিশেষ এক উচ্চস্তরের সিনেমা-সমঝদারদের কণ্ঠ গদগদ হয়ে আসে।

এই বিখ্যাত সুইডিশ চিত্র-স্রষ্টার ছবি এ দেশের কোন ফিল্ম সোসাইটির উৎসাহে যদি কোথাও দেখানো হয়ে থাকে, তার দর্শক হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

আমি শুধু তাঁর কয়েকটি চিত্র-সৃষ্টির কাহিনী ও একটির চিত্রনাট্য পড়বার সুযোগ পেয়েছি। কাহিনীগুলি বা চিত্রনাট্য পড়ে চিত্র-সৃষ্টি বোঝার চেষ্টা যে স্বরলিপি পড়ে গানের বিচারের মত, তা আমি জানি না এমন নয়, তবু চিত্র-বিবরণ ও চিত্রনাট্য থেকে চিত্র-স্রষ্টার শিল্প-দৃষ্টির কোনো আভাসই পাওয়া যায় না, এ কথা আমি মানতে রাজী নই।

ইঙ্গমার বার্গম্যান চিত্র-শিল্প দিয়ে কি করতে চান, তার হিং টিং ছট্ নানা দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। সে ব্যাখ্যা বোঝার ক্ষমতা থাক বা না থাক, তাঁর প্রক্রিয়ায় অস্পষ্টতা কিছু নেই। সে প্রক্রিয়া অভিনব এবং তাঁর প্রত্যেকটি চিত্র-সৃষ্টিতেই এক। জীবনের গহন মর্মোদ্ঘাটনের একটিমাত্র উপায় আছে বলে তিনি মনে করেন নিশ্চয়। সে উপায় হল, বিকৃত অসুস্থ যৌন-প্রবৃত্তির তাড়নাকেই সব চিত্র-সৃষ্টিতে অনুসরণ করে চলা। ভিন্ন ভিন্ন ছবিতে এ প্রবৃত্তির ভিন্ন প্রকাশ আছে মাত্র, কিন্তু কানু ছাড়া গীত নাই। সব ছবির বিষয়ই অসুস্থ অস্বাভাবিক যৌনতা। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে যে, তাঁর আধুনিকতম ছবি সাইলেন্স-এ বার্গম্যান শুধু যৌনতার ইঙ্গিত পর্যন্ত এসে থামেননি, সত্যিকার যৌনসঙ্গমের দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে দেখিয়েছেন।

এ সংবাদ অবিশ্বাস করবার মত কিছু নয়। পশ্চিমের তথাকথিত অগ্রসর শিল্পী-

সমাজে আধুনিক শিল্পোৎকর্ষের প্রমাণই হ'ল বিকৃত যৌন-তন্ময়তা। শুধু সিনেমায় নয়, তারও অনেক আগে থেকে সাহিত্যে সংক্রামকভাবে এই উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছে। কে কতদূরে গা-বিড়িয়ে তোলা যৌন-কল্পনায় পৌঁছাতে পারে, পাল্লা চলেছে তারই। সে পাল্লায় রিজিৎ বার্দোতের ভূতপূর্ব স্বামী পরিচালক ভাদিম যদি নগ্ন নায়িকার মধ্য-কটিতে টেলিফোন রেখে নায়কের আলাপের দৃশ্য তুলতে পারে, তাহলে চিত্র-শিল্পের যুগাবতারদের আরো উগ্র কিছু না ভাবলে চলবে কেন?

কি সাহিত্যে, কি রঙ্গমঞ্চে, কি সিনেমায় অগ্রগতির লক্ষণ হিসেবে যৌন চিন্তাই সার করার যে আস্ফালন সর্বত্রই আজ সংক্রামক হয়ে উঠেছে, তা দেখে একটা উল্টো সন্দেহই কিন্তু জাগে।

জীর্ণ করবার শক্তি হারিয়ে ক্ষুধামান্দ্যে যে ভোগে আহারে রুচি বাড়াতে রসনায় তার স্বাভাবিক অস্বাভাবিক মশলার উত্তেজনার প্রয়োজন হয়। সাহিত্যে শিল্পে যৌনতার এই বীভৎস উন্দামতা, প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের যুগের যান্ত্রিক কৃত্রিমতার পীড়িত কিছু পৌরুষ-হারা হতভাগ্যের নপুংসকতার লক্ষণ নয় ত?

উদ্ধত আস্ফালন কি আসলে করুণ

ইঙ্গমার বার্গম্যান

প্রচ্ছন্ন হাহাকার?

তা না হলে, জীবনের রূপায়ণে চিত্রায়ণে যৌন-কেন্দ্রটুকুর বাইরে দৃষ্টি দেবার নেই, এ মনোভাব ত সুস্থ সম্পূর্ণ মানুষের হবার কথা নয়।

এ যৌনতাবিলাস সৃষ্টিমূলক উদ্ভাবনের দৈন্য ঢাকবারও একটা সুলভ ছল। বিকৃত স্থূলে যৌন চিন্তাই সার করবার জন্য জড়ভরতের বুদ্ধি আর কল্পনাশক্তিও যথেষ্ট।

রুগ্ন বিকৃত মানসিকতার এ সংক্রামক জড়ত্ব শিল্পের নবমুক্তির নামে সারা পৃথিবীতে আজ ছড়াতে চলেছে। এ সংক্রমণ থেকে আমরাও নিরাপদ নই। সেন্সারের বাঁধাইটুকু না থাকলে সাহিত্যে যেমন সহসা এক্‌জিস্‌টেন্সিয়ালিজ্‌ম্‌-এর দূত সার্ত্রে দের উদয় হয়েছে সিনেমাতে তেমনি ইঙ্গমার বার্গম্যানদের ছড়াছড়ি দেখা যেত।

যৌন বিষয় নিয়ে মাতামাতি অবশ্য অধুনাকাল সিনেমাজগতের সর্বত্রই চালু। আমেরিকায় ও কিছুটা ইংল্যাণ্ডে টেলিভিশনের প্রতিযোগিতায় হালে পানি পাবার জন্য সিনেমাকে নোংরা যৌনতার ধোঁয়া তুলে মজতে হয়েছে। যৌন দৃশ্য [illegible] দেখাবার এখনো সেখানে বাধা আছে, তবু সিনেমা এই সুযোগটুকু সদ্ব্যবহার করতে তৎপর। এ বিষয়ে জাপানই সবচেয়ে অকপট। সিনেমার সত্যিকার শিল্প-সৃষ্টিতে অনেক ঝামেলা। সব উপাদানই সেখানে উঁচুদরের হওয়া চাই তাতেও ব্যবসায়িক সাফল্য অনিশ্চিত।

জাপান তাই অতি সস্তা যৌনতার ঝাঁঝালো ছবি নির্মাণে উঠে পড়ে লেগেছে। এ সব ছবিতে বড় দূরে থাক, মাঝারি গোছের অভিনেতা অভিনেত্রী কি পরিচালকেরও দরকার নেই। গল্প মামুলী ছকে বাঁধা। শুধু সুগঠিত দেহের কিছু মেয়ে-পুরুষ থাকলেই হল। এ সব পুতুলে ধরচ যৎসামান্য, লাভ প্রচুর। ... [illegible] এসব ছবি, হিং টিং ছট শিল্পমন্ত্রের বুলি কপচে মহৎ সৃষ্টি বলে জাহির করবার ভণ্ডামিটুকু থেকে [illegible] মুক্ত।

সিনেমায় সত্যিকার মহৎ সৃষ্টি তা বলে [illegible] একেবারে অসম্ভব [illegible] হলে অসুস্থ [illegible] গভীর জীবনবোধ যে পাবার নয়, তা প্রমাণ করে, অপুর সংসার কি নায়ক-এর মত ছবি বিশ্বের রসিক সমাজের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেত না। পশ্চিমের সংক্রামক বিকার মত্ততার বিরুদ্ধে এসব চিত্র-সৃষ্টি এ দেশেরই নির্ভীক বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ, এইটিই আমাদের সবচেয়ে আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

মহৎ শিল্প সৃষ্টি অবশ্য কোন কালে ও দেশেই সুলভ নয়। বালিকা বধূর মত ছবি দেখে গভীর আশা নিয়ে এ শিল্প-সৃষ্টির জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবার অবসরে একটা অতি সহজ কথা বোধ হয় মনে রাখলে ক্ষতি নেই। কথাটা এই যে, নাকামির চেয়ে বোকামি সব সময়ে ভালো, অবাচীনের ভণ্ড ভড়ং-এর চেয়ে অগ্রপথিকের আনিপুণ আন্তরিকতা। বিদেশী কটা নাম আর বুলি কপচানো আধুনিকতার বাতুল বাহাদুরীর চেয়ে আমি নিজে অন্তত সে যুগের দেশের মাটি, কি মুক্তি আবার দেখতে প্রস্তুত।

সত্য বটে, চিত্র-দেবীর গর্ভে,
সাহিত্যের ঔরসে চলচ্চিত্র নামক
সন্তানটির জন্ম, কিন্তু —
ফ্রয়েডের মুখে ফুলচন্দন —
বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েই সন্তানটি
পিতার প্রভাবকে ফুৎকারে
উড়িয়ে দিতে প্রয়াসী,
এমন-কী একরকম পিতৃদ্বেষী।

দেখায়,

লেখা ধরছি, ছাড়ছি, ছেড়ে ফের জাপটে ধরছি, সে আর ক' বছরের ব্যাপার বা, ছবি দেখছি তার ঢের আগে থেকেই।

সেই সেকালে অবশ্য ছবির মানে আলাদা ছিল। ফ্রেমে বাঁধানো, একেবারে পটে লিখা; নয়তো বর্ণ-মালার বই-টইয়ে নানা বর্ণে ছাপা। পুষ্প, পক্ষী, বৃক্ষ, পর্বত, নিসর্গ ইত্যাদি। ছা-পোষা ঘরের মফস্বল পূর্ব-বাংলার ছেলে, অনেক কাল পর্যন্ত পাহাড়, পাথার ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখিনি তো। ছাপা ছবি দেখে দেখে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতুম।

সেই ছবি চালিয়ে আগেই হয়েছিল. আমি শৈশবের বেড়া টপকে বাল্যের বাগানে লাফিয়ে পড়তে না পড়তে বায়োস্কোপ-বইয়েও ছল। আমরা বলতুম 'টকি'। বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভেসে যায়—টকিও তৎকালে ছিল সেই জাতীয় বিস্ময় যা দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।" সায়েন্সকে আর্ট তল্পিদারির কাজে লাগিয়েছে, সবাক ছবির এই অবাক ব্যাপারে হর্ষ-পুলক-রোমাঞ্চ ইত্যাদি সব পেয়ে যেতুম।

আর কী? তখনও রসবোধ ছুরিতে কাটা পেনসিলের শিসের মত এত সূক্ষ্ম হয়নি মশাই যে, ছবিতে দ্বিমাত্রাতিরিক্ত কোনও তাৎপর্যের আস্বাদ পাব। এখন তো শুনি, চোখ আর কান এই দুটি ইন্দ্রিয় নিয়তই হাত বদল করতে পারে, চোখ বুজে অনেকে প্রভূত সঙ্গীতের মূর্ত রাগ প্রতিমা প্রত্যক্ষ করেন, আবার অনেকে চিত্রার্পিত নির্ঝরেরও কলধ্বনি কান পেতে শুনতে পান। রূপ-সাগরে ডুব দিতে জানলে এমন কত শত অরূপ বস্তুতে মন উছাপিয়ে যায়, না জানি। সাতটি সুর আর সাতটি রঙে তফাত থাকে না। প্রত্যহ সূর্যের উন্মীলনে-নিমীলনে নাকি অনাহত সুরমূর্ছনা মহাকাশ ব্যেপে কেঁপে কেঁপে বিস্তারিত হয়ে যায়।

কিন্তু তৎকালে চলচ্ছবিতে পেতে চাইতুম গল্প, স্রেফ গল্প। মোটা দাগের মোটা রুচি ক্ষীণ সুরের চেয়ে পুরুষ্টু উরু-টুরুর দিকেই বেশি নজর দিত। রমা আর রমেশ তারকেশ্বরের ঘাটে, নিকষিত হেম-প্রেম রজকিনী তার ধোবার পাটে—বলুন তো কী?—হৃদয়টাকে আছড়াত। গল্প—ছবি—ছবি—গান—সব একাকার একাত্ম।

(২)

এ কালে ছবি দেখার কদরটি বুঝতে পারি, দস্তুরমত শক্ত। খালি একটা ফ্রী-পাস বা টাকা-তিনেকের একটি টিকিটের কাউন্টার-

ভেবেছি, কক্খনোই মেলে না। চান্স পেলে আমি, এবং আমার মত অনেকেই, রেজো-রেকসন থেকে শেষের কবিতা অন্য উপ-সংহারে পৌঁছে দিতে রাজী আছি।

আবার এ-ও হয়, ছবি দেখতে বসে আমার মনের আনাদের সঙ্গে মনগড় মেলেই। অনেক বা ভিন্ন ভাবে যে ছবি এঁকে রেখেছি, যে ব্যক্তিত্বে তাদের কাবিশি মণ্ডিত, দৃশ্যপটে হুবহু সেই রূপ না ঘটলে নিরাশ হই, বাধা পাই। ভুলে যাই পরিচালক না অভিনেত্রীর মনেও তো আলাদা একটা আলেখ্য থাকা সম্ভব, তাঁরা হৃদয় থেকেই ফুটিয়েছেন। এই ছাত্রীর স্বাধীনতায় আপত্তি তোলার কোনও এখতিয়ার নেই। এটা আমাদের অন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ।

তৃতীয়ত, আমি এবং আমার মত রসিকম্মন্যেরা যা-নেই, বা যা নয়, তাও দেখি। একটি তাৎক্ষণিক দৃশ্যকে ব্যাখ্যায় ব্যাপ্তি দিই, সামান্য একটি প্রতীকের মাথা-ঘামানো তাৎপর্য খুঁজি। বড় বড় কবিদের নিয়ে পন্ডিতেরা যে-মারজে যান্ হেইও করেন, বিলকুল তাই। যে-সব গূঢ় অর্থ ঘোষণা করি, তার অনেকটাই হয়ত আরোপিত, নিরীহ-নিরপরাধ পরিচালক ভদ্র-লোকের চিন্তার চৌহদ্দির মধ্যেও হয়ত তা ছিল না।

(৪)

আমার অন্তিম নিবেদনে এবার প্রথম বক্তব্যের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। চলচ্চিত্র সাহিত্যের পিতৃগৃহ হতে সরে গিয়ে সবল সাবালক হতে চায়, বলেছি। সেই তো উত্তম। তাহলে আত্মসম্মানবোধ ওকে পৈতৃক মাসোহারা ফিরিয়ে দেবার মত মনের জোরও যেন দেয়। আলাদা থাকবে, আবার মাসোহারাও নেবে, এই দুই চাই টাকাও খাই আবদার মানায় না। বিশেষত ফিরে ফিরে এসে সে যেন অন্তত পৈতৃক সম্পত্তি তছনছ না করে। দেশে দেশান্তরে বহুমান্য পরিচালকেরা ইদানীং আপন দর্শন আর দৃষ্টিভঙ্গি আর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপন কাহিনী আপনি উদ্ভাবন করে থাকেন। "ক্যামেরার কালিদাসটাস" জাতীয় খেতাব কেউ যদি পান, পত্রপাঠ তা প্রত্যাখান করাই ভাল। কাউকে কি আমরা "স্টেজের তানসেন বা বীটোফেন" বলি?

এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সূক্ষ্মতায় বা দূরূহতায় বাংলা কাব্য যেখানে পৌঁচেছে, বাংলা কথা বা কাহিনী সেখানে পৌঁছয়নি। তেমনই দুঃসাহসী পরীক্ষায় কথা ও কাহিনী যতটা এগিয়েছে, বাংলার চলচ্চিত্র ততটা হয়ত যায়নি। এ নিয়ে কোনও নালিশ নেই। কারণ চলচ্চিত্র একটি মিশ্র আর্ট, আমরা জানি। বহুর প্রয়াসে, পরিশ্রমে বহু অর্থে প্রস্তুত চলচ্চিত্রে যে-ব্যবসায়িক ঝুঁকি, ছন্দে গাঁথা বাণী বা কথায় গাঁথা কাহিনীতে তা নেই। সুতরাং কিছু আপসকে, অন্তত এ দেশে, অবশ্যম্ভাবী বলে অভিমানী লেখকেরা যেন মানি।

অনেক লেখকেরই এ-নিয়ে খুব খুঁত খুঁত, তাই কথাটা তুললুম। যদি জানতে চান, নিজের গল্প পরদায় দেখতে কেমন লাগে? তবে জনান্তিকে আমার জবানী: চিত্রস্বত্ব যখন বেচলুম, তখনই তো দত্তক দিলুম। দত্তক পুত্র "বাবা" বলে ডাকে না কেন, আমার পদবী ধারণ করে না কেন, এই ক্ষোভকে মনে মনে তা দিয়ে আর লাভ কী?

গংগা

বলেই ভাল কি না জানিনে, তবে একটু বস্তাপচা গন্ধ লেগে থাকে। অবিশ্যি ফিল্‌ম্‌ মেকাররা নিজস্ব লেখকদের গায়ে এই বিশেষণই দিতে চান, কিন্তু মজার নেই, কারণ তাঁদের জিনিসকে তাঁরা গলায় কাটবেন না ল্যাজে কাটবেন, তাঁদেরই বিচার্য।

বিষয়টা যে অযৌক্তিক নয়, তার প্রধান কারণ, কোন লেখকের গল্প নিয়ে ছবি করলে, প্রায়শই একটা বিতর্ক শোনা যায়, বইয়ে ঠিক যা ছিল, ছবিতে তা নেই কেন। কেন থাকে না, তার কারণ বহুবিধ এবং সাহিত্যের রূপকে যখন ছবির (ফিল্মের) রূপে উপস্থিত করতে হয়, তখন দুটি শিল্প রীতির প্রকাশ একইরকম হতে পারে না। অথচ ছবির উদ্দেশ্য, বিশেষ একটা গল্পকেই ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা। আমি জানিনে, ঠিক এই জন্যেই বিদেশের ছবির টাইটেলে 'based' শব্দটির আবির্ভাব কি না। এবং কার্যতত্রে আমাদের দেশেও, 'অবলম্বনে' শব্দটি ব্যবহার হয় কি না। এই সঙ্গে এটাও ভেবে দেখা যেতে পারে, এরকমভাবে বললে আমাদের চিত্রনির্মাতাদের কোনরকম মর্যাদাহানি বা মহিমা খর্ব হয় কি না।

এ কথাগুলো অবিশ্যি প্রসঙ্গক্রমেই এল, যদিচ স্বক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু যে কথা বলছিলাম, কোন কোন সময় কিছু না বলে পারা যায় না। খুশি বা বিরক্ত হলে নয়, অনেক সময় মর্মাহত এবং উত্তেজিত হয়েও কিছু না বলে থাকা যায় না। তাতে লোকসান বই লাভ নেই, তথাপি বলতে হয়।

একটা কথা না বললেও চলে শিল্পের যে-দুই শাখিক নিয়ে প্রসঙ্গের অবতারণা, তাদের বয়সের তফাত হাজার বছর। কেবল হাজার নয়, হাজার হাজার। লিপি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, ভাষা এক শব্দহীন জগতের জন্ম দিয়েছে, যার নাম সাহিত্য। তার একজনের বয়স কয়েক দশক। টেকনোলজির উন্নতির সঙ্গে ধাপে ধাপে তার বিকাশ। দুজনকে দাঁড়িয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই, আর আমি বিশ্বাসও করিনে, দুয়ের মধ্যে কোন বিবাদ আছে। এমন কি, এ কথাও মনে হয় না, ছবি, সাহিত্যিকের গল্পের কাছে বিশেষভাবে নির্ভরশীল। একটা গল্পের অবলম্বন তার দরকার। তা সাহিত্যিকের বিশেষ কোন গল্প হতে পারে, নাও হতে পারে। সে নিজেও তার গল্প তৈরি করে নিতে পারে এবং তাতেও আমরা যাকে উচ্চমানের ছবি বলি সেরকম ছবি তৈরি হতে পারে। আমার ভাবনা ধারণা তো এইরকমই। তবে, অবিশ্যিই এ প্রসঙ্গে আমি বহু চলচ্চিত্র-পরিচালকদের কথা বলছি না, যারা গণ্ডায় গণ্ডায় ছবি করে এবং গল্প তৈরি করে দেন।

তবে গল্প জিনিসটি যেহেতু সাহিত্যিকেরই কাজ, যেহেতু তিনি জানেন গল্প লেখা কী কাকে বলে এবং গল্প লিখতে তিনিই পারেন, সেই হেতু স্বীকার করতেই হবে, ভাল গল্প একমাত্র তাঁদের কাছেই পাওয়া যেতে পারে। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক যে যা-ই বলুন, আমার ধারণা, ছবির কথা যখন উঠবে তখন আর গল্পের জন্য ছবি নয়। ছবির জন্যেই গল্প। চলমান ছবিই যেখানে আসল, ছবিই তখন তার নিজের মত করে গল্প বলে।

এই সব ধারণার পর, বলতে পারি আমি যখন ছবি দেখি তখন শুধু ছবিই দেখি। তখন সাহিত্যের কথা আমার মনে থাকে না। এমন কি, মনে রাখতে চাই না, কার গল্প, কোন গল্প। তখন, ছবিটা কেমন, দৃশ্য-আলো-ছায়া-শব্দ-সঙ্গীত, এ সবের মধ্যেই ডুবে থাকি। আস্তে আস্তে, কীভাবে ছবির ভিতর দিয়ে একটা গল্প ফুটে উঠতে থাকে, পরিণতির দিকে যেতে থাকে, চরিত্র-

বিমল কর

'আজকাল সাহিত্যকেও সিনেমার টিকিট কেটে পড়ে নেওয়া হচ্ছে—'

লেখা আর ছবি

"মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, সাহিত্য বনাম ছবির ঝগড়াটা বাড়াবাড়ি।"

অনেকদিন আগে একবার, শীত যায় বসন্ত আসছে এমন এক দিনে, শেষ বিকেলে অফিসের কাজ সারতে সারতে জানলার বাইরে তাকিয়ে সাধারণ একটি দৃশ্য দেখেছিলাম : আসন্ন সন্ধ্যার দৃশ্য। কবরখানার গাছের মাথায় ঝাঁক বেঁধে পাখিরা ফিরে আসছে, বাতাস পাখিরবে ভরা, আলো এত ম্লান যে নেই বললেও চলে, সিসের দাগের মতন একটি রঙ ক্রমশই কালচে জলের মতন হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আকাশ দেখা যায় না, বাতাস ঈষৎ উষ্ণ, অস্পষ্ট কলরবের মধ্যেও কেমন একটা ক্লান্তি ও বেদনা জানলার বাইরে ক্রমেই গভীর হয়ে উঠছে। সেই আসন্ন ও বিষণ্ণ সান্ধ্য মুহূর্তটি দেখতে দেখতে উদাস হয়ে পড়েছিলাম; ইচ্ছে হয়েছিল, বাইরের ওই মুহূর্তটিকে লেখায় প্রকাশ করি। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সেই ছবি ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করতে পারলাম না, বাইরের ওই আঁধারের রঙটি কলমের মুখে এল না; যে বিষণ্ণতা অনুভব করছি তার স্পষ্ট কোনো রূপ নেই, তাকে দেখতে পাচ্ছি না, অথচ মনের মধ্যে তার সঞ্চার বোধ করছি। অবশেষে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে কলম বন্ধ করলাম। পরে আমার মনে হল, ছবি আঁকার হাত থাকলে বাইরের ওই ছবিটি আমি হয়ত অনেক যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারতাম।

এ-রকম সমস্যা অন্য লেখকদের হয় কি না জানি না, হওয়াই সম্ভব, আমার তো প্রায়ই হয়, নিখুঁত ছবির মতন করে একটা কিছু হয়ত ফোটাতে চাই, পারি না। ভেবে দেখেছি, ছবির যেটা ধর্ম ও গুণ ভাষায় তার ইঙ্গিত দেওয়া যায়, ছবির কাছাকাছি যাওয়া যায়, কিন্তু সেই ছবিটি সম্পূর্ণ ফোটানো অসম্ভব। অবনীন্দ্রনাথের লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, অবন ঠাকুর লেখার মধ্যে ছবি ফোটাতে পারতেন, তবু

অস্বীকার করে লাভ নেই, তুলি হাতে অবন ঠাকুর যা কলম হাতে তা নন।

ভাষার একটা জগৎ আছে যার বাইরে তার পক্ষে যাওয়া মুশকিল, ভাষা যেমন অনেক কিছু পারে আবার অনেক কিছুই পারে না। ভাষার পক্ষে একটি ফুলের বর্ণনা সম্ভব কিন্তু ফুলের রূপ ফোটানো অসম্ভব; ভাষার একটি পাখির ডাক শোনানো যায় বলে আমি মনে করি না। আবার ভাষা যা পারে, ছবি কিংবা গান তা পারে না। সাধারণভাবে আমরা একেই বলি 'লিমিটেসান', সব শিল্পেরই নিজের সাধ্য অসাধ্য আছে, তা নিয়ে লজ্জার বা ঝগড়ার কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হয়নি।

মনে পড়ছে, একবার, আমরা তিন চারজন বন্ধু মিলে শীতের এক রাত্রে সাধারণ এক রেল স্টেশনে আটকা পড়েছিলাম। নির্জন নিরিবিলি স্টেশনের দেড়হাতি মুসাফিরখানায় বসে, প্রায় অন্ধকারে একজন গান ধরেছিল : 'এ পরবাসে রবে কে...!' মাঝরাতে সেদিন ওই গান শুনতে শুনতে যে অনুভূতি হয়েছিল সে-অনুভূতি গানটির ছাপা চরণ পড়ে কোনোদিন হয়নি, হবে না। ভাষা তো একই, তবু পড়ার সময় তার যতটুকু আবেদন, সুরের মিলনে তার শতগুণে বেশি আবেদন। এ নিয়ে আক্ষেপ করা বোকামি।

আজকাল শুনেছি, ফিল্ম বা ছবি আর সাহিত্য নিয়ে নিরন্তর বাগবিতণ্ডা ঘটে। ওদেশেও ঘটে, এদেশেও ঘটছে। বন্ধু-বান্ধবরাও অনেক সময় এই সব তর্কে মেতে ওঠেন। আমি, সত্যিই বলছি, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। শুনেছি, সাহিত্যের যাঁরা গোঁড়া ভক্ত তাঁরা নাকি, সিনেমায় সাহিত্য পড়তে চান; আর সিনেমার যাঁরা গোঁড়া ভক্ত তাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে অস্পৃশ্যতার সম্পর্ক বজায় রাখতে চান। জানি না, এ ধরনের তর্কের প্রয়োজন কতটা।

বাংলাদেশের সিনেমার কথা আমাদের আলোচ্য, কাজেই অন্য কথায় গিয়ে লাভ নেই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যা মনে হয়, বাংলাদেশের সিনেমা এখানকার থিয়েটার যাত্রার ঐতিহ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল। শুনেছি এটা শুধু বাংলাদেশের বেলায় নয়, আরও অনেক দেশের বেলাতেও হয়েছে। আমার যখন হাফ্‌প্যান্ট পরার বয়েস তখন নির্বাক ছবি দেখেছি, আবার সবাক ছবিও দেখেছি। 'ঋষির প্রেম' বলে একটা ছবি দেখেছিলাম, আজ প্রায় কিছুই আর মনে পড়ে না, তবে সে ছবি যে যাত্রা [illegible] তাতে আমার সন্দেহ নেই। [illegible] 'পল্লীসমাজ' দেখে [illegible] কথাই মনে হয়েছিল। [illegible]

[illegible] একটু একটু করে যাত্রা আর থিয়েটার থেকে সিনেমা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। [illegible] এ সব ঠিক আমাদের [illegible] যাত্রা বা থিয়েটারের মধ্যে ফেলা যায় না। সেদিনের কথা ভাবলে এরকম কিছু ছবি যে আমাদের কাছে সতেজ ও নতুন নতুন লেগেছে তা অস্বীকার করতে পারি না। 'চাঁদ সদাগর' আর 'অঞ্জনগড়'-এর মধ্যে যে বাংলা সিনেমার মন্থর অথচ অস্পষ্ট একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে আমরা তা অনুভব করতে পারি। এই যে দুর্বল অথচ আত্মচেতনার চেষ্টা এর একটা পর্ব শেষ হল মাত্র সেদিন। সত্যজিৎ রায় মশাই বাংলা সিনেমাকে আচমকা সাবালক করে দিলেন। ছবি দেখে মনে হল, আগে কখনও এভাবে বাংলা ছবি হয়নি। বাংলা ছবিকে তারপর থেকে একটা [illegible] নতুন [illegible] ছবি হিসেবে স্বীকার [illegible]

অমূল্য রতন
Brooke Bond Tea
Red Label
Brooke Bond Tea
Red Label

হিন্দী চিত্রজগতে যে চরিত্র বাঁচাতে চেয়েছে সেই মরেছে।"

ছবি তৈরির গল্প

বাসু ভট্টাচার্য

আমার এক বিশেষ বন্ধু একটি ছবি করছেন। হিন্দী ছবি। গল্পটি ভাল। তার বিভিন্ন চরিত্রে কাজ করার জন্য বম্বের নামকরা কয়েকজন তারকাকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। সংগীত নির্দেশকও একজন নামকরা ব্যক্তি। যিনি ছবিটি পরিচালনা করবেন আজকাল তাঁরও নামডাক যথেষ্ট। সংলাপ এবং চিত্রনাট্য লেখার জন্যও একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এসেছেন। অর্থাৎ এক কথায় বেশ কয়েকজন নামকরা লোককে নিয়ে বন্ধুবর একটি হিন্দী ছবি করতে নেমেছেন। সুতরাং তাঁর পথে গোলাপের পাপড়ি বিছানো। একে এতগুলো নামকরা লোক তায় ইস্টম্যান কালার—বন্ধুকে আমার পায় কে!

কিন্তু গোল বাধালো সংলাপ এবং চিত্রনাট্য লেখক—।

সে হঠাৎ জানতে চাইল গল্পের ঘটনাস্থল ভারতের কোন শহরে বা গ্রামে। গল্পের পাত্র-পাত্রীরা কোন প্রদেশের লোক? তাদের পারিবারিক সংস্কার কি? ইত্যাদি—।

প্রশ্ন শুনে সবাই হেসে উঠলেন—। এবং বললেন—"মশাই আমরা—বাংলা—মারাঠি তামিল বা কোন আঞ্চলিক ভাষায় ছবি বানাচ্ছি না—আমরা বানাচ্ছি হিন্দী ছবি—যা ভারতের সব প্রান্তের সব ভাষাভাষী লোক দেখবে। এবং আজকাল ভারতের প্রায় প্রতি প্রদেশ অন্য প্রদেশকে কোন না কোন কারণে সহ্য করতে পারে না—সুতরাং আমাদের ছবির পাত্রপাত্রীরা বিশেষ কোন অঞ্চলের বিশেষ কোন পরিবারের অন্তর্গত না হওয়াই ভাল। আর মশাই আমরা বানাতে এসেছি হিন্দী ছবি—, এখানে ওসব বাস্তব বিলাস নেহাৎ-ই মূর্খামি।" সংলাপ এবং চিত্রনাট্যকার বললেন—"কিন্তু তা হলে তো ভীষণ মুশকিল—একটা definite **Background** না থাকলে তো—গল্পের

কোন চরিত্রই থাকবে না।" বাকিরা বললেন—"[illegible] যে একটা চরিত্র সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?"

এরপর আর কথা চলে না। সুতরাং ছবির কাজ এগিয়ে চললো।

কিন্তু প্রসঙ্গটা এখানেই থামলো না। 'চরিত্রহীনতাই' যে হিন্দী চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্র একথা প্রমাণ করতে আমার প্রযোজক বন্ধুর অন্যতম উপদেষ্টা অনেক উদাহরণ দিলেন—, বললেন—"গল্প বা ছবির চরিত্র-রক্ষা করতে গেলে নায়ক-নায়িকাদের identity নষ্ট হয়ে যায়—মনে করুন আপনার ছবি তিসরি কসমে—রাজকাপুরকে গাড়োয়ানের পোশাক তো পরিয়েছেন—কিন্তু চুলটি কি ছাঁটতে পেরেছেন গাড়োয়ানী ঢঙে—, রাজকাপুরের জায়গায় অন্য কোন নায়করা নায়ক হলে, হয়তো—টেরেলিনের প্যান্ট সার্ট পরেই তিসরি কসমের গাড়োয়ান সেজে যেত—, অনেক নায়িকা আছেন যাঁদের আপনি যত দরিদ্র ঘরের মেয়ে বা গৃহিণীই বানান না কেন—তাঁরা সস্তার শাড়ি কিছুতেই পরবেন না—গল্পের চরিত্র রক্ষার জন্য শুধু একটা ভৌগোলিক পরিধিই যথেষ্ট নয়—পাত্রপাত্রীদের পোশাকআশাক, চালচলন

হিন্দী ছবির নায়িকা-চরিত্র : উপাধি নয় শুধু নাম ও রূপ

বাচনভঙ্গী সব কিছুরই একটা চরিত্র দরকার। এখন দেখুন বিশেষ কোন নায়ক বা নায়িকা জনজগতে বিখ্যাত তাঁর বিশেষ চালচলন—বিশেষ বাচনভঙ্গী এবং বিশেষ হেয়ার স্টাইলের জন্য। এখন মশাই আপনি যদি আপনার ছবিতে বিশেষ চরিত্র আনতে গিয়ে তাঁর ঐ সবিশেষ চরিত্রটি ছেঁটে বাদ দিয়ে দিতে চান—তাহলে 'উসকি কাহানী' বানান গে যান।"

ভদ্রলোকের মন্তব্যে আমি একটু হাসলাম। তাতে উনি আরো মুখর হয়ে উঠলেন—"হাসছেন হাসুন—। আপনার এখনো রক্ত গরম আছে তাই পরিবেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারেন। কিন্তু পরিবেশের প্রভাব কি সাংঘাতিক সেটা রক্ত একটু ঠান্ডা হোক তখন বুঝবেন। আপনি হিন্দী ফিল্মে চরিত্র, আইডেনটিটি চাইছেন, হিন্দী ফিল্ম যাদের নিয়ে তৈরী হয় সেই সব নামজাদা লোকেদের identity খুঁজে বার করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে আপনার। হিন্দী চিত্রজগতে যে চরিত্র বাঁচাতে চেয়েছে সেই মরেছে। দেখছেন না আজকাল বম্বে ফিল্মের সব নামজাদা লোকেদের নামের পেছন থেকে তাদের পদবী গায়েব হয়ে যাচ্ছে। কারণ পদবী মানুষের অনেকখানি পরিচয় ব্যক্ত করে ফেলে—এমন কথা বলছি না যে সবাই এটা সজ্ঞানে করেছেন। কিন্তু করেছেন। হিন্দী ফিল্মের শুরুর দিকে কিন্তু এমনটা ছিল না। তখন নায়কদের নামছিল ডি. বিলিমোরিয়া—কে এল সায়গল—পৃথ্বীরাজ কাপুর, নায়িকা ছিলেন দুর্গা খোটে—লীলা চিটনিস—শোভনা সমর্থ—"

আবার একটু হেসে বললাম—"আপনার কথা থেকে আপনি যা বলতে চাইছেন সেটা কিন্তু পরিষ্কার হল না।"

ভদ্রলোক বললেন, "এই সামান্য কথাটা বুঝলেন না—নাইনটি পারসেন্ট হিন্দী ছবির নায়ক-নায়িকাদের দেখবেন—নাম হয় মিস্টার অশোক নয় মিস রমা—অশোক কাপুর নয় বা রমা ত্রিবেদী নয়। কারণ কী জানেন? আমাদের non-commital attitude—; জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আজ আমাদের positive attitude নেই। তাই নামেও নেই। ফিল্মেও নেই। বাংলাদেশে যে লোক হেমন্ত মুখার্জি বলে পরিচিত বম্বেতে বা সারা ভারতবর্ষের লোকে তাকে হেমন্ত কুমার বলে জানে। এ ঘটনাগুলো হয়তো অত্যন্ত casually-ই ঘটেছে কিন্তু ঘটেছে।"

"এখনো কিন্তু আপনার কথাটা পরিষ্কার হল না।"

ভদ্রলোক প্রায় চিৎকার করে উঠলেন—"পদবী হীন নামও যেমন অসম্পূর্ণ—তেমনি হিন্দী ছবিও তাই—। হিন্দী ছবি চলচ্চিত্র নয়—সবাক-চিত্র—, আরে মশাই হিন্দী ছবির যে ভাষা, বলুন দেখি ভারতবর্ষের কোন্ প্রান্তের লোক সেই ভাষায় কথা বলে? ভারতের কোন্ জায়গায় এই ফিল্মি ভাষার কেউ কথা বলে না। এ ভাষা বম্বের ফিল্ম জগতের ভাষা—। প্রত্যেক ভাষার একটা ইতিহাস থাকে—ঐতিহ্য থাকে—তাই তার চরিত্র থাকে। হিন্দী ফিল্মের ভাষার কোন ইতিহাস নেই, কোন ঐতিহ্য নেই, তাই হিন্দি ছবির কোন চরিত্র নেই—"

বললাম—"মশাই এ কথাটা ঠিক মনঃপুত হল না। মুখের ভাষার এদিক ওদিকের ওপর চলচ্চিত্রের চরিত্র নির্ভর করে না—, পরিবেশ—হাবভাব—আচার ব্যবহার—পোশাক পরিচ্ছদ—এগুলো ছবির চরিত্র সৃষ্টির জন্য বেশী দরকারী—।"

"ওগুলো হিন্দী ছবিতে কেন সম্ভব নয় তাতো আগেই বলেছি" বললেন ভদ্রলোক। তারপর একটু চটে গিয়েই বললেন, "এতক্ষণ বকবক করলাম কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার মাথায় কিছুই ঢুকলো না।"

আবার হাসলাম আমি—বললাম, "আপনার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করছিলাম সেটা কেটে গেল।"

অট্টহাসে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক—"আপনি হয়তো ভাবছেন, মনে মনে আমিও হিন্দী 'সবাক-চিত্র'কে 'চলচ্চিত্রে'র পর্যায়ে উঠিয়ে আনতে চাই—! হুঁ—হুঁ—। ও বিলাস এককালে ছিল যখন রক্ত গরম ছিল। সংসারে একা ছিলাম, ভাবতাম ফিল্ম একটা দারুণ মিডিয়াম—একেবারে এটমের মত—ধ্বংসের কাজে লাগাও তো সৃষ্টি রসাতলে যাবে—আর যদি সৃষ্টির কাজে লাগাতে পারো তাহলে শুকনো গাছে সোনা ফলাবে। কিন্তু মশাই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম—শুকনো গাছে সোনা ফলাতে গিয়ে নিজেই শুকিয়ে যাচ্ছি। তাই আজকাল শুভচিন্তার স্বচ্ছ চোখে সুখচিন্তার পট্টি বেঁধে দিনের আলোয় টাকার হিসেব রাখছি এবং আপনাদের আশীর্বাদে বেশ আছি—"

বললাম, " 'বেশ' আর কোথায় আছেন! ভেতরে ভেতরে আপনিও পুড়ছেন, করতে চাইছেন এক—আর করতে বাধ্য হচ্ছেন অন্য কিছু। কিন্তু যেহেতু বুদ্ধিমান লোক আপনি—তাই যা করতে বাধ্য হচ্ছেন সেইটাই যেন স্বেচ্ছায় করছেন একথা প্রমাণ করার জন্য কিছু ছেলে ভোলানো অজুহাত দেখিয়ে আমাকে convince করার নামে নিজেকে প্রতারণা করছেন—"

এবার ভদ্রলোকের কপালের শিরায় টান পড়লো। বললেন—"ধরুন তাই করছি—না করলে কী করতাম? আপনি তো ভাগ্যবান পুরুষ মশাই, প্রথম ছবিতেই রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেলেন। কলকাতার কাগজগুলোও দেখলাম "উসকি কাহানী'র প্রসংশায় পঞ্চমুখ। তবুও তো আজ পর্যন্ত একটা ছবিও বম্বেতে রিলিজ হল না—, আর

নায়ক-নায়িকা : একই রীতি, একই মূহূর্তে

হলেও যে খুব একটা কিছু ঘটবে তাও মনে হয় না।"

আমাকে হাসতে দেখে ভদ্রলোক একটু ব্যঙ্গ করেই বললেন, "হাসবেন না মশাই বেশী হাসবেন না। আপনারা রিয়ালিজম্-এর পূজারী—ছবি তৈরি করার সময় রিয়ালিটি সৃষ্টি করতে জীবনপাত করেন, কিন্তু সেই সব রিয়ালিসটিক্ ছবির কী পরিণতি—সে রিয়ালিটি সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকতে চান। আপনার হয়তো শুনতে খারাপ লাগবে—কিন্তু তবু শুনে রাখুন—হিন্দী ফিল্ম জগতে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পাওয়াটা কোন যোগ্যতাই নয়। বরং ওটাকে অযোগ্যতা হিসেবেই গণ্য করা হয়। এখানে যোগ্যতার হিসেব টাকা আনা-পাই-এ। দেখুন না, সত্যি সত্যি দেখতে গেলে, আপনার পক্ষে এটা কত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। প্রথম ছবিতেই এত বড় সম্মান খুব কম লোকেই পায়। তবু, যে প্রেস-এর মতামত নিয়ে আপনারা এত লাফালাফি করেন সেই বম্বে প্রেস আপনাকে নিয়ে কোন উচ্চবাচ্যই করল না। দেখতেন—আপনার জায়গায় অন্য কেউ যদি ও পুরস্কার পেত তাহলে কী কাণ্ডটাই না হত এখানে।"

"তেমন কিছু কেন হল না বলতে পারেন?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"আইনারই জন্য হল না" অসংকোচে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, "রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়ে চুপচাপ বসে রইলেন—প্রেস কনফারেন্স করলেন না, 'পার্টি' দিলেন না, পুরস্কারের জয়ঢাকটা এক কোনায় পড়ে রইলো, সেটা বাজালেন না—কাগজটাকি শূন্য প্রসব করবে—?"

বললাম—"ওগুলো আমি অ্যাফোর্ড করতে পারিনি—কিন্তু তাই বলে কি প্রেসের লোকেদের কোন দায়িত্ব নেই—"

বললেন, "আছে। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ঐ Supply and Demand-এর বম্বেতে ৬০০ চিত্রনির্মাতা কিন্তু চিত্রসাংবাদিক ৬০ জনও নন—সুতরাং বুঝতেই পারছেন—এঁদের দিয়ে এত বেশী জিনিস করানো হয় যে, নিজে থেকে কিছু করার অবকাশ এঁদের একেবারেই নেই।"

বললাম, "আমিও তাই ভেবেছিলুম। সেই জন্যেই ও'দের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কারণ আপনার মত ও'রাও Victim of circumstance & the system."

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন —"লাখ কথার এক কথা। এতক্ষণে একটা কাজের কথা বললেন। তাহলেই বলুন মশাই—আপনি কি ঐ circumstance এবং System-এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী যে 'যা করতে চাই তাই করব নইলে করব না' বলে বসে আছেন?"

বললাম "সিনেমা যদি শিল্প হয় তাহলে, সে যুগ, সমাজ এবং পরিবেশের সমালোচক হবেই, আর আমি যদি সিনেমাকে শিল্প বলে মেনে নিয়ে থাকি তাহলে তার চাহিদা আমি আমার সাধ্যমত পূরণ করবই—"

আবার ব্যঙ্গ করলেন ভদ্রলোক—"মশাই, যে দেশের শতকরা ৮০ জন লোক অশিক্ষিত সেই দেশে সিনেমাকে শিল্প হিসেবে দেখতে চাওয়া যে কত বড় পাগলামি—পাগল ছাড়া সবাই সে কথা একবাক্যে স্বীকার করবে।"

এক অখ্যাত শিক্ষাবিদের কথা মনে পড়ল আমার. বললাম—"দেখুন আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন লোক অশিক্ষিত নয়, শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর। কিন্তু শতকরা ১০০ জন লোকই শিক্ষিত—, এদেশের সভ্যতা গতকালের উটকো সভ্যতা নয়, হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতির গর্ভে আমাদের দেশের জনতার জন্ম। এবং যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি—এত হতাশার মধ্যেও যে হাসি, সে শুধু তাদেরই ভরসায়—। কারণ আমি জানি—যদি কোনদিন এই System-এর প্রাচীর ডিঙিয়ে ঐ শতকরা ৮০ জনের সামনে দাঁড়াতে পারি......" এরপর আর বলতে দিলেন না ভদ্রলোক—আন্তরিক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে শুধু বললেন—"অনেক বয়েস হয়েছে—তবু সেই দিনের জন্য বেঁচে থাকবার ইচ্ছে রইলো—"

মাঝে মাঝে হিন্দী ছবি দেখা ভাল। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে; হঠাৎ হিন্দী ফিল্ম দেখে ফেলতে হতে পারে, এ ভয় আর থাকে না।

মাঝে মাঝে হিন্দী ছবি দেখা ভাল। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে; হঠাৎ হিন্দী ফিল্ম দেখে ফেলতে হতে পারে, এ ভয় আর থাকে না।

অবশ্যই কথাটা দেশের অধিকাংশ চিত্রামোদীর পক্ষে গ্রহণীয় হবে না। বর্তমান লেখকের মত কতিপয় অবিশ্বাসীর মুখে ছাই দিয়ে হিন্দী ছায়াছবির ভাগ্যরবি মধ্যগগনে ঝলমল করছেন। দর্শকসংখ্যা বোধ করি অর্বুদ-নিযুতে। এঁরা সবাই সজ্ঞানে একটা বাজে ব্যাপারের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন, এমন ধারণা যুক্তিসংগত হতে পারে না। যৎসামান্য প্রবেশমূল্যের পরিবর্তে সত্যিই হিন্দী ছবি দেয় দুহাত ভরে। কত নাচ, গান, 'অ্যাকসন'। আপনার 'এনকোর' বলে চিৎকার করার দরকার হয় না। আপনি আবার, বারবার, পাবেন নাচ-গান এবং হল্লা (যা অ্যাকসন, যা-ই বলুন!)—এতে যাঁর রুচি, তিনি হতাশ হবার সুযোগই পাবেন না। কায়রোর জনৈক শিক্ষক 'পথের পাঁচালী' দেখে নিতান্ত দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, "তোমরা আনু-এর মত ছবি করেছ! আবার এই ঝিমিয়ে পড়া ছবিটাও তোমাদেরই! ভারতীয়দের সত্যি বোঝা মুশকিল!" তাঁর ব্যথা কোথায় বুঝতে আমার কোনো কষ্ট হয়নি।

আমার কিছু বন্ধু বিশ্বাস করেন, আজকের বাঙালীর উচিত ঘন ঘন হিন্দী ফিলম দেখা। নইলে তার জীবনে 'এ বিট অব লাফ্‌টার' অনুপ্রবেশ করবে না। ট্রামে বাসে, বাজারে অফিসে সর্বত্র তার হয় রুদ্র নতুবা করুণ মূর্তি। এ আর দেখা যায় না। তাকে এই দশা থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র বোম্বাই-বটিকা। চাঙ্গা হয়ে উঠতে হলে তার চাই হিন্দী ছায়াছবির মোদক। বন্ধুরা আরও বলেন, ইদানীং বঙ্গসন্তানদের মাথার উপর কী পরিমাণ চাপ পড়েছে, একবার চিন্তা করে দেখুন। নানা ইজ্‌মিক কচকচির ফলে রাজনৈতিক জীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। অফিসের পথে দৈবাৎ বাসে বা ট্রামে বসবার জায়গা পেলে দুদণ্ড ঘুমিয়ে নেবেন তারও উপায় নেই। তখন আপনাকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বারটা কারা বাজাচ্ছে সে বিষয়ে মতামত দিতে এবং নিতে হবে। আধুনিক কবিতা বেশ গোলায়েম এবং কথাসাহিত্য চনমনে হয়ে উঠতে শুরু করেছিল হঠাৎ আঁতেলেকচুয়ালরা সবাইকে সাহিত্যে শোধনবাদ সম্পর্কে অবহিত করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। আধুনিক চিত্রকলা তো দারুণ শিক্ষিত না হলে বোঝা অসম্ভব। সিনেমা দেখে আনন্দ পাবেন, সে রাস্তাও বন্ধ হয়ে আসছে। প্রতীক আর প্রগতিশীলতার যথার্থ মর্ম না ঠাওরাতে পারলেন, তো থাকুন অপাংক্তেয় হয়ে। সবচেয়ে বিপদ, ফিল্‌ম দেখে তার গুণাগুণ বিচার করা চলবে না; কে পরিচালক, তাঁর নাম দেখে তবে স্থির করতে হবে ছবিটা কোন স্তরের। বুঝুন ব্যাপার!

একথা মানতেই হবে যে হিন্দী ছায়াছবির দাবী যৎসামান্য। সেটুকু কর মিটিয়ে আপনি নির্ভেজাল প্রমোদের প্রত্যাশা অবশ্যই করতে পারেন। সমালোচকরা কেন

যে এক্ষেত্রে সরলীকৃতির অভিযোগ এনে যাতায় ভারী করেন বুঝতে পারা কঠিন। জীবন জটিল হয়ে পড়েছে বলেই যে সব জায়গা থেকে সরলরেখা বর্জিত হবে এ কেমন কথা। চিরকাল শুনে আসছি যে এদেশ হল সে দেশ যেখানে "সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে"। বলুন, একমাত্র হিন্দী ছবি ছাড়া একথা আর কোন্ প্রসঙ্গে যথার্থ? নানাপ্রকার টেকনিকাল উন্নতি ছাড়া ছবির বা গল্পের মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ঘটতে যাবে কোন দুঃখে? হিরোকে বেশ হিরো-হিরো দেখালেই তো ভাল। ভিলেনকে যে প্রথম দর্শনেই চেনা যায়, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে নানান বাঁদরেপনা করে সে যে তার খলতার পরিচয় অচিরাৎ পরিস্ফুট করে তোলে, একটার পর একটা শয়তানী অবাধে—কারণে—অকারণে করে যায়, তা-তো নিন্দার হতে পারে না। এ কি গোয়েন্দা কাহিনী যে, খুনী কে আগেভাগে জানতে দিলেই সর্বনাশ? তাছাড়া জানি যখন লোকটা শেষপর্যন্ত বিফল হবেই হবে, তখন সে যতটা পারে নর্তনকুর্দন করে নিক না। ক্ষতি কী? কেউ কেউ আপত্তি তোলেন, ভিলেনের হৃদয় পরিবর্তনের ব্যাপারটায়। ওটা বস্তুত ঐতিহ্যগত। আর

নাভি সৌন্দর্য প্রদর্শনের পথ খুলে দিয়েছেন

বিরহ

হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিলেই কি সেটা ভাল হত? এ প্রসঙ্গে একটাই যা ঝামেলা। হিন্দী ফিল্মের ভিলেনকে আধুনিক কাগজী ভাষায় খলনায়ক বলা যুক্তিসম্মত নয়। কাহিনীর শেষে সে অনিবার্যভাবে খলত্ব বিসর্জন দেয়। কিন্তু তখন, তাই বলে তো আর নায়ক হয়ে ওঠে না। ভিলেনের কল্পনায় একটু বদল ইদানীং হয়েছে। আগে মোটা-গোঁফ কাকা বা মামা ভিলেন হতেন। এখন জামাইবাবুরাও ও পদ পাচ্ছেন।

সবচেয়ে ভাল, হিন্দী ছবির নায়িকাদের দুচোখ ভরে দেখা যায়। শুধু সুন্দরী বা দেহগরবিনী বলে নয়, তাঁরা পেখম মেলে দাঁড়াবার সুযোগও যে পান। বাংলা ছবির পরিচালক তাঁর দর্শকদের কিছুতে ভুলতে দিতে চান না যে, নায়িকা একজন ভদ্রমহিলা। ওদিকে একদৃষ্টে তাকানো অনুচিত। (ব্যতিক্রম নেই তা নয়। যেমন চারুলতা-র পরিচালক। যদিও ক্যামেরার চোখে মাধবী মুখোপাধ্যায়কে অর্ধেক মাধবী এবং অর্ধেক মিং-রাজপরিবারের—মহামূল্য — মৃন্ময়পাত্র বলেই মনে হয়েছে।) ইদানীং বাংলার সুন্দরী ফিল্মি-ললনারা যে বোমবাই-গামিনী হয়েছেন, তা শুধুই আয়বৃদ্ধির মানসে, একথা আমি মনে করি না। সহস্র মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে নিজেকে তুলে ধরায় একটা গভীর তৃপ্তি, রমণীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করা চলে যার সঠিক মূল্য সৎ বা কালো কোনো উপার্জনেই ধরা পড়ে না। নারী-দেহের বহু বর্তুল বিস্ময়, বংকিম ভঙ্গী, কটাক্ষ-ব্রীড়া-লাস্য দেব-মানবের দৃষ্টিবন্দনার বস্তু। হিন্দী চলচ্চিত্রের পরিচালক একথা জানেন, মানেন। তাই নায়িকা উপনায়িকা সবাইকে যথোপযুক্ত সুযোগ দেন আত্ম-প্রকাশের। এর মূল্য কেন অস্বীকৃত হবে?

একটা সহজ কথাই ধরুন। বাংলার এক অর্ধোজ্জ্বল তারকা কয়েক বছর হল আরবসমুদ্রতীরে, দারুণ দীপ্তি বিকিরণ করছেন। তিনি ছবিতে নাভিসৌন্দর্য প্রদর্শনের পথ খুলে দিয়েছেন, বাংলাদেশে থাকতে যা পারেননি। যাঁরা বলবেন, ও আর এমন কী দ্রষ্টব্য বিষয়? তাঁরা নিশ্চয়ই 'সৌন্দর্যলহরী' শাস্ত্র পাঠ করেননি: ওই যে মদনভস্মের গল্প, তার রসসম্মত রূপটি জানেন না। রূপসী পার্বতীকে মহাদেবের

ঐতিহাসিক অ্যাকশন

সামনে দাঁড় করিয়ে কামদেব সড়াক করে তীর ছুঁড়লেন আর ধ্যানভাঙা ধূর্জটি রেগে গিয়ে ধনুসমেত তাকে পুড়িয়ে মারলেন - গল্পটা এত কেঠো নয়। পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করে মদনবাহাদুর স্মিতহাস্যে অপেক্ষা করছেন। মহাদেব ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। তাঁর ঈষৎ বিহ্বল-দৃষ্টি কঠোর থেকে কোমল হয়ে আবার কঠোর হল। বহ্নির আভা দেখা দিল তৃতীয় নয়নে। দেখে শুনে ঘাবড়ে গেলেন রতিপতি। লুকোবেন, এমন ঠাঁই কই? মহাদেবের দিকে পিছন ফিরিয়েই মদন দেখলেন সামনে অপরূপা পার্বতী। তখন, পার্বতীর সৌন্দর্যাধার নাভিসরসীতে "কুত্রকম্প মনসিজহ!" টীকা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতীয় জীবনের নানাস্তরে সতর্ক তর্জনীর বহুবিধ সংকেত এবং শাসন শতেক গুরুজনের অজস্র বিধিনিষেধ হিন্দী ছবি হেলায় উপেক্ষা করেছে। আমোদ এবং প্রমোদ যেখানে মুখ্য, সেখানে কাহিনীর ঘটনা-পারম্পর্য, যুক্তি নির্ভরতা ইত্যাদি যতটা সম্ভব থাকবে। সম্ভব না হলে থাকবে না। তেমনি আইন যতটা সম্ভব মানা হবে। যেখানে যেভাবে সম্ভব তা লঙ্ঘিত হবে। অবশ্যই আদালতে খেসারৎ দেবার দায় বাঁচিয়ে। এই হল সেখানকার চলচ্চিত্রকারের মনের কথা। এদেশী ছবিতে চুম্বন নিষিদ্ধ। এই নিষেধ মানা উচিত কি অনুচিত, তা নিয়ে সোৎসাহ তর্ক চলেছে।

এই ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে হিন্দী ছবির পরিচালক ইঙ্গিতে যা দেখাচ্ছেন তা নিশ্চয় আসল বস্তুর চেয়ে ঢের উত্তেজক। বেশ কয়েক বছর আগে দেখেছিলাম দেবআনন্দ সুরাইয়ার তুলে ধরা মুখের দিকে মুখ নিয়ে যাচ্ছেন (অবশ্যই রূপোলী পর্দায়)... ... আকাশে চাঁদ, গাছের ডালে দুই পাখি, চঞ্চুচুম্বন ইত্যাদি না দেখিয়ে পরিচালক ক্যামেরা এগিয়ে নিয়ে চললেন সুরাইয়ার দিকে (অর্জুন ও গাছের ডালে মাটির পাখির গল্প ভাবুন)। প্রথমে তার গোটা মুখ, তারপর ভুরু-চোখ-নাক-ঠোঁট, পরে বিরাট পর্দা জুড়ে কেবলি দুটি প্রকাণ্ড অধরোষ্ঠ, কুন্দদন্ত!

ইদানীং বাংলা ছবিতে চুম্বন এভাবে দেখান না হোক, ঝোপ দুলিয়ে ধর্ষণদৃশ্যও আভাসিত অবশ্য করা হচ্ছে। যদিও, এই অশ্লীল কাণ্ডটা করেন নায়ক নন (বালাই ষাট), ভিলেন মহোদয়! তিনি যে কী পাষণ্ড তা সরল দর্শককে নির্ভুলভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য। ওটা একটা মননের অনুশীলন, হিন্দী চিত্রকার যার ধার ধারেন না। আবার একই ঘটনা আশ্রয় করে ভিলেনের নষ্টামী এবং নায়কের মহত্ত্ব—দুই-ই

যদি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়, তবে তো অতি উত্তম।

সে যাক...হিন্দী ছবির ভবিষ্যত যে অতিশয় উজ্জ্বল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। যখন মালয়েশিয়া আমাদের কাছ থেকে বছরে কয়েক বস্তা সাক, আফ্রিকা কয়েকশ' পাখা বা সেলাইকল, এমন কি রাশিয়াও কয়েক হাজার জুতো আর কিনবে না, তখনও আমাদের—চা বাদ দিলে—অন্তত একটি রপ্তানী বস্তু তালিকায় থাকবে। তা হল হিন্দী ফিলম। যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর অধিকাংশ মানুষ নিছক আমোদ চাইবে এবং যেখানে পাবে তার কদর করবে। সোয়েডিশ, ফরাসী বা ইতালীয় 'মাজি' নিয়ে কলকাতার কিছু ফিলম সোসাইটির সভ্য বিচলিত হবেন। ঋত্বিক-সত্যজিৎ-কে নিয়ে ওসব দেশের মুষ্টিমেয় মানুষই মাতবেন। যত দিন যাচ্ছে সব দেশেই—কী সমাজবাদী, কী পুঁজিপ্রধান—জনগণের রাজ কায়েম হচ্ছে। যা মোটামুটি এবং সোজাসুজি, তাই পাতে পড়বে। আর সব তফাৎ যেতে বাধ্য হবে। বাসু ভট্টাচার্য বা বাঙ্গালীঘেঁষা বলরাজ সাহানী সরকারী শিরোপা পেতে পারেন, জনতার আশীর্বাদ পাবেন না। সমমাত্রায় তো নয়-ই।

আর একটি হিসাব আছে, যা বলছে হিন্দী ফিলমই আজকের ভারতবর্ষের যথার্থ ছবি তুলে ধরছে। আমাদের সব স্বপ্ন-ইচ্ছা, আশা, প্রার্থনা এবং চরিত্রের সব কনট্রাডিকশন, সবই এখানে স্ফুর্ত। নতুবা হিন্দী ভাষার এত বড় বিরুদ্ধবাদী হয়ে বাঙ্গালী, তামিল বা তেলেগু দর্শক কেন হিন্দী ছবির আসরে দলে দলে হাজিরা দেবেন? আবার কেনই বা হিন্দী ছবিতে এত ইংরেজীয়ানা? স্যুট-বুট-টাই—ড্যাডি—হ্যালো-ডার্লিং, হ্যাপি-বার্থডে-টু-য়ু, থ্যাংকু, শাটাপ্ মিস্টার শ্যাম? পার্টি, ডিনার, ডান্স? দশ বছরের মেয়ের তরুণীর মত রুজ লিপস্টিকের ঘটা?

আমার ধারণা মোরারজী দেশাই বা মধু লিমায়ে কেউই হিন্দী ছবি দেখেন না।

তরুণ মজুমদার

বক্স-অফিস বনাম আর্টসৃষ্টি

শিরোনামা দেখেই হয়তো বিদগ্ধ সমালোচক বিরক্ত হবেন। বলবেন, আর্টসৃষ্টি হল আর্টসৃষ্টি। এর মধ্যে আবার বক্স-অফিসের কথা ওঠে কোত্থেকে?

জবাবে সবিনয়ে বলি, না উঠলেই ভালো হত। কিন্তু আমাদের দেশে ছায়াছবি তৈরি করার যে বাস্তব অবস্থা, সেখানে শুধু আর্টসৃষ্টি কেন, কোন কিছু করতে গেলেই বক্স-অফিসের কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়তে বাধ্য। কথাটা শ্রুতিকটু, তবু সত্য—অতএব অনস্বীকার্য।

সমালোচক : তবে কি শুধু ছায়াছবির বেলাতেই আর্টসৃষ্টির নিয়মকানুন আলাদা? কই, অন্য কারুর বেলায় তো এমন কথা ওঠে না! যথা, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

জবাব : হ্যাঁ। ছায়াছবির পুরো ব্যাপারটাই আলাদা। অন্য কোন Art-form-এর সমস্যার সঙ্গে এর সমস্যায় কোথাও কোনরকম মিল নেই।

প্রশ্ন : কেন?

জবাব : কারণ—

বলছি, একটুখানি থামা ভাল। ভাবা দরকার, ঠিক কোন জায়গা থেকে জবাবদিহিটা শুরু করা উচিত। ভেবেচিন্তে হয়তো দেখা যাবে, যে বিচ্ছিরি কথাটা থেকে সমস্ত গোলমালের শুরু, অর্থাৎ "বক্স-অফিস"—

সেটার মানে কী, অথবা তাকে বিচ্ছিরিই বা ভাবা হয় কেন, এটুকু বুঝলেই কাঁধের বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।

জানি না অভিধান কি বলে। তবে ফিল্ম-দুনিয়ার পরিভাষায় 'বক্স-অফিস' কথাটার একটিই মাত্র অর্থ—সে হল 'জনপ্রিয়তা'। যে ছবি যত জনপ্রিয়, সে ছবির বক্স-অফিস তত বেশী বলে ধরা হয়। পক্ষান্তরে, বক্স-অফিসওয়ালা তাকেই বলে, যা কিনা জনসাধারণের অবাধ দাক্ষিণ্যে ধন্য।

পলাতক

এখন, 'জনসাধারণ' কথাটা যদি আপত্তিকর না হয়, তবে 'বক্স-অফিস' কথাটাই বা ঘৃণার্হ মনে হবে কেন? গণতন্ত্রের যুগে সব কিছুই যখন জনতার অঙ্গুলি হেলনে নির্দিষ্ট হচ্ছে, তখন ছায়াছবিই বা এমন কি ব্যতিক্রম, যাকে এর আওতায় ধরলে মহাভারত অশুদ্ধির সম্ভাবনা?

জানি, আগুনে ঘি ঢালা হল। মুখর প্রতিবাদের কণ্ঠ এবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, জনতার ইচ্ছার দাস আর সবাই হতে পারে—কিন্তু তাই বলে আর্ট! আর্ট করবে পরের পরোয়া? ভাবতে লজ্জা করল না?

পাল্টা প্রশ্ন ঃ কেন করবে? চোখের সামনে দেখেছি অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের ছবির একজিবিশন অনুষ্ঠিত হতে। ওস্তাদ আলাউদ্দিনকে বাজাতে শুনেছি জলসার পর জলসায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তো শুনেছি স্বরচিত নাটকের নানা চরিত্রে স্টেজে নেমে পড়তেন। মনোমতো দর্শক কিম্বা শ্রোতা খুঁজতে যদি তাঁদের লজ্জা না করে থাকে, তবে ছায়াছবিরই বা করবে কেন?

সমালোচক ঃ থামুন! রবীন্দ্রনাথ-আলাউদ্দিন-অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের সঙ্গে তুলনা করছেন গাঁয়ে-মানে না আপনি-মোড়ল ফিল্মী পরিচালকদের? কই, তাঁরা পারেন রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের মতো নিজের সৃষ্টিতে পাঠক কিম্বা দর্শকের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলতে, হয় নাও নয় তো বেরিয়ে যাও!

পারেন বলতে, আমার সৃষ্টির অঙ্গনে শুধু তাদেরই প্রবেশাধিকার, যারা আমি যা দেখাতে চাই তাই দেখতে রাজী, আমি যা শোনাতে চাই তাই শুনতে রাজী?

না, পারেন না। আর, তাই তো আমি বলতে চাই, একদিক থেকে চিত্র-পরিচালকদের সমস্যাটা রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের সমস্যার চেয়ে অনেক অনেক বেশী কঠিন। তাঁদের সংগ্রামও অনেক বড় বাধার বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথ কি পারতেন লেখার পর লেখা লিখে যেতে, যদি তাঁকে বলা হত প্রতিটি লেখা লিখতে হলে তাঁকে, যেমন করেই হোক, অন্তত তিন থেকে চার লাখ টাকা সংগ্রহ করতে হবে এবং সেটা লেখার পেছনে বন্ধক রাখতে হবে? পাঠক যদি লেখা পছন্দ করল তবে সে টাকা ফিরে পাবেন। নইলে সবসুদ্ধ জলে ডুবলো? কি করতেন এ হেন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ? কি করতেন, যদি তাঁকে বলা হত যে তাঁর কোন রচনায় সামান্যতম কাটাকুটি করতে হলেই (যা তিনি প্রায়শই করতেন) আবার তাঁকে পঞ্চাশ হাজার কিম্বা এক লাখ টাকা খরচ করতে হবে?

সামান্য বুদ্ধিতে যতটুকু কুলোয় তাতে বলতে পারি, সম্ভবত পৃথিবী রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনা থেকে বঞ্চিত হত। তবে, রবীন্দ্রনাথকে জীবনে এ ধরনের কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। কারণ, একটি লেখা লিখতে, অথবা কাটাকুটি করে তা থেকে অন্য লেখা সাজাতে, তার যা কিছু খরচা, তা হল (নিজের প্রতিভা বাদে) এক টুকরো কাগজ আর সামান্য একটুখানি কালি। এটুকু ভার বইবার মতো সাধ্য তাঁর ছিল বলেই শিল্পী হিসেবে তিনি অমর হতে পেরেছেন।

পৃথিবীর সব শিল্পীর ক্ষেত্রে ওই একই কথা খাটে। পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কল্পনাকে রূপ দেবার অধিকার বলতে গেলে, তাঁর জন্মগত অধিকারের গণ্ডিতেই পড়ে।

ব্যতিক্রম শুধু চলচ্চিত্রস্রষ্টাদের বেলায়।

লক্ষ্মীর উপাসকেরা সরস্বতীর আরাধনাকে যে ভালো চোখে দেখবেন না, এ তো জানা কথাই।

ছায়াছবিই বোধ হয় দুনিয়ার একমাত্র শিল্প, যা শুধুমাত্র প্রতিভানির্ভর নয়। অর্থনির্ভর, এবং প্রচণ্ডভাবে অর্থনির্ভর। এবং যেহেতু শিল্পীমাত্রেই অর্থশালী হতে হবে এমন কোন কথা নেই, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলচ্চিত্রশিল্পীকে হাত পাততে হয় বাইরের দরজায়, বিত্তবানদের দরজায়, নিজের কল্পনাকে রূপ দেবার তাগিদে। আর এইখানেই সব অনর্থের শুরু।

লক্ষ্মীর উপাসকেরা সরস্বতীর আরাধনাকে যে ভালো চোখে দেখবেন না, এ তো জানা কথাই। তাঁদের কাছে চলচ্চিত্র তো 'শিল্প' নয়, এ হল 'ব্যবসা',—যেমন গুড়ের ব্যবসা, ঘি-এর ব্যবসা অথবা কাটা কাপড়ের ব্যবসা। সুতরাং দশ টাকা ঢাললে যদি বারো টাকা না পাওয়া যায়, নিদেনপক্ষে মূলধনটা উঠে না আসে, তবে সে ব্যবসাতে টাকা ঢালতে যাবেন তাঁরা কোন দুর্বুদ্ধিতে?

তাঁদের দোষ দিই না। ব্যবসা করতে এসে শিল্পসৃষ্টির ভড়ং তাঁদের নেই। কিন্তু হতভাগা চলচ্চিত্রকারেরা যাবেন কোন্ চুলোয়? কি করে তাঁদের মনের খিদে মিটবে?

ভেবেচিন্তে অদ্ভুত বুদ্ধি বার করলেন তাঁরা। প্রায় অসম্ভব, কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করার সাধনা। ব্যবসার শর্ত আর শিল্পের শর্তের মধ্যে একটা "লোয়েস্ট কমন ডিনোমিনেটর" টেনে সেটার গণ্ডিকে দিনের পর দিন বাড়াবার সাধনা। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী দুটি স্বার্থের গলা ধরে একই ঘাটে তাদের জল খাওয়াবার প্রয়াস।

চাওয়া-পাওয়া

এ প্রয়াসে ভুল হয়েছে বারংবার। তবু চেষ্টা থামেনি। কারণ, চলচ্চিত্রকারেরা জানতেন, থামবার অর্থই হল মৃত্যু। জানতেন, ভবিষ্যতের বিজয়মুকুটের দাম বর্তমানের দিন-যাপনের গ্লানি দিয়ে শোধ করা হচ্ছে। তাই, থামতে থামতেও, ডুবতে ডুবতেও, আটকে-যাওয়া শ্বাসনালীতে দম নেবার চেষ্টা করতে করতেও এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। জনসাধারণের সমর্থন ভিক্ষা করেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে, জনসাধারণের রুচিকে বদলে দিয়ে তাঁদের আরো বেশী আত্মীয়রূপে পাবার চেষ্টাও থামেনি। সব কিছুর মূলেই, শুধু একটিমাত্র আশা। আজ স্ট্রাগল্ করছি তো কি হয়েছে? সুদিন একদিন আসবেই। সুদিন একদিন আসবেই।

এই স্ট্রাগল্-এর স্বরূপ যাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। এই আশাকে যাঁরা ব্যঙ্গ করেন, চলচ্চিত্রকারদের এই ভীষণ সমস্যাকে যাঁরা ছোট করেন, বিকৃত করে দেখেন, কিম্বা দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, তাঁরা কোন্ জাতের সমালোচক আমি জানি না; শুধু জানি, ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস হারানোর অক্ষমণীয় অপরাধে তাঁরা অপরাধী। তাঁরা যে শুধু চলচ্চিত্রশিল্পের শত্রু তাই নয়, সমগ্রভাবে শিল্পেরই শত্রু।

এই রূঢ় সত্যকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তাঁরা যেন আমাকে মার্জনা করেন।

কাচের স্বর্গ

দর্শকের রুচির উন্নতি না হলে আমাদের ছবির মানও উন্নত হতে পারে না

আর্ট ও বক্স অফিস

আর ডি বনশল

বক্স-অফিস বলতে সাধারণভাবে আর্থিক দিকই বোঝায়। যে-ছবি বক্স অফিসের আনুকূল্য বেশী পরিমাণ পায় চিত্র-ব্যবসায়ীরা সে ছবিকে আর্থিক দিক দিয়ে সফল চিত্র হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। বক্স-অফিসের স্বার্থ বজায় রেখে কী করে ছবি তৈরী সম্ভব, সে-বিষয়ে কোনও চিত্রনির্মাতা সঠিকভাবে বলতে পারেন বলে আমি মনে করি না। কারণ, ছবি নির্মাণের কোনও 'ফরমুলা' আমি বিশ্বাস করি না, বা এমন কোনও চাবি-কাঠি নেই, যার দ্বারা কোনও ছবির গুপ্তধনের দরজা খোলা যেতে পারে। তা হলে তো সবাই সে পথের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতেন।

পরবর্তী কথা হল শিল্পশোভন ছবি তৈরীর সমস্যা। বক্স-অফিস-সফল হলেই সে ছবি শিল্পশোভন নয় অথবা সবক্ষেত্রেই শিল্পশোভন ছবি আর্থিক দিক থেকে ব্যর্থ হবে, বলা যায় না। তবে লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্বের মতই বক্স-অফিস বনাম শিল্পশোভন ছবির যেন প্রতিযোগিতা অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে—কিন্তু আমাদের দেশের ছবির ক্ষেত্রে তা নিতান্তই সামান্য। আমার বর্তমান প্রবন্ধে কোনও বিদেশী ছবির কথা উল্লেখ করতে চাই না। খুবই মুষ্টিমেয় ভারতীয় ছবির নাম করা যেতে পারে, যেগুলি দু'দিক থেকেই সফলতা অর্জন করেছে।

প্রথম যেদিন ছায়াছবির জন্ম হয়, সেদিন কিন্তু চিত্রশিল্পের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এর স্রষ্টাকে প্রভাবিত করেনি। কলাবিদ্যার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে একে স্বাগত জানানো হয়েছিল' নির্মাতারা সৃষ্টির আনন্দেই সেদিন মগ্ন ছিলেন। মৌন ছায়াছবি মুখর হয়ে উঠলো। বিস্ময়বিমুগ্ধ দর্শক জানালেন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিত্রশিল্প ক্রমশ পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। নির্মাতাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নবাগত শিল্পকে সুষমা-মণ্ডিত করে তোলা—রূপে, রসে একে সঞ্জীবিত করা। শুধু আজকের কথা নয় —শ্রীরামচন্দ্রের 'আলেখ্য-দর্শন' থেকে শুরু করে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্রষ্টা ছায়া-ছবিকে আরও সুন্দর—আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

[illegible] তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বক্স-অফিস বা অর্থনৈতিক চিন্তাধারা। অন্যান্য শিল্পের মতই এর সংগে জড়িত হয় নানাবিধ সমস্যা। যান্ত্রিক পদ্ধতি, কাহিনী—সংগীত—শিল্পী ও কলাকুশলী প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়েই নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। অসতর্কভাবে 'স্টার সিস্টেম' পদ্ধতিও এসে যায়। নির্মাতারা স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে শিল্পের সহজাত প্রাণবন্যা যেন স্তিমিত হয়ে যায়।

লোকশিক্ষা এবং লোকরঞ্জন—এই দু'টি হল ছায়াছবির মুখ্য উদ্দেশ্য। চিত্রশিল্প যখনই ব্যবসাগত গণ্ডির মাঝে ধরা দেয়—'লোকশিক্ষা' তখন গৌণ হয়ে যায়। নির্মাতারা এর আর্থিক বনিয়াদ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কারণ, শিল্পশোভন ছবি বক্স-অফিস সফলতা লাভ করবে কি না, সে সম্পর্কে যখন কোনও নিশ্চয়তা নেই, তখন নিছক ব্যবসায়ী-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বহু চিত্র-নির্মাতা একের পর এক ছবি তৈরী করেন। দর্শকের মনোরঞ্জনের প্রতিই

সাত পাকে বাঁধা

তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শক তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। সেক্ষেত্রে হয়তো বা কোনও ছবি শিল্পের শর্ত-পূরণে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েও অসাধারণ আর্থিক সফলতা লাভ করে থাকে।

মানুষ সুন্দরের পূজারী, এ কথা নীতিগতভাবে স্বীকার করলেও সৌন্দর্যের কোনও মাপকাঠি আছে বলে মনে হয় না। কারণ, ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করা হয়। প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শক একই ছবিকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেন। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে-সব ছবি নির্মিত হয়—সর্বসম্মতভাবে তাকে বিভিন্ন অঞ্চলের দর্শক গ্রহণ করেন বলে কোনও নজির নেই। তবুও জ্ঞানীজন যে-সব ছবিকে শিল্পশোভন বলে আখ্যা দেন—তার চাহিদা মুষ্টিমেয় দর্শকের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর প্রধান কারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার হার যদি আরও উন্নত হত, তা হলে আমাদের দেশের উন্নত-মানের ছবির হারও বেড়ে যেত। যে-সব বাংলা ছবি বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি লাভ করেছে, তার সংখ্যা বিদেশের ছবির তুলনায় সামান্য। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবিষয়ে বাংলার নেতৃত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু বাহ্যিক আনন্দ লাভ করলেও আমাদের দর্শকের বিরাট অংশই তাকে স্বীকৃতি দেয়নি। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, প্রযোজককে শেষ পর্যন্ত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় উৎপীড়িত আজকের অধিকাংশ দর্শক চলচ্চিত্রকে নিছক প্রমোদ বিতরণের উৎস বলে মনে করেন। কিছু কিছু চিত্রনির্মাতা সেই সুযোগ নিয়ে সস্তা ও চটুল ছবির মাধ্যমে ব্যবসার প্রসার করে থাকেন। অবাস্তব কাহিনী—অপ্রয়োজনীয় নাচগান—অশালীন যৌন আবেদন প্রভৃতির অবতারণা করে বাজীমাৎ করার প্রচেষ্টা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে চিত্রশিল্পের সামগ্রিক অবনতি ক্রমশই প্রকট হয়ে ওঠে।

শিল্পশোভন ছবি অর্থনীতির মতবাদের মতই যেন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। কারণ, সাধারণ দর্শকের কাছে তার কোনও মূল্য নেই। ক্ষতিগ্রস্ত চিত্র-প্রযোজকরাই দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী ছবি নির্মাণ করতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের সৃষ্ট 'ফরমুলা' কাজে লাগিয়ে থাকেন। বিদেশী সস্তা ছবির অন্ধ অনুকরণই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে রীতি-নীতি, চরিত্র, নাচগান প্রভৃতির সংযোজনাও করে থাকেন।

দর্শক সমস্যা বাংলা তথা ভারতের চিত্রশিল্পের উন্নতির অন্যতম অন্তরায়।

দর্শকের রুচির উন্নতি না হলে আমাদের ছবির মানও উন্নত হতে পারে না। অবশ্য উন্নত মানের বা শিল্পশোভন ছবিরও একটা নিম্নতম সংজ্ঞা থাকা উচিত। নরনারীর কামপ্রবৃত্তির দৃশ্য জীবন যন্ত্রণার বাস্তব আলেখ্যরূপে যতই অভিনন্দিত হোক না কেন—আমার মনে হয় নৈতিক দিক থেকে এসব দৃশ্যের সংযোজন বিকৃত রুচির পরিচায়ক। 'সাত পাকে বাঁধা' ছবির শাশ্বত বাণী বা 'চারুলতা'র স্নিগ্ধতা দেশ-বিদেশে সম-ভাবে অভিনন্দন লাভ করেছে। অথচ এ দুটি ছবিকেই যদি ফরমুলার প্রলেপ দেওয়া হত, তা হলে অসাধারণ আর্থিক সাফল্য অর্জন করত।

দর্শক সমস্যা বাংলা তথা ভারতের চিত্রশিল্পের উন্নতির অন্যতম অন্তরায়। যৌনধর্মী সস্তা ছবি দিনের পর দিন অধিকাংশ দর্শকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে, অপরপক্ষে শিল্পশোভন ছবিগুলি মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত করেই প্রযোজকের গুদামে ফিরে আসছে। তাই দর্শকের রুচির পরিবর্তন না হলে শিল্পশোভন ছবি তৈরী করা প্রায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে—কিন্তু ক্রমাগত আর্থিক ক্ষতি শেষ পর্যন্ত চিত্র-নির্মাতাদের সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করে দেবে। তাই দেখা যায়, বহু আদর্শবাদী চিত্র-প্রযোজক ছবি নির্মাণ বন্ধ করতে বাধ্য হন।

আজকের ছবির গতি-প্রকৃতি / ঋত্বিক ঘটক

আজকের পৃথিবীতে ছবি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নানারকম হচ্ছে। সেগুলো সম্পর্কে যদি আমরা অবহিত হতাম, তাহলে সত্যিই আনন্দ পেতাম।

প্রথমত গল্প ব্যাপারটাই মোটামুটি বাদ হয়ে গেছে। আজকে ছবির জন্যে সারা পৃথিবীতে যে জোয়ার এসেছে, সেখানে গল্পের কোন অবকাশ নেই। অতিসম্প্রতি মিংগুচি মারা গেছেন, তাঁর কিছু কিছু কাজ দেখেছি। বা ধরুন আন্দ্রেই তারকুভসকির ছবি। অথবা OZU এবং কুরোসাওয়ার ছবি। এগুলোর মধ্যে যে রসের সন্ধান পেয়েছি, তা সত্যিই অনবদ্য।

এঁদের সঙ্গে আমি বলব Fellini-র কথা। এই ভদ্রলোক অনেক গভীরে ঢুকেছেন যদিও জেরাসিমভ তাঁকে CANNES-এ আক্রমণ করেছিলেন। আমার মতে কিন্তু উনি কিছু ভদ্র কাজ করেছিলেন এবং চুটিয়ে কিছু ভাল ছবিও করেছিলেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

পোল্যাণ্ডে একটা চেষ্টা-চরিত্র আরম্ভ হয়েছিল ভাল ধরনের ছবি করার। আলেকজাণ্ডার ফোর্ড ছিলেন এর পেছনে। আন্দ্রেই (AMDREIWEIDA) ভাইদা কিছু ভাল কাজ করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওঁর মাথাটা এখন মোটামুটি গুলিয়ে গেছে। ও সত্যি সত্যি একজন শক্তিশালী ছবি করিয়ে কিন্তু নানারকম চাপে পড়ে বেচারি হারিয়ে যাচ্ছেন। ওঁর শেষ দিকের কাজ দেখে আমি সত্যিই দুঃখিত হয়েছি। পোল্যাণ্ডে এখন উনি ছাড়া, আন্দ্রেই মুঙ্ক হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর— আর যাঁরা আছেন, তাঁরা জাঁ পল সার্ত্রের Existentialism-কে একটা নবধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা করছেন। ফলে যে ধরনের ঘটনা ঘটছে, তা রোমান পোলানস্কির ছবির মতই দাঁড়াচ্ছে।

আমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা যদি কারো উপরে থাকে, তিনি হচ্ছেন লুই বুনুয়েল। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে, উনি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এখনো পর্যন্ত নিজের বিবেক বিক্রি করেননি। এ দেশের মানুষেরা ওঁর বেশি ছবি দেখার সুযোগ পাননি, কিন্তু আমার কিছু কিছু ছবি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখে মনে হয় যে, এখনো বোধ হয় কিছু কাজকর্ম হতে পারবে ছবির জগতে।

Caccoynis (কাকুয়ানিস) জাতীয় চলচ্চিত্রকাররাও কিছু ভাল ভাল কাজ করার চেষ্টাচরিত্র করছেন। আশা করা যায়, হয়তো এঁরা একটা ভাল অবস্থায় পৌঁছবেন।

নাটক এবং ফিল্মের জগতে BERTOLT BRECHT-এর চিন্তাধারা প্রচণ্ডভাবে কাজ করছে এখন। ওঁর 'VERFREMDVNGE' ভীষণভাবে পৃথিবীর সর্বত্র শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছে। মানুষজনকে গল্পে ভুলিয়ে কাঁদানো আর সাধারণ সস্তা দৈহিক ব্যাপার দেখানো— এসব দিয়ে কোন সৎশিল্পী আর খুশি হতে পারছেন না। তাঁরা ভাবছেন, চারপাশের যে জগতকে দেখা যাচ্ছে সেই সম্পর্কে মানুষের

আন্দ্রেই ভাইদার "ইনোসেনট সংসারাস"

সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করা। এইটেই হয়েছে এখন সমস্ত বড় শিল্পীর একমাত্র চিন্তা।

এই ঘটনাগুলোর ভিত্তিতে আমরা আমাদের দেশের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, তখন প্রচণ্ড দুঃখ হয়। আমাদের ছবি করার জগতে রওনা হতে হয়েছে একটা অত্যন্ত বিষাদময় ঐতিহ্য নিয়ে। সাহিত্যকে আমাদের সঙ্গী করতে হয়েছিল। ফল আমাদের এখনো ভুগতে হচ্ছে। আমাদের দেশে ছবি করতে গেলে প্রথমেই একটা গল্প বলবার কথা ভাবতে হয়। তারপরে সব আসে। আমি মনে করি, এইটা আমাদের অনুন্নত দেশের অশিক্ষিত মানুষের চিন্তা-ধারার পরিচায়ক। এ বাধা যদি না থাকত, তাহলে সত্যিই হয়তো কিছু মানুষ কিছু কাজ করে ফেলতে পারতেন। তা হল না।

আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই। যদি কিছু করে থাকি, করেছি। ভবিষ্যতে কিছু করতে পারব কিনা সেগুলো ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত আছে।

তবে কিছু কথা বলে যেতে চাই। সেটা আমাদের দেশে ছবি করার ব্যবস্থা সম্পর্কে। বাংলাদেশের ছবি আসলে পরিচালনা করেন প্রদর্শকরা। তাঁদের কথা ভেবেই ছবি হয়, এবং তাঁদের হুকুমেই ছবি বন্ধ হয়। এ'রাই সর্বাগ্রে টাকা তোলেন। এর পরে এ'রা সুবিধামত পরিবেশকদের টাকা দেন। তারপরে পরিবেশক যখন ভাল বোঝেন তখন প্রযোজককে টাকা দেন। অথচ এই প্রযোজকই নিজের গাঁটের কড়ি ফেলে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে ছবিটি করে থাকেন। অথচ তাঁকেই অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় শেষ পর্যন্ত। এই ঘটনাটা সমস্ত ছবির জগতকে গলাটিপে মারছে।

আরেকটা ঘটনা আপনাদের আমি শুনিয়ে দি। চিত্রপ্রদর্শকদের একটা খুব ভাল ব্যবস্থা আছে, M. G. বলে, তার সাহায্যে একটা লাভের ব্যবস্থা থাকবেই। কাজেই এ'দের কোনদিন ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। 'হাউসফুল' না হলে ও'রা মনে করেন যে আমাদের ক্ষতি হল। এ সম্বন্ধে সকলেরই খানিকটা ভাবা দরকার। এর যে কী প্রতিকার সেটাও বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার আর বেশি কিছু বলার নেই। তবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে ভারতবর্ষে ভাল ছবি হবার কোন সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি নিজে কিছু করি বা না করি, কিন্তু ভবিষ্যৎ পুরুষে যাঁরা আসবেন, তাঁদের জন্যে কথাগুলো বলে রেখে গেলাম।

বোধহয় বলার দরকার ছিল।

কাকুয়ানিস ও কুরোসাওয়া

আন্দ্রেই ভাইদা

ঋত্বিক ঘটকের ছবি

"শ্রী ঘটক বেপরোয়া হবার শক্তি পান কোথা থেকে? সেই উৎস কি মূল বক্তব্যের প্রতি তাঁর প্রত্যয়? এক হিসাবে তা-ই। কিন্তু যুক্তিবাদী, শিল্পরসিক দর্শকের যে-অংশ ওই প্রত্যয়ের শরিক নন, তাঁরা শ্রী ঘটকের "অযান্ত্রিক" কিংবা 'সুবর্ণরেখা' দেখতে দেখতে আচ্ছন্ন বোধ করেন কেন? সমগ্রভাবে পরিচালকের প্রকাশভঙ্গীর গুণ, অথবা শক্তি এই মোহসঞ্চারের মূলে।"

॥ জ্যোতির্ময় বসুরায় ॥

এই দেশের কোন চলচ্চিত্রকারকে যদি 'নিঃসঙ্গ' আখ্যা দেওয়া যায় তবে তিনি শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক। এই একজন ভদ্রলোক, যিনি কখনও কারও মুখের দিকে তাকিয়ে ছবি করেননি। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেও না। তাঁর মুখের দিকে কোন-কোনও সাহসী প্রযোজক কয়েকবার তাকিয়েছেন—তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ—ফলে গত দশ বছরে আমরা পাঁচখানি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী চিত্র তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। শ্রী ঘটকের প্রথম ছবি "নাগরিক" কী সব যেন ব্যবসায়িক গোলযোগের জন্য আদৌ মুক্তি পায়নি। সেটি 'পথের পাঁচালী'র আগে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আরও একাধিক ছবির ভাগ্য-বৃত্তান্ত প্রস্তাব আর সংক্ষিপ্ত প্রস্তুতিপর্বের মধ্যে নিঃশেষিত। অতএব পাঁচখানি কাহিনী চিত্রের পরিচালক হিসাবে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় সিনেমার রেকর্ড-বইতে তাঁর নাম। তবে পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে থাকতে একটি অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল—সেটি ধরলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে পাঁচ।

শ্রী ঘটকের প্রথম প্রদর্শিত চিত্র 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮) মুক্তি পাওয়ার পরেই ছবিটির প্রযোজক মহাশয় সমালোচকদের নিয়ে ছোট একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। উদ্দেশ্য: পরিচালকের সঙ্গে সমালোচকদের আলাপ করিয়ে দেওয়া। সাংবাদিকদের সেখানে প্রশ্ন করবার সুযোগও ছিল। অন্তত, তাঁরা তাই করেছিলেন। 'অযান্ত্রিক' যে নতুন ধরনের এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র এ-বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ ছিল না। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এবং 'পরশ-পাথর' দেখবার পরেও এই ছবি দেখে সকলেই চমকিত। নতুন পরিচালকের বলিষ্ঠ এবং একেবারে স্বতন্ত্র স্টাইলে মুগ্ধ বিস্মিত হয়েও কেউ কেউ সাধারণ চিত্রামোদীর দিক থেকে ব্যাপারটা মনে মনে বিচার করছিলেন। জনৈক প্রবীণ সমালোচক ঋত্বিকবাবুকে প্রশ্ন করেন: "আপনি ছবিটা কাদের জন্য করেছেন?" পরিচালক কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকলেন, তারপর বললেন: "আমার জন্যে।" বলে নিজের বুকের উপর তর্জনীটা বার দুই ঠুকলেন। এক মুহূর্ত পরে সেই আঙুলটাই প্রশ্ন কর্তার দিকে ফিরিয়ে দিয়ে যোগ করলেন—"আর আপনার জন্যেও।"

এর পর আর প্রশ্নোত্তর বেশী দূর অগ্রসর হয়নি।

হ্যাঁ, এই হচ্ছেন ঋত্বিক ঘটক—আত্মপ্রত্যয়ে স্থির দৃঢ় মনের বেপরোয়া। শিল্পী-অনোচিত আত্মবিশ্বাস? অবশ্যই নিজেকে যে তিনি অভ্রান্ত মনে করেছেন এমন নয়। দ্বিতীয় চিত্র "বাড়ি থেকে পালিয়ে"র (১৯৫৯) প্রথম প্রদর্শনীর পর তাঁকে কতকটা বিমর্ষ মনে হয়েছিল। ছবিটি আমন্ত্রিত দর্শকদের মুগ্ধ করেনি। এই চিত্রে এক কিশোর চরিত্রের চোখ দিয়ে কলকাতার ধনী দরিদ্রের আনাচে আর গলির ছবি দেখানো হয়েছে। অনন্য এবং বিশেষ বয়সের জীবনচেতনায় উদ্দীপিত পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী এই চরিত্রে আরোপিত। পরিণত মনের অধিকারী কিশোর চরিত্রকে দর্শক মেনে নিতে পারবেন কিনা এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে এসেছিল। পরিচালক সেদিন কথায় কথায় বলেন: দর্শক যদি গ্রহণ করতে না পারেন, তবে বুঝব সেটা আমারই অক্ষমতা।

অযান্ত্রিক (১৯৫৮)

ছবি যখন তার ভাব বস্তুর মধ্যে দর্শকের চিত্তকে আপ্লুত করতে বিফল হয়, তখন সে-বিফলতা পরিচালকেরই।'

এই "বিফলতা" বারে বারেই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। দর্শককে তিনি অশ্রদ্ধা করেননি; তবু ছবি করবার সময় টিকিট-ঘরের চাহিদার কথা ভেবেছেন এমন দৃষ্টান্ত দেখি না।

শ্রীঘটকের পাঁচখানি ছবির মধ্যে একমাত্র "মেঘে ঢাকা তারা" (১৯৬০) মোটামুটি চলেছিল। ছবিটি প্রযোজককে লাভের টাকা না দিলেও সম্ভবত লোকসান ঘটায়নি। অন্তত বেশ কিছু দর্শক ছবিটি দেখে-ছিলেন। বাকি চারখানি ছবি সম্পর্কে তা-ও বলা যায় না।

চিত্রামোদী মহলে তাঁর সমাদরের অভাব দুটি কারণে। প্রথম কারণ, তাঁর ছবি সাধারণ দর্শকদের খুশী করে না। ছায়াছবি যেখানে প্রমোদমাধ্যম সেখানে সে দর্শকদের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার একটা অলিখিত প্রতিশ্রুতি পালন করে। ঋত্বিকবাবুর ছবিতে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনও আয়োজন তো থাকেই না, উপরন্তু সেখানে একটা নৈরাশ্যের সুর থাকে; প্রায়শ যা সব ছাপিয়ে ওঠে। বর্তমান সমাজ-জীবনে সেই নৈরাশ্যের অন্ধকার তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অন্ধকারের বার্তা কয়জনের ভাল লাগবে?

দ্বিতীয় কারণ, শ্রীঘটকের ছবি কখনও পুরস্কার পায়নি—না দেশে, না বিদেশে। সাহেবদের কাছ থেকে বড় রকমের একটা হাততালি (স্থূল কথায় ফেসটিভ্যালের প্রাইজ) পেতে পারলে হয়ত এ দেশের দর্শকদের কাছে তাঁর ছবির চাহিদার সৃষ্টি হত। যেসব চিত্র-ব্যবসায়ী এখন তাঁর নাম

শুনলে তা পারে, আবার হয়তো তখন টাকা নিয়ে এগিয়ে আসবেন।

বিদেশী গুণীজনের প্রশংসা তিনি যে একেবারে পাননি, তা নয়। পরলোকগত ফরাসী সমালোচক জর্জ সাদুল শ্রীঘটকের 'অযান্ত্রিক'-এর এক রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন "লে মঁদ" পত্রিকায়। অতি সম্প্রতি ফরাসী চিত্র-পরিচালক লুই মাল (যিনি কিছুদিন আগে এদেশে এসে এখানকার কিছু ছবি দেখেন) তাঁকে "মোস্ট ওরিজিন্যাল ডিরেকটর অব ইনডিয়া" বলেছেন। প্রশংসা এদেশেও তিনি কিছু পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভার অথবা চলচ্চিত্র কর্মের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনের কথা যাঁরা খুব জোর গলায় বলেন, তাঁদের মুখে এক সময়ে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এই তিনটি নাম খুব শোনা যেত। এখনও শোনা যায়, তবে অনুক্রমে তাঁর নামটা এখন সর্বদা দ্বিতীয় স্থান পায় না। যাক সে কথা। আসলে আমার বক্তব্য, ঋত্বিক ঘটকের নাম ও'দের সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চার্য নয়। চলচ্চিত্রকার হিসাবে কে বড়, কার শিল্প বেশী উন্নত সে-প্রশ্ন এখানে আদৌ তুলছি না। শুধু বলতে চাই, ঋত্বিক ঘটক ভিন্ন কোটির চলচ্চিত্রকার—সকলের থেকে আলাদা।

শিল্প সম্পর্কে শ্রীঘটকের একটি স্পষ্ট ধারণা আছে। রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন, শিল্পকে সত্য এবং সুন্দর দুই-ই হতে হবে; কিন্তু প্রথমে সে-হবে সত্য, পরে সুন্দর। এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে: তবে কি ঋত্বিকবাবুর ছবি সর্বাংশে বস্তুনিষ্ঠ? উত্তরে এক কথায় 'হ্যাঁ' বলা কঠিন। কারণ নিরপেক্ষ রিপোর্টেজের ভঙ্গীতে তাঁকে ছবি করতে দেখা যায়নি। এখানে সত্যটি হল পরিচালকের নিজস্ব উপলব্ধির সত্য অথবা প্রত্যয়ের সত্য।

রাজনীতিক বিশ্বাসে তিনি কম্যুনিস্ট। সমাজের বর্তমান দুরবস্থার মূলে শ্রেণী বৈষম্য তথা মালিকশ্রেণীর শোষণ এই সাধারণ থিওরি তিনি মেনে নিয়েছেন এটুকু ধরে নিতে পারি। সব ভেঙে চুরে আবার এক নতুন সমাজ গড়ে তোলা হোক, যেখানে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, যেখানে শোষণ থাকবে না, থাকবে প্রতি ব্যক্তির মনুষ্যত্ব বিকশিত হবার সুযোগ—এই সম্ভবত তাঁর কাম্য। এমন এক বিপ্লব ঘটাতে গেলে প্রস্তুতি চাই; সমাজের যারা শরিক তাদের সচেতন করে তোলা দরকার। কম্যুনিস্ট হিসাবে সিনেমা শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে পরিচালকের সেই দায়িত্ব ঋত্বিকবাবু, অনুমান করা যায়, অস্বীকার করেননি। কিন্তু যেহেতু নিজে শিল্পী, তাই নিছক পার্টি-লাইনের প্রচারকেই তিনি তাঁর মূল্য মন্ত্র করে নিতে পারেননি। এইখানে এসেছে তাঁর নিজস্ব বোধ আর বিচারের কথা।

মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০)

তাছাড়া দেশের ঐতিহ্যের প্রতি রয়েছে তাঁর শ্রদ্ধা। সে যাই হোক, ভাবের ঘরে চুরি তাঁর কাজের ক্ষেত্রে প্রশ্রয় পায়নি।

তাঁর বিভিন্ন চিত্র বিচার করলে দেখা যায়, সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলাকে তিনি তাঁর প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আজকের সমাজের স্তরে স্তরে পাপ আর গ্লানি কীভাবে স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে, ব্যক্তিমানুষের জীবনে তা কী সর্বনাশ ডেকে আনছে বিভিন্ন চিত্রে তারই বিশ্লেষণ। অহরহ প্রেম-ভালবাসা, মূল্যবোধ আর আদর্শের অপমৃত্যু কীভাবে ঘটছে তা-ও তাঁর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় ("মেঘে ঢাকা তারা"র প্রণয়ী যুবকটির বিশ্বাস ভঙ্গ, "সুবর্ণরেখা"য় ঈশ্বরের আত্মবঞ্চনা আর ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত স্মরণীয়)। যারা মনুষ্যত্বের শর্ত পালন করতে পারল না, কুমতোর কারাগারে বন্দী থেকে গেল, কিংবা ক্রমশ ধাপে ধাপে নীচে নেমে এল, তাদের প্রতি পরিচালকের অভিশাপ বর্ষিত হয় না। তিনি মহত্তী বিনষ্টির জন্য দোষী করেন সমাজ-ব্যবস্থাকে। তার উপর যেন তর্জনী তুলে জানিয়ে দেন: এ তোমার পাপ যারা অন্যায় করছে আর যারা অশেষ ক্লেশ ভোগ করছে দুই দলই তোমার শিকার।

এই মনের কথা প্রকাশ করবার জন্য পরিচালক উপযোগী গল্প বেছে নেন অথবা তৈরি করে নেন। এখানেও তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যয় আর বেদনার ব্যাপার আছে। বর্তমান বাংলা দেশের দুরবস্থার মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে পীড়াদায়ক বস্তু হল উদ্বাস্তু সমস্যা। ছিন্নমূল মানুষদের পুনর্বাসনের রীতি-নীতি তাঁর চিন্তার বিষয় নয়; ওদের আর্থিক সংকটও তত না, যত ওদের এবং সেইসঙ্গে গোটা বাংলা দেশের মানুষের আত্মিক সংকট। তিনি দেশ বিভাগকে কোন মতেই মেনে নিতে পারেননি। সম্ভবত তাঁর ধারণা, সর্বনাশে মূল্যবোধের যে-ক্ষয় সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করে চলেছে তার মূলে দেশবিভাগ। তাঁর পাঁচখানি ছবির চারখানিতেই (অর্থাৎ 'অযান্ত্রিক' ছাড়া সব কয়টিতে) উদ্বাস্তু চরিত্রের আনাগোনা। দুঃখ যন্ত্রণার চেয়েও বেদনাদায়ক, নৈরাশ্যের কাছে ওদের আত্মসমর্পণ। যেক্ষেত্রে মানুষ

মৃত্যুর পূর্বে, যাঁর। সে মৃত্যু দৈহিক কিংবা আত্মিক। [illegible] বেশী মর্মান্তিক। এই ট্র্যাজেডি [illegible] একাধিক ছবিতে ঘটেছে—বিশেষ করে "সুবর্ণরেখা"য় (১৯৬৫)।

সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের সম্পর্কের বিষয়ে শ্রীঘটকের ধারণা স্বচ্ছ। সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণে তিনি দ্বিধা করেননি। "অযান্ত্রিক" "বাড়ি থেকে পালিয়ে" এবং "মেঘে ঢাকা তারা" প্রকাশিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত। তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি অদল-বদল করেছেন। ঘটনার পরিবর্তন অথবা সংযোজনের চেয়েও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যটাই এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বস্তু। "অযান্ত্রিক"-এ শ্রীসুবোধ ঘোষের গল্পের মূল সুর ও মেজাজ অবশ্য অনেকখানি বজায় আছে। পরিণতির অংশে পরিচালক তাঁর বক্তব্য (যা জীর্ণ, যা পুরাতন তার প্রতি আসক্তি পরিত্যাজ্য) প্রকাশ করেছেন। ওই বক্তব্যের প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমান্তরাল চরিত্র এবং তার উপ-কাহিনী সংযোজিত। দ্বিতীয় চিত্রটি আদৌ মূলানুগ নয়। না মেজাজে, না গল্পবস্তুর দিক দিয়ে। "মেঘে ঢাকা তারা"তেও পরিচালক নিজের

বিচার বোধ অনুযায়ী স্বাধীনতা নিয়েছেন। "কোমল গান্ধার" (১৯৬১) ছবির কাহিনী রচয়িতা তিনি নিজে। 'সুবর্ণ রেখা'র গল্পকার হিসাবে যদিও অন্য একটি নাম আছে, তবু বস্তুত এ-কাহিনী তাঁর নিজেরই বলা চলে। মোট কথা, তাঁর ছবির গল্প সব সময় বক্তব্যপ্রধান। বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি চিত্রনাট্য রচনা করেন।

নাটকের প্রতি তাঁর অনুরাগ সন্দেহাতীত। শ্রীঘটক নিজে বহু নাটক লিখেছেন, একদা নাট্যদলের সঙ্গে তাঁর যোগও ছিল। অভিনয়ের ব্যাপারকেও তিনি মূল্য দিয়ে থাকেন। বিদেশের কোন-কোনও চলচ্চিত্র-ধারায় নাটক উপেক্ষিত, নাট্যরস বর্জন করবার দিকেই সেখানে লক্ষ্য থাকে। আধুনিক বিদেশী চলচ্চিত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, কিন্তু অন্য কোনও দেশের কোনও ধারার অনুসরণে অথবা অনুকরণে তাঁর প্রবৃত্তি নেই। ফর্ম ভাঙা-গড়ার পরীক্ষা তিনি নিজেও করেছেন ('অযান্ত্রিক', 'কোমলগান্ধার'), কিন্তু নাটককে বাদ দিয়ে না। ছবির ধর্ম বজায় রেখেও তিনি নাটক গড়ে তোলেন। এ-ব্যাপারে, মনে হয়, তাঁর আনুগত্য দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি। তাঁর চিত্রনাটকের সুর প্রায়শ দেখি চড়া পরদায় বাঁধা। সম্ভবত এক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার উৎস বাংলা দেশের যাত্রা নাটক। একাধিক ছবিতে যাত্রার বিবেক-সদৃশ চরিত্র দেখেছি। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবির চানাচুরওয়ালা এবং 'সুবর্ণ রেখা'র হরবিলাস (দু জনেরই মুখে তাত্ত্বিক সংলাপ) যাত্রা-নাটকের বিবেক চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়।

দেশজ শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি ঋত্বিক-বাবুর আনুগত্যের আর একটি প্রমাণ সংগীতের প্রয়োগে। তাঁর ছবিতে গানের প্রাধান্য লক্ষণীয়। যারা অবশ্য তাঁর ছবির পাত্র-পাত্রী, সংগীত তাদের জীবনের একটি অংশ। উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সংগীত, রবীন্দ্র-সংগীত এবং লোক-সংগীত তাঁর ছবির সাউন্ড-ট্র্যাকের বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে থাকে। গানের অংশ কমিয়ে ছবিকে আরও গতিশীল করবার পথ তিনি গ্রহণ করেননি। তার চেয়ে গানকে চিত্রনাট্যের উপকরণ করে তোলাতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। যথাযথ পরি-মণ্ডল রচনার জন্য, কখনও বা ভাবাবেগের বিশেষ একটি মাত্রা সৃষ্টির জন্যও তিনি সংগীতের আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রাসংগত বলে রাখি, ভারতীয় মার্গ সংগীত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান প্রত্যক্ষ। লোকসংগীত সম্পর্কেও।

শিল্পগতভাবে ঋত্বিকবাবুর ছবির প্রধান ত্রুটি আতিশয্য। বক্তব্যকে সোচ্চার না করে তিনি শান্তি পান না। অতিনাটকীয়তার আশ্রয় যখন নেন, চূড়ান্তভাবেই নেন। চিত্র-নাট্যে যেমন, তেমনই তাঁর প্রকাশভঙ্গিতেও এই আতিশয্যের লক্ষণ প্রায়শ দেখি। দ্বিতীয় ত্রুটি হল শৃংখলার অভাব। প্রত্যেক প্রকৃত শিল্পীকে অবশ্যই অংশত বেপরোয়া হতে হয়। সাধারণ রীতি-নীতির বন্ধন তাঁর জন্য নয়—একথা মেনে নিয়েও বলব, শিল্পীও কিন্তু যথেচ্ছাচার করতে পারেন না; সংযম ছাড়া সৃষ্টি সার্থক রূপ লাভ করতে অক্ষম। শ্রীঘটকের বেপরোয়া ভাব আবার অসতর্কতারই নামান্তর। 'সুবর্ণ রেখা'য় তিনি স্বচ্ছন্দে ২৬ জানুয়ারি জালিয়ান-ওয়ালাবাগ দিবস পালন করিয়ে দিলেন (আসলে ওই তারিখ হওয়া উচিত ১৩ এপ্রিল); গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটালেন ৩০ জানুয়ারি সকালে (যা সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় ঘটে)। সংবাদপত্র দফতরে টেলিপ্রিন্টারে ওই খবর এসেছে দেখানো হল, অথচ ওইরকম মেলোড্রামাটিক সংবাদে কাগজের কর্মীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়েছে বলে বুঝতে দেওয়া হল না। প্রথম দুটি ভুলের কারণ অসতর্কতা; তৃতীয় ক্ষেত্রে বাস্তবের

কোমল গান্ধার (১৯৬১)

বিকৃতি সম্ভবত ইচ্ছাকৃত। ইচ্ছাকৃত হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কি? কিন্তু তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। ওই ধরনের বেশ-করেছি-ভাব চিত্রটির নাট্যাংশের পর্যায়ে পর্যায়ে। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' চিত্রে বেলেঘাটা কিংবা ওইরকম কোনও জায়গার চানাচুরওয়ালাকে ডালহৌসি স্কোয়ার এবং হাওড়া পুলে অঞ্চলে ভোরবেলা (যখন স্থানটি জনবিরল) চানাচুর বিক্রির জন্য গান গেয়ে সফর করতে দেখা যায়। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় নায়িকার দাদা কিছুদিন উচ্চাঙ্গ সংগীতের রেওয়াজ করে হঠাৎ বোমবাই পৌঁছে রাতারাতি জনপ্রিয় গায়কে পরিণত হয়ে গেল। এই রকম সরলীকরণের ব্যাপার খুঁজলে যথেষ্ট পাওয়া যাবে; কিন্তু তালিকা দীর্ঘ করে লাভ কী?

শ্রীঘটক বেপরোয়া হবার শক্তি পান কোথা থেকে? সেই উৎস কি মূল বক্তব্যের প্রতি তাঁর প্রত্যয়? এক হিসাবে তা-ই। কিন্তু যান্ত্রিকবাদী, শিল্পরসিক দর্শকদের যে-অংশ ওই প্রত্যয়ের শরিক নন, তাঁরা শ্রীঘটকের 'অযান্ত্রিক' কিংবা 'সুবর্ণ রেখা' দেখতে দেখতে আচ্ছন্ন বোধ করেন কেন? সমগ্রভাবে পরিচালকের প্রকাশভঙ্গীর গুণে অথবা শক্তি এই মোহ সঞ্চারের মূলে। ভাষা যে-লেখকের দখলে, তিনি অনায়াসে যে-কোনও রচনায় একটা অতিরিক্ত ডাইমেনশন বা মাত্রা এনে দিতে পারেন। কনটেনট যা-ই হোক, স্টাইলের গুণেই সেই রচনা রসিক পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। শ্রীঘটকের চলচ্চিত্রেও সেই ব্যাপার। রং আর তুলি নিয়ে যেমন নিপুণ চিত্রকর, চলচ্চিত্রের বিবিধ উপকরণ নিয়েও তেমনই শ্রীঘটক আশ্চর্য কাণ্ড করেন। ফিলম ল্যাংগোয়েজ অথবা চিত্রভাষা সম্পূর্ণতই তাঁর আয়ত্তে। তাঁর চিত্রভাষা কিন্তু সহজ, সরল নয়—রীতিমত জটিল। ফ্রেমিঙের বৈশিষ্ট্য, ক্ষণে ক্ষণে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন, গতিছন্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, আনুষঙ্গিক, কখনও বা প্রতীকী শব্দের প্রয়োগ, সংগীত—সব মিলে এক-একটি দৃশ্য পর্যায় এত কথা বলে যে প্রায়শ মনে হয় ছবিতে সংলাপটাই যেন অতিরিক্ত বস্তু। ক্যামেরার কাজের তো কোনও তুলনাই হয় না ('সুবর্ণ রেখা' দেখবার সময় মনে হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে); সম্পাদনা তেমনই জোরালো। তাঁর মতে এবং বলা যায় যে-কোনও চলচ্চিত্র-বিদের মতে "সম্পাদনা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী খুঁটি।" একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "একটা ছবির রূপ কল্পনা করতে গেলে প্রথমেই মাথায় আসে তার সম্পাদনার রূপ। সেইটাই ছবিটির রস, গন্ধ এবং আকার নির্বাচন করে দেয়।" দ্রুত দৃশ্য কেটে দৃশ্যান্তরে নিয়ে যাওয়ার কৌশল তো আছেই, তারই সঙ্গে গতিছন্দের মাত্রাবদল, কখনও বা হঠাৎ যতি এনে দেওয়া—এই সবের মধ্য দিয়ে সুনিপুণ সম্পাদনায় তিনি যে এফেক্ট তৈরি করেন, এক কথায় তা বিস্ময়কর। চিত্রভাষাকে যে-জোরের সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেন, অনুরূপ শক্তি খুব কম পরিচালকের চিত্রকর্মে প্রত্যক্ষ করেছি। শ্রীঘটকের চিত্র-কর্মে আখ্যানভাগের দুর্বলতা অথবা বিশ্বাস-যোগ্যতার অভাব, সংলাপের কৃত্রিমতা ইত্যাদি ত্রুটিকে প্রয়োগসৌকর্য প্রায়শ অনায়াসে অতিক্রম করে যায়।

কয়েকটি দৃশ্যপর্যায়ের উল্লেখ করা যাক। 'অযান্ত্রিক' ছবিতে প্রণয়ী-পরিত্যক্ত যুবতীকে ড্রাইভার বিমলের ট্রেনে চড়িয়ে দেবার দৃশ্যের কথাই ধরুন। পথের মাঝে একটি টিলায় বিষণ্ণ মেয়েটি একলা বসে আছে; বিমল ওকে জগদ্দল গাড়িতে করে নিয়ে এসেছে স্টেশনে; ট্রেন এল, মেয়েটি উঠল; সবশেষে ট্রেন ছাড়বার মুহূর্তে বিমল ওকে কী-যেন বলতে গেল, বলা হল না, শোনা গেল নির্বিকার ট্রেনের ধস ধস শব্দ। সে-শব্দ আজও যেন শুনতে পাই। 'মেঘে ঢাকা তারা'র কথা ভাবলে মনে পড়ে নায়িকার সেই আর্ত স্বর—"আমি বাঁচতে চাই", তখন ক্যামেরা ধীরে ধীরে প্যান করেছে, ওই ধ্বনি কয়েকটি প্রতিধ্বনির আকৃতি সৃষ্টি করে ক্ষণকালের জন্য বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে পড়েছে। 'কোমল গান্ধার' এ পার্টিশন বাংলার সীমান্তে রেলের বাফারটিও দৃশ্যটিও কি ভোলা যায়? রেললাইনের শেষ সীমা-নির্দেশক বাফারটি দেখানো হয়েছে, সেই-সঙ্গে চলন্ত ক্যামেরাগাড়ি; তারপরেই একটি প্রতীকী ধ্বনির প্রয়োগ। সেই শব্দ যেন মর্মভেদী।

'সুবর্ণ রেখা' প্রায় আগাগোড়াই অসাধারণ দৃশ্যপর্যায় আর খণ্ড দৃশ্য দিয়ে তৈরি। অভিরামের মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটি মনে করুন। মুমূর্ষু মা-কে অভিরাম চিনেছে।

ওর এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা সোচ্চার হয়ে উঠতে চাইল। ঠিক তখনই ক্যামেরার চোখ ওদের মুখ থেকে সরে গিয়ে রেল লাইনের দিকে ফেরানো হয়েছে। প্ল্যাটফরম কাঁপিয়ে ট্রেন এল। ইনজিনের আওয়াজ, যাত্রীর ব্যস্ততা। ওদিকে সামনে একটি বট গাছের ঝুরি ধরে একটি ছোট ছেলে দুলছে তো দুলছেই (সে কি এখনকার নিরালম্ব মানুষের প্রতীক?)। সব মিলিয়ে বাইরের পৃথিবীর উদাসীনতা একটি আকাশফাটা বেদনাকে যেন ছাপিয়ে যায়। নির্জন সন্ধ্যায় পরিত্যক্ত বিমান বন্দরে কিশোর-কিশোরী অভিরাম আর সীতার ছুটোছুটির দৃশ্যটিও মন থেকে মুছে যাবার নয়। সন্ধ্যার সেই আবছা অন্ধকারে হঠাৎ ওরা মুখোমুখি হয়েছে কালীবেশী এক বহুরূপীর। সুন্দর পরিবেশে কিশোরীর ভয় আর বিস্ময় তখন মূর্ত। বাস্তব আর বিভ্রমের সীমান্তও সেই ক্ষণে লুপ্ত। এইবার সীতার মৃত্যু দৃশ্যটির কথা ভাবুন। সেখানে ভয়ংকরের রূপ যেন লাবণ্যময়। রক্তাক্ত সীতার দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত, প্রায় অন্ধ ঈশ্বরের জামায় সেই রক্ত ছিটিয়ে পড়েছে, তখনও কিন্তু সীতার মুখখানিতে এতটুকু বীভৎসতার ছায়া পড়েনি। জীবন মৃত্যুর মূর্তি এখানে শান্ত, সুন্দর। বড় ক্লোজ-আপে প্রায় এক মিনিট ধরে ওই মুখ দেখানো হয়েছে। ভোলা যায়?

শুভ তার অশুভের লীলা সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা হয়ে যেতে আর একবার দেখেছি। যে-ছবিতে, সেটি পুণা ইনস্টিটিউটের জন্য তোলা—নাম "ফিয়ার"। অল্প দৈর্ঘ্যের এই চিত্রে আপন আপন স্বার্থচিন্তায় মগ্ন, ভাল, মন্দ, কেউ বা প্রবৃত্তির বশীভূত এমন নানা স্ত্রী-পুরুষকে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে একটি আদিম অনুভূতির শরিক করে দেবার দৃশ্য পর্যায়টি অসাধারণ। সেই অনুভূতির নাম ভয়। শ্বাসরোধকারী কয়েকটি মুহূর্তে অনবরত দৃশ্য কাটা হয়েছে; এক-একটি দৃশ্যে ফুটেছে এক-একটি ভয়ার্ত চাহনি। নেপথ্যে হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ওঠানামার মত আবহ সুরের ব্যঞ্জনা। শঙ্কার পরে স্বস্তি এসেছে সাদা পাখির ঝাঁকের যে দৃশ্যে সেটি আকাশের গায়ে যেন চিরকালের একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্নও এঁকে দিয়ে গিয়েছে।

*

সাড়ে পাঁচখানি ছবির মধ্যে কোনটি রস এবং গুণ বিচারে শ্রেষ্ঠ? চট করে উত্তর দেওয়া হয়তো কঠিন। সে যাই হোক, আমাকে যদি একটিকে বেছে নিতে বলা হয়, তবে আমি ভোট দেব সুবর্ণ রেখাকে। এক্ষেত্রে গল্পের সংখ্যাতীত ত্রুটির কথা আমি মানি। কিন্তু এর তুল্য সর্বাংশে চলচ্চিত্র আমরা কয়টি দেখেছি? বস্তুত, 'সুবর্ণ রেখা' দেখে জানা যায়, আমাদের দেশের এক পরিচালক সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে কী কাণ্ড করতে সক্ষম। সেই কাণ্ডের স্বরূপে আজও যে-চিত্ররসিকের কাছে অনুদ্ঘাটিত, তার জন্য আমি সমবেদনা অনুভব করি।

ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন

দশ বছর আগেই আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল পঞ্চানন—তোকে আর মানুষ করা গেল না।

আমার অপরাধ তখনো ফিল্ম ক্লাবের মেম্বর হইনি। তখন ডানা গজানোর বয়স, পৌরুষে আঘাত দিলে মর্মে গিয়ে বেঁধে। পরদিনই আংটি বেচে ফিল্ম ক্লাবের মেম্বর হয়ে গেলাম। তারপর, গত দশ বছর ধরে চলেছে আমার সাধনা, নিজেকে মনুষ্যকরণের অসাধ্যসাধন। কেউ বাদ পড়েনি—গদার, বুনুয়েল, ভিসকন্তি, আন্তোনিওনি ডি-সিকা, ত্রুফো, রেনে, প্যাসোলিনি, বেরারিম্যান—এঁদের সেরা ছবি সুযোগ পেলেই দেখেছি। আর ফাঁকে ফাঁকে তালিম নিয়েছি গুরুদেব পঞ্চাননের কাছ থেকে। ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনের যাবতীয় বই ম্যাগাজিন কিনেছি। কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝিনি। ফরাসী 'ন্যুভেল ভাগ' বোঝার জন্য ফরাসী ভাষা শেখার চেষ্টাও করেছিলাম, জার্মান নিয়েও ঘাঁটাঘাটি করলাম কিছুদিন। বিস্ময়মুগ্ধ পঞ্চাননও আমার অধ্যবসায় দেখে পূর্বমত পালটে ফেলেছিল—তুই নির্ঘাৎ সিদ্ধিলাভ করবি।

সিদ্ধিলাভ আমি করিনি। কিন্তু আশ্চর্য, আমার অর্ধেক বিদ্যা সম্বল করে পঞ্চানন সিদ্ধিলাভ করে বসল। ফিল্ম ক্লাবে আসার পর অল্পদিনের মধ্যেই আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। বুঝলাম, সামনে রুপালী পর্দায় যে-ছবি দেখানো হয়, পিছনে অন্ধকার চেয়ারগুলির ছবি তার চেয়েও আকর্ষক। সাগরপারের সঙ্গে নিজেদের আত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠার এক অসহনীয় প্রতিযোগিতা চলে এখানে। বাপ মেয়েকে সঙ্গে আনেন। হবু জামাই বিলেত-ফেরত, মেয়ের রুচিকে উন্নত করতে হবে। ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট আসে শাঁসালো পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পাওয়া যাবে। অর্ধশিক্ষিত প্রযোজক মাঝে মাঝে আসর জমাতে আসেন, ডিরেক্টর জানুক, তাঁর প্রযোজকের শুধু টাকা নয়, রুচিও আছে। নানা মতলবে নানা জনের আনাগোনা। মেম্বর বাড়তে বাড়তে ফিল্ম ক্লাব প্রায় বাজারে পরিণত হবার যোগাড়। আর সেই হাটে পঞ্চানন প্রিন্স অব ওয়েলস।

এরই মধ্যে পঞ্চানন নিখোঁজ হয়ে গেল একদিন। ভাল ভাল ফিল্ম দেখানো হচ্ছে, পঞ্চাননের পাত্তা নেই। সোজা চলে গেলাম ওর বাড়ি। দেখি, পঞ্চাননের চোখে শেলের মোটা চশমা, মুখে পাইপ। সামনে স্তূপীকৃত একরাশ কাগজপত্র। মাথাটা কিঞ্চিৎ শ্রাগ করে বলল—তোদের সাহেবী ফিল্ম ক্লাব-টাব নিয়ে আমার পোষাবে না। এখন জনতার যুগ। পাড়ায় পাড়ায় ফিল্ম ক্লাব খুলব। কাল সন্ধ্যায় আসিস, বড়-বাজারে তুলোপটি ফিল্ম ক্লাবের উদ্বোধন হবে। অব কোর্স আমিই প্রধান অতিথি। তারপর তেলপটিতে ব্রাঞ্চ খুলব। শ্যামবাজার, বাগবাজার, কাশীপুর, চিৎপুর, কোথাও বাদ পড়বে না। ওদিকে বহরমপুর, কেষ্টনগর, কাটোয়া, বর্ধমান, সীতারামপুর, রানীগঞ্জ থেকেও অসংখ্য চিঠি এসেছে—সবাই ব্রাঞ্চ খোলার দাবি জানাচ্ছে। দেশের চেহারাটাই পালটে দেব দেখবি।

হলও তাই। এক বছরের মধ্যে ফিল্ম ক্লাবের সাড়ে ছ' শো ব্রাঞ্চ সারা বাংলা দেশে খোলা হল। এরই মধ্যে, একদিন পঞ্চানন এসে হাজির। বলল—কাল তুলোপটি ব্রাঞ্চে আসিস—নতুন ইটালীয়ান ছবি এসেছে একটা। ক্লাসিক প্রোডাকশন। গেলাম। দুটি তরুণী গেটের কাছেই আর্ট পেপারে ছাপা সুভেনির দিল।

ইংগিতময় ব্যঞ্জনা মানে ব্যঞ্জনাময় ইংগিত

দেশ-বিদেশের কাগজে ছবিটার যে-সব প্রশংসা বের হয়েছে, সেগুলি ছাপা হয়েছে। হাংগেরিয়ান, নরওয়েজিয়ান, চেক, রুমানিয়ান ভাষা আমি জানি না। তবে সেসব দেশে প্রশংসা যখন করেছে, তখন নিশ্চয়ই ভাল ছবি। কিন্তু ছবিটা দেখে হতাশ হলাম। প্রথম থেকেই কেমন যেন খাপছাড়া মনে হচ্ছিল ছবিটাকে। মাঝে মাঝে ইংরেজী সব টাইটেল। কিন্তু সেখানেও কোন পারস্পরিক সংগতি নেই। মাঝে মাঝে অন্ধকার, আবার আলোর ঝিলিক, আবার অন্ধকার। তারপর মোটর গাড়ির হেড লাইট। একটি আলোর বিন্দু ক্রমশ প্রখর হয়ে একেবারে চোখ ঝলসে দিল। পঞ্চানন মুখে অস্ফুট শব্দ করল। বললাম, মোটরের হেড লাইটে মাহাত্ম্য কি আছে? ও তো হিন্দী-বাংলা সব ছবিতেই থাকে।

—এটা প্রতীকের ব্যাপার। সিম্বলিজম বুঝতে মগজ লাগে, বুঝলি হাঁদারাম। হেড লাইট হল নায়িকার সন্ধানী চোখ, নায়ককে খুঁজে বেড়াচ্ছে তন্ন তন্ন করে। —বলেই সে আবার উঃফ বলে উচ্ছ্বাসে আমায় জড়িয়ে ধরল।

—কি হল?

পর্দায় তখন নারী মূর্তির নিম্নার্ধ দৃশ্যমান। বিবসনা। পাশে বাথটাব, ওপাশে তোয়ালে সাবান, আর একপাশে কোন ও আরও কি সব রয়েছে।

—কি রকম ফেইথফুল প্রোডাকসন দেখ, এমন রিয়ালিস্টিক টাচ দিতে তোদের ডিরেক্টরদের একশো বছর লাগবে।

এর পর কিছু মামুলি দৃশ্য. ঝোপ-জংগল, লতাগাছ, সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অনেকটা মালতীলতার মত। পাশেই একটি মাকড়সার জাল, ক্লোজ-আপ শটে মাকড়সা একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে ফেড আউট হয়ে গেল। পঞ্চানন আবেগে আমার পিঠে চাপড় মেরে বলল, কি রকম রিচ আইডিয়া দেখ। তোদের ইণ্ডিয়ান ডিরেক্টর হলে মাকড়সার বদলে ভিলেনকেই দেখাত। মাকড়সা জাল বুনছে মানে ভিলেন চক্রান্ত করছে—আর ওই দেখ, নায়িকা নিশ্চিন্তমনে নির্জন ঘাটে স্নান করছে। কোন পোশাক নেই—তার মানে জায়গাটা নির্জন। কেমন সাজেসটিভ, আই মীন ইংগিতময় ব্যঞ্জনা, মানে ব্যঞ্জনাময় ইংগিত রয়েছে এই ন্যুড দৃশ্যের মধ্যে—ভেবে দেখ......

বুঝলাম, সব ভাল। কিন্তু তোমাদের এই ইতালিয়ান ছবিতে শব্দ নেই কেন। মাকড়সা না হয় কথা বলতে পারে না, ফুলের ভাষাও না হয় নীরব। কিন্তু নায়ক-নায়িকারা? তারা কি বোবা?

—শব্দ! ভূত দেখার মত আঁতকে উঠল পঞ্চানন—শব্দ কি করে হবে! এ হল দুঃখের ছবি, দুঃখের কোন ভাষা নেই। প্রচণ্ড আঘাতে মানুষ বোবা হয়ে যায়। যাকে বলে ডাম ফাউণ্ড।

—কিন্তু শাড়ি সেমিজের মত কি যেন দেখলাম কয়েকটি মেয়ের পরনে।

—তুই হিস্টরীর ছাত্র, তুইও শেষ পর্যন্ত ভুল করলি। প্রাচীন রোমের মেয়েদের পোশাক কি? লম্বা সেমিজ, ঘাগরা এসব ছিল তাদের পোশাক। মাথায় খোঁপাও তারা বাঁধত, বেণীও ছিল দু'-একজনের।

—কিন্তু এসব কি কালো কালো, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ছায়া...। পঞ্চাননের ঝাঁকড়া, অর্ধবৃহ

ছবি দেখার আগে

ছবি দেখার পরে

হাসি—আসিস কাল সকালে। নিরিবিলিতে বসে তোর সংগে আলোচনা করব।

আমি যাইনি, পঞ্চাননই এল পরদিন। ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়ে মুখের পাইপে অগ্নিসংযোগ করল।

—তোকে বলি এর ট্রেড সিক্রেট, হাজার হোক তুই হলি বাল্যবন্ধু। লোকে চায় কি? ইনটেলেকচুয়াল ছবি, অথচ দুর্বোধ্য হওয়া চাই। মুখে রুচির কথা, মনে মনে চায় নোংরা দৃশ্য। তার জন্য সাগরপাড়ি দিয়ে বিদেশে যাওয়া কেন বাপু। ভাবলাম নিজেই ছবি করব। সব কিছু এলোমেলো-ভাবে জুড়ে এই তিলোত্তমা।

—কিন্তু এই সব কাগজের রিভিয়ু? বিদেশী পত্রিকার এই সব প্রশংসা?

—তুই একটা বুদ্ধু, ফরাসী জার্মান, নরওয়েজিয়ান, হাঙ্গেরীয়ান এই সব দুর্বোধ্য ভাষা কোন্ মেম্বর বোঝেরে?

সকলের লক্ষ্য এক—ইনটেলেকচুয়াল ও নেকেড ছবি চাই। ভাষা নিয়ে, প্রোজেকসন নিয়ে, হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই।

—তবে এত যে বিদেশী কাগজের প্রশংসা?

—কে বলেছে এসব প্রশংসা? ওগুলো নরওয়ে কি হটেনটটদের ভাষা তা আমিও জানিনে। একটা বিদেশী মেডিকেল জার্নালের দু-পাতা কেটে ছেপে নিয়েছি, বোধ করি কোন ওষুধের বিজ্ঞাপন হবে ওটা। আর একটা কেটেছি জাপানী পত্রিকা থেকে, বোধ হয় সেটা কোন কবিতার লাইন হবে। ধরবে কোন ব্যাটা?

"এ-বাস্তবতা, কী পরিবেশ আর কী চরিত্র, সব দিক থেকেই অকৃত্রিমতার একটা পরিপূর্ণ ইমেজ মনে ধরিয়ে দেয়।"

॥ পঙ্কজ দত্ত ॥ সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায় আজ এমন একটি নাম যার উল্লেখ মাত্রই, শুধু এদেশেরই নয়, পৃথিবীরও নানাদেশের চলচ্চিত্ররসিকজনের মনে শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে একটা অসাধারণ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের চমক উপলব্ধি করার আশা জাগিয়ে তোলে। চলচ্চিত্র-বিশ্বের উচ্চতম শিল্পমহিমার নিরিখে ভারতীয় কৃতিত্বকে একটা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে তোলায় সত্যজিৎ রায়ের একক প্রচেষ্টার তুলনা নেই। বহুদেশে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা থেকে শ্রেষ্ঠত্বের এত সম্মানজনক পুরস্কার ও অভিনন্দন তিনি তাঁর প্রথম [illegible] লাভ করেছেন যা পৃথিবীর আর [illegible] হয়নি।

সত্যজিৎ রায় এই গৌরব অর্জন করেন সরল বাস্তবের রূপ সরাসরি পর্দায় উপস্থিত করে তোলার গুণে। অপুর কাহিনীত্রয়—পথের পাঁচালী, অপরাজিত ও অপুর সংসার—বাস্তবের এমন চেহারা এনে উপস্থিত করে যা অতি সাধারণ দর্শকেরও দৃষ্টিকে ছাপিয়ে মাধুর্যটা তার আত্মার আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। আর এই কারণেই আনকোরা নতুন বা অখ্যাত এবং স্বল্পখ্যাত অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলী সত্ত্বেও অপুর জীবনকাহিনী সাধারণ মানুষকেও অভিভূত করে তোলে। তাঁর ছবিতে যে বাস্তবতা পাওয়া গেল, সেটা সাজানো বা যাকে বলা যায়, স্টেজম্যানেজড তা নয়। এ বাস্তবতা, কী পরিবেশ আর কী চরিত্র, সবদিক থেকেই অকৃত্রিমতার একটা পরিপূর্ণ ইমেজ মনে ধরিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের অত্যন্ত নিবিড় সত্য ও বাস্তবের স্বরূপ অপু-ত্রয়ীতে যেভাবে তিনি উপস্থাপিত করেন তা এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সংগে অনুভূতিকে চমৎকৃত হবার একটা আমেজ এনে দেয়। চরিত্র ও ঘটনার মানবিক প্রতিফলন এমন যা সহজেই দর্শকমাত্রেরই মনের ওপর একটা একাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে। ঘটনাবলীকে অত্যন্ত সাধারণ মানুষেরও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত বাস্তবের সীমার মধ্যে রেখেও শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশিত করে একটা অনাস্বাদিত রস উপভোগের সুযোগ এনে দেয়। [illegible]
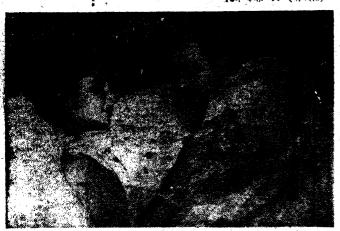
চেয়ে দৃশ্য ও শব্দের সমন্বয়ে এবং সেই সঙ্গে নানা সহজ প্রতীকের সাহায্যে চলতি ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটা রূপ প্রতিভাত করার একটা মৌলিকত্ব শ্রীরায় নিয়ে আসেন তাঁর অপু-ত্রয়ীতে।

কাহিনীর নির্বাচন এবং ছবিতে তার বিন্যাস ব্যাপারে চলতি পথ ছেড়ে নতুনভাবে কিছু করার প্রচেষ্টায় তিনি নানাভাবে এক্সপেরিমেণ্ট অব্যাহত রেখেছেন। এবং ক্রমান্বয়ে তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতার পরিচয়ও উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে। তবুও অপু-ত্রয়ীর শিল্পমহিমার ধাপ থেকে কেমন যেন আজ তিনি সরে সরে আসছেন। দেখা যায় অপুর কাহিনী আপামর জনসাধারণকে যেভাবে অভিভূত করে তুলেছিল, পরবর্তী ছবিগুলি ঠিক সেই পরিমাণ স্বতঃস্ফূর্ত

তিন কন্যা :: (মনিহার)

দেবী

পরশ পাথর

অভিযান

উচ্ছ্বাস দর্শকদের মধ্য থেকে উৎসারিত করতে পারেনি। যদিও শিল্পোৎকর্ষ এবং প্রতীকের সুষ্ঠু প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর বহুশাখ প্রতিভা ও চিন্তার মৌলিকত্ব স্পষ্ট কিন্তু অপু-ত্রয়ী যে রসের আস্বাদন এনে দিয়েছিল তা তাঁর 'নায়ক' বা 'চিড়িয়াখানা' থেকেও পাওয়া গিয়েছে বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে। অপুর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ছবিগুলির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের। 'জলসাঘর', 'দেবী', 'পরশপাথর', 'তিনকন্যা', 'অভিযান', 'মহানগর', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', 'নায়ক' বা 'চিড়িয়াখানা'—প্রত্যেকখানিরই কাহিনী এবং ঘটনাগত চরিত্র ও পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। যার একটির সঙ্গে আর একটির কোন মিল নেই। আর তাই রসের দিক থেকে আবেদনের

অপু—নববধূরাপাত থেকে নববধূর পত্র

জলসাঘর

কাঞ্চনজঙ্ঘা

তারতম্য ঘটে ওঠা স্বাভাবিক। পরীক্ষা-নিরীক্ষার, স্বাধীন ও স্বকীয় চেতনার বিকাশে প্রতিটি ছবি দেখার সময় দর্শককে সম্মোহিত করে তোলার ক্ষমতায় অতুলনীয়। কিন্তু ছবি দেখা শেষে মনে গেঁথে থাকে টুকরো টুকরো কতকগুলো দৃশ্য বা বিচিত্র কতক চরিত্র—মনকে আঁকড়ে ধরে রাখার মতো নিবিড় আবেদনের অনুপস্থিতিটা অনুভব করতে হয়—মন ভরে ওঠায় একটা কিছু ফাঁক থাকে যা অপু-ত্রয়ীর ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে হয়নি। 'চারুলতা' একটি ভিন্ন ধরনের রসের আস্বাদ এনে দেয় এবং শিল্পশোভনতার দিক থেকে অপু-ত্রয়ীর পর অনন্য সৃজনীপ্রতিভার নিদর্শন। ঘটনা ও চরিত্র বিগত শতাব্দীর হলেও তার আবেদন এখনকার মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বাস্তবকে অবিকল রাখার প্রয়াসে প্রথম দিকের বিন্যাসে শান্ত ও ধীরগতি পরিবেশ কাহিনী এবং ঘটনার যথার্থ প্রকৃতি ফুটিয়ে তোলায় সহায়ক ছিল। যার মধ্যে কোন মেলোড্রামা বলতে ছিল না। অপু থেকে 'জলসাঘর', 'দেবী' 'তিনকন্যা', 'কাপুরুষ' বা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' পর্যন্ত ছবিতে জীবনের সাথে সুসমঞ্জস টেম্পো পাওয়া যায়। ব্যতিক্রম প্রথম লক্ষ্য করা গেল 'অভিযান'-এ এবং পরে 'নায়ক' ও 'চিড়িয়াখানা'-য়। এ ছবি-গুলির ক্ষেত্রে ঘটনার প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে গেলেও উত্তেজনা সঞ্চারী মেলোড্রামাকে বেশ প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে—যেটা সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে অভাবনীয়। অভাবনীয় 'মহাপুরুষ'-এর মতো ছবি যা বিচিত্র কতক-গুলি চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া ব্যতিরেকে শিল্প সৌকর্যের মানের তৌলে সত্যজিৎ রায়োচিত প্রতিভাসম্মত বলে স্বীকার করতে বাধবে। 'মহাপুরুষ' যেন শিল্পীর একটি খেয়ালের খেয়ালিপনা।

কাহিনী ও চিত্রনাট্যের নির্বাচন ব্যাপারেও 'মহানগর'-এর পর থেকে দেশের

পথের পাঁচালী

মাটির গন্ধটা যেন ছবির পরিবেশ থেকে ক্রমশই লুপ্ত হয়ে আসছে। 'নায়ক'-এর নায়ক এদেশেরই চলচ্চিত্রের এক তারকা হলেও মনের কুঠিতে তাকে ঠাঁই দেওয়ার মতো যেন কোন সায় পাওয়া যায় না। 'চিড়িয়াখানা' গোয়েন্দা কাহিনী বলে প্রচারিত। গোয়েন্দা কাহিনী বলতে চলতি যে ধারণা, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে তার ব্যতিক্রম ঘটা স্বাভাবিক। এবং তা ঘটেওছে। কিন্তু এই রহস্য কাহিনীটির মধ্যে যা পাওয়া গেল তা হলো বিচিত্র প্রকৃতির কতকগুলি চরিত্র যাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করা দর্শকের পক্ষে সহজ নয়, হয়তো সম্ভবও নয়। যদিও নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হয় যে, বৈদগ্ধ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলায় এ ছবিখানিও উচ্চমানের শিল্পসৌকর্য ও কলাকৌশলের প্রয়োগ সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিকত্বের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। তবু মন ভরে না-ওঠার অনুভূতি নিয়েই ফিরতে হয়।

ছবির যে একটা নিজস্ব ভাষা আছে, আমাদের দেশে সত্যজিৎ রায়ই তার প্রথম সফল প্রয়োগকর্তা। সেই সঙ্গে ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাসে মৌলিক শিল্পচিন্তার প্রয়োগে নির্ভেজাল বাস্তব রূপ ও প্রকৃতিকে দৃষ্টিমোহন করবার ছন্দে বিকশিত করে তোলায় একটি অনন্য প্রতিভা তাঁর মধ্যে আমরা পেয়েছি। ভারতীয় চলচ্চিত্রকে যা বিশ্বে বরণীয় হয়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু ইদানীংকার কয়েকখানি ছবি দেখে মনে হয় অপুত্রয়ীর সেই জনলালিত শিল্পী সাধারণ মানুষকে অগ্রাহ্য করে ক্রমশই ইনটেলেকচুয়ালদের মনোরঞ্জনেই বেশী ঝুঁকেছেন। সাধারণের মনে যে এমনিধারা একটা অনুযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে সেটা অস্বীকার করা যায় না।

॥ মৃণাল সেন ॥

> "শিল্পগত এই নতুন উপলব্ধি যাঁদের ছবিতে কমবেশী দেখতে পেয়েছি এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছি, নতুন শক্তি পেয়েছি, তাঁরা কারা?"

গত পাঁচ মাসে দৌড়ঝাঁপ করেছি প্রচুর। মাদ্রাজে গিয়েছি বার তিনেক, বোম্বাইয়ে পাঁচবার, আর কলকাতায় ফিরে এসেছি বারবার। ব্যক্তিগত কাজের মধ্যে এবং কাজের ফাঁকে—ছবি তৈরির কারখানায় অথবা ঘরোয়া পরিবেশে—বহু লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে এই পাঁচ মাসে, চেনা-অচেনা এবং আধা-চেনা অনেকেরই সঙ্গে বোঝাপড়া হয়েছে নানা পরিবেশে নানা বিষয়ে। এবং বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, মাঝে-মধ্যেই এমন সব ছোটো-বড়ো ঘটনার ভেতরে গিয়ে পড়েছি যার ফলে বদ্ধ-ধারণার অনেক কিছুই পাল্টাতে বাধ্য হয়েছি।

কলকাতার বাইরে দেশের অন্য কোথাও ছবির রাজ্যে কোনোরকম চাঞ্চল্য দেখতে পাবো তা ভাবার কোনো কারণ এতোকাল ঘটেনি। একাধিক ফিল্ম সোসাইটি রয়েছে জানতাম, সভ্যসংখ্যাও যে দিন দিন বেড়ে চলেছে তাও অজানা ছিল না, লেখাজোখা পত্রপত্রিকা সেমিনার সিম্পোসিয়াম সে-সবেরও খবর রাখতাম না এমন নয়, কিন্তু কখনও ভাবিনি বোম্বাইয়ে অথবা মাদ্রাজে কোনো "অঘটন" ঘটতে পারে। বরাবরই ভেবে এসেছি,

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

মৃণাল সেন-কৃত "মুভিং পারস্পেকটিভস" তথ্যচিত্র

বড্ডো frivious বোম্বাইয়ের পরিবেশ আর মাদ্রাজ অসম্ভব সেকেলে। এবার এই কঁমাসে সে ভুল ভেঙেছে।

এ কথা সত্যি, ব্যবসার আসরে রাজ কাপুর বহাল তবিয়তে রয়েছেন, দিলীপকুমার, দেব আনন্দ, রাজেন্দ্রকুমার অথবা বৈজয়ন্তীমালা· মালা সিনহা, ওয়াহিদা রেহমান এ'রাও বক্স-অফিসের মণি-কোঠায় ধ্রুবতারার মতো দিব্য জ্বলছেন, এবং এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আজও সারা তামিলনাদ মাতিয়ে রেখেছেন শিবাজী গণেশন আর এম জি আর। কিন্তু তার বাইরে আমি দেখেছি, বিশেষ করে বোম্বাইয়ে, ছোটো ছোটো গোষ্ঠী গড়ে উঠছে, কেউ কেউ বা একান্তে একক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, এবং বুঝেছি, সাময়িক বিরক্তি হতাশা অক্ষমতা ডিঙিয়ে এইসব টুকরো টুকরো চিন্তাভাবনা আবেগ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একটা বড়ো চেহারা নিয়ে দাঁড়াবে। দেখেছি, বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, এই সমস্ত [illegible]

আলোড়নের পেছনে যে শক্তি সবচাইতে বেশী কাজ করে এসেছে তা হলো সারা দেশময় ফিল্ম সোসাইটিগুলোর অক্লান্ত ক্রিয়াকর্ম।

ভারতীয় ছবির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের অনেকেই হয়তো আমার উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন না এবং তাঁদের সঙ্গে আরো অনেকে হয়তো একমত হয়ে বলবেন, বক্স-অফিসের শাসনের মুখে এই সব টুকরো "আলোড়ন" নিতান্তই খেলো ব্যাপার। বলবেন, গাঁটের পয়সা খরচ করে অথবা দুচারজন শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন বন্ধুবান্ধবের সামান্য পুঁজি ভাঙিয়ে এই সমস্ত পাগলামি একেবারেই অর্থহীন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, যেমন চলছে চলুক, অঢেল অর্থ ঢেলে রঙবেরঙের ছবি হোক নাচ গান চলুক পুরো দমে এবং দেশের অগণিত দর্শকের "ইয়াহু" শব্দে আবহাওয়া সরগরম হয়ে উঠুক। যেমন হচ্ছে তেমনি! অপরের অর্থ নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলা কেন? বড্ডো সব অর্থহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেমানুষি!

কোনো কোনো মহল, শিল্পরসিক রুচিবান, অবশ্য বলে থাকেন যে, সুস্থ ছবি তাঁরা সব সময়েই চান। কিন্তু ফিল্ম সোসাইটির মুরুব্বিয়ানা নিপাত যাক; অর্থাৎ, তাঁরা মনে করেন, ফিল্ম সোসাইটি যেন চব্বিশ ঘণ্টাই নাক সিঁটকিয়ে রয়েছে, দেশী ছবির গন্ধেই নাকে রুমাল দেয় সোসাইটিগুলো। এই মহলের মতে, ভবিষ্যৎ গঠনের কাজে এই সমস্ত কেন্দ্রস্ত

'মুভিং পারস্পেকটিভ'-এ ব্যবহৃত গান্ধী-মূর্তি'

উচ্চকপালেদের কোনো জায়গা নেই, থাকা উচিত নয়।

এ কথা অস্বীকার করবো না যে, উচ্চকপালেরা কখনোই কোনো সংগঠনমূলক কাজে সহায়ক হতে পারেন না, সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দেন এবং বিরুদ্ধ শক্তিকে বেড়ে উঠতে পরোক্ষ সাহায্যই করে থাকেন। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য, সারা ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে ফিল্ম সোসাইটি আজ এক মহৎ আন্দোলনের শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, সারা দেশে বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, এমন কি ছবির কারখানার ভেতরেও কিছুদিন অনুপ্রবেশ করেছে এবং সর্বোপরি এই আন্দোলনের আওয়াজ

বাইশে শ্রাবণ

পেয়ে ব্যবসায়মহলের কর্মকর্তারা কমবেশী নরমগরম মন্তব্য করতে শুরু করেছেন।

অবশ্যই এই আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লব নয় যে, লাঠিসোঁটা নিয়ে পোস্টার নিয়ে হামলে পড়তে হবে ছবির কারখানার ওপর। এ হচ্ছে রুচিকে প্রতিষ্ঠিত করবার আন্দোলন, শিল্পকে সম্যক বোঝার এবং তার সকল প্রয়োগের ব্যাপক প্রয়াস। এবং পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এই মহৎ প্রয়াস আজ কলকাতা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বোম্বাইয়ে, এবং খানিকটা মাদ্রাজেও।

শিল্পগত এই নতুন উপলব্ধি যাঁদের ছবিতে কমবেশী দেখতে পেয়েছি এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছি, নতুন শক্তি পেয়েছি, তাঁরা কারা? ব্যবসায়িক মহলের সঙ্গে তাঁদের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছবি তাঁদের পেশা নয়। কিছুটা নিজের অর্থ, কিছু বা সংগ্রহ করা হয়েছে দরদী বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে এবং সেই

নীল আকাশের নীচে

সামান্য ব্যবস্থা নিয়ে কোনো ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই তাঁরা ছবি করেছেন এবং করছেন—ছোটো ছোটো ছবি—আধ ঘণ্টার বেশী নয় কোনোটাই। সব কিছুই যে উঁচুদরের হয়েছে বলবো না, কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই উন্নত চিন্তার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। বিশেষ করে দেখেছি, অসামান্য প্রয়োগনিষ্ঠা। এবং একথা আজ অকপটে স্বীকার করবো যে, ছবির কলা-কৌশলের অনেক ক্ষেত্রেই, এমন কি কিছু কিছু অংশ বিষয়বস্তু নির্বাচনেও, তাঁদের কোনো কোনো শিল্পকর্ম সারা দেশে শ্রেষ্ঠত্বের এবং অবশ্যই অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। অন্তত আমি ছবি করিয়ে হিসেবে সেই চোখেই দেখেছি। এবং নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছি। হয়তো বাড়াবাড়ি করছেন কেউ। ছবি তৈরির যন্ত্রপাতি নিয়ে হয়তো নিজেকে বড্ডো বেশী প্রকটভাবে জাহির করতে চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। হয়তো বা বক্তব্য প্রকাশের তাগিদে কেউ খানিকটা স্থূলতার আশ্রয়ও গ্রহণ করছেন। কিন্তু ছবির দলের একজন হিসেবে এঁদের অসামান্য নিষ্ঠা আমার মনকে, আমার বুদ্ধিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করেছি, এ এক মহৎ আন্দোলনেরই একটি বলিষ্ঠ প্রকাশ এবং তার শামিল আমিও।

পুনশ্চ

অরণ্যদেব লী ফক

বাঘটাকে কীভাবে মারল দ্যাখো!

লড়াই করে লাভ কী, অস্ত্র ফেলে দাও।

! ? !!

! !

সৈন্য দুজনকে ধরে অরণ্যদেব তাদের মাথা ঠুকে দিলেন।
আঃ! আঃ!

১৫

বরেন বোস লেনে তারা যখন পৌঁছয় সেই আধ-পুরনো আড়াই-তলা বাড়ির হলদেটে রঙ তখন বোঝা যায়নি। পাঁচিলটার ওপাশের পেয়ারা গাছটাকে কী রকম যেন গা ছমছম করা জমাট একটা অন্ধকার বলে মনে হয়েছিল। গলির মুখে দেয়ালের সঙ্গে ব্র্যাকেটে আটকানো গ্যাসের আলোটা বোধ হয় তখন টিমটিম করে জ্বলছিল—আজ ভালো মনে নেই। আসলে এগজিবিশনের আগুনো তখনো তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। মনুরা আর সে সমস্ত পথ যেন হেঁটে আসেনি—এসেছিল উড়ে। এগজিবিশনে আগুন লাগার খবরে, দমকলের ঢং-ঢং শব্দে সমস্ত পাড়া যেন একটা নেশায় মেতে উঠেছিল। ছেলে-বুড়ো সবাই ছুটেছিল আগুন দেখতে। মনুয়াদের বাড়ির দরজা তখন তালা বন্ধ। সেই আবছা-অন্ধকার গলির সামনে দাঁড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে মনুয়া বলেছিল, "ভারি ভয় করছে মলয়দা—আমাকে একলা ফেলে যেয়ো না।" মনুয়ার কচি বুকের স্বাদ শার্ট ভেদ করে মলয়কে কি স্পর্শ করেছিল? তার বুকের ধকধক সে কি শুনতে পেয়েছিল? এতো বছর পরে আজ কিছুই স্পষ্ট মনে নেই। শুধু মনে আছে সেই সুরকি কলের একটানা গুড়গুড় শব্দ। মনে আছে গ্যাসের আলোয় মনুয়ার দুটি চোখ। যে-দুটি চোখের দিকে চেয়ে জীবনে প্রথম সমুদ্রকে সে অনুভব করে। মনুয়া যে-সমুদ্রকে দেখেছিলো। মলয় দেখেনি।

কেমন যেন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। গা শিরশির করে উঠছে। চলেছে তো বাদলকাকাকে দেখতে। তবে মনুয়ার কথা বারবার মনে পড়ছে কেন? সে এখন বর্ধমানে না শিউড়িতে। জব্বলপুরেও হতে পারে। সে এখন সম্ভবত আধ ডজন ছেলেমেয়ের মা। সে নিশ্চয়ই এখন ঝিনুক কুড়োয় না। ঝিনুকের কথা বলতে গেলে এখন সমুদ্রের বদলে ছেলেকে দুধ খাওয়াবার [illegible] ঝিনুকের কথা মনে হয়।

—এই, যাঃ! গড়ের মাঠ কখন যে পেরিয়ে গেছে সে হুঁশ তার নেই। কোথায় এসে পৌঁছলো? কোনখানে নামতে হবে? এই জন্যেই তো নিজের উপর নিজের রাগ হয়। কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়া। আর একবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে তার ঠিকানা নেই।

চড়কডাঙার মোড় কখন আসবে পাশের লোকটিকে প্রশ্ন করলো। তিনি হেসে বললেন, "আর আসবে না মশাই। দুটো স্টপ পিছনে ফেলে এসেছেন।"

মেঘে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। টিপটিপে বৃষ্টি। দোকানের আলোয় ভিজে ফুটপাথ মাঝে মাঝে চকচক করছে। চড়কডাঙার দিকে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনেই সে হেসে উঠলো।—ধেৎ! বাদলকাকিটা যেন কী! মনুয়ার হাত ধরে বরেন বোস লেনের মধ্যে দিয়ে সেই সুরকি-কলের পাশ কাটিয়ে তারা গঙ্গার ঘাটের পাঁজর বার করা রকে খানিকক্ষণ বসেছিল। ভাটার টানে নানা আবর্জনা তখন বড় গঙ্গার দিকে ভেসে চলেছে। সুরকি-কলের একটানা গুড়গুড় শব্দ ছাড়া সেখানে আর কোনো শব্দ ছিল না। মনুয়া যেন একটা ছোট্ট ভীতু পাখি হয়ে গিয়েছিল। আর তারা হাত ধরেনি। কতক্ষণ সেখানে তারা বসেছিল তার হিসেব নেই। কোথাও যেন কোনো তাড়া ছিল না। তারপর আবার তারা সুরকি-কলের পাশ দিয়ে, বরেন বোস লেনের মধ্যে দিয়ে মনুয়াদের আড়াইতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ায়। মনুয়াদের বাড়ির দরজাটা তখন খোলা। মনুয়াকে কী বলে সে ফিরবে যখন ভাবছে তখন হঠাৎ বাদলকাকির খিলখিল করে হাসির শব্দে তারা চমকে ওঠে। বাদলকাকি বলেছিল, "পাজি ছেলেমেয়ে! আমরা ভেবে মরছি, আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দুজনে প্রেম করা হচ্ছে!" —ধেৎ! বাদলকাকিটা যেন কী! মুখে কিছু আটকায় না।

শালকের মোড়টাই শুধু নয় চড়কডাঙার মোড়। জায়গাটা চেনা চেনা। এখান থেকে পশ্চিম দিকে যেতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে মলয়ের হঠাৎ মনে হলো সে যেন [illegible] একটা শহরে এসে পড়েছে। এখানকার বাড়িঘর রাস্তাঘাট সবই যেন অচেনা। [illegible] বড় শহরের মজাই এই। যেখানে শৈশব কেটেছে, কৈশোর কেটেছে, সে জায়গাটা যেন একেবারে পর হয়ে গেছে। সেই ছেলেবেলার [illegible]

[illegible] কোনো হদিস? [illegible]

কিন্তু এই নতুন বাড়িটার পাশ দিয়ে যে গলিটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে তখনও সেটা ছিল। সেটাকে চিনতে পারলো মলয়। এই গলি ধরে গেলেই মাঝামাঝি জায়গায় একটা শিব মন্দির পাওয়া যেতো। কী আশ্চর্য, আজকেও মন্দিরটা রয়েছে। গলিটা যেন বন্ধুর মতো জড়িয়ে ধরলো তাকে। এর সঙ্গে এঁকেবেঁকে চললেই ঝাঝরি-চওড়া একটা রাস্তা পাওয়া যাবে। সেই রাস্তা পেরিয়ে দক্ষিণে কিছুটা হাঁটলেই আড়াইতলা বাড়িটা, মনুয়ারা যেখানে থাকতো। আর সেই পাঁচিল, যার ওপাশে ছিল আধবুড়ো একটা পেয়ারা গাছ। যেখান থেকে বরেন বোস লেনের শুরু।

বৃষ্টিটা আগের চেয়ে জোরে নামলো। মাঝে মাঝে যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এই গলির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেও তা টের পাওয়া যায়।

গলিটা শেষ হতে দক্ষিণে খানিকটা হাঁটলো মলয়। তারপর তার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠলো একটা শব্দ শুনে। বুকের একটা স্পন্দন যেন হারিয়ে গেলো। এই তো সেই সমুদ্র, মনুয়ার সমুদ্র। বৃষ্টিতে, আবছা আলো-অন্ধকারে সবকিছু যেন গুলিয়ে গেলো। বড় শহরের মজাই এই। থেকে থেকেই গুলিয়ে যায়।

পাঁচিলের ওপাশের আধবুড়ো পেয়ারা গাছটা কিন্তু কোথায়? আর বাড়িটাও তো আড়াইতলা নয়। পুরো তিনতলা। তবে তার পাশেই রয়েছে সেই সরু গলি—বরেন বোস লেন।

গলির মুখে খানিক সে দাঁড়ালো। দেয়ালের সঙ্গে ব্র্যাকেটে আটকানো আলোটা দেখলো। কিন্তু গ্যাসের বদলে ধুলোয় ঝাপসা একটা বালব্ সেখানে মিটমিট করছে। কোথায় যেন শাঁখ বেজে উঠলো। টিপটিপে বৃষ্টি হঠাৎ ঝমঝম করে নামলো। আর বরেন বোস লেনের মধ্যে পা বাড়িয়ে মলয়ের মনে হলো সে যেন অতীতের অন্ধকারের বিরাট একটা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

এ কোথায় চলে এলাম? কিছুই যে ঠাহর করতে পারছি না। সুরকি-কলের গুড়গুড় শব্দ, কি বুকের মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে? কী মুশকিল! ছাতাটা খোলবার জায়গা নেই। একটা টর্চ আনলে হতো। আগে কিন্তু চোখ বুজে এই গলির মধ্যে এসে বাদলকাকার বাড়ির দরজা ছুঁতে পারতাম। কিন্তু সেই পাঁচ মোড়ের পথ তো পাচ্ছি না। সামনের বাড়ির একতলার কারা উনুন ধরিয়েছে, জানালা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিল। হাওয়া নেই। তার উপর ঝমঝমে বৃষ্টি। ধোঁয়াগুলো কোথায় পালাবার পথ পাচ্ছে না। আমার অতীতটা কি এই ধোঁয়ার মতো? সেখানকার গণ্ডী থেকে তাই কি পালাতে পারি না? শুধু চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। চোখে না বুকে? বুকে না মনে? মনে না মগজে?—কী মুশকিল! একেবারে যে অন্ধকারে হঠাৎ ভিজে গেলাম। এতো বছর পরে ভিজে কাকের মতো বরেন বোস লেনে ফিরে আসতে হবে বলে কোনোদিন কি জানতাম? কিন্তু বাদলকাকির বাড়ি কোনটা?

চিনতে না পারলেই তো চিত্তির! ডান-হাতি না বাঁ-হাতি বাড়ি? বাঁ-হাতিই হবে। ইস্! কী ঠাসাঠাসি বাড়িগুলো! সবটা মিলিয়ে একটা গোটা বাড়ি? নাকি গোটা বাড়িটাই ঠাসাঠাসি আলাদা আলাদা বাড়ি? নম্বর তো মনে আছে—ফাইভ বাই টু বাই কে। নাকি ফিফটি টু কে? কিন্তু কোনো বাড়ির গায়েই তো নম্বর প্লেট নেই। নাকি আছে—অন্ধকার বলে দেখা যাচ্ছে না? অজগরের পেটের মধ্যে কি এ-রকম অন্ধকার? ওই জানালায় একটা লোক দাঁড়িয়ে বিড়ি নাকি সিগারেট টানছে না? ওকেই জিজ্ঞেস করি। ও মশাই, শুনছেন? বাদলকাকির বাড়িটা কোথায় জানেন? লোকটা বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলো। বাদলকাকির স্বামীর নাম কী? এ মেরেছে। বাদলকাকির স্বামীর ভালো নাম তো জানি না। আসলে ওঁকে তো ভালো করে চিনতামই না। চেহারাটাও তো স্রেফ ভুলে গেছি। না মশাই, ভালো নাম জানি না। বাদলবাবুই হবে সম্ভবত। আরে বলে কি? উনিই নাম বাদলবাবু! আমার নাম? মলয়—মলয় সেন কোন মলয় সেন? যে লেখে-টেখে? হ্যাঁ মশাই, আমি সামান্য লিখে থাকি।

"আগে তো তোর বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল। কবিতা লিখতে লিখতে কি বোকা হয়ে গেছিস? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিস কেন? ভেতরে চলে যায়। পাশেই দরজা। খোলাই আছে।"

আগে কি আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল? কবিতা বানাতে বানাতে কি বোকা হয়ে গেছি? নাকি ট্যাংরায় থেকে থেকে? নাকি রোজ ট্যাংরা আর বাগবাজার করে? আর রয়টার, পি-টি-আই, বি-বি-সি'র খবর তর্জমা করে করে?—কোথায় এসে পড়লাম? অজগরের পেটের মধ্যে কি এ রকম ভ্যাপসা দম-বন্ধ-করা গন্ধ?

"এমন দিনে বেরুলি কেন? [illegible] নাকি? বোস, বোস—এই [illegible] দাঁড়া—তোর জন্যে একটা গামছা এনে দি। মাথাটা মুছে নে।—আমার শুকনো জামা কাপড় পরবি?"

এখন দিন না রাত? না না, শুকনো জামা-কাপড়ের দরকার নেই। বেরুলে তো আবার ভিজতে হবে। একবার বাদলকাকির সঙ্গে দেখা করেই ফিরে যাবো। একটা কাজে এ-দিকে আসতে হয়েছিল। তাই ভাবলাম—। কত রকম ছোট বড় মিথ্যে কথা যে রোজই বলতে হয়! কেন, সত্যি কথাটা বললে কী দোষ হতো? যদি বলতাম বাদলা দেখেই বাদলকাকির কথা মনে পড়লো তা হলে কী ক্ষতি হতো? কিন্তু সেটাই বা কি পুরোপুরি সত্যি? এর সঙ্গে মনুয়ার কথাটাও যে জড়িয়ে রয়েছে। আর সেই সমুদ্রের কথা, মনুয়া যেটা দেখেছিল, আমার যেটা দেখা হয়নি। নাকি মুহূর্তের জন্যে তার আভাস পেয়েছিলাম সেই এগজিবিশন পোড়া রাতে, গ্যাসের আলোয় চকচকে মনুয়ার চোখের মধ্যে? বাস্তবিক, সাত্য কথা বলা ভারি শক্ত!

"এই নে। গামছাটা নিয়ে মাথাটা মুছে নে। প্যান্টশার্ট খুলে দরজার ছিটকিনিতে ঝুলিয়ে দে। আদা দিয়ে গরম এক পেয়ালা চা খা।—জানিস না তোর বাদলকাকি [illegible] হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তিন মাস হলো পুরীতে আছে? [illegible] হয়েছে। ডাক্তার বলেছে পুরীর হাওয়া [illegible] আছে। আর [illegible] পুরীতে আমার [illegible] থাকে। [illegible] একটা ছোট মতো হোটেল আছে। [illegible] পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

ইস্ গামছাটার কী দুর্গন্ধ! মাথায় দুর্গন্ধটা যেন লেপটে বসে গেছে।—বাদলকাকির শেষ চিঠি কবে পেয়েছিলাম? বছর-খানেকেরও আগে নাকি?—কী আশ্চর্য, বাদলকাকিরও তা হলে সমুদ্র দেখা হয়ে গেল? পাঁজরের কয়েকটা হাড় বাদ দিলে তবেই কি সমুদ্রকে পাওয়া যায়? [illegible] হয়তো [illegible] উঠছে।

[illegible] চিঠি [illegible] বাড়ি ফিরে একটা কবিতা লিখে [illegible] হ্যাঁ হ্যাঁ—"

কী করে এই লোকটাকে মনুয়ার কথা জিজ্ঞেস করা যায়?—বাদলকাকা, পাড়ার আর সব কী খবর? মনুয়াদের কী খবর? মনুয়া কে? ওই যে গলির সামনের বাড়িতে থাকতো—

"ও [illegible] তো [illegible] ভারি [illegible] মেয়েটা [illegible] হাসপাতালে। সময় মতো রক্ত দিতে পারলে হয়তো বাঁচতো..."

বৃষ্টিটা আরো বাড়লো নাকি? ছাতা খোলা যাবে না। তার দরকারও নেই। গলির ধোঁয়া দেখছি জলে ধুয়ে গেছে। কিন্তু গন্ধটা যায়নি। ভাবনাগুলো কেন ধুয়ে যায় না? অতীত আর ভবিষ্যৎ কেন ধুয়ে যায় না? বেঘোরে কথাটার ঠিক মানে কি? ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারলেই কি সমুদ্র? ঝিনুক? বালিতে কাঁকড়ার পায়ের ছাপ? আর আজকের রাতের মতো সেই সমুদ্রে যদি ঝড় ওঠে? যদি বৃষ্টি নামে? শেক্সপিয়রের টেম্পেস্ট যদি দেখা দেয়?... ফুল ফ্যাদম ফাইভ দাই মনুয়া লাইজ... মনুয়ার হাড় দিয়ে প্রবালের দ্বীপ গড়ে উঠেছে? ...মনুয়ার সেই চকচকে চোখ দুটি কি মুক্তো হয়ে গেছে? [illegible] আর পার্ল'স দ্যাট ওয়্যার হার আইজ ...ফুল ফ্যাদম ফাইভ... কতটা গভীর এক ফ্যাদম? এখানে তো এক হাঁটু জল। —বাড়ি ফিরে আজকের রাত নিয়ে একটা কবিতা লিখিস—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ... কবিতা লেখা অত সহজ নাকি? বুকের রক্ত নিংড়ে কবিতা বেরিয়ে আসে। আমার বুকের রক্ত সময়মতো পৌঁছে দিতে পারলে কি মনুয়া বাঁচতো? [illegible] অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে এসেছি। [illegible] বুকের তোলপাড় করছে [illegible] এসে পড়লাম। [illegible] কেন মনে হচ্ছে অজগরের পেটের ভেতর থেকে বেরুতে পারিনি [illegible] এক হাঁটু জল। [illegible] বাড়ি ফিরি কী করে? [illegible] হাঁটতে হবে নাকি সমস্ত পথ? ভারি শীত করছে। একটা সিগারেট ধরাতে পারলে মন্দ হতো না। কোথায় একটু বসা যায়? ডান পাশে এটা একটা পার্ক না? ভেতরে একটা ঘর দেখছি। অনেক লোকের ভিড়। ওখানেই একটু দাঁড়াই। একটা সিগারেট ধরাই। —কে বললো, এই যে আর মকেল এলেন; এই শালা, মানে ভাই, সামনেই বাংলার দোকান; দু নম্বর একটা ছোটো ফাইল নিয়ে আয় না বাপু! [illegible] কারুর মুখ দেখা যায় না? [illegible] নিভে গেছে। এই নে [illegible] দিয়ে ধরিয়ে নে। লোকটার [illegible] কী [illegible]! পার্কটার নাম কী? [illegible] নিজে নিজে [illegible] মালিক বলছে, মস্ত নাম আছে মশাই। দেশের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছিলো তাদেরই একজনের নাম। নামটা মনে পড়ছে না। আমরা বলি গাঁজা পার্ক। এখানে আমরা [illegible] খাই, দেশিও টানি। ...যা না মাইরি, শালা, দু নম্বর একটা ফাইল নিয়ে আয় না বাপু...

[illegible] মনুয়া [illegible], ভারি ভয় করছে, [illegible] ...ফুল ফ্যাদম ফাইভ দাই মনুয়া লাইজ...তার হাড় দিয়ে কি প্রবালের দ্বীপ গড়ে উঠেছে...তার চোখ কি মুক্তো হয়ে গেছে? সমস্ত শহরটাই কি একটা বড় গাঁজা পার্ক আর সময়টা কি না-থামা একটা সুরকি-কল?

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

পঞ্চম

আমি অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে থাকি। সে গেয়ে যায়, সে চেয়ে যায়। নিশির ঘোর লাগে অন্ধকারে। আমি সেই অন্ধকারে ছাতিমতলার এই সীমানায়, ঝিঁঝিঁ ডাকা স্বর বহে। কী যেন এক গন্ধ দিকে দিকে, যার নাম জানা নেই। দূরের মেলা এখন নিশ্চুপ। আমার কানে বাজে শেষ কথা কয়টি 'এই অশেষের পালা আর সইতে পারি না তারা।'

অচিনদা আর্তনাদে বাজেন নি। কিন্তু এক আর্তস্বরের ধ্বনি, আমার প্রাণে বাজে অবিরাম সুরে সুরে। একবারও বুঝতে পারি নি, সকাল থেকে যার সঙ্গে এত কথা, সকলই তাঁর বেঁধা পাখির ডাকাডাকি। সেই উপকথাটা মনে পড়ে যায়। পাখিটা যেই কাঁটার গায়ে বুক চাপে, রক্ত ঝরে, তবেই ডাকে। সেই ডাক গান হয়ে যায়। শেষের পালায় এমন অশেষ একবারও ভাবিনি। চোখের সামনে ভাসে, পান খাওয়া ঠোঁট। রহস্যের অঞ্জন মাখানো চোখ। ঢাকাই শাড়ির আঁচল বিছিয়ে বসা এক নারী। কে জানে, কোন্ ঋতু লেগেছে এখন গায়ে। তাঁর দু' পাশে, দুই পুরুষ। দুই চোখের তারায় দুই বাঁধা। সেই দুই তারাতে কী যে কথা, জানা যায়নি। নিঃশব্দে, সেই কথার রহস্যে, কান পেতে চলে দুই জন। মুখে তাঁদের রেখা আঁকা পড়ে যায়। চুল বেবাক শাদা। তবু চলে নিরন্তর, উৎকর্ণ। কী কথা। কী যে কথা।

আমবাগানের বসন্তোৎসবের যাত্রা, ধায় নিরবধি। হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায় কালান্তরে। আমি ভাবি, কোন নিয়তি, কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল এ. কে. মজুমদারকে। কে নিয়ে গিয়েছিল সে, অশেষের দেশে। না পাওয়ার পাওয়ায়। অধরার ধরায়। আজ অশেষের পালা সইতে পারা যায় না। শেষ করাও যায় কি? করতে গেলে টান লাগে, যেখানটা ছিঁড়বে, সে-জ্বালা কি সইবে!

মানুষের এ অবস্থার নাম কী, কে জানে। কেবল, ভয়ে যেন শিউরে যায় বুক। সেই হিজিবিজি রেখায়, হঠাৎ কাঁপন লাগা মুখখানি আবার দেখতে ইচ্ছা করে। ফিরে তাকাই। কেউ নেই, ছাতিম-তলার সীমানায় নীশিথের গাছপালা নীরব। অন্ধকারের পথ বিজন।

তবু যেন দেখতে পাই, কে চলে যায়, দূরের অস্পষ্ট আমবাগানের পারে। দৃষ্টিতে তার বোধ নেই, বুদ্ধিও নেই যেন। সেই এক হাবাগোবা ছেলেটির মত মুখ করে যে চেয়ে আছে, এপার থেকে ওপারে।

তোমার বুকে যদি টনটনায়, তবু দেখ, সেথায় যেন কিসের এক হাসির জোয়ার লাগে। আমার পথ চলাতে, কী যে খুঁজি, ফিরি কিসের সন্ধানে, তার হদিস জানি না। তবু, এই অন্ধকারের নিরালায় দাঁড়িয়ে মনে হয়, কী এক রতন যেন আমার বুক সাগরে দোলা দেয়। খুঁজে পাবার জিনিস না সে। অন্তরালে দেখা দিয়ে যায়। যা পাইনি, তার নাম জানি না। যা পাই, তাই নিয়ে যে পরম ধন মানি।

সহসা, এই অন্ধকার বিজন নিশীথে যেন কার আবির্ভাব ঘটে। আমি দেখতে পাই না, অনুভব করি। চোখের ঝাপসায়, হাত জোড় হয়ে আসে বুকে। নিজের কথা, নিজের বুকে কান পেতে শুনি, এই মানুষে, সেই মানুষ আছে। তাকে নমস্কার।

ঘুম ভাঙে, এক ঝাঁক পাখির ডাকাডাকিতে। তারপরে, কেবল চোখ না, মস্তিষ্ক থেকে ঘুম ছুটিয়ে, বুঝতে পারি পাখি না, ছেলেমেয়েদের হট্টগোল। কেবল তো চায়ের জল না। কী রক্ত জমানো ঠাণ্ডা রে। এই ভোরে একটু গরম জল না হলে কি চলে। অতএব, দারোয়ানীর মুখ চেয়ে কি বসে থাকা যায়। হাত লাগাও সব আপন আপন।

সেই হাত লাগাবার আওয়াজ পাই গরম শয্যায় শুয়ে। বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর গলা শুনতে পাই। সকলেই ব্যস্ত, সকলেরই তাড়া। টের পাই, কেউ কাটে দাড়ি, কেউ মাজে দাঁত। শুনি, কেউ হাসে, কেউ করে গান।

মনে পড়ে যায় কাল রাত্রে গেটে হাত দিতে শব্দ হয়েছিল। বাতি জ্বলে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধুর আবির্ভাব অচিরাৎ। মুখে অবাক উৎকণ্ঠা। আবার অচিনদার নাম শুনেই সব অবাক উৎকণ্ঠার নিরসন। দুপুরে পীড়াপীড়িতেও আহারে রুচি আসেনি। তখন দেহে মনে কেবল শয্যা শয্যা।

শুয়ে থাকা চলে না। বন্ধুর ডাক পড়ে, 'এবার প্রস্তুত, আর দেরি নয়।' ঘরে ঘরে ধোয়া মোছা সাজ সজ্জা। যার শেষ হয় সে-ই দৌড় দেয় ঘরের বাইরে। কেউ কারুর জন্যে বসে নেই। ডাক পড়েছে উপাসনার মন্দিরে।

লেট লতিফের দুর্গতি। তৈরি হয়ে আমি যখন মন্দিরের সীমায়, তখন স্তোত্র, প্রার্থনা শেষে সমবেত গান বেজে উঠেছে। ধরায় এখন আলো। পূর্বপল্লীর গাছপালা ছাড়িয়ে রোদ এসেছে এই প্রাঙ্গণে।

তারপরে আমবাগানে সমাবর্তন উৎসব। গান বেজে ওঠে, 'আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের শান্তিনিকেতন।'...এবার দেখ, এই ভারতের, মহামানবের সাগর তীরে। স্বপ্নের কতটুকু কে জানে। কেবল যে পাঞ্জাব সিন্ধু বোম্বাই গুজরাট দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, তা না। কেমন কালো ধলায় পাশাপাশি হাসাহাসি মিলমিশ। এর নাম, বিশ্ব-ভারতীর প্রাঙ্গণ। আজ আটুই পৌষ। আজ বর্তমান আর প্রাক্তন আশ্রমিকদের

কোলাকুলি। আজ কৃতীদের ডাকাডাকি, কৃতিত্বের ঘোষণা। তার প্রতীক স্বরূপ আচার্য তাঁদের হাতে তুলে দেন ছাতিমের পল্লব। শ্রীজওহরলাল এখন ভারতের প্রধান রাজপুরুষ নন। এখানে তাঁর পরিচয়, আচার্য। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংবর্ধিত করেন। ভারতীয় অংগনে ভাবেন ভিন্ন কথা, বিদ্যা শিক্ষা মানব ধর্ম, বিপুল ভারত কথা। শুনে মনে হয় যেথাকার মানুষ সেথায় আছেন, অন্যখানে তাঁর লীলা নেই।

উৎসব শেষে জনসমুদ্রের স্রোত চলে নানা দিকে দিগন্তরে। সব থেকে বড় স্রোত ধায় মেলার প্রাঙ্গণে। আমিও সেই স্রোতে ভাসি। লক্ষ বাউল সমাবেশ।

আশ্রমের সীমানা পেরিয়ে রাস্তার ওপারে মেলা। সেখানে পা দেবার আগেই পাশ থেকে ডাক শুনতে পাই, 'শুনুন।'

পাশ ফিরে দেখি, ঝিনি। নীল রেশমী শাড়ির ওপরে হাতে বোনা উলের জামা। দক্ষিণ পল্লীতেও যে শীত হানা দেয়, তার প্রমাণ ঝিনি, লাল রেশমী রুমালে মাথায় ঘোমটা দিয়ে গলায় বেঁধে জড়িয়েছে। তবু রুক্ষ চুলের গোছা একেবারে ঢেকে রাখতে পারেনি। ঢাকা ছাড়িয়ে কপালের কাছে এসে পড়েছে। ঠোঁটে নেই রঙ চোখে নেই কাজল। তবু কেন যেন হালকা লালের একটা টিপ আঁকা কপালে। এ যেন বৈরাগ্যের মধ্যে হঠাৎ একটু রঙের ছোঁয়া লাগালো। আর এইটুকুতেই হঠাৎ দেখলে মনে হয় লাল কাপড়ে ঘোমটা টানা একটি বউ। মুখে তার হাসি নেই, ভঙ্গিতে জড়তা। একটা লজ্জা পাওয়া বিব্রত ভাব। কী যেন একটা ধমক খাওয়া আড়ষ্টতা নরম ঠোঁটের কোণে।

অনুমানে ফিরে চাই আশেপাশে। কিন্তু রাধা দিদি সুপর্ণাদি শুভেন্দু নীরেনদাকে দেখি না। মনে মনে অবাক মানি। গতকালের ঘটনা মনে পড়ে যায়। ঝিনির দিকে চেয়ে, কিছু বলতে গিয়ে ঠেক খাই। দেখি কী একটা কষ্টের ছাপ ওর মুখে। কেবল বিব্রত লজ্জা না। জিজ্ঞেস করি, 'আপনি একলা নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁরা সব কোথায়, আপনার সংগীরা?'

'জানি নে।'

এতক্ষণ নত মুখ। এবার হঠাৎ মুখ তোলে ঝিনি। চোখ তুলে বলে, 'আপনাকে খুঁজছিলাম।'

'তাই নাকি?'

আবার মুখ নত। একটু রঙ বদলায়। এক মুহূর্ত, আবার মুখ তোলে। বলে, 'হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত আছেন?'

বলি, 'না, ব্যস্ত আর কী। মেলায় চলেছি।'

'কোপাইয়ের ধারে যাবেন?'

মেলা ছেড়ে কোপাইয়ের ধারে। ঝিনির দিকে চেয়ে দেখি কাজলহীন চোখে জিজ্ঞাসু সংশয়। আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। বলি, 'সবাইকে না বলে যাবেন খুঁজবে না?'

'না।'

কেন, সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারি না। ঝিনির চোখের দিকে চেয়ে মনে হয় কোথায় যেন এক অসহায় দগ্ধ ব্যাকুলতা ছেয়ে রয়েছে। কতটুকু জানি ওকে, কতটুকু বুঝি। তবু এই প্রথম দাক্ষিণ্যের স্রোত ছেড়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একটা যেন কষ্ট লাগা কাঁটা ফোটে যায়। আর হঠাৎ ওর বাবা মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। যাদের মেয়ের জোরটি এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে আছে। বলি, 'চলুন যাই।'

আবার কাঁটাই একবার রঙ বদলায় মুখের। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিকে দেখে। ভিড়ের মধ্যে খালি রিকশার অভাব নেই। দুজনেই একটায় উঠে বসি। যেতে বলে দিয়েই তিন চাকার গাড়ি ছোটে ভেঁপু ফুকতে ফুকতে। খাল পেরিয়ে যখন খোয়াইয়ের লাল রাস্তায় পড়ি তখন মনে হয় ঝিনি অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। মুখ ফিরিয়ে চাই। তারপরে ডানদিকের খোয়াই মাঠের মাঝখানে বাঁশঝাড় দেখিয়ে বলি 'গতকাল রাত্রে অচিন্দার সংগে ওই বাঁশঝাড়ে গিয়েছিলাম।'

ঝিনি তাকিয়ে একটু অবাক হয়। শব্দ করে, 'ও।' তারপরেই আবার নিজের মধ্যে ডুবে যায়। পথে গ্রামের লোকের যাওয়া আসা। রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায় [illegible] গ্রামের নাম [illegible]। রুক্ষ প্রান্ত, মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। মাঝে মাঝে পাকা ইটের [illegible]। [illegible] দোকান, [illegible] চা। [illegible] ঘরের দরজায় [illegible] ছবি আঁকা [illegible]। [illegible] চলেছে।

[illegible] চোখের ওপর দিয়ে [illegible] কথা [illegible] দেখে সেই পথটা [illegible] করে। কিন্তু [illegible] চোখ [illegible] নিয়ে যায় অন্য। [illegible] ঝিনিও সেই-রকম।

এক সময়ে গ্রাম ছাড়িয়ে কোপাইয়ের [illegible] ভেসে ওঠে। চলায় লাগে ঢল। রাস্তা বাঁক খেয়ে নেমে গিয়েছে নিচে। দূরে দেখায় উঁচু নিচু বিস্তৃতির বুকে একটা বাঁকা নীল রেখা চোখে পড়ে। সহসা পশ্চিমে ঘুরে লাগাতে বাতাসের ঝাপটা লাগে। ঝিনির লাল রেশমী রুমালের বাসর এসে পড়ে আমার মুখে। আমার চোখ ঢেকে দেয়। সরাতে গিয়ে শুনি রিকশাওয়ালা বলে, 'ওই কোপাই।'

রুমাল সরাতেই দেখি ঝিনি আমার দিকে চেয়ে। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'শুভেন্দুবাবুর খবর ভাল তো?'

ঝিনির ভুরু যেন বরেক অবাকে কাঁপায়। কোপাইয়ের কূলে এসে হঠাৎ এমন কথা শুনবে বলে যেন আশা করে নি। আসলে আমার হঠাৎই মনে পড়ে যায়, ঝিনির কাল সন্ধ্যার উদ্বেগের কথা। আমার দিকে ঝিনি পাল্টা প্রশ্ন ফেরায়, 'ওর কী হয়েছে?'

বলি, 'কাল ওভাবে চলে গেলেন হঠাৎ। আপনার দুশ্চিন্তা ছিল। নীরেনদা চলে গেছলেন।'

[illegible] চোখ থেকে চোখ সরাতে ঝিনির দেরি হয়। একটু পরে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'ভালই আছে।'

রিকশা প্রায় জলের ধারে এসে দাঁড়ায়। রিকশাওয়ালা বলে, 'এই হলেন কোপাই। পায়ের পাতা ডুবিয়ে ওপারে চলে যান। এখন জল নাই।'

তারপরে বাঁ দিকের বাঁশঝাড় দেখিয়ে বলে, 'ওই উখানে পিকনিক হয়, দাদা দিদিমণিরা আসেন।'

সংবাদ যাবতীয় জুটে যায়। তবে পিকনিক মানে পিকনিক বুঝতে হবে, এইটি একটু মনে রাখবেন বাবু, জানেন কি না, সবাই ওই বলে।

পাদুকা রিকশাতে রেখেই নামি। ঝিনিও নামে স্যান্ডেল রেখে। নদীতে, সাঁওতাল মেয়েপুরুষ কেউ কেউ হাঁটু জলে বুক ডুবিয়ে চান করে। গরুর পা ধোবার [illegible] ছোট ছোট একটা জলেতে জল ছিটায়। ওপারে একটু পাঁচ বাঁধানো সড়ক। জিজ্ঞেস করি, 'ও রাস্তাটা কোথায় গেছে?'

'[illegible], পালরাই, উষাগ্রাম হয়ে [illegible] দিয়েছে।'

কিন্তু ঝিনির তেমনি নতমুখ। [illegible] সেই ভাব। কোপাইয়ের তীরে এসে কোপাই দেখে না। চোখ তুলে একবার তাকিয়ে আবার মুখ ফেরায়। জিজ্ঞেস করি, 'কোন-দিকে যাবেন?'

'যেদিকে খুশি।'

[illegible] খুশি ছিল না। কোপাই যেদিকে আমার চোখ ওর দিকেই। এখন ওর খুশিতেই চলা।

হঠাৎ শুনতে পাই, 'ওদিকটায় যাই।'

যেদিকে ওর চোখের নির্দেশ কোপাই সেদিকে পুবে বেঁকে চোখের বাইরে। পাড় ধরে ধরে যত এগোয় যাই কোপাইয়ের ধারা তত নিচে নামে। পাড় উঁচু হয়ে হয়ে ওঠে। এ হল খোয়াইয়ের রূপ। সে চড়াইয়ে ওঠে, নদী বহে নিচে। কিন্তু রূপেরও নানা রূপ এদিকে। যত এগোই জল তত গভীর। স্রোতে ভরা টান।

রবীন্দ্রনাথ ও হায়দরাবাদ

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে রবীন্দ্রনাথকে বারবার অর্থ-সংকটে পড়তে হয়েছে। নিজে যখন সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে পড়েছেন তখন অপরের সহানুভূতির উপরে তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে। স্বদেশে তো বটেই, এমন কি বিদেশেও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়েছেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ভিক্ষা চাওয়ার মধ্যে যে আত্মগ্লানি ও লাঞ্ছনা আছে, বাবা সে সমস্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর খাতিরে......। (পিতৃস্মৃতি)

সৌভাগ্যের কথা স্বদেশে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে নিঃসঙ্গ হতে হয়নি—এ দেশের বিভিন্ন কয়েকটি দেশীয় রাজ্য, রাজন্যবর্গ ও কিছু বদান্য ব্যবসায়ীর [illegible] অর্থানুকূল্য বিশ্বভারতী-রচনায় রবীন্দ্রনাথকে প্রচুর সহায়তা করেছে। সেইসব হিতৈষী দাতাদের তালিকায় যাঁদের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁরা হলেন হায়দরাবাদের নিজাম, বরোদা, ত্রিপুরা, পোরবন্দর, আওয়াগড়, পিঠাপুরম, জয়পুর, [illegible] রাজ্যের মহারাজগণ, [illegible], [illegible] রাজা, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] প্রমুখ আরো অনেকে। এদের মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য [illegible] স্মরণীয় হল হায়দরাবাদের নিজামের নাম মনে রাখতে হবে, বিশ্বভারতীর তখন শৈশবদশা। এর আদর্শ সম্বন্ধে দেশের বেশির ভাগ লোকেরই তখন সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। অধিকাংশ লোকই তখন এই প্রতিষ্ঠানটিকে কবির বিচিত্র খেয়াল বলে মনে করতেন। দেশবাসীর মনের এই সংশয়-সন্দেহ কবিরও অজানা ছিল না। তবু তিনি আশা ছাড়েন-নি। ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যাঁরা ছিলেন—তাঁদের সহায়তাও তিনি পেয়েছেন। হায়দরাবাদের নিজেদের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য লাভ করার জন্যে যাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়েছিল, তিনি হলেন কালীমোহন ঘোষ। ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে হায়দরাবাদের সঙ্গে বিশ্বভারতীর প্রথম যোগসূত্র গড়ে ওঠে। নিজাম সরকারের কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির আমন্ত্রণে কালীমোহনবাবু হায়দরাবাদ পরিদর্শনে যান। সেখানকার গ্রামীণ জীবনের বৈচিত্র্য ও সমস্যাদি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন এবং নিজাম সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন ও সেই সঙ্গে পল্লী-পুনর্গঠন বিষয়ে একটি পরিকল্পনা তিনি পেশ করেন। এই সময়ে কালীমোহনবাবুর সঙ্গে হায়দরাবাদের প্রথম শ্রেণীর রাজপুরুষদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়—তাঁদের কাছে বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যার কথাটিও তিনি তুলে ধরেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে কালীমোহনবাবু দুটি বক্তৃতাও দেন। তাঁর এইসব বক্তৃতা ও বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা হায়দরাবাদের নিজাম সরকারকে যে প্রভাবিত করে তাতে সন্দেহ নেই। বিশ্বভারতীর আদর্শের প্রতি রাজকর্মচারীদের মধ্যে ঔৎসুক্য দেখা যায়—এবং তার ফলে রবীন্দ্রনাথের অর্থসংকট মোচনের জন্য কালীমোহনবাবু যখন আবেদন করেন, তখন সহজেই তাঁরা সাড়া দেন। হায়দরাবাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মহারাজ কিষণপ্রসাদ এবং তাঁর সচিব [illegible] [illegible] [illegible] কিছুকাল আগে গুজরাটের [illegible] [illegible]—সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন।—[illegible] রবীন্দ্র-অনুরাগী এবং তাঁদের সঙ্গে কালীমোহনবাবুর হৃদ্যতাও [illegible]। [illegible] [illegible] তাঁদের প্রচেষ্টায় [illegible] [illegible] নিজাম [illegible] বিশ্বভারতীতে ইসলাম সংস্কৃতির চর্চা ও পঠন-পাঠনের জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। ১৯২৭-এর শেষে বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভায় যে-প্রতিবেদন পঠিত হয় তাতে নিজামের দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

In July, 1927, His Exalted Highness the Nizam of Hyderabad gave a donation of one lakh of rupees to the Visva-Bharati. The letter of the Finance member to His Exalted Highness, the Nizam, in announcing the gift, stated that it is understood that the amount will be invested in such form as may be agreed upon on consultation with Nizam's Government utilised for making Provision for the study of Islamic Culture in the Visva-Bharati. Rabindranath Tagore wired his thanks on behalf of Visva-Bharati for this munificient offer which was gratefully accepted by the Samsad.

রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞ চিত্তে নিজামের সেই দান গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই ১৯৩৩ সালে তিনি হায়দরাবাদ ভ্রমণে যান। সেবার ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে মহাসমারোহে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাতে যোগ দেন। বোম্বাইয়ের পালা শেষ করে কবি পাড়ি দেন অন্ধ্র ও হায়দরাবাদের দিকে। এই ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী হলেন কালীমোহন ঘোষ, একান্ত সচিব অনিলকুমার চন্দ ও শ্রীমতী রানী চন্দ। ওয়ালটেয়ারে ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের আতিথ্য গ্রহণ করেন তাঁরা। কবি সেখানে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন। এই সময়ে হায়দরাবাদের প্রধান-মন্ত্রী কিষণ প্রসাদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণপত্র পৌঁছয়—তাতে তিনি কবিকে অনুরোধ জানান নিজাম সরকারের আতিথ্য গ্রহণ করে হায়দরাবাদে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতে এবং সেই সঙ্গে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে। স্যার কিষণ প্রসাদ তখন ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আচার্য। ১২ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ সদলবলে হায়দরাবাদে পৌঁছন। এই তাঁর প্রথম হায়দরাবাদে আগমন। রেল-স্টেশনে কবিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে উপস্থিত ছিলেন স্যার আকবর হায়দরী, সৈয়দ মহম্মদ মেহদি, ওসমানিয়া ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ সাজ্জাদ মির্জা, ই ই স্পেইট, রাজা ধনরাজগিরি, বামন নায়ক এবং শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও তাঁর বোন শ্রীমতী লীলামণি নাইডু।

হায়দরাবাদে পৌঁছবার দ্বিতীয় দিন ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কবির সংবর্ধনা সভা আয়োজিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগেই সভাকক্ষে আর তিলধারণের স্থান ছিল না। হায়দরাবাদবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী কিষণ প্রসাদ উর্দু ভাষায় কবিকে স্বাগত জানান। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে হায়দরাবাদের বিশেষ ভূমিকা ও দানের কথা উল্লেখ করেন। শ্রোতাদের কাছে তিনি আবেদনে জানান, তাঁরা যেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ না করেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, কবি তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ হায়দরাবাদের যুবসমাজকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, জীবনের প্রান্তভাগে উপনীত হলেও সব সময়েই তিনি যৌবনের পূজারী—সারা জীবন তিনি যৌবনের জয়গান করেছেন।

Dr. Tagore said, my young friends, I have come to my time of dismissal from life's workshop. ('No', No', Sir Akbar Hydari ex-

claimed)—I am the poet of the young. I sing the hymn of praise to you and tell the eternal story of youth.

ভাষণ শেষে কবি 'গীতাঞ্জলি' থেকে কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দেন।

এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের দিনগুলি কেটেছে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে—কখনও সংবর্ধনা সভায়—কখনও বা কবি সম্মেলনে। ১৮ ডিসেম্বর হায়দরাবাদ থেকে বিদায় নেওয়ার কথা; কিন্তু তা তো হলই না—বরঞ্চ থাকার মেয়াদ আরো কয়েক দিন বাড়াতে হল। কবির সম্মানার্থ বিভিন্ন দিনে ভোজসভার আয়োজন করেছেন প্রধানমন্ত্রী কিষণ প্রসাদ, স্যার আকবর হায়দারি, রাজা-ধনরাজ গিরি, নিজাম মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার আমিন জঙ বাহাদুর প্রমুখ হায়দরাবাদের প্রধান পুরুষেরা। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের আসরে যোগ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, শুনেছেন বিখ্যাত বীণকারের বীণা। ইংলিশ পোয়েট্রি সোসাইটির হায়দরাবাদ শাখা কবিকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন—আবৃত্তি শুনেছেন তাঁর কাছে। নিজাম কলেজ আয়োজিত অনুষ্ঠানে মখদুমিয়া নামে জনৈক ছাত্রের আঁকা রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে—এবং পরে ছবিটি নিলাম করে যে টাকা ওঠে তা বিশ্বভারতীর সাহায্য ভাণ্ডারে দেওয়া হয়। ১৬ ডিসেম্বর কিং কোঠি প্যালেসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহামান্য নিজাম বাহাদুরের বহু-প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ ঘটল—বিশ্বভারতীর জন্যে নিজামের এক লক্ষ টাকা দানের কথা স্মরণ করে কবি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন এবং বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে নিজাম বাহাদুরের আর্থিক সাহায্য রবীন্দ্রনাথ সেদিন একান্তভাবে কামনা করেছিলেন। ১৮ তারিখে সৈদাবাদের 'আমিন মঞ্জিলে' নবাব আমিন জঙ বাহাদুরের প্রদত্ত ভোজসভায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রতি মুসলিম সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের অকুণ্ঠ প্রীতি ও শ্রদ্ধার জন্যে—ভাষার দূরত্ব সত্ত্বেও তাঁরা বাঙালী কবিকে আপন করে নিয়েছেন বলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলেন: এ আমার জীবনের পুরস্কারস্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানোর ব্যাপারে হায়দরাবাদের নারীসমাজও পিছিয়ে থাকেন নি। ২০ ডিসেম্বর সকালে 'হুমায়ুন মঞ্জিলে' কবির সম্মানার্থে সভার আয়োজন করেন। শ্রীমতী হুমায়ুন মিরজা কবিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় হল তাঁর বিশ্বভারতীর জন্যে অকাতরে অর্থসাহায্য করা। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই সভায় উপস্থিত থেকে মহিলাগণকে অনুপ্রাণিত করেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। এই সময়ে তিনি সাধারণত 'দুঃসময়', 'আজি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে নিশীথ-বেলা', 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে, হৃদয় নাচে রে' প্রভৃতি কবিতাগুলি আবৃত্তি করতেন। স্থানীয় সিটি কলেজে হায়দরাবাদের শিক্ষক-সমাজ কবির সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, শিক্ষকদের সভায় বক্তৃতা দেওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই—কেননা, তিনি নিজে 'স্কুল-পলাতক' হিসেবে খ্যাত। কাজেই শিক্ষকদের সান্নিধ্য তিনি খুব কমই পেয়েছেন। তারপর তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে সংগীত ও চারুকলার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে সার্থক করে তোলা ও তাঁর স্বপ্নকে রূপ দেওয়াই হল ভারতবাসীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শুধু বক্তৃতা বা সংবর্ধনা সভা নয়—এরই মাঝে বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ-সংগ্রহের কাজও চলেছে। সেকেন্দ্রাবাদ বার অ্যাসোসিয়েশন এক হাজার টাকা দান করেছেন। রিভোলি টকীজের অনুষ্ঠানে নিজামের ডেপুটি চীফ ইনজিনীয়ার রবীন্দ্র-অনুরাগী সি সি পাল বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্যে হায়দরাবাদ-বাসীর পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য চেয়েছেন এবং সভাস্থলেই রাজা ধনরাজ গিরি বাহাদুর পনের হাজার টাকা দান করেছেন। সেবার বোম্বাই-হায়দরাবাদ ভ্রমণের ফলে এইভাবে বিশ্বভারতীর অর্থভাণ্ডারে একচল্লিশ হাজার এক শো ছিয়াত্তর টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এবং হায়দরাবাদ পরিদর্শনের ফলস্বরূপ বোধ হয় পরবর্তীকালে ১৯৩৩ ও ১৯৩৬ সালে নিজাম সরকার যথাক্রমে উনিশ হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা বিশ্বভারতীকে দান করেছেন।

একদিকে যেমন অর্থ সংগ্রহের কাজ চলেছে, অন্য দিকে তেমনি কবি হায়দরাবাদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করেছেন—দেখেছেন ওসমানসাগর ও গণ্ডাপেট—থেকেছেন বাঞ্জারাহিলের মনোরম পরিবেশে, ছবি এঁকেছেন সেখানে মনের আনন্দে। শ্রীমতী রানী চন্দ তাঁর 'গুরুদেব' বইয়ে বাঞ্জারা হিলের দিনগুলির সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। হায়দরাবাদবাসীর শ্রদ্ধায়, অনুরাগে ও প্রীতিতে কবির জীবন অভিষিক্ত হয়েছে—বিনম্র চিত্তে তা গ্রহণ করে ধন্যবোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দু' সপ্তাহকাল সেখানে কাটিয়ে ডিসেম্বরের শেষ দিকে রওনা দিয়েছেন কলকাতার দিকে।

অন্ধ্র-ওয়ারাঙ্গলের হিন্দু স্থাপত্য

সুধীর রক্ষ

উন্নত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী অন্ধ্র দেশের দৃশ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রাচীন অন্ধ্র আজ খণ্ডিত। বর্তমান অন্ধ্রের উত্তরে ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশের বাস্তার স্টেট, দক্ষিণে তামিলনাদ, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হায়দ্রাবাদ আর মহীশূর রাজ্যের কিছু অংশ। পূর্বঘাট পর্বতমালা উত্তরদিকে বরাবর চলে গেছে। দেশের ভিতর প্রায় কয়েক হাজার ফুট রুক্ষ পাহাড়। উত্তর কোণ পর্যন্ত নগ্ন—জঙ্গলবিহীন। সেন্ট্রাল রেলওয়ের কাজীপেট স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে ওয়ারাঙ্গল জেলা উপস্থিত অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্গত। হায়দ্রাবাদ থেকে ৯২ মাইলের এক পথ ওয়ারাঙ্গল জেলার সঙ্গে সংযুক্ত।

'অরুগলা' বা এক শৈল নগরের অপর নাম ওয়ারাঙ্গল। হায়দ্রাবাদ উপস্থিত যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী, ওয়ারাঙ্গল ছিল প্রাচীনকালে কাকতীয় রাজাদের রাজধানী। ওয়ারাঙ্গল প্রতিষ্ঠার পূর্বে কাজিপেটের পশ্চিম দিকে 'হানামকোন্ডা' ছিল কাকতীয়দের মূল রাজধানী। প্রায় একশত বৎসর ওয়ারাঙ্গল ও হানামকোন্ডা যুক্ত শহররূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ১৪২২ সালে ওয়ারাঙ্গল বাহমনী সুলতানের অধীনে আসে। পরে গোলকুণ্ডার কুতবশাহী সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শূদ্র জাতের একটি নাম হল কাকতীয়। অন্ধ্রের সংস্কৃতি কেবল দক্ষিণ ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আসামের হিন্দু সমাজে কাকতীয়দের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আসামের সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ শ্রীরাজমোহন নাথের মতে অন্ধ্ররাজ্যের দুর্গা উপাসক কাকতীয়রা জীবিকান্বেষীরূপে আসামে আসে এবং তাদের জাতিগত নাম পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি সূচক পারিবারিক পদবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্ধ্রদেশে দুর্গাদেবীকে স্থানীয় ভাষায় 'কুকতী' বলা হয়। দ্রাবিড় ভাষা থেকে উদ্ভূত প্রাচীন তেলুগু কাব্য সংস্কৃত কাব্যের ধরনে লিখিত ও সংখ্যায় প্রচুর। অন্ধ্রদেশে প্রচলিত বহু পুরানো গাথায় রানী রুদ্রমা দেবীর পরাক্রম ও শাসন ক্ষমতা লিখিত আছে। সমগ্র তেলুগুভাষী আজও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, বীর-গাথা পাঠ করে গৌরব বোধ করে। কাকতীয় রাজা গণপতি ছিলেন স্থপতি-কলার এক উপাসক। সেই যুগের রাজাদের মত তিনি কেবল রাজ্য বিস্তার করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। শিল্পী মনের অব্যক্ত প্রকাশ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্যের মধ্যে। অতীতের সেই প্রকৃষ্ট নিদর্শনগুলি আজও মহাকালের স্রোতে দাঁড়িয়ে আছে প্রতি পর্যটকের পর্যালোচনা প্রতীক্ষায়। কাকতীয় সম্বন্ধে ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অংশ হল :

"The Kakatiyas have a place of honour among this ruling families of Medieval Dekkan. By virtue of their numerous conquests, their vast empire, their liberal patronage of arts and letters and the great fervour with which they defended Hindu Culture and Hindu institutions against the repeated onslaughts of Islam"—(Ramappa and other temples of Palampet, Hyderabad, 1958).

ওয়ারাঙ্গল স্টেশনে আমি পৌঁছাই ঠিক দুপুরে। এক রেল কর্মীর সাথে আলোচনা করে নিতে হল দ্রষ্টব্য স্থানগুলি কত অল্প সময়ে দেখা সম্ভব। কর্মী ছেলেটির বয়স প্রায় গোটা পঁচিশ। সুঠাম দেহ। মন তার বেশ সতেজ। তখন তার ছুটি। সে যাবে এখন রেল-কোয়ার্টারের দিকে, মধ্যাহ্ন আহার সারতে। আমাকে নবাগত দেখে সেই তেলুগু ভাষী রেল-কর্মীটি ইংরাজীতে প্রশ্ন করল :

—আপনার মধ্যাহ্ন আহার হয়েছে কি?

উত্তরে আমি বলি—না, আমি অভুক্ত। এখানকার হোটেল কোন দিকে?

ওয়ারাঙ্গলের পথঘাট আমার অজানা। সে আমাকে সঙ্গে করে সদর রাস্তায় এল। একটি সাইকেল রিকশায় আমরা আরোহী হলাম। কথাবার্তায় বোঝা গেল যে ছেলেটি চাকুরি করতে ওয়ারাঙ্গলে রয়েছে। এখানকার অনেক খবর সে রাখে। ওয়ারাঙ্গল ভ্রমণসূচি আমি কোন পথ থেকে শুরু করে কোন পথে শেষ করব সেইসব রাস্তাগুলি সে আমাকে দেখিয়ে দিল। ওয়ারাঙ্গলের রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত। দুধারে নানা দোকান, ছোট বড় অফিস, সদর রাস্তার মোড় থেকেই এক গলি চলে গেছে। গলির ভেতর সরবে ভাঙ্গার এক কল চলছে। এক ঠেলা গাড়ি থেকে ভেলি গুড়ের টিন নামান হচ্ছে। রাস্তা অপরিসর কাজেই সাইকেল রিকশাটি এক পাশে দাঁড়িয়ে গেল। আমরা রিকশা ছেড়ে এগিয়ে যাই একটি দুতলা বাড়ির
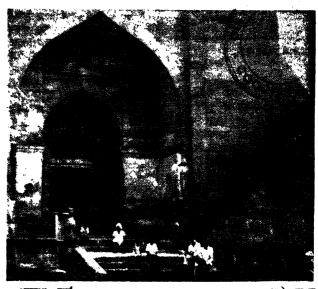
ওয়ারাঙ্গল দুর্গ ফটো—লেখক

দিকে। উপরে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার অবস্থা দেখছি। সঙ্গীটি ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করে এসেছে আমাদের মধ্যাহ্ন আহারের। উপর তলায় দুইটি ঘর নিয়ে একটি রেস্তোরাঁ। সঙ্গীটি নাকি এখানে রোজ খেতে আসে। মাসিক ব্যবস্থা। একটি টেবিলের দুদিকে চেয়ার পাতা। দুটি কাচের ডিসে মিহি চালের গরম ভাত। ছয়টি বাটি ভরা এক সাজিতে নানা মশলা, তরকারি, তেঁতুলের চাটনি ডাল ইত্যাদি। মাংস ও দই যতটা প্রয়োজন সাগ্রহে পরিবেশিত হবে। দই বেশ টক, চিনি একটু চেয়ে নিতে হল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আহারে বেশ তৃপ্তি লাভ করলেও আমি বাঙ্গালী তাই

ওয়ারাঙ্গাল কেল্লার গেট

ফটো—লেখক

আম্বলের তারতম্য আছে, ম্যানেজারকে এই কথা জানিয়ে বিদায় নিলাম।

সঙ্গীটি এবার আমার জন্য একটি রিকশা ঠিক করে দিল। তেলেগু ভাষায় বুঝিয়ে দিল কোন জায়গাগুলি আমাকে দেখিয়ে আনতে হবে। মজুরির ব্যাপার নিয়ে একটু দর কষাকষির পর সঙ্গীটি আমার কাছ থেকে বিদায় চাইল। অপরিচিত এক সঙ্গীর সাথে মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আমি আজ খুবই উপকৃত। স্মরণ করি আমার মত এক বাঙ্গালীকে সে কত সহজে আপন করে নিয়েছে। হয়ত ছেলেটির সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না, কিন্তু সেদিন ছেলেটিকে কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে না পেয়ে কেবল ধন্যবাদ দিয়েছি মাত্র।

হাজার থাম বিশিষ্ট মন্দির

আমি এখন চলেছি একা। কলকারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী তখন আকাশে মিশছে। মনে পড়ে গেল ওয়ারাঙ্গাল সম্বন্ধে ভিনিস পর্যটকের উক্তিটি। কারপেট ও কার্পাস তুলার সামগ্রীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে ওয়ারাঙ্গালের বস্ত্র শিল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"In the Kingdom are made the best and most delicate buckrams (cotton stuffs) and those of highest price; in sooth they look like tissue of spider's web. There is no King or Queen in the world but might be glad to wear them."

উক্ত পর্যটকের নাম মার্কোপোলো। তিনি ওয়ারাঙ্গালের জেনোয়া কারাগারে প্রায় সতের বছর যুদ্ধ-বন্দী হিসাবে কয়েদ ছিলেন। উক্ত নগর সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা চিরকালের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ওয়ারাঙ্গাল ও হানামকোণ্ডার বিরাট উন্নতির কথা পাঠ করলে আশ্চর্য লাগে যে তখনকার দিনেও শিল্পের এতটা অগ্রগতি কি করে সম্ভব হয়েছিল। ওয়ারাঙ্গাল রেলওয়ের অপর পারে প্রায় মাইল দুই যাওয়ার পর দেখা গেল কাকতীয় রাজাদের দুর্গ প্রাকার। রাজা গণপতি ও তাঁর মেয়ে রানী রুদ্রমা যুদ্ধের শত্রুকে দুর্গকে দুর্ভেদ্য করতে দুইটি প্রাচীর তৈরি করিয়েছিলেন। বাইরের প্রাকারটি প্রায় সাত মাইল আর ভিতরেরটি প্রায় চার মাইল স্থান জুড়ে দুর্গকে বেষ্টিত। রিকশা আমাকে নিয়ে দুর্গচত্বরে প্রবেশ করল।

দুর্গের অনেকগুলি গেট। আজ আর সেখানে কোন প্রহরী নেই। পাথরে তৈরি জন্তু মুখব্যাদান করে আজ পথচারীর মনে ভীতি সঞ্চার করে না। প্রাচীরের অনেক স্থান ভেঙ্গে মুছে গেলেও আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এঁকে-বেঁকে ভিতরের দিকে চলে গেছে। ১৩০৯ সালে মালিক কাফুরের আক্রমণে দুর্গের কিছু ক্ষতি হয়েছিল। ১৩২৩ সালে মহম্মদ তুগলক দুর্গকে অবরোধ করলেন। দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র তখন ওয়ারাঙ্গালের রাজা। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ওয়ারাঙ্গালের হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটল। পরে বিজয় নগরের [illegible] দুর্গকে [illegible] অধিকারে আনেন। দুর্গটির উপর আবার আক্রমণ শুরু হয় ১৪২৬ সালে। বাহমনী রাজা প্রথম আহমেদ ওয়ালী দুর্গটিকে ধ্বংস করে দেন। ওয়ারাঙ্গাল এবং গোলকুণ্ডা কুতুব শাহি সম্রাটদের অন্তর্ভুক্ত হয় [illegible]

[illegible]

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি ঘর আজ জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায়। ছাদবিহীন উঁচু দেওয়ালগুলি খাড়া হয়ে [illegible] দাঁড়িয়ে। ঘরগুলির কোনটা অনেকটা বিরাট হলঘরের মত। তিন তলার ছাদ আজও অক্ষত। দুর্গের বাইরে থেকে উপরে যাবার এক সারেকী সিঁড়ি। সোপান শ্রেণীগুলি বেশ উঁচু, আবার কয়েকটি নীচু। সেগুলি অতিক্রম করতে হল খুবই সাবধানে। ছাদে পড়ে রয়েছে পুরানো দিনের কয়েকটি কামান। উপর থেকে পরিবেষ্টিত ওয়ারাঙ্গাল শহরের দৃশ্য [illegible] আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ১,৫৬,৫২৭ নরনারীকে।

দুর্গ দেখে আর একটু পথ এগিয়ে গেলাম। ভগ্নস্তূপে ভরা একটি ছোট মাঠ; চারদিকে চারটি সুউচ্চ গেট অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে কীর্তিস্তম্ভ। সাঁচী প্রবেশ পথের অনুকরণে গেটগুলি নির্মিত হওয়ায় কারণ্যসনের তুলনা সত্যই প্রণিধান যোগ্য। ধূসর গ্রানাইট পাথরের বাঁকগুলি ধনুকের মত আকার ধারণ করে এক একটি হংস মূর্তি ধরে আছে। সুউচ্চ গেটগুলির ভাস্কর্য কারুকাজে খুবই নিখুঁত। নানা প্রতীক ও মূর্তিগুলি আজও অতীতের শিল্পমনের স্বাক্ষর বহন

করে। পাথরের একটি বীম ও থাম ভেঙে পড়ে আছে নীচে। শিল্পকলার বহু নিদর্শন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। নর-নারীর নৃত্যের ভঙ্গি দ্বারপালের প্রতিমূর্তি ইত্যাদি খোদিত হয়েছে কোন এক যুগে। আজও সেগুলি জীবন্ত, অক্ষত ও অম্লান। অনাদৃত ও অরক্ষিত অবস্থায় পাথরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যকলা কালের কবলে একদিন অবলুপ্তির পথে ভেসে যাবে—কেই বা তার খবর রাখে।

সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ভগ্নস্তূপ খননের ভার গ্রহণ করেছেন। সরকারী এক কর্মী আমাকে দেখিয়ে দিল স্তূপের পরিধি কতটা স্থান জুড়ে বিস্তারিত। হায়দ্রাবাদ রাজ্য সরকার স্বাধিকার বজায় রাখতে স্তূপের খানিকটা সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। ভারত ও রাজ্য সরকারের অধিকারে স্তূপের সীমা নিশানা হলেও সহজেই অনুমেয়। স্বয়ম্ভু মন্দিরের অস্তিত্ব আজ আর নেই কিন্তু ভারত ও রাজ্য সরকারের সীমার মধ্যে দুইটি প্রাচীন মন্দির আজও অবশিষ্ট রয়েছে। সেগুলি ভারত সরকারের অধীনে। ভূগর্ভ খনন করে রাজ্য সরকার এক বিরাট সাবেকী মণ্ডপ আবিষ্কার করেছে। মণ্ডপের প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ এক নন্দী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাহিনী আছে শ্রীপ্রোলার যখন রাজা ছিলেন তখন এখানে একটি গরুর গাড়ির চাকা হঠাৎ মাটিতে বসে যায়। লোহার চাকা উপরে তোলার বহু চেষ্টা হল। চাকা কিন্তু নড়ল না। রাজা খবর পেয়ে সশরীরে উপস্থিত হলেন। খনন শুরু হয়ে গেল। মাটির তলায় দেখা গেল এক স্বর্ণ-লিঙ্গ। রাজা স্বয়ং আদেশ দেন উক্ত লিঙ্গকে হানামকোণ্ডায় স্থানান্তরিত করা হোক। স্বর্ণ লিঙ্গটি পরশ পাথর। হানামকোণ্ডা তাই মাত্র তিন বছরের মধ্যেই উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে ওঠে।

বিকেলে ফিরে এলাম বাস স্ট্যাণ্ডে। হানামকোণ্ডার দিকে বিকেলে রওনা হলাম। হানামকোণ্ডার নাম সম্বন্ধে একটি গল্পকথা প্রচলিত। হানামকোণ্ডা উপস্থিত যেখানে রয়েছে সেখানে এক জৈন পুরোহিত বসবাস করতেন। এরুকোদের রাজু নামে এক ব্যক্তি কিছু ফুল নিয়ে পুরোহিতের সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করেন। প্রার্থনা জানান সেখানে একটি সাম্রাজ্য স্থাপনের। হানামকোণ্ডায় একটি দুর্গও স্থাপিত হল। এরুকোদের রাজু হানামকোণ্ডায় রাজা হলেন। সাম্রাজ্যের নাম হল অনুমাকোণ্ডা। হানামকোণ্ডা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমাকোণ্ডার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

রাজা গণপতি সৃষ্ট স্থাপত্যকলার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ হল হানামকোণ্ডার 'হাজার থাম বিশিষ্ট মন্দির।' নগর প্রান্তে এসে বাস থেমে গেল। অল্পদূরে এক পাহাড়। সানুদেশে জৈন তীর্থংকর নির্মিত নানা মূর্তি। সমগ্র হানামকোণ্ডার দৃশ্য দেখতে পাহাড়ের ওপর উঠি। অপরাহ্নের

ভদ্রকালী মন্দিরে পূজার্থীর সমাবেশ

সূর্য হেলেছে পশ্চিমে। নানা পাখির ঝাঁক আকাশে। গাছের মাথায় ও ঝোপঝাপে তারা সব অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্রমেই স্থানটি নীরব ও নিথর হয়ে আসে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা শান্ত ও পবিত্র। তাই বোধ হয় এখানে শিব আসেন সিদ্ধ ঋষিদের দর্শন দিতে। শিবের দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে ঘটে না উঠলেও হানামকোণ্ডার অপরনাম 'সিদ্ধেশ্বরী' একথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

চালুক্য যুগের মন্দিরগুলির মত হাজার থামের মন্দিরটি সূর্য, শিব ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নির্মিত। মন্দির দ্বারে নানা জালিকাটা, পদ্মফুলের পাপড়ির মত। কিন্তু দ্বারগুলি সূচিত করে মন্দিরটি কোন দেবতার জন্য নির্মিত। থামগুলি এমন ভাবে গঠিত যে এক মন্দির থেকে অপর মন্দিরে যাতায়াতের অবাধ পথ রয়েছে। অথচ মূল থামের সঙ্গে অপর থামগুলি নির্ভর করে আছে। হাজার থামের উপর নির্মিত কারুকাজ গণপতি রাজার সময় থেকে আজও অম্লান। তিন হিন্দু দেবের জন্য নির্মিত হাজার থাম বিশিষ্ট মন্দির যেন সমগ্রভাবে একটি বলেই মনে হয়। তিন দেব প্রতীকের মুখোমুখি বিরাট আকারের এক নন্দী। একটি মাত্র পাথর কেটে এই ষাঁড়কে নির্মাণ করা হয়েছিল খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে। নানা অলংকারে ভূষিত হয়ে হিন্দুদেবের অনুগত বাহনটি চার-পা মুড়ে যেন আদেশের অপেক্ষায় প্রতীক্ষারত। গম্ভীর মুখ, একটি মালার হার মুখ থেকে ঘাড় হয়ে লেজ পর্যন্ত সজ্জিত। নন্দি উচ্চতায় প্রায় ছয় ফুট। লেজটির নিম্নদিক ভাঙা। ষাঁড়টি একই পাথরের তৈরী কিনা পরীক্ষা করতে খিলজী সৈন্য লেজটিকে ভাঙে কিন্তু আজও সেটি মেরামত করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। শিল্পখচিত কারুকাজের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করতে খিলজী সৈন্য মূল বিগ্রহগুলিকে উৎপাটন করে। মন্দির মধ্যে বর্তমানে দেব প্রতীক নেই। মণ্ডপের থাম কালো মারবেল পাথরের। অলংকার বিহীন থামের কাছে দাঁড়িয়ে ঠিক আয়নার মত নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিলাম। সূর্য রশ্মি এই সব থামের উপর প্রতিভাত হলে দেবপ্রতীক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মূল বিগ্রহদের ঘিরে আছে অল্প উঁচু বেদি। সেখানে খোদিত আছে নৃত্যরত নর্তকীরা রাজা-রানীর সামনে উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত। মন্দিরের ভিতর প্রকাণ্ড পাথরের দেওয়াল, তার পর আর একটি এমনভাবে সংযোগ করা যে আলো হাওয়া চলাচলের কোন বাধাই নেই। রৌদ্রের খরতাপ ও শীতের প্রখরতা দেওয়ালগুলিতে আঘাত পাওয়ায় মন্দির অভ্যন্তরে সব ঋতুতেই মনোরম। আধুনিক এয়ার-কণ্ডিশনড ব্যবস্থা মন্দির গঠন শৈলীর কাছে আজ তুচ্ছ হয়ে যায়।

হাজার থামের মন্দির সম্মুখে নন্দী—চিহ্নিত স্থানটি খণ্ডিত করে খিলজী সৈন্য
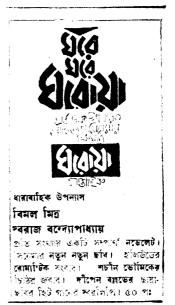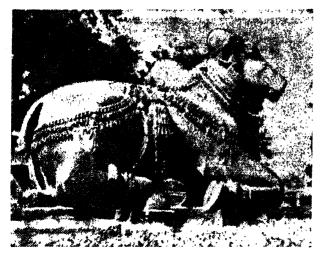
মন্দির মধ্যে উপর দিকে তাকালে দেখা যায় গায়ত্রীকে ঘেরা অষ্টাধিক পাথরের মূর্তিগুলি। দেবীকে আরাধনা করছে দৈত্য, গায়ক, নৃত্যরতা নটনটীরা। অলংকার বহুল নানা কারুকাজ এতই নিখুঁত যে প্রতি ফুল ও পাতার সংযোগস্থলে ধূপকাঠি লাগিয়ে দেওয়া চলে। মন্দিরের খুঁটিনাটি স্থাপত্য কলার অপরূপ নিদর্শনগুলি দেখাতে আমাকে সাহায্য করল সরকারী এক প্রাচীন জমাদার। সে মন্দিরের পাশে একটি ঘরে প্রায় ২০ বৎসর বাস করে আসছে। মন্দির দেখাশুনো করার ভার সে আজও নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে আসছে। বাইরে থেকে দেখা যায় মন্দিরের ছাদে নতুন টালি কয়েক স্থানে বসান। ভারত সরকার সম্প্রতি মন্দির মেরামতের কাজ শুরু করেছেন।

সেই কাকতীয় যুগে শিল্পীরা পাহাড় কেটে যে অনবদ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এক নূতন ধারা সৃষ্টি করে আজও হাজার থামের মন্দিরটি সেই মহিমা সগর্বে ঘোষণা করে চলেছে। পূর্ব দিকের প্রবেশ পথে একটি প্রস্তর ফলক। লেখা আছে ১১৬২ সালে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দির নির্মাতা শ্রীপ্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে একটি করুণ কাহিনী প্রচলিত। প্রতাপরুদ্রের পিতার নাম প্রোলারাজু। পুত্রের ভবিষ্যৎ জানতে রাজা প্রোলারাজু তাঁর সভা পারিষদের নিকট এক জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞকে আহ্বান করলেন। শাস্ত্রাদি বিচারে প্রমাণিত হল প্রতাপরুদ্র হবে পিতৃঘাতক ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি। সভা পারিষদের রায় অনুসারে এ হেন পুত্রকে ইহলোক থেকে চিরকালের মত বিসর্জন দেওয়া চাই। পিতা কিন্তু পুত্রের প্রাণহানিতে নারাজ। তিনি এক রাতে পুত্রকে স্বয়ম্ভু মন্দিরে ফেলে দিয়ে এলেন। রুদ্রজীব নামে উক্ত মন্দিরের এক পুরোহিত ছেলেটিকে কুড়িয়ে আনলেন তাঁর আশ্রয়ে। অপুত্রক সেই পুরোহিত ছেলেটিকে লালন-পালন করলেন; নাম দিলেন রুদ্রদেব। রুদ্রদেব যখন বেশ বড় হয়েছে তখন রাজা প্রোলারাজু আর একটি সন্তান লাভ করেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম মহাদেবরায়ালু। রাজা প্রতিদিন স্বয়ম্ভু মন্দির দর্শন করতেন। একদিন রাজা দেখতে পেলেন মন্দির মধ্যে এক যুবক গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যুবকের সুকান্তি রাজাকে মোহিত করল। যুবক যে তাঁর প্রথম পুত্র এ বিষয়ে তিনি ক্রমশ নিঃসন্দেহ হলেন। তিনি আত্মহারা হয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন যুবককে আলিঙ্গন করলেন—চুম্বনে চুম্বনে ছেলেটির মুখ ভরে উঠল। কিন্তু যুবক পিতাকে জানে না, চেনে না, তাই অচেনা পিতা পুত্রের নিকট আক্রমণ। নিয়তির নির্দেশে পুত্র পিতাকে হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করল না। রুদ্রদেব পরে রাজা হলেন। কিন্তু পিতৃহত্যার অনুশোচনা থেকে রুদ্রদেবের মুক্তি নেই। ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা মন্দির স্থাপনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে ভেবে রুদ্রদেব ওয়ারাংগলে স্থাপিত করলেন বহু মন্দির। 'হাজার থাম বিশিষ্ট' মন্দিরটি এই সব মন্দিরগুলির মধ্যে একটি।

সন্ধ্যার আলো ছায়ায় এগিয়ে চলেছি ভদ্রকালী মন্দিরের দিকে। স্থানীয় ইন্জিনিয়ারিং কলেজের এক ছাত্রকে পেলাম আমার সঙ্গীরূপে। পথের দূরত্ব কমাতে আমরা বেছে নিলাম এক জঙ্গলময় পথ। জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে সংকীর্ণ এক মেঠো পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। এ ধরনের অজানা পথ অতিক্রম করায় বাধা অনেক। জামা-কাপড়ে কাঁটা, কাদাপাঁকে জুতো আমার সিক্ত। ভীত ও সন্ত্রস্ত মনে পৌঁছালাম পাহাড়ের সানুদেশে। সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা আঁধার পুঞ্জীভূত হয়ে আসে পাহাড়ের শীর্ষদেশে। পথ এবার ক্রমশ ঢালু হয়ে পাহাড়ের উপর উঠেছে। ভদ্রকালী মন্দিরটি খৃঃ ১১৭৫ সালে রুদ্রদেব কর্তৃক পাহাড়ের এক কোণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রুদ্রদেবের পুত্র গণপতি মন্দিরের পাশেই এক বিরাট হ্রদ তৈরি করিয়েছিলেন। নাম—ভদ্রী টাংকম। হ্রদের জল পাহাড়কে ছুঁয়ে থাকায় জঙ্গল ও পাহাড়ের প্রতিবিম্ব আমার দেহ মনে এনেছিল এক অপূর্ব শিহরণ। জঙ্গল থেকে ভেসে আসা নানা ধ্বনি শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম মাঝপথে। মৃদু হিল্লোলে হ্রদের জল-কম্পনগুলি দেখি প্রাণ ভরে।

যাদব রাজাদের পরাজিত করে রাণী রুদ্রমা মন্দির রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য বহু জমি ও সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। ভদ্রকালীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা একটি প্রস্তরে লিপিবদ্ধ। প্রস্তর বিগ্রহ উচ্চ ও প্রস্থে প্রায় নয় ফুট। মস্তকে মুকুট। আটটি হাতে ডমরু, তলোয়ার, মানুষের মাথা ইত্যাদি। ১৯৫০ সালে ২৯শে জুলাই মন্দিরটি পরিদর্শন করেন শ্রীমজগদ্গুরু শংকরাচার্য।

ওয়ারাংগলের উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলির নাম ভদ্রকালী, ভেংকটেশ্বরী, পাদ্মাক্ষী, রামলিংগেশ্বর। মুসলমানদের দরগা হল জালালুদ্দিন আবদুল্লা শহীদ আবদুল্লা শহীদ, আবদুল্লা নবী শাহ, পীর শাহ মির্জা প্রভৃতি। ধর্মস্থানগুলি আজও নিত্য পূজিত। অতীতের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী মন্দিরগুলির সঙ্গে জড়িত। ওয়ারাংগলের বাসিন্দা হল হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্মের লোক। জীবন ধারণের উপায় হচ্ছে কৃষি, শিল্প, চাকুরি, সুতো ও কার্পেট বয়ন প্রভৃতি। বৎসরের প্রায় সব সময়ে এখানে মেলা ও উৎসব লেগে থাকে। একমাত্র ভদ্রকালী ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে মেলা ও উৎসব হয় তাতে প্রায় ২৫,০০০ লোকের সমাবেশ ঘটে।

খালের ধারে —ধীরেন দেববর্মণ

পরিচয় পাওয়া যায় প্রদর্শনীতে। তবে এ বৎসর অনেক নূতন শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। নূতন শিল্পীদের উৎসাহ দান করে অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ তাঁদের ও সেই সঙ্গে জনসাধারণেরও ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আর একটি কথা, প্রদর্শনীতে ভাস্কর্যের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন আছে।

পশ্চিম দিকের গ্যালারীতে তেলরঙে ও জলরঙে আঁকা ছবি ও গ্রাফিকের নিদর্শন আছে। অধিকাংশই দুর্বল রচনা। এর এক কোণে প্রবীণ শিল্পী, গোপাল ঘোষও শিল্পী-মহলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। দুঃখের বিষয়, এঁরা অ্যাকাডেমিতে নিদর্শন পাঠাননি। রঙ মনোজ্ঞ সংযত না হলেও রচনা ও পরিপ্রেক্ষিতের দিক দিয়ে সুরেন কুমারের ল্যান্ডস্কেপ (২৫৮) উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে শান্তি বর্মণের নিজস্ব রচনা-রীতিতে (১২, ১৩) চোখে পড়ে। এ দিকের মধ্যে সত্যব্রতর (১২৭) এক কাণ্ড সূক্ষ্ম কারুকার্য ও বিশিষ্ট চিত্রধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। এই সঙ্গে মদনলাল রাঠিকদের নিদর্শনের (১৩৪) নাম করা যায়। পাশের কোণে শিল্পী রাজের একটি ছোট রচনা ভাল লাগে। অবশ্য এটিকে কোলাজ (collage) না বলে অ্যাপ্লিক (applique)এর নিদর্শন বলাই সঙ্গত হবে। রঙীন কাপড় মাধ্যমে তৈরী প্রাচীন লোকচিত্র জাতীয় ছোট কাজটির সরলতা অনেককেই মুগ্ধ করবে। অবশ্য বিলম্বে পাওয়ার জন্য এটি ক্যাটালগের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

মধ্য বা পূর্ব দিকের গ্যালারীতে জলরঙ ও তেলরঙে আঁকা ছবির নিদর্শন আছে: অঙ্কনরীতি আধুনিক, যদিও একেবারে দক্ষিণ দিকে রিয়ালিস্টিক রীতিতে রচিত ছবির কতকগুলি নমুনা চোখে পড়ে। এ গ্যালারীতে রাজস্থান, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও শান্তিনিকেতন থেকে আগত কয়েকটি রচনা সকলের ভাল লাগবে। সুবিখ্যাত প্রবীণ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একান্ত রীতির পথ ধরে জাতীয় রচনা-শৈলীর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রগতিশীল মনের সন্ধান পাই। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র অন্তরের সূক্ষ্ম স্পর্শচেতনার ওপর নির্ভর করে শিল্পী যে রচনার প্রমাণ দিয়েছেন, তাতে সবাই বিস্মিত হই। এটিও ক্যাটালগে উল্লেখিত নেই। তবে এ গ্যালারীর মধ্যে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ ছবি নাইট বার্ড (২৫৬) ও নারী দেবতা (২৬০)। কেশবরাও আকার ও আলোছায়াকে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করে ছিএর লোকশিল্পের ছবির মর্মকথাটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটি অনেকের মনে রেখাপাত করবে। অপর পক্ষে রেখা চিত্র ও প্রতীক সংযোগে এম. সুব্রহ্মণ্যম্ নারী দেবতার একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে দীপালি রায়ের ডেভিল নৃত্য (২০১/ড), চন্দ্রনাথ দে-র হোলি ব্যাটস (৭৬) এবং বিশেষভাবে এম. ভি. দেবাজিত-র দুটি রচনা বেনারস মসজিদ ও স্নানের ঘাট (১৪৪ ও ১৪৪ক) উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় রীতির অধিকাংশ ছবিই পুরনো ওয়াশ প্রথায় আঁকা। ধীরেন দেববর্মণ ও সুধীর খাস্তগীরের ছবির সঙ্গে জেনা উদয়নারায়ণের উইথ হোপ (১১১) ও এস. চন্দ্রশেখর রাও-এর ডন অ্যান্ড ডাস্ক (১৯৫) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রঙের দিক থেকে শেষোক্তটিতে অমৃত শের-গিলের প্রভাব থাকলেও ছবিটির একটি নিজস্ব আবেদন আছে।

দক্ষিণদিকের নূতন গ্যালারীতে প্রধানত বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ছবি রাজ্য-ওয়ারী হিসাবে পৃথক পৃথকভাবে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখানে কয়েকটি ভাল নিদর্শন চোখে পড়ে। এ গ্যালারীটি প্রদক্ষিণ করলেই তিনখানি ছবি মনের ওপর রেখাপাত করে। প্রথমটি দক্ষিণদিকের দেওয়ালে রাখা, নাম লর্ড জগন্নাথ (৩২), শিল্পী অক্রূর দাস (ওড়িশা)। অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত রেখাভিত্তিক আকার যে কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গিমার গুণে কি বিরাট ও বলিষ্ঠ

বাইশ

আর এক রকম। আর একটি ঘটনা।

কী একটা কাজে সংস্কৃত প্রেসে এসেছেন কৃষ্ণকিশোর। প্রেসের ম্যানেজারের নাম পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ভাই। বিদ্যাসাগরকে দাদা বলে ডাকেন পীতাম্বর।

কৃষ্ণকিশোর পীতাম্বরকে জিজ্ঞেস করলেন —আমার কাজটার কী হল?

পীতাম্বর বললেন—দাদার হুকুম না হলে কিছুই হবে না।

এখানে কে কার দাদা, কে কার ভাই—কিছুই জানেন না কৃষ্ণকিশোর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? তোমার দাদাই বা কে?

পীতাম্বর রাগ করে বললেন—আমার দাদাকে জানো না। ভারতবর্ষের, এমন কি পৃথিবীর লোক দাদাকে জানে, আর তুমি জানো না?

প্রেসের অন্যদিকে বসে কাজ করছিলেন বিদ্যাসাগর। পীতাম্বরের কথা তাঁর কানে গেল। তিনি বললেন—এমন গাধা না হলে কি আমার প্রেসের ম্যানেজার হয়! তুমি কে, তোমার দাদা কে, জিজ্ঞেস করছে। বল, আমি বিদ্যাসাগরের ভাই। আর বল, আমার দাদাকে চেনো না! আমার দাদাকে না জানে এমন লোক ভারতবর্ষে নেই!

যজ্ঞেশ্বর ঘোষ সংস্কৃত প্রেসে কাজ করে। যজ্ঞেশ্বরের মা মারা গেলেন। গলায় কাছা দিয়ে প্রেসে এসেছে যজ্ঞেশ্বর। কাজ করছে।

বিদ্যাসাগর ডাকলেন যজ্ঞেশ্বরকে। বললেন—তুই আমার প্রেসে ঢুকলি কেন? বেরো প্রেস থেকে।

কেন, বিদ্যাসাগর রাগ করলেন কেন? কিছুই বুঝে উঠতে পারল না যজ্ঞেশ্বর।

বিদ্যাসাগর বললেন—যা, আমার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়া।

হুকুম তামিল করল যজ্ঞেশ্বর। বিদ্যাসাগর এসে জিজ্ঞেস করলেন—তোর মা মরেছে কতদিন? মায়ের শ্রাদ্ধ কী করে করবি?

—যা একটু জমি আছে, তা বেচে বা বন্ধক রেখে শ্রাদ্ধ করব।

—কত লাগবে?

—আজ্ঞে পাঁচ-সাত শো টাকার কমে নিষ্কৃতি পাব না।

প্রেসের ম্যানেজারকে ডাকলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—যজ্ঞেশ্বরকে সাত শো টাকা দাও।

সংস্কৃত প্রেসে চল্লিশ টাকা মাইনে পায় যজ্ঞেশ্বর। তার কাছে একসঙ্গে সাত শো টাকা যেমন-তেমন কথা নয়।

যা হোক, বিদ্যাসাগর যজ্ঞেশ্বরকে বললেন—যা তো, আজ থেকে তোর এক মাস ছুটি। মা মরেছে, সর্বনাশ হয়েছে, ও আবার এসেছে আমার কাজ করতে!

যজ্ঞেশ্বর চলে গেল। ফিরে এল একেবারে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে যোগে, টাকায় তোর কুলিয়েছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে এখন হাতে কিছু নেই। ধার করে খেতে হবে।

বিদ্যাসাগর প্রেসের ম্যানেজারকে বলে দিলেন—ওর দরকার মতো ওকে কিছু কিছু টাকা দিও।

তারপর মাইনের তারিখ এসে গেল। যজ্ঞেশ্বরের মাইনে তো চল্লিশ টাকা; প্রেসের ম্যানেজার সেই মাইনে থেকে ধার বাবদ দশ টাকা কেটে রেখে যজ্ঞেশ্বরকে তিরিশ টাকা দিতে যাচ্ছেন।

তিরিশ টাকায় সারা মাস কেমন করে চলবে। যজ্ঞেশ্বর ম্যানেজারকে বলল—এত কাটলে বাঁচতে হবে কী?

একটু দূরে আছেন বিদ্যাসাগর, সেখান থেকে তিনি সব কথা শুনলেন। সেখান থেকেই তিনি ম্যানেজারকে বললেন—ওহে, তুমি কি জানো না, ওর মাইনে বাড়ানো হয়েছে। ওর মাইনে যে এ মাস থেকে ষাট টাকা হয়েছে। ষাট টাকা থেকে দশ টাকা কেটে রেখে ওকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিও।

সাগরে মশায়ের অধীনে আছি। আজ যদি আমি তাঁর দল ছাড়ি, তিনি আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিতে পারেন। এ তো গেল আমার প্রথম আপত্তি। এবার আমার দ্বিতীয় আপত্তি শুনুন। বিধবাবিবাহ দলে আছি বলে আপনাদের মতে আমি পাতকী, তাই আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু আমার মতে যে-কাজ ধর্মসংগত, শাস্ত্রসংগত এবং যাতে প্রাচীন ঋষিদের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, সে কাজে যোগ দিয়ে আমি কখনোই পাতকী হইনি, এই আমার বিশ্বাস। তবে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব কেন? আপনারা যাই বলুন, প্রায়শ্চিত্ত আমি কিছুতেই করব না। [illegible] যদি আমার মেয়ে আপনারা না নেন, [illegible]।

[illegible] গিরিশচন্দ্র প্রায়শ্চিত্ত না করলে [illegible] গিরিশচন্দ্রের মেয়ের বিয়ে [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible] ছিল।"

[illegible] মেয়ে-মেয়ের বিয়ে।

গিরিশচন্দ্রের মেয়ে-মেয়ের [illegible] এসে গেল। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন।

[illegible] ভট্টাচার্যের ছেলের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মেজো মেয়ের বিয়ের কথা হয়ে আছে। সময় হয়েছে এবার, গিরিশচন্দ্র গেলেন চাউরিপোতায়।

পাত্রপক্ষ থেকে আপত্তি উঠল। ওঁরা গিরিশচন্দ্রকে বললেন—বারুইপুরের জমিদারদের কাছে গিয়ে তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো যে আর কখনো বিধবাবিবাহ দলে যাবে না, তাহলে আমরা তোমার মেয়েকে নিতে পারি।

—আচ্ছা, বিবেচনা করে দেখি। বিবেচনা করে বলব।

গিরিশচন্দ্র কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। এখন কী করবে?

ক্ষণকাল ভাবলেন বিদ্যাসাগর। তারপর বললেন—গিরিশ, তুই গিয়ে বল্, আমি আর বিধবাবিবাহ দলে থাকব না।

—সে কথা কেমন করে বলব?

বিদ্যাসাগর বললেন—আমি যখন আর বিধবাবিবাহ দিয়ে উঠতে পারছি না, তখন তো আর বিধবাবিবাহ দল থাকছে না। তবে তুই আর কীভাবে ওই দলে যোগ দিবি?

বই পুঁথির উপর বিদ্যাসাগরের অপার ভালোবাসা। লাইব্রেরি ভর্তি বই ছিল তাঁর। সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙলা, হিন্দী। হাতে-লেখা অনেক সংস্কৃত পুঁথি। পড়বার পর বইগুলো বাঁধিয়ে নিতেন। সুন্দর করে

আত্মীয় ছিলেন না। আহার প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে, তাহার ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা বিলক্ষণ ছিল। সে স্থির করিয়াছিল, আমি প্রাণান্তেও পরের গলগ্রহ হইব না; পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা, অনাহারে প্রাণত্যাগ করা ভাল। যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া, যাহা পাইব, তাহাতেই কোনও রূপে আপন ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিব।

"একদিন এই দীন বালক শুনিতে পাইল অমুক ব্যক্তির একটি অল্প বয়স্ক পরিচারকের আবশ্যক হইয়াছে; তিনি লোকের অন্বেষণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, সে ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনার কি একটি অল্প বয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে; যদি সেরূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া আমায় নিযুক্ত করুন।" সে ব্যক্তি কহিলেন, "এক্ষণে আমার তদ্রূপ পরিচারকের প্রয়োজন নাই।" বালক শুনিয়া, হতাশ্বাস হইয়, ম্লানবদনে প্রস্থান করিল।

"সে ব্যক্তি বালকের মুখ দেখিয়া অনুকম্পাবিষ্ট হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কোথাও কর্ম জুটিতেছে না?" তখন বালক কহিল, "না মহাশয়, আমি অনেক স্থানে চেষ্টা দেখিয়াছি, কিন্তু কোথাও কিছু হইতেছে না; একটি স্ত্রীলোক আমায় বলিয়াছিলেন, আপনকার লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই জন্যে আপনকার নিকট আসিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম তিনি, বিশেষ না জানিয়াই, ওরূপ বলিয়াছিলেন।"

"বালকের ভাব দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি, আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত কহিলেন, "তুমি হতোৎসাহ হইও না।" এই কথা শুনিয়া, বালক প্রফুল্ল চিত্তে কহিল, "না মহাশয়, যদিও আমি অশন বসন প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে অতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি, একদিনের জন্যেও, আমি হতোৎসাহ হই নাই। আমার সম্পূর্ণ আশা আছে, আমি, অচিরে কোনও স্থলে নিযুক্ত হইয়া, আপন ক্লেশ দূর করিতে পারিব। দেখুন, এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থলে, অবশ্যই, আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমি কেবল সেই ব্যবস্থা অন্বেষণ করিতেছি।

"এক ভাস্কর কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া বালকের এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া কহিলেন, "অহে বালক, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার সংগে আইস, আমি তোমায় নিযুক্ত করিব; আমার তোমার মত পরিচারকের প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া তিনি সেই বালককে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে যে সকল কর্ম করিতে হইবেক সে সমুদয় বলিয়া দিলেন। বালক, এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, কর্ম করিতে লাগিল। এক দিন, এক ক্ষণের জন্যেও, আলস্য বা ঔদাস্য করিল না। তদ্দর্শনে ভাস্কর, যারপর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

ঈশ্বরের ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস না থাকলে কেমন করে বিদ্যাসাগরের রচনায় একটি অসহায়সম্বলহীন বালক বলতে পারল: 'ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থলে অবশ্যই, আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি।"

আর যাই হোক, বিদ্যাসাগর অবতার হতে চাননি।

বিদ্যাসাগরের একখানা ছবি যোগাড় করেছেন কৈলাসচন্দ্র বসু। ছবির নিচে একটি সংস্কৃত শ্লোক লেখা হল:

শ্রীমানীশ্বরচন্দ্রোঽয়ং বিদ্যাসাগর-সঞ্জ্ঞকঃ।
ভূদেবকুলসম্ভূতো মূর্ত্তি-মূর্ত্তিমদ্দেবতয়ং ভুবি॥

ছবি বাঁধানো হল। তারপর কৈলাসচন্দ্র একদিন সেখানা বিদ্যাসাগরকে দেখাতে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক দেখে বিদ্যাসাগর নিজস্ব ভঙ্গিতে কৈলাসচন্দ্রকে বললেন—"শ্রীমানীশ্বর-চন্দ্রোঽয়ং-এর চেয়ে সত্যকথা আর নেই। "শ্রীমান" না হলে কি এমন উড়ে বেহারার রূপ হয়? "মূর্ত্তিমদ্দেবতং ভুবি—"এ কথার আর প্রতিবাদ নেই। সাক্ষাৎ দেবতা না হলে এমন কর্মভোগ আর কার ভাগ্যে ঘটে থাকে?

এইভাবে কৈলাসচন্দ্রের শ্লোকের টীকা করে বিদ্যাসাগর শেষে বললেন—তোমরা যে আমাকে ভালবাসো, এই আমার জীবনের লাভ। আমি অবতার হতে চাই না!

সংস্কৃত ঋগ্বেদসংহিতার বাঙলা অনুবাদ করেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। অনুবাদ আরম্ভ করে সব সময় বিদ্যাসাগরের কাছে আসতেন রমেশচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরিতে বসে সংস্কৃত পুঁথি ঘাঁটতেন, কোথাও সন্দেহ হলে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নিতেন।

একদল পণ্ডিত রুষ্ট হলেন। রব তুললেন—সর্বনাশ হয়ে গেল, ধর্ম লোপ হয়ে গেল। ঋগ্বেদের বাঙলা অনুবাদ হলে, সর্বনাশের আর বাকি কি। অনুবাদ আর অনুবাদককে গালমন্দ করতে লাগলেন তাঁরা।

কিন্তু বিদ্যাসাগর বরাবর এ কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি রমেশচন্দ্রকে বলেছেন—ভাই, উত্তম কাজে হাত দিয়েছ, কাজটি সম্পন্ন করো। যদি আমার শরীর একটু ভালো থাকে, যদি আমি কোনোরূপে পারি তোমাকে সাহায্য করব।

কিন্তু পরকাল নিয়ে বিদ্যাসাগর বুঝি কিছুই বলেননি। না, একটু কিছু বলেছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের বড় ছেলের দৌহিত্রের নাম ললিত চাটুয্যে। পরকালের তত্ত্ব নিয়ে ললিতের সঙ্গে হাসঠাট্টা করেছেন বিদ্যাসাগর। ললিত নাকি ও-সব তত্ত্ব জানেন।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করতেন—হ্যাঁ রে ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি?

ললিত চাটুয্যে বলতেন—আছে বইকি! আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকবে না তো থাকবে কার?

বিদ্যাসাগর হাসতেন।

পরকাল আছে, মৃত্যুর পর মানুষ আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারে—এমন সম্ভাবনার কথা বিদ্যাসাগর বুঝি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি। প্রভাবতীর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এ প্রভাবতীর উদ্দেশে লিখেছেন: 'বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের এইটি করিও, যাহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনা ভোগ করিতে না হয়।"

এ কি কেবলমাত্র রচনা-কৌশল? কেবলমাত্র স্নেহশীল যন্ত্রণাকাতর মনের পরম দুর্বল মুহূর্তের উচ্চারণ? নাকি বিদ্যাসাগর পরকালে বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পরেও 'পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত' হবার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করতে পারেননি, অথবা নস্যাৎ করতে চাননি?

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন: "ঈশ্বর-চ্যাপেলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার (বিদ্যাসাগর) প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি সেইজন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি তাঁহাকে যে কর্তব্যপথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না।"

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি সে সময়ে বাঙলা দেশে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন আরম্ভ করেছেন।

শশধর তর্কচূড়ামণি একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করলেন।

বিদ্যাসাগর শশধর তর্কচূড়ামণিকে বললেন—শুনেছি আপনি হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য এসেছেন। আপনি শাস্ত্রাদি কোথায় পড়েছেন?

শশধর তর্কচূড়ামণি বললেন—কাশীধামে।

—কী পড়েছিলেন?

—দর্শনশাস্ত্র।

দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে হিন্দুধর্মের সাদা, রাঙা, নীল, কালো, এমন সকল রঙ কোথায় পেলেন? আমিও দর্শন পড়েছি, কিন্তু দুর্বোধ্য বিষয়, কিছুই ভালো বোঝা যায় না। পণ্ডিতমশায় পড়াবার সময় মধ্যে জিজ্ঞেস করতেন, 'ঈশ্বর বোঝা গেল?' আমি বলতুম, আপনি যেমন বোঝেন, আমিও তেমনি বুঝি। পড়িয়ে যাচ্ছেন পড়িয়ে যান। আমার কথা শুনে পণ্ডিতমশায় খুব হাসতেন।

কথায় কথায় বিদ্যাসাগর শশধর তর্কচূড়ামণিকে বললেন—আপনাকে হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য যাঁরা এনেছেন, তাঁরা যে কেমন দরের হিন্দু তা তো আমি দেখেই জানি, তবে আপনি এসেছেন, বক্তৃতা করুন। লোকে বলবে, বেশ বললেন ভালো। এই রকম একটু প্রশংসা পাবেন, আর কিছু না। আমাদের স্কুলের ছেলেরা যে মুরগির মাংস খায়, আপনার বক্তৃতায় তারা যে মাংস ছাড়বে, আমি তা একেবারেই বিশ্বাস করি না।

বিদ্যাসাগর একটু রসিকতাচ্ছলে শশধর তর্কচূড়ামণিকে বললেন—দেখবেন, হিন্দুধর্ম অজর, অমর ও অক্ষয়।

রাস্তার ধারে বারান্দায় বসে মুড়ি খেতে-খেতে গল্প বলছেন বিদ্যাসাগর। গল্প শুনছেন শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরও কয়েকজন। এমন মজার গল্প বলছেন বিদ্যাসাগর, সকলে হেসে অস্থির।

শিবনাথ শাস্ত্রী সে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশিষ্ট মানুষ। শিবনাথকে খুব ভালবাসতেন বিদ্যাসাগর।

রাস্তার ধারে বারান্দায় বসে মুড়ি খেতে-খেতে গল্প-গুজব হচ্ছে, এমন সময় সেখানে একজন বাঙালী পাদরি সাহেব এসে উপস্থিত। পাদরি সাহেব শিবনাথকে চেনেন, বিদ্যাসাগরকে চেনেন না।

শিবনাথকে ওই অবস্থায় দেখে পাদরি সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। শিবনাথকে তিনি বললেন—মুক্তি পাবার জন্য আপনি কি সত্যিই কিছু করছেন? আমার তো মনে হয়, ব্রাহ্মধর্ম করে আপনার মুক্তি হবে না।

ধর্ম-টর্ম নিয়ে এসব গুরুগম্ভীর কথাবার্তা শুনে বিদ্যাসাগর ভাবলেন, পাদরি
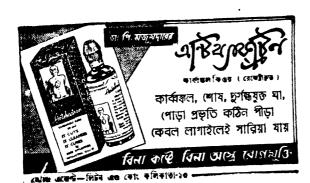
সাহেবের সংগে খানিক আমোদ করা যাক। বিদ্যাসাগর একগাল হেসে পাদরি সাহেবকে বললেন—আরে মশাই, এসব অল্পবয়সী ছেলের সংগে ধর্মের কথা বলে কোনো লাভ নেই। মুক্তির কথা ভাববার ওদের সময়ই নেই। তার চেয়ে বরং আসুন, আপনি আর আমি ধর্মের কথা নিয়ে একটু আলাপ-টালাপ করি। আমাদের তো ওপারে যাবার সময় এসে গেছে।

ঠাট্টা বুঝলেন না দিশী পাদরি সাহেব। খুব গম্ভীরভাবে তিনি বিদ্যাসাগরের পাশে বসলেন। গুরুগম্ভীর মুখে ধর্ম নিয়ে নানারকম কথাবার্তা কইতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগরও নানারকম কথা বলে যাচ্ছেন— সব অবশ্য ঠাট্টা করে বলে যাচ্ছেন। সে সব ঠাট্টার মানে বুঝলেন না পাদরি সাহেব। কেবল এটুকু বুঝলেন, এই মানুষটির সংগে ধর্মকথা কইবার কোনো মানে হয় না। রাগ করে তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন—বুড়ো বয়সেও আপনি এমন নাস্তিক? মৃত্যুর পরে নরকেও আপনার স্থান হবে না।

রাগ করে পাদরি সাহেব বিদায় নিলেন। তার পাণ খুলে হাসতে লাগলেন বিদ্যাসাগর।

তারপর বিদ্যাসাগর শিবনাথকে বললেন—পাদরি সাহেবটিকে আমার পরিচয় দিও না কিন্তু। তা হলে উনি আরো দুঃখ পাবেন। পাদরি সাহেবেরা সব সময়ই মুক্তির গম্ভীর তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত, ধর্মকথা কইবার ওদের কোনো জায়গা-বেজায়গা নেই। এই কথাটি বুঝিয়ে দেবার জন্যই আমি ওঁর সংগে ঠাট্টা করছিলাম।

সকল পাদরি সাহেবকে বিদ্যাসাগর অপছন্দ করতেন, একথা মনে করলে ভুল হবে। তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন পাদরি লাল সাহেবকে, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

কোনো ধর্মমতকে বিদ্যাসাগর নিন্দাও করেননি, প্রশংসাও করেননি। নিছক ধর্মমতের জন্য কারো উপর তিনি সন্তুষ্টও হননি, বিরূপও হননি। মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেছেন তিনি।

বিদ্যাসাগর কেবল একজন পাদরি সাহেবকেই ঠাট্টা করেননি, সময়মতো ব্রাহ্মকেও ঠাট্টা করেছেন।

চাঁদমোহন মৈত্রের সংগে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গেছেন শশিভূষণ বসু। সোজা পথে না গিয়ে একটু ঘুরে গেছেন।

চাঁদমোহন বিদ্যাসাগরকে বললেন—শশিভূষণ আমাকে বড়ো ঘুরিয়ে এনেছেন।

বিদ্যাসাগর শশিভূষণকে বললেন—সে কি গো, তুমি এই বুড়ো মানুষকে এত ঘুরিয়ে আনলে? হ্যাঁ গা বাপু! তুমি কি কারো?

চাঁদমোহন শশিভূষণের পরিচয় দিলেন।

বললেন—ইনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রচারক।

বিদ্যাসাগর তখন শশিভূষণকে বললেন—বাপু! এ সংসারের পথেই যদি মানুষকে এভাবে ঘুরিয়ে আনতে পারো, তা হলে ধর্মের পথে মানুষকে কত যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে, তা কে জানে?

শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবার মামা হরানন্দ ভট্টাচার্য। বিদ্যাসাগরের বন্ধু। তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ। কাশীবাসী হয়েছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য কলকাতায় আসেন।

একবার কাশী থেকে এসে বিদ্যাসাগরের সংগে দেখা করতে গেছেন। বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি মরেছ নাকি?

হরানন্দ বললেন—কেন, আমি মরব কেন? ম'লে কি আসতাম?

—আমিও তো তাই বলি, না ম'লে কি আসতে? তা দেখ, আমাকে যেন পেয়ে ব'সো না।

হরানন্দকে তামাক দেওয়া হয়েছে। তিনি তামাক খাচ্ছেন। খানিকক্ষণ বাদে বিদ্যাসাগর বললেন—তোমায় শেষটা কাশীতে থেলে, মরবার বুঝি আর জায়গা জুটল না? তা গিয়েছ তো আবার এরকম সরে পড়ো কেন? জানো তো, কাশীবাস করে বাইরে ম'লে কী হয়?

—হ্যাঁ, তা তো জানি। তবু মাঝে মাঝে দায়ে পড়ে আসতে হয়।

—শিগগির শিগগির পালাও। না হলে, কাশীর এপারে-ওপারে ভিতরে-বাহিরে অনেক ফারাক। বলি, একটু গাঁজা-টাঁজা খেতে শিখেছ তো?

হরানন্দ অবাক হয়ে বলেন—কেন, গাঁজা খেয়ে কী হবে?

বিদ্যাসাগর ব্যাখ্যা করে বললেন—একটু অভ্যাস রেখো। কি জানো, কখন কী কাজে লাগে বলা তো যায় না। ধরো, যদি তোমার কাশীপ্রাপ্তি হয় তা হলে তো শিব হবে? শিব হলে তোমার নন্দীভৃঙ্গী যখন গাঁজার আলবোলা ধরবে তখন টানতে হবে তো? আগে থেকে অভ্যাস না রাখলে দম আটকে মরে যাবে আর তোমার এত সাধের শিবত্ব ফসকে যাবে।

চন্দননগরের একজন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক ঠিক করলেন যে, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। এ বিষয়ে মতামত নিতে এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। উত্তরকালে মণিলাল সিংহ রায় লিখেছেন :

"একদিন ব্রিটিশ-অধিকৃত চন্দননগরের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার বাসনা জানাইলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন।

"পণ্ডিত মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নন দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার সংসার ত্যাগ করার ইচ্ছা কেন হইল ও পরিবারবর্গ কে কে তাহা জানিতে চাহিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার সংসারে ছিলেন তাঁহার পিতা, বিমাতা, স্ত্রী, ও দুইটি শিশুসন্তান। বিমাতার প্ররোচনায় পিতার অসৎ ব্যবহারই তাঁহাকে সংসার ত্যাগে প্রণোদিত করিতেছিল। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার স্ত্রীর সতীত্বের বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল কি না ও শিশুসন্তান দুইটি তাঁহার ঔরসজাত কি না জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী অতি সাধ্বী রমণী, অতীব পতিপরায়ণা। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, "তা হলে এই সাধ্বী অনুরক্তা স্ত্রী কি করেছেন, যার জন্যে তাঁকে এই শাস্তি দেওয়া হবে? তুমি কি বিবাহের সময় শপথ করনি যে, তুমি তাঁকে আজীবন পালন করবে? শিশু-সন্তান দুইটিই বা কি দোষে পরিত্যক্ত হবে? এরকম কাজ কি অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে না?" এই বলিয়া তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে গৃহে যাইয়া সকলের প্রতি, এমন কি বিমাতার প্রতিও তাঁহার কর্তব্য পালন করিতে নির্দেশ দিলেন ও বলিলেন যে, এইরূপে কর্তব্য পালন করিলে তিনি সংসারে সুখী হইবেন।" (ক্রমশ)

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত ফ্রন্টের (১৮ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর) ছয় দিনব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়। আন্দোলনের কার্যসূচী অনুক্রমে সারা রাজ্যের সর্বত্র ছাত্র, মহিলা, শিক্ষাব্রতী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায় বিভিন্ন দিনে এই আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। কারাবরণকারীদের মধ্যে আছেন এই রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী, বিধানসভার সদস্য, লোকসভার সদস্য এবং কলকাতার পৌরসভাসহ বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সদস্য। তাছাড়া সমাজের সকলস্তরের মানুষ যথা—শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, কবি, শিল্পী, হিন্দু, মুসলমান এবং নেপালী প্রভৃতি—এমন কি বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং বালকরাও বাদ যায় নি। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ শেষ দিনে তিন শতাধিক মহিলাসহ প্রায় তিন হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গ্রেপ্তারের এখন পর্যন্ত সঠিক সংখ্যা সংগ্রহ না হলেও একটি প্রাথমিক হিসাবে মনে হয়, সমগ্র রাজ্যে গত ছয় দিনে এই আন্দোলনে দশ সহস্রাধিক নরনারী কারাবরণ করেছেন। আন্দোলনের ব্যাপ্তি কলকাতা এবং মফস্বল শহরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে আরম্ভ করে পুলিস সর্বত্রই লাঠি চারজ এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গুলি চালনা পর্যন্তও করেছে। পক্ষান্তরে আন্দোলনে যোগদানকারী এক শ্রেণীর লোক কলকাতায় কয়েকখানি স্টেট বাস এবং খানকয়েক ট্রাম ও মটর গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। তা ছাড়া হাতবোমা এবং পটকা নিক্ষেপের ঘটনাও বিরল নহে। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম দিনে অমান্যকারী-দের সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখারজিকে পুলিস গ্রেফতার করে অধিক রাত্রে নিষ্কৃতি দিয়েছে।

দেশী সংবাদ

১৮ ডিসেম্বর—উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে আশ্বাস দিয়েছেন : পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীহরিদাস মিত্র আজ বাংলা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি এদিন এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, যতদিন তিনি ডেপুটি স্পীকার পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন আর তিনি কোন দলের সদস্য থাকবেন না।

১৯ ডিসেম্বর—আজ বিপুল সংখ্যক ছাত্র কোয়েম্বাটুর এবং পলনীতে, মাদরাজ আর ত্রিবান্দ্রমে হিন্দী বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মাদরাজের চাপ্পারাপ্পা কলেজের প্রায় দুই হাজার ছাত্র হিন্দী বিরোধী ধ্বনি ও সরকারী ভাষা সংশোধন বিলের প্রতিবাদ জানাতে মিছিল করে শহরের বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করেন।

কয়েকটি বিড়লা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে, সেগুলি তদন্তের জন্য একটি পুরোদস্তুর তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে কি হবে না, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অল্পদিনের মধ্যে তা বিবেচনা করবেন।

২০ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক অচলাবস্থা দূর করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারী মহলে মতভেদ থাকায় নাকি শ্রীধর্মবীর বিধান সভার অধিবেশন ডাকতে দ্বিধাবোধ করছেন। এই মতভেদের হেতু—সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক উভয়ই।

বিহারে নবগঠিত শোষিত দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করার যে সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহক সমিতি গ্রহণ করেছেন তা অনুমোদন করে এবং আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই বলে শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের নেতৃত্বে গঠিত যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানিয়ে গতকাল বিহার আইনসভার কংগ্রেস দলের এক সাধারণ সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

২১ ডিসেম্বর—আজ রাজ্যসভায় ভাষা (সংশোধন) বিল সম্পর্কে আবার বিতর্ক আরম্ভ

হলে সদস্যরা বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। শ্রীগঙ্গাশরণ সিংহ (নির্দল) বিল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবি জানান। শ্রী এম গোবিন্দ রেড্ডি (কং) বলেন যে, বিলটি অ-হিন্দীভাষী জনসাধারণের পক্ষে ভাল নয়।

আজ রাজ্যসভায় চল্লিশ মিনিটের ব্যবধানে দুবার একজন করে লোক দর্শকদের গ্যালারি থেকে হিন্দীবাদী ধ্বনি দেয় ও পুস্তিকা ছোঁড়ে। দুজনকে (তারা নাকি লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) বর্তমান অধিবেশনের সমাপ্তি (অর্থাৎ শনিবার) পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সভায় ভাষা বিল নিয়ে আলোচনার সময় এই ঘটনা ঘটে।

২২ ডিসেম্বর—আজ মাদরাজে হিন্দী বিরোধী বিক্ষোভকারীদের সব রাগ গিয়ে পড়ে রেলের উপর। তারা মাদরাজে আগত তিনটি ট্রেনে আগুন লাগায় এবং উত্তরগামী সব ট্রেন বাতিল করার জন্য রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানায়।

২৩ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ শান্তিনিকেতনে বলেন, পশ্চিম বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট। তবে, কিভাবে সমাধান করা যায় তার নিশ্চিত পথ এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। অনুসন্ধান চলছে।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ দলবিরোধী কাজকর্ম এবং ইন্দোর অধিবেশনের ঠিক পরেই ভারতীয় ক্রান্তি দলের কার্যনির্বাহক পরিষদ মনোনীত করার ব্যাপারে তাঁর ব্যর্থতার জন্য তিনি আর দলের সভাপতি থাকছেন না বলে দলের সম্পাদক শ্রীশিবকুমার সিংহ জানান।

২৪ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা খারিজের প্রতিবাদে এবং ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভার অপসারণের দাবিতে যুক্ত ফ্রন্টের তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন—"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" আগামী জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হবে বলে যুক্ত ফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আজ শান্তিনিকেতনের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সভামণ্ডপের ১০০ গজ দূরে শাল-বীথির ওপর বড় ধরনের একটি পটকা বিকট শব্দে বিদীর্ণ হয়। এই পটকার ঘায়ে ৪ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে তিনজন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এন সি সি সদস্য।

রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী এবং বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্য আকাদেমীর সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীর সহধর্মিণী শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনী আজ নয়াদিল্লির সেন নার্সিং হোমে ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

বিদেশী সংবাদ

১৮ ডিসেম্বর—আমেরিকা ও বৃটেনের কূটনৈতিক চাপ সত্ত্বেও গ্রীসের পলাতক রাজা কনস্টানটাইনকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে বলে এথেন্সের এক সংবাদে জানা যায়।

১৯ ডিসেম্বর—আজ অস্ট্রেলিয়ার লিবারেল পার্টির নেতা ৬০ বছর বয়স্ক শ্রীজন ম্যাক-ইওয়েন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পরেই তিনি জানান, ক্ষমতাসীন কোয়ালিশনের সংখ্যাগুরু লিবারেল নেতারা নেতা নির্বাচন করলেই তিনি সরে দাঁড়াবেন।

২০ ডিসেম্বর—ভিয়েতনাম বিরোধ মীমাংসার জন্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের সঙ্গে বেসরকারীভাবে আলোচনা শুরু করার জন্য প্রেসিডেন্ট জনসন আজ রাতে ভিয়েতকং নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

২১ ডিসেম্বর—কেপটাউনের হৃদযন্ত্র বদল অস্ত্রোপচার হওয়ার ঠিক ১৮ দিন পরে লুই ওয়াশকান্সকি আজ মারা গিয়েছেন। বিশ্বে একের হৃদযন্ত্র অন্যের দেহে সংযোজনের ঘটনা এই প্রথম। চিকিৎসকদের মতে অস্ত্রোপচার না হলেও তিনি এর বেশী বাঁচতেন না।

২২ ডিসেম্বর—পোপ পল আজ ভিয়েতনাম যুদ্ধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব করেছেন। আশা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট জনসন অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পথে ভ্যাটিকান সিটিতে আসবেন। ভাষণদানের এক সমাবেশে পোপ পল বলেন, নিরপেক্ষ মধ্যস্থতার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি মর্মাহত ও বিস্মিত।

২৩ ডিসেম্বর—সায়গন থেকে প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর নিজস্ব বিমানে ভারতের উপর দিয়ে করাচী যাত্রা করেন। সম্ভবতঃ রোম হয়ে তিনি দেশে ফিরবেন। প্রেসিডেন্ট জনসন করাচী বন্দরে নেমে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সঙ্গে ৭০ মিনিট আলাপ আলোচনা করেন বলে খবরে প্রকাশ।

২৪ ডিসেম্বর—প্রেসিডেন্ট জনসন আজ রাত্রে পোপ পলের সঙ্গে ভিয়েতনামে শান্তি স্থাপনের প্রশ্ন নিয়ে ঘণ্টা তিনেক কাল ধরে আলোচনা করেন। পরে প্রেসিডেন্ট বলেন, সন্ত্রাসবাদের পথ বর্জন করে ভিয়েতনামে সম্মানজনক শান্তি প্রতিষ্ঠার যে-কোন প্রস্তাবে আমরা সায় দেব।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভবিষ্যতের অপেক্ষা—	...	৯৪৫
দেশদর্পণ—	...	৯৪৬
ব্যঙ্গচিত্র—	...	৯৪৮
বৈদেশিকী—	...	৯৪৯
লাফিয়ে উঠল অন্ধকার (কবিতা)	—শ্রীমতী উমা দেবী	৯৫০
ম্যার্জিশিয়ান (কবিতা)	—শ্রীসুশীল রায় ...	৯৫০
যার বাড়ির ঠিক নেই (কবিতা)	—শ্রীসুধেন্দু মল্লিক	৯৫০
সুনন্দর জার্নাল—	...	৯৫১
গানের আসর	—শার্ঙ্গদেব ...	৯৫৩
নুনের পুতুল সাগরে	—শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগী ...	৯৫৫

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীবাদল ভট্টাচার্য

কারণটা কি জানেন

ক্রমশ বেশি লোক আজ **ওরও কলার ফিল্ম** ব্যবহার করছে। আনন্দ উৎসবই হক, তাজা একটা ফুলই হক আর উজ্জ্বল একখানি হাসিমুখই হক.........**ওরও কলার ফিল্ম** সহজে, দ্রুত ও নিখুঁতভাবে মুহূর্তটি ধরে রাখবে।

আরও কি, **ওরও** প্রসেসিং সার্ভিস আপনার জন্যে তাড়াতাড়ি কাজ করে।

ডিস্ট্রিবিউটর : **ওরও ফিল্মস ইস্টার্ন** ইউনিট, মাদ্রাজ এবং কলিকাতা

ওরও প্রাইভেট লিমিটেড, বম্বে এবং দিল্লি

ORWO Manufactured by: **VEB FILMFABRIK WOLFEN, THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC**

NAS 0124 A

FDSCB

মনোজ বসুর উপন্যাস

সেতুবন্ধ

এক রক্ষণশীল পরিবারের ভীরু মেয়ে—রাস্তায় বেরুবার অনুমতি মিলেছিল যার নেহাতই সংসারের আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে—কেমন করে যে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ভাঙন আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে তার মুখোমুখি হয়ে পাঞ্জা কষেছিল তার সাথে, আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, তারই অনুপম উপাখ্যান "সেতুবন্ধ"।

সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ১২·০০

স্বর্ণসজ্জা

দক্ষিণ বাংলার প্রত্যন্ত প্রান্তের প্রায়-অজানা জল-জঙ্গলের রাজ্য বাদা অঞ্চল একমাত্র যাঁর কলমে রূপকথার রহস্যপুরী হয়ে ওঠে, সেই অদ্বিতীয় মনোজ বসুর চিত্তাকর্ষক উপন্যাস "স্বর্ণসজ্জা" দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলের গাঙ-খাল আর তাদের দুর্দান্ত অধিবাসী জলো-ডাকাত নৌকো-মাঝাদের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

রূপবতী

অদৃষ্টবৈগুণ্যে অমৃতও কারও কারও কাছে গরল হয়ে ওঠে। "রূপবতী"র নায়িকা রাধারানীরও হয়েছিল তাই। ভগবান তাকে দিয়েছিলেন অপরিসীম রূপ, অনুপম দেহসৌন্দর্য। কিন্তু সেই রূপই তার জীবনে দেখা দিয়েছিল অভিশাপরূপে। এক অভাগিনী রূপসী নারীর জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী "রূপবতী"।

তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৩·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস

পিয়ামুখচন্দা

"পিয়ামুখচন্দা"র গল্পটি প্রেমের। নায়ক একজন ছন্নছাড়া আধুনিক কবি, নায়িকা জন্মপরিচয়হীনা সর্বপ্রকার মোহলাজমুক্তা এক ধনী বিজ্ঞান-সাধিকা। প্রবোধকুমারের প্রেমের উপন্যাস দু' যুগ আগে যে উদ্দাম উচ্ছ্বাস নিয়ে হাজির হত, মনে হবে, সে উদ্দামতা যেন এখন আরও প্রবল, আরও প্রচণ্ড।

সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ৬·০০

জনম জনম হম

পরিপাটি প্রসাধনে, মূল্যবান সাজসজ্জায়, অনুপম দেহলাবণ্যে, অনন্য মেধায় সহপাঠিনীদের ঈর্ষণীয়া এক অত্যাধুনিকা মেয়ে, আর জ্ঞানদীপ্ত, সংযতবাক, জিতেন্দ্রিয়, সৌম্যশ্রী, সন্ন্যাসীপ্রতিম এক পরম রূপবান পুরুষের একটি চাঞ্চল্যকর প্রেমের উপন্যাস "জনম জনম হম"।

তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস

সেতুবন্ধন

সুকুমার আর ক্ষিতীশ অভিন্নহৃদয় দুই সুহৃদ। সুকুমারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল শ্যামলীর ওপর। সুকুমার চাইল দুটি হৃদয়ের সেতুবন্ধন রচনা করতে। কিন্তু ক্ষিতীশের সকল প্রেরণা, সমস্ত কর্মের উৎসও কি শ্যামলী? লেখকের পরিণত মানসের এক অসাধারণ সৃষ্টি "সেতুবন্ধন"।

দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

তিন দিন তিন রাত্রি

তিনটি মধ্যবিত্ত তরুণ প্রাণ মাধুরী, মানসী আর অসীম। এই তিনটি মানব-মানবী আকস্মিকভাবে কাছে এসেছিল পরস্পরের তিনটি দিনরাত্রির জন্য। এই সামান্য সময়টুকুর পরিধিতেই আশ্চর্য আকস্মিকতায় পরস্পরের উপলব্ধ হয়েছিল জীবনের বিচিত্রতার স্বাদ, সম্পূর্ণতার আনন্দ-বেদনা।

তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

ময়ূরী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে এক অদ্বিতীয় শিল্পী। তাঁর মত এত নিখুঁত, নিটোল গল্প পৃথিবীর খুব কম লেখকই লিখতে পেরেছেন। কথাটা আপাতভাবে অতিকথন বলে মনে হলেও, সত্যি। "ময়ূরী" নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাছা বাছা কয়েকটি গল্পের একটি অনন্যসাধারণ সংকলন।

দাম ৩·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

অফিস: ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-১৪৮৭

বিক্রয়-কেন্দ্র: ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৬৪

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

*

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১০
শনিবার ২১ পৌষ ১৩৭৪

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষাণ্মাসিক ,,	২৩.০০
ত্রৈমাসিক ,,	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, 6 Jan., 1968

ভবিষ্যতের অপেক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মেঘলা ভাব এখনও কাটেনি। মাঝে মাঝে অবশ্য বিশারদরা যে বার্তা প্রকাশ করেন তাতে মনে হয়, অচিরেই বুঝি মেঘের আড়ালটা সরছে, কিন্তু অবস্থা আগেও যা পরেও তাই রয়েছে, সেই বহুকথিত সাংবিধানিক সংকট থেকেই গেছে। কিভাবে এই সংকট দূর করা হবে তা নিয়ে আমরা জল্পনা-কল্পনা অনেক শুনেছি, কখনও মনে হয়েছে, কেন্দ্র একটা উপায় খুঁজে পেয়েছেন, পরে দেখা গেছে সে-উপায়ও অকেজো। বোঝা যাচ্ছে, অন্তত শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি যা বলেছেন তা থেকে অনুমান করা চলে, কেন্দ্র হুট করে একটা কিছু করতে চায় না, এমন একটা সিদ্ধান্ত কেন্দ্র নিতে চায় যার কার্যকারিতা স্থায়ী হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত অন্যপক্ষের খুব বড় একটা সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে না।

এদিকে অনিশ্চয় অবস্থার সুযোগে, ঘোষ-মন্ত্রিসভা বেআইনী—এই যুক্তি ও ক্ষোভের আড়ালে ক্ষমতাচ্যুত যুক্ত ফ্রন্ট যথাসম্ভব নিজেদের পতনকে ঠেকা দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যুক্ত ফ্রন্ট দু দফা আন্দোলন শেষ করে তৃতীয় দফার আন্দোলনের জন্যে তৈরী হচ্ছে এবং ফ্রন্টের নেতারা পূর্বাহ্ণেই জানাচ্ছেন, আগামী আন্দোলন খুব ব্যাপক ও জোরদার হবে। বলা বাহুল্য, তৃতীয় দফার আন্দোলন যেমনই হোক, তাকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' বা ব্যাপক বলে আগে আগে প্রচার করার ফলে মানুষের কিছুটা শঙ্কিত হয়ে ওঠার কারণ আছে। গত দ্বিতীয় পর্যায়ের আইনঅমান্য আন্দোলন যা হয়েছে তাকে আর যাই হোক একেবারে শান্তিপূর্ণ বলা কঠিন। আইনঅমান্য যারা করতে গেছেন তাঁরা অবশ্য শান্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের পেছনে যে জনতা জটলা করেছে তার অংশবিশেষ একটা না একটা গোলমাল বাধিয়ে ফেলেছে। ফলে অবস্থার অবনতি হয়েছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় বোমা, পটকা, ট্রামেবাসে আগুন, গুলি, টিয়ার গ্যাস ও লাঠির তাণ্ডব চলেছে। কলকাতা শহরে হাঙ্গামার প্রায় নির্দিষ্ট একটা স্থান ছিল এবং নিয়ত তার চারপাশে কয়েক ঘণ্টার জন্যে এই গণ্ডগোল ঘটেছে। মফস্বলের অবস্থা এতটা অগ্নিময় হয়নি, বরং সেদিক থেকে সেখানে মোটামুটি শান্ত অবস্থাই গেছে। যাই হোক, গত আন্দোলন থেকে মনে হয়েছে, যুক্ত ফ্রন্টের প্রত্যক্ষ সমর্থক অপেক্ষা দর্শকের সংখ্যাই ছিল বেশি। নয়ত এই আন্দোলনের মধ্যে এমন একটা জনসমর্থন থাকত যার চাপ অনুভূত না হবার কারণ ছিল না। যুক্ত ফ্রন্টের নেতারা অবশ্য দাবি করছেন, তাঁদের আন্দোলন সফল হয়েছে।

যুক্ত ফ্রন্ট গদিচ্যুত হবার পর থেকে বেশ একটা বিভেদ কিন্তু প্রকাশ হয়ে পড়ছে। যেমন, ডান কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীডাঙ্গে বাম কমিউনিস্ট পার্টির ওপর দোষারোপ করে বলেছেন, যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল হবার জন্যে তারা অনেকটা দায়ী। একথাও তিনি বলেছেন, যুক্ত ফ্রন্টের ছ মাস ঝগড়াতেই কেটে যায়। কথাটা অন্যের মুখে হলে হয়ত সেটা উপেক্ষা করা যেত, কিন্তু এক্ষেত্রে কি করা যায়? তার ওপর সম্প্রতি সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রী এস এম যোশির যা ভাষ্য তাতে দেখছি, অকংগ্রেসী সরকার যে কংগ্রেসী সরকারের চেয়ে ভাল কিছু করতে পারেননি তার স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের জন্যে যে অকংগ্রেসী ঐক্য হয়েছিল আমরা যদি তার দিকে তাকাই তবে বুঝতে পারব, মন্ত্রিসভার ভেতরে বাইরে দলাদলির ঝগড়া, নিজ দলের স্বার্থচিন্তা এবং ন্যূনতম কাজ ছাড়া যুক্ত ফ্রন্ট কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এমন কি যুক্ত ফ্রন্ট খারিজ হয়ে যাবার পর যখন ঘোষ-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাবার সময় এল তখনও ফ্রন্টের কিছু শরিক অন্য এক বড় শরিকের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এখনও সে সন্দেহ যে নেই তা নয়।

অকংগ্রেসী দলগুলির পক্ষে এবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার একটা সময় এসেছে বলে সন্দেহ হয়। অন্য পক্ষ অর্থাৎ কংগ্রেস বরাবরই এই আশায় আছে, ক্ষমতা দখলের জন্যে বিভিন্ন দলের মধ্যে যে ঐক্য তা ক্ষমতায় থাকতে এবং ক্ষমতাচ্যুত হলে থাকবে না, কারণ দলীয় আদর্শ ও স্বার্থে এরা কখনোই পরস্পরের মিত্র হতে পারে না। আন্দোলনের বাহ্য প্রকাশ যাই হোক ভেতরে ভেতরে যুক্ত ফ্রন্ট যে দুর্বল হয়ে পড়ছে তা অনুমান করা স্বাভাবিক। কংগ্রেস হয়ত আরও বেশি দুর্বলতার অপেক্ষা করছে এবং কেন্দ্রও।
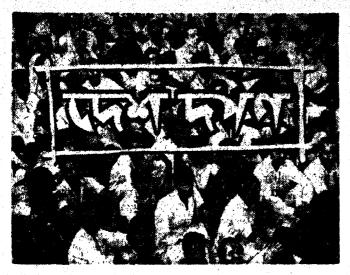
পশ্চিম বাংলার আধুনিক জীবনে একটা রাজনৈতিক বছর পার হ'য়ে গেল। এই বছরটা চিহ্নিত ক'রে রাখার মত। কারণ, রাজনৈতিক ধারাটা কোন চেনা পথ ধরে চলেনি। এক এক সময়ে এক একটা মোড় নিয়েছে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে, আকস্মিকভাবে। আকস্মিকতার বিস্ময় যেমন ছিল, তেমনি ছিল উদ্বেগ, আশংকা। গোটা বছরের হিসেব নিলে দেখা যাবে ১৯৬৭ সালে নিরুদ্বিগ্ন হবার কোন অবকাশ পায়নি পশ্চিম বাংলার জনজীবন। এমন জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি বহুকাল।

গত কুড়ি বছরের জীবনে উদ্বেগ নিশ্চয় দেখা দিয়েছে পশ্চিম বাংলার আকাশে। দুর্যোগ এসেছে বেশ কয়েকবার। আঘাত এসেছে ভিতর-বাহির থেকে। আন্দোলনের ঢেউ এসে তছনছ ক'রে দিয়েছে জীবনধারা। তবু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ছিল না। কংগ্রেসের শক্তিকে টলিয়ে দেবার মত কোন রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত হবার সুযোগ পায়নি। হয়ত এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবার সুযোগ পেয়েছিল; তবু ১৯৬৭ সালের আগে স্থিতাবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারেনি।

এই না-পারার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখা দিয়েছে ১৯৬৭ সালে। রাজনৈতিক ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাবে যে, ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। প্রায় সব কয়টি রাজনৈতিক দল গ'ড়ে উঠেছে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবকে অবলম্বন করে। টুকরো টুকরো দল গড়ে উঠেছে পশ্চিম বাংলায় নানা নামে, নানা নেতৃত্বে। হয়ত তারই ফলে দুটি একটি সংঘবদ্ধ দল ছাড়া আর সব কয়টি দলের আদর্শগত লক্ষ ছিল, কংগ্রেসের রাজনৈতিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা, বিপর্যস্ত করা। নিঃসন্দেহে এটা নেতিবাচক আদর্শ, যে আদর্শকে অবলম্বন করে কোন রাজনৈতিক দলের সংগঠনকে খুব বেশী সক্রিয় করা সম্ভব নয়। জনসাধারণের সামনে সর্বজনগ্রাহ্য কোন বিকল্প আদর্শকে রাখা সম্ভব হয়নি বলেই

অনিবার্য কারণ বশত এ সপ্তাহে কালকূট রচিত 'কোথায় পাব তারে' প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আগামী সপ্তাহ থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, দেশ

১৯৬৭ সালে যে বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার সুযোগ পেয়েছিল তা ভেঙ্গে পড়েছিল অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে। একমাত্র কংগ্রেস-বিরোধী ধ্বনি তুলে ১৮-দফার বিকল্প ব্যবস্থাকে যে বেশীদিন টিঁকিয়ে রাখা যায় না এটাই প্রমাণ করে দিয়েছে যুক্ত ফ্রণ্টের নয় মাসের সরকার।

তাই ২১ নভেম্বর, রাজ্যপালের আদেশে যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা যখন খারিজ হ'য়ে গেল, তখন কোন আকস্মিকতা ছিল না। হয়ত রাজনৈতিক ক্ষোভ ও ক্রোধ ছিল যুক্ত ফ্রণ্টের নানা মহলে। কিন্তু জনসাধারণ বিচলিত হবার কোন কারণ খুঁজে পায়নি। হয়ত সে-কারণেই, কোন জ্বালামুখী ফুটে ওঠেনি গোটা রাজ্য জুড়ে। ২১ নবেম্বরের পর তিনদিন হরতাল ঘোষণা করা হ'য়েছে, ছয়দিনের 'সর্বাত্মক' আইন অমান্য আন্দোলন চালান হয়েছে, রাজনৈতিক লড়াইকে শ্রমিক-কৃষকের অর্থনৈতিক আন্দোলনের স্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টাও করা হয়েছে; কিন্তু রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটেনি। বিস্মিত ক'রে দেবার মত কোন অঘটন ঘটেনি। দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের পর দেখা গেল, নূতন ব্যবস্থাকে সহজ রাজনৈতিক পরিণতি হিসাবেই জনসাধারণ মেনে নিয়েছে। যুক্ত ফ্রণ্টের নেতাদের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র বিপন্ন ব'লে রাজ্যব্যাপী যে প্রচারকার্য ব্যাপকভাবে চালান হ'য়েছিল তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কোন বিস্ময় সৃষ্টি করেনি, কোন নাটকীয় অবস্থারও সৃষ্টি করেনি।

হয়ত এটাও কোন স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিণতির নিদর্শন নয়। কিন্তু এটা আর অস্পষ্ট নেই যে যে-সব দল যুক্ত ফ্রণ্টের নেতৃত্বের দাবি করে, তাদের নেতৃত্ব দ্বিধামুক্ত ছিল না। লোকসভায় কিছুদিন আগে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীডাঙ্গে বলেছিলেন যুক্ত ফ্রণ্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে দুটি কম্যুনিস্ট পার্টি—তাঁর নিজের দল এবং মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি। কিন্তু এরই কিছুদিন পরে, শ্রীডাঙ্গেই বলেছেন, যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতনের জন্য মুখ্যত মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিই দায়ী। শ্রীডাঙ্গের মন্তব্যকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া আপাতত সম্ভব নয়। কারণ, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পর কোন সময়ই অন্য কোন দলকে নেতৃত্বের-অংশীদার হিসাবে মেনে নিতে রাজী হয়নি। এমন কি, যুক্ত ফ্রণ্ট গঠিত হবার পরেই যখন পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায়, ফ্রণ্টের নাম নিয়ে সর্বদলের স্থানীয় কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি সে-প্রস্তাব নাকচ ক'রে দেয়। দলগতভাবে গণকমিটি গঠন করে জেলায় জেলায় এবং গণকমিটির আড়ালে দলীয় রাজনৈতিক সংগঠনকে জোরদার করার এবং প্রসারিত করার চেষ্টা করে।

মূলগতভাবে বিচার করলে যুক্ত ফ্রণ্টের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ক্রমে নানা উপলক্ষে প্রবল হ'য়ে উঠেছিল তার সূত্রপাত হ'য়েছিল গণকমিটি গঠনের পর। এই গণকমিটির ছায়ায় যুক্ত ফ্রণ্টের কোন নীতিই সর্বজন সমর্থনের সুযোগ পায়নি। মার্ক্সিস্ট মহলেও যুক্ত ফ্রণ্টের মার্ক্সিস্ট নেতৃত্ব সম্বন্ধে বহু সমালোচনা শোনা গিয়েছে গত দশ মাসে। এই সব সমালোচনার পর্যালোচনা করলে এটাই স্পষ্ট হ'য়ে যাবে যে, মার্ক্সিস্ট কম্যু-

নিস্ট পার্টির নেতৃত্ব যুক্ত ফ্রন্ট এবং যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে দলীয় রাজনৈতিক সুযোগ ছাড়া আর অন্য কোনভাবে গ্রহণ করেনি। তাই দেখা গিয়েছে যে, যুক্ত ফ্রন্টের বহু দ্বন্দ্বের জন্য মূলত দায়ী মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি। এরই জন্য দেখা গিয়েছে নকশালবাড়ী আন্দোলনকে দমন করার যে-নীতি মন্ত্রিসভায় গৃহীত হল সেই নীতিকেই বিধ্বস্ত করা হল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারিয়েটে। যে-নীতির দায়িত্ব হলেন শ্রীজ্যোতি বসু মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে, সেই নীতির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হল দলগতভাবে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের বিবৃতিতে। খাদ্যনীতি গৃহীত হল মন্ত্রিসভার সভায়, সেই নীতিই বিধ্বস্ত হয়ে গেল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির গণকমিটির মঞ্চে। বিকৃত হল পার্টি শ্লোগানে 'অন্ন দিন, জবাব দিন'। যে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে দায়ী করা হল ১৮-দফা কর্মসূচী রূপায়িত করাবার জন্য, তাকে গণ আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আইনসভায় [illegible] মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি। যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রতি [illegible] হল মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন দাবি করে।

শ্রীঘোষের অভিযোগ হয়ত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। হয়ত শ্রীঘোষের পার্টির দায়িত্বও কিছু কম ছিল না, কারণ দুটি কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে যে-বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে [illegible] যে-দ্বন্দ্বের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যুক্ত ফ্রন্টের পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না। তাই আজ বামপন্থীদের থেকে যে আক্ষেপ শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে এটাই স্পষ্ট করে দেখা গিয়েছে যে, যুক্ত ফ্রন্টের সরকার গঠিত হবার পর বামপন্থীদের মধ্যে 'গণতান্ত্রিক ঐক্য সাধনের সুবর্ণ সুযোগের অপব্যবহার করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা খারিজ হয়ে যাবার পর এই ঐক্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশীভাবে দেখা দিয়েছে এবং সকল দলের সঙ্গে পরামর্শ করে 'ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম' পরিচালনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ-উক্তির যে অর্থটা সামনে এসে দাঁড়ায় তার মর্মকথা বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যসাধন এখনও সম্ভব হয়নি।

বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব যদি দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে তা আগামী বছরের রাজনৈতিক প্রবাহ অন্য কোন দিকে মোড় নেবে কি না সেটা ভবিষ্যতের প্রশ্ন। কিন্তু আপাতত দেখা যাচ্ছে যে, বামপন্থীদের বিরোধী যে কয়েকটি দল আছে সেখানেও বিশেষ কোন ঐক্যবদ্ধ হবার প্রতিশ্রুতি আপাতত দেখা যাচ্ছে না। কংগ্রেসের কথাই যদি বিচার করে দেখা যায়, তাহলে এটাই বেশী চোখে পড়বে। ১৯৬৭ সালে নির্বাচনের পরেই এই দ্বন্দ্ব আরও বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। হয়ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আগেও ছিল; কিন্তু নির্বাচনের পরের দ্বন্দ্ব একটা বিশেষরূপে দেখা দেয়। নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি বলেই রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেস নেতৃত্ব নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে রাজী হয়নি। অথচ বৃহত্তম দল হিসাবে সে-দায়িত্ব একমাত্র কংগ্রেসেরই ছিল।

তাই রাজনৈতিক প্রত্যাখ্যানের পর যুক্ত ফ্রন্ট সরকার যখন গঠিত হল, তখন কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ এই প্রত্যাখ্যান সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই কংগ্রেসের মধ্যে গড়ে উঠল একটি ছোট দল যার একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিয়ে কংগ্রেস প্রভাবিত নতুন মন্ত্রিসভার গঠন করা। এই প্রচেষ্টার ফলেই দলগত সংঘাত আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কংগ্রেসের যুক্ত ফ্রন্টের বিরোধিতাকে হয়ত অনেকাংশে স্লথ করে দিয়েছিল; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেল যে-সব নেতা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস-বিরোধী প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন তীব্রভাবে তাঁরাই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন কংগ্রেসের কোন কোন নেতার সঙ্গে।

নিঃসন্দেহে এইখান থেকেই যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরোধী শক্তিগুলো সংগঠিত হবার সুযোগ পায় এবং অবশেষে মন্ত্রিসভাকে খারিজ করার সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা খারিজ করে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেই যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করা সম্ভব হয়েছে তা নয়। কারণ, নেতৃত্বের সংঘাত এখনও শেষ হয়নি। কারণ, যে-নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে এবং সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জিকে গদিচ্যুত করে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন, তিনিও আজ রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে এড়িয়ে চলতে পারছেন না। হয়ত এই বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠবার জন্যই আজ নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যে-কথাটা স্বীকার করা হয়নি সেটা এই যে, নিছক মন্ত্রিসভা পরিবর্তনের মধ্যে কোন রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা যায় না।

তাই ১৯৬৭ সালের ঘটনাগুলো আলোচনা করলে এটাই বেশী নজরে পড়বে যে, পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনটা হঠাৎ যেন মন্ত্রিসভার অদলবদলের গণ্ডির মধ্যেই আটকে গিয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যুক্ত ফ্রন্টের নেতৃত্ব দাবি করে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি আজ সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচীকে পুনর্নির্বাচন এবং মন্ত্রিত্ব পুনর্গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে। ফলে, কোন বামপন্থী দলই আজ আর 'ঘোষ মন্ত্রিসভা বাতিল কর' এ-ছাড়া অন্য কোন শ্লোগানের কথা উল্লেখ করছে। হয়ত রাজনৈতিক দিশানির্ণয় অন্য কোন পথে সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এটাও সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, ১৯৬৮ সালেও পশ্চিম বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জের টানার প্রচেষ্টা চলেছে। গণ্ডিটা কখন, কোথায়, কিভাবে টানা হবে তা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না।

উঃ ঃঃ!
হিন্দী সমর্থক

লাফিয়ে উঠল অন্ধকার

উমা দেবী

হঠাৎ ঘরের মধ্য থেকে মধ্য রাত্রে
লাফিয়ে উঠল সেই অন্ধকার—
গুহাশায়ী থাবা-তোলা জন্তুর মতন।
আমার শরীরখানা আয়নার মতন ঝকঝকে,
দেয়ালের পেরেকে টাঙানো—
সে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ঝন্‌ঝনিয়ে ভেঙে গেল
—ভেঙে গেল ধারালো টুকরায়।
টুকরো টুকরো কাঁচের খোঁচায়
আজও রক্তাক্ত হয়ে চৌচির—আটখানা
—যদিচ আহ্লাদে নয়।
এখন বাইরে রাত হয়তো বা দুটো।

রাত দুটো।
একটা সবার জন্য—শান্ত স্নিগ্ধ
ঘুমের আরামে বাহুতে বাহুতে বাঁধা।
আর একটা আমার জন্য—
অনির্দেশ্য স্বপ্নাবিল অশান্ত উৎকট
অথচ তরল নীল জলের তুলনা।
সমস্ত কামনা ঠিক জলে-ঢালা তেলের মতো
বিক্ষিপ্ত অস্থির-চিত্ত—
মুহুর্মুহু রঙের খোলস বদলের
খেলায় প্রমত্ত হয়ে আছে—
অথচ নিজস্ব কোনো রূপ নেই।
রাত দুটো থেকে ফের সকাল ছটায়
পৌঁছাতে কদিন লাগে?
সূর্যের ছটায়
এক একটি নক্ষত্র মরে ভোর হতে কত যুগ যায়?
কত কল্প শেষ হলে সেই অন্ধকার—সেই জন্তুর আকার
ফিরে আসে হৃদয় গুহায়?

ম্যাজিশিয়ান

সুশীল রায়

ম্যাজিশিয়ান, ম্যাজিশিয়ান!
ইচ্ছে করে তোমার সমান
হবই হব—
হাতের ছোঁয়ায় সত্য হবে অসম্ভবও।
এক-নিমেষে করব উধাও, এক-নিমেষে আনব ঘুরোয়,
একটা জিনিস এক-নিমেষে তাক লাগাব বানিয়ে দুটোয়।

ম্যাজিশিয়ান, ম্যাজিশিয়ান!
অল্প দিনের শিক্ষা পেয়েই হয়েছি প্রায় তোমার সমান।
এখন পারি অনেক-কিছুই—
এক-কে পারি খুব সহজেই বানাতে দুই।
মঞ্চে উঠে দেখাই অনেক ছলা-কলা,
কেউ কোথাও নেই, নিমেষে দেখাই মানুষের মেলা।

ম্যাজিশিয়ান, ম্যাজিশিয়ান!
গুরু-মারা চেলার মত নই তো এখন তোমার সমান
তোমার উপর টেক্কা দিয়ে
গেছি অনেক দূরে এগিয়ে
এখন পারি যা-কিছু তাই ভাঁড় মেরে সরিয়ে দিতে
কুড়িয়ে আবার আনতে পারি সমস্তটাই আচম্বিতে।

ম্যাজিশিয়ান, ম্যাজিশিয়ান!
এগিয়ে গেছি অনেক বটেই, এক জায়গায় তোমার সমান।
মনের মধ্যে যে খেদ আছে বলব কাকে
এত ভীষণ কাণ্ড করে তাক লাগালাম জগৎটাকে
কিন্তু পূর্ণ করতে পারা গেল না তো শূন্য গুহে
জীবনের এই ট্র্যাজিডি যে!

যার বাড়ির ঠিক নেই

সুধেন্দু মল্লিক

আমার যা কিছু হারায় যা হারায় না তুমি তার
হিসেব রেখেছো কি?
আমার কোন প্রয়োজন নেই।
দেখছো তো বাতাস একটু জোর হলেই ছাদ
পাঁচিল দেয়াল মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে
গুলঞ্চ লতার মতো।
যার বাড়ির ঠিক নেই তার আবার গুমোর কিসের!

আর সবার মতো তুমি আমাকে অবহেলা করবে না
সবার সামনে ছোট করবে না
একটু দূরে গিয়েই ভুলে যাবে না আমাকে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে কেবল তোমার কথা ভাবি
তোমার একটা ছবি পেলে বুকের ভেতর সেলাই করে
রেখে দিতাম: যার
হাসির ভঙ্গি শুধু আমার চোখের মাঝখান দিয়ে
ঝুঁকে তাকালে দেখা যেতো।

আমার ভয় হয়। আমার কষ্ট হয়!
যেদিন হাওয়া ঝড় চমকানো গাছের ওপর থেকে
নেমে আসবে আমার দিকে, তুমি যেন বলো :
আছে রে, আছে
আছে বোঁক সব ওই অন্ধকারের জোড় বাঁধা হাতে
যেখানে জোনাকি ছাড়া আর কেউ যায়নি।

'শীত এবং সাহিত্য'

ক্রিকেট, ক্রিসমাস, কেক, কপি, কমলালেবু, কন্‌ফারেন্স—এ পর্যন্ত 'ক'-এর অনুপ্রাস ঠিক আছে; যে দুটো মিলল না তারা হল সার্কাস আর সাহিত্য-পুরস্কার। আদিতে না থাক, তবু 'ক'-এর ছোঁয়াচ তারা সম্পূর্ণ এড়াতে পারে নি। ডিসেম্বর-জানুয়ারীর এরাই বড়ো খবর।

খবর অবশ্য আরো আছে। বাংলা দেশের স্নায়ু-ধমনীতে রক্ত এখন ঠিক স্বাভাবিক তালে বইছে না। কিন্তু সে বিস্বাদ আলোচনা থাক। ক্রিকেটের কথা না বলাই ভালো, ক্রিসমাস আর কেক মধ্যবিত্ত জীবনে গৌণ, কপি-কমলালেবুর দাক্ষিণ্য এখনো অবারিত নয়, সার্কাস যেন তেমন করে জমে উঠছে না, বাকী সাহিত্য-পুরস্কার আর সাহিত্য-সম্মেলন। তাতেই তা হলে মনোনিবেশ করা যাক।

কবি - সমালোচক - কথাশিল্পী - নাট্যকার শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু এ বছর সাহিত্য-আকাডেমির পুরস্কার পেয়েছেন, নতুন বছরে সর্বাগ্রে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বাংলা দেশে আধুনিক কাব্য আন্দোলনের নিষ্ঠাবান অগ্রনায়কদের তিনি অন্যতম, রম্যরচনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় তাঁর ভূমিকা, দীপ্ত ছোট গল্প এবং পরীক্ষাধর্মী উপন্যাসে তিনি অক্লান্ত, মননশীল সাহিত্য চিন্তায় তিনি নিয়ত মৌলিক, সম্প্রতি নাটক রচনায় আত্মপ্রকাশের আর একটি মাধ্যম তিনি খুঁজে পেয়েছেন। এই পুরস্কারে তাঁর গৌরব-বৃদ্ধির কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু বিলম্বিত হলেও আকাডেমি তাঁর প্রতি নিজেদের কর্তব্যটুকু করতে পেরেছেন সেইটিই আনন্দের কথা।

অভিনন্দন জানাই শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্যকেও—যে বাঙালী লেখক ইংরেজীতে উপন্যাস লেখবার জন্যে পুরস্কৃত হয়েছেন। এ কালের তরুণ পাঠকের জানবার কথা নয়, কিন্তু আমার অস্পষ্ট বালক-স্মৃতিতে যেন জেগে উঠছে সেই বিলুপ্ত এবং অদ্বিতীয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মনীষা-দীপ্ত উজ্জ্বল সব প্রবন্ধ লিখতেন, হয় তো গল্পও; অন্য পত্র-পত্রিকাতেও লিখতেন খুব সম্ভব। বাংলা রচনায় সেদিনের তরুণ অন্নদাশংকর রায়ের বুদ্ধি আর বৈদগ্ধ্যের সমধর্মী ছিলেন তিনি। কী অভিমানে তিনি আর বাংলা লেখেন না জানি না, তাঁর ইংরেজী উপন্যাসে সে প্রতিভা কতটা প্রদীপ্ত—সে সম্পর্কেও পাঠক হিসেবে আমি অসন্দিগ্ধ নই। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের কাছে পৌঁছুবে এ আশা রাখি না, তবু এই ইংরেজী নতুন বছরে তাঁকে আবার বাংলা সাহিত্যে ফিরে আসবার জন্যে আবেদন জানাব। আর একজন কড়া ইংরেজীনবীশ শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরীও তো ফিরে এসেছেন।

সব পুরস্কারের পালা অবশ্য শেষ হয় নি। বাংলা দেশ এখনো বাকী আছে। 'রবীন্দ্র' থেকে 'আনন্দ' পর্যন্ত সেই অঘোষিত-নামা প্রাপকদের আগে থেকেই অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি—'ইন আণ্টিসিপেশন'। নতুন বছরে নতুন ফসলের মতোই বাংলা-সাহিত্যের বাড়-বাড়ন্ত হোক।

এই জার্নাল যখন লিখছি, তখন হায়দারাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন শেষ হয়ে গেল। খবরের কাগজের বিবরণে প্রকাশ, এবারের সাহিত্য সম্মেলন নিছক সপরিবার প্রমোদ ভ্রমণে পর্যবসিত হয় নি—সাহিত্যের নানা প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন বৈঠক তর্কে এবং আলোচনায় উত্তরোল হয়ে উঠেছিল। এইটিই কাম্য—এই-ই হওয়া উচিত। সম্মেলনে একটি একটি মূল সভাপতির দীর্ঘ দীর্ঘ ভাষণ—অন্যমনস্ক এবং অর্ধমনস্ক শ্রোতাদের ঘন ঘন হাই তোলা, চাপা গলায় 'সাইট-সীয়িং' সম্পর্কে পরবর্তী পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন বিভাগীয় আসরে শ্রোতা তথা প্রতিনিধিবর্জিত পরিবেশে সভাপতি ও বক্তাদের মনোরম উপস্থিতি; খাদ্যের টিকেট সংগ্রহের প্রতিযোগিতা এবং প্রায় 'নানাসকাবণেনিভা' দশ-আটকানো ডেলিগেট ক্যাম্পে শোওয়ার জায়গা নিয়ে হাতাহাতি—অনুমান করা যায়, এবারের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অন্তত সেই ট্র্যাডিশনকে খানিকটা বদলাতে পেরেছিল। সাহিত্য সম্মেলন যে সাহিত্যিক এবং সাহিত্য প্রেমিকদের জন্যেই—তা যে ঠাকুর মা এবং পিসিমার অর্ধেক ভাড়ায় আর বিনা খরচে তীর্থ দর্শনের উপলক্ষ নয়—এই সত্য খানিকটা প্রকটিত হলেই সম্মেলনের মর্যাদা এবং গুরুত্ব কিছুটা বাড়তে পারে।

সাহিত্য-অধিবেশন করে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সেই সব দেশেই নির্ধারিত হতে পারে—যেখানে লেখকেরা প্রধানভাবে কোনো নির্দিষ্ট সত্য অথবা আদর্শের ওপর আস্থাশীল—তা সোশ্যালিস্ট রিয়্যালিজ্‌মই হোক, গোষ্ঠীগত নিচ্ছিন্নবাদ হোক, নাৎসী জঙ্গীবাদ হোক অথবা সুররেয়ালিজমের মতো কোনো মনোবাদ হোক। সেখানে একটা ম্যানিফেস্টো তৈরি করা চলে—তার নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণ, অন্তত সংকেত, নৈতিকভাবে মেনে চলবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক-লেখিকাদের ওপরে এসে বর্তায়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রধানাংশ লেখকের এ-রকম কোনো দায়িত্ব নেই, তাঁরা ফ্রী-লান্সু—তাঁরা সাম্যবাদ থেকে প্রকৃতিবাদ (ন্যাচারালিজম্‌), প্রকৃতিবাদ থেকে অসম্ভব-বাদ যে-কোনো জমিতে অবাধে চারণ করতে পারেন। অতএব সাহিত্য-সম্মেলন থেকে লেখক নতুন কোনো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আসবেন এবংবিধ কোনো সম্ভাবনা নেই: তাঁরা যা জানেন তাই তাঁদের যথেষ্ট, যা জানেন না—তা না জানলেও লেখনীচর্চায় কোনো অসুবিধে হবে না। শ্রোতারা কতটুকু উপকৃত হবেন জানি না, কিন্তু এই সব বিবিধ সম্মেলন আর সমাবেশ সত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের রুচি কতটা উর্ধায়িত হচ্ছে বলা কঠিন—কারণ কলকাতার ফুটপাথে এখন লোভন প্রচ্ছদপটে "মাঝরাতের চৌরঙ্গী"রাই বোধ হয় জমিয়ে বাজার বসিয়েছে।

তবু সাহিত্য-সম্মেলন হোক, শীতের মরসুমে কপি-কড়াইশুঁটি যতই বিশ্বাস-ঘাতকতা করুক (বারো টাকা কিলোর গলদা চিংড়ির কথা না হয় ভোলাই গেল)—অন্তত অর্ধেক ভাড়ায়—কলকাতার ক্লান্ত-ক্ষুব্ধ-অনিশ্চয়তা থেকে অনেক দূরের একটি হৃদ্য পরিবেশে কিছু চিন্তার বিনিময় হোক—নিজের স্বপক্ষে যে-কথা লেখক প্রবন্ধ লিখে বলতে পারেন না—উপস্থিতির ব্যক্তিত্ব দিয়ে সেই কথাগুলো তিনি ঘোষণা করুন। আমাদের দেশে সাহিত্য-চিন্তা তো 'ওয়ানওয়ে ট্র্যাফিক'—'সমালোচক বাক্য কন' লেখকেরা নিরুত্তর।' এই সব সম্মেলন আর বৈঠকে লেখক-সমালোচক মুখোমুখি হোন—সেই বিতর্কটুকুই (প্রচণ্ড হলেও) আমাদের পরম লাভ!

জার্নাল লিখতে লিখতে খবর এল, প্রবীণ কথাসাহিত্যিক রামপদ মুখোপাধ্যায় চলে গেছেন। এই নিরভিমান নির্জন লেখকটিকে সামান্য চেনবার সুযোগ হয়েছিল। বাংলা-সাহিত্যে অতিমাত্রায় প্রদীপ্ত তিনি পাননি, কিন্তু নিঃসন্দেহে সৎ-লেখক ছিলেন, বাজার-দরের কথা ভাবেননি, পুরস্কারের কথাও না—একান্ত নিষ্ঠায় বেশ কিছু ভালো উপন্যাস এবং উঁচু দরের গল্প লিখে গেছেন। তাঁর 'মণ্ডল বাড়ি' বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প বলে সুনন্দর ধারণা। নিঃসঙ্গ, সৎ এবং নিরপেক্ষ এই লেখকটি শীতের কুয়াশার সঙ্গেই নিঃশব্দে বাংলা দেশ থেকে চলে গেলেন।

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

সারেঙ্গীকুশল ওস্তাদ মোহম্মদ সাগীরুদ্দীন খাঁ

আমাদের রাগসংগীতের আসরে গান, তবলা আর সারেংগী—এই তিনটি মিলেমিশে এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। এর মধ্যে সারেংগী কণ্ঠসংগীতকে বেশ খানিকটা বিশ্রাম বা রিলিফ দেয় অথচ শিল্পী যে সুরের জাল বোনেন তাকে আরও মনোহরভাবে বিস্তারিত করে। সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে এটি একটি নিপুণ পরিকল্পনা। কণ্ঠ স্বভাবতই একটা নির্ভর চায়। তানপুরাতে এই নির্ভরটা থাকে বটে কিন্তু সুরের সঞ্চলনশীলতা থাকে না, সারেংগী এই রেশটি অব্যাহত রাখে। সারেংগীর একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য কণ্ঠ-সংগীতের সংগে তার ধ্বনিগত সাদৃশ্য। কণ্ঠ থেমে আছে অথচ সারেংগীতে যেন কণ্ঠেরই লীলা চলেছে। এই কারণেই সারেংগী সহযোগী বাদ্যের মধ্যে সর্বোত্তম বলে স্বীকৃত। কাব্যসংগীতের সংগে সারেংগী বাজানো হয় না, এসরাজ বাজানো হয়; কিন্তু সারেংগী বাজলেও চমৎকার শোনাতো। দুঃখের বিষয় সারেংগী বাজনাটা নানা কারণে কাব্যসংগীতের আসরে অপাংক্তেয় হয়ে আছে নইলে এক্ষেত্রেও সারেংগীকে উত্তমভাবে কাজে লাগানো যেত।

খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীতেই সারেংগী সবচেয়ে ভাল চলে তার কারণ সারেংগীর ধ্বনিতে যে আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত তা এই সব শ্রেণীর সংগীতের উপযুক্ত। এ ছাড়া সারেংগীতে ছোট বড় তানের কাজ, মীড়ের কাজ বা অন্যান্য বৈচিত্র্য যেভাবে সম্পাদিত হয় তা অন্য সহযোগী যন্ত্রে সম্ভব নয়। এই বিবিধ গুণের জন্যই সারেংগী কয়েক শতাব্দী ধরে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছে। একক বাদ্য হিসাবেও সারেংগীর স্বীকৃতি কম নয়। এমন অনেক বাজিয়ে আছেন যাঁরা সহযোগিতার চেয়ে স্বাধীনভাবে সারেংগী বাজাতে ভালবাসেন। উদাহরণ-স্বরূপ ছোটে খাঁর নাম করা যায়। তিনি সাধারণত সারেংগীতে একক অনুষ্ঠানই পছন্দ করতেন।

সারেংগী শব্দটা ঠিক কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ বর্তমান। অনেকে বলেন, আসলে শব্দটি "সারংগ" এবং যাঁরা বাজান তাঁদের "সারংগী" বা চলতি ভাষায় সারেংগী বলা হয়। কিন্তু শাস্ত্রাদিতে সারংগবীণা এবং সারংগী—এই দুটিরই বর্ণনা আছে। কোনও বর্ণনায় সারংগবীণা কিন্নরীবীণার পর্যায়ে পড়ে এবং তাতে সারিকা বা পর্দা ছিল। আর যাকে সারংগী বলা হয়েছে তার সংগে বর্তমান সারেংগীর সাদৃশ্য আছে। সংগীতরত্নাকরে পিনাকী-বীণার যে বর্ণনা পাওয়া যায়—তার সংগেও সারেংগীর সাদৃশ্য বর্তমান। আইনে আকবরীতে সারেংগী এবং পিনাক দুটি যন্ত্রেরই উল্লেখ আছে। যাই হোক, পরবর্তীকালে এই যন্ত্রের উন্নতিসাধন করা হয়েছে এটা ঠিক এবং অপরাপর প্রধান যন্ত্রের মত একেও আসরের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। সেতার এবং এসরাজের স্বীকৃতি সাম্প্রতিক কিন্তু সারেংগী তার বহু আগে থেকে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে। এই হিসাবে সারেংগীর একটি কৌলীন্য আছে যা অনেক যন্ত্রই দাবি করতে পারে না। অতএব সারেংগীকে বাঈজীদের সহচর বলে হীনচোখে না দেখাটাই বোধ হয় সমীচীন ছিল।

বর্তমানে কিন্তু আমরা সারেংগীকে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করি। আজকালকার আসরে সম্ভ্রান্ত গায়ক গায়িকা সকলেই ভাল সারেংগীবাদকের খোঁজ করেন এবং তার জন্য কিছু ব্যয় করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত নন। এতে সারেংগীবাদকেরাও মনের মত বাজাতে পারেন এবং শিল্পীদের নানাভাবে নানা ব্যঞ্জনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। কিন্তু তথাপি সারেংগীবাদকেরা আড়ালেই থেকে যাচ্ছেন। যতটা গৌরব তাঁদের পাবার কথা তা তাঁরা পাচ্ছেন না।

ওস্তাদ মোহম্মদ সাগীরুদ্দীন খাঁ

এই কারণেই অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যখন শুনলাম যে "জলসাঘর" নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ওস্তাদ মোহম্মদ সাগীরুদ্দীন খাঁকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত করতে চান। দিন সময় ভাল নয়। অনুষ্ঠান দু-একবার পেছিয়ে দিতে হয়েছে। সাগীরুদ্দীন ব্যস্ত মানুষ। তাঁর পক্ষেও সময় করা কঠিন, বিশেষ করে এই সময়। তথাপি তিনি সানন্দে রাজী হয়েছেন এবং জলসাঘর-এর অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করেছেন।

অসামান্য গুণী ওস্তাদ সাগীরুদ্দীন খুব বেশী পরিমাণেই লাজুক মানুষ। তাঁকে বহু অনুরোধ করেও সারেঙ্গী সম্পর্কে কিছু বলানো গেল না এমন কি একক বাজাতেও তাঁর অসামান্য কুণ্ঠা। তিনি বললেন গানের সঙ্গে বাজাতেই তিনি ভালবাসেন—সেখানেই নাকি তিনি সুরবিহার বা ইম্প্রভাইজেশনের সবচেয়ে সুবিধা পান। একথা অবশ্য খুবই সত্য কেননা বছরের পর বছর ধরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কত গায়ক-গায়িকাকে তিনি কত অভিনবত্বের নির্দেশ দিয়েছেন। সাগীরুদ্দীন সেই ধরনের লোক যিনি নিজের গুণপনা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েও বাহাদুরী দেখাবার প্রলোভনকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারেন। কতবার দেখেছি শিল্পী সুর দিয়েছেন কিন্তু সাগীরুদ্দীনের ছড়ির সঙ্গে সঙ্গে সংগীত যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। শিল্পী খুশী হয়ে উঠলেন, খুশী হলেন শ্রোতারা—ওস্তাদ সাগীরুদ্দীনের মুখে সেই সরল, উজ্জ্বল হাসি বা সর্বক্ষণই সাফল্যের গৌরবে উদ্ভাসিত। গানের গতি শ্লথ হয়ে গেছে বা গান একঘেয়ে হয়ে উঠছে—এমনি সময় সাগীরুদ্দীন অপূর্ব কৌশলে ফোটালেন একটা তানের ফুলঝুরি বা ছোট একটি অলংকার যাতে আসর আবার জমে উঠল। আবার এও দেখেছি শিল্পী আসর জমিয়ে রেখেছেন, বৈচিত্র্যের চমকে শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত, পুলকিত। সাগীরুদ্দীনের মুখেও মুগ্ধ প্রসন্নতা। শিল্পীকে নিবিষ্টমনে অনুসরণ করে চলেছেন তিনি। এক সময় ক্লান্ত শিল্পীকে একটু অবসর নিতে হল আর সঙ্গে সঙ্গে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা সুরের ঝংকার যা হয়ত শিল্পীর অসমাপ্ত কাজটাকে সম্পূর্ণ করে দিল বা এমন একটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল যা শিল্পীরও পরিকল্পনার বাইরে ছিল। এই প্রেরণা দেবার ক্ষমতা অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন এবং ওস্তাদ সাগীরুদ্দীন সেই প্রতিভার অধিকারী।

খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠার তুলনায় সাগীরুদ্দীন একান্ত নিরহংকার ব্যক্তি। নানাভাবে প্রশ্ন করেও আমি তাঁর কাছ থেকে এমন একটি উক্তিও পাইনি যাতে এতটুকু আত্মাদরের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পীদের তিনি ভালবাসেন। এখানকার শিল্পীসমাজে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে মিশে গেছেন এবং সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

নিজের সম্বন্ধে যেটুকু জানালেন তা হচ্ছে এই যে তিনি জৌনপুরের অধিবাসী। তাঁদের বংশে বহু দিন ধরে এই বাজনা প্রচলিত। তিনি তাঁর পিতা এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির কাছেই সারেঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেছেন। বেশ পরিণত বাদক হয়েই তিনি দিল্লিতে ওস্তাদ বুন্দু খাঁর কাছে বছর তিনেক তালিম নিয়েছেন। তাঁর ছেলেও ভালই বাজাতে শিখেছে কিন্তু তার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটাতে তিনি রাজী নন। আগে পড়াশোনা করুক পরে বাজাবার প্রচুর অবসর পাবে।

সেই সন্ধ্যার আসরে একক বাজানোতে তাঁকে রাজী করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যে কণ্ঠশিল্পীর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল তাঁর আসবার যথেষ্ট বিলম্ব হওয়ায় তিনি অগত্যা সারেঙ্গী নিয়ে বসলেন। বেশ খানিকক্ষণ বাজালেন রাগ যোগ। আলাপ, ছন্দ, বিস্তার, তান কিছুই বাদ গেল না। এমনকি বোলতানগুলি যেন কণ্ঠসংগীতের মতই মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল। একক বাজনায় তাঁর দক্ষতা কতখানি তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। এঁর সঙ্গে তরুণ তবলিয়া শ্রীঅনিল রায়চৌধুরীর সঙ্গত মনোরম লাগল।

আমরা কামনা করি ওস্তাদ সাগীরুদ্দীন দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁর অসামান্য গুণপনার পরিচয় প্রদান করুন এবং আমাদের গায়ক-গায়িকাদের উৎসাহ বর্ধন করুন।

শান্তিনিকেতন পৌষ মেলায় লোকসঙ্গীত

খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই এবার পৌষ মেলার শেষ পর্যায়ে শান্তিনিকেতনে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। মেলা প্রাঙ্গণে লোকসংগীতের আসর বসেছিল, শ্রোতা ছিলেন বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি। আমাদের দেশে লোকসংগীতের যথার্থ স্বীকৃতি আর কোথাও পাওয়া না গেলেও শান্তিনিকেতন থেকে পাওয়া যাবেই। এঁরা যেখানেই প্রকৃত গুণীর পরিচয় পেয়েছেন তাঁকেই আহ্বান করে নিয়ে গেছেন শান্তিনিকেতনে এবং সেখানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সরল সমাদরে গুণী ব্যক্তিরা মুগ্ধ হয়েছেন। শান্তিনিকেতনকে লোকসংগীতের তীর্থ বললে অত্যুক্তি হয় না।

তিনজন বাউল গান শোনালেন এবং নৃত্য প্রদর্শন করলেন। এঁরা হচ্ছেন মুর্শিদাবাদের বৃন্দাবন দাস, মেদিনীপুরের (প্রাক্তন যশোরের) জয়গোবিন্দ অধিকারী এবং বাঁকুড়ার সনাতন দাস। এঁদের ব্যক্তিত্ব অনুভব করবার মত। এক একজন গাইতে উঠছেন, সঙ্গে সঙ্গেই নিজের গানে ডুবে যাচ্ছেন, নিজের নৃত্যে বিভোর হয়ে গেছেন। বাউল গানের সঙ্গে একটা অভিনয় থাকে যা গায়কদের নিজস্ব। মূর্তিমন্ত প্রেরণার মত গানের ভাব এবং গতির সঙ্গে এই অভিনয় সবাইকে আকৃষ্ট করে রাখে। সবাইকার গলা হয়তো ভাল নয় কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। এদের গান এবং নৃত্যের আবেদন এতই মর্মস্পর্শী যে কণ্ঠের বিচার যেন খুব গৌণ বলে মনে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে বিরাট মেলাপ্রাঙ্গণে নিস্তব্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাঁদের অনুষ্ঠানটি একটি মুগ্ধ বিস্ময়ের মতই আবির্ভূত হয়ে তিরোহিত হয়ে গেল।

কলকাতা থেকে এসেছিলেন শ্রীঅমর পাল এবং গ্রামীণ গীতি সংস্থা। অমরবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী। তিনি শ্রোতাদের সাধুবাদ অর্জন করেছেন। গ্রামীণ গীতিসংস্থা পূর্ববঙ্গীয় লোকসংগীতের বহুবিধ ধারার এক একটি নমুনা পেশ করলেন। তাঁদের অনুষ্ঠানও মনোজ্ঞ হয়েছে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই হারমোনিয়ামের প্রাধান্যটা কেমন যেন ভাল লাগল না—পল্লীগীতিতে ওটা যেন মূর্তিমান সফিস্টিকেশন। আজকাল অবশ্য পল্লী অঞ্চলেও হারমোনিয়াম বাজানো হয় কিন্তু সে বাজানো আর এ বাজানোয় তফাত আছে। বেশ একটা অনাড়ম্বর অকৃত্রিম পরিবেশ কি রচনা করা যায় না? তথাপি পূর্ববঙ্গীয় লোকসংগীতের ঐতিহ্যকে এঁরা যে বজায় রেখে চলেছেন এর জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজন। পরবর্তী যুগে এইটুকুই প্রেরণাস্থল হয়ে থাকবে।

এক

এখনও শহরের ঘুম ভাঙেনি।

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। শীতকালের দীর্ঘ রাতের অবসানে কুয়াশার পাতলা চাদরে ঢাকা অতি ঝাপসা প্রভাতী আলো। দু-একটা কাক ডাকছে, শোনা যাচ্ছে রাস্তায় জল ঢেলার শব্দ আর সেই সঙ্গে জমাদারদের ঝাঁটার আওয়াজ।

রাস্তায় আলো জ্বলছে। কিছু এড়ানোর পায়চারী করেছেন বাইরের দেক, বোধ হয় রিক্শাওয়ালা, টিউবওয়েল থেকে জল ভরে বালতিতে। কোন রকম যানবাহন এখনও চলতে শুরু করেনি।

ঠিক এমনি সময় রমলা বউদির আচমকা ঘুম ভেঙে গেল—যা আশঙ্কা করেছিল তাই, সত্যি পাশে অনাদিপ্রসাদ শুয়ে নেই, কখন নিঃশব্দে উঠে গেছে। মানুষটা আজকাল যেন ঘুমুতেই চায় না।

পাশের ঘরে আলো জ্বলছে, হয়তো লিখতে বসেছে। একটা ক্ষীণ আশার আলো মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে নিবে যায়। রমলা বউদি পাশের ঘরে গিয়ে দেখে টেবিলের উপর অনাদিপ্রসাদের ডায়রিটা খোলা তার উপর লেখবার কলম, পাশে উজ্জ্বল টেবিল-ল্যাম্প, কিন্তু লেখক সেখানে নেই।

তবে কি বাথরুমে? ছেলেদের কাছে? কিংবা নীচের বৈঠকখানায়?

না, কোথাও অনাদিপ্রসাদকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

বারান্দায় আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে বুড়ি ঝি শুয়েছিল, ঘুমন্ত গলায় বললে, মনে তো হল বাবু নীচে নামলেন।

—কতক্ষণ আগে?

—তা ঘণ্টা-খানেক হবে।

রমলা বউদির গলার আওয়াজ শুনে চাকর নরেন উঠে পড়েছিল, বললে, বাবু বেরিয়ে গেছেন।

—কোথায়?

—তাতো কিছু বললেন না। নীচে নেমে এসেছিলেন, আমাকে ডাকলেন, দরজা খুলে দিলাম, উনি চলে গেলেন।

রমলা বউদির চিন্তা আরও বাড়ে। গায়ে গরম জামা পরেছিলেন?

—অত খেয়াল করিনি। তবে মনে হচ্ছে গায়ে আলোয়ানটা ছিল, বেটো বাড়িতে পরে থাকেন।

রমলা বউদি জুতোর র‍্যাকে চোখ বুলিয়ে দেখে, সব জোড়া সাজানো রয়েছে। তার মানে অনাদিপ্রসাদ বাড়িতে পরার চটি পায়ে বেরিয়ে গেছেন।

রমলা বউদি ওপরের ঘরে ফিরে এসে ডায়রির পাতাটা ভাল করে দেখে; সেখানে লেখা রয়েছে:

"বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। শুধুই কি খাওয়া-পরা-ঘুম আর হাসি-কান্না! খুঁজতে ইচ্ছে করছে সেই জগৎটাকে যা কঠিন বাস্তব। নাগালের মধ্যে থেকেও যার খোঁজ আমরা পাই না। শুধু খুঁজছি আর খুঁজছি—"

লেখা অসমাপ্ত। বোঝা যায় অনাদিপ্রসাদ ডায়রী লিখতে লিখতে উঠে গেছেন। আগের পাতাগুলোও রমলা বউদি উলটে দেখে, বেশির ভাগই সাদা পাতা। কয়েক জায়গায় অসংলগ্ন মন্তব্য।

সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। যে লোকটা বছরের পর বছর ডায়রী লিখে আসছে, প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে আগের দিনের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখে, সেই লোকটা হঠাৎ বদলে গেল কি করে!

মনে আছে বিয়ের পর, সেও প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। রমলা বউদি ঠাট্টা করে বলেছিল, ডায়রীতে যে সব কথা লিখে রাখ যদি অন্য কেউ পড়ে।

যুবক অনাদিপ্রসাদ নির্ভীক উত্তর দিয়েছিল, পরস্ত্রীর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকানোর মতই অন্যের ডায়রী পড়া পাপ।

—কেউই যদি পড়বে না, তবে ডায়রী লেখা কার জন্যে?

—যদি একবার বুঝতে পারতে রমলা আমরা প্রতিদিন কতখানি বদলে যাই, তা হলে ডায়রী লেখার তাৎপর্য বুঝতে পারতে। আজকের আমির সংগে দশ বছর বাদের আমির হয়ত মিল খুঁজে পাবে না। কথার চটকে মানুষকে ভোলানো যায় কিন্তু আমি নিজেকে ভোলাতে চাই না, আমি যা তাই যেন থাকি।

সেই অনাদিপ্রসাদ, যাকে রমলা বউদি দেখেছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে একঘেঁয়ে ডায়রী লিখে যাচ্ছে, সেই মানুষটা প্রায় এক মাস হল ডায়রীর পাতায় আঁচড় কাটে না। আজ অনেকদিন বাদে কয়েকটি ছত্র লিখেছে যার অর্থ বোঝা সহজ নয়।

এক অজানা আশংকায় রমলা বউদির বুক কেঁপে ওঠে, মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে বলে, ঠাকুর ওঁকে তুমি আগের মত স্বাভাবিক করে দাও, যদি কোন অপরাধ করে থাকে তার শাস্তি আমাকে দাও—

এ প্রার্থনা কিন্তু ওপরে উঠতে পারে না, উনুনের ধোঁয়ার মত মাঝপথে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

রমলা বউদি চাকরকে নির্দেশ দেয়, দেখে আয় তো বাবু সামনের মাঠে বেড়াতে গেছেন কিনা।

যদিও মনে মনে সে জানে অসম্ভব, মর্নিং-ওয়াকের কোন অভ্যাস অনাদিপ্রসাদের নেই। তবু বলা যায় না, যদি পার্কেই গিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ বাদেই খবর এল অনাদিপ্রসাদ সেখানে নেই।

রমলা বউদি বিনীতাদের ফোন নম্বর ডায়াল করে, খেয়াল থাকে না অত সকালে কেউ ঘুম থেকে ওঠে না, অনেকক্ষণ রিং করার পর অন্য দিক থেকে ঘুমে-জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

—হ্যালো, কে?

—আমি রমলা কথা বলছি।

—কে রমলা?

—রমলা বউদি।

—ও, হ্যাঁ, কি ব্যাপার, এত সকালে?

এতক্ষণে রমলা বউদির হুঁশ হয়, আর একটু বাদে ফোন করলেই ভাল হত। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে, জিজ্ঞেস করছিলাম, উনি তোমাদের ওখানে গেছেন কিনা।

অপর প্রান্তে আরও বিস্ময়, অনাদিদা, এখানে? কেন? আসবার কথা আছে বুঝি?

রমলা বউদি কিছুক্ষণ নীরব, তারপর অন্যমনস্ক স্বরে বলে, কাল রাত্রে বলছিল তোমাদের ওখানে যাবে তাই—

—সে তো খুব ভাল কথা, কতদিন আসেন নি, আপনিও আসুন না।

কোন সাড়া না পেয়ে বিনীতাই বলে, অনাদিদা এলে কি আপনাকে ফোন করতে বলব।

এ প্রশ্নেরও কোন জবাব নেই। বিনীতার মনে হল হয়ত গোলমালে লাইনটা কেটে গেছে।

দুই ছেলে ঘুম থেকে উঠল। চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, বাবাকে দেখছি না?

রমলা বউদির ছোট্ট উত্তর, বেরিয়েছেন।

—কোথায়?

—জানি না।

ছেলেদের এ-উত্তর দিলেও নিজেকে রমলা বউদি কিছুতেই বোঝাতে পারে না। কোথায় যেতে পারে মানুষটা। কেন এক মাস ধরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যে লোকটা ঘুম থেকে ওঠে, সকাল ন'টা পর্যন্ত পিঠ সোজা করে পড়ার ঘরে বসে লেখে, চান-খাওয়া সেরে একটার সময় প্রকাশক মহলে কিংবা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। প্রতিদিন বিকেলে পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরে সকলের সঙ্গে চা খায়, সন্ধ্যেবেলা রমলা বউদিকে নিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে যায় লেক কিংবা ভিক্টোরিয়ায় সেই মানুষটার এ কি পরিবর্তন। ঘড়ি থামেনি, চলছে দ্রুত, আরও দ্রুত। তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে অসম্ভব দ্রুতছন্দে অনাদিপ্রসাদের জীবনযাত্রা বইছে। কিন্তু রমলা বউদি কিছুতেই তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না।

পাছে ছেলেরা উদ্বিগ্ন হয়, রমলা বউদি তাদের কাছে মনের কথা ব্যক্ত না করে অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল ঢুকে পড়ে কলঘরে। চান সেরে, চুল না আঁচড়ে সব ঘরগুলো আবার একবার দেখে যায়। না, অনাদিপ্রসাদ তখনও ফেরেনি। পুজোর ঘরে ঢুকে অসহায়া নারী অবিরাম চোখের জল ফেলে। নিত্যক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে নামরূপ করতেও ভুলে যায়। পাষাণদেবতা অবিচল, নিষ্পলক। সেখানে সমবেদনা নেই।

উদভ্রান্ত রমলা বউদি কোন রকমে প্রণাম সেরে আবার ওপর-নীচে ঘরে বেড়ায়। কিন্তু তখনও অনাদিপ্রসাদ ফেরেনি।

বাড়ি ঝি কি রান্না হবে জিজ্ঞেস করতে এসে বকুনি খেয়েছে, যা ইচ্ছে রাঁধ না, কেন আমাকে বিরক্ত করছ?

ড্রাইভার পেট্রলের টাকা চেয়েছিল, তার উত্তরে রমলা বউদি বলে, কে গাড়ি করে বেরবে তার ঠিক নেই, পেট্রল ভরে কি হবে?

—স্টার্টটা দিয়ে রাখতাম।

—যা ইচ্ছে করুন। আমাকে জ্বালাবেন না।

রমলা বউদির মনের মধ্যে যে ঝড় বইছে কেউ তার হদিস পেল না। কিছুক্ষণ শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে খাটে শুয়ে রইল মনকে শান্ত করার জন্যে, পারল না। টেলিফোনের কাছে গিয়ে বসল, বারবার ভাবল উচিত হবে কিনা। শেষ পর্যন্ত মনের দ্বন্দ্বকে জয় করে ডায়াল করল বাপের বাড়ির নম্বর। ভাগ্য ভাল, সরাসরি রমলা বউদির দাদাই টেলিফোন ধরেছিল। কিরে রমি, কি হয়েছে? এত গম্ভীর?

রমলা বউদি কোন রকমে উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ সামলায়, তুমি একবার এস।

—এখন?

—পারবে না?

—কোর্টে যেতে হবে যে।

—তা' হলে বিকেলে এস।

দাদা উদ্বিগ্ন হন, কেন কি হয়েছে বল, বাড়ির সব খবর ভাল তো? ছেলেরা কেমন আছে? অনাদি——

রমলা বউদি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাতে সময় নিয়ে এস, অনেক কথা বলবার আছে। বাড়িতে আর কাউকে কিছু বলো না।

—না, না, ঠিক আছে। কোর্ট থেকে সোজা আমি তোর কাছেই যাব।

তবু একটু স্বস্তি বোধ করল রমলা বউদি আর কিছু না হোক, এক মাস ধরে যে চিন্তার বোঝা তাকে পিষে মারছে অন্তত দাদার কাছে সব কথা খুলে সে বলতে পারবে। তারপর ভাল মন্দ যাই হোক।

পার্ক স্ট্রীটের একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ। এ সময় বিশেষ ভিড় থাকে না, অফিস যাবার পথে কেউ হয়ত ব্রেকফাস্ট খেয়ে যায়, নয়ত মার্কেট ফিরতি মহিলারা কফি খান, দুধ-চিনি না দিয়ে। বেয়ারারা ভেতরে ঝিমোয়, খদ্দের দেখলে ম্যানেজার ঘণ্টি বাজিয়ে তাদের ডাকে। অনেক রাত পর্যন্ত এরা ডিউটি দেয়, তাই লাঞ্চের আগে পর্যন্ত কুঁড়েমি করলেও তারা রেহাই পায়।

এক কোনায় বসে সৌরভ সেন খুব নীচু গলায় কথা বলছে মোহনচাঁদের সঙ্গে।

মোহনচাঁদ সুদর্শন, অবাঙালী। নিখুঁত বিলিতী পোশাক, চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে বলে, মিঃ সেন, আপনি বলেছিলেন পঁচিশ হাজার টাকা যদি আমি দিই আপনি ছবি শেষ করে ফেলবেন, আমি কাল হিসেব করে দেখেছি, প্রায় তিরিশ হাজার আমি দিয়ে দিয়েছি, ছবির কতটুকু কাজ হয়েছে বলুন।

চিত্রপরিচালক সৌরভ সেন মৃদু হাসে, সবই তো হয়ে গেছে, নায়ক-নায়িকা ঠিক হয়ে গেছে, দু' রীল ছবি তুলে ফেলেছি, তিনটে গান রেকর্ডিং হয়ে গেছে, এই কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করাতে গেলে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা পড়ত।

—আমি করাতে যেতাম কেন? আপনিই তো আমাকে টেনে আনলেন।

—[illegible] এনে তো খারাপ কিছু করিনি, [illegible] বেশি হলে আর পনের হাজার আপনাকে ফেলতে হবে। বাস, বাকি টাকা ডিস্ট্রিবিউটারদের কাছ থেকে নিয়ে নেব। ছবি রিলিজ হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার পঁচিশ হাজার টাকা আপনি ফেরত পেয়ে যাবেন। তারপর ছবির যা মেরিট, হই হই করে সিলভার, গোল্ডেন, ডায়মণ্ড জুবিলী।

মোহনচাঁদ নিজের মনেই মাথা নাড়ে, যাই বলুন, মিঃ সেন, আপনাদের এই ফিলিমের লাইনটা অন্য ব্যবসার মত নয়, বড় ধোঁয়াটে—

সৌরভ সেন হা হা করে হাসে, আপনি নতুন লোক, তাই বলছেন ধোঁয়াটে, পরে বলবেন অন্ধকার। আর তাই তো চাই, চিত্র-জগৎ হল আলো-আঁধারির খেলা। কালো-সাদা।

মোহনচাঁদ ইংরিজী প্রতিশব্দ ব্যবহার করে, ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট।

—ঠিক তাই, স্রেফ ভেল্কিবাজী, কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে। তা' না হলে আপনারাই বা এ লাইনে আসবেন কেন?

এবার মোহনচাঁদও হাসে, কি করে কথা বলতে হয় আপনি জানেন। শুধু বলা নয়, করে দেখাতেও পারেন।

—ওটাই আমার মূলধন। এমন ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট এ ছবি তুলব, [illegible] আপনার কালো টাকাকে রুপোলী [illegible] রঙীন ছবি তুলব। টেকনিকলার, [illegible] কিংবা ইস্টম্যান, আপনি তখন [illegible] দেখবেন।

[illegible] পেয়ালায় উচ্ছ্বাসটা বড় বেশি [illegible] রঙীন [illegible] হজম করতে সুবিধে হত।

মোহনচাঁদ লক্ষ করে সৌরভ সেন অন্য-মনস্ক হয়ে কাকে যেন দেখছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে [illegible] এক ভদ্রলোক [illegible] রেস্তরাঁর [illegible] এক কোনায় গিয়ে বসলেন।

—ভদ্রলোক কে?

—বিখ্যাত সাহিত্যিক, অনাদিপ্রসাদ।

—হাঁ নাম শুনেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—আলাপ মানে, ওর দুখানা গল্প আমি ছবি করেছি, একটা হিট, অন্যটা [illegible] হিট।

মোহনচাঁদ-এর গলায় বিস্ময়, [illegible] নাকি? [illegible]

সৌরভ সেন বিরক্ত বোধ করে, [illegible] বোধ হয় ঠিক খেয়াল করতে পারেননি। [illegible] আমরা অন্ধকারের মধ্যে বসে রয়েছি, ভদ্রলোক বাইরের আলো থেকে ঢুকলেন।

মোহনচাঁদ সকৌতুকে হাসে, আবার সেই আলো আর অন্ধকার।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওরা ছবি নিয়ে কথা বলল বটে কিন্তু দুজনেরই নজর পড়ে রইলো এক কোনায় বসা একক ভদ্রলোকটির উপর। নিশ্চল পাথর। চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছেন, বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেল, কিন্তু খাবার আসা পর্যন্ত ভদ্রলোক অপেক্ষা করল না, সিগারেটটা শেষ হতেই ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। ম্যানেজার এগিয়ে গেল তার দিকে, বোধ হয় আর একটু বসবার জন্যে অনুরোধ করতে। কিন্তু ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে টেবিলটা দেখিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

টেবিলের উপর একটা দশ টাকার নোট।

মোহনচাঁদ মন্তব্য করল, কিছু না খেয়ে লোকটা পয়সা দিয়ে গেল। ওরও কালো টাকা নাকি?

সৌরভ সেন চিন্তিত স্বরে বলে, সবটাই কেমন অদ্ভুত লাগছে, অনাদিপ্রসাদ সাজ-পোশাকের ব্যাপারে খুব ফিটফাট, এ রকম চেহারায় তাকে ভাবাই যায় না।

—এমনও তো হতে পারে উনি অনাদিপ্রসাদই নন, অনেকটা একরকম দেখতে।

—বোধ হয় তাই। তবে যখন মনে খটকা লেগেছে ও'র বাড়িতে একবার টেলিফোন করে দেখব।

রাজাবাজারের যে অঞ্চলটায় দপ্তরীপাড়া তারই একটা সরু গলির ভেতর দাঁড়িয়ে অশোক জানা এক নতুন মক্কেলের সংগে আলাপ করছে। অশোকের নিজস্ব ছোট প্রেস আছে। নানা রকম কাজ করে। দপ্তরী পাড়ায় এসেছিল সদ্য ছাপা কোন কোম্পানীর বিল বইএর ক্রমিক নম্বর লেখাতে। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক ডাকলেন, অশোকবাবু, শুনছেন।

—আরে কি খবর মিঃ দত্ত, অশোকের চোখ দুটো নেচে ওঠে শিকারী বেড়ালের মত। কদিন আগে এই দত্ত সাহেব মোটর সাইকেল চালিয়ে তার প্রেসে গিয়েছিল ভিজিটিং কার্ড ছাপানোর প্রস্তাব নিয়ে। মাত্র পঞ্চাশখানা কার্ড, তার জন্যে দিয়েছে কুড়ি টাকা। নিশ্চয় দিলদরিয়া মেজাজের লোক। নয়ত বাজার যাচাই না করে এতগুলো টাকা দিয়ে দেবে কেন।

—এখানে কি ব্যাপার?

দত্ত উত্তর দেয়, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, একটা অর্ডার আছে, চিঠির কাগজ ছাপাতে হবে। এই একরকম হলেই হবে। বিল করবেন হাজারের।

—তার মানে?

—খুবই সোজা, আপনার ছাপার খরচ একশোরও [illegible] হাজারেরও নাই, শুধু কাগজের বাড়তি দামটা আমার কমিশন, কি রাজি?

অশোক জানা ঘাঘু ব্যবসাদার, লোভের জালে মাছি পড়েছে, বলে, নিশ্চয়, আমার তো আর ক্ষতি নেই, আপনি যত অর্ডার এনে দেবেন, তার জন্যে নিন না কমিশন।

দত্ত খুশী হয়ে বলে, আমার হাতে অনেক পার্টি আছে, ছোটখাট একটা ভাল প্রেস খুঁজছিলাম, আপনাদের কাজ চমৎকার, দেখবেন কত অর্ডার এনে দিই। অশোক জানা নতুন মক্কেলকে খাতির করার জন্য দার্জিলিং মিঠে পান কিনবে কিনা ভাবছিল এমন সময় দেখল সামনে দিয়ে অনাদিপ্রসাদ হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। আজকের জনপ্রিয় লেখক, বহুদিনের পুরোনো বন্ধু অনাদিপ্রসাদকে হঠাৎ এইভাবে এ অঞ্চলে দেখতে পেয়ে অশোক চেঁচিয়ে ডাকে, এই অনাদি, শোন না। অনাদি—

পায়জামা পাঞ্জাবি পরা লোকটা [illegible] দাঁড়ালেন না। ভদ্রলোক কোন সাড়া না দিয়ে উনি নিজের মনেই ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যান।

মিঃ দত্ত না জিজ্ঞেস করে পারে না, কি ব্যাপার অশোকবাবু, কে উনি? আপনি এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন কেন?

অশোক জানা অবাক হয়ে বলে, আপনি নাকি চিনতে পারলেন না? অনাদিপ্রসাদ।

—উনি! তা হলে চাক্ষুষ কখনও দেখিনি।

অশোক জানা নিজের মনেই বিড়বিড় করে অনাদি এ পাড়ায় কি করছে?

[illegible]

—দূর মশাই এ চেহারায় সে অনাদিপ্রসাদ না।

—উঁহু, আমার ভুল হতে পারে না। আমরা দুজনে সহপাঠী, দুজনে একসঙ্গে লিখতাম। ও পরীক্ষায় ভাল করতে পারল না, কিন্তু লেখক হল। আমি এম এ পাশ করে বেরলাম, কিন্তু লিখতে পারলাম না। সেই অনাদিকে আমি কখনও ভুলতে পারি? কিন্তু—।

একটা বিরাট কিন্তু অশোক জানার মনের ভেতর হাতুড়ি পেটাচ্ছে, কিন্তু অনাদিপ্রসাদ এখানে কেন?

(ক্রমশ)

লক্ষ্মীর কৃপালাভে বাঙালীর সাধনা

বিশ্বকর্মা

মুদ্রণ শিল্প ঃ ব্লক মেকিং

ছোট ফিটফাট অফিসটিতে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়লো দেয়ালে টাঙানো ফ্রেমে-আঁটা চারটে ফটো এবং অশোকস্তম্ভ-লাঞ্ছিত হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত কয়েকটি সার্টিফিকেট। চারুদর্শন এক যুবক পুরস্কার নিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণন ও জাকির হোসেন এবং প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী মহাশয়ের হাত থেকে। একটু লক্ষ করে বুঝলুম, ওই সার্টিফিকেটগুলিই যুবকের হাতে তুলে দিচ্ছেন আমাদের প্রাক্তন ও বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানেরা।

অল্পক্ষণ পরেই যুবকটির সঙ্গে পরিচয় হলো। রেডিয়্যান্ট প্রোসেসের ছোটকর্তা সুধীর মুখোপাধ্যায়। আলাপ করিয়ে দিলেন বড়ো ভাই নীরদবরণবাবু।

হাহুতাশ করে লাভ নেই, অন্যকে দোষ দেওয়াও অন্যায়। শিল্প ও বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান যে তালিকার একেবারে নীচের দিকে তার জন্যে দায়ী আমরা বাঙালীরাই। তার কারণ সম্বন্ধে প্রতিদিন এতভাবে আলোচনা হচ্ছে যে, সে বিষয়ে এখানে বেশি কিছু বলা বাহুল্য হবে। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ও নয় সেটা। বাঙালীর সেই লজ্জাকে কিছুটা লাঘব করেছেন সামান্য যে দু'-একটি শিল্পের কর্ণধারেরা—শুধু তাই নয়, সেই সব শিল্পে বাঙালীকে, বলতে গেলে সবার উপরে তুলে ধরেছেন—তার মধ্যে মুদ্রণ ও প্রোসেস এনগ্রেভিং অর্থাৎ ছাপার ব্লক তৈরির কথা প্রথমেই মনে পড়েছিল। তাই আমাদের এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি শুরু করা গেল বাঙালীর মালিকানায় সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর পরিচালনায় সার্থক এই ব্লকমেকিং শিল্পটি নিয়ে।

ভূমিকা আরও একটু বাড়িয়ে বলা যেতে পারে যে, এই যন্ত্রশিল্পটির সঙ্গে চারুকলা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত আছে বলেই বোধ হয় বাঙালী আজও এতে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। ভারতে ব্লকমেকিং শিল্পের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবৃত্তিতে সর্বাগ্রেই সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাতে হয় আমাদের সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়কে। তিনিই ভারতে ব্লকমেকিং-এর পথিকৃৎ। এই শতকের গোড়ার দিকে নানান পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের রঙীন ও সাদাকালো হাফটোন, মিডলটোন ও কোয়ার্টার টোন ছবিগুলি আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁদের অনেকেরই স্পষ্ট মনে আছে। ঠাকুর-পরিবারের পরেই সাহিত্যে ও চিত্রকলাতে বাংলা দেশে যে পরিবারটি আজও, শুধু ভারতে কেন, বিশ্বে স্বনামধন্য, সেই পরিবারের একজনের শিল্পীমন ও কল্যাণহস্ত এর উপরে ছিল বলেই হয়তো আজ এদেশে এই শিল্পের মান এত উঁচুতে।

বছর দুই-তিন আগে লোকপরম্পরায় শুনেছিলাম যে, ইউ এস আই এস-এর কোনো প্রধান আমেরিকা থেকে কলকাতায় এসে তাঁদের ভারতে প্রকাশিত 'স্প্যান' পত্রিকার ব্লকমেকিং-এর উৎকর্ষের তুলনা করেছিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ব্লকমেকিং-এর সঙ্গে। এর ব্লকগুলি সবই রেডিয়্যান্ট প্রোসেস করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে নীরদবাবু সবিনয়ে বললেন, "দেশী ও বিদেশী শিল্পপতির সফলতার ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে, তাঁদের নিজ নিজ মেধা ও অধ্যবসায়ের তারিফই তাতে বেশি থাকে। কিন্তু যে-কোনো কৃতী শিল্পপতির সাফল্যের পিছনে মেধা ও প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের আনুকূল্য যে কতটা থাকে সাধারণত বাইরের লোকে তা কোনোদিনই জানতে পারে না। আমার মনে হয়, pluck ও luck-এর মধ্যে অধিকতর ক্ষেত্রে luckটাই বড়ো পার্ট প্লে করে। যেমন আমাদের ক্ষেত্রে। ছিন্নমূল হয়ে পার্টিশনের পরে বিক্রমপুরে নিজের দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে নিজের পায়ে কী করে আবার দাঁড়াতে পারি দিবারাত্র তাই ভাবতাম। আমাদের মামা পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সম্প্রতি লোকান্তরিত বাবা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের উৎসাহ-উদ্দীপনায় খুবই ছোট করে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বউবাজারের গঙ্গাধরবাবু লেনে ব্লকমেকিং-এর কারখানা খুললাম। সম্বল একটি ১৫"×১২" ক্যামেরা ও গুটি-কয়েক আনুষঙ্গিক মেশিন ও সরঞ্জাম। মোট দাম কুড়ি হাজার টাকা। ভাগ্যের অনুকূল আমাদের যা হলো, তা হচ্ছে দুজন অতি কর্মঠ ও নিপুণ সহযোগীকে আমাদের সঙ্গে পাওয়া। তাঁরা হলেন শ্রীসত্যরঞ্জন আশ্বলী ও শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার। এঁদের দুজনের সুপরামর্শ ও সাহচর্য এবং জন-পনেরো বিশ্বস্ত কর্মীর কর্তব্যপরায়ণতা যদি আমাদের সহায় না থাকত তা হলে আমাদের দুই ভাইয়ের কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও আজ মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশংসা পেতাম না।

"১৯৫৬ সালে গন্ধাধরবাবু লেন থেকে উঠে এলাম এই ৬-এ, সুরেন ব্যানার্জি রোডে। সেই বছরেই আমরা ব্লকমেকিং-এর সঙ্গে আমাদের ছাপাখানার বিভাগটি খুললাম। ১৯৫৮ সাল থেকে কাজ অনেক বেড়ে গেল এবং কাজের কোয়ালিটির জন্যে ব্লকমেকিং ও ছাপা দুইয়ের জন্যেই বছরে বছরে অনেকগুলি প্রাইজও পেলাম। দিল্লীতে সরকারী প্রতিযোগিতাতে ছাড়াও মাস্টার প্রিণ্টার্স ফেডারেশনের কমপিটিশনেও পেলাম।"

রেডিয়্যাণ্ট প্রেসেস এখন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহত্তম ব্লকমেকিং প্রতিষ্ঠান—অবশ্য ছাপাখানার বিভাগটি নয়। ১৫ জন থেকে এখন এ'দের কর্মীসংখ্যা তিন শো-তে দাঁড়িয়েছে। মেশিনের মধ্যে আছে ক্যামেরা ৪টি; এচিং মেশিন ১৮টি; কাটিং মেশিন ৪টি; রাউডিং মেশিন ২টি; সব রকমের অনেকগুলি স্ক্রীন; স্টিরিও কাস্টিং-এর উপকরণ যথেষ্ট। ছাপাখানায় আছে ১৭টি প্রিণ্টিং মেশিন (বড়ো ও ছোট) এবং ১টি ভারনিশিং মেশিন। টাইপ এবং অন্যান্য সরঞ্জামও যথাযথ।

এই সব যন্ত্রপাতির দাম সাড়ে আট লক্ষ টাকা। কোথায় সেই কুড়ি হাজার টাকার মেশিনারী আর কোথায় আজ ১৫ বছর পরের এই বৃহৎ কারখানা!

রেডিয়্যাণ্টের কাজের আদর বেড়েই চলেছে। কেন্দ্র ও সকল রাজ্যের সরকারী দফতরগুলি, বিদেশী দূতাবাস, বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশক এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির চাহিদা পেরিয়ে এখন বিদেশ থেকেও অর্ডার আসছে। আরও মেশিন চাই, আরও জায়গা চাই। তাই সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়েছে বেহালা তারাতলাতে প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমি কিনে।

এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা কেবল কাজই করেন না, এ'দের অবসর বিনোদনের পদ্ধতিও সুষম। আন্তঃডিপার্টমেণ্ট ফুটবল লীগ খেলা হয়। অফিস লীগেও খেলেন। ক্লাব, লাইব্রেরী আছে। বছরে বছরে মঞ্চাভিনয় করেন সকলে মিলে। এই হল রেডিয়্যাণ্ট-গোষ্ঠীর বিবরণ।

তবুও—নীরদবাবু বললেন, এ যুগের কোটি কোটি টাকার বিশাল উদ্যোগগুলির পাশে ব্লকমেকিং-এর এই বৃহত্তম কারখানাটিও কুটিরশিল্পের মতো।

সামগ্রিকভাবে বাংলার ব্লকমেকিং শিল্পের আলোচনাও নীরদবাবুর সঙ্গে হল। তখন তিনি আর রেডিয়্যাণ্টের মালিক নন, তিনি ব্লকমেকারস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর স্থলাভিষিক্ত যেন অন্য এক ব্যক্তি। তাঁর মতে এই শিল্পের মালিকেরা হলেন নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীরা, যাঁদের দৈনন্দিন মূলধনের অভাবের চাপে প্রায় দিন-আনা দিন-খাওয়া করেই কারবার চালাতে হয়। মালের ও কাজের চাহিদা বলতে বেশির ভাগ ব্লক-মেকারেরই নিয়মিত কিছু নেই। "কখনো হয়তো একগাদা কাজ এলো: চার-ছ' ঘণ্টার মধ্যে সেই কাজ নামিয়ে খদ্দেরকে পৌঁছে দিতে হবে, আবার কখনো দিনের পর দিন কাজ প্রায় থাকেই না। প্ল্যান করে কিছু করবার জো নেই।

"অ্যাসোসিয়েশন" থেকে অনেক হিসেব করে বিভিন্ন কাজের রেট হয়তো বাঁধা হল, তা ছ' মাস কাটতে না কাটতেই কাঁচামালের অর্থাৎ এই শিল্পের ক্ষেত্রে দস্তার ও তামার পাতের, সীসের, ফটোগ্রাফিক প্লেটের, কেমিক্যালের—এমন কি খাঁটি স্বদেশী প্রুফের কাগজের দামও রাতারাতি হঠাৎ দেড় দু' গুণ বেড়ে গেল। কর্মীদের মাইনে ও ভাতা বাড়াতে হল চাল-ডালের দাম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। সব হিসেব বানচাল। যাঁদের কাঁচামালের স্টক ছিল না, অ্যাসোসিয়েশনের বিক্রয়মূল্যে তৈরী মাল বেচতে গেলে তাঁদের ডাহা লোকসান। রিজার্ভ বা সংরক্ষিত তহবিল তো কারুরই প্রায় নেই। এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া ছাড়া গতি নেই।

"সব চাইতে বেসামাল করে দেয় দামলো ভাতার বেহিসেবী চাপ। সরকারী কানুনে অনুযায়ী প্রাইস ইনডেক্সের (দ্রব্যমূল্যসূচীর) পয়েণ্ট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বছরে দু'বার করেও কর্মীদের মাথাপিছু এই ভাতা দশ টাকা করে বাড়াতে হয়েছে। অথচ সেই অনুপাতে ব্লকের দাম বাড়ালে ক্রেতারা বেঁকে বসবেন। ব্লকের প্রধান খরিদ্দার হলেন অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। মন্দার বাজারে অনেকেই নিহত; বাকী যাঁরা টিঁকে আছেন তাঁরা সাংঘাতিক আহত। খরচ কমাতে হয়—তাই কমাও বিজ্ঞাপন, ক্যাটালগ ও ব্যালেন্স-শীট সুন্দর সুন্দর ব্লক দিয়ে এ বছরে আর ছাপিয়ে কাজ নেই। সঙ্গতি যেটুকু আছে তা দিয়ে মজুরদের ভাতা বাড়াও। মালের বিক্রি নেই যার, কী দরকার তার নানা রঙের ক্যাটালগ ব্যালেন্স-শীটের বাহারে? কাজেই, করুক ব্লকমেকার তার দিন গুজরান অর্ধাহারে বা অনাহারে।"

নীরদবাবুর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে পথে নামবার আগে আবার চোখে পড়লো রিসেপশন রুমের দেওয়ালে বসানো কাঁচের আলমারির ভিতরে আরও কতকগুলি পুরস্কার। সেই আলমারির নীচে একটা কাঠের বোর্ডে সাঁটা রেডিয়্যাণ্টের ব্লকে ছাপা ভারী সুন্দর কতকগুলি রঙীন কাজের নমুনো। এ যেন পঞ্চদশী রেডিয়্যাণ্টের রূপের ঝলক! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, ছোট ছোট আরও ষাট-সত্তরজন বাঙালী ব্লকমেকারের কথা। মনে মনে ছবিটা এঁকে দেখলাম—যেন একটা সলিড ব্লকের নিরেট ছাপ—গাঢ় কালো কালিতে ছাপা।

কলতলা থেকে ঘরে ফিরে আসতে বিপিন দেখল, শেফালী মেঝের কোলকুজো মেরে পড়ে আছে। পা দুটো গোটানো, হাঁটু অবধি নিরাবরণ। মাথা বুকের দিকে ঝুঁকে আসায় মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ডান হাত উলপেট ছুঁয়ে মেঝের নেমে গেছে। আঁচলের এক ফালি পিঠের পাশে লুটোচ্ছে। বিপিন আয়নার কাছে এসে গামছাটা বার কয়েক গলায় বুকে ঘষে নিল। তারপর কিছুক্ষণ চুলের ভেতর এলোপাথাড়ি চিরুনি চালাল। একসময় আয়নার দিকে মুখ রেখেই গম্ভীর গলায় বলল, কি ব্যাপার, উঠবে না?

শেফালীর ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চেঁচিয়ে কথা বলার মত দমটুকু আর বিপিনের নেই। সারাটা দিন পেটে ভারি কিছু তলায় নি। পেটে বাচ্চা আসবার পর থেকে, বিপিন লক্ষ করেছে, দিন দিন শেফালী কি রকম মারমুখী হয়ে উঠছে। সকালে, দোকানে বেরুবার মুখে, শেফালী অযথা একটা ঝগড়া পাকিয়ে তুলতে চেয়েছিল। বিপিন উচ্চবাচ্য করেনি। গায়ে জামা চড়িয়ে শান্তমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। দুপুরে বাড়ি ফেরেনি। ফেরার ইচ্ছেও হয়নি। গোপালকে দিয়ে মিষ্টির দোকান থেকে গরম দুধ আনিয়ে খেয়ে নিয়েছিল।

হাত বাড়িয়ে দেয়ালের খোপে চিরুনিটা রেখে মস্ত একটা হাই তুলতে বিপিন নিস্তেজ হয়ে এল। সে ক্লান্ত সুরে বলল, বিছানাটা পেতে দেবে? ঘুম পেয়েছে—? ওদিকে তখনো কোন সাড়াশব্দ নেই। বিপিন বুঝল, শেফালী ফুঁসছে। এখন ওকে আদর করে ভালবেসে সহজ করে তুলতে সময় লাগবে। সে মনে মনে হাসল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। শেফালীর কাছে এগিয়ে এসে হাঁটুমুড়ে বসল। নরম করে ডাকল, শেফালী! বিপিনের ওই দোষ। মাথায় রক্ত চড়লে আর মানুষ থাকে না। লাথিটা তলপেটে পড়েছিল। আসলে তখন সে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। নিজের শরীরের ওপর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। লাথিটা যে অত অব্যর্থ হবে, ঠিক বুঝতে পারেনি।

এবার বিপিন নিচু হয়ে শেফালীকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি দুই হাতে ওকে চিত করে ফেলতে সে চাপা আর্তনাদ করে উঠল। আলোয় শেফালীর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু চোখের মণি ওপরের পাতায় স্থির জমে আছে। নিচু

থেকে সাদা অংশ পাথরের গুলির মত ঠেলে উঠেছে। ঠোঁটের কোনায় লালচে রঙের বুদ্‌বুদ জমেছে। দুই ভ্রু জোড়া লেগে কপালে কতগুলো ভাঁজ পড়েছে। হাতের আঙুলগুলো কি রকম বাঁকানো, ও যেন কিছু আঁচড়াতে চেয়েছিল। বিপিনের বুকের ভেতরটা ধক্‌ করে জ্বলে উঠল। আট মাসের পোয়াতি। হঠাৎ লাথিটা পড়ল—

বিপিন শেফালীর গলায় হাত রাখল। কোন স্পন্দন অনুভব করল না। কপাল, হাতের চেটো, আঙুলের ডগা স্পর্শ করতে উষ্ণতা পেল না। পায়ের ডিম দুটো, শিরায় টান ধরলে যেমন হয়, শক্ত। বিপিন সবেগে ডান হাতটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে টিপবোতামগুলো পটাপট খুলে গেল। বুকের দিকটাও শক্ত, বুঝি বা শেফালী দম বন্ধ করে আছে। বিপিন এবার সরে এসে আরো নিচু হয়ে ওর তলপেটে কান রাখল। কোন শব্দ শুনতে পেল না।

দু' হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার সময় বিপিন শরীরে কোন জোর পেল না। সে টলে টলে যাচ্ছিল। আলোর দিকে চোখ পড়তে মনে হল, কেউ তাকে এইমাত্র গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে। তারপর প্রথমেই তার খেয়াল হল, পেছনের দরজাটা খোলা। সে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। দরজার ও-পাশে উঠোন, উঠোনের প্রান্তে কুয়ো। এক পাশে পায়খানা। কুয়োর পিছনে কলাগাছের ঝোপ। তার ও-পাশে নিচু জলো জমি, রেল লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মুহূর্তে কিছুই বিপিনের চোখে পড়ল না। দরজার ফ্রেমে শুধু শূন্য শব্দহীন অন্ধকার। বিপিন এগিয়ে এসে কপাট ভেজিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

পশ্চিমের জানলা বন্ধ করার আগে লোহার শিকে মাথা ঠেকিয়ে বিপিন কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। জানলার গা ঘেঁষে দু-দুটো নিমগাছ। তার ওপাশে এক চিলতে বাগান। তারপর পুরোনো ধাঁচের এক দোতলা বাড়ি। বাড়িঅলা থাকে। কোন ঘরে আলো জ্বলছে না দেখে বিপিন আশ্বস্ত হল। শুধু বড় রাস্তার দিকে সদর গেটের মাথায় আলোটা জ্বলছিল। বিপিন বুঝল, সুধীর এখনো ফেরেনি। বাড়িঅলার মেজ ছেলে সুধীর।

বিপিন ঘুরে দাঁড়াল। শেফালী নিঃসাড় পড়ে আছে। দুই হাঁটু ঈষৎ ভাঁজ করা বলে পেটটা ভারি বোধ হচ্ছে না। বিপিন নিজের লোমশ বুকে হাত ঘষতে লাগল। এই মুহূর্তে কি করা যেতে পারে ভেবে উঠতে না পেরে সে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। শেফালীকে লাথি মারার পর কি কি ঘটেছিল, ভাবতে চেষ্টা করল। লাথিটা খেয়ে শেফালী ঘুরে গিয়ে দেয়াল ধরে সোজা হয়ে [illegible] দড়ি থেকে গামছা টেনে নিয়ে কাঁধে চাপিয়েছে। তারপর ওকে বেমালুম উপেক্ষা করে পেছনের দরজা খুলে তাড়াতাড়ি উঠোনে নেমে পড়েছিল। এমন কি বাইরের আলোটা জ্বালবার সময়টুকু খরচ করেনি। উঠোনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে কিছুটা সময় পায়চারি করেছে। ঘরের ভেতর শেফালী কি তখন কাতরাচ্ছিল? বিপিন টের পায়নি। কেননা, তখন তার মাথায় আগুন ছুটছে। কুয়োতলায় এসে অনেকক্ষণ ধরে চোখেমুখে জল ছিটিয়েছিল। একমুখ জল নিয়ে শব্দ করে গলা পরিষ্কার করেছিল। মুখ ধোয়া হলে কলাগাছের ঝোপের দিকে সে অর্থহীন তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। আসলে সে কিছুটা সময় নষ্ট করতে চেয়েছিল। যাতে শেফালীর রাগটা পড়ে আসে। তারপর ঘরে এসে আয়নায় মুখ রেখে চুল আঁচড়ানো পর্যন্ত একথা কখনো তার মনে হয়নি, সামান্য একটা লাথিতে পেটের বাচ্চা সমেত নাড়িভুঁড়ি দলা পাকিয়ে মাথামাথি হয়ে শেফালীর শ্বাসযন্ত্র বিকল হয়ে যাবে। বিপিন ভাবতে চেষ্টা করল, শেফালী কখন দুই হাতের দশ আঙুল দিয়ে তলপেট চেপে ধরে শেষবারের মত আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। যখন সে উঠোনে পায়চারি করছে—না, কুয়োতলায়? অথবা ঘরে, চুল আঁচড়াচ্ছিল?

বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে ভেজা ভেজা কপাল মুছে নিতে বিপিনের তেষ্টা পেয়ে গেল। রান্নাঘর বড়ঘরের লাগোয়া। রান্নাঘরে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ হাতড়াবার পর সুইচটা পাওয়া গেল। আলো জ্বলে উঠতে বিপিন দেখল, বালতি-উনুনের মুখে পরিপাটি করে কয়লা সাজানো। হাঁড়ি কড়াই কাঠের তাক থেকে নিচে নামানো হয়েছে। শিলনোড়ার পাশে মসলার কৌটো। বোঝা গেল, শেফালী একবার রান্নার তোড়জোড় করেছিল। এবং এ কথা মনে হতেই দোকান থেকে ফিরবার পরের সমস্ত ব্যাপারটা বিপিনের চোখের সামনে ছায়াছবির মত ভেসে উঠতে লাগল। দোরগোড়ায় এসে সিঁড়ির ধাপে এক পা রেখে সে অনেকক্ষণ ধরে কড়া নেড়েছিল। আর তখনই তার মাথায় একটু একটু করে রক্ত চড়তে শুরু করেছে। শেফালী দরজা খুলতে বিপিন বলেছিল, কি ব্যাপার, অন্ধকার কেন? শেফালী নীরব থেকে খাটের দিকে চলে গিয়েছিল। আলো জেলে জামা খুলতে খুলতে ক্লান্ত বিপিন সংক্ষেপে বলেছিল, ভাত বাড়ো, খিদে পেয়েছে। শেফালী তৎক্ষণে খাটে পা তুলে দেয়ালে পিঠ রেখে গোঁজ হয়ে বসে। বিপিন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। চিৎকার করে উঠেছিল, কি, কথার জবাব দিচ্ছ না যে বড়।—শেফালী তড়াক করে খাট থেকে নেমে তার দিকে এক পা এগিয়ে সমান চেঁচিয়ে উঠেছিল, মেজাজ দেখাচ্ছ কাকে, আমি কি তোমার কেনা বাঁদী? —বিপিন ওকে কথা শেষ করতে দেয়নি। জোরে সে ডান পা তুলে তলপেট বরাবর চালিয়ে দিয়েছিল।

আলো নিবিয়ে বড় ঘরে ঢুকতে শেফালীর দিকে চোখ পড়ায় বিপিন নতুন করে চমকে উঠল। প্রথমটায় সে চোখ বুজল। মেঝেয় অনড় পড়ে থাকা শেফালীর ছবিটা তাড়াতে চাইল। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসে শেফালীর পাশেই বসে পড়ল। ওর গালে টোকা মারল। গলায় সুড়সুড়ি কাটল। চিবুক ধরে নাড়াল। চোখের পাতা টেনে স্বাভাবিক করতে চাইল। নাকের ডগা, কানের লতি ছুঁতে শীতলতা অনুভব করল। তারপর ঠেলে ওঠা দুই হাঁটু সজোরে চেপে মেঝেয় টান টান নামিয়ে দিতে দেখল, দুপা শ্বেত পায়ের গোড়ালি বেয়ে রক্তধারা নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। ওকে পাঁজাকোলা করে খাটে তুলতে বিপিনের রীতিমত কষ্ট হল। তারপর তোশকের তলা থেকে টিয়ে রঙের চাদরটা বের করে শেফালীর পায়ের ডগা থেকে গলা অবধি টেনে দিল।

দূরে গেঞ্জির কারখানায় পেটা ঘণ্টার পর পর বারোটা শব্দ জেগে উঠতে বিপিন অস্থির হয়ে উঠল। এতক্ষণ সে শেফালীর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। সে বুঝল, এভাবে চুপচাপ থাকলে চলবে না। অথচ কি করবে ভেবে থই পেল না। কানের দু পাশে রগগুলো দপদপ করে জ্বলছে। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। তার কান্না পাচ্ছিল। শেষে মনে হল, ব্যাপারটা বাড়িঅলাকে জানানো দরকার। এর চেয়ে বেশী কিছু সে ভাবতে পারছিল না। সুতরাং বিপিন এবার সামনের দরজার কাছে এগিয়ে এল। দু হাত বাড়িয়ে খিল ধরে হ্যাঁচকা টান মারতে দরজাটা বিশ্রী শব্দে ককিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার মেরুদণ্ডের ভেতর ঠাণ্ডা কিছু একটা নড়ে-চড়ে উঠল। বাড়িঅলাগিন্নী প্রায়ই তার ঘরে আসে। বিপিন দিন-রাত দোকানে। শেফালী একলা। বিপিনের ভয় হল, শেফালী যদি ওকে তার সম্বন্ধে সাত-পাঁচ কিছু বলে থাকে—

বিপিনের শরীরে কাঁপুনি ধরল। মগজের ভেতর এলোমেলো সব চিন্তা ছোটাছুটি করছে। বাড়িঅলা এমনিতে লোক মন্দ নয়। কিন্তু বেজায় ভীতু। সার্দা মুখে বিপিনের কথা তিনি শুনবেন। কিন্তু ঘটনাটাকে সহজে হজম করতে চাইবেন না। ভেতরে ঢুকে আড়ালে গিন্নীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তারপর বিপিনকে বসতে বলে নিঃশব্দে উঠে যাবেন দোতলায়। থানায় ফোন করবেন। কিছুক্ষণ বাদে পুলিসের গাড়ি এসে দাঁড়াবে সদর গেটের মুখে। বিপিনের ঘর তছনছ করবে। মাঝরাতে পাড়া জেগে উঠবে। চারদিকের বাড়িগুলোর দরজা জানলা ভেঙে নানা মাপের মুখ উঁকিঝুঁকি মারবে। হাতকড়া লাগিয়ে পুলিস ভ্যাকে গাড়িতে

ছুলাবে। শেফালীর লাশ যাবে পরে। সকাল হতে না হতে এ ফ্ল্যাটের ছেলে বুড়ো সকলের মুখে মুখে তার নামটা চলাফেরা করবে। দোকানে তালা পড়বে। তার কথা কেউ মানতে চাইবে না। ময়না তদন্তের পর রিপোর্ট আসবে, শেফালীর তলপেটে লাথির দাগ পাওয়া গেছে।

দরজায় খিল এ'টে দিতে বিপিনের গা থেকে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর নামল। বরাবর সে একটু দুর্বলচিত্ত। গুরুতর কোন বিপদে পড়লে সাধারণত শেফালীই তাকে সাহস যোগাত। অথচ এই মুহূর্তে ঘরে দাঁড়িয়ে শেফালীর দিকে তাকাতে তার ভয় হচ্ছে। দু হাতে খিলটা চেপে ধরে মাথা নিচু করে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়তে লাগল। তার ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শরীরটা ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসছে। শুধু মগজের ভেতর ভাবনাগুলো ক্রমাগত জট পাকিয়ে যাচ্ছে। থানা পুলিস লোক জানাজানি আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ফাঁসি—নাগরদোলায় চড়লে চারদিকের দৃশ্য যেমন দ্রুত ছোটে যায়, তেমনি এলোমেলো চিন্তা ক্রমাগত পাক খেতে লাগল।

সদর গেটের মুখে কোটালাড়ির সাড়া পেয়ে বিপিন খিল ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু পরে লোহার গেট খোলার শব্দ শোনা গেল। সে প্রায় লাফিয়ে চাবিতে আলোটা নিবিয়ে দিল। সুধীরের ভাঙা ভাঙা কথা শোনা যাচ্ছে। ও এবার বাগানে নেমেছে। দম বন্ধ করতে বিপিনের বুকের ওপর ভারি একটা কিছু হাঁটতে শুরু করল। হঠাৎ আলো নিভে যেতে ঘরটা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। সে আর স্থির দাঁড়াতে পারছে না। দোতলা বাড়ির দরজায় করাঘাতের শব্দ জেগে উঠেছে। বিপিনের দু হাত কখন গলার কাছে এসে জড়ো হয়েছে। সামনের দিকে চোখ পড়তে সে আঁতকে উঠল। তার মনে হল, অন্ধকারে আড়মোড়া ভেঙে শেফালী যেন উঠে বসতে চাইছে। দোতলা বাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা যেতে বিপিন অনির্দিষ্ট হাত বাড়িয়ে সুইচটা খুঁজতে লাগল। আলো জ্বলে উঠতে খাটে শেফালীকে নিস্পন্দ পড়ে থাকতে দেখে বিপিনের বুক থেকে অনেকখানি হাওয়া বেরিয়ে এল।

এর পর সে শেফালীকে পিছনে রেখে ঘরময় পায়চারি শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে সে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। এলোপাথাড়ি চলাফেরায় তার চলন্ত ছায়া মেঝে থেকে সিলিং-এ দ্রুত ওঠানামা করায় সে ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। অথচ থামাও যাচ্ছে না। কেননা, দাঁড়িয়ে পড়লেই মগজের ভেতর ভাবনাগুলো নড়েচড়ে উঠছে। রাত নির্জন হয়ে এলে বিপিন টলতে লাগল। শেষে একসময় কখন সে ঘরের এক কোণায় বসে পড়ল। দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গলিয়ে সে স্থির হয়ে

চাইছিল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছিল। স্নানঘরে আরশুলাদের ছোটাছুটির শব্দ, ঘুমভাঙা কাকের অস্ফুট ডাক, গেঞ্জির কারখানার পেটা ঘণ্টার আওয়াজ তাকে বারবার জাগিয়ে তুলছিল।

সকালে ঘর থেকে বেরুবার আগে বিপিন দরজা জানালা ঠিক ঠিক বন্ধ আছে কিনা দেখে নিল। শেফালীর খুব কাছে এগিয়ে গিয়েও ওকে ছুঁতে সাহস হল না। শেফালীকে আরো শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বিপিন লক্ষ করল, ওর চুলের রাশি খাট থেকে নিচের দিকে ঝুলে গেছে। আর চুল থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে মেঝের। দরজায় তালা লাগিয়ে গেটের কাছে আসতে অধীরের সঙ্গে দেখা।

বাড়িওলার বড় ছেলে। বাজার থেকে থলি হাতে ফিরছে। সে বললে, আজ যে এত তাড়াতাড়ি বিপিন?—দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে জলখাবার খেয়ে বিপিনের বেরুতে সাধারণত ন'টা সাড়ে ন'টা হয়। ইতিমধ্যে সোনারপুর থেকে গোপাল এসে যায়। ও-ই দোকান খোলে। অধীরকে পাশ কাটিয়ে কালভার্টে উঠে বিপিন ফস করে বলে ফেলল সামনে পুজো, তাই সকাল সকাল বেরুচ্ছি। —বড় রাস্তায় পড়ে বিপিন আর পেছন ফিরে তাকাল না। জোরে পা চালাল।

শরতের শুরু। সকাল হতে না হতে রোদের রং গাঢ় হয়ে উঠেছে। চোখ কড়কানো জ্বালা শুরু করল। প্রাইমারী স্কুল পিছনে ফেলে মদন মিত্রের বাড়ির কাছে এসে বিপিন রাস্তার কলের দিকে নেমে এল। মুখ ধুল। চোখে জল দিল। কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখ মুছতে শীত-শীত করতে লাগল।

রেল-গুমটির কাছে এসে বিপিন দাঁড়িয়ে পড়ল। উত্তরে শহরতলি, লোকালয়। দূরে স্টেশন দেখা যাচ্ছে। স্টেশনের ওপাশে বাজার। বাজারের মধ্যে তার ছোট দোকান। দোকানটা আজ বছর চারেকের। এর আগে সে ছিল বর্ধমানে। দক্ষিণে কোন বসতি নেই। দু পাশে নিচু জলো জমি। মাঝে-মধ্যে তাল খেজুর নারকেল ছড়িয়ে আছে। বিপিন দক্ষিণমুখো রেল-লাইনে নামল। বাঁ পাশ থেকে সকালের টাটকা হাওয়া উঠে আসছে। বিপিন পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাল। রাতের সব ঘটনা একে একে তার মনে পড়ে যাচ্ছে। একসময় শেফালীকে মনে পড়ে যেতে মগজের ভেতর পুরোনো চিন্তাগুলো কিলবিলিয়ে উঠল। দূরে রোদ্দুরের দিকে চোখ পড়তে সে ভাবল, এই পথ ধরে কোথাও পালিয়ে গেলে কেমন হয়। যেখানে ইচ্ছে, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার বা সুন্দরবন। দাড়ি গোঁফ রেখে চেহারায় ভোল পাল্টে নাম ভাঁড়িয়ে দিন কেটে গেলেই চলবে। এসব কথা ভাবতে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করতে লাগল। সে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে এগুতে লাগল। শেষে ডিসট্যাণ্ট সিগনালের কাছে এসে পড়তে সে দপ করে নিবে গেল। মগজের ভেতর থানা পুলিস ইত্যাদি ভাবনাগুলো চারিয়ে উঠতে সে থেমে গেল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

ডিসট্যাণ্ট সিগনাল থেকে স্টেশন অনেকটা পথ। ফিরে আসার সময় বিপিনের পা আর চলছিল না। হাঁটুর মুড়ো ভেঙে আসছিল। ফলে সে মাঝে মাঝে থেমে পড়ছিল। আকাশ মাঠ দূর বস্তির রৌদ্র রেল-লাইনের ধারের খাদের দিকে অর্থহীন তাকিয়ে সে অনেকটা সময় নষ্ট করেছিল। মাসের শুরু, দোকানে বেশ ভিড়। এক হাতে গোপাল সামলে উঠতে পারছিল না। বিপিন ভেতরে ঢুকতে এক খদ্দের হাঁক পাড়ল, কি ব্যাপার, আজ যে
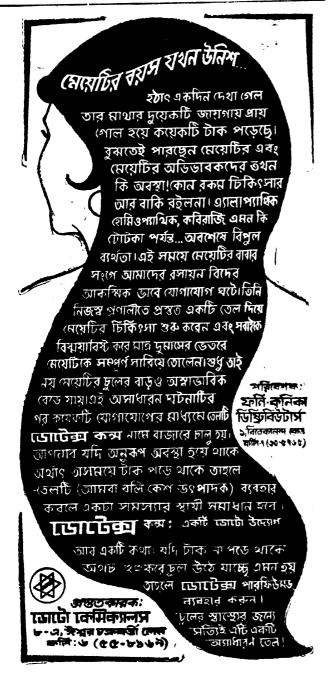
এত দেরি? বিপিন নীরবে ছোট করে হাসল। আর একজন বললে, একটা কনডেন্স মিল্কের কৌটো দাও তো বিপিন। আর হ্যাঁ, ভিকসের বড়ি আছে? বিপিন মাথা নাড়ল। বিপিন মুখ তুলে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না। কেননা, তার দু চোখ অস্বাভাবিক লাল, মুখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন, কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যেতে পারে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বিক্রিপাতি করার পর বিপিন হাঁপিয়ে উঠল। এক ঠায় সে বসে থাকতে পারছিল না। স্থির হয়ে বসলেই বুকের ভেতর ভারি কিছু একটা হোঁচট যায়, মগজের ভেতরকার ভাবনাগুলো ঠিলিক মেরে ওঠে। একসময় সে উঠে দাঁড়াল। গোপালকে বলল, তুই দোকান বন্ধ করে চলে যাস, আমি বেরুচ্ছি। রাস্তায় নেমে পড়বার আগে সে কাঠের তাক থেকে কয়েক প্যাকেট ধূপকাঠি সঙ্গে নিল।

নিমগাছ পেরিয়ে ঘরের দিকে এগুতে গিয়ে বিপিন থেমে পড়ল। বাড়িঅলার ছোট ছেলে মাধব পেছন থেকে তাকে ডাকছিল। মাধব এগিয়ে এসে বলল, একটা কথা ছিল যে। বিপিন চোখ তুলল। মাধব বলল, কাল ডায়মণ্ডহারবার যাচ্ছি, পিকনিক করতে। দু পাউণ্ড রুটি দরকার। মাইরি বিপিনদা, সে করে হোক ম্যানেজ করতে হবে। নইলে প্রেস্টিজ পাংচার।—বিপিন হাসবার চেষ্টা করে বলল, ঠিক আছে, সে দেবো এখন।—মাধব বলল, কি ব্যাপার এত ধূপকাঠি কেন?—বিপিনের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে সংক্ষেপে জবাব দিল, আজ বাবার স্ববাৎসরিক, তাই।—মাধব বলল, তা হলে ওই কথাই রইল। দেখো শেষটায় আমার বিপদে ফেলো না কিন্তু। বিপিন হাসতে গিয়ে থেমে গেল। মাধব শিস দিতে দিতে বাগানে নামল। মেরুদণ্ডের ভেতরে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠছে, বিপিন অবাক হল, কত অনায়াসে কিছু না ভেবে সে কেমন বানিয়ে কথা বলতে পারছে। অথচ কেউ তাকে ধরতে পারছে না।

ঘরে ঢুকে নিশ্বাস নিতে একটু আঁশটে গন্ধ পাওয়া গেল। বিপিন প্যাকেট ভেঙে ধূপকাঠি খুলল। একটা মুখখোলা কৌটার মধ্যে গোছাসুদ্ধ ধূপকাঠি বসিয়ে ধরাল, রাখল খাটের একপাশে। বাইরে ভরদুপুর। অথচ ঘরের ভেতর কি অন্ধকার। শেফালীকে ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। দরজা জানলা সব বন্ধ। বাতাস নেই, একটা গুমোট ভাব। একটা বিড়ি ধরাতে হাড় পাঁজরা ভেঙে কাশি এল। তাড়াতাড়ি বিড়িটা নিবিয়ে দেয়ালে হাত পড়তে বিপিন চমকে উঠল। একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। বিপিনের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। খাটে শেফালী শান্ত শুয়ে। তার মনে হল, বেশীক্ষণ এ ঘরে থাকলে সে-ও শেফালীর মত ধীরে ধীরে তাপহীন হয়ে পড়বে।

দরজা বন্ধ করে বাইরে আসতে বিপিন দেখল, বাড়িঅলার দারোয়ান পেছনের পথ ধরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। বিপিন মাথা নিচু করে বড় বড় পা ফেলে গেটের দিকে এগুতে লাগল। দারোয়ান পেছন থেকে ডাকল, বিপিনবাবু, মাইজী আপনাকে বোলাচ্ছে।—বিপিন ঘুরে দাঁড়াতে দেখল, দোতলার ঝুল-বারান্দায় রেলিঙে বুক ঠেকিয়ে বাড়িঅলা-গিন্নী দাঁড়িয়ে। বিপিন বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। বাড়িঅলা-গিন্নি বললে, একবার শেফালীকে পাঠিয়ে দেবে বিপিন!—বিপিন ঝরঝরে শব্দ তুলে বলল, শেফালী তো নেই! শরীর খারাপ বলে আজ সকালে ওর ভাই এসে নিয়ে গেছে।—বাড়িঅলা-গিন্নী বললে, সে কি! আমি ভেবেছিলাম ওকে দিয়ে একটু কাসুন্দি করাব। প্রথম পোয়াতি। ভাল আসা হবে।—বিপিন হাসবার ভান করল। তারপর একটু সময় নীরব দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল।

বিপিনের দোকানে পৌঁছুতে বিকেল ভেঙে এল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এতক্ষণ সে এপথ ওপথ লাট খেয়েছে। দোকানে আসতে আদৌ তার ইচ্ছে ছিল না। কালীতলায় রামায়ণ পাঠ হচ্ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর এক চায়ের দোকানে। সেখান থেকে পার্কে। কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারেনি। পরিচিত পথঘাট মানুষজন এড়িয়ে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত সে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছিল। ইতিমধ্যে গোপাল এসে কখন দোকান খুলেছে। ভেতরে ঢুকে সে স্থির বসতে পারেনি। ঝাড়ন নিয়ে অযথা আলমারী র‍্যাক পরিষ্কার করেছে। মাল-পত্তরের তত্ত্বতল্লাশ করেছে।

সন্ধ্যে হয়ে এলে খদ্দের কমে এসেছে। শহরতলি অঞ্চল। এ সময় ছেলে বুড়ো সবাই শহরের দিকে ছোটে। কিছুক্ষণ বিপিন মাসকাবারী হিসেবের খাতা নিয়ে বসে ছিল। হিসেব করতে গিয়ে বারবার ভুল হয়ে যাওয়ায় সে খাতা তুলে রেখেছে। ছোটখাটো ত্রুটির জন্যে বার কয়েক গোপালকে ধমকেছে। তারপর রাত একটু ঘন হয়ে এলে সে উঠে পড়েছে। গোপালকে বলেছে, আমি বাজার থেকে আসছি, তুই বস। দোকান থেকে রাস্তায় নেমে প্রথমেই তার মনে হয়েছিল, গোপাল কি তাকে সন্দেহ করছে? পরক্ষণে বিপিন মনে মনে হেসেছে। গোপাল ছেলেমানুষ, তেমন কিছু বুঝবার মত ওর বুদ্ধিই পাকেনি।

স্টেশনে এসে চায়ের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বিপিন এক কাপ ডবল হাফ চা খেয়েছিল। পেটে গরম জল পড়তে চাঙ্গা ভাবটা ফিরে এসেছিল। তারপর সে নির্জনতার লোভে ওভার ব্রীজের ওপর উঠে

পাড়েছিল। রাতের লোকজন ছিল না। ভবঘুরে ভিক্ষুক, চায়ের স্টলের বয়, যারা এখানে রাত কাটায়, তাদের আসার সময় হয়নি তখনো। বিপিন চোখ নামাতে দেখল, প্ল্যাটফরম প্রায় জনহীন। ক্বচিৎ দু-একজন লোক চোখে পড়ে। দু পাশের বাড়িগুলোর দরজা জানলা বন্ধ। শহরতলির এই ধাত। এক প্রহর রাত না গড়াতে চারদিক নিঝুম হয়ে আসে। ফুরফুর করে বাতাস বইছে। আকাশের দিকে চোখ পড়তে বোঝা গেল, অমাবস্যার আর বেশী দেরি নেই। সজল হাওয়ার প্রকোপে কপালের দু পাশের রগগুলোর দপ-দপানি কমে আসছে। মগজের ভেতরকার জটগুলো আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। নিচের জনহীন প্ল্যাটফরমের ম্রিয়মাণ আলোর দিকে চোখ পড়তে বিপিনের মনে হল, কাল রাত থেকে আজ সন্ধে পর্যন্ত যা যা ঘটনা ঘটেছে তা নেহাতই আজগুবী, যেন একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। এবং এ কথা মনে হতেই বিপিন চঞ্চল হয়ে উঠল। রাত তখনো নটা হয়নি। শেফালী এতক্ষণে রান্নাবান্না সেরে চুল আঁচড়াতে বসেছে। আজ এই সময় বাড়ি ফিরলে শেফালী রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। ইদানীং শেফালী তাকে খুব কাছে

পেতে চায়। অথচ কোন দিন সে সাড়ে দশটা এগারটার আগে বাড়ি ফিরতে পারে না। এ সময়ে বিপিনকে দেখে ও খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠবে। সারাটা রাত বুকের মধ্যে মিশে গিয়ে তাপ দেবে। বিপিনের তর সইছিল না। সে হুড়মুড় করে নিচে নেমে এল।

প্ল্যাটফরমের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরাতে মগজের ভিতর পুরোনো ভাবনাগুলো ফের প্যাক খেয়ে উঠল। সামনের জনহীনতায় চোখ মেলে দিতে বিপিন বুঝল, এতক্ষণ ওভার-ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে সে যা ভাবছিল, আসলে তার কোন বাস্তবতা নেই। এবং এ কথা মনে হতে সে রাগে বিড়িটা লাইনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জোরে পা চালিয়ে দোকানে চলে এল।

গোপাল তার অপেক্ষায় ছিল। বিপিন ভেতরে ঢুকে বলল, তুই চলে যা গোপাল, ট্রেনের সময় হয়ে এল। আর হ্যাঁ, কাল তোর ছুটি, আসতে হবে না।—বিপিন শেষের কথাগুলো বেশ জোর দিয়ে বলল। গোপাল মাথা নেড়ে রাস্তায় নামল।

মুটির গাড়ির আসতে বেশ রাত হল। গাড়ি রাস্তায় কোথায় খানায় পড়ে গিয়েছিল। মাল তুলে সব গুনে-গেঁথে হিসেব চুকিয়ে দোকান বন্ধ করতে এগারোটা বেজে গেল। দোকান থেকে বেরুবার সময় বিপিন একটা ওডিকোলনের শিশি আর এক বাণ্ডিল বড় সাইজের মোমবাতি সঙ্গে নিল।

ঘরে ঢুকে অন্ধকারেই বিপিন জামা-জুতো খুলল। প্যাকেট ভেঙে মোমবাতি জ্বালিয়ে মেঝের বসিয়ে দিল। কাল সারা রাত বাতি জ্বলেছে। বাড়িঅলা টের পায়নি। না পেলেও কিছু বলেনি। আজও আলো জ্বলছে দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। বেজায় কৃপণ লোকটা। হয়ত দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে মাঝরাতে এসে ডাকাডাকি শুরু করে দেবে। বিপিন শেফালীর শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল। আবছায়ায় স্পষ্ট দেখা না গেলেও বিপিন বেশ বুঝল, শেফালীর শরীর পচতে শুরু করেছে। দুপুরের আঁশটে গন্ধটা মজে গিয়ে এখন ওর কাছে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। সে শেফালীর চার পাশে ঘুরে ঘুরে ওডিকোলন ছড়াতে লাগল। ওডিকোলনের গন্ধে বমি আসছে। বিপিন তাড়াতাড়ি শিশি উপুড় করে সবটুকু ওডিকোলন ঢেলে দিয়ে ঘরের মাঝখানে চলে এল।

সদর গেটের আলোটা জ্বলছে। আজ রেসের দিন। বাজি জিতলে সুধীরের ফিরতে অনেক রাত হবে। বিপিন বিড়ি ধরাল। এই গুমোট ঘর, অন্ধকার, শীতল, খাটে টান-টান শুয়ে থাকা শেফালী, সব কিছু সে এখন সহজেই মেনে নিতে পারছে। সে বিড়বিড় করতে লাগল। যতীনের কথা বারবার বিপিনের মনে পড়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ওকে কাছে পেলে সে ছিঁড়ে ফেলত। সে-ই বিয়ের সম্বন্ধটা এনেছিল। বিপিনের ইচ্ছে ছিল না। যতীন জোরজবরদস্তি করে তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছিল।

গেঞ্জির কারখানার পেটা ঘণ্টায় একটা বাজল। সুধীর ফিরছে না। সুধীর দুশ্চরিত্র মাতাল। বাড়িঅলার একসময় ক্যানিং স্ট্রীটে গদি ছিল। কালোবাজারে বিস্তর পয়সা কামিয়ে লোকটা এই জমি-বাড়ি করেছে। অধীর বাদে আর সব ক'টা ছেলেই অপদার্থ। এখন পাপের ফল ভোগ করছে লোকটা। বিপিন ঘরময় থুথু ছিটোতে লাগল। শেফালীর ওপর তার রাগ হচ্ছে। দু' বছরের সংসার। শেফালীকে ভাল রাখবার জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। ওর যখন যেটা বায়না, আজ শাড়ি, কাল গয়না, পরশু সিনেমা, সাধ্যমত যুগিয়েছে। ইদানীং ব্যবসার অবস্থা খারাপ। চারদিকে দেনা। যে-কোন সময় দোকান লাটে উঠতে পারে। সে শেফালীকে কিছুই জানতে দেয়নি। তবু ও অশান্তি করেছে, সন্দেহ করেছে। বিপিন মোমবাতি পালটাল। মুখের ভেতরটা বিস্বাদ লাগছে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সে পিচুটি তুলল। এইজন্যে সে বিয়ে করতে চায়নি। এই দু' বছরে সে কতটুকু শান্তি পেয়েছে। শেফালী কখনো তাকে বুঝতে চায়নি। মেয়েমানুষ জাতটাই স্বার্থপর। দিন-রাত পশুর মতো খাটো। টাকাকড়ি সব পায়ে ঢালো। তবু যদি একটু সুখ পাওয়া যেত।

সুধীর ফিরল অনেক রাতে। বিপিন সতর্ক ছিল। লোহার গেটে শব্দ উঠতে সে এক ফুঁয়ে মোমবাতি নিবিয়ে দিল। দোতলা বাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনার কিছু পরে ফের মোমবাতি জ্বালাল। এইটুকু সময়ের ভেতর সে একটা ফন্দি এঁটে ফেলল। এর জন্য মনে মনে সে শেফালীকে তারিফ করল। কেননা, শেফালীই এ বাড়িটা পছন্দ করেছিল। বিপিন হাতে হাত ঘষল। শব্দ করে পিচ কাটলো। পেছনের দরজা খুলে শেফালীকে পাঁজাকোলা করে উঠোনটুকু পার হওয়াতে যা ধকল। তারপর কলাঝোপের ভেতর দিয়ে জলো জমিতে নেমে পড়া। বর্ষার জলে এখন ও-দিকটা থইথই করছে। খুবে একটা মেহনত নেই। অন্ধকারে কিছুটা এগিয়ে কচুরিপানার নিচে কাদার ভেতর পুঁতে দেওয়া। তারপর বর্ষার জল শুকুতে পুজো পেরিয়ে শীত এসে যাবে। ততদিনে শেফালী মাটির তলায়, খুঁজেও হদিস মিলবে না।

বিপিন পায়চারি শুরু করল। কিছুটা সময় অপেক্ষা করা দরকার। আর ভাবতে লাগল, কয়েক দিন বাদে সে বাড়িঅলা-গিন্নীকে জানিয়ে দেবে, তার ছেলে হয়েছে। এদিকে তলে তলে সে দোকান বিক্রির চেষ্টা করবে। দর-দাম ঠিক হলে বাড়িঅলাকে বলবে, ব্যবসাপাতির অবস্থা খারাপ। সে বাইরে চাকরি পেয়েছে। ঘরটা ছেড়ে দিয়ে রাতারাতি দূরে কোথাও চলে যাবে।

শেফালীকে বের করবার আগে সে পেছনের দরজা খুলল। চারদিক একবার পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। উঠোনের দিকে চোখ পড়তে বিপিন অবাক হয়ে গেল। দেখল, ও-বাড়ির ঝুলবারান্দা থেকে এক ঝলক তীক্ষ্ম আলো উজ্জ্বল বর্শা-ফলকের মতো ছুটে এসে তার উঠোন পেরিয়ে লেবু-গাছের দিকে চলে গেছে। উঠোনে নামতে দেখা গেল, শুধু ঝুলবারান্দায় নয়, বাড়ি-অলার ঘরেও আলো জ্বলছে। বাড়িঅলা ব্লাডপ্রেসারের রুগী। হয়ত একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। বিপিন একবার ভাবল, এগিয়ে গিয়ে দারোয়ানকে ডেকে ব্যাপারটা কি হয়েছে জিজ্ঞেস করবে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে শেফালীর কথা মনে হতে সে পেছিয়ে এল। আলো বাঁচিয়ে উঠোনের কোণায় এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকাতে দেখল, অগুনতি তারা নিঃশব্দে জ্বলছে। কলা-ঝোপের মাথায় কালপুরুষ দাঁড়িয়ে। কোমরে ছোরা, পা দুটো ছড়ানো। উদ্ধত, নিশ্চল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অন্ধকারে লেবুগাছের পাতা নড়ছে। বিপিন বুঝতে পারল না রাত কত।

ঘরে ঢুকতে মাথায় রক্ত চড়তে শুরু করল। পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাওয়া চলবে না। উঠোনের ধারালো আলোপথ-টুকু পেরুবার সময় দোতলা থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। রাগে ক্ষোভে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে। সকাল হতে আর কতটুকুই বা বাকি। শেফালীর পচন ধরেছে। রাতের মধ্যে ওকে পাচার করতে না পারলে সমূহ বিপদ। গত রাতের পুরোন ভাবনাগুলো মগজের ভেতর পাক খেতে শুরু করেছে। বিপিন শেফালীকে উদ্দেশ্য করে একটা অশ্লীল গালাগালি দিয়ে উঠল।

তারপর এক সময় চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। তার দুচোখ শিকারী বেড়ালের মত জ্বলছে। সে এক লাফে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে এল। ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে বঁটির বাঁট থেকে ফলাটা খুলে নেবার সময় একটা প্রকাণ্ড গাছের মত তার শরীর কাঁপছিল। বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠছিল। বড়ঘরে এসে লোহার ফলাটা শেফালীর শিয়রের কাছে রেখে সে ঘন করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর খাটের পাশে বসে পড়ল। শেফা-লীর গলা থেকে চাদরটা ছাড়িয়ে নেবার সময় তার হাত এসে তলপেটে থামল।

নিবিড় করে পেটে হাত চেপে ধরতে সে বুঝতে পারল, শেফালীর বাচ্চার শক্ত মাথা সে স্পর্শ করছে। বিপিনের শরীরের ভেতরকার অসংখ্য ঝাঁঝরি দিয়ে ঝরনা-ধারার মত রক্ত স্রোত নিঃশব্দে নিচের দিকে নেমে যেতে লাগল। বুকের তলা থেকে খানিকটা বুদ্‌বুদ জেগে উঠল। দিনের বেলা দুজনের মধ্যে বনিবনা না হলেও রাতে আলো নিবিয়ে বিছানায় উঠে শেফালী তার খুব কাছে চলে আসত। পেটে বাচ্চা আসবার পর থেকে শেফালী বিপিনকে কাছে পেতে চাইত। অন্ধকারে তার একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের তলপেটে চেপে ধরে শেফালী বলত, দেখ, দেখ, তোমার বাচ্চা কি রকম নড়ছে। এই, এই যে পা—। কোনদিন বলত, এই যে মাথা। বুঝতে পারছ না?—শেফালীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপিন পাশবালিশটা টেনে দুজনের মাঝখানে রেখে পাশ ফিরে ধমকের সুরে বলত, দাও, এবার ঘুমোতে দেখি। কেবল বকর বকর।—আসলে বিপিনের ভয় হত, ঘুমের ঘোরে সে যদি ওর পেটে গুঁতো মেরে বসে। একদিন সে বাচ্চার স্বপ্নও দেখেছিল।

বিপিন তলপেট থেকে খুব আলতো করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। শেফালীর মত তার শরীর ধীরে ধীরে তাপ-হীন হয়ে পড়ছে। একদমক কান্না বুক ঠেলে বেরুতে চাইছে। সে অনেক কষ্টে শেফালীর শিয়রের কাছে চলে এল। মোমবাতিটা বাঁহাতে তুলে নিল। গলায় হাত রাখতে টের পেল, শেফালীর শরীর শীতলতায় টলটল করছে। তারপর মোম-বাতিটা ওর মুখের কাছে ধরতে বিপিনের চোখ আর্দ্র হয়ে এল, দুই ঠোঁট তিরতির করে কাঁপতে লাগল। সে শেফালীকে চিনতে পারছে না। সেই শেফালী—দু বছর আগে বনগাঁ থেকে বিয়ে করে এই ঘরে এনে তুলে-ছিল, যার টানা-টানা উজ্জ্বল দুই চোখ, তীক্ষ্ম চিবুকে হাসির আভা, ছোট কপাল, পাতলা ভ্রু, ফোলা-ফোলা গাল, কাঁচা হলুদের মত রং। আর এখন, বিপিনের গলা ঠেলে এক দমক বোবা আর্তনাদ বেরিয়ে এল, দুই চোখ বসে গিয়ে দেখা যাচ্ছে না, গাল আর কপাল ভেঙে মাথার দুপাশে হাড় বেরিয়ে পড়েছে, কানের পাতা নেমে এসেছে, নাক বেবে গেছে।

এমন সময় বাইরে মাধবের গলার আওয়াজ শোনা গেল। সে ডাকছে, বিপিনদা, ও বিপিনদা।—বিপিনের বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। মুখ তুলে তাকাতে দেখল, দেয়ালের অনেক উঁচুতে সিলিং ভেদ করে সকালের রোদ এসে জমেছে। মাধব মুটির জন্য এদিকে আসছে। ও এখন বাগানে। বিপিন বুঝল, মাধব ডাকতে ডাকতে নিমগাছ দুটো পেরুবে। তারপর দরজার কাছে এসে কড়া নাড়তে শুরু করবে। ভিতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নাছোড়বান্দা মাধব পশ্চিমের জানলার কাছে এগিয়ে এসে খড়খড়ি তুলে চেঁচাবে।

কিন্তু, এই মুহূর্তে বিপিনের ওঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তার সমস্ত শরীর এখন একতাল মাংস পিণ্ডের মত অসাড়। বিপিন মোমবাতিটা নামিয়ে শেফালীর দিকে ঝুঁকে এল। সে আরো কিছুটা সময় পাচ্ছে, অন্তত এইটুকু সময়—যতক্ষণ না পশ্চিমের জানলার খড়খড়ি নড়ে ওঠে, শেফালীকে দেখবার। হাতের মোমবাতিটা কাঁপছে। আলো-ছায়ার গভীর দৃষ্টি ফেলে বিপিন শেফালীকে দেখতে লাগল।

"দল বেঁধে নয়, আমার কিন্তু একাই বেড়াতে ভাল লাগে..."। এমন বেশ কিছু নতুন কথা শুনিয়েছেন জাপানের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ইওকিও মিসিমা এবার ভারত ঘুরে এসে।

"দারিদ্র্য, খাদ্যাল্পতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি—এমন কত কি সমস্যা-ভরা এক অসহায় ভারতকে দেখব বলে সেখানে গেলাম, তাকে প্রত্যক্ষ করে নতুন এক অনুভূতি বুকে করে ফিরে এলাম যা আমার যাবার আগের সাজানো চিন্তাধারাকে নির্মূল করে দিয়েছে।"

বাণিজ্যিক কারণের উপর ভিত্তি করে যে-সব জাপানবাসী ভারত ঘুরে এসেছেন তাঁদের মুখ থেকে আমি অনেকবার অনেক-রকমভাবে আমার দেশের দোষগুণ শোনবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। যেমন জাপানী [illegible] কিছুক্ষণ কথা বললেই বুঝতে পারি—তিনি খাঁটি ভারত প্রত্যাগত..."। কিছু দিন থাকলে আপনিও বুঝতে পারবেন, একজন শিল্পীমনা জাপানবাসীর সঙ্গে একজন বিদেশ প্রত্যাগত জাপানবাসীর কতটা তফাৎ। এ ধরনের চারিত্রিক পরিবর্তনের ছাপ অবশ্য সব দেশের মানুষেরই কিছু না কিছু আছে। তবে রুচির দিক থেকে সেখানে পার্থক্যটা বড় হলো এই যে, সাহিত্যিক মিসিমা সান্-এর দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে এক নতুন স্বাদ বহন করে এনেছে। শুনিয়েছেন পুরোনো কথা নতুন করে আজকের জাপানের সামনে, ধারাবাহিক ভারত প্রত্যাগত জাপানবাসীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কোথায় তা আপনারাও বুঝতে পারবেন।

প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ওঁর সাহিত্যের ভঙ্গিতে যে রস ও স্বাদের সৃষ্টি হয়েছে, আমার বাংলা তর্জমায় সেই স্বাদের অপলাপ ঘটবে। তবুও চেষ্টা করব তাঁর বক্তব্যটুকু তুলে ধরবার।

"ভারত উন্মুক্ত স্বচ্ছ, যে-কোন দৃষ্টিকোণ থেকে। কদর্যকে ঢেকে নিজেকে বাহ্যিক সাজে সাজাবার কোন প্রচেষ্টা নেই। জীবন-মৃত্যু, এমন কি আজকের ভারত সম্বন্ধে সকলের রেওয়াজী চলতি কথা "দারিদ্র্য", তাও খোলা রয়েছে চোখের সামনে। সকলকে ডেকে যেন বলছে—আমার উন্মুক্ততায় আমাকে উপলব্ধি কর—প্ররোচনা নেই।

"প্রথমেই শহর বম্বে। সত্যিই সুন্দর শহর, সাজানো-গোছানো ঠাসাঠাসির মধ্যেও এমন সৌন্দর্য আশ্চর্য করে বইকি! এর যে-কোন একটা দিককে তুলে ধরে আলাদা করে দেখ, মনে হবে একটা ছবি। তারপরেই এসো গেটওয়ে অব্ ইন্ডিয়ায়। সমুদ্রকে সামনে রেখে দু' হাত বাড়িয়ে সে ডাকছে সকলকে। উন্মুক্ত সে পথ তার বিশালতায়। কোন একদিন ইংল্যান্ডের রানীর জাহাজ এসে নোঙর নামিয়েছিল এইখানে। প্রথম ভারতের মাটিতে পা রেখেছিলেন সেদিনের অধীশ্বরী। একে কেন্দ্র করেই চারিদিকের বড় বড় বিল্ডিংগুলো আকাশ ছোঁবার চেষ্টা করছে; নিঃশব্দ হচ্ছে বারবার আরব-সমুদ্র থেকে ছুটে আসা লোনা হাওয়ায়। তারই

ভারত সফরকালে ইউকিও মিসিমা : চোখে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি

চকচকে পাথরে কোনো শরীর নিয়ে নানান রঙের শাড়ি পরে ভিড় করছে যুবতীর দল। কারোর মাথায় ছোট ছোট টুকরি, ছিটকে ছিটকে দাঁড়িয়ে আছে ভিখারি ছেলেগুলো, আবলুশ-কালো মানুষের গায়ে ধবধবে-সাদা পোশাকগুলো আমার চোখে আমেজ আনছিল। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, যেন রঙের হাট বসেছে। এই কিন্তু সব নয়।

"নিউ ইয়র্ক দেখেছি। মানুষ যেন রাস্তা দিয়ে খাড়া হয়ে সামনের দিকে চলবার জন্যই সৃষ্ট। কিন্তু এই বম্বে শহরের রাস্তা শুধু মানুষের হাঁটবার জন্যই নয়। কেউ এগোচ্ছে, কেউ পেছোচ্ছে; কেউবা ঘুমুচ্ছে। আবার সংসার পেতে খাবার যোগাড় করছে; কলা খেয়ে খোসাটা যেখানে খুশি ফেলছে। ছোট ছেলের দল ওরই মাঝে কেমন হুড়োহুড়ি করছে। তারই এক পাশে একটু উঁচু ঢিবির উপর বসে আছে বুড়োর দল। চোখে সব লোকের দৃষ্টির মাঝে নির্বিকারত্বের রেশ। মনে হল এদের উদ্দেশ্য যেন সমস্ত জীবন দিয়ে একটা ছবি আঁকা। তাদের এই চলা-ফেরা একে অপরের ব্যবধানে শুধু ছবির এক-একটা আঁচড়। প্রতি মুহূর্তে এ যেন একটা সম্পূর্ণতা পাচ্ছে, পরক্ষণেই হারিয়ে যাচ্ছে আবার নতুনের সন্ধানে।

"এইখানেই তো জীবনের সব থেকে বড় পরিপূর্ণতা, যা প্রতি মুহূর্তের পরি-বর্তনে নতুন নতুন রূপ পাচ্ছে। ক্যামেরার [illegible] মানুষ যদি এই চারিদিকে একটা সুন্দরের কাঠামো খাড়া করে, [illegible] উঠবে পটে বাঁধানো ছবি। [illegible] এই কথায় মনে হয় যে [illegible] নিজস্ব সত্তায় ছবির সৃষ্টি না করতে পারে সে জীবনপ্রবাহে কোন প্রাণ নেই, কোন মূল্য নেই।

"আমার [illegible] অভিমত, ভারতই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে নারীর মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় সত্যকারের সৌন্দর্য যা মানুষকে আবদ্ধ করে রাখে পবিত্রতায়, এর কোন [illegible] আমি করছি না, বলতে চাইছি না [illegible]। এ আমার [illegible] Number one Land of Beauties। আমাদের জাপানে একটা চলতি কথা আছে, [illegible] সুন্দরীকে খুঁজে পাবে প্রাচীন উন্মুক্ততার অতুলনীয় ঐশ্বর্যে মহীয়ান। কিন্তু ভারতে যে দিকে তাকিয়েছি, সে গ্রামই হোক আর শহরই হোক, নারীর সৌন্দর্যের কোন ব্যতিক্রম নেই! সবখানেই সে তার নিজস্ব সত্তায় একই প্রতিভায় দীপ্ত, কোথাও এতটুকু কার্পণ্য নেই।

"পুরাকালের নিশ্বাস রুদ্ধ করা সৌন্দর্যের তুলনা আজকের আধুনিক সাহিত্যিক কেউই কল্পনা করতে পারে না। বলতে পারা যায় যে যুগের ত্রিলোকের সৌন্দর্যকে কেউই কোনদিন বলতে চায় না। তবুও আমার সে কথা [illegible] মনে হয়েছে। যে দিক দেখেছি [illegible]

[illegible] সেই নর্তকী মেয়েটি, [illegible]

আসবার সুযোগ হয়েছিল, আলাপের পর আমায় এমন মুগ্ধ করেছিল যে, মনে হয়েছিল—কেমন হয় একে আপনে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে। সেই গ্যেটের Eastern Poems-এর কলিগুলো বারবার মনে উঁকি দিচ্ছিল। দেহের সমস্ত বক্ররেখা ফুটে উঠেছিল তার জড়ানো শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে, কলির মত বাহুলতা তারই মাঝে নিজস্ব উন্মত্ততায় আন্দোলিত হচ্ছিল; উদ্ধত গ্রীবাভঙ্গি, চটুল কটাক্ষ, ওষ্ঠাধরের নীরব আবেদন ও সর্পিল গতিবেগ তাকে আরও মোহময় করে তুলেছিল। সে যেন কোন্ ফুলে ফুলে মধু খাওয়া সাধনা-মেলা একটা প্রজাপতি।

"গংগা—এই সেই প্রবাহ। কত উচ্ছ্বাস, কত দুঃখ-আনন্দ, আশা-হতাশা, যা একটা জীবন বয়ে বেড়িয়েছে কত সংগোপনে কত আপনার করে, তাকেও শেষে বিসর্জন দিতে হয়েছে এরই কোলে। সেখানে পরিত্রাণ নেই কারোর; আবাহনই কর আর অবহেলাই কর, মৃত্যুকে একদিন গ্রহণ করতেই হবে।

"গংগাকে প্রত্যক্ষ করে মনে হয়েছে, সেই কোন্ কালাতিকাল থেকে জীবন ও প্রকৃতিকে সে একই বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। তাকেই কেন্দ্র করে যে বিশাল আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মাধ্যমে এক এমন জাগতিক ধর্মীয় প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে, ভাবি নি এমন করে তাকে উপলব্ধি করব।

"গংগার পশ্চিম তীর, পুণ্য বারাণসী। অর্ধচন্দ্রাকারে সমস্ত নদীটা কিছু বলবার জন্য যেন মুখ ঘুরিয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে কত মানুষ ছুটে আসছে, এই পুণ্য সলিলে অবগাহন করে তারা তাদের দেহ-মন পবিত্র করবে। প্রভাতের প্রথম দিবাকরের অভিষেককে প্রণাম করবে সমস্ত অন্তরের ভক্তিটুকু দিয়ে, দিনের প্রথম পদক্ষেপকে জানাবে স্বাগত।

"ঠিক তার পাশেই প্রজ্বলিত অগ্নি সহস্র মুখবিস্তারে সমস্ত পাপপুণ্যকে একাকার করে জীবনের শেষ অস্তিত্বের বিলোপ ঘটাচ্ছে। "মানুষের পক্ষে এই হচ্ছে 'সংসার' অস্তিত্বের শেষ। তারপর সেই পূতচিহ্নের অবশেষটুকু মাতৃস্বরূপা গংগার পবিত্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

"অবশ্য হবে না তিন বছরের কম সময়ের একটা পাথরে বেঁধে তাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। নদীর তীরেই সারি সারি সেই পাথরের বেদীতে বসেছে।

"Hinduism is a religion of sacrifice." নিজেকে সব কিছু সত্তার মাঝে উৎসর্গ করাই হিন্দুত্বের মূল মন্ত্র। এর এমন অনেক প্রচণ্ড নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। তারই সাধারণ নিদর্শন এসে দাঁড়িয়েছে ছাগশিশুর বলিপ্রদানে। বাংলাদেশের শক্তিপূজায় এর এক চরম নিদর্শন। কালী এক রুদ্ররূপিণী ভয়াল মাতৃমূর্তির কল্পনায় বিভোর। কলকাতায় কালীবাড়ি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিরিশ থেকে চল্লিশটি ছাগ-শিশু প্রতিদিন বলিপ্রদত্ত হচ্ছে। মহাপূজোর বিশেষ তিথিতে এর সংখ্যা অদ্ভুতভাবে বেড়ে চলে। এই প্রাত্যহিক বলিদান লোকচক্ষুকে আপনা থেকেই নির্বিকার করে তুলেছে। এই হচ্ছে উৎসর্গ—আমার মনে হয়, এখানেই একমাত্র এক উন্মত্ততায় উৎসর্গকে তুলে ধরা হয় সকলের সামনে। সদ্যস্নাত ছাগ-শিশুটির সেই হৃদয়বিদারী চিৎকার, অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় তার উপর দৈহিকশক্তির প্রকাশ ক্ষুরধার খড়্গের ঝিলিক দিয়ে লাফিয়ে-ওঠা, তারপর রক্তাপ্লুত দ্বিখণ্ডিত দেহের থরথর কম্পন, সব মিলিয়ে নৃশংস উল্লাসের এক বাস্তব প্রকাশ। মনে হল সমস্ত রিপুকে এক-

সঙ্গে করে একের উৎসর্গে সব শেষ হয়ে গেল—যার পিছনে লুকিয়ে আছে মানব-চিন্তাধারার এক অতি সূক্ষ্ম প্রকাশ।

"যেখানেই গেছি, দেখেছি বৌদ্ধধর্মকে খর্ব করবার একটা অদ্ভুত প্রচেষ্টা। এটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি যে, ধর্ম মানসিক মনস্তত্ত্বে মহীয়ান, যেখানে দর্শনের পরিপূর্ণ বিকাশ, বিশ্বময় যার একটা বিশাল প্রকাশ, কেন সব সময় বৌদ্ধধর্মকে তার নিজস্ব মৃত্তিকা থেকে বার বার উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছে।

"দারিদ্র্য—জীবন ও মৃত্যু একই বৃন্তে দু'টি পরিপূর্ণতা। তারই সঙ্গে আপন হয়ে জড়িয়ে গেছে এই দারিদ্র্য। যে ধরনের দারিদ্র্য আজ ভারতবাসীর জীবনে দেখা দিয়েছে তার সবটুকুই ভারতের আধ্যাত্মিক সমস্যার কারণ কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাকিয়ে দেখলে দেখব, সেখানে ধর্ম, দর্শন, মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা এমন অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতিই নিজ নিজ প্রকাশে সমস্যা হয়ে মানব-জীবনে দেখা দিয়েছে। কতটা ক্ষুধার্ত সে চিন্তার ঊর্ধ্বে আর এক চিন্তাধারা কাজ করছে—গো-হত্যা করো না। উত্তর ভারতে বহু ভারতবাসী আছেন যাঁরা নিরামিষভোজী। বোম্বাই প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে আমি এক সম্প্রদায়কে দেখেছি যাঁরা ভগবান বিষ্ণুকে মৎস্যাকারের উদ্দেশ্যে চিন্তা করেন। এর উপর ভিত্তি করে তারা মৎস্য-ভক্ষণে বিরত। কিন্তু সেই জায়গায় চারপাশে মাছের প্রাচুর্য। এমনই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় একজন বিদেশী পর্যটককেও এদের চিন্তাধারা, এদের দর্শনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে—তখনই বাইরে থেকে যা আশ্চর্য মনে হয়, একটু মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারায় তা সাধারণ মনে হয়।

"অরণ্যের রাস্তার দু' ধার। সারি সারি গাছ। প্রশান্ত নীরবতায় তারা যেন সকলকে ডাকছে আপন করে পেতে। এ-পথে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি অনেকবার এমনই ছায়াঘন নীরবতায়। মিষ্টি হাওয়া গাছের নীচে যেন মনে গভীর আঁচল বিছিয়ে ডাকছে; যে ছায়া শুধু ক্লান্তির বিশ্রাম বলেই জানতাম তাকে চোখ ভরে দেখেছি, কি যেন এক তৃপ্তির নেশা আমায় বারবার ছুঁয়ে গেছে। দুপুরের রোদ—দু'-একটা নেউল ছুটে রাস্তা পার হচ্ছে, লম্বা লেজ নিয়ে বানরগুলো এ-গাছ ও-গাছ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। গাড়ি থামিয়েছি, গাছের ছায়ায় বসে খাবার বার করেছি, এদিক-ওদিক ছিটিয়ে দিয়েছি কিছু কিছু। গড়ানো সভ্যতার রূপটাকে মন থেকে টেনে বার করে অর্ধ-উলঙ্গ করেছি, নীরবতার নিরবচ্ছিন্নতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। সেই গাছগুলো ওদের ঘন-সবুজ পল্লব দিয়ে নিজেদের সাজিয়ে আমায় ডেকে বলেছে—আমাদের কি শুধুই দেখবে, এস বিশ্রাম কর, নিজের ভাবনাতে নিজেকে দেখ। ঔরঙ্গাবাদের রাস্তার দু' পাশের ঘন-পল্লবিত মহীরুহ-বীথি আমি কোনদিন ভুলব না।

"হিন্দুধর্ম—একটা প্রাণস্পন্দন, কোন অদৃশ্যকায় বিশাল স্বর্গচক্র, যা মানুষ আর প্রকৃতিকে একাকার করে সমস্ত ভারতবাসীর জীবনপ্রবাহে নিয়ত ঘূর্ণায়মান—যার স্তব্ধতা সমস্ত জাতির স্তব্ধতাকে বয়ে আনবে।

"এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ভারতের সামনে আজ অনেক সমস্যা। তার যে-কোন একটাকে তুলে ধরে বিশদভাবে বিচার করলে দেখব, তার সমাধানের পথ বড়ই জটিল।

"সাহিত্যকেই যদি ধরা যায়, কম করে পনেরটা ভাষা তাদের নিজের নিজের সাহিত্য নিয়ে হাজির হবে, দাবি জানাবে জাতীয় সাহিত্যের মূল্যায়নে। সংহতি বজায় রেখে তুলনামূলক বিচার সেখানে অবশ্যই কষ্টসাধ্য।

"Poet Tagore"-এর নিজের জন্মস্থান এবং নিজস্ব ভাষা 'বাংলা'। সেখানে আমার কিছুসংখ্যক কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে মিশবার, জানবার এবং ভাবের আদান-প্রদানের কিছুটা সুযোগ হয়েছিল। যদিও আমি সেসব কবিতা বা লেখা ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমেই জানবার চেষ্টা করেছি, যাতে ভাবের এবং রসের অনেক হানি ঘটা স্বাভাবিক। তবুও তাঁদের সাবলীল সরল এবং সুন্দর চিন্তাধারা আমায় মুগ্ধ করেছিল। আমি তারই দু'-একটা ইংরাজী অনুবাদ সঙ্গে এনেছি, ইচ্ছে আছে জাপানী ভাষায় অনুবাদের।

"সব কিছু প্রত্যক্ষ করে আমার এটাই মনে হয়েছে যে, ভারতে বোধ হয় সত্যকার কোন সমস্যা নেই। থাকলেও তা সমাধান করা খুব একটা শক্ত নয়। সমস্ত সমস্যাগুলি একে অপরের সঙ্গে এমন করে জীবনধারায় গা মিলিয়ে আছে যে, তাদের বাদ দিয়ে ভারতীয় জীবন যে কল্পনাতেই আসে না। যদি সমস্যার সমাধান মানে সমস্ত সমস্যাকে দূর করে দেওয়া হয়, তা' হলে তেমন সমাধান সত্যই বুঝি ভারতবাসীর দরকার নেই। ভারতীয় জীবনের সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশে সমস্যাও একটা অঙ্গ, তাই সমস্যাকে বাদ দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। এমনই এক চিন্তাধারাকে সামনে রেখে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ভারতে সম্পূর্ণ আলাদা করে সমস্যা বলে কিছু নেই। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস দেখলে দেখব, ভারতবাসী বাধাবিপত্তি আর সমস্যাগুলোকে দু' পাশে রেখে কেমন তাদের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে; একে অপরকে জেনেছে, চিনেছে, তারপর তারা এক প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে একে অপরের সঙ্গে লীন হয়েছে। তারই উপর ভিত্তি করে অনেক উত্থান-পতনকে প্রত্যক্ষ করে সৃষ্টি হয়েছে হিন্দুধর্মের মহান্ প্রকাশ।

"নব-জাগরণ—যদিও আজকের ভারত পৃথিবীর বাস্তব দৃষ্টির বিচারে সামগ্রিকভাবে অনেক পিছিয়ে আছে; তবুও আজকের পৃথিবীর কাছে এটা একটা বিরাট উদাহরণ বা আদর্শ যে, ভারত তার পুরনো ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে পৃথিবীর এত

উত্থান-পতনেও নিজস্ব একটা পথ করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এর যে ব্যাখ্যাই হোক না কেন, যে মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবী তার কলকবজায় দানবীয় শক্তি নিয়ে মেতে উঠেছে, তখন ভারত তার নিজস্ব ঐতিহ্যে এক মহান আধ্যাত্মিক রূপ নিয়ে সকলকে পথ দেখাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এ এক বিশেষ মূল্য সমগ্র মানব-জাতির কাছে বহন করে আনবে বলেই আমার বিশ্বাস। উগ্র আধুনিক সমাজ থেকে ছুটে এসে যখন আমেরিকার আজকের কোন যুবককে দেখেছি বারাণসীর গঙ্গার ঘাটে অবগাহন সেরে এক গণ্ডূষ জল হাতে প্রার্থনা জানাচ্ছে—আমার সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে।

"ভারতীয় চরিত্রে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশে যে নতুনের সৃষ্টি হয়েছে তা আমাকে অনেকখানি আকর্ষণ করেছে। নিজেকে এবং নিজের মতামতকে প্রাঞ্জলভাবে অপরের কাছে উজাড় করে দেবার একটা ইচ্ছা দেখেছি সকলের ভিতরেই কিছুটা বিদ্যমান। তাতে যে সময়ের প্রয়োজন হোক না কেন। সে আলোচনায় হয়ত এসে পড়বে দর্শন-রাজনীতি-শিল্প এমন কত কি—কিছুরই সেখানে বাদ নেই। এইখানেই জাপান-বাসীদের সঙ্গে কিছুটা তফাত। একজন জাপানী নিজের মতবাদের প্রতিবাদে প্রতি-পক্ষকে এড়িয়ে চলে, একজন ভারতীয় সেখানে প্রবলভাবে নিজেদের যুক্তি তুলে ধরে।"

Prof. Chic Nakane-র কোন এক উক্তিকে বলা হয়েছে :

"...compare the communities of Japanese and Indians as two diametrically different types of community, suppose the former is compared to a vertical type, the later is a horizontal type...."

এর উত্তর দিতে গিয়ে মিসিমা-সান বলেছেন—"এটা আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা একটু মুশকিল। সাধারণভাবে জাপানকে যদি একটা যে-কোন প্রদেশের সঙ্গে তুলনা কর, ধরা যাক বাংলাদেশ, তা' হলে হয়ত ততটা বৈসাদৃশ্য চোখে পড়বে না। কিন্তু ভারত এত বড় এবং এত ভাষার সমন্বয় যে, সেখানে জাপানের মত একটা ক্ষুদ্র দেশ—স্বল্প জনসংখ্যা এবং একই ভাষায় ভাবের আদান-প্রদানে অভ্যস্ত, একটা দেশের ভাব-ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেই ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।"

চীন ও ভারতের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এক জায়গায় বলেছেন, "ভারতকে চীনের সঙ্গে সীমারেখা টানতে হয়েছে স্থলপথে। সেক্ষেত্রে জাপানের মুখ্য সীমা-রেখা জলপথ নির্ধারণ করছে। আমার মনে হয়, ভারতের মত সমতলভূমি বা পার্বত্য অঞ্চলের স্থলপথে সীমারেখা থাকলে আজকের অতি গোঁড়া জাপানীও বোধ হয় চীন সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারত না। স্বাভাবিক কারণেই চীন সম্বন্ধে ভারত ও জাপানের মধ্যে কিছুটা বৈসাদৃশ্য স্বাভাবিক।"

"জাপানকে বাইরে থেকে কেমন দেখতে লাগে"—উল্লেখ করে বলেছেন, "মনে পড়ে সেই গল্পটা, একটা পিঁপড়ে আর ফড়িং। পিঁপড়ে সারা দিন ব্যস্ত, শীতের সঞ্চয় করে, তখন ফড়িং আরামে দিন কাটাচ্ছে। আমরা এখন এমনই এক উজ্জ্বল দিন আর ফড়িং-এর আনন্দে এগিয়ে চলেছি। ভুলে গেলে চলবে না, সামনে কনকনে শীতের আমন্ত্রণ অপেক্ষা করছে। তার জন্য তৈরি হতে হবে। মানসিক দিক থেকে আরও উন্নত হতে হবে।

"আরও একটা জিনিসে আমায় খুবই হিসাব-মত চলতে হয়েছে। জাপানী চরিত্রের সব কিছু উত্তরের ক্ষেত্রে "হ্যাঁ"-কে আমায় বেশ সচেতনতার সঙ্গে পাশ কাটাতে হয়েছে। যদিও আমি দেশেই এ বিষয়ে সব সময় সচেতন হয়ে চলবার চেষ্টা করি! কারণ, আমরা কখনও "না" বলতে চাই না, "না"-এর সম্মতিতে "হ্যাঁ"-এর প্রকাশ!

"ভারতে থাকাকালীন যে সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তার ভিতর রাষ্ট্রপতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন অন্যতম। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার আমার মনে রেখাপাত করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে প্রথম দৃষ্টিতে আমার মনে হয়েছিল উনি খুবই ক্লান্ত, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর অবশ্য সে ভাব আর ছিল না।

"আমি দূরপ্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ ঘুরেছি। বলতে এতটুকু কুণ্ঠা নেই যে, আমার প্রাক্-ধারণা, তাদের অনেকের চাইতে ভারত উন্নত। পাঁচ ছ' বছর আগে কোথায় পড়েছিলাম যে, কলকাতার রাস্তায় নাকি কুষ্ঠ রুগীর ছড়াছড়ি। কই, এবার গিয়ে আমার চোখে তেমন কিছু তো পড়েনি! মনে হয়, আমরা জাপানী কোন সময়ই খুব একটা পক্ষপাতশূন্যভাবে ভারতকে বিচার করতে চেষ্টা করিনি।"

এমন অনেক কথা লিখেছেন ইউকিও মিসিমা, যার সবটা অনুবাদ করা সময়-সাপেক্ষ। হয়ত এ লেখার ভিতর নতুন কিছু শোনাবার মতন নেই ভারতবাসীর কাছে। তবে নিঃসন্দেহে জাপানবাসীর কাছে এটা ভীষণভাবে নতুন—যা সমগ্র ভারতকে এদের কাছে একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ভারত সরকারের এই প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাই আর অনুরোধ রইলো তাঁরা যেন অদূর ভবিষ্যতে জাপানের এমনই সুধী-জনকে নিজেদের দেশে আমন্ত্রণ জানান। আজকের ভারতকে অপরের চোখে নিরপেক্ষতার বিচারে কিভাবে দেখায়, নিজেদেরও জানা হয়—আবার অপরেরও জানবার সুযোগ পায়।

বিকাশ বিশ্বাস

এল, এসে বাপকে প্রণাম করল। এদের ব্রহ্মজ্ঞান কেমন হয়েছে বাপের পরখ করে দেখবার ইচ্ছে হল। বড়ো ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাপ! তুমি তো সব পড়েছ, ব্রহ্ম কেমন বলো দেখি।' বড়ো ছেলে শ্লোকের পর শ্লোক আউড়ে বোঝাতে লাগল, ব্রহ্ম এমন, ব্রহ্ম অমন, ব্রহ্ম তেমন। বাপ চুপ করে শুনে গেলেন। তারপর ছোটো ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন। সে মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। বাপ তখন খুশী হয়ে ছোটো ছেলেকে বললেন, 'বাপ, তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কী, মুখে বলা যায় না।'

সুন্দর সুন্দর কথা বলতে লাগলেন পরমহংসদেব। জ্ঞানের কথা, ভক্তির কথা, ঈশ্বরের কথা। বললেন—ঈশ্বরের অপার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য যদি না থাকত তো কে তাঁকে মানত? দেখ না, এই জগৎ কী চমৎকার। কত রকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড়ো, ছোটো, ভালো, মন্দ। কারো বেশী শক্তি, কারো কম শক্তি।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তিনি কি কাউকে বেশী শক্তি, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন?
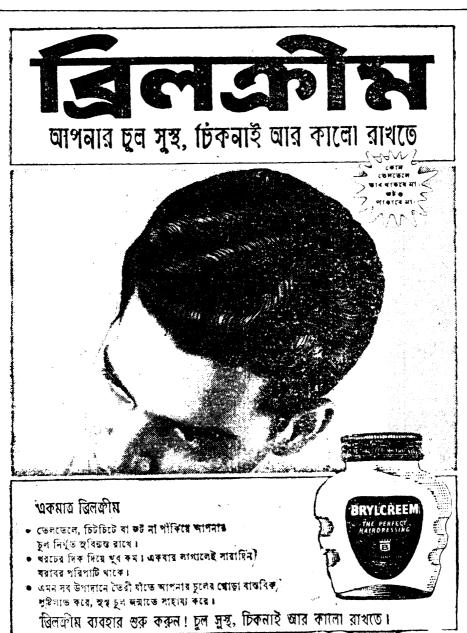
পরমহংসদেব বললেন — তা দিয়েছেন বইকি। সকল লোকের শক্তি কি সমান হতে পারে? কোনোখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনোখানে একটা মশাল জ্বলছে। তিনি কাউকে বেশী শক্তি, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন। আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? অন্যের চেয়ে তোমার দয়া তোমার বিদ্যা আছে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে।

আরো কত কথা বললেন পরমহংসদেব। গানও গাইলেন দু-একখানা। এদিকে রাত প্রায় নটা বাজে। এবার পরমহংসদেবকে বিদায় নিতে হবে।

বিদায়ের আগে বিদ্যাসাগরকে বললেন— একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর বললেন — যাব বইকি। আপনি এলেন আর আমি যাব না!

— আমার কাছে? ছি! ছি!

— সে কি! এমন কথা বললেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।

— আমরা জেলেডিঙি। খাল বিল আবার বড়ো নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়।

হাসিমুখে চুপ করে রইলেন বিদ্যাসাগর। পরমহংসদেব বললেন — তবে এর মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন — হ্যাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে।

কিন্তু সেই বর্ষাকাল কেন, কোনো কালেই বিদ্যাসাগর পরমহংসদেবের কাছে যাননি।

পরমহংসদেব একদিন মহেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন বিদ্যাসাগর সত্যকথা কয় না কেন? বিদ্যাসাগর তো বলেছে এখানে আসবে; কিন্তু এল না।

কাশীতে একবার একজন ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁর ধর্মমত জানতে চাইলেন।

বিদ্যাসাগর বললেন আমার মত কখনো কাউকে বলিনা। তবে এ কথা বলি, গঙ্গাস্নানে যদি আপনার শরীর পবিত্র হয়, শিবপূজায় যদি আপনার হৃদয় পবিত্র হয়, তা হলে তাই আপনার ধর্ম।

কাশীবাসী অনেক বাঙালী ব্রাহ্মণের উপর বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা নেই। মারাঠী বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের উপর বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা আছে। বিদ্যাসাগর বলেছেন : "ইহাদের (মহারাষ্ট্রীয় বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের) আচার ব্যবহার দেখিয়া আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমাদের বাঙলা হইতে যে সকল বাঙালী ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতেছেন তন্মধ্যে অনেকেই ভিক্ষুক ও অনেকেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত, ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য ও মূর্খ...।"

কাশীতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনার বাবার কাছে আমরা অনেক খেয়েছি। সময়ে সময়ে অনেক টাকা-কড়ি নিয়েছি, তৈজসপত্র নিয়েছি। আপনার বাবা পরম ধার্মিক। পিতৃপুণ্যেই আপনি বিখ্যাত হয়েছেন। আপনি আমাদের পাঁচ-সাত হাজার টাকা দান করে নাম করুন।

বিদ্যাসাগর বললেন—আপনারা বাবার কাছে পেয়ে থাকেন, তাঁকে বলুন, তিনি যেমন দেন, তেমনি দেবেন।

ওঁরা বললেন—বড়লোকে কাশীদর্শনে এলে আমাদের অনেক টাকাকড়ি দিয়ে থাকেন। আপনি নামজাদা লোক, আপনাকে অবশ্যি দান করতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—আমি কাশীদর্শন করতে আসিনি, পিতৃদর্শনের জন্য এসেছি। আমি যদি আপনাদের মত ব্রাহ্মণকে কাশীতে দান করে যাই, তা হলে আমি কলকাতায় ভদ্রলোকের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আপনারা যত রকম দুষ্কর্ম করতে হয় তা করে দেশ ছেড়ে কাশীতে উঠেছেন। এখানে আছেন বলে আপনাদের যদি আমি ভক্তি-শ্রদ্ধা করে বিশ্বেশ্বর বলে মান্য করি, তা হলে আমার মত নরাধম আর নেই।

সেই ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না?

বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন—আমি আপনাদের কাশী মানি না। আপনাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।

সেই ব্রাহ্মণেরা রাগ করে বললেন—আপনি তবে কী মানেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—মাকে মানি, বাবাকে মানি। আমার বাবা আমার বিশ্বেশ্বর, আমার মা আমার অন্নপূর্ণা।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) শৈশবকাল হইতে কাল্পনিক দেবতার প্রতি কখনই ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতেন না। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুগণ দেবদেবী প্রতিমার প্রতি যেরূপ হৃদয়ের সহিত ভক্তি প্রকাশ করেন, তিনি জনক-জননীকে বাল্যকাল হইতে তদ্রূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দেবতার স্বরূপ জ্ঞান করিতেন।"

পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে হডসন নামে একজন ছবি-আঁকিয়ে সাহেব এসেছেন। বিদ্যাসাগরের ওই রাজবাড়িতে যাওয়া-আসা আছে। কে জানে কেন, হডসন সাহেবের খুব ইচ্ছে হল, বিদ্যাসাগরের একখানা ছবি আঁকে। প্রথমে রাজী হননি বিদ্যাসাগর। হডসন সাহেব অনেক সাধাসাধনা করলেন, অবশেষে বিদ্যাসাগর রাজী হলেন।

বিদ্যাসাগরের ছবি আঁকলেন হডসন সাহেব। সুন্দর ছবি হল। কিন্তু হডসন সাহেব টাকাকড়ি নিলেন না। বিদ্যাসাগর বিস্তর চেষ্টা করলেন, কিন্তু না, সাহেব এক পয়সাও নেবেন না।

ভেবে-চিন্তে বিদ্যাসাগর তখন তাড়াতাড়ি মা-বাবাকে কলকাতায় আনালেন। টাকা খরচ করে হডসন সাহেবকে দিয়ে ওঁদের দুখানা ছবি করালেন।

বিদ্যাসাগর মাকে বললেন—মা, পাইক-পাড়ার রাজবাড়িতে একজন খুব ভালো পটো সাহেব এসেছেন, তাঁকে দিয়ে তোমার একখানা ছবি তুলিয়ে রাখব।

মা বললেন—দূর, আমার আবার ছবি কী হবে, ছি-ছি।

বিদ্যাসাগর বললেন—ছবি কি তোমার জন্য? ছবি আমার জন্য। একখানা ছবি থাকলে, যখন যেখানে থাকি, প্রাণটা কেমন করলে একবার দেখব।

অগত্যা মা বললেন—তবে তোর যা ইচ্ছা তাই কর।

বিদ্যাসাগর তখন জিজ্ঞেস করলেন—সাহেবকে এখানে আনব? না, তুমি আমার সঙ্গে সেখানে যেতে পারবে?

মা বললেন—পটো সাহেব! না বাপ, আমি সাহেবের সামনে ছবি তোলাতে বসতে পারব না।

বিদ্যাসাগর বললেন—সাহেব খুব ভালো লোক। আমার একখানা ছবি এঁকেছে, তার দাম নেয়নি, আমাকে খুব ভালোবাসে। তাঁর সামনে বসতে দোষ নেই।

মা বললেন—তা তোর যা ইচ্ছা কর। তবে আমি অন্য কোথাও যেতে পারব না বাবা। যা করবি এখানে এনে কর।

বিদ্যাসাগর বললেন—সেখানে সব যোগাড় আছে। সে আড্ডা ছেড়ে এখানে আনতে গেলে হয়তো ছবি ভালো হবে না।

মা বললেন—তুই যখন ধরিছিস, তোকে এ'টে উঠতে পারব না। তা তোর যা ইচ্ছা কর গে, গেলেও তোর সঙ্গে যাব তো। নিন্দা হলে লোকে তো আর আমার নিন্দা করবে না, তোরই নিন্দা করবে। বলবে, বিদ্যাসাগর মাকে পাকপাড়া রাজবাড়িতে ছবি তোলাতে নিয়ে গিয়েছে।*

নিজেরকে সাক্ষাত করে মা-বাবার ছবি তৈরি করলেন বিদ্যাসাগর। ঘরে পছন্দমত জায়গায় মা-বাবার ছবি সাজিয়ে রাখলেন। আমরণ বিদ্যাসাগর মা-বাবার ছবিকে প্রণাম করে তবে গিয়ে জলগ্রহণ করেছেন।

জগদ্ধাত্রী পুজো হবে বীরসিংহে। বিদ্যাসাগরের বাবার ইচ্ছা, পুজোয় বাদ্য-বাজনা ধুমধাম হয়। আর বিদ্যাসাগরের মায়ের ইচ্ছা, সেসব না করে কেবল গরীব-কাঙালীদের খাওয়ানো হয়।

কার ইচ্ছা বজায় থাকবে? কার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন বিদ্যাসাগর—মায়ের, না বাবার?

বিদ্যাসাগর বললেন—দুজনের কথাই থাকবে।

তাই হল। বাদ্যবাজনাও হল, গরীব-কাঙালীদেরও খাওয়ানো হল।

একবার বিদ্যাসাগর মাকে জিজ্ঞেস করলেন—বছরে এক দিন পুজো করে অনেক ছ সাত শো টাকা খরচ করা ভালো? না, ওই টাকায় গ্রামের গরীব-দুঃখীদের মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত?

মা বললেন—গ্রামের গরীব-দুঃখীরা প্রত্যেক দিন খেতে পেলে পুজো করার দরকার নেই।

হ্যারিসন সাহেব সরকারী কাজে মেদিনীপুরে এসেছেন। অল্পবয়সী সাহেব। বিদ্যাসাগর তখন বীরসিংহে। মা বিদ্যাসাগরকে বললেন—তা ছেলেটিকে একবার আমাদের বাড়িতে আনবি না? তাকে একবার আমাদের বাড়িতে এনে কিছু খাওয়ালে ভালো হত।

বিদ্যাসাগর হ্যারিসন সাহেবকে মায়ের ইচ্ছার কথা জানালেন।

হ্যারিসন সাহেব বললেন—তিনি নিজে নেমন্তন্ন না করলে আমি যাব না।

বিদ্যাসাগরের মা হ্যারিসন সাহেবকে নেমন্তন্ন করে চিঠি লিখলেন। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি:

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণং

অশেষগুণাশ্রয়
শ্রীযুক্ত এচ্‌ এল্‌ হেরিসন মহোদয়
পরম কল্যাণভাজনেষু
সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্‌,

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট শুনিলাম, আপনি সত্বর কলিকাতা প্রতিগমন করিবেন। আমার নিতান্ত মানস, দয়া করিয়া তৎপূর্বে একবার বীরসিংহের বাটীতে আগমন করেন, তাহা হইলে আমি যারপর নাই আহ্লাদিত হই। প্রার্থনা এই, আমার

* এই বিবরণ দাখিল করে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই বিবরণটি শুনিয়াছিলাম।" ('বিদ্যাসাগর', দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩০৪) কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে বিদ্যাসাগর ছবি তোলানোর জন্য মাকে পাকপাড়া রাজবাড়িতে নিয়ে যাননি। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয় ছবি তুলাইবার জন্য মাতাকে সঙ্গে করিয়া হডসেন সাহেবের বাটী গিয়াছিলেন।" ('ভ্রমনিরাস', পৃঃ ৩৮)

যাসনা পরিপূরণে বিমুখ হইবেন না। ইতি
২ ফাল্গুন, ১২৭৫ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণ্যাঃ
শ্রীভগবতী দেব্যাঃ।

হ্যারিসন সাহেব তারপর এলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। সন্তান যেমন মাকে প্রণাম করে তেমনিভাবে, পুরোপুরি এ দেশী নিয়মে, হ্যারিসন সাহেব প্রণাম করলেন বিদ্যাসাগরের মাকে।

হ্যারিসন সাহেবকে যত্ন করে খাওয়ালেন বিদ্যাসাগরের মা। সাহেব খাচ্ছেন, বিদ্যাসাগরের মা চেয়ারে বসে সাহেবের সংগে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের ঘরের একজন বৃদ্ধা গৃহিণীর উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে সাহেব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

সন্দেহ নেই, অত্যন্ত উদার স্বভাব বিদ্যাসাগরের মায়ের। মনে এক ফোঁটা কুসংস্কার নেই। গরীব-বড়লোক, পণ্ডিত-মূর্খ, মেয়ে-পুরুষ, হিন্দু-অহিন্দু—বিদ্যাসাগরের মায়ের কাছে সকলেই সমান।

যোগেন্দ্রনাথ আর মহালক্ষ্মীর সংগে শিবনাথ শাস্ত্রী সে সময়ে চাঁপাতলার দীঘির পুব দিকের একটা বাড়িতে একত্র থাকেন। সপ্তাহে দু-তিন দিন আসেন বিদ্যাসাগর, দেখাশোনা করেন, দরকারমত সাহায্য করেন।

পাশের বাড়িতে ছ-সাত বছরের একটি মেয়ে থাকে। মেয়েটি বিধবা। জাতে ছুতোর। মেয়েটির বাবা বেঁচে নেই।

সকাল-বিকাল এ বাড়িতে আসে মেয়েটি। শিবনাথকে 'দাদা' বলে ডাকে। শিবনাথের গলা জড়িয়ে কোলে বসে থাকে।

সেদিন সকালবেলা। শিবনাথের গলা জড়িয়ে মেয়েটি কোলে বসে আছে, এমন সময় বিদ্যাসাগর এলেন। আগে এই মেয়েটিকে তিনি দেখেননি। এই প্রথম দেখলেন। বললেন—ও মেয়েটি কে হে? বাঃ, বেশ সুন্দর মেয়েটি তো।

শিবনাথ বললেন—ওটি পাশের বাড়ির একটি ছুতোরের মেয়ে। আমাকে 'দাদা' বলে, আমার কোলে বসতে ভালোবাসে। ওটি বিধবা।

বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন—বাবা! কি! এইটুকু মেয়ে বিধবা!

তারপর মেয়েটিকে ডাকলেন বিদ্যাসাগর—আয় মা, আমার কোলে আয়।

লজ্জায় যেতে চায় না মেয়েটি। শিবনাথ তখন মেয়েটিকে বিদ্যাসাগরের কোলে বসিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগর ওকে বুকে ধরে আদর করলেন। শিবনাথকে বললেন—মেয়েটিকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দাও। মাইনে আমি দেব।

বিদ্যাসাগরের কথামত পরদিন বিকেলে মেয়েটি আর তার মা বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এল। ছুতোরের মেয়ে বলে বিদ্যাসাগরের মা ওদের এক বিন্দু অবজ্ঞা করেননি। মেয়েটিকে কোলে জড়িয়েছেন, কাছে বসে ওদের খাইয়েছেন, যাবার সময় দুজনকে কাপড় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন।...

"ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল।...

"দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই-শলাকার মত কেবল বিশেষরূপে সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথাসংস্কারের অপেক্ষা করিত না।"

বীরসিংহের বাড়ি একবার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর তারপর মাকে কলকাতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। মা বললেন—যেসব গরীবের ছেলে এখানে খেয়ে বীরসিংহ ইস্কুলে পড়ে, আমি এখান থেকে চলে গেলে তারা কী খেয়ে ইস্কুলে যাবে?

বাড়ির জন্য ছ'খানা লেপ পাঠিয়েছেন বিদ্যাসাগর। ছ'খানাই গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগরের মা। বিদ্যাসাগরকে চিঠিতে লিখলেন: "ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি শীতে বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠাইয়া দিবে।"

যেমন মা, তেমনি ছেলে। উত্তরে বিদ্যাসাগর মাকে লিখলেন: "ঐরূপ ভাবাপন্ন লোকদিগকে ও বাড়ির লোকদিগকে দিয়া তোমার নিজের জন্য একখানি লেপ রাখিতে হইলে সর্বসমেত কয়খানি লেপ পাঠাইব লিখিবে। তোমার পত্র পাইলে আবশ্যকমত লেপ পাঠাইব।"

দুপুরে বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেও নিজে সহজে খেতে বসতেন না ভগবতী দেবী। যদি কোনো অতিথি এসে পড়ে, যদি কোনো উপোসী কাঙাল এক মুঠো ভাতের জন্য দরজায় এসে দাঁড়ায়!

যত দূর সাধ্য, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন ভগবতী দেবী। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন, সকলের খোঁজ-খবর নিতেন। দুঃখীর জাতবিচার করতেন না। ও বাধে মুচি হাড়ি-ডোমের ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেছেন। সাধু-মিস্ত্রীর সংগে থাকত অনেক সময়, দরকার হলে নিজে রুগীর বাড়িতে গিয়ে পথ্য তৈরি করে দিয়ে এসেছেন।

মায়ের কথা উঠলেই বিদ্যাসাগর বলতেন—আমি যদি আমার মায়ের গুণের এক শো ভাগের এক ভাগও পেতাম, তা হলে কৃতার্থ হতাম। আমি যে এমন মায়ের সন্তান এই আমার গৌরব।

(ভগবতী দেবীর স্মরণে)

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

একদিন রাত্তিরে—তখন ক'টা বাজে জানি না—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। প্রচণ্ড জলতেষ্টা পেয়েছে। আলো জ্বালালাম। টেবিলের ওপর ঢাকা-দেওয়া গেলাসটা তুললাম, এক ফোঁটা জল নেই। কখন খেয়ে ফেলেছি, মনে নেই। দু'-তিনটে বড়ো বড়ো ফোঁটা শুধু টেবিলের ওপর পড়ে আছে। একটি ফোঁটার মধ্যে আবার ছোট্ট মশার ছানা মরে পড়ে রয়েছে। আমি তেষ্টার মুখে, আর ও ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে দেখে হাসি পেল। আহা, বড়ো হয়ে কত রক্তপান করার সাধ ছিল! এক ফোঁটা জলে কেন ও আত্মহত্যা করলো! ভাবতে ভাবতে জলের সন্ধান করছি—কোথাও পাচ্ছি না। সব ঘরের দরজা বন্ধ। এত গভীর রাতে দরজা ধাক্কা দিয়ে কারো ঘুম ভাঙিয়ে সামান্য পানি-প্রার্থনা করা যায় না তো।

এমন সময় চোখে পড়লো। আমার ঘরের পাশেই ছোট্ট রোয়াক পার হয়ে দুটো সিঁড়ি নেমে গেলে একটা টিউবওয়েল। টিউব-ওয়েল—পানীয় জলের প্রতীক। ঘুমে সমস্ত শরীর তখন প্রায় আড়ষ্ট হয়ে আছে, তবু আমি টিউবওয়েলটির পাশে নেমে গেলাম, তার মুখের কাছে গিয়ে হাত পেতে বসলাম—বললাম, "জল দে।"

টিউবওয়েল তার জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতন ঘাড়, তুলে বক দেখালো। বললো, "বছরের শেষ, এখন জল কোথায়? তেষ্টা মেটাতে চাও তো গভীরে যাও।"

—"কোন্ পথ দিয়ে যাবো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "পল্লবগ্রাহী আমি, গভীরে যাওয়ার পথ তো জানি না।"

টিউবওয়েল একটু হেসে খক্‌খক্ কেশে তার ওপরের ঢাকনা দিল খুলে। আমি আস্তে আস্তে গোল দেওয়াল ধরে ধরে নামতে লাগলাম, যেভাবে যক্ষের ধন চুরি করতে হেমেন রায়ের নায়কেরা নামতো।

সরু পাইপ বেয়ে অনেক দূর নেমে গেছি। একটু ভয় ভয় করছে—এখন যদি হঠাৎ ধরা পড়ে যাই! যদি কেউ দুম করে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করে—তুমি কে হে? এইখানে কী খুঁজছো?—তখন কী বলবো। যদি সত্যি কথা বলি, জলতেষ্টা পেয়েছে, এক গেলাস জল দেবে তোমরা কেউ?—তখনই ওরা হয়ত আমায় খুন করে ফেলবে।

"বছরের শেষ এখন জল কোথায়?..."

ওপারের লোক তুমি, কেন খুঁড়ছো, আবার [illegible] লড়িয়ে দাও!

ঠিক যা ভেবেছি তাই। একটা পিঁপড়ে এল এগিয়ে। মাছির মতন ছোট্ট হয়ে গিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে আছি ভয়ে—তবু ওর দৃষ্টি এড়াতে পারলাম না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পিঁপড়েদের। সে-ই আমার কাছে এগিয়ে এসে সামনের দুটো পা ঘষে ঘষে জিজ্ঞেস করলো, "খোকা, তুমি এখানে জল খুঁজছো, না গেলাস খুঁজছো?"

থেমে থেমে বললাম, "শুনেছি, মাটির নীচে অনেক ধনরত্ন থাকে, আমি গবেষক, রত্ন খুঁজতে বেরিয়েছি। আমার কোনো লোভ নেই—শুধু খুঁজে দেখা। কী ধন-সম্পদ তোমরা লুকিয়ে রেখেছ, আমাকে দেখাও।"

পিঁপড়ে শুনে বললো, "চালাকি রাখো। তুমি আসলে জল চুরি করতে বেরিয়েছ। রত্ন এখানে অনেক রয়েছে, কিন্তু ও-সব কাঁকর খেয়ে তো আমাদের পেট ভরে না। এই দেখ না, আমি সারা দিন ঘুরে ঘুরে রত্নের আশেপাশে যত ভিজে মাটি থাকে, তাই মুখে করে তুলে আনছি। যদি তুমি এতে ভাগ বসাতে চাও, তোমায় শেষ করবো কামড়ে। তার চেয়ে বরং সময় থাকতে পালাও। গভীরে যাও।"

গত্যন্তর না দেখে তক্ষুনি আমি আবার সরসর করে পাইপ বেয়ে নামতে শুরু করি। আগে পিঁপড়ের হুল থেকে তো বাঁচি, তারপর তেষ্টা মেটানো যাবে।...নামছি নামছি—উঃ, কী অন্ধকার! দম বন্ধ হওয়ার যোগাড়।...এমন সময় এক জোঁকের সঙ্গে দেখা।

কোদালের মতন মুখ বার করে টপকে টপকে ও এগিয়ে এল। আমি আবার লুকোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু, ওরা গন্ধে টের পায়—ফের ধরা পড়ে গেছি। বললো "কী চাই বাবুমশাই?"

ওর মন রাখার জন্যে বললাম, "রক্ত। আমি ওপর থেকে আসছি। রক্তের জন্যে আমার প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। ওপরে এক ফোঁটাও রক্ত নেই, সব নোনতা জল। তুমি কি আমাকে একটু রক্ত যোগাড় করে দিতে পারো? সুস্বাদু রক্ত?"

হেসে জোঁক বললো, "আমিও তাই খুঁজছি। ওপরে খুঁজে এসেছি, সব ফাঁকা, সব বিস্বাদ। চলো, আমরা দুজন আরো গভীরে যাই। যদি সেখানে এক ফোঁটা রক্ত মেলে।"

তারপর আমরা দুজন হাত ধরাধরি করে নীচে নামলাম। আসলে ও রক্ত খুঁজছে, আমি সত্যিকারের জল। আসলে, আমরা দুজন একই জিনিস খুঁজছি—তৃষ্ণার তৃপ্তি। কিন্তু জায়গাটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে—রক্ত বা জল, কিছুরই সন্ধান পাওয়া সেখানে কঠিন। কখনো একটু সন্দেহও হচ্ছে। বুঝতে পারছি, জোঁক জানে আমার শরীরে কিঞ্চিৎ রক্ত আছে—আল-কোহল মাখানো—শেষ পর্যন্ত যদি ও না পায় ওর অভীষ্ট, তবে আমার রক্তই চুষে খাবে। বিনিময়ে ওকে নিঙড়ে সামান্য একটু জল পেলেও পেতে পারি আমি। ওইটুকুতে কী হবে! আর, যদি ওর সঙ্গে লড়াইয়ে না জিতি? আমি ওপরের মানুষ, ছেলেখেলা করতে করতে জীবনযাপন করা অভ্যেস, এত গম্ভীর সিরিয়স প্রকৃতির জীবজন্তুর সঙ্গে ইতিপূর্বে মোলাকাত হয়নি তো। দেখছি, এরা বাঁচতে চাইলে পারে না এমন কাজ নেই। জীবন সম্পর্কে আমাদের মতো উদাসীন নির্বিকার ভাব জোঁক বা পিঁপড়ের নেই।

নামতে নামতে চলেছি আমরা দু'জন বন্ধু। অর্থাৎ পরস্পরের শত্রু। শেষকালে একসময় আমরা আশাপ্রদ কিছুর সন্ধান পেলাম। জোঁক বললো, "আলো দেখতে পাচ্ছ? লাল রক্তের মতো টকটকে আলো?" আমি বললাম, "কই? সামনে ঝকঝাক করছে স্বচ্ছতা। নিশ্চয় কোথাও জল আছে। চলো সেই দিকে যাই।" তারপর ঠাণ্ডা তরল একটা কিছু পায়ে ঠেকলো। পায়ে আলো পড়লো যেন। বললাম, "পেয়েছি!"

ঝপাং করে জোঁক ঝাঁপ দিল সেই হ্রদে। ঝপাং করে আমিও ঝাঁপ দিলাম সেই হ্রদে। আমরা দু'জন বন্ধু, অর্থাৎ পরস্পরের শত্রু. অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলাম। আমার মুখে গায় নোনতা কিছুর স্বাদ বারবার ঢুকে যাচ্ছে। জোঁক ঘন ঘন থু-থু করে কুলকুচো করছে। ওর পছন্দ হচ্ছে না। আমি জল চেয়ে কোনো ভুল তরল পদার্থের মধ্যে ঢুকে গেছি মনে হচ্ছে। আমারও পছন্দ হচ্ছে না।

অনেকক্ষণ সাঁতার কাটার পর যেন সমুদ্রে স্নান সেরে বালি মেখে আমরা দু'জন উঠে পড়লাম। গলা ভরতি বিরক্তি, ঘৃণা, বিবমিষা নিয়ে আমরা দু'জন পরস্পরকে আক্রমণ করলাম তারপর। সে কী যুদ্ধ! আমি ওপারের মানুষ, পেরে উঠবো কেন? জোঁক আমায় সাপটে জড়িয়ে ধরলো চেপে—তারপর আস্তে আস্তে চুষে শরীরের সমস্ত রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে শুয়ে পড়লো জলের কিনারে। ওকে লাল শাড়ি-পরা পরস্ত্রীর মতন দেখাচ্ছিল। ভালোবেসে পাওয়া চিরন্তন আলিঙ্গন নিয়ে দুর্বলাঙ্গ আমি লম্বা ঠ্যাং ফেলে ফেলে প্রাণের দায়ে আবার পাইপ বেয়ে উঠতে লাগলাম। গলকণ্ঠনালীতে প্রচণ্ড পিপাসা। শরীর রক্তশূন্য।

ক্লান্ত লাগছে। অনেক গভীর পর্যন্ত গিয়েও আমি জল পেলাম না বলে গ্লানি-বোধও হচ্ছে। কিন্তু রক্ত ছিল সঞ্চিত

"আমায় সাপটে জড়িয়ে ধরলো চেপে"

দুর্দিনের জন্যে—অ্যালকোহল রাখতো—তা ও খোয়ালাম চুরি করতে গিয়ে!...

ফেরার পথে জংশন স্টেশনে আবার শিম্পাঞ্জির সঙ্গে দেখা। সে তৃপ্তিতে ঘুমোচ্ছে—মুখে একরাশ তিক্ত মাটি। ওপারে উঠে এলাম। চিউইংগাম তার মাথার ঢাকনা খুলে দিল আরেকবার। যেন টুপি তুলে অভিবাদন জানালো। প্রায় অচেতন অবস্থায় আমি ওপারের মানুষ আবার এপারের বাতাস শুষ্কতা ও বস্তুর গন্ধের মধ্যে ফিরে এলাম।...

চিউইংগাম তার জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতন বাহুটি নেড়ে আমার মন দেখালো। সকৌতুকে প্রশ্ন করলো, "পেয়েছ? তোমার তেষ্টা মিটেছে তো?"

—"মিটেছে!" আমি মিথ্যে কথা বললাম। জানি, এবার আমি নিজের ঘরের দিকে যাবো। লেখার টেবিলের পাশে চেয়ারটিতে বসবো। আলো জ্বলছে আছে—ডান দিকের ড্রয়ার খুলবো। সেখানে একটি ছোট্ট শিশিতে আমার ঘুমের ওষুধ রাখা আছে। দশ ফোঁটার বেশী খাই না সাধারণত—ডাক্তারের কড়া নির্দেশ। কিন্তু, আজ আমার যে প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে—আজ তিরিশ ফোঁটা খেতে হবে একসঙ্গে ঢকঢক করে। তারপর ঘুম। 'নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম'। কতকাল ঘুমোই নি,' আমার ঘুম পাচ্ছে।

...কাল সকালে যদি জেগে না উঠি, আপনারা জানবেন, আমার তেষ্টা মিটেছিল। গতকাল গভীর রাতে পর্যটনের শেষে আমি একটা শান্ত হ্রদের সন্ধান পেয়েছিলাম। জানবেন, তার জলের স্বাদ গাঢ় ছিল না, নোনতা ছিল না। সেই জল খেয়ে যে তৃপ্তি আমি পেয়েছি, তারপর আর খামোকা বেঁচে থাকার মানে হয় না।
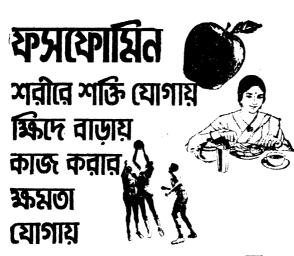
বিবাহ—মডেল ১৯৬৮

সাতষট্টি সালের শেষের যে বিয়ের হিড়িক চললো বিলিতী কায়দায় তাকে আটষট্টির মডেল বলা চলে। অগ্রগামী দেশগুলি আগামীর প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে আগে আগে নমুনার ছাঁদ বদলিয়ে পণ্যের বাজারে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন, আমাদের সেখানে অবস্থাটা একটু খাটো বলে ঝামেলা কম। তা ছাড়া পরিবর্তনকে অমন পাগলের মত ছুটতে আমরা দিতে চাই না। শাড়ি, গহনা থেকে নিয়ে মোটর গাড়ির মডেল পর্যন্ত আমাদের একটানা মন্থরগতিতে এগিয়ে যায়। সবটাই যে ভাল তা বলছি না। শাড়ির বেলায় যেমন 'অ্যানটিক' হল আভিজাত্য আর রুচির নিদর্শন, গাড়ির বেলায় তো ঠিক তা নয়। বিয়ের বেলায়ও দেখুন পাশ্চাত্য দেশে কত রকমের কায়দা চালু হয়, অথচ আমাদের অভাব-অনটন, দৈন্য দুঃখ সব সত্ত্বেও বিয়ের উৎসব মডেল বদলায় নি। আইন করা নিয়ন্ত্রণ তো বলতে গেলে অমান্য করবার জন্যই তৈরী। চুরি করে চাটনি বা আচার খাবার মতই চটচটে তার তীব্র মধুর স্বাদ। মাঝে মাঝে মনে হয় চেয়ে আনা খাদ্য দিয়ে যে দেশের দিন চলে তাদের মডেল পালটানো আইন করে হবে না। সামাজিক সৎসাহস সম্ভবত একমাত্র ভরসা।

আটষট্টি মডেলের বেশ কয়েকটি বিয়েতে পাত পেড়ে আমার এক বিদেশিনীর উক্তি মনে আসছে বার বার। মহিলাটি জড়বুদ্ধি শিশুদের চিকিৎসা করেন বিনা পারিশ্রমিকে। কাজেই অকারণ নিন্দাপটুদের দলের নন বলে মনে হল। গিয়েছিলাম চিত্র প্রদর্শনী দেখতে। ঘুরে ঘুরে দেখছি আর লক্ষ করছি শ্বেতাঙ্গী সুন্দরী একজন গুটিপাঁচ-ছয় জড়বুদ্ধি শিশুকে রঙ-এর আনন্দে মাতিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। শিশুদের কোনটিই ধনী সংসারের নয়। হঠাৎ মহিলাটি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'জান এই শিশুটির বাবা তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কয়েকদিন আগে। এত খরচ করতে হয়েছে যে অবোধ বালকের দু'-চারটে প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্রের পয়সা পর্যন্ত তাঁর নেই। কেন তোমরা এমন? যে পাড়ায় আমি বাস করি সেখানে অন্তত দশটি বিয়ের জাঁকালো আলো আর কান ঝালাপালা বাজনা চলছে দিনের পর দিন। অথচ শুনি তোমাদের দেশে বড্ড অভাব। বিদেশ থেকে খাদ্য এনেও দুর্ভিক্ষ নিবারণ হয় না। সেদিন উত্তর দিতে পারিনি। বিদেশিনীর মন্তব্যে আমার ভারতীয় মর্যাদা কোথায় যেন আঘাতে কঠিন হয়ে উঠেছিল। আজ কিন্তু উত্তর দিতে

পারতাম। বলতাম আমরা মডেল বদলাই না। ঐতিহ্যের আঁটসাঁট বন্ধনের এই দিকটা সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ়তা বেশী।

মডেল আটষট্টির একটি বিয়েতে গেলাম কলকাতার বাইরে। পানাগড়ের পানুবাবুর মেয়ে প্রীতিলতার বিয়ে। ঠিক গৌরীদান নয়। আধুনিক কালের শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক কনে। গণিতে ডক্টরেট করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। পানুবাবু আমাদের আত্মীয় নন। তবে আত্মীয়ের বাড়া। রামপুরহাটে পানুবাবুর বাবা আর আমার বাবা কেবল যে প্রতিবেশী ছিলেন তা নয়। অভিন্নহৃদয়বন্ধু ছিলেন। পানুবাবুকে বড় ভাই-এর মত আমরা মান্য করেছি। বলতে গেলে তাঁর হাতের চড়-চাপড় কানমলা খেয়ে মানুষ হয়েছি। এতদিন পরে সেই সম্পর্ক স্মরণ করে পৌঁছোলাম পানাগড়ে বিয়ের দিন-দুই আগে। ভেবেছিলাম বড় শহরের living up to the joneses তো নেই। হয়তো বা পানুবাবুর মেয়ে প্রীতিলতার শিক্ষিত মনের প্রভাবে এখানে আতিশয্যের মামুলী প্রথার কিছু প্রভেদ দেখব। কিন্তু কোথায়? ঘরের দরজায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বউদি নিয়ে এলেন তিন চার রকম মেঠাই-এর মাটির থালা। ভিয়েন বসে গেছে তারও ক' দিন আগে। এক বাড়ি লোক। আত্মীয় কুটুম্বে ভরা। মিষ্টান্নাদি পাকের সঙ্গে সঙ্গে চলছে জলখাবারের থালা থালা লুচি আর ঝুড়ি ঝুড়ি বেগুনে ভাজা, ছক্কা ইত্যাদি। দুপুরে-বিকেলে তো ইলাহী ব্যবস্থা। রাজমহলের ইলিশ আর বর্ধমানের রুই-কাতলা তো আছেই তার উপর বৃহস্পতিবারে বাজারে মাংস নিষিদ্ধ বলে সেদিনটাতে ঘরের আঙিনার কোনে ঝোপে-ঝাড়ে ছাগশিশুর ঝটপট ঝটকা চুপিসারে সেরে ফেলা হল।

ভিয়েনের পান্ডা-পাত্র প্রাইভেট লিমিটেড কুঁদো উনুনে উৎসর্গের সরাখান। উলটে দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে যে সেই বসেছে আর তাদের হাত কামাই নেই। পান্ডা এবং পাত্র দুজনেরই আদিনিবাস কটকের কাছাকাছি কোথাও। বাঁকুড়ায় এসেছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ কেউ। তাই বাঁকুড়াবাসী বলেই পরিচয়। জমি-জমাও সেখানেই। বিয়ের মৌসুমে ভিয়েন-এর দল পুষিয়ে দু পয়সা রোজগার হয়। বাকী সময়টা কাটে চাষ বাস করে। নিখুঁত সমবায় ব্যবস্থায়। শেয়ার মূলধন ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। সরকারের খাতায় নাম তুলতে হয় না। আইন-কানুন সহজ সরল, নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝি মাত্র। সমবায়ের আরও সভ্য আছে। তারা ব্রাহ্মণ নয় সবাই। যেমন ধরুন পাথরবন্ধু মিষ্টির দোকানের শম্ভুকে ছোঁড়া সিধু। জাতে ময়রা। লুচি, কচুরি গড়তে পটু। দরকার হলে দু খোলা নামিয়ে দিতে পারে। তার হাতের দরবেশের বেশ নাম আছে। পান্ডা-পাত্র শাঁসালো কাজের কনট্র্যাক্ট পেলেই সিধু ছুটি নিয়ে চলে আসে তাদের সঙ্গে। মেঠাই মন্ডার বেলায় বিয়ে বাড়িতেও জাতিভেদ থাকে না। পান্ডামশাই পানের বটুয়া গুছিয়ে নিতে নিতে হাঁক দেন 'সিধে বোঁদেটা শেষ কর।' পান্ডা-পাত্রের দলের আর কোনও বাহানা নেই। দিনে বার কয়েক চা পেলেই চলে যায়। রান্না আর ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে খাওয়ার রুচি থাকে না।

ভাঁড়ার দেখছেন পানুবাবুর মেজ ভাই সানুবাবু স্বয়ং। চাবির গোছা ভেদ করে এক চামচে চিনি পেতেও তাঁর অনুমতি লাগে। জিরে, তেজপাতার কৌটোয় লেবেল মেরে, দাঁড়িপাল্লায় চাল ডাল ওজন করে তিনি গুছিয়েছেন এমন যে এ বাজারেও অতিথিরা খেয়ে প্রাণ দাপিয়ে উঠবে। কিন্তু হিসেব করে সব সামলাতে হবে তো। কনিষ্ঠ কানুবাবুর বড় বাহার। তাতে কালোবাজারের কেনা খাদ্যেশ্বরী আছে চিনির বিকল্প, ময়দা আছে মার্কিন গমের ময়রাদের ঘর থেকে কেনা। ঘটালের ঘি আছে। বনস্পতির সঙ্গে মিশিয়ে মানরক্ষা করা আর কি। ফুলশয্যার শুধু নামে তার জন্য একগাছ লবঙ্গ দার্জিলিং পর্যন্ত কিনতে হয়েছে প্রায় আকাশ-ছোঁওয়া দরে। ভাগ্যে চালের দরটা নেমেছে। না হলে পানুবাবুর নম্বরী বাড়ির টাকাটুকুতে কুলোত না। তবু তো পোলাউ-এর পুরোনো সরু চালের দামটা বেশ বেশীই লেগেছে। পেস্তা বাদাম কিসমিস সবই তো প্রায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বার মত মূল্যমানে উঠেছে। কানুবাবু কমতি কিছু রাখেন নি। পানুবাবুর এই প্রথম কাজ। ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে লাভ কি।

কত দিনই বা আগের কথা। পানুবাবুর ছোট বোন কমলির বিয়েতে পানুবাবুর বাবা মা বেঁচে ছিলেন। কনে দেখার দিনটি পর্যন্ত আমার মনে আছে। কমলির মা ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে, জোমারি থেকে ওঁরা এসেছেন কিন্তু কর্তা বাড়ি নেই।' আমার বাবা গেলেন অভ্যর্থনা করতে আর মা তোরঙ্গ থেকে একটি লাল রং-এর আসমানীর শাড়ি হাতে

নিয়ে ছুটলেন। কানু সানু ছুটলো পান মিষ্টির খোঁজে। কমলি অর্থাৎ কমলাবালার মুখে একটু পাউডার আর পায়ে আলতা দিয়ে মিষ্টির প্লেট হাতে করে পাঠানো হল মেয়ারির ওঁদের মাঝে। বেশ বেশ করে ছেলের বাবা খুশী হয়ে চলে গেলেন। শুনেছিলাম পণ নিয়েছিলেন হাজার দুই। তবে ওই পর্যন্ত। অন্যান্য খরচা বেশী হয়নি। সেই কমলির দিদির বেলায় বিনা পণে বিয়ে কিন্তু পেস্তা বাদাম কিস-মিস মাছ মাংস ঘি সেই পণের চেয়ে অনেক বেশী খরচার ব্যাপার। সেদিন কমলির বাবা বিক্রি করেছিলেন কিছু ধানের জমি আর আজ প্রীতিলতার বাবা বন্ধক রেখেছেন বসতবাড়ি। সেদিন ছিল কন্যাদায় আর আজ হয়েছে মানের দায়। তফাত আসলে বেশী নয়।

পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিক হিন্দু বিয়ে। কি করতে হয় না হয় কনের বাপ মা ভাল জানেন না। আত্মীয় বন্ধুরাও তথৈবচ। তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ করে আনানো হয়েছে ফেলুমাসীকে আর মেজ কাকীকে। ফেলু-মাসী থাকেন পাড়াগাঁয়ে। অবস্থা তেমন ভাল নয়। তাঁর সমবয়সী অনেক মেয়ে অনেক কিছু করেছে কিন্তু ফেলু বেচারা সেই যে হেঁশেলে হাঁড়ি ধরেছে তার আর পরিবর্তন হয়নি। একটু নুয়ে পড়া শীর্ণ চেহারা। গঙ্গা জলের কলসীটা মোটা একখানা শাড়িতে শক্ত করে বেঁধে যখন রিকশা থেকে নামলেন তখন যেন একটা বিজয়িনীর ভাব তাঁর মুখে চোখে। এবার সবাই জব্দ। স্ত্রী-আচারের খুঁটিনাটি, বরণডালা শ্রী তৈরী করা সবই চলবে শ্রীমতী ফেলুর নির্দেশে। বাকি সব অজ্ঞ বোকা। অথচ আচারের হেরফের হলে আবার তাঁদের মন খুঁত খুঁত করে দারুন। তাই মাসী এবার হালের মাঝি, বিবাহ তরণী তরিয়ে দেবার কাণ্ডারী। ওদিকে মেজকাকীও কম যান না। হাতে পায়ে বিবাদ না বাধলেই হয়। কনে প্রীতিলতা এতদিন অভ্যাসমত ছুটোছুটি

এবার সবাই জব্দ। স্ত্রী আচারের খুঁটিনাটি, বরণডালা শ্রী তৈরী করা সবই চলবে...

করে বেড়াচ্ছিল। প্যান্ডালের খুঁটির কাপড় কি রং-এর হবে, ছাদনাতলার চাঁদোয়ার নমুনা কেমন সাঁচির স্তূপের মত হতে পারে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল কনে মিস্ত্রী-মজুর ডেকরেটদের ডেকে ডেকে। মাসী কাকী বললেন কনেকে এখন সব কথায় থাকতে নেই। প্রীতি বেচারা তাই শান্ত হয়ে এ-কোণে ও-কোণে বেড়াচ্ছে। বরের কথায় চোখ নামিয়ে সলজ্জ শরমের ছায়ায় মুখ লুকোচ্ছে। লজ্জাবনত প্রীতির সঙ্গে বরের অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল তবে যোগাযোগ ঘটিয়েছেন অভিভাবকরাই। পঞ্চদশীর মত হাবভাব নিয়ে সাতাশ বছরের প্রীতিলতার পক্ষে ভবিষ্যতের রঙগীন স্বপ্নের রাঙা দিনের অপেক্ষায় গায়ে হলুদ আর আইবুড়ো ভাতের পালা পার হওয়া ভারতবর্ষেই সম্ভব। ফেলুমাসী কনেকে কাবু করেই চুপ করেন নি, উপস্থিত মহিলামহলকে বেশ শাসনে রেখেছেন। কি করা দরকার তার যেন তিনি একটি চলন্ত মনুসংহিতা। যারা পাঠ নেবে না তাদের কপালে গঞ্জনা লেখা আছে। মেজকাকী ফেলুমাসীর চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু শহরের আওতায় সম্পন্ন সংসারের গৃহিণী। দোর্দণ্ড প্রতাপ। তবে কাকী-মাসীর মধ্যে একটা কমাকষি আরম্ভ হওয়ায় কড়াকড়ি ব্যবস্থায় একটু ফাঁক পড়ে গিয়ে সাধারণ সবাই সুবিধে পেল। নিয়ম-কানুন, আচার-নিষ্ঠা সবেরই যে একেবারে একটিমাত্র পথ নয় এটা বুঝাতে পেরে আমাদের মত আম সাধারণও এদিক-ওদিক ফিরবার সুযোগ পেল। নইলে ফেলুমাসীর ফাঁসে প্রায় সকলকেই ধরা দিতে হত।

বিয়ের লগন এগিয়ে এল। পানুবাবুদের আশেপাশের কোন এক জায়গা থেকে সানাই-এর দল এসেছে। হারমোনিয়ামের সঙ্গে সানাই-এর সুর বাগেশ্রীকে কেপাবেনা করে দিলেও বেশ লাগছিল ওদের আনাড়ীপনার পরিবেশনা। দলের পরিচালক বলে দিয়েছে মশাই-এর দয়া বিশ্বাস বিসমিল্লার মত সুযোগ-সুবিধা পেলে তাঁর দলও একদিন নাম করবে। পানুবাবু যে ঝলমলে বাজের দেওয়া পোশাক পরা এক ব্যান্ড পার্টি নিয়ে আসেন নি তাই রক্ষা। উত্তর ভারতের তাঁদের বিয়ে তো ব্যান্ড পার্টি ছাড়া জমেই না। বর যাবে অশ্বারোহণে যেন পৃথ্বীরাজ চলেছেন সংযুক্তা অপহরণে। সঙ্গে আলো আর ব্যান্ড। যাক সে কথা। ব্যান্ডের দলকেও তো বাঁচতে হবে। সানাই-এর টেপ রেকর্ড আর ব্যান্ড-এর টেপরেকর্ড বাজে কোথাও কোথাও কিন্তু সেটাও যান্ত্রিক যুগের হৃদয়হীনতা বইকি।

বাসর সাজানো হয়েছে ফুলে আর ধূপের গন্ধে। চার পাশে রাখা টেবিল তাক আর আলমারি ভরে উঠেছে উপহারে। উপহারের মডেল কিন্তু পালটেছে। প্রীতির ছাত্রছাত্রী থেকে নিয়ে পানুবাবুর বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত উপহারের চটকে চমকে দিলেন সকলকে। এমনকি পানুবাবুর পাশের বাড়িতে যে সোহাগী নামে গোয়ালিনী থাকে সেও এক

বিসমিল্লার মত সুযোগ-সুবিধা পেলে তাঁর দলও একদিন নাম করবে

স্টেনলেস স্টীলের ট্রে নিয়ে এসেছে। এখানেও টেক্কাটেক্কি। দুর্গা পানওয়ালী পানুবাবুদের পরিচিত জনের একজন। সে যখন কিনলো একখানা ওয়াশ অ্যান্ড ওয়ার শাড়ি তখন সোহাগীর মান রাখতে নামতে হল পুঁজির বড় একটা অংশ নিয়ে। পানওয়ালী তাকে হারাবে! এমনি করে প্রীতিলতার প্রীতি উপহারের চাপে বাসরের শয্যাটুকু সামলিয়ে ঘরটিকে ঠেসে ফেলা হল। মস্ত বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরও এমন সব চয়নের গর্ব করতে পারে না। এদিকে শুনলাম প্রতিযোগীদের অনেকেরই আনতে হয়েছে উপহারটি ধার করে। মাসের শেষ। হাতে টাকা থাকা লোক অন্তত পাড়াগাঁয়ে বেশী নেই। তার উপর অগ্রহায়ণের শেষ তিথি কটিতে এত বিয়ে হয়েছে এদিক-ওদিক যে ধার ভিন্ন গতি নেই। একমাত্র আশা ছিল পরিস্থিতির হের ফের দেখে যদি দু'-একটা বিয়ে ও তারিখ পালটায় তবে দিন কতক জিরিয়ে নিয়ে নেওয়া যায়। তাও তো মাঝের পৌষ মাস-এর তিরিশটি দিন অপেক্ষা করতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। পরিস্থিতিও একটু ঠান্ডা হয়েছে। কাজেই যেমন করেই হক দিতেই হবে মর্যাদামাফিক উপহার।

র‍্যাশন বিভাগের কর্তাদের কড়া আইনে লুচি খাওয়ানো যায় না। খাওয়াতে হবে রাধাবল্লভী। কাজেই বিবাহ সন্ধ্যায় ভদ্র আসরে পরিবেশন করা হলো রাধাবল্লভী। লজিক বুঝলাম না। বন্ধু বুঝিয়ে দিলেন যে লুচি হলে নাকি লোকে বেশী খেয়ে ফেলে। হবেও বা। তার চেয়েও অদ্ভুত নিয়ম মাছ দিতে মানা। তবে চিংড়ি সে পর্যায়ে আসে না। মাংসের বেলায় মুরগী চলবে। এখানেও লজিক কি জানিনা। পাঁঠার মাংস আর রুই কাতলা কি আজকাল গরীবের খাদ্য? সে জন্যই কি ধনীর খাদ্য মুরগীর বেলায় নিয়ন্ত্রণ নেই? অবশ্য কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ বিশারদেরা সাধারণকে ভাল করে জানান নি বলেই এসব ধাঁধা মনে আসে। সর্বদেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট করবার বিধি কি তাও জানি না। ২৩শে নভেম্বর থেকে সরকারী ভাবে শতকরা ষাট ভাগ চিনি খোলাবাজারে আসবার কথা তবু কেন পাঁচ টাকা কিলো খণ্ডেশ্বরীর অখণ্ড প্রভাবে মেঠাইকে মিষ্টি করতে হয়?

পানুবাবু কন্যাবিদায়ের পর অবসন্ন বিষণ্ণ মুখে পাওনাদার বিদায় করছিলেন। সসংকোচে গিয়ে বললাম, 'দাদা যাই'। পাশে বউদি যা শাকসবজি বেচেছে তাই গুছিয়ে তুলছিলেন। পোকা বেগুন, শুকনো মুলো এমনি কয়েকটা জিনিসমাত্র। তাঁরও ভাবশূন্য দৃষ্টি। প্রীতিলতার অভাবে ভেঙে পড়েননি, ভেঙেছেন অন্ধকার ভবিষ্যতের অর্থহীন ইকনমিক্স-এর ভাবনায়। হিসাব যা করেছিলেন তার চেয়ে খরচ হয়েছে অন্তত হাজার পাঁচ ছয় বেশী। বউদির নিরাভরণ হাত দুটি দেখে বুঝলাম সেখানেও সব শূন্যের অঙ্কে ঠেকেছে। আত্মীয় কুটুম্বকে শেষ মেঠাইয়ের টুকরোটি পর্যন্ত গুছিয়ে দিয়ে রওনা করেছেন। কমলি আর তার ছোট বোন দুটি এসেছিল ছেলেমেয়ে নিয়ে তারা বোধ হয় মাসখানেক পরে যাবে। বিবাহোৎসবে নাকি সাধারণ লোক তৃপ্ত হয় মিষ্টান্নে। কমলি আর ছুটকিকে দেখে মনে হল এরা ঠিক সেই দলে নয়। অনেক কাল পরে বাপের বাড়ি এসেছে। সঙ্গে একটু সোনা এনেছিল উপহার। তার জন্য যা খরচা হয়েছে তাতে মাসখানেক ভ্রাতৃগৃহবাস না করলে সপরিবারে উপবাস করতে হবে দিন কয়েক। তা ছাড়া দ্বিরাগমনে আসবে বর-কনে, তখনও একপ্রস্থ মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ হবে বইকি। কতই না আইন, আর কতই না সমাজসংস্কার হয়েছে কিন্তু সংস্কারের গোড়া যেমন তেমনই আছে। পণপ্রথা উঠেছে কি? এখন বরং প্রাণও পণ করতে হয় একটি বিয়ে দিতে। প্রীতিলতাকে পুত্রসম সন্তানের শিক্ষা দিয়েও পানুবাবু রেহাই পাননি। সমাজ আছে তো! প্রীতিলতার গণিতের সীমানা কতটুকু। তার চেয়েও বড় লোকাচারের কঠিন হিসাব।

শ্রীমতী

বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার গ্যালারীতে সম্প্রতি শিল্পী দীপক ব্যানার্জি ও সাতজন বিদেশী শিল্পীর গ্রাফিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। উদ্যোক্তা দীপক ব্যানার্জি তরুণ শিল্পী-মহলে পরিচিত। কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করার পরে তিনি ফরাসী সরকারের বৃত্তিলাভ করেন ও সুবিখ্যাত শিল্পী স্ট্যানলি উইলিয়ম হেয়টারের অধীনে প্যারীর আতেলিয়ার-১৭তে শিক্ষালাভ করেন। বিদেশী শিল্পীদের মধ্যও একজন ছাড়া সকলেই মিঃ হেয়টারের সঙ্গে কাজ করেন। নিজের শিল্পরচনার পাশে বিদেশী শিল্পীদের রচনা নিদর্শন দেখার সুযোগ দিয়ে দীপক ব্যানার্জি সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

প্রদর্শনীতে দীপক ব্যানার্জি মোট ১৮টি গ্রাফিক নিদর্শন পেশ করেন। তার মধ্যে পাঁচখানি লিনোকাট। ইতিপূর্বে অন্য শিল্পীর প্রদর্শনী আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছি যে গ্রাফিক অর্থাৎ এনগ্রেভিং অতি সূক্ষ্ম ধৈর্যের কাজ ও এর রচনাপ্রণালীও জটিল। রচনাক্ষেত্রের (texture) নিত্যনতুন বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করার নেশায় ও আনন্দে শিল্পী এত মশগুল হয়ে ওঠেন যে, আকারের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা তিনি অনেক সময়েই ভুলে যান। ফলে কারুকার্যমণ্ডিত হলেও রচনাটি কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। সুখের বিষয়, এ প্রদর্শনীতে এহেন নিদর্শন অল্পই দেখা যায়। দীপক ব্যানার্জি আকার সম্বন্ধে সচেতন ও তিনি নতুন আকার ও রচনাক্ষেত্রের অভিনব কারুকার্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বিভিন্ন প্রিন্টে রেখা ও রঙের স্বপ্নরাজ্য গড়ে উঠেছে এবং এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। সাধারণভাবে হয়ত এই প্রিন্টগুলির সঠিক ব্যাখ্যা করা চলবে না, তা হলেও এগুলির অতি সূক্ষ্ম রেখাবৈচিত্র্য ও রঙের ব্যঞ্জনা দর্শকের মনে যে রেখাপাত করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রিন্টগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—১১, ১২ ও ১৭ নং। তবে একটি প্রিন্টও আমার ভাল লেগেছে — ১৬ নং। অপেক্ষাকৃত স্থূল রেখা ও হালকা নীল রঙের সংমিশ্রণের ফলে এটিকে বাটিকের বিমূর্ত নিদর্শন বলে মনে হয়। শিল্পীর লিনোকাট নিদর্শনগুলি সরল ও দর্শকদের পক্ষে বোঝাও অনেকটা সহজ। এগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পী সংক্ষেপে বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এগুলির মধ্যে ২৩ নং উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীর অপরাপর প্রিন্ট দেখে বোঝা যায় যে, শিল্পীরা একই

এন্‌গ্রেভিং —দীপক ব্যানার্জি

সেডিয়ার —অশোক মুখার্জি

গুরুর শিষ্য, যদিও সকলেই কম-বেশী আপন আপন চিন্তাশক্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। তা হলেও এ'দের মধ্যে কয়েকজনের প্রিণ্ট উপভোগ্য। গেল সিংগার, অ্যাঞ্জেলিকা ক্যাপোরাসো, রিচার্ড রয়েস ও জীন লজের নাম করা যায়। কেবল একটি কথা না বলে পারলাম না। প্রিণ্টগুলির পরিচিতি (title) ফরাসীর পরিবর্তে ইংরাজী ভাষায় রাখলেই বোধ হয় যুক্তি-সঙ্গত হত। অবশ্য এ জাতীয় প্রিণ্ট একান্তই অনুভূতি সাপেক্ষ, সুতরাং পরিচিতি দেওয়া যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তা নয়—তবে যদি থাকে তা হলে জনসাধারণের সহজবোধ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

*

শিল্পী অশোক মুখার্জী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। পুরাতন শিল্পী হিসাবে অশোক মুখার্জী অনেকের নিকট পরিচিত এবং ইতিপূর্বে তিনি কয়েকটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেছেন। তেলরঙে আঁকা মোট ২৪টি নিদর্শন শিল্পী প্রদর্শনীতে পেশ করেন।

শিল্পীর রঙের পাত্র সীমাবদ্ধ এবং তিনি চাপা ও হালকা রঙ পছন্দ করেন। তাই অধিকাংশ রচনাতেই রঙের স্তরভেদ বিশেষ চোখে পড়ে না। শিল্পীর রচনা, বিষয়বস্তু ও অংকনপদ্ধতি দেখে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাই। সমসাময়িক জীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে নানা বিদ্বেষ ও সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত আদর্শ ও মূল্যো-বোধের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান যুগের মানুষ তাই অধিকাংশ স্থলেই অহংকারী, নৈরাশ্যবাদী, ক্রূর ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। শিল্পীর অনুসন্ধানী চোখে বুঝি তাদেরই ব্যক্তিগত বিভিন্ন চরিত্র ধরা পড়েছে এবং সেগুলিই যেন তিনি নানা মুখমণ্ডলের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন। শুধু তাই নয়, শিল্পী রচিত এই বিভিন্ন মুখও যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়—প্রত্যেক মুখই লম্বমান, অথচ দেখতে ঠিক বিসদৃশ লাগে না। রচনা দেখে মনে হয় শিল্পী ইচ্ছাকৃতভাবেই এহেন বিকৃত মুখের সৃষ্টি করেছেন। এগুলি দেখে কালীঘাটের কাঠের পুতুলের কথা মনে পড়ে: রেখা সর্বস্ব, সরব, বলিষ্ঠ ও আত্ম-কেন্দ্রিক—এদের মধ্য দিয়ে শিল্পী যেন সমকালীন কয়েকটি পরিচিত চরিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে দি ইগটিস্ট (৭), দি পেসিমিস্ট (৬) ও বিশেষ করে প্রিজনার অব ওয়ার (১৯) উল্লেখযোগ্য। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে কয়েক ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তির ছাপ দেখা যায়। তা হলেও অন্য জাতীয় কয়েকটি রচনাও আবার চোখে পড়ে—যেমন, উই বিগিন (১৫)। অখণ্ড ও অনন্ত প্রেম ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে এক নবদম্পতী যেন জীবনের পথে প্রথম পদক্ষেপ করছে—শিল্পী সমাজের এই চিরন্তন রূপটুকু কিন্তু ভুলতে পারেন নি। অথবা তাঁর যীশু খৃষ্টমালার নিদর্শনগুলি ধরা যাক। এগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পীর যে পরিচয় পাই সেটি তাঁর দরদী মনের। সম্ভবত এই প্রেম ও বিশ্বাসই তিনি এই জাতীয় রচনার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য সেডিয়ার (৪)। অপরাপর ছবির মধ্যে কর্নার্ড (২১) ও উই আর (১৬)-এর নাম করা যায়।

*

দিল্লীতে প্রদর্শিত হবার পরে সম্প্রতি কলিকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে সমকালীন অস্ট্রেলিয়ান চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। আন্ত-র্জাতিক শিল্পমহলে সুপরিচিত কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীর নিদর্শন এ প্রদর্শনীতে আছে। আগামী সংখ্যায় এই প্রদর্শনী বিষয়ে আলোচনা করব।

চিত্রপ্রিয়

পৃথিবী কি সম্প্রসারিত হচ্ছে ?

আমাদের এই পৃথিবীতে এবং সৌর-জগতে বর্তমানে যে অবস্থা রয়েছে তা মনে হয় যেন একভাবেই চলেছে, কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু সে রকম ধারণা হবার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি? ধরুন, আমাদের অজ্ঞাতসারে পৃথিবী যদি একটু একটু করে ফেঁপে উঠতে থাকে কিংবা পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ঠিক সেই রকম আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং তার ফলে পৃথিবীর বৎসরের মেয়াদ যদি বাড়তে থাকে? এগুলি ঘটা কিছু অসম্ভব নয়, যদি মহাজাগতিক যুগে যুগে ভূমণ্ডলের অভিকর্ষ কমতে থাকে। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩০ সালের ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পল ডিরাকের সেই অনুমিতির কথা, যাতে তিনি বলেন যে, মহাকর্ষের পরিবর্তন কালগত ব্যাপারের উপর নির্ভর করে। তিনি আরো বলেন যে, যে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের উপর দুটি বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ নির্ভর করে তা মোটেই অপরিবর্তনীয় নয়। তা যুগে যুগে কমে আসছে পৃথিবীর বয়সের বৃদ্ধি অনুপাতে। বর্তমানে পৃথিবীর বয়স মোটামুটি ১২০০ কোটি বছর ধরা হয়। ডিরাকের এই অনুমিতি যদি ঠিক হয়, তা হলে বর্তমানে প্রচলিত সমস্ত ভূতাত্ত্বিক ও মহাজাগতিক তত্ত্বের মধ্যে আসবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যে কারণে আমরা এখনো এই অভিকর্ষীয় ধ্রুবকের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত নই, সেটি হচ্ছে অভিকর্ষের এই পরিবর্তন এত কম যে, তা মাপা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। বর্তমানে এমন পদ্ধতির সন্ধান অবশ্য পাওয়া গিয়েছে, যার দ্বারা মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের পরিবর্তন পরীক্ষা করে দেখা কিংবা অন্তত তার সুস্পষ্ট একটা কিছু লক্ষণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে যাঁরা আশা করছেন, তাঁদের মধ্যে জার্মান ফেডারাল রিপাবলিকের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ হান্স জোর্গ ফাহ্‌রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সূর্যের সঙ্গে গ্রহগুলির মহাকর্ষ যদি ধীরে ধীরে কমতে থাকে, তার একটি ফল দাঁড়াবে এই যে, গ্রহগুলি থেকে সূর্যের দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকবে এবং তাদের প্রত্যেকের বার্ষিক আবর্তনের সময় দীর্ঘতর হতে থাকবে অর্থাৎ বছরের মেয়াদ যাবে বেড়ে। তখন মহাকর্ষের দ্বারা নির্ধারিত সময় (এফিমেরিডিয়াল টাইম) এবং মহাকর্ষের দ্বারা নির্ধারিত নয় এমন প্রমাণ (স্ট্যান্ডার্ড) সময়ের মধ্যে পার্থক্য ঘটতে বাধ্য। পরমাণুর কম্পনের ও সময়ের দ্রুততা পরিবর্তনাতীত বলে ধরে নেওয়া যায় বলে সময়ের মানদণ্ড হবার যোগ্যতা বোধ হয় আর কিছুরই নেই। পরমাণুর কম্পনের দ্রুততার বেগ সম্পূর্ণভাবে তার অভ্যন্তরীণ গঠনের উপর নির্ভর করে এবং সেই জন্যই গ্রহগুলির বার্ষিক আবর্তন-বেগ তুলনার উপযুক্ত মানদণ্ড আর অন্য কিছুর নেই।

কিছু ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপারের গবেষণায় বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়েছেন। দশ বছর ধরে পারমাণবিক ও এফিমেরিডিয়াল সময়ের তুলনায় তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ১০০ বছরে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের যে পরিবর্তন ঘটে তা বর্তমানের ২৪ ঘণ্টার দিনের শত কোটি ভাগের ১ ভাগ। আপাতদৃষ্টিতে এইটুকু পার্থক্যকে যতই তুচ্ছ মনে করা যাক, মহাজাগতিক দৃষ্টি ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিক থেকে এটা মোটেই তুচ্ছ নয়।

আজকাল বিজ্ঞানীরা এই ভেবে আরো আশান্বিত হচ্ছেন যে, অভিকর্ষের পরিবর্তন সম্পর্কে চাঁদ থেকে অনেক কিছু নতুন তত্ত্ব জানা যাবে। তাঁরা ভাবছেন যে, বছর দশেকের মধ্যে মহাশূন্যে যাতায়াতের ব্যাপারটায় এত উন্নতি হয়ে যাবে যে, পৃথিবীর দিকে মুখ করে চাঁদে একটি বিরাট আয়না বসানো যাবে। তখন লেসার রশ্মি প্রতিফলিত করে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব একেবারে নির্ভুলভাবে মাপা যাবে (১ ডেসিমিটার পর্যন্ত)। সুতরাং চাঁদ থেকে দূরত্বে কোন পার্থক্য ঘটছে কিনা সেটা জানতে আর কোন অসুবিধা হবে না। সেই দূরত্ব যদি কমতে দেখা যায়, তা হলে বুঝতে হবে পৃথিবীর আয়তন (চাঁদেরও হতে পারে) সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ভূমণ্ডল নিজেই এমন এক নমনীয় জিনিস, যা আঁটসাঁট হয়ে নিজেকে বেঁধে রাখতে

এই পৃথিবী কি ক্রমশ আরো ফুলে ফেঁপে উঠছে
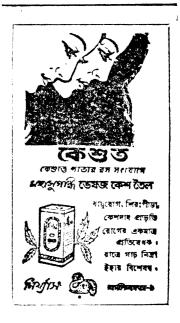
পেয়েছে নিজের অভিকর্ষের দ্বারা। মহাকর্ষের ফলাফলের হ্রাসবৃদ্ধিশীলতার প্রভাব নিশ্চয়ই পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছিল তার সৃষ্টি ও আদিকালে। অভিকর্ষ যদি কমতে থাকে তার মানে ভূমণ্ডলের সম্প্রসারিত হওয়া। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভেগেনারের সেই মহাদেশীয় বিচলন-তত্ত্বের (কণ্টিনেণ্ট্যাল ড্রিফট্) কথা আমরা জানি আজ ৫০ বছর হয়ে গেল, যাতে তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীর আদিকালে একটি মাত্র স্থলভাগ এবং পরে সেটি খণ্ডিত হয়ে আজকের মহাদেশগুলি সৃষ্টি করে। তিনি বলেন যে, যে আফ্রিকা ও আমেরিকা এক সময়ে যুক্ত ছিল, সেটি পরে দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভাসতে ভাসতে দূরে সরে যায়। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে সেই বিচলন বা ভাঙন ভূমণ্ডলের সম্প্রসারণের ফলে ঘটে থাকতে পারে। কিছু বিজ্ঞানীর মতে, এই দুটি মহাদেশের উপকূলের উপাদান, গঠন ও শিলাগুলির চুম্বকধর্ম পরীক্ষা করার ফলে বহু সাদৃশ্য পাওয়া গিয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে মহাদেশ বিচলনের যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের যে সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি। সুতরাং আমরা যদি ধরে নিই যে, পৃথিবীর সম্প্রসারণের কারণ একমাত্র অভিকর্ষের হ্রাস নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভের গভীরে তরঙ্গায়িত কেলাসনও বটে, তা হলে আর কোন গণ্ডগোল থাকে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন ওঠে। আজ মহাকর্ষ যদি কমতে থাকে, তা হলে অতীতে পৃথিবীর উপর সূর্যের আকর্ষণ এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। যদি তাই থেকে থাকে, তা হলে তখন পৃথিবীর বার্ষিক আবর্তনের কক্ষপথ সূর্যের আরও কাছে ছিল। তা হলে সূর্যের প্রদ্যোতনও এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। আর তা থাকলে আদিকালে পৃথিবীর আবহাওয়া অনেক বেশি গরম ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারটা তা হলে তুষার যুগের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। কিন্তু হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য প্যাস্কুয়াল বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা-সভায় বলেন যে, সৌর-প্রদ্যোতন বেশি হলে, তা হলে সারা পৃথিবীর চারদিক ঘন মেঘে আবৃত থাকত (যেমন শুক্রে আছে) এবং সেই মেঘ সৌরশক্তির অধিকাংশই শোষণ করে নিত বলে সৌর-বিকিরণ বেশি পরিমাণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারত না।

পৃথিবীতে প্রত্নজীবতাত্ত্বিকরা শম্বুক ও অঙ্গারক যুগের স্তর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, পৃথিবীর আদিকালে যে সব গাছপালা ছিল সেগুলি সবই প্রায় ছিল ছায়ায় আবৃত, যেখানকার তাপমাত্রা ছিল বড় জোর ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তা ছাড়া সেই সময়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হত, তা সেই সময়কার পৃথিবীর মেঘাবরণের একটি প্রমাণ। সুতরাং সৌর-প্রদ্যোতন বেশি হলেও তুষার যুগের আবির্ভাবে কোন বাধা থাকার কারণ ছিল না।

আবহ-বিজ্ঞান সম্পর্কে ডঃ রামনের নতুন বক্তব্য

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ সি ভি রামন তাঁর এক সাম্প্রতিক থিসিসে বলেছেন যে, অভিকর্ষ শক্তির দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আবহমণ্ডল পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে একই তালে আহ্নিক আবর্তন করে না।

ডঃ রামন তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন:—

আবহমণ্ডলের গতীয় আচরণের চরিত্র এমনই অভিনব, যার ফলে আবহবিজ্ঞানের গোটা আকার ও প্রকৃতি নতুন করে বিচার-বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য। তাপগতিবিজ্ঞানের যুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণমূলক আবহতত্ত্বের বিভিন্ন তথ্য থেকে ডঃ রামন মন্তব্য করেছেন যে, বাষ্পীয় চরিত্রের জন্য বায়ুর উপর, নিচে বা পাশের দিকে প্রবাহিত হতে কোন বাধা নেই। যদি তাই হয়, তা হলে বলতে হয় যে, তাকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আবর্তিত হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতাও তার নেই। বায়ু যখন ভূমণ্ডলের সংস্পর্শে থাকে তখন সৌর-রশ্মির তাপে উত্তপ্ত হয়ে বায়ু উপরের দিকে উঠতে থাকে সেই স্তর পর্যন্ত, যার নাম 'ট্রোপোপজ্'। এই ঊর্ধ্বগতির সময় বায়ুর প্রতিটি প্রবাহ পৃথিবীর সংস্পর্শে থাকার দরুন পৃথিবীর সেই ভরবেগ সঙ্গে নিয়ে ওঠে, যেটা ঊর্ধ্বগতির আরম্ভের সময় ছিল।

উক্ত স্তরে আবহমণ্ডলের স্থৈর্য নির্ধারণ করে উপরে উঠে এসে বায়ুর অংশগুলি আত্মাবর্তন করে কিছুটা তার উপর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে উত্থিত বায়ুর অংশগুলির মিশ্রতার, কিছুটা তার উপর।

পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তন-বেগ হচ্ছে বিষুবরেখাঞ্চলে সেকেণ্ডে ৪৬৫ মিটার এবং মেরুতে ০। সৌর-বিকিরণের যে অংশ পৃথিবীতে এসে তাপ যোগায় তারও সর্বাধিক মাত্রা দেখা যায় বিষুবরৈখিক অঞ্চলে এবং মেরুতে তারও মাত্রা হচ্ছে ০। এই অবস্থায় আবহমণ্ডল বিভক্ত হয় তিন ভাগে — বিষুবরৈখিক বলয়, মধ্যবর্তী অক্ষরেখা অঞ্চলের বলয় এবং মেরু বলয়। প্রতিটি বলয়ের গতীয় আচরণ বিভিন্ন রকমের। সেই আচরণের প্রভাব সেই ট্রোপোপজ্ স্তরেও গিয়ে পড়ে, যার উচ্চতা বিষুবরৈখিক অঞ্চলে সর্বাধিক, মধ্যবর্তী অক্ষরেখা অঞ্চলে তার চেয়ে অনেক কম এবং মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে কম। এই ব্যাপার থেকে ডঃ রামন সিদ্ধান্ত করছেন যে, আবহমণ্ডলের ওই তিনটি বলয় ভূমণ্ডলের আবর্তনের সঙ্গে তুলনা করলে প্রত্যেকে আলাদাভাবে আবর্তিত হয়।

ডঃ রামনের মতে, তাঁর এই সিদ্ধান্ত আবহমণ্ডলের বিভিন্ন জ্ঞাত আচরণের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। উদাহরণ হিসাবে তিনি পূর্ব দিকের [illegible] কথা উল্লেখ করেন, যা [illegible] উত্তরের ও দক্ষিণের মধ্যবর্তী অক্ষরেখা অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। পশ্চিম দিকের বাণিজ্য-বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কেও তাঁর সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। তা ছাড়াও 'জেট্ স্ট্রীম' নামে যে প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন বায়ু পরিচিত, সেটিও ডঃ রামনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জীবনরক্ষার ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি থাক তা কেউই চায় না। তবে নিরাপত্তা নিয়ে নাচানাচি করার কোনও দরকার নেই। এর আরেকটি উদাহরণ দেব। পানাগড় থেকে যে রাস্তা বোলপুরের দিকে গেছে, গাড়িতে সেই রাস্তা ধরে অনেকটা এগোবার পর এক জায়গায় রাস্তার মধ্যে বাঁশ দিয়ে পুলিস গাড়ি থামাল। একজন কনস্টেবল গাড়ির নম্বর দেখে চীৎকার করে আমার গাড়ির নম্বর বলল। পাশে ছোট্ট একটি ক্যাম্প করে একটি পুলিস অফিসার একটা চেয়ার-টেবিল নিয়ে নম্বর লিখলেন। গাড়ি যেতে দেওয়া হল। এই নম্বর নেবার জন্য গাড়ি থামাবার কোনও দরকার ছিল না। কলকাতার যে কোনও একজন ট্রাফিক কনস্টেবলকে এনে বসালেই সে চলন্ত গাড়ির নম্বর একের পর এক নিতে পারত। কলকাতায় কতবার এমন হয়। ট্রাফিক সিগন্যাল না দেখে অন্যমনস্ক হয়ে পার হয়ে গিয়ে ভেবেছি, ভিড়ের মধ্যে নিশ্চয়ই নম্বর নিতে পারেনি। পরে দেখেছি ঠিক চিঠি এসেছে। এসব দিনের জন্য চিঠি তো এসেছেই—এমন কি যেদিন আমি কলকাতায় নেই, গাড়ি গ্যারেজে, সেদিনের

ঘটনার জন্যও চিঠি এক-আধবার এসেছে। যাক সে কথা।

শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা গান্ধীর নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নিয়ে যতই লিখি না কেন, এ কথাও স্বীকার করতে হবে, সর্বত্র সাদা পোশাকে বা ইউনিফর্ম পরে যেসব অফিসার বা নিম্নস্থ কর্মচারী ছিলেন তাঁদের ব্যবহার এ ক'দিন অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত ছিল; ব্যক্তি হিসাবে সকলেই সমালোচনার ঊর্ধে ছিলেন। সবাই চেয়েছেন অনুষ্ঠানটি শান্ত সুন্দর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হোক। হয়েছেও তাই। আকস্মিক একটা পটকার বিস্ফোরণে হয়তো নিরাপত্তা-পরিকল্পনা একটু ম্লান হয়েছে এবং তার আতিশয্য নিয়ে পরে হাসাহাসিও হয়েছে, ঘটনাস্থলে দোষীকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে না পাবায় পুলিসের দারুন দুর্নাম হয়েছে। কিন্তু মুখ মলিন করার মত সক্রিয় ব্যবহার এঁরা কিছু করেন নি।

পটকা ফাটার কয়েক সেকেন্ড আগে বিশ্বভারতীর একটি অ্যান্টিসিল অমনায় অস্থানে সিল করা নিয়ে একটু গোলমাল শুরু হতেই উঠে দাঁড়ালাম। ইন্দিরা-বিরোধী কোনও বিক্ষোভ নাকি? ভাববার সময় পেলাম না, বেশ জোরে একটা পটকা ফাটল। সমস্ত জায়গাটা ধোঁয়ায় ভরে গেল। ছুটে গিয়ে ধোঁয়ার পাশে দাঁড়ালাম। জায়গাটা মুহূর্তে খালি হয়ে গেল। পুলিসের কর্তা-ব্যক্তিরা সবাই এসে গেছেন। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার মাত্র। বেদীতে বক্তা থেমে গেছে। কি হল, কি হবে ভাব সবার। এমনি সময় পুলিস খুব সংযম দেখিয়েছে— কাউকে চার্জ করেনি। পটকার পর লাঠি, লাঠির পর টিয়ার গ্যাস, এই ক্রমগুলো একেবারে হই হই করেনি। আর একই সঙ্গে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষীয় এক ভদ্রলোক ক্ষোভ ও রোষ ভরা কণ্ঠে চীৎকার করে বলে উঠেছেন, "একটা বোমা দিয়ে বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠান ভেঙে দেওয়া যায় না। আপনারা সবাই বসে পড়ুন, বসে পড়ুন, সমাবর্তন চলবে।" কথাটা খুব ভাল লেগেছিল। পটকা বিস্ফোরণের খবরের প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে ওই কথার উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলাম।

সমাবর্তন চলবে কি চলবে না, তা ভাববার সময় আমার ছিল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে ছুটলাম। কয়েক-দিন আগে আশুতোষ বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে ছোঁড়া একটা ইট লেগে ডান হাঁটুটা জখম হয়েছিল। তবু ছুটতে হল। সমাবর্তনের বেদীর পিছন দিকটার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না, যেখানে যাই একটা করে লোহার বেড়া। একটার পর একটা ফেন্সিং, কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে এলাম। টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে দৌড়াচ্ছি, দেখি একদল পুলিস হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। আমাকে আসতে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "উ কোনসে আওয়াজ থা স্যার?" দু'-এক কথায় বললাম, ব্যাপারটা। শুনেই দলের মুখপাত্রটির মুখ দুঃখে, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। শুধু বললেন, "হায় রাম"। আমার প্রতিক্রিয়া, নম্বর দুই যোগাড় হল।

টেলিগ্রাফ অফিসে পৌঁছেই দেখি, কৌতূহলীর দল বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সব চেনা মুখ। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার আগে কেউ এসেছিলেন?" একজন বললেন, আপনিই প্রথম। যাক্, বাঁচা গেল। তা হলে ইউ পি আই-এর খবরই প্রথম যাচ্ছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; ইন্দিরার প্রাণ, এবং আমার ইজ্জত বাঁচাবার জন্য। ভাঙা হাঁটুর ব্যথাটা হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেল।

কি লিখি। টেলিগ্রামের প্রথম লাইনটা কি হবে। কি ফেটেছে, বোমা না পটকা। দুটোর মধ্যে প্রভেদটা ঠিক কি? নিজের অশিক্ষায় নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। হঠাৎ ফেটেছে, না কেউ ফাটিয়েছে। ইন্দিরার দিকে কেউ পটকা বা বোমা ছুঁড়ে দিয়েছিল? নাকি ওখানেই বোমাটা ছিল? যে যেন বলল, গাছ থেকে পড়েছে, কি বলেছিল, গাছ থেকে হঠাৎ পড়ছে না গাছ থেকে কেউ ফেলেছে?

সব ব্যাপারটা ঘটেছে মাত্র মিনিট পাঁচেক আগে। টাইপরাইটারে বসে ভাববার সময় কোথায়? যদি কোনও ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে তবে আরও দু'-একটা অ্যাটেম্পট হতে বাধা কি? কান খাড়া করে রাখ। আরও বেশী দুশ্চিন্তা, বেশী ভেবে লিখতে গেলে ইতিমধ্যে অন্য কেউ এসে আমার আগেই হয়তো প্রথম টেলিগ্রামটা ছেড়ে দেবে, আমি ভাঙা ঠ্যাং, অচল বুদ্ধি নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ইডিয়টের মত কষ্টে হাসি হাসব!

অতএব খুব তাড়াতাড়ি একটি অতি নিরামিষ নিরুত্তাপ নিরপেক্ষ Lead (সংবাদের প্রথম লাইন) ঠিক করে দিলাম "a bomb described by some as a big cracker burst about 100 feet from Premier Indira Gandhi" ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর অবশ্যই Indira unhurt repeat unhurt unscratched repeat unscratched ইত্যাদি।

পর পর দুটো টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ছুটে আবার সমাবর্তন সভায় ফিরে এলাম। ঈশ্বর বারবার আমায় রক্ষা করছেন। ইন্দিরার ভাষণ এখনও চলছে। ইতিমধ্যে কিছুই আর ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রীর মুখ শান্ত অচঞ্চল, একটু যেন অন্যমনস্ক। শুধু এই প্রশংসা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। এই মহিলা একবারের জন্যও মুখে বিপদ-বোধ, বিস্ময় বা বেদনার ছায়া পড়তে দেননি। আগের দিন খেলার মাঠে হেলিকপ্টারে নামবার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রীর মুখের ভাবে একটা সহজ সংযম দেখেছি। শান্তি-নিকেতনে দু'দিনের মধ্যে কোথাও সেই সংযমকে শিথিল হতে দেখিনি। সমাবর্তনে পটকা ফাটার আগে স্নাতকদের সপ্তপর্ণী দিয়ে আশীর্বাদ করার সময় কখনও কখনও তাঁর মুখে একটা হাসি ফুটে উঠতে দেখেছি, কিন্তু সেও পাতলা মেঘে ঢাকা সূর্যের আলোর মত।

এ কথাও অনস্বীকার্য যে, পশ্চিম বাংলায় এই রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভের মধ্যে শান্তিনিকেতনে আসার সংকল্পে অনড় থেকে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য সাহস ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু একা তাঁর সাহসেই কার্যোদ্ধার হত না। যদি না পশ্চিম বাংলার সরকারী বে-সরকারী জনসাধারণও ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসব ও বিশ্বভারতীর সমাবর্তনের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানে সহায়তা না করতেন। এতোর মধ্যেও একটা পটকা ফেটেছে সেটা বড়ো কথা হলেও, সেটাই সব নয়। ওই যে ১৫০ জন কালো পতাকাধারী বিক্ষোভকারী শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পুলিসের বাধা পেয়ে বাধা না ভেঙেই ফিরে গেল, শান্তিনিকেতনের শান্তিরক্ষায় তাদের নীরব অবদানও কম নয়। যে পুলিস দল লাঠি হাতে থাকা সত্ত্বেও একবারের জন্যও তার নির্দয় নির্মম ব্যবহার করে নি, তাদের অবদানও কম নয়।

শান্তিনিকেতনে কারও মনেই এবার খুব শান্তি ছিল এ কথা বলা যায় না। শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হাজার হাজার লোক তৎসত্ত্বেও সমাবর্তন উৎসবের চার দিকের অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিল। মেলায় ভিড় করেছেন। মনে অশান্তি থাকা সত্ত্বেও, অশান্ত মনে কেউ তুমুল অশান্তির সৃষ্টি করেন নি। এটাই এবারের শান্তি-নিকেতনের পরম অভিজ্ঞতা। এই শান্তি বজায় থাকুক, সংক্রামিত হোক—সমাবর্তনের শেষে সকলের মনে এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হয়েছে।

চব্বিশ পরগণার মন্দির : বহড়ু

অসীম মুখোপাধ্যায়

টেরাকোটা অলংকৃত মন্দির বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় থাকলেও ফ্রেসকো সজ্জিত মন্দিরের সংখ্যা একেবারেই কম। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণের সময় এমন মন্দির খুবই কম চোখে পড়েছে যাদের দেওয়ালে ফ্রেসকো আছে। এদিক থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহড়ু গ্রামের ফ্রেসকো সজ্জিত মন্দিরটি আলোচনার দাবি রাখে। কলকাতার প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণে বহড়ু গ্রাম (জয়নগর থানা, আলিপুর মহকুমা)। এই গ্রামের বসু বাড়ির ভিতরে রয়েছে আলোচ্য মন্দিরটি।

এই মন্দিরের আকৃতি এবং অঙ্গসজ্জা নিয়ে আলোচনা করার আগে বহড়ু গ্রাম ও বহড়ু বসু পরিবার সম্পর্কে কিছু বলা বোধ হয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বহড়ু গ্রাম অতি পুরনো। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে এই গ্রামে মাটি খুঁড়ে কালো পাথরে খোদাই করা কয়েকটি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে একটি সূর্য মূর্তির নির্মাণ কাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রাক-মুসলিম যুগেও বহড়ু ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জনবসতি ছিল। এই গ্রামের "বড়ুক্ষেত্র" নামে সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের "রায়মঙ্গল"-এ—সওদাগর পুষ্প দত্তের সিংহল থেকে আদিগঙ্গা পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের বিবরণে—

"লখনে দামামা ধ্বনি ভাবি রায় গুণমণি
বড়ুক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসতে উপনীত হইয়া সাধু হরষিত
পুজিল ঠাকুর সদানন্দে॥"

এই বড়ুক্ষেত্র নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে বড়ু বা বহড়ু। গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছি—দেখেছি তাঁরাও উচ্চারণ করেন বড়ু; বহড়ু নয় এবং বলেন যে তাঁদের পিতা বা পিতামহরাও বড়ুই বলতেন। আঞ্চলিক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রাম-বৃদ্ধদের মতামত বা তাঁদের জ্ঞাত তথ্যও অনেক সময় কাজে লেগে থাকে। কিন্তু বড়ু নাম কেন হল এই গ্রামের? বড়ু শব্দের অর্থই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে বড়ু শব্দটি ওড়িয়া ভাষা থেকে এসেছে, এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ "বটু"। বড়ু বা বটুর অর্থ হল ব্রাহ্মণ তনয়। তাহলে বড়ুক্ষেত্র হল ব্রাহ্মণ তনয়ের নিবাস বা ব্রাহ্মণের নিবাস। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এখান-

মন্দিরের দরদালান

রাসমণ্ডল

ছবিগুলির বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় যে, এদের আয়ুষ্কাল আর মাত্র কয়েক বৎসর। আগেই বলেছি এ ধরনের মন্দিরের সংখ্যা বাংলাদেশে খুব কম। বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া জেলা) দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত লালজীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে প্রবেশ পথটির ঠিক উপরে একদা অংকিত ফ্রেসকোর কিছু এখনও টিকে আছে—কমলা রং-এর জমিনের উপর আঁকা সাদা ফুলগুলি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তী খিলানের গায়েও হলদে রংয়ের জমিনের উপর সাদাফুল ও সবুজ লতাপাতা আঁকা হয়েছিল, বর্তমানে বিবর্ণ হয়ে আসছে। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর গ্রামেও একটি ফ্রেসকো সজ্জিত মন্দির দেখেছিলাম। ওই গ্রামের ওঝাপাড়ায় একটি শিবমন্দিরের দেওয়ালে ফ্রেসকোর ব্যবহার করা হয়েছিল রামলীলা এবং শিবপার্বতী বিষয়ক মোটিফকে কেন্দ্র করে। রোদ আর বৃষ্টি ছবিগুলিকে একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছে, জানি না বর্তমানে তাদের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। যে কয়টি ফ্রেসকো সজ্জিত মন্দির এ পর্যন্ত দেখেছি তাদের মধ্যে বহড়ুর শ্যামসুন্দর মন্দিরের ছবিগুলি অন্যান্যগুলির তুলনায় মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে, যদিও তাদের আয়ু দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

শ্যামসুন্দর মন্দিরের দরদালানের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দেওয়ালে এবং মূল মন্দিরের পাঁচটি প্রবেশপথের ঠিক উপরে আলোচ্য ফ্রেসকোগুলি রয়েছে। দরদালানের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দেওয়ালে প্রায় বর্গাকার জমিনের উপর এই মন্দিরের প্রধান ফ্রেসকোগুলি অংকিত। প্রবেশপথগুলির উপরে যেখানে অন্যান্য ফ্রেসকোগুলি আছে সেই অংশের মাপ হলো—উচ্চতা ১ ফিট ১১ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৪ ফিট ১০ ইঞ্চি। রামলীলা, কৃষ্ণলীলা এবং চৈতন্যলীলা বিষয়ক বিভিন্ন মোটিফ নিয়ে ফ্রেসকোগুলি অংকিত।

দরদালানের পূর্বদিকের দেওয়ালে বিভিন্ন অবতার মোটিফ স্থান পেয়েছে, যেমন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম এবং কল্কি। আর এক জায়গায় বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথকে দেখা যাচ্ছে। বিষ্ণুলীলা বিষয়ক দুটি মোটিফ দেওয়ালের শীর্ষদেশে স্থান পেয়েছে। বৈকুণ্ঠধামে শংখ, চক্র এবং গদাপদ্মসহ লক্ষ্মীনারায়ণ দাঁড়িয়ে আছেন। এর ডানদিকে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণু, বিষ্ণুর পদতলে লক্ষ্মী বসে আছেন, বিষ্ণুর নাভিদেশ থেকে ব্রহ্মা উঠছেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মোটিফের সংখ্যাই বেশী যেমন অষ্টসখী পরিবৃত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, হরিহর, রাধার মানভঞ্জন, কালীকৃষ্ণ, কংসবধ, যশোদা কর্তৃক শিশু কৃষ্ণকে মাখন প্রদান, যমলার্জুন, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা। দরদালানের এই

অংশেই মন্দিরের দুটি উৎকৃষ্ট ফ্রেসকো আছে। একটিতে চৈতন্যদেবের ষড়ভুজ মূর্তি, চৈতন্যদেবের দুই পাশে দণ্ডায়মান রাজা প্রতাপ রুদ্র ও সভাপণ্ডিত সার্বভৌম। বিষয়বস্তু হিসেবে এই ছবিটি এতই অভিনব যে এর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। চৈতন্য ভাগবতে দেখা যায় যে, পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রের সভাপণ্ডিত সার্বভৌমকে চৈতন্যদেব ভাগবতের গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ষড়ভুজ মূর্তি দেখিয়েছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে আছে:—

ব্যাখ্যা শুনি সার্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে গণে এই কিনা ঈশ্বর বিদিত॥
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইল ষড়্‌ভুজ অবতার॥

*

অপূর্ব ষড়্‌ভুজ মূর্তি কোটি সূর্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেল সার্বভৌম মহাশয়॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জন।
আনন্দে ষড়ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥

কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত চৈতন্যদেবের সেই উন্মত্তরূপ আলোচ্য ছবিটির মধ্যে নেই। বরং কোমল সুন্দর করুণাঘন চৈতন্যকেই আঁকবার চেষ্টা করেছেন চিত্রকর। ছবিটি দেখলে নরোত্তমের চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণিত ষড়ভুজ চৈতন্যের কথাও মনে পড়ে যায়:—

হেনই সময়ে প্রভু ষড়ভুজ শরীর।
দেখি সার্বভৌম হইল আনন্দ অস্থির॥
ঊর্ধ দুই হাতে ধরে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হাতে ধরে মুরলী অধর॥
নিম্ন দুই হাতে ধরে দণ্ড কমণ্ডল।
দেখি সার্বভৌম হইল আনন্দে বিহ্বল॥

একেবারে নীচে ডানদিকে যে ছবিটি আছে তা নিঃসন্দেহে এই মন্দিরের সর্বোৎকৃষ্ট ছবি এবং বিষয়বস্তু হিসাবে এর নির্বাচনে শিল্পীর কল্পনাশক্তি ও মৌলিকত্বের পরিচয় বহন করছে। ছবিটির বর্ণনা দিচ্ছি: প্রমোদ উদ্যানে উপবিষ্টা অন্যমনস্কা রাধা, উদ্যানসংলগ্ন প্রাসাদের এক পাশ থেকে কৃষ্ণ গোপনে রাধার দিকে চেয়ে আছেন। রাধার সখী বিশাখা একটি আয়না ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, আয়নায় রাধা ও তাঁর পেছনে কৃষ্ণের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাখার উদ্দেশ্য রাধাকে কৃষ্ণের উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া আর ঠিক তাই তিনি দেহটিকে ঈষৎ হেলিয়ে দিয়ে একটি বিশেষ কৌশলে আয়নাটি ধরে আছেন।

পশ্চিম দিকের দেওয়ালে আঁকা রয়েছে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ কুঞ্জ ও যমুনা নদী। দেওয়ালের ঠিক মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ রাসমণ্ডল দেখা যাচ্ছে। রাসমণ্ডলের কেন্দ্রে বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর দুই পাশে রাধা ও জনৈকা সখী। দ্বিতীয় বৃত্তটিতে অষ্টসখী সহ নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ। তৃতীয় বৃত্তটিতে কুঞ্জগৃহ ও বৃক্ষের মোটিফ দেখা যাচ্ছে।

এইবার প্রবেশপথগুলির উপরভাগের ফ্রেসকো কটি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। ডানদিক থেকে প্রথম প্রবেশপথটির উপরে যে ছবিটি দেখা যাচ্ছে তার বিষয়বস্তু হলো বৃষোপরি উপবিষ্ট হরপার্বতী। হরপার্বতীর দুই পাশে নন্দী ও ভৃঙ্গী। দুই নম্বর প্রবেশ পথটির উপরভাগের ছবিটিতে রামলীলা বিষয়ক মোটিফ স্থান পেয়েছে। সিংহাসনে সীতাকে পাশে নিয়ে রাম বসে আছেন। তাঁর ডানদিকে রাজছত্র ধরে আছেন ভরত, ভরতের পেছনে করজোড়ে দণ্ডায়মান হনুমান। রামের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে চামর দোলাচ্ছেন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। তিন নম্বর

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি

কৈলাসে বৃষোপরিউপবিষ্ট হরগৌরী

প্রবেশপথের উপরে যে দৃশ্যটি অংকিত তাও এক হিসাবে উল্লেখযোগ্য। কেন না উপবিষ্ট গণেশের দুই পাশে দণ্ডায়মান দুই ব্যক্তির একজন হচ্ছেন নন্দকুমার বসুর পুত্র রামধন। চার নম্বর প্রবেশ পথের উপরে চৈতন্যদেবের নামসংকীর্তনের দৃশ্য স্থান পেয়েছে, ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, চৈতন্য তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মত্ত হয়ে নৃত্য করছেন। ঠিক মাঝখানে একটি তুলসী মঞ্চ। তার একপাশে যবন হরিদাস ও নিত্যানন্দ এবং অপর পাশে শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত ও অপর একজন ভক্ত। চৈতন্য ভাগবতে ভক্তসহ চৈতন্যদেবের এই উদ্দাম নৃত্যের বর্ণনা আছে। পাঁচ নম্বর বা একেবারে বাঁদিকের প্রবেশপদ্ধতির উপরে যে ফ্রেসকোটি আছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের অধিকাংশ ফ্রেসকোগুলি বিবর্ণ এবং অস্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু এটি আজও মোটামুটি উজ্জ্বলই আছে। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন আর রাধা তাঁকে পেছন থেকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছেন, তাঁদের দুইপাশে দুইটি বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে।

শ্যামসুন্দরের মন্দিরগাত্রের এই ফ্রেসকোগুলির শিল্পী দুর্গারাম ভাস্কর। দরদালানের পূর্বদিকে শিল্পী বাংলা হরফে তাঁর পরিচয় রেখে গেছেন এইভাবে,—

"অতি দিন হিন ভক্ত জনঃ দুর্গারাম ভাস্করেন ঃ চিত্রকরেন।" ।

কিন্তু কে এই দুর্গারাম ভাস্কর? কোন প্রদেশের লোক তিনি? বাংলার না রাজস্থানের? আগেই বলেছি যে বহড়ুর এই মন্দিরটি নির্মাণে পশ্চিম ভারতীয় স্থাপত্য রীতির অনুসরণ করা হয়েছিল। গর্ভগৃহের ভিতরে যে সিংহাসনটি আছে তার সঙ্গে সমকালীন রাজস্থানী বাসগৃহের মিল যথেষ্ট আছে। বিশেষ করে সিংহাসনের ছাদের অংশটি। ফ্রেসকোগুলির উপরও সমসাময়িক রাজপুত চিত্রকলার প্রভাব সুস্পষ্ট, বিশেষ করে রংয়ের ব্যবহারে এবং

পুরুষ ও নারী উভয়ের সাজপোশাকের উপকরণের মধ্যে। এ থেকে ধারণা হতে পারে যে, শিল্পী দুর্গারাম রাজস্থানের লোক। নন্দকুমার তীর্থভ্রমণের সময় রাজস্থানে গিয়েছিলেন। তাঁর হয়তো রাজস্থানী চিত্রকর দুর্গারামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এবং তাঁকে দিয়েই তিনি বড়-মন্দিরের ছবিগুলি আঁকান। কিন্তু পুরোপুরি রাজস্থানী ভাব ফ্রেসকোগুলির মধ্যে নেই এবং কয়েকটি ফ্রেসকোর ক্ষেত্রে সমসাময়িক বাংলা পটচিত্রের প্রভাবও অংশত দেখা যাচ্ছে। আবার, দুর্গারামের ভাস্কর উপাধি থেকে তাঁকে বাঙ্গালী বলে অনুমান করা যেতে পারে, কেন না সমসাময়িক বাংলাদেশে এই নামে পরিচিত কিছু চিত্রকর ছিলেন এবং তাঁদের প্রথাগত রীতিতে প্রতিমার চালচিত্র আঁকতে দেখা যেত। কিন্তু দুর্গারাম যদি এদেশীয় চিত্রকরই হবেন, তবে কেন শ্যামসুন্দর মন্দিরের ফ্রেসকো-গুলিতে এদেশীয় চিত্রকলার শৈলীটা নিরঙ্কুশ একাধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি? সমসাময়িক কালীঘাটের পটে রেখার টানের যে বলিষ্ঠতা দেখা যায় দুর্গারামের ছবিতে তা নেই। তাঁর ছবি-

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাঁরা দেখবেন তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, এগুলির মধ্যে রাজস্থানী ও এদেশীয় উভয় প্রভাবই আছে। ফ্রেসকোগুলি দেখে এই সিদ্ধান্তে এসেছি:—দুর্গারাম ভাস্কর হয়তো বাঙালীই ছিলেন, নন্দকুমার শ্যামসুন্দরের মন্দিরে ছবি আঁকবার জন্য তাঁকে বহড়ুর বাড়িতে নিয়ে আসেন। নন্দকুমার রাজস্থানে থাকায় রাজস্থানী চিত্রকলার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। মন্দিরের ছবিগুলি রাজস্থানী প্রথায় আঁকবার জন্য হয়তো তিনি দুর্গারামকে কয়েকটি রাজস্থানী চিত্র নমুনা হিসাবে দিয়ে থাকবেন। এখন, শিল্পী দুর্গারাম যিনি এতদিন পর্যন্ত পুরোপুরি এদেশীয় রীতিতে ছবি এঁকে এসেছেন তাঁর পক্ষে রাজস্থানী চিত্রকলার কলাকৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি, ফলে ফ্রেসকোগুলি হয়েছে আধা রাজস্থানী এবং আধা পটচিত্র।

দরদালানের পূর্বদিকের দেওয়ালে কয়েকটি ছবিতে যদিও দুর্গারামের মৌলিকত্ব, কল্পনাশক্তি এবং নিষ্ঠার পরিচয় মেলে, আমার মতে এই অংশেই শিল্পীর ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে। প্রথমত ছোট বড় অনেকগুলি ছবিকে তিনি এমন অবিন্যস্ত অবস্থায় এঁকেছেন যে, একটি থেকে আরেকটিতে যাওয়ার পথে আমাদের দৃষ্টি বারবার হোঁচট খায়। কয়েকটি ছবি কেবলই ছবি হয়েছে তাদের মধ্যে প্রাণের কোন স্পন্দন পাওয়া যায় না এবং দেখে মনে হয় যেন এগুলি আঁকবার সময় শিল্পী তাঁর কাজ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। একটু দ্রুত গতিতে এবং অযত্নে যেন এই ছবিগুলি তিনি এঁকেছিলেন। আবার কোন কোন ছবি দেখে মনে হয় যেন আঁকা শেষ করার পরে হঠাৎ শিল্পীর নজরে পড়েছিল যে, খানিকটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে, ওইখানে যাহোক একটা কিছু এঁকে দেওয়া যেতে পারে এবং তিনি তাই করেছিলেন। এর ফল হয়েছিল খারাপ। যে ছবি বা ছবিগুলি দিয়ে তিনি শূন্যস্থান পূর্ণ করেছিলেন সেগুলির কোনটাই ভাল হয়নি। বরং আশেপাশের ভালো ছবিগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছে। যেমন কালীকৃষ্ণ ও প্রমোদ উদ্যানে রাধা, এই দুইটি ছবির মধ্যস্থলে অংকিত কংসবধের দৃশ্যটি। কৃষ্ণ কংসের কেশাকর্ষণ করে তাঁকে মাটিতে নামিয়ে আনতে চাইছেন, অথচ কৃষ্ণের ভাবভঙ্গী জড়ভরতের মত। কংসের অঙ্গভঙ্গীতেও কোন আতংকের ভাব ফুটে ওঠেনি, বরং মনে হবে যে কংস সিংহাসনে বসে মাথাটি সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। আর কৃষ্ণ তাঁর মাথায় হাত দিয়ে ধীরস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই ধরনের ছবির মধ্যে যে গতি আশা করা উচিত, এক্ষেত্রে তা নেই। একটু নীচেই প্রমোদ উদ্যানে রাধার সেই মনোরম চিত্রটি। উপরে নীচে যদি আরও

বহড়ু বসু বাড়ির একাংশ
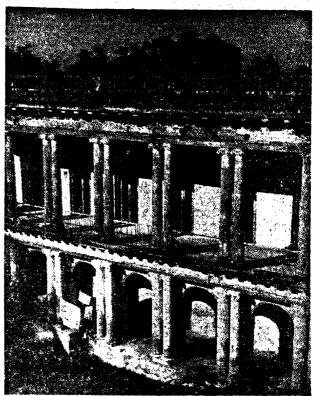
খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখতেন দুর্গারাম, তবে ছবিটিকে আরও সুন্দর দেখাত। কিন্তু শিল্পীজনোচিত পরিমিতি জ্ঞানের অভাব ঘটেছিল তাঁর। কংসবধ দৃশ্যের অবতারণা করে তিনি এমন চমৎকার ছবির সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়েছেন। দরদালানের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে অবশ্য এ ধরনের কোন ত্রুটি তিনি করেন নি। বরং ৪ ফিট ৪½ ইঞ্চি পরিধির রাসমণ্ডলটি তাঁর অঙ্কন প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। একেবারে বাঁ দিকের প্রবেশ পথটির উপরে যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি রয়েছে সেখানেও শিল্পী দুর্গারাম তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সব মিলিয়ে এই ছবিটির মধ্যে একটা কোমল ভাব বিরাজ করছে, যা উপলব্ধি করার মত।

ফ্রেসকোগুলির আলোচনা শেষ করার আগে আর একবার দরদালানের পূর্ব দিকের দেওয়ালে অঙ্কিত প্রমোদ উদ্যানে উপবিষ্টা রাধার ছবিটির উল্লেখ করছি। প্রকৃত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দৃশ্য এটা হতে পারে না। কৃষ্ণলীলার কোথাও এমন কোন বর্ণনা নেই, যার মধ্যে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ ইওরোপীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত প্রাসাদের আড়ালে আত্মগোপন করে আছেন, আর রাধা একটি মোড়ার হাতে বসে আছেন এবং বিশাখার হাতে একটি চতুষ্কোণ ফ্রেমে আঁটা আয়না। শুধু তাই নয় প্রাসাদের গায়ে ভেনেসিয়ান জানালাও দেখা যাচ্ছে। আসলে কৃষ্ণলীলার মাধ্যমে শিল্পী দুর্গারাম তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের উচ্চ কোটির নারী-পুরুষের প্রেম-লীলাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ধার্মিকের চোখে দৃশ্যটি কৃষ্ণলীলাই বটে। কিন্তু সন্ধানী চোখে আসল জিনিসটি ধরা পড়তে দেরি হবে না। এই ছবিটিকে একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক আলেখ্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবির আলোকচিত্র শিল্পী:
অমল [illegible]

বিজ্ঞান ও প্রগতির পথ

অধ্যাপক অম্‌ল্যধন দেব তাঁর বক্তব্য বলবার ঝোঁকে আমাকে প্রায় প্রতিপক্ষ কল্পনা করে নিয়েছেন। এটা তাঁর ভুল। কিন্তু সেটা সামান্য কথা। তাঁর বক্তব্য মূল্যবান এবং অধ্যাপক ব্লাকেটের নেহরু-স্মৃতি বক্তৃতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এ বিষয়ে অধ্যাপক দেবের সঙ্গে আমার মতের সাদৃশ্য এতই বেশী যে, আমাদের উক্তি পাশাপাশি সাজালে ক্রিয়াপদের ব্যবহার ছাড়া সাধারণ পাঠক অন্য কোনো বড় পার্থক্য সম্ভবত লক্ষ করবেন না। অধ্যাপক দেব লিখেছেন : "বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কত বরাদ্দ হইল বা কতজন বিজ্ঞানী ও ইনজিনীয়ার সৃষ্টি হইল তাহা বড় কথা নহে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও লোকবল কতটুকু দক্ষতার সহিত কাজে লাগানো হইবে তাহাই আসল কথা।" ('দেশ', পৃঃ ৫৫০) আমি লিখেছি : "এদেশের গবেষণাগারে বিজ্ঞানচর্চা যতটুকু হয় তার সঙ্গে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার, কৃষি ও শিল্পের, যোগাযোগ কম।" (পৃঃ ২৩৯) বিজ্ঞানের মূল্য ব্যবহারে, "বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের বিচ্ছেদ" (পৃঃ ২৪০) দূর না-হলে শুধু ওপরতলার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও কিছু গবেষণাগার নিয়েই-যে দেশের আর্থিক দারিদ্র্য ঘুচবে না, এ কথাটা বোঝাতে গিয়ে আমরা উভয়েই জাপানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি। আশা করি অধ্যাপক দেবের চিঠি পড়ে পাঠক বিষয়টি আবার নতুন করে চিন্তা করবেন।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসা যাক। "জ্ঞানই শক্তি" কথাটি বেকন "পারমার্থিক" অর্থে বলেননি। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির উপর তার আধিপত্য বাড়াবে এবং আর্থিক জীবনের উন্নতিসাধন করবে এটাই তিনি প্রধানত বলতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে তিনি একটি পরিষ্কার পার্থক্যসূচক রেখা টেনেছিলেন। তিনি ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক সত্য প্রমাণ করা যায় এই ভ্রান্ত (অর্থাৎ, বেকনের মতে ভ্রান্ত) ধারণা ত্যাগ করে তিনি বিজ্ঞানকে আর্থিক জীবনের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত করবার পক্ষপাতী ছিলেন। এর ফলে মানুষ সর্বসুখ লাভ করবে না; কিন্তু এর অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব অপূর্ণ থাকবে।

যা-কিছু বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রমাণ করা যায় তা সত্য হতে পারে না। পারমার্থিক সত্যকে যুক্তি দ্বারা অপ্রমাণ করা যায় না, আবার প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। জীবনে এই পারমার্থিক সত্যেরও প্রয়োজন আছে, বেকন একথা বিশ্বাস করতেন।

আত্মজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সংস্কৃতির বিবর্তনে এমন একটা সময় আসে যখন এ দুয়ের ভিতর অভেদজ্ঞানে দুই-ই একপ্রকার ভাবালুতা দ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন ভেদনির্ণয় করেই বস্তুজ্ঞান-চর্চাকে শক্তসমর্থ করে তোলা যায় এবং তার নিজস্ব বিচারপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আলোচনাও সহজ হয়। বিজ্ঞান বলতে বেকন এই সীমায়িত অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু-জ্ঞানচর্চাই বুঝেছিলেন। এদেশে আমরা বড় সহজে অভেদ চিন্তায় চলে যাই এবং বলিষ্ঠ বিজ্ঞানদৃষ্টির অভাবে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকেও অতি অনায়াসে প্রজ্ঞা বলে গ্রহণ করি।

যুক্তি ও বিজ্ঞানসাধনার এই দুই ফল : এতে সমাজ আর্থিকভাবে বলীয়ান হয় এবং আধ্যাত্মিক জীবন কুসংস্কারের সংক্রামণ থেকে শুদ্ধ হয়। এদেশে আমরা এদুটি কাজের কোনোটিতেই বেশী দূর অগ্রসর হইনি। তার বদলে আমরা কেউ-বা আত্মতুষ্ট আধ্যাত্মিক বড়াই আর কেউ-বা অবাস্তব বিপ্লবী চিৎকারে ব্যস্ত। এতে শুধু ব্যর্থতার উপর ব্যর্থতাই স্তূপীকৃত হবে। প্রগতির পথ ভিন্ন। সেই পথের কথাই আমার প্রবন্ধে বলবার চেষ্টা করেছি। বিশেষভাবে চিহ্নিত কোনো ধর্ম অথবা সমাজ-ব্যবস্থাই উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যবহার অপরিহার্য এ ছাড়া প্রগতির অন্য পথ নেই।

অম্লান দত্ত

২

গত ১৮ই নভেম্বর প্রকাশিত 'বিজ্ঞান ও প্রগতির পথ' প্রবন্ধে লেখকের সহজ, সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার মাধ্যমে যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা শুধু উপযুক্তই নয় উপযোগীও বটে। বর্তমান ভারতের রাজনীতি, শিক্ষা, অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থায় ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব যে শুধু প্রগতির পথ রুদ্ধ করবে তাই নয়, ভারতের এক অন্ধকার অধ্যায়ও সৃষ্টি করবে। লেখককে ধন্যবাদ তাঁর এই সময়োপযোগী আলোচনার জন্য। কিন্তু লেখকের এই আলোচনার প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখতে চাই।

লেখকের মতে—প্রাচীন ভারতের প্রতি অন্ধ অনুরাগ আমাদের মনকে বিজ্ঞানবাদী হতে দেয় নি। আমাদের মনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই শুধু আছে তর্ক-জাল বিস্তারের প্রচেষ্টা। [illegible] তাই প্রাচীনের প্রতি লেখকের ক্ষোভ ও বিদ্রূপ পরিস্ফুট। তাই তাঁর মতে "আমরা তার্কিক। অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এ দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারল না।"

পরিষ্কার করে বুঝতে পারি না যে "তর্ক" ও "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর" মধ্যে লেখক কিভাবে পার্থক্য এনেছেন। বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান কখনও সম্ভব নয়। সেই বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করি আমরা কতকগুলি সম্ভাব্য সত্যকে। সেই সম্ভাব্য সত্যকে আমরা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করি, অভিজ্ঞতায় যাচাই করি। বুদ্ধি, যুক্তি ও যাচাই—এই তিনেই কি বিজ্ঞানের ভিত্তি নয়? "তর্ক" কি এই তিনকে বাদ দিয়ে? লেখক এখানে "তর্ক" বলতে কি বুঝিয়েছেন জানিনা। তবে সম্ভাব্য সত্যের খাতিরে সম্ভাব্য অসত্যকে খণ্ডন করে শুধুমাত্র সত্যের প্রতিষ্ঠাই তর্ক এবং এই বিজ্ঞান। তাই একথা বলা যায় যে, আমরা আজ যতখানি বৈজ্ঞানিক ঠিক ততখানিই তার্কিক।

লেখকের মতে—প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-চর্চার কথা নাকি বিচারে টেঁকে না এবং এরূপ মন্তব্য করাও প্রাচীন ভারতের প্রতি "অতিভক্তিবশত।"

এ প্রসঙ্গে আলোচনার প্রথমেই আমাদের জেনে নিতে হবে যে বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি। ওয়েবস্টারের আভিধানিক সংজ্ঞাই ধরি বা এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার দেওয়া সংজ্ঞাই ধরি, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে তথ্যপূর্ণ-ভাবে জানাই বিজ্ঞান—তত্ত্বের কথা নাই বা ধরলাম। রাসেলকে অনুসরণ করেও বলা যায় যে, বিজ্ঞানের দুটি মৌলিক উদ্দেশ্য।
'....It desires to know as much as possible ...... and to embrace all the known facts in the smallest possible number of general laws.

বিজ্ঞানের যে সংজ্ঞাটাকেই ধরি না কেন, এটা নিঃসন্দেহভাবে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে তথ্যপূর্ণভাবে জানাই বিজ্ঞান —তত্ত্বের কথা নাই বা ধরলাম। এইবার দেখা যাক্ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা সত্যি সত্যিই ছিল কিনা : সৌরজগৎ সম্বন্ধে (গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থিতি, দূরত্ব ইত্যাদি) প্রাচীন ভারতীয়দের কাছ থেকে যে জ্ঞান আমরা পাই তা কি বর্তমান বিজ্ঞানের তথ্য থেকে খুব একটা পৃথক? লেখককে এ প্রসঙ্গে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থটি এবং একেন্দ্রনাথ ঘোষের 'Studies in Rig-Vedic Deities Astronomical and Meteorological' গ্রন্থটি আলোচনা করবার জন্য অনুরোধ

করেছি। বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও তারই সঙ্গে Space, Time ও Ether সম্বন্ধে তাঁদের তথ্য কি এখনও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে? চিকিৎসার ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসা ও সেই সঙ্গে ব্যবহৃত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহের কথা লেখক ভুলে গেলেন কি করে? এমনকি প্রাচীন ভারতে প্ল্যাস্টিক সার্জারি বিদ্যাও ছিল। ডাঃ হির্শবার্গের মন্তব্য তুলে দিচ্ছি এ প্রসঙ্গে '.... The whole plastic surgery in Europe .... the transplating of sensible skin flaps is also an entirely Indian method.'

এগুলি কি প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রমাণ নয়? প্রাচীনকে অস্বীকার করা ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞা করারই সামিল।

লেখক বলেছেন যে, প্রাচীন ভারতে যদি বিজ্ঞান-চর্চা থাকত তাহলে ভারত বারবার বহিঃশত্রুর কাছে পরাজিত হত না!

অভিনব যুক্তির বিরুদ্ধে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে যুদ্ধে জয় পরাজয় কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি? লেখক বোধ হয় বিজ্ঞানকে শুধু পার্থিব শক্তি হিসাবেই দেখেছেন। জ্ঞান ও পার্থিব শক্তির মধ্যে অনেকটা ব্যবধান।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লেখক বার-বার 'ব্যবহারিকজ্ঞান' ও বিজ্ঞানকে এক করেছেন—কিন্তু বিজ্ঞান কি শুধুই ব্যবহারিকজ্ঞান? বরং এর বেশীর ভাগটাই-তো থিয়োরেটিক্যাল। সাধারণত কোন [illegible] তত্ত্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তারপর [illegible] আমরা আমাদের ব্যবহারে লাগাই। আইনস্টাইন নিশ্চয়ই আপেক্ষিকতাবাদ গবেষণার সময় কোন পার্থিব প্রয়োজন মেটাবার [illegible] হননি। লেখক এ প্রবন্ধে [illegible] ও [illegible]কে এক করে ফেলেছেন।

আবার সেই [illegible] দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লেখক মাধ্যমিকদের 'শূন্যবাদ' ও [illegible] 'মিথ্যাবাদ'কে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। লেখক কি পারেন কবিকল্পনা-প্রসূত রোমান্সের দ্বারা দুরূহ অর্থনীতির জটিল তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে? আর মিথ্যা কথাটিকে তিনি যত সহজভাবে নিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী গভীর তার অন্তর্নিহিত অর্থ। কোন মতবাদকে খণ্ডন করতে গিয়ে হয় সেই মতবাদের স্বতঃসিদ্ধ নিয়মকে খণ্ডন করতে হবে, নয়ত তার ভিতরের অসামঞ্জস্য দেখাতে হবে। বিপরীত মতের উপর ভর করে অন্য মতবাদের দিকে শুধু তাকিয়েই থাকা যায়—তাকে আলোচনা বা অনুধাবন করা যায়না। মিথ্যার মিথ্যাত্বকে অপ্রমাণ করতে গেলে লেখকের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ তিনি যেন ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের 'বেদান্ত পরিভাষা' প্রকরণ গ্রন্থটি একবার আলোচনা করে দেখেন।

বর্তমানের চোখধাঁধানো সভ্যতার জলসে অতীতের প্রতি নিষ্প্রভ দৃষ্টি হওয়া প্রগতিশীলের লক্ষণ নয়, বরং তা সত্যের অপলাপ। এবং অবলুপ্ত সত্য প্রগতিকে অনেক পিছিয়ে নিয়ে যায়।

মৃণাল চক্রবর্তী
অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়
ত্রিপুরা

পঞ্চতন্ত্র প্রসঙ্গে

৪ঠা নভেম্বরের দেশ পত্রিকায় সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্রে শিক্ষাবিদের মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। এ সম্পর্কে ১৮ই নভেম্বরে শ্রীমতী রায়ের এবং শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের বক্তব্য কিছু বলার অবকাশ রাখে। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বলেছেন, "এর ফলে এক প্রদেশের কোন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তার সমস্ত যোগ্যতা সত্ত্বেও তাঁর নিজের প্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও শিক্ষকতার কাজ পাবেন না।" এক প্রদেশের কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত যাঁদের অন্য প্রদেশে শিক্ষকতা করবার দরকার পড়তে পারে তাঁরা শ্রীমতী রায়ের "শতকরা ২৪ জনের" মধ্যে কতজন? সেই উচ্চশিক্ষিতদের জন্য প্রতি বৎসর কতজন অর্ধশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে তা নিশ্চয়ই খাস কলকাতায় দেখা যায় না এমন নয়। সংবাদপত্রে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা শীর্ষক কলমে আর কোন নাম উঠবে না এরূপ খেদোক্তি করে শিক্ষামন্ত্রীর কথায় হাসি আসাটাও হাস্যকর। ইংরাজীকে তো প্রবাসে পাঠানো হচ্ছে না। কোঠারী শিক্ষা কমিশন বরং ইংরাজী শিক্ষার উন্নতির কথাই বলেছেন এবং অধ্যাপক বিনিময়ের উপায় হিসাবে সারা দেশে ইংরাজীর মাধ্যমে পড়াশুনা করান হবে এমন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছেন। নিম্নে কোঠারী কমিশনের বক্তব্যের কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি। (রিপোর্টের ২৯২ পৃষ্ঠায়)

"While the goal is to adopt the regional languages as media of education, we should like to stress
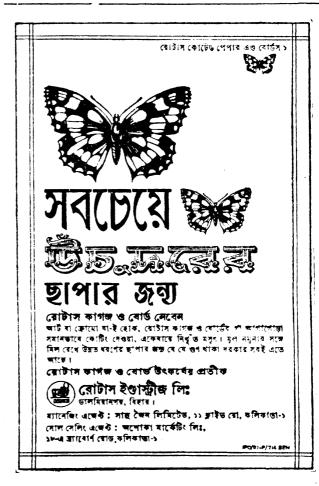
again that this does not involve elimination of English. .... No student should be considered as qualified for a degree, in particular a Master's degree unless he has acquired a reasonable proficiency in English. [or in some other library language]."

অন্যত্র আরও বলেছেন

"In major universities, it will be necessary, as rule, to adopt English as the medium of education because their students and teachers will be drawn on an all-India basis."

এরপর নিশ্চয়ই বিদেশ যাত্রা বা অন্য প্রদেশে শিক্ষকতা করা যায়। ছোটবেলার মাস্টারমশায়ের ধিক্কারটা যখন মনে আছে তখন এখনকার সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রকে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। ভারতের কৃষ্টি রক্ষা করে, বিদেশ যাত্রার প্রভিসন রেখে এবং ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করে মাতৃভাষার মুখরক্ষা করার উপায় খুঁজে বার করতে হা-হুতাশ করতে হয় ১২ বছরের ছেলেকে। কতকগুলো বিমূর্ত নকশার মাঝে ওদের সজীবতাকে টিপে মেরে শতকরা ৭৬ জনের জন্য কথা বলা মায়া-কান্নার মত শোনায়। ইংরাজী ভাষার জাহাজে চড়ে শিক্ষা-সরস্বতী যতদিন ঘুরবে ততদিন শিক্ষা ওই শতকরা ২৪ জনের বন্দরেই ভিড়বে শতকরা ৭৬ জনের ঘাটে ভিড়বে না।

দামিনীর খুঁটিয়ে দেখাতে যদি সাত সমুদ্দুরের তের নদীর পারের ইংরাজী বন্দোবস্ত হাজির করতে হয় তবে তাকে কর্তা/কর্ত্রীর কৌলিন্য বলবো। বছর দুয়েক আগে আগ্রায় কোন হোটেলের এক চাকর আমাকে ইংরাজীতেই ওখানকার দর্শনীয় স্থানের খোঁজখবর দিয়েছিল। ওই সেই দিনও ঔরঙ্গাবাদের এক ট্যাক্সীচালক আমার কয়েকজন বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে ইংরাজীতেই দরদস্তুর করল। এবার তাহলে ধরে নিই আগ্রা থেকে ঔরঙ্গাবাদ পর্যন্ত ইংরাজী কথা-বলা লোকে ভর্তি।

সত্যিকারের [illegible] কথা ভাবলে সাধারণ ছাত্রের ঘাড় থেকে [illegible] ভাষার বোঝা নামাতেই হবে। অন্যথায় [illegible] ভাষা শিক্ষাই মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য যাঁরা মেধানুযায়ী সাধারণ ছাত্রের উপরে তাঁরা ঐচ্ছিক হিসাবে ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পঞ্চম শ্রেণী থেকেই পেতে পারে [কোঠারী কমিশনের [illegible] অনুযায়ী]। কোঠারী কমিশনের মতে

"Even at present, our own universities and colleges produce a small number of scientist and scholars".

—এঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন; কিন্তু তাই বলে ওই কয়েকজনের জন্য ছাত্রসম্প্রদায়ের বিরাট অংশের উপর বোঝা চাপান উচিত হবে কি?

মণিমোহন পাল
বরোদা

পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস

ভারতের অর্থনীতি বিভাগে শ্রীশান্তি-কুমার ঘোষের সুচিন্তিত আলোচনা 'পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস' পড়লাম। শ্রীঘোষ লিখেছেন—"সিংহল তার মুদ্রামূল্য হ্রাস করার ফলে ভারতের চা রপ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—সেজন্য ভারত সরকার কর্তৃক সংশোধনমূলক ব্যবস্থা (রপ্তানী শুল্কের হ্রাস) অবিলম্বে বাঞ্ছনীয়।"—বোধ করি শ্রীঘোষ রপ্তানী শুল্ক হ্রাসকে একমাত্র বা অন্যতম প্রধান সংশোধনমূলক ব্যবস্থা মনে করেন। কিন্তু রপ্তানী শুল্ক হ্রাসের কতগুলি অসুবিধা আছে।

আমার মনে হয় রপ্তানী দ্রব্যের unit value স্থির রাখাই এখন দরকার। কেননা রপ্তানীর আন্তর্জাতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয় সমভাবে—বিভিন্ন দ্রব্যের উপরে কোন দেশ সেগুলি আমদানী করছে তার উপরে নয়। সুতরাং ব্রিটেনের বাজারে যদি আমরা আমাদের রপ্তানীর মূল্য কমাই তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে এসব দ্রব্যের ক্ষতির পরিমাণ ৩।৪ গুণ হতে পারে। সেজন্যই ভারতীয় দ্রব্যের বৈদেশিক মান এখন স্থির রাখাই কর্তব্য।

সিংহল এবং পাকিস্তান তাদের চা, পাট, কাঁচা তুলো ইত্যাদির মূল্য কমিয়ে দিয়েছে। অতএব আমাদের চা এবং পাটজ দ্রব্যের দাম এখন বৃটেনের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক রাখতে হবে। অবশ্যই এ কাজ রপ্তানী শুল্ক কমিয়ে বা লুপ্ত করে করা যেতে পারে। কিন্তু রপ্তানী শুল্ক পুরোপুরি কমিয়ে রপ্তানীকারকদের উৎসাহ দেওয়ার চেয়ে আমার মনে হয় tax credit certificate schemeটি আবার চালু করলে ভালো হয়। এটি এক ধরনের পরোক্ষ উৎসাহ। রপ্তানী শুল্ক কম করে দিলে বা একেবারে লুপ্ত করে দিলে বিদেশী ক্রেতারা তা জানতে পারবে। এবং সেই অনুপাতে দর কষাকষি করে আমাদের রপ্তানী মূল্য কম করার চেষ্টা করবে। কিন্তু tax credit-এ তা হয় না। এতে আমাদের প্রতিযোগিতার শক্তি সম্পূর্ণ অক্ষয় থাকবে। তবে সব-চেয়ে ভালো উপায় রপ্তানী শুল্ক হ্রাস এবং tax credit এক সঙ্গে চালু রাখলে।

আমদানী বিষয়ে বলা যায় যে, পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস ব্রিটিশ দ্রব্যকে সস্তা করেছে। কিন্তু এখানেও দরদামের ব্যাপারে ভারত সরকারকে কঠোর হতে হবে। ব্রিটিশ দ্রব্যের দাম (নূতন পাউণ্ড হিসাবে) বাড়তে দিলে চলবে না। যেহেতু আমরা আন্তর্জাতিক মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে দুর্বল পক্ষ—সেইজন্য হয়ত ব্রিটিশ রপ্তানীকারকরা দাম কিছু বাড়াতে চাইবে। বিশেষ করে complex machinary বা machine tools ইত্যাদি দ্রব্যে ব্রিটিশ রপ্তানীকারকরা অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে দাম কিছু বাড়াবার চেষ্টা করবে। কেননা যেখানে ব্রিটিশ রপ্তানীকারকরা tied currency credit এবং tied project credit এ দ্রব্যাদি রপ্তানী করছে—সেখানে এ জোর তাদের আছে। এ বিষয়ে আমাদের সাবধান হতে হবে।

হিমাদ্রি রায়
নয়াদিল্লী-৬

ভাষা সমস্যা

গত ১৮ নভেম্বরের দেশে প্রকাশিত আমার পত্রে উদ্ধৃত সিলেটি বাক্যটি সম্পর্কে ৯ ডিসেম্বরের দেশে শ্রীমদনরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন যে, এটি আসলে সিলেটি নয়।

ওই বাক্যটি শ্রীহট্টের ছাতকপুরের বারমাসী লোককথা থেকে উদ্ধৃত। উক্ত বারমাসীটি শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ এলাকা থেকে চৌধুরী গোলাম আকবর কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমিতে সংরক্ষিত। কলিকাতার যে সাময়িক পত্রিকাতে এটি মুদ্রিত হয়, তাতে জানানো হয়েছে যে এটি [illegible] আঞ্চলিক ভাষাতেই রচিত। ওই উদ্ধৃতি সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ অংশটি নিচে দিলাম।

"ছাতকপুরে চাইলে উঠে হাতাইয়া গইরজা
সিঁর বইলে কান্দিয়া পিঠ কইরাম, লইরজা
হয়াছমারে দিলো কিওর উট্টা ঝট্টা
এনা অইলে বুঝি মুলকো রইবো থুট্টা।"

বাংলা, অহমিয়া ও ওড়িয়া এগুলি পৃথক ভাষারূপে স্বীকৃত হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান; পক্ষান্তরে সিলেট, চট্টগ্রামের লিখিত ভাষা বাংলা হলেও তার সঙ্গে কথ্য ভাষাগুলির যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এ সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন আছে এ কথা আশা করি কেউ অস্বীকার করবেন না। আমার বক্তব্যের মধ্যে [illegible] বলে উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম, তাকে বিকৃত কল্পনা করে যদিও শ্রীভট্টাচার্য আমাকে উত্তেজিত হয়েছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁর পত্র এক দিকে দিয়ে আমার বক্তব্যেরই সমর্থন করে।

অমিতা রায়

প্রধানমন্ত্রীর সফরে

বুলগেরিয়াতে একটা জনপ্রবাদ আছে, ভগবান কী করে ওই দেশটি সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি একদা পৃথিবীর সমস্ত জাতির প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠালেন, কোন্ জাতিকে কোন্ দেশ দেওয়া হবে বসবাস করার জন্যে। তাঁর দরবারে সবাই হাজির, এবং ভগবান একে একে সকলকে ডেকে দেশ বরাদ্দ করে দিলেন, কাউকে ভারতবর্ষ, কাউকে আমেরিকা, এমনি করে।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে, সবাই চলেও গেছেন। তখন এসে উপস্থিত বুলগার জাতির প্রতিনিধি। "কী চাই?" তিনি প্রশ্ন করেন। "আমার উপস্থিত হতে দেরি হয়ে গেছে, মাঠের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তা আমাদের জন্যে, বুলগারদের জন্যে একটি দেশ বরাদ্দের আজ্ঞা দিন।" ভগবান বললেন, "সব জায়গা তো বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে, আর তো হাতে নেই।"

বুলগার প্রতিনিধির হাঁ হাঁ কান্নাকাটি। দিতেই হবে তাদের একটি দেশ, তা না হলে সে ধরনা দেবে। ভগবান অতি দয়াপ্রবৃত্ত। তাই তো, কী করা যায়? জায়গা তো আর নেই? কিন্তু একটা স্থান না দিয়েও তো পারা যাচ্ছে না, সবারই যার যার দেশ হবে আর এদের হবে না? বললেন, "ঠিক আছে, কী আর করি। আমার স্বর্গের এক অংশ তোমাদের দিলাম।"

সেই থেকে বুলগেরিয়া তাদের কাছে পৃথিবীর স্বর্গ। (কার মাতৃভূমি কার কাছে স্বর্গ নয়?) কিন্তু স্বর্গের সন্ধানে তো আর আমরা আসিনি, তা নিয়ে মাথা ঘামালে মেটারলিংকের "নীলপাখি" খোঁজার মতো হবে। কিন্তু সোফিয়া শহরে প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হল গোলাপ। অসংখ্য গোলাপ ক্ষেত শহরের বুকে। বড় বড় রাস্তাকে লম্বালম্বি ভাগ করেছে গোলাপ ক্ষেত। বাড়ি-ঘরে বাগানে, এমন কি আনাচে-কানাচেও গোলাপ ফোটা।

আমাদের দোভাষী বললেন, "এ আর কী দেখছ? এখন তো অক্টোবর, তোমরা পৌঁছলে তেরো তারিখে, মানে মাসের মাঝামাঝি। যদি অগস্ট মাসেও আসতে তা হলেও দেখতে পারতে আরো কত গোলাপ, কত বড়, কত রকমের। আমাদের দেশ গোলাপের দেশ বলে বিখ্যাত।"

সোফিয়াতে ইন্দিরাজী বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

প্রায় দু'শো বছর আগে, তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন থাকাকালে গোলাপ আসে বুলগেরিয়ায়, সম্ভবত পশ্চিম এশিয়ার কোনো দেশ থেকে। তখন থেকে গোলাপের চাষ, এবং আজ বুলগেরিয়া পৃথিবীর বহু দেশে বিক্রি করে গোলাপের আতর। বলকান্ পর্বতমালা ও "সেরেদনা গোরা" পর্বতের মাঝে আছে বিখ্যাত "গোলাপ উপত্যকা", দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২০ কিলোমিটার। এখানেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বহু সুগন্ধী "কাজানলাক" গোলাপ ("রোজা দামাসেনা")—হয়তো দামাস্কাস থেকে এসেছে। আতরের জন্যে ফুল তোলার সময় হল মে মাস এবং জুনের কিছু কাল। মেয়েরা খুব সকাল থেকে ফুলগুলো আরম্ভ করে কুড়োতে, আর যেমনি সূর্য ওঠার পর শিশির উবে যেতে আরম্ভ করে, অমনি বন্ধ হয় ফুল তোলা। আবার পরদিন ভোরে তুলবে। ওই সময়েই নাকি গোলাপে থাকে সব চাইতে বেশী গন্ধ, অর্থাৎ আতর তৈরির জন্যে প্রকৃষ্ট।

একই ধরনের রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের পর মোটরগাড়ির লম্বা সারিতে এয়ারপোর্ট থেকে যাচ্ছি সোফিয়া শহরে, ৮/১০ মাইল দূরে। প্রায় গোটা রাস্তার দু' পাশে একটানা ঘন পপ্লারের গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আর তেমনি দাঁড়িয়ে নরনারীর জনতা। সারা রাস্তা। বেলগ্রেডের চাইতেও বেশী। রাস্তার পাশে কারখানা। তার শ্রমিক-শ্রমিকারা এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। হাসপাতাল, ডেয়ারি, ইস্কুল—রাস্তার ধারের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লোকেরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। ভারত থেকে কোনো প্রধানমন্ত্রীর এই প্রথম আগমন বুলগেরিয়ায়। সোফিয়া শহরে যেন সবাই রাস্তায় চলে এসেছে। মুখে হাসি, হাততালি আর হাত নাড়া।

চমৎকার শৃঙ্খলা জনতার। বেলগ্রেড, সোফিয়া, তারপর রুমানিয়াতেও দেখেছি এই শৃঙ্খলা। যে যে স্থানে দাঁড়াবে, তা থেকে এক পা সরে সে যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় অভ্যর্থনা একটা অংশ। (মস্কোতেও, স্বাগত জানাতে এসে। বিমানঘাঁটির কাছে লোক সমবেত হয় না।) যাঁরা অভ্যর্থনা করবেন, তাঁরা সকলেই হন যাঁর অভ্যাগত তাঁদের সকলেরই হাত নেড়ে স্বীকৃতি জানান। দেখলাম, আমাদের মতো দু'টি কাযক সাংবাদিক ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়দের তেমন দেখা গেল না। তাঁরা অভ্যাগত হয়েই এসেছেন, ওঁদের প্রাপ্য। কষ্ট করে জনতার দিকে হাত বাড়িয়ে আর শারীরিক পরিশ্রম করা কেন।

ইন্দিরাজী তাঁর দলবল নিয়ে থাকতেন একটি প্রাসাদে, নাম তার "ভ্রানিয়া প্যালেস"। সব স্থানেই প্রধানমন্ত্রীর জন্যে একটি প্যালেস। সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও তাদের প্যালেস-প্রীতি যায়নি। বরঞ্চ বেড়েছে। পুরোনো দিনের প্রাসাদগুলো সব সাধারণের কাজে লাগানো হচ্ছে, এবং সেইই একটা একটি রাখা হয় রাজ্যের অতিথিদের জন্যে। আধুনিক হল প্যালেস অব কালচার, প্যালেস অব লেবর, কিংবা আর্ট অ্যান্ড থিয়েটার ইত্যাদি। আমরা পেলাম একটি হোটেল, হোটেল পিলসকা, তেরতলা।

হোটেল পিলসকা

ভাল হোটেল, কিন্তু এখানকার অশোকা কিংবা ওবেরয় ইণ্টারন্যাশনালের মতো চমকদার নয়, ঠাঁটটা একটু কম। খাওয়া-দাওয়া প্রচুর, চাক চাক শুয়োরের মাংস। গরুর মাংস (বাছুরের), গোটা মাছ, গোটা মুরগী, যে ধরনের রান্না চান—বুলগার কি আন্তর্জাতিক, কি স্রেফ সিদ্ধ (অর্থাৎ ইংলিশ)। আমাদের মতো যাঁরা সর্বভুক তাঁদের পোয়াবারো। মুশকিল আমাদের নিরামিষাশী সঙ্গীদের নিয়ে—জৈন, অগ্নিহোত্রী আর চন্দ্রারকর। তিনজনেই গোঁড়া "শাকাহারী"। খাবার টেবিলে তাদের নিয়ে অনেকেই বিব্রত, তারা নিজেরা তো বটেই। শুধু সোফিয়াতে নয়, সব জায়গাতেই। নমুনাটা এমনি :

সবাই খেতে বসলাম, আমাদের বিমানের লোকজন-সহ। সাদা তোয়ালে হাতে, সাদা পোশাক আর কালো টাই-পরা কয়েকজন ওয়েটার। প্রত্যেককে প্রশ্ন করে জানছে কার কী চাই। আমার ডাইনে চন্দ্রারকার। তার কাছে আসতেই সে আস্তে বললে, "ভেজি-টারিয়ান"। উত্তর একটু জোরে, "নো ভেজি-তারি-আন"। চন্দ্রারকার (বুকে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে) : "ভেজিটারিয়ান, প্লীজ"। উত্তর : "নো ভেজিতারি—ভেজিতারিআনি, প্লীজ"। তিনজন নিরামিষাশীর চোখে-মুখে শংকা।

বুঝলাম কমরেড ওয়েটার ভাবছে, প্রশ্ন-কারক জানতে চাইছে এই হোটেলে শুধু নিরামিষ খাবাই দেওয়া হয় কি না। কিন্তু এই কমেডি কতক্ষণ শোনা যায়, এমন কি দেখা যায়। বললাম, "ভুজাভে দে লেগিম ?" তোমাদের শাকসবজি আছে? "উঁই উঁই", হ্যাঁ, হ্যাঁ। "পম দ্য তেয়ার, শু, শু-ফ্লয়ের ?" আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি? "উই উই"। "দনে, সিলভুপ্লে, দে লোজ বুইঁঈ" (ও-সব সেদ্ধ করে দাও, দয়া করে। "এ বোকুদ সালাদ" (আর প্রচুর সালাদ। "এ ইয়োগোড"। দই।

ওয়েটারের আকর্ণ হাসি। আর মিনিট পাঁচেকের ভিতর আমাদের তিন বন্ধুর জন্যে এসে গেল পাহাড়-প্রমাণ শাকসবজি—ইত্যাদি; পুরো এক বাটি দই। একগাদা পুডিং, চিজ ফ্রুট স্যালাড। "রাইস" ? "নো রাইস"। হতে পারে, আধঘণ্টা সময় নেবে। কী দরকার ? টেবিলে স্থানে স্থানে জমা করা দু'-তিন রকমের ব্রেড।

একজন নিরামিষাশীর স্যালাড নিয়ে কী অবস্থা শুনুন। স্যালাড দাও বলাতে প্রথম-বার ওয়েটার আনল একটা বড় প্লেটে অনেক ধরনের শাকসবজি, সবুজ পাতা, মাছের ডিম, আর ফালি ফালি করে কাটা পাতলা সেদ্ধ মাংস, শুয়োরের। ভায়ার চক্ষু চড়ক-গাছ। বলল (মাংস ও মাছের ডিম কাভিয়ার-এর দিকে দেখিয়ে), এই সব ছাড়া। ওয়েটার দ্বিতীয় প্লেট আনল, অমনি শাকসবজি আর মাঝে মুরগীর ডিম সেদ্ধ গোল করে কাটা। নিরামিষের ব্যাকরণে আবার ভুল। আবার ওয়েটার ফিরে গেল, এবং এল খালি প্লেট নিয়ে নয়, শুধু শাকসবজি নিয়ে।

একটু নমুনা দিলাম মাত্র। এর যে কত প্রকরণ হয়েছে ইয়ত্তা নেই। জানিনা, এর কী প্রতিক্রিয়া বিদেশীদের মধ্যে। আমাদের দেশের মতো খাবার নিয়ে অত গোঁড়ামি—খাদ্যটা যেন ধর্মের অংগ—আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। যে দেশে লোকে খেতে পায় না, সেই দেশে অত বাছ-বিচার? কী জানি, কোথায় যেন একটা অন্ধত্ব। এর সংগে নাকি জড়িত অহিংসা। অথচ বৌদ্ধধর্মের দেশ জাপান, চীন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, লাও, থাইল্যান্ড, সিংহল—তারা কেউ নিরামিষাশী নয়। একমাত্র ভারত—যে দেশ থেকে তাড়িত হয়েছে বৌদ্ধধর্ম, জৈন-ধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম—মুষ্টিমেয় কিছু আছে যদিও। তবে, আমি কী খাব-না-খাব, তা নিয়ে যুক্তিতর্ক অবান্তর। অভ্যাসের দর্শন নেই।

বড্ড ভিড় হোটেল পিলসকায়। দলে দলে লোক আসছে, যাচ্ছে। অনেক ডেলিগেশন। কয়েকজন দেখলাম আফ্রিকানবাসী, একদল এল একদিন বিকেলে, প্রায় ৫০ জন। জানলাম, সবাই বেড়াতে এসেছে চেকোস্লো-ভাকিয়া থেকে। একতলায় রিসেপশান, টাকা-পয়সা বদলানোর দোকান, বিমান-ভ্রমণের টিকিট কেনার দোকান। একতলা আর দোতলার মাঝখানে পুতুল-খেলনা-বিদেশী জিনিস কেনার দোকান, আর আমাদের সাময়িক সংবাদ-প্রেরণ কেন্দ্র। মহিলারা আমাদের খবর নিচ্ছেন আর পাঠানোর চেষ্টা করছেন। তাঁদের টেবিল-

আমাদের দুজন দো-ভাষী

প্রিণ্টারের হাত এত কাঁচা যে, পি টি আই সংবাদদাতা ভাট এবং ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের দেব মুরারকা নিজেরা তাদের সংবাদের "টেপ" কেটে দিত, অর্থাৎ যাতে অবিলম্বে টেলিপ্রিণ্টারে যেতে পারে ভারত-অভিমুখী। "টেপ"-কাটা হল একটা টাইপ করার মতোই জিনিস, যা থেকে আসে ফুটো ফুটো করা শক্ত কাগজের লম্বা ফিতে, যে ফিতেকে একটা মোটরের মাধ্যমে চালালে টেপে-কাটা সংবাদটি গিয়ে পৌঁছবে সঠিক স্থানে।

হ্যাঁ, যদি আপনি "লাইন" পেয়ে যান। আশ্চর্য একটা জিনিস। এখনো সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে খবর পাঠাতে হলে (যে-কোনো খবর, সংবাদপত্রের খবর শুধু নয়), পাঠাতে হবে লণ্ডন হয়ে। এমন কি মস্কো। তাঁরা চাঁদে পৌঁছুলেন বলে, কিন্তু মস্কো থেকে সোজা দিল্লিতে কোনো তার আসে না, আসে লণ্ডন হয়ে। ফলে, অনেক সময় লণ্ডনের তার-অফিস থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু বলে যায়—বোম্বাই কিংবা দিল্লির লাইন নেই, তবে আমরা অনবরত চেষ্টা করছি। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি। প্রশ্ন করেছি, "কী হল? সংবাদ যাবে?" লণ্ডন থেকে বলে টেলিপ্রিণ্টারে : "এ মোমেণ্ট প্লীজ; ট্রাইং।" মোমেণ্ট যে অত লম্বা, দুই থেকে পাঁচ ঘণ্টা, আগে জানতাম না। কারণে-অকারণে, আমরা প্রেজেণ্ট দিতুম যাঁরা টেলি-প্রিণ্টার নিয়ে বসে আছেন হোটেলে—সিগারেট, ওয়াইন, সুইটস। কিন্তু লণ্ডনকে তো আর সিগারেট পাঠানো যায় না টেলি-প্রিণ্টারে? তাঁদের আমরা বড় জোর তোষামোদ করতে পারি। টেলিপ্রিণ্টারে বসে আমরা তাঁদের জানাতাম সকরুণ আবেদন : "হ্যালো, হ্যালো, লণ্ডন (LNDN), থ্যাংকস (TKS), দয়া করুন, দয়া করুন (PLS PLS)। "ট্রাইং, ওয়েট, মোমেণ্ট প্লীজ (MOMT PLS)।"

(আমার স্বীকারোক্তি : গর্ভবেদনা নাকি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা খেটে খবর লিখে, মোটা টাকা দিয়ে সেটা পাঠানোর বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও যদি জানতে পারেন যে, ওটি যাচ্ছে না, তা হলে সেই ব্যথা-বেদনা কী ধরনের তা বুঝতে পারবে একমাত্র সাংবাদিকরা, মানে রিপোর্টাররা)।

স্লাসকা হোটেল ভাল হোটেল। কিন্তু তাদের লিফট (চারটে) কী কারণে জানি না, বড্ড ঢিমে-তালে চলে। স্বয়ংক্রিয়, কিন্তু যতই বোতাম টিপুন, আসবার নামটি নেই। শিক্ষা হল এই যে, অধৈর্য হলে চলবে না, বিশেষত যখন থাকবার ঘরটি হল ন'-তলায়। সমাজতান্ত্রিক দেশের একটি অসুবিধে হল "বেড-টি"। সাধারণত ওটা পাওয়া যায় না। কারণ অজ্ঞাত। নিচেরতলায় কর্মচারী মহাশয় সব যত্ন করে লিখলেন, কখন বেড-টি চাই, কখন শয্যাত্যাগ। কিন্তু কেউ আসে না চা নিয়ে। শুধু একটা টেলিফোন : "মহাশয়। এখন সকাল সাতটা।"

হোটেলের ঘরে বসে হাত-মুখ ধুয়ে চোখ বুলোলাম আমাদের কার্যক্রমের দিকে—ছাপানো প্রোগ্রামে। অমুক জায়গায় যেতে হবে, পোশাক কালো অথবা কালচে। হায় ভগবান! আমার কী হবে? আমার সমস্ত জামাকাপড় স্যুটকেসে। পরনে মিশ্রধরন—ফ্ল্যানেল আর টুইড কোট। অন্যান্যরা বিশ্রাম নিচ্ছেন স্যুটকেসে, যেটার চাবি আমি ফেলে এসেছি বেলগ্রেডের হোটেল-কামরায়। সমস্ত পকেট-ফকেট খুঁজে আবিষ্কার করলাম আমার কপাল থাপড়ানো সত্যটি।

বুলগেরিয়ার একজন খ্যাতনামা অভিনেতা-গায়ক

আমার স্যুটকেসের চাবি নেই। এমনটি আমার জীবনে হয়নি। দুঃখ আরো। যে রিংটিতে আমার চাবি দুটো ঝুলছিল, তা আমি কিনেছিলাম সুদূর জেরুসেলামের সেই স্থানে, যেখানে জন্ম নিয়েছিলেন যীশুখৃস্ট, বেথ্‌লেহেম—ছোট একটা রিং-চেন, যার সঙ্গে সংযুক্ত একটি ছোট্ট ঘণ্টা, যেন গির্জার ঘণ্টা।

মাথার চুল ছিঁড়েও কোনো সমাধান পাচ্ছি না। কী করে স্যুটকেস খুলব? আসছে আটদিন কি আমাকে এই একটি জামা-কাপড়েই কাটাতে হবে, হে ভগবান! ভদ্রতার খাতিরে খোঁজ নিতে এলেন আমার কামরার ভারপ্রাপ্ত মহিলা খিদ্‌মতগারনী, মেড। নমস্কার, নিশ্চয়ই প্রতি-নমস্কার। আপনি ইংরিজী বলেন? না, দুঃখিত, বলতে পারি না। আপনি কি ফরাসী ভাষা জানেন, বলেন? হ্যাঁ, আমি একটু-আধটু বলি, বুঝতে পারি। "কেস্‌কীলাইয়া?" কী ব্যাপার?

আমি অতি বিনীতভাবে খিদ্‌মতগারনীর কাছে জানালাম, আমার স্যুটকেসের চাবি হারিয়ে গেছে এবং স্যুটকেস বন্ধ। আমাকে খুলতেই হবে স্যুটকেস। নতুবা আমাকে তোমার অত সুন্দর দেশ থেকে পালাতে হবে। "আদে মোয়া, সিল্‌ভুপ্লে", অনুগ্রহ করে সাহায্য করো।

আমি নাম-না-জানা ওই মেডটির কাছে কৃতজ্ঞ। দেখতে কুৎসিত, বয়েস ২৫ কি ৩০। কিন্তু অত্যন্ত নম্র এবং সহায়ক। তাকে আমি দেখেছি মাত্র দু'বার, তিন দিনে। প্রথমবার যখন আমার দুঃখের কথা জানালাম, শেষ বার যখন উনি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

আমার প্রয়োজন কালো স্যুটের সেই দিনের বিকেলে যখন আমরা যাবো বুলগেরিয়ার নেতা ডিমিট্রফের সমাধিতে, সমাজতান্ত্রিক জগতের অনন্য নেতা ডিমিট্রফ। গর্গাগ ডিমিট্রফ। আমাদের পৌঁছনোর প্রথম দিনেই বলেছিলাম আমাদের সেই মেয়েকে ও বিদায় করে, দ্যাখো, আমার স্যুটকেসটা কোনো মতে খুলতে পারো কিনা, বাক্স খোলা, বন্ধ হোক কি না হোক। প্লীজ।

উনি বললেন ঃ দেখি কী করতে পারি। জ্য ভু কপ্রানে, মে, ভু ছাজে—আমি তোমাকে বুঝতে পারছি, জানো—যাই হোক, আমার স্যুটকেস তুমি খোলাও। যেমন করে পারো। নাম-না-জানা, দুদিনের দেখা ওই মেয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। অতি সাধারণ বুলগেরিয়াবাসী রমণী, যিনি হয়তো জীবনে কোনোদিন ভারত নামক দেশের নাম শোনেন নি। আমার কাছে তিনি নমস্যা।

দুপুরের পরে ফিরে এসে সেই নাম-না-জানা মহিলাকে ডাকলাম। এলেন দু' মিনিটে। বললাম ঃ "স্যুটকেস খুলেছ? খুলতে পেরেছ?" বললেন ঃ "হ্যাঁ। আমাদের যিনি 'শেফ্' (কর্তা), তিনি নিজে এসে তোমার স্যুটকেস কী করে যেন খুলে দিলেন। প্লীজ সী, তোমার স্যুটকেসে সব জিনিস আছে তো?"

"দেখলাম, সত্যি স্যুটকেস খোলা। ধড়ে প্রাণ এল। ভিতরে কিছু থাকুক কি না থাকুক, কে করে কেয়ার? আমি জানি, কেউ হাত দেবে না একটি জিনিসে। গদগদ ভাষায় জানালাম আমার ধন্যবাদ, জানালাম আমার কৃতজ্ঞতা, বললাম, সব ঠিক আছে, আমি কৃতজ্ঞ।

নাম-না-জানা মেড, যাঁর উপরের দাঁত-পাটি বেরিয়ে থাকে ঠোঁটের বাইরে, দেখতে যিনি কৃশ এবং অসুন্দর, অথচ সেবার যাঁর নেই অসম্ভ, কিংবা স্নেহাভাব, উনি আমার মতো বিদেশীর কাছে এসে বললেন ঃ জানো, আমাদের হোটেলের 'শেফ্' (সেবাবাহিনীর অধিকর্তা) আমাদের কমরেড। তাঁকে আমি জানিয়েছিলাম তোমার বিপদের কথা। উনি কাউকে ডেকে তোমার স্যুটকেস খুলে দিয়েছেন। "সে তু, ভু সাভে।" "উই জ্য লা সে, মের্সারসি"। অনেক ধন্যবাদ, অনেক, অনেক।

সত্যি স্যুটকেস খোলা। কোনো একটি বস্তু একটি বারের জন্যেও এখান-ওখান হয়নি। যেমনি তেমনি আছে। মানুষের উপর আমার বিশ্বাস হল আরো অগাধ। নাম-না-জানা সেই কুশ্রী বুলগেরিয়ান মেয়েটি ছিলেন যেন নিমিত্ত মাত্র। কারণ, সব দেশেই মানুষেরা ভাল, ভাল।

কিন্তু হোটেল প্লিস্‌কা? কী ভিড়, কী ভিড়! নিচেরতলার চমৎকার একটি বস্তু। জুতো পরিষ্কার করার। পয়সা লাগে না, শুধু বোতাম টেপো, আর পা বাড়িয়ে দাও ব্যস, জুতো তিন মিনিটে চকচকে। একটা দিক কালো জুতোর, অন্যটা বাদামি জুতোর। ব্যস, বোতাম টেপো, আর চকচকে তোমার জুতো।

(চলবে)

—খগেন দে সরকার

রমণী ও রমণীয় রচনা

ইন্দ্রজিৎ

সম্প্রতি আমি দু' একটা গুরুগম্ভীর বিষয়ে এবং বোধ করি একটু গুরু-গম্ভীর ভাষাতেই কিছু আপ্তবাক্য প্রচার করেছিলাম। আমার কোন কোন পাঠক তাতে কিঞ্চিৎ বিচলিত বোধ করেছেন। তাঁরা ভেবেছেন, ইন্দ্রজিৎ লোকটার হঠাৎ মতিভ্রম হয়েছে, নইলে যে মানুষ কোন কালে গম্ভীর কথা বলে না সে হঠাৎ আবার গম্ভীর কথা বলতে বসবে কেন? গম্ভীর কথা বলা আমার স্বভাবগত নয় কিন্তু তাই বলে ভাববার কথাও কখনোই বলব না, এমন মাথার দিব্যিও কোন কালে আমি দিইনি। ভাববার মত কথা বলতে গেলে ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ একটু গাম্ভীর্য অবলম্বন করতে হয়। অবশ্য আমার পাঠকরা জানেন যে, স্বভাবদোষে আমার গম্ভীর কথর মধ্যেও হঠাৎ কৌতুকের বুদ্বুদ ফেনিয়ে ওঠে। তার কারণ আমার স্বভাবটা হয়েছে অমিট্ রায়ের মতো। অমিট্ বলেছিল, 'আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ও গ্রহটি মরবার আগেও একটু মুচকি না হেসে মরতে পারে না।' আমার ঠিক সেই দশা; ভয়ংকর গম্ভীর কথা বলতে গিয়েও আমি হঠাৎ হেসে ফেলি।

অবশ্য এই অভিলাষ বরাবর ছিল যে, গভীর কথাও গভীর সুরে না বলে যথাসম্ভব হাল্কা সুরে বলব। বিষয়টা যদি ওজনে ভারিও হয় তাহলেও বলবার ভঙ্গিতে খানিকটা তার ভার লাঘব করে দেওয়া যায়। ভাষাকে সেই ক্ষেত্রে খুব লঘু পদক্ষেপে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে হয়। ভাষার ব্যবহারে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে একটা কথা আছে; অবশ্য আমি বলি গুরুচণ্ডালী গুণ। বাঙলা ভাষার যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা ঐ গুরুচণ্ডালী দোষের গুণেই হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে জাতিভেদ উঠে গিয়েছে, সাধু এবং অসাধু শব্দ এখন এক পঙ্‌ক্তিতেই বসতে পারে। আমার মতে, ভাষার মত বিষয়কেও গুরুচণ্ডালী গুণের আওতায় আনা বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ গুরুতর বিষয়েরও আলোচনা তরতরে ঝরঝরে হওয়া আবশ্যক। তাতে বিষয়ের গুরুত্ব নষ্ট হয় না। এককালে poetic diction বলে একটা কথা ছিল অর্থাৎ গদ্যের ভাষা থেকে পদ্যের ভাষা ছিল পৃথক। এখন সে পার্থক্য দূর হয়েছে। যে ভাষায় আমরা গদ্য রচনা করি, এমন কি যে ভাষায় আমরা কথা বলি সে ভাষাতেই কাব্য রচনা হতে পারে এবং হচ্ছেও। যে কারণে poetic diction উঠে গিয়েছে সেই কারণেই pedantic dictionও উঠে যাওয়ার প্রয়োজন। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্যে আলাদা কোন ভাষার প্রয়োজন হয় না। যে ভাষায় আমরা কথা বলি সে ভাষাতেই যে-কোন পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা চলতে পারে।

যে কথা থেকে এ আলোচনার সূত্রপাত হল সে কথায় আবার ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। আমি সম্প্রতি ব্ল্যাসফেমি, সিনিসিজম্ এবং স্যাটায়ার সম্বন্ধে যে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম তাতেই পূর্বোক্ত পাঠকবন্ধুরা কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, লেখাগুলোতে একটু নাকি পণ্ডিতি পাণ্ডিতি গন্ধ আছে। সত্যি হলে অবশ্যই দোষাবহ বলতে হবে। আমার লেখার মধ্যে সত্যি সত্যি যদি পণ্ডিতি প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের বিষয়। কারণ ও ব্যাধিটা বাস্তবিক কোন কালে আমার ছিল না। এটা হয় বয়সের দোষে হয়েছে নয়তো বুদ্ধির দোষে। আমি বরাবর বলে এসেছি যে পাণ্ডিত্য জিনিসটা কষ্টার্জিত কিন্তু তার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, কখনই চেষ্টাকৃত নয়। লেখকের অজ্ঞাতসারেই অত্যন্ত সহজভাবে লেখার মধ্যে সেটি ফুটে ওঠে। আর অনাবশ্যক ঘটা করে যাকে জাহির করা হয় তাকে পাণ্ডিত্য বলে না তাকে বলে পণ্ডিতি। অর্থাৎ কিনা খাঁটি জিনিসের নাম পাণ্ডিত্য আর নকল জিনিসের নাম পণ্ডিতি। আমার লেখা যদি পণ্ডিতি দোষ-দুষ্ট হয়ে থাকে তবে বড়ই লজ্জার কথা বলতে হবে।

ইন্দ্রজিতের লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে ও লোকটার মধ্যে আসল কিছুই নেই, সমস্তটাই নকল। এমন কি নামটা পর্যন্ত নকল। ছদ্মনামা ব্যক্তি সর্বপ্রকারেই ছদ্মবেশী। ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে তার পাণ্ডিত্যও pseudo-পাণ্ডিত্য। পাণ্ডিত্য যদি বা এক আধটু থাকে তার মধ্যেও নানা রকমের ভেজাল মেশানো। লক্ষ করে থাকবেন যে, যাঁরা খাঁটি পণ্ডিত অর্থাৎ পাণ্ডিত্যই যাঁদের একমাত্র বিষয়সম্পত্তি তাঁরা সব সময়েই বিশেষ কোন বিষয়কে অবলম্বন করে লিখে থাকেন। বিষয় নির্বিশেষে কখনো তাঁরা কিছু লিখতে পারেন না। তার কারণ, পাণ্ডিত্যের বোঝা কাঁধে এমন চেপে বসে যে, এঁরা আর এদিক ওদিক ঘাড় ফেরাতে পারেন না, সোজা এক দৃষ্টে চলতে থাকেন। আমার সে বালাই নেই। বোঝাটা এতই হাল্কা যে দিব্যি এদিক ওদিক তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে হেলে-দুলে চলতে পারি। বিষয় সম্পত্তি যৎসামান্য বলেই আমার লেখা সব সময়েই বিষয়-নিরপেক্ষ। আমি বিষয়ের ধার ধারিনে। মনটাকে মেলে ধরি, সে আপন খুশিমতো বকে যায়, এক কথা বলতে গিয়ে আরেক কথায় হাজির হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কক্ষনো এমন আবোল তাবোল বকেন না। তাঁরা যুক্তি তর্কের দাঁড়দড়া বেঁধে কোন একটা বিষয়কে বেশ মজবুত করে খাড়া করবার চেষ্টা করেন। সেখানে অবান্তর কথার কোন অবকাশই নেই। বক্তব্যটা অবাধ্য হয়ে এদিক ওদিক যেতে চাইল তৎক্ষণাৎ কান মুচড়ে তাকে সোজা পথে নিয়ে আনা হয়। বক্তব্যটাকে সন্দেহাতীত রূপে সর্বজন গ্রাহ্য করতে হলে কোথাও ফাঁক রাখা চলে না। এ জন্যে পণ্ডিত ব্যক্তিদের লেখা অতি মাত্রায় ঠাস-বোনা। ঐ জাতীয় জিনিস আমি কস্মিন কালে লিখতে পারব না। আমার লেখায় চালুনির ফাঁকের মত অসংখ্য ছিদ্র, লজিকের ফ্যালাসি পদে পদে। সেটা স্বাভাবিক, কারণ আমি তো কিছু প্রমাণ করতে বসিনি যে, অতি সাবধানে মাপ জোক করে নিক্তিতে ওজন করে কথা বলব। কোন জিনিস প্রমাণ করবার যার দায় নেই, দায়িত্বহীন উক্তি করবার অধিকার অবশ্যই তার আছে। আমার কথা সকলের গ্রহণযোগ্য হবে এমন আশা আমি কখনো করি না, কথাগুলি শ্রবণযোগ্য হলেই আমি সন্তুষ্ট। গানের সুর শুনেই লোকে খুশী, কখনো জিজ্ঞেস করে না, গানটার বক্তব্য কি কিংবা এতে জ্ঞাতব্য জিনিস কিছু আছে কিনা। সংগীত এবং সাহিত্যের স্বভাব এক। সাহিত্যের মধ্যেও অশ্রুত একটি সুর [illegible] সেটি লেখার

ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়, বিষয়বস্তুতে নয়। যা শুনতে ভালো লাগে তাই সংগীত। মুখের কথা যদি শ্রুতিমধুর হয় তো গানও তার কাছে লাগে না। হ্যাজ্‌লিট যেমন কোলরিজ সম্পর্কে বলেছিলেন, He talks far above singing. সংগীতের মতো সাহিত্যেরও একটি অপরিহার্য গুণ শ্রুতি-মাধুর্য। বাজে কথাও সাহিত্য হতে পারে যদি তা শুনতে ভালো লাগে। প্রমথ চৌধুরী মশায়কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, গল্প কাকে বলে? তিনি বলেছিলেন, যা শুনতে ভালো লাগে তাই গল্প। খুব খাঁটি কথা। গল্প লোকে বরাবর শুনেই এসেছে, পড়তে শিখেছে তো এই সেদিন। কবিতাও চিরকাল গেয়েই শোনানো হয়েছে। কবিতা পাঠ নিতান্তই এ-কালের অভ্যাস। গল্প উপন্যাস (মহাকাব্যগুলিকেই সে-কালের উপন্যাস বলা যেতে পারে) কবিতা গান ইত্যাদির রস অর্থাৎ সাহিত্যের রস প্রধানত কানের ভিতর দিয়েই মানুষের মর্মে প্রবেশ করেছে। এক মাত্র প্রবন্ধ জাতীয় জিনিসই লোকে পাঠ করে, কান পেতে শোনে না। যে জিনিস লোকে শুনতে চায় না কিন্তু প্রয়োজন হলে পাঠ করে সে জিনিস সাধারণত পাঠ্য কেতাবে স্থান পায়। সকলেই জানেন যে, পাঠ করে সে জিনিস সাধারণত পাঠ্য না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব। সে জিনিস কুলুঙ্গিতে তোলা থাকে, প্রতিদিনের কাজে লাগে না। নিতান্ত দিপাকে পড়লে কাজে ভদ্রে কেউ চোখ বুলিয়ে দেখে। কিন্তু সাহিত্য তো তা নয়; সাহিত্য লোকে পড়ে ভেতরের তাগিদে, না পড়ে পারে না বলে। প্রবন্ধ জাতীয় জিনিসের প্রতি এই যে [illegible] তার কারণ এই যে, ও জিনিসটা ঠিক সাহিত্য[illegible] নয়। সাহিত্য বলতে কি, যে প্রব[illegible] জিনিসটা শ্রুতিমধুর হয় এবং [illegible] সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে সে গুণ অধিকাংশ প্রবন্ধেই থাকে না। কেননা [illegible] যুক্তিগ্রাহ্য করতে গেলে সেটা প্রায়ই রসগ্রাহ্য হয় না। যুক্তি আর রস এ দুয়ের মিলন অসম্ভব, এমন কথা অবশ্যই বলব না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, এ দুয়ের মিলন ঘটাতে হলে মনের যে, প্রয়োজন flexibility খুব কম লেখকেরই সেটি আছে। খাঁটি সাহিত্য হয়েছে এমন প্রবন্ধ বাংলা দেশে ক-জন লেখক লিখেছেন?

যাক্, কথায় কথায় আসল কথাটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে। বলেছিলাম, আমার লেখা সাধারণতঃ বিষয়-নিরপেক্ষ। কিন্তু সম্প্রতি আমি যে প্ল্যাসফেমি, সিনিসিজম্ এবং স্যাটায়ার সম্বন্ধে লিখেছি তাকে ঠিক বিষয়-নিরপেক্ষ বলা চলে না। ওখানে আমি ঠিক নির্বিশেষভাবে কথা বলিনি; বিশেষ কিছু বলবার চেষ্টা করেছি এবং যে সব বস্তু লেখার মধ্যে

---

18 CLUES
Litquis No. 37

(1) Nehru was fond of children and like children he was very **Active|Inquisitive.**

(2) The most **Arresting|Intriguing** fact about India is that her soil is rich and her people poor.

(3) Psychology in India never **Believed|Succeeded** in getting itself separated from philosophy.

(4) Disinterested works of **Charity|Piety,** or altruistic labour are as contributory to self-realization as spiritual effort.

(5) Science inlaid with religion and philosophy has greater **Clarity|Variety** and harmony than any one or two of them.

(6) If the absolute truth should really comprehend all, it cannot exclude the self of the person that **Condemns|Contemplates** it.

(7) The laws, themselves, are **Eternal|Universal** and immutable, it is only our knowledge that progressively approaches them.

(8) **Faith|Growth** in life is man's finite way of approaching the infinite.

(9) The **Forces|Values** of ultimate reality cannot be valid for politics which is concerned with every-day life.

(10) Our **Friendship|Worship** should be the evidence of our feelings of gratitude and love.

(11) Rumours must be distilled in the alembic of truth before they can be crystallised into **Historical|Political** facts.

(12) Education must infuse religious **Humility|Unity.**

(13) Science itself is an activity seeking **Ideal|Real** values of the highest sort.

(14) Rural India is **Markedly|Rootedly** conservative in its outlook.

(15) It is difficult, if not impossible, to determine the nature of **Moral|Social** good.

(16) The **Philosopher|Preceptor** should not don the false [illegible] of the shaman, the [illegible] of the prophet.

(17) [illegible] **Philosophy|Spirituality** is to have the sensation of [illegible], not to know the real but to be real.

(18) Suspicion of **Reason|Religion** has always [illegible] present at all stages in the history of the human race and India is no exception to this.

দ্রষ্টব্যঃ—ওপরের [illegible] লেখকের লেখা থেকে নেওয়া [illegible] ওগুলি সব সম্পূর্ণ [illegible] অর্থ বহন করে। [illegible] ও তাঁহাদের রচনার নাম [illegible] সমাধানের সঙ্গে লিটকুইজ [illegible] প্রকাশ করা হবে।

১। নেহরু শিশুদের ভালবাসতেন এবং শিশুদের মতই তিনিই ছিলেন সক্রিয়/জিজ্ঞাসু।

২। ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক/জটিল ব্যাপার হ'ল এর মৃত্তিকা খুব দামী এবং এর অধিবাসীরা গরীব।

৩। ভারতে মনোবিজ্ঞান কখনই নিজেকে দর্শনশাস্ত্র থেকে আলাদা করায় বিশ্বাস করেনি/সফল হয়নি।

৪। দয়া/পুণ্য-র অনাসক্ত কাজ অথবা পরার্থপর পরিশ্রম আত্মজ্ঞানের পক্ষে ততখানি সহায়ক যতখানি আধ্যাত্মিক সাধনা।

৫। ধর্ম আর দর্শনের সমন্বয়ে যে বিজ্ঞান, সেটিতে এদের মধ্যে যে কোন একটি বা দুইটির চেয়ে বেশী স্পষ্টতা/বিচিত্রতা এবং ঐক্য আছে।

৬। যদি পরম সত্যকে সত্যসত্যই সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তা হলে সে, তাঁকে যে ব্যক্তির আত্মা নিন্দা/ধ্যান করে, তাঁকেও (নিজের থেকে) আলাদা করে রাখতে পারবে না।

৭। নিয়মগুলি নিজের থেকেই শাশ্বত/সর্বব্যাপী এবং অটল, আমাদের জ্ঞানের দ্বারা কেবল আমরা তাকে ক্রমশ বুঝতে পারি।

৮। জীবনে বিশ্বাস/বিকাশ অসীমের পানে পৌঁছবার পথে মানুষের সীমিত উপায়।

৯। অন্তিম সত্যের প্রভাব/মূল্য রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কেননা এটি দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত।

১০। আমাদের মিত্রতা/পূজা-র আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের ভাবনার প্রমাণ থাকা চাই।

১১। ঐতিহাসিক/রাজনৈতিক সত্যে রূপান্তরিত হবার আগেই গুজবকে সত্যের চোলাইয়ে পরিশ্রুত করে নেওয়া দরকার।

১২। শিক্ষাকে ধার্মিক বিনম্রতা/একতা-র প্রেরণা দিতেই হবে।

১৩। বিজ্ঞান মূলে একটি ক্রিয়াপদ্ধতি যা সর্বোচ্চ স্তরের আদর্শ/সত্য-র মূল্য খোঁজে।

১৪। গ্রামীণ ভারতের দৃষ্টিকোণ স্পষ্টত/মূলত রক্ষণশীল।

১৫। নৈতিক/সামাজিক মঙ্গলের প্রকৃতি নির্ণয় করা অসম্ভব না হলেও কঠিন তো বটেই।

১৬। দার্শনিক/গুরু-র যাদুকর, পূজারী বা পয়গম্বরের মিথ্যা ভেক ধরা উচিৎ নয়।

১৭। দর্শন/অধ্যাত্মবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, সত্যকে জানা নয়, সত্যে উপনীত হওয়া।

১৮। উদ্দেশ্য/ধর্ম-র উপর সংশয় মানবজাতির ইতিহাসের সমস্ত স্তরেই [illegible] ছিল বা আছে এবং ভারত তার বাইরে নয়।

কোনকালে আমি ব্যবহার করি না এমন সব সামগ্রী—যুক্তিতর্ক তথ্য ইত্যাদি আমদানি করে ব্যাপারটাকে একটু ওজনে ভারি করে তুলেছি, অর্থাৎ কিনা লেখাগুলো came perilously near প্রবন্ধ। স্বীকার করতেই হবে যে, ইন্দ্রজিৎ তার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করেছে। সে স্বধর্মচ্যুত হয়েছে। স্বধর্ম ত্যাগ করা ঘোরতর অধর্মের কাজ।

অধর্ম কেন তা বলছি। প্রথম যখন লিখতে শুরু করেছিলাম তখন ভেবেছিলাম, গুরুত্বের বিষয় নিয়ে কখনো লিখব না, বিষয়ের কৌলীন্য মানব না। যে কোন বিষয় নিয়ে—সাহিত্যে যা অপাঙক্তেয় তাকে নিয়ে রসসৃষ্টির চেষ্টা করব। আমাদের দেশে বলেছে, নারীরত্নং দুষ্কুলাদপি গ্রহণযোগ্য। এর নিহিতার্থটি রম্যরচনার প্রতিও প্রযোজ্য। ওখানে বিষয়ের শুচিবাই নেই, যে কোন বিষয় সমাদরে গৃহীত। তুচ্ছ জিনিসকেও সে তাচ্ছিল্য করে না অকিঞ্চন বিষয় নিয়েও রসসৃষ্টি করে। ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্যে খুব নিচু দরের বিষয় নিয়েও উঁচু দরের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। জি কে চেস্টারটন্ এর নাম দিয়েছিলেন—tremendous trifles. বাজে কথাও যে কতখানি কাজের কথা হতে পারে, আমাদের দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার আভাস দিয়েছেন। ('বাজে কথা'—বিচিত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) বাজে কথার মধ্য দিয়েই মানুষের গুণপনা প্রকাশ পায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করছি—"যে লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোন কথাই বলিতে পারে না, হয় বেদবাক্য বলে নয় চুপ করিয়া থাকে, হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সংসর্গ, তাহার প্রতিবেশ, শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।" আমি আর কিছু না হোক্, আমার লেখায় ঐ বেদবাক্য জিনিসটি যথাসাধ্য পরিহার করবার চেষ্টা করেছি। তবে লেখকমাত্রেই স্বীকার করবেন যে কাজটা বড় সহজসাধ্য নয়। কারণ বেদবাক্য যত সহজে বলা যায়, রসের বাক্য তত সহজে নয়।

প্রমথ চৌধুরী মশায় ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, আমাদের সাহিত্যে গুণপনাযুক্ত হালকামির বড় অভাব। সুখের বিষয় তিনি নিজে সেই গুণপনাযুক্ত হালকামির কিঞ্চিৎ চর্চা করে গিয়েছেন এবং আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে করেছেন। তাতে আমাদের ভাষা এবং সাহিত্য দুই-ই যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। তিনি যে অভাবের কথা বলেছিলেন ইতিমধ্যে সে অভাবও দূর হয়েছে বলা যেতে পারে। কারণ গত পনেরো কুড়ি বছরে আমাদের বহু লেখক হালকামোতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এখন বরং মনে হচ্ছে হালকামোটা একটু যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেজন্যই ইদানীং আমি একটু গম্ভীর মুখ করে গুরুগম্ভীর কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম। এখন দেখছি, তারও ফল তেমন ভালো হয়নি। একজন সমালোচক এমন কথাও বলেছেন যে আমি নাকি ওসব লেখায় অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিয়েছি।

কোন বিষয় সম্বন্ধে বলবার একটি রসিক [illegible] যাকে লিখি রম্য রচনা বা belles lettres ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় লেখা উক্ত জিনিসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে ও জিনিসটি অত সহজ নয়। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য [illegible] পাঠকের মনোরঞ্জন করে। সেটা [illegible] সম্ভব নয়। রম্য রচনা বা রমণীয় রচনা রমণীয়ত্বের [illegible] তার জন্যে যথেষ্ট [illegible] দিতে হয়। সে [illegible] লেখার [illegible] সকলের [illegible] থাকে না। বহু স্মৃতি থেকে জ্ঞানবুদ্ধি রসবোধ মিলিয়ে অতি সম্বদ্ধ একটি মন চাই। হাঁ, পাণ্ডিত্য চাই বইকি; কিন্তু সে পাণ্ডিত্য চাঁচাছোলা পাণ্ডিত্য হলে চলবে না, তাকে রসে ডুবিয়ে ব্যবহার করতে হবে। আমি যাঁকে রম্য রচনার রাজা বলি সেই চার্লস্ ল্যাম্ব এর অধ্যয়ন ছিল বহুবিস্তৃত, কাব্যপারাবার মন্থন করে তাঁর রচনাকে তিনি মণিরত্নহারে সাজিয়েছিলেন। পাণ্ডিত্য তাঁর লেখার মধ্যে রসের আকারে দেখা দিয়েছে। রস আর রসিকতা এক জিনিস নয়। আমাদের ইদানীং কালের রম্য রচনায় রসের চাইতে রসিকতার দিকে ঝোঁক বেশী। ল্যাম্ব পড়ে দেখুন—কোথাও অট্টহাসির অবকাশ নেই; কিন্তু একটি মৃদু হাস্যরস সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সে হাসি কোথাও আবার অকস্মাৎ বেদনায় বিগলিত হয়ে অশ্রুতে মিলিয়ে যাচ্ছে। হাসি কান্নার হীরা-পান্নার মিশ্রণে এক অপূর্ব সামগ্রীর সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে যে মানুষের ছবিটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে তাঁর মুখে হাসি কিন্তু চোখে জল।

লম্ফঝম্প, হাত পা ছোঁড়া, [illegible] অট্টহাসি যেমন [illegible] না তেমনি রম্যরচনাতেও কোন প্রকার আতিশয্যের স্থান নেই। [illegible] রমণীয় রচনাও [illegible] । [illegible] পাণ্ডিত্য [illegible] মন পাওয়া যায় না, নিছক পাণ্ডিত্য দিয়ে [illegible] সরস্বতীরও মন পাওয়া যায় না। প্রশ্ন উঠবে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি তা হলে প্রেমিক বা সাহিত্যিক হতে পারেন না? পারেন না কেন? খুব পারেন। পাণ্ডিত্য যদি দুধ হয়ে রস হয়ে দেখা দেয় তা হলে পণ্ডিত ব্যক্তিও রমণীর মনোরঞ্জন করতে পারেন, সাহিত্য সরস্বতীর কৃপা লাভ করতে সমর্থ হন। [illegible] পণ্ডিতেরা [illegible] থাকে তখন সে অচল। [illegible] মাধুরী হয় তখনই সে [illegible] লাভ করে, [illegible] ফলে ফুলে পূর্ণ করে প্রবাহিত হয়। জমাট বাঁধা পাণ্ডিত্য কোন কাজে লাগে না যদি না সে দ্রব হতে জানে। [illegible] ক্ষেত্রেই দেখা যায় পণ্ডিতদের ঐ দ্রবীকরণের ক্ষমতাটি নেই। ফলে তাঁরা [illegible] প্রেমিক এবং নীরস লেখক [illegible] হন।

বিশুখুড়োকে আমরা একটি অদ্ভুত খবর সংবাদ পড়িয়া শুনাইলাম—শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে পটকা বিস্ফোরণ। খুড়ো মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন—গুরুদেবের ভাষাতেই বলতে ইচ্ছে হয়,—যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?"

শ্যামলাল বলিল—"আমরা অত শত বুঝিনে। সোজা কথায় বুঝি স্থানটা আম্রকুঞ্জ বলেই সেখানে হনুমানের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে!!"

শিক্ষায়তনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বাংলার অধ্যক্ষবৃন্দ জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন। সহযাত্রী [illegible]—"পবিত্রতা রক্ষার জন্য সকাল-সন্ধ্যা [illegible] গোবর ছাড়া আর উপায় নেই।"

উপ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই [illegible] তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে [illegible]—দেশের যুব সমাজের আত্ম-

[illegible] ফিরিয়ে [illegible] হতে [illegible] বটেই, কিন্তু কী উপায়ে? [illegible] প্রাপ্তি-নির্দেশ বলদের [illegible] নয় সে—কিরিয়া আইস, লজ্জার [illegible] নাই—বললেই যুব সমাজ ফিরে আসবে—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

হিন্দী ভাষার আন্দোলন নিয়ে উত্তর ভারতের হিন্দী প্রেমীদের [illegible] দক্ষিণ ভারতে হিন্দী বিরোধী আন্দোলন শুরু হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন [illegible] হলে, হিন্দী প্রেমীরা হয়ত [illegible], দক্ষিণের লোক উত্তরের জনে [illegible] আন্দোলনের উপর [illegible] দিয়ে [illegible]।

চণ্ডীগড় হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ডিগ্রি নেওয়ার পর দেড় শত [illegible] গ্রাজুয়েট পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব ত্যাগ করিয়া চলিয়া [illegible] যাইতে যাইতে এই স্লোগান দিতে থাকেন—'বক্তৃতা নয়, চাকরি চাই'। বিশুখুড়ো বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনৈক ব্যঙ্গরসিকের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন—"মানুষের মগজ ঠিক একটা মেশিনের মতো। জন্ম মুহূর্ত থেকে মেশিনটি চালু হয় এবং যাবজ্জীবন চলে, শুধু বিকল হয়ে যায় মগজের অধিকারী যখন বক্তৃতা দেন"।

লালবাজারে লিফটের মাথায় কে নাকি একটি টাইম বম রাখিয়া চলিয়া যায়, যথাসময়ে সেখানেই বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটে। সহযাত্রী সংক্ষেপে বলিলেন—"লালবাজারে টাইম বম, একেই বুঝি বলে—শিরে কৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধিব কোথা।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলিয়াছেন, কেহ ভারত আক্রমণ করিলে সমুচিত শিক্ষা পাইবে। শ্যামলাল বলিল—"এই দৃঢ়তা ভালো, এই আত্মপ্রত্যয় অতিবড় আশ্বাসের কথা। কিন্তু শুধু আশঙ্কা হয় কার্যক্ষেত্রে না সেই নাম-না-জানা ওড়িয়ার নীতি অনুসরণ করি [illegible] সাড়া [illegible] কম করিস!!"

রাজ্য সভায় সরকারী ভাষা সংশোধন বিলের বিতর্ক কালে শ্রীভূপেশ গুপ্ত মহাশয়ের—'আপনি কি বাংলা বলতে পারেন?'—প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—বাংলায় বলেন—'একটু একটু বলতে পারি কিন্তু এখানে বলব না'। শ্যামলাল বলিল—"কথাটা ফাঁস করে দেওয়া হয়ত ঠিক হল না, কী জানি, হিন্দী-প্রেমীরা

শ্রীমতী ইন্দিরা [illegible] এই অপরাধে [illegible] [illegible] প্রধানমন্ত্রীর গদি নিয়ে বসলেন!!"

একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে জানা গেল মাছেরও নাকি মন আছে।—"নিশ্চয়ই আছে এবং নিশ্চয়ই মাছ আমাদের উদ্দেশ্যে হয়ত বলেছে—'আগে মন করলে চুরি, মর্মে শেষে হানলে ছুরি'—এ না হলে কি আর এত বিরহ সন্তাপ হয়"—অজান্তে বুঝি

সহযাত্রীর একটি দীর্ঘশ্বাসই বাহির হইয়া আসল।

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা বলিয়াছেন—পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ১৯৬৫ সালের ক্ষতি দ্রুত সারাইয়া তুলিতে হইবে।—"খুবই ভালো কথা। কিন্তু সারিয়ে তোলার সেই চাঁদসীর নামকরা মলমটিও পাকিস্তানীদেরই হাতে—বলেন বিশুখুড়ো।

যুক্ত ফ্রণ্টের সাম্প্রতিক আন্দোলনের মহিলা দিবসে আমরা মহিলাদের লাল ঝাণ্ডা হাতে লইয়া বিক্ষোভ প্রকাশের ছবি দেখিলাম। এই প্রসঙ্গে সহযাত্রী বলিলেন—"লাল ঝাণ্ডার বদলে মুড়ো ঝাঁটা হলে বিক্ষোভ আরো জোরদার হত!!"

অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"পৌষ পার্বণের দিনে পিঠের কথা আজ আর কেউ বলেন না—আমরা জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আবার পিঠে খাবার শাসানি শুনে শঙ্কিত হয়ে আছি, পেটে খাবার কোন ভরসাই নেই!!"

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলা প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিপলিং সাহেবের আর যা হোক, দিব্য দৃষ্টি ছিল, হয়ত তাই তিনি ভারতের খেলার কথা ভেবেই ক্রিকেটারদের বলেছিলেন—ফ্লানেল্‌ড ফুলস।"

আপনি যদি নিজের হাতে

ঘরদোর রঙ ক'রে

৬0% খরচা বাঁচাতে চান তাহ'লে

স্বচ্ছন্দে তা করতে পারেন

—কোনো ঝামেলা পোয়াতে

হবে না।

তবে, রঙটি হওয়া চাই

ড্যুরোল্যাক নিউ অ্যাক্রিলিক।

ঘরের ভেতরটা রঙ করতে হলে রঙের বাবদ লাগবে ৪০% আর কাজটা যদি নিজের হাতেই করেন তবে বাকী ৬০% খরচা আপনার বেঁচে যাবে। শালিমার-এর এক আশ্চর্য রঙ এই **ড্যুরোল্যাক নিউ অ্যাক্রিলিক** পেণ্ট—এ রঙ আপনি হাসতে হাসতে লাগাতে পারবেন। আনাড়ি রং-মিস্ত্রী বা শখ ক'রে যাঁরা দেয়াল রঙ করতে চান তাঁদের জন্যে এমন নিখুঁত পেণ্ট আর হয় না। আপনি যদি নিজের হাতে লাগাতে চান তো ভালো কথা, দেখবেন **ড্যুরোল্যাক নিউ অ্যাক্রিলিক** পেণ্ট লাগাতে কোনো ঝকমারি নেই। রঙের মতো রঙ চাই তো **ড্যুরোল্যাক** লাগান।

এই আশ্চর্য রঙটির সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে সব কথা জানতে হ'লে আমাদের বিনামূল্যের প্রচারপত্র "LET DUROLAC NEW ACRYLIC TAKE CARE OF YOUR WALLS" চেয়ে পাঠান।

DUROLAC
ACRYLIC
PLASTIC EMULSION PAINT
NEW ACRYLIC

কুপন	অনুগ্রহ ক'রে আমাকে এক কপি "Let Durolac New Acrylic Take Care of Your Walls" পাঠিয়ে দিন।

নাম ....
....
ঠিকানা ....
....

এই কুপনটি কেটে নিয়ে এই ঠিকানায় পাঠান:
পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট, শালিমার পেন্টস লিঃ
পোষ্ট বক্স নং ২৪৭২, কলিকাতা-১

ULKA-C-SP-BEN-9

রঙের মতো রঙ চাইলে নিন শালিমার

কালচারের হেরফের

চিত্তব্রত পালিত

ইংরেজীতে যা কালচার, বাংলা ভাষায় তার সঠিক তর্জমা করা যায় কিনা বিচারসাপেক্ষ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ভাষান্তরে অর্থান্তরের আশংকা করে শব্দটিকে অবিকৃত রেখে তার সংজ্ঞা দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর কথায় কমলহীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে, আর তার থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার। কিন্তু উপমার ঘটা অন্ধকারের চৌকাঠ পেরিয়ে আলোতে উত্তরণের সুযোগ আমাদের দেয়নি। আলো-আঁধারীতে 'কালচার' আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে হয়ে ওঠেনি।

কালচারের পরিভাষা হিসেবে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদি শব্দ আমাদের পরিচিত। মনের সংস্কার বা জাতীয় মানসের সংস্কার থেকে যে কথাটির উৎপত্তি, অধুনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কবলিত মিশ্র ওরাওটাং জগঝম্পে সেই সংস্কৃতি বিস্মৃতির অন্তরালে। কালান্তরে অর্থের অপকর্ষ হয় একথা আমরা জানি। কৃষ্টি কথাটি বুঝতে হলে শব্দের ব্যাপ্তি ঘটাতে হয়। কর্ষণ করতে হয় মনকে বুদ্ধির লাঙল দিয়ে, বিদ্যার সার দিয়ে, চিন্তার বীজ দিয়ে, তারপর খামারে যে ফসল ওঠে তাকেই বলি কৃষ্টি। কথাটিকে সিঁড়িভাঙ্গা পদ্ধতিতে ভেঙেও কিছুমাত্র নির্যাস পাওয়া যায় না—আদিম প্রশ্নগুলো যথা কী, কীভাবে, কার এবং কেন—থেকেই যায় এবং বোঝা ভারীই হয়ে ওঠে। সোজা কথায়, নিশানা ফস্কে যায়। তাছাড়া খুঁতখুঁতে মনে culture প্রসঙ্গে কথাটি কোথায় যেন agriculture-এর রেশটুকু রেখে যায়। ঐতিহ্যের প্রসংগ এলেই ওয়াজেদ আলীর অমর অধুনা আপ্ত বাক্য মনে পড়ে, যা কিনা সমানে চলছে। ঐতিহ্য জাতির অতীত সত্তা। এর কোন ব্যক্তিগত সংজ্ঞা নেই। ঐতিহ্য মানেই রোমের গৌরব নয়, রোমের গৌরব-অগৌরবের সামগ্রিক চরিত্রে অতীতের দর্পণে ফুটে ওঠে। সামনে চললে বা কালজয়ী হলেই কালচারের পরাকাষ্ঠা হয় না।

কালচারের উৎস সন্ধানে গিয়ে ভাষা পথ স্ববলে খনন করে ভারত রসঋষি দ্বৈপায়ন হবার বাসনা লেখকের আদৌ নেই। ভূমিকার অবতারণা 'কালচার' সম্বন্ধে একটি স্থায়ী মূল তর্কে ফিরে যেতে। আধুনিক মানবের চতুর্বর্গ লাভের উপরে পঞ্চমবর্গ হিসেবে আকাংখিত কালচার ব্যক্তিগত না জাতিগত। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কীসে তার প্রকাশ—চৌষট্টি কলায়? চিন্তায়? আচারে ব্যবহারে? জীবনে?

কালচার ব্যক্তিগত মেনে নিয়ে তর্কে নামা যাক। কালচার কোন বিশেষ ব্যক্তিমানসের উন্নতি বা উৎকর্ষের নানা সাধনপর্যায়ের চরম ফলশ্রুতি। তার প্রকাশ এলিয়টের(১) গলায়, বিদ্যাবত্তায়, কাব্য, সংগীত, চারু-কলায় পারদর্শিতায় এবং ব্যবহারের পরিশীলিত রূপে। এর কোন একটিতে শিক্ষিতপটুত্ব নয়, সমষ্টিগতভাবে বশীকরণ, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, অতিমানব ছাড়া এই বিশ্বরূপের দর্শন পাওয়া ভার। কিন্তু একটি জাতির মধ্যে বা ক্ষুদ্রতর গণ্ডীতে, একটি গোষ্ঠীর মধ্যে, এই চেহারা ধারণা করা যায়। অর্থাৎ কালচার জাতিগত, ব্যষ্টিগত নয়। তাই জাতির ইতিহাস বলতে ইংরেজীতে 'History and Culture of the People' বলা হয়। হিন্দু কালচারের পরিচয় দিতে Abbe' Dubois বা Ward সাহেবকে 'Hindu Religion, Manners, Custom'-এর ব্যাখ্যা করতে হয়। কালচারের অর্থ ঐতিহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা বিষয়ে গরমিল থেকে যায়, 'কালচার' এরিস্যুল জোলাতে চেষ্টা করলে তার আকর্ষণ অনেক কমে যেত। আরাধনা আকাংখার বস্তু কখনই হত না। মনীষার আদিগন্ত প্রসার ব্যাহত হত, সেজানের তুলি স্তব্ধ হয়ে যেত, হান্স অ্যান্ডারসন গল্পের ঝুলি বন্ধ করে ফেলতেন। কারণ জাতিগত কালচার এলিয়টের ধ্রুপদী (perfectionist) চিন্তাধারার বিরোধী, জাতিতে জাতের ইতরবিশেষ থাকে—তার মালিন্যও থাকে। সেই কালচার জাতিগত অর্থে জুলু, মাউরী, কোন্ডার জীবনযাত্রার ঐতিহ্যকেও বোঝাবে।

তাই পাউইসের(২) মত চিন্তাবিদ কালচারকে জনতার হাতে সঁপে দিতে

১। T. S. Eliot: Notes Towards a Definition of Culture.

২। Powys: Meaning of Culture.

মারাজ। কালচারকে নির্ভেজাল অ্যাগমার্ক নিয়ে টিকতে হলে গড্ডালিকায় গা ভাসালে চলবে না। পাউইস আরোহ স্বীকার করেন, অবরোহ বিশ্বাস করেন না। সেই কারণে 'কালচার' তাঁর মতে ব্যক্তিগত। জনতার উপরে তো আর জোর খাটে না, তাই নিজেকেই সামলাতে হয়, কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়। পাউইসও নিজেকে অতিমানব ভাবতে ভরসা পেলেন না। তাই এলিয়টের ব্যাখ্যা তাঁর কাছে legal tender নয়। কালচার তাঁর কাছে নামাবলীর মত গুণাবলী নয়, এক বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা—এরিস্টটল যাকে বোঝাতে চেয়েছেন অল্প-কথায়—শুধু বাঁচা নয়, সুন্দরভাবে বাঁচতে শেখা। জীবন কেবল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের পালাবদল নয়, জীবন মানে জীবনচর্যা—a way of life। এলিয়টের চরিত্র-গুণগুলো বাদ দিয়ে নয়, যতটা সম্ভব আত্মসাৎ করা এবং জীবনে তার প্রতিফলন, রবীন্দ্রনাথ যার দ্যুতিতে আমাদের ধাঁধিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কালচারের দুর্বল প্রদীপকে বাঁচাতে গিয়ে সমাজকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন পাউইস পাছে প্রাত্যহিক 'ল্যাজ কাত টানাটানির' প্রবল ঝড়ে সেটা নিবে যায়। কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব। শুধুমাত্র নরকে নারায়ণ জেনে নয়। মানুষ নিছক বাঁচার তাগিদেই অন্য মানুষের সহযোগী হয়েছে, এক তালে পা ফেলে এগিয়েছে, একে অন্যের উপর নির্ভর করে এগিয়েছে, একে অন্যের উপর নির্ভর করেছে, দূরতর দ্বীপ হয়ে সে থাকেনি। আদি জীবনবেদের যাঁরা ঋত্বিক তাঁরা নিজের মুক্তি ও সৌন্দর্যচেতনার রূপকুণ্ডে এসে সকলের চেনা মুক্তির অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। তাই পারস্পরিক বোঝা-পড়া, ভাব বিনিময়, তাই দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে শুধু ভারতের মহামানবের সাগরতীরে নয়। জগৎ পারাবারের তীরে। তাই জীবনচর্যা জীবনে জীবন যোগ করেই হয়, বিয়োগ করে নয়। 'মানুষের ধর্ম' যার ফলশ্রুতি, প্রেম যার মন্ত্র, যে মন্ত্র এখনও পৃথিবীর যাবতীয় আধিব্যাধির অবসান ঘটাতে পারে।

কালচার সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন নয়, তেমনি চাহিদা যোগানের যোঝাযুঝিতে বন্ধক রাখা ভোগসামগ্রীও নয়। শুধু উপযুক্ত গার্হস্থ্য পরিবেশ এবং অবসরের আয়োজন হলেই অমৃতে অধিকার জন্মায় না। যদিও কডওয়েল (৩) পরজীবী বুর্জোয়া কালচারের ন্যাভিশ্বাস স্মরণ করে নান্দীপাঠ করেছিলেন এক শ্রমজীবী কালচারের উম্বা-লগ্নের। গণভোটে আর যাই ঠিক হোক, কালচারের চরিত্র নির্ধারণ করা যায় না। জনতার চাহিদা মেটাতে বিবিধ প্রকল্প থেকে হুহু করে হরেকরকম সাংস্কৃতিক সামগ্রী বেরিয়ে আসছে এবং আমাদের সত্তাকে ছেয়ে ফেলছে। আমাদের সাহিত্যে, গানে, ছবিতে, ছায়াছবিতে, থিয়েটারে, আচারে ব্যবহারে, বেশবাসে তার রূপ প্রকটিত হচ্ছে। পরিবেশ এবং অবসর কদাচিৎ রাসেলের জন্ম দিচ্ছে। বরং অবসর শয়তানের কারখানার পরিধি বাড়িয়ে চলেছে।

জীবনচর্যা এক নিরলস ব্যক্তিগত প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে। সামাজিকতা সকলের ওই ব্যক্তিগত প্রয়াসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নিমিত্ত মাত্র। জ্ঞান, সৌন্দর্য ও মুক্তির তাপস প্রতিটি মানুষই আত্মার আত্মীয়—এই প্রত্যয় থেকেই 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' কথাটির বোধোদয়। তাই কালচার ব্যষ্টি-সমষ্টির যুগলবন্দী এক সম্পূর্ণ সুরসপ্তক। কিছুমাত্র প্রয়াস না করে, সাধনার সরগম না করে, সংস্কৃতির শিখরে চড়তে গিয়ে আমরা আজ বিরাট ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছি। সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে চেতনা ফসিল হয়ে গেছে, প্রবৃত্তি এখন তেজী ঘোড়ার মত, জেদী ঘোড়ার মত আমাদের এক বিচিত্র গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে নাকাল করছে। আমরা এক দৃশ্য-হীনতায় হারিয়ে গেছি। কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে কেউ গাইলে আমরা মনে মনে আর সেই সুর সাধি না। আমরা শিল্পীর কদর করি না। আমাদের আশা অতি পটুত্বের মোসাহেবকে আমরা শিল্পীর মধ্যে খুঁজে বেড়াই। প্রলেটারিয়ান কালচার জনমানসের সারাৎসার হয়ে ওঠে না, কিন্তু মরমী রূপ-তাপসকে তাদের সামান্য পাথেয় সাড়ে বত্রিশ ভাজা সহযোগে গণদেবতাকে ডালি দিতে হয়। পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াই বড় কথা—দুধ এবং পিটুলিগোলায় তফাত অচিরেই ঘুচে যাবে। গণদেবতা খুশী হলে পুরস্কারের পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্বে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

মূলসূত্রে ফিরে গিয়ে বলি, কালচার জীবনচর্যা এবং তা ব্যক্তিগত। সমাজেই তার স্থিতি এবং প্রকাশ। প্রয়াস বা সাধনা তার প্রাণশক্তির উৎস। চাওয়া মাত্র যা আমরা পেতে চাই তা বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে পাওয়া যায় এবং চেয়েও যা আমরা পাই না তা হল সেই রোদ্দুরের কথা ভাবতে ভাবতে কবির অমলকান্তি রোদ্দুর হয়ে যেতে চেয়েছিল।
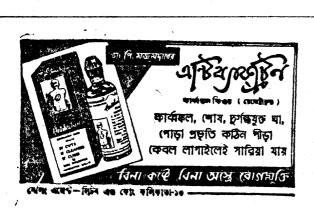
৩। Christopher Codwell : Studies in a Dying Culture.

বুদ্ধদেব বসুর আকাদেমি পুরস্কার

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটির জন্য এ বছর বুদ্ধদেব বসুর নামে আকাদেমি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। অত্যন্ত সুসংবাদ।

এতদিনে আমরা বেশ ভালোভাবেই জেনে গেছি যে, আকাদেমি পুরস্কার বা এইরূপ আরও দু' একটা রাশভারী পুরস্কার অধিকাংশ সময়েই, কোনো সার্থক গ্রন্থকে সম্মানিত করার মত সুবিচারের মুখাপেক্ষী থাকে না। সাহিত্যের বদলে সাহিত্যিকের খ্যাতি ও শেষ-প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা—এইগুলিই গণ্য হয়। সেদিক থেকে, বুদ্ধদেব বসু কেন বহু বছর আগেই আকাদেমি পুরস্কার পাননি—তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

যাই হোক 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' বই-এর নাম আকাদেমি পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আমাদের অন্যরূপ আনন্দের কারণ আছে। শুধু লেখক নন, এবারের পুরস্কৃত গ্রন্থটিও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

বুদ্ধদেব বসুর যৌবনে নাটক রচনা সম্পর্কে কিছুটা উৎসাহ দেখা গেলেও—পরিণত বয়সে, গত চার-পাঁচ বছর ধরেই তিনি দৃশ্যকাব্যকে তাঁর ভাবনা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অনেক লেখকই জীবনের কোনো কোনো সময়ে সাহিত্যের এক একটি অঙ্গের প্রতি বেশী আসক্ত হন। আমাদের বাংলাদেশে মঞ্চের উপযোগী সার্থক নাটক কটা আছে বা নেই, সে আলোচনা এখানে অবান্তর. কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবার মত নাটকের সংখ্যা গুণতে একটা হাতের সবক'টি করও যে ফুরোবে না—সে কথা অনায়াসেই বলা যায়। বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ কিংবা বিখ্যাত লেখকদের মঞ্চের উপযোগী করে লেখা বাজে নাটকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু যে-নাটক সাহিত্য হিসেবেও স্বীকৃতি পাবার যোগ্য—সে রকম নাটক বাংলায় কোথায়? সে-রকম সার্থক নাটক রবীন্দ্র-নাথের পর বুদ্ধদেব বসুই লিখছেন। ইদানীংকালের আরও কয়েকজন লেখক সাহিত্যের অঙ্গ হিসেবেই নাটক লেখার চেষ্টা করছেন, সেদিক থেকে এবছর একটি নাটকের আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া—এক হিসেবে সামগ্রিক স্বীকৃতি।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী' দেশের পাঠকদের কাছে পরিচিত। রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বিচিত্র কাহিনী (মহাভারতে আরও বিস্তৃত-ভাবে আছে), এমনিতেই যথেষ্ট নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ—বুদ্ধদেব বসু তার রূপান্তর ঘটিয়ে—একে শরীরের দুঃখ ও উল্লাস—কিংবা দুঃখময় উল্লাস, ভালোবাসা ও সর্ব-নাশের মন্থন থেকে বেরিয়ে আসা তীব্র অভিমান—একে ঘিরে থাকা সমাজ ও দেশ-কালের স্ট্রেট জ্যাকেট—সব মিলিয়ে তিনি

বুদ্ধদেব বসু

একটি শরীর-মহাদেশের নতুন আবিষ্কার কাহিনীর রূপে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর আজীবন সাহিত্যাদর্শ এই নাটকে প্রতি-ফলিত, এবং কবিতার সৌরভও কোথাও কোথাও সংলাপের বাঁধুনি আমাদের যথেষ্ট মনঃপূত হয়নি, কিন্তু সব মিলিয়ে একটি মহৎ সৃষ্টি।

এই নাটকের সাহিত্যগুণের কথাই আমরা বেশী উল্লেখ করেছি, কিন্তু মঞ্চেও যে এই সব নাটক উপস্থিত করার সার্থকতা আছে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। অবশ্য, সেখানে নির্ভর করছে মঞ্চের প্রযোজক এবং দর্শকবৃন্দ কতখানি প্রস্তুত। কিছুকাল আগে কলকাতার বেতারে এই নাটকের অভিনয় যথেষ্ট অভিনন্দিত হয়েছিল।

কবিতা

বাংলা কবিতা নিয়ে কলকাতা শহরে একটা না একটা উত্তেজক ঘটনা লেগেই আছে। কবিতা সাপ্তাহিকী, দৈনিক কবিতা ও ঘণ্টিকী নিয়ে যে হইহই-রইরই হয়ে গেল তার রেশ এখনও মেলায়নি। বাংলাদেশ ছাড়িয়ে ভারতের সর্বত্র এবং বিদেশেও পৌঁছেছে। এখনও সাহিত্যপ্রেমী বিদেশীরা কলকাতা শহরে এসে ওইসব প্রসঙ্গে চোখ গোল গোল করে নানা প্রশ্ন করেন।

এইসব হুড়োহুড়ি সম্পূর্ণ বিফলে যায়নি নিশ্চিত। আশা করা যায়, বাংলা কবিতার প্রতি অনেকের আগ্রহ বেড়েছে। এদের মধ্যে একটি, অন্য এক দিকেও বিশেষ সার্থকতা অর্জন করেছে।

বিমল রায়চৌধুরী ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'দৈনিক কবিতা'র একটি বিশেষ সংকলন এবার মুদ্রণ সৌষ্ঠবের জন্য ভারত সরকারের প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এ'দের বিশেষ কৃতিত্ব এই, সাময়িক পত্রের বিভাগে এই সংকলন প্রথম পুরস্কার পেয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরস্কারের জন্য আর কোনো পত্রিকা যোগ্য বিবেচিত হয়নি।

এই পর্বের সর্বশেষ সংযোজন, স্বদেশ-রঞ্জন দত্ত'র সম্পাদনায় 'বেঙ্গলি পোয়েট্রি' নামে বাংলা কবিতা বিষয়ক ইংরেজী পত্রিকা।

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন

ভারতের বিভিন্ন ভাষার নির্বাচিত কবিদের এক মঞ্চে উপস্থিত করার জন্য কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের আয়ো-জন করা হচ্ছে। আগামী এপ্রিল মাসে তিনদিন ধরে এই সম্মেলন হবে। এতে যোগদান করবেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় ৩০ জন কবি, এবং কলকাতার কবিরা। অনুবাদ সম্পর্কেও একটি আলাদা অনুষ্ঠান হবে। অন্য প্রদেশের কবিরা কবিতা পাঠ করবেন তাঁদের নিজস্ব ভাষায়—এবং সেই কবিতাগুলির ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে একটি আলাদা পুস্তিকাও ছাপা হবে।

এই সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে সমিতি তৈরি হয়েছে তার নির্বাচিত সভাপতি শ্রীসতীকান্ত গুহ, সম্পাদক আশিস সান্যাল ও বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। সদস্য ও উপদেষ্টাদের মধ্যে আছেন বাংলা দেশের অনেক প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও শিল্পী। যোগাযোগের ঠিকানা : সাউথ পয়েণ্ট ক্লাব, ২ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা—১৬।

রামপদ মুখোপাধ্যায়

৬৯ বছর বয়েসে ঔপন্যাসিক রামপদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে গত মঙ্গলবার ২৬শে ডিসেম্বর। তাঁর আদি নিবাস ছিল শান্তিপুর, চাকরিসূত্রে জড়িত ছিলেন রেল-এর সঙ্গে। প্রবাসী, বিচিত্রা প্রভৃতি সাময়িক পত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা তিরিশেরও বেশী।

সনাতন পাঠক

সাহিত্য সংকলন

সাহিত্য বিচিত্রা : বিমল মিত্র : গ্রন্থালয় (প্রাইভেট) লিমিটেড ১১এ, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১২ টাকা।

গ্রন্থালয় প্রকাশিত বিমল মিত্রের 'সাহিত্য বিচিত্রা' লেখকের গ্রন্থাবলী নয়, একটি উপন্যাস (মিথুন লগ্ন) কয়েকটি গল্প; একটি কিশোর উপন্যাস, ও প্রবন্ধ ছাড়াও বৈদ্যনাথ ঘোষকৃত 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর একটি দীর্ঘ আলোচনা এবং বিমল মিত্রের সাহিত্য সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকার অনেক চিঠি এতে আছে বলেই এই সংকলনের 'সাহিত্য বিচিত্রা' নামকরণ সার্থক।

এই সুবৃহৎ সংকলন গ্রন্থে চিঠিপত্র ও প্রবন্ধের মাধ্যমে এমন অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যে বিমল মিত্রের অনুরাগী পাঠক তার মানস ও সাহিত্য কর্মের মূল সূত্র সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

হয়তো আইনগত কারণে এই সংকলনে 'সাহেব বিবি গোলাম' সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়নি কিন্তু লেখকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্মের সার্থক নাট্যরূপ সংযোজিত করে প্রকাশক ভিন্ন ফরমে একই উপন্যাসের যে নতুন স্বাদ পরিবেশন করেছেন পাঠক সাধারণের তা উপরি লাভের মতই মনে হবে।

বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক ও সতীনাথ এবং আরও অনেক সাহিত্যিক যাঁদের প্রতি সমালোচকের শ্রদ্ধা অপরিসীম, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের আত্মপ্রকাশ আকস্মিক নয়—তাঁদের সাধনা যেমন দীর্ঘ দিনের সিদ্ধি লাভেও তেমন সময় লেগেছে প্রচুর। এবং সেই সব জাত ঔপন্যাসিকের আয়ু হয়তো সেই কারণেই ফানুসের নয়, তাদের সাহিত্য-কীর্তি কাল জয়ী।

বিমল মিত্রের যে আলোড়নকারী উপন্যাস 'সাহেব বিবি গোলাম' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল পনেরো-ষোল বছর আগে তা সংক্ষিপ্ত সময়ের অনুশীলনের ফসল নয়, তার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে যখন কয়েকটি ছোট গল্পে লেখকের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ এবং বৃহৎ উপন্যাস সৃষ্টির ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিমল মিত্রের এমন একটি ইঙ্গিতময় ছোট গল্পের নাম, 'ঝড় ও একটি পাখী।'

'সাহেব বিবি গোলাম' প্রকাশিত হওয়ার অনতিপূর্বে বাংলা সাহিত্য গগন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে', রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা' এবং গল্প উপন্যাসের কিছু কিছু উপাদান মিশ্রিত রম্যরচনা ও ভ্রমণ কাহিনী। নতুন স্বাদের এই রকম সব রচনার প্রচণ্ড প্রভাবে উদভ্রান্ত পাঠক হঠাৎ খেয়াল করতে পারেনি যে উপন্যাস সম্পর্কে তাদের কৌতূহল প্রায় নির্বাপিত। 'সাহেব বিবি গোলামের' মত সুবৃহৎ উপন্যাসের প্রকাশ সেই কৌতূহল শুধু পুনঃসঞ্চারিত করল না, পরবর্তীকালের বাংলা পুস্তক তালিকায় দৃষ্টি দিলেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে সমসাময়িক লেখকরাও কী পরিমাণ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

বিমল মিত্র আমাদের কালের এমন একজন লেখক যাঁর ভাগ্যে নিন্দা প্রশংসার অংশ প্রায় সমান-সমান। তা সত্ত্বেও, সম্ভবত সকল শ্রেণীর পাঠক অকপটে স্বীকার করবেন যে কাহিনী বিন্যাসে তিনি অদ্বিতীয় এবং এক অলৌকিক গুণের অধিকারী।

বাংলা সাহিত্যে এখন ঋতু বদলের সময়। বহু শক্তিমান লেখক বলিষ্ঠ রীতি ও প্রকাশ ভঙ্গীর অনুশীলনে তৎপর। সুখের বিষয়, বিমল মিত্র ময়ূরপুচ্ছ পরিধানে কোন আগ্রহ নেই এবং স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—এই মন্ত্রে বিশ্বাসী বলেই তিনি নিষ্ঠায় অবিচল এবং এখনো সক্রিয়। তাঁর 'সাহিত্য বিচিত্রা' প্রায় নির্ভুল মুদ্রণ ও পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদের জন্যেও অভিনব সংকলন হিসেবে আদৃত হবে। ৩০।৬৭

প্রবন্ধ

দ্বিজেন্দ্র দর্পণ। শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শংকর ঘোষ লেন, কলি-৬। পাঁচ টাকা।

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক বনফুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে যে দ্বিজেন্দ্র বক্তৃতামালা দান করেছিলেন বর্তমান গ্রন্থটি তারই সংকলন। মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত চারটি শিরোনামায় দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব ও কবিত্বের স্মৃতিতর্পণ করেছেন লেখক। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বা গানের শিরোনামায় কোনো স্বতন্ত্র অধ্যায় নেই। স্বদেশ প্রেমিকত্বের প্রসঙ্গে সেগুলি আলোচিত। তেমনি প্রহসন বা হাসির গানের দিকটিও 'ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলাল' অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যদিও নাটক এবং প্রহসন ও হাসির গান সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা হলেই ভাল হত। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্র শ্রদ্ধাপ্রসূত এবং আস্বাদনমূলক। সাধারণ তবে উনি দ্বিজেন্দ্রলালের [illegible] বা [illegible] প্রসঙ্গকে [illegible] করেছেন। প্রয়োজনবোধে স্বমতের বিরুদ্ধ ধারণার যথোচিত পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াসী হয়েছেন।

কবি-নাট্যকার, স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল চরিত্র। হয়ত তাঁর রবীন্দ্রবিরোধিতার কারণে তাঁর স্ব-কালে বা একালেও তাঁর সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝা-বুঝির অবকাশ ঘটেছে। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য ছন্দের পরীক্ষা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন। বলাকার ছন্দের যে বৈপ্লবিক মাত্রা-মুক্তি রবীন্দ্রনাথকে কালামুক্তির এক নতুন রাস্তা দেখিয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের মন্দ্রে তারই অস্ফুট আভাস ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ত এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে ঠিকই পড়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য আলোচনার ক্ষেত্রে এই দিকটি সম্ভবত একটি জরুরী তথ্য।

এ তথ্যের নির্দেশ না থাকলেও বনফুল বিশেষ মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমগ্র দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছেন। ব্যক্তি ও স্বদেশ প্রেমিকের আলেখ্য রচনায় তাঁর নম্র শ্রদ্ধা ও আবেগ আমাদের স্পর্শ করে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টিও বিশেষ মনোজ্ঞ। এতে ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনা অজস্র সুনির্বাচিত উদ্ধৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে মূল রচনার প্রতি পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

বইটি রসিক পাঠকদের কাছে আদরণীয় এবং ছাত্রদের কাছে উপকারী নির্দেশে জনপ্রিয় হবে। এ জাতীয় গ্রন্থের শেষে একটি নির্দেশিকা প্রয়োজনীয় উপাদান। আশা করি প্রকাশক দ্বিতীয় সংস্করণে এ বিষয়ে অবহিত হবেন। ৩১।১।৬৭

উপন্যাস

শজারুর কাঁটা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলি-৯। চার টাকা।

রহস্য কাহিনীর স্বাদ মিশিয়ে একটি সাধারণ প্রেমের গল্পকেও যে কতখানি অসাধারণ করে তোলা যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। মাত্র মাস ছয়েকের মধ্যে তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়ে বইটির অসামান্য জনপ্রিয়তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। লেখকের অন্যান্য ডিটেকটিভ গল্পের সঙ্গে বর্তমান কাহিনীর প্রভেদ এই যে, এখানে খুন তদন্ত এবং তার কিনারা গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। একটি কিশোরীর জীবনে মোহভঙ্গ এবং ধীরে ধীরে তার মনে মাধুর্যময় দাম্পত্য

প্রেমের বিকাশই এখানে প্রধান আকর্ষণ। পর পর তিনটি অভিনব হত্যাকাণ্ড এবং তার পর আরও দুটি হত্যার উত্তেজনাময় চেষ্টা গল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় হলেও উপন্যাসের আসল মধুর রসটি তাতে কোথাও ব্যাহত হয় নি। বরং রহস্যময় খুন, থমথমে পরিবেশ, সন্দেহ-জনক কয়েকটি চরিত্র এবং সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের উপস্থিতি গল্পে কাহিনীর গতিকে আদ্যন্ত একটি আকর্ষণের চূড়ায় তুলে রেখেছে।

সুতরাং রহস্য কাহিনীতেই যাদের অধিক আসক্তি তারা এই অভিনব গল্পটিতে গোয়েন্দা কাহিনীর পরিপূর্ণ রস পেয়েও অতিরিক্ত কিছুর আস্বাদ পাবেন যা সব উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলের শেষে এক অপূর্ব তৃপ্তিতে মন ভরিয়ে দেবে। খুনের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত এখানেও যথারীতি তাদের মনে মনে সম্ভাব্য খুনীর অনুসন্ধান শুরু হয়ে যাবে। অবশেষে খুনীকে ধরবার জন্যে ব্যোমকেশের অসমসাহসিক প্ল্যান রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আসল মানুষটিকে চিনিয়ে দেবে। এবং সবশেষে রহস্য উদ্ঘাটনের [illegible] পরিবেশে দীপা ও দেবাশিসের [illegible] জীবনে নিরুদ্ধ প্রেমের [illegible] সুখদ অনুভূতিতে মন ভরিয়ে [illegible] উপন্যাসের মধুর সমাপ্তিতে শরদিন্দুর [illegible] পাঠকরা। এখানেও তার [illegible] নেই। ২১/১৬৭

আত্মপ্রকাশ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। [illegible] পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ [illegible] কলকাতা-১। [illegible]

[illegible] বাংলা উপন্যাসে এক ধরনের [illegible] কারণ হয়ে [illegible] দিক থেকে বাংলা [illegible] নেই। কিন্তু লেখার [illegible] বাঁধা বিষয়, গতানুগতিক [illegible] এবং চিরাচরিত [illegible] সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র [illegible] পারিপাট্যে তাকে অলংকৃত করা হয়েছে। এই [illegible] গড্ডালিকায় [illegible] যে কয়েকটি উপন্যাস [illegible] ও প্রেরণায় আধুনিক উপন্যাসের [illegible] পেতে পারে শ্রীসুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ' তার অন্যতম। [illegible] একটা [illegible] কথা মনে করা। সমকালীন জীবনের জটিলতা এবং তার যথার্থ [illegible] শিল্পরূপ দেওয়াই প্রকৃত আধুনিকতা। এদিক থেকে 'আত্মপ্রকাশ' নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

'আত্মপ্রকাশ' কোনো কল্পকাহিনী নয়, আত্মজৈবনিক উপন্যাস। ফলত এ গ্রন্থের [illegible] বিষয়ের গুরুত্ব অনেকখানি। [illegible] স্রষ্টা ও সৃষ্টি সমার্থক। এবং রচয়ি-তার কৃতিত্ব এইখানে যে, লেখক নিজেকে এবং পার্শ্বস্থ জীবন বিক্ষোভকে আত্মগত করেও নৈর্ব্যক্তিকভাবে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এ উপন্যাসের নায়ক এক উৎকেন্দ্রিক যুবক। বন্ধুপ্রজনেরাও তার অনুগামী। যথেষ্ট স্পর্শকাতর এবং বিবেকবান হওয়া সত্ত্বেও এক প্রতিকারহীন প্যাশন নায়ককে বিপথগামী করে তুলেছে। এই স্বেচ্ছাচার অহেতুক নয়। এর মূলে নিহিত আছে এক গভীর জীবনবেদনা। রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে বাস্তুভূমি ছেড়ে আসার অভিমান উত্তরকালে এক কিশোরকে পারিবারিক বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে এক প্রতিবাদী চরিত্র করে তুলেছে। সে কাউকে ভালবাসতে পারেনি, শেখেনি। সমাজ প্রতিবেশের কোথাও সে নিজেকে

অরণ্যদেব লী ফক

স্টার সিস্টেম বর্জন ও পোষণ, নতুন পরিচালিকা, নতুন শিল্পী

বাংলা ছবির একটি বছর

ব্যবসার দিক থেকে ১৯৬৭ সাল বাংলা ছবির পক্ষে ভালোয় ভালোয় কেটেছে বলা চলে। কয়েকটি বাংলা ছবি তো বক্স-অফিসে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। প্রথমেই দুটি ছবির নাম উল্লেখ করতে হয়—**বালিকা বধূ** ও **ছুটি**। এ-প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই, ছবি দুটি তথাকথিত 'স্টার সিস্টেম'-এর আনুকূল্য ছাড়াই ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলা ছবির পক্ষে লক্ষণটি শুভ সন্দেহ নেই। বালিকা বধূ ও ছুটি প্রমাণ করেছে যে, সুন্দর গল্প ও সুপরিচালনা থাকলে দর্শকের অভাব হয় না।

অবশ্য স্টার সিস্টেম যে বাংলা চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নেয়নি সে-প্রমাণও '৬৭ সনের ছবিতে পাওয়া যায়। তবু সুখের কথা এই, একাধিক চলচ্চিত্রকার তারকা-প্রথা বর্জনের বলিষ্ঠতা এবং সৎ প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়ে আর সকলকে উৎসাহিত করেছেন। চিত্র পরিচালিকা **অরুন্ধতী দেবী** তরুণ মজুমদার ও অজিত মৈত্র তাঁদের মধ্যে রয়েছেন। প্রসঙ্গত সুসংবাদ এই, চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আলোচ্য বছরেই অরুন্ধতী দেবীর প্রথম আত্মপ্রকাশ। সেদিক থেকে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প লাভবান। অভিনেত্রী-পরিচালিকা **মঞ্জু দে** "অভিশপ্ত চম্বল" তৈরি করে দর্শকদের অবাক করে দিয়েছেন। অভিনেত্রী পরিচালিকার পক্ষে এই ধরনের চিত্রপ্রয়াস নিঃসন্দেহে সাধুবাদার্হ।

পরিচালক তরুণ মজুমদারের বালিকা

পলাতক-এর হিন্দী 'রাহ্‌গীর'-এর শুটিং কলকাতায় সম্পন্ন হয়—(উপরে) ইফতেকার ও শশিকলাকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার এবং (নিচে) বিশ্বজিৎ ও শশিকলা

ফটো—দেশ

"চিরদিনের" : উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী
ফটো—দেশ

বধূ এবং অরুন্ধতী দেবীর ছুটিতে যে-কয়জন নতুন শিল্পী অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিনী, রোমি চৌধুরী, দেবারতি সেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুগায়িকা গীতা দত্তর চলচ্চিত্রে অভিনয় এই বছরেই প্রথম। বধূবরণ ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। এই একই ছবিতে চিত্র পরিচালক অজয় বিশ্বাস ও রাখী বিশ্বাস প্রথম অভিনয়শিল্পীরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। এবং বহুদিন পর কমল দাশগুপ্ত এই ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন।

বাংলা ছবিতে **বৈজয়ন্তীমালার প্রথম** অভিনয় বছরের আর একটি বিশেষ ঘটনা। ছবিটির নাম হাটে বাজারে। তপন সিংহ এই ছবিতে গীতিকার ও সুরকারের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

সত্যজিৎ রায় যে একটি ক্রাইম ছবি (চিড়িয়াখানা) তৈরি করলেন এটাই একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ছবিতে নতুন শিল্পীদের মধ্যে সুবীরা রায়ের নাম করা যেতে পারে। চলচ্চিত্রে চিন্ময় রায়ের অভিনয়ও বোধ হয় এই প্রথম। চিড়িয়াখানাতেই বোধ হয় সত্যজিৎ রায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ গান লেখা ও সুর রচনার কাজ সম্পন্ন করলেন।

নতুন শিল্পী আর যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে সৌমেন চক্রবর্তী (উল্লেখযোগ্য অভিনয় অজানা শপথ ছবিতেই প্রথম) শিবানী বসু আরতি দেবী প্রভৃতি রয়েছেন। শিশু শিল্পী রমাপ্রসাদ বণিক ও কৃষ্ণকলি মণ্ডলের নামও নতুন শিল্পীদের তালিকায় রয়েছে।

চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অরুন্ধতী দেবী ছাড়া যাঁদের নাম নতুন পাওয়া গেল তাঁরা হলেন রবি বসু ও দুষ্মন্ত চৌধুরী (মিস প্রিয়ংবদা) এবং রূপক-গোষ্ঠী (খেয়া)।

জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের মধ্যে সুচিত্রা সেনকে একটি ছবিতে (গৃহদাহ) দেখা গেছে। সুপ্রিয়া চৌধুরী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অঞ্জনা ভৌমিক এঁরা প্রত্যেকেই দুটি ছবির নায়িকা। উত্তমকুমার পাঁচটি ছবির নায়ক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তিনটি ছবির প্রধান পুরুষ চরিত্রের শিল্পী। প্রদীপকুমার তিনটি বাংলা ছবিতে নায়ক অথবা বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী।

সর্বাধিক বাংলা ছবির সংগীত পরি-চালনার দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে অনিল বাগচী, গোপেন মল্লিক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সুধীন দাশগুপ্ত দুটি ছবির সুরকার। সংগীত পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন নাম সুবীর সেন ও আজাদ রহমান (মিস প্রিয়ংবদা)।

অন্যান্য বছরের মত আলোচ্য বছরেও ফটোগ্রাফি এবং শিল্প নির্দেশনার মান উন্নত। ফটোগ্রাফিতে বিমল মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দু রায়, দীনেন গুপ্ত, রামানন্দ সেনগুপ্ত, দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বংশীচন্দ্রগুপ্ত দুটি ছবির (চিড়িয়াখানা ও বালিকা বধূ) শিল্প নির্দেশনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই বছরে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ১৯৬৬ ও '৬৭ সালের একাধিক ছবি ও পুরস্কৃত। যথা ছুটি ও সুভাষচন্দ্র। সত্যজিৎ রায় "নায়ক"-এর চিত্রনাট্যের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। বংশীচন্দ্র গুপ্ত কৃত "গ্লিমপসেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল" (পশ্চিম-বঙ্গ সরকার প্রযোজিত) রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ-পদক লাভ করেছে।

মোট ২৪টি বাংলা ছবি ১৯৬৭ সনে মুক্তি পেয়েছে। তার মধ্যে একটি (পঞ্চ পাণ্ডবের বনবাস) ডাব করা। ছবিটি দক্ষিণ ভারতে তৈরি। বোম্বাইয়ে তৈরি হয়েছে দুষ্টু প্রজাপতি। ছবিগুলির নাম : দেবীতীর্থ কামরূপ কামাক্ষ্যা, ৮০-তে আসিও না, হঠাৎ দেখা, বধূবরণ, নায়িকা-সংবাদ, আন্তশপ্ত চম্বল, পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, জীবন মৃত্যু, ছুটি, গৃহদাহ, বালিকা বধূ, আকাশ ছোঁয়া, খেয়া, প্রস্তর স্বাক্ষর, মিস প্রিয়ংবদা, চিড়িয়াখানা, মহাশ্বেতা, দুষ্টু প্রজাপতি, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, হাটে বাজারে, অজানা শপথ, কেদার রাজা ও পাপ্পা।

এই চব্বিশটি ছবির মধ্যে দুটি পৌরাণিক, চারটি কৌতুক ধর্মী একটি গোয়েন্দা চিত্র এবং বাকিগুলি "সামাজিক" কাহিনী সম্বলিত। বাংলা ছবির সাহিত্যিক ঐতিহ্য এ বছরের ছবিগুলিতেও দেখা যায়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, বিমল কর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রায়, তরুণ ভাদুড়ি মহাশ্বেতা দেবী প্রভৃতির কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন ছবি তৈরি।

পরলোকে ভি এ পি আয়ার

বিশিষ্ট চলচ্চিত্রব্যবসায়ী শ্রী ভি এ পি আয়ার গত বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর, ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। চলচ্চিত্রব্যবসায়ে, চিত্র-পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি ১৯৩৯ সন থেকে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিবেশনে বহু বিখ্যাত বাংলা ছবি সম্পূর্ণ হয় ও মুক্তি পায়। এগুলির মধ্যে "'৪২", "ভুলি নাই", "জিঘাংসা", "গৃহপ্রবেশ" প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। পূর্বে শ্রীআয়ারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল কিনেমা এক্সচেঞ্জ। পরে তিনি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স গড়ে তোলেন এবং নিয়মিতভাবে হিন্দী চিত্র (বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতের) পরিবেশনের দায়িত্ব নেন। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সেবার সুযোগ তিনি কখনো উপেক্ষা করেননি। কলকাতার প্রতিভাবান কলা-কুশলী ও শিল্পীরা যাতে বাংলার বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন সে বিষয়ে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। নবাগত চিত্র-প্রযোজকদের সাহায্য করার কাজে তিনি বরাবর এগিয়ে আসতেন। পূর্বাঞ্চলে হেমন্তকুমারের হিন্দী চিত্রগুলির পরি-বেশনের দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন। তা ছাড়া এ-ভি-এম'এর ছবির পরিবেশক ছিলেন শ্রীআয়ার।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গেও শ্রীআয়ার জড়িত ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার

সবিতাব্রত দত্ত পুরস্কৃত

সংগীত নাটক আকাদমী এ বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার শ্রীসবিতাব্রত দত্তকে দিয়েছেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেতা হিসাবে শ্রীদত্ত বহুদিন যাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে "এণ্টনি কবিয়াল" নাটকে নাম-ভূমিকায় তাঁর অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। রূপকার-সংস্থা গঠনের পর শ্রীদত্ত বাংলার মঞ্চজগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে নেন। তাঁর পরিচালনায় রসরাজ অমৃতলালের "ব্যাপিকা বিদায়" নাট্য-প্রযোজনা প্রভূত মর্যাদা এবং ... পুরস্কার অর্জন করে। এই নাটকে শ্রী... অভিনয়ও উচ্চপ্রশংসিত হয়। সুগা... অভিনেতা হিসাবে বাংলা মঞ্চে শ্রীদ... স্থান অনেক উপরে। গান এবং ... এই দুইয়ের জন্যই তিনি নাট্যরসিকদের ... এত প্রিয়। কলকাতার নাট্যামোদীরা ... অভিনয়শক্তির প্রমাণ সর্বপ্রথম পেয়ে... "অচলায়তন" নাটকে। তখন ... শ্রীদত্ত অভিনয়চর্চা শুরু করেন। ... তিনি যুক্ত ছিলেন বহুরূপী সম্প্রদা... সঙ্গে। বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনা... "চার অধ্যায়" নাটকে অতীনের ভূমি... শ্রীদত্তর চরিত্রচিত্রণ আজও দর্শকরা ভু... পারেননি। শ্রীদত্তর অভিনয়শৈলী... বিকাশের মূলে শ্রীশম্ভু মিত্রের দানের ক... অস্বীকার করা যায় না। শ্রীদত্ত নি... বলেন, "শম্ভুবাবুর কাছেই আমার অভি... বিদ্যার হাতেখড়ি।"

"চারণকবি মুকুন্দদাস" ছবিতে সবিতাব্রত ...

ফটো—দে...

চলচ্চিত্রাভিনয়েও শ্রীদত্ত যথেষ্ট প্র... অর্জন করেছেন। অনেক ছবিতে ... চরিত্রাভিনয় দর্শকদের প্রশংসা পেয়ে... তাঁর অভিনীত "চারণকবির মুকুন্দদা..." অবিলম্বেই মুক্তি পাবে।

শ্রীদত্তের পুরস্কার লাভে বাংলা দে... নাট্যসেবী মাত্রই গর্বিত। তাঁর এই গৌ... সঙ্গত কারণেই অপেশাদার নাট্যজগ... পুলকিত হবেন। এই সম্মান ... শ্রীদত্তের নিজের এবং বাংলা নাট্যজগতে...

শিশু চলচ্চিত্র উৎসব

পয়লা জানুয়ারী থেকে ইনস্টিটিউট অব চিলড্রেনস ফিল্মের উদ্যোগে দুই সপ্তাহব্যাপী শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে ৭০টি দেশের প্রায় ৭০০ ছবি দেখানো হবে। এবারকার আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। সর্বোচ্চ পুরস্কার গ্রাঁ প্রি এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারের জন্য বহু দেশ থেকেই উৎকৃষ্ট চিত্র পাঠানো হয়েছে। পূর্বে ভারতে বিভিন্ন স্থানে ছবিগুলি দেখানো হবে।

গত রবিবার (৩১ ডিসেম্বর) রবীন্দ্র-সদনে উৎসবের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং শিক্ষামাধ্যম হিসাবে শিশু চলচ্চিত্রের প্রসারের কথা বলেন।

ইনস্টিটিউট অব চিলড্রেনস ফিল্মের সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক চিত্র উৎসবের সার্থকতা বর্ণনা করেন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীদিলীপ ভট্টাচার্য কার্য-বিবরণী পাঠ করেন।

বর্তমান উৎসবের বৈশিষ্ট্য এই, প্রতিযোগিতাভিত্তিক চিত্রপ্রদর্শন ছাড়াও চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত প্রদর্শনী, সমীক্ষা, গবেষণা এবং শিশুদের সাহিত্য ও নাট্যাভিনয় বিষয়ক আলোচনা ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উৎসব উদ্বোধনের পর তিনটি ছবি দেখানো হয়। হাঙ্গেরির 'দি বী', ভারতের 'ক্যানিয়ান ডিয়ার' এবং বুলগেরিয়ার 'দি ক্যাপটেন'।

নির্মল দে'র পরিচালনায় নির্মীয়মান শ্যাডো প্রোডাকশন্স-এর "সমান্তরাল" ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

মুক্ত অঙ্গনে থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাটক দেখতে আসেন প্রসপেক্ট প্রোডাকশন্স-এর শিল্পিবৃন্দ

থিয়েটার ওঅর্কশপের "ছায়ায় আলোয়"

সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গণে কলকাতার 'থিয়েটার ওঅর্কশপের' নবতম প্রযোজনা 'ছায়ায় আলোয়' নাটকটি দেখতে এসেছিলেন ভারত ভ্রমণরত কেম্ব্রিজের প্রসপেক্ট প্রোডাকশন্স-এর একজন পরিচালক ও কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী। এ'রা নাটকটির অংশবিশেষ দেখে মুগ্ধ হন। তাঁরা বিমল চক্রবর্তী-কৃত নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার প্রশংসা করেন। অভিনয় শেষে থিয়েটার ওঅর্কশপের সভ্যদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ওঁরা কলকাতার নাট্য-আন্দোলন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন।

মায়ার

শিক্ষায়তন তহবিলের সাহায্যার্থে 'দক্ষিণী' আগামী ২৬, ২৮ ও ২৯ জানুয়ারী নিউ এম্পায়ারে নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' মঞ্চস্থ করছেন। 'দক্ষিণী শিল্পিগোষ্ঠী'র 'মায়ার খেলা' পরিবেশন এই প্রথম। শ্রীশুভ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় দক্ষিণীর ত্রিশজনের অধিক শিল্পী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

✻

ইরানের একটি চিত্রপ্রযোজনা সংস্থা (ফিল্মকো অ্যান্ড ফিল্মস) চলচ্চিত্র-কাহিনীকার শচীন ভৌমিককে দুটি ছবির কাহিনী রচনার জন্য চুক্তিবন্ধ করেছেন। একটি ছবিতে ওই দেশের জনপ্রিয় স্টার এ ফারদিন অভিনয় করবেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন করিম। শচীন ভৌমিক এ ব্যাপারে অনতিবিলম্বে তেহরান রওনা হচ্ছেন।

ব্রিজিত বার্দো গাইতে পারেন এ-ধারণা কারো ছিল না। নতুন একটি ফরাসী টেলিভিশন চিত্রে তিনি পনেরটি গান গেয়েছেন।

ভারতের পরিকল্পনা পদ্ধতি পর্যালোচনার জন্য নিযুক্ত যোজনা প্রণয়ন প্রণালী পর্যবেক্ষক দলের সুপারিশ এই সপ্তাহের বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়। প্রশাসন সংস্কার কমিশন ১৯৬৬ সালে এই পর্যবেক্ষক দল নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা সম্প্রতি তাঁদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেছেন এবং তাতে বলেছেন যে, কয়েকটি মূল বিষয়ের পরিবর্তন করার জন্য আমরা যেসব সুপারিশ করেছি, যোজনা কমিশন ও সরকার তা ইতিপূর্বেই কার্যকর করতে শুরু করেছেন। পর্যবেক্ষক দল যোজনা প্রণয়ন প্রণালীর পরিবর্তনের সুপারিশ করতে গিয়ে কয়েকটি বিকল্প উপায় বাতলেছেন। তার মধ্যে একটি গুরুতর বিষয় হলো : প্রত্যেক পাঁচ বছরে একটি করে যোজনা প্রণয়নের সঙ্গে ১৫ বছরের মেয়াদী একটি যোজনাও প্রস্তুত করা উচিত। তাঁরা আরও বলেছেন, চলতি যোজনাকালের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন যোজনা প্রণয়ন করা দরকার। তা হলে চতুর্থ যোজনার সময় পেরিয়ে পঞ্চম যোজনার নির্দিষ্ট সময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ যোজনা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। পর্যবেক্ষক দল সরকারী শিল্প উদ্যোগ সংক্রান্ত কমিটির মত একটি সংসদীয় কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছেন। তা ছাড়া যোজনা প্রণয়ন কালে বেসরকারী উদ্যোগগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুপারিশও করেছেন।

দেশী সংবাদ

২৫ ডিসেম্বর—আট দিন নয়াদিল্লিতে কাটিয়ে শ্রীকামরাজ আজ মাদরাজে ফিরে গেলেন, কিন্তু এর মধ্যে একদিনও না প্রধানমন্ত্রী, না স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকারের কেউই তাঁর কাছে পশ্চিমবঙ্গের সংকট সম্পর্কে পরামর্শ চান নি। কংগ্রেস সভাপতির ধারণা, যে সাংবিধানিক জটে ব্যাপারটা জড়িয়ে গেছে, সেটা খোলার কোন রাস্তা কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত ভেবে বের করতে পারে নি।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীরাজনারায়ণ আজ এলাহাবাদে বলেন যে, 'কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যে জবরদস্তির শাসন চালাচ্ছেন, জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হতে পারে।' এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, কংগ্রেস জনপ্রিয় আন্দোলন দমনের জন্য গুলি ও লাঠি চালিয়ে দেশে হিংসার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পুলিসী নির্যাতনের অভিযোগ করেন।

২৬ ডিসেম্বর—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন আজ প্রাক্তন রাজন্যবর্গের ১০ জন সদস্যের স্টিয়ারিং কমিটিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের ভাতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিল করা সম্পর্কিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবটি সরকার কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৯৪৫ সনে তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয় বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, সে সম্বন্ধে নূতন তদন্ত দাবি করে পার্লামেন্টের প্রায় ৩৫০ জন সদস্য রাষ্ট্রপতির নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেন।

২৭ ডিসেম্বর—আগামী ২৮ জানুয়ারী থেকে যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগে আইন অমান্য আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। আজ রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি এবং শিক্ষক ও কৃষক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর ফ্রন্টের এক মুখপাত্র একথা জানান।

চালকল মালিকরা তাঁদের উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ লেভী হিসাবে সরকারকে দিতে ইচ্ছুক নন। তাঁদের দাবি—উৎপাদনের অর্ধেক খোলা বাজারে বিক্রয়ের সুবিধা মিল-মালিকদের দেওয়া হোক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ চালকল মালিক সমিতির এই প্রস্তাবে রাজি হন না।

২৮ ডিসেম্বর—আজ দিন দুপুরে বেলেঘাটা এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডে মা ও মেয়ে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হন। মা শ্রীমতী সাধনা রুদ্র (২৭) এবং মেয়ে রাধারানী রুদ্র (৩)। এদিন দুপুরে দেড়টা থেকে আড়াইটার মধ্যে কোন এক সময় তাঁরা সি-আই-টি রোডে নিজেদের ফ্ল্যাটেই খুন হন।

ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব দখলের জন্য উগ্র মারকসবাদীদের চেষ্টা লক্ষ করে কংগ্রেস ও বিদ্রোহী কংগ্রেস মহল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অভিযোগ, উগ্র মারকসবাদীরা কোন কোন এলাকায় অস্ত্র সংগ্রহ করছে এবং হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবীকে সামরিক ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন, উগ্র কমিউনিসটরা স্বাধীন কেরল সৃষ্টির মতলবে আছে।

২৯ ডিসেম্বর—সম্প্রতি সংসদে গৃহীত সরকারী ভাষা (সংশোধন) বিলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারত ও অন্যান্য অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ যে চাপ দিচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার ভাষার প্রশ্নটি আবার নতুন করে আলোচনার জন্য তুলতে পারেন। কেবল দক্ষিণ ভারত নয়, উত্তর ভারতেও সর্বত্র বিলটির সমর্থন পাওয়া যায়নি। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, এতে করে দেশের সংহতি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

৩০ ডিসেম্বর—পাঁচ বছরের জরুরী অবস্থার শীঘ্রই প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে ভারত সরকার এমন এক ব্যবস্থা নিতে চলেছেন, যাতে ভারতরক্ষা আইনের অনেক ক্ষমতাই থাকবে। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পরও ভারতরক্ষা আইন ও বিধি আরও ছ' মাস চলবে।

শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন আজ পশ্চিমবঙ্গের 'গণতন্ত্র সংরক্ষণ সম্মেলনে' এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যেভাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল করেছেন, সে ক্ষমতা সংবিধান তাঁকে কোথাও দেয়নি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যপাল এই পরিস্থিতিতে তাড়াতাড়ি করে ঘোষকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান জানিয়ে "গণতন্ত্রের অবরোধ" করেছেন।

৩১ ডিসেম্বর—বাংলা দেশে বিধাননগর (কল্যাণী)-তে প্রথম অনুষ্ঠিত জাম্বোরির সমাপ্তি দিনের অনুষ্ঠান ধাক্কাধাক্কি গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আজ পণ্ড হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি তারই মধ্যে একটি স্কাউট দলকে সারটিফিকেট এবং একজনকে সিলভার 'এলিফ্যান্ট'-এর প্রতীক দেওয়ার পর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বেলা তিনটার সময়ই জাম্বোরির সমাপ্তি ঘোষণা করে চলে যেতে বাধ্য হন।

বিদেশী সংবাদ

২৫ ডিসেম্বর—পাকিস্তানী কৃষি বিশেষজ্ঞগণ চীনের কৃষি পদ্ধতি পর্যালোচনা করে ফিরে এসেছেন। সরকার তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এদেশেও চীনা কমিউন পদ্ধতি প্রবর্তনে আশান্বিত। সরকার এজন্য প্রধান প্রধান জনবসতির চারধারে কতকগুলি খামার স্থাপন করতে পারেন। এক একটি খামার এক এক ধরনের ফসল ফলাবে।

২৬ ডিসেম্বর—গতকাল রাত্রে মসকোতে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে অন্ততপক্ষে ২০ জন লোক নিহত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই বিস্ফোরণের ফলে একটি নতুন ছয়তলা ফ্ল্যাটের একটি ব্লক ধ্বংস হয়ে যায়। গ্যাসের পাইপ ফেটে গ্যাস নির্গত হওয়ার ফলে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বে-সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হচ্ছে যে, ২০০ লোক ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে থাকতে পারে।

২৭ ডিসেম্বর—দক্ষিণ ভিয়েতনামের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ ত্রান ভান গত রাত্রে প্যারিসে বলেন যে, ভিয়েতনামীরা নিজেরাই ভিয়েতনাম সমস্যার মীমাংসা করবেন এবং তাঁর সরকার প্রত্যক্ষভাবে হ্যানয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চান।

২৮ ডিসেম্বর—সুয়েজ খালে আটক পনেরোখানা মালবাহী জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হবে; নৌ চলাচলের জন্য সুয়েজের পথ বন্ধ থাকবে। এ খবর জানিয়েছেন কায়রোর অর্ধ-সরকারী মুখপাত্র 'আল আহরাম'। গত জুনে মধ্যপ্রাচ্যের লড়াই থেকে সুয়েজ খাল বন্ধ রয়েছে।

২৯ ডিসেম্বর—'মর্নিং হেরাল্ড'-এর এক খবর প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়ার গম পর্ষদের একজন মুখপাত্র আজ বলেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে ১ লক্ষ টন গম বোঝাই করার জন্য ভারত জাহাজের খোঁজ করছে বলে যে খবর শোনা যাচ্ছে—তা তিনি স্বীকার বা অস্বীকার—কোনটাই করতে পারেন না। কেননা ভারত এখনও পর্ষদের কাছে গম কেনার প্রস্তাব দেয়নি।

৩০ ডিসেম্বর—কাশ্মীরী জনসাধারণের উপর ভারত "আবার অত্যাচার-নির্যাতন অভিযান শুরু করেছে"—এই অভিযোগ করে নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান আর একটি দীর্ঘ পত্র পাঠিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে পাক প্রতিনিধি শ্রীআগা শাহী অভিযোগ করেছেন, ভারত অতিরিক্ত দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। পরিণাম গুরুতর!"

৩১ ডিসেম্বর—উত্তর ভিয়েতনাম গত রাত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সরকারীভাবে জানিয়েছেন বোমাবর্ষণ এবং যুদ্ধের অন্যান্য কাজ নিঃশর্তভাবে বন্ধ না হলে উত্তর ভিয়েতনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠকে বসবে না।

সূচীপত্র

ভাল উপন্যাসের আকর্ষণী শক্তি অস্বীকার করা যায় না। ঘন্টার পর ঘন্টা কোথা দিয়ে কেটে যায়, তা বুঝতেই পারা যায় না।
তারা ভরা রাত
তিন টাকা
অবাক পৃথিবী
তিন টাকা
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত
ছিনিমিনি
তিন টাকা
নেপথ্য
দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
সে ডাকে আমায়
তিন টাকা
যেও না চলে
তিন টাকা
ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত
নবীন মাস্টার
তিন টাকা
অথ বিবাহ ঘটিত-৩.০০
তিন অঙ্ক-৩.০০
আরও অনেক বই
বিস্তৃত তালিকার জন্য চিঠি লিখুন
দেব সাহিত্য কুটীর ● ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

সুপার স্প্রিন্ট ৩·২৫
Bata
হকি ৮·২৫
গতিশক্তি সঞ্চারক
দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম আরাম
অভিপ্রায়ে বাটার খেলার জুতোর বৈশিষ্ট্য
দেখুন। কুশন আর্চ আর ইনসোল
আঘাত থেকে রক্ষা করে।
ক্যাম্বিসের আপার—ক্ষয়শীল
টেকসই বন্ধনী। ভারী রবারের
টোগার্ড। আপার আর জুতোর তলির
অভেদ্য বন্ধন। ঢালাই সোল আর
হিল এমন কৌশলে তৈরি যা
পারতপক্ষে হড়কাবে না। সব
মিলিয়ে, আশ্চর্য সমন্বয় সমাবেশ।

প্রচ্ছদ : শ্রীবাদল ভট্টাচার্য

সদ্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত

"তপস্বী ও তরঙ্গিণী" একটি চার অঙ্কের দৃশ্যকাব্য। এক অপাপবিদ্ধ তরুণ ঋষিকুমার এবং স্বর্ণপ্রতিমা পরম কলাবতী এক বারাঙ্গনার পুরাণোক্ত একটি প্রণয়-কাহিনীকে স্বনামধন্য কবি বুদ্ধদেব বসু এ নাটকে এক অসামান্য শিল্পরূপ দান করেছেন: সঞ্চার করেছেন এতে আধুনিক মানুষের মানসতা ও অন্তর্বেদনা। এ নাটকের চরিত্রেরা যেন পুরাকালের হয়েও, সমকালের—সর্বকালের।

লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ, দুটি নরনারী, কেমন করে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল—নাটকটির মূল

বুদ্ধদেব বসুর

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

বিষয় হল এই। এক পরম মুহূর্তে একই সঙ্গে জেগে উঠেছিল বহুবল্লভা নায়িকার হৃদয় এবং তপস্বী নায়কের ইন্দ্রিয়লালসা: একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হয়েছিল পতন আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করেছিল রোমান্টিক প্রেম। তারপর বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কেমন করে ঘটেছিল নায়ক-নায়িকার উদ্বর্তন, কেমন করে তাদের উপলব্ধ হয়েছিল কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা, এ নাটকে এ যুগের অগ্রণী কবি তা-ই শিল্পিত করেছেন। ১৯৬৭ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ হিসাবে এ বইটি সদ্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছে॥ দাম ৩·০০

● বুদ্ধদেব বসুর আরও দু'খানি বই ●

পাতাল থেকে আলাপ
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

তুমি কেমন আছো
সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ৬·০০

॥ প্রকাশিত হল ॥

নকুল মুখোপাধ্যায়ের
দেশগঠনের উদ্দীপক উপন্যাস

দেবতার পাহাড় ৩.০০

"প্রজাপতি"র নায়ক সুখেন্দু আমাদের সকলেরই পরিচিত; আমরা সবাই তাকে হরদম দেখছি গলির মোড়ে, পাড়ার রকে। পরনে ড্রেন-পাইপ প্যাণ্ট, পায়ে ছুঁচলো শু। সামনে আমরা তাকে 'বাবু' বলি, সমীহ করি (ভয়ে)—আত্মীয়তা দেখাই, ঘনিষ্ঠ হওয়ার ভান করি (কাজ উদ্ধারের ফিকিরে); পিছনে 'গুন্ডা' বলি, ঘৃণা করি। রাজনৈতিক দলগুলো তাকে দলে টানার জন্যে কাড়াকাড়ি করে; পেলে লিডার বানায়; না পেলে, বা অন্য দল তাকে টেনে নিলে, 'সমাজবিরোধী' আখ্যা দিয়ে তাকে পুলিসে গ্রেফতার করাবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। অথচ, সে আমাদেরই—হয়তো আমারই, কিংবা আপনার—ছেলে বা ভাই, ভাগনে বা ভাইপো। তাকে নিয়ে আমরা সকলেই বিব্রত, উদ্বিগ্ন এবং বিভ্রান্ত।

সমরেশ বসুর "বিবর" পর্বের তৃতীয় উপন্যাস "প্রজাপতি"র নায়ক সুখেন্দুর জন্যেও সকলেই চিন্তিত, বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত। পাঠক, সমালোচক এমন কি হয়তো লেখকও। কিন্তু সুখেন্দুর জন্যে দায়ী কে?—সুখেন্দুর রচয়িতা? সুখেন্দু নিজে? নাকি সুখেন্দুদের স্রষ্টা? রোগ নির্ণয় করে এক্স-রে প্লেট হাজির হলে আপনি কাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন?—এক্স-রে প্লেটকে? ডাক্তারকে? রোগীকে? নাকি, আর কাউকে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে পাঠক সমালোচক এদের সকলের মত লেখকও ব্যগ্র।

● সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ●

সমরেশ বসুর

'বিবর' পর্বের তৃতীয় উপন্যাস

প্রজাপতি

দাম ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ অফিসঃ ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্রঃ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৬৪

[illegible]

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১১
শনিবার, ২৮ পৌষ ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষান্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭ ০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষান্মাসিক „	২৩.০০
ত্রৈমাসিক „	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষান্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
আসামে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৩ পয়সা

DESH

Saturday 13 Jan. 1968

শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির রাহু

আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থাটা ঠিক যে কেমন তা বুঝিয়ে বলা বেজায় মুশকিল। কোনো কোনো সময়ে এটাকে বদ্ধ জলাশয়ের মতন বলা হয়েছে, বলা হয়েছে যে, এই জলাশয় এখন দূষিত। আবার কেউ কেউ মনে করেন, নানা আবর্জনায় পূর্ণ হলেও এখনও শিক্ষার ধারাটি প্রায় মজানদীর শীর্ণ একটি ধারার মতন বয়ে চলেছে, সময় মতন তৎপর হলে এই ধারাটি আবার সজীব করা সম্ভব। নৈরাশ্যে আমাদের রুচি নেই, তাই মনে করি শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা যাই হোক তার সংস্কার সম্ভব।

শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা ও তার হালচালের খবর যারা রাখেন তাঁরা প্রায় সকলেই একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, রাজনীতি আমাদের ছাত্র সমাজের অনেকখানি ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে। শুধু বাংলাদেশ বলে নয়, ভারতের সব জায়গায় ছাত্রসম্প্রদায় দেশের রাজনীতির একটা বড় ও সক্রিয় শরিক হয়ে উঠেছে। এটা যুবশক্তির পক্ষে কতটা ক্ষতিকর সে প্রশ্ন বিবেচ্য। দেখা গেছে, রাজনীতির অনেক নিন্দনীয় ব্যাপার ছাত্রদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। আর এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, বিচার-বুদ্ধি ভাল-মন্দ সম্পর্কে সম্যক অবহিত না হয়েই রাজনৈতিক গুরুদের কথামতন ছাত্র সম্প্রদায় কখনও 'আংরেজী হটাও' আন্দোলন করে, কখনও বা আরও কিছু।

ছাত্র সমাজ দেশের রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করবে না, সুবোধ বালক সেজে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে যাবে আর ভারী ভারী কেতাবের পাতা ওলটাবে—এমন কথা আমরা বলি না। আজকের সমাজে সেটা সম্ভবও নয়। কিন্তু যে বয়সটায় চোখ মন খোলা রেখে তাকে সব দেখতে ও চিনতে শিখতে হবে সেই বয়সে যদি তারা রাজনীতির শিকার হয়ে পড়ে তবে তাদের পক্ষে আর কিছু করার উপায় থাকে না। একদেশদর্শিতা তার মনকে নষ্ট করে।

ছাত্রদের মধ্যে এই যে রাজনীতির একটা কলুষিত আবহাওয়া তৈরি হয়েছে এর জন্যে ছাত্র সম্প্রদায়কে আমরা তেমন দোষ দিই না; দোষ দি রাজনৈতিক দল ও তার নেতাদের। সম্প্রতি মাদুরাই-তে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবেই নয় একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ হিসাবেও আমরা তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিতে পারি। রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন বলেছেন যে, আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সামনে বহু সমস্যা, এই সমস্যা বাস্তব এবং এও ঠিক যে, আমাদের সম্পদের অভাব আছে। কিন্তু সমস্যা ও সম্পদের অভাব সত্ত্বেও যা আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে না, কারণ শিক্ষাক্ষেত্রের পরিবেশ সুস্থ থাকছে না, শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি স্পষ্টই বলেছেন, রাজনীতিকদের উচিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শান্তিতে কাজ করতে দেওয়া; নিজেদের সংকীর্ণ ও সম্প্রদায়বাদী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অসন্তোষ সৃষ্টি না করা। বস্তুত রাজনীতিকদের উচিত জাতীয় স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হয়ে এবং বৃহত্তর মঙ্গলের কথা ভেবে শিক্ষার কাজ যাতে স্বচ্ছন্দে চলে তার জন্যে সাহায্য করা।

রাষ্ট্রপতির আবেদনের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির মনোযোগ আকর্ষণ হবে কিনা জানি না, বোধ করি হবে না। অথচ এ-সত্য উপেক্ষা করা যাবে না যে, শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে আজ যে উচ্ছৃংখলতা ও দায়িত্বহীনতার জোয়ার জেগেছে তার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলিই মুখ্যত দায়ি। দুঃখের হলেও একথা বলতে হবে, দেশের যাবতীয় শিক্ষাকেন্দ্রকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্র করে তুলেছেন। আর ছাত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই প্ররোচনায় প্রলোভিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় সম্পদ এত বেশি নয়, এবং আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্র এত উন্নতও নয় যে, রাজনীতির নামে তার কিছুটা নষ্ট হলেও মূলে ক্ষতি হবে না। বরং ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, স্বল্প সুযোগ ও অতি সীমিত সম্পদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে পূর্ণ সুযোগ নিতে হলে আমাদের উচিত শিক্ষাক্ষেত্রকে যথাসাধ্য সকল অশান্তি থেকে দূরে রাখা। আশা করি রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় ভবিষ্যতের কথা একবার অন্তত স্থির মনে বিবেচনা করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তাঁর নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করার পর দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস সংগঠনকে একটা নূতন পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। এই মোড় ফেরাবার চেষ্টা আগেও যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টার মধ্যে কতটা আন্তরিকতা ছিল, কতটা প্রেরণা ছিল, বলা সহজ ছিল না। হয়ত সে কারণে এইসব প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কোন উৎসাহ দেখা দেবার সুযোগ পায়নি। যে প্রচেষ্টার মধ্যে সন্দেহ এবং জিজ্ঞাসা প্রশ্রয় পায়, সে চেষ্টা বেশী দূর এগোবার সুযোগ পায় না।

এমন নজির খুঁজতে খুব বেশী দূরে যেতে হবে না। এই সেদিনের কথা। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস মহলের আনাচেকানাচে শুধু গুঞ্জন উঠতে দেখা গিয়েছিল। নূতন নেতৃত্ব চাই, নূতন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস সেবক চাই, আনকোরা টাটকা যুবকদের কংগ্রেস সম্বন্ধে সচেতন করা চাই। তাই কোন কোন মহলে জল্পনা ও পরিকল্পনার অন্ত ছিল না। এই জল্পনা ও পরিকল্পনার মধ্যে যেটা বারবার উচ্চারিত হয়েছিল তা হ'ল নেতৃত্ব বদলের কথা। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসকে মোড়-ফেরাবার জন্য তাই গড়ে উঠল জোট— যে জোটের প্রধান লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়াল সংগঠন নয়, রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল। তাই প্রস্তাবিত হ'ল অ্যাড হক কংগ্রেস গঠন করা, শ্রীগুলজারীলাল নন্দকে সামনে রেখে। তাই প্রয়োজন হ'ল, শ্রীঅজয় মুখার্জিকে। তারপরের ঘটনা আজ আর কারো অজানা নেই। দেখা গেল, যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল কংগ্রেস সংগঠনকে নূতন পথে নিয়ে যাবার জন্য, সে প্রচেষ্টা ক্ষমতা দখলের ব্যর্থতায় নিঃশেষ হ'য়ে গেল।

তাই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠল। রাজনৈতিক মহলে ক্ষমতা দখলের লড়াইটাই বড় হয়ে দেখা দিল। একটা ধারণা নিশ্চয়ই বদ্ধমূল হ'য়ে গেল যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বের সংগে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে গোষ্ঠীর বা জোটের কব্জায় নিয়ে আসা এক হ'য়ে মিশে গেল। হয়ত এ কারণেই, কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিকে নূতন পথে নিয়ে যাবার কথা উঠলেই বাইরে কোন উৎসাহ সঞ্চারিত হ'তে দেখা যায় না। বরং সন্দেহটাই দেখা দেয় বেশী। ক্ষমতা দখলের প্রলোভনটা বড় হ'য়ে দেখা দেয়। উদ্দেশ্যটাকে বাঁকা চোখে দেখতে অভ্যস্ত হ'য়ে যায়।

এ কথাটা ওঠে মূলগত প্রশ্নে। মূল প্রশ্নটা কংগ্রেসের সংগঠন সম্বন্ধে। প্রশ্ন এই যে, কেন আজ প্রয়োজন হয়েছে কংগ্রেসের মোড় ঘুরিয়ে দেবার? কেন

> ### সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
>
> **সুভাষচন্দ্রের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীনেপাল মজুমদার কর্তৃক লিখিত সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রসংগে তিনটি প্রবন্ধ আগামী সপ্তাহ থেকে দেশ পত্রিকায় তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হবে। বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য ও চিঠিপত্র সম্বলিত এই প্রবন্ধাবলী সমসাময়িক ঘটনা ও রাজনৈতিক পটভূমিতে একজন দেশনায়ক ও অপরজন বিশ্বকবির আত্মিক সম্পর্কের এক সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক দলিল।**

বারবার বলা হচ্ছে, কংগ্রেস সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা দরকার? এ প্রশ্নগুলো ওঠে এই কারণে যে, পরিবর্তনের মূল লক্ষ্যস্থল কি তা পরিষ্কারভাবে জনসাধারণের বা কংগ্রেস কর্মীদের সামনে রাখা হয় না। সব প্রশ্নটাকেই রাখা হয় গত চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে। নির্বাচনে জয়লাভ বা সাফল্যলাভ না করার সংগে সংগঠনের রাজনৈতিক চেহারাকে পৃথক ক'রে দেখা হয় না বলেই কথাটা ওঠে। হয়ত সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। কারণ, নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বা কর্মপন্থা যেমন নির্বাচকদের সামনে রাখা হয়, তেমনি সামনে রাখা হয় ক্ষমতাসীন দলের সাফল্য ও ব্যর্থতা।

গত ১৯ বছর ধরে কংগ্রেস ক্ষমতায় থেকে যে কর্মপন্থাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিল, সেই প্রচেষ্টার রাজনৈতিক ব্যর্থতা কোথায়, সেটাই বড় কথা। সেই ব্যর্থতার পিছনে নেতৃত্বের দায়িত্ব যদি থেকে থাকে সেটা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু মূল কথা সংগঠনের রাজনৈতিক শক্তি।

যে-কোন কারণেই হোক, এই রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল বলেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দলগত ব্যর্থতার গ্লানিকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে। অথবা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দলগত নৈপুণ্য ছিল না ব'লেই সাংগঠনিক দুর্বলতা আরও দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল। যেদিক থেকে বিচার ক'রে দেখা যাক না কেন, দেখা যাবে, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দুর্বলতা বা শৈথিল্যের চাপটা সম্পূর্ণরূপে বহন করতে হয়েছে রাজ্য কংগ্রেসগুলোকে এবং বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসকে। কারণ, এই পশ্চিম বাংলায় যে রাজনৈতিক জটিলতা দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সচেতনতা তেমন কোন আগ্রহ নিয়ে প্রকাশ পায়নি। এরই ফলে পশ্চিম বাংলায় যখন কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে তাদের সংগঠনকে প্রসারিত করছিল, জোরদার করছিল, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সে সময় কোন বিশেষ প্রচেষ্টার কথা চিন্তা করেননি।

আজ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্টে পশ্চিম বাংলায় ছাত্র পরিষদের কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পশ্চিম বাংলার ছাত্রদের মধ্যে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য ছাত্র পরিষদ সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করেছে। কিন্তু এই ছাত্র পরিষদ সম্বন্ধে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা জানেন, ছাত্র পরিষদের রাজনৈতিক কর্মপন্থা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, ছাত্র পরিষদের সংগঠনকে জোরদার করার জন্য কোন উদ্যম বা উৎসাহ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছ থেকে এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমন কি, ছাত্র পরিষদের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পশ্চিম বাংলার ছাত্র মহলে থাকতে পারে, তা-ও যে কংগ্রেস নেতৃত্ব কখন স্বীকার করেছেন বা করেন তা জানা যায়নি। ফলে, যতবার কম্যুনিস্ট-প্রভাবিত ছাত্র সংগঠনগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রেসিডেন্সী কলেজের আঙিনায় তাদের নিছক দলগত রাজনৈতিক মতলবকে হাসিল করার প্রচেষ্টা করেছে, ছাত্র পরিষদকে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। সক্রিয়ভাবে বাধা দেবার চেষ্টা যে ছাত্র পরিষদ কখনও করেনি তা নয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টার পিছনে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোন উৎসাহ বা ঔৎসুক্যও ছিল বলে মনে হয়নি। যারা কম্যুনিস্ট সংগঠনকে রাজনৈতিক স্তরে বাধা দেবার চেষ্টা করে বারবার নিরুৎসাহিত হয়েছে তাদের সক্রিয় সমর্থন দেবার মতও কোন কথা শোনা যায়নি কেন্দ্রীয় মহল থেকে। তা ছাড়া, পশ্চিম বাংলার ছাত্ররাই একমাত্র ছাত্র নয়। পশ্চিম বাংলার বাইরেও

আছে অগণিত ছাত্রদল, উপদল। কংগ্রেসের কোন ভূমিকা সে-সব রাজ্যে আছে বলে আপাতত মনে হবার কোনও কারণ নেই; এমন কি, কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্টেও তার উল্লেখ নেই।

এর পর আসা যাক শ্রমিক মহলে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে শ্রমিক মহলের কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে করার আপাতত কোন কারণ নেই। জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্টটাই ধরা যাক। এ রিপোর্ট নিছক সাংগঠনিক রিপোর্ট নয়, বা মিটিং-এর ধারাবিবরণীও নয়। এই রিপোর্টের গুরুত্ব এখানেই যে, এতে কংগ্রেসের সাংগঠনিক চরিত্রকে সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এটা আয়নার মত, যাতে কংগ্রেসের মুখ দেখা যায়। এই আয়নায় মুখটা দেখলে মনে হবে, শ্রমিক মহলে কংগ্রেসের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্টে কোথাও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে আলোচিত হয়নি। অথচ পশ্চিম বাংলার মত একটি সমস্যাসংকুল রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিক জীবনের বড় অংশ জুড়ে আছে।

নীতিগত বুলি হিসাবে শুনতে ভাল লাগবে যে, শ্রমিক বা ছাত্র আন্দোলনকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখ। রাজনৈতিক দেওয়ালে কোণঠাসা হয়ে পড়লে এই কথাটা বারবার শুনতে হয় কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছ থেকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলার জীবনে যত রাজনৈতিক দুর্যোগ এসেছে তার অধিকাংশই নির্ভর করেছে ছাত্র ও শ্রমিক মহলের উপর। শুধু তাই নয়, আজ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অ-কংগ্রেসী দলের রাজনৈতিক চেহারটা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাদের শক্তির মূল উৎসস্থল শ্রমিক মহল, ছাত্র মহল। এটা অজানা ছিল না বলেই, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব আই-এন-টি-ইউ-সিকে ভিন্ন সংগঠন হিসাবে পরোক্ষ সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। হয়ত কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে এমন একটা ধারণা ছিল যে, শ্রমিক মহলের সংগঠনকে তফাত রেখে সমর্থন জানান ছাড়া আর কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কংগ্রেসের থাকা উচিত নয়। এই ধারণার সুযোগ নিয়েই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল এই পশ্চিম বাংলায় ঠিক নির্বাচনের আগে।

বর্তমানে শ্রীকালী মুখার্জি কংগ্রেসের আওতার বাইরে এবং তিনি এখন ভারতীয় ক্রান্তি দলের একজন অতি উৎসাহী নেতা। এখন তাঁর সম্পর্কটা কংগ্রেসের সঙ্গে খুব তিক্ত না হলেও নিবিড় নয়। হয়ত রাজনৈতিক কারণে এবং কম্যুনিস্ট সংগঠনের বিরোধী ভূমিকা আছে বলেই, আই-এন-টি-ইউ-সির পশ্চিম বাংলা শাখার নেতা হিসাবে শ্রীকালী মুখার্জিকে কংগ্রেস বা কংগ্রেস-সমর্থিত প্রগ্রেসিভ ডেমক্র্যাটিক দলের সঙ্গে অনেকটা সমঝোতা করে চলতে হয়। কিন্তু নির্বাচনের আগে তাঁর কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কটা খুব আন্তরিক ছিল না। তিনিই আই-এন-টি-ইউ-সির কার্যনির্বাহক সমিতির কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে, শ্রমিক মহলের এই সংগঠনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবে না। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসাবে পরিচিত হ'লে আই-এন-টি-ইউ-সির পক্ষে কম্যুনিস্ট-বিরোধী সংগঠন হিসাবে শ্রমিক মহলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। তাঁর এই প্রস্তাব, আই-এন-টি-ইউ-সির কার্যনির্বাহক সমিতিতে গৃহীত হয়নি; কারণ, তাঁর যুক্তিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, বিশেষ ক'রে যে ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর একান্ত সংগঠন হিসাবে বি-পি-টি-ইউ-সি পশ্চিম বাংলায় প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস-বিরোধী ভূমিকায় কাজ করে চলেছে। কিন্তু শ্রীকালী মুখার্জি তাঁর মত বা উদ্দেশ্য কোনটাই পরিবর্তন করেননি; কারণ, ঠিক যে সময় এই ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন সে-সময় শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কটা তীব্র বিরোধিতার মধ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। শ্রীকালী মুখার্জির সঙ্গে শ্রীঅজয় মুখার্জির তখনকার সম্পর্কটাতে কোন ফাঁক ছিল না।

তাই শ্রীকালী মুখার্জি এবং ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু তাঁদের কংগ্রেস-বিরোধিতাকে টেনে আনলেন আই-এন-টি-ইউ-সির পশ্চিম বাংলা শাখার মধ্যে। শুধু তাই নয়, এই শ্রমিক সংগঠনকে নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কংগ্রেস-বিরোধী ভূমিকায় নিবিড়ভাবে জুড়ে দেওয়া হ'ল। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সংগঠনের পক্ষ থেকে এবং বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী ও নেতা যাঁরা আই-এন-টি-ইউ-সির নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁরা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে লিখিত আবেদন জানালেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব সে আবেদনে কোন সাড়া দেননি। ফলে পশ্চিম বাংলার আই-এন-টি-ইউ-সির শ্রমিক সংগঠন বহুধারায় বিভক্ত হ'য়ে গেল। শুধু আই-এন-টি-ইউ-সির শ্রমিক আন্দোলন ব্যাহত হল না, কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন বলে কিছু আর পশ্চিম বাংলায় থাকবার সুযোগ পেল না।

অথচ সুযোগ ছিল এবং এখনও আছে। কারণ, এটা আজ আর অজানা নেই, যুক্তফ্রন্ট গঠনের মধ্যে যে রাজনৈতিক ঐক্য বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা হয়েছে, ঠিক ততটা অনৈক্য তীব্রতর হ'য়ে উঠেছে এইসব দলগুলোর মধ্যে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। তাই দেখা গিয়েছে, আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চলে তীব্র শ্রমিক সংগঠনের বিরোধ এবং রাজনৈতিক হত্যা। দেখা গিয়েছে, কলকাতার শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ ও অসন্তোষ। মার্কসিস্ট কম্যুনিস্টদের পাল্টা গঠিত হয়েছে নক্সালবাড়ী মার্কা শ্রমিক সংগঠন। কিংবা ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির ছাপ দেওয়া শ্রমিক আন্দোলন। মিল ছিল না কোথাও। মিল হবার লক্ষণ আজও নেই কোথাও। তবু কম্যুনিস্ট-বিরোধী কোন ভূমিকা নিয়ে কংগ্রেসের আওতায় কোন ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা শ্রমিক মহলে কাজ করেন সত্য; কিন্তু নীতিগতভাবে কংগ্রেসের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায় দায়িত্ব স্বীকৃত হয়নি কোথাও। হয়ত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব অথবা জেনারেল সেক্রেটারী আই-এন-টি-ইউ-সির দিকে হাত দেখিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করবেন; কিন্তু তাতে বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়া হবে না।

তাই আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের নূতন সভাপতি ডাঃ চন্দ্র যখন আবার কংগ্রেস সংগঠনের মোড় ফেরাবার কথা চিন্তা করছেন তখন তাঁর সামনে উদ্দেশ্যটিকে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। নিরুদ্দিষ্ট প্রচেষ্টার মধ্যে কোন সার্থকতা বা সাফল্য নেই, এ কথাটা স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এমন কি, এটাও পরিষ্কার হ'য়ে যাওয়া প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রশাসনিক প্রলোভনের মধ্যে মিশিয়ে ফেলার পরিণতি ব্যর্থতা। এটাও ডঃ চন্দ্রের সামনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রমিক, ছাত্র ও যুবকের বাইরে আরও একটা বিরাট মহল আছে যেখানে রাজনৈতিক সংগঠন কখনও দানা বেঁধে ওঠেনি। সেটা কৃষক মহল। বেশ কিছুদিন ধ'রে কম্যুনিস্ট পার্টি দুটো এই কৃষক মহল সম্বন্ধে বেশ সচেতন হ'য়ে উঠেছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থাকার সময়ই এই কথাটা দুটো কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে আলোচিত হয়েছে। তারই প্রত্যক্ষ পরিণতি হিসাবে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সর্বভারতীয় কিষাণ সভার মধ্যে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থকদের অধিবেশন। এই অধিবেশনে এটাই পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে যে, কম্যুনিস্টদের মধ্যে কৃষক সংগঠন সম্বন্ধে অতীত ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আজ দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলায়ও এর ঢেউ লেগেছে প্রচণ্ডভাবে। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার আর তাঁরই কৃষক সংগঠনের সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। শুধু এঁরাই নয়, ছোট খাট দলগুলো, এমন কি নক্সালবাড়ী মার্কা কম্যুনিস্টরাও আজ কৃষক সংগঠন সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠেছে। এই সচেতনতা কংগ্রেসের মধ্যে এখনও দেখা যায়নি। ডাঃ চন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেস সংগঠন সেদিকে মোড় নেবে কিনা সেটাই বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কদম-কদম, কদম-কদম

তারাপদ রায়

[এক]

আমি এখন হাতী আঁকছি ছেলের জন্যে
আর আঁকছি, ইঁদুর আঁকছি, ঘোড়া,
হাতীর মতন দেখতে ইঁদুর, ঘোড়ার মতন আমি।
এখন আমি কদম-কদম বিছানা জুড়ে
আড়াই গজ ছুটে যাচ্ছি, ফিরে আসছি,
এখন আমি ছেলের জন্যে ঘোড়ার মতন আমি।

[দুই]

কবে যে আমি ঘোড়া ছিলাম
আবার আমি ঘোড়া হলাম
এই কথাটা,
মধ্যখানে খেলাবেলা
পদ্য-পাতা খেলেছে খেলা
এই কথাটা,
হয়তো কিছু অর্থহীন
কিন্তু বাবু, সময় দিন
যথাসময়,
এইতো কদম ঘোড়ার মতন
কদম-কদম, কদম-কদম
যথা সময়।

মোষ

ভাস্কর চক্রবর্তী

তোমার-ই শিংয়ের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে থাকি—কখন যে চাঁদ
ওঠে, কখন যে মেঘ
ঢেকে দিয়ে চলে যায় তোমাকে আমাকে—
চারিদিকে বালি ওড়ে, তোমার দেহের ছায়া অন্ধকারে আরো
দীর্ঘ হয়
বেঁকানো শিংয়ের কাছে ধড় ঝোলে, ফুলে যায় পেট
কোথায় মধর কাক ডাক দিয়ে উড়ে যায়—মাইল মাইল রেল হেঁটে
কেরানীরা বাড়ী ফেরে, লম্প জেবলে স্ত্রী-কে চুমু খেয়ে, চোখ
বোজে বিছানায়
কোথায় কাদের চোখে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে—তারা রাত্রিবেলা
চুল খুলে, পা ছড়িয়ে কাঁদে? কিভাবে বছর যায়, বছর বছর
যায়, আমি
তোমারই শিংয়ের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে থাকি—কখন যে চাঁদ
ওঠে,
কখন যে মেঘ
ঢেকে দিয়ে চলে যায় তোমাকে আমাকে।

এই বাগান ফুলবাগান নয়

শংকর দে

এই বাগান ফুলবাগান নয়, এখানে শর্করার চাষ
জাঁক পেতে বসেছে রোদ্দুর
তেঁতুলগাছ, কাঁটায় রক্তের গন্ধ, রোশনাই কাঠির মতো
হাতে পর্দা টানা
এখানে জমির ফাঁক, এই দেখা শুরুতে প্রথম।
হর্তুকি কাঠের মতো দাঁতে-দাঁত, পিরিচের হাসি
এখানে তোমার দান, কলঙ্কের হাতে এই মাটি।

এই বাগান ফুলবাগান নয়, এখানে শূন্যতা সাদা, আঁধারে
জলের মতো পোকা
নৌকা পিদিমের মতো জেবলে দেখা, জবলে না কোনখানেই
সেই ভাঙা কাজলেরই রূপ ও প্রকৃতি।

লীণ্ডন-জনসন-বর্ষ

ইংরেজী এই ১৯৬৮ সনটি নাকি একাধিক অর্থে লীণ্ডন-জনসন-বর্ষ। বলেছেন একবাক্যে লণ্ডনের "ইকনমিস্ট" এবং মার্কিন "টাইম" পত্রিকা। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধের কথা হোক অথবা বছরের শেষদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তোড়জোড় হোক, প্রেসিডেন্ট লীণ্ডন জনসনই মূলাধার। ঘরে ও বাইরে প্রেসিডেন্ট জনসনের সমালোচকের সংখ্যা কম নয়; দুর্মুখ ও নিন্দুকের সংখ্যা আরও বেশী। সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়। প্রতিষ্ঠাবান শক্তিমান পুরুষের বিরুদ্ধে রসনা ও রটনা প্রায়ই মুখর হয়ে থাকে। তা ছাড়া খুব বড় শক্তিশালী ঐশ্বর্যশালী দেশের বিরুদ্ধে ভয় এবং ঈর্ষা প্রবল হতে দেখা যায়; সবখানি হয়তো অকারণে নয়। উপরন্তু আছে এখনকার কালের রাজনীতি অর্থনীতির আদর্শগত ভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রেসিডেন্ট লীণ্ডন জনসনের প্রতি বিরূপতার মূলে তাই নানা রকম শক্তি ক্রিয়াশীল। তবু এই লীণ্ডন-জনসন-বর্ষে প্রেসিডেন্ট জনসনের উপর পৃথিবীর ভালো-মন্দ অনেকখানি নির্ভর। মার্কিন জনমতের শতকরা কী পরিমাণ অংশ প্রেসিডেন্ট জনসনের পক্ষে বা বিপক্ষে ওঠানামা করতে দেখা যাচ্ছে সে হিসাব থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্ত না করাই ভালো। লীণ্ডন জনসন যতদিন "হোয়াইট হাউসে" সমাসীন ততদিন মার্কিন রাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় তাঁর কথাই শেষ কথা। তাঁর কাজকর্মের ধারা নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন। জনসন-নীতি বিরোধী সেনেটের ফুলব্রাইট এখন যতই আক্ষেপ করুন, লীণ্ডন-জনসন-বর্ষে প্রেসিডেন্ট জনসনের অপ্রতিহত ক্ষমতা রোধ করবার উপায় নেই।

উপায়ের কথা বাদ দিয়েও, স্বীকার করতে হবে মার্কিন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট জনসনের বিরোধীরা সংখ্যায় সামান্য; রবার্ট কেনেডী, ফুলব্রাইট, ম্যানস-ফীল্ড, ম্যাকার্থীরা মান্যগণ্য রাজনৈতিক বটে, কিন্তু এঁদের জনসন-বিরোধিতা সুসংগঠিত নয়। লিপম্যান, গ্যালব্রেথ এবং আরও কিছু কিছু উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীর মতামত আমেরিকার বাইরে চমক লাগায়, কিন্তু মার্কিন রাজনীতির মোড় ফেরাতে খুব বেশী কাজে লাগতে দেখা যায় না। প্রেসিডেন্টপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে ইচ্ছুক যাঁরা, তাঁরা জনসন-নীতির সমালোচনায় অগ্রসর হবেন ও হচ্ছেন, এটা রাজনীতির প্রচলিত নিয়মমাফিক। নতুবা এঁরাই কি আসলে জনসন-নীতির মূল সংকল্পের বিরোধী? ভিয়েতনাম-যুদ্ধই বর্তমানে জনসন-নীতির মূল প্রশ্ন। প্রেসিডেন্ট জনসন আইজেনহাউয়ার-কেনেডী আমলের সূত্র ধরেই ভিয়েতনামকে আমেরিকার সম্মহানি দায়িত্বে পরিণত করেছেন। সে দায়িত্ব থেকে পিছু হটবার প্রস্তাব মার্কিন রিপাবলিকান ডেমক্র্যাট কোন দলের নেতারাই দিতে সাহস করেন না।

উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ করা এবং শান্তি আলোচনার চেষ্টা প্রেসিডেন্ট লীণ্ডন জনসন ও তাঁর পরামর্শদাতারা খুব সোজাসুজিভাবে নিতে পারছেন না। যুদ্ধ দীর্ঘকাল না জিত, না হার অবস্থায় চলতে থাকলে মার্কিন জনমত হয়তো আরও বিচলিত বিক্ষুব্ধ হবে। তবে সে ঝুঁকি প্রেসিডেন্ট জনসন মেনেই নিয়েছেন। এ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আমেরিকার মত বিপুল শক্তিশালী ঐশ্বর্যশালী দেশের পক্ষে খুব বেশী নয়। এ যুদ্ধ যতদিন ভিয়েতনামে সীমাবদ্ধ ততদিন খাস মার্কিন ভূখণ্ডে তার আঁচ লাগছে না। ভিয়েতনামের জংলী চাষী গেরিলাদের সহজে উৎখাত করা সম্ভব হচ্ছে না, তাতে অবশ্য মহাশক্তিধর আমেরিকার মর্যাদাহানি।

জংলী এশিয়ান কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ঠিকমত যুদ্ধকৌশল ব্যবহারের সমস্যা এখানে সত্যিই কঠিন। উত্তর ভিয়েতনামে প্রায় দু বছর সমানে বোমাবর্ষণ করেও ভিয়েতকংদের শায়েস্তা করা সম্ভব হচ্ছে না। মার্কিন সমর দপ্তর "পেন্টাগনের" হিসাব নাকি প্রতি ভিয়েতকং গেরিলা পিছু ৩, ৪ অথবা এমন কী ১০ জন মার্কিন সৈন্য লাগানো দরকার। উপরন্তু উত্তর ভিয়েতনামকে যদিও বা ঠাণ্ডা করা যায় তারপর দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রামে গ্রামে ভিয়েতকংদের সংগে মোকাবিলার জন্য লাগবে নাকি কমসে কম ১৫ লাখ মার্কিন সৈন্য। সে কাজটা শেষ করতে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের গণতন্ত্র শিক্ষা দিতেও সময় চাই কমপক্ষে ১৫ বছর। দূরদর্শী রাজাজী 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় একখানি চিঠিতে তাই লিখেছেন, ভিয়েতনামের উপর দীর্ঘকালের মত সরাসরি অভিভাবকত্বের ভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেওয়া উচিত। এখনকার বন্দোবস্তের তুলনায় সেটা হয়তো অনেক বেশী বাস্তব। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বর্তমান শাসকমণ্ডলী তেমন কিছু কাজ দেখাতে পারছেন না। মার্কিন সমরনেতাদের আফসোস দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাড়ে সাত লাখ সৈন্য লড়াই-এর কাজে লাগে সামান্যই। দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য (গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আপাতত মুলতুবী পরবর্তী আকর্ষণ) প্রধানত মার্কিন সৈন্যরা প্রাণপাত করছে, মার্কিন অর্থ খরচ হচ্ছে দিনপ্রতি ২০০ কোটি ডলার। এর পর মার্কিন জনমত হঠাৎ যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা রক্ষার দায় ঝেড়ে ফেলতে চায় তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাবিষ্যৎ অন্ধকার। রাজাজী সম্ভবত এ সব বিবেচনা করে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে সরাসরি মার্কিন অভিভাবকত্বের অধীন করার পক্ষপাতী।

লীণ্ডন-জনসন-বর্ষে অর্থাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখো-মুখি লীণ্ডন জনসন দক্ষিণ ভিয়েতনাম সম্পর্কে অতখানি স্পষ্ট মার্কিন কর্তৃত্বের ব্যবস্থা বোধ হয় করতে পারবেন না। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও অসম্ভব-প্রায়। ভিয়েতনামে শান্তিপ্রতিষ্ঠা মানে উত্তর এবং দক্ষিণ দুই অংশ থেকেই বিদেশী সৈন্য, সামরিক ঘাটি ইত্যাদি অপসারণ। মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের আশংকা ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য ইত্যাদি সরিয়ে আনলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে নির্ঘাৎ কম্যুনিস্ট রাজত্ব কায়েম হবে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাউয়ার বলেছিলেন, জেনেভা-চুক্তিমত ১৯৫৫ সনে ভোট নেওয়া হলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে কম্যুনিস্টপন্থীরা জয়ী হত। অবস্থা এখন বোধ হয় আরও সঙীন। ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, নানা রকম প্রলোভন দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে কম্যুনিস্টপন্থী ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের প্রবল প্রতিপত্তি। কাজেই ভিয়েতনামে যুদ্ধ চালানোর চেয়ে যুদ্ধ থামানোর ঝুঁকি বেশী। যুদ্ধে ভিয়েতনামের চূড়ান্ত মীমাংসা আপাতত অসম্ভব: ভিয়েতকং গেরিলারাও যুদ্ধে জয়ী হয়ে গোটা দক্ষিণ ভিয়েতনাম দখল করতে পারে না, যতদিন মার্কিন সৈন্য ও বিমানবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামে উপস্থিত। আবার ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিণামও অনিশ্চিত, কারণ প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটির ব্যবস্থা হলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের থাই-কী শাসকগোষ্ঠী কোথায় তলিয়ে যাবেন তার ঠিক নেই। প্রায় অনুরূপ অনিশ্চয়তা গ্রীসে, যে জন্য নাকি মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের অভিমত গ্রীসে গণতান্ত্রিক শাসনের চেয়ে কর্নেলদের রাজত্বই নিরাপদ। লীণ্ডন-জনসন-বর্ষে দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার বিচারও চলবে সম্ভবত অনুরূপ পদ্ধতিতে। ৮।১।৬৮

'নাইট ট্রেন টু চিটাগং'

পিয়ার দারকুরের মতো সাংবাদিকেরা যখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু অপ্রিয় সত্য শুনিয়ে দেন, তখন আমরা ব্যথিত হতে পারি, কিন্তু রাগ করতে পারি না। সেই অপ্রিয় সত্যের নমুনা দু-এক সংখ্যা আগের জার্নালে উদ্ধার করেছিলুম। প্রামাণ্য ইংরিজি সাহিত্য-পরিচায়িকাতে যখন লেখা হয় ঃ "কৃষ্ণচরিত (?) বঙ্কিমচন্দ্রের সব চাইতে জনপ্রিয় উপন্যাস" অথবা "রহস্যময় ভারতে'র আকর্ষণ বোঝাবার জন্যে তাজ-মহলের অন্তত রঙিন ছবির নিচে বলে দেওয়া হয় সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর? ইত্যাদি—তখনও আমরা কৌতুকই বোধ করতে পারি, এবং খুশি হয়ে ভাবতে পারি সাহেব মর্যাদা যতটা 'খরো' বলে কিংবদন্তী আছে ততটা তাঁরা নন—তাঁরাও আমাদের মতো মানবিক ভুল-ভ্রান্তি করে থাকেন।

সহানুভূতি নিয়ে ভুল বুঝলে কিংবা নিরপেক্ষ বিচারের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটলে ক্ষোভ থাকে না—যেমন থাকে না হ্যালাম টেনিসনের উপন্যাস পড়লে; আবার উলটো দিক থেকে যখন সচেতন বিকৃতি ঘটানো হয়, তখন কিপলিং—নিকলস্—'ভওয়ানী জংশন'—সব অপাঠ্য হয়ে ওঠে। সোজাসুজি যাঁরা গালি-গালাজ করেন, তাঁদের বরং সহ্য করা চলে, কিন্তু পিঠ চাপড়ে যাঁরা মুরুব্বিয়ানা করেন, তাঁদের বরদাস্ত করা দুঃসাধ্য।

কিছুই মনে করতুম না, যদি 'নাইট ট্রেন টু চিটাগং' 'ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন' কিংবা ওই জাতীয় কোনো কাগজে প্রকাশিত হত। অর্থাৎ বেশ গা-গরম করা বাস্তব-কাহিনী, নিছক থ্রীলড হওয়ার শখকেই আমি ওটি পড়তে পারতুম। কিন্তু লেখাটি ছাপা হয়েছে বোম্বাই শহর থেকে মুদ্রিত ভারতীয় সংস্করণ "রীডার্স ডাইজেস্টে"—অল্প পয়সায় এবং সংক্ষেপে যে পত্রিকা থেকে আপনি-আমি বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ডাইজেস্ট করে ফেলি—এমন কি ইংরিজি শব্দভাণ্ডার পর্যন্ত প্রসারিত করি। পত্রিকাটি ভালোই—নইলে বছর পঁচিশেক আগেই নিতান্ত তরুণ বয়সে—ভারতীয় হওয়ার আগেই—আমি এর প্রেমে পড়ব কেন এবং আজও পয়সা দিয়ে এটি কিনি কেন?

এর ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর, অর্থাৎ 'অন্বেষী' সংখ্যায় 'নাইট ট্রেন টু চিটাগং' শীর্ষক এই শিহরক বৃত্তান্তটি স্থান পেয়েছে। লিখেছেন ডোনাল্ড্ ডেভিড—যিনি দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন, বর্তমানে যিনি ইংল্যাণ্ডের একটি সামরিক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

লেখাটির উদ্দেশ্য অত্যন্ত সাধু। বাইশ বছরের তরুণ এই সামরিক অফিসার কি ভাবে বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বের জোরে সমবয়স্ক এক রাজনৈতিক "গুণ্ডা" এবং তার দল-বলের হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন—তারপর তারুণ্যের ঔদার্যে এই আক্রমণ-কারীদের রক্ষা করেছিলেন ইংরেজের ক্রোধ থেকে—এটি তারই মনোরম কাহিনী। যাঁরা এর মধ্যেই এটি পড়ে ফেলেছেন, তাঁরা আমার মতোই স্বীকার করবেন যে লেখাটা পড়তে ভালোই লাগে। তরুণ সেনানীর মহত্ত্বেই বা কে অভিভূত না হবেন? সেই জন্যেই বোধ হয় লেখাটির বিশেষ মর্যাদা: 'ফার্স্ট পার্সন অ্যাওয়ার্ড'।'

সময়টা বাংলা দেশে এক দারুণ বৎসর—সেই ১৯৪২! একদিকে বিজয়ী জাপানী সৈন্য এসে দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের প্রান্তদ্বারে—অন্য দিকে দেশ জুড়ে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন। সেই সময়ে আমাদের লেখক ডোনাল্ড্ ডেভিড, টপ-সিক্রেট কিছু কাগজপত্র নিয়ে, ক্যাপ্টেন 'এন'-এর সঙ্গে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন তাঁদের রেজিমেণ্টে যোগ দিতে।

স্বাভাবিক সময়ে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে যে রেলপথ দুশো মাইলের মতো ক্লান্তিকর যাত্রা ছাড়া কিছুই নয়, সংপ্রতি তা ভয়ংকর। কারণ যদিও "The vast majority of Indians were loyal to British Government", কিন্তু বছরের পর বছর ইংরেজের বঞ্চনায় একদল "চরমপন্থী" এখন ক্ষিপ্ত—ঘৃণায় তিক্ত; দেশ জুড়ে জাপান এবং চক্রশক্তি (Axis)-র সমর্থনে হাঙ্গামা, আন্দোলন।'

অতএব? লেখকের ইংরিজিই উদ্ধৃত করি ঃ

"But now there was the hazard of encountering "goondas"—bands of hooligans, revolutionaries and thieves carrying long matchets (? Machetes নিশ্চয়?). They often waylaid trains to rob and murder white occupants."

১৯৪২ সালে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নিশ্চয় সবটাই অহিংস ছিল না, তাই বলে এই তার চেহারা। সাজাবার কয়দাটা একবার দেখুন—গুণ্ডা, বিপ্লবী এবং চোরেরা সব এক দলের, সকলেরই লক্ষ্য এক ঃ "Often ট্রেনকে বিপথে নিয়ে যাওয়া, লম্বা লম্বা ছোরা দিয়ে গাড়ির শ্বেতাঙ্গদের নিধন এবং তাদের যথাসর্বস্ব লুট করা!" তাদের মুখে নাকি ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সর্বাঙ্গক ধ্বনি "জয় হিন্দ" এবং "জয় হিন্দের" ইংরেজি অনুবাদ নাকি "Free India!"

যথাকালে এই "নাইট ট্রেন" রাজনৈতিক গুণ্ডাদের" দ্বারা আক্রান্ত, তাদের হাতে ক্যাপ্টেন্ 'এন'-এর হত্যা, 'সাহেব—বাঁচাও বাঁচাও' রব তুলে ডেভিডের কামরায় কম্পমান "ইউরেশিয়ান" দম্পতির আশ্রয় গ্রহণ (এখানে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে, তাঁরা নাকি খাঁটি ইংরেজকে খাতির করে 'সাহেব' বলেন)। ডেভিড বিব্রত হয়েও নির্ভীক, কোনো ইংরেজ অফিসার কি "Few underfed zealots with knives"-কে ভয় পায়? তারপর ডেভিডের কামরায় চোর-গুণ্ডা-বিপ্লবী ইত্যাদি খুনীদের প্রবেশ, তাদের জাপানীপন্থী তরুণ হিংস্র নেতার সঙ্গে তাঁর তর্ক ও বুদ্ধির খেলা—এই কৌশলেই সংকটত্রাণ, অবস্থার পরিবর্তনে ইংরেজোচিত উদার ক্ষমায় খুনীদের নিষ্কৃতি—উদ্দেশ্য, এই মহত্ত্বে কি বিপথগামী উগ্র তরুণের হৃদয় বদলাবে না?

অতি মনোহর কাহিনী। ১৯৪২ সালে ঢাকা টু চট্টগ্রাম নাইট অভিজ্ঞতা আমার নেই, কিন্তু তখন জাপানীপন্থী বাঙালীরা খুনী-গুণ্ডা-চোরদের সঙ্গে ভিড়ে সাহেব দেখলেই খুন আর তাদের যথাসর্বস্ব লুট করছে—আগস্ট আন্দোলনের এইটিই সত্যি-কারের ইতিহাস কিনা জানতে ইচ্ছে করে। এবং, ইংরেজের এই মহত্ত্বই কি মেদিনী-পুরের অভিজ্ঞতা?

শিল্পী (বোম্বাইয়ের কিনা জানিনা) গান্ধী টুপিওলা ছোরাধারী গুণ্ডাদের ছবি ভালোই এঁকেছেন। ভারতীয় রীডার্স ডাইজেস্ট ইংরেজ মহিমা প্রচার করে ধন্য হয়েছে। কারণ বোম্বাই তো ভারতের বাইরে—বাঙালী কিংবা ভারতবর্ষের নামে অপপ্রচারে সেই "লাস্যময়ী যৌবন-সুন্দরী" কশ্চিৎ বোম্বাইয়া সাংবাদিক-জাব্যে)-র কিছুই যায় আসে না।

জীবনদেবতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯২১ সালের ৩ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে এই আলোচনার অনুলিপি শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের সৌজন্যে আমরা পাইয়াছি, তিনিই ইহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রচর্চায় যাঁহারা নিবিষ্ট, শান্তিনিকেতনে বলাকার ক্লাস লইবার সময় রবীন্দ্রনাথ ওই কাব্যগ্রন্থের যে ধারাবাহিক ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন সেগুলি লিখিয়া লইবার জন্য তাঁহারা চিরদিন শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন: এগুলি প্রথমে কবির জীবিত-কালে শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, কয়েক বৎসর পূর্বে বলাকা গ্রন্থের পরিশেষে সন্নিবিষ্ট হইয়া রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের বিশেষ সহায়স্বরূপ হইয়াছে। প্রদ্যোতকুমার রবীন্দ্রনাথের আরও বহু উল্লেখযোগ্য ভাষণের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিমার্জিত হইয়া তাহার অনেকগুলি রবীন্দ্র-নাথের বিভিন্ন গ্রন্থে (যথা 'বিদ্যাসাগর-চরিত', বিশ্বভারতী) সংকলিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বর্তমানটির আলোচনা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিমার্জিত করিয়া লইবার সুযোগ হয় নাই; রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে যেভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাই গ্রথিত আছে।

আলোচনা-সভার উপলক্ষ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রদ্যোতকুমার আমাদের জানাইয়াছেন—"১৯২১ সালের ২ অক্টোবর শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ঋণশোধের অভিনয় হয়, এই উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে বহু বিশিষ্ট অতিথির সমাগম হইয়াছিল। পরদিন (৩ অক্টোবর) কবির গৃহে সম্মিলিত অতিথি ও ছাত্রদের সহিত রবীন্দ্রনাথ 'জীবনদেবতা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেদিনকার আলোচনাসভায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলির সবিশেষ বিবরণ লিখিয়া রাখি নাই, তবে কবির ভাষণেই তাহার সংকেত আছে।"]

—সম্পাদক, 'দেশ'

জীবন দেবতা ও ঈশ্বরের মধ্যে শুধু aspect-এর পার্থক্য, attitude-এর তফাৎ। কিন্তু উভয়ের অন্তর্নিহিত ভাবটি এক। এক জায়গায় ভগবান নিরপেক্ষভাবে একান্ত আমার, সেখানে কেবল তিনি ও আমি। সেখানে সংসার, জগৎ কেউ নেই, আত্মীয়স্বজন বন্ধুর স্থান নেই। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটি সেখানে গভীর ও রহস্যময়। আমার সেই একান্ত জগতে তিনি একা। কিন্তু আমার আবার এক-জায়গায় বিশ্বে মিলন হয়েছে। জীবন-দেবতা আমাতেও আছেন এবং আমাকে অতিক্রম করেও আছেন, সেখানে অনন্ত অসীমের অন্তর্নিহিত অংশ, সেই আমার বিশ্বদেবতার দিক।

জীবনদেবতার ঝোঁক ব্যক্তির দিকে, বিশ্বদেবতার ঝোঁক ভূমার দিকে, বিশ্ব-জনীনতার দিকে। আমাদের সামাজিক জীবনের সম্বন্ধের মধ্যে বিশ্বদেবতাকেই পাই, সেখানে আমরা অনেকের সঙ্গে তাঁর আরাধনা করি, 'সবার মাঝারে' তাঁকে স্বীকার করি। এই worship মানুষের বন্ধনকে sustain করে রেখেছে।

যে দেবতাকে আমি ইতিহাসের উত্থান-পতনে, বিশ্বমানবতার অভ্যুদয়ে অনুভব করি তিনি বিশ্বদেবতা। কিন্তু যেখানে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করতে করতে, প্রকাশ করতে করতে চলেছে, সেখানে আমার জীবনদেবতাকেই পাই। আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে, শৈশবের অনেক কথা বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেছে কিন্তু স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে যে অর্ঘ্য রচিত হয়েছে তাই সেই দেবতাকে ভূষিত করেছে, সেখানেই আমার জীবনদেবতার অধিষ্ঠান।

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনদেবতা একটি, পৃথক জগতের অধিদেবতা, প্রত্যেকটি জগতের বর্ণসমাবেশ ও অনুভূতি অনন্য-সাধারণ ও বিচিত্র। এই স্বকীয় জগতের যে আভাস আমাদের মনোগোচর হয়, আমার জগৎ সেই আভাসকে ছাড়িয়েও বিদ্যমান, কিন্তু তথাপি এ কথা স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে এই জগৎকে যা ধারণ করে রয়েছে তা একটি ঐক্যবোধের সত্য। গীতাঞ্জলিতে "তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি" এই গান ভাগবতসঙ্গীত কিনা প্রশ্ন করেছ। কবিতাটির মধ্যে তাঁর আসার পায়ের ধ্বনির কথা আছে, তা সকলের কানেই শোনা যাচ্ছে; কারণ তাঁর আগমনটা চিরন্তন সত্য। তবে আমার যে বিশেষ বিশেষ অনুভূতির দ্বারা আমি এই সত্য লাভ করেছি তা একান্ত আমার। 'জীবন-দেবতা' কবিতার মধ্যে যেখানে এই শাশ্বত সত্য ধরা পড়েছে সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই এই কবিতা নিজের জীবনে ঘটাতে পারে। আমার জীবনের realization দুপ্রকারের —একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি, আরেকটি উপনিষদের সমস্ত ব্যক্তিত্বের অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি।

জীবনদেবতা বিশ্বদেবতা থেকে স্বতন্ত্র সত্তা নয়। ভগবান আমার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত আছেন, আবার বিশ্বকে বাদ দিয়ে একজায়গায় শুধু আমারই সঙ্গে একান্তভাবে মিলিত হয়েছেন। এই দুই মিলনের মধ্যে প্রাচীর তোলা যায় না। এই উভয় সম্বন্ধ-মার্গকে পতিব্রতা স্ত্রীর পতিপ্রেমের দুটি aspect বলা যেতে পারে। পত্নী স্বামীর ঘরে সংসারের বিচিত্রকর্মে ব্যাপৃত থাকে, তাতে তার কত আনন্দ ও মনোনিবেশ। আত্মীয়স্বজন দাসদাসী অতিথি নিয়ে তাদের পরিচর্যা ও প্রীতি প্রকাশের দ্বারা একটি বৃহৎ জগতে সে স্বামীর সহিত যুক্ত। এই কর্মের প্রেরণা হচ্ছে তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু স্ত্রীর ভালোবাসার আরেকটি দিক আছে। সেখানে সে সংসারের স্বজনবর্গকে দূরে রেখে এক জায়গায় নিভৃতে স্বামীর সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধে যুক্ত—সেখানে সে একান্তভাবে পতিগতপ্রাণা পতির মুখাপেক্ষিণী, পতির সোহাগে সোহাগিনী।

যেমনি ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের দুটো দিক আছে—যেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন বহির্মুখীন, সেখানে তিনি বিশ্বদেবতা। যেখানে অন্তর্মুখীন সেখানে তিনি জীবন দেবতা।

আমি বলব, ভগবানের তিনটি aspect আছে। প্রথম, যেখানে তিনি আমার ও আমার সংসারের অতীত, অতীন্দ্রিয়রাজ্যের অধীশ্বর। দ্বিতীয়, যেখানে তিনি আমার ও আমার সংসারের কেন্দ্র, সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। তৃতীয়, যেখানে তিনি ব্যক্তিগত-

ভাবে একান্ত আমার, তাঁর সঙ্গে আমার একলার বোঝাপড়া। অর্থাৎ তাঁর transendental বা abstract, subjective এবং objective এই তিনটি স্বরূপ দেখতে পাই।

আকাশের প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্ক অনেকদিনকার ইতিহাসের ধারায় একটি অখণ্ড সূত্রের ভিতর দিয়ে চলে আসার পর একটি সম্পূর্ণ গোলকে পরিণত হয়েছে। সূর্যতে যদি ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় তবে বলা যেতে পারে যে একটি ব্যক্তিগত স্বকীয় অভিব্যক্তির অবিচ্ছিন্ন সূত্রের ভিতর দিয়ে অসীমের মধ্যে নানা অবস্থার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হয়ে অনুভূতি-ধারা বেয়ে একটি বিশেষ স্বরূপ লাভ করেছে, তার সেই স্বরূপটিই 'সূর্য' নামে অভিহিত হয়েছে। তার এই পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে কালপুরুষ বা আর কোনো জ্যোতিষ্কের ইতিহাসের মিল নেই।

জ্যোতিষ্কের ইতিহাসের মত মানুষের ইতিহাসের এরকম একটি স্বকীয় ধারা দেখতে পাই। আমার সমস্ত অনুভূতির ধারা একটি স্বকীয় জগতের সৃষ্টি করেছে, তাকে আধ্যাত্মিক জগৎ বলা যেতে পারে।

আমার বিশ্বাস যে এমন দিন আসতে পারে যখন আমাদের এই স্বকীয় জগতের একটি complete idea সম্বন্ধে আমরা সচেতন হব। এখন আমরা বিচিত্র অনুভূতির ধারাগুলিকে খণ্ডিতভাবে দেখছি, তার কূলকিনারা করে উঠতে পারছি না, কিন্তু তখন আমাদের অনুভূতিগুলির একটি সীমারেখা (outline) তৈরী হবে, চোখে যা এবড়ো খেবড়ো ঠেকছে তার মধ্যেও একটা glow দেখতে পাব। সেই শুভ মুহূর্তে আমার জগতের লীলার নিগূঢ় অর্থটি আমার কাছে পরিস্ফুট হবে। তখন একটি সম্পূর্ণতার শান্তি আমার আত্মচেতনাকে অধিকার করবে। বর্তমানে আমার আত্মিক জগতে শুধু জ্যোতিষ্কের সেবার শক্তিরই সাধনা, ক্ষণে ক্ষণে কেবল সৃজনশীল জগতের আভাস পাচ্ছি। এখন কেবল আমার এক এক জায়গায় ফুল ফুটছে, অন্তরের কল্যাণের সুরকে ধ্বনিত করছে। কিন্তু আমার বিচ্ছিন্ন অনুভূতির মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে। কিন্তু তখন আমার জ্যোতিষ্ক আপনার আনন্দরূপকে প্রকাশ করবে, সৃষ্টিকার্যে রত হবে। subconscious যা ছিল তা conscious-কে ছুঁয়ে যাবে। এই সৃষ্টিতে বিরাজ যার, তিনি এর লীলারসের অধিদেবতা, তিনিই হচ্ছেন এর জীবনদেবতা।

আমি যখন শাহাজাদপুরে ছিলাম তখন একটি গভীর আত্মচেতনার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছিলাম, সন্ধ্যা সঙ্গীতের কবিতাগুলির মধ্যে আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, আমি যেন আমাকে পেয়ে, আমাকে জেনে, বেঁচে গেলাম। এর আগে আমি কি ছিলাম জানি না, হয়তো বিহারী চক্রবর্তী বা আর কিছু ছিলাম। কিন্তু এই সময় থেকে আমার রচনার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হতে লাগল, সৃষ্টির আবেগে আমার মন ভরে গেল। [illegible] আমাদের ভিতর হঠাৎ [illegible] অনুভূতির অন্তরালে একটি অর্থ পরিস্ফুট হয়ে পড়ে। তখন দেখা যায় আমার জগতটি একটি আত্মসম্পূর্ণ [illegible] স্পর্শ করেছে, অসীম আমার মধ্যে সীমা হয়ে গেছে; সেই পূর্ণ উপলব্ধি একটি বিশেষ জগতের সৃষ্টি করেছে। এই জগতের অধিদেবতাই হচ্ছেন জীবনদেবতা। আমার ব্যক্তিগত সত্তা [illegible] হয়ে আনন্দকেই আমি পাচ্ছি। আমার এই আত্মিক জগতের অধিদেবতাকে জীবনদেবতা এই আখ্যা দিয়েছি। জ্যোতিষ্কলোকের পরিণতির মধ্যে যেমন তাঁর লীলা দেখতে পাই, তেমনি আমার অনুভূতির যা কিছু পরিণতি তাতে তাঁরই আনন্দের প্রকাশ।

পৃথিবীর যখন প্রথম সৃষ্টি হল, তখন তা বাষ্পের আকারে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, নানা সংঘাতের মধ্যে তখনও তার আকৃতিবিন্যাস ঘটেনি। ক্রমে তার সমস্তটা জুড়ে দিয়ে একটি সীমারেখার মধ্যে সে সম্পূর্ণ গোলকের আকার ধারণ করল। পৃথিবীর সেই আদিম বাষ্পীয় অবস্থায়—যখন তার জল-স্থলে ভাগ হচ্ছিল, তখন প্রতি মুহূর্তে সে ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য দিয়ে আপনাকে assert করে চলেছিল। কিন্তু আজকের দিনে পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলকে পরিণত হয়েছে, শস্য শ্যামলা ধরণী বনস্থলী-নদী-পর্বত-সাগর দিয়ে সুষমামণ্ডিত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কী গভীর দুঃখের ভিতর দিয়ে খণ্ড খণ্ড দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রতিহত হয়ে সে এসেছে

এই প্রক্রিয়ার ভিতরের ব্যাপারটি সে ধরতে পারেনি কিন্তু ক্রমে এমন জায়গায় সে এল, যেখানে তার শান্তি হল, একটা স্থিতির মধ্যে তার খণ্ডতার অবসান হল। এই ধারাবাহিকতার পর যেখানে সে এসে পৌঁচেছে সেখানে সে অপর সব জ্যোতিষ্ক থেকে পৃথক।

কিন্তু পৃথিবীর এই বিশেষ স্বরূপ ছাড়া তার যে একটি বিশ্ব-রূপ আছে সে কথাও একান্ত সত্য, কারণ সে চিরকালের মত খণ্ডিতস্পর্ধ একটি জ্যোতিষ্ক নয়, কারণ সে অন্যান্য গ্রহউপগ্রহের মতো অনন্ত আকাশে ঘূর্ণমান, সেখানে তার অন্যান্য জ্যোতিষ্কের সঙ্গে যোগ আছে।

...আমার অনেক কবিতা যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি তা বিশ্বজনীনও বটে। কারণ আমার জীবনদেবতা আমাতেও আছে, আবার আমাকে অতিক্রম করেও বর্তমান। আমার ব্যক্তিত্ব এক জায়গায় বিশ্বে merge করেছে। "তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি"তে যে approach-এর কথা বলা হয়েছে, তাকে বিশ্বমানবের অনুভূতির অন্তর্গত করেও বলা চলে। এই পদধ্বনি যেন দেশে দেশে কালে কালে সকল ইতিহাসের মধ্যে শোনা যায়, এই আগমন প্রতীক্ষা চিরন্তন সত্য, শুধু আমার একলার অনুভূতির বিষয় নয়। কারণ এই কবিতা যেমন ব্যক্তিগত তেমন বিশ্বজনীন।

...বৈষ্ণব কবিতার মূল সুর ব্যক্তিগত আর উপনিষদ মূলত বিশ্বজনীন। দুইটিই সাধনার বিভিন্ন মার্গ। জীবনদেবতার idealটা grow করেছে এবং ক্রমশ একটি আকার ধারণ করেছে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার অধিদেবতা একটি নির্দিষ্ট symbolism-এর মধ্যে পাকা হয়ে বিরাজ করছে—একটা বিশেষ ধর্মমতের মধ্যে ধরা পড়েছে। আমি জীবনদেবতাকে বারংবার মূর্তি বদলে বদলে জানবার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ প্রত্যেক বাঁকেতে অসংখ্য সৃষ্টির ধারা চলেছে। আমি আজ যে জীবনদেবতাকে জেনেছি, তাকেই ভালোবেসেছি। এখন আমার কাছে যারা প্রিয়জন তারাই আমার ভালোবাসার পাত্র। আমার প্রিয়বন্ধুদের মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করতে বলেই তাদের আঁকড়ে ধরেছি। এই প্রীতি সম্মিলনের মধ্যে যেমন তাঁকে পেয়েছি, তেমনি মৃত্যুর আপাত বিচ্ছেদের মধ্যেও যিনি আমার জীবনকে প্রিয় ও মধুর করেছেন তাঁকেই ভিন্ন অনুভূতির মধ্য দিয়ে অন্যভাবে পেয়েছি।

এমনিভাবে আমি এক জায়গায় জীবনদেবতাকে অতিক্রম করে বিশ্বদেবতার চরণতলে এসে দাঁড়িয়েছি। সেখানে তাঁকে আমি তাঁর আপনার মহিমাতে দেখেছি। সেখানে আমি আপনার সখা-বন্ধুদের পিছনে ফেলে এসেছি। সেই মিলনের আনন্দ ব্যক্তিত্বহীন।

পাখীর আকাশে পাখা মেলে দিয়ে বিহার করবার যে আনন্দ, এই আনন্দ সেইরূপ, 'সত্যম'-এর মধ্যে ডুবে যাবার, মোক্ষলাভ করবার, সীমাকে অতিক্রম করার, আকাশ বিহার করার আনন্দ। ঘটনা সম্পাতের দ্বারা যে জীবননাট্য অভিনীত হচ্ছে, তার মধ্যে একটা আপেক্ষিক আনন্দ আছে, সেখানে জীবনদেবতাকে পাচ্ছি কিন্তু বিশ্বদেবতাকে যখন পেলাম তখন এই আপেক্ষিকতা ঘুচে গেল, তখন যে আনন্দ লাভ করলাম, তা ইন্দ্রিয় গোচর জগৎকে অতিক্রম করে অসীমের আনন্দ।

> **নূতন নাটিকা**
>
> **বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নাট্যকার শ্রীজ্যোতির্ময় দত্তর নূতন নাটিকা "সতীশ সেন" আগামী সপ্তাহ থেকে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।**

...আমার কবিতার ঝোঁক কোন্ দিকে গেছে তা জিজ্ঞাসা করলে বলব যে তা উপনিষদের দিকেই। উপনিষদের শ্লোকগুলি যে আমার কাছে কত বড় সত্য তা বলে শেষ করা যায় না। সে কথা যেখানে আমি বলবার চেষ্টা করেছি সেখানে 'আমি' 'তুমির' কথা একেবারেই ওঠে না। সেখানে একমাত্র 'তুমি', সেখানে অসীমের অনির্বচনীয় অখণ্ড আনন্দ।

আমার কবিতার মধ্যে জীবনদেবতার একটা দিক আছে, সেটা যে persist করেছে তা নয়, শুধু কোনো কোনো সময়ে সেইদিকটা প্রকাশ পেয়েছে।

বাল্যকালে আমি বৈষ্ণব কবিতার idealism-এর দ্বারা যেমন মুগ্ধ হয়েছি তেমনি উত্তরকালে আমার জীবনে উপনিষদের প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়েছে। প্রথম প্রথম আমি উপনিষদের শ্লোকগুলি বুঝে উঠতে পারতাম না, কিন্তু যখন থেকে তা ব্যাখ্যা করবার জন্য আমার ডাক পড়ল তখন থেকে আমি একই শ্লোককে নিজের অনুভূতি দিয়ে হাজারবার হাজার রকম করে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। এটি আমার অধ্যাত্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা। তেমনি আমার নিজের জীবনের বাইরের কথাও আমার কবিতার মধ্যে এসেছে। আমার কবিতার দুটো দিকই মিশে রয়েছে, কিন্তু উপনিষদের দিকটাই বেশি। যেখানে আত্মা পরমাত্মার মিলন হয়, সেখানে ব্যক্তিত্বের কথা আসে না।

বৈষ্ণব কবিতাতে বিচ্ছেদের ভাবটাই চিরন্তন সত্য এমন একটা কথা আছে, কিন্তু 'আমি' 'তুমি'কে এমন চিরকাল বিচ্ছিন্ন করে রাখলে আমার কাম্য যে মিলন তা ঘটে না। উপনিষদে এই 'আমি'র প্রাধান্য নেই. সেখানে সীমাকে অতিক্রম করে 'তুমি'তে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে যে আনন্দ তার কথাই বলা হয়েছে। আমার কবিতা সেই ব্যক্তিত্ববিহীন অখণ্ড আনন্দকে লাভ করবার প্রয়াসে ধাবিত হয়েছে।

Pessimism (নৈরাশ্যবাদ) আমার কবিতায় আছে কিনা প্রশ্ন করেছ। আমি বলব নৈরাশ্য আমার কবিতার চরম কথা নয়। আমি যখন বিলাতে নার্সিং হোমে ছিলাম, তখন আমার বন্দীদশা ঠেলে ফেলে আমার মন দুঃখকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করেছে। সেই উচ্চতলায় অবস্থিত রোগ-শয্যায় সূর্যকিরণের বক্ররেখা পতিত হয়ে সেই গৃহকে আনন্দ নিকেতন করে দিয়েছে। ...আটলান্টিক মহাসাগরে জাহাজে রুগ্ন অবস্থায় পড়েছিলাম, সেখানে আমার আনন্দ কানায় কানায় ভরে গেছে, দুঃখ আমাকে অভিভূত করতে পারেনি। আর দুঃখ পেয়েছি বলেই কবিত্বশক্তি লাভ করেছি।

"খেয়ার" কবিতাগুলি দুঃখের বলেছ, কিন্তু এগুলিকে seriously নিয়ো না, খেয়াতে যে gleams প্রকাশ পেয়েছে, তা দুঃখের নয়। "অমাবস্যা নিশি", "কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি" এই নামগুলি অনেক সময় accidental। রাজার দুলালের বিষয়ে যে কবিতা আছে, তা করুণ বলেই যে দুঃখের, তা হতে পারে না কারণ sacrifice-এর যেমন দুঃখ আছে, তেমনি আনন্দও আছে। আল্পস পর্বত চড়তে হলে পর্বতগাত্র খুঁড়ে খুঁড়ে দাঁড় দিয়ে দিয়ে উঠতে হয়। কিন্তু উপরে উঠবার ধাপ-গুলির সার্থকতা হচ্ছে যে সমস্ত পাহাড়টাকে অখণ্ডভাবে দেখা। কবিতা-গুলিকে নানা ভাবব্যঞ্জনার কোঠায় শ্রেণীবিভাগ করে দেখাটাও সেই রকম, খণ্ড খণ্ডভাবে বেঁধে বেঁধে দেখা। শ্রেণী-বিভাগগুলি পা দিয়ে উঠবার পথ বেঁধে দিতে সাহায্য করে মাত্র।

যেমন শেলীর কবিতার ভিতরে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে, যদি তার একটা কোনো জায়গায় বিশেষ emphasis দাও তো ভুল হবে। Naples-এর কবিতার dejection তাঁর শেষ কথা নয়। আমি 'খেয়া'তে কি প্রকাশ করতে চেয়েছি, তা ঠিক করে বলতে পারছি না। আবার পড়ে দেখতে হবে। 'সব পেয়েছির দেশ' কবিতাতে তো দুঃখের কথা নেই, 'সার্থক নৈরাশ্য' কবিতার emphasis রাত্রির উপর নয়, রাত্রির অবসানের উপর।

শান্তিনিকেতন
৩ অক্টোবর, ১৯২৯

প্রধানমন্ত্রীর সফরে : বুলগেরিয়া

আমার সুটকেসে আর তালা পড়ল না। উপায় নেই। তাসা বন্ধ করে ড্রেসিং গাউনের কোমরবন্ধ দিয়ে বেঁধে রাখতুম প্লেনে যাওয়ার বেলায়। আমার এখনো কষ্ট হয় ঐ হারানো চাবিটার কি-রিংটার জন্যে।

ঐ শোক বুকে করে যেতে হল মিছিল করে ডিমিট্রফের সমাধি-মন্দিরে। গার্ড অব অনার, সামরিক বাদ্য, লোকেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে দাঁড়িয়ে মস্ত একটি স্কোয়ারের মাঝখানে, "৯ সেপ্টেম্বর স্কোয়ার", যার চারদিকে বড় বড় ইমারত প্রাচীন চত্বর, যার খুব কাছেই হল বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট দলের কংগ্রেস হল (অধিবেশন-স্থান), গেলোয় বিরাট দালান। ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ সন তাদের কাছে, জনসাধারণের কাছে পবিত্র। এটা তাদের জাতীয় দিবস, যেমন আমাদের ২৬শে জানুয়ারি। কারণ, এই দিনটিতে রাশিয়ার সহায়তায় বুলগেরিয়া ফিরে পেল স্বাধীনতা নাৎসি জার্মানীর হাত থেকে।

সোফিয়া এয়ারপোর্টে

ইন্দিরাজীর তরফে বিরাট একটি ফুল-পাতার চক্র নিয়ে সামরিক কায়দায় অর্ঘ্য দিল দুজন ভারতীয় সামরিক কর্মচারী। আমরা সবাই গেলাম সমাধি-সৌধের ভিতরে। গোলাকৃতি ছোট একটি ঘর, যার মাঝখানে একটি কাচ-ঢাকা আধারে শুয়ে গাগি ডিমিট্রফ। যেমন লেনিন শুয়ে মস্কোর রেড স্কোয়ারে, ঠিক তেমনি অবিকৃত সেই মৃতদেহ, যিনি বুলগেরিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন চিরদিনের জন্যে ১৯৪৯ সনের দোসরা জুলাই। ডিমিট্রফ হলেন বুল-গেরিয়ার লেনিন।

আমার মত যারা ১৯৩০-৪০ দশকে ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, তাদের কাছে একদা ডিমিট্রফের নাম ছিল অতি পরিচিত। কমিউনিস্ট-জগতে ইনিই হলেন যুক্ত ফ্রন্ট, "ফ্রন্ট পপুলেয়ার" নামক নীতির স্রষ্টা। একটি শ্রমিক পিতার ঘরে তাঁর জন্ম ১৮৮২ সনের ১৮ই জুলাই, অর্থাৎ তুর্কি সাম্রাজ্যবাদ হতে ১৮৭৮ সনে প্রথম স্বাধীনতা লাভের চার বৎসর পর। বুলগেরিয়া একাদিক্রমে তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ৫০০ বৎসর, যার ভিতরে তারা অনেকবার স্বাধীনতা-যুদ্ধে নেমেছে, অনেক-বার তুর্কি সাম্রাজ্যবাদ রক্তে ডুবিয়ে দিয়েছে বুলগারদের মুক্তি-প্রয়াস। এবং সেই ১৮৭৮ সনেও বুলগেরিয়া পেয়েছিল তার স্বাধীনতা, রাশিয়া যখন পরাজিত করল তুর্কিকে।

হরিদ্রাভ আলোকে ডিমিট্রফের দেহের দিকে চেয়ে মনে এল ইতিহাসের পাতা। জুন মাসের ৯ তারিখে, ১৯২৩ সনে, ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতা অর্জন বুলগেরিয়ায় (সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে) এবং তাদের অকথ্য অত্যাচার, অবিচার ও হত্যা। সেই বছরের সেপ্টেম্বরেই হল সশস্ত্র জনগণের অভ্যুত্থান, ডিমিট্রফের প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট নীতির পরি-প্রেক্ষিতে। সেই অভ্যুত্থানও হয়েছিল ঐ যুক্ত ফ্রন্টের নেতৃত্বে। আবার রক্তবন্যায় ডুবে গেল বৈপ্লবিক প্রয়াস। কিন্তু পৃথিবীতে ঐ ছিল প্রথম ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন।

ডিমিট্রফ কাজ করছিলেন ভাসিল কোলারোভের সহযোগিতায়। এই দুজনের নেতৃত্বে হয়েছিল ১৯২৩ সনের অভ্যুত্থান। ঐ সনে এবং আবার তিন বৎসর পর তদানীন্তন বুলগেরিয়া সরকার ডিমিট্রফকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল, অবশ্য তাঁর অনুপস্থিতিতে। বুলগেরিয়া ও রাশিয়া অনেক দিকে এক রকম। তাদের ভাষা প্রায় এক, অনেকটা অসমিয়া বাংলার মত। মুক্তি-আন্দোলনেও প্রায় এক শো বছর এই দুই দেশ অঙ্গাঙ্গী জড়িত ছিল। দুই দেশের ভিতর যাতায়াত ও আদানপ্রদান ছিল অনেক।

তাই ১৯৩৩ সনে [illegible] রাশিয়ায় [illegible] কাজ করতে লাগলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থায়, যার উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য দেশে কমিউনিজম কায়েম করা। ঐ বছরে ডিমিট্রফ গ্রেপ্তার হন হিটলারের বার্লিনে। আরম্ভ হল "রাইখস্টাগ ফায়ার" বিচার ডিমিট্রফ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে। সাজানো মামলা—জার্মানীর পার্লামেন্ট ভবনে আগুন দেওয়ার অভিযোগ। ডিমিট্রফ ঐ বিচারের সুযোগে আনল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিরাট অভিযোগ। এবং গোটা দুনিয়ায় হলেন বিখ্যাত, অভিযুক্ত থেকে অভিযোগকারীর ভূমিকা নিয়ে।

তার একটি উক্তি এখনো বিখ্যাত

বুলগেরিয়ার : "হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট নেতা; কিন্তু ঐ একই কারণে আমি নই সন্ত্রাসবাদী, নই ষড়যন্ত্রকারী, নই ঘরবাড়িতে আগুন-দেওয়া আসামী।" এই লাইপৎজিগ বিচার ভূমিকায় ডিমিট্রফ হয়ে গেলেন একজন আন্তর্জাতিক নেতা, এবং পৃথিবী-জোড়া আন্দোলনের ফলে, বিশেষত তদানিন্তন রাশিয়ার প্রভাবে, হিটলার তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এবং ১৯৩৫ থেকে উনি হলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ সচিব। তখন থেকে উনি প্রতিষ্ঠা করলেন যাকে আজ বলা হয় যুক্ত ফ্রন্ট নীতি, কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্তের একত্রিত অভিযান। ঐতিহাসিকরা জানেন, এই নীতি গ্রহণ না করায় কী ফল হয়েছিল। হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

প্রায় ২২ বছর নির্বাসনে থেকে ডিমিট্রফ ফিরে এলেন স্বদেশে ১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাসে। সমস্ত কাল উনি পরিচালনা করেছেন বুলগেরিয়ার মুক্তি-সংগ্রাম এবং রুশ সামরিক বাহিনীর সহায়তা। গর্গি ডিমিট্রফ হলেন সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার প্রথম প্রধান-মন্ত্রী। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, মুক্তি সংগ্রামের সময়ে পাঁচটি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে গড়েছিল ১৯৪২ সনে (বিশ্ব-যুদ্ধকালে, যখন হিটলার জিতে যাচ্ছিল সব জায়গায়) যার নাম ছিল "মাদারল্যান্ড ফ্রন্ট"। এরই নেতৃত্বে হয়েছিল গরিলা সংগ্রাম, যে সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে প্রায় ৩০ হাজার বুলগার।

আমরা সেই পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে উড়ে গেলাম (বলকান রেনজ) যেখানে এই গরিলা যোদ্ধারা সংগ্রাম করেছে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে গোটা তিন বছর, নীল পাহাড়শ্রেণী, সবুজ বনে ঢাকা, যা পেরিয়ে আমরা এসেছিলাম বুলগেরিয়ার অন্য প্রান্তে, কৃষ্ণসাগরের সৈকতে। নিচে তাকিয়ে দেখেছি স্বাক্ষর কলকারখানার আর যন্ত্রকৃত কৃষি-কার্যের, আর ঐ দেশের ৭০ লক্ষ অধিবাসী-দের স্বদেশপ্রেমের। ছোট্ট দেশ, আমাদের কাশ্মীরের অর্ধেক এলাকার এবং জনসংখ্যা বৃহত্তর কলকাতার মতো মাত্র।

অথচ তাদের প্রগতিকে অস্বীকার করা যায় না। তুর্কি সাম্রাজ্যের অধীনে তাদের হয়নি বিন্দুমাত্র অর্থনৈতিক প্রগতি। এমন কি, ১৮৭৮ সনের পরেও হয়নি কোনো কলকারখানা, হয়েছিল বটে কয়েকটা ছোট-খাটো কামার-ছুতোরের দোকান। এবং কী হয়েছে বিগত ২০ বৎসরে? তাদের ক্ষেত-খামার আর কারখানার অনেক পরিচয় পেয়েছি। তাদের দেশে কোনো লোক না খেয়ে মরে না, শীতে প্রাণ দেয় না। মাথার উপর আশ্রয় নেই এমন লোক নেই। লোকেদের শিক্ষা অবৈতনিক, বেকারত্ব নেই। ওষুধ-পত্রের খরচ নেই এবং প্রতিটি মানুষের পেনশন ৬০ বৎসর থেকে (মেয়েদের ৫৫ বৎসর থেকে)। অধিকন্তু তাদের ট্রেড

সোফিয়াতে ডিমিট্রফের সমাধীতে সম্মান প্রদর্শন। পেছনে ইন্দিরাজী

ইউনিয়নের মাধ্যমে ছুটি ও বিশ্রামাগারে কালযাপন, তাদের সুদৃঢ় ভবিষ্যৎ। এক একটি খামার কয়েক মাইল জোড়া। কলের লাঙল। কিন্তু কৃষকরা নিজেদের ভিটেতে করতে পারে শাকসবজি ও ফলের বাগান, বিক্রিও করতে পারে, কোনো বাধা নেই।

আমাদের শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রী ফকরুদ্দিন সাহেব ৩১শে অক্টোবর দিল্লিতে বুলগেরীয় শিল্প প্রদর্শনী খুলতে গিয়ে বলেছিলেন : "এই ছোট্ট দেশ এতো করেছে গত ২০ বৎসরে যে, আমাদের অনেক শেখার আছে। আগে বুলগেরিয়া ছিল প্রধানত কৃষিমূলক দেশ। চল্লিশের শেষ অবধি তাদের জাতীয় আয়ের চার ভাগের তিন ভাগ ছিল কৃষি-ভিত্তিক। আজ জাতীয় আয় বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ, এবং কারখানাজাত দ্রব্য হল জাতীয় আয়ের চার ভাগের তিন ভাগ। ভারত এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়ল। ১৯৫৯-৬০ সনে লেন-দেন ছিল মাত্র ৩০ লক্ষ টাকার। কিন্তু পাঁচ বছরের ভিতর এই বাণিজ্যের পরিমাণ এসে দাঁড়াল ছয় কোটি ২০ লক্ষ টাকায়। ফকরুদ্দিন সাহেব সেদিন বলেছিলেন : "দুই দেশের ভিতর বাণিজ্যিক সহায়তা আরো বাড়বে —অনেক অনেক।"

মনে পড়ছে, মোটর করে গেলাম প্রায় ২০।২৫ মাইল সোফিয়া থেকে। দেখলাম তাদের ইস্পাত কারখানা। হ্যাঁ, ঠিক, আমাদের ভিলাই কিংবা রুরকেলার মতো কিছু নয়। কিন্তু বুলগেরিয়ার পক্ষে বেশ বড়। কারখানার শ্রমিকরা আমাদের নিয়ে গেল তাদের হলঘরে (ছোট ঘরে)। কফি খাওয়ালো, বিস্কুট আর টফি। আমরা অনেক প্রশ্ন করলাম, তারা উত্তর দিতে কার্পণ্য করেনি। স্থানে স্থানে শ্রমিকদের ফটো। নিচে লেখা—কে কতো ভাল কাজ করেছে। অনেক স্থানে লেখা বড় বড় স্লোগান, উৎপাদন কতো বাড়বে, তাদের আদর্শ, ইত্যাদি। প্রায় দু মাইল দূরে অনেকগুলো বড় বড় বাড়ি, ৫।৬তলা। সব ঐ শ্রমিদের বাসস্থান। অনেক মেয়ে শ্রমিক। বিদেশীদের দেখে তাদের ঠোঁটে মিটি হাসি। তারা হাত দুলিয়ে অজানা বিদেশীদের জানায় অভ্যর্থনা, বলে, "দোভিজদানে" (আবার দেখা হবে), বলে "ব্লাগোদারিয়া" (ধন্যবাদ)। হাত নাড়িয়ে তারা বলে, "জদ্রাস্তেই", "জদ্রাসতি" (হ্যালো), আবার কেউ বলে, "ভিভ নারোদনা রেপুবলিক বুলগারে" (বুলগার জনতা জিন্দাবাদ)।

সোফিয়া থেকে ওপারে ভারনায়, কৃষ্ণ সাগরের সৈকতে সুন্দর শহরে। আমাদের ছিল দুটো বিমান, রাশিয়ান এ-এন-১২।

ভারণার কাছে সমুদ্র সৈকতে বুলগারি সুন্দরী।

একটার প্রধানমন্ত্রী ও কয়েকজন কর্মচারী, অন্যটায় আমরা সোজা উড়ে সোফিয়া থেকে ভারনা। সুন্দর ভারনা। যে জায়গা ১০ বৎসর আগে ছিল সাপে-খোপে ভরা, আজ তা হয়েছে টুরিস্টদের স্বর্গ। ভারণা নতুন শহর নয়, কিন্তু তার ৫০টি হোটেল অত্যন্ত নতুন। টুরিস্টদের জন্যে আছে সব, যা চান সব ঃ মদ্যপানের স্থান, জুয়োখেলার জায়গা, হোটেল, আমোদ-প্রমোদ স্থান, সমুদ্রের সমস্ত প্রকার খেলা। কোনো অভাব নেই। বিদেশীরা ভিড় করে আসে কৃষ্ণসাগরের সৈকতে।

তারা আমাদের মতো নয়। আমরা হলাম তেমনি দেশ যেখানে লোকরা ল্যাংগট পরে অবলম্বন করতে চায় গৃহস্থ ধর্ম। যারা বিবাহ করে, কিন্তু নারীকে মনে করে পাপ, যদিও সন্তান উৎপাদনে হয় না কোনো ত্রুটি। যেখানে পাথরের গেলাসে গঙ্গাজল সহকারে পান করা হয় সোমরস।

তিনদিন তিন রাতে, একবারও আমরা দেখিনি একটি মদ্যপ, কিংবা ব্যভিচারী। আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি নাইট ক্লাব, বার্, কোথাও দেখিনি সংযমের অভাব। যারা সমাজতান্ত্রিক দেশের সমালোচক, তারা হয়তো বাস্তবে কোনোদিন সমাজতান্ত্রিক দেশ দেখেন নি।

সে যাক্। গেলাম সেই ভারণায়, সোফিয়া এয়ারপোর্টে আমাদের বিমান আকাশে উঠল বলে প্রপেলর চলছে, দম্ নিচ্ছে আমাদের বিমান। হঠাৎ দৌড়ে হাজির ভারত সরকারের ফটোগ্রাফার। অগ্নিহোত্রী। উনি লেট্ লতিফ্। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির বিমানের অভ্যন্তরে। জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার, দেরি কেন?" অগ্নি, অত্যন্ত, গোবেচারি, নিরামিশাষী, পাড়াগেয়ে। সে বলে ঃ

আমরা যখন হোটেল থেকে রওনা হলুম, উনি তখন উপরে সাজসজ্জা করছেন। "যখন নিচে এলাম, দেখি কি সবাই গো অন্ উইত্ দ্য উইণ্ড, মানে কেটে পড়েছেন। আমি একটু লেট্ ছিলাম, জানতাম না, কখন ছাড়ব হোটেল। নিচে এসে দেখি সব ফাঁকা। প্রথম একটু কান্না পেল। তারপর একটা ট্যাকসি করে এলাম এয়ারপোর্টে। এলাম যেমনি অমনি দেখি স্টার্ট হয়েছে প্রপেলার। দৌড়লাম। পেছনে রইল আমার ক্যামেরা সবকিছু।"

পাগল, পাগল!! আমাদের বিমান উড়ল আকাশে, আর তারপর তাদের মাধ্যমে যোগসাধন করা গেল সোফিয়া এয়ারপোর্টে। বলা হল ঃ একটি ট্যাকসিতে ছেড়ে আসা হয়েছে তৈজসপত্র। প্লিজ্ তাদের পাঠিয়ে দাও প্রধানমন্ত্রীর বিমানে।

শেষে এলোও তাই। অগ্নিহোত্রীর ক্যামেরা আর তৈজসপত্র। ভারনায়। অগ্নি-হোত্রী আনন্দে আটখানা। একে নিরামিষাশী, তাতে সরকারী চাকুরে। বেচারার মুখচোখ একেবারে চোরের মতো। সে খুশী তার জিনিসপত্র এসে গেছে, ব্যস্! নো কেয়ার!!

একটি রাত কৃষ্ণসাগরের সৈকতে। হোটেলের নাম হল "গোল্‌ডেন্ এ্যান্‌কার"। পাঁচ মাইল দূরে "গোল্ডেন্ স্যান্‌ডস্"-এর সৈকত। যার নাম সুন্দর। যার নাম সোনালী সৈকত, সোনালী বালুকা। কতো সোনালী মেয়েরা আসে তাদের সোনালী দেহ নিয়ে এই কৃষ্ণসাগরের সৈকতে। তাদের অনেককে দেখলাম বালিতে অর্ধ উলঙ্গ, কেম অর্ধ মানবী!! তাদের ভোগ করবার দ্রব্য অনেক, তাদের পয়সাও অনেক। তারা কেউ বুলগার, কেউ বিদেশী।

এই ছোট্ট শহরে একটি মেয়ের কথা ভুলবার নয়। আমরা তিন বন্ধু ঘুরে ফিরছি কোথায় পাব নিজেদের টাকার বদলে ওই দেশী টাকা। একটি হোটেলের মেয়ে, তার বয়েস মাত্র ২২।২৫, ইনি নিয়ে গেলেন আমাদের। আমরা হাঁটলাম প্রায় আধ মাইল। পেলাম বৈদেশিক মুদ্রা, ভারতীয় টাকার বদলে। নাম-না-জানা ওই বুলগার যুবতীকে আমাদের অনেক ধন্যবাদ।

আবার বিমানে উড়ে গেলাম প্রায় এক ঘণ্টা। ওটা হোল পরদিন। গেলাম একটি কৃষি কেন্দ্রে যার নাম হল "গ্রাফ্ ইগনাতিয়েভো"। ছোট্ট শহরে কতো লোক, কতো মানুষ ইন্দিরাজীর অভ্যর্থনায়। অনেক ঘরে উঠেছে আঙুরের লতা অনেকের ঘরে সুন্দর বাগান। ইন্দিরাজী দেখলেন মস্ত বড় কৃষি স্থল, আঙুরের বাগান আর একটি সুন্দর গ্রাম, তারা সবাই মিলে দিলেন চমৎকার অভ্যর্থনা।

রাস্তায় যেতে যেতে এল একটি বৈবাহিক বাদ্য। কারা যেন যাচ্ছেন বিবাহে। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে দেখে বিবাহের বাদ্য বাজতে লাগল আরো জোরে। জানি না কেন। ইন্দিরাজী নেমে বলেন, "কী ব্যাপার?" তারা জানায়, "আমাদের বিয়ে।"

সবাই মিলে কী হাসি কী হাসি সেদিন। সেই গ্রামে ইন্দিরাজীর জন্যে কতো খাবার, কতো আদর। কতো ভাষা। শেষ নেই।

সবার মধ্যে ফুটে ওঠে একজনের মুখ ঃ বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুডোর জিচ্‌কোভ। বুলগেরিয়ার জাতীয় নেতা জিচ্‌কোভ্, যিনি ত্যাগ করেছেন দেশ ও জাতির জন্যে। ইন্দিরাজী তাঁর সংগে আলাপ-আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক দিন।

দুই দেশের ভিতর কোনো মতান্তর নেই। প্রায় সমস্ত বিষয়ে একমত। দুই দেশেই চায় কী করে বাড়তে পারে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। এবং তার জন্যে দুই দেশের ভিতর স্বাক্ষরিত হয়েছে বাণিজ্য চুক্তি।

গোলাপের দেশ বুলগেরিয়া। সুন্দর দেশ, পপ্‌লার আর গোলাপের দেশ। সেই দুটি মেয়ে যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন ইংরিজী অনুবাদ করার জন্যে। একজন ছিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, আরেকজন সরকারী কর্মচারী। দুজনেই কী মিষ্টি মেয়ে কী ভদ্র। কোথাও অতিশয্য নেই, কোথাও অভদ্রতা নেই, কোথাও নেই বেলেল্লাপনা। তারা যেন আমাদের ছোট বোনের মতো। আমাদের কী চাই, কোথায় যাবো, কী উদ্দেশ্যে, তারা সবকিছুতে আমাদের সংগে।

দুটি চমৎকার বুলগার মেয়ে, বুলগেরিয়ার সুন্দর গোলাপের মতো।

(ক্রমশ)

—খগেন দে সরকার

এক

এখানে নতুন বদলি হয়ে এসেছে সমীর। বাড়িঘর এখনো গোছগাছ করে উঠতে পারেনি। ঝি-বেয়ারা পাওয়া যায়নি মনের মতো। একমাত্র ভরসা কালীচরণ, ভীষণ বোকা। কিন্তু লোক ভালো।

আপাতত সমীর একাই এসেছে। দিদির মেয়ে আসন্ন প্রসবা, সেই সংবাদে সে দিদির কাছে এসেছে, আর সেই সংবাদে মা-ও থেকে গেছেন নাতনীর জন্য। বলেছেন 'চিরটাদিন তো তোর জন্যই সব করেছি, কারো দিকেই তাকাইনি, কোনো কর্তব্যই করিনি, কিন্তু দিদুও আমারই সন্তান, তার মেয়ে শানুও আমারই নাতনী, তাদের সময়-অসময়, সুখ-দুঃখ—সেসব দেখাও আমার কাজ। আমি শানুর বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত যাবো না।' বলাই বাহুল্য এসব মায়ের রাগের কথা, না আসবার অছিলা। এবং এও বলা বাহুল্য মা যদ্দিন না আসবেন তদ্দিন এই বিশৃঙ্খল অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতিও হবে না। কেননা সমীর এর মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, দিশাহারা বোধ করছে, বাজারের পয়সা দিতে দিতে সংসারে বীতস্পৃহ হয়েছে। এনে ফেলে রাখা জিনিসের স্তূপের দিকে তাকালে তার পাগল পাগল করে, থাকতেও কিছুই না পাওয়ার বিরক্তিতে সে উদভ্রান্ত হয়। অথচ এমন বিশ্বস্তও কেউ নেই যাকে হাত লাগাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। অনেক পুরোনো বই আছে, কাগজ আছে, চিঠিপত্র আছে। শখের জিনিসও আছে অনেক। সে ভয়ে শেষে কোথায় হারিয়ে ফেলবে, নষ্ট করবে, বাজে মনে করে ফেলে দেবে—তাই সব ঠাসা আছে ট্রাঙ্কে। আর ট্রাঙ্ক আছে পর্বত প্রমাণ হয়ে ঘরের এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটোনো। কোনটা যে কোন ট্রাঙ্ক তাও মনে থাকে না সব সময়। একটার দরকার হলে দশটা বাক্স হাটকাতে হয়। আর তারপর যা চেহারা হয় ঘর বাড়ির সে একেবারে পৃথিবীর অষ্টমতম আশ্চর্য বলে ভ্রম হতে থাকে। সমীরের কান্না পায়।

বাড়িটা বিশাল। হাকিম হয়ে সমীর এ নিয়ে কম জায়গা ঘুরলো না, কিন্তু এমন সুন্দর বাংলো আর কোথাও পায়নি। সামনে বড় রাস্তা পেরিয়ে গেটে ঢুকলেই দু' পাশে দেয়াল ঘেঁষে এদিকে-ওদিকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ এক শো' ফুট ধরে পাশাপাশি সব সাদা মোটা পাম গাছের সারি এগিয়ে দু' পাশে সবুজ লনের ধারে ধারে ফুলবাগান, বড় গাছের ছায়া, মারবেল মূর্তি। পেরিয়ে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠলে গোল বারান্দা, আর সেখানে দাঁড়িয়ে সোজা তাকালেই ঘরের পর ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢেউ তোলা গঙ্গাজলের শীতল বুক। গঙ্গা গভীর হয়েছে এখানে, প্রশস্ত হয়েছে। এ-পারে হুগলি ও-পারে নৈহাটি। সমীর এ-পারে থাকে। তার বাংলোর পিছন দিককার ঝোলানো বারান্দা থেকে নিচু হয়ে গঙ্গার জল ছোঁয়া যায়। যখন বান ডাকে, ঝাপটে ঝাপটে জল ফুলে ফুলে উঠে আসে এখানে। রাত্রে পায়ের তলায় কুল কুল শব্দ হয়।

সব মিলিয়ে ঘর আছে দশখানা। তার অনেক চেহারা অনেক নাম। খাবার ঘর, বসবার ঘর, লবি, স্টোর, গেস্টরুম, একস্ট্রা এসব বাদ দিয়ে শোবার ঘর চারটা। এবং সেই চারখানা ঘরের জানালা খুললেই তলায় গঙ্গা। এদিকে দু'খানা, ওদিকে দু'খানা মাঝে তিনদিক ঢাকা ঝোলানো বারান্দা জলের উপর। সমীরের অবসর এই বারান্দায় বসেই কাটে। ঘরগুলো এলোমেলো হলেও বারান্দাটা সাজানো। ডেক চেয়ার আছে, বেতের চেয়ার আছে। বস্তুতপক্ষে একজন মানুষের কতটুকুই বা দরকার তাই একখানা ঘর গতানুগতিকভাবে বসবার ঘর হিসেবে সাজিয়ে, একখানা ঘরে খাবার টেবিল পেতে আর একখানা ঘর শোবার করে চলে যাচ্ছে দিন। প্রকাণ্ড খাটপাতা আছে সেই শোবার ঘরে, লেখাপড়ার টেবিল আছে, বইয়ের জন্য কোণে সেলফ আছে। ব্যস।

আসবাবপত্র সবই সরকারী। শোনা যায় সমীরের আগে যিনি ছিলেন তিনি এসব পুরোনো আসবাব ব্যবহার করেননি—সব পুরোনো মত বলে নিজে নিজের মনোমত কিনে নিয়ে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি যাবার পরে ধুলো বালি ঝেড়ে আবার সব বার করা হয়েছে। অযত্নে ধোয়া মোছা করার দরুন এখনো সে সবের চেহারা ধূলি-মলিন। এ নিয়ে সমীরের কোনো হায়-আপসোস নেই, তার খেয়াল কম, তার উপরে অতিরিক্ত অপটু। অন্য ঘরগুলো সবই এখন অপাংক্তেয়। মাঝে মাঝে সাজাবার ইচ্ছে হয়, জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে সুন্দর বাড়িটা সুন্দর করে রাখতে ইচ্ছে করে কিন্তু ইচ্ছের সঙ্গে তার যোগ্যতার মিল হয় না। সে পারে না। তখন মনে মনে মাকে স্মরণ করে। মনে মনে বলে 'উঃ আর পারা যায় না, এবার তুমি এলে বাঁচি।'

কিন্তু তবু, এই জঞ্জাল নিয়েও, এই নিঃসঙ্গতা নিয়েও জায়গাটা তার ভালো লেগেছে। সন্ধ্যেবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে স্নান করে, ধোয়া পাজামা পাঞ্জাবি আর চটি পায়ে পিছন দিককার ঝুল বারান্দায় বসে যখন সে চা খায়, চা খাওয়া সাঙ্গ হলেও যখন সে চুপচাপ তাকিয়ে জলের খেলা দেখে মনটা তার ছল ছল করে। হু হু করে ঘুরপাক খেতে খেতে হাওয়া উঠে আসে গঙ্গার বুক থেকে, এসে আছড়ে পড়ে বারান্দায়। ঘরের পর্দাগুলো উড়তে থাকে অনবরত। শোঁ শোঁ

আমদানি হতে থাকে তার মুখশ্রীতে, তার ঠাণ্ডা মাথা গরম হতে থাকে। থকথকে কাদার মত কালো কালো ডাল, আর তরকারি, নামে কতগুলো চটকানো ঘাসপাতা এক গাদা মশলার ঘাঁট ডালনা, আর মাছ—উঃ সে সব পদার্থ যে কী তা যে খেয়েছে সেই শুধু জানে। এক একটা মুখে দেয় আর উগড়ে বাঁন আসে। সব কিছুর নাম আলাদা আছে ঠিকই কিন্তু স্বাদে গন্ধে একই গোত্রের।

অদূরে, মুখে বৈষ্ণবীয় হাসি নিয়ে আনেক আনত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কালীচরণ। এই সময়ে তার গায়ে লম্বা একটা সাদা কোট থাকে, কেননা এখন তার নাম বাবুর্চি। প্রভুর আসম্মান করতে তার বেদনা লাগে তাই পরিবেশনের সময় এই কোটটি গায়ে দিতে কখনো ভুল হয় না। গলার কিন্তু তিনকহর তুলসীর মালাটি তেমনিই উঁচিয়ে থাকে, একটি পুষ্ট টিকিও থাকে পিছনে। মুখে একটা সন্দেহ ভাব নিয়ে উদগ্রীব ভাবে অপেক্ষা করে সে। 'রান্না কেমন হয়েছে হুজুর?' এই শব্দগুলো সে মুখে বলে না বটে কিন্তু তার নিঃশব্দ শব্দের চেয়ে জোড়ালো।

সেইক্ষণে ফিরে [illegible] সমীরকে রুদ্ধ করে তোলে, সে বাঁকা বাঁকা চোখে তাকায়, তাকিয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। এই লোকটিকে সে বরদাস্ত করতে পারে না। এর চোখ [illegible] মুখ সে [illegible]। [illegible] এই লোকটির কাছে থেকে [illegible]। সে [illegible] ও [illegible] দিন এর [illegible] পড়বে না। এর [illegible] এক ফোঁটা [illegible] ঘটবে না। [illegible] চুপ করে থাকে, [illegible] কী [illegible] বাঁধুনি [illegible] করা [illegible] ভাবে [illegible] উপর [illegible] সে [illegible] সবাই [illegible]। [illegible] মানুষেই সমান [illegible]। [illegible] নিজের ইচ্ছে আর খেয়ালখুশীই [illegible]। সে [illegible]।

ঠিক আছে। [illegible] সে [illegible] থাকে। [illegible] বেশী। তিনি দেখেন সমীর একেবারের জন্যও আর তাকে নিজে থেকে আসতে দেখে কিনা, তার নিজের কোনো সুখ দুঃখের কথা জানতে দেয় কিনা। সত্যি বলতে মানুষের মনটাই আসল। তাকে তুমি ইচ্ছে করলেই ভৃত্যের মতো ব্যবহার করতে পার। শেষ পর্যন্ত সুবিধে বা অসুবিধে মানুষ দুটো। শরীরের বস্তুটাই কি কোনো মানে আছে? কোনো নিলেই তো লাফ তোলে। কোনো নিলেই দেখো পোষা কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়বে। এই মতবাদে সমীর একান্ত হয়।

হাত মুখ ধুয়ে, টাঙানো তোয়ালের প্রান্তে মুছে নিতে নিতে সে আবার গিয়ে বসে সেই ঝোলানো বারান্দায়। সন্ধ্যার শান্তি-দায়িনী গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দার্শনিক হতে চেষ্টা করে, কিন্তু আগের মতো মন মগ্ন হয় না। শূন্য জঠর তাকে বিমুখ করে রাখে। বারান্দার হাওয়ায় আর প্রাণ জুড়োয় না। অসন্তুষ্ট চোখে জলের দৃশ্য তার কাছে সাংঘাতিক একঘেয়ে মনে হয়। সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দুলে দুলে চলে যাওয়া যে নৌকোগুলো, একটু আগে তাকে স্বর্গের ছবি দেখিয়েছে, মাঝিদের গলাখোলা গানের যে সুর তার প্রাণে প্রেমের অনুভূতি এনে দিয়েছে সেই ছবি, সেই গান একটাও

ভালো লাগে না। ওপারে সারি সারি আলোর মালা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক বলে বোধ হয়।

ক্ষুধা বড়ো সাংঘাতিক শত্রু। তুমি সব ভুলতে পার, কিন্তু তাকে ভোলবার উপায় নেই। যতক্ষণ না তুমি তাকে তৃপ্ত করতে পারবে, সে ঠিক লেগে থাকবে তোমার পিছনে। তাড়াতাড়ি ঘরে চলে যায় সমীর। টেবিলের ড্রয়ার খুলে প্যাকেট থেকে বিস্কুট বার করে খায়। কালীচরণই তাকে এই বিদ্যা শিখিয়েছে। কালীচরণের রন্ধনপটুতারই ফল। শুধু বিস্কুটই নয়, অনেক সময় রসগোল্লা সন্দেশও নিয়ে আসে হাতে করে। ফল আনে, কেটে খাবার জন্য ছুরি রাখে। সব এনে রেখে দেয় ঘরে। দরকার মতো খায়। আর খেলেই খিদে পালায়, আর খিদে পালালেই অশান্তি থাকে না কোনো।

সকালে সে ভাত খায় না। এই জন্যেই খায় না। ব্রেকফাস্টেই রুটি ডিম মাখন ফল ইত্যাদি দিয়ে পেট ভরে নেয়। কিন্তু রাত্তিরে পেট ভরে ভাত মাছ না খেলে তার ঘুম আসে না। মা তার জন্য কতো কিছু রান্না করতেন। মাছ তো মাছই, এক ডাল তরকারীই বা কতো ধরনের, কতো স্বাদের। এই করে করে তিনি তাকে রীতিমতো ভোজনপটু করে তুলেছেন। তারপর গাছে চড়িয়ে এখন মই কেড়ে নেয়া! ঠিক আছে।

দুই

চিরদিন সমীরের দেরি করে ঘুমোনো অভ্যেস। ঘুমোনোর আগে আলো জ্বেলে এলিয়ে বসে বই পড়তে ভারি ভালো লাগে তার। সাহিত্যের বই। ওটা তার জীবনের একটা মহা সুখ। এ নিয়ে মা অবশ্য অনেক বকাবকি করেন। বলেন, 'অত রাত জাগা ভালো নয়।' বলেন, 'কী রস তো জানিনে, অত নাটক-নভেল পড়ার তোর দরকারটাই বা কী?' সমীর হাসে। কিসের যে কী দরকার, তা কি কেউ কাউকে বোঝাতে পারে? বিশেষ করে মাকে বোঝানো তো সম্ভবই নয়।

আসলে সমীর চেয়েছিলো লেখক হতে। তা সে পারেনি। এই অকৃতকার্যতার মূলে তার নিজের অক্ষমতা নয়, মায়ের বিরোধিতা। ছেলেবেলায় হঠাৎ হঠাৎ তার মনে অনেক ছবি ধরা দিত। মনের কথা ফুটিয়ে তোলার জন্য তার ভাষার অভাবও যে ঘটেছে তাও নয়। কিন্তু মা এগুলোকে বাচ্চা ছেলের বখামি ছাড়া আর কোনো দাম দেন নি। ধমক ধামক ছাড়াও দু-একবার কান লাল করে দিয়েছেন। পাঠ্য বই ছাড়া অন্য বই হাতে নিতে দেখলে ক্ষেপে গেছেন তিনি। সবই ছেলের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে করেছেন, কিন্তু তখনকার মতো সমীরের হৃদয় দুঃখের সাগরে ভেসে গেছে। সে লুকিয়ে লিখেছে, লুকিয়ে পড়েছে। তারপর আস্তে আস্তে সেই সব কুচিন্তা কুঅভ্যাস একদিন গাছ থেকে ছাল ছাড়িয়ে নেবার মতো করে মা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। এসব তিনি কখনোই সচ্চরিত্রের লক্ষণ বলে ভাবতে পারেননি।

মনে আছে বারো বছর বয়সে চুপেচুপে একটি প্রেমের গল্প লিখেছিলো, কী করে দেখে ফেললেন মা। তারপর শুধু যে তাকে চড়চাপড়েই রেহাই দিলেন তা নয়, তাঁর সামনে বসে লেখার খাতাটি পর্যন্ত পোড়াতে হলো নিজের হাতে। তারপরও তাঁর কান্না দেখতে হলো শুতে এসে। এই কান্না তাঁর বিপথগামী পুত্রের অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্য।

হ্যাঁ, বড়ো হতে হতে এই কান্না দিয়েই তিনি জয় করেছেন ছেলেকে। ছেলের অপার্থিব রোগের এই সব বীজ তিনি সমূলে উপড়ে দিয়েছেন। ছলে বলে কৌশলে তিনি বুঝিয়ে ছেড়েছেন এর তুল্য অপরাধ আর নেই। জীবনকে পঙ্গু করার পক্ষে এ রকম বিষ দুর্লভ। এসব কীর্তি-কলাপ অপদার্থ [illegible] সাজে, তাঁর ছেলের নয়।

এ-পারে সে ভালো ছাত্র হয়ে পাশ [illegible] নিয়েছিলো। তার মানসিক [illegible] সম্পূর্ণ ভাবে ছেঁটে ফেলেছিলেন [illegible]। নিজেই বুঝেছিলো তার [illegible] হওয়া না হওয়া মানেই [illegible] খেয়াল খুশির ইচ্ছের মতো। মা এর উপমা ওই দিতেন। মার উপর তার বিশ্বাস অগাধ ছিলো, মাটির তালের মতো তাই তিনি তাকে যেমন খুশি তেমনি করে ভেঙেছেন আর গড়েছেন।

তবু তাঁর মধ্যে বড় হয়ে [illegible] রয়েছে অনেক, ঠোকাঠুকিও লেগেছে। ছেলেবেলার দিনগুলো পার হলে [illegible] আবার বি-এ-তে ভর্তি হবার সময় খানিক গোলমাল হলো। সে ইংরিজীতে অনার্স নিতে চেয়েছিলো, মা বললেন অর্থনীতি। তিনি শুনেছেন অর্থনীতি পড়লে চাকরি মেলে ভালো। চাকরি, চাকরি আর চাকরি। মার কাছে ওইটাই ছিলো মুখ্য। হয়তো [illegible] সকল মা-বাবার কাছেই তাই কিন্তু তার মধ্যেও তারতম্য থাকে। শিক্ষিত এবং সৎ সন্তানই পিতামাতার প্রধান কামনা, তারপর তার জীবিকা। কিন্তু সমীরের মার তা নয়, তিনি প্রথমে যা চান তা হচ্ছে একটা নির্বিচার আনুগত্য, তারপরে তার উপার্জনক্ষম হবার সাধনা। উপার্জন যেভাবে যে উপায়েই হোক না কেন, শর্তটা থাকবে উপার্জনটাই মোক্ষম। হয়তো বা অসাধু উপায়ে হলেও।

কিন্তু না, মা সম্পর্কে এ রকম ভাবা সমীরের অন্যায়। তখন সে এ রকম ভাবতো না। তখনো ভাবতো না, কখনো ভাবেনি, এখন ভাবছে। এখন ভাবছে? কেন ভাবছে? মার উপর রাগ হয়েছে বলে ভাবছে? মা সঙ্গে আসেননি বলে ভাবছে? সমীর জানে না।

সাহিত্যের দরজা থেকে বরাবরের মতো সেবারেও ফিরতে হয়েছিলো। ইংরেজী অনার্সের বদলে ইকনমিকস অনার্স নিয়ে

ছলো ছলো চক্ষে সংগম করতে হয়েছিলো চাকরির ক্ষেত্র। তারপর হাকিম হবার পালা।

না, এটা প্রথমে প্ল্যান ছিলো না মার। তিনি ভেবেছিলেন, পাশ করে বেরুলো মাত্র ছেলে বুঝি মস্ত দরজা পেরিয়ে এক সোনার পুরীর সন্ধান পাবে। তা সে পায়নি। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েও পায়নি। আসলে পাবার প্রশ্ন ওঠেনি। কেননা তখন সবাই জেদ ধরেছিলো এখুনি সে চাকরিতে ঢুকবে না। টিউশানি করবে আর এম-এ পড়বে।

[illegible] মাকে এ নিয়ে [illegible] কিছু নেই। মা যে তাকে [illegible] এ এম পরীক্ষায় [illegible] ছিলেন বি এ পাশ করবার পরে, তার মনে [illegible] কিছু ফেলে দেবার মতো হয়নি। এই তো আজ তার কী সুন্দর মসৃণ জীবন; এই জীবনে তাকে পৌঁছে দিল কে? মা। মা-ই তো। এই মান, সম্মান, অভ্যর্থনা, ক্ষমতা—তার মুঠোর মধ্যে আজ কে ভরে দিল? মা। মা-ই তো। যেখানেই যখন যায় শহরের সবচেয়ে সেরা বাড়িটি নির্দিষ্ট থাকে তার জন্য। বয় বেয়ারা মালি মেথর সব প্রস্তুত। সে হ'লো কালেক্টার সাহেব, তার দৃষ্টি পাবারই তো ছোট্ট ছোট্ট মফঃস্বল শহরের একমাত্র কামনা। অধস্তনেরা তো বটেই, ইস্কুলের মাস্টার, কলেজের অধ্যক্ষ, [illegible] মালিক, ডাক্তার উকিল কে না তাকে তোয়াজ করে? শীতকালে ভর্তি ঝুড়ি ঝুড়ি লেবু, আর কই মাছ, বর্ষাকালে পিঠ চওড়া চওড়া সের দেড়সের ওজনের সব গঙ্গার ইলিশ, গ্রীষ্মকালে আম জাম লিচু—উপহারের অন্ত নেই। আসুক না ক্রীসমাস, কতো ফল কতো কেক। যে সময়ের যা, যে উপলক্ষ্যে যা, সব—সব তার করায়ত্ত।

করায়ত্ত, না? কিন্তু সে তো এসব চায় না। এ তো তার পছন্দ নয়। অনেক বারণ করে সে লোকদের, তা। শোনে না। এই জন্যই শোনে না, তাঁর মা রাগ করেন এসব উপঢৌকন না এলে। তার সর্বময়ী কর্ত্রী মা রাণীর মতো মর্ত্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করেন এসব, খুঁত ত্রুটি ধরে রাগ

করেন। খালি হাতে এসে ছেলের সংসারে নিজেই হাকিমী দণ্ড ধারণ করে বিচার করেন। দুর্বল চরিত্র অনুগত পাত্রের পাতলা কান ভারি করে তোলেন নালিশে। রেগে গিয়ে সমীর সায়েস্তা করে তাদের, বুঝেও বোঝে না তার নিজস্ব কর্তব্য কোনটা। অনেক সময় হঠাৎ হঠাৎ তার বিবেক অশান্ত হয়ে ওঠে, তাকিয়ে দেখতে পায় যা সে করছে আর যা সে নিজে তার মধ্যে কোন মিল নেই। যেন একটা ছদ্মবেশী মানুষ কার হ'য়ে বদলা কাজ ক'রে যাচ্ছে অবিরত। আপন কর্মের প্রহারে তখন আপনি জর্জরিত হয়, অনেক রাত্রির অনেক নির্ঘুম প্রহর তাকে ব্যাকুল ক'রে তোলে। চিরদিন মায়ের হাতের পুতুল হ'য়ে থাকার অনির্দেশ্য যন্ত্রণায় ভোগে সে। তবু তার নিস্তার নেই। মনে হয় আমৃত্যু এই পংগুতা কষ্ট দেবে তাকে। মায়ের উচ্ছ্বাব অতন্দ্র প্রহরী হয়েই কেটে যাবে জীবন। অভ্যাস। অভ্যাসের ফল। এই অভ্যাসের ফলেই সে এমন ব্যক্তিত্বহীন। এর বিরুদ্ধে আর কিছু করার ক্ষমতা নেই তার। হোক ন্যায়, হোক অন্যায়, মাকে সে কখনো, কোনোদিন, কোনোরকমেই অস্বীকার করতে পারবে না।

কিন্তু কী অদ্ভুত। এই বিশ্লেষণ এতোদিন কোথায় ছিলো তার? এখন তার বয়স ছত্রিশ বছর আট মাস নয়দিন। এই দীর্ঘজীবনে আর কবে সে এমন করে চিরে চিরে দেখেছে নিজেকে? কখনো না, কোনোদিন না। এমন কি সেদিনও না, যেদিন একটা একটা করে বুকের পাঁজর ভেঙে নিয়ে সে চলে গিয়েছিলো। কোথায় গেল সে। কেন গেল।

না, এখন আর কোনো শোক নেই, বিরহ নেই, তবু একটা হাহাকার ছড়িয়ে আছে বুকে।

গংগাতীরের এই বিশাল বাড়িটির একক বারান্দায় বসে, অথবা একক শয্যায় শুয়ে অথবা একা একা বিশ্রাম ভোগ করতে করতে, বারে বারে কতো ভুলে যাওয়া কথাই যে চমকে ওঠে বুকের মধ্যে!

মা-বিরহিত হ'য়ে বস্তুত এই সে প্রথম কোনো কর্মস্থলে এসে একা হয়েছে। মা তাকে কোনোদিনই এভাবে ছেড়ে দেননি। তিনি জানেন তাঁকে ছাড়া তাঁর পুত্রের দশদিক অন্ধকার। সমীর কিছু পারে না, কিছু জানে না। সমীর একান্তভাবেই তার মায়ের উপর নির্ভরশীল মানুষ। তাছাড়া ছেলেকে একা ছাড়তে প্রাণেও সয় না। কে জানে কতো অযত্ন হবে হয়তো, হয়তো অসুখ করবে, হয়তো ঘরের মধ্যে বোবায় ধরবে, হরেক চিন্তায় কাতর হ'য়ে তিনি কাছে কাছে থাকেন। সেবায় যত্নে প্রভুত্বে প্ররোচনায় ভরে রাখেন দিন রাত। না, মা থাকলে কখনো নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করে না সমীর। এই মা-ই একশো হাতে সব ভুলিয়ে দেন। সংসারের সকল ভালমন্দ ধুলোবালি থেকে পুতু পুতু ক'রে আগলে রাখেন, সব দিকের সব জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে একমুখী ক'রে তোলেন। মায়ের কাছে সমীর সব সময়েই নির্মল শিশুমাত্র। ছেলের জন্য তিনি সতত্ই অক্লান্ত। এজন্য মায়ের কাছে নিশ্চয়ই তার চিরকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তা সে আছেও।

'মাগো, আমি কখনো তোমার অবাধ্য হবো না' 'মাগো, তুমি যখন যেমন ক'রে আমাকে চাও, আমি তাই হবো।' 'মাগো, তুমি দুঃখী, আর আমি তোমার দুঃখহরণ' 'মাগো, আমি আমৃত্যু তোমার, তোমার, একান্ত তোমার।' 'মাগো, তুমিই আমার স্বর্গ মর্ত্য, পাতাল, তুমি সব। তুমিই আমার মঙ্গল অমঙ্গলের একমাত্র কর্ত্রী, তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই গায়ত্রী, তুমিই দুর্গা।' এইসব শব্দগুলো সমীর নানাসময়ে নানাভাবে কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করেছে মনে মনে। কতোবার তা সারা পরিবেশ ভরেছে। কতোবার কেন, সারাজীবন এই সত্যই যে পালন করে এসেছে মায়ের কাছে। এই নিঃশব্দ প্রতিজ্ঞায় চিরদিন সে অটল, অচল।

শুধু, এখন, এই নির্জন নিঃসঙ্গ রাত্রি-দ্বিপ্রহরের বিশাল বাড়িটাতে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে পায়চারি করে, কেন যে বারে বারে মন তার উধাও হচ্ছে কে জানে। কেন যে আবার সবকে এড়িয়ে, সবকে ছাড়িয়ে ফিরে ফিরে তাকেই মনে পড়ছে তাই বা কে জানে। এই সবটা যদি মা দেখতে পেতেন, বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যেতেন। কিন্তু মাগো, তুমি রাগ করো না, বিরক্ত হয়ো না, একটা সত্য কথা আমি তোমাকে না জানিয়ে পারছি না, আমি আজ স্বাধীন হয়েছি, আমার মন আজ স্বাধীন চিন্তায় সক্ষম হয়েছে। আমি কেমন করে যেন কোন জানালায় উঁকি মেরে দেখতে পেয়েছি আমারও একটা আলাদা সত্তা আছে, যাকে আমি ভালোবাসি। যাকে আমি এই প্রথম অনুভব করছি বুকের মধ্যে। আমার অস্তিত্বকে আজ আমি নিজেই অভিনন্দন জানাচ্ছি। (ক্রমশ)

কেবল ভোগ করে নিন

সুমথনাথ ঘোষ

সত্যি কথা বলতে কি, খাস শহরের লোক শুনলে এই সেদিন পর্যন্ত আমার দেহে মনে কেমন একটা যেন শিহরণ জাগতো। ঠিক বিস্ময় নয়, শ্রদ্ধা বললেও ভুল হবে, একপ্রকার সম্ভ্রমের ভাব আপনা-আপনি যেন ফুটে উঠতো।

রাজধানী কলকাতা, ইংরেজ রাজত্বের পীঠস্থান, লণ্ডনের পরেই, 'যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না', তার দ্বিতীয় মহানগরী, বিশ্ববন্দিত, যেখানে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রদীপ অহর্নিশ দেদীপ্যমান, সেইখানে সাহেবদের সঙ্গে যারা একই বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়, একই আকাশের চন্দ্রাতপের তলায় একই কলের জল খেয়ে, একই বৈদ্যুতিক আলোয় বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বাস করে, তাদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব যে কিরকম ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তারা যেন এক ভিন্ন জগতের লোক, কোন সুদূর অধিবাসী!

অথচ সবচেয়ে মজার কথা, আমার বাড়ি থেকে এই শহরের দূরত্ব তখন ছিল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের রুটকোড'-এর হিসাবে চার মাইল। কারণ ট্রেনই ছিল শহরের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। এক আনার একখানা থার্ড ক্লাস টিকিট কেটে কোনোরকমে 'ডেলি প্যাসেঞ্জারদের' ভিড়ের ভেতর একবার মাথা গলিয়ে দিতে পারলে কিংবা ক্যানিং লক্ষ্মীকান্তপুর বা ডায়মণ্ড হারবারের আমদানী শাকসব্জির বোঝা,

বলেই দু'জন প্যাসেঞ্জার খপ করে আমার হাত ধরে ওপরে টেনে তুলে নিলেন।

ভেতর থেকে একজন বলে উঠলেন, ছিঃ এরকম করে 'লাইফ রিস্ক' করে! নটা পাঁচের ট্রেনে না হয় যেতেন—কয়েক মিনিট পরেই ত!

প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক পানখাওয়া দাঁতের গোড়া দেশলাই কাঠির পিছন দিয়ে খুঁচতে খুঁচতে একবার জবাব দিলেন, মার্চেণ্ট অফিসের কেরানীর দুঃখ আপনি কি বুঝবেন দাদা, আপনি যে সরকারী অফিসে কাজ করেন!

এমনি আরো অনেক মন্তব্য এধার ওধার থেকে যখন আমার কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করছিল তখনো আমি কিন্তু ভদ্রলোকের সেই কথাটা যেন শুনতে পাচ্ছিলাম, 'ভোগ করে নিন', কেবল ভোগ করে নিন।'

'ভোগ' মানে উপভোগ, না কর্মভোগ, কোনটা তিনি যে বলতে চান, বুঝতে না পেরে ভাবছিলাম, ভদ্রলোকের মাথাটার কিছু ছিট আছে!

দেখা মনে পড়ে, সেদিন রবিবার, বাজার করে ফিরছি বড় রাস্তা ধরে, তাঁর সঙ্গে দেখা!

এই যে বাজার করতে গিয়েছিলেন? আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমার ত চাকরবাকর রাখার সামর্থ্য নেই, নিজেকেই সব করতে হয়!

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, খুব ভাল! বলেই আমার থলেটার ওপর একবার চট্ করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, গলদা চিংড়ি কিনেছেন দেখছি।

চিংড়ি মাছের শুঁড়গুলোর মধ্য দিয়ে যে উঁকি মারছিল বুঝতে পারিনি। তাড়াতাড়ি সেটা লুকোবার জন্যে থলেটা ধরে নাড়া দিতে যাচ্ছি, এমন সময় তাঁর কণ্ঠ থেকে সেই অমোঘ বাণী বেরিয়ে এলো, যত পারেন ভোগ করে নিন, কেবল ভোগ করে নিন।

মনে হলো আমার দু' গালে দুটো চড় মেরে যেন তিনি চলে গেলেন! গলদা চিংড়ী বড়লোকের খাদ্য, ভোগের জিনিস, জানি। কিন্তু আমি যে চিংড়ী কিনেছিলাম, তা ভদ্রলোকেরা ছোঁয় না। ছোটো গলদা চিংড়ী দিয়ে ফুলকপির কালিয়া লুচির সঙ্গে খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু এমনি আকাশ-ছোঁয়া চিংড়ীর দাম যে দর শুনে সোজাই পালিয়ে আসি। ওইদিন কয়েকটা ঘাড়-মটকানো, লাল রঙের, রসা চিংড়ী সিকি দামে পাওয়াতে ঘিয়ের বদলে ছোট্ট একটা বনস্পতির টিন ও ফুলকপি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম।

তাই একবার মনে হলো, ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ঢেলে দিই সব। তিনি নিজের চোখে দেখুন, কি মর্মান্তিক রসিকতা করেছেন আমার সঙ্গে। ধনীর সঙ্গে কেরানীর ভোগবিলাসের যে আকাশ-পাতাল

[illegible] রূপবতী চামচ করে ফলের রস খাওয়াচ্ছে ওঁকে।

এই যে আসুন। আমায় দেখেই প্রথমে তিনি সম্বোধন করলেন। তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হলো না যে তিনি খুব অসুস্থ। তবু প্রশ্ন করলুম, কেমন আছেন?

বেশ সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ভাল আছি। তবে বয়েস হয়েছে, এখন টিকিট কেটে স্টেশনে অপেক্ষা করা ট্রেনের জন্যে—

কি বলছেন! বয়েসের তুলনায় আপনি অনেক 'ফিট' আছেন।

চোখ দুটো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দীপ্ত হয়ে উঠলো। বললেন, বলুন ত, আমার এই বউমাদের একটু বুঝিয়ে। কিছুতেই বাইরে বেরুতে দেবে না। বড় বড় ডক্তার এনে কেবল কতগুলো পয়সা মিছিমিছি নষ্ট করছে। যত বলি আমি খুব সুস্থ আছি ওরা বিশ্বাস করে না, আমার কথা! এবার হঠাৎ একটু থেমে আমায় প্রশ্ন করলেন, তারপর আপনার সব খবর ভাল ত?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। আপনার আশীর্বাদে এক রকম আছে সবাই।

আমার মন ওই একজনের। বলে হাতটা তুলে একবার ওপরের দিকে দেখালেন। তারপর একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলেন অফিস যেতে হবে ত আজ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। না গেলে কোম্পানীর [illegible] কোথায় পাবো?

ঠিক। এই বয়েসে কেবল পরিশ্রম করুন। আর ভোগ করে নিন, যত পারেন ভোগ করে নিন।

এর ঠিক দু'দিন পরে ভবনাথবাবু মারা গেলেন, হঠাৎ হার্টফেল করে।

শ্রাদ্ধের আগে খবর জানাতে এলেন তাঁর বড় ছেলে অভিজিৎবাবু। তাঁর বাবার বয়েসটা ঠিক কত হয়েছিল জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, সাতাত্তর বছর দু মাস!

বলেন কি, এতো হয়েছিল? আশ্চর্য, বাইরে থেকে একেবারে ধরা যেতো না। এখনো রীতিমত শক্ত ছিলেন। বাইরে থেকে দেখলে নিরীহ অমায়িক মনে হলেও আসলে কিন্তু তাঁর ভেতরটা ছিল তেজস্বিতা আর পৌরুষের দম্ভে ভরা।

ঠিক বলেছেন! বাবাকে আপনি ঠিক চিনে ছিলেন! যাকে বলে পুরুষসিংহ তিনি তাই ছিলেন। তাই এতখানি আত্মবিশ্বাস নিজের ওপর রাখতেন যে, তাঁর মতের বিরুদ্ধে যাবার আমাদের কারো সাহসই ছিল না। তিনি যা করবেন, তা আমরা মানতে বাধ্য। তা সে ভালো হোক, আর মন্দ হোক। তবে মন্দ হতে কখনো দেখিনি। বিচারবুদ্ধি রুচিজ্ঞান, সবদিক থেকে তাঁর 'টেস্ট' এত উঁচু সুরে বাঁধা ছিল যে, আমরা তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারতুম না। একটা কথা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এই সেদিন যে আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, তার কনেও তিনি পছন্দ করে এনেছেন। আমরা এত মেয়ে পছন্দ করেছি কিন্তু উনি দেখেই নাকচ করে দিয়েছেন। এমন কি যে বিয়ে করবে, সেও যাকে পছন্দ করেছিল, তাকে বরখাস্ত করে দেন, ধ্যেত ওকে সুন্দরী বলে নাকি? তারপর নিজে খুঁজে এনেছিলেন যে মেয়েকে, তার রূপ দেখবার মত। আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সত্যি সত্যি আমাদের ফ্যামিলির সব বউয়ের সেরা।

বললুম, তিনি ছিলেন ধনীর সন্তান। ছেলেবেলা থেকে জীবনটাকে উপভোগ করেছেন সব দিক থেকে, কাজেই তাঁর টেস্ট-এর সঙ্গে কার তুলনা? 'রতনে রতন চেনে—'

না। ওকথাটি বলবেন না। অভিজিতবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন। বাবার সামনে ওকথা কেউ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন! তিনি বড়লোকের ছেলে হয়ে জন্মেছিলেন এইটুকু মাত্র! নইলে বাপের অতুল সম্পত্তি কড়ে আঙুল দিয়েও স্পর্শ করেননি। তাঁর চরিত্রের এটাই ছিল মহত্ত্ব! যারা বাপের

পয়সার কাপ্তেনি করে তাদের তিনি ঘেন্না করতেন, পুরুষ বলে মনে করতেন না।

বলেন কি?

হ্যাঁ, জীবনটাকে তিনি উপভোগ করেছেন সত্যি, তবে সবটাই নিজের উপার্জনের পয়সায়—বাপের একটা কানাকড়িও হাত দিয়ে ছোঁননি, সেটাই বাইরের লোক জানে না! এক দিকে তিনি যেমন দৃঢ়চরিত্র, আত্মাভিমানী, অন্য দিকে তেমনি ভোগবিলাসী ছিলেন।

এই বলে গলাটা একটু নামিয়ে অভিজিৎবাবু বললেন, ভাবতে পারেন, আজ যাঁকে আপনারা দেখেছেন, খালি গায়ে, কাপড় জড়িয়ে, তালতলার চটি পায়ে আপনাদের এই রাস্তায় পায়চারি করতে, একদিন সেই মানুষই ফরাসডাঙার কোঁচানো ধুতি লুটিয়ে, গিলে-করা পাঞ্জাবি আর মখমলের নাগরাজুতো পায়ে দিয়ে আতর-গোলাপের খোশবাই বাতাসে ছড়াতে ছড়াতে যখন ল্যান্ডো গাড়ি হাঁকিয়ে সন্ধ্যাভ্রমণে বেরুতেন, তখন তাঁর সেই গাড়ির বিরাট দুই ওয়েলার ঘোড়ার মিলিত খুরের ধ্বনিতে কেবল রাস্তা মুখরিত হয়ে উঠতো না, দু'পাশের বাড়ির জানালা খুলে যেতো। মেয়ে পুরুষে চেয়ে থাকতো। চৌধুরী-বাড়ীর ছোটবাবুর দিকে। ভাবতে পারেন যে, এক এক রাত্রে 'নাইটক্লাব' করতে গিয়ে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দিতেন তিনি। একটা রক্ষিতার খরচ জোগাতে গিয়ে যখন বড় বড় লোকের ছেলেরা ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতো, বাবা তখন সমানে দু' তিনজন চালিয়ে গিয়েছেন?

এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে শুনছিলাম। অভিজিৎবাবুকে চুপ করতে দেখে বললুম, বলেন কি, এ যে বিশ্বাস করা যায় না! কে বলবে যে ওই ভদ্র, নিরীহ, অমায়িক প্রকৃতির মানুষটি একদিন, এরকম উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন?

উচ্ছৃঙ্খল? চীৎকার করে উঠলেন অভিজিৎবাবু। 'উইথড্র' করুন আগে ওকথাটা! একটা দিনের জন্যেও কেউ তাঁকে কখনো পথেঘাটে বা দশজনের সামনে বেলেল্লাগিরি করতে দেখেনি। আবার স্ত্রী পুত্র, পরিবার নিয়ে সংসারধর্ম যেমন তিনি পালন করেছেন তেমনি মা বাপ, আত্মীয়স্বজন ও সমাজের প্রতি যথাকর্তব্য পালনে কখনো বিরত হননি। এমন কাজ একদিনের জন্যেও করেননি, যাতে বংশমর্যাদা ও বাপের সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

এই বলে গলাটা একটু খাটো করে অভিজিৎবাবু বললেন, শুনলে আশ্চর্য হবেন যে রাত্তির দশটার পর তিনি কখনো বাড়ির বাইরে থাকতেন না। আমার মা-বাবার মত সুখী দম্পতি নাকি আমাদের চৌধুরী পরিবারে খুব কম ছিল। বাস্তবিক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন বাবা। ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনেছি, বাবার যখন আঠারো বছর বয়স, একদিন ঠাকুরদাদা তাঁর জুড়ি হাঁকিয়ে সেই রামবাগানে গেছেন, দেখেন তাঁর ভিক্টোরিয়া গাড়িটা এক বিখ্যাত বাইজীর বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোচম্যানকে হুকুম দেন, এই জুড়ি গাড়ি ঘুরাও! সেই যে তিনি ঘরে ফিরে এলেন, আর জীবনে নাকি ওপথ মাড়াননি।

ওদিকে বাবা বাড়ি ফিরলে তিনি অগ্নিমূর্তি ধরলেন। বললেন, কাপ্তেনী করতে হয়, নিজের রোজগারে করো, বাপের পয়সায় নয়। বাপের কর্তব্য ছেলে যতদিন না সাবালক হয়, তাকে প্রতিপালন করা। আমার মনে হয়, তুমি এখন কেবল সাবালক হওনি, তার চেয়ে আরো কয়েক ধাপ উঁচুতে উঠেছো, লায়েক হয়েছো। তাই আমার হুকুম—আজ থেকে আমার অনুমতি ছাড়া কোনদিন গাড়িতে হাত দেবে না!

অভিজিৎবাবু এবার একটু দম নিয়ে বললেন, এতে বাবার আত্মসম্মানে এমন ঘা লাগে যে, সেইদিন রাত্রেই কাউকে কিছু না বলে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেন। তারপর নিরন্তর কঠোর পরিশ্রমের ফলে পাটের দালালী ও আমদানি রপ্তানির ব্যবসা থেকে অল্প দিনের মধ্যেই ফুলে-ফেঁপে ওঠেন এবং নিজেই বাড়ি গাড়ি সব কিছু করেন। ঠাকুরদাদার দুখানা বাড়ি ছিল, তিনি তিনখানা বাড়ি করেন। ঠাকুরদাদার ছিল দু'খানা গাড়ি, উনি করেন তিনখানা।

ঠাকুরদাদা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন বাবাকে ডেকে বলেছিলেন, তুমি আমার সব সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। আমার বংশের গৌরব। বাপের ওপরে টেক্কা দিয়েছো, সব দিক থেকে। তোমার মত ছেলে রেখে যে মরতে পারছি, তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর আমার কিছু নেই।

এই বলে হঠাৎ অভিজিৎবাবু হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, জানি ছেলে হয়ে বাপের প্রশংসা করা আত্মপ্রচারের সামিল, বাবাকে আপনি খুব শ্রদ্ধা করতেন, তাই হঠাৎ আবেগের মুখে এত কথা বলে ফেলেছি, তার জন্য মনে কিছু করবেন না।

অভিজিৎবাবু চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি চুপ করে সেই একই চেয়ারে বসে রইলুম। থেকে থেকে কেবল ভবনাথবাবুর সেই কথাটা যেন কানের কাছে বাজতে লাগল, 'ভোগ করে নিন', যত পারেন ভোগ করে নিন।

সহসা চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠলো, সেদিনের সেই দৃশ্যটা! অসুস্থ হয়ে তিনি বিছানায় বসে আছেন, আর দুটি তরুণী রূপসী পুত্রবধূ তাঁর সেবা করছে। এই মাত্র অভিজিৎবাবু যে কথাটা বলে গেলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও মনে পড়ে গেল, 'ছোটভাইদের জন্যে যত সুন্দরী মেয়ে আমরা পছন্দ করি, বাবা সব নাকচ করে দেন। শেষে খুঁজে খুঁজে তিনি নিজেই এই অপরূপ সুন্দরী পুত্রবধূকে ঘরে আনেন!'

আবার ভবনাথবাবুর সেই কথাটি মনে হলো, 'ভোগ করে নিন', 'যত পারেন ভোগ করে নিন'।

এও কি তবে সেবা নয় ভোগ? তাঁর জীবনের শেষ উপভোগ! কে জানে।

চৌত্রিশ

চকদীঘির সিংহরায় পরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বহুকাল ঘনিষ্ঠতা। বিশেষ করে সারদাপ্রসাদ আর ছক্কনলাল সিংহরায়ের সঙ্গে। মাঝে মাঝে কিছু দিন বিদ্যাসাগর সিংহরায়দের চকদীঘির বাড়িতে গিয়েও থেকেছেন। বিদ্যাসাগরের কথায় সিংহরায় পরিবার চকদীঘিতে স্থাপন করেছে একটি ইংরেজী-সংস্কৃত হাই স্কুল এবং একটি হাসপাতাল।

এবার বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন, দিন কয়েক চন্দননগরে থেকে হাওয়া-বদল করে যাবেন। চন্দননগরে গিয়ে থাকবেন ঘোষ-বাবুদের এক বাগানবাড়িতে, নাম 'মেজরের কুঠি'। আসার কয়েক দিন আগে বাড়ি দেখে গেলেন।

ওই 'মেজরের কুঠি'র খুব কাছে গঙ্গার ধারে একটা বাড়িতে তখন থাকেন ছক্কনলাল সিংহরায়। খবর পেয়ে ছক্কনলালের বাড়িতে এলেন বিদ্যাসাগর।

ছক্কনলালের একটি ছেলের নাম মণিলাল। রজনীলালের মেজদাদা, মণিলাল।

মণিলালের তখন খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। রজনীলাল এসে বলল—মেজদাদা, বিদ্যাসাগর মশায় এসেছেন। বাবা তোমায় ডাকছেন।

দু ভাই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল।

বিদ্যাসাগর বসে আছেন। পরনে ধুতি, সাদা মেরজাই, সুতী চাদর, পায়ে চটি। রজনীলালের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়ে গেছে। এবার ছক্কনলাল মণিলালের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মণিলাল বিদ্যাসাগরের পায়ের ধুলো নিল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে।

বিদ্যাসাগর সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন—অমন করে কী দেখা হচ্ছে?

মণিলাল বলল—যাঁর কথা এত দিন কত শুনেছি, আজ নিজের চোখে তাঁকে প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, তাই দেখছি।

মণিলালের বয়স তখন বাইশ বছর।

যা হোক, সেদিন 'মেজরের কুঠি' দেখে আবার কলকাতা চলে গেলেন বিদ্যাসাগর। ছক্কনলাল নিজেদের গাড়িতে করে বিদ্যাসাগরকে স্টেশনে দিয়ে এলেন।

দিন কয়েক বাদে আবার চন্দননগরে এলেন বিদ্যাসাগর। সঙ্গে এসেছে তিন দৌহিত্র—সুরেশ, যতীশ আর লাটু।

ছক্কনলাল বিদ্যাসাগরকে ডাকতেন—খুড়োমশায়। আর বিদ্যাসাগর ছক্কনলালকে ডাকতেন—খুড়ো। ছক্কনলালের স্ত্রীকে ডাকতেন—খুড়ী। ছক্কনলালের ছেলেরা বিদ্যাসাগরকে ডাকত—দাদামশায়।

প্রত্যেক দিন সকালে ছক্কনলাল যান 'মেজরের কুঠি'তে বিদ্যাসাগরের কাছে। সেখানে বসে দুজনের নানারকম কথাবার্তা হয়। কথাবার্তার মধ্যেই ছক্কনলালের বাড়ি থেকে চা আসে।

বিকেলবেলা নিজেদের গাড়িতে বেড়াতে বেরোন ছক্কনলাল। প্রত্যেক বিকেলে 'মেজরের কুঠি'র সামনে গিয়ে উঁচুগলায় বিদ্যাসাগরকে ডাকেন—খুড়োমশায়।

খুড়ো।

দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে যান। সন্ধ্যার আগে ফিরে আসেন।

সুরেশকে 'কুমারসম্ভব' পড়াচ্ছেন একদিন বিদ্যাসাগর। মণিলাল খুব মন দিয়ে শুনছে। বিদ্যাসাগরের চোখ এড়াল না। বিদ্যাসাগর মণিলালকে জিজ্ঞেস করলেন—তুই সংস্কৃত জানিস?

মণিলাল বলল—দাদামশায়, আমি ফার্স্ট ক্লাসের ছেলে, কেমন করে বলি যে, আমি সংস্কৃত জানি? তবে আপনিই আমাদের স্কুল করিয়েছেন, আপনি তো জানেন যে, আমাদের স্কুলে সংস্কৃত বিশেষভাবে পড়ানো হয়। আমি তা সাধ্যমতো শেখার চেষ্টা করি, এই পর্যন্ত বলতে পারি।

উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলেন বিদ্যাসাগর। সুরেশের সঙ্গে মণিলালকেও ছাত্র করে নিলেন। নতুন ছাত্রের কাছ থেকে বিদ্যাসাগর কোনো মাইনে নেবেন না?

বিদ্যাসাগর গম্ভীর হয়ে মণিলালকে জিজ্ঞেস করলেন—আমায় কী মাইনে দিবি?

মণিলাল বলল—আমিই তো আপনার।

বিদ্যাসাগর তবু গম্ভীর। বললেন—শুধু ওসব ফাঁকা কথায় হবে না।

মণিলাল বলল—আপনিই বলুন। যদি তা আমার অসাধ্য হয় তো জানব যে, আমিই কেবল আপনার দয়া থেকে বঞ্চিত হব।

বিদ্যাসাগর বললেন—আচ্ছা, একদিন অন্তর তোদের বাগানের একটি করে বেল তোকে পড়ানোর পারিশ্রমিক ধার্য করলাম। সেদিন খুড়ীকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে তোদের গাছে অজস্র বড়ো বড়ো ভালো বেল হয়েছে দেখে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল মণিলাল।

বিদ্যাসাগরের কাছে 'কুমারসম্ভব' পড়ে যাচ্ছে মণিলাল। এবং কথামতো বিদ্যাসাগরকে বেল সরবরাহ করে যাচ্ছে।

হঠাৎ একদিন মালী এসে মণিলালকে বলল—বিদ্যাসাগর মশায় বেল ফেরত দিয়েছেন। আর না বলা পর্যন্ত বেল নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন।

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল মণিলাল।

সেদিনও বই নিয়ে গেল মণিলাল, সুরেশের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সামনে বসল, কিন্তু বই খুলল না।

বিদ্যাসাগর বললেন—হল কী? বই খোল।

মণিলাল বলল—আমি আপনার কাছে এমনি পড়ব কেন?

আসল কারণ বুঝতে পারলেন বিদ্যাসাগর। সহাস্যে বললেন—পরশু খুড়োর সঙ্গে ঠাকুরবাবুদের চাঁপদানীর বাগানে গিয়েছিলাম। সেখানে এক গাছ খুব সুন্দর বেল হয়েছে দেখে প্রশংসা করায় তোমার বাবা সেই বেল এক ঝুড়ি আমায় দিয়েছে, তাই মালীকে আর এখন বেল দিতে বারণ করেছি।

মণিলাল বলল—বেশ, তা হলে আপনার খুড়োকেই পড়াবেন।

অগত্যা ছক্কনলালের দেওয়া সমস্ত বেল তক্ষুনি ছক্কনলালকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। মণিলালকে আবার আগের মতো বেল সরবরাহ করে যেতে বললেন।

সমস্ত বেল ফেরত পেয়ে ছক্কনলালও নিশ্চয় অবাক হয়েছেন। পরে তিনি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—খুড়োমশায়, কেন বেল ফিরিয়ে দিয়েছেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—আর সে কথায় কাজ নেই বাবা। তোমার মধ্যম পাণ্ডব খাপ্পা হয়েছেন। বলেন কিনা, যাঁর কাছ থেকে বেল নিয়েছেন তাঁকে পড়ান গে। শেষে কি তোমাকে পড়াতে গিয়ে এই বয়সে চাবুক খাব? তাই তোমার বেল ফেরত দিয়েছি।

খুব ভোরে চন্দননগরের গঙ্গাতীরের রাস্তাটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত গতিতে হেঁটে আসতেন বিদ্যাসাগর। বাড়ি ফেরার পথে মণিলালের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মণিলাল বিদ্যাসাগরের বাড়িতেই যাচ্ছে।

একদিন সকালবেলা রাস্তায় একটা কাণ্ড হল। কে একজন ভদ্রলোক মণিলালকে জিজ্ঞেস করলেন—এখানে বিদ্যাসাগর কোথায় থাকেন?

লোকের জ্বালায় বিদ্যাসাগর অস্থির, মণিলাল ভাবল, এই ভদ্রলোককে ভাগিয়ে দেওয়া যাক। মণিলাল ভদ্রলোককে বলল—বিদ্যাসাগর চন্দননগরে নেই। কলকাতায় গেছেন।

সেই মুহূর্তে বিদ্যাসাগর উপস্থিত। মণিলালের কথা তিনি শুনতে পেয়েছেন। ভদ্রলোককে বিদ্যাসাগর বললেন—ও জানে না, আমি কাল রাত্রে ফিরেছি।

ভদ্রলোককে সাদরে বাড়িতে নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর।

পরে বিদ্যাসাগর মণিলালকে জিজ্ঞেস করলেন—তুই মিথ্যে বলে ওই লোকটাকে ভাগিয়ে দিচ্ছিলি কেন?

মণিলাল বলল—আপনি যে কেবল নাকে কাঁদেন যে, আর পারি না, লোকের জ্বালায় যাই কোথায়?

বিদ্যাসাগর বললেন—আর অমন করে লোক ভাগাসনি।

মণিলাল বলল—ভালো, এবার থেকে লোক ডেকে এনে দেব।

বিদ্যাসাগর বিচলিত হয়ে বললেন—তাই নয়, যতদিন বেঁচে থাকি যথাসাধ্য পরের জন্য যা পারি করবার চেষ্টা করব।

বাংলা ১২৯৮ সনের ১৪ জ্যৈষ্ঠ বিদ্যাসাগর চন্দননগরে বসে আপন শরীর বিষয়ে লিখেছেন: "আমার অবস্থা ক্রমে মন্দ হইয়েছে। এক দিনের জন্যও সুস্থ নহি।"

১৮৯১ সালের গোড়ার দিকে এক রবিবারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শুনলেন, বিদ্যাসাগর হাওয়া-বদলির জন্য ফরাসডাঙায় এসেছেন। একেবারে গঙ্গার পাড়ে একটা বাড়িতে আছেন।

এত কাছে যখন আছেন, হরপ্রসাদের সাধ হল, বিদ্যাসাগরকে একদিন নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। একখানা নৌকো করে ফরাসডাঙার দিকে চললেন হরপ্রসাদ।

আতপুরে একটা কাজ আছে। সেই কাজ সেরে ফরাসডাঙায় গেলেন হরপ্রসাদ।

ফরাসডাঙায় বিদ্যাসাগরের বাড়ির সামনে গঙ্গার চড়ায় বিস্তর ইট পড়ে আছে। রাস্তা নেই, সেই ইটের উপর দিয়ে খুব কষ্টে যেতে হবে।

নৌকো থেকে নেমে হরপ্রসাদ দেখলেন, সামনের বাড়িতে বারান্দায় বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে আছেন। বিদ্যাসাগর সব দেখতে পেয়েছেন—হরপ্রসাদ নৌকো থেকে নেমেছে, ইটের উপর দিয়ে কষ্ট করে আসছে।

কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে পড়লেন হরপ্রসাদ। উপর থেকে বিদ্যাসাগর বললেন—ঘরের ভেতর ঢুকো না, সিঁড়ি আছে।

উপরে উঠে গেলেন হরপ্রসাদ। বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে আছেন। আর টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে আছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের কলেজে চাকরির চাইতে এসেছেন আশুতোষ।

আশুতোষকে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজে নিতে রাজী হলেন। দু'শো টাকা মাইনে দেবেন। কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল, উঠবার জন্য ব্যস্ত হলেন আশুতোষ।

বিদ্যাসাগর বললেন—তা হবে না। কিছু খেয়ে যেতে হবে।

পিছনের হল-ঘরে ঢুকলেন বিদ্যাসাগর। পাঁচ-সাতটি কাঁচের আলমারি সেখানে। প্রত্যেক তাকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আম।

আশুতোষকে একখানা আসনে বসালেন বিদ্যাসাগর। আশুতোষের সামনে একখানা রেকাবি দিলেন। তারপর নিজে ছুরি দিয়ে আম কাটতে বসলেন। একবার এ আমের এক চাকলা দেন, আর একবার ও আমের এক চাকলা দেন। পাঁচ-সাত রকমের আম খাওয়ালেন আশুতোষকে।

আশুতোষ চলে গেলেন।

তারপর বিদ্যাসাগর হরপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন—তুই এখানে কোথায় এসেছিলি?

—আপনি এত কাছে আছেন, তাই মনে করেছি, যদি আপনার পায়ের ধুলো আমার বাড়িতে পড়ে।

বিদ্যাসাগর বললেন—কিন্তু তুই যে এদিক দিয়ে এলি?

কিছুই বিদ্যাসাগরের চোখ এড়ায়নি।

হরপ্রসাদ বললেন—আপনার এখানে আসব বলেই বেরিয়েছিলাম, পথে একটা কথা মনে পড়ল বলে আতপুরে মুখুজ্জেদের ইটখোলায় গিয়েছিলাম। তা আপনি যেতে পারবেন কি? গেলে আমরা কৃতার্থ হব।

বিদ্যাসাগর বললেন—কেন? তুই আমাকে ঘটা করে খাওয়াবি নাকি?

—সে ভাগ্যও কি আমার হবে?

বিদ্যাসাগর বললেন—তাই তো আমি বলছিলাম। আমি কি খাই তা জানিস? সেদ্ধ-শাকটার সঙ্গে বার্লি সেদ্ধ করে তাই একটু একটু খাই। তবে যে এই আম দেখছিস, ও আমার জন্য নয়। যে নিজে কিছু খেতে পারে না, অন্যকে খাইয়েই তার তৃপ্তি। তাই তো আশুকে অত করে নিজের হাতে আম খাওয়াচ্ছিলাম। যা হোক, তুই এসেছিস, ভালোই হয়েছে। কিন্তু আমি তোকে জিজ্ঞেস করব না, তোর বাড়ির কে কেমন আছে। হয়তো তুই বলবি—অমুক মারা গিয়েছে, অমুক ব্যামোয় ভুগছে—এসব কথা শুনতে আর আমার ইচ্ছে হয় না। আমার বড়ো কষ্ট হয়।

হরপ্রসাদ বললেন—ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের ওখানকার সব সংবাদই ভালো।

তারপর বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—বাড়িতে পায়ের ধুলোর কথা বলছিলি, তোরা নতুন বাড়ি করেছিস নাকি?

—একটু কুঁড়ে বেঁধেছি বইকি।

—আমি গেলে আমায় কি খাওয়াতিস?

—বাড়ির মেয়েরা পাক করে কি খাওয়াবে তা জানি না। আমাদের দেশের দুটো ভালো জিনিস আছে, আমি মনে করেছিলাম, তাই খাওয়াব।

—কী কী?

—নৈহাটির গজা আর বসনপুলি।

—আচ্ছা, তা তবে আনিস।

—আপনি যখন 'আনিস' বললেন, তখন শুভস্য শীঘ্রং—আমি আসছে রোববারেই নিয়ে আসব।

আরো অনেকক্ষণ বসে রইলেন হরপ্রসাদ। অনেক কথাবার্তা হল। সন্ধ্যা নাগাদ হর-

করবেনই বা কেন। আমি নিজে তো বুঝি।'

কথার শেষে ওর ছোট একটা নিশ্বাস পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করি, 'কী বোঝেন?'

ঝিনি বলে, 'এই আমার আচরণ, ব্যবহার। বলছিলাম আপনাকে, সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আপনাকে ওরকম করে বলে গেলাম। আপনি হয়তো তেমন করে গায়েও মাখেননি। কিন্তু আমি ছটফটিয়ে মরেছি।'

হঠাৎ একটু হেসে নিয়ে বলে, 'আপনাকে ছোবলাতে গিয়ে নিজেই ছোবল খেয়ে মরেছি।'

তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না, না, তা কেন—।'

'তা-ই। ওটা আমার নিজের ব্যাপার তো, আমি তা-ই জানি। কাল দুপুরে আপনার সংগে দেখা হবার পর থেকে নিজের সব কথাবার্তাগুলো যতই ভাবছিলাম, ততই আপনার মুখটা আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল। রাধা লিলি সুপর্ণাদি নীরেনদার কথাও মনে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু—।'

আমি অবাক জিজ্ঞাসু চোখ তুলে ওর দিকে তাকাই। ও কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

আমি ঘাড় নেড়ে বলি, 'কিছু না। বলুন।'

ঝিনি আমার চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে বলে, 'কিছু বই কি। হয়তো আপনাকে অনেক চিনি না। তবু একটু তো বুঝি। আপনি ভাবলেন, শুভেন্দুর নামটা কেন বললুম না।'

বলে একটু হাসে। আমার প্রতিবাদের আগেই ঘাড় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'আপনার চোখ দেখেই বুঝেছি। আপনি কী ভেবেছেন, তা জানিনে, কিন্তু ওর নামটা ইচ্ছে করেই বলিনি। কেন সে কথা পরে বলব, ওকে ঠিক এদের সংগে জড়াতে পারিনে। ও একটু আলাদা।'

বলতে বলতে ওর ভুরু জোড়া একবার একটু কুঁচকে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে এক মুহূর্ত অন্য দিকে চেয়ে থাকে। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে রাখে। তারপরে জিজ্ঞেস করে, 'ঠিক বলিনি?'

বেঠিক যে না, তা ঠিক জানি। সংগীদের সকলের নাম করতে গিয়ে, একজনের নাম উহ্য রাখলে আপনা থেকেই জিজ্ঞাসা জাগে। ভিন্ন বৈচিত্র্যের কৌতূহল লাগে। বলি, 'না, ঠিক মানে, নামটা না শুনে একটু ভাবছিলাম।'

ঝিনি হাসতে হাসতেই টুকটাক করে কয়েকগাছি ঘাস ছিঁড়ে ফেলে। হাল্কা গোলাপী নখের সংগে সবুজ ঘাসের রঙ যেন একটা ছেঁড়াছিঁড়ির খেলা। বলে, 'সব কথা বলছিলাম। নিজের ব্যবহারের কথা মনে করে ওদের কথাও আমার মনে পড়ছিল। কিন্তু কী জানি কেন, আমার একটুও লজ্জা করেনি। রাত্রে সব কথা ভাবতে ভাবতে রাধা লিলিদের দু একটা ঠাট্টার কথা মনে পড়ছিল। এমন কি অচিনদার কথাও! তাতেও আমার একটু লজ্জা করেনি। আমি মিথ্যে কথা বলতে পারিনে। আমি ছলনা করতে পারিনে। তাই আমার লজ্জা করেনি। তা ছাড়া, আমার সংগীরা আমাকে সবাই ভালবাসে। এমন কি, অচিনদাও।'

বলে ঝিনি একটু থামে। আমার দিকে তাকায় না। ঘাসের ওপর খুলে রাখা ওর বিনুনি পাকানো স্যান্ডেলের আশেপাশে, ঘাসের ওপর আঙুল দিয়ে যেন বিলি কাটতে থাকে। তারপরে, গালের চুলে

ঝাঁকে একটা ঝটকা দেয়। আমার দিকে চেয়ে বলে, 'আপনি তো ওরা নন। অথচ যা কিছু, তা আপনাকে নিয়েই। আপনার মুখটা তাই বারেবারে মনে পড়ছিল, ছট-ফটিয়ে মরছিলাম।'

যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। মুখ ফেরাতে গিয়ে আবার হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা বলব?'

গম্ভীর না, ঝিনির চোখে যেন, 'ব্যাকুল নরম ভাবের খেলা'। বলি, 'বলুন।'

ঝিনি ঘাড় কাত করে। তাতে ওর মুখ সরে যায় দূরে। কিন্তু নীল রেশমী শাড়ির ছোঁয়া আসে ঘনিয়ে। বলে, 'জীবনের সব কিছু কি যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায়?'

'করতে পারলে ভাল।'

ঝিনি কথা না বলে চোখের দিকে চেয়ে থাকে। আমি আবার বলি, 'করতে পারা উচিত।'

ঝিনি বলে, 'লেখকরা বুঝি তাই করেন।'

আমি বলি, 'লেখকদের কথা বলতে পারি না। সব মানুষের কাছে সংসারের সেটাই দাবি।'

'সংসারের দাবিই সব? মনের দাবি বলে কিছু থাকবে না?'

সে কথা কি বলতে পারি! এ দুয়ের দু হাতে মেলে না বলেই দুয়ের হাতাহাতি। দুয়েতে তাই বিবাদ। মনে সংসারে লড়াই নেই এমন মানুষ কোথায় আছে, কে জানে। হয়তো আছে কোটিকে গোটিক। কোটির কথা বলি। মনে সংসারে লড়াইয়ের টান পড়তেই, এ জীবন চমকে চমকে উঠছে। এই দুঃখ-অসুখের আবেগ দেখা নিরন্তর [illegible]। তাই বলি, সব কথার কে ঠিক জবাব দেবে, তা বলতে পারি না। তবে, দুয়ে মেলাতে পারলে ভাল।'

'মেলে কী?'

ঝিনির ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি আরো [illegible] হয়ে ওঠে। ওর এই চোখের দিকে চেয়ে এক কথাতে 'হ্যাঁ' বলতে পারি না। চুপ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই।

ঝিনি চোখ ফিরিয়ে চায়, কোপাইয়ের ওপারে বেণুবনের দিকে। যেন নিজেকেই নিজে বলে, 'আমি তো কখনো মেলাতে পারলাম না।'

আমি জবাব না দিয়ে, চুপ করে থাকি। ঝিনির গলায় এমন একটা সুর বেজে ওঠে, যেন মনের কোথায় একটা চির আতুর স্থানে গিয়ে সেই সুর বিষণ্ণ করে দেয়। একটা ব্যথা ধরিয়ে দেয়। কেন ফিরি দিকে দিকে, প্রান্তে প্রান্তে, রাঢ়ে বঙ্গের পথে মেলায়, কখনো তার হদিস পাইনি। মেলাতে পেরেছি বলে, নাকি মেলাতে পারিনি বলে। তার চেয়ে নিজেকে আরো জিজ্ঞেস করি, নাকি মেলাবার জন্যেই?

তার চেয়ে আরো ভাল, এ প্রসঙ্গ থাক। পথ চলার এই দেখাতে এমন কথায় কী মিলবে। ঝিনিকে তা বলতে পারি না। জানি, ঝিনিও তা মানতে রাজী না।

কোপাইয়ের বাঁকে, জল কলকলিয়ে বাজে। ছেউটি বেণুর ঝোপে ঝাপে, গাছ-গাছালির ঝুপসি ঝাড়ে পাখীরা ডেকেই চলে। ঝিনির দৃষ্টি এখনো ওপারের বেণু-বনে। যেন সেখান থেকেই হঠাৎ ওর গলা ভেসে আসে, 'লোকে বলে, এই জানো, সেই জানো, সব কিছু জানো। কিন্তু নিজেকে জানার কথাটা কেউ বলে না। কত রকমের যুক্তি দিয়ে, কারণ দিয়ে ভেবেছি, সেই গোসাবা যাওয়া-আসার পথে কতটুকুই বা একজনকে দেখা, কতটুকুই বা তাঁকে চেনা। তবু—তবু, গায়ের এক একটা দাগ যেমন সারা জীবনেও মেলায় না, মনেরও বোধহয় সেইরকম। একটা কী ধরে যায়, একটা কী লেগে যায়, কিছুতেই সেই একটা কিছুকে সরানো যায় না, মেলানো যায় না। বুদ্ধিতে কুলোয় না, যুক্তিতে পাই না, এমন কি কোন আশাও নেই...।'

কথা শেষ না করেই ঝিনি আমার দিকে তাকায়। আমিও চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না। ওর দিকে চেয়ে চমকে উঠি। মুখে ওর ছায়া ঘনায়নি। যেন একটা কিসের ঝলকে ঝলকানো। অথচ ওর চোখে জল এসে পড়েছে। তবু নিচু স্পষ্ট গলাতেই বলে, 'কে জানতো, আবার এখানে এসে দেখা হয়ে যাবে। জানতাম না, কিন্তু কেন জানিনে, রোজ মনে হত, কোথাও না কোথাও একবার দেখা হবেই। হবেই হবে। হলও তাই। চিঠির জবাব না পেয়ে একলা একলা অনেক দিন চোখ মুছেছি। কিন্তু সেটা শোক বা আসল জ্বালা নয়। বরং আপনাকে দেখে তাই আর সামলাতে পারলুম না।'

কথা থামিয়ে, ঝিনি হঠাৎ একটু হাসে। অথচ ওর চোখের কোণে বড় বড় দুটি জলের ফোঁটা চিকচিক করে। ও মোছে না। বলে, 'আমার লজ্জাশরম কিছু নেই আর, না?'

বলেই আবার হাসতে যেতেই জলের ফোঁটা গালে নেমে আসে। ওর দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হতে থাকে। আমার ভিতের তলায়, হাতের সীমায়, সংসারের কঠিন ছায়া দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুই বলতে পারি না, কিছু করতে পারি না।

ঝিনি যেমন করে গাল কপাল থেকে রুক্ষ চুলের গুছি সরিয়ে দেয়, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই গলার রেশমী রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নেয়। তারপরে আমার দিকে আবার চোখ তুলে বলে, 'কেন এমন হয়, বলতে পারেন।'

অন্তত এইটুকু সত্যি বলতে পারি, এই 'কেন'-র কারণ আমি জানি না, বুঝি না। তাই ঘাড় নাড়ি। ঝিনি আবার জিজ্ঞেস করে, 'যিনি লেখেন, তিনিও বলতে পারেন না? তিনি তো মানুষের মন চেনেন?'

'মানুষের মন চেনাটা কোন কথা নয়, নিজেকে চেনাটাই চেনা। যে নিজেকে কিছু চেনে, সে অন্যকেও কিছুটা চিনতে পারে। আসলে, যা দেখি তা নিজের চোখেই। বিচার নিজের মনেই। নিজেকে দিয়েই পরকে চেনা যায়।'

ঝিনির শরীরে বাঁক লাগে। গ্রীবাতে ঢেউ লাগে, মুখ অনেকখানি এগিয়ে আসে। নিচু গলায় যেন কিসের আবেগ চলকানো স্বর। জিজ্ঞেস করে 'নিজেকে দিয়ে কি আমার কথা একটু বলা যায় না?'

ওর চোখের দিকে চেয়ে কেমন যেন অসহায় বোধ করি। বলি, 'নিজেকে তেমন চিনলাম কবে।'

ঝিনি তেমনি গলায়, আবার জিজ্ঞেস করে, 'তবে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। ও যেন আরো নিবিড় হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এতে কি অপরাধ হয়?'

সহসা জবাব দিতে পারিনে। ওর মুখের দিকে বিব্রত অবাক চোখে চেয়ে থাকি।

ওর গলা আরো নিচু হয়। যেন অনেক দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসে, 'যার কোন কারণ যুক্তি কিছুই জানিনে, তার জন্যে কি কোন অন্যায় অপরাধ হয়?'

চোখ সরাতে পারি না। বলি, 'আমি তা জানি না।'

'আমিও তো জানি না।'

যেন এক আর্তস্বর বাজে ওর গলায়। নুয়ে পড়ে সহসা। আর মুহূর্তে আমার পায়ে কিসের স্পর্শ লাগতেই চমকে উঠি। চোখ নামিয়ে দেখবার আগেই টের পাই, ঝিনির হাত আমার একটি পা চেপে ধরেছে।

ওর মুখ ভেঙে পড়েছে ওর বুকের কাছে। আমার পায়ে রাখা ওর হাতের ওপর তাড়াতাড়ি হাত রাখি। ডাক দিই, 'শুনুন।'

ও যে আমার কথা শুনতে পায়, তা মনে হয় না। কেবল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ায়। কিছু বলে না। আমি আবার ডাকি, 'শুনুন।'

ওর অস্পষ্ট গলা শোনা যায়, 'কী ?'

তারপরে আস্তে আস্তে মুখ তোলে। দেখি, ওর চোখ ভেজা ভেজা, কিন্তু টলটলানো না। বরং মুখের রঙ রোদ-লাগা জবার মত হয়ে গিয়েছে। তেমনি অস্পষ্ট অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'রাগ হচ্ছে ?'

'না।'

'ভয় ?'

'না।'

'তবে একটু এমনি করে বসে থাকি।'

আমি মনে করতে পারি না, এ সেই অলকা চক্রবর্তী, দর্শন শাস্ত্রের বিদুষী, নিখুঁত নাগরিকা। এ যেন আর কেউ, অন্য কোন মেয়ে। যার পরিচয় আমার জানা নেই। অথচ তার চোখের জলের গভীর থেকে একটি নম্র লাজানো হাসিতে সুখ-দুঃখের খেলা খেলে। (ক্রমশ)

(দুই)

যারা এই শহরের বহুদিনের বাসিন্দা তারা বুঝতে পারে না কেন বাইরে থেকে লোক এলে কলকাতাকে বলে আজব শহর। তাদের দোষ দেওয়া যায় না কারণ প্রাচুর্য আর দারিদ্র্যের এমন সহ অবস্থান নীতি আর কোন শহরে বোধ হয় কেউ দেখেনি। এখানে গগনভেদী সুরম্য অট্টালিকার পাশে জরাজীর্ণ দারিদ্র্য পীড়িত খোলার চালের বস্তি। যখন শোনা যায় দেশব্যাপী খাদ্য সংকট তখনও এই আজব শহরে বিয়ে বাড়িতে দেখা যায় রাশি রাশি সুখাদ্যের অপচয়। এখানকার নিউ মার্কেটে পাওয়া যায় না এমন কোন জিনিস নেই, কথায় বলে টাকা থাকলে বাঘের দুধও কেনা যায়। কিন্তু আশ্চর্য, পাওয়া যায় না বাচ্চা ছেলেমেয়েদের টিনের দুধ, রুগীর পথ্য হর্লিকস আরও অনেক কিছু যার প্রয়োজন নিত্য। দামী রেস্তরাঁয় আলো কমিয়ে রেখে এক আবছা স্বপ্নালু পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য। আবার অন্যদিকে সূর্যের আলোর অভাবে অন্ধকার আলোকহীন কোনরকমে দিনগত পাপক্ষয় করছে অভাবী মানুষ। এই আজব শহরের বিরাট হোটেলে 'যাদের আছে' তাদের জন্য সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভনীয় আয়োজন আর 'যাদের নেই', হোটেলের বাইরে ফুটপাথের উপর শয্যার ঢালাও ব্যবস্থা। দুয়েরের মাঝখানে উঁচু প্রাচীর, লোহার গেট, সশস্ত্র পাহারাওয়ালা. উর্দিপরা দরোয়ান।

লোকটা নির্বোধের মত শুধু দেখে হয়ত অসতর্ক মুহূর্তে মনটা টন টন করে ওঠে, কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। নয়ত চাণক্য পণ্ডিতের মত বলে ফেলত 'শহরের সর্বাঙ্গে ঘা।'

কথাটা মনে ধরত না, মাথা নাড়ত, শিখা দুলত, বেরিয়ে আসত দীর্ঘশ্বাস, 'সমাজের সর্বাঙ্গে ঘা।' পাঁজর পড়ছে।

এই আজব শহরেরই একটি অতি পরিচিত অঞ্চল। তখনও অফিস ছুটি হয়নি। শীতকালের বিকেল, নিস্তেজ সূর্যের আলো। ট্রাম চলছে, একটু এগুলেই বাঁদিকে বেঁকে চলে যাবে ডালহাউসি। উল্টোদিকের ফুটপাথে বড় বড় হোটেল; নীচে সারি সারি দোকান। রাস্তায় ট্যাক্সি, গাড়ি, আর বাসের অবিরাম যাতায়াত। মানুষের স্রোত বইছে, উত্তরে দক্ষিণে, পূবে পশ্চিমে। চৌরাস্তার মোড়ে উঁচুতে দাঁড়িয়ে পুলিস হাত ওঠাচ্ছে নামাচ্ছে। মানুষ যন্ত্র হয়ে গেছে। একদিকে স্রোত থামে, আর একদিক চলতে শুরু করে।

চলা আর থামা। নিয়মের কড়াকড়ি।

এরই পাশে এক অনিয়মের রাজত্ব বসেছে। বিরাট পুকুরের ধার ঘেঁষে খেলার মাঠ পর্যন্ত বিস্তৃত যে অঞ্চল, যার আর এক সীমানায় এসপ্লানেডের হকার্স কর্নার, সেইখানেই ভোজবাজির খেলা দেখাচ্ছে এক নাম না জানা যাদুকর। সেই আদিকালের লাল ভেল্কি লাগার খেলা, সকলের সামনে হাত সাফাই, ঝুড়ির ভেতর থেকে রূপসীর অন্তর্ধান। মানুষকে ভেড়া বানানো। এই একই খেলা সাজিয়ে গুছিয়ে শীতকালে নিয়ন্ত্রিত মঞ্চে দেখালে বিজ্ঞাপনের ভড়কাতে চার সপ্তাহ টিকিট পাওয়া যেত না। এখানে কিন্তু দর্শনী নেই। বিনা পয়সার দর্শক। খেলা দেখে খুশী হলে কয়েকটা পয়সা থালার উপর ফেলে দেয়।

বেশ কিছু লোক জড় হয়ে খেলা দেখছে। ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। আখ মাড়াই-এর কলগুলোর এক ঘেয়ে টুংটাং ঘন্টার শব্দ। গাছের তলায় ল্যাংড়ার চায়ের দোকানও সরগরম। একজন ফুচকাওয়ালা ভিড় দেখে সেইখানে তার মালপত্র নিয়ে বসেছে। যে লোকটা কাটা ফল বিক্রি করছিল সেও কাছে এগিয়ে এল, দেখতে দেখতে চারদিকে ফেরিওয়ালার ভিড়। ভিড় দেখলেই খদ্দেরের আশায় ওরা ছোটে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ যেন একটা মেলা বসে যায়।

এও তো এই আজব শহরেই সম্ভব।

টুকরো কথাবার্তা শোনা যায়। ভিড়ের মধ্যে একজন আর একজন সমবয়সীকে বলছে, ওই যে মেয়েটা দেখ না একটা পুরোন ব্যাটারীর সেলের উপর বসে আছে।

—তুই ঠিক চিনতে পেরেছিস?

—আমার সহজে ভুল হয় না। ঐ মেয়েটা সেদিন ছাড়িয়ে না দিলে আমাকে ওরা হয় মেরে ফেলত, নয়ত জখম করে ফেলে দিত ঐ পুকুরের মধ্যে।

আর ওদের কথা শোনা গেল না। যাদুকর শেষ খেলা ঘোষণা করছে। যে মেয়েটির বিষয়ে এরা কথা বলছিল সে উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলে, জোরে জোরে হাত-তালি দেবেন বাবু মশায়রা, নয়ত ওস্তাদের খেলা জমবে না।

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে হাততালি পড়ল।

মেয়েটির নির্দেশ, একবার নয় আরও দুবার।

তিনবার হাততালি। যাদুকরের খেলা শেষে আবার হাততালি। ভিড় ভেঙে গেল। ছত্রভঙ্গ হয়ে কেউ বসল চায়ের দোকানে। কয়েকজন ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে দাঁড়ায়। আর কেউ বা কাটা ফলের কাছে: দুটো ছোড়া ভিমটো পাইনঅ্যাপেলের শিশি নিয়ে ধরেছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারে না। কারণ তেষ্টা পেলে এরা আখের রসই খায়।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল বিকাশ। ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ভোজবাজি দেখতে। খেলার শেষে বাড়ি যাবার জন্যে ট্রামে উঠবে, না বাসে উঠবে ভাবছিল, এমন সময় নজরে পড়ল ল্যাংড়ার চায়ের দোকানে দুখানা ইটের উপর বসে অনাদিপ্রসাদ ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছেন আর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সেই লাস্যময়ী মেয়েটির দিকে। হঠাৎ দেখলে যার জাত বোঝা যায় না, চেনা যায় শুধু ভারতীয় বলে।

বিকাশ অনাদিপ্রসাদের ছোট ছেলের বন্ধু, এক পাড়ায় বাড়ি। কাছে এগিয়ে গিয়ে হেসে কথা বলার চেষ্টা করে, কাকাবাবু, আপনি এখানে?

অনাদিপ্রসাদ ফিরে তাকালেন, কিন্তু বিকাশকে চিনতে পারলেন বলে মনে হল না, কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন।

বিকাশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সেখান থেকে সরে যায়।

অনাদিপ্রসাদ নিজের মনেই চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করেন। মেয়েটা উঠে গিয়ে বড় গাছটার পিছনের ছায়ায় দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে মস্করা করছে যাদুকর আর তার দুই সঙ্গী। মেয়েটা ওদের সঙ্গে সিগারেট ধরাল, পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞেস করল, আজ কত হল?

ওস্তাদও রসিকতা করতে ছাড়ে না, বেলাক না হোয়াইট?

—তার মানে?

থালায় পড়েছে সাড়ে তিন টাকা

—আর বেলাক?

—কাল্লু পকেট মেরেছে বার টাকা, আর ফাউন্টেনপেন দুটো। মেয়েটা খিল খিল করে হাসে, লোকগুলো সত্যি বেয়াকুব, হাততালি দিতে গিয়ে পকেট সামলাতে ভুলে যায়।

ওস্তাদ মুখ ভঙ্গী করে বলে, হাততালি কি আর খেলা দেখে দেয়, সব তোমার মুখের দিকে চেয়ে, তাই না তুমি মিস কমলকলি। সকলেই হেসে ওঠে। মিস কমলকলি সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে বলে, আমার কমিশন?

কমিশন নয়, বল নজরানা, ওস্তাদ নির্দেশ দেয়, এই কাল্লু, মিস কমলকলিকে তিনটে টাকা দিয়ে দে।

ঠিক এই সময় ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল। জ্বলে উঠল বিজ্ঞাপনের নিয়ন-গুলো। ঝলমল করছে চৌরঙ্গীর রাস্তা। আরও ঝলমলে দোকানের আলো। সেদিকে একবার তাকালে আর কি কেউ অন্ধকারের দিকে চোখ ফেরাতে পারে।

অন্ধকার নামার আগেই পরেশচন্দ্র হাইকোর্ট থেকে সোজা গিয়েছিলেন রমলা বৌদির কাছে। সারাদিনের দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তির ছাপ রমলা বৌদির মুখের উপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। দাদাকে দেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

পরেশচন্দ্র প্রথমটা হকচকিয়ে যান, ভাববার চেষ্টা করেন এমন কি গুরুতর

ঘটনা ঘটতে পারে যার জন্যে তাঁর বোন এতখানি বিচলিত হয়েছে।

পরেশচন্দ্রের বিস্ময়ের মাত্রা আরও এই জন্যে বাড়ে যে তাঁদের পরিবারে সুখী সাধ্বী স্ত্রী ও পুত্র গর্বে গর্বিতা মায়ের আদর্শ চরিত্র হল রমলা। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সুখী দাম্পত্য জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ্য গতি কোথায় আজ বাধা পেল।

বোনের মাথায় হাত রেখে সহানুভূতিভরা গলায় বললেন, কি হয়েছে আমায় খুলে বল।

রমলা বউদি যেন এইটুকু বলারই অপেক্ষা করছিল। একদিন যে কথা কাউকে খুলে বলতে পারেনি, নিজের মনেই ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছে, পুঞ্জীভূত দুর্ভাবনা যা মনের গহনে আবদ্ধ হয়েছিল তার আগল সে খুলে দিল। দুর্বার জলস্রোতের মত সে উচ্ছ্বাস শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ল কান্নায়।

কৌঁসুলী পরেশচন্দ্র আর একবার ধরে প্রশ্ন করে আসল ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করেন, এরকম কতদিন হয়েছে?

রমলা বৌদি ভাববার চেষ্টা করে, মাস-খানেকের ওপর যতদূর মনে হচ্ছে ওঁর জন্মদিন থেকে।

—সে তো আগের মাসেই, আমরা খেয়ে গেলাম সকলে।

—সারাদিন ঠিক ছিল, বিকেলে বেড়াতে গেল, আমি সঙ্গে যাইনি, রান্না বাড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, ফিরে এল কেমন যেন অন্যমনস্ক। তখন অবশ্য আমি লক্ষ করিনি, এখন পেছনে ফিরে দেখতে গেলে মনে হয় সেটাই সূচনা।

—তারপর থেকে আর লিখছে না।

—না। লেখার টেবিলে বসে, দু' একটা খাতার পাতা ওল্টায়, যদি জিজ্ঞেস করি লিখছ না কেন, বলে তাড়া কি। অনেক তো লিখেছি, কদিন না হয় বিশ্রাম নিলাম।

পরেশচন্দ্র গম্ভীরভাবে চিন্তা করেন, সারাক্ষণ কি করে?

—কিছু ঠিক নেই। কখনও দেখি নিজেরই লেখা পুরোন বইগুলো পড়ছে। কখনও ছাদে গিয়ে ফুলের টব নিয়ে কাজ করে। আগে গাছ গাছড়ার শখ ছিল না। আমিই ওগুলো মালিকে দিয়ে লাগিয়েছিলাম। আজকাল খোন্তা খুন্তি নিয়ে গাছের পরিচর্যা করে।

—আর কিছু?

রমলা বউদি ঘরের কোণের দিকে আঙুলে দেখিয়ে বলে, ওই যে লাল মাছ রাখার অ্যাকোয়ারিয়ামটা দেখছ—

—ওটা তো তোর ছোট ছেলেকে আমিই কিনে দিয়েছিলাম কোন একটা জন্মদিনে—

—হাঁ, ছোট খোকা বড় হবার পর ও জিনিসটা অকেজো হয়ে গুদোম ঘরে পড়ে ছিল। কদিন হল ওটাকে টেনে বার করেছেন, জল ভরে বাজার থেকে মাছ এনে ছেড়েছেন। রাত্রিবেলা আলো জ্বালিয়ে চুপচাপ ওইদিকে তাকিয়ে থাকেন।

পরেশচন্দ্র চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করেন, আশ্চর্য ব্যাপার। অনাদি হঠাৎ এরকম করতে শুরু করল, কিছু বুঝতে পারছি না।

—সবচেয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ে বেড়েছে, না বলে কয়ে হঠাৎ হঠাৎ বাড়ি থেকে চলে যান। কোথায় যে এত ঘোরেন জিজ্ঞেস করলেও বলতে চান না। কিন্তু আমি পকেটে দেখেছি ট্রেনের টিকিট, বাসের টিকিট বিভিন্ন জায়গার।

এতদূর শুনে পরেশচন্দ্র রমলা বউদিকে প্রশ্ন না করে পারলেন না, হাঁরে অনাদির ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধে কিছু জানিস? মানে কোন শেয়ার টেয়ার কিছু কিনেছিল না বা হঠাৎ আর কোন ব্যাপারে লোকসান হয়েছে কিনা।

রমলা বউদি মাথা নাড়ে, ওসব তো আমার কাছেই থাকে, কোন গোলমাল নেই। বই-এর বিক্রি ক্রমশ বাড়ছে।

—তাতো আমরা সবাই জানি, বরাবর ও গোছান ছেলে, বাড়ি করেছে, ভাড়া দিয়েছে, প্রত্যেক ছেলের নামে আলাদা ইনসিওরেন্স করে রেখেছে। কিন্তু আর কি হতে পারে? একটু থেমে বলেন, আমার মনে হয় ডাক্তার দেখানো দরকার।

রমলা বউদির মুখ ভয়ে শুকিয়ে যায়, কেন দাদা, তোমার কি মনে হচ্ছে—

কথা শেষ করা গেল না, ব্যস্ত হয়ে বিকাশ ঘরে ঢুকল, কাকীমা—

রমলা বউদি নিজেকে সামলে নেয়, কি বাবা!

—কাকাবাবু কোথায়?

—উনি বাড়িতে নেই।

বিকাশ ইতস্তত করে একটা কথা বলবার ছিল—

রমলা বউদি ভরসা দেয়, বল না, উনি আমার বড়দা।

—মানে মনে হল যেন কাকাবাবুকে দেখলাম—

ভাইবোন দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, কোথায়?

কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিকাশ ময়দানে বাজিকর-এর আড্ডায় যে অবস্থায় অনাদিপ্রসাদকে ভাঁড়ে চা খেতে দেখেছিল তার বর্ণনা দিল।

রমলা বউদির বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়, তোমাকে উনি চিনতে পারলেন না?

—না।

রমলা বউদি অসহায়ভাবে পরেশচন্দ্রের মুখের দিকে তাকায়, তাহলে কি হবে দাদা।

সংসারে অভিজ্ঞ পরেশচন্দ্র বোঝেন এসময় আরও শক্ত না হলে চলবে না, বিকাশকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি এখন বাড়ি যাও। যদি আমরা ওঁকে খুঁজতে যাই তোমাকে নিয়ে নেব।

বিকাশ চলে যায়। পরেশচন্দ্র নিজের মনে বলেন, ছেলেটির কথা যদি সত্যি হয় আমাদের কি যাওয়া উচিত হবে? বলা যায় না আমাদের দেখলে হয়ত অনাদি লজ্জা পাবে, হয়ত বিরক্ত হবে—

রমলা বউদির আশঙ্কা অন্যরকম, বলে, যদি চিনতে না পারে?

ভাইবোনে অনেকক্ষণ পরামর্শ করেও কর্তব্য স্থির করতে পারে না। ভয়ের কারণ আরও এই জন্যে, এই প্রথম অনাদিপ্রসাদ এতটা সময় বাইরে রয়েছেন, ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁরা ঠিক করলেন গাড়ি করে ময়দানের ওই চত্বরটায় ঘুরে আসবেন, নীচে নামতে যাবেন, দেখলেন অনাদিপ্রসাদ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন। দুজনেই সবিস্ময়ে থমকে দাঁড়ান।

সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েও অনাদিপ্রসাদের চেহারায় কিন্তু ক্লান্তির ছাপ নেই, শুধু মাথার চুলগুলো রুক্ষ। পরেশচন্দ্রকে দেখে উজ্জ্বল হেসে বললেন, আরে কি ব্যাপার? বড় কুটুম্ব যে? কতক্ষণ আসা হয়েছে?

পরেশচন্দ্র বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলেন, এইতো কোর্ট থেকে আসছি।

অনাদিপ্রসাদ ওপরে উঠে এসে গায়ের আলোয়ানটা খুলতে খুলতে স্ত্রীকে বলেন, কিগো, দাদাকে ভাল করে খাইয়েছ, নয়ত আবার বাড়ি গিয়ে শালাজের কাছে নিন্দে করবে।

পরেশচন্দ্র বললেন, আমার জন্যে ভাবতে হবে না, ওরে রমি, আগে অনাদির খাবার ব্যবস্থা করে দে।

অনাদিপ্রসাদ নিশ্চিন্তভাবে কোচের ওপর বসে বলে, বাথরুমে গরম জল দিতে বল তো. বেশ শীতের আমেজ পড়েছে, ভাল করে চান করা যাক। আর বাড়ির যদি হাত খালি থাকে গরম গরম খান কয়েক লুচি ভাজতে বল। পরেশদা আর আমি দুজনেই খাব।

রমলা বউদি এতক্ষণ একদৃষ্টে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল, এতটা সহজ অনাদিপ্রসাদকে সে বহুদিন দেখেনি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তোমরা বসে গল্প কর, আমি এখুনি সব করে ফেলছি।

প্রথম সুযোগেই পরেশচন্দ্র কথা পাড়েন, তারপর এখন কি লেখা হচ্ছে?

অনাদিপ্রসাদ সহজ উত্তর দেয়, নতুন কিছু না।

—তাহলে?

—তাহলে কি?

পরেশচন্দ্র কি বলবেন ভেবে পান না, কথার মোড় অন্য দিকে ফেরান, কখন বেরিয়েছিলে?

—সকালে। কয়েকটা কাজ ছিল। এমন আটকে গেলাম বাড়িতে যে খেতে আসব না

তাও জানাতে পারলাম না। আপনার বোন নিশ্চয় খুব ভাবছিল।

—তাতো ভাববেই।

কলঘরে বালতিতে জল ঢালার শব্দ শুনেই অনাদিপ্রসাদ উঠে পড়ে। —আমি চট করে স্নানটা সেরে আসি, আপনি বসুন, পালাবেন না।

অনাদিপ্রসাদ স্নানের ঘরে ঢুকতেই পরেশচন্দ্র রমলা বউদিকে কাছে ডাকেন, মৃদু ভর্ৎসনা করে বলেন, কি যে তোরা আবোল তাবোল বকিস। এতক্ষণ অনাদি আমার সংগে কথা বলল, কই কোন গোলমাল তো দেখলাম না।

রমলা বউদি তখনও যেন ঘোরের মধ্যে বলে, আমিও কিছু বুঝতে পারছি না দাদা, অন্যদিন কিন্তু এরকম থাকে না। তাছাড়া সকাল থেকে কোথায় গিয়েছিল—

—কাজে গিয়েছিল, কাজে।

—কি কাজ?

পুরুষে মানুষের হাজার রকম কাজ থাকতে পারে। মিছিমিছি অত ভাবিস না। শেষ-পর্যন্ত তোর জন্যে না ডাক্তার ডাকতে হয়।

এতক্ষণে রমলা বউদি ম্লান হাসে, তাহলে তো দুঃখ নেই, ও'র কিছু না হলেই বাঁচি।

কিছুক্ষণের মধ্যে স্নান সেরে পরিষ্কার জামা কাপড় পরে অনাদিপ্রসাদ বেরিয়ে এলেন। হাসিমুখে গল্প করতে করতে সম্বন্ধীর সংগে আহার করলেন, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আজ একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়ব।

পরেশচন্দ্র সায় দিয়ে বলেন, হাঁ, হাঁ, তুমি শুয়ে পড়, আমি এবার উঠি।

—আমি আর নীচে নামছি না, রমলা তুমি দাদাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এস।

—না, না, কারুর আসতে হবে না, আমার সংগে আবার ফরমালিটি।

—আহা নামুক না, একটু এক্সারসাইজ হবে।

তিনজনেই হা হা করে হাসলেন।

নীচে নামতে নামতে পরেশচন্দ্র রমলা বউদির কাঁধে হাত রেখে বললেন, নাড়ু ভাবনার কিছু নেই, সব ঠিক আছে। তবু যদি দরকার মনে করিস আমাকে তখুনি খবর দিবি। একলা ভেবে ভেবে তিলকে তাল করেছিস।

রমলা বউদি স্বীকার করেন, সত্যি, চিরকালই আমি একটু বেশি ভাবি, তাই না দাদা?

পরেশচন্দ্র সস্নেহে বলেন, এখনও সেই ছোট খুকিটি, ওপরে যা। ঝগড়াঝাঁটি করবি না। ওর সঙ্গে ভাল করে গল্প কর। আজকের রাতটা ভাল করে ঘুমোতে দে, কাল আমি টেলিফোনে খোঁজ নেব অখন।

দাদার গাড়ি রওনা করিয়ে দিয়ে রমলা বউদি ওপরে উঠে শোবার ঘরে যায়। দেখে অনাদিপ্রসাদ বিছানায় শুয়ে পড়েছে, গায়ের ওপর একটা পাতলা কম্বল। চোখ বন্ধ। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

রমলা বউদি স্বামীর কাছে গিয়ে বসে। শান্ত সৌম্য মুখ। চওড়া কপালের ওপর আস্তে আস্তে হাত রাখে।

শীতল করস্পর্শে অনাদিপ্রসাদ চোখ মেলে তাকান। খুশী হয়ে বলেন, আঃ তোমার হাতটা কি নরম। এখন বেশ আরাম লাগছে। মানুষের সবচেয়ে বড় বদ অভ্যাস নিজের বিছানায় না শুলে ঘুম আসতে চায় না। ছেলেদের দেখতে পেলাম না, ওরা বাড়িতে নেই বুঝি? আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, বড় ঘুম পাচ্ছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন অনাদিপ্রসাদ। রমলা বউদি অনেকক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর সারাদিনের দুশ্চিন্তার জ্বর এতক্ষণে ছেড়ে গেল। নিজের স্বামী, নিজের সংসার, এতদিনের সুখের নীড়, যা মনে হচ্ছিল বুঝি ভেঙে গেল—এতক্ষণে বোঝা গেল সেটা শুধু দুঃস্বপ্ন। তার কিছুই হারায়নি, সব আছে।

স্ত্রী রমলা নিশ্চিন্ত হতেই মা রমলা ব্যগ্র হয়ে পাশের ঘরে চলে গেল ছেলেদের খবর করতে।

যদি পাঁচ মিনিট বাদে রমলা বউদি ফিরে আসত, দেখতে পেত অনাদিপ্রসাদ আবার খাটের উপর উঠে বসেছেন। খুঁজছেন বালিশের তলায় রাখা নতুন ডায়রীখানা, যার পাতায় তিনি হিজিবিজি কাটেন, ছবি আঁকেন, কিন্তু কিছু লেখেন না।

যে মানুষ হঠাৎ জেগে উঠে খানিকের সুরে ফেরে, সে কি পরিণামের কথা ভাবে? ভাবে সেই নুনের পুতুলের কথা যে সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল?

(ক্রমশঃ)

নাগা কুকুর বিক্রেতা —বিষ্ণু দাস (আর্ট কলেজ)

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনও অপেক্ষাকৃত শান্তিময়, ফলে কোনও শিল্পীর কাছ থেকে আমূল পরিবর্তনসূচক কোনও অতি আধুনিক বা বিমূর্ত রচনার নিদর্শন দেখা যায়নি। যে কয়টি দেখা গেছে সেগুলির মধ্যে সমকালীন দ্বন্দ্ববহুল যুগ ও জীবনের আলেখ্যর চেয়ে শিল্পীর ব্যক্তিগত রচনা ধারাই প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রথমেই চোখে পড়ে স্যর উইলিয়ম ডবেল রচিত বিল বক। প্রতিকৃতি জাতীয় ছবিখানির মধ্য দিয়ে চরিত্রগত বিশেষত্বটুকু ফুটে উঠেছে। মেদবহুল দেহ, বিশেষ ভঙ্গীতে রাখা দুটি হাত, সামান্য মুক্ত ঠোঁট ও সর্বোপরি অসমান দুটি চোখের চাহনির মধ্য দিয়ে যেন একটি বিশেষ পরিচিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। সরল ও স্বাভাবিকভাবে আঁকা ছবিখানির মধ্য দিয়ে শিল্পীর চরিত্র বর্ণনার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাই। 'নাইট-কনভিক্ট ইন দি সোয়াম্প' সিডনী নোলানের নিজস্ব রচনা রীতির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এক্সপ্রেশানিস্ট জাতীয় রচনাটিতে শিল্পী উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতা ও কয়েদীর মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন। এর পরেই যে ছবিখানি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল দি বার্ণ্ট কান্ট্রী। শিল্পী রাসেল ড্রাইসডেল প্রধানত নিসর্গ শিল্পী হিসাবে পরিচিত এবং রচনাটিতে তিনি অতি সংক্ষেপে, বিশেষ করে পুরোভাগে কয়েকটি পত্রহীন শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড ও অনুরূপ প্রতীক রেখে দেশের এক বিশীর্ণ রূপ দেখিয়েছেন। কয়েকজনের রচনা পদ্ধতি দেখে পগী, পোলক ও ক্লীর কথা মনে পড়ে যায়—যেমন, রে ক্রুকের উডল্যান্ড উইথ ফ্রুট, জন কোবারওয়েলকারের শ্যামমার ও ফ্রেড উইলিয়ামসের আপওয়ে ল্যান্ডস্কেপ। লেকটির জাতীয় অতি সরল, সংক্ষিপ্ত রচনা ও অনুরূপ প্রকাশভঙ্গিমার

জন্য রবার্ট ডিকারসনের দি আউটিং ও জ্যাকলিন হিক-এর থ্রি মাইল কিডস উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীতে ত্রি-আয়তনিক রচনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চোখে পড়ে—অ্যালবার্ট টাকারের-ট্রী। অপরাপর রচনার মধ্যে লিওনার্ড ফ্রেঞ্চ-এর অব ফিশেস, আর্থার বয়েডের ফিগার ইন দি ল্যাণ্ডস্কেপ, টমাস গেলঘর্নের সুররিয়ালিস্টিক রচনা—দি ফার্স্ট টু ব্রীজ ইন সেনটেনিয়েল পার্ক, মাইকেল মিট-এর এডা ও বিশেষ করে অ্যান্ড্রু সিবলে-র কাব্যধর্মী রচনা মাউন্ট গানেট হোটেল উল্লেখযোগ্য। মোটের উপর সমকালীন চিত্রকলাধারা অনুসরণ করলেও অস্ট্রেলিয়ার শিল্পিগণ যে দেশের ঐতিহ্য ও পুরানো প্রথা একেবারে পরিহার করেন নি সেটা প্রদর্শনী প্রদক্ষিণ করলেই বোঝা যায়। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে অ্যাকাডেমি ভবনে অস্ট্রেলিয়ার চিত্রকলা তথা শিল্পী সিডনী নোলান ও রাসেল ড্রাইসডেলের অঙ্কন পদ্ধতি বিষয়ে দুই দিন রঙীন ফিল্ম দেখান হয় ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্যালারীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ রবার্ট ক্যাম্পবেল বক্তৃতা দেন।

*

সম্প্রতি সরকারী আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রধানত দুটি কারণে এই প্রদর্শনীটি আগ্রহ সহকারে দেখি। প্রথমত এখানে দেশের কয়েকজন ভবিষ্যত প্রতিভাবান শিল্পী তথা ভাস্করের সন্ধান পাই। দ্বিতীয়ত ছবি মনোনয়ন ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের রুচি ও বিচারবোধের পরিচয় পাই। প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই আপন আপন রচনার ওপর মমত্ব থাকা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও কয়েকজনের কাছ থেকে ক্ষেত্রবিশেষে মাত্র একটির বেশী নিদর্শন পেশ করা হয় নি। ফলে প্রদর্শনীর মান হয়েছে উন্নত।

একটি কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে প্রদর্শনীটি শিক্ষার্থীদের, সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে অসামান্য কোনও নিদর্শন আমরা আশা করতে পারি না, যদিও কচিৎ কোনওবারে এহেন নিদর্শনও চোখে পড়া বিচিত্র নয়। ছাত্রছাত্রীগণ পছন্দমত মাধ্যম অর্থাৎ তেল ও জল রঙ ও টেম্পারাতে কাজ করেছেন। অঙ্কনরীতি মিশ্র—অর্থাৎ প্রথাগত, ভারতীয় আধুনিক, বিমূর্ত ও প্রায়-বিমূর্ত। বিভিন্ন কাজ দেখে বোঝা যায় যে প্রত্যেক বিভাগেই নিয়মমত শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে। অবশ্য দুই-এক ক্ষেত্রে হয়ত বিশেষ কোনও শিল্পী-অধ্যাপকের সামান্য প্রভাব দেখা যায়, তবে সেটা আদৌ দোষের নয়। কোনও সংগীত আসরে শ্রদ্ধেয় বড়ে গোলাম আলি খাঁর কোনও সুযোগ্য ছাত্রের পরিবেশনের মধ্যে যদি গুরুর ঘরানার বৈশিষ্ট্য শোনা যায় সেটা কেউই অস্বাভাবিক মনে করেন না। চিত্রশিল্পী ও

বিজ্ঞাপন —সুশীল পাল (আর্ট কলেজ)

কণ্ঠশিল্পী উভয়েরই পথ সাধনার এবং এই সাধনার পথে চলতে চলতেই একদিন তাঁরা নিজস্ব পথের সন্ধান পান—অবশ্য যদি প্রতিভা থাকে।

ড্রয়িং ও পেন্টিং বিভাগে যাঁরা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অরুন্ধতী বসু মল্লিক (প্রোসেশন), সতীশ্রী দত্ত (ল্যাণ্ডস্কেপ), মল্লিকা রায় (টয়লেট) ও শঙ্কর গুহ (সানসেট মেরিনবিচ)-র নাম উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে গৌরাঙ্গ কুণ্ডুর পেন্টিং নং ১৩ চোখে পড়ে। ভারতীয় বিভাগে নির্বাচিত নিদর্শনের মধ্যে শুভ্র-শুভ্রানের সুপরিকল্পিত বিন্যাসের জন্য বিজন সামন্তর শিল্প সংগীত-এর নাম করা যায়। এই প্রসঙ্গে ফণীভূষণ জানার ফেয়ারওয়েল অব উমা ও শিবানী পালের কীর্তের অ্যাণ্ড কীর্তেশনও উল্লেখযোগ্য। জল রঙ বিভাগে প্রথমেই বিনোদবিহারী দাসের (দেওয়ালী উৎসব) নাম করতে হয়। এ বিভাগে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঞ্চন দাশগুপ্ত ও জ্যোতির্বিন্দু চৌধুরীর কাজ প্রশংসার যোগ্য। গ্রাফিক বিভাগে মানস চৌধুরীর বিরাট স্কেচটি সর্বপ্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলিষ্ঠ রেখাসম্পদ ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়ে এই শিক্ষার্থী-শিল্পীর অঙ্কন প্রতিভার পরিচয় পাই। দুঃখের বিষয় গ্রাফিক বিভাগে সমকালীন কোন বিশেষ নিদর্শন চোখে পড়েনি, তবে বিশ্বপতি মাইতি ও সুশীল পালের নাম করা চলে। প্রাচীরচিত্রে মঞ্জুশ্রী রায় রুচি ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কমার্শিয়াল বিভাগে কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন চোখে পড়ে, বিশেষ করে কয়েকটি ফোল্ডার, ক্যালেণ্ডার ও পোস্টার রচনায় যারা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সুশীল পাল (হলিডে অ্যাট জু), সুশান্ত সিংহ রায় (বোটানিক্যাল গার্ডেন), হাসি দাশ (সি এল টি) ও জ্যোতির্বিন্দু চৌধুরী (ক্যালেণ্ডার)-র নাম করা যায়। ভাস্কর্যের নিদর্শন অবশ্য অল্পই দেখলাম। তা হলেও কয়েকটির মধ্যে সমসাময়িক চিন্তাধারা ও গঠন প্রণালীর আভাস পেলাম—বিশেষ করে ননীগোপাল মজুমদার (এ পিকনিক), শমিতা কুণ্ডু (ফ্লাইং বার্ড) ও করবী ঘোষ (কম্পোজিশন) ভাস্কর্য শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিভা ও সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া চামড়া, বাটিক ও কাঠের তৈরী নানা জিনিসের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি, রুচি ও কারুকুশলতার সন্ধান পেয়েছি।

চিত্রপ্রিয়

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার

ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে!

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: অ্যাসপ্রো রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ও গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি দ্বিগুণেরও বেশী সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীগগির শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুশী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • বাতের বেদনা • সর্দি-জ্বর-ভাব • ফ্লু ডেঙ্গু জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার বড় বড় হয়, তাই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

[illegible]

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।

মেলবোর্নের চিঠি

মৃত্যুরও রকমফের আছে। কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান প্রাণ খোয়ান রাষ্ট্রবিপ্লবে, কোথাও-বা প্রেসিডেন্ট মারা যান গুপ্তঘাতকের গুলিতে, আবার কোথাও-বা প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু ঘটে স্রেফ [illegible]। মৃত্যুর পদ্ধতি অবশ্য অনেকটাই নির্ভর করে দেশনায়কের চরিত্রের উপরে, তবে ব্যাপারটাতে হয়ত প্রত্যেক দেশের নিজস্ব [illegible] কিছুটা প্রভাব [illegible]।

[illegible] ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার [illegible] অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড হোল্ট [illegible] ছিল ছুটির দিনে উপসাগরের গভীর জলে ডুব সাঁতার কেটে বর্শা দিয়ে মাছ শিকার করা। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা সমুদ্র থেকে অনেকটা দূরে, কিন্তু ভিক্টোরিয়ার উপকূলে পোর্টসীতে হোল্টের একটি [illegible] ছিল, আর ছুটিতে তিনি সেখানে আসতেন সাগরের ঢেউয়ে [illegible] করতে।

রবিবার সকাল বেলা [illegible] নাগাদ চারজন প্রতিবেশী [illegible] সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পোর্টসীর উপসাগরে সাঁতার কাটতে যান। সেদিন আকাশ মেঘে ভরা, জলে প্রবল ঢেউ। সঙ্গীরা বেশি দূর এগোতে সাহস বোধ করেননি, ফলে হোল্ট একাই সাঁতরে এগিয়ে যান। তিনি পাকা সাঁতারু, তাই কেউ উদ্বেগ বোধ করেননি। কিন্তু উপকূলের এই অংশটিতে জলের নীচে অনেক এবড়ো খেবড়ো পাথর—এক সময়ে এখানে জাহাজডুবি হয়েছিল বলে জায়গাটার দুর্নাম আছে। হোল্ট অনেকটা সাঁতরে যাবার পর হঠাৎ জলে ভয়ানক ঢেউ উঠতে থাকে, তারপর আর তাঁকে দেখা যায় না। তখন সঙ্গীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়। তারপর ডুবুরী, নৌকো, হেলিকপ্টার দিয়ে তন্ন তন্ন খোঁজ—সে খোঁজ এখনো চলছে—কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর শরীরের কোনো হদিস আজ পর্যন্ত মেলেনি। অনেক সাঁতারুর বিশ্বাস তিনি জলের নীচে কোনো প্রচণ্ড স্রোতের টানে পড়ে গিয়েছিলেন, সেই টানে তাঁর দেহ হয়ত অনেক দূরে চলে গেছে।

মরবার সময় হোলটের বয়স হয়েছিল উনষাট। গরীব ঘরের ছেলে, নিজের চেষ্টা আর সামর্থ্যের জোরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সাতাশ বছর বয়সে প্রথম পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। যখন তাঁর একত্রিশ বছর বয়স তখন মেঞ্জিস তাঁকে নিজের সরকারে শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এই সরকার বেশী দিন টেঁকেনি। কিন্তু ১৯৪৯ সালে মেঞ্জিস যখন আবার প্রধানমন্ত্রী হন, তখন হোলটকে দ্বিতীয়বার তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করেন। তারপর ক্রমে হোলট মেঞ্জিসের ডান হাত হয়ে ওঠেন, এবং ১৯৬৬ সালের গোড়ায় মেঞ্জিস যখন স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নেন, তখন লিবরাল পার্টি হোলটকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করে, এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। হোলট্ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মোট ৬৯২ দিন—এই সময়ের মধ্যে দুটি সাধারণ নির্বাচন হয়। প্রতিনিধি-সভার নির্বাচনে হোলটের নেতৃত্বে লিবরাল এবং কান্ট্রি পার্টি অভূতপূর্ব জয়লাভ করে। গত নভেম্বর মাসে সেনেটের নির্বাচনে এই দুইদল সংখ্যাধিক্য পায়নি বটে, কিন্তু প্রতিনিধি সভায় সংখ্যাধিক্য থাকার ফলে সরকার এখনো লিবরাল-কান্ট্রি পার্টি কোয়ালিশনের হাতে।

হোলট্ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দু বছরেরও কিছু কম সময়, কিন্তু এরি মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে তিনি উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। মেঞ্জিস ছিলেন একান্তভাবে ব্রিটিশভক্ত—তাঁর আমলে ব্রিটেনকে কেন্দ্র করে অস্ট্রেলিয়ার সরকারী রাজনীতি গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়া প্রতিবেশী এশিয়ার দেশগুলির প্রতি মেঞ্জিসের মনোভাব ছিল অকপট তাচ্ছিল্যের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গত দু দশকের মধ্যে পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থায় যেসব গভীর পরিবর্তন ঘটেছে, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি সে সব বোঝবার কোনো চেষ্টা করেননি। অথচ ইতিমধ্যে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য লোপ পেয়েছে, এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ইয়োরোপের প্রতিপত্তি নিশ্চিহ্ন। এশিয়ার প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত হ্যারল্ড হোল্ট

প্রতিষ্ঠা ঘটেছে; চীন কম্যুনিস্ট ডিক্টেটর-শিপের অধীনে এসেছে; এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলিতে দারিদ্র্য, জনবিক্ষোভ এবং দুর্বল শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কম্যুনিস্ট চীন সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু করেছে। সুয়েজের পূব থেকে ইংরেজ সরে যাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তাও বর্তমানে অনেকখানি অনিশ্চিত। যদিও এদেশের আর্থিক অবস্থা খুবই উন্নত এবং বলতে গেলে এদের কোনো কঠিন আভ্যন্তরীণ সমস্যা নেই, তবু এদের জনসংখ্যা অত্যন্ত অল্প হওয়ার ফলে এই বিরাট মহাদ্বীপের সামরিক সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এদের প্রায় সাধ্যাতীত। মেঞ্জিস অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতিবেশী এশিয়ার সৌহার্দ্য গড়ার চেষ্টা করেননি; অপর পক্ষে এদেশ আক্রান্ত হলে ব্রিটেন যে কার্যকরীভাবে সাহায্য করতে পারবে, এই নিতান্ত অবাস্তব প্রত্যাশা তিনি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

হোলট্ প্রধানমন্ত্রী হয়ে মেঞ্জিসী রাজনীতির দুর্বলতা দুভাবে শোধরাবার চেষ্টা করেন। ব্রিটেনকে ছেড়ে তিনি বেশী জোর দেন আমেরিকার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপরে। এটা এদেশের বামপন্থীরা পছন্দ না করলেও অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে এই নীতির যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। কম্যুনিস্ট চীন আণবিক শক্তি হয়ে ওঠার ফলে অস্ট্রেলিয়ার

নিরাপত্তা নির্ভর করছে হয় নিজস্ব আণবিক সমর সরঞ্জাম গড়ে তোলার ওপরে, আর নয়ত মার্কিনী আণবিক ছত্রের আশ্রয় নেওয়ার ওপরে। (একথা দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলি সম্পর্কেও সমান খাঁটি।) ফলত গত দু বছরে অস্ট্রেলিয়া ক্রমশই সামরিক নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। মার্কিনের প্রতি এই পক্ষপাত শুধু বৈদেশিক অথবা দেশরক্ষা নীতির মধ্যে আবদ্ধ নেই; সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও মার্কিনী প্রভাবের বিস্তার বর্তমানে লক্ষণীয়।

হোল্টের রাজনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বোধ হয় প্রথমটির চাইতেও বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি এদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি অস্ট্রেলিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করে প্রতিবেশী এশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপরে জোর দেন। এই সম্পর্কের পথে প্রধান বাধা এদেশের কুখ্যাত "শ্বেত অস্ট্রেলিয়া পলিসি"। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে চীনে মজুরদের আসা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৭-র মধ্যে শুধু ভিক্টোরিয়াতেই সোনা আবিষ্কারের হিড়িকে চল্লিশ হাজার চীনে মজুরের আমদানি ঘটে। ১৮৬১ সালে এদেশের স্থায়ী এশিয়ান বাসিন্দার সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে তিন ভাগ (৩·৫%)। গরীব দেশ থেকে আসার ফলে চীনে মজুরেরা অস্ট্রেলিয়ানদের তুলনায় অনেক কম মাইনেয় কাজ করতে রাজী হোত। ফলে অস্ট্রেলিয়ার সংগঠিত শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলি এশিয়ান মজুরদের আসার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। গত শতাব্দের শেষ দিক থেকে একটির পর একটি আইন করে এদেশে এশিয়ানদের আসা এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের পথে নানা প্রতিবন্ধক খাড়া করা হয়। এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী হয়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি। বর্তমানে এদেশে স্থায়ী এশিয়ান বাসিন্দার সংখ্যা কমে শতকরা ০·৩% এ এসে দাঁড়িয়েছে।

হোল্ট্ প্রধানমন্ত্রী হয়ে অল্পদিনের মধ্যে শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতিতে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। আগে নিয়ম ছিল, এদেশে যারা ইয়োরোপ থেকে আসত তারা পাঁচ বছর বাস করার পর স্থায়ী বাসিন্দা হবার জন্য আবেদন করতে পারত; এশিয়ানদের আবেদন করার জন্য পনের বছর অপেক্ষা করতে হত, এবং যেহেতু খুব কম এশিয়ানই পনের বছর থাকার অনুমতি পেত, তাই আবেদন করার সুযোগ তাদের বড় একটা মিলত না। হোল্ট এই ব্যবস্থা বদলে নিয়ম করেন যে এশিয়ান-ইয়োরোপিয়ান নির্বিশেষে যে কোনো লোক এদেশে পাঁচ বছর বাস করার পর স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করতে পারবে। অবশ্য তার ফলে কিছু রাতারাতি এদেশে এশিয়ান নাগরিকদের সংখ্যা বাড়েনি। (বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে প্রতি বছর সাতশ'র মত এশিয়ানকে স্থায়ী বাসের অনুমতি দেওয়া হয়। তা ছাড়া সাড়ে বারো হাজার এশিয়ান ছাত্রছাত্রী লেখাপড়ার জন্যে এবং সাড়ে চার হাজার এশিয়ান ব্যবসায়ী কাজ-কারবার উপলক্ষে সাময়িকভাবে থাকার অনুমতি পান।) কিন্তু নতুন ব্যবস্থার ফলে অশ্বেতকায়দের পক্ষে এদেশে নাগরিকত্ব পাওয়ার পথে বাধা অনেকটা কমেছে, এবং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই বর্তমানে তাদের নির্বাচনী ঘোষণা থেকে "শ্বেত অস্ট্রেলিয়া" নীতিকে বাদ দিয়েছে। সাম্প্রতিক নানা লক্ষণ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এশিয়ানদের পক্ষে এদেশে আসা এবং বসবাস করা আগের তুলনায় অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু হোল্ট্ শুধু ইমিগ্রেশন নীতিতে পরিবর্তনের সূচনা করেননি, তিনি প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার ওপরেও ঝোঁক দিয়েছিলেন। অনেকটা তাঁর উদ্যোগে গত দু বছরে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলি দেশের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছে। এদিক থেকে তাঁর নীতির প্রধান সূত্র ছিল তিনটি: প্রতিবেশী এশিয়ান দেশগুলির আর্থিক উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়ার সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো; এদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করা; এবং চীনের সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে এদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় সামরিক, রাজনৈতিক,

এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়া। ভারতবর্ষের খাদ্য সংকটে অস্ট্রেলিয়া যখন গম পাঠিয়ে সাহায্য করে তখন তার পেছনে হোলটের ব্যক্তিগত উদ্যোগ লক্ষ্য করেছি। জানুয়ারীতে এদেশে ইন্দিরা গান্ধীর আসবার কথা ছিল (হোলটের মৃত্যুর ফলে সেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী আপাতত পিছিয়ে দিয়েছেন) এই নিমন্ত্রণও হোলটের পররাষ্ট্রনীতির একটি ফল।

এই চেষ্টার ফলে অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যে অস্ট্রেলিয়ার প্রতি মনোভাব অনেকটা বদলেছে গত কয়েক বছরে এই অঞ্চলে বারবার ঘোরার সময়ে সেটা আমার চোখে পড়েছে। পরিবর্তনের কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেল হোলটের মৃত্যুর পরে বাইশে ডিসেম্বর শুক্রবার যখন মেলবোর্নের সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের জন্য অনুষ্ঠান হলো। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনো এত বড় আন্তর্জাতিক সমাবেশ এদেশে ঘটেনি। [illegible] ছাব্বিশটি দেশ থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন—যাঁদের অধিকাংশই এশিয়ার। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোস, কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং হী, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লী কুয়ান ইউ, [illegible] পররাষ্ট্রমন্ত্রী [illegible], কাম্বোডিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী [illegible], লাওসের অর্থমন্ত্রী [illegible]। এ ছাড়াও প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন [illegible] প্রধানমন্ত্রী, [illegible] প্রধানমন্ত্রী, [illegible] প্রেসিডেন্ট [illegible]। [illegible] এসেছিলেন [illegible] প্রেসিডেন্ট [illegible] প্রধানমন্ত্রী [illegible] এবং [illegible]।

হোলটের পরে অস্ট্রেলিয়ায় যে প্রধানমন্ত্রী হলেন তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এদেশে অনেকদিন থেকে ফেডারাল সরকার লিবারাল এবং কান্ট্রি পার্টি কোয়ালিশনের হাতে। হোলট ছিলেন লিবারাল পার্টির নেতা; ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জন ম্যাকইউয়েন কান্ট্রি পার্টির নেতা। হোলটের মারা যাওয়াতে আপাতত ম্যাক ইউয়েনকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে—কিন্তু যেহেতু কোয়ালিশনে লিবারালরাই প্রধান দল তাদের নির্বাচিত নেতাই পরে প্রধানমন্ত্রী হবেন। হোলটের আমলে লিবারাল পার্টির ডেপুটি নেতা ছিলেন উইলিয়ম ম্যাকমাহন। স্বভাবতই তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবার কথা, কিন্তু ম্যাকইউয়েন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে ম্যাকমাহন যদি লিবারাল পার্টির নেতা নির্বাচিত হন, তাহলে কান্ট্রি পার্টি আর কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে থাকবে না। অথচ কান্ট্রি পার্টিকে বাদ দিয়ে লিবারালেরা ফেডারাল সরকার গঠন করতে পারেন পার্লামেন্টে এমন শক্তি তাঁদের নেই। ফলে লিবারালেরা এখন কাকে তাঁদের নেতা নির্বাচন করবেন, সেটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানুয়ারীতে এই নির্বাচন হবে—এ পর্যন্ত তিনজন প্রধান ক্যান্ডিডেটের কথা শোনা যাচ্ছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল হাসলাক, শিক্ষামন্ত্রী জন গর্টন, এবং শ্রমমন্ত্রী লেসলী বেরী। এঁদের মধ্যে গর্টন সেনেটের সদস্য; সুতরাং তিনি যদি নেতা নির্বাচিত হন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী হবার আগে তাঁকে সেনেটের সদস্যপদ ত্যাগ করে প্রতিনিধি-সভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হতে হবে। সেক্ষেত্রে হোলট্ এতদিন যে কনস্টিটুয়েন্সির প্রতিনিধি ছিলেন সেই হিগিনস্-এ তিনি লিবারাল ক্যান্ডিডেট হিসেবে সম্ভবত দাঁড়াবেন।

যদি লিবারাল-কান্ট্রি পার্টি কোয়ালিশনে ভাঙন না ধরে তাহলে ১৯৬৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত এঁরাই ক্ষমতায় থাকবেন। তবে সেই নির্বাচনে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির পক্ষে ক্ষমতায় আসা অসম্ভব নয়, এবং সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক নীতিতে হয়ত আবার একটা বড় পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু বর্তমান কোয়ালিশন যদি বজায় থাকে তাহলে জানুয়ারিতে যিনিই লিবারাল পার্টির নেতা (এবং ফলে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী) নির্বাচিত হোন না কেন, তিনি মোটামুটি হোলট্ প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করবেন বলেই আমার ধারণা।

শিবনারায়ণ রায়
মেলবোর্ন, ২৯-১২-২৬

হৃদয়হীন এই খোজাপ্রথাকে মনুষ্যত্বের জঘন্যতম বিকার বলিলেও বরং অল্প বলা হয়।

মুর্শিদাবাদের কঠোর অবগুণ্ঠনের মধ্যে বেগমদের উপভোগের জন্য খোসবাগ, রৌসনীবাগ, ফররাবাগ, মতিঝিল, হীরাঝিল প্রভৃতি প্রমোদ-উদ্যানের নাম উল্লেখ করা যায়। মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদ শহর পত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রমোদ-উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন এমন নিদর্শন নাই। প্রমোদ-উদ্যানগুলি পরবর্তী নবাবদের তৈয়ারী। সর্বসাধারণের উপভোগের জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ নওয়ারা বা নববর্ষ ও 'বেরা' উৎসবের প্রচলন করেন। উৎসব উপলক্ষে বেগমরা প্রাচীর-ঘেরা প্রাসাদের বাহিরে আসিবার সুযোগ পাইতেন।

নওয়ারা উৎসবে বিভিন্ন ধরনের সুসজ্জিত বজরা ভাগীরথীর বুকে শোভা পাইত। হংসমুখী, ময়ূরপঙ্খী, হাতীমর্দান, মকরমুখী, মৎস্যমুখী রংমহল, ঘোড়ামর্দান প্রভৃতি বজরার নাম ছিল। চান্দ্রমাসের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নির্দিষ্ট ধর্মীয় উৎসব বৎসরের সব ঋতুতেই দেখা দেয়। হিন্দুদের উৎসব সৌরমাসে চালিত হওয়ায় পূজাপার্বণগুলি একই ঋতুতে উদযাপিত হয়। বেরা উৎসব প্রতি বৎসর বর্ষাশেষে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার দিন ধার্য হইয়া থাকে। সে কারণে ইহা স্থানীয় উৎসব বলিয়া মনে হয়। মনস্কামনা পূরণের জন্য দেবতার উদ্দেশে কলাগাছের ভেলাতে প্রদীপ জ্বালাইয়া জলে ভাসানোর রীতি এদেশে আছে। বেরা উৎসবে বেগমরা সোনার প্রদীপ-সহ ভেলা ভাসাইয়া পীর খাজা খিজিরের নিকট দোয়া বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। খাজা খিজির সমুদ্রের প্রতীক। অনেকে তাঁকে জলদেবতা মনে করে। বেরা উৎসব জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই উপভোগ করে। কাহারও কাহারও মতে, সিরাজদ্দৌলা বেরা উৎসব প্রবর্তন করেন। অন্যপক্ষে, নবাব মকরম খাঁর সময়ে উৎসবটি প্রথমে রাজধানী ঢাকাতে প্রচলিত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথম মুর্শিদাবাদে বেরা উৎসব প্রচলন করেন।

মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুতে বেগম নৌসেরাবানু ও কন্যা আজিমন্নেসা বা জিন্নাতুন্নেসা উভয়েই সংকটে পড়িলেন। আজিমন্নেসা বেগমের একমাত্র পুত্র সরফরাজ খাঁ মসনদে বসিতে প্রস্তুত। অন্যদিকে আজিমন্নেসার স্বামী উড়িষ্যার ডেপুটি নবাব সুজাউদ্দিনও মসনদ দখল করিবার জন্য সৈন্যসামন্ত সহ মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সরফরাজ খাঁ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। মসনদের জন্য পিতাপুত্রের যুদ্ধ মোগল আমলে নূতন নহে। নৌসেরাবানু ও আজিমন্নেসা সরফরাজকে নিরস্ত্র হইতে পরামর্শ দিলেন।

সুজাউদ্দিনের বয়স হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ মসনদে বসিবার সুযোগ পাইবেন। মাতা ও মাতামহীর উপদেশ শিরোধার্য করিয়া সরফরাজ খাঁ সুজাউদ্দিনকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে বাংলার মসনদে বসাইয়া অভিবাদন জানাইলেন। সুজাউদ্দিন যখন উড়িষ্যার ডেপুটি নবাব তখন আজিমুন্নেসা বেগম সরফরাজকে সঙ্গে করিয়া মুর্শিদাবাদে পিতার আশ্রয়ে চলিয়া আসেন। সুজাউদ্দিনের অতিরিক্ত অসংযত চরিত্র তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। সুজাউদ্দিনের বিবাহিত বেগম ছাড়া বহু উপপত্নী ও সহচরী ছিল। সহচরীদের সান্নিধ্য ব্যতীত তিনি একটানা চার ঘণ্টার বেশী সময় কাটাইতে পারিতেন না। নবাব আলীবর্দী প্রথম জীবনে সুজাউদ্দিনের খিদমদার বা হুঁকাবাহক ছিলেন। খোসামোদগিরি করাই তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। আলীবর্দী পরিবারের বেগমদের সুজাউদ্দিনের হারেমের সঙ্গিনীরূপে নিযুক্ত করা হইত। জন হলওয়েল সাহেবের মতে, সুজাউদ্দিনের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন হাজী পরিবারের মেয়েরা। সুজাউদ্দিন কাশ্মীর ও পারস্য হইতে বহু মূল্যবান আসবাবপত্র ও নানা প্রকার গাছপালা সংগ্রহ করিয়া ভাগীরথীর অপর পারে ফররাবাগ বা সুন্দর উদ্যান নামে প্রমোদ উদ্যান সুসজ্জিত করেন। রাজ্য শাসনের দায়িত্ব মন্ত্রীদের উপর দিয়া তিনি সহচরীদের সঙ্গে ফররাবাগে আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতেন। কথিত আছে, ফররাবাগের সৌন্দর্য দেখিতে স্বর্গ হইতে লোকচক্ষুর অন্তরালে অপ্সরাগণও নাকি সেখানে বিচরণ করিত। সুজাউদ্দিনের অপর কীর্তি হইল মুর্শিদাবাদে বর্তমান কিল্লা নিজামতের অপর তীরে রৌসনীবাগ বা আলোময় উদ্যান।

অতঃপর বিহারের ডেপুটি নবাবের পদ শূন্য হওয়ায় আলীবর্দী ঐ পদে মনোনীত হইলেন। আজিমুন্নেসা বেগম তাঁহার একমাত্র পুত্র সরফরাজকে মুর্শিদাবাদ হইতে দূরে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ, বিহারে বিদ্রোহী পাঠানদের দৌরাত্ম্য লাগিয়াই ছিল। পাঠানদের হাতে সরফরাজের জীবন বিপন্ন হইতে পারে এই আশংকায় আজিমুন্নেসার ইচ্ছায় সরফরাজের পরিবর্তে আলীবর্দীকে বিহারের নবাব নিযুক্ত করা হয়। এই উপলক্ষে ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে আলীবর্দী আজিমুন্নেসার আমন্ত্রণে বেগমমহলের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন। পর্দার আড়াল হইতে আজিমুন্নেসা সরফরাজ খাঁ মারফত আলীবর্দীকে বহু মূল্যবান একটি খিলাত বা দরবারী পোশাক উপহার দিয়া বিহারের নবনিযুক্ত ডেপুটি নবাবকে সম্মানিত করেন। তাঁহারই অনুগৃহীত ও স্বামীর আশ্রিত আলীবর্দী যে একদিন সরফরাজকে হত্যা করিয়া বাংলার মসনদে বসিবেন এ কথা সেদিন তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। মুর্শিদাবাদের রাজপথের উপর ত্রিপলিয়া তোরণদ্বারের উত্তর-পূর্বে ১৭৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদটির পূর্বদিকে প্রবেশদ্বারে সিঁড়ির নীচে একটি সমাধি অযত্নে আজও পড়িয়া আছে। আর প্রবেশদ্বারে প্রোথিত শিলালিপিতে ফার্সী ভাষায় নৌসেরীবানুর নাম লেখা আছে। বিশেষ লক্ষণীয়, নৌসেরীবানুর সমাধি তাঁহার স্বামী মুর্শিদকুলী খাঁর সমাধির পাশে স্থান পায় নাই। আজিমুন্নেসা বেগম-এর সমাধিও রৌসনীবাগে তাঁহার স্বামী সুজাউদ্দিনের সমাধির পাশে নয়। আজিমনগরে একটি মসজিদের প্রবেশদ্বারে সিঁড়ির নীচে আজিমুন্নেসা বেগমের সমাধি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষণ করিতেছেন। নৌসেরীবানুর বেগমের সমাধি সরকার সংরক্ষণ করেন নাই। মুর্শিদকুলী খাঁ, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার সমাধি পৃথক স্থান নির্বাচনে যেমন তাহাদের পারিবারিক অনৈক্যের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি মসজিদের প্রবেশপথের সিঁড়ির নীচে তাঁহাদের সকলের সমাধির মধ্যে বিশেষ চিন্তাধারার একটি পরিচয় মেলে।

আজিমুন্নেসা বেগমের মৃত্যু সম্পর্কে মুর্শিদাবাদে অদ্ভুত জনশ্রুতি আছে। শোনা যায়, শেষ বয়সে তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের জন্য প্রতিদিন একটি জীবন্ত মানুষের কলিজার প্রয়োজন হইত। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড অবসানের জন্য নাকি বেগমকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। এই জনশ্রুতির মূলে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হয়তো তিনি বাবরের মত ইচ্ছা-মৃত্যু বরণ করেন।

সুজাউদ্দিনের অন্যতম মন্ত্রী হাজী আহম্মদ সরফরাজকে [illegible] দিয়া মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। [illegible] তাঁহার হারেমে [illegible] পনর শত বেগমের সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাতেও তিনি তুষ্ট নহেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের পৌত্রবধূর অপরূপ সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া তিনি সেই রূপসীকে দেখিবার অভিপ্রায় করিলেন। জগৎশেঠ পড়িলেন বিষম বিপদে। পৌত্রবধূকে নবাব হারেমে পাঠাইলে বংশমর্যাদা ও কুল নষ্ট হয়। না পাঠাইলে নবাব জবরদস্তি করিতে পারেন। আবার হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব করিলে এ ঘটনা গোপন থাকিবে না। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাল্কীতে পৌত্রবধূকে সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নবাবের কৌতূহল নিবৃত্ত হইলে অনতিবিলম্বে তিনি পৌত্রবধূকে বিদায় দিলেন। 'তারিখ-ই-বাংলায়'

এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্সে ঘটনা বর্ণনায় বলা হইয়াছে—'She was not deflowered but returned dishonoured to her husband."

পৌত্রবধূর স্বামী ছিলেন মহাতাব রায়, যিনি সিরাজদ্দৌল্লার সময় জগৎশেঠ ছিলেন। জগৎশেঠের মহিমাপুরের বাড়ীর নিকটে 'সতীচড়া' নামে জায়গা আছে। সে স্থানে ২৫০ বৎসর পূর্বে অধুনালুপ্ত 'সতীমন্দির' নামে একটি মন্দির ছিল। শেঠবংশের কোন্ মহিলার স্মৃতিরক্ষার্থে মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল, জানা যায় না। হয়তো মন্দিরটি উক্ত পৌত্রবধূরই স্মৃতি-বিজড়িত। যাহা হউক জগৎশেঠ আলীবর্দীকে মুর্শিদাবাদের মসনদে আহ্বান করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁর কামান হইতে যে মাটির গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা সম্ভব হইয়াছিল জগৎশেঠের চক্রান্তের প্রভাবে। বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন আলীবর্দী সরফরাজকে গিরিয়ার যুদ্ধে হত্যা করিয়া ভবিষ্যতে ঘাতকের হস্তে নিজ দৌহিত্রের মৃত্যুর বীজ বপন করিয়াছিলেন। বিজয়ী আলীবর্দী মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথম সরফরাজ খাঁর ভগিনী নফিসাবেগমের প্রাসাদদ্বারে হস্তি-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নিজ কৃতকার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। "ভাগ্যে যাহা ছিল, ঘটিয়াছে। তুমি আপনাকে চিরদিন সম্মান করিবে ও অনুগত থাকিবে।" নফিসাবেগম নীরব রহিলেন। কোন কোন লেখক সরফরাজ খাঁর মাতা আজিমুন্নেসা বেগমের নিকট মার্জনা ভিক্ষার কথা লিখিয়াছেন। গিরিয়ার যুদ্ধ হয় ১৭৪০ সালে। আজিমুন্নেসার সমাধিফলকে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ উল্লিখিত আছে। সুতরাং আজিমুন্নেসার নিকট আলীবর্দীর ক্ষমা চাওয়া সম্ভব নয়।

হাজী আহম্মদ ও আলীবর্দী পরিবারের মধ্যে সরফরাজ খাঁর হারেমের পরে শত বেগমের ভাগবাটোয়ারা ও পুনর্বণ্টন হইয়া গিল। বলা বাহুল্য, এ ধরনের পুনর্বণ্টনের দৃষ্টান্ত নবাবী ইতিহাসে বিরল নহে। সরফরাজ খাঁর স্ত্রীকে ঢাকাতে অন্তরীণ রাখা হয়। সরফরাজের প্রকৃত স্ত্রী যে কে ছিলেন তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। আজমতুন্নেসা বেগম নামে তাঁহার এক স্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। বেগমদের মধ্যে একমাত্র সরফরাজ খাঁর স্ত্রীর সমাধির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। সরফরাজ খাঁর বেগম মুর্শিদাবাদে নাগিনাবাদে বা ন্যাক্‌টাখালিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি বেগম মসজিদ নামে পরিচিত। নিকটেই সরফরাজের সমাধি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষণে রহিয়াছে। সরফরাজ খাঁর বেগমের সমাধি মসজিদের আঙিনায় ছিল, উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণ্য নিদর্শন নাই। মসজিদটি এখন জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত। বেগম মসজিদ নামকরণের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। মহিলাদের সাধারণত মসজিদে জমায়েত হওয়ার প্রচলন নাই। তবে তাহাদের জমায়েত হওয়ার বিরুদ্ধে কোন সুস্পষ্ট ধর্মীয় নির্দেশও নাই। জমায়েত নামাজ পড়িতে হইলে মহিলাদের বোরখা ব্যবহার করিতে হয়। নামাজের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে

বেগম মসজিদ

এরূপ ঝঙ্কারযুক্ত নূপুরে জাতীয় কোন অলংকার পরিধান করা নিষিদ্ধ। জমায়েতে মহিলারা ইমামের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। পুরুষদের সঙ্গে তাহাদের এক সারিতে দাঁড়াইবারও বিধি নাই। তাহাদের সারি পুরুষদের পশ্চাতে হয়। সুতরাং সরফরাজ খাঁর হারেমের শত শত বেগমের সুবিধার জন্য বেগম মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সরফরাজ খাঁর বেগম এই মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়াও ইহার নাম বেগম-মসজিদ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সরফরাজ খাঁর মৃত্যুদিবসে তাঁহার কোনও এক বেগমের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। নফিসাবেগম উক্ত শিশুপুত্র আগাবাবার জীবন রক্ষার্থে নোয়াজেস মহম্মদের অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। সরফরাজ খাঁর আর এক ভগিনী দরদরিয়ানা বেগমের স্বামী ছিলেন উড়িষ্যার ডেপুটি নবাব দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁ। তিনি ভ্রাতৃহন্তার বিরুদ্ধে স্বামীকে যুদ্ধ করিতে প্রেরণা দেন কিন্তু ঘটনার বিবর্তনে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁকে সমুদ্র-পথে মসলিপত্তনে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। দরদরিয়ানা বেগম আলীবর্দীর নিকট আত্ম-সমর্পণ না করিয়া বারবাটি দুর্গ হইতে পত্তনে স্বামীর নিকট চলিয়া যান। নফিসা-

পত্তনে স্বামীর নিকট চলিয়া যান। নফিসা-

বেগম আগাবাবার সহিত আলীবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা পূর্ণিয়ার নবাব সৈয়দ আহম্মদের কন্যার বিবাহ দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। অভিপ্রায় ছিল আলীবর্দীর অবর্তমানে আগাবাবাকে মসনদে বসাইবেন। ঘেসেটি বেগমের সন্তান না থাকায় তিনি সিরাজদ্দৌল্লার অনুজ একরামদ্দৌলাকে একই উদ্দেশ্যে পুত্রস্নেহে লালন পালন করিতে থাকেন। আলীবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যা ময়মনা-বিবির পুত্র সৌকতজঙ্গও ছিলেন মসনদের একজন ভাবী উত্তরাধিকারী। আবার আলীবর্দীর অগ্রজ হাজী আহম্মদের কন্যা রাবিয়া বেগমের স্বামী আতাউল্লা খাঁ ও ভগিনীপতি মীরজাফর বাংলার মসনদ নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এই অপরাধে আতাউল্লা খাঁকে সস্ত্রীক বিষয়সম্পত্তি সহ বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। বিদেশে আতাউল্লা খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে হিরাজরের মন্দরের মুখাত রেজা খাঁ ছিলেন উক্ত রাবিয়া বেগমের জামাতা। এদিকে সিরাজের পিতা জৈনুদ্দিন আহম্মদ পাঠানসর্দারের হাতে নিহত হইলে আলীবর্দী সিরাজকে মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারীরূপে অপত্য স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। আলীবর্দীর অজ্ঞাতে পনর বৎসরের বালক এই সিরাজ-মাতা আমিনা ও সহচরী লুৎফাকে লইয়া বিহারের শাসনভার রাজা রামনারায়ণের নিকট হইতে স্বয়ং গ্রহণ করিবার জন্য পাটনায় উপস্থিত

হন। নৌজেস মহম্মদ খাঁর প্রধান সেনাপতি হুসেনকুলী খাঁ সিরাজকে বাধা দিবার চেষ্টা করেন।

আলীবর্দীর পর্দানশিন বেগম জসরৎন্নেসা আলীবর্দীকে শাসনকার্যে পরামর্শ দিতেন। এমন কি, দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম রাজধানী হইতে আলীবর্দীর সাময়িক অনুপস্থিতিতে জসরৎন্নেসাকে শাসনকার্য চালাইবার ক্ষমতাও অনুমোদন করিয়াছিলেন জানা যায়। মারাঠারা বর্ধমানে বেগমের শিবির অবরোধ করিলে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হইয়া রক্ষী সেনাদলকে শত্রুব্যূহ ভেদ করিবার আদেশ দেন। সাহসিকতা ও নির্ভীকতার জন্য তিনি বিপন্মুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসংগত প্রমাণিত হয় নবাব আলীবর্দী যুদ্ধক্ষেত্রে বেগমকে সংগে লইয়া যাইতেন। কারণ মারাঠাদের অতর্কিত আক্রমণে নবাব পরিবারের বিচ্ছিন্ন হইবার ভয় ছিল। অপর পক্ষে আক্রমণকারী মারাঠা শিবিরে কিন্তু নারীর কোনও স্থান ছিল না। অন্যান্য আক্রমণকারীদের মতই নারীর উপর তাহাদের অত্যাচার গংগারামের লেখনীতে পাওয়া যায়।

"বর্গীর নাম শুইন্যা সব পালাইল
গর্ভবতী নারী যত না পারে চলিতে
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে।
ভাল ভাল স্ত্রীলোক ধইরা লইয়া যায়
আংগুলে দাঁড় বাঁধি দেএ তার গলাএ
একজন ছাড়ে আর একজন্য ধরে।
এই মত বর্গী যত পাপ কর্ম কইরা
সেইসব স্ত্রীলোক জত দেএ ছাইড়া।"

মারাঠারা শুধু অত্যাচারই করিয়াছে তাহা নহে তাহারা প্রকৃত বীরত্বের সম্মান ও মূল্য দিয়াছে। একবার পেশোয়া বালাজী রাও বাংলাদেশ আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় ভাগলপুরের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। মারাঠাদের লুণ্ঠতরাজে বাধা দিবার জন্য প্রাচীরঘেরা অন্দরমহল হইতে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। অনুসন্ধানে জানা গেল গিরিয়ার যুদ্ধে নিহত সরফরাজ খাঁর প্রধান সেনাপতি গাউস খাঁর স্ত্রী ঐ বাড়ীতে বসবাস করিতেছেন। বীরাংগনা রমণীর পরিচয় পাইয়া বালাজী রাও সেনাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ দেন এবং দাক্ষিণাত্য হইতে সংগৃহীত মূল্যবান জহরত ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়া নির্ভীক মহিলাকে সম্মানিত করেন। মারাঠাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে আলীবর্দী হতাশ হইয়া পড়িলে জসরৎন্নেসা বেগমের প্রেরণায় শান্তিচুক্তির জন্য মনসুর আলী খাঁ ও ফকির আলী খাঁ নামে দুইজন বিশ্বস্ত দূতকে রঘুজীর নিকট পাঠানো হইল। হলওয়েলের সাহেবের লেখনী জসরৎন্নেসা বেগমকে মহানুভব, উচ্চমনা, বুদ্ধিমতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিংসাত্মক নৃশংস কার্য ব্যতীত রাজ্যশাসনের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলীবর্দী

জনৈক বেগম—হস্তীদন্তের উপর চিত্রিত
(শ্রীপৎ সিংজীর সৌজন্যে)

জসরৎন্নেসার পরামর্শ লইতেন। সন্ধ্যার পরে অন্দরমহলে বেগমদের সহিত আলাপ আলোচনা আলীবর্দীর দৈনন্দিন কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জসরৎন্নেসার দুই কন্যা ঘেসেটি ও আমিনার সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদে নানা গুজব রটিতে লাগিল। ঘেসেটি ভবিষ্যতে নিরাপত্তার জন্য সেনাপতি হুসেনকুলী খাঁর সংগে ঘনিষ্ঠতা রাখিতেন। আমিনাও গোপনে হুসেন কুলী খাঁর সহিত যোগাযোগ করিলেন। আমিনার সহিত হুসেনকুলী খাঁর যোগাযোগ ঘেসেটির ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ফলে হুসেনকুলী খাঁর জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িল। জসরৎন্নেসা ও ঘেসেটির পরামর্শে নৌজেস মহম্মদ হুসেনকুলী খাঁকে নিহত করিবার সম্মতি দিলেন। সিরাজ বেগমমহলের সহিত জড়িত হুসেনকুলী খাঁ সম্বন্ধে নানা গুজবের অজুহাতে প্রকাশ্য রাজপথে দিবালোকে তাহাকে হত্যা করেন। আলীবর্দী হত্যাকাণ্ড হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার জন্য শিকারের অজুহাতে রাজমহল চলিয়া যান। আপাত দৃষ্টিতে হুসেনকুলী খাঁর হত্যা বেগমদের প্রণয় সম্পর্ক জড়িত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি রাজনৈতিক হত্যা। অতঃপর রাজা রাজবল্লভ হুসেনকুলী খাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ঘেসেটি বেগম রাজবল্লভের মাধ্যমে ইংরেজদের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন। ঘেসেটি ও রাজবল্লভের যোগাযোগের মধ্যে 'ওর্মে' সাহেব প্রণয়সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন।

আলীবর্দী পাঠান সর্দার মোস্তাফা খাঁকে নিহত করিয়া তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে পাটনা প্রাসাদে অন্দরমহলে আশ্রয় দেন। পাঠান-দুহিতার প্রতি সিরাজ নজর দিতে পারেন সন্দেহে অন্দরমহলে সিরাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অনতিবিলম্বে মোস্তাফা খাঁর কন্যাটির সহিত শা-মহম্মদ ইসাক নামে এক যুবকের সহিত বিবাহ দিয়া মোস্তাফা খাঁর স্ত্রীকে বেতিয়ার রাজার রক্ষণাবেক্ষণে স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে সিরাজের বিবাহ উৎসবে বিশু নাম্নী এক নর্তকীর দলকে দশহাজার টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদে আনা হয়। নবাব দরবারে নর্তকীদের বিশেষ মান-মর্যাদা ও সমাদর ছিল। নর্তকী সম্প্রদায় সেই সময় বড় নিন্দার্হ ছিল না। নর্তকীদের মধ্যে মুন্নি বেগম মীর্জাফরের ইচ্ছায় মাসিক পাঁচশত টাকা ভাতায় মুর্শিদাবাদে থাকিতে সম্মত হন। সেকেন্দ্রাতে বালকুণ্ডা নামক স্থান মুন্নি বেগমের জন্মস্থান। বিশু নর্তকী তাহাকে লালন পালন করেন। অন্যতমা নর্তকী বব্বু বেগমও অনুরূপ ব্যবস্থায় রহিয়া গেলেন। মুর্শিদাবাদে মতি-ঝিল ও অধুনালুপ্ত হীরাঝিল প্রমোদ উদ্যান তখন বিখ্যাত ছিল। হীরাঝিলে এন্তাজমহল ও রংমহল নামে দুটি বিলাস-ভবন ছিল। মতিঝিলে দোলপূর্ণিমায় সাত দিন ধরিয়া নৃত্যগীত ও রং আবীর খেলার উৎসব চলিত। প্রতিদিন প্রত্যূষে মতিঝিল উদ্যানে নানাদিক হইতে পাঁচশত নর্তকী জাঁকজমকপূর্ণ মূল্যবান পোশাক ও অলংকারে সুসজ্জিত হইয়া দলে দলে সারিবদ্ধভাবে নৃত্যগীত সহকারে রং ও আবীর ছড়াইয়া নবাব পরিবারের মনোরঞ্জন করিত। রং মিশ্রিত জল রাখিবার জন্য দুই শত চৌবাচ্চা ছিল। স্তূপাকার লাল ও সফেদা রঙের আবীর রাখা হইত। আলী-নগরে সন্ধির পর সিরাজ মহাসমারোহে হীরাঝিলে অনুরূপ উৎসব পালন করেন। (সিরাজ কলিকাতা হইতে ইংরাজদের বিতাড়িত করিয়া সম্ভবত খলিফা আলীর নামানুসারে শহরের নূতন নামকরণ করেন "আলীনগর"।) ঐ উৎসবে মীর্জাফরের উপস্থিতি দেখা যায়। করম আলির 'মুজাফর নামা'য় এই উৎসবের বিবরণ লিখিত আছে। নবাবদের হারেমে রূপোপ-জীবীদের স্থান ছিল না। কিন্তু নর্তকী, জারিয়া বা ক্রীতদাসী ও সহচরীদের মর্যাদা ছিল।

সেসময়ে সুস্থ সবল সুন্দর যুবকদের রাজপথে চলাফেরা বিপজ্জনক ছিল বলিয়া শোনা যায়। সিরাজ একলক্ষ টাকা ব্যয়ে দিল্লী হইতে ফৈজী নামে এক কাঞ্চনী বা নর্তকীকে হীরাঝিল বিলাসভবনে লইয়া আসেন। সিরাজের ভগিনীপতি সৈয়াদ মহম্মদ খাঁ মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে সুন্দর যুবক ছিলেন। ফৈজীর সহিত তাঁহার গোপন আলাপ সিরাজের নজরে পড়িলে ফৈজী সিরাজ কর্তৃক তিরস্কৃত হন। ফৈজী সিরাজকে উত্তরে বলে, "আপনি আমার ব্যবসা ভাল ভাবেই জানেন। আমাকে তিরস্কার না করিয়া বরং আপনার মা ও

মাসীর দিকে দৃষ্টি রাখুন।” এই শ্লেষবাক্যে ক্রুদ্ধ সিরাজ হীরাঝিলে একটি প্রকোষ্ঠ দরজা জানালা ইঁটের গাঁথুনিতে রুদ্ধ করিয়া ফৈজীর জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে, সিরাজ রানী ভবানীর বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে হারেমে আনিবার জন্য উৎসুক হন। ইহা সত্ত্বেও রানী ভবানী কখনো প্রকাশ্যে সিরাজের বিরোধিতা করেন নাই। রাজশক্তির বিরুদ্ধাচারণ করা মহাপাপ—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

আলীবর্দী'র হারেমে লুৎফান্নেসা নামে এক জারিয়া (bond maid) বা ক্রীতদাসী ছিল। লুৎফা শব্দের অর্থ ভালবাসা ও নেসা শব্দের অর্থ স্ত্রী। সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রীর নাম ওমদতুন্নেসা। তিনি ইরাজ খাঁর কন্যা। ওমদতুন্নেসাকে উপেক্ষা করিয়া সিরাজ লুৎফার প্রতি আকৃষ্ট হন। 'মোতাক্ষরিন' অনুবাদক গোলাম মোস্তাফা লুৎফাকে ভারতীয় সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তন্বী দেহ, ওজন মাত্র বাইশ সের। পান খাওয়ার সময় তাহার গলার মসৃণ ত্বকে পানের রং ফুটিয়া উঠিত। গোলাম মোস্তাফার মতে তিনি ছিলেন পলাশীখ্যাত মোহনলালের ভগিনী। অজ্ঞাতকুলশীল মোহনলালের প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রাপ্তি লুৎফার উপর সিরাজের দুর্বলতাতেই সম্ভবপর হইয়াছিল। ওয়াট্‌স সাহেবের পত্নী মুর্শিদাবাদে ৩৭ দিন বন্দী থাকার পর লুৎফা ও সিরাজ-জননী তাঁহাকে সিরাজের অগোচরে চন্দননগরে ফরাসী অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই ঘটনাও লুৎফার প্রতি সিরাজের দুর্বলতার প্রমাণ দেয়। পলাশীর পরে লুৎফা সংগে থাকাতেই সিরাজ শত্রুর নিকট অনায়াসে ধরা পড়েন। লুৎফা সংগে না থাকিলে সিরাজ আরো তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণ ও স্বপক্ষীয় ফরাসী সেনানায়ক মাসিয়ে ল'র সহিত মিলিত হইতে পারিতেন। সিরাজের পশ্চাদ্গামী পলায়নপর বহু সহচরী ও পঞ্চাশটি হাতী ভগবানগোলায় ধরা পড়ে। সিরাজের পতনের পর পরিত্যক্ত বেগম ও সহচরীবৃন্দ মীর্জাফরের পরিবারে স্থান পায়। লুৎফাকে বিবাহ করিবার জন্য মীর্জাফর ও মীরন উভয়েই অভিলাষী হন। লুৎফা সম্ভবত রাজপুত রমণী ছিলেন। একাধিক বিবাহ ঐতিহ্য বিরোধী। বিবাহ-প্রস্তাবের উত্তরে তিনি রাজপুত রমণীসুলভ নির্ভীকতার সংগে স্পষ্ট শ্লেষাত্মক ভংগিতে বলেন—যে চিরদিন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহীর অংকশায়নে অভ্যস্ত, সে কখনো গর্দভপৃষ্ঠে আরোহীর অংকশায়িনী হইতে পারে না। বস্তুতপক্ষে, মীর্জাফরকে ক্লাইভের গর্দভ বলিয়া সেই সময়েই অভিহিত করা হইত। জসরৎন্নেসা, লুৎফান্নেসা, ঘেসেটি ও আমিনা সহ আলীবর্দী পরিবারের প্রায় অনেককে

নর্তকী দল

বিনা প্রস্তুতিতে রাত্রির অন্ধকারে একটি সাধারণ বজরায় ঢাকাতে নির্বাসিত করা হয়। লং সাহেবের বিবরণীতে মুরিদুন্নেসা নামে সিরাজের কোনও এক বেগমের নাম উল্লেখ আছে। ঘেসেটি ও আমিনাকে জলে ডুবাইয়া মারিবার পর ক্লাইভের চেষ্টায় জসরৎন্নেসা ও লুৎফান্নেসাকে মুর্শিদাবাদে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৭৮২ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে ফস্টার সাহেব নিজে লুৎফান্নেসাকে খোসবাগে সিরাজের সমাধির হক নিতে দেখেন। খোসবাগে আলীবর্দী পরিবারের সমাধি ও পাটনাতে হাজী আহম্মদের সমাধির তত্ত্বাবধানের জন্য লুৎফান্নেসাকে মাসিক ৩০১ টাকা ভাতা দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত তিনি মাসিক ১০০০ টাকা ব্যক্তিগত ভাতা পাইতেন। সিরাজবেগম ওমদতুন্নেসা প্রথমত মাসিক

লুৎফান্নেসা (?)
—(সৈয়দ জাফর নবাবের সৌজন্যে)

৫০০ টাকা হারে ভাতা পাইতেন। ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে সিরাজের সমাধির দক্ষিণে লুৎফান্নেসাকে সমাধি দেওয়া হয়। সিরাজকন্যা উম্মত জোহরা মাতা লুৎফার জীবদ্দশাতেই মারা যায়। উম্মত জোহরার সাকিনা, খয়রুন্নেসা, জিনা বেগম ও ফাতিমা নামে চারি কন্যার নাম পাওয়া যায়। ফাতিমার পুত্র মহম্মদ আলীর বংশধরেরা খোসবাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৮৪৫ সালে কোম্পানী খোসবাগ সমাধির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ওয়ারেন হেস্টিংস মুক্তি পাইলে নবাব-বংশধরেরা অভিনন্দন জানায়। অভিনন্দনপত্রে সিরাজবেগম ওমদতুন্নেসার স্বাক্ষরও ছিল। তাঁহার ব্যক্তিগত ভাতা বৃদ্ধির জন্য ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি সরকারের নিকট একখানি আবেদনলিপিও প্রেরণ করেন বলিয়া জানা যায়।

মীর্জাফর মহিষী মুন্নি বেগম সিরাজের মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে অন্দরমহলে গচ্ছিত বহু মূল্যবান জহরত ও ধনরত্নাদি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইংরেজরা রাজকোষের অর্থ ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া লইল, কিন্তু অন্দরমহলের গুপ্ত ধনরত্নাদির খোঁজ তাহারা রাখিত না। মীর্জাফর মসনদ হইতে অপসারিত হইয়া মুর্শিদাবাদে থাকিলে জীবন বিপন্ন হইতে পারে মনে করিয়া মুন্নি বেগম সহ কলিকাতার চিৎপুরে ইংরেজ রক্ষণাধীনে নিরাপত্তায় রহিলেন। সাথাসাথ তাঁহার কন্যা ফাতেমা বিবি ও জামাতা নবাব মীর কাসেমের সংগে মুর্শিদাবাদে বসবাস করেন। মীর কাসেম ইংরেজদের সহিত যুদ্ধজয়ে নিরাশ হইয়া হারেমের অগণিত বেগমের মুক্তি দিয়া শুধুমাত্র নিজস্ব কয়েকজন অন্তরঙ্গ বেগমকে নিরাপত্তার জন্য রোহিলাগড়ে পাঠাইয়া দেন। পশ্চাদপসরণের সময় পাল্কীতে পর্দানসীন

বেগমদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ রাজকোষের প্রচুর ধনরত্নাদি প্রেরণ করা হয়। পঞ্চাশ শত পাল্কী ও গাড়ী, একশত হাতী, বারশত ঘোড়া, তিনটি উট, দুইহাজার বরকন্দাজ ও বহু বজরা বেগমদের সহিত ছিল।

ইংরেজদের সাহায্যে মীরজাফরের কন্যা ও জামাতা সুবে বাংলা হইতে বিতাড়িত হওয়ার পর মীরজাফর পুনরায় মসনদে বসিলেন মুন্নি বেগম পর্দানসীন বেগম হইলেন। রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য মীরজাফরকে বৃদ্ধ বয়সেও বিহারের দিকে যাইতে হয়। বিহার সীমান্তে শান্তিস্থাপন করিয়া তিনি হস্তিপৃষ্ঠে রাজমহলের বনে শিকার করিতে করিতে মুর্শিদাবাদে ফিরিলেন। অবসর বিনোদনের জন্য গায়িকা ও নর্তকীও তাঁহার সঙ্গী ছিল। মীরজাফরের মৃত্যুর পর মুন্নি বেগমের পুত্র নজমদ্দৌল্লা কোম্পানীর সহায়তায় নবাব-মসনদে বসিলেন। নজমদ্দৌল্লা জন্মিবার পূর্বে মুন্নি বেগম তেলেভাজা ফুলুরি খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া নজমদ্দৌল্লা অনেকের কাছে "ফুলুরী" নবাব বলিয়া পরিচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বেগমরা সন্তানের জননী হইবার পর ধূমপান করিতে পারিতেন। নজমদ্দৌল্লা নবাব হইলে ইংরেজ কোম্পানী মুন্নি বেগমকে "মাদার-ই-ইণ্ডিয়া" উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। মুন্নি বেগম মীরজাফরের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী ক্লাইভকে নগদ ও ধনরত্নে পাঁচ লক্ষ টাকা তুল্য দান করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের কোম্পানীর রেসিডেণ্ট মিডিলটন সাহেব সহ নবাব প্রাসাদে আয়না মহলে মুন্নি বেগমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দান গ্রহণ করিতে সম্মত হন। অর্থদ্বারা এদেশে মৃত ইংরেজ সৈন্যদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে একটি অর্থ-ভাণ্ডার খোলা হয়। নজমদ্দৌল্লার মৃত্যু হইলে মুন্নি বেগমের দ্বিতীয় পুত্র সৈফ-দ্দৌল্লা মসনদে বসিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। অতঃপর বব্বু বেগমের নাবালক পুত্র মোবারকদ্দৌল্লা মসনদের অধিকারী হইলেন। বব্বু বেগম অনেক চেষ্টা করিয়াও নাবালকের অভি-ভাবিকা হইতে পারিলেন না। মুন্নি বেগম ইংরেজদের সুনজরে থাকিয়া মোবারক-দ্দৌল্লার অভিভাবিকা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

নিরালা উদ্যান —(শ্রীশৈল দে'র সৌজন্যে)

কোম্পানী মুন্নি বেগমের জন্য মাসিক ১২০০০ টাকা ভাতা ধার্য করেন। মুন্নি বেগম মুর্শিদকুলী খাঁর তৈয়ারী দেওয়ানখানা বা চেহেল সতুনের ভগ্নাব-শেষের উপর ১৭৬৭ খ্রীঃঅব্দে মুর্শিদাবাদের কেন্দ্রস্থলে বর্তমান বৃহৎ চক মসজিদ নির্মাণ করেন। দেওয়ানখানা চল্লিশটি স্তম্ভের উপর নির্মিত ছিল বলিয়া উহার নাম ছিল চেহেল সতুন। চেহেল অর্থ চল্লিশ, সতুন অর্থ স্তম্ভ। চেহেল সতুন নবাব প্রাসাদের তোরণদ্বারের বাহিরে ছিল। এখানে নবাবেরা প্রজাদের দুঃখদুর্দশার কথা শুনিতেন। মুন্নি বেগমের সঞ্চিত অর্থে কোম্পানী নিজামত ডিপোজিট ফাণ্ড নামে অর্থ ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল নবাব বংশীয়দের সমষ্টিগত প্রয়োজনীয় কার্যে ঐ গচ্ছিত অর্থ ব্যয়িত হইবে। নবাবদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য নবাব মাদ্রাসা ও নবাব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে মুর্শিদাবাদে সরকারের ব্যবস্থা-ধীনে অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় আছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই বিনা বেতনে সেখানে এখন বিদ্যালাভের সুযোগ পায়। নিজামত ডিপোজিট ফাণ্ডের জন্যই এই ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হইয়াছে। শোনা যায় মুন্নি বেগম বহু অনাথা ও দরিদ্র পরিবারের কন্যাদের বিবাহের খরচ বহন করিতেন। তাঁহার সময় নিজামত হইতে দীপালী উৎসবের জন্য ৫।৬ হাজার ও হোলী উৎসবের জন্য সাঁইত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। রাণী ভবানী মুর্শিদকুলী খাঁর সময় হইতে মুন্নি বেগমের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মুন্নি বেগমের সম্মানার্থে তিনি একটি মূল্যবান পাল্কী উপহার দেন এবং সেই পাল্কীর ত্রিশ জন বাহকের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্তও সেই সঙ্গে করিয়া দেন। সম্রাট শাহ আলমের স্ত্রী গভর্নর কর্নওয়ালিশ মারফত মোবারক-দ্দৌল্লার দ্বাদশ কন্যার মধ্যে একটির সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পত্রখানা এখনো নিজামত রেকর্ড রুমে আছে। সৈয়দ বংশ ভিন্ন অন্য কোন পরিবারে তাঁহাদের কন্যার বিবাহ দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ এবং মুন্নি বেগম ও বব্বু বেগম এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়। মুন্নি বেগমের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার সময় তাঁহার বয়সের সংখ্যানুযায়ী তোপ-ধ্বনি করিয়া কোম্পানী সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাংলার শেষ নাজিমের বিশজন বেগম ও একশত জন সন্তান ছিল।

ইংরেজ লেখকরা নবাব পরিবারের অনেককে অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উদ্দেশ্য ছিল—জনসমাজে তাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করা। অধিকন্তু শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতাও ঐরূপ উক্তির কারণ। তাঁহাদের বিবাহজনিত সম্পর্ক অনেক সময় স্বাভাবিক নিয়মবিরুদ্ধ হইলেও অবৈধ নহে। দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সাক্ষী থাকিলেই বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। শিয়া মতে বিশেষ ক্ষেত্রে সাময়িক বিবাহেরও অনুমোদন আছে। যাহাকে "মোতা" বিবাহ বলে।

পরিশেষে বলা যায়, নবাবেরা পারিবারিক জীবনের জটিলতা ও সমস্যা সমাধানে অতিরিক্ত সময় ও শক্তিক্ষয়ে সাম্রাজ্য-শাসনে দুর্বল হইয়া পড়েন। রোমের 'Petticoat Government'-এর সহিত ইহার কোনো সংগতি না থাকিলেও ফলাফলের দিক হইতে সাদৃশ্য রহিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের প্রেতচ্ছায়া আজও দুর্বল ভাগীরথীর ক্ষীণ ধারায় প্রতিফলিত হয়। মুর্শিদাবাদের স্বল্পকালীন অথচ গুরুত্ব-পূর্ণ ইতিহাসের নায়কেরা একে একে বিদায় লইয়াছে। কঠোর পর্দার অন্তরালে অবস্থান করিয়া যাহারা তাহাদের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের পরিচয় আমরা সামান্যই জানি। অজ্ঞাত থাকিয়া গেলেও তাহাদের অবদানও যে নিতান্ত তুচ্ছ নহে তাহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। নুরজাহানের প্রতিপত্তি, জাহানারার আত্মত্যাগ, কিংবা বাইজানটাইন সম্রাজ্ঞী থিওডোরার নারীকল্যাণমূলক কার্যকলাপের সহিত জসরৎমেসা বেগম, লুৎফান্নেসা এবং মুন্নি বেগমের তুলনা কি একেবারেই অবাস্তব? বিস্মৃতির অতল হইতে তাহাদের কাহিনী পুনরুদ্ধার কার্যে কোনো ভবিষ্যৎ অনুসন্ধিৎসু অগ্রসর হইবে এই আশা পোষণ করিতে পারা যায়।

সংখ্যার সংকট

কিরণ চক্রবর্তী

দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। সংখ্যাটা যদি দশের বদলে এক শো হয়, তাহলে আরও ভাল। এক শো যদি হাজারে গিয়ে পৌঁছয়, তাহলে আরও। জনবল, কে না জানে, যে-কোনও দেশেরই মস্ত সম্পদ। যে-কোনও কাজে। কিন্তু সেই জনবল যখন মাত্রা ছাড়িয়ে বাড়তে থাকে, সম্পদ না-হয়ে ব্যাপারটা তখন সংকট হয়ে দাঁড়ায়। স্রেফ সংখ্যার চাপেই কাজ তখন ভণ্ডুল হবার উপক্রম হয়। ভারতবর্ষেও সেই একই অবস্থা দেখা দিয়েছে। জনসংখ্যার প্রবল চাপে দেশ-গঠনের কাজ এখানে ভণ্ডুল হবার উপক্রম হয়েছে। এ-দেশে লোকসংখ্যা এখন পঞ্চাশ কোটিরও বেশী। তা নিয়ে গর্ব করার কোনও কারণ নেই। বরং ভয় পাবার হেতু আছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন, কোটির হিসেবে এই যে আমরা পঞ্চাশোর্ধে পৌঁছেছি, এটা একটা মস্ত বিপদের সংকেত। এই সংকেতকে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহলে আমরা ঘোর সংকটে পড়ব।

জনসংখ্যা যে কীভাবে বাড়ে, ভাবলে অবাক হতে হয়। পৃথিবীতে যখন মানব-জীবনের সূচনা, তারপর দশ লক্ষ বছরে মানুষের মোট সংখ্যা মোটামুটি এক শো কোটিতে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু দু শো কোটিতে পৌঁছতে তাই বলে আরও দশ লক্ষ বছর লাগেনি। মাত্র এক শো বছরের মধ্যেই এক শো কোটি দ্বিগুণ হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে দু শো কোটি বৃদ্ধি পেয়ে তিন শো কোটি হতে লাগল মাত্র বত্রিশ বছর। তিন শো কোটির চার শো কোটি হতে যে আরও অনেক কম সময় লাগবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। জনসংখ্যা বাড়ে চক্র-বৃদ্ধির হারে। যা কিনা প্রায় ম্যাজিকের মতন ব্যাপার। সুদের সুদ, তস্য সুদ মিলিয়ে মানুষের সংখ্যা হু-হু করে বাড়তে থাকে।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদিকে ম্যালথাস সাহেব জনসংখ্যা-বৃদ্ধির প্রতি-রোধক হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি ভুল দেখেননি। কিন্তু এ-সব বিঘ্ন জনবন্যাকে সাময়িকভাবে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখতে পারে মাত্র, স্থায়ীভাবে পারে না। দু-চার-দশ বছরের মধ্যেই বাঁধ ভেঙে যায়, বন্যার জল আবার ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে যেতে থাকে। পৃথিবীতে এ-যাবৎ যুদ্ধবিগ্রহ তো কিছু কম হয়নি। অসংখ্য মানুষ তাতে মারা পড়েছে। দুর্ভিক্ষে আর মহামারীতেও অসংখ্য জায়গায় অসংখ্য বার অসংখ্য মানুষের প্রাণ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু, জন-সংখ্যার বৃদ্ধি তাতে ঠেকে থাকেনি।

ভারতবর্ষের কথাই ভাবা যাক। এই শতাব্দীর সূচনায়, ১৯০১ সনে, এ-দেশের লোকসংখ্যা ছিল তেইশ কোটি তিরাশি লক্ষ। ১৯২১ সনে এই সংখ্যাটা পঁচিশ কোটি বারো লক্ষে এসে দাঁড়াল। 'দাঁড়াল' কথাটা অবশ্য ভুল; কেননা, জনসংখ্যা কখনও একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না, সে ক্রমবর্ধমান। তবু লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ১৯০১ থেকে ১৯২১, এই কুড়ি বছরে এ-দেশে মানুষের সংখ্যা দেড় কোটিও বাড়েনি। বৃদ্ধির পরিমাণ এক কোটি উন-ত্রিশ লক্ষ মাত্র। পরবর্তী কুড়ি বছরে বেড়েছে ছ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ। তার পরের কুড়ি বছরে বৃদ্ধির হার আরও দ্রুত। দেশবিভাগের পরিণামে ভারতবর্ষের আয়তন হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৬১ সনে দেখা গেল, লোকসংখ্যা প্রায় চুয়াল্লিশ কোটিতে এসে পৌঁছেছে। গত দু বছরের ইতিহাস আরও দ্রুত বৃদ্ধির। এই ছ বছরে এ-দেশে ছ কোটিরও বেশী লোক বেড়েছে। ভারত-বর্ষের লোকসংখ্যা এখন পঞ্চাশ কোটিরও বেশী।

জনসংখ্যা যদি এই হারে বাড়তে থাকে, অবস্থাটা তাহলে কী দাঁড়াবে? 'এই হারে বাড়বে' ভাবাটাও ঠিক নয়। লোকসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধির হারটাও বেড়ে যায়। তা নইলে আর একে চক্রবৃদ্ধি বলবে কেন? ভারতবর্ষে এখন প্রত্যহ পঞ্চাশ হাজার শিশু জন্মলাভ করে। বছরে জন্ম-লাভ করে প্রায় দু কোটি শিশু। সামনের বছরগুলিতে এই বৃদ্ধির হার দু কোটি থেকে আড়াই কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে; আড়াই কোটি থেকে পাঁচ কোটিতে পৌঁছতেও বেশী সময় লাগবে না। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, বৃদ্ধির হার যদি না কমানো হয়, তাহলে আগামী আটাশ বছরেই আমাদের লোকসংখ্যা এক শো কোটিতে পৌঁছে যাবে।

অবস্থা যে তখন কী দাঁড়াবে, ভাবতেও ভয় হয়। শুধু লোক বাড়লেই তো চলে না, সেই অনুপাতে খাদ্যের পরিমাণ বাড়া চাই, বাসস্থানের ব্যবস্থা বাড়া চাই, চাকরি বাড়া চাই। এ-সব বস্তু যে এ-দেশে বাড়ছে না, তা নয়। কিন্তু যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, আহার-বাসস্থান-চাকরির ব্যবস্থা তো সেই হারে বাড়ছে না। সেটা সম্ভবও নয়। একটা বাড়ে জ্যামিতিক হারে, অন্যটার বৃদ্ধির হার পাটিগাণিতিক। আহার-বাস-স্থান-চাকরির প্রসার তাই জন-প্রসারের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। ক্রমেই আরও বেশী-সংখ্যক লোক না-খেয়ে কিংবা আধপেটা খেয়ে থাকে; ক্রমেই আরও বেশী লোক মাথা গুঁজবার ঠাঁই পায় না; ক্রমেই আরও বেশী লোক বেকার-জীবন যাপনে বাধ্য হয়।

হিসেব দিলেই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। ১৯৫০-৫১ সনে এ-দেশের লোক গড়পড়তা মাথাপিছু রোজ ১২·৮ আউনস খাদ্য পেত। ১৯৬৫-৬৬ সনে সেক্ষেত্রে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ১২·৪ আউনসে নেমে এসেছে। বাসস্থানের সমস্যাও আগের তুলনায় এখন তীব্রতর। কর্ম-সংস্থানের সমস্যাও তথৈবচ। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সূচনাকালে এ-দেশে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষ। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে তাদের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে অনেক বেড়েছে: বেকারের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লাখের জায়গায় প্রায় এক কোটি।

এর থেকে মনে হতে পারে, পাঁচসালা পরিকল্পনায় তাহলে কোনও কাজই হয়নি; না বেড়েছে খাদ্য, না বেড়েছে বাসস্থান, না চাকরি। সেটা কিন্তু ঠিক কথা নয়। ১৯৫১-৫২ সনে এ-দেশে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি টন। তারপর পনর বছরে সেই পরিমাণ প্রায় দু কোটি টন বেড়েছে। ১৯৬৫ সনে ভারতবর্ষে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ সাত কোটি কুড়ি লক্ষ টন। অর্থাৎ খাদ্য-বৃদ্ধির হার নেহাত খারাপ নয়। বেড়েছে বাসস্থানের ব্যবস্থাও। এই পনর বছরে নতুন-নতুন অসংখ্য ঘরবাড়ি নির্মিত হয়েছে। চাকরিও কম বাড়েনি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার সূচনায় এ-দেশে যত চাকরি ছিল, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক শেষে চাকরির সংখ্যা তার চাইতে অনেক বেশী। নতুন যেসব কাজের সংস্থান ইতিমধ্যে করা হল, তার সংখ্যা তিন কোটি দশ লক্ষ।

অর্থাৎ আহার-বাসস্থান-চাকরির প্রসার ঘটানো হয়নি বলে এই দুরবস্থা, এ যুক্তি ধোপে টেঁকে না। সব কিছুই বেড়েছে, কিন্তু মানুষের সংখ্যা যে হারে বেড়েছে, সেই হারে বাড়েনি। মানুষের সংখ্যা যদি ইতিমধ্যে এই রকমের দ্রুত হারে না বাড়ত, তাহলে ভারতীয়দের মুখে অন্ন আর-একটু বেশী উঠত, বাসস্থানের সমস্যায় ভারতীয়-দের আর একটু কম ভুগতে হত, চাকরির

অভাবে এত বেশী মানুষকে এভাবে কষ্টে পড়তে হত না।

আহার আর বাসস্থানের মধ্যে যে একটা অচ্ছেদ্য যোগসম্পর্ক রয়েছে, সেটাও লক্ষ্য করা দরকার। এই বাংলা দেশেরই এক কবি একদা একটি সতর্কবাদী উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, অতিশয় প্রজার ভারে ধরণী হবে শস্য। কথাটার একটা তাৎপর্য আছে। চাষাবাদের জমি তো অফুরন্ত নয়। মানুষের সংখ্যা বাড়লে তার মাথা গুঁজবার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে চাষের জমিতেও মাঝে-মধ্যে টান না দিয়ে উপায় থাকে না। মানুষ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জনপদের সীমানাও বাড়ে, আর জনপদের সীমা বাড়লে চাষের জমির সীমানা নানাস্থানে সংকুচিত হয়। তা ছাড়া ঘরবাড়ি বানাবার জন্যে ইঁট চাই, বালি চাই। চাষের জমির মধ্যে ইঁটখোলা তাই ক্রমে আসর জাঁকিয়ে বসে, বালির লোভেও মানুষ তখন চাষের জমিতে হাত বাড়ায়। খাদ্য-সমস্যা তার ফলে আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

তা ছাড়া মানুষ তো জন্তু নয়। শুধু আহার আর বাসস্থানের সমস্যা মিটলেই তার চলে না। তাকে যদি মোটামুটি ভালভাবে বাঁচতে হয়, তাহলে জীবন-ধারণের আরও হাজার উপকরণ তার চাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে না-পারলে তার প্রত্যেকটিতেই টান ধরে। শিক্ষার কথাই ধরা যাক। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষে ইস্কুলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এ-দেশে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় সাঁইত্রিশ লক্ষ। কিন্তু ছয় থেকে এগারো বছর যাদের বয়স, এমন প্রায় সাড়ে ছ কোটি ছেলেমেয়ে এ-দেশে আজও শিক্ষার সুযোগ পায় না। শুধু তাই নয়, অনেক ইস্কুলই নামেমাত্র ইস্কুল, যেসব সরঞ্জাম সেখানে থাকা উচিত তা নেই। উপরন্তু ক্লাসে-ক্লাসে এমন গাদাগাদি যে, লেখাপড়ার কাজ ঠিকমত চলতে পারে না, কোনক্রমে নিয়ম রক্ষা হয় মাত্র। সবাইকে যদি ঠিকমত শিক্ষার সুযোগ দিতে হয়, ইস্কুলের সংখ্যা তাহলে দ্বিগুণ করতে হবে। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে এখন রোজ যে পঞ্চাশ হাজার নতুন শিশু জন্ম নিচ্ছে, তাদের জন্যে আরও অনেক নতুন ইস্কুল খোলাতে হবে। কত ইস্কুল? রোজ অন্তত আড়াই শো। এবং সেই অনুপাতে সরঞ্জাম, সেই অনুপাতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীও চাই।

কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। কিন্তু জনসংখ্যা যে এ-দেশে কী মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে, এবং করেই চলেছে, এর থেকেই সেটা বুঝে নেওয়া যাবে। সংখ্যা অন্তত এক্ষেত্রে এখন আর আনন্দের ব্যাপার নয়। সংখ্যা এক্ষেত্রে সংকটের সূচক। সংখ্যা একটা মস্ত বড় জাতীয় সমস্যা।

'জাতীয় সমস্যা' কথাটাকে যদি বড় গালভরা শোনায়, তবে 'পারিবারিক সমস্যা' হিসেবেই এটার বিচার হোক। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক, সংখ্যা সেখানে সমস্যার সৃষ্টি করছে কিনা। পরিবারের কর্তার মাসিক আয় যেখানে পাঁচ শো টাকা, সন্তানের সংখ্যা দুটি কি বড়জোর তিনটি হলে এই বাজারে কায়ক্লেশে তিনি তাদের খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে পারেন। তার বেশী ছেলেপুলে হলেই তাঁকে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। দুধের বিল বাকী পড়ে, বাজারের থলির অনেকটাই শূন্য থেকে যায়, ইস্কুলের মাইনে ঠিকমত মেটানো যায় না। তাহলে?

তা ছাড়া মায়েরও এখন সন্তানদের একজন। যে মায়ের অনেক ছেলেপুলে, একে তো তিনি বাচ্চাদের ঠিকমত দেখাশোনা করেই উঠতে পারেন না, তার উপরে তাঁর নিজের বিশ্রামও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। আর্থিক কিংবা মানসিক, যেদিক দিয়েই বিচার করা হোক, বেশী সন্তান হওয়া একালে আর আশীর্বাদ বলে গণ্য হতে পারে না। কোলে পো কাঁখে পো-এর দিন ফুরিয়েছে। একালের মানুষ ভালভাবে জীবনধারণ করতে চায়, বাঁচার মতো বাঁচতে চায়।

সেটা সম্ভব হতে পারে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি কমে। যাতে কমে, সকলেরই সেদিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

তা ছাড়া, আর-একটি দিক থেকেও এই সমস্যাটিকে বিচার করা যেতে পারে। বিশ্ববিখ্যাত এক বিজ্ঞানী অবশ্য সেই দিক থেকেই বিচার করেছেন। মানুষের সংখ্যা যদি এইভাবে হু-হু করে বাড়তে থাকে, [illegible] তিনি [illegible] এবং আশ্রয়ের সমস্যা তো মারাত্মক হয়ে উঠবেই, কিন্তু তার থেকেও ভয়াবহ একটা সংকট দেখা দেবে। মানুষের সংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে মানুষ সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধাবোধ বলে আর কিছু থাকবে না। তিনি কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলেননি। মানুষ সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধাবোধ যে ইতিমধ্যেই কমেছে, তার আরও নানা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সংখ্যার বৃদ্ধিও একটা মস্ত বড় কারণ। ঘরের মধ্যে যদি একগাদা মানুষকে ঠেসাঠেসি গাদাগাদি করে থাকতে হয়, রাজপথে চলতে গিয়ে যদি একের সঙ্গে অন্যের প্রতিপদে ঠোকাঠুকি লাগে, বাসে-ট্রামে-দোকানে-বাজারে যদি একের ঘাড়ের উপরে অন্যের নিশ্বাস পড়ে, তা হলে বিরক্তি বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। সেই বিরক্তিই ধীরে ধীরে ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়। ঘৃণা অন্য মানুষের প্রতি। মানবজীবনে এর চাইতে মারাত্মক ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে?

সন্দেহ নেই যে, সেই বিজ্ঞানী এক [illegible] রকমের অদ্ভুত সম্ভাবনার দিকেই অঙ্গুলি তুলে ধরেছেন। কে জানে, বিজ্ঞানের জাদু খাদ্যসমস্যার সমাধান হয়ত একদিন করতে পারবে, [illegible] খাদ্য [illegible] বাড়িয়ে তুলে আশ্রয়-সমস্যার সমাধান করাও হয়ত একদিন অসম্ভব হবে না। কিন্তু এই যে সমস্যা, যাকে বলতে পারি মানবজীবনের মৌলিক মূল্যবোধের সমস্যা, এর সমাধান তো বিজ্ঞান এনে দিতে পারবে না। মানুষের সংখ্যা যদি বেয়াড়া রকমের বেড়ে যায়, তা হলে বিপর্যস্ত হবে আমাদের যাবতীয় মূল্যবোধ। প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ-মায়া-মমতার নাভিশ্বাস উঠবে।

অনেকে বলবেন, সেটা অনেক পরের কথা। হয়ত তাই। কিন্তু জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ইতিমধ্যেই প্রাচ্যের নানা দেশে যে সংকট ঘনিয়ে তুলেছে, তার ছবিটি তো দূরের ছবি নয়। সে-ছবি এই মুহূর্তের ছবি। চোখের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খাদ্য বাড়ছে, আশ্রয় বাড়ছে, চাকরি বাড়ছে, কিন্তু সেই বৃদ্ধি জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। ফলে সুন্দর সচ্ছল সুখী জীবনের স্বপ্নটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। সেই স্বপ্নকে যদি বাস্তবে পরিণত করতে হয়, তা হলে পরিবারের আয়তন ছোট রাখার কথা ভাবতেই হবে। এটা এই মুহূর্তেরই দাবি।

ময়ূর পৃষ্ঠে আরোহিণী রমণী

খিলানের কোন চিহ্নই আর নেই। সুতরাং খিলানের আকৃতি কি ছিল তাও বোঝার উপায় নেই। এককালে নিশ্চয়ই কাঠের দরজা ছিল, বর্তমানে দরজা, চৌকাঠ, সবই উধাও হয়েছে। প্রবেশ পথের শীর্ষদেশ থেকে শুরু করে কার্নিশের নীচ পর্যন্ত একটা নিরেট কাঠামো দেখা দিয়েছে। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে যেন এই কাঠামো মন্দিরের সম্মুখ ভাগকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করেছে।

অন্তত চলার পথে হঠাৎ চোখে পড়লে থমকে দাঁড়াতে হবে। বনজঙ্গল আর আগাছার আড়াল থেকে এখানে সেখানে উঁকি দিচ্ছে পোড়ামাটির নকশা। আরও কাছে এসে দেখতে পাওয়া যাবে কার্নিশের নীচে দুটি সারিতে বেশ কয়েকটি পেনেল। প্রবেশ পথের দু পাশে ভিতের উপর থেকে শুরু করে কার্নিশের নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আরও কয়েকটি সারি, এখনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে, প্রথাগত অলংকারের রীতি অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, খিলানের শীর্ষদেশ থেকে শুরু করে কার্নিশের নীচ পর্যন্ত অর্থাৎ মন্দিরের সম্মুখভাগের ঠিক কেন্দ্রস্থলেও ছিল আরও কয়েকটি সারি। গ্রামের বৃদ্ধরাও মন্তব্য করেছেন যে তাঁদের যৌবনে এই মন্দিরটিতে অনেক বেশী পোড়ামাটির অলংকরণ দেখেছিলেন। তবে আমি যে কেবল তাদের জবানবন্দির উপর নির্ভর করে লিখছি তা নয়, মন্দিরের একটি পুরাতন আলোকচিত্র দেখার সুযোগও আমার হয়েছিল, ওই আলোকচিত্রটি প্রায় দশ বছর আগের এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে মন্দিরের সম্মুখ ভাগে পোড়ামাটির নকশা আজকের তুলনায় কিছু বেশীই ছিল। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের দেওয়ালে কোন নক্‌শার ব্যবহার করা হয় নি।

গ্রামবাসীদের কাছে রক্ষিত এই মন্দিরের যে কয়টি পোড়ামাটি টালি বা "প্লাক" আছে এবং মন্দিরের সম্মুখ ভাগের দেওয়ালে কার্নিশের ঠিক নীচেই যে কয়টি পেনেল আছে সেগুলি আমি দেখেছি। পেনেলগুলি অর্ধভগ্ন বলে মাপজোকের অসুবিধা আছে। বিচ্ছিন্ন টালিগুলির গড় মাপ এই—দৈর্ঘ্য নয় ইঞ্চি, প্রস্থ সাড়ে সাত ইঞ্চি, ঘনত্ব আড়াই ইঞ্চি।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই মন্দিরের গাত্রসজ্জার জন্য ব্যবহৃত পোড়ামাটির টালিগুলি আকারে বাড়তে থাকে। অবশ্য এ কথা যে সর্বত্র সত্য, তা নয়। বিষ্ণুপুর, বীরভূম এবং হাওড়া জেলায় এমন অনেক বাংলা মন্দির আছে যেগুলির নির্মাণকাল সপ্তদশ শতাব্দী হলেও তাদের গায়ে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বড় টালির ব্যবহার দেখা গেছে। অষ্টাদশ শতকে মন্দির গাত্রের এই পোড়ামাটির টালিগুলি আকারে বড় করার কারণ ভিন্ন। সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে ধীরে ধীরে পোড়ামাটির অলংকারের অবনতি হতে থাকে। এতদিন পর্যন্ত অতি ক্ষুদ্র টালির মধ্যে স্বল্প পরিসর স্থানে শিল্পীরা যে নিজের দক্ষতার সঙ্গে চমৎকার নকশা খোদাই করে এসেছেন তা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। পরবর্তীকালের শিল্পীরা অনুরূপ দক্ষতার অধিকারী না হতে পারায় তাঁদের পক্ষে ক্ষুদ্র টালির স্বল্প পরিসর স্থানে সূক্ষ্ম নকশা খোদাই করা কিছু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, ফলে তাঁরা অপেক্ষাকৃত বড় আকারের টালি ব্যবহার করতে শুরু করেন। ক্রমশই টালির আকার বাড়তে থাকে এবং একই সঙ্গে সূচিত হয় আরও অনেক পরিবর্তন। অবশ্য বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রামের মন্দিরগুলি দেখলে এ কথা বলতে ইচ্ছা হবে না যে অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে মন্দির শিল্পীর অধঃপতন হয়েছিল, অন্তত আমার তাই মনে হয়। ওই সময়ে বীরভূম জেলায় যেসব কারিগর কাজ করেছিলেন তাঁদের কাজের মধ্যে "এস্থেটিক ডেপথ" না থাকুক তাঁরা যে তাঁদের পূর্বপুরুষের তুলনায়
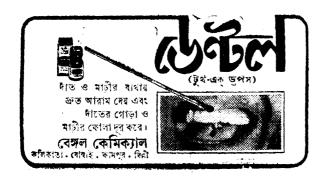
অনেক বেশী বাস্তবধর্মী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাই হোক গোবিন্দপুরের এই মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত এবং পোড়ামাটি টালিগুলির আকারে সময়োচিত বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য টালিগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে মন্দিরগাত্র সজ্জার সেই সনাতন রীতিটিই অনুসৃত হয়েছে গোবিন্দপুরের মন্দিরটির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা এবং নানা পৌরাণিক দেবদেবীর লীলা বিষয়ক মোটিফ স্থান পেয়েছে মন্দিরের গায়ে অঙ্গসজ্জার উপকরণ হিসাবে। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে এবং তা মন্দির শিল্পের ক্ষেত্রে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করছে, সাধারণত মন্দিরগাত্রে উপরাংশে দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ হয়ে থাকে এবং সেখানে অন্য কোন বিষয়বস্তুর স্থান হয় না। কিন্তু আলোচ্য মন্দিরটির সম্মুখভাগে কার্নিশের নীচে যে দুটি সারি আছে, তার মধ্যে কয়েকটি প্যানেলে সামাজিক দৃশ্যাবলী স্থান পেয়েছে, পৌরাণিক বিষয়বস্তু নয়। যেমন হরিণের পিছনে ধাবমান ব্যাধ কিম্বা উপবিষ্ট সশস্ত্র যোদ্ধা। জোর করে এই মূর্তিগুলিকে পৌরাণিক দেবতার মূর্তি বললে ভুল হবে।

এবার কয়েকটি পোড়ামাটি টালির বিষয়-বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যাক। কিছুদিন আগেও এগুলি মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন ছিল। প্রথম টালিটিতে উৎকীর্ণ হয়েছে গণেশের মূর্তি। পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ গণেশ, কোনো কারণে টালিটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় টালির বিষয়বস্তু হলো শিশু কৃষ্ণ, তাঁর ডান পায়ের কাছে একটি গো বৎস। আরও একটি লক্ষণীয় জিনিস হল এই যে কৃষ্ণ এবং গো বৎস উভয়ই অত্যন্ত অগভীরভাবে উৎকীর্ণ, টালির আকার এবং ওজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গভীর করে খোদাই করা উচিত ছিল এই টালিটি। তৃতীয় টালিটিতে উৎকীর্ণ হয়েছে এক যোদ্ধার মূর্তি, হাটু-গেড়ে বসে আছে যোদ্ধাটি, মাথায় পাগড়ি, আয়তচক্ষু, আকর্ণবিস্তৃত গোঁফ, চাপদাড়িও দেখা যাচ্ছে। কোলের উপর ঢাল, এক হাতে একটি ছুরি, ঢালের উপর দিকে তলোয়ারের একাংশ দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্যই শিল্পী এটি উৎকীর্ণ করেছেন নচেৎ এর কোন প্রয়োজন ছিল না, বরং এটি থাকায় বিষয়বস্তুর সামগ্রিক সৌন্দর্য কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। চতুর্থ টালিটি বিষয়বস্তু হিসাবে শিল্পীর কল্পনাশক্তির স্বাক্ষর বহন করছে। ময়ূর পৃষ্ঠে উপবিষ্টা এক রমণী, তার এক হাতে তীর অপর হাতে ধনুক। যেন তূণীর থেকে তীর নিয়ে ধনুকের ছিলায় স্থাপন করতে যাচ্ছে। ময়ূরের ঠোঁট থেকে একটা

কৃষ্ণ

সাপ ঝুলছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে রমণী শিকারে বেরিয়েছে। কোনো কারণে টালিটির উপর নীচের অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও রমণীর অঙ্গভঙ্গে, তীর ধরবার ভঙ্গিতে এবং ময়ূর পৃষ্ঠে তার উপবেশনের ভঙ্গীতে একটা বিশেষ সৌন্দর্য জড়িয়ে আছে। এই রকম আরও কত সুন্দর টালি মন্দিরগাত্র অলংকৃত করেছিল আজ তা বোঝবার উপায় নেই।

গোবিন্দপুর মন্দিরের এই পোড়ামাটি টালিগুলি ছাঁচ থেকে তৈরী, না শিল্পীরা স্বহস্তে খোদাই করেছেন—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে ছাঁচে তৈরী টালি এবং খোদাই করা টালি, এদের ব্যবহার কখন হয় এবং কিভাবে হয়। এ কথা অবশ্য ঠিক যে উভয় নিয়মে প্রস্তুত নকশা করা টালিই মন্দির গাত্রসজ্জার জন্য ব্যবহার করা হত, কিন্তু যেখানে একই

গণেশ

খোদাই করার যেমন একটা সূক্ষ্ম কৌশল ছিল, তেমনি একটি বিশেষ কৌশল ছিল ইঁট পোড়াবার জন্য ভাটি তৈরি করায় এবং সেই ভাটিতে ইঁট পোড়ানোর মধ্যে। অষ্টাদশ শতক থেকে যখন ধীরে ধীরে মন্দির শিল্পের অবনতি দেখা দিল তখন সে অবনতি কেবল খোদাইয়ের কলাকৌশলেই সীমিত রইল না, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই, সব কিছুতেই দেখা দিল, অর্থাৎ মাটি নির্বাচন, রং নির্বাচন, ছাঁচ তৈরী করা, খোদাই, ভাটি নির্মাণ এবং ইঁট পোড়ানোর কায়দা সব কিছুর মধ্যে অল্প বিস্তর ত্রুটি দেখা দিতে লাগল। অবশ্য ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়। কয়েকটি জেলায় দু-একটি গিল্ডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যাঁরা তাঁদের পুরুষানুক্রমে শেখা বিদ্যাকে একটুকুও ম্লান হতে দেন নি। গোবিন্দপুরের ক্ষেত্রে অবশ্য তা ঘটে নি, ক্রমাবনতির মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে এই টালিগুলির মধ্যে। আকারে বড়, ওজনে অনাবশ্যক রকমের ভারী, খাপছাড়া গড়ন এবং আধ পোড়া। কিন্তু তা হলেও মোটের উপর প্রতিটি টালিতেই বিষয়বস্তু বেশ পরিচ্ছন্ন, সহজ এবং সরল করে উৎকীর্ণ। মূর্তিগুলির পোশাকে দ৷

নকশা করা ইট

বিষয়বস্তুর বারংবার অবতারণা করা হচ্ছে যেমন একই ভঙ্গীতে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান একই আকারের মানুষ, বানর এবং অন্য কোন পশু বা পাখি বা লতাপাতা, ফুল বা "স্ক্রোল-ওয়ার্ক", সেখানে ছাঁচের ব্যবহারই করা হত, কেননা তাতে সময় এবং শ্রম উভয়ই কম হত এবং প্রয়োজনও মিটত যথাযথভাবে। আবার যেখানে নানা বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হত বা যেসব ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিষয়বস্তুকে একবার মাত্র দেখান হত সেখানে শিল্পী নিজের হাতেই টালির গায়ে খোদাই করতেন। একবার মাত্র দেখাবার জন্য আলাদা করে ছাঁচ বানানো হত না। আমার এ সিদ্ধান্ত অনুমানভিত্তিক নয়। বাঁকুড়া, বীরভূম এবং মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে এমন কয়েকটি পরিবারের সন্ধান পেয়েছি, যাদের পূর্ব পুরুষরা এক সময় মন্দির শিল্পী ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও পোড়ামাটির টালি প্রস্তুত করতে পারেন। ছাঁচ এবং খোদাই সম্পর্কে তাঁদের মতামতই আমি তুলে ধরেছি।

গোবিন্দপুর মন্দিরের টালিগুলি প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থাৎ একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য একটি টালি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি টালির বিষয়বস্তু অপরটি থেকে ভিন্ন অর্থাৎ একই বিষয়বস্তুকে বারবার দেখান হয় নি। সুতরাং ধরা যেতে পারে যে টালিগুলি খোদাই করা। তবে কার্নিশের নীচে এবং প্যানেলগুলির বিভাজক রূপে যে সমস্ত লতাপাতার নকশাযুক্ত টালি রয়েছে সেগুলি ছাঁচে তৈরি।

গোবিন্দপুর মন্দিরের এই পোড়ামাটির টালিগুলি কিন্তু ভালভাবে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হয় নি। আমার মনে হয় এ কারণেও মন্দিরটি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। লোকে কথায় যাকে বলে "গোড়ায় গলদ", এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। আধা শুকনো মাটির গায়ে নকশা [illegible] দেশেও [illegible] হয় নি বরং একটা সমতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে এবং দু'টি একটি [illegible] শিল্পী সমকালীন [illegible] এড়াতে না পারলেও একটা বিশেষ কমনীয়তা ধরে রাখতে পেরেছেন।

আলোকচিত্র—অমল সেনগুপ্ত

প্রয়াণ

রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনী গত ২১ ডিসেম্বর নয়াদিল্লীর সেন নার্সিং হোমে পরলোক গমন করেছেন।

নন্দিতা অনেকদিন থেকে অসুস্থ ছিলেন। যেতে তাঁকে হবে জানা ছিল। যাবার দিন এত কাছে সেটুকু ভাবিনি। অগ্রহায়ণের শেষে শান্তিনিকেতন যাবো। ভাগ্নীর বিয়ে। আমার শ্বশুরের সংসারে নন্দিতা কন্যার মত আপন ছিলেন। এত দিন পরও সেই স্নেহের সম্বন্ধকে তিনি সমান সমাদর দিতেন। বার বার অনুরোধ করেছিলেন যেন যাবার আগে জানিয়ে যাই। ১৯৬৩ সালের পর চিকিৎসকের নির্দেশে তাঁর শান্তিনিকেতন যাওয়া আসা মানা ছিল। পৌষের শান্তিনিকেতন, উৎসব মেলায় শান্তিনিকেতন প্রতি বছর তাঁকে টেনেছে। যেদিন আর যাবার উপায় রইল না সেদিনও দিল্লির দুরন্ত শীতের আড়ালে নন্দিতার মনে শান্তিনিকেতনের প্রীতি উত্তাপ আরও গভীর আরও গাঢ় হয়ে উঠেছিল। যে তখন শান্তিনিকেতন যেত তার কাছে আগ্রহে শুনতেন সব কথা। খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন সবার কুশল। তাদের অনেকেই হয়তো জানেন না কি নিবিড় ছিল এই ভালবাসা। শান্তিনিকেতনের প্রত্যেকটি মানুষ, এক একটি লতাপাতা কালো পাথর নদী আর নীল আকাশ একটি প্রাণকে এমন করে ভরে রেখেছিল যার তুলনা কম। ভেবেছিলাম তাই আমার যাবার আগে শান্তিনিকেতনের কোন কথাই হয়তো বললেন। আমার ভুলই হয়েছিল। বলবার কথা ছিল অন্য। বিয়েতে উপহার পাঠাবেন বলে যোগাযোগের কথা উঠেছিল। যাবার আগের দিন উপহার এল। গজদন্তের নৌকো। অপরূপ সৃষ্টি। শিল্পী-মন নন্দিতার যোগ্য মনোনয়ন। দাঁড়, মাঝি, হাল পাল এমনকি বৈঠা পর্যন্ত নিখুঁত দক্ষতায় তৈরি। কে জানতো সেই বহিত্র তাকে বয়ে নিয়ে যাবে অনন্ত সাগর পাড়ি দিতে। এমন প্রতীকমূলক হবে তার শেষ উপহার।

শেষ উপহারই বটে। এই তরণীটি সযত্নে করে গুছিয়ে পাঠিয়ে দেবার পর থেকে নন্দিতা যেন কেমন পার্থিব জিনিসে আকর্ষণহীন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দিদি শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির হাতে শুনেছিলাম নৌকোটি বেছে কেনায় তাঁর যেমন আগ্রহ হয়েছিল তেমনই তারপরে কেমন একটা অনাসক্ত ভাব এসেছিল। কেন কে জানে। আমার আক্ষেপ অন্য। শেষ দিনের শেষ কথাটি বলেছিলেন বড় দুর্বল ক্ষীণ স্বরে। যেন এ জগতের মানুষই আর নন। ক্লান্ত কণ্ঠ, শ্রান্ত তার স্বর। তবু শান্তিনিকেতনের খবর যেন ফিরে এসে সব জানাই। সেই শান্তিনিকেতনের একটি বিয়ে। উপস্থিত থাকতে পারবেন না। তার আলপনা, সানাই-এর সুর, অনাড়ম্বর সহজ সুন্দর অথচ প্রাণোজ্জ্বল অনুষ্ঠানের সব খুঁটি নাটি মনে করে আনতে যেন না ভুলি। ফিরেই যেন গল্প শোনাই। রূপকথার মত শান্তিনিকেতনের গল্প, যে রূপকথার এক রাজকন্যা ছিলেন নন্দিতা।

আমার গল্প শোনানো হয়নি। এ না হওয়ার দুঃখ ভুলি কি করে? শুধু কি আমার দুঃখ? শান্তিনিকেতনে প্রতিমা দেবীর কাছে গিয়ে প্রায়ই বসতাম। তিনিও কেবল প্রশ্ন করতেন 'বুড়ী কেমন আছে?' আর কোনও অভিলাষ বাকী নেই। বুড়ীকে একবার দেখতে পেলে সব বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

রবীন্দ্রনাথের পাশে দৌহিত্রী নন্দিতা

নিজে। রিনিদির (শ্রীমতী আসফ আলি) মুখে শুনেতাম নন্দিতা এক এক করে হিসাব মিলিয়ে ফর্দ তৈরি করে যাচ্ছেন। কোথায় কি আছে তার তালিকা হচ্ছে। বই-এর [illegible] তালিকাভুক্ত হচ্ছে, ফাইল হচ্ছে যাতে যেদিন তিনি থাকবেন না সেদিন কৃষ্ণ কৃপালানী হাতের কাছে সব সহজে পান। দুঃখ সইবার শক্তি দেখেছি, দুর্দান্ত সাহস দেখেছি কিন্তু এ বিবেচনা সাহস ও ধৈর্যের পরের ধাপ। আমার স্বামীর মুখে শুনেছি এ বিবেচনাবোধ তাঁর প্রায় জন্মগত ছিল। যখন নন্দিতার বয়স মাত্র এগারো বছর দিল্লীতে আমার শ্বশুরের (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সচিব শ্রীনিশিকান্ত সেন) কাছে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার কাছে কুইন মেরীজ স্কুলে পড়তেন তখন তাঁর খুব সাংঘাতিক রকম ডিপথেরিয়া হয়। বাড়িতে ঠিক সে সময় বড় কেউ ছিলেন না। সেই আতঙ্কগ্রস্ত কিশোরকুলের সান্ত্বনা ছিল নন্দিতার সাহস, ধৈর্য ও বিবেচনা। [illegible]

[illegible] আমার মত সামান্য মানুষের পক্ষে সেটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। নন্দিতাও মার্জনা করেন নি। বলেছিলেন 'খুব আত্মপ্রচার করছো!' আর কেউ এমন কথা বললে আঘাত সহ্য করা কঠিন হতো। কিন্তু জানতাম নন্দিতা সত্যই সেটা অনুভব করেছেন এবং হয়তো আমার সংশোধনের বিশেষ প্রয়োজন। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে আপত্তি ছিল বলেই বোধহয় কৃপালনী দম্পতির একজনও নন্দবাবুর পক্ষপাতী ছিলেন না।

নন্দিতা কৃপালনি

সেই পাঞ্জাবের টাকার অধ্যাপনা থেকে সাহিত্য আকাদেমির সচিবের কাজ পর্যন্ত একইভাবে, একই আদর্শে কাটাতে পেরেছিল।

নন্দিতা কিছুদিন নাইনিতাল ও দিল্লির স্কুলে পড়াশুনো করেন। তারপর গোখেল মেমোরিয়ল স্কুলে ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর থেকেই শান্তিনিকেতনে যান। অল্প বয়সে নৃত্যগীত ও অভিনয়ে অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তাঁর মৃত্যুর চার পাঁচদিন পর বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় কৃষ্ণ কৃপালানীর ঘরে বন্ধুবান্ধব চুপ করে বসেছিলেন। মীরা দেবীর কাছে কলকাতায় গেছেন নন্দিতার পরম স্নেহের রিণিদি। রিণিদির ফিরবার সময় হয়ে গেছে। দুর্যোগের জন্য প্লেন আসতে দেরী হচ্ছে। কারও মুখে কথা নেই। হঠাৎ কৃপালানীজী বলে উঠলেন 'সেটা কোন সাল?—১৯৩৫। চিত্রাঙ্গদা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দিল্লি এসেছিলেন। বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে অর্থসংগ্রহ করছিলেন। সেবার নন্দিতা নেচেছিল। সে ছিল সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা। বীর চিত্রাঙ্গদা ছিলেন নন্দলাল বসুর কন্যা যমুনা দেবী আর অর্জুন নন্দবাবুর পুত্রবধূ নিবেদিতা। পুরুষ সে নৃত্যনাট্যে বেশী কেউ ছিল না। কেবল বীর চিত্রাঙ্গদার কয়েকটি প্রজা ছিল ছেলে। তারা গেয়েছিলেন, 'বাহুবলে তুমি রাজা দেহবলে তুমি মাতা'—যেমন হঠাৎ কথা আরম্ভ করেছিলেন, ঠিক তেমনই হঠাৎ চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন সেবারই মহাত্মা গুরুদেবকে অর্থ সাহায্য অংগীকার করে অনুরোধ করেন আর যেন এভাবে তিনি অসুস্থ শরীরে অর্থভিক্ষা করে না বেড়ান। মনে হলো শেষের কথাটুকু তাঁর চিন্তাধারাকে ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবার আবরণ। বোধ হয় মনের চোখে চেয়ে দেখছিলেন নৃত্যপরা নন্দিতাকে, সুন্দরী চিত্রাঙ্গদাকে। শুধু চিত্রাঙ্গদা নয়, শ্যামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতির নামভূমিকায় নন্দিতার প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বোতোমুখী প্রতিভার একটি পূর্ণ রূপ। একটি রবীন্দ্রনাথ যে কোন দেশের বহুযুগের সাধনার

ফল। সেই প্রতিভার সৌন্দর্যানুভূতির দিকটুকু থেকে অঞ্জলি ভরে নিয়েছিলেন নন্দিতা। বাটিকের কাজ, আলপনা সবই তিনি করতে পারতেন নিপুণ হাতে। কিছুদিন সেণ্ট্রাল কটেজ ইনডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়াম এবং কিছুদিন দিল্লি ক্লথ মিলসের ডিজাইনারের কাজও করেছিলেন নন্দিতা। উপার্জনের টাকার অনেকটাই চলে যেত আত্মীয় বন্ধুর প্রয়োজনে। এমন আত্মীয় যাঁদের প্রয়োজনের খবর প্রচার করবার নয়। মুখফুটে বলবারও নয়। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নন্দিতা সর্বদাই নীরবে দিয়ে যেতেন যেখানে জানতেন প্রয়োজনের তাগিদ অনেক। যেখানে মানুষের অভাবের খবর শুনেছেন সেখানেই সাধ্যমত সাহায্যে বিমুখ হননি।

কেবলমাত্র অভাবগ্রস্তের অর্থসাহায্যই নয়, সেবায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন নন্দিতা। বিলেতে বিরাট অস্ত্রোপচারের পর ফিরে এসে সবে সামান্য চলাফেরার অনুমতি পেয়েছেন এমন সময় কৃষ্ণাজীর অসুখ হ'লো। হাসপাতালের ঘরে নন্দিতার একভাবে দিনরাত কাটানো সেবার মূর্তি ভুলবো না। কি সাহস, কি সহনশক্তি। এতটুকু বিচলিতভাব হ'লে শ্রীযুক্ত কৃপালানীর আরোগ্যলাভে অন্তরায় হ'তে পারে, তাই সেখানেও হাসিমুখ, নিশ্চিত দৃঢ় মনোভাব। গত পূজোর দিন কয়েক পর সৌম্যদা এসেছিলেন। সংগে এসেছিলেন মীরা দেবী। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারের
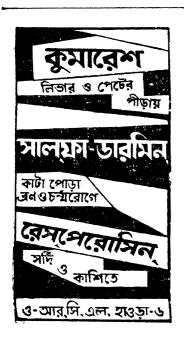
কোনও কাজে এসেছিলেন বলে দু'একদিন দিল্লির এক বড় হোটেলে কাজকর্মের সময়টা কাটাচ্ছিলেন। সেখানে সামান্য সর্দিজ্বর হয়। সৌম্যদার ঘরে বসে আমরা চা আর পকৌড়ি খাচ্ছি ওদিকে নন্দিতা বার বার ফোন করছেন। সৌম্যদার শরীর ভাল নয়। অবিলম্বে তাঁর বাড়িতে যেন চলে যান। সৌম্য ঠাকুর হাসলেন। বুড়ী তো বুড়ীই। সে সবাইকে ভাবে ছেলেমানুষ। সেবা করতে চায় যেমন ছোট ছেলেকে মা সেবা করেন। তাই ও বুড়ী। গুরুদেবও আদর করে পরম স্নেহের নাতনীকে নাম দিয়েছিলেন বুড়ী। ডাকতেন, বুধা, তুই ছিলি কোথায়? ছোট্ট সেই বুধা সেদিন থেকেই বুড়ী। স্নেহ মমতায় পরিণত মনের মত সম্পূর্ণ। সৌম্যদাকে কিন্তু বুড়ীর আজ্ঞা মানতে হ'য়েছিল। যেতে হ'য়েছিল তাঁর আশ্রয়ে। সেই আশ্রয়ের প্রশ্রয় পেয়ে আমরাও সন্ধ্যায় গিয়ে জুটলাম। মুখ্য কারণ সৌম্যদার সন্ধান আর বাকীটুকু উপরি পাওনা। এরকম পাওনা দিতে নন্দিতা বড্ড ভালবাসতেন। মীরা দেবীর সন্ধানে এলেন প্রশান্ত মহলানবীশ ও শ্রীযুক্ত রাণী মহলানবীশ। তারপর এলেন রেখা মেনন ও তাঁর কিশোরী কন্যা। সবাই বসে গেলেন বুড়ীর আদর যত্নের আসর জাঁকিয়ে। অসুস্থ সেই বুড়ী এতগুলো বুড়ো কাঁচা এক করে একসূত্রে বেঁধে নিলেন। এত সুন্দর ছিল তাঁর মানুষকে আদর যত্ন করবার ক্ষমতা।

নন্দিতা আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। অনেকগুলি সন্তানের পিতামাতা নন্দিতার শ্বশুর শ্বাশুড়ী শেষ জীবন কাটিয়েছেন নন্দিতার কাছে। আচার্য কৃপালানী কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট থাকাকালীন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ নন্দিতার হাতে ছিল সংসারের ভার। প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে করতে ভালবাসতেন বলে সংসারের কাজেও নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। অথচ এই নৈপুণ্য ছিল বিশেষভাবে সহজ ও সরল। পছন্দগুলিও ছিল অনাড়ম্বর। বছর দুই আগে মীরা দেবী এসেছেন। নন্দিতা তখনও অসুস্থ। তাই মশলাপাতি তেল বাঁচিয়ে মেয়ের পছন্দমত রান্না করবেন বলে বাজার করে আনলেন। বারান্দায় বসে বঁটি পেতে তরকারির ঝুড়িতে হাত দিলেন। ভাবলাম ঠাকুর বাড়ির রান্না। রাঁধবেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কন্যা। খাবেন রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী। বোধ হয় নানারকমের শৌখীন আয়োজন হবে। পরে দেখি মীরা দেবী কুটে নিলেন পুঁইশাকের চচ্চড়ি, টোমেটোর অম্বল আর পালং-এর ঘণ্ট। সামান্য এতটুকু এতটুকু করে ভাল করা কুটনো। যা বুড়ী ভালবাসে তাই তো হবে। বেশী খেলে পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা হয়। পরিমাণও তাই আয়োজনের মতই অল্পসল্প। জীবনের এই মূল্যবোধটুকুও নন্দিতা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। প্রাচুর্যের প্রাচীর পার হ'য়ে আসা মূল্যবোধ বলেই ভারসাম্য হারাবার ভয় ছিল না।

রাজনৈতিক মতবাদ তীব্র ছিল না নন্দিতার কিন্তু আজীবন খাদি ব্যবহার করেছেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে কারাবরণ করে আট মাস কারাগারে ছিলেন। এখানেও এঁরা আদর্শ দম্পতি। কৃষ্ণ কৃপালানীও ৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন। আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর বা ঘটা কোন ব্যাপারেই নন্দিতা পছন্দ করতেন না। এমনকি মৃত্যুর পর কোন অনুষ্ঠান না হয় এই ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। নশ্বর দেহ সম্বন্ধে একটি ইচ্ছা মাত্র ছিল। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে যেন অন্ত্যেষ্টি হয়। পিতা ডাঃ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর মৃত্যু হয় ইংলণ্ডে। সেখানে বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা নন্দিতার বড়ই সুন্দর লেগেছিল। হায়, নন্দিতা জানতেন না ব্যবস্থার সৌন্দর্য এখনও আমাদের দেশে নেই। দর্শন দিয়ে তত্ত্ব দিয়ে মৃত্যুকে আমরা অমরত্ব দিতে পারি কিন্তু নশ্বর দেহকে ভস্ম করার আয়োজনে অমার্জিত হৃদয়হীনতা প্রায়ই দেখা যায়। রাজধানীর বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়। শেষ যাত্রার আগে সাত নম্বর বিশ্বম্ভর দাস রোডস্থ ভবনে আপনজনের সমাবেশের সুন্দর শেষটুকু রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেশ মাধুর্যমণ্ডিত করেছিল। ঠিক তার পরেই নিগমবোধ ঘাটের কর্কশ, রুচিহীন ব্যবস্থা সকলকে দারুণ রূঢ় আঘাত করেছে।

নন্দিতা নেই। রবীন্দ্রনাথের বংশধারা শেষ হ'য়ে গেল বলে আমরা দুঃখ করছি। কিন্তু ধারার কি শেষ হয়? বরং এইখানে সান্ত্বনা আছে। এখানে দেশের অগণিত মানুষের সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে থাকবে আগামী দিনের অনন্তকাল। ধারা তো সামান্য নয়, অসামান্যের আধার এতটুকু বংশধারায় শেষ নয়। জাতির জীবনধারা তাকে ধরে রাখবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের রচনা 'গল্পসল্প' গ্রন্থটি নন্দিতাকে উৎসর্গ করে যে কথা বলে গিয়েছেন তার উদ্ধৃতি দিয়ে নন্দিতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

নন্দিতাকে

শেষ পারানির খেয়ায় তুমি
দিনশেষের নেয়ে
অনেক জানার থেকে এলে
নূতন-জানা মেয়ে।
ফেরাবে মুখ যাবে যখন
ঘাটের পারে আনি,
হয়তো হাতে দিয়ে যাবে
রাতের প্রদীপ খানি।

শ্রীমতী

এক একদিন

শংকর চট্টোপাধ্যায়

আমি পালাতে গেলে তখনই দেখি প্রভুর হাত বাঁধন দিচ্ছে,
রাস্তাগুলো উলটে-পালটে যাচ্ছে রাস্তায়।
পায়ের তলা ধুলো-কাদায় মাখামাখি তবু বাড়ি বলছে
'ঘরেই ছিলে, দেখা পেলাম না তো?'

তাই শুনে সদর-অন্দরের সে কী ভীষণ হাসাহাসি
যেন তালা খুলতে ব্যস্ত চাবি বলছে
'ঠিকানাটা ভুল হল নাকি?'

এক একদিন ঘোর দুপুরে আমার পা 'চলা' হারিয়ে ফেলে
এক একদিন ঘোর রাত্তিরে আমার হাত
সদর দরজা চিনতে পারে না
এক একদিন নিজের পাশে দাঁড়িয়ে বলি 'মনে পড়ছে তো?'
এক একদিন আমার পলায়নের রাস্তা
সোজা ঘরের ভেতরে ছুটে আসে।

প্রভুর বাঁধন ছিঁড়ে এক একদিন আমি ঘরের ভেতরই ছুটে মরি
বাইরে বেরুনোর রাস্তাটা খুঁজে পাই না।
এক একদিন আমার অভিষেক হয়
এক একদিন আমার পলায়ন।

সব কিছু নিরর্থক জেনেও

বিশ্বেশ্বর সামন্ত

ইচ্ছে করলে কররেখা পালটে ফেলা যায় না।
হঠাৎ শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে আবার হাতের রেখায় ফিরে আসি,
নির্লজ্জ অসুখের সংবাদ, হাসপাতাল হতাশা ও ব্যর্থতার
এরকম যাবতীয় বিষয়বস্তু হাতের মুঠোয় ধরে আছি।

অজস্র কাট-কুট রেখা। চিঠিটা অনেক হাত ঘুরে এখানে এসেছে,
স্পষ্ট করে ধরে ফেলা যায় না হাতবিনিময়,
ডুবসাঁতারে ধরা যায় না অন্ধকার
চোখের পাতা, আমার সামনে সর্বনাশ
ক্রমশ হৃদয়ের দিকে বাঁশি বাজছে শব্দহীন।
হাতের রেখায় প্রতিশ্রুতি
মঞ্চসফল নাটক কিংবা অসময়, ঘুমিয়ে থেকে
এ সব কিছুই বোঝা যায় না, চোখের পাতায় অন্ধকার।
হাতের মুঠোয়
ধরে রেখেও বোঝা যায় না ভবিষ্যৎ কোনদিকে,
সামনে কিংবা পেছন থেকে দু দিকে ডাক ক্লান্তিহীন

চোখের কাছে দৃষ্টি আমার হাতের রেখা
নির্বিকার—হাতের রেখায় ধরে রেখেও পালটে ফেলা যায় না,
দাঁড়িয়ে থেকে কোন মতে সভ্যতাকে ছুঁয়ে ফেলা নিরর্থক।

তুমি আমার

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

তুমি আমার শূন্য বুকে নৃত্যময়ী
তুমি আমার অচল সিকি
ঠাকুরঘরের ভোগের থালা তুমি আমার ঘণ্টাধ্বনি
ছারপোকাসার নেড়া তোশক বগল-ছেঁড়া গায়ের জামা
তুমি আমার মরণকালে গীতার মত শিয়রশায়ী।

তুমি আমার ঘুম-ভাঙা-ভোর বাউলকণ্ঠে 'রাই জাগো' গান
তুমি আমার খয়রাতী দান রেশন-চালের পাথরকুচি
দূর-বিদেশে তুমি আমার খাল পেরোতে ভাঙা সাঁকো
তুমি আমার ঘুষঘুষে জ্বর নতুন জুতোর দুঃখ ও সুখ
ওপর-তলার খুশি মেজাজ তুমি আমার তুমি আমার।

তুমি আমার ভূর্ভুবস্ব : হাঁচি-পাওয়া সুখের মতন
তুমি আমার খেলার মাঠের বাজি জেতা ঘোড়ার টিকেট
ফ্রক-ছাড়্-ছাড়্ বয়সকালের বালিকাটির লোভের আটা
তুমি আমার লজ্জানিথর নারীর প্রথম ভীরু প্রণয়
জন্মলগ্নে ভাগ্য-নাচান তুমি আমার শনিগ্রহ।

'সাম্যবাদ ও প্রগতির পরিচয়'

সাম্যবাদ ও প্রগতি প্রসঙ্গে আলোচনাগুলো সুন্দর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য নিবেদন করতে চাই।

শোষণ-বৈষম্যহীন সাম্যবাদী সমাজ পরিকল্পনা তরুণ মনে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। কিন্তু ওই ধরনের সমাজ সৃষ্টির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটু স্থির চিন্তা সেই উৎসাহকে সংযত করে।

সাম্যবাদী মতে শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজগঠনের প্রথম ধাপ হলো সমাজতন্ত্র। এই অবস্থায় সমাজের উৎপাদনের উপায়গুলি সামাজিক। রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হবে সর্বহারাদের একনায়কত্বে। এ অবস্থায় সমাজে ধনতান্ত্রিক সমাজের জন্মদাগগুলো থেকে যাবে। এই জন্মদাগ বলতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কল্যাণকর-অকল্যাণকর ভাবনাচিন্তা ও সৃষ্টিকে বোঝায়। সুতরাং শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির দ্বিতীয়-ধাপে এই অকল্যাণকর দাগগুলো মুছে ফেলবার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হবে।

দেখা যাচ্ছে, শোষণহীন সমাজ সৃষ্টির পরিকল্পনায় মানুষের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করলেও মনস্তত্ত্বকে একপ্রকার উপেক্ষাই করা হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে মানুষের সমস্ত কর্ম কতকগুলি প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। প্রশ্ন এই যে—এই প্রবৃত্তিগুলো কি মানুষের অর্থনীতি তথা সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি? তা নয়। বিশেষ অর্থনৈতিক তথা সামাজিক ব্যবস্থা মানুষের বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তিগুলোকে উস্কে দিতে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তারা যে ওই প্রকৃতিগুলোকে সৃষ্টি করে এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। বিজ্ঞান বরং আংশিকভাবে এটুকু প্রমাণ করতে পারে যে, এই প্রবৃত্তিগুলো রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়; উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়মে নয়।

তা যদি সত্য হয় তবে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বহারাদের একনায়কত্ব শোষণ-বৈষম্যহীনতার প্রতিশ্রুতি দিলেও সে প্রতিশ্রুতি তারা চিরকালের জন্য পালন করতে পারবে কিনা বা পালন করবে কিনা তার কোন গ্যারান্টি নেই। একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হ'লেই তো আর মনস্তত্ত্বের নিয়মগুলো উল্টে যাবে না; সকলেই উদার আর সমাজ সচেতন হয়ে পড়বে না, আর লোভ, স্বার্থপরতা সংকীর্ণতা ইত্যাদি মানুষের মন থেকে উবে যাবে না। সাম্যবাদী বন্ধুরা বলবেন—"সেই জন্যই তো আমরা বলি সাম্যবাদী সমাজ সৃষ্টির একটা স্তরে সাংস্কৃতিক বিপ্লব দরকার। এই স্বার্থপরতা, লোভ, সংকীর্ণতা ইত্যাদি বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থারই কলঙ্ক।" হ্যাঁ, একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন সে কথা না হয় মানা গেল। কিন্তু এই মনোবৃত্তি একমাত্র বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার কলঙ্ক হলো কি ভাবে? সত্যকে এড়িয়ে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে লাভ কি? দোষ যদি দিতেই হয় তবে সে দোষ মনোবিজ্ঞানের ঘাড়েই চাপান উচিত।

আসলে মানুষের লোভ ও স্বার্থপরতা এক অনুকূল পরিবেশে প্রবলতর হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। আবার আর একটি বিশেষ অবস্থায় মানবকল্যাণে প্রবুদ্ধ মানব সমাজের ঐশ্বর্যকে বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছে, একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতর দিয়ে। অর্থাৎ সমাজে স্পষ্টত দুটো পরস্পর বিরোধী মনঃশক্তি কাজ করছে।

সকল ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করবার প্রবৃত্তিও একটা শক্তি ও সত্য; আর সেই ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণের সংপ্রবৃত্তি একটা শক্তিও বটে। এ দুয়োর কোনটাকেই নশ্বর বলে প্রমাণ করা যাবে না। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভেতর দিয়ে স্বার্থপরতা লোভ ইত্যাদি দূর করবার চেষ্টা কল্পনায় সম্ভব বলে বোধ হ'লেও বাস্তবে তা কতটা সম্ভব তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

মানুষের পশুশক্তিকে জোর করে নির্মূল করা যায় না। সাময়িকভাবে তাকে দমিয়ে রাখা যায় বটে, কিন্তু তাতে বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। মহত্তর মানবীয় ভাবের উন্মোধন করে তাকে নিষ্প্রভ করে দেওয়া যেতে পারে বা তাকে সুকৌশলে মহত্তর দিকের অভিমুখী করে দেওয়া যেতে পারে। এর জন্য অবশ্যই বিপ্লবের প্রয়োজন। কিন্তু এ বিপ্লবের ক্ষেত্র 'মন', এবং তার প্রকৃতি আলাদা। মনের বিশিষ্টতাকে অস্বীকার করে জোর করে অনেক কিছুই করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে কিছুই ফল হবে না।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব তো পৃথিবীতে কত হয়েছে। এক একটা ধর্মমতের অভ্যুত্থান সেই বিপ্লবেরই সাক্ষর। কিন্তু সে বিপ্লব কখনই একটানা বিশুদ্ধ পথে অগ্রসর হয়নি। (কারণ এই আপেক্ষিক জগতে চরম বিশুদ্ধতা

বলে কিছু নেই)। অনপনীত থেকে গেছে। তাই সে বিপ্লবের সুফল হয়েছে সাময়িক। বোধ হয় এই জন্যেই শ্রীঅশোক দত্ত সাম্যবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"যথা সময়ে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন বা মুসলমান ধর্মমতের সঙ্গে এর স্থান হবে।"

সাম্যবাদী পরিকল্পনা যে বাস্তবে কতটা রূপায়িত হতে পারছে তা সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। সোভিয়েট রাশিয়া আজ বহুদিনের অভিজ্ঞতার ঠেকে শিখেছে, incentive না দিলে ভাল উৎপাদন হয় না। তারই পরিণতি শিল্পক্ষেত্রে Managereal system-এর প্রবর্তন এবং ম্যানেজারকে লভ্যাংশের ১০% বখরা দেওয়ার বন্দোবস্ত। অর্থাৎ ধনবৈষম্য লোপের প্রতিশ্রুতি সেখানে সংগতকারণেই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আর এই ধন-বৈষম্য যদি ভবিষ্যতে সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করে তা হলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। দ্বিতীয় এই ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র ও সরকারী পার্টির দাপট অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। সব ব্যাপারে সরকারী নির্দেশই চূড়ান্ত—তা যুক্তিসংগত হোক বা নাই হোক। মত প্রকাশের ব্যাপারে পরাধীনতা সেখানে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের চেয়েও বেশী। আজ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক ক্ষীণতর না হয়ে দৃঢ়তর হচ্ছে। এটাও এক ধরনের শোষণ নয় কি?

অতএব দেখা যাচ্ছে, শোষণহীন, শ্রেণী-হীন, ধনবৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির কল্পনা অংশত কল্পনাই। দ্বান্দ্বিক নিয়ম যদি একটা সর্বব্যাপী সত্য হয় তবে মানুষের মন সামাজিক ক্ষেত্রে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে যাবে এটা বিশ্বাস করবার পক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও লোভ, স্বার্থপরতা, স্ব-প্রধান হবার প্রবণতা আছে। হয়তো সে সব চরিতার্থ করবার ক্ষেত্র এবং উপকরণ আলাদা—তবু তা আছে ও থাকবে। তবে এটা আশা করা যায় রাষ্ট্রনৈতিক বৈষম্য, শোষণ ও শ্রেণী প্রাধান্য ... যুগে অবলুপ্ত। ... পারস্পরিক বিরুদ্ধ শক্তিগুলো একটা ... আসবে। কিন্তু এও হয়তো সাময়িক। তবু ক্ষণ-কালের সুখ সৌন্দর্যকে চিরকালের করে তোলার চেষ্টাই তো মানুষের সাধনা। তাই বিফলতার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েও সে সাধনার প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণা বশেই অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও মানুষ যেমন প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত করে। এতে অন্তত সাম্যবাদী স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা সইতে হবে না।

সবশেষে বলি, সাম্যবাদ কতকগুলো অর্ধসত্য এবং একটা উদার মনোভাবের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট হয়েছে। উদার মনোভাব দীর্ঘজীবি হোক। কিন্তু সত্য সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আরো পরিচ্ছন্ন হওয়া ভাল; নইলে কিছু জল ঘোলা করাই সার হবে, কিছু একটা লাভ হবে না।

অসীমকুমার ভট্টাচার্য
কাঁচড়াপাড়া

॥ ২ ॥

'সাম্যবাদ ও প্রগতির পথ' সম্পর্কে আমার বক্তব্যের জবাবে অধ্যাপক অম্লান দত্তের ক্ষুদ্র পত্র এবং অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখিত সেই পত্রের সুবৃহৎ ভাষ্য পাঠ করলাম। আমার ধারণা উভয় সমালোচকই মূল প্রসঙ্গ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছেন, এবং দুজনকেই মূল প্রবন্ধটি নতুন করে পাঠ করবার অনুরোধ জানাবো। নীচে কয়েকটি বিষয়ে আমার মন্তব্য যোগ করলাম।

... অধ্যাপক দত্ত লিখেছেন, ... সোভিয়েত ব্যবস্থা ... ভিতর একটিকেই আমাদের বেছে নিতে হবে, চিন্তার এই গোঁড়ামি ত্যাগ করা আবশ্যক। পথ দুটি নয় বহু। বিভিন্ন ব্যবস্থার দোষগুণ বিচার করে আমাদের নিজস্ব পথ তৈরি করে নিতে হবে।"

ধরে নিচ্ছি যে 'সোভিয়েত ব্যবস্থা' বলতে সাধারণ অর্থে তিনি সমাজতন্ত্রই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু পথ কি সত্যিই বহু? অথবা অধ্যাপক দত্ত কি নিজে 'বহু পথে' বিশ্বাসী? তাঁর মূল প্রবন্ধ অনুযায়ী তিনি অর্থনীতির সর্বস্তরে ব্যক্তিগত স্বার্থ-বোধকে প্রয়োগ করতে উন্মুখ, রাষ্ট্রীয় মালিকানার তিনি প্রবলতর বিরোধী এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অসমাজতান্ত্রিক পথের উদাহরণ-স্বরূপ জাপান এবং জার্মানীর নজির দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর 'বহু পথ' নানা শব্দ এবং বাক্যের গোলক-ধাঁধা ঘুরে ধনতন্ত্রের ইন্দ্রপুরীতে এসে পৌঁছেছে।

অধ্যাপক দত্তের 'বহু পথ' যে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' সে কথা অধ্যাপক চক্রবর্তীও অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং সাম্যবাদের মধ্যে তুলনা। তিনি বলেছেন আরও, 'সংশোধিত ধনতন্ত্রবাদের নামান্তর' যদি গণতান্ত্রিক সমাজবাদ হয় আর অধ্যাপক দত্ত যদি গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পক্ষে হন তাতে তিনি কেন স্বধর্মভ্রষ্ট হবেন?' অবশ্যই অধ্যাপক দত্ত স্বধর্মভ্রষ্ট হবেন না, কিন্তু স্বীয় ধর্মকে প্রচ্ছন্ন রেখে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সৃষ্টি করাও কি সমর্থনযোগ্য হবে?

মোটমাট আমাদের সামনে দুটি মৌলিক পথ—সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র—যদিও খুঁটিনাটির ব্যাপারে একই মৌলিক ব্যবস্থারই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকাশ থাকতে পারে। ত্রিশ দশকের আগের এবং পরের ধনতন্ত্রের বহিঃরূপে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ যে কিছুটা বাড়েনি এমন নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ধনতন্ত্র সংশোধিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক রূপ পাচ্ছে। এমন উদাহরণের অভাব নেই—যেমন তুরস্ক বা জাপান—যেখানে ধনতান্ত্রিক সরকার শিল্পায়নের প্রথম পর্বে সরকারী উদ্যোগে কলকারখানা গড়ে তুলে পরে সস্তায় সেগুলি ব্যক্তিগত শিল্পপতিদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। ধনতন্ত্রে সরকারী উদ্যোগে অপরিকল্পিত ব্যক্তিতান্ত্রিক অর্থনীতির অনিশ্চয়তা খানিকটা দূর করবার জন্য ব্যবহৃত হয়, বা যেখানে ঝুঁকি বেশী সেখানে ব্যক্তিগত পুঁজির অভাব মেটাতে প্রয়োগ করা হয়, সামাজিক মালিকানা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সেখানে গৌণ।

তাই এই সরকারী উদ্যোগেরই পাশাপাশি—যেমন ভারতে তেমনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যত্র মুষ্টিমেয় শিল্পপতির হস্তে শিল্পসংস্থানের এক মোটা অংশের কেন্দ্রীকরণ হ্রাস পাচ্ছে না। অধ্যাপক চক্রবর্তী সর্বজনীন মূলধন অংশীদারত্বের ভিত্তিতে 'শ্রেণীহীন ধনতন্ত্রের অলীক স্বপ্ন দেখুন আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে অন্ততপক্ষে মূলধনের কেন্দ্রীকরণের উল্লেখ করলে সুখী হতাম।

অপরপক্ষে, সমাজতন্ত্রের বহিঃরূপও সর্বত্র শতকরা একশো ভাগ একরকম হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, কিউবা বা পোল্যাণ্ডে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একইভাবে সংঘটিত হয়নি, অর্থনৈতিক বিকাশের পথেও উনিশ-বিশ পার্থক্য রয়েছে। পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কসবাদীরা তাদের প্রয়োগপদ্ধতি পাল্টাবে না, এমন কথা লেনিন বা অন্য কেউ দিব্যি দিয়ে বলে যাননি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিশ্চয়ই হবে এবং তা নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে সেটা বিচিত্র নয়। বরং মতপার্থক্য না থাকাটাই কি অস্বাভাবিক হতো না। এবং মতপার্থক্যহীন সমাজতন্ত্রেও কি অধ্যাপক চক্রবর্তীদের মতো সমালোচকদের সমালোচনার ঊর্ধ্বে যেতে পারতো? কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পোল্যাণ্ড 'পুরাতন প্রথাদের দাসত্ব স্বীকার করে' (অর্থাৎ মার্কসবাদ বর্জন করে) 'বুর্জোয়া পথ' গ্রহণ করেছে। খুব সাম্প্রতিক খবর, হয়তো অধ্যাপক চক্রবর্তীর নজরে আসেনি, পোল্যাণ্ডে রাষ্ট্রীয় খামার বৃদ্ধি করবার একটি নির্ধারিত কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে, যার মাধ্যমে ছোট ছোট জমিগুলো খামার কিনে নেয়া হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংস্কারের স্বরূপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। এটাই হয়তো, সোভিয়েট সরকারের বহু নীতি আমার মতো বহু মার্কসবাদীর সমালোচনার অবকাশ রাখে—যেমন 'বিশ্বশান্তির' প্রয়োজনে যেনতেনপ্রকারেণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তুষ্ট রাখবার নীতি, বা অসমাজতান্ত্রিক দেশের মার্কসবাদী আন্দোলনের প্রতি ঔদাসীন্য। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এমন সমালোচনা অন্যায় নয় যে গত পঞ্চাশ বছরে সোভিয়েট নেতৃত্ব ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থকে সংকুচিত করবার মতো প্রয়োজনীয় আদর্শগত প্রচারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি। যার ফলে এখনও সেখানে ক্ষুদ্র সমষ্টির সঙ্গে বৃহত্তর সমষ্টির লক্ষ্যের গরমিল রয়েছে বেশ কিছুটা। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে সোভিয়েটের সেই ব্যর্থতার স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই কি যে সোভিয়েট 'বুর্জোয়া পথ' নিয়েছে? সেখানে কি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যক্তিগত শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে বা অপরের শ্রম বিনিয়োগ করে 'বাড়তি মূল্য' উপার্জনের সুযোগসৃষ্টি হয়েছে বা অন্য কোনভাবে ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তির অর্থনৈতিক শোষণের অধিকার আইনী করা হয়েছে? যে কোন অভিযোগই তথ্য এবং তত্ত্বভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং আশা করি আমার সমালোচকেরা তাদের 'ঢালাও' মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব পালন করবেন।

অধ্যাপক দত্ত নানা প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত চাষের বাঞ্ছনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। যদি ধরে নিই যে ভারতে আগামীকালই সমাজতন্ত্র হলো, এমন ভাববার কোন কারণ নেই যে, ডিক্রী করে পরশুই সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে আসবে। বরং এমনটাই সম্ভব যে, ছোট চাষী তার পুরো জমিই হাতে রাখবে, জমিহীন ভূমি-মজুরেও কিছু জমি পাবে—কিন্তু সেখানে ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মূল পার্থক্য—মধ্যস্বত্বভোগী থাকবে না, বর্গাদারী প্রথা দূর হবে এবং শ্রমনিয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক শোষণ বিলুপ্ত হবে। আমার সঙ্গে অধ্যাপক দত্তের পার্থক্য এই যে, তিনি 'ব্যক্তিগত চাষ' অর্থে অবস্থাপন্ন চাষীর মজুর বা বর্গাদার নিয়োগ করে চাষ করবার কথা ভাবছেন এবং সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থার বিলুপ্তি মেনে নিতে পারছেন না। কৃষি কতটুকু রাষ্ট্রায়ত্ত হবে, কিভাবে সমবায় প্রথার প্রয়োগ করা হবে, এবং কৃষির উৎপাদনের বাড়তি অংশ শিল্পোন্নয়নের কর্মযজ্ঞে কিভাবে বিনিয়োজিত হবে—এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, ইতিহাস, আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়, অন্যান্য সমাজ-

তান্ত্রিক দেশের সাফল্য এবং অসাফল্যের দৃষ্টান্ত ইত্যাদির ওপর।

এখন 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদী' পথ কি? এই পথ 'গণতান্ত্রিক', (ভালো কথা) এবং 'সমাজবাদী', (আরও ভালো কথা), কিন্তু ভারতে কয়জন মানুষ অন্তত মৌলিকভাবে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করবে?

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মূল্যায়নে অধ্যাপক চক্রবর্তীর 'বাস্তব ইতিহাসের নিরিখ প্রয়োগ করা যাক। বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, সুইডেন, ইটালী ইত্যাদি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা শাসনক্ষমতায় আসীন থেকেও ধনতন্ত্রের বনিয়াদে এতটুকু চিড় খাওয়াতে চাননি। কিভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজবাদী রূপায়ণ হবে এবং সেই সমাজবাদ কি রূপ পরিগ্রহ করবে—এই ধরনের প্রশ্নের কোন ইতিবাচক উত্তর এদের কর্মসূচী থেকে পাওয়া যাবে না, যেমন পাওয়া যাবে না অধ্যাপক চক্রবর্তী বা অধ্যাপক দত্তের আলোচনা থেকে। অপরপক্ষে কিছু নেতিবাচক উত্তর পাওয়া সম্ভব: যেমন, এই সমাজবাদী উত্তরণ 'হিংসাত্মক পথে' হবে না এবং সেই সমাজবাদী সমাজ সোভিয়েট বা চীনের সমাজ এবং অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। অন্ধ কম্যুনিস্ট বিরোধিতার চূড়ান্ত গোঁড়ামি ছাড়া এদের মত এবং পথ অস্পষ্ট।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদী চিন্তাধারার অস্পষ্টতার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত অধ্যাপক চক্রবর্তীর পত্র। তিনি একই সঙ্গে আমেরিকার শ্রেণীহীন ধনতন্ত্রে এবং 'আত্মচ্যুতির বিচার প্রয়াসী' মানবতাবাদী মার্কসবাদ বিশ্বাসী। এই পরস্পরবিরোধিতা কোন ব্যতিক্রম নয়, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দর্শনেরই প্রতিফলন।

আর একটি দৃষ্টান্ত অধ্যাপক দত্তের বক্তব্য: সাম্যবাদীদের মধ্যে পার্থক্য আদর্শ নিয়ে নয়, উপায় নিয়ে। অথচ ব্যক্তি-স্বার্থবোধসঞ্জাত যে সাম্যবাদী সমাজ অধ্যাপক দত্ত কল্পনা করেছেন তার সঙ্গে কোন মার্কসবাদীরই মিল হবে না। অপর-পক্ষে 'সাম্যবাদ' মার্কসবাদীদের কাছে শুধুমাত্র একটি ভাববিলাসী সর্বকালীনতাক অবাস্তব আদর্শ নয়, বাস্তবে রূপায়িতব্য উপায়সাপেক্ষ একটি মতবাদ।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দত্তের আর একটি সমালোচনার জবাব দিতে চাই। তিনি আমার একটি উদ্ধৃতি দিনের পর দিন ব্যক্তিগত আর্থিক প্রতিষ্ঠার লড়াই সোভিয়েট দেশে গৌণ হয়ে আসছে' তুলে প্রশ্ন করেছেন, 'লেনিনীয়যুগের তুলনায় একথাটা কি ঠিক?' একেত্রে লক্ষণীয় যে তিনি লেনিনীয়যুগের (১৯১৭—১৯২৩) কথা বলেছেন, অথচ বিশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন, যা ব্যতিরেকে 'ঐতিহাসিক ঝোঁক'র বিচার সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু যদি ধরেও নিই যে বর্তমানের সঙ্গে লেনিনীয়যুগের এই তুলনা প্রাসঙ্গিক, তিনি কি বলতে চান যে লেনিনীয়যুগে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত আর্থিক প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল না, অথচ তার পূর্বে এবং পরে ছিল? আমার ধারণা তিনি 'ব্যক্তিগত আর্থিক প্রতিষ্ঠার লড়াই'-এর সঙ্গে সেই সম্পর্কে 'সরকারী মনোভাব' গুলিয়ে ফেলেছেন, না হলে ওই যুগের শ্বেতবিদ্রোহ বা অন্যান্য সংঘর্ষকে স্মরণে আনতেন। আমি এখনও মনে করি যে ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব বিশ বা ত্রিশ দশকে সোভিয়েটে ঘটেছে, এখন তার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব, যদিও ক্ষুদ্র সমষ্টির সঙ্গে বৃহৎ সমষ্টির দ্বন্দ্ব এখনও রয়েছে এবং 'সমাজতন্ত্র' পার হয়ে 'সাম্যবাদ' না আসা পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বের সফল মীমাংসা হবে না। (এখানে একটু যোগ করতে চাই, যে অধ্যাপক চক্রবর্তীর কাছে 'সাম্যবাদী' এবং 'সমাজতান্ত্রিক' সমাজের পার্থক্য স্পষ্ট নয়, যে কারণে তিনি এই দুটি শব্দকে সর্বত্র একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।)

আমলাতন্ত্র প্রসঙ্গে

'আমলাতন্ত্র' প্রসঙ্গে আমি যে যুক্তি এবং তথ্যের অবতারণা করেছি সেগুলি খণ্ডনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে অধ্যাপক দত্ত লিখেছেন, যে এই সম্পর্কে আমার ধারনা 'কল্পনায় স্নিগ্ধ'। অনুমান করে নিচ্ছি যে অধ্যাপক দত্তের ধারনা 'বাস্তবে তিক্ত', কিন্তু সেই 'বাস্তব' কি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, না 'অভিজ্ঞ' ব্যক্তির মতামতের প্রতি আস্থা, না সংখ্যা এবং তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত গবেষণার ফলাফল? সোভিয়েট আমলাদের সংখ্যা প্রচুর, দায়িত্ব পরিবর্তন-শীল, জাতীয় পরিকল্পনায় অংশাধিকারের জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বে এরা লিপ্ত, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাও এদের সীমাবদ্ধ। কিছু কারখানার পরিচালক গোষ্ঠীস্বার্থে জাতীয় নীতির রদবদলের চেষ্টা যে অতীতে করেনি এবং ভবিষ্যতে করবে না এমন নয়, কিন্তু সেই প্রচেষ্টাকে সমস্ত স্তরের আমলার সুসংহত, অপ্রতিরোধ্য আধিপত্যের চিহ্ন হিসাবে হাজির করতে হলে ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থিত করা প্রয়োজন। মিলোভান জিলাসের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ব্যর্থ, প্রাক্তন কম্যুনিস্টের ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত 'কালাপাহাড়ী' মন্তব্য কেন এই প্রসঙ্গে আপ্তবাক্য হবে?

গণতন্ত্র প্রসঙ্গে

অধ্যাপক দত্ত এবং অধ্যাপক চক্রবর্তী উভয়েরই আলোচনার ধারা 'গণতন্ত্র' এবং 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'র প্রসঙ্গে এনে ফেলেছেন। 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' কাকে বলে? অধ্যাপক দত্তের মতে, ধনতন্ত্রবিরোধীতা সত্ত্বেও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধ্যাপনার সুযোগ লাভ বৃটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতার এক বড়ো প্রমাণ। অর্থাৎ একদল অখ্যাত, নগণ্য বিদেশীর সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মতামতের প্রতি সহনশীলতাই ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ। একই নিরিখে তাহলে পিকিং-এ ব্যক্তিস্বাধীনতা ঢের বেশী, যেহেতু জোন রবিনসন-এর মতো একজন বিশ্ব-বিখ্যাত পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদকে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসবাদের দোষত্রুটি সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দেয়া হয়েছে। মস্কো বা পিকিং-এ বিদেশী শিক্ষক বহু, এবং তাদের সবাই সাম্যবাদী নন।

আমার পক্ষ থেকে অবশ্য এসব দৃষ্টান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। কয়েকজন বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ফল আস্ফালনের দিক দিয়ে বিচার করে একটি দেশের বা সমাজ ব্যবস্থার রাজ-নৈতিক কাঠামোর বিচার হয় না। অধ্যাপক চক্রবর্তী বা অধ্যাপক দত্ত যে ধরনের ব্যবস্থাকে 'গণতন্ত্র' বলে মনে করেন, সেটি নিছকই পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত এক ধরনের শাসনব্যবস্থা। এই পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় মাত্র ভিত্তি দুটি কিংবা তিনটি সমমতাবলম্বী দল, যারা পালা করে সরকার চালায়। একই শাসনব্যবস্থা পুনঃপুনঃ

নওরোজ

সন্ধ্যেবেলা এলগিন রোডে ট্র্যাফিক জ্যাম, শুক্রবার, ৫ই জানুয়ারী। রাস্তার দুপারে সার-বাঁধা অসংখ্য মোটর-গাড়ি। কোনো লক্ষ্মীর বরপুত্রের বিবাহ নয়, উপলক্ষ একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার ৫০ বর্ষ পূর্তি উৎসব। এমন উপলক্ষে এমন সমারোহ দেখার অভ্যেস আমাদের নেই, সুতরাং খানিকটা হতচকিত হতেই হয়। এলগিন রোডের নতুন কলেজ পরিপূর্ণ হয়ে আছে উৎসুক সুবেশ নরনারীতে, যথোপরি কলকাতা ও ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

নওরোজ একটি গুজরাটী ভাষার সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। গত পঞ্চাশ বছরে এই পত্রিকা একবারও বন্ধ হয়নি, অবিরাম চলেছে এবং তার পরও চলছে—এই ঘটনা গুজরাটীদের কাছে যেমন আনন্দের, কলকাতার সমস্ত নাগরিকদের পক্ষেও বিস্ময় ও তৃপ্তিমূলক। এই ঘটনা গুজরাট ও বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে একটা সৌহার্দ্যবন্ধন প্রমাণ করে। কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি সূত্রে বেশ কিছু সংখ্যক গুজরাটী বাস করেন—শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগও তাঁরা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এঁরা গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে সংকীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ নন, এঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে পারেন, বাংলা দেশের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁরা সজাগ—সেই সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কও এঁরা বজায় রেখেছেন। 'নওরোজ' সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়াও 'গুজরাটী সাহিত্য মণ্ডল' নামে একটি সংস্থা আছে—এঁরা প্রতি বছর গুজরাট থেকে বিশিষ্ট লেখকদের কলকাতায় নেমন্তন্ন করে এনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন এবং গুজরাটী ও বাঙালী লেখকদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ হয়। দিল্লী কিংবা বোম্বের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এরকম কোনো বিশিষ্ট উদ্যোগ আছে কিনা, আমরা জানি না।

কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষে একাদিক্রমে পঞ্চাশ বছর টিঁকে থাকাই যথেষ্ট বিস্ময়কর, গুজরাটী ভাষায় কিন্তু একাধিক দৈনিক ও সাপ্তাহিক আছে—যাদের বয়েস এক শো ছাড়িয়ে গেছে। 'নওরোজ'-এর বৈশিষ্ট্য—গুজরাট থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে কলকাতা শহর থেকে এর নিয়মিত প্রকাশ। ১৯১৪ সালে একজন সাংবাদিক, শ্রীএদালজী নওরোজী কাঙ্গা কলকাতায় একটি গুজরাটী প্রেস স্থাপন করে 'নওরোজ' বার করেন। তখন তাতে থাকতো শুধু বিজ্ঞাপন, বিনা মূল্যে কপি বিতরণ করা হতো স্থানীয় গুজরাটীদের মধ্যে। ১৯১৭ সাল থেকে তিনি একে একটি পরিপূর্ণ সাপ্তাহিকের রূপ দিলেন, সংবাদ ও সাহিত্য পাশাপাশি স্থান পেলো। তারপর থেকে এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর জল-ঝড়, যুদ্ধ, ব্ল্যাক-আউট দাঙ্গা—সব কিছুর মধ্য দিয়েও এ পত্রিকা প্রত্যেক সপ্তাহে বেরিয়েছে। সব পত্রিকারই প্রথম যাত্রাপথ বিঘ্নময়, শ্রীযুক্ত কাঙ্গা রিকশা চেপে যেতে যেতেও প্রুফ দেখেছেন গোড়ার দিকে, একক হাতে সব কিছু করতে হয়েছিল, ঠেলাগাড়িতে করে টাইপ নিয়ে যাচ্ছেন, ঝরঝর করে টাইপ রাস্তায় ছড়াচ্ছে—আর সম্পাদক কাঙ্গা পিছন পিছন সেই টাইপ কুড়োতে কুড়োতে যাচ্ছেন—এমন গল্পও আছে। আজ এই পত্রিকা সুপ্রতিষ্ঠিত, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সব ক'টি দিক এর মধ্যে প্রকাশিত। ১৯৫৫ সালে শ্রীযুক্ত কাঙ্গা অবসর নেবার পর তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ শ্রীযুক্ত নওল কাঙ্গা, শ্রীমতী লালু কাঙ্গা যুগ্মভাবে কাগজ চালাচ্ছেন। আমাদের "পুজোসংখ্যা"র মতন দেওয়ালীর সময়ে এঁদের বিশেষ সংখ্যা বেরোয়।

শুক্রবারের অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা কলকাতার গুজরাটী সাহিত্য মণ্ডল। 'নওরোজ'-এর উদ্যমকে স্বীকৃতি জানাবার জন্য কলকাতার বিশিষ্ট গুজরাটীরা সমবেত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ উৎসবের আয়োজন করেছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র ভাই দেশাই ছিলেন সভাপতি, ভাষণ দিয়েছেন তুষারকান্তি ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, কে সি আগরওয়াল, চাম্পানি উর্দেস, দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রমুখ।

অনুবাদ

সম্প্রতি দুখানি বিশিষ্ট অনুবাদ-গ্রন্থ আমাদের চোখে পড়েছে। দুজন বিশিষ্ট বাঙালী কবি দুজন প্রখ্যাত বিদেশী লেখককে বাংলা ভাষায় উপস্থিত করেছেন।

মণীন্দ্র রায় অনুবাদ করেছেন রবার্ট ফ্রস্টের ৫২টি কবিতা। রবার্ট ফ্রস্ট আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়, এমন কি জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুশয্যায় ফ্রস্টের কয়েক লাইন কবিতা (ঈষৎ ভুল উদ্ধৃতি সমেত) কাগজে লিখেছিলেন আপন মনে। ফ্রস্টের কবিতার পরিণত প্রশান্তি ও বিহ্বল কবিমনের আবেদন ভারতীয় মানস খুব স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করে।

মণীন্দ্র রায়ের নির্বাচন ও অনুবাদ অত্যন্ত আন্তরিক ও সাবলীল। প্রায় মৌলিক কবিতার স্বাদ পাওয়া যায়। বাংলা অনুবাদ শাখায় এই গ্রন্থটি একটি বিশিষ্ট আইশ-এর 'স্বপ্ন' শ্রুতিনাট্যের। 'শ্রুতি-অনুবাদ করেছেন জার্মান লেখক গুন্টের আইশ-এর 'স্বপ্ন' শ্রুতিনাট্যের। 'শ্রুতি-নাট্য' সাহিত্যের একটি নতুন শাখা। আজকাল ঘরে ঘরে রেডিও এবং রেডিওতে সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হচ্ছে নাটক। আমাদের বাংলা দেশের বেতার কেন্দ্র থেকেও অনেক নাটক প্রচারিত হয়, তার অধিকাংশই উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের জোড়াতালি দেওয়া নাট্যরূপ। এগুলোকে চিনির অভাবে স্যাকারিন বলা যায়। এ ছাড়া রেডিও-র জন্যই বিশেষভাবে লেখা যে-সব নাটক প্রচারিত হয়—তাদের অধিকাংশেরই মান সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ডিলান টমাস থেকে শুরু করে দেশবিদেশের অনেক কবি ও লেখক রেডিও-কে অবলম্বন করে নতুন সাহিত্যের রূপ দিয়েছেন। সিনেমা এবং সাহিত্যের মধ্যে যতখানি প্রভেদ, মঞ্চ-নাটকের সঙ্গে বেতার-নাট্যের প্রায় ততটাই ব্যবধান বলা যায়। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশে বেতার-নির্ভর সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস এখনও তেমন শুরু হয়নি। বিদেশের কবি ও লেখকরা শ্রুতিনাট্য নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা প্রয়োগের পর একে একটা বিশিষ্ট শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন।

গুন্টের আইশ-এর বিখ্যাত শ্রুতিনাট্যের নিপুণ ও সুষম অনুবাদ করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এতে আছে পাঁচটি স্বপ্ন এবং পাঁচটি কবিতাপ্রতিম মুখবন্ধ। স্বপ্নের আলাদা বর্ণ বোঝাবার জন্যই সম্ভবত এই বইটি পাঁচ রঙা কাগজে ছাপা, মূল জার্মান সংস্করণের অনেক ছবি এতে পুনর্মুদ্রিত, চমৎকার ছাপা এই বইখানি হাতে নিলে ভারী আরাম হয়। আশা করি, এই বইখানির দৃষ্টান্তে বাংলা দেশের উৎসুক লেখকরা মৌলিক শ্রুতিনাট্য রচনার পরীক্ষায় আগ্রহী হবেন।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

বিশল্যকরণী। অন্নদাশঙ্কর রায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি-১২। পাঁচ টাকা।

প্রেমের অন্বিষ্ট কি কোনো পারফেকশান? কোনো পূর্ণতা? না-কি অনাদি কালের যুগল প্রেমের স্রোতে লীন হয়ে থাকাই তার অন্তিম অভিপ্রায়? অথবা বিপন্ন বিশ্ব-মনবতার মুক্তির পথ কি জ্ঞানমার্গে? না প্রেমমার্গে?

প্রবীণ কথাসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর একটি প্রভূসম্মিত ভঙ্গিতে এবং কবিতাকল্প দ্যুতিতে এরূপ অনেক দুরূহ দার্শনিক ভাবনার সঞ্চার করে দিয়েছেন তাঁর এই উপন্যাসে। কাহিনীর ঘটনাস্থল ইউরোপ, পাত্রপাত্রীও অংশত ওদেশের এবং প্রধানত লন্ডন প্রবাসী অভিজাত বাঙ্গালী সম্প্রদায়। মননশীলতাই রচনাটির অন্যতম চরিত্রলক্ষণ। রক্ত মাংসের রূঢ় বাস্তবতা এখানে প্রায় অনুপস্থিত। সামরিক সমস্যার জটিলতায় মথিত, প্রাত্যহিকতার স্থূলতায় অভিবাক্ত উদভ্রান্ত মানুষের মুখের আদল এই কাহিনীর মার্জিত বিদগ্ধ চরিত্রাবলীর মুখে ফোটে না। কারণ তত্ত্ব আর জীবনের সাঙ্গীকরণে লেখকের যতটা অভিনিবেশ অস্তিত্বের নিরাবরণ উন্মোচনে ততটা নয়। একটি আশ্চর্য স্বপ্নের মত তাই কাহিনীটি আমাদের আকর্ষণ করে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতায় মুদ্রিত হয় না।

কাহিনীর নায়ক হারীতের প্রেমের পাত্রী মধুপা তাকে গভীরভাবে ভালবেসেও সে অন্যত্র বিবাহিত। হারীতের কাছে একদিন তার ফিরে আসবার বাসনা থাকলেও মাতৃত্বের বন্ধন তার প্রতিবন্ধক হয়। অতএব ভগ্ন-হৃদয় কবি হারীত লন্ডনের প্রবাস জীবনে, ইউরোপের তীর্থে তীর্থে পথ পরিক্রমা করে তার যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ের মুক্তির আশায়। প্রতীক্ষা করে থাকে সেই নারীর যে বিশল্য-করণীর মত তার হৃদয়কে বিশল্য করে তুলবে। লন্ডনের পার্বনী হালদারের নিবিড় সান্নিধ্যে হারীত মুগ্ধ। কিন্তু বোহেমিয়ান কবি হারীতের জীবনে সে বিশল্যকরণীর ভূমিকা গ্রহণে অক্ষম। তারপর এল চিত্র-শিল্পী জোন। শিল্প সমর্পিতপ্রাণা রমণী আর স্বপ্নবিলাসী কবি দুজনে দু' জনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। শুরু হল, ইউরোপের দেশে দেশে শিল্পী আর কবির সম্মিলিত সৌন্দর্যাভিসার। হারীতের মনে হয় তার জন্মান্তর হতে চলেছে। জোনই তাকে বিয়াত্রিচের মত পথ দেখিয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নিয়ে যাবে। সেই হবে তার প্রার্থিত বিশল্যকরণী। কিন্তু না, জোন স্বপ্নসর্বস্ব, তারুণ্যে উচ্ছল হারীতের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দায়িত্ব নিতে পারে না। কিন্তু সে হারীতকে জীবনের অন্যতর অর্থের সন্ধান দেয়। বলে, সৌন্দর্যসৃষ্টির বেদনাই হোক কবি হারীতের অনন্তকালের যন্ত্রণা আর রূপসৃষ্টির তৃপ্তিই হোক তার চিরকালের বিশল্যকরণী। আনন্দে বেদনায় আচ্ছন্ন হারীত অবশেষে ভারতগামী জাহাজে চেপে বসে। আর তার প্রিয়তমা জোন তার বিয়াত্রিচে, চিরবিরহের অনন্ত স্বপ্নলোকে হারিয়ে যায়।

বিশ্বমনস্ক অন্নদাশঙ্কর অনায়াসে এই মধুর প্রেমের কাহিনীকে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অনেক জটিল প্রশ্ন ও প্রতি-প্রশ্নের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছেন। অথচ কোথাও সেই রাজনৈতিক বিতর্ক বা দার্শনিক ভাবনা উপন্যাসের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়নি। বরং যুদ্ধ ও শান্তির অনিবার্য প্রসঙ্গ প্রেম ও পূজোর প্রাসঙ্গিক উপলব্ধি কাহিনীর গতিকে গভীরতায় স্পন্দিত করে দিয়েছে। ভাবীকালের মানুষের জন্যে লেখকের একটি স্বপ্ন সাধ যেন মুহূর্তে মুহূর্তে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বিশ্ব-সাহিত্যের দুর্লভ অভিজ্ঞানে শিল্প ও সংস্কৃতি চিন্তার পরিশীলিত পরিবেশে। যে পরিবেশ রচনায় পরমতায় অন্নদাশঙ্কর আজও অগ্রগণ্য। গ্যোটে-দান্তে বা বাখ-বেটোফেন অথবা র‍্যাফেল-এঞ্জেলো তাই অনায়াসে হারীত ও জোনের একান্ত সমীপবর্তী চরিত্র। কখনো বা তাদের রূপ-বীক্ষার অবলম্বন কখনো বা স্বপ্নের উদ্দীপন। শেষের কবিতার স্বপ্ন-বিলাসী বোহেমিয়ান অমিত-ও যেন মাঝে মাঝে হারীতকে স্পর্শ করে যায়। এই জাতীয় রচনাকে কি সাহিত্যিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করা সম্ভব? যদি তা না-ও হয় তা হলেও ধ্রুপদী শিল্প ও সাহিত্যের আবহে প্রেম ও মানব স্বপ্নের চিরন্তন রূপরচনায় অভীপ্সার বিশল্যকরণী এক অনন্যসৃষ্টি।

৪০৬।৬৭

মধ্যরাত। দিব্যেন্দু পালিত। চতুষ্পণী প্রকাশনী. ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। ছয় টাকা।

তরুণ লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে দিব্যেন্দু পালিত একটি বিশিষ্ট নাম। বক্তব্যে আধুনিক হয়েও রচনারীতির বহিরাঙ্গিক প্রসাধনকলায় তিনি সবিশেষ সচেতন, রূপ-উপন্যাসের নিজস্ব টেকনিকে তিনি কখনো উপেক্ষা করেন না। তাঁর অধিকাংশ গল্পই পাঠকের অভিজ্ঞতাকে মর্যাদা দেয়, উপন্যাসেও তিনি হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেননি। দিব্যেন্দু পালিতের আরেকটি আকর্ষণ, তাঁর স্নিগ্ধ সুন্দর স্রোত-স্বচ্ছন্দ ভাষা। 'মধ্যরাত' তাঁর তৃতীয়

উপন্যাস। এই উপন্যাসে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষ করা গেল। [illegible] উপন্যাস। [illegible] মধ্যেকার [illegible] যুবতী একটি মেস-বাড়ি গড়ে উঠেছে। [illegible]—এই নামটি [illegible] বিশেষ [illegible]।

[illegible] উঠেছে তপতী। [illegible] সেই সূত্রে [illegible]। এছাড়া রয়েছে রঞ্জা, নবীন, ডিনা, অঞ্জলি ব্যানার্জী। প্রত্যেকের জীবিকা আলাদা, শুধু আত্মরক্ষার [illegible] তারা একাত্ম। লেখক আশ্চর্য ভঙ্গিতে এদের আচার-আচরণ, সমস্বন্দ জীবনযাত্রা, বেদনা, নিঃসঙ্গতা, দু-একটি নিবিড় উজ্জ্বল মুহূর্ত ফুটিয়ে তুলেছেন। তপতী-সতীশের সম্পর্কও তিনি অতি সংযমী রেখায় এঁকেছেন। পরিণত-বয়স্ক দুটি যুবক-যুবতীর—যারা স্বভাবতই নিরাবেগ ও নিরাসক্ত—দ্বিধান্বিত পদক্ষেপ ভালবাসার মুকুলটিকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে পারে নি, শুধু হঠাৎ জোয়ারে কেঁপে উঠেছে মাত্র— এই অংশে বিবেকেন্দু পালিত বিরল সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। শেষ দৃশ্যে তপতীর শূন্যতা ও ক্লান্তি পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়। ১২২।৬৭

প্রাপ্তি স্বীকার

জগতের ধর্মগুরু। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ঃ পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য ৩·২৫।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী লীলামৃত। শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ভক্তিতীর্থ ঃ পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী। মূল্য ২·০০।

মৌন শিলালিপি। মহামাত্য। কে ঘোষ ঃ ৩এ ডঃ জগবন্ধু লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

গীতিগুচ্ছ। শ্রীমাধবনারায়ণ বসু। কুন্দরালী, ২৪ পরগণা। মূল্য ·৭৫।

বহুবর্ণা। শ্রীবিমলচন্দ্র বেদজ্ঞ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ঃ ২০৪ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

কালপুরুষ। রণজিৎ মুখোপাধ্যায়। নরেশ ভট্টাচার্য ঃ ৫ চেতলা রোড, কলিকাতা-২৭। মূল্য ১·০০।

এখন সময় নয়। শঙ্খ ঘোষ। অনুভব প্রকাশনী ঃ ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ·৫০ পয়সা।

প্রতিবিম্ব। পরেশ মণ্ডল। অনুভব প্রকাশনী ঃ ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৫০ পয়সা।

বিষুবে রোদ্দুরের ডালপালা। তুলসী মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ জগৎ ঃ ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ২·৫০।

বাঁশুরীয়া। পরাশর। ঘোলপুকুর জয়কালী পুস্তকালয় ঃ ঘোলপুকুর, মেদিনীপুর। মূল্য ১·০০।

একদিন প্রতিদিন। মনীষীমোহন রায়। সুজনী ঃ ৬৭এ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ২·৫০।

নৃত্যপথিক। নরেন্দ্রচন্দ্র রায়। ডিলাইট বুক কোম্পানী ঃ ১৭০/৩ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·৭৫।

*

প্রোডাকশন সিণ্ডিকেটের "আঁধার সুখ" ছবিতে (পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়) রিণা ঘোষ ও মৃণাল মুখোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

বন্ধুকৃত্য

নেপালে ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শন বন্ধ

নেপালে দুটি ভারতীয় হিন্দী চিত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে যে প্রহসন ঘটে গেল ভারত সরকার সে ব্যাপারে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকবেন এমন আশঙ্কা অবশ্য আমাদের নেই। তবে এ বিষয়ে তাঁদের অতি সত্বর সচেতন ও সক্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঘটনাটি অদ্ভুত। একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করার জন্য নেপাল সরকার হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ছবি দুটি 'শহীদ' (বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর জীবনী নিয়ে তৈরী) এবং 'ফর্জ' (ভারতের উপর চীনা আক্রমণের পটভূমিতে গোয়েন্দা চিত্র)। 'শহীদ' মূলত দেশাত্ম-বোধক চিত্র। দর্শককে দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করার জন্যই ছবিটি তৈরী।

সংবাদে প্রকাশ, ওই দেশের সেন্সর বোর্ড ছবি দুটির প্রদর্শন অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, শহীদ ও ফর্জ মুক্তি পাবার পর নেপাল সরকার ছবি দুটির প্রদর্শন সম্পর্কে হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলেন। দুটি ছবিরই প্রদর্শনীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। ললিতপুরে দেখানো হচ্ছিল 'শহীদ', কাঠমাণ্ডুতে 'ফর্জ'। অবশ্য পরে শোনা গেছে, শহীদ-এর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা নেপাল সরকার ভাবছেন। ফর্জ চার সপ্তাহ চলার পর বন্ধ হয়ে গেল। পরে অবশ্য আদেশটি একটু অদল-বদল করা হয়। বলা হয়, নেপাল সরকারের কোন সহকারী কমিশনার ছবিটি প্রদর্শনযোগ্য মনে করলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ছবি দুটির প্রদর্শন বন্ধ করার আদেশের পিছনে চীনা রাষ্ট্রদূতাবাসের হাত আছে। প্রত্যাহারের আদেশ জারির কিছু দিন আগে নাকি চীনা দূতাবাসের ব্যক্তিরা 'ফর্জ' দেখে এসেছিলেন। অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, চীনের আবদার রাখাই নেপাল সরকার তাঁদের একমাত্র ফর্জ বা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের কথা ভাববার অবকাশ বোধ হয় তাঁরা পাননি। ব্যাপারটি আরও হাস্যকর এই কারণে যে, সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র লাভের পরেই ছবি দুটির প্রদর্শনের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। শহীদ-এর মত ছবি, যা এক আত্মত্যাগী দেশসেবীর জীবনকাহিনী নিয়ে তৈরী, কী কারণে নিষিদ্ধ হতে পারে তা বোঝা দুষ্কর। ফর্জ প্রধানত প্রমোদ-চিত্র। চীন দূতাবাস ছবিটি দেখে রুষ্ট হতে পারেন : কিন্তু নেপাল সরকার ছবি দুটির উপর অপ্রসন্ন হয়েছেন বলেই আমরা বিস্মিত।

প্রসঙ্গত-উল্লেখ্য, কাঠমাণ্ডুতে চীনা দূতাবাসের ব্যক্তিরা নেপাল সরকারের বিনা অনুমতিতেই এতকাল চীনা প্রচার-চিত্র দর্শকদের দেখিয়েছেন। শুধু রাষ্ট্রদূতাবাসেই নয়, ওই দেশের নানা স্থানেও —বিশেষত তেরাই এবং উত্তরাঞ্চলের কোদরি রোডে—প্রচার-চিত্র নিয়মিত প্রদর্শিত হয়েছে। নেপাল সরকারের টনক নড়েছে

কিছুকাল পর। এখন নাকি তাঁরা এই ধরনের প্রচার-কার্য বন্ধের উপায় ভাবছেন। কিন্তু চীনা ষড়যন্ত্রবাদের প্রভাবে যদি নেপাল সরকার ভারতীয় ছবির প্রতি খড়্গহস্ত হন তবে এদেশের চলচ্চিত্রমহলে ক্ষোভের সঞ্চার হবারই কথা। চলচ্চিত্র-শিল্পও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ঘটনার সঙ্গে ভারতের আত্মমর্যাদার প্রশ্নও জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষিতে কী করণীয় তা ভারত সরকারই ভাল জানেন। তবে চলচ্চিত্রশিল্পের স্বার্থে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে সে বিষয়ে অতি শীঘ্র কোন না কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

মাদ্রাজে হিন্দী চিত্র প্রদর্শন বন্ধ

হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের ফলে ২০ ডিসেম্বর থেকে মাদ্রাজে হিন্দী চিত্র প্রদর্শন বন্ধ। যে-সব সিনেমায় হিন্দী ছবি দেখানো হচ্ছিল সেইসব প্রেক্ষাগৃহে এখন তামিল অথবা ইংরেজী ছবি চলছে। বিক্ষোভ-কারীরা একাধিক সিনেমায় ঢুকে দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র ভেঙেছেন। কিছু-সংখ্যক দর্শক আহত হয়েছেন।

দক্ষিণ ভারতে তৈরী "রাম অউর শ্যাম" ছবিটির মুক্তি পাবার কথা ছিল ২২ ডিসেম্বর। চিত্রমুক্তি স্থগিত আছে। যাঁরা অগ্রিম টিকিট কেটেছিলেন তাঁদের টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। যদিও ২২ ডিসেম্বর বিক্ষোভ ও আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে তবু নাকি সেখানে হিন্দী চিত্র দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। চিত্রপ্রদর্শক মহলের জনৈক মুখপাত্র বলেন, "আবার যে হামলা হবে না তার নিশ্চয়তা কী?"

পরলোকে ননী মজুমদার

অভিনেতা শ্রীননী মজুমদার গত বুধবার ৫৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। অভিনেতা হিসাবেই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। স্বর্গত বসন্ত মজুমদার এবং হেমপ্রভা মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীননী মজুমদার ছাত্রাবস্থায়ই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনেও তাঁকে আটক রাখা হয়। তিনি নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন।

চিত্রপরিচালক - অভিনেতা শ্রীসুশীল মজুমদার তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বহু ছবিতে শ্রীননী মজুমদার অভিনয় করেছেন। চরিত্রাভিনেতা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একমাত্র কন্যা ও জামাতাকে রেখে গিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র প্রদর্শনী

ইণ্টারন্যাশনাল টুরিস্ট সপ্তাহ উপলক্ষে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিস্ট শাখা এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের যুগ্ম উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থায় ২ জানুয়ারী থেকে ৫ জানুয়ারী এবং ৭ জানুয়ারী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩০টি ছবি দেখানো হয়। 'টুরিজম' প্রসারের পক্ষে ছবিগুলির দান যথেষ্ট। ফ্রান্স, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, গ্রীস, জাপান, যুগো-স্লাভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের ছবি বাদ যায়নি।

চলচ্চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমদিন মোট সাতখানি ছবি দেখানো হয়।

'৬৭ সালে প্রদর্শিত হিন্দী ও বিদেশী ছবি

কলকাতা এবং বোম্বাইয়ে ১৯৬৭ সনে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবির সংখ্যা ৭৬। ১৯৬৬ সনে কলকাতা ও বোম্বাইয়ে মুক্তি-প্রাপ্ত হিন্দী ছবির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮০ ও ৭৪। ১৯৬৭ সালে কলকাতায় মোট ১২১টি বিদেশী ছবি মুক্তি পেয়েছে। বোম্বাইয়ে ১৬৮টি।

সেতার শিল্পীর বিদেশ সফর

সেতার শিল্পী দেবব্রত চৌধুরী সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকা সফর শেষ করে দেশে ফিরে এসেছেন। নিজের উদ্যোগেই তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় তিনি দুই মাসের উপর ঘুরেছেন এবং মোট ৫৫টি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন। প্যারিস, পশ্চিম বার্লিন, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, স্টকহম, লস এঞ্জেলস, স্যান ফ্রান্সিসকো প্রভৃতি শহরে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, কনসার্ট হলে, রেডিও ও টেলিভিশনে সেতার বাজিয়েছেন। তাঁর অনুষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে আদৃত হয় এই কারণে যে, তিনি বাজনার পূর্বে ভারতীয় রাগসংগীত সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করে তোলেন এবং সেতারবাদনে রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতা অটুট রাখেন। পশ্চিমের শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি রাগ সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত বা জাজ-মিশ্রিত করেননি।

শ্রীচৌধুরী গত বাইশ বছর যাবৎ সেতার বাজাচ্ছেন। তিনি ওস্তাদ মুস্তাক আলী খানের ছাত্র। শ্রীচৌধুরী আকাশ-বাণীর একজন বিশিষ্ট শিল্পী। এবং বহু [illegible]

[illegible]

ছবির পর ছবি

"ছুটি"-র অসামান্য সাফল্যের পর পূর্ণিমা পিকচার্স সত্যজিৎ রায়ের "গুপী গাইন ও বাঘা বাইন" প্রযোজনা করছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর। সম্প্রতি ছবির কিছু গান রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন অনুপকুমার ঘোষাল ও জয়কৃষ্ণ সান্যাল। এ সপ্তাহে ছবির আউটডোর শুটিং গ্রহণের জন্য শ্রীরায় তাঁর ইউনিট সহ বীরভূম যাত্রা করছেন। গুপী ও বাঘার চরিত্রে যথাক্রমে তপেন চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ অভিনয় করবেন। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন জহর রায়, সন্তোষ দত্ত, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কানু মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি।

গুপী গাইন ও বাঘা বাইন

নির্বাক কমেডি চিত্র

নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ আর নেই কে বলে? চিত্রপ্রযোজক রালফ অ্যান্ড্রুজ হলিউডে একটি নির্বাক কমেডি ছবি তৈরি করছেন। বিশ দশকে তৈরি চার্লি অ বিস্টোনের কমেডি চিত্রের মতই এই ছবি। নাম : "দি সায়লেন্ট ট্রিটমেন্ট"। "মডার্ণ টাইমস"-এর (১৯৩৬) কাল শেষ। আধুনিক দর্শকরা কি আবার ওই ধরণের নির্বাক চিত্র দেখতে ভিড় করবেন? প্রযোজক—পরিচালক অ্যান্ড্রুজ বলেন, "ছবিটির অভিনবত্ব দর্শকদের টেনে আনবে। ভাল কমেডি দেখার বস্তু, শোনার নয়।"

শ্রীঅ্যান্ড্রুজ এ-যাবৎ টেলিভিশন-চিত্র তৈরি করছেন। সিনেমায় তাঁর এই প্রথম প্রচেষ্টা।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে চিত্রভারতীর প্রথম ছবি "তীরভূমি"-র শুটিং সমাপ্ত। আগামী মাসে ছবিটির মুক্তি পাবার কথা। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিকাশ রায়। তিনি নিজেও ছবির একজন প্রধান শিল্পী। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, রুমা গুহঠাকুরতা, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সীতা মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, শঙ্কর ও রবি ঘোষ। বিজন পালের সংগীত পরিচালনায় ছবির কয়েকটি গান সম্প্রতি রেকর্ড করা হয়েছে।

তীরভূমি

ছায়াময়ুপোর "প্রথম বসন্ত"-র শুটিং অচিরে আরম্ভ হয়েছে প্রতিভা বসুর কাহিনীর ভিত্তিতে। নির্মল মিত্র ছবিটি পরিচালনা করছেন। চিত্রনাট্য পরিচালকেরই লেখা। মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অজয় গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী ও ভারতী দেবী ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক।

প্রথম বসন্ত

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "শেষ থেকে শুরু" নাটকটির মঞ্চাভিনয় দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। এই নাটক অবলম্বনে তৈরি সাহা চিত্রপীঠের প্রথম চলচ্চিত্র "শেষ থেকে শুরু"-র শুটিং সবে শেষ হয়েছে। চিত্রসাথী ছদ্মনাম নিয়ে একদল অভিজ্ঞ কলাকুশলী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সংগীত পরিচালক দুইজন—অনিল বাগচী ও নচিকেতা ঘোষ। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, গিরীন চক্রবর্তী, রবীন দাস, লতিকা দাশগুপ্ত প্রভৃতি ইঙ্গিত নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ এবং নবদ্বীপ দত্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভা রাও ও স্বপনকুমার।

(উপরে) চিত্রভারতীর 'তীরভূমি' (পরিচালনা : গুরু বাগচী) ছবির একটি দৃশ্যে বিকাশ রায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় (নীচে) 'তীরভূমি'র গান রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে মান্না দে, সংগীতপরিচালক বিজন পাল ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

নিউ ইয়র্কে "শ্যামা"

গত ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কের ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হল। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির লোয়েব স্টুডেন্টস্ সেণ্টারের ল্যুবিন্ অডিটোরিয়ামে তিলধারণের স্থান নেই। হলের মধ্য থেকে ভেসে আসা মুহুর্মুহু হাততালির আওয়াজ শুনতে শুনতে বাইরে থেকে ফিরে গেলেন অনেকে, কর্মকর্তারা নোটিস বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছিলেন 'স্থান নেই'। অনুষ্ঠানান্তে মহিলা-পুরুষ সবাই ছুটলেন শিল্পীদের অভিনন্দন জানাতে। তিন মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে মঞ্চস্থ হল শ্যামা। শিল্পী খোঁজার কাজই আরম্ভ হল প্রথমে। নিউ ইয়র্ক ছাড়িয়ে নিউ হ্যাম্পশায়ার, বাল্টিমোর, এমন কি মণ্ট্রীল (ক্যানাডা) পর্যন্ত জাল পাতা হল। পাওয়া গেল বাল্টিমোরের শ্রীমতী মঞ্জু বাসাককে। ঠিক হল উনি গাইবেন শ্যামার গান। নিউ হ্যাম্পশায়ারের শ্রীজ্ঞানব্রত ভট্টাচার্য গাইবেন কোটালের গান। মণ্ট্রীলের শ্রীকুমার মুখার্জী নিলেন [illegible]। এখানে নিউ ইয়র্ক থেকে শ্রী[illegible]কে আবিষ্কার করা হল। উনি নাচলেন বজ্রসেনের ভূমিকায়। ভারতনাট্যম্, কথাকলি ইত্যাদিতে গত ১০ বছরের [illegible]। সুন্দর [illegible]। কোটালের ভূমিকায় নাচলেন শ্রী[illegible] সেনগুপ্ত, [illegible]। [illegible]

নিউ ইয়র্কে "শ্যামা" নৃত্যনাট্যে নামভূমিকায় পলি রায়

সলিল দত্তর "অপরিচিত" ছবিতে অপর্ণা সেন ও সন্ধ্যা রায়। ফটো—দেশ

নিউ ইয়র্ক থেকে ৭০ মাইল দূরে মিড্ল্-টাউনে চাকরি করেন। ছোটবেলায় নাচের অভিজ্ঞতা কিছু আছে। উত্তীয় হলেন মিঃ আর্ল বেনসন্। সুন্দর সুগঠিত দেহ, কোমল স্বভাব। আমেরিকান ছেলে আর্ল—ভারতের শিল্পকলার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহ। সামান্য নাচের অভিজ্ঞতা আছে। এখানকার ইণ্টারন্যাশনাল হাউসের খ্যাতিসম্পন্না নাচিয়ে লাভলীন ভাটিয়া—পাঞ্জাবের মেয়ে-বর্তমানে লাভলীন ভাটীয়া পোস্ট্-[illegible] হলেন শ্যামার প্রধানা সখী, আরও এলেন শ্রীমতী বীণা ভাটিয়া, শ্রীমতী মানসী দে, শ্রীমতী বাসন্তী ভাদুড়ী। এঁরাও হলেন শ্যামার সখী। সব শেষে এলেন মিঃ শর্মা—মাদ্রাজের ছেলে-হলেন বজ্রসেনের বন্ধু। ইণ্টারন্যাশনাল হাউসে লোক্ ডান্সের অভিজ্ঞতা আছে। [illegible] করলেন লাভলীন। নামভূমিকায় নাচলেন শ্রীমতী পলি রায়। গানের ভার শ্রীঅমিয় ব্যানার্জীর উপরে। উনি নিজে করলেন বজ্রসেনের গান। গানের দলে একে একে আরও এলেন—শ্রীঅজিত্ সাক্সেনা—নিউইয়র্কে বিখ্যাত গাইয়ে—ভারত, জার্মানী ও আমেরিকা থেকে [illegible] ডক্টরেট পেয়েছেন। এলেন শ্রীমতী কজলী নাগ—উনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষিকা ছিলেন। এলেন শ্রীমতী শিপ্রা ব্যানার্জী। এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন শ্রীমতী মিল্‌ড্রিড্ অর্জেলো ও শ্রীমতী গীতা নাথ। সেতার সংগতে এলেন শ্রীমতী স্বপ্না চ্যাটার্জী। ভায়োলীন বাজালেন মিঃ টমাস ওডোনেল আর বাঁশী বাজালেন ডোনাল্ড্ অ্যাণ্ডারসন ও মার্থা গ্রেন। ভায়োলীন ও ক্ল্যারিওনেট্ নিয়ে যোগ দিলেন তরুণ শিল্পিদ্বয় রণজিৎ ও সঞ্জিৎ (ডাঃ সাক্সেনার ছেলে দুটি)। কুমারবাবুর সঙ্গে তবলা ধরলেন আমেরিকার ছেলে ক্যারী কাস্। শিল্পিদ্বয় শ্রীমতী পলি রায় ও শ্রীঅমিয় ব্যানার্জীর পাশে জড় হলেন অনেক শিল্পী। সঙ্গে যোগ দিলেন মার্কিন ছেলেমেয়েরা। শুরু হল মহড়া। নিরলস প্রচেষ্টায় দিনের পর দিন শ্রীমতী রায় গড়ে তুললেন শিল্পিদলকে। ভাষার ব্যবধান, ভাবধারার বৈষম্য মিলিয়ে গেল।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্য নিউ ইয়র্ক ও আশেপাশে বিরাট সাড়া জাগিয়েছে। এখানকার টেগোর সোসাইটির কর্মকর্তারা খুব অনুপ্রাণিত। এই ধরনের অনুষ্ঠান আরও কিছু করা যায় কিনা সে নিয়ে আলোচনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

[illegible] ঘোষাল
কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের চোখে

বার্গম্যান ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রর ছবির সেকাল একাল

মহাশয়

সম্প্রতি প্রকাশিত "দেশ"-এর চলচ্চিত্র সংখ্যার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সুষ্ঠু সম্পাদনায় ও সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলিতে সংখ্যাটি এক অপূর্ব সুখপাঠ্য গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রতিটি প্রবন্ধই প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রবিদদের উপলব্ধি ও মন্তব্যে ভাস্বর। তবুও মনে হয়, প্রায় প্রতিটি বিষয়েই আরও বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এবং প্রয়োজন আছে।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের সময়োপযোগী চিন্তাগর্ভ আলোচনা "ছবির সেকাল একাল" পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। অবশ্য দু-এক জায়গায় আমাদের পরিচিত প্রেমেন্দ্র মিত্র যেন ইচ্ছে করেই নিজেকে একটু অচেনা করে তুলেছেন। নমুনা ইংমার বার্গম্যান

শ্রীরঞ্জিত পিকচার্সের "দাদু" (পরিচালনাঃ অজিত গাঙ্গুলী) ছবিতে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুভা গুপ্তা।... ফটো—দেশ

সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটুকু অত হতাশাব্যঞ্জক হবে কেন? সাহিত্যে একজিসটেন-সিয়ালিজম্-এর দূত সার্ত্র-দের উদয় লেখকের কাছে "সহসা" মনে হলো কী করে? সামান্য একটু সজাগ দৃষ্টিতেই প্রায় পঞ্চাশ বছরের এবং ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আরও বেশী বিস্মিত হয়েছি তাঁর চিরপরিচিত বিদ্রোহী রূপ হঠাৎ রক্ষণশীল মূর্তিতে পরিবর্তিত হওয়ায়। তাঁর নিজের প্রথম যুগের সফল রচনাগুলির সম্পর্কে চিত্ররূপ কোন অংশেই বার্গম্যানের সৃষ্টির চেয়ে কম চাঞ্চল্যকর হবে না। তাই বলে তাদেরকে আমি কোনমতেই অর্থহীন বলবো না। তা ছাড়া বার্গম্যানের চিত্রশিল্পের দার্শনিক ব্যাখ্যাকে নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অতখানি স্পষ্ট ধারণা পোষণ করা কতটা সমুচিত তাতে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ আছে।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় লেখককে "নায়ক" চিত্রটির জন্য অত বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করি। সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টিমানকে নিম্নাভিমুখী করার ব্যাপারে উপর্যুক্ত ছবিটির যথেষ্ট অবদান আছে। অন্যতম কারণ হিসাবে ছবিটিতে একটি বিখ্যাত বিদেশী চিত্রের (রোমান হলিডে) প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান এ কথা অস্বীকার করা যায় কি?

—অরূপ ভট্টাচার্য
চিত্তরঞ্জন

মহাশয়,

'দেশ' পত্রিকার চলচ্চিত্র সংখ্যায় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রবন্ধ পড়লাম। তিনি কতবার কি ছবি দেখতে প্রস্তুত তাতে কারো কিছু এসে যায় না। কিন্তু বার্গম্যানের কোন ছবিই না দেখে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা নিতান্তই হাস্যকর। তিনি যদি দয়া করে আলোচ্য চিত্র নির্মাতার 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ', 'দি ম্যাজিসিয়ান' 'স্মইণ্টার লাইট', 'সেভেন্থ সিল' দেখেন, তবে হয়ত বুঝতে পারেন, তিনি বার্গম্যানের শিল্প-দৃষ্টির যে "আভাস" পেয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। অবশ্য যাঁদের 'মুর্গি' দেখে অভ্যাস তাঁদের বার্গম্যানের ছবি হজম নাও হতে পারে।

—ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত
কলিকাতা ৩১

শৌখিন নাট্য সংস্থার তালিকায় আর একটি নাম যুক্ত হল "রঙ্গ নিকেতন"। গত ২৯শে ডিসেম্বর অন্ধ অ্যাসোসিয়েশন হলে এ'রা পরিবেশন করলেন এ'দের প্রথম নাটক বাদল সরকারের "বড়ো পিসীমা"। আজকের দিনে যে নাটকের প্রয়োজন সর্বাধিক; "বড়ো পিসীমা" তা-ই। নাটকটির শিল্পী ও পরিচালক সকলেই নতুন। কিন্তু তাঁদের পারদর্শিতা নবাগতের মত নয়। বাবলু দত্তের "অনাথ", টাবলু ভট্টাচার্যের নিতাই, কল্যাণ ভট্টাচার্যের ধ্রুবেশ ও শিবু চাটার্জীর জগৎ এ নাটকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র রূপায়ণ। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় শৈলেন বসাক ও বাণী চট্টোপাধ্যায় মোটামুটি ভাল অভিনয় করেছেন। মিঃ সেনের ভূমিকায় রাধন দাস চরিত্রের আত্মগত বিনয়ীভাবটি ফুটিয়েছেন। মিসেস সেনের ভূমিকায় আরতি ঘোষ প্রথমদিকের আড়ষ্টতা কাটিয়ে শেষের দিকে ভালই অভিনয় করেছেন। কৃষ্ণা চ্যাটার্জীর ধর্ডীন, গৌতম দত্তের স্মারক, গণেশ দাসের রাজীব ও কল্যাণ দাসের "পিসেমশাই" মন্দ নয়। কাজল মুখার্জীর "বড়ো পিসীমা" ও শেখর মুখোপাধ্যায়ের "যোগীন" সার্থক চরিত্র রূপায়ণ। এ'দের বাচনভঙ্গী ও সংযত অভিনয় এবং অভিব্যক্তি চরিত্র দুটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নেপথ্যের আবহসংগীত নাটকের রস খানিকটা ক্ষুণ্ণ করেছে। নাট্য-পরিচালনা করেছেন শেখর মুখোপাধ্যায়।

শেক্সপীয়রের "রোমিও-জুলিয়েট"-এর নতুন চলচ্চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে। ছবিটি তৈরি করছেন ফ্রাঙ্কো জেফিরেলি। তিনি এর আগে 'টেমিং অব দি শ্রু" পরিচালনা করেছিলেন। ইটালিতে "রোমিও জুলিয়েট"-এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যথাক্রমে লিওনার্ড হুইটিং এবং অলিভিয়া হাসে যথাক্রমে রোমিও ও জুলিয়েটের চরিত্রে অভিনয় করছেন।

জাপান চলচ্চিত্রশিল্পকেন্দ্র নেতৃবৃন্দ তাঁদের দেশে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছেন। ওসাকাতে "ইন্টার-ন্যাশনাল এক্সপোজিশন" (১৯৭০) উপলক্ষে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবটি "নন-কম্পিটিটিভ" হবে। এবং পরে এই ফেস্টি-ভ্যাল ভারতেও অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেল।

অভিনেতা রাজা পরাঞ্জপে ইসমাইল মার্চেণ্ট ও জেমস আইভরির "দি গুরু"-তে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অপর্ণা সেন, রিটা টুশিংহাম ও মধুর জাফরে ছবির তিন প্রধান মহিলা শিল্পী। ডিসেম্বরে বোম্বাইয়ে ছবির শুটিং আরম্ভ হয়েছে।

ইন্দ্রপুরী হিন্দী চিত্রের আউটডোর শুটিংয়ের সঙ্গে ছবির নায়ক ধর্মেন্দ্রর জন্মোৎসব পালিত হল। জন্মদিনের কেক অভিনেতার হাতে তুলে দেন মেহমুদ। শিল্পীর "কত"-তম জন্মোৎসব পালন করা হল তা অবশ্য জানা যায়নি।

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স ভারতে আর্ট সিনেমা তৈরির কথা ভাবছেন। সম্প্রতি সংস্থার এক মুখপাত্র বোম্বাইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা বলেন। এখানে কোম্পানির যে টাকা রয়েছে তা আর্ট সিনেমা তৈরিতে ব্যয় করা হবে। কোম্পানি এ কথা ভারত সরকারকে জানিয়েছেন।

শেখ আবদুল্লার মুক্তিলাভ এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ভারত সরকার ২ জানুয়ারি তাঁর উপর থেকে সব বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। শেখ আবদুল্লা ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার পরে এ পর্যন্ত তিনি তিনবার গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। এবার মুক্তিলাভের পরে তিনি ঈদের নামাজ পড়েন এবং এক জমায়েতে ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। যদিও তাঁর মত কি তাহা তিনি ব্যক্ত করেন নি। ভারত-পাক মৈত্রীর জন্য তিনি আবেদন জানান। তিনি বলেন ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক হওয়া উচিত আমেরিকা ও কানাডার মত। দু' দেশের মধ্যে ভিসা-পাসপোর্টের কোন দরকার থাকবে না। এই দু' দেশের যে কেউ যে কোন জায়গায় বাস করতে পারবেন—এমন হওয়া উচিত। শেখ আবদুল্লা এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন—ভারত, পাকিস্তান আর কাশ্মীর এ তিন পক্ষই খুশী হয়, কাশ্মীর সমস্যার তেমন একটা সমাধান খুঁজে বার করতেই হবে। ভারতের ক্ষতি হয়, এমন কোন সমাধানে তিনি সম্মত নন। আবার পাকিস্তানের অমর্যাদা হয় এমন কিছু করতেও তিনি নারাজ। তাসখন্দ ঘোষণাকে উদ্দীপ্ত করে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবেন। সাংবাদিকরা তিনি ভারতীয় নাগরিক কিনা এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি এই প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না। তার পরে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে তাঁর কোন ফরমুলা আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি তা এড়িয়ে যান।

বড়শব্দ মিলিন আছি ওম এক এ ঘোষণা করেন।

৪ জানুয়ারি—আজ সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ে স্টেট বাস, ট্রাম এবং একটি পুলিশের ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে বহু লোক আহত হয়। আহতের সংখ্যা ১৪। এর মধ্যে গুরুতর আহত ৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাসের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দেশী সংবাদ

১ জানুয়ারি—সংযুক্ত সমাজবাদী দলের জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতি স্থির করেছেন যে, তাঁরা উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের সদস্যদের সরিয়ে আনবেন। যত শীঘ্র সম্ভব পদত্যাগপত্র পেশ করার জন্য জাতীয় কার্য-নির্বাহক কমিটি দলের সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রকাশ।

প্রধানমন্ত্রীর রায়বেরেলী ও বারাণসী সফরের সময় হাজার হাজার ছাত্র গিয়ে ভাষা বিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ জানাবে বলে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ঘোষণা করায় এলাহাবাদ জেলার সমগ্র সীমানা জুড়ে দিন রাত পুলিস পাহারা দিচ্ছে। জেলায় দু মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এই আদেশ অনুযায়ী সভা, শোভাযাত্রা এমন কি স্লোগান দেওয়াও নিষিদ্ধ।

২রা জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ রায়বেরেলিতে বলেন যে, ভাষা বিল নিয়ে আর বিবেচনা করার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, পুনর্বিবেচনা করতে গেলে কেবলই জটিলতা বৃদ্ধি পাবে। শ্রীমতী গান্ধী সাংবাদিকদের জানান, সরকার হিন্দীকে সরকারী কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করছেন না বলে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়।

৩ জানুয়ারি—কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী ডি বসু আজ বেরুবাড়ি মামলার রায়দান শেষ করেন এবং আবেদনকারীদের অনুকূলে রুল পাকাপাকিভাবে বহাল করেন। বিচারপতি বেরুবাড়ি হস্তান্তর সংক্রান্ত তারিখ ঘোষণা এবং সীমানা নির্ধারক স্তম্ভ নির্মাণ স্থগিত রাখার জন্য প্রতিপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর হুকুমনামা জারিরও আদেশ দিয়েছেন।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্মৃতিপূত জ্ঞানপীঠ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সমাবেশে আজ 'আংরেজী হাঠাওওয়ালাদের' বাইরের ফটক থেকে সমাবেশ লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং পুলিসের বেটন চারজ, লাঠি চারজ, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগের ফলে এই পুণ্যতীর্থ ভয় ও আতঙ্কের রাজ্যে পরিণত হয়।

৪ জানুয়ারি—চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশে গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সমধর্মী দলগুলির সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া কংগ্রেসের কর্তব্য। কংগ্রেসের উপর-মহলে নাকি এ রকম ভাবনা চলছে। আগামী সপ্তাহে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বিষয়টি পর্যালোচনান্তে নীতি-নির্দেশ দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৫ জানুয়ারি—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ স্থির করেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং অন্যান্য অভি-যোগের তদন্ত করার জন্য লোকপাল নিযুক্ত করা হবে। এজন্য সংসদের পরবর্তী অধি-বেশনে প্রয়োজনীয় আইন পাস করার চেষ্টা হবে।

৬ জানুয়ারি—ভারত-পাকিস্তান ঠাণ্ডা লড়াই আজ তুঙ্গে ওঠে। ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের প্রথম সচিব শ্রী পি এন ওঝাকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন পাক সরকার। আর তারই বদলা হিসাবে ভারত সরকারও নয়াদিল্লির পাকি-স্তানী হাই কমিশনের উপদেষ্টা শ্রী এম এম আমেদকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এদেশ ত্যাগের এক আদেশ জারি করেন।

প্রখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ ললিতমোহন ব্যানারজি আজ ভোরে নিজ বাসভবনে ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ডাঃ ব্যানারজিই প্রথম বাঙালী এম এস (মাসটার অব সারজারি)। ১৯০৪ সালে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বঙ্গীয় সরকারের মেডিক্যাল সারভিসে যোগদান করেন। পরে তিনি এম এস ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৫ সালে ডাঃ ব্যানারজি ইংলন্ডে গিয়ে সেখান থেকে এফ আর সি এস ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসেন। প্রথম বিশ্ব-

বিদেশী সংবাদ

১ জানুয়ারি—আজও সারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম জুড়ে প্রচণ্ড লড়াই চলে। অথচ নববর্ষ বলে দুই পক্ষই ৩৬ ঘণ্টার জন্য সামরিক যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হয়েছিলেন। সরকার পক্ষ এ জন্য ভিয়েতকংদের দায়ী করেন। নতুন বছরের প্রথম দশ মিনিটের মধ্যে ৩৫টি প্রাণহানি ঘটে।

২ জানুয়ারি—প্রেসিডেন্ট জনসন গতকাল মারকিন ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিকে পশ্চিম ইয়োরোপ এবং দক্ষিণ আফরিকায় অর্থলগ্নী করতে নিষেধ করেছেন এবং মারকিন পর্যটকদের আগামী দু বছর পশ্চিম গোলার্ধেই অবস্থান করার আবেদন জানিয়েছেন। প্রচুর পরিমাণে ডলার বাইরে চলে যাওয়া বন্ধ করার জন্য টেকসাসে তিনি যে ব্যাপক কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন, উপরোক্ত ব্যবস্থা দুটি তারই অন্তর্গত।

৩রা জানুয়ারি—ট্যাংক ও ক্ষেপণাস্ত্র ইউ-নিট সহ রুশ যোদ্ধৃবাহিনীকে চীন ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী, মংগোলিয়ার লোকবসতিহীন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। গত গ্রীষ্মে চীন-মংগোলিয়া সীমান্তে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সময় ওই সেনাবাহিনীকে সেখানে পাঠানো হয়েছে বলে মনে হয়। ৭ নবেম্বর রুশ সৈন্যদের উপস্থিতির খবর প্রথম সমর্থিত হয়েছে।

৪ জানুয়ারি—"বিনাশর্তে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় রাজী" এ কথা কয়েক সপ্তাহ আগেই কূটনৈতিক সূত্র মারফত উত্তর ভিয়েতনাম জানিয়েছে। নিরপেক্ষ কূটনৈতিক মহল থেকে জানা গেল: ভিয়েতনামের ব্যাপারে প্রাথমিক শান্তি আলোচনা লাওস, বারমা বা কামবোডিয়ার রাজধানীতে অনুষ্ঠান সম্ভব কিনা, ওই তিন দেশের কাছ থেকে উত্তর ভিয়েতনাম তা জানতে চেয়েছে।

৫ জানুয়ারি—কূটনৈতিক তৎপরতার বহর দেখে মনে হচ্ছে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু অনেকের ধারণা পরিস্থিতির হেরফের কিছু হয়নি।

৬ জানুয়ারি—আগামী সপ্তাহে প্রিন্স নরোদম সিহানুকের সঙ্গে আলোচনার ফলশ্রুতি প্রেসিডেন্ট জনসনকে জানাবার জন্য মারকিন রাষ্ট্রদূত চেসটার বোলস ওয়াশিংটনে ফিরে আসতে পারেন বলে পররাষ্ট্র দফতরের খবরে প্রকাশ।

৭ জানুয়ারি—আজ স্ট্যানফোরড (কালি-ফোরনিয়া) বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রে একটি মরণাপন্ন রোগীর দেহে নতুন হৃদপিণ্ড বসানো হয়েছে। এদেশে এ জাতীয় অস্ত্রোপচার এই দ্বিতীয়বার হলো। রোগীটির বয়স ৫৪ বছর। ৪৩ বছর বয়সের এক ভদ্রমহিলার হৃদপিণ্ড তাঁর দেহে সংস্থাপন করা হয়েছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীতপনলাল ধর

শুষ্ক ত্বক
ব্রণ
মেচেতা
ছুলী
রূপ প্রসাধনে
অপরিহার্য
Basant
Malati
বসন্ত
মালতী
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

আমার কী সিগারেট চাই আমি জানি
সেরা তামাকের স্বাদ আর সত্যিকারের আমেজ
"ধরালেই বুঝি সিগারেটের মত সিগারেট। খাঁটি তামাকের স্বাদ, ভরপুর তামাকের গন্ধ— উইল্‌স প্লেনই আমার পছন্দ। খেলেই দেখবেন—স্বাদে গন্ধে মন মজাবে। প্রতিটি টান চমৎকার, দেখুন না একটা ধরিয়ে!"
৮০ পয়সায় ১০টি
উইল্‌স প্লেন
—সেরা সিগারেটের সেরা
WILLS
NAVY CUT
WILLS

স্যানডাকের এই
নতুন নকশায়
সারাদিনের স্নিগ্ধতা
বাটার এই স্যানডাক্ লীলা—স্নিগ্ধতর পায়ের পাতা
স্নিগ্ধ রাখতেই তৈরি। এর গড়ন আর উপকরণ,
নির্মাণ আর নকশা সব কিছুতেই সারাদিনের সজীবতা।
শীতল, খোলা-মেলা 'মিউল' ফ্যাশন, আরামে পা পাতবার
উপযুক্ত গোড়ালি, স্নিগ্ধ মনোরম রঙ, হাঁটতে চলতে
খুশি হয়ে উঠবে আপনার পা-দুটি। বালিকা, তরুণী,
মহিলা—সকলের জন্য স্যানডাক্ লীলা। সারাদিনের স্নিগ্ধতা।
বাটার উন্নত বিশিষ্ট সংমিশ্রণ কেমিলনে তৈরি,
এতে জুতোর গড়ন আর উজ্জ্বলতা বরাবরই
একরকম থাকে, সব সময়েই মনে হয় যেন নতুন কেনা,
ধুলো-ময়লা-কাদায় একটুও মলিন হয় না। সদ্য-কেনার
উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে মোটেই ঝামেলা নেই,
ভেজা কাপড়ের দু-এক ঝাপটা, ব্যস্, ধুলো-কাদা,
ময়লা দাগ নিমেষে উধাও।
আজই আসুন বাটার দোকানে,
সবার আগে বেছে নিন আপনার স্যানডাক্ লীলা।
নতুন যুগের নতুন জুতো।
লীলা
মিস্‌টি ব্লু, মিস্‌টি গ্রে, উইকার আর পিংক
সাইজ ১০ থেকে ১ : ৭.৯৫
২ থেকে ৬ : ৯.৫০
স্যানডাক্*
কেমিলন*
Bata লীলা
নতুন যুগের নতুন জুতো

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১২
শনিবার ৬ মাঘ ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭ ০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষাণ্মাসিক „	২৩.০০
ত্রৈমাসিক „	১১.৫৫

আসাম-ত্রিপুরায়
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
আসামে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 20 Jan. 1968

হায়দরাবাদ অধিবেশন

হায়দরাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়েছে। এই অধিবেশনের যতটা গুরুত্ব ছিল ততটা তাৎপর্য তাতে যোগ হয়েছে কিনা সন্দেহ। মনে রাখতে হবে, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশন। একটানা বিশ বছর একচ্ছত্র ক্ষমতায় থাকার পর গত নির্বাচনের শেষে জমা-খরচের খাতায় কংগ্রেসের লোকসানের যেটা মোট হিসেব সেই হিসেবটা এবার অন্তত পরিষ্কার চোখে দেখার কথা। কোনো কোনো পণ্ডিত এমন সতর্কবাণীও করেছিলেন যে, হায়দরাবাদই কংগ্রেসের শেষ সুযোগ; এই রাজনৈতিক দলটি যদি এখনও বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে তার পায়ের মাটি শক্ত করতে না পারে তবে ভবিষ্যতে আর তার পায়ের তলায় মাটি থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে গত নির্বাচনের শেষে কংগ্রেসের যে রকম ক্ষয়ক্ষতি দাঁড়িয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই দ্বিধানিত রাজ-নৈতিক দলটি বর্তমান অধিবেশনে কি ধরনের আত্মজ্ঞান অর্জন করলেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হল না। এইমাত্র বোঝা গেল, নিজেদের হৃতস্বাস্থ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের নেতারা সচেতন। কিন্তু এই স্বাস্থ্য যে কিভাবে পুনরুদ্ধার করা যায় তার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। যেটুকু আছে তার কতটুকু নিতান্ত সভা-মঞ্চের বক্তৃতা অথবা সুপারিশ আর কতটুকুই বা কাজের কথা সে-বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। কংগ্রেসের নবীন দল তো মনে করেছেন, কাজের কাজ কিছুই হয়নি, বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার মতন সামর্থ্য কংগ্রেস পায়নি।

একটা বিষয় অবশ্য স্পষ্ট, কংগ্রেস যে সব রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত সেই সব রাজ্যে পুনরুজ্জীবিত হবে। অর্থাৎ, এবারের অধিবেশনে এই একটিমাত্রই রাজনৈতিক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যা না নিলে তার চলে না। এই প্রস্তাবটির বহিরঙ্গ যেমনই হোক, মূল কথাটি বোধ করি এই যে, অ-কংগ্রেসী সরকারকে আর বড় সুনজরে দেখা চলে না। রাজনীতির দিক দিয়ে অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সংগতভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে পারেন, এবং বিরোধী দলের শক্তিক্ষয়ের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে প্রশ্নটি দাঁড়াচ্ছে অন্য রকম: যেমন, অকংগ্রেসী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে কংগ্রেস নিজেকে শক্তিশালী করবে কিনা, নিজের ত্রুটি সংশোধন করবে কিনা, অথবা ক্ষমতা দখলের জন্যেই শুধু চেষ্টা করে যাবে? বলা বাহুল্য, প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, হৃতশক্তি-কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেছেন, সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা, সুস্থির লক্ষ্য, এবং নতুন পথ সামনে রেখে এই কাজটি করতে হবে। পুনরুজ্জীবিত করা নিশ্চয় সহজসাধ্য নয়, এবং কথাটা আমাদের বারে বারে শোনা। তবু আশা করব, যে শিক্ষা কংগ্রেস পেয়েছে তাতে তার বাস্তবজ্ঞান হওয়া উচিত এবং নিতান্ত কথায় পুনরুজ্জীবিত না হয়ে কাজে পুনরুজ্জীবিত হবে।

দেশের বর্তমানে যা অবস্থা তাতে আতঙ্কিত না হওয়ার কারণ নেই। একদিকে গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলি ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে, সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও স্বার্থবুদ্ধি একটা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছে, অর্থ-নৈতিক কাঠামোয় জোড়াতালি, জাতীয় উন্নয়নের বাধাবিপত্তি প্রবল—এমন একটা অবস্থায় দেশকে কোনো রকমে ধরে রাখতে হলেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সুস্থ, দৃঢ়, গণতন্ত্রে আস্থাবান একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন রয়েছে। কংগ্রেস এই আশা পূরণ করতে পারে যদি প্রকৃতপক্ষেই তার অলস ধমনীতে নতুন করে রক্ত প্রবাহ দেওয়া যায়। ইতিপূর্বে অনেকবার কংগ্রেস নতুনভাবে গড়ে ওঠার আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু তার নতুনত্ব কোথাও উপলব্ধি করা যায়নি। নিছক বিরোধী রাজ-নৈতিক দলগুলির সঙ্গে রাজনীতির প্যাঁচ খেলে শক্তি সঞ্চয় সম্ভব নয়, গণতন্ত্র রক্ষাও সম্ভব না। ঠিক যে যে কারণে কংগ্রেসের ওপর থেকে মানুষের আস্থা ক্রমশই নষ্ট হয়ে আজ কংগ্রেস দুর্বল সেই কারণগুলির সংশোধন প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের স্বপ্ন দেখিয়ে আর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টিকে থাকা মুশকিল। আজকের রাজনীতিতে, বিশেষত আমাদের দেশে, মিথ্যা প্রতি-শ্রুতিতে ধৈর্য ধরে বসে থাকার দিন আর নেই। এটা কংগ্রেস অ-কংগ্রেস উভয়েরই জানা উচিত এবং সে শিক্ষা আশা করি তাঁদের হয়েছে।

হায়দরাবাদ একটি পরিপূর্ণ শহর। আলোর রোশনাই আছে। ট্যাক্সি, গাড়ি আর বাসে মুখর এর পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে রাস্তাঘাট। আর আছে পরিপূর্ণ একটা হৃদয়। গোটা মানুষের হৃদয়। যেখানে স্পর্শ পাওয়া যায় সমগ্র মানুষের চেতনার। যার অন্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে হয় প্রতি পদক্ষেপে। আর আছে স্টেডিয়াম, যা কলকাতায় নেই। অফুরন্ত প্রাণের স্পর্শ আছে বলেই গোটা ওয়াট ভেঙে পড়েছিল সেদিন। যেদিন মাদ্রাজ থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে এলেন সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নতুন সভাপতি। সঙ্গে ছিলেন বিদায়ী সভাপতি শ্রীকামরাজ।

কি বিপুল সম্বর্ধনা। কি অভ্যর্থনা। প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গিয়েছিল সেদিন। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে হায়দ্রাবাদ আট মাইল পথ। দীর্ঘ নয় সে-পথ। তবু তিন ঘণ্টার বেশী সময় লেগেছিল সে-পথ তাঁদের কে নিয়ে যেতে। গ্রীনল্যান্ডস পর্যন্ত। শহরের এক প্রান্তে বেগমপেটের কাছে এই গ্রীনল্যান্ডস গেস্ট হাউস। যে গেস্ট হাউসের সামনে সবুজ ঘাসের গালিচে পাতা, মরসুমী ফুলে ঢাকা, বাহারে পাতায় ছাওয়া। সেখানেই ছিলেন শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা। এই নেতাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল বিপুলভাবে হায়দ্রাবাদের গোটা মানুষ। অফুরন্ত আদরে আর অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে। হয়ত আশাতীত ছিল এই অভ্যর্থনা। কারণ তারই আগের-দিন গোটা শহরে দেওয়ালে দেওয়ালে প্রাচীরপত্র পড়েছিলঃ বয়কট কর এই অভ্যর্থনা। বয়কট কর কংগ্রেস সভাপতির আগমন, যে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবাংলার জনগণের যুক্তফ্রন্ট সরকার, যে-কংগ্রেস বঞ্চিত করেছে অন্ধ্র সরকারের লক্ষ কর্মচারীকে কেন্দ্রীয় হারে দুর্মূল্য ভাতা থেকে।

এই পোস্টারে ছিল কম্যুনিস্টদের স্বাক্ষর, ছিল অন্যান্য বিরোধী দলের সমর্থন। অন্ধ্র সরকারের কর্মচারীদের প্রস্তাব ছিল কালো ব্যাজ ধারণ ক'রে কংগ্রেস সভাপতিকে ধিক্কার জানাবার। ধিক্কার জানায়নি। জানান সম্ভব ছিল না। কারণ, যেদিন কংগ্রেস সভাপতি আসেন, তারই আগের দিন অন্ধ্র সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় কর্মচারীদের দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি করা হবে। এই বর্ধিত হারে দুর্মূল্য ভাতা দিতে অন্ধ্র সরকারের মূল্য দিতে হবে সাড়ে আট কোটি টাকা বছরে। তবু এই সাড়ে আট কোটি টাকার মূল্য দিতে দ্বিধা ছিল না অন্ধ্র সরকারের মনে। এই সাড়ে আট কোটি টাকার মূল্য দিয়ে শ্রীব্রেহ্মানন্দ রেড্ডী কিনেছিলেন অবিচ্ছিন্ন সাফল্য। আর সম্ভবত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান নেবার প্রবেশপত্র।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রবেশপথটি খুব সুগম নয়। একুশ জন সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ সাতজনকে আসতে হয় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের সমর্থন নিয়ে। নির্বাচনের মাধ্যমে। সভাপতি বদল হয়েছে। শ্রীকামরাজের জায়গায় এসেছেন শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা। এবারের ওয়ার্কিং কমিটি হবে নতুনভাবে। তাই নির্বাচনটা ছিল এবারের হায়দ্রাবাদ অধিবেশনের বড় একটা অংশ। বিশেষ করে এই কারণে যে, বেশ কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছিল একটা কথাঃ অগ্নিমুখী নবীন কংগ্রেস সদস্যদের কথা। ইংরেজীতে যাদের বলা হচ্ছে ইয়ং টার্ক। কথাটা যেভাবে রটে থাক, এটা অনস্বীকার্য যে কংগ্রেসের মধ্যে একটা অশান্ত সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে। এরা নিজেদের বলে ইয়ং টার্ক। এরা দাবি করে যে, পুরোনো প্রাচীন নেতৃত্বকে পাশে সরিয়ে রেখে কংগ্রেসের মধ্যে একটা নতুন চিন্তা-ধারা প্রবর্তন করার সময় এসে গিয়েছে। প্রাচীনকে সরিয়ে নবীনের হাতে কংগ্রেসের নেতৃত্বকে ছেড়ে দেবার সুযোগ এসেছে।

সুযোগটা এসেছে কংগ্রেসের অসাফল্যে গত নির্বাচনে। ইয়ং টার্কদের মতে, কংগ্রেসের মধ্যে প্রাচীনের ঘুণ ধরেছে। তাই নেতৃত্বে নবীনের স্পর্শ আনতে হবে। তাই সভাপতি নির্বাচনের একটা স্তরে শোনা গিয়েছিল এদের অশান্ত ভাবা, অফুরন্ত আশা। এদের প্রতিনিধি হিসাবে শোনা গিয়েছিল শ্রীমোহন ধারিয়ার নাম। সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নির্বাচনটা অবশ্য হয়নি। কারণ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং শ্রীকামরাজের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নির্বাচনের ভার। এঁদের পরামর্শ অনুসারেই নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা। সর্বসম্মতিক্রমে। কারণ, নবীনের দল এর কোন বিরোধিতা জানায়নি।

বিরোধিতা জানান সম্ভব ছিল কিনা সেটা প্রকাশ পায়নি। কারণ, নবীনের সঙ্গে প্রবীণের সংঘর্ষ তখনও ঘটেনি। ঘটার সুযোগ ছিল না। কিন্তু নবীনের দাবিটা স্বীকৃত হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রীর মহলে। হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস অধিবেশন বসার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই প্রধানমন্ত্রীর মহল থেকে শোনা গেল একটা কথা। নবীনকে স্থান ক'রে দাও কংগ্রেসের বিভিন্ন সংগঠনে। নবীনকে অংশীদার ক'রে নিতে হবে কংগ্রেসের নেতৃত্বে। কারণ, প্রবীণ নেতৃত্বের মধ্যে এই কথাটা চালু করা হল যে, কংগ্রেস সংগঠনে ঘুণ ধরেছে। প্রাচীনের ভারে সংগঠনে দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা। নানা ব্যর্থতা। যেমন দেখা গিয়েছে গত চতুর্থ নির্বাচনে। এই ব্যর্থতাকে সামনে রেখেই প্রবীণের উপর প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়ে গেল।

তাই হায়দ্রাবাদে অধিবেশন বসার, ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দুটো স্পষ্ট রাজনৈতিক অবস্থা কংগ্রেসের সামনে দেখা দিল। একটা চতুর্থ নির্বাচনে কংগ্রেসের ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয়, নবীনের দাবি প্রবীণের অংশীদার হবার। এই দুটো প্রশ্নকে সামনে রেখেই কংগ্রেসের নেতারা এলেন হায়দ্রাবাদে দীর্ঘ দুই বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে যোগদান করার জন্য। এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রীর মহল থেকে এবং অবশেষে নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার পক্ষ থেকে অধিবেশন বসার অনেক আগে থেকেই প্রচার করা হল। নবীনকে কংগ্রেস সংগঠনে মর্যাদার স্থান দিয়ে দায়িত্বের অংশীদার করতে হবে। চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে এঁরা বললেন, কংগ্রেস সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে হবে, মজবুত করতে হবে, সক্রিয় করতে হবে।

নেতৃত্বে অংশীদার করার প্রশ্নটা যাচাই হয়ে গেল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সাতজন নির্বাচনের মধ্যে। নির্বাচনের আগে একটা ধারণা রটে গেল যে, নবীনদল এবার নির্বাচনে একটা বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করবে। তাই নির্বাচনটা একটা বিশেষ নীতি-গত প্রশ্ন নিয়েই দেখা দিল। কংগ্রেস অধিবেশনের কাজ শুরু হবার ঠিক প্রাক্কালে প্রাক্তন মন্ত্রী এবং 'সিন্ডিকেট' নেতৃত্বের একজন বিশিষ্ট সদস্য শ্রী এস. কে. পাতিল হায়দ্রাবাদে এসে বললেন, প্রবীণের সমর্থন নিয়েই নবীনকে কংগ্রেস সংগঠনে আসতে

হবে। রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়, হওয়া উচিতও নয়। শ্রীপাতিলের মন্তব্যটা প্রায় চ্যালেঞ্জের মতই অনেকের কাছে মনে হ'ল।

এই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়েই কিনা বলা কঠিন, তবে দেখা গেল নির্বাচনের প্রাক্কালে নবীনদল হঠাৎ তাদের মত ও পথটা আমূলে পরিবর্তন করে নিল। ঘোষণা করা হল যে, ইয়ং টার্ক দল নির্বাচনে অংশীদার হবে না। কারণ, ইতিমধ্যেই রটে গেছে যে নবীনের চ্যালেঞ্জটা প্রবীণদল উপেক্ষা করেনি। প্রধানমন্ত্রীর মত যাই থাক না কেন প্রবীণ নেতৃত্ব তাদের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনে দাঁড় করাবার একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেন। হয়ত প্রবীণ নেতৃত্ব মনোনীত প্রার্থীদের সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর কোন বক্তব্য ছিল না। তাই, নির্বাচনের আগের দিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিষয় নির্বাচনী সভায় স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, তাঁর মনোনীত কোন প্রার্থী তালিকা নেই। এই ঘোষণাটা করেছিলেন একটা জিজ্ঞাসার উত্তরে। কিন্তু কোন জিজ্ঞাসা তাঁর সামনে এসেছিল বলে দেখা যায়নি। তবু এই ঘোষণা তাঁকে করতে হয়েছিল; কারণ, বিভিন্ন ক্যাম্পে তখন একটা প্রার্থী তালিকা হাত ফিরতে শুরু করেছে। সেই তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাদের নাম প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছিল শ্রীঅতুল্য ঘোষের পক্ষ থেকে। বিষয় নির্বাচনী সভা চলার সময়, বাইরে এসে চায়ের আসরে শ্রীঘোষ সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের নামগুলো তিনিই প্রস্তাব করেছেন। হয়ত কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না এই প্রার্থী তালিকার সঙ্গে, তবু প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে যে, অস্বীকৃতি জানান হয় তা উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া হায়দ্রাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের কোন সময় কথাটা অপরিস্ফুট ছিল না যে, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রী এস কে পাতিল এবং শ্রীকামরাজের সঙ্গে নেতৃত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোন বিরোধ ছিল না। তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা সকল সদস্যের সামনে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল। এই বিরোধিতার তাৎপর্য ছিল বলেই হয়ত নির্বাচনে শ্রীঅতুল্য ঘোষের মনোনীত প্রার্থীদের সাফল্য এমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। শ্রীঘোষের প্রার্থী তালিকায় যে সাতজনের নাম ছিল, তাঁরা সকলেই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন এবং এই চ্যালেঞ্জের সামনে যে দুইজন প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন শ্রী কে ডি মালব্য এবং শ্রীশ্যামনন্দন মিশ্র তাঁরা পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার কোন সুযোগ পাননি।

এটা কংগ্রেস নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ কিনা হয়ত সঠিক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু যে ভাবে হায়দ্রাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হবার প্রাক্কালে এটা অজানা ছিল না যে, এবারের অধিবেশনে একটি মাত্র প্রস্তাব সকলের সামনে রাখা হবে এবং সে প্রস্তাবে যেমন থাকবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা তেমনি অর্থনৈতিক ও কংগ্রেসের সাংগঠনিক সমালোচনা। এটা অবশ্য ঠিকই ছিল সমগ্র প্রস্তাবকে গত চতুর্থ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরা হবে। যে-প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে সেটাও চতুর্থ নির্বাচনকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে, তবু পার্থক্য আছে।

এই রাজনৈতিক প্রস্তাবের মূল কথা ছিল অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কার্যক্রম। সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করে এটাই প্রস্তাবে রাখা হয়েছে যে, নির্বাচনের পর তিনটি রাজ্য ছাড়া বাকী ছয়টি রাজ্যে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে স্বীকৃত হলেও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভা গঠনের কোন অনুমতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। তারই সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলো বিভিন্ন রাজ্যে সুবিধাবাদীর মত যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে। প্রস্তাবে এই বিরোধীদের সমঝোতাকে সুবিধাবাদীদের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে এই কারণে যে, যে-সব দল যুক্ত ফ্রন্টে যোগদান করে তাদের মধ্যে অনেকেই নির্বাচনের আসরে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। এদিক আদর্শগত ভাবেও অনেক দলের মধ্যে কোন মতৈক্য হবার সম্ভাবনা নেই। তবু এই সমন্বয় হয়েছে যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে, কারণ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াই ছিল বড় প্রশ্ন।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এই ক্ষমতার সুযোগ নিয়েই যুক্ত ফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দলের ক্ষমতার অপব্যবহার করার প্রচেষ্টা। সমগ্রভাবে গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করে এবং নৈরাশ্যের সুযোগ নিয়ে অরাজকতাকে ডেকে আনাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কম্যুনিস্ট দলের প্রতি তীব্র বিক্ষোভ জানিয়ে গণতন্ত্রের বিপদকে সামনে রাখা হয়েছে।

এই গণতান্ত্রিক বিপদকে সামনে রেখেই কংগ্রেসের সংগঠনের কথাটা প্রস্তাবে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিহীনতাই বিরোধী দলগুলোকে গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপে উৎসাহিত করেছে। এই শক্তিহীনতার সুযোগ নিয়েই আজ পশ্চিমবাংলায় এবং অন্যান্য রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এরই ফলে কংগ্রেস সংগঠনকে এক অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই প্রস্তাবে সমস্ত সংগঠনকে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যাতে, এই অরাজকতার মোকাবিলা করা সম্ভব হয় এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

সেকেন্দ্রাবাদ আসার পথে নূতন সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এই অবস্থার উল্লেখ করেই বিজয়বাড়ায় বলেন যে, রাজনৈতিক বিরোধিতাকে মোকাবিলা করার জন্য যুক্ত ফ্রন্ট আজ কলকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে সংঘবদ্ধভাবে অরাজকতাকে রাজপথে নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে হবে কংগ্রেস সংগঠনকে। প্রয়োজন হলে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু যে-প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটিতে এবং পরে প্রকাশ্য অধিবেশনে গৃহীত হয় তাতে কংগ্রেসের দায়িত্ব বা কর্মপন্থা সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। শুধু সমগ্রভাবে বলা হয়েছে যে, বিশৃংখলার মোকাবিলা করতে হবে।

হয়ত এরই ফলে, প্রস্তাবের আলোচনায় কোন সুনির্দিষ্ট পথের নিশানা দেওয়া হয়নি। অপরদিকে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে এই আশংকাই প্রকাশ করা হয়েছে, যে, এই প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য অ-কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়া। এই সমালোচনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই, প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হয়েছে এই প্রস্তাবের মধ্যে অ-কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার কোন ইংগিত দেওয়া হয়নি। অথচ জগজীবন রাম এবং শ্রী এস কে পাতিল এই কথাটাই স্পষ্ট করে দিতে চেষ্টা করেছেন যে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার প্রশ্নটা এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে বলেই প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। দেশকে যারা টুকরো টুকরো করে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বিভিন্ন রাজ্যে যারা কংগ্রেসের অসাফল্যের সুযোগ নিয়ে অরাজকতা ছড়িয়ে দিতে চায়, তাদের সঙ্গে প্রয়োজন হলে কংগ্রেস নিশ্চয়ই মোকাবিলা করবে। প্রয়োজন হলে কংগ্রেস এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেও দ্বিধা করবে না।

নেতৃত্বের কাছ থেকে তাই হায়দ্রাবাদের কংগ্রেস অধিবেশন কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থার ইংগিত পায়নি। শুধু সমালোচনা নিয়েই রাজনৈতিক কর্তব্য সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এই চেষ্টার ফলে এটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব আজ দ্বিধাবিভক্ত। দ্বিমুখী নেতৃত্বের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট ইংগিত পাওয়া সম্ভব নয় বলেই হায়দ্রাবাদ অধিবেশনকে ব্যর্থতার পর্যায়ে টেনে এনেছে। অপরিস্ফুট রাজনৈতিক বিচারের মধ্যেই শেষ হয়েছে হায়দ্রাবাদের কংগ্রেস অধিবেশন।

হায়দরাবাদে শিক্ষা শিবির সমাপ্ত

ব্রিটেনের শ্রমদান

ভ্যালেরি, ব্রেন্ডা, জোন, কেরল, ক্রিস্টিন, এরা কেউই চিত্রতারকা নয়, ইংলণ্ডের ছোট একটি শহরের মাঝারি সাইজের ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের মেয়ে-টাইপিস্ট। এদের নাম ইদানীং ব্রিটেনের ঘরে ঘরে, টি-ভি-তে এদের আবির্ভাব একালের ব্রিটিশ বীরাঙ্গনা মর্যাদায়, খবর-কাগজে, ট্রেড ইউনিয়ন মহলে এই পাঁচটি মেয়ে-টাইপিস্টের সংকল্প সম্পর্কে চলেছে প্রখর আলোচনা, যে আলোচনায় সবখানি যদিও এই বীরাঙ্গনাদের প্রশস্তি নয়। এরা করেছে কী? নাচগানে নতুন কোন বাহাদুরি দেখায়নি, কোন ভারতীয় যোগীর সন্ধানে পাড়িও দেয়নি; এক সুপ্রভাতে এই পাঁচজন মেয়ে-টাইপিস্ট অফিসে এসে তাদের মনিবকে জানিয়ে দিল, তারা এখন থেকে রোজ অফিসে আসবে আধঘণ্টা আগে, এই বাড়তি আধঘণ্টা তারা কাজ করবে কোন অতিরিক্ত মজুরী না নিয়ে। মনিবকে খুশী করবার জন্য, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় ভ্যালেরি, ব্রেন্ডা, জোন, কেরল, ক্রিস্টিন এই অতিরিক্ত আধঘণ্টা কাজের সংকল্প নেয়নি। ব্রিটেনের ব্যবসা-বাণিজ্যে সংকট, উৎপাদনে গড়পড়তা খরচের চড়া হার, বিদেশে রপ্তানীর প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ মালপত্রের ক্রমাগত মার-খাওয়া, এ সব দেখে এই ইংরেজ টাইপিস্ট মেয়ে পাঁচটি নিজেরাই সোজা-সুজি ঠিক করে ফেলেছে, তাদের সাধ্যমত কিছু করা দরকার, ব্রিটেনকে খাড়া করে তুলতে। টাইপিস্ট মেয়েদের কতটুকুই বা সাধ্য? তবু ওই যে তাদের দৈনিক আধ-ঘণ্টা অতিরিক্ত শ্রমদানের সংকল্প সেটা সারা ব্রিটেনকে বেশ একটুখানি নাড়া দিয়েছে। মেয়ে-টাইপিস্ট পাঁচটির আধঘণ্টা শ্রমদানে উৎপাদন কতটুকু বাড়তে পারে, ব্রিটেনের সংকটই বা কী পরিমাণ কমা সম্ভব, তা নিয়ে হাসাহাসি ঠাট্টা তামাসাও চলেছে, আবার এরা তারিফও পেয়েছে প্রচুর। তার চেয়ে বড় কথা, এদের দেখাদেখি কতকগুলি কারখানার শ্রমিকরাও দিন আধ-ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করার সংকল্প নিয়েছে। এই যে শ্রমদান আন্দোলন এর ধুয়া হল "ব্যাক ব্রিটেন" : ব্রিটেনকে খাড়া করো, ঠেলে তোলো।

ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা সত্যিই সঙীন। পাউণ্ডের প্রাণ নিয়ে টানাটানি তো আছেই, প্রতিরক্ষা খরচের দায়, "ওয়েলফেয়ার স্টেট" তথা জনকল্যাণ রাষ্ট্রের রকমারি সমাজমঙ্গল বাবদ খরচের বোঝাও বিপুল। এখন সব কিছু কাট-ছাঁট, খাটো করা ছাড়া উপায় নেই। লেবার গভর্নমেণ্টের পক্ষে কাটছাঁট করা আবার মুশকিল। মজুরীর হার টেনেটুনে বেঁধে রাখতে চাইলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্তারা খাপ্পা, শ্রমিকরা ধর্মঘটের দিকে পা বাড়ায়। স্কুলে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত আবশ্যক করবার প্রতিশ্রুতি ছিল লেবার পার্টির। সে-প্রতিশ্রুতি এখন তাকে তুলে রাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কারণ টাকায় টানাটানি। কিন্তু মুলতুবী রাখা হলে শিক্ষকরা রুষ্ট হবেন; তাঁদের সংগঠনগুলি জানিয়ে দিয়েছে, শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী গর্ডন ওয়াকারকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হবে। ব্রিটেনের জনকল্যাণ রাষ্ট্রে সকলের অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্র সরবরাহের প্রায় বিনামূল্যে দাতব্য ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের বড় বড় সংকল্পের কী হয়েছে না-হয়েছে সে কথা বাদ দিলে "দোলনা থেকে কবর" পর্যন্ত জীবনের সব কটি পর্বে সকলকে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থাটা ব্রিটেনে ভালই হয়েছে গত তেইশ বছরে। প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলানও আর সকলের মত নির্দিষ্ট হারে বার্ধক্য-ভাতা পান এবং নেন; অবস্থাপন্ন পরিবারের শিশুরাও বিনামূল্যে কিছুটা দুধ রোজ পায়। এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যেতে পারে "ওয়েল-ফেয়ার স্টেটের" বোঝাটা বেশ ভারীই।

মুশকিল ঘটিয়েছে এখন জাতীয় আয় এবং জাতীয় দায়ের মধ্যে বিষম ফারাক। ভালো খেয়ে-পরে সকলেরই সুখে থাকা চাই বটে, কিন্তু রসদ আসবে কোত্থেকে? বিদেশ থেকে আমদানী খাদ্য, কাঁচামাল ইত্যাদি বাবদ খরচের বহর মোটা; বিদেশে ব্রিটিশ মালপত্র রপ্তানীর আয় যদি ঠিকমত হয়, যদি রপ্তানী বাড়ে, আমদানী বাবদ খরচ মিটিয়ে যথেষ্ট বাড়তি থাকে তবেই "দোলনা থেকে কবর" পর্যন্ত সকলকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা সম্ভব। এখন সেটা অসম্ভব হতে চলেছে, কারণ ব্রিটিশ মালপত্রের রপ্তানীতে মন্দা, মালপত্র উৎপাদনের খরচা অন্য কোন কোন দেশের অনুপাতে চড়া, আর তার ওপর ব্রিটেনের সাম্রাজ্য গেলেও পৃথিবীর নানা জায়গায় সাম্রাজ্যিক ঘাঁটি রয়েছে এখনও। সেগুলি বাবদ খরচ কম নয়।

মুশকিল কেবল লেবার পার্টির কিম্বা লেবার গভর্নমেণ্টের নয়। মুশকিল ব্রিটেনের জনসাধারণ যে রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত, যে ধরনে তারা কলকারখানা কাজকর্ম চালায় সেসব নিয়ে। ভ্যালেরি, ব্রেন্ডা, জোন, কেরল, ক্রিস্টিন, সেট টাইপিস্ট বীরাঙ্গনাদের শ্রমদান সংকল্প ওই মুশকিলের একটা দিক স্পষ্ট করে তুলেছে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এই বীরাঙ্গনাদের শ্রমদান সংকল্পে মোটেই খুশী নন। তাঁদের কথা, বহুকাল আন্দোলন চালিয়ে ব্রিটেনের শ্রমিকরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সে অধিকারের মূল নীতি, ন্যায্য মজুরীতে নিয়মমত ঘণ্টা-মাফিক কাজ। অতএব বীরাঙ্গনা টাইপিস্টরা নাকি ট্রেড ইউনিয়ন নীতির একেবারে গোড়ায় কোপ বসিয়েছে! অনেককাল আগে হলে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের এই অভিমত যুক্তি-সঙ্গত মনে করলেও করা যেত। এখন এই ওয়েলফেয়ার স্টেটে বার্ধক্য ভাতা, বিনা খরচায় চিকিৎসা ব্যবস্থা, অবৈতনিক শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত, তারপর বেকার-ভাতা; এ-সব বাবদ যে বিপুল খরচ সেটা জাতীয় আয় অর্থাৎ কলকারখানা ইত্যাদিতে উৎপাদন থেকেই মিটাতে হয়। কাজেই উৎপাদন বাড়াতে ব্রিটিশ শ্রমিকদেরও স্বার্থ রয়েছে, যদিও পুরনো ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতিতে ভাবনা চিন্তার ফলে শ্রমিকরা সেটা মানতে নারাজ। অন্য কোন কোন দেশের শ্রমিকদের দায়দায়িত্ব-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা অবশ্য ঠিক হবে না। যেসব দেশে বার্ধক্য ভাতা, বেকার-ভাতার ব্যবস্থা নেই, নেই ন্যূনতম জীবিকা-অর্জনের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা সেসব দেশের শ্রমিকরা ব্রিটেনের টাইপিস্ট বীরাঙ্গনাদের শ্রমদানের আদর্শে উৎসাহিত নাও হতে পারে। কিন্তু তা বলে ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গোঁড়ামি তারিফ করা যায় না।

কঠিন সংকটের সময় নিজেদের সুবিধা অসুবিধা অভাব অভিযোগকে জিদের সঙ্গে বড় করে না দেখে দেশের বৈষয়িক উন্নতি চেষ্টায় কিছু পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করতে পারা ভালো। অপরপক্ষ সে রকম ত্যাগ করছে না, সুধু এই যুক্তি দেখিয়ে নিজেরা কিছুমাত্র ত্যাগ করব না, কাজে ফাঁকি দেব, এরকম মনোভাব একটা দুষ্টবৃত্ত সৃষ্টি করে, যাতে কারোই ভালো হয় না। ভ্যালেরি, ব্রেন্ডা, জোন, কেরল, ক্রিস্টিন শ্রমদানের সংকল্প নিয়েছে ব্রিটেনের কঠিন সংকটের কথা ভেবে। একথা হয়তো ঠিক যে তাদের চাকুরির ব্যবস্থা ভালো, চাকুরিতে কখনও বাড়তি গণ্য হলে বেকার অবস্থায় নিঃসম্বল হওয়ার ভয় নেই, কারণ বেকার ভাতার ব্যবস্থা আছে। এসব থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেনের শ্রমিক শ্রেণীর অনেকে নিজেদের পাওনা গণ্ডার বেশী আর কিছু ভাবতে নারাজ। সে মনোভাব কোন দেশের পক্ষেই ভালো নয়'

১৫-১-৬৮

বোগনভিলা

হরপ্রসাদ মিত্র

কতোটুকু জানি বলো আদিগন্ত পূবে বা পশ্চিমে
নজর সম্ভব নয় একযোগে উত্তরে-দক্ষিণে
এ-শীতে বোগনভিলা কী আগুন ছড়ালো ফটকে
হঠাৎ গভীর ইচ্ছে নাড়া দেয়, জানাই তোমাকে
কে তুমি, কোথায় আছ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে
আদৌ ছিলেই কিনা, আজকাল এমনো সংশয়
স্বতই উদ্গত হয়, এমন কি সব মূল্যবোধে।

যৌবন, তুমিই জানো রক্তের আসল কলনাদ
নেপথ্য-সংবিৎই লেখে সময়ের যথার্থ সংবাদ
যখন পৃথিবীময় দেওয়ালের বিবিধ পোস্টার
কারো বা নিপাত চায়, অবিরত কারো উচাটন,
জনমে কুশপুত্তলির ছেঁড়া শার্ট, হৃদয়ের খড়,
জোটে চিরম্লানমুখী সহিষ্ণুতা, ছাপোষা ভব্যতা,
আমরা হারাই আর ওরা বলে, ছিল না তো কেউ,
মনেও পড়ে না সত্যি কী আগুন বোগনভিলায়!

যৌবন, তুমিই জানো রক্তের গভীর স্রোতোবেগ
আমিও উত্তাপ চাই.—ছেঁড়া কথা উড়েছে অনেক।
শব্দার্থে নিরুদ্ধ যতো হীনশ্রমী ভাবালু কবিকে
যৌবন, তুমিই বলো—শব্দ এক অনন্যীকরণ!
যথার্থ শব্দের স্বাদ ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়তায়
অনিরুদ্ধ অভিজ্ঞতা যেমন এ বোগনভিলায়।

কার্নিভালে

মণীন্দ্র মিত্র

আপনি বরং ও-পাশে থাকুন
এ-পাশে আমি।
মধ্যে টেবিল সেতুর ওপার
হাতের তাস নামিয়ে রাখুন
রঙ মিলিয়ে আবার খেলুন
অঙ্ক কষুন,
আসুন এবার কোরসাকে
একটু বসি।

মধ্যে টেবিল, পায়ের পরে পা
না-হয় রাখুন
নীল আলোর অন্ধকারে
দেয়াল-দেয়াল
আপনি বরং ও-পাশে থাকুন
এ-পাশে আমি।

মধ্যে সেতু ভগ্নদশা
রক্ত আমি আপনি মশা
বরং উল্টো
মাছের জল না জলের মাছ
অঙ্ক কষুন,
ট্রায়াল ব্যালান্স উল্টো করে
লক্ষ্মীসোনা হাতটা ধরুন
মেরী-গো-রাউণ্ড ক্যার্নিভালে॥

"সৈকতে চিতা"

অলোকময় দত্ত

নিঃসঙ্গ পাহাড়ের চূড়া থেকে ধীর ভাবে সে
জগতকে তুলে নিলো রেটিনার অন্তিম পর্দায়
তারপর বেপরোওয়া ঢাল বেয়ে চিতা
নেমে এলো সমুদ্র সৈকতে।
নুড়ি, শঙ্খ, সামুক ও জীবাণুরা ব্যাকুল তোলে অনিদ্রায় তার
দুরন্ত পদক্ষেপে।
ঢেউদের ফস্ফরাস ফেনায় সেই সাজার মূর্তির ঘাড় ও গ্রীবা
ডুবে গেলো এক অবিস্মরণীয় প্রেরণার ভারে।
দূরে দূরে মানুষের সমাজ বিপন্ন বোধে ঘুমের ভিতর
পাশ ফিরে কথা ব'লে উঠলো।
তবু জানোয়ার দম ধ'রে আর একবার চেটে নিলো লবণ।
শব্দ, ঢেউ, ঘ্রাণ, চাঁদ ও মেয়েরা একে একে সেই স্বাবলম্বী
আত্মার ছায়া ফেলে মিলালো হাওয়ায়,
আর বিস্মৃতি তার অঙ্গার চোখে জ্বালিয়ে দিলো আগুন।
পৃথিবী ও ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে একবার সেই
কুকুর-শিকারী বেড়াল
ফেনা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো অফুরন্ত বালির ওপর এক অবিকল
প্রতিভায়।

'আমার ভারত ভ্রমণ'

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।' কী নেই এখানে? পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পাবে—প্রাণ যা চায়। চার হাজার মীটার উঁচুতে কাশ্মীর থেকে কেরালা কিংবা মাদ্রাজের সমুদ্র তীরে ঘুরতে পারো—চলতে পারো মধ্যপ্রদেশ কিংবা বাংলা দেশের বনভূমির মধ্য দিয়ে, স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারো রাজস্থান এবং পাঞ্জাবের সমতলে।

ভারতবর্ষ রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙের স্বপ্নে এবং বর্ণনায় ১৮৯৪ সালে যেমন ছিল, আজও তার চাইতে খুব বেশি বদলায় নি। সেই মোগ্‌লি, সেই শের খাঁ, সেই কাল নাগ সেই রিকি-টিকি—'জাঙ্গল বুকে'র সেই তারা আজো আছে।

চলো—চলো, ভারত দেখবে চলো। দ্বিধা কেন? এই তো ১৯৬৬ সালে পনেরো কোটি ট্যুরিস্ট দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে—তার মধ্যে

দিল্লির ট্যাক্সিওলার খপ্পরে পড়লে একই স্থানে পঞ্চাশ বার পাক খেয়ে সর্বস্বান্ত হতে হবে

ভারতে এসেছে মাত্র দেড় লক্ষ—মানে হাজারের এক ভাগ! 'তোমরা জানো না—তোমরা কী হারাইতেছ!'

(আমি নড়ে-চড়ে এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে বসলুম। খুবই উৎসাহ বোধ করছি। ভারত দর্শনে এই বিমুখতার জন্যে নিজের ওপরেই খুব লজ্জা হল।)

ভাবনার কী আছে হে? খরচ? সে তো নামমাত্র। যে-কোনো ইয়োরোপীয়ান—এই হাজার সাতেক টাকা হলেই মাসখানেক চমৎকার ভারতে কাটিয়ে আসতে পারে। ১৯৬৭ সালে ভারত-পর্যটকের সংখ্যা দ্বিগুণ দাঁড়িয়েছে—১৯৭৫ পর্যন্ত অপেক্ষা করো—ইয়োরোপীয়েরা যেমন লীলাচ্ছলে 'কোত্ দাজুর' কিংবা আল্‌প্‌সে-ভ্রমণ করে আসে—ভারত ভ্রমণ তেমনি সহজ হয়ে যাবে।

(ঈস, তাই নাকি? তবে আর বসে আছি কেন? এত সস্তা যখন, তখন আর ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দেরি কেন—আজই তো বেরিয়ে পড়তে পারি।)

চার্টার্ড বিমানে—সে আর কত ভাড়া—

থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম

হাজার চারেকেই যাওয়া-আসা কুলিয়ে যাবে। একটু কষ্ট করে ন্যু-ইয়র্ক, লণ্ডন, পারী, রোম কিংবা ফ্রাঙ্কফুর্ট—যেখান থেকে হোক বিমানে একবার পা তোলো, তারপর 'এয়ার ইণ্ডিয়া' তোমার সেবার্থে সতত প্রস্তুত। শাড়িপরা বিমান-সেবিকা, সঙ্গীত, সাজ-সজ্জা—তোমার স্বপ্নের জিনিসগুলো সব তৈরি। খাসা দেশ হে! ইংরিজী সভ্যতার ফলে পুরো পাশ্চাত্ত্য সুযোগ-সুবিধে ট্যুরিস্টদের জন্যে প্রসারিত। সব বড়ো শহরে ক্লাব পাবে, গলফ পাবে, রেসকোর্স পাবে, পোলো আর ক্রিকেটের মাঠ পাবে—এমন কি দোতলা বাসও পাবে।

শুধু এই নয়। কিপ্‌লিঙের সেই ভারতবর্ষ অন্তরে অন্তরে আজো অপরিবর্তিত। আজো দেখতে পাবে বেঙ্গল ল্যানসারদের প্যারেড আর হোটেলের দরজায় দরজায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বৃদ্ধ সৈনিকেরা আজো 'সাহেব' দেখলেই ভক্তিভরে সেলাম ঠুকবে।

(আমি আরো অনুপ্রাণিত হলুম। কেন যে এতদিন ভারত দর্শনে যাই নি—নিজের সেই নিটোল গর্দভত্বের কথা ভেবে নিদারুণ গ্লানি হচ্ছে এখন।)

হোটেলের খরচ? কম—খুব কম। একটা শোওয়ার ঘর—তা দৈনিক পনেরো থেকে ত্রিশ টাকার মধ্যেই; খাওয়া-দাওয়া সব মিলিয়ে সত্তর-পঁচাত্তর টাকার বেশি হবে না এই সব রাজকীয় হোটেলে: বোম্বাইয়ের তাজমহল আর সান-এন স্যাণ্ড, আগ্রার ক্লার্ক, কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন কিংবা ওবেরয়, দিল্লীর ক্লারিজ, ইম্পিরিয়াল কিংবা অশোকা, হায়দ্রাবাদের রিজ—

তা ছাড়া অতি মনোরম ট্যুরিস্ট বাংলোও আছে। যেমন ধরো মাদ্রাজের পঁচাশি কিলো-মিটার দক্ষিণের মহাবলীপুরমে। চমৎকার সব ঘর—যা দিয়ে বালুতট, সমুদ্র, তাল-বীথি, কিংবা ১৩০০ বছর আগেকার বিখ্যাত মন্দিরগুলো—

দেশ দেখতে চাও? ট্রেনে উঠে পড়লেই তো হয়। চমৎকার শীততাপনিয়ন্ত্রিত কামরায়—বিস্তৃত শয্যার আরামে, ডাইনিং কারের স্বাচ্ছন্দ্যে—এই ধরো, তিন শো থেকে শ'-পাঁচেক টাকা হলেই ভারতের একটা বৃহদংশ ঘুরে আসতে পারো।

আর এখন তো রাজা-মহারাজারাই হোটেলওলা হয়ে বসেছেন। এই তো উদয়-পুরের হ্রদ প্রাসাদ—যেখানে আগে মহারাজা-দের আবাস ছিল, এখন সেটা খাসা হোটেল হয়ে উঠেছে।

(তবে আর কী? আমিও তো তা হলে দৈনিক মাত্র পঁচাত্তর টাকা খরচ করলেই মহারাজা হয়ে উদয়পুরের প্রাসাদে বসে

গোঁফে চাড়া দিতে পারি। প্রথম যৌবনেই গোঁফ কামাবার বদ-অভ্যেস করে ফেলেছি, আবার ওটা গজাতে হল দেখছি!)

রাজস্থান তো স্বপ্নরাজ্য। কিন্তু আছে—আরো আছে। কাশীর বিখ্যাত ঘাটগুলো, ভুবনেশ্বর কিংবা কাঞ্চীপুরমের সংরক্ষিত বনভূমি, গুহাশিল্প এবং প্রস্তর ভাস্কর্যের ইলোরা আর মহাবলীপুরম, তাঞ্জোর, কৈলাস, বিজয়নগর, নশো জৈন মন্দিরের পালিতানা, ভারতের ভার্সাই ফতেপুর সিক্রী, তাজমহল, মহীশূর, জয়পুর, গোয়ালিয়র, হিমালয়ের কোলে দার্জিলিং—সব অদ্ভুত, সব মনোরম।

(আহা, খাজুরাহো-কোনারক নেই কেন? ও দুটি জায়গার জন্যেই তো প্রাণ বেশি কাঁদে!)

ট্রেনের খাবার একাদশীর নামান্তর

কোন্ ভারতবর্ষকে চাই? গুপ্ত-পল্লব-চোলদের কীর্তিখচিত? নাকি রাজা-মহারাজাদের প্রাসাদে অধ্যুষিত? ফকির, পবিত্র গোর, গুরু, সাধু, যোগী শোভিত? না কিপলিঙের সেই স্বপ্নময়, শিশু কল্পনার জগৎটিকে?

(সব চাই—সব চাই। নইলে আর পয়সা খরচ করা কেন?)

কী কিনবে? হাতে কাজ-করা কাশ্মীরী শাল? কাশী আর মুর্শিদাবাদী রেশম? দিল্লী আর জয়পুরের গয়না? মহীশূর আর কেরলের ধাতুর কাজ? মাত্র কটা টাকা দিলে কাশ্মীর তোমার জিনিস, ফিরোজাবাদের কাচের চুড়ি—আর—আর সেই ভারতীয় অপূর্ব শাড়ি সেই অদ্বিতীয় সন্ধ্যার পোশাক?

আরো চাই? মানে, আরো হাজার দুই ডলার খরচের সামর্থ্য আছে কি? যদি থাকে, তা হলে মৃত বাঘের পেটে পা রেখে ছবি তুলতে পারো, সাক্ষাৎ ম্যান-ইটারের চামড়া নিয়ে বীরদর্পে বাড়ি ফিরতে পারো। বিশেষ কষ্ট করতে হবে না—শিকার করারও দরকার নেই, কেবল দু-একজন রাজপুত-শিকারী ভাড়া করতে পারলেই—

(ইউরেকা! আরে—এই তো ভারত জয়ের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান—মানে নর-খাদকের চামড়া! আর দু' হাজার ডলার! সে তো নস্যি!)

কিন্তু ওকে—আর তো পারা যায় না মশাই! হাত থেকে বিদেশী টুরিজমের বইটা পড়ে গেল, আমি লাফিয়ে উঠলাম। সার্থক নাম মশাই স্টেশনের—মশাগ্রাম! কামড়ে কিছু আর রাখল না।

থার্ড ক্লাসের ভিড়ে উঠতে না পেরে, এক ঘণ্টা পরের লোক্যাল ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে প্ল্যাটফর্মে বসে ভারত ভ্রমণ করছিলুম। এই সন্ধ্যাতেই কী দুর্ধর্ষ মশার কামড়। টুরিজমের বইতে মশার কথা কেন লেখে না, বলতে পারেন?)

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

নেপাল মজুমদার

ডঃ মেঘনাদ সাহা শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পরই সম্ভবত সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার পরামর্শ দেন। এর পর সুভাষচন্দ্র কবির সাক্ষাৎ প্রার্থনা এবং শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে তাঁকে পত্র দেন। সুভাষচন্দ্রের এই পত্র পাওয়ার পরই কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেন (২০শে নভেম্বর ১৯৩৮), পত্রটি ছিল এই :

ওঁ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু — শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে আমার [illegible] পাইবার [illegible] এমন সময়ে তোমার [illegible] আনন্দিত হয়েছি। কখন তোমার এখানে আসবার সুবিধা হবে আমাকে [illegible] অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হব। তোমার সঙ্গে আলোচনার বিষয় অনেক আছে। তোমার শুভকামনার [illegible] সঙ্গে মনের যোগ দিই।

ইতি ২০।১১।৩৮

তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে [illegible] ও [illegible] ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন। এই কারণেই [illegible] কবির [illegible] হয়নি। কিছুদিন পর—৮ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) তারিখে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এইদিনই অপরাহ্নে তিনি কলকাতার শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর ভাষণের প্রারম্ভেই বলেন,

......"প্রায় ২৮ বছর আগে আমরা কয়েকজন ছাত্র কবিগুরুর নিকট যাই তাঁহার নিকট হইতে কিছু উপদেশ লইতে।...... তিনি আমাদের পল্লীসংগঠনের কথা বলেন। তখন বুঝিতে পারি নাই......পরে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই বুঝিতে পারলাম তাহার মূল্য কতখানি।....."

এই অনুষ্ঠানে কবি একটি বাণী পাঠিয়ে ছিলেন। শ্রীনিকেতনের সাধনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে কবি যে-সব কথা বলেছিলেন সে-সম্পর্কে আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন, "তিনি ইহা বলিয়া আর একটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনকে বাঁচান দায়। তাঁহার এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলিব যে, তাঁহার এইরূপ আশঙ্কা মিথ্যা, এতবড় মিথ্যা কথা আর হইতে পারে না। কবির সৃষ্টি অমর। শান্তিনিকেতন বা শ্রীনিকেতনের [illegible] যদি শাশ্বত হইয়া থাকে তবে তাহার মৃত্যু হইতে পারে না। যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বিশ্বের বা ভারতের এক কোণে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন, সেই শিক্ষার আদর্শ যদি বিশ্বমানবের মনে স্থান লাভ না করিতে পারে তবে বীরভূম জেলার একটি প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা কোথায়? তখন বীরভূম জেলার গণ্ডি ভেদ করিয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হইবে। যে আদর্শ প্রচারের জন্য এই প্রচেষ্টা তা যখন আমরা গ্রহণ করিব তখন বীরভূম জেলার একটি শ্রীনিকেতন থাকুক বা না-থাকুক কিছুই যায় আসে না।

"এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আমি প্রয়োজন মনে করি। অনেকে বলেন যে, গৃহশিল্পকে গড়িয়া তোলা ও কলকারখানা স্থাপনের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সম্পর্কে আমার মত এই যে, গৃহশিল্প চিরকাল থাকিবে সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের ন্যায় গৃহশিল্পও চিরকাল থাকিবে। বড় জোর তাহার গণ্ডি একটু সংকীর্ণ হইতে পারে। ইউরোপ ও জাপানে যেখানে কলকারখানার আধিক্য, সেখান হইতেও গৃহশিল্প নির্বাসিত হয় নাই।"

কিন্তু ১১ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের কথা।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি

স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
Swaraj Bhawan, Allahabad

General Secretary
J. B. Kripalani

President's Calcutta Address
38-2 Elgin Road, Calcutta
Telephone: Park 59
Telegram: SUBASBOSE

রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্র

সুতরাং কলকাতায় দুদিন থেকেই সুভাষচন্দ্র ওয়ার্ধা যাত্রা করেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার—৫ই ডিসেম্বর মেঘনাদ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় মেডিকেল কলেজে তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম উদ্বোধনী সভার কথা। সুভাষচন্দ্র কলকাতায় মেঘনাদের সঙ্গে এসব বিষয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করে যান বলেই অনুমিত হয়।

১১ই ডিসেম্বর ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হয় এবং এই সভাতেই ত্রিপুরী কংগ্রেসের দিন ধার্য হয় (১০—১২ই মার্চ ১৯৩৯)। এই সময় রবীন্দ্রনাথের পত্রের জবাবে সুভাষচন্দ্র তাঁকে ওয়ার্ধা থেকে এক পত্র লিখে (১৪ই ডিসেম্বর) জানান, তিনি আগামী জানুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ শান্তিনিকেতনে যেতে চান। পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত করা হল:

All India Congress Committee
ওয়ার্ধা

শ্রীচরণেষু, ১৪।১২।৩৮

আপনার অনুগ্রহলিপির উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি।

আমি জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ শান্তিনিকেতনে আসিতে ইচ্ছা করি। ঠিক তারিখ আমি যথাসময়ে আপনাকে জানাইব এবং আপনার সুবিধামতই দিন স্থির করিব।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত
(স্বাঃ) শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষচন্দ্রের এই পত্রের জবাবে কবি তাঁকে লিখলেন (২০ ডিসেম্বর '৩৮):

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, শান্তিনিকেতন

জানুয়ারির মাঝামাঝি তোমার আসার প্রতীক্ষা করে রইলুম। ডিসেম্বর মাসটা আমার এখানে লোকের ভিড় কাজের ভিড় সমস্ত অবকাশটা নিরেট ঠাসা, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেও তার জের চলে। সেই গোলমালের সময়টা তুমি এড়িয়ে আসছ শুনে খুশি হলুম।

ইতি ২০।১২।৩৮
তোমাদের
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৌষ উৎসব এসে পড়ায় কবি শান্তিনিকেতনে খুবই ব্যস্ত থাকলেন। সুভাষচন্দ্রও ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত থাকলেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বস্তুত এতদিন পর্যন্ত গান্ধীজীর মনোনীত ব্যক্তিই সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত হতেন। কিন্তু এবার বেশ কিছুদিন হতেই সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের পক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ও নেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আসতে লাগল। সুভাষচন্দ্রও নীতিগত প্রশ্নে সভাপতিপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলেন। দেশের সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলিই এজন্য সুভাষচন্দ্রের উপর চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীরা সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন চাইছিলেন না। তাঁরা এবার মৌলানা আজাদকে সভাপতি করতে চাইলেন। ১৫ই জানুয়ারি (১৯৩৯) কংগ্রেস সভাপতি মনোনয়নের দিন ধার্য ছিল। ওইদিন আসামের গোপীনাথ বরদলৈ, ফকরুদ্দীন আলি, বিষ্ণু মেধী, সিদ্ধিনাথ শর্মা এবং বাংলার কংগ্রেস প্রতিনিধিদের জে সি গুপ্তের নেতৃত্বে ১০ জন সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করলেন। অপরদিকে গান্ধীজীর অনুগামীরা মৌলানা আজাদের এবং পট্টভি সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাব করেন। পরদিন ১৬ই জানুয়ারি কংগ্রেস সেক্রেটারি ঘোষণা করে দিলেন যে, আগামী ২৫শে জানুয়ারির মধ্যে এলাহাবাদে নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অফিসে কাহারও কাছ থেকে যদি প্রার্থীপদ প্রত্যাহারপত্র না পাওয়া যায়, তাহলে ২৯ জানুয়ারি সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের ভোট গ্রহণ করা হবে।

ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে 'দেশনায়ক'-রূপে বরণ করে নেবার সংকল্প জানিয়ে পত্র দেন (১৪ই জানুয়ারি ১৯৩৯)। স্মরণ রাখা দরকার, সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনে যে গান্ধীজীর সম্মতি বা অনুমোদন নেই একথা তিনি পরিষ্কার কবিকে লিখে জানিয়েছিলেন এবং সে-কথা জেনেও কবি প্রকাশ্যেই সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে চাইলেন। কবির পত্রটি ছিল:

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, শান্তিনিকেতন

ফেব্রুয়ারির আরম্ভে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। সঙ্গীতভবনের সাহায্যকল্পে সেখানে আমাদের অভিনয়ের পালা আছে। ৮ই ফেব্রুয়ারির অভিনয়ের প্রথম দিন। সেইদিন আমি তোমাকে রঙ্গশালায় প্রকাশ্য অভিনন্দন দিতে চাই। যদি অবকাশ করতে পারো আমি খুবই খুশি হব। কিছুদিন থেকে আমার মনে এই ইচ্ছা জেগেছে। আশা করি বাধা হবে না।

ইতি ১৪।১।৩৯
তোমাদের
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ই জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসু কলকাতায় ফিরলেন। সুভাষচন্দ্র কলকাতায় পৌঁছেই শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছা জানিয়ে কবিকে লিখলেন। কবি পুনরায় তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পত্র দিলেন (১৯শে জানুয়ারি ১৯৩৯)।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই বিশ্বমানবের কথাই চিন্তা করেছেন। বিশ্বের সকল দেশের সমস্ত মানুষের জন্যই তাঁর সমান অনুভূতি ছিল। জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতার কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতেই তিনি বাঁধা পড়েননি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির অবস্থা সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন। বিশেষ করে বাংলা দেশের কথা, বাঙালী জাতিকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার কথা শেষ জীবনে তাঁর মনে জেগেছিল। স্মরণ রাখা দরকার, সাম্প্রদায়িক দলাদলি, দাঙ্গা এবং কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন খুবই দূষিত হয়ে উঠেছিল। বাংলার এই অবস্থা কবিকে গভীরভাবে পীড়িত ও বিচলিত করেছিল। কবি মনে প্রাণে চাইছিলেন বাংলার এই দুর্দিনে এমন কোন মহান নেতার আবির্ভাব ঘটুক যিনি বাঙালী জাতিকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবেন। রবীন্দ্রনাথ যে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে শুধু কংগ্রেস সভাপতি বা সারা দেশের ভাবী নায়ককে দেখতে চাইছিলেন তা নয়;—সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আবার বাঙালী জাতি তার সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, এই বাসনাই তিনি এতদিন সগোপনে অন্তরে লালন করে এসেছিলেন। সেই

কথাই তিনি সুভাষচন্দ্রকে পত্রে বিস্তারিত জানিয়ে লিখলেন :

ওঁ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু শান্তিনিকেতন
কল্যাণীয়েষু, উত্তরায়ণ

আগামী কন্‌গ্রেসে তোমাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রকাশ্য সমর্থন করবার জন্যে আমার কাছে উপরোধ এসে পৌঁচেছে। আমার বক্তব্য তোমাকেই জানিয়ে রাখছি। এ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে পূর্বেই আমি মহাত্মাজী ও জওহরলালকে চিঠি লিখেছিলেম বোধ হয় জানো। তারপরে তার ফলের হিসাব রাখা আমার কাজ নয়। যাঁরা কন্‌গ্রেসের চালক তাঁরা বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্তব্য স্থির করেন—আমি রাষ্ট্রিক সম্প্রদায়ের বহির্ভূক্ত মানুষ, সে উদ্দেশ্য আমার অগোচর, সুতরাং অব্যবসায়ীর ইচ্ছাজ্ঞাপনের বেশি আর কিছু করার অধিকার আমার নেই।

দ্বিতীয় কথা, বাংলা দেশের ভাগ্য-পরিচালনার কাজে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি—পরস্পর একটা আনাগোনা চলছে। কেউ যদি মনে করে এই ঘনিষ্ঠতার উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কোনো একটা সুযোগ ঘটানো চলছে তাতে তোমার অনিষ্টই ঘটবে। আমি চাই অসংকোচে তোমার সঙ্গে যেন যোগ স্থাপন করতে পারি।

আজ বাংলাদেশ দুর্বল। আমার ইচ্ছা কোনো যোগ্য লোককে বাংলা প্রদেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে নির্বিচারে তার চারদিকে সমস্ত বাঙালীকে সম্মিলিত করা হয়। সেই মিলনে বললাভ করে আর একবার বাংলা আপন শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করতে পারবে। নাটশালায় তোমাকে সম্বর্ধনার যে সংকল্প করেছি তার মূল কথাটি এই। কন্‌গ্রেসের ভিতর দিয়ে যে ইচ্ছা আকার নেবে এ ইচ্ছা তার চেয়ে গভীর এবং অকৃত্রিম। এর পরিচয় পেয়েছিলুম বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে—তখন বাংলা নিজের অভিপ্রায়কে যে রকম সম্পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশ করেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন আর কখনো ঘটেনি। সেই উপলব্ধিকে আর একবার জাগানো চাই, এবং এই প্রচেষ্টায় তোমাকেই আশ্রয় করব। আর সকল পথ ছেড়ে এই পথেই প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা করি—এই আমার মনের কথা তোমাকে বললুম।

তুমি এখানে আসতে চেয়েছ জেনে খুব খুশি হলুম।

ইতি ১৯।১।৩৯
তোমাদের
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরদিন মৌলানা আজাদ এক প্রেস-বিবৃতিতে (২০।১।৩৯) কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেন। ফলে আরও

জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ২১ জানুয়ারি শনিবার প্রাতে সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতন যাত্রার পূর্বে এক প্রেস-বিবৃতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, "মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে তিনি যে বিবৃতি দিয়াছেন, উক্ত বিবৃতি পাঠ করিয়া আসন্ন রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন সম্পর্কে আমারও কিছু বলিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে বলিয়া এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কালে সৌজন্যের ভুয়া অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠার ফলে নূতন ভাবধারা আদর্শবাদ এবং কর্ম তালিকার সমস্যা দেখা দিয়াছে।

"অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত ভারতে রাষ্ট্রপতিপদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে কোনও বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া যাইবে এবং জনগণ কি চাহে তাহা পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়া যাইবে। এবং জনগণ কি চাহে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। এই সকল কারণে জনগণ ভারতের রাষ্ট্রপতিপদের নির্বাচন ও নির্দিষ্ট সমস্যা এবং কর্মতালিকার ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন। এই দিক হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাঞ্ছনীয়ও নহে।"... (ইউ পি)

[আনন্দবাজার পত্রিকা—২২শে জানুয়ারি ১৯৩৯]

শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্রকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। ওইদিনই অপরাহ্ণে শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে কবি স্বয়ং সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে তাঁর ভাষণে বললেন,

"কল্যাণীয় সুভাষচন্দ্র! আমাদের যা বলবার কথা, হাজার বছর পূর্বে আমাদের ঋষিরা তা বলে গেছেন। যে আগমনী মন্ত্র এখানে শুনলেন, পৃথিবী যাঁদের আগমন প্রতীক্ষা করে তাদের জন্য তার অভ্যর্থনা-বাণী কতদিন হ'ল তারা বলে গেছেন। সে পুরাতন হবে না। সমস্ত দেশে যে অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে তুমি এসেছ, আমাদের দেশ তোমাকে যে আসন দিয়েছে, সেই আসনের বার্তা রয়েছে ঋষিদের সেই পবিত্র বাণীর ভিতরে। তাঁদের বাণীতে তুমি পেয়েছ তোমার আসন। আমার খুশি হবার একটা কারণ হচ্ছে এই—এই সুযোগে তুমি আমার পরিচয় পাবে। এ কথা শুনে হাসতে পার, তুমি বলতে পার আমার পরিচয় তোমার জানা আছে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ প্রকৃত কথা নয়। কেননা আমার পরিচয় জানবার গুরুতর বাধা আমাদের দেশে ছিল। আমার আধখানি পরিচয় নিয়ে আমি বাংলাদেশে এসেছি। আমাকে জানে আমি বাণীর সাধক। এখানেই থেমে গেছে। তারপর যে আমার আর কোন সাধনায় দেশ আমাকে আহ্বান করেছে সে খবর পৌঁছতে বিলম্ব হল, সেটা মনের ভিতর গ্রহণ করতে বাধা হওয়ার কথা। দোষ দিই না। আমাদের কবি কালিদাস বলে গেছেন—বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ—বাক্য এবং অর্থ দুই-ই একসঙ্গে সংযুক্ত বাক্যের সঙ্গে অর্থের পরস্পর যোগ রয়েছে। যে অংশে আমি বাণীর চরণে আমার অর্ঘ্য এনে দিয়েছি সেখানে দীর্ঘ কাল তোমরা আমাকে পেয়েছ, দেখেছ, হয়ত আনন্দও পেয়ে থাকবে, কখন কখন হয়ত আঘাতও পেয়েছ। কিন্তু অর্থের যে সাধনা, যে অর্থ নিজের জন্য নয়, দান করবার জন্য, সে অর্থেরও সাধক যে আমি এটা তোমাকে জানতে হবে, নইলে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় হবে না। বাক্য এবং অর্থ দুই-ই একজায়গায় যদি দেখ তাহলে বুঝবে আমার মধ্যে উভয়ের সম্মিলন শুভোদয়ের জন্য হয়েছে। আমার সৌভাগ্য, বাণীর আহ্বানের সঙ্গে অর্থের আহ্বান আমাকে আকর্ষণ করেছিল জীবনের কোন এক সময়ে। যৌবনের প্রান্তভাগে একদিন আহ্বান পেয়ে এখানে এসেছি। তারপর দীর্ঘকাল এই সাধনা করেছি লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেটা দেখবার কারো দরকার ছিল না। দেখে নি। চোখে না পড়বার কারণ এই—অনেককে অস্পষ্ট করে আমাকে দেখেছে। অস্পষ্ট আমার পরিচয়, আমি অর্থের সাধক। সে সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে কিনা সে অপর কথা। বাণীর সাধনায় আমার সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। যাঁরা আমাকে ভালবাসেন তাঁরা বলেন, আমি একটা কিছু [illegible] করেছি বাক্য দেবতার বরলাভে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে পড়ুক—তুমি যদি এসে দেখ, এই কর্মক্ষেত্রে আমার পরিচয়, তোমার দৃষ্টিতে এই জন্য পড়ুক, তোমার

সম্প্রদায়ের জন্য শুধু নয়, তোমার অভিজ্ঞতা সর্বদেশব্যাপী। তুমি দেখেছ,—ইউরোপে যারা অর্থের সাধক, তাদের সাধনার পীঠ-স্থানে তুমি দেখেছ,—তারা কি রকম করে জ্ঞানে কর্মে বড় হয়ে উঠেছে, কি রকম অর্ঘ্য দিয়েছে জীবনে, নানা বিচিত্র দিক থেকে তুমি দেখেছ। তার মধ্যে একটা পরিচয়—মানুষের মনবস্তু—সে পরিচয় যদি এখানে জাগ্রত হয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্র, সাধনার ক্ষেত্র যদি এখানে গড়ে থাকে, তাহলে তুমি আনন্দিত হবে আমি জানি। আর সে-পরিচয় যদি [illegible] সঙ্গে তোমাকে দিতে চাই, এই কারণে দিতে চাই [illegible]

[illegible]

এই জন্য [illegible] তুমি [illegible] [illegible] জন্য [illegible]।"

এরপর [illegible] শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে [illegible] আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন,

[illegible] দেবার জন্য আয়োজন করেছি [illegible]। ছেলেরা, যারা বাল্যকাল থেকে শিক্ষার বিড়ম্বনায় পীড়িত, [illegible] ক্লাস [illegible], [illegible] নাই, [illegible] নাই, [illegible] নাই, [illegible] নাই—কেবল আছে পড়া মুখস্থ করা। [illegible] পেয়েছি [illegible] থেকে [illegible]

করেছি—তার আনন্দ তুমি বুঝবে, তুমি কারাবাস ভোগ করেছ। এই কারাবাস আমাদের প্রত্যেক শিশু ভোগ করছে—কি দুঃখ, কি পীড়ন আমি জানি। যে-সময় শিশুদের মন সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত থাকবে, যখন তারা গাছ-পালা, পশু-পাখীর সঙ্গে মিলনের আনন্দে মগ্ন থাকবে, সে-সময় তাদেরকে জাঁতাকলে ঢোকানো হয়—কি শিক্ষা শেখান হয় তার নমুনা আমরা দেখেছি। পড়াপাখী, বুলিবলা পাখীর মত গড্ডলিকা দল সৃষ্টি করি; তারা হয় বিদেশের বুলি মুখস্থ করা খাঁচার পাখী। পারি নি। চেয়েছি করতে, পারি না-পারি চেষ্টা করেছি আনন্দ দিতে, মুক্তির স্বাদ দিতে। এখানকার হাওয়াতে এখানকার ছেলেমেয়েদের যে আনন্দ, তাতে তাদের দাবী আছে, এই জন্য তারা জন্মেছে। তা নইলে কেন ফুল ফোটে, দিনান্তে কেন পাখী ডাকে যদি তারা ক্লাস ঘরে ঢুকে দাগ কাটা passage মুখস্থ

করে জীবনের সুন্দর সময় নষ্ট করে। কি দুর্ভাগ্য, মানুষ সৌন্দর্যবোধ থেকে বঞ্চিত থাকবে। এই জন্য এখানে আরম্ভ করেছিলাম। পারিনি—এত ভার কি একলা বইতে পারা যায়। অনেক রকম দুঃখের ভিতর দিয়ে চলেছি। একেবারে কিছু ফল হয়নি বলতে পারি না। মনের মত হয়নি।

"অন্য দেশের যারা দেখেছে, বলেছে ভাল। শুধু বলেনি, অনুকরণ করেছে। এ তুমি বোধ হয় দেখে থাকবে। ওরা বুঝতে পেরেছে, শিক্ষাটা সমগ্র জীবনের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষাকে যারা বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তারা তাকে পীড়িত করে রাখে। মানুষের মনকে তারা কেটে কেটে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এখানে শিক্ষাকে সমগ্র জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে—আনন্দের সঙ্গে, উৎসবের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, চিত্রকলার সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে—আয়োজন করেছি। মুক্তি এবং আনন্দের স্বাদ দিতে চেষ্টা করেছি। এখানে নূতনত্ব আছে। দেশের লোক জিজ্ঞাসা করে—কি তোমার সিলেবাস, কি বই পড়, ব্যাকরণ কি পরিমাণ হয়, সে-গুলি মুখস্থ করতে পেরেছ কিনা এবং কয়টা বাড়িঘর আছে;—সরস্বতীকে টেনে এনে কারারুদ্ধ করবার আয়োজন বিশেষ লোকের ভাল লাগে। এখানে তা দেখতে না-পেয়ে তারা দুঃখ করেছে। আমি বলেছি—দেশের অন্তরে যে রত্ন আছে, সাধনা আছে তা তারা শূন্য করে ফেলেছে। কাজ যা করবার তা সম্পূর্ণ হয়নি এখানে। সেটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনি, সামর্থ্য নাই। রাষ্ট্রীয় দিক থেকে তুমি আমার কর্মের পরিচয় নিয়ে যাবে তাকে স্বীকার করতে পার সুখী হব।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৯ই মাঘ ১৩৪৫॥ ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯]

পূর্বেই বলেছি, কিছুদিন যাবৎই কবির মনে আশঙ্কা জাগে, তাঁর অবর্তমানে হয়ত তাঁর শান্তিনিকেতনের জন্য আর কেউ এগিয়ে আসবে না। সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় কবি গভীর আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর আশা,—সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আবার বাঙালী জাতির নব-অভ্যুত্থান ঘটবে। তাঁর অন্তরের আরও একটি গোপন আশা ও কামনা এই, সুভাষচন্দ্র তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনার কথা সহজেই বুঝতে পারবেন এবং তার সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন আর তাঁর অবর্তমানেও সুভাষচন্দ্রই হবেন তার প্রধান রক্ষক,—ধারক ও বাহক।

সুভাষচন্দ্র কবির মনের এই গভীর দুঃখ ও আক্ষেপের কথাটি বুঝতে পেরে, কবিকে আশ্বাস দিতে গিয়ে তাঁর ভাষণে বলেন :

"গুরুদেব,—এবার এখানে আমার নূতন করে আসা। ইতিপূর্বে কয়েকবার আমি এখানে এসেছি, বোধ হয় দুইবার। কিন্তু আজকের আসার মধ্যে একটা নূতনত্ব আছে। প্রধানত দুই কারণে এখানে এসেছি। এক কারণ, আপনি ডেকেছেন আর এক কারণ, নিজের মন থেকে আসবার ইচ্ছা এবং প্রেরণা অনুভব করেছি।

"আপনার যে অখণ্ড সাধনা, সেটা সাধারণ মানুষ বা সাধারণ ভারতবাসী যে উপলব্ধি করবে—অন্ততপক্ষে সহজে উপলব্ধি করবে এটা আশা করা অন্যায়। আমিও সেই সাধারণের একজন। সুতরাং আমি যে আপনার অখণ্ড সাধনার মহত্ত্ব ও গৌরব উপলব্ধি করতে পারব সে দুরাকাঙ্ক্ষা আমি করি না, সে উপলব্ধি যখন আসে একদিনে আসে না। সে উপলব্ধি হচ্ছে ক্রমিক এবং সারাজীবনব্যাপী। তবে আমার মনে হয় যদি আমরা চলার পথে চলতে থাকি তা হলে সে উপলব্ধি ক্রমশ প্রসারলাভ করবে।

"আপনার প্রাণের মধ্যে একটা বেদনা, একটা অভিমান আছে—হয়ত আছে—যে, আপনার দেশবাসী আপনাকে জানল না, আপনার সাধনা বুঝল না। কিন্তু তার জন্য কি দেশবাসীকে আপনার দোষ দেওয়া উচিত। যদি তারা এত সহজে বুঝতে পারত, তাহলে তারা ত আপনার সমান হয়ে পড়ত। দ্রষ্টার সম্মুখে যে সত্য প্রতিভাত হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা উপলব্ধি করা যেমন কঠিন তেমনি সময়সাপেক্ষ। আমরা এইটুকু বলতে পারি, আমরা চলার পথে চলেছি, চলবার চেষ্টা করছি। দ্রষ্টার সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আপনার সাধনাকে বুঝবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তাহলে দেশবাসীকে অপরাধী করতে পারবেন না। এটা সর্বদেশে সর্বজীবে (লোকে?) দেখতে পাওয়া যায়—যাঁরা নূতন পথ দেখান, মানুষকে যাঁরা নূতন সত্যের উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করেন তাঁদের মহত্ত্ব, তাঁদের মূল্য সাধারণ লোকে বুঝে না। বরং সেই সত্যদ্রষ্টা ও সাধকদের শূলে চড়াবার চেষ্টা করে। সুতরাং আপনার দেশবাসীর যে বিশিষ্টতা আপনি দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন সেটা শুধু আমাদের দেশের লোকের ধর্ম নয়, বোধ হয় মানবজাতির ধর্ম। মানুষের অন্তরে যত দৈন্যই থাকুক না কেন, আমরা যারা আশাবাদী, আমাদের মনে হয়, এই দৈন্য, নীচতা ও মলিনতার অন্তরালে একটা দেবত্ব নিহিত আছে এবং যে সত্য সাধনা আজ দেশবাসী বুঝছে না, একদিন সে তা বুঝবে, বুঝবার চেষ্টা করবে।

"মধ্যে মধ্যে একথা উঠে এবং আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়, হয়ত আপনার মনেও উঠেছে—আপনি উপস্থিত না-থাকলে আপনার সাধনার কি হবে। সেদিন কলকাতায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমি বলতে চাই—কোন বস্তু বা সাধনা মরতে পারে না যতদিন তার সার্থকতা আছে। আপনি যে-জিনিসটা দেশবাসীকে ও মানব জাতিকে বুঝাবার ও শিখাবার চেষ্টা করছেন, যতদিন সেটা তারা না শিখবে, না বুঝবে ততদিন পর্যন্ত আপনার এই প্রত্যক্ষ বাস্তব সাধনা মরতে পারে না। যে সত্য ও সাধনা নিয়ে আপনার সমস্ত জীবন দাঁড়িয়ে রয়েছে যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন শান্তিনিকেতন বাঁচুক বা মরুক তাতে কিছু আসবে যাবে না। যতদিন পর্যন্ত সে সত্য ও সাধনা জাতির প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না-হবে ততদিন পর্যন্ত আপনার শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকবেই থাকবে। শুধু তাই নয়, এরকম সাধনা ভারতের দিকে দিকে স্থানে স্থানে গড়ে উঠবে।

"আমরা যারা রাষ্ট্রীয়জীবনে বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করি, আমরা মনে-প্রাণে আমাদের অন্তরের দৈন্য অনুভব করি। প্রাণের দিক দিয়ে যে-সম্পদ না পেলে মানুষ বা জাতি বড় হতে পারে না, সেই সম্পদ, সেই প্রেরণা আমরা চাই। কারণ আমরা জানি, সে প্রেরণা, সাধনার সেই আভাস যদি প্রাণের মধ্যে পাই তাহলে আমাদের কর্মজীবনের ও রাষ্ট্রজীবনের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হবে। আপনার কাছ থেকে সে প্রেরণা আমরা চাই।"

এরপর সুভাষচন্দ্র জাতির মুক্তিসংগ্রামে কবিগুরু নির্দেশিত মহান আদর্শের পথ অনুসরণ করে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর ভাষণে বললেন,

"আমরা হয়ত আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি কিন্তু আমাদের আদর্শ বড়। আমরা চাই মানুষের ও জাতির পরিপূর্ণ জীবন, আমরা চাই আমাদের দেশের প্রত্যেক নর-নারী, আমাদের অখণ্ড জাতি সব দিক দিয়ে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটা সোপান মাত্র। আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ রয়েছে, যে স্বপ্ন আমাদিগকে বিভোর করে রেখেছে সে অতি উচ্চ। সেই স্বপ্নকে ও আদর্শকে আমরা কতটা বাস্তব জীবনে মূর্ত করে তুলতে পারব জানি না। তার জন্য কতটুকু শক্তি আছে নিজেরাই জানি না। ব্যক্তিগত শক্তি ও যোগ্যতা যতটা থাকুক না কেন আমরা মস্ত আদর্শ (সামনে) রেখে চলতে চেষ্টা করছি। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস আছে, আমাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা যতটুকু হউক না কেন, আমরা যে-পথে চলেছি সেটা সত্যের পথ। আমাদের পরে যারা আসবে তারা আমাদের চেয়ে বেশী শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হবে।

আমাদের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে তা তারা শোধরাতে পারবে, সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজ করবার চেষ্টা করছি। আপনি জাতিকে—শুধু জাতিকে কেন, সমগ্র মানব সমাজকে আদর্শের পথ দেখিয়েছেন,—শুধু দেখিয়েছেন তা নয়, মানুষকে সেই পথে চালাবার চেষ্টা করে এসেছেন। তাই বর্ণীর বা সাহিত্যের সাধনায় আপনার চেষ্টা পর্যবসিত হয় নাই, শুধু ভগবানের সাধনায় আপনার সাধনা পর্যবসিত হয় নাই, অন্তরের আদর্শকে আপনি বাহিজীবনে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা এইটুকু আপনার চরণে নিবেদন করতে চাই—এই আদর্শ আমাদেরও জীবনের আদর্শ, কারণ এটা আমাদের জাতীয় আদর্শ। আমরা আমাদের জীবনে তা সফল করতে পারি বা না পারি সেই আদর্শকে আমরা অন্তরে রেখেছি, বাহিরে রেখেছি এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি, ভবিষ্যতেও করব।

"আমরা যারা সামান্যভাবে কাজ করতে চেষ্টা করছি, আপনার কাছে যে অপরিসীম স্নেহ, উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি ও পেয়ে থাকি এতে আমাদের জীবন বাস্তবিক ধন্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, যখন আমাদের

ভারতের ডিমস্থেনিস—রামগোপাল ঘোষ

নারায়ণ দত্ত

আঠার শ' সাতচল্লিশ। ডিসেম্বর মাস। কনকনে সেই পড়ন্ত শীতের বেলায় একটার পর একটা জুড়িগাড়ি, ফিটন, পাল্কি এসে থামতে লাগল কলকাতার টাউন হলের সামনে। ভিস্তিদের ছড়ান জলে রাস্তার মরা ধুলো আবার অসময়ে উড়তে লাগল আর ধূসরতর হতে লাগল সে দিনের ধূসর গোধূলি। ওদিকে গঙ্গার বুকে দিনান্তের সূর্য দু হাতে তার রঙের ডালি উজাড় করে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সে রঙ বেশ কিছুক্ষণ পড়ে থাকা রক্তের মত কালচে হয়ে এসেছে। আশেপাশের গাছগাছালিতে এরই মধ্যে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। পাখিদের পাখায় পাখায় ঘরে ফেরার শব্দ। বাইরে যখন এমনি ভাঙা হাটের মেলা, টাউন হলের মস্ত মস্ত থামগুলো পেরিয়ে ভেতরে তখন নানা উত্তপ্ত আলোচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ইঙ্গ-বঙ্গ সভা সবে জমে উঠেছে। সে সভায় অবশ্য সাহেবরাই সংখ্যায় বেশি। তবে বাঙালীবাবুরাও কম নন। ইয়ং বেঙ্গলের কয়েকজন চাঁই, শহরের বড় বড় বাড়িগুলোর কেউ কেউ—গণ্যমান্য অনেকেই সেই সভার শোভাবর্ধন করেছিলেন। সাহেবদের ত কথাই নেই। জজ-ব্যারিস্টার, সুপ্রিমকোর্টের দু একজন, সরকারী কর্তাব্যক্তি, খানদানী ইংরেজ ব্যবসাদার—কেউই প্রায় বাদ যায়নি। না যাবার কারণ আছে। আজকের বিচারে সেই মিটিংটা হয়ত অনেকেরই কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হবে, কিন্তু সেদিন, কি সাহেব, কি বাঙালী উভয়েরই কাছে সভার বিষয়টি বড় তুচ্ছ ছিল না।

কেন ছিল না, সে কথা বলতে গেলে সব গোড়া থেকে শুরু বলতে হয়। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষের পরপর দুজন গভর্নর জেনারেল আসেন যাঁদের রাজনৈতিক ব্যর্থতার জন্যে 'রিকল' করা হয়। এঁদের ব্যর্থতার আসল কারণ এঁদের আফগানিস্তান নীতি। এই দুই হতভাগ্যের প্রথমজনা হচ্ছেন লর্ড অকল্যান্ড। এমিলি ইডেনের দাদা। তাঁর পরেই এলেন এলেনবরো। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে শান্তি এল না। অগত্যা তিতি-বিরক্ত হয়ে লণ্ডন পাঠাল জবরদস্ত এক সেনানায়ককে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ডের মালিক করে। এরই নাম হেনরি হার্ডিঞ্জ। হাতকাটা হার্ডিঞ্জ। কমপক্ষে কুড়িটি যুদ্ধের নায়ক। এমনি এক যুদ্ধে নাকি তাঁর একটি হাত খোয়া যায়। এঁরই কলকাতায় আসার দিন নাকি চাঁদপালঘাটে এত ভিড় হয়েছিল যে ভাবী গভর্নর জেনারেলকে গার্ডেন রীচে নামিয়ে স্টেট কোচে করে লাটভবনে আনতে হয়। অনেকক্ষণ অপেক্ষমাণ আম-জনতা জুলাই মাসের গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে অবশেষে ভগ্নমনোরথ হয়ে যখন বাড়ি ফিরে এল, কেল্লার একুশটা তোপ দুম...দুম...করে জানিয়ে দিলে, হার্ডিঞ্জ এসেছেন। তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে।

সেদিন কলকাতার লোককে নিরাশ করলেও, হার্ডিঞ্জ ব্রিটিশ সরকারকে নিরাশ করেননি। ভারতবর্ষে তিনি শান্তি এনেছিলেন। বছর চারেক বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে যেদিন লর্ড ডালহৌসিকে তাঁর রাজপাট বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন, সেদিন তিনি সগর্বে বলতে পেরেছিলেন—ইট উইল নট বি নেসেসারি টু ফায়ার এ গান ফর সেভেন ইয়ার্স টু কাম—অর্থাৎ সাত বছরের মধ্যে আর বন্দুক ছোঁড়ার দরকার হবে না। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, হার্ডিঞ্জ তাঁর চার বছরের রাজত্বে শুধু বন্দুকই ছোঁড়েননি। আরও কিছু করেছিলেন। জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তিনি বাঙালীর অজ্ঞান তিমির দূর করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। আঠার শ' চুয়াল্লিশ সালের এডুকেশন রিজোলিউশন পাস করেছিলেন। কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গায় কলেজ বসিয়েছিলেন। এমনকি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকে তাঁর 'ষড়দর্শন সংগ্রহ' রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

রামগোপাল ঘোষ

দিনের ঘটনা সেই বাসনারই চরিতার্থতা মাত্র।

কেননা, রামগোপালের বাগ্মিতার ইতিহাস যে তাঁর সত্য ভাষণ ও তেজস্বিতারই ইতিহাস, কালাকানুনের পক্ষে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর তারই সাক্ষ্য। এই কালাকানুনটা অনেকের মতে রাউলাট অ্যাক্টের পূর্বসূরী। শিবনাথ শাস্ত্রী এই আইনটা সম্বন্ধে লিখেছেন—'১৮৪৯-৫০ সালে গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। ভারতবাসী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দের সহিত বিরোধস্থলে কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতের ও দণ্ডবিধির অধীন করাই এই সকল পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য ছিল। এদেশীয়দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষাই ঐ আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ ঐ সকল পাণ্ডুলিপির 'কালা-কানুন' (Black Acts) নাম দিয়া তাহিদের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করেন।' এই সময়ে বাঙালীদের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে শাস্ত্রীমশায় বলেছেন—'আন্দোলনে দেশ কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এদেশীয়দের পক্ষ হইতে বলিবার কেহ ছিল না। তাহাদের পক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে এমন সংবাদপত্র ছিল না। এদেশীয়গণ নীরবে বাদবিতণ্ডা শুনিতে লাগিল।' এবং বাঙালীর এই ক্লীব নীরবতা ভাঙলেন আর কেউ নয়—রামগোপাল ঘোষ। তাঁর গলায় কালাকানুনের পক্ষে-বাঙালীর বক্তব্য ভাষা পেতে লাগল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা অনুযায়ী রাজা রাধাকান্ত দেবও রামগোপালের এই জেহাদের সামিল হয়েছিলেন। এবং এক সভায় রামগোপালের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে মুগ্ধ হয়ে বেথুন সোসাইটির সভাপতি ই. এফ. বেথুন নাকি কৃষ্ণকমলকে বলেছিলেন—'ইট ইজ এ

গ্রাউণ্ড দে অফ ইয়োর কান্ট্রি।' লক্ষ করার বিষয়, এই সময়ে সাহেবদের সঙ্গে রামগোপালের ঝগড়াও কারবার। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করার জন্যে তাঁর ক্ষতি হয়েছিল। প্যাঁচ কষে সাহেবরা রামগোপালকে অ্যাগ্রো-হরটিকালচারাল সোসাইটির সহ-সভাপতির পদ থেকে বার করে দেন। কিন্তু তাতে রামগোপালকে টলাতে পারেনি।

বরঞ্চ, এই সব ঘটনাই রামগোপালের জিদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। অনেক বড় ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রেরণা যুগিয়েছিল। সেটা আঠার শ' তিপান্ন সাল। স্যার চার্লস উড একটা খসড়া বিল আনেন, যাতে ভারতীয়দের ব্যবস্থাপক সভা বা সিভিল সার্ভিসে ঢোকার বা ব্রিটিশ হাকিমের মাইনে বাড়ার কোনরকম উল্লেখ ছিল না। এই নিয়ে কলকাতা তখন তোলপাড়। সে বছর জুলাই মাস। উনত্রিশে। সেই টাউন হল। কি ভিড়। কি ভিড়। হার্ডিঞ্জ মেমোরিয়ালের ভিড়ের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সিঁড়িতে পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে। ভিতরে এগোতে পারছে না। সামনের রাস্তায় ত আজকের পরিভাষায় ট্রাফিক জ্যাম—ব-বুন্দের পার্কিং-মিটারের কল্যাণে। সেকালের কাগজে বলা হয়েছিল যে, প্রায় দশ হাজারের মত লোক এসেছিল সেই সভায়। সভাপতিত্ব করলেন রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। আর প্রধান বক্তা ঠনঠনের কালোবাড়ীর ছেলে রামগোপাল ঘোষ। ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচারের বিরুদ্ধে বলতে বলতে রোষে ক্ষোভে রামগোপাল যেন তুবড়ির মত ফেটে পড়লেন। প্রতিধ্বনিত সেই আবেগকম্প্র কণ্ঠস্বরে সেদিনের টাউন হল গমগম করতে লাগল। স্তব্ধ জনতা আবিষ্ট হয়ে শুনেছে বাগ্মী নবযুগের 'মাইটি' রামগোপাল বলে চলেছেন। বক্তৃতা শেষ হতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে রামগোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রাধাকান্ত দেব। বললেন, বেঁচে থাক রামগোপাল। দীর্ঘজীবন লাভ কর। শুধু স্বদেশের নয়, বিদেশের বহু বিদেশী কাগজ সে বক্তৃতার প্রশংসা করেছিল। প্রশংসা করেছিল এমন কি 'টাইমস' কাগজও। বহু ব্রিটিশ এম-পি তাঁকে সমর্থন করে কাগজে চিঠি লিখেছিল। বাঙলা দেশের কণ্ঠস্বর সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে বিদেশের বাতাসে তরঙ্গ তুলেছিল।

কিন্তু রামগোপালের যে বক্তৃতা কলকাতা আজও বার বার মনে করবার চেষ্টা করে, সেটা কর্পোরেশনের মিটিং-এ নিমতলার শ্মশান রক্ষায় তাঁর ভাষণ। তারিখটা সাতই মার্চ। আঠার শ চৌষট্টি। শোনা যায়, তিনি ব্যবস্থাপক সভা নাকি এই বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অগ্রণী হতে অনুরোধ করে। বিদ্যাসাগরই তাঁদের পাঠান রামগোপালের কাছে। এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা না গেলেও রামগোপালের নিজের বক্তৃতা থেকে জানা যায় যে, এ বিষয়ে তাঁকে বলতে অনুরোধ করা হয় শনিবার। আর তিনি বলতে ওঠেন সোমবার। এবং এটাই মনে হয় রামগোপালের 'সোয়ান সঙ'—শেষ বড় বক্তৃতা। রক্ষণশীল সমাজের হয়ে ডিরোজিও ছাত্র রামগোপালের এই সওয়াল সাহেবদের কাগজে কার্টুনে ছবির বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। রামগোপাল তাঁর বক্তৃতার বলেন, 'দু' দল ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ীতে এসেছিলেন নিমতলা শ্মশান তুলে দেবার জন্যে আইনে, এই, কি...' রামগোপাল বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।' আর সেকথা শুনেই একজনের ত পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে থাকে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে থাকে তাঁর। অপর জন কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন। তাঁর চোখ জলে ভেসে যায়।' শুধু রামগোপালের এই ঐতিহাসিক বক্তৃতা সরকারের সহানুভূতি আদায়ের জন্যই নয়। তাঁর বাগ্মিতার উৎকর্ষ বুঝতে হলে এই বক্তৃতাটি বিশ্লেষণ করা দরকার। তাতে দেখা যাবে যে, রামগোপাল একদিকে যেমন আইনের কূট যুক্তিগুলির চমৎকার ব্যবহার করেছেন, তেমনি পাশাপাশি আবেদন করেছেন মানবতার নামে। এখানেই আমরা দেখি ডিমস্থেনিস রামগোপালের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। মনীষার দ্যুতি।

নিমতলার শ্মশান তুলে দেবার ব্যাপারে সরকারী সুপারিশ ছিল তিনটি। এক—শ্মশানে জন্তু-জানোয়ারের ছাল ছাড়ান বন্ধ করা। দুই—মৃত পশুদের বা মানুষের দেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া নিষিদ্ধ করা। এবং তিন—নিমতলার শ্মশান তুলে দেওয়া। জনস্বাস্থ্যের খাতিরে প্রথম দুটি বিষয়ে রামগোপাল সরকারকে সমর্থন করেন। কিন্তু তীব্র বিরোধিতা করেন তৃতীয় প্রস্তাবের। এই বিষয়ে তিনি এক এক করে চারটি আইনগত আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন যে, আইনে আছে যে, যদি কোন কারণে সরকার কোন স্থান থেকে শ্মশান তুলে দেন, তা হলে দেশের সুবিধামত স্থানে বিকল্প শ্মশান করে দিতে বাধ্য থাকবেন। বর্তমান ক্ষেত্রে সরকার তা করেননি। দ্বিতীয়ত ভারতীয় [illegible] শ্মশানের প্রতি [illegible] সম্প্রদায় [illegible] আইনে সরকার কি [illegible] রামগোপাল [illegible] দেখান, যে আইনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] রামগোপাল [illegible] এই [illegible] বিশ্বাস না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্মরণীয় হয়ে আছে [illegible]

'Sir I care not where my body may be burned after death but I consider it my duty to stand up here on behalf of the vast majority of my countrymen who would feel it to be a dire calamity if the prospect so reverentially contemplated of their bodies, being disposed of on the banks of the Hooghly were lost to them.'

দুঃখের কথা, রামগোপালের বক্তৃতা [illegible] এবং এর বিশদ [illegible] [illegible] সম্ভব নয়। তাই নবযুগের সেই মহাবাগ্মীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তাঁর বাগ্মিতার বৈভব সবই আজ মহাশূন্যের অনন্তলোকে বিলীন হয়ে গেছে। তা আবার শোনবার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু তাঁর সেইসব ঐতিহাসিক বক্তৃতাগুলির কোন প্রামাণ্য সংগ্রহগ্রন্থও আজও রচিত হয়নি। না রচিত হয়েছে তাঁর কোন প্রামাণ্য জীবনী। রামগোপালের শতবর্ষ মৃত্যুবার্ষিকীর শোকসভায় কলকাতা যে আত্মবিস্মৃত জাতি—এই নিষ্ঠুর সত্যকে আমরা আবার নতুন করে জানলাম।

প্রথম দৃশ্য

॥ ১ ॥
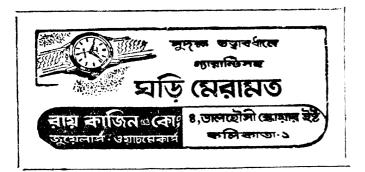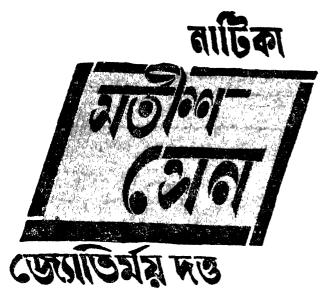
যে কোনো শ্রীহীন ঘর, যেমন ঘরে সেই অত্যাশ্চর্য শ্রেণীসংকর জীব, বালিগঞ্জের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, তাঁর জীবনের অধিকাংশ সন্ধ্যা যাপন করেন। বসার জন্য সোফা আছে, দাঁড়ানো আলো আছে, কিন্তু সেগুলি শুধু পুরোনো ও মলিনই নয়, পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন। কোণের কৌচটি বিশাল ও কুৎসিত এবং ঐ পরিবেশে অবিশ্বাস্য, বস্তির উঠোনে একটি বজরার খোলের মতো বেমানান। এমন গভীর তার গহ্বর, এমন নকসাকাটা তার হাতল যে কৌচ না-বলে সিংহাসন বলাই ভালো। কে জানে, হয়তো দিল্লির দরবারে পাঁচ তোপের অধিকারী কোনো করদ রাজার সুপুষ্ট পশ্চাৎদেশ এর উদার আলিঙ্গন লাভ করেছিল; নানান প্রাসাদ, জমিদার বাড়ি, ভিক্টর ব্রাদার্স ঘুরে, অবশেষে দশ বছর আগে কৌচ মহারাজ এই অকুলিন ঘরে এসে স্থিতিলাভ করেন। অন্য আসবাব বেতের; তুলোর গদি, লাল সালু, মোড়া, উর্ধ্বভাগ বহু তৈলসিক্ত বাঙালী ঘাড়ের ঘর্ষণে কালো হ'য়ে এসেছে। সবুজে শান্তিনিকেতনী পর্দা। দেয়ালে একটি যামিনী রায় একটি পরিচ্ছন্ন ক্যালেণ্ডার, একটি বৃদ্ধের—সম্ভবত গৃহকর্তার পরলোকগত পিতার ফোটোগ্রাফ।

তবু, এই ঘরটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে: প্রথমেই বই। চেয়ারে, টেবিলে, বইয়ের আলমারির [illegible] মাথায়, সর্বত্র বই। আগাথা ক্রিস্টি [illegible] বা শারদীয় যুগান্তর বা পঞ্জিকার মতো শুধু মুদ্রিত আবর্জনা নয়, সত্যকারের বই। এনসাইক্লোপিডিয়া বা উকিলের বাড়ির মতো পংক্তিবদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক পালোয়ানি গজতুল্য গ্রন্থযূথ নয়; নানান রঙের ও আকারের ও বিষয়ের বই, যার অনেকগুলিই গৃহকর্তার দৈনন্দিন ব্যবহারে লাগে।

দ্বিতীয়ত, ঘরটি প্রশস্ত। অর্থাৎ বাড়িটি পুরোনো ও যুদ্ধের আগে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, কারণ অল্পভাড়ার—ও গৃহকর্তা স্পষ্টতই বেশি ভাড়া দিতে অক্ষম—বাড়ির ঘরগুলি আজকাল এতো ছোটো যে নিতান্ত বামন ছাড়া অন্যদের শয়নকালে দরজা কিংবা জানালা খোলা রাখতে হয়; শুধু গরমের জন্য নয় বাতায়ন দিয়ে পা দুটি বার করে না দিলে ঘরের মধ্যে শোয়ার জায়গা হয় না। এই ঘরটি এতোই বড় যে পেছনে লেখার টেবিল সত্ত্বেও সামনের অংশে জনাদশেক বসতে পারেন, এবং একটু সাবধানে—আসবাব ও বই বাঁচিয়ে—চললে এমনকি পায়চারি করা যায়।

শেষোক্ত গুণটি ঘরটির অধিবাসীর কাছে বিশেষ মূল্যবান, কারণ যে একমাত্র শারীরিক ব্যায়াম তিনি করেন তাহলে ঐ ঘরটুকুর মধ্যে পায়চারি করা। লেখার চেয়ারের উপর তার পাঞ্জাবি; অধিকাংশ দিন ওই সোফাতেই তিনি রাত কাটান। এই হ'লো ঘরটির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। এই ঘরে গৃহস্বামী দিনের কার্যক্ষেত্র, রূঢ় জীবনসংগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যায় প্রোমোশন-পেনসন, মন্ত্রী মহলে দুর্নীতি, পাকিস্তানের শয়তানি, চীনের চক্রান্ত, ইত্যাদি উচ্চ আধ্যাত্মিক ও জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন না; এটাই তাঁর কার্যক্ষেত্র; তাঁর জীবনের কুড়িটি বছর এখানেই কেটেছে ওইভাবেই যেমন তাঁকে দেখা যাচ্ছে এখন, পেছনের টেবিলে নিশ্চুপ, কলম উদ্যত কিন্তু স্থির, শুধু অবিরাম সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে।

ওঁর পিতৃদত্ত নাম সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে কোনো এক 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রগতিশীল সম্পাদক তাঁকে এই নাম পরিবর্তন করতে অনুরোধ করেন কিন্তু সতীশচন্দ্রের কাছে ছদ্মনাম ধারণ কিঞ্চিৎ হাস্যকর, মধ্যযুগীয় হিন্দী লেখকসুলভ কার্য বলে মনে হয়। অথচ প্রতি ডাকে সম্পাদকের পরামর্শের সারবত্তা প্রমাণিত হ'তে থাকে: সতীশচন্দ্র যে পত্রিকাতেই রচনা পাঠাতেন না কেন, ভারতীয় ডাকবিভাগ স্বভাববিরুদ্ধ ক্ষিপ্রতা সহকারে অমনোনয়নের সংবাদ বহন করে আনতো। অবশেষে তিনি তাঁর নামের ঈষৎ সংস্কার করেন; নাম নেন সতীশ সেন। শুনতে ভালোই অথচ কাব্যিক নয়। এটি

তাঁর পিতৃদত্ত নাম সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়।

যবনিকা উত্তোলনের পর কুড়ি, তিরিশ, এমনকি চল্লিশ সেকেন্ড সতীশ নিশ্চল হ'য়ে ব'সে থাকেন। দর্শকেরা সবে অধৈর্য হ'য়ে উঠতে শুরু ক'রেছেন, এমন সময় সতীশ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে একবার টেলিফোন বেজেছিলো, এখনো বাজছে, কিন্তু সেদিকে সতীশ কর্ণপাত করলেন না। ছাইদানির মধ্যে সিগারেট থেঁতলে দিলেন, আড়মোড়া ভাঙলেন হাত ছড়িয়ে, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন, একটু অনিশ্চিতভাবে, পিতার ছবির সামনে মুহূর্ত কয়েক থেমে, হয়তো বা ছবির দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে। সোফায় ব'সে একটি বইয়ের পাতা ওল্টালেন, রেখে দিলেন, অবশেষে তুলে নিলেন খবরের কাগজ। এমনভাবে পাতা খুলে পড়তে শুরু করলেন যে বোঝা যায় খবরটি কোন পাতায় কোন স্তম্ভে তা তিনি জানেন, এবং তা তিনি হয়তো আগেও কয়েকবার পড়েছেন। তিনি নিবিষ্ট হয়ে পড়ছেন, এমন সময় দরজার ঘণ্টা বাজলো। সতীশ কাগজটি রেখে ফিরে গেলেন চেয়ারের কাছে,

তিন

ছেলেবেলায় খুব রুগ্ন ছিলো সমীর। সর্দি কাশি প্রায় ছাড়তোই না। গলার মধ্যে মস্ত মস্ত দুই টন্সিল সব সময়েই দুই কড়া সৈনিকের মতো উপস্থিত থাকতো। হয়তো সেজন্যই ভুগতো। জ্বর হতো বারে বারে। চুপচাপ বসে থাকতো বিছানায়, জানালা দিয়ে তাকিয়ে রাস্তা দেখতো। মা একেবারে বুকে করে রাখতেন। দিদির দশ বছর পরে তাকে পেয়ে মা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন। সব সময়েই বলতেন, 'মেয়ে তো পর, ছেলেই হচ্ছে আসল। ছেলে ভগবানের আশীর্বাদ, মেয়ে অভিশাপ।' এ কথায় বাবা চটে যেতেন, দিদিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলতেন, 'বাজে কথা বলবে না। এসব কথা আমি সহ্য করতে পারি না। মিতু আমাদের প্রথম, মিতু আমাদের মা।'

মা বলতেন, 'মেয়ে তো দু' দিন বাদে ধনে-প্রাণে শেষ করে চলে যাবে পরের ঘরে। আর ছেলে? সে আমাদের শেষ বয়সের অবলম্বন। আমাদের অক্ষম জীবনের যষ্টি। ছেলে চিরদিন মা-বাবাকে দেখে। খাওয়ায়, পরায়—' অতএব সেই ছেলের জন্য মা যে আপ্রাণ হবেন সে তো নিতান্তই স্বাভাবিক। সারাদিন তিনি আগলাচ্ছেন রুগ্ন ছেলেকে। সারা দিন নিষেধ-শাসনের গন্ডি। 'এটা ক'রো না', 'ওটা খেয়ো না', 'সেটা ধ'রো না'—এই রব। শীতগ্রীষ্ম বারো মাস তেল মাখাচ্ছেন বুকে, স্নান করাচ্ছেন গরম জলে, রাশি রাশি জামা কাপড় পরিয়ে রাখছেন। খেলার বয়সে খেলতে দেননি, মেশার বয়সে মিশতে দেননি, স্কুলে যাবার বয়সে স্কুলে যেতে দেননি। কী করে দেবেন? তাঁর ধারণা, খেললে ছেলে পড়ে গিয়ে মরে যাবে। মিশলে বদ হয়ে যাবে। আর স্কুলে? ওরে বাবা, সে তো সাক্ষাৎ যমালয়। কী দু পাতা খচরমচর পড়াবে তার জন্য একদিকে মাস্টাররা বেত মারবে, অন্য দিকে দুষ্টু ছেলেরা খোঁচা দিয়ে হয়তো অন্ধই করে দেবে চোখ। তা ছাড়া যা সব বখার দল! ছেলেকে পাকিয়ে কাঁঠাল বানিয়ে দেবে না দুদিনে? তাই তিনি চোখের আড়াল করতে নারাজ। এ নিয়েও বাবার সঙ্গে লাগতো। বাবা বলতেন, 'তুমি ওর জীবনটা নষ্ট করে দেবে। ও কোনো দিন স্বাধীন হতে পারবে না, শক্ত হতে পারবে না। ওর ব্যক্তিত্ব পঙ্গু হয়ে যাবে।'

'রাখো তোমার স্বাধীনতা। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আগে ছেলে আমার বাঁচুক তো, তারপর অন্য কথা। নিজে তো গুণের গোঁসাই। কবে এক মেয়ে বানিয়ে তির তির করে জীবন কাটিয়েছ। কতো আহা ধন মহা ধন করে দশ দশটি বছরের আরাধনার ছেলে পেয়েছি একটা, তাও আজ যায় কাল যায়। বেশী ইয়ে করতে যেয়ো না আমার উপর।'

বাবা তর্ক ছাড়েননি, বলেছেন, 'ছেলে একা তোমার নয়, আমারও। তাকে কীভাবে কী করে মানুষ করবো না করবো তা আমাকেও দেখতে হবে বইকি!'

'কতো তো দেখছো।' সঙ্গে সঙ্গে মা মুখঝামটা দিয়েছেন, 'সব করবো আমি আর লাঠি উঁচোবে তুমি।' একদিন একটা কাঁথা কেচেছ না কোনোদিন রাত জেগেছ? পেটের মধ্যে দশ মাস রেখেছ না ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে প্রসব করেছ? কী করেছ তুমি? হ্যাঁ, ভোগ করেছ, তা ঠিক। সুখটা সবই তোমার। আর তারপর আমি করেকম্মে মানুষ করলে লোকে বাপের ব্যাটাই বলবে।'

কথাগুলো অভ্রান্ত সত্য। এর পরে থেমে গেছেন বাবা। ভুরু কুঁচকে রাগ করে কাজে গেছেন। যেতে যেতে বলেছেন, 'জগতে আর তো কারো ছেলে নেই কিনা, আর তো কেউ স্কুলে যায় না কিনা—'

বাবাকে দিদিই সব এগিয়ে গুছিয়ে দিয়েছেন, বাবার সব কাজ দিদির। দিদি বলেছে, 'ওসব থাক বাবা, এবার তুমি যাও।'

বাবা গেলে দিদি মাকে বুঝিয়েছেন, 'ওকে সত্যি মা এবার স্কুলে দাও, সাত বছরের ছেলে, ওরও তো একটু সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে মিলতে মিশতে খেলতে ইচ্ছে করে! বাড়িতে সারাদিন এক বোঝা জামা কাপড় পরে সকাল সন্ধ্যায় মাস্টারের কাছে বসে থেকে ওর অসুখও সারবে না, দেখো।'

এবার মার চোখে জল দেখা দিয়েছে, রুদ্ধ গলায় বলেছেন, 'আমি তো ওর মা না, আমি ওর শত্রু কিনা, তাই ওর ভালো চাই না। তোরাই সব বুঝিস, সব জানিস। ঠিক আছে, যা খুশি কর।'

মায়ের সেই অভিমানের সুযোগে ভাইকে লুফে নিয়েছেন দিদি, 'চল সমু, আজই তোকে ধীরুবাবুর স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসি।'

সমীর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তার ভয় করেছে স্কুলে যেতে। তার মনে হয়েছে স্কুলে গেলেই বুঝি সবাই মিলে তাকে মারবে, পিটবে, শাস্তি দেবে।

দিদি তখন রাগ করে বলেছে, 'দেখলে কী রকম ভীতু হয়ে গেছে? এ কিন্তু ঠিক করছো না মা।' হঠাৎ মা সব রাগ অভিমান ভুলে একগাল হেসে দৌড়ে এসে ছেলেকে বুকে চেপে ধরেছেন, চুমু খেয়েছেন, আদর করতে করতে বলেছেন, 'এই ভীতু ছেলেই আমার ভালো। বেশী সাহস দেখিয়ে কাজ কী! দেখিস ও আমার কতো বড়ো হয়, আমি ওকে কেমন মানুষ করে তুলি। বড়ো আমার কতো টাকা আনবে ঘরে, মাকে দেখে

সহাস্যে বলতেন, 'এ দেখছি পিঠোপিঠি ভাইবোনের বাড়া।' ইন্দিরার মাকে বলতেন, 'মেয়ে আমার ছেলের চেয়ে পুরো দশ বছরের বড়ো। এখন তো সে রীতিমতো ঘরনী গৃহিণী। ওদের নিজের ভাইবোনের সম্পর্ক প্রায় মা আর ছেলের মতো। সমুর ছোটবেলাটা তো তার দিদির কোলে কোলেই কেটেছে। একার সংসার, স্বামী অন্যমনস্ক অপটু, ঐ মেয়ে যে আমার কতো করেছে তার কি ঠিক আছে কিছু? তারপর তার বিয়ে হলো যখন, ছেলের কি ফুলে ফুলে কান্না! বাপ!'

এর পরে ইন্দিরার মা জিজ্ঞেস করেছেন, জামাই কী করে, কোথায় থাকে—আর মা ডালা খুলে সবিস্তারে খবর দিতে বসেছেন।

যতোক্ষণ তারা পারিবারিক খোঁজখবরে নিষ্ঠা দেখিয়েছেন ততোক্ষণ ইন্দিরা আর সমীরও কম নিষ্ঠার সঙ্গে প্রেম করেনি। সমীর বলেছে, 'ইন্দু, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

ইন্দিরা বলেছে, 'শমী, এ ভালোবাসা আমাদের সফল হবে না।'

সমীর বলেছে, 'কেন ইন্দু? আমাকে কি তুমি পছন্দ কর না?'

ইন্দু বলেছে, 'পছন্দ-অপছন্দর কথা নয়—আমি তোমার চেয়ে তিন মাসের বড়ো, এই সাংঘাতিক বড়োত্বই শেষ পর্যন্ত তোমার মায়ের কাছে সাংঘাতিকতম অপরাধ বলে গণ্য হবে।'

'না। আমি তা মানবো না। আমি মানবো না। আমি মানবো না।' ক্ষেপার মতো করেছে সমীর।

আস্তে আস্তে তারা এভাবেই অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছিলো। তারপর একদিন এক নির্জন অবসরে দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করলো, সমীরের বলিষ্ঠ চুম্বনে ইন্দিরা রক্তাক্ত হলো। আর তারো পরে, যখন দুজনই পরীক্ষা দিয়ে অলস দিন যাপনে শিথিল ছিলো সেই সময়ে কোনো দুপুরে মেয়েদের শরীরতত্ত্ব বিষয়ে সমীরের কৌতূহল প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

দুই বাড়ি থেকে দুই মা সিনেমায় গিয়েছিলেন। ইন্দিরা গল্প করতে এসে আটকে গেল। দরজায় ছিটকিনি বন্ধ ক'রে সমীর চোখে চোখে তাকিয়ে বললো, 'দেখাও।'

তাদের তরুণ তাজা শরীর দুটো আগুনের মতো জ্বলছিলো তখন। তারই মধ্যে ইন্দিরা শঙ্কিত হ'য়ে বললো, 'ও কি, ছুঃছী।'

'হ্যাঁ।'

'খুব অন্যায়।'

'কিছু অন্যায় নয়।'

'দরজা খোলো আমি যাবো।'

'না।'

'তুমি কি আমাকে জোর করবে?'

'ইন্দু—'

'না।'

'ইন্দু—'

'না।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

ইন্দু দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিলো, সমীরের উত্তাল যৌবন তাকে পিষ্ট করলো বুকের মধ্যে। বড়ো বড়ো দম নিতে নিতে ইন্দিরা বললো, 'তুমি কি কখনো আমাকে বিয়ে করবে যে, এভাবে সব নিচ্ছো?'

'হ্যাঁ, করবো, করবো, করবো।'

'সে শক্তি তোমার নেই।'

'আমাকে অপমান ক'রো না—'

'তোমার মা—'

'না, মা নয়, কেউ নয়—'

'আঃ, ছাড়ো ছি—ছি—কী অসভ্য—'

'চুপ। তুমি আমার। আমার।'

'কিন্তু তুমি—'

'কোনো কিন্তু নয়—'

'তুমি একটা বাঘ—'

'ইন্দু—আমার ইন্দু—'

'সমীর—'

'শরীর আমার সুখের খনি—'

'কিন্তু, কিন্তু—'

'কিচ্ছু ভয় নেই সোনা।'

'ছাড়ো, লক্ষ্মীটি ছাড়ো।'

'আমার সুখ, আমার সম্ভোগ—'

'সমীর।'

'আমার আলো, আমার ঐশ্বর্য—'

'সমীর।'

'আমার সব। আমার সব।'

সমীরের জ্ঞান ছিলো না। সে উন্মাদের মতো ভালোবাসছিলো ইন্দিরাকে। ইন্দিরার সমস্ত বাধা ধূলিসাৎ ক'রে সে তার সমস্ত লজ্জা কেড়ে নিচ্ছলো। তাদের ছাড়া-ছাড়া কথা, বড়ো বড়ো দম, ঘাম আর পরিশ্রম সার্থক হচ্ছিলো দরজা-বন্ধ ঘরের নিরালায়।

জ্ঞান ফিরলে সমীর বললো, 'ক্ষমা কর।' ইন্দিরা বললো, 'থাক, আর ইয়ে করতে হবে না, ছোটোলোক।' সমীরের মুখ সুন্দর সরল এক নিষ্পাপ হাসিতে ভ'রে গেল। হাত ধ'রে বললো, 'যা ঐশ্বরিক তাকে মানুষ এমন নরক বলে ঠেলে রেখেছে কেন বল তো? এর মধ্যে দোষ কোথায়? স্বাভাবিক ইচ্ছে, স্বাভাবিক কাজ।'

'থাক, থাক—'

'রাগ ক'রো না। আচ্ছা তুমি মহাভারতের সব মুনি-ঋষির কথাই জানো না—'

হঠাৎ দরজায় মায়ের গলা শুনতে পেল সমীর। সে চকিত হ'লো। তার কয়েক মুহূর্তের মাত্রহীন জগতের আনন্দ ভয়ের আকৃতি নিল।

'এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কেন?' অস্থিরভাবে সে উঠে দাঁড়ালো। ইন্দিরা সন্ত্রস্তভাবে খোলা চুল বেঁধে নিল। সমীরের মা সমীরের নাম ধ'রে ডাকছিলেন আর জোরে জোরে কড়া নাড়ছিলেন।

ভিতরে ঢুকে তিনি কড়া চোখে তাকিয়েছিলেন দুজনের দিকে। তারপর কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন।

ইন্দিরা পাংশু মুখে চলে গেল। সমীর দাঁড়িয়ে থাকলো ছবির মতো।

শেষে যা হবার তাই হ'লো। ভিতরে ভিতরে কোন ষড়যন্ত্র যে কী কাজ করলো কে জানে, ইন্দিরাকে আর এ বাড়িতে কোনদিনই দেখতে পেলো না সমীর। শুধু তাই নয়, দু'চার দিনের মধ্যে, পাশের বাড়ির দরজায় তালাও ঝুলতে দেখলো। তবু আশা ছিলো, ছুটির পরে কলেজে দেখা হবে।
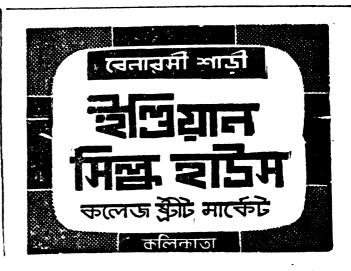
স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলো তারা, বি এ-ও সেখানেই পড়বে, এটা তাদের স্থির, নিশ্চয় ছিলো। আই এ পরীক্ষার ফল নির্দিষ্ট তারিখেই বেরুলো, পাসের তালিকায় ইন্দিরার নাম খুব নীচের দিকেও ছিলো না, কিন্তু বি এ ক্লাসে দেখা গেল না তাকে। কিছুকালের মধ্যে একখানা হলদে রঙের নিমন্ত্রণ-চিঠি এলো। ইন্দিরার বিয়ে।

মা নিভাজ ভালোমানুষের মতো চিঠিটি নিয়ে তার ঘরে ঢুকেছিলেন, 'ওমা, দেখ, দেখ' বলে বিমর্ষ ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তারপর আদ্যোপান্ত পড়ে শুনিয়ে বলেছিলেন, 'বলা নেই, কওয়া নেই, দুম করে কোথায় যে চলে গেল, আশ্চর্য। একটা বিদায়-আদায়ও তো নেয় মানুষে! এতোদিনের এতো চেনা, বন্ধুতা, প্রতি-বেশিতা, তার যেন কোন দাম নেই। সত্যি। আমার এতো খারাপ লেগেছিলো! যাক, মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছেন, ভালো করছেন। অধিক বয়েস পর্যন্ত কুমারী রাখার সত্যি কোনো মানে হয় না। শেষে আর নুন লবণ জ্ঞান থাকে না মেয়েগুলোর, বাচ্চা কাচ্চা যাকে পায়, পুরুষ হলেই মাথা চিবিয়ে খায়।'

সমীর শক্ত হ'য়ে বসে মার কথা শুনছিলো, আস্তে উঠে বাথরুমে চলে গেল। বাথরুমে গিয়ে তার আঠারো বসন্তের প্রথম প্রেমের বেদনায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো।

ইন্দিরাকে সমীর ভালোই বেসেছিলো। নামত 'বাছুরে প্রেম' হলেও কেবলমাত্র বাছুরের কৌতুকই ছিলো না। সমীরের স্বভাবে ফাঁকি কম, চালাকি কম, ইন্দিরাকে সে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে এটাই তার বদ্ধ ধারণা ছিলো। হলো না। গুরুজনদের ধূর্ত প্রচেষ্টার কাছে তারা উভয়েই হেরে গিয়েছিলো। বয়েস তাদের সত্যিই কম ছিলো।

এই বিচ্ছেদের কষ্ট অনেকদিন পর্যন্ত আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো সমীরকে। তারপর কখন একেবারে ভুলে গেল। ভুলে গেল, কিন্তু বয়সের ধর্মে মেয়ে দেখলেই চাঞ্চল্যের বৃত্তিটাও কেমন অক্ষম হ'য়ে রইলো অনেকদিন পর্যন্ত।

লেখাপড়ায় চিরদিনই সে পয়লা নম্বরের। আই এ-র পরে বি এ পরীক্ষাটাও তার সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখলো। যদিও বি এ-তে ভর্তি হবার সময় মার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিলো এক প্রস্থ। সে চেয়েছিলো ইংরিজী অনার্স নিতে, মা বললেন অর্থনীতি। বাঁ হাতের ঝাপটায় তিনি ছেলের এই খামো ইচ্ছেকে হাওয়ায় মিশিয়ে দিলেন। বললেন, 'পাগল নাকি! ইংরিজী পড়ে তো কী মোক্ষ হবে? কোথায় চাকরি পাবি! যতীনবাবুর ছেলেকে দেখছিস তো, কী বিশাল চাকরি করে! কেন? অর্থনীতি পড়েছিলো বলে। হয় ইনজিনিয়ারিং নয় অর্থনীতি। এ দুয়ের বাইরে যাওয়া মানেই জলে ডোবা। তা তুমি অংকে যা পন্ডিত তোমার আর ইনজিনিয়ার হবার আশা নেই। অর্থনীতিই ভালো।'

'কেন, ইংরিজীতে বুঝি চাকরি হয় না?'

'না।'

'আমি ইংরিজীই পড়বো।' জেদ করেছিলো সমীর। মাকে বুঝিয়েছিলো, 'ভালো করতে পারলে সব বিষয়েই সমান আদর।'

মা মুখ বাঁকিয়ে উঠে গেলেন। এবং সমীর জানলো তাকে অর্থনীতিই পড়তে হবে।

পড়লো। ভালোও করলো। কিন্তু তবু সমস্যা মিটলো কই? মা তাকে এম এ পড়তে দিলেন না। আবার সেই একই কথা, 'এম এ পড়ে কী মোক্ষ হবে?'

'আমি কলেজে পড়াবো।'

'মাস্টারি! আবার সেই মাস্টারি! না বাপু। মাস্টারির খুরে খুরে আমার দণ্ডবৎ। সে তোমাদের কলেজের মাস্টারিই হোক, আর স্কুলেরই হোক। এক মাস্টারিতেই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তোমাকে আর সে রাস্তায় হাঁটতে হবে না।'

'কেন, মাস্টারি কি খারাপ?' সমীর তার মাস্টার বাবার জন্য বেদনাবোধ করছিলো। সেই শান্ত সদাশিব স্কুল মাস্টারটিকে সে মনে মনে পুজো করতো।

মা ধমক দিলেন, 'বেশী পাকামি করতে হবে না। যা বলছি তাই শোন। যদি ভালো চাকরি পেয়ে যাস, নিয়ে নিবি, না পেলে অন্য ব্যবস্থা।'

'না পেলে এম এ পড়বো?'

'না।'

'তবে কী পড়বো?'

'এটা স্বাধীন ভারত, পড়বার অনেক বিষয় আছে। চারু কাকা কাল যে ফার্মের নাম ক'রে গেলেন সে ফার্মে তাড়াতাড়ি দরখাস্ত ক'রে দে একটা।'

'আমি এম এ-তে ভর্তি হবো।'

এবার খেঁকিয়ে উঠলেন মা, 'তোমার বাপ তোমার জন্য লক্ষ টাকা জমা রেখে যান নি যে, যা খুশি তাই করবে। এই আমিই দুঃখে কষ্টে একা একা এতোখানি করে তুলেছি, এম এ পড়ার মতো বিলাসিতার টাকা আমি তোমাকে যোগাতে পারবো না।'

সমীরের স্বভাব অনুযায়ী সমীরের চুপ ক'রে যাওয়া স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু এখানে তার বাপকে টেনে আনা হয়েছে, তার আসল অভিমানের জায়গায় মা হাত দিয়েছেন। সে গোঁজ হয়ে বললো, 'আমি টিউশনি ক'রে পড়বো। আমার খরচ কাউকে যোগাতে হবে না। আমি ঠিক করেছি, আমি অন্য চাকরি করবো না, মাস্টারি করবো।'

টিউশনি সমীর এর আগেও নিয়েছিলো একটা। মা চেঁচামেচি ক'রে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি জানেন টিউশনি করা মানেই চোখের আড়াল। কলেজ আর বাড়ির বাইরের জীবন। আড্ডার সুযোগ। পাঁচজনের পাঁচ রকম কথা কানে নিয়ে বিগড়ে যাওয়া।

সমীরের এই বাদ-প্রতিবাদের আস্পর্ধায় তিনি সেদিন ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়েছিলেন। পরে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার যা খুশি তাই তুমি করো, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমিও আর তোমার সংসার আগলে বসে থাকবো না। আমি কাশী যাবো।'

তবু সেদিন সমীর অবদমিত হয়নি। মার সঙ্গে আর তর্ক না ক'রে সে দিদির কাছে গিয়েছিলো। বলেছিলো, 'মাকে বোঝাও, রাজী কর। আমি এম এ পড়বো দিদি।'

জামাইবাবু বলেছিলেন, 'এ রকম একটা তুখোড় ছেলেকে তোমার মা একেবারে ক্রিপলড্ ক'রে রেখেছেন। ও কী না হতে পারতো!'

দিদি বলেছিলেন, 'না সমু, তুই মার কথা মতোই চল। আমি তুই বলার আগেই মাকে এ কথা বলেছিলাম। মা বলেছেন, যদি টিউশনিই করে তবে দয়া ক'রে সে টাকা ক'টি যেন সংসারের সাহায্যে আমার হাতেই দেয়। আমি অনেক কষ্টেই তাকে মানুষ করেছি, যদি অমানুষ হ'য়ে সে কথা না বোঝে আমি এক রাতও আর ওর সঙ্গে থাকবো না।'

এবার সমীর উল্টো রাগে ফুঁসতে লাগলো। অদ্ভুত একটা প্রতিশোধ-স্পৃহা অনুভব করলো। মনে হলো, মার দিকে সে হাজার হাজার টাকা ছুঁড়ে দিয়ে সগর্বে বলে, 'নাও খুশী হও, আমিও ঋণ শোধ ক'রে মুক্তি পাই।'

কিন্তু সে যে সমীর! সে যে মাতৃভক্ত শিশু! চরিত্রের দুর্বলতাই তো তার বৈশিষ্ট্য, চরিত্রের দার্ঢ্য নয়।

তাই অল্পকালের মধ্যেই আবার সব তীব্রতা তার নিস্তেজ হ'য়ে এলো। মার নির্দিষ্ট পথেই চলতে চলতে ভাবলো, মিছিমিছি ঝামেলা ক'রে সত্যি লাভ নেই। মা যা চান তাই ভালো। হাজার হোক, সমীরের বয়েস কম, ছেলেমানুষ, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি নেই, মা তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, মা-ই তাকে ঠিক পথের নিশানা দেবেন। মার মতো ভালো আর কে বাসে তাকে? মার মতো আর কার অত বুদ্ধি, অত বিবেচনা, অত কর্মক্ষমতা। মার মতো অমন ক'রে আর কে কোন সন্তানকে অত দুর্দৈবের মধ্যেও এরকম সুখে লালন করেছে?

নইলে হাকিম হবার মতো কোনো উপাদানই তার মধ্যে ছিলো না। তার হাঁক নেই, ডাক নেই; চালে-চলনে চটক নেই— একটা জোর গলায় ধমক ধামক করতেও কতো দ্বিধা। মা যদি তাকে ঠেলে ঠেলে না চালাতেন, একটা আস্ত গোবর্ধন হ'য়ে থাকতো হয়তো।

এমন অপদার্থ যে, এতোখানি বয়সে একটা বিয়ে পর্যন্ত করতে পারলো না। দিদি বলেন, 'সমী, তোর যে কানের কাছে চুল পেকে গেল রে।'

- সমী বলে 'দুঃখে দুঃখে। একটা বউও কি তোমরা জুটিয়ে দিতে পারো না?'

জামাইবাবু বলেন, 'বি ব্রেভ! অন্তত একবারের জন্য হৃদয়ের খাপ থেকে শান দেওয়া তলোয়ার খোল তো সমী। একবারের জন্যে আমরা তোমাকে তোমার মূর্তিতে দেখি।

ক্রমশঃ

Waterbury's
Compound

বিজ্ঞান কংগ্রেস

বিজ্ঞানী যে গজদন্তমিনারবাসী নন, এই কথাটাই বোঝাবার জন্য ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৩তম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ আত্মারাম মন্তব্য করেছেন যে, আধুনিক দুনিয়ার মানবীয় সমস্যা কেবল রাজনীতিজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দেওয়া অনুচিত। সেইসব সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানী ও কারুবিদদেরও রয়েছে এক অসামান্য ভূমিকা। অবশ্য কথাটা কিছু নতুন নয়। প্রতি বছরই বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রধান বক্তারা এই সার কথাটির পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। শুধু আধুনিক কাল বললেও ভুল হবে। আদিম কাল থেকেই মানুষের প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা চলে আসছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের রূপ নেয় কয়েক শো বছর আগে। বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কিন্তু তার আগেও যে ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ আমরা প্রাচীন ভারতীয়, গ্রীক, রোমীয় ও চীনা সভ্যতার আমলের বিজ্ঞানচর্চার কথা উল্লেখ করতে পারি। মানুষ যখনই প্রকৃতির কোন নিয়মের সন্ধান পেয়েছে, তখনই সেটি সমাজের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে, তার লব্ধ জ্ঞানকে গজদন্তমিনারের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। নদীর জল প্রবহণের নিয়ম আয়ত্ত করেই সে খেত-খামারে সেচের জন্য খাল কেটেছে, নির্মাণ করেছে বিরাট সব হ্রদের মত জলাশয়—যেমন আজমীরের আনাসাগর। মানুষের প্রকৃতিকে চেনবার জানবার অনুসন্ধিৎসা থেকেই আজ এই বিংশ শতাব্দীতে তার ভূমণ্ডল থেকে গ্রহ-গ্রহান্তরে উড়ে যাবার এত আয়াস-প্রয়াস, এত চেষ্টা, যার শুরু হয় প্রথমে স্পুৎনিক দিয়ে। তারপর ধাপে ধাপে সে মহাজগৎ বিজয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে, রুশ ও মার্কিন মহাকাশচারীরা মহাকাশযান থেকে মহাশূন্যে বার হয়ে পদচারণা করেছেন এবং আরো কত শত সাফল্য অর্জন করেছেন যেগুলি এখন থেকেই আমাদের এই পৃথিবীতে বহু উপকারে আসছে।

বিজ্ঞানের পথে পাশ্চাত্য আমাদের বহু পিছনে ফেলে গিয়েছে অথচ এমন দিন ছিল যখন আমরা ভারতীয়েরা তাদের চেয়ে এগিয়ে ছিলাম। বিভিন্ন বিদেশী জাতির আক্রমণে আমরা আমাদের স্বাধীনতা খুইয়ে বসার ফলেই আমাদের এই অবস্থা হয়। আমরা হয়ে যাই এক আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর গত ২০ বছর ধরে আমরা চেষ্টা করে আসছি যাতে বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা আবার পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হতে পারি। ডঃ আত্মারামের ভাষায় এই "অসীম প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও দরিদ্র দেশে" আধুনিক বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার বহুখানি চর্চা করা দরকার, দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য ততখানি করার মত আর্থিক সম্বল এখনো আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। অথচ বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার বন্ধন অচ্ছেদ্য—যাকে ইংরেজীতে বলা যায় "Symbiosis of science and engineering", বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

ডঃ আত্মারাম

উদ্ভাবন থেকেই যেমন অর্থনৈতিক উন্নতির কলকব্জা, যন্ত্রপাতি তৈরি হয়, তেমনি আবার যন্ত্রপাতি না থাকলে বিজ্ঞানচর্চাও করা যায় না। সুতরাং এই অন্যোন্যজীবী দুটি ক্ষেত্রের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অনিবার্য। হয়তো কেউ কেউ বলবেন যে, বিজ্ঞান হিসাবে গণিত চর্চা করার জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কি দরকার? আর্কিমিডিস, পাইথাগোরাস বা লোবাচেভস্কির গণিত চর্চার জন্য তো ইঞ্জিনীয়ারিং দরকার হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত গণিতও আর্কিমিডিসের যুগে বসে নেই। আজ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার না হলে তার চলে না। জীবশাস্ত্রের কথা ধরুন। সেখানেও আমার বিজ্ঞানচর্চার হাতিয়ার হিসাবে দেখছি ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ, ট্রেসার অ্যাটম, সেন্ট্রিফিউজ ইত্যাদি ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অবদান। আপনি আমি সবাইয়ের মত ইঞ্জিনীয়ার ও কারুবিদেরাও কি দেখতে বুঝতে চাইবেন না যে, জৈব যোগবাহী পদার্থগুলির স্বরূপটা কিরকম? রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি যন্ত্রশক্তিতে রূপান্তরিত কর, যেমন হৃদ্ পেশী সংকোচনে, উদ্ভিদ-জগতের আলোক-সংশ্লেষ ক্রিয়ার মত আলোকশক্তির সাহায্যে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের তৈরি করা ইত্যাদি ব্যাপার সম্পর্কে অগ্রণী কি শুধু বৈজ্ঞানিকদের, ইঞ্জিনীয়ারদের নয়? তাই যদি না হবে তা হলে "বায়োমেকানিকস" নামক বিজ্ঞানের নতুন একটি শাখার আবির্ভাব হল কি করে? রসায়ন বিজ্ঞানের কৌশলে কৃত্রিম পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন যথোপযুক্ত পরিমাণে করতে পারলে অর্থাৎ খাদ্যোৎপাদনকে কৃষির স্তর থেকে শিল্পের স্তরে তুলে নিয়ে যেতে পারলে আমাদের দেশ-সমস্ত পুষ্টির অভাব মেটাতে বড় কম সাহায্য হবে না। এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর যৌথ প্রচেষ্টা। তেল থেকে প্রোটিন উৎপাদন করাও সেই-রকম এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার যৌথ প্রচেষ্টার ফল। সুতরাং এইসব ব্যাপার থেকে এই জিনিসটাই স্পষ্ট হয়ে বার হয়ে আসছে যে, বিজ্ঞানচর্চা যদি গজদন্ত-মিনারের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থাকে অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চা যদি শুধু বিজ্ঞানেরই জন্য হয়, তাতে দেশের কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। বিজ্ঞানচর্চার শেষ লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, আধিব্যাধি, অশিক্ষা ইত্যাদি দূর করার উপায় উপকরণ আবিষ্কার করা, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী উদ্ঘাটন করে সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে।

ডঃ আত্মারাম তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে প্রত্যেকটি জাতির সমৃদ্ধি ও স্বস্তি নির্ভর করে তার বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য ও শিল্পশক্তির উপর, যে দুটির অগ্রগামী বন্ধনের কথা আমরা আলোচনা করলাম। ভারত সরকার সেটা বোঝেন বলেই দেশের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী বিজ্ঞানচর্চা খাতে ক্রমশ অর্থ বরাদ্দ করছেন, যদিও সেই অর্থ সমাজের উপকারের দিক থেকে বিচার করলে কতটা কাজে আসছে সেটা বিচার-বিবেচনাসাপেক্ষ। ডঃ আত্মারাম স্বয়ং বিজ্ঞান ও শিল্পের সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রিসার্চ ল্যাবরেটরী ও টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে, তবে সেগুলিতে মৌলিক গবেষণা কিরকম হচ্ছে এবং কিভাবে সেগুলির মধ্যে সহ-যোগিতার বন্ধন গড়ে উঠছে সে বিষয়ে সকলে একমত নন। সেই বন্ধনের মধ্যে আমলা-তন্ত্রের কোন স্থান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে কোন কোন বিষয় নিয়ে কোথায় কি কাজ হচ্ছে, সে সম্পর্কে নিয়মিত সহজবোধ্য রিপোর্ট খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়া উচিত, যাতে সংবাদপত্রের মারফৎ পাঠকেরা বিজ্ঞান ●

কারুবিদ্যা সম্পর্কে অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান-লাভ করতে পারেন, হয়ে উঠতে পারেন বিজ্ঞান-সচেতন। অথচ এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বিভিন্ন কাগজে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সংবাদ প্রকাশ ক্রমশ কমে আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অথচ দেশবাসীকে বিজ্ঞান-সচেতন করে তোলার উপরই নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি; কারণ, আবার ডঃ আত্মারামের ভাষায় বলি, "আজ যা গণ্ডিবদ্ধ রয়েছে বিজ্ঞানীর লেবরেটরীর মধ্যে, কাল তাই আবার রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির রূপ নেবে", যেসব যন্ত্রপাতি বর্ধিত ও সুনিশ্চিত করবে দেশে আপামর জনসাধারণের সংগতি ও সমৃদ্ধি। কিন্তু ডঃ আত্মারামের মতে, ভারত সরকার তাঁদের সেই টেকনোলজিক্যাল নীতি সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার করে কিছু ঘোষণা করেননি, যে নীতিই হচ্ছে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর যোগসূত্র। তিনি মনে করেন যে, ভারতের প্রগতি প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল:—(১) ভারতের বৈষয়িক সম্পদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ ও পরিমাপ করা এবং যত দূর সম্ভব সেগুলি কাজে লাগানো, (২) পুঁজি যাতে উৎপন্ন হয় সেজন্য উৎসাহ দেওয়া এবং (৩) জাতীয় লোকবলকে অর্থনীতির উন্নতিকল্পে কাজে লাগানো। এই তিনটি ব্যাপারেই তিনি বিদেশের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের ভিতরের সম্পদ যতখানি সম্ভব ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ডঃ আত্মারামের ভাষায়, বৈষয়িক সম্পদের উপর অর্থ লগ্নী করে যে লাভ হয়, তার চেয়েও অনেক বেশী লাভ হবে মানবিক সম্পদের (লোকবল) উপর টাকা খাটিয়ে; কারণ, বিজ্ঞানী, কারুবিদ, ইঞ্জিনীয়ার, যন্ত্রকৌশলবিদ ইত্যাদি বিশেষজ্ঞদের আমরা যত বেশী তালিম দিয়ে তৈরি করতে পারব, জাতির উন্নতি হবে সেই অনুপাতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত যাঁরা এইসব বিষয়ে তালিম পেয়েছেন তাঁদের সকলের জন্য উপযুক্ত বেতনে কর্মসংস্থান করা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনাই আমাদের নেই। বহু বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির ভাল চাকরির সন্ধানে দেশ ত্যাগ করার এটাই হচ্ছে প্রধান কারণ। ডঃ আত্মারাম বলেছেন এমন কোন বৈজ্ঞানিক সংস্থা আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে রূপ নিতে পারেনি, যা গবেষণার ক্ষেত্রে কখন কোন বিষয়কে আগে প্রাধান্য দিতে হবে সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিতে পারে।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বিরাট ব্যবধান সংকীর্ণ করে আনার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই উক্তি প্রশংসনীয় নিশ্চয়ই। কিন্তু পৃথিবীতে যে "শতকরা ৭০ জন" দারিদ্র্যের দ্বারা পীড়িত ও নির্যাতিত তাদের দারিদ্র্য ঘোচানোর প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রনেতৃবর্গ ও সমাজব্যবস্থার। তাঁদেরই কর্তব্য হচ্ছে যুক্তিসংগত সমাজনীতি গ্রহণ করে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সেই দারিদ্র্য ঘোচাবার ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞানের জনকল্যাণমূলক প্রয়োগটা নির্ভর করে তাঁদেরই উপর। বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার উপর আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব বন্ধ করাটাও তাঁদেরই কাজ। পরিকল্পনার জন্য আমাদের যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, বহু কালের কুসংস্কারমূলক ঐতিহ্যগুলি মুছে ফেলা দরকার, ঠিক তেমনি বিজ্ঞানচর্চার জন্যও আমাদের চাই এক সুসমঞ্জস পরিকল্পনা যার মূল-উপমূলগুলি গ্রথিত থাকবে ভারতের ঐতিহাসিক অনন্য বিশেষত্বগুলির মধ্যে।

হৃৎপিণ্ড প্রতিরোপণের প্রয়াস

কেপটাউন থেকে হৃদ্‌রোগীর হৃৎপিণ্ড প্রতিরোপণের যে ক'টি খবর আমরা পড়লাম সেগুলি থেকে বোঝা যায় যে, হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। ৫৮ বৎসর বয়স্ক ডঃ ফিলিপ ব্লেবার্গের দেহে আচার্য বার্নার্ডের নেতৃত্বে একদল শল্যচিকিৎসক রুগ্ন হৃৎপিণ্ডের বদলে যে নতুন হৃৎপিণ্ড বসিয়েছেন তা কোন শ্বেতাঙ্গের নয়, একজন শ্বেত কৃষ্ণাঙ্গের (মুলাটো) অর্থাৎ যাঁর পিতা ছিলেন শ্বেতাঙ্গ এবং মাতা কৃষ্ণাঙ্গ। ভদ্রলোক মস্তিষ্কের ভিতরে রক্তক্ষরণে মারা যান। অবসরপ্রাপ্ত দন্তচিকিৎসক মিঃ ব্লেবার্গ এখনো পর্যন্ত শুধু ভাল আছেন নয়, তরল ছাড়া অন্যান্য খাদ্যও খাচ্ছেন। এই অস্ত্রোপচার করতে ৫ ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

এর আগে আচার্য বার্নার্ডেরই নেতৃত্বে শল্যচিকিৎসকরা গত ৩রা ডিসেম্বর মিঃ লুইস ওয়াস্কানস্কির বুকে ব্যাধিগ্রস্ত হৃৎপিণ্ডের বদলে এক মৃত কৃষ্ণাঙ্গিনীর তাজা হৃৎপিণ্ড জুড়ে দেন। ১৮ দিন বেঁচে থাকবার পর তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ডঃ ব্লেবার্গের দেহে অস্ত্রোপচার নিয়ে এ পর্যন্ত যতদূর জানা যায়, সারা দুনিয়ায় তিনবার মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতিরোপণ করা হল। দ্বিতীয়টি করেছিলেন ডঃ কানট্রোভিৎস নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে অবস্থিত এক হাসপাতালে এক আড়াই সপ্তাহ বয়সের শিশুর উপর। শিশুটি অস্ত্রোপচারের পর ৬½ ঘণ্টা বেঁচে ছিল। কিছু দিন আগে খবরের কাগজে একটি কুকুরের ছবি ছাপা হয়েছিল, যেটি বেশ ভালভাবেই বেঁচে ছিল শরীরের মধ্যে এক জোড়া হৃৎপিণ্ড নিয়ে, যার একটি ছিল প্রতিরোপিত। খবরটি এসেছিল রাশিয়া থেকে। এবং আচার্য বার্নার্ড বলেছেন যে, এই ধরনের অস্ত্রোপচারে তিনি রুশ চিকিৎসকদের পদ্ধতি থেকে অনেক কিছু শিখেছেন।

শরীরের অংগ-প্রত্যংগ ও যন্ত্রের প্রতিরোপণ কতকগুলি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যে আজকাল হামেশাই হচ্ছে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ২০০০ জন বৃক্ক রোগগ্রস্ত মানুষের দেহে অন্য বৃক্ক প্রতিরোপণ করা হয়েছে।

এই ধরনের দেহযন্ত্র প্রতিরোপণের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয় এই যে, রোগীর হৃৎপিণ্ডের টিসুর সঙ্গে প্রতিরোপণীয় হৃৎযন্ত্রটির টিসুর পুরোপুরি মিল প্রায়ই হয় না।

কোন রোগীর দেহে রক্তদান করার সময় যেমন রক্তের গঠনের মিল না হলে সে রক্ত দেওয়া চলে না, টিসুর ক্ষেত্রেও তাই। তবে মানুষ একদিন এই বাধা নিশ্চয়ই জয় করবে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে এমন দিন আসার সম্ভাবনা আছে বলে শল্যচিকিৎসকরা আশা করেন, যখন জীবজন্তুর হৃৎপিণ্ড মানুষের শরীরে প্রতিরোপণ করা এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হৃৎপিণ্ডের জায়গায় এমন যান্ত্রিক পাম্প বসিয়ে দেওয়া যাবে, যা হৃৎপিণ্ডের বিকল্প হিসাবে কাজ করবে।

এই প্রসঙ্গে একটি অতি আফসোসের কথা না বলে পারছি না। বর্ণবিদ্বেষবিরোধী ফরাসী কমিটির দ্বারা প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, বর্ণবৈষম্যমূলক দক্ষিণ আফ্রিকায় — যেখানে হাজারে হাজারে কালা আদমিদের বিনা বিচারে বন্দীশালায় রাখা হয়েছে, সেখানে শ্বেতাংগ জাতির মানুষের শরীরে হৃৎপিণ্ড প্রতিরোপণের জন্য হৃৎযন্ত্র সংগ্রহকল্পে ঐসব কাফ্রিদের হত্যা করা কিছু আশ্চর্য নয়। সেইজন্য বন্দীদশায় কারো হৃৎপিণ্ড সংগ্রহকে আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ ঘোষণা করা কর্তব্য।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

(তিন)

খুঁজতে একবার আরম্ভ করলে খোঁজার নেশা ক্রমশ পেয়ে বসবে। যা কখনও দেখিনি তা দেখতে পেলে যত না আনন্দ তার চেয়েও বেশি আনন্দ যা দেখেও দেখিনি তাকে নতুন করে দেখতে পেলে, খুঁজে পেলে তার নিহিত অর্থ। যে দার্শনিক জীবন মৃত্যুর ভারসাম্যের মান খুঁজছে, যে বিজ্ঞানী খুঁজছে বিশ্বরহস্যের চাবি, তারা সকলেই সেই চিরকেলে ক্ষ্যাপা যে পরশ পাথর খুঁজতে, অজস্র নুড়ি কুড়িয়ে বেড়ায়, পেয়েও ভ্রূক্ষেপ করে না, খোঁজার আনন্দে মশগুল হয়ে পরশ পাথর ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে নুড়ি খুঁজতে শুরু করে।

এমনি করেই খুঁজতে খুঁজতে অনাদি প্রসাদ একদিন এসে পড়লেন বই-পাড়ায়। কলেজ স্কোয়ার পেরিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং, আশেপাশের ফুটপাথ, মুদির দোকানের মত ছোট ছোট প্রকাশক ভবন। ছাত্র অনাদিপ্রসাদ এই ফুটপাথ থেকেই সস্তায় কলেজের বই কিনতেন, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন নামকরা লেখকদের গল্প উপন্যাসের মলাটগুলো। সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা ছিল। স্বপ্ন দেখতেন তাঁর বই ছাপা হচ্ছে, পাঠকরা কিনছে, সমালোচনা বার হচ্ছে কাগজে। স্বপ্ন সকলেই দেখে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবে তা পরিণত হয় না। ব্যতিক্রম অনাদিপ্রসাদ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস সাহিত্য জগতে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ভাগ্যবান তিনি, লেখক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বেড়েইছে, কমেনি একরত্তি।

লেখক অনাদিপ্রসাদ এ বই পাড়ায় আসলেও রেলিং বা ফুটপাথের দিকে বড় একটা নজর দিতেন না, সোজা গিয়ে ঢুকতেন বিভিন্ন প্রকাশ ভবনে। সর্বত্রই তাঁর অবারিত দ্বার। সকলেই খাতির করে, আর করবে নাই বা কেন, অনাদিপ্রসাদের বই ছাপালে পাঁচ ছটি সংস্করণ হবে নির্ঘাত, সে বিষয়ে কারও সংশয়ের অবকাশ নেই।

প্রথম জীবনে আসতেন ট্রামে বাসে, এখন আসেন গাড়িতে। ফুটপাথ আর রেলিং-এর বই-এর সঙ্গে সম্পর্ক কেটেই গিয়েছিল বলতে গেলে। আজ আবার এতদিন বাদে সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে মনে হল বহুকাল আগে যে ছোট্ট বাসায় ভাড়া ছিলেন সেইখানে যেন ফিরে এসেছেন।

অনেকক্ষণ ধরে ফুটপাথে পায়চারী করে রেলিং-এ টাঙানো বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখে বিশ বছর আগের দেখা চিত্রের সঙ্গে আজকের খুব একটা পার্থক্য খুঁজে পেলেন না। সেদিনের মত আজও সচিত্র মোটা মোটা রামায়ণ মহাভারত ঝুলেছে, রয়েছে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী, সেইরকমই সায়েন্স আর আর্টস-এর দামী দামী টেকস্ট বুক, কিছু ডিকসনারী, বহু বছর-এর পুরোন এনসাইক্লোপিডিয়ার সেট। সেই রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ, হয়ত তার আধুনিক সংস্করণ। নতুন সংযোজন-এর মধ্যে দেখা গেল কিছু কিছু সদ্য প্রকাশিত বইও রেলিং-এ শোভা পাচ্ছে। হয় দপ্তরীর কারসাজী, না হয় তো বাজারে বিক্রী হচ্ছে না বলে প্রকাশকই ভার লাঘব করতে কম দামে বই ফুটপাথে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে নূতন ও পুরাতনের সহ অবস্থান নীতি ।

বই-এর মেলার পার্থক্য নজরে না পড়লেও বিশ বছরে এই অঞ্চলের পরিবেশ যে অনেক বদলেছে তা বুঝতে বেশি দেরী হল না। হঠাৎ একটা হল্লা উঠল, চীৎকার, চেঁচামিচি, শ্লোগান।

—কি ব্যাপার মশাই?

—কলেজের ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে।

—কি নিয়ে।

—একদল ক্লাস করতে চায়, আরেক দল তাদের করতে দেবে না।

দেখতে দেখতে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সোডার বোতল ফাটছে। উপর থেকে সশব্দে পড়ছে থান ইঁট। বন্ধ দরজায় দুমদাম আওয়াজ।

দোকানীরা এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রেলিংএর বই ঝুপঝাপ ঢুকে গেল ট্রাঙ্কের মধ্যে। বড় বড় দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ট্রাম বাস দাঁড়িয়ে পড়ল দূরে দূরে, যুদ্ধক্ষেত্র বাঁচিয়ে।

সাধারণ লোক ছিটকে পালিয়ে গিয়ে মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বিনাপয়সার হাডুডু খেলার দর্শকের মতো সকৌতুকে দেখতে লাগলো শ্রাদ্ধ কত দূর গড়ায়। অনাদি-প্রসাদ তাদের সঙ্গ নেননি; পেছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সদ্য বন্ধ হওয়া বই-এর দোকানের সিঁড়িতে।

ইতিমধ্যে জনকয়েক আহত হয়েছে, শোনা যাচ্ছে তাদের আর্তনাদ, অন্যদের শ্লাঘা। দু' একটা পটকাও ফাটছে। কোথা থেকে একরাশ ধোঁয়া ভেসে এল। কোন দাহ্য পদার্থে আগুন লাগান হয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি পটপরিবর্তন হওয়া সম্ভব অনাদিপ্রসাদের কোন ধারনা ছিল না। ঠিক যেন পেশাদার মঞ্চে নাটক দেখছেন।

একটি লোক দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে অনাদিপ্রসাদের পাশে সিঁড়ির উপর আশ্রয় নিল। দেখলে বয়েস বোঝা যায় না, ফর্সা রং, চোখের তলায় কালি, মুখে আত্ম-বিশ্বাসের অহঙ্কার, পরনে প্যান্ট, তার ওপরে ঝোলান সার্ট, হাতে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ, মুখটা জীপ দিয়ে বন্ধ। অনাদিপ্রসাদের দিকে না তাকিয়েই দূরের আগুন লক্ষ্য করে বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে, কেমন মজা দেখছেন?

—কিছুই বুঝতে পারছি না।

—স্রেফ্ কেলোর কীর্তি। অ্যামেচার দিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। ব্যাটারা ঠিকমত একটা সোডার বোতল ছুঁড়তে জানে? না পারে ভড়কি দিয়ে বাস জ্বালাতে। পুলিস এসে টীয়ার গ্যাস ছুঁড়লে পারবে সেই শেল তুলে নিয়ে পুলিসকে মারতে? ভাল মানুষের ছেলেরা কেঁদে ককিয়ে মরবে, তবু ব্যাটারা আমাদের ডাকবে না।

অনাদিপ্রসাদের বিস্ময়, কেন?

—আমরা তো আর অ্যামেচার নই, প্রফেশ্যানাল, আমাদের কাজে লাগাতে হলে পয়সা ছাড়তে হবে তো। আমাদের শ্লোগান, ফেল কড়ি মাখ তেল। কত ছেলে চান, চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিন, সারি সারি দাঁড় করিয়ে দেব। ডানপিটে, বেপরোয়া, তারা প্রাণের মায়া করে না। জান লড়িয়ে দেবে।

—কিসের জন্যে?

লোকটি হিঁহি করে হাসে, সে যেরকম চাইবেন, আন্দোলন করতে বললে করবে, আবার যদি কারুর আন্দোলন বন্ধ করাতে

সরস্বতীর বাহন, সে কারণে নয়, এ'রা সোনার ডিম পাড়ে বলে।

বলাই বাহুল্য, অনাদিপ্রসাদের হয়ে জামিন দাঁড়াতে সুনীল রায় একটুকু ইতস্তত করলেন না। যেখানে সই করতে বললেন করে পরের দিন অনাদিপ্রসাদকে কোর্টে হাজির করার স্বীকৃতি জানিয়ে, পুলিস অফিসারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, অনাদিপ্রসাদকে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ি করে বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে রওনা হলেন।

যদিও সুনীল রায় তাঁর রাজহাঁসের জন্য জামিন হয়ে, পুলিস যে ভুল করে অনাদিপ্রসাদকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তা সদম্ভে ঘোষণা করে চলে এসেছেন, কিন্তু লেখকের সংগে পাশাপাশি বসে কিছুতেই কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার বলুন তো, আপনি হঠাৎ এই হাঙ্গামার মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন।

অনাদিপ্রসাদের নিস্পৃহ উত্তর, জড়াইনি তো, শুধু দেখছিলাম।

—কি দেখছিলেন?

—জীবন।

—হঠাৎ?

—এতদিন তো শুধু লিখেছি, কিছুই দেখিনি। এখন তাই শুধু দেখছি; খুঁজছি, কিছু লিখছি না।

সুনীল রায় আঁতকে ওঠেন, আপনারা না লিখলে আমাদের চলবে কি করে?

অনাদিপ্রসাদ চলমান গাড়ি থেকে রাস্তার দিকে নজর রেখে উত্তর দেন, আপনাদের না চললে আমারও চলবে না, কিন্তু তাই বলে সাহিত্যে আর ভেজাল মেশাতে পারব না।

—কি বললেন?

—তেল ঘিতে ভেজাল দিচ্ছে বলে আমরা প্রতিবাদ করি, ওষুধে ভেজাল বলে আমরা চেঁচাই, কিন্তু জেনে বুঝে আমরা যে সাহিত্যে ভেজাল দিচ্ছি তার বিরুদ্ধে কারা আন্দোলন করবে বলতে পারেন?

বিচক্ষণ প্রকাশক সুনীল রায় এবার কিন্তু শিউরে উঠলেন। সাহিত্যের রাজহাঁসরা সোনার ডিম পাড়ে এই তিনি এতদিন জানতেন, কিন্তু তারা যে আবার ধর্মগুরুদের মত ফতোয়া জারি করতে চায় এ তাঁর ধারনা ছিল না। এ প্রসংগ থামিয়ে দেবার জন্যে বললেন, সারাদিনে আপনার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আজ বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে এ নিয়ে কথা বলব।

অনাদিপ্রসাদ কিন্তু শুনলেন না, একটা সিগারেট ধরালেন, নির্ভীক স্বরে বললেন, ময়দানের কাছে গাড়ি থামান আমার কিছু বলার আছে।

গাড়ি থামল।

ফাঁকা মাঠ। শীতের সন্ধ্যার অন্ধকার, রাস্তায় নিয়নের আলো। দূরে ভিক্টোরিয়ার সামনে গাড়িওয়ালা লোকেদের ভীড়।

অনাদিপ্রসাদ নেমে পড়লেন মাঠের মধ্যে। সুনীল রায় বাধা দেবার চেষ্টা করেন, এ কি করছেন, ঠাণ্ডা লেগে যাবে, নির্ঘাত হিম পড়ছে।

অনাদিপ্রসাদ ঠাট্টা করে বলেন, গায়ের শালটা দিয়ে মাথায় ঘোমটা দিন। আঃ, এই ফাঁকার মধ্যে এসে একটু আরাম লাগছে।

কিছুক্ষণ দুজনে নীরবে হাঁটলেন। সুনীল রায় ইচ্ছে করেই কোন কথা বললেন না অনাদিপ্রসাদকে সুযোগ দেবার জন্যে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ইঞ্জিনের হ্যাচকা টানে হঠাৎ যেমন রেলগাড়ি চলতে শুরু করে, তেমনিভাবেই কথা শুরু করলেন অনাদিপ্রসাদ, শহরে বাস করার এই বোধহয় সবচেয়ে বড় বিপদ, অন্যের সংগে যোগসূত্র আমরা হারিয়ে ফেলি, নিজের অজান্তে একক হয়ে যাই। ভাবুন তো আপনারা আমার কথা। আমরা বাড়িতে থাকি, গাড়ি করে বেরুই, পরিচিত দুচারজনের সংগে মিশি, নিজেদের কাজ করি। একটা ধারায় চলি, তার এপাশ ওপাশে কি আছে দেখবার অবকাশ হয় না। এতটুকু জগতের মধ্যে বাস করে একজন লেখকের পক্ষে পাঠককে কি দেওয়া সম্ভব। প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার জাবর সে এখনও কেটে চলে যতদিন যায় তত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কমে, অথচ জনপ্রিয়তা বাড়ে, ফলে সাহিত্যে ভেজাল না দিলে তার চলে না।

সুনীল রায় মন দিয়ে তাঁর রাজহাঁসের কথা শুনছিলেন, তবে অনেকখানি বুঝতে পারছিলেন না, তাই সরাসরি প্রশ্ন করেন, এসব কথা হঠাৎ আপনার মাথায় এল কি করে? আগে তো এরকম বলতে শুনিনি।

অনাদিপ্রসাদ স্বীকার করলেন, হঠাৎই বটে। গত মাসে আমার জন্মদিনে— সেদিন তো আমি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। আপনার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। চেক নিয়ে এলাম বৌদির হাতে।

—হ্যাঁ, সেইদিন থেকেই। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, অনেকে এসেছিলেন দেখা করতে। ফুলের উপহারে পড়ার ঘরটা ভরে গিয়েছিল। বাড়ির সকলেই হাসি খুশী, ফিল্মের জন্যে একটা বই বিক্রী হল। মোটা অঙ্কের টাকা অগ্রিম পেলাম। ঘন ঘন টেলিফোন বাজছে। যাঁরা আসতে পারেননি, শুভকামনা জানাচ্ছেন। খানকয়েক গ্রীটিংস্ টেলিগ্রামও এল। নিজেরই বেশ লাগছিল।

অনাদিপ্রসাদ থামলেন, বোধহয় ভাবছিলেন সেই দিনটারই কথা।

সুনীল রায় প্রশ্ন করেন, তার পর?

নাড়া খেয়ে ঘড়ি আবার চলতে শুরু করে, সন্ধ্যের পর বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয়ের খাবার কথা ছিল। সারাদিনই বাড়িতে বসেছিলাম, ভাবলাম বিকেলে একটু বেড়িয়ে আসি। বাড়ির সবাই কাজে ব্যস্ত, একলাই গাড়ি করে এলাম ভিক্টোরিয়ার, ভেতরে ঢুকলাম। সবে তখন আলোগুলো জ্বলছে, পরের দিন থেকে একটা নতুন লেখা শুরু করার কথা, সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম কিস্তি। গল্পটা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে দ্রুত পায়ে আমার দিকে আসছে। খুব বেশী হলে উনিশ কুড়ি বয়েস হবে। বেশ সুন্দরী, আধুনিক সাজপোশাক।

অনাদিপ্রসাদ আবার থামলেন, মৃদু হেসে বললেন, অহমএ সুড়সুড়ি লাগল। ভাবলাম, মেয়েটি নিশ্চয় আমায় চিনতে পেরেছে, নিশ্চয় আসছে আমার অটোগ্রাফ সংগ্রহ করতে। হাতে কাগজ বা খাতা নেই, কে বলতে পারে হয়ত দশ টাকার নোট মেলে ধরবে তার উপর স্বাক্ষর করে দেবার জন্য। কিন্তু আশ্চর্য মেয়েটি আমার কাছে এসে থামল। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল। এখন কটা বেজেছে?

হাতঘড়ি দেখে সময় বললাম। লক্ষ করলাম মেয়েটির হাতেও ঘড়ি রয়েছে, সময় একই, তবে অকারণে সময় জিজ্ঞেস করার কারণ বুঝলাম না।

মেয়েটি আমার সংগে পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল, বলল, আজকের ওয়েদারটা বেশ ভাল, তাই না? ঠাণ্ডা পড়েছে, অথচ খুব বেশী নয়। এইরকম আমার ভাল লাগে।

কিছু উত্তর দেবার ছিল না। তবু বললাম, সারা বছরের মধ্যে এই দু' একটা মাসই তো কলকাতায় যা ভাল।

—লোকেরা পিকনিকে যেতে পারে, রোদে খেলাধূলা করতে পারে, ক্রিকেট, টেনিস, সবেরই তো এই সীজন।

নিজের মনেই মেয়েটি অনেকক্ষণ বকবক করে হঠাৎ প্রশ্ন করল, আপনার বিকেলে বেড়ানোর অভ্যেস আছে বুঝি?

বললাম, হাঁ, সময় পেলে রোজই কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাই।

মেয়েটি হাসল, কথাটা কেন তুললাম জানেন? বেড়ানোর অভ্যেস বাঙালীদের নেই। দেখুন না এই ভিক্টোরিয়ায় ক'জন

বাঙালী বেড়াতে আসে। সবাই ঘরকুনো, বাড়িতে বসে থাকে, না হয় আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যায় আর খুব বেশী হলে সময় কাটায় সিনেমায়। নেচার-এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আই হেট্ ইট্। কথার ধরনে একটু অবাক হয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বুঝি খুব বেড়াও?

—সারাক্ষণ তো ঘুরে বেড়াই। যেখানে সেখানে। কলকাতা, কলকাতার বাইরে। মাঠে, ঘাটে। বাড়িতে থাকতে আমার বিশ্রী লাগে।

কথায় কথায় আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েটি হঠাৎ বলল, কিছু যদি মনে না করেন, ঐ গেটটা পর্যন্ত আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন?

—কেন?

—সেই তখন থেকে একটা ছেলে আমাকে ফলো করছে।

আমি পেছন ফিরে তাকালাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

মেয়েটি মন্তব্য করল, ঠিক কোথাও লুকিয়ে আছে। আপনার সঙ্গে হাঁটছি বলে বিরক্ত করছে না। প্লীজ, ঐ গেটটা পর্যন্ত এগিয়ে দিন, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব।

অনুরোধ মত মেয়েটিকে এগিয়ে দিলাম। গেটের বাইরে থেকে হাসি মুখে সে হাত নাড়ল, অনেক ধন্যবাদ, আবার হয়ত কখনও দেখা হবে।

ট্যাক্সীতে উঠে মেয়েটি চলে গেল।

আমি আবার ভিক্টোরিয়ার চক্কর দিতে শুরু করলাম। কিন্তু কিছুতেই মেয়েটিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। বার বার নিজের মনকে প্রশ্ন করেছি, এ মেয়েটি কে? কোন সমাজের? কোন যুগের? এদের তো আমি দেখিনি, চিনি না। তবে আমার উপন্যাসে যে সব অষ্টাদশীর কথা লিখি, তারাই বা কারা? তারা কি শুধু আমার কল্পনাপ্রসূত, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন।

ভাবত ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। আত্মীয়-দের খাওয়ার পালা চুকল, কিন্তু ভাল করে কারুর সঙ্গে গল্প করতে পারলাম না। সবাই চলে গেলে বিছানায় গিয়ে শুলাম, কিন্তু ঘুমতে পারলাম না। সারা রাত ছট-ফট করেছি। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন উপন্যাসে যেসব চরিত্র সৃষ্টি করেছি, তাদের সবাইকে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন সুনীলবাবু, পনেরটির বেশি চরিত্র খুঁজে পেলাম না। জীবনের শুরু থেকে এদের আমি চিনতাম, জানতাম। তাদের ভালবেসেছিলাম। তাদের সুখে হেসেছি, দুঃখে কেঁদেছি, তাদের কথা লিখে সাহিত্যজীবনে আমার স্বীকৃতি। কিন্তু তারপর? আর কোন নতুন চরিত্রের সংযোজন হয়নি। বিভিন্ন উপন্যাসে তারাই ঘুরে ফিরে এসেছে হয়তো পোশাক বদলে চেহারা পাল্টে। কিন্তু মানুষগুলো সেই এক। যে আঠার বছরের মেয়ের কথা আমি আজও লিখছি, সে বাস্তবে ছিল, আমার বয়েস যখন পঁচিশ। তার মানে এই দীর্ঘ দিন ধরে জনপ্রিয়তার শিখরে বসে আমি নতুন উপন্যাসের নামে কি ভেজাল সাহিত্য উপহার দিয়েছি পাঠকদের! অনাদিপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, সেই দিন থেকে কলম থামিয়েছি। আর মিথ্যে কথা লিখে নিজের পাপ বাড়াব না, জীবনকে দেখবার চেষ্টা করছি, বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজছি।

বিহ্বল সুনীল রায় অস্ফুট স্বরে বলেন, গত জন্মদিনে?

অনাদিপ্রসাদের ততোধিক অস্ফুট স্বগতোক্তি, কে বলতে পারে ঐ দিন থেকে হয়ত আমার নতুন জন্ম হল।

(ক্রমশঃ)
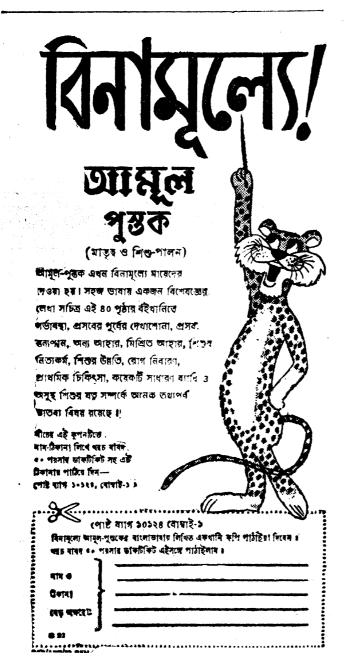
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আর্থিক সংকট

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চেহারার যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। দুঃখের বিষয়, এই পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়েছে। যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে যখন বাতিল করা হয়, তখন বর্তমান আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গের মোট রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি টাকা; প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট সরকারের আমলে সেই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০ কোটি টাকা (ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত)। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সংকট আর কখনও এত তীব্র হয়নি। চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সাহায্যের অনুপাত বেশ কিছু কমে গেছে। অবশ্য বর্তমান আর্থিক সংকটের মূল কারণ তা নয়। এই আর্থিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত আছে আরও কয়েকটি সমস্যার—যেমন, এই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের শিল্পমূলধন এবং বিনিয়োগের ক্রম-প্রবাহ, শিল্পে মন্দার সৃষ্টি এবং উৎপাদন হ্রাস, খাদ্য সংগ্রহ নীতির ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব ঘাটতির মূল কারণ রাজ্য সরকারের ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধি। যে হারে খরচের পরিমাণ বেড়েছে সে হারে আয় বাড়েনি। কেন্দ্রীয় সরকারকে যদি বাজেট-ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয় তবে নূতন মুদ্রা চালু করে সেই ঘাটতি দূর করা সম্ভবপর। তাছাড়া নূতন করের সৃষ্টি করে রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে নূতন মুদ্রা চালু করা সম্ভব নয়—নূতন কর ধার্য করার ক্ষমতাও রাজ্য সরকারের পক্ষে সীমায়িত। রাজ্য সরকার বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারেন বটে, কিন্তু গত দুই বছর এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা খুব আশাপ্রদ নয়। সুতরাং আর্থিক দুর্গতি মোচনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষে বিকল্প কোন উপায় আগেও ছিল না এখনও নেই। কংগ্রেসী সরকারের আমল থেকেই আর্থিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি একটু অনুদার মনোভাব দেখাচ্ছেন, তা আমরা দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক আর্থিক সংকটের তীব্রতা হয়তো আরও কম হত, যদি পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে কেন্দ্রীয় সরকার আরও সহৃদয় দৃষ্টি রাখতেন। এ কথা ভুললে

চলবে না, দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তু আগমন এবং নানাবিধ অর্থনৈতিক চাপে পশ্চিমবঙ্গকে যতটা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, আর কোন রাজ্যকেই তত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু সেই অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গকে যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা উচিত ছিল, সেই পরিমাণ সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার দেননি।

পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক সংকটের তীব্রতা আরও বেড়েছে শিল্পে মন্দা এবং উৎপাদন হ্রাসের দরুন। গত এক বছরে বিভিন্ন কল-কারখানায় অবিশ্রান্ত ঘেরাওয়ের ফলে যে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং অনেক কারখানা অচল হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি অনিশ্চয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং বেশ কিছু পরিমাণ শিল্প-মূলধন এবং বিনিয়োগ-প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যে চলে গেছে। শিল্প-ঘেরাওয়ের ফলে কর্মচারী ছাঁটাই এবং বেকার সমস্যা আরও বেড়েছে, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক শ্রমিক ছাঁটাই ঘেরাওয়ের কারণ হয়েছে। ঘেরাওয়ের ফলে অনেক কারখানাই নিজেদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে এবং এর মারাত্মক প্রভাব দেখা গেছে উৎপাদন ক্ষেত্রে। পি ডি এফ সরকারের আমলেও গত দুই মাসে শিল্প-পরিস্থিতির উন্নতি খুব সামান্যই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ীগণের বিনিয়োগ স্পৃহাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করা দরকার।

খাদ্য সংগ্রহ নীতির ব্যর্থতা

খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ক্ষোভের বিষয় খাদ্য সমস্যার গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার পরেও এখনও পর্যন্ত খাদ্য সংগ্রহের একটি সুষ্ঠু নীতি অনুসৃত হয়নি। নভেম্বর মাস থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত যেখানে চাল সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল তিন লক্ষ টন সেখানে নভেম্বর মাস থেকে ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে মাত্র ৪৬,০০০ টন। খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য শুধু ফুড কর্পোরেশনকে দায়ী করে লাভ নেই। সরকারের দিক থেকে হাস্কিং মিলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং নিজের দায়িত্বে নূতন চালকল খোলার জন্য যতটা দৃঢ়তা থাকা উচিত ছিল, তা দেখা যায়নি; তাছাড়া জোতদারদের কৃত্রিম খাদ্য সঞ্চয় নীতি বানচাল করার জন্য যে সুষ্ঠু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল, তারও অভাব দেখা গেছে। খাদ্য নিয়ে যাঁরা চোরাকারবার করেন, তাঁদের কঠোর শাস্তি প্রদানের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত খুব দেখা যায়নি। খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতারও যথেষ্ট অভাব দেখা যাচ্ছে। সরকার খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকারও আশানুরূপ খাদ্য সরবরাহ দিয়ে যেতে পারছেন না। খাদ্য সংগ্রহের কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমরা আশা করব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও একটি সুষ্ঠু খাদ্য সংগ্রহ নীতি রূপায়ণের চেষ্টা করবেন। সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতির ক্ষেত্রে শুধু উদ্দেশ্যের আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে প্রয়োজন সেই নীতি ফলপ্রসূ করার উপযুক্ত দৃঢ়তা। খাদ্যে স্বাবলম্বী হতে পারলে অনেক অর্থনৈতিক সমস্যারই সমাধান হবে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন না বাড়লে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোও সম্ভবপর হবে না; কারণ শিল্পোৎপাদন বাড়াবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচামাল সরবরাহ থাকা দরকার।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা

সম্প্রতি মাদ্রাজে নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার মূল্যায়ন করা হয়েছে। সম্মেলনের সভাপতি ডক্টর এন এম মাথুর পরিকল্পনা কমিশনের পুনর্গঠনের সুপারিশ করেন, যাতে দেশের অর্থনীতিবিদদের সুচিন্তিত মতামত থেকে পরিকল্পনা কমিশন লাভবান হতে পারেন। অধ্যাপক সি এন ভকিল মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দিতে পারে এমন অর্থনৈতিক নীতি পরিত্যাগ করার সুপারিশ করেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা যে পাশাপাশি চলতে পারে সে

বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক লাকড়াওয়ালা ভারতে বৈদেশিক মূলধন প্রাপ্তির বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষত অত্যধিক সার্ভিস চেঞ্জ-এর কথা উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহণমন্ত্রী ডক্টর ভি কে আর ভি রাও কিভাবে ভারতের রপ্তানি বাড়ানো যায়, নূতন ধরনের রপ্তানি-সামগ্রী তৈরি করা যায় অথবা বিদেশীদের এদেশে বেড়াতে আসার জন্য আকৃষ্ট করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। "অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব" সম্পর্কে আলোচনা-চক্রে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব লেবার ইকনমিক্স-এর সম্মেলনও একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে ডক্টর বলজিৎ সিং কর্মসংস্থান নীতির মধ্যে যে ফাঁক আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'অর্থনৈতিক তত্ত্বের বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক আলোচনায় যোগ দেন ডক্টর ব্রহ্মানন্দ, ডক্টর গৌতম মাথুর, শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম, ডক্টর সুব্রতেশ ঘোষ প্রভৃতি। বর্তমান লেখকও আলোচনায় যোগদানকারীদের মধ্যে একজন।

সুব্রত গুপ্ত

অনেক সময়ে সারারাত ধরেও প্রেসের কাজ দেখতেন। সরস্বতীর বর্তমান প্রোডাকসন ম্যানেজার মহেন্দ্রবাবুর তো কুলি, কম্পোজিটার, মেশিন-ম্যান, প্রুফরীডারির অমানুষিক খাটুনি খেটেও অনেকদিন ভাতই জুটতো না।

শৈলেনবাবু তাঁর নিজের সম্বন্ধে বললেন, আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহায়তায় সুরেশবাবুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে শৈলেনবাবু হাতে কলমে কাজ শিখেছিলেন। এ-কথা তিনি সকৃতজ্ঞভাবে বললেন। তার আগে নাকি তিনি সত্যজিৎ রায়ের পরলোকগত পিতা কবি ও হাস্যরসিক সুকুমার রায় মশায়ের আমলে ইউ-রায় অ্যান্ড সনসের মুদ্রণ বিভাগেও কিছুদিন শিক্ষানবিশী করেছিলেন।

এই হলো শ্রীসরস্বতী প্রেসের জন্মকথা। সামান্য তিন হাজার টাকার পার্টনারশিপের ছোট্ট ছাপাখানা থেকে আজকের এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের শেয়ালদার ভাড়া বাড়িতে এবং নিজস্ব ৭২ বিঘা জমির উপরে বেলঘরিয়ার প্রকাণ্ড বাড়িতে আধুনিক লেটার-প্রেস আছে পঞ্চাশটিরও বেশী, ফটো-অফসেট মেশিন আছে আটটি, ব্লক মেকিং আছে, সিল্কস্ক্রীন প্রিণ্টিং আছে, পাঁচটি লাইনো ও চারটি মনোটাইপ মেশিন আছে, সর্ট-কাস্টার ও সুপার-কাস্টার টাইপ-তৈরির মেশিন আছে—যে টাইপ তাঁরা বাজারেও বিক্রী করে থাকেন; আর আছে দ্রুততম বেগে ছাপার উপযোগী ৩৬"×৫০" সাইজের কাগজে একসঙ্গে কাগজের দুই পিঠে ৬৪ পৃষ্ঠা করে ঘণ্টায় ৬৫০০ কপি মুদ্রণ শক্তিসম্পন্ন 'লেটার-প্রেস শীট-ফেড্ পারফেকটর রোটারি প্রেস'। অতি আধুনিক, ছয় লক্ষ টাকা দামের এই অতিকায় যন্ত্রটি ১৯৬৭-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে চালু করা হয়েছে। এটি জার্মানিতে তৈরি।

প্রসংগত বাঙালীর মালিকানায় অন্যান্য বড়ো বড়ো প্রেসের বিষয়ে শৈলেনবাবুর সংগে আলোচনা হলো। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ছাড়াও ঈগলের হৃষীবাবু, গোসেনের নীরদবাবু, লালচাঁদ রায়ের লালচাঁদবাবু, নাভানার গোপাল রায়, লয়াল আর্টের নারায়ণ লাহিড়ী, রেডিয়্যাণ্টের মুখোপাধ্যায়দের, ইটনা প্রেসের কানাই ও বলাই চট্টোপাধ্যায়ের, নবমুদ্রণের ব্রজদুলাল সেনের, ক্যাক্সটনের অরুণ ঘোষের, রায় কোম্পানীর শুভেন রায়ের এবং অন্যান্য কয়েকজন মুদ্রকের সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা শৈলেনবাবুর মুখে শুনলাম।

এর পরেই গুহরায় মশায়কে আমার মূল প্রশ্নে ফিরিয়ে আনলাম। সমস্যা ও সমাধান।

শৈলেনবাবুর নির্দেশে তাঁর একান্ত সচিব হরেনবাবুই আমার হাতে দিলেন 'বঙ্গীয় মুদ্রক সমিতি'-র ১৯৬৭ সালে অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি শ্রীকালীচরণ পাল (নবজীবন প্রেস) মহাশয়ের অভিভাষণের একটি কপি। সম্পূর্ণ অভিভাষণটি দীর্ঘ। কিছু কিছু উদ্ধৃতি থেকেই আমার প্রশ্নের উত্তর অনেকটা পাওয়া যায়: "স্বাধীনতার পরে ভারতের দ্রুত উন্নতি এবং শিক্ষাপ্রসারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বাহন মুদ্রণশিল্প।...আজ সমগ্র পৃথিবীতে মুদ্রণ পারিপাট্যের উপযোগী নব নব যন্ত্রাদি আবিষ্কার হইতেছে।...মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান মুদ্রক ব্যতীত গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধারণভাবে মুদ্রক গোষ্ঠী সরকারী আমদানী নীতির বাধা অতিক্রম করিয়া নূতন যন্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই। মূলধনের অভাব, নূতন মেশিনের আকাশস্পর্শী দাম এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালের মধ্যে পুরাতন মেশিন পরিবর্তন করা বা আধুনিকীকরণের কল্পনাও তাঁহারা করিতে পারেন না।...মুদ্রণের দরের সহিত পড়তার কোনও সম্বন্ধ নাই। মৌলবস্তুর দাম বাড়িতেছে, শ্রমিকের মজুরী বাড়িতেছে, সরকারী ট্যাক্স বাড়িতেছে, মুদ্রকদিগের পারিবারিক খরচ বাড়িতেছে অথচ কাজের দাম সেই অনুপাতে বাড়িতেছে না।...সমস্যা অনেক। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক সমস্যা শ্রমিক অশান্তি। কিছুকাল ধরিয়া, বিশেষভাবে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে, শ্রমিক আন্দোলন আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া আছে।...ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানই আজ নিশ্চিন্তে অর্ডার লইতে পারেন না।..."

মুদ্রণ শিল্পের আগামী দিনের কর্মীদের প্রশিক্ষার অব্যবস্থার প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে কালীচরণবাবু বলেছেন, "আর একটি সরকারী অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রিণ্টিং স্কুল সম্বন্ধে। পশ্চিম বাংলার প্রিণ্টিং স্কুল স্থানীয় মুদ্রকদিগের চেষ্টা সহযোগিতা এবং বদান্যতায় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে শিল্পের প্রতিনিধি নাই। ক্রীড়াবিদদের দ্বারা ধর্মসভা পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে ছাত্র এবং শিল্প কাহারও লাভ হইবে না। আমরা সরকারের কাছে বার বার প্রতিবেদন দিয়াছি কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।"

মুদ্রকগোষ্ঠীর কোনো কোনো লোকের মুখে এর আগে শুনেছি যে, কেবল এই পশ্চিম বাংলার প্রিণ্টিং স্কুল স্থাপনেই নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও প্রেসকর্মী গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারদের উদ্বুদ্ধ করার মূলে রয়েছেন আমাদের গুহরায় মশায় নিজেই। তাই মুদ্রক সমিতির সভাপতির ভাষণটি পড়ে আমি এ বিষয়ে শৈলেনবাবুর নিজস্ব মতামত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, যে, স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুদ্রণশিল্পের গবেষণার (রিসার্চের) জন্য সরকার থেকে কল্যাণীতে ৫০ বিঘা জমি দিয়েছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তার সদ্ব্যবহার কোনো কিছুই করা সম্ভব হয়নি। এখন গুহরায় মশায় সচেষ্ট যাতে জাতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের) উদ্যোগে এই প্রশিক্ষা ও গবেষণা বিদ্যালয়টি সত্বর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

উপসংহারে আবার উঠলো শ্রমিক সমস্যার কথা অর্থাৎ আমাদের শিল্পোদ্যোগের এখন সেই গোড়ার প্রশ্ন। সে সম্বন্ধে শৈলেনবাবু বললেন যে, সরকারের মূল নীতি যদি 'ওয়ার্ক' বায়াসড না হয়ে ওয়ার্কার বায়াসড হয়' অর্থাৎ কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের পক্ষে না হয়ে সরকারের নীতি যদি শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তা হলে সমস্যার সমাধান হবে না। রুমানিয়ার মত কমিউনিস্ট দেশেও শিল্পের উৎপাদনের সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না বলে সেই রাষ্ট্র তাঁদের শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের নীতির পরিবর্তন করে সম্প্রতি জোর দিয়েছেন যাতে শ্রমিকের কর্মপটুতা পুরস্কৃত হয়। অন্যথায় দণ্ড—মাইনে কম দিয়ে। মোট কথা, রুমানীয় সরকার এখন রাজনৈতিক অনুশাসন ও নতুন নতুন শ্রমিক আইন প্রবর্তনের মত অবাস্তব উপায়ের চাইতে ভালো কাজের জন্য, বেশী উৎপাদনের জন্য নগদে অথবা বস্তুতে (মে টি রি য়া ল) পুরস্কার দেওয়াটাকেই শিল্পোন্নয়নের রাজপথ বলে ধরে নিয়েছেন। আমাদের সরকারের শ্রম বিভাগও যদি একটা সৎ, আন্তরিকতাপূর্ণ, বলিষ্ঠ নীতি গড়ে তুলে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে মালিক ও শ্রমিক পরস্পরের সমস্যা সমাধান করতে পারেন—যে নীতি শ্রমিক এম এল এ'র চীৎকার বা মালিকের বড় কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় অন্ধ না হয়—তা হলেই এই সমস্যার জটিলতা অনেকটা কমে আসে।

তা যদি না হয় তা হলে, এখন যেমন ন্যায্য দামে সময়মত ছেপে ডেলিভারি পাওয়ার আশা নেই বলে কলকাতার বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান তাঁদের লেবেল-ক্যালেণ্ডার কলকাতার প্রেসে ছাপতে না দিয়ে সুদূর মাদ্রাজের দ্রুত প্রগতিশীল শিবকাশি শহর থেকে ছাপিয়ে আনাচ্ছেন, তেমনি বাঙালীর রাজনীতি-নেশায় মশগুল অবস্থায় হয়তো কিছুদিন পর থেকে বাঙালী ছেলেমেয়ের স্কুলের বাংলা বই 'কিশলয়'ও ছাপিয়ে আনতে হবে কাশ্মীরের পহলগাঁও অথবা নেফার বমডিলা থেকে। অর্থাৎ যে স্থানে এখন শিল্পের নামগন্ধও নেই সেখানেও হয়তো ততদিনে শিল্পোদ্যম এতটা এগিয়ে যাবে যে, নেশাতুর বাঙালী হঠাৎ একদিন চমকে জেগে উঠে দেখবে যে, শুধু মুদ্রণ কেন, সব কলকারখানাই বেহাত হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বকর্মা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
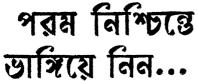
ডালহৌসি স্কোয়ার একটা নরক। সকাল বেলা নয়। তখন মানুষগুলোর কোন দিকে খেয়াল থাকে না। দ্রুতগতি, স্থিরলক্ষ্য। যেমন করেই হোক, ঘড়ির কাঁটা একটা নির্দিষ্ট স্থানে পোঁছবার আগেই দাসত্বের দরবারে হাজিরা দিতে হবে। রক্ত আর ঘামের বদলে মাসান্তে রজত-মুদ্রার নিশ্চিত প্রাপ্তিযোগ। একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ।

বিকালে কিন্তু এই মানুষগুলোরই অন্যরকম চেহারা। ঢিলেঢালা শরীর, পরিশ্রান্ত, তবু যেন কিছুটা তৃপ্তির ছাপ মুখে চোখে। বন্ধনমুক্তির তৃপ্তি। সারাটা দিন কাজের একটা অলক্ষ্য রজ্জুতে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁধা থাকে। নড়াচড়া করতে পারে না।

শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়, বিবেকও। অবশ্য যদি এদের বিবেক বলে কোন অর্থহীন অনুভূতি এখনও থাকে। অনেক দিন দাসবৃত্তি করার পর।

বিকালে ডালহৌসি স্কোয়ার একটা নরক। একজনের স্ত্রী আর একজনের স্বামীর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলতে বলতে চলে যে, তাদের দম্পতি বলে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একজনের কুমারী বোন আর একজনের ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করে বিলিতী সুপারি গাছের নীচে। জোড় বেঁধে বেঁধে এখানে ওখানে বসে। বাস-স্টপের কাছে, ট্রাম দাঁড়াবার শেডের তলায়, পার্কের আলো-আঁধারি কোণে! অনবরত বক বক বকম। ভবিষ্যতের চিন্তা, বর্তমানের অনিশ্চয়তা, নিজেদের জীবনের ছোটখাট দগদগে ঘা সেই সব গুঞ্জনধ্বনির অন্তরালে বেমালুম চাপা পড়ে যায়।

যারা জোড় পায় না, কিংবা বয়সের রোলার যাদের চেপটে এইসব উত্তেজনার অনুপযুক্ত করে দেয়, তারা দেশকালের দোষ দিতে দিতে বাড়ি ফেরে।

আড়চোখে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের ছবি কিংবা মাদকতাময় সংলাপ শুনতে শুনতে, যা দেখার কিংবা না শোনার ভান করে জাত হিসাবে আমরা কোথায় নেমে চলেছি, তার ভুল হিসাব কষে।

এক বাটি সরষে উপুড় করে দিলে যেমন সরষেগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক আকারের, এক বর্ণের। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় কে যেন ডালহৌসি স্কোয়ারে অফিসের বাটিগুলো উপুড় করে দেয়। পিল পিল করে কেরানীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরের আকারে তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু মনের চেহারা এক। একজনকে আর একজন থেকে পৃথক করে দেখা যায় না।

বড় পোস্ট অফিসের চওড়া চাতালের ওপর বসে বসে রতন দেখে। থামে হেলান দিয়ে বেশ জুতসই হয়ে বসে। বজরার ওপর থেকে যেভাবে জমিদাররা সুন্দরবনের জমিদারি দেখত, কিংবা রাজনৈতিক নেতারা আজকাল মঞ্চের ওপর থেকে ভিড়ের একটা হিসাব নেয় যে চোখে, ঠিক সেই রকম।

দুপুরবেলা সরে সরে রোদ থেকে বাঁচবার জন্য রতন একেবারে বড় পোস্ট অফিসের চাতালের ওপর উঠে পড়ে। এখানে ওখানে ছায়ার আঁচড়। লোকের কোলাহল। ছাপ লাগাবার দুপ দুপ শব্দ। রতন দেখে, শোনে।

ঠিক তার কাছে বসে মনি-অর্ডার লেখার লোকগুলো। ছোট ছোট ফুল আঁকা টিনের বাক্সগুলোকে টেবিল করে সস্তা কলমে লেখে।

পাঠাচ্ছ কাকে?

রাইমণি মহাপাত্র।

ঠিকানা?

পোস্টাপিস জয়গোবিন্দপুর। গ্রাম তিলকুঠিয়া।

ডিস্ট্রিক্ট? জিলা, জিলা?

জিলা বালেশ্বর।

লোকটা কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মুছল
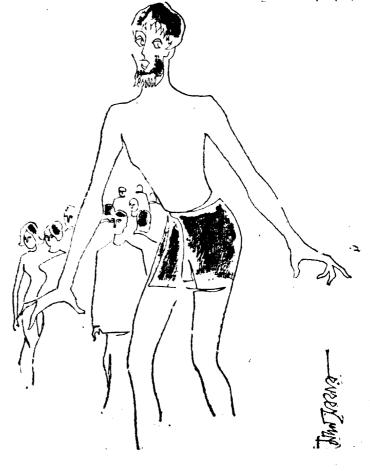
শোন, একবার পড়ি।

লোকটা সাগ্রহে উবু হয়ে বসল।

পনেরো টাকা। পাঠাচ্ছে গুণধর মহাপাত্র।

সমস্ত লেখাগুলো লোকটা পড়ে নেয়, তারপর ফর্মটা গুণধরের দিকে এগিয়ে দেয়।

লোকটা ছোটে। এর পর লাইনে দাঁড়াতে হবে। ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি। মোলায়েম গালিগালাজও চলবে।

চলুক, এ ছাড়া উপায় নেই। তের বছরের রাইমণির হাতে পনেরো টাকা পৌঁছে দেবার এটাই বাঁধা সড়ক।

দিনের শেষে রতন হিসাবটাও দেখে। যে লোকগুলো মনি-অর্ডার ফর্ম লিখে দেয়, তাদের রোজগার নিন্দার নয়। কুড়িয়ে বাড়িয়ে মন্দ হয় না। এক একজনের জন্য এক এক রকমের রেট। নতুন লোকের বেশী। এটা এ শহরের দস্তুর। নতুন লোককে এখানে খেসারত বেশী দিতে হয়। সর্বস্তরে।

মাঝে মাঝে রতনের দিকে একটা বিড়ি ছুঁড়ে দেয়। যেদিন রোজগার মনের মতন হয়। দিল খুশ থাকে।

নে পাগলা, ধরা একটা।

রতনের দিকে না চেয়ে নিজের বিড়িটা ধরিয়ে নেয়, তারপর জ্বলন্ত বিড়িটা রতনের দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখে, রতন কখন উঠে গেছে। বিড়িটা পড়ে আছে।

বিড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের পকেটে রাখতে রাখতে লোকটা বলে, শালা, নবাব। বিড়ি পছন্দ হল না।

বিড়ি পছন্দ হয়েছিল রতনের, কিন্তু সম্বোধন পছন্দ হয়নি।

নিত্যারামপুরের জগন্নাথ মুহুরীর ছেলে পাগল। আজই না হয় তার আস্তানা নেই, মাথার ওপর রোদ বৃষ্টি আটকাবার কোন নিশ্চিন্ত আচ্ছাদন, কিন্তু ক্লাসের মাস্টাররা একদিন তর পিঠ চপড়ে বলেনি, এ ছেলে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করবে!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে রতন দেখল, রাস্তার কোণের পানওয়ালীকে ঘিরে ছোটখাট ভিড়। অফিস-ফেরত বাবুরা, পোস্ট অফিসের সামনে অনেকক্ষণ ধরে লাইন দিয়ে থাকা লোকেরা যাবার সময় এক খিলি পান সওদা করছে।

রতনের মনে পড়ল, এর আগে এক বুড়ী বসত ওখানে। ঠিক একভাবে পানের ডালা সাজিয়ে। একটা লোক ভুলেও তার কাছে যেত না। পান কেনবার, পান চিবোবার কোন প্রয়োজনই তারা বোধ করেনি।

সে বুড়ী বহুদিন আসে না। বোধ হয় মরে গেছে, কিংবা অক্ষম, অপারগ।

তার জায়গায় উঠতি বয়সের একটা মেয়ে এসে বসেছে। চেহারায় চটক আছে। নাক-মুখের বাহার।

এমন ঢং দেখায় যেন পান নয়, সেই সঙ্গে নিজের যৌবনেরও কিছুটা বিক্রি করছে। পানের বোঁটায় চুন দেবার সময় মুচকি হাসে, খিলিটা বাবুদের হাতে এমনভাবে এগিয়ে দেয়, যেন হাতে নয় মুখেই তুলে দিচ্ছে।

দু-একজন পড়ন্তবয়সের বাবু, অফিসের ছোকরা বাঙালী বেয়ারা তার আঙুলে আঙুল ছুঁইয়ে চুন নেয়। বসে বসে নীচু গলায় গল্প করে। বোধ হয় রসিকতার গল্প। জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটতে কাটতে মেয়েটা হেসে হেসে উত্তর দেয়।

নরক, নরক। এই ডালহৌসি স্কোয়ার একটা পাপের জায়গা। ধর্মক্ষেত্রে পাপের সীমা-পরিসীমা নেই, কর্মক্ষেত্রেও তাই।

রতন রাগে নেমে আসে। একেবারে বাস-স্টপের কাছাকাছি। গাদাগাদি ভিড়। ঘরে ফেরার তাগিদ আছে, এমন মানুষের দল মৌচাকে মৌমাছির মতন জমাট বেঁধে থাকে। এক-একটা বাস আসে আর ঝাঁপিয়ে পড়ে, পড়ার চেষ্টা করে। ওঠার মানুষে আর নামার মানুষে মিশে একাকার। বাস চলে গেলে দেখা যায়, ভিড় একই রকম। লোক-সংখ্যা একটুকু কমেনি।

এখানে, এই বাস-স্টপে, তিনটি মেয়ে প্রায়ই এসে দাঁড়ায়। এক বয়সের, কথাবার্তা শুনে মনে হয় একই অফিসের হয়তো।

এদের যেন ফেরার তাড়া নেই। কিংবা বাস খালি হলে উঠবে, এমন একটা অসম্ভব কল্পনা মনে নিয়ে ভিড় থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নানারকম গল্পগুজব করে।

হাঁটুর ওপর মুখটা গুঁজে রতন চুপচাপ শোনে।

এদের তিনজনের নামও রতনের জানা হয়ে গেছে। পরস্পরের সম্বোধন শুনে। রমা, নন্দিতা আর মানসী।

তিনজনে বোধ হয় একই দিকে থাকে। একই বাসে ওঠে।

অফিসের কথা বলে, বাড়ির কথা, মাঝে মাঝে নিজেদের অতৃপ্ত জীবনের কথা। নিজেদের জীবনের অতৃপ্তির কথা কিন্তু মানতে চায় না। মনকে চোখ ঠেপে। বোঝায়, বেশ আছি বাবা, কোন ঝামেলা নেই, অশান্তি নেই। যখন যা খুশি তাই করছি। শীলার অবস্থা দেখলি তো। রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের শীলা। কেমন হাসিখুশী ছিল, হাতে শাঁখা আর চুলের ফাঁকে সিঁদুর পরবার পর থেকেই মন-মরা হয়ে গেছে। বরের সঙ্গে নাকি বনিবনা হচ্ছে না। রোজ ঝগড়া, রোজ মন-কষাকষি।

নন্দিতা ভুরু কোঁচকায়, বনছে না তো বিয়ের ফিতে কেটে দিলেই হয়। নিজের স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে মহাপ্রভুদের মন রাখতে হবে নাকি?

রতন জানে এদের তিনজনের কারো চুলের ফাঁকে সিঁদুরের ছিটে নেই, হাতে শাঁখার বন্ধন।

রোজই যে এইরকম জীবনবোধের কথা হয় এমন নয়। হাল্কা কথাও শোনা যায়। পরিহাস-সিঞ্চিত।

রমা বলে, তিন-তিনটে টিকেট হিমানী হারাল? বেয়ারাকে দিয়ে কত কষ্টে কেনা হয়েছিল। ভাবলাম, শনিবারটা তিনজনে সিনেমা দেখব। এমন চমৎকার বই।

নন্দিতার গলা, আমি বাবা বেঁচে গেছি। আমার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। তোরা এক কাজ কর, হিমানীকে মারধোর করিসনি, থানায় দিয়ে দে।

পাশে দাঁড়ানো ভিড় অগ্রাহ্য করে, পরিবেশ ভুলে মানসী উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

এই মেয়েটা মুখে কথা কম বলে। নন্দিনীদের কথা শোনে। ডাগর দুটি চোখ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে আর কথায় কথায় এই আকাশ-ফাটানো হাসি।

এই তিনজনকে রতন কোন দিন পুরুষের সঙ্গে মিশতে দেখেনি। বোধ হয় কথা বলতেও নয়। নিজেদের নিয়ে এরা একটা আলাদা জগৎ, আলাদা পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। নিজেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা সব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

সমস্ত ডালহৌসি স্কোয়ারের মানচিত্র রতনের নখদর্পণে। ডালহৌসি স্কোয়ারের মানচিত্র আর সেখানকার মানুষগুলোর সাময়িক জীবন।

আটটার পর ডালহৌসি স্কোয়ার প্রায় খালি। পোস্ট অফিসের রাতের ডিউটি দিতে আসা বাবুরা থাকে, দরোয়ানরা খাটিয়া পেতে ফুটপাথে বসে, কচিৎ কয়েকজন পথচারী দ্রুতপায়ে ট্রাম বাসের সন্ধানে ছোটে।

রতনের বুকটাও যেন খালি খালি লাগে। এতো প্রাণচাঞ্চল্য, কলরব মুখরতা, নিষিদ্ধ গুঞ্জন, সব আচমকা থেমে গেলে মনে হয় যেন তার হৃদস্পন্দনও এমনই আচমকা বন্ধ হয়ে যাবে। জীবন তাকে কিছুই দেয় নি, তবু মৃত্যুকে রতনের বড় ভয়।

সিঁড়ি থেকে উঠে রতন আবার থামের কাছে ফিরে আসে। মোটা মোটা বর্তুলাকার থামগুলো যেন নিরাপত্তার প্রতীক। থামের পিছনে যাওয়ার আর উপায় থাকে না। কোলাপসিবল্ গেটের বাধা।

চুপচাপ থামে হেলান দিয়ে রতন বসে থাকে। বেশীক্ষণ তাকে বসতে হয় না। ডানদিকের বড় লালবাড়ির একতলায় আলো জ্বলে ওঠে।

এটাই সঙ্কেত।

রতন উঠে দাঁড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে আবার নামতে আরম্ভ করে। রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক দেখে। এখন বাস মোটর কম। রাস্তা ফাঁকা। ফাঁকা বলেই তারা কিছুটা বেপরোয়া। চাকায় ঝড়ের গতি আনে।

অনেকবার দেখে রতন রাস্তা পার হয়ে ওপারে পৌঁছয়।

ততক্ষণে হিন্দুস্থানী বউ ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছে। নাকে, কানে, গলায় একরাশ রুপোর অলঙ্কার। পায়েও বোধ হয় মল। শাড়ী ঢাকা বলে রতন দেখতে পায় না। কিন্তু যাবার সময় ঝম ঝম করে বাজে।

রতন হাত পাতে।

প্রসারিত হাতের ওপর একটা খবরের কাগজ এসে পড়ে। গোটা তিনেক রুটি আর কোন দিন ভাজা, কোন দিন মুলোশাক।

খবরের কাগজটা বুকে চেপে আবার এদিক ওদিক দেখে পরমায়ু বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রতন নিজের জায়গায় ফিরে আসে।

খবরের কাগজটা সামনে পেতে খাবার উদ্যোগ করতে করতে চোখ তুলে লাল-বাড়িটার একতলায় দিকে দেখে।

বাত্তি নিবে গেছে। হিন্দুস্থানী বউটি উঠে গেছে সিঁড়ি দিয়ে। তিনতলায় নিজের কুঠুরিতে। দরোয়ানের বউ। দুজনকে পালপার্বণে রতন গঙ্গাস্নানে যেতে দেখেছে।

আজ তিন বছরের ওপর ঠিক একভাবে এ সময়ে বউটি রতনের জন্য রুটি আর তরকারি যুগিয়ে যাচ্ছে। ঝড় বৃষ্টি, গণ্ডগোল কোনদিন কামাই হয় নি। সকালের ব্যবস্থা আলাদা।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের সামনে নিস্তারিণী হোটেল। দূরে থেকে যারা মোকদ্দমার ব্যাপারে শহরে আসে, বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী, সস্তাদরের উকিল, সকলের ভরসা ওই নিস্তারিণী হোটেল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভিড়। ঢোকাই দুষ্কর। দুপুরের পর থেকে একটু হালকা হয়। দু একজন বসে শুধু চা খায়। চা আর শুকনো বিস্কুট। মামলা মোকদ্দমার কথা বলে। কোন হাকিমকে কত টাকায় কেনা যায় তার কাহিনী।

রতন এসে দাঁড়ায় ভোরবেলা। এখানে রতন একলা নয়। এক পাল ভিখারী। পুরুষের চেয়ে মেয়ে বেশী। অনেকের সঙ্গেই জানাশোনা। টানাটানি, ঠেলাঠেলিতে জ্ঞান থাকে না। অনেক যুবতীর গায়ের কাপড় সরে যায়। আদুড় বুক। ভ্রূক্ষেপ নেই। দোকানের ছোকরাগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। টিটকারি দেয়।

দেবার বেলা এসব মেয়েদের ভাত, বাসি তরকারি দেয় দেরিতে। কারণ, খাদ্য পেলেই এরা চলে যাবে। মজাদার নিখরচার দৃশ্য সরে যাবে চোখের সামনে থেকে।

এদের মধ্যে রতনও থাকে বটে কিন্তু চেঁচামেচি ঠেলাঠেলিতে সে একেবারে অংশ নেয় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতন শান্ত চিত্তে স্থির হয়ে সে অপেক্ষা করে।

হোটেলের মালিক নিজেই ছোকরাদের ডেকে বলে, ওরে বাঙ্গা, একে দিয়ে দে আগে। তরকারি একটু বেশী দিস।

একটা মাটির সরার জিনিসগুলো নিয়ে রতন কোর্টের ফুটপাথে বসে পড়ে। এবার আর পোস্ট অফিসের সামনে যায় না। সেখানে যাবার উপায় নেই। জল দিয়ে সিঁড়ি চাতাল সব ধোয়া হচ্ছে। উঠতে বলে না, সাবধানও করে দেয় না, একেবারে নল দিয়ে গায়ের ওপর জল ছিটিয়ে রসিকতা করে।

বেশ কয়েক দিন এমনই চলে, তারপর হঠাৎ সেই দিন আসে।

রতন বুঝতে পারে।

জঙ্গলে ঝড় আসবার আগে বুনো পশুরা যেমন বুঝতে পারে, কিংবা বৃষ্টিতে মাটি তোলপাড় হবার আগে যেমন পিঁপড়েগুলো হদিস পায় সর্বনাশের, তেমনই রতনও বুঝতে পারে।

শীর্ণ শরীরের কলকব্জাগুলো যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। ভূমিকম্পে যেমন থরথরিয়ে মাটি কেঁপে ওঠে, তেমনই অস্থির আবেগে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপতে থাকে। দু ঠোঁটের কোণ বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ে। দেহে দানবের শক্তি ভর করে।

রতনের তখন মনে হয় সামনের পৃথিবীটা চুরমার করে নিশ্চল করে দেওয়া তার পক্ষে মোটেই কঠিন কোন কাজ নয়। দুর্বার স্পৃহা হয় সামনের আলো ঝলমল এই টেলিফোন ভবনের মধ্যে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে ফেলে। বাস-স্টপে, ট্রামের শেডের তলায় জমাট বেঁধে দাঁড়ানো মানুষগুলোর কণ্ঠনালী চেপে ধরে একসঙ্গে সকলের শ্বাসরোধ করে দেয়।

পৃথিবীর সবকিছুতে তখন রতন আগুনে ঝলসানো চামড়ার গন্ধ পায়। শ্মশানের আশপাশে যেমন পাওয়া যায়।

তীব্র গতিতে রতন ছুটতে আরম্ভ করে। মনে হয়, পালানো দরকার। এই একঘেয়ে পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গ্লানি থেকে, এই কুমারী মেয়েদের জোর করে সুখে থাকার ভঙ্গী থেকে, ঝোপেঝাড়ে বসে থাকা অফিস ফেরত কপোত কপোতীর মিথ্যা জাল বোনা থেকে।

কতদিন রতন জানে না। সময়ের পরিধিও যেন পার হয়ে যায়।

দু দিন, দু সপ্তাহ খেয়াল থাকে না।

হঠাৎ একদিন চোখের সামনে থেকে অস্বচ্ছ পর্দাটা সরে যায়। পুরোনো পৃথিবীটা দৃষ্টির জগতে ভেসে ওঠে। লোকজন, হইচই, যানবাহনের বিদ্যুৎ-গতি।

তৃণশয্যা থেকে উঠে রতন এদিক ওদিক চায়। এ তো তার পরিচিত জায়গা নয়। এত

গাছপালা, পাখির কাকলি, অলসভাবে বসে থাকা মানুষের দল—এ সবের সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। তার যেখানে আস্তানা, সেখানে মানুষ আরো ঋজু, আরো কর্তব্য-কঠিন। দুপুরের রোদের সঙ্গে তাদের মিতালি কম।

রতন দাঁড়িয়ে ওঠে। হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছে চলে আসে। এতক্ষণ পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। তীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভব করে। বুঝতে পারে, এ জ্বালা, এ যন্ত্রণা বুভুক্ষার।

রাস্তার পাশ দিয়ে চলতে চলতে ট্রাম-লাইনের কাছে বসে—দাঁড়ায়। তার আস্তানার সামনেও এমনি ট্রামের লাইন আছে।

একটু এগিয়েই চিনতে পারে। নিস্তারিণী হোটেল। ভিড় কম। জন চারেক চায়ের কাপ আর মামলার নথি সামনে রেখে জটলা করছে।

রতন দাঁড়ায়। দোকানের ছোকরারা দেখে তার দিকে, কিন্তু কাছে আসে না। অথচ এক মুঠো ভাতের তার বড় প্রয়োজন ছিল। তরকারির দরকার নেই, শুধু এক মুঠো ভাত।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রতন আবার চলতে আরম্ভ করে। বুঝতে পারে, এরা এখন কিছু দেবে না। লোকেদের পাতের অভুক্ত ভাত তরকারি জমিয়ে রেখে তারপরের দিন ভোরবেলা সকলকে বিলোবে।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের কাছ বরাবর এসেই রতন চিনতে পারে। পোস্ট অফিসের উঁচু ডোমটা রোদে চকচক করে ওঠে।

বাকি পথটুকু রতন ছুটে চলে যায়।

থামে হেলান দিয়ে কায়েমী হয়ে বসে। এতক্ষণ পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

মনি-অর্ডার লিখতে লিখতে পাশের লোকটা বলে, কি রে, এত দিন ছিলি কোথায়? শ্বশুরবাড়ি নাকি?

রতন হাসে। কথাটার অর্থ বিশেষ উপলব্ধি করে এমন নয়, সে হাসে পুরোনো আশ্রয়ে ফিরে আসার আনন্দে।

এখানে বসে বসেই কথাটা মনে হয়।

ভয়ঙ্কর অন্ধকার দিনগুলোর কথা। যে তমিস্রা অকস্মাৎ রতনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলে তার স্বরূপনির্ণয় রতনের সাধ্যাতীত, কিন্তু তার ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। জীবনের ভিত ধরে কে যেন বেপরোয়াভাবে নাড়া দেয়। রতনের চেতনাকে অসাড় করে।

কেন এমন হয়? অনেক চিন্তা করেও রতন হদিস পায় না। অনেক, অনেক আগের এক রাতের কথা মনে পড়ে যায়। সে রাতে আকাশ লাল হয়ে উঠেছিল আগুনে। যারা আগুন জ্বালিয়েছিল তারা খুব চেনা লোক। একেবারে গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে বাস করত। তারপর হঠাৎ তারা অন্যলোক হয়ে গেল। রতনের এত পুরুষের বাস করা মাটি জল সব নামবদল করল।

দুটো কিশোরী ছিল রতনের খুব ঘনিষ্ঠ। এক বাড়িতে থাকত। তাদের এক-সময়ে কোলে-পিঠে করে রতন মানুষ করেছিল। সেই আগুনে তারা হারিয়ে গেল। আগুনে, না আগুন-চোখ কতকগুলো কালো ছায়ার মধ্যে, ভেবে কূলকিনারা পায় না রতন।

সে আগুনে রতনও ঝাঁপ দিতে চেয়েছিল, ছুটতে চেয়েছিল আগুন-চোখ কালো কালো ছায়ার পিছনে, কিন্তু বার্ধক্যস্থবির দুটো হাত তাকে বাধা দিয়েছিল, গৌরাঙ্গী একটি প্রৌঢ়ার আর্ত চীৎকার তাকে যেতে দেয় নি।

তারপর মাঝে মাঝে এমনই হয়।

সে রাতের আগুনের হল্কা মুখে-চোখে লেগে তাকে উত্তপ্ত করে তোলে। মনে হয় কালো ছায়াগুলো লোমশ হাত বাড়িয়ে তার কণ্ঠনালী টিপে ধরবে। শ্বাস ফেলতে দেবে না। চাবুকের আঘাতে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

কিছুতেই রতন নিজেকে সংযত করতে পারে না। এখানকার মাটি, জল, আকাশও কাঁপতে থাকে। তাকে এক জায়গায় কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয় না।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে রতনের নজরে পড়ে।

একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে একটা তোবড়ানো টিনের মগ, ছেঁড়া ন্যাকড়া, মাদুরের টুকরো।

ভ্রূ কুঁচকে রতন দেখে। এসব আবার কার সম্পত্তি। এত দিন সিঁড়ির ধারে-কাছে কেউ ছিল না। নতুন খদ্দের আবার কে এসে জুটল!

রতন সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ে। একেবারে ওপরের চাতালে গিয়ে যারা মনি-অর্ডার লিখছে, তাদের পাশে গিয়ে বসে।

গলার ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। এই সময়ে একটা বিড়ি পেলে হত। দু হাতের কোটরে রেখে সুখটান দিত।

আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে।

মনি-অর্ডার লিখতে সবাই ভীষণ ব্যস্ত। ফর্মগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়েছে। কোনদিকে দৃষ্টি নেই। মনের এমন অবস্থায় রতনকে বিড়ি ছাড়বে এমন আশা কম।

রতন দাঁড়িয়ে ওঠে। চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকলে পেটের মোচড়ানিটা যেন আরো অনুভব করে। মনে হয়, তলপেট থেকে যন্ত্রণাটা পাক খেয়ে গলার কাছ অবধি আসছে। প্রাণান্তকর যন্ত্রণা।

তার চেয়ে এদিক ওদিক ঘুরলে, মনটা অন্য কিছুর ওপর আরোপিত করলে, খিদের জ্বালাটা ভুলে থাকা যায়।

রোদটা একটু নিস্তেজ হতেই সবুরের ঘাটি উপড়ে হয়ে গেল। পিল পিল করে সবাই ছড়িয়ে পড়ল সারা রাস্তায়। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কির ফাঁকে ফাঁকে নরম কথা বাঁকা চোখের ইশারা, ছলে হাত ছোঁবার চেষ্টা।

এদিকে অন্ধ একটা ছেলে সুর করে ইনিয়ে বিনিয়ে গাইছে। লোকের সামনে হাত পেতে। হাতে কিছু পয়সাও জমে যাচ্ছে।

বিরক্তিতে রতনের মুখে, চোখের কোণে বিচিত্র আঁচড় পড়ে। হাত পাততে সে কখনও পারবে না। মরে গেলেও নয়।

নিত্য রামপুরের জগন্নাথ মুহুরীর ছেলে ভিক্ষে করবে? গাঁয়ের মাথা হেঁট হবে না।

একবার দিয়েছিল। ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা লোক দুপাশে ভিখারীদের অকৃপণ হাতে পয়সা বিলি করছিল।

রতন তখন নিস্তারিণী হোটেল থেকে ফিরছিল।

ভিখারীদের মধ্যেই কে একজন বলেছিল।

ভায়ের বিধবাকে পথে বসিয়ে তার সম্পত্তি মেরে দিয়েছে লোকটা, তাই এত দরাজ দিল।

বোধ হয় রতন একটু অন্যমনস্ক ছিল। আচমকা ভারী গলার স্বর কানে গিয়েছিল।

নে, ধর।

কিছু না ভেবেই রতন হাত প্রসারিত করে দিয়েছিল, তারপর মনে হয়েছিল, হাতে কে যেন জ্বলন্ত সিগারেট একটা চেপে ধরেছিল।

চমকে হাত সরিয়ে নিতেই ডবল পয়সাটা ছিটকে ফুটপাথের ওপর। পাশে জটলা করা ভিখারীর দল হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ফুটপাথের ওপর।

রতন আর দাঁড়ায় নি। দ্রুত পা চালিয়ে যেতে যেতেই পিছন ফিরে দাতার দিকে দেখেছিল। লোকটা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

আজ এই প্রথম মনে হল দু একটা পয়সা পেলে মন্দ হয় না। পেটের মধ্যে যে যন্ত্রণাটা থেকে থেকে মোচড় দিয়ে উঠছে, সেটাকে সাময়িক ঠান্ডা করা যায়।

রাস্তার ওপারে, ডালহৌসি স্কোয়ারের রেলিং ঘেঁষে সারি সারি ফেরিওয়ালা বসে আছে। শশা, পেঁপে, ঝাল ছোলা, আখের শরবত, বাদামভাজা, মাছির পালে কালো হয়ে থাকা কুমড়োর মেঠাই।

কেনার জিনিসের অভাব নেই। অভাব শুধু পয়সার।

ভাবতে ভাবতেই রতন হাতটা বাড়িয়ে দিল। চলমান জনতার দিকে। কোন একজনের কৃপাদৃষ্টির প্রত্যাশায়।

এ শহরে শীত নেই, শীত পড়ে না। তবু অনেকে সোয়েটারের ওপর গরম কোট চড়ায়। তার ওপর মাফলার। হাওয়া ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ করে।

তেমনই একজনের গায়ে রতনের হাতটা লেগে যায়। গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা। চলে না, যেন গড়ায়।

সরু মেয়েলী সুরে বলে, জ্বালাতন মাইরি। কেবল দাও আর দাও। এরাই সুখে আছে। মানিক, আজকের কাগজে দেখেছিস?

পাশের লোকটি নস্যি দিচ্ছিল নাকের

হুজৌর। ঘাড় নাড়তে গেলে, অথবা কথা বলতে গেলে নাসিা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

তাই নাসিা নাকে গলুজে বলল, কি? মালতী রায় অপহরণের খবর?

আরে দূর, ওসব আবার খবর নাকি? এ তো শহরের শোভা। ওসব না থাকলে শহর আর গ্রামে তফাতটা কোথায়?

তবে?

হরিদ্বারে এক ভিখিরী মারা যেতে তার ঝোলা থেকে ষোল হাজার টাকা পাওয়া গেছে। কি রকম ভিখিরী একবার বোঝ। সব ছদ্মবেশী কুবের, দুর্গানি মানকে।

মানিক এবার রতনের দিকে দেখে। আর তাদের এগোবার দরকার নেই। এই বাসস্টপেই দাঁড়াবে।

রতনকে জরিপ করে বলে, কি রকম কাপড়া চেহারা দেখেছিস? দিনে হাত পাতে, রাতে সিঁদ কাটে। ভিক্ষে করে এমন কাটোমিনের পাহাড় হতে পারে নাকি?

রতন সরে আসে। সব কথা সে বুঝতে পারে এমন নয়। এটুকু বোঝে এখানে দয়ার প্রত্যাশা করা বৃথা।

রতন আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে। থামে হেলান দিয়ে বসতে গিয়েই চমকে ওঠে। চোখ দুটো কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে।

শেষ ধাপে টিনের মগের পাশে মাদুরের ওপর একটা মূর্তি নড়াচড়া করছে। আলোর দিকে পিছন ফিরে থাকার চেহারাটা ঠিক মালুম হচ্ছে না।

একটু চেয়ে থাকতেই বুঝতে পারে।

উস্কোখুস্কো চুল, শতছিন্ন শাড়ি পরনে, এমন বেজায়গায় ছেঁড়া যে, আব্রু রাখাই দায়।

মেয়েছেলে। এ উটকো আপদ আবার এসে জুটল কেন। মেয়েছেলে এলেই তার সাঙাত এসে জুটবে। কিছু দিন পরেই বাচ্চার কান্না শুরু হবে। এখানে তিষ্ঠোতে দেবে না।

হঠাৎ রতনের খেয়াল হয়।

সামনের লালবাড়ির একতলায় আলো জ্বলে উঠেছে। এই সংকেতটুকুর জন্যই এতক্ষণ সে একমনে অপেক্ষা করছিল। পেটের নাড়িতে নাড়িতে হাজার টান। সোজা হয়ে বসবার উপায় নেই। রতন একটু কুঁজো হয়ে বসে। মিছামিছি মুখ নেড়ে কিছু চিবোবার ভান করে।

আর এ সবের প্রয়োজন নেই। আলো জ্বলে উঠেছে। এবার করুণার হাত প্রসারিত হবে। নিবারিত হবে বুভুক্ষা।

রতন উঠে পড়ে। ইচ্ছা ছিল এক দৌড়ে রাস্তাটা পার হবে কিন্তু সাহস হয় না। দু চোখে আগুন জ্বালিয়ে ডবলডেকার ছুটে আসছে। এলোমেলোভাবে ট্যাক্সির পাল। একটু অপেক্ষা করাই ভাল।

বউটি দরজার কাছে দাঁড়ায়।

রোজকার মতন খবরের কাগজে রুটি তরকারি নেবার ভঙ্গীতে রতন দুটো হাত পাতে।

কাপড়া হায়, কাপড়া।

বউটির হাতের চুড়ির রুনঝুন শব্দের মতনই মিঠে গলার স্বর।

কাপড়? শুধু খাদ্য নয়, বসনও দিচ্ছে দয়ার প্রতিমূর্তি দেবী।

রতন কাপড়টা বগলে নিয়ে তারপর কাগজের পোঁটলাটা নেয়।

এতক্ষণ পর নিজের পরিধেয়র দিকে নজর পড়ে।

পরনের কাপড়টা শুধু ময়লাই নয়, ফালি ফালি হয়ে গেছে। বাতাসে ছেঁড়া নারকোল পাতার মতন ঝুলছে চারদিকে।

সত্যিই একটা আবরণের খুব দরকার ছিল।

ছুটে রাস্তা পার হতে গিয়েই বিপর্যয়।

একবার রতন এদিক ওদিক দেখেছিল। মোটর, বাস কোনদিকে নেই। রাস্তা প্রায় ফাঁকা।

একেবারে পুরো রাস্তাটা পেরিয়ে ফুটপাথে পৌঁছবার মুখেই ধাক্কা খেল। এক চোখো মোটর সাইকেল।

মোটর সাইকেলের সঙ্গে ধাক্কাটা খুব তীব্র নয়, কিন্তু রতন একটা দীপদণ্ডের ওপর ছিটকে পড়ে। বুকে এমন চোট লাগে, মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ নিশ্বাসই নিতে পারে না।

হাতের খবরের কাগজটা পথের ওপর। রুটি আর তরকারি জঞ্জালের ওপর ছড়িয়ে যায়। কাপড়টা কিন্তু রতন বগল-ছাড়া করে নি।

ফুটপাথ থেকে বহু কণ্ঠ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে মাটি থরথরিয়ে কাঁপছে। সে মেঘ কড় আনে, সে মেঘে আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে। বাতাসে মর্মন্তুদ শিসের শব্দ।

সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত আবার এগিয়ে আসছে রতনের জীবনে।

আশপাশের গোটা কয়েক লোক চেঁচিয়ে উঠেছিল, কিন্তু এগিয়ে এল শুধু একজন।

শুধু এগিয়ে আসাই নয়, ধরে ধরে তোলে রতনকে। সিঁড়ির ধার পার করে তাকে থামের নীচে বসিয়ে দেয়। ঈষৎ নরম একটা হাত বুকের ওপর বুলোতে থাকে।

আর আশ্চর্য, সেই ভূমিকম্প, সেই ঝড়ো বাতাসের সম্ভাবনা, সেই আতংক-নিথর মুহূর্ত সব উধাও হয়ে, রতনের সামনে মমতা ভরা ডাগর দুটি চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

চুপ। একটু শোও না হয়, আমি বুকটা ডলে দিই। আহাম্মক বেটারা গাড়ি চড়ে মনে করে, লাট বনে গিয়েছে। চোখে কানে দেখে না।

থামে মাথা রেখে শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে রতন শোবার চেষ্টা করে। বুকের যন্ত্রণার ওপর নরম হাতের স্পর্শ ভাল লাগছে, বেশ ভাল। পেটের মধ্যে অন্ত্রগুলো আর আগের মতন মোচড় দিচ্ছে না।

ডাগর দুটো চোখ, উস্কোখুস্কো চুল, নিটোল একটা অবয়ব দেখতে দেখতে কথাটা মনে পড়ে।

বগলের কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে নেয়। পরনের টানাটা ফেলে দেয় সিঁড়ির ওপর।

মনে হয়, এতদিন ডালহৌসি স্কোয়ারের স্বরূপ রতন চিনতে পারে নি। এটা নিছক নরক নয়। শান্তি আছে, সেবা আছে, সহানুভূতি আছে।

লালবাড়ির তিনতলার হিন্দুস্থানী বউটির মতন আরো অনেক অনুভূতিশীল হৃদয় ছড়ানো আছে এখানে ওখানে, যাদের জিনিস দেবার সাধ্য না থাকলেও, হৃদয় দেবার সামর্থ্য আছে।

যারা রতনের জীবন থেকে ভয়ঙ্কর দিনগুলো সরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে।

ধীরে ধীরে রতনের দুটো চোখ বুজে আসে।

অনেক পরে, যখন চারদিক নিস্পন্দ নিথর, কোথাও কোন আলোড়ন নেই, তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন দুটো চোখ রতন একটু খোলে। অপলকণের জন্য। তার মধ্যেই মনে হয়, শরীরের ওপর নরম একটা দেহের স্পর্শ। খুব নরম।

মুখের ওপর রোদ এসে পড়তে, রতন ধড়মড় করে উঠে পড়ে। রোদ না লাগলেও উঠতে হত, এখনই জলের ছিটে দিতে শুরু করবে। রসিকতা করে নলটা একেবারে তার পিঠের ওপর ধরবে। জবজবে করে ভিজিয়ে দেবে।

বুকের ওপর নরম স্পর্শ আর নেই। বুকের যন্ত্রণাও একটু কম। যন্ত্রণার লাঘব করে নরম দেহের মালিক সরে গেছে।

দাঁড়িয়ে উঠেই রতন লজ্জায় কুঁকড়ে যায়।

শরীরে একটি তন্তুও নেই। নতুন কাপড়টা সযত্নে কে দেহ থেকে খুলে নিয়ে গেছে। সেবার হাত আর অপহরণের হাত এক এটা ভাবতে রতনের ইচ্ছা করে না। কিন্তু এ ছাড়া আর কি হতে পারে।

কুঁজো হয়ে নিজের পরিত্যক্ত টানাটা খোঁজে। কোথাও কিছু নেই। সিঁড়ির শেষ চাতালে টিনের মগ, ছেঁড়া মাদুর, ময়লা কাপড়ের টুকরো সব উধাও।

সবকিছু রতনের কাছে পরিষ্কার হয়ে

যায়। ডালহৌসি স্কোয়ার একটা নরক। এখানে দয়া, মায়া, সমবেদনা সব ভান। সব মেকী। মানুষ শুধু মানুষের সর্বনাশ করতে উন্মুখ।

কিন্তু এখনই লোক চলাচল শুরু হবে। অফিস এলাকা জেগে উঠবে।

কি করবে রতন? কি করে ঢাকবে নিজের নগ্নতা।

ছুটে একটা টেপাকলের আড়ালে চলে যায়। নিজের দেহটা যতটা সম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তা কি সম্ভব? ডালহৌসি স্কোয়ারের হাজার চোখ।

মনে মনে রতন সেই ভয়ংকর দিনগুলো কামনা করে। মাটি দুলে উঠবে, ঝড়ো বাতাসে সব ওলটপালট, দেহে অস্থির আর উপস্থির ঠোকাঠুকিতে মাদল বাজবে। রতনের দেহে দানবের শক্তি আসবে।

চোখের সামনে থেকে মুছে যাবে ডালহৌসি স্কোয়ারের বিবর্ণ ছবি। লজ্জা সংকোচ, ভয়, ঘৃণা—সব অনুভূতির বাইরে চলে যাবে রতন।

যখন রতন আর রতন থাকবে না।

শার্ঙ্গদেব

পরলোকে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

গত ২৯ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে উত্তর-ভারতীয় সংগীতজগতের অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি সত্তর বৎসর অতিক্রম করেছিলেন। গত কয়েক বৎসর ধরে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে অক্ষম ছিলেন, কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিবিধ সংগীত সম্মেলনে যোগদান করে তাঁর বলিষ্ঠ দীপ্ত কণ্ঠের স্বকীয় ভঙ্গিমায় সংগীত পরিবেশন করেছেন। বিস্তার এবং গমকের কাজে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। ভজন গানও তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তাতেও তাঁর একটি স্বকীয় পদ্ধতি ছিল। তাঁর কণ্ঠের ব্যাপকতা, পুরুষসুলভ দীপ্ত স্বরক্ষেপ, আবেগপূর্ণ বিস্তার, গমক এবং ক্ষুরধার তান শ্রোতাদের কাছে উচ্ছ্বসিত গিরিপ্রস্রবণের মত মনে হত। সংগীতজগতে তিনি ছিলেন একটি আইডিয়ার স্বরূপ এবং বহু কৃতী শিল্পীর ওপর তাঁর প্রভাব আজও অসামান্য।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ একজন প্রখ্যাত সংগীতবিদ্ ছিলেন। ছয় খণ্ডে প্রকাশিত "সংগীতাঞ্জলি" এবং দুই খণ্ডে প্রকাশিত "প্রণবভারতী" তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। শুনেছি সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল এবং নাট্যশাস্ত্রে তাঁর গবেষণাও ছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত হতে পারিনি বলে সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব হল না। তাঁর সব মতবাদের সঙ্গে অনেকের মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল না; তাঁর কোনও কোনও গানেরও সম্পূর্ণ সমর্থন করা হয়ত সম্ভব হয়নি। যেমন তাঁর "বন্দে মাতরম্" গানের সুরের সপক্ষে মত প্রকাশ করতে না পারায় কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়েছেন; কিন্তু তাঁর অনন্যসাধারণ সংগীত-প্রতিভার স্বীকৃতি ও সমাদরে আমরা বরাবরই নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেছি।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ১৮৯৭ সালে ক্যাম্বে জেলার ঝাঝাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বরোদায় যোদ্ধৃপদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু পরে সাধক হয়ে যান। নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই ওঙ্কারনাথকে জীবনধারণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তরুণ বয়সে তিনি সংগীতসাধক পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্করের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। আগেকার গুরুগৃহে শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই। গুরুর গৃহে তিনি বাস করতেন এবং তাঁর কাজকর্মও করে দিতেন। পরবর্তী কালে যখন গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখনও তিনি গুরুকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। একটি সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, স্বল্পকালের জন্য তিনি আউলিয়া রহমৎ খাঁ নামক একজন ওস্তাদের কাছে খেয়াল শিক্ষা করেন এবং তাঁর গায়কীতে নাকি এই ওস্তাদের গায়ন-পদ্ধতির প্রভাব খুব কম ছিল না।

জীবনে তিনি পরিপূর্ণ সম্মান লাভ করেছেন। রাষ্ট্রীয় সম্মান তিনি পেয়েছিলেন। বহির্ভারতে নেপাল এবং আফগানিস্থান থেকে তিনি সম্মানসূচক উপাধি পেয়েছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ তাঁকে সঙ্গীতমার্তণ্ড উপাধি প্রদান করেন। সারা ভারতে এইটিই ছিল তাঁর পরিচিত সম্মানিত আখ্যা। কিছুকাল পূর্বে কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট প্রদান করে সম্মানিত করেন। সাত বৎসর ধরে তিনি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির সংগীত বিভাগের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

রাশেট্র আমন্ত্রিত হয়েও তিনি ভারতীয় সংগীতকলার পরিচয় প্রদান করেছিলেন।

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম এবং পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ—এ'রা তিনজনে সংগীতজগতে এককালে ভাস্বর ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিরাজিত ছিলেন। এই দিকপালদের দুজন বিপুল শূন্যতা রেখে চলে গেছেন, শেষ মনীষী ছিলেন ওঙ্কারনাথ। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিরাট ব্যক্তিত্বও অন্তর্হিত হল।

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত লোকসংগীত এবং লোকগাথার গবেষণা কেন্দ্র

তিন বৎসর পূর্বে কলকাতায় Folk Music and Folklore Research Institute স্থাপিত হয়। লোকসংগীতে নানা দিক দিয়ে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচিত হয়েছিল। নগর-সভ্যতার দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য বহু স্থান থেকে লোকসংগীতের প্রচলন উঠে যাচ্ছে; আবার নাগরিকদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য লোকসংগীতকে নানাভাবে পরিবর্তিতও করা হচ্ছে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিল্পীর এতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়। লোকসংগীতের যথার্থ রূপ সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করবার জন্য অভিজ্ঞদের নিয়ে একটি সমিতি সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস, এই ইনস্টিটিউট এবিষয়ে সার্থকতার সঙ্গে কর্তব্য পালনে তৎপর হবেন। এই উদ্দেশ্যে উক্ত গবেষণা কেন্দ্র গত অক্টোবর মাসে লোকসংগীত সম্পর্কীয় তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদির একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন—Folk Music and Folklore an Anthology। এই সংকলনের প্রধান সম্পাদক শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং সহযোগী সম্পাদকরূপে আছেন শ্রীখালেদ চৌধুরী, শ্রীগগন দত্ত, শ্রীসনৎকুমার বসু, শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরণজিৎ সিংহ এবং শ্রীঅবনী রায়। সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে

প্রিয়ব্রত চৌধুরী

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২, "কথাশিল্প" থেকে, দাম দশ টাকা। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। বিশেষ করে বিষ্ণুপুরের একটি টেরাকোটা প্যানেল (১৬১৪) প্রচ্ছদপটের শোভা বর্ধিত করেছে। এ ছাড়া বহু চিত্র এবং ম্যাপও সংযোজিত হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলির জন্য শ্রীখালেদ চৌধুরী পাঠকদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

আলোচ্য সংখ্যার ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, দুর্ভাগ্যবশত লোক সঙ্গীত এবং লোক-গাথা সম্পর্কীয় আলোচনা কেবলমাত্র কতিপয় অধ্যাপক এবং উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয়রূপে নিবদ্ধ রয়েছে। এ ছাড়া আমাদের দেশে লোক-সঙ্গীত এখনও সাহিত্য বা সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় বলেই গণ্য। কিন্তু প্রযুক্ত সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বা সমাজ-তত্ত্বের দিক থেকে এর বিচার প্রায় হয়নি বললেই চলে। এই সংখ্যায় লোকসঙ্গীতকে সঙ্গীত-বিদ্যার দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। যে-সব গানের স্বরলিপি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলির স্টাফ নোটেশনও দেওয়া হয়েছে, যাতে বাইরের বিশেষজ্ঞগণ এই সুরগুলির মাধুর্য উপভোগ করতে পারেন।

গ্রন্থের সবগুলি প্রবন্ধই মূল্যবান। দেশীয় বিভিন্ন পর্যায়ের লোকসঙ্গীত ছাড়াও নানারকম উপজাতি, আদিবাসীদের গান নিয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা কয়েকটি প্রবন্ধে পাওয়া গেল। শুধু সঙ্গীত নয়—তাদের জীবনধারা সম্বন্ধেও কিছু আলোকপাত করা হয়েছে, যা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। জলপাইগুড়ির ভুটান সীমান্তে টোটোদের বৃত্তান্ত জেনে অনেকে হয়ত বিস্মিতই হবেন। নেপালের লোকসংগীত সম্বন্ধীয় অনেক তথ্যও একটি প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে, যা অনেকেরই অজানা। ভোজপুরী এবং উত্তর প্রদেশের সংগীত সম্বন্ধে দুটি তথ্যবহুল প্রবন্ধে কয়েক প্রকারের গান এবং তাল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, যা বাংলার শিল্পীদের কাছেও পরিচিত। উদাহরণ-স্বরূপ কাজরী, চৈতি, কাহারবা প্রভৃতি রীতির উল্লেখ করা যায়।

আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে এই গবেষণা কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী। লোক-সঙ্গীতকে উপলক্ষ করে তাঁরা যে আলোচনা এবং মূল্যায়নের সূত্রপাত করেছেন, তা থেকে শুধু সঙ্গীততত্ত্ব নয়, আরও বহু বিদ্যাই সমৃদ্ধ হবে। লোক-সঙ্গীতকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যায় না, সঙ্গীতের সঙ্গে একটি জাতির সমগ্র জীবনধারা যুক্ত হয়ে আছে। এই আলোচনায় সেই জীবনের বহু অনুদ্ঘাটিত তথ্য আত্মপ্রকাশ করবে এবং সম্পূর্ণ মানবিক রীতিতে একটি মানব সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখের বহু নিবিড় চিত্র আমাদের অনুভূতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে এসেছি, মানুষের বিচারে সেই ইতিহাস আদৌ সম্পূর্ণ নয়, বোধ করি, লোকসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে যে লোকসমাজের পরিচয় আমরা পাই তা থেকেই এক-একটি জনপদের লোক-জীবনের প্রকৃত পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এই গবেষকগোষ্ঠী যে আমাদের এই দিকে সচেতন করে দিয়েছেন এর জন্য এ'রা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

রবীন্দ্র-সংগীতে ডি-ফিল

শ্রীপ্রিয়ব্রত চৌধুরী সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় ও দেশী সঙ্গীতের প্রভাব"—এবিষয়ে গবেষণা করে ডি-ফিল (আর্টস) ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন। অপর পরীক্ষকদ্বয়ের মধ্যে ছিলেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এবং শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সংগীত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং তাঁর পুত্র শ্রীনির্মল চক্রবর্তীর কাছে সেতার ও কণ্ঠসংগীতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং শ্রীগোপাল দাশ-গুপ্তের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখেছেন। শ্রীচৌধুরী বাংলা সাহিত্যে এম এ।

ভাল রেকর্ড কিনুন

গতবারের এই আলোচনা এবং সুধী সাহিত্যিক সুনন্দ মহাশয়ের সমালোচনার পর কয়েকটি পত্র পাওয়া গেছে। কেউ কেউ

ব্যাপারটার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—করবারই কথা। সত্যি বলতে কি, আমার নিজেরও কি রকম বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু বিশ্বাস, অবিশ্বাসের কথা নয়—এ যে আমাদের সংস্কৃতির প্রতি চ্যালেঞ্জ এবং হালকা বাজে গানের প্রতিপত্তি যদি এভাবে বেড়ে চলে, তাহলে ভয়ের কথা। আমাদের কর্তব্য এমন কিছু করা দরকার, যাতে ভাল লিরিকের বিক্রি বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। অধিকাংশ লেখক-লেখিকার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আজকাল রেকর্ডের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই মূল্যবৃদ্ধি সমর্থনযোগ্য নয়। এল-পি রেকর্ডের দাম এত বেশী যে, অনেকের পক্ষে তা কেনা অসাধ্য। এ ছাড়া অনেক দোকানে ভাল রেকর্ড পাওয়াও যায় না। শিলঙ থেকে একজন লিখেছেন, "কর্মসূত্রে আসামের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে প্রায়ই ঘুরতে হয় এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রিয় অনেক অসমীয়া ভদ্রলোকের সাথেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সবাইরই দেখলাম একটা অভিযোগ যে ভাল বাংলা গান এবং রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড সব সময় পাওয়া যায় না। রেকর্ড বিক্রেতাদেরও সেই একই অভিযোগ যে, কোম্পানীগুলো অর্ডার দেওয়া সত্ত্বেও রেকর্ড পাঠায় না। কাজেই রবীন্দ্রসংগীত চলে না এটা ঠিক বলতে পারেন না। আমার মনে হয়, একমাত্র আসামেই দেড়শো-দুশো কপি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড চলতে পারে। সমস্ত বাংলা দেশ এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের বাঙালী সংগীত-প্রিয়রা তো রইলেনই।" একজন পত্রলেখক সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের মাইক্রোগ্রুভে রেকর্ড বের করবার উপদেশ দিয়েছেন। ৭৮ আর পি এম রেকর্ডের নাকি অনেক অসুবিধা আছে। বিষয়টি রেকর্ড ব্যবসায়ী এবং প্রস্তুতকারকদের কাছে তুলে ধরছি এবং আবেদন করছি, তাঁরা উপযুক্ত কর্তব্য নির্ধারণ করুন।

সুনন্দা পট্টনায়ক

বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের সাংগীতিক প্রতিভার বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত অনেকে জানিতে চাহেন; আপনাদের বিখ্যাত দেশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এ বিষয়ে আমার যাহা অভিমত তাহা লিখিতেছি। শ্রীমতী সুনন্দার সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটে বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সুরশৃঙ্গার সংগীত সম্মিলনীতে; ইহা দশ-বারো বৎসর পূর্বের ঘটনা। শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনায়ক পটবর্ধনের শ্রেষ্ঠা শিষ্যারূপে তখন সুনন্দা সংগীত গুণীগণের সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া আকাশবাণীর Auditionএ যখন

সুনন্দা পট্টনায়ক

সুনন্দা প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়, তখন আমিও তাহার বিচারকমণ্ডলীর অন্তর্গত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সংগীত সম্মিলন ও Audition উভয় ক্ষেত্রেই রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতায় ও সুরের অধিকারে পট-বর্ধনজীর উপযুক্ত শিষ্যারূপে যোগ্যতা অর্জন করে। তবে তাহার সংগীতের মৌলিকতাও যথেষ্ট সুপরিস্ফুট হইয়াছিল। তান, তারানা ও সরগমের অতি দ্রুত ও অনবদ্য বিস্তারে তাহার গানে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সুনন্দার সংগীত সম্বন্ধে তখন তাহার পিতা আমার অভিমত জানিতে চাহিলে আমি বিনা দ্বিধায় বলিলাম : "সুনন্দা উত্তর ভারতের দ্বিতীয় শুভলক্ষ্মীরূপে নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।" সুনন্দার সংগীত সাধনা কোন ধারায় অগ্রসর হইবে এ বিষয়ে আমার বিশেষ চিন্তা ছিল; কেননা, উদীয়মান প্রতিভা লইয়া বহু তরুণতরুণী আশু প্রশংসার উচ্ছ্বাসে সংগীতমার্গে অগ্রসর হইতে চায় না। অল্প শিখিয়াই সন্তুষ্ট হয় এবং দর্শের হাততালিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু সুনন্দা সম্বন্ধে যে এই আশঙ্কার কারণ নাই তাহা কয়েক বৎসরের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম। গোয়ালিয়র ঘরানার গায়কী আয়ত্ত করিতে সুনন্দা যথেষ্ট অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছে; তবে শুধু গতানুগতিক শিক্ষার প্রকাশেই সুনন্দার প্রতিভা সীমাবদ্ধ নহে। তাহার সংগীতে রস ও ভাব স্বতই পরিস্ফুট। তা ছাড়া খেয়ালের তানে, তারানা, ত্রিবটে ও সরগমে তাহার অসাধারণ অধিকার এবং সুরের অতি দ্রুত পরিবেশনেও ত্রি-স্থানে সুরের বিস্তার ও অনবদ্য সুমার্জিত ব্যবহার সত্যই অতুলনীয়। কর্ণাটদেশীয় প্রথম শ্রেণীর গুণীগণ সরগম প্রস্তারের সময়ে এইরূপ সুমার্জিত দ্রুত স্বরের তানলহরী প্রকাশে অভ্যস্ত।

যদিও সুনন্দা উচ্চাঙ্গ সংগীতে হিন্দুস্থানী পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি তাহার গানে দক্ষিণী পদ্ধতির কারুকলার সমাবেশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ওড়িশ্যা দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিন্দুস্থানী ও দক্ষিণী সংগীত পদ্ধতির এক যৌগিক সংমিশ্রণ। ওড়িশী সংগীত-প্রতিভা সুনন্দার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজেও কয়েকটি রাগ-রাগিণী ও বহু ভজন গান ওড়িশী ধারা অবলম্বনে সৃষ্টি করিয়াছে। ওড়িশী কলাবিদ্যা ওড়িশ্যার প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত নানা মূর্তিতে, ওড়িশ্যার জননৃত্যে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সুনন্দা তাহার মন্দিরে ভজন সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়া ওড়িশ্যার বিস্মৃত সংগীতের সুপ্ত ধারা জাগাইয়া তুলিতেছে, ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ সমাদরের বস্তু।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

সাতান্ন

কিন্তু রাগ করি নি ভয় পাই নি সত্যি। শুধু বিব্রত সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে থাকি। এতখানি সইতে পারি না। তা-ই ডাকতেই হয়। পাছে ওর আবেগে চমক লাগে, তেমন করে ডাকি না। ওর ভাবেতে সুর মিলিয়ে ডাকি, 'ঝিনি দেবী।'

'উঃ!' যেন আচমকা কাঁটা বেঁধা খোঁচানিতে আর্ত স্বরে সোজা হয়ে বসে। তারপরে চোখের জল না মুছেই ভুরু বাঁকিয়ে হেসে ওঠে। বলে, 'কী অদ্ভুত যে আপনার কথা—"ঝিনি দেবী"। ঝিনি আবার কখনো দেবী হয় নাকি! একে বলে গুরুচণ্ডালী দোষ।'

তাড়াতাড়ি শুধরে নিতে যাই, 'তা হলে অলকা—।'

'না, দেবী জুড়ে দেওয়া চলবে না। ঝিনিতে নয় অলকাতেও নয়।'

বলতে বলতে গলা থেকে রুমাল খুলে অনায়াসে চোখ আর গাল মুছে নেয়। ছোট মেয়ের মত, রুক্ষু চুলে একটা ঝাপটা দিয়ে বলে, 'আর অলকা বলাও আপনার নিষেধ, সে কথা আগেই বলেছি চিঠিতে যে জন্যে ঝিনি লিখেছিলাম। এর পরে ঝিনির নাম ধরে যদি তুমি না বলতে পারেন তা হলে আর কথা বলেও দরকার নেই।'

বলে এমন ভাবে অন্যদিকে ঘাড় ফেরায়, যেন এ দু দিনের যা কিছু এত কথা হাসি কান্না সব এক কথাতে নাকচ। দেখ তো এবার সেই দক্ষিণের দরিয়া থেকে এই রাঢ় পর্যন্ত দেখা মেয়েটিকে চিনতে পার কি না! আমি তো পারি না। বিদুষী বল, নাগরিকা বল সকল ভেদাভেদের জট পেরিয়ে সে-ই এক মেয়ে। সে-ই এক চিরদিনের মেয়ে। যে-রূপেতেই আবির্ভাব হোক সে-ই এক রূপ-অদ্বিতীয়া। যে অদ্বিতীয়া রূপেরও কোন শেষ নেই। বৈষ্ণব কবির মত, এক নায়িকার রূপের কথা বলি না। বলি, সেই বহুর মধ্যে এক-এর কথা যাকে জনম থেকে দেখেও নয়ন তৃপ্ত হল না। কিন্তু অতৃপ্ত নয়নের সামনে, এই রূপ দেখে যে, আমার চলায় লাগে ঠেক। বলায় বাক্‌রুদ্ধ।

তবু, অপাঙ্গে কৌতুকবোধেই ঝিনির দিকে তাকিয়ে থাকি। জবাব খুঁজে পাই না। ঝিনি আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। দেখি ওর আয়ত চোখে বাঁকিয়ে চাওয়ার ঝলকানি। ঠোঁটের কোণের হাসিতেও কী এক অচিন কথার স্ফুরণ। না, না একে আমি আগে কখনো দেখি নি। এ সেই প্রকৃতি, যার সবটুকু জুড়ে উদ্যত পঞ্চশর ফুলধনুর টঙ্কারে। চোখের দিকে তাকিয়ে বলে 'কবুল?'

বলি, 'কবুল।'

'জয়ে ভয়ে?'

'নির্ভয়ে।'

'গলাটা তবু যেন কেমন শোনাচ্ছে।'

'কেমন?'

'গম্ভীর গম্ভীর।'

'ওটা স্বরের দোষ।'

ঝিনি হেসে ওঠে। আস্তে অথচ হাসির বেগে, শব্দ বেজে ওঠে। যেন ঠিনঠিনিয়ে কার হাতের চুড়ি বেজে ওঠে দূর থেকে। তারপরে হঠাৎ হাসি থামিয়ে কোপ কটাক্ষে চায়। তবু নাসারন্ধ্র স্ফুরিত-কাঁপে থিরি-থিরি। ঠোঁটের কোণে টিপে রাখা একটি দ্যুতি ফুটি ফুটি করে। বলে, 'স্বভাবের দোষ নয় তো?'

হেসে বলি, 'তাও হতে পারে।'

'চমৎকার। কেন এমন করে কথা বলতে শিখি নি।'

'কেমন করে?'

'লেখকের মত করে।'

'কেন?'

'সবই যেন কলমে লেখার মত, একেবারে তৈরী।'

'তা কেন, আমি তো—।'

কথা শেষের আগেই আবার হাসি। বলে 'বুঝতে পারি নে তো। মনে হয় সবই যেন সত্যি। শুনে কি কেউ বুঝতে পারবে এ শুধু কথার কথা।'

'কথার কথা কেন?'

'তবে খাঁটি সত্যি।'

এবার হাসি চাপা দায়। বলতে যাই, 'মিথ্যে হবে কেন।' তার আগেই ঝিনি আবার বেজে ওঠে, 'দায়ে পড়ে বুঝি সারাদিন অনেক মিথ্যে কথা বলতে হয়।'

তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না না, তা কেন হবে।'

ঝিনি চুপ। শুধু ঘাড় কাত করে চোখে চোখে রাখে। ওর চোখের খোঁজাখুঁজির ঝিলিক দেখে আমার হাসিতে বেগ লাগে। কিন্তু হাসতে ভরসা পাই না। ও বলে, 'সত্যি, বড্ড মিথ্যেবাদী বলতে ইচ্ছে করে।'

'বেশ তো, তা-ই বল।'

ঝিনির দৃষ্টি নেমে যায়। মুখ একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বলে, 'না। তা হলে যে আর একটুও আশা থাকে না।'

কোন জবাব দিতে পারি না। হয় তো, ঝিনির নিশ্বাস পড়ে না। বাতাস লাগে ঝোপে ঝাড়ে ঘাসে পাতায়। শুকনো পাতা ঝরে ওড়ে। মনে হয় যেন কোন গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কোথায় যেন দু একটি গলার স্বর শোনা যায়। অস্পষ্ট ভাঙা ভাঙা, ছাড়া-ছাড়া। কাছে না, দূরে, বোঝা যায় না। কোথা দিয়ে কে চলে যায়, কে জানে। আমি ঝিনির দিকে একবার চেয়ে কোপাইয়ের ওপারে তাকাই। ঝিনি এক জল ধারা আপন বেগে এক টানে চলে। আমি যত ভাবি, ভিন্ন স্রোতে যাই, তা হয় না। তাকে ফেরাতে পারি না।

তবু এবার ফেরার কথাই বলতে হয়।

একটু চুপ করে থেকে বলি, 'এখন তা হলে ফেরা যাক।'

ঝিনি ফিরে চায়। তারপরেই আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিছু বলে না। যেমন ছিল, তেমনি থাকে। সেই ভাবেই জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে কী মনে হল?'

কিছু না ভেবেই বলে ফেলি, 'ভাল।'

ঝিনি আবার ফিরে চায়। একটু যেন হাসেও। অবিশ্বাস আর বিষণ্ণতার হাসি। একটু আগের ঝিলিক ঝলক এখন আর নেই। বলে, 'এত উদাসীন কেন? আমার সম্পর্কে কি একটু কিছু জানতেও ইচ্ছা করে না?'

এমন করে বলে না, যাতে চমক লেগে যায়। যদি বলতে পারতাম, এ মেয়ে বড় নিলাজ পরানী, নাগরিকা না, নাগরী, তা হলে আমার কথা ফুরাতো। নটে গাছ সেখানেই মুড়নো। কিন্তু কেমন করে জানি না, নিজের কথা শোনাতে চায়, তবু নির্লজ্জ মনে হয় না। যেন এক বিষাদ শালীনতার প্রকাশ। নাগর। বলতে গেলে জিভ খসে। স্বৈরিণীর দায়হীন নির্বিকার রঙ্গ ওর মধ্যে দেখি নি। কেবল ক্ষণের সুখের আগুনে কিছু ছাই ছিটিয়ে রেখে যাওয়ার মাতাঙ্গিনী ছুট দেখি নি। তা-ই, ঝিনি চমক লাগাতে না চাইলেও, মনের কোথায় একটা চমক লেগে যায়। মনে হয় যা আমার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, তা নিজে থেকেই থমকে দাঁড়ায়। এতক্ষণে মনে হয় কেবল একটা ধারাকে, এক টানা চলে যেতেই দেখছি। তার আঁকাবাঁকা পথের সন্ধান একটুও জানতে পারি নি। এখন ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হয়। অনেক কথা শুনেছি কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী কথা শোনা হয় নি। যে কথা এত কথার সৃষ্টি করেছে।

তাড়াতাড়ি বলি, 'জানতে ইচ্ছা করে।'

আবার ওর চোখের কোণে একটু ঝিলিক দেখা যায়। ঠোঁটের কোণে একটু দ্যুতি। তারপরে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে। কী যেন বলি-বলি করে। তারপরে বলে, 'আপনার কথা শুনে তো সত্যি মিথ্যে বুঝতে পারি নে। কিন্তু আমার বলতে ইচ্ছে করে।'

তারপরে আবার একবার নিচু হয়ে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, 'জানেন আমি বিধবা।' হয়তো ভয়ংকর কোন কথা নয়। কিন্তু অজানার চমকের কাছে সবটুকু সেই রকম। সেই দক্ষিণের দরিয়া থেকে এই রাঢ়ের কোপাইয়ের ধারে। কখনো একবারও এমন কথা মনে হয় নি। তা-ই, কেবল চমকে ফিরে তাকাই না, হঠাৎ যেন কোথায় একটা কী বিঁধে যায়। কে মারে কোথা থেকে মারে, খুঁজে পাই না। বিঁধে যাওয়ার স্বরূপ বুঝতে পারি না, কতখানি বাজে। এমন একটা কথা নিয়েও যে ঠাট্টা করবে তেমন মেয়ে না। তবু যেন বিশ্বাস করতে পারি না। কথা বলতেও পারি না। কেবল চেয়ে থাকি ওর দিকে।

ঝিনিও তৎক্ষণাৎ আর কোন কথা বলে না। চোখে ওর জল পড়ে না। কেঁদেও ভাসায় না। কথা শুরু করেও কথা বলতে যেন বাধে। তেমনি বলি বলি ভাবে, নিচু মুখে, ঘাসের গায়ে হাত বুলিয়ে যায়। আর আমি যেন নতুন করে আবার ওকে দেখতে থাকি। আর একবার ওর চব্বিশ পঁচিশের শরীরের দিকে তাকাই। শরীরে বৈধব্যের কোন দাগ লাগে কি না, জানি না। কিন্তু দক্ষিণের দরিয়ায় যে মেয়েকে দেখেছিলাম, কোথাও তার টোল টুটানো দেখি না। স্বাস্থ্যে ওর তেমনি ঔদ্ধত্যের থেকে দীপ্তি বেশী। নম্র অনম্রের খেলাখেলি বন্ধুর অঙ্গে। কূলে কূলে জোয়ার-তরঙ্গের ছপছপানিতে, ধরা অধরায় টল টল করে। তাকে ঘিরে, এখনো সেই বেশবাসের রঙ রাঙানো। কেবল আজ সকালেই একটু রঙ বিবাগী দেখেছি। কিন্তু তার ভিতর থেকেও আর একজনকে ফুটে উঠতে দেখেছি। পঞ্চশরের ফুলধনুর ছিলায় যার টান। যে লক্ষ্যভেদের সীমায় দাঁড়িয়ে আমি হাত জোড় করে আছি। এর মধ্যে আমি কোন বৈধব্য আবিষ্কার করতে পারি নি।

সহসা ওর বাবা মায়ের কথা আমার মনে পড়ে যায়। ওর মৃত দাদার কথা, হেনরির কারাবাস। ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তীর পারিবারিক জীবনের বিষাদ অন্ধকারে এ অন্ধকারতম সংবাদ শুনি নি।

এতক্ষণ পরে, ঝিনি চোখ তুলে চায়। আমি জিজ্ঞেস করি 'সত্যি?'

ওর ঠোঁটে আবার একটু হাসি দেখা দেয়। বলে, 'এ নিয়ে কি কোন মেয়ে মিথ্যে বলতে পারে?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না, না, তা নয়। কিন্তু মাত্র মাস দুয়েক আগে যখন দেখা হয়েছিল তখনো শুনি নি।'

'কে বলবে?'

বলতে বলতে ঝিনি আবার একবার চোখ ফিরিয়ে নেয়। সেইভাবেই বলে, 'বাবা মা আজও কিছুই জানেন না।'

অবাক মানি, কথা বলতে পারি না। বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। সংসারে এত বিস্ময়! এত অবিশ্বাস্য কথা কে কবে শুনেছে! বলি, 'বুঝতে পারলাম না।'

ঝিনি তেমনি ভাবেই বলে, 'তাঁরা বিয়ের কথাও জানতেন না, তা-ই এ কথাও জানেন না।'

তবু তেমনি অবাক চোখে নির্বাক বিভ্রান্তি নিয়ে চেয়ে থাকি ঝিনির দিকে। ওর কথার ওপারে কী ঢাকা পড়ে আছে, দেখতে পাই না। বুঝতে পারি না। ঝিনি মুখ ফিরিয়ে, আমার চোখের দিকে একবার চায়। তারপরে ওর কথায় যেন কুয়াশায় রোদ পড়ে। বলতে থাকে, 'সে কথা তখন বাবা মাকে বলতে পারি নি...।'

যে কথা ছিল ওর নিরালায় নির্বিঘ্নে বেড়ে ওঠা, নিষ্পাপ বনফুলের পাপড়ি ঢাকা মনে। কুয়াশা সরে যায়, আমি শুনতে থাকি। দু বছরের বড় এক ছেলে ওর সহপাঠী, কেন তাকে ওর ভাল লেগেছিল সে প্রশ্ন আমার নেই। সহপাঠী হয়েও সে যে ঝিনির মত পড়াশুনো করা ছেলে, তাও না। কলকাতায় অনাত্মীয় স্বজনহীন ঘরে, পুরনো বিশাল অট্টালিকায় ছিল তার বাস। ঝিনির কৈশোরে সে পক্ষিরাজের পিঠে চেপে ঝনঝনিয়ে আসে নি রাজপুত্রের মত। মনোহরণ রূপ ধরে সে ভোলায় নি। ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, বিরাগী এক প্রাচীন বংশের বেগহীন রক্তধারার নিঃসঙ্গ দুর্বল শিশু। অপচয়ের একটি অবশিষ্ট মাত্র যেন। তার জীবনের চার পাশে সংসারে সবাই যখন স্বার্থান্ধ, কুটিল, স্বার্থপরের বেশে, যৌবনের প্রথম পর্বেই যখন সকল অন্ধকার তখন ঝিনির মধ্যে আলোর আবিষ্কার। ঝিনির কথায়,

'ওর অসুখী অবিশ্বাসী গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কারুর কথা বলতে ইচ্ছা করতো না। সবাই ভাবতো, ও হাসতে জানে না, মিশতে জানে না।'...

কিন্তু সংসারে এমন মানুষ আছে, সে যেন কোন্ দূরে, আড়ালে পড়ে থাকা এক জলাশয়ের মত। অন্য স্রোতের বেগ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে না এলে সে মিশতে পারে না। তার হাসিটা দশজনের থেকে তফাত। সে ছিল সেই রকমের মানুষ। যাদের হাসির চাবিকাঠিটা সামনাসামনি পড়ে থাকে অবহেলায়। কারুর চোখেও পড়ে না। সেটাও তার অভিমান ছিল। কিন্তু, 'ও যে কী সুন্দর হাসতে পারতো, হাসাতে পারতো, যারা চোখে দেখেনি, তারা বিশ্বাস করতে পারবে না। আসলে ও ছিল ভীষণ দুষ্টু, হাসকুটে, কত রকমের বুদ্ধি যে ওর মাথায় খেলতো। একেবারে একলা ছিল তো, সেজন্যে ও নিজেকে যত দেখতো, অন্যকেও তাই। ও নিজেকে যত ঠাট্টা করতো, অন্যকে নিয়েও ততটা। কে কেমনভাবে চলে ফেরে, হাসে, কার কী মনের ভাব, নিখুঁত বলতো। ওর এসব ব্যাপার কেউ জানতো না। ওর মধ্যে যে ওরকম একটা ছেলে আছে, কেউ টের পেত না।'...

আর সে ছিল একেবারে ছেলেমানুষ। বয়সটা তার কিছু না। ছেলেমানুষের যেমন পড়ায় মন বসে না, অথচ বুদ্ধি আর পারদর্শিতা থাকে, তারও সেইরকম ছিল। পড়া পরীক্ষা, সবকিছুই যতক্ষণ তার ভাল লাগে ততক্ষণ। অন্য সব বিষয়েই সে এত ছেলেমানুষ ছিল, তাকে সামলানো দায়। একটু একরোখা ছেলেমানুষের মত। যা চাই, তা তাকে পেতে হবে। কিন্তু তার চাইবার মানুষ ছিল না। তার কাছে পাবার মানুষ ছিল বেশী। তাই যখন সে চাইবার মানুষ খুঁজে পেল, তার কাছ থেকে সে সব কিছু ছেলেমানুষের মত জোর করে আদায় করেছে।

বলতে বলতে ঝিনির মুখে হাসি ফোটে। দৃষ্টি ওর কোপাইয়ের ওপারে, আসলে অন্য এক জগতে। বলে, 'ও এমনভাবে চাইতো। এখুনি এই করতে হবে। এখুনি এই এনে দিতে হবে। আর আমি যেন কেমন হয়ে যেতাম। ওর কোন কথার অবাধ্য হতে পারতাম না। অথচ ও যে হুকুম করে কিছু বলতো তা নয়। যেমন ছেলেমানুষেরা হেসে, পা দাপিয়ে, খুনসুটি করে বলে, তেমনি করে বলতো। আমি কখনো কখনো বিরক্ত হতাম, রাগ করতাম, তবু ওর কথা না শুনে পারতাম না। আমার নিজের মনটাই টনটনিয়ে উঠতো।...ঠিক তেমনি করেই ও একদিন বিয়ের কথা বললো। বাবা মায়ের ইচ্ছে তো দূরের কথা, ওর আর আমার কথা যেসব বন্ধুরা জানতো, তাদের একটুও ইচ্ছে ছিল না। তাদের কাছে ও ছিল অসুখী, অস্বাভাবিক, স্বাস্থ্যহীন। তারা কেউ ওকে বুঝতো না, তা-ই। বাবা মায়ের কাছে সেটা তো ছিলই। আমাদের সমাজে জাত বর্ণের কথাও তো কেউ ভোলে না। সেদিক থেকেও ওর সঙ্গে আমাদের অমিল ছিল। সাহস করে তাই কখনো বলতে পারিনি।'...

তবু বিয়ে হয়েছিল। শানাই বাজিয়ে ছাঁদনাতলায় না। সম্ভবও ছিল না। আইনের আশ্রয়ে, কাগজ কলমের সই সাবুদে। সাক্ষী ছিল তিনজন। আজ ছাতিমতলার মেলায় যারা তার সঙ্গী, সেই রাধা, লিলি আর শুভেন্দু।

তখন ঝিনি মনে করতো, একদিন বাবা মাকে, দাদাকেও বলবে। তখনো দাদার সেই দুর্ঘটনা ঘটেনি। সবাইকে বলে ঝিনি স্বামীর সংসারে যাবে। কিন্তু দুর্ঘটনা যখন ঘটলো, তখন পর পর দুটো। আগে দাদা, তারপরে সে। মাঝখানের সময়ের পরিধি ন' মাস। তার মধ্যে কোন কথা বলা যায়নি। সংসার করতেও যাওয়া হয়নি। দাদার মৃত্যুর পরে সেকথা আর কখনো উচ্চারণের সাহস হয়নি। এখন ঝিনির কষ্ট, সেই দিনের অপেক্ষা, কবে বলতে পারবে।

ঝিনি নিচু মুখে, যেন ঘাসের সঙ্গে মুখোমুখি করে, ঘাড় নাড়িয়ে একটু হাসে। বলে, 'এখন হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন, আজ শুভেন্দু আমার কাছে কী চায়।'

বলে ও আমার মুখের দিকে চায়। কিন্তু আমি তখনো ওর পিছনের জীবন সীমায় পড়ে আছি। যা শুনেছি তার সবখানি যেন মন দিয়ে ঠিক ধরতে পারিনি। তবু বলি, 'পারি।'

ঝিনি বলে, 'এর জন্যে শুভেন্দুকে আমি খুব দোষ দিই না। হয়তো ওর দিক থেকে ও ঠিক। কিন্তু আমি পারি না। কেন পারি না তাও জানিনে। পারলে হয়তো ভাল হত। কোথায় যে ছিটকে পড়েছি, মনে হয়, আমি যেন ওদের থেকে আলাদা।'

ঝিনি চুপ করে। আমি এক আশ্চর্য বিধবা দেখি। বৈধব্যের স্পর্শ যার নেই। বরং যার জীবনের চারপাশে এক ভিন্ যমুনার জলস্রোতের টান। আমি যেন দেখি, শূন্য কলসী কাঁখে অভিসারে চলে এক চির অভিসারিকা। তার যৌবনে যে বেজেছে প্রেমজরির ঝনক ঝনক, তা-ই শুনি কথায় হাসিতে।

দেখি, পোড়ারমুখী কলঙ্কিনী রাই আঁধার ছেড়ে প্রেম যমুনায় যায়। কিন্তু ওর এই যাতনাজাত আলো সইবে কে। যারা ওর অনেক দিনের, কলসী ওকে ছাপাছাপি করতে হবে। সেই ঘাটের ঠিকানা কে জানে।

ক্রমশঃ

বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার গ্যালারীতে সম্প্রতি শিল্পী ব্রহ্মজিত ছিগ, নকুল সিংহ ও মনোজ দিদ্দি তাঁদের যুক্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তিনজন শিল্পীই শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিক্ষালাভ করেছেন। প্রদর্শনীতে প্রথমজনের পাঁচটি, দ্বিতীয়জনের ছয়টি ও তৃতীয়জনের চারটি নিদর্শন পেশ করা হয়।

তিনজন শিল্পীরই, বিশেষ করে শেষের দুজনের রচনায়, প্রগতিশীল মনের পরিচয়

পরিত্যক্ত কুটির —ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

পাওয়া যায়, যদিও প্রত্যেকের রচনারীতি পৃথক। নকুল সিংহের কালিকলমে রচিত ড্রয়িংগুলি বলিষ্ঠ—কল্পনা, কম্পোজিশন ও রেখা সৌষ্ঠবের জন্য এগুলির কয়েকটি চোখে পড়ে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সূক্ষ্ম রেখাজালের প্রাধান্য থাকায় কয়েকটির মধ্যে পুনরুক্তিদোষের ছাপ দেখা যায়। দুটি নিদর্শনে স্থাপত্যশিল্পের বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে, ফলে পরিপ্রেক্ষিতের দিক দিয়ে দুটি রচনা অনেকের চোখে পড়ে—যেমন, ড্রয়িং ৫ ও ১।

মনোজ দিদ্দির মাধ্যম তেলরঙ, রচনারীতি বিমূর্ত। শিল্পীর দুই একটি কাজে মিরো ও পোলকের প্রভাব দেখা যায়। রচনা ক্ষেত্রটি সাধারণত কোনও হালকা রঙে ভরে ফেলে তার ওপর লম্বা ও আড়াআড়িভাবে তিনি গাঢ়তর রঙের রেখাগুলি নানাভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তরল রেখাগুলি আপন খেয়ালমত নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে রেখা বহুল প্যাটার্নের সৃষ্টি করেছে—যথা ল্যান্ডস্কেপ। তবে সব ক্ষেত্রে শিল্পীর প্রয়াস সফল হয়নি। মাত্রাতিরিক্ত তরল রেখা ব্যবহারের ফলে অনেক সময় ছবির মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেছে—যেমন ল্যান্ডস্কেপ ২। অপরাপর ছবির মধ্যে ল্যান্ডস্কেপ ৬ উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মজিত ছিগের রচনা ভিন্ন জাতীয়। পৃথিবীতে জন্মলাভ করার পর থেকে মানুষকে নানা কষ্ট স্বীকার করে জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়—এই [illegible] বস্তুই সম্ভবত পাঁচটি রচনামালার মধ্য দিয়ে শিল্পী প্রকাশ করতে চেয়েছেন। রচনাগুলি মূলত শরীর ধর্মী, অথচ [illegible] অংকন পদ্ধতির জন্য এগুলি মনে রেখাপাত করে না। শিল্পীর নিজস্ব চিন্তাধারার সংগে হয়তো রচনাগুলির কোনও সম্পর্ক আছে, কিন্তু শিল্পীর কাছেই সেটা বোধগম্য—অপরের কাছে বক্তব্যটুকু আদৌ সুস্পষ্ট হয়নি। তবে শিল্পীর আঁকা দুটি মুখমণ্ডল সকলেরই চোখে পড়ে। এক হিসাবে এই দুটি ছোট রচনার মধ্য দিয়ে শিল্পী বোধ হয় আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন।

মানবের ভাগ্য—৩ —ব্রহ্মজিত ছিগ

শিল্পী ফাল্গুনী দাশগুপ্ত তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন আর্টিস্ট্রি হাউস-এ। প্রদর্শনীতে শিল্পী জলরঙে আঁকা ২৭ খানি নিদর্শন পেশ করেন। ফাল্গুনী দাশগুপ্ত দশ বৎসর পূর্বে কলিকাতা সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপন করেন। বর্তমানে তিনি পুরুলিয়ার সৈনিক বিদ্যালয়ে চিত্রকলা বিভাগের শিক্ষক। কলিকাতায় এটি তাঁর প্রথম প্রদর্শনী। শিল্পী প্রধানত প্রকৃতির পূজারী—তাঁর অনুসন্ধানী চোখে যেখানকার যে দৃশ্য ধরা পড়েছে সেই দৃশ্যই তিনি রঙ ও তুলি সহযোগে চিরস্থায়ী করে রাখায় চেষ্টা

ড্রয়িং—৩ —নকুল সিংহ

১৮৬৮ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিত পত্রের নমুনা —বিড়লা অ্যাকাডেমি

করেছেন—প্রকৃতপক্ষে প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন দৃশ্যই দেখা যায়। শিল্পীর রচনারীতি রিয়ালিস্টিক, কয়েকটি ছবি দেখে এম এস যোশী ও বিমল দাশগুপ্তের পূর্ব রচনার কথা মনে পড়ে যায়। বর্তমান যুগে এই জাতীয় রচনা দেখে শিল্পীকে স্বভাবতই পুরাতনপন্থী বলে মনে হয়। অনেকেই স্বীকার করবেন যে, এই শ্রেণীর নিসর্গ দৃশ্য যেন ঠিক যুগোপযোগী নয়। তবে শিল্পীর অঙ্কন পদ্ধতি প্রশংসনীয়। শিল্পী চাপা রঙের পক্ষপাতী, তাই অনেকগুলি ছবির মধ্য দিয়ে যেন একটি বৈরাগ্যের ভাব ফুটে উঠেছে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে—বিশেষ করে যেখানে তিনি পরিপ্রেক্ষিতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, যেমন এ ফিশিং ডে। পুরোভাগে জলাশয়ের ওপর সুবিস্তীর্ণ মেঘাবৃত আকাশের মধ্য দিয়ে শিল্পী প্রকৃত বাতাবরণের সৃষ্টি করেছেন সন্দেহ নেই, তবে পৃষ্ঠভূমির পাহাড় শ্রেণী আরও একটু স্বাভাবিক হলে ছবিখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হত। কয়েকটি ছবিতে শিল্পী বর্ষা ঋতুর সজল শ্যামল রূপটুকু সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন; বিশেষ করে কালো, সবুজ ও নীল রঙের সুকৌশল ব্যবহারের ফলে ছবিগুলির ভাষা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে হ্যাপহ্যাজার্ড ক্লাউডস (৯) ও ক্লাউডস্ (৭) উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য রচনার মধ্যে স্নোজ্ (৩) ও পরিত্যক্ত কুটীর-এর নাম করা যায়।

ল্যান্ডস্কেপ—৩ —মনোজ দিশ্ব

*

এক বৎসর পূর্বে দক্ষিণ কলিকাতায়, সুবিস্তীর্ণ লেকের পাশে, সাদার্ন অ্যাভেনিউ-এ নিজ বিরাট অট্টালিকায় বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার নিজস্ব স্থায়ী মিউজিয়াম ও প্রাচীন ও সমকালীন চিত্রকলা গ্যালারী স্থাপন করেন। সম্প্রতি এই অ্যাকাডেমির প্রথম বার্ষিকীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষগণ এক উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বাংলা দেশের কয়েকজন স্বনামধন্য ও প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী লিখিত পুরনো মৌলিক পত্র ও কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের রচনার পাণ্ডুলিপি এই প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। অধিকাংশ পত্রই ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখা, যদিও এই শতকের প্রথম দুই তিন দশকে লেখা চিঠিরও নিদর্শন প্রদর্শনীতে দেখা যায়। পত্রলেখকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন লালবিহারী দে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু ও চিত্তরঞ্জন দাশ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, পরশুরাম ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রচনার পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ মৌলিক পত্র দেখান সম্ভব হয়নি—কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষগণ বাকী অংশটুকুর প্রতিলিপি প্রদর্শন করেছেন—তাহলেও কয়েকটি পত্রের মধ্য দিয়ে পত্র লেখকের চিন্তাধারা ও তৎকালীন দেশ ও নিদর্শনও ছিল। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম সহকারে বিভিন্ন স্থান থেকে পত্র ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার জন্য বিড়লা অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষগণ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই এই অ্যাকাডেমি, বিশেষ করে এর সংগীত কলা বিভাগ, জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অ্যাকাডেমির এক মুখপাত্র বলেন যে গত বছরে ন্যূনপক্ষে ৩০,০০০ দর্শক অ্যাকাডেমির স্থায়ী মিউজিয়ম ও গ্যালারী পরিদর্শন করেছেন। কর্তৃপক্ষগণ এখন এখানে একটি আর্ট লাইব্রেরী স্থাপন করার পরিকল্পনা করছেন।

চিত্রপ্রিয়

মহিলা সেবা সমিতি

লাট-প্রাসাদের সদর ফটকের সামনাসামনি যে ছোট্ট ঘরখানা '৬২ সালের সীমান্ত সংকটে কলকাতা আর তার আশেপাশের মহিলা সংগঠনকে এক করে সংযুক্তভাবে কাজ করার দপ্তর হয়েছিল, সেখানেই মহিলা সেবা সমিতির অফিস। পুরানো আমলের মস্ত বাড়ির একতলার অন্ধকার ঘর। ঢুকতেই এক ফালি ঘেরা বারান্দার মত জায়গা। তবু ঘরখানার বিশেষত্ব আছে। বাংলা দেশের কর্মী কন্যাদের আনাগোনায় মুখর হয়ে থাকে সারা দিন। সেখানে মহিলা সমাজসেবীদের সাক্ষাৎ পেতে গেছি বহু-বার। তবে জানা ছিল না যে, মফস্বলে সেখানে মহিলা সেবা সমিতির কাজকর্ম হয়। সত্যি কথা বলতে কি, সেবা সমিতির সম্বন্ধে বেশী কিছু জানতামই না। এই পৌষে শান্তিনিকেতনে শ্রীমতী অশোকা গুপ্তের সঙ্গে দেখা হলো। কথা উঠলো ক্রেশের। মায়েরা কাজকর্ম করতে আরম্ভ করেছেন ঘরের বাইরে। উপার্জনের তাগিদে বহু সংসারেই সেটা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। ছোট ছেলেমেয়ের ভার নেবার মত যৌথ পরিবারের মাসী-পিসীর অভাব, ঠাকুমা-দিদিমারা বহু ক্ষেত্রেই শহরবাসী [illegible] জীবনযাত্রা থেকে দূরে। ক্রেশ না হলে ছেলে-মেয়েরা অবহেলা অযত্নে শৈশব কাটিয়ে যদিই বা প্রাণে বেঁচে থাকে, তাদের সুস্থ নাগরিক হবার পথে অনেক বাধা এসে দাঁড়াতে পারে। ক্রেশ-এর কথা বলতে বলতে মহিলা সেবা সমিতির ক্রেশ-এর উল্লেখ করলেন অশোকাদি। কলকাতায় ও নিকটবর্তী অঞ্চলে এখন একাধিক ক্রেশ কাজ করছে। তার মধ্যে মহিলা সেবা সমিতি পরিচালিত সোনারপুর থানার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের ক্রেশটি ঐ এলাকার কর্মরতা মায়েদের মস্ত সহায়। চারদিকে উদ্বাস্তু উপনিবেশ। যখন মেয়েরা প্রথম এসেছিলেন, তখন তাঁদের স্বাবলম্বী ভবিষ্যৎ প্রায় স্বপ্নের মত ছিল। এখন তাঁরা সংসার সামলিয়ে নানারকম হাতের কাজ করে উপার্জন করেন মোটা-মুটি মন্দ না। ছেলেমেয়ের শৈশবে বেপরোয়া উপেক্ষার ভয় নেই। তার জন্য রয়েছে মহিলা সেবা সমিতির ব্যবস্থা। অসুখ-বিসুখে পর্যন্ত বিনা খরচে সপরিবারে চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা আছে। চোখ খারাপ হলে চশমা দিয়ে দেন বিনা খরচায়।

ছোট বাচ্চাদের প্রি-প্রাই মারী স্কুলের একটি ক্লাশ

মহিলা সেবা সমিতির কথা শুনে আগ্রহ হয়েছিল আরও কিছু জানবার। কলকাতা ফিরেই গেলাম ৮ নম্বর গভর্নমেন্ট প্লেস নর্থ-এ। সমিতির সচিব শ্রীমতী সুশীলা সিংহী সেদিন [illegible] যাচ্ছিলেন সমাজ-সেবীদের সভায় যোগ দিতে। তবু টেলি-ফোন করতেই বললেন, যাবার আগেই যেন চলে আসি ওঁদের অফিসে। অফিসের কামরায় শ্রীমতী সিংহী ছিলেন আর ছিলেন ওঁদের সহ-সভাপতি শ্রীমতী রেণু সেন এম-এল-সি। সভাপতি অশোকা গুপ্তের সঙ্গে তো আগেই দেখা হয়েছিল। কোষাধ্যক্ষা হলেন শ্রীমতী গৌরী সেন। শ্রীমতী গৌরী সেন স্বর্গীয় সুকুমার সেন মশায়ের স্ত্রী। সুকুমার সেনের দীপ্তিমান কর্মজীবনের শেষ কয়েকটি বছর কেটেছে দণ্ডকারণ্যে। বহু বাধা বিপত্তির মাঝে সেখানকার চেয়ারম্যান হিসাবে উদ্বাস্তু দলের অনেক উপকার করেছিলেন। সেই হতে তাঁর সহকর্মী ছিলেন তাঁর পত্নী। সেই কাজে থাকতেই স্বামীর শেষ নিশ্বাস-টুকু পড়েছিল বলে গৌরী মাসীমার ইচ্ছা ছিল, উদ্বাস্তুদের জন্য কাজ করে নিজের বাকি জীবন কাটাবেন। মহিলা সেবা সমিতির অফিসে সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না—এই আমার আক্ষেপ। কিন্তু বুঝলাম, সেদিনের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করে শ্রীমতী গৌরী সেন এই কর্মী-দলে যোগ দিয়েছেন।

সমিতির অফিসে এক দিকে কাগজপত্র, টাইপরাইটার সব রাখা, অন্য দিকে আল-মারিতে সাজানো বেতো, সুজনী, খেশ ইত্যাদি উদ্বাস্তু মহিলাদের হাতের কাজ। ঝাড়ন থেকে নিয়ে সব কিছুই বাজারে কেনা জিনিসের তুলামানের। শ্রীমতী সিংহী বললেন যে, দামের বেলা বরং বাজারের জিনিসের দামের চেয়ে দু পয়সা কম। নানা

মহিলা সেবা সমিতি পরিচালিত ক্রেশ

জায়গা থেকে অর্ডার আসে। বিক্রি হয় ভালই। তাই মেয়েরা চট করে ঘরের কাজ সামলে চলে আসেন কেন্দ্রে। উপার্জনক্ষম পুরুষ নেই এমন সংসারও যে নেই তা নয়। ছেলেমেয়েরা স্কুল টিফিন পায়। বই খাতা পায়। কাজেই সেটা সম্ভব হতে পারে। শ্রীমতী সিংহী তাই বলছিলেন যে, প্রথম যখন ওরা এসেছে উদ্বাস্তু হয়ে, তখন মহিলা সেবা সমিতির সভ্যারা হাতে বসে সেলাই করে ওদের জন্য পোশাক তৈরি করেছেন। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা পর্যন্ত তাঁদের হাতের তৈরি কত জিনিস পেয়েছে।

এখন ওরা নিজেরাই হাতে তৈরি করে, উপার্জন করে স্বয়ংভর হয়। সমিতি সাহায্য করে হাতের জিনিস বাজারে দেবার। ওঁদের সমিতির রিপোর্টের কপি খুঁজছিলেন যে মেয়েটি টাইপ ইত্যাদি করেন। সুশীলা দেবী হাসতে হাসতে বললেন, "আমাদের মেয়েরাই যে মাত্র স্বয়ংভর হয় তা নয়। এই যে ছেলেরা আসেন কাজ করতে তাঁরাও প্রায় নিঃস্বার্থভাবে খাটেন। সামান্য পারিশ্রমিক, কাজ প্রচুর। সদ্য পাস-করা অল্প-বয়সী ছেলেরা এখানে কাজে পাকা হয়ে যান, উচ্চতর শিক্ষা পেতে থাকেন কাজ করতে করতে। তারপর উন্নততর জীবন সহজ হয়ে ধরা দেয়। কাজেই এঁরাও সেবা সমিতির সাহায্যেই উজ্জ্বল আগামী জীবন গড়ে তোলেন।"

১৯৫৬ সালের ২১শে মার্চ মহিলা সেবা সমিতি রেজিস্টার্ড হয়। তার অনেক আগেই এদের কর্মপ্রচেষ্টার সূত্রপাত। ৪৭।৪৮ সনে দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের জন্য ৮০,০০০ পশমী পোশাক পাঠিয়েছেন মহিলা সেবা সমিতি। ৪৮।৪৯ সালে ১৬টি বয়ন শিক্ষা কেন্দ্র বিভিন্ন পূর্ব পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তু শিবিরে আরম্ভ হয়েছে। তা থেকে বছর খানেকের মধ্যে ৩,০০০ মহিলা বুনতে শিখেছেন এবং ৩২টি বয়ন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তার পরে ২৫টি মহিলা খাদি বুনতে শিখেছেন এবং আর কিছু মহিলা বয়ন শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শিক্ষা দিয়েই সমিতি নিরস্ত থাকেনি। আরও ২৯টি বয়ন কেন্দ্র খুলে ৩২টি মহিলাকে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে নিযুক্ত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। তারপরের গতি আরও স্বচ্ছন্দ। হাজার হাজার মেয়ে ক্রমশ নানা কাজে শিক্ষালাভ করে চলেছেন। তার মধ্যে অবশ্য তাঁতই এখনও প্রধান উপজীবিকার শিক্ষা। চৌহাটিতে ৫৬।৫৭ সালে উৎপাদন কেন্দ্র শুরু হয়। সেখানে সেলাই শেখার ব্যবস্থাও হয়। ৫৭।৫৮ সালটি স্মরণীয়। এই সময়ে ক্রেশের পত্তন হয়। মেয়েরা উত্তরোত্তর নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন প্রকট হয়ে ওঠে। তারই সমাধানকল্পে ক্রেশের ব্যবস্থা। ক্রেশের ব্যবস্থা ছাড়াও সমিতি প্রি-প্রাইমারী স্কুল বা নার্সারী স্কুল চালাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং কিছু অর্থসাহায্য পাচ্ছেন। বর্তমানে স্কুল এবং ক্রেশ মিলিয়ে ১১৬টি শিশু আছে। কাছাকাছি ভাল স্কুল না থাকায় শিশুদের অভিভাবক সকলেই চান স্কুলকে আরও বড় করা হোক এবং ক্রমশ স্কুলের মান বাড়ানো হোক।

তাদের কাজের কামাই নেই

আশা করা যায়, সমিতির উৎসাহী কর্মীরা সমাজসেবার সবটুকু সুযোগ পূর্ণ করে উদ্বাস্তু সমাজের স্বয়ংভর হবার সাহায্য করে যাবেন। এখনও তাদের অনেক বাকি আছে। অনেক আছে তাদের অভাব-অভিযোগ। মহিলা সেবা সমিতির মহান উদ্দেশ্য ক'টি উল্লেখ করে শ্রীমতী সিংহী বললেন, কেবলমাত্র উদ্বাস্তু মহিলাদের সাহায্য নয়, আরও অনেক আছে ও'দের লক্ষ্য। প্রথম লক্ষ্য—দেশের যে-কোনও সংকটে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা। দ্বিতীয় হচ্ছে—যেখানেই মেয়েদের দুঃখ বা প্রয়োজন, সেখানেই তাদের অসুবিধা মোচনের চেষ্টা করা। তৃতীয়—নারী ও শিশুকে দায়িত্বশীল এবং উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। সেই গড়ে তোলার কাজে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। চতুর্থটি হচ্ছে—নারী জাতিকে সর্বতোভাবে কার্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত করা। তার মধ্যে উদ্বাস্তু মেয়েদের সাহায্য করা প্রধান লক্ষ্য। সর্বশেষ লক্ষ্য হচ্ছে—নারী সমাজের একতা, শক্তি ও সংগঠনের জন্য কাজ করে যাওয়া। নারী সমাজ যাতে নিজেদের উন্নতিসাধন তো করবেনই, দেশের বৃহত্তর উন্নতির জন্যও তাই চান প্রস্তুতি।

সমাজসেবা বহু দিন পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবীদের উপর নির্ভর করে চলেছে। স্বাধীন সরকার ক্রমে ক্রমে সমাজ উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা গ্রহণ করছেন। সরকারের ভূমিকা ও স্বেচ্ছাসেবীর উৎসাহ একযোগে চলবার সুযোগ পেলে কাজ যে অনেকাংশে সহজ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই মহিলা সেবা সমিতির মত সংগঠন যদি আরও গড়ে ওঠে, তবে সামাজিক উন্নতির পথ কঠিন থাকবে না। এখনও আমাদের দেশের বহু প্রচেষ্টা পুরোপুরিভাবে শহরভিত্তিক। পল্লী অঞ্চলেরও প্রচুর উন্নতি হয়েছে সত্য, কিন্তু শহরমুখী কর্মপ্রচেষ্টার জোয়ার থামেনি। মেয়েদের মধ্যে যদি এদিকে আসবার উৎসাহ থাকে, তবে হয়তো পল্লী অঞ্চলের মেয়েরাই এ মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবেন। বিবাদ-বিসংবাদ, আলাপ-আলোচনা—সবই বিকেন্দ্রীভূত হোক। অগণিত লোকসংখ্যার মুষ্টিমেয় মাত্র কেন সুযোগ-সুবিধার বেশী অংশের অধিকারী হবে? পল্লী সংগঠনে যদি মহিলারা একযোগে কাজ করেন, তবে তার শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। পল্লী বলতে শুধু শহরের উপকণ্ঠস্বরূপ পল্লীগুলি মাত্র নয়। দূরে, বহু দূরে অবহেলিত পল্লীজীবন যেন জেগে উঠতে পারে তার চেষ্টা মেয়েরা করুন এই আমাদের প্রার্থনা। পল্লীর মেয়েদের উপার্জনের প্রয়োজন শহরের মেয়েদের চেয়ে কোন অংশে কম নয় অথচ তাদের পদে পদে বাধা। সংকোচ, সামাজিক নিষেধ, পারিবারিক শ্লেষ, কটাক্ষ—সবই আজও মাথা তুলেই আছে। সেখানে শিক্ষিত মেয়ে, কর্মী মেয়ে, উৎসাহী মেয়ে এমন সংগঠন করুন যাতে উপকারের মাত্রা অনেকে দূর পর্যন্ত পৌঁছোয়। সংগঠনের সামান্য শক্তি আর সাহস হলেই তা আর অসম্ভব থাকবে না।

টুকিটাকি

জলের বদলে সামান্য সিরকা ব্যবহার করে মসলা বেটে রাখলে অনেক দিন তাজা থাকে। শীতকালে স্বচ্ছন্দে সপ্তাহ দশ দিন চলে যাবে। রেফ্রিজারেটর যাঁদের আছে, তাঁরা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত রাখতে পারবেন। বোতলে বেশ করে ভরে রেখে দিতে পারেন ও প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারেন।

ফুল তাজা রাখতে অনেকে অনেক কিছু ব্যবহার করেন। ফুলদানিতে দু' এক টুকরো কাঠকয়লা দিলে তাজা রাখবার সাহায্য হয়। তার সঙ্গে এক বড়ি অ্যাসপিরিন দিলেও ভাল ফল হয়।

সাবানের চলন যখন বেশী ছিল না, তখন রিঠা বা অরিষ্ট ফলই ছিল কাচাকুচির শ্রেষ্ঠ উপাদান। রিঠা ভেঙে বীচি ফেলে দিয়ে পুরোনো কাপড়ে পুঁটলি করে রাখবেন। ঈষদুষ্ণ জলে পুঁটলি ঘুরিয়ে ফেনা করে কাপড় ধোবেন। আবার পুঁটলিটি তুলে রাখবেন ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য। সাবান, স্যাম্পুর বহুল প্রচলন সত্ত্বেও জোর করে বলতে পারি যে, মাথা ঘষতে অথবা পশমী রেশমী কাপড় ধুতে রিঠার তুলনা নেই। রিঠা ব্যবহার করলে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেবার পর্বটা ভালভাবে করা দরকার। ফেনা থেকে যায় না হলে ভিতরে ভিতরে।

শ্রীমতী

হাত ভিঁড়িয়ে দেয়া। আখরোটটি এক হাতেই ভাঙতে হয়।

এ সময়ে দার্জিলিংয়ে এলে নেড়ী কুত্তার গলায়ও শরৎটোর মালা দেখতে পাবেন, কুকুরের ল্যাজে ফুলকবরীর বেঁধে দেবার মত ওও কোন দুষ্টু ছেলের কীর্তি ভাববেন না। নেপালীরা কাক ও কুকুরের পুজো দেয়। কাক ও কুকুর নাকি যমদুয়ারের প্রহরী, তাই আয় কা কা বলে ওরা কাক আহ্বান করে, কুকুরের গলায় মালা দিয়ে খাবার দেয়।

✲

লোকসংস্কৃতির অনুচিন্তাধারে নেপালী সাহিত্য প্রসঙ্গ মনে এল। উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু এখনও লেখা হয়নি, যদিও বই ছাপা হচ্ছে অনেক, তার বেশির ভাগই নেপালে, কিছু কিছু দার্জিলিংয়েও। স্থানীয় তরুণ লিখিয়েদের উদ্যম ও নিষ্ঠার শেষ নেই। সাহিত্যকর্মীদের একটা ভাল সংগঠনও হয়েছে। সম্প্রতি কালিম্পং সিনেমাগৃহে নেপালী একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা হয়ে গেল। কর্মকর্তাদের সাংগঠনিক কৃতিত্বের তারিফ করতে হয়, কিন্তু নাট্যবস্তু ও প্রযোজনা আরও উন্নত হবার অবকাশ ছিল। বাংলাভাষাভাষী একদল নেপালী নাটক অভিনয় করলেন। কর্মকর্তাদের বলেছি এমন সুযোগ থাকলে ওরা ভাল বাংলা একাঙ্ক নাটক বাঙালী নাট্যানুরাগীদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিলেও তা পারেন। তাতে বাঙালী-নেপালী সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও দৃঢ় হয়।

✲

অনেকদিন দার্জিলিংয়ের জেলা সমাজ-শিক্ষা অধিকারিকের পদ শূন্য পড়ে ছিল, কালিম্পংয়ের জনতা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রী সুব্বা অস্থায়ীভাবে ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রী সুব্বার সৌজন্যে দূর গ্রাম জনপদের কয়েকটি লাইব্রেরী দেখে আসার সৌভাগ্য হল। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী থেকে মস্ত দুই বাক্স বোঝাই বই নিয়ে যে-সব বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে জীপ চালিয়ে প্রায় দুর্গম গ্রামের মধ্যে গিয়ে লাইব্রেরীতে বই দিয়ে আসতে হয় তা না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। দূর গ্রামদেশের [illegible] নবজাগ্রত গ্রন্থপিপাসার এই ধরনের সরকারী গ্রন্থ-ছত্র যারা পরিচালনা করছেন তাঁদের প্রশংসা করতে হয়। শ্রী সুব্বার মত অক্লান্ত সরকারী অফিসার আমি কম দেখেছি। তিনি নিজে নেপালী, সুতরাং নেপালী সমাজে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অসীম আগ্রহ। কপচু গ্রামের পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ যে মেয়েটি এখানকার লাইব্রেরীয়ান, কাজের ফাঁকে তাকেও এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার জন্য শ্রী সুব্বা উৎসাহিত করছেন, বলে দিলেন কেমন করে দরখাস্ত করতে হবে, ইত্যাদি।

[illegible] সব লাইব্রেরীতেই দেখেছি কত মূল্যবান বাংলা বই (কোন কোনটা দুই বা তিন কপি) অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি এসব লাইব্রেরীর পাঠক সবাই নেপালী, সুতরাং বাংলা বইয়ের তাদের চাহিদা নেই। এতদঞ্চলের বাসিন্দা ও তাদের ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলে বই বিতরণের ক্ষমতা যাদের হাতে তাঁরা এহেন অবিবেচনার পরিচয় দিতেন না। জানি না, ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে তারা বর্ধমানে বা বাঁকুড়ায় নেপালী বই পাঠিয়েছেন কিনা। নতুন সমাজশিক্ষা অধিকারিক কয়েকদিন হল কার্যভার গ্রহণ করেছেন, তিনি দয়া করে যেন এটুকু করেন যাতে ওইসব লাইব্রেরীতে অব্যবহার্য বাংলা বইগুলি শিলিগুড়ি বা অন্যত্র যেখানে বাঙালী পাঠক আছেন এমন লাইব্রেরীতে স্থানান্তরিত হয়।

✲

শীতের মধ্যে প্রচণ্ড দুর্যোগ মাথায় নিয়ে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের বেসিক কোর্সের শিক্ষার্থীরা পাহাড়ে চড়তে গেলেন। ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর অব ফিল্ড ট্রেনিং তেনজিং সবে বিদেশ সফর করে ফিরেছেন, তিনিও গেছেন সঙ্গে। ডেপুটি ডি এফ-টি নোয়াং লম্বুও গেছেন।

এই পর্বতারোহণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি যে পাহাড়ে অবস্থিত তার সাবেকী নাম বার্চ হিল, এখন নামান্তরিত হয়ে হয়েছে জওহর পর্বত; ও নাম আছে রাস্তার নির্দেশক ফলকে, আর কাগজপত্রে, [illegible] লোকমুখে এর নাম [illegible] হয়ে গেছে। আরও আশ্চর্য, প্রতিষ্ঠানের একটা নতুন নাম বেশ চালু হয়ে গেছে— তেনজিং ইস্কুল।

পাহাড়ে চড়াও যে একটা শিক্ষার বিষয় হতে পারে এ ধারণা এদেশে খুব বেশী দিনের নয়। অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালী

কোনও কারণে সমর্থন করতে পারেন নি। স্বাদেশিকতার প্রধান অবলম্বন হৃদয়াবেগের প্রবলতা যা তিনি সর্বতোভাবে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর ধর্মবোধ ও মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক।

২। বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ রূপে বেদান্ত ভিত্তিক। কেবল তা নয়, স্বধর্মের প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন হলে দেশের প্রতিটি আচার ও ব্যবস্থার সমর্থন করতে কুণ্ঠিত হননি। কেন করেন নি তার ব্যাখ্যা হয়তো দেওয়া যায়, কিন্তু বিচারবোধ এমনভাবে প্রয়োজনের দাবি মেটাতে বিসর্জন দিলে ফল শুভ হয় না। ফল যে শুভ হয়নি, তা ভবিষ্যতে দেখা গিয়েছে। বহু-বর্জনীয় আচার ও ব্যবস্থা অন্যায়ভাবে স্থায়িত্ব পেয়েছে। অপরপক্ষে যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক চিন্তা উপনিষদ-ভিত্তিক, কিন্তু চলতে চলতে হয়ে ওঠায় তিনি উপনিষদকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। এই সত্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমাণিত করেছেন, কিন্তু স্বাধীন চিন্তার অভাবে তত্ত্বটা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচিত হয়নি; সেকারণে রবীন্দ্র-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যেও যথেষ্ট আলোকপাত হয়নি।

৩। রামকৃষ্ণশিষ্য বিবেকানন্দ দেবী কালীর উপাসক। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলেই নয়, বিশুদ্ধ মানবতাবোধের ফলে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে কালী ও মঙ্গলকাব্যের বিরোধী ছিলেন। অন্যপক্ষে শিব তাঁর রচনায় প্রচুরভাবে উল্লেখিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ধারণা কোনও সংকীর্ণতার দ্বারায় সীমায়িত যে ছিল না, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৪। ধর্মবোধকে সংঘাশ্রিত করার ফলে যে মিশন বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার দ্বারা সমাজের বহির্ভূত শ্রমণের সৃষ্টি হয়েছে, যাঁদের আত্মসমর্পণ সামগ্রিক। এই মিশন কতটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন, সেটা বিচার্য নয়, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অমন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি অসম্ভব ছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিহত হয়নি, সমাজের অঙ্গীভূত থেকে স্বনির্ভর হতে প্রতিটি ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। মিশনের অন্তর্নিহিত সার্বিক দাবীর ফলে আজ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিগ্রহায়িত। এ যদি কেবল নিজস্ব বিশ্বাস হত তাহলে অন্যের কাছে অযৌক্তিক মনে হলেও কিছু বলার থাকতে পারে না। কিন্তু বিচার-হীনতার ফলে দুই মনীষীর সমন্বয় ঘটানোর অভ্যাস এক বিরোধী অংশের মধ্যে মানসিক জড়ত্ব স্থায়িত্ব পেয়েছে। এমন কি শঙ্করীপ্রসাদের বিবেকানন্দের প্রতি [illegible] স্বীকার করে নিলেও তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধাবলী স্মর্তব্য) আশ্চর্য লাগে যখন দেখি তিনিও পারম্পরিক বিরূপতাকে ব্যক্তিনির্ভর বলে ধরেছেন। তা নইলে কি করে তিনি লিখতে পারেন, "বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে যদি কিছু ব্যক্তিগত বিরূপতা থাকে মৃত্যুর অত্যুজ্জ্বল আলোকে তা আবৃত হয়ে গিয়েছিল।" এটা নিছক আলঙ্কারিক উক্তি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কখনই কোনও কারণে সৌজন্য বোধ হারাননি, বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি সেই সৌজন্যবোধের বিন্দুমাত্র অভাব প্রদর্শন আরও অসম্ভব ছিল। অনেক অল্প প্রতিভাবান ব্যক্তির মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতর ও বৈশিষ্ট্যতর রচনা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ একসঙ্গে গ্রহণ করা নিবেদিতারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার আকর্ষণ সন্দেহাতীত। কিন্তু কিছুটা মতের পার্থক্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথের মৌল জীবনদৃষ্টির সঙ্গে যে নিবেদিতার অনেক মিল ছিল সেকথা শঙ্করীপ্রসাদ বিশদভাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু যা বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ ও যা উক্ত মনীষীদ্বয়ের পার্থক্য গভীরতরভাবে প্রকাশ করে সে বিষয়ে শঙ্করীপ্রসাদ প্রায় নিরুত্তর। বিবেকানন্দের জীবিতকালে নয়, মৃত্যুর পরই নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব নিবেদিতাকেও নিজস্ব জীবনবোধ থেকে কিছু পৃথক হতে বাধ্য করেছিল। এবং নিবেদিতাও দুজনকে একই সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি, উভয়ের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রভাব সত্ত্বেও।

যে প্রশ্ন উত্থাপিত হল এখানে সেটা যেমন সমাজের এক বৃহৎ অংশকে সংশয়ী করে বলে মনে হয় না তেমনি কম্যুনিস্ট মতাবলম্বীদের কাছেও এর কোনও গুরুত্ব নেই। অধুনামৃত এক সাম্যবাদী পণ্ডিত অধ্যাপকের কাছে এই সংশয়ের কথা তুলেছিলাম। অত্যন্ত সহজ সরলীকরণ দ্বারা তিনি প্রশ্নটির সমাধান করে দিলেন এই বলে যে, প্রকৃতপক্ষে দুজনেই সাম্রাজ্যবাদী তথা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সংঘর্ষে সৃষ্ট, সুতরাং প্রশ্নটাই অলীক ও অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজনমত কম্যুনিস্টরা উভয়কেই ব্যবহার করবেন। স্মরণ হচ্ছে কোনও এক জায়গায় বিবেকানন্দ চীনের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন। অন্য ঐতিহাসিক চরিত্রও অবশ্য অনুরূপ উক্তি পূর্বে করেছেন। এখনও পর্যন্ত মার্ক্সবাদীরা যে বিবেকানন্দের উক্ত মন্তব্য কেন কাজে লাগাননি তা জানি না।

কিন্তু অন্য বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা গ্রহণ-বর্জন নৈতিক নীতিতে বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে বিশেষ অনুরোধ যেন যুক্তি ও বিচার দ্বারা মানসিক অসংশয়কেও আঘাত করতে অনাগ্রহী না হন। বাঙালীর সমাজজীবনে এর অত্যন্ত প্রয়োজন আজ।

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
মাদ্রাজ-১৭

২

গত ২৩শে ডিসেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর "নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য" প্রবন্ধটি হঠাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করায় মনোযোগ সহকারে পড়লুম। প্রথমেই শ্রীবসুকে ধন্যবাদ, তিনি বাংলা দেশের একটি অজ্ঞাত বিষয়বস্তুকে সকলের সম্মুখে বহু পরিশ্রম করে উপস্থাপিত করেছেন বলে। নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ সাধারণ পাঠকসমাজের নিকট এতদিন অজ্ঞাত ছিল বললেও কোন ভুল হবে না।

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিকট শোনা দু'একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। আশা করি, অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত সাধারণের নিকট খুব পরিচিত না হলেও বাংলার সুধীসমাজে তিনি খুব অপরিচিত ছিলেন না। ১৯০২ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। স্বদেশী যুগে কিছুকাল 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। পরিশেষে পরিণত বয়সে বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্ম নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন।

শ্রীবসু লিখেছেন যে, নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী বুদ্ধগয়া ভ্রমণের সময় দলে ছিলেন কুড়ি জন। নানা তালিকা এবং চিঠিপত্র ঘেঁটে তিনি আঠারজনের নাম সংগ্রহ করেছেন। আমার পিতৃদেবও এই দলের একজন ছিলেন এবং মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ও আমার পিতৃদেবের সঙ্গে সেখানে ছিলেন। বেম 'মিসেস টেগোর' অনবধানতাবশত লেখেননি। কবিপত্নীও সেই সময় বুদ্ধগয়ায় ছিলেন। আমার পিতৃদেবের নিকট শুনেছি, মৃণালিনী দেবী সকলের সম্মুখে খুব আসা-যাওয়া করতেন না। তিনি লাজুক প্রকৃতির ছিলেন এবং সবার আড়ালে নিজেকে গোপন রাখতে পছন্দ করতেন। আমার মনে হয়, সেজন্যই মৃণালিনী দেবীর উপস্থিতি অনেকের নজরে পড়েনি।

পিতৃদেব বুদ্ধগয়ার একটি ঘটনা সুযোগ হলেই সকলকে বলতেন। সেই ঘটনার কথা বলছি। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিছনের দিকে বোধিদ্রুমের নিকট এক সন্ধ্যাবেলা নিবেদিতা ধ্যানমগ্না। দু' চোখ বেয়ে তাঁর জল

গাড়িয়ে পড়ছে— তিনি যেন কোন অতীতের প্রাণলোকে চলে গেছেন। সকলে নীরবে বসে নিবেদিতার সেই ভাবগম্ভীর অবয়বের দিকে চেয়ে আছেন। আর রবীন্দ্রনাথ গাইছেন: 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।' এই দৃশ্যের বর্ণনা দিতে দিতে আমার পিতৃদেব আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন।

তদানীন্তন ছোট ছোট অনেক ঘটনা আমার পিতৃদেবের নিকট শুনেছি। তিনি একবার বলেছিলেন যে, কলকাতার কোন এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে [illegible] রবীন্দ্রনাথের গান [illegible] কাছে তাঁদের দুজনের [illegible] সেই [illegible] আমার পিতৃদেব [illegible] কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেই [illegible] পারেননি।

শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত
[illegible]-২২

ছায়াচিত্র সংখ্যা

দেশ পত্রিকার বিশেষ ছায়াচিত্র সংখ্যাটি নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সংখ্যাটি প্রকাশ করার জন্য 'দেশ' কর্তৃপক্ষ [illegible] হয়েছেন। চলচ্চিত্রও যে একটি শিল্প [illegible] এবং এর মধ্যেও যে [illegible] সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে [illegible] অনেকেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। [illegible] তাঁদের সংখ্যা [illegible] একথাও সত্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক, তার আঙ্গিক, অভিনয়, পরিচালনা, প্রযুক্তির [illegible] কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ [illegible] বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুষ্টিমেয় কয়েকটি পত্রিকা বাদ দিলে, নিছক চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্রিকা হিসেবে বাজারে যেগুলো প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নব নব চিন্তার খোরাক দূরে থাক বরং, পরন্তু নায়ক নায়িকার একান্ত ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা রসালো জল্পনা, অশালীন ছবি, শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের নামে একঘেয়ে জনভোলানো বিবরণীতেই পাতাগুলি পূর্ণ। তাই বিশেষ চলচ্চিত্রকার ও সাহিত্যিকদের চিন্তাধর্মী ও মননশীল প্রবন্ধগুলি দেশের ছায়াচিত্র সংখ্যায় পড়তে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছি।

নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় ছবি তুলতে গিয়ে একজন পরিচালককে যে-সব বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তা সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রবন্ধটিতে সহজভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রবন্ধটি থেকে জনসাধারণের শেখবার জিনিস রয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছবির 'সেকাল একাল' প্রবন্ধটি আমার যেন কেমন একপেশে বলে মনে হয়েছে। আধুনিক ইয়োরোপীয় চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে তিনি কেবল অস্বাভাবিক যৌনতার প্রকাশই লক্ষ করেছেন, এটা দুঃখের বিষয়। শিল্পের কোনো নতুন আন্দোলন বা ধারার মধ্যে যেমন সত্য ও আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকে, তেমনি তার মধ্যে আগাছার মতো কিছু অবাঞ্ছিত, চটকদার, ও আপাত মনোলোভন জিনিসও গজিয়ে ওঠে। তাই বলে সম্পূর্ণ প্রচেষ্টাটিকে নস্যাৎ করার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। তিক্ত মন্থন থেকে খাঁটি জিনিসকে চিনে নেবার মধ্যেই রস [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] বসু ভট্টাচার্য হিন্দী চলচ্চিত্র জগতের বর্তমান পরিবেশে উন্নত রুচির পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক হিন্দী ছায়াচিত্র নির্মাণ যে কতখানি দুঃসাধ্য তা তাঁর প্রবন্ধটিতে আলোচনা করেছেন। সব চেয়ে ভালো লাগলো, তিনি সাধারণ দর্শকদের সম্পর্কে কোনো উন্নাসিক মনোভাব প্রকাশ করেননি দেখে। পংকজ দত্ত তাঁর প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, '.....ইদানীংকার কয়েকখানি ছবি দেখে মনে হয়, অপু-ত্রয়ীর সেই জননন্দিত শিল্পী সাধারণ মানুষকে অগ্রাহ্য করে ক্রমশ ইনটেলেকচুয়ালদের মনোরঞ্জনেই বেশী ঝুঁকেছেন। সাধারণের মনে এমনিধারা একটা অনুযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে সেটা অস্বীকার করা যায় না।' তাঁর এই মন্তব্য চিন্তা করে দেখবার মত। ঋত্বিক ঘটকের ছবি সম্পর্কে আলোচনাটিও খুব ভালো লাগলো। মোট কথা, এরূপ একটি সুসম্পাদিত, রুচিশীল চলচ্চিত্র সংখ্যা প্রকাশের জন্য "দেশ" কর্তৃপক্ষকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।

সুপ্রিয় রায়
ইমামবাড়ার লেন, হুগলী।

॥ ২ ॥

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিশেষ সংখ্যা দেশ-এ শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা 'ছবির একাল সেকাল' সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন না তুলে পারছি না। তাঁর চলচ্চিত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে লেখক যৌনতা ও বর্তমান যুগের মানসিকতা যার প্রতিফলন সিনেমায়, সাহিত্যে, শিল্পে সর্বত্র, সম্পর্কে কতকগুলো এমনই প্রতিক্রিয়াশীল চরম মন্তব্য করেছেন, যা যে কোনো সাধারণ পাঠককেই হতাশ করে। জীবনবোধের যে রূপ বিদেশে আজ ক্রমবর্ধমান, তার কিছু অংশ যে ভারতে অনুকরণ করা হয়, একথা মানি। কিন্তু শ্রীমিত্র কি শুধু অতিশয়োক্তির চাপে পড়েই পালাতে চাননি 'দেশের মাটি' কিংবা 'মুক্তি'র কালে? মুক্তির যুগ থেকে এগিয়ে এসে আমাদের সাহিত্য বা চলচ্চিত্র এমন অবস্থায় এখন এসে পৌঁছেছে, তাতে অনুকরণপ্রিয়তা (যা অনেক অংশেই বিকৃত) আসতে তো পারেই। তাছাড়া বিকৃতি এলেও তাঁরই রচনা অবলম্বনে সৃষ্ট 'কাপুরুষে'র মত বা 'চারুলতা'র মতো অথবা 'বালিকা বধূ'র মতো চলচ্চিত্র অন্তত বাঙলা দেশে সুস্থ মানসিকতা নিয়ে বর্তমান দিনেও কি নির্মিত হচ্ছে না? তারপর তিনি লিখেছেন—সাহিত্য বা শিল্প বা চলচ্চিত্র সবই 'অগ্রগতির লক্ষণ হিসেবে যৌন চিন্তাই ধার করার যে আস্ফালন করছে তা দেখে এক উল্টো সন্দেহ জাগে,' এবং এটা কিছু 'পৌরুষহারা নপুংসকতার লক্ষণ নয় ত?'—স্বীকার করতে দ্বিধা নেই প্রেমেন্দ্রবাবু, ইংল্যাণ্ডের [illegible] ঝোলা কিংবা সংশ্লিষ্ট দেশের সম্পর্কে অনেকাংশে ঠিকই মন্তব্য করেছেন, কিন্তু এটা কি করে এক কথায় বোঝানো সম্ভব যে, 'যৌনতাবিলাস, সৃষ্টিমূলক উদ্ভাবনের দৈন্য ঢাকবারও একটা ছল'। এ প্রসঙ্গে ঋত্বিককের যথেষ্ট প্রশস্ত অবসর ও পৃথক স্থান-কাল-পাত্র থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র চলচ্চিত্র সম্পর্কিত আলোচনাতে এমন অবিনাস্ত মন্তব্যের প্রয়োজনটা কোথায়। শ্রীমিত্র আরও বলেছেন, 'এ সংক্রমণ থেকে আমরাও নিরাপদ নই—সেন্সারের বালাইটুকু না থাকলে, সাহিত্যে যেমন সহসা এক্জিসটেনশিয়ালিজমের দূত সার্ত্রের উদয় হয়েছে, সিনেমাতে তেমনি ইংল্যাণ্ডের বাগম্যানদের ছড়াছড়ি দেখা যেত'। ভারতবর্ষীয় মানুষদের প্রতি এত বেদনা ও নিরাশার অঙ্কুশ কী করে যে 'সাগর থেকে ফেরা'র কবি নিক্ষেপ করতে পারেন, ভাবতেই পারা যায় না।

পরিশেষে শ্রীমিত্রের রচনা সম্পর্কে সব চাইতে বড় প্রশ্ন যা মনে জাগে—চলচ্চিত্রের একাল-সেকাল পর্যালোচনা করতে গিয়ে সভ্যতার একাল-সেকাল সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত মন্তব্যবাণ নিক্ষেপ করাই কি ছিল তাঁর উদ্দেশ্য?

শংকর মজুমদার
সুন্দর মজুমদার
হাওড়া

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাউরের

প্রধানমন্ত্রীর সফরে

আবার যাত্রা হলো শুরু। গোটা ড্রিল এখন মুখস্থ। কী কী হাতে থাকবে, কোন্ কোন্ জিনিস স্যুটকেসে যাবে, এবং স্যুটকেসে কোথায় কার স্থান। আধ-ঘণ্টাতেই তৈরি। সব কিছুই হতে হবে কুইক্। কুইক্ শেভ, কুইক শাওয়ার, কুইক্ ব্রেকফাস্ট। এবং আগের রাতেই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী অনুরোধ জানিয়ে রেখেছেন ঃ প্লেন ছাড়বে দশটায়, এয়ার-পোর্টে যেতে হবে অন্তত ৪০ মিনিট আগে। জিনিসপত্র প্যাক্ করে স্যুট-কেস ঘরের দরজার সামনে যেন থাকে সকাল আটটায়।

ইউ-এন আই সংবাদ সরবরাহ প্রতি-ষ্ঠানের রাজাগোপালন একটু নার্ভাসধাতের মানুষ। সে রাত থেকে তৈরি হতে থাকে। "আই সে, খগেন, রাত্রে শোয়ার আগে শেভ করে রাখলে সকালে আর তাড়াহুড়ো করতে হবে না"।

বললাম ঃ "তাই করো। আর সঙ্গে চান্ ও ব্রেকফাস্টও সেরে নাও, একেবারে স্যুট পরে শোও। সকালে আর ল্যাঠা থাকবে না।" হাসতে হাসতে তার জবাবঃ "আই সে, ইটস্ এ গুড আইডিয়া"।

হঠাৎ হোটেলের ঘরটা ছাড়তে যেন মায়া-মায়া ঠেকল। টেবিল, চেয়ার, গালিচা, জলের গেলাস, বেসিন্ সবাই যেন তিনদিন তিন রাত্রিতে জানা শোনা হয়ে গেছল, যেমন হয়েছিল মোটরের ড্রাইভারটি (যাকে কামারাদ্ কিম্বা তোভারিশ্ বলে ডাকলে এক গাল হাসত আর গাড়ি চালাত একশো কিলোমিটার বেগে), আমাদের ভার-নেওয়া কর্মচারী টিটলোফ্, হোটেল পিলসকার ডাইনিং হলে আমাদের বিশেষ একটি স্থান, সকলের সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যাত্রা শুরু করতেই হবে।

সবাই এসে হাজির। কিন্তু প্রত্যেক-বারই দেখা যায় একজন দুজনের পাত্তা নেই। লেট্ লতিফ্। বিশেষ করে বন্ধুবর চন্দ্রাকার আর মারাংগুলি। তাদের তাগিদ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে ("আমরা তাহলে চললাম") আসতে হয়েছে কয়েকবার এবং এই ধরনের সফরে ঘড়ি ধরে কাজ করাটা একটা ভীতিপ্রদ জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিটি দিন একেবারে ছাপানো ছক-কাটা। যথা ঃ সোফিয়া থেকে রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্তে পৌঁছনোর প্রথম দিন। ১০-৪৫ প্রধানমন্ত্রীর অবতরণ বালা-সেসা এয়ারপোর্টে; ১২-৩০ মৃত বীরদের স্মৃতি সৌধে পুষ্পার্ঘ্য দান; অপরাহ্ন ১টা ইন্দিরাজী যাবেন রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়োন গেয়োরগে মাউরের মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (কার্টসি কল্); ১-৩০ ওঁনাদের লাঞ্চ; (এবং আমাদেরও: কিন্তু প্রায়ই থাকে হয়তো ওই দেশের সাংবাদিক-দের সঙ্গে আহার); ৪-৩০ ইন্দিরাজী যাবেন ভারতীয় দূতাবাসে; ৫টায় সরকারী-ভাবে আলোচনা অরম্ভ দুই প্রধানমন্ত্রী এবং দুই দেশের ডেলিগেশন সভ্যদের মধ্যে; রাত ৮-৩০ রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইন্দিরা গান্ধীকে অভ্যর্থনা। এটি শেষ হতে রাত প্রায় ১১টা। ঘড়ি মহাশয় তখন বিদায় নিলেন।

প্লেন ছাড়ার কথা সকাল ১০টায়। চারদিকে সুন্দর রোদ, এয়ারপোর্ট ঝল-মলে। প্রথম পৌঁছতে রীতিবদ্ধ অভ্যর্থনা, বিদায় নেওয়ার বেলাতেও তেমনি। ব্যান্ড বাজে, গার্ড অব্ অনার, গণ্যমান্যদের সঙ্গে একে একে হ্যান্ডশেক্, তারপর দুই প্রধানমন্ত্রী (কোন স্থানে রাষ্ট্রপতিও) এসে দাঁড়াবেন প্লেনের সিঁড়ির সামনে। লেফ্‌ট্-রাইট্ করে সৈনিকরা যাবে শেষবারের মতো সেলাম জানিয়ে। এবং প্রধানমন্ত্রীর শেষ বিদায়ী কাজ হল সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে সকলকে হাত নাড়িয়ে উল্লাস জানানো।

প্লেন যথারীতি দৌড়তে আরম্ভ করল টারম্যাকে। বেগ বাড়ছে ক্রমশ, জেটের চিৎকারও বাড়ছে তেমনি, এবং আমাদের কানের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছল ওই

বুকারেস্টের একটি রেস্তোরাঁয় একদিন রাত্রে

আওয়াজের একটা বিশেষ তীব্রতার সঙ্গে ঠিক যে-মুহূর্তে প্লেন মাটি ছেড়ে উঠে যায় শূন্যে। অক্টোবরের ১৬ তারিখের সকাল। প্লেন দৌড়চ্ছে পইপই করে। এবং ঠিক যে মুহূর্তে শূন্যে উঠে যাওয়ার কথা, তা না করে অকস্মাৎ ব্রেক্ করে থেমে গেল। কী একটা শব্দও শোনা গেল পেছন দিকে, প্লেনের নিচে।

ব্যাপারটা বড় সুবিধের ছিল না। দুর্ঘটনাটি হতে হতে হয়নি, প্রধানমন্ত্রীর কপালের জোর, আমাদেরও এবং আমাদের ভিতরে যারা বিবাহিত তাদের পত্নীদের শাঁখা-সিঁদুরের জোর। প্লেন উঠতে গিয়ে পারেনি, কারণ পেছনের দিকটাতে ভার অত্যন্ত বেশী, এবং তাই সে একটু ধপাস্ করে আছাড় খেল। নিচের দিকে একটা কিছু ভেঙেও গেছল। তবে বিশেষ কিছু নয়।

আসলে মালপত্র ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে, আমাদের আর, ওই ওঁনাদের। সবদেশ থেকেই প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলের সকলেই, আর আকাশবাণীর সংবাদদাতা ও ফটোগ্রাফার দুজন। যার পদও মর্যাদা বেশি তার ভেটের পরিমাণও বেশি। যদি প্রধানমন্ত্রী পান অনেকগুলো পিস্-এর কৃস্টাল্ সেট্, সিঁড়ির শেষ ধাপের লোকটি পাবে হয়তো একটা স্যুটের কাপড়, কিম্বা রূপোর রেকাবি। নানা ধরনের আকৃতির প্রায় গোটা পঞ্চাশেক বাক্সভরা ভেটের জিনিসপত্র, টি-ভি সেট্, কার্পেট থেকে শুরু করে টেবল ল্যাম্প। যতো দেশ পার হচ্ছি ততো বাড়ছে ওই-সব বাক্সদের সংখ্যা, কোনো কোনোটি (কাঠের বাক্সে প্যাক্ করা) দেখতে অর্ধ-আলমারির মতো।

যেতে যেতে একটু দুঃখ করে সেদিন বলছিল স্কোয়াড্রন লিডার গোয়েল: "একবার চেয়ে দেখুন, আই-এ একের ভিয়াইপি প্লেন, সুন্দর জেট্ প্লেন, হয়ে গেছে একটা কারগো প্লেন। আমরা মালপত্রের কী জানি? আর বাক্সের সংখ্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। গড্ নোজ্ হোয়্যার দ্য লিমিট্।"

"স্কাই প্রেপস্?"

"স্কাই?" বলে গোয়েল সোজা হয়ে বসে, "স্কাইজ মাই লিমিট্, ইজনাট্ মুখো (মানে, স্কোয়াড্রন লিডর মুখার্জি), এ্যান্ড নট অব কারগোজ! দ্য হেল!!"

আধ ঘন্টা পরে আমাদের প্লেন আকাশে উঠল। দুপাশ থেকে বিদায় দিতে এল চারটে মিগ্ জংগী বিমান, তারা অনেকক্ষণ উড়ে উড়ে চলল আমাদের সঙ্গে। পাইলটরা হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে, আমরাও জানলার কাচে হাত নাড়ি। অকস্মাৎ ফটোগ্রাফার জৈন চেঁচাতে লাগল, "আরে ভাই, দেখো, ইয়ে পাইলট আওরাত হ্যায়, লেড়কী আওরত।" দেখতে তাই কিন্তু ওটা বিমান-চালকের মাথার আবরণ ও বয়সের স্বল্পতা হেতু। অন্ততঃ আমার তাই মনে হলো। কি জানি, হয়তো আওরতই হবে।

প্লেন উড়বার আগে, আবশ্যক রক্ষার জন্যে কয়েকজন পেছন থেকে গিয়ে বসল দ্বিতীয় কামরায়। মালপত্র টানাটানির আর সময় ছিল না। এবার উড়তে আর কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে এগো গুজব ছড়াতে আরম্ভ করল প্লেনের ভিতরে যে যা বলে! কেউ বলছে, চাকা ভেঙে গেছে। কেউ বলছে, না পেছনে ল্যান্ডিং-এর একটা অংশ খেঁতলে গেছে, রেডিয়োর তার ছিঁড়ে গেছে, ওয়্যারলেসের অ্যানটেনাটা আর নেই,— ইত্যাদি। সমস্ত গুজবকে ধূলিসাৎ করে আমাদের প্লেন চললো তো চললই, এমনকি অতি নিরাপদে নেমেও গেল "বাক্কোয়াসা" এয়ারপোর্টে। মাত্র ৪৫ মিনিট ওড়া, ওই কলকাতা পাটনা, কিম্বা আরো কাছে।

সাংবাদিকদের মন থাকে সংবাদের দিকে। আমরা ভেবেছিলাম, বুলগেরিয়াতে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে জনসাধারণ ততো আদর-অভ্যর্থনা জানিয়েছে, না-জানি বুকারেস্টে কী হবে। একেবারে উলটো। এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যেতে রাস্তার পাশে কোনো লোকজন নেই, শহরের

ভিতরেও কেউ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নেই, আমাদের মোটর মিছিল দেখতে। রাস্তা পার হওয়ার জন্যে লোকদের বাধা দিয়ে। সবাই একটু হৃচকচিয়ে গেল, এমন কি কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীও।

টাইমস অব ইনডিয়ার থ্রি-পিস্ স্যুট-পরা রেড্ডি সাহেব চালাক—হাসির চিলিক দিয়ে খাটো গলায় আমাদের বুদ্ধি দিতে গিয়ে বললেন : আরো জানো তো, রুমানিয়া হল কমিউনিস্ট চীনের বন্ধু। ওরা ভারতকে জানো তো, বিশেষ ইয়ে করে না। আমাদের একটু হেয় করে, জানো তো?

রাজাগোপালন : "আই সি ! ইটস্ এ গুড আইডিয়া! আই সে, খগেন, পুট্ ইট্ ইন দ্য রিপোর্ট"। আমরা, ইউ সি, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, মন্তব্য করতে পারিনা। তোমরা হলে বিশেষ সংবাদদাতা, লাগাও লাগাও।"

বললাম : "আই সি, আমি দেখি" বাঙলাতেই ওটরে বললাম।

"কী বললে মাই ব্রাদার?"

"সেড্ ইন বেঙলী আমি দেখি।"

"মানে?"

"মানে হল, আই সি।"

"ও মাও আই সি।"

রাজা (রাজাগোপালনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আমাদের সকলের কাছে) হল, সংবাদের পোকা। চোখদুটো সর্বদা লাল, কিন্তু কোনোদিন রাগতে দেখিনি। অনেক সময় দিল্লিতে লোকসভার বারান্দায় দেখা হতেই হয়তো চেঁচিয়ে উঠল : "আই সে, এখনো দাঁড়িয়ে আছ তোমরা? প্রধানমন্ত্রী রিয়েল নিউজ দিয়েছে। কি না?" বিদেশের শহরে হয়তো ফিরে এল রাত দুটোয়। অমনি আমাকে কাছে পেয়ে তার উৎসাহ-ব্যঞ্জক আহ্বান : "আই সে খগেন! কোথায় ছিলে বাবা অ্যাতোদিন। যা নাইট ক্লাব দেখলাম না, কী সে বলি, টেরিবল্, ওয়ান্ডারফুল। অ্যান্ড দ্য উইমেন্, মাই গড্!"

"কেন ব্রাদার, আমি তো এই একই হোটেলে ছিলাম। দেখিনি।"

"আই সি।"

এই যে রাস্তায় লোক ছিল না প্রধান-মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করতে, এই ব্যাপারটা আমি উল্লেখ করলাম আমার পরিচিত একজন রুমানিয়ান (তাদের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের) কর্মচারীকে। তিনি জানালেন যে, সেদিন ছিল সোমবার, মোটেই ছুটির দিন নয়। গত বৎসর তাদের কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য কোনো কারখানা কিম্বা প্রতিষ্ঠানে কাজ বন্ধ করা চলবে না, ছুটির দিন ছাড়া। [illegible] রাস্তায় লোক পাওনি।"

একটি রুমানিয়ন চিত্র তারকা

আমাদের শুরু হোল রুমানিয়া দেখা, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর রুমানিয়া দর্শন, তাদের ভাষায় "ভিজিতেই অফিসিয়ালে ইন রেপুবলিকা সোসিয়ালিস্তা রোমানিয়া আ একসেলেনসেই সালে (হার একসে-লেনসি) প্রিমিনেই মিনিস্ত্রু আল রেপুব-লিকি ইন্দিয়া, ইন্দিরা গান্ধী।"

রুমানিয়া ছোট্ট দেশ, ইউরোপে মাঝারি আকৃতির দেশ যার জনসংখ্যা মাত্র এক কোটি ৯০ লক্ষ (১৯৬৬ সনে)। প্রতিবেশী দেশ হল যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও রাশিয়া। সকলেই সমাজতান্ত্রিক। রাশিয়া ছাড়া অন্যান্য দেশ-গুলো তাদের রাজনৈতিক কাঠামোকে বলে পিপল্স্ ডেমোক্রেসি, জনসাধারণের গণ-তন্ত্র, অথবা জনগণতন্ত্র, যাই বলুন। প্রত্যেক দেশেই কমিউনিস্ট দলই হলো মুখ্য দল, এবং প্রাধান্য এতো বেশি যে অন্যান্য খুচরো-খাচরা যারা আছে তারা নামমাত্র। এবং এটা অবশ্যম্ভাবী যে, কিছুকাল পরে তাদের আলাদা অস্তিত্ব রাখার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না।

রোমানদের সঙ্গে এদের যে নিকট সম্বন্ধ ছিল তা নাম থেকেই অনুমান করা যায়, "রোমানিয়া"। কৃষ্ণ সাগরের পারে পারে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে ছিল কয়েকটা গ্রীক বসতি। রুমানিয়ার মাটিতে প্রথম রাষ্ট্র ছিল 'দাসিয়া' (খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী), কিন্তু রোমান সম্রাট ট্রাজান এটিকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন ১০৬ সনে। দাসিয়ান আর রোমানদের ভিতর বৈবাহিক ফলস্বরূপে যাদের উদ্ভব হল তারাই রুমানিয়ানদের আসল পিতৃ-পুরুষ।

দশক থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী হাঙ্গেরির সামন্ত রাজারা দখল করল একটা অংশ। তারপর অনেককাল যুদ্ধ তুর্কী সাম্রাজ্যের সঙ্গে এবং ১৫৪১ সনে তুর্কীর অধীনে

কৃষ্ণ সাগরের সৈকতে টুরিস্ট

নৃত্যময়ীদের দল : এক রজনী বুকারেস্তের অপেরা হলে
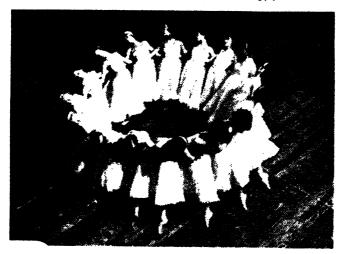
গেল ট্রানসিলভানিয়া প্রদেশ। তুর্কীদের প্রভাব তাই রুমানিয়াও এড়াতে পারেনি। সামন্তবাদী যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও তুর্কীদের প্রভাব একেবারে যায়নি ১৮৪৮-এর বিপ্লবের আগে। এবং দুটি প্রদেশ, মলদোভা এবং ওয়ালাচিয়া, একত্রিত হয়ে ১৮৫৯ সনে গ্রহণ করে 'রোমানিয়া' নাম।

তারপর ইউরোপের ইতিহাসের ও দুটো বিশ্বযুদ্ধের আবর্তে পড়ল রুমানিয়া। প্রথমটির পর সে ফিরে পেল (১৯১৮) ট্রানসিলভানিয়া এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ হল 'রোমানিয়া রাষ্ট্র' ভৌগোলিকভাবে। দ্বিতীয়টির মধ্য দিয়ে এল নতুন রুমানিয়া। রুমানিয়ার রাজা ১৯৩৮ সনে কায়েম করে তার একনায়কত্ব এবং ১৯৪০-এ ট্রানসিলভানিয়া আবার গেল হাঙ্গেরিতে, যখন ফ্যাসিস্ট নেতা হরথি ছিল হাঙ্গেরির শাসক। এবং রুমানিয়াও ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নিজেদের ফ্যাসিস্ট নেতা জেনারেল আন্তেনেস্কুর হাতে চলে গেল। পূর্ব ইউরোপের এই সব কটি দেশেই যুদ্ধ ছিল শুধু হিটলারের বিরুদ্ধেই নয়, নিজ নিজ দেশের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেও। রুমানিয়াতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ হল ১৯৪৪ সনের ২৩শে আগস্ট থেকে। জার্মেনী তখন রাশিয়া ও আমেরিকার পরাক্রমে পর্যুদস্ত হতে আরম্ভ হয়েছে। ওদিকে রুশ সৈন্যরাও ঢুকে গেছে রুমানিয়ায় এবং তাদের সহায়তায় রুমানিয়ান সৈন্যরা দেশকে মুক্ত করে ফ্যাসিবাদ থেকে। তাদের সৈন্যসংখ্যা ১৯৪৫ (মে মাসে)-এ ছিল ৫,৪০,০০০ এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে ১,৭০,০০০ জন। হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তিকরণেও রুমানিয়ান সৈন্যরা অংশ নিয়েছিল।

রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করে রুমানিয়া প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র গ্রহণ করল ১৯৪৭ সনের ৩০শে ডিসেম্বর। ওটিই তাদের জাতীয় দিবস।

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর বুকারেস্ত, অনেক দোকানপাট, দোকানে দোকানে ভিড়। কেনাকাটাও খুব কম নয়। কয়েকটা সুপারবাজার আছে, একটিকে দেখেছি। খুব সাজানো বলে মনে হল না। দামও বেশ। একটা সাধারণ উলের জামা ১২৫ টাকার কম নয়, যা হয়তো আমাদের দেশে ৬০ টাকা।

আমাদের তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী মিস্টার বেক্। তাকে বললাম, "দেখুন, আমি বেহালার একটা ছড়ি কিনতে চাই। কোথায় যাবো?" তিনি কাছেই একটা রাস্তার নাম করলেন, ভিকটরি স্কোয়ারে। গেলাম। প্রিয়দর্শিনী একটি মহিলা—কিছুটা ফরাসীতে কিছুটা হাতের ভঙ্গিতে জানালাম উদ্দেশ্য। সে অমনি বেহালা-ছড়ি-বাক্স সামনে এনে ঘোষণা করল, 'ভোয়ালা'। আমি শুধু ছড়িটি তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কঁবিয়াঁ?" কত্তো দাম?

বললেন, ওটি আলাদা নিতে পারবে না, বেহালা সুদ্ধ নিতে হবে। কী গেরো! কত্তো করে বললাম, না, নিয়ম নেই আলাদা বিক্রি করার। তাহলে কোথায় পাব? ঐ ওদিকে অমুক জায়গায় অমুক দোকানে গেলে পাবে, হয়তো। অনেক ঘুরে অমুককে পেলাম শেষটায়। সেখানে বেহালাও নেই ছড়িও নেই। ওদিকে ঘড়ি মহাশয় তাগাদা দিচ্ছেন, এবার বাপু হোটেলে ফেরো, অন্যথায় তোমাকে ফেলে রেখে অন্যান্যরা চলে যাবে।

ফিরেই [illegible], যার [illegible] নাম হল 'আতেনে পালাস'। মিস্টার বেক বললেন, "দেখা যাক কী করা যায়।" অবশেষে শরণ নিলাম আমার পরিচিত রুমানিয়ান ভদ্রলোকটির, যিনি দিল্লির দূতাবাসে বেশ কয়েক বৎসর ছিলেন। উনিও প্রধানমন্ত্রীর আগমন নিয়ে ব্যস্ত, আমার ছড়ির জন্যে ছড়ি খোঁজানোর সময় তাঁর কোথায়? তিনি বললেন তাঁর স্ত্রীকে। এবং উনিই কোত্থেকে যেন পেয়ে গেছেন একটা ছড়ি।

আমি আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, হয়তো কলকাতাতে পাব। বুকারেস্ত ছাড়বার এক ঘণ্টা আগে সেই ভদ্রলোক ছড়িটা কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই যে, তোমার ছড়ি।"

(আরও চলবে)

—খগেন দে সরকার

নাট্যকার আরাবাল

বর্তমান পৃথিবীর নতুন নাট্যকারদের মধ্যে আরাবাল একটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের প্রতিভা। তুলনা দিয়ে বোঝাতে গেলে তাঁকে বলা যায় মঞ্চের চার্লি চ্যাপলিন (প্রথম দিককার)। এই উদ্ভট গোলমেলে পৃথিবীতে তাঁর চরিত্রগুলো বড়ই সাধারণ আর সরল—এত সরল যে, তাদের ব্যবহার, কথাবার্তায় আমাদের হাসি পাবে। যেমন, তাঁর একটি নাটকে, একজোড়া স্বামী-স্ত্রী—একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে এসেছে পিকনিক করতে। চারদিকে দারুণ যুদ্ধ, গোলাগুলি ছুটছে—ওরা তারই মধ্যে ওসব কিছু অগ্রাহ্য করে খাবারের তারিফ করছে—যুদ্ধ খুব বেশী ঘোরালো হলে ওরা বড় জোর মাথা ছাতা দিয়ে আড়াল করছে—এবং বৃষ্টি থেমেছে কি না দেখার মতন ওরা ছাতার বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছে গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়েছে কি না। এসব দেখে আমাদের হাসি পাবারই কথা। আর একটি নাটকে, একটি মৃত শিশুর কফিনের দু-পাশে স্বামী-স্ত্রী বসে বলছে—এখন থেকে আমরা খুব ভালো হবো।

আরাবাল জাতে স্প্যানিশ, থাকেন ফরাসীতে। বয়েস বেশী নয়, ৩৯ বছর মাত্র, বেশ সুদর্শন, বেঁটে, গোলগাল চেহারা, যত্ন করে ছাঁটা দাড়ি ও গোল চশমা। ব্যবসায়িক মঞ্চ তাঁকে এখনও গ্রহণ করেনি, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য পাঠকদের কাছে আরাবাল একটি প্রিয় নাম। সব মিলিয়ে, আরাবাল যেন একটি বয়স্ক শিশু। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে ইংরেজিতেও পাওয়া যায়, "অটোমোবিল গ্রেভইয়ার্ড", "দি এক্সিকিউশনার", "পিকনিক অন দা ব্যাটেল ফিল্ড" ইত্যাদি।

কিছুদিন আগে আরাবালের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ বেরিয়েছিল 'এভার গ্রীন' কাগজে। সেই বিবরণটিতে আরাবালের চরিত্র বেশ বোঝা যায়। আমরা তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি। ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন একজন মহিলা, অ্যান মরিসেট—তিনি আফ্রিকায় শিক্ষা বিস্তার যোজনায় কাজ করেন। প্রথমে একটা রেস্টুরেন্ট এবং পরে লেখকের বাড়িতে কথাবার্তা চলে ফরাসী ভাষায়।

প্রশ্ন : আপনি কি খাবেন? চা? কফি? এই দোকানে মদ দেয় না।

আরাবাল : জানি। আপনি কি খাচ্ছেন?

অ্যান : সুপ।

আরাবাল : ঠিক আছে। (ইংরেজিতে) বেয়ারা, আমার জন্যও...

অ্যান : আপনি কি কলাম্বিয়া-তে ইংরেজি পড়ছেন?

আ : হ্যাঁ। কিন্তু ওরা শিগগিরই আমাকে তাড়াবে।

অ্যান : কেন?

আ : ওরা আমাকে ঘেন্না করে।

অ্যান : কেন?

আ : সবাই আমাকে ঘেন্না করে, ছাত্ররা, অধ্যাপকরা, ফোর্ড ফাউন্ডেশন—সবাই।

অ্যান : আপনার এখানে কোনো বন্ধু নেই?

আ : না, সব শত্রু। কিন্তু আমার ক্রীতদাস আছে।

অ্যান : ক্রীতদাস?

আ : হ্যাঁ। ক্রীতদাস। আমি ওদের হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখি। হ্যান্ডকাফ পরে থাকা অবস্থায় ... [illegible] ... ওঠে।

অ্যান : রেগে ওঠে?

আ : হ্যাঁ! আমার এখন ... আমি ওদের হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রেখেছি—তাই ওরা লেখাতে পারে না।

অ্যান : আপনি ওদের নিয়ে আর কি করেন?

আ : অনেক কিছু! সুযোগ পেলে আমি ... ওদের নিয়ে ঘুরি ... আমি ওদের জিজ্ঞেস করি, তুমি কি কম্যুনিস্ট? তারা বলে, না। আমি বলি খুব খারাপ, কেননা, আমি নিজে কম্যুনিস্ট। রাজনীতিতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই—কিন্তু শুধু আমি এই কথা বলি। ... আমি ... দিয়ে ওদের ওপর ... করাই, বারবার।

অ্যান : আপনার এতে ভালো লাগে?

আ : না।

অ্যান : তবে এরকম করেন কেন?

আ : ... আমি বেঁচে থাকার স্বাদ পাই।

অ্যান : ওদের সঙ্গে আপনার রোজ দেখা হয়?

আ : রোজ। ওরা আমার চেয়ে অনেক বেশী চালাক।

অ্যান : আপনি কি বিবাহিত?

আ : হ্যাঁ।

অ্যান : কোনো সন্তান—

আ : না, কোনোদিন না।

অ্যান : কোনোদিন না কেন?

আ : আমি কুমার। আমাকে চিরকুমার থাকতেই হবে।

(বাড়িতে)

আরাবাল : (মদের বোতলের কর্ক খুলে) এই ব্যাপারটা খুব উত্তেজনা দেয়। এর মধ্যে একটা বেশ যৌন রূপক আছে।

অ্যান : সব কিছুই আপনার কাছে—

আ : নিশ্চয়ই! যৌন রূপক না থাকলে কোনো কিছুই আকর্ষণীয় হয় না।

অ্যান : আকর্ষণীয়? তার মানে—এই একটা ব্যাপার আপনার ভালো লাগে?

আ : মোটেই না! আমি সব কিছু ঘৃণা করি, নিজেকে ছাড়া।

অ্যান : কখনো আপনি নিজেকেও ঘেন্না করেননি?

আ : মাঝে মাঝে... তুমি মার্কুইস দ্য সাদের লেখা পড়েছ?

অ্যান : না, বিশেষ কিছু না।

আ : ভালো না। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, খুব দুষ্টু ছিলাম, মা আমার ... শাস্তি দিতেন—তাতে আমার খুব উত্তেজনা হতো, আমার খুব ভালো লাগতো...... তোমার এখানে দড়ি আছে?

অ্যান : না। কেন?

আ : যে হলো আমি তোমাকে বেঁধে ফেলতে পারতুম, অথবা তুমি আমাকে বাঁধতে। আমি আমার ক্রীতদাসদের বেঁধে রাখি। ওদের খুব ভালো লাগে। ওরা আমাকে ওদের বেঁধে দেবার জন্য মিনতি করে। কিন্তু আমি মারি না।

অ্যান : আপনার নাটকগুলো কি সব এই রকমই?

আ : বোধ হয়। কিন্তু ওগুলো তো আমি লিখি না। প্যারিসে আমার চাকররা ওগুলো লেখে। দড়ি দিয়ে বাঁধলে তোমার ভালো লাগবে না? আমার মা আমাকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখতেন শাস্তি দেবার জন্য।

অ্যান : আপনার মা কি রকম ছিলেন?

আ : খুব ধর্মভীরু। খুব! এখন অবশ্য পাগল। আমাকে দেখে দেখে তিনি ... তুমি খালি আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

অ্যান : আপনার বাবা কি রকম ছিলেন?

আ : আমি তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে চাই না। মা ওঁকে ঘেন্না করতেন।

অ্যান : কি অদ্ভুতভাবে আপনার শৈশব কেটেছে!

আ : তোমার ধারণা, আমি অদ্ভুত?

অ্যান : একটু।

আ : মোটেই না। আমি স্বাভাবিক, তুমিই অদ্ভুত। বলো ঠিক কি না? আমি অদ্ভুত?

অ্যান : একটু। সেটা স্বাভাবিক—এর জন্যেই হয়তো আপনার কল্পনাশক্তি বেশী।

আ : তুমি আমাকে ঘৃণা করো?

অ্যান : না। আপনি আমাকে ঘৃণা করেন?

আ : হ্যাঁ।

অ্যান : তা হলে আপনি এখানে রয়েছেন কেন?

আ : এতে আমার মজা লাগে। এতে আমি বেঁচে থাকার স্বাদ পাই। আমাকে দেখতে কেমন? তোমার পছন্দ হচ্ছে?

অ্যান : মন্দ না। অনেকটা শিশুর মতন।

আ : তোমার কি ধারণা আমাকে টুলুজ লোত্রেক-এর মতন দেখতে? সবাই তাই বলে, একমাত্র স্যামুয়েল বেকেট-এর বউ ছাড়া। ওর ধারণা, আমাকে শুবার্ট-এর মতন দেখতে—এটা আমার বেশ পছন্দ। তোমার এখানে কোনো খেলনা আছে?

অ্যান : খেলনা?

আ : হ্যাঁ। যেমন, ইলেকট্রিক ট্রেন?

অ্যান : না। তবে আমার ঘরে দাবা আছে, খেলবেন?

আ : এসো। আমি তোমাকে হারিয়ে দেবো—

[দাবা খেলা শুরু হলো, অ্যান প্রথমে জিতছিল—হঠাৎ আরাবাল অ্যানের হাতটা টেনে নিয়ে খুব জোরে কামড়ে ধরলো। অ্যান বললো, হাত ছাড়ুন, আমি আপনাকে ভালবাসি না। আরাবাল সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমি বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল, কিন্তু খুব দয়ালু, আমি কারুর রক্ত বার করি না। —বাকি খেলায় আরাবাল জিতে গেল। একটু বাদে আরাবাল বললো, তুমি একটা হাস্যকর মেয়ে। তুমি পাগলের মতন আমার প্রেমে পড়ে গেছ বুঝতে পারছি। অ্যান বললো, একটুও না। আরাবাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, যাক, বাঁচলুম। অ্যান জিজ্ঞেস করলো, আপনার বুঝি প্রত্যাখ্যাত হতে ভাল লাগে? আরাবাল : খুব। এতে আমি বেঁচে থাকার স্বাদ পাই।]

সনাতন পাঠক

কবিতা

কবিতা এবং কবিতা। শান্তিকুমার ঘোষ। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ৩২।২ যোগীপাড়া রোড, কলকাতা-২৮। আড়াই টাকা।

শান্তিকুমার ঘোষের নতুন এই কাব্যগ্রন্থে তিনি যথার্থ নতুন একটি কাব্য-ভঙ্গি আয়ত্ত করেছেন। এই ভঙ্গি সর্বত্র যে সুখকর হয়েছে বলা যাবে না। তবু ব্যবহৃত হতে-হতে বাংলা কবিতার যে-চেহারা ক্লান্তিকর ক্লিশে হয়ে দাঁড়িয়েছে তার হাত থেকে কিছু ক্ষেত্রে মুক্তি পাওয়া গেছে—এ-বড়ো কম লাভ নয়। শান্তিকুমারের কবিতায় প্রকৃতির একটি বড়ো ভূমিকা এখনো পরিলক্ষিত তবে প্রকৃতির কবিতায় সুচতুর নাগরিকতার অনুপ্রবেশ একটা নতুন চরিত্রের সৃষ্টি করেছে। উদাহরণত 'ঘোড়া বরদার' কবিতাটির নাম করা যেতে পারে:

গানিমেয়া এগিয়ে ব্যাগটা ধরে ফেলে।
গাঁ গাঁ ইয়াগু
রাস বলালেই সাইক্লোনের মতো
ছুটেল ঘোড়া।

শান্তিকুমার দীর্ঘ কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য পান না; লিরিক-নির্ভর বেশ কিছু সুন্দর কবিতা উপহার দিয়েছেন তিনি। 'সুপোরের' 'জাহাজঘাটার দিক থেকে' 'মুহূর্তের কবিতা : চার নম্বর' 'বিস্ময়ের বিদীর্ণ মুহূর্তে' প্রভৃতি এই শ্রেণীর। 'নিসর্গ নিপুণ অতি' এবং 'কখন পাথর খসে গেছে' এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা। শেষোক্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

কখন পাথর খসে গেছে
তোমার ক্যাটি থেকে।
হা হা করছে শহর।
কে ফিরিয়ে দেবে
অসম্ভব ভালবাসা আবার প্রথমে।
বিদ্ধ কম্পমান হৃৎপিণ্ড
চেতনার কাছে।

শান্তিকুমার ঘোষ বিশেষ শব্দসচেতন কবি। তবু তিনি কেন 'অবাক্য' লিখলেন বোঝা গেল না। ২৮৭।৬৭

অনুবাদ

গীতিকা। জেসেলিন থানচেফ। অনুবাদক, অমিতা চক্রবর্তী। সুবর্ণরেখা কলিকাতা ৯। আড়াই টাকা।

বুলগারিয়ার কবিতার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় অল্পই। ইংরেজী ভাষার মারফত বুলগারিয়ান কবিতার সঙ্গে আমাদের যেটুকু পরিচয় ঘটেছে, একটি দেশের কবিতার পর্যাপ্ত পরিচয় লাভে তার মূল্য নিতান্তই কম। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কোন বাঙালী কবির বুলগারিয়ান কবিতার অনুবাদ পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। এদিক থেকে আলোচ্য অনূদিত কাব্যগ্রন্থখানির মূল্য অনেকখানি। বিশেষ করে, অনুবাদক যখন সরাসরি বুলগারীয় ভাষা থেকে কবিতাগুলির অনুবাদ করেছেন।

জেসেলিন থানচেফ একালের বুলগারিয়ার বিশিষ্ট এবং জনপ্রিয় কবি। এই শতাব্দীর চার দশকে তাঁর কাব্যজীবনের শুরু ও প্রতিষ্ঠা। তিনি সাম্যবাদী কবি। তাঁর কবিতায় তাই সাম্যবাদ সৃষ্টি প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। ফলে, কবিতায় বিদ্রোহ ও স্পষ্টতার সুর পরিলক্ষিত এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন রাষ্ট্রবোধ

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও সোচ্চার। তবে, এক্ষেত্রে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাঁর কবি-আত্মাকে গ্রাস করতে পারেনি। কবিতাগুলো তাই কোথাও শ্লোগানসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর শিল্পী প্রতিভার মৌলিকতার জন্য। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট আন্তরিক। কবির আদর্শ এবং বিশ্বাস আত্মিক হওয়ায় কবিতাগুলি গাঢ়তা পেয়েছে এবং অনুভূতি-ময় হয়ে উঠতে পেরেছে। তাছাড়া, কবি মূলত রোমান্টিক বলে তাঁর কবিতায় একটা বিপুল স্পন্দন ও সাবলীলতা লক্ষ করা যায়। 'মানুষের গাথা', 'শিল্প', 'মেয়ের জন্মদিনে', 'বেঁচে আছি' প্রভৃতি কবিতা পাঠক মাত্রেরই ভাল লাগবে। কোন কোন কবিতায় থানচেভের বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় এত দুর্বার এবং অনিবার্য হয়ে ওঠে যার ফলে কবিতা আশ্চর্য সবলতা পায়। এই প্রসঙ্গে 'মৃত্যুদণ্ড' কবিতাটি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমন,

আমার বাঁচতে হলে,
কিছু না কিছু মরতে হবে
নিজের ভিতর অবিরত।

অনুবাদ কর্ম সর্বদা সফল হয়েছে একথা বলা চলে না। মাঝে মাঝে ভাষা ব্যবহার দুর্বল বলে মনে হয়েছে। কবিতায় বিন্যাসও মনোরম হয়নি। অবশ্য অনুবাদকের পক্ষে এ সব ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ সফলতা লাভ করা সত্যি কঠিন। যা হক, বুলগারিয়ান কবিতার এই অনুবাদকর্মের জন্য অনুবাদক আমাদের ধন্যবাদার্হ।

৬৫।৬৭

জীবনী

বিদ্যাসাগর। নমিতা চক্রবর্তী। জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৯। ছয় টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাতঃস্মরণীয় মহা-পুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবন ও বিপুল কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে একালের শিক্ষিত বাঙালীর কৌতূহল ক্রমবর্ধমান। এর কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমত, আধুনিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে যে সমস্ত উদ্যোগ অবশ্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাসাগরের বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনে তার সবকটি দৃষ্টান্তই উপস্থিত রয়েছে। দ্বিতীয়ত, মানুষ হিসাবেও তাঁর জীবন যথেষ্টই আকর্ষণীয়।

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীনমিতা চক্রবর্তীর 'বিদ্যাসাগর' চরিত গ্রন্থখানি এদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। জীবনী রচনার ক্ষেত্রে একটি নীতি প্রচলিত রয়েছে। তা হল, কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনের আদ্যন্ত ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে তার কৃতিত্ব ও সফলতার দৃষ্টান্তযোগে বিবৃত করা হয়। শ্রীচক্রবর্তী এই চিরাচরিত নীতি পরিহার করে একটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করে আলোচ্য গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরের জীবনের যাবতীয় ঘটনাকে ক্রমবন্ধভাবে বিন্যস্ত করেননি, তাঁর জীবন ও কর্মের উল্লেখযোগ্য দিকগুলিকে গ্রহণ করে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে তাকে নূতন-ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এবং এইভাবে বিদ্যাসাগরের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন, বিদ্যাসাগরের বংশ-পরিচয় ও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব, তাঁর শিক্ষাজীবন এবং সমকালিক যুগলক্ষণ, কর্মজীবন এবং শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ, বাংলা গদ্যের উন্নতিসাধনে তাঁর ভূমিকা, নব জাগৃতির পটভূমিকায় তাঁর কৃতিত্বের বিচার, ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি। এবম্প্রকার বিন্যাসীকরণে লেখিকার সাফল্য স্বীকৃতিযোগ্য। বিভিন্ন ঘটনার তাৎপর্য-বিচারে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যে [illegible] কিছু তথ্যের অবতারণা [illegible]কে কৌতূহলী করে রাখে। বিশ্লেষণের ফাঁকে ফোকরে বিদ্যাসাগর-জীবনের ছোটখাটো ঘটনা সংযোজিত হওয়ায় রচনাটি সরস ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তবে, কোথাও কোথাও রচনারীতি ঈষৎ তরল হয়ে পড়ায় বিষয়ের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর বিষয়ক গ্রন্থ হিসাবে রচনাটি সাধুবাদের যোগ্য।

অভিজ্ঞতার কাহিনী

বিহঙ্গের গান। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ৬·০০ টাকা।

বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী যে গল্প-উপন্যাসের থেকে কম আকর্ষণীয় হয় না, এ প্রমাণ ইতিপূর্বে বহুবার আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে দু-একটি নিঃসন্দেহে

বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী কীর্তি। ডাক্তারের জীবনের বহু কৌতূহলকর গল্প সুন্দরভাবে শুনিয়েছেন ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী মহাশয়। বিশ্বনাথবাবুও পেশায় ডাক্তার। তদুপরি তিনি বেশ কিছু গল্প-উপন্যাসও রচনা করেছেন। সুতরাং বিহঙ্গের গান যদিও এক ডাক্তারের ব্যবসায়িক জীবনের সূত্রে পরিচিত, কিন্তু রোগী-রোগিণীর জীবনের ঘটনা এবং এক তরুণ চিকিৎসকের প্রতিষ্ঠার পথে নানান কাঁটা ও ফুলের বিবরণ, তবু 'বিহঙ্গের গান' কতখানি আত্মজৈবনিক তা অনুমান করা কঠিন। কারণ, এর অধিকাংশ গল্পই কেমন নিষ্প্রাণ। নীরস কাহিনীগুলি যদি সত্য ঘটনার সমাহার-রূপে ধরে নেই, তাহলে বলতে হয় আত্মজৈবনিক রচনার জন্য তাঁর আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা সঙ্গত হত। যদি কল্পিত হয়, তাহলেও বিশ্বনাথবাবুর কল্পনাশক্তির প্রশংসা করা গেল না। ৩৫৪।৬৭

বঙ্গ পরিচয়

চোমং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ। চোমং লামা। পেপার হাউস, শিলিগুড়ি। দশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ সম্পর্কে ছদ্মনামা লেখক চোমং লামা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভূখণ্ড পরিচয়ের দিক থেকে লেখকের শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। প্রতিটি জেলার ভৌগোলিক বিন্যাস ও পরিচিতি, প্রাচীন রাজশক্তি এবং ধর্ম-জীবনের উত্থান পতনের কাহিনী, শিল্প-সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, সামাজিক রীতিনীতি, বর্তমান জীবনযাত্রার চিত্র; এক কথায় অতীতের যোগসূত্রে বর্তমান উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক রূপটিকে লেখক গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিভিন্ন জেলার উপজাতিসমূহের আলোচনায় লেখকের পাণ্ডিত্য স্মরণীয়। লোকসংস্কৃতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর বিস্তৃত উল্লেখ গ্রন্থখানির গুরুত্ব বর্ধিত করেছে। মাঝে মাঝে সরস কাহিনীর অবতারণা করে লেখক বিষয়গত নীরসতার হাত থেকে পাঠককে রক্ষা করেছেন। আর উপাদান বিন্যাসের মধ্যে সাহিত্যগুণ সঞ্চারিত হওয়ায় দীর্ঘায়তন গ্রন্থখানি কোথাও বস্তুভারে শ্লথ হয়ে পড়েনি। আরো একটি কারণে লেখক প্রশংসা দাবী করতে পারেন। তাহল, তথাকথিত ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক রচনায় যে ধরনের আতিশয্য এবং ভাবালুতা থাকে তা এ গ্রন্থে অনুপস্থিত। আমাদের জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতিকে ঐতিহাসূত্রে দেখার মত নিষ্ঠা এবং সাহসিকতার বড়ই অভাব। এদিক থেকে লেখকের প্রয়াস শ্রদ্ধার্হ। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

৪০৭।৬৭

প্রাপ্তি স্বীকার

তারামণ্ডল পরিচয় ও বিশ্বের বিশালতা। শ্রীকামিনীকুমার দে। যুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড : ২ রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ১·০০।

জোড়া পর্ব। পঞ্চানন ভট্টাচার্য। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড : ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ১০·০০।

পঞ্চদশী। শ্রীদাশরথি বিশ্বাস। দক্ষিণ বাগনান পোঃ আলিদা, ২৪ পরগণা। মূল্য ১·০০।

নতুন জনপদ। মৃত্যুঞ্জয় মাইতি। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৬·০০।

মন্দ মধুর। হিরণ্ময় ভট্টাচার্য। মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৪·০০।

সম্রাট/অপারেশন কাউন্টাস। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অধুনা : ১৭/১ডি সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৪·০০।

ধীরে বিস্ফোরণ। সত্যধন ঘোষাল। মানস প্রকাশনী : ১৭ ভবানন্দ রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য ১·৫০।

আমার দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের লাইফ ডিভাইন (৭-৮ অধ্যায়)। শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স : ১-১-১ এ/বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২·০০।

ব্যথার নূপুর। শ্রীশক্তিপ্রসাদ রায়শর্মা। নীলোৎপল রায়শর্মা : পোঃ কলাবাগ, মুর্শিদাবাদ। মূল্য ২·২৫।

বিচিত্র বাঘ শিকার। ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী : ১৩২/১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩·০০।

সুভাষিতাবলি। শিল্পায়ণ আর্টিস্ট সোসাইটি : ১৯০ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা- ২৬। মূল্য ১·০০।

মধ্যরাত ছুঁতে আর সাত মাইল। অমিতাভ দাশগুপ্ত। বীক্ষণ প্রকাশ ভবন : ১বি অভয় সাহা লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ২·০০।

প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-মন। অলোক রায়। বাগর্থ : ১/৩ কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য ৩·০০।

অস্থিমজ্জা রাগে ইত্যাদি। শান্তি লাহিড়ী। অনুভব প্রকাশনী : ১৯ পাণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ০·৫০।

আমার হাতে রক্ত। কৃষ্ণ ধর। অনুভব প্রকাশনী : ১৯ পাণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ০·৫০।

এ যেন বারবেলা। সত্য গুহ। অনুভব প্রকাশনী : ১৯ পাণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ০·৫০।

*

প্রথম বসন্ত : মাধবী মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার তো আছেই। তা ছাড়া প্রতি বছরেই বাইরের ফেস্টিভ্যালের জন্য ছবির নির্বাচন চলছে। প্রশ্ন শুধু এই, ফিল্মের গুণ বিচার করবেন কারা? ফিল্ম-সেন্সরের বেলায়ও এই একই প্রশ্ন। সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলের সীমারেখা নির্ধারণ করা যেমন কঠিন, ফিল্মের ক্ষেত্রেও তেমনি। অথচ চলচ্চিত্রের ব্যাপারে এই সব দুরূহ বিষয়ের নিষ্পত্তি অতি সহজেই ঘটছে। ফিল্ম-বিচারের জন্য শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। তাতে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধিও থাকেন। এবং মান্যগণ্য ব্যক্তিদেরও নেওয়া হয়। কারণ তাঁরা অভিজ্ঞাত। সরকার হয়ত মনে করেন, এই-ভাবেই প্রতিনিধিত্বমূলক বিচারকমণ্ডলী গঠিত হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখেন না নিজস্ব ক্ষেত্রে একজন যতই প্রতিষ্ঠাবান হোক না কেন, ফিল্ম বিচারের ক্ষমতা যে তাঁর থাকবেই তা নিশ্চিত বলা যায় না। জ্ঞানী-গুণী হলেই যে ফিল্ম-আর্টের গুণাগুণ নির্ধারণের শক্তি থাকে এমন কোন কথা নেই।

সম্ভবত আমাদের দেশে ফিল্ম আজও মুখ্যত প্রমোদ-মাধ্যম

ফিল্মের বিচার করবেন কারা?

বিবেচিত বলেই সরকার মনে করেন যে, এর ভাল-মন্দ বিচারের জন্য প্রবীণ শিক্ষাবিদ কিংবা আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, খ্যাতনামা লেখক, অভিজ্ঞ বার্তাজীবী (চিত্র-সমালোচক নন) এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করলেই যথেষ্ট। তাঁরাই ভাল বিচার করতে পারবেন, কোন্ ছবির উদ্দেশ্য মহৎ কিংবা কোন্ ছবি জাতীয় সংহতির পক্ষে অনুকূল অথবা সুস্থ আমোদ বিতরণের জন্য তৈরি।

অর্থাৎ যা ফিল্ম নয় তার বিচারের জন্যই তথাকথিত এই সব কমিটি। সত্যিকারের ফিল্ম বিশ্লেষণের জন্য আসল সমঝদারের প্রয়োজন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শ্রীসত্যজিৎ রায় এই কথাই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, সিনেমা মিডিয়ম ভাল বোঝেন এমন ব্যক্তিদের নিয়ে অ্যাওয়ার্ড কমিটি, সেন্সর বোর্ড এবং ওই জাতীয় পরিষদগুলি গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত মতামতের পার্থক্য সব সময়েই থাকবে। অ্যাওয়ার্ড কিংবা সেন্সরের ক্ষেত্রে তাই পরিপূর্ণ সন্তোষজনক বিচার কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু বিচার যাঁরা করবেন তাঁদের মতামতে যদি জ্ঞানের পরিচয় থাকে তবে সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়।

তবে চলচ্চিত্র-বিচারের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে শিল্পগত গুণ। উদ্দেশ্য-ধর্মী বিষয়বস্তু কিংবা জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক কাহিনী শিল্পবিচারের পথে যেন প্রতিবন্ধক না হয়। অবশ্য ভারতবর্ষের মত দেশে এই ধরনের ছবি তৈরির প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে শিল্পগুণের প্রতি-যোগিতায় ওই সব ছবি রাখার পরিকল্পনা যদি থাকে, তবে ছবিগুলিকেও শিল্পসম্মত উপায়ে তৈরি করতে হবে।

শ্রী রায় যা বলেছেন, এই কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করার চেষ্টা বহু-বারই হয়েছে। দুঃখের বিষয়, তাঁরা এই বক্তব্য অনুধাবনের সদিচ্ছা এ-যাবৎ তেমন দেখাতে পারেননি। তবু আশা রাখি, কর্তৃ-পক্ষ এ বিষয়ে সচেতন হবেন।

সেন্সর বোর্ড কিংবা অ্যাওয়ার্ড কমিটিতে ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের ব্যক্তিদের নেওয়া হলে অবস্থার কোন উন্নতি হবে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী রায় বলেন, নীতির দিক থেকে কথাটি শুনতে ভাল লাগলেও এখানেও সেই ব্যক্তির প্রশ্ন। ব্যাঙের ছাতার মত ক্লাব ও সোসায়েটি গজাচ্ছে। এবং বিদেশী ছবি যে সব সময় আর্টের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তা নয়। প্রসংগত তিনি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ফরাসী

চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে বলেন, "এ ম্যান অ্যান্ড এ ওম্যান"-এর টিকিটের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কিন্তু "ও হাজার বাপ-থাজার"-এর জন্য সেরকম আগ্রহ দেখা যায়নি।

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর নিবেদন "যুগ-মানব কবীর" ছবির এগারোটি গান সম্প্রতি রেকর্ড করা হয়েছে। দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামের অন্তরালে একদল অভিজ্ঞ কলাকুশলী ছবিটি পরিচালনা করবেন। বিজন ঘোষ দস্তিদার ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। অসীমকুমার নামভূমিকার শিল্পী।

সুধীর মুখার্জীর পরিচালনায় "আঁধার দুয়ে"-র (সুধীর মুখার্জী প্রোডাকশন) শুটিং নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলেছে। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর রোমান্টিক কাহিনীর ভিত্তিতে (চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা) ছবির বিভিন্ন প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন রিনা ঘোষ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী, নন্দিতা দে, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরকার।

বি ভি প্রোডাকশন্সের প্রথম ছবি "প্রথম প্রতিশ্রুতি"-র চার দিনব্যাপী আউটডোর শুটিং বীরভূমের পাহাড়ী অঞ্চলে সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। এর পরে আট দিন ধরে ইনডোর শুটিং শেষ করেন পরিচালক রবি বসু। মাধবী মুখোপাধ্যায়, অঞ্জু মাহেন্দ্রু, নির্মলকুমার, বিকাশ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল মজুমদার, বঙ্কিম ঘোষ, পদ্মা দেবী প্রভৃতি ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন। বোম্বাইয়ের শিল্পী রাজকুমারকেও ছবিতে দেখা যাবে শোনা যাচ্ছে। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

চিত্রপ্রযোজনার হার ঊর্ধ্বগামী

ভারতের তিনটি প্রধান চিত্র প্রযোজনা কেন্দ্রের মোট ৩৩৩টি ছবি ১৯৬৭ সনে সেন্সর করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আর কখনও এক বছরে এত অধিকসংখ্যক ছবির সেন্সর হয় নি। ৩৩৩টি প্রযোজনার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষার ছবিই বেশী। এবং তার মধ্যে তেলুগু ও মারাঠী চিত্রের সংখ্যা সর্বাধিক।

নির্মল চৌধুরী পরিচালিত ফিল্ম ক্লাসিকের "চারণকবি মুকুন্দদাস" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাবে—একটি দৃশ্যে তৃপ্তি মিত্র ও সবিতাব্রত দত্ত। ফটো—দেশ

পূর্ণ দাস (সামনে), জীবনকৃষ্ণ দাস ও লক্ষ্মণ দাস—আমেরিকায় অনুষ্ঠানরত

বাউল শিল্পীদের আমেরিকা সফর

বাংলা দেশের পাঁচজন বাউল সম্প্রতি আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। এঁরা হলেন শ্রীপূর্ণ দাস, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস, শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস, শ্রীসাধানন্দ দাস ও শ্রীলক্ষ্মণ দাস। তাঁদের আমেরিকা ভ্রমণের উদ্যোক্তা ছিলেন মারকিন ইমপ্রেসারিও অ্যালবার্ট বি গ্রসম্যান।

এক সঙ্গে শিল্পীরা প্রায় কুড়িটি অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন। চারজন বাউল আগেই ফিরে এসেছেন। শ্রীপূর্ণ দাস ফিরেছেন গত সপ্তাহে। এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি তাঁর আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। মোট ত্রিশটি অনুষ্ঠানে তিনি গান গেয়েছেন। সর্বত্রই বাউল দল অভূতপূর্ব অভিনন্দন পেয়েছেন। বাউল গানের আস্বাদ মার্কিন শ্রোতাদের কাছে নতুন। তাই তাঁরা বাউলদের পেয়ে আনন্দে মেতে উঠেছেন। ১২ সেপ্টেম্বর তাঁরা সান-ফ্র্যান্সিসকো পৌঁছেন। যাবার পথে টোকিও, হংকং, হনলুলু প্রভৃতি স্থানেও অনুষ্ঠান করেন। আমেরিকার সানফ্র্যান্সিসকো, লস এঞ্জেলস, নিউ ইয়র্ক, বস্টন, শিকাগো প্রভৃতি শহরে তাঁরা পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে গান করেন।

বিদেশ-সফরের আনন্দময় মুহূর্তগুলির কথা বলেন শ্রীপূর্ণ দাস। করতালি, অভিনন্দন এবং সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে তাঁদের দিনগুলি কেটেছে।

"আমেরিকার রসিকজনের আন্তরিক প্রীতি পেয়েছি। আর লক্ষ করেছি, ভারতের ধর্ম, সংগীত ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। আমরা যে এত সমাদর পেয়েছি তার কারণও এই। বাউল গান ওঁরা ভালবেসেছেন।"

সমতলে পাহাড়ী নাচ

পাহাড়ের শিল্পীরা নেমে এসেছিলেন সমতলে। কলকাতায় গত সপ্তাহে ফোর্ট উইলিয়মের বক্সিং এরেনায় প্রায় দেড় শো জন পুরুষ-মহিলা তাঁদের নাচ-গানে দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। ওঁরা এসেছিলেন কালিম্পং থেকে। সিকিমী, ভুটানী, লেপচা ও নেপালীদের নিয়ে গঠিত এই শিল্পিদল। নাচতে-গাইতে তাঁরা এসেছিলেন কালিম্পঙের ডাঃ গ্রাহামস হোম সেবাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য।

পাহাড়ী নাচ দেখবার সুযোগ কলকাতার রসিকজন এর আগে বিশেষ পাননি। নতুন পরিবেশে ওঁদের "আনসফিসটিকেটেড" নাচ দেখে শহুরে সমঝদাররা মুগ্ধ।

জনসাধারণের সামনে ওঁরা নাচলেন তিন দিন। নাচের সঙ্গে ছিল ফ্যাশন প্যারেড। আঠারো জন মহিলা পরিবেশন করলেন। দেখা গেল, আধুনিকতার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলেই চলেছেন পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা।

প্রতিনিধি দলের নেত্রী শ্রীমতী ইউদিন লামপা হিসে সাংবাদিকদের জনালেন, শিল্পীরা কেউই পেশাদারী নন। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই পার্বত্য অধিবাসীদের সঙ্গে সমতলের মানুষদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জাতীয় সংহতি এভাবেই রূপ নেয়।

তিনটি অল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র

সুগার ডল, ক্রোকেন হরাইজন এবং পিস টাইম আর্মাডা—এই তিন নামের তিনটি অল্প দৈর্ঘ্যের রঙিন চিত্র না দেখলে বোঝা যাবে না, ছবি তিনটি কত সুন্দর। কান্তিলাল রাঠোর ছবি তিনটির নির্মাতা। প্রথমটি কার্টুন চিত্র, শিশুদের জন্য চিলড্রেনস ফিল্ম সোসায়েটি নিয়েছেন। যেমন রঙের খেলা, তেমনি সংগীত ও স্পীড। দশ মিনিটের ছবি, শ্রেষ্ঠ বিদেশী কার্টুনচিত্রের সমতুল্য।

"ক্রোকেন হরাইজন" পঁচাত্তরটি আঁকা ছবির সমষ্টি। দক্ষিণ ভারতের এক স্বর্ণকারের চৌদ্দ বছরের মেয়ে সুন্দরবল্লীর আঁকা। আপন মনে ছবিগুলি এঁকেছিল কিশোরী শিল্পী। সেগুলি সংগ্রহ করে রাখেন শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেই ছবিগুলিকে সঙ্গতি রেখে ছবিতে সাজানো হয়েছে। ছবির শট কম্পোজিশন দেখবার মত।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "জীবন সংগীত" ছবির (পি এম পিকচার্স) নায়িকা সন্ধ্যা রায়

তৃতীয় ছবি "পিস টাইম আর্মাডা" ফিল্মস ডিভিসন নিয়েছেন। ভারতের অর্থনৈতিক ও খাদ্য সমস্যার উপর ছবি। এই ধরনের বিষয়-বস্তু স্বভাবতই নীরস হয়। কিন্তু এই ছবিটিতে আমাদের দেশের একটি সমস্যার দিক কার্টুনের মধ্য দিয়ে অদ্ভুত সরসভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। দেখতে বেশ মজা লাগে, অথচ সমস্যার গুরুত্বটিও উপলব্ধি করা যায়। নানা দেশ থেকে জাহাজে খাদ্য আসছে ভারতে। জাহাজগুলি এসে ভিড়ছে বন্দরে। সেটাই "পিস টাইম আর্মাডা"।

গত শুক্রবার লাইট হাউস সিনেমাতে ছবিগুলির প্রদর্শনী হয়। চিত্রনির্মাতা কান্তিলাল রাঠোর উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকার নৃত্যগীত

ইউ-এস-আই-এস সংস্থার সহযোগিতায় ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি কলকাতায় আমেরিকার নৃত্যগীত উৎসবের আয়োজন করেছেন। ২৪ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত উৎসব চলবে। অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন আমেরিকার বিখ্যাত শিল্পীদল ফিলাডেল-ফিয়া স্ট্রীং কোয়ারটেট, বিয়ারস ফ্যামিলি ও মরে লুই ড্যান্স কোম্পানি।

মরে লুই ড্যান্স কোম্পানি ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ জানুয়ারী আলাদা অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন রবীন্দ্রসদনে। হিন্দী হাইস্কুলে বিয়ারস ফ্যামিলি লোকসংগীতের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ২৬ জানুয়ারী হিন্দী হাইস্কুলে ফিলাডেলফিয়া স্ট্রীং কোয়ারটেট তাঁদের নৃত্যগীত পরিবেশন করবেন। প্রতি অনুষ্ঠানেই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শুরু হবে।

ভারত সার্কাসে অসাধ্য সাধন

ভারত সার্কাসে বসে একটার পর একটা খেলা দেখে মনে হয়েছে, শিল্পীরা কি সর্বশক্তিমান? এত অঘটনও কি ঘটে?

বিরাট গোলকের মধ্যে একজন শিল্পী মোটর বাইক চালিয়ে গেলেন অবলীলায়, প্রচণ্ড বেগে। গোলকের গা বেয়ে ঘুরলেন, কখনও সোজা হয়ে কখনও উপরে নীচে। ওই শিল্পীই দেখালেন মোটর বাইকে "ডেথ-জাম্প"। ঝাঁপে "ডেথ-জাম্প" দিলেন আর একজন তরুণী। দুটি খেলাই রুদ্ধশ্বাসে দেখবার মত। এমন খেলা আরও আছে। একটি মেয়ের বুকের উপর পা ফেলে চলে গেল একটি হাতি। মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। জন্তু-জানোয়ারের খেলাও কম বিস্ময়কর নয়।

বেশী অবাক করে ভারত সার্কাসের ব্যালান্সিং-এর খেলা। রীতিমত চমকপ্রদ। ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু তারের উপর দিয়ে মেয়েদের মিছিল; ধাবমান ঘোড়ার পিঠে চড়ে নানা কসরৎ, তারের উপর দিয়ে অটো-সাইকেল চালানো এবং মেয়েদের আরও নানা ব্যালান্সিং-এর খেলা চমৎকার। অল্প বয়সী মেয়েদের নানা কাণ্ড দেখবার মত। এই সার্কাস দলের পুরুষ ও মহিলা শিল্পীরা সমান পারদর্শী। মহিলাদের সাইকেলের

ভারত সার্কাসের খেলা।

সেগুলিও খুব চিত্তাকর্ষক। অন্যান্য মহিলাদের খেলাই সার্কাসে বেশী। রোমাঞ্চও উত্তেজনার মাঝখানে আবার মজার ব্যাপারও আছে। যেমন কুকুরের অংক কষে দেওয়া। ক্লাউনদের ভাঁড়ামি তো আছেই। সব মিলে আড়াই ঘণ্টাব্যাপী ভারত সার্কাসের অনুষ্ঠান খুবই উপভোগ্য। বড় দিনের আগে মার্কাস স্কোয়ারে ভারত সার্কাস প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। আরও বেশ কিছুদিন চলবে।

শিশু রংমহলের উৎসব

শিশু রংমহলের পক্ষকালব্যাপী উৎসব শেষ হয়েছে। মেলা এবারকার উৎসবে ছিল না। মেলা না করার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার বর্তমান আবহাওয়া। কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার গণ্ডগোলের মধ্যে যেতে চাননি। তা সত্ত্বেও নিজস্ব গৃহের অঙ্গন গমগম করেছে শিশুদের হাসি কল্লোলে।

এবারকার উৎসবের প্রতিটি ছড়া, নাটিকা ও নাটক পরিচ্ছন্নভাবে অভিনীত হয়েছে। লালচে বুড়ো, কনকবংশী, আনন্দ প্রভৃতি শিশু ও বয়স্ক দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। পুতুল নাচের নতুন সংযোজন হয়নি।

শেষ দিনে ডাঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থেকে সর্বভারতীয় আর্ট প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ করেন।

পাটনায় নাট্যোৎসব

বড়দিনের সময় পাটনায় প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা শিল্পী সমিতি শাজাহান ও লৌহকপাট নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকাভিনয়ের নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিহারের প্রখ্যাত নাট্যকার বিহার আর্ট থিয়েটারের অনিল মুখোপাধ্যায়।

পাটনা কালীবাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্যানোরামিক স্টেজ দেখার জন্য বাইরে থেকে বহু জনসমাগম হয়েছিল। শাজাহান নাটকে নামভূমিকায় সুভাষ সেন, মৃণাল চক্রবর্তী. হেনা মুখোপাধ্যায় (জাহানারা), নীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (পিয়ারা) সোমী খাঁ প্রভৃতি সুঅভিনয় করেন। পিয়ারার দুটি গানই হৃদয়গ্রাহী হয়।

জরাসন্ধর কাহিনী অবলম্বনে "লৌহ-কপাট" (নাট্যরূপ : জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়) নাটকটিতে অতিরিক্ত ঘটনা ও সংলাপ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অভিনয়ে নেপাল ভট্টাচার্য, সুশীল চক্রবর্তী, অজিত গাঙ্গুলী, হেনা মুখোপাধ্যায়. অজিত বিশ্বাস. প্রভাত গাঙ্গুলী প্রভৃতি সুনাম অর্জন করেন। দুটি নাটকই সুখভোগ্য হয়।

জাপানের ছবি

জাপানের কয়েকটি চলচ্চিত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন সিনে সেণ্ট্রাল কলকাতা। জাপানের রাষ্ট্রদূতাবাস এবং ইন্দো-জাপানীজ অ্যাসোসিয়েশন এই ফেস্টিভ্যালের সহযোগিতায় মোট ছয়টি চিত্র ফেস্টিভাল-এ দেখানো হবে। এর মধ্যে তিনটি নতুন ছবি। যথা, দি ফেসেজ অব ল্যাণ্ড, রিট্রিট ফ্রম কিসকা ও আওয়ার অর্গানাইজেশন টু লাইফ। বাকি তিনটি চিত্র : দি গেট অব হেল, দি ট্রেজারস ও দি আয়ল্যাণ্ড।

১৯ থেকে ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে নিউ এম্পায়ারে।

কানাই দত্তের বিদেশ সফর

সুপ্রসিদ্ধ তবলাবাদক শ্রীকানাই দত্ত অল্পাধিক তিন মাসব্যাপী বিদেশ সফরের পর কলকাতায় ফিরে এসেছেন। তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন শহরে প্রায় ৭০টি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাঁর একক অনুষ্ঠানগুলি সমালোচক ও বিদেশী রসিক-বৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারের সঙ্গেও তিনি তবলায় সংগত করেন। শ্রীদত্তের বাজনা সম্পর্কে "দি টাইমস" কাগজের সমালোচক বলেন,

Dutta had a brief solo display, when he charmed his audience with a fine burst of virtuosity."

অপর এক সমালোচকের মন্তব্য :

Dutta, who looks like a warrior, made the two drums sing.

অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত ফিল্ম ক্র্যাফটের "পঞ্চশর" ছবির মুক্তি আগামী সপ্তাহে—ছবির নায়ক-নায়িকা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতা।

ফটো—দেশ

নাট্যানুষ্ঠানেও গুণী সংবর্ধনা

অভিনেতা নিমু ভৌমিকের ব্যবস্থাপনায় এন বি এণ্টারপ্রাইজের উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারী সকাল সাড়ে দশটায় বসুশ্রীতে রূপকারের "বাপিকা বিদায়" ও "চলচ্চিত্ত চঞ্চরী" অভিনীত হবে। নাট্যানুষ্ঠানের আগে সংগীত নাটক আকাদমি কর্তৃক পুরস্কৃত শ্রীসবিতাব্রত দত্তকে সংবর্ধনা জানানো হবে। সংবর্ধনার শেষে শ্রীদত্ত "চারণকবি মুকুন্দদাস" ছবির গান গাইবেন।

অশোককুমারের গান

শিল্পী-জীবনের প্রথম দিনগুলিতে অশোককুমার অনেক ছবিতে গান গেয়েছেন। শেষ গান তিনি করেছিলেন ফিল্মিস্তানের "সজন" ছবিতে, ১৮ বছর আগে। এতকালের মধ্যে কোন ছবিতে তিনি গান করেন নি। আঠারো বছর পর আবার তিনি ফিল্মের গান গাইলেন সংগীত পরিচালক বসন্ত দেশাইয়ের সুরে। গানের কথা লিখেছেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজের একটি ইস্টম্যান কালার ছবির (এখনও নামকরণ হয়নি) জন্যই অশোককুমারের গান। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করছেন।

কানাই দত্ত

পাঠকের চোখে

বিদেশের পটভূমিতে হিন্দী ছবি

'দেশে'র বিশেষ বড়দিন সংখ্যাটি খুব ভাল লাগল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন নিবন্ধে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি, তার উন্নতির উপায় ও উন্নতির পথে বাধা, সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করা হয়েছে। নিবন্ধগুলিতে এমন অনেক সমস্যার কথা উল্লিখিত হয়েছে যেগুলি বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। এ প্রসঙ্গে আমার একটি সমস্যার কথা মনে পড়ছে যেটির তেমন উল্লেখ কোথাও দেখলাম না। এ ব্যাপারটিকে সমস্যা বলা সমীচীন কিনা জানিনা, কিন্তু ব্যাপারটির সঙ্গে শুধু চলচ্চিত্রের রুচিবোধের সমস্যাই নয়, অন্য কিছু সমস্যাও জড়িত। গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

গত কয়েক বছরে বিদেশের পটভূমিতে হিন্দী চিত্র তোলার বেশ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রায় সব কটি ক্ষেত্রেই বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব ও শিল্পের প্রয়োজন এমন অপরিহার্য ছিল, যে জন্য এগুলিতে বিদেশের পটভূমি

ইতালির "ক্যাসানোভা ৭০" ছবিতে মার্চেলো মাস্ত্রোয়ানি ও লীনা অরফী—ছবিটি কলকাতায় আসছে।

ব্যবহার করতে হয়। অতি মামুলী (এবং অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তিকর) প্রণয় আখ্যান এগুলির উপজীব্য—যেমনটি সাধারণ হিন্দী ছবিতে নিত্যই দেখা যায়। এগুলির কাহিনীর বিস্তার দেশের পটভূমিতে করে চিত্রগ্রহণ দেশেই করলে কী ক্ষতি বোঝা যায় না। তবে কী ধরতে হবে, ভারতের মাটিতে প্রেম দুর্লভ হয়ে গেছে, কাশ্মীর-সিমলাতে ভালবাসার নির্ঝর শুকিয়ে গেছে বলেই টোকিওর পথে নেচে গেয়ে ভারতীয় তরুণ-তরুণীরা প্রেম করতে বাধ্য হচ্ছে! দুর্বৃত্তদের স্থান ভারতে হচ্ছে না বলেই হংকং-এর জলে স্থলে তাদের দুষ্কার্যের জাল রচনা করতে হচ্ছে! কলকাতা কিংবা বোম্বের সন্ধ্যার আকর্ষণ আর উত্তেজনা ফুরিয়ে গেছে বলেই প্যারিসের সন্ধ্যায় তা খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে। এই জাতীয় চিত্রগুলিতে যে নাইট ক্লাব, স্বল্পবসনা বিদেশিনী সুন্দরীদের নৃত্যগীত, নায়ক-নায়িকার 'সুগভীর' প্রেম প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়, সবই তো ভারতের বড় শহর-গুলিতে তোলা যেতে পারে। স্বল্পাবৃতা নায়িকা ও বিদেশিনীদের ভারতে তোলা কত হিন্দী প্রমোদচিত্রেই তো দেখা যাচ্ছে। নয়ন-লোভন দৃশ্যসমৃদ্ধ স্থান ভারতেই কী কম আছে? আর এ ধরনের চিত্রে কাহিনীরই বা কি গুরুত্ব? যদি কিছু গুরুত্ব থাকেও, দেশের মাটিতে কি তা কমে যাবে?

এই 'জনপ্রিয়' হিন্দী ছবিগুলির দ্বারা বিদেশী মুদ্রা কত অর্জিত হয় জানিনা, কিন্তু এগুলির নির্মাণে অতি দুর্মূল্য বিদেশী মুদ্রা প্রচুর ব্যয় হয়ে যায়। এই সব চলচ্চিত্র নির্মাতাদের বিদেশী মুদ্রার জন্যে চিন্তা করতে হয় না, শিল্পী কলাকুশলীসহ সদল-বলে বিদেশ ঘুরে আসতে তাঁদের অসুবিধে হয় না। অথচ কত সঙ্গতিহীন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশী মুদ্রার অভাবে গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে বিদেশ যাবার সুযোগ হয় না, আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে বিদেশী মুদ্রার স্বল্পতার কারণ দেখিয়ে ভারতের প্রতিনিধি দলের আকার সংক্ষেপ করার জন্যে ভারত সরকার চাপ দেন।

তা ছাড়া এ ব্যাপারটির অপর একটি দিকের কথাও স্মর্তব্য। যদিও সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের নিবন্ধে জানা গেল, বিদেশের শহরে সিনেমার শুটিং দেখার জন্যে 'অগণিত' উৎসুক দর্শকের সমাবেশ হয় না, তবুও পথে পথে হিন্দী ছবির নায়িকার প্রেম প্রার্থনায় নায়কের নৃত্যগীত, লম্ফঝম্প, রাস্তায় গড়াগড়ি ও আরও বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপের দৃশ্যগুলি, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী খলনায়কের সাথে প্রচণ্ড সংগ্রামের লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী যে বেশ কিছু পথচারীকে আকৃষ্ট করে তা অনুমান করা যায়। এবং দৃশ্যগুলি দেখে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অবস্থা, ভারতীয় দর্শকদের রুচিবোধ, ভারতীয় তরুণ-তরুণীর জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদেশীরা কি ধারণা করেন তাও সহজেই অনুমেয়।

তাই মনে হয়, বিদেশে চলচ্চিত্র গ্রহণের অনুমতি দেবার পূর্বে ভারত সরকারের সতর্ক ও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করা কর্তব্য। এর দ্বারা ভারতীয় দর্শকদের রুচিবোধ রাতারাতি পরিবর্তন হবে না বটে, তবে বিদেশে ভারতীয় চিত্রের সুনাম বাড়বে বই কমবে না এবং সর্বোপরি দুর্মূল্য বিদেশী মুদ্রার অপচয় নিবারিত হবে। আর প্রয়োজনবোধে যে সব দর্শক দেশে বসে বিদেশের দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে চান তাঁদের জন্যে সরকারী কিংবা বেসরকারী উদ্যোগে অল্প কয়েকজন ফটোগ্রাফার বিদেশে পাঠিয়ে সেসব দৃশ্য তুলে এনে সিনেমায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার কথা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

শ্যামশঙ্কর গোস্বামী
উত্তরপাড়া
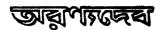
হায়দরাবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক-সপ্ততিতম অধিবেশন বর্তমান সপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্পর্কে আলোচনাই এই অধিবেশনে প্রাধান্য লাভ করে। নতুন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা, শ্রীপাতিল, শ্রীজগজীবন রাম ও অন্যান্য নেতৃবর্গ অধিবেশনের বিভিন্ন দিনে যে ভাষণ দিয়েছেন তার সারমর্ম হল এই, জনগণের কাছ থেকে কংগ্রেস অনেক দূরে সরে গিয়েছে। কাজেই গণসংযোগের ক্ষেত্রে তার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই অধিবেশনে যোগদানকারী বেশিরভাগ প্রতিনিধি মনে করেন—জনমানসের উপর কংগ্রেসের প্রভাব বিস্তারের জন্য নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে রাজ্যের আইন-সভা দলকে সাহায্য করার জন্য অনুমতি দিয়ে কেন্দ্রীয় সংসদীয় দল একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অধিবেশনে দেশের বহু অংশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের পরস্পর সাক্ষাতে যে মনোভাব প্রকট হয়েছে তা হচ্ছে—কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি বৈষয়িক নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ১১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হবার পর এই অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দেশী সংবাদ

৮ জানুয়ারি—আসাম পাক অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের কাজ শিথিল করার ও যে সব বিদেশীর উপর বহিষ্কারের আদেশ প্রদত্ত হয়, তাদের আবেদনের সত্বর নিষ্পত্তির জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনাল রাজ্য সরকার বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এপ্রিল মাসে ট্রাইব্যুনাল উঠে যাবে।

যে সমস্ত পৌর এলাকায় জনসংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশী নয়, সেই পৌর সভাগুলির জন্য রাজ্য সরকার পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেবেন। সম্পূর্ণ খরচ রাজ্য সরকার গ্রান্ট হিসাবে দেবেন। পশ্চিমবঙ্গে এই রকম পৌর সভার সংখ্যা ১১।

৯ জানুয়ারি—আজ রাতে লালবাহাদুর নগরে কেন্দ্রীয় পারলামেনটারী বোরডের সভায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকে ডকটর ঘোষের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সঙ্গে কোয়ালিশন করার অনুমতি দেওয়া হয়। বিহার ও পাঞ্জাব সম্পর্কেও নীতিগতভাবে কোয়ালিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবশ্য শেষোক্ত রাজ্যে এখন পর্যন্ত এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি।

আজ জামসেদপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ ভি ভি গিরি বলেন যে, আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বৈষম্য থাকুক তা গণতন্ত্র কখনই চায় না। তবু ২০ বছর পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেও ভারতের বহু ব্যক্তি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন।

১০ জানুয়ারি—১৯৬২ সালের ২৬ অকটোবর চীনা আক্রমণের সময়ে যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতির আদেশে আজ তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ঘোষণার কথা রাজ্য সরকারগুলিকে জানিয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ রাজ্য সরকারই ইতিমধ্যে ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিয়েছেন।

উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, ভারতে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে রাষ্ট্রপতিপ্রধান সরকার গঠন করলে তা হয়ত একনায়কত্বের দিকে দেশকে নিয়ে যাবে।

১১ জানুয়ারি—১৯৬৭ সালের নবেমবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যে আদেশ জারি করেন তার বৈধ্যতা চ্যালেঞ্জ করে নিখিল ভারত জনসংঘ দলের চেয়ারম্যান শ্রীপূরনলাল লক্ষ্মণপাল কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রী এ কে দত্তের এজলাসে একটি আবেদন করেছেন। ২৫ জানুয়ারি এই আবেদনের শুনানি হবে।

ওড়িশা সরকার রাজ্যের সেচ ও বিদ্যুৎ এবং গৃহনির্মাণ বিভাগের ৫ জন ক্লাস ওয়ান অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত সাপেক্ষে তাঁদের সাসপেনড করার আদেশ দিয়েছেন বলে জানা গেল। ওই ৫ জনের মধ্যে ৩ জন চীফ ইনজিনিয়ার, একজন সুপারিনটেনডিং ইনজিনিয়ার এবং আর একজন এক্‌জিকিউটিভ ইনজিনিয়ার।

১২ জানুয়ারি—পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ শিক্ষক পাইকারীভাবে যে ক্যাজুয়েল ছুটি নিয়েছেন তার ফলে আজ এখানে সবগুলি কলেজের পড়াশুনা বন্ধ হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন ও মাগগী ভাতার নতুন হার প্রবর্তনের ব্যাপারে বিহার সরকার যে টালবাহানার কৌশল অবলম্বন করেছেন তারই প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পাইকারীভাবে এই ছুটি নিয়েছেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা আজ কর্নাটক সাহিত্য মন্দিরে তাঁর প্রতি প্রদত্ত এক সম্বর্ধনার উত্তরে বলেন যে, হিন্দীতে মহান ও সমৃদ্ধ সাহিত্য আছে বলে তিনি জানেন না। হিন্দীকে নতুন রূপ, নতুন শক্তি দিতে হলে তার ব্যাকরণ বদলাতে হবে। নতুন শব্দসম্ভার গ্রহণ করতে হবে।

১৩ জানুয়ারি—উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ সাংবাদিকদের বলেন, শিগগির একটি অর্থ-কমিশন গঠন করা হবে। তবে স্থায়ীভাবে কমিশন গঠনের তিনি বিরোধী। তিনি বলেন, আগামী বছরে রাজ্যগুলির রিজারভ ব্যাংকের কাছ থেকে ওভারড্রাফট নেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় বাজেটের কোন কথা ফাঁস হয়ে না পড়ে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে উপ-প্রধানমন্ত্রী নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পূরণের প্রশ্ন সম্পর্কে কোন কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

১৪ জানুয়ারি—প্রায় চার লক্ষেরও বেশী পুণ্যার্থী আজ ভোরে গঙ্গাসাগরে মকর-সংক্রান্তির পুণ্যস্নান করেন। এবার তীর্থযাত্রীর সংখ্যা গত বছরের দ্বিগুণ। অশান্ত সাগর, মেঘলা আকাশ, কনকনে হাওয়া, ঝিরঝিরে বৃষ্টি এবং তীব্র ঠাণ্ডায় পুণ্যার্থীদের কষ্ট বেড়ে যায়। আজ আরও দুজন তীর্থযাত্রী মারা যান। এই নিয়ে সাগরমেলা উপলক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ৭।

বিদেশী সংবাদ

৮ জানুয়ারি—আজ মসকোতে চারজন রুশ যুবকের বিচার আরম্ভ হয়েছে। বিচারকার্য চলার সময় তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের কাকেও আদালত কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গোপন পুস্তক ও পুস্তিকা বিলি করে তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালিয়েছে।

৯ জানুয়ারি—রাষ্ট্রপুঞ্জ দফতরের মঃ পিয়ের পি স্টালা নামক একজন প্রবীণ ফরাসী কর্মচারী রাষ্ট্রপুঞ্জ ভবনের ২৫ তলায় অবস্থিত তাঁর অফিসের জানালা দিয়ে পড়ে মারা গিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপার বিভাগের প্রোজেকট অফিসার ছিলেন।

১০ জানুয়ারি—ভারতে মারকিন দূত শ্রীচেস্টার বোলজ ও প্রিনস সিহানুকের মধ্যে আজ হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে এক ঘণ্টা আলাপ আলোচনা চলে বলে সরকারী অফিসাররা জানান। প্রেসিডেনট জনসনের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে শ্রী বোলজ নমপেনে এসেছেন।

১১ জানুয়ারি—সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা দু মাসের একটি কুকুর-বাচ্চার মাথা ও সামনের দুটি পা অন্য একটি কুকুরের (বয়স ৪) ধড়ে বসানো হয়েছে। এজন্য যে কঠিন অস্ত্রোপচার দরকার হয় তা করেন মসকোর ডাঃ ভ্লাদিমির দেমিকভ। তাঁকে সাহায্য করেন কয়েকজন ইউক্রেনীয় ডাক্তার। সময় লাগে ৪ ঘণ্টা।

১২ জানুয়ারি—ঢাকা থেকে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায়—হালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ৬০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। (পাক সরকারের মতে এই সংখ্যা মাত্র ২৮) আরও প্রকাশ যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী আছেন।

১৩ জানুয়ারি—পাকিস্তানের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো দেশের গণতন্ত্রকে দমিত রাখার জন্য প্রেসিডেনট আয়ুবের শাসনের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নোংরা প্রচারে কোন পাকিস্তানীরই—কি পুরুষ, কি নারীর সম্মান নিরাপদ নয়।

১৪ জানুয়ারি—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারলড উইলসন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পারস্য উপসাগর থেকে যাতে তাড়াহুড়া করে সৈন্য সরিয়ে না নেন, সেজন্য ওয়াশিংটন ও কমনওয়েলথভুক্ত কয়েকটি দেশের কাছ থেকে তাঁর উপর চাপ আসছে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সুখ সঙ্গ
Brooke Bond Tea Red Label
Brooke Bond Tea Red Label
Brooke Bond Tea Red Label
ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল চা
খরচা বাঁচায়—
প্যাকেট পিছু ঢের বেশী কাপ
চা পাওয়া যায়

সূচীপত্র

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৩
শনিবার ১৩ মাঘ ১৩৭৪

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলকাতায়
বার্ষিক ২৫.০০
ষান্মাসিক ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষান্মাসিক " ১৪.০০
ত্রৈমাসিক " ৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষান্মাসিক " ১৪.০০
ত্রৈমাসিক " ৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)
বার্ষিক সডাক ৪০.০০
ষান্মাসিক " ২০.০০
ত্রৈমাসিক " ১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)
বার্ষিক ৩১.০০
ষান্মাসিক ১৬.০০
ত্রৈমাসিক ৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুলে (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday, 27, Jan. 1968

প্রজাতন্ত্র

ভারতের জাতীয় জীবনে ছাব্বিশে জানুয়ারি একটি ঐতিহাসিক দিন। এই দিনটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রজাতন্ত্র, আজ তার অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হল। প্রজাতন্ত্র যে রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি সংগঠন মাত্র একথা স্বীকার করে নিলেও বলা যায় এই ব্যবস্থার মধ্যেই প্রজার হাতে তার সাফল্যের মন্ত্র ধরে দেওয়া আছে। জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব আজ তাই সর্বসাধারণের। মানবাধিকার, ন্যায় বিচার, সমষ্টিগত কল্যাণের আদর্শই আমাদের প্রজাতন্ত্রের আদর্শ। দেশ ও জাতিকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও ন্যায় নীতির পথে নিয়ে যাবার জন্যেই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রজাতন্ত্রের এই আদর্শ যেন আমরা সফল করে তুলতে পারি।

কোয়ালিশনের পর

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কংগ্রেসকে সামনের দরজায় আসতে হল। অনেকের ধারণা হয়েছিল, পি ডি এফ-কে সামনে রেখে কংগ্রেস পেছন থেকে কলকাঠি নাড়লেও এখনো পুরোপুরি সম্মুখবর্তী হতে রাজি না। এটা ঠিক যে, ডঃ ঘোষ এই রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হবার পর কংগ্রেস মৌখিক সমর্থন জানানো ছাড়া তাঁকে বা তাঁর মন্ত্রিসভাকে অন্যভাবে সাহায্য করতে পারছিল না, প্রাথমিক ঝড়ঝাপটা যা গেছে তা ঘোষ-মন্ত্রিসভাকেই সহ্য করতে হয়েছে, আর কংগ্রেস এক্ষেত্রে অন্তত নিরাপদ ছিল। যাই হোক, হায়দরাবাদ অধিবেশনের পর বোঝাই গিয়েছিল এবার কংগ্রেস সামনে আসছে। তার পরই এই রাজ্যে কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন, এখন কংগ্রেসদলও মন্ত্রিসভার অন্যতম শরিক, কংগ্রেসের ছজন মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন, দফতরের ভার তাঁরাও পেয়েছেন। সাধারণভাবে অবস্থাটি স্বস্তিকর বলে মনে হতে পারে হয়ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, এখনও মোটা মস্ত বাধা, বিধানসভার অধিবেশনের বাধা, সেটা থেকে গেছে, আর এই বাধা না পার হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি কই!

যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল করার পর থেকে এ-যাবৎ যে অস্বস্তিকর একটা পর্ব চলেছে এই রাজ্যে তা স্থায়ি হওয়া উচিত না। রাজনীতি যে পথে চলে সে পথে সাধারণ মানুষকে চলাতে হলে তার ভাগ্যে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু জোটে না। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কি অর্থনৈতিক কি সামাজিক জীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যায় তার অবস্থা কী রকম দীন হয়ে উঠেছে, কৃষি শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি যে কোনো বিষয়েই তার অবনতি পীড়াদায়ক। রাজনীতির লড়াই যদি একমাত্র মূল্য হয় নেতাদের সে লড়াই দলনীতির হয় অবশ্য, তবে তাতে সাধারণ মানুষের পেটের অন্ন বা বেকারের চাকরি জোটে না, বরং স্কুল-কলেজ থেকে বিদ্যাদিগ্‌গজ গড়িয়ে ওঠে না। মোট কথাটা এই যে, এখনকার যা অবস্থা তাতে এই রাজ্যের মানুষের নিত্য প্রয়োজনের অভাবের নিরসন দরকার, কিন্তু দুঃখভোগ অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন, নইলে জলের ওপর তেল ভাসার মতন ওপরে রাজনীতির উত্তেজনা আসবে যাবে কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনধারায় সেই একই ক্লেশ দুঃখ থেকেই যাবে।

শাসনের অধিকার পেলেই শাসক উত্তম হন না। পি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন অর্থ এই নয় যে, উত্তম শাসন এসেছে। উত্তম ব্যবস্থা দ্বারা এই শাসনের সুফল জানাতে হবে। যুক্তফ্রণ্টের বেলায় প্রশাসনের অবনতি যে ঘটেছিল এ কথা আজ আর অস্বীকার করার দুঃসাহস না থাকা ভাল, এমন কি প্রকারান্তরে বামপন্থী দলগুলিও সে শাসনের বিচ্যুতি অস্বীকার না করে পারেন নি, অন্তত এ কথা তো শোনাই গেছে যে, কংগ্রেসের চেয়ে ভালো কিছু করতে যুক্তফ্রণ্ট পারে নি। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, শিল্পের দরজা ক্রমাগত বন্ধ হওয়া, অন্নের হাহাকার, জাতীয়তা-বিরোধী শক্তির মাথা চাড়া দেওয়া—ইত্যাদি অভিযোগ তো তার বিরুদ্ধে হামেশাই উঠেছে। সতর্ক, সাবধান হলে ও লক্ষ্য সম্বন্ধে মতের মিল থাকলে, এবং দায়িত্ববোধ থাকলে হয়ত এই অভিযোগ উঠত না। দফতর প্রশাসনে যতটা শরিকানিতা ছিল ততটা সাবধানতা ছিল না শরিকদের। কাজেই এই নতুন কোয়ালিশনকে টিকতে হলে কাজেকর্মে ও লক্ষ্যে বাস্তববাদী ও দক্ষ হতে হবে। নিছক মন্ত্রিসভা গঠন একটা বাহ্য ব্যাপার, অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে তার তেমন একটা মূল্য নেই। আজ পশ্চিমবঙ্গের যে হাল, তাকে রোগজর্জর বললেও ভুল হবে না, এখন দেখতে হবে এই নতুন কোয়ালিশন কতটা ভাল চিকিৎসা করতে পারেন।

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনে আরও একটা অধ্যায় শুরু হ'ল কংগ্রেস এবং প্রগ্রেসিভ ডেমক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর মধ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবার পর। কোয়ালিশন গঠিত হবার মধ্যে হয়ত কোন রাজনৈতিক অভিনবত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ যেদিন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেছে রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে সেদিনই কংগ্রেস-পি-ডি-এফ কোয়ালিশনের ভিত্তি গঠিত হ'য়ে গিয়েছিল। কারণ কংগ্রেস দলের অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকলে পি-ডি-এফ নেতা ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভা গঠিত হবার কোন সম্ভাবনা থাকত না। এমন কি, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটত কিনা সন্দেহ। তবু দীর্ঘ দেড় মাস পি-ডি-এফ নেতা ডাঃ ঘোষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে কংগ্রেস কোয়ালিশনের জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ঘোষের পক্ষ থেকে একটা সুনির্দিষ্ট তাগিদ নিশ্চয়ই ছিল। কারণ সতেরজনের দলের নেতা হিসাবে ডাঃ ঘোষের পক্ষে তাঁর মন্ত্রিসভাকে খুব বেশী দিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কংগ্রেসের সমর্থন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকলেও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে ডাঃ ঘোষের পক্ষে একটাই সুনিশ্চিত পথ খোলা ছিল। তাঁর মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সহযোগ। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এই দেড় মাসকাল অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিলনা। কংগ্রেসের সমগ্র রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপন্থা এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল।

কোয়ালিশন নীতি গৃহীত হবার পর সমগ্র অবস্থাটা পর্যালোচনা করার সুযোগ ঘটেছে হায়দ্রাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে। এই অধিবেশনের আগে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস-বিরোধী রাজনীতির চেহারাটা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে বা পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তর-প্রদেশে শ্রীচরণ সিং কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে যে কংগ্রেস-বিরোধী কোয়ালিশন গঠন করেন তার বর্তমান বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা আজ আর কারো অজানা নেই। আজ যে কোন সময় শ্রীচরণ সিং-এর মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে পারে। বিহারে শোষিত দল সংগঠিত করতে হয়েছে, কারণ যেসব সদস্য শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে কংগ্রেস-বিরোধী কোয়ালিশন থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের পক্ষে সেই মুহূর্তে কংগ্রেসে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। অথচ আজ যদি বিহারে শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে, তবলে কংগ্রেসকেই শোষিত দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করতে হবে।

হায়দ্রাবাদের অধিবেশনের আগেই সরকার গঠনের রাজনৈতিক খেলাটা একটা বিক্ষিপ্ত পথ ধ'রেই চলছিল। হয়ত এ কারণেই কংগ্রেসের রাজনীতির আমূল পরিবর্তনের জন্য চাপ পড়ছিল নেতৃত্বের উপর বিভিন্ন রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে এটাই স্পষ্ট হ'য়ে এসেছিল যে, কংগ্রেসের পক্ষে এককভাবে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের দৃষ্টি-ভঙ্গীটা বেশীদিন জনসাধারণের সামনে রাখা সম্ভব হবে না। যে কোয়ালিশনের প্রশ্নটা নীতিগতভাবে নির্বাচনের পর গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি সেই কোয়ালিশনের কথাই হায়দ্রাবাদ অধিবেশনের পূর্ব মুহূর্তে অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে। এই নীতিগত পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়েই কংগ্রেস নেতৃত্বকে গ্রহণ করতে হ'ল পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অবস্থাটা।

পশ্চিম বাংলার অবস্থাটা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। উত্তর প্রদেশে বা বিহারে কংগ্রেস-বিরোধী দলের মধ্যে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়ে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে, পশ্চিম বাংলায় পরিবর্তনটা আসে ভিন্ন আকারে। পশ্চিম বাংলায়ও যুক্তফ্রন্ট থেকে সমর্থক দল বেরিয়ে এসে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সুস্পষ্ট ক'রে দিয়েছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে এটা নিশ্চিত হ'য়ে গিয়েছিল যে, রাজ্যপালের আদেশ ছাড়া যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সেই অবস্থায় সরান সম্ভব ছিল না। তাছাড়া রাজ্যের প্রশাসনকে কম্যুনিস্ট-দের প্রভাব থেকে সরিয়ে আনার প্রশ্নটাও এই সঙ্গে জড়িত ছিল। তাই পশ্চিম বাংলাকে সামনে রেখে কোয়ালিশনের নীতিকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করা খুব সহজসাধ্য ছিল না।

আরও একটা গুরুতর প্রশ্ন ছিল। এটাও বিশেষভাবে পশ্চিম বাংলার প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সংবিধানগত এবং এর জন্য মূলত দায়ী বিধানসভার স্পীকারের ২৯ নভেম্বরের রুলিং। এই রুলিং-এর ফলে শুধু সংবিধানগত নয়, রাজনৈতিক অসুবিধার সৃষ্টি হ'য়েছে। এই অসুবিধার কথা মনে রেখেই নানা প্রচেষ্টা হ'য়েছে সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করা। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবিধানে স্বীকৃত সবরকম সমাধানের কথা চুলচেরা বিচার করেছে গত দেড় মাসে। সকলে পারার মত সমাধান পাওয়া সম্ভব হয়নি। যে সমাধান হওয়া সম্ভব, তা-ও সহজ পথে চলবে কিনা সে সন্দেহ নিশ্চয়ই আছে।

তাই কংগ্রেস নেতৃত্বকে অপেক্ষা করতে হয়েছে হায়দ্রাবাদ অধিবেশন পর্যন্ত। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসকে কোয়ালিশনের কথাটা মূলতুবী রাখতে হয়েছে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নীতি পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত। সেই নীতি সুস্পষ্টভাবে বদলে গিয়েছে হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে। এই পরিবর্তনের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে পশ্চিম বাংলা এবং অন্যান্য রাজ্যের কংগ্রেস-বিরোধী এবং বিশেষ করে কম্যুনিস্ট দলের 'গণতন্ত্র-বিরোধী' কার্যকলাপ। যে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলিকে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, সেই দলগুলোকেই 'গণতন্ত্র-বিরোধী' হিসাবে অভিযুক্ত করে কংগ্রেস কোয়ালিশনের নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে।

এই নীতি গৃহীত হয়েছে বলেই পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস-পি-ডি-এফ কোয়ালিশন সম্ভব হয়েছে। এই কারণেই বিষয় নির্বাচনী সভায় রাজনৈতিক প্রস্তাবটি গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভা ডাকা হ'য়েছিল এবং চল্লিশ মিনিটের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় কোয়ালিশনের প্রশ্নটা সুনির্ধারিত হ'য়ে গিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার সংবিধানিক জটিলতার প্রশ্নও নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল; কিন্তু সে প্রশ্ন সম্বন্ধে একথাটাই পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সদস্য মহলে শোনা গিয়েছে যে, জটিলতা সমাধানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্যের কংগ্রেস পার্টির নয়। জটিলতা সৃষ্টির সঙ্গেও পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের কোন দায়দায়িত্ব নেই। কাজেই এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে যদি কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহ'লে রাজনৈতিক-

ছিলেন যখন
কর্মভার নিলেন।

দাতা-পরিত্রাতা প্রমাদ

কুরু-পাণ্ডব বিরোধে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডব-পক্ষে, তবে কৌরবদেরও সাহায্য থেকে তিনি একেবারে বঞ্চিত করেননি। ভারত-পাকিস্তান বিরোধেও প্রায় এ-ধরনের আচরণ-সাদৃশ্য অনেকে লক্ষ্য করছেন। কেবল ভারত-পাকিস্তান বিরোধে কেন, আরও অনেক ক্ষেত্রেই। একালের কুরুক্ষেত্র তো সারা পৃথিবীজোড়া। আর পরিত্রাতা, রক্ষাকর্তা, দাতা, যে পরিচয়ই দিই, তিনি একালের কাছে শ্রীকৃষ্ণতুল্য এক এবং অদ্বিতীয় নন; আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, এবং ছিটেফোঁটা যে যেভাবে পারে পরিত্রাতা, দাতা ইত্যাদি রূপে ভূমিকা করছে। এরাই প্রথম সারির, দ্বিতীয় সারিতে এতদিন ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স। ব্রিটেনের পালা প্রায় শেষ; ফ্রান্সের ভূমিকা ঠিক পরিত্রাতার নয়, ইউরোপের পশ্চিমপাড়ায় সর্দারিতেই ফ্রান্স ব্যস্ত। তাদের বাড়িয়ে বলার কাজ নেই। কথা হল, ভারত এবং পাকিস্তান, এ দুটি দেশের মধ্যে কার ওপর কোন্ দিকের বেশী টান? আমেরিকার ঝোঁক কার দিকে? রাশিয়াই কি এখন পাকিস্তানের চাইতে ভারতের বেশী অনুরাগী? চীনের অনুরাগ এবং বিরাগ এতই স্পষ্ট যে সে সম্পর্কে আপাতত কোন প্রশ্ন ওঠে না।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন এই তিনটির মতিগতির ওপর সব বিষয়ে নির্ভর করা বিচক্ষণ নীতি কি না। আমেরিকার কথাই বিশেষ করে ভাবার মতো। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনশালী, শক্তিশালী গণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ভারত যে ধনশালী, কিংবা প্রচণ্ড শক্তিশালী না হতে পারে, কিন্তু জনসংখ্যায় বৃহত্তম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্রী থাকার এখনও সবার তার চেষ্টা। সে চেষ্টা আমেরিকা নীতিগতভাবে সমর্থন করে, ভারতকে সাহায্যও দেয়। কতকাল দেবে, দিতে আগ্রহী থাকবে এবং সক্ষমও, এসব প্রশ্ন উঠেছে, নানামহলে সেসব প্রশ্ন নিয়ে ইদানীং জল্পনা-কল্পনা এবং উদ্বেগ কম নয়। অনেকের বিশ্বাস ও আশা, কম্যুনিস্ট বিপদ যতদিন ভারতের ঘাড়ে আমেরিকা ততদিন ভারতের ওপর বিমুখ হবে না। কম্যুনিস্ট বিপদ নিশ্চিতই খুব খারাপ হলেও সে হিসেবে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির হয়তো একটি মূলধন। তবে আমেরিকা এই বিপদটা সম্বন্ধে কী মনে করে সেটাও যাচাই করা উচিত।

কম্যুনিস্ট বিপদ সম্পর্কে আমেরিকার ভূমিকা এবং প্রতিশ্রুতি প্রায় সেই কুরুক্ষেত্র-যুগের মতোই—সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের বিনাশ মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের সংকল্প। ভিয়েতনামে সে-সংকল্পের পরীক্ষায় আমেরিকা তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কিন্তু আমেরিকার দায়িত্ব এ ব্যাপারে প্রায় দুনিয়া-জোড়া; ল্যাটিন আমেরিকার খবরদারিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে করতে হয়; ইউরোপে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট শক্তির প্রসার প্রতিরোধের জন্য গ্রীস, তুর্কী, পশ্চিম জার্মানীতে আমেরিকার দায়িত্ব সর্বাধিক। এছাড়া আফ্রিকার কিছু কিছু অংশ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, জাপান, ইন্দোনেশিয়ার রক্ষণাবেক্ষণও আমেরিকার। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি ঘটে, যদি সে যুদ্ধে দুপক্ষের বিনাশের আশঙ্কা সমানভাবে শেষ হয় তাহলে অবশ্য আমেরিকার ওপর দায়-দায়িত্বের চাপ এখনকার মত প্রবল থাকবে না। তবে এই পারমাণবিক যুগে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাধ করে কোন পক্ষই চাইতে পারে না, সে যুদ্ধে জয় পরাজয় সম্পর্কেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। আমেরিকা অতএব তার এখনকার [illegible] কতখানি ও কতদিন [illegible] পারবে এবং পারবে সে প্রশ্ন উঠেছে। সে প্রশ্নের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ জড়িত। শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার যে পরিমাণ দায়-দায়িত্ব তার ওপর ভারত-পাকিস্তান বাবদ আরও বেশী দায় ঘাড়ে নিতে মার্কিন রাষ্ট্রকর্তারা এখন নারাজ।

কতকটা সে-কারণেই হয়তো চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের মিতালিকে আমেরিকা খুব আশঙ্কাজনক কি বিপজ্জনক মনে করছে না। সোভিয়েট রাশিয়াও এখন পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতায় উদ্যোগী। কয়েক বছর আগে এ-ধরনের মিলমিশ আমেরিকা বরদাস্ত করত না। জোট এবং ঘোঁট এখন আর আগের মত আঁটসাঁট নেই। তার ফলে জোট-নিরপেক্ষ ভারতের প্রতিপত্তি খর্ব হয়েছে। মার্কিন, সোভিয়েট দাতা ও পরিত্রাতারা এখন কৌরবপক্ষ পাণ্ডবপক্ষ দুদিকেই। কোনটা যে কৌরবপক্ষ মার্কিন সোভিয়েট দাতা-পরিত্রাতারা সেটাও এখন খোলাখুলি বলছেন না। বরং মার্কিন-মহল থেকে ভারতের ওপরেই নানাভাবে বেশী দোষারোপ করা হচ্ছে। ভারত তার সামরিক শক্তি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে, বেচারা পাকিস্তান এতে সন্ত্রস্ত তো হবেই, মার্কিন-মহলের এ মন্তব্য ভারতের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দেয় না। কাশ্মীর সম্পর্কে রাশিয়ার মনোভাবও আগের মত পুরোপুরি ও স্পষ্টত ভারতের অনুকূলে মনে করা যায় না। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, ভারত-চীন বিরোধকে সামরিক গুরুত্ব দিতে আমেরিকা অনিচ্ছুক।

দাতা-পরিত্রাতা রক্ষাকর্তামহলের এসব উল্টোপাল্টা মতিগতি ভারতের পক্ষে ভাবনার কথা বৈকি। আমাদের রাষ্ট্রকর্তারা কতকগুলি সরল যুক্তি আশ্রয় করে আছেন। কম্যুনিস্ট চীন ভারতের শত্রু, সুতরাং আমেরিকার কর্তব্য সব বিষয়ে ভারতকে সমর্থন ও সাহায্যদান। পাকিস্তান যখন কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে ভাবসাব করে জোটের নিয়ম ভেঙেছে, তখন আমেরিকার উচিত পাকিস্তানকে কোনরকম আশকারা না দেওয়া। রাশিয়ার উচিতও তাই। কারণ কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে রাশিয়ার এখন বিষম বিরোধ। মহাশক্তিধর দাতা-পরিত্রাতাদের এভাবে উচিত অনুচিত শিক্ষা দিয়ে কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। নৈতিক মানদণ্ডের দোহাই দিয়ে আমরা আক্ষেপ করতে পারি, আমেরিকার কাছে, রাশিয়ার কাছে দরবার করতে পারি, কিন্তু যে যার ভালো যেটা সে নিজের মতো করেই বুঝেছে। যেহেতু আসলে ভারতের ভূমিকা ছিল কট্টর জোট-নিরপেক্ষ, তখন আমেরিকার বন্ধু হয়ে যাননি, বন্ধুত্বে রাজী হননি। এখন আমেরিকাকে কী করে বোঝানো যায়, কাশ্মীর ব্যাপারে, পাকিস্তানের জঙ্গী মনোভাব সম্পর্কে, কম্যুনিস্ট চীন সম্পর্কে ভারত যা ভাবছে আমেরিকার উচিত সেটা মান্য করা?

কোন কোন বিদেশীমহলের ধারণা, ভারত সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের মোহভঙ্গ ঘটছে, অথবা বলা যায় ভারতকে আর্থিক দাক্ষিণ্যে আমেরিকার উৎসাহে এখন ভাটার টান। সেজন্য কিছুটা দায়ী সম্ভবত মার্কিন টাকাদাতাদের অনাগ্রহ, কোন কোন মার্কিন রাজনৈতিক মহলের বিরূপতা। মোট কথা সারা দুনিয়ায় আমেরিকার দায়দায়িত্ব বিরাট, সেজন্য ভারত-পাকিস্তানকে খাড়া রাখবার দায়টা চিরস্থায়ীভাবে কাঁধে নিতে আমেরিকা ক্রমেই নারাজ হতে পারে।

২২-২-৬৮

আজন্ম অভাবের মধ্যে

বেণু দত্ত রায়

ভীষণ অভাব, মস্ত অভাব মনের মধ্যে
পুষে রাখছি। সেই ছোট বেলা থেকে
কত জন্ম জন্ম যুগ যুগ অভাবের মধ্যে
বড়ো হচ্ছি। সর্বক্ষণের জন্য শুধু
ভীষণ অভাব, মস্ত অভাব· ভারী অভাব।

কাছে গেলে কেবল নখে আঁচড়াতে ইচ্ছে করে
কেবল মাংস ক্ষতবিক্ষত করতে ইচ্ছে করে
বাগান নেই, বাড়ি নেই, ভালো-খাওয়া নেই।
আমার জন্যে যেন একটা জালন্দী এনেছে ওরা
আটত্রিশ ইঞ্চি কোমর, তাকে আবার শায়া শাড়ি
বিশ্রী বেঢপ, মাদারের খুঁটির মত গড়ন।

অভাব, ভীষণ অভাব, বড়ো বিশ্রী অভাবের মধ্যে
বড়ো হচ্ছি
বন্দুক ছিটান নেই, বেয়নেট চার্জ নেই, কেবল
শুধু ছিটান দম-আটকানো দরজা-বন্ধ ঘরে
অশীতিপর উন্মাদের মত পলিত কেশ মাঝে মাঝে
অট্টহাসি হেসে উঠি।
বাপরে এমন বিশ্রী অভাবের মধ্যে কত যুগ .
বাঁচা যায়।

বারংবার হটে হটে

তুষার রায়

বারংবার হটে হটে হঠাৎ হটেনটট যোদ্ধা যেন
ছুটে যায় সিংহের দিকে
এরকমই স্বপ্নে ঘুমে বুকের ভেতরে যেন গুরুগুরু
কি কাঁপছে লাভা-স্রোতে না দুর্বল হৃদপিণ্ড থেমে যাবে?
আমি তাই আজকাল আগ্নেয়গিরির ছবি দেখি না ভুলেও

অদ্ভুত জ্যোৎস্নায় আজকাল ঘুম ভেঙে গেলে
স্পষ্ট দেখা বানাতে পাই দরাগের সাত লক্ষ সাদা ঘোড়া
আলো-মেঘে ঠিকরে ছুটে চলেছে আমার বুকের গভীরে
আমি জানি কেউ [illegible] পৃথিবী
যেন শেষবার, তিনবার ঠিক ঠিক বলে চুপ মেরে যাবে টিকটিকি,

তবু শেষবার আকণ্ঠ ডিঙিয়ে উঠে ইচ্ছে করে, সাদা কালো
সাত রঙের ঘোড়া ও আগুনে ঘোড়া টগবগিয়ে
কড়কড়ে চিবিয়ে ফেলি, আমি
বারংবার হটার মধ্যে থেকে হঠাৎ হটেনটট যোদ্ধা যেন
ছুটে যাই সিংহের দিকে।

সেই মুখের নির্ঝর

দেবারতি মিত্র

যদি ভেঙে যায় ঘুমঘোর,
অন্য কোনও পৃথিবীতে, হয়ে গেলে সহস্র বছর,
তবে, সেই মুখখানি আমার এ চোখের পল্লবে—
শ্রান্তিহীন মুগ্ধ নিমেষের মত বারবার তরঙ্গিত হবে।

সঘন, সুন্দর, শান্ত
স্তূপ স্তূপ নক্ষত্রের স্রোতের অন্তরে
সেই মুখ অবিচ্ছিন্ন আলোকপ্রপাত,
অজস্র উত্তাল ফেনা,
কত অসম্ভব বার শব্দময় কোমল স্পন্দন;
ভেসে যেতে যেতে বহুক্ষণ—
অন্য কোনও পৃথিবীর অজ্ঞাত বন্দরে
অকস্মাৎ যদি হয় ভোর,
নতুন বাতাস থেকে তখনও কি না নিয়ে নিঃশ্বাস
সেই মুখের নির্ঝর
প্রতি বিন্দু টেনে নেব বুকের গভীরে,
নির্মজ্জিত ভবিষ্যতে, সহস্র বছর পরে?

সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ ও রবীন্দ্রনাথ

নেপাল মজুমদার

৩০শে জানুয়ারী (১৯৩৯) প্রভাতী সংবাদপত্রে বড়ো বড়ো হরফে সুভাষচন্দ্রের জয়লাভের খবর প্রকাশিত হয়। সারা দেশের বামপন্থী ও প্রগতিশীল মহলে ছাত্র ও যুব মহলে সে কী বিপুল উন্মাদনা ও বিজয়োল্লাস! বিশেষ করে—সারা বাংলাদেশই যেন উচ্ছ্বাসে ও আনন্দে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথও যে অত্যন্ত আনন্দিত হন, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই জয়লাভ উপলক্ষেই যে কংগ্রেসের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ-বিদ্বেষ ও বিশ্রী কলহের সৃষ্টি হতে পারে একথা কবি তখনও পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেননি।

পরদিন—৩১শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতনে হিন্দী ভবন-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ওইদিন প্রাতে জওহরলাল ও ইন্দিরা সহ শান্তিনিকেতনে এলেন। শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার পরই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওইদিনই অপরাহ্নে তিনি হিন্দী ভবন-এর উদ্বোধন করেন। পরদিন—১লা ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ সম্পর্কে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক বিবৃতি প্রকাশিত হয় (বরদৌলি—৩১ জানুয়ারী) :

"মিঃ সুভাষ বসু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুস্পষ্টরূপেই জয়লাভ করিয়াছেন। আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, গোড়া হইতেই আমি তাঁহার পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। ইহার কারণ এ স্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নির্বাচনী প্রচারপত্রে তিনি যে সকল তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি না। আমি মনে করি যে, সহকর্মীদের কথা তিনি যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অযৌক্তিক ও অশোভন হইয়াছে। তথাপি তাঁহার জয়লাভে আমি আনন্দিত। মৌলানা সাহেব তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিবার পর আমার চেষ্টাতেই ডাঃ পট্টভি নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই। অতএব এই পরাজয় তাঁহার অপেক্ষা আমারই অধিক। আমি যদি সম্পূর্ণ নীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব দাবি করিতে না পারি, তবে আমার কোনই মূল্য নাই। অতএব আমার নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, আমি যে নীতি ও কার্যপদ্ধতির পরিপোষক, প্রতিনিধিরা তাহা সমর্থন করেন না। এই পরাজয়ে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।"

এই দীর্ঘ বিবৃতির উপসংহারে তিনি বলেন,

"যাহাই হোক, সুভাষবাবু ত আর দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার কার্যক্রম এবং নীতিকেই তিনি সর্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক মনে করেন। যাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাঁহারা কেবলমাত্র উহার সাফল্য কামনা করিতে পারেন। তাঁহারা যদি উহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা যদি তাল রাখিয়া চলিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন। সংখ্যালঘিষ্ঠদের কোনক্রমেই বাধা সৃষ্টি করা উচিত হইবে না। যখন তাঁহারা সহযোগিতা করিতে অসমর্থ হইবেন, তখন তাঁহারা সহযোগিতা হইতে বিরত থাকিবেন। কংগ্রেসসেবীদিগকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যাঁহারা কংগ্রেসী হইয়াও স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের বাহিরে থাকেন, তাঁহারাই কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সুতরাং যাঁহারা কংগ্রেসে থাকা অস্বস্তিকর মনে করিবেন তাঁহারা বাহিরে চলিয়া আসিতে পারেন। তাঁহারা কোনপ্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া বাহির হইবেন না; কার্যকরীভাবে দেশের

অধিকন্তর সেবা করার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা বাহিরে আসিবেন।

[আনন্দবাজার পত্রিকা—১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯।

এই বিবৃতি পাঠ করে সমগ্র দেশ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। এই নির্বাচন যুদ্ধে সীতারামাইয়া ও সুভাষচন্দ্রের মাঝখানে গান্ধীজী এসে পড়লেন কখন এবং কি করে একথা সাধারণ লোকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। ফলে দেশের প্রগতিশীল ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।

এই বিবৃতি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে যে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা অনুমান করা শক্ত নয়। জওহরলাল তখনও শান্তিনিকেতনে। সন্দেহ নেই, কবি এ বিষয়ে জওহরলালের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। কিন্তু তার কোন নোট বা বিবরণ পাওয়া যায় না। ১লা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা এক ঘরোয়া বৈঠকে জওহরলালকে গান্ধীজীর ওই বিবৃতির তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবার অনুরোধ জানালে পর তিনি যা বলেন তা খুবই অস্পষ্ট ও ভাসা-ভাসা ধরনের। এই সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি বিবরণী দিয়ে লিখলেন, (শান্তিনিকেতন, ২রা ফেব্রুয়ারী).

"গতকল্য সন্ধ্যায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী যে বিবৃতি দিয়াছেন তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, এই সময়ে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্যাবলী সম্পর্কে কোন কথা বলা সঙ্গত হইবে না। তিনি বলেন যে, গান্ধীজী যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোনো নূতন কথা নয়। কয়েকমাস পূর্বে অন্য এক অবস্থায় তিনি এই প্রকার মন্তব্যই করিয়াছিলেন। কংগ্রেস সভাপতির পদ একটি অদ্ভুত রকমের। তাহার নির্বাচনের উপর নানা বিষয়ের প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু যদি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি বা কার্যক্রম ওই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়বস্তু হয় তাহা হইলে নির্বাচনের ফলে কোনো একটি বিশেষ নীতি সমর্থিত হইল বলা যায়। কিন্তু সাধারণত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়বস্তু পরিষ্কার থাকে না। অবশ্য কংগ্রেস অধিবেশনে সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর ভোট দিতে হয়। কাজেই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অতীতে যেমন ঘটিয়াছে তেমন ইহাও হইতে পারে যে, একই নির্বাচকমণ্ডলী (অর্থাৎ প্রতিনিধিমণ্ডলী) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এক প্রকার এবং পরে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঠিক তাহার বিপরীত সমর্থন করিতে পারেন। নির্বাচিত সভাপতি যে নির্বাচকমণ্ডলীর সাধারণ ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠিক সেই নির্বাচকমণ্ডলী যদি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হইলে সেই শেষ সিদ্ধান্তটিই বলবৎ থাকে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯।

আসন্ন ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে জওহরলালের এই মন্তব্য বা উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ফলাফল সম্পর্কে এ যেন তাঁর ভবিষ্যৎবাণী। গান্ধীজীর ওই বিবৃতির পর ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরিণাম যে কি হবে তা

অনুমান করে নিতে তীক্ষ্ণধী জওহরলালের পক্ষে কোন অসুবিধা হয়নি।

পরদিন প্রাতে (২রা ফেব্রুয়ারী) সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে এলেন। সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে এসেই জওহরলালের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। দুঃখের বিষয় এই আলোচনার আজও পর্যন্ত কোন নোট বা বিবরণ পাওয়া যায়নি। এই সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি লিখেছেন,

"শ্রীযুক্ত বসু আসিয়াই পণ্ডিত জওহরলালের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথের সহিতও অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ করিবার পর রাষ্ট্রপতি আবার পণ্ডিত নেহরুর সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার প্রকৃতি জানা যায় নাই। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় রাষ্ট্রপতি মোটরযোগে কলিকাতা যাত্রা করেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯]

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল উভয়েই সুভাষচন্দ্রকে অবিলম্বে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তাঁর নির্দেশ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

কলকাতায় পৌঁছে পরদিনই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর বিবৃতির জবাবে এক প্রেস বিবৃতিতে বিষয়টি পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন যে—"ভোটদাতা অর্থাৎ প্রতিনিধিদিগকে মহাত্মার পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে বলা হয় নাই। কাজেই আমার ও দেশের অধিকাংশ লোকের মতে ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মার সহিত সভাপতি নির্বাচন প্রশ্নের কোনই সম্বন্ধ নাই।" তিনি আরও বলেন,—"আমি ঐকান্তিকভাবে এই আশাই অন্তরে পোষণ করিতেছি যে, কংগ্রেসের তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে তথাকথিত সংখ্যালঘিষ্ঠদের সহিত অসহযোগিতা করিবার কোন ক্ষেত্রই উপস্থিত হইবে না। কংগ্রেসের মধ্যে কখনও কোন বিচ্ছেদ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলে আমি সর্বান্তঃকরণে যে তাহা নিবারণে প্রয়াস পাইব তাহা বলাই বাহুল্য।" এই বিবৃতির উপসংহারে তিনি গান্ধীজীর সমর্থন ও আশীর্বাদ লাভের আবেদন জানিয়ে বলেন,

"মহাত্মার সহিত কোন কোন বিষয়ে কচিৎ আমার মতভেদ ঘটিয়া থাকিলেও মহাত্মার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কাহারো অপেক্ষা আমি কম শ্রদ্ধাবান নহি। আমার সম্বন্ধে মহাত্মাজী কি অভিমত পোষণ করেন তাহা আমি জানি না তবে তিনি আমার সম্বন্ধে যে অভিমতই পোষণ করুন না কেন তাঁহার বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইবার জন্য আমি সর্বদাই যত্নবান থাকিব কেননা সকলের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইয়াও আমি যদি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থাভাজন না হইতে পারি তাহা হইলে তাহা অতিশয় মর্মন্তুদ হইবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯]

এই বিবৃতিদানের কয়েকদিন পরই সুভাষচন্দ্র এলাহাবাদে পুনরায় জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (১৩ই ফেব্রুয়ারী)। ওইদিনই তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ওয়ার্ধা যাত্রা করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি সেবাগ্রামে গিয়ে গান্ধীজীর পরামর্শ ও নির্দেশ ভিক্ষা করেন। কিন্তু এ আলোচনার কোন ফল

হল না। গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশনে তাঁকে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করবার পরামর্শ দেন। ব্যর্থ মনোরথে সুভাষচন্দ্র জ্বর গায়েই কলকাতায় ফিরে আসেন (১৭ই ফেব্রুয়ারী)।

এরপর সুভাষচন্দ্র খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের কথা। ডাঃ নীলরতন প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা তাঁকে কোনমতেই ওয়ার্ধা যাবার অনুমতি দিলেন না। সুভাষচন্দ্র সমস্ত অবস্থাটা জানিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখবার আবেদন জানিয়ে সদস্যদের তার করলেন। কিন্তু কোনই ফল হল না। নির্ধারিত সময়ে সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতেই সর্দার প্যাটেল প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির ১২ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করে বিবৃতি দিলেন। জওহরলাল অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে পদত্যাগ করে বিবৃতি দেন। এর ফলে সুভাষচন্দ্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

৭ই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেস শুরু হবার কথা। এদিকে রাজকোটে দেশীয় রাজ্য প্রজা আন্দোলনে সংকট সৃষ্টি হলে ৪ঠা মার্চ থেকে গান্ধীজী অনশন শুরু করেন। সুভাষচন্দ্র তখনও অসুস্থ। ডাক্তারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অসুস্থ শরীরেই তিনি ত্রিপুরী যাত্রা করেন। ৬ই মার্চ ১০৩ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে তিনি জব্বলপুরে পৌঁছান। ৭ই মার্চ বড়লাটের কাছ থেকে রাজকোট সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার আশ্বাস পেয়ে গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করেন। ওইদিনই ত্রিপুরীতে এ আই সি সির বৈঠক শুরু হয়। জ্বর বৃদ্ধি পাওয়ায় সুভাষচন্দ্র এতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। পরদিন ৮ই মার্চ বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠকে সুভাষচন্দ্রকে অসুস্থ অবস্থায়ই স্ট্রেচারে করে আনা হয়। ওইদিনই গোবিন্দবল্লভ পন্থ গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও তাঁর অনুসৃত নীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সুভাষচন্দ্র আপোস আলোচনার দ্বারা প্রস্তাবটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করবার অনুরোধ জানান। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দুদিন আলোচনার পর ১০ই মার্চ বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভায় পণ্ডিত পন্থের ওই প্রস্তাবটি ২১৮ ১৩৫ ভোটে গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র অবশ্য ওইদিন উপস্থিত হতে পারেননি। ওইদিনই ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয়। সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র বসু সভাপতির অভিভাষণটি পাঠ করেন।

পরদিন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই খবর ফলাও করে ছাপা হয়। সমস্ত বাংলা দেশের মানুষই সেদিন পরাজয়ের অপমানে ক্ষোভে ও ক্রোধে যেন ফেটে পড়বার উপক্রম হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। সংবাদপত্রযোগে এইসব খবর অধীর আগ্রহে তিনি পাঠ করছিলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ওই হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির মধ্যেও সুভাষচন্দ্র যে অসুস্থতাজনিত সমস্ত শারীরিক ক্লেশকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত মাথা উঁচু করে লড়াই করেছিলেন এর জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর হৃদয় অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতিতে ভরে উঠল। এই নিরতিশয় অবমাননা ও দুঃখের মধ্যে সুভাষচন্দ্র যাতে ভেঙে না পড়েন এর জন্য ওইদিনই তিনি ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্রকে সহানুভূতি ও উৎসাহ জানিয়ে পত্র লিখলেন (১১ই মার্চ)। এই পত্রে তিনি সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে জানিয়ে দিলেন যে, বাংলা দেশের পক্ষ থেকে তিনি তাঁকে যে প্রকাশ্য অভিনন্দন জ্ঞাপনের সংকল্প করেছিলেন তা সফল হতে মোটেই বিলম্ব হবে না। পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত করা হলঃ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অসুস্থ শরীর নিয়ে কংগ্রেসের দুঃসাধ্য কাজে তোমাকে পীড়িত করেছিল সেজন্য আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিলেম, এখনো উৎকণ্ঠার কারণ আছে। আশা করি উপযুক্ত শুশ্রূষায় ও বিশ্রামে তুমি আরোগ্যের পথে চলেছ; এবং বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে সম্মানদানের যে সংকল্প আমার মনে আছে তা সফল হতে বিলম্ব হবে না। ইতি—

তোমাদের

১১।৩।৩৯ স্নেহরত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ই মার্চ রাত্রি ১০টায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরদিন ১৩ই মার্চ অপরাহ্নে সুভাষচন্দ্র কলিকাতার পথে যাত্রা করেন। সুতরাং ওইদিনই তিনি ত্রিপুরীতে কবির পত্রটি পেয়েছিলেন বলে অনুমিত হয়। পরদিন অপরাহ্নে অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁকে ধানবাদ স্টেশনে নামিয়ে জামাডোবায় তাঁর ভ্রাতা সুধীর বসুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে ইউরোপে মহাযুদ্ধের করাল ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। হিটলারের হিংস্র থাবা তখন চেকোস্লোভাকিয়ার বুকে। ১৫ই মার্চ নাৎসী বাহিনী প্রাগ নগরী অধিকার করে। ওইদিনই সন্ধ্যায় হিটলার প্রাগ নগরী অধিকার করে তার পুরাতন প্রাসাদশীর্ষে নাৎসী নিজস্ব পতাকা উড়িয়ে দেন। পরদিন তারে বেতারে পত্র-পত্রিকায় সারা পৃথিবীতে এই খবর ফলাও করে ছাপা হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এই সংবাদে তিনি যে কি পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন তা অনুমান করা শক্ত নয়। কবির আরও দুঃখ ক্ষোভের কারণ এই যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে হিটলারের এই সাম্রাজ্য-লোভী ক্ষুধা ও আগ্রাসী নীতিকে তো নিন্দা করা হলোই না পরন্তু মহাত্মাজীর উক্ত অনুগামীরা সগৌরবে ভারতবর্ষে তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে হিটলার-মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন।

উল্লেখযোগ্য, ১০ই মার্চ সন্ধ্যায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের সূচনাতেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস তাঁর অভিভাষণের সূচনাতেই কংগ্রেসের মধ্যে মহাত্মাজীর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন,

..."যদিও ইটালীর ফ্যাসিস্ট দল, জার্মেনীর নাৎসী দল এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট দল হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং আমরা অহিংসা নীতি গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আমাদের কংগ্রেস দল উহাদের সহিত তুলিত হইতে পারে। ইটালীর সমস্ত অধিবাসী ফ্যাসিস্ট নহে, জার্মানীর সমস্ত লোক নাৎসী নহে এবং রাশিয়ার সমস্ত লোক কমিউনিস্ট নহে; তথাপি প্রায় সমস্ত ইটালীয়ান, জার্মান ও রুশীয়দের তাহাদের দলের উপর আস্থা আছে।...ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান।...কংগ্রেসের লিখিত গঠনতন্ত্রে তাহার জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট নাই ইহা সত্য; কিন্তু ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, রাষ্ট্রপতি পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যপদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করা একটা প্রথা দাঁড়াইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে কংগ্রেসে তিনি সর্বেসর্বা। কিছুকাল পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইউরোপে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গান্ধীজী কংগ্রেস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।"...

[আনন্দবাজার পত্রিকা—১১ই ৩—১৯৩৯]

বলা বাহুল্য, ত্রিপুরী কংগ্রেসে পন্থ প্রস্তাবেরও মূল সুর (main spirit) এই ছিল। পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা তো 'মহাত্মাজী কী জয়! হিন্দুস্থান কী হিটলার কী জয়' —এই বলে জয়ধ্বনি করে বসলেন।

এই সবই সংবাদপত্রযোগে কবির নজরে আসে। কবি বুঝতে পারেন, এই যেখানে কংগ্রেসে মহাত্মাজীর অনুগামীদের দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে স্বাধীন ও অপক্ষপাত বিচারের ক্ষীণ আশাও লুপ্ত হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যও যে সুবিচার পাবে না কবির তাতে সন্দেহ থাকে না। গভীর দুঃখে কবির মনে এই সব নানা চিন্তার আলোড়ন

স্বভাবতই বাংলাদেশের সেণ্টিমেণ্ট এতে প্রবলভাবে আহত হয়। ফলে সুভাষচন্দ্রের পরাজয়কে বাংলাদেশের পরাজয় বলে গ্রহণ করা হয়। কাগজে কাগজে তার তীব্র সমালোচনা চলল। দিনের পর দিন সভা-সমিতি ও মিছিল তার তীব্র নিন্দা ও বিক্ষোভ প্রকাশ চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থেকেও এই সব সংবাদ পান। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি গান্ধীজীকে অবিলম্বে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বাংলার প্রতি সুবিচার করবার আবেদন জানান (২৯ মার্চ)। ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী নেতাদের আপোস-বিরোধী মনোভাব ও কঠোর অনমনীয় জিদের দ্বারাই যে বাংলাদেশকে রূঢ় আঘাত করা হয়েছে তাতে আর কবির কোন সন্দেহ ছিল না। কবির পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত হল:

UTTARAYAN
Santiniketan, Bengal
March 29, 1939.

Dear Mahatmaji,

At the last Congress session some rude hands have deeply hurt Bengal with an ungracious persistence, please apply without delay balm to the wound with your own kind hands and prevent it from festering. With love

Ever yours,
(Sd) Rabindranath Tagore

Mahatma Gandhi
Birla House, New Delhi.

গান্ধীজী তার জবাবে কবিকে জানালেন যে, তিনি সুভাষকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, এ ছাড়া সংকট বা অচলাবস্থার সমাধানের আর কোন উপায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। গান্ধীজীর পত্রটি ছিল এই (২।৪।৩৯):

New Delhi
2.4.39.

Dear Gurudev,

I have your letter full of tenderness. The problem you set before me is difficult. I have made certain suggestions to Subhas. I see no other way out of the impasse.

I do hope you are keeping your strength. Charlie is still in the hospital. With love

Yours,
(Sd) M. K. Gandhi.

গান্ধীজীকে চিঠি লেখার পরদিনই—৩০শে মার্চ কবি কলকাতায় আসেন। কলকাতার বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে বসন্তোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। কবি কলকাতায় কয়েকদিন থেকে বাংলাদেশের উত্তেজনার কথা সবই শুনলেন। কলকাতায় তখন জোর রাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনা—এর পর বামপন্থীরা ও সুভাষচন্দ্র কী করবেন? হয় 'পন্থ-প্রস্তাব' অনুযায়ী গান্ধীজীর অনুগামী পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁদের সব কিছু নির্দেশ মেনে চলতে হবে অথবা তাঁদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে বামপন্থীদের নিয়ে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু 'পন্থ-প্রস্তাব'টি এমনই সুকৌশলে রচিত হয়েছিল যে, তাতে করে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে আত্মসত্তা বা তাঁর রাজনীতি বিসর্জন দেওয়া অথবা পদত্যাগ করা ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর ছিল না। 'পন্থ-প্রস্তাব'-এ বলা হয়,

..."মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশমত গত কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্যতালিকা যে মূলগত নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, এই কমিটি তাহাতে গভীর আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। এবং দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে, ঐ নীতি পরিত্যাগ না করিয়া ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্যক্রম নির্ধারণের উক্ত নীতিই অনুসরণ করা উচিত। গত বৎসরের কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কার্যে এই কমিটি আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং উহার সদস্যের উপর দোষারোপ করায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

"আগামী বর্ষে সংকটজনক পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এবং ঐরূপ সংকটে মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেস ও দেশবাসীকে পরিচালিত করিতে সমর্থ বলিয়া, তাঁহার অবিচলিত আস্থা কংগ্রেসের কার্য-পরিচালকগণের লাভ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া এই কমিটি মনে করে। সেজন্য এই কমিটি সভাপতিকে মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী আগামী বৎসরের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে মনোনীত করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৯ই মার্চ ১৯৩৯]

কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মৌল আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্য এবং বিরোধ ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল। তা ছাড়া কিছুকাল থেকে বিশেষ করে ১৯৩৮-এ ইউরোপে মিউনিক-সংকটকাল থেকেই সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তৃতা ও বিবৃতিতে আভাসে-ইঙ্গিতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে চরমপত্র বা আলটিমেটাম দেবার কথা বলে আসছিলেন। অথচ গান্ধীজী তা চাইছিলেন না। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র তাঁর সভাপতির অভিভাষণে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে এই চরমপত্র দেওয়ার কথাটা বিবেচনা করে দেখবার অনুরোধ জানালেন। এই ভাষণের উপসংহারে বলা হয়,

"আমার মনে হয় যে, স্বরাজের প্রশ্ন উত্থাপন এবং চরমপত্রের আকারে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকট আমাদের জাতীয় দাবি দাখিল করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। আমাদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা চাপাইয়া দেওয়া হউক এবং আমরা নিষ্ক্রিয় মনোভাব অবলম্বন করিয়া থাকিব এরূপ অবস্থা বহুকাল পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা কখন আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে, তাহা এখন আর সমস্যা নহে। ইউরোপে শান্তি-প্রতিষ্ঠা না-হওয়া পর্যন্ত কয়েক বৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা যদি সুযোগ বুঝিয়া ধামাচাপা দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা কি করিব। চতুঃশক্তি চুক্তিদ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে ইউরোপে একবার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেটব্রিটেন যে কড়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রেটব্রিটেন প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরবদিগকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে এই কারণে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রেটব্রিটেন নিজেকে দুর্বল বলিয়া মনে করিতেছে। সেই হেতু আমি বিবেচনা করি যে, উত্তর দিবার নির্দিষ্ট সময় দিয়া চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকট পেশ করা আমাদের উচিত। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন উত্তর না-পাওয়া যায় বা অসন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় দাবিসমূহ আদায় করিবার জন্য আমাদের যে সকল উপায় আছে, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। বর্তমানে আমাদের নিকট যে উপায় আছে তাহা হইতেছে ব্যাপক আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ। দীর্ঘ সময়ের জন্য নিখিল ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহের ন্যায় বড় রকমের একটা সংঘর্ষের সম্মুখীন হইবার মত অবস্থা আজ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নাই।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—১১ই মার্চ ১৯৩৯]

কিন্তু সবচেয়ে জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হল, নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়ে। সুভাষচন্দ্র তখনও জামাডোবায় অসুস্থ। তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে বিপক্ষ দল অত্যন্ত হীন কুৎসা ও অপপ্রচার চালাতে থাকেন যে, এ সবই তাঁর বুজরুকী মাত্র। সুভাষচন্দ্র যে তাতে কী মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন তা তাঁর এই সময়কার লেখা My Strange Illness (Modern Review—April 1939) প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে। ২৫শে মার্চ তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সোজাসুজি আইন ও ক্ষমতা বহির্ভূত হয়েছে; তবুও তিনি যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারছেন না তা এই পন্থ-প্রস্তাবের জন্য, কেননা তাতে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে মহাত্মাজীর পরামর্শ ও অনুমোদন গ্রহণ করবার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। ওইদিনই তিনি গান্ধীজীকে এক দীর্ঘ পত্রে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ ভিক্ষা করেন। নতুন কমিটি যদি একমতাবলম্বী না-হয়ে বহু মতাবলম্বী হয়, কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণ এই উভয় পক্ষের সমানুপাতিক ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠনে তাঁর অনুমোদন আছে কি না জানতে চান।

তা ছাড়া পন্থ-প্রস্তাবের মারাত্মক গঠনতান্ত্রিক ত্রুটি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি দেখান যে, এটি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ১৫নং অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ বিরোধী হয়েছে—পন্থ-প্রস্তাব মানতে হলে ওই ১৫নং অনুচ্ছেদটি বাতিল করে দিতে হয়। তিনি জানতে চান, পন্থ-প্রস্তাবকে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বলে তিনি মনে করেন কিনা?

সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতির পর কলকাতায় দারুণ উত্তেজনা ও জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে, সুভাষচন্দ্র হয়ত পন্থ-প্রস্তাব অমান্য করবেন, না-হলে পদত্যাগ করবেন। কিন্তু বামপন্থীরা—বিশেষ করে সারা বাংলাদেশই তখন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত একটা সংঘর্ষের জন্য চঞ্চল ও উদগ্রীব হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ তখনও কলকাতায়। তিনি এ সবই শুনলেন। তা ছাড়া নিদারুণ অসুখে ও বিপক্ষদের হীন আক্রমণে সুভাষচন্দ্রের হৃদয় যে জর্জরিত হয়ে উঠেছে এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে কবি অত্যন্ত ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর আশঙ্কা হল, সুভাষচন্দ্র হয়ত উত্তেজনা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ায় পদত্যাগ করে বসতে পারেন। তাই শান্তিনিকেতন যাবার পূর্বে সুভাষচন্দ্রকে উৎসাহিত ও অনুপ্রেরিত করার জন্য কিছু পরামর্শ দিয়ে তিনি এক পত্র লিখলেন (৩রা এপ্রিল ১৯৩৯)। পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত হল :

কলিকাতা

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
কল্যাণীয়েষু,

কয়েকদিন কোলকাতায় এসে দেশের লোকের মনের ভাব ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছি। সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে—এমন অনুকূল অবসর যদি স্বিধা করে হারাও তাহলে আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। বাংলাদেশ থেকে তুমি যে শক্তি পেতে পার, তার থেকে বঞ্চিত হবে, অন্য পক্ষও চিরদিন তোমার শক্তি হরণ করতে থাকবে। এত বড়ো ভুল কিছুতেই কোরো না। তোমার জন্যে বলছিনে, দেশের জন্য বলছি। মহাত্মাজী যাতে শীঘ্রই তাঁর শেষ বক্তব্য তোমাকে জানান দৃঢ়ভাবে সেই দাবি করবে। যদি তিনি গড়িমসি করেন তাহলে সেই কারণ দেখিয়ে তোমার পদত্যাগ করতে পারবে। তাঁকে বোলো শীঘ্রই তোমাকে ভবিষ্যতের কর্তব্য স্থির করতে হবে, অতএব আর বিলম্ব সইবে না। আশা করি তোমার শরীর সুস্থ হবার দিকে চলেছে। আজই শান্তিনিকেতনে ফিরছি।

ইতি
২।৪।৩৯
তোমাদের
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

কবি যে সেই মুহূর্তে কী পরিমাণ উদ্বেলিত হয়েছিলেন—সাময়িকভাবেও তিনি যে আত্মবিস্মৃত হয়ে দলীয় রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন উপরোক্ত পত্রই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তার কারণ, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের অন্যায় আচরণ ও আপোস-বিরোধী মনোভাবের জন্য তিনি অনান্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে যে তাঁরা কিছুতেই কাজ করবেন না এবং সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য যে তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছেন, এ কথা তখন কবির কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কবি ওইদিনই শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। সম্ভবত শান্তিনিকেতনে ফিরেই তিনি গান্ধীজীর জবাবী-পত্রটি (২।৪।৩৯ তারিখের) পান। গান্ধীজীর এই পত্রে তিনি জানতে পারেন, চিঠিপত্রে সুভাষচন্দ্রকে তিনি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। বস্তুত এই সময় গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ওই জটিল সমস্যা নিয়ে খুব ঘনঘন চিঠিপত্র ও তার-বিনিময় হচ্ছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সেগুলি প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং লোকের তাতে উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের পরিসীমা ছিল না। ফলে নানা গুজবও চলছিল। ৫ই এপ্রিল সুভাষচন্দ্র জামাডোবা থেকে এক বিবৃতিতে এই সব গুজবের ভিত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি পন্থ-প্রস্তাব অমান্য করবেন না। বিবৃতির শেষে বলেন,

"সুতরাং নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সভ্য বা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই যে, আমি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব মান্য করিব না। আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক না কেন, আমি ওই প্রস্তাব মান্য করিব। আমি যদি কোনও কারণবশত উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত

---

*'রবীন্দ্রসদন'-এ রক্ষিত এই পত্রের অনুলিপিতে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর নোট আছে—"চিঠিতে ভুল করে গুরুদেব ৩।৪।৩৯ পরিবর্তে ২।৪।৩৯ তারিখ দিয়েছেন।"

করিতে না-পারি তাহা হইলে আমি বিধি-মত নিজের পথ বাছিয়া লইব। তবে কিনা আমি এ কথা বলিয়া রাখি যে, আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মতামতের উপর নির্ভর করিবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৬ই এপ্রিল ১৯৩৯]

এই সময় কবির পুরী যাবার কথা হয়। ১৬ই এপ্রিল তিনি কলকাতায় এলেন। কলকাতায় তিনি প্রশান্ত মহলানবিশের বেলঘরিয়ার বাড়িতে উঠেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি তিনি পূর্বেই পাঠ করেছিলেন। সম্ভবত সুভাষচন্দ্রও লোক-মারফত কবিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সব জানিয়েছিলেন। কবি বুঝলেন, একমাত্র গান্ধীজীই এই অচলাবস্থার সমাধান করতে পারেন। কিন্তু এ ব্যাপারে চিঠিপত্র বা তার-বিনিময়ে কিছু ফল হবে না; একমাত্র গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনাতেই তা সম্ভব। সুভাষচন্দ্র অবশ্য সাক্ষাত আলোচনার জন্য গান্ধীজীকে ধানবাদে আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ৭ই এপ্রিল রাতে রাজকোট চলে যান। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ১৮ই এপ্রিল প্রাতে তিনি কলকাতা থেকে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে যুগপৎ তারবার্তা পাঠিয়ে অবিলম্বে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ-আলোচনার অনুরোধ জানালেন। রাজকোটে গান্ধীজীকে তার করলেন—

"I earnestly appeal to you to arrange meeting immediately with Subhas and save the situation from tragic disaster."

অনুরূপ মর্মে সুভাষচন্দ্রকে জামাডোবায় তার করলেন :

"I earnestly appeal to you to arrange meeting with Mahatmaji and save the situation from tragic disaster."

উল্লেখযোগ্য, অনুরূপ মর্মে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে তার করলেন। ওইদিনই রাত্রে কবি পুরী যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে ইউনাইটেড প্রেসের এক প্রতিনিধি ওই সমস্যা-সংকটের সমাধান সম্পর্কে কবির অভিমত জানতে চান। কবি তার উত্তরে এক বিবৃতিতে বলেন,

"বৃথা পরস্পরের দোষারোপে মূল্যবান সময় নষ্ট হইয়াছে; আমাদিগকে অবিলম্বে পূর্ণ আনুগত্যের সহিত একমাত্র মহাত্মাজীর নেতৃত্বাধীনে আমাদের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া দূরদর্শিতার সহিত বর্তমান বিরাট সুযোগের ব্যবহার করিতে হইবে।"

গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে তার করার কথা উল্লেখ করে কবি পরিশেষে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করবার আবেদন জানিয়ে বলেন,

"বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ ব্যক্তিগত কিংবা রাজনৈতিক হউক বা না-হউক এবং উহা হইতে উদ্ভূত মনোমালিন্য পরিহার্য কিংবা অপরিহার্য হউক বা না-হউক, কোন পক্ষ হইতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বা বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ দ্বারা ইহা দূরীভূত হইতে পারে না, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। একমাত্র আমাদের নৈতিক জ্ঞানের নিকট আবেদন আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে যে, যখন আমরা অগ্রসর হইতেছি এবং প্রায় প্রত্যেক উপকরণের অভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছি তখন জাতীয় ঐক্যের স্থায়ী আবশ্যকতার সম্বন্ধে এই মারাত্মক অনবধানতা সমর্থিত হইতে পারে এরূপ বহু ঘটনা যদি ঘটিতে পারে, তথাপি আমাদের পক্ষে আমাদের ব্যূহ অক্ষুণ্ণ রাখার শক্তি অপেক্ষা মূল্যবান কিছু নাই এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ অপেক্ষা বিপজ্জনক কিছু নাই। বাংলার তথা সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের নিকট আমার আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরে সামান্য সামান্য ব্যাপারে ক্ষমা করেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—১৯শে এপ্রিল ১৯৩৯]

কিন্তু গান্ধীজী রাজকোট ছেড়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতে পারেন নি। গান্ধীজীর কাছে রাজকোট সমস্যাটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বলে মনে হয়। গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সুভাষচন্দ্র আপোসের যতগুলি প্রস্তাব করেছিলেন গান্ধীজী তা গ্রহণ বা অনুমোদন করতে পারেন নি। তিনি আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবার পরামর্শ দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে পুরোনো সদস্যদের বাদ দিয়েই—সম্পূর্ণভাবে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র পন্থ-প্রস্তাব-এর উল্লেখ করে সম্মিলিতভাবে কাজ করবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। শেষে স্থির হয়, কলকাতায় আসন্ন এ-আই-সি-সি'র বৈঠকের সময় গান্ধীজী কলকাতায় এসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আরও আলাপ-আলোচনা করবেন।

২১শে এপ্রিল সন্ধ্যায় সুভাষচন্দ্র কলকাতায় এলেন। এর প্রায় হপ্তাখানেক পরে ২৭শে এপ্রিল গান্ধীজী কলকাতায় এলেন। অন্যান্য কংগ্রেস নেতারাও এলেন। গান্ধীজী সোদপুরে আশ্রমে উঠেছিলেন। ওইদিনই ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সমস্যা নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নিভৃতে তাঁর প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু আপোস-মীমাংসার কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না। পরদিন কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির ঐতিহাসিক অধিবেশন শুরু হয়। সুভাষ আপোস-মীমাংসার শেষ চেষ্টা করে দক্ষিণপন্থী নেতাদের কাছে প্রস্তাব করেন যে, যদি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের সভ্যদের নিয়ে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে তাঁরা সম্মত না-হন, তবে অন্তত ৪ জন নতুন বামপন্থী প্রতিনিধিকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হোক। কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতারা তাতে রাজী হন না। তাঁরা পুরোনো সভ্যদের নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্য কঠিন জিদ ধরে রইলেন। পরদিন ২৯শে এপ্রিল নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন শুরু হলে সুভাষচন্দ্র তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় এবং তার জায়গায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হন।

কলকাতায় সেদিন কী ভয়ংকর উত্তেজনা! বাইরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের চার পাশে অপেক্ষমান বিপুল জনতা ক্রোধে ও উত্তেজনায় চিৎকার ও গর্জন করে বিক্ষোভ জানাতে থাকে। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় নেতাদের একে একে উত্তেজিত জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে তাঁদের মোটরে উঠিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন পুরীতে। গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে তিনি কলকাতায় এ আই সি সি অধিবেশনের পরিণতি লক্ষ্য করছিলেন। সংবাদপত্রযোগে কবি সব খবরই পেলেন। সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের বিবৃতি পাঠ করে কবি খুবই বিচলিত হয়ে উঠলেন। কংগ্রেসের বিভেদপন্থীদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে তিনি ঐক্যের জন্য যে কঠিন ধৈর্য ও সংযত প্রচেষ্টা করেছিলেন তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এক তারবার্তা পাঠান। সেটি ছিল এই :

"অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতাবোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে; তাহা হইলেই আপাতদৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই চিরন্তন জয়ে পরিণত হইবে।"

ইতিমধ্যে কলকাতায় প্রগতিশীল ও বামপন্থীরা এক ঘরোয়া বৈঠকে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। ৩রা মে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল জনসভায় সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সভায় সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনের কথা ঘোষণা করে বলেন যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের সংহত এবং সম্মিলিত করাই হবে এই ব্লকের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসের

বিরুদ্ধে হিসেবে নয়, পরন্তু কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে এই ব্লক কাজ করবে এবং কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র, মূলনীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করবে। তাছাড়া গান্ধীর প্রতি যতদূর সম্ভব শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে তাঁর অহিংস অসহযোগ নীতিতে পূর্ণ আস্থা রাখবে। পরিশেষে তিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অধিবেশনে বিক্ষোভ প্রকাশের নিন্দা করে বাংলা দেশকে কঠিন সংযম ও শৃঙ্খলার সংগে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানান। তিনি রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত পত্র পাঠ করে বলেন,

"আমার মত এই যে বিক্ষোভ প্রকাশ না পাইলেই ভাল হইত। কারণ তাহা সংযমের অভাবই সূচনা করিয়াছে। সংযম হারাইয়া কোন বড় কাজ কখনও করা যায় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে বাণী পাঠাইয়াছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কারণ বড় কিছু করিতে হইলে আমাদিগকে আত্মস্থ হইবে হইবে; সংযমী হইতে হইবে। সংযম হারাইলে শক্তিক্ষয় হয়।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৪ঠা মে ১৯৩৯]

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মধ্যে এই তীব্র বিরোধ ও ভাঙনের আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের কয়েকদিন পরই কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অবিলম্বে কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানিয়ে নিম্নলিখিত মর্মে এক বাণী পাঠান :

"কংগ্রেসের মধ্যে ভেদসৃষ্টিকারী মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সংকট সময়ে একজন স্থির মস্তিষ্ক, নিরপেক্ষ ও সহানুভূতিশীল সভাপতির বড়ই আবশ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে সুভাষের পদত্যাগ অপরিহার্য হইয়াছে।

"আমার স্থির বিশ্বাস, কঠোর ও অবিবেচনাপ্রসূত কার্যের ফলে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে, আপনার ব্যক্তিত্বে এইভাব দূরীভূত হইবে।" [আনন্দবাজার পত্রিকা—৬ই মে ১৯৩৯]

"কঠোর ও অবিবেচনাপ্রসূত কার্যের ফলে"...এই কথাগুলির মধ্যে কবির যে তাঁর মনোভাব ও তিরস্কারের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, এটা লক্ষ করবার মত।

সুভাষচন্দ্র যে শেষ পর্যন্তও অসীম ধৈর্য সহকারে আপোস ও সম্মিলিত নেতৃত্ব গঠনের

চেষ্টা করেছিলেন তাতে আর কবির সন্দেহ ছিল না। কলকাতায় এ আই সি সি সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র শেষবারের মত আপোস ও সম্মিলিত নেতৃত্বের আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন,

"কিন্তু বর্তমানের ন্যায় জরুরী অবস্থায় কি করা যাইতে পারে? আপনারা জানেন যে, গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় দেশে—যেখানে নির্দিষ্ট মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল বিদ্যমান সেখানে সমরাশংকা কিংবা জাতীয় সংকট সমস্ত রাজনৈতিক বাধা বিঘ্ন সমতল করিয়া দিয়া বিভিন্ন মতসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মিলিত করিয়া দেয়। বিভিন্ন মতসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংমিশ্রণে এরূপ কমিটি গঠিত হয়, যাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে ঘোর শত্রু বলিয়া মনে করে। ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্ত্য দেশে জাতীয় সংহতিমূলক মন্ত্রিসভা গঠন একটা সাধারণ জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"আমাদের স্বদেশ হিতৈষণা কি ব্রিটিশ কিংবা ফরাসীদের চেয়ে কম যে তাহারা যাহা পারে আমরা তাহা করিতে পারি না?"...

রবীন্দ্রনাথ মোটামুটিভাবে সুভাষচন্দ্রের এই নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। পূর্বেই বলেছি, দক্ষিণপন্থী নেতাদের অন্যায় জিদ ও আপোস-বিরোধী মনোভাবের জন্য কবি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। অপরদিকে বাংলা দেশের উন্মত্ত বিক্ষোভ আন্দোলনকেও তিনি সমর্থন করতে পারছিলেন না। পুরী থেকে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক খোলা চিঠিতে কবি তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করে লিখলেন (২৪শে বৈশাখ ১৩৪৬—৮ই মে—১৯৩৯),

"রাষ্ট্রে সম্পদ যাদের অনেককালের সাধনার জিনিস এবং যাদের কাছে পরম মূল্যবান তারা দলগত পরস্পর তীব্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এর সম্মান বিস্মৃত হয় না। প্রয়োজন বোধ করলে তার আঘাত লাগায় বাইরের দিকে গোড়ার দিকে নয়। আজকের দিনে চেম্বারলেনি সংকটে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চেম্বারলেন গায়ে পড়ে ছাতা হাতে ফ্যাসিস্ট ব্যাঘ্রের মধ্যে মাথা হেঁট করে ঢুকে পড়লেন, যুদ্ধবিভীষিকায় আতঙ্কিত য়ুরোপে আশু শান্তির আশ্বাস সগর্বে ঘোষণা করে দিলেন, পরক্ষণেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মাভৈঃ বাণীতে আশ্বস্ত চেকোশ্লোভাকিয়াকে নাৎসি নখদন্তে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে দেখেও অনায়াসে লজ্জা সম্বরণ করলেন। তবু তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে যে ইংলণ্ড পূর্বে ও পশ্চিমে অপমানিত, সে তো তাঁকেও তাঁর দলবলকে সমূলে উৎখাত করবার চেষ্টায় ক্ষেপে ওঠে নি। আত্মসম্বরণ করে সকল মতের সকল দলের লোক আজ আশু বিপত্তির সদ্য প্রতিকারের চেষ্টায় সংহত করচে দেশের সমস্ত শক্তি। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রিক দায়িত্ব সাধনের শিক্ষায় যাদের চরিত্র বলিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি, তারা এই ক্ষুব্ধ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি তীব্র স্বরে দোষারোপ করে কলহ করতে করতে দেশের কর্তব্যবুদ্ধিকে ভেঙেচুরে বিক্ষিপ্ত করে দিত। ওরা কাজকে সফল করবার জন্যে ভুলতে জানে রফা নিষ্পত্তি করতে পারে, তর্কবিতর্ক থামিয়ে দিয়ে কোমর বাঁধতে এক মুহূর্তে প্রস্তুত হয়। আজ আমরা স্বরাজ্যের আংশিক অধিকার পেয়েছি, এই অধিকারকে ক্রমশ প্রশস্ত করে পরিপূর্ণতায় হয়তো নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না। কিন্তু সে জন্যে আবশ্যক সৃষ্টি করবার শক্তি চালনা, যে-শক্তিতে আছে ধৈর্য, আছে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য এবং অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য বিষয়ের সম্মান রক্ষার প্রতি গভীর দরদ। মূল্যবান সম্পদকে সৃষ্টি করে তোলবার একান্ত উদ্যমে যারা অভ্যস্ত নয় দেশের দুর্ভাগ্যের সেই সকল তাড়া-পড়োরা গোড়া থেকেই ছোটো বড়ো সকল বিষয়েই আপন শক্তি প্রকাশ করে ভেঙে ফেলবার আস্ফালনে।"

উপসংহারে কবি বাংলা দেশের অস্থির উন্মাদনা ও বিক্ষোভ প্রবণতার সমালোচনা করে বললেন,

..."বিভ্রান্ত হয়ে চেঁচামেচি করি কেন, হিস্টীরিয়ার হাত-পা খেঁচুনি লাগে কেন কথায় কথায়? শেষ পর্যন্ত একটু যেন হাসবার শক্তিও রাখতে পারি। বাংলা দেশের মনে অল্প একটুতেই ধুলো-ওড়ানো আঁধি লাগে—ঊনপঞ্চাশ পবনের মধ্যে সেইটেই সবচেয়ে দুর্বল হাওয়ার ছেলেমানষি। দেখতে সে পালোয়ান। কিন্তু যারা সৃষ্টিকার্যের পক্ষে তারা এর হঠাৎ হাঁসফাঁসানিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অব্যবস্থিতচিত্তদের কে মনে করিয়ে রাখতে পারবে যে, মহৎ কাজে চাই তপস্যার চিত্তবৃত্তি—শান্তো দান্ত উপরত তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা।"

[প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ ॥ পৃ ২৯৮—৩০০]

৯ই মে (২৫শে বৈশাখ) পুরীতে মহাসমারোহে কবির ঊনাশীতম জন্মদিবস উদ্যাপিত হয়। ১১ই মে প্রাতে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন। ওইদিনই অপরাহ্ণে সুভাষচন্দ্র কবির সঙ্গে নিভৃতে প্রায় একঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। সম্ভবত কবি সব কথা শুনে তাঁকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের কোনও বিবরণই আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

১২ই মে কবি কালিম্পং যাত্রা করেন।*

* বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে চিঠিপত্রগুলি 'রবীন্দ্র সদন'-এর তথ্য-ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। "নবজীবন ট্রাস্ট" গান্ধীজীর চিঠিপত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। "আনন্দবাজার পত্রিকা" কর্তৃপক্ষ পুরানো ফাইলগুলি দেখবার অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন।

—লেখক

"Bread for myself is a material question; bread for my neighbour is a spiritual question!"

সু-

চিঠি লেখবার সময় পেলেও চিঠি লেখবার মত নিভৃত কোন জায়গা এখনো যোগাড় করে উঠতে পারিনি; তাই বোধ হয় কিছুটা দেরি হয়ে গেল। আজ খুঁজে খুঁজে একটা পোড়ো স্কুল বাড়িতে খানিকটা সময় কাটানোর সুবিধে পেয়েছি। অনুপস্থিত ছাত্রদের একটি নড়বড়ে বেঞ্চিতে বসে চিঠি লিখতে পারছি। কত কথা লিখতে চাইছি, কিন্তু কি লিখবো ঠিক যেন ভেবে উঠতে পারছি না! এখন দুপুর, খুব গরম, স্কুলবাড়ির ছায়াটা উত্তপ্ত, বাইরে ধূধূ মাঠে ধুলো উড়ছে; হাত-তেপান্তরে নিস্তব্ধতা ঝম্ ঝম্ করছে। রাত্রে আমাকে যদি এই পোড়ো স্কুলবাড়িতে থাকতে হয় নিশ্চয়ই আমার ভয় করবে। কিছু শুনিনি অবশ্য, তবু আমার কেমন বিশ্বাস ভূতেদের পক্ষে এমন উপযুক্ত আস্তানা আর একটিও ধারে-কাছে নেই। ক'দিন এখানে থেকে দেখেছি, যত রাত গভীর হয়, আকাশ-মাটি অনেকটা জুড়ে নিঃশব্দ একটা বিভীষিকা যেন নেমে আসে, জানালার বাইরে বিনিদ্র চোখ দুটো সজাগ থাকলে বোঝা যায়, একটা শব্দহীন আর্ত কোলাহল যেন আশেপাশে শুষ্ক, রুক্ষ মাটিতে মাথা কুটে কুটে সারা হয়ে যাচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে যেন একটা হা-হাকারের পর্দা উদ্বন্ধনের রজ্জুর মত ঝুলে আছে! মনে হয় যেন সর্বদা একটা অন্তহীন আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন, আবৃত হয়ে আছি।

না শুনলেও চোখে দেখে বুঝতে পেরেছি, এখান থেকে মানুষজন, পশু-পাখি (গৃহপালিত) সব স্থানান্তরে চলে গেছে, গ্রাম বলতে, জনপদ বলতে যা চোখে পড়ছে তা কেবল খোলস! অনেকদিন আগে শুনেছি (আমার জন্মের আগে) কলকাতা-বাড়ির ভাড়াটেরা উঠে গেলে নাকি এমনি দৃশ্য হতো। আমরা অবশ্য তা দেখিনি। জীর্ণ মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, ভাঙা বেড়া, শুকনো পাতকো, ধুলো-ভর্তি সংকীর্ণ পথ মাড়িয়ে, নিজের পায়ের শব্দ নিজে শুনতে শুনতে অবশেষে এই স্কুলবাড়িতে এসে উঠেছি। রোদ কমলে, বেলা পড়লে আবার কোথায় গিয়ে উঠবো জানি না। এখানে একলা একলা রাত কাটাবো না, বলেছি সে সাহস আমার নেই। মনে হচ্ছে, আমি এমনভাবে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি যাতে একটা গভীর শূন্যতা বোধ উপলব্ধি করতে পারছি, আর আশ্চর্য নিজের প্রতি সমস্ত মমতা যেন হারিয়ে ফেলেছি।

তোমাকে চিঠি লেখবার আগে আমকাঠের দুটো নড়বড়ে বেঞ্চি এক করে জোড়া দিয়ে শোবার চেষ্টা করেছি। খুব ক্লান্ত বোধ করেছি, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি রাত থাকতে। যেখান থেকে এসেছি সেখানে 'সেবার-কাজ' এখন জোরদার হয়েছে, অনেক সেবাদল এসে গেছেন—ত্রাণকার্যে ইউনিসেফের কেয়ারের তৎপরতাও দেখে এসেছি। আমার আর করবার কিছু নেই। পরশু থেকে লক্ষ-লোকের প্রাত্যহিক আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। চাল, ডাল, গম, আটা, দুধ-চিনি, ভিটামিন বড়ি এখন গাড়ি গাড়ি এসে পৌঁছচ্ছে, ওষুধপত্র, জামাকাপড়ও বাক্সবন্দী হয়ে অনেক আসছে। সরকারী-বেসরকারী 'রিলিফ মেজার' জোর হয়েছে!

ভেবেছিলুম বেঞ্চিতে পিঠ দিলেই ঘুমটা সহজেই আসবে। ক্লান্তি অপনোদন হবে। চোখ বুজলেও এক তিলতে ঘুমও আশেপাশে এল না। চোখ বন্ধ করলে অস্বস্তিটা আরো যেন বেড়ে গেল। রিলিফ কাজের হট্টগোলের ছবিটা চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল: একটা বিরাট আমবাগানের মধ্যে সেবা-কর্মীদের ক্যাম্প পড়েছে, অদূরে রন্ধনশালায় যজ্ঞকুণ্ড জ্বলছে, ইন্ধন হিসাবে কালো কয়লার একটা ছোটখাটো পাহাড় যেন গজিয়ে উঠেছে—সেই পাহাড়ের গা-বেয়ে আশপাশে পিঁপড়ের সারের মত অগণিত ক্ষুধার্ত মানুষ মুখর আর চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত আর উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। পঙ্গপাল আক্রমণের মত চুরাশি বিঘা আমবাগানটা ছেয়ে গেছে! দুর্ভিক্ষের ছবি কি, দেশে দুর্ভিক্ষ বলতে কি বোঝায় জানি না, কিন্তু এখানে আসা থেকে মনে হচ্ছে, দুর্ভিক্ষের চিত্র মানুষই তৈরি করেছে! এ ছবি দেখান হচ্ছে দেশ-বিদেশের মানুষের স্বার্থ এবং সুখবৃদ্ধির জন্যে। আমার কিন্তু ঘুম চলে গেছে, ক'দিন ধরে চোখে এক-ফোঁটা ঘুম নেই! বোধ হয় ইনসমনিয়া হলো, আর-একটা রোগ বাড়ল!

স্কুল বাড়িটার কোন খিদে-তেষ্টা নেই বলেই বোধ হয় এখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—ছাত্র নেই, শিক্ষক নেই, এমন কি ম্যানেজিং কমিটির কেউ-ই নেই, সুতরাং ওটা এক জায়গায় থাকারও কোন মানে নেই। যে দেশে মানুষের পেটের ভাত ঠিকমত পাওয়া যায় না সে দেশের শিক্ষার নামে স্কুল করার কোন মানে নেই। বিলাসিতা! ভাবছি, দুর্ভিক্ষ মিটে গেলে এ বাড়িতে সাধারণ মানুষের হিতকর আর কি কাজের আয়োজন হতে পারে!

যেখান থেকে কাজ করে রাত থাকতে বেরিয়ে পড়েছি সেখানে বেসরকারী এক সেবা-দলের কর্মীর সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম দুঃখহরণ শর্মা

ওই দেশীয়, বয়স আমার দ্বিগুণ, কিন্তু উৎসাহ কার্যক্ষমতা আমার চারগুণ, দেখলে মনেই হবে না বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। শুনেছি স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ভদ্রলোক কংগ্রেসের দলভুক্ত ছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতার পর দলটিকে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন কেবল 'সোস্যাল ওয়ার্ক' করেন। মানে?

দুঃখহরণই বলেছিলেন, এই যেমন আজ করছি—দুঃখীর সেবা! কিন্তু এতে চিরকাল থাকবে না?

দুঃখহরণ উত্তর না দিয়ে হেসেছিলেন। মানে তাঁর ধারণা ভারতবর্ষে এ ধরনের সেবার কাজ চিরকালই থাকবে। থাকতেই হবে। না হলে ভারতবর্ষ বলতে বিদেশীরা বুঝবেন না।

কেন? সে কথাও দুঃখহরণ বলেছিলেন, দেশের নামটা এক হয়েছে, কিন্তু দেশের লোক সব এক হয়নি। আমার ঘরে যদি কোনদিন হাঁড়ি না-চড়ে অপরের ঘরে তেমনি হাঁড়ি না চড়লে আমাদের বাড়ন্তের দুঃখটা কি সবার এক মনে হয়?

তারপর কথাটা দুঃখহরণ বোঝাবার জন্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষ তো দেখেছিলেন, কত লোক খিদের জ্বালায় রাস্তাঘাটে পড়ে মরে গেল! তাতে কার কি হলো? তখন যুদ্ধ চলছে, সরকার তো বলেই দিলে, ভাগ্য ভাল যে এতগুলো লোক গুলি-গোলায় মরেনি! আমরাও দেখিনি!

নিজেকে সে অভিজ্ঞতার পাপ থেকে যেন মুক্ত করতে বলেছিলুম, আমি তখন জন্মাই নি!

দুঃখহরণ আমার দিকে চেয়ে কেমন যেন মুখ করলেন। হয়তো ছেলেমানুষ ভেবে সৌহার্দ্য হলেন।

সেইদিন আমি আমার বয়েসের হিসেব করেছিলুম। শুনেছিলুম, যে বছর বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ হয় সেই বছর আমি মায়ের পেটে এসেছিলুম। মা এই সেদিনও বলতেন, খোকা তখন পেটে, সারা দুপুর বাড়িতে একলা, ঘুম হয় না, পেট নিয়ে হাঁস-ফাঁস করি, নতুন বাসা ভয়ে মরি। এদিকে—

আমি যখন খুব ছোট তখন মা আত্মীয়-স্বজনের সংগে গল্পচ্ছলে আমার জন্মের 'অকালটা' এমনিভাবে বর্ণনা করতেন—বড় খারাপ সময়ে আমি তাঁর পেটে এসেছিলুম! মা বলতেন, কেবল ফেন দাও, ফেন দাও বলে সে কি করুণ চিৎকার শহরময়!

মা আরো বলতেন, কিন্তু ভাই, আমার ঘরে একদিনও চালের অভাব হয়নি, আমার খাটের তলায় দু' মণ চালের বস্তা সমানে বসানো ছিল। উনি আপিস থেকে এক এক র‍্যাশন আনতেন, কত লোককে যে যেচে যেচে দিয়েছি তার হিসেব নেই!

আমরা খুব অবস্থাপন্ন নই, তুমি তো জান, কিন্তু তবু এতগুলো বিপর্যয়ে আমাদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি—দুর্ভিক্ষে মরিনি, দাংগায় কাটা পড়িনি, দেশ-ভাগেও উচ্ছেদ হইনি। দিব্যি বেঁচে আছি, সুস্থ, সবল শরীর নিয়ে চলা-ফেরা করছি। ভাগ্যবান!

দুঃখহরণ বলেছিলেন, এ-সব ব্যাপারে চিরকালই যারা মরবার তারা মরে।

তা হলে আপনি এদের সেবা করতে ছুটে এসেছেন কেন? জানেন যখন—

বদনামের ভয়ে! দুঃখহরণ হেসে বলেছিলেন।

কার বদনাম, কিসের বদনাম, সে কথা দুঃখহরণকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।

কথাটা তখন থেকে ভেবেছি যারা মরবার তারা মানে কি! যারা এই কারা? মানুষ অনেক কারণে মরে, তার মধ্যে অনাহারে মৃত্যু নাকি বড় লজ্জাজনক! কিন্তু লজ্জাটা কার? যে মরে তার, না যে দেশের লোক হয়ে সে মরে সেই দেশের?

দুঃখহরণ বাবুর কথার তাৎপর্য ওর মধ্যেই আছে—বদনাম! এককালে দুঃখহরণরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছেন, এখন দেশের দুর্ভিক্ষ দূর করবার জন্যে চেষ্টা করছেন! সভ্য দেশের নাগরিকের অনাহারে মৃত্যু কলংকের!

এই নিয়ে কিন্তু খুব হই-চই হচ্ছে। কাগজে তোমরা দেখেছ, এখানে নানা জায়গা থেকে নানা লোকে বলছে—ইতিমধ্যে অনাহারে মৃত্যু বহু ঘটে গেছে—সরকারকে, পার্টিকে দোষারোপ করা হচ্ছে। এখন মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে মারামারি! বড় বড় লীডারেরা সরেজমিনে তদন্ত করতে আসছেন। আমি এখানে আসবার দু' দিন পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন, সরকারী ত্রাণকার্য উদ্বোধন করে গেছেন। সে ছবি তোমরা হয়তো এখন কলকাতা শহরের বায়স্কোপে দেখছ! কি ছবি বল দিকি? লংগরখানার তৈরি খাদ্য প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং চোখে দেখছেন! ছবি দেখে তোমাদের চোখে নিশ্চয়ই জল

তিনি এমনি নোংরা ঘেঁটে মানুষকে কদর্য অন্ন সংগ্রহ করতে দেখেছেন! তাঁর বিশ্বাস হয়েছে, উপহার হিসেবে মুফত ভারত এ যাবৎ যত খাদ্য পেয়েছে তা সবটুকু সদ্ব্যবহার করেনি! ভারতে খাদ্যের অভাবটা তাঁর কেমন গোলমেলে মনে হয়েছে—তিনি দেশের ঘরে (পার্টি ইত্যাদি) এবং বাইরে (ডাস্টবিন, নর্দমা ইত্যাদি) খাদ্য-ব্যবহারের বিভিন্নতা লক্ষ করে বলেছিলেন: So many millions of your people go to bed with empty stomachs while so many thousands of ships come to your main ports with rice, wheat and other edibles from the U.S.A.! What happens to all these? ....If your hungry people were given an honest share of these it would, I am sure, put a stop to so much begging and search for food in dustbins!

আমি কিন্তু ছাড়িনি, সে চিঠির কড়া একটা প্রতিবাদ লিখে সঙ্গে সঙ্গে কাগজে পাঠিয়েছিলুম—মনে পড়ছে, বোধ হয় লিখেছিলাম, খাদ্য নিয়ে অত মাতব্বরি করবার তাঁর কোন দরকার নেই, কেননা এমন কিছু খাদ্যদান বা উপহার তাঁরা ভারতের জনগণের দুঃখদুর্দশা দূর করবার জন্যে দেন না! খুব রাগ হয়েছিল ভদ্রলোকের কথার সুরে দাতার আত্মম্ভরিতা লক্ষ করে। শুনিয়েও দিয়েছিলুম আচ্ছা করে—ভিক্ষে দিয়ে দারিদ্র্য কারো ঘোচানো যায় না!

তখন রাগ করাটা বোধ হয় সংগত হয়নি। সবার কাছ থেকে এত পেয়ে-পেয়েও আমরা আজও খাদ্য-ব্যাপারে ভিখিরিরও অধম! আজও আমরা অনগ্রসর জাতির তালিকাভুক্ত!

দুঃখহরণ শর্মা বলেছিলেন, ইংরেজ আমাদের পেট ভরে খেতে দেয়নি, খাওয়া-পরা নিয়ে আমরা অনেক আন্দোলন করেছি, অনেক গালাগাল দিয়েছি। সব দুঃখের মূল পরাধীনতা ভেবেছি! আজ? আজ বলছি খরা, ওঠাউঠি দু' বছর বৃষ্টি হয়নি, সুতরাং খাদ্য হয়নি, অতএব দুর্ভিক্ষ হয়েছে! যেন বিহার বা বাংলা বা উত্তরপ্রদেশ ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিহারের দুর্দশা ভারতের দুর্দশা নয়।

দুর্ভিক্ষ এলাকায় আমরা পৌঁছবার আগেই নানা দেশ থেকে নানা ধরনের লোক এসে গেছে। ভারতবর্ষীয় মানুষের দুর্গতির ইতিহাস নানাভাবে লেখা হচ্ছে, পৃথিবীর নানা জায়গায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ছে! মহামান্য পোপ পল থেকে আরম্ভ করে বিলেতের একজন শিশুও আমাদের দুর্দশার জন্যে সহানুভূতি জানাচ্ছে—নেদারল্যান্ডের ছেলেরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে খাদ্য-ফাণ্ডে পাঠাচ্ছে।

...আমার আর করবার কিছু নেই। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বললেন, বিহারের দুর্ভিক্ষ এখন ওয়ার্ক-কেস হিসাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে। অবস্থা আয়ত্তে এসেছে।

দুর্ভিক্ষ! দুর্ভিক্ষ! দুর্ভিক্ষ! বাবা বলতেন বাংলাদেশেও আমার জন্মের আগে ভয়ানক এক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, কত লোক না-খেতে-পেয়ে মারা গিয়েছিল, দশ-বিশ লক্ষ নাকি! কিন্তু তিনি বলতেন, প্রকৃত খাদ্যের অভাব দেশে হয়নি—পঞ্চাশ-ষাট টাকা দিলে দিব্যি মন-মন চাল পাওয়া যেত—ইস্পাহানী কোম্পানী অনেক খাদ্যশস্য মজুত করে রেখেছিল।

তা হলে আর দুর্ভিক্ষ কি! ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তো নয়! আমি বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা পড়েছি! এই তো পরশু যেখানে ছিলাম সেখানে এক দিকে লোককে খিচুড়ি খাওয়ানো হচ্ছে, আর এক দিকে দু-তিন মাইলের মধ্যে বাজারে তিন টাকা-চার টাকা কিলো দরে চাল বিক্রি হচ্ছে। লোকে বলছে 'ব্ল্যাক'! হোক। চাল-ধান দেশে একেবারে নেই কে বলবে! তা হলে?

সবাই বলছে নানা সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে চাল-ধানের ব্যবসা ঠিক চলছে। এতবড় দেশের দু'-এক জায়গায় এক বছর, কি দু' বছর চাষ

না হলে কি হয়? কিছু না। চাল-ধান অনেকের ঘরে স্টক করা আছে!

কিন্তু যা হয়, চোখে দেখছি, আর ভাবছি, কি করে চিরকালের জন্যে এ-দশা থেকে রেহাই পাওয়া যায়? খাদ্য-বণ্টনের সুষম ব্যবস্থাটা কি?

আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। আমরা অনেকগুলো ভাই-বোন ছিলুম। দুবেলা যা খেতে পেতুম, তাতে পেট ভরতো না; আরো খাবার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াতুম। আমার আত্মীয়স্বজনরা আমাকে হ্যাংলা বলতো, কিন্তু অকারণেই আপ্যায়িত করতো। আমার এক বড়লোক আত্মীয় ছিলেন, ছোটবেলায় কারণে-অকারণে তাঁদের বাড়ি যেতুম, আর তাঁদের উচ্ছিষ্টের অনেক প্রসাদ লাভ হতো! আমি ভাবতুম, তাঁরা আমাকে ভালবাসেন, তাই খেতে দেন আদর করে। অনেক বড় হয়ে কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁরা আমাকে ভালবাসেন না, করুণা করেন।

অনাহারক্লিষ্ট পঙক্তি-ভোজনে-বসা নাম-গোত্রহীন লোকগুলোকে দেখে আমার ছেলেবেলার কথা মনে হয়েছিল। খিদের জ্বালায় ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে, বড়লোক আত্মীয়রা খাওয়াচ্ছেন!...

যাঁরা দল বেঁধে যা কোন সংস্থার প্রতিনিধি হয়ে দুর্ভিক্ষ এলাকায় রিলিফের কাজ করতে এসেছেন তাঁদের অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, আমি একলা একলা এখানে কি করতে এসেছি? রিলিফের উপকরণই বা আমার সঙ্গে কি আছে? আমি কি দিয়ে এই সব অগণিত মানুষের অনাহার নিবারণ করবো? প্রশ্নটা নিশ্চয়ই সঙ্গত। কিন্তু শুনে আমি মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি। কেন, একলা-একলা বিনা উপকরণে কি দুঃখীর দুঃখ দূর করা যায় না?

ওঁদের ধারণা বোধ হয় আমি এখানে মজা দেখতে এসেছি। হায়, আমার একান্ত ভালো করার ইচ্ছেটা ওদের দেখাতে পারলাম না! ওরা মনে করলো, দুর্ভিক্ষ নিয়ে আমি সংবাদ রচনা করে কিছু উপার্জন করবো। আমি এখানে এসে একজন বড়লোকের সঙ্গে দেখা করে নিজের ইচ্ছেটার কথা বলেছিলুম। তিনি বেশ ধৈর্য সহকারে আমার কথা শুনে বললেন, আপনার উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু শুধু হাতে একা আপনি কি করবেন! দেখতে পারেন চেষ্টা করে। আমি তারপর নিজে অনেক চেষ্টা করেছি, যাঁরা এখনো দুবেলা খেতে পান বা খান, তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে আশ-পাশের দুর্দশার চিত্রটা তুলে ধরেছি। বলেছি, আপনার সাধ্যমত সাহায্য করুন। কেউ কেউ করেছেন, কেউ কেউ তেড়ে উঠে বলেছেন, গবর্নমেণ্টের কাছে যান! খাওয়াবার মালিক আমরা নাকি?

খুব করে চিত্র সকরুণ করতে কেউ আবার বলেছেন, নতুন কিছু নয়, ওরা চিরকালই খেতে পায় না, আমরা জন্ম থেকে দেখে আসছি! আপনি কত খাওয়াবেন?

আমাকে তো দুদিন হাজত-বাস করতে হয়েছিল, কিনা আমার 'মুভমেণ্ট' এখানকার পুলিসের বিশেষ সন্দেহজনক মনে হয়েছিল, যাদের জ্বালা তারা জানে না, তুমি সেই জ্বালা জানিয়ে দেবার কে হে? তা ছাড়া তুমি এখনকার কেউ নও, কোথা থেকে এসেছো তার ঠিক কি।

যারা এখানে দুবেলা খেতে-পরতে পায়, তাদের কাছে সন্দেহজনক অবাঞ্ছিত হলেও কারো কারো হয়তো উপকারে আসতে পেরেছি—ক্ষুধাতুর অনেক লোকের মধ্যে গিয়ে সাধ্যমত কাজ করেছি। কৃতজ্ঞতা আমি চাইনি, কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে মনে এই প্রশ্ন জেগেছে, চিরকাল সকল বিপর্যয়ে এমন হয় কেন—অগণিত লোক এমন দুঃখ পায় কেন?

সে দুদিন পাটনায় ছিলুম, সেখানকার হাল-চাল দেখেছিলাম; দু একজন হোমরা-চোমরা সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে দেশের 'খাদ্য-পরিস্থিতি' নিয়ে আলোচনা করেছিলুম। তাঁরা সবাই অবস্থা গুরুতর বলেছিলেন, সরকার ব্যবস্থা অবলম্বনের চিন্তা করছেন বলেছিলেন। পাটনা শহরে খাদ্যের কোন অভাব বা দুর্ভিক্ষের কোন ছায়া দেখিনি। পাটনা শহর ত্যাগের দিন সন্ধ্যে বেলায় রাজভবনের পাশ দিয়ে আসতে গিয়ে যে চিত্র দেখেছি, তাতে একদিন আশ পাশ ঘুরে ঘুরে যা দেখলুম, কোন মিল নেই, বোধ হয় সেদিন রাজভবনে বিদেশী কোন সম্মানীয় অতিথি এসে থাকবেন—ঘরে ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছিল, প্রচুর খানা-পিনার আয়োজন হয়েছিল, গেটে এত গাড়ি জমেছিল নড়বার উপায় ছিল না! মুহূর্তের জন্যে আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, ক্ষুধার জ্বালা কি! আশ্চর্য প্রতারণা নির্ভেজাল সঙ্গে!

এখন বোধ হয় কলকাতায় দুর্ভিক্ষের জন্যে চাঁদা তোলবার তাড়া পড়ে গেছে? চিত্রতারকারা বিনা মেক-আপ-এ পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়েছেন? লেখক শিল্পীরাও বোধ হয় আছেন? খুব ভাল, খুব
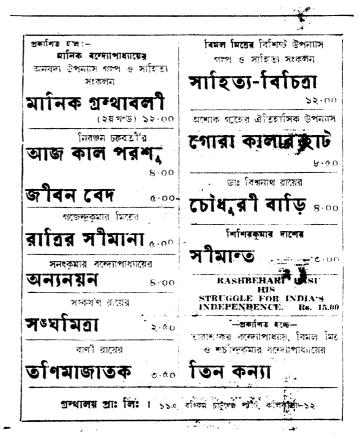
মানবিক, প্রশংসনীয় কাজ! কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার কিছুতে মন থেকে যায় না, এ ক'রে প্রকৃত কি উপকার হয়? এ কি ঠিক সেই জিনিস নয়, কন্যাদায়গ্রস্ত কোন ভদ্রলোকের জন্যে চ্যারিটি ফাংশন ক'রে কিছু টাকা তুলে দাতাদের আত্মপ্রসাদ লাভ? কেননা সমাজে বিয়ের ব্যাপারে পণ প্রথাটা সেই ঠিক আছে! তার কোন পরিবর্তন নেই, সংস্কারও নেই!

যাকগে, এবার তোমাকে একটা দুঃখের খবর শুনিয়ে এ চিঠি শেষ করছি। জানি প্রকৃত সত্য ঘটনা বলে এ কাহিনীর কোন মূল্য নেই সাহিত্যে বা মানুষের রস-পিপাসায়, কিন্তু এর মূল্য আর এক ভাবে, সে তুমি জান বৈ কী!

সে গ্রামে ঢুকে কোন সাড়া-শব্দ পাইনি। মনে হয়েছিল বুঝি গ্রাম সুদ্ধ সবাই মরে গেছে! এদিকের গ্রাম যেমন হয় তেমনি, একটা নগণ্য গ্রাম। আমার তো মনে হয়, স্বাধীনতার পর শহরের, বন্দরের, কল-কারখানার চেহারা আমরা যেমন ক'রে বদলে দিতে পেয়েছি তেমনি ক'রে গ্রামের বা ক্ষেত-খামারের চেহারার কোন রদ-বদল করতে পারিনি, সেই এক চিত্র দৈন্যের, হতাশার!

না, না, সাড়া-শব্দ পেলুম! ভিতরে কিছু দূর এগুতে একটা চাপা কান্নার সুর কানে এল। আমি আমার চারদিকে চেয়ে শব্দটাকে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলুম। অকারণে মনটা হঠাৎ কেমন যেন বিষন্ন হয়ে গেল। বিহারের খরাক্লিষ্ট নাম-না জানা একটা গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হল, দুঃখটা আমার নিজের—আমিও বুঝি কেঁদে ফেলবো। (দোহাই তোমার, আমাকে সেন্টিমেন্টাল ভেবো না! পরের দুঃখে কাঁদবার বোকামি আমার নেই!)

দু'পা এগিয়ে দেখতে পেলুম—যে কাঁদছিল তাকে। একটি মহিলা বুক চাপড়ে কাঁদছে, তার সামনে বাঁশের খাটিয়ার ছেঁড়া কাঁথা ঢাকা দেওয়া একটি মৃত দেহ, অদূরে কঙ্কালসার একটা লোক মাটি খুঁড়ে গর্ত করছে।

বুঝলুম এরা মুসলমান। পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে মহিলাটি কাঁদছে। খুবই স্বাভাবিক। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে লোকটা বুঝি পড়েই যায়!—কি শক্ত মাটি! আমি সাহায্য করতে এগুবো কিনা, ইতস্তত করলুম। লোকটিই অস্ফুটে ডাকলে, ভাই সাব—মেহেরমান—

তারপর দুজনে মিলে সেই শুকনো মাটিকে সায়েস্তা ক'রে কবর তৈরি ক'রে মৃত দেহটিকে তার মধ্যে শুইয়ে দিলুম।

মাটি দেওয়া শেষ হ'লে লোকটি আমাকে বললে, যে মরেছে সে তার একমাত্র বংশধর! এই মাটিতে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে কচুর মূল তুলতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে মারা গেছে। অনেকদিন তাদের উপোস চলছিল। মাটির এই ফালিটুকু তার পৈতৃক। নিষ্ঠুর এ-মাটিতে আর তো কোন কাজ হবে না, তাই ওর তলায় পুত্রের কবর-খানা করলে।

মহম্মদ আরো বললে, যদি অকালে সে বেঁচে থাকে তা হ'লে একদিন ছেলের কবর-খানার পাশে একটা স্মৃতি তৈরি ক'রে দেবে, যেখানে তার মত দুঃখীরা এসে আল্লার কাছে দোওয়া মাঙবে—আর যেন কারো কখনো দানা কষ্ট না হয়! মানুষ দু'মুঠো যেন খেতে পায়!

হপ্তা আগে আমি ওদের স্বামী-স্ত্রীকে কেরায়ার জিম্মায় দিয়ে এসেছি। এখন তো বেঁচে থাকুক!

চিঠিটা শেষ ক'রে চোখ তুলে সামনে চেয়ে দেখেই ভয়ে যেন আধমরা হয়ে গেলুম। এরা আবার এল কোথা থেকে? এই তো কদিন আগে অনেক দূরে উপযুক্ত জায়গায় ওদের রেখে এসেছি! আবার আমার পিছনে পিছনে কি করতে এসেছে? আমার কাছে কতটুকু?

কঙ্কালসার দুটি নারী-পুরুষ! স্বামী-স্ত্রী! গুটি গুটি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

ভয়ে আমি চীৎকার করতে চাইলুম, হাত উঠিয়ে একটা কাঠের টুকরো ছুঁড়তে গেলুম।

মহম্মদ হাত জোড় ক'রে কোটরগত চোখ দুটো পিটপিট ক'রে যেন বলতে চাইলে, ভাইসাব আমরা মরেই গেছি! আর কেন মারবে? এবার আমাদের কবর দাও!

আমি বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ছুটে স্কুল-বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়ালুম। খোলা দরজা হা হা করছে। দাবদাহের মত সামনে আকাশটা লাল হ'য়ে উঠেছে, বোধ হয় সূর্য অস্ত গেছে।

চার

না, জামাইবাবার ইচ্ছেমতো সমীর আর সাহসী হতে পারলো না। কিন্তু সমীরের কথামতো তার মা আর দিদি এবার ওকে একটি বউ জুটিয়ে দিতে একেবারেই বদ্ধপরিকর হয়েছেন। কানের পাশে ছত্রিশ বছর বয়সের পাকা চুলে কলপ লাগিয়ে ওকে বুঝি তার বরাসনে বসতেই হয়।

মা সেই কারণেই সঙ্গে আসেননি। নাতনীর বাচ্চা হবার জন্যে অপেক্ষা করাটা শুধু জানিয়ে শুনিয়ে ছলনা মাত্র। তিনি তাঁর অনুপস্থিতি দিয়ে একা থাকার অসুবিধেটা হৃদয়ঙ্গম করাতে চাইছেন। সেই সঙ্গে নিজের মূল্যও বাড়াচ্ছেন কিছু। দিদি পরামর্শ দিয়েছেন, 'ওকে জানতে দাও, একজন মেয়ের অভাবে পুরুষ কতো অসহায়। বুঝিয়ে দাও, তোমাকে দিয়ে আর অতো খাটুনি খাটানো পোষাবে না।'

সত্যি বলতে মার শরীরটা এবার ভেঙেছে। অনেকরকম উপসর্গ দেখা দিয়েছে, যা আগে কখনো ছিলো না। বয়স তো কম হলো না। কতো হলো? শুনেছে, দিদি আর মার সঙ্গে বয়সের তফাত খুব বেশী নয়। মার বিয়ে হয়েছিলো পনেরো বছর বয়সে, দিদি জন্মেছেন ষোলো বছরে, আর সে জন্মাবার সময় তিনি ছাব্বিশ বছর বয়সের মহিলা। ছাব্বিশ আর ছত্রিশ কতো? বাষট্টি? বাষট্টি।

মার বয়স বাষট্টি হলো? এতো? কিন্তু মাকে তো একটুও বয়স্ক লাগে না। কী সুন্দর স্বাস্থ্য, কী চমৎকার শরীরের বাঁধ। না, মাকে একটুও বুড়ো লাগে না। চুল পর্যন্ত পাকেনি। মার পাকেনি কিন্তু সমীরের পেকেছে। দিদিরও পাকেনি। দিদিকেও খুব কম বয়স দেখায়। দিদি! দিদির মতো ভালোমানুষ দেখা যায় না। ওকে বিয়ে দেবার গরজের মধ্যে দিদির ঐকান্তিক ভালোবাসা ছাড়া সত্যি আর কিছু নেই। এর আগেও দিদি এ নিয়ে অনেক ঝগড়া করেছেন মার সঙ্গে, মাকে অভিযোগ করেছেন, এতো দিনেও সমীর কেন বিয়ে করেনি, সেজন্য মাকেই দায়ী করেছেন। মা কান্নাকাটি করেছেন, রাগ করে খাননি, সমীর মধ্যস্থ হয়ে থামিয়েছে সেই ঝগড়া। মনে আছে, দিদি একবার কোন মেয়েকে দেখে একেবারে পাগল হয়ে গেলেন। রূপের বর্ণনায়, গুণের বর্ণনায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে চিঠি লিখতে লাগলেন বারে বারে। সমীর তখন মেদিনীপুরে। দিদির চিঠি পড়তে পড়তে সে হাসতো, পরে কিন্তু মন্দ লাগতো না; ভেবেও ছিলো, একবার গিয়ে রূপে সরস্বতী গুণে লক্ষ্মী মেয়েটিকে দেখে এলে হয়। মা সে পথ একেবারেই মাড়ালেন না। দিদির সব উৎসাহে জল ঢেলে নিরুত্তর রইলেন। সমীরেরও নিজে থেকে কিছু করতে না বলাতে কেমন লজ্জা হলো। আর গরজও তো তেমন ছিলো না! প্রেমে তো আর পড়েনি?

কিন্তু এখন মা তার বিয়ে দিতে চাইছেন। তিনি মেয়ে পছন্দ করেছেন। মেয়ে? না মেয়ের বাপ? হঠাৎ বুকের মধ্যে পুরোনো স্মৃতি চমকে উঠলো। আরো একবার আরো একজন মেয়ের বাপের কথা মনে পড়ে গেল।

মা বলেন, 'আমি আর ক'দিন, তোকে দেখবে কে তখন? শেষে মাকেই তো দোষ দিবি? দিদির মতো বলবি, আমিই গরজ করে তোর বিয়ে দিইনি।'

না, এ কথা কখনো বলবে না সমীর। বলা উচিত নয়। মা তাকে যা করেছেন, যেভাবে করেছেন তার তুলনা নেই। সমীর জানে না দুঃখ কাকে বলে, দারিদ্র্যের সঙ্গেও তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। কেন নেই? মার জন্য। মা তাকে সব সময় আড়াল করে রেখেছেন, আবৃত করে রেখেছেন। কিন্তু তবু—না, এর মধ্যে কোনো তবু নেই সমীর। যদি তুমি এতো দিন কোনো তবু দেখতে না পেয়ে থাক আজ আর তা বিশ্লেষণ করো না।

তা বলে টাকা নিয়েও সে বিয়ে করতে পারে না। মায়ের এই আদেশ তার নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। দিদি ঠাট্টা করেছিলেন, 'মা তোকে মুরুব্বি ধরেছেন সমু, ভদ্রলোকের সাতখানা বাড়ি, দুখানা গাড়ি, কিন্তু ব্যবসাটা তামাকের। তুই তো আবার তামাকরসিক নস।'

এই ঠাট্টায় মার মুখ গম্ভীর হয়েছে। কোনো কাজ করতে করতে সেই কাজেই চোখ রেখে বলেছেন, 'তামাকের ব্যবসা বলে কিছু অশ্রদ্ধার জিনিস নয়। তামাক বেচেই লক্ষপতি একজন। এটা একটা নিষ্ঠারই পরিচয়, যোগ্যতারই পরিচয়। প্রশংসার যোগ্য।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছেন, 'তোমাদের মতো মুখেই ডম্ফাই, মুখেই কেবল বড়ো বড়ো কথা। শ্রেণীভেদ দিব্যি টনটন করছে।'

'না, না, তুমিও যেমন। আমি কি সত্যি বললাম নাকি? শুধু একটু মজা করলাম সমুর সঙ্গে।' দিদি ঠান্ডা করেছেন মাকে। মা চনচনে হয়ে বলেছেন, 'ভদ্রলোক সমুর শালা নয়, শ্বশুর, তার সঙ্গে এসব ইয়ার্কির অর্থ হয় না। তিনি তোমারও গুরুজন।'

দিদি অপ্রস্তুত মুখে হেসেছেন। মা থামেননি, স্বগতোক্তি চলেছে এই বলে যে, 'ছেলে বিয়েতে যখন মাথা পাতেনি তখনো শুনেছি তা আমারই দোষ, এখন যখন হাতে-পায়ে ধরে রাজী করিয়েছি তখনো আমার দোষ। ঠিক আছে, আমি আর কিছুর মধ্যেই থাকতে চাই না। যা তোমাদের ইচ্ছে তাই করো। আমার কী স্বার্থ। তোমাদের ভালোর জন্যই ভেবে-চিন্তে কাজ করা।'

মায়ের রাগ দেখে একেবারে চুপ করে থেকেছেন দিদি। সমীরও সরে পড়েছে ঝামেলা থেকে।

শোনা গেছে, যে মেয়েটিকে মা পছন্দ করেছেন, মেয়েটি নাকি খুব লক্ষ্মী। আজকাল সুন্দরীদের মতো চটপটে নয়। মুখ সুন্দর না নেই। রং কালো বটে, তা বলে মুখ তেমন মন্দ নয়। একটু মোটার দিকে। তা মোটা না হলে মানাবে কেন? সোজা তো নয়, হাকিম সাহেবের বউ, দশাসই হবে তবে তো সবাই মানবে! দিদি বলেছেন, 'করে ফেল, করে ফেল, মনে হচ্ছে ভালোই সম্বন্ধটা। নগদ টাকাই অনেক পাবি, তার উপরে—'

'দিদি তুমিও শেষে—'

'শোন সমু, ওটা তো ঠিক, মায় ইচ্ছে-মতোই শেষ পর্যন্ত তোকে সব করতে হবে। মিছিমিছি আর গোলমাল কেন! আর তোর বয়েস কি বসে থাকবে নাকি বিয়ের জন্য? চল্লিশে পৌঁছুতে দেরি আছে নাকি?'

'দিদি, বিয়ে আমি করবো না।'

'সে কী রে? মা কি চিরদিন থাকবেন?'

'তুমি মাকে বোঝাও।'

'মাকে কি বোঝাবো, আমিও চাই তুই এবার বিয়ে কর। এখানে না হোক, যেখানে তোর খুশি। তবে মা যখন এখানেই জেদ ধরেছেন—'

জামাইবাবু বলেছেন, 'সত্যি তোমরা যে কী! সমুকে তোমার মা কি এখনো নাবালক করে রাখতে চান নাকি? একজন বয়স্ক পদস্থ মানুষ, ওরকম একটা হট করে বিয়ে করতে পারে? তার নিজের কোনো রুচি নেই? ইচ্ছে নেই? পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নেই?'

'তুমি আর বগড়া দিও না। মা এমনিতেই তোমাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেন।' কথাটা দিদি হেসে হেসেই বলেছেন, কিন্তু কথাটা সত্য। সমীর জানে সে কথা।

সমীর এ কথাও জানে, মা যেখানে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সেখানে জয়ও তাঁর সুনিশ্চিত। সমীরের ইচ্ছে-অনিচ্ছের মানে সবকিছুই আলগা হয়ে যাবে। মার সঙ্গে সে পারবে না। কেন পারবে না? এতোকাল পরে এখানে এই পাত্রপাত্রীদের একা মায়েদের বসে সেই প্রশ্নটাই সমীরকে খোঁচা দিচ্ছে। কেন সে কিছুই পারে না? কেন সে অন্তত এ কথাটাও জোর দিয়ে বলে আসতে পারেনি, আর যাই হোক, টাকার উপর আমার কোনো লোভ নেই। লোভ থাকলেও আমার কাছে হাত পেতে নিতেম না।

বলেছিলো। দিদির কাছে, টাকাকড়ির প্রশ্ন তুলো না, আমি টাকা নিয়ে বিয়ে করবো না।'

মা তিনখণ্ডে ছিলেন, কেননা, একেবারে মুখে বলেছিলেন, 'তুমি বিয়ে করবে কি করবে না সেটাই শুধু তোমার বলবার কথা, অন্য বিষয়গুলোর ভার দয়া করে আমার উপরেই রাখতে পার, আমিই বুঝবো।'

সমীর চুপ। এর উত্তরে যে বলবে, 'এই নাটকের আমিই যখন নায়ক, আমাকে ঘিরেই যখন ঘটনাগুলো ঘটতে যাচ্ছে, তখন আমাকেই সব কথা বলতে হবে বইকি।' এ সাহস তার ছিলো না।

ভাগ্য ভালো যে, এমনি সময়েই কাজির অর্ডার এসে গেল, যার নিস্পন্দতে হাসিক সমীর পালাতে পেরে বাঁচলো তখনকার মতো।

পালালেও কাঁটাটা খচখচ করছিলো বুকের মধ্যে। মাকে অসন্তুষ্ট করে, দুঃখিত করে কোনো কিছুই ভালো লাগে না তার। বিশেষ করে মা যখন এলেন না, দিদির কাছে

'তুমি দেখছি লাগাম-ছাড়া হওয়া মাত্র পাগলা ঘোড়ার মতো এক দৌড় লাগিয়েছ।'

'লাগাম-ছাড়া?'

'তোমার মায়ের লাগাম। চোখের ঠুলিটাও দেখছি খসে গেছে। জগৎটাকে কেমন দেখছো?'

'আমাকে ঠাট্টা করছো?'

'না।'

'তবে এর নাম কী?'

'জিজ্ঞেস করছি, তারপর কী করলে?'

'ইন্দিরা নামের একটি মেয়েকে আমি উনিশ বছর বয়সে ভালোবেসেছিলাম।'

'মায়ের কাছে না জিজ্ঞেস করেই?'

'হ্যাঁ।'

'খুব সাহস তো।'

'সেই সাহস প্রকৃতির, আমার নয়।'

'তারপর?'

'তারপর সেও এমনি করে একদিন হারিয়ে গিয়েছিলো।'

'খোঁজনি?'

'খুঁজেছিলাম।'

'পাওনি?'

'না।'

'তারপর?'

'উনিশ থেকে সাতাশ, ক' বছর? আট বছর। সেই আট বছরে অক্ষরে অক্ষরে মায়ের ইচ্ছার শাসনে পা ফেলেছি, ধাপে ধাপে উঠেছি।'

'হুঁ।'

'তারপর তোমাকে দেখেছি।'

'তারপর আবার আমাকে ভালোবেসেছ; না?'

'হ্যাঁ।'

'ইন্দিরার মতো, না তার চেয়ে কম-বেশী?'

'ইন্দিরা ভূমিকা, তুমি আসল।'

'সুখী হলাম।'

'তীরে ঢেউ থাকে, ফেনা থাকে, মধ্যসমুদ্র শান্ত, অতল।'

'ডুবে গেলে আর ওঠা যায় না, না?'

'না।'

'তুমি বুঝি ডুবেছিলে?'

'ডুবেছিলাম।'

'এখনো ওঠোনি?'

'কই আর।'

'তবে কী করলে এতো দিন?'

'ডুবে থেকে 'ডুবে আছি' এই কথাটা ভুলে গেলাম। ভাবলাম, আবার বুঝি বেঁচে উঠেছি, আর বেঁচে উঠে আবার নিয়মিত পাপক্ষয় করছি।'

'পাপক্ষয় কেন?'

'তা ছাড়া কী? জীবন একঘেয়ে, জীবন বিস্বাদ। জীবনের বিশেষ কোনো অর্থ আর পেলাম কোথায়?'

'তারপর?'

'তারপর ভালো ফল করার জন্য যেমন তাড়াতাড়ি চাকুরির তুঙ্গস্থানে পা দিতে পেরেছিলাম, তুঙ্গস্থানে পৌঁছে তেমনি ঘুরতে লাগলাম মফস্বলে মফস্বলে। মফস্বলের কেষ্টবিষ্টুদের মতোই অফিস কাছারি আর বাড়ি, বাড়ি আর মা, মা আর ক্লাব, ক্লাব আর তাস খেলা, তাস আর টেনিস, টেনিস আর মদ। (না মদে ততো আসক্ত হইনি, চেষ্টা করে বিফল হয়েছি) সব সময় হুজুর, হুজুর। সব সময় খোকা, খোকা। সব সময় মায়ের যত্ন আর অধিকারবোধের নাগপাশ।'

'তারপর?'

'তারপর এখন আমার বিবাহ দিবে।'

'এতো দেরিতে? এতো দিন তবে কী করলে?'

'জানি না, এতো সময় কখন কেটে গেল। জানি না, দশ বছরের প্রলেপে কোথায় তুমি চাপা পড়ে গেলে।'

'তা হলে কবর খুঁড়ে আর লাভ কী?'

'আমার বিবেক, আর আমার ঘুমিয়ে থাকা ভালোবাসা দুই-ই এখন সদাজাগ্রত শত্রু। বলো তো এখন আমি কী করি? বলো তো এখন আমি কী লিখি মাকে?'

মা,

আমি ভালো আছি। তোমার সর্দি সম্পূর্ণ সেরেছে তো? প্রার্থনা করছি—শানুর এবার একটি মেয়ে হোক, আমি মেয়ে ভালোবাসি। তা ছাড়া ওর একটি ছেলে আছে। দীপক কি আসবে বক্তা হবার সময়ে? আমিও যাবো। তখন আমি তোমাকে নিয়ে আসবো।'

মাকে চিঠি লিখতে বসে এক ঘণ্টা চিন্তা-ভাবনার পরে কলম কামড়ে কামড়ে সমীর এইটুকু লিখলো। লিখে অনেকবার পড়লো। পড়ে 'তখন আমি তোমাকে নিয়ে আসবো' কথাটা কাটলো গভীর করে। তারপর আবার চিন্তা করতে লাগলো, কী লিখবে। চিন্তা করতে করতে যখন রাত অনেক বেড়ে গেল তখন এক টানে প্যাড থেকে চিঠির পাতাটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিল ঝুড়ির মধ্যে।

একটা ভীষণ অশান্তিতে হৃদয় ভরে গেল তার। একটা ভীষণ যন্ত্রণাবোধ তাকে নির্মম করলো। চিরদিনের শান্তশিষ্ট বাধ্য অনুগত মানুষটা হঠাৎ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো অস্থির বেগে, ঘরময় হাঁটতে লাগলো। শেষে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো খোলানো বারান্দায়। গঙ্গা তেমনি একই গতিতে প্রবহমান। মনে হলো, সমীরকে দেখে তার গাঢ় অন্ধকার ঠাণ্ডা বুক আরও একটু প্রসারিত হলো। সমীর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো সেই অন্ধকার জলরাশির শোভা।

ক্রমশ

শিল্প-উৎপাদনে ক্রম-অবনতি

দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়, তখন উৎপাদকদের লাভের পরিমাণ বাড়ে, এবং তার ফলে উৎপাদন বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে যদিও এখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা যাচ্ছে তবুও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন মোটেই বাড়ছে না। বরং বলা যেতে পারে শিল্পোৎপাদনে ক্রম-অবনতি (recession) দেখা যাচ্ছে। শিল্পে মন্দার সৃষ্টি কিভাবে হল এ সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ছয়টি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পাবার দরুন কয়েকটি মূলধন-সামগ্রীর জন্য চাহিদা খুবই কমে গেছে। দ্বিতীয় কারণ দেখানো হয়েছে, করের অতিরিক্ত উঁচু হার জনসাধারণের সঞ্চয়ের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন লক্ষ্য অপূর্ণ থাকার দরুন শিল্প-কাঠামোয় ভারসাম্যের অভাব দেখা গেছে এবং গত দু বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা এর ফলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে পারেনি। অপর তিনটি কারণ হচ্ছে—ব্যাংক কর্তৃক শিল্পক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে কড়াকড়ি, পর পর দু বছর অজন্মা এবং অনাবৃষ্টি এবং সরকারের অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা।

যে ছয়টি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে হয়তো সবাই একমত হবেন না। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, শিল্পে মন্দার সৃষ্টি হবার যে কোন কারণ থাকুক না কেন, এর ফলে দেশের উৎপাদনব্যবস্থা একটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। শিল্পে মন্দার ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। ধাতব পদার্থের উৎপাদন কমেছে শতকরা ৮·২ ভাগ এবং পরিবহণ যন্ত্রপাতি নির্মাণে উৎপাদন কমেছে শতকরা ২৫·২ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৯৭ মিলিয়ন টন; কিন্তু ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সালে কয়লার উৎপাদন হয়েছে যথাক্রমে ৭০·৫ মিলিয়ন টন এবং ৭২ মিলিয়ন টন। কাপড়ের উৎপাদনও ১৯৬৬ সালের তুলনায় ১৯৬৭ সালে কম হয়েছে। পাটশিল্পে উৎপাদন বাড়েনি বললেই চলে। শিল্পে এই তীব্র মন্দার ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে সরকারের পাওনা রাজস্বের পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেটে ৩৫০ কোটি টাকার কম হবে বলে অনুমিত হয়েছে।

শিল্প-উৎপাদনে মন্দা দূর করার জন্য এবং দেশের শিল্প-কাঠামোর ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য সরকারের উচিত শিল্পনীতির পুনর্বিবেচনা করা। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে এ ধরনের শিল্প যাতে সরকারের অর্থনৈতিক আনুকূল্য লাভ করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কৃষিজাত সামগ্রীর, বিশেষতঃ কাঁচামালের দাম যাতে স্থিতিশীল থাকে এবং একান্ত আবশ্যক ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি যাতে হয়, সেজন্য পরোক্ষ করের কাঠামোরও একটু পরিবর্তন হওয়া দরকার।

ভারতে কর-কাঠামোর সংস্কার

ভারতে ১৯৬৬-৬৭ সালে জাতীয় আয়ের ১৩·৩ শতাংশ করের আওতায় এসেছে; ১৯৬৫-৬৬ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৩·৮ ভাগের উপর কর ধার্য করা হয়েছিল। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭০-৭১ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৭ ভাগের উপর কর ধার্য করা হবে। বর্তমান মূল্যস্তরের ভিত্তিতে এখন ভারতে জনপ্রতি গড় আয় হচ্ছে বছরে ৪৮২ টাকা এবং তার মধ্যে জনপ্রতি কর প্রদানের পরিমাণ গড়ে ৬৪ টাকা। অবশ্য অনেক পশ্চিমী রাষ্ট্রে জাতীয় আয়ের আরও বেশী অংশ করের আওতায় এসেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে দেশগুলিতে জনপ্রতি জাতীয় আয়ের পরিমাণ ভারতের জনপ্রতি জাতীয় আয়ের চেয়ে অনেক বেশী। ভারতে মোট রাজস্বের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আসে পরোক্ষ কর থেকে।

গড় আয় যখন খুব অল্প থাকে তখন স্বভাবতই পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে নানা রূপ সমস্যার সৃষ্টি হয়। শুধু বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে পরিকল্পনার আয়তন বড় করা চলে না। এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য অধিক করের মাধ্যমে জোর করে সঞ্চয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে, অথবা বাজারে নূতন মুদ্রা ছেড়ে ঘাটতি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এখন যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তাতে শেষোক্ত পদ্ধতির উপর বেশী নির্ভর করা উচিত হবে না। সুতরাং অবাঞ্ছিত ব্যয় প্রতিরোধ করার জন্য এবং সরকারী প্রকল্পগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয় সেজন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ আরও বাড়ানো দরকার। কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে যদি কর-কাঠামো আরও সরল করা হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কর-কাঠামো আরও সরল করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে করের কাঠামো আরও সরল করা যেতে পারে তা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। আমাদের করনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, একদিকে প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির জন্য রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং অপরদিকে সমাজে আয় ও ধনের বৈষম্য কমিয়ে দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক শক্তির সমান এবং ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করা। প্রচলিত কর-ব্যবস্থা যেন সামগ্রিকভাবে দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি ও সঞ্চয় একত্রীকরণের (mobilisation of savings) সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সহায়ক নয়, এ জাতীয় ব্যয়ের উপর করের হার আরও বাড়ানো যেতে পারে—উৎপাদন বৃদ্ধিকারীদের কর-প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দেওয়া যেতে পারে—সাধারণ মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর করের হার কমিয়ে দিয়ে বিলাস-সামগ্রী এবং মাদক দ্রব্যের উপর করের হার আরও বাড়ানো যেতে পারে, রপ্তানী শিল্পের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য রপ্তানী শুল্কের হার অনেক কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে, আমদানীর বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আরও বেশী করে সরকারী সাহায্য দেওয়া যেতে পারে এবং এ উদ্দেশ্যে ঐ জাতীয় জিনিসের উপর করভার লাঘব করা যেতে পারে—এবং সব শেষে, কর প্রদানে ফাঁকি বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রশাসনিক প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কালডরের সুপারিশ অনুযায়ী সকলের ক্ষেত্রে "বাধ্যতামূলকভাবে আয় ও ব্যয়ের হিসাব দাখিলের নিয়ম" চালু করার কথা সরকারের বিবেচনা করা উচিত। কর ফাঁকি বন্ধ করতে পারলে এবং "কালো টাকার" (black money) কারবার বন্ধ করতে পারলে ভারতের আর্থিক সমস্যার অনেক সুরাহা হবে।

সুব্রত গুপ্ত

(চার)

জন্মদিন পালনের রীতি যদিও আধুনিক সমাজব্যবস্থায় চালু আছে বহু দিন ধরে, তবু কেন যে জন্মদিন পালন করা হয় তার সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়ায় অসুবিধা আছে। আমরা কি জন্মদিনে স্মরণ করতে চাই সেই শুভ বা অশুভ ক্ষণটিকে, যে সময় থেকে এই পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক? না জন্মদিন রাস্তার ধারে মাইলের সংকেত লেখা পাথরের মত জানিয়ে দিয়ে যায়, ক্রমশ বয়েস বাড়ছে, জীবনের পথে চলতে চলতে পথ শেষের নিশানা দেখতে পাব—সেই তো মৃত্যু। যে-কোন কারণেই হোক, জন্মদিনকে আমরা ভুলতে পারি না। আনুষ্ঠানিকভাবে যেমন ঐ দিনটিকে সবাইকে জানায় না, তবুও মনের মধ্যে খচখচ করে, ঠিক যেন গলায় কাঁটা বেঁধেছে মাছের পরের অস্বস্তি। তাই বলে অনাদিপ্রসাদের সেরকমও সত্য নয় যে, পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন থেকে তাঁর নতুন জন্ম হল।

নতুন জন্ম, সেই নিষ্পাপ শিশু-মন অনাদিপ্রসাদ কোথায় পাবেন? জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে তিক্ত করেছে, বিরাট ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার রিক্ত করেছে। বিনিময়ে উপহার দিয়েছে ধন, মান, যশ। পঞ্চাশ বছরের ভাল মন্দে ভরা অতীতটাকে স্লেটের ওপর লেখা অঙ্কের মত মুছে ফেলা যায় না।

তবু নতুন জন্ম সম্ভব না হলেও গভীর ঘুম থেকে মানুষ হঠাৎ জেগে উঠতে পারে। তার জন্যে বেশী ঠেলাঠেলি করার দরকার হয় না। 'বেলা যায়'-এর মত সামান্য দুটি কথা নদের পুতুল লালাবাবুকে সমুদ্র মাপতে পাঠিয়ে দিতে পারে। আলো যখন জ্বলে, বহু যুগের অন্ধকার এক মুহূর্তে সেখান থেকে ছুটে পালায়, চেতনার পরশমণি নির্জীব সত্তাকে অনায়াসে সজীব করে।

তেমনি করেই সেই জন্মদিনের রাতে জন-প্রিয় লেখক অনাদিপ্রসাদ মোহাচ্ছন্ন ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছেন। নিজের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়েছেন। মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন তাঁকে খোঁচা মেরেছে—আমি কে? সত্যিকারের অনাদিপ্রসাদ কোনজন? যে লোকটা কাগজের উপর কালির আঁচড় কেটে সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে লোকের মন-রাখা উপন্যাস লেখে সে, না বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত, অথচ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে সদা প্রস্তুত যে সৈনিকটা, সময়ে অসময়ে নীরবে চাড়িয়া দিয়ে যায়, সেই লোকটা অনাদিপ্রসাদ? অনাদিপ্রসাদ সে রাত্রে বিছানার উপর বসে ভাববার চেষ্টা করেছেন, রমলা বউদির কাছে তিনি কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, ছেলেদের কাছে স্নেহময় পিতা, আত্মীয়দের কাছে হৃদয়বান আত্মীয়, বন্ধুদের কাছে অকৃত্রিম সুহৃদ। সকলের চোখ দিয়েই অনাদিপ্রসাদের একটা আলাদা রূপ আছে। তাকে নাকি অস্বীকার করা চলে না, যার চোখে যেরকম চেহারা তা স্মরণ রেখেই অনাদিপ্রসাদকে ব্যবহার করতে হয়।

অনেক সময় এই ব্যবহারের মধ্যে স্বাভাবিকতা থাকে না, ঢুকে পড়ে অভিনয়।

কি মারাত্মক চিন্তা! আমরা অভিনয় করছি ঘরে বাইরে, ছোট বড় প্রতিটি কাজে, লেখার আসরে, বক্তৃতার সভায়, সমাজের কাছে, রাজনীতির মঞ্চে। দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করতে করতে নিজের সত্তাকে আর চিনতে পারছেন না অনাদিপ্রসাদ। লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একক হতে চেয়েছিলেন, অনেকের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু বুঝতে পারেন নি, ক্রমশ তাঁর চার পাশে একটা কঠিন আবরণ তৈরী হয়ে গেছে, অনাদিপ্রসাদ পরিণত হয়েছেন শামুকে।

পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে অনাদিপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, শামুকের খোল ছেড়ে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে। নির্জন দ্বীপের মত একলা বেঁচে থাকার মধ্যে হয়ত বাহবা আছে, আছে আভিজাত্যের বড়াই, কিন্তু সত্যিকারের জীবন নেই। বাস্তবকে দেখতে গেলে ঘরের দেয়াল ভাঙতে হবে। এতদিন ধরে মনের আনাচে-কানাচে যত পাঁচিল আমরা তুলেছি, সেগুলো চুরমার করে দিতে হবে। দৃষ্টির প্রসারতা বাড়াতে হবে, সামনের সিনেমার ছবির পর্দার মত। সংকোচ নয়, প্রসার। বন্ধন নয়, মুক্তি। গোষ্ঠী নয়, জনতা।

তাই তো দেখা গেল, কলকাতার শহরে যেখানে জনস্রোতে বইছে অনাদিপ্রসাদ সেখানেই গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। হয়তো সে স্রোতের কোন লক্ষ্য নেই, অনির্দিষ্ট পথে বয়ে চলা, তবু সেই স্রোতের মধ্যে ভেসে গিয়ে

অনাদিপ্রসাদ আনন্দ পেয়েছেন। নিজেকে চলতে হচ্ছে না, অন্যরা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি—সামনে, পিছনে, পাশে মানুষের চাপ, তাদের দেহের উষ্ণতা, আবেগ-ভরা নিঃশ্বাস। জনতা চলছে। এগুচ্ছে কি পেছুচ্ছে বলা শক্ত, কিন্তু তার গতি আছে। সেই গতির বেগ আজ অনাদিপ্রসাদকে পেয়ে বসেছে।

চলতে চলতে হয়ত অনাদিপ্রসাদ প্রশ্ন করেছে, এরা কোথায় যাচ্ছে? পাশের জন মৃদু ভর্ৎসনা করে, 'এরা' মানে? বলুন, আমরা। অনাদিপ্রসাদ নিজেকে শুধরে নেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো জিজ্ঞেস করছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—জানি না।

—তবে কেন এই চলা?

নির্ভীক উত্তর, চলতেই হবে। একবার থেমে গেলে আর চলতে পারব না। অনাদিপ্রসাদ ঘাড় ফিরিয়ে ভদ্রলোককে লক্ষ করেন, চোখে-মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সেখানে কঠিন বাস্তবের ছাপ পড়েছে, আধময়লা জামা কাপড়, রুক্ষ চুল, পুরু কাচের চশমা।

ভদ্রলোক হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, এ লড়াই বাঁচার লড়াই।

জনতা প্রতিধ্বনি তোলে, এ লড়াই লড়তে হবে। লড়তে হবে।

অনাদিপ্রসাদের বিহ্বল প্রশ্ন, লড়াই কার বিরুদ্ধে?

ছোট জবাব, অন্যায়, অত্যাচার।

কোন্ অন্যায়, কার অত্যাচার, এ কথা বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা হয়ত সে ভদ্রলোকের নেই, নেই সেই বিপুল জনতার। কিন্তু তারা নীরব নয়। কবির বাসনা পূর্ণ হয়েছে, এই-সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে ভাষা ফুটেছে। এইসব ভগ্ন বুকে ধ্বনিত উঠেছে আশার আলো। তাই তো এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় এদের সঙ্গে কদম কদম পা মিলিয়ে চলার মধ্যে অনাদিপ্রসাদের এতটা আনন্দ।

জনস্রোতে গা ভাসাবার ইচ্ছা যখন অভ্যাসের পর্যায়ে উপনীত হয়, তখনই দেখা যায়, মানুষের আর স্রোতের ভালমন্দ বিচার থাকে না। সেই কারণেই লোকে দেখেছে, ফুটবল মাঠ ফেরত দর্শকদের সঙ্গে পা মিলিয়ে অনাদিপ্রসাদ হাঁটছেন। শুনছেন পাশের জনের উক্তি, ছ্যা, ছ্যা, বাঙালীদের দ্বারা আর ফুটবল খেলা চলবে না, কোথায় গেল সেই আগের দিকপাল খেলোয়াড়েরা, যাদের ভয়ে বাঘাবাঘা গোরা সাহেবরাও ঠকঠক করে কাঁপত। ছেড়ে দেন, আর খেলা দেখব না।

আসল উত্তর, ক্রমে ক্রমে এখন পলি-টিকস, রাজনীতির সাংঘাতিক থাবা ঢুকেছে খেলার জগতে, নতুন খেলোয়াড়দের কোন সুযোগ নেই। সব রসাতলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রসাল টিপ্পনী, দাদা, ফুটবল তো তবু পড়ে আছে, রাজার খেলা ক্রিকেট ভাবলে তো, এখন তো স্রেফ নবাবী তামাশা। হাজার হাজার বিদেশী মুদ্রার অপচয়, ছাত্ররা বিদেশে যেতে পারে না। আর বদলে ক্রিকেট টিম গিয়ে দেশের নাম ডোবাচ্ছে।

দ্বিতীয়জনের একটাই মন্তব্য, সেখানেও রাজনীতির দাদু, চৌকশ খেলোয়াড়রাও চিৎপটাং, সেখানেও পার্টির জোরে বেড়া লাফ।

একটা হাসির কোরাস শোনা যায়।

অনাদিপ্রসাদ এই দর্শকদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ময়দান পার হয়ে যান। চোখে পড়ে সান্ধ্য ভ্রমণে ব্যস্ত প্রৌঢ়, ঘরোয়া খেলায় মত্ত কিশোর-কিশোরীর দল, কোন এক কোণে শিল্পীদের সভা, ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে ঘন হয়ে বসা তরুণ-তরুণী,

কেন, এই সাধনবাবুদের স্মরণ নিতে বাধ্য হয়। এরা হিসেবের খাতায় ভোজবাজির খেলা দেখায়, কালোকে করে সাদা, নিজেকে করে রাজা। তাই কালো টাকার যারাও অংশ পায়, সেই থেকে বাড়ি গাড়ি। সেগুলোর রং কিন্তু কালো নয়, রঙীন।

'প্রফুল্ল'র যোগেশ ভাই রমেশের উদ্দেশে সখেদে সকৌতুক উক্তি করেছিল, 'উকিল কী চীজ রে!' ভদ্রলোকের যুগে সাধনবাবুদের উৎপত্তি হয়নি। জানি না এদের দেখলে বিস্মিত যোগেশ কি বলত।

সাধনবাবু পাড়ার মাতব্বর হলেও নিজের পকেট থেকে কোন ব্যাপারেই চাঁদা দেন না, তবে অনেক টাকা সংগ্রহ করে দেন তাঁর মক্কেলদের কাছ থেকে। স্যুভেনীরে বিজ্ঞাপন, ডাক্তারের জন্যে লরী, বিচিত্র অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পী, প্রয়োজনের সময় সব কিছুই তিনি জুটিয়ে এনে দেন। এক কথায়, তিনি এখানে অনিবার্য [illegible]। এঁদেরই [illegible] এখনকার সমাজের মাথা।

অনাদিপ্রসাদ সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চমকালেন, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত রূপে ফুঁসছেন দৃপ্ত সিংহের মত। এক কোনায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে দোষী বালকের মত একটি যুবক। আশেপাশে দু' চারজন মাতব্বর।

সিংহের গর্জন, তোমাকে আমি চাবকাব, বদমাইশ ছোঁড়া। আমার মেয়ের সঙ্গে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে! আমাদের ঘর জান, বংশ জান? তোমার বাবা তো অফিসের কেরানী, ওর চাকরি খেয়ে দেব। ফের যদি এদিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখি তো জেলে ঢোকাব। ইডিয়ট, পাজী, ছুঁচো—

অনাদিপ্রসাদকে দেখে সাধনবাবু নিজেকে সংযত করেন, সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ত দেন, আমার মীনাকে তো জানেন কি শান্ত মেয়ে, এই বজ্জাত ছোঁড়াটা—

অনাদিপ্রসাদ গম্ভীর গলায় বললেন, আমি সব শুনেছি, মীনা কোথায়?

—মীনা কেন? ওপরে আছে।

—আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই, জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে অনাদিপ্রসাদ সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন সোজা মীনার ঘরে।

বছর কুড়ি বয়েসের মেয়ে, সাদামাটা চেহারা, একমাথা চুল। চোখে-মুখে কাঁচা বয়েসের একটা উজ্জ্বল জৌলুস আছে। খাটের ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল, ভয়ে আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখে দুর্ভাবনার জল।

অনাদিপ্রসাদকে দেখে মীনা আরও চমকে ওঠে, কাকাবাবু, আপনি!

অনাদিপ্রসাদের শুকনো প্রশ্ন, ছেলেটার নাম কি?

—সমীর।

—তোমাকে মিছিমিছি বিরক্ত করে?

মীনা ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, কলেজের রাস্তায় কিংবা বন্ধুদের বাড়ি গেলে—

—সাক্ষী আছে?

—হ্যাঁ, আমার বন্ধুরা দেখেছে, আমি যত বারণ করি—

—আজ বুঝি তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল?

মীনা আরও ভয় পায়, হ্যাঁ, আমাকে জোর করে—

অনাদিপ্রসাদ ঠাস করে এক চড় মারেন মীনার গালে, মিথ্যে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না? তুমি প্রশ্রয় দিয়েছ বলেই ঐ ছেলেটা তোমার কাছে আসে। সত্যি কিনা বল।

মীনা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে হ্যাঁ, সত্যি।

—ছেলেটাকে নীচে এইভাবে অপমান করছে দেখেও তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

মীনা আরও অসহায়, কি করব? বাবা যে বোঝেন না, ওঁকে বলার আমার সাহস নেই।

—ছি, ছি, যা সত্যি তাও বলতে পার না, এই তোমাদের চরিত্র। তোমরা কলেজের মেয়ে, তোমাদের উপর দেশের ভবিষ্যৎ। আমি ভাবতেও পারছি না। অনাদিপ্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চান, মীনা ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে, দোহাই কাকাবাবু, এসব কথা বাবাকে বলবেন না। আমাকে উনি জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

অনাদিপ্রসাদ কোন উত্তর না দিয়ে তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন। একটি নাটকীয় মুহূর্ত। ঘরের সকলের দৃষ্টি অনাদিপ্রসাদের উপর নিবদ্ধ। গম্ভীর আহ্বান শোনা যায়, সমীর, আমার সঙ্গে চল।

সাধনবাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনাদিপ্রসাদ বললেন, ওর যা ব্যবস্থা করার আমি করছি।

অনাদিপ্রসাদের পড়ার ঘরে সোফার উপর বসে পড়ে এতক্ষণ বাদে সমীর একটু সুস্থ বোধ করে, অস্ফুট স্বরে প্রার্থনা জানাল, আমাকে একটু জল দেবেন?

অনাদিপ্রসাদ জল এনে দিলেন। ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে অযাচিতভাবে মীনার কাছে যাওনি এ কথা সাধনবাবুকে জানালে না কেন?

সমীর প্রথমটা চুপ করে থেকে পরে উত্তর দিল, ওরা তো আমাকে বিশ্বাস করত না।

—তা হলেও যেটা সত্যি তা বললে না?

—বললে ওরা মীনাকে কষ্ট দিত। বেচারী ওর বাবাকে বড় ভয় পায়।

—তাই বলে নীরবে এতখানি অন্যায় অপমান তুমি সহ্য করলে!

সমীর চোখ তুলে অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকায়, সহজ অথচ দৃঢ় গলায় বলে, কি করব, আমি যে মীনাকে ভালবাসি।

অনাদিপ্রসাদ বিব্রত হন, ভালবাসা কথাটা তো জোর গলায় বলবার সাহস নেই। তোমরা আমাদের যুবসমাজের প্রতিনিধি? ছি, ছি, ভীরু, কাপুরুষ।

সমীর আহত হল, কিন্তু লজ্জা পেল না। নির্ভীক গলায় বলল, আপনারাই কাপুরুষ করে দিয়েছেন আমাদের। আমাদের কখনও স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দেননি, যুবশক্তির কণ্ঠ রোধ করে রেখেছেন।

অনাদিপ্রসাদ এই প্রথম ধাক্কা খেলেন, তোমাদের ভালবাসায় জোর না থাকলে যে-কোন বাধার বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াত।

—হয়ত তাই দাঁড়াবে, শুধু সমাজের নিয়ন্ত্রণকর্তারা যদি একটু বদলাতেন। যাক গে, তর্ক বাড়বে, মীমাংসা হবে না। আমিও উঠব, যদি অনুমতি দেন, বাড়ি যাই।

—পাড়ার চাপা উত্তেজনা এখনও রয়েছে, আমি গাড়ি করে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

—অনেক ধন্যবাদ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সমীর থেমে ফিরে অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে নিষ্কম্প কণ্ঠে ঘোষণা করে, আমার ভালবাসা কিন্তু খাঁটি, প্রয়োজন হলে জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে যাব।

অনাদিপ্রসাদের মুখে স্মিত হাসি, আমাকে তোমার পাশে পাবে।

(ক্রমশ)

সরকারের অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাতে বাঙলার গ্রন্থকেরাই এ যাবৎ বেশির ভাগ পুরস্কার পেয়েছেন। স্বপ্নার মাখনবাবুর বিশেষ কৃতিত্ব হলো যে, ১৯৬৭ সালের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাতে সর্বোৎকৃষ্ট বাঁধাইয়ের জন্য সর্বভারতীয় গ্রন্থকদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিনটি পুরস্কারই তিনি নিয়ে এসেছেন।

এর আগে যে উপাল লিপো, সরস্বতী প্রেসের কথা লিখেছি তাঁদের পুরোদস্তুর গ্রন্থন বিভাগ আছে; কিন্তু এই প্রবন্ধে যাঁদের কথা লিখছি তাঁরা সবাই হলেন একক বাঁধাইয়ের কাজের দপ্তরীখানা।

পুস্তক গ্রন্থনের প্রয়োগগত (টেকনিক্যাল) দিকটির বিবরণ লিখে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। কেবল একটি তথ্য সকলের কাছে উপস্থিত করছি। সাধারণ ফোঁড়-সেলাই কিম্বা ক্রস-সেলাই (সেকশ্যানাল থ্রেড স্টিচিং) ইত্যাদি ছাড়া এখন যেমন বিলিতি পেপার ব্যাক সিরিজে বিনা সেলাইয়ে বাঁধাই চালু হয়েছে, ভারতীয় গ্রন্থন শিল্পেও তা এসেছে ১৯৫৬/৫৭ সালে। বেঙ্গল বুক বাইন্ডিং-ই এখানে তার প্রবর্তন করেন বলে শুনেছি। কিন্তু সাধারণের প্রতিকূলতার জন্য এই জাতীয় সেলাই-ছাড়া বাঁধাই বোধহয় চালানো যাবে না, কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আঠা গলে গিয়ে এই বাঁধাই খুলে যায়।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয় তাঁর 'শিল্পকথা'-তে বলেছেন : শিল্পচর্চার দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ দেয়, আর-একটা অর্থ দেয়। চারুশিল্প ও কারুশিল্প। কারুশিল্প আমাদের জীবনযাত্রার পথকে কেবল যে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমেরও পথ করে দেয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে শিল্পকে বাদ দেওয়া জাতির পক্ষে অর্থাগমের দিক দিয়েও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

গ্রন্থন কাজে কারুশিল্পীর প্রকৃত শিল্প-সৃষ্টির সময় আসে বাঁধাইয়ের পরে। প্রচ্ছদের অলংকরণ যেন অভিসারিকার অংগরাগ। সাধারণভাবে পুরু কাগজের উপরে প্রেসে-ছাপানো নানা রঙের নয়নাভিরাম ছবি ছাড়াও বেনারসী ব্রোকেড, মুগার কাপড়, র' সিল্ক কিম্বা মিহি মাদুরের মনোহর সজ্জায় বইয়ের মলাটকে শোভিত করা হয়। তার উপরে সোনালী রূপোলী পাতে (গোল্ড এমবসিং করে), নয় তো সিল্ক-স্ক্রীনে করা হয় তার নামাঙ্কন—যেন বরবর্ণিনীর চন্দন-চর্চা।

এতক্ষণ ধরে কেবল প্রকাশকের বই বাঁধাইয়ের কথাই বলেছি। আমাদের দেশের বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য উপহারের উপযোগী 'নভেলটি আইটেমস্' তৈরি করাও আমাদের গ্রন্থকদের বেশ একটি লাভের ব্যবসার দিক আছে। বিদেশে অবশ্য এর প্রচলন আগেই হয়েছিল, কিন্তু এই সব জিনিসকে ভারতীয় কারুশিল্পে সঞ্জীবিত করবার পথ দেখিয়েছেন আমাদের বাঙালী শিল্পীরাই। এখন এখানকার দেশী ও বিদেশী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁদের গ্রাহক খরিদ্দারদের তোষণের জন্যে ডায়েরী, ক্যালেণ্ডার, ক্যাটালোগের মতো অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস এই সব গ্রন্থকদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে উপহার দেন। চা-পরিষদের (টি-বোর্ডের) ১৯৬৫ সালের মাদুরের মলাট ও ১৯৬৮ সালের র' সিল্কে মোড়া ডায়েরী দুটি এবং কেশোরামের ১৯৬৮ সালের ডায়েরীটি নমুনা হিসেবে দেখিয়ে শুভবাবু বললেন যে, এক একটির মোট খরচ নাকি পড়েছে প্রায় ত্রিশ টাকা করে। 'নভেলটি আইটেমস'-এর মধ্যে প্লাস্টিক ও রেকসিনে বাঁধানো চিঠিপত্রের ফাইল, কাগজ রাখার ফোলডার, শুভবাবুও অনেক রকম তৈরি করেন তাঁর জার্মানী থেকে আমদানি করা দামী দামী প্লাস্টিক ওয়েলডিং মেশিনে।

নিপুণ হাতে কঠিন অধ্যবসায়ে যাঁরা এই সব মনোহর জিনিস তৈরি করেন, যাঁরা বই গুলি সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলে প্রকাশক পান জাতীয় পুরস্কার তাঁদের কথা অর্থাৎ বাইন্ডিং প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কথায় শুভবাবু বললেন যে, বেঙ্গল বুক বাইন্ডিং-এর মতো আয়তনের একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীসংখ্যা আন্দাজ ৫০জন। মাসিক আয় এঁদের ৭৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা। আমাদের দক্ষ মুসলমান কারিগরেরা প্রায় সকলেই পাকিস্তান চলে গিয়েছেন। অধিকতর ক্ষেত্রে তাঁদের স্থান নিয়েছেন পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মানুষেরা। শুধু পুরুষই নয়, মেয়েরাও। কাগজ ভাঁজাইয়ের (ফোলডিং) কাজে প্রধানত মেয়েরা থাকেন আর পুরুষেরা করেন সেলাই ফোঁড়াই মেশিন চালানোর কাজ। কিন্তু সেই মুসলমান দপ্তরীদের মতো দক্ষতা এখনো এঁদের হয় নি। তাঁদের মতো নতুন কর্মীদের চাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। কিন্তু—বারবার বলতে ভালো লাগে না—আমাদের যাদবপুরের সরকারী প্রিণ্টিং স্কুলে নাকি এই বিদ্যাও শিক্ষার্থীরা ভালো করে পান না। সুপারভাইজার হতে পারেন—শ্রমিক নয়। হাওড়া হোমস্-এও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ফল হয় একই। গ্রন্থকদের নিজেদের একটি সমিতি আছে, 'পুস্তক গ্রন্থন ব্যবসায়ী সমিতি।' উচিত তাঁদের পক্ষ থেকেই বাঁধাই শেখানোর ব্যবস্থা করা, শ্রমিককে কাজে নেওয়ার আগে। কিন্তু যে-শিল্প মাত্র গত দুই-তিন দশকে বস্তী-শিল্পের পর্যায় থেকে কুটির শিল্পে উন্নীত হয়েছে বহু চেষ্টার পর, সেই শিল্পের মালিকদের সে ব্যবস্থা করবার সামর্থ্যই বা কতটুকু? আজকের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মোট বিক্রি যেখানে টাকার হিসেবে কোটি পেরিয়ে অর্বুদে পৌঁছয়, সে জায়গায় এই গ্রন্থন-শিল্পের এক একটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিক্রি মাত্র দেড় দু লক্ষ টাকা। লাভ বা উদ্বৃত্ত যা থাকে তার থেকে বাঁচিয়ে একটা স্কুল খোলার ব্যবস্থা করা এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

যান্ত্রিক আধুনিকতা আনাও গ্রন্থকদের পক্ষে একটি অবশ্য করণীয়। কিন্তু এখানেও সেই সমস্যা মূলধনের অভাব। যাঁরা এঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তাঁদের আবার সমস্যা সরকারী আমদানি নীতির বেড়াজাল ভেদ করে আসা।

তবুও নিরুদ্যম হলে চলবে না, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

বাঙালীর ব্যবসা নিয়ে যখন লিখতে বসেছি তখন তার অর্থকরী দিকটার উপরেই আমাদের বেশি লক্ষ্য। তবুও নন্দলালের ভাষায় আর-একবার এ কথা বলে শেষ করি যে, নানা বাধা বিঘ্ন লঙ্ঘন করে অতি কষ্টে অর্থাগমের পথ করে নেওয়ার সংগে সংগে আমাদের এই বাঙালী কারুশিল্পীরা এই শুভবাবু, আশুবাবু, শচীনবাবু, মাখন-বাবুরা তাঁদের সৌন্দর্যের সোনার কাঠি আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের জিনিসগুলিতে ছুঁইয়ে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে আরও সুন্দর করে তুলুন।

বিশ্বকর্মা

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

আটত্রিশ

তথাপি দেখ, মনের চমক ঘোচে না। যে বিবাহ-বিধবা সংবাদ শুনেছি, তার মর্ম বুঝি না। সংবাদের মধ্যে যে ঘটনা, তাই কখনো সব না। নদী কেবল তরঙ্গে বয় না। তার তলার স্রোতের ধারা বহে কেমন টানে, কে জানে। তাই জিজ্ঞেস করি, 'তারপরে?'

ঝিনি ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করে, 'কীসের তারপরে?'

পাল্টা জিজ্ঞাসায় হঠাৎ জবাব দিতে পারি না। কেবল ওর চোখের দিকেই চেয়ে থাকি। ঝিনিও একটু তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। কী যেন ভাবে। তারপরে বলে, 'জানি নে। খালি এইটুকু বলতে পারি, ওকে আমার মনে পড়ে। কিন্তু আমি যেন নিজেকেই চিনতে পারি নে। তখনকার সেই "আমি"-কে। কেন যে ওর এত বাধ্য হয়েছিলাম, কেন যে কেবলই ওর কাছে কাছে থাকতে ইচ্ছে করতো, কখনো বুঝে উঠতে পারি নি। ভালবাসা?'

যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করে। নিজের কাছেই জবাব চায়। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'জানি নে। তাও জানি নে। সব ঘটনা যেন ভাল করে মনে করতেও পারি নে। ওকে যত মনে পড়ে, ঘটনার কথা তত নয়। যেন একটা আবছা ঝাপসা মত কিছু। কী যেন ঘটেছিল, কী যেন হয়েছিল। মনে মনে অনেক খুঁজি। কিছু একটা খুঁজে পাই নে। তারপরে তো আর কিছু জানি নে।'

বলে ঝিনি আমার দিকে চায়। চোখে আর ঠোঁটে এমন এক হাসি, যেন আমাকেই জিজ্ঞেস করে, কিছু জানা আছে কিনা। দেখে এমন অসহায় লাগে, হঠাৎ অবুঝ একটা কষ্ট বিঁধে যায়। চোখ ফিরিয়ে চাই দোপাটিয়ের ওপারে। মনে মনে আবার বলি, কলঙ্কিনীর আড়ালে সেই যায়। চিরদিনের অন্তর কলসী, ভেসে চলেছে। শুধু কলসীর শব্দ থাকে, বয়ান থাকে না। [illegible] 'ভাসাতে চলেছি।' [illegible] সে কী বলবে।

'আমি খারাপ, না?'

কথা শুনে চমকে উঠি। মুখের দিকে চেয়ে বলি, 'না তো।'

ঝিনি হেসে মুখ নামায়। তার আগেই একটু রঙের ছোপ লেগে যায় মুখে। তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। শুভেন্দুর অপরাধ কী? তার আগে বল, ধন না, বিত্ত না, মান গ্রহণ বর্জন না। একে দেখে, মন প্রাণে ধন দেয় কোন্ জন। সেখানে কে অপরাধী, কে নয় তার কোন বিচার নেই। এখানে হেতু-সেতু কার্য-কারণে অন্বেষণ। বন্ধন চলে না।

আমি ঝিনির দিকে দেখি। যত বিরতই হই, যত আড়ষ্ট লাগুক, সহসা যেন মনেতে কী এক সুর বেজে যায়। বিস্ময় যত লাগে, মুগ্ধবোধের টানে ভেসে যাই তার চেয়ে বেশী। কোন পথে পথে ফিরি, কিসের সন্ধানে, তার নাম ধাম জানি না। কিন্তু এ যেন এক অচিন চেনার কূলে দাঁড়িয়ে প্রাণ গলে যায়। মানুষ চিনি কতটুকু, দেখি কতখানি। তার বন্ধ দরজার চাবি নিয়ে ফিরি না। কুলুপের হদিস জানা নেই। কার হাতে চাবি, কে খোলে, কেমন করে, কে জানে। যখন খুলে যায়, তখন মুগ্ধ প্রাণে দু চোখ মেলে চেয়ে থাকি। আর কী খুঁজি, জানি না, এইটুকুই পাওনা।

মানুষ দেখতে বেরিয়েছি, সে হলফ আমার নেই। কিন্তু আমার চোখের কূল জুড়ে তার মেলা। আমার সকল আস্বাদনের স্বাদে স্বাদে ভাসা। যেন, আপনি সুরা হয়ে নেশা ধরিয়ে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়; মনে হয়, এই পরম পাওনা।

ঝিনি কেন বলেছে, সে ভাবনা ওর। আমার ফেরা এই পাওনা পাখায় নিয়ে উড়ে যাওয়া।

ঝিনি হঠাৎ ফিরে তাকায়। সাজানো মুখে ভুরু তুলে বলে, 'কী?'

বলি, 'কিছু না। এবার ফেরা যাক।'

'তাড়া আছে বুঝি?'

'তাড়া আমার না। মাঝ-আকাশ ধরতে যাওয়া সূর্যের তাড়া। হাতে-বাঁধা ঘড়ির তাড়া। কিন্তু সে কথা ঝিনিকে বলা বৃথা। ওর ওঠবার কোন লক্ষণ নেই। কেবল একবার ঘড়ির দিকে তাকাই। সেটা লক্ষ করে ও বলে, 'ওটা তো চিরদিনই দেখতে হবে, এখন থাক না। কিন্তু আমার কথা শুনে কী মনে হল বললেন না তো।'

বলি, 'এমন আর কখনো শুনি নি।'

'খুব খারাপ, না?'

'এর খারাপ ভাল জানি না।'

'তবে?'

বলতে গিয়ে বাধে। তবু বলি, 'কষ্ট হয়।'

ঝিনি মুখ ফিরিয়ে নেবার আগে একবার আমার চোখের দিকে তাকায়। একটু চুপ করে থাকে। তারপরে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'চলুন যাই।'

কিন্তু ওর চোখ দুটো এখন টলটলানো।

বলে চোখ দুটো আধ-বোজা করে আমার দিকে চায়। ঝিনি চকিতে একবার আমার দিকে চায়। গোকুল বিন্দু সুজয়, সবাই হেসে ওঠে।

এই হাসির মুখে ভিন্ন কথা বলি, সে সাহস নেই। এই উৎসবের রঙে বাধা দিই, সে ক্ষমতা নেই। বরং দেখি, গোপীদাস দাড়ি কাঁপিয়ে হাসে আমার দিকে চেয়ে। আর একটু একটু ঘাড় নাড়ে। রাধা বদ্ধা ওদিকে রান্না দেখতে যায়। আর গোপীদাস্ নতুন সুর ধরে দেয়,

'ও ভোলা মন, মন চিনা তোর
ধ্যানে ঘাপটি মারে।
ফরে রে অধরা শিকার, ধরার ঘরে
ভাঙতে চাঁদ লেখে রে।'...

সুজয় গোকুল একসঙ্গে 'জয় গুরো' ধ্বনি করে। ওদিক থেকে রাধা বদ্ধা ফোকলা দাঁতে হাসে। বলে, 'ঠিক বইলছ গোঁসাই।'

বিন্দু ওদিকে সুজয় গোকুলের মধ্যখানে খিলখিলিয়ে বাজে। ঝাঁপিয়ে খানখান শরীর — এক পাশে ঠেলে গোকুলকে, আর বাঁকে সুজয়কে।

গোপীদাসের গানের কথা সঠিক বুঝি না। কিন্তু ঝিনিদিদি আর — তার আমাকে চিত্ত বলে ঠাট্টার কথা মনে পড়ে যায়। তার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারি না। তার দাড়ি কাঁপে, ভুরু নাচে, চোখে উঠানে চাহনি। দেখে আড়ষ্ট লাগে, লজ্জা করে। চোখ নেমে যায়। গোপীদাস ঘড়ঘড়ে গলায় তেমনি করেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান করে,

'এ চিত্ত দেখলে চেনা যায় না গ,
লয়ন চুলে গোঁফ ধসানো রে।
পীত বসনে ঢাকা দিয়ে, মোহন হেঁইসে
বড় লাজ বিশিষ্ট থাকে রে।'...

এদিকে সুজয় গোকুলের হাততালি লেগে গিয়েছে। বিন্দুর প্রেমজাহির ঝিনঝিনি। আর গোপীদাস যেন চোর ধরা দারোগার মত আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ে। হাঁক দিয়ে তেজনার মনকে ডেকে নতুন কথায় সুর জোড়ে,

'এ চিত্ত চলে, নাক নাড়ে, অবশ্যা
পড়িয়েছে
আওয়াজ করে না রে।
শিকার করে, চুপিসাড়ে, তখন দেখ উঁহু'
গেয়ান
শিকার ধ্যানে ধ্যান আবেশ রে।'...

গোপীদাস কোমর দুলিয়ে পাক মারে। তারপরে ধপাস করে বসে আমার সামনে। ঝিনিকে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন লাইগল গোঁসাইদিদি।'

ঝিনির গলায় যেন মিঠে লজ্জায় সুধা উপচালো। বলে, 'সুন্দর।'

বিন্দু বেজে ওঠে হাসিতে। গোপীদাস বলে, 'লাইগতে হবে, লাইগতে হবে। যেমন চিত্ত, তার তেমনি গান। জয় চিত্তধারী!'

আবার হাসি বাজে সকলের। আর আমার দিকে চেয়ে গোপীদাস চোখ ঘোরায়। তার অর্থ বুঝি। কিন্তু আমার কথা বলতে পারি না। কেবল অসহায় হয়ে একবার ঝিনির দিকে তাকাই।

গোপীদাস এবার ভিন্ন সুরে বলে, 'অই গ বিন্দু, রাধা তো খালি ভাতটার রাঁধে। একবার ডালে চালে হাঁড়ি দিলা। বাবাজী আর দিদির সঙ্গে খাব।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না, না, তা হবে না।'

ঝিনিও বলে ওঠে, 'খাওয়া থাক, অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

গোপীদাস ভুরু তুলে চোখ পাকিয়ে একবার আমাকে দেখে। আবার ঝিনিকে। তারপর রাধার দিকে চেয়ে বলে, 'অই, ই দুজোতে যে এক দোখ গ!'

এতক্ষণে গোকুল আবার মুখ খোলে, 'এক সুরেতে বাজে।'

সবাই হেসে ওঠে। তার মধ্যে সব থেকে হাসি-খুশির জো সার গোপীদাসের। বলে, 'কিন্তুক, হালে বড় সুখ পেলাম।'

ঝিনি বলে, 'কাউকে বলে আসি নি তো।'

গোকুল আবার মুখ খোলে, 'তাই কি আবার কেউ বইলে আসে?'

আসরের প্রথম থেকেই যে দিকে চাল লেগেছে, সব সে দিকেই বহে। ঝিনি মুখ নামিয়ে নেয়। আমি জিজ্ঞেস করি গোপীদাসকে, 'কিন্তু মেলা ছেড়ে আজ এখানে কেন?'

গোপীদাস মাথার চুলের ঝুঁপসিতে আঙুল চালিয়ে বলে, 'আজ ত কী সব হচ্ছে উখানে, ইল্লি দিল্লি থেকে মন্ত্রীর কত্তারা সব এইসেছেন। তাই ভাবলাম কী যে, এ বেলাটা কোপাইয়ের বনে যেয়ে, চালে ডালে ফুটিয়ে খেয়ে আসি।'

সরল উক্তি। সাতে নেই, পাঁচে নেই। তোমরা থাক গিয়ে মন্ত্রী কর্তা নিয়ে। সেখানে আমাদের আসর নেই। তার চেয়ে নদীর ধারে, বনের নিরালায় একটু কাটিয়ে আসি। আগুন জ্বালো, পাক কর, ভোজন সারো এখানেই।

আবার চোখ ঢুলুঢুলু করে বলে, 'আটে-ঘাটে তো কাটে বাবাজী। খাঁচায় থাকতে পারি না। তা হাঁ বাবাজী, এ মেলার পরে যাওয়া হবে কুথা?'

আমি বলি, 'ইচ্ছা আছে নানুর যাব।'

গোপীদাস যেন অবাক হয়ে যায়। সকলের সঙ্গে চোখাচোখি করে। তারপরে বলে ওঠে, 'জয় গুরো, জয় গুরো। মনের কথা বইলেছেন যে গ। আমরাও তো ফিরতি পথে নানুর হয়ে যাব।'

'তাই নাকি?'

'হঁ বাবাজী।'

বিন্দু বলে ওঠে, 'সে বেশ হবে। আর ঝিনিদিদি যাবে না?'

ঝিনির মুখে ছায়া ঘনায়। বলে, 'জানি নে। আমার সঙ্গে লোক আছে যে। বলতে পারি নে।'

কথা শেষের আগেই সে একবার আমার দিকে চায়। আমি গোপীদাসের দিকে। গোপীদাস বলে, 'আমি বাবাজী, দিদিকে নিয়ে আপনি আসেন। তখন দেখব থাকে কি না দেখি কোন আছে?'

হেসে বলি, 'ওঁর সঙ্গে যে লোক আছে।'

বিন্দু বলে, 'সবাই যাবে, তাতে কী।'

ঝিনি বলে, 'দেখা যাক।'

বলে সে উঠে দাঁড়ায়। আমিও দাঁড়াই। গোপীদাস বলে, 'ও বেলা আবার মেলায় দেখা হবে।'

রাধা বদ্ধা ছাড়া সবাই একটু এগিয়ে আসে আমাদের সঙ্গে। গোপীদাস সহসা পিছন থেকে গেয়ে ওঠে, 'দুয়ে যুগল, একে হেরি, মরি মরি।'...

ঝিনির মুখের লাল ছোপ আরো গাঢ় হয়। কিন্তু চোখ হঠাৎ চলচলিয়ে ওঠে।

আমি কথা বলতে পারি না। পিছনে শোনা যায়, 'জয় গুরু, জয় গুরু।'

ক্রমশ

বংশগতির বাহন কে?

ছেলেমেয়েরা বাপ মায়ের মত দেখতে হয়, তাদের মধ্যে আরো নানা ব্যাপারে, আচার ব্যবহারের মিল পাওয়া যায়। এই বংশগতি বা বংশের ধারার বাহন কে? সবাই জবাবে বলবেন, পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ। কিন্তু ঐ বীজগুলির উপাদান তো শুধু একটি নয়? প্রতিটি বীজ বা কোষের মধ্যে আছে একটি কেন্দ্রীণ বা নিউক্লিয়াস, আর আছে রস-জাতীয় পদার্থ সাইটোপ্লাজম। আবার প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে একটি করে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিওপ্লাজম। এই যে আজ প্রায় ৩০০ বছর ধরে জীবতাত্ত্বিকদের মধ্যে এই নিয়ে তর্ক চলেছে যে, বংশগতির আসল বাহন কে, পুরুষবীজ না স্ত্রীবীজ। এই তর্ক যখন শুরু হয়েছিল তখন অণুবীক্ষণের এত উন্নতি হয় নি। তার দ্বারা কোষগুলিকে ফাঁকা মৌচাকের খোপের মত দেখাত। কিন্তু তা হলে কি হবে। তখনই কীটাণুর সমর্থক ও ডিম্বাণুর সমর্থকদের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল মতামতের না 'প্রতিযুদ্ধ'। প্রথমোক্তরা বিশ্বাস করতেন যে, শিশু পুংবীজ থেকেই তার বংশগতি লাভ করে। আর শেষোক্তরা জোর গলায় রুখে দাঁড়িয়ে বললেন যে, না, ভ্রূণ তার বংশের ধারা লাভ করে স্ত্রীবীজ বা ডিম্বাণু থেকে। ঝগড়াটা প্রথমে এই স্তরে ছিল। তারপর সেটা আরো একটি দিকে সম্প্রসারিত হল উনবিংশ শতাব্দীতে নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের পরে। একদল বললেন, নিউক্লিয়াসই বংশগতির বাহন। অন্যেরা তা অস্বীকার করে বললেন যে, না সাইটোপ্লাজম বংশগতির ধারক ও বাহক।

সোভিয়েট বিজ্ঞান একাডেমীর সাইবিরীয় শাখায় প্রতিষ্ঠিত এই ইলেকট্রনিক অনুবীক্ষণে জৈব কোষের ভিতরকার ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই যন্ত্রে যে কোন জিনিস ৩ লক্ষ গুণ বড় দেখায়

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শুরু হয়ে গেল এই নিয়ে গবেষণা। বংশের যে সব ধারা লাভ করে শিশু মা বা বাবার মত হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন, সেগুলি নিউক্লিয়াসই বহন করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা বললেন যে, অধিকাংশ কীটাণুর (পুংবীজ) প্রায় সবটুকুই যখন নিউক্লিয়াস তখন বংশগতিটা বাপের দিক থেকেই প্রধানত শিশু লাভ করে।

কিন্তু সাইটোপ্লাজমের সমর্থকরা জবাব দিলেন যে, প্রধানত মানে সবটা নয়, কিছুটা বাকি থেকে যায়; কারণ, প্রধানত মানে সম্পূর্ণত নয়।

যাই হোক এখনো পর্যন্ত কেউই নিশ্চিত-ভাবে প্রমাণ করে দেখাতে পারেন নি যে, বংশের ধারা পরিবহণে কার ভূমিকা সবচেয়ে বড়—নিউক্লিয়াসের, না সাইটোপ্লাজমের। কাজটা তো সহজ নয়। বেশ বড় একটি মানুষের ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের ব্যাস হচ্ছে ১ মিলিমিটারের ১০ ভাগের ২ ভাগ এবং সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও অন্যরকম বিভিন্ন মিলিয়ে তার ওজন ১ গ্রামের লক্ষ ভাগের ,

১ ভাগ। আর তার ঘনমান হচ্ছে ১ ঘন মিলিমিটারের ১ শতাংশ। এইটুকু জিনিসের মধ্যে নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমকে আলাদা করে নিয়ে দুটিকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করা কি সহজ ব্যাপার? এরকম ব্যাপারের উত্থাপন করতে গেলে লোকে বলবে, লোকটার মাথার ঠিক নেই।

কিন্তু সোভিয়েট বিজ্ঞানাচার্য বোরিস আস্তাউরফ এবং প্রায় একই সময়ে আমেরিকা ও জাপানের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ঐ ধরনের পরীক্ষা চালান। তিনটি জায়গা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, বংশগতির বাহন হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং এ ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজমের ভূমিকা নগণ্য বললে কিছু অন্যায় হবে না।

আচার্য আস্তাউরফের লক্ষ্য হল এটা দেখা যে, কোষের গড়ন বাড়ন কার উপর প্রধানত নির্ভর করে—নিউক্লিয়াসের উপর না সাইটোপ্লাজমের উপর। তিনি দেখালেন যে, তিনি যদি নিউক্লিয়াসকে একেবারে বাদ দিয়ে সাইটোপ্লাজম নিয়ে কাজ করতে এবং সাইটোপ্লাজমকে বাদ দিয়ে নিউক্লিয়াস নিয়ে কাজ করতে পারেন তা হলে আসল প্রশ্নের জবাব কোষ নিজেই দেবে।

আচার্য আস্তাউরফ গুটিপোকার ডিম নিয়ে তাঁর পরীক্ষা আরম্ভ করলেন, কোন ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসকে পুংবীজের নিউক্লিয়াসের দ্বারা নিষিক্ত করে নয়, একটি পুংবীজের নিউক্লিয়াসকে আর একটি পুংবীজের দ্বারা নিষিক্ত করে। কথাটা শুনে খুব আশ্চর্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আস্তাউরফ সেই পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেন। তিনি রাসায়নিক কৌশলের দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, ডিম্বাণুকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যায়, যাতে তার নিউক্লিয়াস নষ্ট হয়ে গিয়ে সেই জায়গায় দুটি পুং নিউক্লিয়াসের আবির্ভাব ঘটে। সেই দুটির একটি বদলে গিয়ে স্ত্রী নিউক্লিয়াসের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং অন্যটি তাকে নিষিক্ত করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় "উৎপাদিত অ্যান্ড্রোজেনেসিস"।

ঐ ধরনের অ্যান্ড্রোজেনাস বাচ্চা তৈরি করার চেষ্টা আগেও হয়েছে, যার কোষের সাইটোপ্লাজম আসবে মায়ের দিক থেকে এবং নিউক্লিয়াস আসবে বাপের দিক থেকে। যাঁরা ঐ ব্যাপারে নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন থিয়োডোর বোভেরি, অস্কার ও রিচার্ড হার্টউইগ ও টমাস হান্ট মর্গান। কিন্তু তাঁরা সফলকাম হতে পারেন নি। পেরেছেন শুধু আস্তাউরফ অসমসত্ত্ব (হেটারোজিনাস) ও সমপ্রজাতির মধ্যে অ্যান্ড্রোজেনোসিস ঘটাতে।

গুটিপোকা থেকে একটি প্রজাতির স্ত্রী-পোকা এবং অন্য প্রজাতির পুরুষ পোকা বেছে নিয়ে আস্তাউরফ শুরু করেন তাঁর পরীক্ষা। ডিম পাড়ার ৯০ মিনিট পরে নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলিকে ১৩৫ মিনিট ৪০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে রাখা হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণুর উপর উত্তাপের প্রভাব পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুংবীজের নিউক্লিয়াস স্ত্রীবীজের ডিম্বাণুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তার সঙ্গে মেশবার জন্য। কিন্তু ঠিক সেই সময় উত্তাপে ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় [illegible] নিউক্লিয়াসটির আর অন্য কোন উপায় থাকে না [illegible] বাচ্চাগুলি যখন বড় হল দেখা গেল যে, তাদের নিউক্লিয়াসগুলি শুধু অন্য বাপের বংশগতি বহন করছে। কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজমের ঘনমান নিউক্লিয়াসের তুলনায় হাজার হাজার গুণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও সেই সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সুতরাং জয় হল নিউক্লিয়াসওয়ালাদের।

এর পর আস্তাউরফ উদ্যোগী হলেন ডিম্বাণুর উপর বিকিরণের প্রভাব পরীক্ষা করে ঐ গুটিপোকার ডিম ব্যবহার করেন। এই ক্ষেত্রেই দুটি অভিমত ছিল। এক দল বলছিলেন যে, বিকিরণ নিউক্লিয়াসের চেয়ে সাইটোপ্লাজমের অনেক বেশী ক্ষতি করে। অন্য দলের বক্তব্য ঠিক বিপরীত। এ ক্ষেত্রেও আস্তাউরফ পরীক্ষার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন যে সাইটোপ্লাজমের তুলনায় নিউক্লিয়াস অনেক অনেক বেশী সংবেদনশীল—বিকিরণ সাইটোপ্লাজমের তুলনায় নিউক্লিয়াসের হাজার হাজার গুণ বেশী ক্ষতি করে। ৫ লক্ষ রন্টজেন বিকিরণ প্রয়োগ করে তিনি দেখালেন যে, বহু কোষের সাইটোপ্লাজম ধ্বংস হল না কিন্তু তার হাজার গুণ কম বিকিরণে ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। আস্তাউরফ আজ একজন বিশ্বস্বীকৃত বিজ্ঞানী। বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন এবং তাঁর এই গবেষণা রেশম শিল্পের উন্নতির সহায়ক হবে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দোকানের শো-কেসে, অসংখ্য খেলনার মধ্যে দাঁড়িয়ে—'Jul Toute' বা ক্রিসমাস বুড়ো

ছোটখাট জিনিস—যেমন ছোট একটা বই বা এক জোড়া মোজা কি এক বাক্স চকোলেট, সুন্দর করে বেঁধে দিলেই সকলে সন্তুষ্ট থাকত। এখন অবশ্য লোকে কি জিনিস পেল সে দিকে যতটা নজর না দেয়, তার চেয়ে বেশী নজর দেয় জিনিসটার দামের ওপর। আজকাল কার কোট, সোনার ঘড়ি বা গয়না, মুক্তার নেকলেস, রুপোর চা বা কফি সেট, না হয় ফ্রিজিডেয়ার, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি ছাড়া কেউ কথা বলে না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যদিও খেলনাই সাধারণত পায়, তবু তাদেরও হিসেব থাকে, কোন খেলনার কত দাম। তাই দামী 'ওয়াকী টকী' পুতুল বা ইলেকট্রিকাল মোটর গাড়ি বা রেলগাড়ির ট্র্যাক, না হয়ত স্কেটিং ও স্কিইং এর দামী সরঞ্জামের খোঁজে মাসী পিসীরা দোকানের পর দোকান চষে বেড়ায়। আগে নিয়ম ছিল যে, কি উপহার পাবে সেটা যেন কারো জানা না থাকে। আজকাল অনেকে কি কি চায় তার লম্বা তালিকা উপহার-দাতাদের কাছে আগে থেকেই পাঠিয়ে দেয়। তাই নতুন জিনিস পাবার মধ্যে পুরোন কালের শিহরণ না থাকলেও আকাঙ্ক্ষিত জিনিস পাবার সন্তুষ্টি আছে। উপহার পছন্দসই না হলে ক্রিসমাসের পর দোকানে গিয়ে তা ফেরত দিয়ে সেই দামে বা তার ওপরে অল্প কিছু দিয়ে নিজের ইচ্ছামত জিনিস কেনার ব্যবস্থা সব দোকানেই থাকে। তাই ক্রিসমাসটা সকলের পক্ষেই লাভের সময়।

ক্রিসমাসে শুধু উপহার কেনার হাঙ্গামাটা কাটিয়ে উঠলেই যে সব কাজ শেষ হল তা নয়। বলতে গেলে তখন কাজ শুরুই হয়নি। ঘরে ঘরে মেয়েদের অসম্ভব কাজ পড়ে। বাইরের কাজ করে এমন কি অনেকে সারা দিন বাইরে চাকরি করে কি করে যে সব কাজ ক্রিসমাসের মধ্যে সুন্দর ভাবে শেষ করে সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। প্রথমত বাড়ি ঘর সব ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত ঝেড়ে পুঁছে, তকতকে, ঝকঝকে করতে হবে। প্রতিটি ঘর পালিশ করে বড় বড় কাচের জানালাগুলি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পর্দা টাঙাতে হবে। অনেকে এই সুযোগে নতুন পর্দাই কিনে ফেলে। ক্রিসমাসে ঘর সাজাবার নানা সরঞ্জাম আগের বছরে যেখানে গুছিয়ে তুলে রাখা হয়েছিল, সেগুলি বার করে পরিষ্কার করতে হবে। এই সব জিনিসের মধ্যে প্রধান স্থান মোমবাতির আধারগুলির। সাধারণত এগুলি কাঠের বা পেতলের হয়, এবং চারটি মোমবাতি ধারণ করার ব্যবস্থা এগুলিতে থাকে। ক্রিসমাসের বারো সপ্তাহ আগে এগুলি বার করে সাজানো নিয়ম। প্রতি রবিবারে একটি করে মোমবাতি কিছুক্ষণের জন্যে জ্বলে, ও ক্রিসমাসের ঠিক আগের রবিবারে চারটি মোমবাতি একসঙ্গে জ্বালিয়ে আগমনী-বার্তা প্রচার করা হয়। এই মোমবাতিগুলির নামও Advent Candles। সাধারণত মোমবাতিগুলি ঘরে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে একটু বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তাই আজকাল ইলেকট্রিক-এর আলো বা বাতি জ্বালার নিয়ম প্রচলিত হয়েছে। প্রতি ঘরে ঘরে, জানালায় নবেম্বরের শেষ থেকে এই বাতিগুলি অন্ধকারের রাত্রে পথিকের পথ আলোকিত করে। বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়িগুলি আলোয় ঝলমল করে ও গাঁয়ে ছোট ছোট কুটিরগুলিতে এই দীপশিখা-গুলি নির্জন আঁধারে জনপ্রাণী বসতির চিহ্ন ছিটিয়ে দেয়। অনেক বাড়িতে আবার এই চার সপ্তাহ ধরে জানালায় মস্ত সোনালী বা রুপোলী ইলেকট্রিকের তারা টাঙিয়ে দেয়, যেগুলিকে এখানে 'Advent Star' বলা হয়। রাস্তায় রাস্তায় আলো দেওয়া অবশ্য পৌরসভার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। দোকানের মালিকরা নিজেদের দোকানগুলিও খুবই সুরুচিপূর্ণভাবে সাজায়। স্টকহলমের নানা সেতু আলোর মালায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বড় বড় চৌমাথাগুলিতে বিরাট Christmas Tree বসানো হয়, সেগুলির চূড়া বড় তারায় ও ডালগুলি ইলেকট্রিকের বাল্ব দিয়ে সজ্জিত হয়।

কিন্তু এ সবই ক্রিসমাসের প্রত্যাশামাত্র। ক্রিসমাস আসতে তখনও এক মাস বাকি। শিশুদের মন আর কিছুতেই যেন ভোলে না, তারা ক্রিসমাসের জন্যে অধীর হয়ে ওঠে। বোধ হয় বিশেষ করে বাচ্চাদের মন ভুলিয়ে রাখার জন্যে সুইডেনে Advents Calendar-এর প্রথা প্রচলিত আছে। একটি রঙীন ছবি দিয়ে এই ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়, যার মধ্যে ২৪টি ছোট ছোট বন্ধ জানালা থাকে। এই জানালাগুলির ওপর ১ থেকে ২৪ অবধি তারিখ লেখা থাকে। ডিসেম্বরের প্রতিদিন তারিখ হিসেবে একটা করে জানালা খোলা হয়, আর তার ভেতর সাজানো, পাওয়া যায় কোন গুপ্তধনের সন্ধান, অর্থাৎ কয়েকটি ক্রিসমাসের উপহারের নমুনা। ২৪ ডিসেম্বর, অর্থাৎ ক্রিসমাসের আগের দিন সবচেয়ে বড় জানালাটা খোলা হয়, আর তার মধ্যে প্রতি বছরই দেখা দেয় যীশুখৃষ্টের শিশুমূর্তি।

ডিসেম্বরে ক্রিসমাসের প্রস্তুতির মন-মাতানো আবহাওয়ার মধ্যে আসে বছরের শ্রেষ্ঠ দিন, তার গুরুগম্ভীর পরিবেশ নিয়ে —১০ই ডিসেম্বর 'নোবেল দিবসে'। ওই দিন বছরের নির্বাচিত বিশ্বের প্রধান বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও সাহিত্যিক সম্মিলিত হন স্টকহলমে সুইডেনের রাজার হাত থেকে তাঁদের নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করার জন্যে। এ বছর পদার্থবিদ্যায় পুরস্কৃত আমেরিকান

প্রফেসার হান্স বেথে, রসায়নে পুরস্কৃত ইংল্যান্ডের প্রফেসারদ্বয়, রোলান্ড নরিশ ও জর্জ পোর্টার এবং জার্মানীর প্রফেসর মানফ্রেড আইগেন, দুই আমেরিকান চক্ষু-চিকিৎসক প্রফেসার হালদান হার্টলাইন ও প্রফেসার জর্জ ওয়াল্ড ও সুইডিশ চিকিৎসক প্রফেসার রাগনার গ্রানীট এবং গুয়াতেমালার প্যারিসে স্থিত সাহিত্যিক রাজদূত সেনর মিগয়েল আস্তুরিয়াস, তাঁদের পরিবার-পরিজনসহ স্টকহলমে নোবেল দিবস সুশোভিত করেছিলেন।

বছরের অন্ধকারতম ও দীর্ঘতম দিনে সুইডেনের প্রতি ঘরে ঘরে, স্কুলে অফিসে কারখানায় দোকানে হাসপাতালে আসে 'লুসিয়া' অর্থাৎ আলোকের দেবী স্বয়ং। এই Santa Lucia-র বসনের বৈশিষ্ট্য—গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা সাদা গাউন, লাল রঙের কটিবন্ধে বাঁধা, মাথায় জ্বলন্ত মোমবাতির মুকুট। লুসিয়ার হাতে থাকে এক ট্রে-ভর্তি কেক ও বিস্কুট, এক পট কফি। শীতের চরমদিনে সুইডিশ মানুষের কাছে এই হল লুসিয়ার দান—ক্ষুধা নিবারণের জন্যে খাবার ও তিমির মোচনের জন্যে মোমবাতির আলো। তিমিরাবৃত সুইডেনকে আলোকিত করার জন্যে, পরনে সাদা পরিচ্ছদ, লুসিয়ার চুলও সাধারণত হালকা সোনালী রঙের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সব দিক দিয়েই আঁধারকে এড়িয়ে চলে সান্তা লুসিয়া। ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে সান্তা লুসিয়া আবির্ভূতা হন সুইডেনে। পুরান কালের দিনপঞ্জী হিসাবে ১৩ ডিসেম্বর ছিল বছরের সবচেয়ে ছোট দিন। যদিও বর্তমানে ২২/২৩ ডিসেম্বরই বছরের ক্ষুদ্রতম দিন বলে পরিচিত। অবশ্য ১৩ ডিসেম্বরকে সবচেয়ে ছোট দিন বললেও খুব ভুল হবে না, কারণ ১৩ বা ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে দিনালোকের বিশেষ কোনও তারতম্য কারও দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব। কেবল আবহাওয়া অফিসেই সঠিক জানা যায় যে, ১৩ থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ক' মিনিটের ক্ষীণ আলোক লুপ্ত হল। তাই আজও লুসিয়া দিবস ১৩ ডিসেম্বরেই পালন করা হয়। ওইদিন সুইডেনে যতগুলি লুসিয়ার স্থানে স্থানে আবির্ভাব হয়, তার মধ্যে বোধ হয় ঘরের ছোট্ট মেয়ের অংশটাই বিশেষ মোহনীয়। ১৩ ডিসেম্বর ভোরে লুসিয়া নাটিকায় বাড়ির সকলেরই নির্দিষ্ট অংশ থাকে। বাবার কাজ হচ্ছে ঘুমের ভান করে চুপটি করে বিছানায় শুয়ে থাকা। পাশের ঘরে যে মা মেয়েকে 'লুসিয়া' সা ছোট ছেলেদের একটি টুপি পরিয়ে ও হাতে মোমবাতি ধরিয়ে দিয়ে লুসিয়ার সঙ্গী সাজাতে ব্যস্ত, সে দিকে বাবার মনোযোগ দেবার কোনই প্রয়োজন নেই—যদিও ট্রেতে কাপ-প্লেট সাজানোর আওয়াজ কানে আসে ও টাটকা কফির গন্ধে সারা বাড়ি ভরে ওঠে। ধীরে ধীরে লুসিয়ার শোভাযাত্রা অগ্রসর হয় শোবার ঘরের দিকে। একটু উঁকি মেরে দেখে নিতে হয় বাপ সত্যি ঘুমিয়ে কিনা। তারপর গলার স্বর ঠিক করে নিয়ে গান শুরু হয়—

'চারিদিকে আজ নিবিড় অন্ধকার,
বিদায় নিয়েছে দিনমণি,
আঁধার ঘরে আজ এসেছে
আলোকের দেবী
সান্তা লুসিয়া, সান্তা লুসিয়া!'
ইত্যাদি

বাবা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে জেগে ওঠেন। মুখে গান ও হাতে ট্রে ভর্তি খাবার ও কফি নিয়ে মেয়ে তার বাবাকে প্রথম কাপ কফি দিয়ে আপ্যায়িত করে। তারপর সকলে একত্রে প্রাতরাশ সারে। মোমবাতির মুকুট একটু বিপজ্জনক তাই আজকাল অনেকেই ইলেকট্রিক বাতির মুকুট ব্যবহার করে। আজকাল লুসিয়া নিয়ে কিছু বাড়াবাড়িও হয়। স্টকহলমে একজন লুসিয়া নির্বাচিত হয় তার সৌন্দর্য অনুসারে, তাকে নিয়ে শহরে শোভাযাত্রা বার হয়, যার মধ্যে পুরোন কালের ঐতিহ্যের কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে প্রতি পরিবারে 'লুসিয়া' উৎসব আজও মধুরভাবে সম্পন্ন হয়।

সুইডিশ-ঘরে সব উৎসবই পালন করা হয় আগের দিন রাত্রে। মিডসামারের আগের রাত্রে যেমন নাচে-গানে সুইডিশ মন ভরে ওঠে, ঠিক সেভাবেই এই মিডউইন্টার দিবস বা ক্রিসমাসের আগের রাত্রে, অর্থাৎ ২৪ ডিসেম্বরেই খুব হইচই করে ক্রিসমাস উৎসব পালন করা হয়। অবশ্য এর ফলে সুইডিশ-ঘরনীরা ক্রিসমাসের তোড়জোড়ের ব্যবস্থায় একদিন কম পায়। ক্রিসমাসের জন্যে তৈরি শুরু হয় ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই, আর লুসিয়া দিবসের পর থেকে এমন দ্রুতবেগে চলে যে, কেউই প্রায় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে না।

ক্রিসমাসের ভোজটাই এখানে ক্রিসমাস পালনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর তৈরিতেই ঘরনীদের অর্ধেক সময় কেটে যায়। ক্রিসমাসে টেবিলে অফুরন্ত খাবার সাজিয়ে দেওয়াটাই নিয়ম। এর মধ্যে ক্রিসমাস 'হ্যাম' না থাকলেই নয়। এক-একটি পরিবার প্রায় ১৫/২০ কিলো হ্যাম কেনে। ক্রিসমাসে নানা আত্মীয়-অতিথিরা খেয়ে যা বাঁচে তা পরে বেশ কিছুদিন স্যাণ্ডউইচে চালিয়ে নেয়। এ ছাড়া ক্রিসমাসে এক রকম মাছ খাওয়া সুইডেনে প্রচলিত আছে, যেগুলি গরমকালে শুকিয়ে রাখা হয় এবং ক্রিসমাসের ১৫ দিন আগে থেকে ভিজিয়ে ক্রিসমাসের দিন এক বিশেষ 'সস' দিয়ে খাওয়া হয়। মাছের কোনও স্বাদ বোঝা প্রায় অসম্ভব, সঙ্গে 'সস' থাকা তাই বিশেষ প্রয়োজন। টেবিলে এ ছাড়া নানা রকম মাংস, ভিনিগারে ভরানো মাছ ও বহু রকমের পনিরের সঙ্গে বিরাট পাত্র-ভরা সিদ্ধ আলু সব সময়েই থাকে। সঙ্গে খাবার জন্যে রুটি-মাখনও থাকে। যদিও সেটা নেহাতই আটপৌরে, তবুও ক্রিসমাসের জন্যে সুইডিশ-ঘরনীরা বিশেষ রুটি ঘরে তৈরি করে ও দোকানেও বিশেষ রুটি পাওয়া যায়। ক্রিসমাসের পোশাকী খাবারের সঙ্গে তাল রেখে ক্রিসমাসের টেবিল শোভিত করে। মিষ্টান্ন হিসাবে ক্রিসমাসে ভাতের পায়সমত খায়। পায়সের পাত্রে মাত্র একটি বাদাম থাকে, যার পাতে সেটা পড়ে, তার পক্ষে পরবর্তী বছরটা বিশেষ লাভবান হবে সেটাই সকলের বিশ্বাস। ডুমুর, খেজুর, আখরোট, বাদাম ইত্যাদিও ক্রিসমাসে খাওয়ার রেওয়াজ

'লুসিয়া' উৎসবে ঘরে ঘরে এই শোভাযাত্রার দৃশ্য দেখা যায়

তুষারাবৃত উত্তর সুইডেনের শীতকালীন দৃশ্য

খাছে। টাটকা ফল বা শাকসবজি খাওয়ার কোনও প্রথাই প্রায় নেই। ইংলণ্ডের মত 'টার্কি' খাওয়াটা আজকাল একটু জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শুধু ক্রিসমাস-ডের জন্যে রান্না করেই সুইডিশ মেয়েরা পার পায় না। যদিও ক্রিসমাস উৎসব তিন দিন পালন করা হয়, অর্থাৎ ২৪, ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর তবু তার জের চলে ২০ দিন ধরে। ১৩ জানুয়ারি ক্রিসমাস ট্রিকে ঘর থেকে বিদায় দেওয়া হয় এবং সেদিন পর্যন্ত অতিথিদের যাওয়া-আসা লেগে থাকে। তাই ঘরে তৈরি রকমারি কেক-বিস্কুটে ভাণ্ডার ভরে রাখা প্রয়োজন হয়। ক্রিসমাসের আগে রাতের পর রাত জেগে গৃহিণীরা নানা রকম খাবার তৈরি করতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে।

২৪ ডিসেম্বর আগমনের আগে আর সব কাজই সেরে ফেলা হয়, শুধু বাকি থাকে ক্রিসমাস ট্রি কিনে সাজানো আর সেটা কিছু কম কাজ নয়। যদিও সুইডেনের বনে বনে এ-গাছের ছড়াছড়ি, তবু গাছগুলি কিনতে বেশ দাম দিতে হয়। আগে থেকে কিনলে যদিও একটু সস্তা পড়ে, শেষ মুহূর্তে কিনতে গেলে যে-কোনও দামই বিক্রেতা চেয়ে বসতে পারে। তাতে আপত্তি ওঠার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, ক্রিসমাস ট্রি ছাড়া ক্রিসমাস পালন একেবারেই অচিন্তনীয়। কাজেই ক্রিসমাস ট্রি যখন কিনতেই হয় তখন যে-কোনও দামে রাজি থাকা দরকার। অবশ্য দাম অনুযায়ী ছোট-বড় নানা আকারের ক্রিসমাস ট্রি পাওয়া যায়। যখন এই গাছকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তার বিশেষ স্থানে দাঁড় করিয়ে, তাকে সাজিয়ে জ্বলজ্বলে করা সম্পূর্ণ হয়, তখনই ক্রিসমাসের প্রস্তুতি শেষ হয় বলা চলে।

বহু প্রত্যাশা পূর্ণ করতে শেষে আসে ক্রিসমাস ইভ। আত্মীয়স্বজনে বিভিন্ন বাড়িতে একটি বছরের পর পুনর্মিলন হয়। ঘরের সাজসরঞ্জাম, টেবিলে সাজানো মোমবাতির আলোয় আলোকিত খাবার, ঝলমলে ক্রিসমাস ট্রির তলে স্তূপাকার ক্রিসমাসের উপহার—সকলে হাসিখুশি মনে আনন্দ উপভোগ করতে তৈরি। গৃহিণীর পরিশ্রম সার্থক হয়ে চলে। সকলে হাত ধরে প্রথমে নাচ শুরু করে ঘরের মধ্যে, ক্রিসমাস ট্রি, খাবার টেবিল ঘিরে ঘিরে। সকলের সাথে ক্রিসমাস উপলক্ষে গাওয়া সংগীতের সুইডিশ গান। শেষ কিছুক্ষণ নাচের পর সকলেই খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্রিসমাসে এরা কি ভীষণ খায় তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। খাবার আগে ও পরে কিছুক্ষণ না নাচলে খাবার হজম করাই হয়ত অসম্ভব, তাই বোধ হয় সেটা ক্রিসমাস উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাবার পর উপহার খোলার উত্তেজনা। বাড়ির কেউ একজন সাদা দাড়ি-গোঁফ ও লাল পোশাক ও টুপি পরে সান্তাক্লসের কর্তব্য সারে। সান্তাক্লস সকলের কাছে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা-সহ উপহার বিলিয়ে দেয়। বাড়ির প্রত্যেকেই তাদের পছন্দ মত উপহার পেয়ে আনন্দিত। সেগুলি নিয়ে হাসাহাসি ও সেগুলির বিষয়ে আলোচনা করতে করতে রাত হয়ে যায় অনেক, এবং সকলেই সারাদিন ক্লান্ত বোধ করে, তবু এই দিনটাকে বিদায় দিতে কারো ইচ্ছা হয় না।

যদিও আর কদিন পরেই পুরোনো বছরকে বিদায় দিতে হয়, ক্রিসমাসের উৎসবাদি চলতে থাকে আরো কিছুদিন। নববর্ষে পদার্পণ করার আগের দিনও ঘরে ঘরে খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গানের ব্যবস্থা থাকে, তবে সে উৎসবের তুলনা ক্রিসমাসের প্রাণখোলা আনন্দের সঙ্গে করা চলে না। পুরোনো বছরকে বিদায় দিতে সকলের মন একটু বিষাদময় হয়ে ওঠে। বিগত বছরে হয়ত নানা সমস্যা ও অসুবিধা ভোগ করেছে অনেক বা হয়ত বহু মানুষের আশা বা মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি, তা হলেও বছরটা ছিল বহু পরিচিত, প্রতিদিনের সঙ্গী, তাই নববর্ষকে অভিনন্দন জানাতে সকলেই একটু ভীত, কিছু বা দ্বিধাগ্রস্ত। নতুন বছরে কার ভাগ্যে কি ঘটে কে জানে? রাত ১২টা বাজার কিছু আগে থেকেই পরিবারের সকলে টেলিভিশন ঘিরে বসে। গত বছরের বিশ্বের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার প্রতি বছরই দর্শকদের কাছে পরিবেশিত হয়ে থাকে। একজন বিখ্যাত সুইডিশ অভিনেতা বা অভিনেত্রী নববর্ষের বন্দনায় রচিত প্রসিদ্ধ কোন কবিতার অংশ পাঠ করতে করতেই রাত ১২টা বাজে। সুইডেনের প্রধান গীর্জাগুলির ঘণ্টা একের পর এক নববর্ষের শুভাগমনে বেজে ওঠে। পটকা বাজিতে আকাশ ভরে যায়, শুরু হয় আর এক বছরের।

৬ জানুয়ারি সুইডেনে প্রতি বছরই ছুটি। ক্রিসমাসের পর ১৩ দিন পূর্ণ হয়। ওইদিন, তার আগের রাত্রে, অর্থাৎ 'Twelfth Night' ক্রিসমাসের সমাপ্তিতে আর এক ভোজের পালা। ১৩ জানুয়ারির আগের কদিন ঘরে ঘরে শিশুদের মিলনের পালা। ক্রিসমাস ট্রির নানা প্রসাধন হরণ করা শিশুদের বিশেষ অধিকার। এরপর এক এক সকলের ক্রিসমাস ট্রি, ১৩ জানুয়ারির মধ্যে নিরাভরণ হয় এবং তার পরেই বাইরে বরফ পুড়ে সকলের স্মৃতি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আবার শুরু হয় স্বাভাবিক জীবনযাপন। দোকানে দোকানে বাড়িতে ঘরে উপহার কেনার তাড়া থাকে না, নানা রকম খাবার তৈরি করার ঝামেলা থাকে না। সকলে স্বেচ্ছায় দিন কাটাতে পারে, কি অদ্ভুত সুন্দর লাগে ভাবতে সকলের। কিন্তু সত্যি কি সুন্দর হয় জীবনটা? ক্রিসমাসের আলো যখন আর জ্বলে না, সব দোকানের, রাস্তা-ঘাটের সজ্জা যখন মুছে ফেলা হয়, সুইডেন তখন সত্যিই অন্ধকারে ডুবে যায়। [illegible] আলোর, ও সূর্যের এবং উত্তাপের আশা নিশ্চয়ই থাকে, তবে তা কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে কার্যকরী হবে তার হিসাব রাখা যায় না। যখন আবার বসন্ত ফিরে আসবে সুইডেনে, সঙ্গে নিয়ে আসবে ঝলমলে রোদ, কচি সবুজ পাতা, রঙ-বেরঙের কোমল ফুল—বসন্ত আসবেই, তার জন্যে অপেক্ষা করে যেতে হবে মাত্র—ধৈর্য ধরে।

কৃষ্ণা দত্ত

ছবিগুলি সুইডিশ ট্যুরিস্ট ট্রাফিক অ্যাসোসিয়েশনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

চিত্রম গ্যালারীর স্টুডিওতে অঙ্কনরত কয়েকটি ছেলেমেয়ে

প্রদর্শনীতে শিল্পী ১২টি নিদর্শন পেশ করেন।

রচনা পদ্ধতির দিক দিয়ে এচিং-এর সঙ্গে স্লেট খোদাইয়ের কিছু সাদৃশ্য আছে। তামা বা দস্তাজাতীয় ধাতুর পাতের পরিবর্তে সাধারণ লেখার কোনও স্লেটের ওপর নরুন বা ঐ জাতীয় যন্ত্র দ্বারা সরাসরি রচনাটি খোদাই করতে হয়। বলা বাহুল্য, খোদাই ভুল বা মনোমত না হলে স্লেটখানি ফেলে দিতে হয়। সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে শিল্পীর দক্ষতাই খোদাইয়ের প্রধান সম্বল। পার্থক্য এই যে, এচিং-এর এক রঙ ও বিভিন্ন রঙীন প্রিন্ট গ্রহণ করা যায়, স্লেট খোদাইয়ে সেটা সম্ভব নয়। তবে আধুনিক চিত্রের জন্য স্লেট খোদাই কাজে রিলিফের (relief) বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

শরীর ধর্মী নিদর্শন থাকলেও শিল্পীর কয়েকটি খোদাই বিমূর্ত শ্রেণীর। সুতরাং তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল মনের সন্ধান পাই। নতুন আকার ও প্রতীক খোদাই করে শিল্পী বর্তমান যুগের কয়েকটি বিশিষ্ট নিদর্শন রূপায়িত করেছেন, যেমন স্পেসক্রাফট ও সিটি স্কোয়ার। দুটির মধ্য দিয়েই শিল্পীর যুগোপযোগী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। শরীর ধর্মী খোদাইগুলি কিন্তু ভিন্ন গোত্রের। কোমল, কমনীয় আকার ও সূক্ষ্ম খোদাই কার্য কুশলতার গুণে এগুলি যেন সুললিত কাব্যের রূপ গ্রহণ করেছে। বাস্তবিক কয়েকটি ক্ষেত্রে শিল্পী যেন ভাস্কর্যের গঠন প্রণালী অবলম্বন করেছেন, শুধু তাই নয় এমন কি নেগেটিভ ফর্মেরও সৃষ্টি করেছেন এই প্রসঙ্গে কাপল (Couple) খোদাইমালা —১, ২ ও ৩-এর নাম করা যায়। তবে কয়েকটি কাজ ভাল লাগেনি, যেমন প্রিমিটিভ অ্যাফেকশন—এটি যেন দলভ্রষ্ট। তাছাড়া রচনা ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ, রঙ ব্যবহার করার অবকাশ নেই, সুতরাং সেদিক থেকে অনেকের কাছে এ জাতীয় খোদাই কাজ একঘেয়ে মনে হতে পারে। তবে স্লেট খোদাইয়েরও মাধুর্য আছে—এ যেন পল্লীগ্রামের অতি পরিচিত ও পবিত্র সন্ধ্যাপ্রদীপ, এর প্রদীপের শান্তস্নিগ্ধ আলোক বাঁধা পল্লীগ্রামেই শোভা পায়। সুতরাং শহরে বাস করেও যাঁদের চিত্ত পল্লীগ্রামের কোনও পরিচিত পরিবেশচেতনার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে তাঁদের কাছে এই স্লেট খোদাইয়ের কাজ ভাল লাগবে ও এগুলি তাঁদের ঘরেরও শোভা বর্ধন করবে। অপরাপর খোদাইয়ের মধ্যে গাছপালা উল্লেখযোগ্য। যাঁরা দৃষ্টিহীন তাঁরা ছবির রসগ্রহণ করতে পারেন না অথচ স্পর্শচেতনার দ্বারা তাঁরা নাকি এমন স্লেট খোদাই কাজ উপভোগ করতে পারেন। শিল্পী দৃষ্টিহীনদের বিশেষ করে তাঁদের আনন্দদান করার জন্যই তিনি স্লেট খোদাই কাজ করেছেন। শিল্পীর উদ্দেশ্য মহৎ। অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই প্রদর্শনী দেখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে—আশা করি তারা স্লেট খোদাই কাজ উপভোগ করবেন।

*

চিত্রম গ্যালারীতে সম্প্রতি চার থেকে চৌদ্দ বছরের বালকবালিকাদের এক চিত্র প্রদর্শনী দেখে মনে হয়, যে যার খুশীমত স্টুডিওতে যে সব ছেলেমেয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে তাদের আঁকা নানা ছবি এই প্রদর্শনীতে প্রথম পেশ করা হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রচনা দেখে তাদের বিচিত্র কল্পনাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রদর্শনী দেখে মনে হয় যে যার খুশীমত এঁকে গেছে—জন্তু জানোয়ার থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের নানা পরিচিত দৃশ্য প্রদর্শনীতে দেখা যায়, কারোরও কার্পণ্য নেই। মনে হয় অঙ্কনকার্যে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে কয়েকজনের ছবি ভাল লেগেছে, তাদের নাম ঊর্মিলা সরকার, বাসবী মুখার্জী, স্বপন গাঙ্গুলী, স্বাগতা সিংহ ও সন্দীপ ভগত। বড়দের মধ্যে উমা সরকার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে।

চিত্রপ্রিয়

মায়ের কাছে—'জানো, আজ রুথ খুব দুষ্টুমি করেছে। জানো ড্যাডি, সিস্টার ওকে বকেছেন অপরিচ্ছন্ন পোশাক ছিল বলে।'

—'তখনই তোমায় পইপই করে বললাম, ওটা পরো না, তা মোটে শুনলে না। বেশ হয়েছে।' ওদের মা মেয়েকে ভর্ৎসনা করলো। অমনি ঝেঁঝে উঠলো মেয়ে—'কোনটা পরতাম? ওই পচা চেক-চেক জামাটা, না কটকটে লালটা?'—ব'লে মুখ ব্যাজার করে খাটের পাশে বসলো।

ফ্রান্সিস অনুযোগ করলো। 'যা হয়েছে হয়েছে। এখন মুখ হাত পা ধোও, স্থির হও। দেখ, আংকল কী এনেছে তোমাদের জন্যে। এসো আলাপ করো।' উঠে এসে ও আমার পাশে বসলো। মুখ ভার করে বলল, থ্যাং কিউ, যখন টফির বাক্সটা দিলাম। দুটো একটা মামুলি প্রশ্ন করলাম। বিরক্ত মেয়ে যা জানালো, তার সারাংশ হচ্ছে : ওকে ভালোবাসে না কেউ, না বাবা, না মা। জুলি ল্যান্স এইসব বন্ধুদের কত আছে, অথচ ওর একটাও ভালো জামা নেই। ওর পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না, ইস্কুলে যেতে ঘেন্না করে। সাজতে ওর খুব ইচ্ছে করে কিন্তু মা পছন্দ করে না, এইসব। ওর শেষ কথা অবশ্য—'আই কুড্‌ন্ট কেয়ার লেস'; আমার বয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস অসন্তুষ্ট হয়েছে, বলাই বাহুল্য।—'কী সব বলছো রুথ! আংকেল তোমার সম্বন্ধে কী ধারণা করবে, বলো তো? ভাববে, তুমি ম্যানার্স জানো না। বাপ-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নেই।...ওরা বড়োলোক, আমরা গরিব মানুষ, কাপড় মেপে আমাদের কোট কাটতে হয়। বড়োলোকদের নকল করে চলতে চাইলে আমরা তো পারবো না।...আসল কথা বলো, দুষ্টুমি ছাড়া

মুখ ভার করে বললো—থ্যাঙ্ক ইউ...

কিছুতে তোমার মন নেই!' আমি সমর্থন করলাম, 'ঠিক তাই, যতটুকু সামর্থ্য, তাই নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।'

রুথ নরম হয়েছে। হয়তো লজ্জিতও হয়েছে একটু। কিন্তু যা জেদী মেয়ে, তখনও ঘাড় নিচু করে অনুযোগ করে—'ড্যাডি, তুমি কেন বড়োলোক হলে না? কেন তোমার গাড়ি নেই?'

এই ছেলেমানুষি প্রশ্নের যে কোনো উত্তর হয় না। সুতরাং আমরা অন্য আলোচনায় মন দিলাম। তবু মনে হলো, রুথ মেয়েটার কোনো কষ্ট আছে। যেন এ-বাড়ির মেয়ে নয়, এমন একটা চাপা নিঃসঙ্গতা ওকে কষ্ট দেয়। মায়া হলো, একা মেয়ে অভিমান করে পাশে বসে থাকবে! ওর হাতখানি টেনে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম অন্যমনস্ক হয়ে। মাঝে মাঝে ওর শখের কথাও জেনে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ ও বলে উঠলো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।' এবং আমার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো।

অর্থাৎ এখনি রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়তে চায়। আমাদের কথার মাঝখানেই ওদের শোবার ব্যবস্থা। অর্থাৎ, আমাদের আড্ডা ভাঙতে বলছে। অর্থাৎ আমায় চলে যেতে বলছে হয়তো। সাত পাঁচ ভেবে উঠে পড়লাম। মাত্র সাড়ে আটটা।

ফ্রান্সিসকে কিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত মনে হচ্ছিল। রান্নাঘর থেকে মেরিকে ডাকলো, 'কই, একটু বেরিয়ে এসো, হিমাংশু চলে যাচ্ছে।' মেরি তার কাকতাড়ুয়ার মতো মুখে নিয়মমতো হাসি ছড়িয়ে বললো, 'এর মধ্যেই? বোম্বাই থেকে ফেরার আগে আবার এসো।' আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

[illegible] স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে বেরিয়ে এল ফ্রান্সিস আলমেডা। গম্ভীর। বুকটা টিপটিপ করছে আমার। এক সময় ও বললো, 'আজকের ব্যাপারের জন্যে আমি খুব দুঃখিত।'

—'কেন, কেন, কী হয়েছে?' খানিকক্ষণ পর ও বললো—'মেয়েটা আজ এমন বিগড়ে আছে! বড়ো অসভ্যতা করেছে সে। তুমি ক্ষমা কোরো।...আসলে জানো ও এরকম অসভ্য নয় মোটেই। এক-একদিন ও ক্র্যাঙ্ক হয়ে যায়, কাউকে মানে না, কথা শোনে না। প্রথম প্রথম মারধোর করেছি, কোনো ফল হয়নি। এখন ছেড়ে দিয়েছি, বড়ো হয়েছে তো। এখন আর গায়ে হাত তোলা যায় না।'

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হই। ওকে সান্ত্বনা দিতে বলি, 'ছাইপাঁশ কেন ভাবছো। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগলো, কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা।' যেন শুনতে পায়নি, ফ্রান্সিস বলে চললো, 'কেন এমন হয়েছে, আমি জানি।...আমাদের পাপ।' থেমে-থেমে বললো ফ্রান্সিস, 'জানো, জন জন্মাবার পর স্বামী-স্ত্রী ভেবেছিলাম, অন্তত পাঁচ বছর আমাদের কোনো বাচ্চা হবে না। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই মেরি আবার কনসীভ করলো। অ্যাকসিডেন্ট।...ও তো [illegible]...' ফ্রান্সিস যেন অনেক দূর থেকে বলতে লাগলো, 'আমার মনে হয় কোনো অলৌকিক বোধ থেকে রুথ বুঝতে পেরেছে, ও আমাদের বাঞ্ছিত সন্তান নয়। তাই ও নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত সচেতন। আমাদের স্নেহ ভালোবাসার পরোয়া করে না। গরিব বাপ-মা, যারা অনিচ্ছায় ওকে পৃথিবীতে এনেছে, তাদের ঘেন্নাই করে হয়তো! একটা [illegible] ভুল!'

—'তোমাদেরই মনের ভুল।' আমি হালকা করার চেষ্টা করি। 'আজকাল এইসব হচ্ছে। আজকাল কটা বাচ্চা বাপ-মায়ের সাধ-আহ্লাদে জন্মায় বলো?...সেটা তোমার দুশ্চিন্তা।'

আগের কথার রেশ টেনে ফ্রান্সিস বললো, 'অথচ জন-এর চেয়ে রুথকে তো কম ভালোবাসি না আমরা!'

তারপর আস্তে আস্তে আমরা স্টেশনের দিকে এগোলাম। লোকাল ট্রেন প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর আসে। [illegible] পড়লাম, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, ফ্রান্সিস হাত নাড়ছে। কেমন যেন বিষণ্ণ। নাকি বিরক্ত। হঠাৎ ওর ভেঙেচুরে কান্না মুখটা দেখে আমার অসময়ে কংসের কথা মনে হলো, [illegible] মুহূর্তে এসে [illegible] যার সমস্ত গর্ব খর্ব করে দিয়ে গিয়েছিল।

ফেলে গেলেন, সেটি একটি সাহিত্যে অশ্লীলতাবিরোধী পোস্টার। এম এল এ হোস্টেলে—যেখানে একদল ডেলিগেট এবং আমন্ত্রিত "ভি আই পি"দের ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল—এই পোস্টার অনেকেরই নজরে পড়েছে। বোঝা গেল, সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রতিবাদী একদল লোক বেশ তৈরি হয়েই এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোনও আলোচনায় যোগ না দিয়ে শুধুমাত্র পোস্টার সেঁটে, অধিবেশন বর্জন করে এবং সারাক্ষণ আমতলায় জামতলায় গজগজ ফুসফাস করেই এনার্জি ক্ষয় করলেন কেন, এ রহস্য বোঝা গেল না।

যাই হোক, সমরেশবাবু তাঁর সংযত এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে অধিবেশন উদ্বোধন করলেন এবং দেখা গেল, তাঁর আন্তরিক ভাষণ অধিকাংশ শ্রোতারই হৃদয় স্পর্শ করেছে। সমরেশবাবুর মোদ্দা কথা হল এই, আধুনিক উপন্যাসে যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা সন্নিবেশিত হয়ে থাকে বা যেসব পাত্রপাত্রী ঘোরাফেরা করে, সেসব বুঝতে হলে খোলা চোখে সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। কারণ এই ধরনের সাহিত্য এই সমাজেরই বে-আবরু ছবি। কোনও সৎ সাহিত্যিকই তাঁর সময়কালের প্রতি চোখ বুজে অবাস্তবকে অনুসরণ করেন না।

কিন্তু সমরেশবাবুর এই সহজ সরল ও যুক্তিসিদ্ধ কথার পর শাখা সভাপতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের যুক্তিহীন, প্রমাণহীন, অভক্ত অধ্যাপকী বাগাড়ম্বরে শ্রোতৃবৃন্দ যেন ঝিমিয়ে পড়লেন। পুরো এক ফরমা (ডবল ডিমাই ষোল পেজী, স্মল পাইকায় ছাপা) ভাষণে ডঃ ভট্টাচার্য আমাদের এই কথাই শোনালেন, "কোন কোন জনপ্রিয় লেখক সম্প্রতি তাঁদের রচনায় যৌন আচারের যে নির্লজ্জ (সরকার-প্রচারিত লুপ ধরণের বিজ্ঞাপনের চেয়েও?) বর্ণনা দিতে আরম্ভ করেছেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক সমাজ স্বভাবতই বাংলা কথা সাহিত্যের নামে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন", "সাহিত্যের ভাষা আর কিছু আছে, তা আর মনে হয় না।" (একথা কি অধ্যাপকের সকল সাহিত্যিক সম্পর্কেই প্রযোজ্য?), "...প্রেম সাহিত্য বাংলায় আর রচিত হয় না", "সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে হাসির গল্পের অভাব বাঙালী পাঠককে স্বভাবতই পীড়িত করে", "সাম্প্রতিক কালেও বাংলা নাটকের যে ধারা চলেছে, তাতেও তার সম্পর্কে আশার কথা কিছু আছে বলে মনে হয় না।"

ডঃ ভট্টাচার্যের মতে আজকাল দেখা গেল, বাংলা গল্প উপন্যাস এবং নাটকের ক্ষেত্রে 'কিস্সু' হচ্ছে না। এতে হতাশ হবারই কথা। তবে তাঁর ভাষণের অন্তের প্যারাগ্রাফে তিনি এমন একটা আশার কথা শুনিয়েছেন যাতে বাংলা সাহিত্যের পাঠক-সমাজের হতাশা কেটে যাবে এবং নিতান্ত অসুস্থরাও চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন, "একদিন বাংলা প্রবন্ধ যেমন একান্ত আত্মভাবকেন্দ্রিক ছিল, আজকে আর তা নেই। এখন ভূদেব-রামেন্দ্রসুন্দরের মত প্রবন্ধ রচিত হয় না, তার প্রধান কারণ, এখন প্রবন্ধমাত্রই তথ্যকেন্দ্রিক হয়েছে।...এই শ্রেণীর প্রবন্ধ এবং সাহিত্যালোচনা বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে তুলতে সহায়তা করছে, সন্দেহ নেই।" (প্রবন্ধকার হিসেবে ডঃ ভট্টাচার্য যে

স্বধর্মনিষ্ঠ, তাঁর এই মন্তব্যের পর তা আর কে অস্বীকার করবে?)

এইবার দেখা যাক, তাঁর সাহিত্যালোচনা কতটা তথ্যকেন্দ্রিক? কতটাই বা যুক্তিসহ?

এক সময় তিনি বললেন, "একথা স্বীকার করতেই হবে, সাহিত্যের সনাতন প্রথা সাহিত্যের গতিশক্তির পরিচায়ক নয়। তা প্রাচীন বা ক্লাসিক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে প্রাণহীন বলে গণ্য হতে পারে; কিন্তু যার সঙ্গে পরিবর্তনশীল সমাজের প্রত্যক্ষ যোগ, তা কখনও সনাতন প্রথার অনুগামী হতে পারে না।"—মুদ্রিত ভাষণ, পৃ ৫।

আবার একটু পরেই তিনি বলছেন, "একথা বলাই বাহুল্য এই শ্রেণীর রচনা (অর্থাৎ যে রচনার বিরুদ্ধে ডঃ ভট্টাচার্যের অভিযোগ) কখনও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না, সাহিত্যে কোনদিন তা ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে না..."—ঐ, পৃ ১০।

ক্লাসিক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ার পরিণাম যদি "প্রাণহীন বলে গণ্য" হওয়াই হয়, তবে কোন লেখক সাধ করে মৃত্যুর সাধনাকে কাম্য বলে ধরে নেবেন? লেখক ঠোঁট উলটে বলবেন, "আমার ঠেকাটা কি?"

তাঁর আরেকটি মন্তব্য! "কেবলমাত্র শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখকের রচনায় প্রত্যক্ষভাবে বাংলার জলবায়ুতে পরিপুষ্ট বাঙালীর জীবনের স্বাদ অনুভব করা গিয়েছে।"—এটা কি তথ্যকেন্দ্রিক বক্তব্য না আপ্তবাক্য?

মূল সভাপতি মহাশয় উদ্বোধন সভায় তেলুগু ভাষায় সম্ভাষণ জানিয়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উদাহরণ যতটা দক্ষতার সঙ্গে রাখতে সমর্থ হলেন, সেই পরিমাণই আমাদের সন্তাপ করলেন সাহিত্য সম্পর্কে পরম বৌদ্ধিকবহ তাঁর মতামত প্রকাশ করে। সাহিত্য সম্মেলনে কর্মিকের যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, মূল গায়েন আসরে অবতীর্ণ হবার আগে তা বোঝা যায়নি। লেখক এবং পাঠককে প্রতিপক্ষ সাজিয়ে তরজার আকারে গ্রথিত মূল সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ মহাশয়ের ভাষণের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। আশা করি পাঠকরা খুশী হবেন।

—"পাঠক হিসাবে দাবি করব যে, দান্তের নরকের বর্ণনা যদি চিরায়ত সাহিত্য হয়ে থাকে, আমাদেরও আজকের নরকের চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে এঁকে তা থেকে উদ্ধারের পথচিহ্ন বিশ্বাসের সঙ্গে লিখে দাও। রচনা করো, হে সাহিত্যিক, সেই সাহিত্য যা ঝড়ের রাতে ঝরাবে বিদ্যুতের আলো।"

এখন ধরুন, পাঠকরূপী শ্রীদাশের এই উদাত্ত আবদার রাখবার জন্য কোনও সাহিত্যিক "আজকের নরকের চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে" আঁকলেন এবং রচনাটি "আইনের চোখে অশ্লীল" বলে ঘোষিত হল। আর তারপর সাহিত্যিক প্রশ্ন করলেন, "দোষ কোথায় আমার?"

এর উত্তরও মূল সভাপতি দিয়েছেন। তাঁরই জবানিতে: "তার উত্তরে পাঠক আমি বলব যে, আইনের চোখে সাহিত্য বিচার করছি না। কিন্তু আমাদের দুই কূলকে যদি তোমার লেখনী-বন্যা সোনার ফসলের

জনপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদকের কর্তব্য হবে, "সাধারণ রুচিসম্পন্ন অগণিত পাঠকের কথা মনে রেখে, তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব না দেখিয়ে ধীরে ধীরে তাঁদের মনে বিশেষ রুচির প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা মমতা এবং আগ্রহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা।... আমার মতে, আজকের দিনে সম্পাদকের ভূমিকা যদি কিছু থাকে তবে তা পাণ্ডা মশাই-এর নয়, চড়িদারের—তীর্থযাত্রীদের দেবতার দুয়ারে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর কাজ।"

এই রকম স্পষ্ট বক্তব্য শ্রীশম্ভু মিত্রেরও। নাটক সম্পর্কে আলোচনা চক্রে তিনি যেসব সমস্যার উপর আলোকপাত করলেন, সেগুলি বাস্তব। শ্রীমিত্র বলেছেন, "প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে আমাদের অন্তরের তৃপ্তি পাই না। নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত মুদ্রা আজ আমাদের কাছে কোনো অর্থ বহন করে না। অথচ সেই সংস্কৃত যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নানান লোকনাট্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের নাট্যচিন্তার যে ধারা প্রবহমান তার গভীর অনুভব আমাদের প্রাণ দিয়ে বুঝতে হবে, নইলে আমাদের দেশের নাট্যমঞ্চ দেশীয় নাট্যমঞ্চ হবে না।

"এই কথা আজ আরো বেশী করে বলার দরকার এইজন্য যে, স্বাধীনতার পরেও আমাদের দেশে অনুকারী প্রবৃত্তি কমার পরিবর্তে হয়তো বেড়েছে। তাই পশ্চিমের আধুনিক ফ্যাশন অনুকরণে নাটক করি তাই আমরা অনেক সময় প্রগতির চরম লক্ষণ বলে মনে করি। কিন্তু তাতে তো আমাদের চিন্তা স্বাধীনচিন্তক হয় না, আমাদের সৃষ্টিও বিজ্ঞানসম্মত হয় না। তাই এককালে যেমন আমরা সেন্টিমেন্টাল দেশাত্মবোধের নাটক করেছি, যেখানে প্রবল অত্যাচারের পরে বন্দেমাতরম বলে চীৎকার করা মাত্র দর্শকবর্গ নির্বিবাদে হাততালি দিয়ে উঠেছে তেমনি আজ সেন্টিমেন্টাল মানবতাবাদের নাটক করি যেখানে ঠিক সেই একই ধরনে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে হাততালি সংগ্রহ করা হয়। কিংবা অ্যাবসার্ডিস্টদের অনুকরণে নাটক করি।" শম্ভুবাবুর মতে "চারিদিকের নানারকম সস্তা তামাশার মধ্যে সেই গভীর নাট্যোপলব্ধির দেশজ রূপটা গড়ে তোলার সমস্যা আমাদের প্রধানতম শিল্পগত সমস্যা।"

সেমিনার বা আলোচনা-চক্রগুলিতে যেসব প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে, তার অধিকাংশই যদিও কাঁচা [illegible], কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের নিষ্ঠা, যত্ন এবং প্রয়াসে সেগুলো বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। আমার কাছে অনেকে সোৎসাহে এইসব আলোচনাচক্রের প্রশংসা করেছেন এবং এগুলিকে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নিয়মিত কর্মসূচির মধ্যে গ্রহণ করার দাবিও জানিয়েছেন। শ্রী[illegible]লোকরঞ্জন দাস, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শ্রী[illegible]ন সেন এবং তরুণতর অনেকেই [illegible] আলোচনায় যোগ দিয়েছেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো আমার বেশ ভাল লেগেছে। বিশেষ করে শ্রীশম্ভু মিত্র কৃপিত মিত্র প্রভৃতি অভিনীত ব্যঙ্গ-নাটিকা, ভারতীয় [illegible] আর্ট আকাডেমির সদস্যদের [illegible]ত অন্ধ্রের লোকসঙ্গীত। এই [illegible] বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন। এঁরা "[illegible]গলা হাওয়ার বাদল দিনে" গানটি গেয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি করেন। নটরাজ রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের কুচিপুড়ি নৃত্যের আসরটিও বেশ জমেছিল।

অন্তত আপনার মহানুভবতাটা আগে টের পাই নি। আন্দাজ করতে পারি নি ঐ সব খিস্তি, তামাশা, অশ্লীল আক্রমণ আসলে সতীশকে বিখ্যাত করার উদার উদ্দেশ্যপ্রসূত।

দামোদর : উদ্দেশ্যটা যাই হোক, ফলটা তো ভালো হয়েছে? পেয়েছো তো লাখ টাকা?

সতীশ : না পেলেই হয়তো ভালো হতো, বর্তমান অতিথি সমাগম ঘটতো না। কিন্তু আপনাদের আগমনের কারণ জানতে পারি কি?

দামোদর : বলছি, অতো তাড়া কিসের।

মন্মথ : দামোদরবাবু, আমি চলি।

দামোদর : সেকি, তোমাকে ছাড়া চলবে কী করে? এ কথা গোপন করে লাভ নেই যে প্রথমে আমি নিরুদ্দেশই ছিলাম; তোমারই প্রস্তাবে, তোমারই আগ্রহে আজ এখানে আসা।

ইন্দ্রাণী : এতো শিগগির আপনাকে যেতে দেবো না, মন্মথবাবু। এই মিষ্টি-গুলো অখাদ্য, কিন্তু আপনাকে আরেক কাপ চা খেতেই হবে।

মন্মথ : আজ বরং আসি।

ইন্দ্রাণী : খুব তাড়া আছে কোথাও যাবার?

মন্মথ : এখান থেকে যাওয়ার তাড়া আছে। তোমার স্বামীর লেখা হয়তো আমি বুঝি না, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্বাতন্ত্র্য, আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর এই পুরস্কার পাওয়াতে আমি আন্তরিক খুশী হয়েছিলাম, শুধু তিনি প্রথম বাঙালী বলে নয়, প্রথম স্বাধীন সাহিত্যিক বলে। কিন্তু স্পষ্টতই ও'র মেজাজ আজ ভালো নেই; ও'র তিক্ততার কারণ আমি আন্দাজ করতে পারি কিন্তু আশা করে-ছিলাম উনি এর ঊর্ধ্বে উঠতে পারবেন।

ইন্দ্রাণী : [কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে] : আপনি তো জানেন আজ ছ' মাস ধরে কাগজে-কাগজে কী চলছে! রাম-শ্যাম যদু-মধু, যে-কোনো মফস্বলের অধ্যাপক যে জীবনে একটা চিঠি পর্যন্ত শুদ্ধ লিখতে পারে না, সতীশকে ছাপার হরফে যাতা গাল দিচ্ছে। রাত দিন কুৎসিত টেলিফোন। এই এক্ষুনি কে এক অশিক্ষিত রকবাজ ছোকরা, যে তালব্য শ আর দন্ত্য-স'র তফাত করতে শেখে নি, ফোন করে বললো : টাকাটা পেয়ে ল্যাজটা যেন আরো মোটা হয়ে না যায়; দেশের শত্রুকে কয়েকটা লোক টাকা দিয়ে যতোই আস্কারা দিক, তাকে সায়েস্তা করার মতো যথেষ্ট বাঙালী এখনো বেঁচে আছে।

মন্মথ : ছিঃ, ছিঃ।

ইন্দ্রাণী : উনি কার কি ক্ষতি করেছেন? তিরিশ বছর ধরে নিজের মনে বই লিখে গেছেন, সেই বই কারো যদি অপাঠ্য মনে হয়, না-পড়ুক। তাই বলে বাড়ি বয়ে এসে উৎপাত, দরজার সামনে মাতাল হয়ে চিৎকার : শালা সতীশ সেন সাহস থাকলে বেরিয়ে আয়; দাঁত কটা খুলে নি।

মন্মথ : সে কি, এই কলকাতা শহরে!

ইন্দ্রাণী : এতো লোক চিৎকার করলো, আস্ফালন করলো, কাদা ছুঁড়লো, এই কলকাতা শহরে, তাতে আমি অবাক হই নি। আর এতেও অবাক হই নি যে এতো বন্ধু, এতো অনুরাগী পাঠক, এতো তরুণ সাহিত্যিক যারা নাকি কাউকে তোয়াক্কা করে না, আপনারা, আপনি, কেউ বললেন না ওই মানুষটিকে ছেড়ে দাও, ও'র বই যদি খারাপ মনে হয়, কিনো না, পড়ো না, কিন্তু এই নোংরামি কেন? (দরজায় ঘণ্টা) কারো কি মনে হয় নি কোনো বই লেখার জন্য, তা যতোই অপাঠ্য হোক অশ্লীল হোক, দাঁড়ান আসছি [দরজা খুলে দেন ইন্দ্রাণী]

গলা : আমরা প্রজাতন্ত্র থেকে আসছি।

ইন্দ্রাণী : আসুন।

(ক্রমশ)

'জাম্বোরী'তে বাংলার গাইডরা

এবার অতিথি ছিলেন বলতে গেলে সারা বিশ্বের স্কাউট আর গাইড আর আমন্ত্রণ করেছিলেন বাংলা দেশের স্কাউট আর গাইডরা। ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর নদীয়া জেলার নতুন শহর কল্যাণীতে গড়ে উঠেছিল আর এক নতুন শহর। প্রসারিত এক তাবুনগরী। ভারতবর্ষের আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ২০,০০০ ছেলেমেয়ে একত্র হয়েছিল সেখানে। এবার অল ইণ্ডিয়া জাম্বোরীর পঞ্চম অধিবেশন ছিল। তার উপর এবার ছিল স্কাউট আন্দোলনের হীরক জয়ন্তী। একে-তো স্কাউট গাইডের মিলন ক্ষেত্র, তার উপর জয়ন্তী উৎসব। যেন সোনায় সোহাগা তো বটেই তার উপর হীরে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহু সম্প্রদায়ের আদান-প্রদানের দারুণ সুযোগ হয় এই মিলন ক্ষেত্রে। বিদেশ থেকে প্রতিনিধিরা আনে তাদের সংবাদ, প্রীতি আর বন্ধুত্ব।

এক সময় গাইড আর স্কাউট আলাদা সংস্থা ছিল। এখন তারা এক সংস্থার দুই দিক। ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস। এবারের মহান আমন্ত্রণের অনেকটা ভারই তুলে নিতে হয়েছিল সকলের সঙ্গে বাংলার গাইড বিভাগের নারী কর্মীদের। প্রথম দায়িত্বই অর্থ সংগ্রহ। একেবারে গোড়ার কথা। এত বড় উৎসব, বহু অর্থের প্রয়োজন। তারই আয়োজনে কোটিতে গাইডদের প্রথম কাজের নিয়োগ। গান বাজনার আসর, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, লটারীর টিকিট বিক্রি, জাম্বোরীর স্টল বেচা তার উপর শুভেচ্ছুদাইদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আনা কোনটাই স্বল্পায়াস সাধ্য ব্যাপার নয়। অর্থ সংগ্রহের কাজে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের গাইড মেয়েরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তারপর এল শিবিরের ব্যবস্থাপনার ভার। কম তো নয়। হাজার হাজার অতিথি। মেয়েদের শিবিরই হয়েছিল চারটি। শিবিরগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল সুন্দর সুন্দর: সবর্ণদীপ, রাসমঞ্চ, সারঙ্গিনী আর নিবেদিতা। প্রত্যেকটি শিবিরের পরিচালনায় পূর্ণ দায়িত্ব ছিল একটি করে গাইড কমিশনারের উপর। গাইড কমিশনাররাও ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের। এমন মিলন ক্ষেত্রের উপযুক্ত ব্যবস্থাই বটে। তাঁদের বলা হতো Sub-Camp Chief. এঁদের মধ্যে বাংলা দেশের ছিলেন শ্রীমতী সুনীতি পাকড়াশী, হায়দ্রাবাদের মিসেস এম বেজেল, মহারাষ্ট্রের মিস টি অশা, মধ্যপ্রদেশের মিসেস শান্তি আচারিয়া। এঁদের অধীনে ছিলেন চারজন Asst. Sub-Camp Chief—শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ, শ্রীমতী তারা ঘোষ, শ্রীমতী বিভা চক্রবর্তী আর শ্রীমতী জয়ন্তী ঘোষ ছিলেন এই কাজে।

প্রত্যেক রাজ্যের গাইডরা তাঁদের নিজস্ব ধারায় নিজের নিজের শিবিরের প্রবেশদ্বার সাজিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি শিবির তাই সজ্জার বৈশিষ্ট্যে সুন্দর দেখাচ্ছিল। পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের শিবির সজ্জা প্রায় প্রত্যেক আগন্তুকের প্রশংসা পেয়েছে।

সমাবেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলা দেশের প্রায় ১২৫টি মূকবধির, অন্ধ, পঙ্গু এবং জড়বুদ্ধি গাইডের যোগদান। জীবন যাদের অকরুণ নিয়তির বিধানে কঠিন তাদের সবার মাঝে সমান করে টেনে এনে সহজ সুন্দর স্নেহপ্রীতিতে আপন করার চেষ্টা পৃথিবীর সর্বত্র সবস্তরে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এখন কেবল প্রথম পত্তন মাত্র। গাইড আন্দোলনের মাধ্যমে তার গতি স্বচ্ছন্দ থেকে স্বচ্ছন্দতর হোক এই আমাদের কামনা। সমাজজীবনের সক্রিয় অংশ হিসাবে এদের মিলিয়ে নেবার প্রচেষ্টা জাম্বোরীর মিলনোৎসবকে দারুণ এক সুষমায় ভরে দিয়েছিল। অসুস্থ, অক্ষম নাগরিক হয়ে তারা করুণার পাত্র হয়ে আর এক কোণে কাল কাটাবে না। আত্মীয় প্রিয়জনের দুঃখের বোঝামাত্র হয়ে থাকবে না। পিতা-মাতার সীমাহীন চিন্তা আর আশংকার পাত্র হয়ে পড়ে থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা যে, নিষ্ঠুর মানুষ তাদের পদদলিত করতে পারবে না। সমাজকে উন্নতিশীল করতে গেলে যেমন পিছিয়ে থাকা মানুষকে আগে টেনে তুলতে হয় ঠিক তেমনই দৈবদুর্বিপাকে ক্ষুন্ন জীবনগুলিকেও সামনে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। ব্যবস্থার ভার থাকে যারা এগিয়েছে তাদের উপর, যাদের এমন দুর্ভাগ্য হয় নি তাদের উপর। সার্থক নাগরিক গড়ার আন্দোলন ভারত স্কাউট অ্যাণ্ড গাইড আন্দোলন। সার্থকতার পরিধি থেকে সামান্য অংশও বাদ যেন না যায় এই তো ভাবনা।

জাম্বোরীর সব কটি দিনের উৎসব আয়োজন ছিল কত রকমের তার সীমা নেই। লোকনৃত্য থেকে নিয়ে অসামরিক প্রতিরক্ষার প্রদর্শনী, প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে নিয়ে নানারকম ড্রিল আর সবার শেষ Campfire উৎসবকে মাতিয়ে দিয়েছিল। স্কাউট আর গাইডদের তাই সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকতে হয়েছে। মাঠে দাঁড়িয়ে, চারদিকে ঘুরে ঘুরে কমিশনাররা সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করেছেন। গাইড কমিশনার মহিলাদের মধ্যে দেখলাম রমলা ব্যানার্জী, সরোজিনী মিশ্র, গীতা মুখার্জি, বিভা মুখার্জি, সন্ধ্যা গুহ-রায়, বিজলী ঘোষ সকলেই তৎপরতার সঙ্গে কার্য পরিচালনায় ব্যস্ত। বিদেশী অতিথি-দের দায়িত্ব ছিল জয়শ্রী সেন ও ডাঃ পরিমল দাসের উপর। বিদেশী গাইডদের নানা জায়গা ঘুরিয়ে দেখানো, খাওয়া-দাওয়া সবার সঙ্গে

কিন্তু একবারে বেশীক্ষণ কখনই রাখবেন না। এই ভাবে বাঁটি দিয়ে ফেটালে নাকি তাড়াতাড়ি ঘনত্ব আসে।

ঘি বেশী দিন থাকলে কটুগন্ধ বা বিস্বাদ হয়ে যেতে পারে। দুর্গন্ধ বা পচা ঘি অবশ্য ঠিক করার উপায় নেই। কিন্তু সামান্য কটুগন্ধ বা বিস্বাদ হলে ঘি ফুটতে দিন। আগুন থেকে নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিন। আবার ফুটতে দিয়ে নামিয়ে একইভাবে জল ছিটিয়ে দিন। দেখবেন কিছু উপকার হবে।

মাখন গলিয়ে ঘি করার যুগ তো প্রায় পিছনে ফেলে এলাম, তবু যদি কখনও কারও সে সুযোগ হয় তবে খুব সাবধানে অমূল্য জিনিসটি সামলাতে হবে। মাখন খুব পুরোনো হলে সজনে গাছের পাতাশুদ্ধ একটি ডাঁট ডাল মাখন গলাবার সময় তাতে দেবেন। আঁচ যেন খুবকড়া না হয়। আবার একেবারে ঢিমাও না থাকে।

ঘি বেশী দিন থাকলে কটুগন্ধ বা বিস্বাদ ঝামেলাপূর্ণ কাজ। বাজারে ব্যবসায়ীরা নানা কারণে কড়া বা কাঁচা দাগ রাখেন। কিন্তু ঠিক আন্দাজমত সময়ে ঘি তৈরি করার উপর ঘি-এর ভাল মন্দ অনেক নির্ভর করে। একটি কাঠি, বেশ সরু কাঠের কাঠি হলে ভাল হয় —ঘিতে ডুবিয়ে জ্বালালে যদি পরিষ্কার, সুন্দর আগুনে জ্বলে তবে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় দাগ ঠিক আছে।

ঘরে মাখন তৈরি করতে পারা আর একটি ভুলে যাওয়া ব্যাপার। দুধই পাওয়া যায় না, আবার যা পাওয়া যায় তার স্নেহমান এত কম যে মাখন করা কঠিন। তবু, যেখানে সম্ভব তার জন্য সেই পুরোনো দিনের শোনা নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করছি। যাঁরা মোটা-মুটি ভাল দুধ পেতে পারেন তাঁদেরই পক্ষে সম্ভব মাখন ভাল ভাবে তোলা। মাখন তুলবার দুধ অল্প আঁচে আস্তে আস্তে ফুটিয়ে নেবেন। বড় ছড়ানো মুখের পাত্রে দুধ রেখে দিন অন্তত পাঁচ ছ ঘণ্টা। তারপর উপর থেকে সর তুলে নিন। এভাবে দিন কয়েক জমিয়ে বোতলে খুব ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে দিয়ে ঝাঁকাবেন। মাখন উপরে উঠে যাবে। আরও একটু ঠাণ্ডা জল পাত্রে রেখে তাতে সবটা ঢেলে দিলে মাখন উপরে ভাসবে। পাতলা এক টুকরো কাঠের গায়ে লবণ ঘষে তাই দিয়ে মাখন টেনে তুলবেন।

শ্রীমতী

একটি সংবাদে প্রকাশ, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র নাকি শ্রীআশু ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনান্তে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেস পরিষদ দলের কোন সদস্য দলত্যাগ করিবেন না। বিশুখুড়ো বলিলেন—“তা হলে বলা চলে সাম্প্রতিক হাড়-কাঁপানে শীতের প্রকোপটা কমের দিকে চলল!!”

আচার্য কৃপালনী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে

বলিয়াছেন, ডুবন্ত একটা নৌকা হইতে সকলেই বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন।—“হয়ত তাই। কিন্তু আমরা এটাও জানি কাসাবিয়াংকারা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড থেকেও পালাবার চেষ্টা করে না” —বলে শ্যামলাল।

একটি সংবাদ শিরোনাম—পাকিস্তান টিটোকে দলে টানিতে পারে নাই।—বুঝলাম টিটো জনাব আয়ুবের চেয়েও

দশাসই, তাই টাগ অব ওয়ারের খুঁটি টিটোকে নাড়ানো গেল না—”—মন্তব্য জনৈক সহযাত্রীর।

পশ্চিম পাকিস্তানের কোন এক স্থানের অধিবাসীরা কখনই আইন বিগর্হিত কোন কাজ করে না, ফলে অপরাধের অভাবে সেই অঞ্চলের থানাই উঠাইয়া আনা হইয়াছে। অন্য সহযাত্রী বলিলেন—“বেকার থানা কর্মীরা চাকরির দাবিতে কিছু বে-আইনী কাজ করেছেন কি-না সে খবর এখনও পাওয়া যায় নি।”

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কোন মহিলা সদস্য নেওয়া হইবে কিনা, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেস সভাপতি নাকি বলিয়াছেন—এর জবাব তিনি দিতে

পারিবেন না। পরে তিনি বলেন—জানিয়া রাখুন আমি রোমাণ্টিক। খুড়ো বলিলেন—“কথাটা শুনতে বড় ভাল লাগল। ট্র্যাজিক ঘটনাবলীর ডামাডোলে এমন কথা ত কেউ বড় একটা বলেন না, কংগ্রেস সভাপতিরাও কখনোই না।”

পৌর কমিশনারের আদেশবলে ১০-৩০টায় অফিসে হাজির হইবার নির্দেশ সম্পর্কে অ্যাকাউণ্টস বিভাগের কর্মীরা একটি ডেপুটেশন লইয়া প্রধান কর্মকর্তা, দুইজন ডেপুটি কর্মকর্তাদের ঘরে আসন শূন্য দেখিয়া চতুর্থবারে অন্য একজন ডেপুটিকে দেখিয়া তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিয়া আসেন। সহযাত্রী বলিলেন—“তাঁদের ধৈর্যের তারিফ করব। আমরা হলে এত ঘোরাঘুরি না করে—তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ কর—বলিয়া কোরাসে গান ধরতাম; কাজে না হলেও সঙ্গীতের টানেই তাঁরা যথাস্থানে সমাসীন হতেন!!”

একটি হাস্যকর বৈদেশিক মামলা সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল। জনৈক ব্যক্তি আঘাত পাইয়া একটি মামলা রুজু করেন। কিন্তু আদালত বলেন—এটা ঈশ্বরের কাজ এবং এই বলিয়া ভদ্রলোকের মামলা খারিজ করিয়া দেন। অতঃপর ভদ্রলোক ঈশ্বর অ্যাণ্ড কোম্পানীর নামে মামলা দায়ের করেন এবং খেসারত হিসাবে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ক্রোক করার দাবি জানান।—“বুঝতে বেগ পেতে হয় না ভদ্রলোক একটি ঝানু মামলাবাজ। কিন্তু অনুরূপ অনেক মামলায় জড়িত ঈশ্বর নামের ব্যক্তিটি বহু দিন থেকেই ফেরার, হুলিয়া বের করেও কোন ফল হয় নি। কচিৎ ধরা পড়ে গেলেও সংকিপ্তিং খুব দিয়ে ঈশ্বর সরে পড়েন। মুশকিল সেখানেই” —বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়া মার্কিন মুলুকের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছেন বলিয়া প্রেসিডেণ্ট জনসন নাকি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—“প্রসারের প্রশ্নই ওঠে না, আমরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করব না বলেই বহু আগে ঘোষণা করেছি। কিন্তু কই, সে সম্পর্কে জনসন সাহেবের আনন্দ প্রকাশের কোন খবর ত এখনো পাই নি, পেলে পরম আনন্দ হত কেননা, তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট!!”

মাদ্রাজে জাতীয় ক্রীড়া সমাপ্তি দিবসে প্রতিযোগীদের যে-পদক দেওয়ার কথা ছিল তার সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না বলিয়া একজনকে দেওয়া-পদক আবার ফিরাইয়া আনিয়া অন্য জনকে দিয়া কোন রকমে মুখ রক্ষা করা হইয়াছে। শ্যামলাল

বলিল—“জাতীয় হলেও এটা শুধুই খেলা-ধুলো বলেই হয়ত পদক সম্পর্কে এই অব্যবস্থা। তবে যথা সময়ে পদক যথাস্থানে ডাকযোগে প্রেরণ করা হবে শুনে আশ্বস্ত হয়েছি—দিয়ে নিয়ে গেলে কালীঘাটের কী হয় তা আর বললাম না!!”

সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা শহরে মশা মারিতেছেন তিন শ' জন এবং তা তদারকি করিতেছেন এক শ' তেত্রিশ জন তবু মশা মরিতেছে না।—“কী করে মরবে: মশা মারার জন্য একটি কামানও কি তাঁরা সংগ্রহ করেছেন?”—বলে শ্যামলাল।

মুখোশ তৈরিতে ফ্রান্সের জনৈক ভাস্করের মত ওস্তাদ নাকি পৃথিবীতে কেউ নেই।—“তা হতে পারে। কিন্তু বলতে পারি ভদ্রলোকের ব্যবসা বুদ্ধি তেমন নেই। যদি থাকত তাহলে বহু আগেই তিনি ভারতে এসে মুখোশের ব্যবসা খুলতেন। মুখোশের এমন চাহিদা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই”—বলেন সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় দৈনিক পাঁচ হাজার টন চাল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—“নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তের চেয়ে চাল “সেদ্ধ” পর্যন্ত সংবাদের জন্যই বেশী আগ্রহী!!”

প্রধানমন্ত্রীর সফরে

রুমানিয়া

একটা কথা আবার বলছি। সমাজতান্ত্রিক দেশ বলতে আমরা আগে যা বুঝতাম কি জানতাম, তা আর আজ খাটে না। ভালো করে খেতে পায় না, কাপড়-চোপড় চলনসই, কাঠখোট্টা অভদ্র এবং সর্বদা সন্দেহশীল, এ সব হয়তো চলতো এই শতাব্দীর চল্লিশ-দশকে। কিন্তু ২০ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ আর তা খাটে না।

আমি অনেকের কাছে শুনেছি, যেমন পোল্যান্ড সম্বন্ধে যে, আগে নাকি দারুণ জাঁক ছিল। আনন্দময় ছিল ইত্যাদি। কিন্তু তারা ভুলে যান সেদিনের আনন্দ-উৎসব ছিল শতকরা পাঁচজন লোকের জন্যে। আজ সেটা শতকরা অন্তত ৮০।৯০ জনের জন্যে। খুবই স্বাভাবিক যে, আগেকার "শতকরা পাঁচজন" অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ।

ধরুন, এই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর তাদের সরকারী সান্ধ্য-অভ্যর্থনা যার নাম হল রিসেপশ্যান এবং তাদের ভি-আই-পি ডিনার। কোনো অংশে কোনো ধনতান্ত্রিক দেশের পেছনে নয়। জানি না আমেরিকায় কী হয়, কিন্তু ইউরোপের অন্য কোনো দেশের পশ্চাতে তারা নয়, এ সব বিষয়ে একেবারে কেতাদুরস্ত, কোথাও ত্রুটি নেই। রিসেপশ্যান, তা ওদের হোক কি ইন্দিরাজীরই হোক। মানে, ওঁরাও দেবেন ডিনার ও রিসেপশ্যান, আবার ইন্দিরাজী তাঁর তরফে দেবেন তাঁদের। আগে ডিনার তারপর রিসেপশ্যান সাড়ে-আটটায়।

মস্ত একটি হলঘর। একটানা টেবিল পাতা দু পাশে দেয়াল-ঘেঁষে, লম্বায় প্রায় ৪০ ফিট। সারা টেবিল খাবার ভর্তি—গোটা পারিজন মাছ। গোটা মুরগী আর-টার্কি, গোটা শুয়োরের ছানা, এখানে-ওখানে ভেড়ার ঠ্যাং সবটা, আটেল কাটা তরকারি, স্যালাড, কেক, মিষ্টি এবং গাদা-করা ফল (আঙুর, আপেল, নাসপাতি)। যার যা খুশি, যতোটুকু খুশি খান, আলাপ করুন, আবার খান, আবার আলাপ করুন, রাত ১০।১১ অবধি। টেবিলে এখানে-ওখানে কালো-পোশাক সাদা শার্ট গায়ে দাঁড়িয়ে খিদমৎগার। গোটা শুয়োরের ছানা থেকে আপনার কোন্ অংশটি চাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিন, উনি ছুরি চালিয়ে ওইটুকু দেবেন আপনার প্লেটে। মাছের বেলাতেও তাই। আর টার্কি। দেখলেই ভয় করে। জানি না, লোকে এতো খায় কেন।

সরকারের তৈরি ফ্ল্যাট বাড়ি

টেবিলের কোণায় কোণায় জড়ো করা অনেক বোতল। না, মদ নয়। ওয়াইন নয়। হুইস্কি-ব্র্যান্ডি জিন-রাম নয়। স্রেফ ফলের রস, আঙুর, আনারস, আপেল, স্ট্রবেরি ইত্যাদি। আজ্ঞে না, মদ ছোঁবার যোটি নেই। কারণ ভারতের সংবিধান!!! আমাদের প্রটোকল প্রথমেই বলে রেখেছে যে, কোনো রিসেপশ্যান বা ডিনারে কোনো প্রকারের মদ্য পানীয় দেওয়া চলবে না—যেখানেই উপস্থিত থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সংবিধানের কোথাও উল্লেখ নেই ডিনার অথবা রিসেপশ্যানের, যদিও আছে মদ্যপান নিবারণের কথা। কিন্তু বিদেশে? ধরুন একটা দেশ যার প্রধানমন্ত্রী, কথার কথা, ধর, তাঁদের বংশে খানা এবং তাঁদের সংবিধানে মদ্যপানের কোনো উল্লেখই নেই। ধরুন তিনি এলেন আমাদের দেশে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী কি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেন?

পাশ্চাত্য দেশের অভ্যাস অন্য ধরনের। তাদের দেশে মদ্যপান নিষিদ্ধও নয়, পাপ

আঙুরের ক্ষেতে রুমানিয়ান সুন্দরী

বললেও প্রথা হয় না, এমন কি যীশু খৃস্টের জন্মের সঙ্গেও জড়িত মদ ও রুটি। তাদের দেশে মদ্যপ হলো নিন্দনীয় কিন্তু মদ্যপান নয়। তারা ভোজের বদলে খাবারের সঙ্গে পান করেন যা আমরা চলতি-শব্দে বলি "মদ"। ওটা না খেলে তাদের খাবার খাওয়াই ভাল করে হয় না। এটা আমি অনেকের কাছ থেকে দেখেছি। তারা চুমুক-চুমুক করে। খাবার রেখে শেষ প্লেটটি। টেবিলে দেখেছি জড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে খাবারের গাদা। আমরা আমাদের "ন্যাংগটিপনা" চাপিয়ে দিই অন্যদের কোমরে, চাপিয়ে দিই আমাদের তথাকথিত নৈতিক মান।

কিন্তু শুনুন, "নৈতিক" মানের কথা: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যতোজন কর্মচারী আছেন প্রায় সকলেরই মদ্যপানে অরুচি নেই। কিন্তু প্রটোকল? পার্টিতে তাদের জন্যে কোনো (মদ) পানীয় নেই। মুখ ফুটে বললেই আসে, কিন্তু কী যে একটা ভয়, প্রটোকলের ভয়! তারা কী করেন? সবকিছু শেষ হওয়ার পর তাদের অনেকে চলে আসতেন আমাদের হোটেলে, যেখানে সাংবাদিকরা ভারতীয় সংবিধান ভঙ্গ করে খাবার টেবিলে আনতো (মদ) পানীয়। তারা আমাদের শরিক হয়ে যেতেন, আনন্দে গলাধঃকরণ করতেন তরল পদার্থ ভারত সরকারকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে।

এই ন্যাকামির কী প্রয়োজন? যে মদ্যপান করে না তার গলায় ঠেসে কেউ দেয় না পানীয়। কিন্তু "ডগ-ইন-দ্য-ম্যানজার" নীতিতে ভারতের এই অদ্ভুত প্রটোকল কেন? আমার নিজের কানে শোনা, বিদেশীরা কীভাবে হাসে, কীভাবে তাচ্ছিল্য করে ভারত সরকারের প্রটোকলকে। তারা প্রকারান্তরে বলে, আমরা বলি সোজাসুজি, "আমরা ভণ্ড তপস্বী!"

ডিনারেও তাই। কিন্তু পোশাক-আশাক দেখে চক্ষু চড়কগাছ। কে বলে সমাজতান্ত্রিক দেশ! কী পোশাক মেয়েদের! কতো মিংক কোট, কতো যে কতো রকমের ফ্যাশান! সব কালো। আমাদের নিজেদের পোশাক মনে হলো গেঁয়ো। আর চারদিকে সুগন্ধ, কে যে গায়ে লাগিয়েছে। আর গায়ের কোন্ জায়গায় বোঝবার উপায় নেই, শুধু সুগন্ধ। ওদিকে বাজনা। চমৎকার ব্যান্ড, চেম্বার মিউজিক। (ইন্দিরাজী এক রাত্রে তাঁর দেওয়া ডিনারে শুনালেন ইয়েহুদি মেনুহিন ও রবিশঙ্করের যুগলবন্দী (রেকর্ড)। আমার ভাল লাগে নি, পরিষ্কার বলছি।)

আর ডিনারে বসাও এক মাথাব্যথা ব্যাপার। শ' চারেক লোক। কে কোথায় বসবে সব ছক-কাটা। ঢুকবার পথে একটি টেবিলে নকশা করে লেখা আছে আপনার সীটটি কোথায়। দু'এক স্থানে ছাপানো নামের লিস্টি দেওয়া। তা দেখে স্থান খুঁজে পাওয়াও খুব সহজ নয় যদিও। প্রত্যেক টেবিলে দু'জন ওয়েটার, কালো-সাদা পোশাক, বো-টাই, হাতে দস্তানা। তাদের আসা-যাওয়া খাবার দেওয়া একটা যেন চমৎকার ড্রিল, কারো মুখে একটি শব্দ অবধি নেই, নিয়ম হল, প্রতিটি কোর্স প্রথম দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর ডিশে, তারপর পাবে অন্যান্যরা।

এমনি একটি রিসেপশানে (বুকারেস্ট শহরে) সাক্ষাৎ একটি রুমানিয়ান তরুণীর সঙ্গে, তরুণী ও রূপসী। ভারতের মেয়েদের মতো শাড়ি-পরা। নাম তার "মার্গিতা।" ইনি হিন্দী গান করেন চমৎকার, হিন্দী বলেনও বেশ। ফটোগ্রাফার জৈন এবং আমার সঙ্গে হিন্দীতে বেশ কথা বলে গেলেন, এবং দেখলাম তাঁর হিন্দী অন্তত আমার হিন্দীর চাইতে ভাল। মার্গিতার গান রেকর্ড হয়েছে, নিজের ভাষায়, এবং একটি রেকর্ড হয়েছে (৩৩ আর-পিএম) চারটি হিন্দী গান নিয়ে, ফিল্মের গান। আ বরে পরদেশী, বব্ সে

বলম্ ঘর আয়ে. শর পর টোপি জাল. তুম্‌সা নাহি দেখা।

তার সঙ্গেই এই রেকর্ড একটি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে নিলাম। বললাম, "রেকর্ডে নাম সই করে দাও।" দিলেন, এবং লিখলেন হিন্দীতে, "ভারত কী লোগোঁকী মেরা প্রেম। নার্গিতা।" (দিল্লি ফিরে এসে গানগুলো শুনলাম। বেশ ভাল, দু'-একটি শব্দ বাদ দিলে বুঝবার উপায় নেই যে বিদেশী তরুণীর কণ্ঠজাত হিন্দী।)

বুকারেস্ত শহরে তার জন্ম, এবং ১৪ বছর আগে প্রথম দেখেন হিন্দী ফিল্ম "আওয়ারা।" তারপর থেকে হিন্দী গান গাওয়ার বাসনা জাগল। বিদেশী ভাষা শেখার ইস্কুলে হিন্দী শিখলেন আর হিন্দী গানের রেকর্ড শুনে শুনে গানও শিখতে লাগলেন। তিন বছর আগে তাঁর প্রথম হিন্দী গান রুমানিয়বাসীদের প্রশংসা অর্জন করে। এবং রেকর্ড যখন বেরিয়েছে তখন বুঝতে হবে যে কিছু কিছু হিন্দী গান (দ্রুত লয়ের এবং অর্কেস্ট্রা-সহ) জনপ্রিয়ও বটে। নার্গিতা প্রায় গোটা পঞ্চাশেক হিন্দী গান জানেন। টি-ভিতে গান করেন।

অথচ ইনি এখনো ভারতবর্ষ দেখেন নি। বললেন, "আমার স্বপ্নের দেশ ভারত।" (একবার জানাতে ইচ্ছা হল যে স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন না হয়ে যায়।) ডক্টর রাধাকৃষ্ণন রুমানিয়াতে যান ১৯৪৫ সনে। তাঁকে হিন্দী গান শুনিয়েছেন নার্গিতা, এবং রাধাকৃষ্ণন করেছেন প্রচুর প্রশংসা। বললেন : "আর ১০।১২ গান এখন শিখছি। একটি হল দিকরুবো। আমি ভরতনাট্যমও এখন শিখছি।" ভারত সরকারের উচিত কোনো কৃষ্টি বিনিময় প্রোগ্রামে নার্গিতার মতো মেয়েদের আমাদের দেশে আনা। আশ্চর্য মনে হয়, কেন তার এই অবধি ভারত দেখার সুযোগ হল না।

নার্গিতার খুব ইচ্ছে ইন্দিরাজীর সঙ্গে একটি ছবি তোলার। গিয়ে বললাম তাঁকে নার্গিতার কথা। অমনি রাজি হলেন। এসে দাঁড়ালেন নার্গিতার পাশে. আর ক্লিক ক্লিক ক্লিক। জানি না, ছবি কেমন হয়েছে. এবং ক্লিক তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে কিনা যে নার্গিতাকে ছবি পাঠাবে।

একটি অবিস্মরণীয় রাত্রি ছিল বুকারেস্তের "অপেরা রোমানা"-য়। চেকোভস্কির বিখ্যাত "সোয়ান লেক।" পুরো চার অঙ্কের ব্যালে। আমি ব্যালে-বিশারদ নই, কিন্তু শুধু বলতে পারি নৃত্য-সংগীত ছিল অতি চমৎকার। ইন্দিরাজী অপেরা হলে তাঁর বসার জায়গাটিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিচের সমস্ত দর্শকরা করতালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। শেষ হওয়ার পর ইন্দিরাজী পাঠালেন মস্ত বড় পুষ্প-ডালি যারা ব্যালে করলেন তাদের প্রশংসায়।

রুমানিয়ার জাতীয় সম্পদের ভিতর অতি উচ্চস্থান আছে তৈলেতে (পেট্রল ইত্যাদি) ও তৈলজাত রাসায়নিক দ্রব্যাদিতে। ইউরোপে রুমানিয়ার দ্বিতীয় স্থান এ বিষয়ে, অর্থাৎ রাশিয়ার পরেই। অয়েল টেকনোলজিতেও রুমানিয়ার স্থান উচ্চে। তারই সহায়তায় হয়েছে গৌহাটির রিফাইনারি এবং হলদিয়াতেও হবে এদের সহায়তায়। তেল এবং আঙুরের ওয়াইন—দুটির জন্যে এই দেশ অত্যন্ত গর্বিত। স্বভাবতই ইন্দিরাজীকে তারা এই দুটি জিনিসই দেখাতে চাইবে।

মোটরের মিছিলে একদিন গেলাম প্রায় ৬০।৭০ কিলোমিটার উত্তর দিকে, প্লয়েস্তিতে। "ব্রাজি" অয়েল রিফাইনারি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারখানা। মস্ত বড় কারখানা। ঘুরে দেখতেই এক ঘণ্টা লাগে। কাজ ফেলে কেউ ইন্দিরাজীকে দেখতে আসে নি, কিন্তু ক্যানটিনের মেয়েরা এল ভিড় করে। কিছুক্ষণ পরে হল শ্রমিকদের খাওয়ার ছুটি। তখন রাস্তায় তারা দাঁড়াল ভিড় করে। হাততালি দিয়ে ইন্দিরাজীকে অভ্যর্থনা জানাল। নারী-শ্রমিকও তাদের ভিতর দেখলাম অনেক।

এখান থেকে আবার চললো মোটর মিছিল গ্রাম মাঠ পেরিয়ে বিখ্যাত আঙুরস্থান, "ভালেয়া কালুগারেয়াস্কা" নামক ওয়াইন তৈরির কারখানায়। কতো মাইল আঙুরের ক্ষেত পেরিয়ে এলাম ঠিক নেই। ট্রাক থেকে মেশিনে কয়েক মন করে আঙুর তুলে নিচ্ছে কলের বালতি, সে ঢেলে দিচ্ছে রস-করার মেশিনে, আর তারপর ধাপে ধাপে গিয়ে পৌঁছয় ওয়াইনের স্তরে। বোতলজাত হয়ে,

নাম-ঠিকানা তারিখের লেবেল এ'টে কয়েক হাজার বোতল আছে শুয়ে কাঠের র‍্যাকে।

ওখানে লাঞ্চ দিলেন স্পোরেশ্তি এলাকার মেয়র। এই প্রথম দেখলাম মদ্য (ওয়াইন) পানের ফরম্যালিটি। লম্বা টেবিলের মাঝে মাঝে প্রতি তিন চারজন উপবিষ্ট অতিথি-দের জন্যে একটি করে বড়ো কাচের দণ্ড-বিশিষ্ট বোল। প্রত্যেকের আশেপাশে ডজন-খানেক নানা আকৃতির কাচের গেলাস। তিন-জন মহিলা ওয়েটার আমাদের টেবিলে। (প্রধানমন্ত্রীর টেবিল অন্য ঘরে।) একজন মহিলা হাতে নিলেন একটি সরু-গলা বোতল। উপবিষ্টদের মধ্যে একজন রুমানিয়ান ওয়াইন-এক্সপার্ট বর্ণনা করলেন ওয়াইনের কী নাম, ওটার আঙুর তাদের দেশে এসেছে ফ্রান্স কি ইতালী থেকে কতো বৎসর আগে, ওয়াইনে চিনির ভাগ, জলের ভাগ ও অ্যালকোহল কতো ভাগ। মহিলা তখন বিশেষ গেলাসে ঢেলে দিলেন প্রত্যেককে। এটা হল চোখে দেখার জন্যে। পান করার জন্যে নয়। একটু চেখে বাকিটুকু ঢেলে ফেলো ঐ সামনের বড়ো বোলটায়। আবার আসবে অন্য একটা। এমনি করে চললো পুরো আধ ঘণ্টা। কোনোটা মেয়েরা পছন্দ করে, কোনটা পুরুষেরা, কোন্ উৎসবে কোনটা চলে বেশি, ওয়াইন এক্সপার্ট হাসি-ঠাট্টা মিশিয়ে বলে যাচ্ছেন।

বারান্দায় বাজছে লোক সংগীতের অর্কেস্ট্রা, রুমানিয়ান লোক যন্ত্রে। ভায়োলিন, পিয়ানো একর্ডিয়ন, ক্লেরিনেট, আড়-বাঁশী, এবং একটি অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র অর্থাৎ অনেকগুলো ছোট ছোট বাঁশী এক জায়গায় জোড়া দেওয়া পর পর, প্রতিটির আলাদা সুর, "সরগম" করে বাঁধা। খানা-পানীয়ের স্বাদ অনেক বেড়ে গেল উৎসবের আবহাওয়ায়।

রুমানিয়ার সার্কাস : পেত্রিকা এবং ভিনতোর,

কিন্তু ওদের লোকসংগীত, লোকনৃত্যের পরিচয় পেলাম অন্য স্থানে। বুখারেস্ট শহরে কিন্তু যেন শহরে নয়। শহরের এক কোণায় অনেক জায়গা নিয়ে বসানো হয়েছে একটি মিউজিয়াম, "ভিলেজ মিউজিয়াম"। এই ধরনের মিউজিয়াম এই প্রথম দেখলাম।

ছোট একটা হ্রদের চারপাশে স্বাভাবিক গাছগাছড়া, বন, ঝোপ ইত্যাদি। মাঝে মাঝে প্রাচীন ঘরবাড়ি, প্রমাণ সাইজের। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের গ্রামীণ ঘর বাড়ি। একটা ঘরে ঢুকুন। ঘর ব্যবহার হতো পুরোনো দিনের চরকা, কেঠো তাঁত, কিম্বা উনুনের মতো জিনিস। শোবার ঘর, বসার ঘর ওই পুরোনো দিনের মতো সাজানো। এমন মিউজিয়াম যে সবখানি দেখার পর জানতে পারা যায় কী-ভাবে ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে গ্রামের জীবন, তাদের কেমন ছিল জীবনধারা। শহরের লোকেরা গ্রামকে তো চেনেই না। তাদের পক্ষে এমনি মিউজিয়াম অত্যন্ত আবশ্যক।

ইতিকর্তব্যে কোথাও পেছুন আমরা হাঁটছি এই মিউজিয়ামে। রাস্তাও কিন্তু গ্রামীণ, ঘাস, গাছ, ফুল, পাথর। মাঝে মাঝে একটু খোলা জায়গা। যেমনি আমরা উপস্থিত ওই ধরনের খোলা জায়গায় (অনেকটা আমাদের ঘর-বাড়ির ঘাস-ঢাকা আঙিনার মতো), অমনি সেখানে লোকগীতি আর নৃত্য। আগে থেকে অপেক্ষা করছে তারা, শুধু একটা দল নয়, অন্তত গোটা পাঁচেক। আধেক ছেলে, আধেক মেয়ে। সাজসজ্জা ন্যাশনাল, জাতীয় বেশ রঙচঙে, দেখতে ভারি সুন্দর। ছেলেদের হাঁটু অবধি বুট।

সেই গ্রামীণ পরিবেশে লোকগীতি আর নৃত্য। সঙ্গে বাজছে লোক-যন্ত্র। প্রাণ-মাতানো তাদের তাল আর সুর (ভাষা তো বুঝতে পারিনি)। ইচ্ছে হয় তাদের সঙ্গে লেগে যাই নবমাতানো নাচ গানে। কিন্তু তা তো হবে না। আমরা শহরে সভ্য মানুষ, নাচতে চাইলে বড়জোর যেতে হবে রেস্তোরাঁ-হোটেলের ড্যান্স-ফ্লোরে।

এমনি মিউজিয়াম যেন গোটা দেশের দর্পণ। যেমনি দেখেছি বেলগ্রেডের সামরিক মিউজিয়াম। আপনি গোটা মিউজিয়মটি ঘুরে নিন, আপনি সাধারণভাবে জেনে যাবেন গোটা দেশের ইতিহাস। শুধু পাথর, কাঠ, হাড়-গোড় রাখা মিউজিয়াম নয়।

একটি কথা না-বললে আমার রুমানিয়ার কথা বলা হবে না। তা হলো সার্কাসের জন্তুর। বুকারেস্তে সেদিন আমরা ঘুরে দেখছি। নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, যেমনি হচ্ছে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে। বড় বড় বাড়ি, বাগান দিয়ে সাজানো। তৈরি হচ্ছে সেখানে নানা রকমের স্থাপত্য-শিল্প। সাধারণ লোকদের জন্যে সরকারী চিন্তা-ভাবনার পরিচয় আমরা সবাই পেয়েছিলাম।

ঘুরতে ঘুরতে এলাম পাকাপোক্ত একটি সার্কাস ঘরে। গোলাকৃতি হলঘর, মস্ত বাড়ি, বাইরে বাগান। যেন আধুনিক অপেরা হল। (হায়! হায়! কোথায় আমাদের হাওড়ার মাঠে-ফেলা সার্কাস তাঁবু, কিম্বা দিল্লির লালকেল্লার উল্টো দিকের মাঠে!) প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। স্টেজে এল গোটা চারেক ভল্লুক, ছোট বড় চকচকে গায়ের লোম।

কতো যে খেলা দেখাল দশ মিনিটে: মোটর সাইকেল চড়ছে, বলের উপর ভারসাম্য রাখছে, কানে কানে কথা বলছে, খবরের কাগজ পড়ছে, আরো অনেক।

ভল্লুকদের মাস্টার হলেন প্রাক্তন ইতিহাস-শিক্ষক ইয়ন ভিনতোর, বয়েস মাত্র ৩৪। কোথায় ইস্কুলে ইতিহাসের ক্লাস, কোথায় বাঘ-ভল্লুক নিয়ে খেলার স্টেজ। তার অনুগত ভল্লুকদের নামও চমৎকার: পেত্রিকা, তুতু, মুরো, আজা। দেখলাম, ভিনতোর যেন ভল্লুকদেরই মানুষ। সে যেন তাদের ভাষা বুঝতে পারে। বোতল থেকে তাদের নিয়ম খাওয়াচ্ছে, আদর করছে, আলিঙ্গন করছে। যার নাম চমৎকার।

ক্রমশ

—খগেন দে সরকার

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর

আপনার বহুল প্রচারিত ও জনসমাদৃত 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার ৩৫বর্ষ ৫ম সংখ্যার 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' ধারাবাহিক রচনার ৪৫৩ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত-কুলতিলক "তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পর্কে লেখক যে "স্বকীয় মন্তব্য" করিয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতেছি। ওই মন্তব্য অত্যন্ত অবমাননাকর, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা ওই "স্বকীয় মন্তব্যের" দৃঢ় প্রতিবাদ জানাইতেছি।

'তারানাথ তর্কবাচস্পতি'কে অকৃতজ্ঞ, তাহা মিথ্যাবাদী, মর্মবেদনাদায়ী ইত্যাদি অশালীন বিশেষণে ভূষিত করায় আমাদের পরিবারে ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ, বিরক্তি ও মর্মপীড়া উৎপাদন করিয়াছে। উপরন্তু আমরা বংশ পরম্পরায় 'তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্বাসী তাহা আমাদের নিকট ধর্মবিশ্বাসের মতই পবিত্র ও সত্য।

লেখকের কল্পকল্পিত "স্বকীয় মন্তব্য" আমাদের বংশের প্রত্যেকের সত্য ও বিশ্বাসের প্রতি মর্মান্তিক আঘাত হানিয়াছে।

আশা করি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া "তারানাথ তর্কবাচস্পতির বংশধরদিগের জানাইবেন।

বিনীত

'তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জীবিত বংশধরগণের স্বাক্ষর (সংখ্যা ৪০)

লেখকের উত্তর

তারানাথ তর্কবাচস্পতি লোকান্তরিত হয়েছেন ১৮৮৫ সালের ২০ জুন। তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৭৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত 'আবার অতি অল্প হইল' প্রকাশিত হয়েছিল। 'আবার অতি অল্প হইল'র পরবর্তী একটি সংস্করণ (তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবদ্দশায় প্রকাশিত) থেকে একাংশ উদ্ধার করি :

"ঐ (পাইকপাড়ার) রাজবাড়িতে ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, খুড়ো (তারানাথ তর্কবাচস্পতি) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়ের ফর্দে, রাজকুমার ন্যায়রত্নের নামে, ৮ টাকার অঙ্কপাত করিয়াছিলেন। ফর্দ দেখিয়া ন্যায়রত্নের পক্ষে অবিবেচনা হয়েছে এই বলিয়া বিদ্যাসাগর, ৮ টাকার জায়গায় ১২ টাকার অঙ্কপাত করিয়া দেন। বিদায়কালে ন্যায়রত্ন ১২ টাকা পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁর পক্ষে উচিত বিবেচনা হয় নাই এই কথা জানাইলেন। খুড়ো কহিলেন, বলিলে বিদ্যাসাগর বিরক্ত হবেন, কিন্তু না বলিলে নয়, এজন্য বলিতে হইল, আমার বিবেচনায় ন্যায়রত্ন ইহা অপেক্ষা অধিক পেতে পারেন; কিন্তু আমি যে পক্ষ ন্যায়রত্নও সেই পক্ষ; অর্থাৎ আমি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তকের উত্তর লিখেছি, ন্যায়রত্নও লিখেছেন; সেই অপরাধে বিদ্যাসাগর রাগ করিয়া ন্যায়রত্নের বিদায় কমাইয়া দিয়াছেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

বিদ্যাসাগরের উপর অন্যায় দোষারোপ হইতেছে এবং সকলে অকারণে তাহাকে দোষী ভাবিতেছে, ইহা দেখিয়া কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণগোপাল ঘোষ বাবু বলিলেন, বাচস্পতি মহাশয়! আপনি এরূপ অন্যায় কথা বলিতেছেন কেন? ইহা কহিয়া বিদায়ের কাগজখানা খুড়ার সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন দেখুন, আপনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নামে ৮ টাকার অঙ্কপাত করিয়াছিলেন; ৮ টাকা অন্যায় বিবেচনা করিয়া বিদ্যাসাগর আটের জায়গায় বার করিয়া দিয়াছেন। এমনস্থলে বিদ্যাসাগর রাগ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিদায় কমাইয়া দিয়াছেন, এ কথা বলা ভাল হইতেছে না।

জোঁকের মুখে চুন পড়িলে যেমন হয়, খুড়ো আমার অপ্রতিভ হয়ে সেইরূপ হয়ে গেলেন। এক্ষণে সকলে বলুন, অলীক দোষারোপ করিয়া পরের দুর্নাম ও অনিষ্ট চেষ্টা করা হবিষ্যাশী ধার্মিক চূড়ামণি খুড়ার পক্ষে উচিত কর্ম হয়েছে কিনা এবং তজ্জন্য তাঁর উপযুক্ত ভাইপো রাগ করিলে উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলে দোষের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কিনা।

বিদ্যাসাগরের তুল্য খুড়ার যথার্থ হিতৈষী মিত্র ভূমণ্ডলে নাই। খুড়ো এখন মানুন না মানুন তাঁর মানসম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি, সকলের মূলে বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের সহায়তা ব্যতিরেকে, খুড়ার কালেজে প্রবিষ্ট হইবার, কস্মিনকালেও সম্ভাবনা ছিল না। বিদ্যাসাগর যেরূপ অদ্ভুত চেষ্টা ও কষ্টস্বীকার করিয়া খুড়াকে কালেজে অধ্যাপকের তক্তে বসাইয়াছিলেন, তাহা কাহারও সাধ্য নহে। খুড়ো আমার মহাশয় ব্যক্তি; এখন বড়লোক হয়ে সে সকল ভুলিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, খুড়ার গায়ে মানুষের চামড়া নাই। যাতে বিদ্যাসাগরের মর্মান্তিক হয়, পিতা পুত্রে সে চেষ্টায়, ক্ষণকালের জন্যেও অলস ও অমনোযোগী নহেন। বিদ্যাসাগরের কুৎসা করা, খুড়ার কুলতিলক জীবানন্দ ভায়ার শরীর ধারণের, সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে।..." (আবার অতি অল্প হইল, ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত সংস্করণ, পৃ ৪—৬)

প্রশ্ন থেকে যায় : এই 'আবার অতি অল্প হইল'র প্রকৃত রচয়িতা কে? এই রকম প্রসিদ্ধি চলে আসছে যে বেনামীতে প্রচারিত এই পুস্তকের রচয়িতা স্বয়ং বিদ্যাসাগর। প্রমাণের জন্য দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৮) পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ১১৬—১৭।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'আবার অতি অল্প হইল'র আলোচ্য অংশের, তারানাথ তর্কবাচস্পতি কিংবা বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত, কোনো যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

অতএব স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পর্কে আমার 'স্বকীয় মন্তব্য' আমার 'কল্পকল্পিত' নয়, প্রত্যেকটি মন্তব্যের মূলে আছে বিদ্যাসাগরের একটি বেনামী রচনা। এই অবস্থায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবিত বংশধরগণের 'দৃঢ় প্রতিবাদ' সত্ত্বেও তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্য প্রত্যাহারের কোনো সঙ্গত কারণ দেখি না।

আমার বিবরণ সত্য হইলেও তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবিত বংশধরগণ 'মর্মান্তিক আঘাত' পেয়েছেন বলে আমি দুঃখিত কিন্তু এক্ষেত্রে নিরুপায়।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবিত বংশধরগণ লিখেছেন : "আমরা বংশপরম্পরায় 'তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্বাসী তাহা আমাদের নিকট ধর্মবিশ্বাসের মতই পবিত্র ও সত্য।" কিন্তু বিশ্বাস এক বস্তু, সত্য আরেক বস্তু। এককালে অবশ্যই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তারানাথ তর্কবাচস্পতির মধুর সম্পর্ক ছিল; কিন্তু তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবিত বংশধরগণের 'সত্য ও বিশ্বাসের প্রতি মর্মান্তিক আঘাত' লাগলেও একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে চিরকাল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তারানাথ তর্কবাচস্পতির মধুর সম্পর্ক ছিল না। চিরকাল মধুর সম্পর্ক থাকলে বিদ্যাসাগর কি কোনোকালে বেনামী রচনায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পর্কে লিখতে পারতেন যে তাঁর 'গায়ে মানুষের চামড়া নাই'! চিরকাল

ইংরিজী অনার্স, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা বা 'একাউন্টেন্সি' পড়াতে চাইবেন। এটি হল যে কোন ধরনের শিক্ষার চাহিদার দিক। এই পরিচিত তত্ত্ব Marginal Efficiency of Capital (or Investment) অনুযায়ী আমরা (ধরা যাক) বি ই কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদনপত্রের সংখ্যা ব্যাখ্যা করতে পারি। অধিকতর সঙ্গতি থাকলেও অর্থকরী কোন শিক্ষার ব্যবস্থা না হ'লে (অর্থাৎ 'ইঞ্জিনিয়ারিং' বা ডাক্তারী পড়ার সুযোগ না পেলে) যেহেতু ছেলেকে চাকরির সন্ধানে নিয়োজিত রাখা বা বি এ (Pass) পড়ানোর মধ্যে ব্যক্তিগত খরচের তারতম্য হবে বেশী নয়, এই ধরনের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট চাহিদা থেকে যায়। কাজেই হায়ারসেকেণ্ডারীর তুলনায় বি এ (Pass) পাশের আয়ের আশা বেশী মনে হলে কিম্বা একই মনে হলেও, যেহেতু বি এ (Pass) পড়ার খরচ খুব বেশী নয়, অন্য কোথাও সুযোগ না পেয়ে হাজার হাজার ছাত্রের বি এ (Pass) পড়তে চাওয়া আমরা অনুধাবন করতে পারি। প্রথম প্রশ্নের জবাব শেষ করার আগে বলে রাখা ভাল কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষালাভের তথা শিক্ষিত হতে চাওয়ার অন্যতর সম্ভাব্য কারণ এখানে উপেক্ষিত বা অপেক্ষাকৃত কম বিবেচিত, যেমন: শুধুই জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষা; সামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষা। তাছাড়া আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্র অভিভাবক শিক্ষার ব্যয় বহন করেন বলে নিয়োগের কর্তা হিসেবে তাকেই চাহিদার সূত্রধর করা হয়েছে।

কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার যোগানের দিকই অনেককে মনে হয় বিচলিত করে। কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়োজিত জাতীয় সম্পদ যদি ওই জাতীয় শিক্ষিতের আয় ক্ষমতার বা উৎপাদন ক্ষমতার এতটুকু তারতম্য না ঘটায়, সমাজের দিক থেকে নিঃসন্দেহে ঐ সম্পদ অন্যায় ব্যবহার করার কাজ চলছে। এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণের (পরিসংখ্যানের) অভাবে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে হয়ত কিছু বলা যায়। হায়ার-সেকেণ্ডারী পাশকরা ব্যক্তির গড় আয় বি এ (Pass) পাশ করা ব্যক্তির গড় আয়ের তুলনায় (বর্তমান কালে প্রায় সকলের অভিজ্ঞতাতেই মনে হয়) খুব বেশী নয় বা অপেক্ষাকৃত সমান। যদি এ কথা ঠিক হয়, বি এ (pass) শিক্ষার জন্য নিয়োজিত সম্পদ সম্পর্কে বলা যায় যে তার অন্যতর ব্যবহারে সমাজের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আমাদের স্বল্প সম্পদ আমরা হয়ত এমন বিষয়ে ব্যবহার করছি যার অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় শূন্য। কাজেই সমাজের সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের জন্য ওই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার বিলোপসাধনে আখেরে (in the long run) আমাদের লাভ বই লোকসান হবে না। প্রশ্ন এই নয় যে পরিবর্তনের ফলে এ' মুহূর্তে সামাজিক ব্যয় কি হবে বা কত বেশী হবে; প্রশ্ন এই যে সম্পদের ব্যবহার সর্বোৎকৃষ্ট কিনা—যদি তা' না হয় তবে অন্যতম বিন্যাসের আয়োজনের ও বর্তমান ব্যবস্থার বিলোপসাধনের প্রয়োজন আছে। দেশের আর্থিক অঙ্গের অন্যদিকে এই প্রশ্ন যেমন স্বাভাবিক, শিক্ষাব্যবস্থাতেও ঠিক তেমনই হওয়া কাম্য। সম্পদ আমাদের স্বল্প, তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার প্রয়োজন; দরিদ্র দেশের আর্থিক প্রগতির পথে অনর্থনৈতিক যে কোন বিশেষ ব্যবস্থা পবিত্রজ্ঞানে বছরের পর বছর পূজিত হতে পারে না।

শ্রীকান্ত চ্যাটার্জী,
য়ুনিভার্সিটি অফ সারে
দেবপ্রিয় ঘোষ
য়ুনিভার্সিটি অফ এসেক্স

ভাষা সমস্যা

গত ৬ই জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী অমিতা রায়ের পত্রে যে 'ভাষাসমস্যা'টি উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীহট্টীয় তথা হবিগঞ্জীয় হওয়া সত্ত্বেও তার অর্থোদ্ধার করতে পারিনি। কথ্য ভাষার সমস্ত ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য লেখ্যরূপে পাওয়া যায় না, তাতেই এই বিভ্রান্তি ঘটেছে বলে মনে হয়।

শ্রীমতী রায়ের বক্তব্য নানা কারণে ত্রুটি-পূর্ণ। হবিগঞ্জ অঞ্চলের কথ্যভাষা মুখ্যত পূর্ব বাংলার ত্রিপুরা জেলার কথ্যভাষা-সংশ্লিষ্ট, শ্রীহট্টের সাধারণ কথ্যভাষা, যা মৌলভীবাজার, উত্তর শ্রীহট্ট, সুনামগঞ্জ ও করিমগঞ্জ মহকুমায় এবং কাছাড় জেলায় ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে হবিগঞ্জীয় কথ্যভাষার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। অতএব শ্রীমতী রায়ের উদ্ধৃতিকে যথার্থ বলে মেনে নিলেও ভুল লোকাতে বাংলাভাষার তালিকা থেকে ত্রিপুরা জেলাকে (কুমিল্লা) খারিজ করতে হয়, শ্রীহট্টকে নয়।

দ্বিতীয়, লেখ্যভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার পার্থক্যের ব্যাপার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।

ওড়িয়া কিংবা অসমীয়া ভাষার সহিত বাংলার সাদৃশ্য সম্পর্কে শ্রীমতী রায়ের বক্তব্য যে কোন আর্যভাষা সম্পর্কেই খাটে। তবু তিনি সম্ভবত এক্ষেত্রে লেখ্যভাষার সাদৃশ্যই লক্ষ করেছেন। কিন্তু শ্রীহট্টীয় বা চট্টগ্রামের কথ্যভাষাই যখন তাঁর আলোচ্য, তখন অসমীয়া কথ্যভাষার সঙ্গে তুলনাটাই যুক্তিযুক্ত হবে। সেক্ষেত্রে বলা যায়, আসামের উজানগুলো জেলা, সহরাঞ্চলের কথ্য-ভাষার অর্থোদ্ধার করাও কোন নবাগত বঙ্গভাষীর পক্ষে সম্ভব নয়।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও আরেকটা কথা বলা প্রয়োজন। আসামের এই জেলার অধিবাসী সকলেই শ্রীহট্টীয় ভাষী এবং নিজেদের মাতৃভাষা বাঙলার সম্মান রক্ষার জন্যে এদের প্রতিটি মুহূর্তে জীবনপণ সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে, শিলচরে একাদশ শহীদের আত্মত্যাগও সেদিনের কথা, কলকাতার নিরাপদ দূরত্বে বসে কোন কোন বুদ্ধিজীবী যখন এই ধরনের আকস্মিক সত্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হন, তখন সেই পাণ্ডিত্যের ঝক্কি সামলাতে আমাদের পর্যাপ্ত মূল্য দিতে হয়।

সুজিৎ চৌধুরী
করিমগঞ্জ, কাছাড়।

সাম্যবাদ ও প্রগতি

আমি বলেছিলাম, প্রগতির পথ বহু। ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত তাঁর দীর্ঘ পত্রে অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন তুলেছেন: "পথ কি সত্যিই বহু? অথবা অধ্যাপক নন্দ কি নিজে 'বহু পথে' বিশ্বাসী?" অর্থাৎ, তিনি শুধু নিজে বহু পথ মেনে নিতে অসম্মত তাই নয়, অন্য কোনো ব্যক্তি বহু পথ স্বীকার করে নিয়েছেন এমন কথা বিশ্বাস করতেও তিনি রাজী নন। অথচ আমার মূল প্রবন্ধে আমি আর্থিক উন্নতির নানা পথের কথা বলেছি তাই নয়, উদাহরণ দিয়ে কথাটা স্পষ্ট করে তুলতেও চেষ্টা করেছি। লিখেছি: "এ শতাব্দীতে দ্রুত আর্থিক উন্নতির নানা উদাহরণই চোখে পড়ে; যেমন জাপান, সুইডেন, ক্যানাডা, মেক্সিকো ও সোভিয়েত দেশের আর্থিক উন্নতি হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। এই বিভিন্ন পথের তুলনা-মূলক বিচার থেকে আমাদের শিক্ষালাভ করতে হবে।" ইজরায়েল ও মিশরের নাম যোগ করে তালিকা আরও দীর্ঘ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু যে পাঁচ-ছটি দেশের নাম দেওয়া হয়েছে তাদেরও দুই বিপক্ষ গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা সম্ভব অথবা সঙ্গত নয়। যেমন জাপান ও মেক্সিকোর পথ এক নয়, আবার মেক্সিকো ও সোভিয়েত দেশের পথও ভিন্ন। ইজরায়েলের কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থাকে 'ধনতান্ত্রিক' অথবা নিছক ধনতন্ত্রের অর্থে বলা যায় না, আবার 'সাম্যবাদী' বললেও মার্কসবাদের সঙ্গে তার যোগ থাকে না।

কিন্তু এই তর্কও থাক। মূল কথাটি পুনরায় সংক্ষেপে বলি। বিজ্ঞানের প্রয়োগের সাহায্যে মানুষের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোই আর্থিক প্রগতির পক্ষে প্রধান প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সমাজে ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন চাই। কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয় কোনো বিশেষ সমাজব্যবস্থা অথবা মতবাদের গোঁড়ামি এজন্য প্রয়োজন হয় না। প্রগতির কতগুলি মূল শর্ত

আছে। যেমন (ক) আর্থিক উন্নতির একটি প্রধান শর্ত শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার প্রসার এবং কৃষি ও শিল্পের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চার যোগসাধন। এটি ফললাভের জন্য মার্ক্সবাদ অপরিহার্য নয়। অন্যত্র এই প্রসঙ্গটি আমি আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

(খ) সমাজকে প্রগতিমুখী করতে হলে শ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের যোগসাধন আবশ্যক। "আর্থিক জীবনে স্বার্থবুদ্ধির গুরুত্ব অস্বীকার করা ভুল"; অতএব "স্বার্থবোধকে ধনোৎপাদনের কাজে কিভাবে নিযুক্ত করা যায় সেটা আর্থিক উন্নতির আলোচনায় বিশেষভাবে বিবেচ্য।" আর্থিক প্রগতির এটি দ্বিতীয় শর্ত। এই শর্তটিও নানাভাবে পালন করা যায়। এর সঙ্গে কারখানার মালিকানা সংক্রান্ত প্রশ্নের কোনো প্রত্যক্ষ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। যেমন মার্কিন দেশে তেমনই সোভিয়েট দেশেও "কাজের নিয়ম এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হয় যে, নিজের স্বার্থের মুখ চেয়েই শ্রমিক কাজে দক্ষতা অর্জন করতে আগ্রহী হন।" রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও এই শর্ত পালিত না-হলে কাজের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

(গ) ব্যক্তি স্বার্থের শক্তিকে অস্বীকার করা যেমন অবাস্তব, ব্যক্তিস্বার্থের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করে নেওয়াও তেমনই প্রয়োজন। এখানেই প্রগতির একটি তৃতীয় শর্তের সন্ধান পাই। আমার মূল প্রবন্ধে তাই লিখেছিলাম : "বাজারের হাতে সব কিছু ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। অতএব আর্থিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।" কিন্তু বর্তমান জগতে আর্থিক পরিকল্পনারও রূপভেদ আছে। জাপান, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশেও আর্থিক পরিকল্পনার সার্থক ব্যবহার আছে যেমন আছে সোভিয়েট দেশে এবং ভিন্নরূপে যুগোস্লাভিয়ায়।

ডঃ দাশগুপ্ত লিখেছেন : "তিনি (অর্থাৎ, বর্তমান লেখক) 'ব্যক্তিগত চাষ' অর্থে অবস্থাপন্ন চাষীর মজুরে বা বর্গাদার নিয়োগ করে চাষ করবার কথা ভাবছেন।" এই ব্যাখ্যার সমর্থনে ডঃ দাশগুপ্ত আমার প্রবন্ধ থেকে কোনো উক্তি উদ্ধৃত করতে পারেন নি, কারণ আমার প্রবন্ধে এমন কোনো কথাই আমি বলিনি। বর্গাদারী চাষ ব্যবস্থা আর্থিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক নয় বলেই আমি মনে করি। ডঃ দাশগুপ্ত লিখেছেন : "যদি ধরে নিই যে ভারতে আগামীকালই সমাজতন্ত্র হলো এমন ভাববার কোনো কারণ নেই যে, ডিক্রী করে পরশুই সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে আসবে। বরং এমনটাই সম্ভব যে, ছোট চাষী তার পুরো জমিই হাতে রাখবে, জমিহীন ভূমিমজুরেও কিছু জমি পাবে।"

এখানে ঐ অবান্তর 'পরশু' শব্দটির তাৎপর্য কি? ছোট চাষী তাঁর পুরো জমি কতদিন হাতে রাখতে পারবেন? এ বিষয়ে মার্ক্সের মত এবং স্তালিন ও মাওয়ের পথের সঙ্গে আশা করি ডঃ দাশগুপ্তের ভালোই পরিচয় আছে। ছোট চাষী সম্বন্ধে প্রুদোঁ ও লুই ব্লাঁ [illegible] মিলের অনুকূল ধারণা মার্ক্সের কাছে অসহ্য ছিল; capital-গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তাই মার্ক্স ছোট চাষীদের "a class of barbarians" বলেও উল্লেখ করেছেন। এই প্রকৃত অসহিষ্ণুতাই পরে স্তালিনের রক্তক্ষয়ী পদ্ধতিতে পরিণতি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাপানে এবং তাইওয়ানে ছোট চাষীকে নিয়ে কৃষির ক্ষেত্রে চীন ও সোভিয়েত দেশের তুলনায় অধিকতর সাফল্য লাভ করা গেছে। আবারও পথ ও পদ্ধতির বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। জাপানে কৃষির উন্নতি যে-পথে ঘটেছে যুগোস্লাভিয়ায় সে-পথে নয়। যুগোস্লাভিয়া ও ডেনমার্কের অভিজ্ঞতায় প্রচুর প্রভেদ। আবার ইজরায়েলের পথ আরও স্বতন্ত্র। আমার কাছে এই সব পথই শ্রদ্ধেয়।

সহজ কথা; তবু এরও পুনরুক্তি র তো আবশ্যক ছিল। আর্থিক প্রগতির বহুবিধ পথ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে যাঁরা সচেতন নন তাঁরা এদেশের বিশেষ অবস্থা লক্ষ্য করে একটা পূর্বকল্পিত অবস্থাভেদের সাধনায় ব্যর্থতা ডেকে আনবেন, কিংবা অর্থহীন অপচয়ের পথে দেশকে ঠেলে দেবেন, এই বিপদটাকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই প্রগতির মূলে শর্তগুলি সম্বন্ধে যেমন ধারণা স্পষ্ট রাখা আবশ্যক তেমনই পরিবর্তনের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তাকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রাখাও প্রয়োজন।

ডঃ দাশগুপ্ত লিখেছেন যে, আমার "বহু পথ" নানা শব্দ এবং ব্যাখ্যার গোলক ধাঁধা ঘুরে ধনতন্ত্রের ইন্দ্রপুরীতে এসে পৌঁছেছে।" ইন্দ্রপুরী কেন? আমারও মূল প্রবন্ধের প্রতিটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আমি লিখেছি : "সম্পত্তির সম্পর্ক ঐ সব দেশে (অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক দেশে) এখনও বিরাট অসাম্য। এই অসাম্যের সংঘাতে মানুষে মানুষে একটা সহজ ঐক্যবোধ অনবরত ব্যাহত হচ্ছে।" সোভিয়েত অথবা মার্কিন কোনো দেশই আমার চোখে ইন্দ্রপুরী নয়, এবং যাঁরা পৃথিবীকে ইন্দ্রপুরী ও দৈত্যপুরী এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখেন তাঁদের সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর মিল নেই। একই সঙ্গে এই কথাও বলব যে, আর্থিক প্রগতি যে-পথেই আসুক না কেন, শিক্ষার উন্নতি ও শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিমের বিবিধ সমাজেই সাধারণ শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে।

ডঃ দাশগুপ্তের পত্রে আমার বক্তব্যের প্রতি অবিচার অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু জোন রবিনসনের মতো চীনদরদীকে তিনি "বিখ্যাত পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ" আখ্যা দিতে গেলেন কেন? স্বদেশে অধ্যাপিকা রবিনসন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একজন বড় সমালোচক। পেকিং-পিকিংয়ে কি নিজ দেশের এমন নির্ভীক ও সরব সমালোচক পাওয়া যাবে? মনে রাখা ভালো যে, মার্ক্স স্বয়ং লণ্ডনে বসে ধনতন্ত্রের সেই সুবিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। লেখকের এই স্বাধীনতা কবে আমরা চীন ও সোভিয়েত দেশে দেখব?

আর, আমরা স্বাধীন ভারতের মানুষেরা কবে মন্ত্রএক ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে নিজে পৃথিবীর দিকে তাকাতে শিখব?...

অম্লান দত্ত

আসামের জ্যোতিপ্রসাদ

জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার পূর্বপুরুষ রাজস্থানের অধিবাসী ছিলেন। ব্যবসার সূত্রে আসামে এসে ওঁদের পরিবার ভাষা, সংস্কৃতি ও বিবাহ বন্ধনে আসামের সঙ্গে জড়িয়ে যান—এবং জ্যোতিপ্রসাদ অসমীয়া সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। বস্তুত, ওঁদের পরিবারের অনেকেরই সাহিত্যপ্রীতি দেখা গেছে, এবং সাহিত্যের বিকাশ হয়েছে নতুন অবলম্বিত ভাষা অসমীয়াতে।

গত ১৭ই জানুয়ারি মহাবোধি সোসাইটি হলে অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি চক্রের উদ্যোগে জ্যোতিপ্রকাশের ১৫শ মৃত্যু-বার্ষিকী প্রতিপালিত হলো। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন বক্তার শ্রদ্ধা নিবেদনে এবং প্রকাশিত স্মারকপত্রে জ্যোতিপ্রকাশের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আমাদের গোচর হলো।

জ্যোতিপ্রকাশের বাবা আসামের চা-বাগানের মালিক। ঐ প্রদেশে ওঁদের আগমন তিন পুরুষ আগে। এই পরিবারের একজন চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা কবি ছিলেন, তিনি অসমীয়া ভাষায় 'জোনাকি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জোনাকি বেরিয়েছিল কলকাতা থেকে। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অসমীয়া সাহিত্যে নতুন রোমান্টিক আন্দোলন শুরু হয়, এবং সাহিত্যের একটি অধ্যায় 'জোনাকি যুগ' হিসেবেও চিহ্নিত হয়।

জ্যোতিপ্রসাদের জন্ম ১৯০৩ সালে। কৈশোর থেকেই তিনি সাহিত্য ও রাজনীতিতে উৎসাহী হয়েছিলেন। তেজপুরের স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্থাপিত কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন, সেই সময়েই লেখেন তাঁর প্রথম নাটক "শোণিত কোনওয়ারি"—বালকের লেখা সেই নাটক তৎকালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এরপর কিছুদিন বিলেতে শিক্ষা [illegible] পাশ্চাত্যে নাটক ও সংগীতেই বেশী আকৃষ্ট হন, হিমাংশু রায়ের কাছে হাতে কলমে ফিল্ম তোলার অভিজ্ঞতাও লাভ করেন।

দেশে ফিরে, ১৯৩০ সালে তিনি আবার অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সময়ে তাঁর লেখা গানগুলির মধ্যে 'লুইতের নদীর (ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম) পাড়ে আমরা যুবকেরা মরতে ভয় পাই না'—স্বদেশী ছেলেদের মুখে মুখে ফিরতো। ১৯৩২ সালে তাঁর দেড় বছর কারাদণ্ড হয়। জেলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তবুও মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে আসতে রাজী হননি।

জ্যোতিপ্রসাদের রচনার সঙ্গে নজরুলের তুলনা করা হয়। তাঁর দেশাত্মবোধ ও আবেগ তাঁর কবিতা ও গানগুলিকে সহজ অনুভূতি-গ্রাহ্য করে তুলেছে। গানের সুর তিনি নিজেই দিতেন, তাঁর গানগুলি "জ্যোতি-সংগীত" নামে পরিচিত। গানের সুরে তিনি আসামের লোকগীতি এবং পাশ্চাত্য সুর নিপুণভাবে মিশিয়েছেন। তাঁর কবিতার প্রধান সুর বিদ্রোহের, কিন্তু কিছু লিরিক লিখেছেন, যার মধ্যে আসামের মেঘলা মুকুট পরা পাহাড়, উপত্যকা, বনরাজির মুগ্ধ প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

জ্যোতিপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর একটি নাটক, "কারেংগার লিগিরি"। সমগ্র অসমীয়া নাট্য সাহিত্যে এই নাটকের একটি বিশেষ উজ্জ্বল স্থান আছে। তাঁর অপর নাটকগুলির নাম, "লভিতা"—('৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা), "রূপালিম্" এবং "নিমাতি কন্যা" (নৃত্য-নাট্য)।

জ্যোতিপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবন ঘটনা-বহুল। তিনি রাজনীতির সঙ্গে আগাগোড়া যোগ রেখেছেন। ১৯৩২ সাল থেকে তিনি তেজপুরে কংগ্রেস সেবাদলের কমান্ডার ছিলেন। '৪২-এর আন্দোলনের সময় পুলিশের হাত এড়াতে বহুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। শেষ জীবনে তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

জ্যোতিপ্রসাদের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, তিনি আসামের বিখ্যাত সাপ্তাহিক "অসমীয়া"র সম্পাদক হয়েছিলেন কিছুদিন। অসমীয়া ভাষায় ফিল্ম তোলারও তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। "জয়মতী" এবং "ইন্দ্রমালতী" নামে দুখানা ফিল্মও তিনি তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫১ সালের ১৭ই জানুয়ারি। জ্যোতিপ্রসাদের স্মরণ সভায় অন্নদাশঙ্কর রায় এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন।

নতুন বই

প্রথমে কৌতূহল বশে পাতা ওল্টাতে শুরু করেছিলাম। তারপর গল্পের টানে শেষ অবধি যেতে হলো, ৬১৪ পৃষ্ঠার একখানি বৃহদাকার বাংলা বই দুদিনে পড়ে শেষ করে ফেললাম। লেখক নতুন অথবা নতুন কিনা জানি না—আমি অন্তত তাঁর কোনো লেখা আগে দেখিনি। কোনো অচেনা লেখকের এত বড় একখানা বাংলা উপন্যাস পড়ে শেষ করে ফেলতে পারবো—নিজের ওপর এরকম ভরসা ছিল না।

লেখকের নাম ব্রজমাধব ভট্টাচার্য, উপন্যাসের নাম "ভাস্বর দিগন্ত"। লেখক পরিচিতি থেকে জানা গেল, লেখক বয়সে প্রবীণ, কাশ্মীর ও বারাণসীতে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং উভয় গোলার্ধের দর্শনে তাঁর গভীর জ্ঞান গ্রন্থের মধ্যেই স্বয়ম্প্রকাশ। বর্তমানে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজে শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়ন প্রভূত।

উপন্যাসটির আয়তন যেমন বিশাল, পটভূমিকাও সেইরকম। আরম্ভ হয়েছে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে—নেটিভ স্টেটের রাজকুমার-রাজকুমারীরা যে আনন্দে বিলেতে লেখাপড়া শেখার নাম করে গিয়ে বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও উৎকট সাহেবী অনুকরণে গা ভাসাতেন, সেই সময় মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট্ট রাজ্যের রাজকুমারী অনুপ্রভা প্রেমে পড়লেন একটি উজ্জ্বল বাঙালী বৈজ্ঞানিক যুবকের। ওঁদের বিয়ে হলো, কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই রাজরক্ত ও ব্রাহ্মণ রক্তের মধ্যে সংঘাত। এরপর দুটো মহাযুদ্ধ পেরিয়ে গেল, কাহিনীর শেষ হয়েছে ১৯৪৭এ ভারতের স্বাধীনতার দিনে। এই পুরুষব্যাপী কাহিনীর বিস্তার এবং ভারত ও ইওরোপের নানা প্রান্ত জুড়ে চরিত্রগুলির আনাগোনা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নানান তরঙ্গ প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে।

কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণের ধর্মে খানিকটা অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথা মনে পড়ে। কিন্তু ঔপন্যাসিকের সহজাত কুশলতা তেমন নেই, আঙ্গিক কিছুটা কাঁচা, তার ফলে অবশ্য এমন একটা টাটকা সতেজ ভাব এসেছে—যে পড়তে খুবই ভালো লাগে। বইখানিকে হয়তো মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি বলা যাবে না—কেননা, আবেগের স্রোত কিছুটা বেশী, আদর্শের বাড়াবাড়ি এবং কিছু অতি-নাটকীয় ঘটনা আছে। লেখকের পাণ্ডিত্যও কোথাও কোথাও অতিরিক্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু এর পরিপূরক হিসেবে আছে লেখকের আন্তরিকতা ও সততা—ঐ দুটি জিনিস সুগন্ধ বাতাসের মতন আগাগোড়া কাহিনীর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। সংলাপ বহুলাংশেই বুদ্ধিদীপ্ত ও স্মরণযোগ্য।

তা ছাড়া বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও কেউ এমন গভীর শ্রদ্ধায় বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির সাধনা করছেন—এ কথা জানতে পারলে এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যায়।

সনাতন পাঠক

মুখী দেবী প্রমুখ মনীষীদের স্মৃতি-কথা সংকলনটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। সেই সঙ্গে আছে বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র। সুসম্পাদিত ও তথ্যবহ এই সংকলনটি একটি অবশ্য সংগ্রহীতব্য প্রকাশনের পর্যায়ে পড়ে।

প্রাপ্তি স্বীকার

স্বপ্ন। গ্যুন্টার আইশ। অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। দীপায়ন প্রকাশনা : ৭২ কালীঘাট রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ৩·০০।

নীলকণ্ঠ পাখির সময়। সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। অনুভব প্রকাশনী : ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ০·৫০।

হে অগ্নিপ্রবাহ। রাম বসু। অনুভব প্রকাশনী : ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ০·৫০।

প্রতিবিম্ব। পরেশ মণ্ডল। অনুভব প্রকাশনী : ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ০·৫০।

ভ্রমর। শিশির বসু। ললমোহন দত্ত : ৯৯ জান মহম্মদ ঘাট রোড, নৈহাটি, ২৪ পরগনা।

ON THE ORIGIN OF THE NAMA-SUDRAS. by Nirode Bihari Roy. Kirti Publishing Concern : 67/A/2 Diamond Harbour Road, Calcutta-3. Price 1.25.

"অগ্নিযুগের কাহিনী" (পরিচালনা : ভূপেন রায়) : আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়

শুভলক্ষ্মী বড়ুয়ার ভরতনাট্যম

নৃত্যশিল্পী শুভলক্ষ্মী বড়ুয়ার নাম আজ আর রসিকজনের অজানা নয়। আসামের মেয়ে শুভলক্ষ্মী, নাচ শিখেছেন মাদ্রাজের বিখ্যাত "কলাক্ষেত্র" নৃত্য-প্রতিষ্ঠানে। রুক্মিণী দেবী যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান। শুভলক্ষ্মী ও তাঁর দিদি বিজয়-লক্ষ্মী প্রথমে মণিপুরের রাসবিহারী শর্মার কাছে নাচ শিখতে শুরু করেন। তাঁরা মণিপুরী ও নাগা স্টাইলের নাচে সুনাম অর্জন করেন। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লিতে সারা ভারত যুব কংগ্রেসে তাঁরা আসামের প্রতিনিধিত্ব করেন।

শুভলক্ষ্মী আজ ভরতনাট্যমের শিল্পী। কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে তিনি রসিকজন ও সমালোচকদের সামনে নেচেছেন। দর্শকদের প্রশংসাও পেয়েছেন প্রচুর। এখন শুভ-লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ চারিদিকে। ভারতের নানা স্থানে তিনি নৃত্য পরিবেশন করবেন। কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে তাঁর অনুষ্ঠান আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে।

সম্প্রতি শিল্পী কলকাতায় এসেছিলেন। সাংবাদিকদের জন্য তিনি এক ঘণ্টাব্যাপী ভরতনাট্যমের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। তিনি ভরতনাট্যমের বিভিন্ন মুদ্রা, অভিনয়, নৃত্যশৈলী ও আঙ্গিকের সঙ্গে সাংবাদিক-দের পরিচয় করিয়ে দেন। একাধিক নাচের নৃত্য তাঁর অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল। শুভলক্ষ্মীর ভরতনাট্যম আমাদের মুগ্ধ করেছে। শুভলক্ষ্মী সুন্দরী তাঁর নৃত্য-ভঙ্গি আরও সুন্দর। বিশেষভাবে উল্লেখনীয় তাঁর নৃত্যের কমনীয়তা এবং অভিনয়। শিল্পীর অভিনয় যেন সমস্ত ভাব উজাড় করে ঢেলে দেয়। তাঁর দুটি আয়ত চক্ষুর ভাষা দর্শকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। শিল্পীর পদচারণও চমৎকার। উত্তর ভারতের একটি নাচের নমুনা তিনি দেখালেন, যার পুরো কাজ পায়ের উপর। সেটি ছন্দোময় করে তুলেছেন শিল্পী। জনসাধারণ যে তাঁর নৃত্য দেখে পুলকিত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। এবং আমরা এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ যে, শুভলক্ষ্মী একদিন এ-দেশে প্রথম শ্রেণীর নৃত্যশিল্পীর মর্যাদা পাবেন।

যে ঐতিহ্যে শুভলক্ষ্মী লালিত তাতে আশৈশব শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ হওয়াই স্বাভাবিক। এই অনুরাগ তাঁর সার্থক। শুভলক্ষ্মীর পিতা প্রথম অসমীয়া চলচ্চিত্র "জয়মতী"-র নায়ক শ্রীফণী বড়ুয়া। শুভলক্ষ্মী আসামের সুগায়ক এবং বেতার

শুভলক্ষ্মী বড়ুয়া

এম পি (আসামের প্রথম গ্রামোফোন শিল্পী) শ্রী পি সি বড়ুয়ার ভ্রাতুষ্পুত্রী, এবং সংগীতাচার্য শ্রীলক্ষ্মীরাম বড়ুয়ার পৌত্রী।

পথে হল দেখা

শ্রীলেখা মুভীটোনের "পথে হল দেখা"-র মুক্তি আসন্ন। শচীন অধিকারী পরিচালিত এ ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে-ছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার, অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চ্যাটার্জি, দিলীপ রায়, ভারতী দেবী, বিপিন গুপ্ত প্রভৃতি। ছবিটি রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে তৈরী। সংগীত পরিচালনা করেছেন চিত্ত মালাকার।

চেনা-অচেনা

আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনীর ভিত্তিতে "সুয়োরাণীর সাধ" নামে যে ছবিটি তৈরী হচ্ছে, তার নাম এখন "চেনা-অচেনা"। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা সান্যাল ছবির দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী। ছায়া দেবী, বিকাশ রায়, অসিত বরণ মিত্র, দিলীপ রায়, অনুপ গাঙ্গুলি প্রভৃতি অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন। হীরেন নাগ ছবিটি পরিচালনা করছেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। দুলালী চৌধুরী চিত্র প্রযোজিকা।

এণ্টনী কবিয়াল-এর উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে "এণ্টনী কবিয়াল" নাটকটির তিন শত অভিনয় সম্পূর্ণ হয়েছে গত ২৯ জানুয়ারী। নাটকটির জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। প্রতিদিন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে "এণ্টনী কবিয়াল" অভিনীত হচ্ছে। বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত ও নান্দিক নির্দেশিত এই নাটকের প্রধান শিল্পীরা হলেন জহর গাঙ্গুলি, সবিতাব্রত দত্ত (নামভূমিকা), নেপাল দত্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, কালীপদ চক্রবর্তী, তরুণ মিত্র, কল্যাণী ঘোষ, সাধনা রায়চৌধুরী, গীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সম্প্রতিকালে "এণ্টনী কবিয়াল" নাট্যামোদী মহলে যে সাড়া জাগিয়েছে তার তুলনা বিরল। কয়েক দিনের মধ্যেই তিন শত অভিনয়ের স্মারক উৎসব সম্পন্ন হবে।

শ্যামা

রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা"র আকর্ষণ তো এমনিতেই দুর্নিবার। বৈতালিক স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয়ের "শ্যামা"তে উপরিপাওনাও ছিল যথেষ্ট। বজ্রসেনের গান গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামার গান আরতি মুখোপাধ্যায়, কোটালের দেবব্রত বিশ্বাস। তার উপর শ্যামার ভূমিকায় জ্যোৎস্না বিশ্বাস এবং বজ্রসেনের চরিত্রে নরেশকুমারের নাচ। সব মিলে রবীন্দ্র সদনে "শ্যামা" নৃত্য-নাট্য সেদিন খুবই সুখভোগ্য হয়ে উঠেছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বিশ্বাস দুই সুবিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরা ভাল গাইবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু অবাক করে দিয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। প্রতিটি গান দরদের সঙ্গে নিখুঁত গেয়েছেন তিনি। উত্তীয়র গান চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠেও চমৎকার। অভিনেত্রী জ্যোৎস্না বিশ্বাস যে এত ভাল নাচেন তা জানা ছিল না। "শ্যামা"-র নাচে তিনি দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। নৃত্যশিল্পী নরেশকুমারও সুন্দর নেচেছেন। তাঁর অভিনয় ও অভিব্যক্তি বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। কোটালদের (অচ্যুতনারায়ণ ও কেনেথ কুমার) নাচও মন্দ নয়। সখীদের সমবেত নৃত্য দুর্বল। তাঁদের নাচের সঙ্গে গানগুলিও ভাল হয়নি। একক গানে সৌরেন পাল ও বনশ্রী সেনগুপ্ত প্রশংসা পেয়েছেন। আবহসংগীতে রসবোধের পরিচয় পাওয়া গেছে। সংগীত পরিচালক সমরেশ রায় এ-কারণে বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

"শ্যামা" : জ্যোৎস্না বিশ্বাস ফটো—দেশ

চিত্রসাথী পরিচালিত চিত্রপীঠের "শেষ থেকে শুরু" ছবিতে সমীর মজুমদার ও বিদ্যা রাও

পাদপ্রদীপের আলোয়

অশান্ত বিবর ও কালো মাটির কান্না

নাট্রিক গোষ্ঠী সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গনে মঞ্চে "অশান্ত বিবর" ও "কালো মাটির কান্না" (নাট্যরচনা : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য) নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন। বিষয়বস্তু ও পটভূমি ভিন্ন হলেও নাটক দুটির প্রতিপাদ্য ও বক্তব্য এক। "অশান্ত বিবর"-এর পটভূমি শহরে। এই নাটকের কারখানার মালিক প্রায় ভিলেন। শ্রমিকদের একতা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি দিতেও তার বিবেকে বাধে না। গুণ্ডা লাগিয়ে মানুষ মেরে ফেলা, নাটকের ঘটনা দেখে মনে হয়, তার কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার।

"কালো মাটির কান্না" দর্শকদের শোনাবার চেষ্টা হয়েছে ওই একইভাবে। এখানে দেখানো হয়েছে কোলিয়ারির ম্যানেজারের অকথ্য অত্যাচার। শ্রমিকদের প্রাণের কোন মূল্যই তার কাছে নেই। বিপজ্জনক খাদে (যেখানে গ্যাস জমে উঠেছে) সে শ্রমিকদের চাবুক দিয়ে ঘড়পাটি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে। এবং আন্দোলনকারী শ্রমিকদের (তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের নেতৃত্বে) জানবার পরও যে প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করে তা-ও না। ধর্মঘট অর্থাৎ কাজে যোগ না দেওয়ার সংকল্প অবশ্য তাদের আছে। তবে আর কিছু নেই। দেশের আইন ও পুলিসের উপর বুঝি তাদের আস্থা নেই। "অশান্ত বিবর" নাটকও দেখে মনে হয়, যে-কোন অন্যায় যেন অবাধে ঘটতে পারে। তার যেন কোন প্রতিকার নেই। এর বিরুদ্ধে সব শ্রমিকদের নিষ্ফল প্রতিবাদের অতিরিক্ত আর কোন কিছুই নাটক দুটিতে দেখা যায় নি। দেশের আইন-শৃঙ্খলার উপর তাদের কোন ভরসা নেই।

মৌলিক নাটকে বিষয়বস্তুতে সমাজ-সচেতনতা থাকবে না, বলছি না। সমসাময়িক সব সমস্যারই প্রতিফলন থাকা উচিত। শ্রেণী-সংগ্রামও। কিন্তু তা নাট্যরসের ভিতর দিয়ে উপস্থিত হলে দর্শকেরা আনন্দ পান। এবং যদি যুক্তিসংগত এবং সৎভাবে বিশ্লেষণ করা হয় অর্থাৎ উভয় পক্ষেরই দোষগুণ যদি দেখানো হয় — বস্তুবত অক্ষুণ্ণ থাকে তবে চিন্তাশীল দর্শকেরও সন্তুষ্ট হবার কথা। আলোচ্য দুটি একাঙ্কে এই বাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় দুর্লক্ষ্য।

তবে নাট্রিক গোষ্ঠী শক্তিমান। কী

(সি-৯৩১৪)

(সি-৯৩৫৪)

(সি-৯৩১০)

(সি-৯৩৪২)

(সি ৯২৭৯)

অভিনয়ে, কী নাট্য পরিচালনায় তাঁরা অদ্ভুত কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। টিম ওয়ার্ক খুবই ভাল। এবং নাট্য পরিচালনাও (যথাক্রমে রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ও নিখিল ভট্টাচার্য পরিচালিত) চমৎকার। কালো মাটির কান্না-র এক বৃদ্ধ কর্মচারীর বিবেকের দ্বন্দ্ব ও পুত্র-স্নেহকে কেন্দ্র করে নাটকে কয়েকটি আবেগ-মুহূর্ত সুন্দরভাবে রচিত। তার উপর অভিনয়ের বাহাদুরি। উঁচু স্তরের অভিনয়ের জন্যই নাটক দুটি নিবিষ্ট মনে দেখা চলে। "কালো মাটির কান্না"-য় রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, রণদীপ ভট্টাচার্য, নিখিল ভট্টাচার্য, দেবীকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতির অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। "অশান্ত বিবর"-এ তুষার মজুমদার, জ্যোতি-ভূষণ মজুমদার, লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমান গুপ্ত, নির্মল চক্রবর্তী, মদন চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু দত্ত ও

অর্ধেন্দু মুখার্জি পরিচালিত "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় (দেশবন্ধু), তন্দ্রা বর্মন ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিঃসন্দেহে বর্তমান। আমার মনে হয়, এদের ভিন্নমুখী মননের মিলন সম্ভব হতে পারে মূল আবেদনের পরিবর্তন না করে (পরন্তু শিল্পের অন্য একটি মাধ্যমে যাতে সেই আবেদনই আরো তাড়াতাড়ি আরো গভীরভাবে দর্শকের শিল্পচেতনার মর্মমূলে পৌঁছে দেওয়া যায় সেইভাবে) কাহিনীর আঙ্গিকে আংশিক প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে। যেমন, বলা যেতে পারে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'। অবশ্য এই পরিবর্তন যোগ্য লোকের দ্বারাই একমাত্র সম্ভবপর। না হলে শিব গড়তে বাঁদর হয়ে যাবার ভয় আছে।

অনাগ্রহীর বেশির ভাগ রচনার সংকীর্ণ চিন্তাধারা-ফলপ্রসূত মৌলিক দিক উদ্বোধনের অভাব অনুভব করা যায়। প্রযোজক ও পরিবেশক শ্রী আর ডি বনসালের মত, দর্শকের রুচির পরিবর্তন না হলে ভালো ছবি হতে পারে না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দর্শক-রুচি পরিবর্তিত হবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ, দর্শকবৃন্দ বলতে আমরা একই রুচি, সংস্কৃতি বা কৃষ্টিসম্পন্ন একটি শ্রেণী বুঝি না; বিভিন্ন মত, রুচি, জীবনদর্শন এবং কৃষ্টিসম্পন্ন বহু একককে সমাবেশ মাত্র বুঝি। শ্রীরায় একবার বেতার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, দর্শক বলতে তিনি বোঝেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও বিভিন্ন মতাদর্শসম্পন্ন বহু Individual-এর সমাবেশ মাত্র। শুধুমাত্র এক বিশেষ শ্রেণীর লোকই যে শুধু নিম্নরুচিসম্পন্ন ছবি দেখেন তা নয়, জীবনে যারা পরিতৃপ্ত ও সুখী তাদের মন জুড়ে সাধারণত এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের বেশ বড় অংশ উক্ত ধরনের ছবির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক, শিল্পের জটিল প্রশ্ন নিয়ে তারা মাথা ঘামান না। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক হতে পরিবর্তন এলেও সব দর্শকই যে শিল্প ছায়াছবি দেখবেন তা হবে না। তা হলে যেমন বস্তু পয়সা পেত না, ইংলণ্ড এবং সারা পৃথিবীতে বিটলরা এত খ্যাতি অর্জন করতে পারত না। হয়ত এটা হবে যে শিল্পসম্মত ছবির দর্শকের সংখ্যা খানিকটা বৃদ্ধি পাবে। সেটা নিঃসন্দেহে একটি আনন্দের ক্ষণ হবে প্রথম দলের পরিচালকদের পক্ষে এবং এক নগণ্য শ্রেণীর দর্শকদের পক্ষে যারা ঐ শ্রেণীর ছবির প্রত্যাশায় সাগ্রহে দিন গুনে যায়।

পরিশেষে শ্রীশংকর দত্তের সমীক্ষার প্রশংসা করি আর ধন্যবাদ জানাই 'দেশ' কর্তৃপক্ষকে।

ইতি—

স্বপন সেন

তালপুকুর, ব্যারাকপুর

বিবিধ প্রসঙ্গ

উতকামণ্ডে রাজ কাপুরের **মেরা নাম জোকার** ছবির আউটডোর শুটিং এক দিন বন্ধ রাখতে হয়। ওখানকার সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্ররা এই হিন্দী চিত্রের শুটিং-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই প্রতিরোধ হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের অন্তর্গত। শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা রাজ কাপুরকে শুটিং চালাবার অনুমতি দেন।

মালা সিংহের বিয়ের দিন পিছিয়ে গেছে। ২৭ জানুয়ারীর পরিবর্তে শুভদিন ধার্য হয়েছে ২৩ ফেব্রুয়ারী। "অনিবার্য" কারণেই এই বিলম্ব—শ্রীমতী সিংহ সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে বলেছেন।

বিটল জর্জ হ্যারিসন বোম্বাইতে এসেছেন। ভারতীয় সংগীত টেপ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। হ্যারিসন "ওয়াণ্ডার ওয়াল" ছবির সংগীত পরিচালক। ওই ছবির জন্যই ভারতীয় সংগীতের প্রয়োজন।

লুই মাল ও ডেনাল্ড রিচি কয়েক দিন আগে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলেন। তাঁরা ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের তৈরি ছবি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। লুই মাল তাঁর আলোচনায় বুনুয়েল, ব্রেসো ও গোদারের ছবির কথা বলেন। প্রসঙ্গত তিনি সত্যজিৎ রায়ের ছবির গুণের কথা বলেন। আমেরিকায় এক্সপেরিমেন্টাল ছবি তৈরির প্রসঙ্গ বলেন ডেনাল্ড রিচি।

বিটল **রিংগো স্টার** একটি ছবিতে অভিনয় করার জন্য রোমে এসে পৌঁছেছেন। মারলোন ব্রাণ্ডো ও রিচার্ড বার্টন ছবির দুই বিশিষ্ট শিল্পী।

এ-ভি-এম-এর আগামী ছবি "দো কলিয়াঁ"-তে মালা সিংহ ও বেবী সোনিয়া

অরণ্যদেব লী ফক

সমুদ্রে যারা ডাকাতি করত, তাদের বলা হত জলদস্যু। জাহাজে হানা দিয়ে তারা লুটপাট করত, মানুষ মারত। ভারী নিষ্ঠুর ছিল তারা।

PURSER

সব তৈরী ?

গত ১৫ই জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন গড়ে উঠেছে। কংগ্রেস দলের ৬ জন এই মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছেন। তাঁরা হলেন—[illegible], ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীবিজয় সিংহ নাহার, শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ, শ্রীবিনোদচন্দ্র [illegible] ও শ্রীআবদুস সাত্তার। মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের যোগদানের ফলে দপ্তরগুলিও পুনর্বণ্টিত হয়েছে। কংগ্রেস পক্ষের মন্ত্রিগণ রাজভবনের সিংহাসন কক্ষে ঐদিন অপরাহ্নে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ করেন। মন্ত্রগুপ্তির শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর।

নতুন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ১৮ জানুয়ারি নতুন ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর মনোনীত যে ১৩জন সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে নবাগত ৫জন। পুরাতনদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম—শ্রীঅতুল্য ঘোষ। অবশ্য একে বাদ দেবার জন্য কংগ্রেস সভাপতির উপর নানা মহল থেকে চাপ পড়েছিল বলে শোনা যায়। নতুন কমিটিতে শ্রীদিনেশ সিং নেই এমন কি পুরাতন সদস্য শ্রীগুলজারিলাল নন্দও নেই। শ্রীঘোষ আর কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ থাকবেন না, শ্রী এস কে পাতিল কোষাধ্যক্ষ হলেন। কংগ্রেস সভাপতি সহ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সংখ্যা একুশ জন।

দেশী সংবাদ

১৫ জানুয়ারি—গত ২২ নভেম্বর ময়দানে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পুলিসের মারপিট এবং দুজন প্রাক্তন মন্ত্রী ও কয়েকজন বামপন্থী নেতাকে আহত করার অভিযোগ করে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি কলকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার শ্রী এস বসুর বিরুদ্ধে যে আবেদন করেছেন সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী পি সি চক্রবর্তীর আদালতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে।

পশ্চিম বাংলায় পি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙন ধরেছে—এই গুজবের পটভূমিকায় আজ কংগ্রেস পক্ষের ছয়জন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন। [illegible] রাজভবনের সিংহাসন কক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে নতুন মন্ত্রীদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ-বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর।

১৬ জানুয়ারি—বিহারের পূর্বতন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে বি সহায় ও অন্যান্য পাঁচজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য বিহার সরকার আয়ার কমিশন গঠন করেছেন। সেই কমিশনের কাছে পেশ করার জন্য রাজ্য সরকার অভিযোগ তালিকা এখন পাকাপাকিভাবে স্থির করেছেন। অভিযোগের সংখ্যা ১১২।

আজ কলকাতায় আই সি এ প্যাভেলিয়নে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের রজত জয়ন্তী উৎসব সভায় বক্তৃতাকালে বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রী জি ডি বিড়লা দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে বলেন। এই সমস্যার সঙ্গে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা জড়িত মন্তব্য করে তিনি বলেন, সরকার যদি কর্মের সংস্থান করতে না পারেন তা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

১৭ জানুয়ারি—আজ রাজ্যের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রথম দিনের বৈঠকে স্থির হয়, এখন থেকে দৈনিক ৫ হাজার টন করে চাল সংগ্রহের চেষ্টা করা হবে। মন্ত্রিসভার মতে এই হারে চাল সংগৃহীত হলে মোট সংগ্রহ ৭ লক্ষ টন পৌঁছানো সম্ভব হবে। বর্তমানে দৈনিক সংগ্রহের পরিমাণ ৮ হাজার ২ শত ২৯ টন।

আজ কলকাতায় যুক্ত ফ্রন্ট-এর প্রতিনিধি সম্মেলনে শ্রীজ্যোতি বসু ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হলেও ফ্রন্ট তা চলতে দেবে না। কারণ, সভা চলতে দিলে তা হবে "কাপুরুষতা" এবং ফ্রন্টের

আন্দোলনের দল ও নিজেদের প্রতি প্রবঞ্চনা।"

১৮ জানুয়ারি—বিহার বিধানসভার বিরোধী দলপতি শ্রীমহেশপ্রসাদ সিংহের (কং) অনুরোধ উপেক্ষা করে রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো আজ বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দেন। রাজ্যপাল আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলপতি শ্রীসিংহ দাবি করেন, বর্তমান মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু দলে পরিণত হয়েছে। এই ভাষণ না দেওয়ার জন্য তিনি রাজ্যপালকে অনুরোধ করেন।

১৯ জানুয়ারি—আজ দুর্গাপুরে [illegible] বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন উপলক্ষে বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস লাঠি চালায়। লাঠি ও গুলির আঘাতে একজন মজুরের মৃত্যু সহ আহত ৩৩ জন আহত হয়েছেন। বেসরকারী সূত্রে জানা যায় যে, পুলিস ১৭ রাউন্ড গুলি চালায়। পুলিস ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বিহার বিধান পরিষদে আজ মন্ত্রী ও সদস্যগণ সবরকম শালীনতা বিসর্জন দিয়ে পরিষদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় চরম ব্যর্থতার জন্য সরকারের নিন্দা করে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় এই হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। এই হট্টগোলের মধ্যে পরিষদে বেসরকারী অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিষদে ক্ষমতাসীন যুক্ত ফ্রন্ট দল সংখ্যালঘু।

২০ জানুয়ারি—পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস নেতা ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ আজ দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সম্প্রতি ঐ রাজ্যে সংগঠিত কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পত্তন ঘটানোর জন্য শ্রীআশুতোষ ঘোষ এম এল সি যে তৎপরতা চালিয়েছিলেন, তা রাজধানীর উঁচু মহলের কারও বা কয়েকজনের অভিপ্রায়প্রসূত।

২১ জানুয়ারি—জানা গিয়েছে যে, দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানায় ক্রমবর্ধমান অশান্তির জন্য কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রণালয় এই কারখানার পরিচালনভার একজন সামরিক অফিসারের হাতে ন্যস্ত করছেন। এই অফিসারের নাম [illegible] ওবেরয়। এই প্রথম একজন সামরিক অফিসারকে সরকারী ইস্পাত কারখানার উচ্চতম পদে নিয়োগ করা হচ্ছে।

খড়্গপুরের কাছে বি টি রোডে আজ সন্ধ্যায় একটি যাত্রিবাহী বাস দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়। আহত হয় ৫০ জন। এদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার পর বাসের চালক পালিয়ে যায়। দুজন কনডাক্টর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বিদেশী সংবাদ

১৫ জানুয়ারি—ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার নানা স্থান থেকে আজ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংবাদ আসে। ভূমিকম্প, ঘূর্ণিবাত্যা, তুষারঝড়, দাবানল কিছুই বাদ যায়নি। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ পশ্চিম সিসিলির সংবাদ। সেখানে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এ-পর্যন্ত কয়শত লোকের মৃত্যু ঘটেছে। ব্রিটেনে ঘূর্ণিবাত্যায় অন্তত ১৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন স্থানেও তুষারঝড় বা দাবানলে জীবননাশ ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা প্রচুর।

১৬ জানুয়ারি—দুজন পূর্বতন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সমেত আটজন বিশিষ্ট ব্যক্তির এক কমিটি গতকাল বলেছেন, ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বিরতির জবাবে হ্যানয়কেও থামতে হবে। শান্তি আলোচনার জন্য উত্তর ভিয়েতনামের পূর্বশর্ত—বোমাবর্ষণ থামাতে হবে।

১৭ জানুয়ারি—মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালা রাষ্ট্রে আজ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। গুয়াতেমালার মার্কিন সামরিক মিশনের প্রধানকে নিয়ে ৫ জন নিহত হওয়ায় সারা দেশে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা শুরু হওয়ায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

১৮ জানুয়ারি—ভিয়েতনামের যুদ্ধ [illegible] থামছে না, বরং বাড়ছে, [illegible] জনকল্যাণের কাজকর্ম—আজ মার্কিন কংগ্রেসের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে জনসনের 'স্টেট অব দি ইউনিয়ন' ভাষণের এইটি হলো মূল কথা। প্রেসিডেন্টের ভাষণ টেলিভিশনে সারা দেশে প্রচারিত হয়।

১৯ জানুয়ারি—করাচির সংবাদে প্রকাশ, জাতীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কারণ, পাকিস্তান সরকার সন্দেহ করেন তিনি গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র পরিচালনা করছিলেন।

২০ জানুয়ারি—পেন্টাগনের অফিসারেরা আজ ওয়াশিংটনে বলেন, বোমা বর্ষণকারী একটি বি—৫২ বিমানের উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের জন্য গড়ে প্রায় ৬০ হাজার ডলার খরচ হয়। উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার প্রশ্নের সঙ্গে যুদ্ধের বাড়তি খরচের সংখ্যাটা জড়িত রয়েছে।

২১ জানুয়ারি—তিব্বতীদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও চীন নেপাল, সিকিম, ভুটান, নেপাল ও ভারত সীমান্ত এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী সড়ক নির্মাণের কাজ ক্রমশ অগ্রসর হয়ে চলেছে। আর সেই সব রাস্তাই সীমান্ত এলাকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ভুটানে আগত কয়েকজন তিব্বতী উদ্বাস্তুর কাছ থেকে এই সংবাদ জানা গিয়েছে।